অমৃত

ত্রৈমাসিক সূচীপত্র

১১শ বর্ষ : ২য় খণ্ড Acc No. 7405

শুক্রবার : ২০শে শ্রাবণ ১৩৭৮—১৮ই কার্তিক, ১৩৭৮ 9.7.2.74

Friday : 6th August 1971 — 5th November 1971.

অমৃত

আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে

ভেবে দেখুন

আপনার মনের সাধ, ছোটবেলা থেকেই ছেলে পড়াশোনায় ভালো হ'ক। আপনি চান তার সব চাহিদা পূরণ ক'রে তাকে মানুষ ক'রে তুলতে। কিন্তু এখনই পিঠোপিঠি যদি আর একটি এসে পড়ে, সবদিক সামলে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়?

সারা দুনিয়ায় কোটি কোটি দম্পতি তাই করছেন। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পরেরটির কথা তাঁরা ভাবছেনই না। নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরোধ হ'ল, সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে প্রিয়, রবারের জন্মনিরোধক. নিরাপদে ও সহজে ব্যবহার করা যায় ব'লে জন্মনিরোধের জন্যে বহুকাল ধরে লোকে নিরোধ ব্যবহার ক'রে আসছেন। আপনি নিরোধ ব্যবহার করুন না?

সরকারী অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় 3 টি নিরোধ পাওয়া যায়

আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন

লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, সহজে ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ রবারের জন্মনিরোধক

মনোহারী দোকান, মুদীর দোকান, কেমিস্টের দোকান প্রভৃতি সর্বত্র পাওয়া যায়

১২শ বর্ষ
২য় খণ্ড

১৪শ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
ডাক—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday, 4th August, 1972 শুক্রবার, ১৯ শ্রাবণ, ১৩৭৯ .52 Paise

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রদীপ দাশ

এক নজরে

লাখ টাকার বন্দী :

হিটলারের একদা সঙ্গী রুডলফ হেসের ৭৮ বছর বয়সের মধ্যে ৩১ বছর জেলে অতিক্রান্ত হল। হিটলারের শান্তি প্রস্তাব নিয়ে হেস ১৯৪১ সালে প্যারাশুটের সাহায্যে ইংলণ্ডে অবতরণ করা মাত্র গ্রেপ্তার হন। তারপর ছ' বছর তিনি ইংলণ্ডেই বন্দী ছিলেন। পরে নুরেমবার্গের বিচারে অন্য নাৎসী নেতাদের মৃত্যুদণ্ড হলেও হেস রক্ষা পান এবং তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়। সেই আদেশ অনুসারে ১৯৪৭ সালে হেসকে পশ্চিম বার্লিনের স্প্যাণ্ডো জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। তারপর থেকে গত পঁচিশ বছর হেস সেখানেই বন্দী হয়ে আছেন। স্প্যাণ্ডো জেল চতুঃশক্তির সৈন্য দলের প্রহরাধীন। একত্রিশ বছর বন্দী থাকা হয়ত বন্দীদশার ব্যাপারে কোন নতুন রেকর্ড নয়। কিন্তু হেস যে এখন বিশ্বের সর্বাধিক মূল্যবান বন্দী তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্প্যাণ্ডো জেল ৬০০ বন্দী থাকার জন্য নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু গত ছয় বছর ঐ জেলে হেস ছাড়া আর কোন বন্দী নেই। আর ঐ একজন বন্দীকে পাহারা দিতে সেখানে বৃটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সৈন্যদল অবস্থান করছে; তাছাড়া জেলের অসামরিক প্রশাসন ত আছেই। এই আড়ম্বর ব্যবস্থার জন্য চতুঃশক্তির প্রতি বছর ব্যয় হচ্ছে আড়াই লক্ষ ডলার, অর্থাৎ প্রায় উনিশ লক্ষ টাকা। আর এখনও পর্যন্ত যা ব্যবস্থা তাতে হেসের জীবদ্দশায় ঐ ব্যয় হ্রাস পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ পশ্চিমী শক্তিবর্গ হেসকে মুক্তি দেওয়ার পক্ষপাতী হলেও সোভিয়েট ইউনিয়ন সে প্রস্তাবের বিরোধী। সোভিয়েট ইউনিয়নের আশঙ্কা, হেসকে মুক্তি দিলে হিটলারের ঐ পার্শ্বচরকে ঘিরে জার্মানির চরম দক্ষিণপন্থীরা আবার একটা অভ্যুত্থানের চেষ্টা করবে।

মৃত্যুর অধিক শাস্তি : যে মানুষ বারবার মৃত্যুদণ্ডের প্রার্থনা জানিয়েছে, আত্মহত্যার জন্য একটা রিভলবার বা কোন ধারালো অস্ত্র পেতে বারবার আকুল প্রার্থনা জানিয়েছে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা নিঃসন্দেহে মৃত্যুর চেয়েও কঠিন শাস্তি। ইস্রায়েলের সামরিক আদালত এমনই এক শাস্তি দিয়েছেন জাপানী সন্ত্রাসবাদী যুবক কোজো ওকামোতোকে। মাসখানেক আগে তেল আবিভ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রীদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে যে তিনজন জাপানী সন্ত্রাসবাদী শতাধিক ব্যক্তিকে হতাহত করে, তাদের মধ্যে দুজন ঘটনাস্থলেই প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু ওকামোতো আত্মহত্যার সুযোগ পায় না, তার আগেই নিরাপত্তাবাহিনীর লোকেরা তাকে ধরে ফেলে। কিন্তু ধরা পড়ার পর ওকামোতো কারও কাছে কোন স্বীকারোক্তি করে না, শুধু যখন যে পুলিশ কর্মচারীকে দেখতে পায় তার কাছেই সে আত্মহত্যার সুযোগ প্রার্থনা করে। একজন পুলিশ অফিসার অবশ্য তাকে স্বীকারোক্তির বিনিময়ে তাকে আত্মহত্যার সুযোগ দেবেন বলে প্ররোচিত করেন। কিন্তু ওকামোতোকে সে প্রস্তাবে সম্মত করানো সম্ভব হয়নি। তারপর আদালতে দাঁড়িয়েও সে বিমান-বন্দরে হত্যাকাণ্ডের পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে মৃত্যুদণ্ডের প্রার্থনা জানায়।

ওকামোতোকে যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি তার প্রধান কারণ ইস্রায়েলে এখন একমাত্র নাৎসি যুদ্ধাপরাধী ছাড়া আর কারও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে বিচারকরা বোধহয় একথাও ভেবেছিলেন যে, ঐ সন্ত্রাসবাদীকে মৃত্যুদণ্ড দিলে প্রকৃতপক্ষে তার ইচ্ছা পূরণই করা হবে, সেটা তার অপরাধের শাস্তি হবে না। সারা বিশ্বেরই একথা জানা আছে যে একজন জাপানীর কাছে হারাকিরি প্রায় অন্ন গ্রহণের মতোই স্বাভাবিক ঘটনা। তাই অন্য সকলের ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মৃত্যুদণ্ডের তুলনায় কম শাস্তি হলেও একজন জাপানীর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে একজন জাপানী সন্ত্রাসবাদীর ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডই অধিক শাস্তি। একটি ধিক্কৃত ভর্ৎসিত জীবনের বোঝা অনির্দিষ্টকাল ধরে বইতে হবে —এইটাই এখন ওকামোতোর পক্ষে সবচেয়ে বড় শাস্তি।

দুর্ঘটনা প্রতিরোধক গাড়ি : প্রতি দশটি মোটরগাড়ির দুর্ঘটনার মধ্যে নয়টি ঘটে চালকের ত্রুটির জন্য। অত্যধিক দ্রুতগতি, বেপরোয়া মনোভাব, অনবধানতা, মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি কারণে সাধারণত গাড়ির চালকরা বিপদ ডেকে আনেন। কিন্তু এসব ত্রুটি স্বভাবজাত, সুতরাং উপদেশ দিয়ে তার প্রতিকার হওয়া সম্ভব নয়; একটু অন্যমনস্ক হলেই চালকরা তাঁদের স্বভাব-জাত ত্রুটির প্রভাবাধীন হন। এ সকল কারণে বিজ্ঞানীরা এখন গাড়িকে দুর্ঘটনা থেকে রক্ষার দায়িত্ব গাড়ির উপরেই ন্যস্ত করার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করছেন। প্রত্যেক গাড়িতে এমন এক 'ইলেকট্রনিক ওয়াচম্যান' রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে যা গাড়ির চালকের মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর না করে গাড়ি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়ামাত্র আপনা থেকে গাড়িকে থামিয়ে দেবে।

প্রায় দু বছরের চেষ্টায় কয়েকজন বৃটিশ বিজ্ঞানী এ ব্যাপারে অনেকটা সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন বলে জানতে পারা গেছে। তাঁরা যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করছেন তাতে গাড়ি চালানোর ব্যাপারটাই হবে স্বয়ংক্রিয় এবং রাডার নিয়ন্ত্রিত। চালকের ভূমিকা তাতে সামান্যই থাকবে। 'ইলেকট্রনিক ওয়াচম্যানে'র সতর্ক দৃষ্টি থাকবে গাড়ির গতি, প্রতিটি যন্ত্রপাতি এবং রাস্তার দিকে। আর অস্বাভাবিক বা অবাঞ্ছিত কিছু ঘটার আগেই গাড়ি আপনা থেকে থেমে যাবে।

বলা বাহুল্য, এ পরীক্ষা সফল হলে পথ দুর্ঘটনা ও মানুষের জীবনের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে। পশ্চিমের শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলিতে এখন পথ দুর্ঘটনায় প্রায় এক-দশমাংশ লোকের মৃত্যু হয়।

পর্যটকরা আবার আসছেন : কেন্দ্রীয় সরকারের অসামরিক বিমান পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ করণ সিং একটি আশার কথা শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পর্যটক সংখ্যা হঠাৎ দ্রুতগতিতে বাড়তে আরম্ভ করেছে, এবং কলকাতাতে বাড়ছে সবচেয়ে দ্রুত হারে। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, এ হার যদি অব্যাহত থাকে তবে ১৯৭৮ সালে ৮ লক্ষ এবং ১৯৮০ সালে দশ লক্ষ পর্যটক আগমনের লক্ষ্য অবশ্যই পূরণ হবে। সুতরাং পর্যটন ব্যবসায়কে ভিত্তি করে এদেশের হোটেল সংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্যপ্রক্রিয়নের কারখানা বৃদ্ধি, বহু লোকের কর্মসংস্থান ও সর্বোপরি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের যে লক্ষ্য ভারত সরকারের আছে তা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে।

আসলে পর্যটকরা হলেন বসন্তের দূত কোকিলের মতো। কোকিল যেমন বর্ষায় আসে না, পর্যটকদেরও তেমনই রাজনৈতিক অশান্তি ও অস্থিরতার মধ্যে তাঁদের আশা করা চলে না।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

শিক্ষা নিয়ে নতুন চিন্তা

কয়েক বৎসর ধরেই শিক্ষাবিদদের মনে এই চিন্তা দেখা দিয়েছে যে, আমাদের বিদ্যালয় ও কলেজে যে পাঠক্রম চালু করা হয়েছে তা সত্যি সত্যিই বাস্তব অবস্থার উপযোগী কি না। শিক্ষাব্যবস্থার মূল দায়িত্ব রাজ্য সরকারসমূহের। কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার জন্য অর্থসাহায্য করেন। কিন্তু রাজ্যের শিক্ষার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। তাই সারা ভারতে একই রকম শিক্ষাক্রম চালু করার কোনো ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। একমাত্র বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং শিক্ষাবিদগণ একমত হলেই শিক্ষাক্রমে সর্বভারতীয় ঐক্য আনা সম্ভব। আমাদের পশ্চিমবাংলায় শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুদিন যাবৎ একটা অস্থির আবহাওয়া চলছে। ছাত্র বিক্ষোভ, পরীক্ষায় গন্ডগোল, গণ টোকাটুকি ইত্যাদি শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। শিক্ষাবিদরা এখন ভাবতে শুরু করেছেন যে, ছাত্রদের ওপর যে বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বর্তমান অবস্থায় তা সুষ্ঠুভাবে বহন করার ক্ষমতা তাদের আছে কিনা।

এই প্রসঙ্গেই বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে বিভিন্ন মহলে। আগে ছিল দশ ক্লাশের ইস্কুল, দু বছরের ইণ্টারমিডিয়েট এবং দু বছরের ডিগ্রী কোর্স। এই মোট চৌদ্দ বছরের শিক্ষাক্রমকে পরে পরিবর্তন করে এগারো ক্লাশের ইস্কুল এবং তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করা হয়। এখন দেখা যাচ্ছে এগারো ক্লাশের ছাত্রছাত্রীদের কচি মাথায় অনেক বেশি বিদ্যা ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টার ফলে সেখানে ব্যর্থতা বাড়ছে। ছেলেমেয়েরা সব হজম করতে পারছে না। এবং ইস্কুলগুলোতেও পড়াবার মান পাঠক্রমের অনুযায়ী নয়। তার ফলে পরীক্ষার্থীরা কোনোরকমে পাশ করার জন্য উদগ্রীব। কলেজে ঢুকে তারা আর থৈ পায় না। তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স তাদের কাছে দুর্বহ ও দুর্বোধ্য ঠেকে। পড়াশোনার চেয়ে যে কোনো উপায়ে একটা ডিগ্রী পাবার জন্য তারা সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এতে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। গত কয়েক বৎসর ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অবস্থা চলছে তার দিকে নজর দিলেই এর সত্যতা যাচাই করা যাবে।

কীভাবে এই জটিল অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে আসল প্রশ্ন। দশ ক্লাশের ইস্কুল, দু বছর ইণ্টারমিডিয়েট এবং দু বছর ডিগ্রী কোর্সের পুরনো প্রথায় বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ফিরে গেছে। পশ্চিমবাংলার শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন যে, শিক্ষাক্রম অদলবদলের কথা তাঁরাও ভাবছেন। শিক্ষাসম্পর্কিত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির প্রস্তাব হল, বিদ্যালয়ে দশ ক্লাশে ফিরে যাওয়া হক। তারপর প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় দু বছর এবং তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স। এতে অবশ্য শিক্ষাক্রম এক বছর বেড়ে গেল। আগে যেখানে একজন ছাত্র চৌদ্দ বছর পরে কলেজ থেকে বেরোতে পারত, প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রমে সেখানে তার লাগবে পনেরো বছর। এতে শিক্ষাবিদ মহলে আপত্তি উঠবে। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাক্রম যে অকেজো হয়ে গেছে এ বিষয়ে প্রায় সকল মহলেই একমত।

মোটকথা শিক্ষাক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন আনা দরকার, শিক্ষাবিদ, ছাত্র এবং শিক্ষানুরাগী মহল এটা অনুভব করছেন অনেকদিন থেকেই। শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ ফিরিয়ে আনতে হলে শিক্ষাসংস্কার অপরিহার্য। শিক্ষা নিয়ে অনেক পরীক্ষা হয়েছে এতদিন। কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা কমিশন বসিয়েছিলেন এবং তার রিপোর্টও সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু সরকার অন্যান্য কাজে এত ব্যস্ত এবং বিব্রত যে, শিক্ষাসংক্রান্ত সুপারিশ বছরের পর বছর অপেক্ষা করে থাকে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য। কিন্তু আর বোধহয় এভাবে শিক্ষার সমস্যাকে ফেলে রাখা উচিত হবে না। কারণ এর সঙ্গে দেশের যুব সমাজের ভবিষ্যৎ জড়িত। যুব সমাজকে প্রকৃতপক্ষে জীবন সংগ্রামের উপযোগী করে গড়ে তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। তার পাঠক্রমও হওয়া উচিত আধুনিক জীবনের উপযোগী। তার জন্য শিক্ষাক্রম সংস্কার সিলেবাস সংস্কার এবং পরীক্ষাপদ্ধতির পুনর্বিন্যাস অবশ্য প্রয়োজন। এ সম্পর্কে শিক্ষাবিদদের অবহিত হবার সময় এসেছে।

পটভূমি

"পূজোর প্রাক্কালে অভিনব আকর্ষণ"—ঠিক এই ধরনের বিজ্ঞাপন অবশ্য প্রচারিত হয়নি, কিন্তু ঐ সময়ে পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক আসর যে বেশ জমজমাট হয়ে উঠবে সেটা অনুমান করা কঠিন নয়; তার কারণ ক্ষমতাসীন দল এবং বিরোধী পক্ষ উভয়েই আন্দোলন শুরু করার কথা ঘোষণা করেছেন। প্রথম ঘোষণাটা আসে অবশ্য বিরোধী পক্ষ, প্রধানতঃ মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির তরফ থেকে। তারপর কংগ্রেস দলের তরফ থেকেও সেপ্টেম্বরে আন্দোলন শুরু করার কথা বলা হয়েছে।

এই আন্দোলনের ঘোষণার পর দুটো কথা প্রথমেই মনে হচ্ছে। একটা হলো, বিরোধী পক্ষ যে ধরনের আন্দোলনের কথা ভাবছেন সেই ধরনের আন্দোলনের পক্ষে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসটাই বোধ হয় সবচেয়ে প্রশস্ত। এই সময়টাই জিনিসপত্রের দাম সবচেয়ে চড়ে। বাজারে খাদ্যশস্য বেশি পাওয়া যায় না। নতুন চাল বাজারে আসে না, অথচ আগের ফসলের চালের চালান বন্ধে আসে। জানি, এই রাজ্যে বোরো ধানের চাষের ফলন শুরু হওয়ার পর অবস্থা সামান্য পাল্টেছে কিন্তু এখনও এখানে প্রধান ভরসা আমন। সেই ধান উঠতে এখনও বাকি থাকে। এ বছরে তো আবার প্রচণ্ড খরায় বোরো এবং আউশ, দু-ধরনের ধানের চাষ মার খেয়েছে। ফলে চালের বাজার চড়তে শুরু করেছে। সুতরাং দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হলে আগস্ট-সেপ্টেম্বরই প্রশস্ত। ১৯৫৯ সালের সঙ্গে ১৯৭২ সালের খাদ্য অবস্থার কোনো তুলনাই হয় না, তবু স্মরণ করা যেতে পারে যে ঐ আন্দোলনও আগস্ট মাসেই হয়েছিল।

দ্বিতীয় কথাটা হলো, পশ্চিম বাংলায় এই ধরনের আন্দোলন অনেক দিন হয়নি। এই ধরনের শেষ বন্ধ হয় গত বছরের অক্টোবর মাসে। সেই বন্ধই শেষ বন্ধ হয়ে দাঁড়ালো, কেন না, তার ব্যর্থতা সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সেই বন্ধ ডাকার পিছনে অবশ্য অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া ছিল না। ১৩ জন সরকারী কর্মচারীকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদেই ঐ বন্ধ ডাকা হয়েছিল। ঐ বন্ধকে ঠিক আন্দোলনের পর্যায়ে ফেলা যায় না। ঐ সময় বামপন্থী নেতারা প্রায়ই শোনাতেন যে, বন্ধ ছাড়া প্রতিবাদ জানাবার আর কোনো পথ নেই। তাঁরা অবশ্য বোঝাতে চাইতেন যে, সরকারী দমননীতিই আন্দোলন গড়ে তোলার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। কিন্তু দলীয় সংঘর্ষ ও খুনোখুনির রাজনীতির যে ঐতিহ্য ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছিল সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে আসল বাধা। গত বছরেও জিনিসপত্রের দাম চড়েছিল। যুব কংগ্রেস তার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহও শুরু করেছিল। সরকারের আধা-ফ্যাসিস্ত দমন-নীতির কথাও কম শোনা যায় নি। তবু কিন্তু বামপন্থীরা কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন নি। বন্ধই যখন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন অন্ততঃ আর-এস-পি'র পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, শুধু বন্ধে কোনো কাজ হবে না, আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভের কথা ভাবতে হবে। কিন্তু সেই প্রস্তাবে অন্যান্য বামপন্থী দল কোনো উৎসাহ দেখায় নি এমনকি সি পি এমও নয়।

•

শুধু নির্বাচনী কারচুপির অভিযোগ তুলে থেকে গেলেই যে চলবে না, সি-পি-এম এই সিদ্ধান্তে আসে গত মে মাসে। তাই তখনই রাজ্য কমিটির বৈঠকে গৃহীত হয় আন্দোলনের কর্মসূচী। সেই কর্মসূচী ছিল পাঁচ-দফা—গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্যে আন্দোলন; বর্গাদার উচ্ছেদ ও জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ; বন্ধ কারখানা খোলার দাবি, চাকরির নিরাপত্তা ও শ্রমিকদের ওপর গুণ্ডাদের আক্রমণ বন্ধের দাবীতে সভা-সমাবেশ; বেকারির বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন এবং শিক্ষা-বাঁচাও আন্দোলন। সি-পি-এম গত সপ্তাহে যে কর্মসূচী ঘোষণা করেছে তার মধ্যেও এইসব দাবী আছে। তাছাড়া নতুন কয়েকটিও যুক্ত হয়েছে। যেমন, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের অতিরিক্ত খাজনা মকুবের দাবী।

যে মাসে আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হলেও কিন্তু সি-পি-এম সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনে নামে নি। তার কারণ তখন সামনেই ছিল পার্টির নবম কংগ্রেস। সেই সম্মেলনে হাওয়া কোন্ দিকে বয় তা না দেখে আন্দোলনে নেমে পড়া সম্ভব ছিল না। পার্টি যে আত্মগোপন করছে না এবং সশস্ত্র বিপ্লবের পথে যাচ্ছে না সে-বিষয়ে ঐ সম্মেলনের পর আর কোনো সন্দেহ থাকে না। তাছাড়া শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে পার্টির নবম কংগ্রেস থেকে সরাসরি ডাকও দেওয়া হয়েছে। সম্মেলনের শেষে পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুন্দরাইয়া নিজেই বলেছিলেন যে, আলাপ-আলোচনার মধ্যে যে কথাটা সবচেয়ে বড় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তা হলো, গণতান্ত্রিক পথে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা।

সি পি এমের নবম কংগ্রেসের পর কলকাতায় বামপন্থী ফ্রন্টের যে-সভা হয় সেখানেও এই ধরনের আন্দোলনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বিধানসভা বর্জনের প্রশ্নে ফ্রন্টের কোনো কোনো শরিকের মধ্যে যে মতবিরোধের কথা আর গোপন নেই সেটা এখনও মেটে নি। আর-এস-পি ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদের এ-বিষয়ে এখনও কোনো কথা দেয় নি, কারণ দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের আগে কোনো কথা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভবও নয়। এ-বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও বিধানসভার বাইরে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা সম্পর্কে কোনো দ্বিমত দেখা দেয় নি। ফ্রন্টের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে বলা হয় যে, কংগ্রেস সরকার পশ্চিমবঙ্গের কোনো সমস্যাই সামলাতে পারছেন না। সরকারের ব্যর্থতার ফিরিস্তি নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশের সিদ্ধান্তও করা হয়েছে।

এই আন্দোলন শেষপর্যন্ত কতোটা সফল হবে, সরকার কিভাবে তার মোকাবিলা করবেন সেসব ভবিষ্যতের প্রশ্ন। সি পি এম যেখানে সভা-সমাবেশ করবে কংগ্রেসও সেখানে পাল্টা সভা-সমাবেশ করবে, একথা ঘোষণা করেছে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নিজে। সেটা হবে দলীয় ভিত্তিতে আন্দোলনের মোকাবিলা। এই ধরনের মোকাবিলার চেষ্টা কোনো নতুন অশান্তি ডেকে আনবে কিনা সেটাও ভবিষ্যতের প্রশ্ন।

আপাতত একটি প্রশ্ন বিবেচনা করা যাক। বামপন্থীদের এই আন্দোলন কিভাবে পরিচালিত হবে? এখানে আমি এই আন্দোলনের চেহারা কি হবে ঠিক সেই প্রশ্ন তুলতে চাইছি না। সেটার আভাস সি-পি-এম এবং অন্যান্য বামপন্থী নেতারা কিছু কিছু দিয়েছেন। আমি এখানে জানতে চাইছি, এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি হবে—শুধুই সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ গড়ে তোলা অথবা সেই আন্দোলনের সুযোগে কোনো বিশেষ দলের শক্তিবৃদ্ধি করা?

হয়ত এই প্রশ্ন তোলার এখন সময় নয়, কিন্তু তবু প্রশ্নটা যে উঠছে তার কারণ সি-পি-এমের নবম কংগ্রেসের আলাপ-

আলোচনার এই প্রসঙ্গ উঠেছে। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের পর এই প্রথম পার্টির কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হলো। সুতরাং সেখানে কেরল ও পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রন্টের শাসনকালের অভিজ্ঞতার কথা স্বাভাবিকভাবেই উঠেছিল। যুক্তফ্রন্টের ভাঙনের জন্য নিজেদের পার্টিকে প্রকাশ্যে দায়ী করা চলে না, কিন্তু আভাসে-ইঙ্গিতে অনেকেই এমন কথা বলেছেন যে সি-পি-এমের দলীয় শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা ফ্রন্টের ভাঙনের অন্যতম কারণ। পার্টির অন্যান্য কংগ্রেসে যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে সেগুলি কার্যকর করতে গিয়ে সি পি এম পশ্চিম বাংলায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার চেয়ে দলীয় শক্তিবৃদ্ধির দিকেই নজর দিয়েছে বেশি, এমন কথাও বলেছেন কেউ কেউ।
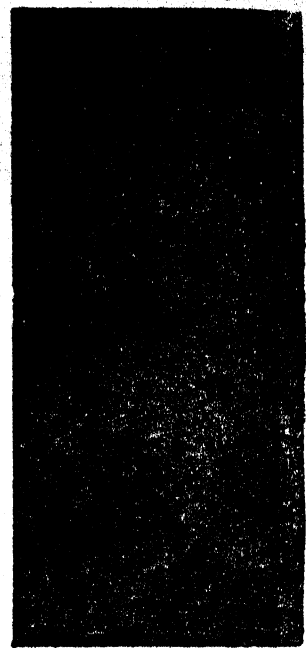
পার্টি কংগ্রেসে যে রাজনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে সেখানেও কিন্তু এই প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সেখানে বলা হয়েছে, গণ-আন্দোলনের মধ্যে যেসব দল, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে তাদের প্রতি আমাদের দলকে 'উপযুক্ত রাজনৈতিক মনোভাব' দেখাতে হবে। প্রস্তাবের এই অংশ থেকে অনায়াসেই মনে করা চলে যে পার্টি এযাবৎ এই উপযুক্ত মনোভাব' দেখাতে পারে নি। কেন পারে নি? প্রস্তাবের অপর একটি অংশে যে কথা বলা হয়েছে, তা থেকে এই কারণটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানে বলা হয়েছে যে, এককভাবে দলের শক্তিবৃদ্ধির চেয়ে শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মিলিত আন্দোলন অনেক বেশি জরুরী। অর্থাৎ নিজের দলের শক্তিবৃদ্ধি করতে গিয়ে সি-পি-এম গণ-আন্দোলনের যে ক্ষতি করেছে ভবিষ্যতে যেন সে ধরনের ভুল আর না করা হয়, সেই জন্যেই এই সতর্কবাণী।

ভুল মানুষ মাত্রেই করে, পার্টি মাত্রেই করে। কিন্তু সেই ভুল বুঝতে পারার ক্ষমতা সকলের থাকে না। মাদুরাই কংগ্রেসের প্রস্তাব থেকে মনে হয় সি-পি-এম তার নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে এবং প্রকারান্তরে সেই ভুল স্বীকারও করেছে। এখন কথা হলো, কাগজে কলমে 'সঠিক রাজনৈতিক মনোভাব' গ্রহণের কথা স্বীকৃত হলেও কাজে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে?

আজ সি-পি-এম ছাড়া অন্যান্য বামপন্থী দল সি-পি-এমের ছত্রছায়ায় ফ্রন্ট তৈরি করলেও এবং ফরওয়ার্ড ব্লক সেই ফ্রন্টের সঙ্গে মাখামাখি করলেও ১৯৭০ সালে যুক্তফ্রন্টের আমলের শেষের দিকে অবস্থা ছিল সম্পূর্ণই অন্যরকম। তখন সি-পি-আই তো বটেই, এমনকি এস-ইউ-সি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকও সি পি এম-বিরোধী আট পার্টির জোট তৈরি করেছিল। সি-পি-এম সম্পর্কে তাদের মোহভঙ্গের প্রধান কারণই ছিল সি-পি-এমের মাতব্বরি ও খবরদারি। ১৯৭১ সালের নির্বাচনের সময়ও তাদের সেই ভয় কাটে নি। এমনকি যে আর এস-পি আট-পার্টি ফ্রন্টে নাম লেখায়নি তারাও তখন সি-পি-এম ফ্রন্টে যেতে চায় নি। গত অক্টোবরের বন্যার কথা আগে বলেছি। মিলিতভাবে ঐ বন্যার ত্রাণকার্য উদ্যোগও বানচাল হতে বসেছিল, কারণ সি-পি-এম তখন ঐ আন্দোলনের নেতৃত্বে অন্য কোনো দলকে ভাগ বসাতে দিতে চায় নি। ১৯৭২ সালে এসে অবস্থা পালটে যায়। মধ্যপন্থার একরকম বিলুপ্তি ঘটে পশ্চিম বাংলার রাজনীতি থেকে। তাই এস-ইউ-সি, আর এস-পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকও সি পি এমের সঙ্গে হাত মেলায়।

এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে তারা সি-পি এমের সঙ্গেই আছে, যদিও ফ্রন্টের অস্তিত্ব তার বৈঠকের বাইরে বিশেষ টের পাওয়া যায় না। নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর ফ্রন্ট যদি গণ-আন্দোলনে নামে তবে সেটাই হবে ফ্রন্টের শরিকদের প্রথম একটা ইতিবাচক কর্মসূচী। সেই আন্দোলন, শুরু হওয়ার আগে সি-পি-এম তার সহযোগীদের আশ্বস্ত করতে চায় যে অতীতের ভুল সে আর করবে না। মাদুরাই কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে তারই আভাস দেওয়া হয়েছে।

২৮-৭-৭২ —দেবদত্ত

[ব]ছরের তুলনায় অনেক বেশি। আমাদের [দেশে]র চাষের চার-পঞ্চমাংশই যে সেচের [ব্যবস্থা]র বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল, [সেই ব]াটা অকরুণ বরুণ দেবতা এবার আর [একবার] মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

একমাত্র ভরসার কথা এই যে, ফলন [কম] হওয়া সত্ত্বেও ঠিকভাবে ব্যবস্থা করতে [পারলে] দেশের কোথাও খাবারের টানাটানি [হবার] কথা নয়। ঠিক এমনি দুর্দিনে [কাজে] লাগবে বলেই খাদ্য কর্পোরেশনের [হা]তে 'বাফার স্টক' হিসেবে ৮০।৯০ [লক্ষ] টন খাদ্যশস্য মজুত করে রাখা [হয়ে]ছে। যদিও বর্তমান বছরের গোড়া[য়] [বিদেশ]ের খাদ্যশস্যের আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ [করে] দেওয়া হয়েছে তা হলেও এই মজুত [খাদ্যশ]স্য যদি সময়মত উপযুক্ত স্থানে [পৌঁ]ছে দেওয়া যায় তাহলে অনাহারে [কারও] মরার কারণ নেই।

* * *

দীর্ঘ আলোচনার পর এখন মনে হচ্ছে, [জমি]র মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা সংক্রান্ত [রাজ্যগুলির] আইনগুলির মধ্যে কিছু সামঞ্জস্য [আনা]র এবং এই সীমা কমিয়ে দেওয়ার [চেষ্টা]টা সফল হতে চলেছে।

যদিও ব্যাপারটি নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় ভূমি সংস্কার কমিটি, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সাবকমিটি ও সমগ্র কমিটির কাছ থেকে অনেক দফা প্রস্তাব এসেছে তা হলেও যেহেতু বিষয়টি রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত সেহেতু এ সম্পর্কে শেষ কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রীরা।

মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত ভূমি সংস্কারের প্রস্তাব যে আকারে গৃহীত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীদের চাপে জমির সিলিং সংক্রান্ত প্রস্তাব অনেকখানি নরম করতে হয়েছে।

যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক উঠেছিল সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীরা জমির মালিকদের স্বার্থে বেশ কিছু সুবিধা আদায় করে নিতে সমর্থ হয়েছেন। বিতর্কের বিষয় ছিল, যাঁরা সরকারি প্রকল্প থেকে সেচের সুবিধা পান তাঁদের ক্ষেত্রে এবং যাঁরা নিজেদের জমির জন্য নিজেদের খরচে সেচের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন তাঁদের ক্ষেত্রে জমির সিলিংয়ের পরিমাণ একই হবে কিনা। এ নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে তীব্র মতভেদ ছিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত উচ্চপর্যায়ের কমিটি প্রস্তাব দেন যে, যাঁরা নিজেদের জমির সেচের ব্যবস্থা নিজেদের খরচেই করে নেন তাঁদের ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বেশি জমি রাখতে দেওয়া যেতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে স্থির হয়েছে যে, সেচের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা আছে এবং বছরে দুটো ফসল হয়, এমন জমির ক্ষেত্রে পরিবার-ভিত্তিক সিলিংয়ের পরিমাণ হবে ১০ থেকে ১৮ একরের মধ্যে। এই দুই অঙ্কের মধ্যে ঠিক কোন জায়গায় সিলিংয়ের পরিমাণ বেঁধে দেওয়া হবে সেটা নির্ভর করবে মাটির প্রকৃতি ও অন্যান্য বিষয়ের উপর। যাঁদের জমিতে জমির মালিকের নিজের খরচে সেচের ব্যবস্থা থাকবে তাঁরা অন্যদের তুলনায় ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বেশি জমি রাখতে পারবেন। অর্থাৎ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সাবকমিটি ঐসব ক্ষেত্রে যতখানি ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিলেন তার ওপর আরও দশ শতাংশ ছাড় মুখ্যমন্ত্রীরা আদায় করে নিতে সমর্থ হয়েছেন।

'পরিবার' এর সংজ্ঞাটিও মুখ্যমন্ত্রীরা কতকটা নরম করে নিতে সমর্থ হয়েছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি সুপারিশ করেছিলেন, পরিবার বলতে বোঝাবে স্বামী, স্ত্রী ও তিনটি সন্তান, সাবালক-নাবালকনির্বিশেষে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীরা স্থির করলেন, সাবালক সন্তানরা পরিবারের সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবেন না। তার মানে, সাবালক সন্তানের নামে আলাদা জমি রাখতে বাধা থাকবে না।

আর একটি বিতর্কিত প্রশ্ন ছিল, জমির সিলিং সংক্রান্ত আইন কবে থেকে কার্যকর হবে। কেন্দ্রীয় ভূমি সংস্কার কমিটির প্রস্তাব ছিল, ১৯৭০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে সিলিং আইন কার্যকর হবে। কংগ্রেসের সিলিং কমিটি সেই প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীরা অনেকেই এই তারিখ এগিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীরা দাবী করছিলেন, এই বছর ১৮ জানুয়ারি থেকে অর্থাৎ গত বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে যেদিন কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছে সেই তারিখ থেকে সিলিং আইন চালু করা হোক। মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন একটা মাঝামাঝি রফা করেছেন। তাঁরা স্থির করেছেন, জমির সিলিং সংক্রান্ত আইন চালু হবে ১৯৭১ সালের ২৯ জানুয়ারি থেকে অর্থাৎ লোকসভা মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে যেদিন কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছে সেই তারিখ থেকে। এই তারিখ নির্দিষ্ট করে দেওয়ার অর্থ হল, ঐদিনের পর যেসব জমি হাতবদল করা

হয়েছে সেগুলিকে পূর্বতন মালিকের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করেই সিলিং-এর আইন প্রয়োগ করা হবে।

ফলের বাগিচার ক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রীরা বিশেষ সুবিধা আদায় করে নিতে পেরেছেন। কংগ্রেসের সিলিং কমিটির সুপারিশ ছিল, ফলের বাগিচার জন্য কোনরকম ছাড় দেওয়া হবে না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব হল, শুকনো, সেচহীন জমির মত ফলবাগিচার ক্ষেত্রেও মালিকানার সিলিং ৫৪ একর পর্যন্ত ধার্য করা যেতে পারে।

বছর দুয়েক যাবৎ আমাদের দেশে এই ভূমি সংস্কার নিয়ে কথাবার্তা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের পর এখন সেই আলোচনার উপর যবনিকাপাত হতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রীরা স্থির করেছেন, বর্তমান বছর শেষ হওয়ার আগেই তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজ্যে রাজ্যে ভূমি সংস্কার আইন চালু হবে। যেসব রাজ্যে ইতিমধ্যে আইন তৈরি হয়ে গেছে সেসব রাজ্যে প্রয়োজন হলে মুখ্যমন্ত্রীদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনের সংশোধন করতে হবে।

* * *

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সম্প্রতি যে রদবদল হয়ে গেল তার পরিপ্রেক্ষিতে কোন কোন পর্যবেক্ষক হিসেব করে দেখার চেষ্টা করছেন দিল্লিতে কোন মন্ত্রণালয়ে কত ঘন ঘন মন্ত্রী বদল হয়েছে। এই হিসেব নিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কোন মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীদের পরমায়ু খুবই কম।

যেমন রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের কথা ধরা যাক। এবার এই মন্ত্রণালয় থেকে কে হনুমন্তায়া বিদায় নিয়ে গেলেন এবং তাঁর জায়গায় এলেন টি এ পাই। শ্রীপাইকে নিয়ে গত ছয় বছরে আমরা ছয়জন রেলওয়ে মন্ত্রী পেলাম। এস কে পাতিলের পর সি এম পুনাচা, তাঁর পর ডাঃ রামসুভগ সিং, তাঁর পর গুলজারিলাল নন্দ, তাঁর পর শ্রীহনুমন্তায়া এবং এখন শ্রীপাই। শিল্পোন্নয়ন বিভাগে ১৯৬৭ সাল থেকে চারজন এলেন আর গেলেন— মনুভাই শাহ, ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ, দীনেশ সিং ও মইনুল হক চৌধুরী। ১৯৬৭ সাল থেকে এযাবৎ পূর্ত ও গৃহ-নির্মাণ দপ্তরের ভার পেয়েছেন তিনজন— প্রথমে জগন্নাথ রাও ঐ দপ্তরের ভার নিয়েছিলেন রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে। তার পর দপ্তরটি পুরোপুরি একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর এক্তিয়ারে এল। কে কে শাহ্ ঐ দপ্তরের ভার নিলেন। শ্রীশাহ্ রাজ্যপাল হয়ে চলে যাওয়ার পর দপ্তরটি গেল উমাশঙ্কর দীক্ষিতের কাছে এবং শ্রীদীক্ষিতের অধীনে রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে বিশেষভাবে ঐ দপ্তরের ভার নিলেন ইন্দ্রকুমার গুজরাল। শ্রীগুজরাল তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বদলি হওয়ার পর এখন দপ্তরটি আবার সরাসরি শ্রীদীক্ষিতের তত্ত্বাবধানে এল। এইভাবে পেট্রোলিয়াম ও রসায়ন দপ্তরে ছয় বছরে পাঁচজন মন্ত্রী এসেছেন। শিক্ষা বিভাগে পাঁচ বছরে এসেছেন চারজন মন্ত্রী।

দ্বিতীয় আর একটি দিক দিয়ে এই রদবদলের খতিয়ান তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে। মন্ত্রিমণ্ডলীতে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের হিসেব নিতে গেলে দেখা যাবে যে, এ বিষয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে মোটেই সমতা নেই। কেন্দ্রশাসিত পণ্ডিচেরিকে হিসেবে ধরলে লোকসভায় তামিলনাড়ুর চল্লিশজন প্রতিনিধি আছেন। তাঁদের মধ্যে দুজন ক্যাবিনেটে স্থান পেয়েছেন এবং তাঁরা দুজনেই দুটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক মন্ত্রণালয় অধিকার করে আছেন। এঁদের সঙ্গে আছেন একজন উপমন্ত্রী। অন্যান্য রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বের হার এইরকম :—

জম্মু ও কাশ্মীর—লোকসভার সদস্য ছয়জন, তাঁদের মধ্যে পাঁচজন কংগ্রেসী, ক্যাবিনেটে একজন, দুজন উপমন্ত্রী।

মহারাষ্ট্র—৪৫ জন সদস্য, দুজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, চারজন রাষ্ট্রমন্ত্রী।

উত্তরপ্রদেশ—৮৫ জন সদস্য, প্রধান-মন্ত্রীসহ দুজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, চারজন রাষ্ট্রমন্ত্রী, পাঁচজন উপমন্ত্রী।

বিহার—একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনজন উপমন্ত্রী।

মহীশূর—একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী, দুইজন উপমন্ত্রী।

পশ্চিমবঙ্গ—একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী, একজন উপমন্ত্রী।

২৯-৭-৭২ —পুণ্ডরীক

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ৯৮ জন বাঙ্গালী অফিসারের স্মৃতি ফলক। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ কর্নেল শফিউল্লাহ্ গত ২৪শে জুলাই এই স্মৃতি ফলকের উদ্বোধন করেন।

কবিতীর্থ শিলাইদা

কুমারেশ ঘোষ

শিলাইদা ঘুরে এলাম।

দেখে এলাম রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি আর কাছারিবাড়ি। পদ্মার তীরে কাব্যের শতদল আর বৈষয়িক পদ্মপাতা।

এর আগে কতবার কুষ্টিয়ায় গেছি। আমার মামাবাড়ির দেশ, আমার জন্মভূমি। গোরাই নদীর ধারেই বাড়ি, দোতলার জানলায় দাঁড়ালেই দেখা যায় নদীতে পাল তুলে নৌকো চলেছে ভেসে, দেখা যায় নদীর ওপারটা সবুজ ধানের বন্যা। ওপারের হরিপুর বা বেনেপাড়া থেকে গৃহস্থ চাষী আসে খেয়া পেরিয়ে দুধ নিয়ে, তরকারি নিয়ে কুষ্টিয়ার বাজারে। বিক্রী করে সে পয়সায় তেল নুন লুংগী শাড়ি কিনে ফিরে যায় সাঁঝের খেয়ায়।

কতদিন, কতবার দেখেছি। দেখেছি আর ভেবেছি, একদিন ঐ নদীতে খেয়া পার হয়ে, চরের মিহি বালিতে পা পিছলে-পিছলে, এগিয়ে ধানের ক্ষেতের মাঝে সিঁথে কাটা কাঁচা রাস্তা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে এগুলেই তো শিলাইদার কবিগুরুর কুঠিবাড়ি: সাহিত্য তীর্থ। গেলে হয় না?

কিন্তু যাওয়া হয়নি। শুধু আমার কেন, অনেকেরই যাওয়া হয়নি। যাওয়া দরকারও মনে হয়নি। হাঁ, হ্যাঁ, জানি, রবীন্দ্রনাথ ঐ কুঠিবাড়িতে অনেকদিন অনেকবার থেকেছেন, অনেক কিছুই লিখেছেন, কাছেই পদ্মার বোট বেঁধে কত গান বেঁধেছেন। সেসব পড়েছি তাঁর লেখায়। পড়েছি, কিন্তু ঐসব দেখবার প্রেরণা পাইনি আমরা। আমরা গেছি শান্তিনিকেতনে, শ্রীনিকেতনে, জোড়াসাঁকোয়। কারণ, শিলাইদা গাঁয়ের কুঠিবাড়ি সেদিন ভি-আই-পি বা ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিল্ডিং হয়ে ওঠেনি।

হলো পূর্ব পাকিস্তানে পাক অত্যাচারের বেদনা আর বিভীষিকার মাধ্যমে। পূর্ব-বাংলার বাঙালী বাংলাভাষা আর রবীন্দ্রসংগীতের মালা তাদের কণ্ঠে ধারণ করলো। তারই জের-এ জেরবার হলো। তবু জয়ী হলো বাঙালী। পূর্ব-পাকিস্তান হলো বাংলাদেশ। তাদের জাতীয়সঙ্গীত হলো রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।'

আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, রবীন্দ্রনাথের শিলাইদাকে আমরা দ্বিতীয় শান্তিনিকেতন করবো।

কিন্তু সেখানে কুঠিবাড়ি নাকি পাক-বোমায় বিধ্বস্ত! হায়, হায়।

না, না। ভুল খবর। পাক-সেনাদের ভ্রূকুটি কুঠিবাড়িতে পড়েনি। পড়েনি? যাক, বাঁচা গেল! চলো তবু, সামনেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কুঠি, কুঠিবাড়ি!

বাংলাদেশের ভাবিকালের শান্তিনিকেতন সচকিত হয়ে উঠলো, কুঠিবাড়ি রং-এ-রূপে হলো রূপসী। বাংলাদেশ সরকার পথ বেঁধে দিলো তীর্থ যাত্রীদের জন্যে।

১৩৭৯ সালের ২৫শে বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের ১১১তম জন্মদিনে শিলাইদার কুঠিবাড়িরও হলো নবজন্ম। পাক-সেনাদের অনাহারে বাংলাদেশের রক্তমাখা পাঁক থেকে পদ্মার তীরে আবার জন্ম নিলো যে পদ্ম কুঁড়িটি তারই পাদপদ্মে প্রণতি জানাতে প্রাণের আবেগে চললো তীর্থযাত্রীরা। চললো দেশ-বিদেশ থেকে। চললো মাঠের চাষী, গাঁয়ের গৃহস্থ, সহরের বাবুরা। চললো ব্যবসায়ী, চললো চাকুরে, চললো কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক।

চললাম আমরাও। তীর্থযাত্রীর জনতার মিছিলে মিশে গেলাম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের আমরা, বঙ্গ-সাহিত্যের মহা-সম্মেলনে। মোহিনী মিল পাড়ার চক্রবর্তী-বাবুদের বাড়ির অস্থায়ী আস্তানা থেকে আমরা রওনা দিলাম সূর্য উদয়ের আগেই। বালি ভেঙে ভেঙে গোরাই নদীর ধারে এসে দেখি, তার বুকখানা শুকিয়ে গেছে। খাঁ-খাঁ করছে। বাংলাদেশের বহু মায়ের বুকের মতই অদূরে নদীতে মৃদু মন্দ জলস্রোত। সে স্রোতের অগ্রগতিতে ভাটা পড়েছে তবে থেমে যায়নি। যেমন হয়েছে বাংলাদেশের বাঙালীর। আগামী দিনে এই নদী হবে জলযৌবনা, ঢেউ-ঢেউ ভাসিয়ে দেবে দুকূল। বাংলাদেশের বাঙালীরাও। শুকনো নদীর ধারে এসে ভাবছিলাম, জন নদীর মত এই গোরাই নদীও বুয়ে চলেছে ধীরে। তীরে কুষ্টিয়ায় হলো বীভৎস হত্যাকাণ্ড, কত সংসার গেল ধ্বংস হয়ে, কত মৃতদেহ ভাসলো এই নদীতে। তবু সর্বসহা নদী সেদিনের মতই আজও উদাসীন, উদার।

ফেরি-নৌকোর নদী পার হলাম। দেখলাম গাঁয়ের অনেকেই হেঁটে নদী পার হচ্ছে। কোথাও হাঁটু জল, কোথাও উরু-জল। পার হয়ে শিলাইদার পথ সাড়ে তিন থেকে চার মাইল। তাই বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অনুরোধে ঢাকা থেকে কুষ্টিয়ার প্রশাসক সাহেবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কলকাতার সহুরে সাহিত্যিক আর সাহিত্যিকদের জন্যে চার চাকার ব্যবস্থা করা হয়। কুষ্টিয়ায় এসে সুসংবাদই পেয়েছিলাম, কুষ্টিয়ার প্রশাসক সাহেব আমাদের জন্যে নাকি তিনটে জীপ আর একটা ট্রাকের ব্যবস্থা করেছেন। আর কাগজেও দেখেছিলাম। মাটির পথে আলো মাটি ফেলে মোটরেবল করা হয়েছে। কিন্তু মোটর কই? ট্রাক বা জীপের দেখা নেই। বুঝলাম, পথ চলতে সময়ে কদল দেখতে হবে, জিভ বার হয়ে যাবে। তবু তো রবি এখনও নীরব। একটু পরেই শিশু-রবি যখন দৌরাত্ম্য শুরু করবে, তখন কাঁচ-রবির তেরায় বেরিয়ে ভরিয়ে যাবার কথাই। কিন্তু উপায় কি? আর কবিই তো লিখেছেন, পথ চলাতেই আনন্দ!

অতএব আমরা সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে শুকনো হাসি হেসে বললাম, শ্রীচরণই ভরসা হোক। কুঠি থেকে প্রায় আশি বছর বয়সের আশিজন মেয়ে-পুরুষের তৈরী হলো লম্বা মিছিল। পথের দুধারে গাঁয়ের কাঁচ ন্যাংটো ছেলেমেয়েরা লাইন করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো ফর্সা জামা-কাপড় পরা, রঙীন শাড়ি পরা সহুরে বাবু বিবিদের। দেখতে লাগলো লুঙ্গী পরা, মুখে দাড়ি, হুঁকো হাতে গৃহস্থ চাষী দেখতে লাগলো ময়লা শুধু শাড়ি পরা গেরস্ত বৌ-ঝিরা। লোহা-ইঁটের শহরে ওরা সরলতায় দ্রষ্টব্য, আমরাও তেমনি আজ গাঁয়ের পথে ওদের কাছে মেক-আপের মুখোস পরা দর্শনীয় জীব।

ততক্ষণে শিশু-রবি আকাশে চড়েই রোদ্দুরের আগুন ছড়াতে লেগেছে।

আমাদেরই এক সহযাত্রী আসবার সময় যশোর থেকে দুটো টোকা কিনেছিলেন। বেশ দেখতে টোকা দুটো। গাঁয়ের চাষীরা মাথায় দিয়ে রোদ্দুরে মাঠে কাজ করে। ঐ ডিজাইনের টুপি প্যারিসের ফ্যাসানী মেম-সাহেবরাও মাথায় দেয়। তাছাড়া ঐসব বাঁশের জিনিস আজকাল কেতা-দুরস্ত বাঙালী-সাহেবদের ড্রইংরুমেও শোভা পেয়ে থাকে। কাজেই চাষী মাঠে না উঠলেও চাষীর মাথার ঐ টোকা আজ উঠে গেছে। তাই বন্ধুটির কাছ থেকে একটি টোকা হস্তগত করে বিনা সংকোচে মাথায় চাপালাম। কিন্তু হাওয়ায় যে উড়ে যায়? তাড়াতাড়ি আমার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে গামছাটা বার করে টোকার চূড়োর উপর দিয়ে জড়িয়ে থুতনির তলায় বাঁধলাম। এবং দেখি পথের দুপাশের চাষী আর চাষী পুত্র-কন্যাদের দিব্যি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

বাবু, উডা কিনছেন কম থিকে?

যশোর থিকে।

দ্যাখ, দ্যাখ বাবু টকা পিন্দেসে!

বললাম, মানাইছে?

সংগে সংগে একজন চাষী বলে উঠলো, খাইন মানাইসে।

আমরা পথের দুধারে চাষী ভাইদের আর গাঁয়ের পরিচয় নিতে নিতে আর আমাদের পরিচয় দিতে দিতে এগিয়ে

চললাম। এমন সময় দেখা গেল একটা ঘোড়ার গাড়ি আসছে। ব্যস, ঘোড়া দেখে অনেকেই খোঁড়া হয়ে গেল। বিশেষ করে মেয়েরা। ঝাঁকুনির সঙ্গে ধরপাকড় করে অনেকেই হাত চেপে ধরলেন। ব্যস, কাঁচার বাহনী মেয়ে-পুরুষের হাতে চাপানো গেল।

খানিক পরেই দেখা গেল এক ধরনের ঘোড়ার গাড়ি। গরুর গাড়িতে ঘোড়া জোতা। দীর্ঘাকারের ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়া স্বাভাবিকই। এবারও অনেকেই লাফিয়ে উঠলেন তাতে।

আরো খানিকটা এগিয়ে আমরা কয়া গ্রামে বাঘা যতীনের বাড়ি এসে গেলাম। বাড়িটা ভগ্ন দশায়। কয়েকটি মুসলমান পরিবার বাস করছে। বিপ্লবী যতীন মুখুজ্জে এই চাটুজ্জে বাড়িতে মামাদের কাছে মানুষ হয়েছিলেন এবং গোরাই নদীর তীরের এই মানুষটি উড়িষ্যায় বুড়ি বালামের তীরে ইংরেজের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত একলা লড়াই করে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন দেশের জন্যে। শুনলাম, বাংলাদেশ সরকার কয়া গ্রামের এই ভগ্নপ্রায় বাড়িটিকে পুনরুদ্ধার করে উল্লেখযোগ্য করে তুলবেন। মনে মনে শ্রদ্ধা জানিয়ে আম-কাঁঠালের বাগান আর পুকুরের ধার দিয়ে উঠলাম এসে কাঁচা মাটির পাকা সড়কে।

এবার খানিকটা এগুতেই চোখে পড়লো। আমাদের পরম-আরাধ্য দুটি জীপ শিলাইদার দিক থেকে ধুলো উড়িয়ে আসচে। ঐ আসে, ঐ আসে, মন নেচে উঠলো হরষে। জীপদ্বয়কে দাঁড় করিয়ে জানলাম, তারা আমাদের উদ্দেশ্যেই প্রেরিত এবং একদলকে পৌঁছে দিয়ে (কাদের দল কে জানে) আবার ফিরচে নতুন দলকে আনতে। ড্রাইভাররা বললে, দাঁড়ান গাড়ি ঘুরিয়ে আনি। কিন্তু এক গাড়ির চওড়া রাস্তায় তো গাড়ি ঘোরানো যায় না, কাজেই খানিকটা তাদের এগিয়ে যেতে হলো। আর পরে যখন এলো দেখি আমাদের দলের পেছনে চলারা জীপ দুটিতে বোঝাই হয়ে চালু হয়েছেন। মানে, জীপ দুটির মুখ ঘুরেচে বটে, তবে সামনে দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।

থাকগে। যেতে দাও গেল যারা।

কয়া গ্রাম পার হয়ে বাঁ বেঁকলাম আমরা। অন্য আরো অনেকেই চলেছে শিলাইদা-তীর্থে। [illegible] সাইকেলে [illegible] বাঁধানো পথে। [illegible] করচে চাষী। মাঝে মাঝে সবুজ গাছেরতলায় ছায়া-শীতল গাঁ। কাঁচা মাটির বাড়ি। বাড়ির গৃহস্থের মনটাও কাঁচা, শহুরে ভেজালে পাকেনি।

সঙ্গী বন্ধুকে বলছিলাম, এই যে দেখচো গাঁ এ হচ্ছে শুদ্ধ গাঁ নয়, একধারে ধর্মশালা, রেস্টহাউস, গেস্টহাউস—যা মনে করো তাই। এখানে তুমি জল চাইলে সেই সঙ্গে মোয়া বা নাড়ু পাবে। বসতে চাইলে পিঁড়ি পাবে, রাতে শুতে চাইলে ঘর পাবে। আর পাবে তাদের কৃতার্থ হয়ে যাওয়া মন। যে মন আমাদের হারিয়ে গেছে।

দেখি এক দইওলা বাঁকে করে দই নিয়ে আসচে। গাঁ থেকে চলেচে কুষ্টিয়ার বাজারে। ডাকঘর-এর অমলের জানা দইওলা নয় যে বিনে পয়সায় দেবে।

কত করে গো?

এজ্ঞে একসেরি ভাঁড় পাঁচসিকে কর্তা!

দই তো তোমার টক হবে।

এজ্ঞে না কর্তা, মিষ্টি। খেয়ে দ্যাহেন।

দাও।

দই তো কিনলাম। কিন্তু তিনজন আমরা, খাই কী করে। পথের ধারে বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েছিল তিন-চারজন চাষী। আমাদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা বুঝে একজন চাষী বললেন, দাঁড়ান বাবু, বাড়ি ঠেঙে বাটি গেলাস আনি। ছুটে গিয়ে নিয়ে এলো বাটি আর জল ভর্তি গেলাস। বাটিতে দই ঢেলে নিয়ে খাচ্ছি আমরা, এমন সময় দেখা গেল, মানুষ বোঝাই ট্রাক আসছে একখানা প্রচুর ধুলো উড়িয়ে কুষ্টিয়ার দিক থেকে। কাদের ট্রাক কে জানে! কিন্তু কাছে এসেই থেমে গেল ট্রাকটা। দেখি আমাদের দলের লোকেই বোঝাই। ওঠো ওঠো। হাত ধরে টেনে তুললো আমাদের। একজনের তখনও দই খাওয়া শেষ হয়নি। সে ভাঁড় নিয়েই উঠলো ট্রাকে। আর ট্রাক চলতেই ঝাঁকুনি তার বুক ভেসে গেল দই-এ। আমরা চাষী-দের আতিথ্যের জন্যে ধন্যবাদ জানাবারও অবসর পেলাম না।

লরী ভর্তি বন্ধু-বান্ধবীদের দিকে চেয়ে দেখি সবাই [illegible] পাউডার মেখে [illegible] ফর্সা জামা-[illegible] একেবারে [illegible]! হতে [illegible] কাউকে [illegible] শিলাইদার কুঠি-বাড়িতে আসতে দেখেই [illegible] কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেন না পথের শুকনো ধুলো [illegible] শুকনো ধুলো [illegible] আমাদের [illegible] লরী-যাত্রীর জামা-কাপড় [illegible] দিলো। এতক্ষণ আলোচনায় [illegible] হয়ে গেলাম [illegible] হয়ে নেমে হলাম রাগী। একটু পরেই দেখা গেল, গাছের ফাঁকে শিলাইদার তিনতলা কুঠি-বাড়ির চুড়ো।

আমরা লরী থেকে একে-একে নামলাম। যতো [illegible] সবাই আমরা গায়ের ধুলো ঝাড়ালাম। দেখি কুঠিবাড়িও বহু-দিনের ধুলো ঝেড়ে নতুন রং-এ সেজেছে। উৎসবের সাজ। চারিদিকে ঢেউ খেলানো প্রাচীর ঘেরা। ভেতরে সাজানো উদ্যান। পাশে বড় বড় আম-কাঁঠালের গাছ। তারই মাঝে দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে, চুড়ো মাথায় সুকল্পিত কুঠিবাড়ি! কাব্য মন্দির। সামনে ঘাট বাঁধানো বসড় পুকুর। তাতে টলটলে জল। বিরাট বকুল গাছেরতলায় বাঁধানো ঘাটটা ছায়াশীতল। কবি কী এই ঘাটে এসে বসতেন? হয়তো। কবি কী এই পুকুরে স্নান করেচেন কোনদিন। না বোধহয়। পুকুরে স্নানটা আরামের হলেও কবির পক্ষে খদা, আর মহামান্য জমিদারের পক্ষে বড় খেলো ব্যাপার!

আমাকে কিন্তু জলীয় লোভ পেয়ে বসলো। আর গামছা যখন সঙ্গে, তখন কোন বাধাই নেই। কয়েকজন স্নানও করছেন। আমিও তাঁদের সংগে যোগ দিলাম, ধুলো ধুয়ে মুক্ত হলাম।

কুঠিবাড়িকে ঘিরে ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে মেলা, রবীন্দ্র-মেলা। চারিদিক থেকে লোক এসে জড়ো হচ্ছে। হেঁটে, সাইকেলে, গরুর গাড়িতে, ঘোড়ার গাড়িতে, মোটরে, লরীতে। বাগানের গাছের তলায় তলায় বসে গেচে পসরা নিয়ে পসারীরা। ডাব, তালশাঁস, তরমুজ, লিচু এনেচে আশ-পাশের গাঁয়ের লোকেরা। বসেচে পান-বিড়ির দোকান, সরবতের দোকান।

২৫শে বৈশাখের ডাকে তীর্থযাত্রীর দল আসচে তো আসচেই। আসচে কুষ্টিয়া থেকে। পাবনা থেকে, ঢাকা থেকে, যশোর থেকে, হুগলী থেকে। আসচে কলকাতা থেকে। আসচে কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ফটোগ্রাফার, রিপোর্টার, আর্টিস্ট, - গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে। আর আসচে চাষী, মজুর, গাঁয়ের ছেলেমেয়ে বুড়ো। কুঠিবাড়ির চার-দিকে শতদলের মেলা। বহুদিনের অবজ্ঞাত শিলাইদা আজ প্রাণচঞ্চল মুখর করে দিলো যে-আজ নীরব কবিরে।

বাগানের একধারে সাজানো মঞ্চ। হলদে প্লাস্টিক-চাদরে সুসজ্জিত মঞ্চ-বীথি মাইকও উপস্থিত। একটু পরেই

[illegible] … আয় লোকসংগীত শাস্তি। ছুটিতে … ছাত্রীরা এসেছেন। শাইনের … সুপারিশ। আমাদের দিক দিয়ে …লা হলো কথাবার্তা, দেওয়া হলো … ছবি উপহার, এবং পরে একটি কৃষ্ণ-… চারা রোপণ। তথাগতী তীর্থযাত্রী-… স্বাগত জানালেন, বললেন, শেষ …বের ইচ্ছার বাস্তব রূপ দেখেন …। ঐ শিলাইদহকে করবেন তাঁরা …তীর্থ শান্তিনিকেতন।

…তাই হলো ভিত্তি-পূজো হলো। …ইদহ হলো রবীন্দ্র-ভক্তের পদচিহ্নে …।

দুপুরে ঢালাও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। …লো গেলাম অদূরে কাছারী বাড়িতে। …লা বাড়ি। কাছেই পদ্মা। ঐ পদ্মায় … বেঁধে কত না লিখেছেন কবি। আশে-… কয়েকখানা বাড়ি। হয়তো সেদিনের …লাদের। কুঠিবাড়ি যেন কাব্যের খাতা, … জাবদা খাতা হচ্ছে কাছারী বাড়ি। …টি কল্পনা, একটি অতি-বাস্তব। একটি …র খোরাক, একটি দেহের খোরাক। তাই …তো কাছারী বাড়িতেই হয়েছে স্থূলদের উপশমের ব্যবস্থা। স্বেচ্ছাসেবকরা …তিথি-সেবায় তৎপর। পাতে পড়লো ভাত, …ল, তরকারি, মাছ। বাংলাদেশের মাছ!

ওখানে আলাপ হলো ফরিদা পারভিন-[illegible] … গানী মেয়ে। … গান গাই … ছিলেন … আমি তো … মুগ্ধ … দিক দিয়ে … সেকথা ভাবলেও … তার … করিয়ে দিলো। [illegible] ঐ মেয়েই আমার সব। আমার কাছে দোয়া করেন, যেন বেঁচে-বর্তে থাকে। সবাই ধরলো বললো, গান শোনাও। মিষ্টি গলায় ফরিদা গান গাইলো, গানের পর গান। সঙ্গীতে কাছারীবাড়ী বিস্মিত হলো।

ফিরে এলাম কুঠিবাড়িতে। রবীন্দ্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছে। দলে-দলে লোক ঢুকছে, বেরুচ্ছে. কুঠিবাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখছে। আমিও দেখলাম। পদ্মবোট দু'খানা বোট উপুড় হয়ে পড়ে আছে এক-তলায়। দোতলায় বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। স্তব্ধ দুপুরে গাছপালা রৌদ্র-স্নান করছে। গেলাম তিনতলায়। একটা বড় ইজিচেয়ার ভগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে। হয়তো বলছে, একদিন আমার কোলেই শুয়ে থাকতেন তোমাদের কবি। আজ তিনি নেই, আমিও নেই হতেই চলেছি।

ছাদের পাশে আলাপ হলো এক মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে। মুখে দাড়ি, পরনে লুঙ্গি, গায়ে আধময়লা জামা। বললেন, পাবনা থেকে আইছি। আপনারা তো আইছেন কলকেতা থেকে। ওখানে রবি ঠাকুরের বই পাওয়া যায় কমে? আমার কাছে যে ক'খানা ছিলো তা পড়ে পড়ে পাতাগুলো ছিঁড়ে গেছে।

শিলাইদহের [illegible] … খোলা চোখে চেয়ে রইলাম … দিকে। কিন্তু চোখ দিয়ে দেখবার ক্ষমতা আমার কোথায়? কবি লিখেছেন—

'শিলাইদহ'র আকাশ সমুজ্জ্বল তটরেখা শ্যামল, নদী সুপ্রশস্ত, মন স্বপ্নাতুর, কাজকর্ম স্বল্প, লেখা-টেখা বন্ধ, চারিদিকে ছুটি, এবং অন্তরে বাহিরে সৌন্দর্য প্রবাহ। —স্বচ্ছ নীলাম্বরও স্নেহভরে আবিষ্ট।... সমস্ত আকাশ যেন হৃদকমলের মতো আমাকে বেষ্টন করে ধরেছে।... আমার এখানে যখন জনসমাগম হবে তখন এরা যেন আর এখানে থাকবে না—মানুষ এলে যেন প্রকৃতির মধ্যে আর প্রকৃতির স্থান থাকবে না। মানুষ এত বেশি জায়গা জোড়ে, চতুর্দিকে এতটা জিনিষের অপব্যয় করে।'

হয়তো অপব্যয় করে। হয়তো লোকের পদশব্দে প্রকৃতি নিজেকে গুটিয়ে নেয়। কিন্তু কবি, তুমি প্রকৃতির পূজারী, আর আমরা যে তোমার পূজারী। তাই আমাদের এই কবিতীর্থে আসার সময় যা অর্থের অপব্যয় বলে মনে করিনে। মনে করি, আজ আমাদের সময় যা অর্থ সার্থক।

রবীন্দ্র কাহিনীর চিত্ররূপ দেওয়া হচ্ছে চলচ্চিত্রের আদি যুগ থেকে। ছবি যখন নির্বাক ছিল তখন থেকে সুরু করে অব্যাহতগতিতে আজও তা চলছে। কিন্তু রবীন্দ্র-তথ্যচিত্র? এই প্রসঙ্গ উঠলেই অনেকগুলো জিজ্ঞাস্য এক সংগে আসে। এর সদুত্তর খুঁজে পাই না—হয়তো আমার মতো অনেকেই পাবেন না।

বিশ্ব কবি যখন লোকান্তরিত হন তখন চলচ্চিত্র বিশ্বের অন্যতম সৃজনশীল শিল্প বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর ব্যবসায়িক দিকের সাফল্য সম্পর্কেও তখন বিশ্ববাসী আস্থাবান। এর বিরাট সম্ভাবনায় বিশ্বকবিও বিশ্বাসী। বিভিন্ন লেখা ও চিঠিপত্রের মধ্যে তাঁর মনোভাবও ব্যক্ত। এই অবস্থায় কবির জীবদ্দশায় কোন পূর্ণাঙ্গ তথ্য চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা কেন যে কেউ করেনি বুঝতে পারলাম না। কবি সম্পর্কে কৌতুহলী ছিলেন সকলেই। তাঁর দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি জানতে আগ্রহী নন এমন কেউ ছিলেন বলে মনে হয় না। তা সত্ত্বেও তথ্য চিত্রের মাধ্যমে কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথকে পরিপূর্ণভাবে কেউ ধরে রাখলেন না। সমগ্র বিশ্বে বহু চলচ্চিত্রবিদ ছিলেন যাঁরা রবীন্দ্র অনুরাগী—তাঁরাও কেউ উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসেননি। এ জাতীয় তথ্য চিত্র করার রেওয়াজ তখন ছিল না বলেই কি সম্ভব হয়নি? পর্যাপ্ত উপকরণ তখনই বর্তমান—সহজলভ্যও। তথ্যচিত্রের উপাদান হিসাবে অনায়াসেই পাওয়া সম্ভব হোত। তা সত্ত্বেও এটা না হওয়া সত্যিই বেদনাদায়ক।

পরবর্তীকালে তথ্যচিত্র নির্মাণের উপকরণের দিক থেকে অন্তরায়ও ছিল। যেমন ধরা যাক জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী—ঐতিহ্যময় এই ঠাকুরবাড়ী যেখানে বিশ্বকবির শুধু মাত্র জন্ম ও মৃত্যুই হয়নি—স্মরণীয় অনেককিছুই ঘটেছে এই প্রাসাদকে ঘিরে। নবকলেবর ধারণ করল এই ঠাকুরবাড়ী। পরিবর্তিত রূপে একে আর জীবনস্মৃতির ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল না। দক্ষিণের বারান্দা শুধু বেঁচে রইল বইয়ের পাতায়। ওপার বাংলার শিলাইদহ ও সাজাদপুরের কুঠিবাড়ী যার সংগে কবির ছিল নিবিড় যোগসূত্র—দেশ বিভাগের পর তা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হল। সীমান্ত পার হয়ে সেখান থেকে ছবি তুলতে যাওয়া তখন দুরধিগম্য কেন—অনধিগম্যই ছিল। অন্য দিকের দিক থেকে এগুলোর গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। এতো বস্তু—এবারে ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা নিকটতর কাছে পেয়েছেন সেই সব সৌভাগ্যের অধিকারীরা একে একে বিদায় নিলেন। বিভিন্ন ঘটনার প্রামাণ্যতা সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য ও নির্দেশ শুধু মাত্র গ্রহণযোগ্যই হোত না—ছবিতে তাঁদের উপস্থিতি একটা বিশেষ মূল্য বহন করত। এঁদের মধ্যে পাওয়া যেত সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, রাজনীতিবিদ ও অন্যান্য স্তরের বরেণ্যদের—সেই সংগে সেই সব নীরব মহানদের যাঁরা বিশ্বকবিকে শান্তিনিকেতন গড়ার কাজে সহায়তা করেছেন। এছাড়া বিদেশের মনীষীরা—রবীন্দ্রনাথের সংগে যাঁদের আলোচনার কথা স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে।

বহুমুখী রবীন্দ্র প্রতিভার বিভিন্ন দিকের নিদর্শন থেকেও আমরা বঞ্চিত হয়েছি সময়োচিত তথ্যচিত্রের অভাবে। কবির অভিনয় দক্ষতাকে সমকালীন বোদ্ধারা অসাধারণ বলে উল্লেখ করেছেন। অজস্র নাটকে কবি প্রধান অংশও নিয়েছিলেন। কবির সেই নৈপুণ্যের সামান্যতম একটা অংশও তুলে রাখা হয়নি। ভাবীকালের জন্যে রবীন্দ্র অভিনয়ের সবাক চিত্র যদি তুলে রাখা হত আজ তা অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হত। অতীতে যাঁরা এই অনুপম অভিনয় দেখবার সুযোগ পেয়েছেন আজ তাঁদের স্মৃতিই একমাত্র অবশিষ্ট রইল।

কবির লোকান্তরের দীর্ঘদিন পরে অবশেষে রবীন্দ্র তথ্যচিত্র নির্মাণ শুরু হল। এ বিষয়ে পথিকৃৎ হচ্ছেন আশীষ মুখোপাধ্যায়। লুক পাবলিসিটির তরফ থেকে তুললেন 'প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ'। ছবির শুরু জোড়াসাঁকোর ঐতিহ্যপূর্ণ ঠাকুরবাড়ীর দৃশ্য দিয়ে। কবির কাব্য প্রতিভার উন্মেষ ও ক্রমবিকাশ কবিতার কলি ও গানের সংগে প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্ভারের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। শান্তিনিকেতন ছবির একটা বিশেষ অংশ জুড়ে ছিল। শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিবেশের সংগে মানুষও দেখান হয়েছে। ১৩৪০ ফুটের এই তথ্যচিত্রে সংগীতে অংশ নিয়েছিলেন দক্ষিণীর শিল্পী। রবীন্দ্র জীবন নিয়ে এই প্রথম প্রচেষ্টা ১৪।৫।৫৮ তারিখে আমন্ত্রিত কিছু সংখ্যক লোকের সামনে দেখান হয়। পরবর্তীকালে যখন সাধারণের সামনে উপস্থিত করা হয় তখন সম্ভবতঃ নাম ছিল প্রকৃতি ও কবিগুরু। প্রাথমিক এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন সেদিন সকলে।

তারপর রবীন্দ্র শতবর্ষের দিন এল এগিয়ে। ১৯৬১তে কবির শতবর্ষ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র তথ্যচিত্র করার প্রবণতা দেখা গেল। এবিষয়ে সরকারও অংশ নিলেন। একটা পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্র তথ্যচিত্র করার পরিকল্পনা নিলেন ভারত সরকারের ফিল্মস ডিভিসন। পরিচালনার জন্য নির্বাচন করা হল সত্যজিত রায়কে। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সত্যজিত রায় তুললেন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কীয় ৪৮৪৪ ফুটের পূর্ণাঙ্গ তথ্যচিত্র 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। সাহায্য নেওয়া হল দলিল, পুরান আলোকচিত্র, চিঠি, মুদ্রিত গ্রন্থের পৃষ্ঠা, অংকিত চিত্র ইত্যাদি অজস্র প্রামাণিক উপকরণ থেকে। ফিল্মস ডিভিসনের ভান্ডারে ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও বিদেশের সংগ্রহে যেসব সংবাদ চিত্র সংরক্ষিত ছিল তা থেকে সংগ্রহ করা হল অনেক কিছু। সত্যজিত রায় প্যারিস ও লন্ডনে গিয়ে আনলেন কিছু উপাদান। গ্রামোফোন রেকর্ডে কবির স্বকণ্ঠ আবৃত্তি ও গানের কিছু কিছু অংশ ব্যবহার করা হল—সেই সঙ্গে কবির আঁকা কিছু ছবিও। সমগ্র বিশ্বে এই তথ্যচিত্রটি দেখান হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য তথ্যচিত্র বলে প্রশংসিতও হয়েছে সর্বত্র। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত ভাল ছবি ইতিপূর্বে দেখিনি বললেন সমালোচকেরা যখন এটি আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের টেলিভিসনে দেখান হল। দিল্লীর সপ্রু হাউসে এই ছবির উদ্বোধনে শ্রীনেহরু সত্যজিৎ রায়কে স্মারক হিসেবে উপহার দিলেন রৌপ্যফলক। লোকার্ণো (সুইজারল্যান্ড) আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ক্ষুদ্রায়তন ছবিগুলোর মধ্যে প্রথম পুরস্কার পেল এই ছবি। আজও এই ছবি রবীন্দ্র সম্পর্কীয় শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র বলে গণ্য হয়ে আসছে।

অন্যান্য যেসব তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি হল :

(১) রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন : লিটল সিনেমা। পরিচালনা : শান্তি চৌধুরী। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কর্মধারার একটি পরিচয় তুলে ধরা হয় এই ছবিতে। আগাগোড়া স্থির চিত্র দিয়ে গড়ে তোলা এটি। স্থির চিত্রগুলোর বিন্যাস ছিল সুপরিকল্পিত। আলোকচিত্রগুলো তুলেছিলেন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার শম্ভু সাহা বিশ্বকবির জীবনের শেষ পাঁচ বছরে।

(২) রবীন্দ্রনাথ ও গ্রাম পুনর্গঠন : নির্মাতা পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পরিচালনা : আশীষ মুখোপাধ্যায়। তথ্যবহুল এই ছবিতে বিশেষ করে পাওয়া যায় শ্রীনিকেতনের পরিচয়।

(৩) পল্লী সংগঠনে রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথ ও পল্লী সংগঠন) পল্লী সংগঠন কাজে বিশ্বকবির অবদান এই ছবির প্রতিপাদ্য বিষয়।

(৪) রবীন্দ্রনাথ : অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন। বিভিন্ন সময়ে তোলা রবীন্দ্র বিষয়ক

সংবাদ চিত্র থেকে সম্পাদনা করে এটি তৈরী।

(৫) **শান্তিনিকেতন :** ফিল্মস্ ডিভিসন। এই তথ্য চিত্রে রবীন্দ্র ভাবধারার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন শান্তিনিকেতনকে বিশদভাবে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা হয়েছে।

(৬) সংগীতে রবীন্দ্রনাথ : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে প্রণব রায়ের পরিচালনায় গৃহীত হয়েছিল বলে শুনেছি। প্রদর্শিত হয়েছিল কিনা সঠিক বলতে পারি না।

(৭) জয়তু রবীন্দ্রনাথ : সংক্ষিপ্ত তথ্য চিত্র। ছবির কথক ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরও এই ছবিতে শোনা গিয়েছিল।

(৮) রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা: পরিচালনা শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী। ১৬ মিনিটের রঙীন এই তথ্যচিত্রে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরা হয়েছে। কবির আঁকা অনেক ছবি এতে স্থান পেয়েছে। ভাষ্যপাঠ করেছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুর সংযোজনায় পণ্ডিত রবিশঙ্কর।

(৯) টেগোর পেন্টিংস : রণধীর রায়ের পরিচালনায় দু' রীলের ডকুমেণ্টারী ছবি। অপূর্ব বর্ণসমারোহের মাধ্যমে রবীন্দ্র চিত্রকলা সম্পর্কীয় এই তথ্যচিত্র চোখ ও মনকে ভরিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আঁকা ছবি সম্বন্ধে যখন যা বলেছেন সযত্নে সংগৃহীত সেই বাণীগুলিকেই পরিচালক ধারাবিবরণীরূপে ব্যবহার করেছেন।

এবার বৈদেশিক প্রচেষ্টার প্রসঙ্গে আসা যাক।

(১) সোভিয়েট রাশিয়াতে রবীন্দ্র জীবনী অবলম্বনে নির্মিত প্রামাণিক ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন স্যামুয়েল বুবারিক। মস্কোর সেন্ট্রাল ডকুমেণ্টারী স্টুডিওর প্রযোজনায় এটি গৃহীত হয়েছিল। প্রায় ৫০০০ হাজার ফুটের এই ছবির নির্মাণকাল দু' বছর। কবি মিখাইল মাতুসোভস্কি ১৯৫৯ সালে ভারতে এসে নানা জায়গার তথ্য সংগ্রহ করে চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন। পরে এদেশের বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু দৃশ্য গ্রহণ করা হয়। রবীন্দ্র জীবনকাহিনী ঠিক ধারাবাহিকভাবে এ ছবিতে বর্ণিত হয়নি। তবে কবির জীবনের প্রধান ঘটনাগুলোর সঙ্গে তাঁর বিরাট কর্মকাণ্ডের একটা আভাস ছবিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। কবির মস্কো ও অন্যান্য অঞ্চল পরিদর্শনের দৃশ্য এর একটা বিশেষ অংশ জুড়ে আছে। সোভিয়েট রাশিয়ার বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের কিছু নাটক ও গীতিনাট্যের দৃশ্যও এতে সংযোজিত। কুইবিশেফ অপেরা ব্যালে থিয়েটারে অভিনীত 'চিত্রাঙ্গদা' এর মধ্যে একটি। ভারতীয় সুরের ভিত্তিতে এই প্রামাণিক ছবিটির আবহসংগীত রচনা করেছেন ভিতালী গাকিসম্যান। পার্ক সার্কাস রবীন্দ্র শান্তিমেলায় ১২-১১-৬১ সালে প্রথম প্রদর্শিত হয়। পরে 'কবীন্দ্র রবীন্দ্র' নামে নিয়মিত চিত্রগৃহে দেখান হয়।

(২) সোভিয়েট ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: বিশ্বকবির সোভিয়েত ইউনিয়নে ভ্রমণকালে অনেক সংবাদচিত্র গৃহীত হয়েছিল। সেগুলো একত্রিত করে পুরো সংবাদচিত্র অবলম্বনে নতুন ভাষ্য সহযোগে এটি নির্মিত। ভারতবর্ষে দেখানো হয়েছিল কিনা বলতে পারি না।

(৩) ক্যালিফোর্নিয়ার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য নিয়ে ডেভ ওয়েন এদেশে এসেছিলেন ভারতীয় জীবন ও সংগীত সম্বন্ধীয় একটি ছবি তুলতে। এ ছবির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গৃহীত হয়েছিল শান্তিনিকেতন থেকে। ডেভ ওয়েন একদা শান্তিনিকেতনে কাটিয়েও ছিলেন। তাঁর গৃহীত শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের চলচ্চিত্র ক্যালিফোর্নিয়া উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছিল।

(৪) রুমানিয়াতে রবীন্দ্র শতবর্ষে অনুষ্ঠিত উৎসবকে ছবিতে ধরে রাখা হয়েছিল। প্রামান্য এই তথ্যচিত্রের নাম দেওয়া হয় 'বুখারেস্টে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের চলচ্চিত্র'। ভাবগম্ভীর পরিবেশে কিভাবে রুমানিয়াবাসী বিশ্বকবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এতে।

(৫) ড্যান্সেস অন টেগোরস সঙ— নিউইয়র্কের স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যের অধ্যাপিকা থাকাকালীন মঞ্জুশ্রী চাকী (সরকার) রবীন্দ্র গীতকে কেন্দ্র করে নৃত্য পরিকল্পনা করেছিলেন তারই ছবি। রবীন্দ্রনাথের নটরাজ বন্দনা দিয়ে ঋতুচক্রের নৃত্যানুষ্ঠান ও তার সংগে প্রাচীন রাগরাগিনীর চিত্রকলার পটভূমিকায় রবীন্দ্রগীতের মাধ্যমে ভাবতের ঋতুবদলের সংগে হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ নৃত্যভঙ্গিমায় দেখান হয়েছে।

রবীন্দ্র তথ্যচিত্র হয়ত আরও কিছু কিছু হয়েছে। সবগুলোকে একত্রিত করে ক্রমান্বয়ে দেখাবার ব্যবস্থা অদ্যাবধি হয়নি। এখনও এমন পর্যাপ্ত উপকরণ আছে যা দিয়ে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্র তথ্যচিত্র প্রস্তুত করা সম্ভব। রবীন্দ্র শতবর্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যেসব অনুষ্ঠান হয়েছে তা থেকে সংকলন করে একটি তথ্যচিত্র করলে বৈচিত্র্যের দিক থেকে নোতুন আস্বাদ পাওয়া যায়।

অপর্যাপ্ত রবীন্দ্র সাহিত্যের ভাষ্যগ্রন্থের মতন অসংখ্য রবীন্দ্র তথ্যচিত্র হোক এটা কারুর কাম্য নয়। তবে এখনও নোতুন উপাদান দিয়ে পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্র তথ্যচিত্র করার অবকাশ আছে।

রবীন্দ্র অনুরাগী স্বাধীন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংস্থা ইতিপূর্বে কাজী নজরুলের জীবন অবলম্বনে তথ্যচিত্র করেছিলেন। এবার তাঁদের বিশ্বকবির জীবন নিয়ে তথ্যচিত্র করার প্রয়াসী হওয়া উচিত। বিশেষতঃ যখন শিলাইদা ও সাজাদপুরের কুঠিবাড়ীর মত রবীন্দ্র স্মারক তাঁদের হাতের মধ্যে।

যে সমস্ত রবীন্দ্র তথ্যচিত্র আছে সেগুলোকে যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা উচিত। রবীন্দ্রকাহিনীর চিত্ররূপের অতীত দিনের ছবিগুলো অযত্নে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তথ্যচিত্রগুলোও যাতে সে অবস্থায় না যেতে পারে তার জন্যে সচেষ্ট হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধহয় কেউ অস্বীকার করবেন না।

সমকালীন

রামচন্দ্র রায়

সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস আমাদের প্রত্যেকেরই অল্পাধিক্তর জানা আছে। একটি সমাজকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ সাহিত্য গড়ে ওঠে। সামাজিক চিন্তার দ্বারা শুধু সাহিত্যিক কেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীও প্রভাবিত হয়। ব্যক্তিচিন্তা সমাজচিন্তারই প্রতিফলন মাত্র। কোন একটি সমাজ পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক চিন্তাও বদলায়। আবার সমাজচিন্তা বিবর্তনের মুহূর্তে যুগধর্মী নতুন মননশীলতা, জীবন সম্পর্কে নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠে এবং সেই মননশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সাহিত্যে, শিল্পে, নৃত্যে-গীতে ইত্যাদিতে। সেইজন্যই বিশেষ একটি যুগচেতনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে যখন সাহিত্য সৃষ্টি হয় তখন সেই সাহিত্য সেই যুগের সমাজনীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির আলোড়ন থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। কারণ এই ত্রিবিধ নীতি, সমাজে যাঁরা চিন্তা করেন, কিছু সৃষ্টি করার জন্য মত্ততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সচেষ্ট হন তাঁদেরকে ভাবিয়ে তোলে—ভাবতে বাধ্য করে। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই সমাজনীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতিসাপেক্ষ চিন্তা ছাড়া নিরপেক্ষ চিন্তা করতে পারেন না। যেহেতু তাঁরা সমাজবদ্ধ জীব সমাজের দ্বন্দ্ব সংঘাত তাঁদের মনেও দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি করে। সমাজের যুগান্তকারী আলোড়ন ব্যক্তিমানসেও আলোড়ন তোলে। আমরা কোন সাহিত্যিক যখন বিচার করব, অর্থাৎ তাঁর সাহিত্যের সাহিত্যিক মূল্য, সামাজিক মূল্য বিচার বিশ্লেষণ করব—তখন একথা স্মরণে রাখা উচিত নয় যে যুগে সাহিত্য রচিত হয়েছে সেই যুগের যুগ পরিবেশ ও পরিস্থিতি প্রভাবিত মানসিকতার স্তর সে যুগের ভালমন্দের ধারণা, ন্যায় নীতিবোধের ধারণা, সুন্দর অসুন্দরের ধারণা, মানবিক মূল্যবোধের স্তর কেমন—সেই ভিত্তিতে বা মাপকাঠিতে সেদিনের সাহিত্যের মূল্যায়ন ও সাহিত্যিকের বিচার করা উচিত। বস্তু-সাপেক্ষ বৈজ্ঞানিক চিন্তা দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিবাদী মন নিয়ে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে সমাজের অভ্যন্তরে নানান কার্যকারণ, ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের সমস্যা বর্তমান তা সমাধানের ইঙ্গিত খুঁজে পাবো।

আদিম মানুষের পাশবিক আচার-আচরণ সেদিনের মানুষের কাছে অস্বাভাবিক বা অসুন্দর ছিল না। কিন্তু যুগবিবর্তনের ফলে তথা সমাজবিবর্তনের ফলে আজকের সভ্য মানুষের কাছে তা শুধু অশ্লীল নয় বীভৎসও। মধ্যযুগীয় মানসিকতার উপর আশ্রয় করে যা ছিল রুচিসম্মত, সাহিত্যে যার অভিব্যক্তি ছিল সেদিন রুচিশীল—আজকের সমাজের সেই মননশীলতার অভিব্যক্তি রুচিসম্মত বা সর্বোচ্চ বলে বিবেচিত হয় না। মধ্যযুগীয় সাহিত্যিক বোক্কাগীয়রের সাহিত্যে যে আদি রসের প্রাধান্য তা আজকের সাহিত্যে স্থান পেতে পারে না। ঠিক একই কারণে সংস্কৃত সাহিত্যে শকুন্তলার দেহগত রূপের বর্ণনা ও কামভাব নিয়ে কালিদাসের প্রগলভতাও উন্নত রুচিশীল মনে অরুচিকর মনে হয়। কিন্তু সেদিন তা অসুন্দর ছিল না এটাই সুন্দরতম প্রকাশ বলে সর্বজনগ্রাহ্য ছিল।

সেদিন যাঁরা বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য রচনা করতে চেয়েছেন তাঁরা জীবনকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন—যেভাবে উপলব্ধি করেছেন ঠিক সেভাবেই নিজেদের মত করে এঁকেছেন। আজকের বিচারে তা অরুচিকর বা অশ্লীল মনে হলেও সেই সমাজে তা রুচিসম্মত মনে হয়েছে এবং হয়েছে বলেই তদানীন্তন সমাজ তা গ্রহণ করেছে এবং প্রশংসা করেছে। কিন্তু আজকে যে সাহিত্যিক সেই পুরনো ধ্যানধারণা বা পুরনো রুচি বা পুরনো সমাজের মনন-শীলতার অভিব্যক্তি সাহিত্যে ঘটান তা আজকের মাপকাঠিতে অশ্লীল হয়ে পড়ে। অবশ্য 'অশ্লীল সাহিত্য' কথাটি বহুল প্রচলিত হলেও এর বাস্তব ভিত্তি নেই। কারণ সাহিত্যে যদি হয় তাহলে অশ্লীল হতে পারে না আর যদি অশ্লীল হয় তাহলে তা আদৌ সাহিত্য পদবাচ্য নয়। সাহিত্যজীবনে সমাজ সম্পর্কে সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিই যুগধর্মী সাহিত্য সৃষ্টির উপকরণ।

আজকের সামাজিক মূল্যবোধ পাল্টেছে। সেইহেতু আজকের সাহিত্যের স্বরূপ, গতিপ্রকৃতি বা সাহিত্য চিন্তা, সাহিত্য জিজ্ঞাসা তথা সমাজ জিজ্ঞাসা পূর্বের মত নয়। আমরা চাই বা না চাই—এই দ্বন্দ্বসংঘাতময় সমাজ ও সামাজিক চিন্তার পরিবর্তন হবেই। এক জায়গায় থেমে থাকবে না, সমাজ ও সভ্যতা পরিবর্তনশীল। আজকের সাহিত্য কোন ধারায় প্রবাহিত তা অনেক আলোচনার অপেক্ষা রাখে। সে প্রশ্নে আমি যাচ্ছি না। আমার আলোচনার বিষয় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে স্বদেশ ও সমাজচিন্তা। অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, রবীন্দ্র সাহিত্যে সমাজ ও স্বদেশ চিন্তা আলোচনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু মনে হয়, সমাজচিন্তার সঙ্গে সাহিত্য চিন্তার সম্পর্ক কি—তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে না পারলে রবীন্দ্র সাহিত্যে সমাজ ও স্বদেশ চিন্তা সঠিকভাবে বোঝা যাবে না। এ প্রশ্নের গভীরে যাওয়ার আগে মানসিকতা কি, সমাজচিন্তা বলতে আমরা কি বুঝি, সমাজচিন্তা কি করে গড়ে ওঠে বা এই সমাজচিন্তা কিভাবে ব্যক্তিচিন্তায় রূপান্তরিত হয় তা আলোচনা করলে জিজ্ঞাসা সহজে বোঝা যাবে। সমাজচিন্তা ব্যক্তিমানসকে নিয়ন্ত্রণ করে বলেই রবীন্দ্র-নাথের মত বহুমুখী প্রতিভাধর সাহিত্যিকও প্রথমত ভাববাদী দর্শন দিয়ে সাহিত্যসেবী হিসাবে গড়ে উঠলেও পরবর্তীকালে সমাজ-চিন্তা তাঁর ব্যক্তিমানসকে পীড়িত করেছিল। সম্ভবতঃ সেই তাড়নাকে কেন্দ্র করেই 'কালান্তর' রচনা।

মানসিকতা বলতে আমরা কি বুঝি? একদিকে প্রত্যেকটি মানুষের নিজস্ব মস্তিষ্কপ্রসূত জল্পনা-কল্পনা ও বিশ্ব-প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে প্রতি-নিয়ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত; অপরদিকে ব্যক্তি-মস্তিষ্কের সঙ্গে তার নিজস্ব সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার দ্বন্দ্ব—এই দুই দ্বন্দ্বের ফলেই এই ব্যক্তি মননশীলতার বিকাশ ঘটছে। সমস্ত মানবসমাজের এই ব্যক্তি মননশীলতার একত্রীকরণের মধ্য দিয়েই সামাজিক মানসিকতার সৃষ্টি। এই সমাজ-মননের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও তার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির ও বহির্জগতের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই ক্রমাগত মানুষের চিন্তার বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি ও এর থেকে মানসিকতার বিকাশ ও ভাবজগতের সৃষ্টি হয়। সামা-জিক চিন্তা বলতে আমরা একটা বিশেষ সমাজের সুনির্দিষ্ট আদর্শগত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে বুঝে থাকি, —যার মধ্যে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারা ও ভাবনা-ধারণার নিয়ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছে। একটা পরিবেশ বা পরিস্থিতির মধ্যে নানান চিন্তার দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিয়ে আমরা একটা সমাজচিন্তার পরিমণ্ডলকে বুঝে থাকি। সমস্ত মানুষের চিন্তার সেই সমাজচিন্তাকেই
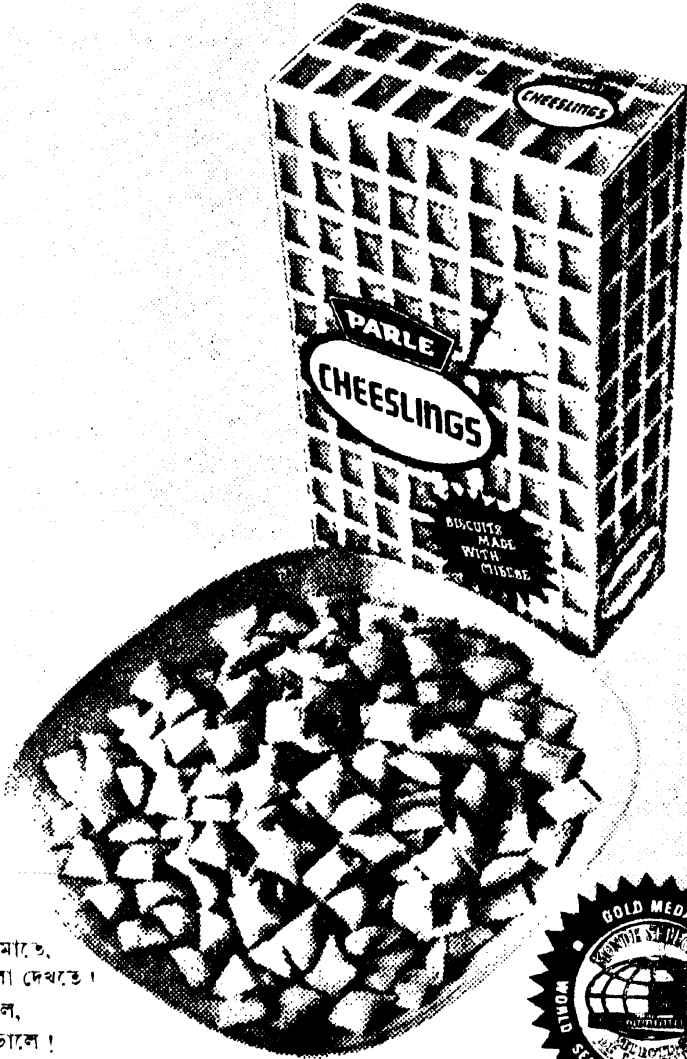
পরিমণ্ডলকে বুঝে থাকি। সমস্ত মনুষ্যে চিন্তায় সেই সমাজচিন্তারই ব্যক্তিকরণ ঘটছে। এই পারসোনিফায়েড সোস্যাল থিংকিং হচ্ছে ব্যক্তিচিন্তা। শংকরাচার্য, যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ প্রভৃতি মনীষীদের চিন্তা এইভাবেই গড়ে উঠে ছিল। আবার রামমোহন নজরুল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র ও বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক চিন্তানায়কদের চিন্তাও এভাবেই গড়ে উঠেছে। তাই বিশেষ বাস্তব পরিবেশের মধ্যে মনুষ্যের ভাবজগৎ সেই পরিধিকে অতিক্রম করে যেতে পারে না—সেই পরিবেশ অনুযায়ী গড়ে ওঠে। অতিক্রম করে যেতে পারে না বলেই অতীতের কোন মনীষীর পক্ষে আধুনিক চিন্তা ভাবনা ও ধারণাগুলির জন্ম দেওয়া সম্ভব হয় নি। এটা তাদের দুর্বলতা নয়, পরিবেশ প্রভাব জন্ম দেওয়ার উপযোগী ছিল না বলেই সম্ভব হয় নি।

ইতিহাস ও যুক্তি বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে ও তার উপর ভর করে যে অভিজ্ঞতা—সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের গতি প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ণয় করতে চাই তাহলে যে সামাজিক পরিস্থিতিতে ও পরিবেশে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি—সেই পরিস্থিতির সঙ্গে সম্যক পরিচয় ঘটার প্রয়োজন আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধকে যেমন বঙ্কিমযুগ বলে অভিহিত করা যেতে পারে, তেমনি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে রবীন্দ্র প্রভাবিত যুগ বলা যেতে পারে। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক থেকেই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য পরিচিতির সূচনাকাল।

বঙ্কিমযুগে দেখা গেছে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভাব, বিদেশী সাহিত্য, শিল্প ও দর্শনের প্রভাব তৎকালীন বাঙালী মানসকে প্রভাবিত করেছিল। সমকালীন রাষ্ট্র চেতনা ও সমাজ-জিজ্ঞাসা সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর যাঁরা ইংরেজী সাহিত্যরস পানের মাদকতায় নিমগ্ন ছিলেন তাঁরা মূলতঃ ব্যষ্টিস্বার্থে নয়—ব্যক্তি-স্বার্থের উপর নির্ভর করে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কল্যাণকে সারা দেশের আপামর জনসাধারণের কল্যাণ বলে জাহির করার চেষ্টা করেছিলেন এবং বিসমার্ক, গ্যারিবল্ডি ও ম্যাটসিনির আদর্শে রাজনৈতিক আন্দোলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাস্তবধরনের রাজনৈতিক চেতনা শিক্ষিত বাঙালীকে প্রভাবিত করেছিল। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এদেশে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও তার রাজনৈতিক ভিত্তি ক্রমশঃ শক্তিশালী হতে লাগল। ইতিমধ্যে ১৮৮৫ খৃঃ ঐতিহাসিক জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হল। শিক্ষিত ও সচেতন ভারতবাসী এই সংগঠনের মাধ্যমে সম্মিলিত শক্তি সঞ্চয় করে—অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর তুললেন। ১৮৯১ খৃঃ ইংরেজ সরকার তার পক্ষে পরিকল্পিত দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বাংলাকে দুটি শাসন বিভাগে বিভক্ত করে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদমূলক বিভ্রান্তিকর চিন্তা গড়ে তুলে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করল। ১৯০৫ খৃঃ লর্ড কার্জন বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করলেন। স্বদেশী আন্দোলন শুরু হল। ১৯০৫ খৃঃ থেকে ১৯১১ খৃঃ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন। একদিকে জেগে উঠলেন লোকমান্য তিলক, লালা রাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি—অপরদিকে 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর' দল গোপনে যুবশক্তিকে প্রস্তুত করতে লাগল ইংরেজ নিধনের জন্য। ইতিমধ্যে ইউরোপে ১৯১৫ খৃঃ প্রথম মহাযুদ্ধ ঘোষিত হল। সুবিচারের আশায় ভারতবাসী ইংরেজ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করল। কিন্তু তাদের ভাগ্যে জুটল 'রাওলা এ্যাক্ট' ও 'জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড'। এদিকে ১৯১৪ খৃঃ মহাত্মা গান্ধী ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন। ১৯১৯ খৃঃ মন্টেগু চেমসফোর্ডের শাসন সংস্কার ঘোষিত হল। কিন্তু ১৯২০ খৃঃ মধ্যে অসহযোগ আন্দোলন সারা দেশে প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। ইংলণ্ডে তিন তিনবার গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেও কোন সুফল হল না। লাভের মধ্যে মুসলমান সমাজ ঘোরতর হিন্দু-বিদ্বেষী হয়ে পড়ল। হিন্দু সমাজকে দুভাগে বিভক্ত করার অপ-
[illegible]
হলে অনিবার্য কারণেই ভারতকে জড়িয়ে পড়তে হল। ফলে যুদ্ধের ঘৃণ্য বীভৎসতা, সমাজভ্রষ্টতা, মানবিক মূল্যবোধের হ্রাস, চরিত্রহানি দেশকে সর্বনাশের পথে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। ১৯৪১ খৃঃ শতাব্দীসূর্য রবীন্দ্রনাথ জঘন্য সমাজ সভ্যতার রক্তাক্ত পটভূমিকায় চিরনিদ্রিত হলেন।

এই সমস্ত নানাপ্রকার জটিল সামাজিক, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় রবীন্দ্র যুগের অর্ধশতাব্দী কেটেছে। রবীন্দ্র চেতনা প্রসার, রবীন্দ্র মানসের ক্রমবিকাশ—সমাজের এই সমস্ত বাস্তব পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে ঘিরে আন্দোলিত হয়েছিল—একে বাদ দিয়ে নয়।

রবীন্দ্রনাথ শুধু সাহিত্য সমালোচনা করেই তাঁর সাহিত্য কীর্তির যবনিকা টানেন নি। দেশের তদানীন্তন রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়েও তিনি তাঁর সুগভীর ও সুচিন্তিত গঠনমূলক বক্তব্য প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। উপন্যাস রচনার গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই দেখা যায় গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ বেশীর ভাগ নরনারীর হৃদয়-স্পন্দন ও তার সঙ্গে সমাজ পরিবার ও নৈতিক চেতনার পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে নানান বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেছেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিশেষকরে ১৯০৫ খৃঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরে অশান্ত সমাজ ও বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক চেতনার আঘাতে তাঁর পরবর্তী সাহিত্য—নৈরাশ্যের পটভূমিকায় জীবনের বৃহত্তর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

যুগধর্ম যেমন নরনারীর জীবনকে প্রভাবিত করে তেমনি কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রভৃতি সমাজের এই চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও এ প্রভাব মুক্ত নয়। এই প্রভাব মুক্ত ন বলেই—যখন ১৯০৫ খৃঃ স্বদেশী আন্দোলন শুরু হল তখন একদিকে যেমন দেশের অন্যান্য শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকার, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, ছাত্র, শিক্ষক সবাই এ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ছিলেন, অপরদিকে রবীন্দ্রনাথও বাদ পড়েন নি। তিনি এগিয়ে গেলেন। বাদ পড়তে পারেন না এড়িয়ে যেতে চাইলেও এড়ানো ততটা সহজ নয়। বাংলা তথা বাঙালীর এক নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। বাংলা দ্বিখণ্ডিত হলে—বাংলার সমাজ দুর্বল হয়ে পড়বে, স্বাবলম্বনশক্তি হারিয়ে ফেলবে মন আশংকায় এই যে ব্যথা,—এই যে যন্ত্রণা কোন ব্যক্তিবিশেষের যন্ত্রণা নয়—সমগ্র বাং তথা বাঙালী সমাজ তথা ভারতবাসী যন্ত্রণা। সাহিত্যিক হিসাবে সমাজের প্রতি কর্তব্যের তাগিদে রবীন্দ্রনাথকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনে। আন্দোলন ত্বরান্বিত করার জন্য বলিষ্ঠ চেতনা, অনুপ্রেরণা জোগাবার জন্য লেখনী ধরতে হয়েছিল। যুগচেতনাকে জাগিয়ে তোলাই ছিল তাঁর কাজ।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দি প্রতিক্রিয়ায় দেশের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই উত্তাল জোয়ারে যখন সেই স্বাদেশিকতার নামে অ পশ্চাৎ বিবেচনা না করে শুভ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়ার চেষ্টা চলতে থা তখন এই পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ঘরে বাইরে উপন্যাস রচনা করেন। উ জাতীয়তাবাদ ও সন্ত্রাসবাদের কবলে নরনারীর আপন সত্তা কিভাবে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত হয় তারই মর্মন্তুদ কাহিনী চা অধ্যায়' প্রকাশ। 'গোরা' উপন্যাসেও ফু উঠেছে সমসাময়িক জীবনচিত্র ও কবির বিরাট দেশ পরিকল্পনার ছবি।

রবীন্দ্রনাথ গল্পে, উপন্যাসে ও প্রবন্ধে সর্বত্র সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও উগ্র স্বদেশী ব্যাপারকে কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। তৎসত্ত্বেও স্বদেশচিন্তা তাঁকে বারবার উদ্বেলিত করেছে। অবশ্য ঠাকুর পরিবার বহুকাল আগেই স্বদেশী চিন্তায় অগ্রণী ছিল। সেযুগের ইঙ্গবঙ্গীদের অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা এই ঠাকুর পরিবারের স্বদেশীচিন্তাকে অনুকরণধর্মী করে তুলতে পারে নি। তাছাড়া হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করে যে স্বাদেশিকতার আগুন জ্বলতে আরম্ভ করেছিল তার থেকে রবীন্দ্রনাথ বালক হলেও দূরে ছিলেন না। হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ একটি জোরালো স্বদেশী কবিতাও পাঠ করেছিলেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোর সেই স্বদেশী আবহাওয়াতেই বেড়ে ওঠে। "রাখীবন্ধন",

...ী 'উৎসব' প্রভৃতি কবিতায় তিনি ...প্রেমের গৌরব ও মিলন প্রচেষ্টাকে ...না জানিয়েছেন। 'ভারতী' পত্রিকায় ...ক স্বদেশচিন্তা প্রসঙ্গে অনেকগুলি ...পূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাঁর ...চিন্তার পরিণত রূপের সার্থক প্রকাশ 'কালান্তর' প্রবন্ধ সঙ্কলনে। ...ন্তরের প্রবন্ধগুলি পড়লে মনে হয় ...নাথ সমাজের বাস্তবসাপেক্ষ ...র পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছেন। তাই ...তদানীন্তন কংগ্রেসের বিভিন্ন সন্ত্রাস... ...কাজকে সমালোচনা করতে দোষ। ...গান্ধীকে অকৃত্রিমস্নেহ করলেও তাঁর ...কাজকে সমর্থন জানাতে পারেননি।

...লান্তরের প্রবন্ধগুলি লেখা হয়েছিল ...ন ১৩২১-এর বৈশাখ থেকে ১৩৪৮-...শাখের মধ্যে। এই সময়কার ভারত... রাজনীতির ও সমাজনীতির এক ...পরিবর্তন ঘটে। মানবিক মূল্যবোধ ...ত, সামাজিক অস্থিরতা, ভারতবাসীর ...উৎপীড়ন, নির্যাতন সমগ্র সমাজে এক ...বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। অল্প ...ব্যবধানে দুটি বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম ...দ্ধের পর গান্ধীজীর আবির্ভাব, ...সংগ্রেসের আন্দোলন, টেরোরিজম ও ...নতা সংগ্রামের জোয়ার সারা ভারত...এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এক ...হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করে জাতীয় ...চেতনার যে জাগরণ হয় তা প্রথম বিশ্ব...দ্ধের পর বেশ দানাবেঁধে ওঠে। প্রাথমিক ...থায় রবীন্দ্রনাথ জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে ...ভাবে জড়িত থাকলেও পরে নরম ও ...পন্থীর মত পার্থক্যের জন্য নিজেকে ...সরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। ...রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ভাবধারায় স্বকীয়তাকে ...রাখলে রেখে এগোবার চেষ্টা করেছিলেন। ...কাজে প্রায়ই রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে মত...পার্থক্য দেখা দিত। রাষ্ট্রনেতাদের উদ্দেশ্য ...স্বরাজ লাভ আর রবীন্দ্রনাথের ...উদ্দেশ্য ছিল চিত্তমুক্তি ও সকল ...মানবের স্বাভাবিক ও সহজ প্রকাশ। ...ভিন্ন সময়ে লিখিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ ...থেকে এই মতভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ, শুধু রাজনৈতিক বা ...সমকালীন ভারতীয় সমাজজীবনের ...আলোচনাই নয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দ্বন্দ্ব সংঘাতগুলি তুলনামূলকভাবে আলোচনা করেছেন কালান্তরের বিশেষ কতকগুলি প্রবন্ধে। এই শ্রেণীর প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করতে গেলে প্রথমেই 'লোকহিত' প্রবন্ধের কথা স্মরণে আসে। সমাজে একশ্রেণী শোষণ করে আর শ্রেণী শোষিত হয়। এই শ্রেণী সংগ্রাম প্রতিটি সমাজব্যবস্থার মধ্যে আছে। তবে বিভিন্ন ভাবে। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীদ্বন্দ্বকে নিজের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত দৃষ্টি কোন থেকেই বিচার করেছেন ও আলোচনা করেছেন। যদিও মার্কস আলোচিত শ্রেণী সংগ্রামের দুটি পরিভাষা—একটি 'বুর্জোয়া শ্রেণী' অপরটি 'প্রলেতারিয়েৎ শ্রেণী' তাঁর প্রবন্ধে অনুপস্থিত। এই প্রবন্ধে সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত ভদ্রশ্রেণীর সঙ্গে সুযোগ-বঞ্চিত, সবচেয়ে অবহেলিত, নিপীড়িত, নিগৃহীত নিম্ন জনসাধারণের পরিবেশগত সামাজিকগত ও অর্থনৈতিকগত পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করে 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে শ্রেণীদ্বন্দ্বের সংঘাতকে পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পটভূমিতে আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন ব্যক্তি সাধনার উপর। কালচার বা কৃষ্টি ছাড়া স্বাধীনতা লাভ অর্থহীন হয়ে পড়ে, এ সত্য তিনি বারবার প্রচার করার চেষ্টা করেছেন। মানসিক অন্ধতা, মনুষ্যত্ব-হীনতা, বাস্তব সমাজ সম্পর্কে অজ্ঞতা কখনও স্বাধীনতার ব্যবহারিক মূল্য সঠিক-ভাবে বিচার করতে পারে না। পারে না বলেই—রবীন্দ্রনাথ প্রথমে সমাজ মানসকে এর থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। ১৩২৬এর মাঘ মাসে 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি প্রকাশ। ইংরেজের সেই স্বাধিকার প্রমত্ততার জন্য নিজেকে এবং নিজের দেশকে একমাত্র সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের এই বাস্তব সত্যটুকু জানা দরকার যে মনুষ্যত্ব একটি অখণ্ড সত্য, তাকে যখন কেউ স্বার্থের বা স্বজাতির খাতিরে খণ্ডিত করার চেষ্টা করে তখন তাকে খণ্ডিত করা যায় না। উপরন্তু তার প্রতিঘাত নিজের দিকে এসে পৌঁছোয়। দেশপ্রেমের ক্ষুদ্রতা এবং সঙ্কীর্ণতা যে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেন নি—'মুক্তধারা' নাট্য-রূপ পরবর্তী যুগে ...ধারা নাটকে দেখেছি। এইভাবে তিনি এক এক 'বাতায়নিকের পত্র', 'সত্যের আহ্বান', 'স্বরাজ সাধন', 'হিন্দু-মুসলমান' প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁর নিজস্ব স্বদেশ চিন্তা ও সমাজের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে সরাসরি গান্ধীজীকে সমালোচনা না করলেও অসহযোগ নীতিকে সমর্থন করেননি। কিন্তু 'সত্যের আহ্বান' ও 'চরকা' প্রবন্ধে তিনি সরাসরি সমালোচনা করেছেন। রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিধি এত বিস্তৃত যে অল্প কথায় ও অল্প আলোচনায় তাঁর স্বদেশপ্রীতি, সমাজনীতি ও অর্থ-নীতির উপর ব্যক্তিগত ধারণা প্রবন্ধাকারে ব্যাখ্যা করা সহজ ব্যাপার নয়। অল্প কয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে যার মধ্যে রবীন্দ্র-নাথের সমাজ সম্পর্কে ধারণা বা স্বদেশ-প্রীতির স্বচ্ছ আলোকপাত ঘটেছে এমন কয়েকটি—শুধু আলোচনা করতে গিয়ে কালের ক্রমশঃই মূল্য দেখে—অল্প কথায় শেষ করার চেষ্টা করছি। মূলকথা রবীন্দ্র-নাথের সমাজচিন্তা ও যুগোপযোগী স্বদেশচিন্তা ও তা সাহিত্যে প্রতিফলন সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে যে সমাজচিন্তা, ব্যক্তিচিন্তা, ভাবজগৎ, বস্তুজগৎ, বিশেষে সমাজের সামাজিক মূল্যবোধ ও সাহিত্যিক মূল্যবোধ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি সেই তত্ত্বের ভিত্তিতেই বলা যায়—কোন সমাজের সচেতন শিল্পী বা সাহিত্যিক সমাজের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ব্যথা-বেদনা ও সমাজ জিজ্ঞাসাকে উপেক্ষা করে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন না। তাই সমাজের অস্থিরতা বিশেষ করে ১৯০৫ খৃঃ থেকে ১৯৩৭ খৃঃ পর্যন্ত রাজনৈতিক এই বিপর্যয় ও পরাধীনতার গ্লানি রবীন্দ্রনাথকেও ভাবিয়ে তুলেছিল।

অনেকের ধারণা রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী—বস্তুবাদী নন। রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী আমি একথা স্বীকার করি। কিন্তু তার সঙ্গে একথাও স্বীকার করি যে, বিশেষ করে ১৯০৫ খৃঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরের থেকে ১৯৩৭ খৃঃ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে বস্তুবাদী চিন্তার আভাস পাওয়া যায়। একথা সত্য যে, যিনি যত বেশী সামাজিক দ্বন্দ্বসংঘাতের সম্মুখীন হন এবং সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সমাজকে, সামাজিক সমস্যাকে তথা জীবন জিজ্ঞাসাকে উপলব্ধি ও বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন—তিনি তত বেশী বস্তুবাদী হয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথ যখন সংঘাতময় পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সমাজ সমস্যা তথা যুগমানসের সমস্যাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন তখনই তাঁকে বস্তুবাদের দিকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। তা তিনি চান বা না চান।

যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর' প্রবন্ধে শুধু সমকালীন ভারত-বর্ষের রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থ-নীতির আলোচনা করেননি, বিশ্বের পরিবর্তিত অবস্থার পটভূমিতে একালের ভারতের সমস্যাও পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছেন। কালান্তরের 'কালান্তর' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনার সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার পারস্পরিক মিলন ঘটেছে। শুধুমাত্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বা হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কে নয়, দেশের ক্ষুদ্র রাজনীতি সম্পর্কেও কালান্তরের প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন।

অবশ্য ন্যাশনালিজম সম্পর্কে রবীন্দ্র-নাথের ধারণা একটু স্বতন্ত্র। ন্যাশনালিজম গ্রন্থে তিনি বলেছেন—

> 'The nationalism is a cruel epidemic of evil that is sweeping over the human world of the Present age, and eating into its moral vitality.'

ন্যাশনালিজম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা থেকে পরিষ্কার হবে যে কেন রবীন্দ্রনাথ উগ্র স্বাদেশিকতার যুগে—অন্য সবারের মত নিজেকে বাঁধা বাঁধনহারা করে সবারের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন নি।

এখনই তো তাকে খুঁজি ॥

কৃষ্ণ ধর

হোক অন্ধকার তবু এখনই তো তাকে খুঁজি
যার দৃষ্টিতে অক্লেশে দেয় আকাশ পাতাল, রৌদ্র, রিমঝিম
বর্ষণেও নেই শেষ।
স্নান করা যায় তাতে অবিরল, পাপ-পুণ্য ধুয়ে মুছে গেলে
নিজেকেই মনে হবে তপস্বী সে তরুণ বালক।
একেই নিবিড় বলে, নবজাত পৃথিবীর সেফার্ড আঁচলে
নতুন ঘাসের মতো তৃষ্ণার্ত শিষ দিয়ে খুঁজি বা তাকেই
সেই চিরন্ময় অমৃতের যার দীক্ষা, অনশ্বর অভ্রান্ত প্রতীক
জীবনের শিকড়ে শিকড়ে, যেন জলধারা প্রশান্ত প্রগাঢ়।
তাকেই তো খোঁজে চোখ, অন্ধকারে, চারধারে
দেশে দেশে, ইতিহাসে, শ্রমে ও কর্মের চত্বরে
নানা ছাঁদে, রূপকল্পে, কখনো বা মানুষেরই নিজস্ব সত্তায়
মাইকেলেঞ্জেলোর বা পিয়েতায় সেন্ট বেসিলিকায়
অশ্রুপাতে, রবীন্দ্রনাথের হাতে কোনো বা বেহাগে
আমাদের এই বাংলাদেশে, চলে নিত্য খোঁজা
বাইরে নয়, ভিতরে ভিতরে
যেমন নদীর স্রোত রাত্রিদিন শুধু পথ খুঁজে
পৌঁছে যায় এক লক্ষ্যে নীল মোহানায়
সেখানেই তার শান্তি, সার্থকতা, পরিপূর্ণ সত্তার বিকাশ
নিজেরই দর্পণে।।

খেলেছ সমস্ত দিন খর রৌদ্রে

ক্ষিতীশ দেব সিকদার

খেলেছ সমস্ত দিন খর রৌদ্রে
চাইছো বিশ্রাম কোন বৃক্ষ
ছায়া দেবে মাথার ওপর ছত্রাকারে
দাঁড়িয়ে থাকনি তুমি কিম্বা চারাগাছ যখন সময় ছিলো
মুখে এসে লেগেছিলো প্রভাতের প্রথম আলোক
মাটি ছিল বর্ষণে মসৃণ
চাইছ বিশ্রাম
কোন বৃক্ষ ছায়া দেবে মাথার ওপর ছত্রাকারে।

খর রৌদ্র চলে গেল চোখের আড়ালে
ফিরবে কোথায় কোন গৃহ
স্থান দেবে মাথার ওপর ছত্রাকারে
পেছনে রাখনি তুমি ছন্দ ভালবাসা যখন আগুন ছিলো
শিরায় শিরায় ছিলো উদ্বেলিত শোণিতের দাগ
স্বপ্ন ছিলো আকাশে উড্ডীন
ফিরবে কোথায়
কোন গৃহ ছায়া দেবে মাথার ওপর ছত্রাকারে!

খেলেছ সমস্ত দিন খর রৌদ্রে হে আমার অবোধ সন্তান!

তোমার ফেরা ॥

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

এই যে তোমার মাটির দাওয়া শান্ত উঠোন খামার বাড়ী,
দাঁতাল নখর চিহ্ন আঁকছে প্রখর গ্রীষ্ম দমকা হাওয়া
শীতের চাবুক শিস তুলছে বুকফাটা ইট দেয়াল ভাঙায়
মানকচু ভিড় করছে তোমার শোবার ঘরে
বসার বেদী
উইয়ের বাসা, ফণীমনসা কাঁটায় বিঁধছে তুলসী মঞ্চ
এবুও তুমি বলছ না যে কিছুই
এ কি ঔদাসীন্য?
রাত গড়াচ্ছে, ট্রেনের বাঁশি গৌরীপুরের বাঁক পেরোচ্ছে
শুনতে পাচ্ছ?
নইলে কাচ ঝাপসা হচ্ছে আমার হাতে লন্ঠন তুলছে
দেখতে পাচ্ছ?
এই কি ফেরার ধরণ তোমার
ফেরার বাড়ী একি তোমার
চিরটা রাত এইভাবে কি দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ম ছিল?

আগে ভাবতুম বাঙালীরা শুধু কলকাতায় থাকেন। কিন্তু রেঙ্গুনে এসে আমার এই ভুল ধারণা ভেঙে গেলো। আজকাল তো আর অতীতের রেঙ্গুন নেই। এখন রেঙ্গুনের হাওয়া একেবারে পাল্টে গেছে। এই শহরে আজকাল মানুষ আছে কিন্তু জীবন নেই। এখন রেঙ্গুনে পাবেন শুধু ইলিশ মাছ আর বাঙালী। প্রতি মাসেই জাহাজে করে বিস্তর ভারতীয় চলে আসছে। কিন্তু বাঙালী নট নড়নচড়ন। দেশে ফিরে আসবার কোন লক্ষণই নেই। রেঙ্গুন শহরে বেশ জাঁকিয়ে বসে আছেন।

আপনারা জানেন এক শহরে দুই বাঙালী থাকলে কী হয়? দুটো ক্লাব, দুটো দুর্গো পুজো এবং সর্বশেষে হাইকোর্ট। রেঙ্গুনের বাঙালীদের দেখে সর্বপ্রথম বুঝতে পারলুম শরৎচন্দ্র পল্লীসমাজের বেণী ঘোষালের চরিত্রকে কোথায় খুঁজে পেয়েছিলেন। কলকাতায় ফিরে এসেও শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনের বাঙালীদের ভুলে যাননি। তাই ঐ বেণী ঘোষালের চরিত্র সৃষ্টি করে রেঙ্গুনের বাঙালীদের স্মৃতিকে অটুট রেখে গেছেন।

আজ রেঙ্গুন ত্যাগ করে এসে বেশ বুঝতে পারছি যে, রেঙ্গুনের বাঙালীদের সহজে ভোলা যায় না। কী করে রেঙ্গুনের চাটুজ্জে, বাঁড়ুজ্জে এবং সেজদাদাদের ভুলি বলুন। আর যদি ভুলবার চেষ্টা করলুম অমনি দূতাবাসে নালিশ চলে গেলো। সবাই বলতে লাগলো, অমন ছাই বাঙালীর মুখে আগুন। আপনার দোষ মাত্র একটি : আপনি বাঙালী।

যাক যেদিন রেঙ্গুনের বাজারে রটে গেলো যে, আমি রেঙ্গুন ছেড়ে চলে যাচ্ছি অমনি সব বাঙালীদের চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগলো। ভেবেছেন ওরা দুঃখে কাঁদছিলো। দূর ছাই? ওরা সবাই কাঁদছিলেন আনন্দে। হয়তো ওরা মনে-মনে বললেন, যাক আপদ বিদেয় হলো—

এই কয়েকমাসের ভেতর যাদের সঙ্গে মাসী পিসী সম্বন্ধ বানিয়েছিলুম তারা সবাই আমাকে বিদায় দিতে এলেন। ওদের হাতে রুমাল ছিলো। আমার সঙ্গে কথা বলেন আর রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছতে লাগলেন।

কেউ কেউ বললেন : যাবার আগে একবার পোয়ে ড্রাগন প্যাগোডায় ঘন্টা বাজিয়ে যাও।' এইখানে একটা কথা চুপি চুপি বলে রাখি। কখনও যদি রেঙ্গুনে ফেরবার আকাঙ্ক্ষা হয় তাহলে পোয়ে ড্র্যাগন প্যাগোডায় একবার ঘন্টা বাজিয়ে আসবেন। আপনার রেঙ্গুনে ফিরে যাবার রিটার্ন টিকিট কাটা হয়ে যাবে। আপনার পাসপোর্ট ভিসার আর কোন চিন্তা করতে হবে না।

আমি রেঙ্গুন ত্যাগ করবার দুদিন আগে বাঙালীদের মোড়ল মিত্তিরদা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মিত্তিরদা রেঙ্গুনে সবপরিচিত। দুর্গো পুজো, রিলিফ ফান্ড, মেমোরিয়াল ফান্ডের সঙ্গে বহুদিন জড়িত ছিলেন। অতএব তার হাতে বিস্তর কাঁচা টাকা ছিলো। যাক এবার মিত্তিরদা বেশ একটা দুঃখের সুরে বললেন : 'তুমি যাচ্ছো এই কথা যেন বিশ্বাসই করতে পারছিনে। এই কয়েকমাসের ভেতর তুমি আমাদের বেশ আপনজন হয়ে গিয়েছিলে। আর শত্রুর কথায় কান দিও না। সরকারী চাকরী করলে দু-একটা গালমন্দো শুনতে হয় বৈকি? জানি সবাই তোমাকে বলবে : 'তুমি কোথায় যাবে? আর যাবেই বা কেন? ঐ কলকাতা শহর তো আর সাহেবদের 'ক্যালকাটা' নেই। দিশী লোকেরা সবাই শহরটাকে শুষে খেয়েছে। তাই ঐ

শহরের নাম করতে হলে সবাই দুঃখ করে বলেন : ওঃ ক্যালকাটা। ঐ শহরে নিত্য মারপিট হচ্ছে। জীবনের হেরফের হচ্ছে। এখন বাড়ী থেকে বেরুলে পর লালবাজারে খবর দিয়ে বেরুতে হয়। কে জানে বাড়ী ফিরবে কিনা?

মিত্তিরদার সহানুভূতিসম্পন্ন কথা শুনে মনটা খুশীতে ভরে উঠলো। স্বীকার করতে হবে ভদ্রলোকের বাঙালী-প্রীতি আছে।

কিন্তু পরের দিনের কাণ্ড শুনুন। ভোরবেলা খবর পেলুম যে আগেরদিন রাত্রে মিত্তিরদা সপরিবারে কলকাতায় চলে গেছেন। যাবার আগে আমার নামে একটি ছোট চিরকুট লিখে গেছেন। লিখেছেন : 'ভায়া, কলকাতায় চললুম। যাবার খবরটা কাউকে বলিনি। বাঙালী মহলে এই খবর জানাজানি হয়ে গেলে আমায় কেউ আস্তো রাখতো না। রেঙ্গুনের বাঙালীদের চেনো তো। ওরা কারু ভালো সইতে পারে না।

প্রথমে মিত্তিরদার এই মন্তব্য আমার কাছে অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়েছিলো। মনে করলুম যে, মিত্তিরদা অযথা রেঙ্গুনের বাঙালীদের নিন্দে করছেন কিন্তু তার পরের দিন যখন চাটুজ্যে গিন্নী, ঘোষদার শ্বাশুড়ী, সেনের শালী আর হালদারের মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন আমার মন বলতে লাগলো মিত্তিরদা লোক চেনেন।

গল্পটা বাড়িয়ে বলবো না। যেমনি ঘটনা ঘটেছিলো তেমনি বলবো।

চাটুজ্যে গিন্নী একটু নাটকের ভংগীতে বললেন : হ্যাঁ ভাই তুমি যাবে। কিন্তু রেঙ্গুন ছেড়ে তুমি কেন যাবে ভাই।

ওর কথার ঢং শুনে মনে হলো যে চাটুজ্যে গিন্নী যেন আমার যাবার কথা একেবারে বিশ্বাস করেননি।

ঘোষদার শ্বাশুড়ী বললেন : তুমি যাচ্ছো কেন ভাই, তুমি কী আমাদের উপর রাগ করেছ?

সেনের শালী কণ্ঠস্বর একমাত্রা উঁচুতে উঠিয়ে বললেন : 'আপনি যে রেঙ্গুন ত্যাগ করে যাবেন এই কথা আমাদের মন একেবারেই বিশ্বাস করতে চাইছে না।'

এবার হালদারের মেয়ে মুখ খুললেন। আমরা রেঙ্গুনের সবাই হালদারের মেয়েকে 'হালদার ডটার' বলে ডাকতুম। উনি সম্প্রতি মেমসাহেব হয়েছেন। শাড়ী ছেড়ে মিনি-স্কার্ট পড়তে সুরু করেছেন। ঠোঁটে সিঁদুর মাখেন। 'হালদার ডটার' এবার একটু ফিক করে হেসে বললেন : সো ইউ আর গোয়িং: উই স্যাল মিস ইউ ভেরী মাচ।

এমনি ধরণের আরো বহু বিদায়-স্তুতি আমাকে শুনতে হলো। খানিক বাদে 'হালদার ডটার' চলে গেলেন।

ব্যস এবার চাটুজ্যে গিন্নী, ঘোষদার শাশুড়ীর আর সেনের শালীর মুখ খুললো। চাটুজ্যে গিন্নী বেশ একটু রাগের সুরে বললেন : ঐ ডাণ্ডাস মেয়ের মুখে আগুন: এমনভাবে আপনার সঙ্গে কথা বললো যেন ঐ মেয়ে আপনার 'লভে' পড়েছেন। চাটুজ্যে গিন্নীর কথা শুনে লজ্জায় আমার মুখ রক্তিম হলো।

ঘোষদার শাশুড়ী আমার প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে বললেন : ওকে লজ্জা দিচ্ছো কেন ভাই? ওর কী দোষ? ঐ ধিঙ্গী মেয়ের কথা যদি বলি......

ঘোষদার শাশুড়ীর কথা শেষ করতে হলো না। চাটুজ্যে গিন্নী, সেনের শালী একসঙ্গে বলে উঠলেন :

—বলুন না। আপনার কথা শুনবার জন্যে আমাদের পেট ফেঁপে উঠেছে!

এবার ঘোষদার শ্বাশুড়ী বেশ জাঁকিয়ে গল্প সুরু করলেন। বললেন 'কাউকে বলবে না।'

: পাগল হয়েছেন। দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন।

: শুনেছি ঐ মেয়ে নাকি আজকাল লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খায়।

ব্যস এবার তিনজনে মিলে হালদারের ডটারের নিন্দা সংকীর্তন সুরু করলেন। শুনেছি আজ অবধি রেঙ্গুনের বাঙালীরা ভগবানের নাম সংকীর্তন করেননি, কিন্তু পরনিন্দা সংকীর্তন যথেষ্ট হয়েছে।

'হালদারের ডটারের' নিন্দা শেষ করে সেনের শালী চলে গেলেন। যাবার আগে আমাকে বললেন: 'আমাদের কিন্তু ভুলে যাবেন না।'

এই কথা বলে সেনের শালী বিদায় নিলেন। চাটুজ্যে গিন্নীর মুখ দিয়ে এবার খৈ ফুটতে সুরু করলো। : শুনলে কথা। আমাদের সবাইকে কী করে অপমান করে গেলো।

আমি কিন্তু চাটুজ্যে গিন্নীর কথা শুনে বেশ একটু বিস্ময় প্রকাশ করলুম। জিজ্ঞেস করলুম : কার কথা বলছেন?

কার কথা বলবো? তোমার ঐ সেনের শালীর কথা বলছি। আমাদের সবাইকে শুনিয়ে বলে গেলো : আমাদের কথা ভুলে যাবেন না।' আমাদের সঙ্গে কথা বলে গেলো না।

ঘোষদার শাশুড়ী চাটুজ্যে গিন্নীকে সমর্থন জানিয়ে বললেন : 'তুমি ঠিক কথা বলেছ। কী জাঁহাবাজ মেয়ে বাবা। আমাদের পানে একবার না তাকিয়ে বেশ গটগট করে চলে গেলো।

: তাহলে বলবো ওর কথা—চাটুজ্যে গিন্নী তার কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়িয়ে বললেন।

ঘোষদার শাশুড়ী উৎসাহিত বোধ করলেন। এবার 'ওর কথা' মানে সেনের শালীর কথা সুরু হলো। আর 'ওর কথা' মানে আরব্যোপন্যাস রচনা সুরু হলো।

এমনি করে প্রায় দশ মিনিট গপ্পো হলো। চাটুজ্যে গিন্নী আর ঘোষদার শাশুড়ী আমাকে ছেড়ে যাবার কোন লক্ষণই দেখালেন না। আমি নিজে বেশ অস্বোয়াস্তি বোধ করতে লাগলুম। কতোক্ষণ আর মেয়েদের সঙ্গে বসে গপ্পো করা যায়। বার বার ঘড়ির পানে তাকাতে লাগলুম। অর্থাৎ ইঙ্গিত-আকারে বললুম : এবার যান। কিন্তু দুজনের কেউ-ই নড়বার কোন চিহ্ন দেখালেন না।

এমনি করে আরো পাঁচ মিনিট কাটলো, এবার আমি ঘোষদার শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করলুম : আপনি যাবেন না?'

ঘোষদার শাশুড়ী এবার নীচু গলায় জবাব দিলেন : ওকে কিন্তু ভাই একেবারেই বিশ্বাস করতে পারছি নে।

আমি বিস্মিত হতবাক হয়ে বললুম আপনি কী বলছেন? ওকে মানে কে?

ঘোষদার শাশুড়ীর কণ্ঠস্বর আরো নীচু হলো। বললেন : ওকে মানে চাটুজ্যে গিন্নীকে।

: কেন? আমার বিস্ময়ের বাঁধ ভাংগলো।

: উনি আবার কী করলেন?

: কী আবার করবেন? হয়তো আমি চলে গেলে ঐ চাটুজ্যে গিন্নী আপনমনে বিড়-বিড় করে আমার পিণ্ডি চটকাবেন। রেঙ্গুনের বাঙালীদের আপনি চেনেন না।

'আমি চুপ করে গেলুম। জবাব দেবার মতো আর কোন শব্দ খুঁজে পেলুম না।'

এই হলো রেঙ্গুনের বাঙালীর জীবন আরো সহজে বলতে পারেন বিদেশে বাঙালীর জীবন-কথা। শুনলে হাসবেন কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করুন। আমরা হলুম কলকাতায় সাহেব, বিদেশে বাঙালী।

যাক এবার আপনাদের মধ্যপ্রাচ্যের বাঙালীর গপ্পো বলি। রেঙ্গুন ছেড়ে এলুম কায়রোতে। তখন কী ছাই ভেবেছিলুম যে মিশরের রাজধানীতে বসে আবার বাঙালীর পরনিন্দা পরচর্চা শুনতে হবে।

কায়রোর বিমানবন্দরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে এক বাঙালী এসে আমার কাছে দণ্ডবৎ হয়ে বললো : 'দাদা, পেন্নাম। 'আমার নাম নারায়ণ'। মিস্টার নারায়ণ বাঙালী।

: মিস্টার নারায়ণ, বাঙালী। অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বললুম। আমার কণ্ঠস্বরে খানিকটা বিস্ময়, খানিকটা উত্তেজনা ছিলো। হয়তো আমার বিস্ময় ও কৌতূহল নারায়ণের দৃষ্টি এড়ালো না। একগাল হেসে বললো, ইয়েস সার। মিস্টার নারায়ণ। প্রবাসী বাঙালী। দেশে থাকাকালীন নামের আগে 'শ্রী' পদবী লিখতুম। কিন্তু দাদা আমাকে কী বললেন জানেন? 'নারায়ণ দেশ ত্যাগ করে এসে যদি নামের আগে 'মিস্টার' না লিখতে পারলি তাহলে আর সাত-সমুদ্দুর পার হয়ে এই যবনের দেশে এলি কেন?

: দাদা? আমার কণ্ঠস্বরের উত্তেজনা ক্রমেই বাড়তে লাগলো।

: হ্যাঁ। দি গ্রেট বেঙ্গলী। কায়রোর বেঙ্গল সোসাইটির প্রাণ। দাদা না থাকলে কায়রোর বেঙ্গল সোসাইটি জীবিত থাকতো না। আর এই অধমকে যে দেখছেন, এই অধম হলো দাদার সেবক। যাক দাদা আমাকে আজ ডেকে বললেন : নারায়ণ কায়রোতে আর একজন বেঙ্গলী আসছেন। আমাদের বেঙ্গল সোসাইটির আর একজন মেম্বর বাড়লো। ওকে এয়ারপোর্টে অভ্যর্থনা

করতে যাও। তাইতো আপনাকে পেন্নাম করতে এলুম।

কায়রোর এই মহাপ্রাণ দাদার সম্বন্ধে আমার জানবার আকাঙ্ক্ষা আরো তীব্র ও প্রবল হলো। হবে না কেন বলুন? বাঙালীর জানবার আকাঙ্ক্ষা অপরিসীম।

ঃ তোমার দাদা কী করেন? আমি একটু মৃদু কন্ঠেই জিজ্ঞেস করলুম।

ঃ দাদার কোয়ালিফিকেশন? দাদা হলেন 'বাটার মাস্টার।'

ঃ বাটার মাস্টার? দাদার এই পদবী শুনে আমি বেশ একটু হকচকিয়ে গেলুম। বাটার মাস্টার? এই কথার মানে কী মিস্টার নারায়ণ?

একগাল হেসে মিস্টার নারায়ণ বললোঃ বুঝলেন, দেশে আপনারা কতাদের হাত করতে হলে তেল ব্যবহার করেন। বিদেশে সাহেবদের হাত করতে হলে 'বাটার' ব্যবহার করি। দাদা আমার বাটার দিয়ে কায়রোর কর্তাদের এমনি হাত করেছেন ওরা সবাই দাদার কথায় ওঠেন বসেন। দাদা কখনই পাপ করেন না। বড়ো ধার্মিক।

আমি আবার অস্ফুটে স্বরে বললুম, দাদা বুঝি ধর্ম করেন?

একগাল হেসে মিস্টার নারায়ণ বললোঃ ধর্ম! জানেন তো এই দেশে সবাই পাঁচবার নামাজ পড়ে। কিন্তু আমার দাদা, দশবার চণ্ডীপাঠ, গীতা পাঠ, রামায়ণ পাঠ করেন। এখানকার সবাই দাদাকে এতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন যে, দাদাকে দেখলেই বলেন 'মিস্টার নান্দী, ইউ আর এঞ্জেল!' উঁহু আমার দাদার ভেতর একটুও খুঁৎ পাবেন না।'

এবার আমি কী প্রশ্ন করবো ভেবে পেলুম না। তাই হঠাৎ আচমকা জিজ্ঞেস করলুম ঃ দাদার বুঝি কোন বদ দোষ, মানে এই পান, সিগ্রেট খাবার অভ্যেস নেই?

আমার প্রশ্ন শুনে মিস্টার নারায়ণ হাসতে সুরু করলো। প্রথমে মৃদু হাসি, তারপর উচ্চ হাসি।

ঃ কী যে বলেন, দাদা পান—মানে ড্রিংকস করবেন? দাদার চরিত্র আপনি জানেন না। একেবারে স্পটলেস। আপনি দাদাকে ড্রিংকস দিন, দাদা মুখ ফিরিয়ে নেবেন। তবে যখন কায়রোতে খুব শীত পড়ে তখন দাদা আমাকে ডেকে বলেন ঃ 'নারায়ণ একটা লেপ দে।' আমি দাদাকে কী বলি জানেন? দাদা লেপ দিয়ে কিছু হবে না। দাদা কায়রোর শীত লেপ দিয়ে ঢাকতে পারবেন না। বরং একটু মৃত-সঞ্জীবনী খান?

ঃ মৃতসঞ্জীবনী? আমার বিস্ময় ক্রমেই বাড়তে থাকলো।

ঃ হাঁ মৃতসঞ্জীবনী! তবে আমার দাদা তো সাহেব মানুষ। উনি আবার দিশী মৃতসঞ্জীবনী খান না। তাই আমি ওকে বিলেতী ব্রান্ডি ঢেলে দিই। বেশী নয়, কয়েক ফোঁটা—'কুড়ি চামচ ব্রান্ডি।

ঃ কুড়ি চামচ—এবার আমার কণ্ঠ উঁচু হলো।

ঃ কুড়ি চামচ। সকালে কুড়ি চামচ। শীত যদি একটু বেশী থাকে তবে দুপুরে কুড়ি চামচ। বিকেলটা যদি কনকনে হয়, তাহলে কুড়ি চামচ, আর রাত্রিবেলা যদি বরফ পড়ে......

নারায়ণের কথা শেষ হবার আগেই আমি বললুম ঃ তোমাকে আর বলতে হবে না। তবে দাদাতো শুধু শীতকালেই মৃত-সঞ্জীবনী খান।

এবার একটু লজ্জামিশ্রিত কন্ঠে মিস্টার নারায়ণ বললো ঃ কী যে বলেন। আপনি দাদাকে চেনেন না, তাই এই কথা বলেন। বর্ষাকালে যখন বৃষ্টি পড়ে তখন আমি দাদাকে কতো বলি—দাদা একটু 'স্কটল্যান্ড' খান? শরীরটা চাঙ্গা থাকবে, মেজাজও শরীফ থাকবে।

ঃ 'স্কটল্যান্ড'! 'আমার বিস্ময়ের বাঁধ উপচে পড়লো।

ঃ স্কটল্যান্ড! মানে ঐ যে আপনারা যাকে বলেন হুইস্কী, আমি ওটাকে বলি স্কটল্যান্ড। কিন্তু আমার দাদা এমন ধর্ম-ভীরু লোক, স্কটল্যান্ড উনি একেবারেই ছোন না। উনি বলেন, নারায়ণ যদি শরীরটা ঠিক রাখতে হয়, তাহলে তোর ঐ মৃত-সঞ্জীবনীই দে। ব্যস আমি দাদার গেলাসে কুড়ি চামচ মৃতসঞ্জীবনী ঢেলে দিই। আর একটা কী কাজ করি জানেন?

ঃ কী? 'আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

ঃ দাদাকে বলবেন না?

ঃ পাগল হয়েছ!

ঃ নেভার।

ঃ কস্মিনকালেও নয়।

ঃ আমি দাদাকে না বলে ঐ কুড়ি চামচের মৃতসঞ্জীবনীর সংগে আরো কুড়ি চামচ স্কটল্যান্ড ঢেলে দিই। যদি খুব বৃষ্টি হয়—

নারায়ণের কথা শেষ হবার আগেই বলি ঃ সকালে একবার, দুপুরে একবার, বিকেলে একবার আর রাত্রিবেলা—

এবার আমার কথা শেষ হবার আগে মিস্টার নারায়ণ জবাব দিলো ঃ 'আপনি তো জিনিয়াস। এতো কথা জানলেন কী করে। খুব জোর বৃষ্টি হলে রাত্রিবেলা দাদাকে বেশ একটু বেশী ডোজ দিতে হয়। আর বাকী মৃতসঞ্জীবনীর যে তলানি থাকে ঐটুকু দাদা আমাকে পেসাদ দেন।'

আমি এবার একটু দৃঢ় কন্ঠে জিজ্ঞেস করলাম ঃ বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা মিস্টার নারায়ণ তোমার দাদা বেশ গুণী তো। উনি তো মৃতসঞ্জীবনীই খান—আর কিছু...

এবার মিস্টার নারায়ণ বেশ চটে গেলো। বেশ একটু উত্তেজিত কন্ঠে বললো, আপনি তো আচ্ছা লোক। আমার দাদাকে আপনি কী ভাবছেন? এই গোটা দুনিয়ায় দাদার সামিল লোক কোথাও পাবেন না। ধর্ম ধর্ম করেই দাদা পাগল হয়ে গেলেন। সন্ধ্যার পর মৃতসঞ্জীবনী খাবার পর দাদার মেজাজ যখন চাঙ্গা হয়ে ওঠে তখন দাদা সমস্ত বেদ, গীতা একসুরে বলতে পারেন। দাদার মতো অমন চণ্ডীপাঠ কেউ করতে পারবে না।'

ঃ না, না নারায়ণ, আমি চণ্ডীপাঠের কথা বলছিনে। তোমার দাদা হলেন ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তি।

এবার একটু ব্যঙ্গ করে নারায়ণ বললো, তাহলে আপনি কী মনে করেন

দাদা হলেন 'ম্যাডম্যান।' আমার দাদা হলেন এই কায়রো শহরের সবচাইতে সেরা আদমী। ঠাকুরের কথা শুনলেই দাদার চোখে জল আসে। কোনদিন পরদ্রব্যে পর নারীর উপর দাদা দৃষ্টি দেন না।

: পরনারী—আমি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলুম।

এবার মিস্টার নারায়ণ একগাল হেসে ফেললো। বললো, জানি আপনি কী বলতে চাইছেন? ভাবছেন দাদার বুঝি মেয়েমানুষের প্রতি আসক্তি আছে। দূরে দূরে, দাদার অমন কোন বদদোষ পাবেন না। মেয়েমানুষ দেখলেই দাদা চোখ বুজে থাকেন। এই দেখুন না আমাদের গৌরীর কথা।'

: গৌরী? সে আবার কে?

: আরে গৌরী। গৌরী হলো দাদার পাশের বাড়ীর মেয়ে। বয়স বেশী নয়—পঁচিশ বছর। দেহে আছে—যৌবন আছে। আর আজকালকার মেয়েদের ফ্যাসন জানেন তো?

: কী ফ্যাসন? আমি বেশ নির্লিপ্ত কণ্ঠেই জিজ্ঞেস করলুম।

: কী আবার হবে। ওরা আজকাল আবার কাপড়-চোপড় একটু আলগা করে পরেন। যাক গৌরীর কথা বলছিলুম। গৌরী প্রায়ই দাদার কাছে আসেন। বলে ইংরেজী শিখবো। গৌরীকে দেখলেই দাদা বলেন, নারায়ণ ঐ সোমত্ত মেয়েকে ঘরে ঢুকতে দিও না! আমি কিন্তু দাদার কথার প্রতিবাদ করি। বলি দাদা আপনি বড্ডো সেকেলে সেন্টিমেন্টাল। মেয়েটি আপনার কাছে ইংরেজী শিখতে চায়, আপনি কেন আপত্তি করেন। আপনি একটুও ভয় পাবেন না। আমি সবদিক সামলাবো। আর গৌরী এলে আমি কী করি জানেন?

: দরজা জানলা সব বন্ধ করে দিই। গৌরী যে দাদার কাছে এসেছে কাউকে জানতে দিই না।

: আইডিয়া তো খুবই চমৎকার মিস্টার নারায়ণ—আমি জবাব দিই।

একটু লজ্জিত হয়ে মিস্টার নারায়ণ বলে: কী যে বলেন! আমি হলুম দাদার সেবক। সবই দাদার ইচ্ছে, আমি কর্ম করি আর দাদার যে ইংরেজী জ্ঞান। গৌরীকে ইংরেজীর এ, বি, সি, ডি গট গট করে শিখিয়ে দেন।

এবার বুঝতে পারলুম মিস্টার নারায়ণের দাদা সত্যিই কায়রোর বাঙালী সমাজের প্রাণ।

নারায়ণ এবার আমাকে বললো, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি শুধু দাদার সেবক নই—আপনারও সেবক। যাক কয়েকদিন এই কায়রো শহরে থাকুন, সব বাঙালীকে চিনতে পারবেন। ডলার ঘোষ, স্টার্লিং রয়, ফ্রাঙ্ক মিটার, দয়েচ বাড়ুজ্যের সঙ্গে আপনার জান পয়চান হবে।

ডলার ঘোষ, স্টার্লিং রয়, ফ্রাঙ্ক মিটার? তুমি কী বলছো নারায়ণ? তোমার কথার মানে তো ঠিক বুঝতে পারলুম না।

একগাল হেসে নারায়ণ বললো, বুঝেছি দাদা। কলকাতার গন্ধ এখনও আপনার গা থেকে যায়নি। এখনও আপনারা শংকর ঘোষ, সমীর রায়, বিজন মিত্র সুধীর বাড়ুজ্যে নাম ধরে ডাকেন। কিন্তু বিদেশে এলে বাঙালীদের নাম পাল্টায়। মাইনের অংক দেখে আমরা লোকদের ডাকি। আমাদের ডলার ঘোষ ডলারে মাইনে পান। যুনাইটেড নেশনস-এ কাজ করেন। স্টার্লিং রয় ব্রিটিশ পাউণ্ড শিলিং-এ চেক কাটেন। বড়ো এক পেট্রোলিয়াম কোম্পানীতে কাজ করেন। ফ্রাঙ্ক মিটার ইউনেস্কোতে কাজ করেন। শুনেছি ফরাসী মুদ্রায় বাজার করেন। কিন্তু দাদা সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন আমাদের দয়েচ বাড়ুজ্যে। জার্মানীর এক স্টীল কোম্পানীর প্রতিনিধি। ওকে গিয়ে নাম জিজ্ঞেস করলে কী জবাব দেবে জানেন? বলবে: আমার

নাম টেন থাউজেণ্ড।

টেন থাউজেণ্ড।

নারায়ণের গপ্পো শুনে আমি ক্রমেই তাজ্জব হচ্ছিলুম। কিন্তু টেন থাউজেণ্ড কারু নাম হতে পারে বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। খানিকক্ষণ আমি চুপ করে রইলুম। হয়তো আমার মনের বিস্ময়ের কথা নারায়ণ বুঝতে পারলো। তাই একটু হেসে বললো: টেন থাউজেণ্ড ওঁর নাম নয় দাদা। ওটা হলো মাইনের ফিগার অর্থাৎ কথা শুরু করবার আগেই দয়েচ বাড়ুজ্যে সবাইকে জানিয়ে দেন উনি কতো মাইনে পান। উনি তো প্রতি কথায় ডলার ঘোষ এদের তুচ্ছ করে বলেন: ওদের আবার মার্কেট ভ্যালু আছে নাকি। বাজারে তো আজকাল ডলার অচল। ডলার দিদি আবার এই কথা শুনলে ভারী মাইণ্ড করেন। যাক চলুন একদিন আমার সঙ্গে। পরিচয় করিয়ে দেবো।

এই কথা বলেই নারায়ণ কণ্ঠস্বর একটু নীচু করে বললো: আসল কথা কী দাদা জানেন। আপনার সঙ্গে ওদের কাছে গেলে একটু 'ওয়াটার' খেতে পারবো। আমি যদি একা ডলার দাদার কাছে যাই তাহলে ডলার দিদি কী বলেন জানেন, নারায়ণ যা এক ডজন ডিম কিনে আন। আর স্টার্লিং রয়ের বাড়ীতে গেলে স্টার্লিং বৌদি আমার প্যাকেট থেকে একটার পর একটা সিগারেট খান। এবার যদি আপনার সঙ্গে যাই তাহলে 'ওয়াটার' একটু খেতে পাবো। আর আপনি যখন চিড়িয়াখানায় কাজ করেন—

'চিড়িয়াখানা?' বিস্ময় ও রাগ দুটোই যেন আমার কণ্ঠস্বর দিয়ে বেরুলো।

: কিছু মনে করবেন না দাদা। আপনারা ইংরাজীতে যাকে বলেন এম্বাসী কায়রোতে বাঙালী মহলে ওটার নাম হলো চিড়িয়াখানা। হবে না কেন এই নাম। এয়ার পোর্টে যেই এলো সেই ছুটে গেলো ঐ অঞ্চলে। ওটা বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু আমরা ওকে চিড়িয়াখানা বলে ডাকি। আমার কথায় কিছু অফেন্স নেবেন না।

অফেন্স নিলে পরও কিছু করবার যো ছিলো না। কারণ রেঙ্গুনে থাকাকালীন একবার চিত্রাঙ্গদা নাটকের সময় স্টেজে উঠে দাঁড়িয়েছিলুম। দর্শকমণ্ডলী থেকে প্রচুর এনকোর পেয়েছিলুম। পরে এই এনকোর দেবার কারণ শুনেছিলুম যে আমার দর্শন নাকি ওরা সচরাচর পান না। তাই একবার আমাকে দেখে ওরা তুষ্ট হননি। বার বার দেখবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন।

কায়রোতে থাকার দিন তিনেক বাদে একদিন মিস্টার নারায়ণের সঙ্গে ডলার ঘোষের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে গেলুম। ভাবলুম এ বাঙালীর সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয় করে রাখা ভালো। হয়তো ভবিষ্যৎ-এ উপকার হবে। আর বিদেশে যদি বাঙালী বাঙালীকে না দেখে তাহলে কে দেখবে।

ডলার ঘোষ আমাদের দুজনকে দেখে চীৎকার করে উঠলেন। পরে কথা প্রসঙ্গে বুঝতে পারলুম যে ওটা আনন্দধ্বনি নয়, ক্রোধের চিৎ। রাগটা আমার উপরে নয়, নারায়ণের উপর।

: আরে নারায়ণ, সেই যে দুই মাস আগে তুই মুর্গীর ডিম পোলট্রী থেকে কিনে দিবি বলে চলে গেলি, আর তো এই অঞ্চলে তোর দেখা সাক্ষাৎ পাইনি। কী ব্যাপার?

নারায়ণ একটু কৈফিয়তের সুরে বললো, দাদা ঐ পোলট্রীর মুর্গীগুলো তো এখনও বড়ো হয়নি তাই আর ডিম জোগাড় করতে পারিনি।

: বাজারে একডজন ডিম কতো জানিস? ডলার ঘোষ আবার ধমকের সুরে প্রশ্ন করলেন।

: কুড়ি পিয়াসট্রা—নারায়ণ মিন মিন করে বললো।

: পোলট্রীর ডিমের দাম কতো? ডলার ঘোষ এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন।

: আঠার পিয়াসট্রা। নারায়ণ জবাব দিলো কিন্তু সেই সঙ্গে বললো, কিন্তু ডলারদা এখান থেকে পোলট্রীতে বাসের যাতায়াতের খরচ হলো পাঁচ পিয়াসট্রা।

এবার ডলার ঘোষের কণ্ঠস্বর একটু মিহি হলো। বললেন, দ্যাখ নারায়ণ, জীবনে পরোপকার করা হলো সবচাইতে বড়ো ধর্ম।

এই কথা বলতে বলতে ডলার ঘোষের নজর আমার উপর পড়লো। হয়তো এতো-ক্ষণ উনি আমাকে দেখতে পাননি। চোখ দিয়ে নারায়ণকে জিজ্ঞেস করলেন : কে?

নারায়ণ এবার লোকটিকে সম্বোধন করলো, ডলারদা উনি আমাদের কায়রোর নতুন বাঙালী। [illegible] একজন [illegible] রয়েছেন।

ও আচ্ছা তো নারায়ণ এই ভদ্রলোকের আগমন উপলক্ষে একটা সেলিব্রেট করতে হয়। [illegible]

ডলার ঘোষের কথা শেষ হবার আগেই নারায়ণ বললো : ডলারদা, ঐ সেদিন বলছিলেন আপনার কাছে একটা নতুন বোতল এসেছে। কী জানি নাম?

: শিভাস রিগ্যাল। বেস্ট হুইস্কী ইন দি ওয়ার্ল্ড। বেশ একটু অহংকারের সঙ্গেই ডলার ঘোষ জবাব দিলেন। তারপর আমার পানে তাকিয়ে বললেন, আপনি কায়রোতে এসেছেন। সুখী হলুম। যাক আপনার আগমন নিয়ে একটু সেলিব্রেট করা যাক। আর নারায়ণও বেশ কিছুদিন হলো আমার পেছনে লেগেছে। ঐ শিভাস রিগ্যালের ছিপি খোলেনি।

তারপর গলার স্বর নীচু করে বললেন, আপনাদের ঐ ভদ্রলোকের কাণ্ড আর বলবেন না। এখানে বড়ো কর্তারা সবাই যোগ দিয়েছেন আর বড়োবাবুরা হিসেবের খাতায় নিয়োগ করছেন। তাই ঐ অফিসে আর ঢুঁ মারিনে। যাক আপনি যখন নিজে থেকেই দেখা করতে এলেন তখন আপনাকে একটু এক্ষে ওয়েলকাম করা যাক। আচ্ছা...

ডলার ঘোষ বেশ বজ্রগম্ভীর গলায় তার চাপরাসীকে ডাকলেন।

আর্দালী [illegible] সেলাম ঠুকে এসে দাঁড়ালো।

সোডা আইস আর বোতল লাও বেশ একগালী সুরে ডলার ঘোষ বললেন।

[illegible] দেখতে পেলুম যে নারায়ণের মুখ আনন্দের উজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে। যাক এবার ডলার ঘোষের বাড়ীতে [illegible] পাওয়া গেছে। কিন্তু একটা বাধেই বিপদ ঘটলো। হঠাৎ ডলার ঘোষ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, নতুন কায়রোতে এলেন। সরকার ভালো এক্সাইজ দিচ্ছেন তো। কায়রোর [illegible] নিশ্চয় [illegible]।

আমি একটু নম্র সুরে বললুম : মন্দ নয়। দিন চলে যায়।

: বেশ ভালো। তা আপনি কোন কারেন্সীতে পান। এখানে স্টার্লিং না ডলারে। প্রশ্নটা শুনে আমি একটু চমকে গেলুম। কিন্তু একটু বাদে নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম... সরকারের একটাতেও না। ইজিপশিয়ান কারেন্সীতে মাইনে পাচ্ছি। আমার জবাব শুনে ডলার ঘোষের মুখ বেশ গম্ভীর হয়ে গেলো। মনে হলো এই ধরনের জবাব দিয়ে যেন মস্ত অপরাধ করেছি। তিনি আবার চীৎকার করে বললেন : আহমদ [illegible] জলদি হ্যায়। ফ্রিজীডেয়ার বন্ধ করো। কফি লাও।

তারপর আমার পানে তাকিয়ে বললেন : বুঝলেন মশাই, নিশ্চিন্তে শিভাস রিগ্যালের বোতলগুলো আলমারীতে বন্ধ করে রেখে গেছেন—

কিন্তু ডলার ঘোষের কথা শেষ হবার আগেই নারায়ণ বললো : ডলারদিদি কিন্তু বাড়ীতেই আছেন দাদা। মনে হলো যেন বাড়ীর ভেতর থেকে ওর গলার আওয়াজ শুনতে পেলুম।...

এবার ডলার ঘোষ ধমক দিয়ে বলে উঠলেন : যখন আমি বলছি যে আমার স্ত্রী বাড়ীতে নেই তখন উনি নিশ্চয় বাড়ীতে নেই। বাড়ীতে থাকলেও অফিসিয়ালি বাড়ীতে নেই। যাক কফি খান, ব্রেজিলিয়ান কফি......

কিন্তু নারায়ণের মুখে নৈরাশ্যের স্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠেছিলো। এবার আমার পানে তাকিয়ে বললো, উঠুন দাদা, এখন যদি না বেরুন তাহলে বাজারের দোকান-গুলো বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর ডলার ঘোষকে উদ্দেশ্য করে বললো : দাদা আমার একটু বাজারে সওদা করতে বেরুবেন। এখন না গেলে দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যাবে।

ডলার ঘোষ আমাদের পানে ভ্রুকুটি করে তাকালেন, তারপর নারায়ণকে বললেন : আজ তো চললি। আমার মুর্গীর ডিমের কী হলো?

নারায়ণ একটু মৃদু হেসে বললো : পোলট্রীর মুর্গী দাদা। আজকাল আবার ট্রেড ইউনিয়নের যুগ। সহজে বড়ো হতে চায় না। আর বড়ো না হলে ডিম পাওয়া যায় না। মুর্গী বড়ো হোক, ডিম দিক, সব ডিমই আপনাকে এনে দেবো।

ডলার ঘোষের জবাব না শুনেই আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।

রাস্তায় এসে নারায়ণ একটু চড়া মেজাজ করে বললো : ছিঃ ছিঃ আপনি যে একেবারে ডাঙ্গার কাছে এসে নৌকো ডোবাবেন এ কিন্তু কখনই কল্পনা করিনি। আর একটু দেরী করে যদি ঐ ইজিপ-শিয়ান কারেন্সীতে মাইনে পাবার জবাবটা দিতেন তাহলে ঐ শিভাস রিগ্যালের বোতলের ছিপি খোলা হয়ে যেতো। দূর, দূর, বিদেশে বাঙালীদের সঙ্গে কী করে মিশতে হয় জানেন না। যাক চলুন এবার স্টার্লিং রয়ের বাড়ীতে ঢুঁ মেরে আসি। দেখবেন এবার কিন্তু কোন বেফাঁস কথা বলবেন না।'

এই বলে নারায়ণ পকেট থেকে এক প্যাকেট ইজিপশিয়ান ক্লিওপেট্রা সিগারেট খুললো। তারপর বাঁ পকেটে গোটা অর্ধেক সিগারেট রেখে দিয়ে প্যাকেটের ভেতর তিনটি সিগারেট রাখলো। আমি বিস্মিত হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম : কী ব্যাপার নারায়ণ ঐ সিগারেট ভাগাভাগি করলে কেন?

একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে নারায়ণ বললো : দাদা আমার দুঃখের কথা বলবেন না। যখনই স্টার্লিং রয়ের বাড়ীতে আসি তখনই স্টার্লিং বৌদি আমার প্যাকেট খুলে সিগারেট খান। বলেন : নারায়ণ তোর এই ইজিপশিয়ান সিগারেট খেয়ে যা তৃপ্তি পাই, বিলেতি সিগারেট খেয়ে অতো আনন্দ পাইনে। আর ক্লিওপেট্রা সিগারেট খেলে মনে হয় নিজেই ক্লিওপেট্রা হয়ে বসে আছি। গরীব মানুষ দাদা, বেশী তো সিগারেট কিনতে পারিনে। তাই নিজের জন্যে কিছু সিগারেট তুলে রাখলুম।

স্টার্লিং রয় বাড়ীতেই ছিলেন। দেখলেই মনে হয় বেশ বিদ্বান, জ্ঞানী লোক। চোখে পুরু চশমা। আর পুরু চশমা মানেই বুদ্ধিজীবীর লক্ষণ।

: হ্যালো নারায়ণ, হাউ ডু ইউ ডু। তোমাকে এতদিন দেখিনি কেন? কোথায় ডুব মেরে ছিলে। অ্যান্ড হু ইজ দিস? স্টার্লিং রয় অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বললেন।

নারায়ণ হেসে জবাব দিলো : নতুন বাঙালী। সম্প্রতি কায়রোতে এসেছেন।

আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে এলুম।

: দ্যাটস ভেরী গুড আইডিয়া। দাঁড়াও তোমার বৌদিকে ডাকি। 'পেরী'।

হোম্মাইর ফিল্ম হিরোদের মুখে আপনারা নিশ্চয় 'মেরী জান' ডাক শুনে থাকবেন। প্রেমের প্রারম্ভে কণ্ঠস্বর যেমন কোমল নরম হয়, 'পেরী' ডাক তারই আভাস দিলো।

নারায়ণ এবার গলার স্বর নীচু করে আমার কানে ফিসফিস করে বললো : 'পেরী' একটা মদের নাম দাদা।

আমিও খুব মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলুম : না, না, সাহেবরা গিন্নীদের পেরী বলে ডাকেন।

: কিন্তু স্টার্লিং রয়তো সাহেব নন দাদা—নারায়ণ আবার প্রশ্ন করলো।

: উনি হলেন বি, জি, এস অর্থাৎ বিলেত গিয়ে সাহেব। তাই হয়তো গিন্নীকে পেরী বলেই ডাকেন।

এবার একটু বাদে পেরীর দর্শন পেলুম। বাল্যকালে ক্যামিস্ট্রিতে লাইনের বর্ণনা পড়েছিলুম। আজ পেরীকে দেখে আমার সেই বর্ণনার কথা মনে পড়লো। পেরী অবশ্য আধুনিক আদবকায়দায় দুরস্ত। বেশভূষার বর্ণনা দিয়ে আপনাদের মন ভারাক্রান্ত করবো না। তবে বলতে পারি যে পেরীর গায়ের রঙ যদি মেহগিনী না হতো তাহলে তাকে রিংকেড ধারকোটের দ্বিতীয় সংস্করণ বলে বাজারে চালানো যেতো।

'পেরী' এসেই নারায়ণকে উদ্দেশ্য করে বললো : ডিয়ার, ডিয়ার নারায়ণ। হোয়াট এ সারপ্রাইজ। তোমাকে এতোদিন দেখিনি, কেন?

এবার আমার পানে তাকিয়ে বললেন : ইনি কে?

: নতুন বাঙালী—নারায়ণ জবাব দিলো।

: এনাদার বেঙ্গলী। গুড।

: কেন কায়রোতে বুঝি নতুন বাঙালী আসতে নেই—নারায়ণ এবার প্রশ্নবোধক স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

: বাঙালীদের কথা বলো না নারায়ণ। তোমার ঐ ডলার ঘোষ আজকাল কায়রোর বাজারে এমন কেলেঙ্কারী করছেন যে বলবার নয়। সেদিন কফি পার্টিতে ডলার ঘোষের গিন্নী সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন যে আজকাল বাজারে সব জিনিস স্টার্লিং-এ কিনতে পাওয়া যায় না। এই কথাটা বলার কী প্রয়োজন ছিলো বলতে পারো।

: ধরুন আপনি যদি জানতে পারতেন যে এ্যানাদার নিউ বেঙ্গলী আপনার বাড়ীতে এসেছে তাহলে আপনি কী করতেন? প্রশ্নটা আমার মুখ দিয়েই ফস্ করে বেরিয়ে গেলো।

: তাহলে দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে বলে দিতুম : হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ নট এট হোম। গন টু এ পার্টি। তাহলে আপনি টেরও পেতেন না যে আমরা বাড়ী আছি কিনা? কিন্তু নারায়ণ তোমায় দেখে ভারী খুশী হয়েছি।

এইবার নারায়ণ সিগারেটের বাক্স খুলে বললো : বৌদি খাবেন?

: ক্লিওপেট্রা। ওঃ ডিয়ার। জানো নারায়ণ তোমার এই ক্লিওপেট্রা পেলে আমার আর কোন সিগারেট খেতে ইচ্ছে করে না। মাত্র দুটো সিগারেট কেন? সত্যি নারায়ণ আজকাল তুমি বড্ডো সিগারেট খাচ্ছো। অতো সিগারেট খেওনা। তাহলে ক্যানসার হবে।

এবার আলাপ আলোচনায় স্টার্লিং রয় বাধা দিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : আমাদের ডলারের সঙ্গে দেখা হয়েছে? দেখবেন একটি ক্যারেকটার। সুবিধে পেলে সবাইকে তাচ্ছিল্য করে কথা বলে। ওর কথা শুনলে মনে হবে আংকেল শ্যাম ওর শ্বশুর।

আমি অপ্রতিভ হয়ে জবাব দিলুম :—হ্যাঁ আলাপ হয়েছে।

: হবেই তো, সবাই কায়রোতে এসে প্রথমেই ডলারের বাড়ীতে যায়। তাই লোকটার মনে ভারী অহংকার। যাক আপনাকে কী অফার করবো। বিয়ার, পোর্ট—

আমি কোন জবাব দেবার আগেই নারায়ণ বললো : দাদা, এই যে আপনি সেদিন এক নতুন বিয়ারের নাম করছিলেন। কী নাম তার?

: গিনেস......

কিন্তু স্টার্লিং রয়ের কথা শেষ হবার আগেই গিন্নী বাধা দিয়ে উঠলেন। বললেন : তুমি কী পাগল হয়েছ। জানো না উনি বাঙালী। বাঙালীরা একেবারেই ড্রিংকস পছন্দ করেন না। ডোন্ট কম্পেল হিম। বরং কফি খাওয়া যাক। আমরা আবার কফিতে চিনি দিই না। এটা হলো মধ্যপ্রাচ্যের স্টাইল। কফি দিলুম সঙ্গে।

আমি নারায়ণের পানে তাকালাম। বুঝতে পারলুম যে আজ মিস্টার নারায়ণের 'ওয়াটার' খাওয়া আর হবে না। স্টার্লিং মেমসাহেবের কথা শুনে নারায়ণের মুখে হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। এবার অনুরোধ উপরোধ না করে বললো : চলুন দাদা যাই। আরো দু-এক বাড়ীতে যেতে হবে।

: কোথায় যাবে নারায়ণ? ফ্রাংকের বাড়ীতে? নতুন বাঙালীকে আবার আজেবাজে জায়গায় নিয়ে যেও না। বুঝলেন মশায় এই কায়রোর বাঙালীদের একেবারেই বিশ্বাস নেই। কখন যে আপনাকে লেংড়ি দেবে বুঝতে পারবেন না। আগে থাকতেই আপনাকে সাবধান করে দিলুম।

স্টার্লিং রয়ের কথা শেষ হবার আগেই আমরা দরজার বাইরে চলে এলুম। কিন্তু দরজার সামনে এসে স্টার্লিং মেমসাহেব বললেন : নারায়ণ প্লিজ সেন্ড মী ফিউ প্যাকেটস অফ ক্লিওপেট্রা।

রাস্তায় এসে আমার মুখ খুললো। কারণ সত্যি কথা বলতে কী আমার আর কোন বাঙালীর বাড়ীতে যাবার স্পৃহা ছিলো না। তাই বললুম : নারায়ণ আগে ভাবতুম আমাদের রেঙ্গুনের বাঙালীরা সবাইকে টেক্কা দেন। কিন্তু কায়রোর বাঙালীদের দেখে মনে হচ্ছে এরা রেঙ্গুনের বাঙালীদের ট্রেনিং দিতে পারেন।

নারায়ণ প্রথমে আমার কথার কোন জবাব দিলো না। এমন ভাব করলো যেন আমার কথা শুনতে পায়নি। পকেট থেকে সিগারেটগুলো বের করে প্যাকেটে ভরতে ভরতে বললো : যাক এ যাত্রায় অনেকগুলো সিগারেট সেভ করেছি। প্রতিবারেই বাড়ীতে আমার খালি প্যাকেট নিয়ে ফিরতে হয়। হ্যাঁ কী বলছিলেন কায়রোর বাঙালীরা রেঙ্গুনের বাঙালীদের ট্রেনিং দিতে পারে। অমন কথা বলবেন না দাদা। এখনতো সবেমাত্র সন্ধে দেখেছেন, রাত দেখেননি, চলুন এবার ফ্রাংক মেটারের বাড়ীতে আপনাকে নিয়ে যাই। উনিতো অনেকদিন যাবত আমাকে 'ওয়াইন' খাওয়াবেন বলছেন। দেখি আজ উনি ওয়াইনের বোতলের ছিপি খোলেন কিনা।'

'আমাদের দেখে কিন্তু ফ্রাংক মেটার বেশ পুলকিত হলেন। অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন : বসোয়ার, বসোয়ার, আসুন, ওয়েলকম টু কায়রো।'

এবার নারায়ণ আমার পরিচয় দিয়ে বললো : ইনি কিন্তু সাহিত্যিক।

: সাহিত্যিক। সাপার্ব। গুড। ইনি আমাদের কায়রোর বাঙালী সমাজকে নিয়ে বেশ জোরদার উপন্যাস লিখতে পারবেন। আমি লেখবার মালমশলা আপনাকে বিস্তর দেবো। আমি যখন প্যারীতে ছিলাম তখন একদিন এই ধরনের উপন্যাস নিয়ে স্যাকেরীয়া সাগানের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। আপনি নিশ্চয় ফ্রাঁসোয়া সাগানকে চেনেন।

একটু লজ্জামিশ্রিত অপরাধীর কণ্ঠে জবাব দিলুম : না।

: তাহলে আপনি জাঁ পল সার্ত্রেকে চেনেন?

: না—আবার ছোট্ট জবাব দিলুম।

: বাড লাক। যাক আপনি এসেছেন ভালোই হলো। এবার ভাবছি আমরা কায়রোতে রবীন্দ্রনাথের উপর সেমিনার করবো। আলোচনার বিষয় হবে : রবীন্দ্রনাথ কী সত্যিই কবি ছিলেন? গীতাঞ্জলি কী ওঁর লেখা? বলুন তো সবজেক্টটা কেমন? শুনেছি শেকসপীয়র নিয়ে এমন একটা তর্ক হচ্ছে। কিন্তু ইতিমধ্যে নারায়ণ অধৈর্য হয়ে পড়েছিলো। ফস করে বলে উঠলো : দাদা, আমাদের এই নতুন দাদাকে আপনার ওয়াইনের ভাণ্ডার দেখাতে নিয়ে এলুম।

হয়তো এই কথা শুনে ফ্রাংক মেটার বেশ গর্ব অনুভব করলেন। বললেন : ঐ যে ওয়াইনের ভাণ্ডারের কথা আপনাকে নারায়ণ বললো ঐটি হলো আমার প্রাইজ সম্পত্তি। সব ধরনের ওয়াইন ওখানে পাবেন। জানেন আমার কাছে একটা ওয়াইনের বোতল আছে ঐ বোতল ছিলো সম্রাট নাপোলিওঁর কাছে। তিনি ওয়াটারলু যুদ্ধে যাবার সময় ঐ বোতলটি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু লড়াইতে হেরে যাবার দরুণ ঐ বোতলের

ছিপি খুলতে পারেননি। বর্তমানে ঐ বোতল আমার কাছে আছে। বাপ্‌সে ওয়াইন রাখা কী সহজ কথা। এর জন্যে যে কতো মেহনত করতে হয় কী আর বলবো।

এবার নারায়ণ লজ্জা দ্বিধা ভেঙে বললো ঃ একটা ওয়াইনের বোতল খুলবেন দাদা। চেখে দেখি না কেমন আপনার ওয়াইন। সত্যিই নাপোলি'ওর গায়ের গন্ধ বোতলের সঙ্গে লেগে আছে কিনা?

এবার ফ্রাঙ্ক মেটার নারায়ণকে ধমক দিয়ে বললেন ঃ দ্যাখ নারায়ণ ঠাট্টা ইয়ার্কি করিস নে। ওয়াইন রাখা সহজ কথা নয়। বন্দরে, গরমে ওয়াইন রাখতে পারবেন না। বড়ো রাস্তার সামনে মানে যেখান দিয়ে লরী বাস চলে তার কাছে ওয়াইনের বোতল রাখতে পারবেন না, কারণ লরীর কাঁপুনিতে ওয়াইনের বোতলের আস্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। তারপর বোতলকে শুইয়ে রাখতে হবে। নইলে ওয়াইনের রঙ খারাপ হবে। শুধু কী তাই? ওয়াইন খুলবার আগে অনেক মেহনৎ করতে হয়। সাদা ওয়াইন হলে ফ্রিজে [illegible] একত্রিশ মিনিট রাখবেন। স্টপ ওয়াচ দিয়ে সময় দেখবেন। কিন্তু আজ তো ফ্রিজে বোতল রাখবার সময় নেই। আর একদিন আপনাকে ওয়াইন খাওয়াবো। আজ কী দেবো বলুন ঃ কফি, টী, মিনারেল ওয়াটার —

[illegible] নারায়ণ আমাকে বাড়ী থেকে টেনে বের করলো। বাইরে এসে বললো ঃ

[illegible] জীবনে [illegible] পয়সা খরচ করলাম সেই পয়সা দিয়ে এক [illegible] কিনে খাওয়া যেতো। চলুন একবার দয়েচ বাড়ুজ্জের বাড়ীতে ঘুরে আসি। [illegible] চান্স।

আমরা কিছু বলবার আগে দয়েচ বাড়ুজ্জে বললেন ঃ জানি নারায়ণ তুই আমার এখানে সবশেষে আসবি। নিশ্চয় এর আগে ডলার, স্টার্লিং ও ফ্রাঙ্কের বাড়ীতে গিয়েছিলি। তারপর উনার কী বললো? ওর মেজাজটা ভালো দেখলি তো?

ঃ কেন, ওর মেজাজ খারাপ হবার কী কারণ? আমিই কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম।

ঃ কারণ তো সবাই জানে। জানেন তো আজকাল ডলারের মার্কেট রেট বড্ড খারাপ যাচ্ছে। তাই ডলার আমার সঙ্গে আর টক্কা দিয়ে উঠে পারছে না। যাক, এবার বলতো ডলারের মার্কেট রেট কতো?

ঃ আড়াই ডলারে এক পাউন্ড। এক ডলারে পাঁচ দয়েচ মার্ক।

এবার হাতে তুড়ি বাজিয়ে দয়েচ বাড়ুজ্জে বললেন ঃ ছাই জানিস। তুইতো ব্যাঙ্ক রেটের কথা বলছিস। আমি কী তোকে ব্যাঙ্ক রেটের কথা জিজ্ঞেস করছি। কালোবাজার মানে ব্ল্যাকমার্কেটের রেট কতো?

একটু অপরাধীর সুরে নারায়ণ জবাব দিলো ঃ কালোবাজারের রেট তো জানি না!

ঃ আরে ঐ বাজারের রেটতো আজকাল টাকার আসল রেট। ডোইশ্চ মার্ক পাকেট গেছে!

আগে পাঁচ দয়েচ মার্কে এক ডলার পাওয়া যেতো, এখন পাঁচ দয়েচ মার্কে দুই ডলার পাওয়া যায়। তাইতো তোর ডলার দাদার গলার সুর অতো মিনমিনে হয়ে গেছে। গত সপ্তাহে ডলার ঘোষ আমাকে বেশ জগ দিচ্ছিলো। এই সপ্তাহে আমাকে দেখলে এড়িয়ে যাচ্ছেন।

নারায়ণ এতোক্ষণে মরীয়া হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট ভাষায় বললো ঃ দাদা বড্ডো তেষ্টা পেয়েছে।

ঃ বুঝেছি হুইস্কী খেতে চাস। জার্নি ডলার তোকে কিছুই খেতে দেয় নি। শিভাস রিগ্যালের গপ্‌পো নিশ্চয় করেছে। ঐ বোতলের ছিপি আজ এক বছর ধরে খোলে নি। কখনও খুলবে বলে মনে হয় না। তারপর আমাদের স্টার্লিং মেম-সাহেবকে কেমন দেখলেন। দেখতে পেয়েছিলেন কি? আমি তো ওকে দেখতে পাই না। মনে হয় সদাসর্বদাই বাতাসের সঙ্গে মিশে আছেন।

ঃ দাদা পাবো কিছু? নারায়ণ আবার অনুনয়ের সুরে বললো।

ঃ পাবি না কেন নিশ্চয় পাবি। তবে নারায়ণ নট অ্যাট হোম। বুঝলেন মশায় আমার গিন্নী বড্ডো স্ট্রীকট। বাড়ীতে বসে মদ খাবার যো নেই। তাই হোটেল বারে বসে মদ খেতে হয়। চলুন শেরটনের বারে বসে মদ খাওয়া যাক। কি বলেন?

ঃ দি গ্রেট আইডিয়া— আমি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলুম। সত্যি কথা বলতে কি নারায়ণের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে আমারও তেষ্টা পেয়ে গিয়েছিলো।

এবার আমরা শেরটনের বারে যাবার উপক্রম করলুম। নারায়ণও পুলকিত। যাক শেষ অবধি মদ খাওয়া যাবে। ভেতর থেকে কোট পাৎলুন পরে দয়েচ বাড়ুজ্জে এলেন। হঠাৎ দরজার সামনে এসে বললেন ঃ

ঃ হ্যাঁরে নরায়ণ, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

ঃ কি? নারায়ণ [illegible] হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ তোর পকেটে খুচরো কিছু আছে কি?

ঃ খুচরো? নারায়ণের বিস্ময় ক্রমেই বাড়তে লাগলো।

ঃ হ্যাঁ, আই মীন ইজিপশিয়ান কারেন্সী। আমার কাছে শুধু দয়েচ মার্ক আছে।

ঃ বেশ তো হোটেলের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ভাঙিয়ে নেবো—নারায়ণ বেপরোয়া হয়ে বললো।

ঃ তুই পাগল হয়েছিস, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ভাঙাবো। আমার বাড়ীর মালী আমাকে রোজ ভালো রেটে কালোবাজার থেকে টাকা ভাঙিয়ে দেয়। তা তুই আজ আমাকে দশটা ইজিপশিয়ান পাউন্ড ধার দে। তোকে ভালো রেটেই টাকা দেবো। কালোবাজার থেকে এক পাউন্ড বেশী পাবি।

ঃ দিতে পারতুম দাদা, কিন্তু ঐ শেরটন হোটেলের নিয়ম জানেন তো। ওরা আমার ওদের বারে ইজিপশিয়ান কারেন্সী নেয় না। ফরেইন কারেন্সী চায়। অতএব আমার কাছ থেকে টাকা ভাঙিয়ে আপনার কোন লাভ নেই।

এই বলে আমার হাতে টান দিয়ে বললো ঃ চলুন আর নয়। আর কিছুক্ষণ এদের সঙ্গে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

রাস্তায় এসে নারায়ণ বললো ঃ দেখলেন তো কি বিচিত্র সমাজের ভেতর আছি। কিন্তু আমার দাদাকে যদি দেখেন তাহলে এতোক্ষণে পাঁচটা বোতলের ছিপি খোলা হয়ে যেতো।

তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো ঃ দাদার কাছে মাঝে-মাঝে সুন্দরী-রাও আসে। খবরদার এই কথা যেন কাউকে বলবেন না।

বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য অবদানের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন :

'বহু দিন পর্যন্ত আমাদের ভদ্রসমাজের বিশ্বাস ছিল—পল্লীজীবন মৃতপ্রায়, পূর্বের মত সচল প্রাণপ্রবাহ তার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তার পক্ষে নতুন যুগকে সাহায্য করা বা নতুন যুগের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়। কিন্তু এই চিন্তার প্রতিবাদ কার্যকরভাবে প্রথম গুরুদেবই করেন। এবং প্রমাণ করে দেখালেন যে, এখনো গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্যে যে শক্তি ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগাতে পারলে সমগ্রভাবে এ যুগের ভারতবর্ষ লাভবান হবে।'

এই কথা বলে নিজের বক্তব্য সপ্রমাণে তিনি কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে মেলার প্রচলন করেছিলেন শান্তি-নিকেতন ও শ্রীনিকেতনে। তাঁর প্রবর্তিত নৃত্যছন্দে আছে পল্লীসমাজের সহজ সরল নাচ। 'ফাল্গুনী'তে ((১৯১৬) অন্ধ বাউলের চরিত্র রচনা করে বাংলার বাউলদের নাচের আদর্শে পরিকল্পিত নৃত্যভঙ্গীতে তিনি সকলকে মোহিত করেন। রায়বেঁশে নৃত্যের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছেন গুরুদেব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বহুল পরিমাণে গানের ব্যবহার করেছেন বাংলার যাত্রাগানের আদর্শে। লেখক বলেছেন—

'এইভাবে গুরুদেবের প্রেরণায় পল্লী-সংস্কৃতি বিভিন্ন দিকে প্রবল শক্তিতে নিজেকে বিকশিত করবার সুযোগ পেলো প্রমাণ করল যে, সে রক্ষণশীল নয়, সেও জানে যুগের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যেতে।'

১৩১৭ সালে ব্রহ্মোৎসবের সময় বাউলদের প্রসঙ্গে গুরুদেব যে উক্তি করেছিলেন এই গ্রন্থে লেখক তা উদ্ধৃত করেছেন। সেই উদ্ধৃতিটুকু রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও সঙ্গীতে বাউলপ্রভাবের এক অপূর্ব নিদর্শন। এছাড়া গুরুদেব এই গ্রন্থের লেখকের পিতৃদেব স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষকে শিলাইদহের লালন সা ফকিরের শিষ্যগণ প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন, শ্রুতিলিখনে ধরা সেই কাহিনীও তিনি এইখানে সংযোজিত করেছেন। এই অধ্যায়ের শেষে লেখক বলেছেন—

'আজ এই বলে শেষ করবো যে, এ-যুগের বাঙালীর কাছে পূর্ব যুগের শিলাইদহ অঞ্চলের বাউল ও রবীন্দ্র বাউলের যুক্ত সাধনার অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই সাধনার দ্বারাই নানাভাবে বিচ্ছিন্ন বাঙালী আজ ঐক্যবদ্ধ হোক এবং সমগ্র দেশের সামনে মহৎ একটি দৃষ্টান্ত খাড়া করে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করুক।'

লেখকের এই আশা আজ যেন দুরাশা বলে মনে হয়। জাতি হিসাবে বাঙালীর ঐক্য সাধনের প্রয়োজন আজ সর্বাধিক।

লেখক 'গুরুদেবের স্মৃতি' নামক যে অধ্যায়টি লিখেছেন তা একটু সংক্ষিপ্ত মনে হয়। তিনি দীর্ঘ দিন গুরুদেবকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন, আমাদের মনে হয় তিনি যদি এই বিষয়বস্তু নিয়ে একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করেন তাহলে বাংলা সাহিত্যে তা এক মূল্যবান অবদান হিসেবে স্বীকৃতি পাবে।

এই গ্রন্থের 'রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের ক্রম-বিকাশ' ও 'তপতী নাটক' নামক অধ্যায় দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের গীতি-নাট্য বিষয়ক আলোচনার অভাব নেই বটে তবে তার পিছনের সংবাদ পরিবেশনা করার অধিকার শান্তিদেব ঘোষের মত বোধকরি বর্তমানে আর কারো নেই।

'রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা' রবীন্দ্রসঙ্গীত-বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থগুলির মধ্যমণি রূপে সর্বত্র সমাদৃত হবে। আমাদের এই কালে রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তা বেড়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের যথোচিত নিষ্ঠার অভাব আছে। এই সূত্রে লেখককে রবীন্দ্রনাথের ২২।২।৪১ তারিখে লেখকের কাছে লিখিত পত্রখানির যে প্রতি-লিপি প্রকাশিত হয়েছে তা রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরাগী মাত্রেরই জানা কর্তব্য, তিনি লিখেছিলেন—

'কেবল দুটি উপদেশ আমার আছে। এই অঞ্চলে দূর মানুষ। সিনেমা প্রভৃতির সংস্পর্শে কোনো গুরুতর লোভেও নিজেকে যদি অবনত করিস তাহলে আমার প্রতি ও আশ্রমের প্রতি অসম্মানের কলঙ্ক দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়, আমার গানের সম্পদ তোর কাছে আছে—বিশুদ্ধ ভাবে সে গানের প্রচার করা তোর কর্তব্য হবে। আমি তোর পিতার বিশ্বস্ত। আশা করি আমার উপদেশ মনে রাখবি।'

মৃত্যুর সামান্যকাল পূর্বে লিখিত এই পত্রখানি বর্তমানকালে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি যে অত্যাচার চলেছে তার প্রতিকার সাধনে কি সফল হবে এই প্রশ্ন মনে জাগে!

—অভয়ংকর

রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা।। শান্তিদেব ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-৯।। মূল্য ১২-০০ টাকা মাত্র।

তারাশংকরের জন্মদিনে

কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে এক আড়ম্বর-পূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তারাশঙ্করের ৭৫তম জন্মোৎসব পালিত হয় ২৪ জুলাই। এই উপলক্ষে তাঁর রচনাবলীর প্রথম দুই খণ্ডও প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে সভা-পতিত্ব করেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ডঃ রমা চৌধুরী।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রথমে তারাশংকরের রচনাবলীর প্রথম দুই খণ্ড বিক্রয় করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক বনফুলের কাছে। অনুষ্ঠানে বাংলা সাহিত্যজগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী তারাশংকর স্মৃতি-ভবন স্থাপনের প্রস্তাব করেন, তিনি বলেন, তারাশংকর যে এক-জন কৃতি সাহিত্যিক ছিলেন তা তাঁর রচনার ও রচনাবলীর চাহিদাতেই প্রমাণিত হয়। প্রকাশকের আশাকে ছাড়িয়ে গেছে গ্রাহকের সংখ্যা। তারাশংকর স্মৃতি-ভবন নির্মাণ সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রথমেই সরকারের কাছে না গিয়ে তারাশংকরের অনুরাগী পাঠক, প্রকাশক ও সাহিত্যিক বন্ধুদের এই কাজে অগ্রণী হওয়া ভাল।

ডঃ রমা চৌধুরী বলেন, তারাশংকর যে আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন আমাদের অতি আপনজন।

শ্রীঅন্নদাশংকর রায় বলেন, তারাশংকরের রচনাবলী প্রকাশ করে প্রকাশকরা এক মহৎ কাজ করেছেন। শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

বলেন, তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়ন আমার সাধ্যাতীত।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু বলেন, বাংলা সাহিত্যের ধারাকে হিমালয়ের সাথে তুলনা করা যায়, যার চূড়ায় আছেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মধ্যবিত্তকে ঠাঁই দিয়েছেন শরৎচন্দ্র কিন্তু পাদদেশে দৃষ্টি দিয়েছেন তারাশঙ্কর।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেন, মহৎ স্রষ্টার দুটি লক্ষণ, ঐশ্বর্য আর বৈচিত্র্য। এই ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্যের মাপকাঠিতে তারাশঙ্কর কবি সাংবাদিকভাবে মহৎ স্রষ্টা।

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল বলেন, তারাশঙ্কর সত্য সত্যই একক অনন্য।

বনফুল আহ্বান জানিয়ে বলেন, তারাশঙ্করের সব লেখা ছোট বড় সবার পড়া উচিত। তারাশঙ্কর রচিত গান পরিবেশন করেন শ্রীরবীন মজুমদার।

তারাশঙ্কর পরিষদের অনুষ্ঠান

তারাশঙ্কর পরিষদের উদ্যোগে টালাস্থিত বাসভবনে ৭৫তম জন্মোৎসব পালিত হয়, সভাপতিত্ব করেন শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমনোজ বসু। সভাপতি, প্রধান অতিথি ছাড়া ডঃ অজিত ঘোষ, কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্তী প্রমুখ ভাষণ দেন। পরিষদের পক্ষ থেকে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতী বাণী রায়কে তারাশঙ্কর পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কারের মধ্যে আছে তাম্রাধারে খচিত অভিজ্ঞানপত্র, তারাশঙ্করের তিনশত টাকা মূল্যের গ্রন্থাবলী এবং একটা কলম। অনুষ্ঠানে পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু।

মধুসূদনের মৃত্যুবার্ষিকী : কবি মধুসূদনের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয় ২৩ জুলাই রোববার ঢাকায়। উদ্যোগী ছিলেন 'স্বগতি' গোষ্ঠী, সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ সুফী মোতাহার হোসেন। মধুসূদনের প্রতিভা সম্পর্কে বহু ব্যক্তি আলোচনা করেন। মাইকেলের রচনা থেকে পাঠ করা হয় এবং সংগীতানুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা ছিল।

কায়কোবাদের মৃত্যুবার্ষিকী : মহাশ্মশান কাব্যের কবি কায়কোবাদের মৃত্যুবার্ষিকী বাংলাদেশের হাজারীবাগে উদ্‌যাপিত হোয়েছে জাতীয় তরুণ সংঘের উদ্যোগে। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন দেওয়ান আবদুল হামিদ। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বাংলা আকাদেমির মহাপরিচালক ডঃ মাজহারুল ইসলাম। আলোচনায় এঁদের সংগে অংশ নেন ডঃ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ ফজলুল হক এবং ইকবাল হোসেন। ডঃ মাজহারুল ইসলাম বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চেতনার অগ্রদূত কায়কোবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান জানান।

নির্বাচিত গল্প—মতি নন্দী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। নির্বাচক : সন্তোষকুমার ঘোষ। ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল, ২৮, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা-১৩। প্রতি গ্রন্থ—ছয় টাকা।

বাংলা সাহিত্যে বিগত দুটি দশকের ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে মতি নন্দী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ পরিচিত। এঁদের নির্বাচিত গল্পগুলির একমাত্র নির্বাচক শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার ঘোষ চারের দশকের প্রথম দিকে আবির্ভূত এবং অধুনা সুপ্রতিষ্ঠিত একজন কথাসাহিত্যিক। একজন প্রতিষ্ঠিত অত্যন্ত শক্তিশালী গল্পকার তাঁর অনুজ চারজন গল্পলেখকের গল্প নির্বাচন করে, তাঁদের সম্পর্কে বিস্তৃত ভূমিকা রচনায় যে গুরুদায়িত্ব গ্রন্থগুলির প্রারম্ভে পালন করেছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

মনে পড়ে, একজন সম্প্রতি স্বর্গত প্রখ্যাত বাংলা গল্পকার ও ঔপন্যাসিক সখেদে মন্তব্য করেছিলেন, 'বাংলাদেশে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর উপন্যাসের লেখক, পাঠক ও প্রকাশক অবলীলায় জোটে, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর গল্পের পাঠকও নেই, প্রকাশকও নেই।' বস্তুত বাংলা ছোট গল্প যে কি অসামান্য শিল্পমূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আলোচ্য 'নির্বাচিত গল্প' সংকলন গ্রন্থগুলি তা প্রমাণ করে। আলোচ্য লেখকদের অন্যান্য উল্লেখ্য গল্প এখানে না থাকলেও যে গল্পগুলি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, তা লেখকদের মানসবৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট করার সহায়ক নিঃসন্দেহে।

মতি নন্দী পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা ছোটগল্পের আসরে নামেন। বাংলাদেশের সমাজজীবনে তখন স্বাধীনতা-উত্তর মানুষগুলির মনে হতাশ্বাস পুঞ্জীভূত। যাবতীয় জীবনধারার প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে আঘাত পড়তে শুরু করেছে। মধ্যবিত্ত জীবনের ভাঙনকে গল্পে শরীরের রক্তের সম্বন্ধের মত গ্রহণ করেছেন চারের দশকের লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর প্রমুখ। পাঁচের দশকে এসে মতি নন্দী সেই ধারায় গল্পে নতুন রীতির চেতনাপ্রবাহ ঘটালেন। কিন্তু মতির লেখায় শুধু রীতিসর্বস্বতা থাকল না, জীবনের গভীরে ডুব দিয়ে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে জীবনের রক্ত-মাংস সমেত চেহারা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। 'জীবনযাপন প্রণালী', 'পাষাণভার', 'গুণ্ডাম্বয়', 'শবাগার', 'শহরে-আসা' ইত্যাদি গল্পে তার পরিচয় মেলে। মতি তাঁর গল্পে অত্যন্ত অকপট এবং সতর্ক লেখক। একথা ঠিক, মতি গল্পে পরিষ্কার করে গল্প রাখেন এবং তাঁর পরিচিত অন্তরঙ্গ সীমানাকে ব্যঞ্জনায় সীমাহীনতা দানে তৎপর হন। গল্পের দেহে ও বিষয়ভাবনায় মতি সত্যিকারের সুস্থ লেখক।

অন্যদিকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় আলোচ্য চারজন লেখকের মধ্যে বয়সে ও আবির্ভাবে কনিষ্ঠ হলেও ছোটগল্পে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী। মতির মত বিষয়ে কোন অন্তরঙ্গ সীমানা চিহ্নিত করেন নি, কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বক্তব্যকে চিহ্নিত করেন। মতির মত গল্প বলতে তিনি চান না। গল্পের কাহিনী সংগোপনে বিন্যস্ত হয়। শীর্ষেন্দু তাঁর গল্পভাবনায় স্থিরচিত্ত, আত্মমুখী। তাই তাঁর ভাষায় অতি সূক্ষ্ম জীবনানুগ কবিত্ব গল্পের অন্তরঙ্গ স্রোতে বয়ে যায়। মৃত্যু, স্মৃতি, দার্শনিক চিন্তা, দর্পণে নিজেকে দেখা—এ জাতীয় বিষয়ভাবনায় 'সাপ', 'স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু', 'চারুলালের আত্মহত্যা' 'অবেলায়', 'মৃণালকান্তির আত্মচরিত' ইত্যাদি গল্প শীর্ষেন্দুকে স্বতন্ত্র আসনে বসায়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এঁদের মধ্যে অত্যন্ত সহজেই পাঠকের কাছে এসে পড়ার ক্ষমতা রাখেন। মূলত কবি হলেও এঁর গল্প রচনার প্রয়াস ছয়ের দশকের শুরু থেকেই সম্ভবত। প্রেম, প্রেমের রক্ত-মাংস, জটিলতা, নারী-পুরুষ—এসব সুনীলের গল্পের বিষয়ে নিয়ত মেলে। রগরগে যৌবনকে সুনীল অবলীলায় হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে 'অ্যাভারেজ' এবং 'স্বভাবী' দুই পাঠকের সামনে অবলীলায় এবং স্থিরনিশ্চিত আত্মবিশ্বাসে ছুঁড়ে দিতে পারেন। 'মনীষার দুই প্রেমিক', 'প্রতিশোধের এক দিক' ইত্যাদি গল্পে তার প্রমাণ আছে। সুনীল মতির মত পরিচিত সীমানায় থাকতে রাজী নন, শীর্ষেন্দুর মত গম্ভীর, বিষণ্ণ কোন বিষয়ে বেশীক্ষণ ঘোরাফেরাতেও অখুশী। তিনি বিষয় নির্বাচনে অস্থির এবং এই অস্থিরতাই তাঁর গল্পের ঐশ্বর্য। তাঁর অভিজ্ঞতা যে বিচিত্র, 'খরা', গল্প এবং 'তিনটে খাঁচা'-র নবকৃষ্ণ, রতন ইত্যাদি চরিত্র প্রমাণ করে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্পের বুদ্ধিনির্ভর বিষয়ে যেমন কৌতূহল সৃষ্টি করেন, কর্মেও সেইরকম চমক তৈরী করেন, যা আদৌ সস্তা নয়। উপরোক্ত তিনজন গল্পলেখকের মত শ্যামলের গল্প 'এ্যাভারেজ' পাঠকমহলে স্বল্পপরিচিত। কিন্তু শ্যামল স্বক্ষেত্রে সম্রাটের মত একজন

ক্ষমতাবান শিল্পী। শ্যামল গল্পের ফর্মে গতানুগতিক রীতি মানেন নি। ভাষাকে করেছেন তীক্ষ্ম, চাঁছাছোলা কঞ্চির মত যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু। এতটুকু বাহুল্য, সেন্টিমেন্ট, আসক্তির আবেগ নেই। ভাষা থেকে লেখক শ্যামল নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে রেখেছেন। এই নিষ্ঠুর নিরাসক্তি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করায়—যেমন বিষয়ের ক্ষেত্রে মতির গল্পেও তা-ই। শ্যামল শব্দপ্রয়োগে শ্লেষের, ব্যঙ্গের মেজাজ ছাড়তে পারেন নি কোথাও কোথাও। এসব তাঁর গুণ ও বিশিষ্টতা। 'ছায়া পূর্বগামিনী', 'খরার পরে', 'তখন', 'টানাপোড়ন', 'যারা অজ্ঞান করে' ইত্যাদি গল্পের বিষয়ভাবনা, চরিত্র, লেখকের জীবন-দৃষ্টি, সরসতা যথার্থ শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় করায়।

সবশেষে তরুণ লেখকদের ছোটগল্পের গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ।

কলিকাতা-নাম্য এবং (কাব্যগ্রন্থ)—সুধীরকুমার বসু। প্রকাশিকা : শ্রীমতী পুষ্প বসু, ১২ ঘোষ লেন, কলকাতা ৬। দাম : তিন টাকা।

সমকালীন বাংলাদেশ ও জীবন যাপনের নানা অসঙ্গতিতে পীড়িত হয়ে সুধীরকুমার বসু এই কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি কবিতাই লিখেছেন। পড়তে পড়তে মনে হয়, প্রকৃত চারণকবির কণ্ঠস্বরে যেমন বিষাদের ছোঁয়া লাগে, তেমনি বিশাদে তিনিও আচ্ছন্ন। অবশ্য, এই কাব্যগ্রন্থের কোনো কোনো কবিতায় কবির তির্যক মনোভঙ্গির পরিচয়ও অত্যন্ত স্পষ্ট। সেসব ক্ষেত্রে তিনি কখনো সার্থক, কখনো ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।

জহরলালের ভারতবর্ষ—সুহাস মজুমদার। প্রকাশক : রাখালচন্দ্র নাথ, আনন্দপুরী, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা (উত্তর)। আড়াই টাকা।

গ্রন্থকার এই ছোট বইখানিতে ভারতের জাতীয়তা সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত বহু উদ্ধৃতিসহযোগে বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। রামমোহনের জাতীয়তা, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের জাতীয়তা এবং জহরলালের জাতীয়তা—এই তিন পর্যায়ে তিনি ভারতের ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দির জাতীয়তাবাদকে বিশ্লেষণ করে প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হয়েছেন যে জহরলালের জাতীয়তাবাদের মধ্যে স্বাজাত্য বোধ এবং জাতির মর্যাদাবোধের দান ছিল গৌণ। বিতর্কিত এই তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি বহু যুক্তি দেখিয়েছেন সত্য, কিন্তু জহরলালের ভারতবর্ষের সত্যকার স্বরূপটি তাঁর রচনায় প্রস্ফুট হয়ে ওঠেনি, তাঁর সমালোচনা একান্ত একপেশে হয়ে গিয়েছে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

দীপাবলী (বৈশাখ-আষাঢ় '৭৯)—সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ঘোষ। মানিকতলা গভর্নমেন্ট হাউসিং এস্টেট, ব্লক এফ, ফ্ল্যাট : ৪, কলকাতা-৫৪। পঁচাত্তর পয়সা।

গত ২৫-এ বৈশাখ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে কবিগুরুর জন্মতিথিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক এই সাহিত্যপত্রিকাটির প্রথম আত্মপ্রকাশ। সাম্প্রতিককালের ক্রমবর্ধমান এই শ্রেণীর পত্রিকার মধ্যে আলোচ্য পত্রিকাখানির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রসগ্রাহী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এর কয়েকটি প্রবন্ধ তথ্য বিশ্লেষণ ও রচনানৈপুণ্যের জন্য লক্ষণীয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তপন ঘোষের 'নাট্যবোধ ও কীটস', ভবতোষ দত্তের 'বঙ্গদর্শন', কল্যাণ সেনগুপ্তের 'অস্তিত্ববাদ দর্শনে ও সাহিত্যে' ও দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'বাট্রাণ্ড রাসেল'-এর উল্লেখ করা যায়। সন্তোষকুমার ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় ঘোষ, স্বপন মিত্র প্রমুখের কবিতাও ভাবে ও ভাষায় পরিচ্ছন্ন।

অর্কোরিনা (মার্চ-এপ্রিল '৭২)—সম্পাদক : অনল ঘোষ। 'দি লাকে জুইসারস ৩০/বি চ্যামবার্স রোড, মাদ্রাজ : ২৮। দেড় টাকা।

ইংরেজি ভাষায় দ্বিমাসিক কাব্য ও নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কীয় পত্রিকাটি ইতিমধ্যেই কবি ও কবিতা-অনুরাগীদের কাছে সমাদৃত হয়েছে। এদেশের বিভিন্ন প্রদেশের ও ভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত কবিতাগুলির সুষ্ঠু নির্বাচন ও ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা প্রশংসার্হ। অতীতের এবং সাম্প্রতিককালের খ্যাতনামা কবিদের রচনাও অনূদিত হয়েছে ইংরেজিতে। অনুবাদকদের মধ্যে আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আর আছেন : নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, জে এল দাস, সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সুভাষচন্দ্র সরকারের কাজী নজরুলের ভক্তিমূলক গানের ওপর মনোজ্ঞ আলোচনা এবং কয়েকটি গানের ইংরেজি অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। নারায়ণ চৌধুরীর 'বাংলাদেশ অ্যাণ্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল—এ স্টাডি ইন কনট্রাস্ট' নিবন্ধটি বিশেষ মূল্যবান। অনেক সার সত্য এতে পরিবেশিত হয়েছে। প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ-পরিচ্ছন্নতা তারিফ করার মতো।

অভিনয় (মে-জুন '৭২) — সম্পাদক : দিলীপ বন্দোপাধ্যায়। ১৩১, হরেন মুখার্জি রোড, কলকাতা : ২৬। দেড় টাকা।

মঞ্চ ও চিত্রজগতের এই মাসিক পত্রিকাটি মূলত মঞ্চ-জগতের সার্বিক কল্যাণে নিবেদিত। শুধু শহর কলকাতার নয়—বাংলা ও ভারতের গ্রামে গঞ্জে নগরে নাট্যামোদীদের নাট্যপ্রচেষ্টার সমস্ত সংবাদ এতে পরিবেশিত হয়ে থাকে। সেই সঙ্গে থাকে নাটক এবং নাট্য-সম্পর্কীয় আলোচনা। এই সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন সুখরঞ্জন চক্রবর্তী, সুকৃতি রায়চৌধুরী, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শিশির বসু, রথীশ সাহা, প্রণব চক্রবর্তী প্রমুখ। নাটক লিখেছেন চণ্ডী সেনগুপ্ত ও চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। প্রখ্যাত নাট্যকর্মী সুধী প্রধানের 'নাট্যক্ষেত্রে নৈরাজ্য' পাদপ্রদীপের অন্তরালের অন্ধকারে জোরালো সার্চলাইটের কাজ করেছে।

আলোক-সরণি (জুলাই '৭২)—সম্পাদক : সঞ্জীব সরকার। ৬৫ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা : ৯। পঁচাত্তর পয়সা।

ইদানীং বিভিন্ন লিট্‌ল ম্যাগাজিনে মাঝে-মধ্যে গল্প সংখ্যা প্রকাশ করছে। ছোট গল্পের পাঠকদের কাছে এটা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। আলোক-সরণির সপ্তম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি গল্প সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। বারোজন তরুণ লেখকের বারোটি গল্প এতে আছে। মার্ক টোয়েনের একটি গল্প অনুবাদ করেছেন বিজন ঘোষ। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি গল্প লিখেছেন দিলীপ সেনগুপ্ত। সংকলনটি অনেকেরই ভালো লাগবে।

।। ২৯ ।।

অনেক বেছে অনেক ঘুরে অনেক হেঁটে—সুরেনই এই বাড়িটা পছন্দ করল। মানসরোবরের ঘাটের কাছে, অভয়াচরণ তর্কচূড়ামণির বাড়ি। একেবারে গঙ্গার ওপর নয়, বাঙ্গালীটোলার যেটা বড় রাস্তা, যা কালীতলা থেকে কেদারঘাট পর্যন্ত সোজা চলে গেছে তারই ওপর। তবু গঙ্গা দেখা যায়। ওপরে তিনতলা থেকে তো কথাই নেই, মনে হয় গঙ্গার ওপরই আছি। এদিকে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ থেকে ওদিকে রামনগর পর্যন্ত দেখা যায়। শুধু ডানহাতি কামাকুনি একটা বড় বাড়ি থাকায় কাশীনরেশের প্রাসাদটা পুরো চোখে পড়ে না।

দুমহল ঠিক নয়—দুভাগে ভাগ করা বাড়ি। একটাতে তর্কচূড়ামণি নিজে থাকেন, আর একটা ভাড়া দেন। তারই তিনতলা পুরোটা ভাড়া নিল সুরেন। একখানা দেড়খানা ঘরে হয়ত কোনমতে থাকতে পারে হেমন্ত, কিন্তু পাশাপাশি অন্য ভাড়াটে থাকলে বনিয়ে থাকা মুশকিল। তাছাড়া একা নিজস্ব বাড়িতে এতকাল থেকে এসে এখন পাঁচটা ভাড়াটের সঙ্গে বাস করাও সম্ভব নয়। এ গুনতিতে তিনখানা, আসলে আড়াইখানা ঘর—ভাড়াও সে অনুপাতে একটু বেশি। তর্কচূড়ামণি ষোল টাকার এক পয়সা কম নিতেও রাজী হলেন না কিছুতে। তাও ব্রাহ্মণ বলেই এতটা কনশেসন করছেন তিনি (ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাউকে দেবেন না সে কথাতো আগেই শুনিয়ে দিয়েছেন—তবে আর কনশেসনের কারণ কি? তবে সে কথা আর বলে লাভ নেই বলেই সুরেন চুপ করে গেল)।

সুরেন এতদিনে মোটামুটি পিসীর মেজাজ ও রুচি বুঝে নিয়েছে। বাড়ি দেখে আর তাকে চিঠি লিখে মত আনাবার জন্যে অপেক্ষা করল না একেবারেই এক মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে ভাড়া পাকা করে নিল, যদিচ মত আনাবার মতো সময় ছিল হাতে।

সত্যিই পিসির চিঠিতে আশ্চর্য ফল হয়েছে। এতটা যে হবে তা সুদূরে কল্পনাতেও কখনও ভাবেনি সুরেন। নিজে পৌঁছতে পারেনি ম্যানেজিং ডিরেক্টারের ঘরে, চাপরাশীকে দিয়েই চিঠিটা পাঠাতে হয়েছিল বটে—কিন্তু চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং অন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সম্মান দেন না, ওকে সামনের চেয়ারে বসিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পিসীর খবর নিয়েছিলেন। হঠাৎ এভাবে সংসার গুটিয়ে চলে যাচ্ছেন কেন—কারণটা জিজ্ঞাসা করাতে সব খুলে বলতেও হয়েছিল—শুনে খুব দুঃখ প্রকাশও করেছেন। অতঃপর নিজে ওকে দিয়ে তখনই দরখাস্ত লিখিয়ে এক মাসের ছুটি মঞ্জুর করে বারবার বলে দিয়েছেন যে, দরকার হলে স্বচ্ছন্দে আরও দু'চার দিন দেরি করতে পারে। পিসীকে ভালভাবে স্থিতু না করে যেন আসে না।

তারপর সুরেনের খবর নিয়েছেন। কোন ডিপার্টমেন্টে কী কাজ করে। শুনে বলেছেন, 'ও, বগলাবাবুর সেকশান? এই রে, মানুষটি ভাল নয়—বেগ দেবে তোমাকে।...ঠিক আছে, আমি অর্ডার লিখে দিচ্ছি। ফিরে এসে তুমি আমার খাস আপিসে কাজ করবে, তোমাকে অন্য কোন সেকশ্যনে যেতে হবে না। মাইনেও বেড়ে যাবে অটোমেটিক্যালি!'

তারপর একটু থেমে বলেছেন 'তোমার হাতের লেখা তো ভালই। কথাবার্তা করে মনে হচ্ছে কিছু লেখাপড়াও করেছ। যদি কাজ চলে, মনে হচ্ছে চলবে—তাহলে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজটা তোমাকে দিতে পারি। এখন যিনি আছেন তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছে না, কেবলই কামাই করেন—বড় অসুবিধে হয়। তাঁকে অন্য একটা কাজে বসিয়ে তোমাকে নিয়ে নেব। হাউ এভার, তার আগে আমার আপিসে তো কাজ করো কিছুদিন, কাজটা বুঝে শিখে নাও, তারপর দেখা যাবে। নইলে ঠিক পেরেও উঠবে না।'

এ সবই সদয় সহৃদয় কথা। অন্তরঙ্গতার সুর। আত্মীয়ের মতো, অভিভাবকের মতো ব্যবহার। সাধারণ নিচুদরের কেরাণীর কাছে সুদুর্লভ সৌভাগ্য। এও একরকম পিসীর কাছেই উপকৃত হওয়া। তবে সেটা তত গায়ে লাগল না—কারণ তার বদলে সেও কিছুটা কাজে আসতে পারল বলে।......

হেমন্ত ও বাড়ি দেখে খুশী হল। বললে, 'এই জন্যেই তোকে পাঠিয়েছিলুম। এমন মনের মতোটি আর কেউ বেছে নিতে পারত না। সবদিক দিয়েই সুবিধে হল। কাছেই তো দেখছি বাজার বসে, আনাজ বেচতেও যায় মাথায় করে। আমার তো আর মাছের চিন্তা নেই, বাজারে যেতে হবে না। সামনে গঙ্গা, কাছেই কেদার। এক বিশ্বনাথ একটু দূরে পড়লেন—তা হোক, পালে পার্বনে এইটুকু হেঁটে যেতে পারব অনায়াসে। গলি দিয়ে গলি দিয়ে যাওয়া—রোদ্দুরের ভয় নেই। এই বেশ হয়েছে।'

তারপর একটু থেমে বললে, 'তা সবই তো ভাল, এমন থাকা তোর পছন্দ, বুদ্ধি বিবেচনা সবই তো ভাল,—এইবার নিজে দেখে একটি বিয়ে কর। যাহোক, মাইনেও তো বাড়ল কিছু!'

'যা হোক নয় পিসীমা, আমার হলে পনেরো টাকা মাইনে বাড়া—এ তো আশার অতীত ঐশ্বর্য। কিন্তু তেমনি ধীরুরটা

একেবারে বাদ চলে গেল যে! খরচা ওদিকে বেড়েই যাচ্ছে। দাদুর দু'তিনটে ছেলেমেয়ে হয়ে গেল। আয় তো আর বাড়ছে না। বাবার ঐ শরীরের অবস্থা—ডাক্তার বদ্যির খরচ তো লেগেই আছে।...বাবা অবশ্য খরচ করতে দিতে চান না, কিন্তু আমরা দেখেশুনে চুপ করে থাকি কি করে? তবু তো ছোট্‌কার ভাবটা বইতে হল না—নিভারা সে দায়টা তুলে নিলে পুরোপুরিই—আর শুনছি বেশীদিন তাদেরও বইতে হবে না।...তবু খরচেরও তো অন্ত নেই।'

বলতে বলতেই একটু গম্ভীর হয়ে গেল সুরেন। খানিকটা চুপ করে থেকে বললে, 'তাছাড়া এখনকার মেয়ে দেশে শ্বশুরবাড়ি পড়ে থাকবে, সংসারে খাটবে, আমি মাসে একদিন যাবো—এতে কেউ রাজী হবে না। দেখছি তো চারদিকেই। মহা অশান্তি হবে সে একটা। অথচ এই মাইনেতে যদি বৌ নিয়ে কর্মস্থলে বাস করতে হয়—এক পয়সাও তো পাঠাতে পারব না।...না পিসীমা, ও আশা ত্যাগই করুন।...দাদার ছেলে হয়েছে, বংশরক্ষের জন্যে ভাবতে হবে না। আর আমার ঠিক ইচ্ছেও আর নেই।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দুজনেই। তারপর হেমন্ত আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল, 'হ্যাঁ রে, একটা কথা জিজ্ঞেস করব—? ইচ্ছে নেই কেন, সে কি বৌমার জন্যে?'

'তীর্থস্থানে বসে, তায় আপনি গুরুজন সামনে—মিথ্যে কথা বলব না, সে দিকে যে মনটা একটু না টলেছিল তা নয়, দিনকতক খুবই কষ্ট হয়েছিল; তারও জীবনটা হয়ত আমার জন্যেই নষ্ট হয়ে গেল, সেও ভেবে কতকটা—তবে সে ভাবটা এখন কেটে গেছে, সত্যিই বলছি। কখনও সখনও তাকে মনে পড়ে যে বুকের মধ্যেটায় এটুকু কেমন করে ওঠে না তা নয়—তবে সে কদাচিৎ। তাছাড়া এটুকু বুঝে নিয়েছি, এদের বাইরেটা যার যতই চকচকে হোক ভেতরটা ভাল নয়। খুব কম পুরুষের জীবনেই শান্তি আনতে পারে এরা।'

একটু চুপ করে থেকে হেমন্ত বলে, 'তোর দিকে ওর মনটা ঝুঁকেছিল ঠিকই, সে ঝোঁকটা এখনও বোধহয় যায় নি। আরও সেই জন্যেই হয়ত বরকে মনে ধরে না।...তোরা যাকে প্রেম বলিস, নবেলে নাটকে যা লেখে—সে প্রেমটা তোর দিকেই। নইলে ষোড়শীবাবু-টাবু—'

বলতে গিয়েও যেন হঠাৎ চুপ করে যায় হেমন্ত।

সুরেন মুখ তুলে চায় না, কিন্তু তার মুখ দৃষ্টিটাই ভ্রূকুটিবদ্ধ হয় একটু। হেমন্ত সেটা লক্ষ্য করে।

সুরেন বলে, 'ষোড়শীবাবু কি হয়েছে—?'

এধরনের কৌতূহল সুরেনের স্বভাব-বিরুদ্ধ। কোনরকম নোংরা কথার ধারে কাছেও যেতে চায় না সে। তাই হেমন্ত একটু অবাকই হল ওর প্রশ্নে। বলল, 'ও, তুইও সন্দেহ করেছিলি তাহলে। তবে ওটা আমি ভেবে দেখেছি, এমন কিছু দূষ্য ব্যাপার নয়। ষোড়শীবাবুর টান স্বাভাবিক, সেটা বৌমার মন্দ লাগত না এই জন্যে যে, এতবড় একটা লোক, ধনী, আশ্রয়দাতা—সময়ে অসময়ে এটাওটা শখের জিনিস যোগায়—সে ওর জন্যে উৎসুক, ওর কৃপার প্রার্থী—এইটেই ভাল লাগত আর কি। তার বেশী কিছু নয়। পুজো কে না চায় বল। না চাইলেও অযাচিত পেলে তো আরও খুশী হয়।...তবে ওর আসল টানটা তোর দিকেই—'

আস্তে আস্তে সুরেন বলে, 'ওকথাটা যাক পিসীমা।...বৌদি বলি, গুরুজন সম্পর্কে এসব আলোচনা না করাই ভাল। লাভও তো কিছু নেই।'

'তা ঠিক।' সায় দেয় হেমন্ত, তবে আঘাতটা সেও সামলাতে পারে নি। মেজাজ তো খিটখিটে হয়েছেই—শরীরটাও ভাঙছে। হয়ত খুব একটা মজবুত ছিল না কোনদিনই, তবু—।...যাক গে। সত্যিই, এসব কথা তোর না শোনাই ভাল।

দারোয়ানকে আগেই মোটা বকশিশ দিয়ে বিদেয় করেছিল, দিন আষ্টেক দেখে সুরেনকেও ছেড়ে দিল, হাতে পাঁচ-ছয়দিন ছুটি থাকতেই। বল যে, 'থাকতে তো পাস না। দেশেই দুটো দিন কাটিয়ে যাস বরং—'

সুরেন বলে, 'তাই যাবো। তবে ইচ্ছে আছে একদিন দুদিন আগেই জয়েন করব। দরকারের বেশী থাকি নি এটা প্রমাণ করা ভাল। তারপর—নতুন সেকশান, নতুন কাজ, ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের চোখের সামনে—বুঝে নিতেও দেরি হবে। তবে, হাতের লেখা দেখে আর দরখাস্তে ভুল হয় নি দেখে—উনি যেন একটু অবাক হয়েই গেলেন। বললেন, আগে জানলে এমনিতেই তোমাকে আমার আপিসে টেনে নিতুম।'

সুরেন চলে যেতে আবারও সেই একা। সেই বিরাট শূন্যতা।

তবে কলকাতার নিজস্ব বাড়ির ফাঁকা ঘরগুলোয় একা ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে যেমন হঠাৎ এক এক সময় ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করত, এ তেমন নয়। একটু পুরো তলা ঠিকই, তবে বলতে গেলে দুখানাই মাত্র ঘর, ঘর বলতে যা বোঝায়। আর একটা যা ছোট্ট এক ফালি অন্ধকার ঘর, তাতে ভাড়ার রাখা ছাড়া কিছু করা যায় না—আর একটু রান্নার জায়গা। তাও এর মধ্যে একটা ঘরই যা একটু বড়, তাতেই ওর শোওয়া বসা ঠাকুর পুজো চলে যায়। একটা ক্যানেস্তারা তাক আছে, তার সঙ্গেই জলচৌকী পেতে, পুজোর উপকরণ গঙ্গাজল, ঠাকুরের পট, গুরুর ছবি সব সাজিয়ে নিয়েছে।

পাশের ঘরটা খালিই পড়ে থাকে, বাড়তি ঘর। যদিই কেউ কোনদিন আসে টাসে—থাকবে। এই 'কেউ'টা যে কে—তা নিজেকেই প্রশ্ন করতে সাহস হয় না যেন। সে কি সুরেন? নিভা? না মণিকারাই। কার আসার আশা করছে সে তা নিজেও জানে না। শুধু 'কেউ হয়ত আসবে'—এই অনিশ্চিত অস্পষ্ট একটা ঘটনার ওপর ভরসা করে বর্তমানের নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে চায় হয়ত।...

কলকাতার মতো নিঃসঙ্গ নয়—এই একটা মস্ত সুবিধে।

সেখানে আশপাশের কোন বাড়িতে হেমন্ত যেত না, তারাও আসত না। এখানেও সে বড় একটা কোথাও যায় না, তবে অপরে আসে। পাশেই বাড়িওয়ালারা থাকেন, এ মহল ও মহলের মধ্যে একটা দরজার মাত্র ব্যবধান, তর্কচূড়ামণির মা স্ত্রী দোর ঠেলে খুলিয়ে আলাপ করতে আসেন।

নিচে এক 'কারেৎ গিন্নি' আছেন, ছেলে বৌদের সঙ্গে বনে না বলে একা পড়ে থাকেন, তিনিও আসেন মধ্যে মধ্যে। একাই মুখে ছেলেদের মহিমা কীর্তন এবং অবিবেচনার নিন্দা করেন বসে বসে। সবাই বড় বড় চাকরি করে, করত। বিশেষ যে দুটি মারা গেছে তাদের তো তুলনাই নেই, রাজা ছেলে। আবার তারা আসে না খোঁজ নেয় না। হারামজাদী ছোটলোকের বেটি বৌয়েরা গুণতুক করেছে—এখানে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত। এখন উনি মলেই বাঁচে সবাই,—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এছাড়া এ মহল ও মহলের নিচেতলায় অন্ধকার খোপে খোপে অনেক ভাড়াটে। তার মধ্যে স্বামী-পুত্রহীনা পরদয়া নির্ভর বিধবা বুড়িও আছে আবার সামান্য কাজ করে, স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঐরকম একটা অন্ধকার ঘরে কাটায়—এমন লোকও আছে। কেউ বাতাসার কারিগর, কেউ বা মুদীর দোকানে মাল ওজন করে। একজন সন্দেশ রসগোল্লা তৈরী করে কালীতলার মোড়ে কান্তবাসের দোকানে। সামান্য আয়ে অনেকগুলি পেট চালাতে হয়—এই মাসিক আটআনা এক টাকা ভাড়ার বেশী দেবার ক্ষমতা নেই। এও দিতে পারে না বেশির ভাগই—বাড়িওয়ালাও তার জন্যে জুলুম করেন না। আশপাশে নাকি চার আনা ভাড়ার ঘরও আছে—তবে সে ঘরে থাকলে ছেলেপুলে মরে যাবে এই ভয়েই যায় না কেউ। বুড়িদের মার্কণ্ডের পরমায়ু, তারা থাকতে পারে।

এরা এইসব ভাড়াটেরা নিজেদের গরজে ওপরে উঠে এসে আলাপ করে, ঘনঘন এরা কারণে অকারণে প্রণাম করে। কারণ প্রয়োজনে চার আনা আট আনা ধার করতে হয় প্রায়ই। আগে আগে সুদের কথা জিজ্ঞেস করত। বাটি গেলাস হাতে করে আনত বাঁধা রাখতে—এখন ধমক খেয়ে সে কথা আর তোলে না। তাতেই ভক্তি আরও বেড়ে গেছে। দায়ে অদায়ে এক আধপালা তেল, দুখানা তেজপাতা কি দুটো আলু—এসব তো আছেই। তবে এ আর ফেরৎ নেয় না হেমন্ত। পয়সাটা নেয়। নইলে জানে যে এ চাহিদা বেড়েই যাবে। শুধু তাই নয় একবারের দেনা শোধ না দিলে পরে আর দেয় না, হাঁকিয়ে দেয়।

পর্যন্ত এখানেও একটা বাড়ি ...লে। পরে আরও।

...তায় বাড়ি চলে যাচ্ছে দেখলে— ...যদি তার পরে বেশী দাম ওঠার ...না থাকে—লোভ সামলাতে পারে না। ...বু বলতেন চড়ুকে পিঠ—সুড় সুড় ...ওঠে, চড়ক সন্ন্যাসীদের মার খাওয়ার ... মতো।

...থাটা ঠিকই—হেমন্ত এখন দেখে। ... বাড়ি কেনার পর দায়ে পড়ে মিস্ত্রী ...জ বার করে। দাঁড়িয়ে থেকে তদারক ... মেরামতও করায়। সেই সঙ্গে একটু ...টু পরিবর্তন। ফলে সহজেই বিক্রী হয়ে ... লাভও পায় শ'সাতেক টাকার মতো।

তবে এখানে এরকম বাড়ি কম, দেখে-...ন সাবধানেই কিনতে হয়। কখনও ...তর কান্ড করেও মেহনতই সার হয়, সর্ব-...ল্যে একশটা টাকা হয়ত ওঠে। কি আর ...টু বেশী; ছুটোছুটি মজুরী পোষায় ... লোকসান হতে দেয় না অবশ্য। কেনার ...র দেখেশুনে হিসেব করেই ফেলে। ...তাটাই এখানে বড় প্রশ্ন, বড় রাস্তা থেকে দূরে—এইটেই সর্বাগ্রে দেখতে হয়—আর ...মত করলে কিছু বদল করলে লোভনীয় ... হবে কিনা!...

বাড়ি কেনে অবশ্য বেচবার জন্যেই—...জ এখান থেকে নড়ে না। ঘরে বসে গঙ্গা ...—এ ওর বহুদিনের শখ। সুবিধেও ...ক। কেদারনাথ, বাজার সব কাছে। ইচ্ছে ... নিত্য স্নান করাও যায়। যদিচ তা সে করে না। বিশেষ বর্ষাকালে—কাদা ঘোলা জল, যত রাজ্যের নোংরা ধুয়ে আসা—স্নান করতে প্রবৃত্তি হয় না তাতে।...এখান থেকে আরও যেতে চায় না দুটো কারণে। সুরেন সযত্নে সব সাজিয়ে দিয়ে গেছে, যেখানে যা দরকার—এই তক্তপোষখানা কিনে এনে নিজে বিছানাটি পর্যন্ত পেতে দিয়ে গেছে পরিপাটি করে—মনে হয় তার শ্রদ্ধা ও ভাল-বাসার স্পর্শ আছে এ ঘরের সর্বত্র। এখানে থেকে গেলে সেটা হারিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় কারণ—দুখবাড়ির নিচের তলায়, আশেপাশে অনেকগুলি হতভাগা জুটেছে—কুপোষ্য—তারা যেন ওরই মুখ চেয়ে থাকে। এত দীন এত দুঃখী যে মানুষ হয় তা এতকালের জীবনে কখনও জানে নি। কলকাতায় সীমাবদ্ধ জীবনে এ অভিজ্ঞতা হয় নি।

এখানে সস্তাগন্ডা ঠিকই—কিন্তু তাই বলে মাসিক দশ টাকা আয়ে যে সংসার চলে—চলতে পারে—তা তো আজও অবিশ্বাস্য মনে হয়। বাড়ি যারা —তাদের কারও আয় মাসে তিন কারও বা চার। যার পাঁচ টাকা মাসোহারা সে নিজেকে এদের তুলনায় অবস্থাপন্ন মনে করে। সেই চালে চলে।

এদের জীবন দেখে আর নিজের জীবনের কথা ভেবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়। তারও কেউ নেই সত্যি কথা—তবু এরকম নিরন্ন পরমুখাপেক্ষী তো করেন নি ভগবান। এদের মধ্যে অনেকেরই সন্তান হয়েছিল। হয়ত কারও কারও আছে এখনও—তবু এই অবস্থা। যাদের বেঁচে নেই তাদের তবু একটা সান্ত্বনা—কারও ভাইপো, কারও ভাগ্নীজামাই, কারও বা দূর সম্পর্কের নাতি এই টাকা পাঠায়—হয়ত এইটুকু পাঠাতেই তাদের কষ্ট হয়, হয়ত তাদের বৌরা গঞ্জনা দেয়—এ টাকাটা অসুবিধে করে তাদের ছেলেমেয়ের পেট মেরে পাঠানো হচ্ছে বলে; খোঁজখবর তো কেউ নেয়ই না—সম্ভবত সেখানে বসে অসহিষ্ণুভাবে দিন গোনে—কবে এরা মরবে।

এদের অসুখবিসুখে কেউ দেখার নেই, পাশের ঘরের প্রতিবেশী ছাড়া। তাদের নিজেদের শরীরেরই অপটু অবস্থা, তবু বাধ্য হয়েই—মরে-মরেও করে। নিজেদের মধ্যে সদ্ভাবও নেই তেমন, ফলে সে সেবার মধ্যে তিক্ততাও থাকে যথেষ্ট।

হেমন্ত এই ভারটাই নিজের হাতে তুলে নেয়।

কাউকে ডাকতে হয় না, এদের কারও অসুখ হয়েছে শুনলে নিজেই এগিয়ে যায়, প্রাণপণে সেবা করে, 'গুয়ে মুতে করা' যাকে বলে তাই। তার জন্যে কোন কৃতজ্ঞতাও আশা করে না, ও জিনিসটা আশা করতে সে ভুলেই গেছে বহুকাল। ওর প্রাক্তন বৃত্তির কথাটা কি ভাবে জানাজানি হয়ে গেছে, হেমন্ত নিজেই হয়ত বলেছে—সেও সব ঢাকাঢাকি পছন্দ করে না—এত সেবা এবং সাহায্য করলেও বিধবারা ওর হাতে কেউ খেতে চায় না। ওরই মধ্যে, নিজেদের সুবিধামতো একটা শাস্ত্রও বার করে নিয়েছে—সাবু বার্লি পর্যন্ত ওর হাতে চলে, এমন কি লুচি হালুয়াও, 'আতুরে নিয়মো নাস্তি' তবে সে বাক্যের দোহাই দিয়েও ভাত খাওয়া নাকি চলে না। ভাতেই সমস্ত জাতধর্ম বাঁধা তাদের।

তা হোক, তার জন্যে কোন দুঃখ কি অভিমান নেই হেমন্তর। বরং সে হাসি-মুখেই নিরামিষ ঝোল বা সুক্তোটা রান্না করে নিয়ে দিয়ে যায়—পাশের ঘরের কেউ ভাতটা বাঁধে।

দুঃখ হয়েছিল অন্য কারণে. প্রথম প্রথম খুবই আঘাত পেয়ে ছিল, ক্রমে সেটাও সয়ে গেল।

যারা ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করে—প্রায় অনাহারশীর্ণ তাদের ছেলেমেয়েদের অসুখ লেগেই থাকে; সে জন্যে—ওষুধপথ্যের প্রয়োজনে—ওর কাছেই ছুটে আসে। সে দেনাও নয়, দানই। হেমন্ত ইচ্ছে করেই দেয়, বলে এ আর শোধ দিতে হবে না। কিন্তু তারাই, যখন হেমন্ত ছুটে যায় সেই সব রুগ্ন ছেলেমেয়েদের সেবা করতে-তখন বিরক্ত হয়। আগে সেটা বুঝতে পারত না। কেমন একটা আড়ষ্ট আড়ষ্ট ভাব নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে বিরস কণ্ঠে বলে, 'থাক থাক, আপনি আর কেন এসব—আমরাই তো আছি—আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।' সেবাবিদ্যা যে শিখেছে, চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রাথমিক জ্ঞান যার অধিগত—তার পক্ষে চোখের সামনে অনাচার অনিয়ম হতে দেখলে চুপ করে দেখা শক্ত বলেই, আগে আগে তাদের ধমক দিয়ে জোর করেই সেবা করত, কিন্তু পরে কারণটা জেনে নিরস্ত হল।

ওর ঝিই প্রথম বলল ওকে। এখানে এসে সারাদিনের লোকই রেখেছে। বামুনের মেয়েই একটি—দরকার হলে যাতে রান্নাও করত পারে। তবে ঘরমোছা বাসন মাজা সব কাজই করে—শরীর খারাপ না হলে রান্নাটা হেমন্ত নিজেই করে নেয়। সেই ঝিই বললে একদিন, 'আপনি কেন মিছিমিছি ভূতের বেগার দিতে যান মা, ওরা সব যা-তা বলে। যাদের জন্যে এত করেন তারাই যখন তার মর্ম বোঝে না তখন কী দরকার আপনার জোর করে যাওয়ার?'

'যা তা বলে? কী বলে রে?' প্রশ্ন করে বটে কিন্তু কী বলে নিজের মনের মধ্যেই যেন তার একটা আভাস পায়—উত্তর পাবার আগেই।

'সে আমি বলতে পারব না মা আপনাকে।'

অনেক পীড়াপীড়িতেও বলল না সে।

শেষে একদিন নিজেই শুনল হেমন্ত, নিচের যে ছেলেটি টাইফয়েডে ভুগছিল তার মা বলছে, 'বুড়ী ডাইনী, নিজের সাতকুল খেয়ে বসে আছে। এখন আমার বাছার ওপর নজর পড়েছে।...এ এক হয়েছে জ্বালা! এ বাড়ি ছাড়তে না পারলে একটাকেও রাখতে পারব না!'

সেই দিনটাতেই খুব মর্মান্তিক দুঃখ পেয়েছিল, বহুদিনের জ্বলে যাওয়া চোখে আবারও নেমেছিল জলের ধারা—তবে সে সাময়িক। বিধাতার নিদারুণ শিক্ষায় সব আঘাত সামলে নেবারই শিক্ষা হয়েছে তার, সেই সঙ্গে অপরের দিকটাও দেখতে শিখেছে। কী বা ওদের শিক্ষা, ওদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী বিবেচনা আশা করাই তো নির্বুদ্ধিতা। আবারও সেই কালীয়-নাগের কথাই মনে পড়ে—'ভগবান, তুমি আমাকে বিষই দিয়েছ, বিষ ছাড়া আর কি আশা করো আমার কাছ থেকে?'

তবে ক্ষমা করলেও—ওদের সাহায্য দানে বিরত না হলেও—নিচে সাধে গিয়ে আর সেবা করতে বসে না। অন্তত ছোট ছেলে-মেয়েদের অসুখে নয়।

এক একবার মনে হয়—ঈশ্বর এইসব প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে তার সংসারের প্রবল নেশা কাটিয়ে দিচ্ছেন, তার মনকে—বিরূপতা কাটিয়ে নিজের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করছেন। এই ঘটনার পর বিশেষ করে—মনে মনে একটা ধারণা হয় যে, এতদিন পরে সে নেশা কেটেই গেছে। কিন্তু ভগবান আবারও বুঝি হাসেন কঠিন কৌতুকের হাসি। আরও আকর্ষণ আরও আঘাত দেবার জন্যে তৈরী হন।

(ক্রমশঃ)

আবহাওয়ার কথা

বর্ষাকালে এখনো পুরো বৃষ্টি নামেনি, কোথাও কোথাও এখনো খরা চলছে, ব্যাপারটা অনেকের কাছেই তাজ্জব মনে হচ্ছে। চৈত্র মাসে কেন কালবৈশাখী হয়নি, কেন আষাঢ় মাস শুরু হবার পরেও বর্ষা আসতে দেরি হয়েছিল—অনেকের কাছেই তা বোধগম্য ছিল না। আজকাল খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় আবহাওয়ার খবর ছাপা হয়ে থাকে—শুধু খবরটুকুই নয়, তা নিয়ে সাহিত্য করারও চেষ্টা হয় (এমনকি আকাশবাণীতেও) কিন্তু আবহবিদরা কেন পুরোপুরি নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন না তার কারণ অনেকেরই জানা নেই। আজকাল আবহাওয়া নিয়ে যতোটা আগ্রহ তৈরি হয়েছে, ততোটা আবহাওয়ার কার্য-কারণ সম্পর্কিত জ্ঞান নয়। অথচ যে-কোনো স্কুলপাঠ্য ভূগোল বইয়ের পৃষ্ঠা ওলটালেও আবহাওয়ার মূল কথাগুলো মোটামুটি জেনে নেওয়া চলে। এ-সপ্তাহের বিজ্ঞানের কথায় আমি এই মূল কথাগুলোই সহজ-ভাবে উপস্থিত করতে চেষ্টা করছি।

গ্রীষ্মের পরে বর্ষা, বর্ষার পরে শরৎ ইত্যাদি ঋতুগুলো যে পর পর এসেই থাকে, তার মূলে রয়েছে এই ঘটনাটি যে পৃথিবীটা কক্ষপথে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে নেই (পৃথিবীর মেরুরেখাটি যদি কক্ষরেখার ওপরে লম্ব হত, তাহলে সেটা হত পৃথিবীর খাড়া অবস্থা), সাড়ে-তেইশ ডিগ্রী হেলে রয়েছে। পৃথিবীর এই অবস্থাকে বোঝাবার জন্যে একটি পরিচিত উপমা হচ্ছে লাট্টু। লাট্টু খাড়া হয়েও ঘোরে আবার একপাশে খানিকটা হেলে গিয়েও ঘোরে। পৃথিবীর অবস্থা এই হেলে-পড়া ঘূরন্ত লাট্টুর মতো—নিজের চারদিকে ঘুরছে, আবার কক্ষপথে ছুটন্ত অবস্থায় সূর্যের চারদিকেও।

মাত্র সাড়ে-তেইশ ডিগ্রী হেলে থাকা শুনতে যতো সামান্য মনে হোক, কিন্তু এইটুকু ঘটনার জন্যেই পৃথিবীর সর্বত্র দিন ও রাত্রি সমান হতে পারে না, সূর্যের উদয় সারা বছর ধরে একই জায়গায় নয়, মেরুদেশে ছ-মাস দিন ছ-মাস রাত্রি ইত্যাদি।

ঋতু-পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা করতে হলে এই দুটি খবর জরুরী : কখনো দিন বড়ো রাত্রি ছোট, কখনো দিন ছোট রাত্রি বড়ো (তারই মধ্যে দুটি তারিখে দিন ও রাত্রি অবশ্যই সমান), সূর্য সবসময়ে ঠিক মাথার ওপর দিয়ে যায় না, কখনো উত্তরে সরে যায় কখনো দক্ষিণে।

আবহাওয়ার মূলে দ্বিতীয় যে প্রকাণ্ড ঘটনাটি রয়েছে, তা হচ্ছে পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডল। এটি না থাকলে পৃথিবী হেলে-থাকা সত্ত্বেও আবহাওয়ার কোনো রকম হেরফের হত না।

তৃতীয় ঘটনাটি অবশ্যই ভূপৃষ্ঠের বৈচিত্র্য : কোথাও সমুদ্র, কোথাও পর্বত, কোথাও অরণ্য ইত্যাদি।

এই তিনটি ঘটনার কথা মনে রেখে এবারে আরেকটু বিশদ আলোচনায় যাওয়া যাক।

আবহাওয়া ও সূর্য

সূর্য হচ্ছে প্রকাণ্ড একটা শক্তির উৎস। সূর্য থেকে প্রতি মিনিটে যে পরিমাণ তাপ ছড়িয়ে পড়ছে তা ১,১৬০ কোটি টন কয়লা পুড়িয়ে পাওয়া শক্তির সমতুল।

সূর্য থেকে ছড়িয়ে-পড়া এই বিপুল তাপের খানিকটা অংশ পৃথিবীতে এসেও পৌঁছয়। কতটা? এক সেন্টিমিটার দীর্ঘ বাহুবিশিষ্ট কালো একটি বর্গক্ষেত্রকে যদি আমরা বায়ুমণ্ডলের ওপরের সীমানায় স্থাপন করতে পারি, এমনভাবে যেন সূর্যের কিরণ এই বর্গক্ষেত্রের ওপরে লম্বভাবে এসে পড়ে, তাহলে এই বর্গক্ষেত্রের ওপরে

সূর্যের তাপ পাওয়া যায় প্রতি মিনিটে প্রায় দুই ক্যালরি। তবে এর সবটাই পৃথিবীর মাটিতে এসে পৌঁছতে পারে না, তার আগেই অনেকখানি অংশ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল শুষে নেয়। সেটা এতখানি যে পরিষ্কার দিনেও পৃথিবীর বিষুবরেখায় দুপুরে ভূপৃষ্ঠের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে তাপ পাওয়া যায় প্রতি মিনিটে ২ ক্যালরি নয়, ১·৫ থেকে ১·৭ ক্যালরি।

তাহলে বায়ুমণ্ডল আছে বলেই সূর্যের সবটুকু তাপ ভূপৃষ্ঠে পৌঁছতে পারছে না। বায়ুমণ্ডল যদি না থাকত? তাহলে আর এই মাঝপথে খোয়া যাওয়ার ব্যাপারটি ঘটত না, পৃথিবী তার কক্ষরেখায় হেলে থাকা সত্ত্বেও বিষুব ও মেরু এলাকা সমেত পৃথিবীর সব এলাকাতেই সারা বছরে তাপ এসে পৌঁছত মোটামুটি সমান মাত্রায়—অর্থাৎ, প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে প্রতি মিনিটে প্রায় ২ ক্যালরি।

তবে ব্যাপারটা আরো অনেক জটিল। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার পরে সূর্যের বিকীরণে বড়ো রকমের অদলবদল ঘটে যায়। বাতাসের অণু, ধুলো ও জলীয় বাষ্পের কণা ও বিশেষ করে মেঘের ভিতরকার জলের ফোঁটায় প্রতিফলিত হয়ে সূর্যের বিকীরণের খানিকটা অংশ বায়ুমণ্ডলের বাইরে ঠিকরে বেরিয়ে যায়। কতখানি? প্রায় ৪২ শতাংশ।

খানিকটা অংশ খোয়া যায় বায়ুমণ্ডলের ভিতরেও। বায়ুমণ্ডলের স্বচ্ছতা যতো কমে, এই খোয়া-যাওয়ার পরিমাণ ততো বাড়ে। আকাশে পুরু মেঘ বা ঘন কুয়াশা থাকলে সূর্যের কিরণ ভূপৃষ্ঠে আদৌ না পৌঁছতেও পারে।

বায়ুমণ্ডলে কতখানি খোয়া যায়? গড়ে প্রায় ১৪ শতাংশ।

এই খোয়া যাওয়ার ব্যাপারটা শুধু বায়ুমণ্ডলের স্বচ্ছতা অস্বচ্ছতার ওপরেই নির্ভর করে না। নির্ভর করে সূর্য কতটা ওপরে আছে তার ওপরে, এমনকি ভূপৃষ্ঠের প্রকৃতির ওপরেও। সূর্য দিগন্ত থেকে যতো উঁচুতে, ততোই তার কিরণের খোয়া-যাওয়া কম। সূর্য যখন ১০ ডিগ্রী ওপরে তখন সূর্যকিরণের খোয়া-যাওয়ার পরিমাণ সূর্য যখন ৬০ ডিগ্রী ওপরে তখনকার খোয়া-যাওয়ার পরিমাণের চেয়ে চার-পাঁচ গুণ বেশি। মেরুদেশে সূর্য সবসময়েই

থেকে আকাশের অনেক নিচের দিকে, এ-কারণে সেখানে সূর্যকিরণের অনেকখানিই থামা যায়।

তা সত্ত্বেও সূর্যকিরণের যতোখানি অংশ শেষ পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠে পৌঁছতে পারে, সারা বছরে তার মোট পরিমাণ অনেকখানি। ১৩ সংখ্যাটির পিছনে তেইশটি শূন্য বসালে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তত-ক্যালরি। গোটা পৃথিবী ৩৫ মিটার পুরু বরফে ঢাকা থাকলে এই উত্তাপ তাকে পুরোপুরি গলিয়ে ফেলতে পারত।......

ভূপৃষ্ঠ কিন্তু সবটুকু তাপ ধরে রাখতে পারে না। এক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠও একটা আয়নার মতো, তাপের খানিকটা অংশ এই আয়না থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসে। [illegible] প্রায় ৪ শতাংশ। কম-বেশি তারতম্য হতে পারে। সেটা নির্ভর করে ভূপৃষ্ঠের প্রকৃতির ওপরে। মনে করা যাক, সূর্যের তাপ একই পরিমাণে এসে পড়ছে চষা জমি, ঘাসের ক্ষেত, অরণ্য ও বরফ-ঢাকা সমতলের ওপরে। সূর্যের বিকিরণ ধরে রাখার ক্ষমতা এই জায়গাগুলোতে কিন্তু সমান নয়। চষা জমি ধরে রাখতে পারে ৮৮ শতাংশ, ঘাসের ক্ষেত ৭৫ শতাংশ, অরণ্য ৯৫ শতাংশ, বরফঢাকা সমতল ৫ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে, বরফের তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা প্রায় কিছুই নেই। এ কারণে গ্রীষ্মকালের পরিপূর্ণ দিনেও মেরুদেশের বরফ সূর্যের তাপে গলতে পারে না।

আবার ভূপৃষ্ঠের কোন জায়গা থেকে কতখানি তাপ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে তা নির্ভর করে শুধু সেই বিশেষ জায়গার প্রকৃতির ওপরেই নয়, তার রঙের ওপরেও। হালকা রং হলে ঠিকরে আসার পরিমাণ বেশি। সে-কারণে গ্রীষ্মকালে গাঢ় রঙের চেয়ে হালকা রঙের জামা পরলে গরম কম লাগে, সাদা জামায় সবচেয়ে কম। (অধ্যাপক [illegible], কালো গোরু ও সাদা গরুর দুধেও এ-কারণে তফাৎ হতে পারে। এ বিষয়টি নিয়ে আমাদের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গবেষণা হওয়া উচিত)।

সূর্যের তাপ সমুদ্র কতখানি ধরে রাখতে পারে? দুপুরের দিকে, সূর্য যখন দিগন্তের কাছাকাছি, তখন ৩০ শতাংশ। সূর্যের কিরণ খাড়াভাবে এসে পড়ছে, না তেরছাভাবে, তার ওপরেও ধরে রাখার ক্ষমতা নির্ভর করে। এবারে দেখা যাক, যে-তাপ ভূপৃষ্ঠ ধরে রাখতে পারল (মোট হিসেবে গড়ে ৪৫ শতাংশ) তার পরিণতি কী হচ্ছে।

আমরা জানি, পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিস তাপ ছড়ায়—তা সে জমিই হোক, বাতাসই হোক, ধুলো বা গাছপালাই হোক। ফলে ভূপৃষ্ঠের ধরে-রাখা তাপ ছড়িয়ে পড়ে (প্রায় অর্ধাংশ), তেমনি বায়ুমণ্ডলের ছড়িয়ে দেওয়া তাপও। এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে একটা তাপের বিনিময় শুরু হয়ে যায়। সে জিনিস যতো বেশি উত্তপ্ত—তা থেকে ছড়িয়ে পড়া তাপও ততো বেশি। সাধারণত দেখা যায়, ভূপৃষ্ঠ যতোটা উত্তপ্ত হতে পারে বায়ুমণ্ডল ততোটা নয়। ফলে এই তাপ-বিনিময়ের ব্যাপারে ক্ষতিটা বেশি হয় ভূপৃষ্ঠেরই।

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে? ভূপৃষ্ঠ যেমন তাপ পায় (সূর্য থেকে ও বায়ুমণ্ডল থেকে) তেমনি আবার ফিরিয়েও দেয়। এই পাওয়া ও ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যে কাটাকুটি হয়ে গিয়ে অবশিষ্টাংশ থেকে যায় ভূপৃষ্ঠের ভাগে। ইংরেজিতে বলে রিজিডিউয়াল রেডিয়েশন।

এই অবশিষ্ট তাপের ওপরেই নির্ভর করে ঋতু। যেমন, গ্রীষ্মকালে দিন বড়ো রাত ছোট। সারাদিন ধরে যতো তাপ ভূপৃষ্ঠ পায় রাত্রিবেলা তা খোয়া যেতে শুরু করে। কিন্তু সব মিলিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার হিসেবে ভূপৃষ্ঠের অবশিষ্ট তাপ অনেকখানিই থেকে যায়। অতএব গ্রীষ্মকাল। শরৎকালে দিন ও রাত্রি প্রায় সমান, ফলে ভূপৃষ্ঠের অবশিষ্ট তাপ আরো কম, শীতকালে দিন ছোট রাত বড়ো, ফলে অবশিষ্ট তাপ আরো আরো কম।

ভূ-সংস্থান ও আবহাওয়া

ভূপৃষ্ঠ কতখানি তাপ নিতে পারবে, কতখানি ছড়িয়ে দেবে তা নির্ভর করে স্থানীয় ভূ-সংস্থানের ওপরেও। জমি উঁচু-নিচু কিনা, কাছাকাছি পাহাড় বা পর্বত বা অরণ্য বা মরুভূমি বা সমুদ্র আছে কিনা—স্থানীয় আবহাওয়া তার দ্বারাই অনেকখানি নির্ধারিত। এ-কারণে দুটি অঞ্চল একই অক্ষাংশে হওয়া সত্ত্বেও (অর্থাৎ সূর্য থেকে পাওয়া তাপ সমান হওয়া সত্ত্বেও) আবহাওয়ার দিক থেকে পৃথক হতে পারে। যেমন, সমুদ্রতীরের এলাকায় গরম বা শীত কোনোটাই বেশি হতে পারে না। সমুদ্র থাকার দরুণ স্থানীয় যে বায়ুপ্রবাহ থাকে, ব্যাপারটা তারই ফলে। তেমনি অরণ্যের ধারের শহর, পার্বত্য উপত্যকার শহর, মরুভূমির ধারের শহর—প্রত্যেকটি শহরের বিশেষ অবস্থানের দরুনই স্থানীয় আবহাওয়া বিশেষ রকমের হয়ে থাকে, সুন্দরবনের কাছে কলকাতার আবহাওয়া, সুন্দরবন বিরাট থাকায় সবদিকে যা ছিল, সুন্দরবনের যেমন খানিকটা কেটে বসতি হবার পরে এখন আর তা নেই। আবার অরণ্যের ঘের বসিয়ে মরুভূমির এলাকাকেও সুজলা সুফলা করা হয়েছে এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই।

বায়ুপ্রবাহ

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কোনো সময়েই স্থির নয়, নানা বায়ুপ্রবাহে বায়ুমণ্ডল সবসময়েই আলোড়িত। কোনো বায়ুপ্রবাহে শীত, কোনো বায়ুপ্রবাহে গরম, কোনো বায়ুপ্রবাহে বর্ষা, কোনো বায়ুপ্রবাহে ঝড় ইত্যাদি। বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি হবার মূল কারণটি এই : যেখানে উত্তাপ বেশি সেখানকার বাতাস হালকা, যেখানে উত্তাপ কম সেখানকার বাতাস ঘন। হালকা বাতাস ওপরে ওঠে আর তখন সেই ফাঁকা জায়গা ভরাট করবার জন্যে ঘন বাতাসকে ছুটে যেতে হয়। উত্তাপের মধ্যে এসে সেই ঘন বাতাসও হয়ে ওঠে হালকা, তা ওপরে ওঠে, তখন আরও ঘন বাতাস ছুটে আসে। অর্থাৎ একটি প্রবাহ সৃষ্টি। ভূপৃষ্ঠের দুই এলাকার মধ্যে তাপের বৈষম্য থাকলেই এমনি প্রবাহ সৃষ্টি হয়ে থাকে। খুব মোটা চোখে তাকালেও তাপের বৈষম্য খুব বড়ো রকমের থেকে গিয়েছে মেরু ও বিষুবের মধ্যে। মেরুতে তাপ কম, বিষুবে বেশি। ফলে অবশ্যম্ভাবী রূপে একটি বায়ুপ্রবাহ। শীতকালে স্থলভাগ যতো বেশি ঠাণ্ডা হয়, জলভাগ ততোটা নয়, ফলে বায়ুর প্রবাহ স্থলভাগ থেকে জলভাগের দিকে। গ্রীষ্মকালে স্থলভাগ যতোটা গরম, জলভাগ ততোটা নয়, ফলে বায়ুর প্রবাহ জলভাগ থেকে স্থলভাগের দিকে। এই হচ্ছে

আরবের মৌসুমী বায়ু, যার দরুণ বর্ষা আসে।

আবহবিদ কিভাবে আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেন ? বায়ুপ্রবাহের হদিস নিয়ে। তাঁকে জানতে হবে কোথায় বাতাস হালকা, কোথায় বাতাস ঘন— অর্থাৎ কোথায় বায়ুমণ্ডলের চাপ কম, কোথায় বেশি। কাজেই তাঁকে প্রথমে বিভিন্ন স্থানের বায়ুমণ্ডলের চাপের মাপ জানতে হয়। তারপরে তিনি মানচিত্রের ওপরে সেই মাপগুলো চিহ্নিত করেন ও একই মাপবিশিষ্ট স্থানগুলো রেখার দ্বারা যুক্ত করেন। তা থেকেই বেরিয়ে আসে নিম্নচাপের এলাকা বা সাইক্লোন এবং উচ্চ-চাপের এলাকা বা অ্যান্টি-সাইক্লোন। তা থেকেই বায়ুপ্রবাহের হদিস পাওয়া ও আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা। এই ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হবে কিনা তা নির্ভর করে বায়ুমণ্ডলের চাপের যে মাপগুলোর ভিত্তিতে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করছেন তা চব্বিশ বা আটচল্লিশ বা বাহাত্তর ঘণ্টা পরেও বজায় থাকছে কিনা তার ওপরে— যদিও ধরেও নেওয়া যায় মাপগুলো নির্ভুল ও ব্যাপক এলাকা জুড়ে নেওয়া হয়েছে। পুরোপুরি নির্ভুল হওয়া সম্ভব নয় বলেই পাঁচশোটি ক্ষেত্রে মেলে না।

হুকুমমাফিক বৃষ্টি

নয়াদিল্লীর সোভিয়েত দূতাবাসের তথ্য বিভাগ থেকে একটি প্রবন্ধ প্রচার করে বলা হয়েছে, হুকুমমাফিক বৃষ্টি নামানো বিজ্ঞানের পক্ষে এখন আর অসম্ভব ব্যাপার নয়। প্রবন্ধটির নাম 'হুকুমমাফিক বৃষ্টি' লেখক ভি-তেরেকোভ, ইঞ্জিনিয়ার। আমাদের দেশে বৃষ্টির জন্যে দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমী বায়ুর ওপরেই নির্ভর করতে হয়, এই বায়ুর আগমনে বিলম্ব ঘটলে যে কী ভয়ানক অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে এ-বছরে তার মর্মান্তিক প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এ অবস্থায়, হুকুমমাফিক বৃষ্টি নামানো বিজ্ঞানের পক্ষে যদি অসম্ভব ব্যাপার না হয়ে থাকে, অন্ততপক্ষে বাঁকুড়া পুরুলিয়ার মতো কয়েকটি স্থানীয় এলাকায় এ-দেশের বিজ্ঞানীরা একটা পরীক্ষামূলক চেষ্টা করে দেখতে পারতেন। যাই হোক, প্রবন্ধটির বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থিত করছি।

শুরু এইভাবে :

সংক্ষিপ্ত হুকুম শোনা গেল, ফায়ার! অর্থাৎ, কামান দাগো।

সঙ্গে সঙ্গে বিমানবিধ্বংসী কামানের গর্জন। আগুনের রেখা এঁকে আকাশে রকেট উৎক্ষিপ্ত।

আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আশেপাশের তুলোর ক্ষেত, আঙুরের ক্ষেত ও ফলের বাগানের ওপরে নেমে আসে বৃষ্টি। ব্যাপারটি ঘটেছিল উজবেকিস্তানে, ১৯৬৯ সালে। এই হুকুমমাফিক বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে বিজ্ঞানীরা ১,৫০,০০০ হেক্টর (এক হেক্টর প্রায় আড়াই একর) জমির ফসল বাঁচিয়েছিলেন। একমাত্র তুলোর ক্ষেতেই যে পরিমাণ ফসল বেঁচে গিয়েছিল তার দাম ছিল সোভিয়েত মুদ্রায় ৬৪ লক্ষ রুবল। আর এই হুকুমমাফিক বৃষ্টিপাত ঘটাবার জন্যে খরচ করতে হয়েছিল অনধিক ৪,৮৭,০০০ রুবল।

এই ছিল বিশ্বের প্রথম হুকুমমাফিক বৃষ্টি।

কিভাবে এই বৃষ্টি ঘটানো হয়েছিল, সে আলোচনায় যাবার আগে আরো একটি খবর তোলা দরকার। ফসলের ক্ষতি হতে পারে যেমন বৃষ্টি না হবার দরুণ, তেমনি কুয়াশায় ও শিলাবৃষ্টিতেও। তেরেকোভ বলছেন, এই দুই শত্রুর বিরুদ্ধেও লড়াই চালাবার কায়দা বিজ্ঞান জেনে গিয়েছে।

প্রথমে কুয়াশার কথা ধরা যাক। কুয়াশার বিরুদ্ধে বিজ্ঞান লড়াই চালিয়ে থাকে বিভিন্ন উপায়ে। যেমন, কুয়াশা ও মেঘকে উত্তপ্ত করে তোলা, কুয়াশা ও মেঘের ওপরে কামান দাগা, উচ্চ কম্পাঙ্কের বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করা, নানা ধরনের রাসায়নিক প্রয়োগ করে কুয়াশা ও মেঘকে 'বিষাক্ত' করে তোলা। শেষোক্ত উপায়টি সবচেয়ে ফলপ্রসূ ও ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

প্রযুক্ত রাসায়নিকটি হচ্ছে কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড। দেখা গিয়েছে, কুয়াশার বিরুদ্ধে এটি একেবারে মোক্ষম দাওয়াই। নিমেষে কুয়াশা উধাও হয়ে যায়।

যেভাবে ব্যাপারটি ঘটে তা এমনিতে খুবই সরল। কার্বন ডাই-অক্সাইডকে আমরা চিনি গ্যাসীয় অবস্থায়। কিন্তু এখানে তা নয়। এটি কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড, যার তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নিচে। এই অতি-শীতল রাসায়নিকটি প্রযুক্ত হবার পরে কী ঘটে? অতি-শীতল মেঘের মধ্যেকার জলের ফোঁটাগুলো জমে বরফের কণিকা হয়ে যায় আর সেই কণিকার ওপরে জলীয় বাষ্প জমাট বাঁধতে থাকে। ফলে আকারে ও ওজনে বাড়ে এবং বাড়তে বাড়তে এমন একটা মাত্রায় পৌঁছয় যে মাটিতে পড়ে যায়। এটা খুব একটা খরচের ব্যাপার তাও নয়। মাত্র কয়েকশো গ্রাম রাসায়নিক ছিটিয়ে পুরো এক ঘন-কিলোমিটার মেঘ ঝরিয়ে দেওয়া চলে। যে-সব সোভিয়েট বিজ্ঞানী এই বিশেষ ক্ষেত্রে কাজ করছেন তাঁদের মতে, অতি-শীতল মেঘ ও কুয়াশা ঝরাবার কর্তব্যে বিজ্ঞান কার্যত সফল হয়েছে।

ফসলের দ্বিতীয় শত্রু শিলাবৃষ্টির বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের লড়াইয়ের কায়দা এই রকম : শিলাবাহী মেঘ আসছে কিনা সে-খোঁজ রাখতে হয় রেডারের সাহায্যে। খোঁজ পাওয়া গেল, আসছে—তখন? কামান দেগে বা রকেট উঠিয়ে সেই বিপজ্জনক মেঘের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হয় আয়োডিন

পদার্থের সংস্পর্শে বড়ো আকারের শিলা গড়তে পারে না, হয়ে ওঠে পরিমাণে প্রচুর হলেও ছোট আকারের—যেগুলো মাটিতে পৌঁছবার আগেই নির্দোষ জল হয়ে যায়। অর্থাৎ বৃষ্টিটা ঠিকই থাকে, শিলা নয়। ফসলের ক্ষতি হতে পারে না।

এই দুটি দৃষ্টান্তই দূর করার, বিদেয় করার। কিন্তু হুকুম মাফিক বৃষ্টির বেলায় তো তা নয়—সেটা তো ডেকে আনা। তার উপায় কী ?

অতি-শীতল মেঘ ও কুয়াশা ঝরাবার জন্যে যে উপায়ের আশ্রয় নেওয়া হয়, সেই একই উপায়। প্রথমে ঠিক করা দরকার কোন এলাকায় বৃষ্টি নামাতে হবে। তার পরে দরকার সেই এলাকার সবচেয়ে কাছাকাছি যে অতি-শীতল মেঘ রয়েছে তার মধ্যে কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড ছড়াবার ব্যবস্থা করা। সময়টি ঠিক করতে হবে মেঘের গতিবেগের হিসেব থেকে, যাতে ঠিক জায়গাটিতে সেই মেঘ বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। হিসেব করে দেখা হয়েছে, কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে এক ঘন-মিটার জল পাবার জন্যে যতো খরচ করতে হয় সেচ ব্যবস্থা থেকে এক ঘন-মিটার জল পাবার খরচ তার চেয়ে কম নয়।

কিন্তু আকাশে যদি মেঘ না থাকে তাহলে? মনে হয়, এক্ষেত্রেও একটি পথ পাওয়া যেতে পারে। স্বাভাবিক মেঘ তৈরি হয় কি-ভাবে? উত্তপ্ত বাতাসের প্রবাহ থাকে ওপরের দিকে, শীতল বাতাসের প্রবাহ নিচের দিকে—তারই ফলে। তাহলে বিশেষ সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে এমনি একটি পরিস্থিতি কি সৃষ্টি করা যায় না? নিশ্চয়ই যায়। সে জন্যে চাই উত্তাপ সৃষ্টি করার প্রকাণ্ড একটি যন্ত্র, উত্তাপকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেবার জন্যে অজস্র নল সমেত। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড যন্ত্রটি চালু থাকে আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আকাশে দেখা দেয় মেঘ—সত্যিকারের মেঘ। কাজেই বৃষ্টিপাত ঘটানো বিজ্ঞানের পক্ষে তেমন শক্ত ব্যাপার নয়, যদিও প্রচণ্ড একটা খরচের ব্যাপার।

আরো একটি উপায় আছে, যাতে খরচ আরো কম। ঐতিহাসিক দলিলে দেখা যায় যুদ্ধ শুরু হচ্ছে পরিষ্কার আবহাওয়ায় কিন্তু শেষ হচ্ছে বৃষ্টির মধ্যে। এ থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, সম্ভবত বাতাসে প্রচণ্ড একটা আলোড়নের ফলেই এই বৃষ্টিপাত। কিন্তু তাই বলে বৃষ্টিপাত ঘটাবার জন্যে আকাশে কামান দেগে যাওয়া চলে না। বিজ্ঞানীরা তখন স্থির করলেন বাতাসে প্রচণ্ড একটা আলোড়ন তুলবেন শ্রবণাতীত শব্দ তরঙ্গের সাহায্যে। ল্যাবরেটরিতে ইতিমধ্যেই পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, তাতে এই পদ্ধতি অযথার্থ প্রমাণিত হয় নি। যাই হোক, বিজ্ঞানীরা তৎপর রয়েছেন, কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটাবার

অল্প আয়াসে বেশী ওজন

কত অল্প আয়াসে কত বেশি ওজন বহন করা চলে, তাই নিয়ে গবেষণা যে একেবারে হয় নি তা নয়। কিন্তু সারা দেশে যারা কায়িক পরিশ্রম করে মোট বইছে, তারা এখনো এই গবেষণার বাইরে। গবেষণা হয়েছে নভশ্চরদের বেলায়, কিছুটা কম পরিমাণে মোটর গাড়ির ড্রাইভারদের বেলায়, আরো কিছুটা কম পরিমাণে দপ্তরের কর্মীদের বেলায়। সম্প্রতি দুজন ভারতীয় এই অবহেলিত কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ চালিয়েছেন। এঁরা হচ্ছেন এস আর দত্ত ও এন এল রামনাথন। একই ওজনের বোঝা সাতটি বিভিন্ন উপায়ে বহন করা হয়েছে। কোন উপায়ে কতখানি শক্তি খরচ হয়, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের ওপরে কতখানি চাপ পড়ে তার পরিমাপ নিয়ে তাঁরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তাতে অবাক হতে হয়। সবচেয়ে কম আয়াসে সবচেয়ে বেশি বোঝা বহন করবার যেটি উপায় তার প্রচলন প্রায় নেই বললেই চলে।

পরীক্ষা কার্যে বোঝা-বহনকারী ছিল সাতজন, বোঝার ওজন ছিল ৩০ কিলোগ্রাম গ্রানাইট পাথরের টুকরো, বোঝা বহন করে নিয়ে যাবার দূরত্ব ছিল এক কিলোমিটার আর চলার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় পাঁচ কিলোমিটার।

বোঝা বহন করার সাতটি বিভিন্ন উপায় ছিল এই :

(১) বোঝা দু-ভাগে ভাগ করে নিয়ে ফিতে দিয়ে বেঁধে কাঁধের দু-দিকে ফেলে দেওয়া—একটি সামনের দিকে, অপরটি পিছনের দিকে।

(২) বোঝা ঝুড়ি বা চুবড়িতে নিয়ে মাথায় তুলে নেওয়া—মাথার ওপরে ঝুড়ি বা চুবড়ি বসাবার জন্যে খড়ের বিঁড়ে।

(৩) থলে বোঝাই করে নেওয়া।

(৪) বস্তা বোঝাই করে পিঠের ওপরে ফেলে দেওয়া—বস্তার মুখ দু-হাতে ধরে থাকা।

(৫) শেরপা—বস্তা বোঝাই করে পিঠের ওপরে ফেলে দেওয়ার মতোই, তবে বস্তার মুখ দু-হাতে ধরে না থেকে একটা ফিতে বেঁধে কপাল দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া।

(৬) একটা দণ্ডের দু-দিকে বোঝা ঝুলিয়ে দিয়ে দণ্ডটি কাঁধের ওপরে ফেলা।

(৭) হাতে ঝুলিয়ে নেওয়া।

পৃথক্-পৃথক ভাবে এই সাতটি উপায়ে বোঝা বহন করতে কতখানি শক্তি খরচ হচ্ছে এবং হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের ওপরে কতখানি চাপ পড়ছে তার পরিমাপ নিয়ে শ্রীদত্ত ও শ্রীরামনাথন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ১নং উপায়টি হচ্ছে বোঝা বহন করার সেরা উপায়। অথচ এই উপায়টির প্রচলন বিশ্বের সর্বত্রই সবচেয়ে কম। বলা বাহুল্য, বোঝা যদি এমন হয় যে তাকে দু-ভাগে ভাগ করা চলে না তাহলে অবশ্যই এই উপায় বাতিল করতে হয়। নচেৎ, শ্রীদত্ত ও শ্রীরামনাথনের মতে, প্রথম উপায়টিই গ্রহণীয়।

ভারতে ৬নং উপায়টি বোঝা বহন করার প্রচলিত উপায়—অর্থাৎ, একটি দণ্ডের দু-দিক থেকে বোঝা ঝুলিয়ে দিয়ে দণ্ডটি কাঁধের ওপরে ফেলা। এক্ষেত্রে বোঝাটি দু-ভাগে ভাগ করে নেওয়া সত্ত্বেও, শক্তিক্ষয় হচ্ছে ৩০ শতাংশ বেশি।

আর সবচেয়ে খারাপ পদ্ধতি কোনটি? হাতে ঝুলিয়ে বোঝা বহন করা—কি শক্তিক্ষয়ের দিক থেকে, কি হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের ওপরে চাপ পড়ার দিক থেকে।

অতএব, নিজের বোঝা যিনি নিজে বহন করতে চান তিনি জেনে রাখুন—যে-কোনো বোঝা দু-ভাগে ভাগ করে নিয়ে ফিতে দিয়ে বেঁধে কাঁধের সামনে-পিছনে ঝুলিয়ে দিয়ে বহন করাটাই সবচেয়ে কম আয়াসে সবচেয়ে বেশি বোঝা বহন করার উপায়। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, বোঝাটি যেন এমন হয় যে তাকে দু-ভাগে ভাগ করা চলে। আমাদের জীবনের অনেক বোঝাই অখণ্ডনীয়, জীবন্ত বোঝারা তো বটেই।

শুক্রগ্রহের মাটিতে ভেনাস—৮

এই নিয়ে দ্বিতীয়বার পৃথিবী থেকে পাঠানো মনুষ্যহীন ব্যোমযান শুক্র গ্রহের মাটিতে আলতোভাবে নামতে পারল। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২২শে জুলাই তারিখে ভারতীয় সময় বেলা ২টা ৫৯ মিনিটে। এই ব্যোমযানটি হচ্ছে ভেনাস-৮, আর প্রথমটি ছিল ভেনাস-৭। দুটিই সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব। ভেনাস-৭ শুক্র গ্রহের মাটিতে সক্রিয় ছিল ২৩ মিনিট আর ভেনাস-৮ সম্পর্কে জানা যাচ্ছে যে এটি সক্রিয় থেকেছে ৫০ মিনিট। প্রথমটির বেলায় যা ঘটেছিল এবারেও তাই—সক্রিয় থাকার সারাটিক্ষণ ধরে শুক্রগ্রহ সম্পর্কে অজস্র খবর সংগ্রহ করেছে ও বেতারে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। এই খবর এখন রয়েছে বিশ্লেষণের পর্যায়ে।

বিজ্ঞানের কথার পাঠকরা নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারছেন, আমেরিকান বিজ্ঞানীদের একটি ব্যোমযান এখন রয়েছে বৃহস্পতি গ্রহের পথে। ওদিকে একটি আমেরিকান ও দুটি সোভিয়েট ব্যোমযান সমানে মঙ্গলগ্রহের পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। লক্ষণ দেখে বোঝা যায় যে-সব গ্রহ পৃথিবীর কাছাকাছি (যেমন এই তিনটি) সেগুলো সম্পর্কে সঠিক বৈজ্ঞানিক খবর জানতে আর দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে না। সম্ভবত সশরীর মানুষের যাতায়াত শুরু হতেও নয়।

দশ বছরে ৫০০টি কসমস উপগ্রহ

গত ১৯ই জুলাই তারিখে কসমস শ্রেণীর ৫০০তম সোভিয়েট উপগ্রহটি পৃথিবীর কক্ষ পথে স্থাপিত হয়েছে, এই উপগ্রহটির সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তর সম্পর্কে পরীক্ষা চালানো হবে।

কসমস শ্রেণীর প্রথম উপগ্রহটি পৃথিবীর আকাশে উঠেছিল ১৯৬২ সালের ১৬ই মার্চ তারিখে।

কসমস শ্রেণীর এই সমস্ত উপগ্রহের সাহায্যে মেঘ সঞ্চার, সৌর বিকীরণ, আয়নমণ্ডলের তেজস্ক্রিয়তা, কণা-ঘনীভবন, বিকীরণ-বলয়, মহাজাগতিক রশ্মি ও পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে গবেষণা চালানো হয়েছে।

আদালতের বিচারের খরচ ও সময় কমাবার উপায়

সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার বিধানসভায় অধিকাংশ সদস্য জোরালো দাবি তুলেছেন, আদালতের বিচারের খরচ ও সময় কমাতে হবে। তাঁদের অবগতির জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও যুক্তরাজ্যে পরীক্ষামূলকভাবে অবলম্বিত একটি উপায়ের বিবরণ সংক্ষেপে উপস্থিত করতে চাই।

উপায়টি হচ্ছে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার—বিশেষ করে টেপ রেকর্ডারের ও কম্পিউটরের।

যে-কোনো বিচারে বহু সংখ্যক সাক্ষী উপস্থিত করতে হয়, বিশেষ করে জনকয়েক বিশেষজ্ঞ সাক্ষীও। আদালতে এই সাক্ষীদের উপস্থিত করাটাই প্রচুর খরচের ব্যাপার, সময়েরও। এ-ব্যাপারে টেপ রেকর্ডার সাহায্য করতে পারে।

কি ভাবে? সাক্ষীদের, বিশেষত বিশেষজ্ঞ সাক্ষীদের সশরীরে আদালতে উপস্থিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, তাঁদের সাক্ষ্য তুলে নেওয়া হোক টেপ-রেকর্ডারে এবং সেই টেপ-রেকর্ডারটি সাক্ষীর বদলে আদালতে উপস্থিত হোক। এতে খরচ তো বাঁচবেই, তাছাড়া বাঁচবে বিচারের সময় এবং সাক্ষীর সময়ও।

টেপ-রেকর্ডার ব্যবহার করা যেতে পারে বিচারের বিবরণ রেকর্ড করার জন্যেও। সাধারণত এ-কাজটি করা হয় শ্রুতি-লিপিকরদের সাহায্যে। কিন্তু তাঁদের লিখিত বিবরণে হুবহু ছবিটি পাওয়া যায় না। আর সেই বিবরণ খুঁজতে হলেও মোটা মোটা ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা ওলটাতে হয়। টেপ-রেকর্ডারের বিবরণ গোটা বিচারটাকেই হুবহু উপস্থিত করতে পারে।

টেপ-রেকর্ডারের বিবরণ বা সাক্ষ্য ওলোটপালোট করাটা খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞের পক্ষে সেটা ধরাটাও খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়। •

(১০)

'শেষ উত্তর'-এর বিপুল সাফল্য আমায় যেন নতুন প্রতিষ্ঠা দিল। শুধু কর্মক্ষেত্রেই নয়, রসিকচিত্তেও। গানগুলির প্রত্যেকটিই ত 'হিট সং' হয়ে দাঁড়ালো। এসব গানের রেকর্ড-সেল থেকেও প্রচুর রয়্যালটি পেয়েছি।

এরপরই মুরলীবাবুর সঙ্গে নতুন করে দু' বছরের কনট্রাক্ট হয়ে গেল। মুরলীবাবু অত্যন্ত সৎ, ভদ্র ও বিনয়ী মানুষ। কিন্তু এসব গুণকেও ছাপিয়ে উঠেছিল ছোট-বড় সবার কাছেই তার গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ। 'শেষ উত্তর' হিট পিকচার হয়েছিল বলে মিঃ বড়ুয়ার প্রতি ত বটেই, আমার প্রতিও তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। একাধারে অর্থবান ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির এমন অকৃপণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদারতা বড় একটা দেখিনি। চিত্রজগতে ত নয়ই। আর দেখিনি বলেই তার স্মৃতিও আজও এমন করে মনকে অভিভূত করে রেখেছে। দক্ষিণা হিসাবে মোটা অঙ্কের টাকা ছাড়াও যে সম্মান পেয়েছি, তার আনন্দ জীবনীশক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমার কর্মশক্তিকেও যেন বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমারই স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য স্টুডিওতে বিশেষভাবে সুসজ্জিত মেক-আপ-রুম-সংলগ্ন স্নানাগারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। [illegible] বাংলো কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই নিরিবিলি আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যে নিজের কাজ সম্বন্ধে চিন্তা করবার, অভিনয় ও গানকে সুন্দরতর করে তোলবার কল্পনায় বিভোর হয়ে যাবার অবকাশ পেতাম বলেই তখনকার কাজ এমন সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে।

এরপরের ছবি 'যোগাযোগ', যার হিন্দী ভার্সান হোলো 'হসপিটাল'। এ-ছবিতে আমার বিপরীতে নায়কের ভূমিকায় ছিলেন তখনকার রূপশ্রেষ্ঠ অভিনেতা জ্যোতিপ্রকাশ। অমন চেহারা বড় একটা চোখে পড়ে না। বিধাতার দেওয়া রূপের সঙ্গে মিশেছিলো তাঁর নির্মল চরিত্র ও অতুলনীয় স্বভাব-ব্যবহারের মাধুর্য। রূপসী নারী অথবা রূপবান পুরুষ নিজের রূপলাবণ্য সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে পারে? আর এর জন্য অন্তরের অতলে থাকেই থাকে একটা প্রচ্ছন্ন অহংকার। কিন্তু জ্যোতিপ্রকাশের মধ্যে কোনো আত্মসচেতন উগ্রতার লেশমাত্র ছিল না। নম্রমধুর ব্যবহারে, অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানজ্ঞাপনের বৈদগ্ধ্যে মর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধে রুচিমার্জিত অন্তরটিই যেন প্রতিফলিত হোতো।

অত অল্পবয়স। কিন্তু কখনও কোনো লঘুচিত্ততা অথবা শালীনতাবোধের ঘাটতি দেখিনি তাঁর চলায়, বলায়, আচারে-ব্যবহারে। স্বভাবমাধুর্যেই হয়ত বা তাঁর নিষ্পাপ রূপের আবেদনকে গভীর করে [illegible] ছিলো। দীর্ঘতায় কিছু স্বল্পতার ক্ষতিপূরণ ঘটিয়েছিল তাঁর মুগ্ধকারী হাসি আর সরল, নিষ্পাপ চাউনি। রোমান্টিক চরিত্রে তোলে ওঁকে এত সুন্দর মানিয়েছিল। জ্যোতিপ্রকাশের সঙ্গে কাজ করে সত্যিই বড় আনন্দ পেয়েছি।

কিন্তু কে জানত নিয়তির মত দুর্ঘটনা এ-আনন্দের এমন নির্মম পরিসমাপ্তি ঘটাবে? ছবিটির তিন-চতুর্থাংশ শেষ হয়েছে। সবার মন আনন্দে ভরপুর। এম. পি. প্রোডাকসন্স সর্বদিক দিয়েই আর একটি মধুর ছবি চিত্ররসিকদের উপহার দিতে পারবে—এই বিশ্বাসে সবাই দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। প্রতিদিন আমার কাছে কত চিঠি যে আসত—কানন দেবী ও জ্যোতিপ্রকাশের চেহারা ও অভিনয়ের কম্বিনেশন দেখবার জন্য সবাই অধীর প্রতীক্ষায় রত।

এমন সময় বিনামেঘে বজ্রপাতের মতই জ্যোতিপ্রকাশের মহার্ঘ রত্নের মত জীবনের অবসান ঘটল। ওঁর স্ত্রী তখনকার সুদর্শনা ও খ্যাতিসম্পন্না অভিনেত্রী শীলা হালদারের মৃত্যু ঘটল দুরারোগ্য রোগে। আর এ-বিচ্ছেদযন্ত্রণা সহ্য করতে পারেননি তাঁর প্রেমময় কোমলপ্রাণ স্বামী। আত্মঘাতী হয়ে তিনিও মৃত্যুবরণ করলেন।

সারা চিত্রজগতে শোকের ছায়া নেমে এল। কিন্তু এ [illegible] ক্ষতিগ্রস্ত [illegible]

করেছিলাম এবং সে অসম্পূর্ণ কাজের ক্ষতিপূরণ ঘটাটা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়েছিলো।

কিন্তু চরম ক্ষতির মুহূর্তেও মন ভরে উঠেছিল তাঁর প্রেমের সততায়, আন্তরিকতার একাগ্রতায়, আত্মনিবেদনের নিষ্ঠায়। এমন সীমাহীন ভালবাসার কাহিনী কবির কল্পনাতেই প্রত্যক্ষ করা যায়, আর পড়া যায় সেইসব উপন্যাসে যেগুলিকে বাস্তববীরা অবাস্তবতার অপবাদ দেগে কোণঠেসা করে রেখে দেন। এই ধূলিধূসর আবেগহীন জগতে এমন আত্মহারা প্রেমের রূপ কি মানুষের চেতনায় অন্য একটা পরিণতির আভাস দেয় না?

রূপকথার রাজপুত্রের মত জ্যোতিপ্রকাশ এবং তাঁর অভিনব জীবননির্বাণে আমরা সবাই ত খুবই মুষড়ে পড়লাম। সেদিন প্রোজেকসান দেখানো হোলো 'যোগাযোগ'র সেই শেষ-না-হওয়া ছবি, স্টুডিওর সবাই যত মুগ্ধ হয়েছে তার চেয়ে বেশী 'হায় হায়' করেছে। এমন ছবি তার সার্থক সমাপ্তিতে পৌঁছতে পারল না? অন্য কোনো হিরোকে দিয়ে নতুন করে ছবিটি আরম্ভ করার কথা ভাবাও যাচ্ছে না, অথচ না করেই বা উপায় কি? কাজ ত বন্ধ রাখা যায় না?

অগত্যা জহর গাঙ্গুলীকে দিয়ে আবার নতুন করেই ছবিটি শুরু করা হোলো। জহরবাবু শক্তিমান অভিনেতা। পার্ট উনি ভালই করছিলেন। তবু সবার মনটা খুঁত খুঁত করত। এমন অশুভ সূচনা যে ছবির তার পরিণাম হয়ত দুর্ভাগ্যবাহীই হবে এইরকম একটা আশংকায় সবাই যেন ত্রস্ত হয়ে থাকতাম।

কিন্তু সকলের সব আশংকাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে শুধু 'হিট' নয় 'সুপারহিট' ছবির তালিকায় স্থান পেয়েছিল এম-পি প্রোডাকসনের 'যোগাযোগ'। শুধু অভিনয় নয়, গানও এ-ছবির একটা বড় আকর্ষণ ছিল। এ-ছবিতেই রবীন মজুমদারের সঙ্গে কাজ করেছি। তাঁর গাওয়া দু-একটি গানও যথেষ্ট সমাদৃত হয়। পরিচালক সুশীল মজুমদারের কৃতিত্বও অনস্বীকার্য।

এই ছবিতেই নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ঘটে। একেবারে প্রথমের দিকে ম্যাডান থিয়েটারে আমার সঙ্গে ব্যবহারে ও কথাবার্তায় তাঁর যে প্রচ্ছন্ন একটা অবহেলার ভাব মনকে পীড়া দিত, এখন যেন তা তিরোহিত। এখানে তিনি আমার প্রতি অনেক স্নেহকোমল। এই ছবিতে কাজ করবার সময়ই তাঁর সময়ানুবর্তিতা, ডিসিপ্লিন ও শিল্পবোধ-সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরিচয় ঘটল।

'যোগাযোগ'-এর গানগুলির কালজয়ী জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে একটি মজার ঘটনা

যোগাযোগ চিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে

...পথ বেঁধে দিল চিত্রে ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে

বলবার লোভ সামলাতে পারছি না। তিন-চার বছর আগে, কোন্ একটি সিনেমা হলে মনে নেই, পুরনো দিনের ছবি হিসেবে 'যোগাযোগ' দেখানো হচ্ছিল। সেই সময়ই এত বছর বাদেও দর্শকদের তুমুল উচ্ছ্বাসের উল্লেখ করে কোনো একটি ইংরাজী পত্রিকায় কোনো এক সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন

> ... and the whole house hummed with the tune of "If you don't like me don't give your heart!"

'যদি ভাল না লাগে ত দিও না মন'-এর এমন উপভোগ্য অনুবাদে এই বয়সেও কৌতুকবোধ না করে পারিনি।

তবু জ্যোতিপ্রকাশের সঙ্গে একত্রে অভিনীত ঐ একটি মাত্র ছবির শেষ অবধি পৌঁছতে পারলাম না—এ আফশোষ যাবার নয়।

ছবির লাভের অংকও রীতিমত উৎসাহব্যঞ্জক। ১৯৬৩ সালের ১৭ই এপ্রিল উত্তরা, পূরবী ও উজ্জ্বলাতে বাংলা ছবির মুক্তি ঘটল। হিন্দী ভার্সন বোম্বের কোন এক ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে বিক্রী করে প্রচুর টাকা পেয়েছিলেন মুরলীবাবু। আর সে লাভের একটা মোটা অংশ আমিও পাই।

ছবির পরিচালক সুশীল মজুমদারের কৃতিত্ব নিশ্চয় ছিল। নইলে এত দুর্ঘটনার পরও ছবি হিট করল কেমন করে? তবু একটা সিন সেটিংয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতেও বড় ক্লেশমানুবী বলে মনে হয়েছিল। হাসপাতালের একটি দৃশ্যে নই একাকী গানটি গাইতে গাইতে নায়িকা একটি সিঁড়ির দিকে [illegible]

ছবির প্রতি যথেষ্ট পরিমাণ দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও) আজকে বাংলা ছবির এই অগ্রগতির যুগে পরিণতমান [illegible] হাস্যকর হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

তখন যুদ্ধ চলছিল। সারা দেশ জুড়ে হাহাকার। সর্বদিকে একটা [illegible] তছনছ হয়ে গেল। আমার জীবনও [illegible] কারণে খুব এলোমেলো হয়ে [illegible] এই যুদ্ধোত্তর [illegible] ছবি হোলো 'বিদেশিনী'। তখন যুদ্ধের দরুণ ফিল্ম রেশন হয়ে যায়। লাইসেন্স [illegible] না করে কোনো প্রযোজকই ছবি তৈরীর কাজে হাত দিতে পারতেন না।

'বিদেশিনী' করবার [illegible] মুরলীবাবু একদিন আমাদের [illegible] পড়িয়ে শোনালেন। আমি [illegible] পরিচালকও নই। তবু চিত্রজীবনের [illegible] অভিজ্ঞতা দিয়ে এইটুকু বুঝেছিলাম [illegible] 'বিদেশিনী'র প্লটের জোর নেই। এ-গল্প সিনেমায় চলবে না। এ-কথা ওঁদের জানালাম, সঙ্গে জানালাম গল্পটি গ্রহণ করবার বিরুদ্ধে আমার তীব্র প্রতিবাদও। কিন্তু মুরলীবাবু জানালেন যে, এই গল্প সিনেমাতে করবার লাইসেন্স হাতে নিয়েই তিনি কাজ শুরু করতে চলেছেন। অতএব এ-গল্প না করলে ছবির লাইসেন্স [illegible] হয়ে যাবে।

প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'বিদেশিনী'র হিরোইনের রোল নিতে হোলো। কারণ আমি এম-পি-র সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। বাদানুবাদ দিয়ে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে চলে আসা যেত না তা নয়। কিন্তু যে আমি জীবনে কারো কাছে কোনোদিন অকৃতজ্ঞ হইনি, সেই আমি তাঁকেই বিপন্ন করে চলে যাব যিনি জীবনের অতি দুঃসময়ে আমায় প্রতিষ্ঠা ও সম্মান দিয়েছেন? অতএব তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ছাড়া কিই বা উপায় ছিল? কিন্তু মনের মধ্যে দ্বিধা ছিল এম-পি-র আগের দুটি ছবির সুনাম এতে অক্ষুন্ন থাকবে ত?

ধীরাজ ভট্টাচার্যকে নায়ক ও আমায় নায়িকার ভূমিকায় নিয়ে ছবি শুরু হোলো,

শেষ উত্তর : প্রমথেশ বড়ুয়া ও কানন দেবী

শেষ হোলো এবং ১৯৪৪ সালের ২৯শে [illegible] মুক্তও হোলো। কিন্তু মিথ্যা হোলো না আমার আশঙ্কা। ছবি দর্শকদের একেবারেই খুসী করতে পারেনি। তখনই মনে হয়েছে 'বিদেশিনী'-তে এম-পি প্রোডাকসনের যে ভাঙন শুরু হোলো তার সর্বনাশা ঢেউ বুঝি তাঁর ভেঙে সব ভাসিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

এর পরের ছবি 'পথ বেঁধে দিল'। এ-ছবিতেই প্রথম ছবি বিশ্বাসের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটল। ছবিবাবু মস্তবড় অভিনেতা এবং তার চেয়েও বড় শিল্পী এ-কথা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই জেনেছিলাম। এখন মানুষটির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধুর অন্তঃকরণটির সঙ্গেও পরিচয় ঘটল।

সহশিল্পীরূপে তাঁর [illegible] সহযোগিতা ত ভোলবার নয়ই, এছাড়া তাঁর রসিক চিত্তটিও কম আকর্ষণীয় ছিল না। যেমন মার্জিত কৌতুক তাঁর প্রতি কথায়, তেমনই নির্ভেজাল আন্তরিকতা তাঁর ব্যবহারে। দেখা হলেই খুব কাছে এসে কানের কাছে একটু ঝুঁকে স্নেহ ও রঙ্গ-ভরে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় একাধারে বড়র স্নেহ এবং সম্ভ্রমবোধের দুরত্বে সুন্দর একটা ভারসাম্য লক্ষ্য করতাম। ব্যক্তিত্বপূর্ণ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারাই শুধু নয়—এই সংযত ব্যবহারই ছিল তাঁর হৃদয় থেকে উৎসারিত আভিজাত্যের অঙ্গ। এ-আভিজাত্য নিছক পড়ে-পাওয়া নয়, এ ছিল তাঁর বিদগ্ধ অন্তরের সৃষ্টি।

শিল্পী ছবি বিশ্বাসের সম্বন্ধে শিল্প-রসিকদের কাছে নতুন করে কিছু বলার নেই। এইটুকু শুধু না বলে পারছি না, শিল্পজগতে ছবিবাবু প্রবেশ করেছিলেন বিধিদত্ত রাজদন্ড হাতে নিয়েই। তাঁর রাজকীয় ব্যক্তিত্বের সামনে সকলের মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে আসত।

এ-ছবির পরিচালক ছিলেন প্রেমেন-বাবু। প্রেমেনবাবুর পরিচালনা ভালই, তবে তার চেয়েও ভাল লাগত এবং এখনও লাগে ওঁর লেখা গল্প উপন্যাস পড়তে।

'পথ বেঁধে দিল'র বাংলা সংস্করণ ১৯৪৫ সালের ১৯শে মে-তে মুক্তি পেল। হিন্দী সংস্করণ মুক্তিপ্রাপ্ত হোলো তারই কয়েকমাস বাদে।

এ ছবির অবস্থা 'বিদেশিনী'র চেয়ে আশাপ্রদ ছিল। কিন্তু তবু এই কথাটাই যেন দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে এম-পি

যোগাযোগ চিত্রে

প্রোডাকসন রাহুগ্রস্ত। এ সময়টা মুরলীবাবুকেও খুব বিপর্যস্ত ও চিন্তিত মনে হোতো। মাঝে মাঝে যখন ওঁর ধর্মতলার অফিসে যেতাম, দেখতাম ওঁকে ঘিরে বসে আছে গণৎকারের দল।

সরল মানুষ মুরলীবাবু তাঁর সততা ও কর্মক্ষমতা সত্ত্বেও ঘোর অদৃষ্টবাদী ছিলেন। শুনেছিলাম রাশিচক্র মিলিয়েই তিনি মহরতের দিন, স্যুটিং আরম্ভ করার দিন হিরো হিরোয়িন এমন কি পরিচালক পর্যন্ত নির্বাচন করতেন।

দুটি ছবিতে লাভের চেয়ে লোকসানের অঙ্ক বেশী হওয়ার দরুনই মানুষটাও যেন বড় দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন।

এম-পি প্রোডাকসনের পরবর্তী দুটি ছবি হোলো 'তুমি আর আমি' (বাংলা ও হিন্দী) এবং 'অনির্বাণ'। হিরো যথাক্রমে মিহির ভট্টাচার্য ও জহরবাবু।

প্রথমটির পরিচালক অপূর্ব মিত্র। ইনি দেবকীবাবুর আত্মীয় এবং অ্যাসিস্টেন্ট ছিলেন, যদিও পরিচালনার কাজে তাঁর ধার কাছ দিয়েও যেতে পারেননি। আর সৌমেন মুখার্জির পরিচালনা সম্বন্ধে যত কম বলা হয় ততই ভাল।

এম-পি প্রোডাকসনের পরবর্তী ছবি গুলো যেন পূর্ব খ্যাতিকে ধাপে ধাপে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এই সময় একটা কথা আমার মনে হোতো, মুরলীবাবুর বাণিজ্যলোকের যে দরজা এমন সাড়ম্বর সাফল্যে খোলা হোলো তা শেষ অবধি বন্ধ করে দিতে হবে না তো?

এসব ছাড়াও এম-পি প্রোডাকসনের বাইরে 'বনফুল' 'কৃষ্ণলীলা' ও 'আরেবিয়ান নাইট' ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করি।

পি. আর প্রোডাকসনের ব্যানারে প্রযোজিত 'বনফুল' ছবিতে পি. এন রায়ের সঙ্গে পার্সেন্টেজ বেসিসে কাজ করেছি। বোম্বের তরুণ অভিনেতা কৃষ্ণকান্ত এ ছবির হিরো, পরিচালক নীরেন লাহিড়ী। ছবি যেমনই হোক টাকা ভালই পেয়েছিলাম।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানাই. এন, টি-তে কাজ করবার সময়ই বোম্বে থেকে অনেক লোভনীয় টাকার অঙ্কের প্রলোভন নিয়ে প্রস্তাব এসেছিল ওখানের চিত্রজগতে কাজ করবার আমন্ত্রণবাহী হয়ে, এখন তাদের তাগাদাটা আরো জোরালো হোলো।

প্রথমের দিকে এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কোনো চিন্তাই করিনি। কারণ নিউ থিয়েটার্স ও বি. এন. সরকারই তখন সব-রকম সুবিধা অসুবিধা নিয়েই আমার কাছে স্বর্গ ও বিধাতা। আর এখন ত সে প্রশ্ন ওঠেই না। কারণ সুখে-দুঃখে, শান্তিতে ও স্বচ্ছন্দে, আনন্দ ও বেদনায় যে বাংলাদেশ জননীর স্নেহে আমায় আশ্রয় দিয়েছে, প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, দিয়েছে ভারতব্যাপী যশ আজ আমার সেই বাংলাদেশকে ছেড়ে যাব কোথায়? কেন? কিসের আকর্ষণে? ঈশ্বর যে অর্থ আমায় দিয়েছেন নিজের সম্মান ও সুনাম বজায় রেখে চলার পক্ষে তা কি আকর্ষণীয় নয়? এর চেয়ে বেশী লোভ করে বহির্মুখী চটকের ডাকে সাড়া দিলে যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এই পুজারত একাগ্রতা? চাঞ্চল্যের গড্ডালিকা প্রবাহে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। সবচেয়ে বড় কথা, এ যেন দরিদ্র মার স্নেহাঞ্চল ছায়া ত্যাগ করে কোনো উন্নাসিক ধনীর ঐশ্বর্যের অহংকারের কাছে আপনাকে বিকিয়ে দেওয়া।

তাই ওঁদের আমি জানালাম, বাংলাদেশ ছেড়ে বোম্বে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি সত্যিই প্রয়োজন হয় ওঁরাই যেন এখানে এসে ছবি করে নিয়ে যান। মিঃ বড়ুয়াকেও অনেক চেষ্টা করে বোম্বের কোনো পার্টি নিয়ে যেতে পারেনি।

অতঃপর বোম্বেরই এক প্রযোজক লক্ষ্মীদাস আনন্দ কোলকাতায় এসে দেবকীবাবুর পরিচালনায় একটি হিন্দী ছবি 'কৃষ্ণলীলা' করে নিয়ে গেলেন। এই ছবিতে আমার ছিল রাধার ভূমিকা। প্রথম জীবনে 'কৃষ্ণসুদামা'তে রুক্মিণীর ভূমিকা এবং শেষের দিকে রাধার ভূমিকা দিয়ে একটি বৃত্তকে সম্পূর্ণ করাই কি বিধাতার অভিপ্রায় ছিল?

বোম্বের এই পার্টি আমায় প্রচুর অর্থ দিয়েছিল। যতদূর জানি বাংলাদেশের চিত্রজগতে আজ অবধি কোনো শিল্পীর দক্ষিণা আমার সেই অঙ্ককে ছাপিয়ে উঠতে পারে নি। (ক্রমশঃ)

হচ্ছে মেঘ, বৃষ্টি, ফসল নৃত্য, জেলে মাঝি-মাল্লার নাচ ইত্যাদি। কৌতুক ও ব্যঙ্গাত্মক নৃত্য হচ্ছে বুড়োবুড়ি, ভাঁড়, সং-এর নৃত্য ইত্যাদি। এগুলি সবই বাংলাদেশের নৃত্য। এই ধরনের নৃত্যের বিভাগ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকনৃত্য সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

এবার শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। নাগরিক সংস্কৃতি থেকে শাস্ত্রীয় নৃত্যের উদ্ভব। সুতরাং শাস্ত্রীয় নৃত্য সভ্য সমাজের দান। শাস্ত্রীয় নৃত্যের মাধ্যমে জীবনের উন্নততর ভাবাদর্শের প্রতিফলন দেখা যায়। অধিকাংশ শাস্ত্রীয় নৃত্যে দেখা গিয়েছে যে, আধ্যাত্মিকতা বা জীবনদর্শনকে নৃত্যের মাধ্যমে ব্যক্ত করার প্রচেষ্টা আছে। শাস্ত্রীয় নৃত্যে দেবতা প্রিয় এবং প্রিয় দেবতা হয়ে ওঠেন। সেইজন্য এতে প্রয়োজন হয় উন্নততর আঙ্গিকাভিনয়, বাচিকাভিনয় সাত্ত্বিকাভিনয় ও আহার্যাভিনয়ের। দেবতাদের ক্রিয়াকলাপ ও পরিচয়ের জন্য প্রয়োজন হয় নানা প্রকার হস্তভেদ, করণ, মণ্ডল, অঙ্গহারাদির এবং এইগুলির ব্যাকরণসম্মত প্রয়োগ। শাস্ত্রীয় নৃত্যে রঙ্গপূজা অবশ্য করণীয়। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক-যুগে রঙ্গপূজার ক্রিয়াকাণ্ডগুলি অনাবশ্যক জ্ঞানে পরিত্যক্ত হয়েছে। এখন শুধু অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে প্রণাম জানিয়ে নৃত্যারম্ভ হয়।

শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এতে শৈল্পিক মূল্যকে ('এশথেটিক ভ্যালু') বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। নৃত্যকে শিল্পবস্তু হিসেবে গ্রহণ করে তার দ্বারা শিল্পানন্দ সৃষ্টি করা শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পতত্ত্বে শিল্পের দ্বারা রসসৃষ্টি না হলে সে শিল্প-বস্তু গ্রহণীয় নয়। শিল্পবস্তুর দ্বারা রস-সৃষ্টি হলে তা রসিক মনে অলৌকিক আনন্দ দান করে। এই আনন্দকে পাশ্চাত্য শিল্প-সমালোচকরা 'এশথেটিক প্লেজার' বলেছেন। শাস্ত্রীয় নৃত্যে শুধুমাত্র মনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকে প্রকাশ করা হয় না, অথবা তাকে সামাজিক, দৈহিক প্রয়োজনের তাগিদে অথবা কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্বপ্রচারের বাহন হিসেবে ব্যবহার করা হয় না, বরং শিল্পসৃষ্টির প্রেরণায় তাকে শিল্পবস্তুতে পরিণত করে অন্যের মনে আনন্দ সঞ্চার করাই তার প্রধান উদ্দেশ্য। এই শিল্পানন্দ সাধারণ আনন্দ থেকে পৃথক। সামাজিক চিত্ত বা সহৃদয়হৃদয় সংবাদী মনই এই আনন্দকে অনুভব করতে পারেন। সুতরাং শাস্ত্রীয় নৃত্যে রসসৃষ্টির জন্যে যেমন নৃত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত নৃত্যশিল্পীর প্রয়োজন হয়, তেমনি বিদগ্ধদর্শকেরও প্রয়োজন হয়। কিন্তু লোকনৃত্যে এ সবের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। এখানে শিল্পসৃষ্টি অপেক্ষা মানব-সমাজের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সমবেতভাবে কোন কাজ করতে গেলেই প্রয়োজন হয় সম্মিলন। সঙ্ঘবদ্ধ ঐক্য ছাড়া কোন কাজ সমবেতভাবে করা যায় না। এই ঐক্যের জন্য প্রয়োজন হয় ছন্দের। এই একটানা ছন্দের তালে তালে দৈহিক পরি-শ্রমসাধ্য কাজগুলি সকলে একসঙ্গে করা যায়।

সিংহলের মুখোস নৃত্যে রাজা ও রানীর ভূমিকায় দুজন নৃত্যশিল্পী।

এই মনোবৃত্তি থেকেই শুরু হয়েছে মাঝি-মাল্লার গান, মাটি কাটার গান, হাতে তালি দিয়ে গান। যুদ্ধের কলাকৌশলও একটি নিবন্ধ ছন্দে গ্রথিত করা হয়। এর জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে তরবারী, ছোরা, লাঠি নৃত্য ইত্যাদি। পৃথিবীর সব লোকনৃত্যেই এর প্রকাশ। স্বাস্থ্যরক্ষার্থেও নৃত্যের প্রয়োজন হয়েছিল। ব্যায়ামগুলিকে সুষ্ঠু ও মনোজ্ঞ করে তোলার জন্যে ছন্দ ও সুরের প্রয়োজন হয়েছিল। সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড-গুলিকে আকর্ষণীয় ও আনন্দমুখর করার জন্য নৃত্যের যোজনা করা হয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, লোকনৃত্য অনেকটা প্রয়োজনের তাগিদেই সৃষ্টি হয়েছিল। সেখানে শাস্ত্রের কোন নিয়ম মানার বালাই নেই অথবা নৃত্যের জন্যে কোন শাস্ত্রও সৃষ্টি করতে হয়নি। বরং লোকনৃত্য লোক-পরম্পরায় চিরকাল চলে আসছে।

কিন্তু শাস্ত্রীয় নৃত্য অভিনয় করার জন্যে শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল। শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিল্পসৃষ্টির দ্বারা রস-সঞ্চার করা। এই রসসৃষ্টি করতে গেলে শাস্ত্রের জ্ঞানও থাকা চাই। ব্যাকরণের জ্ঞান অর্জন করতে গেলে শাস্ত্রের নিয়ম ও অনু-শাসনগুলিকে যথারীতি অনুসরণ করতে হবে। এইখানেই শাস্ত্রীয় নৃত্যের সঙ্গে লোকনৃত্যের মূলগত পার্থক্য।

শাস্ত্রীয় নৃত্যে চারটি অভিনয়ের মধ্যে তিনটি অভিনয়ের পূর্ণ প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু কোন কোন লোকনৃত্যে তিনটি অভিনয়ের প্রয়োগ থাকলেও তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। এখানে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রথমে আঙ্গিকাভিনয়ের কথাই ধরা যাক। নাট্য-শাস্ত্রে বর্ণিত নৃত্যের প্রতিটি অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, উপাঙ্গের বিভিন্ন ক্রিয়ার বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। তার জন্যে প্রতিটি আঙ্গিকক্রিয়াকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে; যেমন—করণ, মণ্ডল, অঙ্গহার, চারী স্থানক উৎপ্লাবন ভ্রমরী চালক রেচক হস্তভেদ পাদভেদ ভ্রূভেদ চক্ষুভেদ মুখা-ভিনয় ইত্যাদি। এ সকল বিষয়গুলি আয়ত্ত করা কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। শাস্ত্রীয় নৃত্যে এগুলির প্রয়োগের নিয়মা-বলীও লিপিবদ্ধ আছে।

লোকনৃত্যে আঙ্গিকাভিনয়ের শাস্ত্রীয়-নিয়মানুগ কোন প্রয়োগ নেই। লোকনৃত্যের আঙ্গিকক্রিয়া সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। অঙ্গহারের প্রাচুর্য বা বৈশিষ্ট্য থাকে না। একই আঙ্গিকক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই এ-কথা প্রযোজ্য নয়। বিশেষ করে সমরনৃত্যের আঙ্গিকক্রিয়াগুলি আয়ত্ত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। রাইবেঁশে, তরবারী, ঢালী নৃত্যগুলিতে ব্যায়ামের কৌশল অবলম্বন করা হয়। এইসব আঙ্গিকক্রিয়াগুলি যে সকল সময় সৌন্দর্য-মণ্ডিত হয়ে রসসৃষ্টির সহায়ক হয় সেকথা বলা যায় না, তবে কঠিন ও সময়সাপেক্ষ।

আহার্যাভিনয়ের প্রয়োগ লোকনৃত্য এবং শাস্ত্রীয় নৃত্য উভয় ক্ষেত্রেই আছে। কিন্তু তার মধ্যেও একটি পার্থক্য অনুভূত হয়। আহার্যাভিনয়ের মধ্যে রূপসজ্জা, রঙ্গমঞ্চ, বাদ্যযন্ত্রাদির স্থাপন ইত্যাদিকে গণ্য করা হয়। রূপসজ্জার প্রধান উদ্দেশ্য নিজেকে সজ্জিত করে অপরের কাছে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করা। অন্যান্য শিল্পে এর প্রয়োগ নেই, কিন্তু নাটক বা নৃত্যে এর বিশেষ প্রয়োজন আছে। নাটকের চরিত্রগুলিকে বা নৃত্যনাট্যের চরিত্রগুলিকে পরিস্ফুট করে তোলার জন্যে সেই ধরনের চরিত্রানুযায়ী রূপসজ্জা করা হয়ে থাকে। লোকনৃত্যে আখ্যানমূলক নৃত্যাভিনয়ের চরিত্রগুলির কোন কোনটিতে মুখোশ ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য পুরুষচরিত্রগুলিতে দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে বৈচিত্র্য আনা হয়। স্ত্রীভূমিকায় পুরুষেরা অভিনয় করলে পরচুলা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। মেয়েরা অভিনয় করলে ফুল অথবা গহনা প্রভৃতির প্রাচুর্য থাকে। সাধারণত দেখা যায় যে, শিল্পীরা আঞ্চলিক পোষাকপরিচ্ছদ পরেন। লোকনৃত্যের জন্য কোন বিশেষ পোষাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজন হয় না। উপজাতীয় নৃত্যগুলির মধ্যে রূপসজ্জার বৈশিষ্ট্য থাকে। অনেক সময় প্রকৃতির স্বভাবজাত উপাদান থেকে রূপসজ্জার উপকরণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে; যেমন পশুর চামড়া, শিঙের মুকুট, কড়ি, শাঁখ বা নানারকম পুঁতির মালা, মুখে বিচিত্র ধরনের রঙের প্রলেপ ইত্যাদি। এর ফলে সাজপোষাকগুলি বৈচিত্র্যময় ও বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে।

লোকনৃত্যে মঞ্চের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। উন্মুক্ত প্রান্তরে বা গৃহাঙ্গনে অথবা গ্রামের আখড়া প্রভৃতিতে এইসব নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। লোকনৃত্যের অধিকাংশ সমবেত নৃত্য। তার জন্যে প্রয়োজন হয় বিস্তৃত স্থানের। তাছাড়া ধর্মীয় বা সামাজিক ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলি গ্রামের বা বাসগৃহের অঙ্গনেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অপর পক্ষে শাস্ত্রীয় নৃত্যে রঙ্গমঞ্চের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ আচার্য ভরত রঙ্গমঞ্চের নির্মাণকৌশলের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। ভূমি সংগ্রহ ও জরিপ করা থেকে শুরু করে প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ পর্যন্ত কি ধরনের হওয়া উচিত এবং এর জন্য কি করণীয় তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। নাটক আরম্ভ হওয়ার পূর্বে রঙ্গপূজার নিয়ম ও অনুশাসন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। অবশ্য আধুনিককালে এগুলি বিশেষভাবে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। রঙ্গপূজার প্রয়োগ নেই বললেই চলে।

শাস্ত্রীয় নৃত্যে অথবা নাট্যশাস্ত্রে উক্ত নাট্যাভিনয় বা নৃত্যাভিনয়ে 'কুতপবিন্যাস' আহার্যাভিনয়েরই একটি অপরিহার্য অঙ্গ। 'কুতপবিন্যাসের' অর্থ হচ্ছে বাদ্যযন্ত্রাদির যথাযোগ্য স্থানে বিন্যাস। অভিনয় আরম্ভ হবার আগে যন্ত্রগুলিতে সুর মিলিয়ে সেগুলি বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ ভাবে স্থাপন করতে হবে। অভিনয়ের বিশেষ বিশেষ স্থানে মিশ্রিত বাদ্যযন্ত্রগুলির বাদনপদ্ধতিও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। যন্ত্রীরা কিভাবে ও কেমন করে উপবেশন এবং কোন সময় কোন সুর, তাল ও ছন্দে বাজাবেন তার নির্দেশ দেওয়া আছে। লোকনৃত্যেও অবশ্য বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজান হয়ে থাকে। তবে তার জন্য কোন নিয়মকানুন প্রণয়ন করা হয় নি। লোকনৃত্যে যন্ত্রীরা সুবিধামত ও ইচ্ছামত উপবেশন করেন। কখনও কখনও তাঁরা দাঁড়িয়েও বাজান। লোকনৃত্যে সাধারণতঃ ঢাক ঢোল বাঁশী করতাল ঢপ্ মাদল ইত্যাদি বাজান হয়ে থাকে। শাস্ত্রীয় নৃত্যে মৃদঙ্গ বেণু বীণা পাখোয়াজ মন্দিরা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে আধুনিক যুগে যে প্রধান চারটি শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রচলন আছে, তাতে এই জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগ বেশী দেখা যায় না। কথক নৃত্যে তবলা ও সারেঙ্গী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মণিপুরী নৃত্যে খোল ও মন্দিরা প্রধান বাদ্যযন্ত্র। এ ছাড়া লাই-হারাওবাতে মণিপুরী ঢোলও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভরতনাট্যম্ নৃত্যে মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজ এবং মন্দিরা ব্যবহৃত হয়। কথাকলি নৃত্যে বাংলার ঢাকজাতীয় বাদ্য চেন্ডা ব্যবহৃত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শাস্ত্রে কতকগুলি বিশেষ বাদ্যযন্ত্রের নামোল্লেখ থাকলেও বাস্তবে তা ব্যবহৃত হয় না।

উভয় নৃত্যেই বাচিকাভিনয়ের প্রয়োগ আছে। লোকনৃত্য লোকসঙ্গীত এবং লোকসাহিত্যকে অবলম্বন করেছে। লোকসাহিত্য কোন ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি নয়, সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি। লোকসাহিত্যের উদ্ভব কবে এবং কোথায় এবং কে তা যেমন সঠিকভাবে নির্দেশ করা যায় না, তেমনি লোকনৃত্যের উদ্ভব কবে এবং তার সৃষ্টি-কর্তা কে তা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। মুখে মুখে লোকসাহিত্যের প্রচার এবং সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে লোকসাহিত্যও নিজেকে যুগোপযোগী করে নেয়। তবে এর অন্তর্নিহিত ভাবধারাটি অক্ষুন্ন থাকে। অর্থাৎ এর বহিরঙ্গ পরিবর্তনশীল হলেও এর অন্তরঙ্গের পরিবর্তন হয় না। এই লোকসাহিত্যকে অবলম্বন করে লোকনৃত্যের বিকাশ। সুতরাং লোকনৃত্য যে পরিবর্তনশীল নয়, একথা বলা যায় না। অনেক সময় দেখা যায় যে কোন কোন জায়গার লোকনৃত্য ক্ল্যাসিক্যালধর্মী। তার প্রধান কারণ যে, এতে অনেক সময় শাস্ত্রীয় নৃত্যের কিছু কিছু নিয়মাবলী অনুসৃত হতে দেখা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে ময়ূরভঞ্জ অথবা সেরাইকেলার ছৌ নৃত্য, দাক্ষিণাত্যের থেরুকুথু, যক্ষগান ইত্যাদি নৃত্যনাট্যগুলির। লোকসাহিত্য পল্লীসমাজের সাহিত্য। এতে পল্লীজীবনেরই প্রতিচ্ছায়া পড়ে। লোকনৃত্য এই সাহিত্যকেই অবলম্বন করেছে।

শাস্ত্রীয় নৃত্য অবলম্বন করেছে উচ্চতর সাহিত্যকে। উচ্চতর সাহিত্যের প্রকাশ বিস্তৃততর এবং লেখকও আত্মসচেতন হয়ে এই সাহিত্য সৃষ্টি করেন। সাহিত্যিক সাহিত্যশিল্পের সার্থকতা লাভ করার আদর্শ নিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি করেন। তখন সাহিত্য আর লোকসাহিত্য থাকে না। উচ্চতর সাহিত্যে পরিণত হয়। এইজন্য লোকসাহিত্য ও উচ্চতর সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য ঘটে। শাস্ত্রীয় নৃত্য এই উচ্চতর সাহিত্যকেই অবলম্বন করেছে। সেইজন্য শাস্ত্রীয় নৃত্য কোন কোন সময় লিরিকধর্মী, আবার কোন সময় রোমান্টিক অথবা এপিকধর্মী হয়ে উঠেছে। আধুনিক যুগে ভারতের চারপ্রান্তের চারটি শাস্ত্রীয় নৃত্যকে এই শ্রেণীতে গণ্য করা যায়। কথক, মণিপুরী, ভরতনাট্যম নৃত্যে রোমান্টিক ও লিরিকধর্মীর আমেজ পাওয়া যায়। কথাকলি নৃত্যকে সম্পূর্ণভাবে এপিকধর্মী বলা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, লোকনৃত্য ও শাস্ত্রীয় নৃত্যে বাচিকাভিনয়ের সমানভাবে প্রয়োগ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু তাদের রূপ ও প্রকাশভঙ্গী পৃথক।

নৃত্যে সাত্ত্বিকাভিনয়ের প্রয়োগ নেই বললেই চলে। সাত্ত্বিকাভিনয়কে মানবিক বিকার বলা যেতে পারে। অলঙ্কারশাস্ত্রকাররা এ বিষয়ে বহু তর্কবিতর্ক করেছেন, তা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। নাটকে হয়তো এর প্রয়োগ সম্ভবপর; কিন্তু নৃত্যে এর প্রয়োগ খুবই সীমিত। নৃত্যে নাটকের মত বাক্যের প্রয়োগ নেই অথবা উত্তর-প্রত্যুত্তরও নেই। তার ফলে বাক্যের স্থান অধিকার করেছে নানারকম অলংকৃত মুদ্রা। যখনই কোন মানসিক অনুভূতিকে প্রকাশ করা হয়, তার সঙ্গে মুদ্রার ব্যবহারও করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ মানসিক অনুভূতিকে মুদ্রার সাহায্যে অলঙ্কৃত করে প্রকাশ করা হয়।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা বোঝা গেল যে, লোকনৃত্য ও শাস্ত্রীয় নৃত্যে তিনটি অভিনয়েরই প্রয়োগ আছে। তবে তার প্রকাশভঙ্গী কোন কোন ক্ষেত্রে বিপরীতধর্মী। তার ফলে দুটি নৃত্যশ্রেণীর মধ্যে আন্তর ব্যবধান ঘটেছে। এই দুটি শ্রেণীর নৃত্যই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে সুপ্রকাশ। এই বৈশিষ্ট্যগুলি দুটি শ্রেণীকে পৃথক করে একটি বিশেষ মর্যাদা দান করেছে।

দুঃখে সুখে বাঁচা

নিখিলচন্দ্র সরকার

(পাঁচ)

[illegible] নেমে অনীশ বুঝতে পারল [illegible]দিনের চেয়ে বেশি ঠান্ডা। [illegible] দিয়ে কানটা ভাল করে ঢেকে [illegible] চাদরটা মাথা পর্যন্ত টেনে নিয়ে [illegible] ধরাল। পায়ের ভেতর দিয়ে [illegible] যেন হু-হু করে উঠে আসছে। [illegible] পরেছে সে। পায়ে চটি, সেজন্যেই [illegible] আরো বেশি লাগছে। এরই মধ্যে [illegible] গেছে সব। রাস্তা-ঘাট শীতে [illegible]সড়ো। মাটি ভেজা গাছের পাতা [illegible] ফোঁটা হিম ঝরছে। রাস্তায় [illegible] আলো ছিল না। জ্যোৎস্না ফুটেছে। [illegible] কিছু ছেলেমেয়ে এই ঘন কুয়াশার [illegible] ধীরে গল্প করতে করতে হেঁটে [illegible]। ওদের ভেতর কেউ কেউ আবার [illegible] চাদর দিয়েই জড়িয়ে সাড়িয়ে পাশা-[illegible] হাঁটছিল। আশপাশের বাড়ি থেকে [illegible] নেশা নেশা গন্ধ আসছে। কুয়াসার [illegible] জ্যোৎস্না পড়ায় আরো ফুটফুটে ধব-[illegible] দেখাচ্ছে সব কিছু, কিন্তু কেমন ঝিম [illegible] একটু আচ্ছন্ন ভাব। দূরের মাঠ [illegible] শাল-মহুয়ার বন জ্যোৎস্নায় ভেসে [illegible]। বিশাল প্রান্তরে, ফাঁকায় শীতের [illegible] ছুটে বেড়াচ্ছে। এই ঝিম-ঝিম [illegible] আলোয় কুয়াসাভেজা গাছপালা, মাঠ, [illegible]তে দেখতে অনীশের মনের মধ্যেও [illegible]কিরকম হলো। নিজের খেয়ালেই অনেকটা সে হাঁটল। কোন কষ্ট হচ্ছিল না। [illegible] আগে কলেজে পড়ার সময় কিছুদিন [illegible] লেখার চর্চা করেছিল সে। ছাপাও [illegible] কয়েকটা। ওই সময়কার নামকরা [illegible] ওস্তাদের কাছে সে গানও শিখেছিল [illegible]। কবিতা লেখার অভ্যেসটা একসময় [illegible] গেল তার। গানের গলা ভাল [illegible]। ওস্তাদী গান ছেড়ে পরে [illegible]-সংগীত ও অতুলপ্রসাদের গানও [illegible] সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেগে [illegible] পারল না। মাঝে মাঝে মাথায় কী [illegible]। আজ এতদিন পরে তার বুকের [illegible]টা যেন গুর-গুর করে উঠল আবার, [illegible] একটু বোদলাও। [illegible] অনীশ। তারপর একসময় মনে হলো, অতসী আজ সন্ধ্যের ওদের ওখানে একবার যেতে বলেছে। ওর মামা নাকি ডেকেছেন ওকে।

এখানে আসার পর আরো অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তার। কিন্তু এদের সঙ্গে যে অন্তরঙ্গতা, ঘনিষ্ঠতা, এমন আর কারো সঙ্গে হয়নি। একসঙ্গে কোথাও বেরোলে মনে হবে, এরা যেন একই পরিবারের। অনীশ দেখেছে প্রত্যেকর সঙ্গেই প্রত্যেকের এখানে জানাশোনা, অল্প সময়ের মধ্যেই পরস্পরে পরিচয় করে নেয়। অবশ্য এর কারণ, আছে। ক'দিনের জন্যে সবাই বেড়াতে আসে এখানে, অপরিচিত জায়গা যেখানেই যাওয়া যায় সেখানেই তাদের পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-সালাপ। সুতরাং পরিচয়টা খুব তাড়াতাড়িই হয়। এখানে আসার পর অনেকের সঙ্গেই তো আলাপ হলো, কেউ আশ্রম রোডে, কেউ ধানোয়ার রোডে এসে উঠেছে; এরই মধ্যে আবার কতজন চলেও গেছে। অতসীদের সঙ্গে ওদের এতটা ঘনিষ্ঠতার কারণ বোধ হয় এই, এরা আরো ক' মাস এখানে থাকবে, অনীশরাও এত তাড়াতাড়ি ফিরতে চায় না কলকাতায়। ওখানকার আলো-বাতাসহীন অন্ধ ঘরে থাকতে থাকতে ওদের সবারই স্বাস্থ্য মন ভেঙে পড়েছে। খানিকটা সেরে উঠলেই তখন যাওয়ার কথা। তাছাড়া অতসীর মামা সুরেশবাবু লোকটি বড় মজার মানুষ, বেশ ফুর্তিবাজ।

এখানে আসার অল্প ক'দিনের মধ্যেই পরিচয়টা গভীর ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল ওদের। বাড়ি থেকে বেরোলেই সব সময় দেখা হচ্ছে, প্রথমে হেসে মাথা নাড়া, 'কি কোথায় চললেন, বাজার হলো, আজ কোন পর্যন্ত বেড়াতে গিয়েছিলেন, কেমন লাগছে?' ইত্যাদি সব প্রশ্ন। কুশলাদি জানা। তারপর কথা বলতে বলতে সুরেশবাবু ওকে একদিন ধরে বাড়ি নিয়ে গেলেন। চা মিষ্টি খাওয়ালেন, নানা প্রসঙ্গে গল্প-গুজব করলেন। সানুদের সঙ্গেও অতসীর মেলামেশা বেড়ে গেছে বিশেষ করে মনুর সঙ্গে ভাবটা যেন একটু বেশি। এমনি করেই দু পরিবারের মধ্যে একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠছে। প্রথম প্রথম যে আড়ষ্টতা ছিল, এখন আর তা নেই। সুরেশবাবুরাও এসেছেন ওদের এখানে। ভাল একটা কিছু রান্নাটান্না হলে দু'বাড়িতে দেওয়া নেওয়া চলে।

প্রথম আলাপেই তিনি বলেছিলেন, 'বয়েসে ভাই আমার চেয়ে অনেক ছোট তুমি, সুতরাং ওসব আপনি-টাপনি কিন্তু বাদ ভাই।'

'আমারও শুনতে খুব খারাপ লাগে। আপনি বরং আমাকে তুমি এবং নাম ধরেই ডাকবেন।' অনীশ হেসে ফেলেছিল।

একটু চুপ করে থেকে আবার তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের সঙ্গে তোমাদের তফাৎটা এসব নামগুলো থেকেই বোঝা যায়। আমাদের সময়ের নামগুলো যেন খুবই সাদাসিধে, আটপৌরে।'

'তা ঠিকই, এ-যুগে ছেলের নাম কেউ আর হরিচরণ রাখবে না, রাখলেও সেটা অচল।'

'তোমার নামটা কিন্তু আমি ভাই প্রথম শুনেছি, অনীশ, এর মানেটা কি?'

'মানে নাস্তিক।' অনীশ হাসতে হাসতে ফের বলেছিল, 'নাম দিয়ে কিন্তু আমায় বিচার করবেন না; শব্দটার অর্থের সঙ্গে কোন মিল নেই আমার।'

'আমি কিছুই বিচার করছি না ভাই, বরং নামের সঙ্গে যে অর্থটা সচরাচর জড়িয়ে থাকে, সংসারে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ওটা থাকা না থাকা সমান কথা, মানুষটার কাছে অর্থটা যেন নেহাতই বাড়াবাড়ি মাত্র, কোনই প্রয়োজন নেই।' একটু থেকে কি ভেবে ওকে দেখতে দেখতে বলেছিলেন, 'তোমার নামটা শুনে আমি অবাকই হয়েছিলাম একটু, মানেটা বুঝিনি বলেই তোমায় জিজ্ঞেস করলাম।'

'প্রথম প্রথম আমিও বুঝিনি, পরে অর্থটা জেনে নিয়েছি, কিন্তু আমার হাসি পেয়েছে। শুনেছি, নামকরণটা আমার মামার, তিনি অবশ্য ঘোর নাস্তিক ছিলেন।'

'তোমার মামা হয়ত তোমায় ওরকমই কিছু একটা দেখতে চেয়েছিলেন। এটা তো ঠিকই, নাম দেওয়ার সময় আমাদের ইচ্ছে একটা থাকেই, কিন্তু ওপর্যন্তই।'

'আসলে শব্দটার সঙ্গেই আমাদের মাখামাখি, অর্থটা ফাউও বলতে পারেন।'

'তাছাড়া কি ; আমাকেই দেখ না কেন, সুরের সঙ্গে কিছুই অক্ষর-পরিচয় নেই, অথচ আমি তার দেবতা, কি-না সুরেশ, কোন মানে হয় এর।'

'সুর মানে তো দেবতাও।'

'আমি ভাই মানুষ হয়েই বাঁচতে চাই, কোন দেবতা-টেবতা নয়।' হো-হো করে হেসে ফেলেছিলেন তিনি।

ভাবতে ভাবতে অনীশ বারান্দায় এসে দাঁড়াল। অতসী ঘরেই ছিল। তাড়াতাড়ি উঠে এসে বলল, 'আসুন এত দেরি হলো যে!' চোখে-মুখে নরম একটু হাসি লেগে আছে, চোখে চোখে একবার চেয়েই দৃষ্টি নত করেছে অতসী।

'দেরি আর কি, সময় তো এখানে অঢেল, নাকে মুখে গুঁজেই তার বাদুড়-ঝোলা হয়ে ছুটতে হয় না।'

'ওরে বাবা, আপাতত ওসব থেকে বেঁচে গেছি।'

'যাই বলো, সময়টা তবু কেটে গেছে, এখানে তো সময়ই ফুরোতে চায় না।'

'অত ঘরে বসে থাকলে আর ফুরোবে কি করে, আমাদের মতন ভোর ভোর উঠুন, বেড়ান, ঘোরাঘুরি করুন, দেখবেন সময় কাটাবার জন্যে অত মাথা ঘামাতে হবে না।'

অতসী খিল করে হেসে উঠল। একটু চুপ করে থেকে মুখ তুলতে তুলতে আবার বলে, 'কোথায় একটু তাড়াতাড়ি আসবেন তা নয়, এলেন সেই দেরি করে। আমি তো ভাবলাম আজ আর এলেনই না।'

'একবার তাই ভেবেছিলাম।'

'তাহলে আমাকেই আবার যেতে হতো আপনাদের ওখানে।'

'তাই নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' আস্তে করে মাথা কাত করল।

'অত জরুরী, কি ব্যাপার?' অনীশ মৃদু মৃদু হাসছে, বলল, 'তোমার মামাকে দেখছি না! আবার মানুর গলাও যেন শোনা যাচ্ছে?' অতসীর চোখে চোখে সে চেয়ে রইল।

'হ্যাঁ, মানুকে আর যেতে দেওয়া হয়নি। রাঙামামার কাছ থেকে ও মুরগীর রোস্ট শিখে নিচ্ছে।'

'আরে বাপস্, তবে তো সাংঘাতিক কাণ্ড চলছে ওদিকে।'

'তা একটু চলছে, আপনিও দেখবেন আসুন না।'

'না, আমার বারান্দাই ভাল।' একটু থেমে ফের বলল, 'জ্যোৎস্নায় বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু।'

অতসী সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল। পরে দৃষ্টি সরিয়ে আনতে আনতে বলল, 'অনেকক্ষণ একভাবে চেয়ে থাকলে কিরকম যেন একটা নেশা হয়ে যায় তাই না?'

'নেশা বলতে নেশা, দারুণ নেশা।' অনীশ একটা সিগারেট ধরিয়েছে আবার, ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আমিও খানিকটা ঘুরে এলাম এর মধ্যে।'

'আমারও না ভীষণ ইচ্ছে করছে এর মধ্যে বেড়াতে, কিন্তু ঠাণ্ডা লেগে যায় যদি ; আপনি একবার ডাকলেই পারতেন!' অতসীর গলায় আবদারের সুর।

'ডাকলে তুমি যেতে?' অনীশ ওর চোখে চোখে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ।

'কেন যাবো না, এই কাছেই তো।' অতসী মুখ টিপে টিপে হাসছে।

'তা হলেই বা, শেষে একটা সাংঘাতিক অসুখ করলে তোমার মা, মামা আমাকে আর অত খাতির করত না।'

'মোটেই নয়, কিছু বললে আমাকেই বলতো। আমাকে ওরা ভাল করেই জানে।'

'বেশ, আমার জানা রইল।'

অনীশ কথা বলতে বলতে একটা চেয়ারে এসে বসল। অতসীও অন্য একটা চেয়ার টেনে নিল। বারান্দার বাতি নেবানো, জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। অতসী শাল দিয়ে গলা মাথা ঢেকে নিয়েছে ভাল করে। অনীশ সিগারেটে আরো কটা টান মেরে টুকরোটা ফেলে দিল একসময়। অতসীর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'এখানে কি রকম লাগছে তোমার?'

'খুব ভাল। এখানে একটা চাকরি-টাকরি পেলে থেকেই যেতাম।'

'কলকাতার ওপর এত রাগের কারণ?' অনীশ অল্প অল্প হাসছিল।

অতসী চোখের মিষ্টি এক ভঙ্গি করল, বলল, 'সব কারণ জানতে নেই।' এরপর অনীশের মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে আনল ও অন্যদিকে চেয়ে শুধলো, 'আপনার ভাল লাগছে না?'

'হুঁ, তবে তোমার মতন পার্মানেন্টলি থেকে যাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই।'

'ইচ্ছে থাকলেই বা থাকতে পারছি কই!'

'ধরো, থাকবার সুযোগই এসে গেল তখন?'

'বলছি তো থেকে যাবো।' অতসীর মুখ থেকে হাসিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। একটু গম্ভীর ও আহত দেখাচ্ছিল ওকে, সামান্য পরে আস্তে আস্তে মুখ তুলল, অনীশের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাতে তাকাতে বলল, 'এক রাঙামামা ছাড়া এই সংসারে কেউ আমাদের আর ভালবাসে না। আমার তো বাবা নেই।' অতসী মুখ নীচু করল, শেষের শব্দ কটা বলতে গিয়ে গলাটা কেমন ধরে এলো। চোখের কোল দুটো সহসা জলে ভরে উঠেছে যেন, ভেতরে ভেতরে গভীর এক আবেগ রোধ করছিল অতসী। একটু অনামনস্ক হয়ে নখ খুঁটছিল ও। ছেলেবেলা থেকেই কত অপমান আর দুঃখের ভেতর দিয়ে বড় হয়ে উঠেছে। সব যেন এক মুহূর্তে মনে পড়ে যায় একসঙ্গে।

অনীশও একটুক্ষণ চুপ করে থাকল একসময় আবার একটা সিগারেট ধরাল, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ধীরে সহানুভূতির গলায় বলল, 'তোমার রাঙামামা তো শুনেছি বাইরে থাকেন, কলকাতায় তা হলে তোমরা কার ওখানে থাকতে?' অনীশ [illegible] দিকে চেয়ে থাকল অল্প সময়।

'মেজমামা, ন' মামার এখানেই, কোথায় আর যাবো।' অতসী [illegible] তুলেছে, বলল, 'এ যে কিভাবে [illegible] আপনাকে বোঝাতে পারবো না [illegible] থামে অতসী, কি একটা ভেবে নি[illegible] আস্তে বলল, 'ওর মধ্যে ফি[illegible] আর একটুও ইচ্ছে নেই, আবার [illegible] গেলে আর বাঁচবোই না আমি।'

অনীশ চুপ করে থাক[illegible] পরে ও বলল, 'এসব কিছু [illegible] তাছাড়া জানার কথাও নয় আমার [illegible]'

'আস্তে আস্তে সবই শুনে[illegible] বুঝতে পারছিল, পরিবেশটা [illegible] উঠেছে। একটু হালকা করার জ[illegible] আবার বলল, 'আমি চাইলে কি [illegible] কাতা কি আমায় ছাড়বে, [illegible] তো ফিরতেই হবে, তবে ওদের [illegible] নয়।' অতসী ঠোঁট কামড়ে হাস[illegible]

অনীশ সিগারেটটা খেতে খে[illegible] উন ফ্র্যাঙ্ক, কলকাতা আমারও [illegible] ভাল লাগে না, তবু উপায় [illegible] মাঝে মাঝে এরকম বেরিয়ে পড়তে খারাপ লাগে না।'

'মাসীমা তো বলছিলেন আরে[illegible] দুয়েক থাকতে এখানে।'

'মা-ও কলকাতার ওই বাড়িতে [illegible] মুহূর্তও থাকতে চাইছে না, এখানে [illegible] তো ভালই, তবে আমার অতদিন [illegible] চলবে না, বড় জোর আর [illegible] থাকতে পারি, ছুটি পাবো না।'

'সে তো এখনও ঢের দেরি।' [illegible] হেসে উঠল, 'মানুরা একা এক[illegible] পারবে তো?'

'কেন পারবে না, তোমরা তো থ[illegible]

কি ভাবল অতসী, পরে বলল [illegible] কাতায় গিয়ে আমার জন্যে একটা [illegible] দেখবেন তো!'

'মেয়েদের তো স্কুলের চ[illegible] বেস্ট।'

'কাদের কাছে, যাদের চাকরিটা [illegible] না করলেও যাদের দিব্যি চলে যায় [illegible] আমার তো দুজন মানুষের চলার [illegible] টাকাটা চাই।'

'তুমি টাইপ জানো?'

'কিছু কিছু।'

'কথা দিচ্ছি না, চেষ্টা করবো।' [illegible] কি ভেবে এবার হাসল জোরে [illegible] প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট [illegible] নিয়ে ঠোঁটে ছুঁইয়ে রাখল খানিকক্ষণ [illegible] ঠোঁটের ফাঁকে ধরে রেখেই চিবিয়ে [illegible] বলল, 'এমন ফুটফুটে জোছনায় এ[illegible] কথাটথা ভাল লাগে!'

অতসীও হাসল, বলল, 'কি [illegible] করবো, গদ্যটাই তো আমাদের একমা[illegible] বলুন। আমি তো আপনার মত [illegible] কবিতা-টবিতা লিখি না।'

অনীশ যেন চমকে উঠেছে ও[illegible] শুনে, 'কবিতা লিখি তোমায় কে বল[illegible]

...কোবেন না, সব শুনেছি ...ই মানুষের কাজ! ওসব বিশ্বাস তোমার গলা দিয়েছে।'

...তো মনে হচ্ছে গলাটা আপনারই ...সী চোখে চোখে চেয়ে রইল ...ের চোখে মধুর এক কালিমা রয়েছে, মুচকি হেসে শুধোয় ...ও বলুন তো এসব কিছুই, ...া লেখেন না, গান জানেন ...একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

...র হাতের ওপর হাত রাখতে ...রে নিল, তারও মুখে হাসি, খুব ...র সংগে বলল 'অনেক আগে ...ের পড়ার সময় একটু আধটু চর্চা করতাম, কিন্তু টিকে ...লাম না, জীবন সোংরামি।' ...সিগারেটের ছাই ঝেড়ে পর-পর ...টান মেরে বলল 'গানটা আরো ...চালিয়েছিলাম, পরে তাও ছেড়ে ...এমন মান হলো বরং দুটোই ...নীশ হাসিমুখে নিয়ে অতসীর ...লাল।

...শুনছি না আপনাকে গান ...হবে।'

...বাস কর আগের গলা আর নেই।' ...হোক, আপনার গান আমরা গোটা...বো।'

...জুতো-ফুলো দেখি কিছু মনে ...র।'

...বার শুনুন, কালোই দেখবেন যাবে।'

...না তো নয়, পরে দেখা যাবে।' ...উঠে দাঁড়াল, কপা এগিয়ে এসে 'তোমাদের বাগানের গোলাপগুলো ...াতের, গন্ধও বেশ, সারা বাড়িটা ...মধ্যে কেমন মাতিয়ে দিয়েছে।' অনীশ ...লাতে উঠোনে নেমে পড়েছে, কাছে ...দুটো ফুল তুলে নিল। তারপর ...উঠে এসে আবার আগের জায়গায়

...না—, রাত্তিরবেলায় ফুল তুললেন। ...া, কি হয় তুললে?'

..., হয়—জানি না; শুনেছি ফুলকে ...ফুলের বাগানে নাকি তখন দেবতারা ...।'

...আমিও তো দেখলাম কজনকে।' অনীশ ...লাগল।

..., ইয়ার্কি মারছেন।' অতসীও ...হাসল।

...ই দেখ, বিশ্বাস করছো না তো, ...নিজের চোখে দেখে এলাম।'

—আপনার সংগে ওরা কথা বলেছে।

...মুখের এক মধুর ভংগী করল।

...সব দেখেই তো আমি চলে এলাম।' ...হাসছে অনীশ।

...আবার ইয়ার্কি?' অতসী চোখ টান...রে তাকাল ওর মুখের দিকে।

...ঠিক আছে ইয়ার্কি।' অনীশ বাগানের ...চাইল, একটু পরে নিজের মনেই ...'আমি দেখলাম মদনা আর রতি দুজনে বেছে বেছে সব ফুল তুলছে, ফুলের ধনু, ফুলের তীর তৈরী করবে ওরা।' অনীশ এবার শব্দ করে হেসে উঠল।

অতসী এতক্ষণে যেন এর অর্থটা ধরতে পেরেছে। একবার চেয়েই ও চোখ নামিয়ে এনেছে। মুহূর্তে এক লজ্জা এসে ওকে আড়ষ্ট করে ফেলেছে। একটু পরে মুখ তুলল অতসী, তার সারা মুখে কি এক আবেশ মাখা রয়েছে যেন। ধীরে ধীরে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, 'এখানে এসে কিন্তু আর কোথাও যাওয়া হলো না, শুধু স্টেশন, বাজার, কালী ময়রার দোকান আর বাড়ি।'

'চলো একদিন নদী দেখতে যাই।'

'চলুন।'

'হাঁটতে পারবে তো, এখান থেকে দূরে আছে, অন্ততঃ পাঁচ ছ মাইল হাঁটতে হবে।'

'যতটা পারা যায় যাবো, না পারলে ফিরে আসবো।'

'ওসব হবে না, না দেখে ফেরা চলবে না।'

'আমার আপত্তি নেই।'

'ঠিক আছে, তোমার মামার সংগে পাকাপাকি কথা বলে ফেলি।'

'চলুন, আপনারা যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই যাবো।'

'ঠিক তো?' অনীশ হালকে থাকে চেয়ে চেয়ে।

'ঠিক, ঠিক।' অতসী মাথা নাড়ল মিষ্টি ভঙ্গিতে।

'কথাটা মনে থাকে যেন।' অনীশ উৎসাহবোধ করছিল, সে আবার একটা সিগারেট ধরায়।

'থাকবে।' মিষ্টি করে হাসে অতসী, শাড়ির একটা কোনা আঙুলে দিয়ে জড়াতে জড়াতে বলল, 'অত সিগারেট খেতে আপনার ভাল লাগে?'

'সব সময় যে লাগে তা নয়, অভ্যেস। না খেলে কি রকম ফাঁকা ফাঁকা লাগে যেন।'

'না, অত খাবেন না।'

'এখানে এসে ভেবেছিলাম কমাবো, কিন্তু পারছি না, কমানো তো দূরের কথা, দেখছি আরো বেড়ে গেছে খাওয়া।'

'এমন করলে কিন্তু চেহারা ভাল হবে না।'

'চেহারা যা হবার হয়েছে, সেজন্যে ভাবি না, কিন্তু কাজকর্ম না থাকলে যা হয়!'

'এটা কোন কথা নয়, ইচ্ছে করলেই কমাতে পারেন।' অতসী মুখ টিপে টিপে হাসছে।

'সত্যি পারি না, পারলে কি আর কমাই না, আমারও তো কষ্ট হয় এতে, খেতে পারি না, খিদে হয় না, মাথাও ঘোরে।' অনীশও ওর মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল।

'যাক গে, আজ কিন্তু এখান থেকে না খেয়ে যেতে পারবেন না।'

'এমন তো কোন কথা ছিল না।'

'তাতে কি হয়েছে।'

'আগে জানলে তো বাড়িতে বলে আসতাম, বাড়ির লোক মিছিমিছি এই হাঁড়ায় বসে থাকবে, তুমিই বল না, এটা কি ভাল দেখাবে!'

'ওসব কিছু শুনবো না, আজকে শুনবোই না, আবার না খেয়েই চলে যেতে চাইছেন, খান তো দেখি একবার।' শাড়িটা মাথা থেকে পড়ে যাওয়ায় আবার টেনে নিল অতসী।

'এর চেয়ে বরং তো গান শোনাতে আমি রাজী আছি।'

'শোনাতে আপত্তি নেই, কিন্তু খেয়ে যেতেই হবে।'

'তোমার মামার মতন অত আর আমি ভোজনরসিক নই, আমি খুব একটা খেতে-টেতে পারি না।'

'তা আর পারবেন কেন, অত চা সিগারেট খেলে কি আর খিদে থাকে!' অতসী চোখের এমন একটা ভঙ্গি করল যে অনীশ কিছুক্ষণ পলক ফেলতে পারল না, কেমন মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল। কথার মধ্যে ওর যে আন্তরিকতা ও আবেগ ফুটে উঠেছে তা যেন এই মুহূর্তে অনীশকে সামান্য বিহ্বল করল।

অতসীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে কি ভাবল অনীশ। পরে একটু ভারী কণ্ঠে আস্তে আস্তে বলল, 'চা সিগারেট কোন আর অভ্যাস ধরেছি, ছেলেবেলা থেকেই খাওয়া আমার বদ। একটু বেশি হলেই ভীষণ অস্বস্তি।'

'আমার কিন্তু দেখে কোন অসুবিধে খারাপ লাগে না।' একটু থেমে ফের বলল, 'আপনাকে খাওয়াবেন বলেই বড্ড আয়োজন করে মামী অনেক কিছু করেছেন, নতুন ধরনের প্রিপারেশন হবে নাকি?'

'অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল! তোমার মামাকে এবার আসতে বলো, জানেন তো আমি এসেছি?'

'বোধ হয় নয়, এলেই তো আমাকে আবার উঠতে হবে।'

'দরকার নেই, তুমিই বসো।'

'আর বসবো না, এমনিতেই এবার উঠতে হবে, ওদিকের একবার খবর নিতে হয়।'

'দরকার হলে ওরাই দেবে, তুমি বসো তো এখানে।'

'মানুটা রেগে যাবে।' অতসীর কি যেন মনে পড়ে গেল হঠাৎ, গালে একটা হাত রেখে বলল, 'এ মা—, দেখেছো, আপনাকে এখনও একবার চা দেয়া হলো না ছিঃছি।' অতসী যেন এজন্যে খুব লজ্জা বোধ করছিল, সে তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছে, অনীশ হাত ধরে জোর করে আবার বসিয়ে দিল, 'বসো।' অনীশ হাসছিল, বলল, 'এতক্ষণে বুঝি মনে পড়ল?'

'একদম খেয়াল ছিল না।' অতসী মাথা নাড়াল।

'এরকম জ্যোছনায় কিছুই মনে থাকে না।'

'বাঃ, একবার বলবেন তো!'

অনীশ হাসতে হাসতে ওর মুখের দিকে তাকাল, বলল, 'একবার আমারও মনে হয়েছিল, এই ঠান্ডায় একটু আদা চা হলে মন্দ হয় না; কিন্তু বলি কি করে, চা সিগারেটের ওপর যে বক্তৃতা দিচ্ছিলে তাতে আর সাহস হলো না।'

'আপনি না একেবারে—।' কথা শেষ না করেই এবার উঠতে যাচ্ছিল অতসী।

'উঁহু।' অনীশ বাধা দিল, হাসি হাসি চোখে এখনো অতসীকে দেখছিল ও, বলল,

'আমি কি?'

'একটা—ইয়ে।' বলে জিভ ভেংচালো অতসী।

'ইয়ে মানে?'

'যান, জানি না!' অতসী সলজ্জ ভঙ্গিতে মুখ নীচু করেছে। ঠোঁটের ডগায় মৃদু হাসি।

অনীশ কিছু সময় আর কোন কথা বলল না, অতসীও চুপ। গাছের পাতা থেকে টুপ টুপ করে হিমের ফোটা পড়ছে। ওদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। আরো অনেক কিছুই যেন মনে পড়ছিল তার। এক সময় খেয়াল হলো, সে এখানে বসে আছে বটে, কিন্তু মনটা এখানে ছিল না। বেশিক্ষণ চেয়ে থাকলে সব কেমন ভুলিয়ে দেয়, মন খারাপ হয়ে যায়। কত কথাই না মনে পড়ে। অতসীর মধ্যেও একটা পরিবর্তন এসেছে, অনীশ বুঝতে পারে মেয়েটা অনেক স্বাভাবিক অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। প্রথম দিন ওর মুখে যে বিষণ্ণ, মলিন, দুঃখী দুঃখী একটা ভাব ছিল, এখন ও তা কাটিয়ে উঠেছে: সামান্য উজ্জ্বল, অনাড়ম্বর। ওর মুখখানা বড় সুশ্রী, দুঃখের মধ্যেও হাসিটুকু ধরে রেখেছে। নরম স্বভাবের কেন জানি এক ধরনের মমতা, সহানুভূতি বোধ করেছে। সানুদের সঙ্গে এসেছিল অতসী। যদিও এই পথে আসতে যেতে অনেকবারই চোখাচোখি হয়েছে তার। প্রথম প্রথম অসুস্থ মনে হতো ওকে, এখন অনেক সেরে উঠেছে। চট করে কিছু বোঝা যায় না। অনীশ মুখ তুলল, অতসীকে দেখতে দেখতে বলল, 'কাল তাহলে নদী দেখতে যাওয়া পাকাপাকি তো?'

'বলেছি তো আমার আপত্তি নেই। রাঙামামার সঙ্গে কথা বলে দেখুন।'

'আরে নদীটা তো একটা উপলক্ষ মাত্র, আসলে একসঙ্গে মিলে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করা।'

'কিন্তু মাসীমা, মা এদ্দূরে হাঁটতে পারবে তো?'

'ওদের জন্য না হয় একটা টাংগা করবো।'

'সেই ভালো, দরকার হলে আমরাও উঠতে পারবো।' অতসী হাসল। একটু নীরব থেকে বলল, 'তারচেয়ে এক কাজ করলে হয়, নদী এখন থাক, চলুন 'দ' দেখে আসি।'

'সেটাও তো নদীই।'

'তাহলেও নদীটা এখানে দেখতে ভালো, 'দ' এর মতন হয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। একটা আশ্রমও আছে ওখানে, জায়গাটা দেখতে নাকি ভারী সুন্দর, পাথর-টাথরও আছে। তাই চলুন।' অতসী উৎসাহের গলায় বলল। ওকে খুশি খুশি দেখাচ্ছিল।

'বেশ চলো, তাও মাইল চারেক হাঁটতে হবে কিন্তু।'

'এখানে না ভাল কিছু দেখার নেই।'

'একপক্ষে ভালোই হয়েছে, ভিড়টা অনেক কম।' অনীশ গায়ের চাদরটা টেনে নিল আরো ঘন করে, শেষে বলল, 'আসলে এ জায়গাটা পুরোপুরি স্বাস্থ্য ফেরাবার জন্যে যারা কিছুদিনের জন্যে এসে থাকবে তাদের জন্যে উটকো ভিড়টা তাই কম এখানে।' অনীশ প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে নিল, অতসীর মুখের দিকে চেয়ে কি ভেবে হাসল, বলল, 'শুনেছি এখানকার চেয়ে হাজারীবাগ টাউন অনেক ডেভেলপড, দেখারও নাকি অনেক কিছু আছে।'

'টাউন কদ্দূর এখান থেকে?'

'কত আর, চল্লিশ বিয়াল্লিশ মাইল হবে।'

'একদিন ঘুরে এলে হয় কিন্তু।'

'চলো না, ভোরের বাসে উঠবো, সন্ধ্যার ফিরে আসবো।'

'আমি তো একপায়ে খাড়া, কবে যাবেন বলুন?'

অনীশ সিগারেট টানতে টানতে কথা বলছিল, বলল, 'এ জায়গাটার একটা সুবিধে এই, এটাকে সেন্টার করে আশপাশের অনেকগুলো জায়গারই ঘুরে আসা যায়। তিলাইয়া বাঁধ একটা দেখার মতন, বেশি দূরেও নয় এখান থেকে ...

নাথ পাহাড়ও খুব কাছেই, খুচখাচ অনেক আছে।'

'এত শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যা... একটা একটা করে হোক আগে।'

'হবে, সব হবে, তবে পরের যাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই আমার। একবার যেতেও পারি, নিজেরই দর... বাবার কাজটা চুকিয়ে দিলে হয়!' ... জ্বলন্ত টুকরোটা ঠোঁটে ছুঁইয়ে ... একটু অন্যমনস্ক হলো।

অতসীও সামান্যক্ষণ নীরব থেকে ... কণ্ঠে বলল, 'আমার কিছুই মনে পড়... আমার।'

'আমার বেলায় উল্টো। বাবার সময়ের কষ্টে অসহায় মুখটা আজো স্পষ্ট দেখতে পাই, চোখের কোনা জল গড়িয়ে পড়ছে, অথচ কোন কথা... পারছে না।' অনীশ ধোঁয়ার খানিকটা বাকিটা নাক মুখ দিয়ে বের করে দিল...

'আমি এবার উঠি, আপনার জ... করে আনি।' অনীশ উঠে দাঁড়াল।

'একটু আদা দিও চায়ে।' ... চেয়ারটা সামান্য সরিয়ে আনল, পা... চেয়ারে তুলে গুটিয়ে বসেছে।

'ভেতরে এসে বসুন না, এখানে ঠান্ডা।'

'ঠান্ডা তো কি, ঘরে বসে তো বাইরের এমন মোহিনী চেহারা দেখা... না! এখানেই ভাল। তুমি বরং মামাকে পাঠিয়ে দিও; কেন ডাকলেন জানা গেল না এখনও!'

'এমন জরুরী কিছু নয়। আম... বুঝি বিশ্বাস হলো না!'

'বুঝেছি, প্ল্যানটা তাহলে তো...' অনীশ মাথা ঝাঁকালো।

'না না, আমার কিছু প্ল্যানটান...' বলতে বলতে হাসি হাসি মুখ নিয়ে চলে গেল।

একটু পরে সুরেশবাবু এলেন, বসতে বসতে একটা সিগারেট ... বললেন, 'কতক্ষণ এসেছো ভাই?'

"তা প্রায় ঘন্টা দেড়েক তো হ...

"এতক্ষণ একা একা বসে এখানে?" সুরেশবাবু একটু অবা... চাইলেন ওর মুখের দিকে।

"না, অতসী ছিল।"

"আমাকে একবার খবর দিল... এখন গিয়ে আমায় বলল। দিন দিন ... বুদ্ধি হচ্ছে না!"

"খবর না দিয়ে তো ভালই... একবার গল্প আরম্ভ হলে কি আ... [illegible] হবে?"

...তা আমতা করল, "না, ঠিক ...টের পেলাম একটা কিছু; ...রে জেনে নিলাম।" অনীশ ...হাসছিল।

...এক সময় পারতাম, এখন ...ছি।"

...মনে হলো।"

...ন হবে, কে জানে।" ...জোরে সিগারেটে টান ...সময় নীরব রইলেন ...শকে দেখলেন একবার, ...লেন, "অতসী আজ কদিন ...থা বলছিল, আসলে মানু ...খাওয়াবে, ওর প্রস্তাবটা ...ভাল লাগল, আমি ...লাম। একটা নতুন ধরনের ...এলো, শেষ পর্যন্ত ...ছে?" সুরেশবাবু হাসলেন

...তো আগে দিতে হয়। ...তে বলল যেন জরুরী

..., আমিই ওকে শিখিয়ে ...রেশবাবু ওর মুখের দিকে ...সে ফেলেছেন, বললেন, ...একদম দেখা নেই, কি

...ছিল না, দেরি করে ঘুম ...আর বেরোতাম না। শীতও ...কি ভেবে অনীশ শুধলো, ...ছিলেন এর মধ্যে?"

...আর যাবো, এই ধারে কাছেই ...করেছি।" একটু চুপ করে ..."আমাদের না হয় একটা ...বয়স হয়েছে; কিন্তু ...সেই শুধু ড়িয়ে পড়লে আর ...বয়েসের সংগে সংগে সাহসও

...অভ্যেস একটা কুড়েমির ...। এখানে এসেও তা ...একটু থেমে হাসি ...অনীশ সুরেশবাবুর ...দিকে তাকাল, পরে বলল, ...জীবনটা তো আমার একঘেয়ে ...ভেঙেছে দেরি করে, পাড়ার ...এসে এক কাপ চা আর ...নিয়ে খবরের কাগজের ...ফেলা, মাসকাবারি ...হলে কোন কোনদিন ...সিনেমা, ঘুরেফিরে একই ...পর দিন ভাঙা রেকর্ডের ..., পড়িমড়ি করে ধস্তাধস্তি ...অফিস যাওয়া, আবার ক্লান্ত ...আবার সেই চায়ের ...তো রুটিন, ছকে বাঁধা ...কথাগুলো বলতে বলতে

"আমারও ভাই অতিরিক্ত ঘোরাঘুরিটা ভালো লাগে না। তবে বেড়াতেই যখন এসেছি তখন একদম কিছু দেখবো না, এটাও ঠিক নয়।" সুরেশবাবু সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিলেন, ছোট করে একটা হাই তুললেন।

"শুনেছেন তো, আগামীকাল দ... দেখতে যাচ্ছি আমরা।"

"বেশ তো, চলো।"

"খেয়ে দেয়েই বারোটা একটা নাগাদ বেরিয়ে পড়বো, যারা হাঁটিতে পারবে না, তাদের জন্যে একটা টাঙাও থাকবে।"

"কতটা যেতে হবে?"

"কত আর, ধরুন মাইল চার-পাঁচ হবে।" অনীশ মনে মনে একবার হিসেব করে নিল যেন। সুরেশবাবুর মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল সে, বলল, "অবশ্য যাওয়া আসা নিয়ে।"

"তাও একেবারে কম পথ নয়।"

অতসী চা নিয়ে এসেছে। ওর দিকে চেয়ে সুরেশবাবু শুধোলেন, "কি রে, পারবি তো হাঁটিতে?"

"হুঁ, পারবো।" অতসী সুরেশবাবুর সামনেও একটা কাপ রাখল।

"আমার কোন অসুবিধে হবে না, ওরা আবার কলকাতার লোক কিনা!" বলে মৃদু মৃদু হেসে চায়ে চুমুক দিলেন সুরেশবাবু।

"কলকাতার লোক বলে কি আমরা কিছুই পারি না নাকি?" অতসীও হাসতে হাসতে কথার জবাব দিল, সে একবার অনীশের মুখের দিকে চোরা চোখে চাইল।

"ঠিক, ঠিক কথা।"

সবাই একসঙ্গে জোরে জোরে হেসে উঠল। কি ভেবে সুরেশবাবু অনীশকে লক্ষ্য করে বললেন, "আবার ডুব মেরো না যেন, তুমি না হলে ভাই জমেই না, কি বলিস রে অতসী, ঠিক না?"

অতসী কি বলবে বুঝতে পারল না, সে চুপ করে রইল, মাথা নীচু করে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

অনীশ চায়ে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরায় আবার, সোৎসাহে বলে, "দারুণ হয়েছে চা-টা।"

অতসী সলজ্জ চোখে তাকায়, বলল, "আদা দিয়েছি তো?" চোখ ছোট ছোট করে হাসল ও।

"সে জন্যেই দারুণ।" অনীশও ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসছিল।

অতসীর পেছনে এইমাত্র মানু এসে দাঁড়িয়েছে।

"কি রে মানু, আজ যে বাড়ি ফেরার নাম নেই, ব্যাপার স্যাপার কি?" অনীশ ওর দিকে তাকিয়েই হো হো করে হেসে উঠল।

"কি করবো, অতসীদি যে ছাড়ল না।" মানু অতসীকে পেছন থেকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে।

সুরেশবাবু চা খেতে খেতে মুখ তুললেন, মুচকি হেসে বললেন, "কি মানুদি, শেখা হলো তো?"

অনীশ চেয়ে আছে এক দৃষ্টে, বলল, "ওসব মুখে বললে হবে না, আমরা হাতে কলমে পরীক্ষা চাই।"

"তাতে কি মানুদি আমার ভয় পায় নাকি, হুঁ।" সুরেশবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

"আপনি উঠছেন যে!"

"ওদিকে কদ্দুর হলো দেখে আসি একবার।" বারান্দা থেকেই সুরেশবাবু চেঁচালেন, "হলো নাকি রে চারু? কী ঠান্ডা পড়েছে আজ, ওরা আবার ফিরবে তো।" বলতে বলতে তিনি ভেতরে চলে গেলেন।

অতসী এবার তাড়া দিল, "আর বাইরে নয়, এবার ভেতরে চলুন।"

"চলো।" অনীশও উঠে দাঁড়িয়েছে।

খেতে খেতে ওদের রাত হয়ে গেল। সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছে। জ্যোৎস্নায় সব ভিজে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে কাকগুলো চীৎকার করে উঠছে, ভেবেছে বুঝি সকাল হলো। গাছপালা, মাটি বন, প্রান্তর বাড়িগুলো যেন সব বেহুঁসের মতন পড়ে আছে। চারদিক কেমন নিঝুম স্তব্ধ। চাদর দিয়ে কান মাথা আরো ঘন করে ঢেকে নিয়েছে। অতসী ওর হাতে ভাজা মসলা দিতে দিতে বলল, "খুব দেরি করে দিলাম তো।"

অনীশ হাসতে হাসতে ফিস ফিস করে বলল, "এজন্যে আমার অবশ্য কোন আফসোস নেই।" একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। এটা খেতে খেতেই এটুকু পথ চলে যাবে।

মানু খানিকটা এগিয়ে গেছে, গেট পর্যন্ত অতসীও নেমে এসেছে।

"তুমি আর এই ঠান্ডায় এসো না।" অনীশ কি ভেবে মুখটা ওর খুব কাছে নিয়ে এলো, আস্তে আস্তে বলল, "তোমার মামা আমায় সব বলেছেন।" অনীশ হাসছিল খুব।

"না না, মোটেই না! রাঙামামাই ডেকে পাঠিয়েছিল আপনাকে!" অতসী এই মুহূর্তে লজ্জায় মুখ আনত করেছে। সে সত্য সত্যই যেন আজ এই সন্ধ্যায় ধরা পড়ে গেছে। সে এক দৌড়ে চলে এলো।

অনীশ আর অপেক্ষা করল না। এই অফুরন্ত স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার ওপর দিয়ে ও আর মানু ঘরে ফেরার জন্যে নিঃশব্দে হাঁটছিল।

(ক্রমশঃ)

তুমি কি কেবলই ছবি

অতুল চক্রবর্তী

পুরাকালের কাহিনী থেকে শোনা যায় নারীর রূপের আগুনে বহু রাজ্য ছারখার হয়ে গেছে। যেমন রামায়ণের উপাখ্যানে বর্ণিত আছে, সীতার প্রতি রাবণের লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপের ফলে সোনার লঙ্কা ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। তেমনি গ্রীক মহাকাব্য থেকে আমরা জানি, রূপসী হেলেনকে অপহরণের ফলে ট্রয় নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে ইতিহাসে হয়তো এমন ঘটনা আরও আছে। কিন্তু চিত্রপটে আঁকা নারীর অপূর্ব রূপলাবণ্য দর্শনে সারা বিশ্ব মুগ্ধবিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়, এমন দৃষ্টান্ত জগতে দুর্লভ।

কিন্তু এই দুর্লভ দৃষ্টান্তের অন্যতম হচ্ছে মোনালিসার চিত্র। আর এই দৃষ্টান্ত রূপকথার কল্পিত কাহিনী নয়, আধুনিক জগতের এক বাস্তব ঐতিহাসিক সত্য। মোনালিসার ওষ্ঠাধরের দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় হাসি শতাব্দীর পর শতাব্দী শিল্পী ও দার্শনিকদের মধ্যে বিরামহীন বিতর্কের বিষয়বস্তু। ফ্রান্সের ল্যুভর মিউজিয়ামে রক্ষিত এই চিত্রপটটি দর্শন করবার জন্য প্রতি বৎসর পৃথিবীর নানা দেশ থেকে অন্যূন এক লক্ষ যাত্রীর সমাবেশ হয়। মোনালিসার রূপমুগ্ধ অগণিত অন্ধ অনুরাগীর মধ্যে দুজন বিশ্ববিশ্রুত দুর্ধর্ষ সেনাপতিও ছিলেন। একজন, মহাবীর নেপোলিয়ন এবং দ্বিতীয়জন ফিল্ড মার্শাল গোয়রিং। তাঁরা বহু সময়ে এসে মোনালিসার নির্বাক চিত্রের সামনে অপলক দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এমন কথাও শোনা যায় কোন কোন দর্শক নাকি মিউজিয়ামের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে এসে চিত্রের সামনে উপস্থিত হতো এবং পুনর্বার সূর্যাস্তের শেষে দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত স্থান ত্যাগ করতো না।

কিন্তু যাঁর রূপের প্রতিকৃতি নিয়ে বিশ্বের দরবারে এতো আলোড়ন সেই মোনালিসা কিন্তু কোন অসামান্যা নারী ছিলেন না। ১৪৭৯ খৃঃ ইতালিতে তাঁর জন্ম, ১৪৯৫ খৃঃ ফ্লোরেন্সের জিওকোন্ডো নামক এক ভদ্রলোকের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী হিসেবে তাঁর বিবাহিত জীবনের শুরু। তিনি রূপসী ছিলেন একথা নিঃসন্দেহ, কিন্তু যে শিল্পী তুলির রেখায় তাঁর রূপকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের আসন দান করেছেন তাঁর ঐকান্তিক শিল্পসাধনা ভিন্ন হয়তো মোনালিসা জগতে অজ্ঞাতপরিচয় থেকে যেতেন। এই মহান শিল্পীর নাম লিওনার্দো-দা-ভিন্সি।

লিওনার্দো ছিলেন আত্মভোলা শিল্পী-সাধক। মোনালিসার প্রতি তাঁর কোন প্রণয় অথবা পার্থিব আকর্ষণ ছিল বলে জানা যায় নি। শুধুমাত্র রং ও তুলির রেখায় রূপসী নারীর অনির্বচনীয় রূপকে ত্রিকালবিজয়ী মৃত্যুঞ্জয়ী করে রাখবার প্রচেষ্টাতেই তাঁর সকল প্রয়াস নিয়োজিত হয়েছিল। মোনালিসা অন্য পাঁচজন নারীর মতনই আপন সৌন্দর্যে গর্ববোধ করতেন এবং স্বকীয় আলেখ্য রচনায় সবিশেষ আগ্রহী ছিলেন। কথিত আছে ১৫০০ খৃঃ থেকে ১৫০৪ খৃঃ পর্যন্ত এই চার বৎসর আপন চিত্র অঙ্কনের উদ্দেশ্যে মোনালিসা লিওনার্দো-দা-ভিন্সির চিত্রশালায় নিয়মিত উপস্থিত হতেন।

চিত্রাংকনের আয়োজনও ছিল রাজকীয়। শোনা যায় লিওনার্দো গোধূলি লগ্ন ভিন্ন মোনালিসার ছবিতে হাত দিতেন না এবং মোনালিসা যেখানে উপবেশন করতেন তার পটভূমিতে থাকতো ফোয়ারা ও গোলাপ, আইরিশ আদি ফুলের চারা যা ছিল নায়িকার একান্ত প্রিয়। এছাড়া উপস্থিত থাকতেন খ্যাতনামা বাদ্যশিল্পী যাঁদের যন্ত্রসংগীতের মধুর মূর্ছনায় মোনালিসার মন চিত্রাঙ্কনকালে সর্বদা পরিতৃপ্ত ও সুস্নিগ্ধ থাকতো। উপরন্তু মোনালিসার মনোরঞ্জনের জন্য চিত্রশালায় উপস্থিত থাকতো কিছু যাদুকর ও বিদূষক যাদের ক্রিয়াকলাপ নায়িকাকে সদা-সর্বদা প্রফুল্লচিত্ত করে রাখতো যাতে তাঁর মুখমণ্ডলে বিষণ্ণতার ক্ষীণতম ছায়াপাতও না হয়।

উপরোক্ত চার বৎসর মোনালিসা স্বয়ং লিওনার্দোর চিত্রশালায় উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু এর পরে চিত্রটিকে সুসম্পূর্ণ করবার জন্য শিল্পী আরও দু বৎসর সময় নিয়েছিলেন। অবশেষে সৃষ্টি হলো সেই অভূতপূর্ব কীর্তি এবং দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ল তার অভাবনীয় যশোগাথা।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, রূপের পাশেই থাকে ঈর্ষা এবং তার থেকে অনেক সময়ে সূচিত হয় হিংসা ও বিনাশের মনোবৃত্তি। আজ পর্যন্ত কয়েকবার মোনালিসার চিত্রপট অপহরণ ও বিনষ্ট করবার চেষ্টা হয়েছে তাঁর রূপের পূজারী ভক্তদর্শকদের মধ্য থেকেই। এখন তাই ইস্পাতের বেড়া দিয়ে ঘেরা খাঁচার মধ্যে চিত্রপট রক্ষিত এবং সদা-সর্বদা সশস্ত্র প্রহরী ও পুলিশ অফিসার ছবিখানির প্রহরায় নিযুক্ত। এতদ্‌সত্ত্বেও একজন বলিভিয়ান দর্শক একবার ছবিটির প্রতি একটি পাথর ছুঁড়ে মারে। এই ঘটনার পর চিত্রটিকে বুলেট নিবারক স্ফটিকের আবরণে রাখা হয়েছে।

ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস এই চিত্রটি বারো হাজার ফ্রাঙ্কের বিনিময়ে ইতালি থেকে সংগ্রহ করেন এবং ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই সুবিখ্যাত ভার্সাই রাজপ্রাসাদে সম্ভবতঃ ১৬৯৪ খৃঃ সেটি প্রতিষ্ঠিত করেন। ইওরোপে বিগত কয়েক শতাব্দী থেকে জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ ও কলহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ঐ মহাদেশে মোনালিসার চিত্রখানি সর্বত্র সমাদৃত ও অভিনন্দিত। কিছুকাল পূর্বে পশ্চিম জার্মানিতে মোনালিসার জন্মতিথি স্মরণ করে ডাকটিকিটে তাঁর মূর্তি ছাপানো হয়েছিল। সোভিয়েট রাশিয়ার ইন্সটিটিউট অফ অ্যাপ্লায়েড এন্ড ডেকরেটিভ আর্টস-এর পক্ষ থেকে একবার দাবি করা হয় মোনালিসার মুখাবয়বের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ রুশ নারী সৌন্দর্যের প্রচলিত আদর্শের বহুলাংশে সৌসাদৃশ্য রয়েছে। সম্ভবতঃ রুশ সৌন্দর্যবিশারদেরা এই কথাই বলতে চান—হয়তো কোন এক সুদূর অতীতে মোনালিসার পূর্বপুরুষ রুশ জনক জননীর বংশোদ্ভব। এই উক্তি থেকে মোনালিসার প্রতি রুশ শিল্পী মহলের আন্তরিক অনুরাগই প্রমাণিত হয়।

১৯১১ খৃঃ মোনালিসা হঠাৎ ল্যুভর মিউজিয়ামে আপন মঞ্চ থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায়। সেখানে ফরাসী বিপ্লবের পর পরই ভার্সাই থেকে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এই সংবাদে এক সর্বব্যাপী আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং নানারূপ গুজবের সৃষ্টি হতে থাকে। মিউজিয়ামের বারোজন কর্মচারী বরখাস্ত হয় এবং গোয়েন্দা বিভাগের হাতে অনুসন্ধানের ভার সমর্পণ করা হয়। প্রায় দুই বৎসর পর মোনালিসার আকস্মিক অন্তর্ধানের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়।

ভিনসেঞ্জো পেরুগিয়া নামধারী জনৈক ইতালিয়ান রং-মিস্ত্রি মাঝে মাঝে ল্যুভরে কাজ করতে আসতো। ১৯১১ খৃঃ ২১ আগস্ট সকাল আটটার সময়ে সকলের অলক্ষিতে সে মোনালিসার চিত্রখানি শ্রমিকদের ঢিলে আলখাল্লার মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে সরে পড়ে। প্রায় দু বছর পর সে ধরা পড়ল যখন সে ফ্লোরেন্সের এক চিত্র ব্যবসায়ী আলফ্রেড গোনির নিকটে লুকিয়ে ছবিটি বিক্রি করতে গিয়েছিল। বিচারে পেরুগিয়ার সাত মাস কারাদণ্ড হলো। কিন্তু জবানবন্দীতে সে জানিয়েছিল—ছবিটি সরিয়ে আনাতে তার কোন অপরাধ হয় নি, কারণ ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন ইতালি জয় করবার পর ইতালির বহু শিল্প সম্পদ তিনি লুণ্ঠন করে ফ্রান্সে নিয়ে গিয়েছিলেন। মোনালিসাকে ইতালির মাটিতে ফিরিয়ে এনে তাকে সে স্বদেশে প্রত্যানয়ন করেছে মাত্র।

যাই হোক ইতালি সরকার সামরিক কায়দায় গার্ড-অফ-অনার সহকারে পুনর্বার মোনালিসাকে ফরাসী রাজদূতের হাতে সমর্পণ করলেন ১৯১৩ খৃঃ ২১ ডিসেম্বর। পরের মাসেই তাকে ল্যুভার মিউজিয়ামে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হলো। এই ঘটনার অল্প কিছুদিনের পরেই কিন্তু আবার একটি

।। ২৫ ।।

অসময়ে সজলকে দেখে সেদিন আরতি অবাক! আরতি ভয়ে ভয়ে বলল, 'কি হয়েছে তোমার? চেহারাটা এমন বোকা বোকা মানুষের মত কেন?'

সজল বুঝতে পারল, বাইরে সে যতই সহজ হওয়ার ভাব দেখাক, মনের মধ্যে ঝড় এখনও শান্ত হয়নি। সেতারটা দাওয়ার ওপর নামিয়ে রেখে বলল, 'এটা কিছুদিনের জন্য তোমার কাছে রাখতে এলাম।'

আরতি অবাক হয়ে বলল, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'বুঝবে। আমাকে একটু এগিয়ে দাও। বসতে পারছি না।'

'একটু চা খাবে না? আঁচ দিয়েছি?'

'না। তুমি চল'।

'দাঁড়াও মাকে বলে আসি। কাপড়টা পাল্টেনি।'

দুজনে আস্তে আস্তে পাশাপাশি হাঁটছিল। কেউ কোন কথা বলছিল না।

সেই চেনা সরু গলিটা এক সময় শেষ হল। ওরা মোড়ের কাছে এসে পড়ল। আরতি ধীরে ধীরে বলল, 'একটা কিছু তুমি বলতে চাইছ, অথচ বলতে পারছ না। কি হয়েছে?'

'অরুণার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে? আমি বাসা ছেড়ে চলে এসেছি।'

আরতি দাঁড়িয়ে পড়ল। 'সে কি! এখন যাচ্ছ কোথায়?'

'একটা হোটেলে। বাসা খুঁজছি। হোটেলের হৈচৈ, যাচ্ছেতাই খাওয়া, সহ্য হচ্ছে না। আগের বাড়ীওয়ালার কাছে যাব। ও বাসাটা তুমি তো জানোই। ...হ্যাঁ, দেখ, তোমার বাসার ঠিকানায় আমার একটা দরকারী চিঠি আসতে পারে।'

আরতির কানে বোধহয় কোন কথা ঢুকছিল না। সে চুপ করে কি ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল।

সজল আবার বলল, 'আমি নতুন করে জীবন শুরু করতে চাই, আরতি। অনেক, অনেক শিখলাম এ জীবনে! কলকাতা ছেড়ে যাব। একটা টীচারশিপের জন্য লিখেছি। সেই চিঠিটা তোমার ঠিকানায় আসতে পারে।'

আরতি শান্ত গলায় বলল, 'এ চাকরিটা ছেড়ে দেবে?'

'আপাতত তিন মাস ছুটির দরখাস্ত করেছি। মিঃ মুখার্জিকেও লিখেছি, আমি প্রফেশান চেঞ্জ করতে চাই বলে। আর দেখ, ওদের মধ্যে থাকলে, আমিও একদিন ঘুষ নেব, ঘুষ না নিলে চাকরি করতে পারব না। আর সেই ঘুষের টাকায় দামী দামী আসবাবপত্র কিনব, বাড়ী করব, না, না, আমি গরীবের ছেলে, গরীবই থাকব, অসৎ হতে পারব না'।

আরতি বলল, 'অরুণার বড় ক্ষোভ ছিল তুমি ঘুষ নাও না বলে। তা হলে তার অনেক ভারি ভারি গয়না হোতো, দামী দামী শাড়ী হত। আমি ভেবে দেখলাম, ...একরকম ভালো হোলো, সজলদা। এটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ। এবার নিজের মত চলবে। কিন্তু একটা কথা—'।

সজল আরতির দিকে তাকালো।

'তুমি সুখী হতে পারো না, সজলদা।'

সজল বিস্মিত চোখে তাকাল, বলল, 'কেন? কেন সুখী হতে পারব না?'

আরতি শান্ত গলায় বলল, 'কোন শিল্পীর জীবনে অবিচ্ছিন্ন সুখ, আনন্দ থাকতে পারে না। ওটা অসম্ভব, ও আশা তুমি কোরো না। দুঃখ, যন্ত্রণা শিল্পীর সৃষ্টির উপাদান। সজলদা, জীবনে সুখ চেও না, পাবেও না। হ্যাঁ, তবে তোমার এ দুঃখের, এ যন্ত্রণার সংজ্ঞাটা আলাদা। যে দুঃখ তুমি পেয়েছ, সেটা অবশ্য খুব নিম্নস্তরের।'

সজল ঠিক বুঝতে পারছিল না। এই মুহূর্তে তার সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

আরতি আবার বলল, 'সব দুঃখ থেকে কিন্তু সৃষ্টি হয় না, এই যেমন সব মাটিতে সব ফসল হয় না। কিন্তু সে যাই হোক, সজলদা, দুঃখ তোমার সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে আছে, এটা জেনে রেখো। কিন্তু এই দুঃখ থেকেই একদিন মহৎ সৃষ্টি হয়।'

কথা নয়, যেন দূরাগত কোনো করুণ সুর। যেন অদেখা কোন ফুলের পবিত্র গন্ধ পাচ্ছে সজল।

সজল দুঃখের সঙ্গে বলল, 'তুমি কি বলছ আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। যদি লেখার কথা বলে থাক, তবে বলব, লিখে কিছু হবে না। তুমি জান না আরতি, আজ আর প্রতিভাটা 'সাকসেস'-এর একমাত্র কথা নয়। সুযোগ, জানাশোনা, সোশ্যাল স্ট্যাটাস—এ যুগে এগুলোরও দরকার। লেখাটেখা ছেড়ে দেব আমি! ব্যর্থ, সারা জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গেল! এই যে জীবনটাকে নতুন করে শুরু করব বলছি, এ-ও হয়ত ব্যর্থ পরাজিত মনের কল্পনা।'

সজলের গলার স্বর ভারি হয়ে আসছিল।

আরতি শান্ত গলায় বলল, 'ব্যর্থ? লেখা ছেড়ে দেবে? কিন্তু এই ব্যর্থতাবোধ এই বেদনাই যে তোমার আসল মূলধন, সজলদা! আর 'সাকসেস?' তুমি জানো না, 'সাকশেসফুল ম্যান' মাত্রেই বড় স্বার্থপর, বড় সাংসারিক বুদ্ধিসম্পন্ন। ব্যতিক্রম যে নেই, তা বলব না। কিন্তু সজলদা, তুমি সে দলের মানুষও নও। এই না হওয়াটা যে কতো বড়ো জিনিস, কতো বড়ো সম্পদ, এর কতো মূল্য সে তুমি এখন বুঝতে পারবে না। কাজেই 'সাকশেস' এর আশা না করে লিখে যাও। লেখাই তোমার ধর্ম, তোমার ব্রত। লেখা কখখনো ছাড়বে না। তোমার নতুন জীবনে লেখাই একমাত্র সাধনা হবে।'

ছবিটা কী উদাসীন শূন্যতার ভাষায় শব্দিত!

সজল ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল।

চারধারে বিশ্বময়ের স্মৃতি! বইয়ের আলমারি, ছোট খাট, টেবিলেও কিছু বই। বোধহয় শুচিতা মাঝে মাঝে দাদার বই-গুলো পরম যত্নে গুছিয়ে রাখে। দাদা আসবে, পড়বে। এমনি করেই কতোদিন সে অপেক্ষা করেছে। বিশ্বময় আসেনি। বিশ্বময় কি আসবে না?

হ্যাঁ, বিশ্বময় হয়ত এ ঘরে আর আসবে না। পথকেই সঙ্গী করে বুকে একটা জ্বালা নিয়ে কোন অজানা জনপদ অরণ্য নদীতীরে বিশ্বময় ফিরবে!

বিশ্বময় তার বন্ধু, বড়ো প্রিয় বন্ধু। সেই বিশ্বময়ই হারিয়ে গেল!

শুচিতার মুখটা মনে পড়ছিল সজলের! শুচিতা কত কাঁদছে! ঈশ্বর, ওর কান্নার অবসান যেন হয়! বিশ্বময়কে যেন শুচিতা খুঁজে পায়! শুচিতা যেন খুশি হয়! এই মুহূর্তে তার আর কোন প্রার্থনা নেই!

বাসায় ফিরে এল সজল। বড় ক্লান্ত সে। তা হোক, এই তার নব-জন্ম, এই তার দ্বিজত্ব। এই পুরনো ঘরে একদিন গভীর রাত্রে উঠে দেখবে, পার্কের দেবদারু গাছটার ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো এখনো তেমনি পড়ে কিনা। আজো কল থেকে টিপটিপ করে, ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার নির্দিষ্ট নিঃসঙ্গ উদাসীন ছন্দ অলস মধ্যাহ্নে একটানা বাজে কিনা!

হ্যাঁ, এই ঘরেই অরুণা একদিন এসেছিল, যেদিন দাঙ্গার সময় মৃত্যুর হাত থেকে কোনভাবে বেঁচে ফিরে এসেছিল সে! সেইদিনটি সজলের জীবনে অক্ষয় হয়ে আছে।

শিশু দেবদারুর মত, সুন্দর শুভ্র সেই মুসলমান ছেলেটিই বা আজ কোথায় কে জানে! সেই অরুণাও আজ নেই, আর কখনো এ ঘরে সে আসবে না, আর কখনো সে সজলের দিকে একটা টফি ছুঁড়ে দিয়ে বলবে না—তোমার মন খারাপ হওয়ার ব্যাধিটা আমি সারাবই সারাব। অরুণা মুছে যাক সজলের জীবন থেকে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক তার স্মৃতি!

সজলের আদৌ ঘুম আসছিল না। শরীরে সমস্ত স্নায়ু বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল হয়ে গেছে। সে ভাবছিল, অরুণার কাছ থেকে এতোবড় আঘাত না পেলে জীবনকে দেখা তার অসমাপ্ত থাকত। তারচেয়ে এই ভালো! এই ভালো! এই দুঃখ, এই বেদনার দান, এই ভালো, এই ভালো!

আজ বাবা, মা, মিনু, নিজের সেই ছোট গ্রাম—অমৃতপুরের কথা বড় মনে হয়। এই অশ্রুসিক্ত মুহূর্তে তারা যেন সজলের বিছানার চারদিকে ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। মিনুকে ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে, ঘর ছেড়ে, সে একদিন জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় এসেছিল। তারপর কত দুঃখ দারিদ্র্য আঘাতের মধ্য দিয়ে সে পথ অতিক্রম করে এসেছে। আশ্বাস, সুলতাদি, বিশ্বময়, অরুণা, শুচিতা, আরতি—এই মিছিলের একধারে আলো-অন্ধকারের তীরে জীবনের একটি ধূসর মানচিত্র টাঙানো!

আশ্চর্য! জীবন যেন নিজেই একটি গুরুগৃহ। এতোদিন ধরে সজল সেই গুরু-গৃহে থেকে পাঠ গ্রহণ করছিল। কতোদিন সন্ধ্যাবেলায় সে অদূরের অরণ্য থেকে সমিধ আহরণ করে ফিরেছে। তারপর রাত্রি নীরব হলে প্রদীপের আলোয় পড়তে বসেছে—'নি গ্রামাসো অবিক্ষত, নি পদ্বন্তো নি পক্ষিণঃ।'

গ্রামগুলি নিস্তব্ধ, পথিকের পায়ের শব্দ আসবে না, পাখিদের পাখার শব্দও স্তব্ধ। সকলেই নিদ্রিত। —'রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে।' —হে রাত্রি তোমাকে আমার এই স্তবগান অর্পণ করলাম। তুমি গ্রহণ কর।'

এবার পাঠ শেষ। গুরুগৃহ থেকে চলে যাবার দিন সমাগত। গৃহের চারদিকের আদিগন্ত প্রান্তর থেকে আলোর গান এবার নিভে যাবে, নামবে নির্জন সন্ধ্যার পরিচ্ছেদ। খেয়া পেরিয়ে দূরের যাত্রীরা ফিরে যাবে দূরের গ্রামে, মাটির পথের ওপর এবার নামবে অপার্থিব নৈঃশব্দ্য!

এই মুহূর্তে এই আসন্ন বিদায়-রাত্রিতে মনে হয়, 'স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে।' হ্যাঁ, ছবি-ই ত! দুঃখ সুখের নানা রঙের, নানা রেখার, নানা প্রতীকের এক ছবি। বিশ্বময়ের মত কোন শিল্পী, জীবনের সমস্ত যন্ত্রণার বেদনার নির্যাসের রঙ দিয়ে সে ছবি এঁকে চলেছে।

সজল উঠে দাঁড়াল। না, আজ আর খাওয়ার ঝামেলা করবে না। শরীরটা ভালো নেই। কল থেকে এক কুঁজো জল নিয়ে এল। হাতমুখও ধুয়ে এসেছে। ঘরের দরজাটা বন্ধ করে, কি করবে মনে না পড়ায় টেবিলের বইগুলি উল্টাতে লাগল!

সকলের ওধারে ছিল পোকা-কাটা ছেঁড়া গীতাঞ্জলিটা। খবর কাগজের 'কভার' দেওয়া। অনামনস্কভাবে পাতা উল্টাচ্ছিল সজল। এক জায়গায় এসে থামল। পাতাটায় লাল নীল পেন্সিলের আঁকাবাঁকা অজস্র রেখা। বোধহয় বইটির আগের মালিকের বাড়ীর কোন শিশু, পেন্সিল দিয়ে এখানে তার ছবি আঁকার সাধ মিটিয়েছে।

সজল মনে মনে সেই শিশুটির ... মুখটা ভাবতে লাগল। একটি আনন্দময় নিষ্পাপ শিশুর এই করুণ কারু... শিশুটি হয়ত ফুলের মত সুন্দর। না, ... সব শিশুই সুন্দর।

অরুণার শিশুও সুন্দর, পবিত্র!

সজল কিছুক্ষণ সেই এলোমে... রেখাগুলোর দিকে তাকিয়েছিল। ... তার মনে হোলো, সে কি আর ক... পিতা হবে?

সজল অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছিল।

সেই ছবি থেকেই কবিতাটায় ... পড়ল। আশ্চর্য! এই কবিতা সে এ... পড়েনি!

'যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু
এবার এ জী...
তবে তোমায় আমি পাইনি ...
সে-কথা র...
যেন ভুলে না যাই, বেদনা ...
শয়নে স...

আশ্চর্য কথাটি? এ জীবনে ... দেখা পাইনি এই বেদনা যেন শয়নে ... জেগে থাকে! কার দেখা? সে কে? ... প্রভু?

বইটা বন্ধ করে সজল অ... ভাবল। এই প্রভুর অন্বেষণে কি নি... একদিন বেরিয়ে পড়েছিল? এই ... ব্রহ্ম? আশ্চর্য, এ যে মিলে যাচ্ছে ... এই ব্রহ্মই ত নচিকেতার জিজ্ঞাসিত... একমাত্র মনের দ্বারা, অনুভবের ... তাকে পেতে হয়।

যতই উঠে হাসি,
ঘরে যতই বাজে বাঁশি,
ওগো যতই গৃহ সাজাই আ...
যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা
সে-কথা ...
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পা...
শয়নে স...

ঘরে যতই প্রিয়জনের আনন্দ ... বাজুক, যত দামী, উজ্জ্বল আসবা... সাজাই, তোমাকে যে ঘরে আনা হ... ব্যথাটুকু এই বেদনাটুকু যেন স... মধ্যে মনে থাকে, সব সময় জেগে ...

সজল কোনদিন তো একথা ... কোনদিন তো ভাবেনি জীবনের ... উদ্দেশ্য কি? সে তো শুধু ছোট ... দুঃখ, অরুণা কার্তিক করুণা—এ... সারা দিন-রাত্রির মুহূর্তগুলি... তুলেছিল। একদিনও সে ভাবেনি আবর্জনা। আত্মা, জীবন, মন আলোকিত হয় না, যেখানে আ... যেখানে সকালের রোদের বা রাত্রি... লোকিত অন্ধকারের বেদনা নেই সমগ্র অতীত জীবনটা তার-ই ধূসরতার মধ্যে কাটিয়ে এল! এই গুলিকেই সজল জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘরে জমিয়ে তুলেছিল! এত বড় গেল জীবনে!

সজল অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

আশ্চর্য! আজ তার মনে হয়, অরুণার চলে যাওয়াটা জীবনের পক্ষে কত বড়ো আশীর্বাদ! দিনে দিনে সে নরকের অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল! কে যেন একটা বড় আঘাত দিয়ে কঠিন আঘাত দিয়ে তাকে সেই মৃত্যুমুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে এল!

অনেকক্ষণ পরে সজল বাইরে এসে দাঁড়াল। সামনে সুদূরে প্রসারিত নক্ষত্র-লোক। সারা আকাশ অসীম নীরবতার সমুদ্র। রাত্রির এই স্তব্ধতায় পৃথিবী যেন ধ্যান করতে বসেছে! সজলের ইচ্ছা হচ্ছিল, আজ সেও তার অন্ধকার ঘরে বসে একটু প্রার্থনা করে!

॥ ২৭ ॥

সেদিন আবছা তন্দ্রার মধ্যে সজল যেন সেতারের শব্দ শুনল, হঠাৎ কোনো তারে হাত পড়ে গেলে যেমন একটা সুর বেজে ওঠে।

ঘরে আলো। বন্ধ জানালার ফাঁক-বেয়ে আসা এই আলোর রঙ দেখে বোঝা যায় বেলা হয়েছে।

আরতি কি এসেছে? না আসবে? অথবা সজলের মনে মনে এমনি একটা প্রত্যাশা ছিল বলেই, হয়ত ভুলে সেতারের শব্দ সে শুনে থাকবে!

এমনি মাঝে মাঝে হয়, এমনি করেই রবীন্দ্রসংগীতের কোন কোন লাইন অবচেতন মনে হঠাৎ সে শুনতে পায়। তারপর উঠে গানটা খুঁজতে থাকে! বের করে বারবার গানটা পড়ে।

তবু একটা আনন্দময়, রোমাঞ্চময় প্রত্যাশা নিয়ে সজল দ্রুত দরজা খুলে দিতে সকালের একরাশ আলো ভিড় করে এলো।

আর যে এলো সেও সকালের আলোর মতই।

'কি? ঘুম ভাঙল?'

কথা নয়, মৃদু সুরে ভরে-থাকা গান! তানপুরায় নিখুঁত জোয়ারী থাকলে যেমন সুরের শরীরটা অনেকক্ষণ ধরে কাঁপতে কাঁপতে এক সময় ঘরের হাওয়ায় বিলীন হয়ে যায়, শুধু সারা ঘরে তখন দেশাহীন স্মৃতির সংগীত বাজে!

আরতি হাসতে হাসতে বলল, 'বোধহয় সুখবর আছে। নাও, এই চিঠি নাও।'

সজল তাড়াতাড়ি চিঠিটা পড়া শেষ করল। —হ্যাঁ, এক সময়কার স্কুলের সেরা ছেলে বলে, তাকে চাকরি দিতে কর্তৃপক্ষের আপত্তি নেই। স্কুলও বড় হচ্ছে, মাল্টি-পারপাস হয়ে যাবে। গবর্মেন্ট টাকা দিচ্ছে। তবে তাকে পরে এম, এ-টা দিতে হবে। তারপর স্কুলের ডেপুটেশনে বি টি পড়ে আসতে হবে এক সময়। তাতে অবশ্য প্রধান শিক্ষক হওয়ার সম্ভাবনা আছে!

সজল আরতির দিকে তাকালো। বলল, 'তোমার কথা ফলে গেল দেখছি।'

আরতি সেতারটা বিছানায় রাখছিল। হেসে বলল, 'দেখলে সকাল বেলা কেমন সুন্দর খবর বয়ে নিয়ে এলাম!'

সজল দেখছিল, সেতারের কভারটা আরতি কেচে এনেছে শুধু নয়, এক জায়গায় একটু ছিঁড়ে গেছল, সেটাও সুন্দর করে রিফু করে এনেছে।

আরতি পুরনো কাপড় রিফু করে পারে! আরতি সজলের বিধ্বস্ত, পুরনো জীবনটাকেও এমনি করে সূক্ষ্ম কারুকার্য দিয়ে সুন্দর, নতুন, পবিত্র করে তুলতে পারে! সুরযন্ত্রের মতো কোন কোন পুরনো জীবনও বোধহয় ভালো!

সজল পেস্ট আর টুথ ব্রাস নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'সেতারটা একটু এমনি বাজাও। আমি আসছি'।

আরতি বিছানায় বসে বলল, 'কি বাজাবো?'

সজল যেতে যেতে বলল, 'ভৈরবী'।

সজল কলতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছিল, আরতি ভৈরবী আলাপ করছে। আলাপের ঢং আব্বাসের ঢঙের মত। রীতিটা ধ্রুপদের। খাদের কাজ সেরে একটি একটি করে পর্দা ওপরে উঠবে, আবার খাদে ফিরে আসবে।

আব্বাস এমনি করেই আলাপ করত। মনে হোতো, সে ধ্যান করতে বসেছে, সুরের ধ্যান।

আরতি এবার চড়ার দিকে যাচ্ছে। সজল কান পেতে শুনছিল।

কলতলার কাছে, ঐ দেবদারু গাছটার পাতায় সকালের রোদ এসে পড়েছে। রোদ নয়, ভৈরবীর সুরগুলো যেন ছড়িয়ে পড়ছে।

সজল ইচ্ছে করেই দেরি করছিল, এই আড়াল থেকেই সে ভৈরবীর আলাপটুকু শুনতে চায়। এই দূরত্বে থেকে সে আরতিকেও গভীর করে অনুভব করছে। মনে মনে ছবিটা দেখছে, মুখ নিচু করে, পর্দাগুলোর দিকে না তাকিয়ে তন্ময়ভাবে মীড় নিচ্ছে, একটিমাত্র পর্দায় বহু সুরের জন্ম হচ্ছে, হাতের সুন্দর স্পর্শে। এ মূর্তি যেন সরস্বতীর ধ্যানমগ্ন, সুন্দর প্রতীক!

আরতি বোধহয় এই দেরি দেখে অস্থির হয়ে উঠছে। নতুবা, হঠাৎ ঠুংরী ধরনের আলাপ ধরবে কেন? কিন্তু ভারি মিষ্টি লাগছে, ভারি করুণ লাগছে। এই করুণ সুরের মধ্যে একদিন সুলতাদির চলে যাওয়ার দুঃখের ছায়া সে শুনতে পেয়েছিল।

আজ কোথায় সুলতাদি!

আশ্চর্য! জীবনের পথে চলতে চলতে পথের দুধারে কতো কিছু ফেলে রেখে যেতে হয়। কতো শ্রদ্ধা, ভালোবাসা স্নেহ! কতো মানুষের স্পর্শ, স্মৃতি, সুর। দুপারের তীরভূমিতে সব কিছু রেখে জীবনের স্রোত বয়ে চলে সমুদ্রের দিকে। এই প্রবহমানতাই জীবন।

আরতি বেরিয়ে এল। 'বাঃ, কি করছ এতক্ষণ?'

সজল চোখে মুখে জল দিয়ে বলল, 'না, এই আসছি'।

আরতি সেতারটায় এমনি টুং টাং করছিল।

সজল ফিরে এসে বলল, 'চাকরিটা হয়ে গেল, তবু কেন যেন খুশি হতে পারছি না, আরতি।'

আরতি হেসে বলল, 'তা হলে কিন্তু তুমি বড্ড 'কমন' হয়ে যেতে। তাছাড়া, কতো বড়ো 'রিস্ক' নিচ্ছ। যত হোক একটা গবর্মেন্ট চাকরি। সেটা ছেড়ে চলে যাবে। 'লাইন চেঞ্জ' করা চাট্টিখানি কথা নয়। যাই বলো, আমার কিন্তু ভালো লাগছে। আমার বাবাও টীচার ছিল, টীচারশিপ আমারও ভালো লাগে। —কি, আবার কোথায় চললে?

সজল বলল, 'একটা কথা মনে মনে ভাবলাম। তুমি স্নান সেরে এসেছ। আমিও স্নানটা সেরে আসি। কি? বাড়ী ফিরতে দেরি হলে কেউ ভাববে?'

আরতি বলল, 'বলে এসেছি। কিন্তু কতক্ষণ?'

'যদি বলি, সারাদিন। ভাবছি কালই দেশে চলে যাব।'

'ও, কালই চলে যাবে?' —আরতি কেমন করুণভাবে কথাটা বলল।

সজল বলল, 'কিন্তু কেউ ভাববে?'

'একটা টেলিফোন করতে হবে। পাশে একটা কারখানা আছে। মাস্টারমশাইকে ডেকে দেবে। কিন্তু তুমি, সারা দিন কোথায় কাটাবে?'

খুশিতে সজল এ প্রশ্নটার কোন জবাব দিল না। এই মুহূর্তে ভীষণ ভালো লাগছে তার। আরতি কি সুন্দর করে তাকিয়ে কথা বলছে। একসঙ্গে সারাদিন কাটাতে তার আপত্তি নেই। সজলের মনে হচ্ছিল, আরতির আত্মা যেন এই আনন্দটুকুর জন্য অপেক্ষা করছিল। নইলে এমন আনন্দের সঙ্গে সাড়া দেবে কেন?

সজল তৈরি হচ্ছিল। দেখছিল, আরতি কেমন লোভীর মত এই শেষবার সজলের ঘরকন্নাটুকু দেখে নিচ্ছে। এ ঘরে দু'তিন বারের বেশি সে আসে নি। তবু বোধহয় ভালো লাগছে ওর। এই অগোছালো জিনিসপত্র, এখানে ওখানে বই, খবরের কাগজ, ময়লা জামা-কাপড়, কোণের দিকে ছোট খাটটা। কতদিন পরিষ্কার করা হয় নি।

আসলে, ঘরের তো মূল্য নয়, মূল্য সেই মানুষের স্মৃতির, যাকে সে ভালোবাসে। এই ভালোবাসার স্পর্শেই ধূলি কখন সোনা হয়ে ওঠে।

আরতি বইগুলো নাড়া চাড়া করছিল। বাবার বইগুলো একটির পর একটা খুলে ... আঁচল দিয়ে কী সুন্দর স্নেহে সেগুলো মুছল।

সজল বলল, 'ও কি করছ! কাপড়টা নোংরা হয়ে যাবে না?'

আরতি হেসে একবার তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'যাক'।

আরতি এবার সেই 'গীতাঞ্জলি'টা তুলে নিল।

সজল বলল, এই 'গীতাঞ্জলি'টা কিন্তু কলকাতা এসে প্রথম কিনেছিলাম। পোকায়-কাটা'।

আরতি বলল, 'এটা আমি নোব'।

'বেশ। নাম লিখে দোব?'

আরতি বলল, 'সারা বইটার পাতায় পাতায় তোমার নাম লেখা আছে। আর লিখতে হবে না।'

আরতি বইটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল। বাইরে দাঁড়িয়ে আবার চেয়ে রইল ঘরটার দিকে। এ ঘরে আর কখনো তাকে আসতে হবে না।

এ ঘরের মানুষ এবার দেশে ফিরে যাবে।

সজল ঘরটা বন্ধ করে বলল, 'চল, কোথাও খেয়ে নেব বাইরে।'

'কাল নিশ্চয়ই খাওনি?'

সজল হেসে বলল, 'কি করে জানলে?'

'খাটের অবস্থা দেখে। কেন? খাওনি কেন?'

'ইচ্ছে করল না।'

'বাঃ, বেশ মানুষ তো! ইচ্ছে করল না বলে খাবে না? ঘুম এলো রাতে?'

'এলো, তবে এখন থানার ঘড়িতে চারটে।'

'ওমা! কি করলে এতক্ষণ?'

সজল বলল, 'শুয়ে শুয়ে কবিতা পড়ছিলাম।'

আরতি হেসে বলল, 'সত্যি তুমি এক পাগল। আচ্ছা, আজকাল কবিতা লেখ না?'

'না।'

'কেন?'

'কবিতার মৃত্যু হয়ে গেছল।'

আরতি বলল, 'সব মৃত্যু কিন্তু সব শেষ নয়। এর পরও 'রেসারেকশন' আছে। দ্যাখো এসব চলবে না। তোমাকে আবার লিখতে হবে। যারা লেখক নয়, তারাই এরকম অজুহাত দেখায়। কেউ বলে খেতেই পাই না লিখব কেমন করে, কেউ বলে সংসারে আনন্দ নেই, কেউ বলে লেখার সময় পাইনে। এসবই কিন্তু মিথ্যে কথা। আসলে তোমার লেখার কিছু নেই, তুমি লেখক নও, তাই এসব অজুহাত। যে সত্যিকারের লেখক, সে হাজার অসুবিধের মধ্যেও লিখবে। সে না লিখে থাকতে পারবে না। না, না, তোমাকে কিন্তু আবার লিখতে হবে। আমি ওসব কিছু শুনব না। দিনের মধ্যে একটা সময় স্থির করে নেবে। রোজ সে সময় বসবে। দেখবে, লেখার হাত ঠিক ফিরে এসেছে। কী সুন্দর কবিতা লিখতে তুমি! —আচ্ছা, আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

সজল আরতির কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল। বড় ভালো লাগছিল তার। এ তো সত্যি তার নবজন্ম। একটা মৃত্যু পেরিয়ে নতুন জন্ম তার জন্য আজ অপেক্ষা করে আছে।

এও তো তার দ্বিজত্ব।

'কি কোথায় যাচ্ছ?'

সজল ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে বলল, 'চল, একটু কিছু খেয়ে নি।'

আরতি বলল, 'সেই যখন অনেকক্ষণ থাকতে হবে, তখন আমি রান্না করে দিতে পারতাম'। তারপর কেন যেন খুব খুশি হয়ে বলল, 'দ্যাখো, খুব ভালো হোত কিন্তু। তুমি বাজার করে আনতে। আমি তক্ষুণি আঁচ ধরিয়ে তোমার জন্য চা করতাম। চা খেয়ে তুমি সেতারটা নিয়ে বসতে। আমি রান্না করতে করতে ভৈরবীর দু-একটা তান মুখে মুখে বলতাম। সত্যি ভাবতে ভাবতে ভীষণ ভালো লাগছে। তুমি তো আবার কাল চলে যাবে। চল ফিরে যাই।'

সজল মনে মনে সেই সুন্দর ছবিটার কথা ভাবছিল। আরতি খোলা চুল ছড়িয়ে বিছানার একধারে বসে রান্না দেখবে। রান্নার শেষে একসঙ্গে বসে দুজনে খাবে।

ছোট ছোট, তুচ্ছ, গৃহস্থালির নিত্য ঘটনাগুলির মধ্যে কোন মহৎ উপন্যাসের চরিত্র, দৃশ্য, 'ডায়ালগ' সকালের করুণ শান্ত রোদের মত বেজে উঠবে।

সজলেরও বড় ইচ্ছে করছিল, চলে যাওয়ার আগের দিনের এই সহজ সংসারটুকুর জন্য কেন যেন বড় লোভ হচ্ছিল তার।

সজল বলল, 'বেশ ফিরে যাই চল।'

বারবার জীবনের কাছে সেই আনন্দ সেই সহজ সত্যটা মূল্য পায়। সজলের হৃদয়কে সম্পূর্ণ অপূর্ণ রেখে, অতৃপ্ত রেখে মুহূর্তের উপাসনা হয় না।

ক্ষুধিত জীবন বিকৃতিতে ডেকে আনে, তার সব সৌন্দর্যকে, সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করে দেয়।

শীতের রোদ এই বিকেলের ... ঘাসের ওপর পরম তৃপ্তিতে শুয়ে ... সারা মাঠ, চওড়া পীচঢালা গর্বিত ... রোড, দুপারে নতুন বেড়ে-ওঠা ... গাছের সারি, নত, নম্র, প্রবীণ বৃক্ষশাখা রেখাচিত্র—সব যেন অপরূপের কবিতার ... পাণ্ডুলিপি।

আরতি এক সময় মৃদু গলায় বলল, 'বাঃ বেশ, সারা বিকেলটা এইখানে কাটিয়ে দিলে।'

সজল দূরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানি কি? জানো, ছেলেবেলা থেকে এই পথ আমাকে টানত। ... মাঝখান দিয়ে যে চওড়া মাটির রাস্তা দুপারের গ্রামের গাছপালা, পুকুর, খড়ের ঘরের ধার দিয়ে ওদিকে মংগলামাড়া ... কাজলাগড়, তারপর হলদী নদীর ধারে ... নরঘাট পর্যন্ত চলে গেছে—সেই ... বেরিয়ে পড়তে খুব ইচ্ছে করত! মনে হ'ত পথটা শেষ হলেই আমি আমার ঠিকানায় পৌঁছে যাব।'

আরতি কথাগুলো শুনতে শুনতে অনামনস্কভাবে ঘাসের পাতা ছিঁড়ছিল।

সজল আবার বলল, 'লোকে বলে ... ঠিকানায় পৌঁছে দেবার জন্য। আর ... আনন্দটা উপরি পাওনা। কিন্তু আর ... আমার কাছে চলার আনন্দটাই এক ... পাওনা। চলতে চলতে লোকের সঙ্গে ...

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও বাংলায় বিপ্লববাদের গোড়ার যুগ

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই, যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক ও ভারতের অগ্নিযুগের অন্যতম নায়ক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন :

'১৯০২ খৃষ্টাব্দে বাংলায় সর্বপ্রথম বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রচালিত হয়। প্রথম ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র নিখিল বঙ্গীয় বৈপ্লবিক সমিতির সভাপতি ছিলেন। এই সমিতির সহ-সভাপতিদ্বয় ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস ও অরবিন্দ ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কার্যকরী সমিতির অন্যতমা সদস্যা ছিলেন ভগ্নী নিবেদিতা। উক্ত পাঁচজনকে লইয়া প্রথম নিখিল বঙ্গীয় বৈপ্লবিক দলের কার্যকরী সমিতি স্থাপিত হয়।'১

এই বছর ১৯৭২, ১২ই শ্রাবণ তারিখে (ইংরেজী ২৮ জুলাই) সেই সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের একশত বছর পূর্ণ হবে। অথচ অগ্নিযুগের প্রারম্ভে পথ-প্রধানের অন্যতম এই মানুষটিকে আজ দেশ প্রায় ভুলতে বসেছে। ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১২ই শ্রাবণ (ইং ১৮৭২) তাঁর জন্ম হয়। বোম্বাই মাদ্রাজের পুণা শহরে। তাঁর বাবা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মেজ ছেলে, ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম আই-সি-এস—অথচ ঘোরতর দেশপ্রেমিক, হিন্দু মেলার একটি স্তম্ভস্বরূপ। তাঁর মা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীও ছিলেন তেজস্বী মহিলা, বাংলাদেশে স্ত্রী-স্বাধীনতায় অগ্রণী। বাবা-মায়ের প্রভাব বালক সুরেন্দ্রনাথের উপর পড়েছিল সন্দেহ নেই, তবে তার চেয়েও বেশী ছাপ পড়েছিল খুল্লতাত ও অন্তরঙ্গ উপদেষ্টা রবীন্দ্রনাথের। তাছাড়া বরাবরই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল সুরেন্দ্রনাথের। তাঁর বোন ইন্দিরা দেবীও বার বার লিখেছেন তাঁর স্মৃতিচারণে, দাদার একরোখা চরিত্রের কথা।২

এই সবকিছু মিলেই যৌবনে স্বাভাবিকভাবে সতেজ দেশপ্রেমিকে পরিণত হন সুরেন ঠাকুর। চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আর ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন বড়দিদির মত। এই সূত্র ধরেই বাংলাদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র, সুলেখক মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় কিছুদিন আগে

'দেশ' এ 'গগনেন্দ্রনাথ' নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধে এ বিষয়ে লেখেন :

বাঙালী বিপ্লববাদীদের আনাগোনা ছিল ঠাকুর বাড়ীতে, তবে খুব কম লোকেই জানতেন এঁদের কথা। এঁদের চিনতেন, এঁদের কথা জানতেন সুরেন্দ্রনাথ আর গগনেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গেই ছিল এঁদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আর তিনি এঁদের গগনেন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে আসতেন। বারীন ঘোষ এসেছেন, উল্লাস কর এসেছেন, খুব সম্ভবতঃ রাসবিহারী বসু এবং অরবিন্দ ঘোষও এসেছেন। আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের প্রায় সকলেরই যোগাযোগ ছিল সুরেন ও গগনের সঙ্গে।'৩

এই যোগাযোগ আরও গভীর ও অর্থবহ হয়ে উঠল আর একজন বিদেশী বন্ধুর প্রভাবে—তিনি জাপানী শিল্পী ও বিপ্লববাদী কাকুজো ওকাকুরা। তিনি এদেশে এসেছিলেন ভগিনী নিবেদিতার আমন্ত্রণে। নিবেদিতার অন্যতম জীবনী

রচয়িতা লিখছেন : 'ওকাকুরা রাজনীতিতে বিপ্লবপন্থী ছিলেন। এক্ষেত্রেও ভগিনী নিবেদিতার সহিত তাঁহার মতের সম্পূর্ণ মিল ছিল। ঠাকুরবাড়ীর সুরেন ঠাকুরও বিপ্লবের কার্যে সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন...।'৪

নিবেদিতার মাধ্যমেই ওকাকুরার সঙ্গে আলাপ হল সুরেন ঠাকুরের। বহু বছর পরে সেই স্মৃতিচারণ করে সুরেন্দ্রনাথ নিজেই লিখছেন :

"Okakura spoke English with a halting accent, as though at a loss for the right word, which, however, he always managed to find. 'What are you thinking of doing for your country?' Came his first abrupt question. It took us completely by surprise for I had no inkling of what I afterwards suspected, that Nivedita, out of her elder-sisterly regard, had changed him to stir us all up. "৫

অল্পকালের মধ্যেই সুরেন ঠাকুর-ওকাকুরা পরিচিতি, রূপান্তরিত হল গভীর বন্ধুত্বে। অবন ঠাকুর লিখছেন : 'ওকাকুরা যখন প্রথমবার আসেন এদেশে ... মনে পড়ে কলকাতায় সুরেনের বাড়ীতেই ছিলেন। সুরেনকে খুব ... পছন্দ করতেন ... এক করা।'৬ ... রথীন্দ্রনাথও লিখছেন :

'কাকুজো ওকাকুরা ... টের কাছে টেম্পল চেম্বার্সে ... ঘর নিয়েছিলেন। সুরেনদাদার ... সঙ্গে আলাপ হবে তাঁদের ... রোডের বাড়ীতে উঠে আসেন। ... গুণীমহলে মেলামেশা করার সেখানে সুবিধা হল। সুরেনদাদা নিজেকে তাঁকে ধরে সাহায্য করে ... হল।'৭

শীঘ্রই ওকাকুরার উদ্যোগে কলকাতায় একটি গুপ্ত বৈপ্লবিক চক্র স্থাপিত হয়। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এর বিবরণ দিতে গিয়ে লিখছেন :

"Like Nivedita, another foreigner named okokura, a Japanese also influenced the revolutionary movement in Bengal....with a view to preach the message of independence for India, okakura organized a small group which included Nivedita......"

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও লিখছেন একই ধরনের কথা : 'ওকাকুরার উদ্যোগে..... ভারতে মুক্তির বাণী প্রচার করিবার জন্য কলকাতায় নামজাদা লোক লইয়া একটি ভাসা ভাসা মন্ডলী সংগঠিত হয়। ইহার মধ্যে... হেমচন্দ্র মল্লিক, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগ্নী নিবেদিতা প্রভৃতি ছিলেন।'৯

ওকাকুরা বাংলার বিপ্লববাদীদের মধ্যে সুরেন ঠাকুরকেই যে সবচেয়ে বড় বন্ধু মনে করতেন, তার আর একটি স্থায়ী প্রমাণ রয়ে গেছে। তিনি তাঁর বংশগত সামুরাই তরবারিটি, ভারত ত্যাগের পূর্বে সুরেন ঠাকুরকে উপহার দেন, যে সামুরাই তরবারি জাপানীরা কখনও পরিবারের বাইরে যেতে দেয় না। কতখানি বিশ্বস্ত বন্ধু ও পরমাত্মীয় মনে করায়, এ হেন উপহার ওকাকুরা সুরেন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়।১০

প্রবন্ধের প্রথমেই বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে প্রথম বিপ্লবী সংঘ, 'অনুশীলন সমিতি' গড়ে উঠলে সুরেন ঠাকুর তার কোষাধ্যক্ষ ও অন্যতম নেতারূপে স্বীকৃত হন। কিন্তু তিনি যে কতটা সক্রিয় ছিলেন, তা অনেকেই জানতেন না। এমন কি রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায়ও লিখছেন :

'সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্তরালে ছিলেন, অর্থ দিয়া তিনি সাহায্য করিতেন বিপ্লবীদের।'১১

শুধু অর্থ দিয়ে নয়, বক্তৃতা করে, অস্ত্র জোগাড় করে দিয়ে, যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি নিয়েই বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ রাখতেন সুরেন ঠাকুর। সে কথাই লিখেছেন প্রবীণ বিপ্লবী অবিনাশ ভট্টাচার্য :

'১৯০২ খৃষ্টাব্দে পি মিত্র, সরলা দেবী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি আর দাস প্রভৃতি আমাদের মাথার উপর ছিলেন।... বিশ্বস্ত ছেলেদের কাছে গ্যারিবল্ডী, ম্যাৎসিনির জীবনী এবং অন্যান্য বৈপ্লবিক আন্দোলন কিভাবে পরিচালিত হইয়াছিল, তাহার বিষয় বক্তৃতা হইত। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পি মিত্র, সখারাম গনেশ দেউস্কর প্রধানতঃ বক্তৃতা দিতেন।'১২

অন্যত্র ঐ একই লেখক বলছেন :

'সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের পরেও আমাদের অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন, আমাদের জন্য রিভলভার যোগাইতেন।'১৩

অন্য একজন গবেষকও লিখছেন যে অত্যাচারী ছোটখাট ব্যাম্পফিল্ড... কে হত্যা করবার জন্য বিপ্লবীরা উদ্যোগী হলে, সুরেন ঠাকুর তাঁদের এক হাজার টাকা দান করেন। একজন লিখছেন : 'অরবিন্দ প্রবর্তিত বাংলাদেশ গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্বে (১৯০২) সুরেন ঠাকুর বারীন ঘোষকে এক হাজার টাকা দিয়াছিলেন।'১৪

তরুণ আর একজন গবেষক এই যুগ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবেই লিখেছেন :

It has been recorded by Aurobindo Ghosh that....an Executive Committee (of the Revolutionary party) was soon formed under the leaderships of Barrister Pramatha Nath Mitter, consisting of P. Mitter as president, C. R. Das and Aurobindo Ghosh as Vice-presidents and Surendra Nath Tagore as Treasurer).

এইভাবে বিপ্লবী আন্দোলনের গোড়ার যুগে, প্রচন্ড সতেজ ও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন সুরেন ঠাকুর। সেই উৎসাহকেই সংহত করে, তিনি নেমেছিলেন হিন্দুস্থান ইনস্যুরেন্সকে দাঁড় করানর উদ্দেশ্যে। তবে সে আর এক কাহিনী।

১৯০২এ অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বাংলাদেশে অগ্নিযুগের সূচনা হয়। সেই যুগে সুরেন্দ্রনাথের কি স্থান ছিল, তার একটা ছোট্ট বর্ণনা দিয়েই শেষ করছি :

"The members of the Anusilan Samiti, mostly young students... were given moral and Patriotic training through regular weekly classes. These lectures were delivered by P. Mitra, Sakharam Ganesh Deuskar and Surendra Nath Tagore....P. Mitra, Aurobindo, C. R. Das and Surendranath Tagore formed the first executive Committee of the Anusilan Samiti. These and Nivedita may be regarded as the five members of the first council for revolutionary activities in Bengal".

১। 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম' : ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা, ১৯৫৪, পৃঃ ২০৫
২। 'সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর' : ইন্দিরা দেবী, অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি, সতীরাণী ঠাকুরের সৌজন্যে
৩। 'দেশ' ১৬ই অক্টোবর, ১৯৭১, পৃঃ ১০০১
৪। 'ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ' : গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী, কলিকাতা ১৩৬৭, পৃঃ ১৭
5. "Kakuro Okakura" : Surendra Nath Tagore Visva Bharati Quarterly, August 1936
৬। 'জোড়াসাঁকোর ধারে' : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা, পৃঃ ১০৯
৭। 'পিতৃস্মৃতি' : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা ১৯৬৬, পৃঃ ১০১
৮। The History of the freedom movement in India: vol I. R. C Mazumdar, page 463
৯। 'ভারতে দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম'
১০। তরবারিটি এখন শান্তিনিকেতনে, রবীন্দ্র সদনে সংরক্ষিত
১১। 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৪৫
১২। ভারতে দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম, পরিশিষ্ট
১৩। ঐ
১৪। ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ
15. Two Great Indian Revolutionaries : Uma Mukherji, Calcutta 1966, Page 12.
16. History of the Freedom Movement in India, Vol 1, Page 463

…র মূর্তিসহ ৪৭৯ খৃঃ একটি জৈন …মাপাও পাওয়া গেছে এখানে। মৌর্য… চন্দ্রগুপ্তের গুরু পৌণ্ড্রবর্ধন …সী জৈনাচার্য ভদ্রবাহুর প্রভাব …বতই পৌণ্ড্রবর্ধন কোটিবর্ষ প্রভৃতি …লে পড়েছিল। অনেকের মতে বগুড়ার …স্থান গড়েই নাকি আদি পৌণ্ড্রবর্ধন …স্থান গড় অনুসন্ধানে বহু জৈনমূর্তি …ার করা সম্ভব হয়েছে। মালদহ, …াজপুর বরেন্দ্র প্রভৃতি গৌড়ভূমি নিয়েই …ণ্ড্রবর্ধন এবং কোটিবর্ষের অবস্থান। …াবতই শ্রুত কেবলি ভদ্রবাহু ও …কেবাহু প্রভৃতি জৈনাচার্যের ধর্মীয় …রণা বাঙলাদেশকেও যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ …রেছিল জৈনধর্মের প্রতি। দুর্ভিক্ষ …পীড়িত বাঙলাদেশ থেকে ভদ্রবাহু …ম্বর হয়ে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করেছিলেন …লেন। শ্বেতাম্বর শ্রাবকবৃন্দ সহ …পৌণ্ড্রবর্ধন থেকে গিয়েছিলেন স্থূলভদ্র। …ংলাদেশ থেকে উদ্ধার করা জৈন মূর্তি- …লি কিন্তু দিগম্বর সম্প্রদায়ের। এমনকি …বাংলাদেশে জৈন মূর্তি নির্মাণে ভাস্কর্য …শিল্পীরও বৈশিষ্ট্য আছে। পাহাড়পুরে …প্ত জৈন মূর্তিগুলিতে পালযুগের …শিল্পশৈলীর প্রভাব সুস্পষ্ট। যদিও …পালরাজাদের সময় জৈন প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়ে, …বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রবল হয়। চালুক্যরাজ …বীরধবলের মন্ত্রী বসন্ত পালের তীর্থ- …যাত্রার বর্ণনা রয়েছে "বসন্ত বিলাস" …গ্রন্থে। এই তীর্থযাত্রায় তার সঙ্গে যেসব …নৃপতি সহযাত্রী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে …ও গৌড়বঙ্গের সংঘবীরা সঙ্ঘপতিও …ছিলেন। এ রচনা থেকে বোঝা সম্ভব ত্র…য়োদশ শতাব্দীতেও বাঙলাদেশে জৈন …সংঘগুলি সচল ছিল। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ …"গ্রহকাজুন-সুরী" দ্বাদশ শতাব্দীতে …বঙ্গদেশে কর্মক্ষম ছিলেন। এর নাম …থেকেই বোঝা যায় ইনি জৈন ছিলেন। …ভাবতই ধারণা করা সম্ভব আদি …পৌরাণ ধর্মের পর বাঙালীরা যে ধর্মের …তে আকৃষ্ট হয় তা হল জৈনধর্ম। এই …সময় থেকেই তার উত্তরণ ঘটে বৌদ্ধ- …গে। বৈদিক সংস্কৃতির প্রভাব সম্ভবত …শুঙ্গযুগের সমকালে প্রকাশিত হয় …বাঙভূমে।

সম্রাট অশোকের রাজত্বের পর দু-এক …শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলা তথা ভারতে …বৌদ্ধধর্ম বিশুদ্ধ ছিল। তারপর স্থানীয় …ভাব ও লোকায়ত ধর্মবিশ্বাস ক্রমে ক্রমে …ধর্মকে বিকৃত করে ফেলে। হীনযান ও …মহাযান বিভক্ত হয়। খৃষ্টীয় ৪র্থ-৫ম …শতকে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য তন্ত্র-মন্ত্র …সংযোগের ফলে বৌদ্ধধর্ম তার …স্বকীয়তাকে হারায় বা স্বল্প পরিমাণ …ত হতে শুরু করে। আনুমানিক ৫ম …শতকে বৌদ্ধ যোগাচার সম্প্রদায়ের সর্ব- …ন আচার্য অসঙ্গের দ্বারাই প্রথম …বৌদ্ধধর্মে ব্রাহ্মণ্য যোগে সংমিশ্রণ ঘটে। …পরবর্তীকালে এই যোগাচার ধর্ম শুধু …মহাযান বৌদ্ধদেরই নয়, হীনযানদের

বুদ্ধ মূর্তি। রাজসাহী

মধ্যেও তার প্রভাব বিস্তার করে চলে। সেকারণেই শুধু চীন বা জাপানেই নয়, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ এবং শ্রীলঙ্কা (সিংহল) ও এর প্রভাব দেখা যায়। বৌদ্ধধর্মে এই তান্ত্রিকতার অনুপ্রবেশের ফলে বিভিন্ন দেশজ ও স্থানীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে এক মিশ্রতন্ত্র অদ্ভুতরূপে দেখা দিল ভারত তথা বাঙলার বুকে। মহাযান ধর্মে মূলবৌদ্ধ আদর্শের যেটুকু ছিল সেটুকুও তন্ত্রের স্রোতে ভেসে গেল।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি হিন্দুধর্ম ও যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি হিন্দুধর্মেও দেব-দেবীর মূর্তির পাশে মহাশক্তি নারীমূর্তির পুজো চলতে থাকে। এর পাশাপাশিই ভূত-পেত্নী, পিশাচ-পিশাচিনীর সব অদ্ভুত অদ্ভুত অলৌকিক শক্তির মূর্তি পুজো দেখা দিল। ক্রমেই বৌদ্ধধর্ম বিকৃত থেকে বিকৃততর হতে থাকে। আস্তে আস্তে বৌদ্ধধর্ম তার আপন সত্তাকে হারিয়ে অর্থ-শূন্য যুক্তিবাদ অথবা ইন্দ্রজালের কুল-কুণ্ডলীনীতে ঘুরপাক খেতে খেতে 'বজ্রযান' 'কালচক্রযান' 'শূন্যযান' "মন্ত্রযান" ইত্যাদি আখ্যা লাভ করে। ইতিমধ্যে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম নবরূপে বজ্রযান ধর্ম হয়ে প্রচারিত হয়েছে। এই তন্ত্রসর্বস্ব বজ্রযানই ছিল সর্বত্র বিস্তৃত। দশম শতাব্দীর শেষদিকে নেপাল কাশ্মীরের কোথাও কোথাও এবং লাদাক অঞ্চলে—"কালচক্রযান" (তান্ত্রিক) বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। মন্ত্রযানের অনেক কিছুই (আচার-অনুষ্ঠান) কালচক্রযানে সংক্রামিত হলেও কালচক্রযানীরা নিজেদের বজ্রযানী বলে থাকে।

ভারত তথা বাঙলায় যখন বৌদ্ধধর্ম প্রায় নিঃশেষিত তখন শুরু হল পশ্চিমী বিদেশী মুসলমানদের (আফগানিস্থান, তুরস্কের) বর্বর আক্রমণ। মুসলমানীলায় মেতে উঠলো মুসলমান সৈন্যরা। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে শুরু হল ধ্বংসযজ্ঞ ব্যাপকহারে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। চূর্ণ-বিচূর্ণ হল বুদ্ধমূর্তি; ধ্বংস হল মঠ-মন্দির, নির্দয়-নির্মমভাবে হত্যা করা হল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের। সুতরাং এই বিদেশী মুসলমান অত্যাচারের ফলে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিক পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হল বলা চলে। একমাত্র আরাকান রাজাদের প্রভাবে বাঙলার পূর্বদিকে অর্থাৎ চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই নতুন বিজয়ী শক্তি অগ্রসর হতে পারেনি বলেই দ্বাদশ শতাব্দীর পরেও বৌদ্ধধর্মের শেষ দীপশিখা সেখানে জ্বলতে দেখা গেছে।

চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম

চট্টগ্রামে "পণ্ডিত বিহার" নামে এক বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। নবম শতাব্দীতেই এটির প্রচার ও প্রসার ঘটে। সে সময় সমগ্র চট্টগ্রামই পণ্ডিত বিহার নামে পরিচিত ছিল। এই প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মঠ বা সংঘারামে দেশ-বিদেশের বহু পণ্ডিতই প্রায়ই একজোট হতেন। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ-র বর্ণনাতে (চট্টগ্রামের) ও এরূপ নির্দেশ দেখা যায়—বাঙলার পূর্ব-দক্ষিণদিকের সমতটে অবস্থিত অসংখ্য চৈত্যবিশিষ্ট এক পার্বত্য স্থান। "চৈত্য" বলতে সাধারণভাবেই মরোনত্তর দেহাংশ বা চিতাভস্ম সংরক্ষণের স্তূপ বা বৌদ্ধ মঠ মন্দিরকেই বোঝায়। সম্ভবত সেই চিতা থেকে উদ্ভূত চৈত্য শব্দ থেকেই চট্ট বা চট্টল শব্দের উৎপত্তি হয়। বাঙলায় পালযুগে মহীপালের রাজত্বকালে (৯৮৮—১০৩০ খৃঃ) আচার্য প্রজ্ঞাভদ্র (তিলোপা) এই পণ্ডিত বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্তের "বাঙলায় বৌদ্ধ-ধর্ম" পৃঃ ১৬৩ থেকে জানা গেছে—তিলোপা আদিতে চট্টগ্রামেরই লোক অর্থাৎ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। যে নারীর সহিত একত্রে তিনি যোগাভ্যাস করতেন সে নারী প্রথম জীবনে তিল পিষিয়া জীবনধারণ করিতেন। তার সঙ্গীরূপে তাহার নাম হয় তিলপাদ। এই তিলপাদ যখন বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মে দীক্ষিত হলেন তখন তার নাম হয় প্রজ্ঞাভদ্র। তিনিই প্রথম চট্টগ্রামে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য অধ্যক্ষ নিজে বিকৃত সংস্কৃত ভাষায় কয়েকটি প্রচার পুস্তিকা রচনা করেন যেমন—দোহাকোষ, শ্রীসহজসম্বর-রস্বাধিষ্ঠান, অচিন্ত্য মহামুদ্রানাম, তত্ত্বচতুরোপদেশ, মহাসমুদ্র প্রদেশ, ষড়ধর্মোপদেশ প্রসন্নদীপ এমন কত কি। এই প্রজ্ঞাভদ্রের প্রধান শিষ্য ছিল নাড়পাদ বা নারোপা পরে যার নাম হয় সিদ্ধাচার্য

জ্ঞানসিদ্ধি বা যশোভদ্র। যিনি পরে বজ্রবাদসার সংগ্রহ পঞ্জিকা নামে এক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শোনা যায় কনিষ্ঠ প্রভৃতি বৌদ্ধ পণ্ডিত বা লামারা প্রধান থেকেই (পণ্ডিত বিহার) বৌদ্ধধর্ম প্রচারে তিব্বতে গিয়েছিলেন। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে অশোক ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য "সোণক ও উত্তর" নামে দুজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে সুবর্ণভূমি অর্থাৎ ব্রহ্মদেশে পাঠিয়েছিলেন। জলপথে অথবা স্থলপথে যেভাবেই হোক না কেন যাবার সময় বৌদ্ধ প্রচারকরা অবশ্যই পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন। এসব কারণে বহু আগেই চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত বা চালু ছিল। খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই মগধদেশ থেকে বৌদ্ধরা বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য বাঙলার পূর্বদেশ চট্টগ্রামে এসে হাজির হলেন এমন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী লিখিত চট্টগ্রামের ইতিহাস গ্রন্থ থেকে। ধর্মপ্রচারে আরো যারা বেরিয়েছিলেন তাদের স্মৃতিও এই পণ্ডিত বিহারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। যেমন—লুইপাদ, শবরীপাদ, অবধূতপাদ, বুদ্ধজ্ঞানপাদ, অনঙ্গবজ্র, নানাবোধ, জ্ঞানবজ্র, অমোঘনাথ, ধর্মশ্রী মৈত্র প্রমুখরা।

চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহার ছাড়াও বাঙলার আরো কতগুলি বিহার বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে সেদিন প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। যেমন—পাহাড়পুরের সোমপুরী বিহার, পশ্চিম বাঙলার দিনাজপুর জেলার বাণগড়ের দেবীকোট বিহার, ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে বিক্রমপুরী বিহার, কুমিল্লার কণকস্তূপ সমগড়, ময়নামতীর আনন্দ রাজার প্রাসাদ, রূপনকন্যার প্রাসাদ, ভোজ রাজার প্রাসাদ নামের স্তূপ সমূহ শালবন বিহার প্রভৃতি। এ ছাড়া দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পালরাজবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা রামপাল গঙ্গা এবং করতোয়ার সঙ্গমস্থলে রামাবতী নামে যে নতুন রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন তার একাংশেই প্রসিদ্ধ জগদ্দল মহাবিহার। বাঙলাদেশে পালদের মত চন্দ্রবংশীয় রাজারাও বৌদ্ধ ছিল। বৌদ্ধ রাষ্ট্র—ব্রহ্ম ও আরাকানদের সঙ্গে ছিল এদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা। সে সময় চক্রশালা দেবগ্রাম ও রামুতেও কয়েকটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এই পাল বা চন্দ্ররাজবংশের রাজত্বের সময় বাঙলাদেশে মহাযান ধর্মের প্রসার ঘটে। এ সময় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের তিনটি শাখা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যেমন বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান। বাঙলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগ শ্রীহট্ট, ঢাকা, ময়মনসিং জেলায় বজ্রযান শাখার বিস্তৃতি দেখা যায়। মহাযানী বৌদ্ধকথা—শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ প্রভৃতি জটিল বৌদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য হত না, তাই তন্ত্রযানের সহজ সরল প্রক্রিয়া মানুষকে আকৃষ্ট করে তোলে। সে সময়ে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি কল্পনায় এবং তাদের পুজোর সময় আলপনা, আঁকা, স্তবস্তোত্র, যপ মন্ত্র, মুদ্রা প্রভৃতি বিভিন্ন ভঙ্গির ক্রিয়াকলাপও প্রাধান্য লাভ করে। এর ফলে বৌদ্ধধর্ম এবং তার দর্শন যায় হারিয়ে কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্য বা শিল্পের প্রভূত বিকাশ ঘটে।

রামপালের সময় (১০৮৪-১১৩০ খৃঃ) কালচক্রযান আবার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। পণ্ডিত অভয়াকর গুপ্তের কালচক্রযানের ওপর লেখা কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এই কালচক্রযানের ওপর নির্ভর করেই তৎকালীন বাঙলায় জ্যোতি[ষ] ও নক্ষত্রবিদ্যার অনেক উন্নতি ঘটে। পা[ল] যুগের স্থাপত্য বা শিল্পকলায় বৌ[দ্ধ] ভাস্কর্যের নিদর্শন, আজও ভারতবর্ষে[র] গৌরবের বস্তু। এছাড়া সাহিত্যেও বৌ[দ্ধ] সিদ্ধাচার্যরা সংস্কৃত মিশ্র সংস্কৃত অপভ্রং[শ] ও প্রাচীন বাঙলা ভাষায় অনেক বৌ[দ্ধ] গ্রন্থও রচনা করেন।
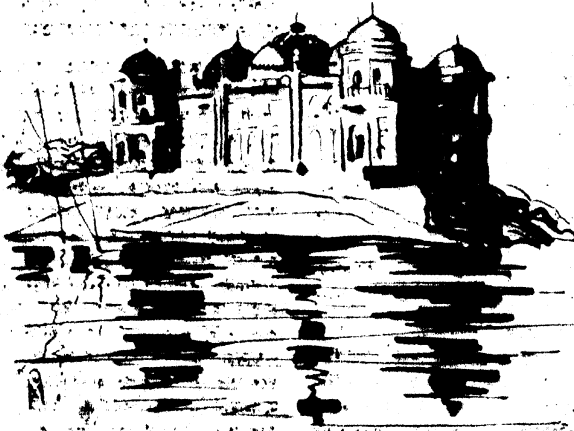
দ্বাদশ শতাব্দীতে সেনবংশের রাজ[ত্বের] সময় বাঙলায় বৌদ্ধধর্ম অনেকটাই হ্[রাস] পায়। সেনরাজবংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃ[ষ্ঠ]পোষক হওয়ায় বৌদ্ধদের তারা পাষণ্ড ভণ্ড বলে অভিহিত করে। তবে এ সম[য়] বৌদ্ধধর্মের তন্ত্র-মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ ধ[র্মের] যাগযজ্ঞ, হোম, মিলেমিশে একাকার [হয়ে] যায়। ব্রাহ্মণ (হিন্দুদের) দশ অবতারর[...] গণ্য হল। ব্রাহ্মণ পুরোহিত আর বৌ[দ্ধ] ভিক্ষুর মধ্যে আর কোন পার্থক্যই থা[কল] না। বৌদ্ধভিক্ষুরা আর বিহার বা সংঘা[রামে] থাকার প্রয়োজনবোধ করলো না। ভিক্ষুশূন্য বৌদ্ধ বিহারগুলি কঙ্কা[লের] মত জীর্ণ স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে র[ইল]। দ্বাদশ শতাব্দীর এই সময় বাঙলার [বৌদ্ধ] ধর্মের এমন পরিবর্তন খুবই লক্ষ্য[ণীয়]। পরবর্তীকালে তুর্কী আক্রমণের

রম্য বৌদ্ধবিহার—চট্টগ্রাম

ঐতিহাসিক সাত গম্বুজ মসজিদ। ঢাকা

...াদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে এই বৌদ্ধ ...হারগুলি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। একমাত্র গ্রাম অঞ্চলেই এর কিছুটা রক্ষা পেয়েছে ...ই সেদিনের তুর্কী আক্রমণের হাত ...কে। অনেক দিক থেকেই দ্বাদশ ...াব্দীর শেষ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর ...থম ভাগ মনে রাখার মত। এই ত্রয়োদশ ...তকেই অভ্যুদয় হয়েছিল বিখ্যাত বাঙালী ...দ্ধ কবি—রামচন্দ্র কবিভারতীর। তিনি ...তিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ। তর্ক ব্যাকরণ ...তি শ্রুতি, মহাকাব্য, আগম, অলংকার, ...দ নাটক জ্যোতিষ, সংস্কৃত শাস্ত্রে তিনি ...লেন অসাধারণ পণ্ডিত। তিনি স্বদেশে ...দ্ধধর্মের এমন দুরবস্থা দেখে সিংহলে ...লে যান, সেখানে তিনি ভক্তিশতক নামে ...কশ গাথা অবলম্বনে এক কাব্য রচনা ...রেন। এছাড়া বৃত্ত-রত্নাকর পঞ্জিকা ও ...বৃত্তমালা নামেরও দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। ...র এই অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে তৎকালীন ...সিংহলরাজ দ্বিতীয় পরাক্রমবাহু বৌদ্ধ ...বিকে 'বৌদ্ধাগম চক্রবর্তী' উপাধিতে ...ভূষিত করেন।

তিব্বতী পণ্ডিত তারানাথের 'বৌদ্ধ-...র্মের ইতিহাস' থেকে আমরা জানতে ...রি যে বাঙালী রাজা প্রতীত সেনের ...ত্যুর পর চিঙ্গালরাজ নামে এক বাঙালী ...জা বাঙলার সর্বত্র এমন কি দিল্লী পর্যন্ত ...হিন্দু-মুসলমানদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত ...রেন। শুধু তাই নয়, মুসলমানদের দ্বারা ...ধ্বংসপ্রাপ্ত বহু বৌদ্ধ বিহার, মঠ, ...মন্দিরেরও সংস্কার সাধন করান। তিনিই ...থম ব্রাহ্মণ ধর্মের সঙ্গে মিশ্রিত বৌদ্ধধর্মকে ...টিকিয়ে রেখেছিলেন। এমন তথ্য পাওয়া ...য় বেণ্ডেল সাহেবের রচনা থেকেও।

পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে তান্ত্রিক ...বৌদ্ধধর্মের জের টেনে 'নাথপন্থের' প্রকাশ ...টে। এই নাথ বা যোগীদের সহজীয়া ...মত প্রসারে বাঙলা ও বাঙলার যথেষ্ট ...আছে। ময়নামতী ও গোপীচাঁদের গান ...বা মীননাথ, লুইপাদ, গোরক্ষনাথ ...াদি নাথ গুরুদের নিয়ে রচিত বহু ...পদ পূর্ববাঙলার বাঙালী কবিদের ...ত।

পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে শ্রীচৈতন্যের ...বির্ভাব ঘটে। তখন আবার (ষোড়শ ...াব্দীর প্রথম ভাগে) গৌড়ীয় বৈষ্ণব ...র্মের প্রভাব বিস্তার হয় বাঙলাদেশে। ...রা বাঙলায় হিন্দুধর্মের এক নবজাগরণ ...রু হয়। অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্মের এক ...জোয়ার বাঙলার মাটিতে আছড়ে পড়লো। ...হলেও হিন্দু, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গতি ছিল ...ব্যাহত। বৈষ্ণবধর্মের স্রোতে গা ভাসিয়ে ...লেও ব্রাহ্মণদের দোর্দণ্ডপ্রতাপের হাত ...কে হিন্দু কেন বৌদ্ধরাও রেহাই পাননি। ...দিনের তন্ত্রচারী বাঙালী ব্রাহ্মণ সহজীয়া ...বপ্রেম ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যকে ...ন্ত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে নির্দেশ করে। ...দশ শতকের শেষার্দ্ধে শিখধর্মের ...ক গুরু নানক বাঙলায় এসেছিলেন। এ সময় তিনি বাঙলাদেশ দিয়ে কা...প ও পুরী গিয়েছিলেন। তারপর যখন গুরু তেগ বাহাদুর বাঙলাতে আসেন তখন পাটনা মালদহ প্রভৃতি স্থানে তিনি কোন গুরুদ্বার দেখতে পাননি। কিন্তু ঢাকায় এসে শিখদের মন্দির ও ধর্মশালা দেখতে পান। ঢাকায় শিখদের মন্দির দেখে গুরু তেগ বাহাদুর বলেন—ঢাকাতে দেখি শিখদের ধর্মভান্ডার জমিয়া উঠিয়াছে। গুরু হরগোবিন্দের শিষ্য সুখরাসহ এর শিষ্যবৃন্দই ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, গুরু গোবিন্দ ও বাঙলাদেশ ভ্রমণ করে গেছলেন।

এ পর্যন্ত বাঙলাদেশে ধর্মের আলোচনায় দেখা গেল যে চট্টগ্রাম এবং সংলগ্ন সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে হিন্দু বৌদ্ধ বা মুসলমান কোন ধর্মই কর্তৃত্ব প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। যখন যে রাজ্যে যে রাজা রাজত্ব করেছেন তখন সেই রাজার ধর্মই প্রজারা গ্রহণ করেছে। শেষের দিকে মুসলমান রাজত্বকালে ইসলাম ধর্মের প্রভাব পড়েছে বেশী। বারবার ধর্মান্তরণের ফলে ধর্ম বিশ্বাসে আস্থাহীনতা অথবা রাজসকাশে বিশেষ সুবিধা লাভের ইচ্ছায় অথবা ফকির দরবেশদের কেরামতী দেখে সেদিন অনেকেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দীক্ষিত হয়েছেন ইসলাম ধর্মে। হিন্দুরা তখন সংখ্যায় অল্প ছিল সে তুলনায় বৌদ্ধরা অনেক বেশী ছিল। এমন কি ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজারা তান্ত্রিক বৌদ্ধ ছিলেন। এ যুগেও বৌদ্ধধর্ম আবার বিপন্ন হয়। মুসলমানেরা একটু কায়েমী হতেই প্রথমেই তারা ধ্বংস করলো বৌদ্ধ মঠগুলি এবং বৌদ্ধ মূর্তিগুলিকে। ঐ সময়ই চট্টগ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত বিহার ধ্বংস করা হয়। পুরাতাত্ত্বিকদের ধারণা, জুম্মা মসজিদ আর রংমহাল পাহাড়ের কাছাকাছিই ছিল এই পণ্ডিত বিহার। বর্তমানে জেনারেল হাসপাতাল এবং তার লাগোয়া অঞ্চলেই ছিল সেদিনের বৌদ্ধবিহার—পণ্ডিতবিহার। ককসেসবাজারের ৬ মাইল দূরে সমুদ্র মধ্যে মহেশখালি দ্বীপে পাহাড়ের ওপর আদিনাথ মন্দিরের কাছে বৌদ্ধ স্তূপ ও বুদ্ধ প্রতিমা শোভিত গোরিখাবাটা বিহার, চট্টগ্রাম থেকে ২৩ মাইল দূরে সীতাকুণ্ডে বুদ্ধ পদচিহ্ন শোভিত বৌদ্ধ বিহারটি ঐ সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পণ্ডিত বিহার ধ্বংসের পর বাঙালী বৌদ্ধদের কাছে আর কোন ধর্ম পুস্তিকা বা আচারবিধি কিছুই থাকলো না। বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও আস্তে আস্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। শতাব্দীকাল ইসলামী রাজত্বে থাকায় এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও তার মানবতাবাদ সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে, বিশেষ করে রাজকীয় সুবিধাভোগের সম্ভাবনায় অনেকে (বিরাট অংশই) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিল। স্থানীয় বৌদ্ধেরা ইসলামী ধর্ম গ্রহণ করে ফেলায় কিছু বৌদ্ধ মন্দির মসজিদে রূপান্তরিত হল। মূর্তিগুলো সরিয়ে ফেলা হল। আজো বাঙলাদেশে 'বুদ্ধের মোকাম' নামে একজাতীয় উপাসনাগার আছে। সেগুলির সঙ্গে মসজিদের কোন সম্পর্কই নেই, লম্বা লম্বা ঘর দেখে পণ্ডিতদের অনুমান এক সময় এগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ছাত্রাবাস ছিল।

বাঙলাদেশে বহু ধর্মমতের উত্থান-পতন একদিকে যেমন সংশ্লেষণ জাত বহু নবধর্ম ও সংস্কৃতির অভ্যুদয় হয়েছে তেমনি সম্ভব হয়েছে বহু ধর্মমতের সহঅবস্থান। কৌল, নাথ, অতিচারী অবধূত, সহজিয়া, আউল, বাউল, ফকির দরবেশ, থেকে শুরু করে সাধু, সন্ত, মঠ মোহান্ত পর্যন্ত একাকার হয়ে গেছে মহান মানবপ্রেমে উন্মুখ হয়ে, কখনো আবার পরস্পরের প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে বিপন্ন করে ফেলেছে নিজেদের তবুও সমন্বয় সাধনই ছিল বাঙলা ও বাঙালীর প্রধান লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য তুলে ধরা হল—'মুসলমান অধিকারের পর নতুন সমাজে যা অনাচার দেখা দিল, বৌদ্ধধর্ম শেষে তাদের মধ্যে নিবদ্ধ হয়ে পড়ল এবং তারা ক্রমে প্রজা উপাসে, বোধিসত্ত্ব ভুলে গেল। ভুলে গেল 'শূন্যবাদ', বিজ্ঞানবাদ, করুণাবাদ, দর্শন, শীল, বিনয় সব ভুলে গেল। রইল জনাকয়েক মূর্খ ভিক্ষু অথবা ভিক্ষু নামধারী বিবাহিত পুরোহিত। তারাই নিজের মত করে বৌদ্ধধর্ম গড়ে তুললো।' বাঙালী বৌদ্ধরা কতকগুলি পুজো—লক্ষ্মীপুজো, দুর্গাপুজো, সরস্বতী পুজো, ষষ্ঠীমাতী, মগধেশ্বরী, শনি, মনসা, ডাকিনি, নবগ্রহ, গ্রাম্য দেবদেবীর পুজো, কার্ত্তিক ব্রত এমন কত কি দেবদেবীর পুজো করতো। পুজোয় পশু বলি দেবার রেওয়াজ ছিল। তারা ভোগ দিত পীরের দরবারে। ভোগ এক্ষেত্রে অবশ্য 'সিন্নী'। সত্যনারায়ণ-এর সিন্নী হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম ও জাতিনির্বিশেষেই দেওয়া প্রথা ছিল।

নাটক জমে ওঠে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে। মীর মহম্মদ কাসেম খাঁ যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে বাঙলাদেশের ভার তুলে দেন, বাঙলাদেশ ছাড়াও সেকালের ত্রিপুরা প্রদেশও ছিল ইংরেজের আওতায়। সমগ্র বাঙলা যখন ইংরেজের কুক্ষিগত, ইংরেজ যখন শাসনযন্ত্র কায়েম করবার জন্য তোড়জোড় শুরু করেছে ঠিক সেই সময় খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ১৮১২ খৃঃ লণ্ডন ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি বাঙলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে সর্বপ্রথম খৃষ্টধর্ম প্রচারের কাজ শুরু করে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পর খৃষ্টানরা কিছুটা সুবিধে করতে পারে। তবে তার আগে পর্যন্ত বাঙলাদেশে হিন্দু-মুসলমান এবং বৌদ্ধধর্মই প্রধান ছিল। তার মধ্যে মুসলমানরাই ছিল বা আছে সবচেয়ে সংখ্যায় এবং শক্তিশালী।

জীবিকার সন্ধানে

আমি লাইফ ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট।

অনেকেই হয়তো পরিচয় শুনে একটু চমকে উঠবেন। ইন্সিওরেন্স এজেন্টের সেই সুপরিচিত চেহারার সঙ্গে আমার যে অনেক গরমিল। তা যে সেই সেকথা আমিও অস্বীকার করবো না। এতোদিন পুরুষরাই ছিলেন এক্ষেত্রে একমেবাদ্বিতীয়ম। এবং এই চেহারার একটা বিশেষ রূপ ছিল এক-সময়ে। একহাতে পেটমোটা ব্যাগ, অন্যহাতে ছাতা আর গায়ে সুতীর কোট। এই ছিল ইন্সিওরেন্স এজেন্টের চিরপরিচিত চেহারা। আর তিনি যে পুরুষ সেকথা তো বলাই বাহুল্য। তাঁকে সবাই খুব ভাল নজরে দেখতেন না। অনেকেই তাঁর সংস্রব এড়িয়ে চলতে চাইতেন। বিশেষতঃ তাঁর পরিচয় পাওয়ার পর। কারণ, ইন্সিওরেন্সের সঙ্গে অনেকেই মৃত্যুর একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক খুঁজে পেতেন। তাঁদের ধারণায়, ইন্সিওরেন্স করলেই মৃত্যু অবধারিত। সাধ করে কে আর নিশ্চিত মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করতে চায়, বলুন? তাই মনেপ্রাণে অনেকেই এহেন ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতেন। আবার কেউ কেউ ইন্সিওরেন্সের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে এজেন্টকে তেড়ে মারতে যেতেন। এক্ষেত্রেও ভয় সেই একই—মৃত্যুভয় যার নাম।

অথচ মজার ব্যাপার দেখুন যে, আমরা এজেন্টরা কিন্তু কোনসময় কারো মৃত্যু কামনা করি না। বরং আমরা চাই যে, যিনি ইন্সিওরেন্স করবেন তিনি দিব্যি হেসেখেলে বেঁচে থাকুন এবং পলিসির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর নিজের টাকা বুঝে নিন। আসলে আমাদের উদ্দেশ্য হলো একদিকে টাকা জমানোর অভ্যাস গড়ে তোলা আর অন্যদিকে হঠাৎ কোন অঘটন যদি ঘটে যায় তবে ছেলেপুলে নিয়ে পরিবারটা যেন পথে না বসে। এমনিতেই তো আমাদের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে টাকা জমানো প্রায় অসম্ভব। তাইতে আনতে খাইয়ে কুলোয় না। এরই মধ্যে ভবিষ্যতের পথ চেয়ে কিছু সঞ্চয় করা দরকার। সেই সঞ্চয় যাতে সহজে হয় সেজন্যই তো আমরা সকলকে অনুরোধ করি ইন্সিও-রেন্স করতে।

আমাদের উদ্দেশ্য সাধু হলেও তা বোঝাতে অনেকদিন লেগে গেছে। এখন অনেকেই ইন্সিওরেন্সের ব্যাপারে আগ্রহী। আমার মনে হয় যে, আগেকার এজেন্টদের পোষাক আর ব্যাগ-ছাতাই ইন্সিওরেন্সের সুফল প্রচারে বিলম্বের কারণ। এখন আর সেই টিপিক্যাল এজেন্ট খুঁজে পাওয়া যাবে না। এবং সেই সঙ্গে আমরাও এজেন্টের কাজ নিয়েছি। এতোদিন যা ছিল পুরুষের এক-চেটিয়া সেখানে এখন আমরা এসেছি। এতো আমাদের কম গর্বের কথা নয়। নিঃসন্দেহে আমরা নতুন প্রতিশ্রুতির বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রাখবো। যদিও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রাখার জন্য ব্যাগ এবং রোদবৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য ছাতা আমরা আজো ব্যবহার করি তবুও আমাদের অস্পৃশ্য রাখার সংস্কার এখন আর তেমন নেই।

আমাদের কাজের পরিশ্রম খুব বেশি। এজন্য খুব খাটতে হয়। ফাঁকির কোন অবকাশ নেই। অবশ্য নিজের ফাঁকি নিজে বোঝা খুব শক্ত। কিন্তু আমাদের কাজটা হলো ঠিক ব্যবসার মতো। ব্যবসায়ী যেমন নিজের খুশিমতো কাজ করেন আমরাও তেমনি। ব্যবসাদার বোঝেন যে, কাজ করলেই লাভ আর ফাঁকি দিলেই ক্ষতি। আমাদেরও এই সত্যটুকু মেনে চলতে হয়। ঘরে বসে থাকলে কেউ আমার কাছে এসে সেধে ইন্সিওরেন্স করবে না। তাই ছুটতে হয় আমাকেই। অফিসে অফিসে লোকজনের সঙ্গে গিয়ে কথা বলতে হয়। এজন্য সারাদিন প্রায় চরকির মতো ঘুরি। টালা থেকে টালি-গঞ্জ পর্যন্ত আমাদের অক্লেশ যাতায়াত।

প্রথম প্রথম অফিসে গিয়ে কথাবার্তা বলতে একটু অসুবিধা হয়। বিরাট অফিসের কোন একটা ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক তাকাই। ঠিক কার সঙ্গে পরিচয় করলে আমার কাজের সুবিধা হবে সেটা বুঝে নিতে হয়। আর আপনাদের আশীর্বাদে সে দক্ষতা আমাদের সকলেরই আছে। যেই বোঝা হলো অমনি গুটিগুটি এগিয়ে যাই সেই টেবিলের দিকে। একথা সেকথার পর একটা চেয়ার টেনে বসি। আরো দু-একটা কথা বলি। ইতিমধ্যে আমার নিজের পরিচয় দিয়ে ফেলেছি। তখন আমার আগমনের উদ্দেশ্য বুঝতে আর তাঁর বাকি থাকে না। সেদিন আর বেশি দেরি করি না। মোটামুটি ইন্সিওরেন্সের নানা স্কীম নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করি। উদ্দেশ্য, যাতে সব জিনিসটা তিনি বুঝে নেন এবং সহকর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে [illegible] বেশ খানিকটা এগিয়ে রাখেন।

নির্দিষ্ট দিনে আবার যাই। বেশ বুঝতে পারি যে, আমার উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হয়েছে। মনটা তখন খুশিতে ভরে ওঠে এই ভেবে যে, আরো একটা নতুন আস্তানা পাওয়া গেল। আর বেশ বুঝি যে, আমার কাজ ষোলআনা এগোয়নি তাহলেও অখুশি হওয়ার উপায় নেই। মনে মনে অপ্রসন্ন হলেও মুখে হাসি রাখতেই হবে, এটাই হলো আমাদের সাকসেস-সিক্রেট। সব শুনে নিয়ে এবার তাঁকে অনুরোধ করি আমাকে কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার। তাঁর সঙ্গে টেবিলে টেবিলে ঘুরে দু-চারজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করি। সব কথা খুলে বলি। দু-একজন সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যান। অনেকেই সময় নেন একটু ভাবনা চিন্তার।

দু-একজন রাজী হলো তো ভাল। আবার কেউ রাজী না হলেও আমার কোন অসুবিধা নেই। যাঁরা আগ্রহ দেখালেন তাঁদের কল্যাণে আমার অফিসে যাতায়াতের পথটা প্রশস্ত হয়ে গেল। আর মজার কথা যে, মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত কারো কাছে সঞ্চয়ের ব্যাপার কখনো বিস্বাদ বহন করে আনে না। সবাই এর গুরুত্ব বোঝেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সঞ্চয়ে আগ্রহী। এটাই অন্ততপক্ষে আমার ধারণা। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে, স্যালারি সেভিংস স্কীমেই সকলের আগ্রহ বেশি। প্রিমিয়াম জমা দেওয়ার ঝামেলা নেই। মাস মাস মাইনে থেকে টাকা কেটে নেওয়া হয়। হিসেব করে প্রতি মাসে টাকা জমাতেও হয় না। একসঙ্গে খুব একটা চাপও পড়ে না। আর আমাদের মতো মাঝারি আয়ের ক্ষেত্রে কেটেকুটে যা হাতে আসে সেটাই হলো মাসিক রোজগার এবং তার উপরই বাজেট করা হয়। তাই স্যালারি সেভিংস সকলের মনেও ধরে। তবে এজন্য আমাকে ছোটাছুটি করতে হয় খুব। কোন কোন অফিসে হয়তো স্যালারির সেভিংসে টাকা কাটার অর্ডার নেই। সব ব্যবস্থা আমাকে করতে হয়। অর্ডার বার করাতে হয়। এটুকু কষ্ট অবশ্য করতেই হবে। নাহলে যে নিজের ব্যবসা মাটি হয়ে যাবে।

ইদানীং ইন্সিওরেন্স সম্বন্ধে অনেকের আগ্রহ বেড়েছে। এর একটা মূল কারণ, ইনকাম ট্যাক্সের হাত থেকে রেহাই পাওয়া। তাই এই সুযোগে আমরা অনেক কেস পেয়ে যাই। এমনি ইন্সিওরেন্সের এজেন্টের খুব দুর্নাম। কাজ করতে আসার আগে পর্যন্ত এটা তেমনভাবে উপলব্ধি করি নি। কেউ কেউ এমন কথাও মুখের উপর বলে দেন যে, ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট-দের উপর তেমন ভরসা করা যায় না। তখন তাঁদের সব অভিযোগ শুনতে হয়। এবং প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এটা তাঁর নিজের ঘটনা নয়, অন্য কারো কাছ থেকে শোনা। সব কথা শুনে [illegible] হয় এবং বেশ ধৈর্য নিয়ে। তারপর আবেদন রাখি যে, এই তো আমি আপনা-দের খুব কাছেই আছি। আমার কাছে একটা পলিসি করে দেখুন না। সকলের সুযোগ এবং আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা [illegible]

সহজে রাজি হন না। করছি আর করবো এই দুটো কথা আমাকে খুব শুনতে হয়। কিন্তু কোন সময়ই হাল ছাড়ি না। যেদিনই দেখা হয় একবার মনে করিয়ে দিই যে, এবার করে ফেলুন, আর দেরি করবেন না। কাজ আদায়ের জন্য বলি যে, একটু তাড়াতাড়ি করুন না হলে আমার কোটা পূর্ণ হচ্ছে না। এদিকে বছর শেষ হয়ে এলো। এমনিভাবে অনেক সময় নষ্ট হয়। আবার কোন কোন সময় খুব সহজে কাজ হয়ে যায়। বেশি কথা খরচ করতে হয় না। সঞ্চয়ের আগ্রহে আর ভবিষ্যতের কথা ভেবে অনেকেই ইন্সিওরেন্স করে নেন। অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেমন সফল হই না তেমনি একনাগাড়ে ব্যর্থতার বোঝাও বয়ে বেড়াতে হয় না। একজন হয়তো নিদারুণ ভাবিয়ে দেখালেন আবার আর একজন হয়তো দারুণ আগ্রহে ইন্সিওরেন্স করালেন। আমাদের ব্যবসার এটাই স্বাভাবিক রীতি। আর শুধু আমাদেরই বা কেন, সব ব্যবসার এই একই নিয়ম।

কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় আমাদের একটু অতিরিক্ত খাটতে হয়। প্রিমিয়াম জমা দেওয়াটা প্রায় আমাদের দায়িত্বের মধ্যে। আর এদিকে আমাদের লক্ষ্যও রাখতে হয়। সবাই যাতে সময় মতো প্রিমিয়াম জমা দেন সে জন্য তাগিদ দিতে হয়। অনেকে আমার হাতেই টাকা দিয়ে দেন। টাকা জমা দিয়ে রসিদ পৌঁছে দিতে দেরি হলে চলবে না। এতে অনেকের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাঁরা মনে করেন যে, আমি সেই টাকা খরচ করে ফেলেছি সম্ভবত। তাই রসিদ দিতে দেরি হচ্ছে। এ-রকম ধারণা আমার ব্যবসার পক্ষেও ক্ষতিকর। তাই আমাকে খুব সতর্ক থাকতে হয়। টাকা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা জমা করে দিই। তবু, কোন কোন সময় ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যায়। কেউ হয়তো একটা প্রিমিয়ামে পিছিয়ে আছেন। এবং সেটা তার খেয়ালও নেই। হঠাৎ একবার তিনি দাবি করে বসলেন যে, প্রিমিয়াম তাঁর আপ-টু-ডেট দেওয়া আছে এবং সে রকম রসিদ তাঁর চাই। তখন আমি পড়ি ফ্যাসাদে। অনেক করে তাঁকে বোঝাতে হয়। তিনি কবে কবে আমাকে টাকা দিয়েছিলেন সে-সব তাঁকে খুঁটিয়ে শুনি। কিন্তু তিনি তাঁর জেদ থেকে নড়তে চান না। এ-রকম ক্ষেত্রে মান বাঁচানোর জন্য একটা প্রিমিয়াম আমারই দিয়ে দেওয়ার কথা, কিন্তু তাহলে যে, আমার দুর্নাম হয়ে যাবে। তাই সেই একই অফিসের আরো যাঁরা আমাকে জমা দেওয়ার জন্য টাকা দেন তাঁদের কানে কথাটা তুলি এবং তারপর সবাই মিলে তাঁকে বোঝাই। এতক্ষণে তিনি রাগ মানেন।

এ সময়টা আমার খুব কষ্ট হয়। এতো খাটাখাটনি করি তবু অযথা বদনামের ভাগী হতে হয়। এমনিতেই তো ইন্সিওরেন্স সম্বন্ধে কতজনে কতো কটূকাটব্য করে। সে-সব আমাদের শুনতে হয়। নিন্দা শুনে কাজ শুরু করি। কিন্তু ফিরে আসি প্রশংসা নিয়ে। তারপর তাঁদের কথা তাঁদের ফিরিয়ে দিয়ে বলি, এতো যে অভিযোগ করলেন ইন্সিওরেন্সের নামে সে-সব তো কই টিকলো না। আসলে আপনারা একটা মিথ্যে ধারণার আশ্রয় নিয়েছেন। আর আমিই সে ধারণা কাটিয়ে দিলাম। তবে যখন টাকা-পয়সার ব্যাপারে বদনাম শুনতে হয় তখন মনটা সত্যি খুব ছোট হয়ে যায়। কিন্তু রাগ করার উপায় নেই। নিন্দা, বদনাম আর প্রশংসার সেই ঋষি বাক্য শিরোধার্য করে আমাদের স্থির থাকতে হয়।

এছাড়া আর একটা কাজ আমাদের করতে হয়। কারো হয়তো পলিসি পেড-আপ হয়ে গেছে। সেই টাকাটা কিভাবে ফেরৎ পাওয়া যায় এবং কত টাকা ফেরৎ পাওয়া যাবে সে খবর আমাদের এনে দিতে হয়। এ-সব ক্ষেত্রে অনেক সময় পলিসি ছাড়া শেষ প্রিমিয়ামের রসিদ পর্যন্ত থাকে না। তখন অফিসে গিয়ে একে তাকে ধরে রেকর্ড পত্র সব বের করে আগে দেখতে হয় তিনি কত টাকা জমা দিয়েছেন এবং তারপর হিসেব কষতে হয় তিনি কত ফেরত পাবেন। কিন্তু মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে পেড-আপ পলিসির অনেক টাকা কাটা যাওয়ায় অনেকেই মাঝ পথে টাকা তুলতে রাজি হন না। আবার কেউ কেউ টাকা তুলেও নেন। তবে সবাইকে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি যে, মেয়াদ শেষ হওয়ার পর টাকা তোলাই ভাল এবং প্রফিট সমেত টাকাটা পাওয়া যাবে।

এতো গেল আমার কাজের কথা। এবার আমার কথা একটু শুনুন। জীবনে কোন-দিন ভাবিনি যে লাইফ ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট হবো। বরাবরই ভাবতাম যে, লেখা-পড়া শিখে চাকরি করবো। আর যদি কপালে থাকে কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় বসবো। কিন্তু তার কোনটাই যে হয় নি সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। পাশ করে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে মা-বাবা বিয়ে দিয়ে দায় সারলেন। কথাটা খুব হালকা করে বললাম। তবে এটাই আমাদের দেশের রেওয়াজ এবং এখনও কয়েক পুরুষ এই ধারা অব্যাহত থাকবে। আমারও প্রথম সন্তান মেয়ে। তাই এই ভাবনাটাই মাথায় প্রথমে আসে।

বিয়ের পর চুপচাপ বসে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর গোড়া থেকেই কিছু একটা করবো এ-রকম বাসনা ছিল, শুধু ঘরকন্না নয়। এদিকে সমস্যা দেখা দিল, কি করবো তাই নিয়ে। গোটা কয়েক চাকরির ইন্টারভিউ দিলাম, কিন্তু কনে দেখে পছন্দ না হওয়ার মতো উত্তর পেলাম যে, পরে জানাবো। কোথাও কোন পথ পাচ্ছি না। অথচ মনের মধ্যে দারুণ আকাঙ্ক্ষা কিছু একটা করার। আর চোখের সামনেই দেখতে পেলাম যে, দিনে দিনে চাকরির বাজার খুব কঠিন ঠাঁই হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে আমার এক আত্মীয় পরামর্শ দিলেন লাইফ ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট হবার। এতে কোন মাইনে নেই। সবটাই নির্ভর করবে নিজের কর্মক্ষমতার উপর। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবটা প্রায় লুফে নিলাম। কারণ, আরো দেরি করতে আমার ধৈর্য ছিল না।

এজেন্ট তো হলাম। কিন্তু কাজের তো কিছুই জানি না। আমার ডেভেলপমেন্ট অফিসার আমাকে সব বুঝিয়ে দিলেন। তিনি উৎসাহ দিয়ে বললেন, মেয়ে এজেন্ট আমাদের খুব বেশি নেই। তবে আপনারা এগিয়ে এলেই তো আরো মেয়েরা উৎসাহ পাবে। তিনি নানা উদাহরণ দিলেন। তার মধ্যে যেটা আমার খুব মনে ধরেছিল তা আজো আমার স্পষ্ট মনে আছে। তিনি বললেন, এই তো হাইকোর্টের দিকে তাকিয়ে দেখুন না। একদিন যেখানে কোন মহিলা ভীরু পদক্ষেপে ঢুকতেন আজ সেখানে কতো মেয়ে প্র্যাকটিস করছেন। এমনি-ভাবে মেয়েরা ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র এবং স্বাধীন জীবিকা-উপার্জনে। কথাটা আমার খুব মনে ধরেছিল। আমার মনে কি রকম একটা সংকল্প দানা বেঁধেছিল, এই সম্পূর্ণ অপরিচিত অথচ স্বাধীন জীবিকায় আমাকেও সফল হতে হবে।

সংকল্প আজো আছে। সাফল্যের জন্য সংগ্রামী মেজাজও আমার হ্রাস পায় নি। অফিসে সকলের কাছ থেকেই অকুণ্ঠ সহযোগিতা পাই। প্রয়োজনে একগাদা ধুলো ঝেড়ে পুরনো রেকর্ডও বের করে দেন কেউ কেউ। আবার পার্টির কাছ থেকেও একই রকম সহযোগিতা পেয়ে থাকি। কোন কোন অফিসে এক একজন আমার জন্য অনেক কেস করে দেন। এঁদের সকলের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

এক অচেনা পথে চলতে গিয়ে নিন্দা আর প্রশংসায় সকলকে আমি আপন করে নিতে পেরেছি। এটাই আমার বড় সাফল্য এবং সংকল্প সাধনের প্রথম সিঁড়ি ভাঙা। আর কিছু না হোক এখানে এসে যা পেলাম ধরা-বাঁধার চাকরিতে জীবনের শেষে হিসেব মেলাতে গিয়ে তার কণামাত্রও হতো দুর্লভ।

একদিন অনেক মেয়ের কলকাকলীতে এই জীবিকা মুখর হবে। সেদিন একথা ভেবে আমার গর্ব হবে যে, ও'রা আমারই উত্তরসূরী।

—প্রমীলা

প্রাক-বিবাহে প্রস্তুতি

স্টেশনারী দোকানের ভদ্রলোক এতক্ষণ মেয়েটির দিকেই তাকিয়েছিলেন, কান খাড়া করে ওর কথা শুনছিলেন, হঠাৎ মেয়েটি তাকাতেই চোখাচোখি। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললেন, 'একটু তাড়াতাড়ি করবেন, তিন মিনিট প্রায় হয়ে এলো।'

তারি বয়ে গেছে ভদ্রলোকের কথা শোনায়। দরকার পড়লে ন' মিনিট কথা বলে তার পয়সা দিয়ে যাবে এরকমই একটা উপেক্ষার মুখভঙ্গি করে মেয়েটি ভদ্রলোকের দিকে তাকালো। ভদ্রলোক বোধহয় অপ্রস্তুত হলেন। কি একটা কাজে ফের মনোনিবেশ করতে চেষ্টা করলেন।

মেয়েটির চাঞ্চল্য যেন পূর্বাপেক্ষা অনেক বেড়ে গেল। মুখটা হালকা হাসিতে উদ্ভাসিত হল। মনে হল ওপাশের কোন রসিকতা উপভোগ করছে।

মেয়েটির পরনে হালকা হলুদ শাড়ী ব্লাউজটা প্রায় শাড়ীর কাছাকাছি রঙ, কানে বড় দুটো রিং, মুখের প্রলেপটা একটু বেশী উজ্জ্বল, দীঘল চোখ, চোখে সামান্য কাজল কালি, মুখে হাসি, ঠোঁটে আবছা আবির রঙ, দাঁড়ানোর ভঙ্গি লবঙ্গলতিকা। এহেন আধুনিকা নিজের বিয়ের মার্কেটিং নিজে করবে এতে আর অবাক হবার কি আছে! তার ওপর পাত্র যদি তার পূর্ব-পরিচিত প্রেমিক হয়।

এবার সমস্ত শরীরের সঙ্গে মাথা দুলিয়ে বাঁ কানে হাত চাপা দিয়ে বললো, 'শোনো। এখুনি ফোন ছেড়ে দেব অনেক লাইন পড়েছে, একটা দেখেশুনে কমপ্যাক্ট কিনবে। ভাল কথা, সঙ্গে একটা আইব্রো কিনতে ভুলো না।'

দশকবৃন্দ কেমন অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।

মেয়েটি আবার শুরু করলো, 'একটা হেয়ার টনিক কিনবে। শোনো, সব কিন্তু নিউ মার্কেটের হওয়া চাই। ওখানের জিনিস ছাড়া আমার পছন্দ হবে না।'

এরপর অনেকক্ষণ রিসিভার কানে তুলে চুপ করে ওপক্ষের কথা শুনলো, 'শোনো', হালকা শব্দে একটু হাসি ছুঁড়ে বললো, 'ফোন এক্ষুনি ছাড়ছি। তোমার বস্‌কে একটু রোমান্টিক হতে বোলো। এত হাঁকডাক কিসের? অবশ্য কতদিন আগে বিয়ে করেছে বেচারা—সব ভুলে গেছে। বল না তা প্রায় তিন যুগ হবে তো?'

ওপক্ষ এর জবাবে তার বস্ সম্বন্ধে কি বললো জানি না তবে নিশ্চয়ই সেও রসিকতা করে দুচার কথা বলতে ছাড়ে নি।

'শোনো'—আবার মেয়েটি শুরু করলো। আমি কিরকম অবাক হয়ে শুনছিলাম প্রতি লাইনের শুরুতেই একবার করে 'শোনো' কথাটি। ওপক্ষ তো নিশ্চয়ই শোনার জন্য রিসিভার উঁচিয়ে আছে, যতক্ষণ না এ শ্রীমুখ দেখা যায়। 'একটা কলভেণ্ডার ডিউ'-এর 'ওডিকোলন' কিনতে ভুলো না।'

সম্ভবত ওপক্ষ বলছিল শুধু ওডিকোলন কিনলেই চলবে একটা সেণ্ট চাই তো?

ওপক্ষের সবই আমার অনুমান। কিন্তু এপক্ষের কথাতে বেশ বুঝতে পারলাম অনুমান আদৌ ভ্রান্ত নয়। মেয়েটি বললো, 'না-না 'টুনুয়া' আমি জানি দারুণ গন্ধ সেণ্ট। ওসবের দরকার নেই। আজকালকার মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা উগ্র কিছুই ব্যবহার করতে পছন্দ করে না। সেণ্টের দরকার নেই। ওডিকোলন এর হালকা গন্ধই বেশ আমেজ আনে। ওসব দারুণ দারুণ গন্ধ সেণ্ট আমার ভাল লাগে না, তুমি কিনবে না।'

কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে হাঁপাতে লাগলো। বুঝলাম আর বক্‌বক্ করার ধৈর্য নেই। মাথার চুল, শাড়ীর আঁচলে আলতো করে ডান হাতটা বুলিয়ে নিয়ে বেশ শান্ত স্বরে বললো, 'এখন ছাড়ছি, ফোন করার জন্য অনেকে অপেক্ষা করছেন, ছাড়ছি। দেখা হলে কিছু জানার থাকলে জেনে নিও। এগুলো আগে কিনে ফেল তো। ছাড়ছি—' বলেই আস্তে আস্তে রিসিভারটা রেখে দিল। তারপর ব্যাগ থেকে কতগুলো খুচরো পয়সা ঢেলে দি... মেয়েটি রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নি... মেয়েটির অন্তর্ধানের সঙ্গে সকলেই ... মুচকি মুচকি হাসছেন। দোকানের ভদ্র... একগাল হেসে বললেন, 'এতক্ষণ মে... ফোন করলো ইচ্ছে করলে একটি ... ততক্ষণে রকেটে চাঁদে পাড়ি দিতে পার... মাত্র কয়েকটা কস্‌মেটিকের জন্য এত ... নষ্ট।'

আমার সঙ্গে এক বান্ধবী ছিল। ... কিন্তু ব্যাপারটা এতক্ষণ বেশ উপভো... করছিল। এবার সে সুযোগ পে... ফিস্‌ফিস্ করে আমার কানের ... বললো, 'আজকালকার মেয়েদের হালচাল ... যেন কেমন-কেমন হয়েছে।'

আমি কোন কিছুর জবাব না ... শুধু বললাম, 'বাইরে গিয়ে ব... ব্যাপারটা কি।'

আমাদের কেনাকাটার কাজ সমাপ্ত ... রাস্তায় বেরিয়ে বললাম, 'শোনো, আজ... মেয়েদের রুচি অনেক পাল্‌টেছে। আ... মত আর গেঁয়ো গেঁয়ো সাজতে ... ভালবাসে না। অত্যধিক লিপস্টিক, ... পেণ্ট, উগ্র সেণ্ট দিয়ে নিজেদের ... সাজাবার মত দৃষ্টিভঙ্গি একালের মে... ত্যাগ করেছে। হালকা, পছন্দমত ... ব্যবহার করে নিজেদের রূপকে, বাড়াতেই ওরা ভালবাসে।

অঞ্জলি চৌ...

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

১) বাংলাদেশ থেকে আর একখানি ছবি

জহীর রায়হান কৃত 'জীবন থেকে
য়া'র পরে—অনেক পরে বাংলাদেশের
রী আর একখানি বাংলা ছবি সম্প্রতি
কাতা শহরে মুক্তিলাভ করেছে। এই
বখানিও তৈরী হয়েছিল ১৯৭১ সালের
৫ মার্চ রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য-
র সেই ভয়ঙ্কর বর্বর তাণ্ডব শুরু হবার
গে অর্থাৎ যখন বাংলা দেশের নাম ছিল
র্ব পাকিস্তান, তখন। ভারতস্থ গণপ্রজা-
ত্রী বাংলাদেশ হাই কমিশন নিবেদিত
সেস্ট্রো ফিল্মস-এর 'নতুন ফুলের গন্ধ'
বটিতে আগের ছবির মতো নেই কোনো
মা-আন্দোলন বা রাজনৈতিক চেতনার
ভূমি। এটি শুধু প্রেমের ছবি—প্রেম,
চ্ছেদ এবং পুনর্মিলন। প্রেমের ছবি বটে,
ন্তু কিছুটা অসাধারণত্ব আছে। একটি
ণ তরুণীর প্রতি প্রেম, শুধু অন্ধই নয়,
হায়ও। কাজেই এখানে প্রেমের জন্ম
ছে সহানুভূতি থেকে। মা-বাপহারা
নুর মামা তাকে তুলে দিতে চেয়েছিল
দুর্বৃত্তের হাতে স্রেফ টাকার লোভে।
দরই ভাড়াটে কবীর সানুর ঐ বিয়েতে
ত দেখে তাকে বিবাহমণ্ডপ থেকে তুলে
াছিল এবং পরে নিজে তাকে বিবাহ
াছিল। ছবি এঁকে আর কপয়সা রোজ-
হয়; তবুও দারিদ্র ওদের মনের
কে ছিনিয়ে নিতে পারেনি। কিন্তু হঠাৎ
শুনল শ'পাঁচেক টাকা খরচ করলে
তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। কিন্তু
া! সানু বললে, দরকার নেই আমার
য পেয়ে; আমরা বেশ আছি। কবীর
ন্তু নাছোড়বান্দা, পাঁচশো টাকা যোগাড়
তেই হবে। সে বেছে বেছে নিজের
া ভালো কয়েকখানি ছবি নিয়ে গেল
শহরে বেচতে। কিন্তু মুরুব্বি কই?
দুর্বিপাকে নিরপরাধ হয়েও সে চুরির
গেল জেলে। জেল থেকে খালাস হয়ে
ছুটল সানুর খোঁজে। কিন্তু কোথায়
! তার মামা আবার ষড়যন্ত্র ক'রে
ক সেই দুর্বৃত্তের কবলে সমর্পণ করতে
ইন জেনে সানু সকলের অজান্তে বাড়ী
স। পথে সে পড়ল এক মোটরের
য়। মোটরের মালিক সঈদ সাহেব তাকে
নিয়ে গেলেন হাসপাতালে। তিনি
তার আঘাতই সারালেন না, যথোচিত
ব্যয় করে তার দৃষ্টিশক্তিও ফিরিয়ে
লেন। তারপর তিনি তাকে নিজের
ত একটা কাজ দিলেন। চিত্রপরিচালক
সাহেব তার নাম রাখলেন সীমা।
কে তিনি নিজের মেয়ের মতো স্নেহ

ছদ্মবেশী / অনিল চট্টোপাধ্যায় ও মধুছন্দা (বোম্বে)

করতেন। ক্রমে সীমার নাম ছড়িয়ে পড়ল।
সে হল জনবন্দিতা চিত্রনায়িকা।

কবীর তার সানুর কোনো পাত্তা না
পেয়ে ফিরে গিয়েছিল তার আশ্রয়দাত্রী
রোজীর কাছে। ক্লান্ত, অবসন্ন পীড়িত
কবীরকে সেই আশ্রয় দিয়েছিল; নিজের
সেবায়, যত্নে সুস্থ করে তুলেছিল। তারপর
যখন সে জেনেছিল কবীর শিল্পী, তখন
সে কিনে এনেছিল ওর জন্যে রং, তুলি,
ক্যানভাস, ইজেল। কবীরের কাছে তার
সনির্বন্ধ অনুরোধ, সে যেন রোজির এক-
খানি ছবি এঁকে দেয়। কবীর রোজির
কাছে কৃতজ্ঞ; কিন্তু সানুকে সে ভুলবে কি
করে? কাজেই সে আবার বেরিয়ে পড়ে
সানুর খোঁজে। সিনেমার বিজ্ঞাপনে সে
দেখল, নায়িকা সীমার চেহারা অবিকল
তার সানুর মতো। চক্ষুকর্ণের বিবাদ-
ভঞ্জনের জন্যে সে কোনোক্রমে স্টুডিওতে
ঢুকে দেখল—কোনো ভুল নেই, সানুই
সীমাতে রূপান্তরিত। সে গেল সীমার
বাড়ী; ডাকল—সানু! কিন্তু সীমার মধ্যে
সানু মরে গেছে। তার মনে ধারণা জন্মে-
ছিল, কবীর তার চোখ ফিরিয়ে দেবার
অছিলায় তাকে ত্যাগ করেছিল। আজ সে
আবার তাকে ফিরে পেতে চায় যে আজ
সিনেমার সার্থক নায়িকা বলে। তাই সে
কবীরকে দরওয়ান দিয়ে অপমান করে
তাড়িয়ে দিল। কিন্তু কে তাকে বলে দেবে,
সে ভুল করেছে। বলে দিলেন সঈদসাহেব।
তখন সীমা ছুটল কবীরের সন্ধানে। কবীর
সীমার মিলন হল। আর রোজি? সে
আত্মহত্যা করে নিজের জ্বালা জুড়োলো।

পরিচালক মমতাজ আলী স্বরচিত
কাহিনীটিকে যে-ছন্দে আরম্ভ করেছিলেন,
ছবির শেষের দিকে সেই ছন্দ বজায় রাখতে
পারেননি। সন্দেহ হয়, ছবিটি যে-ভাবে
প্রদর্শিত হচ্ছে, সেইটিই এর পরিপূর্ণ রূপ
কিনা। কবীরের প্রতি সিনেমা-নায়িকা
সীমার দুর্ব্যবহার এমনই আকস্মিক এবং
অকল্পনীয় যে, দর্শক দৃশ্যটি স্বচ্ছন্দচিত্তে
গ্রহণ করতে পারে না; মনে হয় সানুর
মতো মেয়ে ঠিক এমন রূঢ় হতে পারে
না। কবীরকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব করার
জন্যে যথেষ্ট প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল।
আবার তেমনই সঈদ সাহেবের মুখের কথা
শুনেই তৎক্ষণাৎ মত পরিবর্তন করে

...নীতির জন্যে ...ওয়া সামনে ...রুদ্রকে ক্ষমা করে না কি? বরং রোজির ...টের স্পর্শ ও সার্থকতায় চিত্রিত। এবং চিত্র-পরিচালক সতীশ সাহেবের বেশভূষা চরিত্রটি আকর্ষণীয় এবং ...গ্রাহী।

অভিনয়ে প্রধান নায়িকা রূপে কবরী চৌধুরীর সহজ সাবলীল অভিনয় প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু চঞ্চলমতী সীমারেখে চরিত্রটি অসংগতিপূর্ণ হওয়ায় তিনিও বিশেষ রেখাপাত করতে পারেননি। মার-বিলাসিনী রোজির নিঃসঙ্গ জীবনের ব্যথা-বেদনা চমৎকারভাবে রূপায়িত করেছেন আনোয়ারা। নায়ক কবীরকে জীবন্ত করেছেন সরকার কবীর। সতীশসাহেবের ভূমিকাটিকে দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন মুস্তাফা। অপরাপর ভূমিকা দুর্বল।

ঢাকার স্টুডিও যে আমাদের কলকাতার যে কোনও স্টুডিও থেকে যান্ত্রিক দিক দিয়ে আধুনিক তার প্রমাণ বাংলাদেশ থেকে আগত দুখানি ছবিতেই মেলে। ছবির মধ্যে 'অপটিকস'-এর কাজের ছড়াছড়ি—বলা যেতে পারে প্রয়োজনাতিরিক্ত। টেকনিকের ব্যবহার হয় আর্টের পরিপোষণের জন্যে, টেকনিকের জন্যে টেকনিক নয়। তবু বলতে হয়, ছবির কলাকৌশলের সকল বিভাগের কাজই উচ্চস্তরের। কিন্তু গানের রচনাও যেমন দুর্বল, তেমনই গানগুলি সুপ্রযুক্ত নয়।

কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও 'নতুন ফুলের গন্ধ' বাংলা ছবির বাজারে সত্যিই নতুন ফুলের গন্ধ বয়ে এনেছে।

বিবিধ সংবাদ

প্রখ্যাত যাদুকর শ্রী পি, সি, সরকারের (জুনিয়র) বিদেশ যাত্রা : স্বর্গত যাদুসম্রাট পি. সি. সরকারের সুযোগ্য পুত্র শ্রী পি. সি. সরকার (জুনিয়র) সম্প্রতি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নবপরিণীতা স্ত্রী ও 'ইন্দ্রজাল'এর লোকজনসহ গত ১০ জুলাই জাপান রওনা হয়েছেন। ছয় বৎসর ধরে তিনি জাপানের বড় বড় শহরে এবং হংকং, হাওয়াই, তাইপে ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে তাঁর 'ইন্দ্রজাল' প্রদর্শন করবেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান যে, তাঁর আধুনিকতম ইন্দ্রজাল ভারতীয়-দের দেখাবার নিমিত্ত এই ছয় বৎসরের মধ্যে যখনই সময় পাবেন তখনই দেশে ফিরে আসবেন। শ্রীসরকার ইতিপূর্বে তাঁর স্বর্গত পিতার সংগে বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। এবার জাপান সফর 'ইন্দ্রজালের' দলবলসহ তাঁর নিজস্ব প্রথম সফর।

নবপরিণীতা স্ত্রীসহ প্রখ্যাত যাদুকর শ্রী পি. সি. সরকার (জুনিয়র)

বোম্বাইতে বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবার্ষিকী পূর্তি উৎসব

সম্প্রতি ইণ্ডিয়া কালচার লীগের উদ্যোগে এখানে বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শত-বার্ষিকী পূর্তি উৎসব পালিত হল। এই উপলক্ষে একটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটকের প্রতিযোগিতা ও আধুনিক নাটকের ধারা সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্যে নাটকের গতি-প্রকৃতি বিষয় আলোচনা হয়।

উৎসবটি উদ্বোধন করেন মহারাষ্ট্র সরকারের সাংস্কৃতিক বিভাগের ডিরেক্টর তুলজারাম চবানে। তিনি বলেন মহারাষ্ট্র সরকার ভাষা নির্বিশেষে সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করতে আগ্রহী—নাট্যচর্চা সঙ্গীতচর্চা ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁরা অর্থ সাহায্যও করে থাকেন। কলকাতা থেকে বিশেষ আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন নাট্যকার রমেন লাহিড়ী। কলকাতাস্থ উৎসব সমিতির যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীপি কে রায় ও শ্রীসুকৃতি রায়চৌধুরী।

উত্তর সাধক অভিনীত 'আমি' নাটক দর্শকদের মনোরঞ্জন করে। ইউনি থিয়েটার কয়ের মঞ্চস্থ করেন শতাব্দী পদাবলী'। বাঙালী এসোসিয়েশন (অম্বর-নাথ) অভিনীত 'বন্দরের কাল' নাটক নবে রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি। প্রতি-যোগিতার ফলাফল : শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা শতাব্দীর পদাবলী'। ২য় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা 'আমি'। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার—রামারমণ (শ. প.) শ্রেষ্ঠ পরিচালনা—রামারমণ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বিশু গোস্বামী।' শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—মানসী দাশগুপ্ত।

আধুনিক মারাঠি, গুজরাটি, বাংলা তেলেগু ও কানাড়া নাটকের ধারা সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন প্রঃ সদানন্দ মে... অমর জরিওয়ালা, রমেন লাহিড়ী, ডি... চারী ও এ শঙ্কর।

ঋত্বিক ঘটকের নতুন ছবি

চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাসে শ্রীঋত্বিক [illegible] একমাত্র পরিচালক যিনি নিজস্ব [illegible] ও বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত। অযান্ত্রিক, মেঘে ঢাকা তারা, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি ছবির [illegible] কাছ থেকে বেশ কয়েক বছর [illegible] কোন ছবি পাইনি। এবারে আমরা [illegible] তাঁকে ফিরে পাচ্ছি। শ্রীঘটকের [illegible] তাঁর 'যুক্তি তক্ক আর গপ্পো' সম্পর্কে [illegible] সংখ্যায় এই কলমে আপনাদের [illegible] সংবাদ পরিবেশন করেছি।

কিন্তু তার আগে তিনি অন্য একটি [illegible] কাজে অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। [illegible] নাম—তিতাস একটি নদীর নাম।

২০শে জুলাই ছবির শুটিংপর্বের [illegible] সঙ্গে চিত্রগ্রহণের কাজও শুরু করে [illegible]। প্রসঙ্গত [illegible]—শ্রীঘটক [illegible] ঢাকায়। [illegible] বাংলাদেশ [illegible] বাংলার চিত্রশিল্পের [illegible] পরিচালক শ্রীঘটকের কাজের ধারা বাঙলাদেশের সবাইকে বিস্মিত করেছে। ওখানকার কলাকুশলী যারা এ ছবির সঙ্গে যুক্ত তাদের প্রত্যেকের অভিমত—সৃষ্টির নেশায় মত্ত এত কঠোর পরিশ্রম করতে তারা ইতিপূর্বে আর কোন পরিচালককে দেখেন নি। দিন-রাত একটানা স্যুটিং করে একটুও তিনি ক্লান্ত হচ্ছেন না বরং খবরে প্রকাশ, এই ছবির সঙ্গে যুক্ত দুজন সহকারী কাজের চাপে অবশেষে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

ছবির স্যুটিং যাতে ব্যাহত না হয় তার জন্য বাঙলাদেশ সরকার মোটর, লঞ্চ, হেলিকপ্টার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস শ্রীঘটককে সরবরাহ করেছেন। শ্রীঘটক নদী-নালা, উন্মুক্ত আকাশের নীচে প্রাকৃতিক পরিবেশে সমানে স্যুটিং চালিয়ে যাচ্ছেন। খবরে প্রকাশ, এই সপ্তাহে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্যুটিং করছেন এবং সেখান থেকে তিনি সোজা ঢাকায় ফিরে যাবেন। এ ছবির শিল্পীতালিকায় আছেন—কবরী চৌধুরী, মুস্তাফা সিরাজ, রোজী, আনোয়ার প্রভৃতি জনপ্রিয় শিল্পীরা। চিত্রগ্রহণে আছেন—ওপার বাঙলার বিখ্যাত চিত্রশিল্পী বেবী ইসলাম।

প্রথম পর্যায়ের স্যুটিং শেষ করে শ্রীঘটক আগস্ট মাসের ১০/১২ তারিখ নাগাদ কলকাতায় ফিরে তাঁর যুক্তি-তক্ক আর গপ্পোর স্যুটিং শুরু করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে এই ছবিতে আর্থিক সাহায্য করছেন কেন্দ্রীয় সরকারের ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন সংস্থা।

মঞ্চাভিনয়

'ভুলছি না ভুলবো না': গত দু বছর পশ্চিমবাংলায় সন্ত্রাসের যে কালো ছায়া নেমেছিল তারই পটভূমিকায় রচিত একটি নাটক সম্প্রতি মঞ্চ অঙ্গনে পরিবেশিত হোল। নাটকটির নাম 'ভুলছি না ভুলবো না'। প্রযোজনা করলেন নট নাট্যমঞ্চ শিল্পীরা। এই নাটকের মধ্যে দেখানো হয়েছে কি করে একটি পরিবারের শান্ত একটি ছেলে ভ্রান্ত রাজনীতির নিষ্করুণ শিকার হচ্ছে। নাট্যকার সোচ্চারে শেষ-পর্যন্ত এখানে এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে হিংসার পথে মুক্তি কোনদিনই আসেনি, আসবে না।

নাটকের প্রায় প্রত্যেক শিল্পীই স্বচ্ছন্দ অভিনয় করতে পেরেছেন এবং সংঘবদ্ধ অভিনয়ের অটুট নিবিড়তাই সমগ্র নাটকটিকে অসাধারণ এক পরিবেশ দিয়েছে। অভিনয়ে ছিলেন প্রদীপ রায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়, নিবেদিতা বসু, সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, ভবানী পালচৌধুরী, বাসু বসু।

নাটকটির সুষ্ঠু নির্দেশনায় জগমোহন মজুমদার তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় ঠিকই দিতে পেরেছেন।

সানডে রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'স্বিধা': বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'স্বিধা' নাটকটি রঙ্গের আলোয় সার্থকতাবে কয়েকদিন আগে তুলে ধরেছেন সানডে রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা। নাটকটির সামগ্রিক প্রযোজনার

১৯৭২ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের অপরাজিত চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড়বৃন্দ

দর্শক

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

১৯৭২ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গল লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সূত্রে অপরাজিত অবস্থায় উপর্যুপরি তিন বছর লীগ চ্যাম্পিয়নশীপ পাওয়ার গৌরব লাভ করেছে। ইতিপূর্বে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৭১ বছরের ইতিহাসে মাত্র তিনটি ক্লাব—ডারহামস এল আই, মহামেডান স্পোর্টিং উপর্যুপরি ৫ বার) এবং মোহনবাগান (উপর্যুপরি ৩ বার ও ৪ বার। উপর্যুপরি তিন বছর লীগ বিজয়ী হলেও ইস্টবেঙ্গলের ১৯৭২ সালের মত কোন গোল না খেয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়নি। কোন গোল না খেয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে একমাত্র রয়েল আইরিশ রাইফেলস ১৯০১ সালে। রয়েল আইরিশ রাইফেলস ১৯০১ সালে সমস্ত খেলায় জয়ী হয়েছিল এবং একটা গোলও খায়নি—একই বছরে এই ধরনের রেকর্ড করে এ পর্যন্ত কোন দলই লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়নি।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন ইস্টবেঙ্গল যোগ্য দল হিসাবেই ১৯৭২ সালের প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। তারা ২৯টা খেলায় ৩৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ৪৯টা গোল দিয়েছে। অপরদিকে তাদের বিপক্ষে কোন দল একটা গোলও দিতে পারেনি।

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলা

লিডসে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ৪র্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যান্ড ৯ উইকেটে জিতে বর্তমানে ২—১ খেলায় (ড্র ১) এগিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, ইংল্যান্ডের এই জয়লাভের ফলে তাদের হাতেই কাল্পনিক 'অ্যাসেজ' খেতাব থেকে গেল। ১৯৭২ সালের শেষ ৫ম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভেও অ্যাসেজ খেতাব ইংল্যান্ডের হাতছাড়া হবে না। তখন ১৯৭২ সালের টেস্ট সিরিজের ফলাফল যা সমান দাঁড়াবে। ১৯৭১ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ড 'অ্যাসেজ' খেতাব জয়ী হওয়ার দরুণ ১৯৭২ সালের টেস্ট সিরিজের বর্তমান অবস্থা ইংল্যান্ডের সম্পূর্ণ অনুকূলে।

লিডসের হেডিংলে মাঠে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে এই নিয়ে ১৫টা টেস্ট ক্রিকেট খেলা হল। খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : অস্ট্রেলিয়ার জয় ৫, ইংল্যান্ডের জয় ৩ এবং খেলা ড্র ৭।

লিডসে ১৯৭২ সালের ৪র্থ টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া টসে জিতে প্রথমেই ব্যাট করার দান নিয়েছিল। কিন্তু এই সুযোগের কোন সদ্ব্যবহারই করতে পারেনি। লাঞ্চের সময় অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ছিল—৭৯ রান (১ উইকেটে)। লাঞ্চের পরই তারা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। যেখানে একসময় ২টো উইকেট পড়ে তাদের ৯৩ রান ছিল সেখানে ৯৮ রানের মাথায় তাদের ৭ম উইকেট পড়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার ৯৩ রানের মাথায় ৩য় ও ৪র্থ এবং ৯৮ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ ও ৭ম উইকেট পড়ে। ব্যাটিংয়ে কি শোচনীয় ব্যর্থতা! অস্ট্রেলিয়ার এই শোচনীয় হারের জন্যে সমস্ত কৃতিত্ব ইংল্যান্ডের ন্যাটা বোলার ডেরেক আন্ডারউডের। তিনি ৩১ ওভার বল দিয়ে ৩৭ রানের বিনিময়ে ৪টে উইকেট নিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, আন্ডারউড ১৯৭২ সালের আগের তিনটে টেস্ট খেলায় দলভুক্ত হননি।

প্রথম দিনেই অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ১৪৬ রানের মাথায় শেষ হয় এবং খেলার বাকি সময়ে ইংল্যান্ড ১০টা উইকেটই হাতে জমা রেখে ৪৩ রান সংগ্রহ করেছিল। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক রে ইলিংওয়ার্থ প্রথম দিনের খেলায় ৩২ রানে ২টো উইকেট এবং ৩টে 'ক্যাচ' ধরে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৫২ (৯ উইকেটে)। এইদিন ইংল্যান্ড ৯টা উইকেট খুইয়ে পূর্ব দিনের ৪৩ রানের সঙ্গে ২০৯ রান যোগ করে। খেলার এক সময় ইংল্যান্ড দারুণ সঙ্কটে পড়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস যেখানে ১৪৬ রানের মাথায় শেষ সেখানে দেখা গেল ১২৮ রানের মাথায় ইংল্যান্ডের ৭ম উইকেটের পতন—অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের থেকে মোটেই ভাল অবস্থা নয়। ইংল্যান্ডের এই দারুণ বিপদে পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়েছিলেন ৮ম উইকেটের জুটি—অধিনায়ক রে ইলিংওয়ার্থ

এফ আর স্পেফোর্থ

লেন হাটন

[illegible] আন্ডারউড
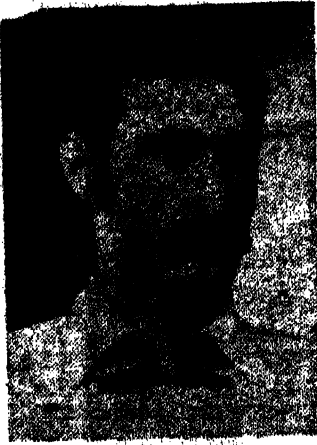
এবং শেষ [illegible] বোলার [illegible] [illegible]। এই ৮ম [illegible] জুটি ইলিংওয়ার্থ (নটআউট [illegible] রান) এবং স্নো (৩৮ রান) দৃঢ়তার সঙ্গে [illegible] খেলে দলের অতি মূল্যবান ১০৩ রান যোগ করেন। অস্ট্রেলিয়ার অফ-স্পিনার অ্যাশলি ম্যালেট দ্বিতীয় দিনের মধ্যাহ্নভোজের আগে মাত্র ৪৩ রানে ৫টা উইকেট নিয়ে ইংল্যাণ্ডকে কাঁদিয়ে ছেড়েছিলেন। লাঞ্চের সময় ইংল্যাণ্ডের রান ছিল ১৯২ (৬ উইকেটে)।

তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংস ২৬৩ রানের মাথায় শেষ হলে তারা অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের ১৪৬ রানের থেকে ১১৭ রানে এগিয়ে যায়।

অস্ট্রেলিয়া ১১৭ রানের পেছনে পড়ে ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং মাত্র ১৩৬ রানের মাথায় তাদের ২য় ইনিংসের খেলা শেষ হয়। এই ১৩৬ রানই লিডসের হেডিংলে মাঠে পুরো এক ইনিংসের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার সর্বনিম্ন রানের রেকর্ডে পরিণত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসের ১১১ রানের মাথায় ৯ম উইকেট পড়ে যায়। খেলার এই অবস্থায় ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে অস্ট্রেলিয়ার আরও ৬ রানের প্রয়োজন ছিল। এদিকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]টা উইকেট। শেষ ১০ম উইকেটের জুটিতে [illegible] সিহান (নটআউট ৪১ রান) এবং বোলার বব্‌ ম্যাসি (১৮ রান) ২৫ রান তুলে দলকে শোচনীয় ইনিংস পরাজয় থেকে বাঁচিয়ে দেন। তৃতীয় দিনের খেলা ভাঙার নির্দিষ্ট সময়ের [illegible] আগে ইংল্যাণ্ড ১ উইকেটের বিনিময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২০ রান তুলে অস্ট্রেলিয়াকে ৯ উইকেটে হারিয়ে দেয়। তৃতীয় দিনেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হওয়াতে ৪র্থ টেস্টের বরাদ্দ পাঁচদিনের খেলায় ৪র্থ ও ৫ম দিনটা [illegible] [illegible] [illegible]।

ইংল্যাণ্ডের [illegible] [illegible]-বোলার ডেরেক আণ্ডারউড ২য় ইনিংসের খেলায় ৪৫ রানে ৬টা উইকেট পান। দুই ইনিংসের খেলায় তিনি ৮২ রানের বিনিময়ে ১০টা উইকেট পেয়েছেন।

ট্রেন্ট ব্রিজের ৩য় টেস্টের ২য় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার যে রস এডওয়ার্ডস নটআউট ১৭০ রান করে 'হিরো' আখ্যা লাভ করেছিলেন তিনিই কিনা সদ্যসমাপ্ত ৪র্থ টেস্টের উভয় ইনিংসে 'গোল্লা' করেন।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক আয়ান চ্যাপেল ব্যাটিংয়ে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া তাঁর দল পরিচালনার ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। লর্ডস মাঠের ২য় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভের স্তম্ভ ছিলেন নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় বব্‌ ম্যাসী। এই খেলায় ম্যাসী তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে ১৩৭ রানে ১৬টা উইকেট পাওয়ার সূত্রে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন। কিন্তু সেই দুর্ধর্ষ ম্যাসীকে ৪র্থ টেস্টে ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসে অধিনায়ক চ্যাপেল বিশেষ কাজে লাগাননি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ১৪৬ রান (স্টাকপোল ৫২ রান। আণ্ডারউড ৩৭ রানে ৪, আরনোল্ড ২৮ রানে ২, স্নো ১১ রানে ২ এবং ইলিংওয়ার্থ ৩২ রানে ২ উইকেট)

● ১৩৬ রান (সিহান নটআউট ৪১ রান। আণ্ডারউড ৪৫ রানে ৬ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড : ২৬৩ রান (ইলিংওয়ার্থ ৫৭, স্নো ৪৮, এডরিচ ৪৫ ম্যালেট ১১৪ রানে ৫ এবং ইনভেরারিটি ২৬ রানে ৩ উইকেট)

● ২১ রান (১ উইকেটে)

ওভালের টেস্ট ক্রিকেট

ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

আগামী ১০ই আগস্ট ওভালে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার ১৯৭২ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের শেষ ৫ম টেস্ট খেলার আসর বসছে। বর্তমানে ইংল্যাণ্ড ২–১ খেলায় (ড্র ১) এগিয়ে আছে। এবং এই সূবাদে ইংল্যাণ্ড যে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৭১ সালের টেস্ট সিরিজে কাল্পনিক 'অ্যাসেজ' খেতাব পেয়েছিল তা ইংল্যাণ্ডের হাতেই থেকে গেল। এমনকি ৫ম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া জয়লাভ করলেও 'অ্যাসেজ' খেতাব ইংল্যাণ্ডের হাতছাড়া হবে না, সেক্ষেত্রে ১৯৭২ সালের টেস্ট সিরিজ যা অমীমাংসিত থেকে যাবে।

সারে কাউণ্টি ক্রিকেট ক্লাবের 'হেড কোয়ার্টার্স' লণ্ডনের এই কেনিংটন ওভাল মাঠের উদ্বোধন ১৮৪৫ সালে। কেনিংটন ওভালে টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসর প্রথম বসে ১৮৮০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর। ওভালের এই প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যাণ্ড ৫ উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য, ওভালের এই ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার ১৮৮০ সালের টেস্ট খেলাই আবার ইংল্যাণ্ডের মাটিতে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা। ওভালের ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ১৮৮২ সালের টেস্ট খেলাটি উভয় দেশের ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। যেখানে ইংল্যাণ্ডেরই জয়লাভ সুনিশ্চিত সেখানে অস্ট্রেলিয়া শেষ পর্যন্ত নাটকীয়ভাবে ৭ রানে জয়ী হয়। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৮৫ রান সংগ্রহ করতে গিয়ে ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংস অপ্রত্যাশিতভাবে ৭৭ রানে শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়ার দুর্ধর্ষ বোলার স্পেফোর্থ ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংসের খেলায় ৪৪ রানে ৭টা উইকেট নিয়ে ইংল্যাণ্ডের বাড়া-ভাতে ছাই ফেলেছিলেন। ওভালের এই ঐতিহাসিক টেস্ট খেলায় স্পেফোর্থ ১৪টা উইকেট নিয়েছিলেন ৯০ রানে।

অস্ট্রেলিয়ার কাছে ইংল্যাণ্ডের এই অপ্রত্যাশিত পরাজয় ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট

'সংলাপে অগ্নিযুগ-স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' নামক রচনা সম্পর্কে শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহের আলোচনার উত্তর

মাননীয় 'অমৃত' সম্পাদক মহাশয়,

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহ মহাশয় লিখিত পত্রের উত্তরে প্রথমেই আমার মুখবন্ধের যেটুকু অংশ আপনারা প্রকাশ করেননি, সেই 'নিবেদন' ও 'দুটি কথা' অংশটুকুই নিবেদন করছি। এ থেকে সমগ্র বিষয়টি বোঝার পক্ষে সুবিধা হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

'নিবেদন'

কৈশোর ও যৌবনের বয়ঃসন্ধিকালে দু'বছর (চোদ্দ বছরের শেষ থেকে ষোল পূর্ণ হবার কিছুদিন আগে পর্যন্ত) শ্রীমৎ নিরালম্ব স্বামিজীর সঙ্গলাভ ও সেবার সৌভাগ্য ঘটেছিল। কেমন করে তা বলা আছে।

প্রভাতে কুমারী—মধ্যাহ্নে যুবতী—সন্ধ্যায় বৃদ্ধা—ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীর মতই প্রত্যহ সকালে জ্ঞানী সন্ন্যাসী নিরালম্ব, বিকেলে দুরন্ত কিশোর বালক যতীন ও সন্ধ্যায় বীর বিবেক সন্তান' যতীন্দ্র উপাধ্যায় ওরফে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনতুম। সন, তারিখ, অচেনা নাম, সংস্কৃত শ্লোক ও ইংরেজি বুকনিগুলি নোট করে রাখতুম তখুনি তখুনি। বলার তালে তালে লিখতে লিখতে কোন কথা পড়ে গেলে বা বানান ভুল হলে অবসর সময়ে জিজ্ঞেস করে শুধরে নিতুম। সারা-দিনের শোনা কথা নিরিবিলিতে লিখে রাখতুম পরদিন দুপুরে—যাঁর কাছে যা শুনেছি' নাম দিয়ে খাতায়।

এমনি করে লেখাভর্তি বারোখানি বাঁধানো খাতা রাখা ছিল বরানগরে সতুকাকা শ্রীবিজয়বসন্ত বসাক মহাশয়ের বাড়ীতে। অনেক বছর পরে তাঁরই সাগ্রহ তাগিদে অল্প অল্প পোকায় কাটা খাতা-গুলি হুবহু নকল করে যখন শোনাতে গেলুম তখন বসাককাকু অন্তিম শয্যায়।

তাঁরই পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে ঘরে ঘরে বাঙলামায়ের বীর সন্তান-দের হাতে তুলে দিলুম—সংলাপে অগ্নি-যুগ-স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বামী নিরালম্ব)।

বন্দেমাতরম
চিত্তপ্রিয় রায়

'দুটি কথা'

স্নেহপ্রেমহার বল জগতে দুর্জয়
উদ্ভাসিত খরশান অসিমুখে যার,
কোথায় কম্পিত নহে, অটল হৃদয়
স্নেহপ্রেমভাব কাছে পরাজয় তার।'

হয়েছিল তাই। সন্ন্যাসীর স্নেহ। অবরুদ্ধ বাৎসল্যরসের উৎসমুখ খুলে ঝরঝর ঝরেছিল স্নেহ-নির্ঝরিণী। ছোট আবদারের উত্তরে স্বামিজী বলেছিলেন—যেসব কথা খুব কম লোককেই বলেছেন, বা কাউকেই বলেন নি। কথার মধ্যেও সন্ন্যাসের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়নি। 'আমি' 'আমার' বলতেন না। প্রয়োজনবোধে 'শর্মা' 'স্বয়ং' 'নিজে' 'খোদ' শব্দ ব্যবহার করে শেষ করতেন 'যাওয়া গেল' 'করা হল' এই সব প্রথম পুরুষের ক্রিয়া দিয়ে। তেমনই লেখা আছে। আশা করি সুধীজনের বুঝতে অসুবিধা হবে না।

গান ও কবিতাগুলির দু'চার কলি বলতেন স্বামীজি। ভাব ও মর্ম বোঝবার সুবিধার জন্যে পূর্ণ উদ্ধৃত হল সেগুলি। বালক, কিশোর, ও তরুণ যুবা যতীন্দ্র-নাথের কথা শুনেছি তাঁর কাকা অম্বিকাচরণ মশায়ের কাছে, বিয়াল্লি ও চিন্ময়ী মায়ের কথা স্বামীজির খোল রাণী দেবীর কাছে। সেগুলি ঐভাবেই যেমনটি শুনেছি তেমনটিই লেখা আছে।

জয়হিন্দ
লেখক

আমার দিক থেকে যা বলবার তা সবই সঙ্ক্ষেপে বলা হল। হয়তো একেবারে শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মশায়ের মনস্তুষ্টি করতে সক্ষম হলুম না। তাই আর একটু বিশদভাবে বলি।

এ লিখিৎ-পড়িৎ কেতাদুরস্ত কেতাবী বিদ্যা নয়। শ্রুতিঃস্মৃতি। গুরুর শোনা আর স্মৃতিভরে শোনানো। ব
জ্ঞানের ভাণ্ডার চারটি বেদও গুরু
পরম্পরায় হাজার হাজার বছর ধরে শ্রু
করেই চলে এসেছিল লেখার কৌ
জানবার আগে পর্যন্ত। এ বল
'হরিবিবহং' নয় 'অহং শ্রুতম্' ইতিহা
স্বামীজি বলেছেন, আমি শুনেছি। প
করবার অধিকার নেই আমার। স্বামী
কথা অপরিবর্তিতই থাকবে' বি
নিরুপায়।

'দলীয় স্বার্থে'—যে সময়ের
অতি আধুনিক পরিস্থিতে প্রচলিত দ
মত তখনকার রাজনীতি, চতুর্দশ
বিকশিত চতুর্দশপদী সনেটের রূপ
ছিল মহাকাব্য মহাভারত, পাণ্ডব, ক
ছিল দুটি দল কৃষ্ণ ও শ্বেত—স্বদে
বিদেশী। এতেও যদি দলীয় স্বার্থে
পান তা হলে শ্রদ্ধেয় মহাশয়ের দৃ
দোষেরই সৌরভ।

'ব্রহ্মা আর স্রষ্টা'—যজ্ঞবেদী ব
সাজাতে হয় ছোট বড় মাঝারি
কাঠকুটো দিয়ে। কিন্তু আগুন জ্বাল
একটি দীপশলাকায় বা চকমকি
যতীন্দ্র উপাধ্যায় সেই দেশলাই।
নামই তারা হয়েছিল প্রথমে। কিন্তু
সাধারণ বুঝবে—'চতুরানন'। যো
কাল শেষ হয়েছে। আমরা ভুলতে ব
হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্যু, ঋত্বি
শ্রেণীর চার দল ব্রাহ্মণ, সবার
একজন ব্রহ্মার কথা। তাই 'স্রষ্টা'
হয়েছে সহজসাধ্য বলে।

শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় বা
জ্ঞানবৃদ্ধ, লিখিৎ-পড়িৎ বিদ্যায়
স্থানীয়। তবু দুঃখের সঙ্গে ব
হচ্ছে—লিখিৎ-পড়িৎ কেতাবী
দৌলতে জানা ছিল—'অন্ধকূপ হত
দুর্দান্ত অত্যাচারী নবাব সিরাজউ
আর নিরালম্ব স্বামীর মুখে শ
'বাঙলার সুযোগ্য তরুণ নবাব সি

করবেন—আপনাদের কেতাবী ভাষা বিষয়ে কেতাদুরস্ত হয়ে থাকুক, তা নিয়ে স্বামীজির মুখের কথায় মাথাতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।

আবার দেখুন,—আখড়ায় মা-গোঁসাই-এর গান—

হব যাহা তাঁহি, তোঁহে জনমি পুন
তোঁহে সমায়ত, নাকি তব
আদি অবসানা।

[illegible] লেগেছিল। জানতুম—

হর চতুরানন মরি মরি যাওত
নাহি তুয়া আদি অবসানা।
তোঁহে জনমি পুন তোঁহে সমায়ত
সাগরে লহরী সমানা।

মনে হয়েছিল—নিরক্ষরা বৈষ্ণবী কি [illegible] না কোন পরবর্তী পদকর্তার [illegible] দল পরের কলিটি শুনিয়ে মিল [illegible]। কিন্তু গাড়ীর এগিয়ে [illegible] মা-গোঁসাই-ও আখর ধরেছেন—

[illegible] নয়, দুটি নয়
[illegible] লাখ নিধি
তোতেই জন্মে তোতেই লয়
[illegible] আদি নাই, অন্ত নাই হে—
[illegible] অনন্ত তুমি,
নাহি তুয়া আদি অবসানা।

[illegible] যা শুনেছি তাই। জানা [illegible] সংশোধন করবার অধিকারী মনে [illegible]। তাহলে শ্রুতির মান, [illegible] কিছুই থাকে না। সংসার-[illegible] নিষ্কলুষ বিমল কৈশোরে [illegible] একা লেখা সম্ভবও নয়।

[illegible] চক্রবর্তী [illegible] ছিলেন, [illegible] ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রাই জানতে [illegible] তাঁরা জানলেও বলবেন না। [illegible] ক্ষেত্রে চক্রবর্তী মশায় যা করে-[illegible] বলেছিলেন স্বামীজী। গুপ্ত [illegible] কথাই কি আজ পর্যন্ত [illegible] উঠেছে? তা হলে পি, মিত্র [illegible] যতীন্দ্র ব্যানার্জি রচিত দীক্ষা [illegible] মাননীয় প্রবন্ধলেখক মহাশয় বলে [illegible] কৃতার্থ হব। অপরিণত বয়স বলে [illegible] বলেন নি আমায়।

মশায়ের অনুরূপ ধারণা গুপ্ত সমিতি পরিচালকদের সম্বন্ধে। তিনি বয়স্ক, [illegible] অন্তঃভাগীয় অন্তরঙ্গ ছিলেন [illegible] জানি না। তাঁরাও সাহসী হতেন না [illegible] বলতে—নরেন গোঁসাইকে সভা [illegible] ব্যক্তিগত পরিচয় ও অর্থলাভের [illegible] সহজ ছিল না গুপ্ত সমিতির [illegible]।' আবেদনের পর অনেক কঠোর [illegible] উত্তীর্ণ হয়ে তবে সভ্য [illegible] মহাশয় স্বকপোলকল্পিত যে কালিমা সমিতি ও পরিচালকদের [illegible] তার ছিটে যে পরমারাধ্য নিতা-[illegible] শ্রীঅরবিন্দ বারীন্দ্রের গায়ে লাগছে [illegible] দেখেছেন কি?

চরম দলের 'উপায়' সম্বন্ধে প্রবল প্রতিবাদ করে জানতে চেয়েছেন—'লেখক কোথায় পেলেন এটি?' সে তো বলাই আছে যতীন ব্যানার্জির মুখে। তাঁর বলার ৪৪ বছর পরে তাঁর উক্তির সত্যতার প্রমাণ পেয়েছি বছর চার আগে ১৩৭৪ সালে। কই, সে সময় তো বিদগ্ধ মহাশয়ের বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ পাঞ্চজন্য গর্জন করে নাই। ভগিনী নিবেদিতার একাধিক জীবনী গ্রন্থ আছে। সবগুলিতেই আইরিশ মেয়ে মিস মার্গারেট নোবলের বাল্যশিক্ষার কথা অল্পস্বল্প থাকলেও পুরোপুরি কোনখানিতেই নেই। নিরালম্ব স্বামীর মুখেই বিপ্লবিনী নিবেদিতার বাল্যশিক্ষার কথা প্রথম শুনে অবাক হয়ে যাই। তার ৪৪ বছর পরে যতীন ব্যানার্জির কথারই অনুরণন পাই ১৩৭৪ সালের শারদীয় সংখ্যা 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকায়। প্রভাসচন্দ্র চৌধুরীর প্রবন্ধ 'জাতীয় আন্দোলন ও নিবেদিতা' পড়ে দেখতে অনুরোধ করি মহামান্য প্রতিবাদক মহাশয়কে। সে সময় সম্ভবত তিনি চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করে যোগমগ্ন সমাহিত ছিলেন। এও হতে পারে—প্রবন্ধ-লেখক সম্ভবত মহাশয়ের আপন আত্মীয়, তাই প্রতিবাদমুখর রসনা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল তখন।

বিদগ্ধ জনের পুরানো বই খুঁজতে দেরি হতে পারে। দল সম্বন্ধে প্রভাসবাবুর প্রবন্ধের কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

'সাধারণ নিরীহ মানুষের উপর পুলিশ লাঠি চার্জ করল বরিশালে। তার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাঙলায় পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ফেটে পড়ল। তখনই বাঙলার রাজনীতি ক্ষেত্রে সুস্পষ্টরূপে দেখা দিল তিনটি দল—

(১) নরমপন্থী। নেতা সুরেন্দ্রনাথ। উদ্দেশ্য—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ। উপায়—সভাসমিতি, বক্তৃতা, আবেদন, নিবেদন।

(২) চরমপন্থী। নেতা—বিপিনচন্দ্র পাল। উদ্দেশ্য স্বাধীনতা লাভ। উপায়—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।

(৩) বিপ্লববাদী। নেতা অরবিন্দ ও নিবেদিতা। উদ্দেশ্য—ইংরাজবর্জিত নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা লাভ। উপায়—বোমা রিভলভারের সাহায্যে বৈপ্লবিক গুপ্ত-হত্যা।'

কিছু কিছু গড়মিল থাকলেও মূলত একই নিরালম্ব বর্ণনার অনুরণন। প্রধান পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতমা হলেও যতীন বাঁড়ুয্যে নিবেদিতাকে তৃতীয় দলের নেতা তাঁর অরবিন্দদার সহনেতার আসনে বসান নি। নিবেদিতার সায় ছিল না 'উপায়' নির্ধারণে তাই। দলের নামেও একটু তফাৎ নরম, গরম, চরম।

মহাশয় লিখেছেন—লেখক তাঁর সঙ্গে নিরালম্বের আলাপের উল্লেখ করেছেন, ঐ সংলাপের সত্যতা কি জানি না।' আলাপ হত নিরিবিলিতে, প্রায়ই সন্ধ্যার পরে। উপস্থিতদের মধ্যে স্বামীজি, রেণুদা আর লেখক। সংলাপের সত্যতা জানতে হলে নিরালম্ব ও রেণুদার কাছে যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। অতি সোজা—কাঁটা-খোঁচা বাধাবিঘ্ন পথশ্রম—কোন কিছুই নেই সে পথে।

মনে জানে পাপ—লেখক জানেন তাঁর শ্রুতি নির্মল, নিষ্পাপ, সত্যাশ্রয়ী।

মহাশয় লিখেছেন—লেখক দাবী করেছেন, নিরালম্ব অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।' উক্তিটি তিনি কোথায় পেলেন জানি না। নিরালম্বের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন প্রায় দু-বছর আশ্রমে বাস করেছি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যোগা-যোগ তো দূরের কথা, আজ পর্যন্ত এ দগ্ধকপালার পোড়া চোখে তাঁর পুণ্যদর্শন লাভ ঘটেনি। বারীন্দ্র ঘোষমশায়কে একদিন মাত্র দেখেছি বরানগরে। স্বামীজির সঙ্গেই কথা বলেছেন, লেখকের সঙ্গে নয়। অরবিন্দের সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠ যোগা-যোগের কথা কোথায় পেলেন মহাশয় যদি পত্রাঙ্ক ও পংক্তিটি জানিয়ে দেন বিশেষ উপকৃত ও বাধিত হব। জানা মাত্রই পংক্তিটি সংশোধন করা হবে। ওটি মস্ত বড় মিথ্যে। এই সত্যভিত্তিক তথ্যমূলক কাহিনীতে ওরকম মিথ্যার স্থান হতেই পারে না।

ছাপার ভুল ত্রুটি অনেক হয়েছে, সেটা লেখকের হাতের বাইরে। চক্রবর্তী ও গোঁসাই-এর ওপর মহাশয়ের অঢেল দরদ। হবে না কেন—'পাতকী বলিয়া কি গো পায়ে ঠেলা ভাল হয়?' সৌরভক্তি প্রেম প্রবাহিণীর দরদ তরঙ্গ। কিন্তু অতি দরদে প্রতিবাদক মহাশয় গুণ হৈয়া দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায় দেখছেন যে। তাঁর পরামর্শ নিলে নিশ্চয়ই প্রথমে নরেনকে নির্বাচিত করা হত না। কিন্তু হয়েছিল। মহাশয় আজ অর্ধশতাব্দী পরে যে প্রেমচক্ষুতে নরেনের গুণকে দোষ দেখছেন 'বিদ্যার বিদ্যায়' মত পরিচালক বা অন্য সভ্যরা নরেনকে সে চোখে দেখবার সুযোগ পায় নাই। সভ্য হবার পর সমিতির নিয়ম মত পড়াশুনা যুদ্ধবিদ্যা রাইফেল বন্দুক বোমা পিস্তল সবই শিখতে হয়েছিল তাকে। শিখেছিলও—আদুরে দুলালটি থাকে নাই—যা মশায়ের প্রজ্ঞাচক্ষুতে প্রতিভাসিত হচ্ছে। আদুরে দুলাল থাকলে পাঁজরে পায়ে গুলি খেয়েও দৌড়তে পারত না, সেখানেই খতম হত।

নরেনকে নির্বাচিত করবার একটা গুপ্ত কারণও ছিল। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা, বাবুয়ানি চালচলন পোশাক-পরিচ্ছদ, সহজে কেউ (পুলিশেও) সন্দেহের চোখে দেখবে না। একটা ক্যামোফ্লাজ। কলেজের সঙ্গীটি ছিল দুঁদে বোমা-বিশারদ।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মনিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২৫.০০	টাকা	৩০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা	১২.৫০	টাকা	১৫.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬.২৫	টাকা	৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার (চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১.০২
ষাণ্মাসিক	টাকা	০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ
২য় খণ্ড

১৫ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday, 11th August, 1972 শুক্রবার, ২৬ শ্রাবণ, ১৩৭৯ **.52 Paise**

প্রচ্ছদ : শ্রীনিতাই ঘোষ

জাতির জনক

ধীনতার রজত জয়ন্তী

এবারের স্বাধীনতা দিবসের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। সময়ের দিক থেকে এবার আমাদের স্বাধীনতার জয়ন্তীর বৎসর। পঁচিশ বছর আমরা অতিক্রম করে এসেছি প্রথম স্বাধীনতার দিনটি থেকে। এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর ও পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় বলেই গণ্য হবে। পঁচিশ বছরে একটি নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটেছে যাদের আচরণ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পূর্ববর্তী প্রজন্মের ব্যবধান ও পার্থক্য ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠছে। এই নতুন তরুণেরা স্বাধীন ভারতে জন্মেছে। স্বাধীনতার দিনের প্রতিশ্রুতি ও সংকল্পের কথাই বার বার তাদের শোনান স্বাধীনতা সংগ্রাম বা পরাধীনতার বেদনার সাক্ষী তারা নয়। স্বাধীন দেশের নাগরিকের গৌরব নিয়ে তারা জন্মেছে র জীবনে তারা চায় স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতির সার্থক প্রতিফলন। প্রত্যাশা এবং প্রত্যাশার ব্যর্থতা থেকেই একালের যন্ত্রণার উদ্ভব। এই যন্ত্রণা থেকে উত্তরণই হল এ যুগের সমাজতাত্ত্বিক, রাষ্ট্রনিয়ামক, শিক্ষাবিদ ও অন্যান্য সকল মক মানুষের লক্ষ্য।

বহু ত্যাগ ও অশ্রুর বিনিময়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছিল ১৯৪৭ সালের পনেরোই আগষ্ট। এই তার জন্য আমাদের দেশের বহু বীর সন্তান আত্মবিসর্জন করেছেন, বহু দেশপ্রেমিক কারাবরণ করেছেন। তাঁদের কথা যেন আমরা ভুলে না যাই। স্বাধীনতার দিনে তাঁদের নামেই গ্রহণ করা হয়েছিল নতুন ভারত গড়ার সংকল্প। পিকতার বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল পৃথিবীর এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র জনতার সত্যাগ্রহ, অসহযোগ এবং গণ-প্রতিবাদের মাধ্যমে বিদেশী রাজশক্তিকে সেদিন অচল করে দেওয়া হয়েছিল। এই আন্দোলনের চাপে বিদেশী শক্তিকে শেষ পর্যন্ত সরতে হয়েছিল। কারণ সে পড়েছিল দেওয়ালের লিখন, লক্ষ্য করেছিল সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতের বাইরে আজাদ হিন্দ ফৌজের দুর্বার সংগ্রাম, দেখেছিল নৌ-বিদ্রোহের উত্তাল তরঙ্গ। কিন্তু চক্রান্তে এবং নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতায় স্বাধীনতা এল খণ্ডিত ভারতে। দ্বিজাতিতত্ত্বের দোহাই দিয়ে ধর্মান্ধ মুশ্লিম পাকিস্তান আদায় করে নিল। বৃটিশের সহায়তা ও সমর্থন না থাকলে কখনোই তা সম্ভব হত না। দেশ ভাগ আমাদের দুঃখের ও সমস্যার কারণ হয়েছে। ইতিহাসের অমোঘ বিধানে পঁচিশ বছরেই সেই অসত্যের ভিত ধ্বসে গেছে। র্ষ যে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করে চলছে বাংলাদেশের অভ্যুদয় তারই সার্থকতা নতুন করে প্রমাণ

স্বাধীন ভারতবর্ষ গোড়া থেকেই সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ অনুসরণ করে চলেছে। এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশে গণতন্ত্রের অবলুপ্তি ঘটেছে জঙ্গীতন্ত্রের ষড়যন্ত্রে। ভারতবর্ষ আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল, বহুভাষী এবং বহু র দেশ হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র রক্ষা করেছে। এত বৃহৎ দেশে প্রাপ্তবয়স্কের ন ভোটাধিকার দানও ভারতের অন্যতম কৃতিত্বরূপে গণ্য। ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যকে নিজস্ব ধারা অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ভারতবর্ষ একটি কেন্দ্রীয় শাসনে ঐক্যবদ্ধ। এখানেই সংসদীয় গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটি ভাষাগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি স্বীকার করে নিয়েও আমরা বৃহত্তর সংস্কৃতির অংশীদার; আমরা বাঙালী, মারাঠী, পাঞ্জাবী যাই হই না কেন সর্বোপরি আমরা ভারতীয়। এই বোধই স্বাধীনতা রক্ষার মূলমন্ত্র। অনেক সময় এই ভারতীয়ত্বের বিরুদ্ধে কিছু কিছু বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি উপদ্রব সৃষ্টির রে। কিন্তু ভারতবর্ষ তার সার্বিক ঐক্যবোধ নিয়ে এমনভাবে প্রত্যেকটি ভারতীয়কে একত্র গ্রথিত করে রেখেছে যে তাকামীরা উপহাসিত, তিরস্কৃত ও পর্যুদস্ত হয়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়।

এবারের স্বাধীনতা উৎসবে এই ঐক্য, সংহতি ও গণতান্ত্রিক সাফল্যের বিষয় নিশ্চিতই হবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। পাশাপাশি আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখব দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে। পরিকল্পিত অর্থনীতি অনুসরণের দ্বারা র্ষে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, দারিদ্র্যই আমাদের প্রধান শত্রু। এই দারিদ্র্যের মোচন না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতার তাৎপর্য কোনো দিনই দেশের সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হবে না। মহাত্মা গান্ধী স্বরাজের লক্ষ্য হল প্রতিটি মানুষের চোখের জল মোছা। দুঃখ, দারিদ্র্য ও শোষণ থেকে যে অশ্রুর উৎপত্তি সেই দী সমাজের পরিবর্তন ছাড়া কি গান্ধীজীর লক্ষ্যে আমরা পৌঁছুতে পারব? স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উৎসবে এই সকল মানুষের।

রজতশুভ্র পঁচিশবছর

পুলকেশ দে সরকার

লওনার্ড মসলে বলেছেন : একটু ধৈর্যেই সব সংকট কাটিয়ে ওঠা যেত। খান একটি মানুষ—মহম্মদ আলি —কীর্তি, পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার এক মধ্যেই তিনি মারা গেছেন। শুধু ধৈর্য ধারণ, তাড়াহুড়োতে সায় না হলেই হত।

পণ্ডিত নেহরু তাঁকে ১৯৬০-এ লেন, না, আমরা সত্যি ক্লান্ত হয়ে ছলাম, বয়সও বাড়ছিল। আমাদের খুব কম মানুষেই ছিলেন যাঁরা আবার দণ্ড সইতে প্রস্তুত — যদি সত্যিই ভারতের জন্য দৃঢ়পণ হতাম তবে বণ্টই ছিল আমাদের একমাত্র পথ। পাঞ্জাবকে জ্বলতে দেখেছি, প্রতি হানাহানির বিবরণ শুনেছি। দেশ-দের পরিকল্পনায় একটা যেন উপায় পেলাম। তাই অবলম্বন করলাম।'

কিন্তু স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী- ১৭ই আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন পর, তিনি যখন অমৃতসর উড়ে ন এবং পাঞ্জাব সফর করলেন তখন একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলেন। প্রথম উপলব্ধি করলেন এলোপাতাড়ি নিতার পথে ছুটলে কি ও কত প্রাণ দিতে হয়।

তবু 'লওনার্ড' উপসংহারে বলেছেন, লকা যখন গাড়িয়েই গেছে তখন আর টুন-ঠুন করে কি হবে? ভারত ধীন। অঙ্গচ্ছেদ হয়েছে, রক্তপাত হয়েছে, তু রোগী বাঁচবে।(১)

আমরাও বলি, ভারত স্বাধীন, টাই মূল ও বাস্তব সত্য। ভারত ধীন, একথা বাহাত্তর খৃস্টাব্দে বাঙলা-র আবির্ভাবে সূর্যের মত সত্য হয়ে ছে। শুধু আমরা স্বাধীন নয়, ঔপ-বেশিক ধর্মান্ধতার শোষণ-পীড়িত প্রতি-দের মুক্তিসংগ্রামে আমরা অকুতোভয়ে দাঁড়াতেও পারি। বাঙলাদেশের ধীন সত্তা প্রতিষ্ঠায় পরিণত ভারতরাষ্ট্র পন স্বতন্ত্র মাহাত্ম্যের স্বাক্ষর রেখেছে।

আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু

---

(১) দি লাস্ট ডেজ অব দি বৃটিশরাজ ওনার্ড মসলে, পৃ পৃঃ ২৮৪—২৮৬।

সূচনায় যে দুর্বলতার বেদনা আছে তা ইতিহাসস্বীকৃত। শুধু যে দেশ-বিভাগের বেদনা তাই নয়, বৃটিশ কূট-নীতিকেরা এই স্বাধীনতাকে তাঁদের 'দান' হিসেবে মনে রেখেছেন। এই দানের দলিল '১৯৪৭-এর ভারতীয় স্বাধীনতা আইন।' (২) এটি ১৯৪৭-এর ৪ঠা জুলাই বৃটিশ পার্লামেন্টে 'ভারতীয় স্বাধীনতা বিল' (৩) আকারে পেশ করা হয়। রাজানুমোদন পায় ১৮ জুলাই। এই বিল বা আইনের বিধানমতই স্থির হয়, ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষকে ইণ্ডিয়া (ভারত) ও পাকিস্থান নামে দুটি ডোমিনিয়ানে ভাগ করা হবে।

ঐ আইনের বিধানমতই ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের অবসান হল—উদ্ভূত হল ভারত ও পাকিস্থান ডোমিনিয়ান, বৃটিশ সরকারের শাসন-ক্ষমতা এই দুই ডোমি-নিয়ান সরকারে হস্তান্তরিত হল। বৃটিশ মন্ত্রিসভায় ভারত-সচিবের পদ উঠে গেল। বৃটিশরাজ ডোমিনিয়ান দুটোর গবর্নর জেনারেল নিয়োগ করবেন, কিন্তু বৃটিশ মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে নয়, ডোমিনিয়ানের পরামর্শক্রমে। ১৫ আগস্টের পর বৃটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত কোন আইন কোন ডোমিনিয়ানেই প্রযোজ্য হবে না, ডোমি-নিয়ান আইনসভায় গৃহীত আইন ও বৃটিশরাজ খারিজ করতে পারবেন না। দেশীয় রাজ্যগুলোর ওপর বৃটিশরাজের যে সর্বাধিপত্য ছিল বা উপজাতীয় এলাকা-গুলোর সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিল তা প্রত্যাহৃত ও ছিন্ন হল। ডোমিনিয়ান দুটির সঙ্গে বৃটিশরাজের সংযোগ থাকবে কমনওয়েলথ রিলেশান্স অফিস মারফৎ। ইংলণ্ডের রাজার 'ভারত-সম্রাট' উপাধি বাতিল হল।

কিন্তু এই বিধিবদ্ধ স্বাধীনতা বা ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যেই এমন অনেক জটিল নতুন সমস্যার সৃষ্টি হল যাদের সমাধানে টাল সামলাতে সামলাতে আমরা পঁচিশটা বছর পার হয়ে চলেছি, সন্দেহ নেই, এইভাবেই ভারতের পূর্ণ যৌবনে তার মেরুদণ্ড ঋজু হয়েছে, পদক্ষেপ নিশ্চিত ও দৃঢ়তর হয়েছে এবং পেশী বলিষ্ঠতর হয়েছে।

পয়লা নম্বরের সমস্যা দেখা দেয়, দেশ ভাগের ফল—উদ্বাস্তু সমাগম ও লক্ষ লক্ষ উৎসাদিত মানুষের পুনর্বাসনে। তার পর দেশীয় রাজ্য কাশ্মীর হায়দারাবাদ, ফরাসী ও পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চল (চন্দননগর, পণ্ডিচেরী, মাহে, কারিকল, গোয়া, দামন, দিউ) এবং নাগা প্রভৃতি পাহাড়িয়া অঞ্চলের ইন্দ্রাস্তি, ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন, '৪৭, '৬৫, ৭২-এ মার্কিন-চীনা অস্ত্র সুসজ্জিত ও প্ররোচিত পাকিস্থানী আগ্রাসন, চীনের ভারত আক্রমণ (১৯৬২) এবং প্রতিরক্ষা সমস্যা।

ভারত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক ও বৈষয়িক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমতালে চলেছে রাজনৈতিক দলগত সমস্যা, কংগ্রেসের সাংগঠনিক বিবর্তন এবং আদর্শগত বিরোধে নিত্য নতুন দলের আবির্ভাব ও বিলয়।

১৯৪৭-এ যে নেতৃবৃন্দের ওপর জাতীয় আন্দোলনের দায়িত্বভার ছিল, যাঁরা আন্দোলন ছেড়ে বৈঠকে বসেছেন, যাঁরা প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিবাদ ও আপোষ করে-ছেন এবং যাঁদের উদ্দেশে ক্ষমতা হস্তান্ত-রিত হল তাঁদের অনেকেই এই পঁচিশ বছরে বিগত হয়েছেন, কখনো কখনো মনে হয়েছে এ শূন্যস্থান পূর্ণ হবে না, ভারত বিপর্যস্ত হয়ে যাবে, কিন্তু হয় নি, ভারত তাঁদের স্মৃতিভার নিয়ে এগিয়ে এসেছে এই বাহাত্তর খৃস্টাব্দে, বর্তমানের সামর্থ্য সুনিশ্চিত করেছে ভবিষ্যৎ।

তবু ভুলে যাওয়া কঠিন, আততায়ীর হাতে গান্ধীজী নিহত হয়েছেন, সর্দার প্যাটেল, শ্রীনেহরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্যামা-প্রসাদ, বিধানচন্দ্র, মৌলানা আজাদ, শরৎ-চন্দ্র বসু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, গোবিন্দ-বল্লভ পন্থ ও আরও অনেককে আমরা এই পঁচিশ বছরে হারিয়েছি। স্বাধীনতার পর অনেকে কংগ্রেস সংস্থা ছেড়ে গেছেন, অনেকে এসেছেন, কম্যুনিস্টদের কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করার পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সংস্থারূপে তাঁরা অবস্থান করেন, ক্ষমতা হস্তান্তরকালে যিনি রাষ্ট্রপতি(৪) ছিলেন সেই কৃপালনী প্রমুখ কংগ্রেস ছেড়ে কৃষক প্রজা মজদুর পার্টি গড়েন, রাজা-গোপালাচারী ১৯৪২-এর প্রস্তাবে ভিন্নমত পোষণ করে কংগ্রেস ছেড়েছিলেন, গান্ধীজীর আমন্ত্রণে আবার এসেছিলেন, দেশ বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর হলে তিনি পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর হয়ে আসেন, পরে গভর্নর জেনারেল হন, ভারত ১৯৫০-এ সাধারণতন্ত্রী সংবিধান রচনা করলে গণপরিষদের প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্র-প্রসাদ ভারতের রাষ্ট্রপতি হন, রাজা-গোপালাচারী কিছুকাল মাদ্রাজের কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন, তারপর একদিন পৃথক দল গড়েন—স্বতন্ত্র পার্টি। এই উত্থান-পতন, অদল-বদল আনা-গোনা কংগ্রেসকে কেন্দ্র করেই হয়েছে, কেননা, কংগ্রেসই একমাত্র বৃহত্তম শাসক পার্টি যা সর্বতো-ভাবে সর্বভারতীয় এবং কেন্দ্রে অবিচ্ছিন্ন শাসন-রজ্জু ধরে আছে। এই সব আন্তঃ-ক্রিয়ায় কংগ্রেসেরও সাংগঠনিক ও আদর্শ-গত বিবর্তন ঘটেছে এবং তাই বৈষয়িক পরিকল্পনায় আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থায় ও পররাষ্ট্র নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। আজ এই মুহূর্তে বাঙলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে নিকটতর হয়েছে (যা সম্ভব করেছে কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট মোর্চা) তত দূরবর্তী হয়েছে চীন ও আমেরিকা থেকে। কিন্তু এই যে সাং... ও রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তন, তা রাষ্ট্রনীতি... দলীয় রাজনীতির এবং আভ্যন্তরীণ ... ও পররাষ্ট্র নীতির আন্তঃক্রিয়ারই ... গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ যে রাষ্ট্রনীতি ... সুস্পষ্ট ছিল না আজ তা রূপময় হয়ে...

কিন্তু সে এই দীর্ঘ পঁচিশ ... অনিশ্চয়তার অনভিজ্ঞতার পথাতিক্রম ...

যে-কথা আজ আমরা মুখ খুলে ... অর্থাৎ, কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি রেখায় ... পুঞ্জের পর্যবেক্ষকদের আর দরকার ... পঁচিশ বছরের সূচনায় আমরা তা ... পারি নি, কেননা, কাশ্মীর প্রশ্নকে ... রাষ্ট্রপুঞ্জের হাতে তুলে দিয়েছিলা... পঁচিশ বছর ধরেই আশা করে এসে... ঐ আন্তর্জাতিক সালিশী আদালত... সমস্যার সমাধান হয় নি, বরং জটিল ... জটিলতর হয়েছে এবং গোটা ব্যাপার... আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে।

কাশ্মীর ছিল একটি দেশীয় রা... এর রাজা হিন্দু, কিন্তু প্রজারা অধিকা... মুসলমান। মুসলমান-প্রধান অঞ্চল পা... স্থানের, দেশ বিভাগের এই নীতি ... প্রয়োগে বিস্তার করতে চেয়েছিল ... পাকিস্থান। বৃটিশ আধিপত্য ... পর দেশীয় রাজ্যের ক্ষেত্রে যে ... সৃষ্টি হয়েছিল এটা সেই ফল। ... থাকতে পারার স্বাধীনতা ... কিন্তু দেশীয় রাজ্যের প্রজারাও ... হতে চাইছিল এবং ... করছিল। সুতরাং স্বাধীন ... পাকিস্থানী এলাকা পরিবেষ্টিত ... সম্মুখে একটাই পথ খোলা ছিল ... ভারত বা পাকিস্থান ডোমিনিয়ানের ... মিলে যাওয়া। এরই নাম সংযু... একসেশান। কিন্তু সব রাজা ... নিজামের মতিগতি এক রকম ... কেউ কেউ এ নিয়ে বিলেতে ... গেছেন, আশা-নিরাশায় দুলেছেন ... করেছেন, বৃটিশ কূটনীতিতেও ... জায়ার লুকোচুরি চলেছে।(৫) ... মহারাজা তাঁর রাজ্যকে ১৫ আগস্ট ... ভৌম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করবেন ... পাকিস্থানে স্ট্যাণ্ডস্টিল এগ্রিমেন্ট পাঠা... জানালেন। হায়দারাবাদের নিজামও ... জানালেন। তাঁর রাজ্যে ৮০০০ ভার... সৈন্যকে সরিয়ে নেবার জন্য চাপও ... লাগলেন। আশংকা হল, দেশীয় রা... গুলোর ধাক্কায় ভারতরাষ্ট্র বিপর্যস্ত ... কিন্তু এর প্রতিরোধে এল তিনটি ... হাত—সর্দার প্যাটেলের দৃঢ়তা, ... মেননের কৌশল এবং লর্ড মাউন্টব্যাটে... পরামর্শদান।(৬) একে একে সব ...

---

(২) ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্ট, ১৯৪৭।

(৩) ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বিল।

(৪) তখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে রাষ্ট্রপতি বলা হত।

(৫) এ বিষয়ে স্যার কনরাড কর্ফিল্ড ... লর্ড ইসমে, মিঃ জর্জ এবেলের ... উল্লেখযোগ্য।

(৬) ভারত ডোমিনিয়ান হবার প... মাউন্টব্যাটেন গভর্নর জেনারেল ছি... দশ মাস কাল।

নেতাজী

মাউণ্টব্যাটেন দরবারে সংযুক্তি প্রস্তাবে রাজী হলেন — বাদ কাশ্মীর, মহীশূর, ভূপাল, যোধপুর, জুনাগড়, হায়দারাবাদ। কি করে তার নিরাকরণ হল বা কোন্‌টা হয় নি পঁচিশ বছরে তারই ইতিহাস লেখা আছে।

কিছু অবিস্মরণীয় বিষম ইতিহাস

লেখা আছে কিছু কিছু বিষম ইতিহাস, পাঞ্জাবের সীমান্ত প্রদেশের, বাঙলার, শ্রীহট্টের। ১৯৪৭-এর ১৫ আগষ্ট যে উৎসবের মধ্য দিয়েই কাটুক, ১৬ আগষ্ট বাঙলায় আনন্দের কারণ ছিল না। এদিনই স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের বঙ্গ-বিভাগের রোয়েদাদ বেরোয় : খুলনা জেলা পূর্ববঙ্গে এবং মুর্শিদাবাদ জেলা পশ্চিম-বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত, ঢাকা, চট্টগ্রাম বিভাগের সমস্ত জেলা পূর্ব পাকিস্থানের যশোর, মালদা, দিনাজপুর, নদীয়া, জলপাইগুড়ি ভাগাভাগি। পঁচিশ বছর ধরে তার জের চলেছে।

বিষমতর ইতিহাস লেখা হয়েছে পাঞ্জাবে। শুরু হয়েছে ক্ষমতা হস্তান্তর উৎসবের আগে, সেখানে উৎসব হয়নি। মসলে লিখেছেন :

'১৯৪৭-এর আগষ্ট ও পরের বছরের বসন্তকাল অবধি ন' মাসে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ কি ষাট লক্ষ হিন্দু, মুসলমান, শিখ গৃহহারা হয়েছে এবং উন্মত্ত রক্তলিপ্সু জনতার হাত থেকে পালিয়ে বেঁচেছে। ছ' লক্ষ লোক নিহত হয়েছে। না, এ শুধু হত্যা নয়। যদি তারা শিশু হয়ে থাকে তবে তাদের পা দুটো ধরে দেওয়ালে মেরেছে তাদের মাথাগুলো। মেয়ে হলে ধর্ষিতা হয়েছে; তরুণী হলে ধর্ষণের পর স্তন কেটে দেওয়া হয়েছে; অন্তঃস্বত্ত্বা হলে পেট ফেড়ে দেওয়া হয়েছে।

'লাহোর ষ্টেশনে যাত্রীবাহী ট্রেন আসছে, সব মড়া, লেখা আছে : 'ভারতের উপহার'; শিখ হিন্দু জবাই করা যাত্রীভর্তি ট্রেন পাঠিয়ে মুসলমানরা লিখেছে : 'পাকিস্থানের উপহার।'

'স্বাধীনতার আগে যদি শিখেরা বিষম হয়ে থাকেন, ১৭ই তারিখে সীমানা রোয়েদাদ বেরোবার পর রাগে পাগলপ্রায় হয়ে গেলেন। যা ভাবা গেছল এ যে তার চাইতেও খারাপ!

'ছ' লাখ মৃত। ১,৪০,০০,০০০ গৃহ-ত্যাড়িত; এক লক্ষ তরুণী অপহৃত, ধর্মান্তরিত অথবা হস্তান্তরিত।'

'অনিবার্য ছিল?' জিগ্যেস করেছেন মসলে।

নতুন বঙ্গ ভঙ্গ

কিন্তু বঙ্গভঙ্গ এক অভিনব ব্যাপার। একদা বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধে বাঙালী সন্তান অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল, প্রাদেশিক প্রশ্নকে সারা ভারতের প্রশ্ন করেছিল মজঃফরপুরে বিস্ফোরণের ভূমিকা থেকে জেলখানায় অগ্নিনালিকা গর্জে উঠেছিল; প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম বসু, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন বসুর আত্মদান বৃথা যায় নি, ১৯১১তে বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহৃত হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাসের পরিহাসে আবার সাত-চল্লিশে বঙ্গভঙ্গ হল নিজেদেরই সম্মতিতে।

ফল সঙ্গে সঙ্গে ফলতে লাগল। দুই প্রান্তে উদ্বাস্তু স্রোত বইতে লাগল। ২৩শে জুন নববঙ্গে (পশ্চিমবঙ্গে) কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা হয়েছিলেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ; পূর্ববঙ্গে কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা হয়েছিলেন কিরণশঙ্কর রায়। একদিকে ডঃ ঘোষ চাইছিলেন, পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু না আসে; অন্যদিকে কিরণশঙ্কর পাকিস্থান সংবিধান পরিষদে জানালেন : উত্তর ও পূর্ব বাঙলায় হিন্দুদের মধ্যে নিদারুণ আতঙ্ক; পশ্চিমবঙ্গের দিকে উদ্বাস্তুর ঢল নেমেছে; কেননা, তাদের আশঙ্কা, পাঞ্জাবে যা হয়েছে এখানেও তা হতে পারে। (১৩ই অক্টোবর, ১৯৪৭)

তখন দেশবিভাগের পর দু মাসও কাটেনি।

নাগরিকাধিকারের কথা তুলে উদ্বাস্তু সমাগম নিরস্ত করার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকা ১৯৪৮-এর অক্টোবরে লিখলেন : 'পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী (৫) বলছেন, উদ্বাস্তুদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১ লক্ষ। হিসেব কোথা থেকে পেলেন জানিনে; কিন্তু এমন দিন আসতে পারে যখন এ সংখ্যাটা এরও পাঁচ ছ' গুন হতে পারে। সুতরাং পুনর্বাসনের যদি কোন পরিকল্পনা থাকে তবে এই সম্ভাবনা খেয়াল রেখে যেন তা করা হয়, নইলে গবর্নমেন্ট বলতে পারেন, হঠাৎ আসায় তাঁরা অভিভূত হয়ে পড়েছেন।'

ইতিমধ্যে ডাঃ রায় ডঃ ঘোষের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন এবং উদ্বাস্তু স্রোত বন্ধ করতে গবর্নর জেনারেল এক অর্ডিনান্স জারী করলেন : পারমিট ছাড়া কেউ ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে পারবে না। পত্রিকা লিখেছিলেন :

'১৯৪৮-এর সূচনা থেকে পূর্ব বাঙলা ছেড়ে আসা শুরু হয়েছে। মনে হয়েছিল, এ অবস্থাটা শিগগিরই কেটে যাবে। সে আশা নির্মূল হয়েছে। ১৯৪৯-এর আরম্ভেই স্পষ্ট হয়ে গেল, এ একটা সাময়িক ব্যাপার নয়। সুতরাং এ শুধু সাময়িক সাহায্যের ব্যাপার নয়, এ পুনর্বাসনের ব্যাপার।'

প্রদেশ কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন

কিন্তু এই অবস্থাটা বিবেচনা করতে গেলে এর যথার্থ পটভূমিকাটি স্মরণে আনতে হবে। দ্বিরাট এই বঙ্গভঙ্গ হওয়ার ফলে, দুই-তৃতীয়াংশ ভৌগোলিক আয়তনের সঙ্গে দুই-তৃতীয়াংশ কংগ্রেস সংগঠনও দেশচ্যুত হয়েছিল। ফলে, কংগ্রেসে যে পূর্ববঙ্গীয় সংখ্যাপ্রাধান্য ছিল তাও তলিয়ে গেল। এবং সেখানে পশ্চিমবঙ্গের এক নতুন এক্সিস তৈরী হল। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, অরুণচন্দ্র [illegible] সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি, ডঃ ঘোষ, [illegible] স্থলাভিষিক্ত হলেন অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখার্জি, ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি, কালীপদ মুখার্জি প্রমুখ। এ দুইয়ের [illegible] ভঙ্গি ছিল কিছু বিপরীত এবং তার কারণও ভৌগোলিক। কালক্রমে তাই [illegible] বঙ্গে যে নতুন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ [illegible] আবির্ভাব হল, তা মুখ্যত পশ্চিমবঙ্গ [illegible] পূর্ববঙ্গ বিমুখীন। পূর্ববঙ্গ [illegible] উদ্বাস্তু স্রোত ছিল এঁদের পক্ষে অস্বস্তি[illegible] কিন্তু কেন্দ্রীয় নীতির দরুণ সক্রিয় বিরো[illegible] করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু নতুন [illegible] এবং ডঃ ঘোষের স্থলাভিষিক্ত ডাঃ [illegible] মন্ত্রিমণ্ডলী পরস্পরে প্রতিফলিত [illegible] দুইয়ের মধ্যে এই নীতি অনুসৃত [illegible] পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ও সরকার [illegible] সর্বতোভাবে পশ্চিমমুখীন এবং [illegible] পৃষ্ঠপোষক হলেন পশ্চিম ভারতাগত [illegible] বণিক সম্প্রদায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বা[illegible] সমাগম ঘটতে লাগল।

উদ্বাস্তু সমাগমের কারণ চরম পর্যা[illegible] উঠল ১৯৫০-এ। হিন্দু বাঙালী বিতাড়[illegible] উৎসাদনের পবিত্র কর্তব্য নিয়েছিল পূ[illegible] বঙ্গের পাকিস্থানীরা; রক্তপাত, [illegible] ধর্ষণ যখন হল ব্যাপক এপারে ডাঃ রায় [illegible] মন্ত্রণাসভা সংবাদপত্র-সাংবাদিকদের [illegible] চেপে যাবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু [illegible] এমনই অপ্রতিরোধ্য হল যে, সব বাঁধ ভে[illegible] গেল, প্রতিক্রিয়া ঘটল এখানেও; ১৯৫০-[illegible] ৯ ফেব্রুয়ারী সৈন্যও তলব করতে হল [illegible] কাতা শহরতলীতে; জারী করতে হল ১৪৪ ধারা আর কারফ্যু।

সর্দার প্যাটেল, পণ্ডিত নেহরু [illegible] বাসীকে শান্ত সংযত থাকতে বললেন [illegible] জওহরলাল এক অনিরুদ্ধ আবেগে [illegible] বসলেন, যদি যে উপায় আমরা [illegible] তাতে সায় না পাওয়া যায় তো অন্য [illegible] আমাদের নিতে হবে।

পূর্ববঙ্গ থেকে বীভৎস কাহিনী [illegible] আসতে লাগল এবং 'প্রতিকার কি?' [illegible] প্রশ্নে পত্রিকা একটা 'গ্যালআপ পোল' অবতারণা করলেন। দিল্লীর কর্তারা অসন্তু[illegible] চিত্তে আবার বঙ্গবাসী সম্পাদকদের [illegible] ভর্ৎসনা করলেন। জনসাধারণ [illegible] একসাথ চাইছিল। পণ্ডিত নেহরু অন্য [illegible] পন্থা না নিয়ে পার্লামেন্টে আর একবার তীব্র তিরস্কার করলেন বঙ্গবাসী সংবাদ[illegible] পরিচালক-সাংবাদিকদের।

'নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি'

শেষ ফল হল, ১৯৫০-এর ৭ এপ্রি[illegible] নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি। প্রতিবাদে ডঃ শ্যা[illegible] প্রসাদ মুখার্জি ও শ্রী কে সি নিয়োগী মন্ত্রিত্বের পদ ত্যাগ করলেন। নেহরু-নী[illegible] সঙ্গে মতান্তরে আরও দুটি পদত্যাগ [illegible] ছিল : মোহনলাল সাকসেনা ও ডঃ মাথাই-র। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং [illegible] নেহরু-নীতি সর্বতোভাবে সমর্থন [illegible] ছিলেন।

(৫) তখনও ছিল ১৯৩৫-এর আইনমতে প্রদেশ এবং তদনুসারে এখন যাঁরা 'মুখ্যমন্ত্রী' তখন তাঁরা ছিলেন 'প্রধান-মন্ত্রী'।

লালবাহাদুর শাস্ত্রী

শেখ আবদুল্লা

[illegible] ৩০ লক্ষের মত হিন্দু পূর্ব-[illegible] পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসামে [illegible] মত ছড়িয়ে পড়েছে। শ্যামা-[illegible] কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে প্রস্থানের [illegible] বিরুদ্ধে হয়েছিলেন সংখ্যালঘু [illegible] মন্ত্রী। তিনিও ঘোষণা [illegible] অবস্থা ক্রমশঃই অব-[illegible] হচ্ছে। ১৯৫২-এর একটি মাস [illegible] অক্টোবর। দশ হাজার উদ্বাস্তু [illegible] উদ্বাস্তুর সংখ্যা দাঁড়ালো [illegible] ভারত সরকার ১৬ অক্টোবর [illegible] আগমনের পথ দিলেন বন্ধ [illegible] প্রথা প্রবর্তিত হল। [illegible] পুনর্বাসনের সূচনাতেই ভারত [illegible] পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় তুলে [illegible] লাগলেন। কাশ্মীরে এক [illegible] স্থির হল। পুনর্বাসন মন্ত্রী [illegible] শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন। ১৯৫৪ [illegible] কথা।

[illegible] কথা উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গে [illegible] আমলে কিছু উদ্বাস্তু আন্দামানে [illegible] হয়েছিল; সেইসব উদ্বাস্তু আজ

ভালই আছেন। কিন্তু এক শ্রেণীর রাজনীতিকের অকারণ হৈ-চৈয়ে তখনই তা ব্যাহত হয় এবং অন্যান্য প্রদেশ বা রাজ্যও সেখানে 'আবাদে'র দাবী জানায়। ফলে, সেখানে উদ্বাস্তু পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়। এরপর যখন দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের প্রস্তাব আসে তখনও অনুরূপ হৈচৈ হয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও দণ্ডকারণ্যে আজ পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের এক নতুন বসতি গড়ে উঠেছে। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমাচারির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আলোচনা-ফলই দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা। আন্দামান ও দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সার্থক হয়েছে।

'কোচবিহারের বাগড়ুলি'

বহু উদ্বাস্তু বা পূর্ব পাকিস্থানের বাঙালী হিন্দুর পুনর্বাসন হয়েছে কোচবিহারেও। কোচবিহার ছিল এক দেশীয় রাজ্য। এক শ্রেণীর কোচবিহারীর বিপরীত

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

বিধানচন্দ্র রায়

আন্দোলন এবং কেন্দ্রের দ্বিধা সত্ত্বেও কোচবিহার শেষপর্যন্ত—পাকিস্থান বা আসামে না গিয়ে—পশ্চিমবঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত হল ১৯৫০-এর পয়লা জানুয়ারী। তদবধি কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা।

কোচবিহার অন্তর্ভুক্তির আরও তিন বছর পর পশ্চিমবঙ্গে আর এক বৈপ্লবিক বিধান হল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ দশসালা বন্দোবস্ত থেকে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করে এক শ্রেণীর জমিদার সৃষ্টি করেছিলেন তার অবসানে ১৯৫৩-এর মে মাসে এক বিল উত্থাপিত হয়। 'পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি-দখল বিল'। (৮) ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল এই বিল পাশ হয়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গে কোচবিহার রাজ্য অন্তর্ভুক্ত এবং পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হল বটে কিন্তু কেন্দ্রের অনিশ্চিতভাবে পণ্ডিত নেহরুর ভুলে, স্যার ফিরোজ খাঁ নূনের সঙ্গে পণ্ডিত নেহরুর এক চুক্তিকালে পাকিস্থান বেরুবাড়ী ভারতেরই এক বৈধ এলাকা

(৮) ওয়েস্ট বেঙ্গল এস্টেটস্ একুইজিশান বিল

সম্ভার নিয়ে পাকিস্থানের উদ্দেশে উড়ে যান। তখন ১৯৪৭-এর নভেম্বরের মাঝামাঝি।

হায়দারাবাদের নিজাম - উল - মুলকের ব্যাপারটা কিছু আলাদা। তিনি স্বস্থানেই স্বাধীন থাকবেন এই ছিল তাঁর বাসনা। সর্দার প্যাটেল বললেন, নিজাম যদি দেওয়ালের লিখন না পড়ে থাকেন তবে হায়দারাবাদও জুনাগড়ের পথ নেবে। সংবিধান পরিষদে (৯) তিনি অবশ্য জানালেন, নিজামের সঙ্গে ভারত সরকারের একটা চুক্তি হয়েছে; বৃটিশের ছত্রচ্ছায়া ছাড়া বৃটিশ সরকারের সঙ্গে অন্যান্য যেসব সন্ধি-শর্ত ছিল তা এক বছরকাল অক্ষুন্ন থাকবে।

হায়দারাবাদ ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হল না। ১৯৪৮-এর মার্চ মাসেও না। হায়দারাবাদের ভেতরটা উদ্বেলিত হয়ে উঠতে লাগল। ২৬ এপ্রিল পণ্ডিত নেহরু ঘোষণা করলেন: হায়দারাবাদের ব্যাপারে ভারত সরকারের ধৈর্য শেষ সীমায় পৌঁছেছে।

হায়দারাবাদে রাজাকার নামে এক উৎপাতের সৃষ্টি হল। ওরা হায়দারাবাদের সীমা ছাড়িয়ে নাগপুরেও হানা দিতে লাগল। ১২ জুন খবর পাওয়া গেল, স্যার ওয়াল্টার মংকটন দিল্লীতে এসেছেন সংযুক্তির প্রস্তাব নিয়ে; ওদিকে বৃটিশ সরকারের সঙ্গেও হায়দারাবাদ সরকার আলাপ চালাতে লাগল। নিজাম ইংলণ্ডেশ্বরকে এক ব্যক্তিগত পত্র দিলেন। স্যার ওয়াল্টার মংকটনের সেক্রেটারী রিচার্ড সোমস্ট কিছু দলিলপত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন, উইলিংডন বিমান ঘাঁটিতে ধরা পড়ে গেলেন। জুলাই মাসের শেষে হায়দারাবাদের প্রধানমন্ত্রী স্যার মীর্জা ইসমাইল দিল্লী এসে নেহরুর সঙ্গে আলাপ করলেন বলে। ১লা আগস্ট এও জানা গেল, করাচী ও হায়দারাবাদে বিমানযোগে বন্দুক আনা-নেওয়া চলছে। করাচীতে একটি ল্যাংকাশায়ার বিমান দুর্ঘটনায় এই সংবাদের সমর্থন পাওয়া গেল।

১০ আগস্ট ভারতীয় সংবিধান পরিষদে উপ প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই হায়দারাবাদ সম্পর্কে এক শ্বেত-পত্র প্রকাশ করলেন। নিজাম সরকার এক প্রেস নোটে জানালেন, তাঁরা 'মামলা' নিয়ে যাবেন রাষ্ট্রপুঞ্জে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে নাকি তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২১ আগস্টের সংবাদ - হায়দারাবাদ রাজ্যের ২৫০টি গ্রাম স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। নিজাম আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপুঞ্জে সরকারি নালিশ জানালেন। ভারত সরকার নিজামকে জানালেন, শর্ত পালন করার ভারত সরকারের পক্ষে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনেই বাধা রইল না।

১৩ সেপ্টেম্বরের খবর • নিজাম ভারতীয় সেনাবাহিনীর হায়দারাবাদ রাজ্যে প্রবেশ। তাদের দ্রুত অগ্রগতি। তিন দিনেই সব শেষ। বৃটিশ পার্লামেন্টে পার্লামেন্ট সদস্য, নিরাপত্তা পরিষদ উভয় পক্ষকে বৈঠকে ডাকল। কিন্তু ১৯৪৮-এর ১৭ সেপ্টেম্বর নিজাম আত্মসমর্পণ করেছেন বলে খবর এল। মেজর জেনারেল চৌধুরীকে গবর্নর করে হায়দারাবাদে মিলিটারী শাসন প্রবর্তিত হল। রাজাকর-দলনেতা সৈয়দ কাশিম রেজভি বন্দী হলেন। নিজাম নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত নালিশ তুলে নিলেন।

২৪ নভেম্বর নিজাম এক ফরমানে ঘোষণা করলেন, ভারতীয় সংবিধান পরিষদে যে সংবিধান গৃহীত হতে চলেছে তা ভারতের অন্যান্য অংশের মত হায়দারাবাদেও প্রযোজ্য হবে। ভারত-সংযুক্তির ভূমিকা। এবং হায়দারাবাদ রাজ্যে পঞ্চমাংকে যবনিকা পাতের ইংগিত।

চিরন্তন কণ্টক কাশ্মীর প্রশ্ন

১৯৪৭-এর অক্টোবর নাগাদ কাশ্মীর প্রশ্ন জটিল থেকে জটিলতর হতে লাগল। রাজা হিন্দু, প্রজারা অধিকাংশ মুসলমান। গা-লাগা পাকিস্থান। মসলের চরিত্রবিন্যাসমতে মহারাজ ছিলেন ধর্মান্ধ, ভ্রষ্ট চরিত্র, স্বেচ্ছাচারী ও প্রজাদের সম্পর্কে উদাসীন। কংগ্রেসীরা জেলে।

নেহরু বললেন, আমি গিয়ে দেখছি। গান্ধীজী বললেন, না, তোমার গিয়ে কাজ নেই, গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পার, আমি যাই। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, কারও গিয়ে কাজ নেই, আমি যাব। হরি সিং তাঁর পুরোনো বন্ধু। কাশ্মীরের মহারাজা অসুখের ভান করে দেখা করেন নি। দেখা করতে হল কিন্তু ভি পি মেননের সঙ্গে—দায়ে পড়ে— অক্টোবরে যখন উপজাতীয়েরা ওরফে পাকিস্থানীরা হানা দিল কাশ্মীর রাজ্যে। মহারাজ সাহায্য ভিক্ষা চাইলেন ভারতের কাছে। মহারাজ ভারত ডোমিনিয়ানের সঙ্গে সংযুক্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলেন। এদিকে শ্রীনগরে সর্বভারতীয় দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলন ও কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের হাজুরিবাগে এক বিরাট জনসভায় প্রেসিডেণ্ট শেখ আবদুল্লা কোন ডোমিনিয়ানে যোগদানের সিদ্ধান্তে না এসে 'জনরাজ'-এর আভাস দিচ্ছিলেন। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে সীমান্ত থেকে উদ্বেগজনক সংবাদ আবদুল্লা স্বীকার করলেন। স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন করা হল। কাশ্মীরকে পাকিস্থানের কুক্ষিগত করার অভিপ্রায় কারও কাছে অস্পষ্ট রইল না। শেখ আবদুল্লা দিল্লীতে এলেন ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য। ২৬ অক্টোবর পণ্ডিত নেহরু মন্ত্রিসভার জরুরী বৈঠক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ইমার্জেন্সী কমিটিও ডাকলেন।

ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীর রক্ষার সাহায্যে এগিয়ে গেল। ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেন • কাশ্মীরের মহারাজাকে জানালেন, যেই মাত্র কাশ্মীরে আইন-শৃংখলা ফিরে আসবে অমনি গণভোট নিয়ে সংযুক্তি প্রশ্নটির মীমাংসা হবে। চার্চিল নেতৃত্বের বৃটিশ পার্লামেণ্টে কমনওয়েলথ মন্ত্রী ফিলিপস নোয়েল বেকারের মুখে জিন্না নেহরু বৈঠকের কথা শোনা গেল। কিন্তু সীমান্ত প্রদেশের প্রধান খান আবদুল কায়ুম খান এই বলে চেঁচিয়ে উঠলেন যে, 'মুসলিম কাশ্মীরে ভারত সেনাবাহিনী পদার্পণ করেছে। এ মুসলিম জাহানের বিরুদ্ধে এক চ্যালেঞ্জ। তাই তিনি মুসলিম জাহান এর মোকাবিলার জন্য আহবান করছে

পক্ষান্তরে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু গবর্ণর জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের কথারই প্রতিধ্বনি করে বলল কাশ্মীরে যখন শান্তি-শৃংখলা ফিরে আসবে তখন ভারত সরকার রাষ্ট্রপুঞ্জ কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার তত্ত্বাবধানে রেফারেণ্ডাম বা গণমত গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনী নভেম্বরে দ্বিতীয় সপ্তাহে শ্রীনগর বারমুলা রো বরাবর বারমুলা দখল করে হানাদারে পেছনে ছুটে চলেছে। এই অবস্থায় ১১ নভেম্বর শেখ আবদুল্লা বললেন, বারমু উরি, পাত্তন, মুজাফারাবাদ ও অন্য জায়গায় যা হয়েছে তারপর রেফারেণ্ড আদৌ নাও হতে পারে। যা হয়েছে ত পর এ নিয়ে কাশ্মীরবাসী মাথা নাও ঘামা পারে। (১০)

ইতিমধ্যে পর পর বেশ কয়ে আন্ত-ডোমিনিয়ান বৈঠক হয়। তার একে ফলও প্রকাশিত হয় না। কিন্তু কাশ প্রশ্নে পাকিস্থানও যে একজন সার্ট এটা কার্যতঃ স্বীকৃত হয়ে যায়। ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি ঘণ্টা আলাপ হল কাশ্মীর নিয়ে। কাশ প্রশ্ন সালিশীতে দেবার প্রস্তাব সম্প গান্ধীজী বলেছিলেন, ভারত ইউনিয় পাকিস্থান কি বরাবর বিরোধ নিষ্প জন্য তৃতীয় পক্ষের ওপর নির্ভর কর শুনছি কাশ্মীর ভাগ হবে। এর কোথায়? (১১)

১৯৪৭-এর শেষ দিনে খবর হ ভারত সরকার স্থির করেছেন, কাশ প্রশ্নটি তাঁরা রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা প ষদে তুলবেন।

১৯৪৮-এর ২ জানুয়ারী পণ্ড নেহরু স্বদেশবাসীর উদ্দেশে বল কাশ্মীরের এই সোজা প্রশ্নটি রাষ্ট্র যথাশীঘ্র নিষ্পত্তি করে ফেলবে। ৭ জ য়ারী নিরাপত্তা পরিষদে বিতর্ক সুরু রাষ্ট্রপুঞ্জ উভয় পক্ষকে বলল, যুদ্ধ থা দুই দেশ রাষ্ট্রপুঞ্জের সালিশী মেনে নি দু দেশের প্রতিনিধি কাশ্মীরে গণ সম্পর্কিত খসড়া পরিকল্পনায় দিলেন। (২৫ জানুয়ারী ১৯৪৮)

---

(৯) কন্সটিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি

(১০) অমৃতবাজার পত্রিকার, ১২ নভে ১৯৪৭।

(১১) অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৬ ডিসে ১৯৪৭।

বাঙলাদেশ মুক্তি লগ্নে : লেঃ জেঃ অরোরার সামনে আত্মসমর্পণ দলিলে সাক্ষর করছেন পাকিস্থানী সেনাধ্যক্ষ নিয়াজী

আনন্দমুহূর্ত : আমাদের তিন সেনাপ্রধানের সঙ্গে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম

শেখ আবদুল্লা অবশ্য বলেছিলেন, পাকিস্থানী প্রতিনিধিমণ্ডলী সেখানে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে অস্বীকার করছেন যে, কাশ্মীর অভিযানে তাঁদের দায়িত্ব নেই সেখানে পাকিস্থান একটা পক্ষ হয় কি করে?

ভারত সরকার জম্মু ও কাশ্মীর সমস্যার সব নথিপত্র তথ্য দিয়ে এক শ্বেতপত্র প্রকাশ করলেন। নিরাপত্তা পরিষদ ভারত-পাকিস্থানের প্রতিবাদ সত্ত্বেও কাশ্মীরে এক 'গণভোট তদারকী কমিশন' নিয়োগ করলেন। (২৭ মে, ১৯৪৮) ২২ নবেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জে কাশ্মীর কমিশনের প্রথম খণ্ড রিপোর্ট বেরোলো প্যারিসে। তাতে জম্মু-কাশ্মীরে গণভোট বন্দোবস্তের অসুবিধের কথা বলা হল। ইতিমধ্যে পরলোকগত জিন্নার স্থলাভিষিক্ত গবর্ণর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দিন বললেন, কোন কথা নয়, কাশ্মীর পাকিস্থানের পক্ষে এক জরুরী প্রশ্ন।

১৯৪৯-এর ১ জানুয়ারী রাষ্ট্রপুঞ্জের যুদ্ধবিরতির আদেশ বলবৎ হল। ২২ মার্চ রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী ট্রিগভি লাই ঘোষণা করলেন, এডমিরাল চেস্টার ডবলিউ নিমিৎস জম্মু-কাশ্মীরের গণভোট এডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত হলেন। ২৬ জুলাই নাগাদ যুদ্ধবিরতি রেখা চূড়ান্ত হয়ে গেল, ৩০ জুলাই চুক্তি সমর্থিত হল।

ইতিমধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী সদলে ভারতকে উপদেশচ্ছলে হুমকি দিচ্ছিলেন যে এশিয়ার শান্তি রক্ষার্থে এ ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতেই হবে তখন শেখ আবদুল্লা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, 'কাশ্মীর ভারতের সঙ্গেই তার ভাগ্য জড়িয়ে ফেলেছে।' (১২)

ইতিমধ্যে পাকিস্থান আমেরিকার অপরিমিত আশীর্বাদে রণসাজে সজ্জিত হয়ে চলেছে। আমেরিকার যুক্তিটা ছিল— কম্যুনিজম রুখতে হবে। কিন্তু লক্ষ্য ছিল বিরাট ভারত যেন শক্তিশালী হয়ে না ওঠে।

১৯৫০-এর ২২ মে দিল্লীতে পাকিস্থানের শিল্পমন্ত্রী চৌধুরী নাজির আহমদ বললেন, রাষ্ট্রপুঞ্জে দেরী হলে পাক-ভারত সংঘর্ষ হতে বাধ্য। জুন মাস নাগাদ দিল্লীতে দু দেশের প্রধানমন্ত্রীর নেহরু-লিয়াকতের মিলনের পর লিয়াকৎ বললেন, কাশ্মীর যুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্থানের বিশ্রাম নেই। স্যার জাফরুল্লা খান বললেন, পাকিস্থান কাশ্মীর আক্রমণ করতে যায় নি, গেছেন ভারতীয় বাহিনীকে ঠেকাতে। (আগস্ট, ১৯৫০)

গিলগিটে খানিকটা জায়গা আমেরিকাকে ইজারা দেবার কথা চলতে লাগল। এই গিলগিটে গবর্ণর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দিন বললেন, কাশ্মীরের মুক্তি প্রতিটি কাশ্মীরবাসীর অন্তরের কথা। (১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০)

স্যার ওয়েন ডিকসন ঘোষণা করলেন, ভারত কাশ্মীর বিভাজনে রাজী, পাকিস্থান নয়। ডিকসন অবশ্য বলেছিলেন, উপজাতীয়দের কাশ্মীর অভিযান ও পাকিস্থানের নিয়মিত সেনাদের প্রবেশ আন্তর্জাতিক আইনের খেলাপ। কাশ্মীর ভারত ভূখণ্ডের অংশ, তা আক্রমণের কোন অধিকার পাকিস্থানের নেই। কিন্তু ১৯৫১তে লণ্ডনের কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের পর ডাউনিং স্ট্রীট থেকে যে ইস্তাহার বেরোলো তাতে ডিকসনের ভাষ্য বাতিল হয়ে গেল।

বৃটেন ও আমেরিকা উদ্যোগী হয়ে কাশ্মীর সম্পর্কে একটা প্রস্তাব রাখলেন নিরাপত্তা পরিষদে। স্যার ওয়েনেরই কিছু রূপান্তরিত গণভোট। এই ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাব পাশও হয়ে গেল। পণ্ডিত নেহরু নম্র ভাষায় এক প্রতিবাদ রাখলেন। কিন্তু মানতে রাজী হলেন।

উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের সংবিধান পরিষদে সংবিধান গৃহীত (১৯৪৯, ২৬এ নবেম্বর) এবং বলবৎ (১৯৫০, ২৬এ জানুয়ারী) হবার পরও কাশ্মীরে কাশ্মীরের জন্য একটি পৃথক সংবিধান পরিষদ, অর্থাৎ কাশ্মীরকে ভারত-অঙ্গীভূত হলেও পৃথক রাষ্ট্ররূপে গণ্য করার পটভূমি রচিত হল। জম্মু-কাশ্মীর-লাডাকের সংবিধান পরিষদের উদ্বোধন হল ১৯৫১-এর ৩১এ অক্টোবর, ঝিলম নদীর তীরে প্রাচীন 'শের গরহি প্যালেস'-এ। অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট গোলাম মহম্মদ সাদিক এই পরিষদকে সার্বভৌম বলে ঘোষণা করলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বললেন, কাশ্মীর গণপরিষদের এ কথা বলার পূর্ণ এক্তিয়ার আছে।

কার্যতঃ, কাশ্মীর সংবিধান পরিষদের রথ এবং রাষ্ট্রপুঞ্জে ইঙ্গ-মার্কিন পরিচালিত গ্রাহাম-রথ সমান্তরালে চলতে লাগল। ১৯৫১-এর ২১এ ডিসেম্বর ডাঃ ফ্রাঙ্ক গ্রাহাম রিপোর্ট দিলেন, কাশ্মীর রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে গণমত নেবার আগে কাশ্মীর বিসামরিকীকরণ প্রস্তাবে ভারত-পাক মতৈক্য হল না।

শেখ আবদুল্লার দিক পরিবর্তন

শেখ আবদুল্লা স্বয়ং এক সমস্যা হয়ে দেখা দিলেন। কেননা, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অনুমোদনক্রমে 'ভারতাঙ্গীভূত' কাশ্মীর সহ ভারতের দুই প্রধানমন্ত্রী, নেহরু ও আবদুল্লা। অথবা দুই পৃথক রাষ্ট্র দুই সংবিধান, দুই পতাকা। প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা ঘোষণা করলেন (১৯৫২, ২৫এ মার্চ)। দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে জম্মু-কাশ্মীর সংবিধান পরিষদের অধিকার অবিসম্বাদী। (১০ই এপ্রিল) ভারত ভূখণ্ডে যতদিন সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব থাকবে ততদিন কাশ্মীরের ভারত-সংযুক্তি সীমাবদ্ধ প্রকৃতির হবে। কাশ্মীরে ভারতীয় সংবিধানের প্রয়োগ সম্পর্কে যে সব যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে তাদের তিনি বললেন, অবাস্তব, বালসুলভ, বাতুলতা প্রায়। এ বক্তৃতা আবদুল্লা দিয়েছিলেন রণবীরসিংপুরায়।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রতিবাদে বলে উঠলেন, শেখ আবদুল্লার মনে কি আছে এ তার এক নগ্ন পরিচয়। পণ্ডিত জওহরলাল আবদুল্লাকে সমর্থন করলেন। তিনি সকল দোষ চাপালেন জম্মু প্রজা পরিষদের ওপর। অমৃতবাজার পত্রিকা ১৫ এপ্রিল লিখলেন, পণ্ডিত নেহরুর এই উপসংহার সংগত হচ্ছে না। ২১ বছরের রিজেণ্ট যুবরাজ করণ সিং ৫ মে কাশ্মীর বিধান সভায় সবাইকে আশ্বস্ত করে বললেন, তিনি আবদুল্লা-নীতির পুরোপুরি সমর্থক। ১২ জুন কাশ্মীর সংবিধান পরিষদে রাজ্যে বংশানুক্রমিক রাজশাসন প্রথা বিলুপ্তির সুপারিশ হল।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও এন সি চ্যাটার্জি দাবী করেছিলেন ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের পূর্ণ সংযুক্তি। ২৯ জুলাই নয়াদিল্লীতে ভারতীয় জনসংঘের উদ্যোগে কাশ্মীর দিবস পালন উপলক্ষে প্রচার হয়েছিল, ভারত এক ও অবিভাজ্য; এক একটিমাত্র সংবিধান, একটি পতাকা ও এক প্রেসিডেণ্ট থাকতে হবে। শেখ আবদুল্লা জানিয়েছেন তিনি ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায় গ্রহণ করবেন না, সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ারে থাকবেন না। আবদুল্লাকে পণ্ডিত নেহরু সমর্থন করলেন, কম্যুনিস্টরা নেহরুকে সমর্থন করলেন। নেহরু সবাইকে সতর্ক করে বললেন, 'কাশ্মীর সমস্যা আজ এক বিশ্ব-সমস্যা।' ভারতীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও জম্মু ও কাশ্মীরে যে ন্যাশনাল মিলিসিয়া গড়ে তোলা হয়েছিল, নেহরু তাকে বললেন, একটা পুলিশ বাহিনী মাত্র। ইতিমধ্যে কাশ্মীর সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে নিষ্পন্ন এক 'সন্তোষজনক' চুক্তির কথা প্রধানমন্ত্রী নেহরু লোকসভাকে জানালেন ২৪ জুলাই। জম্মু প্রজা পরিষদ ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের পূর্ণ সংযুক্তির দাবী যে আন্দোলন চালাচ্ছিল তার নিন্দা করলেন। শেখ আবদুল্লা জম্মুবাসীদের সাবধান করে দিয়ে বললেন, এ আন্দোলন চললে জম্মুর সঙ্গে কাশ্মীরের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যাবে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ এই উক্তির প্রতিবাদ জানালেন ও কাশ্মীর প্রশ্ন রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে প্রত্যাহারের দাবী জানালেন।

পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রপুঞ্জের কাশ্মীর-মধ্যস্থ ডঃ ফ্রাঙ্ক গ্রাহাম আর একবার ভারত-পাক প্রতিনিধিদের নিয়ে বসলেন। (২২ জানুয়ারী, ১৯৫৩)

১৫ ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রী নেহরু কংগ্রেস সংসদীয় দলের কাছে বললেন ভারত-কাশ্মীর সীমান্তে যে কাস্টমস বাধা রয়েছে তা তুলে দেওয়া আপাতত সম্ভব নয়।

---

(১২) অমৃতবাজার পত্রিকা, ৬ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি দুই প্রধানমন্ত্রী—নেহরু ও আবদুল্লার সঙ্গে যে পত্রালাপ করেছিলেন ১৩৯ পৃষ্ঠাব্যাপী সেই পত্রাবলী প্রকাশ করলেন।

শেখ আবদুল্লা জম্মু-কাশ্মীরকে—কাশ্মীর-উপত্যকা, জম্মু, লাডাক, গিলগিট এবং মীরপুর-পুঞ্চ-মুজঃফরাবাদ—এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব আনলেন; প্রত্যেকটি প্রদেশ হবে কিছু পরিমাণে স্বায়ত্তশাসিত। এদের সবার ওপরে থাকবে ফেডারেল গবর্নমেণ্ট। নেহরু সরকার এই প্রস্তাব বিবেচনাধীন রাখলেন, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ একে 'মারাত্মক বিচ্ছিন্নতাবাদ' বলে নিন্দা করলেন।

'বাঙলার শেষ বাঘ'

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ আরও প্রস্তাব করলেন, জম্মু প্রজা পরিষদের ব্যাপারটা সরেজমিনে তদন্ত হোক। নেহরু রাজী না হওয়ায় শ্যামাপ্রসাদ বললেন, তিনি নিজেই যাবেন ব্যাপারটা বুঝতে। শ্যামাপ্রসাদ লোকসভার সদস্য। তিনি ১১ মে জম্মু যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। তখন কাশ্মীর যেতে ভারত সরকারের বিধিমতে পারমিট লাগত। কেননা, কাশ্মীর ভিন্ন রাজ্য। শ্যামাপ্রসাদ বললেন, পারমিট ছাড়াই যাবেন। কেননা, কি আইনবলে এই পারমিট প্রবর্তিত হয়েছে তা তাঁর জানা নেই।

শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীর যাবেন শুনে শেখ আবদুল্লা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। ডঃ মুখার্জির তারবার্তার উত্তরে জানালেন 'আপনার এই আগমনেচ্ছা 'অসময়োচিত।'

পাঠানকোট-জম্মু সীমান্ত পার হতেই, কাশ্মীর রাজ্যের দু মাইল ভেতরে লক্ষ্মণপুরে (১১ মে, ১৯৫৩) ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দী হলেন। দিল্লীতে শ্যামাপ্রসাদের একটা মামলা ছিল; কিন্তু তাঁকে দিল্লীতে আসতে দেওয়া হল না। তারপর অকস্মাৎ নীলাকাশে বজ্রপাতের মত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মৃত্যু সংবাদ পশ্চিমবাঙলা তথা ভারতের কোন কোন অঞ্চলকে স্তব্ধ করে দিয়ে গেল। ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে ২৩ জুন শ্রীনগরের সংবাদ : আজ প্রত্যূষে ৩.৪০ মিনিটে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি গভর্নমেণ্ট হাসপাতালে মারা গেছেন। বিমানযোগে তাঁর মরদেহ এনে ২৪ জুন কেওড়াতলায় অন্ত্যেষ্টি হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নেহরু তখন কায়রোতে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কাটজু অল্পক্ষণের জন্য শ্যামাপ্রসাদের মরদেহবাহী বিমানটিকে দিল্লীতে নামাতে অনুমতি দেন নি।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু-রহস্যভেদের একটা ক্ষীণ ক্ষণস্থায়ী দাবী উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গে, কিন্তু ভারত সরকার, প্রধানমন্ত্রী নেহরু, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সর্বময় কর্তা শ্রীঅতুল্য ঘোষ এই তদন্তে রাজী না হওয়ায় তার ওপর যবনিকাপাত হয়েছিল।

কিন্তু শেখ আবদুল্লা তখনও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যান নি। বরং তিনি ভারতমুক্ত [illegible] ঘোষণা করলেন : 'অবস্থার চাপে পড়ে কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। আজ সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। কাশ্মীরিরা একটা স্বতন্ত্র জাতি।'

নাটকীয় গতি ও ভঙ্গিতে ১৯৫৩ এর ৯ আগস্ট শেখ আবদুল্লা আরও ৩০ জনের সঙ্গে হাজতবন্দী হয়ে গেলেন। কাশ্মীর নিয়ে নেহরুর সঙ্গে বিরোধ করবার যে ব্যক্তিটি ছিলেন, সেই শ্যামাপ্রসাদ অপসৃত হতেই শেখ আবদুল্লাকে অপসারণের কোন বাধাই আর নেহরুর ছিল না। আবদুল্লার সঙ্গে মীর্জা আফজল বেগও বন্দী হন। বকসী গোলাম মহম্মদ হন কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী।

কাশ্মীরকে নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থির হল (২১এ আগস্ট, ১৯৫৩) কাশ্মীরে গণভোট পরিচালক নিযুক্ত হবেন ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে। গণভোট পরিচালক হিসেবে এডমিরাল নিমিৎস-এর নিয়োগ নিয়ে নেহরু-মহম্মদ আলির মধ্যে গোপন পত্রালাপ হল (৩১ আগস্ট, ১৯৫৩)। নিমিৎস পদত্যাগ করলেন।

ইতিমধ্যে পাকিস্থান মার্কিন মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত হয়েছে। তার ওপর হল পাকিস্থান আমেরিকার এক সামরিক চুক্তি। আমেরিকা ভারত সরকারকে সরকারীভাবে জানালো যে, দক্ষিণ এশিয়ায় স্বাধীন রাজ্যগুলোকে বলিষ্ঠতর করবার পরিকল্পনা মতো সে পাকিস্থানকে সামরিক সাহায্য দেবে (১৬ নবেম্বর, ১৯৫৩)।

২ ডিসেম্বর ভারত-রুশ বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনকালে জানা গেল, পাকিস্থান আমেরিকাকে একটি গোয়েন্দা বিমানঘাঁটি প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু পাক ভূখণ্ড ছেড়ে দিচ্ছে ও মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় (সেণ্টো) যোগ দিচ্ছে। কিন্তু পাকিস্থানেরও পার্শ্ব পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। কেননা, কূটনৈতিক ও রণনৈতিক কৌশলের খাতিরে চীন-রুশ-আমেরিকার মধ্যে পাকিস্থানকে সমাদরের প্রতিযোগিতা চলছিল—সমরসম্ভার জোগানের ব্যাপারে।

১১ ডিসেম্বর (১৯৫৩) নিউইয়র্ক টাইমসের খবর মতো আমেরিকার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নিকসনের পাকিস্থান পরিদর্শনের উদ্দেশ্যই হল পাকিস্থানের সামরিক সামর্থ্য বৃদ্ধি। ১৯৫৩ এর ২৯ ডিসেম্বর খবর পাওয়া গেল, কোরিয়া থেকে সমরোপকরণ ফিরিয়ে আনা এবং তুরস্কে দেবার জন্য জাহাজ বোঝাই সমরোপকরণ পাকিস্থান আসছে। ১৯৫৪ এর ৬ জানুয়ারী আরও খবর এল, ভারতের প্রতিবাদ সত্ত্বেও প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ২০০,০০০,০০০ ডলার সামরিক সাহায্য দেবেন স্থির করেছেন। কথাটা পরিষ্কার হল যখন পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলি বললেন, বন্ধুরাষ্ট্রও জরুরী অবস্থায় পাকিস্থানকে ঘাঁটি করতে পারবে।

ইতিমধ্যে কাশ্মীর রাজ্যের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনায় আমেরিকা সংবাদদাতাদের ছলে ভারতকে হুমকি দিলেন। কাশ্মীর রাজ্য ভারতের সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ারভুক্ত করে ৩০ জানুয়ারী চুক্তি এবং সংবিধান পরিষদে ভারত-সংযুক্তির সুপারিশ হল। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে বললেন : 'আমি আপনাকে জানাতে চাই যে আমরা পাকিস্থানকে সামরিক সাহায্য দিচ্ছি। ইতি গজের মত একটা প্রতিশ্রুতি ছিল 'তা ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য নয়। (১৯৬৫ খৃস্টাব্দের যুদ্ধে সে প্রতিশ্রুতি পালিত হয়নি)।

শ্রীনেহরু পাকিস্থানের সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলার পথ নিলেন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে উভয় রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে নেপথ্য বৈঠক হল। ১৯৫৬ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি নয়াদিল্লীর এক জনসভায় ঐ বৈঠকের মর্ম প্রকাশ করে বললেন, তিনি পাকিস্থানকে পাক-অধিকৃত কাশ্মীর দিতে চেয়েছিলেন, তাতে যুদ্ধবিরতি রেখাই দুদেশের সীমা হত। কিন্তু পাকিস্থান 'অংশ' নিতে রাজী না হওয়ায় এই প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়।

এরপর এল ১৯৫৭তে জারিং মিশন এবং বার্তা নিয়ে চলে গেল। কাশ্মীর সমস্যা যেমন তেমনই রইল। ১৯৫৮তে ভারত সরকার কাশ্মীর সরকারের সহযোগিতায় শেখ আব্দুল্লাকে ছেড়ে দিয়ে আবার বন্দী করালেন। ইতিমধ্যে পাকিস্থানের সঙ্গে সরাসরি সমঝোতার চেষ্টা চলেছে, সেক্রেটারী পর্যায়ে, মন্ত্রী পর্যায়ে, প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে, এমনকি প্রেসিডেণ্ট পর্যায়ে। পাকিস্থানের জেড এ ভুট্টোর সঙ্গে ভারতের স্বরণ সিংয়ের সঙ্গে, একদফা রাওয়ালপিণ্ডিতে, আর এক দফা দিল্লীতে। আবার করাচীতে। সেই কাশ্মীর ভাগের কথা। পাকিস্থান নিম-রাজি, শুধু পদ্ধতি নিয়ে কথা বাকী। কিন্তু চতুর্থ পর্যায়ে কাশ্মীর উপত্যকা প্রশ্নে আলোচনা ঠেকে গেল।

ইতিমধ্যে গোয়া

১৯৪৭এ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষ ছেড়ে দিতে রাজী হল এবং ছেড়ে গেল। গেল, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরাও; যেতে চাইল না পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীরা। এবং ভারতবর্ষে গোয়া-দামন-দিউর মধ্যে গোয়াই তাদের প্রধান ঘাঁটি। এই ঘাঁটি সম্পর্কে কি করা হবে তা নিয়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মনে যে দ্বিধা ছিল তা কাটিয়ে উঠতে ১৪টি বছর লেগেছিল। ১৯৪৭ থেকে সাত বছর পর প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ১৯৫৪ এর ১৫ এপ্রিল লোকসভাকে জানালেন, তিনি পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষকে বিধিগত ক্ষমতা হস্তান্তরসাপেক্ষে ব্যবহারিক ক্ষমতা হস্তান্তরে অনুরোধ করেছেন।

ফলে, পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় কন্সাল জেনারেল ও ভাইস-কন্সালকে পর্তুগীজ এলাকা ছেড়ে যেতে বললেন। ভারত সরকারও পর্তুগীজ কন্সাল জেনারেল ও কন্সালের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, তিনি গোয়ায় সামরিক সমাধান চান না, তবে তাঁর আশা, গোয়া মুক্ত হয়ে

ভারতে সংযুক্ত হবে। (১৫ আগস্ট, ১৯৫৪)

গোয়া প্রবেশের জন্য ভারতীয়দের সত্যাগ্রহ শুরু হল। ১৬ আগস্ট সত্যাগ্রহীরা সাবন্তবাড়ি-গোয়া সীমান্তে তেরেখোল ছিটমহলে ঢুকে পড়লেন। গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস ১৫ আগস্ট ছিটমহলটি মুক্ত করে নিয়েছিলেন। শ্রীনেহরু রাজ্যসভায় ২৭ আগস্ট বললেন, তাঁরও ইচ্ছে করে একটা পতাকা নিয়ে গোয়ায় ঢুকে পড়েন। ডিসেম্বর মাসে তিনি পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষকে সত্যাগ্রহীদের পীড়ন না করবার জন্য সাবধান করে দিলেন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শ্রী ইউ এন ঢেবরকে কিছু কৈফিয়ৎ দিতে হল গোয়া মুক্তি আন্দোলনে কংগ্রেস নেই কেন বলে। তাঁর যুক্তি ছিল কংগ্রেস শাসক-পার্টি।

আরও কয়েকটা বছর গড়ালো। ১৯৬০ এর শেষে শ্রীনেহরু বললেন, আমার সন্দেহ নেই, গোয়া, দামান, দিউ মুক্ত হবে।

গোয়া আফ্রিকান কমিটির কনফেনসানে এমনি একটা বাণী দেওয়া ছাড়াও ১৯৬১ এর আগস্টে রাজ্যসভায় তিনি এরই পুনরুক্তি করেছিলেন। মোরারজী নেহরু ভাষণের ভাষ্য করে বলেছিলেন, যে ভারত অহিংসার কথা বলে এবং শান্তিপূর্ণ পথে বিশ্বসমস্যা সমাধানের কথা বলে তার পক্ষে জবরদস্তি গোয়া প্রশ্নের সমাধান সঙ্গত নয়। শ্রীনেহরু আমেরিকা সফরে গেলেন এবং ফিরে এসে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের ২৭ নবেম্বর লোকসভাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ২ ডিসেম্বর এক খবর এল যে, পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ গোয়াকে রণসাজে সজ্জিত করছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীও সীমান্তে সন্নিবিষ্ট হল। তারপর একদা ভারতীয় সেনাবাহিনী গোয়ার অভ্যন্তরে মার্চ করে গেল। ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে পর্তুগীজ সশস্ত্র সেনাবাহিনী গোয়া, দমন, দিউয়ে আত্মসমর্পণ করল। মেজর জেনারেল ক্যান্ডেথ বিমুক্ত ছিটমহলের সামরিক শাসক হলেন। ৪৬৩ বছর পর্তুগাল-করায়ত্ত ভারত ভূখণ্ড মুক্ত হল। ডিসেম্বর ১৯, ১৯৬১।

পঞ্চশীলের অন্ত্যেষ্টি

ইতিমধ্যে একটি ভয়ঙ্কর বিপদ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এসে ভারত-সীমান্তে ওৎ পেতে ছিল। তিব্বত থেকে সে পায়ে পায়ে হেঁটে আসে। ম্যাকমোহন লাইনে এসে থাবা রাখে এর নাম চীন।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে তিব্বত মুক্তির নামে চীনারা যখন তিব্বত অধিকার করে বসে তখন থেকেই ভারত-তিব্বত সীমান্তের সমস্যা চিহ্ন মাত্র রয়েছে। গত শতাব্দী ধরে যা ছিল কাগজের দলিল তাই পরিণত হল আন্তর্জাতিক উত্তেজনা ও হাঙ্গামার উৎস।

চীনারা সীমান্তের গাড়োয়াল অংশে সক্রিয় হয়ে নিলাং গিরিবর্ত্মকে মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করল। ভারত-চীন সম্পর্ক তখনও অটুট—'ভাই-ভাই'! চীনের আসল লক্ষ্য কাশ্মীরে একটা থাবা রাখা।

কিন্তু কিছু তিব্বতী নীতি [illegible] ম্যাকমোহন লাইন পার হয়ে [illegible] কাছে নয়াচীনের বৃহৎ মানচিত্র, ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ও তার পাদদেশ অন্তর্ভুক্ত (ডিসেম্বর, ১৯৫৩)।

এই গোপন বিহার ভারতীয় নেতৃবৃন্দের বিশ্বাসী দৃষ্টির অগোচরে রেখে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৫ জুন চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন লাই এলেন পালাম বন্দরে। ভারতের চিরাভ্যস্ত আতিশয্যে এই প্রচ্ছন্ন মিত্র-দূতকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হল। ঘোষণা হল প্রগাঢ়তর বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইতিহাসে এই হল পঞ্চশীলের জন্মক্ষণ। দুই প্রধানমন্ত্রীর যুক্ত ইস্তাহার। চীনের দাবী ছিল : 'ভারত! তিব্বত ছেড়ো।' ভারত রাজী হল। পঞ্চশীলে রইল প্রত্যেক দেশের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা ইত্যাদি সহাবস্থানের সহিষ্ণুতা।

নেহরু গেলেন চীনে ১৯৫৪ এর অক্টোবরে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে আবার এলেন চৌ এন লাই ভারতে।

পাকিস্থানের তৎকালীন অন্যতম নায়ক শহীদ সুরাবর্দী চীনে গিয়ে চীনাদের আশ্বাস দিয়ে এলেন, চীন যদি পাকিস্থানকে কাশ্মীরের ব্যাপারে সমর্থন করে পাকিস্থান বাগদাদ চুক্তি থেকে সরে আসবে। উল্লেখযোগ্য যে, কাশ্মীর সম্পর্কে ভারত চীনের কাছ থেকে একথাটি আদায় করতে পারেনি যে, কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

এর পর ভারতের দার্শনিক প্রেসিডেন্ট ডঃ রাধাকৃষ্ণণ চীন ঘুরে এলেন। (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭)

তিব্বতের রাজধানী লাসায় ভারতীয় দূতাবাসের ধারে-কাছেই যুদ্ধ চলছিল; দিল্লীতে সে সংবাদ পৌঁছালো ১৯৫৯ এর মার্চ মাসে। বৌদ্ধ উৎসাদনের একতরফা যুদ্ধ। পঞ্চশীলে আবদ্ধ ভারত নির্বাক সাক্ষী থাকেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু চীনকে আরও একবার এই আশ্বাস দিলেন যে, চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপে কোন ইচ্ছাই আমাদের নেই (২৪ মার্চ, ১৯৫৯)।

দলাই লামা নিখোঁজ। হংকং থেকে জানা গেল, চীনা রাষ্ট্র পরিষদ ২৮ মার্চ এক ঘোষণাবলে তিব্বতী গবর্ণমেন্ট ভেঙে দিয়েছেন। খবর এল দলাইলামা পালাচ্ছেন। যে তিব্বতী প্রতিনিধিমণ্ডল নেহরুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তাঁদের প্রধানমন্ত্রী বলে দিলেন, ভারত চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাবে না। কিন্তু চুক্তি হয়েছিল তিব্বতের স্বায়ত্তশাসন অক্ষুণ্ণ রাখার ভিত্তিতেই। ১৯৫৯ এর এপ্রিল মাসে দলাইলামা সদলে ভারতে প্রবেশ করলেন। প্রধানমন্ত্রী এই সংবাদ লোকসভাকে দিলে সদস্যগণ স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসধ্বনিতে ফেটে পড়লেন। নেহরুও বললেন, দলাইলামা যথাযোগ্য মর্যাদা পাবেন।

এদিকে প্রকাশ পেল যেসব মানচিত্র যাতে ভারত ভূখণ্ড তিব্বতে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। নেহরু পর্যন্ত চীনাদের কৈফিয়ৎ [illegible] মান্য করলেন না। চীনে [illegible] সম্পর্কে গালমন্দ শুরু হল। ভারত-তিব্বত বাণিজ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগল। ভুটান-সিকিম সীমান্ত বরাবর চীনা সৈন্যের সমাবেশ হল। নেফায় চীনাদের অনুপ্রবেশ বেড়েই চলেছে। লাডাকের অবস্থা আরও উদ্বেগজনক।

১৯৫৯ এর ৩০ আগস্ট পত্রিকার আট কলমব্যাপী শিরোনামার মর্মার্থ হল : লাডাক ও নেফায় চীনা আগ্রাসন। নেহরু বললেন, দেশের সীমান্ত রক্ষা করতে হবে। চীনারা নেফার লঙ্জুতে একটি ভারতীয় অগ্রসর ঘাঁটি দখল করল। ভারত সরকারের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করল। (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯) মার্শাল চেন-ঈ বললেন, ভারত যদি চীনা ভূখণ্ড স্পর্শ করে তো তা সহ্য করা হবে না। সোভিয়েট রাশিয়া চীনকে সমর্থন করল।

সরল অর্থ দাঁড়ালো, চীন ম্যাকমোহন লাইন মানে না। সোভিয়েট রাশিয়া সন্দেহ প্রকাশ করল, ভারতকে কোন পাশ্চাত্য শক্তি প্ররোচিত করে থাকবে।

চীনারা ভারত থেকে ভুটানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তিব্বত হয়ে ডাক যাবার যে সংক্ষিপ্ত পথ ছিল তা বন্ধ করে দিল।

১৯৬০এ চৌ এন লাই ভারতের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ২৪ এপ্রিল অবধি আলোচনা হল। নেহরু পিকিং গেলেন। কিন্তু চৌ বললেন, ম্যাকমোহন লাইন মানছি না। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের শীতকালীন অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী জানালেন, চীনারা লাডাক অঞ্চলে আরও খানিকটা এগিয়ে এসে কয়েকটা ঘাঁটি বসিয়েছে।

পাকিস্থানে রাওয়ালপিণ্ডিতে চীনের রাষ্ট্রদূত টিং কিয়োয়ু প্রেসিডেন্ট আয়ুব ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদেরের সঙ্গে দেখা করলেন। টি কিয়োয়ু ঘোষণা করলেন, চীন সোভিয়েট রাশিয়ার মত কাশ্মীরের ওপর ভারতের দাবী স্বীকার করে না।

জয় ও পরাজয়

১৯৬২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের মাথায় ভারত বনাম ইংলণ্ড টেস্ট ম্যাচে ভারত 'রাবার' লাভ করল।

চীন পাকিস্থান-অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট এলাকার ৪০০০ বর্গ ভূখণ্ড তার বলে দাবী করল। এতদিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নৈরাশ্য প্রকাশ করলেন '১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের চুক্তি স্বাক্ষরে যে আশা জেগেছিল, গত কয়েক বছর ধরে পিপলস রিপাবলিক অব চায়নার আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী নীতি তা বিনষ্ট করে দিয়েছে। চীন ইতিমধ্যেই ভারতের ১২০০০ বর্গমাইল ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছে। চীনা বিশেষজ্ঞরা এসে কাঠমাণ্ডুতে কাঠমাণ্ডু-লাসা রোড চুক্তি স্বাক্ষর করে গেল। ভারতের পররাষ্ট্র বিভাগীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী লক্ষ্মী মেনন লোকসভাকে জানালেন, চীনারা আরও এগিয়েছে। চীনারা এগোচ্ছে আর বলছে, সাবধান, সীমান্ত সঙ্ঘর্ষ যে কোন মুহূর্তে সমরাগ্নি জ্বালাতে পারে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন, লোকসভা সদস্যদের সব সংশয় ঝাড় মেরে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, সব মিথ্যে কথা, সব গুজব। চীনা সৈন্যেরা নেফার পঁচিশ বর্গ-

পাকিস্থান দ্বারকা বন্দরে গোলাবর্ষণ করেছিল; কিন্তু অনতিবিলম্বে আরব সাগরে ভারতীয় নৌবহরের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার সংগে সংগে নিরস্ত হয়।

পাক-বিমান পশ্চিমবংগেও আক্রমণ চালিয়েছিল; কিন্তু পাক-সেনা সীমান্ত অতিক্রম করেনি। স্থলযুদ্ধ পশ্চিমেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্থানী সিন্ধুর গাদরা অঞ্চলে বহুদূরে অগ্রসর হয়ে যায়; কিন্তু পাকিস্থানীরা রাজস্থানে হানা দিয়েছিল।

কিন্তু লাহোর অভিমুখীন ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণে ইংগ-মার্কিন অভিভাবকেরা বেসামাল হয়ে পড়লেন। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী তো বলেই বসলেন, ভারত আক্রমণকারী। পরে অবশ্য শোধন করে ছিলেন। তখন কূটনৈতিকদের ছুটোছুটি আরম্ভ হয়ে গেল, যুদ্ধ থামাও যুদ্ধ থামাও। শুধু তাই, পররাজ্যলোভাতুর চীনও ঝোপ বুঝে কোপ মারার জন্য বিপন্ন দোস্তকে রক্ষার অছিলায় ভারত সীমান্তে হুমকি দিতে লাগল। সোভিয়েট রুশিয়াও একটা মধ্যস্থতার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠল। মাত্র দিন কয়েক যুদ্ধে কূটনৈতিক চাকা ঘোরা। ভারত রণক্ষেত্রে জয়ী হলেও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে হেরে গেল এবং পাকিস্থানকে কেউ আক্রমণকারী না বলে পাক-ভারতকে একই তৌলে তুলে দুই বেয়াড়া ছেলের ক্রোধ উপশমে সালিশীতে বসালেন। দুজন তখন ভাল ছেলের মত যার যার জায়গায় সরে এল।

অসহায় ভারতকে পাকিস্থানের সংগে সমতোল দণ্ডে তুলে নিয়ে এলেন সোভিয়েট রুশিয়া তারই ভূখণ্ড—তাসখন্দে। এই তাসখন্দ বৈঠক হল জেনারেল আয়ুব খাঁ ও লালবাহাদুর শাস্ত্রীর। চুক্তি স্বাক্ষরের পর ভারতে দুটি সংবাদ একসংগে এল ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে; সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃবৃন্দের খবরদারিতে পাক-ভারত চুক্তি আর লালবাহাদুর শাস্ত্রীর বিষম মৃত্যু। ১৯৬২তে চীনের সংগে পরাজয়ের যে গ্লানি ভারতকে কাতর করেছিল ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের জয়ের মধ্যেও কূটনৈতিক পাকচক্রে সেই একই গ্লানি বহন করতে হল।

নানা কারণে ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দ ভারতে বিরাট এক রাজনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে এল। একাদিক্রমে ১৯৪৭ থেকে কুড়ি বৎসর নিরংকুশ কংগ্রেস শাসনে রাজ্যে রাজ্যে চিড় ধরল, কেন্দ্রেও ক্ষমতা ক্ষীয়মান হল। বামপন্থী আন্দোলনের নিজস্ব গুণে নয় অথবা অকংগ্রেসী দলের অন্তর্নিহিত কোন আকর্ষণেও নয় জনসাধারণের আশা পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় এবং ক্রমশঃ জনগণ দূরে সরে গিয়ে গণ-বিরোধী ব্যবস্থাদি নেওয়ায় কংগ্রেসের প্রতি লোকের আস্থা হারিয়ে যাচ্ছিল। অথচ কোন পথও ছিল না। সেই আক্রোশে অন্ধ আবেগে ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে সাধারণ ভোটদাতারা ব্যালট বাক্সে তাদের নঞর্থক প্রতিবাদ বিজ্ঞাপিত করল। কেরালা, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, পশ্চিম বাংলা, বিহার, পাঞ্জাবে অকংগ্রেসী সরকারের উদ্ভব হল। কিন্তু কোথাও অন্য কোন দল নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সর্বত্র যুক্তফ্রন্ট গঠিত—এক মাদ্রাজ ছাড়া।

এবং এই এক মাদ্রাজ ছাড়া কোন যুক্তফ্রন্টই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি; তার কারণ, দলগুলোর মধ্যে যে দলাদলির অসামঞ্জস্য ছিল তার কখনও নিরাকরণ হয়নি।

মাদ্রাজে ভাষাভিত্তিক আন্দোলন চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ করেছে। সেখানে দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘামের আন্দোলনকে কংগ্রেস প্রথমে তাচ্ছিল্য করেছিল, পরে তাদের দমনের পথ নিয়েছিল, কিন্তু সেখানে হিন্দী-ইংরাজি-তামিলের সংঘর্ষে বাংলাদেশের মতই তামিলীদের জয় হয়েছিল। এবং এই ভাষার লড়াইয়েতেই কামরাজ প্রমুখ প্রথম সারির নেতারা ধরাশায়ী হয়েছেন। বস্তুতঃ, দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম বা ডি এম কে-র শেকড় এত গভীরে, তামিলীদের মনোভূমিতে এত দৃঢ় প্রোথিত যে, একে উৎপাটন করা কারও সাধ্য নেই। এই কারণে মাদ্রাজের ডি এম কে সরকারই সব চাইতে দীর্ঘস্থায়ী সরকার। মাদ্রাজের নামও তারা বদলে নিয়ে করেছেন তামিলনাড়ু। এখন স্বায়ত্তশাসনের দাবী তুলেছেন বলে কেন্দ্রের সংগে কিছু বিপদ বেধেছে। তবে করুণানিধি সতর্ক হাল ধরে রাখলে এ সংকটও কাটাবে আশা করা যায়। একটা ক্ষীয় আন্দোলনে সম্প্রতি এ রাজ্য নাড়া খেয়েছে।

উড়িষ্যায় স্বতন্ত্র কোয়ালিশনও বেশ কিছু কাল স্থায়ী ছিল; এখন নড়বড়ে হয়ে যাওয়ায় সেখানে কংগ্রেসের পক্ষে চল নেমেছে, এবং কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সহ এই যে কয়েকটি প্রদেশে যুক্তফ্রন্ট সরকার হয়েছিল ১৯৬৭ থেকে তাদের মধ্যে ছিল অন্তর্বিরোধ, যার এক নতুন প্রকাশ হল দলত্যাগ, ডিফেকসান—যার উচ্চর ভারতীয় নাম আয়ারাম ও গয়ারাম।

কিন্তু পশ্চিমবংগের ইতিহাস কিছু স্বতন্ত্র। এখানে কংগ্রেস থেকেই তার উৎপত্তি। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কেন্দ্রীভূত হতে হতে শ্রীঅতুল্য ঘোষের ব্যক্তিবিন্দুতে এসে ঠেকেছিল। আসলে এ ছিল—কেন্দ্রে সঞ্জীব-কামরাজ-মোরারজী-পাতিল-নিজলিঙ্গাপ্পা-অতুল্য প্রমুখের যে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী সিণ্ডিকেট গড়ে উঠেছিল তার এক প্রাদেশিক প্রতিবিম্ব মাত্র। কেন্দ্রেও এই সিণ্ডিকেটের সোল্লাস সমর্থনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর স্থলাভিষিক্ত মন্ত্রী হয়েছেন।

রাজ্যে রাজ্যে তেমনি—অতুল্য, কামরাজ, পাতিল, মোরারজী প্রমুখ। শ্রীঅতুল্য ঘোষের প্রতাপ এতই অসামান্য ছিল যে, লোকে তাঁকে 'বংগেশ্বর' বলে অভিহিত করত। কিন্তু আপাতঃদৃষ্টিতে এই যে নিরেট অটুট কংগ্রেস সংস্থা তার প্রথম ফাটল ধরা পড়ল—শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক বিতাড়নে। শ্রীঘোষাশ্রিত কংগ্রেস সরকারের, ডাঃ রায় মন্ত্রিমণ্ডলীর অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়; ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের মন্ত্রিসভায়ও তাঁর স্থান ছিল। কিন্তু 'একদা কি যেন হল সেই' অজয়বাবুকে বেরিয়ে আসতে হল কংগ্রেস থেকে। ১৯৪২-এর বীর অজয় মুখোপাধ্যায় দুঃসাহসভরে বাংলা কংগ্রেস বলে এক নতুন রাজনৈতিক সংস্থা গড়লেন। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের নির্বাচন মুখে। প্রকৃতপক্ষে অবশ্য একটি গণ্য করার মত দল ছিল কম্যুনিস্ট পার্টি বিচ্ছিন্ন মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি। নির্বাচনে দুটি ফ্রন্ট হল বামপন্থীদের দক্ষিণপন্থী ও কংগ্রেস ছাড়া। পশ্চিমবংগে দক্ষিণপন্থীদের কোনকালেই সম্ভাবনা ছিল না (অসামান্য ব্যক্তিত্বের শ্যামাপ্রসাদের কথা ছাড়া)। কংগ্রেস গেল দুর্বলতর হয়ে। শ্রীঅতুল্য ঘোষের সকল গর্ব চূর্ণ করে বাংলা কংগ্রেস উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় নির্বাচিত হয়ে এল। পশ্চিমবংগে অকংগ্রেসী দলের এই অভাবনীয় জয়লাভে নতুন সরকারের উদ্ভব হল। মুখ্যমন্ত্রী হলেন অজয় মুখোপাধ্যায়। না মাসেই অন্তর্কলহে ভেঙ্গে গেল; আবার নির্বাচন; আবারও যুক্তফ্রন্ট জয়ী এবং আবারও অজয় মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রী। এবারও তের মাসের মধ্যে ভেঙ্গে গেল। প্রমাণ হয়ে গেল শ্লোগান ও বাকসর্বস্ব বামপন্থী বা অকংগ্রেসী দলগুলো মিছিল সভা পরিচালনায় যদিচ দক্ষ প্রশাসন কাজে নয়, কেননা, সেখানেও তাদের সকল কাজে দলাদলি ও স্বদল স্ফীতির দৃষ্টিভঙ্গী বিস্মৃত হওয়া সম্ভব ছিল না। ক্রমে বিস্ফোরণ ঘটল, এমনকি রক্তপাতের পথে তাদের জনপ্রিয়তা তলিয়ে যেতে লাগল। পশ্চিমবংগে দুঃসহ এক হত্যার রাজনীতি আমদানী করে কোন কোন বামপন্থী দল গোপনে সঞ্চারিত উগ্রপন্থী দলটিকেই ভয়াবহ মান করে তুলল; চারদিকে হত্যাকাণ্ড চলল নির্বিচারে এবং অকারণ তত্ত্বকথার অজুহাতে সব অপরাধকে তিলকচন্দন দিতে চাইল।

বিরক্ত বিপন্ন জনসাধারণ মুক্তির পথ খুঁজছিল—কারখানা বন্ধ, শিক্ষালয় বন্ধ, অফিস বন্ধ, বাজারে অরাজকতা, শেষটা '৭২এর নির্বাচনে তার অবসান ঘটিয়ে দিল। কিন্তু ৬৭তেও যেমন ৭২এও তেমনি নঞর্থক ভোট। ১৯৬৭তে রব উঠেছিল কংগ্রেস চাই না কংগ্রেস চাই না, ১৯৭২এ রব (কিন্তু নিঃশব্দ রব, কেননা, নিহত হবার আশংকা ছিল) উঠল বামপন্থীদের হটাও। ফল হল যে কংগ্রেসের ১৯৬৭এর পর পুনরুজ্জীবনের আদৌ সম্ভাবনা ছিল না, তা আজ নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এমন স্থান অধিকার করেছে বিপন্ন নাগরিক এত নিরাপদ মনে করছে যে অদূর ভবিষ্যতে বামপন্থার পুনরভ্যুত্থানের কোন লক্ষণই দৃশ্যমান না।

কেন্দ্রেও এমনি এক অভিনব ঘটনা ঘটেছে। 'সিণ্ডিকেট' বা 'হাইকম্যাণ্ড' যে নামই দেওয়া যাক, তার অন্তর গেছে বদলে। কি করে এ সম্ভব হল? প্রেসিডেন্ট পদে

আমাদের
প্রধানমন্ত্রী

স্মরণীয় ১৫ আগস্ট ।। ১৯৭২

শ্রীভি ভি গিরির নির্বাচন অন্যতম লক্ষণ মাত্র। তার কি কারণ?

১৮৮৫ থেকে কংগ্রেসের মধ্যে অনেক পটপরিবর্তন হয়েছে। সুরাট কংগ্রেস তার এক দৃষ্টান্ত। অথবা অসহযোগ আন্দোলনের মুখে। অথবা নো-চেঞ্জার প্রো-চেঞ্জারদের সংঘাত। অথবা ১৯২৮ থেকে স্বাধীনতা বনাম ডোমিনিয়ান স্টাটাস ইত্যাদি। অথবা ১৯৩০-৩২-৪২ এর আন্দোলন। সন্দেহ নেই, এসবই প্রোগ্রাম কর্মসূচী ও তার গতির স্পন্দন। কিন্তু স্বাধীনতার পর বৈষয়িক স্বার্থগুলোও চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। যেমন শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, চারদিকে উন্নয়নের উদ্যম চলতে লাগল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা একবার কৃষিপ্রধান একবার শিল্পপ্রধান— অন্যদিকে বেকার সমস্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পথ দেখা যাচ্ছে না।

১৯৬৭তে মার খেয়ে কংগ্রেসকে একটা গণ্ডীর ভাবতে হল। আসলে আবদ্ধকটা কোথায়। কেন কংগ্রেস ক্রমশঃ জনগণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং লোকের বিশ্বাস হচ্ছে এ রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াশীল এক সংস্থা মাত্র।

লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে মোরারজী দেশাইও একজন প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু হেরে যান। এ শক্তি দুই বর্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না, এর মধ্যে দুটি বিপরীত ভাবাদর্শের সংঘাত ছিল। সে সংঘাতের প্রথম আঘাত অনুভূত হয় বাঙ্গালোরে ১৯৬৯-এর ১০ জুলাই যখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ও কংগ্রেস পার্টির অধিবেশন বসে। শ্রীমতী গান্ধী অসুস্থতার জন্য সেখানে আসতে পারেন নি। কিন্তু একটা নোট জানিয়েছিলেন ব্যক্তিস্বত্ব ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের অভিপ্রায়। মোরারজী ভাবলেন যাক শেষ পর্যন্ত নিজলিঙ্গাপ্পা, দেশাই, পাতিল প্রমুখেরা সকলেই খুশী হলেন। এঁরা এর বিরোধী ছিলেন। মোরারজী এমন কথাও বললেন যে যদিন আমি অর্থমন্ত্রী আছি হতে দিচ্ছি না।

শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে রইলেন, চ্যবন, ফকরুদ্দিন আলী আহমেদ, শরণ সিং, সঞ্জীবায়া, সুব্রহ্মণিয়াম। ওয়ার্কিং কমিটি দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। কিন্তু একটা আপোষ প্রস্তাব পাশ করে আপাততঃ তা চাপা দেওয়া গেল।

কিন্তু আর একটা লেগে গেল, রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেনের মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্ট পদ নিয়ে। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ড ৫-২ ভোটে এন সঞ্জীব রেড্ডীকে মনোনীত করলেন, শ্রীমতী গান্ধীর প্রার্থী ছিলেন শ্রীজগজীবন রাম। ঐ সভায় শ্রীমতী গান্ধী ভি ভি গিরির নামও করেছিলেন শ্রীরামের আগে। তাও গ্রহণযোগ্য হয়নি কামরাজ প্রমুখের। চ্যবন তখন ওদের পক্ষেই ছিলেন। এ বিষয়ে কোন মীমাংসা হল না, আপাতঃ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ প্রশ্নের মত হল।

কিন্তু গোটা টেবিলটাই উল্টে পাল্টে গেল যখন ভি ভি গিরি নির্বাচনে দাঁড়াবার জন্য পদত্যাগ করলেন। মিঃ রেড্ডী তখন স্পীকার। সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, গিরি জিতলেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিশীল কংগ্রেসসেবী ও অন্যান্য দল এবং 'সিন্ডিকেটের' মৃত্যুঘণ্টা বাজল রেড্ডীর পরাজয়ে।

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণে শ্রীমতী গান্ধী যে দৃঢ়পদ তা প্রমাণিত হল যখন তিনি মোরারজী দেশাইকে অর্থ দপ্তর থেকে অব্যাহতি দিলেন, অথবা, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পথে কাঁটাটি তুলে ফেললেন।

এরপর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কংগ্রেস সদস্যদের পার্টি হুইপ না মেনে গিরির পক্ষে ভোট দেবার জন্য একটা নিয়মানুবর্তিতার প্রশ্ন তোলা হল। পরাজিতদের মনে আক্রোশ কতখানি সঞ্চারিত হয়েছিল তা কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নিজলিঙ্গাপ্পার একটি উক্তিতে প্রকাশ, তা হচ্ছে, শ্রীমতী গান্ধী ১৯৭২ অবধি প্রধানমন্ত্রী থাকবেন।

ব্যবধান ক্রমশঃই বাড়ছিল। শ্রীমতী গান্ধী আরও কয়েকজন জুনিয়র মন্ত্রীকে শামিল করলেন। শ্রীমতী ও তাঁর সমর্থকেরা নিজলিঙ্গাপ্পাকে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পদ থেকে অপসারণের জন্য ওয়ার্কিং কমিটিকে নিয়ে আর কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন ডাকতে অনুরোধ জানালেন। মোরারজী বললেন, এটা নিয়মানুবর্তিতার খেলাপ। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী গান্ধীকে (১৯৬৯, ২৮ অক্টোবর) এক দীর্ঘ চিঠি লিখলেন।

শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর সমর্থকেরা ওয়ার্কিং কমিটি বয়কট করে পৃথক বৈঠক করলেন (১লা নভেম্বর, ১৯৬৯)। স্থির হল নয়াদিল্লীতে ২২।২৩ নভেম্বর এক নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন ডাকলেন। ২রা নভেম্বর নিজলিঙ্গাপ্পা শ্রীমতী গান্ধীর কৈফিয়ৎ তলব করলেন, কেন তিনি অবৈধ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন ডাকছেন। শ্রীমতী পাল্টা উত্তর দিলেন, কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্টই কংগ্রেস সংবিধানের খেলাপ করছেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ২১ জন সদস্যের মধ্যে ১১ জনের সভায়, মুখ্যমন্ত্রীগণের আপোষ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে সদস্যপদ থেকে অপসারণের এবং নতুন নেতা নির্বাচনের নির্দেশ দিয়ে প্রস্তাব নিল।

স্বভাবতঃই শ্রীমতী গান্ধীর সমর্থকগন এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল।

আজও সেই অবস্থাই আছে। সন্দেহ নেই, শ্রীমতী গান্ধীর সমর্থক ও শাসক 'কংগ্রেস' নামে অভিহিত কংগ্রেসকেই লোকে কংগ্রেস বলে জানে, তথাপি এও সত্য যে সংগঠন কংগ্রেস বলে একটি সংগঠন মৃতপ্রায় অবস্থায় আছে।

শ্রীমতী গান্ধীর জনপ্রিয়তা তাঁরাও স্বীকার করেন যখন বলেন ১৯৭২-এর নির্বাচনে 'ইন্দিরা-হাওয়া' লেগেছিল। কেননা কেন্দ্রে, লোকসভায় এত সংখ্যাশক্তি নিয়ে কংগ্রেস সম্প্রতি আসে নি; মনে হয় আর আসতেও পারবে না। সারা ভারতে শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি সমর্থন নিঃসংশয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে শ্রীমতী গান্ধী যে সহানুভূতি, মনোবল, কূটনৈতিক বুদ্ধি ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা-ভারতের অন্য কোন নেতা দেননি। শ্রীমতী গান্ধী শুধু দীর্ঘজীবী নন, দূরদর্শিনীও বটেন। পঁচিশ বছর ভারতের মানমর্যাদা আজ বহু দেশের ঈর্ষার বস্তু।

জোড়পত্র

ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন আরম্ভ হয় অন্ধ্র প্রদেশের জন্ম থেকে। অন্ধ্র ছিল মাদ্রাজের গর্ভে। কিন্তু তেলেগুভাষীদের পৃথক রাজ্যের যে দাবী উঠেছিল তা অগ্রাহ্য করায় পট্টি শ্রীরামালুকে আত্মবিসর্জন দিতে হয়েছিল, তারপর যে বিক্ষোভ হয়েছিল তা অপ্রতিরোধ্য বিধায় অন্ধ্র প্রদেশ সৃষ্টি স্বীকার হলই, ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন নীতিও গৃহীত হল। যেখানে চলতি সেখানে হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে জনগণ। বোম্বাই প্রদেশ থেকে গুজরাট মহারাষ্ট্রের জন্মও এ প্রকার সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে। পাঞ্জাব হরিয়ানা।

এখন ভারতে ২১টি রাজ্য—(১) অন্ধ্র প্রদেশ, (২) আসাম, (৩) বিহার, (৪) গুজরাট, (৫) হরিয়ানা, (৬) হিমাচল প্রদেশ, (৭) জম্মু কাশ্মীর, (৮) কেরালা, (৯) মধ্যপ্রদেশ (১০) মহারাষ্ট্র, (১১) মণিপুর (১২) মেঘালয়, (১৩) মহীশূর, (১৪) নাগাল্যান্ড, (১৫) উড়িষ্যা (১৬) পাঞ্জাব, (১৭) রাজস্থান, (১৮) তামিলনাড়ু, (১৯) ত্রিপুরা, (২০) উত্তর প্রদেশ, (২১) পশ্চিমবঙ্গ।

মাদ্রাজ থেকে অন্ধ্র প্রদেশ, তামিলনাড় (মাদ্রাজ); আসাম থেকে মেঘালয়; বোম্বাই থেকে গুজরাট মহারাষ্ট্র; পাঞ্জাব থেকে হরিয়ানা, পাঞ্জাব,—এমনি অনেক বদল হয়েছে ভারতের মানচিত্রে রাজ্যের।

কেন্দ্রাধীন অঞ্চল হল : আন্দামান নিকোবর, অরুণাচল, দিল্লী, গোয়া-দমন দিউ, লাক্ষা দ্বীপ, মিজোরাম, পণ্ডিচেরী।

পঁচিশ বছরের যুবক ভারতকে ১৯৪৭-এর প্রাচীনেরা চিনতেই পারবেন না।

তৃতীয় পাক-ভারত যুদ্ধ ও সিমলা চুক্তি

পাকিস্থানের গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৭১-এর মার্চ থেকে। এ গৃহযুদ্ধের চূড়ান্ত রূপ নেয় পূর্ব পাকিস্থানে বাংলাদেশ অভ্যুত্থানের সংগ্রাম। পাকিস্থান একতরফা মার্কিন-চীনা সমরাস্ত্র নিয়ে বাঙালী নিধন শুরু করে—একেবারে যাকে বলে ব্যাপক গণহত্যা। ওরই মধ্যে এক দুর্নিবার প্রতিরোধও গড়ে উঠতে থাকে। অসংগ্রামী সাধারণ গৃহস্থ দরিদ্র মানুষের

শরণার্থীরূপে আসে ভারতে, প্রধানতঃ পশ্চিম-বঙ্গে আশ্রয় নিতে থাকে। ভারতে এই মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন অভিব্যক্ত হয়। ক্রোধে পাকিস্থান এই কারণে ভারতকে সীমান্তে অতিক্রান্ত গোলাবর্ষণে প্ররোচনা দিতে থাকে ; আগরতলা কার্যত আক্রান্ত হয়।

কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ৩ ডিসেম্বর যখন সাধারণভাবে রাজনৈতিক প্রসঙ্গে বিশেষ করে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে ভাষণ দিচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী, সে সময়ই পাকিস্থান আন্ত-র্জাতিক রেখা পার হয়ে ভারত আক্রমণ করে বসে। ভারতও সংগে সংগে দুই ফ্রন্টে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ভারতীয় সেনা-বাহিনী যশোর ক্যান্টনমেন্ট দখল করে নানা দিক থেকে ঢাকার দিকে অগ্রসর হয়। পশ্চিম রণাঙ্গনেও পাঞ্জাব খন্ডে আক্রমণ স্তিমিত করে কাশ্মীর সিন্ধু রণক্ষেত্রে এগিয়ে যায়। শেষপর্যন্ত পূর্ব পাকিস্থানে (বাংলাদেশে) পাকবাহিনীর ৯৩,০০০ সৈন্য ভারত ও বাংলাদেশ যুক্ত সৈন্যাপত্যের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে। বিজয়ী ভারত পশ্চিম রণাঙ্গনেও একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে।

এরই ফলস্বরূপ ১৯৭২-এ প্রথমে এপ্রিল ২৬এ দূতপর্যায়ে বৈঠকে পরে সিমলায় শ্রীমতী গান্ধী-ভুট্টো বৈঠকে সিমলা চুক্তি নিষ্পন্ন হয় (জুন-জুলাই)।

প্রিন্সেপঘাটে দ্বিতীয় হুগলী সেতুর শিলান্যাসের প্রস্তুতি

পশ্চিমবঙ্গের পঁচিশ বছর

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

সারা ভারতবর্ষের দিক থেকে দেখতে গেলে, ১৯৭২ সালের ১৫ আগস্ট তার স্বাধীনতার ২৫ বছর পূর্তির তারিখ। শুধুই তাই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কাছে এই তারিখ আরও একটু বেশি কিছু। এই তারিখ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ২৫তম জন্ম-বার্ষিকী। পশ্চিমবঙ্গ নামে যে ভৌগোলিক সত্তা আজ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গ রাজ্য হিসেবে স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উৎসবের শরিক তার অস্তিত্বের সূচনাও হয়েছে পঁচিশ বছর আগেকার সেই বিশেষ দিনটি থেকে। পশ্চিমবঙ্গের সেই সত্তা ছিল খণ্ডিত সত্তা। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্মৃতিতে স্বাধীনতা আর খণ্ডনের সেই ইতিহাস ওতঃপ্রোতভাবেই এক সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

ভারতবর্ষের আর কোন অংশেরই মানুষ সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মত এমন-ভাবে আশা ও নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে স্বাধীনতা সিংহদ্বার অতিক্রম করে নি। স্বাধীনতা যখন এল তখন জাতির শ্রেষ্ঠ নেতা মহাত্মা গান্ধী রয়েছেন পশ্চিম-বঙ্গের মানুষদেরই মধ্যে। কিন্তু তিনি রইলেন স্বাধীনতার আলোকোজ্জ্বল উৎসবের প্রাঙ্গণ থেকে অনেক দূরে—বেলেঘাটার এক অন্ধকার প্রান্তে। এক বছর পরে যে পশ্চিমবাংলা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে জর্জরিত সেখানে স্বাধীনতা এল। সেই স্বাধীনতাকে কিভাবে বরণ করবে বুঝতে না পেরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তখন অন্তত কিছু সময়ের জন্যে থমকে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু অকস্মাৎ একটা প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসের বন্যায় সব কিছু ভেসে গেল। ১৪ অ[illegible] সন্ধ্যা থেকেই কলকাতার রাস্তায় অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যেতে লাগল—হিন্দু ও মুসলমান একজন অন্যজনকে বুকে জড়িয়ে ধরল। যে কলকাতায় দীর্ঘকাল যাবৎ হিন্দু ও মুসলমানরা একে অন্যের পাড়ায় পা দেয়নি সেই কলকাতাতেই সাম্প্রদায়িক অঞ্চলভাগের সব সীমানা মুছে গেল।

কিন্তু গান্ধীজী কলকাতার এই চেহারা বদলের উপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারলেন না। বেলেঘাটা থেকে নিরাশা প্রকাশ করে তিনি বললেন, উচ্ছ্বাসের বাষ্পেভরা এই বেলুন ফুটো হয়ে যেতে দেরি লাগবে না। তাঁর কথাই সত্য হয়েছিল। স্বাধীনতার পর পনের দিন পার হতে না হতেই কলকাতায় সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুন আবার জ্বলে উঠেছিল।

আজ স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী উৎসব পালন করতে গিয়ে পশ্চিমবাংলার মানুষ ঐসব পুরান কথা মনে না করে পারে না কেননা বিগত দিনের ঐ ইতিহাস পঁচিশ বছর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের উপর এক বোঝা হয়ে চেপে থেকেছে। সেই ইতিহাস পশ্চিমবঙ্গের জন্মের প্রথম দিন থেকে তার উপর ভয়ঙ্কর পঙ্গুতা চাপিয়ে দিয়েছিল।

আগেকার বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ পাকিস্তান হয়ে গেল আর সেই অংশের সংগে চলে গেল বাংলাদেশের সবচেয়ে উর্বর জমিগুলি। পশ্চিমবঙ্গের ভাগে প[illegible]

নির্মীয়মান হলদিয়া বন্দর
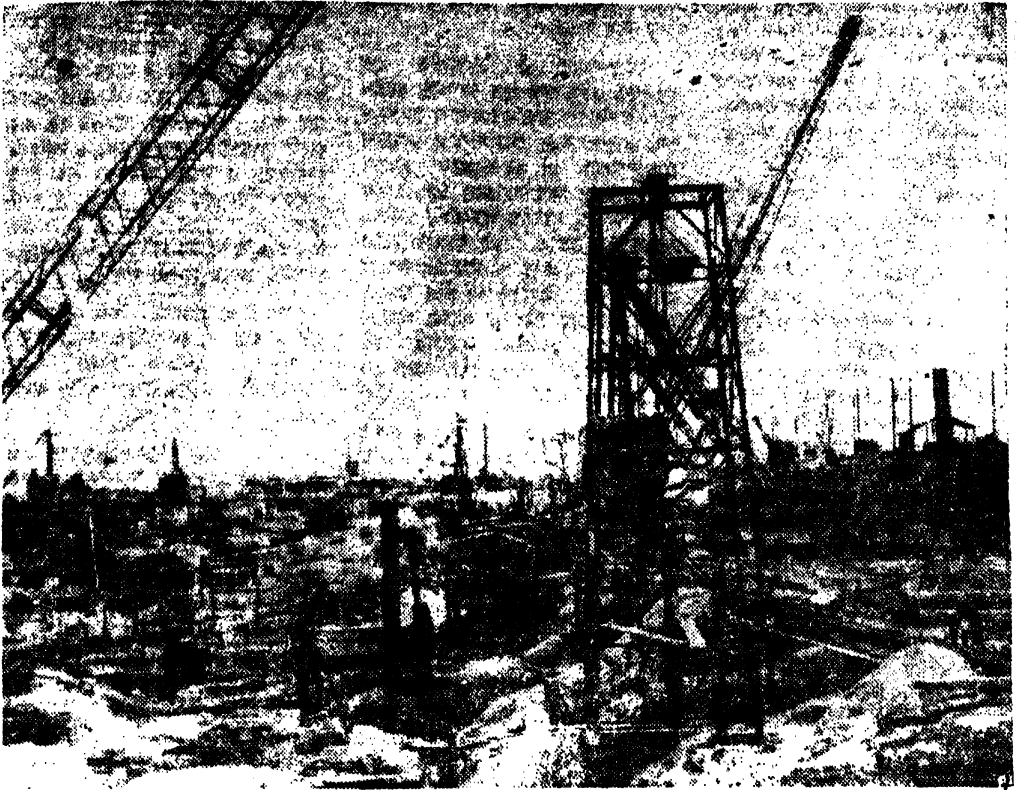
প্রধানত শুকনো এবং সমুদ্রের নোনা জলে ঘেরা জমি। সুজলা, সুফলা কথগুলি পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে নিদারুণ মিথ্যা হয়ে রইল। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ ভৌগোলিক দিক থেকে তার দক্ষিণাংশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ১৯৫৬ সালে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জ মহকুমাটি পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর সেই ভৌগোলিক বিচ্ছেদের অবশ্য প্রতিকার হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মধ্যে সরাসরি সড়ক ও রেলওয়ে যোগাযোগের বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে ওঠার জন্য আরও দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে।

কলকাতা বন্দরের সঙ্গে জলপথে আসামের যোগাযোগের যে সুবিধা ছিল সেটাও বঙ্গবিভাগের ফলে বিপর্যস্ত হয়ে গেল। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর পূর্ববঙ্গের নদীপথ দিয়ে ভারতীয় স্টীমার চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হল। পরিণাম, কলকাতা বন্দর তার পশ্চাদ্‌ভূমির একটা বড় অংশ হারাল।

বঙ্গ বিভাগের আর একটি বৃহৎ ও ক্ষতিকর পরিণাম হল এই যে, চটকলগুলি রয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গে আর পাটের জমিগুলি রয়ে গেল পূর্ববঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের চটকলগুলি তাদের কাঁচামালের সূত্র থেকে বঞ্চিত হল। এর বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সময় লেগেছে এবং যে ব্যবস্থা হয়েছে সেটাও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়।

পশ্চিমবঙ্গের আজন্ম পঙ্গুত্বের তালিকা এখানেই সম্পূর্ণ নয়। বড় পঙ্গুত্বের ভার তাকে জন্মাবধি বহন করতে হয়েছে বিশেষ করে সংস্কৃতি ও মানসিকতার ক্ষেত্রে। বাংলাভাষীদের দুই-তৃতীয়াংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। তাঁরা যে শুধু পরদেশী হয়ে গেলেন তাই নয়, ঘটনাক্রমে ও কুটিল চক্রান্তের পরিণতিতে তাঁরা আমাদের বৈরী হয়ে গেলেন। বাংলাভাষা ও সাহিত্য তার উৎসভূমির একটা বড় অংশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পশ্চিমবাংলায় লেখা বই, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র, পশ্চিমবঙ্গে তোলা ছায়াছবি প্রভৃতি একটি বিরাট বাজার থেকে বঞ্চিত হল। এই বিচ্ছেদ, এই বঞ্চনা মেনে নেওয়া পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে মোটেই সহজ হয়নি। পঁচিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভারতীয় হওয়ার চেষ্টা করেছে, আবার বাঙালিয়ানাও ছাড়তে পারে নি। তাদের এক মুখ যখন দিল্লীর দিকে, অন্য মুখ তখন ঢাকার দিকে। যে বাংলা পূর্ব পাকিস্তান হয়ে গেছে তার বৈরিতায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভারতের অন্যান্য অংশের মতই ক্ষুব্ধ হয়েছে আবার যে পূর্ব পাকিস্তান তার বাঙালীত্ব বজায় রাখার জন্য লড়াই গভীর মমত্ব অনুভব করেছে। এই দ্বৈত মানসিকতার যন্ত্রণায় পশ্চিমবঙ্গ বলতে গেলে আজন্ম পীড়িত হয়েছে।

আর সবচেয়ে বড় যে রুগ্নতা ও পঙ্গুত্বের অভিশাপ পশ্চিমবঙ্গকে বহন করতে হয়েছে সেটা হল, অনস্বীকার্যভাবে, তার উদ্বাস্তু সমস্যা। এই সমস্যা তার অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করেছে, তার সমাজ-জীবন তছনছ করে দিয়েছে, তার অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করেছে। তবু স্বাধীনতার মূল্য শোধ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে তার যাত্রার সূচনা থেকেই এই দুর্বহ ভার বহন করতে হয়েছে। পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এই উদ্বাস্তুরা এক ঝাঁকে পশ্চিমবঙ্গে আসেন নি, তারা এসেছেন দফায় দফায়, কখনও ক্ষীণ ধারায়, কখনও বিরাট তরঙ্গের আকারে। সরকারী হিসেবে হল, ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৭০ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে চল্লিশ লাখের বেশি উদ্বাস্তু এসেছেন। শুধু যাঁরা সরকারী খাতায় উদ্বাস্তু হিসেবে নাম লিখিয়েছেন এটা হচ্ছে শুধু তাঁদেরই সংখ্যা। উদ্বাস্তুদের আসল সংখ্যা এর চেয়ে বেশি হবে। কেননা যাঁরা পূর্ববঙ্গে নিজেদের ভিটা ছেড়ে চলে এসেছেন তাঁদের অনেকেই সরকারী তালিকায় উদ্বাস্তু হিসাবে নাম লেখান নি।

যদিও এই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের আর্থিক দায়িত্ব বহন করেছেন প্রধানত আর্থিকত দায়িত্ব বহন করেছেন প্রধানত

রকার তাহলেও এঁদের আশ্রয়, ও জমির সংস্থান করতে গিয়ে কে তার অর্থনীতি ও সমাজ-উপর প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করতে তার চেয়েও বড় কথা হল উদ্বাস্তু-তৃতীয়াংশের পুনর্বাসন, সরকারী আজও সম্পূর্ণ হয় নি।

বের উদ্বাস্তুরা তবু তাঁদের া সম্পত্তির জন্য খেসারত পেল, র্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা তা পাননি। ালে ভারত সরকার উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণ আইন প্রণয়ন করে-তার আওতা থেকে পূর্ববঙ্গের র বাদ দেওয়া হল এই যুক্তিতে ৫০ সালের নেহরু-লিয়াকত চুক্তি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা তাঁদের আসা সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ অধিকারী। পাকিস্তান চুক্তির ঐ ন নি, অথচ পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা ণ সংক্রান্ত ভারতীয় আইনের পান নি। একটি হিসাবে প্রকাশ াবে মুসলমানরা যে সম্পত্তি ফেলে দন তা থেকে পশ্চিমী উদ্বাস্তুরা একরের বেশি জমি, গ্রামে প্রায় বাড়ি, শহর এলাকায় ২,৮৭,০০০ াকান ও অন্যান্য সম্পত্তি পেয়ে-এছাড়া ভারত সরকার ৬০ টাকার বাড়ি বানিয়ে পাঞ্জাবী দের দিয়েছেন। এই ক্ষতিপূরণের পরও ভারত সরকারের পুনর্বাসন ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাঞ্জাবী দের বাবদ নগদ আরও ২০০ কোটি রচ করেছেন। আর সেই জায়গায় উদ্বাস্তুরা ক্ষতিপূরণ হিসাবে এক পান নি, কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের রচ করেছেন মোট ৩০৩ কোটি

৫১ সালে, অর্থাৎ স্বাধীনতার মাত্র র পরেই লোকগণনার রিপোর্টে এই জন সমাগমের ভয়াবহ চিত্রটি পায়। ঐ রিপোর্টে দেখান হয়েছিল, েগে উদ্বাস্তু ও স্থানীয় মিলিয়ে লোকসংখ্যার বসতির ঘনতা যেখানে বর্গ মাইলে ৭৯৯ সেখানে শুধু বসতির ঘনতা হচ্ছে প্রতি বর্গ ৬৮। জেলাওয়ারি হিসাবে দেখান , বাঁকুড়া জেলায় এই ঘনতা সব-কম—৩·০ এবং কলকাতায় সবচেয়ে ১৩৪০৪। এই দুই জেলায় সমগ্র াদের ঘনতা যথাক্রমে প্রতি বর্গমাইলে ৭৮, ৮৭৮। বীরভূমে উদ্বাস্তু ভর ঘনতা ৬·৮, মেদিনীপুরে দার্জিলিংয়ে ১৩·১, মুর্শিদাবাদে বর্ধমানে ৩৫·৫, কোচবিহারে পশ্চিম দিনাজপুরে ৮৩৪, চব্বিশ ৯৩, হাওড়ায় ১০৯·১ ও ২৮২.৯। রাজ্যের মোটামুটি ১৬০ জ এলাকার মধ্যে উদ্বাস্তুদের শতক-ও জনের বেশি বাস করেন এবং মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭০ জন কল-কাতা শিল্পাঞ্চল, চব্বিশ পরগণা ও নদীয়ার ভিড় করে আছেন।'

লোকগণনার ঐ রিপোর্টের এক দশকেরও পরে কলকাতা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্গানাইজেশনের সমীক্ষায় বলা হল—'কলকাতা মেট্রোপলিটান এলাকায় (উদ্বাস্তুদের) যে সব জবরদখল কলোনি গড়ে উঠেছিল সেগুলির মধ্যে ১৪৯টি এক দশকব্যাপী সরকারি পুনর্বাসন প্রয়াসের পরও টিকে রয়েছে। এই কলোনিগুলিতে ২৬ হাজার উদ্বাস্তু পরিবার বাস করেন। এবং কয়েকটি উদ্বাস্তু কলোনির লোকেরা যদিও নিজেদের স্কুল ও অন্যান্য সাধারণ সংস্থা গড়ে তুলেছেন তাহলেও এই কলোনিগুলি এখন পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে এই শহরের অংশ নয়।'

সি এম পি ও-র ঐ সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছিল, কলকাতার সবচেয়ে কাছাকাছি যেসব শহরতলী এলাকা রয়েছে, যেমন উত্তর ও দক্ষিণ দমদম, কামারহাটি, পানিহাটি, গার্ডেনরীচ ও সাউথ সুবারবন অঞ্চল, সেই সব জায়গায় বসতি গেলে রাতারাতি জনপদ গড়ে উঠেছে। আর খাস শহরের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত হারে বেড়ে উঠছে শহরের পূর্ব প্রান্তে লবণহ্রদের মহামারীসঞ্চারী জলাভূমি গা ঘেঁষে অবস্থিত ট্যাংরা, তপসিয়া ও কসবার নিচু, পাকা নর্দমাহীন, জল নিকাশের স্বল্প ব্যবস্থাযুক্ত এলাকাগুলিতে এবং দক্ষিণের শেষ প্রান্তে টালিগঞ্জের বিভিন্ন ওয়ার্ডে। মাথা গোঁজার জায়গার জন্য খোঁজাখুঁজি যখন বাড়ছে তখন কলকাতা ও হাওড়ার উপকণ্ঠে এমন কি সেইসব জমিরও বাজার দর চমকপ্রদভাবে বেড়ে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যেসব জমি নিচু, মাঝে মাঝেই জলের নিচে তলিয়ে যায়, যেখানে নর্দমা অথবা জলনিকাশের সুবিধা নেই, জল সরবরাহের ব্যবস্থা খারাপ, শহরের কেন্দ্রস্থলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার মত পর্যাপ্ত পরিবহণ ব্যবস্থা যেখানে নেই।'

একথা বিনা প্রতিবাদেই বলা যায় যে, কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের যে অবনতি ও ক্ষয়িষ্ণুতার প্রতি ইদানীংকাল সারা ভারতের এবং বলতে গেলে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে তার অনেকখানির জন্যই দায়ী এই বিপুল উদ্বাস্তু জনস্রোত সামলাবার ব্যাপারে আমাদের শোচনীয় ব্যর্থতা। পঁচিশ বছর পার হয়ে এসেও আমরা সেই ব্যর্থতার গ্লানি বহন করে চলেছি, স্বাধীনতার এই রজত জয়ন্তীর উৎসবের দিনেও সে কথাটা আমরা কেমন করে ভুলব?

তবু, একটা পরম আশ্বাস, স্বাধীনতার ২৫ বছর পূর্তির দিনটিতে এসে আমরা একথা বলতে পারছি যে আমাদের সীমান্তের অপর পারে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় আমাদের দেশ বিভাগের অনেক ক্ষত নিরাময় করে দেবার প্রতিশ্রুতি এনেছে। আজ আমরা ভাবতে পারছি যে, আমাদের চটকলগুলির কাঁচা মালের সন্ধানে আমাদের দূর বিদেশে হাতড়াতে হবে না, আসামের পণ্য কলকাতার বন্দরে আসার জন্য অথবা কলকাতা থেকে আসামে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের আর ব্যয়সাধ্য পথে ত্রিভুবন ঘুরে যাতায়াত করতে হবে না। আরও বড় কথা এই যে, বার কোটি বাঙ্গালীর ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি যেন সহজ ও অবাধ বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে প্রাণবন্ত বিকাশের একটা পথ খুঁজে পেল এবং দফায় দফায় উদ্বাস্তু জনস্রোতের আঘাত পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে আছড়ে পড়ার বেদনাময় অধ্যায় সমাপ্ত হল।

উন্নয়নের পথরেখা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এই যে তার প্রথম পঁচিশ বছরের পথ হেঁটে এল সেদিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে আজ আমরা দেখতে পারি, কতটা এগিয়েছি।

১৯৫১ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে কলকারখানা থেকে আয়ের পরিমাণ ১০৩ কোটি টাকা বেড়ে ৩০৫ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রায় তিনগুণ হয়েছে। কৃষির অগ্রগতি হয়েছে শতকরা বার্ষিক ২ ভাগ হারে। ১৯৬১-৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন শক্তির মোট পরিমাণ বার্ষিক ১৬.২ শতাংশ হারে বেড়েছে। ১৯৫১ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সেচসেবিত জমির পরিমাণ ১১ লাখ ২৯ হাজার ৩০৩ হেক্টেয়ার থেকে বেড়ে ১৬ লাখ ৭৮ হাজার ২৮ হেক্টেয়ার হয়েছে।

পঁচিশ বছর আগে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ১১০তম মাইলপোস্টের গায়ে 'দুর্গাপুর জঙ্গল বলে' যে সাইনবোর্ডটি আঁটা ছিল সেটি আজও এখনও লাগান রয়েছে। কিন্তু সেই 'দুর্গাপুর জঙ্গল' এখন আর নেই। পঁচিশ বছরে সেখানে জঙ্গলের মধ্য থেকে গড়ে উঠেছে একটি বড় শিল্পনগরী। সেখানে রয়েছে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা, অ্যালয় ইস্পাত কারখানা, মাইনিং অ্যাণ্ড অ্যালায়েড মেশিনারি কর্পোরেশন, অপথ্যালমিক গ্লাস কারখানা, কোক ওভেন কারখানা, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও দুর্গাপুর কেমিক্যাল কারখানা। এ ছাড়া সেখানে একটি সার কারখানার নির্মাণ সবে সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এইসব রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা ঘিরে বেশ কিছু ছোট বড় বেসরকারি কারখানাও স্থাপিত হয়েছে।

দুর্গাপুরের মতই দ্বিতীয় আর একটি বৃহৎ উন্নয়নকেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে কলকাতা থেকে ৫৬ মাইল দূরে, হুগলী ও হলদি নদীর সংযোগস্থলের কাছে, হলদিয়ায়। নতুন বন্দর, ডক, বিরাট তৈল শোধনাগার, সার কারখানা, পেট্রো-কেমিক্যাল রাসায়নিক শিল্প, সম্ভবতঃ জাহাজ নির্মাণের কারখানা ইত্যাদি নিয়ে হলদিয়ায় একটি বৃহৎ পরিকল্পনা করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকে এযাবৎ পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার খরচ করেছেন মোট ৬৮৪ কোটি ৭০ লাখ টাকা।

বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বিনিয়োগ মোট ৪০৩ কোটি ৩০ লাখ টাকা সারা ভারতে মোট কেন্দ্রীয় বিনি- ১৩.৩ শতাংশ।

রতবর্ষের অর্থনীতিতে পশ্চিম- একটা অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে, দেশের ৎপাদনে তার স্থান প্রথম সারিতে। সালে ভারতবর্ষে যত রেলওয়ে তৈরি হয়েছে তার শতকরা বেরিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের কার- থেকে, শতকরা ১৭টি বাস্- ন শতকরা ৫৮টি বিজলি শতকরা ৬৫টি সেলাইয়ের কল, কাগজ ডের বোর্ডের উৎপাদনের শতকরা গে ও সালফিউরিক অ্যাসিডের উৎ- ও প্রায় শতকরা ৮ ভাগ পশ্চিমবঙ্গের া থেকে পাওয়া গেছে। ভারতবর্ষের র ৪৫ শতাংশ ও আমদানির ৩০ কলকাতা বন্দরের মধ্য দিয়ে হয়। বর্ষ বন্দরে যে ২০০ কোটি টাকার পাটজাত জিনিস বিদেশে রপ্তানি য়ায় প্রায় যোল আনাই পশ্চিমবঙ্গ সারা দেশের কয়লার চাহিদার এক- ংশ মেটায় পশ্চিমবঙ্গ। দেশের জয়েন্ট কোম্পানিগুলির এক-তৃতীয়াংশ আছে বঙ্গে।

নেক দুর্ভাগ্যের মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গের বড় সৌভাগ্য এই যে, প্রথম দিকে দীর্ঘকাল এই রাজ্যের মানুষ একটি সরকার ও সবল নেতৃত্ব পেয়েছিল। নেতৃত্বের হাল ধরেছিলেন ডাঃ বিধান- রায়ের মত একজন মানুষ যিনি কিছু মারাত্মক ত্রুটি সত্ত্বেও (কৃষির অগ্র- দিকে যথেষ্ট নজর না দেওয়া তাঁর ম ত্রুটি) উচ্চ কল্পনা, দূরদৃষ্টি ও ল সংকল্প নিয়ে কাজ করে গেছেন। বিধানচন্দ্র রায়ের সময় রাজনৈতিক রতা যে ছিল না তা নয়। আজ এটা ধূসর স্মৃতি মাত্রে পর্যবসিত হয়ে ও কথাটা আদৌ মিথ্যা নয় যে, প্রথম- ডাঃ রায়কে বাইরের ও ভিতরে প্রবল ধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ম বাংলার পঁচিশ বছরের ইতিহাস ভুলে গেছেন তাঁদের মনে করিয়ে ার প্রয়োজন আছে যে, ডাঃ রায়ের নের গোড়ার দিকেই তাঁর দলের মধ্যে বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। বিরুদ্ধে দিল্লীতে নালিশ গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নেহরু এক সময়ে ডাঃ ক সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তও পাকা করে ফেলেছিলেন। র মধ্যে অনাস্থা প্রস্তাবের হাত ৎও তিনি অল্পের জন্য রেহাই ন পান। এ ছাড়া, দলের বাইরে প্রায় ক্ষণ তাঁকে প্রবল গণ-আন্দোলনের সম্মু- হতে হয়েছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত ই 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়' আন্দোলন, নিস্ট পার্টির বর্ণাঢ্যে আমলের অস্থা- খাদ্য আন্দোলন, বিহার-বাংলা সংযুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন, এই সবই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মাথার উপর দিয়ে গেছে। কিন্তু এই সব কিছুর মধ্য দিয়েই তিনি ধীরে ধীরে নিজের আসন পাকা করেছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম- বঙ্গকে বিভিন্ন দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

ডাঃ রায় মারা যাওয়ার বছর পাঁচেকের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের অবনতির যে লক্ষণ- গুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠল সেগুলি ডাঃ রায় বেঁচে থাকলেও ঠেকাতে পারতেন কিনা সংগতভাবেই সে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাধির মূল কারণগুলি রোগেই গিয়েছিল। পঁচিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ তার মামুলি পাটশিল্প ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পকেই অবলম্বন করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। এই সব শিল্পের যন্ত্রপাতি যখন পুরান ও অচল হয়ে গেছে তখন ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল পেট্রোল-ভিত্তিক রসায়ন শিল্প, ইলেকট্রনিক শিল্প, নিত্য- ব্যবহার্য পণ্য উৎপাদন শিল্প প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে নতুন কলকারখানা বসিয়ে এগিয়ে গেছে। ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালের দেশব্যাপী মন্দার প্রধান ধাক্কাই এসে লাগল পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের উপর। যে কয়লা ও ইস্পাতের সহজলভ্যতার উপর ভিত্তি করে একদা পশ্চিমবঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প গড়ে উঠে- ছিল সেই কয়লা ও ইস্পাতের দাম সারা ভারতবর্ষে এক করে দেওয়া হল। ফলে পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প তার ভৌগোলিক অবস্থানের দরুণ বিশেষ প্রাকৃতিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হল। অথচ অন্য দিকে তুলার দাম সারা ভারতবর্ষে এক করা হল না। ফলে পশ্চিম ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের কলগুলি মার খেল। এদিকে, হুগলি নদীর জল যত কমতে থাকল কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব ততই কমতে থাকল। ভারত থেকে কয়লা রপ্তানি ও বিদেশ থেকে খাদ্য আম- দানি বন্ধ হওয়ায় এই বন্দরের কাজ কমল। কৃষি, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ ইত্যাদির ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল যে অবহেলা করে আসা হয়েছে তারও পরিণাম প্রায় একই সময়ে বোঝা যেতে লাগল। কৃষি বিপ্লবের হাওয়া পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছল না। তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে রাসায়নিক সারের চাহিদা যখন হু হু করে বাড়তে থাকল পশ্চিমবঙ্গে তখন সারের কোন চাহিদা নেই বললেই চলে, হরিয়ানায় যখন সমস্ত গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছল, পশ্চিমবঙ্গে তখন শতকরা ৮টি গ্রামেও বিদ্যুৎ পৌঁছল কিনা সন্দেহ। সেচের জল সরবরাহ করার জন্য অন্ধ্রপ্রদেশে যখন প্রায় সওয়া লাখ বিদ্যুৎ- চালিত পাম্প কাজ করতে আরম্ভ করল, তখন পশ্চিমবঙ্গে ১২০০ বিদ্যুৎ-চালিত পাম্পও বসল না।

একই সময়ে কলকাতা শহর নাগরিক অধিকৃতার চূড়ান্ত উদাহরণ হিসাবে সারা পৃথিবীতে চিহ্নিত হয়ে গেল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আন্ত- র্জাতিক সংস্থাও এই শহরের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

অধঃপতনের এই লক্ষণগুলির কোনটিই হয়ত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ঠেকাতে পারতেন না। এমন কি এই লক্ষণগুলির কোন কোনটি হয়ত তাঁরই ভ্রান্ত নীতির পরিণাম। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এগিয়ে যাওয়ার যে সংকল্প ও উদ্যম তাঁর নেতৃত্বের মধ্যে দেখা গেছে পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে তেমনটি আর দেখা যায়নি।

পশ্চিম বাংলায় গত পঁচিশ বছরের মধ্যে শেষ পাঁচ বছর কেটেছে প্রচণ্ড রাজ- নৈতিক অস্থিরতার মধ্যে। কখনও পাঁচ- মিশালি সরকার, কখনও রাষ্ট্রপতির শাসন, এরই মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে। একই সময়ে সন্ত্রাসের মারাত্মক রাজনীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। শত শত তরুণ এবং সমাজের নানা স্তরের অনেক গণ্যমান্য ও সাধারণ মানুষের রক্তে এই রাজ্যের মাটি ভিজেছে।

ইতিমধ্যে, পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা পুঞ্জী- ভূত হয়েছে। কারখানার পর কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন শিল্প হয় নি, ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে নতুন কলকারখানা খোলার জন্য যেখানে ২০৫টি আবেদন পাওয়া গিয়েছিল সেখানে ১৯৭১ সালে পাওয়া গেল মাত্র ১৩টি। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে সারা রাজ্যে বেকারের আনুমানিক সংখ্যা ছিল যেখানে ১৫ লাখ সেখানে এখন এই সংখ্যা ২৮ লাখ বলে অনুমান করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে নতুন একটি প্রজন্ম গড়ে উঠেছে। পরাধীন দেশের অনেক বেদনাময় স্মৃতির ভার থেকে এই নতুন প্রজন্মের তরুণেরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় পাঁচ বছর বাদে আবার যে একদলীয় সরকার শাসনক্ষমতায় এসেছেন তাঁদের মধ্যে এই নতুন প্রজন্মের যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত সরকারও ইদানীংকালে পশ্চিমবঙ্গের পুঞ্জীভূত সমস্যাগুলি সম্পর্কে আগের তুলনায় অনেক প্রখরতর চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের আজকের দুর্বলতা থেকে তাকে নিরাময় করার একটি প্রকাণ্ড এবং সম্ভবত সর্বশেষ সুযোগ ঘটনার বিচিত্র যোগাযোগে তার এই পঞ্চবিংশতিতম জন্মদিনেই এসে উপস্থিত হয়েছে। সেই সুযোগ যদি আমরা হারাই তাহলে ইতি- হাসের কাছে আমাদের আর কোন কৈফিয়ৎ দেওয়ার থাকবে না।

পরিকল্পনার নতুন দিগন্ত

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

এটাকে আমরা নিশ্চয়ই শুভ যোগাযোগ বলে মেনে নেব যে, স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী বছরেই জাতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে নতুন চিন্তার সূত্রপাত হয়েছে। চার-চারটি পাঁচসালা পরিকল্পনা এবং তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা পার হয়ে আসার পর যে আমরা পরিকল্পিত অগ্রগতির পথ সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছি সেটি বোধহয় সুস্থতারই লক্ষণ। কারণ, এই প্রয়াস এ-কথাই প্রমাণ করে যে, এতদিন পর্যন্ত আমরা যে-পথে এগিয়েছি তার মধ্যে যদি কোনো ত্রুটি থেকে থাকে, তবে তা স্বীকার করে নিয়ে আজ আমরা বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাইছি। পাঁচ নম্বর পাঁচসালা পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করতে গিয়েই আমাদের সেই বাস্তবের সম্মুখীন হতে হলো।

আজ হয়ত আমরা এই বক্তব্যকে অনেক বেশি স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আগে আমরা তার কোনো হদিসই পাইনি এ-কথা বললে আমাদের নেতাদের ধীশক্তিকে অকারণ ধিক্কার জানানো হয়। আর যার কাছেই হোক, অন্ততঃ এ-দেশে পরিকল্পনার ধ্যান-ধারণার যিনি জনক সেই জওহরলাল নেহরুর কাছে এ-কথাটা গোপন থাকে নি যে, আমাদের পরিকল্পনা হয়ত আমাদের প্রার্থিত পথে এগিয়ে দিতে পারছে না। তৃতীয় পরিকল্পনার মাঝপথে আমরা তাই তাঁর কণ্ঠে এই অস্বস্তিকর মন্তব্য শুনি : 'সর্বত্রই সমৃদ্ধি, বৈষয়িক উন্নয়ন চোখে পড়বে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, প্রত্যেকেই সেই সমৃদ্ধির বখরা পাচ্ছে। অসংখ্য মানুষই তার বখরা পায়নি এবং জীবনধারণের জন্যে দরকারী প্রাথমিক জিনসপত্রই যোগাড় করতে পারছে না। একদিকে দেখছি মুষ্টিমেয় সচ্ছল মানুষ। তারা যে-করেই হোক নিজেদের জন্যে একটা সচ্ছল সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে। অবশ্য গোটা ভারতের কথা ও অবস্থা সম্পূর্ণই অন্য রকম। ...আমার মনে হয়, নতুন ধনসম্পদ একটা বিশেষ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে এবং সবদিকে ঠিকমতো ছড়িয়ে পড়ছে না।'

পরিকল্পনা কমিশনের তদানীন্তন কর্তা গুলজারিলাল নন্দাও ব্যক্ত করেছিলেন একই ধরনের অস্বস্তি। প্রশান্ত মহলানবিশের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির রিপোর্টও অনেকের মনের সন্দেহগুলিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করলো। প্রথম দুটি পাঁচসালা পরিকল্পনায় আয় ও সম্পদ বণ্টন সম্পর্কে মহলানবিশ রিপোর্ট আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, পরিকল্পিত অগ্রগতি বড় বড় কোম্পানির পোষ মাস এনে দিয়েছে। নতুন শিল্পপতি তৈরি ও ছোট কল-কারখানার প্রসারের জন্যে চেষ্টা যে হয়নি তা তো নয়, কিন্তু তবু কিছু লোকের হাতে বৈষয়িক ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হওয়ার ধারা তাতে পাল্টায়নি। অন্যদিকে ভারতের বৈষয়িক উন্নয়ন সম্পর্কে একান্ত ওয়াকিবহাল ও গভীর সহানুভূতিশীল সুইডেনের অর্থনীতিবিদ গুন্নার মিরডাল দেখালেন যে, গ্রামাঞ্চলের জন্যে যে উন্ন

এছাড়া, বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার বিনিয়োগ করেছেন মোট ৪০৩ কোটি ৩০ লাখ টাকা অর্থাৎ প্রায় ভারতে মোট কেন্দ্রীয় বিনিয়োগের ১৩.৩ শতাংশ।

ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে পশ্চিমবঙ্গের একটা অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে, দেশের শিল্পোৎপাদনে তার স্থান প্রথম সারিতে। ১৯৬৯ সালে ভারতবর্ষে যত রেলওয়ে ওয়াগন তৈরি হয়েছে তার শতকরা ৩৮টিই বেরিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের কারখানা থেকে, শতকরা ১৭টি [illegible], শতকরা ৩৮টি [illegible], শতকরা ৬৫টি সেলাইয়ের কল, কাগজ ও কাগজের বোর্ডের উৎপাদনের শতকরা ২৮ ভাগ ও সালফিউরিক অ্যাসিডের উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৮ ভাগ পশ্চিমবঙ্গের কারখানা থেকে পাওয়া গেছে। ভারতবর্ষের রপ্তানির ৪৫ শতাংশ ও আমদানির ৫০ শতাংশ কলকাতা বন্দরের মধ্য দিয়ে হয়। ভারতবর্ষ বছরে যে ২০০ কোটি টাকার বেশি পাটজাত জিনিস বিদেশে রপ্তানি করে তার প্রায় ষোল আনাই পশ্চিমবঙ্গে তৈরি। সারা দেশের কয়লার চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ মেটায় পশ্চিমবঙ্গ। দেশের জয়েন্ট স্টক কোম্পানিগুলির এক-[illegible] অংশ আছে পশ্চিমবঙ্গে।

অনেক দুর্ভাগ্যের মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গের একটি বড় সৌভাগ্য এই যে, প্রথম দিকে বেশ দীর্ঘকাল এই রাজ্য মোটামুটি একটি স্থায়ী সরকার ও সবল নেতৃত্ব পেয়েছিল। এই নেতৃত্বের হাল ধরেছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মত একজন মানুষ যিনি কিছু কিছু মারাত্মক ত্রুটি সত্ত্বেও দেশের অগ্রগতির দিকে যথেষ্ট নজর না দেওয়া [illegible] ত্রুটি। উচ্চ কল্পনা, দূরদৃষ্টি ও সুবিবেচনা সংকল্প নিয়ে কাজ করে গেছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সময় রাজনৈতিক অস্থিরতা যে ছিল না তা নয়। আজ এটা একটা দূরের স্মৃতি মাত্রে পর্যবসিত হয়ে গেলেও কথাটা আদৌ মিথ্যা নয় যে, প্রথম থেকেই ডাঃ রায়কে বাইরের ও ভিতরের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পশ্চিম বাংলার পঁচিশ বছরের ইতিহাস যাঁরা ভুলে গেছেন তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে যে, ডাঃ রায়ের শাসনের গোড়ার দিকেই তাঁর দলের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে দিল্লীতে নালিশ গিয়েছিল এবং প্রধানমন্ত্রী নেহরু এক সময়ে ডাঃ রায়কে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তও প্রায় পাকা করে ফেলেছিলেন। দলের মধ্যে অনাস্থা প্রস্তাবের হাত থেকেও তিনি অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন। এ ছাড়া, দলের বাইরে প্রায় সর্বক্ষণ তাঁকে প্রবল গণ-আন্দোলনের সম্মুখীন হতে হয়েছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়' আন্দোলন, কম্যুনিস্ট পার্টির [illegible] অভ্যুত্থান, খাদ্য আন্দোলন, বিহার-বাংলা সংযুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন, এই সবই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মাথার উপর দিয়ে গেছে। কিন্তু এই সব কিছুর মধ্য দিয়েই তিনি ধীরে ধীরে নিজের আসন পাকা করেছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গকে বিভিন্ন দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

ডাঃ রায় মারা যাওয়ার বছর পাঁচেকের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের অবনতির যে লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠল সেগুলি ডাঃ রায় বেঁচে থাকলেও ঠেকাতে পারতেন কিনা সংগতভাবেই সে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাধির মূল কারণগুলি গোড়াতেই নিহিত ছিল। পঁচিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ তার মামুলি পাটশিল্প ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পকেই অবলম্বন করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। এই সব শিল্পের যন্ত্রপাতি যখন পুরনো ও অচল হয়ে গেছে তখন ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল পেট্রোলিয়াম-ভিত্তিক রসায়ন শিল্প, ইলেকট্রনিক শিল্প, বিদ্যুৎ-[illegible] যন্ত্র উৎপাদন শিল্প প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে নতুন অর্থনৈতিক পথে এগিয়ে গেছে। ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর প্রধান ধাক্কাই এসে পড়ল পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের উপর। যে কয়লা ও ইস্পাতের সহজলভ্যতার উপর ভিত্তি করে একদা পশ্চিমবঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প গড়ে উঠেছিল সেই কয়লা ও ইস্পাতের দাম সারা ভারতবর্ষে এক করে দেওয়া হল। ফলে পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প তার ভৌগোলিক অবস্থানের দরুণ বিশেষ প্রাকৃতিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হল। অথচ অন্য দিকে তুলার দাম সারা ভারতবর্ষে এক করা হল না। ফলে পশ্চিম ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের কলগুলি হার মানল। একদিকে, হুগলী নদীর জল যত কমতে থাকল কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব ততই কমতে থাকল। তাছাড়া কয়লা, বস্ত্রশিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমিক অশান্তি বৃদ্ধি হওয়ায় এই বন্দরের কাজ কমল। কৃষি বিভাগে উৎপাদন বেড়ে চললেও ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল যে অবহেলা করে আসা হয়েছে তারও পরিণাম প্রায় একই সঙ্গে দেখা যেতে লাগল। কৃষি বিপ্লবের হাওয়া পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছল না। তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে রাসায়নিক সারের চাহিদা যখন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে বাড়তে থাকল পশ্চিমবঙ্গে তখন সারের তেমন চাহিদা নেই বললেই চলে। হরিয়ানায় যখন সবগুলি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছল, পশ্চিমবঙ্গে তখন শতকরা ৯টি গ্রামেও বিদ্যুৎ পৌঁছল কিনা সন্দেহ। সেচের জল সরবরাহ করার জন্য অন্ধ্রপ্রদেশে যখন প্রায় সওয়া লাখ বিদ্যুৎ-চালিত পাম্প কাজ করতে আরম্ভ করল, তখন পশ্চিমবঙ্গে ১২০০ বিদ্যুৎ-চালিত পাম্পও হবে না।

একই সময়ে কলকাতা শহর নাগরিক [illegible] চূড়ান্ত উদাহরণ হিসাবে সারা পৃথিবীতে চিহ্নিত হয়ে গেল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থাও এই শহরের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

অধঃপতনের এই লক্ষণগুলির কোনটিই হয়ত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ঠেকাতে পারতেন না। এমন কি এই লক্ষণগুলির কোন কোনটি হয়ত তাঁরই ভ্রান্ত নীতির পরিণাম। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এগিয়ে যাওয়ার যে সংকল্প ও উদ্যম তাঁর নেতৃত্বের মধ্যে দেখা গেছে পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে তেমনটি আর দেখা যায়নি।

পশ্চিম বাংলায় গত পঁচিশ বছরের মধ্যে শেষ পাঁচ বছর কেটেছে প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে। কখনও পাঁচমিশালি সরকার, কখনও রাষ্ট্রপতির শাসন, এরই মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে। একই সময়ে সন্ত্রাসের মারাত্মক রাজনীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। শত শত তরুণ এবং সমাজের নানা স্তরের অনেক গণ্যমান্য ও সাধারণ মানুষের রক্তে এই রাজ্যের মাটি ভিজেছে।

ইতিমধ্যে, পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা পুঞ্জীভূত হয়েছে। কারখানার পর কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন শিল্প হয় নি, ১৯৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে নতুন কলকারখানা খোলার জন্য যেখানে ২০৬টি আবেদন পাওয়া গিয়েছিল সেখানে ১৯৬৯ সালে পাওয়া গেল মাত্র ২৩টি। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে সারা রাজ্যে বেকারের আনুমানিক সংখ্যা ছিল যেখানে ১৫ লাখ সেখানে এখন এই সংখ্যা ২৮ লাখ বলে অনুমান করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে নতুন একটি প্রজন্ম গড়ে উঠেছে। স্বাধীন দেশের অনেক বেদনাময় স্মৃতির ভার থেকে এই নতুন প্রজন্মের চেতনা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় পাঁচ বছর বাদে আবার যে একদলীয় সরকার শাসনক্ষমতায় এসেছেন তাঁদের মধ্যে এই নতুন প্রজন্মের যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত সরকারও ইদানীংকালে পশ্চিমবঙ্গের পুঞ্জীভূত সমস্যাগুলি সম্পর্কে আগের তুলনায় অনেক প্রখরতর চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের আজকের দুর্দশা থেকে তাকে নিরাময় করার একটি প্রকাণ্ড এবং সম্ভবত সর্বশেষ সুযোগ ঘটনার বিচিত্র যোগাযোগে তার এই পঞ্চবিংশতিতম জন্মদিনেই এসে উপস্থিত হয়েছে। সেই সুযোগ যদি আমরা হারাই তাহলে ইতিহাসের কাছে আমাদের আর কোন কৈফিয়ৎ দেওয়ার থাকবে না।

পরিকল্পনার নতুন দিগন্ত

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

এটাকে আমরা নিশ্চয়ই শুভ যোগাযোগ বলে মেনে নেব যে, স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী বছরেই জাতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে নতুন চিন্তার সূত্রপাত হয়েছে। চার-চারটি পাঁচসালা পরিকল্পনা এবং তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা পার হয়ে আসার পর যে আমরা পরিকল্পিত অগ্রগতির পথ সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছি সেটা বোধহয় সুস্থতারই লক্ষণ। কারণ, এই প্রয়াস এ-কথাই প্রমাণ করে যে, এতদিন পর্যন্ত আমরা যে-পথে এগিয়েছি তার মধ্যে যদি কোনো ত্রুটি থেকে থাকে, তবে তা স্বীকার করে নিয়ে আজ আমরা বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাইছি। পাঁচ নম্বর পাঁচসালা পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করতে গিয়েই আমাদের সেই বাস্তবের সম্মুখীন হতে হলো।

আজ হয়ত আমরা এই বাস্তবকে অনেক বেশি স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আগে আমরা তার কোনো হদিসই পাইনি এ-কথা বললে আমাদের নেতাদের ধীশক্তিকে অকারণ ধিক্কার জানানো হয়। আর যার কাছেই হোক, অন্ততঃ এ-দেশে পরিকল্পনার ধ্যান-ধারণায় যিনি জনক সেই জওহরলাল নেহরুর কাছে এ-কথাটা গোপন থাকে নি যে, আমাদের পরিকল্পনা হয়ত আমাদের প্রার্থিত পথে এগিয়ে দিতে পারছে না। তৃতীয় পরিকল্পনার মাঝপথে আমরা তাই তাঁর কণ্ঠে এই অস্বস্তিকর মন্তব্য শুনি : 'সর্বত্রই সমৃদ্ধি, বৈষয়িক উন্নয়ন চোখে পড়বে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, প্রত্যেকেই সেই সমৃদ্ধির বখরা পাচ্ছে। অসংখ্য মানুষই তার বখরা পায়নি এবং জীবনধারণের জন্যে দরকারী প্রাথমিক জিনিসপত্রই যোগাড় করতে পারছে না। একদিকে দেখছি মুষ্টিমেয় সচ্ছল মানুষ। তারা যে-করেই হোক নিজেদের জন্যে একটা নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে। অবশ্য গোটা ভারতের কথা ও অবস্থা সম্পূর্ণই অন্যরকম। ...আমার মনে হয়, নতুন ধনসম্পদ একটা বিশেষ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে এবং সবদিকে ঠিকমতো ছড়িয়ে পড়ছে না।'

পরিকল্পনা কমিশনের তদানীন্তন কর্তা গুলজারিলাল নন্দাও ব্যক্ত করেছিলেন একই ধরনের অস্বস্তি। প্রশান্ত মহলানবিশের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির রিপোর্টও অনেকের মনের সন্দেহগুলিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করলো। প্রথম দুটি পাঁচসালা পরিকল্পনায় আয় ও সম্পদ বণ্টন সম্পর্কে মহলানবিশ রিপোর্ট আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, পরিকল্পিত অগ্রগতি বড় বড় কোম্পানির পৌষ মাস এনে দিয়েছে। নতুন শিল্পপতি তৈরি ও ছোট কল-কারখানার প্রসারের জন্যে চেষ্টা যে হয়নি তা তো নয়, কিন্তু তবু কিছু লোকের হাতে বৈষয়িক ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হওয়ার ধারা তাতে পাল্টায়নি। অন্যদিকে ভারতের বৈষয়িক উন্নয়ন সম্পর্কে একান্ত ওয়াকিবহাল ও গভীর সহানুভূতিশীল সুইডেনের অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডাল দেখালেন যে, গ্রামাঞ্চলের জন্যে যে উন্ন

...নের ব্যবস্থা নেওয়া হলো তাতে যাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো তারাই হলো উপকৃত।

অথচ আমরা যদি ১৯৫১ থেকে আজ পর্যন্ত যে বছরে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা শুরু হলো, তার হিসাব মিলিয়ে দেখি, তবে আমরা কিছুতেই বলতে পারব না যে, আমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেছি। মানুষের উপর দিয়ে নানা ঝড়-ঝাপটা গেছে। প্রকৃতি প্রায়ই বিরূপ হয়েছে। চোরাকারবারীদের দাপট সমানভাবেই হয়েছে। জিনিসপত্রের দাম প্রায়ই আয়ত্তের মধ্যে থাকেনি। বিদেশী সাহায্যের ধারা কখনও ক্ষীণ, কখনও প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। তবু এই দু' দশকের পথ পেরিয়ে এসে আমরা এখন খাদ্যের ব্যাপারে পরনির্ভরতা একরকম কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী গুদামে ৯০ লাখ টন খাদ্যশস্য মজুত। কলকারখানার যে ভিত এই সময়ের মধ্যে গড়ে উঠেছে, তার উপর যে কোনো সৌধ তৈরির কল্পনাকে আকাশকুসুম বলে উড়িয়ে দেওয়ারও উপায় নেই।

পরিকল্পনায় হাতেখড়ি

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল স্বভাবতঃই সীমিত, সেই আমাদের পরিকল্পনার কাজে হাতেখড়ি। সামনে ছিল সোভিয়েট রাশিয়ার পরিকল্পনার সাফল্যের জাজ্বল্যমান উদাহরণ। সেই উদাহরণের নকল করার সে সাধ্য আমাদের ছিল না। ফারাক ছিল দু' দেশের সমাজব্যবস্থার মধ্যেও। সমাজতান্ত্রিক একদলীয় রাষ্ট্রে যে পথে পরিকল্পনার কাজ চলে, ভারতের মতো সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে সে পথে এগোনো চলে না। প্রথম পরিকল্পনার সময় সরকারের প্রথম চেষ্টা ছিল শুধু কী করে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানো যায় আর কী করে জিনিসপত্রের দামটা থাকে আয়ত্তের মধ্যে। প্রধান জোরটা তাই গিয়ে পড়েছিল চাষবাসের উন্নতির উপর। সরকারী খাতে যতো টাকা মোট বরাদ্দ ছিল তার শতকরা ৩০ ভাগেরও বেশি খরচ করা হলো সরাসরি চাষবাস ও সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে।

লক্ষ্য সীমিত হওয়ার সুবিধে এই যে, তা অনেক সহজে পূরণ করা যায়। প্রকৃতি ছিল মোটের উপর অনুকূল। তাই চাষবাসে বেশি লগ্নীর সুফল পাওয়া গেল হাতে-হাতেই। ফলন বেড়ে হলো পাঁচ কোটি থেকে সাড়ে ছ' কোটি টন। কলকারখানার উৎপাদন বৃদ্ধির উপর তেমন জোর দেওয়া হয়নি। কিন্তু শিল্পের উৎপাদন যেভাবে বাড়লো (গড়ে বছরে শতকরা প্রায় আট ভাগ) আজ যদি সেই হারে বাড়ে, তবে আমরা বর্তে যাই। স্থির ছিল পাঁচ বছরে জাতীয় আয় শতকরা এগারো ভাগ বাড়বে। দেখা গেল আসলে তার চেয়ে বেশিই বেড়েছে।

প্রথম পরিকল্পনার রচয়িতাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল যে, তাঁরা বেশ ভীরু পায়ে এগিয়েছেন। কোনো ঝুঁকির মধ্যে যাননি। দেশের বৈষয়িক ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে প্রভাবান্বিত করতে চেষ্টা করেননি। দ্বিতীয় পরিকল্পনা যখন তৈরি হলো, তখন দেখা গেল যে, রচয়িতারা তাঁদের আগের দ্বিধা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন। প্রথম পরিকল্পনার সাফল্য তাঁদের সাহস অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয় পাঁচ বছরের পরিকল্পনা তৈরির কর্মকৌশলও অনেক বেশি আয়ত্ত হয়েছিল। কিন্তু এ সবের চেয়ে বড় কথা ছিল জাতির প্রয়োজন। প্রথম পরিকল্পনায় যেভাবে জাতীয় আয় বেড়েছিল তাতে আত্মপ্রসাদের কোনো সুযোগই ছিল না, কারণ প্রয়োজনের অংক ছিল আরো অনেক বড়।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা তাই শুধু আকারে বাড়লো না, কোন বিষয়ের উপর আমরা বেশি গুরুত্ব দেব সে-বিষয়েও দিক-পরিবর্তন ঘটে গেল। কৃষি উপেক্ষিত হলো না বটে, কিন্তু বড় কারখানা ও খনিজ শিল্পের উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া হলো আগের তুলনায় অনেক বেশি। তবু যেহেতু বড় কারখানায় খুব বেশি লোকের কাজের ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নয়, তাই কুটির-শিল্পের প্রসারের ব্যবস্থাও রাখা হলো।

কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষার মাশুল বুঝি দিতেই হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়েই আমাদের তা দিতে হলো। পরিকল্পনার রচয়িতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলো, তাঁরা শুধু কী করা যায় সেটাই ভেবেছেন, কেমন করে করা যায় সেটা তেমন ভাবেননি। ফলে পরিকল্পনার প্রায় শুরু থেকেই দেখা দিল গোলযোগ। নানা জিনিসের ঘাটতি বৈষয়িক ব্যবস্থাকে সংকটের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেললো। উন্নয়নের কাজে টাকা খরচের ফলে অনেক লোকের আয় বেড়েছিল, অথচ সেই অনুসারে জিনিসপত্রের উৎপাদন বাড়েনি। তার সঙ্গে অসাধু ব্যবসায়ীদের খেলা তো ছিলই। এই অবস্থায় কথা উঠলো, পরিকল্পনাকে কাটছাঁট করা যায় কিনা। কিন্তু কাটছাঁট করা তো খুব সহজ ব্যাপার নয়। প্রায় সব প্রধান প্রকল্পের কাজই তখন শুরু হয়ে গেছে। মাঝপথে সেগুলো থামিয়ে দেওয়া যাবে কী করে? তবু অবস্থা বিপাকে বরাদ্দের পরিমাণ কিছুটা ছাঁটাই করতেই হলো শেষপর্যন্ত। সরকারী খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ৪,৮০০ কোটি থেকে কমে দাঁড়ালো ৪,৫০০ কোটি টাকা। তবে
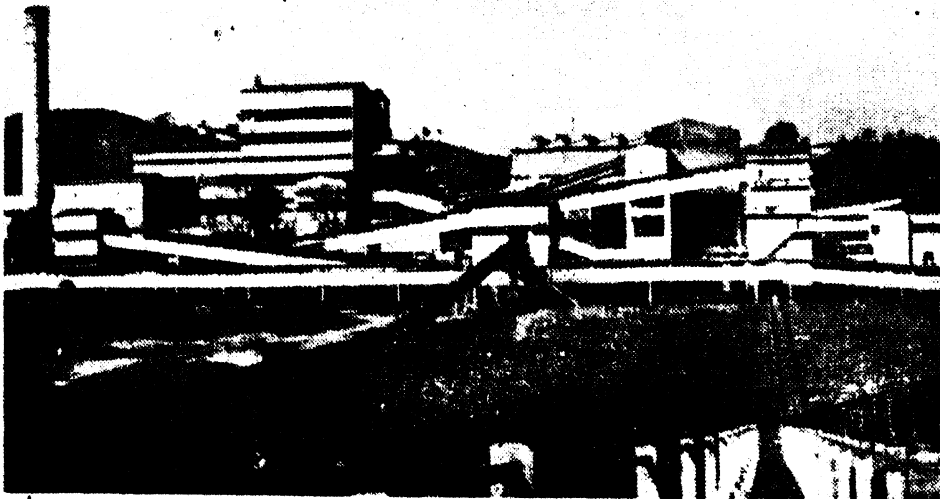
নোয়ামুণ্ডিতে টিস্কোর কারখানা ভারতীয় ইস্পাতশিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

সল্ট লেকের নির্মাণকার্য
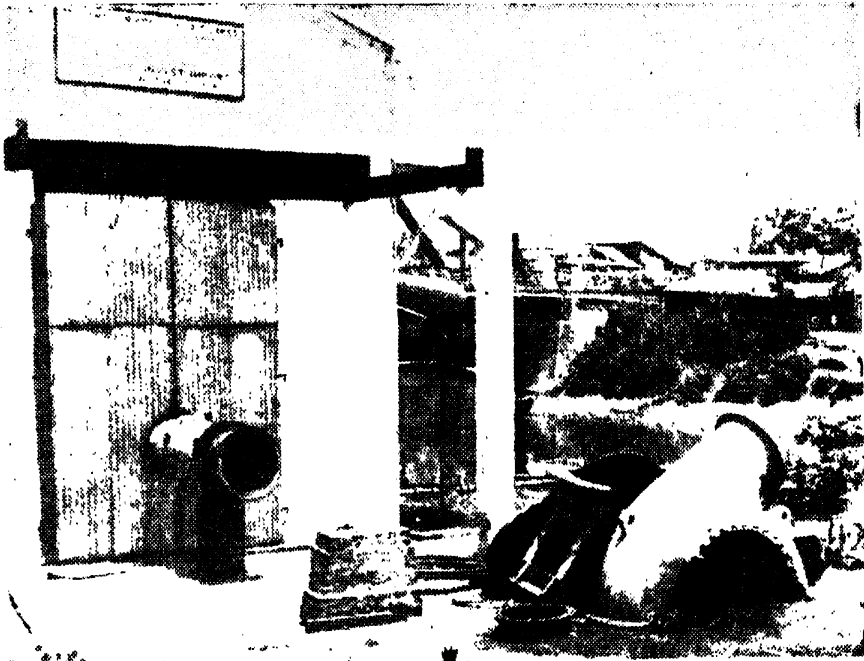
পরিকল্পনাতে বোধহয় আসল খরচের পরিমাণ ঐ অংকের চেয়ে কিছু বেশিই দাঁড়িয়েছিল।

সংকটের মধ্যে গিয়ে পড়লেও কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনা ব্যর্থতার মধ্যে শেষ হয়নি। চাষবাসের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলো প্রায় প্রথম পরিকল্পনারই মতো। শিল্পের ক্ষেত্রে শুধু লগ্নীর পরিমাণই বাড়লো না উৎপাদনের হারও বেড়ে চললো। ইতিমধ্যে অবশ্য কয়েকটি দুর্লক্ষণও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তার মধ্যে একটি হলো, সমাজের দুর্বলতার অংশের চাহিদার কথা ভুলে থেকে ওপর তলার মানুষের চাহিদা মেটানোর উপযোগী পণ্য উৎপাদনের ওপর জোর দেওয়া। দ্বিতীয় দুর্লক্ষণ হলো, বেকারের সংখ্যা কমের দিকে না গিয়ে বেড়ে চলেছিল। তৃতীয়তঃ, জিনিসপত্রের দাম হয়ে উঠেছিল ঊর্ধ্বগামী।

তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যে উন্নয়নের কৌশলগত কোনো বড় রকমের পরিবর্তন চোখে পড়ে না। কৃষিকে অবহেলা না-করেও বড় শিল্পের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার যে-নীতি দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত হয়েছিল, তা তিন নম্বর পরিকল্পনাতেও মোটের ওপর একই রইল। কিন্তু অন্যদিক থেকে তৃতীয় পরিকল্পনাকে যদি আমরা পরিকল্পিত উন্নয়নের ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায় বলে চিহ্নিত করি, তবে অন্যায় হবে না। এই পরিকল্পনার বছরগুলির নানা দুর্যোগ আমাদের আকাশকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে গেল। পরিকল্পনার দ্বিতীয় বছরেই চীনের সঙ্গে লড়াইয়ের ফলে আমাদের শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, বৈষয়িক ক্ষেত্রেও বিরাট ধাক্কা এসে লাগল। প্রতিরক্ষার ব্যাপারে আমরা যে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ততায় দিন কাটাচ্ছিলাম তার অবসান ঘটে গেল। প্রতিরক্ষা বাবদ খরচের পরিমাণ বেড়ে গেল রাতারাতি। বছর দুয়েকের মধ্যে জওহরলালের তিরোধানকেও একটা বড় ধাক্কা বলে ধরতে হবে, কারণ পরিকল্পনার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল আন্তরিক। পরিকল্পনার শেষ দু' বছরে প্রচণ্ড খরা খাদ্য উৎপাদনের সব হিসেব-নিকেশ বানচাল করে দিয়ে গেল। সব মিলিয়ে আমরা যে গভীর গাড্ডায় গিয়ে পড়েছি, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ রইল না যখন আমরা দেখলাম যে, তৃতীয় পরিকল্পনা-কাল শেষ হতে না হতেই টাকার আন্তর্জাতিক মূল্য কমিয়ে দিতে হলো দারুণভাবে।

তৃতীয় পরিকল্পনা, আমাদের এত বড় একটা ধাক্কা দিয়ে গেল যে, বছর-তিনেক (১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯) আমরা পরিকল্পনার কথা ভুলেই রইলাম। পরিকল্পনার সেই 'গোধূলি-বেলায়' প্রতি বছর একটি পরিকল্পনা তৈরি করে আমরা দিন-আনি-দিন-খাই গোছের অবস্থায় কাজ চালাতে লাগলাম। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার একটা খসড়া তৈরি থাকা সত্ত্বেও আমরা এগোতে পারছিলাম না, কারণ আমরা সাহস হারিয়ে ফেলেছিলাম। জনসাধারণের মধ্যে স্বভাবতই দেখা দিয়েছিল হতাশা আর সেই সুযোগে একদল লোক ধুয়ো তুলেছিল যে, পরিকল্পনার আর কোনো দরকার নেই। রাজনৈতিক নেতৃত্বও ইতিমধ্যে দ্বিধার ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। শ্রীমতী গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন থাকলেও তিনি তখনও সিণ্ডিকেটের হাতে বন্দী।

দ্বিধা অবশ্য ক্রমে চলে গেল। পুরো একটা পাঁচসালা পরিকল্পনা চালু হলো ১৯৬৯ সালে। মোট লগ্নীর পরিমাণ অনেক বেড়ে গেল, কিন্তু পরিকল্পনায় খসড়ায় একথা স্পষ্ট করে দেওয়া হলো যে, আমরা যে পথ ধরে চলেছি তার মধ্যে কোনো মৌলিক কোনো ত্রুটি নেই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছিল মোট জাতীয় আয় বর্ধনের মারফৎ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গড়ে তোলা এবং জনসাধারণের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস করা। চতুর্থ পরিকল্পনায় সেই নীতি অটুট রইল। এই পরিকল্পনা এখন মাঝপথে। এর মূল্যায়নের এখনও সময় আসেনি। শুধু এর প্রথম দু' বছরের অভিজ্ঞতার একটা মূল্যায়ন পরিকল্পনা কমিশন করেছেন। খাদ্যশস্য, কল-কারখানার উৎপাদন, জিনিসপত্রের দাম, চাকরী-বাকরীর ব্যবস্থা, রপ্তানী প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফলাফলের যে-ছবি পরিকল্পনা এঁকেছেন তাকে পুরোপুরি উৎসাহব্যঞ্জক বলা চলে না। কিন্তু পরিকল্পনার মূল নীতি সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন সেখানে নেই।

জ্বলন্ত প্রশ্ন

সেই প্রশ্ন আমরা খুব স্পষ্টভাবে শুনলাম শ্রীমতী গান্ধীর মুখে এই বছরের

মার্চ মাসে। দিল্লীতে ভারতীয় বণিকসভা ফেডারেশনের সভায় তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। এক দশক আগে তাঁর পিতার মুখে আমরা যে-ধরনের সন্দেহের কথা শুনেছিলাম, সেই সন্দেহ তাঁর মুখে একটা দৃঢ় প্রত্যয় হিসেবে উচ্চারিত হলো। তিনি বললেন, আমরা আমাদের মতো দেশে যে-পথে উন্নয়নের কাজ করতে চাইছি সেটা ঠিক পথ নয়। উন্নয়নের যে-সব রীতি আজ দুনিয়াময় চালু রয়েছে তাতে গরীব দেশের সমস্যা কমে না বরং বাড়ে। পশ্চিমের ধনী দেশের অনুকরণে আমরা শুধু দেশের মোট আয় অথবা মোট উৎপাদন বাড়িয়ে চলার নেশায় মেতে থেকেছি। কিন্তু এই নেশা যে মারাত্মক তা ভেবে দেখি নি। কারণ মোট উৎপাদনের অথবা মোট আয়ের পরিমাণ বাড়লেই যে দেশের সব মানুষ সমানভাবে উপকৃত হয় তা নয়। তার ফলে শুধু বাড়ে সামাজিক আর রাজনৈতিক অস্থিরতা।

উন্নয়ন কোন্ পথ ধরে এগোবে, সেটা শুধু বই পড়ে স্থির করা যায় না। সেটা স্থির হয় দেশের চাহিদা আর অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। সেই চাহিদা আর অভিজ্ঞতাটা কী?

কয়েক বছর আগে এক দল অর্থনীতি-বিদ অঙ্ক কষে দেখিয়েছিলেন এ-দেশে একেবারে ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে গেলে প্রতি মানুষের প্রতি মাসে কুড়িটা টাকা লাগেই। ঐ হিসেবটা ছিল ১৯৬০-৬১ সালে টাকার দাম যা ছিল তারই ভিত্তিতে। আজকের হিসেবে সেটা ৩৭ টাকার মতো দাঁড়ায়। এই সামান্য চাহিদাটুকুও যাদের মেটে না তাদের সংখ্যা কতো? কম করেও বাইশ কোটি। এই সংখ্যাটাই যথেষ্ট আতঙ্কজনক। তার সঙ্গে আমরা যদি মনে রাখি যে, এই ধরনের মানুষের সংখ্যা গত দু দশকে মোটেই কমে নি (পরিকল্পনা কমিশনের হিসেব অনুযায়ী) তখন আরো ভীত হয়ে পড়তে হয়। অবশ্য অধ্যাপক ডান্ডেকর ও অধ্যাপক রথ তাঁদের 'ভারতে গরীবী' নামে বিখ্যাত আলোচনায় দেখিয়েছেন যে, দেশের কিছু সংখ্যক লোক গত কয়েক বছরে আরো গরীব হয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের সভাপতি রবার্ট ম্যাকনামারাও তাঁর এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় এই ধরনের কথাই বলেছেন।

পরিবর্তিত রণকৌশল

বাইশ বছরের পরিকল্পিত প্রগতির পর যদি এই অবস্থা দাঁড়িয়ে থাকে তবে উন্নয়নের কৌশল পরিবর্তনের কথা উঠবে বৈকি? পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনার যে 'অ্যাপ্রোচ পেপার' তৈরী হয়েছে তার মধ্যে আমরা সেই পরিবর্তিত কৌশলেরই আভাস পাচ্ছি। সেই কৌশলের পূর্বাভাস ছিল শ্রীমতী গান্ধীর পূর্বোদ্ধৃত বক্তৃতায়।

পঞ্চম পরিকল্পনার রচয়িতাদের উদ্দেশ্য গরীবীর ওপর 'সরাসরি আক্রমণ।' গরীব কে? যার জিনিসপত্র কেনার ক্ষমতা নেই সেই গরীব। সুতরাং গরীবী হটাতে গেলে মানুষের কেনার ক্ষমতা বাড়াতে হবে। কেনার ক্ষমতা বাড়াতে হলে তাকে উপার্জনের সুযোগ দিতে হবে—হয় চাকরী দিয়ে, অথবা সে যাতে নিজে চাষবাস-ব্যবসা করে রোজগার করতে পারে তার ব্যবস্থা করে। সুতরাং প্রথমে দরকার কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা। গরীবের সংখ্যা গ্রামেই বেশী। শহরে যারা গরীব তারা প্রধানত গ্রাম থেকেই এসেছে। সুতরাং কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থাটা প্রথমে গ্রামেই বেশী করে করতে হবে। তবে শিক্ষিত বেকারদের সমস্যাটার কথাও পরিকল্পনা কমিশন ভুলে যান নি।

কিন্তু বেশ কিছু লোকের আয়ের ব্যবস্থা হলেও তারা প্রয়োজনমত সব কিছু কিনতে পারবে না, যদি জিনিসপত্রের দাম আক্রা থাকে। সেই জন্যে দাম যাতে আয়ত্তের বাইরে না-চলে যায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। খাদ্যশস্য, খাওয়ার তেল, মোটা কাপড়, চিনি, জ্বালানী প্রভৃতির উৎপাদন যদি বাড়ে তবেই দাম আয়ত্তের মধ্যে থাকে। সুতরাং ঐ সব জিনিসের উৎপাদন বাড়াতে হবে।

কিন্তু কাজের ব্যবস্থা হলে এবং ন্যূনতম চাহিদা মিটলেই কি মানুষের জীবনের সব চাহিদা মিটবে? মিটবে না, তার কারণ তাদের আয়ের পরিমাণ এমন হবে না যার দ্বারা সে সন্তানের শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্যরক্ষা, পানীয় জল, ঘরবাড়ী—এই সবের ব্যবস্থা করতে পারবে। সুতরাং এইগুলি যোগাবার জন্যে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে।

খুব সংক্ষেপে এটাই হলো পঞ্চম পরিকল্পনায় গরীবীর বিরুদ্ধে অভিযানের রণকৌশল। পরিকল্পনা কমিশন বলেছেন, শুধু দ্রুত জাতীয় আয় বাড়লেই যে সকলের কর্মসংস্থান হয় না এবং গরীবের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় না তা অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে। গত দু দশকে দেশে গড়পড়তা মাথাপিছু আয় বেড়েছে, তবু গরীবের সংখ্যা কমে নি। সেই জন্যেই গরীবীর বিরুদ্ধে এই সরাসরি অভিযান।

'অ্যাপ্রোচ পেপারে' পঞ্চম পরিকল্পনার যে মূলনীতির কথা বলা হয়েছে সে-সম্পর্কে অভিযোগ উঠছে যে, তা বড়ই ভাসা-ভাসা। এটি কোনো পূর্ণাঙ্গ দলিল নয়, সুতরাং তার মধ্যে খুব নির্দিষ্ট ব্যবস্থার কথা হয়ত আশাও করা যায় না। মূল প্রশ্ন হলো, গরীবীর বিরুদ্ধে রণ-কৌশল হিসেবে এটা কতোটা কার্যকর হবে এবং এই পরিবর্তিত কৌশল কার্যকর করা সম্ভব হবে কিনা। এত দিন আমরা একটা পথ ধরে চলে এসেছি। আজ হঠাৎ মাঝ-পথে দিক-পরিবর্তনের চেষ্টার মধ্যে ঝুঁকি বড় কম নেই। আমরা যে-ধরনের উৎপাদনকে এত দিন অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছি আজ হঠাৎ তার পরিবর্তনের চেষ্টা করলে নতুন জটিলতা দেখা দেবেই। যে-সব দেশের অগ্রগতি ইদানীং আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে, যেমন জাপান বা সোভিয়েট রাশিয়া, তাদের ইতিহাসে এমন মাঝপথে দিক-পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত নেই। এত দিন ধরে যে-রীতিতে কাজ চলছিল সেটা বরবাদ করা এক জিনিস, সেই রীতির বদলে নতুন রীতি চালু করা একেবারেই অন্য ব্যাপার। শ্রীমতী গান্ধী নিজেই বলেছেন, ভবিষ্যতের পথটা আমাদের কাছে মোটেই পরিষ্কার নয়, সেই পথ আমাদের তৈরী করে নিতে হবে।

কিন্তু পরিবর্তিত রণকৌশল সম্পর্কে আরো মৌলিক প্রশ্ন হলো : গরীবীর ওপর সরাসরি আঘাত হানতে গিয়ে আমরা আমাদের সামগ্রিক উন্নয়নকে ব্যাহত করব কিনা? অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান, স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল, খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে গিয়ে কল-কারখানার বা রপ্তানীর প্রসার ব্যাহত হবে কিনা। যাঁরা ভিন্ন মতের লোক, তাঁরা বলছেন, সামগ্রিক উন্নয়ন বাড়লে আপনা থেকেই সব মানুষের উপকার হবে, সুতরাং সামগ্রিক উন্নয়নকে ব্যাহত হতে দেওয়া চলবে না। তাছাড়া এই পরিবর্তিত রণকৌশল অন্য বিপদও ডেকে আনতে পারে। কল-কারখানা এবং অন্যান্য শিল্প যদি উপেক্ষিত হয় তবে আমাদের বৈষয়িক ব্যবস্থা কৃষিভিত্তিকই থেকে যাবে, অথচ শেষ পর্যন্ত শিল্পভিত্তিক বৈষয়িক ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছাড়া কোন পথ নেই। কৃষিভিত্তিক বৈষয়িক ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের চিরদিনই সমৃদ্ধ দেশগুলির ধামা ধরে দিন কাটাতে হবে।

পরিকল্পনা কমিশন অবশ্য বলছেন যে, আমরা এমন একটা অবস্থায় পৌঁচেছি যে, এখন একই সঙ্গে গরীবীর বিরুদ্ধে সরা-সরি অভিযান চালান এবং সামগ্রিক উন্নয়নের কাজ চালান সম্ভব। আমাদের বৈষয়িক ব্যবস্থার ভিত্তি নিশ্চয়ই গত পঁচিশ বছরে দৃঢ়তর হয়েছে, কিন্তু পঞ্চম পরিকল্পনাকে যদি তার মূখ্য-উদ্দেশ্য সফল করতে হয় তবে প্রধান সমস্যা হবে অর্থের সংস্থান। সেই অর্থের সংস্থানের দিকেই পরিকল্পনা কমিশনকে নজর দিতে হবে।

—তাহলে দেবে না তুমি? কথাগুলো মহাজন ইয়াকুবের মুখের উপর যেন ছুঁড়ে মারল। ইয়াকুব কি ভাবছিল। রাগও হয়েছে তার ওই সামাদের উপর। ছেলেটা জাহান্নামে গেছে শহরে যাতায়াত করে, ওর বন্ধু গোপালও বলে।

—বাবুর কথাগুলো সমঝে দেখো চাচা, এতগুলো টাকা হাতে পাবে একসঙ্গে, কি ঠ্যাকার পড়েছে তোমার রোদজল সয়ে রাত জেগে বাগানে বসে থাকার। নিবিব তোয়াজ করে বাড়িতে নাস্তাপানি করবে, গোশ্ত খেয়ে থাকবে।

বুড়ো ইয়াকুব চমকে ওঠে ওদের কথায়।

সবুজ বাগানে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছে কড়া রোদ, এখানে গাছগাছালির ঘনছায়ায় এতটুকু রোদ নেই, সবুজ স্নিগ্ধ পাখীডাকা জগৎ। বাতাসে আশশেওড়া ঘেঁটু ফুলের মিষ্টি খোসবু উঠছে। দুটো কোকিল পাল্লা দিয়ে ডাকছে। কাউকে দেখা যায় না, তবু তাদের ওই সুর নির্জন নিস্তব্ধ বাগানে প্রাণের সাড়া এনেছে। দমকা বাতাসে সবুজ থলো থলো আমগুলো দুলছে। গাছভর্তি আম এসেছে এবার।

বুড়ো ইয়াকুব এমনি একটি সবুজ পৃথিবীর মাঝে হারিয়ে গেছে অতল স্তব্ধতার মাঝে।

মির্জা ইয়াকুব শেখ

শক্তিপদ রাজগুরু

—এই বাগান আর তোকে নিয়েই সব আছি ফাতিমা। কাম কি আর কৈজাতে গানোর।

বড় সিন্দুরে - নিমাঙ্গ - কালাপাহাড়-রা-রানীপছন্দ - নবাবপছন্দ - মীনাখাস-লক্ষ্ণবালী, দিলসাদার - বইটে - ওমরাখাস-ক্কা—

দুঝলি, এর মধ্যে নবাবের পাঞ্জার ছাপ কা থাকতো।

ফাতিমা আব্বার কথায় খিলখিলিয়ে সে ওঠে। বাগানে ওই হাসিটা কি সুর লে। ইয়াকুব শেখ মেয়েকে বাগানে নিয়ে য়ে একটা একটা করে গাছগুলোকে নাতো। দু-একটা গাছে আম-এ রং রছে। ইয়াকুব শেখ বাতাসে কিসের ঘ্রাণ তো।

—শরীফ!

সংশার ছেলেটা এগিয়ে এলে বলে কুব,

—নিমলি এবার তৈয়ার হবে। টুসি গা—

লাগির ডগায় জালের থলিমত করা, থলিটায় আম খসে পড়বে, চোট লাগবে এতটুকু। ইয়াকুব বলে,

—সরমী রে, ওরা বহুৎ সরমী। থোড়া ট লাগলে আদমীর দিল জখম হয় না, আমকা দিল জখমী হো যায়। শয়ার!

কোহিতুর গাছের নীচে এসে দাঁড়ালো কুব। এখানে কয়েকটা সেরা গাছ খছে ইয়াকুব। এ আমগাছের পাতা-লোও যেন নরম—ওপাশে মাল-ই-নজাম আমগাছে ফলগুলো ঝুলছে।

বুঝলি বেটি, আম-এর শাহানশা এই হিতুর।

ফাতিমা ওই আমগুলোর দিকে চেয়ে কে। অন্য গাছে আম ছেয়ে আছে। এ-ছে আম তত নেই, ধরেও না। আর মগুলো দেখতে কদাকার। আর ওটা—

—এই তোমার শাহানশা! তাহলে বেগম থায়?

ইয়াকুব মাথা নাড়ে—আছে বেটি, জরুর ছে। ওই তো পাশাপাশি গাছই রয়েছে। মাল-ই-আনজাম!

ফাতিমা চেয়ে থাকে। নিটোল পুরুষ্ট মগুলোর গায়ে হলুদ সিন্দুর আভা ড়েছে। মসৃণ কমনীয়তা ফুটে উঠেছে। ন টুসকি দিলে ওর মসৃণ আবরণ ভেদ রে রস বের হয়ে আসবে।

ইয়াকুব শেখ বলে চলেছে,

—শাহী আমলে এই আম যেতো খাস গায় মুকসুদাবাদ সুবা থেকে, ঘোড়া টিয়ে শাহী ডাক যেতো—আর হিসাব রে আম পাঠানো হতো, আগ্রা পৌঁছতে সময় লাগতো—তাতেই তৈরী হয়ে তো সেই আম। পথে দেরী করার—মার কায়দা নেই। আম বিলকুল নষ্ট হয়ে লে গর্দান যাবে মীর মুনশির। তারপর বাবী আমলে এর বোলবোলাও বাড়লো, াড় কলম করে ভিন্ স্বাদের আম বানাও নাম মিলবে। তাই দেখছিস এতো ভিন কিসিমের আম, তাদের স্বাদ আলাদা, মেজাজ আলাদা। খোসবুর তার তফাৎ!

...সে অনেক দিনের কথা। ফাতিমার সেই মন আজ বদলে গেছে। আমের কিসসা তার কাছে পুরোনো হয়ে গেছে। ওর জওয়ানী মনে আজ অন্য সুর বাজে। তাই বাবার ওইভাবে সামাদকে ফিরিয়ে দেওয়াটা বিশ্রী ঠেকেছে তার।

যাবার সময় সামাদ ওর সঙ্গে কথা বলবে ভেবেছিল, তা বলেনি। ক্ষুব্ধ হয়েই গেছে বোধহয় সে। ফাতিমা ক্রমশঃ ওই একরোখা মানুষটাকে সহ্য করতে পারছে না। বাবার একগুয়েমীর জন্য আজও বিয়ে তার হয়নি, সামাদকে তার ভালো লাগে। তাছাড়া সামাদ কারবার করে দু-পয়সা কামাচ্ছে। তার কাছেই কলকাতার গল্প শুনেছে সে। ঝকঝকে রোশনী-জ্বলা শহর—সিনেমা-থিয়েটার কতো কি আছে।

জীবনের সব আকর্ষণ, সব পাওয়া থেকে ওই ইয়াকুব শেখের জন্যই লোক-বিরল এই বাগানের নির্জনে থাকতে হয়েছে তাকে। অজ পাড়াগাঁ এটা। শহরে—বহরমপুরে দু-একবার গেছে, বেরা উৎসবের সময় চক মুর্শিদাবাদেও গেছে, সেই রোশনী ফাতিমার মনে কি আভাষ এনেছে। ততই মনে মনে কঠিন হয়ে উঠেছে মেয়েটা। বাবার উপর চটে উঠেছে। মনে হয় ওর এই বাগানের নির্জনে তাকেও বন্দী করে রেখেছে ইয়াকুব শেখ, সেই কারণে ফাতিমা চেয়েছিল তার বাবা এবার বাগানের স্বত্ব ছেড়ে দিলে তারা আবার শহরে যেতে পারবে। কিন্তু তা হয়নি।

—আব্বা!

ইয়াকুব ওর ডাকে চাইল। ওর মুখে ফুটে উঠেছে খুশীর আভাষ। পাকা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে লোকজনদের কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছে। কোন গাছে আমের তার এসেছে তাই জানাচ্ছে। কার বাড়িতে কোন্ আমের কি ফরমাইস আছে সেইমত্ত আম পাঠাতে হবে।

ওর বাগানের আম সাধারণতঃ বাইরে যায় না। চক মুর্শিদাবাদ-বহরমপুরের কিছু বাড়িতেই ওর মাল সব ফুরিয়ে যায়। তবু হরি সার বাজারে একটা দোকান ওর আছে। খানদানী আমওয়ালা সে। লোকজনদের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে মেয়ের দিকে চাইল। ফাতিমা বলে,

—ওদের বেচে দিলেই তো ঝামেলা চুকে যেতো, দামও দিচ্ছিল অনেক টাকা।

—তাজ্জব! কি বলছিস তুই! ইয়াকুব শেখ চমকে উঠেছে মেয়ের কথায়।

বাতাসে আশশেওড়া পাতা, ঘেঁটু ফুল আর আমপাকার তীব্র সুবাস উঠছে। লাল-হলুদ-সবুজ-এর বর্ণবাহার লেগেছে গাছে গাছে। ফাতিমা এই মাধুর্যের সংবাদ রাখে না। ও দেখেছে এত খেটে—এই লোকজনদের মাইনে দিয়ে যা থাকে, ওরা তার থেকে বেশী টাকা দিতে চেয়েছিল একসঙ্গে। তাদের অভাব তবু মিটতো। ফাতিমা বাবার কথায় বলে,

—ঠিকই বলছি। এতগুলো টাকা দিতে এলো—তুমি ফিরিয়ে দিলে?

ইয়াকুব মেয়ের দিকে চাইল। ফাতিমা যেন ক্ষুব্ধ হয়েছে। গোসা করেছে—ভুল বুঝেছে তাকে। ওরই মত পেয়ার করে ওই আম-এর খানদানকে, তার যত্নে ফলানো ওই ফলগুলোকে। ফাতিমার সঙ্গে তাদের কোন ফারাক নেই তার মনে। সেই কারণেই অসহায় কণ্ঠে বলে ইয়াকুব শেখ,

—টাকাটাই বড় রে? ইজ্জৎ-খানদান এসবের কোন কিম্মৎ নাই? ওই লোক-গুলো আমার বাগানের আম কাঁচাই পেড়ে কারবাইড দিয়ে ভাপিয়ে মুর্শিদাবাদের সেরা আম বলে—বেইজ্জৎ করবে তাই দেখবো? জিন্দগীভোর এই খানদান মেনে এসেছি—আর ক'দিন বাঁচবো, একে ওই টাকার জন্য বেচতে পারবো না।

ফাতিমা বাবার দিকে চেয়ে থাকে। বুড়ো ইয়াকুবকে মনে হয় অনেক বয়স বেড়ে গেছে। চোখগুলো বসে গেছে—চোয়ালের হাড় ঠেলে উঠেছে। বুড়ো বলে,

—ওরা বলে—মাল-ই-আনজাম, কেমন আম? চাকু লাগাও—। ওই চাকু আমার কলজেয় লাগাতে চায় ওই আহাম্মুকের দল! ওদের ইয়াকুব শেখ বাগান বেচে না—কভি নেহি!

ফাতিমা লোকটার দিকে চেয়ে থাকে। মনে হয় এ সবই ওর পাগলামি। ফাতিমার মুখে জবাবটা এসেছিল, কি হাল বদলেছে সংসারের! কি সখ-সাধ মিটেছে তার? কিন্তু কথাটা বলতে তার বাধে।

চুপ করে সরে এল সে। ইয়াকুব শেখ ঠিক ওর মনোভাব বুঝতে পারে না। তবে মনে হয় ফাতিমা খুশী হয়নি।

বৈকাল নামছে। গাছগাছালির নীচে আবছা আঁধার জমছে, ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যায়। কাঠরার মসজিদের আজান থেমে গেছে, এইবার তারাগুলো চকচকিয়ে ওঠে। ইয়াকুব শেখ দাঁড়িয়ে আছে—বাতাসে ওঠে চেনা মিষ্টি খোসবু। হারানো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে।

জমিদার কান্তিবাবু, হরি সাহা, গোবিন্দ মল্লিক, গদাইচন্দ্র আরও কতজনের কথা ভোলেনি সে। কান্তিবাবু বলতেন,

—আম তৈরী করতে জানে ইয়াকুব।

মাঝে মাঝে ওর বাড়িতে গিয়ে আম খাইয়ে আসতো ইয়াকুব।

তুলোর উপর সাজানো থাকতো কোহিতুর, মাল-ই-আনজাম, দিলসাদার, মীর্জাখাস, জর্দালু, বীরা, চম্পা আরও কতো আম। কোনটা মিষ্টি, মিষ্টি বেশী খাওয়ার মাঝে একটু টক-মিষ্টি দানাদার ওই মীর্জাখাস পরিবেশন করতো—শেষ পাতে কোহিতুর। বোঁটা কেটে সাজানো মধু লাগিয়ে চোকলা সাফ করে তুলোর উপর রেখে হাওয়া দিত একপাশে। হাওয়া লাগিয়ে আবার উলটে অন্য পাশে হাওয়া দিতে হতো। তোয়াজের পর কাট-গ্লাসের প্লেটে ছুরি দিয়ে কাটতে

...হ্যাঁসিয়ার যেন চাঙ্গ আঁটিতে না ... দিল ভখমী হয়ে যাবে সুন্দরীর। ...গুলিগলা রং—মুখে দিয়ে নাড়তে হবে আপনা থেকেই গলে ক্ষীর হয়ে যাবে, ...ওতে নেই—যেন, জমাট ক্ষীর আর ...খোসবু। হাতে খোসবু থাকবে ...ভোর, ঢেকুর উঠবে খোসবু বের হবে ...রাড়ভোর। মৌজ তর হয়ে থাকবে।

...হুরী গদাই চন্দ্র ছিল নবাবের ...রী বংশ, চন্দ্রমশাই ইয়াকুবের বাগানের ...ই খেতেন, আর দাম দিতেন মোহর ...বলতেন।

—সেরা খানদানী, উমদা চীজ ইয়াকুব, ...কিম্মৎ দিতে হয় আশরফী দিয়ে।

আজ! ওই মহাজন হালদার লোভী ...দাঁত মেলে এসেছিল তার ...সেই বড় খানদানী চীজ বিল- ...কিনে নিতে ওই ঘামে-ভেজা কতক- ...নোট দিয়ে। আর চমকে উঠেছে শেখ- ...ফাতিমার কথায়।

...মির্জা ইয়াকুব শেখ, এককালে ...ছিল তার পূর্বপুরুষ। ভিন দেশ ...এসে এখানের এই উমদা চীজ এই ...মোহব্বৎ-এ পড়েছিল। শাহী- ...আমলের সেই স্বীকৃতি আজও রয়ে ...এখনও এস্টেট থেকে, সরকার থেকে ...মেলে, হোক পাঁচ টাকা তনখা— ...সেই পেনসন নিতে যাবার দিন কল- ...লক্ষ্ণৌ-চিকনের কাজ করা জীর্ণ ...চোস্ত পরে কানে গাজিপুরী ...নিয়ে রিয়াসৎ-এ যায়। নাম বলে— ...ইয়াকুব শেখ জালালাবাদী।

সেই খানদানকে ধুলোয় বিকিয়ে দিতে ...পারবে না।

কথাটা বলতো আয়েষা, তার বিবি।

আজ তারই মেয়ে ফাতিমা টাকা দেখে ...উঠেছিল,...ইয়াকুব কি ভাবছে! ...থার রাতজাগা পাখী একবার ডেকে থেমে ...বাগানের গাছের ডালে টিন বেঁধে ...গেছেল—অন্য লোকজন বাদুড় ...তাড়াচ্ছে। শব্দ ওঠে ঠং...ঠং—ঠং।

এগিয়ে চলেছে ফাতিমা এই অন্ধকারে। ...দিন তবু আশা করেছিল সে, বাবা এই- ...ছেড়ে শহরের আস্তানায় ফিরে যাবে। ...তাদেরও অভাব কষ্ট ঘুচবে। আর! মনের ...একটা উজ্জ্বল স্বপ্ন- জেগে ওঠে। ...মাদই কথাটা বলেছিল তাকে,

—তোকে নিয়ে কলকাতায় বাসা করবো ...তিমা, কতো দিন ওই অন্ধকার বনে- ...থাকবি?

সামাদের কথাতেই বাবাকে বলেছিল ...গান-এর ফল বিক্রীর কথা। সব কেমন ...গেছে। ফাতিমা আজ বৈকালে তবু ...টা বলতে গিয়েছিল কিন্তু কোনো ...হয়নি। বাবার একগুয়েমীতে চটে ...ছে সে।

—সামাদ! সামাদ!

গাছগাছালিভরা বাড়িটার জানলার ...ফিসফিসিয়ে ডাকছে ফাতিমা।

চমকে উঠেছে সামাদ। মেজাজটা ভালো নেই। এমন দাঁও ফসকে গেল, তারও হাজার খানেক টাকা মুফৎ আসতো, তাছাড়া সেরা খানদানী বাগানের এ-বছরের ফলন্তস্থ নিয়েছে তারা—এ-বাজারে ওদের নাম বের হয়ে পড়তো।

তা হয়নি। বুড়ো যক্ষের মত ওই বাগান আগলে রয়েছে। ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি। ফাতিমার ডাক শুনে চমকে ওঠে সামাদ।

—তুই।

হাঁপাচ্ছে ফাতিমা। সামাদ ওকে দেখছে নির্বিকার চাহনিতে। তার ব্যবসায়ী মন জেনেছে কোন ফায়দাই হয়নি। ফাতিমা আজ বাবার উপরে রাগ করেই এসেছে। অনেক দিন তার হারিয়ে গেছে, তার সে কিছু হারাতে রাজী নয়। সামাদ বলে,

—বুড়ো কিছুতেই রাজী হল না ফাতিমা। বলে কিনা খানদান—ইজ্জৎ—

ফাতিমা চটে উঠেছে। বাবাই তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে দু-এক জায়গায় তার বিয়ের কথাবার্তা হয়েছিল। ফাতিমা দেখতেও খারাপ নয়—তাই অনেকেই নিতে চেয়েছিল তাকে বৌ করে। সামাদের বাবাকেও ফিরিয়ে দিয়েছিল ইয়াকুব শেখ।

—বাস্তাড়ির ঘরে আমার মেয়ের সাদি হবে না মিঞা। জানোই তো মির্জার খান-দান আমাদের।

ওদের সমপর্যায়ের ছেলে এখানে খুবই অমিল। তাই মেয়েকেও বিয়ে দিতে পারেনি। মুঙ্গের, লক্ষ্ণৌ, মোরাদাবাদ ওই দিকে তাদের করণীয় ঘর আছে।

ফাতিমা কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল। মিথ্যা ওই বংশমর্যাদা নিয়ে তাকে এমনিই ব্যর্থ হয়ে সারাজীবন কাটাতে হবে—এ-কথাটা ভাবতে শিউরে উঠেছিল ফাতিমা। কিন্তু ইয়াকুব তার দিকে চায়নি। ওই খান-দানের মোহই তাকে আমের বাগান বেচতে দেয়নি—ফাতিমাকে ঘর বাঁধতে দেয়নি।

আজ ফাতিমা আর মিথ্যা ওই বোঝা বইতে পারবে না। ফাতিমা বলে ওঠে সতেজ কণ্ঠে,—ওই ইজ্জৎ-খানদানের কি দাম আছে সামাদ?

সামাদ চমকে উঠেছে ওর কথায়,—ফাতিমা!

ফাতিমা বলে—তাই ঝুটে ওই সবকিছু ফেলে চলে আসবো।

—সত্যি! সামাদ কি স্বপ্ন দেখছে ওর ডাগর কালো চোখের অতলে। নারকেল গাছের পাতাগুলো বাতাসে লুটোপুটি খাচ্ছে। ওদের ভাবনাগুলো অমনি আছড়ে পড়ে উথালপাথাল হাওয়ার মত, ওদের দুজনের মনে অমনি দিকহারানোর হু হু সারা।

...ইয়াকুব শেখ ফাতিমাকে খুঁজছে, সারা বাড়িতে কোথাও তার পাত্তা মেলে না। ইয়াকুব বিস্মিত হয়েছে। ক'দিন থেকেই দেখছে ফাতিমার মুখচোখে একটা কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। আজ বৈকালেও সে পরিষ্কারভাবেই জানিয়েছে তার বিরক্তিটা। ইয়াকুব ঠিক বুঝতে পারে না ওকে। ওর কাছে ওই সম্মান-মর্যাদাই বড়। তার জন্য অনেকেই অনেক কিছু সহ্য করে থাকে। ফাতিমাও তাই ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে। কোথায় গেছে ঠাওর করতে পারে না।

হঠাৎ ফাতিমাকে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি ঢুকতে দেখে ইয়াকুব ওর দিকে চাইল। বেশ চড়াস্বরেই প্রশ্ন করে সে।

—কোথায় গিয়েছিলি আঁধারে?

চমকে ওঠে ফাতিমা। ওর বুক কেঁপে ওঠে অজানা ভয়ে। ওর গোপন অভিসারের কথা কি জানে ওই হৃদয়হীন বুড়ো মানুষটা? ফাতিমা সাবধান হয়েছে। সহজ-ভাবে জানাবার চেষ্টা করে।

মাতরম্‌' প্রসঙ্গেই লিখেছিলেন তাঁর 'সন্ধ্যা' নামক বিখ্যাত সান্ধ্য দৈনিকে—

'আমার-মন্ত্রে অরবিন্দ দেখিয়াছ কি? ভারত-মানস সরোবরের প্রস্ফুটিত শতদল! এ ফিরিঙ্গির আদাড়ে-পাদাড়ের বিলিতি ড্যাফোডিল নহে, নির্গন্ধ! শুধু রঙের বাহার! কেবল বর্ণবিলাস! দেবতার পূজায় লাগে না। প্রাণযজ্ঞে অনাবশ্যক। শুধু সাহেব-বিবির সাহেবিয়ানার আড়ম্বর! আমাদের অরবিন্দ জগৎদুর্লভ। হিম-শুভ্র বর্ণে সাত্ত্বিকতার নিবাস! বৃহৎ ও মহৎ। হৃদয়ের প্রসারতায় বৃহৎ! হিন্দুর স্বধর্ম মহিমায় মহৎ। এমন একটা গোটা ও খাঁটি মানুষ—এমন বজ্রের মত বহ্নিগর্ভ, আবার কমল-দলের ন্যায় কান্তকোমল, এমন জ্ঞানোজ্জ্বল, এমন ধ্যান-সমাহিত মানুষ তোমরা ত্রিভুবনে খুঁজিয়া পাইবে না।... ইনি ঋষি বঙ্কিমের ভবানন্দ, জীবানন্দ, শান্তানন্দ স্বামী।'

শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর স্বদেশবাসী নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছিল অথচ তিনি বাক-পটু ছিলেন না। তিনি সর্বদাই সমাহিত ভঙ্গীতে থাকতেন। এমন কি আলিপুরের মামলা চলা-কালেও তিনি কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে স্তব্ধ হয়ে যোগাসনে আরূঢ় হয়ে শান্ত ভঙ্গীতে বসে থাকতেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ শ্রীঅরবিন্দকে কিন্তু ঠিক চিনেছিলেন। দেশবন্ধুর জীবনে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে ঠিক কিভাবে যে যোগাযোগ ঘটে তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু দেশবন্ধু কোন অদৃশ্য শক্তিকে আদালতকক্ষ কম্পিত করে বলতে পেরেছিলেন যে শ্রীঅরবিন্দ হাইকোর্ট নয়—ইতিহাসের হাইকোর্টে আজ তিনি দণ্ডায়মান—

"Long after this controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he is dead and gone, he will be looked upon as a poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone his words will be echoed and re-echoed not only in India, but across distant Seas and lands..."

ইংরাজীতে যাকে বলে 'প্রফেটিক আটারেন্স' দেশবন্ধুর এই কথাগুলি তাই। ব্যারিস্টার সি আর দাশ কোন অদৃশ্যলোকে সর্বত্যাগী বীরকল্প হয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হয়েছিল সেই রহস্যের সন্ধান কে দিতে পারবে!

শ্রীঅরবিন্দ যে চিত্তরঞ্জনকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন তার প্রমাণ শ্রীঅরবিন্দকৃত দেশবন্ধুর 'সাগর সংগীতের' ইংরাজী অনুবাদ। দুঃখের বিষয় আজ আর পাওয়া যায় না।

শ্রীঅরবিন্দ দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হয়ে যখন আলীপুরের জেলে বন্দী ছিলেন তখন তাঁর সম্পাদিত 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। নীরদবরনের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ এই সময়ের কথা বলেছেন এবং নীরদবরণ তাঁর 'শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা' নামক মূল্যবান গ্রন্থটিতে এই ঐতিহাসিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন—

'আমাদের বন্দেমাতরমের আর্থিক অবস্থা ভয়ানক খারাপ ছিল। শুধু কয়েক বছর ধরে আমরা কাগজ চালিয়েছি। দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হয়ে যখন আলিপুরে জেলে বন্দী ছিলাম, আর্থিক দুরবস্থার জন্যে কাগজ চালানো দুঃসাধ্য দেখে তারা একটা লেখা বের করে, তাতেই কাগজ বন্ধ হয়ে যায়। পরে খালাসের পরে 'কর্মযোগিন' বের করি।'

'বন্দেমাতরম' থেকে 'কর্মযোগিন' এই ব্যবধানের মধ্যেই শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক চেতনার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। শেষবারে এই 'কর্মযোগিনের' সম্পাদনা ভার ভগিনী নিবেদিতার হাতে সমর্পণ করে তিনি গোপনে প্রথমে চন্দননগর ও পরে পণ্ডিচেরী যাত্রা করেন। এই কথাগুলি শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং নীরদবরণকে নিম্নলিখিতভাবে বলেছিলেন :

'সেবারও যখন নিবেদিতার কাছে আমার গ্রেপ্তারের গুজব শুনলাম, 'কর্মযোগিনে' 'প্রতি খোলা চিঠি' নামে একটি প্রবন্ধ লিখি, এবং গোপনে চন্দননগরে চলে যাই। সেখানে বন্ধুরা আমায় ফ্রান্সে পাঠাবার কথা ভাবছিল, আমি আদেশ শুনলাম—'পণ্ডিচেরী চলে যাও।'

বরোদার ডাক্তার শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য মণিলাল এই কথা শুনে প্রশ্ন করেছিলেন—'পণ্ডিচেরী কেন?' এবং সেই প্রশ্নের জবাবে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন—সে প্রশ্নের অবকাশ ছিল না, শ্রীকৃষ্ণের আদেশ! মানতেই হবে। পরে বুঝতে পেরেছি যে, আমার যোগের কাজের উদ্দেশ্যে এ আদেশ।'

শ্রীঅরবিন্দের নিজের উক্তিতেই তাঁর জীবনের এক অত্যাশ্চর্য অধ্যায়ের অতি সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।

আজ শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতবর্ষের আলোকে মনে এই প্রশ্ন জাগে যে শ্রীঅরবিন্দকে কি আমরা ঠিক ঠিক চিনেছি? 'উই হ্যাভ ইয়েট টু ডিসকভার হিম'। জন্মশতবর্ষের পুণ্য লগ্নে এই আমাদের ব্রত হোক।

—অভয়ঙ্কর

[উপন্যাস]

(এক)

কার্তিক মাস পড়তেই শীত কখন শত্রুপক্ষের গুপ্তচরের মত নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছে। বেলা ফুরিয়ে এলেই কেমন শিরশিরানি ভাব। সন্ধ্যার পরই ঠান্ডা জমেছে। আর রাত গভীর না হতেই হিমেল হাওয়া। ভোরবেলায় রীতিমত শীত করে।

স্টেশনটা মাইল চার দূরে। ঘড়ির দিকে একনজর তাকিয়ে বাণীব্রত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। প্রায় সাড়ে চারটে বাজল। আর গড়িমসি করা চলে না। দেরি করলে ট্রেন মিস হতে পারে। রাত্তিরে আর গাড়িও নেই। সমস্ত রাত স্টেশনের অন্ধকার ঘরে মশার কামড় খেয়ে কাটাতে হবে।

জোয়ান গোছের একটা লোক উঠোনে বসে আয়েস করে বিড়ি ফুঁকছিল। কাছেই ডালপালা ছড়ানো একটা পেয়ারা গাছের ছায়া। এদিকে সেদিকে আরো কিছু গাছগাছালি। একেবারে কোণের দিকে মস্ত এক ঘোড়ানিমের গাছ, কৌতূহলী প্রতিবেশীর মত বাড়িটার দিকে গলা বাড়িয়ে রয়েছে।

এবার বাড়িতে পা দিয়ে উঠোনটা দেখে বাণীব্রত চমকে উঠেছিলেন। বছর খানেকের মধ্যে কী দশা। যেন অতিকায় লোমওলা একটা বিশ্রী বনমানুষ। সমস্ত জায়গা জুড়ে প্রায় কোমর-সমান উঁচু ঘন জঙ্গল। বাণীব্রত নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আগাছার মূল নির্মূল করেছেন। অবশ্য আবার ধীরে...ধীরে ধীরে জন্মাবে। কিন্তু বেশী দিন। বনজঙ্গল ফের ভালো করে গজিয়ে উঠবার আগেই তিনি চলে আসছেন। তিন-চার মাসে আর কত বড় হবে? এবার তো তিনি সপরিবারে এখানেই থাকবেন।

বর্ষার জলহাওয়ায় শুধু গাছগাছালিই হয় নি। ঘরদোরেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। সাত-আট দিন ধরে ঘরের পিছনেই তিনি লেগেছেন। ঝাড়ামোছা, সাফসুতরো থেকে শুরু করে ঘরের কলি ফেরানো পর্যন্ত সব তার চোখের সামনেই হচ্ছে। বাড়িটা প্রায় বাসের অযোগ্য হয়েছিল। দেওয়ালের কোনে ঝুল, চটা-ওঠা মেজে। এখানে সেখানে সুড়ঙ্গের মত ইঁদুরের গর্ত। মেরামতি করতে তাই সময় লেগেছে। অবশ্য উপায় ছিল না। বাড়িটা সারিয়ে-সুরিয়ে পরিষ্কার করে তোলার জন্যই আসা। বেশ স্বাচ্ছন্দ, বাসোপযোগী না হলে চলবে না। এতোদিন কলকাতায় কাটিয়েছেন। প্রথম জীবনে পটলডাঙার একটা মেসে ছিলেন। মাসে একবার করে বাড়ি আসতেন। তার চেয়ে বেশী খরচে কুলিয়ে উঠতে পারতেন না। তখন মনোরমা থাকত এই পাড়াগাঁয়ে। কতোদিনকার কথা, প্রায় তিরিশ-বত্রিশ বছর হবে। বাণীব্রতর মনে পড়ল মাসের শেষের দিকে স্ত্রীর কাছ থেকে তিনি একখানা করে চিঠি পেতেন। ঈষৎ হেলানো লাইনের উপর হ্রস্ব-দীর্ঘ অক্ষর। নানা ভুল বানানে ভরা একটি গ্রাম্যবধূর পত্র। চিঠিতে অনেক কিছু লিখত মনোরমা। ঘর-সংসারের টুকিটাকি খবর....সংসারের এটা-ওটার জন্য ফরমাস। কোনো পত্রে এক কৌটো পাউডার, এক শিশি ভালো আলতা কিম্বা একটা শস্তা স্নো আনবার জন্য বিশেষ অনুরোধ থাকত। বাণীব্রতর মনে পড়ে মাসের শেষে স্ত্রীর হাতের লেখা সেই তুচ্ছ চিঠিখানার জন্য তিনি কতদিন মেসের লেটার বাক্সটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন। ফেলে-আসা দিনের কথা ভাবলে আজও পানের সুগন্ধী মশলার মতো মিষ্টি লাগে।

উঠোনে পা রেখে বাণীব্রত বাড়িটাকে ভালো করে দেখলেন। দোতলাটা নতুন, তার নিজের তৈরি। বছর তিনেক আগে ছাদের উপর তিনি দুখানা ঘর তুলেছেন। ইচ্ছে ছিল আলাদা করে নতুন একটা বাড়ি তুলবেন। কিন্তু পেরে ওঠেন নি। অত টাকা তার কোথায়? ছেলেমেয়েদের খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছেন। বড় মেয়েটির বিয়েও হয়েছে। তাতে এক কাঁড়ি অর্থব্যয়। এই দুখানা ঘর তুলতে প্রায় ছ-সাত হাজার টাকা বেরিয়ে গেছে।

ছেলেরা তার কাজে সায় দেয় নি। শুধু ছেলেরা কেন, মনোরমাও খুব বিরক্ত। এককালে গাঁয়ে থাকলে কি হবে, স্ত্রীর কথা শুনে মনে হয় না, সে কোনোকালে গ্রামে ছিল। মাসের পর মাস সেখানে কাটিয়েছে। গাঁয়ের কথা শুনলে মনোরমা এখন নাক সিঁটকোয়। বলে, 'বাব্‌বা। গ্রামের কথা আর বলো না। সন্ধ্যে না হতেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। এক প্রহর না হতেই যেন দুপুর রাত। চারদিকে নিঃসাড়, নিঝ্‌ঝুম। একটা অসুখ-বিসুখ করলে ডাক্তার-বদ্যির দেখা পাওয়া ভাগ্যের কথা।

স্ত্রীর কথা শুনে বাণীব্রত চটেন নি। বরং হেসেছেন। বেশ কয়েক বছর মনোরমা চন্দনপুরে যায় নি। যাবার উৎসাহও নেই। ইদানীং বাণীব্রত অফিসের একটা সেকশনের বড়বাবু হয়েছেন। তারও সব সময় ছুটি মেলে না। যখন ছুটি হয়, তখন মনোরমার গেলে চলে না। ছেলেদের পরীক্ষা, নয়তো মেয়ে জামাইয়ের আসার কথা, কিম্বা সংসারে কারো অসুখ-বিসুখ। নানা বাধা পাহাড়-প্রমাণ এক প্রাচীরের মত পথ আগলে দাঁড়ায়।

চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে এল। রিটায়ার করতে আর মাস তিনেক বাকি। বাণীব্রত তাই দিন দশেক ছুটি নিয়ে চন্দনপুরে এসেছিলেন। বসবাস না করলে ঘরদোরের যা অবস্থা হয়, বাড়িটার সেই দশা। আগে থেকে একটু মেরামতি না করে রাখলে হঠাৎ এসে আতান্তরে পড়তে হবে।

আসার সময় তিনি স্ত্রীকে সঙ্গে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মনোরমা অরাজি। চন্দনপুরে যাবার অনুরোধ শুনে সে নিরুৎসাহ হয়ে বলল, 'যেতে হয় তুমি যাও। আমাকে আবার কেন বাপু? তাছাড়া পুজোর বন্ধের পরই হিরুর পরীক্ষা। দুজনে মিলে গেলে ও কি আর পড়াশুনো করবে ভেবেছ?'

হিরু অর্থাৎ হিরণ বাণীব্রতর ছোট ছেলে। ষোল সতেরো বছর বয়স। এবার হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা দেবে। পুজোর বন্ধের পরই তার টেস্ট পরীক্ষা। অবশ্য পরীক্ষা হবে কিনা তার ঠিক নেই, খবরটা

—আজ্ঞে কথাটা আমিও শুনেছি।'

হীরালাল একটু হাসবার চেণ্টা করল। '[illegible] রিটায়ার করে আপনি নাকি [illegible] চলে যাচ্ছেন?'

'—হ্যাঁ, চন্দনপুর ছাড়া আর কোথায় [illegible]? কলকাতায় গেছলাম চাকরি [illegible]। পেটের জন্যে এতদিন থেকেছি। [illegible] সেখানে আমার কে আছে? বাড়ি-[illegible] করতে পারিনি।'

'—[illegible] ঠিক।' হীরালাল একটু চিন্তা [illegible] বলল, 'তবে এতদিন কলকাতায় [illegible] শহুরের মানুষ হয়ে গিয়েছেন। [illegible] গ্রামে ফিরে আপনার হয়তো [illegible] অসুবিধে হবে।'

'অসুবিধে কিছু হবে না।' বাণীব্রত [illegible] জানালেন, 'কেন অসুবিধে হবে [illegible]? আমি গ্রামের লোক নই? [illegible] বছর না হয় কলকাতায় আছি। [illegible] তার আগে পাঁচিশ-তিরিশ বছর তো [illegible] চন্দনপুরেই কাটালাম।'

হীরালাল কোনো জবাব দিল না। [illegible] বসে দাঁড়িয়ে রইল।

বাণীব্রত [illegible] দিকে তাকিয়ে [illegible], 'আমার বাবার একটা কথা শুনবে হীরালাল? উনি কি বলতেন জানো?'

'[illegible] বলতেন?' হীরালাল দাঁত বের [illegible]।

'[illegible] বলতেন, গাঁয়ে মাঠে সমান। [illegible] মায়ের মতন। [illegible] গেলে মাকে [illegible] জানি?'

[illegible] হীরালালের মনে [illegible]। সে [illegible] যা বলেছেন। বিপদে [illegible] লোকে যেমন করবে, [illegible] পাবেন? আর কলকাতার [illegible] এখন। কাগজে তো সব খবরই [illegible] বসেই আমাদের মনে ভয় ধরে। [illegible] ভেতরে সেঁধোয়। নিজেরাই [illegible] কলকাতার মানুষজন সব আছে [illegible] করে?'

বাণীব্রত হেসে বললেন, 'অতখানি ভয় পাবার মত কিছু নয়। গণ্ডগোল, হাঙ্গামা [illegible] লেগে আছে। কিন্তু তাই বলে [illegible] দরজা এঁটে কেউ বসে নেই। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, সিনেমা-থিয়েটার [illegible] সব চলছে। পথে-ঘাটে [illegible] করছে। কিছুই বন্ধ থাকছে না। তাছাড়া আমাদের পাড়াটাও মোটামুটি ভালো। [illegible] কাটাকাটি এখনও শুরু হয় নি।'

হীরালাল শুধোল, আপনার বাসাটা কোথায় যেন?'

—আমার বারিক লেনে। ঐ আমহার্স্ট স্ট্রীট থেকে বেরিয়েছে রাস্তাটা।' একটু [illegible] হেসে বাণীব্রত ফের বললেন, 'তুমি কিন্তু কলকাতায় গিয়ে একবারও বাসায় [illegible] নি।'

হীরালাল লজ্জিত হয়ে বলল, 'আজ্ঞে কলকাতা এক-আধবার যাই বটে, কিন্তু কাজের বোঝা মাথায় নিয়ে [illegible] সব সেরে [illegible] কোথাও যাবার ফুরসত পাই না।'

জোয়ান লোকটার নাম হারান। গোরুর গাড়িটা তার। স্টেশনে পোঁছে দেবে বলে ভাড়া খাটতে এসেছে। সে ব্যস্ত হয়ে বলল,—'আর দেরি করবেন নাই। হাই দেখুন, রোদ্দুর একেবারে আশ্বথ গাছের মগডালে। বেলা ডুবল বলে—'

অগত্যা বাণীব্রত গাড়িতে উঠে বসলেন। শীতের বেলা, রোদ্দুর আর নেই। বড় গাছের মগডালে, শিবমন্দিরের চুড়োয় ইস্কুল-বাড়িটার মাথায় এখনও এক চটকা রোদ্দুর লেগে আছে। গ্রাম্য পথ। অপরিসর রাস্তা। ধুলো উড়িয়ে একদল ছেলেমেয়ে কলরব করে কি যেন খেলছে। গোরুর গাড়ি আসছে দেখে তারা রাস্তা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। খানিকটা গেলেই একটু বাজার মতন জায়গা। তিন-চারটে ময়রার দোকান, ছোট একটা মাঠ। শনি-মঙ্গলবারে এখানে হাট বসে। গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে পথটা এবার এক প্রান্তরে গিয়ে পড়ল।

গাড়িতে বসেই বাণীব্রত বাড়িটা লক্ষ্য করছিলেন। আশেপাশে আর উঁচু বাড়ি নেই বলে দোতলাটা এখনও চোখে পড়ছে। দেওয়ালে ফিকে হলুদ রঙ.....কার্ণিশের একটু নীচে পর্যন্ত খয়েরী বর্ডার আছে। তাই আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। এবারও প্রায় হাজারখানেক টাকা খরচ হল। বাণীব্রত মনে মনে একবার হিসেবটা ঝালিয়ে নিলেন। বাঁকুড়া থেকে সিমেণ্ট আর রঙ আনতেই প্রায় আড়াইশ টাকা বেরিয়ে গেছে। তারপর ইঁট লেগেছে, চুন, বালি, দড়াদড়ি জোগাড়ের কাজে এটা সেটা আরো কত জিনিস প্রয়োজন হল। প্রতিটি বস্তুই তাকে পয়সা খরচ করে কিনতে হয়েছে। আর আজকাল যা দাম। জিনিসপত্রের দর [illegible] মাঝে-মধ্যে পয়সা দিলেও মেলে না।

বাণীব্রতর ফের বাবার কথা মনে পড়ল। সেকেলে মানুষ। কেউ ঘর করবে শুনলে বলতেন, 'তুমি এবার ঘোরে পড়লে হে। এ ঘোর এখন কাটবে না।'

কে শুধোত, ঘোর কিসের আজ্ঞে? ঘরের সঙ্গে ঘোরের কি সম্পর্ক?'

—ঘোর নয়? বাবা হেসে বলতেন, —ঘর মানেই তো ঘোর হে, বিষয় অর্থাৎ বিষ। ঘরের নেশা বড় পাজি নেশা হে। যতদিন না শেষ করছ, ততদিন তোমার ঘোর রইল, আবার শেষ হলেই যে ঘোর কাটবে তাও জোর করে বলতে পার না।'

গ্রাম অনেক পিছনে। সামনে গ্রামছাড়া রাঙামাটির পথ। এ অঞ্চলের চেহারাই এমনি। লাল মোরাম ছড়ানো মাটি। ডাঙা-ডহরে ভর্তি। নিকটে-দূরে ধানের ক্ষেত। গ্রামের ধারে মাঠের উপর ধোঁয়ার আস্তরণ। হাওয়া নেই বলে ধোঁয়াটা পুরু চাদরের মত ভাসছে। এক চুল নড়ে না।

বাণীব্রত ভাবছিলেন তিনিও কি ঘরের নেশায় পেলো? বাড়ির নেশা। তার বাবা

বলতেন ঘর নয়,......ও হল বিষম ঘোর' তারও কি ভয়ে ঘোরে কাটছে?

চন্দনপুরে আসার আগের রাত্তিরে মনোরমাও তাই বলছিল। পরদিন সকাল আটটায় ট্রেন। বাণীব্রত একটু তাড়াতাড়ি শুতে গেলেন। সারাদিন ট্রেন-জার্নির ধকল আছে, রাতে একটু সুনিদ্রা না হলে গা ম্যাজম্যাজ করবে। আজকাল বয়স হয়েছে। এতটুকু অনিয়ম সহ্য হয় না।

আড়াইখানা মোটে ঘর। ছোট ঘরটা ছোট ছেলের জন্য। সে রাত্তিরে শোয়, পড়াশুনো করে। সকাল-সন্ধ্যে বিন্তিও বই নিয়ে বসে। বাকি দুখানা ঘরের একটাতে মিলন আর কিরণ থাকে। অন্যটি বাণীব্রতর। ঘরে একটা পালঙ্ক আছে। তার উপর বিছানা। মনোরমা মেয়েকে নিয়ে মেঝেতে শোয়। আর একখানা খাট রাখবার জায়গা নেই। নইলে বাণীব্রত হয়তো আর একখানা খাট কিনতেন। মেঝেতে শুতে হয় বলে মনোরমার কি আক্ষেপ। বিন্তি মুখে কিছু বলে না বটে, কিন্তু রাত্তিরে শোবার সময় এমন ব্যাজার মুখে দাঁড়ায় যে তার অপ্রসন্ন ভাবটুকু সহজেই ধরা পড়ে।

কতক্ষণ চোখ বুজেছিলেন মনে নেই। আচমকা তার ঘুম ভেঙে গেল। ঘাড়ের কাছে চুলের মধ্যে অতি পরিচিত করস্পর্শ। বাণীব্রত বুঝতে পারলেন মনোরমা মেয়ের কাছ থেকে উঠে তার পাশে এসে বসেছে।

মুখ না ফিরিয়েই তিনি শুধোলেন, 'বিন্তি ঘুমিয়েছে?'

—'কি জানি বাপু।' মনোরমা ফিস ফিস করে বলল। 'মনে তো হয় ঘুমিয়েছে। বড় মেয়ে, যদি হঠাৎ জেগে ওঠে, আমাকে পাশে না দেখলে কি ভাববে বলো ত?'

—'কি ভাববে আবার?' বাণীব্রত একটু হেসে স্ত্রীর হাতটা চেপে ধরলেন। বললেন, 'শোও এখানে। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

—'এখানে শোব?' ঘুমন্ত মেয়ের দিকে তাকিয়ে মনোরমা একটু ইতস্তত করল।

—'শোবে না কেন?' বাণীব্রত ফের হাসলেন। উঁকি দিয়ে মেয়েকে একবার দেখে বললেন, 'বিন্তি এখন ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। ও উঠবে না।'

বালিশে মাথা রেখে শুতেই বাণীব্রত একটা হাত বাড়িয়ে স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলেন। মনোরামা দুর্বল গলায় বলল, 'আঃ ছাড়ো। রাত দুপুরে কি টানাটানি করো—'

ঘরে আবছা অন্ধকার তবু স্ত্রীর মুখখানা দেখতে পাচ্ছিলেন বাণীব্রত। মনোরমার বয়স হয়েছে,—তা প্রায় সাতচল্লিশ হবে। বাণীব্রতর চেয়ে আট বছরের ছোট। কিন্তু এই বয়সেও মনোরমার শরীরের আশ্চর্য বাঁধুনী। মুখখানা ঠিক লম্বাটে নয়, বরং ঈষৎ গোল। কিন্তু গায়ের রঙ যেন ফেটে পড়ছে। বিন্তি সুন্দরী ঠিকই। তবু বাণীব্রতর মনে হয় ওর বয়সে মনোরমার গড়ন, দেহশ্রী আরো সুন্দর ছিল।

—'আর একটা বাড়তি ঘর থাকলে কোনো চিন্তার ছিল না', মনোরমা আগের মতই ফিসফিস করে কথা কইল।

ছোট বাড়ি বলে স্ত্রীর মনে খেদ আছে। বাত-ব্যাধির মত ব্যথাটা প্রায়ই চাগিয়ে ওঠে। বাণীব্রতর সে কথা অজানা নয়। স্ত্রীর খেদোক্তি শুনলে বাণীব্রত তাই চুপ করে থাকেন। কোনো মন্তব্য করেন না।

কিন্তু আজ ব্যতিক্রম। বাণীব্রত তাড়াতাড়ি বললেন, 'ঘরের দুঃখ এবার তোমার ঘুচবে। চন্দনপুরের বাড়িতে ছখানা ঘর। জনে জনে একখানা করে ঘর নিলেও এক-আধটা ঘর বাড়তি থাকবে।'

—'রিটায়ার করে তুমি তাহলে চন্দনপুরেই যাবে?' মনোরমা শক্ত গলায় শুধোল।

—'না গিয়ে উপায় কি বলো? আর কলকাতায় থাকব কেমন করে? মাস গেলে আট'শ টাকা মাইনে পাচ্ছিলাম। রিটায়ার হলে পর একটি কানাকড়িও আসবে না। প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুইটির টাকা কটা সম্বল। তাই ভেঙে কদিন খাবো?'

—'তখন সংসার কি তোমায় চালাতে হবে?' মনোরমা সান্ত্বনা দেবার ঢঙে বলল। 'ছেলেরা বড় হয়েছে। এখন ঘর-সংসারের দায়িত্ব তাদের। তুমি যা পার দিও।'

মেয়েলি যুক্তি। বাণীব্রত তাই হেসে ফেললেন। বললেন, 'পাগল নাকি। ওরা চালাবে কেমন করে? ছেলেরা কি রোজগার-পাতি করে নিশ্চয় জানো। মিলনকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ালাম। আশা ছিল ও একটা ভালো চাকরি করবে, কিন্তু ওর কপাল। দুবছর বেকার হয়ে রইল, এখন যা চাকরি করে, তার মাইনে যাই হোক তবু সেটা ইঞ্জিনিয়ারের কাজ নয়।'

স্ত্রীকে নীরব দেখে বাণীব্রত ফের বললেন, 'আর কিরণের কথা বাদ দাও। ও বেচারি সবে ডাক্তারি পাশ করে হাউস-সার্জেন হয়েছে। শ'দেড়েক টাকার মত অ্যালাউন্স পায়। তাতে ওর নিজেরই চলে না। ঘর-সংসার দেখবে কেমন করে?'

তবু মনোরমা বলল, 'আস্তে আস্তে ওদের রোজগার বাড়বে। এর মধ্যে মিলন যে একটা ভালো চাকরি পাবে না, তাই কি তুমি বলতে পারো?'

—'কি জানি।' বাণীব্রত খুব হতাশ-ভঙ্গি করলেন। 'যদি পায় তো ভালই। কিন্তু এই অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করে আমি কলকাতায় থাকতে পারি না।'

—'তা পারবে কেন?' মনোরমা রুদ্ধকণ্ঠে জানাল। 'চন্দনপুরে গেলেই তোমার যত সাশ্রয় হবে। সেখানে খরচপত্তর নেই, জিনিসপত্র সব বিনিপয়সায় মিলবে।'

বাণীব্রত কোনো কথা বললেন না। স্ত্রীকে তিনি ভালো করে চেনেন। মনোরমা ভীষণ সেন্টিমেন্টাল। চন্দনপুরে যাওয়ার পক্ষে যত অকাট্য যুক্তিই থাক না কেন, কোনোটাই এখন তার মনে ধরবে না।

স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে মনোরমা উঠে বসল। বলল, 'সব মিছে কথা, খরচপত্র চালাতে পারবে না বলে তুমি চন্দনপুরে যাচ্ছ, এই কথা আমাদের বিশ্বাস করতে বলো? সেখানে বুঝি সংসারের পিছনে টাকা গুনতে হবে না? আসলে ওই বাড়ি তোমার নেশা। আর সেই টানে তুমি ছুটে চলেছ।'

—'নেশা? কি বলছ তুমি?' বাণীব্রত ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন।

—'নেশা নয় তো কি? নইলে এদিকে টাকা নেই বলছ, অথচ বাড়ি সারাবার বেলায় কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা বেরোয় কেমন করে?'

নীচে বিছানায় শুয়ে বিন্তি উসখুস করছিল। বাণীব্রত তাই চুপ করে গেলেন। মনোরমার জিভকে বিশ্বাস নেই। রাত-দুপুরে চেঁচামেচি, কলহ শুনে মেয়েটা কি ভাববে—।

•

খুব ভোরে ট্রেন এসে হাওড়া স্টেশনে ঢুকল। তখনও প্রায় অন্ধকার, ভালো করে আলো ফোটে নি। কলরব করে কয়েকটা কাক একসঙ্গে ডেকে উঠল। আকাশের বুকে একটি দুটি তারা স্পষ্ট না হলেও এখনও চোখে পড়ে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে বাণীব্রত একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসলেন। অত ভোরে পথ-ঘাট বেশ ফাঁকা। গাড়ি প্রায় পাখির মত উড়ে চলল।

অমিয় বারিক লেনের কাছে আসতেই বাণীব্রত চমকে উঠলেন। গলির মুখেই একটা পুলিশের গাড়ি। জন দশ-বারো রাইফেলধারী পুলিশ সদর্পে ঘোরাফেরা করছে। তার ট্যাক্সিটা গলিতে ঢুকতেই একজন সার্জেন্ট এগিয়ে এসে শুধোল,—'কোথায় যাবেন আপনি?'

বাণীব্রত ব্যাপারটা ঠিক আঁচ করতে না পেরে আমতা আমতা করে বললেন, —ইয়ে, আমার বাড়ি যাব। মানে সাতাশ নম্বর অমিয় বারিক লেন।'

গাড়িটার ভিতরে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে সার্জেন্ট তাকে যাবার অনুমতি দিল।

(ক্রমশঃ)

বহুদিন অবধি 'বেস্ট সেলার' এবং শীর্ষস্থান পেয়েছে।

কিন্তু এমন অসংখ্য হাউসেও আমার কথা কিংবা বিশ্বাসের যোগ্য পারিতোষিক আমার বর্ণাঢ্য জীবনবিধাতা জোগাননি। আমার সর্বপ্রথম দক্ষিণা ছিল মোটা অঙ্কেরই। কিন্তু প্রযোজকবৃন্দ প্রচুর লাভ করেও ২১ হাজার টাকা থেকে আমার বাকির কয়েকশো প্রয়োজন ত্যাগ করতে পারেননি। এমন একটা উজ্জ্বল মুহূর্তে প্রযোজকদের এহেন আচরণে বিরক্তির তিক্ততা মনকে একেবারেই স্পর্শ করেনি একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। বিশেষ করে আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত বিদেশ যাবার ঠিক আগেই এই ঘটনা আমায় বেশ খানিকটা বিচলিত করেছিল। তবে একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, বিদেশে আকাঙ্ক্ষিত ছবিটির সর্বাঙ্গীন সাফল্যের আনন্দ সংবাদ এ দুঃখকে অনেকখানিই ভুলিয়ে দিতে পেরেছিল।

যাইহোক সময় ও বয়সের ব্যবধানে এ কথা আমি ভুলে গেছি, এবং তাঁদের সঙ্গে আমার মোটামুটি প্রীতির সম্পর্কই বজায় আছে।

এ ছবিতেই প্রথম অশোককুমারের সংস্পর্শে এলাম। শিল্পী হিসাবে উনি অত্যন্ত কো-অপারেটিং। মানুষ হিসাবে ওঁর মার্জিত কিন্তু বড় বেশী কায়দাদুরস্ত—যাকে বলে স্মার্ট—বাংলাদেশের নায়কদের মত অনাড়ম্বর ও আত্মীয়তাপ্রবণ নন। অনেক পরে বোম্বাইতে অবশ্য অশোককুমারের [illegible] সঙ্গে আমার ও আমার স্বামীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়, এবং তারপর সস্ত্রীক কোলকাতায় এসে দু-একবার আমাদের আতিথ্য গ্রহণও তিনি করেছেন। এ দূরত্ব বোধ তখন অনেকটাই অপসারিত হয়ে গেছে; এবং আজও আমাদের মধ্যে সৌহার্দ্য সম্পর্কই আছে।

এরপর 'গীতাঞ্জলি' নিবেদিত এবং অপূর্ব মিত্র পরিচালিত '[illegible]'—সবদিক থেকেই একেবারে ব্যর্থ ছবি। এ ছবি ১৯৫৭ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর প্যারাডাইসে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। কিছু অর্থপ্রাপ্তি ছাড়া এ ছবির সম্বন্ধে কোনো উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা নেই।

'চন্দ্রশেখর' ও '[illegible]'র কাজ শেষ হবার অব্যবহিত পরই ১৯৫৭ সালের ৬ই আগস্ট আমি বিদেশযাত্রা করি। উদ্দেশ্য—ওখানের সিনেমা, স্টুডিও তথা চলচ্চিত্র জগৎ দেখা। ভাল করে জ্ঞান হওয়ার দিন থেকে যে চিত্রলোকে আমার প্রবেশ—তার অগ্রগতির চূড়ান্ত বিকাশ যে পাশ্চাত্যেই ঘটেছে। দেখবার আকাঙ্ক্ষা আমার বরাবরই ছিল প্রবল। এখন অবসরও খানিকটা পাওয়া গেল এবং আর্থিক অবস্থাও অনুকূল। তাই সুযোগ পাওয়া মাত্রই সাগরপারে পাড়ি দিলাম।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে মায় তুলাদা ও রাণীদির (প্রশান্ত মহলানবীশ ও রাণী মহলানবীশ) কথা। আমার বিদেশ ভ্রমণের আনন্দস্মৃতির অনেকখানিই জুড়ে আছেন এই স্নেহপ্রবণ বিদগ্ধ দম্পতি। রাণীদি ওখানে আগে থেকেই ছিলেন অপেক্ষা করছিলেন তুলাদার যাওয়ার। আর ঠিক এই সময় উনিও যাচ্ছিলেন। এই যোগাযোগই আমার পক্ষে অত্যন্ত শুভলাভ হয়ে দাঁড়ালো। তুলাদার সঙ্গে স্বল্পকালীন সফরের সময়ই তাঁর উদার ও মুক্ত মনের স্নেহস্পর্শ একঝলক হাওয়ার মতই আমার বাড়ালদের হৃদয়কে যেন জুড়িয়ে দিয়েছিল। জীবনে কতশত লোকেরই তো সংস্পর্শে আসি। প্রত্যেকের কাছেই কিছু-না-কিছু পাই। কিন্তু আলোর পরশ পাই শুধু তাঁদেরই কাছে যাঁরা নিজেদের অন্তরাত্মার আলো দিয়ে আমাদের জীবনের আলো-ছায়ার লীলাকে উদ্ভাসিত করে দিয়ে যান।

প্রশান্তদা জ্ঞানী, গুণী, সাধক, বৈজ্ঞানিক শুধু না দার্শনিকও। আর এসবেরই সমন্বিত ছিল তাঁর নির্লিপ্ত অকুতোভয়, মধুর ব্যক্তিত্ব যা কোনো সামাজিক সীমার মধ্যে হৃদয়ের অপরিমিত ঐশ্বর্যকে গণ্ডীবদ্ধ করে রাখেনি। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় আত্মীয়তার সূত্রেই। কিন্তু এই উপলক্ষে গড়ে ওঠা উভয়ের মধ্যে শ্রদ্ধা ও স্নেহের নিবিড় বন্ধন অটুট ছিল শেষাবধি যখন এই আত্মীয়তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। আর এইখানেই ছিল তাঁর মহত্ত্ব।

আত্মীয়স্বজনের প্রতি মানুষের স্নেহ ভালবাসাকে বড় জোর বলা যায় স্বাভাবিক কারণ এখানে সকল সম্পর্কের দায়-দায়িত্ব সহজ কারণেই স্বতঃপ্রবৃত্ত। কিন্তু আত্মীয় সম্পর্কের বাইরেও মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসার মধ্যে তার হৃদয়ের গৌরব সূচিত হয়—কারণ এখানে মানুষ স্রষ্টা। তুলাদা আমার জীবনে এমনই এক আলোক-স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে, যাঁর স্নেহসজল হৃদয়ের সান্নিধ্যে এসে পেয়েছি অনেক। এই অভিজ্ঞতাকেই কবির ভাষায় বলা যায় 'অপরূপকে দেখে গেলাম দুটি নয়ন মেলে।'

মনে পড়ে, ওদেশে থাকার সময় খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপর ছিল ওঁর সজাগ দৃষ্টি। হলিউড দেখতে যাব। কে নিয়ে যাবে সেখানে যেন কোনো অসুবিধা না হয়। অসুস্থ হয়ে পড়েছি। ওদেশে হাসপাতালের সুব্যবস্থা নার্স সবই কল্পতরুর মত অনায়াসলভ্য। তবু এসব খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপর তুলাদার মায়ের মত বাৎসল্যভরা ব্যবস্থাপনা আজও যেন ভোলা যায় না। রাণীদি তাঁরই সুযোগ্যা সহধর্মিণী।

কালের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে অনেক ভাঙাগড়ার বিবর্তন চলেছে। কিন্তু আগেই বলেছি তুলাদার সঙ্গে নিবিড় স্নেহ সম্পর্কের মর্যাদা তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। যেখানেই যেতেন আমার জন্য টুকিটাকি কত কিছু নিয়ে আসতেন। কিউরিওর ওপর আমার চিরকালের ঝোঁক। যেখানেই পেতেন রকমারী কিউরিও কেনাটা অজানতেই যেন আমার কাজের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠেছে। তুলাদা একথা জানতেন—তাই মনে করে দেশ-দেশান্তর থেকে কতরকম কিউরিও যে আমার জন্য সংগ্রহ করে এনেছেন। একবার ওঁর হাত থেকে একটা কিউরিও নেবার সময় হঠাৎ মনে পড়ে যায় আমার সেই ছোটবেলাকার মেলা থেকে মা আমার জন্য একটি বেতের চুবড়িতে করে খেলাঘরের রান্নাবাটি, পুতুল এনে দিয়েছিলেন। তখনও ঠিক এমনই খুশী হয়েছিলাম।

আজ একই বছরে মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে মা ও তুলাদাকে হারিয়ে মনে হচ্ছে আমায় স্নেহ করবার মানুষগুলিকে বিধাতা যেন একে একে সরিয়ে নিচ্ছেন।

এই ট্যুরেই লণ্ডন, কায়রো, ইটালী, প্যারিস, সুইজারল্যাণ্ড, নিউইয়র্ক, হলিউড, কানাডা, মেক্সিকো, ওয়াশিংটন, শিকাগো, লস্ এ্যাঞ্জেলস, আরও নানান দেশ বেড়ালাম। সমস্ত দৃশ্য দেখার চেয়ে স্টুডিওগুলো দেখার ওপরই জোর দিয়েছি বেশী।

এই সময়েই একদিন গিয়েছিলাম এম জি এম স্টুডিও দেখতে। ৬০০ একর জমির ওপর দাঁড়িয়ে সে যেন আলাদা এক জগৎ। পনের-ষোল দিন ধরে দেখেও শেষ করতে পারিনি। না দেখলে কল্পনাও করা যায় না কি বিরাট সেখানকার কাণ্ডকারখানা। প্রবেশদ্বারের সামনেটা কতকটা আমাদের রাজভবনের মতন। আগে থেকে অনুমতি নিয়ে প্রবেশপত্র সংগ্রহ না করলে সেখানে প্রবেশের অধিকার মেলে না। গেটের সামনে প্রবেশপত্র চেক করে নিয়ে ব্যবস্থাপকমণ্ডলী আগে ফোন করে জেনে নেন—কোন ফ্লোর খালি আছে, কোন ফ্লোরে কাজ চলছে। তারপর 'গাইড' সঙ্গে দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়ার পালা।

বিরাট বিরাট আর বিরাট। সবই সেখানে বিরাট। কত হাজার বছর আগের জগৎ তার সমস্ত চমক বিভ্রান্তি নিয়ে যেন সেখানে অপেক্ষা করছে।

একটা বিভাগে গিয়ে মনে হোলো যেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফিরে গেছি। কত পুরোনো মডেলের হাজার হাজার গাড়ী। ঘোড়ার গাড়ী থেকে সুরু করে মোটরগাড়ী সৃষ্টি হওয়ার বিভিন্ন পর্যায়, পরিবর্তন ও আধুনিক মডেলের গাড়ীতে রূপান্তরিত হওয়ার ইতিহাস যেন একনজরেই চোখে পড়ে।

এ বিভাগের সঙ্গেই পাশাপাশি আর এক চত্বরে রাখা আমলের গাড়ীর সাজানো মডেল। গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গতি, প্রকৃতি ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিও উপভোগ করবার মতই।

পরের বিভাগে গিয়ে তো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবার যোগাড়। লোমহর্ষক জঙ্গল—ঝোপঝাড়, বন জঙ্গল, যেন আস্ত সুন্দরবনটাই তুলে আনা হয়েছে। এই জঙ্গলের মধ্যে বাঘ-ভালুক তাদের পরিবার-বর্গ নিয়ে রীতিমত পুরুষানুক্রমে ঘরকন্না করতে পারে। জঙ্গল সংক্রান্ত বিরাট সেটও অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দেখবার মতই।

তুমি আর আমি : কানন দেবী এবং মিহির ভট্টাচার্য

তারপরই বাগান। সেখানে নানা রং-বেরঙের মস্ত অর্কিড। পৃথিবীর কোনো দেশের এমন কোনো ফুল নেই যা সেখানে দেখা যায় না। দুচোখ ভরে—এ বাগান দেখছিলাম আর ভাবছিলাম স্বর্গলোকের নন্দনকানন কি এর চেয়েও মনোহর?

স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের দেখাবার এবং শেখাবার জন্য মস্তবড় শিক্ষায়তন রয়েছে। তাঁরা স্টুডিও দেখে এ সম্বন্ধে—আলোচনার ক্লাস অ্যাটেন্ড করে যাচ্ছে সেখানে বসেই পড়াশোনা, খেলাধুলো করতে পারেন—তারও সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

মেক-আপ রুম দেখে তো অবাক বনে যেতে হয়। যে কোনো মানুষ সে যত কুৎসিতই হোক না কেন এখানের অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মেক-আপের কল্যাণে ক্ষণিকের জন্যও যেন রূপসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে আগেকার দিনে মুনি-ঋষিদের একটি বরে—সুন্দর অবয়বে রূপান্তরিত হওয়ার মতই।

পুরুষ ও মেয়েদের আলাদা পোশাকের ঘরে কত রকমারী ছাঁদের ও রঙের পরিধেয়। সম্রাট সম্রাজ্ঞী, রাজা-রাণী থেকে সুরু করে ভিখারিণীবেশ ধারণের অজস্র সজ্জাপ্রকরণ। মন্ত্রবলে যেন একনিমেষে ইতিহাসের যে কোনো পাতায় ফিরে যাওয়া যায়।

পথ বেঁধে দিল চিত্রের একটি দৃশ্য

টেকনিশিয়ানস রয়েছে কত রকমের সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি, 'মিউজিক টেক' ঘরে সে কি অপূর্ব সুরের মায়াজাল। আর সংগীত গ্রহণের কি বিস্ময়কর ব্যবস্থা।

শিল্পীদের বিশ্রামাগার, ভোজনকক্ষ, সুইমিং পুল, লাইব্রেরী, খেলার মাঠ—কি কি যে নেই, আর কি অপর্যাপ্তভাবে।

একটা ঘরে শুধু গল্প পড়ে শোনাবার জন্যই লোক মোতায়েন আছে, —পালা করে তারা প্রযোজক, পরিচালক ও শিল্পীদের গল্প পড়েই শুনিয়ে যাচ্ছে। সারা স্টুডিওতে যেন, শিক্ষাকেন্দ্র ও রিসার্চের আবহাওয়া। বিরাট টেলিফোন একসচেঞ্জ ত ছিলই আর তখনকার দিনেই ৭৫ জন

পুলিশ সেই আজবদেশের ট্রাফিক কন্ট্রোল করছে (এখন জানি না তাদের সংখ্যা কত)।

ওয়ার্ণার ব্রাদার্স আর কে ও রেডিওর এগুলো অবশ্য অত ডিটেলসে দেখতে পারিনি। তবে ওখানেও যে প্রকাণ্ড ব্যাপার চলছে তারই একটা আন্দাজ নিয়ে আসতে পেরেছিলাম। মেক্সিকোতে ছবির মত ছোট্ট খাটো, পরিচ্ছন্ন স্টুডিওটি গীতি-কবিতার মতই সুন্দর।

স্থানাভাবে হলিউডের পুরো ছবি দিতে পারলাম না। কয়েকটি আঁচড়ে সামগ্রিক ধারণার একটু ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছি মাত্র কারণ সুদক্ষ চিত্রকর আমি নই।

ওদেশের স্টুডিও দেখে যে সত্যটি উপলব্ধি করেছিলাম সেটি হচ্ছে এই যে, সৃষ্টি ব্যাপারটা হলো প্রকৃতির বিকাশ। সৃষ্টি কি? না, প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু অপ্রকাশ আছে তাকে প্রকাশ করবার, যা কিছু অব্যক্ত আছে তাকে ব্যক্ত করবার, যা কিছু অমূর্ত আছে তাকে মূর্ত করে তোলবার একটা অফুরন্ত প্রচেষ্টা। এই ক্রোড়কে এরা এড়িয়ে যায়নি—উপরন্তু সৃষ্টির নেশায় মেতে যথার্থকে আহ্বান করেছে। তাই বুঝি ওদের কমের উদ্দীপনার অন্ত নেই। অন্ত নেই জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষের রহস্যভেদ করবার সন্ধানে, অক্লান্ত উদ্যমের।

ওদেশের স্টুডিও ও টেকনিশিয়ানস্‌ গুলোর সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের দেশের স্টুডিও গুলোকে তাদের ঘর বললেও কিছু মাত্র অত্যুক্তি হয় না। তবে শুধুমাত্র শিল্পী, পরিচালক ও টেকনিশিয়ানদের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা প্রতিভা ও শিল্পের প্রতি ভালবাসার জোরেই যা সৃষ্টি হয়েছে তাকে কোনো দেশের রসিক সমাজই অপসৃষ্টি বলে তাচ্ছিল্য করতে পারবেন না। যদি তাঁরা আমাদের দেশের স্বল্প সরঞ্জামের পরিপ্রেক্ষিতে এইসব ছবিকে বিচার করে দেখেন তবে অবাকই হবেন। তাই ত ওদেশের স্টুডিও মহলের বিরাট কাণ্ডকারখানা দেখে বিস্মিত হলেও এটি টুকু ভেবেই মনটা খুশি হয়ে উঠেছিলো যে এতরকম সুযোগ-সুবিধা পেলে আমাদের

অনুরাধা চিত্রে কানু ব্যানার্জি, জহর গাঙ্গুলী এবং কানন দেবী

দেশের চলচ্চিত্রশিল্প কোনো অংশে অন্য দেশের পিছনে ত থাকতই না বরং ভাবের মহত্ত্বে ধ্যানের গভীরতায়, কল্পনার ঐশ্বর্যে সকল দেশের সেরা হয়ে উঠতে পারত।

এই টুরেই একাধারে ভিভিয়েন লে, হেপবার্ন গ্যারেন্স, স্পেন্সার ট্রেসি, অ্যাডল্ফ মেঞ্জো, ক্যাথারিন হেপবার্ন, মিরনা লয়, রবার্ট ইয়ং, রবার্ট রিয়ন প্রমুখ তখনকার দিনের শীর্ষস্থানীয় শিল্পনায়কদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটেছিল। ওঁদের সুবিখ্যাত চিত্রসাংবাদিক ও সমালোচক H. H. Wollenburge -এর সঙ্গেও আলাপ হোলো।

ওঁদের অমায়িক, সহজ ব্যবহারও আপন করে নেওয়ার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলেও মনে বেশী দাগ কেটেছেন ভিভিয়েন লে। তাঁর সুটিং-এর অবসরে একসঙ্গে লাঞ্চ খেয়েছি গল্প করেছি, আর সামান্য পরিচয়েই স্পর্শ পেয়েছি তাঁর প্রাচ্যমুখী গভীর মনটির। ভিভিয়েন একবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাই ভারত সম্বন্ধে তাঁর নানান জিজ্ঞাসার যেন অন্ত ছিল না। চেহারার মধ্যেও কোথায় যেন ছিল ভারতের ধ্যানমুখীনতার অতল রহস্য। রূপের অসামান্য ঔজ্জ্বল্যকে গভীরায়িত করেছিল তাঁর দীর্ঘপক্ষ দুটি কালো চোখের নিবিড় ইসারা।

আমাদের দেশের স্টুডিও সম্বন্ধে উনি অনেক কথা জানতে চাইলে আমি সলজ্জে বললাম, 'তোমাদের যেরকম সব ব্যাপার দেখছি আমাদের স্টুডিও মহল সম্বন্ধে তোমায় বলার বা জানানোর বিশেষ কিছু নেই। সেসব ছেলেখেলার কাহিনী শুনলে তোমাদের হাসি পাবে।' উনি সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত দুটি টেনে নিয়ে বলেছিলেন 'এরজন্য এত কুণ্ঠা কিসের? ভারতবর্ষ শিল্পে, কাব্যে, গানে সকলের উর্ধ্বে। আর এত উর্ধমুখী আকুতি নিয়ে যে দেশের শিল্পী জন্মায় বাইরের বাধা তাদের বেশীদিন দাবিয়ে রাখতে পারে না।'

ভোজনের শেষে ওদের fruit pudding -এর প্রশংসা করতে না করতেই উনি সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা কমপ্লিমেন্ট দিলেন 'কিন্তু তোমাদের দেশের পিঠে পায়েসের কাছে এ পুডিং দাঁড়াতে পারে? ওদেশের পায়েসের সেই চালের সুঘ্রাণ আজও ভুলতে পারিনি।'

মাত্র কয়েকটি কথাতেই তাঁর সংবেদনশীল অন্তর, ভারতের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিনয়-নম্র মনটিকে বড় আপনার মনে হয়েছিল। আর কোন এক অদৃশ্য গ্রন্থি নিয়ে মনটা তাঁর সঙ্গে কোথায় যেন গাঁটছড়া বেঁধেছিল। আর বোধকরি সেই-জন্যেই মাত্র কয়েক বছর আগে ভিভিয়েনের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে মনটা এমন হয়েছিল।

(চলবে)

অনুলিখন—অন্ধ্যা সেন

অবলুপ্ত জনপদ ঝাড়খণ্ড

বিনয় মাহাতো

...রে পেরিয়ে আরও পশ্চিমদিকে ...গেলে দেখা যাবে গাঙ্গেয় সমভূমির ...পর্শ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। ... যাচ্ছে। গাঙ্গেয় সমভূমির ...ঃ কৃষ্ণমৃত্তিকার পরিবর্তে মাটির ... ক্রমশঃ রক্তিম হচ্ছে। আর যে ...টি সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ছে ...পরিপাটির নারকেল সুপারী গাছের ... মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ...ী শাল পিয়াশাল এবং মহুয়ার ...বণ। ঝাড়গ্রাম অঞ্চল থেকে এই ...দের সূচনা। ঝাড়গ্রাম (মল্লভূম), ...ধলভূম, মানভূম, রাঁচি, হাজারিবাগ, ... পরগণা, পালামৌ থেকে আরম্ভ ...উত্তর-পশ্চিমে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া ... অঞ্চল, বর্নাবিষ্ণুপুরের রাজা, ...পুরের শালবনি, গড়বেতা ... এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে দাঁতন, ... ভঞ্জভূম, এদিকে বীরভূমের ...সীমানা পর্যন্ত এলাকা জুড়ে ...রয়েছে এই আরণ্যক পরিবেশ। ...ক ঝাড়গ্রামই হল সমতলভূমির ...ম। এরপর চাকুলিয়া থেকেই আরম্ভ ...অরণ্যআবৃত ছোটনাগপুরের পার্বত্য ... কিছুকাল আগে পর্যন্ত এই অরণ্য ...মভূম, ধলভূম, মানভূম, সিংভূম, ...ন, বাঘমুণ্ডি, চিয়াড়া, পাড়ুই, ...ম সামন্তভূম (সাঁওতালভূম), শিখর-...টি পরগণায় বিভক্ত ছিল। কিন্তু ...ভাবে এই অঞ্চলের নাম ছিল ...। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে ...ই অঞ্চলই নয় 'সমগ্র ছোটনাগপুরেই ...ড়খণ্ড নামে পরিচিত ছিল,' ...ম জেলা গেজেটিয়ার-১৯১১-পৃষ্ঠা-... এই বিস্তৃত জনপদের নাম কে কবে ...ত রেখেছিলেন তার বিস্তৃত ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত, তবে ঝাড়খণ্ড নাম-...করণ যে এই আরণ্যক পরিবেশ সে ...সন্দেহের অবকাশ নেই। ১৯১৭ ...র রাঁচি জেলা গেজেটিয়ারে এ-... বলা হয়েছে,—ঝাড়খণ্ড নামকরণ ...বোঝা যায় সমগ্র ছোটনাগপুরে অঞ্চল গভীর অরণ্যে আবৃত ছিল, এবং ...হ এই অরণ্যে ছিল শালগাছেরই —অন্যান্য গাছ একেবারে ছিল না ...কথা অবশ্য বলা যায় না। এই অঞ্চলের যে সমস্ত জায়গায় ইদানীং গ্রাম ও শহর গড়ে উঠেছে, সেই সমস্ত অঞ্চলেও যে একদা গভীর অরণ্য ছিল এবং জঙ্গল কেটেই এই সমস্ত অঞ্চলে গ্রাম ও জনপদ গড়ে উঠেছে, তা এই অঞ্চলের গ্রামসমূহের নামগুলি পর্যালোচনা করলে সহজেই প্রতীয়মান হয়ে উঠবে। উদাহরণস্বরূপে কয়েকটি গ্রামের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন : ঝাড়গ্রাম, শালবনি, মহুলবনি, কেঁদবনি, কুড়চিবনি, আসনবনি, জামবনি, ঝাঁটিবনি, আগুইবনি, ধনকাটি, আমডিহা, নিমডিহা, বেলতলা, ডালকাটি, হাতিয়াশোল, বাঘরুশোল, ভালুকমাচা, ভালকিবাঁধা, ন্যাকড়াখাঁধ, শিয়ালা, খেঁকিডি (খেঁকি—খ্যাঁকশিয়াল, ডি—ডিহি-গ্রাম=খেঁকিডি) প্রভৃতি। গ্রামগুলির এই ধরনের নামকরণ সম্পর্কে নিশ্চয় বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। তাছাড়াও এই গ্রামসমূহের দেবস্থানগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখা যাবে এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিরাটকায় বৃক্ষসমূহ। প্রাচীন বিশ্বাস দেবস্থানের বৃক্ষচ্ছেদন পাপ। কারণ এই সমস্ত বৃক্ষেই দেবতা আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই লৌকিক বিশ্বাসের ফলেই এই অঞ্চলের দেবস্থানগুলির বৃক্ষসমূহ কুঠারের আঘাত থেকে নিজেদের রক্ষা করেছে এবং সেই সঙ্গে অদ্যাবধি বহন করে চলেছে এই অঞ্চলের আরণ্যক প্রকৃতির পরিচয়।

এখন এই অঞ্চলের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। ইতিহাসের কোন পর্বে এই ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে মানুষ প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল তার সঠিক বিবরণ আমাদের জানা না থাকলেও, এই অঞ্চলের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত নেই। ঝাড়গ্রাম, ধলভূম, এবং মানভূম অঞ্চলের গভীর অরণ্যে আজও ছড়িয়ে আছে প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন। সুবর্ণরেখার তীরে দুলৌম গ্রামে আজও ছড়িয়ে আছে প্রাচীন এক নগরীর ধ্বংসাবশেষ। ঝাড়গ্রাম মহকুমার সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত টিপু কিয়ারচাঁদ গ্রামের অগণিত প্রস্তরস্তম্ভ, পিতলকাঠি-গ্রামের-জয়চণ্ডীর মন্দির, কিংবা গুপ্তমণির থান আজও বহন করে চলেছে আর্যেতর সভ্যতার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর। বাঁকুড়া জেলার পনআসুরিয়া গ্রামে পাওয়া গেছে প্রস্তর যুগের কুঠার এবং ফলক। অনুরূপ কুঠার এবং ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে ধলভূম এবং মানভূমেও। ঝাড়গ্রামের নিকটবর্তী লালগড়ে পাওয়া গেছে নব্যপ্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র। তাম্রনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে বিনপুর থানার তামাজুড়ি গ্রামে। গত ২২শে আগস্ট ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদ, 'সম্প্রতি কংসাবতীর কাছে হুড়া (পুরুলিয়া) থানার এক পাথুরে বনাঞ্চলে খনন কার্যের ফলে তিনটি তাম্রনির্মিত কুঠার এবং লাঙলের ফলার মত একটি নিদর্শন পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধি-কর্তা জানাচ্ছেন, বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ভারততত্ত্ববিদদের ধারণায় এই নিদর্শনগুলি তিন চার হাজার বছর আগের তাম্রযুগ সভ্যতার।

কুঠারগুলির এক-একটির ওজন প্রায় আড়াই কিলোগ্রাম। দৈর্ঘ্য ২০ থেকে ২১·৫ সেন্টিমিটার। বিশেষজ্ঞদের ধারণায় এই তাম্রনির্মিত স্ব-স্কন্ধ কুঠার ব্যবহৃত হয়েছে ভারতীয় আর্য ও ইরানীয়দের আদি-পুরুষদের দ্বারা, কিংবা নিষাদ, পুলিন্দ অথবা শবর প্রভৃতি প্রাক আর্যগণের মৃগয়া-ভিত্তিক জীবনযাত্রার সময়। লাঙলের ফলার মত নিদর্শনটি লম্বায় ৪৫·৫ সেন্টিমিটার। এটি সম্ভবতঃ ভূমিকর্ষণের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। এই শ্রেণীর কুঠার মধ্যভারত ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় আবিষ্কৃত তাম্রনির্মিত স্ব-স্কন্ধ কুঠারের সমপর্যায়ভুক্ত।'

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে এই অঞ্চলের ভূমিকে বলেছেন পুরাভূমি,—'রাজমহলের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া এই পুরাভূমি সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজমহল, সাঁওতাল-ভূম, মানভূম, সিংহভূম, ধলভূমের পূর্বাংশেরী মালভূমি এই পুরাভূমির অন্তর্গত; তাহারই পূর্বদিকে ঘেঁষিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশের উচ্চতর গৈরিকভূমি, ইহাও সদ্যোক্ত পুরাভূমির অন্তর্গত। মালভূমি অংশ একান্তই পার্বত্য, বনময়, অজলা এবং অনুর্বর। এখনো এই অংশে গভীর শালবন, পার্বত্য আকর, কয়লার খনি এবং ইহা সাধারণতঃ অনুর্বর। প্রাচীন উত্তর রাঢ়ের অনেকখানি অংশ, দক্ষিণ রাঢ়ের পশ্চিমাংশ, এবং তাম্রলিপ্ত রাজ্যের কিয়দংশ পশ্চিমাংশ এই মালভূমি এবং উচ্চতর গৈরিক ভূমির অন্তর্গত। দক্ষিণ রাঢ়ের রাণীগঞ্জ, আসান-সোলের পার্বত্য অঞ্চল, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চল, বর্নাবিষ্ণুপুর রাজ্য, মেদিনী-পুরের শালবনি, ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর, সমস্তই এই পুরাভূমির অংশ। এইসব পার্বত্য গৈরিক অঞ্চল ভেদ করিয়াই ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী, কাঁসাই (কাঁসাই) প্রভৃতি নদনদী সমতলভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে। এখনো ইহাদের জলস্রোত পার্বত্য লালমাটি বহন করিয়া আনে।'

...ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ড অংশে রাঢ়ী-

খণ্ড জাঙ্গাল নামে এক দেশের উল্লেখ আছে। বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বর, নীরজ্বা ও অজয়নদ এই দেশের অন্তর্গত। ইহার তিন ভাগ জংগল, এক ভাগ গ্রাম ও জনপদ, অধিকাংশ ভূমি উষর, স্বল্পমাত্র ভূমি উর্বর। এখানে কোথাও কোথাও লৌহ আকর আছে।......একাদশ শতকে রাজা হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ভট্টভবদেবও রাঢ় দেশের অজলা জংগলময় প্রদেশের উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন এই রাঢ়ীখণ্ড জংগলই যে আমাদের আলোচ্য জনপদ ঝাড়খণ্ড সে কথা আর নিশ্চয় প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

এই রাঢ়ীখণ্ড জাংগল ঠিক কোন সময়ে ঝাড়খণ্ড নাম পরিগ্রহ করেছিল তার বিস্তৃত ইতিহাস আজও আমাদের অজ্ঞাত। ঝাড়খণ্ড শব্দটির প্রথম প্রয়োগ সম্ভবতঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে। মথুরা যাওয়ার প্রাক্‌কালে মহাপ্রভু কিছুকালের জন্য ঝারিখণ্ডে অবস্থান করেছিলেন,—

প্রসিদ্ধ পথছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা॥
নির্জন বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণনাম লইয়া।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া॥
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন॥
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জংগম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥
যেই গ্রাম দিয়া যান যাহা করেন স্থিতি।
সেই সব গ্রামের লোকের হয় প্রেমভক্তি॥
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড।
ভিল্লপ্রায় লোক তাহা পরম পাষণ্ড॥

সমসাময়িককালে রচিত আকবর ইনামগারের উপাখ্যানেও ঝাড়খণ্ডের উল্লেখ আছে। সম্রাট শেরশাহ বিশেষ [illegible] হাতী ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য ঝাড়খণ্ডের রাজার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছিলেন। হাতীটির নাম ছিল শ্যামচন্দ্র। এই শ্যামচন্দ্র কখনো মাথার উপর দিয়ে ধূলো ছিটোত না। এই হাতীটি ছিনিয়ে নিতে পেরে শেরশাহের বিশ্বাস জন্মেছিল যে, তিনি একদা দিল্লীর সম্রাট হতে পারবেন।

মুসলমান শাসনের প্রথম যুগে 'ঝাড়খণ্ড' অঞ্চলের হীরকের আকর্ষণে বিহারের শাসনকর্তাগণ এই অঞ্চল আক্রমণ করে রাজাদের কাছ থেকে হীরক আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে যে হীরক পাওয়া যেত তার সমর্থন ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের হ্যামিলটনের হিন্দুস্থান গেজেটিয়ারেও রয়েছে। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত কোকড়ার মধু রায় এবং লক্ষ্মী রায় সৈন্য সাহায্য করে উড়িষ্যা বিজয়ে মানসিংহকে সাহায্য করেছিলেন। এর দু-বছর পরে মানসিংহ এই ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়েই মেদিনীপুরে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক বেগলার এই ঝাড়খণ্ডকে একটি জেলারূপে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ঝাড়খণ্ড নামে পৃথক কোন জেলার অস্তিত্ব অন্য কোথাও স্বীকৃত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

এই ঝাড়খণ্ড ছিল সর্বদা অশান্ত সীমান্ত প্রদেশ। একপ্রান্তে বাংলাদেশ, অপরপ্রান্তে বিহার এবং উড়িষ্যা। মধ্যবর্তী-স্থান ঝাড়খণ্ড। এই অঞ্চলে বসবাস করতেন অনার্যেতর শ্রেণীর মানুষ। তাঁদের মধ্যে এমন একটা সহজ বিদ্রোহের ভাব এবং দাসত্ববিরোধী চরিত্র ছিল যে তাঁদের বশে রাখতে সব সময় তৈরী থাকতে হত। তাদের এই দাসত্ববিরোধী বিদ্রোহীর পরিচয় পরবর্তীকালেও লুপ্ত হয়ে যায় নি। বিভিন্ন সময়ের বিটিশবিরোধী স্বাধীনতাসংগ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে তার উদাহরণ স্বাক্ষর; সাঁওতালবিদ্রোহ, কোল্‌বিদ্রোহ, চুয়াড়বিদ্রোহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অনার্যেতর সম্প্রদায়ের এই সব মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাঁরা ডাকাতির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন, সর্প ভক্ষণ করতেন, নানাপ্রকার উত্তেজক পানীয় গ্রহণ করতেন এবং বিভিন্ন গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করতেন।

জৈনদের ধর্মগ্রন্থ আচারাংগসূত্রেও এই অঞ্চলের অধিবাসীদের রূঢ় আচরণের কথা উল্লিখিত হয়েছে। মহাবীরের প্রতি কুকুর লেলিয়ে দিতেও এঁরা কুণ্ঠিত হননি। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অসংস্কৃত আচরণের কথা পরবর্তীকালের গ্রন্থেও মুকুন্দরাম বলেছেন,—

অক্ষটি হিংসকরাড় চৌদিকে
কৃতাঞ্জলি বীর কহে হইগো
লোকে না পরশ করে সভে
ঘনরামেরও রাঢ়ের মানুষের
প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল না।

"জাতি রাঢ় আমিরে
করম রাউত।"

প্রভৃতি উক্তি তারই প্রমাণ। কেউ কারও এই অঞ্চলের মানুষকে বলে বর্ণনা করেছেন। এই অঞ্চল আচারব্যবহার এত প্রমাণ মনের সন্দেহ ঘোচে না। সম্পাদক থেকে আরম্ভ করে ঘনরাম, এমনকি কৃষ্ণদাস সবাই ছিলেন উক্ত সম্প্রদায় মুকুন্দরাম, ঘনরাম তো সেকালের ব্রাহ্মণেরা অনার্যেতর মানুষকে কি চোখে দেখতেন পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ছিলেন নিম্নবর্ণের মানুষ সঙ্গে তাঁর পরিচয় সাধারণ ক্ষেত্রে স্বল্প পর্যবেক্ষণের নয়। আর তাঁরা যদি তবে মহাপ্রভুর প্রভাবেও চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটত না ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এই অঞ্চলের নাম সাঁওতালদের সম্পর্কের বলা যেতে পারে। ব্রাহ্মণেরা দের অস্পৃশ্য মনে করেন তেমনি ব্রাহ্মণদের শত্রু জলাবধি কোন সাঁওতাল ব্রাহ্মণের পর্যন্ত স্পর্শ করেন না। রাঢ়ের ব্রাহ্মণেরা যে দাম্ভিক ছিলেন তাহার একটু প্রমাণ কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধ চন্দ্রোদয় দ্বিতীয় অঙ্কে। কৃষ্ণ মিশ্র ব্রাহ্মণ ব্যংগই করেছেন। অহংকারের চিত্র তিনি আঁকিয়েছেন তাহা উপভোগ্য। জন্মদেশ জনপদ এবং পিতার এবং নিজের অহংকার ব্রাহ্মণ অহংকার করিয়া বলিতেছেন নাস্মাকং জননী তথোজ্জ্বল

সম্ভোত্রিয়া

বংশে কাচন কন্যকা খলু ময়া
তেনাস্মি

অস্মাচ্ছ্যালক ভাগিনেয়
দুহিতা মিথ্যাভি
তৎ সম্পর্কবশাদ্‌ময়া প্রেয়সী
ব্রাহ্মণ অহংকারের আত্মশ্লাঘার
সত্যি উপভোগ্য।"

ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের বহু 'বামুনমারা'। বিভিন্ন গ্রামের এক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের অধিবাসীদের পারস্পরিক চিত্র আমাদের চোখের সামনে তার থেকে বলা যায় ব্রাহ্মণ এই অঞ্চলের মানুষ সম্পর্কে বিশেষ থাকা একান্তই স্বাভাবিক।

দুঃখে সুখে বাঁচা

নিখিলচন্দ্র সরকার

(ছয়)

[illegible] আসছে। অনীশের মনে [illegible] এই শীতের মধ্যে ওদের [illegible] আছে। ইস্, অনেকটা [illegible] আজ! মার কথা ভেবে মন কষ্ট বোধ করেছে, ঠাণ্ডায় মা [illegible] পারে না, নানান রকমের [illegible] মাথা ঝিম ঝিম করে, [illegible] আরো [illegible] ওদের জন্যে সকাল সকাল [illegible] বসে থাকতে হয় খাবার নিয়ে, [illegible] খেতে পারবে না ভেবে [illegible] সব সময়ই মা যেন [illegible] দিয়ে জড়িয়ে [illegible] মার সবক্ষণের [illegible] চোখের জল মোছে। ওর [illegible] কিছুতে মন বসাতে [illegible] না।

ফিরে এসে বুঝেছে, ব্যাপারটা আগে [illegible] ঠিক করা, সাজানো। শুধু তার [illegible] এটা গোপন রাখা হয়েছিল। মা তো [illegible] এমন কি মানুও জানত সব। [illegible] এতটুকুও বুঝতে দেয় নি, আবার [illegible] অতসীদি ধরে রেখেছে! মহা [illegible] হয়ে গেছে মানুটা! হয়তো [illegible] এ নিয়ে তার সঙ্গে মজা করতে [illegible] অথবা এমনও হতে পারে, আগে [illegible] জানালে যদি সে রাজী না হয়! [illegible] মামার নাম করে ডেকে নিয়ে গেছে [illegible] এই ছলনাটুকু ভালই লেগেছে [illegible]। ওর কথা শুনে মা একটু অবাক [illegible] জিজ্ঞেস করেছিল, 'সে কিরে, তুই [illegible] না?'

'কি করে জানবো, কেউ তো বলে নি।'

'[illegible] তোর সঙ্গে মজা করেছে অতসী।' [illegible] দেবী কি মনে করে হাসলেন [illegible]।

[illegible] তবু যে মাকে এত রাত অবধি [illegible] খাবার নিয়ে বসে থাকতে হয়নি। [illegible] করে যে আগেই মাকে বলে গেছে [illegible]। [illegible] কি ভেবে হাসল একটু। [illegible] এসেই মানু গায়ের চাদরটা রেখে [illegible] ঢুকে পড়েছে। মানু ঘুমিয়ে পড়েছিল, মানুর ঠাণ্ডা হাত লাগায় ওর ঘুম ভেঙে গেল। একটু বিরক্তি দেখিয়ে আবার পাশ ফিরে শুয়েছে ও। মাও গিয়ে একসময় ওদের পাশে শুয়ে পড়ল। বেশ রাত হয়েছে। ঘুলঘুলি দিয়ে বাইরের জ্যোৎস্না আবছাভাবে ঘরে পড়েছে।

অনীশ কলঘরে গিয়ে হাতে পায়ে জল দিয়ে ঘরে এলো। মাফলার চাদরটা বিছানার একপাশে রেখে দিয়ে একটু জল খেল। তারপর বাতিটা নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। আবছা আলো ঘরের মধ্যে এক রহস্যের ছায়া ফেলেছে। অনীশের ঘুম আসছে না। অতসীর কথাই তার মনে পড়ছিল বারবার। অতসীকে আজ একটু অন্যরকম দেখাচ্ছিল। আজকের এই সম্ভাষণে ওকে যেন আরো ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ মনে হলো। প্রথম দেখার পর থেকেই কি অনীশ মনে মনে ওর জন্যে কোন দুর্বলতা একটু একটু করে সঞ্চয় করেছিল? অতসীরও কি প্রশ্রয় ছিল এতে? মনটা উল্টেপাল্টে দেখতে গিয়ে ওর ধারণা হলো, প্রথম থেকেই অতসীর জন্যে ও একধরনের মায়া ও সহানুভূতি বোধ করেছে। ভীষণ রকম অবাকও হয়েছিল অনীশ। ওই মুখের সঙ্গে আরো একজনের মুখের মিল ছিল খুব। বুকের ভেতরটা যেন মুহূর্তে কিরকম করে উঠেছিল! সংসারে এমন মিলও থাকে! সহসা একটা ঝড় বয়ে যাওয়ার অবস্থা। পার্থক্য শুধু একটুখানি ওর মুখে করুণ মলিন এক ছায়া ছিল। ওর মতন দুঃখী বুঝি সংসারে আর দুটি নেই। কিন্তু আজ অতসীর মধ্যে অন্য এক রূপ দেখেছে অনীশ, সেখানে কোন মলিন ছায়া নেই, খুশিতে ঝলমল। মোটামুটি সবই শুনেছে সে। সত্যিই মেয়েটা বড় দুঃখী। খুব অল্প সময়ে ও বাবাকে হারিয়েছে। একজন মানুষের অভাব যে সংসারে সমস্ত সময় কত বড় বিপর্যয় নিয়ে আসে ও [illegible] অতসীর মতন আর কেউ জানে না। অনীশ নিজেও তো বাবাকে হারিয়েছে, এখনও বাবার কথা তার মনে পড়ে, মা তো এই শোক আজ পর্যন্তও কাটিয়ে উঠতে পারছে না। এমন নয়, তাদের নাবালক অসহায় অবস্থায় রেখে বাবা চলে গেছেন! তখন তারা দাঁড়িয়ে গেছে। অনীশ চাকরি করছে, দীপেন্দু মানু পড়াশুনো নিয়ে আছে। সানুর বিয়ে হয়ে গেছে। ছাত্র হিসেবে দীপেন্দু খুব প্রমিজিং। সুতরাং তার বাবা এমন একটা অবস্থায় রেখে গেছেন যে তাঁর অবর্তমানে ওরা ডুব জলে পড়েনি। তবু বাবার কথা মনে হলে মন খারাপ হয়ে যায়। মাথার ওপর এতদিন নির্ভর করার মতন নিশ্চিন্ত একটা ছায়া ছিল, আজ আর তা রইল না, যাবতীয় ভাবনা, কর্তব্য অকর্তব্য সব এখন তার ওপর এসে পড়েছে। অতসীর হয়তো তার বাবার কথা কিছু মনে নেই। থাকবার কথাও নয়। ওর বাবা বড় অসময়ে চলে গেছেন। আর সেই মুহূর্তেই যেন এক সমস্ত বড় দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে ওদের ওপর। সকলের কাছেই কেমন অনাদৃত, বাড়তি ঝামেলা হয়ে দাঁড়ালো। ওর বাবা ওদের সব সুখ শান্তি আনন্দ সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেছেন! ওর দুঃখের কথা শুনতে শুনতে অনীশ গভীর এক কষ্ট বোধ করেছে। অতসী ভেজা ভেজা গলায় বলেছিল, 'জানেন, এক রাঙামামা ছাড়া আর কারো কাছে আমরা এতটুকু স্নেহ ভালবাসা পাই নি। এমনিতেই আমাদের দেখতে পারত না মামারা, তার ওপর আমার অসুখ হলো, মার মুখ দিয়ে রক্ত পড়েছে, অশান্তি ঝামেলা আরো বেড়েছে।' অতসীর বলা [illegible] কষ্ট হয়েছে, [illegible] এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় মুখখানা মলিন হয়ে উঠেছে।

অনীশ সান্ত্বনা দেওয়ার মতন করে গাঢ় মমতামাখা গলায় বলেছে, 'দুঃখ মানুষের চিরকাল থাকে না, দিন রাত্রির মতন পালা করে আসে, কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি, এর মধ্যে দিয়ে আমরা অনেক কিছু শিখে নিই।'

অতসীর চোখ সজল হয়ে এসেছে, থেমে থেমে বলেছিল, 'তার জন্যে যে অনেক মূল্য দিতে হয়।'

'তা হয়, কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো আর একে ঠেকাতে পারি না. বরং মেনে নিলেই কষ্টের অনেক লাঘব।'

'আমরা এরপর সইবারও ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলাম। আর প্যারছিলাম না!'

'এখন আর সেকথা কেন?'

অনীশের মনে হয়েছে, অতসী এখন অনেক স্বাভাবিক, সুস্থ। দুঃখের নেখস্না ভাবটা দেখতে দেখতে শুকিয়ে গেছে। সব সংসারের একটা ভারী বোঝা নামিয়ে যেন হালকা, স্বস্তিবোধ করছে অতসী।

অনীশ ঘুমোতে পারছে না। সেই আবছা অন্ধকারের মধ্যে সে চেয়ে চেয়ে অনেক কিছু ভাবছিল। খালি ছটফট করছে। লেপটা গা থেকে সরিয়ে রাখল, সামান্য শীত শীত করছিল তার। কি মনে করে লেপটা টেনে নিল আবার। মনের মধ্যে কিসের এক অস্থিরতা যেন। সে নিজেও তো কম দুঃখ পায় নি! বাবা মারা গেছেন, সব দায়দায়িত্ব এসে তার ওপর পড়েছে। মায়ের মুখের দিকে তাকালে কষ্ট হয়। দীপেন্দু জেলে, শেষ পর্যন্ত কি হবে জানে না। এসব ছাড়াও আরো গভীর এক দুঃখ সে গোপনে লালন করেছে বহুদিন। অতসীর দুঃখের যে অভিজ্ঞতা, অনীশের তা নয়, তবু একটা জায়গায় দুজনের মিল আছে। এই সংসারে, খুব অল্পবয়সেই দুজনকে দুঃখ মাথা পেতে নিতে হয়েছে। আর এই অভিজ্ঞতা আছে বলেই তো জীবনকে অনেকটা স্বচ্ছভাবে, খোলা চোখে দেখতে পারে আজকাল। হয়তো সব মানুষেরই কোন না কোন সময়ে এই অভিজ্ঞতা হয়, কেউ বোধ করি এর থেকে সরে থাকতে পারে না, সম্ভবও নয় বোধ। যা মানুষের অনিবার্য পাওনা, তখন সেটা আগে পাওয়াই একদিক থেকে সুবিধে। অভিজ্ঞতাই শেষ পর্যন্ত মানুষকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। জীবনকে যে খুব কাছে থেকে দেখেছে, তার পক্ষেই জীবনের রহস্য বোঝা অনেক সহজ। অতসী একভাবে বুঝেছে, অনীশ অন্যভাবে।

একটা সময় ছিল, যখন সে সব কিছুকেই ভাসা ভাসা ভাবে দেখেছে, ওপর ওপর বিচার করেছে, মানুষের মুখের কথাকে বড় বেশি মূল্য দিত। এই বিশ্বাস তার ধীরে ধীরে নষ্ট হয়েছে, বুঝেছে, মানুষের বাইরেটাকে সব সময় পুরো দাম দিতে নেই, দিলে ঠকতে হয়, সেও ঠকেছে, দুঃখ পেয়েছে। আগে খুব সহজেই যা বিশ্বাস করত সে, এখন চট করে তা পারে না। প্রতিমা যেন তার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেছে, সব এত সোজা সরল নয়। অনীশও বুঝেছে, তার দেখার মধ্যে ত্রুটি ছিল। অথচ প্রতিমাকে সে এমনভাবে ভাবতে চায় নি। কে জানে, সব দোষ হয়ত ওরও ছিল না।

ওরা একই ওস্তাদের কাছে তখন গান শিখছে। প্রতিমা দেখতে শুনতে ভালই। প্রথম নজরেই চোখে পড়ার মতন মেয়ে। ওর মুখের সঙ্গে যে অতসীর মুখের এতটা মিল থাকবে ভাবাই যায় না। প্রতিমার চোখের তলায় নাকের কাছে একটা বড় তিল ছিল, অতসীর নেই। অমিল হয়ত আরো অনেক বিষয়ে! অনীশ এখনও সব জানে না।

প্রতিমার গলা সুরেলা। ও গ্রে স্ট্রীট শোভাবাজারের মুখটায় থাকে। প্রতিমাদের অবস্থা ভাল, অধিকাংশ দিনই গাড়ি করে যাওয়া-আসা করে ও। ওর বাবার বড়-বাজারে লোহার কারবার আছে, মাঝে মাঝে অবশ্য গাড়ি আসে না, প্রতিমাই আসতে বারণ করে দেয়। অনেকদিন অনীশকেও তুলে এনেছে গাড়িতে, ওকে বাড়ির কাছে নামিয়ে দিয়ে প্রতিমা বাড়ি গেছে। অনীশ অস্বস্তি বোধ করেছে, প্রতিমাকে তখন বড় অচেনা অচেনা লাগত।

ওস্তাদের বয়েস হয়েছে। তিনি বেনারসে থাকেন। বছরে ছ সাত মাস বাড়ি থাকেন। গেল বছর দেশে গিয়ে অসুখে ভুগেছেন বেশ ক' মাস। আর হয়ত বেশিদিন আসতে পারবেন না।

অনীশ বলেছে, 'এবার দেশে গেলে ওস্তাদ সাহেব হয়ত আর ফিরবেনই না।' 'শরীরটা ওনার খুব ভেঙে পড়েছে।'

'ওস্তাদের মতন এমন মানুষ হয় না! দেখলে এখন বড় কষ্ট হয়।'

'আমি তো সময় পেলেই চলে আসি।' প্রতিমা হাসতে হাসতে বলেছিল, 'তুমিও তো চলে আসতে পার!'

'কি আসবো, কিছুই তো হচ্ছে না আমার। সেদিন দেখলে তো ওস্তাদ সবার সামনেই কেমন ধমক দিল আমায়।'

'ঠিক করেছেন, আমি হলেও তাই করতাম।' প্রতিমা বড় বড় চোখ করে হেসে উঠেছিল. 'তোমার মতন গলা পেলে দেখতে, এতদিনে কি করতাম আমি। তোমার গলাটা যেন ভগবান এই ঘরানার জন্যেই সৃষ্টি করেছিলেন।'

'তুমিও কম যাও না!'

'তোমাকে না আমার ভীষণ হিংসে হয়!' প্রতিমা খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।

অনীশ একটু উদাসীন গলায় বলেছিল, 'আমার বোধহয় কিছু হবে টবে না।'

'হয়েছে, আর অহঙ্কার করতে হবে না।' সামান্য গম্ভীর দেখাচ্ছিল যেন ওকে. আস্তে আস্তে কেমন আবেশমাখা চোখে অনীশকে দেখতে দেখতে বলেছিল, 'কি হয়েছে তোমার বল তো, আজ কদিন ধরেই তোমাকে একটু অন্যরকম দেখছি!'

'কি হবে, কিছুই নয়।'

'আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে তোমার।'

'সত্যি বলছি, কিছু হয়নি।'

'ঠিক আছে, আমায় বলবে না তো; আর বলবেই বা কেন, আমি তো তোমার কেউ নই।' অভিমানে ঠোঁট কাঁপছিল প্রতিমার।

অনীশ একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল, পরে বিষন্ন গলায় বলেছিল, 'অমন করে বলো না!' দাঁত ... আনতে আনতে অস্ফুটে আবার ... 'উল্টোটা প্রতিমা, উল্টোটা, বরং ... কেউ নই তোমার।' অনীশের ... এসেছিল।

'এই তুমি আমায় বুঝলে!'

অনীশ কোন কথা বলতে পারেনি ... মুহূর্তে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে ... দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'তুমি ... ধরেছো, মনটা আজ কদিন ধরে ... খারাপ আমার। আমার দ্বারা আর ... গান শেখা হবে না।'

'কেন?' প্রতিমা যেন চমকে উঠ...

'ডাক্তারের নিষেধ।' একটু সময় ... করে থেকে ফের বলেছিল সে, 'একটু ... রেওয়াজ করলেই বুকের অসহ্য যন্ত্র... গলাও ব্যথা ব্যথা করে।'

'কদিন একটু রেওয়াজ কম ক... পার।'

'কমই তো করি, ... ওস্তাদের কাছে ধমক খাই।' ... অনীশ ওর মুখের দিকে চেয়ে ... একটু হাসল, হাসতে হাসতেই ... 'এবার নিশ্চয়ই আমাকে আর হিংসে ... না!'

প্রতিমা চোখ তুলেছিল, কে... নিতে পারছিল না। চোখ ফেটে ... করে জল গড়িয়ে পড়েছিল। ... নিজেকে সামলে নিয়ে একসময় ব... 'আমি বলছি, উনি সেরে উঠবে... অত ভেবো না তো!'

'এটা যদি শুধু শরীরের জন্যেই ... তবে আমিও অত ভাবতাম না; অ... নানান ঝামেলা!' একটু নীরব থেকে ... বলেছিল, 'এসব গান-বাজনার ... পরিবেশ চাই, পরিবেশ না হলে কি ... না।' কথা বলতে বলতে ও কি যে... ছিল, তারপর স্বগতোক্তির গলায় ব... 'বাড়ির লোকের সঙ্গে এই নিয়ে ... রোজ রোজ খিটিমিটি, আর ভা... না!'

'এর মধ্যেও তো এতখানি এগি...'

'এগিয়েই তো বুঝতে পারা... যাওয়া যাবে না, এ পথটা আমা... নয়।'

প্রতিমা পলকহীন চোখে ... দেখেছিল ওকে, তারপর ধীরে ... জিগ্যেস করেছিল, 'ওস্তাদ জানেন ... ছেড়ে দিচ্ছ?'

'না, এখনও বলিনি কিছু, সাহ... না।'

'বলনি ভালই করেছো, শুনলে ... দুঃখ পাবেন তিনি।'

'আমিও তো কম কষ্ট পা... এজন্যে!'

'শুধু তুমিই, আর কেউ নয়?' ... আস্তে আস্তে আবেগভরা ... না ... আবার তাকিয়েছিল ওর দিকে, দীর্ঘশ্বাস পড়ল, শাড়ির আঁচল ... আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলেছিল, 'এসব যা বলছিলাম, উনি তো আর ... দিন পরেই দেশে ফিরে যাচ্ছেন।'

...কিন্তু হাঁটবো, এই ভিড়টিড়
...হবে না এখন।'
...আর রাগ দেখাতে হবে না, ...তোমার সঙ্গে হাঁটবো।' চলতে ...এর একটা হাত ধ'রে আস্তে করে ...প্রতিমা।
...তো?'
...চ্ছে আজ নতুন হাঁটছি তোমার

...চেয়ে একটা যেমন করে দাও না ...সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চলে আসবে ...গলায় যেন ঈষৎ উপহাস
...
...কি আমার?'
...নি বুঝে না অত; খালি মনে ...এ কষ্ট করার কোন মানে নেই।' ...নই, তবু এক জিনিস কি রোজ ...মাঝে মাঝে মুখ পাল্টাতে ...আমারও তাই।'
...বাড়ির লোক জানতে পারলে ...জেনেই দেখছি।'
...কি হচ্ছে, জানার এখনও বাকি ...
...এই সেই ঝিরঝির বৃষ্টির ভেতর ...একটা রেস্টুরেন্টে ...দেওয়া কেবিনে বসে ...কথা বলেছে, একসময় অভি- ...ফেলেছিল প্রতিমা ভাঙা ভাঙা ...তোমার সঙ্গে এই মেলা- ...বাড়ির লোকের পছন্দ নয়; ...আমাদের দেখে ফেলেছে। ...দেখেছে বাড়ি এসে ...একটা সময় বাবার থেকে আরো ...নিয়ে বলেছিল 'আমায় ভুল ...এর চাইতেও কষ্ট সইতে ...বলতে বলতে অনীশের ...প্রতিমা। অনীশও ...এক আবেগ বোধ করছিল সে ...হাত ধরে ...বাড়ির কাছাকাছি এসে অনীশ ...এই ভেজাটা আজ ঠিক হলো ...দেখ, জ্বর না আসে আবার।'
...জন্যেই তো! কি ভেবে আবার ...দেখবে, আমি একদিন ঠিক ...সেদিন সবারই শান্তি, আমি আর ...সইতে পারছি না।'
অনীশ প্রায় চীৎকার করে উঠে- ...আর এসব বলবে না ...না।'
...বলবো না।'
...মধ্যেই কেমন একটা গোঙানির ...বুকের ভেতরটা যেন যন্ত্রণায় ...হচ্ছে। অনীশের অন্যমনস্কতা ...দেখা গেল তার দু'চোখে জল। ...ডাল, জমি, টিলা তরুলতা ...জ্যোৎস্নার মধ্যে রহস্যের ছায়া ...সবকিছু ঝাপসা দেখাচ্ছিল। ...নিজ গায়ে। জ্বরের ...অনেক গাঢ় হয়েছে। কানদুটো ...উঠেছে। অনীশ উঠে ...পায়চারি করল বারান্দায়।

একবার উঠোনে নেমে পড়েছিল, ভীষণ কনকনে ঠান্ডা। কানের তাপটা মুহূর্তে কমে গেল। এই একটু সময়ের মধ্যেই পা দুটো তার ভিজে গেল যেন। টুপটুপ করে হিমের ফোঁটা পড়ছিল গাছের পাতা থেকে। শব্দের মধ্যে ছন্দ ছিল। আবার উঠে এলো। চেয়ারে এসে বসেছে অনীশ। বুকটায় থেকে থেকে ব্যথা। কিসের এই যন্ত্রণা মাঝে মাঝে নিজেও ভুলে যায় সে। যৌবনের সেই উচ্ছল দিন-গুলি প্রতিমাকে নিয়েই কেটেছিল তার। সব আশা উৎসাহ স্বপ্ন ওকে ঘিরেই। দুঃখ সইবার পাঠও ওর কাছ থেকেই নিয়েছে অনীশ। প্রতিমা শেষপর্যন্ত ওর কথা রাখতে পারল না, অনীশের স্বপ্নও একদিন মিথ্যে হয়ে গেল। সে ঠিকই বলেছিল, শেষ খেলাটা তাহলে প্রতিমার হাতেই ছিল, হাততালি নিয়ে ও চলে গেছে। বাঃ, বারে সার্কাসের শেষের খেলোয়াড়! সব শুনে ভেঙে পড়েছিল সে। এও কি কখনো সম্ভব? সব বিশ্বাস যে কেবলই এলোমেলো হয়ে যায়। নিছক কতগুলো বানানো কথা দিনের পর দিন তাকে শুনিয়েছে প্রতিমা? হৃদয়ের কোন ব্যাপারই ছিল না ওর মধ্যে? না, আজো যেন অবিশ্বাস করতে পারে না সে। আবার বিশ্বাস করা ছাড়া বা আর কি আছে? শেষে এমন একটা নিষ্ঠুর কাজ কেন করল প্রতিমা? কি করে ও করল? বিজনের কথা প্রায়ই প্রতিমা ওর কাছে বলত, ওদের বাড়ি আসে, দূর সম্পর্কের আত্মীয় হয়। ও নাকি প্রতিমাকে অনেক কিছু বলেছে। প্রতিমা বিজনের সব কথা তাকে বলে নি, ওকে অপছন্দ করার কথাটা অনেকবার বলেছে। ওর বাবা মা নাকি বিজনকে খুব ভালবাসে। অনীশ কোনদিনও ওকে দেখে নি, তবে মাঝে মাঝে কেন যেন ঈর্ষা বোধ করেছে। অথচ বিজনের সঙ্গেই প্রতিমার বিয়ে হলো! হায়রে! ছেলেমানুষের মতন লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছিল সে। এই আঘাত সামলে উঠতে অনেক সময় লেগেছিল অনীশের। এরপর আর একদিনও সে ওস্তাদের কাছে গান শিখতে যায় নি; ওস্তাদও একদিন তাঁর দেশে ফিরে গেছেন। সে দিনগুলো যেন কী দুঃস্বপ্নে ভরা! থেকে থেকে কত কথাই না তার মনে পড়েছে। প্রতিমা না দম্ভ করে বলতো, 'আমার যা কিছু দেখছো, সব তোমার জন্যেই রাজা, তোমার জন্যে।' প্রতিমা সময় সময় কি খেয়ালে আবেগের গলায় ওকে রাজা বলে ডাকতো। আবার কখনো বা বলেছে, 'বুঝলেন রাজামশাই, আপনাকে না দেওয়ার কিছুই নেই আমার, সব তুলে রেখেছি, সময় মতন নামিয়ে দেবো।' অনীশের একে একে সব মনে পড়ছে, আর বুকের ভেতরটা জ্বলে জ্বলে ছাই হয়েছে। বিড় বিড় করে কত সময় বলেছে 'একি হলো প্রতিমা, আমার সঙ্গে এই খেলা খেলে কতটা লাভ হয়েছে তোমার? আমি গরীব বলেই কি আমার ভালোবাসাটা মিথ্যে হয়ে গেল তোমার কাছে। তুমি তো সবই জানতে আমার, তবে? তুমিই না একদিন ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিলে, জান জান, কি স্বপ্ন দেখেছি, তুমি আমি দুজনে একসঙ্গে কোথায় যেন বেড়াতে গেছি, কনফারেন্সে গাইছি দুজনে, আহা রে, কবে যে সেইদিন আসবে!' আর কোনদিনও আসবে না। এ তুমি কেন করলে প্রতিমা, কেন?'

এরপর সুস্থ ও স্বাভাবিক হতে বেশ সময় লেগেছে অনীশের। পরীক্ষাটাও আর দেওয়া হয়নি। কোন কিছুতেই একটানা আর লেগে থাকতে ইচ্ছে করে না। আস্তে আস্তে নিজের মধ্যেই একসময় গুটিয়ে গেল। অনেক চেষ্টার পর একটা চাকরি পেয়েছে সে। ততদিনে সমাজের রূঢ় চেহারাটা দেখতে শিখেছে অনীশ। অভিজ্ঞতা যেন মানুষকে অনেক গম্ভীর করে, বয়েস বাড়িয়ে দেয়। দেখলে মনে হতো তার বয়েস বেড়ে গেছে, কয়েকটা ভাঁজও পড়েছে চোখের তলায়। পেটের নানারকম অসুখবিসুখে সে ভুগছে আজকাল। তার উৎসাহ কমে গেছে, স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। আর বসে থাকতে ইচ্ছে হলো না তার। এই মোহিনী রাত্রি তাকে আরো কোথায় নিয়ে যাবে। অপলকে কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থাকলেই মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে। সব যেন ভুল হয়ে যায়। এবার উঠে পড়ল সে। অতসী যেন আজ এতদিন পরে তার শুকোনো পুরনো ব্যথাটাই মনে করিয়ে দিয়েছে। ওর মনের গভীরেও কি এখন ভালবাসার অস্ফুট ধ্বনি শোনা যায়। ও তো জানে না তার মনের গভীরে এক ক্ষত আছে। ওর ভালবাসার অস্ফুট স্পর্শে যেন আবার সব জেগে উঠছে। অনীশ ওকে প্রথম দেখার পর থেকেই মনে মনে অনেকরকম চিন্তার কাটাকুটি খেলা খেলছে, খুব সাবধানে সে পা ফেলতে চায়। আর ভুল নয়। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত সে, অতসীও জীবনে দুঃখ পেয়েছে অনেক। মেয়েটাকে দেখে যেমন চমকে উঠেছিল, মায়াও হয়েছিল তার। দুজনের মধ্যে একটা জায়গায় মিল আছে বলে খুব কাছের মনে হয়েছে ওকে। তাছাড়া আরো একটা কথা মনে হয়েছে অনীশের, অতসী বড়লোক নয়, তাদেরই মতন সাধারণ সুখ দুঃখের সংসারে বড় হয়ে উঠেছে। খুব নরম স্নিগ্ধ ধরনের মেয়ে এই অতসী। দুঃখ অভাবের দাগগুলো এখনও ওর শরীরের কোথাও কোথাও দেখা যায়। অনীশ বুঝতে পারে, তাকে দেখে অতসীও কী এক আবেগ বোধ করে।

প্রথম দিন সে ওর চোখে বিষণ্ণ ক্লান্ত এক ছায়া কাঁপতে দেখেছিল, এখন যেন ধীরে ধীরে তা মিলিয়ে যাচ্ছে। অনীশেরও ভাবতে ভাল লেগেছে। আজ তো অতসীকে বেশ হাসিখুশিই দেখাচ্ছিল। আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে ফেলেছে ও। ওকে আজ বেশ ভাল লাগছিল দেখতে। ওর আন্তরিকতা অনীশকেও স্পর্শ করেছে। সেই ছাপ নিয়ে নিজে অস্ফুটে বলল, 'তুমি সেরে ওঠো অতসী, ঈশ্বরের কাছে আমার এই প্রার্থনা।' রাত আরো গভীর নিশায় ঢলে পড়েছে। অনীশ আস্তে আস্তে ঘরে চলে এলো। অনেক স্বস্তি বোধ করছে সে এই মুহূর্তে। মনের মধ্যে এখন কিসের এক সুখ যেন ছড়িয়ে পড়ছে। (ক্রমশঃ)

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

মিনতি চক্রব[র্তী]

কতকগুলি মানুষ নিয়ে গঠিত হয় এক একটি পরিবার আর এইরকম কতকগুলি বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন জাতির পরিবার নিয়ে গঠিত হয় এক একটি সমাজ। এই সমাজ ও তার সামাজিক সভ্যদের বেঁচে থাকার জন্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। মানুষও যেমন সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, সমাজও মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে নানাভাবে। বর্তমানে আমরা সমাজের এমন এক ধাপে এসে পৌঁছেছি যখন আমাদের সকলেরই ভাববার সময় এসেছে যে আমাদের এই বাঙালী সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে কি না? সামাজিক সত্তা হিসাবে সমাজের যেমন আমাদের প্রতি কিছু কর্তব্য আছে, আমাদেরও তেমন সমাজের প্রতি কিছু কর্তব্য আছে কি না?

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হল এক সমষ্টিগত কথা ও কতকগুলি পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত পদ্ধতি, যে পদ্ধতি আমাদের জীবনের মূল্যবোধকে বুঝতে শেখায় এবং সামাজিক প্রথা, ধারা ও ব্যবহারকে অনুসরণ করতে শেখায়। ব্যক্তিগত স্বার্থ বাদ দিয়ে যখন এক ব্যক্তিকে আর একজনের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করা হয় তখন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ঘটে থাকে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রভাবের দিক থেকে মূলত তিনটি সমতা ও সংস্থিতির উপর নির্ভরশীল (১) ব্যক্তির উপর ব্যক্তি, (২) ব্যক্তির উপর গোষ্ঠী, ও (৩) গোষ্ঠীর উপর সমাজ। মানবজাতিকে সবচেয়ে বেশী সমাজসচেতক জীব বলা হয়।

সমাজ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। এই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মানবগোষ্ঠীর কতকগুলি প্রবণতা থাকে। ভিন্নমুখী প্রবণতা ও জীবনাদর্শই মানুষকে বিপথগামী হওয়ার বা সামাজিক আদর্শের বিরুদ্ধে কাজ করার সুযোগকে খোরাক জোগায়। প্রতিটি মানুষের পৃথক পৃথক দৈহিক একক বা মাত্রা আছে ও মানসিক সত্তা আছে। আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত আগ্রহ ও উদ্দীপনার প্রভাবে সঞ্চালিত।

সমাজের গ্রহণযোগ্য ধারা ও পদ্ধতি মানুষ ও গোষ্ঠীর ব্যবহারকে স্থির করে। যখন আমরা এই সামাজিক ধারা ও আদর্শানুযায়ী কাজ করি তখন আমরা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে, আর যখন আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি আমাদের বিপথে যাওয়ার আগ্রহকে উদ্দীপিত করে তখন আমরা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের আয়ত্বের বাইরে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রতিনিধি শক্তিসমূহ যখন তাদের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন সমাজের সমতা ও ভারসাম্যের অভাবে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ব্যবহার অদৃঢ় ও ভঙ্গুর হয়ে ওঠে। যে সমাজবেশী পরিবর্তনশীল সেই সমাজে প্রাচীন ও নবীনের সামাজিক ব্যবহার ও শৃংখলার সমতার অভাবে নিয়ত সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় আর এই সংঘর্ষের ফলেই সৃষ্টি হয় সামাজিক বিশৃংখলা। কখনও কখনও পাশাপাশি অবস্থানকারী ভিন্নধর্মী সমাজের সাংস্কৃতিক মূল্যের সংঘর্ষ প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি ও ব্যবহারকে দুর্বল করে শৃংখলাহীন অনৈতিক সমাজ তৈরী করতে পারে, যেখানে হয়ত পূর্ববর্তী প্রবর্তক তার কাজের জন্য বিলীন হয়ে যায়। এইরকম ঘটনা সাধারণত মানুষের বৈরাগ্য বা ঔদাসীন্য থেকেই বেশী হয় যখন মানুষ তার কাজ করবার ইচ্ছা বা তার বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় কর্মাদি করবার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে।

সমাজের যথাযথ বিকাশ, বৃদ্ধি, প্রগতি ও স্থায়িত্বের জন্যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। সমাজের পক্ষে আইন ও শৃংখলার প্রয়োজন তার বেঁচে থাকার জন্যে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাজই হল এই আইন ও শৃংখলাকে রক্ষা করা। গতিশীল সমাজের সামাজিক সমস্যা ও জটিলতার পরিমাণ যত বাড়বে তত সমাজের সংগে মানুষের সামঞ্জস্যহীনতা, অসংগতি ও বিভিন্ন মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মানের অবনতি হবে। এই পারস্পরিক সম্পর্কের সুস্থ ও সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের জন্যেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কতকগুলো দিক আছে। নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল বা সহানুভূতিপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গী এবং দমন ক্ষমতার যথাযথ প্রয়োগের উপরেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সার্থকতা নির্ভরশীল। নিরপেক্ষ দিকটি হল মানুষকে এমন এক শক্তি নিয়ে যাওয়া যাতে সে সামাজিক আদর্শের প্রতি নিজে থেকেই সাড়া জাগায়। আর প্রগতিশীল ও সহানুভূতিপ্রবণতা এবং দমনক্ষমতা যা শিক্ষা ও সংযমের মাধ্যমে মানুষকে বিপথে যাওয়ার পথ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম।

প্রতিটি সমাজই তার নিজস্ব সামাজিক আদর্শানুযায়ী তার সভ্যদের ইচ্ছাকৃতভাবে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া জাগাতে চেষ্টা করে যা সামাজিক সংগঠন রক্ষা করার পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় সহায়। সেইজন্য সমাজ সর্বপ্রথম প্রয়োজন মনে করে তার সভ্যদের ব্যবহারের উপর লক্ষ্য রাখতে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে বড় সুলক্ষণ হল সমাজীকৃত মানুষ। কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা ঠিক নয় ও সামাজিক আদর্শ মেনে না। এইরকম সমাজবিরোধী ব্যক্তিগত স্বার্থযুক্ত মানবচারি[ত্র] পক্ষে খুব ক্ষতিকারক। সমাজ এই জাতীয় বিপথগামী চরিত্র সমাজের সমতা রক্ষা করার। এ[ই] রক্ষার মাধ্যম প্রধানত—শিক্ষা, ধর্ম, সাহিত্য, সামাজিক-রাজনৈতিক ... মন্তব্য-সমালোচনা, প্রচারক আইন-আদালত প্রভৃতি।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ফলপ্রসূ হল বিভিন্ন মানুষের মনোভাবকে ... করতে পারা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সংস্থাপন করা, যাতে সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক[রা] লক্ষ্য গড়ে ওঠে। সামাজিক ... ফলপ্রসূ করবার জন্যে দুটি ... বিবেচনা করা যেতে পারে— ফলপ্রসূ করার মাধ্যম ও ... ফলপ্রসূ করার মাধ্যম।

সমাজ প্রাথমিকভাবে ... সামাজিকীকরণের উপর ... সামাজিকীকরণ হল এমন এক ... দ্বারা মানুষ সমাজ ও মানুষের ... আনতে পারে ও পরস্পর ... কিছু গঠন করার জন্য ... পারে। এই ধারা সেইজন্য সমাজ ... জন্য কতকগুলি শর্ত তৈরী ... সমাজের সংগে খাপ খাওয়া[তে] সামাজিক আদর্শ ও জ্ঞান গ্রহণ ... ও অভ্যাসের বশবর্তী হতে পা[রে] ... মানুষই তার জন্ম থেকেই ... কানুন বা জ্ঞান সংগে ... না তাকে এসব শিক্ষা ... ও সামাজিক প্রয়োজন ... এইসব শিক্ষার ধারাকে ...

ব্যক্তিসাধারণকে সামাজিক ... হলে তার উপরে এমনভাবে ... করতে হবে যাতে তারা ... সামাজিক মূল্যে অনুভব ক[রে] ... আদর্শানুযায়ী কাজ করে। এই ... এক নিয়মমাফিক ... মানবমনে এক অভ্যাস ও নিয়[ম] ... বীজ বপন করে দিতে পারে। ... প্রাথমিক মাধ্যম হল আমাদের ... শুধু বিদ্যালয়ের মাধ্যমে যে এ[ই] ... পারে তা বললেই চলবে না। ... বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপর ... যাঁদের ক্ষমতা আছে শিক্ষার্থীকে ... শিক্ষার মাধ্যমে তাকে উপযুক্ত ... করা। বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় ... আমাদের মধ্যে এক নিয়মমা[ফিক] ... অভ্যাস ও নিয়মানুবর্তিতার বী[জ] ... দিয়ে দ্বারা জীবন আমাদে[র] ...

[illegible] করে থাকে। বিদ্যালয় ছাড়াও কিছু সংস্থার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা হয়ে থাকে যেমন বয় স্কাউটস গাইড, ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর শিক্ষা প্রভৃতি।

[illegible] বিরোধ ও শত্রুতার অবসান [illegible]-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার [illegible] মাধ্যম হল মানব-জীবনে ধর্মের [illegible] এক অলৌকিক ও রহস্য-[illegible] সঙ্গে যুক্ত উৎসব ও [illegible]সমূহ এইভাবে মানুষের [illegible] আধিপত্য বিস্তার করে [illegible] জন্যে। ধর্মীয় সংস্থাসমূহ সভ্যদের উপর আধিপত্য স্থাপনের বিশ্বাস, জ্ঞান ও শিক্ষার উপর [illegible]। বিশ্বাস অধিকাংশ সময়েই [illegible] জন্য গঠিত হয় ও তার [illegible] সব সময়েই এক বড় সামাজিক [illegible]। বিশ্বাস যদি একবার মানব-[illegible] বেঁধে বসে তবে তা পরিবর্তন-[illegible] আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে [illegible] Rules তৈরী করে গেছেন [illegible] আমাদের মধ্যে দানা বেঁধে [illegible] প্রভাবে আমরা আজও [illegible]।

[illegible] আদালতে ও শাসন-[illegible] তাদের জীব-[illegible] ধর্মের নামে শপথ গ্রহণ [illegible], শিষ্টাচার, অনুশাসন [illegible] ধরে চলে আসছে [illegible] উঠে দাঁড়ানো, এ সব [illegible] বা শিষ্টাচার ছাড়া নয়। [illegible] সামাজিক [illegible] মানা করাও [illegible] ও উৎসবের [illegible] যে একাত্মতার সৃষ্টি হয় [illegible] তার উদ্যম, উচ্ছৃঙ্খলতা [illegible] সাহায্য করে। এইসব [illegible] যে একতা ও আধ্যাত্মিক-[illegible] জাগায় তা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের [illegible] গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

[illegible] বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য ও [illegible] মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ [illegible] হচ্ছে মানুষের অনুভূতি, [illegible] ও মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের এক [illegible] যা মানুষের উত্তেজনা ও [illegible] বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করে। [illegible] মানুষ সুযোগ পায় তার [illegible] অন্যের মধ্যে চালিত করাতে [illegible]। অনেক সময় মানুষ [illegible] করলে পড়ে বিপথগামী [illegible] অন্যের মন্তব্য বা সমালোচনা [illegible] সাহায্য করতে পারে। [illegible] বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেসব [illegible] ও রাজনৈতিক মন্তব্য মানুষের মনোভাবের উপর বিশেষ-[illegible] বিস্তার করে।

[illegible] ও সমালোচনা অপেক্ষা ব্যক্তিত্ব [illegible] সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে [illegible] পথ। যুক্তিতর্কের দ্বারা মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তারের এক সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা। প্রচার-কাজকে দৃঢ়মত পোষণের এক আকৃতি বলা যেতে পারে। প্রচার কাজ হ'ল আর এক মাধ্যম যার মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কিছুটা সম্ভব হয়। এই প্রচার কাজের আর এক মাধ্যম হল শ্লোগান। এই শ্লোগান খুব সহজভাবে গ্রহণযোগ্য ও কোনও উদ্দেশ্য বা নীতিকে সংক্ষিপ্তভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপিত করতে পারে তার সমর্থন পাবার জন্যে। শ্লোগান খুব ছোট ও সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত যার অন্তর্নিহিত অর্থ হবে গভীর অর্থবোধক ও তা রাজনীতিবিদকে তার বিরুদ্ধ পক্ষকে জব্দ করবার জন্য সাহায্য করবে।

মানুষের শিল্পগত প্রকাশ তার অনুভূতির প্রাধান্যের মধ্য দিয়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে অনেকাংশে সাহায্য করে। সংগীত বা বাদ্য এই রকমই এক অনুভূতি যা মানব-মনে এক আবেদন বা সাড়া জাগায়। যুদ্ধের সময় গীত দেশাত্মবোধক বা বিদ্রোহের সংগীত মানবমনকে দেশপ্রেমের এক প্রেরণা জাগায় বৈকি! আমাদের দেশে যে সব বড় বড় সংগীত সম্মেলন আছে যেমন তানসেন সংগীত সম্মেলন বা সদারংগ সংগীত সম্মেলনের অনুষ্ঠান মানবমনে যে এক আবেগপ্রবণ অনুভূতির প্রভাব বিস্তার করে তা নিঃসন্দেহে মানবমনকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে অনেকাংশে সাহায্য করে। চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও উৎসবের মধ্য দিয়ে যে কল্পনাশক্তির প্রকাশ পায় তা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সহকারী ভূমিকা গ্রহণ করে। বিভিন্ন রকমের শিল্পগত চেতনা আমাদের আত্মসচেতন ও অনুপ্রাণিত করে তোলে আমাদের জীবনকে সৌন্দর্যময় ও সুশৃংখল করার জন্যে।

মানুষ তার পরিশ্রম, উদ্যম ও কর্মপ্রচেষ্টার জন্য বন্ধু বান্ধব, সহকর্মী, সমাজ ও সর্বোপরি দেশের শাসনতন্ত্রের কাছ থেকে প্রেরণা, স্বীকৃতি, মর্যাদা ও পুরস্কারের আশা রাখে। সমাজের সর্বাপেক্ষা নিম্নতম মানুষকেও যদি তার কাজের জন্য কিছু মর্যাদা দেওয়া যায় তা তাকে গভীরভাবে সাড়া জাগায়। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মানুষ তার সম্মানকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে ও মর্যাদা দেয়। যে মানুষ সমাজের আদর্শানুযায়ী সুশৃংখলভাবে জীবনযাপন করে সমাজ তাকে সুনাগরিক হিসেবে সম্মান দেয়। এই পুরস্কার মানুষের মনে এক দায়িত্বভাব এনে দেয় যা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিশেষ সহায়ক।

অনেক পরিস্থিতিতে রসবোধ, বিদ্রূপ, সতর্কবাণী, ভীতিপ্রদর্শন সামাজিক নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

সামাজিক আইনকানুন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নিরাপত্তামূলক মাধ্যম হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করে। যে সমাজের আকৃতি ও জটিলতা যত বেশী তারা নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে মানব-ব্যবহারের এক ধারা তৈরী করে এবং তা অমান্য করার জন্যে প্রয়োজনীয় শাস্তি ও দণ্ডের ব্যবস্থাও স্থির করে, এইভাবে তৈরী আইনকানুন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এক যন্ত্র-বিশেষ। আইনশৃংখলাকে রক্ষা করার জন্যে দৈহিক বলপ্রয়োগ ও দৈহিক পীড়নের প্রয়োজন হয়। এই দৈহিক পীড়নের মধ্যে পড়ে দৈহিক আঘাত, যন্ত্রণা, বন্দীদশা বা অর্থ-দণ্ড। এগুলির ভার ন্যস্ত হয় সমাজে আইনসভা ও পুলিশের উপর।

বলপ্রয়োগ যে সব সময়ে হিংসার মাধ্যমে হতে হবে তা নয়, অহিংসার মধ্য দিয়েও তা সম্ভব হয়। এই বলপ্রয়োগের তিনটি বড় আকৃতি আছে এগুলি হল ধর্মঘট, বর্জন ও অসহযোগ। ধর্মঘট শ্রমিক আন্দোলনের এক বড় অস্ত্র বিশেষ। বর্জননীতি ও অসহযোগ আন্দোলনের সংগে আমাদের খুব ভাল পরিচয় আছে যা ১৯২০ সালে ভারতের মহাত্মা গান্ধী পরিচালনা করেছিলেন।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের আর এক বড় মাধ্যম হল সাহিত্য ও লেখনী, সাহিত্য বা উপন্যাস যে কেবল সমাজের এক প্রতিচ্ছবি সকলের সামনে তুলে ধরে তাই নয় সামাজিক আদর্শ, মনোভাব ও বিশ্বাসকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। Richelieu বলেছেন,

'The Pen is mightier than the sword'

আমাদের বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের জন্যে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য দানের কথা আমাদের পরিচিত। সাহিত্য বা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখনী-সমূহ অনেক সময় অনেক অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃতি লাভ করতে পারে ও থাকেও বহুদিন। লেখনী খুব সহজেই এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। শরৎচন্দ্র বা বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসসমূহ উনবিংশ শতাব্দীর সমাজের কিছুটা সংস্কার করেছিল বৈকি!

নীতিগত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল দেশের সরকার। সমাজের আইন ও শৃংখলা রক্ষা করার জন্যে সরকার সৃষ্টি করেছেন পুলিশ, আইনসভা, কারাগার ইত্যাদি। পুলিশ নিরাপত্তার প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন উপায়ে কাজ করে। তাদের শুধুমাত্র উপস্থিতিই অনেক সময় আইন-শৃংখলা রক্ষা করার পক্ষে যথেষ্ট, কেননা কোনও সময় পুলিশের সতর্কবাণীতেও কিছুটা কাজ হয়ে থাকে। পুলিশের সবচেয়ে বড় কাজ হল আইন-শৃংখলা ভঙ্গকারীকে উপযুক্ত শাস্তির জন্যে বিচারকদের সামনে উপস্থিত করা।

আইনসভাকে গঠন করা হয়েছে সমাজের প্রতিনিধি হয়ে বিচার করবার জন্যে। তাদের কর্তব্য হল দোষী ও নির্দোষীকে সাব্যস্ত করা ও তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা। বিচারকদের প্রধান ভূমিকা হল দুপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ, আদালতের বিচার, জুরিদের মতামত গ্রহণ ও দোষীব্যক্তির দণ্ড-বিধান। সরকার তার আইন-কানুনের মধ্য দিয়ে সমাজ ও তার সামাজিক সভ্যদের মধ্যে এক সমতা আনতে সাহায্য করে। গণতান্ত্রিক সমাজে সরকার যেমন মানুষের সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে আইন প্রবর্তন করেন, ঠিক তেমন জনসাধারণের কর্তব্য সেই আইনকে মেনে নিয়মমাফিক কাজ করা।

সমাজে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তথ্য-প্রচার ও জনসংযোগ রক্ষা করার জন্যে সরবরাহ-ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন। যেসব বন্ধ মানুষে তথ্য সরবরাহের জন্যে আবিষ্কার করেছে তারা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করার পক্ষে শক্তিশালী প্রতিনিধি। রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা প্রভৃতি সমাজে যে কি ঘটছে শুধু তাই প্রতিফলিত করে তাই নয়, সমাজের গতি কোন্ দিকে তারও নির্দেশ দিয়ে থাকে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের যে কতখানি ক্ষমতা ও দায়িত্ব আছে তা আমাদের অবিদিত নয়। এইসব নেতৃবৃন্দ তাদের দৈহিক ও মানসিক শক্তি, কর্মক্ষমতা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সমাজের উপর এমন প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারেন যে অনেক সময় তাদের একটি কথায় অনেক কাজ হতে পারে। সামাজিক গতিতে এদের বলা যেতে পারে সংযোগ-সাধনকারী প্রতিনিধি। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে আমাদের দেশের মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তিটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন,

'The whole nation follows him implicitly & for one reason only, that they believe him to be a saint. To see a whole nation different races of differing temperaments and ideals joining hands to follow a saint is a modern miracle and possible only in India.' * A

সামাজিক নিয়ন্ত্রণে সামাজিক সংগঠকদের ভূমিকাও কিছু কম নয়। সমাজ সংস্কারের জন্য রাজা রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা আমরা জানি। কিন্তু আবার আমাদের একথা ভুললেও চলবে না যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সমাজ সংস্কারকদের সমাজের উপর অনেক আধিপত্য থাকলেও তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত নন। তাদেরও সমাজের মনোভাব, অনুভূতি প্রয়োজন ও মূল্যের প্রতি নজর রেখে কাজে অগ্রসর হতে হয়।

এতক্ষণে আমরা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের যে মাধ্যমসমূহ নিয়ে আলোচনা করলাম তার মধ্যে অধিকাংশই শহরবাসীকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, কিন্তু গ্রামের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে সেখানকার চিত্র একটু অন্য রকম। কোনও প্রদেশ যেমন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী গ্রামসমূহে যেখানে শহরের সভ্যতার আলো এসে পৌঁছতে পারেনি, সেখানে সামাজিক কোনও বিশৃঙ্খলা হলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে উপস্থিত হবে না বা গ্রামবাসীরাও আইন-সভার স্মরণাপন্ন হবেন না। গ্রামে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক মাধ্যম হ'ল সনাতন গ্রাম পঞ্চায়েত। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে আবার দু'টি প্রকারভেদ আছে :—

(১) কোনও এক বিশেষ জাতি নিয়ে গঠিত 'শতাকি' যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় 'থানা জাতি যোল আনা' ও 'গ্রামজাতি যোল আনা' নামে দু'টি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। আর একটি হ'ল (২) সার্বগ্রিকভাবে গঠিত প্রতিষ্ঠান—গ্রাম যোল আনা যার মধ্যে আছে ছোট্ট এক সামাজিক প্রতিষ্ঠান পাড়া যোল আনা দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন জাতি নির্বিশেষে বিভিন্ন জাতি ধর্মের বাইরে সমস্যাদির সমাধান করে থাকেন আর প্রথমটি কেবল যে জাতির প্রতিষ্ঠান সেই জাতির সমস্যাদি লক্ষ্য রাখেন। প্রথমোক্ত সংস্থার 'মুখ্য' হিসেবে যিনি বিবেচিত হ'ন তিনি সেই বিশেষ জাতির মধ্যে মোটামুটি অর্থবান, সুবক্তা এবং সামাজিক উন্নতির প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহশীল, আর, দ্বিতীয়োক্ত সংস্থার 'মুখ্য' হিসেবে যাঁরা উপস্থিত থাকেন তাঁরা প্রতি জাতির প্রতিনিধি। এই পঞ্চায়েতসমূহ সংশ্লিষ্ট অপরাধী ব্যক্তির বিচার, দণ্ডবিধান, শাস্তিস্বরূপ জরিমানা প্রদান ও সাময়িকভাবে তাকে সমাজ হতে বহিষ্কৃত করে 'একঘরে' করতে পারেন। এই পঞ্চায়েতসমূহ যে সব পুরাতন ও বহুদিনের পুরোনো সমস্যার সমাধানে অক্ষম হ'ন তখন তা স্থানীয় 'ইউনিয়ন বোর্ডের' সম্মুখীন হয়।

পঞ্চায়েত ছাড়াও কিছু কিছু সামাজিক প্রতিনিধি গ্রামীণ সামাজিক নিয়ন্ত্রণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করেন। এঁদের মধ্যে আছেন কুলগুরু বা দীক্ষাগুরু, পরিবারের পুরোহিত ও আত্মীয়স্বজন। এই কুলগুরু ও পুরোহিত সম্প্রদায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও কলহের নিষ্পত্তি করেন। এই কুলগুরু ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের ভূমিকা শহরে কদাচিৎ চোখে পড়ে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণে আত্মীয়স্বজনের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে শহর ও গ্রামের চিত্র মোটামুটি একই রকমের। বহু জটিল ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পারিবারিক দ্বন্দ্ব যার প্রতিফলন বা ছোঁয়াচ এসে পড়ে সমাজে সেই সব জটিল সমস্যাদির মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন আত্মীয়স্বজন। এই আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করেন 'ভগ্নীপতি' ও 'মামা'। এ ছাড়া পরিবারে পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের স্নেহের সম্পর্ক, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনীর প্রতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনীর সম্পর্ক যদি যথাযথ থাকে, সেই রকম পারিবারিক সংগঠন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

এ ছাড়া কিছু কিছু সামাজিক-ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে যা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে সহায়ক। এগুলি হ'ল বিজয়াদশমীর পর কনিষ্ঠেরা বয়স্কদের প্রণাম করা, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু, বান্ধবদের [illegible] মাধ্যমে প্রীতির সৌহার্দ্য [illegible] দোলপূর্ণিমার দিন পরস্পর আবিরে রাঙিয়ে সম্প্রীতির [illegible] সর্বত্র [illegible] একনিষ্ঠভাবে সামাজিক [illegible] সাহায্য করে।

এতক্ষণের আলোচনায় [illegible] যে বিশেষ মাধ্যমে সামাজিক [illegible] হয়। তবে এর মধ্যে কিছু [illegible] কথা বা ব্যাখ্যা চলে যায়, [illegible] জর্জরিত দিশেহারা মানুষকে [illegible] বা ধর্মের মাধ্যমে সামাজি[illegible] সম্ভব নয়। এসব ক্ষেত্রে [illegible] সামাজিক সমস্যার সমাধান [illegible] তবে, বাস্তবতার দিক দিয়ে [illegible] সর্বপ্রথম যেটি প্রয়োজন তা [illegible] প্রতিটি স্তরের মানুষকে আত্ম[illegible] সামাজিক সচেতন হতে হবে [illegible] দায়িত্ব পালনের জন্যে তার [illegible] যে সমাজকে বর্জন করে [illegible] সমস্যার সমাধান নয় [illegible] গ্রহণ করেই সামাজিক [illegible] পারে। এজন্য আর একটি দিকে নজর দিতে হবে তা হল ব্যক্তি[illegible] মধ্যে যে কৃত্রিম ফাঁক আছে [illegible] হবে। এজন্য সমাজের প্রতি[illegible] মানুষকে সমানভাবে এগিয়ে [illegible] শুধু বয়স্কদের কথা শুনলে[illegible]

অল্পবয়স্কদের প্রশ্ন [illegible] দিকেই সমানভাবে নজর দি[illegible] পুরোনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে [illegible] সমন্বয় সাধন করতে হবে। এ[illegible] হতে অর্থনৈতিক বৈষম্য [illegible] অনেকাংশে শিথিল করতে [illegible] একটি যে দিকে আমাদের [illegible] বিশেষ প্রয়োজন, তা হ'ল [illegible] অগ্রগামী দেশসমূহের মত [illegible] সামাজিক সম্পর্ক [illegible] স্ত্রীজাতি সম্পর্কে অমূলক বৈষম্য [illegible] হতে দূরীভূত করতে হবে। [illegible] সমাজের প্রতিটি সন্তাকে তার [illegible] করে সমাজকে আপন করে [illegible] এর পরে সমাজের আর একটি [illegible] দিক যেটি তা হ'ল পরিবারে [illegible] বয়স্কদের ভূমিকা। কতকগুলি [illegible] নিয়েই যখন গঠিত হয় একটি [illegible] পরিবারের বিশৃঙ্খলার [illegible] সমাজে যা সমাজের শৃঙ্খলার [illegible] সহজেই শিথিল করতে ও [illegible] হাওয়াকে দূষিত করতে পারে। [illegible] পিতামাতার স্নেহের মাধ্যমে সন্তান[illegible] কর্তব্য ও শিক্ষাদান, সন্তানদের [illegible] হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে [illegible] উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

* বিভিন্ন দেশে এই রকম লেনিন, স্ট্যালিন, মাও-সে-তুং, আব্রাহাম লিঙ্কন প্রভৃতি স্ব স্ব সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছেন।

॥ ৩০ ॥

হোক, এ খবর এ পরি-
হেওতে প্রস্তুত ছিল না।
পর্যন্ত সে নিমাইদের কোন
চিঠি লেখে নি। চিঠি
মধ্যে মধ্যে তার কোন জবাব
পুজোর সময় যখন মণিকা
নানীং বড় ছেলে গোবিন্দও
প্রণাম জানাচ্ছে, তখন
বৌদি জানাতে গোনা দুটি
নিজেরও কোন সংবাদ
ইয়ের সম্বন্ধেও কোন কুশল
ই যে আছে—তেমন কোন
পাওয়া যেত না হেমন্তর
চিঠিতে।

মধ্যে মধ্যেই চিঠি লিখত।
নান ভুলে ভর্তি, অর্ধেক
কাটা—প্রায়-অপাঠ্য হাতের
রে না পড়ে ফেলে দিত না
চোখ বুলিয়ে উনুনের
খবার খাঁজে ঢুকিয়ে রেখে
ন উনুন ধরাবার প্রয়োজনে

চিঠি এল খামে। হাতের
বুঝল নিমাইয়ের চিঠি।
না এই দীর্ঘকালের মধ্যে
চিঠি দেয়নি নিমাই!
একটা যেন কী অমঙ্গলের
ল।

রক্ষণেই মনে হল—হয়ত
পারছে না, তাই ইনিয়ে
নতুন করে ক্ষমা প্রার্থনা
পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ত্রুটো
একবার। তা যদি হয়—
কোন চিঠি পড়বেও না—
পাঠিয়ে দেবে।

কিন্তু চিঠি পড়ে দেখল আশঙ্কাটাই সত্য। তবে আর যাই হোক—এই দুঃসংবাদের কথাটা ভাবে নি সে। একেবারেই অভাবনীয়।

মণিকা মারা গেছে।

মাত্র সাত আট দিনের জ্বর। প্রথম দুদিন ডাক্তার দেখানো হয় নি, সর্দি জ্বর—ইনফ্লুয়েঞ্জা ভেবেছিল সবাই। তারপর রকম সকম ভাল নয় দেখে নিমাই পাড়ার চারুবাবু হোমিওপ্যাথকে ডেকে আনে। তিনি দিন দুই দেখে রুগী ছেড়ে দেন। তখন পাড়ার নন্দী ডাক্তারকে ডেকে আনা হয়। দুটাকা ফীয়ের ভাল পাসকরা ডাক্তার। কিন্তু আসলে তিনিই রোগ ধরতে পারেন নি। তিনি ম্যালেরিয়া ভেবে চিকিৎসা করেছিলেন, কুইনিন ইঞ্জেকশানও দেন নাকি। তাতেই রোগটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। ভয় পেয়ে—বাড়িওলার পরামর্শে আট টাকা ফীয়ের এক ডাক্তারকে ডাকে নিমাই, তিনি এসেই নাক সিঁটকেছেন, বলেছেন—এ তো রুগী শেষ করে আমাকে ডাকা হয়েছে। হয়েছে টাইফয়েড—তার ওপর গাদাখানেক কুইনাইন খাওয়ানো হয়েছে। ইঞ্জেকশানও পড়েছে। এখন আর চিকিৎসার এলাকায় নেই—এখন বাঁচাতে পারেন এক ভগবান। তবুও তিনি ওষুধ দিয়েছেন কিছু কিছু—নিরাশায় আশা হিসেবে—কিন্তু কোন ফলই হয়নি। কোন ওষুধেই কোন ফল হয় নি। হার্ট নাকি খারাপ ছিল, দিনদুই পরেই সব শেষ হয়ে গেছে।

'কী বলিব জ্যাঠাইমা, অমন দাবদলনী যুবতী ভাজা আমার যেন তৈলহীন পিদীপের মতো দেখিতে দেখিতে নিভিয়া গেল। কোন প্রকার নাড়াচাড়া করা গেল না, সেবাযত্ন হইল না। আমি আমার খমতা মতো যতটা পারিয়াছি ঔষধপত্তোর কোন ত্রুটি করি নাই। ডাক্তারও তো তিনজনকে দেখাইলাম। তথাপি যে এত সত্তর তিনি চলিয়া যাইবেন তাহা কে বুঝিয়াছিল?—কাহাকেও খবর দেওয়া গেল না, উঁহার বাপের বাড়িতেও একটা খবর পাঠানো হয় নাই। মিত্তাকালে মা বাবা এমন কি আপন মায়ের অধিক আপনাকে পজ্জন্ত দেখিতে পাইল না—এই আমার সবচেয়ে বড় আপসোস। আপন মা তো ছাই, জন্মে এক নাইন পত্তর দিয়া উদ্দীশ লইত না, এক পয়সার বাতাসা লইয়াও কোনদিন কেহ আসে নাই। ইদানীং আপনার মম্ম আমার পরিবার খুব বুঝিয়াছিল, কেবলই বলিত, চলো একবার মার পায়ে গিয়া সকলে আছড়াইয়া পড়ি, তা আপনার অপিত্তী-ভাজন হওয়ার ভয়েই সে সাহস করি নাই।

'কী বলিব জ্যাঠাইমা, বোধহয় সেই মনানলে দগ্ধ হইয়াই বৌটা আমার এমন-ভাবে মরিয়া গেল। ডাক্তার বলিল, এ রুগীর বাঁচারও তেমন ইচ্ছা নাই। এ যেন মরিতেই চাহে। এ রুগীকে বাঁচানো ঔষধের কম্ম নয়। আমার তো মনে হয়—আপনার সহিত যে অসদ বেবহার করিয়াছিল তাহার ফলেই তার মনের এই অবস্তা। আপনি এখনো যদি নিজ গুণে খমা না করেন তাহা হইলে সে বেচারী বোধহয় সগ্গে গিয়াও সুস্থির হইতে পারিবে না। আপনি দয়া করিয়া তাহাকে মাপ করুন, বাবা বিশ্বনাথকে জানান যাহাতে সে পরলোকে সুখ পায়।

'পরিশেষে নিবেদন এই যে, জ্যাঠাইমা, আমার মনে আর এক বিন্দু সুখ নাই। মন সব্বদাই হুহু করিতেছে। সংসার যেন বিষ মনে হইতেছে। কেবলই মনে হইতেছে ভগবান যদি বা মনের মতো বৌ দিলেন—তবে আবার কাড়িয়া লইলেন কেন? আমার পাপেই কি এমন হইল? তবে কি তাঁহার ইচ্ছা নয় যে আমি ছেলেপিলে লইয়া সুখে ঘর সংসার করি?...... যাহা হউক,

এখ্খনে আপনার কাছে একটি ভিখ্খা—আপনি অনুমতি করুন ছেলেমেয়ে তিনটাকে আপনার পাদপদ্মে ফেলিয়া দিয়া যেদিকে দু চখ্খু যায় চলিয়া যাই। সন্নিসী হওয়াই আমার কপালের লিখন, আপনার কি খমতা তাহা খন্ডাইবেন? মিথ্যাই বিবাহ দিয়াছিলেন।

যাহা হউক, সে ভুল শুধরাইবার এই সময়। আপনি সব দিক বিবেচনা করিয়া যাহা হুকুম করিবেন তাহাই করিব। নিবেদন ইতি—অধম সেবক হতভাগ্য নিমাইচরণ।'

চিঠি শেষ করে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল হেমন্ত। আবেগ দুঃখ অনুশোচনা শোক এসব বহুকালের বিস্মৃত অনুভূতি ওর কাছে। অনেকদিনের ভুলে যাওয়া জিনিস। তবু আজ, এতকাল পরেও বুকের মধ্যে এ একটা কিসের তুফান! কিসের আলোড়ন! বুকের মধ্যটা এমন ব্যথা ব্যথা করছে কেন? মণিকা ভাল মেয়ে নয়, তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে নি, তার সম্বন্ধে বিদ্বিষ্টই ছিল বরং—তবু সে যে এমনভাবে টপ্ করে স্বামী-পুত্র-কন্যা ভরা সংসার রেখে মারা যাবে তা কে ভেবেছিল! হতভাগী মেয়েটা—ঈশ্বরদত্ত অনুপম লাবণ্য নিয়ে এসেও জীবনে এতটুকু সুখ পেল না। না পেল মনের মতো বর—না পেল নিজের মতো ঘর। তার সংসারে প্রাচুর্য ছিল কিন্তু সুখে ছিল না এটা হেমন্তও মানতে বাধ্য। যেখানে কোন নিজস্ব অধিকার নেই—প্রতি মুহূর্তে যেখানে পরের মন যুগিয়ে থাকতে হয়, সর্বদাই ভয় কখন কোন ব্যবহারে রেগে যাবে আর দূর করে তাড়িয়ে দেবে সেখানে হাজার ভোগে থাকলেও কেউই সুখে থাকে না। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকা—এ অবস্থা বাড়ির পোষা কুকুরের চেয়েও খারাপ। কুকুরেরও একটা জোর থাকে—অধীন হলেও—এদের সেটুকুও নেই।

এ ওরই কপাল। আপন হতেও পারল না নিমাইয়ের মতো সয়ে থাকতেও না। অথচ ঈশ্বর জানেন এই অপূর্ব রূপসী কিশোরী মেয়েটি যেদিন গাড়ি থেকে নেমে তারাই পাঠানো গোলাপী বেনারসী পরে দুধে আলতায় দাঁড়িয়েছিল সেদিন হেমন্তর সর্ব অন্তঃকরণ চেয়েছিল ওকে আপন করতে—আপন করে নিতে। মন যেন সহস্র বাহু বিস্তার করে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল, চেয়েছিল বুকে টেনে নিতে। ওর পাশে নিমাইকে দেখে হেমন্তই মনে মনে দুঃখিত ও লজ্জিত হয়েছিল, অনুতপ্ত হয়ে বার বার প্রতিজ্ঞা করেছিল, ঐশ্বর্যে প্রাচুর্যে স্নেহে ভালবাসায় এই অভাবটা এই খামতিটা পুরিয়ে দেবে সে। স্বামী না পাক মনের মতো, ওর সন্তানকে দিয়ে যাতে এ অভাববোধ দূর হয়—এ দুঃখ ঘোচে—সেই ব্যবস্থাই করবে, সেই-ভাবে মানুষ করবে, মানুষের মধ্যে একজন হয়ে যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে সে।

মেয়েটাই পারল না। সম্ভব হতে দিল না এই স্বপ্ন। ওর দুর্গ্রহই ওর স্বভাবকে চির অসন্তুষ্ট করে রাখল—নিজের অবস্থার সঙ্গে খাইয়ে নিতে দিল না। তবু বেঁচেও থাকত যদি। যাই হোক, যেভাবেই হোক নিজের মতো করে ঘর-কন্না গুছিয়ে নিয়েছিল, ছেলেমেয়ে নিয়ে একরকমভাবে সংসার করছিল—হয়ত ক্রমে ওর এই অশান্তি অতৃপ্তিও কমে আসত একদিন। একদিন এই ছেলেমেয়েদের মধ্যেই তৃপ্তি আর শান্তি খুঁজে পেত। ভগবান সে সুযোগটুকুও দিলেন না ওকে।

নিমাই লিখেছে, 'সেই মনানলে দগ্ধ হইয়াই আমার বৌটা মরিয়া গেল।' সেই মনানল মানে হেমন্তর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্যে অনুতাপ। হেমন্ত এত নির্বোধ নয়—আর নিমাই নিজেও না, সেও জানে হেমন্ত এ টোপ গিলবে না, এত বোকা নয় সে। তবু কোন কোন বোকা লোকও এক একটা জায়গায় খুব চাতুরীর পরিচয় দেয়। নিমাইও এটা বেশ হিসেব করেই লিখেছে। এই রকম শোকাবহ সংবাদে মনটা অবশ্যই একটু নরম হয়ে আসবে—আর সেই সুযোগে পুরোটা না বিশ্বাস করুক, খানিকটা হয়ত করতে পারে। আর তাতেই যথেষ্ট কাজ হবে।

সে যাই হোক—এর মধ্যে মনানলটাই সত্যি। অতৃপ্তি আর অনুযোগ, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ভাগ্যের বিরুদ্ধে অভিমান। কে জানে কেন
কেন কিছুতেই পারল না
তিনটে সন্তান হওয়া
ভাগ্যকে মেনে নিতে—নিজে
নিতে পারল না কেন!
ক্ষতির কথা ভেবে, কী পে
চিন্তায় যা পেয়েছে,
যেটা—সেটার দিকে ফিরে
না কোনদিন। না পাওয়া
হতাশা আশায়—কবায়ত
দলে গেল চিরদিন।

অনেকদিন আগের এক
পড়ল হেমন্তর। বহু যুগ,
জন্মান্তরের কথা, তবু মন

কমলাক্ষ বলেছিল কথা
সেই জন্যেই মনে আছে।

বলেছিল—বুকের মধ্যে
কপালে নিজের গালটা চেপে
'তোমার মনটি ভারী
ঐ 'ঘরে পড়া ভগবানের এক
বলতে পারো।'

কথাটা বোঝে নি
জিজ্ঞেসা করেছিল। এক
কমলাক্ষও বোঝাতে পারে
'এমনি ভালবাসা, মনে রোম
যে চায় জীবনে—ঐ দাখো
শব্দটাতেই চলে এলুম।
শুধু ভালোবাসার
পার্থিব—এইসব সংসারের
লাভ-লোকসান ইহকাল
ছেড়ে নিজেদের
মানুষ যে ভালবাসে আর
শুধুই সেই ভালবাসা
যেখানে বড় কথা নয়, প্রতি
চিন্তাভাবনা যেখানে
কাটাতে চায় একজনের
কল্পনায় তার চেয়েও
উপভোগ করে—এমনি এক
প্রেম, ভালবাসা—কী
তোমাকে বোঝাতে পারব
যে ইংরিজী জানো না

ইংরেজী জানত না ঠিক
জানত না, তবু বুঝেছিল।

আজ মণিকার কথা ভা
কথাটাই মনে পড়ল। হয়ত
রোমান্টিক মনই ছিল, সে
ভগবানই তাকে তৈরী করেছিল
করে—তাই নিমাইয়ের মতো
খারাপ লেগেছিল, তাই
সন্তানের পিতা ষোড়শী
ক্লেদাক্ত আকর্ষণও তত খারাপ
উদ্দেশ্য ভাল নয়, ভবিষ্যতে
নেই জেনেও সে স্মৃতি
অবহেলা করতে পারে নি।
পুজো করতে গিয়েছিল মনে
অন্তরে ছুটে গিয়েছিল এক
সহানুভূতিশীল, ভদ্র—এবং
রোমান্টিকও—মনের দিকে।

ইহসংসারের কিছুতে তার মন ভরল না, এমন কি সন্তানেও না। সেই প্রেম, ভালবাসা লেখাপড়া না জানলেও, এমন করে গুছিয়ে ভাবতে না পারলেও—সেই রোমান্সের জন্যই অজান উৎসুক পিপাসা হয়েছিল আর বোধহয় সে আশা রইল না. সে অমৃত না পাবার—এই কথাটা যেদিন বুঝল, সেইদিনই মনটা ভেঙে গেল. জীবন ভবিষ্যৎ সব বিবর্ণ বিস্বাদ হয়ে গেল!......

আবারও ভগবানের সম্বন্ধেই অভিযোগ বা বিক্ষোভ ফেনিয়ে ওঠে—হেমন্তর মনে। যদি কেউ থাকেন এমন অস্তিত্ব, মানুষের নিয়ন্তা—তিনি ভারী নিষ্ঠুর। অকারণেই নির্মম। মানুষকে নিয়ে নিয়ত একটা অকরুণ কৌতুকের খেলা তাঁর। হেমন্তকে তিনি সারাজীবন বঞ্চিত করেছেন এরকম-ভাবে—আবার এই মেয়েটাকে সব দিয়েও অন্যরকমে চিরবঞ্চিত করলেন।

হেমন্তর কিছুই রইল না—এর সামনে হাতের কাছে সম্ভোগের সমস্ত উপকরণ সাজানো থাকতেও তার মন ভরতে দিলেন না—চির বঞ্চিত রাখলেন।

কে জানে, এমন কত প্রাণ নিয়ে নিয়ন্তার এই হৃদয়হীন নিষ্করুণ খেলা খেলছেন তিনি।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল—হেমন্ত সেইভাবেই স্থির হয়ে বসে রইল। চিঠিটা এসেছিল বেলা তিনটে নাগাদ। তখন থেকেই —সেই একভাবে চিঠিটা কোলে নিয়ে বসে আছে সে, বাইরে থেকে আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হতে পারে পাথরের প্রতিমা। ভেতরে যে বিপুল ঝড় উঠেছে, মনের মধ্যে বহুদিনের স্মৃতি তার সহস্র দুঃখ সহস্র বেদনা নিষ্ফলতার সেই সমস্ত অনুভূতি নিয়ে রক্তস্রোতে তুফান তুলেছে—বাইরে তার লেশমাত্র চিহ্ন ছিল না।

ধীরে ধীরে বাড়ির পিছন দিকটাতে পশ্চিমে সূর্য ঢলে পড়লেন, ঘাটের ওপরের বাড়িগুলোর ছায়া দীর্ঘতর হয়ে ঘাটের ধারে বহুদূর পর্যন্ত গঙ্গার জলকেও ছায়ান্ধকার করে তুলল। প্রমোদভ্রমণকারী-দের নৌকোর সংখ্যা বাড়ছে একটি একটি করে। ও পারে রামনগরে খরমুজের ক্ষেতে ঘূর্ণি বাতাস লেগে ছোট ছোট বালির স্তম্ভ উঠছে মধ্যে মধ্যে। পড়ন্ত রোদে সোনালী দেখাচ্ছে বালিগুলো। নিচে পথচারীদের ভিড় বাড়ছে—তাদের কথা-বার্তার একটা ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাচ্ছে এখানে বসেই। নিচের কায়েৎ গিন্নী কাকে পাকড়াও করেছেন, তার কাছে সোৎসাহে নিজের বিগত জীবনের ঐশ্বর্য সমারোহের বর্ণনা করছেন—তার একটা একটা শব্দ বা বাক্য মধ্যে মধ্যে বেশ সরব হয়ে উঠছে। 'বললে বিশ্বাস করবে না ভাই। আমার জ্যাঠামশাই হুকুম করলে তাবড় তাবড় সায়েবদের সুদ্ধু কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হত।'

সবই শুনছে, সবই দেখছে—কিন্তু কোনটাই ঠিক তাকে যেন স্পর্শ করছে না। এসবের কোন কিছুই তাকে আজ উত্তেজিত সক্রিয় করে তুলতে পারছে না। এ যেন কী এক জড়তায় পেয়ে বসেছে তাকে—তার স্বভাব-বিরুদ্ধ নিষ্ক্রিয়তায়। কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না তার, হাতটা পা-টা নাড়তেও না।

শোক?

দুঃখ?

অনুতাপ?

কিছুই না। নিজের জীবন দিয়ে আর একটা হতভাগা পীড়িত সর্ববঞ্চিত জীবনের হিসেব মিলিয়ে নিচ্ছে শুধু, নিজে নিজেই কান পেতে শুনছে নিজের বুকের বিক্ষুব্ধ স্পন্দন। আর কিছু নয়!...

অবশেষে ঝিয়ের ডাকে সম্বিত ফিরল হেমন্তর। সে বেচারী ভয় পেয়ে গেছে। এমন তো কখনও হয় না, কোনদিন তো দেখেনি এভাবে এই সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে থাকতে। ঐ চিঠিটা পাবার পর থেকেই—। তবে কি ও চিঠিতে কোন দুঃসংবাদ আছে? কারও মৃত্যু সংবাদ? কিন্তু তাহলে তো ডাক ছেড়ে না কাঁদুক চোখ দিয়ে জল পড়ত অন্ততঃ। এ তো শোকের কোন বহিঃপ্রকাশই নেই কোথাও।

অনেক ভেবে অনেক ইতস্ততঃ করে কাছে গিয়ে ডাকল, 'মা।'

যেন ঘুম ভেঙে চমকে উঠল হেমন্ত, 'কী গা বদিনাথের মা? কী হয়েছে?'

'না, মানে—সন্ধ্যে হয়ে গেল, অমন একভাবে ঠায় বসে আছেন—কী জানি শরীর টরীর খারাপ লাগছে কিনা—ও কার চিঠি মা, চিঠিটা পাবার পর থেকেই—চিঠিতে কোন অন্য খবর আছে নাকি মা?'

'সন্ধ্যে হয়ে গেল? তাই তো, ও ঘরটা তো বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। তা আলো জ্বালোনি কেন!......বাবা, এতক্ষণ বসে আছি!... খবর—হ্যাঁ খারাপ খবরই আছে একটু। আমার দেওর-পো'র বৌ মারা গেছে। অশৌচ পড়ল। এখনও শ্রাদ্ধশান্তি হয় নি। —চলো দিকি একটু দাঁড়াবে—গঙ্গাচানটা করে আসি।'

তারপর যেন কতকটা অর্ধস্বগতোক্তি করেই বলল, 'আমিই অনেক খুঁজে বিয়ে দিয়ে এনেছিলুম—লক্ষ্মীঠাকরুণের মতো রূপ ছিল। অভাগীর বরাত খারাপ—তিনটে অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে রেখে মরে গেল। স্বামী যা—তিন মাসের মধ্যে আর একটা বে করবে বোধহয়।'

'কী হয়েছিল মা?'

'বলছে তো টাইফয়েড।'

আর কথা বাড়াতে দিল না সে। উঠে তরতর করে নেমে গেল গঙ্গার ঘাটের দিকে।

রাত্রে আহ্নিক করে উঠে কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসল হেমন্ত।

লিখতে হবে—কিন্তু কী লিখবে?

সন্ধ্যা থেকেই এই দ্বন্দ্ব চলছে মনে। আবার সেই সংসার, আবার ছেলে মানুষ করা?

বুদ্ধি বিবেচনা বলে, 'না না, আর নয় —অনেক হয়েছে, ও পাপে আর দরকার নেই। এতদিনেও শিক্ষা হল না? আরও কত লাঞ্ছনার সাধ আছে? এ দায় ঘাড়ে না নিলে কেউ তোমাকে দোষ দেবে না, কেউ কিছু বলবে না। সত্তর বছরও পেরিয়ে গেছে কবে. পরের ছেলে মানুষ করার আর বয়স নেই।'

কিন্তু বুদ্ধি বিবেচনার অতীত একটা বস্তু আছে, অন্তর—অত্যন্ত অবুঝ, অত্যন্ত যুক্তিবধির। সে চুপি চুপি বলে, 'মেয়েটা সারাজীবন মন গুমরে-গুমরে গেল, দুঃখই পেল জীবনভোর। যেখানে যেখানে তার সান্ত্বনা থাকতে পারত—একটু শান্তি —সে সব পথ তুমিই ঘুচিয়ে দিয়েছিলে। তার একটা ছেলেও যদি মানুষ হয় তবু পরলোকে গিয়েও সে শান্তি পাবে একটু। এটুকু থেকে তাকে আর বঞ্চিত করো না।'

আরও গভীরে, মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে কোথায় চিরঅমর, চিরঅপরাজেয় আশা বাস করে সে কানে কানে বলে, হয়ত এই সর্বশেষ পর্বে জীবনের এই পশ্চিম দিগন্তে এসে বিধাতা মুখ তুলে চেয়েছেন। হয়ত এতদিনের বিরূপতা ঘুচেছে এবার। সেই জন্যেই এখানে এনে ফেলেছেন। সমস্ত পরিচিত লোক থেকে দূরে, ওদের আত্মীয়-স্বজনের আওতার বাইরে—নিজের কাছে রেখে নিজের মতো করে মানুষ করতে পারলে হয়ত মানুষ হতে পারে—এতকালের সাধ পূর্ণ হতে পারে। মৃত্যুকালে মুখে জল দেবার মতো লোক, সত্যিকারের আপনার লোক।

যুক্তি বাধা দিতে আসে বৈকি। কিন্তু যে শুনতে চায় না—তাকে কে শোনাবে!...

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর—আবারও ঝিয়ের আহ্বানেই সম্বিৎ ফেরে, 'মা', ভেবে আর কি করবেন। জগতের নেয়মই এই। যাদের ভরা সংসার তাদেরই ভগবান আগে টেনে নেন। আর এই যমের অরুচি আমরা পড়ে থাকি—আমাদের যমেও পোঁছে না।... তা মা—এবার একটু উঠুন। রাত দশটা বাজে। এর চেয়ে বেশী রাত করে খেলে আপনার অসুখ করবে যে। যতক্ষণ শরীরটা আছে ততক্ষণ তাকে দেখতে হবে তো।'

'হ্যাঁ, এই যে উঠি বদিনাথের মা। যাচ্ছি তুমি জায়গা করো।'

তারপর দৃঢ়হস্তে কলম ধরে পরিষ্কার স্পষ্ট হরফে সংক্ষিপ্ত চিঠি শেষ করেন।

'তোমার সর্বকনিষ্ঠ সন্তানকে যদি মনে করো তো আমার কাছে রাখিয়া যাইতে পারো—তবে নিঃশর্তে। বাকী দুজনের ভার লইতে আমি অপারগ। আমার অনেক বয়স হইয়াছে বোধ করি তাহা তোমার স্মরণ নাই। তোমার এখনও বিবাহের বয়স পার হয় নাই, গরিবের ঘরের একটি মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করো—সে-ই ছেলেমেয়েদের দেখিতে পারিবে। ইতি—'

(ক্রমশঃ)

বাবুই পাখির বাসা

বীরেন্দ্র দত্ত

বাইরের দরজার কড়া হঠাৎ একবার নড়ে থেমে গেল।

ঘরের মেঝেয় চিত হয়ে শুয়ে ভাঙা হাতপাখা নাড়তে নাড়তে বীথি বই-এ চোখ রেখেছিল একটু আগেও। এখন হাত-পাখাটা মেঝেয় পড়ে আছে। ও শুধু পড়ায় গভীর মনোযোগী। এরই মধ্যে ওই বোধ হয় প্রথম শুনতে পেল, বাইরের দরজায় কড়াটা কেউ যেন একবার নেড়ে দিয়ে থামল।

বড়দা কি আজ দোকান থেকে তাড়াতাড়ি ফিরল? কটা বাজল? এলেও বড়দা এইভাবে তো কড়া নাড়ে না! বই-এর দিকে দৃষ্টি রেখেই বীথি কথাগুলো ভাবল। একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেয়ালের তাকের দিকে তাকাল। বাবার কেনা বহু পুরনো ঘড়টা যতবার বীথি দম দিয়ে মিলিয়ে সচল করেছে, ততবারই কিছু সময় চলে বন্ধ হয়ে গেছে। এখনো তা-ই। এখন ঘড়িতে দশটা একত্রিশ। বীথি হিসেব করে বুঝল, এখন ঠিক দেড়টা। বড়দার তো ফেরার কথা নয়। বোধ হয় বাতাসে কড়া নড়েছে। বীথি পাশ ফিরে শুয়ে বইটা মুখের অনেক সামনে নিয়ে এল।

বাইরের দরজার কড়া এবার জোরে নড়ল। আগের থেকে একটু বেশী সময় কড়া নড়ল যেন। কেউ কি ডাকছে? বলাই, না ছোড়দা? বীথির ঘামে ভেজা পিঠ মেঝেয় চটচট করতেই হাত-পাখা বাঁ হাতে নিয়ে একটু বাতাস খেল। বইটা বুকের ওপর উপুড় করে রেখে পাশে সীমার দিকে তাকাল। সীমা মেজবৌদির মেজ মেয়ে, বীথির খুব ন্যাওটা। ইউনিভার্সিটির গরমের ছুটিতে সেই যে কলকাতার হস্টেল থেকে এই বাড়ি ঢুকেছে, তার পর থেকে সীমা বীথির সঙ্গ ছাড়েনি। বীথিকে খুব ভালবাসে সীমা। কোনদিন দুপুরে মায়ের কাছে শোয় না। বীথির কাছে ঘুমোয়।

বীথি সীমাকে দেখল। খালি গায়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। গোটা গায়ে ঘামাচি বিজ-বিজ করছে। ওর ওপাশে রন্টু, বড়দার ছোট ছেলে। বীথির মা ভুবনময়ী দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে আছেন। বীথি মাকে দেখল। কি ময়লা, ছেঁড়া কাপড় পরে আছে মা! বীথির চাপা কষ্টটা অতি পুরনো অম্বলের ব্যথা জেগে ওঠার মত বুকের মধ্যে বেজে উঠল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল বীথি।

অসহ্য গরমে সীমা ছটফট করছে। বীথি সীমার গায়ে হাত রাখতেই শুনল, বাইরের দরজার কড়ায় আওয়াজ হল। তা হলে সত্যি কেউ ডাকছে? বড়বৌদি, মেজবৌদিরা কি করছে এখন। ওরা কি শুনতে পাচ্ছে না? নতুন বৌদিও তো এই একটু আগে খেয়ে উঠল। নাকি সব শুয়েই একেবারে অঘোর ঘুমে অচেতন।

বীথির উঠতে ইচ্ছে করছে না। সীমাকে গলা নামিয়ে ডাকল, 'এই সীমা, দেখে আয় তো, বাইরে কে কড়া নাড়ছে।'

সীমা সংগে সংগে উঠে বসল। বছর আট বয়স। বীথির খুব অনুগত। উঠে দাঁড়িয়ে কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। লম্বা দালান। বীথিদের ঘর বাদ দিয়ে পর পর চারখানা ঘর। ওপাশের কোণে রান্নাঘর, পাশেই একটু দূরে কলঘর, পায়খানা। বহু পুরনো একতলা বাড়ি। মেঝে আর ঘরের দেয়ালের কিছুটা ওপর পর্যন্ত সিমেন্ট বাঁধানো। বাকিটা মাটির। ওপরের ছাদে কাঠের ফ্রেমে টিন বসানো। গরমের দিনে সারা বাড়ি যেন আঁচ ফেলে দেওয়া উনুনের মত চাপা থাকে। বাড়ির দু পাশে নোংরা ড্রেন। কোন দিন তার গন্ধ বাড়ির চারপাশ থেকে সরে না।

বীথির মেজবৌদি অরুণা মাঝের ঘরের মেঝেয় শুয়ে মাস ছয়েকের শিশুকে স্তন দিচ্ছিল। বাইরে দালানে সীমাকে যেতে দেখে বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস রে?'

'বাইরে কে কড়া নাড়ছে, ভালপিসি দেখতে বলল।'

'তাড়াতাড়ি আসবি। এসে শুয়ে পড়বি।' অরুণার গলার স্বর একটু চড়া। যে কোন কথা আস্তে বললেও জোর শোনায়।

সীমা বড় জাঠাইমার ঘর পাশে রেখে কাঠ-কুটো, কয়লা, নোংরা ভাঙা টিন, গুল দেওয়ার মাটি, সারা বাড়ির ঝাঁটানো জঞ্জাল রাখার জায়গার কাছে এল। ওগুলো পেরোলেই সদর দরজা। সীমা এগোতে যাবে, আবার কড়া নড়ল, সংগে সংগে দরজায় হাত দিয়ে মৃদু ধাক্কা মারার শব্দ। সীমা খিল নামিয়ে দরজা খুলে দিল।

সামনে দাঁড়িয়ে একটি যুবক। ঘর্মাক্ত। ঘন ঘন ঘাড়-মুখ মুছছে রুমাল দিয়ে। যুবকটি সীমার দিকে তাকাল। 'এখানে বীথি চক্রবর্তী বলে কেউ থাকেন, কলকাতায় পড়াশুনা করেন?'

'ভালপিসির কথা বলছেন? হ্যাঁ।' সীমা বড় করে ঘাড় নাড়ল। 'আসুন, ভালপিসি শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে।'

'না। আগে তুমি গিয়ে বল, কলকাতা থেকে তরুণবাবু এসেছেন। তরুণ চৌধুরী।' গলা অনেক নামিয়ে বলল তরুণ। 'কি, নাম মনে থাকবে তো?'

'হ্যাঁ।' সীমা আবার বড় করে ঘাড় নাড়ল। একবার তরুণের চোখে চোখ রেখে প্রায় দৌড়নোর মত দালান ধরে হাঁটতে লাগল। বীথির বড়বৌদি নমিতা তিনটি ছেলেমেয়ের মধ্যে ঘুমে অচেতন। দুরন্ত ছেলেমেয়েগুলিকে অনেক কষ্টে শুইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে নিজে ঘুমোতে পেরেছে এতক্ষণে। সীমার মা-ও তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। বীথির নতুন বৌদি কণিকার এখনো বাচ্চা হয় নি। দরজায় খিল এঁটে রেডিও শুনছে। নমিতা ও অরুণা দুপুরে রেডিও বাজলে রেগে যায় বলে রেডিওর শব্দ অনেক কমিয়ে দিয়েছে। ওরা কেউ সীমার পায়ের শব্দ পায় নি।

সীমা বীথির কাছে এসে দাঁড়াল। হাঁটু মুড়ে শুয়ে-থাকা বীথির সামনে ঝুঁকে বলল, 'ভালপিসি, তোমায় কে একজন ডাকছে।'

'আমায়!' শুয়ে থেকেই বীথি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, কলকাতা থেকে এসেছে। খুব সুন্দর দেখতে।'

বীথি দ্রুত উঠে বসল। 'আমাকে কে ডাকতে আসবে কলকাতা থেকে। দূর পাগলি, ভুল শুনেছিস।'

'হ্যাঁ গো, তোমাকেই ডাকছে। তোমার নাম বলার পর বলল, আমার নাম তরুণ চৌধুরী।'

......'হ্যাঁ, তরুণ চৌধুরী আমার নাম।' একটু থামল তরুণ। 'আপনি যদি বীথি চক্রবর্তী হন, তা হলে আমার স্পেকুলেশন কারেক্ট।'

'মানে!'

'আগে বলুন আপনি বীথি চক্রবর্তী কিনা।'

'হ্যাঁ, তাতে কি!'

'সমস্ত মিলিয়ে, মানে চেহারা, কণ্ঠস্বর, কথা বলার ভংগি—সবেতেই আপনি রোমান্টিক। শোভনা, মানে আপনার রুমমেট, অর্থাৎ আমার মাসতুতো বোন বলেছিল, দেখলেই দাদা, তোর এরকম মনে হবে।'

বীথি এতক্ষণ অবাক হয়ে দেখছিল তরুণকে। ওর কথায় মুখ লাল হয়ে উঠল। 'আপনি বসুন, আমি শোভনাকে ডেকে দিচ্ছি।'

'আমি এসেছি ও জানে।' তরুণ থামল। 'বলুন, কবে গান শোনাবেন।'

'সে কি! আমি আবার গান শিখলাম কবে?'

'সুকণ্ঠ থাকলে বাথরুমও গান শেখায়।'

বীথি সত্যি লজ্জা পেল। কথা ঘোরাল, 'আচ্ছা, শোভনা কি আপনার নিজের মাসতুতো বোন?'

'না, দূরসম্পর্কের।'

'থাক, ঘটা করে পরিচয় দিতে হবে না। 'সম্পর্কে' দূর হলেই বা, এখন তো কাছে আছি!' শোভনা ওদের কাছে এসে দাঁড়াল।

হেসে উঠল বীথি। 'আপনার কথা খুব শুনেছি। আপনি তো খুব ভাল গান গাইতে পারেন।'

'না শুনেই কমপ্লিমেন্টস দিচ্ছেন?'

'তা ছাড়া আর উপায় কি? এই হস্টেলের ভিজিটার্স রুমে বসে তো আর গান শোনা যায় না।'

'বেশ তো, এ্যারেঞ্জ করুন। আপনি তো বর্ধমানে থাকেন?'

'এই শোভনা, এরই মধ্যে সব বলে দিয়েছিস?'

'কেন, ভুল করেছি নাকি? বেশ, আপনাদের বাড়ি যাবো না, খাবো না, থাকতেও চাইব না। সুতরাং ভয়ের কি?'

'এই না!' বীথি যেন অপ্রস্তুত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। 'আমি তা বলছি না।' একটু থেমে বলল, 'বেশ তো, আসুন আমাদের ওখানে। ভাল করে গান শুনব।'

'সত্যি ডেকে বলছেন তো?'

'সত্যি নয়তো কি মিথ্যে? ক'দিন বাদে তো হস্টেল বন্ধ হচ্ছে। গরমের ছুটিতে একদিন আসুন।'

'কি রে বীথি, আমাকে তো কোনদিন যেতে বলিস নি!' শোভনা বলল, 'তোর বাড়ির ব্যাপারটা তো মিস্টি করেই রেখেছিস!'

তিনজনেই হেসে উঠল। বীথি [illegible] চাপা সংকোচ আর ভয়ে আড়ষ্ট।

'তোমরা একটু কথা বল, [illegible] আসছি।' শোভনা উঠে গেল।

তরুণ বলল, 'একটা সত্যি কথা [illegible] আপনাকে আমার কিন্তু খুব ভাল [illegible] আসলে ব্যাপারটা হঠাৎ না, শোভনা [illegible] কথা বলেছে তো, তাই!' একটু থেমে [illegible] গলা নামিয়ে বলল, 'এবার ঠিক [illegible] যাবো। গিয়ে পরিচয়টা স্থায়ী করা [illegible] মানে বন্ধুত্বটা। আপত্তি নেই [illegible] বলুন!'......

'ভালো পিসি, ওকে এখানে [illegible]

চমকে উঠল বীথি। না, এখন [illegible] বীথি হঠাৎ ভীষণ অসহায় বোধ [illegible] সত্যি তরুণই এসেছে। কিন্তু [illegible] ক'দিনের পরিচয়ে ওদের বাড়ি চলে [illegible] ভাবতেই পারে নি। নিশ্চয়ই [illegible] কাছ থেকে ঠিকানা নিয়েছে। [illegible] কথবে? এ বাড়িতে বসাবে কোথায়? [illegible] দোরের যা চেহারা! তার ওপর [illegible] কি ভাববে? দাদারা যদি শোনে! [illegible] বীথির বুকের ভিতরটা ভারী [illegible] হয়ে উঠল।

সীমার মুখের দিকে তাকিয়ে বীথি সচেতন হল। 'শোন, গিয়ে বল, [illegible] একটু দাঁড়ান, আসছে।' সীমা যাবে [illegible] পিছন ফিরতেই বীথি ওর [illegible] আচমকা ধরে ফেলল, 'এই, তোর [illegible] গায়ে দিয়ে নে।' মেঝেয় পড়ে থাকা [illegible] জামাটা হাতে দিল।

সীমা জামাটা গায়ে [illegible] বাইরে চলে গেল।

বীথি সামান্য কয়েক মুহূর্ত [illegible] দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে চোখ বুলোল। [illegible] কি মনে হল, তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে এগিয়ে এল। মাকে ঠেলা দিয়ে ডাকল, 'মা!'

ঘুম ভেঙে গেল ভুবনময়ীর। [illegible]

'তাড়াতাড়ি ওঠ, এক ভদ্রলোক এসেছে কলকাতা থেকে।'

'কে?' সংগে সংগে উঠে বসলেন ভুবনময়ী।

'আমার সেই যে বান্ধবী শোভনার [illegible] গল্প করেছি তোমাকে। তার দাদা।'

নির্বিকার চোখে তাকিয়ে থেকে ভুবনময়ী বললেন, 'কেন এসেছে?'

'কি জানি। বোধ হয় শোভনারই কোন দরকারে।'

এতদিন তো আসেনি! তা-ও এই
এখন কোথায় বসাবি?'
...র তাড়াতাড়ি ওঠ না। নতুনবৌদির
...ও। এ ঘরটা একটু পরিষ্কার করে
...ড়।'
...মেঝের ওপর উঠে দাঁড়ালেন
...কে তখনো ঘুমোতে দেখে
...লেন। 'ওঠ তো বাবা, তোর মায়ের
... কলকাতা থেকে লোক এসেছে,
...।'

...ঘুম-ভাঙা চোখ রগড়াতে
...একটু ভুবনময়ীর সংগে ঘর থেকে
...গেল, বীথি এবার একা ঘরের মধ্যে
...। ঘরটাকে কিভাবে একটু
...যায় ভাবছে। সব পরিষ্কার
...না। অথচ এ ঘরে না বসালে
...কোথায়? নতুন বৌদির ঘরটা একটু
...পরিচ্ছন্ন, কিন্তু ছোট আর একটা-
...থাকায় ভীষণ গুমোট। মেজ-
...অনেক জিনিসপত্তর।
...মেজবৌদি ভীষণ নোংরা। ঘরের
...জামা-কাপড়ের দিকে তাকানো
...পরিষ্কার হলে কি হবে,
...পুরুষ, বিশেষ করে বীথির
...কি ভাল মনে বসতে

...কথাগুলো ভেবে নিয়ে বীথি
...এক অসহায়তায় কাঠ হয়ে গেল।
...ভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ওদের
...তক্তপোশটায় ছেঁড়া ময়লা
...তোশক-দেওয়া বিছানা, ওপরের
...চাদরটা ময়লা ছিল বলে আজই
...সাবান জলে দিয়েছে বীথি।
...করে নতুন বৌদির ঘরে ঢুকল।
...কণিকার সংগে কথা বলছিলেন,
...গেলেন।
...তোমার একটা নতুন চাদর
...?'
...কেন, কে এসেছে?'
...পরে বলছি, দাও না। ভদ্রলোককে
...পারছি না।'
...তালা-না-দেওয়া ট্রাঙ্কটা খুলে
...কাচানো ইস্ত্রি-করা বেড-শীট বের
...দিল।

বীথি আর একটুও দেরী না করে
...বিছানার ওপর চাদরটা পেতে দিল।
...তক্তপোশটাও ঢেকে গেল। আর
...ঘরটায় চোখ বুলোতে গিয়ে একটা
...থেমে গেল। ছেঁড়া তেল-
...বালিশ, বালিশ কাঁথাগুলো
...চট-চাপা হয়ে ঘরের কোণটায়
...রয়েছে। 'ইস্, এগুলোকে নিয়ে
...কি করি? কি চাপা দেব?' বিড়-বিড়
বীথি। কিছু ঢাকা দিলেও তো দেখা
...তা ছাড়া ঢাকা দেবেই বা কি দিয়ে?
...নিজের দু'খানা শাড়িই ধোবাকে
...কাচতে। একটা আলনায় ঝোলানো।
...দিয়ে চাপা দিলে তরুণবাবুই বুঝতে
...ব্যাপারটা। প্রথম পরিচয়ের দিন
...সামনে ওটা পরেই তো
...ছিল।

কি করবে এখন? হঠাৎ কি ভেবে জড়ো করা নোংরা পুঁটলিটা দু'হাতে তুলে নিল। বেশ কয়েকটা আরশুলো সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল মুহূর্তে। কণিকার ঘরের সামনে এসে বলল, 'এটা একটু তোমার ঘরের কোণে ফেলে রাখব?'

'সে কি! আমার ঘরে জায়গা কোথা? একটু মেজদির ঘরে রাখ না।'

বীথি দ্রুত মেজবৌদির ঘরে চলে এল। মেজবৌদি অরুণা ততক্ষণে মেঝেয় উঠেছে। 'কি ব্যাপার ঠাকুরঝি?'

'এটা একটু রাখবে বৌদি? এক ভদ্রলোককে আমাদের ঘরে বসাতে হবে। এগুলো সামনে রাখতে বিচ্ছিরি লাগছে।'

'কিন্তু আমার ঘরে জায়গা কোথা? তা ছাড়া যা নোংরা! সমস্ত আরশোকা আমার ঘরে ঢুকবে। তুমি দালানে রেখে দাও না।'

'দালান দিয়ে তো আসবেন।' বীথির কণ্ঠে অসহায়তা।

'তুমি ফেলে রাখ না। দেখবে না।'

বীথি রীতিমত ঘামছে। 'সেই ভাল। এই জানালার কাছে রাখলাম বৌদি।' পুঁটলিটা রেখে বীথি নানাভাবে ঢাকতে লাগল দ্রুত হাতে।

'কে এল?' অরুণা উঠে বসেছে।

'আমার এক বান্ধবীর দাদা।'

'হঠাৎ?'

'কি জানি। বোধ হয় শোভনা কোন দরকারে পাঠিয়েছে।'

'একা এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'এই দুপুরে! কি ব্যাপার!'

বীথি অরুণার দিকে তাকাল। একটু হাসল। 'ব্যাপার আর কি? জরুরী কোন দরকার বলেই এসেছেন হয়ত।' বীথি চাপা গলায় কথা বলতে বলতে নিজের ঘরে চলে এল।

ঘরের মেঝের আরশোলাগুলো সব পালিয়েছে। ঘরটা এখন একটু ফাঁকা। দড়ি ঝোলানো আলনা থেকে তাড়াতাড়ি জলে ধোয়া ময়লা ব্রা-টা সরিয়ে নিল বীথি। কয়েকটা নোংরা জিনিসপত্তর তক্তপোশের তলায় ঢুকিয়ে দিল। ঘরের ওপাশে দেয়াল আলমারি-ঢাকা ছেঁড়া ময়লা কাঁথা-কাপড় দিয়ে তৈরি পর্দাটার আর কিছু করা যাবে না মনে হতেই বীথি বুঝতে পারল, তরুণবাবু অনেকটা সময় বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। এবার ডেকে আনতে হবে। নিজের পোশাক দেখল। কাপড়টা একেবারে আটপৌরে, ময়লা, ছেঁড়া। জামাটারও পিঠের দিকটায় একটু সেলাই করা। এই পরে কি ডাকতে যাবে? কিন্তু এখনি পরার মত কাপড় একটাই আছে আলনায় কোঁচানো। বদলালে বৌদিরা কিছু বলবে না তো? নাকি না বদলেই পরা কাপড়টাকে গুছিয়ে পরে ডাকতে যাবে? ভাবতে ভাবতে পরনের কাপড়টা সন্তর্পণে শরীরের ওপর পরিপাটি করে নিল। ছেঁড়া অংশগুলো আপাতত একটুও দেখা যাচ্ছে না। পিঠ-বুক ভাল করে ঢেকে নিল। গরমে ঘামে জামা ভিজে গেছে। দ্রুত ভাঙা আর্শিটায় মুখ দেখল। খোলা চুলে খোঁপা করে বীথি দালান ধরে বাইরের দরজার সামনে এল।

সীমা দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তরুণকে একমনে দেখছে। বুড়ো আঙুলটা চুষছে একভাবে। বীথি সীমার পিছনে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন। আসতে আমার খুব দেরী হয়ে গেল। যা-তা ভাবছেন তো?'

তরুণ রোদে দাঁড়িয়ে রীতিমত ঘামছিল। ফর্সা রঙ রোদে পুড়ে লাল হয়ে গেছে। ঘন ঘন মুখ-ঘাড় মুছছে রুমাল দিয়ে। বীথির কথায় একটু এগিয়ে এল। হাসল। 'আপনি বুঝি খুব ভাল?'

'কেন?'

'না হলে ভাজোপিসি হলেন কি করে?'

'ও।' বীথি সীমার দিকে তাকিয়ে সলজ্জ হাসল। 'থাকে কথা ছাড়ুন, তাড়াতাড়ি ভিতরে আসুন। যা রোদ!'

ঘরের ভিতরে পা দিতে দিতে তরুণ বলল, 'খবর না দিয়ে, অর ওপর আবার দুপুরে এসেছি বলে খুব অপ্রস্তুত বোধ করছেন তো?'

'কখনো আপনি বুঝতে পারবেন?'

'তার মানে অপ্রস্তুত হয়েছেন, এই তো?'

'না, মা এলে ভালই করতেন। নিশ্চয়ই কোথাও কাজে এসেছেন এদিকে?'

'কেন, কাজ না থাকলে কি আসা যায় না?'

'তা আসবেন না কেন! সেটা তো আমার বাড়ি হবে, আমার ধারণায় ছিল না।'

'তার মানে চলে যেতে বলছেন? বেশ ভাল।' বলেই তরুণ বীথির ঘরের দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আরে, কি করছেন? আপনি একটা কথায় এত মানে ধরেন! আপনাকে কোন কথাই বলা যায় না তা হলে!'

তরুণ হাসতে হাসতে জুতো বাইরে খুলে রেখে ঘরে ঢুকল। তক্তপোশের ওপর বসল। 'আপনাদের ইলেকট্রিক নেই বুঝি?' সিলিং-এর দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে বলল তরুণ।

'না। এখানে আর সব বাড়ি আছে, আমাদেরটায় আসেনি। মাটির বাড়ি, তার ওপর বাড়িওয়ালার ব্যাপার... বীথি

কথাগুলো বলে হাতপাখাটা সামনে ধরল। 'পাখাটা ছেড়ে দেবেন কিন্তু। বাতাসের ব্যাপার বোঝেন তো! দিন।'

তরুণ পাখা হাতে নিয়ে বাতাস খেতে লাগল। বাঁ হাতে ঘাড় মুছছে। 'এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়ান আগে। উঃ, আজ কিন্তু ট্রিমেণ্ডাস গরম!'

'আসছি, আপনি বসুন।' বীথি ঘরের বাইরে এল।

রান্নাঘরে ঢুকতে যাবে, দীপেনকে ঘরে ঢুকতে দেখল। দীপেন বীথির সেজ-জ্যাঠামশাই-এর একমাত্র ছেলে। বছর ত্রিরিশ বয়স। বাড়ির ছেলেদের মধ্যে ওই সবচেয়ে ছোট। ওকে দেখে বীথি থমকে দাঁড়াল। 'ছোড়দা, তুমি আমাদের ঘরে একটু যাও না। কলকাতা থেকে একজন এসেছেন, কথা বলো, আমি যাচ্ছি।'

'যাচ্ছি। কিন্তু কে?'

'আমার বান্ধবী শোভনার দাদা। তরুণ চৌধুরী।'

দীপেন সোজা বীথিদের ঘরে চলে এল। 'নমস্কার।'

'ও, নমস্কার।' তরুণ হাতের কাগজটা খুলে চোখ বুলোচ্ছিল। ঈষৎ চমকে তাকাল।

'আমি বীথির ছোড়দা। আপনি বুঝি বীথির সঙ্গে একসঙ্গে পড়েন?'

'না, ঠিক তা নয়।' একটু হাসল তরুণ। কথা ঘোরাল, 'আচ্ছা এটা কি আপনাদের নিজেদের বাড়ি?'

'না, এটা ভাড়া বাড়ি। এই ধরুন, বছর আটেক আছি। তবে আমাদের নিজের বিরাট বাড়ি, কয়েক বিঘে পুকুর, জমি আছে আরও ইন্টিরিয়ারে। সে দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। নেহাত চাকরির খাতিরে এই বাড়িতে পড়ে থাকতে হচ্ছে। 'এরকম ন্যাস্টি বাড়িতে থাকতে আমাদের ফ্যামিলির কেউই অভ্যস্ত নয়।'

'ও' তরুণ থামল। 'আপনি কি করেন— চাকরী?'

'না, এখনো পাইনি, এবার পাবো।' একটু থেমে বলল, 'বীথুটা পাশ করলেই আমার চাকরী।'

'তার মানে!'

'মানে, আমার এক বন্ধুর এখানকার একটা অফিসের ডিপার্টমেন্টাল হেড। বীথুটা খুব ইন্টেলিজেন্ট। ... দাদা ওকে দেখেছেন। সেটেনো রাখছে নিয়েছেন। সেই সঙ্গে আমাকেও ... একটা কাজে। ভদ্রলোক ব্যাচিলার। ... তবে আপনার মত নয়।' হাসল দী...

তরুণ সলজ্জ হাসল। 'মানে ... বীথুর বড় কাজেও লাগতে পারে ...

'হলে মন্দ কি? ব্যাপারটা ... মেয়েদের চাকরী করতে দেওয়াটা ... ফ্যামিলিতে কেউ চায় না। কিন্তু ... উইডো যা মানে আমার কাকিমা ... নেই। এই সব ভেবেই আমি ... ইন্টারেস্ট নিয়েছি। এর সঙ্গে ... জড়িয়ে আছে। আজকাল চাকরী ... বোঝেন তো!'

বীথি ঘরে ঢুকল। 'কি বলছ ... তোমার চাকরী হল?' বলতে বলতে ... তরুণের সামনে ধরল।

'হবে এবার।' দীপেন তরুণের ... তাকিয়ে বলল, 'আমি আসি। আমার ... এখনি যেতে হবে।'

'আচ্ছা, আসুন।' তরুণ হা... নমস্কার করল।

দীপেন বেরিয়ে যেতেই তরুণ ... করল, 'আপনাদের নিজেদের বাড়িটা ... গ্রামে বললেন তো? আমাদেরও ... কিন্তু বর্ধমানের এক গ্রামে।'

বীথি ভিতরে চমকে উঠল। ছোড়দা... সেই বানানো গল্পটা এরই মধ্যে ... গেছে! বীথি আড়ষ্ট বোধ করল। ... দিকে তাকিয়ে বলল, 'ছাড়ুন তো। ... তো আবার সেখানে যাবেন?'

হো হো করে হেসে উঠল ... হাসির দমকের মধ্যেই গলা নামিয়ে ... 'তা ঠিক। তবে আপনার জন্যে যেতে ... আপত্তি নেই। আপনার এ্যাট্রাকশান ... নয়!'

'আপনি বসুন, আমি আসছি।' ... আরক্ত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

অরুণা বড়জা সমিতার ঘরে ... দরজার ফাঁক দিয়ে বীথিকে বাইরে ... দেখেই দরজার সন্তর্পিত ফাঁকটা বন্ধ ... আস্তে আস্তে। অরুণা বলল, ... হল?'

সমিতা অরুণার চোখে চোখ ... 'কি আবার? দুজনে তো দুজনকে ... বলছে।'

'আজকাল এভাবেই হয়। আপনি ... জানেন না দিদিভাই।'

'ছেলেটির কিন্তু বয়স বেশী ... আর? বড় জোর তিরিশ। তবে বেশ ... হওয়া আছে।'

...দেখতে!' অরুণা চোখ বড় করল। ...ই ভাল।'

'...বড় তুমি! একটুতেই যদি ...হয়ে যায়, তা হলে অনেকেই অনেক ...করতে পারে। ওর পাশে আমাদের ...কে কি রকম মানায়, একবারও ...

...কে পাশের ঘরে ঢুকতে দেখে ওরা ...উঠে দাঁড়াল।

...দেখে ভুবনময়ী ঘরের মেঝেয় ...এতক্ষণ শুয়েছিলেন। 'হ্যাঁরে ...শোভনার কিরকম ভাই?'

'...আবার! যেমন ভাই হয়!'

'...আমি বলছি আপন ভাই?'

'...সম্পর্কের ভাই।'

'...কাছে এসেছে কেন?'

'...কথা বল। পাশের ঘরে ...আছেন।'

...বীথির মুখের দিকে তাকিয়ে ...চাইছেন। বললেন, 'এ বাড়িতে ...বাইরের ছেলেকে হট্ করে ...কারসাজি বীথু।'

'...ওসব পরে বলবে। এখন চুপ

'...কেন? আমি ওসব পছন্দ ...পাড়ার লোকে কি বলবে? আজ ...বাড়ির মেয়েদের কোন ছেলেবন্ধু ...আমার চার মেয়ের বিয়ে ...কত বড় বড় মেয়েরা ...কোথা থেকে ...বলতে পারে? তখন সামলাবে

...বীথি চাপা রাগে যেন চেঁচিয়ে

...এখন থামুন ছোটকাকিমা। ...ভদ্রলোক আছেন। চলে গেলে না ...কথা বলবেন।' কণিকা বলল। ...বলল, 'ভদ্রলোক খুব ...ঠাকুরঝি, আর বয়সও কম। ...কাকিমা ভয় পাচ্ছেন!'

'...কথা ছেড়ে দাও।' একটু থামল ...আমায় তোমার একটা কাপড় ...পরে কিছুতেই সামনে যেতে ...পারছি না। আমার ...এমনভাবে আলনায় গোছানো, ও'র ...যাচ্ছে না!'

...বীথির সমবয়সী। এ বাড়িতে ...বন্ধুর মতন। মৃদু হাসতে ...ওর একটা শাড়ি বীথিকে ...বলল, 'জামাটাও পাল্টে নাও।' ...ঘরের কোণে নিয়ে গেল। ...একটু বড় হতে পারে, তবু ...অবস্থা যা, তাতে কাঁধের কাছে ব্রা-র স্ট্র্যাপ তো কখনই জামায় ঢাকা থাকে না। তোমার পরা ব্রা-টা একবার দেখ, ছেঁড়া আর ময়লা।'

'যাও, কি অসভ্য তুমি!' ফিসফিসিয়ে বলল বীথি। বীথির ফর্সা গাল, দু'কানের চারপাশ লাল হল মুহূর্তে।

ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে থেকে বীথিকে কাপড় পরতে দেখে নমিতা ঘরে ঢুকল। 'কে এসেছে ছোটকাকিমা?' গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল নমিতা।

বীথি উত্তর দিল। 'আমার বান্ধবী শোভনা, তার দাদা। বর্তমানে দরকারে এসেছেন, একবার আমাদের বাড়ি ঘুরে যাচ্ছেন।'

'তুমি আসতে বলেছ ঠাকুরঝি?'

'শোভনার কাছ থেকে ঠিকানা পেয়ে এসেছেন।'

'তা কখনো হয়? তুমি নিজে না আসতে বললে আসবে কেন?'

বীথির কাপড় পরা হয়ে গেছে। মেজ-বৌদির দিকে একবার তাকাল। বড়বৌদিকে চেনে। কথা না বাড়িয়ে নীরব থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অরুণা ঘরে ঢুকল। এতক্ষণ দালানে দাঁড়িয়ে দরজার আড়াল দিয়ে তরুণকে দেখছিল। ঘরে ঢুকে কণিকার দিকে একবার তাকিয়ে ছোটকাকিমাকে দেখল। 'কাকিমা, আপনি জানতেন ছেলেটি আসবে?' অরুণার কণ্ঠস্বর চাপা হলেও জোর শোনাল।

'আমাকে আবার কি বলবে?'

'কিন্তু বড়ভাসুর বা তাঁর মেজভাই শুনলে কি বলবেন, একবারও ভেবেছেন?' অরুণা ভুবনময়ীর সামনে দাঁড়াল।

নমিতা যেন বিড় বিড় করল, 'আমি দেবদাসকে বলে রেখেছি, বীথু পাশ করলেই বিয়ের ব্যবস্থা হবে। দেবদাস পাত্র হিসেবে খারাপ নয়। হোক আগেকার ম্যাট্রিক পাশ, বা একটু বয়স বেশী। ভাল চাকরী করে। আর আপনারাই তো দেখে কথা দিয়েছেন। এখন আমি কি করি!'

'তুমি এসব কি বলছ বড়বৌমা?'

'ঠিকই বলছি। ছেলে কালো বলে অমত তখনি বলতে পারতেন। আর মেয়ে নিজে পছন্দ করেছে, এটাই বা গোপন করার কি ছিল?'

'আস্তে কথা বল বৌমা।' একটু থামলেন ভুবনময়ী। 'তুমি কেন ভাবছ ও অন্য কিছু করছে?'

'কিন্তু এত সুন্দর দেখতে একটি ছেলে এমন ভরদুপুরে অকারণ আসতে যাবে কেন? এ তো নাটক-নভেলেই ঘটে! কলকাতার হস্টেলে রেখে মামাবাবু না হয় পড়াশুনোর সব খরচ দিচ্ছেন। তা বলে আপনাদের কি অন্য খোঁজখবর রাখা উচিত ছিল না কি?'

ভুবনময়ী নীরব রইলেন। এমনিতে ভীষণ শান্তপ্রকৃতির। তার ওপর বছর পাঁচেক আগে স্বামীর হঠাৎ মৃত্যুর পর থেকে একেবারে বোবা হয়ে গেছেন।

একান্নবর্তী সংসারে অভাবটাও ভীষণভাবে আঘাত করে গভীরভাবে। মনে মনে বিড়-বিড় করলেন—'বীথি কি সত্যি নিজে কিছু ভেবেছে? কিন্তু আমার কোন মেয়েই তো এরকম নয়! বীথিকেও তো এসব ব্যাপারে ভাবাই যায় না!'

'ছেলেটিকে ভাল করে দেখেছেন? বিরাট বড়লোক বলে মনে হল। এ তো আগুন! বীথির পুড়তে কতক্ষণ?' নমিতার কণ্ঠে ক্ষোভ স্পষ্ট। 'আমি এখন দেবদাসকে কি বলব, তাই ভাবছি।'

'আপনি অকারণ ভাবছেন দিদিভাই।' কণিকা এতক্ষণ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে ছিল। বেশ কয়েক মাস নমিতার সঙ্গে কথা বন্ধ। এই মুহূর্তে কথা না বলে পারল না। 'এসব কিছু না-ও হতে পারে তো! এমনি হয়ত ভদ্রলোক এদিকে এসেছেন, ঘুরে যাচ্ছেন! ঠাকুরঝিকে দেখে যা মনে হল, ও তো এসব কিছুই জানে না! একেবারে অপ্রস্তুতে পড়েছে। একটা মেয়ে সত্যি কিছু করলে এত অপ্রস্তুত হবে কেন! কলেজে পড়া মেয়ে!'

'তুমি থাম কণিকা। বালিগঞ্জের মেয়ে তো তুমি। নেহাৎ বাবা জোর করে এরকম বাড়িতে বিয়ে দিয়ে ফেলেছে' বলে গলা নামিয়ে কথা বলছ। তুমিই তো সব শেখাও?'

কণিকা চুপ করে গেল।

অরুণা কিছু বলতে যাচ্ছিল, বীথি ঘরে ঢুকল। ঘরের মধ্যে নীচু গলায়, কখনো বা ফিসফিস করার মত কথা হচ্ছিল বলে বুঝতে পারেনি। ঘরের মেঝেয় দাঁড়িয়ে বলল, 'মা, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছেন! বৌদি, তোমাদের সঙ্গেও।' বীথি সকলের দিকে একবার দৃষ্টি ঘোরাল।

'আমি কি করে যাব? আমি বেরুতেই পারব না।' ভুবনময়ী বললেন, 'লোকের সামনে পরে বেরুবার মত একটা কাপড় দিয়েছিস?'

অরুণা নমিতা পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি বিনিময় করল।

'কিন্তু তরুণবাবু বারবার বলছেন যে!' বীথি যে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছে, কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল। 'যত বোঝাচ্ছি মা আসতে পারবে না, একটু অসুস্থ আজ, বলছেন, তা হলে আমি নিজে গিয়ে দেখা করছি। পাশের ঘরে আছেন তো? এখন বল, আমি কি করি?'

অরুণা-নমিতা উঠে দাঁড়াতেই বীথি বলল, 'বড়বৌদি তুমি চল। আলাপ করিয়ে দি। তুমিও এসো মেজবৌদি। একবার শুধু পরিচয় হলেই হল।' বলে কণিকার দিকে চোখ ঘোরাল।

'চল।' কণিকা হঠাৎ বেরুবার জন্যে দরজার দিকে এগোল। অরুণার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসুন না মেজদিভাই, এতে ক্ষতি কি?'

তিন বৌদি বীথিদের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বীথি ওদের আগেই ঘরে ঢুকেছে। তরুণ ছোটদের একটা পড়ার বই-এর পাতা ওলটাচ্ছিল। হাতে ভাঙা হাতপাখাটা। একটু ঘামছে তরুণ। ঘরের মেঝেয় সীমা মুখের মধ্যে বুড়ো আঙুল নিয়ে একভাবে তরুণকে দেখছে। এর মধ্যে নমিতার দুই ছেলে, অরুণার এক ছেলে, আর এক মেয়ে এসে সীমার কাছে বসেছে। অরুণার ছোট ছেলেটি নাক খুঁটছে বসে বসে। কণিকার তা চোখে পড়তে বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকে তরুণকে দেখল।

'এই দেখুন, আমার বড়বৌদি, ইনি মেজবৌদি, এ ছোটবৌদি।'

'ও, আচ্ছা, নমস্কার, নমস্কার।'

'এঁর নাম তরুণ চৌধুরী। শোভনার দাদা, ভীষণ ভাল গান জানেন।'

'গানে ইনিও কম নন।' বীথিকে দেখিয়ে তরুণ হাসতে হাসতে বলল, 'আপনাদের শুনিয়েছেন কিনা জানি না, কিন্তু সত্যি খুব ভাল গলা।'

'তাই বুঝি?' কণিকা হাসল। 'আমরা এতদিনেও যা শুনিনি, আপনি শুনলেন কোত্থেকে?'

'শোভনা, মানে আমার বোনের কাছ থেকে।'

হেসে উঠল কণিকা। বীথিও।

অরুণার ঘরে বাচ্চাটা কেঁদে উঠতেই অরুণা বলল, 'আমি একটু আসছি, আমার আবার ছেলে কাঁদছে।'

'নিশ্চয়ই আসুন। এমন দুপুরে সকালের ঘুম ভাঙিয়েছি, পাপটা তো আমারই!' হাসতে লাগল তরুণ।

অরুণা-নমিতা দুজনেই অল্প হাসল। নমিতা একদৃষ্টে তরুণকে দেখছিল। অরুণা সরে আসতেই নমিতাও পিছু পিছু চলে এল। কণিকাও থাকল না। 'আসি, আপনি বসুন।' তরুণ হাসতে কণিকা নিজের ঘরে চলে এল।

'কই, আপনার মাকে তো দেখলাম না?'

'আসছে।' বীথি কণিকার ঘরে এল।

'মা, একবার চল তো!' বলেই মায়ের দিকে তাকাল। নোংরা ছেঁড়া কাপড় আর মায়ের মুখের কঠিন অথচ অসহায় রেখা-গুলি দেখে ঝিমিয়ে গেল।

'এ অবস্থায় যাবেন কি করে?' কা[illegible] কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন অসহায়তা।

'দাদার কোন ধুতি নেই?'

'দাদা তো প্যান্ট পরে বীথি, [illegible] একখানা ধুতি আছে, তা লাল পাড়। [illegible] পরবেন না!' কণিকা বলল।

'দীপুকে বললি না কেন?' [illegible] দীপেনের কথা বলল। 'তারচেয়ে বড় [illegible] কাছে একবার খোঁজ কর।'

বীথি বুঝল, মা বড়বৌদিকে [illegible] জিজ্ঞেস করতে বলছে। কিন্তু না [illegible] বড়বৌদি রেগে যাবে, মা জানে। [illegible] বীথির ভীষণ খারাপ লাগছে। [illegible] একটিও কাপড় নেই, যখনি ভাবে [illegible] মন খারাপ হয়ে যায়। কলকাতা [illegible] আসার সময় ভেবেছিল কিনবে [illegible] পয়সায় কুলোয়নি। মামাবাবু যে কটা [illegible] হস্টেলে থাকা, পড়ার খরচ ইত্যাদির [illegible] দেন, তাতে চলে না। তার ওপর [illegible] বাবুকেও চাপ দেওয়া যায় না। তাই [illegible] টিউশনি করে চালাতে হয়। মা [illegible] জানেন না, বাড়ির কেউ না।

বীথি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বড় [illegible] কাছ থেকে চাইতেও খারাপ লাগে। [illegible] কোন্ অর্থে কি কথা নেবে, বলবে [illegible] বুঝতে পারে না বলে বৌদিদের [illegible] ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায়। শুধু [illegible] অসহায় অবস্থাটা ভেবে বীথি [illegible] বড়বৌদির ঘরে এল।

'বৌদি, দাদার কোন কালো পাড় [illegible] আছে, দেবে?'

নমিতার ভিতরে চাপা রাগ [illegible] হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার দাদা [illegible] জানই, একটা সামান্য কাপড়ের দোকানের সেলসম্যান। কটা টাকা মাইনে [illegible] চার-পাঁচখানা কাপড় জমানো থাকবে [illegible]'

'তুমি এভাবে কথা বলছ কেন বৌদি?' বীথি মাথা নীচু করে শান্ত গলায় [illegible]

'না, এমনি বলছি। তা ছাড়া [illegible] কাপড় ছিল, বাচ্চাদের কাঁথা করে ফেলেছি।'

'আচ্ছা।' বীথি ঘরের সামনে থেকে [illegible] এল। বুকের মধ্যেটা টনটন করছে [illegible] এখনি বোধহয় দু' চোখ বেয়ে জল [illegible] পড়বে। দালানে দাঁড়িয়ে থেকে [illegible] ভাবল। দীপেনের কথা মনে পড়ল [illegible] অনেকটা বন্ধুর মতন। ওর কালো [illegible] কাপড় আছে। কি ভেবে ছোড়দার ঘরে [illegible] এল। ছোড়দা কিছু না বলে কাপড় দি[illegible] আপত্তি করে না। ও বীথিকে একটু [illegible] চোখে দেখে। বীথি ধীর পায়ে ওর [illegible] দিকে এগোল।

নমিতা অরুণার ঘরে চলে এল। অ[illegible] ছেলের মুখে স্তন দিয়ে ঘুম পাড়া[illegible] নমিতা সামনে বসে বলল, 'বল তো, [illegible] কাছে কাকিমার জন্যে একটা কাপড় [illegible] এসেছিল ঠাকুরঝি, আমি দি কোত্থেকে [illegible]'

'তাই বুঝি?' অরুণা [illegible] নমিতার দিকে তাকাল। 'মা দিতে [illegible] গেছে!'

'কি জানি! আমার কি? নেই, সত্যি বলেছি।' নমিতা চুপ করল। অন্যমনস্ক।

অরুণ ছেলের পিঠে হাত বোলাতে লাগল একভাবে। কোন কথা বলছে না।

'ছেলেটিকে তোমার কিরকম মনে হল?' নমিতা বলল।

'কি জানি, আমার তো সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।'

'কেন?'

'ছেলেটিকে দেখতে কিন্তু খুব ভাল! সত্যি জামাই করার মত?'

'তোমার বড় মেয়ে এখন স্কুলে। থাকলে ভাল হত বলছ? ক্লাস ইলেভেনে পড়ছে যখন, আলাপ করিয়ে দিয়ে চেষ্টা করতে নাকি?'

'না, এতোটা ভাবছি না। আমার অন্য ভয় হচ্ছে।'

'কিসের ভয়?'

'আপনার তো বড় বলতে সবই ছেলে দিদিভাই। আমার বড়মেয়ের পরেও দুই মেয়ে। বিয়ে দেব কি করে?'

'কেন? বীথু কিছু বলে গেল তোমাকে?'

'ভাবছি, ও যদি নিজে পছন্দ করে বিয়ে করে, সে তো একটা কেচ্ছা। তার পরেও কি আমাদের বাড়ির অন্য মেয়েদের বিয়ে হবে?'

'তা ঠিক। এটা তো আমি ভাবিনি!' নমিতার কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

'আবার জাতটা কি হতে পারে ভেবে দেখেছেন দিদিভাই? চৌধুরী বললে তো অনেক জাতই হয়। অনেক মুসলমানও তো চৌধুরী আছে। আবার পোড়া বাংলাদেশ হয়েছে এখন, সব মুসলমানেরা এদিকে আসছে। ছেলেটির যে রকম লম্বা চওড়া চেহারা, এ যদি সত্যি তা-ই হয়!'

'আমিও ছেলেটাকে দেখার পর তা-ই ভাবছি ভাই।' নমিতা অন্যমনস্ক হল।

'অথচ দেখুন, এ বাড়ির ছেলেরা [illegible] করার সাহস করেনি, সামান্য একটা মেয়ে কি করতে যাচ্ছে!'

'করতে যাচ্ছে কি, করেছে! একটা পাগল নমিতা। দেখলে না, গানের পর্যন্ত শানিয়েছে, মেয়ে কলকাতার গানও শেখে লুকিয়ে লুকিয়ে। ছিঃ ছিঃ, আমি কোথায় টাকাপয়সা খরচ করতে পারবে না বলে আমার ইঞ্জিনীয়ার মামাতো ভাই-এর সঙ্গে সম্বন্ধ করেছিলুম। এখন কেলে-ঙ্কারির বাকি থাকল কি?'

অরুণা কি বলতে যাচ্ছিল, বীথি ঢুকল অরুণার ঘরে, 'মেজবৌদি, মা বলল, তোমার কাছে একটা টাকা হবে?'

'কেন?'

'মিষ্টি আনতে দেবে। মায়ের কাছে তো কিছু নেই।'

আমার হাতে তো ও কিছু রাখে না ভাই, কোথেকে দেব? ছোটকাকিমা তো জানেন। সে নিয়ে কত ঝগড়া হয় ওর সঙ্গে! জেনেশুনেও চাইছেন কেন?'

বীথি একটুকাল নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কণিকার ঘরে এসে বলল, 'নতুন বৌদি, তুমিই দাও না ঐ একটা টাকা। তোমার তো কাল সকালে লাগবে? জানি মাসের শেষ, আমি বরং ছোড়দার কাছ থেকে চেয়ে তোমায় দেব অক্ষ সন্ধ্যেতেই।'

'মেজদিভাই দিলেন না?'

বীথি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'মাসের শেষ, কি যে করি! কলকাতা থেকে আসার পর আমার যা ছিল, সব মা নিয়ে নিয়েছে আগেই।'

'কিন্তু আমার এক টাকায় হবে তো?'

'তা-ও তো হবে না। চা, চিনি, দুধ নেই। যা আছে, তাতে তো বাড়িরই হবে না।'

কণিকা অসহায়ভাবে বীথির দিকে তাকিয়ে ছিল, বলাই ঢুকল ঘরে। বড়দার বড় ছেলে। বছর সতেরো বয়স হবে। পড়া-শুনো করে না, বড়দা একটা কাজে লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

'কাকিমা ও ঘরে সুন্দর মত ভদ্রলোক কে? দিদির সঙ্গে কথা বলছেন?'

'দিদির পরিচিত। খুব ভাল গান জানেন।'

'সত্যি! তাহলে তো কথা বলতে হয়। নিশ্চয়ই হিন্দী গান ভাল জানেন।'

বীথি হঠাৎ বলল, 'বলাই আস্তে কথা বল। এই শোন, একটাকার খাবার এনে দিবি?'

'হ্যাঁ, দাও।'

'একটু বাইরে শোন।' বীথি বলাইকে নিয়ে বাইরে এলো। 'তোর তো দোকান চেনা আছে ধারে চা, চিনি, গুঁড়ো দুধ আনতে পারবি?'

নমিতা সামনে এসে দাঁড়াল। 'ঠাকুরঝি আবার ওকে ধারে জিনিসপত্তর আনতে দিচ্ছ। এ নিয়ে কিন্তু আগে একটা গণ্ডগোল হয়েছিল।'

'কিচ্ছু হবে না, আমি ঠিক আনব।' বলেই বলাই দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

বীথি নমিতার অনেক কাছে সরে এল। 'বৌদি তুমি কিছু ভেবো না, আমি আজই ধারে দিয়ে দেবো। ছোড়দা আসুক।' ও হঠাৎ বেরিয়ে গেল। তখন খেয়াল হয়নি।'

নমিতার মুখে চাপা বিরক্তি। বীথিকে একবার দেখে নিয়ে সরে গেল সামনে থেকে।

বলাই খাবার, চা, চিনি, দুধ নিয়ে এলে বীথি মাকে ডাকল। 'মা একবার এসো।'

'কোন খাবার-টাবার আনবেন না যেন!' তরুণ বলল।

'বসো বাবা, তা কখনো হয় নাকি, এত-দূর থেকে এসেছ। কিছু মিষ্টিমুখ করতে হবে।' বলতে বলতে ভুবনময়ী বেরিয়ে এলেন। বলাই তরুণের কাছে চলে গেল।

কণিকার ঘরে ঢুকতেই বীথি বলল, 'মা, কিসে খেতে দেবে?'

'কেন? কাপ-ডিস তো আছে।'

'সব ভাঙা।'

'আমরা যেগুলোয় খাই, সেগুলোর কথা বলছি না। বৌমাদের কাছে চাও না!'

'বৌদিদের কাছে আমি চাইতে পারব না।' বীথির মুখ গম্ভীর।

ভুবনময়ী বুঝতে পারলেন। 'নতুন বৌমা, তোমার কাছেও তো নেই।'

'থাকবে কি করে? যা ছিল সব ভেঙে গেছে। আর কিনছে কই?'

বীথি বলল, 'আমি আসছি মা। পম্পা-দের আছে।' দ্রুতপায়ে দরজার সামনে থেকে সরে গেল বীথি, পাশের ঘর থেকে বলাই-এর সঙ্গে তরুণবাবুর কথাবার্তার শব্দ কানে আসছে।

বীথি চলে যেতে কণিকা জিজ্ঞেস করল, 'ছেলেটিকে কিরকম মনে হল?'

'খুব ভাল বৌমা। জামাই করার মত।' ফিসফিস করে বললেন, 'জান, আমার পায়ে হাত দিয়ে কেমন প্রণাম করল। অতো বড়-লোকের ছেলে তো! আর কথাবার্তা কি সুন্দর বলে!'

'বীথির পাশে মানাবে না?'

'সে ভাগ্য কি আর হবে? বীথি আমার দেখতে কি সুন্দর! ওর বাবার কত আশা ছিল!'

'ছোটকাকিমা, আপনাকে ও একবার ডাকছে। এখনি দোকানে বেরিয়ে যাবে। একবার আসুন।' দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে নমিতা বলল।

'যাচ্ছি বৌমা।' বলেই ভুবনময়ী কণিকার দিকে তাকালেন। 'বীথি বোধহয় [illegible] আনতে গেছে। এলে তুমি সাজিয়ে দাও বৌমা। আমি আসছি।' নমিতার ঘরে এসে বললেন, 'কি বলছিস প্রমথ?'

'বীথির কোন ছেলেবন্ধু নাকি এসেছে?'

'বীথির নয়। ওর এক বন্ধুর দাদা। এদিকে এসেছে কি দরকারে, তারে [illegible]।'

'এটা কি ভাল? হঠাৎ একটা ছেলেবন্ধুকে বাড়িতে আসতে বলে কোন সাহসে? যা তা ঘটতে পারে, তখন?'

ভুবনময়ী নীরব রইলেন।

'তাছাড়া দেবদাসের সঙ্গে বিয়ের কথা তো ঠিক। এখন এভাবে ছেলেদের সঙ্গে মিশলে আমাদের মুখ থাকে কোথায়?'

'এতসব ভাবছ কেন?'

'ভাবতে হয় ছোটকাকিমা।' অরুণা এগিয়ে এল। 'আপনার নাতনীকে তো বিয়ে-থা দিতে হবে। ওর এমন টাকা নেই যে সবকিছু চাপা দিয়ে বিয়ে দেবে!'

'আস্তে কথা বল বৌমা। বাইরের লোকটা এখনো আছে।'

'তাছাড়া বাইরের লোককে দাঁড়িয়ে খাও— আমাদের মত লোকের পক্ষে বিলাস। আমাদের বাজে খরচ করার পয়সা কোথায়? কারোর কাছে পয়সা, কারোর কাছে কাপড় ভিক্ষে করছে, এসব কি? আমরা যেমন, সেই ভাবেই থাকা ঠিক নয় কি?' প্রমথ একটু থেমে থামল, 'আমি চলি, দোকানে অনেক খদ্দের। বীথিকে একটু সাবধানে রাখবেন।' প্রমথ বেরিয়ে গেল।

ভুবনময়ী আর কোন কথা না বলে কণিকার ঘরে চলে এলেন। ও'র মুখ নীচু।

পম্পাদের বাড়িটা দুটো সরু গলি পেরিয়ে পড়ে। যদিও পম্পার ঘরের জানালা থেকে ওদের বাইরের দরজা দেখা যায়, তবু পম্পাদের বাড়ি পৌঁছতে ঘোরাপথে আসতে হয়। বীথি পম্পার ঘরের এপাশের জানালায় টোকা দিয়ে ডাকল, 'পম্পা, একবার খোল।'

জানালা খুলল পম্পা। 'কি রে!'

'তোদের একটা কাপডিস আর বড় প্লেট একবার দেনা। এখুনি দরকার।'

'একজন খুব সুন্দর দেখতে ছেলে তোদের বাড়ি এসেছে নারে?'

'তুই দেখেছিস?'

জানালা দিয়ে দেখেছি। কিন্তু মনে হয় তোদের বাড়ি যাবে না। তাহলে কোথাকার লোক?'

'হ্যাঁ, আমার বান্ধবীর দাদা।'

স্বাধীনতা সংগ্রামের তিন সঙ্গী

শিবদাস চক্রবর্তী

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত 'সিপাহী বিদ্রোহ', না 'স্বদেশী আন্দোলন' —এ নিয়ে একদা ঐতিহাসিক মহলে প্রবল বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। সর্বভারতীয় স্তরে এখনও সেই বাদানুবাদের উপর যবনিকাপাত হয়েছে, একথা জোর করে বলা না গেলেও, তার তীব্রতা যে এখন অনেক কম একথা অবশ্য স্বীকার্য। সিপাহী বিদ্রোহের উদ্ভব যে কারণেই ঘটুক, তার প্রসার যুক্তপ্রদেশ এবং আর কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল, তার তরঙ্গ সমগ্র ভারতভূমিকে প্লাবিত করতে পারেনি। আর স্বদেশী আন্দোলন ভাগীরথী তীরে উদ্ভূত হয়ে অচিরেই ভারত মহাসাগর অভিমুখী হয়েছিল। প্রশাসনিক অসুবিধার অজুহাতে বাঙালীর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনা, সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতাকে পঙ্গু করবার উদ্দেশ্যে বঙ্গব্যবচ্ছেদের কার্জনীয় চক্রান্তের সক্রিয় প্রতিবাদ স্বদেশী আন্দোলনের উৎস হলেও তার মোহানা সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ রহিতের সোচ্চার দাবি কণ্ঠে নিয়ে তার প্রথম আবির্ভাব হলেও এই দাবি দমনের জন্য প্রতিপক্ষের নির্লজ্জ নিষ্ঠুর আচরণ তার কণ্ঠে অচিরেই ধ্বনিত করে তুলেছিল প্রতিপক্ষের ত্রাসসঞ্চারী চরম আকাঙ্ক্ষার বাণী—বৃটিশের নিয়ন্ত্রণমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা। স্বদেশী আন্দোলনের জন্মের অনধিক এক বছরের মধ্যেই বিপিনচন্দ্র পাল বিখ্যাত 'বন্দে মাতরম্'-এর পাতায় (৬ সেপ্টেম্বর, ১৯০৬) এক ঐতিহাসিক ঘোষণায় বলেন—'...উই ডিজায়ার টু মেক ইট অটোনমাস, য়্যাবসোলিউটলি ফ্রি অব দি বৃটিশ কন্ট্রোল'। দাদাভাই নৌরজী কর্তৃক কংগ্রেস মঞ্চ থেকে 'স্বরাজ'-এর দাবি উত্থাপন এর কয়েক মাস পরের ঘটনা।

তখন অবশ্য আকাঙ্ক্ষাই অভিব্যক্ত হয়েছে, তার বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হয়নি। কিন্তু অকপট ও অক্লান্ত আকাঙ্ক্ষাই যে আকাঙ্ক্ষিত লাভের পূর্ব সর্ত, এ তো অস্বীকার করা যায় না। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার যথার্থই বলেছেন যে, ১৯০৫-এর ছোট গাঙ্ ক্রমশ নানা স্রোতোধারায় পরিপুষ্ট হয়ে ১৯১৯ থেকে বেগবতী নদীর মতো প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রসংগমে পৌঁছেছিল। সত্যই ১৯০৫-এ যার সূচনা, ১৯৪৭-এ তার পরিণতি। মহাত্মা গান্ধীও বঙ্গভঙ্গ রোধক এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে প্রায় সমসাময়িককালে বলেছিলেন—'দি রিয়েল অ্যাওয়েকেনিং (অব্ ইণ্ডিয়া) টুক প্লেস আফটার দি পার্টিশন অব্ বেঙ্গল।...... আফটার দি পার্টিশন দি পিপল স দ্যাট দে মাস্ট বি কেপেব্ল অব্ সাফারিং। দিস নিউ স্পিরিট মাস্ট বি কনসিডারড টু বি দি চিফ রেজাল্ট অব দি পার্টিশন'।

মহাত্মাজী কথিত এই 'নিউ স্পিরিট' বা নতুন মেজাজের তাৎপর্য বিপিনচন্দ্র আগেই স্ব-প্রতিষ্ঠিত 'বন্দে মাতরম'-এ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'নিউ স্পিরিট' শীর্ষক দুটি প্রবন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন। এই মেজাজের মূলে ছিল যে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মনির্ভরতার আকাঙ্ক্ষা, একথার উল্লেখ করে প্রথম প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন—'ইট ইজ দি স্পিরিট অব্ এ সেনসিটিভ প্যাট্রিয়টিজম্ দ্যাট ক্যান ব্রুক, নাইদার ইন থট নর ইন ডিড, এনি শেপ অর ফর্ম অব্ ডিপেণ্ডেন্স য়্যাণ্ড সারভিটিউড'।

কিন্তু ইতিহাসেরও ইতিহাস থাকে, সমস্ত ঘটনাই স্থানিক ও কালিক পরিবেশের ঘাত প্রতিঘাত থেকে উদ্ভূত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যভাগে বাঙালীর স্বদেশচর্যায় এই যে নতুন মেজাজ, নতুন আকাঙ্ক্ষার উদয়, এরও তেমনি ইতিহাস আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই প্রতীচী প্রাচ্য মহাদেশ এশিয়ার প্রতি কীভাবে মারমুখী আহ্বান (চ্যালেঞ্জ) জানিয়ে আসছিল, মনীষী বিনয়কুমার সরকার তাঁর 'দি ফিউচারিজম্ অব্ ইয়ং এশিয়া' গ্রন্থে তার মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। এই মারমুখী আহ্বান ছিল দ্বিমুখী—রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে প্রদত্ত স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভাষণ হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আগ্রাসী প্রতীচীর প্রতি আধুনিক এশিয়ার প্রথম যোগ্য প্রত্যুত্তর। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতীচীর মারমুখী আহ্বানের জবাব দিতে এশিয়াকে আরও এক যুগ অর্থাৎ বারো বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দ নানা চাঞ্চল্যকর ঘটনায় ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। এই বছরেই প্রতীচ্য দেশ রাশিয়াকে পরাভূত করে প্রাচ্য দেশ জাপান জয়লাভ করে। এশীয় দেশের কাছে ইউরোপীয় শক্তির পরাভব ঊনিশ শতকে এই প্রথম। এই সময় চীনবাসী কর্তৃক আমেরিকার পণ্য বর্জন ও এশিয়া কর্তৃক ইউরো-আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রতিষ্ঠা প্রয়াসের প্রতীক। এই সমস্ত ঘটনা ইউরোপাধিকৃত ভারতবর্ষের স্বাধীনতালিপ্সু মানুষের মনে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার করে। ফলে দৈবক্রমে বৃটিশের অধীনতাকে যে ভারতবাসী একদা বিধাতার আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করেছিল, তার চিন্তায় ও চেতনায় রূপান্তর দেখা দিল। বৃটিশ শাসন যে ভারতবর্ষের অদৃষ্ট বিধিলিপি নয়, ইউরোপীয় রাজশক্তি যে জগতে অপরাজেয় নয়, এই চিন্তা তার মনকে গ্রাস করা শুরু করলো, তবে এই চিন্তা ও চেতনার সজীব অঙ্কুরোদ্গম ঘটে বাংলার পলিমাটিতে এবং তা সহজে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে স্বদেশী আন্দোলনের সময়।

একটি অসতর্ক স্ফুলিঙ্গ দাবদাহে পরিণত হয়ে কীভাবে স্বপ্ন-সৌধ ভস্মসাৎ করতে পারে,—একথা রণদর্পী ইংরেজদের হৃদয়ঙ্গম করতে প্রায় বিয়াল্লিশ বছর সময় লেগেছিল। সত্যিই সেদিন কে জানতো যে ১৯০৫-এর ৭ই আগস্টের গোধূলী বেলায় 'স্বদেশী' এবং 'বয়কট'-এর শপথ কণ্ঠে নিয়ে কলকাতা টাউন হলের প্রাঙ্গণে যে স্বদেশী আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ বৃটিশ চক্রান্তের অনিবার্য প্রতিক্রিয়ারূপে জ্বলে ওঠে তার দাহিকা-শক্তি এত ব্যাপক ছিল! এই দিনকার সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার নরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক উত্থাপিত ৩-সংখ্যক প্রস্তাবটি ছিল প্রকৃতিতে বৈপ্লবিক। এইটিই ৭ই আগস্টের বিখ্যাত 'বয়কট প্রস্তাব' এবং এই প্রস্তাবেই সর্বপ্রথম জাতীয় আন্দোলনে এযাবৎ অনুসৃত ভিক্ষা-নীতি বা 'মেনডিক্যান্ট পলিসি'র ব্যর্থতা কার্যত স্বীকৃত হয়ে সক্রিয় রাজনৈতিক পন্থা গ্রহণের আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে রূপান্তরের ঘটনাও সত্যিই কৌতূহলোদ্দীপক। স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম বাংলার মাটিতে, তার পরিপুষ্টি বাংলার জল-বায়ুতে, কিন্তু তার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষে। স্বদেশী আন্দোলনের সেই ভারত-পরিক্রমার পথে বাংলার মধ্যে যে বিশিষ্ট দুজন সর্ব-

ভারতীয় নেতা তাকে সর্বাগ্রে অভিনন্দন জানিয়ে তার অগ্রগতির পথ সুগম করেছিলেন. তাঁরা হচ্ছেন বাল গঙ্গাধর তিলক এবং লালা লাজপত রায়। স্বদেশী যুগে বাংলার অগ্রগণ্য দেশনায়ক বিপিনচন্দ্র পালের নামের সঙ্গে এই দু'জন সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতার নাম যুক্ত হয়ে মুক্তিকামী ভারত-আত্মার জপনাম হয়ে উঠেছিল—'লাল-বাল-পাল'। কারণ, মুখ্যত এ'দেরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্থানীয় অসন্তোষের আগুন জাতীয় রোষের দাবানলে রূপান্তরিত হয়েছিল।

স্বদেশী আন্দোলন ছিল প্রকৃতপক্ষে বাংলার জঙ্গী জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ। জাগ্রত জনমতের অকুণ্ঠ সমর্থন ছাড়া এই ধরনের আন্দোলন কখনই সার্থক হতে পারে না। তাই এই আন্দোলনের যা' কিছু সার্থকতা, তার একটা বড়ো অংশের অংশীদার সেদিনের সর্বশ্রেণীর জাগ্রত জনগণ। তবু নেতৃত্বের কথাও উপেক্ষণীয় নয়। কারণ, নেতৃত্ব দুর্বল ও ভ্রান্ত হলে সত্যিকার জন-জাগরণও ব্যর্থ হয়ে যায়। স্বদেশী আন্দোলনের ভাবধারা প্রচারে ও প্রসারে সেদিন সদর ও মফঃস্বল বাংলার যে-সমস্ত দেশপ্রেমিক কোনো না কোনোভাবে নেতৃত্ব দান করেছিলেন, তাঁদের সকলের নামোল্লেখ সম্ভব নয়, যদিও সকলেই তাঁরা নমস্য। সুতরাং যাঁদের কণ্ঠ, লেখনী ও কর্ম এই আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি নিরূপণে সর্বাধিক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাঁদের কথাই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গভূমিতে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন তখনও 'মুকুট-বিহীন রাজা'র মতো। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় চেতনার উদ্বোধনে সুরেন্দ্রনাথের অবদান অসামান্য। স্বদেশী যুগে গরমপন্থী দলের উদ্ভবের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর অপরিমেয় প্রভাব ছিল অম্লান। এছাড়া বাংলার রাজনীতিতে অরবিন্দের যোগদানের পূর্বে নব্য স্বদেশপ্রেমের প্রচারে এবং স্বদেশী ভাবধারার প্রসারে যাঁরা অগ্রগণ্য ভূমিকার অধিকারী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ইংরেজী দৈনিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক মতিলাল ঘোষ, বাংলা সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী'র সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক এবং ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ইংরেজী সাপ্তাহিক 'নিউ ইন্ডিয়া'র সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল, বাংলা সান্ধ্য দৈনিক 'সন্ধ্যা'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বাংলার কবি শিরোমণি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বরিশালের বরেণ্য জননায়ক মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত উল্লেখযোগ্য।

যে কোনও বড়ো আন্দোলন মাত্রেই স্বরূপতঃ চিন্তার আন্দোলন। আন্দোলন অভিব্যক্ত হয় কর্মে, কিন্তু তার আদি উদ্ভব ঘটে চিন্তায়। তাই চিন্তায় নেপথ্য থেকেই কর্মের গতি ও প্রকৃতির নিয়ামক। এই নেতৃত্বদানের যোগ্যতা সকলের থাকে না। এর জন্য যে দু'টি অপরিহার্য গুণের প্রয়োজন হয়, তা হচ্ছে নিজস্ব রাষ্ট্রদর্শন এবং সেই দর্শন-সঞ্জাত চিন্তা সর্বসাধারণের মধ্যে নিজস্ব ভঙ্গিতে সঞ্চার করবার সামর্থ্য। বাংলার মাটির জাতক স্বদেশী আন্দোলন যাঁদের কাছ থেকে এই ধরনের যোগ্য নেতৃত্ব লাভ করেছিল, তাঁরা হচ্ছেন বয়ঃক্রমানুসারে বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অরবিন্দ ঘোষ। অথচ স্বদেশ-চিন্তায় এ'রা তিনজন ছিলেন ভিন্ন মত ও পথের পথিক।

স্বদেশী যুগে বাংলার রাজনীতি নরমপন্থা পরিত্যাগ করে গরমপন্থা এবং শেষ পর্যন্ত চরমপন্থার অভিমুখী হয়েছিল। বিপিনচন্দ্র ছিলেন গরমপন্থী, অরবিন্দ ছিলেন একাধারে গরম ও চরমপন্থী। আর রবীন্দ্রনাথকে ঠিক এইভাবে কোনো পন্থারই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। অথচ সকল পন্থার উৎস যে অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেম এবং মোহাদ্য যে স্বদেশের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি,—রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত আন্তরভাবে নিজস্ব উপায়ে তার সঙ্গে যুক্ত ছিল। বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দের স্বদেশ-চিন্তার মুখ্য বৈশিষ্ট্য ছিল—রাষ্ট্রমনস্কতা, রাষ্ট্রযন্ত্রের জাতীয়করণ ছিল তাঁদের আশু লক্ষ্য। আর রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তার বৈশিষ্ট্য ছিল—সমাজমনস্কতা। রাষ্ট্রযন্ত্রকে উপেক্ষা করে সমাজের দিক থেকে স্ব-নির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন ছিল তাঁর চিন্তার ধ্রুব লক্ষ্য। অথচ তিনজনেই পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে সুপরিচিত হয়েও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি ছিলেন পরম শ্রদ্ধাবান। আবার তিনজনেই ছিলেন স্বরূপে আন্তর্জাতিকতা বা বিশ্বমানববাদী। কিন্তু বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ আগে জাতীয়তাবাদী,
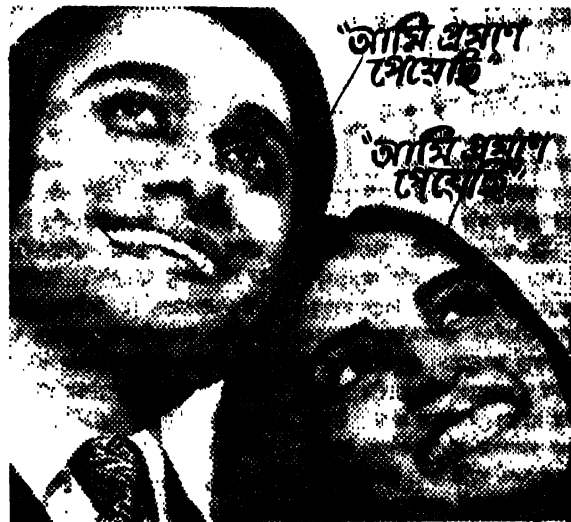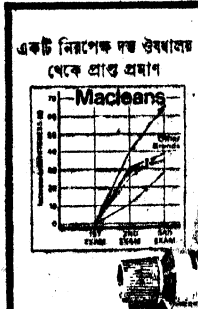
পরে আন্তর্জাতিকতাবাদী। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রতি তেমন প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জাতীয়তাবাদের উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ পরিণামে জাতি-বৈর সৃষ্টি করে।

বাংলার সক্রিয় রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ,—দুজনেরই স্থিতিকাল স্বল্প-স্থায়ী। কারণ, দুজনেরই জীবনদেবতা তাঁদের জন্য ভিন্ন ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখে-ছিলেন। রবীন্দ্রজীবনীকারের মতে 'রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের সহিত যথার্থভাবে তিন মাস যুক্ত ছিলেন—১৩১২ সালের আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত'। এই কাল-সীমার মধ্যেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথের লেখনী থেকে একের পর এক প্রাণ-জাগানো মন-মাতানো দেশাত্মবোধক গান নির্গত হয়ে নব-পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' এবং ভান্ডার'-এর পৃষ্ঠা পূর্ণ করে। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে রবীন্দ্র-জীবনীকারের উক্তি সত্য হলেও ঐ সময়ের পরবর্তীকালে রচিত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তামূলক প্রবন্ধাবলী পড়লে এবং তাঁর অন্যান্য ক্রিয়া-কলাপ লক্ষ্য করলে মনে হয়, এই আন্দোলনে অনুসৃত উপায়ের প্রতি তাঁর সংবেদনশীল কবি-মন সব সময় সমর্থন জানাতে না পারলেও এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁর সহানুভূতি সর্বদা জাগরূক ছিল। এ ছাড়া রবীন্দ্র-জীবনীকার উল্লিখিত সময়-সীমার পরেও জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে নেতৃত্বদান এবং 'বন্দেমাতরম্' মামলায় বিচারাধীন বন্দী অরবিন্দের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা উজাড় করে লেখা 'নমস্কার' শীর্ষক কবিতা উপরি উক্ত ধারণার পক্ষে দুটি বড়ো প্রমাণ। এই সমস্ত দিক লক্ষ্য করেই সম্ভবতঃ বিপিনচন্দ্র তাঁকে 'বিরোল ওয়ান অব দি ক্রিয়েটরস্ অব্ দিস নিউ ন্যাশনালিজম্ ইটসেলফ' বলে উল্লেখ করেছিলেন।

বাংলার রাজনীতিতে অরবিন্দের আবির্ভাব ১৯০৬-এর মাঝামাঝি সময়ে,—আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বদেশী আন্দোলনের জন্মের প্রায় এক বছর পরে এবং মোট স্থিতিকাল চার বছর। এর মধ্যে আলিপুর বোমার মামলায় জড়িত হয়ে এক বছর হাজতবাসে কেটেছে। ফলে কারা-গরাদের বাইরে মাত্র তিন বছর তিনি বাংলার রাজ-নীতিতে সক্রিয়ভাবে বর্তমান ছিলেন। অবশ্য তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রস্তুতি-পর্ব চলেছে বরোদাবাস কালে। এখান থেকেই বোম্বাই শহরের গুপ্ত সমিতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়, মহারাষ্ট্র-কেশরী বিপ্লবী তিলকজীর সঙ্গে দেশের রাজ-নৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হয় এবং এখানে থাকাকালীন তিনি যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে বাংলায় পাঠান। সে যাই হোক, বাংলার স্থিতিকালেই রাষ্ট্র-চিন্তা-নায়করূপে অরবিন্দ-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। বিপিনচন্দ্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গরমপন্থীদের মুখপত্র তখনকার বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক 'বন্দে মাতরম' হয় অরবিন্দ-প্রতিভার আত্মবিকাশের মুখ্য ক্ষেত্র। এই পত্রিকা সম্পর্কে পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—'হরিদাস হালদার প্রদত্ত ৫০০ টাকা পকেটে নিয়ে বিপিন পাল বন্দে-মাতরম প্রকাশ শুরু করেন। তিনি সহকারী সম্পাদকরূপে আমার সাহায্য দাবি করেন এবং আমি তা' দিতে সম্মত হই।' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বিপিনচন্দ্র ছিলেন এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। পরে অরবিন্দ এর অঘোষিত সম্পাদক হন। তবে বন্দেমাতরমে যোগদানের অল্পদিনের মধ্যেই স্বকীয় প্রতিভার গুণে তিনি এর মধ্যমণিরূপে গণ্য হন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে অরবিন্দ ছিলেন একাধারে জ্ঞানযোগী এবং কর্মযোগী। কর্মযোগী অরবিন্দ বিপ্লবী পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। কারণ, তাঁর নিজের কথায় —'তিনি নপুংসক নীতিবাগীশ ছিলেন না অথবা তিনি ভীরু শান্তিবাদীও ছিলেন না'। 'কিন্তু জ্ঞানযোগী অরবিন্দ ছিলেন বিপিনচন্দ্র-উদ্ভাবিত 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' বা প্যাসিভ রেসিস্ট্যান্সের প্রবক্তা। ১৯০৭-এর ৯ই এপ্রিল থেকে ২৬শে এপ্রিলের মধ্যে বন্দে মাতরম-এ প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে অরবিন্দ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে দার্শনিক তত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেন।

ভাঙা বাংলার ঐক্যসাধনের সুদৃঢ় সংকল্প থেকে সঞ্জাত স্বদেশী আন্দোলনের ভিত্তি ছিল চারটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত —স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা ও স্বরাজ। এর মধ্যে আবার মূল স্তম্ভটি ছিল 'বয়কট'। আর এই আন্দোলনের হাতিয়ার ছিল—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। বিপিন-চন্দ্রের মতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ছিল 'নট নন-অ্যাক্টিভ, বাট নন-অ্যাগ্রেসিভ রেসিস্ট্যান্স'। আর অরবিন্দ এই অনাক্রমণাত্মকতার সীমা নির্দেশ করে বলেছিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বাহিকবর্গের ((দি এক্সিকিউটিভ) কার্য-কলাপ শান্তিপূর্ণ এবং সংগ্রামের বিধির মধ্যে আবদ্ধ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্তই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারী সযত্নে নিষ্ক্রিয়তার মনোভাব রক্ষা করে চলবে। বয়কটের প্রকৃতি এবং তাৎপর্য সম্পর্কেও সে সময় বন্দে-মাতরম-এ অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়। বিদেশী রাজের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বর্জননীতির অনুসরণ ছাড়া বয়কটের মধ্যে প্রতিপক্ষের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষের কোনো স্থান ছিল না। অরবিন্দের মতে বয়কট ছিল মানে অ্যাক্ট অব সেলফ-ডিফেন্স, অর অ্যাগ্রেশন ফ্রম দি সেক অব সেলফ-প্রিজার-ভেশন'। বয়কটকে ঘৃণাপ্রসূত কাজ বা অ্যাক্ট অব হেট' বলাতে তাঁর অপত্তি ছিল। তিনি বলেছিলেন 'একে ঘৃণাপ্রসূত কাজ বলা আর যে লোকটিকে তিলে তিলে হত্যা করা হচ্ছে তার পক্ষে হত্যাকারীকে আঘাত করা অসংগত বলা একই কথা।' বয়কটের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অরবিন্দের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের তেমন মতভেদ ছিল না। মনীষী বিনয়কুমার সরকারের কথা উদ্ধৃত করে বলা চলে যে 'ফায়ার-ইটার য়্যান্ড ফায়ার-স্পিটার' বিপিন-চন্দ্রের বজ্রকণ্ঠকে আশ্রয় করেই বয়কট জাতীয় শিক্ষা এবং স্বরাজের বাণী বাংলা থেকে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু বয়কটের প্রতি রবীন্দ্রনাথ তেমন প্রসন্ন ছিলেন না।

কিন্তু এহো বাহ্য। এই তিন মনীষীর ভিন্ন অভিমতকে মতানৈক্য না বলে মত-বৈচিত্র্য বলাই অধিকতর যুক্তিসংগত। আর বৈচিত্র্য কখনই ঐক্যের পরিপন্থী নয়, বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের আবিষ্কারকেই শ্রেয় পথ বলে মনে করেছে। স্বদেশী আন্দোলনের ইতিবৃত্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিমতের ভিন্নতা সত্ত্বেও এই আন্দোলনের ভাবমূর্তি রচনায় বিপিনচন্দ্র-রবীন্দ্র-অরবিন্দ,— এই তিন জনেরই অবদান ছিল অপরিমেয়। এঁদের সম্মিলিত সাধনায় এই আন্দোলন নিছক রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক আন্দোলনের স্তরে আবদ্ধ না থেকে এক মহৎ ভাবা-ন্দোলনের স্তরে উন্নীত হয়েছিল। ১৯০৮-এ 'বন্দেমাতরম'-এর পৃষ্ঠায় বিপিনচন্দ্র সুস্পষ্ট ভাষায় স্বদেশী আন্দোলনের ভাবগত আদর্শ ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন—'ভারতের এই নতুন আন্দোলনের শক্তির মূল উৎস হচ্ছে তার চরম আদর্শনিষ্ঠা। যদিও এই আন্দোলন দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন চেয়েছে, তবু এ কেবলমাত্র একটা অর্থনৈতিক আন্দোলন নয়, যদিও এই আন্দো-লন দৃঢ়কণ্ঠে পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবী জানিয়েছে, তবু এ কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। এ আন্দোলন স্বরূপতঃ একটা প্রবল আধ্যাত্মিক আন্দোলন। এই আন্দোলনের লক্ষ্য নিছক রাজনৈতিক অগ্র-গতি অথবা রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়—এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হবে ভারতের পৌরুষ ও নারীত্বের যথার্থ মুক্তি সাধনা।'

স্বদেশী যুগে 'লাল-বাল-পাল' কিভাবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সেকথা পূর্বেই আভাসিত হয়েছে। কিন্তু ভারত-পরিক্রমায় অগ্রগত হবার পূর্বে বাংলার মাটিতে জাত স্বদেশী আন্দোলনের আদি রূপকার ছিলেন নিঃসন্দেহে — বিপিনচন্দ্র-রবীন্দ্র-অরবিন্দ। বিপিনচন্দ্র ছিলেন এই আন্দোলনের রাজ-নৈতিক দার্শনিক, রবীন্দ্রনাথ চারণ কবি এবং শ্রীঅরবিন্দ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

কারলোভি ভ্যারি চলচ্চিত্র উৎসবে ইণ্টারভিউ ছবির নায়ক রঞ্জিত মল্লিক শ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন

—ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

একটি অসাধারণ চলচ্চিত্র

১৯৭১ সালের রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সম্পর্কিত ঘোষণায় জানা গিয়েছিল যে, ও বছরের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে নির্বাচিত হয়েছে আরোহী নিবেদিত এবং বসু ভট্টাচার্য লিখিত, প্রযোজিত ও পরিচালিত 'অনুভব' নামে সাদা-কালো ফোটোগ্রাফীর মাধ্যমে তোলা হিন্দী ছবি। ছবিখানি সম্প্রতি দেখবার পরে মনে প্রশ্ন জেগেছে, কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র নির্বাচন কমিটি ছবির কোন কোন বিষয়ে কি কি ভাবে নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা রেখে ছবির প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি ক্রম নির্ধারণ করেন ব্যাপারটা জানতে পারলে আমাদের কাছে সহজে বোধগম্য হত কেন 'সীমাবদ্ধ' প্রথম স্থান লাভ করেছে এবং 'অনুভব' দ্বিতীয় স্থান এবং এবং এবং।

'অনুভব' কাহিনীর নায়ক-নায়িকা— বিখ্যাত সংবাদপত্রের জবরদস্ত সম্পাদক অমর সেন এবং তার স্ত্রী মিতার জীবনে যা ঘটেছিল, আজকের জগতে পৃথিবীর যে কোনো সভ্য দেশে আকছার তা ঘটে থাকে। বললে অন্যায় হবে না যে, আধুনিকা নারীর কুমারী জীবনের প্রথম প্রেম কদাচিৎই বিবাহে পর্যবসিত হয়। কাজেই যখন তারা বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে, তখন তাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রাক-বিবাহ জীবনের প্রথম প্রেমকে চায় একেবারে ভুলে যেতে এবং প্রেমিকের সঙ্গে আর কোনো দিন দেখা না হওয়াটাই কামনা করে মনে প্রাণে। কিন্তু যদি ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে যায়, তখন? তখন বেচারা নারী যেন ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের সঙ্গেই সংগ্রাম করতে থাকে। কামনা করে, তার শান্তির সংসারে যেন আগুন জ্বলে না ওঠে কোনোমতে।

ছ'বছরের দাম্পত্য জীবনটা যখন একটি সন্তানের অভাবে একটা শুষ্ক ছকে-বাঁধা জীবনে পরিণত হতে চলেছিল, ঠিক সেই সময়েই মিতার দরজার সামনে আচম্বিতে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়েছিল শশী। সেই শশী যে একদিন ওর কুমারী জীবনকে স্বপ্নময় করে তুলেছিল, যাকে ঘিরে সে একদিন কল্পনার জাল বিস্তার করেছিল। কিন্তু সেই অতীত তো বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছিল, আজ তাকে নতুন করে ফিরিয়ে আনার তো কোনো প্রয়োজন নেই। না, শশীও সেই অতীতকে ফিরিয়ে আনতে আসেনি। সে এসেছে, সেই পুরোনো সংবাদের দোহাই দিয়ে মিতার কাছ থেকে একটুকু সুপারিশ আদায় করতে ওরই স্বামীর খবরের কাগজের আফিসে একটি চাকরীর জন্যে। কিন্তু মিতা শশীর এই অনুরোধও রাখতে নারাজ—ওর সঙ্গে ওর কোনো পরিচয় কোনো দিন ছিল, তা ও প্রাণ থাকতে স্বীকার করতে পারবে না।

কিন্তু বিনা সুপারিশে। শশী কাজটা পেল এবং নিজের কলমের জোরে সে দিনগাগিরই অমরের এমন প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল যে, সম্পাদকীয় স্তম্ভেও তাকে লেখবার অধিকার দিল অমর খুশী মনেই। শশী শুধু লেখেনই না, তার গানের গলাও ভালো। শশীর গুনগুনানি অমর শোনে মুগ্ধচিত্তে। হঠাৎ শশী জিজ্ঞেস করে বসে অমর তার সুকণ্ঠী স্ত্রীর গান শুনেছে তো? অমর অবাক। ছ'বছর ওদের বিয়ে হয়েছে; মিতা গান জানে, তাতো সে জানে না। বাড়ী ফিরে সে জোর গলায় স্ত্রীর কাছে কৈফিয়ত তলব করে, সে যে খুব ভালো গাইতে পারে, তা তার কাছ থেকে গোপন রেখেছে কেন। নিত্য-নৈমিত্তিক ছকে-বাঁধা জীবনে উৎসাহ কৈ, যে সে গান গাইবে—একথা মিতা বলতে পারল না। সে স্বামীকে গান শোনাল; শুধু তাই নয়। সব চাকর-বাকর ছাড়িয়ে দিয়ে সংসারের কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু অমরকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে যে হরি চাকর, সে কিছুতেই গেল না। মিতা হরির খুঁতি মেনে নিয়ে তার কাছে নিজের অন্যায় স্বীকার করল। হরি সেদিন থেকে শুরু করল মিতাকে বৌমা সম্বোধন করতে। বৃষ্টিতে ভিজে অমর অসুস্থ হয়ে পড়ল। ফলে, শশীর ওদের বাড়ীতে আসা-যাওয়ার প্রয়োজন হল। মিতার অস্বস্তি বেড়ে গেল। সে গোপনে শশীকে বলতে চাইল, সে যেন অহেতুক ওদের বাড়ীতে এসে ওর অস্বাচ্ছন্দ্য না বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু অমর দূর থেকে ওদের এই কথা কওয়া দেখল। তার চকিতে মনে পড়ে গেল মিতা খুব ভালো গাইতে পারে, সেকথা সে শশীর কাছ থেকেই প্রথম শুনেছে। তাহলে? তার ওপর শশীর মতো ছেলে!—তাহলে অতীতে ওদের মধ্যে...না, অমর আর ভাবতে পারে না। অসুস্থ দেহে সন্দিগ্ধতা বেড়ে ওঠে। ডাক্তারের অনুমতি না নিয়েই কাজে বেরিয়ে পড়ে। শশী তার আগেই নিজের কানে শুনে এসেছে, অমর অযথা মিতার সঙ্গে রেগে কথা বলছে। আফিসে শশীর ওপরও যখন অমর ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে তাকে পদত্যাগ পত্রে সই করতে বলে, তখন শশী তার নিজের ফাইল থেকে হাতে-লেখা পদত্যাগপত্রটি বার করে ওর সামনে মেলে ধরে। তার মানে, তুমি তৈরী হয়েই এসেছ।' 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাকে উপলক্ষ ক'রে আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ হয়, এ আমি কিছুতেই চাই না।' এরপর সব পরিষ্কার হয়ে গেল। শশী যে একটি সৎ, ভদ্র যুবক, এ বিষয়ে অমরের মনে আর কোনো দ্বিধা রইল না। অতএব অমরের মিতা অমরেরই রইল, বোধ করি, আর একটু বেশী করে।

—'অনুভব'-এর কাহিনী বর্ণনায় কিছুটা বেশী সময় ব্যয় করলুম এই কথাই আর একবার করে বলতে, এই ধরনের ঘটনা আজকে শিক্ষিত সমাজে হামেশাই ঘটছে যে কোনও দেশে। —কিন্তু এই ঘটনাটিকে কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার-প্রযোজক-পরিচালক বাসু ভট্টাচার্য ছবি সংলাপ-গান-শব্দ-আবহ-সঙ্গীত প্রভৃতি সহযোগে যে চিত্রভাষার মাধ্যমে পর্দার ওপর বিধৃত করেছেন, তা অনির্বচনীয়। অতুলনীয় তাঁর দৃশ্যের পর দৃশ্য, শট-এর পরে শট সাজানো অপরূপ তাঁর দৃশ্যরচনায় নির্বাচনী ক্ষমতা বা সিলেকটিভনেস, অসামান্য তাঁর সংলাপ ও সঙ্গীতের প্রয়োগ, অদ্ভুত তাঁর অপটিকস-এর ব্যবহার। এমন একটি অতি সাধারণ কাহিনীকে ঘিরে এমন মনস্তত্ত্বমূলক সুস্-ঘন শিল্প সৃষ্টি আমরা ছবির পর্দায়—বিশেষ করে ভারতীয় ছবির পর্দায় কচিৎ দেখেছি। বাসু ভট্টাচার্যকে সাধুবাদ জানাবার উপযোগী ভাষা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। 'অনুভব' অনুভূতিবহ সামগ্রী।

নায়ক-নায়িকা বা স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায় সঞ্জীবকুমার ও তনুজা—দুজনেরই অভিনয় অত্যন্ত সাবলীল স্বচ্ছন্দ ও জীবন্ত। এবং ওরই মধ্যে তনুজার অভিনয় অধিকতর হৃদয় সংবেদনশীল। শশীর ভূমিকায় দীনেশ ঠাকুর বুদ্ধিদীপ্ত লেখকের চেহারাটাই ফুটিয়ে তুলেছেন। হৃদয়বান ভৃত্য হরির বেশে এ কে হাঙ্গাল দরদী ও বাস্তব অভিনয় করেছেন। ছবিটিতে আরও বহু নর-নারী আছেন; কিন্তু তাঁদের ব্যবহার করা হয়েছে পট-ভূমিকা সৃষ্টির জন্যে।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসনীয়। সাদাকালো ফোটোগ্রাফী যে কত উচ্চাঙ্গের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাধুর্যমণ্ডিত হতে পারে 'অনুভব' ছবি তার একটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। এর জন্যে নন্দ ভট্টাচার্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কারও লাভ করেছেন। এস চক্রবর্তীর সম্পাদন এবং 'রঙকোর অপটিক্যালস'-এর কাজ ছবিটির সৌষ্ঠব বর্ধনে প্রভূত সাহায্য এবং 'রঙকোর অপটিক্যালস'-এর কাজ অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ন্যূনতম যন্ত্র সহযোগে গান এবং আবহসংগীত রচনা করা হয়েছে কি আশ্চর্য সার্থকভাবে। ছবির চারখানি গানই সু-রচিত, সুগীত এবং সুপ্রযুক্ত। এছাড়া বাংলা রবীন্দ্রসংগীত 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে' গানও আছে, যেমন আছে আবহসংগীত রূপে ব্যবহৃত 'ভজ গৌরাঙ্গ' প্রভৃতি গানের সুর।

'অনুভব' হচ্ছে শতকরা একশোভাগই পরিচালকের ছবি ডিরেক্টার্স পিকচার এবং শতকরা একশোভাগই সার্থক মনোহারী ছবি।

শ্রীমান পৃথিরাজ/অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবোধা বসু ও মহুয়া রায়চৌধুরী। পরিচালনা : তরুণ মজুমদার। —ফটো : অমৃত।

হয়েছে ও একটি অসাধারণ চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন নরেন দাশ (কৃশানু), নির্মল চক্রবর্তী, মণি মুখার্জি (দেবদত্ত), আশু চক্রবর্তীর (অংশু), শান্তি মণ্ডল (প্রসেনজিৎ), রবি চক্রবর্তী (বিবেক)।

বিবিধ সংবাদ

সোভিয়েট চলচ্চিত্র 'লিবারেশন'

আজ শুক্রবার, ১১ আগস্ট থেকে নিউ এম্পায়ারে মুক্তিলাভ করছে ইউরি ওজেরভ পরিচালিত এবং নিকোলাই ওলিয়ালিন, ল্যারিসা গোলিবকিনা, বোরিস জিডেনবার্গ প্রভৃতি শিল্পী অভিনীত সোভিয়েট চলচ্চিত্র 'লিবারেশন'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায় বিধৃত হয়েছে এই চিত্রটির মারফত। স্টালিন, হিটলার, মুসোলিনী প্রভৃতি যুদ্ধরথীদের এই ছবিতে বিশেষ মুহূর্তে দেখতে পাওয়া যাবে। ছবিটি ফিল্ম পোলাস্কি, ডেফা ও ইতালির লারেন্টিস-এর সহযোগিতায় নির্মিত হয়েছে।

তরুণ ঐন্দ্রজালিক মদন কুণ্ডু সম্প্রতি নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন শেষে স্বদেশে ফিরেছেন।

গত মাসের বাসন্ত সফরে মদন কুণ্ডুর ... অনেকগুলি ... দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরা, ... এসিড খাওয়া খেলা দর্শক ... আলোড়ন সৃষ্টি করে।

যাদুবিদ্যায় তাঁর কৃতিত্বের নিদর্শন স্বরূপ নেপালের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে এই তরুণ ঐন্দ্রজালিককে একটি স্বর্ণ ... দেওয়া হয়। নেপালী প্রথানুযায়ী ... দেওয়ার অর্থ হচ্ছে আমাদের ... মদন কুণ্ডু দীর্ঘজীবী হোন।

কার্লোভিভারি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা রূপে পুরস্কৃত হয়েছেন ... সেন পরিচালিত বাংলা ছবি 'ইন্টারভিউ'-এর নায়ক রঞ্জিত মল্লিক। শ্রীমল্লিকের এই সম্মাননা বাঙালী চিত্রামোদী মাত্রকেই আনন্দিত করবে।

প্রবাসী বাঙালীর মিলনোৎসব

বিহার বাঙালী সমিতির ছাপরা শাখার উদ্যোগে গত ১৮ই জুন কালীবাড়ীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বিশেষভাবে নির্মিত এক সুশোভিত মঞ্চে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে এ বছর বর্ষাকালীন মিলনোৎসব পালন করলেন, স্থানীয় বাঙালী সমাজ।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন শাখা-সভাপতি শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বাগত ভাষণ দেন সহকারী শাখা-সভাপতি শ্রীগোপালকৃষ্ণ দত্তচৌধুরী। এর পর সংগীতানুষ্ঠান শুরু হয়। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন, কল্যাণী সাহা, মিতা মিত্র, মিত্রা ... । যন্ত্রসঙ্গীতে সর্বশ্রী শ্রীজিতেন মুখোপাধ্যায় তুষার ভাদুড়ী, গোপাল মুখোপাধ্যায় নন্দন চট্টোপাধ্যায়, অলক ভট্টাচার্য, ... চট্টোপাধ্যায়, শুভেন বন্দ্যোপাধ্যায়। যন্ত্রসঙ্গীতে—সুজাতা সুর (সেতার) গোবিন্দদাস চট্টোপাধ্যায় (লখনউ) (বেহালা) তবলায় বাসব ভাদুড়ি ও রাজেন পাঠক প্রমুখ।

চতুরঙ্গের সপ্তম প্রতিষ্ঠা দিবস

পাটনার বলিষ্ঠ নাট্যসংস্থা চতুরঙ্গ সপ্তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করল, স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে তিনদিনব্যাপী একটি নাট্য সম্মেলনের মধ্য দিয়ে। চতুরঙ্গ বিহারের সংস্কৃতিতে বর্তমানে একটি ঐতিহ্যসৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান। গত সাত বছর ধরে নিয়মিত হিন্দী, বাংলা ও অন্যান্য স্থানীয় ভাষায় নাটক অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে চতুরঙ্গ বিহারের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নিজেদের আসন পাকা করে নিয়েছে। সপ্তম প্রতিষ্ঠা দিবসে অনুষ্ঠিত নাটকের চয়ন, প্রযোজনা, উপস্থাপনা ও সুসংবদ্ধ দলগত অভিনয়ের মাধ্যমে চতুরঙ্গ নিজেদের সুনামকে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। প্রতিষ্ঠা দিবসের অনাড়ম্বর অথচ আকর্ষণীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল সুধীন দাশশর্মার ষোল ফুট উঁচু একটি পোস্টার।

প্রথম দিনের নাটক সুধাংশু দাশগুপ্তের 'আমি এ চাইনি' নাট্যকাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটিমাত্র সেট পরিকল্পনার দিক থেকে চমৎকার। প্রতিটি চরিত্রই সুঅভিনীত। বিভিন্ন ভূমিকায় অলোক মুখোপাধ্যায়, শুক্লা মুখোপাধ্যায়, বরুণ সরকার, প্রদীপ দেবরায়, রতন সরকার ও সুদীপ নিয়োগী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পরিচালনায় বরুণ সরকার, মঞ্চে সুহৃদ ঘোষ ও আলোকসম্পাতে দীপঙ্কর দাশগুপ্ত তাঁদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছেন।

বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' অভিনীত হয় দ্বিতীয় দিন। চতুরঙ্গের মুজঃফরপুর শাখা, দিলীপ ঘোষের সুযোগ্য পরিচালনায় এই বহু অভিনীত নাটকটি পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে অভিনয় করে অভিনব প্রতীক মঞ্চ, সীমিত আলোকসম্পাতে ও প্রয়োজনীয় আবহসঙ্গীতের সাহায্যে আপাত প্রচারিত এই এ্যাবসার্ড নাটকটি দর্শকদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়। দিলীপ ঘোষ, দীপক ঘোষ, শিশির দাস, অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, স্বাধীন দাস ও শ্রীমতী সিন্ধু ঘোষ প্রত্যেকেই সুঅভিনয় করেছেন।

তৃতীয় দিবসে বহুবিতর্কিত মারাঠী নাট্যকার বিজয় তেন্দুলকর লিখিত 'শান্ততা কোর্ট চালু আহে' হিন্দী প্রযোজনা 'খামোশ আদালত জারী হায়' মঞ্চস্থ করেন চতুরঙ্গের নতুন গঠিত খগৌল (দানাপুর) শাখা। সামাজিক সমস্যাপূর্ণ জমাট কাহিনীভিত্তিক এই নাটকটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই কৌতূহল বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে।

এই উপলক্ষ্যে একটি সুন্দর স্মরণিকাও প্রকাশিত করেছে চতুরঙ্গ। পূর্বে অভিনীত বনমানুষ ও জ্বালা নাটক দুটি যথাক্রমে বাংলা ও হিন্দীতে প্রকাশিত হওয়ায় স্মরণিকার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্টুডিও সংবাদ

অগ্রদূতগোষ্ঠীর শ্রীবিভূতি লাহা জানিয়েছেন—ডি, এম, সুলতানিয়ার হয়ে যে ছবির জন্য তিনি চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তার জন্য তিনি কাহিনী ঠিক করে ফেলেছেন—বিমল করের বিখ্যাত মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস 'একদা কুয়াশায়'-এর চিত্রস্বত্ব ক্রয় করা হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ছবির নায়ক চরিত্রে উত্তমকুমারকে ইতিমধ্যে চুক্তিবদ্ধ করা হয়েছে।

'মেমসাহেব' ছবির প্রযোজিকা ও সঙ্গীতপরিচালিকা শ্রীমতী অসীমা ভট্টাচার্য তাঁর পরবর্তী ছবি ধনঞ্জয় বৈরাগী রচিত 'কালো হরিণ চোখ'-এর চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন। ছবিটি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক শ্রীসুশীল মজুমদারের ওপর। শ্রীমজুমদার বর্তমানে চিত্রনাট্য রচনার কাজে ব্যস্ত আছেন। প্রধান দুটি চরিত্রে খুব সম্ভবত উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন থাকছেন। নিয়মিত চিত্রগ্রহণ সেপ্টেম্বারের গোড়া থেকে শুরু হবে। এ ছাড়াও প্রযোজিকা শ্রীমতী ভট্টাচার্য তাঁর পরবর্তী ছবির জন্যও গল্প নির্বাচন করে রেখেছেন। প্রফুল্ল রায়ের একটি অপ্রকাশিত কাহিনী (খুব সম্ভবত নামকরণ হবে—'সুখের সন্ধানে') নিয়ে শ্রীমতী ভট্টাচার্য তাঁর ৪র্থ ছবিটি প্রযোজনা ছাড়াও সঙ্গীত পরিচালনা করবেন।

গত সপ্তাহে গ্র্যান্ড হোটেলের ব্যাংকোয়েট হলে পরিচালক স্বদেশ সরকারের পরবর্তী ছবি সুনীল গংগো-পাধ্যায় রচিত 'জীবন যে রকম'-এর মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন—শ্রীমতী কানন দেবী। তাছাড়া বিশিষ্ট অতিথি-বর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—তপন সিংহ, অরুন্ধতী দেবী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঠু মুখোপাধ্যায়, অজয় কর, অনুপ ঘোষাল, স্বরূপ দত্ত, দুলাল দত্ত, বিশু চক্রবর্তী এবং কাহিনীকার সুনীল গংগোপাধ্যায়।

খবরে প্রকাশ, পরিচালক শ্রীসরকার বর্তমানে চিত্রনাট্য রচনার কাজে ব্যস্ত আছেন। ছবির প্রধান চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং নায়িকা চরিত্রে বম্বের কোন জনপ্রিয়া নায়িকাকে নেওয়া হতে পারে বলে খবর পাওয়া গেছে।

'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ'-এর নতুন শিল্পীরা:

তরুণ মজুমদার পরিচালিত কে এল কাপুর ফিল্মসের নির্মীয়মান ছবি 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ'-এর স্যুটিংয়ে কোনো আগন্তুক যদি হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হন, তাহলে লক্ষ্য করে অবাক হবেন যে, নবাগত প্রচুর শিল্পী-দের ভিড়ে সর্বদা ফ্লোর গমগম করছে। ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবার অভিজ্ঞতা এদের এই প্রথম। তবু, এ ছবির অভিজ্ঞ শিল্পী যাঁরা, অর্থাৎ সন্ধ্যা রায়, বিশ্বজিৎ, উৎপল দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, এবং আরো অনেকের মতে নতুনদের অভিনয়, কুশলতা ও সপ্রতিভতা নাকি তাদের মতো স্বনামধন্যদেরও রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

এই নতুনদের সামনের সারিতে আছে এ ছবির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ দুটি কিশোর-কিশোরী, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহুয়া রায়চৌধুরী। তাদের অভিনয়ের কথা বহুদিন লোকমুখে আলোচিত হবে বলে সবার বিশ্বাস। এছাড়াও আছেন ইন্দ্রনীল দত্ত, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস মুখোপাধ্যায় বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময় মিশ্র, সত্যজিৎ বসু, পুরোধা বসু, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজন সেনগুপ্ত, গীতা নাগ, ও সাইমন উড। এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভূমিকায় অপূর্ব কুশলতা দেখিয়ে পরিচালককে খুশি করেছে।

তপন সিংহের আঁধার পেরিয়ে

প্রিন্স আনওয়ার শাহ রোডস্থ নিউ থিয়েটার্স ২নং স্টুডিওতে গেল ১৪ জুলাই থেকে টানা নদিন স্যুটিং করে পরিচালক তপন সিংহ তাঁর নবতম ছবি 'আঁধার পেরিয়ে'র কাজ শুরু করলেন। চিত্তরঞ্জন মাইতি রচিত একটি কাহিনী অবলম্বনে ছবিখানির প্রযোজক সংস্থা হচ্ছেন সত্য সাধা প্রোডাকসন্স। শ্রীসিংহ নিজেই এর চিত্রনাট্য রচনা এবং সংগীত পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন, ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, মাধবী চক্রবর্তী, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, প্রেমাংশু বসু, বিকাশ রায় প্রভৃতি প্রথিতযশা শিল্পী। ছবির একটি বিশিষ্ট অংশ রঙীন হবে। ছবিটির একমাত্র পরিবেশক হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স।

মৃণাল সেনের ছবি

মৃণাল সেন পরিচালিত ডি এস পিকচার্স-এর ছবি 'কলকাতা-৭১' ফিল্ম সেন্সার বোর্ড কর্তৃক 'সর্বসাধারণের জন্য' দর্শনীয় বিবেচিত হয়েছে। ছবিটিতে পাঁচটি কাহিনীকে একত্র করে দেখানো হয়েছে—প্রতিটির সঙ্গে অপরটির মর্মগত যোগসূত্র বর্তমান। প্রথম 'আদালত গাই'টি পরিচালক শ্রীসেনেরই রচনা এবং বাকী চারটি ১৯৩৩ সূচক 'আত্মহত্যার অধিকার', ১৯৪৩ সাল-সূচক 'অংগার', ১৯৫৩ সূচক 'স্মাগলার' এবং ১৯৭১ সালসূচক 'একাত্তরের গল্প' লিখেছেন যথাক্রমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, সমরেশ বসু এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন মাধবী চক্রবর্তী, সাধনা রায় চৌধুরী, গীতা সেন, বিনতা রায়, সুচেতা রায়, স্নিগ্ধা মজুমদার, সুহাসিনী মূলে, রঞ্জিত মল্লিক, উৎপল দত্ত, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্র-প্রসাদ সেনগুপ্ত, দেবরাজ রায় এবং অন্যান্য শিল্পী। ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং, সুরকার হচ্ছেন নৃত্যাচার্য উদয়শঙ্করের কৃতী পুত্র আনন্দশঙ্কর। চিত্র-গ্রহণ ও সম্পাদনা করেছেন যথাক্রমে কে কে মহাজন ও গংগাধর নস্কর।

জীবনটাই নাটক: গেল সপ্তাহে ইন্দ্র-পুরী স্টুডিওতে গৌতম চিত্রমের প্রথম ছবি ফণী চক্রবর্তী রচিত এবং অভিযাত্রী ইউনিট পরিচালিত 'জীবনটাই নাটক' ছবির কিছু দৃশ্য গ্রহণ করা হয়। বাস্তব সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাতই এ ছবির বিষয়বস্তু। এ পর্যন্ত যাঁদের স্যুটিং-এ অংশ নিতে দেখা গেছে তাঁরা হলেন, সমিত ভঞ্জ, আরতি ভট্টাচার্য, দিলীপ রায়, পদ্মা দেবী, ফণী চক্রবর্তী, চিন্ময় রায়, পারু সেন। অধীর বাগচী হলেন ছবিখানির সুরকার।

পদি পিসীর বর্মি বাক্স: অরুন্ধতী দেবী নিবেদিত অনিন্দ্য চিত্রের রঙিন ছবি 'পদি পিসীর বর্মি বাক্স' এখন মুক্তি প্রতীক্ষায়। বহিদৃশ্য প্রধান মজাদার এই ছবির কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীমতী লীলা মজুমদার। চিত্রনাট্যকার, সুরকার ও পরিচালক হলেন অরুন্ধতী দেবী। পদি পিসীর ভূমিকায় আছেন ছায়া দেবী। অন্যান্য চরিত্রগুলিতে আছেন, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, রুদ্র-প্রসাদ সেনগুপ্ত, চিন্ময় রায় রবি ঘোষ, জহর রায় নির্মল কুমার, পদ্মা দেবী, কেতকী দেবী, রাজলক্ষ্মী দেবী (বড়), খগেন পাঠক এবং নায়ক চরিত্রে নবাগত বালক শিল্পী তপন ভট্টাচার্য। ছবিখানি বাংলা চলচ্চিত্রে এক নতুন আস্বাদ এনে দেবে। অনিন্দ্য চিত্র ও শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাঃ লিঃ ছবিখানির পরিবেশক।

সত্যজিৎ রায়ের ছবি

বিশ্ববন্দিত পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায় বর্তমানে তাঁর পরবর্তী ছবি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'অশনি সংকেত'-এর চিত্রগ্রহণ বীরভূম জেলার লাভপুরে সম্পূর্ণ শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়ে শুরু করে দিয়েছেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায় এই পর্বে অংশগ্রহণ করছেন এবং পরবর্তী পর্যায় শুরু হবে আগস্টের গোড়ায়—তখন বাঙলাদেশের ববিতা অংশগ্রহণ করবেন বলে খবরে প্রকাশ। ছবিটি সম্পূর্ণ ইস্টম্যানকলারে তোলা হচ্ছে। ছবির চিত্র-গ্রহণ, শিল্পনির্দেশ, সম্পাদনায় যথাক্রমে আছেন—সৌমেন্দু রায়, অশোক বসু ও দুলাল দত্ত।

পিকনিক/আরতি ভট্টাচার্য এবং সমিত ভঞ্জ

জলসা

নবনালন্দা উৎসব

২৯শে ও ৩০শে জুলাই রবীন্দ্র-নালন্দা সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান পরি-নৃত্যনাট্যানুষ্ঠানের দুটি সন্ধ্যা যথাযথ আনন্দ দিতে পেরেছে। দনা ছিল আনন্দ মুখোপাধ্যায় যে ছিল শেয়াল ও অবনীন্দ্র-নাথের পুতুল।' প্রকৃতির সবচেয়ে জন শিশুর দল। তাই তাদের তাঁর রহস্যের ঘোমটা খুলে হৃদয়ের আনন্দ বিনিময়টাও সহজ

আরগ বাচ্চারা তাদের মাকে ছেড়ে বেরিয়ে একে একে হাঁস খরগোস কচ্ছপ ও কোলাব্যাঙের দের ঠিকানা নিয়ে মাকে কিভাবে নৃত্যগীতালেখ্য। তারই সরস থম থেকে শেষ অবধি সারা আনন্দে মাতিয়ে রাখে। পরি-ত বছরের শিশুর দল। অভিনয় সবই যেন এদের কাছে খেলা হয়ে উঠেছিল আর এই খেলার আনন্দটাই ছড়িয়ে গেল পরিণতমন দর্শকচিত্তে। নেপথ্যসংগীত রচনা, পরিচালনা ও নির্দেশনার কৃতিত্ব প্রাপ্য শৈলেন মুখো-পাধ্যায়ের। নাট্য পরিচালনায় সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন সাধন গুহ। —সুরেন চক্রবর্তীর মঞ্চসজ্জা চিত্তাকর্ষক। সমান আনন্দ দিয়েছে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়াংশে পরিবেশিত অবনীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় শিশু উপা-খ্যান ক্ষীরের পুতুল—নাট্য পরিকল্পনা অনাদি প্রসাদের, নাট্য পরিচালনায় ছিলেন উমা বসুমজুমদার ও অমিতা বসু রায়। বিভিন্ন রাগমাধুর্যে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করেছেন আবহসংগীত রচয়িতা দীনেশ চন্দ।

৩০শে জুলাই নৃত্যনাট্য রূপায়িত হোলো কবিগুরুর সুবিখ্যাত 'পতিতা'।

'প্রণমি তোমারে হে রাজমন্ত্রী,
চরণপদ্মে নমস্কার।
লও ফিরে তব স্বর্ণমুদ্রা
লও ফিরে তব পুরস্কার।'

ঋষ্যশৃঙ্গের তপস্যা ভঙ্গকালে এক লহমায় 'জন্মান্তর প্রাপ্ত' এক নর্তকীর এই ভাববিপ্লব ও অন্যান্যদের চটুল কটাক্ষের অনিবার্য ও চিত্তবিভ্রান্তকারী রূপের বিলোল আহ্বান—দুই-এর দ্বন্দ্বের ঋষ্য-শৃঙ্গের ভাবান্তর নৃত্যপটুতা, নাটকীয় ভাবময়তা ও ব্যঞ্জনায় মূর্ত করে তুলেছেন সুদর্শন নৃত্যশিল্পী সাধন গুহ।

নটীর হৃদয়ের বিপ্লব, চেতনার নব-জাগরণ, নিঃসঙ্গ বেদনা নৃত্যলালিত্য ও অনুভবগাঢ়তায় চিত্তগ্রাহী করেছেন সুস্মিতা মিত্র। কথাকের মুদ্রা থেকে কখনও ভারত-নাট্যম কখনও বা মণিপুরীর ইঙ্গিতে হৃদয়ের নিভৃত ভাবকে যেন কথা বলিয়েছেন এই প্রতিভাময়ী নৃত্যশিল্পী।

অলকানন্দার সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশে-ছিল নারীর সহজাত যৌবনলাবণ্য লীলা-উচ্ছল উদ্দাম, প্রলোভনের ইসারা। এ আকর্ষণে ঋষ্যশৃঙ্গের তপস্যা ভঙ্গ না হয়ে পারে?

আবৃত্তি ও সংলাপে নৃত্য ও গীতে ও কাহিনীর সূত্রে যোজনা করেছেন সুচিত্রা মিত্র ও কাজী সব্যসাচী।

এই অংশে বিশেষ করে সুচিত্রা মিত্রের অংশ অত্যন্ত মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

অনাদি প্রসাদের নৃত্য পরিকল্পনা যথাযথানেই প্রতিষ্ঠিত।

সঙ্গীতাংশে ছিলেন—সুচিত্রা মিত্র, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও গোরা সর্বাধিকারী। বলা বাহুল্য আপনাপন আকর্ষণে এঁরা সবাই-ই শ্রোতাদের মন জয় করে নিয়েছেন।

তবু মনে বেশী দাগ কেটেছে কণিকার 'উতল হাওয়া' ও 'আহা তোমার সঙ্গে' সুচিত্রার 'বাজিল কাহার বীণা।' উভয়ের কণ্ঠসমৃদ্ধ কোরাস গানের ডালির মধ্যে মাধুর্য যেন ভোলা যায় না। তরুণেতর শিল্পীদের মধ্যে গোরা সর্বাধিকারীর কণ্ঠে 'সকল কলুষ তামসহর'—উপভোগ্য।

এছাড়াও সমবেত আবৃত্তি ও সঙ্গীতে সামগ্রিক সার্থকতার অংশীদার হয়েছিলেন অরুণ চট্টোপাধ্যায়, সমীন সিংহ, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, শংকর বসু, প্রশান্ত লাহিড়ী, শামতা দাশগুপ্ত, মিত্রা হালদার, সুপ্রিয়া সেন, কুন্তলা গৌতম, অর্পিতা সেন, কাকলি সেন, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর লাহিড়ী, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, প্রণবেশ সেন, সমীন সিংহ, জীবন কুণ্ডু, প্রবীন চট্টোপাধ্যায় শংকর বসু। সুপরিবেশনার জন্য ধন্যবাদার্হ আর্য মিত্র ও ভারতী মিত্র।

পৃথকভাবে বিচার করে দেখলে গান, নাচ দুই-ই উচ্চমানের ও আকর্ষণের তবু না বলে পারছি না নৃত্যনাট্য এতটা দীর্ঘ-বিলম্বিত না হলে ভালো হত।

সাংবাদিক সম্মেলনে অমলাশঙ্কর

তিন মাসব্যাপী রাশিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী ও ফ্রান্সের বিভিন্ন দেশে সাংস্কৃতিক পরিভ্রমণের পর ৩০শে জুলাই দেশে ফিরলেন শ্রীমতী অমলাশঙ্কর। গত বুধবার ম্যাক্সমুলার ভবনে এক ঘরোয়া সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীমতী শঙ্কর আবেগভরে ব্যক্ত করলেন তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী।

ওদের আতিথ্যে, সৌজন্যে সহৃদয়তায় তিনি মুগ্ধ। তিনি অভিভূত, বিস্মিত ও সম্মোহিত শিল্পের নানান ক্ষেত্রে, বিরাট মঞ্চ পরিকল্পনায়, মঞ্চ গঠনের অভিনবত্বে। সুশৃঙ্খল শিক্ষাপদ্ধতিতে এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর ভাবী শিল্পীদের পথ ছেড়ে দিয়ে পরিণত শিল্পীদের কর্মান্তরে অবসর গ্রহণের অভিনব পদ্ধতিতে (যদিও যোগ্য শিল্পীদের পূর্ণ ক্ষমতায় আসীন থাকা সত্ত্বেও শিল্পজগৎ থেকে বিদায় নেওয়াটা বেদনাদায়ক), পেশাদারের সমান্তরালে এ্যামেচার গোষ্ঠীর উন্নত মানে।।

ক্ষীরের পুতুল নৃত্যনাট্যের একটি দৃ

ওদের তুলনায় আমাদের অগ্রগতির নগণ্যতা সত্ত্বেও শ্রীমতী শংকর একটি সত্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে আমাদের অন্তর্মুখী শিল্প সম্পদের বিপুল সম্ভারের কাছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিল্প উপাদান তুচ্ছ। প্রতিভারও অভাব নেই—অভাব শুধু অর্থনৈতিক আনুকূল্যের। এ বিষয়ে সরকারের সহৃদয় সহায়তা ছাড়াও নানা বেসরকারী অর্থসমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি তৎপর হলে আমাদের দেশের বিস্ময়কর অগ্রগতি কেউ রুখতে পারবে না। এছাড়া সাংস্কৃতিক বিনিময় ভিত্তিতে যোগ্য ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে বিদেশে পাঠানো উচিত—ভারতের যথার্থ শিল্পরূপটি অন্যদেশের গুণীমহলে মেলে ধরতে।

শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা নৃত্য গীত নিয়ে রিসার্চ ওয়ার্কেই বা রত হবে না কেন?—পাশ্চাত্য ব্যালেও আমাদের নৃত্যশিক্ষার্থীদের শিক্ষার অঙ্গীভূত হওয়া প্রয়োজন। উদয়শঙ্কর কালচারাল সেণ্টারের শ্রীমতী শংকরের বিস্ময়কর শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থেই সকন্যা শ্রীমতী শঙ্কর নিমন্ত্রিত হন।

আশ্রমিক সংঘের নৃত্যনাট্যোৎসব

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের নৃত্যোনাট্যোৎসব রবীন্দ্রসদনে যথারীতি পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ আকর্ষণ করে। শুদ্ধ রাবীন্দ্রিক ধারায় রবীন্দ্র সৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ করার আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য।

একদিন মেঘের ঘনঘটাচ্ছন্ন নির্জন দুপুরে বাড়ীর ভিতর একটা ঘরে খাটের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে শ্লেট নিয়ে লেখা 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে'র অনির্দেশ্য

আকুলতা কবির মনে যে অনু...

তারই ফলশ্রুতি 'ভানুসিংহের প...

রূপে মনোলোভা হলেও ...

উপেক্ষিতা। উপেক্ষিত সেই ...

সমাজে তুলে ধরে আশ্রমিক সং...

রসিকদের এক নতুন ...

দিয়েছেন।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ, মিলন ...

মহামিলনের প্রতিটি পর্যায় ...

নৃত্যাঞ্জলিতে উপভোগ্য ...

প্রতিটি শিল্পী।

বিশেষ উল্লেখের দাবী ...

ভূমিকায় লুবনা মরিয়াম। ...

শিল্পী। কোলকাতার মঞ্চে ...

গত হলেও কোনো সংকোচ ...

ছিল না তাঁর নৃত্যাভিনয়ে। ...

মণিপুরীর ছোঁয়ার সুষমা ...

করে তুলেছেন নৃত্যদক্ষতা ...

রূপায়ণে। রাবীন্দ্রিক ধারা ...

তার প্রতি এর আনুগত্য ...

করেছে।

কৃষ্ণের ভূমিকায় ...

প্রশংসনীয়।

সখীদের মধ্যে ছিলেন শান্তি...

শিষ্যাবৃন্দ। গানে ছিলেন শান্তি...

নামী শিল্পীবৃন্দ।

সব মিলিয়ে ভানুসিংহের ...

খুবই উপভোগ্য।

অন্যান্য নৃত্যনাট্য ...

'বাল্মীকি প্রতিভা', 'চিত্রাঙ্গদা' ...

দেশ', 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা' ...

ক্রমবিকাশকেই ব্যক্ত করেছে।

দর্শক

১৯৭২ সালের মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বিজয়ী দক্ষিণ কোরিয়া দলের অধিনায়কের হাতে আবদুল রহমান ট্রফি।

ফুটবল প্রতিযোগিতা

লামপুরে মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা হ উপলক্ষে আয়োজিত ১৬শ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে রিয়া ২-১ গোলে মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে আবদুল রহমান হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭০ ম্পিয়ান দক্ষিণ কোরিয়া ১৯৭১ স্থান পেয়েছিল। অপরদিকে সালের প্রতিযোগিতায় মালয়েশিয়া ৩য় স্থান।

২ সালের প্রতিযোগিতায় যোগদান ১১টি দেশ। গত বছরের ১০ম অংশকারী (১২টি দেশের মধ্যে) এ বছরের প্রতিযোগিতায় যোগ- [illegible] তাছাড়া গত বছরের [illegible] এ বছর 'বি' টিম নিয়ে [illegible] তারা ১৯৭২ সালের [illegible] প্রতিযোগিতায় যোগ- [illegible]।

[illegible] দক্ষিণ কোরিয়া [illegible] এবং মালয়েশিয়া [illegible] মালয়েশিয়া 'বি' দলকে [illegible]। এখানে উল্লেখ্য, [illegible] ১৯৭২ সালের অলিম্পিক [illegible] খেলতে যাবে।

[illegible] ক্রমপর্যায় তালিকা

দক্ষিণ কোরিয়া, ২য় মালয়েশিয়া [illegible], ৪র্থ মালয়েশিয়া ('বি'), [illegible] এবং ৬ষ্ঠ হংকং। গত চ্যাম্পিয়ান ব্রহ্মদেশ ৯ম স্থান

ওয়াটারপোলো লীগ প্রতিযোগিতা

[illegible] রাজ্য ওয়াটারপোলো লীগ [illegible] 'এ' গ্রুপে ইস্টার্ন রেল দল [illegible] অবস্থায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছে এবং [illegible] হয়েছে সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাব। উল্লেখ্য, গত বছরও তারা অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল এবং [illegible] লীগ চ্যাম্পিয়ান বি এন আর লীগ তালিকায় দ্বিতীয় স্থান।

ফেডারেশন টেনিস কাপ প্রতিযোগিতা

[illegible] ক্রিভল্যান্ডে আমেরিকা [illegible] মহিলা টেনিস খেলোয়াড়- [illegible] টেনিস কাপ' প্রতিযোগিতার [illegible] অস্ট্রেলিয়া ৫-২ খেলায় [illegible] কে পরাজিত করে প্রতিযোগিতার [illegible] কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। আমেরিকার হার হলেও আমেরিকার কিশোরী খেলোয়াড় কুমারী ক্রিস ইভার্ট অস্ট্রেলিয়ার দুবারের উইম্বলেডন বিজয়িনী শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট এবং গত বছরের উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ান ইভন গুলাগংকে পরাজিত করে রাতারাতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালের উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে অপ্রত্যাশিত খেলোয়াড় কুমারী ইভার্ট অস্ট্রেলিয়ার আধা-আদিবাসী খেলোয়াড় ইভন গুলাগংয়ের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

পেস্তা সুকান স্পোর্টস উৎসব

সিঙ্গাপুরের বার্ষিক পেস্তাসুকান স্পোর্টস অনুষ্ঠান গত ২রা আগস্ট থেকে আরম্ভ হয়েছে। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানটি সাত সপ্তাহ চলবে। এই উৎসবের অনুষ্ঠান তালিকায় আছে : অ্যাথলেটিকস, সাঁতার, সাইক্লিং, বক্সিং, স্যুটিং, ফুটবল, বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন এবং টেনিস। ভারতবর্ষকে নিয়ে ১৫টি দেশের প্রায় এক হাজার প্রতিযোগী এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন। এবছরের ফুটবল প্রতিযোগিতায় গত বছরের যুগ্ম বিজয়ী দক্ষিণ ভিয়েৎনাম এবং ভারতবর্ষ যোগদান করেনি।

ভারত সফরে এম সি সি দল

১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ইংলিশ ক্রিকেটের প্রতিভূ এম সি সি'র দশ সপ্তাহের ভারত সফর পাকা হলেও বর্তমানে তাদের খেলোয়াড়দের ভারতে আসা নিয়ে নানা ঝঞ্ঝাট দেখা দিয়েছে। বর্তমানে ইংল্যান্ড দলের যাঁরা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড় ইতিমধ্যেই ভারত সফরে যোগদানের অক্ষমতা জানিয়ে দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে আছেন ইংল্যান্ডের বর্তমান অধিনায়ক রে ইলিংওয়ার্থ, প্রাক্তন অধিনায়ক মাইক স্মিথ, ফাস্ট বোলার জন স্নো, নামী ওপেনিং ব্যাটসম্যান জন এড্রিচ এবং রিচার্ড হাটন। এঁরা সকলেই ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা তুলে সফরে যোগদানের অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত যদি এম সি সি ভারত সফরে আসেই তাহলে তা

খুব শক্তিশালী দল হবে না। ১৯৭১ সালের ইংল্যান্ড সফরে ভারতবর্ষ টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয়ী হয়েছিল। ১৯৭২ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ড যদি আবার হেরে যায় অথবা সিরিজ ড্র করে তাহলে স্বদেশে ফিরে অন্তত বলার মত মুখ থাকবে যে, দুর্বল দল নিয়ে খেলতে হয়েছিল।

বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতা

আইসল্যান্ডে বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতার ফাইনাল সিরিজে আমেরিকার ববি ফিশার বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ান রাশিয়ার বরিস স্প্যাসকির থেকে ২ পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছেন। ফাইনাল সিরিজের ২৪টি খেলার মধ্যে এ পর্যন্ত (আগস্ট ৭) যে ১১টি খেলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ফলাফলঃ ফিশার সাড়ে ৬ পয়েন্ট এবং স্প্যাসকি সাড়ে ৪ পয়েন্ট। বিশ্ব খেতাব পেতে ফিশারের আর মাত্র ৬ পয়েন্ট দরকার। অপর দিকে বিশ্ব খেতাব হাতে রাখতে স্প্যাসকির দরকার আরও সাড়ে ৭ পয়েন্ট।

অলিম্পিক সাঁতার

আমেরিকার সাঁতারুরা গত ১৯৬৪ সালের টোকিও এবং ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিক সাঁতার অনুষ্ঠানে সর্বাধিক পদক জয়ের সূত্রে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, আমেরিকানরা জাত সাঁতারু। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাই আমেরিকার এই বিরাট সাফল্যের উৎস।

অলিম্পিক গেমসের চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় আমেরিকা যে ১৯৬৪ সালে দ্বিতীয় এবং ১৯৬৮ সালে প্রথম স্থান পেয়েছিল তার জন্যে আমেরিকার সাঁতারুদের অবদান যথেষ্ট। ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসে আমেরিকার মোট ৪৫টি স্বর্ণপদকের মধ্যে ২১টি স্বর্ণপদক (পুরুষ বিভাগে ১০ ও মহিলা বিভাগে ১১) সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন সাঁতারুরা।

আসন্ন ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিক গেমসে আমেরিকার সাঁতারুরা ১৯৬৪ ও ১৯৬৮ সালের মতই যে বিরাট সাফল্য লাভ করবেন তার পূর্বাভাস সম্প্রতি আমেরিকার অলিম্পিক [illegible] আসরে পাওয়া গেছে। এই অনুষ্ঠানে [illegible] এ পর্যন্ত ৮ বার বিশ্ব রেকর্ড [illegible] চুরমার হয়ে গেছে। পুরুষদের [illegible] মার্ক স্পিজ একাই তিনটি বিশ্ব [illegible] ভেঙেছেন—১০০ ও ২০০ মিটার [illegible] ফ্লাই এবং ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে। নতুন বিশ্ব রেকর্ড : ১০০ [illegible] স্টাইলে ৫১·৪৭ সেঃ ১০০ মিটার [illegible] ফ্লাইয়ে ৫৪·৫ সেঃ এবং ২০০ [illegible] বাটারফ্লাইয়ে ২ মিঃ ০১·৭ সেঃ।

বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতার স্কোর বোর্ড

(৭ই আগস্ট পর্যন্ত)

	বরিস স্প্যাসকি			ববি ফিশার		
	কত চালে			কত চালে		
খেলা	ঘুঁটি	খেলা শেষ	পয়েন্ট	ঘুঁটি	খেলা শেষ	পয়েন্ট
১নং	সাদা	৫৬	১	কালো	৫৬	০
২নং	কালো	×	১	সাদা	অনুপস্থিত	০
৩নং	সাদা	৪১	০	কালো	৪১	১
৪নং	কালো	৪৫(ড্র)	½	সাদা	৪৫(ড্র)	½
৫নং	সাদা	২৭	০	কালো	২৭	১
৬নং	কালো	৪১	০	সাদা	৪১	১
৭নং	সাদা	৪৮(ড্র)	½	কালো	৪৮(ড্র)	½
৮নং	কালো	৩৭	০	সাদা	৩৭	১
৯নং	সাদা	২৯(ড্র)	½	কালো	২৯(ড্র)	½
১০নং	কালো	৫৬	০	সাদা	৫৬	১
১১নং	সাদা	৩১	১	কালো	৩১	০
		মোট পয়েন্ট	৪½		মোট পয়েন্ট	৬½

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

১৯৭২ সালের প্রথম বিভাগের [illegible] লীগ প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। [illegible] জিত অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ান [illegible] ইস্টবেঙ্গল এবং [illegible] মোহনবাগান। লীগ তালিকায় [illegible] স্থান পেয়ে স্পোর্টিং ইউনিয়ন [illegible] বিভাগে নেমে গেছে। [illegible] স্পোর্টিং ইউনিয়ন প্রথম [illegible] যোগদান করে ১৯২৮ সালে। [illegible] ৬ বছর খেলার পর [illegible] দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যায় [illegible] প্রথম বিভাগে প্রত্যাবর্তন [illegible]

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ
চূড়ান্ত তালিকা

দল	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়
ইস্টবেঙ্গল	১৯	১৮	১	০
মোহনবাগান	১৯	১৬	২	১
মহঃ স্পোর্টিং	১৯	১৩	২	[illegible]
এরিয়ান্স	১৯	৮	৫	[illegible]
বি, এন আর	১৯	৭	৭	[illegible]
উয়াড়ী	১৯	৬	৮	[illegible]
রাজস্থান	১৯	৮	৩	[illegible]
ভ্রাতৃ সংঘ	১৯	৬	৭	[illegible]
খিদিরপুর	১৯	৬	৭	[illegible]
বাটা	১৯	৬	৫	৮
পোর্ট কমিঃ	১৯	৭	২	১০
হাওড়া ইউঃ	১৯	৪	৭	৮
জর্জ টেলিঃ	১৯	৫	৫	[illegible]
ক্যালঃ ক্লাব	১৯	৫	৫	[illegible]
কালীঘাট	১৯	৫	৫	৯
টালীঃ অগ্রঃ	১৯	৪	৬	৯
বালী প্রতিভা	১৯	৪	৬	৯
কুমারটুলি	১৯	৩	৮	[illegible]
ইঃ রেল	১৯	৩	৬	১০
স্পোর্টিং ইউঃ	১৯	৪	৩	১২

বিশিষ্ট গোলদাতা

আকবর খাঁ ১৭ ও হাবিব [illegible] ১৫, পি কান্নন (মহঃ [illegible] সুরজিৎ সেনগুপ্ত (মোহন [illegible] প্রশান্ত পোদ্দার (উয়াড়ী) ১০ [illegible] ও সুভাষ ভৌমিক (মোহনবাগান) [illegible] দত্ত (খিদিরপুর) ৯।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১২শ বর্ষ
২য় খণ্ড

১৬ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
মাশুল—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday, 18th August, 1972 শুক্রবার, ১ ভাদ্র, ১৩৭৯ .52 Paise

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক

প্রচ্ছদ : শ্রীনির্মল সাহা

'এক নজরে'

গুপ্তধন উদ্ধার : অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় যখন বৃটেন, ফ্রান্স ও স্পেনের মিলিত উদ্যোগে মুক্ত সমুদ্রে জলদস্যুতা নিষিদ্ধ হয় এবং সব জলদস্যুকে অবিলম্বে জাহাজ ও লুণ্ঠিত সম্পদ সমেত নিজ নিজ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয় তখন সে নির্দেশ জলদস্যুরা প্রকাশ্যে অমান্য না করলেও এরকম একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে জলদস্যুরা তাদের লুণ্ঠিত সম্পদের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র নিজ নিজ রাষ্ট্রের কাছে জমা দেয় এবং বাকি সম্পদ সাগর মহাসাগরের বিভিন্ন অজ্ঞাত দ্বীপে অথবা সমুদ্রগর্ভে লুকিয়ে রাখে। তাদের মতলব ছিল, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সতর্কতা একটু শিথিল হলেই ঐসব গুপ্তধন তারা উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। ঐ গুজবের উপর নির্ভর করে বিগত দুই তিন শতাব্দীতে বহু অভিযাত্রীর উদ্যোগে নানা অজ্ঞাত দ্বীপে ও সাগর জলে অগণিত অভিযান পরিচালিত হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের 'ওকদ্বীপ' নামক একটি অতি ক্ষুদ্র দ্বীপে বিগত দুই শতাব্দীতে গুপ্তধনের সন্ধানে যেসব অভিযান পরিচালিত হয় তার কথা ইতিপূর্বে একবার 'একনজরে'র পাতায় আলোচিত হয়েছিল।

গুপ্তধনের সন্ধানে অধিকাংশ অভিযানই এ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু ঐসব ব্যর্থতার ফাঁকে ফাঁকে যে সামান্য কটি সাফল্য অর্জিত হয়েছে তারই অনুপ্রেরণায় আজও সমুদ্রের বুকে গুপ্তধনের অনুসন্ধান অব্যাহত আছে। সম্প্রতি নরওয়ের একজন ও সুইডেনের দুজন ডুবুরীর মিলিত উদ্যোগে নরওয়ের উপকূলবর্তী শহর ওলসন-এর অদূরে সমুদ্রগর্ভ থেকে ২০০ কিলোগ্রামের বেশি সোনা ও রূপোর মুদ্রার সন্ধান মিলেছে। মুদ্রাগুলি স্পেন ও হল্যান্ডে একদা প্রচলিত ছিল এবং সেগুলি পাওয়া গেছে নরওয়েজিয়ান সাগরে ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে ডুবে যাওয়া একটি ওলন্দাজ জাহাজ থেকে। ইউরোপের উপকূলে একটি প্রচেষ্টায় এতখানি গুপ্তধনের সন্ধান ইতিপূর্বে আর পাওয়া যায়নি।

পরিচ্ছন্ন অলিম্পিক : আসন্ন অলিম্পিকের দিনগুলিতে মিউনিখ শহর যাতে সকল দিক থেকে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন থাকে তার জন্য মিউনিখ পুলিশ বিশেষভাবে সতর্ক হয়েছেন। ব্যাভেরিয়া রাজ্যের আইনমন্ত্রী কদিন আগে ঘোষণা করেন যে, মিউনিখ পুলিশ কর্তৃপক্ষের একদিনের সর্বাত্মক অভিযানে শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার মার্ক মূল্যের অশ্লীল পুস্তিকা উদ্ধার হয়েছে। সত্তরজন পুলিশের একটি বাহিনী একটানা চব্বিশ ঘণ্টা ধরে শহরের পঁচাত্তরটি দোকানে অভিযান চালিয়ে ঐসব অবাঞ্ছিত অশ্লীল সামগ্রী উদ্ধার করে।

আগামী ২৬শে আগস্ট থেকে মিউনিখে বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আগেই পশ্চিম জার্মানীর ঐ প্রসিদ্ধ শহরটিকে সকল দিক থেকে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করে তোলার জন্য ব্যাভেরিয়া রাজ্য সরকার কৃতসংকল্প হয়েছেন।

পরিচ্ছন্ন রোম : **প্রায় দেড়শজন মান্যবয়সী কূটনীতিক, ব্যবসায়ী ও অভিনেতার নামসম্বলিত একটি নোটবই রোজাভুরো নামক চল্লিশ বছর বয়স্কা এক রমণীর কাছ থেকে উদ্ধার করে রোমের পুলিশ ঐ শহরের অভিজাত পতিতাদের একটি বড় চক্র** ভাঙতে পেরেছে বলে দাবি জানিয়েছে।

রোজাভুরো তার বৃহৎ খরিদ্দারদের কাছে 'রোজালিন্ডা' ও 'টাইডি রোজা' নামে পরিচিত ছিল। এবং প্রতি খরিদ্দারের কাছ থেকে সে একরাত্রির জন্য একটি সুন্দরী পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনী সরবরাহের নজরানা বাবদ পাঁচ লক্ষ লিরা অর্থাৎ ৫,২০৫ টাকা আদায় করত। পুলিশ ঐ পাপ ব্যবসায়িনীর বিরুদ্ধে [illegible] ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নাবালিকা সংগ্রহ ও তাদের ঘৃণিত [illegible] যাপনে বাধ্য করার এবং সেই সঙ্গে 'হোয়াইট স্লেভারি'র অভিযোগ এনেছে।

রোজার কাছ থেকে পাওয়া ঠিকানার বইতে লেখা [illegible] সাংকেতিক ঠিকানা অনুসরণ করে পুলিশ এপর্যন্ত [illegible] মেয়ে উদ্ধার করেছে যাদের বয়স ১৫ থেকে ২১-এর মধ্যে [illegible] তাদের মধ্যে দুজন সুইডেনের ও বেশ কয়েকজন [illegible] পুলিশের রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'টাইডি রোজা'র [illegible] প্রতিটি মেয়েই পরিচ্ছন্ন, সুন্দরী, শিক্ষিতা ও আধুনিক। [illegible] তার খরিদ্দারেরা সবাই মধ্যবয়সের, এবং তাদের সম্বন্ধে [illegible] খোঁজখবর নিয়ে বিশেষ করে তাদের আর্থিক সঙ্গতি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে তবেই রোজা তাদের নাম তার ঠিকানার [illegible] অন্তর্ভুক্ত করত। কিন্তু পুলিশের রিপোর্টে [illegible] হয়েছে যে, রোজার নজরানা অত্যন্ত বেশি হলেও [illegible] এ ব্যাপারের ইতিহাসে এটা কোন রেকর্ড নয়। [illegible] প্রাক্তন অভিনেত্রী জোরী ফিস যে অনুরূপ ব্যবসায়ে [illegible] তাঁর 'ফিস'-এর ধারেকাছেও রোজার নজরানা পৌঁছতে [illegible] ফিস তাঁর সরবরাহ করা প্রতিটি একরাতের সঙ্গিনীর [illegible] খরিদ্দারদের কাছ থেকে দশ লক্ষ লিরা, অর্থাৎ ১২,[illegible] আদায় করতেন। সে পাপ ব্যবসায়ও অবশ্য পুলিশের [illegible] ক্ষেপেই ভেঙে যায়।

অতি সতর্কতা : দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার [illegible] বিদ্বেষ, মানবতাবিরোধী নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি নানা দোষে [illegible] হলেও একটি বিষয়ে তাঁরা অতি সতর্ক। রাষ্ট্র ও [illegible] নৈতিক মান যাতে কোনভাবে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে তাঁদের [illegible] সজাগ দৃষ্টি। এজন্য আজও দক্ষিণ আফ্রিকায় টেলিভিশন [illegible] হয়নি। ইউরোপ ও আমেরিকার টি-ভিতে যেসব বেলেল্লাপনা [illegible] দক্ষিণ আফ্রিকায় টি-ভি চালু হলে সেইসব অবাঞ্ছিত ব্যাপারের অনুপ্রবেশ অপ্রতিরোধ্য হবে—শুধু এই কারণে [illegible] সেখানকার নীতিবাদী শ্বেতাঙ্গ শাসকরা বিজ্ঞানের [illegible] শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ টেলিভিশনকে দূরে ঠেলে রেখেছেন। সম্প্রতি সেখানকার পোর্ট এলিজাবেথের তেইশ বছর বয়স্কা এক [illegible] যুবতীকে তার নিজেরই একটি নগ্ন চিত্র কাছে রাখার অভিযোগে একশ র‍্যান্ড জরিমানা করা হয়েছে। ছবিটা তার নিজেরই [illegible] তবু বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট তাকে অশ্লীল চিত্র সংরক্ষণের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কোন কারণ খুঁজে পাননি।

গার্ল ফ্রেন্ড : কদিন আগে গায়ানার জর্জটাউনে ছাব্বিশ বছরের এক যুবককে রাষ্ট্রীয় আইন লঙ্ঘন করে দ্বিতীয়বার বিবাহের অভিযোগে ছয় মাস কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বিচার চলাকালে একটি মেয়েকে তার মামলার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ নিতে দেখে সরকারপক্ষের কৌঁসুলি আসামীর কাছে জানতে চান, মেয়েটি প্রথম না দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী। প্রশ্ন শোনামাত্র আসামী জিভ কেটে তাড়াতাড়ি জবাব দেয় : না না, কোন পক্ষই নয়, উনি আমার গার্ল ফ্রেন্ড।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

খরা এবং বন্যা

পশ্চিম বাংলার ওপর এবার প্রকৃতির রোষদৃষ্টি পড়েছে। একদিকে খরা এবং অন্যদিকে বন্যা। এমন অভূতপূর্ব সংকটে বোধ হয় অন্য কোনো রাজ্য পড়ে নি। উত্তর বাংলায় মালদহ, দিনাজপুর এবং এদিকে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় দীর্ঘদিনের অনাবৃষ্টির ফলে তীব্র খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। খরার মোকাবিলার জন্য সরকার যখন প্রস্তুত হচ্ছেন এমনই সংবাদ এল উত্তর বাংলায় জলপাইগুড়ি, কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে প্রবল বন্যাস্রোতে লক্ষ লক্ষ মানুষ বিপন্ন। ইতিমধ্যে কিছু লোকের প্রাণহানির সংবাদও এসে পৌঁছেচে। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শন করে এসে বলেছেন যে, অবস্থা খুবই গুরুতর। বন্যা এসেছে আকস্মিকভাবে। তার জন্য প্রতিরোধাত্মক ব্যবস্থা সরকার থেকে নেওয়া হলেও সব সময়ে পাহাড়ী নদীর আকস্মিক জলস্ফীতি রোধ করা সম্ভব হয় না। এই আকস্মিকতার জন্যই বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলের জনসাধারণের দুর্গতি সারা দেশের মানুষের যতটা তাড়াতাড়ি দৃষ্টি আকর্ষণ করে খরাজনিত দুর্দশা সম্পর্কে সরকার এবং জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে সে তুলনায় বিলম্ব ঘটে। তার কারণ, খরা পরিস্থিতি ধীরে ধীরে তার তীব্রতা বাড়ায়। শস্য শুকিয়ে যায়, খাদ্যদ্রব্য হয় দুষ্প্রাপ্য, গ্রামের মানুষ ক্রমশ নিঃস্ব হতে হতে অনশনের সম্মুখীন হয়।

বিধানসভায় বিভিন্ন সদস্যের কণ্ঠে পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলের মানুষের, খরাপীড়িত ও বন্যাপ্লাবিত মানুষের দুর্দশার কথা ধ্বনিত হয়েছে। মালদা জেলায় অনশনে মৃত্যু হয়েছে বলেও কোনো কোনো সদস্য অভিযোগ করেছেন। পরিস্থিতি যে গুরুতর আকার নিয়েছে সে বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। খরা এবং বন্যা এই উভয় দুর্যোগের ফলেই পশ্চিম বাংলায় শস্যহানি ঘটছে। আগামী ফসলের সম্ভাবনাও নষ্ট হবার আশংকা। নিঃস্ব ও দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের সামনে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন যে, অবস্থা খুবই খারাপ। বৃষ্টির জন্য যখন খরাপীড়িত উত্তর বাংলার মানুষ হা পিত্যেশ করছিল ঠিক তখন বন্যা এসে তাদের সর্বনাশ করে গেল। খাদ্যমন্ত্রী অবস্থার গুরুত্ব স্বীকার করেও এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, খাদ্যের অভাবের আশংকা নেই। রাজ্য সরকারের হাতে খাদ্যশস্য মজুত আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, বন্যাপ্লাবিত এলাকায় লোক উদ্ধার করে তাদের কাছে ত্রাণসামগ্রী যথাসময়ে পৌঁছে দেবার। খরা এলাকায় টেস্ট রিলিফের কাজ, খাদ্য বিতরণ ইত্যাদি জরুরী কাজ ব্যাপকভাবে না করতে পারলে মানুষের দুর্দশার অন্ত থাকবে না। এই বিপদের মোকাবিলা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সর্বশক্তি প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ত্রাণের কাজ শুরু হয়েছে তবে আরও সাহায্যের প্রয়োজন। একা রাজ্য সরকারের পক্ষে এই বড় সংকটের মুখোমুখি হওয়া সহজসাধ্য নয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য চাওয়া হবে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে খরাত্রাণের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা চেয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র ৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা সাহায্যের সুপারিশ করেছেন। বলা বাহুল্য, এই অর্থ সাহায্য মোটেই পর্যাপ্ত নয়। পশ্চিম বাংলা এবার যে নিদারুণ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে তাতে তার একার পক্ষে এতগুলো বিপন্ন মানুষকে ত্রাণসামগ্রী দিয়ে সাহায্য করা, ঘর-বাড়ী তৈরী করে দেওয়া এবং তাদের অর্থনীতিক পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য খরা অবস্থা ভারতের অন্যান্য অনেক রাজ্যেই দেখা দিয়েছে। তাতে সমস্যাটা প্রায় সর্বভারতীয় চেহারা নিয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা স্বতন্ত্র। এখানে একই সংগে খরা এবং বন্যার প্রাদুর্ভাব। নানা সমস্যায় জর্জরিত পশ্চিম বাংলায় প্রকৃতির এই রুদ্ররোষ অভিশাপের মতো দেখা দিয়েছে। আর্ত, ক্ষুধার্ত মানুষের করুণ বিলাপে আকাশ ভারী। জনপ্রতিনিধিরা আবেগকম্পিত কণ্ঠে এর প্রতিকার দাবী করেছেন। এই দাবী আজ সকল মানুষের। জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টি এই দুয়েরই অভিশাপ থেকে রাজ্যের মানুষ যাতে রক্ষা পায় এবং তাদের এই দুর্দশার অবসান ঘটে তার জন্য সরকার ও জনসাধারণের ঐকান্তিক প্রয়াস ব্যর্থ হবে না বলেই আমরা আশা করি।

পটভূমি

বিদ্যুৎ-ঘাটতির আক্রমণটা যে এবার পশ্চিম বাংলাকেই পোহাতে হচ্ছে, তা নয়। গোটা দেশের উপরই এর সঙ্কট দেখা দিয়েছে—অন্ধ্রে যেসব বড়ো কল-কারখানা বা চাহিদা করে বিদ্যুতের ব্যবহার বেশি সেখানে তো বটেই। গুজরাটে নাকি এমন অবস্থা হলো যে, কল-কারখানা সব প্রায় বন্ধ হয়-হয়। মহারাষ্ট্রেও মাঝে মাঝে গেল-গেল রব উঠছে। পাঞ্জাব-হরিয়ানাতেও অবস্থা আশাপ্রদ নয়। কিন্তু তবু পশ্চিম বাংলায় অবস্থাটা প্রায় একটা কেলেঙ্কারির পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে এবং এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘ দিনের ঔদাসীন্যের ইতিহাস।

বিদ্যুৎ সংকটের একটা বড় কারণ যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের গাফিলতি তা রাজ্য সরকারের একজন মন্ত্রী বিধানসভায় উল্লেখ করতে ভোলেন নি। এই যুক্তি যদি মেনে নেওয়া যায় যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যের বৈষয়িক উন্নয়নে আগ্রহী ছিলেন না, তবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে তাঁদের গাফিলতিরও একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা কি একথাও ধরে নেব যে, এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসনের আমলে যাঁরা প্রশাসন চালিয়েছেন তাঁদেরও বৈষয়িক উন্নয়নের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ ছিল না? ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২, এই পাঁচ বছরে যুক্তফ্রন্ট নামে সরকার মোট রাজত্ব করেছে দু বছরেরও কম। মাস তিনেক গেছে কংগ্রেস-প্রভাবিত গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারের শাসন। কিন্তু বাকি প্রায় বছর তিনেক ধরে যে রাষ্ট্রপতির শাসন চললো, তখন বিদ্যুৎ সংকট সম্পর্কে কোনো রকম সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন? ধাওয়ান সাহেবের সময় পাঁচ-পাঁচজন মোটা মাইনের উপদেষ্টা রাইটার্স বিল্ডিংসের শোভাবর্ধন করেছেন। ধাওয়ান সাহেবের বিদায়ের পর রাজ্যপাল হিসেবে আসেছিলেন জবরদস্ত এক সিভিলিয়ান। সেই সময় একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপর বিশেষভাবে ভার দেওয়া হয়েছিল পশ্চিম বাংলায় দেখাশোনা করার। তবু, শিল্প ও কৃষির বিকাশের পক্ষে যে বিদ্যুৎ অপরিহার্য তার উৎপাদনের সমস্যাটি উপেক্ষিতই থেকে গেছে।

ঠিক এক বছর আগের কথা বলছি। গত বছর আগস্ট মাস। একটি বণিকসভার পক্ষ থেকে বিস্তারিত চিঠি দিয়ে এই রাজ্যের বিদ্যুৎ সংকটের চেহারাটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। মোট কতোটা বিদ্যুতের দরকার, তার তুলনায় কতোটা বিদ্যুৎ কম পাওয়া যাচ্ছে, ভবিষ্যতে চাহিদা কতোটা বাড়বে, বিদ্যুৎ-ঘাটতির ফলে কল-কারখানার কতোটা ক্ষতি হচ্ছে—সব কথাই ঐ চিঠিতে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। নিম্নবঙ্গ, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বাকি এলাকায় বিদ্যুতের দরকার ৯৫০ মেগাওয়াটের মতো। তার জায়গায় তখন পাওয়া যাচ্ছিল ৯২০ মেগাওয়াটের মতো। ভবিষ্যতে চাহিদা ও যোগানের ফারাক আরো যে বাড়বে সে-কথাও বলা হয়েছিল। তার কারণ, চালু কারখানা ছাড়াও নতুন অনেক কল-কারখানা বসবে। হঠাৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় কোন্ ধরনের কারখানায় কতো ক্ষতি হচ্ছে (যেমন পাটকলে ছ' মাসে তিন কোটি টাকা, ঐ বণিকসভার সদস্য এক বারোটি প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৭৫ লাখ টাকা) তার হিসেবও সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছিল।

মনে রাখা দরকার যে, ঐ আগস্ট মাসে পশ্চিম বাংলার শিল্পোন্নয়নের জন্য ১১ দফা কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছিল। ঐ কর্মসূচী অনুযায়ী কিছু দিন পরেই ঘোষিত হয়েছিল শিল্পপতিদের নানা রকম বিশেষ সুযোগ-সুবিধে দেওয়ার কথা। সেই সব সুযোগ-সুবিধের মধ্যে অন্যতম ছিল সুলভে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা। কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকলে তো শিল্প প্রসারের কথা ভাবাই যায় না। প্রায় সব রাজ্যেই এই ধরনের সুবিধে দেওয়া হয়। সুতরাং পশ্চিম বাংলাকেও দিতে হবে, না হলে শিল্পপতিরা এই রাজ্যে কল-কারখানা বসাতে চাইবেন কেন? কাজেই কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো বটে, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যে যেটা প্রথমেই করা দরকার ছিল, অর্থাৎ যথেষ্ট বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে নজর দেওয়া, ডায়াস সাহেবের প্রশাসন সে-সম্পর্কে কী করেছিলেন? অবস্থা সামলাবার জন্যে একটা কমিটি নিয়োগের কথা গত বছর অক্টোবরের নাগাদ উঠেছিল কিন্তু সেটুকুও হয়নি।

●

অথচ ঘটনাচক্রের যেটা সবচেয়ে বড় পরিহাস তা হলো, বিদ্যুতের চাহিদা মেটাবার মতো ক্ষমতা এই রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে রয়েছে। তবু, আমরা বিদ্যুৎ সংকটে ভুগছি। স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিম বাংলায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা ক্রমেই বাড়ানো হয়েছে। ১৯৬০-৬১ সালে ঐ ক্ষমতা ছিল প্রায় ৫৯০ মেগাওয়াট। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৬৬ সালে ঐ ক্ষমতা দাঁড়ায় ১০৩০ মেগাওয়াটে। ১৯৬৯ সাল নাগাদ ঐ ক্ষমতা আরো বেড়ে যায় (১২০৮ মেগাওয়াট)। কথা আছে চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে, অর্থাৎ ১৯৭৪ সালে ঐ অঙ্ক হবে ১৯৫০ মেগাওয়াট।

তবু বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে তার কারণ কোনো উৎপাদন কেন্দ্রেই পুরো বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে না। সে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদই বলুন, ডি ভি সি-ই বলুন দুর্গাপুর প্রোজেক্টসই বলুন আর কলকাতা

ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনই বলুন। এর মধ্যে সবচেয়ে কলঙ্কময় রেকর্ড অবশ্যই দুর্গাপুর প্রোজেক্টসের। সরকারী মালিকানাধীন কোনো কারখানাতেই পুরো উৎপাদন হয় না। কিন্তু তার মধ্যেও সবাইকে টেক্কা দিয়েছে দুর্গাপুর প্রোজেক্টস। ঐ প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতা ২৮৫ মেগাওয়াট। তার জায়গায় তৈরি হচ্ছে মাত্র ৫০ থেকে ৮০ মেগাওয়াট। এই উৎপাদনের বহর নিয়ে দুই মন্ত্রীর প্রকাশ্য বাদানুবাদ ব্যাপারটাকে আরো হাস্যকর করে তুলেছে। বিদ্যুৎমন্ত্রী বলছেন, উৎপাদনের পরিমাণ ৫০ মেগাওয়াটের বেশি নয়। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী বলছেন, সে কী কথা! উৎপাদনের পরিমাণ ৮০ মেগাওয়াট! কিন্তু হায়, যে ২০৫ মেগাওয়াট উৎপাদনের ক্ষমতার অপচয় ঘটছে তার জবাব দেয় কে?

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অধীনে ব্যাণ্ডেল এবং জলঢাকা প্রকল্পের অবস্থা যে দুর্গাপুরের চেয়ে খুব একটা ভালো তা নয়। ব্যাণ্ডেলে প্রায় ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ ঐ অঙ্কের অর্ধেকও না। উত্তরবাংলার বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রধান উৎসস্থল জলঢাকা। কিন্তু সেখানে উৎপাদন প্রায়ই ব্যাহত হয়। এমনও অবস্থা গেছে যে, গোটা উত্তরবঙ্গ তার চাহিদার এক চতুর্থাংশ বিদ্যুৎও পায় নি।

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের রেকর্ড যখন এই, তখন আবার কথা হচ্ছে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার। নীতিগত দিক দিয়ে এই প্রস্তাব অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের মতো এত বড় একটা ব্যাপারে কেনই বা একটা বিদেশী কোম্পানির হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে? তবে বিদেশী কোম্পানি চট করে রাষ্ট্রায়ত্ত করা যায় না। তার আগে নানা সম্ভাব্য জটিলতার কথা ভাবতে হয়। এমন কি আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনাও উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু ঐ সব প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও আর একটি প্রশ্ন থাকে—ব্যাণ্ডেল বা জলঢাকার অভিজ্ঞতা থেকে কি মনে হয় যে, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ প্রার্থিত সুফল ডেকে আনবে?

ডি ভি সি'র অধীনে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে, সেটিও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আওতায় আনার প্রস্তাব উঠেছে। ঐ প্রস্তাব সম্পর্কেও একই ধরনের প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। ডি ভি সি'র পরিচালনায় হয়ত কেন্দ্র, নিশ্চয়ই গলদ আছে। কিন্তু রাজ্য সরকারের হাতে এলেই কি সব মুশকিলের আসান ঘটবে?

•

কেন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে পুরো উৎপাদন হচ্ছে না? তার একটা কারণ, শ্রমিক অসন্তোষ। এ ব্যাপারে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের রেকর্ড চমৎকার। ব্যাণ্ডেল, জলঢাকা, কোথাওই ধর্মঘট, ধীরে চলো, নিয়মমাফিক কাজের কমতি দেখা যায় না। সম্প্রতি অবশ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ অবস্থা কিছুটা সামলে উঠেছেন। বিদ্যুৎ পর্ষদের বিবাদ আবার শুধু সাধারণ শ্রমিকদের সঙ্গে নয়। ওখানে এঞ্জিনিয়াররাও নানা কারণে কর্তৃপক্ষের ওপর বিমুখ।

তবু শ্রমিক অসন্তোষ দিয়ে সব ব্যাপারটা ব্যাখ্যা হয় না। আসল গলদ পরিচালনার অব্যবস্থায়, যেটা সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়ে ওঠে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্নে। বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী হিসেব দিয়েছেন যে, এই রাজ্যে তিন মাস বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ২৩বার 'ব্রেক-ডাউন' হয়েছে। ঐ তিন মাস হলো মার্চ, এপ্রিল এবং মে। তারপরেও দু' মাস কেটে গেছে। ঐ দু' মাসে ব্রেক-ডাউনের সংখ্যা নিশ্চয়ই যথাসময়ে পাওয়া যাবে। সরকার নাকি অন্তত একটি ক্ষেত্রে নাশকতার গন্ধ পেয়েছেন। কিন্তু বাকি দুর্ঘটনাগুলি কীভাবে ঘটছে?

ঘটছে প্রধানত উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে। দুর্গাপুর প্রোজেক্টসই এই কথার সেরা উদাহরণ। সেখানে চারটির মধ্যে দুটি বিকল, আরো দুটির অবস্থা সঙ্গিন। কারখানার ভারপ্রাপ্ত সুপারিনটেনডেন্ট পদত্যাগ করেছেন। এখন একজন 'বিশেষজ্ঞ' ঐ কারখানা দেখাশোনা করবেন। কিন্তু আশু সংকট মীমাংসার কোনো সম্ভাবনা নেই। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে বয়লারগুলি নিয়মিতভাবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পরীক্ষা করে দেখার নিয়ম আছে। সেই নিয়ম সব কেন্দ্রে পালন করা হয় না বলে অভিযোগ উঠেছে। অথচ বয়লার পরিদর্শনের জন্যে সরকারী ব্যবস্থা ঠিকই রয়েছে। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যে যদি উৎপাদন বন্ধ হয়, তবে মেরামতে প্রচুর সময় নষ্ট হয়। কারণ কর্তাব্যক্তিদের এমনই সুব্যবস্থা যে, দরকার মতো যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় না।

রাজ্য সরকার যে এই সমস্যার দিকে চোখ ফিরিয়ে আছেন তা নয়। থাকা সম্ভবও নয়। উন্নয়নের সব কর্মসূচীই নির্ভর করছে বিদ্যুতের ওপর। কল-কারখানার কথা আগেই বলেছি। কৃষির কথাটা আলাদা করে বলা দরকার। পশ্চিম বাংলায় কতো গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে তার সর্বশেষ সরকারী হিসেব এই সেদিনই পাওয়া গেছে। সেই সংখ্যা মাত্র চার হাজার বারো। অথচ রাজ্যে মোট গ্রামের সংখ্যা প্রায় ৩৮ হাজার। কাজ তা হলে কতোটা বাকি তা সহজেই অনুমান করা যায়। গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্দেশ্য কুঁড়েঘরে আলো জ্বালানো নয়। সেচের জন্যে বৈদ্যুতিক পাম্প চালানোই তার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে ছোটখাটো শিল্পের প্রসার। কার্যভার গ্রহণের পরই নতুন সরকার দশ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু যেখানে বর্তমান চাহিদাই মেটানো যাচ্ছে না, তখন আবার নতুন নতুন গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রশ্ন ওঠে কী করে?

ঘাটতি মেটাতে হলে উৎপাদন বৃদ্ধি তো দরকার বটেই। সে চেষ্টা তো চলেছেই। কিন্তু তা বেশ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই চলছে। চতুর্থ পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় প্রকল্প হচ্ছে পুরুলিয়ার সাঁওতালদিহিতে। প্রথমে কথা ছিল ওখানে এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হবে। পরে সেই লক্ষ্য কমিয়ে ৪৮০ মেগাওয়াট করা হয়। শেষ পর্যন্ত ১২০ মেগাওয়াটের দুটি ইউনিটের অর্থাৎ মোট ২৪০ মেগাওয়াটের কাজ সুরু হয়েছে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ আশ্বাস দিয়েছিলেন এই বছরের মাঝামাঝি প্রথম ইউনিটের উৎপাদন সুরু হবে। সেই 'মাঝামাঝি' তো ইতিমধ্যেই পার হয়ে গেছে। সেই জন্যেই বোধ হয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন যে, ১৯৭২ নয়, ১৯৭৩ সালেই উৎপাদন সুরু হবে।

সাঁওতালদিহি ছাড়া রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে আরো নানা পরিকল্পনা নিয়েছেন। তার মধ্যে আছে ব্যাণ্ডেলের সম্প্রসারণ, দুর্গাপুর প্রোজেক্টস-এর সম্প্রসারণ, ডালখোলায় নতুন উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি। কিন্তু আমরা তো আগেই দেখেছি, শুধু উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ালেই প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না, যদি না ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। পশ্চিম বাংলার বিদ্যুৎ-সংকট সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার যে তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেছেন তাঁরাও স্বভাবতঃই এই বিষয়টির ওপরই জোর দিয়েছেন।

১১-৮-৭২ প্রিয়দর্শী

[illegible] মারফত বন্টনের জন্য যে ৪০০ [illegible] টন খাদ্যশস্য পাঠান হয়েছিল তার [illegible] মাত্র এক টন বিক্রি হয়েছে।

[illegible] বিহার থেকে তিন সপ্তাহে [illegible] জনের অনাহারে মৃত্যুর খবর পাওয়া [illegible] এসব খবর দিয়েছেন ঐ রাজ্যের [illegible] নেতা জগন্নাথ সরকার, সোস্যালিস্ট [illegible] ও সি-পি-আই দলভুক্ত কয়েকজন [illegible] সদস্য একটি জেলা কংগ্রেস [illegible] সভাপতি প্রভৃতি। বিহারের মুখ্য-[illegible] সেখানকার পরিস্থিতিকে [illegible] দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি এবং [illegible] বলে অভিহিত করেছেন। [illegible] অবশ্য অনাহারে মৃত্যুর [illegible] অস্বীকার করেছেন।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি বিভাগের মন্ত্রী, [illegible] ও সেক্রেটারিরা এখন রাজ্যে রাজ্যে [illegible] পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ-[illegible] নিচ্ছেন এবং এই পরিস্থিতির [illegible] করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার [illegible] ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চাইছেন [illegible] সম্পর্কে রাজ্য সরকারের সঙ্গে [illegible] করছেন।

অনাবৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধির [illegible] সরকার ও সংসদ সদস্যদের [illegible] কারণ হয়েছে। বিশেষ করে এই [illegible] মাস থেকে খাদ্যশস্য, ডাল, তেল, [illegible] অত্যাবশ্যক জিনিসপত্রের [illegible] ভারত সরকার [illegible] যদিও তাঁরা চান না যে মূল্য-[illegible] নিয়ে আতঙ্ক ছড়াক তা হলেও [illegible] বিশেষভাবে [illegible] করছেন। মূল্যবৃদ্ধির [illegible] কি রকম দ্রুত হারে [illegible] অর্থমন্ত্রী চাবন লোকসভায় [illegible] বিবৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন। তিনি [illegible] যে, ১৯৬৯ সালে একটা টাকার [illegible] পুরো ১০০ পয়সা হলে [illegible] সেটার দাম এখন ৪২-৫ পয়সায় [illegible] গেছে। শ্রীচাবন অবশ্য এই বলে সান্ত্বনা [illegible] চেষ্টা করেছেন যে, পৃথিবীর [illegible] অনেক দেশের মুদ্রারই ক্রয়ক্ষমতা [illegible] পেয়েছে। কিন্তু এই কথা বলে শ্রীচাবন [illegible] পান নি। মূল্যবৃদ্ধি রোধে ব্যর্থতার [illegible] এমন কি তাঁর নিজের দলের [illegible] সমালোচনার লক্ষ্যস্থল হতে [illegible] বিশেষ করে, চিনির দর আয়ত্তে [illegible] না পারায় কোন কোন সদস্য অত্যন্ত [illegible] প্রকাশ করেছেন।

কোন কোন পার্লামেন্ট সদস্য মূল্য-[illegible] জন্য সরকারের আয়ের তুলনায় ব্যয় [illegible] করার নীতির সমালোচনা করলে [illegible] চাবন স্বীকার করেন যে, অতিরিক্ত [illegible] ছাপিয়ে ভারত সরকারকে গত বছর [illegible] কোটি টাকার সংস্থান করতে হয়েছে। [illegible] তিনি বলেন, বাংলাদেশের শরণার্থীদের [illegible] দেওয়ার জন্য ও যুদ্ধের খরচ মেটাবার [illegible] এটা না করে উপায় ছিল না।

পাইকারি দামের যে সর্বশেষ সরকারী [illegible] সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা [illegible] দর চড়ার প্রবণতা অব্যাহত আছে। [illegible] জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে তাতে ঐ সূচক সংখ্যা আরও তিন পার্সেন্ট বেড়ে গেছে। আগের সপ্তাহে ঐ সূচক সংখ্যা ছিল ২০১-৬। আলোচ্য সপ্তাহে সেটা হয়েছে ২০৪-৪। গম জোয়ার ও বাজরার পাইকারি দাম বেড়েছে এক শতাংশ হারে আর চিনি, নারকেল তেল ও ডালের দাম চড়েছে চার থেকে সাত শতাংশ হারে।

দর চড়ার সমস্যাটি নিয়ে পরিকল্পনা কমিশন তিন দিন ধরে আলোচনা করেছেন। এইসব আলোচনায় মূল্যবৃদ্ধির প্রধান দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হল, মুদ্রাস্ফীতি। আর একটি কারণ হল, অনাবৃষ্টির দরুণ অভাবের মনোভাব। ইতিমধ্যে সংসদের ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন বিবৃতিতে মূল্যবৃদ্ধি রোধের সরকারী পরিকল্পনাগুলির আভাষ পাওয়া গেছে। মজুতদারি বন্ধ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমত ভারত রক্ষা আইনও কাজে লাগান হবে, [illegible] ব্যবস্থা প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে ছয় সপ্তাহের মধ্যে সারা দেশে নতুন করে [illegible] হাজার ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলা হবে, বিদেশ থেকে ডাল ও তেল আমদানির জন্য ও সার আমদানির জন্য বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করা হবে ইত্যাদি।

মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে লোকসভায় যে বিতর্ক হয়ে গেল তাতে যোগ দিয়ে অর্থমন্ত্রী চাবন আভাষ দেন যে, সরকারী বন্টন ব্যবস্থা এমনভাবে সম্প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে যাতে শুধু খাদ্যশস্য নয়, অন্যান্য [illegible] এবং মোটা কাপড় তেল, ডাল প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যও এই সরবরাহ ব্যবস্থার আওতায় আসতে পারে। অর্থমন্ত্রী বলেন, আপনারা আর কয়েক সপ্তাহ ধৈর্য ধরলেই সরকারী ব্যবস্থাসমূহের ফল দেখতে পাবেন।

যে সব জিনিসের দাম অত্যন্ত দ্রুত চড়ছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল চিনি। চিনির দাম কিভাবে আয়ত্তে রাখা যায় সে বিষয়ে খাদ্য ও কৃষি বিভাগ নাকি খুব গভীরভাবে বিচার বিবেচনা করে দেখছেন। ঐ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শের সিং লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন যে, সরকার শীঘ্রই ১৯৭২-৭৩ সালের জন্য আখ ও চিনি সম্পর্কে নতুন নীতি ঘোষণা করবেন। চিনির যোগান ও দামের ক্ষেত্রে এখন যে অসন্তোষজনক পরিস্থিতি রয়েছে সেটা দূর করার জন্য ইতিমধ্যে কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

●

উগান্ডার প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইদি আমিন মধ্যে মধ্যে একটা কাণ্ড করে বসেন। বৃটিশ আমলে কিংস আফ্রিকান রাইফেলস বাহিনীতে যোগ দিয়ে ক্রমে ক্রমে তিনি মেজর জেনারেলের পদে উঠেছিলেন। ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে উগান্ডার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মিল্টন ওবোটে যখন বিদেশে রয়েছেন তখন জেনারেল আমিন অকস্মাৎ একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ডাঃ ওবোটেকে ক্ষমতাচ্যুত করলেন এবং নিজে তার দেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর নিজের মর্জিমত খুব কড়া হাতেই দেশের শাসন চালাচ্ছেন। ডাঃ ওবোটের বহু সমর্থক তাঁর আমলে খতম হয়েছেন। তাঞ্জানিয়ার সঙ্গে তিনি সীমান্ত লড়াই চালিয়েছেন। তিনি খণ্ডজাতির লড়াইয়ের উস্কানি দিয়েছেন। লাঙ্গি ও আচোল উপজাতির হাজার হাজার মানুষকে গত এক বছরে খুন করা হয়েছে। তিনি যা মনে করেন তাই করেন চক্ষুলজ্জার বালাই না রেখেই। রাজধানী কাম্পালা থেকে ইজরায়েলের দূতাবাসের পাট গুটিয়ে নেওয়ার আদেশ তিনি দিলেন সেই দেশে সফর করে ফিরে আসার পরই।

সম্প্রতি জেনারেল আমিন আর একটি কাণ্ড করেছেন। তিনি হুকুম দিয়েছেন, এশিয়ায় জন্মগ্রহণ করে যাঁরা উগান্ডায় বাস করছেন অথবা যে সব উগান্ডাবাসীর পূর্ব-পুরুষ এশিয়ার মানুষ ছিলেন তাদের মধ্যে

যাঁরা উগান্ডার নাগরিক নন তাঁদের নব্বই দিনের মধ্যে উগান্ডা ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাঁরা নাকি উগান্ডার অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই এশীয় বংশোদ্ভবদের একটি কন্যাকে বিয়ে করতে চেয়েছেন।

যে সাত হাজার শ্বেতাঙ্গ বৃটিশ নাগরিক উগান্ডায় রয়েছেন তাঁরা জেনারেল আমিনের হুকুমনামার আওতায় আসেন নি। অ-নাগরিক যে সব এশীয় বংশোদ্ভব ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, কল-কারখানার মালিক ও সরকারী কর্মচারী হিসাবে কাজ করছেন তাঁরাও বাদ পড়ছেন। বাকি যাঁরা বিতাড়িত হতে চলেছেন তাঁদের অধিকাংশের নাড়ির যোগ ভারত, পাকিস্থান বা বাংলাদেশের সঙ্গে, যদিও তাঁরা বৃটিশ পাসপোর্টের অধিকারী। এঁরা সকলেই যে ইচ্ছা করে বৃটিশ পাসপোর্ট নিয়েছেন তা নয়। অনেককেই নানা ছলছুতো করে উগান্ডার নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে দেওয়া হয় নি।

যাঁদের উপর এই বহিষ্কারের আদেশের খড়্গ ঝুলছে তাঁরা সাধারণত দোকানদার বা ছোটখাট ব্যবসায়ী। বহিষ্কার করার আগে হয়ত এঁদের সম্পত্তিও কেড়ে নেওয়া হবে। তা যদি হয় তাহলে এঁদের নিঃস্ব হয়ে আশ্রয় ও জীবিকার সন্ধানে অন্য কোন দেশে পাড়ি দিতে হবে।

কিন্তু এঁরা যাবেন কোথায়? যেহেতু এঁরা বৃটিশ পাসপোর্টধারী সেহেতু এঁদের গ্রহণ করার নৈতিক দায়িত্ব বৃটিশ সরকারের রয়েছে। প্রেসিডেন্ট আমিন কাম্পালাস্থিত বৃটিশ হাই কমিশনারকে সে কথা বলেছেন। বৃটিশ সরকারকে যদি তাঁদের সেই নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হয় তাহলে তাঁদের আগামী মাস তিনেকের ভিতর প্রায় সাট হাজার (বৃটিশ পত্র-পত্রিকাগুলির মতে অবশ্য হাজার চল্লিশেকের বেশি নয়) কাল চামড়ার মানুষকে জায়গা দিতে হবে। বৃটেনের দিক থেকে সমস্যাটাকে ঘাড় পেতে নেওয়ার মত আগ্রহ বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না।

এদিকে ভারত সরকার আশংকা করছেন, এই সমস্যার ধাক্কা কতকটা তাঁদের উপরও এসে পড়তে পারে। পররাষ্ট্র বিভাগের উপমন্ত্রী সুরেন্দ্রপাল সিং পার্লামেন্টে একটি বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, বহু সংখ্যক বৃটিশ পাসপোর্টধারী তাড়াহুড়ো করে ও আতঙ্কিত হয়ে উগান্ডা থেকে ভারতে চলে আসুন, এটা তাঁরা হতে দিতে চান না। তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, যাঁরা উগান্ডা থেকে বহিষ্কৃত হতে যাচ্ছেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে ভারতবর্ষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত যোগসূত্র রয়েছে। কিন্তু তাঁরা যাতে তাড়াহুড়ো করে এদেশে ঢুকে সমস্যার সৃষ্টি করতে না পারেন সে জন্য ভিসা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ভারত সরকার এঁদের আগমন নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত করেছেন।

দিল্লীতে যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে তাতে জানা যাচ্ছে যে, উগান্ডায় প্রায় ৭৩ হাজার ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ আছেন। তাঁদের মধ্যে ৪০ হাজারের উগান্ডার নাগরিকত্ব নেই। ঐ ৪০ হাজারের ভিতর হাজার তিনেক ভারতীয় নাগরিক। বাকি সকলেই বৃটিশ পাসপোর্টধারী বলে ধরে নেওয়া যায়। এঁদের মধ্যে কতজন বহিষ্কার আদেশের আওতায় আসছেন তার সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি।

•

দিল্লীতে ত্রিশ বছরের পুরান এক দর্জীর বক্তব্য: "পুলিশ বাহিনী তুলে দিন। তা হলেই অপরাধ বন্ধ হয়ে যাবে।"

১১-৮-৭২ পর্যটক

পর্যটকের চোখে বাংলাদেশ

পর্যটকের জন্য বাংলাদেশ তার আপন বৈচিত্র্য আর বৈশিষ্ট্য নিয়ে অপেক্ষমান। নৈসর্গিক পরিবেশের সীমান্তছোঁয়া সবুজ জলরাশির বুকে দাঁড়ি-মাঝির ভাটিয়ালী গান, দূরান্তের মসজিদ থেকে ভেসে আসা আজানের 'ডাক' তারই মধ্যে কখনো কখনো ফকিরের থানে মন্দিরের সন্ধ্যারাত্রির শঙ্খ-ঘণ্টা অথবা কোন গ্রামীণ উৎসবে ঢাকের বিচিত্র বোলের একটানা সুর কিংবা ঘরমুখো রাখাল ছেলের বাঁশির তান নবীন পর্যটকের মনে অজানা পরিবেশের বৈচিত্র্যের ছায়া এনে দেবে। প্রকৃতিবিদ বা কবি শিল্পী বা আলোকচিত্রী এমন কি দুঃসাহসী শিকারীদের কাছেও আহ্বান জানায় এমন অকৃপণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সুন্দরী বাংলাদেশ। নবীন পর্যটকদের কাছে অজানা এ পরিবেশে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের জন্য কিছু বিশেষ তথ্য জানারও প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজনীয়তা পূরণের চেষ্টায় এবারের এ রচনা।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকে নিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক। ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ১৬০৮ খৃঃ স্থানীয় শাসক ইসলাম খাঁ এ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। তখন নাম ছিল 'জাহাঙ্গীরনগর'।

ঢাকার দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজীবের পুত্র শাহজাদা মুহম্মদ আজম নির্মিত লালবাগ দুর্গ ও মসজিদ। এই দুর্গ মধ্যে নবাব শায়েস্তা খাঁর কন্যা পরিবিবির কবর বা ইরানদুখত সমাধি। লালবাগের কাছেই আর একটি দর্শনীয় স্থান মুঘল সম্রাট শাহজাহান পুত্র শা-সুজা নির্মিত বড়কাটরা বাজার এবং নবাব শায়েস্তা খাঁ নির্মিত ছোটকাটরা বাজার। এছাড়া রয়েছে হজরত মহম্মদের নাতি ইমাম-হোসেন-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শা-সুজার সময়ে নির্মিত বকসী বাজারের হুসেনী দালান যেটি সিয়া সম্প্রদায়ের সৈয়দ মীর মুরাদ কর্তৃক ১৬৪২ সালে নির্মিত। নদীতীরে শায়েস্তা খাঁ নির্মিত সাত-গম্বুজ মসজিদটিও স্থাপত্য বৈচিত্র্যে বৈশিষ্ট্য। পুরানো পল্টনের কাছে পাঠান যুগে নির্মিত দিলখুসবাগের মসজিদটি এবং শাহ-নিয়ামতউল্লা-বুৎ-শিকারের কবর।

শিপ্রা আদিত্য

নবাব শায়েস্তা খাঁ নির্মিত ১৬৭৬ খৃঃ চক-বাজার মসজিদ। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ কর্তৃক ১৭০৯ খৃঃ নির্মিত ঠাঠারী বাজার রোডের করতলব খাঁর মসজিদ। আরমানি-টোলা রোডে তারা মসজিদটিও বিচিত্র শিল্পকর্মে মণ্ডিত। ধানমণ্ডিতেও সাত গম্বুজ নামের এক প্রাচীন মসজিদ আছে। এছাড়া আছে, বর্তমানে পাক বাহিনী কর্তৃক বিধ্বস্ত ভাষা আন্দোলনের পবিত্র ভূমি 'শহীদ বেদী।'

ঢাকার প্রাচীন হিন্দু কীর্তিগুলির মধ্যে রয়েছে—ঢাকেশ্বরী রোডে বল্লাল সেন নির্মিত ঢাকেশ্বরী মন্দির, রমনার বুড়া-শিব এবং কালী মন্দির, ঠাঠারী বাজারের জয়কালী মন্দির। গুরুদুয়ারা বা শিখ সংগত আছে প্রসিদ্ধ দুটি। শাঁখারীটোলার মধ্যে শিখ গুরু হরগোবিন্দের সময়ে নাথা সাহেব নির্মিত নাথা সাহেব সংগত বা তেগবাহাদুর সংগত। এছাড়া আছে সুজাতপুরের গুপ্ত সাহেবের মন্দির।

পুরাতত্ত্ব ও সংস্কৃতি বিষয়ে উৎসাহীদের জন্য রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা, বলদা সংগ্রহশালা, বাংলা আকাদেমী গ্রন্থাগার, বুলবুল আকাদেমী বা বাফা চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়।

ঢাকাশহরের সীমান্ত ঘেঁসা জংগল মধুপুরের গড় অঞ্চলে এখনও বাঘ থেকে শুরু করে বিচিত্র রকমের পাখী শিকার করা সম্ভব। মাছ ধরার জন্য রয়েছে রমনার গ্রীন লেক, ধানমণ্ডির লেক, বুড়িগঙ্গা নদী এবং মৎস্য বিভাগের সংরক্ষিত পুকুরগুলি। রাজধানী ঢাকায় পর্যটকদের সাময়িক বসবাসের জন্য আছে দেশী-বিদেশী পরিকল্পনায় রচিত বহু আবাসিক হোটেল, ক্লাব, সার্কিট হাউস প্রভৃতি। পরিবহন ব্যবস্থা আছে—ট্যাক্সি, সাইকেল রিকসা, বাস, নদীবক্ষে ভ্রমণের জন্য ডিঙ্গি নৌকা থেকে ইয়াট, শাম্পান, হাউসবোট, স্পীড-বোট, লঞ্চ প্রভৃতি জলযান।

সংগ্রহ-উপযোগী বৈচিত্র্যময় বস্তুগুলির মধ্যে স্থানীয় গোলাপী মুক্তোর অলংকার, তাঁতবস্ত্র, সূচীশিল্প বস্ত্র, রেশমী শাড়ি, বাঁশ, বেত ও কাচের কাজ, পাটের শিকে, ব্যাগ প্রভৃতি। প্রধান বিপণিগুলি হলো—নিউ মার্কেট, জিন্না এ্যাভেন্যু, নবাবপুর,

পটুয়াটুলি, এবং ইসলামপুরে চকবাজার, হোসেন-শা-বাগ ও ইন্টার কন্টিনেন্টালের চম্পক, কনক, গীতাঞ্জলি ইত্যাদি। বিপনি-কেন্দ্র ঢাকা স্টেডিয়াম, জিন্না এ্যাভেন্যু নিউ অ্যালিফেন্টরোডের কিউরিও বা হস্তশিল্পের দোকান। চিত্রাবলী বিক্রয়কেন্দ্র আছে দুটি—একটি ধানমণ্ডিতে অপরটি অ্যালিফ্যান্ট রোডে জিরাজ চিত্রশালা।

ঢাকার কাছেই শহরতলীর মধ্যে আছে কয়েক'টি চড়ুইভাতির সুন্দর জায়গা। সেগুলি হল—সাভার, মির্জাপুরে, জয়দেব-পুরে, শিবপুরে, মধুপুরে, রাজেন্দ্রপুরে, চন্দ্রা, প্রভৃতি অঞ্চল। সেসব জায়গায় পর্যটকদের জন্য বিশ্রাম-গৃহ রয়েছে বন-দপ্তরের তত্ত্বাবধানে। স্থানীয় পর্যটক দপ্তরের কার্যালয় রয়েছে তোষাখানা রোডে। তথ্যকেন্দ্র হল শা-বাগ হোটেলে। ঢাকায় কয়েকটি মজলিসি বা ক্লাবও আছে। যেমন—ঢাকা ক্লাব লিমিটেড, বাঙলাদেশ প্রেস ক্লাব, বাঙলাদেশ ফ্লাইং ক্লাব, জিমখানা ক্লাব প্রভৃতি। এছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশে অনেক নতুন ক্লাব হয়েছে।

মীরপুর

ঢাকা শহরের ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে মীরপুরে গ্রামে রয়েছে বাগদাদের শাহাজাদা সুলতান আউলিয়া শা-আলি বাগদাদীর মাজার এবং এই দরগার মসজিদটি ১৪৮০ খৃঃ নির্মিত।

সাভার

ঢাকা থেকে ১৬ মাইল দূরে ধলেশ্বরী ও বংশীনদী সংগমে সাভার অবস্থিত। এ সাভারে বৌদ্ধ-বিহারের ধ্বংসাবশেষ রাজা হরিশ্চন্দ্রের দুর্গ প্রভৃতি বিভিন্ন পুরা-কীর্তি সমৃদ্ধ।

ধামরাই

ঢাকা থেকে পনের মাইল উত্তর দিকে ধামরাই। এখানে আছে হজরত মির শাইয়ং আলির তীয়রেজীএর ১৪৮২ খৃঃ নির্মিত দরগা। ধামরাই প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু কীর্তিতে সমৃদ্ধ।

বজ্রাসন বা বল্লাসন

এখানে আছে প্রাচীন বল্লাসন মহা-বিহারের ধ্বংসাবশেষ সমৃদ্ধ বাজাসনের ভিটা।

নারায়ণগঞ্জ

ঢাকার দশ মাইল দূরে শীতলক্ষা নদী তীরে বর্তমান শিল্পনগরী এবং বাংলা-দেশের বৃহত্তম বন্দর নারায়ণগঞ্জ অবস্থিত। বুড়ীগঙ্গা তীরবর্তী ঢাকা নারায়ণগঞ্জ রাস্তার রূপমাধুরী নবীন পর্যটকদের বিমোহিত করবে। নারায়ণগঞ্জের সোনাকান্দা ও হাজিগঞ্জ মহল্লায় দুটি গোলাকার জল-দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। এ ছাড়া শিল্প-নগরী নারায়ণগঞ্জে বৃহৎ বৃহৎ কল-কারখানা ও ব্যবসায়ীক পরিবেশের জন্যই নারায়ণগঞ্জ আজও সুবিখ্যাত। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের মিটারগেজ রেল স্টেশনের স্বল্প দূরেই আছে পর্যটকদের জন্য ডাকবাংলো। এ ছাড়া শহরের মধ্যে দেশী হোটেলও পাওয়া সম্ভব। পরিবহনের জন্য ট্যাক্সি ও রিকসাও পাওয়া যায়।

সোনারগাঁও

নারায়ণগঞ্জের স্বল্প দূরেই সোনারগাঁও। এই সোনারগাঁওতেই বাংলার পাল রাজাদের অন্যতম প্রাথমিক রাজধানী ছিল। এখানকার প্রাচীন কীর্তিগুলির মধ্যে শহরের প্রাচীন প্রবেশদ্বারটি এখনও সুস্থ দেহে বিরাজ করছে। এটির শিল্পকর্ম অপূর্ব। শা আবদুল আলির দরগার এবং সেন বংশের দ্বিতীয় রাজা বল্লাল সেনের প্রস্তর রথের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। অন্যান্য প্রাচীন কীর্তিগুলির মধ্যে রয়েছে ১৩৮৯ খৃঃ নির্মিত গিয়াসুদ্দীন আজিম শাহ দরগা। এই দরগার সিকিমাইল পশ্চিমে আছে পাঁচ পীরের দরগা। পাঁচজন এই গাজীপীরের নাম হল, গায়সুদ্দি, শামসুদ্দি সিকান্দার গাজী এবং কালু। আজো নদীমাতৃক বাংলা-দেশের প্রতিটি মাঝি তার পাড়ি শুরু করে যে নাম দিয়ে বা যে নাম স্মরণ করে বৈঠা ধরে তা হ'ল আল্লা, নবী, পাঁচপীর বদর বদর। পাঁচপীর দরগার অদূরেই আর পাঁকাই-র দেওয়ান বা প্রখ্যাত পীর শা আবদুল আল্লার দরগা। কাছের গোয়ালদি গ্রামে মোল্লা আকবর খাঁ কর্তৃক গৌড়াধিপতি হুসেন শাহের সময়ে ১৫১৯ খৃঃ নির্মিত সোনারগাঁয়ের প্রাচীনতম মসজিদটি নির্মিত হয়েছে গাঢ় লাল ইঁট দিয়ে এবং এতে আছে তিনটি গম্বুজ। মাঝের গম্বুজটি নীল রং-এর বিচিত্র প্রস্তর মোজাইকে সুশোভিত। বারভুঁইয়ার অন্যতম ভুঁইয়া ঈশা খাঁ নির্মিত বাংলা স্থাপত্যে দেওয়ান বাড়ী। ট্যাকশালের ধ্বংসাবশেষ ও ঈশা খাঁর দীঘি আজও দেখা যায়।

বিক্রমপুর

প্রাচীন বাংলার অন্যতম প্রখ্যাত নগরী বিক্রমপুর ঢাকা থেকে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। সেদিনের বিক্রমপুরের কিছুই আজকের ক্ষুদ্র বিক্রমপুরের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই বিক্রমপুরের অনেক কীর্তি ধ্বংস করেই পদ্মা নাম নিয়েছে কীর্তিনাশা। পুরাতত্ত্ব সমৃদ্ধ বিক্রমপুর পর্যটকদের পক্ষে এক অবশ্য দর্শনীয়স্থান। এখানকার প্রাচীন কীর্তিগুলির মধ্যে রয়েছে বল্লাল সেন নির্মিত বল্লালবাড়ী, বল্লালদীঘি রামপাল দীঘি, প্রভৃতি। মুন্সীগঞ্জ থেকে দেশী নৌকো বা ষ্টিমার যোগে এখানে আসা যায়। মুন্সীগঞ্জের ইদ্রাকপুর নামক স্থানে হার্মাদদের হাত থেকে প্রাচীন ঢাকাকে রক্ষার জন্য মোগলদের নির্মিত এক জল-দুর্গের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

কক্সেসবাজার

সমুদ্র তীরবর্তী এটি একটি স্বাস্থ্যকর সৈকতাবাস। চট্টগ্রাম থেকে ৯৮ মাইল দূরত্বের পাকা রাস্তা দিয়ে এটির যোগাযোগ তাছাড়া বিমানে যাতায়াতেরও সুযোগ আছে। পর্যটকদের সুবিধার জন্য সুন্দর আধুনিক ব্যবস্থাসহ বিশ্রামাগার হোটেলের ব্যবস্থাও এখানে আছে। বিশ্রাম কেন্দ্র থেকে আধ মাইলের মধ্যে এক সুন্দর পাহাড় আছে সেটি সাধারণতঃ পিকনিক স্পট' হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। ব্রহ্ম সীমান্ত বর্তী এ শহর এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বাংলা ও ব্রহ্মদেশের সাংস্কৃতিক সমন্বয় বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট। পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা প্রায় ৭০ মাইল সৈকতের সৌভাগ্যবান কক্সেস বাজার। একটানা এই লম্বা সৈকতে সামনে অন্তহীন নীল জলরাশি পিছনে রয়েছে ঘন বনানীপূর্ণ পর্বতশ্রেণী এ সৈকতে শ্রান্ত পর্যটকের সামনে বিস্তীর্ণ নীল জলরাশির সফেন সমু তার উপর আলো-ছায়ার বিচিত্র খেলা কিম্বা হাঙ্গরবিহীন এ-সৈকতে সমুদ্রস্নানে পরম তৃপ্তি লাভ। পেছনের পাহাড়ে এ দিনের শিকার অভিযান যে কোন শিকারীর পক্ষেই লোভনীয়। তেমনি সমুদ্রমধ্যে মহেশ খালি বা সোমাবিয়া দ্বীপের কাছে সম্পান বা সমুদ্রগামী নৌকার পালের ছায়ায়

...হবে সুযোগও পর্যটকদের জীবনে ...কই আসে।

চাইলা

কক্সেসবাজারের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ...ভাল রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত, জঙ্গল ...তত্ত্বাবধানে এক ডাকবাংলো এখানে ...এখানকার জঙ্গলে হরিণ, বনমোরগ ...করে ডোরাকাটা বাঘও মাঝে ...পাওয়া সম্ভব সৌভাগ্যবান ...কাছে।

রামু

কক্সেসবাজারের ১০ মাইল পূর্বে ...সব ঋতুতে যাতায়াতের উপযোগী ...রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত। রামু থেকে আধ ...দূরে বৃহৎ স্থাপত্যের ঢঙে বিচিত্র ...ও পাথরের ভাস্কর্যমণ্ডিত বৌদ্ধ ...অমূল্যরত্ন শোভিত ...মন্দিরে বুদ্ধ প্রতিমা শুধু যে ...নয়, এখানে এলে বাংলাদেশের ...বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও তার পরম্পরার ...সম্ভব হবে সাধারণ পর্যটকদের ...জন্মভূমি সম্বন্ধে এ অঞ্চলে বন্য ...দেখতে পাওয়া যায়।

...নিয়া

...থেকে ২২ মাইল পূর্বে ...সীমান্তবর্তী ঘন বনানীপূর্ণ পার্বত্য ...এ অঞ্চলে হাতী ডোরা-... বিচিত্র জাতের পাখী ...পাওয়া যায়। শিকারীদের পক্ষে এ ...জায়গা।

...

...থেকে ২৮ মাইল উত্তরে ...ট্রাঙ্করোডের কাছে আরাকান ...ওপর ছোট এক পাহাড়ের মাথায় ...বন দপ্তরের এক সুন্দর ডাকবাংলো। ...জঙ্গলেও হাতি, হরিণ, বাঘ ...করে বিচিত্র সব পাখীর ...

হিমছারী

...সুন্দর এক চড়ুইভাতি ও ...কেন্দ্র হিসেবে কক্সেসবাজার থেকে ...মাইল দূরের সমুদ্র-বেলার ওপর ...দক্ষিণমুখী সমুদ্রের ওপর পাঁচ ...বিখ্যাত 'ভাঙ্গাপাহাড়' শ্রেণী ...সৌন্দর্য চিরকালই পর্যটক-...বিমোহিত করে।

টেকনাফ

কক্সেসবাজার থেকে ৬৫ মাইল দূরে ...নদীর মোহনায় এই টেকনাফ। ...ব্রহ্মদেশ। বন্য জন্তু সমৃদ্ধ ...জঙ্গল এবং নদীবক্ষে পর্যটকদের ...জীবিহারের সুব্যবস্থা রয়েছে। জঙ্গল ...এবং ভ্রমণ বিভাগের ডাকবাংলো ...এখানে।

...মার্টিন-দ্বীপ

...বর্গমাইল বিস্তৃত মাত্র ১০০০জন ...বাসযুক্ত এই প্রবালদ্বীপটি সমুদ্র ...থেকে মাত্র ১৪ মাইল দূরের সমুদ্র-...অবস্থিত। নারকেল গাছ শোভিত ...বেলাভূমিতে পর্যটকদের সংগ্রহের

জন্য ছড়ানো আছে বিচিত্র সব শাঁখ, ঝিনুক, সুক্তি, কড়ি ইত্যাদি।

সোনাদিয়া দ্বীপ

কক্সেসবাজার থেকে মাত্র এক ঘন্টা সমুদ্র পাড়ি দিলেই সোনাদিয়া দ্বীপে পৌঁছানো যায়। বিচিত্র এই দ্বীপ মৌসুমী পাখীর সমাবেশে বৈচিত্র্যময়। তেমনি এর তীর সংলগ্ন সমুদ্র ও সামুদ্রিক মৎস্য-রাজিতে ভরপুর।

মহিষখাল

কক্সেসবাজার থেকে ৬ মাইল দূরে সমুদ্রবক্ষে মহিসখাল বা মহিষখালি দ্বীপ। এই দ্বীপের দক্ষিণ সীমান্তে আছে গোরক্ষ-ঘাটা বাজার। এখানকার মগ বস্তির মধ্যে আছে বিচিত্র সব বৌদ্ধ মন্দির বা 'কেয়াং'। এই কেয়াং-এর মধ্যে আছে স্বর্ণমণ্ডিত বৌদ্ধ প্রতিমা এবং বিচিত্র বর্ণবহুল 'জেদি বা স্তূপ'। কাছের পাহাড়ের ওপর আছে বৃহৎ এক জেদি বা স্তূপ। এই জেদিতে প্রহরারত বিরাট দুই চীনথিস বা জালি অর্থাৎ কল্পনাজাত সিংহমূর্তি। এই পাহাড়ের ওপরেই আছে বিখ্যাত হিন্দু মন্দির আদিনাথ।

হ্নীলা

টেকনাফের ৩০ মাইল উত্তরে এবং কক্সেসবাজার থেকে প্রায় চার ঘন্টার পথ। উত্তরে আরাকান পর্বতশ্রেণীর বিচিত্র দৃশ্য-সমৃদ্ধ হ্নীলা এ অঞ্চলের এক শিকার বা চড়ুইভাতি অথবা নিছক বিনোদনের উপযুক্ত স্থান। প্রায় ৭০০ ফিট উঁচু পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত বন দপ্তরের ডাকবাংলো। নিঃসন্দেহেই এটি এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ডাকবাংলো।

উখিয়া

কক্সেসবাজার থেকে ২১ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ঘন বনানী ও অজস্র বন্য-জন্তুপূর্ণ এ অঞ্চলে এক বিচিত্র জায়গা রয়েছে। পাহাড়ের ওপর রয়েছে ডাকবাংলো। এখানে বন্য জন্তু দেখবার জন্য পর্যটকদের আর জঙ্গলে ঢুকতে হয় না। ডাকবাংলোর সামনে প্রায়ই এদের আনাগোনা হয়।

রাঙামাটি

পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশের প্রধান পথ হিসেবে রাঙ্গামাটি পর্যটকদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। চট্টগ্রাম থেকে ৬৫ মাইল যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত। পাহাড়তলীর নিচে ঘুমন্ত এ ছোট শহরটি পর্যটকদের সুবিধার জন্য আছে সার্কিট-হাউস, ডাকবাংলো, পর্যটক বাংলো।

রামগড়

চট্টগ্রাম থেকে ৬৬ মাইল দূরে। এখানকার সুন্দর পাহাড়ী নিঃসঙ্গ আকাশ-ছোঁয়া তালগাছ, ঘন সবুজ পটভূমিতে রোমাঞ্চকর। চাটগাঁ থেকে এখানকার পথের বৌচিত্র্য চড়াই-উৎরাই আর খাদের গভীরতায় মনোরম সেই সঙ্গে চা-বাগানের পটভূমির এক শান্ত পরিবেশ সহজেই পর্যটকের মনে দাগ কাটে।

কাপ্তাই

লুসাই পাহাড়ের কোল ঘেঁসে দুরন্ত কর্ণফুলী এসে পড়েছে কাপ্তাই এর হ্রদে (বাঁধ)। এই হ্রদের ব্যাপ্তি প্রায় ২৬৫ বর্গ-মাইল। এখানে রয়েছে বিখ্যাত কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এটি পাক-ভারত মহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তর বাঁধ সংলগ্ন হ্রদ। গভীর জঙ্গলঘেরা এই পার্বত্য অঞ্চলে রয়েছে অশেষ বন্যপ্রাণী এবং হ্রদ বা চড়াই-এর দিকে কর্ণফুলী নদী, কাসালাং এবং মৈনী নদীর জলে রয়েছে অফুরন্ত মাছ। কাপ্তাই হ্রদে পর্যটকদের ভ্রমণের জন্য অপেক্ষমান স্পীডবোট মোটর লঞ্চ হাউস-বোট ইত্যাদি নৌ-বিহারে শ্রান্তি অবসানের জন্য। কাপ্তাই থেকে ২৭ মাইল দক্ষিণে আলিখোয়াং-এ রয়েছে পর্যটক বিভাগের বিশ্রাম গৃহ।

বরকল

কর্ণফুলী নদীর ওপর লুসাই পাহাড়ের নিচে 'বরকল' পর্যটকদের আর একটি আকর্ষণীয় স্থান। বড় বড় পাথর বা নুড়ির বাধা ভেদ করে খরস্রোতা কর্ণফুলী গিরি শৃঙ্গকে রোমাঞ্চকর

...এ
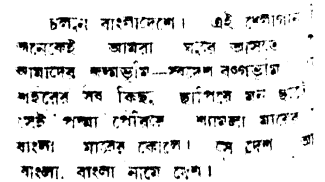
এখন দায়টা যেন একা অসীমারই। তো ছাড়া আর কি ভাবতে পারে ও। পর পর এতগুলো লোক স্নেহাংশুর চিঠিখানা পড়লো, সকলেরই হাতে হাতে চিঠিখানা ঘুরলো। কিন্তু ব্যস ঐ পর্যন্তই। না-কি-হ্যাঁ, ভাল-কি-মন্দ তার বেলা কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই।

অন্য আগে হলে বাড়িতে এতক্ষণ হৈ চৈ পড়ে যেত। জয়ার বিয়ের(?) পাত্রের খোঁজ পাওয়া আর হাতে চাঁদ পাওয়া দুই সমান। এখন যেহেতু জয়ার বিয়েতেই মন নেই, সেইহেতু স্নেহাংশুর চিঠিরও কোন মূল্য নেই ওদের কাছে।

বেশ, দেখা যাবে। অসীমা মনে মনে গজ গজ করল কিছুক্ষণ আহ্লাদী ননদের বিয়ে হল কি না হল ওর ভারী দায় পড়েছে। স্নেহাংশুর হাজারবার অনুরোধ উপেক্ষাই না ভাইকে জয়ার বিয়ের জন্যে পাত্র দেখতে লিখেছিল অসীমা। না হলে স্নেহাংশুই বা গরজ নিয়ে একেবারে ছেলেকে সঙ্গে করে জয়াকে দেখাতে নিয়ে আসবে। আর এখন সেই শাশুড়ীর মুখে রা-টি পর্যন্ত নেই। ভাল। [illegible] হল যা হোক অসীমার। কিন্তু আর নয়। পারলে স্নেহাংশুকে এখনি আসতে মানা করে চিঠি লিখে দিত ও।

আসলে জয়ার সম্পর্কে এতদিনে বাড়ির সকলেই হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। কারো চেহারা খারাপ, কেউ ভীষণ কালো, কেউ থপথপে মোটা, কেউ জয়ার চেয়ে মাথায় বেঁটে। আবার কেউ যেন কেমন কেমন। একটা না একটা খুঁত বার করবেই জয়া। যেন মানুষের বাইরের আকৃতিটাই সব। আর ভেতরের গুণগুলোর কোন মূল্য নেই। কিন্তু ওকে বোঝায় কে এসব কথা। কচি খুকী তো নয়। পঁচিশ বছরের ধাড়ী মেয়ে। তার ওপর আবার স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। ভাল কথা বলতে গেলে উল্টে এক ঝুড়ি পরিপক্ব জ্ঞান দিয়ে পেট ভরিয়ে তবে ছাড়বে। দাদারা তো হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। আর তাদেরই বা দোষ দেবে কি করে অসীমা। ঠায় বাড়িতে পা উঁচিয়ে হবার উপক্রম—অথচ একটা ছেলেকেও পছন্দ হল না জয়ার। বিয়ে না করার মতলব ছাড়া এ সবের আর কি মানে হতে পারে। দুত্তোর বিয়ের নিকুচি করেছে। এখন যা পারিস তাই করগে যা। আমরা অপারগ। এবার হল? এই কানমলা, নাকমলা। নেড়া আবার যদি বেলতলায় যায়।

তবু যাচ্ছে তো। বার বার সম্বন্ধ ভংগ হচ্ছে বলেই তো জয়া বেঁকে বসে। কেন কয়েকবার তো তাই ঘটেছে। জয়া সাফ-সাফ বলে দেয় নি সবাইকে। বিয়ে না হয় না হোক—তোমাদের আর মাথা ঘামাতে হবে না। এতকাল মাথা ঘামিয়ে কি লাভ হল? একবার নয়, দুবার নয়, বিশ-বাইশবার। এ বয়সে কার ভাল লাগে এ সব। তবে আবার কেন? একেবারে শেষবার দাদা যে সম্বন্ধটা এনেছিল—ও কি একটা জয়ার সঙ্গে বিয়ের যোগ্য পাত্র? ও তো একটা রীতিমত মিনসে। সময়মত বিয়ে করলে এতদিনে বোধহয় ওর ছেলের জন্যেই মেয়ে দেখতে যেতে হত। কালো মোটা......আর বয়েস না হোক পঁয়তাল্লিশ তো বটেই। তবে আর মহাপাত্র মশায়ের ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী আর চাকরিতে প্রতিপত্তি জয়ার কোন স্বর্গে বাতি দেবার কাজে লাগবে। ঘেন্না ঘেন্না! বিয়ের নামে ঘেন্না ধরে গেছে জয়ার।

তবু সেবার দাদা আর বৌদির পীড়াপীড়িতে রাজী হয়েছিল জয়া। সব জেনেশুনেই পাত্রমশাইয়ের দৃষ্টিতে নিজেকে পছন্দ করিয়ে নেবার জন্যে সং সেজে গিয়ে বসেছিল ওর সামনে, তবে হ্যাঁ......ঐ এক শর্তে। আগেভাগেই সবাইকে দিয়ে সত্য করিয়ে নিয়েছিল জয়া......এ বিয়ে হলে ভাল, না হলেও ভাল। কিন্তু এই শেষ। আর নয়। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হোক। রোজ রোজ সং সেজে পরপুরুষের চোখে নিজেকে পছন্দ করিয়ে নেবার মধ্যে যে হীনতা আছে, অসম্মান আছে, কোন মেয়ের ভাল লাগে সেটা। কোন মেয়ের না মর্যাদায় বাধে! জয়া সুন্দরী নয় ঠিকই কিন্তু সুশ্রী তো ঠিকই। অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেছে। পেটে বিদ্যেও তো কিছু আছে। তবু যখন এতদিন এত চেষ্টার পরও কোন কূলকিনারা হল না, তখন প্রত্যাশার আর আছে কি?

আর এত কাণ্ডর পরও যদি বৌদির মাথাব্যথা না কেটে থাকে তো সে দায় নিশ্চয়ই জয়ার নয়। কাল সে অসীমাই বুঝবে। ওকে তো জিজ্ঞেস করে মত নিলে ভাইকে চিঠি লেখে না বৌদি! তবে?

তবে আবার কি সে কথাটা বলবি তো? অসীমাও আজ ঠিক করে ফেলেছে দু'কথা না শুনিয়ে ছাড়বে না কিছুতেই। বিয়ে করব না বললেই তো আর হবে না। তবু দাদাদের দায়-দায়িত্ব তো একটা থাকেই। আর না হয় কেড়ে কাসুক জয়া। মন খুলে বলুক, যদি কাউকে ভাল লেগে থাকে ওর, তবু যা হোক একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়। না হলে এত ছেলে দেখে গেল ওকে একটাকেও পছন্দ হয় না—এ কথা কী বিশ্বাস করার মতো কথা?

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতেই তাই আজ জয়াকে নিয়ে পড়ল অসীমা—তবে-টবে নয়, ঠিক করে বলতো জয়া তোর মতলবটা কী?

জয়া ঘাড় কাৎ করে বৌদির দিকে অপাঙ্গে যেন চোখ তুলে তাকিয়ে নিষ্ঠ গলায় উত্তর দিল—মতলব তোমার না আমার? তুমিই খুলে বলো না ননদিনীকে বাড়ি থেকে বিদেয় না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছ না?

অসীমা এ কথা বলার ধরণ শুনে একটু শুকনো হাসল, বলল—না না, ঠাট্টা নয়। ঠিক করে বল্ তো। তোর আপত্তিটা কিসের? স্নেহাংশু লিখেছে ছেলে নাকি খুব ভাল। রূপবান গুণবান বলা কী যায় যদি পছন্দ হয়ে যায় তোকে। আর হয়ত তো অমন...

—ক্ষমা কর বৌদি, আর নয়। খুব শিক্ষা হয়েছে এতদিন। আর তবু, যদি কোন কর, আমি বাড়ি থেকে পালাব। নিশ্চয়ই পালাব, বলে রাখলাম। তোমরা কোন হদিশই পাবে না আমার।

অসীমা এবার সত্যি সত্যি চটে উঠল—ছেলেমানুষি করিস না জয়া। ভাল করে ভেবে দ্যাখ, এখনো তো সেই ইঞ্জিনীয়ার ছেলেটি কোন স্পষ্ট কথা বলে নি। তোর দাদা গিয়েছিলেন ওঁদের বাড়ি। ওঁরা নাকি মতামত জানাবার জন্যে কিছুদিন সময় নিয়েছেন। এখন যদি ওরাই তোকে পছন্দ করে? তোর তো ঐ ছেলের সঙ্গে বিয়েতে পুরই অমত আমি তো জানি। তার জায়গায় স্নেহাংশুর বন্ধুর সঙ্গে যদি হয়ে যায় বিয়েটা, ভালো হয় না?

—তুমি খেপেছ বৌদি। পনেরো দিনের মধ্যে যারা মনস্থির করতে পারল না তাদের মনের কথা বুঝে নিতে অসুবিধে হয়? তবু বার বার দাদা যে কেন দৌড়চ্ছে বুঝি না আমি!

দৌড়চ্ছেন কি সাধে—ভেবে দ্যাখ। আর আশা আছে বলেই না এত দৌড়োদৌড়ি। আমি বলছি তোকে ওদের ভীষণ পছন্দ হয়েছে। তোর দাদাকে তো পাত্র নিজেই একরকম বলে ফেলেছে কথাটা। শুধু কি নাকি একটু মুস্কিল আছে তাই আরেক হপ্তা সময় নিয়েছেন তাঁরা। তারপর একটু থেমে আবার শুরু করল কথাটা—ধর যদি তাই হয়। যদি লেখে তারা রাজী। বিয়ের দিনক্ষণ স্থির করলেই ......

অসীমাকে কথাটা শেষ করার পর্যন্ত সময় দিল না জয়া। তার আগেই উদ্ধত ভঙ্গিতে জবাব দিয়ে উঠল—করুক। আমি তো সে কথা আগেই বলে দিয়েছি— আমি প্রস্তুত।

অসীমা এবার চুপ। জয়া ওকে চুপ করিয়ে তবে ছাড়ল। শুধু কিছুক্ষণ জয়ার মুখের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অসীমা। তারপর বললো—এত জেদ কী ভাল জয়া। মনে লাগে সে ছেলেকে তোর পছন্দ হয় নি তবু বলার তুই প্রস্তুত। আর এও সব যদি কোন কারণে দেখি এ বিয়েতে অসুবিধে আছে ওদের, মানে আমি বলতে চাইছি.... সে ক্ষেত্রে স্নেহাংশুর বন্ধুর সঙ্গে যদি হয়ে যায় বিয়েটা, ভাল হয় না জয়া? হাতের লক্ষ্মী কি পায়ে ঠেলা ভাল হবে? বিয়ের কথা কি বলা যায়। যাদ ভাবতলে লেখা...

—সে তো আমি জানতামই ওদের পছন্দ হবে না। তবু তো শুনলে না আমার কথা। পাছে দোষ পাও তোমরা তাই রাজীও হয়েছিলাম। কিন্তু কি কথা ছিল তখন, সব কথা ছিল না—এই শেষ? আর এর মধ্যে সে কথা সব ভুলে গেলে?

অসীমা এবার জয়াকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিল। তা হয় না রে জয়া, তা হয় না। বার বার এত অভিমান করছিস তুই। তোর আমার মত মেয়ে মাত্রেরই জিজ্ঞেস করে দ্যাখ, এমনি কত বিড়ম্বনার অভিজ্ঞতাই না জমা হয়ে রয়েছে সবার মধ্যে। তাই বলে তারা বিয়ে করছে না? সবাই তোর মত জেদ করে আইবুড়ো হয়ে বসে রয়েছে? লক্ষ্মী মেয়ে আর না বলিস না জয়া। শোন আমার কথা। নয়তো পরে ঠকবি তুই।

জয়ার চোখ দুটো এবার ছলছল করে উঠল। তারপর নিজেকে সামলে নিতে নিতে বলল—ঠিক ঠকবো, তাও ভাল। কোন দুঃখ থাকবে না আমার। কিন্তু নতুন করে আর ঠকতে পারব না। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল,—যে আসবে তাকেই আমায় বিয়ে করার কথা বলতে হবে। এত শস্তা আমি! না না বৌদি, দোহাই তোমার স্নেহাংশুকে একটু বুঝিয়ে বোল আমি বিয়েই করব না। বন্ধুকেও যেন আগে থেকেই সে কথা বলে রাখে স্নেহাংশুদা। না হলে সর্বক্ষণ একটা মানুষ হাঁ করে দেখবে আমার দিকে সে ভাল লাগবে না আমার। তা হলে আমি ওদের সামনেই বেরুতে পারব না। সংকোচে কথাই বলতে পারব না। আর নয় তো দুদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে কোথাও থাকি। তা হলে তোমরাও বাঁচো আমিও বাঁচি।

অসীমার বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো এবার। বেশ তাই হোক। তুমি জন্ম জন্ম আইবুড়োই থাক। তোমার দুই দাদাও নিশ্চিন্ত থাকুক। শাশুড়ী যেমন আজ চিঠিটা আসার পর থেকেই আত্মভোলা হয়ে উঠেছেন, তেমনই থাকুন, সবাই নিশ্চিন্ত হয়েই কাটাক। এখন যত দায় অসীমারই। স্নেহাংশু কাল বন্ধুকে নিয়ে এসে পড়লে আগেই জয়ার ভেদের কথা বলে রাখা দরকার। না হলে মেয়ের আবার রাগ অভিমান হবে। হয়তো বা ভয় করে কথাই বলবে না ওদের সঙ্গে। কিম্বা হয়ত কোনো ছুতোয় বাড়িই ফিরবে না। তার চেয়ে আগেভাগেই বলে রাখা ভাল। তারপর যা হয় হোক। জয়ার বিয়ে না হলেও ও ভারী বয়ে গেছে।

পরের দিন দুপুরের ট্রেনে কলকাতা থেকে স্নেহাংশু আর ওর বন্ধু শোভন এসে পৌঁছোল। স্টেশনে ওদের জন্যে কেউ অপেক্ষা করে নি। স্নেহাংশু আগেও কেবার ঘুরে গেছে এখান থেকে। পথঘাট সব ওর চেনা। তাই স্টেশন থেকে টাঙ্গায় চড়ে [illegible] কোন অসুবিধে হল না।

তবু অসীমারই যেন কেমন লাগছিল স্নেহাংশুর জন্যে নয়। সঙ্গে তো একজন বাইরের লোক রয়েছে। আর বিয়ে হোক আর না হোক এ বাড়ির তরফ থেকে সমান ভদ্রলোকটিকে, দেখাতে কারো একজনের স্টেশনে হাজির থাকা উচিৎ ছিল। সেটা দেখাতেও ভাল।

তা কোনটা আর অসীমার ইচ্ছে মত হচ্ছে। কারই বা দায় ঠেকেছে এত। অনুপম তো বলেই দিল, স্নেহাংশু তো বাইরের কেউ নয়। আর আজ নতুন আসছে না এখানে। তবু লোকদেখানো অভ্যর্থনা করতে স্টেশন পর্যন্ত ধাওয়া করার কোন মানে আছে? আর ওর সঙ্গে যিনি আসছেন তাঁর কাছে কি ব্যাপারটার অন্য অর্থ হয় না। মানে এ নাকি, একটু যেন স্বার্থ গন্ধ লুকিয়ে রয়েছে এই সবের মধ্যে। না, অহেতুক বাড়াবাড়ি কোন মানে হয় না। যা স্বাভাবিক তা ভাল। সেটা দেখায়ও ভাল। কারণ দুপক্ষের মেলামেশার পথে কোনরকম কৃত্রিমতা যেন প্রতিবন্ধক না হয়ে দাঁড়ায়।

আসলে অসীমা বোঝে, এ সব যুক্তি অসার। কিছু বলার জন্যেই বলা। নয়তো কী। জয়া যখন এ বিয়েতে রাজী নয় তখন এ সব ফাঁকা সৌজন্য অর্থহীন হয়ে ঠেকবেই। আর এও জানে অসীমা জয়া রাজী থাকলে ঠিক উল্টোটাই ঘটতো। তখন ওকে আর বলে দিতে হত না। অনুপম নিজেই ছুটতো স্টেশনে।

অনুরণিত হয়ে চলল অনেকক্ষণ। কথা বলে তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে প্রাণ চায় না কারো, তাই এই নীরবতা।

—সত্যি চমৎকার। অপূর্ব। বেশ গান আপনি। গভীরতা ভঙ্গ করে ধীরে ধীরে মন্তব্য করল শোভন।

জয়াও অবাক। আগে কখনও এত ভাল গাইতে পেরেছে বলে মনে পড়ে না ওর। সত্যি শোভন কিছু অতিরঞ্জন করেনি। ওর গানের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কথা বলেছে মাত্র। বেসুরো হলে কানে বাজতো বৈকি জয়ার।

ভদ্র, সংযত, শান্ত। কিন্তু বেশ বোঝা যায় প্রকৃতিতে বড্ড উদ্দাম শোভন। সংকল্পে আর দৃঢ়তায় অটল। আর স্নেহাংশুর স্বভাবটা ঠিক বিপরীত। হাঁক-ডাক, ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ির মধ্যেই ও যেন বেশ আনন্দ পায়। এতদূরে থেকে দুদিনের জন্যে বেড়াতে আসা সে কী কেবল ঘরের কোণে বসে বসে গান গাইবার জন্যে। পরের দিন সকালেই দূর পাহাড়গুলো থেকে বেড়িয়ে আসার জন্যে তৈরী হয়ে একেবারে টাঙ্গা ভাড়া করে এনে দাঁড় করাল বাড়ির দরজায়।

কিন্তু আর যারা সঙ্গে যাবে তারাই তৈরী নয়। অনুপমের তো সঙ্গী হওয়ার কোনই উপায় নেই। ছোট শালা এবং তার সঙ্গে — ছেলে-ছোকরাদের হুড়োহুড়ি, আনন্দের মধ্যে মূর্তিমান ছন্দপতনের মতো ঠেকবে ওর উপস্থিতিটা। নিরুপমের জ্বরের তাপ এখনও কমেনি। কিরণময়ীর ... বেড়াবার বয়স পেরিয়ে গেছে ... আর অসীমা জয়ার তো এখানের ... দেখে দেখে চোখ পচে গেছে।

তবু যেতে তো হবে একজনকে, সে কি ... বলে দিতে হবে। অচেনা অদেখা দেশে ... সঙ্গী একজন, তা সে যেই হোক। জয়ারও তো স্কুল। ছুটি থাকলেও ... অন্য কথা ছিল। এখন অসীমা ছাড়া ... কেই বা আছে! যুক্তিটা নেহাৎ মন্দ নয়। তবে তাই অসীমাই যাক।

অসীমারও পাল্টা যুক্তি আছে বই কি! ... এই রান্নাবান্নার পাট কে সামলাবে, ... হলেই হয়েছে। এ সব করেছে কোন ... না এ কাজ এত সস্তা? ফাঁকা ... বসে দুখানা শেখা গান গেয়ে ... লোকের কাছে বাহবা কুড়নো যায়, কিন্তু এ কাজ এত সহজ নয়। মুখে তুলতে ... খাদ্য উগরে আসে মুখ ... তো ফাঁকা কৃতিত্বটাও মাঠেই মারা ... সব গুণপনা ফাঁস হয়ে যাবে এক ... । না না, বরং জয়াই যাক। একদিন স্কুল ফাঁকি বই তো নয়।

অগত্যা জয়াকেই বেরুতে হল। আর সেই দেখালেও ভাল। অসম বয়সী সঙ্গী হলেই যেন ছন্দপতন ঘটে যায়। বার বার আলাপের সুর কেটে যায়। তা হতে দেয়নি ... তাই রক্ষে। এখন ওরা তিনজন, সমবয়সী, তরুণ। টাঙ্গাটা শহর এলাকা ছাড়িয়ে উন্মুক্ত মাঠ-প্রান্তরের উঁচু-নিচু পথ ধরে ছোটা শুরু করতেই কি ভেবে শোভন ঠিক গানটাই গেয়ে উঠল—আমরা নতুন যৌবনেরই দূত। আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত......।

ফাগুনের অফুরন্ত ধরা সকালের হাওয়ায় হাওয়ায় মুঠো মুঠো মিষ্টি সুরের রেশ ছড়িয়ে এই যে অবিরাম ছুটে চলা...এই সব পাহাড়ঘেরা প্রকৃতির নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলি উঁচুনিচু পথ ঘাট, ঘোড়ার খুরের ছন্দবদ্ধ শব্দ, সব মিলিয়ে জয়ার মনে খুশির আবেশ ধরিয়ে দিচ্ছে।

শোভনের গান থামল। এবার জয়ার পালা। বন্ধুর হয়ে স্নেহাংশুই অবশ্য অনুরোধ পেশ করল—জয়া এবার তুমি। ধরো... রেশ কেটে দিও না।

জয়া মিষ্টি হাসল—আর আপনি, উঁহু আপনার পরে তবে আমি, কি বলেন শোভনবাবু?

—নিশ্চয়ই! নে স্নেহ, এবার ধর......

স্নেহাংশু এবার জোরে হেসে উঠল—আমি! আমি হলাম হংস মধ্যে বক যথা। তোদের সুরের হাটে মূর্তিমান ভাঙা বাঁয়া তবলা। ওতে আর জোর করে বেসুরো বোল নাই তুললি শোভন।

জয়া খিলখিল করে হেসে উঠল—ইস্ কথার ফুলঝুরি। না তা হবে না স্নেহাংশুদা। আপনি না গাইলে আমি কিন্তু......

শোভন এবার প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল—তবেই হয়েছে! এই যদি আপনার পণ হয় আমি হলফ্ করে বলে দিতে পারি এ জীবনে গান গাইবার আর অবকাশই হবে না আপনার।

টগ্ বগ্....টগ্‌বগ্ ......টগ্‌বগ্ ...... টগ্‌বগ্......ওদের হাসি থামতেই নির্জন পথ প্রান্তর আবার অশ্বক্ষুরধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল। চড়াই শেষ করে এখন আবার উৎরাই ভেঙে নেমে চলেছে টাঙ্গাটা। কতদূর পর্যন্ত চোখে পড়ছে এখন। কৃষ্ণচূড়ার লাল রঙে দূরান্তের সমতল ভূমি যেন হোলি খেলায় মেতে রয়েছে। মুঠো মুঠো আবির ছড়িয়ে রয়েছে গাছের পাতায়। এক ঝাঁক সাদা হাঁস চঞ্চল ডানায় ভর করে পাহাড় ডিঙিয়ে কোথায় কতদূরে উড়ে চলেছে কে জানে!

ওরা সবাই এখন চুপচাপ। কারো মুখে কথা নেই। কেবল অপলক চেয়ে রয়েছে দূরে মনোরমা প্রকৃতির দিকে। হাওয়ায় জয়ার মাথার চুল উড়ছে। দামাল হাওয়ায় পত পত শব্দে শাড়ির আঁচল উড়ছে। তবু কোন হুঁস নেই ওর। সত্যি কি অপূর্ব দৃশ্য। এতবার তো এদিকে এসেছে কিন্তু কই আগে কখনও প্রকৃতিকে এত ভাল লাগেনি জয়ার।

ঘন সবুজে ঢাকা একটা ছোট্ট পাহাড়ের কোলে এসে গাড়ি দাঁড়াল। জায়গাটা আশ্চর্য শান্ত, নিঝুম স্তব্ধ। কেবল গাছে গাছে অসংখ্য পাখপাখালির অবিরাম ডাকাডাকি ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

ওরা তিনজনে টাঙ্গা থেকে নেমে পড়ল। এবার পাহাড়ে ওঠার পালা। শোভন আগে, মধ্যে জয়া আর পেছনে স্নেহাংশু। অনেকক্ষণ কেউ কথা বলেনি ওরা। স্নেহাংশুই শুরু করল এবার—শুভো, কেমন লাগছে রে জায়গাটা?

—ভাল..... অপূর্ব! সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল শোভন।

—কিন্তু তোর জগতের সঙ্গে তো কোন মিল নেই। তবু অপূর্ব লাগছে? আবার প্রশ্ন ভেসে এল পেছন থেকে।

—নেই বলেই তো এত ভাল লাগছে।

জয়ার গলায় এবার বিস্ময় ফুটে উঠল —আপনার আবার কোন জগৎ শোভনবাবু?

শোভন এবার নীরব যেন শুনতেই পায়নি জয়ার কথাগুলো। আপন মনে গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে চড়াই ভেঙে চলেছে। ওর হয়ে স্নেহাংশু উত্তর দিল— রাজনীতি। চির অশান্তি আর ঝকমারিতে ভরা যে রাজনৈতিক জগৎ.....উনি সে জগতেরই মানুষ।......

—আশ্চর্য, শোভনবাবুকে দেখে তো তা ভাবা যায় না!

—ওকে নিয়ে ভাববারও কিছু নেই জয়া। ও বাইরে যতটা রোমান্টিক ভাবছ...

প্রকৃতিতে ঠিক তার উল্টো। কট্টর রিয়ালিস্টিক্।

জয়া হঠাৎ বড় অপ্রস্তুত বোধ করল। আর স্নেহাংশুদাটাও এমন ঠোঁটকাটা। মুখ ফসকে একটা আলগা কথা বলে ফেলেছে ও কিন্তু তার কোন মাথা নেই ওর কাছে। না, শোভনকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে বড় বয়ে গেছে ওর। ওটা একটা কথার কথা, আর কিছু নয়।

স্নেহাংশু অনর্গল কথা বলে চলেছে—ও কি নয় তুমি জিজ্ঞেস কর জয়া। কবি, গায়ক, অভিনেতা রাজনীতিক জনসেবক...

কি এক সুদূরের চিন্তায় যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল শোভন। কিন্তু অর্বাচীন স্নেহাংশুর প্রগলভতা ওকে আবার টেনে নিয়ে এল মাটির বুকে। আপত্তি নয়, কৌতুকের সুরেই প্রতিবাদ করে উঠল—বলু, বলে যা—থামলি কেন?

জয়াও ওদের দুজনের বিতর্কে কৌতুক উপভোগ করছিল। বলল—আর কিছু না হোক শোভনবাবু গায় তো বটেই।

স্নেহাংশু আবার ফুট কাটলো—বড় বাউল বল জয়া। পথে পথে গান গেয়ে বেড়ানই যার হল ওর। কেবল তুমি যা মন দিয়ে ওর গান শুনলে তাই। না হলে আর কারো ধৈর্য নেই ওর গান শোনার।

স্নেহাংশুর কথা বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল—না হেসে পারল না জয়া।

আরো ওপরে উঠে এসে ওরা একটা ছায়া ঘেরা জায়গায় বসে পড়েছে। মাথার ওপর সূর্যটা এখন অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। বাতাসে গরমের আমেজ রয়েছে। তাই এখন বসে পড়ে জিরিয়ে নিতে ভালই লাগছে ওদের। পাহাড়ে ওঠার রীতিই অবশ্য তাই। একটানা দুস্তর চড়াই উৎরাই ভেঙে এগোন দুঃসাধ্য ব্যাপার। অল্পেতেই হাঁপিয়ে পড়তে হয়। তাই মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে হয়।

তিনজনেই সমান দূরত্ব বজায় রেখে ঘাসের ওপর বসেছে। শুধু শোভন ঘাসের ওপর গা এলিয়ে শুয়ে পড়ল। স্নেহাংশু বলল—খুব টায়ার্ড না কি রে শুভো! জয়া তুমি!

জয়া হাসল, বলল—একটু......তবে শোভনবাবুর মত নয়।

ওদের কথার মধ্যে না গিয়ে শোভন হঠাৎ নিজের মনেই কথা বলে উঠল—এ জায়গাটা আশ্চর্য সুন্দর তো! তারপর জয়াকে উদ্দেশ করে বলল—আপনি নিশ্চয়ই প্রায়ই এদিকে বেড়াতে আসেন, তাই না?

—খুব কম। তেমন সময় পাই কই! একটু হেসে বলল জয়া।

শোভন যেন অবাক হল খুব। তাড়াতাড়ি ওর দিকে পাশ ফিরে কাৎ হয়ে শুয়ে বলল—সেকি! আমার কিন্তু তুমি [illegible] মনে হচ্ছিল......মনে হচ্ছিল......

কি মনে হচ্ছিল বলার আগেই স্নেহাংশু ফুট কাটল—মনে হচ্ছিল এই পরিবেশে জয়াকে বড় সুন্দর মানায়......এই বলবি তো?

অন্য সময় হলে জয়া হয়তো বিরক্ত বোধ করত। লজ্জা পেত। কিন্তু এখন, এই পরিবেশে লোকালয় থেকে বহুদূরে অরণ্য প্রকৃতির কোলে স্নেহাংশুর হাল্কা রসিকতা শুনতে ভালই লাগল ওর। তাই হাসল কেবল।

শোভন এবার ওকে আক্রমণ করতেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো। বলল—তা বলে এই সব জায়গায় তোকে একটুও মানায় না স্নেহ......

—তাহলে প্রকৃতির দুই শিশুর কাছ থেকে আমার বিদেয় হওয়াই উচিত বলছিস?

ওর কথা শুনে শোভন খুব জোরেই হেসে উঠল, বলল—বিদেয় নয়। তুই বরং নিচে নেমে গিয়ে টাম্পা থেকে চায়ের ফ্লাস্ক আর ক্যামেরাটা নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আয়। তাতে এই পরিবেশে গরম চা খাওয়ার মত একটা মানানসই কাজে অন্তত নিজেকে লাগাতে পারবি ভেবে গর্ব অনুভব করতে পারিস।

জয়াও হাসল এবার। নেহাৎ ভদ্রতা করেই হাসল। না হলে একদম অচেনা অপরিচিত একজন পুরুষের দৃষ্টির সামনে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতে ওর সংকোচই বোধ করার কথা। হয়তো বা এই অবকাশে শোভন ব্যক্তিগত আলাপ জুড়ে দিতে পারে। কিম্বা নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ নিতে পারে। স্নেহাংশুকে কিছুক্ষণের জন্যে সরিয়ে দেবার সেটাই কারণ হতে পারে।

কিন্তু না, শোভন ওকে অস্বস্তির হাত থেকে বাঁচাল। স্নেহাংশু শোভনের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নেমে যেতেই শোভন একবারে অন্য খাতে আলাপ শুরু করল—নিন, এবার আপনি একটা গান ধরুন।

গান! জয়া যেন তখনও আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। একটু কিন্তু কিন্তু করে বলল—আমি কি আপনার মত গাইতে পারব শোভনবাবু?

—কিন্তু আপনি তো কাল গাইলেন। তবে আজ এত সংকোচ করছেন কেন? তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার বলল—জানেন আগে আগে আমারও বড় সংকোচ ছিল। যেখানে সেখানে অচেনা মানুষদের সামনে কেউ গান গাইতে বললে বড় রাগ হত আমার। কিন্তু এখন আর ও সব রোগ নেই।

—কী করে এ জড়তা কাটালেন?

শোভন হাসল একটু। হেসে বলল—ঐ তখন থেকে যা বলল কথাটা সত্যি। পার্টির কাজে, প্রয়োজনে কিম্বা চাঁদা আদায় করার জন্যে পথে পথে গান গেয়েছি কত! গলা শুনে কেউ হেসেছে, কুকুর ঘেউ ঘেউ ডেকেছে ......কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করিনি। এখন [illegible] অভ্যেসই হয়ে গেছে।

—আপনি রাজনীতি সত্যিই করেন!

—করি। না করে উপায় নেই। [illegible] একটু চুপ করে থেকে [illegible] প্রশ্ন করল—কেন আপনি করেন না?

—না। আমি ঠিক [illegible] রাজনীতি [illegible] উঠতে পারি না। [illegible]

শোভন আবার একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল—বুঝি [illegible] যে চলবে না। বুঝেছেই সব......না বুঝলে চলবে কেন!

শোভনের এ কথার পিছে [illegible] রই অবজ্ঞা [illegible] কিন্তু জয়াকে [illegible] ইচ্ছে করছিলনা। বরং [illegible] নিজের কথা কত সহজ এবং অকপটে প্রকাশ করতে পারে ভেবে ভালই লাগছিল। তাই [illegible] থামিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা গানই ধরল [illegible]

আরো কিছুক্ষণ পর চায়ের ফ্লাস্ক হাতে স্নেহাংশু ফিরে এল। এসেই গল্প গল্প করে কথা শুরু করল—এই পাহাড় ছাড়িয়েই নাকি আরেকটা সুন্দর পাহাড় রয়েছে ড্রাইভার বলছে। [illegible] ঘুরে দেখে আসি। কী এখানে বসে এতক্ষণ [illegible] ছিস কে জানে। [illegible] কোথাকার [illegible] জয়া। তুমি চলো তো!

শোভন তাড়াতাড়ি উঠে [illegible] নাকি। তবে চল। চাটা খেয়েই বেরুনো যাক। তারপর জয়ার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল—তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কোন তাগিদ নেই তো আপনার। কোন আপত্তি অবশ্য [illegible] নিষেধ......[illegible]

—না না, অসুবিধে আবার কি [illegible] বলেই তো এলাম। [illegible]

এ পাহাড় থেকে সে পাহাড়। সেখান থেকে আরেক পাহাড়। আবার সেখান থেকে আরো দূরে। আজ যেন বেড়াবার নেশা ধরে গেছে ওদের। বাড়ী ফেরার কথা [illegible] নেই কারো [illegible] অদ্ভুত ভাল লাগছে [illegible] স্নেহাংশুদার [illegible] মেজাজে, [illegible] কথা, শোভনের প্রকৃতির প্রতি [illegible] চিন্তার গভীরতা [illegible] ব্যবহার আর অরণ্যের [illegible]... পথে পথে জয়াকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াবার [illegible] রাখে বইকি! মনেই হচ্ছে না জয়ার [illegible] দুদিনের আলাপ। এই মানুষটির [illegible] যেন কত দীর্ঘ দিনের পরিচয়। [illegible] সব মিলিয়ে একটা ভাল লাগার মিষ্টি [illegible] যেন মিশে গেছে জয়ার মনে?

আর [illegible] বোঝা গেল [illegible] চলে যেতে [illegible] জয়া যেন ভুলে গিয়েছিল এ ভাল লাগা দুদিনের। যে মানুষটাকে ঘিরে এই ভাল লাগা......ভালবাসা......এ জীবনে [illegible] কখনও দেখা হবে না তার সঙ্গে। [illegible] কাজের কোন [illegible] রাজনীতির [illegible] অগণিত মানুষের [illegible] শোভন, বাউলের মত পথে পথে গান গেয়ে পার্টির জন্যে [illegible] ঘুরে বেড়াবে। [illegible]

…ও জীবনে হয়তো তার কোন. হদিশই …ন জয়া।

…ই প্রথম মনে হল জয়ার একটু যেন …রে ফেলেছে ও। শোভনেরও যে ভাল …লে ওকে সে তো ওর চোখের ভাষায় …পেরেছিল জয়া। আশ্চর্য, এ জীবনে …যে মানুষটিকে ভাল লাগল ওর, …এগিয়ে না আসতে দেবার জন্যে …পথ বেঁধে রেখেছিল ও।

…তবু মন তো। একবার মাত্র দেখে …ই অনেকক্ষণ। মনের কোণে একটু …অনুরণন হয়ে চলেছে। কদিন ধরেই …মন। কিছু ভাল লাগে না। কেমন …ই উদাস সেই জয়ার।

…বাড়ীদেরও তাই সন্দেহ। নানান প্রশ্ন …করছেন। অসীমারও এক প্রশ্ন—কি …হল জয়া! শরীর খারাপ! তবে এত …লম্বা শুয়ে কেন, স্কুলে যাবি না

…চিকে গিয়েও সেই এক মন। খোলা …সিয়ে দূর পাহাড়টার দিকে চোখ …রয় বার বার। অন্যমনস্কের মত চেয়ে …অনেকক্ষণ। ছাত্রীদের …কাছেও …পড়ে যেতে হয় ওকে।

…রাতে অদ্ভুত মিষ্টি আর …নানা স্বপ্ন দেখে জয়া। হয়তো বা …মনের সব কল্পের অনুরণনেরই কল্পনার …স্বপ্নটা আর কিছু নয়। আর রাতের …তারের স্বপ্ন। স্নেহাংশুদার চিঠি …আর তাই বাড়ীতে প্রচণ্ড হৈচৈ হয়ে …এবার বিয়ের সব ঠিক। শোভনের …ভীষণ ভাল লেগেছে ওকে। আরো কত …লেখেছে স্নেহাংশুদা……।

…আর সত্যি আবেগ নিয়েই …জয়ার। তারপরও অনেকক্ষণ …হারান সুরটাকে খুঁজে পেতে …। কোন সংস্কার মানে না জয়া। …বিশ্বাস ভোরের স্বপ্ন সত্যি না …হয় না। চিঠি আসবেই।

…হলও ঠিক তাই। বিকেলে ছুটির …ফিরতে না ফিরতেই অসীমা …পাড়া জানান দিয়ে দুটো …ছড়িয়ে দিল হাওয়ায়। তারপর …করে হেসে বলল—কী গো …তখন বলিনি আমি……তোমাকে …হবেই! এবার হল? নাও এবার সাজ। …কই। যাকে বলে একদম ছাঁদি তোর …আর তর সইছে না বাবুর। সামনে …২০ই বিয়ের তারিখ। হেসে ফেলেই …গম্ভীর হতে চেষ্টা করছে। নয় তো …খুশি তো বটেই। তাই বলে এই বয়সে …এত খুশির প্রাণ পড়তো নাকি অবস্থা …হবে……সত্যিই বৌদিটা যেন কী! …ওদের একটা মায়া আছে।

ওপরে উঠতে না উঠতে কিরণময়ীও কলকলিয়ে উঠলেন। আনন্দে ডগমগ হবারই তো কথা। এত কাণ্ডর পরও যে জয়ার বিয়ে হবে ভাবতে পেরেছিলেন কই। অপ্রত্যাশিত খুশিতে তাই এত উচ্ছল।

বিকেলে অনুপম নিরুপম অফিস থেকে ফিরতেই সারা বাড়িতে আনন্দের হুল্লোড় পড়ে গেল। এতদিনের এত চেষ্টা এত দুর্ভাবনা……সবের নিরসন হল আজ। শুধু একটি চিঠির মধ্যে। আনন্দ না হয়ে যায়!

তবু রাতে খেতে বসে অনুপম অসীমাকে বললো—এ বিয়েতে জয়া রাজী? তুমি জিজ্ঞেস করে দেখেছো তো?

—সে কথা এখনো জিজ্ঞেস করতে হবে? মুখ দেখে বোঝা যায় না! লজ্জায় ভাল করে তাকাতে পারছে না কারো দিকে!

—তা ঠিক। তবু একবার জিজ্ঞেস করে দ্যাখো। ওর তো আবার এ বিয়েতেও অমত ছিল। না হয় চিঠিখানাও দেখাও ওকে।

—বেশ, বলছ যখন তাই যাচ্ছি।

জয়া তখনই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। অসীমার ডাকাডাকিতে আবার খুলতে হল। তবে আজ আর বিরক্তি নেই এতটুকু। বরং ঠিক উল্টো। হাসিখুশি সলজ্জ চাহনি। ভাল করে তাকাতেই পারছে না বৌদির চোখের দিকে। হবারই কথা। এখনো তো মনে পড়ে যাচ্ছে সে সব কথা। কত তর্ক করেছিল বৌদির সঙ্গে। বিয়ে করবেই না বলে জেদ করেছিল। এখুনি যদি বৌদি সে সব কথা তুলে ঠাট্টা শুরু করে দেয়! বৌদির মুখেতে কিছু আটকায় না।

অসীমার চোখে দুষ্টুমীর হাসি, তাই একবার তাকিয়েই তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল জয়া। অসীমা খিলখিল করে হেসে উঠল—নাও আর লজ্জা দেখাতে হবে না। যা বোঝার এতক্ষণে বুঝে নিয়েছি। তবু আসতে হল তোমার দাদার জন্যে। বলে কিনা জয়ার মতামতটা তবু নেয়া ভাল। অতএব ঝেড়ে কাশ একবার শুনি। গিয়ে আবার রিপোর্ট দিতে হবে তো!

অসীমার কথা বলার ধরণ দেখে শুনে জয়া হেসে ফেলল—যাও, মাঝ রাতে আর জ্বালাতে হবে না। এবার বিদেয় হও দেখি। বলো গিয়ে আমি আবার কি বলব…… তোমাদের যা খুশি তাই……

—ওরে বাপরে! এত? তাই যদি তখন কেন এত আপত্তি! আমি তো ভাবলাম বুঝি সত্যি সত্যি স্নেহাংশুর চিঠি পেয়ে চটে গেলি……কারণ যে অন্য তখন কি এত বুঝেছি! এখন বুঝলাম…… নাও, তবু দেখো……দুটো চিঠিই দিয়ে গেলাম।

দুটো চিঠি! আরেকটা তবে কার! জয়ার বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন ধড়াস করে উঠল। অসীমা ওর হাতের মধ্যে চিঠি দুটো গুঁজে দিয়ে চলে গেছে ততক্ষণে। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে এসে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে বাতি জ্বেলে নিল জয়া। তারপর দেখে, একটা সেই ইঞ্জিনীয়ার ছেলেদের তরফের চিঠি। আরেকটা স্নেহাংশুর। রুদ্ধশ্বাসে স্নেহাংশুর চিঠিটাই আগে পড়তে শুরু করল জয়া। স্নেহাংশু লিখেছে……ওখান থেকে নিরাপদেই এসে পৌঁচেছি। আজ কাজে জয়েন করেছি। শোভনের কলেজ খুলতে এখনো দেরি। তোমাদের ওখানে খুব ভাল লেগেছে ওর। আরেকটা কথা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক জেনেও লিখছি, জয়াকেও ভাল লেগেছিল ওর। এ বিয়েতে ওর আগ্রহই ছিল। জয়ার কথাটা ওকে আগে জানাই নি। ভেবেছিলাম বলার দরকার হবে না। কত মেয়েই তো এল গেল কাউকেই যখন পছন্দ হয়নি ওর। তখন জয়াকেও হবে না। কিন্তু আশ্চর্য, ঠিক যেটা ভাবতে পারিনি তাই হল। শেষে আমাকেই বলতে হল……জয়া এ বিয়েতে মোটেই রাজি নয়…

স্নেহাংশুর চিঠিটা পড়তে পড়তে জয়ার চোখ দুটো জলে ঝাপসা হয়ে উঠল। বাকীটা আর হল না পড়া। তার আর দরকারও নেই। এতক্ষণে ওর বোঝা হয়ে গেছে অন্য চিঠিতে কি লিখেছে তারা। শুধু না জেনে আগেভাগে সম্মতিও দিয়ে ফেলেছে জয়া।

দেশপ্রিয় প্রসঙ্গ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক মৃত্যুতে সমগ্র বাংলাদেশ শোকে আকুল হয়ে পড়ল। দেশবন্ধুর মুখের পানে তাকিয়ে তাঁর স্বদেশবাসী অনেক আশায় বুক বেঁধেছিল, কিন্তু সহসা সেই আশার অবসান হল। সেদিন বঙ্গজননী প্রকৃতই অনাথিনী।

বাংলাদেশের রাজধানীতে একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হল দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর। ঠিক সেইকালে অর্থাৎ মৃত্যুর মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে দেশবন্ধু ফরিদপুরে প্রভিনসিয়াল কনফারেন্সে যে ভাষণদান করেন তার মধ্যে অসহযোগের পরিবর্তে সহযোগিতার ইংগিত ছিল। রেসপনসিভ কো-অপারেশন।

সেই দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে তিনটি পদ শূন্য হল। প্রাদেশিক কনগ্রেসের সভাপতির পদ, বাংলা স্বরাজ্য দলের সভাপতির পদ এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের পদ।

দেশবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট করে যেতে পারেন নি। গান্ধীজী সেইকালে অভিমত প্রকাশ করলেন যে, যতীন্দ্রমোহনকে দেশবন্ধুর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী হিসাবে গ্রহণ করা হোক। গান্ধীজীর প্রস্তাব সকলে সমর্থন করলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর মাত্র বারো দিন পরে ২৮শে জুন ১৯২৫ খৃস্টাব্দে কন্‌গ্রেসের এক সভার সভাপতির পদের জন্য যতীন্দ্রমোহন ও মৌলানা আক্রাম খানের নাম প্রস্তাবিত হয়। মৌলানা পরে নাম প্রত্যাহার করে নেন এবং যতীন্দ্রমোহন সর্বসম্মতি অনুসারে কনগ্রেস দলের সভাপতি নির্বাচিত হলেন এবং গান্ধীজী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'আমি খুশী হয়েছি। দেশবন্ধুর জায়গায় নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করার যোগ্যতা তাঁর আছে।'

এরপর ২৯শে জুন তারিখে তিনি কন্‌গ্রেসের প্রাদেশিক সভার সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সেদিন তাঁকে সবাই সানন্দে গ্রহণ করেছিল। তাঁর স্বপক্ষে ছিল ষাটটি ভোট আর বিপক্ষে ছিল মাত্র আটটি।

অনেকগুলি জীবনীগ্রন্থের রচয়িতা মণি বাগচী সম্প্রতি 'দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন' এই নামে একটি জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন। দেশপ্রিয় মাত্র আটচল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বীর সৈনিক মাত্র বারো বৎসর জননায়কের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই নিজের চরিত্রগরিমা, নিষ্ঠা এবং ত্যাগের দ্বারা জনগণের অন্তরে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। যতীন্দ্রমোহনের স্মরণীয় জীবনের কথা বেশী আলোচিত হয়নি এবং বর্তমানকালের জয়ঢাকের যুগে তিনি প্রায় বিস্মৃত।

দুঃখের বিষয় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের উল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থ বাজারে সুলভ নয়। মণি বাগচী তাঁর সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন :

'বাংলায় তাঁর অবশ্য একখানি জীবনী আছে। এই বইটির লেখক শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ধর। বইটি তথ্যবহুল হলেও এর দৃষ্টিভঙ্গী এবং সিদ্ধান্ত কিছুই নিরপেক্ষ নয়।'

আশ্চর্যের বিষয় মণি বাগচী কিন্তু সুরেন্দ্রচন্দ্র ধরের গ্রন্থটির ওপর অনেকখানি নির্ভর করেছেন। ফলে সেই গ্রন্থে পরিবেশিত ভুল তথ্য তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করেছেন। সুরেন্দ্র ধর রচিত গ্রন্থটি বর্তমানে দুর্লভ। এছাড়া দেশপ্রিয়ের ভ্রাতৃজায়া পদ্মিনী সেনগুপ্ত রচিত একটি সংক্ষিপ্ত দেশপ্রিয়-জীবনী পাওয়া যায়।

মণি বাগচী মহাশয় প্রচুর পরিশ্রমসহকারে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের জীবনী রচনা করে সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। নেই। একজন অবহেলিত মহান লোকচক্ষে পুনপ্রতিষ্ঠিত করব প্রচেষ্টা অতিশয় প্রশংসনীয়। কিন্তু বিষয় এই গ্রন্থে কিছু কিছু আছে মনে করি—সেইগুলি আমরা কিছু কিছু উল্লেখ করছি, পরবর্তী সংস্করণে এই সব লেখকের পক্ষে সহায়ক হবে :

(১) যতীন্দ্রমোহনের জন্মস্থান : গ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত গ্রাম। এই গ্রামেরই প্রসিদ্ধ সংস্কৃত স্বর্গতঃ রজনীকান্ত কাব্য-পুরাণতীর্থ কাছে আমরা একদা সংস্কৃত অধ্যয়ন এবং তিনি যতীন্দ্রমোহনের ছিলেন। তাঁর কাছে আমরা যতীন্দ্রমোহনের জীবনের অনেক তথ্য জানতে পেরেছি

...(২) দেশপ্রিয়ের জন্মবিবরণের স্বপ্ন প্রসঙ্গটি সুরেন্দ্রচন্দ্র ধরের গ্রন্থ করে লিখিত বলে মনে হয়। তবে এ নিছক গাল-গল্প। কারণ যা থাকতেন বরমা গ্রামে, যাত্রামোহন করতেন শহরে। সুতরাং আদালত ফেরার পর তাঁর বরমা-বাসিনী পত্নীর

স্বপ্ন-বিবরণ দান সম্ভবপর মনে হয় না। যতীন্দ্রমোহনের জননী বরমাতেই এই সময়টিতে থাকতেন, কারণ যতীন্দ্রমোহন গ্রামেই জন্মেছেন।

(৩) 'যাত্রামোহন টাউন হল' নামে কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, তখনও ছিল না। 'চট্টগ্রাম সমিতি' নামক কোনো কিছু ছিল না। এখানকার প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল 'চট্টগ্রাম এ্যাসোসিয়েশন'। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন যতীন্দ্রমোহনের পিতা। যাত্রামোহনের প্রদত্ত জমিতে সভানুষ্ঠানের সুবিধাদির জন্য একটি ভবন নির্মিত হয় এবং যাত্রামোহনের মৃত্যুর পর বৎসর ঐ ভবনটির উদ্বোধনকালে তার 'যাত্রামোহন সেন হল' (১৯২০) নামকরণ করা হয়।

(৪) পুস্তকটির ৫২ এবং ৫৬ পৃষ্ঠায় চট্টগ্রামে কুতুবদীয়া অন্তরীণ রাজবন্দীর মামলা সংক্রান্ত প্রদত্ত বিবরণে তথ্যগত কিছু ত্রুটি আছে মনে হয়—

প্রথমতঃ, কুতুবদিয়া রাজবন্দী মামলা ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে অনুষ্ঠিত হয়। চিত্তরঞ্জন সেই সময় স্মরণীয় ভাষণদান করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে ১৭ জন বাঙালী যুবককে চট্টগ্রামের অনতিদূরস্থ বঙ্গোপসাগরের বুকে অবস্থিত কুতুবদিয়ার চরে বন্দী করে রাখা হয়। 'কুতুবদিয়া' চট্টগ্রামের সমুদ্রোপকূলবর্তী গ্রাম নয়। এই অন্তরীণ আবাসের ভারপ্রাপ্ত পুলিস ও মিলিটারি অফিসরদের অত্যাচারের প্রতিকারে ব্যর্থমনোরথ হয়ে রাজবন্দীরা মরিয়া হয়ে দুরন্ত সমুদ্র কিছুটা সাঁতার কেটে এবং কিছু অংশ জেলেডিঙিতে করে অতিক্রম করে চট্টগ্রাম শহরে চলে এসেছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁদের দুর্দশার বিবরণ জানাতে। কিন্তু অন্তরীণবিধি অমান্য করার অজুহাতে সতের জন রাজবন্দীর একটি স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালে বিচার হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ (তখনও দেশবন্ধু নন) তাঁদের পক্ষ সমর্থন করার জন্য সঙ্গে ফজলুল হক সাহেব ও ঢাকার শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে আসেন। সেদিন তাঁদের সহযোগী ছিলেন জুনিয়র ব্যারিস্টার জে এম সেনগুপ্ত।

(৫) আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের সদর দপ্তর চট্টগ্রাম শহরেই অবস্থিত ছিল। পাহাড়তলী নামক নাতি-উচ্চ শৈলশ্রেণী পরিবেষ্টিত অঞ্চলে ছিল রেলওয়ে ওয়ার্কসপ।

(৬) ১৩৭ পৃষ্ঠায় আছে '১৯১২ সালে চট্টগ্রাম কনফারেন্সে তিনি ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান'—এই তথ্যটি নির্ভুল নয়। যতীন্দ্রমোহনের পিতৃদেব ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। যতীন্দ্রমোহন এবং চন্দ্রশেখর দে ছিলেন স্বেচ্ছাবাহিনীর অধিনায়ক।

(৭) ২৫৩ পৃঃ ১৯৩৩-এর এসপ্লানেডে ট্রামগুমটিতে অনুষ্ঠিত যে কনগ্রেস অধিবেশনের বিবরণ লেখক দিয়েছেন, বর্তমান লেখক তার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। দেশপ্রিয় তখন অন্তরীণ অবস্থায় হাসপাতালে রোগশয্যায় শায়িত। জাতীয় মহাসমিতির এই স্মরণীয় অধিবেশনে শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তের সভানেত্রীত্ব করার ব্যবস্থা স্থির হয় হোয়াইটওয়ের উপরস্থ ভিকটোরিয়া চেম্বারসের্‌র এক হোটেলের কামরায় কনগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত অনুসারে। এসপ্লানেড গুমটিতে বেলা আড়াইটে থেকে তিনটের সময় অনেকের উপস্থিতিতে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী সেনগুপ্ত অভিভাষণ পাঠ করতে উদ্যত হলে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার তাঁকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন, ডেপুটি পুলিস কমিশনার তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। ইতিমধ্যে মাত্র প্রথম কয়েক লাইন পাঠ করা হয়। তাঁর সঙ্গে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি গোপিকাবিলাস সেনও লালবাজারে প্রেরিত হন। সুতরাং 'তিনি অভিভাষণ পাঠ করলেন' (২৫৩ পৃঃ) এই মন্তব্য করা বোধহয় ঠিক হবে না।

(৮) পরিশেষে লেখক দেশপ্রিয়ের মরদেহের শেষযাত্রার বিবরণ দান করতে গিয়ে বলেছেন—'তখন অনেকের হয়ত স্মরণ আছে দেশীয় সংবাদপত্রের শিরোনামায় একটি ইংরেজী কবিতা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছিল "Home they brought their warrior dead এই তথ্যটি ঠিক নয়। দেশপ্রিয়ের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি শেষ হওয়ার পর তাঁর পবিত্র চিতাভস্ম চট্টগ্রামে প্রেরিত হয়। ৩০শে জুলাই চট্টগ্রামে এক বিশাল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় চিতাভস্মসহ। দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকায় ২রা আগস্ট, ১৯৩৩ তারিখে সেই শোভাযাত্রার যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তার শিরোনাম ছিলHome they brought their warrior dead..

দেশপ্রিয়ের একান্ত সচিব সুখেন্দু সেনগুপ্ত সম্ভবতঃ আরও অনেক তথ্য সরবরাহ করতে পারেন। এই গ্রন্থে মেয়র যতীন্দ্রমোহনের বর্মা আদালতে ঐতিহাসিক বিচারের কাহিনীটি উপেক্ষিত হয়েছে।

যতীন্দ্রমোহনের এই জীবনীগ্রন্থটি অনেক দিক থেকে একটি অভাব পূরণ করবে। দেশপ্রিয় সম্পর্কে এই জাতীয় আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, লেখক অভাব পূরণ করেছেন। সেই কারণে তিনি অভিনন্দনযোগ্য।

—অভয়ঙ্কর

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন (সচিত্র জীবনী)— মণি বাগচী। রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলিকাতা। ছয় টাকা মাত্র।

বিদ্যাসাগর স্মরণসভা : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ৮১-তম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির উদ্যোগে। স্মরণসভায় সভানেতৃত্ব করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী। তিনি বলেন বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রকৃষ্ট উপায় হোল নিরক্ষর দেশবাসীকে লেখাপড়া শিখতে সাহায্য করা। পশ্চিমবাংলার শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি সমিতির কার্যক্রমের সপ্রশংস উল্লেখ করেন।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর স্মরণসভা : ২রা আগস্ট সন্ধ্যায়, মনে হয় অনেক দিন পরেই, পশ্চিমবঙ্গের বর্ষীয়ান ও তরুণ কবি-সাহিত্যিকরা স্টুডেন্টস হল ভরিয়ে দিলেন সম্প্রতি পরলোকগত সাহিত্যিক শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে। বর্ষীয়ান লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে স্মৃতিচারণ করলেন, দক্ষিণারঞ্জন বসু বললেন, গভীর সঙ্কটেও শান্তিরঞ্জন ছিল কর্তব্যে আশ্চর্য নিষ্ঠাবান। সুভাষ মুখোপাধ্যায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন, আমাদের সমাজে অনেক সাহিত্যিককেই শান্তিরঞ্জনের মতো স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করতে হবে। মণীন্দ্র রায় বললেন, কোন লেখকের যেন আর এমন দুর্ভাগ্য না আসে। সন্তোষকুমার ঘোষ শান্তিরঞ্জনকে একজন বড় মানুষ ও খাঁটি শিল্পী হিসেবে চিহ্নিত করলেন। ধরাগলায় লিখিত ভাষণ পাঠ করলেন সভার সভাপতি নরেন্দ্রনাথ মিত্র। এছাড়া বললেন, রণজিৎকুমার সেন, ধনঞ্জয় দাস, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত, বিমল রায়চৌধুরী, শচীন বিশ্বাস প্রমুখ। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি শোক প্রস্তাব পাঠ করেন। সভায় তা গৃহীত হয়।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নন-কনফরমিস্ট লেখকদের লেখক হিসেবে বেঁচে থাকার সমস্যাটি সভায় প্রায় সব বক্তার মুখে মূর্ত হয়ে ওঠে। এই সমস্যাকে নির্মূল করতে আর বোধ হয় কালহরণ মানায় না বলে মনে করলেন অনেকে। তরুণ লেখকদের সম্পর্কে শান্তিরঞ্জনের আন্তরিক উৎসাহ প্রমাণিত হল অসিত সান্যাল ও দিলীপ সেনগুপ্তের একাগ্রতায়। তাঁদের উদ্যোগ

এমন দুটি প্রয়োজনীয় সত্তাকে সার্থক করে তুলেছে, এ খবরই আমার কথা।

পরলোকে মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য : সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য জগতের অন্যতম পথিকৃৎ মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য বিরাশি বছর বয়সে হৃদরোগে মারা গেছেন ২৭ জুলাই। মহামহোপাধ্যায় সুদীর্ঘকাল সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি মহাচার্য শ্রেণীর ন্যায় বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সম্মানসূচক ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। মহামহোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতি পুরস্কারেও সম্মানিত হয়েছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন দীর্ঘকাল এবং পরিষদের মুখপত্র সম্পাদনা করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ ৩১ জুলাই মহামহোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশে আশুতোষ ভবনে শোকসভার আয়োজন করেন। এই সভায় দেশের জ্ঞানী-গুণী শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিতরা উপস্থিত ছিলেন। বেদগানের মাধ্যমে সভারম্ভ হয়। পৌরোহিত্য করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চিন্তাহরণ কান্ত ভট্টাচার্য। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ ও দীননাথ ত্রিপাঠী ভাষণ দেন মহামহোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যকীর্তি প্রসঙ্গে।

পূর্ব বাংলার গল্প। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা। সাত টাকা।

গ্রন্থের নামকরণ যে কোন পাঠককে অবাক করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের গল্পের খোঁজ রাখেন প্রায় সব সচেতন পাঠকই। তাঁরা হয়তো রবীন্দ্রনাথ 'পূর্ব বাংলার গল্প' বলে বিশেষ একশ্রেণীর গল্প লিখে গেছেন ভেবে অবাক হবেন না। কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে এ নাম বিভ্রান্তিকর মনে হবেই। বাংলাদেশের জন্মের পরেই ওপার বাংলার গল্প সংকলন একাধিক বেরিয়েছে। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'পূর্ব বাংলার গল্প' নামে বই বেরুলে স্বভাবতই সাধারণ পাঠক দ্বিধায় পড়বেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ এই রকম গ্রন্থ প্রকাশ করে সাধারণ পাঠককে মুশকিলে ফেলেছেন। কিন্তু গ্রন্থটি খুললেই বোঝা যাবে, একেবারে অতিপরিচিত গল্প— পোস্টমাস্টার, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, একরাত্রি, ছুটি, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র, অতিথি, শাস্তি ইত্যাদি বারোটি গল্প নিয়েই এ গল্প সংকলন। যদিও বিজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে শিলাইদহে ও পদ্মার তীরে বেড়ানোর সময় যে গল্পগুলি লিখেছেন, তাদেরই সংকলন এ গ্রন্থ। কিন্তু বিজ্ঞাপন কজন দেখেন? গ্রন্থটির ভূমিকার মতন অংশে 'পূর্ব বাংলার গল্প' নামকরণের কোন রকম বক্তব্য দেওয়া হয়নি। আমরা বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ থেকে এ জাতীয় প্রয়াসকে একটু অস্বস্তির সঙ্গে গ্রহণ করছি।

পটভূমি কম্পমান। আশিস সান্যাল। বাক সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯। চার টাকা।

তরুণ প্রতিষ্ঠিত কবি শ্রীআশিস সান্যালের সার্থক কাব্যগ্রন্থ 'পটভূমি কম্পমান' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কবি পরিচিতির অপেক্ষা রাখেন না। তাঁর কবিতাগুলি তাঁকে প্রতিষ্ঠার আসনে বসাতে সক্ষম। তিনি নিঃসন্দেহে আধুনিক কিন্তু তাঁর কবিতায় কোথাও আধুনিকতার বিকৃতি নেই, না বিষয়ে না আঙ্গিকে, কিন্তু কোন কোন কল্পনায়। কবিমনে যা কিছু স্বতঃস্ফূর্ত, যে অনুভূতি হৃদয়ের গভীর গোপন প্রদেশে কবিত্বের উৎস হিসাবে কাজ করে সে সবই বর্তমান সংকলনের কবিতাগুলিতে স্পষ্ট। কবি সংকলনের শেষে ছয়টি কবিতাকে 'বাংলাদেশ: স্বপ্নের জাগরণে' নামে বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বাংলাদেশ সংক্রান্ত কবিতাগুলিতে কবির দেশের প্রতি মমত্ববোধ, চিরকালের মুক্তিপ্রাণ মানুষের কল্যাণমুখী বাসনা গভীর নিবিড় আশা-আকাঙ্ক্ষার আলোয় বাংলা মাকে দেখা—এ সবের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন কবিপ্রাণতা দিয়ে। প্রেম, বিশ্বাস, নিষ্ঠুরতা, বিষণ্ণতা, অনন্ত তৃষ্ণা, বর্তমানকালের অসহায়তা সমস্ত কিছুকে সার্থক চিত্রের ব্যঞ্জনায় কাব্যময় করেছেন তিনি। কবিতার চিত্রের অন্তর্নিহিত অভিজ্ঞতা যে কোন স্বভাবী পাঠককে বোধ ও বোধির দৈবরথে স্থাপন করে অলৌকিক আস্বাদ দেবে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

ধাঁধা (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ '৭৯)। সম্পাদক : বিশ্বনাথ বসু। ১ গোপীমোহন দত্ত লেন, কলকাতা—৩। কুড়ি পয়সা।

নতুন ধরনের সাময়িকী। ধার যত ভার ততখানি নয়। না হোক, তবু সাময়িক সাহিত্যে প্রথম পদাপর্ণেই সবাইকে ধাঁধিয়ে দিয়েছে ধাঁধা। শব্দ নিয়ে শব্দ আর সংখ্যা দিয়ে শংকা বাড়াবার বিস্তর উপকরণ আছে এর মধ্যে। আছে বাঁশির খেলা, শব্দের ফাঁকি আর সংখ্যার যাদু। ক্লান্ত মন ও মস্তিষ্ক এই ধাঁধার খেলায় মাতিয়ে তাজা করে তোলার জন্য তিনদেশে নানান ধরনের বই আছে। শুধু ধাঁধা উপজীবন করে সাময়িক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ এদেশে এই প্রথম। সাহিত্যগুণান্বিত হওয়ায় ধাঁধা আর ধাঁধার উপভোগ্য। ছোট বড় সবাইকে সমানভাবে মাতাবে।

ভাণ্ডার (জুন-জুলাই ৭২) — সম্পাদক : গোপাল হালদার। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন, ২৩এ নেতাজী সুভাষ রোড (আটতলা), কলকাতা : ১। এক টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আন্দোলনের মুখপত্রের দশম বর্ষের সপ্তম অষ্টম সংখ্যায় সমবায় এবং তৎসম্পর্কীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীলকুমার নন্দী, অসীম রায়, অনিল দে সুধীরকুমার মিত্র। আর আছে সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের ধারাবাহিক উপন্যাস প্রশান্ত দীর সাক্ষাৎকার এবং কটি কবিতা।

শ্রেষ্ঠ গল্পসম্ভার (১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা '৭৯)—সম্পাদক : শ্যামলরঞ্জন ভট্টাচার্য। পত্রমহল, ১৬ বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, কলকাতা : ৯। দু টাকা।

আলোচ্য পত্রিকাটির বর্ষা-সংকলনে স্থান পেয়েছে নতুন লেখক-লেখিকাদের নানান ধরনের গল্প। নতুন লিখিয়েদের লেখাগুলির মধ্যে তারুণ্যের দীপ্তি মেলে কোন কোনটির মধ্যে। সম্পাদকের প্রতিভা আবিষ্কারের চেষ্টা প্রশংসনীয়।

আলেখ্য (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ '৭৯)—সম্পাদক : ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষাল। ৩১, সন্তোষপুর এভিনিউ, কলকাতা : ৩২। এক টাকা।

'আলেখ্য' সাহিত্য ও সমাজচিন্তার আলেখ্য। তারই নিদর্শন রয়েছে দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যায় আলোচ্য সংখ্যাটিতে। সবচেয়ে উল্লেখ্য প্রবন্ধ হল দুটি : ব্যোমকেশ মজুমদারের 'চন্দ্রকুমার দে' এবং তীর্থরেণু দাসের 'রামমোহন রায়ের ইংরেজী রচনা'। এছাড়া লিখেছেন সুজিৎ দাশগুপ্ত, কল্যাণ সেন, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রণবরঞ্জন ঘোষ প্রমুখ।

সীমান্ত (এপ্রিল-জুন '৭৮) — সম্পাদক : দীপেন রায়। ৩২।১ হরতকীবাগান লেন, কলকাতা : ৬। এক টাকা।

গল্প কবিতা প্রবন্ধের সুনির্বাচিত সংকলন। বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে গল্প লিখেছেন তরুণ সান্যাল, মুকুল রায়, বিদুর মাহাতো, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

পরিবারটা কোনটারই কোন ত্রুটি হতে দেয় না! বছর খানেক পরে পড়াশুনোর প্রশ্নও ওঠে। অনেক খুঁজে একটি মেয়ে বার করে। অল্পবয়সী বিধবা, বাংলা লেখাপড়া জানে। সে-ই এসে পড়ায়। এটুকু হেমন্তই পারত, ভালই পারত কিন্তু তার আর অত ধৈর্য থাকে না। তাছাড়া — যা মনে হচ্ছে ছেলেটার মাথা তত সাফ নয়—এখন থেকেই বকতে হয় অনেক বেশী। এখানে চিন্তামণির বাংলা ইস্কুলে দেওয়ার কথা বলেছে অনেকে—পাঠশালাতেও দিতে বলেছে কেউ কেউ—কিন্তু এইটুকু ছেলেকে সে কোথাও পাঠাবে না।

এর মধ্যে নিমাই বিয়ে করেছে একটি, ছ মাস না যেতেই। অবশ্য নাকি না করে উপায়ও ছিল না, নিমাই লিখেছে. ছেলেমেয়েকে দিদিমার কাছে রেখে দিয়ে সে মাসে কুড়ি টাকা করে পাঠাত, সে টাকা তাঁদের সংসারেই চলে যায়—ছেলেমেয়েরা এক ফোঁটা দুধ খেতে পায় না, দুবেলা শুধু দুটো ভাত আর এক পাল-করে মুড়ি— কোন খাওয়ার ব্যবস্থা নেই, ছেলেমেয়ে তিন মাসেই আধখানা হয়ে গেছে।

নতুন বৌকে নিয়ে বিয়ের পর নি কাশীতে এসেছিল একবার। বৌ দে আসাটাই আপাত-কারণ—আসল কারণ জানে—ছেলেকে দেখতে আসা। অর্থাৎ কি হালে মানুষ হচ্ছে। দেখে যেন দীর্ঘ নিঃশ্বাসই পড়ল নিমাইয়ের। রাজার হালের সঙ্গে নিজের এবং বড় দু

বয়েস হল। এ বয়স অবধিই বা কটা লোক বাঁচে। মরার পরের কথা বলছি—আমি কি আর মরতে বলছি তাড়াতাড়ি!'

তবু তো আর একটা কথা আশাকে বলে না, ইদানীং যে কথাটা প্রায়ই তার মনে হয়। মণিকা মরে তার এই সুবিধাটা ক'রে দিয়ে গেল — এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। নইলে বুড়ি একটুও নরম হত না। লোকে যে বলে ভাগ্যবানের বৌ মরে; তার ক্ষেত্রে অন্তত কথাটা ফলে গেল।

তবে প্রতি সোনালী স্বপ্নের পিছনেই নাকি একটা আসন্ন বিপদের কালো ছায়া উঁকি মারে — নিমাইচরণেরও ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে একটি বিঘ্ন দেখা দিল। গলায় বেঁধা কাঁটার মতো, খেতে অসুবিধা হয় না কিন্তু খচ্‌খচানিতে অস্বস্তি হ'তে থাকে।

বিশু কাশীতে প্রতিষ্ঠিত হবার বছর দুই পরেই এই ব্যাঘাত এসে জুটল—দুশ্চিন্তায় এই কাঁটা ও তজ্জনিত একটা খচখচানি। বছরে একবার ক'রে নিমাই, কোনমতে আসার গাড়িভাড়া যোগাড় ক'রে—অবশ্য বুঝে ফেরার গাড়ি ভাড়াটা হেমন্তই দিয়ে দিত আশার হাতে। সেবার এমনিই এক নিশ্চিন্ত সুখ-যাত্রায় এসে—সুখযাত্রা তো বটেই, অঢেল মাছ আর অঢেল মিষ্টি, দই রাবড়ি, রামনগরের বেগুন, কাশীর বিখ্যাত কপি, এক বছর ধরে স্বপ্ন দেখার মতোই খাওয়া-দাওয়া—দেখল একটি কে হিন্দুস্থানী ছেলে বিশুর সঙ্গে পড়ছে এবং প্রায় ওর মতোই সুখে ও আদরে এখানে প্রতিপালিত হচ্ছে। 'মতো,' এই জন্যে যে রাতটা এখানে থাকে না, মায়ের সঙ্গে ঘরে যায়, কিন্তু সে ঐ রাতটুকুই, ভোর না হ'তে হ'তেই এখানে এসে হাজির হয়—দিনভর এখানেই থাকে, এখানেই খাওয়া-দাওয়া, পড়াশুনো সব কিছু। পোশাক-আশাকের অবস্থা দেখেও মনে হয়, সে হেমন্তরই প্রতিপাল্য বা পোষ্যভুক্ত হয়ে গেছে।

বিশুরই বয়সী হবে ছেলেটা, কি সামান্য দু-চার মাসের ছোট। দেখতে-শুনতে মন্দ নয়—বিশুর পাশে দাঁড়াবার মতো নয় অবশ্যই, তবে একেবারে কালো ভূতও নয়। মুখ চোখ ভালো, মাজা মাজা রঙ, স্বাস্থ্যটিও চমৎকার, গোলগাল।

পরিচয় নিয়ে জানা গেল হেমন্তর হিন্দুস্থানী ঝি মুনিয়ার ছেলে ও। ছেলেটার নাম ভোলা। হেমন্তই নাম রেখেছে নাকি ভোলানাথ, ওর মার রাখা নাম সরযূ প্রসাদ—ডাকত সুরজু বলে। ও এখানে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় (ক্রুদ্ধ নিমাই-এর ভাষায় 'গেড়ে বসা') উপলক্ষটা শোনা গেল বদ্যিনাথের মার মুখে। ছেলেটা প্রতি দিনই মায়ের সঙ্গে আসে এখানে, মা কাজ-কর্ম করে, ও চুপ ক'রে বসে আপন মনে এটা-ওটা বিশুর পরিত্যক্ত জিনিস নিয়ে খেলা করে। কখনও বা, বিশুর সময় থাকলে কাঠের ব্যাট আর বল নিয়ে তার সঙ্গে ব্যাটবল খেলা করে। আসল কথা খাওয়া—এখানে এলেই বদ্যিনাথের মা দুখানা এক-খানা রুটি, কি অন্য কোন খাবার থাকলে দিয়ে দেয়—বসে বসে এক কুটো ধরে একটু একটু করে খায়, তাতেই অনেকটা সময় কেটে যায়, কাজ-কর্মের অবসর পায় মুনিয়া। সকালের জল খাবারটা নিশ্চিত এবং দুপুরের খাওয়াটাও প্রায় দিনই—এখানে সারা হয়ে যায়, সেই লোভেই মুনিয়া ওকে এখানে নিয়ে আসে। নইলে মুনিয়ার মাসী আছে পাশেই, স্বচ্ছন্দে সেখানে রেখে আসতে পারত।

আরও পরিচয় পাওয়া গেল, মুনিয়ার স্বামীর ঔরসজাত ছেলে এ নয়—(এটা বদ্যিনাথের মা চোখ টিপে ফিসফিস করে জানাল) মুনিয়ার মরদ আজ আট বছর নিরুদ্দেশ। মুনিয়া এক বাঙালীবাবুর বাড়ি কাজ করত, ব্রাহ্মণ ইঞ্জিনীয়ার নাকি—সেইখানেই গর্ভবতী হয় মুনিয়া। এ নিয়ে গোলমাল করা বা চেঁচামেচি করবার কথা ওরা ভাবতেই পারে না, দোষটা বরং নিজেদেরই ভেবে চোর হয়ে থাকে। বাবুর স্ত্রী ব্যাপারটা বোঝামাত্র ঝাড়ু মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে, তবে সে বাবু নাকি মধ্যে মধ্যে টাকাটা সিকেটা দেয়, পথে-ঘাটে দেখা হ'লে।

তবে এ পরিচয় জানা সত্ত্বেও কিছু আটকায় নি—এখানে এ বাড়ির ছেলের মতো মানুষ হ'তে থাকায়।

ঘটনাটা সামান্য। যেমন একা বসে খায় তেমনিই খাচ্ছে, উঠোনের মাথার ওপরে জাল দেওয়া আছে বলে বানরের উপদ্রব নেই। নিশ্চিন্ত হয়েই বসে খাওয়া চলে। সেদিন কে বোধহয় ছাদের দরজা খুলে রেখে এসেছিল, কিম্বা পাশের বাড়ি—অর্থাৎ বাড়ি-ওলার বাড়ি দিয়েই এসেছে। এক বিরাট গোদা বাঁদর এসে উপস্থিত, লক্ষ্যটা সামনেই ভোলার হাতে ধরা দুখানা রুটি। ঠিক সেই সময়টায় হেমন্ত পুজো সেরে বেরিয়ে এসেছে বাইরে, ছেলেটা বাঁদর দেখে ভয় পেয়ে কেঁদে উঠে, 'মায়ী গে—' বলে এসে দু হাতে জড়িয়ে ধরেছে—হেমন্তকে। সেখানে মুনিয়াও ছিল, কলতলায় বসে বাসন মাজছিল—তার কাছে না গিয়ে হেমন্তকে এসে জড়িয়ে ধরল, এবং 'মা' বলে—সেই ওর সৌভাগ্যের সূত্রপাত। বদ্যিনাথের মায়ের মতে, ওর সাগুরুই ওকে দিয়ে এটা করিয়েছে। 'ওর কপালের লেখন, সুখভোগ আছে অদেষ্টে, ঝিয়ের ঘরে জন্মালে কি হবে, বেজন্মা হলেই বা কি হবে—বিধেতা পুরুষ হাত ধরে এখানে এনে ফেলেছে, বিধেতা পুরুষই ঐ মা বাকিা বলিয়েছে ওকে দিয়ে—কারুর কিছু করবার নেই তো!'

এসব কথা বিশ্বাস করে না নিমাই। দাঁত কিড়মিড় করে বলে, 'বিধেতা পুরুষ না ছাই, ঐ হারামজাদী মাগীই শিখিয়ে দিয়েছে। নইলে নিজের মা থাকতে আর একটা ভিনজাতের বুড়িকে কেউ মা বলে?'

তবে বদ্যিনাথের মার কাছে যা-ই বলুক, হেমন্তকে সোজাসুজি কিছু বলতে সাহস হয় না। আবার একেবারে চুপ করে থাকতেও পারে না। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ইশারায় বলে।

'যতই হোক, ছোটজাতের ছেলে, ঝিয়ের ছেলে—তার ছোঁয়া — একটা দেওয়া বোধহয় ভাল হচ্ছে না।' তারপর সামলে নিয়ে বলে, 'আবিশ্যি তোমার বলতে, খাওয়া দাওয়া, তুমি আমাদের ঢের বেশী বোঝ এসব—তবু—'

হেমন্তর মুখ সঙ্গে সঙ্গে কঠোর হয়ে ওঠে, বলে,—'ছোটলোকের ছেলে কাকে? তোমাদের গুষ্টির মতো ছোটলোক ভূভারতে কোথাও আছে নাকি? ছেলেকে যদি মানুষ করতে পারি—নয়, মানুষ হবে না তা জানি—বড় যদি পারি, ওকে মানুষ করার চেষ্টা এ আর বেশী কথা কি?'

তারপর নিমাইয়ের মুখের ওপর ভ্রূকুটি-বদ্ধ দৃষ্টি স্থির রেখে বলে, যদি মনে করো—এখানে ওর সঙ্গে থাকলে তোমার ছেলের ক্ষতি হবে— নিয়ে যেতে পারো, পোশাক-আশাক গুছিয়ে দিচ্ছি, নিয়ে যাও। তাই বল কি ভাববে—তোমার ছেলের ভাগ কম পড়বে বলে তোমার কি দুশ্চিন্তা —বলে, থাকে ভেবে বুঝে আশ্রয় দিয়ে তাকে ত্যাগ করতে পারব না, কোন না দেখে।'

এর পর পালিয়ে আসা ছাড়া থাকে না।

পথে আসতে আসতে আশা তিরস্কার করে—'কেন তুমি ওসব কথা তুলতে গেলে বুড়ির এখনও যা বুদ্ধি, আমাদের এক বেচে আর এক হাট থেকে কিনতে পারে। ওকে জ্ঞান দিতে যাও তুমি! নেবে কে?'

তারপর বলে, 'ভোলা ছেলেটা ভাল। হাজার হোক বাঙালী ভদ্দরলোক জন্মিত তো, এরই মধ্যে বেশ সভ্যভব্য উঠেছে না?'

নিমাই ধমক দিয়ে ওঠে, 'ছাই তুমি আমার বা হয়েছ না—পারো গুনগান। কাঠ বোকা। তোমার সঙ্গে দুটো পরামর্শ করব সে জোও নেই।'

আশা ম্লান-মুখে চুপ করে যায়। ভাল মানুষ। দ্বিতীয় পক্ষের দর্প ও প্রকাশ করতে তো পারেই না, মণিকার জোর ছিল সেটুকুও দেখাতে পারে এমন কি দোজবরের বিশেষ আদরটাও করা হয়ে ওঠে না, স্ত্রী হাত শুনেছে মণিকা ঢের বেশী রূপসী ছিল, লেখা জানত, গান জানত। বড়লোকের গেলেও মানিয়ে নিতে পারত।

শোনে আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস আশা।

তাদের অবস্থা খারাপ, এই পাওয়াই দুরাশা ছিল। ভয়ে ভয়ে হবে—এই জেনে বুঝেই সে এসেছে। করা ছাড়া অন্য উপায় কি?

জোর করা কি ঝগড়া করার সাহস নেই।

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ সংকট

অরুণকুমার রুদ্র

সংকটের রূপ

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ সংকট ক্রমশ তীব্র …কে তীব্রতর আকার ধারণ করছে। ঘন ঘন …্যুৎ বন্ধ জনজীবনে ক্রমাগত বিশৃংখলা …ষ্টি করছে। বিদ্যুতের অভাবে কলকার…না প্রায়ই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে …াই লে-অফে কয়েক লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী …তিগ্রস্ত হচ্ছেন। এবং কোন কোন স্থানে …পাদন কমে যাচ্ছে, আবার কিছু কিছু …নে উৎপাদন একেবারেই বন্ধ হওয়ার …কেত শোনা যাচ্ছে। অপরিকল্পিতভাবে …্যুৎ বন্ধ করে দেওয়ার ফলে ব্যাংক, …-আই-সি ও ট্রেজারীতে আদায় প্রায় … থাকে। বিদ্যুতের অভাব কৃষিক্ষেত্রেও …তিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। …্যুতের অভাব বৈষয়িক উন্নয়নের …ে পদে বাধা সৃষ্টি করছে। …ল, বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য চাই …ামের বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ …য় রেখে ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের …ে দ্রুত থেকে দ্রুততর করা। শত শত …টি টাকার লগ্নীর প্রস্তাব এলেই বেকার …্যা সমাধান ও উৎপাদন বৃদ্ধি হবে না, … না প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের …স্থা প্রয়োজনীয় সময়ের মধ্যে করা হয়। …র যেটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, তা হল …যাতে প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের যোগান …াহত রাখা। কল-কারখানা চালাতে …ন বিদ্যুতের প্রয়োজন, তেমনি কৃষি…ত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গেলেও …্যুতের যোগান অব্যাহত রাখা অপরি…র্য। ইতিমধ্যেই বিদ্যুতের অভাবে পাট…ল্পে উৎপাদন কম হওয়ায় যে ক্ষতি …েছে তার হিসাব আমরা পেয়েছি। কেবল …ল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দিক …কে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি তাই নয়, …ষ্যতে বিদ্যুতের যোগান যদি প্রয়োজন… অব্যাহত রাখা না যায়, তাহলে পশ্চিম…ের বেকারির সংখ্যা বাড়তে বাধ্য। আর …্যাতে শিল্প বাড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির …ে সংগে বেকারীর বোঝা হালকা করবার …চেষ্টা চলছে, সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হবে। …, বিদ্যুতের অভাবে কেবল পাটশিল্পই …তিগ্রস্ত নয়, পশ্চিমবাংলার বস্ত্রশিল্প, …ঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, কয়লাখনি শিল্প—সবই … ও বিপন্ন। পশ্চিম বাংলার হাজার …জার গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছিয়ে দেবার যে …কল্পনা করা হয়েছে তাও ব্যর্থ হওয়ার …্য। জেলায় জেলায় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প…ের মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের …আয়োজন করা হয়েছে, তাও ভয়াবহ …ে চলেছে। তাছাড়া ইলেকট্রনিকস কল-কারখানা স্থাপনের জন্য প্রায় সাড়ে তিনশ কোটি টাকা বিনিয়োগের যে আবেদন এসেছে, তার জন্যও চাই বাড়তি বিদ্যুৎ উৎপাদন। কলকাতায় টিউব রেল স্থাপনের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তার জন্যেও চাই বেশি বিদ্যুতের যোগান। হলদিয়া বন্দর ও সার কারখানা, দুর্গাপুরে ইস্পাত শিল্পের বিস্তার সহ বিভিন্ন প্রকল্পগুলির সার্থক রূপায়ণের জন্য চাই আরও বেশি করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা এক্ষেত্রে গড়িমসি করলে চলবে না—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ আরম্ভ করে শেষ করতে হবে। না হলে গ্রামের নিষ্প্রদীপ অবস্থা ঘুচবে না, আবার শিল্পাঞ্চলের আলো নিভে যাবে, আর চাকা স্তব্ধ হবে। বিজলী উৎপাদনের প্রসার ঘটাতে না পারলে পশ্চিমবঙ্গের বৈষয়িক ভবিষ্যত অন্ধকার।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার অর্ধেকও উৎপাদন হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গে ডি-ভি-সির অংশ ধরে মোট উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১৫৫০ মেগাওয়াট। কিন্তু মোট বিক্রয়যোগ্য উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৮৬০ মেগাওয়াট। কলকাতা সহ শিল্পাঞ্চলে বিদ্যুতের চাহিদার পরিমাণ প্রায় ৫৫০ মেগাওয়াট। এর মধ্যে দুর্গাপুর তাপ-বিদ্যুৎ প্রকল্পের দেয় অংশ ১১০ মেগাওয়াট, ডি ভি সির দেয় অংশ ১০৫ মেগাওয়াট, ব্যাণ্ডেল তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দেয় অংশ ১০৫ মেগাওয়াট, ও কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের দেয় অংশ ২৩০ মেগাওয়াট। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গত তিন-চার মাস ধরে ওই চারটি সংস্থার কোনটিই নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সক্ষম হয়নি। এই কয় মাসে দৈনিক সরবরাহের গড় পরিমাণ—দুর্গাপুর তাপ-বিদ্যুৎ প্রকল্প ৭০ মেগাওয়াট, ব্যাণ্ডেল তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র ৯৫ মেগাওয়াট, ডি-ভি-সি ৬৫ মেগাওয়াট, সি ই এস সি ২১০ মেগাওয়াট—মোট ৪৪০ মেগাওয়াট। অর্থাৎ ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১১০ মেগাওয়াট। যদিও ব্যাণ্ডেল তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদনের ক্ষমতা প্রায় ৩২০ মেগাওয়াট, তবুও কলকাতার জন্য সরবরাহের গড় পরিমাণ প্রায় ৯৫ মেগাওয়াট। ডি ভি সির উৎপাদন ক্ষমতা এক হাজার মেগাওয়াটের উপর। কিন্তু গত বছর বিক্রয়যোগ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৮০০ মেগাওয়াট। এই সংস্থার বিক্রয়যোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। দীর্ঘকাল উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দুর্গাপুর বিদ্যুৎ প্রকল্পের অবস্থাও শোচনীয়। মোট ৫টি ইউনিটের মধ্যে তিনটি বর্তমানে চালু আছে। বাকী প্রকল্প, তিনটির মধ্যে একটি ইনস্টলেশনের নিষ্ক্রিয় হওয়ার দিকে। সুতরাং এখান থেকে যে ৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যেত তাও কমে যেতে বাধ্য। সি ই এস সি চুক্তিমত উপরোক্ত তিনটি সংস্থার নিকট থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে থাকে। সুতরাং যদি ঐ তিনটি সংস্থার বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে, তাহলে সি ই এস সির বিদ্যুৎ যোগান ক্ষমতা কমে যাবে এবং অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে।

ইতিমধ্যে প্রয়োজনমত বিদ্যুতের যোগানের অভাবে পাট ও কয়লা শিল্পে ব্যাপকভাবে লে-অফের আশংকা দেখা দিয়েছে। এর ফলে বেকার সমস্যার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা তীব্র। গত বছর বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাবে বিভিন্ন শিল্পে শতাধিক কল-কারখানায় দু লক্ষের বেশি শ্রমিক-কর্মচারীর সাময়িক কর্মচ্যুতি ঘটেছিল। গত বছরের তুলনায় এ বছর বিদ্যুৎ যোগানের পরিমাণ কম ও চাহিদা বেশী। তাই মনে হয়, এই বছর বিদ্যুৎ যোগানের অভাবের জন্য যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে। ইতিমধ্যেই, প্রায় ৪৫০টি কল-কারখানায় হয় উৎপাদন একেবারেই বন্ধ, আর না হয় উৎপাদনের পরিমাণ কম। তাছাড়া সাময়িকভাবে সমস্যামুক্ত হওয়ার জন্য সরকারী পর্যায়ে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তার কার্যকারিতা সম্পর্কেও অনেক সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ, আগামী এক বছরের মধ্যে নতুন সরবরাহের উৎস সৃষ্টি করার সম্ভাবনা নেই। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে রেশন প্রবর্তন করেও যে অবস্থার বিশেষ উন্নতি হবে, তারও লক্ষণ নেই। আসল কথা, অবস্থার উন্নতির জন্য বর্তমান সমস্যার কারণগুলি নির্ণয় করা উচিত এবং নতুন নতুন সরবরাহের উৎস সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যাতে বর্তমানের চাহিদার যোগান দেওয়া সম্ভব হয় এবং ভবিষ্যতে নতুন নতুন কল-কারখানায় ও কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বাড়তি বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

সংকটের কারণ

একথা ঠিক যে বিদ্যুতের চাহিদা নিঃসন্দেহে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ সংকটের কারণ যে কেবল চাহিদা ও যোগানের মধ্যে পার্থক্য থাকার দরুন—একথা ঠিক নয়। ঘন ঘন বিদ্যুৎ উৎপাদন বিরতি—সংকটকে চরম পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। ঘন ঘন যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য ক্রমাগত বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাধা পড়ছে। একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রত্যেক যন্ত্রের কর্মক্ষমতার একটা সীমা আছে। যন্ত্রগুলিকে রীতিমত দেখাশুনা করা ও প্রয়োজনমত পরিবর্তন না করলে অকালে যন্ত্রগুলি বিকল হবে এবং বিরাট বিভ্রাট দেখা দেবার সম্ভাবনা। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি দীর্ঘকাল অবহেলার জন্য উৎপাদন যন্ত্রগুলির কর্মক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। অযোগ্য ও অপ্রয়োজনীয় পরি-

অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও শ্রীমতী রাণী মহলানবীশের সঙ্গে কানন দেবী

প্রণব রায় পরিচালিত 'অনুরাধা'। দুটি ছবির কোনোটি সম্বন্ধেই আমার বিশেষ বক্তব্য নেই।

এরপর আমি নিজের প্রোডাকশানে মন দিলাম। এ আমার কত দিনের আকাঙ্ক্ষা, কত রাতের স্বপ্ন। এ স্বপ্ন দেখার সুরু কবে থেকে? সেই আমার বড় সাধের নিউ থিয়েটার্সে কাজ করবার সময় থেকেই। তখনই ত কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভাবতাম এমন দিন কি আসবে না যখন নিজেই এমন একটা কোম্পানী গড়ে তুলব যার প্রতিটি ছবিতে থাকবে সুন্দর কাহিনী, প্রাণকাড়া গান। প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী, সুরকার, কলাকুশলী, সবারই আত্মবিকাশের পূর্ণ অধিকার ত থাকবেই সবার ওপর থাকবে স্বাধীনতা। কোথাও কোনো কর্তৃত্বের পীড়ন থাকবে না, থাকবে শুধু পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভালবাসা। এই শক্তির জোরেই চলার পথের সব বাধা কেটে যাবে না কি?

কিন্তু স্বপ্ন যদি স্বপ্নই থেকে যায়? এ ভয়ও যে না হয়েছে তা নয়। কারণ খুব কম ক্ষেত্রেই স্বপ্ন ও বাস্তবে ছন্দের মিল দেখা যায়। তবু দেখাই যাক না চেষ্টা করে? জীবনের অনেক ক্ষেত্রের মত এখানেও ত অঘটন ঘটতে পারে। আর যদি তা নাও ঘটে স্বপ্নভঙ্গের মধ্যেও কি নতুনতর প্রাপ্তির ক্ষতিপূরণ ঘটবে না? এ অভিজ্ঞতা ত অস্বীকার করা যায় না যে বিধাতাকে যখনই কঠিন কঠোর মনে হয়েছে তখনই কোনো-না-কোনো পথ বেয়ে নেমে এসেছে তাঁরই করুণার ঢল?

এইরকম নানা আশ্বাসে মনকে চাঙ্গা করে নির্ভয় কাজে নেমে পড়লাম। আমার প্রোডাকসনের নাম দিলাম 'শ্রীমতী পিকচার্স'। কেন? এর কারণস্বরূপ গানের কলির মত ঘুরেফিরে সেই নিউ থিয়েটার্সের কথাটাই আসে।

আগেই বলেছি, কৃষ্ণচন্দ্র দে আমায় 'রাধে' বলে ডাকতেন। আর তারই সঙ্গে ভাবসঙ্গতি রেখে পি এন রায় ডাকতেন 'শ্রীমতী'। জীবনের গৌরবদীপ্ত যুগের একটি মধুর স্মৃতিকেই লালন করতে চেয়েছি বলেই হয়ত নিজের প্রতিষ্ঠানের নামকরণের সময় ঐ নামটাই মনে এল।

অজয় কর (ক্যামেরাম্যান), বিমল চ্যাটার্জি (সিনারিও রাইটার) আর আমাকে নিয়ে আমাদের সম্মিলিত ইউনিটের নাম হোলো 'সব্যসাচী' ইউনিট।

এই ছবিতেই অনুভাকে (ভবিষ্যতের স্বনামধন্যা অনুভা গুপ্ত) আমি নায়িকার রোলে নিয়েছিলাম। অনুভা প্রসঙ্গে এই কথাটা ভুলতে পারি না যে প্রথম থেকেই ও আমার শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালবাসার গ্রহণ করেছে, আমার প্রতিটি নির্দেশ মেনেছে আর হৃদয়ের একাগ্রতা দিয়ে আমার কাজকে সার্থক করে তোলবার চেষ্টা করেছে। 'অনন্যা' ছাড়া 'বামুনের মেয়ে'তেও ও কাজ করেছে এবং 'মহিলা-শিল্পী-মহল' (পরে এ প্রসঙ্গ আসবে) ও আরও অনেক ক্ষেত্রে অনুভার সম্পর্কে এসেছি। কিন্তু কখনও মুহূর্তের জন্যও আমার প্রতি ওর আনুগত্য ও আন্তরিকতার কোনো তারতম্য দেখিনি। যখন ও উঠতি আর্টিস্ট তখন ওর স্বভাব ব্যবহারে যে নম্রতা ছিল, ঠিক সেই নম্রতারই অপরিবর্তিত রূপ দেখেছি যখন ও শিল্পীখ্যাতিতে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। বছরখানেক আগে যেদিন ও আমাদের সবাইকে ছেড়ে সব দেওয়া-নেওয়ার বাইরে চলে গেল, তখনও কানে বাজছিল ওর সেই বালিকাসুলভ মিষ্টি মিষ্টি কৈফিয়ৎ 'কাননদি, রাগ কোরো না গো দুটি পায়ে পড়ি। আজ বাড়ীতে হঠাৎ অনেক লোক এসে গেল বলে রিহার্সালে আসতে দেরী হোলো।' এখনকার এমন অহং ভাবাপন্ন যুগে বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি এমন আনুগত্যের কথা ভাবা যায়? আমার কাছে এতটা নত হবার ওর কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবু যে হয়েছিল সে ওর নির্মল অন্তঃকরণের স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসার তাগিদ। এ সুকুমার সরল আচরণের স্মৃতি আজও মনকে ভিজিয়ে দেয়।

তারপর যা বলছিলাম। 'অনন্যা'র কাজ সুরু হোলো, শেষ হোলো এবং ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে সগৌরবে মুক্তিপ্রাপ্ত হোলো। কিন্তু এই ছবিতেই সর্বপ্রথম সিনেমার ছবির ওপর ট্যাক্স বসানোর দরুন আমাদের কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছিল। তাছাড়া আমার অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে প্রোডাকসন ম্যানেজার প্রোডাকসন কস্ট যে উঁচু ধাপে উঠিয়েছিলেন—তার

ফলে তাঁর লাভ হয়েছে প্রচুর, কিন্তু কতির মূল্য দিতে হয়েছে আমায়। তবে সান্ত্বনা এই যে 'অনন্যা'কে শিল্পরসিক ও সমালোচকবৃন্দ অত্যন্ত সমাদরেই গ্রহণ করেছেন।

আর 'অনন্যা'কে উপলক্ষ্য করেই আমার জীবনে এল পরম লগ্ন।

এই সময় টালিগঞ্জে নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্কুলের থেকে আমার কাছে কিছু ডোনেশন দেবার আবেদন এল। আর ঐ প্রতিষ্ঠানেরই পুরস্কার বিতরণী সভায় তৎকালীন রাজ্যপাল ডাঃ কাটজু এলেন সভায় পুরস্কার বিতরণ ও উদ্বোধন করার জন্যে। ডোনেশনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সভায় প্রধান অতিথি হবার আর রাজ্যপালকে অভ্যর্থনার দায়িত্বভার গ্রহণের সম্মতিও দিতে হোলো।

'অনন্যা'র স্যুটিং-এর পর জেনেছি। ডাঃ কাটজুর সঙ্গে আলাপ ত হোলোই, আলাপ হোলো তার Naval A.D.C. হরিদাস ভট্টাচার্যের সঙ্গেও। নিয়মমাফিক পরিচয়ের আগেই তাঁর দিকে চোখ পড়েছিল। না পড়ে পারে? কি বলব তাঁকে? রূপবান? পরম রূপবান? অসাধারণ সুন্দর? না, কোনো গতানুগতিক বিশেষণই এ ক্ষেত্রে ঠিক লাগসই হয় না। দেখলাম সকলের মাথা ছাপিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক দীর্ঘদেহী পুরুষ। ঋজু, সরল, ছিপছিপে। যৌবনের প্রাণবন্ত সৌন্দর্য সমস্ত অঙ্গপুরে। জম-কালো ইউনিফর্ম ছাপিয়েও ফেটে পড়ছে তাঁর রঙের জোলুষ। প্রশস্ত ললাট, চোখ দুটি খুব বড় নয়—কিন্তু ভারী উজ্জ্বল আর বুদ্ধিদীপ্ত তাঁর সপ্রতিভ চাউনী। আর এই রূপকে শানিত করে তুলেছে তাঁর অসাধারণ স্মার্টনেস। ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা এক টুকরো মিষ্টি হাসি সেই স্মার্ট-নেসকেই অলংকৃত করে? চুম্বকের মত আকর্ষণী শক্তি ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বে? না রূপে? বলতে পারি না।

তবে ফর্মালিটি অথবা লৌকিক শালীনতা বোধের বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করেও অবাধ্য চোখ দুটির দৃষ্টি বার বার যেন ও'রই ওপর পড়ছিলো। আর কি আশ্চর্য? যতবার তাকাচ্ছি দেখি উনিও আমার দিকেই চেয়ে আছেন। চোখাচোখি হতে উনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন। আমিও। বেশ কয়েকবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে গেল। আর সকলের অলক্ষ্যে দুজনের চুরি করে দেখাটা দুজনের কাছেই বারবার ধরা পড়ে যাচ্ছিল। লজ্জার মধ্যেও এক অনামা পুলকে মন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। অপরাধটা তাহলে আমার একার নয়। এ অপরাধের আর একজন ভাগীদারও আছেন। একথাটা মনে হতেই—কবিগুরুর ভাষায় বলা যায়—'বাজিল বুকে সুখের মত ব্যথা।' নাটকীয় মনে হলেও আরও একটা অকপট সত্যকথা না বলে পারছি না, ঠিক এই মুহূর্তেই রবীন্দ্রনাথের 'ওগো সুন্দর চোর' চরণটি মনের মধ্যে গুণ-গুণ করে ফিরছিল।

পূর্ণিমার সঙ্গে পথ বেঁধে দিল চিত্রে
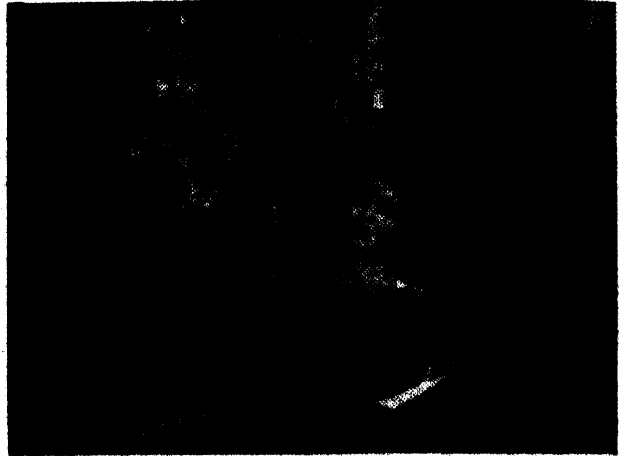
এই হোলো আমাদের প্রথম দেখার অধ্যায়।

বাড়ী ফিরলাম। কাজ-কর্ম সবই চলছে। কিন্তু সব ছাপিয়ে মনে ভেসে উঠছে একটি রূপ। রাজবেশের মত জমকালো পোষাকের এতটুকু অবকাশে ফুটে ওঠা গোলাপী আভার রং, মিষ্টি হাসি, ক্ষিপ্র সপ্রতিভ গতিভঙ্গি—আর সেই 'চুরি করে দেখা'। সব কাজেই কেমন একটা অন্যমনস্কতা এসে যাচ্ছে, আর মনের অতলে উঁকি দিচ্ছে একটি প্রশ্ন, 'আর একবার দেখা হয় না?' কি আশ্চর্য যোগাযোগ' বিধাতা যেন আমার মনের ইচ্ছেটা পূর্ণ করবার জন্যই হঠাৎ কল্পতরু হয়ে উঠলেন।

কারণ, ঘটনার কিছুদিন বাদেই উনি একদিন এলেন গভর্নমেণ্ট হাউসেরই একটা ফাংশনে গান গাইবার অনুরোধ নিয়ে আমারই মত হৃদয়ের গোপন তাগিদে নয় ত—যাই হোক, তখন চোখে দেখার সূচনাটা বিলম্বিত লয়ের আলাপে পৌঁছল।

তারপর 'অনন্যা'রই স্যুটিং-এর একটা লোকেশন ছিল পলতায়। কিন্তু তার জন্য গভর্ণমেন্টের কোনো পদস্থ কর্মচারীর পারমিশন দরকার। তখন আমায় সবাই ধরলেন, হরিদাস ভট্টাচার্য এ বিষয়ে যথা-যোগ্য সাহায্য করতে পারেন কারণ তিনি স্বয়ং গভর্নরের এ-ডি-সি আর তাঁর সংগে ত সেদিন আলাপই হয়েছে। অতএব এ সুযোগ ...ইত্যাদি ইত্যাদি। মুখে বললাম দেখি চেষ্টা করে—কিন্তু কাউকে জানতে দিইনি এইরকম কোনো সুযোগের প্রতীক্ষায় মনটা কিভাবে উৎকণ্ঠিত রয়েছে, আর—এ সুযোগ পেয়ে মনের ভেতর কি দ্রুতলয়ের নৃত্যের মাতন সুরু হয়েছে।

সুযোগের যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করতে একটুও দেরী হোলো না। মিঃ ভট্টাচার্য শুধু ব্যবস্থাই নয়, সবকিছুরই অত্যন্ত সুব্যবস্থা করে দিলেন, নির্বিঘ্নেই সকল কাজ সুসম্পন্ন হোলো।

এরপর হঠাৎই একদিন ফোন বেজে উঠল—একটি মধুর কণ্ঠের প্রশ্ন 'কেমন আছেন? চিনতে পারছেন?' ও'কে বললাম, 'বোধহয় পারছি'—কিন্তু মনে মনে বললাম, 'ও কণ্ঠ আমি লক্ষ লোকের মধ্যেও চিনে নিতে পারি।'

এরপর আস্তে আস্তে ফোনের মাত্রাও বেড়ে চলল। প্রথমে মাঝে মাঝে, তারপর প্রতিদিন—ক্রমশঃ একদিনে অনেকবার। আসা-যাওয়াও চলতে থাকে সমান ছন্দে। এর ব্যতিক্রম হলেই মনটা উদাস হয়ে যেত ঐ গভর্ণমেন্ট হাউসের পথেই। দেখা হলে খুব একটা আবেগভরা রোমান্টিক কথাবার্তা হোতো—তা নয়। কিন্তু ও'কে দেখলেই কর্মক্লান্ত মনের বিরসতা উবে গিয়ে সে কোন এক মধুরতায় সারা মন ভরে যেত। ঐ কয়েকটি মুহূর্তের জন্যই তৃষিত মন যেন উন্মুখ হয়ে থাকত।

কি একটা কারণে একদিন দুজনেই ব্যস্ত থাকায় পুরো একদিন ফোনযোগে কথা বা দেখা হয়নি। পরদিন উনি ফোন করতেই বললাম, 'কাল মনটা বড্ড খারাপ হয়েছিল। অনেক রাত অবধি ঘুম আসেনি।' ও প্রান্ত থেকে উত্তর এল 'আমারও।'

'সত্যি'?—

'সত্যি'। তারপর কিছুক্ষণের নীরবতার পরই কানে এল সেই পরিচিত মিষ্টি কণ্ঠে সুস্পষ্ট উচ্চারিত কটি কথা 'তাই ভাব ছিলাম এত কষ্ট করবার কি দরকার?'

'তার মানে?'

'দেখাশোনার ব্যবস্থাটা ত' পাকাপাকি করে নিলেই হয়।'

একটা অনির্দেশ্য আবেগে সারা শরীর কেঁপে উঠল—গলাও বুজে এল। কোন রকমে শুধু বলতে পারলাম, 'সেই ভালো

(চলবে)

অনুলিখন—বন্যা সে
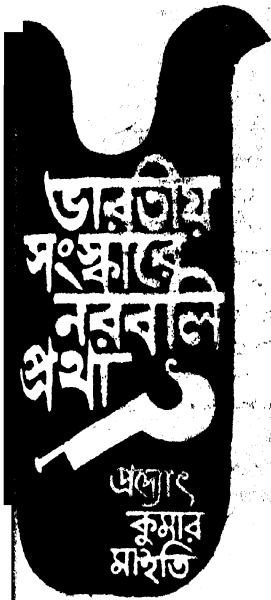
...বলি প্রথা ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর ...দেশেই দীর্ঘকাল ধরে ধর্মীয় ...র অঙ্গীভূত ছিল। গ্রীস, ইতালি, জাপান, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশেও নরবলি প্রথার বহুল প্রচলনের ...ওয়া যায়। আমেরিকার উপজাতি- ...র বিশেষ করে 'মায়া' সভ্যতার ...দের মধ্যে এর ব্যাপক প্রচলনের ...া যায়। ভারতবর্ষে অতি সুপ্রাচীন- ...কেই এই প্রথার প্রচলন ছিল। ...ারোতে আবিষ্কৃত শিলালিপি ও ...হরগুলির উপরে আঁকা চিত্রাবলী ...থা প্রমাণিত হয়েছে যে, মহেঞ্জো- অধিবাসীদের মধ্যে নরবলি প্রথার প্রচলন ছিল। এমন কি ঐ সময় যে- ...নুষকে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি ...ত, তাদের কারাগারে রাখা হত ...ইসব মানুষ দেবালয়ের বন্দী বলে ...হত। মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত ...শিলমোহরে সাতজন মানুষকে বলির ...যে নিবেদিত করা হচ্ছে তার স্পষ্ট ...পাওয়া যায়। বলির পূর্বে নিবেদিত ...লকে ফল ও অন্যান্য সামগ্রী ...যে সাজান হত তারও পরিচয় ...। এই নরবলি প্রথা যে ভারতবর্ষে ...সংস্কার থেকে উদ্ভূত তা সুধীসমাজ ...। পরবর্তীকালে আর্যসমাজের মধ্যে ...রও যেমন স্থান হয়েছিল তেমনি ...র অনুসৃত নরবলিপ্রথাও ক্রমে ক্রমে ... ও সংস্কারের মধ্যে যে স্থান করে ...রও পরিচয় পাওয়া যায়। মহেঞ্জো- ...ভ্যতার যুগে মিনার্স প্রভৃতি বহু ...র মধ্যে যে নরবলি প্রথা সুরু ...। সেই প্রথা ভারতবর্ষে আধুনিক- ...ন্ত প্রচলিত ছিল। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর কোথাও কোথাও অতি গোপনে আজও এই প্রথা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় সংস্কারে নরবলি প্রথার ইতিহাস উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছি।

ভারতবর্ষে মহেঞ্জোদারোর অধিবাসী-দের মধ্যে নরবলি প্রথার প্রচলন ঐ সময়-কার শিলালিপি ও শীলমোহরের উপর আঁকা চিত্রাবলি থেকে যেমন জানা যায়, তেমনি পরবর্তীকালের সাহিত্যিক প্রমাণ থেকে একথা সুস্পষ্ট যে প্রাচীনকাল থেকেই নরবলি প্রথা আর্যশাসিত ভারতীয় সমাজেও স্থান করে নিতে সক্ষম হয়। 'ঐতরীয় ব্রাহ্মণে' উল্লিখিত রাজা হরিশ্চন্দ্র এবং শুনঃশেপ-এর কাহিনী থেকে নরবলি প্রথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কাহিনীটি হল, : রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্র কামনায় বরুণ-দেবতার পূজা করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন পুত্র হলে প্রথম পুত্রকে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেবেন। দেবতার বরে পুত্র হয়; নাম রাখেন রোহিত। পুত্র বড় হলেও দেবতার নিকট প্রতিশ্রুতি পালনে হরিশ্চন্দ্র দেরি করেন। এবং পরে দেবতার নিকট প্রতিজ্ঞার কথা পুত্র রোহিতকে বলেন। রোহিত একথা শোনার পরে দীর্ঘকাল বনে গিয়ে বসবাস সুরু করে এবং ঋষি অজীগর্তের কাছে নিজের অসহায় অবস্থার কথা বলেন। শেষে রোহিত ঋষি অজীগর্তের সমর্থন লাভ করে তারই দ্বিতীয় পুত্র শুনঃশেপকে বরুণদেবতার নিকট নিজের পরিবর্তে বলি দেওয়ার জন্যে স্থির করেন। বলিদানের প্রাক্কালে ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অন্য-তম পুরোহিত বিশ্বামিত্রের নির্দেশে শুনঃশেপ দেবতার উদ্দেশ্যে প্রাণভিক্ষা করেন এবং মুক্তি পান।' উপরোক্ত কাহিনীটি নিছক অলীক কল্পনা প্রসূত নয়, ভারত-বর্ষের ঐ সময়কার সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে কাহিনীটি একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে একথা স্পষ্ট হয় যে, নর-বলি প্রথা ঐ সময়কার আর্যসমাজের কোন কোন অংশে প্রচলিত ছিল। এবং রাজা হরিশ্চন্দ্র অনার্য সংস্কার থেকে উদ্ভূত এই নরবলি প্রথাটি পুত্র লাভের আশায় উদ্‌যাপনের প্রতিশ্রুতি করলেও আর্য-সমাজ কর্তৃক এটি যথাযথ স্বীকৃতি পায়নি, তাই বোধকরি ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অন্যতম পুরোহিত বিশ্বামিত্রের পরামর্শ-ক্রমে শেষ পর্যন্ত শুনঃশেপ রেহাই পায়। কাহিনীটি যে কেবলমাত্র 'ঐতরীয় ব্রাহ্মণে' পাওয়া যায় তা নয়, কয়েকটি পুরাণেও বিধৃত হয়েছে, যেমন—ভাগবত পুরাণ, বায়ু পুরাণ, দেবী ভাগবত পুরাণ ও মার্কণ্ডীয় পুরাণ।

তাছাড়া—মহাভারতে বর্ণিত মগধের রাজা জরাসন্ধের কাহিনীটিও—এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি এক সহস্র রাজাকে বন্দী করে মগধের সারনাথের পশুপতি মন্দিরে রেখেছিলেন। ঠিক করে-ছিলেন, তাঁদেরকে দেবতার নিকট বলি দেবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। এ কাহিনীটিও আমাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সপক্ষে রায় দেয় অর্থাৎ নরবলি প্রথা প্রচলনের ইঙ্গিত দেয়।

প্রসঙ্গতঃ আরও একটি পৌরাণিক কাহিনীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বৃষলদের রাজা পুত্রসন্তান কামনায় ভদ্র-কালীর তুষ্টি সাধনের জন্যে নরবলির আয়োজন করেছিলেন। ঋগ্‌বেদের সময়কার অন্যতম উল্লেখযোগ্য অনার্য উপজাতি পানিস কর্তৃক অনুষ্ঠিত নরবলি প্রথার অনুকরণেই বৃষলদের রাজা নরবলির মধ্য দিয়ে ভদ্রকালীর পূজার ব্যবস্থা করেন। বলির জন্যে তিনি একজন পশুস্বভাবসম্পন্ন মানুষকে বন্দী করে রেখেছিলেন, কিন্তু রাত্রে বলির সময় দেখা গেল, লোকটিকে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে অনুষ্ঠানে বলির প্রয়োজন; সেই মুহূর্তে অনুসন্ধানের জন্য চারদিকে অনুচর পাঠানো হল। শেষ পর্যন্ত ভরত নামে এক জীর্ণ শস্যক্ষেত্র পাহারা-ধারী ব্যক্তিকে ধরে এনে বলির আয়োজন করা হয়। বলি দেওয়ার পূর্বে তাকে স্নান করান হয়, সাজান হয়, এমন কি পূজা করা হয়। তারপর রাজপুরোহিত বলির জন্যে খড়্গ তোলে তবে শেষ পর্যন্ত ভদ্র-কালী ভরতকে রক্ষা করেন। কাহিনীটি ভাগবত পুরাণে রয়েছে। এই কাহিনী এবং উপরোক্ত 'ঐতরীয় ব্রাহ্মণ' ও 'মহাভারতে' বর্ণিত কাহিনী দুটি থেকে একথা বলা চলে যে, অনার্য সংস্কার প্রসূত নরবলি প্রথা ক্রমে ক্রমে আর্য সংস্কারের অংগীভূত হয়ে পড়ে। তার কারণ প্রাক্ আর্যসমাজে এই প্রথা অত্যন্ত দৃঢ় ছিল যার জন্যে আর্য-ধর্ম ও সংস্কার এই প্রথামুক্ত হতে পারেনি।

অন্যভাবেও প্রমাণ করা যায় যে, এই নরবলি প্রথা আর্য সংস্কারে স্থান করে নিয়েছিল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত একটি শীল-মোহরের উপর সাতজন মানুষকে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়ার জন্যে চিত্রিত করা হয়েছে। পরবর্তীকালে আর্য সংস্কারের মধ্যেও সাতজনকে বলি দেওয়ার প্রথা গৃহীত হয়েছিল, তার ইঙ্গিত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও অথর্ব বেদে পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে রয়েছে : 'দেবী ললিতা সাতজন রাক্ষসের মাথা দিয়ে তৈরী একটি মালা পরিধান করেছিলেন।' তাছাড়া অথর্ব-বেদে রয়েছে : 'সাতটির[১] একত্রিত বলিই দেবতার উদ্দেশ্যে সত্যিকার বলি।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আর্য-সংস্কারে যে কেবল প্রাক্ আর্যের নরবলি প্রথা স্থান পেয়েছিল তা নয়; প্রাক্ আর্য অনুসৃত

১। সাতটিই মানুষ বা মানুষ ও পশু-মিলিয়ে সাতটি, তা সুস্পষ্ট কোন উল্লেখ অথর্ববেদে নেই। তবে আমাদের মনে হয়, উভয় প্রথার কথা বলা হয়েছে।

নরবলির বিশেষ যোগ ছিল তাও মনে রাখা দরকার। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়:

"কুরুরে কাটিয়া যত কে মহিষ পারে
ছাগ মেষ মহিষ শোণিত দুয়ারে।।
কেহ কেহ মানুষের কাটামুণ্ড লৈয়া।
খড়্গ করে করয় নর্তন মত্ত হৈয়া।।"

মানুষের কাটামুণ্ড নিয়ে নাচের কথার মধ্য থেকে বাংলাদেশের নরবলি প্রথা প্রচলনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। প্রসংগতঃ দেবী কালীর রূপের কথাও আমাদের মনে পড়ে। দেবী কালীর গলায় নরমুণ্ডের মালার [illegible] অর্থবহ [illegible] সহজেই অনুমেয়। [illegible] মানসকল্পনার [illegible]ভূত দেবী কালীর নরমুণ্ডের মালা পরিধান যে নরবলি প্রথা প্রচলনের ইঙ্গিত করে তা বলাই বাহুল্য। মারাঠারাও যে নরবলি প্রথার বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিল তাও আমাদের অজানা নয়। তাঞ্জোরের বিখ্যাত কালীমন্দিরে প্রত্যেক শুক্রবারে একজন মানুষকে বলি দেওয়ার প্রথার প্রচলন ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকেও চালু ছিল। ১৮৩০ খৃস্টাব্দে প্রায় পঁচিশ জনেরও বেশী লোককে স্থানীয় রাজার নির্দেশে বাস্তারের দন্তেশ্বরী দেবীর মন্দিরে বলি দেওয়া হয়েছিল। এ প্রথা দীর্ঘকাল ধরে যে প্রচলিত তাও শোনা যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে কোচদের রাজা নরনারায়ণ প্রায় একশ পঞ্চাশজন মানুষকে বিভিন্ন সময়ে দেবতার কৃপালাভের জন্যে বলি দিয়েছিলেন।

[illegible] উপজাতিদের মধ্যে [illegible] প্রচলনের [illegible]টি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। খন্দ উপজাতির লোকেরা তাদের ধরিত্রীদেবী 'তরীপেনু'কে সন্তুষ্ট করে তাঁর সর্বপ্রকার আশীর্বাদ লাভের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে সফসলের জন্যে নরবলি দিত। ভূমিজরা 'রংকিনী' দেবীর ও ভূঞারা 'ঠাকুরাণী মায়ের' তুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যে নরবলি দিত। ভূমিজরা ছোট ছোট বালকদের চুরি করে নিয়ে গিয়ে দেবীর কৃপালাভের উদ্দেশ্যে বলি দিত। তাছাড়া নাগা অঞ্চলের [illegible] উপজাতিদের মধ্যেও এ [illegible] প্রচলন [illegible]। দক্ষিণ-ভারতের তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চলের [illegible] এবং কয়েসুদের মধ্যে অত্যাধুনিক কাল পর্যন্ত [illegible] প্রচলনের খবর পাওয়া যায়।

কেবল যে রাজন্যবর্গ ও বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে নরবলি প্রথার প্রচলন ছিল তা নয়, বোম্বাই প্রদেশের করহাড়া সম্প্রদায়ের [illegible] মধ্যেও এ প্রথার প্রচলন [illegible] প্রতি বছর একটি ব্রাহ্মণ যুবককে তারা দেবতার আশীর্বাদ লাভের জন্যে বলি দিতেন। তাছাড়া চন্দ্রভাগা [illegible]তীরবর্তী অঞ্চলের কিডার (পাঙ্গী) নামক স্থানে 'দেও-নাগের' মন্দির আছে। শোনা যায়, এই নাগ দেবতার উদ্দেশ্যে নিয়মিত নরবলি দেওয়া হত। আসামের 'ইউ-থ্লেন' নামক নাগের কাছে এরকম নরবলির কথাও শোনা যায়।

ভারতীয় সংস্কারে নরবলি প্রথার সংগে আত্মবলিদান [illegible]ও জড়িয়ে রয়েছে। 'শতপথ ব্রাহ্মণ' থেকে জানা যায়, 'অশ্বমেধ' অনুষ্ঠানের উপলক্ষ্যে আত্মবলিদান প্রথার প্রয়োজনীয়তা ছিল। দক্ষিণ ভারতের মন্দির ভাস্কর্য থেকে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে যে, এক সময় ঐ অঞ্চলে দেবীর উদ্দেশ্যে আত্মবলিদান প্রথার প্রচলন ছিল। দক্ষিণ ভারত ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এ প্রথা যে একসময় প্রচলিত ছিল তা জানা যায়। চুটিয়া এবং তাদের উত্তরাধিকারী অহোমরা আত্মবলিদান প্রথার বিশেষ অনুরাগী ছিল। ছোট নাগপুরের দ্রাবিড়ীয় উপজাতিদের মধ্যেও এ প্রথার প্রচলন ছিল। কোচবিহারের ভোগী সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ প্রথা প্রচলনের খবর পাওয়া যায়। তাছাড়া আসামের জান্তিয়া পরগণার কান্দারা যোগীদের মধ্যেও এ প্রথা প্রচলিত ছিল। এ সম্প্রদায়ের কোন মানুষ আত্মবলিদান করলে পর তার মাথাটি একটি স্বর্ণপাত্রে করে দেবীর সামনে রাখা হত। হৃৎপিণ্ডটি রান্না করে উপস্থিত কান্দারা যোগীরা তা খেত। তাছাড়া এ অঞ্চলের রাজপরিবারের লোকেরা ঐ আত্মবলিদানের মানুষটির রক্ত দিয়ে যে ভাত রান্না হত, তার অল্প কিছু নিয়ে গিয়ে খেত। কান্দারাযোগীরা কোন সময় যদি আত্মবলিদানের লোক না পেত তখন তারা অন্য লোক চুরি করে এনে এ প্রথা উদ্‌যাপন করত। এমনকি লর্ড বেণ্টিংকের সময় (১৮২৮-১৮৩৫) এই অঞ্চলের অধিবাসিগণ নরবলি দেওয়ার জন্যে কয়েকজন ইংরেজকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধ সত্ত্বেও তাদের মুক্তি না দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত বেণ্টিংক জান্তিয়া পরগণা দখল করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এবং কঠোর হস্তে এ অঞ্চলের আত্মবলি ও নরবলি প্রথার উৎখাত করেন।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ভারতবর্ষে নরবলি তথা আত্মবলিদান প্রথার যে রূপটি দেখলাম তা আজকের দৃষ্টিতে ভয়াবহ মনে হলেও যে যুগে এসব প্রথার প্রচলন ভারত তথা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ও উপজাতিদের মধ্যে ছিল, সেই যুগের দৃষ্টিভঙ্গিতে এ প্রথাগুলি ছিল একটা প্রয়োজনীয় ধর্মীয় সংস্কার। [illegible] মানুষ ক্রমে সভ্য হয়ে ধর্মীয় সংস্কারের গণ্ডীমুক্ত হয়ে চলেছে। ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই মহেঞ্জোদারোর অধিবাসীদের মধ্যে যে নরবলি প্রথার সূত্রপাত দীর্ঘ কয়েক হাজার বছর পূর্বে সুরু হয়েছিল এবং [illegible] পর শতাব্দী ধরে অব্যাহত [illegible] ছিল, তা আজও ভারতের [illegible] নির্মূল করা চলে না। [illegible] কালেও ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও গোপন নরবলির খবর কাগজে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে নরবলি প্রথার বিলোপ সাধনের পেছনে একদিকে রয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার আর অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসকদের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা। ♦

---

৩ আগ্রা, ৩০শে ডিসেম্বর—

কুকুরশন গ্রামে নরবলির অভিযোগ সম্পর্কে মন্দিরের জনৈক পুরোহিত এবং একজন গ্রামবাসীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু পুলিশ জানিয়েছে যে, প্রধান আসামী আগ্রা জেলার জনৈক ধনী ঠাকুর ফেরার হয়েছে।

পুলিশ বলেছে যে, ১২ই ডিসেম্বরের রাতে ১৪ বছরের বালক চন্দন সিংকে গ্রামের কালীমন্দিরে উৎসর্গ করে বলি দেওয়া হয়। গ্রামের কাছেই তার ধড় পাওয়া যায়, মাথা পাওয়া যায়নি।

পুলিশ জানতে পেরেছে যে, উক্ত ঠাকুর নাকি স্বপ্ন দেখে যে, কুকারশন গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চাবনদেবী তাকে বলেছেন—সে যদি একটি বালক এনে তাঁর সামনে বলি দেয়, তবে তাকে দু' কোটি টাকা গুপ্তধনের সন্ধান বলে দেবেন। ঠাকুর মন্দিরের পুরোহিত ও অপর এক ব্যক্তিকে দলে আনেন এবং স্বপ্নে আদিষ্ট গুপ্তধন পাওয়ার পরে তাদের প্রত্যেককে ৪০ হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এর পরে ঠাকুর গড়হি করিমপুর গ্রামের জনৈক মেষপালকের সংগে সাক্ষাৎ করে তার ছেলেকে বিশেষভাবে দেবীদর্শনের জন্য পাঠাতে বলে। মেষপালক এই প্রস্তাবে রাজী হয়। এই কথানুযায়ী বালকটি মধ্যরাত্রে মন্দিরে আসে এবং সে ঘুমিয়ে পড়লে তুড়ুক দিয়ে কুপিয়ে তাকে বলি দিয়ে রক্ত দেবীকে উৎসর্গ করা হয়। বালকটি নিরুদ্দেশ হওয়ার এক সপ্তাহ পরে তার বাবা পুলিশে এজাহার দেয়। পরে পাহাড়ের কাছে একটি কবর খুঁড়ে বালকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

—ইউ এন আই ও পি টি আই (যুগান্তর, তারিখ—৩১-১২-৬৯)। প্রসঙ্গত আমরা একটি গোপন নরবলির খবর উল্লেখ করলাম। এমন বিক্ষিপ্তভাবে গোপন নরবলির খবর কাগজে আরও দেখা যায়।

অলৌকিক জাগরণ ॥

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

কোনও কোনও মুহূর্তে অপার আশ্চর্যের
কোনও কোনও মুহূর্তে বুকের মধ্যে অলৌকিক ফুলের নির্যাস
কোনও কোনও মুহূর্তে পারিপার্শ্বিকের এই আমি
রোমাঞ্চিত, শিহরিত
প্রথম বর্ষার নিদারুণ স্পর্শ কাতরতায় উদ্বেলিত;

কোনও কোনও মুহূর্তের কোনও মুহূর্তে
আশ্চর্য
অনন্য;

বুকের মধ্যে যখন ধ্বনি,
...তোমার প্রতিধ্বনি
চোখের জলের স্মৃতি যখন বুকের আগুনকে
ক্রমাগত বিশুদ্ধ করে
সমান্যে কোনও কোনও মুহূর্তে তখন
অলৌকিক জাগরণ।।

চিরায়ত ॥

নবনীতা দেব সেন

আবাল্য বিধ্বস্ত মন এখনো রয়েছে ভাঙা ঘরে
আছি শান্ত বিধ্বস্ত সদরে।
আমি জানি, অজেয় প্রভাত
সূর্য-স্বয়ংবরা হবে চন্দ্রহীন সব মধ্যরাত—
তুমি আছো, তাই বেঁচে আছি।
এই সত্য পরিষ্কার অন্তরে মেনেছি :
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে জন্মলগ্নে আমাকে স্পষ্টত
আনন্দের ব্যাকরণ আমরণ থাকবে অধিগত।
যতো আসে আসুক আঘাত
নতজানু, পেতে আছি হাত।
জানি তো শেষাঙ্ক নয় শোক
মিলনান্ত সমস্ত নাটক
যাত্রাদিন হয়ে যাবে ভরন্ত, নিটোল
অভিজ্ঞার সুবর্ণক ফল।

অঞ্জলিতে তুলে দিয়ো যন্ত্রণার প্রকৃষ্ট প্রসাদ
আমার ছলনামুক্ত জীবনের চিরায়ত স্বাদ।।

কেমন করে ভালবাসলে ॥

সন্তোষ সিংহ

মানসী, কেমন করে ভালবাসলে পূর্ণতায় পৌঁছাব
আমি সারা দুপুর আঁক কষে পাতার পর পাতা ভরিয়েছি
দুধের শিশুরা বুকের ওপর খেলা করে
বিন্যস্ত কোমল বুকের ওপর
নির্মল ভালবাসা টপ্‌টপ্‌ করে গড়িয়ে যায়
পাথর বাটি হাতে ছুটে আসে মানুষ

একদিন সব কিছু থেকে যাবে
বাখারির ঘরে রাঙামাটির প্রলেপ
বাগানের পাশাপাশি চেয়ার—
মাটির কলসে জল ঢালার পূর্ণতা
বীজ থেকে মহীরুহের পূর্ণাঙ্গ রূপ
আমার পরখে ধরা দেয়

অথচ শোন কী অদ্ভুত বেদনার শব্দ ওঠে
কেমন করে তোমাকে কাছে পেলে পূর্ণতায় পৌঁছে যাব।

জলাটা আস্তে আস্তে যাচ্ছে। মাসুকে য় নিতে চেয়েছিলেন নীলিমাদেবী। অতসী ওর হাত টেনে ধরেছে, "না, হবে না, সানুদি আমাদের সঙ্গে বে।"

"বেশ তো, থাকুক।"

সানু একটু ম্লান হেসে বলেছে, াকে নিয়ে তাই তোমাদের অসুবিধেই তারচেয়ে ওখানেই চলে যাই আমি।"

"একদম হবে না, আমাদের সঙ্গে ত হবে।"

"অত হাঁটতেই পারবো না আমি।"

"এখন পারবে না, দেখা যাবে।"

"বলছো যাচ্ছি, তবে তোমাদের দলে ক মামার না।" কি ভেবে সানু কে চোখ ফেরাল।

ঢাকুরিয়া রোড ধরে খানিকটা এগিয়ে ডানপাশে বেঁকে গেল ওরা। এই কু পেরোলেই ধানোয়ার রোড। রাস্তা াগোলে একটু ঘুরতে হয়। এই ভূমি পথটাই অনেক সোজা। রাস্তার ই দুর্গামণ্ডপের কাছাকাছি রীতুকার পানের দোকান।

"কে কে পান খাবে?" অনীশ চেঁচিয়ে য় জানতে চাইল।

আমি।" অতসী হাত তুলল।

াই, এই অতসীদি, শুধু তুমি কি. ও খাবো, আমরা সবাই খাবো।" অতসীকে টানতে টানতে এগিয়ে।

ানু মাথা নাড়ল, "না, আমি খাবো

তুমি যাও।' সানু সরে করে কর

র্দশ করে নিয়ে নাও লাগবেই তো।"

াবু সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন। মামারটায় লালবাবা জর্দা দিতে "নীলিমাদেবী বলতে বলতে কি হাসলেন একটু।

মামার শুধু খয়ের আর চুন।" র মা হাসল মৃদুভাবে।

মামার তাই চুন আর এলাচ।"

ড়ান, আর একবার মনে করে নিই। চুন খয়ের, চুন এলাচ।" অনীশ মৃদু এবার অতসী আর মামুর দিকে।

মামাদেরটায় ভাজা মসলা, মিন্টি া, পিপারমেন্ট সব।" মানু মাথাটা হেলিয়ে হাসতে হাসতে কাডি- বোতাম লাগিয়ে নিল। অতসী মুখ টিপে হাসছে।

তসীর মা নীলিমাদেবীর দিকে বলল, "ওরে বাবা, একবার জর্দা মামার যা হয়েছিল না দিদি!"

থম প্রথম একটু অসুবিধে হয়, মাগে, আমারও হয়েছিল। তবে মামার ওটা না হলে আমার চলেই

রেশবাবু সিগারেট টানছিলেন, হেড়ে বললেন, "মিছিমিছি দাঁড়িয়ে লাভ কি, আমরা বরং এগোই।"

"হ্যা হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন, আমি ঠিক ধরে ফেলবো।"

অনীশ পানের দোকানের সামনে এসে রীতুয়াকে পান বানাতে বলে সিগারেট ধরাল। দোকানের বড় বড় আয়নায় নিজের অস্পষ্ট মুখটা বার কয়েক দেখে নিল।

"কি রে মানু, চল।" মানু তাকাল ওর দিকে।

"তুই এগো না, আমরা আসছি।"

"দেখলে তো অতসী, তোমাদের দলে আমি বেমানান।"

"একদম মিথ্যে কথা।" অতসী সানুর কাছে এসে বলল, "চলো আমরা হাঁটতে থাকি।"

"আমাদের পান দুটো আগে দিয়ে দিন তো।" মানু তাড়া দিল।

"তোর আর সবুর সইছে না যেন।"

"দেখছো না, আমাকে ফেলে রেখেই কেমন চলে যাচ্ছে।" মানু এবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে, একটু জোরে জোরে বলল, "ভাল হচ্ছে না অতসীদি।"

"এই নিন দিদিমণি।" রীতুয়া দুটো পান এগিয়ে দেয় মানুর দিকে।

মানু সঙ্গে সঙ্গে পান মুখে পুরেছে, পানের বোঁটা থেকে সামান্য চুন মুখে দিল। পরে পানের রসে ঠোঁট দুটো জিভের ডগা দিয়ে বারকয়েক ভিজিয়ে নিল। কাছে এসে অতসীর হাতে পানটা দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, "লাল হয়েছে?"

"হুঁ, ভীষণ।"

অনীশও নিজের পানটা মুখে পুরল। দু প্যাকেট চারমিনার সিগারেট, একটা দেশলাইও নিল। জর্দা দেওয়া পানটা আলাদা করে একটা শালপাতায়, বাকিও গুলো কাগজের ঠোঙায় ভরে দিয়েছে রীতুয়া।

ওরা অনেকটা এগিয়ে গেছে। অনীশ জোরে জোরে পা চালিয়ে অতসীদের ধরে ফেলেছে। মানুর হাতে ঠোঙাটা দিয়ে বলেছে, "যা, ওদের দিয়ে আগে আয়, শাল- পাতারটা মার।" পরে সানুর দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল, "খেতে পারতিস সানু।" অনীশ পান চিবোচ্ছিল, একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল আবার।

সানু মাথা নীচু করে হাঁটছিল, মুখ না তুলেই জবাব দিল, "আমার ভালই লাগে না।"

"আগে তো খেয়েছিস দেখেছি।" অনীশ সিগারেটের ধোঁয়া নিয়ে খেলা করছিল।

সানু মুহূর্তে চোখ তুলে তাকাল একবার, আবার সরিয়ে আনল দৃষ্টি। ওর দাদা যেন ভুল করে অজান্তেই আজ হঠাৎ একটা খোঁচা দিয়ে ফেলেছে। আগে তো অনেক কিছুই করেছে সে, এখন কি তা পারে? আজ অনেক অধিকারই তো সে হারিয়ে ফেলেছে। পান খেলে তাকে আরো সুন্দর দেখাতো। ওর স্বামীও খুব পছন্দ করতো পান খাওয়াটা। পানের রসে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে ও কত রকমের

খেলাই না খেলেছে স্বামীর সঙ্গে। সব যেন মনে পড়ে যায় এক এক করে। বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে থাকে। আরো কত কি পছন্দ করতো ওর স্বামী। এক এক করে ওর জীবন থেকে তা চলে যাচ্ছে? খাওয়াটাই সে ছেড়ে দিয়েছে এখন। একটু অন্যমনস্ক ও বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল ওকে। নীরবে অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিল ওদের সঙ্গে।

অতসী মিষ্টি করে হাসল, একটু পরে বলল, "আজ একটা খেতে পারতে সানুদি, এক মাত্রায় শখের হলে হয়ে যেত, এই না।"

সানু এবার তাকাল ওর মুখের দিকে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বলল, "আমার সঙ্গে কারো না মেলাটাই তো ভাল!"

"তুমি যে কী বল না সানুদি, ওটা কি আমাদের ইচ্ছে, অনিচ্ছের ওপর নির্ভর করে?"

"এসব কথা থাক অতসী।" সানু ওর মুখের দিকে চেয়ে ম্লানভাবে হাসল, বলল, "পান খেলে তো দেখছি বেশ দেখায় তোমাকে!" সানু আবার যেন কি ভাবছে একটু অন্যমনস্ক হয়ে।

অনীশ সিগারেট টানছিল। সানুর কথাটা ওর কানে গেছে। সেও লক্ষ্য করেছে অতসীকে একটু অন্যরকম দেখাচ্ছিল। অতসীকে দেখতে দেখতে বলল, "ঠোঁট দুটো যে একেবারে লাল টুকটুকে করে ফেলেছো!"

"খারাপ লাগছে?" অতসী চোখের এক ঝলক করে ওর দিকে তাকাল।

অনীশ কি একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। অপলকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে চোখ সরিয়ে এনেছে। চোখের ইশারায় কি যেন বোঝাল। অতসীর মুখ মুহূর্তে লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে, মাথা নীচু করে মুচকি মুচকি হাসছিল ও। মানুও দাঁড়িয়ে পড়ে ওদের সামিল হলো আবার।

ধানোয়ার রোডের দুপাশে বড় বড় সব বাড়ি। সব বাড়িতেই এখন লোক। ছেলেমেয়েরা বাগানে হুল্লোড় করছে। দুপাশে আম শিরিষ ইউক্যালিপটাস গাছের ছায়া পথের ওপর। আরো অনেকে বেড়াতে বেরিয়েছে। গরুর গাড়ি যাচ্ছিল ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করতে করতে।

টাঙাওলা রাস্তা ছেড়ে এবার মাঠের পথ ধরেছে। সুরেশবাবু টাঙাওলাকে থামতে বললেন। তিনিও দাঁড়িয়ে পড়েছেন। ওরা এখনও অনেক পেছনে রয়েছে। তিনি সিগারেট ধরিয়ে হেসে হেসে বললেন, "এ জায়গাটা তো ভারী সুন্দর!" এখানে এসেই বাড়িগুলো শেষ হয়েছে, গাছ গাছালিও কম। মাঠটা অনেক বড়, আকাশটাও যেন হঠাৎ বড় হয়ে গেল। চোখের সামনে আপাতত কোন বাধা নেই না আর। অনেকদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে যায়। দূরের চালু জমিতে সবজের ক্ষেত- গুলো, এর রূপ যেন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। হলুদ ফুল ফুটে আছে ক্ষেতে

অতসী ওর মুখের দিকে চেয়ে একটু গম্ভীর হলো, কিছুক্ষণ পরে বলল, 'তবে আর বসে কাজ নেই, তাড়াতাড়ি চলে আসবো।'

সূর্যের আলোটা আরো লাল দেখাচ্ছে। ছায়া নেমে আসছে দীর্ঘতর হয়ে। একটু একটু শীতও করছিল, শালটা খুলে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে নিল অতসী। পথটা এখানে এঁকে বেঁকে সরীসৃপের মতন দেখাচ্ছে। টাঙাটা এগিয়ে গেছে। মানুকেও দেখা গেল না। বড় বড় শালগাছে পথগুলো ঢেকে রয়েছে যেন। অতসী আর অনীশ পাশাপাশি হাঁটছে। আশপাশে আর কেউ নেই, দেখাও যাচ্ছে না কাউকে। অতসীর শরীরটা বার বার ওর গায়ে লাগছে। ওর নিশ্বাসও অনীশের গায়ে পড়ছে। অতসী যেন ভয় পেয়েছে সামান্য। অনীশ কি ভেবে দাঁড়িয়ে পড়েছে, অস্ফুটে বলল, 'শোন।'

অতসী ওর চোখের দিকে চেয়ে মুচকি হাসল 'কি বলুন।' ওর চোখেও কিসের নেশা।

'তোমাকে আজ দারুন লাগছে।' অনীশ দু মুহূর্ত কি ভাবল, হঠাৎ আরো কাছে টেনে নিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরেছে সে। গলাটা ভাঙা ভাঙা শোনাল। সারা চোখমুখ ভীষণ রকম তেতে উঠেছে। শরীর যেন পুড়ে যাচ্ছে এমন একটা ভাব। অতসীও নিজেকে সরিয়ে নিল না, সে একটু অবাক হলো। আস্তে করে পর পর ওর মুখে গালে কয়েকটা চুমু খেল অনীশ। বুকটা কাঁপছিল অনীশের।

ওর এই আকস্মিক আচরণে অতসীও প্রথমটায় কেমন বিহ্বল, বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল, ঘোর খানিকটা কাটতেই সে সরে এলো অস্ফুটে বলল, 'আপনি না ভীষণ, কেউ যদি এখন দেখতো!' শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছে নিল। সে তাকাতে পারছিল না, চোখমুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে। তারও বুকটা এখন থর থর করছে।

অনীশ একটু পরে স্বাভাবিক হয়ে বলল, 'কিছু মনে করো না, লোভটা সামলাতে পারলাম না।'

অতসী কিছু বলল না, সে একটু তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। বিদ্যুৎ চমকের মতন কি যেন একটা হয়ে গেল ভেতরে। মাথার ওপর দিয়ে শিস দিতে দিতে একটা পাখি উড়ে গেল। বনটা শেষ হয়ে গেছে। সামনে বিরাট নদী। বরাকর।

টাঙাটা দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। ঘোড়াকে ছোলা খেতে দিয়েছে টাঙাঅলা। সুরেশবাবু নীচে নেমে গেছেন। অতসীর মা আর নীলিমাদেবী নদীর দিকে চেয়ে আছেন। সানু কি যেন একটা দেখছিল একদৃষ্টে। মানু পাথর কুড়োচ্ছিল।

নীলিমাদেবী একসময় বললেন, 'আমাদের এসব দেখে কি হবে দিদি, তার চেয়ে চলুন আমরা মন্দিরে যাই।'

'সেই ভালো।'

অতসীকে দেখে মানু এগিয়ে এলো, ওর মুখের দিকে যেন সে কেমন করে চেয়ে থাকল। অতসী চোখ সরিয়ে নিয়েছে, তাকাতে পারছিল না। পরে কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে মানু ফিসফিস করে বলল, 'কিছু একটা যেন হয়েছে মনে হচ্ছে; অমন করে কী অত ভাবছো?'

অতসী ম্লানভাবে হাসল একবার, বলল, 'আমাকে ফেলে চলে এলে যে।'

'ফেলে এলাম কোথায়, বলো রেখে এলাম।' মানু হাসতে লাগল।

'যাও, তোমার খালি ইয়ার্কি'।'

নদীতে জল নেই বেশি। বড় বড় পাথরের টুকরো। পরিষ্কার জল। নীচের বালি পর্যন্ত দেখা যায়। 'দ'-এর মতন করে নদীটা এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে। একেবারে মাঝ বরাবর জলের গভীরতা, স্রোতও আছে ওখানে।

আরো অনেকেই জায়গাটা দেখতে এসেছে। পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে এগিয়ে গেছে অনেকে। বেশ খানিকটা দূরে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হাত ধরাধরি করে পাথর টপকাচ্ছে। সানু ওদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন করে উঠল হঠাৎ। সারা শরীরে এক বিদ্যুৎ খেলে গেল। বুকের ভেতরটা ফের মোচড় দিয়ে উঠেছে। এই তো সেদিনের কথা! এখনও অ্যালবামে ছবিগুলো গাঁথা রয়েছে। বিয়ের কিছুদিন পর বেড়াতে গেছে। কত রকমের খুনসুটি। একের পর এক মুহূর্তগুলোকে ধরে রাখার চেষ্টা। কিন্তু সব যেন ভোজবাজির মতন মিলিয়ে গেল। ওর স্বামীর ভালবাসায় যেন সবই ভুলতে পেরেছিল। কী ছেলেমানুষিই না করত! বুকের তলা থেকে এই মুহূর্তে যেন তার একরাশ কান্না উঠে এলো। এক এক করে সবই তো চলে গেল। তার ভালবাসায় কি তবে কোন অভিশাপ ছিল? আজ এত-দিন পরে আবার সন্দীপের মুখটা কেন ভেসে উঠছে? ওই ছেলেটার মতন কি সন্দীপও এতখানি লম্বা? ওর সঙ্গে কি সন্দীপের চেহারার কোন মিল আছে! এই নামটাকে তো অনেকদিন আগেই জঞ্জালের মতন সে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। আবার কেন এতকাল পরে কেউ খুঁড়ে তুলে আনছে। তার নিয়তি বড় নিষ্ঠুর। হঠাৎ কেন আবার দু চোখ তার ঝাপসা হয়ে আসে? সানুর আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে হলো না। এসব দৃশ্য দেখার অধিকার কি আজ তার আছে? সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। এমন নিঃসঙ্গ তো আর কখনো সে অনুভব করেনি। চোখে আঁচল চেপে ধরেছে। আর সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। মন্দিরের কাছে এসে স্বাভাবিক হলো, চোখ মুছে নিল সে আস্তে আস্তে। জীবনের প্রথমেই যে সন্দীপকে সে ভাল বেসেছিল। অথচ তাকেই সে দূরে সরিয়ে দিল। ওর ওই শান্ত গভীর চোখে যেন কত কী লুকোনো থাকত। লাজুক, নিরীহ। সন্দীপ তাকে পড়াত, ওর কথা শুনতে শুনতে কেমন যেন নেশা ধরত তার। অনেক দিন লুকিয়ে লুকিয়ে ওদের বাড়ি গিয়েছিল সানু, ওর মার হাতের রান্না খেয়েছে। এক সময় নিজের ঘর মনে করত সানু। বড়দাও জানত কথাটা, সে নিজেই বলেছিল তাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সানুর কথা কোন মূল্যই পেল না এ বাড়িতে। বাবাও রাজী হলো না। বিয়ের পর আবার নতুন করে ভালবেসেছিল স্বামীকে। কোন রকম ফাঁকই রাখেনি সেখানে। শুধু এরই মধ্যে আজ সে রিক্ত, আর কিছুই রইল না তার কাছে। মা-বাবাকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে সে বলল: তোমরা না আমার সুখ চেয়েছিলে, দেখ দেখ, আমি কত সুখী, কত ভাগ্যবতী। চোখ দুটো আবার জলে ভরে উঠেছে সানুর। তাড়াতাড়ি করে মুছে নিল।

নীলিমাদেবী ওকে এভাবে চুপচাপ এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শুধোলেন, 'কি রে, চলে এলি যে!'

'ভাল লাগছে না, চলে এলাম।'

সুরেশবাবু নদীর প্রায় মাঝামাঝি চলে গেছেন।

মানুও পাথর টপকে খানিকটা এগিয়েছে। অতসী পাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অনীশ অতসীর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, হেসে বলল, 'তুমি গেলে না।'

অতসী মুচকি মুচকি হাসল, চোখ না তুলেই বলল, 'আপনি যান না, আমার এখানেই ভাল।'

'এই অতসীদি, এসো না, আমি আর পারছি না।'

'সাবধানে পা দিস মানু।' অনীশ ওপর থেকে জোরে জোরে বলল।

অতসী এগিয়ে গেল। মুখে চাপা হাসি। ভয়ে ভয়ে সে কয়েকটা পাথর ডিঙিয়েছে সবে। অনীশ হাসছিল চেয়ে চেয়ে। আর এগোতে পারছে না অতসী। হঠাৎ কি খেয়াল হলো ওর। বসে পড়ে কি ভাবল এক মুহূর্ত, এক আঁজলা জল তুলে নিল, অনীশের গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বলল, 'খুব মজা, না?'

'এলে আমিও ভিজিয়ে দেবো।'

'আসুন, আসুন না।'

দূরে কারা যেন গলা ছেড়ে গান গাইছে। অতসী অনীশের মুখের দিকে চেয়ে এবার হেসে হেসে বলল, 'আহা, নেমেই আসুন না একবার, ঠিক আছে, আর জল দেবো না।' অতসী জিভ বের করে ভেংচাল।

মাথার ওপর দিয়ে পাখির ঝাঁক উড়ে গেল। নদীর জলে মুমূর্ষু সূর্যের রক্তাভ আলো পড়েছে।

অনীশ সিগারেট খেতে খেতে বলল, 'আর যেও না, এবার উঠে এসো, মানুকেও ডাক। এসব পাথরটাথর বড় গোলমেলে।'

অনীশ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু না বলে হাসল শুধু।

সূর্য ডুবছিল, কালচে ভাবটা এখন

দেখতে দেখতে মরে যাচ্ছে। সন্ধ্যা নামছিল নিঃশব্দে। বেশ শীত করছিল। একে একে সবাই ফিরছে।

অতসী উঠে এলো। মানুও সাবধানে পা ফেলতে ফেলতে ফিরে আসছে। তখনো গান ভেসে আসছিল। অনীশ মুচকি হেসে বলল, 'সুর হচ্ছে না।'

অতসী ঘাড় হেলিয়ে তাকাল, বলল, 'আমার কথা কিন্তু আজ শুনতে হবে!' ওর গলায় আবদার ও অধিকার ছিল।

'তাই নাকি?' অনীশ অপলকে তাকিয়ে রয়েছে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' অতসী চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে হাসল। ওকে যেন আগের চেয়ে আরও একটু চপল ও খুশি খুশি দেখাচ্ছে।

'কথাটাই তো শুনলাম না এখনও।'

'গান।' অতসী চোরা চোখে হাসল।

কিছু বলল না অনীশ। সিগারেট টানল খানিকক্ষণ। অতসী যেভাবে তখন মাথা নীচু করে চলে এসেছিল, একটু অস্বস্তি বোধ করেছে অনীশ। হয়তো তার ওপর ক্ষুব্ধই হয়েছিল। এখন আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। দুজনের মাঝখানে যেন একটা বাধা ছিল। আজ অনীশ জোর করেই বাধাটা সরিয়ে দিয়েছে। অতসীর মধ্যে যেন এই মুহূর্তে উচ্ছলতা আরো বেড়ে গেছে। কোন রকম সংকোচ ছিল না। অনীশও মুগ্ধ চোখে ওর এই রূপান্তর দেখল। সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে বলল, 'গানটান কি আর মনে আছে!'

'ওসব শুনছি না।' অতসী বড় বড় চোখ করে কি ইশারা করল।

মানু ততক্ষণে উঠে এসেছে। অতসী ওকে টানতে টানতে বলল, 'ওখানটায় গিয়ে চলো বসি।'

অতসী আর মানু গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে, পাশে অনীশ। চোখ বুজে কি ভাবল যেন। একটু পরে গাইল। 'কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে—, নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে, তোমার অভিসারে যাব অগম-পারে, চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে, পরানে বাজে বাঁশী, নয়নে বহে ধারা—দুখের মাধুরীতে করিল দিশাহারা।'

অনীশ শেষ না হতেই থামিয়ে দিয়েছে, আফসোসের গলায় বলল, 'আর মনে পড়ছে না।' তখনো গুনগুন করে মনে করার চেষ্টা করছে সে।

অতসী হাঁটুর ওপর থুতনী রেখে মাটির ওপর আনমনে কি একটা আঁকছিল। চোখ তুলে তাকিয়ে রইল একটুক্ষণ। পরে গাঢ় কণ্ঠে বলল, 'এখন বুঝলাম এত বিনয় কেন! এই গলা নিয়েও গান ছেড়ে দিলেন!'

'কই আর লেগে থাকতে পারলাম।' অনীশ হাসল ম্লানভাবে।

সুরেশবাবু উঠে এলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'কি হে, এরকম গলা নিয়েও কিনা চুপ করে ছিলে এদ্দিন।'

ধীরে ধীরে শান্ত চুপচাপ হয়ে আসছে জায়গাটা। অন্ধকার চুপি চুপি এগিয়ে এলো। যে ছেলেটি এতক্ষণ গাইছিল, এখন চুপ করে গেল।

"ঠাণ্ডার মধ্যে বসে আর লাভ কি।" অনীশ সকলের মুখের ওপর দিয়েই একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনল।

সুরেশবাবু বসতে বসতে বললেন, "আরেকটা হোক ভাই।"

"পুরোটা না গাইতে পারলে আমারও খারাপ লাগে।" অনীশ কি মনে করে মাটি থেকে একটা ইঁটের টুকরো তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল। এই অক্ষমতার জন্যে নিজের ওপরই রাগ হলো।

"এতো নিজেদের মধ্যে, যা মনে আছে তাই হোক।"

অনীশ গলা ছেড়ে গাইতে শুরু করল। 'নীর ভরনে ক্যায়সে জাঁও সখিরি ম্যায়। ডগর চলত মোসে করত রার।' সুরের জাল বুনে দিল যেন। সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে সেই সুর। গলার কাজও সূক্ষ্ম। অনীশও অনেকদিন পর যেন আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে সুরের জগতে। গভীর আবেগ বোধ করছিল সে। কথা এবং সুরের মধ্যে যেন অশ্রুত এক বেদনা গলে গলে পড়ছিল। ভগবান যেন জগতে তাকে এই ঐশ্বর্য দিয়েই পাঠিয়েছিলেন, অনীশ পারে নি সেই সম্পদ কাজে লাগাতে। সবাই কেমন মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনছিল। গান শেষ না করেই কান্নায় ভেঙে পড়ার মতন করে অনীশ বলল "ভুলে গেছি।'

সুরেশবাবু জড়িয়ে ধরেছেন অনীশকে, বললেন, "সাবাস।" একটু পরে আবার বললেন, "এমন করেও নিজের সর্বনাশ কেউ করে!"

অনীশ কিছু বলল না। চুপচাপ বসে থাকল। অনেকক্ষণ পরে অতসীর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, "এই জীবনটা যে অনেকদিন আগেই আমার শেষ হয়ে গেছে।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অনীশ।

অতসীর চোখ দুটো ছলছল করছে। যে জীবন অনীশের হাতছাড়া হয়ে গেছে, মনে হলে শুধু বুকটা হু হু করে ওঠে, কষ্টই বাড়ে; সে যেন এতোর পরে, আজ তাই শুনতে চেয়েছে। দেখে তো কখনো বোঝা যায় নি, এমন একটা ব্যথা সব সময় বয়ে বেড়াচ্ছে অনীশদা। অতসীর কষ্ট হচ্ছিল। আরো কিছু সময় নীরবে বসে থাকল ওরা। হিমে মাটি ভিজে উঠেছে।

সুরেশবাবু বললেন, "এখানে ঠাণ্ডা খেয়ে আর কি হবে, চলো আশ্রমে যাই, হাত মুখ ধুয়ে ওগুলো খেয়ে নেই গিয়ে।"

"চলুন।" অনীশ উঠে পড়ল। ওরাও উঠেছে।

"এই অন্ধকারে যাওয়া যাবে না। জোছনা ফুটলেই আমাদের যেতে হবে।" অনীশ স্বাভাবিক গলায় বলল। কি ভেবে হাসতে হাসতে সিগারেট বের করল সে, একটা সুরেশবাবুর দিকেও এগিয়ে দেয়।

ধোঁয়া ছেড়ে অনীশ অতসীকে এক পলক দেখল, বলল, 'এবার তোমরা টাঙায় যেও।"

"না, আমি হেঁটে যাবো।" অতসীও হেসে ফেলেছে ওর চোখে চোখে চেয়ে।

'আমিও।' মানু অতসীকে সমর্থন করার গলায় বলল।

"হাঁটতে পারলে তো ভালই।"

ওরা আশ্রমে এলো। আরো অনেকের ভিড় এখানে, সামনে একটা মন্দির। কলতলায় এসে হাত মুখ ধুয়ে নিল সবাই। তারপর একটা শতরঞ্চি বিছিয়ে গোল হয়ে বসল। মানু আর অতসীই খাবার ভাগ করছে। কালীমিত্তিরের দোকানের প্যাঁড়া আর ল্যাংচাও ছিল। সাধুরাও ওদের সঙ্গে এসে বসেছে।

ওদের খাওয়া শেষ হলো অনেক সময়। গোছগাছ করে রাখল সব। একটু পরে চাঁদ উঠল। খাঁখাঁ মাঠ বন সেই জোছনায় ভেসে গেল।

সুরেশবাবু বললেন, "এবার যাওয়া যাক।"

অনীশ অতসীর মুখের দিকে চেয়ে বলল, "মন্দিরে যাবে না?"

"হুঁ।" ঘাড় হেলিয়ে হাসল সে, পরে মানুকে টানতে টানতে বলল, "এসো।"

"কোথায়?"

"এসোই না।" হঠাৎ যেন কি মনে পড়ে গেল অতসীর, মানুর হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল, "একটু দাঁড়াও, আসছি।" অতসী এগিয়ে এলো। অনীশের সামনে এসে অসংকোচেই গলায় বলল, "কটা পয়সা দিন তো, লাগবে।"

শৈলশিখরে বালাজি মন্দির

অঞ্জলি সেনগুপ্ত

দক্ষিণে বালাজী বা ভেঙ্কটেশ্বর নামটি দেশীয়দের কাছে একটি অতি মধুর অতি আকর্ষণীয় নাম। এ নামের আকর্ষণে দূর দূর দেশ থেকে হাজার হাজার যাত্রী আকৃষ্ট হয়ে আসেন এখানে। ই জাগ্রত দেবতা এই বালাজী—আমরা বলি বিষ্ণু বা নারায়ণ। এই দেবতার এঁরা সোনাদানা টাকাপয়সা অম্লান- দান করে যান ক্ষমতানুসারে। এমনকি র প্রধান ভূষণ যে তার মাথার কেশরাশি, এঁরা অক্লেশে দান করে যান এই দেবতার । তারপর শ্রীপুরুষনির্বিশেষে মুণ্ডিত মস্তককে ফিরে যান ঘরে। বাস্তবিক, এক তাজ্জব ব্যাপার।

মাদ্রাজ থেকে নব্বুই মাইল দূরে অন্ধ্র- দেশের অন্তর্গত একটি ছোট্ট শহর—এই তিরুপতি। সেখানে প্রায় তিন হাজার ফুট একটি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত তিরু- মালাই শহরে এই বালাজীর মন্দির। পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে র রাস্তা একেবারে ওপরে। সেখানে ই ভূখণ্ডে রয়েছে ধর্মশালা, হোটেল, সংলগ্ন বাজার ইত্যাদি। বৃহত্তম মাদ্রাজ অন্ধ্রপ্রদেশ ভিন্ন হয়ে যাবার পর তিরুপতিতে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল দির উন্নতি হয়েছে। দেবতার নামে ম ভেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।

পাহাড়ের নীচ থেকে ওপরে সারাদিনই চলাচল করে। সময় লাগে প্রায় এক । তীর্থযাত্রীরা হেঁটেও ওপরে ওঠেন। ম রয়েছে পায়েচলা পথ ও সিঁড়ি। দুপাশে রয়েছে নিওন আলোর সারি। পতি শহরেও নিওন আলোর ঝলমল রাতের বেলায়। সেজন্য রাত্রিবেলা ওপরে বেশী ভাল লাগে। বাস ঝড়ের বেগে ম চলে। শহরের আলোর মালা কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে যেন লুকোচুরি ড খেলতে পিছু হটতে থাকে।

দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় তিরু অর্থে , আর মালাই অর্থে পাহাড়। এখানে দের আর এক নাম তিরুমল স্বামী। ণে যে চন্দ্রগিরি পাহাড়ের উল্লেখ আছে, নাকি সেই পাহাড়। মেরুপর্বতের অংশ এই চন্দ্রগিরি। সর্পরাজ ণ ও বায়ুর সঙ্গে ঘোর যুদ্ধের ফলে পর্বত থেকে নাকি একটি পাথরের া ভেঙে পৃথিবীতে পড়ে যায়। সেটির ই সৃষ্টি এই বিরাট মন্দির। সাতটি আছে এই পাহাড়ের। এই সাতটি অংশ করে নারায়ণের মন্দির। প্রবাদ : এই ট অংশ হল সর্পরাজের সাতটি ফণা। ওপরে বিষ্ণু এসে আসন গ্রহণ করেছেন। পতি শহর থেকে রাত্রির অন্ধকারে মালাই শহরের আঁকাবাঁকা আলোগুলো দেখলে অনেকটা তাই মনে হয়। মনে হয় একটা সাপ যেন এঁকেবেঁকে উঠে গিয়েছে। সাপের পুরো অংশটা নয়, মাথা থেকে শরীরের অর্ধেক অংশ রয়েছে। বাকি অংশে তৈরী হয়েছে আরেকটি শহর বা তীর্থস্থান। তার নাম অহোবিল্লা। সেখানে নরসিংহের মন্দির। লেজের শেষ অংশে যে মন্দির, তার নাম শ্রীশৈল।

তিরুপতি ও তিরুমালাই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পহ্লবরাজারা, চোল বংশের রাজাদের ও মাদুরার পান্ড্যরাজাদের ধন- সম্পত্তি নাকি নারায়ণের নামেই উৎসর্গ করা ছিল। এ মন্দিরে প্রথম পুজো অর্চনাদি করেন বিজয়নগরের রাজা।

তিরুমল স্বামীর দর্শন দিনে তিনবার করে হয়। শুক্রবারই কেবল দুপুরে দর্শন- লাভ হয়ে থাকে। কারণ আগের দিন নারায়ণকে পুষ্পসম্ভারে সাজান হয়, আর পরদিন দুপুরে তা দেখানো হয় সবাইকে। এই দর্শনের নাম ফুলাঙ্গি দর্শন। ভোরের দর্শনের নাম বিশ্বরূপ দর্শন। এ সব দর্শনের জন্যই টিকিট কেটে লাইনে দাঁড়াতে হয়। টিকিট ছাড়া দর্শনের নাম ধর্মদর্শন, তা নাটমন্দির থেকে দেখতে হয়। উৎসবের সময় ছাড়া আসল মন্দিরে টিকিট ছাড়া ঢোকাই যায় না। এখানে বিশেষ উৎসব যে সেপ্টেম্বর মাসে, তার নাম নবরাত্রির উৎসব। আমাদের দুর্গাপুজোর নবমী দিন থেকেই শুরু এই উৎসবের। সৌভাগ্যক্রমে আমরা এই উৎসবের শেষদিন গিয়েছিলাম এই মন্দিরে। গিয়ে শুনলাম, স্বনামধন্যা গায়িকা শ্রীমতী লতা মঙ্গেশকর মাত্র কয়েকদিন আগে এই উৎসবে এসে যোগদান করেন এবং সঙ্গীত পরিবেশন করে সবাইকে মুগ্ধ করে যান। এই সময়ে এখানে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা হাজার থেকে লক্ষে গিয়ে পৌঁছায়। যাত্রীদের সারবন্দীভাবে বসে দর্শনের জন্য অপেক্ষা করে থাকবারও একটি বিরাট এলাকা রয়েছে। সেখানে চারটে মোটা তার দিয়ে ঘেরা বিরাট ছাউনিতে প্রায় চার হাজার প্রতীক্ষমান যাত্রী বসে। আরও প্রায় পাঁচশত যাত্রী দাঁড়িয়ে, মোটা তারের জাল দিয়ে ঘেরান পথে সারি দিয়ে। এই লাইন জলস্রোতের মত সারা মন্দিরের পথ ঘুরে ভেতরে গিয়ে দর্শন করছেন নারায়ণকে। তারপর অন্যপথে বেরিয়ে আসছেন। এ সময়ে কোন দর্শনী লাগে না এই লাইনে। সারারাত সারাদিন ধরে চলেছে এই জনস্রোত। মন্দিরের দরজা তখন আর বন্ধ হয় না। এই উৎসব প্রায় পনেরোদিন চলে। আমরা ভোর পাঁচটায় গিয়ে লাইন দিয়ে বসলাম, আর বেলা প্রায় দুটোর সময় নারায়ণ দর্শন করে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলাম। ওখানেই প্রাতরাশের মত মাদ্রাজী খাবার বিক্রীর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বাঙালীদের রসনায় তা রোচা খুবই কষ্টকর। প্রায় উপবাসে সেই সারাদিনের বসে থাকায় ক্লান্তি—সে আর জীবনে ভোলবার নয়—সে আমাদের এক আনন্দ মেলানো ক্লান্তি। একে এক নিদারুণ ধৈর্যের পরীক্ষা বললেও অত্যুক্তি হয় না। ক্লেশ না করলে ক্লেশমোচনের স্পর্শ তো পাওয়া যায় না। নারায়ণকে দর্শন করে যেন সমস্ত ক্লেশ দূর হয়ে গেল। যদিও তাঁর স্পর্শ লাভ হয় নি, কিন্তু মন যেন অনির্বচনীয় আনন্দ ও পবিত্রতায় ভরে গেল।

এই উৎসব চলাকালে দুটি বিশেষ টিকিট বিক্রী হয়। একটি চার টাকার টিকিট। সে লাইনে দাঁড়ালে প্রতীক্ষার সময় আরও সংক্ষিপ্ত হোত। সে লাইনে প্রায় দেড় ঘন্টা দাঁড়াবার পর ঘোষণা শুনলাম, টিকিট আর দেওয়া হবে না। চার টাকার টিকিট বন্ধ হয়ে গেল। আরও একটা বিশেষ টিকিট ছিল যার নগদ মূল্য একশত টাকা। কিন্তু সেটা আমাদের সাধ্যাতীত। কাজেই এই লাইন ছাড়া আমাদের আর উপায় ছিল না। মন্দিরে পুরোহিত নারায়ণের পায়ের কাছে রাখা ছোট্ট একটি মুকুট আমাদের মাথায় স্পর্শ করিয়ে দিলেন। পুজো দেবার ব্যবস্থা ছিল আরেকটি জায়গায়, সেখানে বিরাট হোমকুণ্ড জ্বলছে। পুজোর উপকরণ হল একটি আস্ত নারকেল, মিছরি, ধূপ, কর্পূর আর ফুল। পুরোহিত ধূপ কর্পূর সমস্তই হোমকুণ্ডে ঢেলে দিলেন, আর নারকেলটা ভেঙে আধখানা রেখে বাকী আধখানা প্রসাদ দিলেন।

মন্দিরের বাইরে থেকে প্রথমেই চোখে পড়বে মন্দিরের গোপুরম বা সিংহদ্বার। নহবতখানার মত দুইদিকে দুই প্রকোষ্ঠ, তার দরজার মাথা থেকে সুক্ষ্মশীর্ষ পাঁচতলা ছাত। কিছুদূর উঠবার পর তা শেষ হয়ে গিয়ে পাশাপাশি থাকে আছে সাতটা সোনার কলস, আর এর চারদিকে ঘিরে উৎকীর্ণ করা আছে পুরাণ, রামায়ণ মহা- ভারতের কাহিনী। দেখে মনে হয় রামায়ণ মহাভারতের প্রকৃত রূপই যেন দেখছি। গোপুরম দিয়ে ঢুকলেই মন্দিরপ্রাঙ্গণে দেখা যাবে সোনার তৈরী ধ্বজস্তম্ভ। আর ধ্বজস্তম্ভের পাশেই একটা উঁচু বেদী। এই জায়গাটা মন্দিরের প্রথম উঠান। তারপর নাটমন্দির। নাটমন্দির পেরিয়ে প্রধান মন্দিরে প্রবেশ করবার দরজা। এখানকার দরজার পাল্লা দুটি সোনার। ভেতরে কালো পাথরের তৈরী নারায়ণের বিরাট মূর্তি। সর্বাঙ্গে এত সোনা হীরা মণিমুক্তা বসান যে পাথর প্রায় দেখাই যায় না। মাথার ওপর

মূর্তি অনুযায়ী বহু মূল্যের অনুষ্ঠ, সেও মূল্যবান পাথরে তৈরী। মন্দিরগহ্বরে স্নিগ্ধ দীপালোকে বালাজীর মূর্তি ঝক্‌ঝক্ করছে। কিন্তু একটা বড় অদ্ভুত ব্যাপার যে মূর্তির চোখ দুটি একেবারে মুখ পর্যন্ত ঢাকা। যেন একটা প্রলেপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেন কপালে তিলক কাটতে কাটতে কালক্রমে এরকম হয়ে গিয়েছে। আবার কেউ বলেন মূর্তির চোখের দৃষ্টি এত তীব্র যে, সাধারণ মানুষ তা সহ্য করতে পারবে না বলেই এই ব্যবস্থা। এই গর্ভগৃহটির নাম 'আনন্দনিলয়ম'। বালাজীকে পাঁচটি রূপে পূজা করা হয় এখানে। প্রথমে বেঙ্কটেশ্বর, দ্বিতীয় ভোগশ্রীনিবাস মূর্তিতে, তৃতীয় শ্রীনিবাস মূর্তিতে, চতুর্থ কলুভু শ্রীনিবাস মূর্তিতে ও পঞ্চম উগ্র শ্রীনিবাসমূর্তিতে। এখানে এসে তীর্থযাত্রীরা মানত করে কেশচ্ছেদন করেন।

এ মন্দিরে বাঁদরের উপদ্রব বড় বেশি। যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায় এরা। নজর থাকে যাত্রীদের হাতের ব্যাগ বা থলির দিকে। খাবারের জিনিষ দেখলে পেছন থেকে টুপ করে তুলে নিয়ে পালাবে।

বালাজী মন্দিরের মাইল সাড়েক দূরে দুটি পুণ্য প্রস্রবণ—একটির নাম আকাশ-গঙ্গা, অপরটি পাতাল-গঙ্গা। পাহাড়ের কোন এক অজানা পথ থেকে নেমে এসেছে এই আকাশগঙ্গা। তারপর একটি প্রস্রবণের সৃষ্টি করেছে। এর আর এক নাম পাপনাশম্। এখানে স্নান করলে সমস্ত পাপ নিমেষেই ধুয়ে মুছে যায়। এমনি বিশ্বাস তীর্থযাত্রীদের। পাতাল গঙ্গাও এই রকম আর একটি প্রস্রবণ। বালাজী মন্দিরের মাইল দেড়েক দূরে 'গোগর্ভ' নামে আরেকটি ছোট্ট ডোবার মত আছে। শোনা যায় সেখানে চতুর্দশ ভাবলি তপস্যা করেছিলেন। এর আর এক নাম পোকালি তীর্থ।

তিরুপতি থেকে মাইল তিনেক দূরে দেবী পদ্মাবতীর একটি মন্দির আছে। ইনি নাকি বালাজীরূপী নারায়ণের স্ত্রী। মন্দিরের পাশেই একটি সরোবর। সেখানে পদ্মের ওপর অধিষ্ঠিতা দেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। বালাজীকে দর্শন করার পর দেবী পদ্মাবতীকে দর্শন করার নিয়ম।

তিরুপতিতে যাত্রীদের থাকবার সুব্যবস্থা রয়েছে। পাহাড়ের ওপরেও রয়েছে বিরাট বিরাট ধর্মশালা ও হোটেল। হোটেলগুলি সমস্তই ঐ দেশীয় লোকের খাবারের যোগান দেয়। সেজন্য বাঙালীরা এখানে একটু অসুবিধায় পড়েন। কিন্তু নারায়ণ দর্শনের কামনার কাছে তাদের সে অসুবিধাটুকু অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়।

বৃদ্ধাঙ্গনা

এষা ভট্টাচার্য

ও'দের দেখতে পাবেন নানা জায়গায়। কলকাতায় গঙ্গার ধারে বসে ভাগবত পাঠ শুনছেন, পার্কে নাতনির হাত ধরে পড়শী বৌ-ঝিয়েদের সঙ্গে গল্প জুড়ে বসে গেছেন; বাঁকুড়ার সদর শহরের বাড়ীর ন্যাড়া ছাদে বসে আমসত্ত্ব শুকোচ্ছেন কেউ কেউ উবু হয়ে বসে; কেউ বা পশ্চিমগামী ট্রেনে বেরিয়ে পড়েছেন অমরনাথের উদ্দেশে। গাঁয়ে গাঁয়ে ও'রা গ্রীষ্মের বিকেলে পুকুরপাড়ে পা-ধুতে বাসন মাজতে আসেন—এবাড়ি ওবাড়ির খবর নেন—এপাড়া ওপাড়ার খবর দেন পরস্পরকে; শহরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে ও'রা মাঝে মাঝে সিনেমায় যান, ঘুরে বেড়ান পোষা কুকুর নিয়ে, পুত্র-কন্যার কিছু কিছু উপকারে লাগার চেষ্টা করেন এ বয়সেও—এমন কি এ বয়সেও ও'দের কেউ কেউ এমন দোর্দণ্ডপ্রতাপ যে সংসারের হাল নিজের হাতেই ধরে রাখেন—ছেলে বা ছেলে-বৌ ও'দের ছায়ায় গৌণ হয়ে থাকেন।

বুঝতেই পারছেন, বৃদ্ধাদের কথা বলছি। দীর্ঘজীবন পথ এ'রা পেরিয়ে এসেছেন—সুখে, দুঃখে, সার্থকতা-হতাশায় ভরা কৈশোর-যৌবন-প্রৌঢ়কাল। এবার সূর্য স্পষ্টতঃই দিগন্তে চলেছে, মুখের বলি-রেখা, নিবন্ত চোখের মণি, বক্ষের বিধ্বস্ত কুঞ্চ ও বঙ্কিম শিরদাঁড়া বলে দিচ্ছে, দিন সারা হল।

মেয়েরা সাহিত্যের এক প্রধান কেন্দ্র-বিন্দু। গল্পে, উপন্যাসে, রসরচনায় এবং অবশ্যই বিশেষ করে কবিতায় রাজ্য জুড়ে বিরাজ করেন পূর্ণযৌবনা মোহিনীরা, চপলা কিশোরীরা, এমনকি বালিকারা পর্যন্ত—বৃদ্ধারা কাব্যে উপেক্ষিতা। মধ্য-বয়সের প্রেম বর্ণনা করতে গিয়ে নায়ক নিজেকে প্রৌঢ় ঘোষণা করেও নায়িকাকে বড় জোর প্রৌঢ়-যৌবনা করে রাখতে সাহস করেন।

মানতেই হয় জীবনে বুড়িদের নিজস্ব ভূমিকা থাকলেও কবিতা থেকে তাঁরা সভয়ে নির্বাসিতা। এমন যে অতিপ্রাজ্ঞ কবি রবীন্দ্রনাথ, যাঁর বিষয়ে এই কথাটাই বলা হয়ে থাকে যে, মানব-জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা তাঁর কাব্যের পরিধির মধ্যে বৃত্ত নয়, তিনিও বৃদ্ধাঙ্গনাকে আড়াল করে রেখেছেন। বুড়িরা তাঁর ছোটদের কবিতায় দেখা দেয় শুধু চরকা-কাটা বুড়ি হয়ে, মাঝে মাঝে হিং টিং ছট জাতীয় কৌতুকের ক্ষেত্রে। মানতেই হয়, একমাত্র লোকগাথা ও রূপকথা ছাড়া বুড়িদের দেখা মেলা ভার—এবং যে-যুগে ঠাকুমা-দিদিমার ঝুলি থেকে নাতি-নাতনি সাজানো বুড়ি বুড়ি মজাদার গল্প বেরিয়ে আসতো, তাও বিগত। যৌবনের জয়গান গাইতেই ব্যস্ত দুনিয়ার তাবৎ কবিকুল, 'মেঘবরণ কেশ', 'পীনোন্নত পয়োধর', 'নিটোল কপোল' এর প্রশস্তি তাঁদের কবিতায় ছত্রে ছত্রে; পাকা চুল, শুষ্ক বুক, বলিঅঙ্কিত গালের কথা কে লিখতে যাবে?

ফরাসী কবি বোদলেয়ার অবশ্য একটি কবিতায় সরাসরি বুড়িদের নিয়ে এসে-ছিলেন। স্থিরচিত্রের মতো তাঁদের ঝুঁকে পড়া মাথা, বিভ্রান্ত দেহভঙ্গীর আবেদনটিকে তিনি ধরেছিলেন সনেটে, ভাবতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের অতীত যৌবনমহিমার সঙ্গে আজকের এই জরা-মির্জিত দেহের ব্যবধান। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেখানেও জরাকে উপলক্ষ্য করে যৌবনেরই জয়বার্তা বিঘোষিত; জরার জন্য সহানুভূতির আর এক নামই তো লুপ্ত যৌবনের জন্য হাহাকার।

সাহিত্যে যে এমন সার্বজনীনভাবে, অবিসম্বাদিতভাবে জরা অবহেলিত হতে পারলো, তার একটা বড়ো কারণ অবশ্যই এই যে, জীবনেও জরার স্থান 'হারের দলে।' যৌবনের অর্থ যদি হয় দিগ্বিজয়, মনোহরণ, বার্ধক্যকে বলা যায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে প্রত্যাহরণ। বৃদ্ধাকে সবকিছুই ছেড়ে যায় একে একে,—রূপলাবণ্যময় জগৎ 'যেহেতু ইন্দ্রিয়ের ক্ষীণতায়), অতীতের উত্তাপ (যেহেতু স্মৃতিও নিভু নিভু), ঘটনা-ধারার উপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা (যেহেতু বুদ্ধি-বৃত্তি ক্ষীণ)। ছেলেরা বিবাহিত সকলে, তার মানে অন্য এক রমণীর বৃত্তে নিবদ্ধিত—কেউ বা দূর দেশে চাকুরি করে, কেউ বা পেতেছে আলাদা সংসার। কন্যারা যে যার স্বামীর ঘর করছে দূরে অদূরে। আর ও'র নিজের স্বামী? তিনিও হয় অথর্ব নয় মৃত। বৃদ্ধার মতো নিঃসঙ্গ আর কে আছে?

পুরুষমানুষ যখন বুড়ো হন, তখনও তাঁর পুরুষকার জগৎ একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় না। তিনি পুরুষ বলেই অনেকগুলো ক্ষেত্রে তখনও ক্ষমতার অধিকারী থাকেন, সংসারের অনেক দায়িত্বের মধ্যে তখনও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকেন। তিনি যদি মননশীল ব্যক্তি হন, বার্ধক্যেও তাঁর সৃষ্টি-শীলতা ও বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণগ্রাস ঘটে না—বই পড়েন তিনি, ম্যাগাজিনের পাতা উল্টোন, লেখালেখিও করেন কিছু কিছু। ফিলোসফার্স জীবনের সমস্যাদি নিয়ে বিশেষ-পত্রেরও মগ্ন থাকেন।

আমাদের পুরুতান্ত্রিক সমাজে বয়োবৃদ্ধ পুরুষের বার্ধক্যজনিত নিঃসঙ্গতার ক্ষতিপূরণস্বরূপ অনেককিছু আছে—সারাজীবন ধরে অর্জিত সাফল্যবোধ ও সঞ্চিত অর্থের নিরাপত্তা, অপসারিত আপন সম্পূর্ণতার ও আত্মাভিমানের বর্ম। সংসার ছাড়াও পুরুষমানুষের একটা বহির্জীবন থাকে, যেহেতু কর্মসূত্রে এবং স্বভাবসূত্রে আবাল্য তিনি এক বৃহত্তর পরিমণ্ডলে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন সে পরিমণ্ডল যত ধোঁয়াটেই হোক, তার আবহের মধ্যে তাঁর মানসিক জীবনটা অন্তত আংশিকভাবে আশ্রয় পেয়ে থাকে। কিন্তু সংসারসর্বস্ব মেয়েদের আসন সংসারের মধ্যে যে মুহূর্তে টলে, অমনি সে একলা, অমনি সে আতঙ্কিত, অবলম্বনহীন। বড়ছেলে সেই বৌকে ঘরে এনে তুলল, স্বামী রিটায়ার করলেন, এবং আলমারির চাবিটা তাঁর পিঠের আঁচল ছেড়ে বৌমার রিং-এ স্থান নিলো, তখনই তাঁর জীবনের সম্পূর্ণতা চিড় খেলো, শিথিল হতে শুরু করলো বহুদিন ধরে গড়ে তোলা আঁটো বাঁধুনি।

বার্ধক্যের দোরগোড়ায় এই ক্ষণটিতে, মেয়েদের সামনে চারটি পথ খোলা থাকে... এক বৌ-এর পা মাড়িয়ে নিজেকে জাহির করা এবং সংসারের কর্তৃত্ব তখনও নিজের হাতে রেখে দেওয়া (যার ফল—দজ্জাল শাশুড়ি, পুত্রবধূর বিদ্রোহ, পুত্রের অসন্তোষ; অথবা পুত্র মাত্রাতিরিক্তভাবে ম্যা-ন্যাওটা হলে দাম্পত্য অশান্তি)। দুই: সন্তানতর বৌ-এর কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে তার মুখ-ঝামটা সহ্য করে অকৃতপক্ষে নিজ সংসারে 'ফালতু' হয়ে পড়া। এর চেয়ে করুণতর অবস্থা বৃদ্ধার পক্ষে আর কিছু নেই। তিন: পুত্র ও পুত্রবধূ বিবেচক ও সহানুভূতিসম্পন্ন হলে তাদের পরিবারেই অভিভাবকের ভূমিকায় সীমিত কিন্তু সুস্পষ্ট আসন গ্রহণ (দুঃখের বিষয়, এমন সুসমঞ্জস পরিবার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে দিন দিনই লোপ পাচ্ছে)। চার: পুত্রের পরিবার থেকে পৃথক হয়ে থাকা (বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ অথবা কাশীবাস)। একমাত্র তিন নম্বর সমাধানটি ছাড়া, অন্য তিনটি পথেই সূচীমুখ নিঃসঙ্গতার কাঁটা বেঁধে; এমন কি যিনি খাণ্ডারনি শাশুড়ী, তিনি কর্ত্রী থেকে যেতে পারলেও সুখী হতে পারেন না, বৌকে দাবাতে পারলেও নিজের নিঃসঙ্গতার বেদনাটিকে ডোবাতে পারেন না।

এই নিঃসঙ্গতাটুকু অবশ্য বুড়ো বয়সের স্বাভাবিক পাওনা। যৌবনের লক্ষদীপ জ্বালা উৎসব কখনও ম্লান হবে না—এটা আশা করা আর 'কখনও বুড়ো হবো না' পণ করে বসা একই কথা। যৌবনের কল্লোচ্ছ্বাসিত প্লাবনের পর প্রৌঢ়ত্বের শারদীয় স্নিগ্ধতার ঝাঁপি ক্ষণেকের জন্য উঁকি দিয়ে যাবার পরে জরা তার নিরাভরণ হেমন্তের কুয়াশাকে ছড়িয়ে দেবেই। আসল সমস্যা হলো সেই নিঃসঙ্গতাকে পূরণ করে তোলা, ফলপ্রসূ করে তোলা।

অতীত বাংলার সমাজে এই পূরণকারী ক্রিয়াকলাপের ঘাটতি ছিলো না কোনো। ক্রিয়া বিবাহ, পূজাপার্বণ, ব্রতপার্বণ—বৃদ্ধারাই ছিলেন এসবের পরিচালিকা উপদেষ্টা এবং প্রধানা কারিগরী। মায়ের জেঠিমার পিসীমার কি শাশুড়ীদের তত্ত্বাবধানেই মাঙ্গলিক কর্ম বা স্ত্রী-আচারাদি সুসম্পন্ন হতো। সামাজিক ঐতিহ্য তাঁদের প্রবীণত্বের সম্মান দিতো; এদিকে যে-সব বুড়ো হুঁকো হাতে চণ্ডীমণ্ডপের ভাঙা আড্ডায় ও চক্রান্তে, ঈর্ষায় ও […] অকর্মণ্য কালক্ষেপ করতেন, তাঁদেরই ঘরে বুড়িরা পার্বণ-উৎসবে পারিবারিক জীবনে একটি পরিপূর্ণ, […] স্নিগ্ধতার ধারা বজায় রাখবার চেষ্টা করে যেতেন। দল বেঁধে তীর্থস্নানে যেতেন তাঁরা, পুজো দিতে যেতেন মন্দিরে, […] তীরে বা পুকুরপাড়ে পেতেন সমবয়সীর সঙ্গ ও সখ্য।

আর ছিলো তাঁদের পৌত্র-পৌত্রী[রা]। বাবা নয় মা নয়, তাঁরাই ছিলেন সাঁতার[…] নাতি আর নাতনিদের কাছে—ছিলেন গল্পের আর আবদারের কল্পতরু, ভালো ভালো খাবারের শিল্পী, পিতার […] চক্ষুর আড়াল, মাতার প্রহারের বিরু[দ্ধে] আশ্রয়। বাংলাদেশের লোকগাথা, ব্রত-ক[থা], পাঁচালী গান ও ছেলে ভুলানো গা[ন] তাঁরাই তো আদি উৎস—ঠাকুমা-দিদি[মার] কোলে শুয়েই সেদিনকার শিশুরা […] কল্পনালোকে উড্ডীন হতো পক্ষীরাজে[র] পাখায়, পার হতো সাত সমুদ্র আর তে[র] নদী, ব্যাঙমা-ব্যাঙমীদের সঙ্গে পাতা[তো] বন্ধুতা। গ্রীষ্মের কাসুন্দি, আমসত্ত্ব, […] আচার, পৌষের ক্ষীরপুলি ছিলপিঠে পায়েস—কিম্বা সাড়ীতে চীন-পাতা […] সর তুলে বানানো ঘি—সবই তো তাঁদে[র] হাতের তৈরী। সেই সুখী, বহুমু[খী] প্রতিভাসম্পন্না, অক্লান্ত সেবিকা বৃদ্ধা[…] দের সঙ্গ শৈশবে পেয়ে ধন্য হয়েছেন এ[…] ব্যক্তিদের জেনারেশন হয়তো এখনও শে[ষ] হয়ে যায়নি।

কিন্তু প্রায়লুপ্ত হয়ে এসেছে বৃদ্ধা[দের] সেই সামাজিক ভূমিকা, যেহেতু সমাজ[…] রূপ পাল্টেছে, যেহেতু ধর্মকেন্দ্রিক ঐতি[হ্য]ধারা বিলোপের পথে এবং যেহেতু প[রি]বারও আণবিক ভগ্নাংশে পরিণত। আজ[কের] দিনের বৃদ্ধাদের অবলম্বনরূপে চাই নতুন প্রথা, নতুনতর অভ্যাস ও সংস্থান। অভ্যাস ও এই সংস্থান হবে ব্যক্তিগত—এ[…] বার্ধক্যের অনেক পূর্ব থেকেই এর […] চাই প্রস্তুতি ও অনুশীলন। সঙ্গহীনতা[র] অন্যতম মহৌষধ কোনো বিশেষ বি[ষয়ে] কৌতূহলী ঔৎসুক্য—হোক তা শিল্পক[লা], ধর্মকর্ম অথবা অন্যতর বহির্মুখী সামাজি[ক] ক্রিয়াকলাপ। তীর্থ পর্যটন ও [পৌত্র]পৌত্রীদের দিন যদি শেষ হয়ে গি[য়ে] থাকে, পাশ্চাত্য ধরণে বৃদ্ধাঙ্গনাদের […] নির্দিষ্ট সঙ্ঘ বা সমিতি-জাতীয় প্রতিষ্ঠা[ন] গড়ে উঠতে বাধাটা কোথায়? অনেক অ[…] ক্ষীয়মান সূক্ষ্মশিল্পকর্মের ধারা এখ[নো] বৃদ্ধাদের আয়ত্তে রয়েছে। কিছু শি[…] শিক্ষণকেন্দ্র খুলে বয়োকনিষ্ঠদের সেই […] চারু ও কারুকলায় শিক্ষিত করে তোলা[র] ভার তাঁরা কি নিতে পারেন না? তা[তে] ভবিষ্যদ্বংশীয়দের মধ্যে এক বহুমুখী সম্পন্ন উত্তরাধিকার চারিত হয়ে যাবে সুরক্ষিত হয়ে থাকবে।

দেবল দেববর্মা

[উপন্যাস]

(দুই)

আজ ভোরে বাড়িশুদ্ধ সকলে জেগে। চা-পর্ব শুরু হয়েছে। টেবিলের উপর ধূমায়িত পেয়ালা। মিলন আর কিরণ দুদিকে মুখোমুখি বসে। দু ভায়ের হাতেই খবরের কাগজ। ভাগাভাগি করে পড়ছে। খানিকটা দূরে মনোরমা রয়েছে। তারও হাতে চায়ের কাপ। ভীষণ চা-খোর মনোরমা। সারাদিনে যে ক' কাপ চা পেটে যায় তার ঠিক নেই। মেঝের উপর পা ছড়িয়ে মনোরমা বসেছে। এক পাশে চায়ের সরঞ্জাম। কেৎলী... ছাঁকনিতে চায়ের পাতা। দুটো ডিস... একটা কাপ। স্টোভটা এখনও জ্বলছে। তবে জোরে নয়। কল ঘুরিয়ে একদম কমিয়ে দিয়েছে। তাই সাপের জিভের মত লকলকে আগুনের শিখা অল্প-স্বল্প উঁকি দিচ্ছে।

তাকে দেখে বিন্তি সহর্ষে বলল,—'ওমা! বাবা এসে গেছে!' চাপের কাপটা নামিয়ে রেখে সে প্রায় নাচের ভঙ্গিমায় বাপের কাছে দৌড়ে এল। হাত থেকে সুটকেসটা নিয়ে শুধোল, — 'আর কিছু আনোনি বাবা?'

দেশ থেকে বাণীব্রত শুধু হাতে ফেরেন না। নিজের মালপত্র ছাড়াও আরো কিছু সঙ্গে থাকে। একটু ভালো ঘি, কিম্বা খানিকটা সরু চাল। নিদেনপক্ষে সামান্য তরকারিপত্র। সঙ্গে কিছু আনবেনই। একবার চন্দনপুর থেকে একটা বড় রুই মাছ সঙ্গে এনেছিলেন। সেকথা বাড়ির সকলেই জানে। অথচ এবার তার হাতে নিজের সুটকেসটি ছাড়া আর কিছু নেই। মনোরমাও তা লক্ষ্য করে অবাক হয়েছে। কিন্তু মুখে কিছু বলে নি। আর বিন্তি চুপ করে না থাকতে পেরে কথাটা বাবাকে শুধিয়েছে।

মেয়ের প্রশ্নটা বাণীব্রতর কানে অবশ্য ভালোই লাগল। দেশ থেকে বাবা কিছু আনল কিনা মেয়ে খোঁজ করেছে। পয়সা দিলে কলকাতায় সবই মেলে। তবু নিজের গ্রাম-ঘরের জিনিসের সঙ্গে স্মৃতির একটা অদৃশ্য সুতোর বন্ধন। তার স্বাদই আলাদা। সেবার চন্দনপুর থেকে একটা কুমড়ো এনেছিলেন বাণীব্রত। বেশী বড় নয়, মাঝারী আকার। তার উঠোনেই একটা গাছ হয়েছিল। পাঁচ-ছটা কুমড়ো ফলেছিল গাছে। সেই কুমড়োই একটা সঙ্গে করে এনেছিলেন। বাড়িতে সামান্য জিনিসটা নিয়ে কি হৈ-চৈ। হিরণ আর বিন্তি তখন অনেক ছোট। দুজনে কুমড়োটা নিয়ে প্রায় কাড়াকাড়ি শুরু করেছিল। শেষে মনোরমা ভাই-বোনকে ধমক দিয়ে, সেটা সরিয়ে রাখে।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে বাণীব্রত মুচকি হাসলেন। বললেন,—'এবারও একটা জিনিস এনেছি রে বিনু।'

—'কি জিনিস বাবা?' বিন্তি সাগ্রহে শুধোল।

বাণীব্রত লক্ষ্য করলেন, বড়-মেজ দুই ছেলেরই দৃষ্টি চঞ্চল। মনোরমাও উৎসুক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। দেশ থেকে কি এনেছেন, তা সকলেই জানতে চায়।

তবু রহস্য করে তিনি মেয়েকে শুধালেন,—'কি এনেছি তুই বল,—'

বাণীব্রতর সঙ্গে আর কিছু নেই। হাতও খালি। মেয়ে তাই শূন্য দৃষ্টিতে বাপের দিকে তাকিয়ে রইল।

মনোরমা আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, —'এ তো ভারী মজা! তুমি কি সঙ্গে করে এনেছ, ও কেমন করে বলবে?'

বড় ছেলে মিলনও মাকে সমর্থন করল। সে হেসে বলল,—'মা তো ঠিক কথাই বলেছে বাবা। চন্দনপুর থেকে তুমি কি এনেছ, বিন্তি কেমন করে বলবে?'

বাণীব্রত এবার আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বললেন, — 'বেশ, তাহলে বিনু নিচে জিনিসটা নিয়ে এস।'

—'কোথায় আছে বাবা?' বিন্তি সাগ্রহে জানতে চাইল।

—'সিঁড়ির মুখে নামিয়ে রেখে এসেছি। একটু ভারী বলে আর বয়ে আনতে পারলাম না।'

বিন্তি তক্ষুনি ছুটল। বাণীব্রত বড় ছেলের পাশে একটা চেয়ারের উপর পা এলিয়ে দিয়ে বসলেন। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন,—'ব্যাপার কি তোমাদের? এই কাকডাকা ভোরে চায়ের পাট চুকিয়ে দিচ্ছ।' মেজ ছেলেকে লক্ষ্য করে একটু পরিহাস করে শুধোলেন,—'কিরণ যে আজ সূর্যিঠাকুরকেও হারিয়ে দিলি।'

কথাটা মিথ্যে নয়। কিরণ ভীষণ লেট-রাইজার। অনেক রাত্তিরে ঘুমোয়। ওঠেও তেমনি দেরীতে। সূর্যোদয় দূরে থাকুক, সাড়ে সাতটার আগে তার ঘুমই ভাঙে না। আর ছুটি-ছাটার দিন হলে তো কথাই নেই। বেলা নটা অব্দি কিরণ বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকবে।

মনোরমা বলল,—'ও কি এখন উঠেছে? আমরা সবাই রাত্তির চারটে থেকে উঠে বসে আছি।'

—'রাত চারটে থেকে? কেন, হয়েছে কি?' বাণীব্রত অবাক হয়ে তাকালেন।

মুখের উপর থেকে কাগজটা সরিয়ে রেখে মিলন কথা কইল। ব্যাপারটা আমি খবরে কাগজে পড়লাম। তবে ঠিক-ঠিক কি হয়েছে তা অবশ্য আমরাও কেউ জানিনে। রাত চারটের সময় বিকট একটা বোমার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। কি প্রচণ্ড আওয়াজ। বাড়িটা যেন থর থর করে কেঁপে উঠল।

—'বলিস কি? এত জোর শব্দ!' বাণীব্রত ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন।

মনোরমা চোখ বড় বড় করে বলল,—শুধু কি তোর ঘুম ভেঙেছে মিনু? শব্দ শুনেই আমার বুকের ভিতরটা যেন ধড়ফড় করে উঠল। তাকিয়ে দেখি বিন্তি বিছানার উপর উঠে বসেছে। আর বোমা কি একটা ফাটল রে? পর পর কটা যে আওয়াজ হল কে জানে। পাঁচ-ছটা তো হবে। একটা

াধহয় আমাদের বাড়ির মধ্যেই কাটল, ই বা রে মিলু?'

স্বামীর দিকে তাকিয়ে মনোরমা ফের লল,—'কামে আমার তালা ধরে গেছে াপু।'

কিরণ মুখ না তুলেই মন্তব্য করল,— া খুব ভয় পেয়েছিল বাবা, বুঝলে?'

মনোরমা একটুও প্রতিবাদ করল না। বরং সে বলল,—'ভয় আবার পাই নি? যখন দুমদুমো ফাটছিল তখন আমি ইষ্টমন্ত্র প করছি। আর শুধু বোমা নাকি? কি হৈ-চৈ আর চিৎকার। যেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, লছে রাস্তায়। আমি ভয়ে কাঁটা। কিন্তু মিন্তুটার সাহস আছে গো। বলে—মা ছাদে ই চল। মারপিট গণ্ডগোল ভালো করে খতে পাব!'

—'তোমরা ছাদে গিয়েছিলে?'

—'পাগল হয়েছ নাকি? ছাদে যাই, রপর একটা বোমা এসে ঘাড়ের উপরে ড়ুক।'

মনোরমার কথা শুনে কিরণ হি-হি করে সল। বলল,—মায়ের কি ভয় জানো বা? ছাদে যাওয়া দূরে থাক, আমাদের ঘরের দরজা পর্যন্ত খুলতে দেয় নি।'

মিলন আবার খবরের কাগজের পাতায় াখ বুলোবে ভাবছিল। বাপের মুখের কে তাকিয়ে সে বলল, —'গণ্ডগোল শেষ্য বেশীক্ষণ ছিল না। আধ ঘন্টা পরেই ব থেমে-টেমে গেল। বোধহয় পুলিশের াড়ি-টাড়ি শেষকালে এসেছে।'

বাণীব্রতর কপালে ধনুকের মত বাঁকা ন্তার রেখা ফুটে উঠল। চিন্তিত মুখে ়নি বললেন,—'গলির মুখে একটা পুলিশের াড়ি দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। রাইফেল হাতে জন পুলিশও রয়েছে। একজন সার্জেন্ট ়া আমার ট্যাক্সিটা থামিয়ে উঁকি দিয়ে ক যেন দেখল।'

কিরণ ব্যঙ্গ করে শুধোল,—'শেষ র্যন্ত পুলিশ তোমার মালপত্র সার্চ করল না?'

—'না, মানে ঠিক সার্চ নয়। মালপত্র ছুঁয়ে দ্যাখে নি, এমনি উঁকি দিয়ে গাড়ির ভেতরটা একবার দেখে নিল।' একটু থেমে ণীব্রত ফের বললেন,—'কিন্তু আমাদের াড়ায় তো গণ্ডগোল আগে ছিল না মিনু।'

কিরণ হেসে বলল,—'আগে ছিল না াে কি হয়েছে? গণ্ডগোলটা যে আস্তে াস্তে ছড়িয়ে পড়ছে বাবা। আমাদের াড়াই বা বাদ থাকবে কেমন করে?'

—'তা বটে', বাণীব্রত ফের চিন্তা শুরু করলেন।

স্টোভটা কখন নিভে গেছে। মনোরমা লক্ষ্য করেনি। সেটা আবার জ্বালাতে হল। চায়ের কেৎলিতে জল গরম করতে দিল মনোরমা। বাণীব্রত এখুনি চা চাইবেন। মেজ ছেলে কিরণেরও চায়ের নেশা আছে। দিনে পাঁচ-সাত কাপ চা সে খায়। তাকেও এক কাপ দিতে হবে। মনোরমা কতদিন বলেছে,—'ঘন্টায় ঘন্টায় অত চা গিলিস কেন? এত চা খেলে খিদে নষ্ট হবে যে।' শুনে কিরণ মুচকি হাসে। বলে,—'তুমি নিজে খেলে দোষ হয় না মা? তোমার খিদে-তেষ্টা বলে বুঝি কিছু নেই?'

ছেলের সঙ্গে কথায় কে পারবে? ও তার কম্মো নয়। মনোরমা তাই চুপ করে যায়। চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলে,— 'তবে খেয়ে নে. ডাক্তারি পড়েছিস, শরীরের ভালো-মন্দ নিজেই ভালো বুঝবি।'

হাঁপাতে হাঁপাতে বিন্তি এসে পৌঁছল। পায়াটা বেশ ভারী। অনেক কসরৎ করে সে উপরে তুলে এনেছে। , কোনোমতে মেঝের উপর কলসীটা নামিয়ে রেখে সে চেঁচিয়ে উঠল.—'মা দেখে যাও। কত বড় গুড়ের পায়া।'

কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে মনোরমা তখুনি উঠে এল। একনজর তাকিয়ে বলল,—'ওমা! চন্দনপুর থেকে গুড় এনেছ বুঝি?' পরে কলসীটা সামান্য একটু তুলে সে ওজন বুঝতে চাইল। এক চিলতে হেসে বলল,—'তা তের-চোদ্দ সের খুব হবে, তাই না গো?'

বাণীব্রত মুখ তুলে বললেন—'পায়াটায় সাড়ে সতেরো সের গুড় আছে।'

—'তাই বলো বাবা।' বিন্তি ঘাড় দুলিয়ে কথা কইল, 'কি বিষম ভারী কলসীটা। তুলে আনতে আমার হাত দুটো একেবারে ছিঁড়ে গেছে।'

সংসারে প্রয়োজনীয় জিনিস পেলে গৃহিণী মাত্রেই খুশি। মনোরমার চোখে-মুখে সেই আহ্লাদের আলো। মেয়েকে লক্ষ্য করে সে বলল,—'তা বিন্তি আজ খুব জব্দ হয়েছিস, চন্দনপুর থেকে তোর বাবা কি নিয়ে এল কিছুতেই বলতে পারলি না।'

বিন্তি হাত ঘুরিয়ে, চোখ নাচিয়ে বলল,—'আহা! আমি একা বুঝি? তোমরাও তো সব চুপচাপ ছিলে। চন্দনপুর থেকে বাবা কি এনেছে, কেউ বলতে পারনি।'

বাণীব্রত বললেন,—'অমূল্য মোড়ল গুড়ের পায়াটা জোগাড় করে দিল। তার ভাগ্নে-জামাইয়ের ঘরে একটা মোটে পায়া ছিল। নইলে এখন কি গুড়ের সময়? আর কিছুদিন পরে খেজুর গুড় উঠবে। তারপর আখের গুড়। আমাদের বাঁকড়ো জেলায় চন্দনপুরের গুড় বিখ্যাত, খুব নাম-ডাক। এমন গুড় কলকাতায় কিনতে পাবিনে বিনু।'

গুড়ের কলসীটা তুলে নিয়ে মনোরমা ঘরের মধ্যে ঢুকল।

বিন্তি শুধোল,—'বাবা, তুমি মুখ-হাত ধোবে না? মা চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছে কিন্তু—'

বাণীব্রত বললেন,—'হাওড়া স্টেশনে নামার আগে গাড়িতেই মুখ-হাত ধুয়েছি। ওতেই চলবে। আগে এক কাপ চা খাই। তারপর বাথরুমে ঢুকব। একেবারে চান-টান সেরে বেরুবো ভাবছি।'

মিলন শুধোল,—'তোমার বাড়ি-ঘর সারানো হল বাবা?'

—'হ'ল একরকম করে। তোরা তো কেউ সঙ্গে গেলিনে। বুড়োমানুষ, —একা একা যতটুকু সম্ভব তাই হয়েছে।'

কিরণের কাগজ পড়া শেষ হয়েছিল। সে বলল,—'রিটায়ার করে তুমি কি চন্দন-পুরেই থাকবে বাবা?' ব্যাপারটা ভালো করে ভেবে দেখেছ?'

বাণীব্রত ছেলের হাত থেকে খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে বললেন,—'আর কি ভাববো বল? মাস তিন পরেই রিটায়ার করতে হবে। আট'শ টাকা মাইনে পাচ্ছি। অবসর নিলে একটি কানাকড়িও আসবে না। কলকাতায় থাকলে সংসার চালাব কেমন করে?'

মনোরমা গরম জলে চায়ের পাতা ভিজতে দিল। এদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, —'তোমার ওই এক বুলি। রিটায়ার করলে সংসার চালাবে কেমন করে? চন্দনপুরে গেলে বুঝি খরচপত্তর লাগবে না? সেখানেও জিনিসপত্র কিনেকেটে খেতে হবে। তাহলে মরতে পাড়াগাঁয়ে যাওয়া কেন?'

বাণীব্রত মৃদু হাসলেন, মনোরমার পাল্টা যুক্তি। চন্দনপুরে কি নিখরচায় থাকা যাবে? আর কী জায়গা,......যেন ধাপধাড়া গোবিন্দপুর। মাইল চার দূরে রেল-ইস্টিশন। দত্যি-দানোর মত বড় বড় গাছ। কাঁচা পথের দুপাশে খেজুর, কালকাসুন্দে আরো কত আগাছার বনঝোপ। রাত এক প্রহর না হতেই গ্রাম নিঝুম,......নিঃসাড়। অসুখ-বিসুখ করলে বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে। তাহলে চন্দনপুরে যাবার জন্যে এত মাথাব্যথা কিসের?—

—'খরচপত্র নিশ্চয় অনেক কম লাগবে।' বাণীব্রত স্ত্রীকে বোঝাতে চাইলেন। 'এই ধরো মাস গেলে দেড়'শ টাকা ভাড়া গুণছি। চন্দননপুরে গেলে বাড়িভাড়া লাগবে না, তারপর কলকাতা শহরে টাকার কি মূল্য? বানের জলের মত অর্থ ব্যয়। চন্দনপুরের সঙ্গে কি কোনো তুলনা হতে পারে?'

মিলন শুধোল,—'তুমি চন্দনপুরে গেলে বিন্তি আর হিরণের কি হবে বাবা? এরা কোথায় পড়বে?'

—'সে আমি ভেবে রেখেছি মিলু।' বাণীব্রত মেয়ের মুখের উপর সস্নেহ দৃষ্টি রাখলেন। বললেন,—'বিনুকে আমি চন্দন-পুরের ইস্কুলে ভর্তি করে দেব। অবশ্য বয়েজ স্কুল। কিন্তু মেয়েরাও পড়ে। হেড-মাস্টারের সঙ্গে কথা বলে এসেছি, ট্রান্স-ফার সার্টিফিকেট দেখালেই ভর্তি করে নেবে।'

- পতঙ্গ বাঁচে কেমন করে?
- ভিয়েতনামের জন্য রোগ আবিষ্কার
- মহাশূন্যে সোভিয়েত-মার্কিন জোট

পতঙ্গেরা কিভাবে নিজেদের বাঁচায়? সমস্ত দিক থেকে দুর্বল এই জীবগুলো, যারা তাদের চেয়ে অনেক বেশি পরাক্রান্ত জীব—পাখির খাদ্য, তারা যে বেঁচে থাকে সেটাই একটা আশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু কিভাবে?... বিষয়টি নিয়ে অক্সফোর্ডের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের একজন গবেষক কর্মী 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সংক্ষেপে তাঁর লেখাটি এখানে উপস্থিত করছি ছবি সহ।

প্রজাপতির কথা ধরা যাক। আফ্রিকায় এক ধরনের প্রজাপতি দেখতে পাওয়া যায় যাদের গায়ে কমলা আর কালো আর সাদা ছিটে, ঝকঝকে রঙ। সহজেই এদের ওপরে চোখ পড়ে কিন্তু নিজেদের আড়াল করবার কোনো চেষ্টাই এদের নেই, চলাফেরা বেশ নিশ্চিন্ত। কেন? এদের শরীরের টিস্যুতে এমন এক ধরনের বিষ আছে যা পেটে গেলে পাখিরা বমি করতে শুরু করে ও ভীষণ কষ্ট পায়। কাজেই পাখিরাই এদের এড়িয়ে চলে। তাই এই প্রজাপতির এমন নিশ্চিন্ত চলাফেরা।

এদের মধ্যেই পাওয়া যায় আরো এক ধরনের প্রজাপতি, বাইরে থেকে দেখতে যারা হুবহু এদেরই মতো। সিংহের চামড়া গায়ে দিলে শেয়ালকেও যেমন সিংহ মনে হতে পারে—তেমনি এই দ্বিতীয় দলের প্রজাপতিরা প্রথম দলের প্রজাপতি বলে চলে যায়। পাখিরাও এই ভুল করে এবং বিষাক্ত প্রজাপতি ভেবে খেতে আসে না। অর্থাৎ এই দ্বিতীয় দলের প্রজাপতিরা বাঁচছে নিতান্তই বাইরের চেহারার জোরে ভুল ধারণা সৃষ্টি করে বা ধোঁকা দিয়ে। এইভাবে চেহারা পাল্টে ধোঁকা দেওয়া বা ভাঁড়ানোর ব্যাপারটাকে ইংরেজিতে বলা হয় মিমিক্রি।

শুধু এই দলটিই নয়, আরো কয়েক ধরনের প্রজাপতি এদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে, চেহারার দিক থেকে যাদের মধ্যে পুরোপুরি না হলেও মোটামুটি মিল। অর্থাৎ সেই মিমিক্রি বা ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা। সফল হয়েও যায়।

এই মিমিক্রি বা ভাঁড়ানো বা ধোঁকা দেওয়া—ব্যাপারটা প্রথম লক্ষ করেন বিজ্ঞানী বেটস, ১৮৬২ সালে। তাঁরই নাম থেকে উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় দলের প্রজাপতিদের বলা হয় বেটসিয়ান। আর তৃতীয় দলের প্রজাপতিদের নাম অন্য আরেকজন বিজ্ঞানীর নাম থেকে—ম্যুলেরিয়ান।

মিমিক্রি সম্পর্কে গোড়ার দিকে বিজ্ঞানী-মহলে খুবই আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের সূত্রটি সকলেই জানেন। পরিবেশের সঙ্গে যেসব জীব নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে তারাই টিকে যায়, অর্থাৎ যোগ্যতমরা। আর এই যে একদল প্রজাপতি টিকে থাকবার জন্য ধোঁকা সৃষ্টি করছে—এটা তো তাহলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সূত্রেরই একটা জ্বলন্ত বাস্তব দৃষ্টান্ত। অবশ্য মিমিক্রিকে আদৌ স্বীকার করেন না এমন বিজ্ঞানীরও অভাব ছিল না। তাঁরা বললেন, অনুরূপ পরিবেশগত অবস্থায় অনুরূপ গায়ের রঙ তৈরি হয়েছে, এটাকে মিমিক্রি বলাটা কষ্ট-কল্পনা ছাড়া কিছু নয়।

কয়েক-শো বছর আগে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে প্রজাপতির শূক বিষাক্ত উদ্ভিদ খায় বলেই প্রজাপতিরা এমন অখাদ্য হয়ে ওঠে। আধুনিক বিজ্ঞানীদের গবেষণায় এই ধারণা অনেকখানি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। কয়েক জাতের প্রজাপতি মথ, গুবরে-পোকা, ফড়িং, মাছি ইত্যাদিরা বিষাক্ত উদ্ভিদ খেয়েই শরীরে বিষ জমায়। এদের গায়ের রঙ চোখে পড়ার মতো, যেন গায়ের রঙটাই একটা নিষেধ যা পতঙ্গভুকরা মান্য করে চলে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, শরীরে বিষ জমা করে রাখতে পারে যে-সব পতঙ্গ তাদের গায়ের রঙ হয়ে থাকে নিষেধসূচক।

বলা বাহুল্য কীটপতঙ্গের মধ্যে অনেকেরই গায়ের রঙ নিষেধসূচক নয়। তারা কী খেয়ে বেঁচে থাকে। সেই উদ্ভিদ, বিষাক্ত উদ্ভিদও বটে। তবে তাদের শরীরের মধ্যেই এমন একটা আয়োজন থাকে যে উদ্ভিদের বিষ তারা বর্জন করতে পারে। বহু প্রকারের মথ ফড়িং শুঁয়োপোকা ইত্যাদি এই দলে পড়ে। এই জীবগুলোর গায়ের রঙ চোখে না পড়ার মতো, আকার ও [illegible] ছাপ বহন করে। নিষেধসূচক গায়ের রঙ নিয়ে যারা নিজেদের জাহির করে বেড়ায়, তাদের চেয়ে অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে টিকে থাকার সম্ভাবনা এই জীবদেরই বেশি।

যে-সব পতঙ্গ শরীরে বিষ জমিয়ে রাখে তাদের রঙ হয়ে থাকে নিষেধসূচক (যা বড্ড বেশি চোখে পড়ে)। তার মানে কি? নিষেধসূচক রঙ বিশিষ্ট পতঙ্গরাই আত্মরক্ষার সংগ্রামে জয়ী, তারাই যোগ্যতম। কেন? পাখি বরং না খেয়ে মরবে তবুও এই পতঙ্গ খাবে না, খেলেই পাখির প্রাণান্তকর অবস্থা। পাখির চোখের দৃষ্টিতে কি এমন পরিবর্তন আসতে পারে

নিয়ে আসা হয়েছে আমেরিকায় (আগে ছিল ভিয়েতনামে) ও সীমান্ত এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়ানো হচ্ছে। খবরদারী যন্ত্রে ধরা পড়া খবরগুলো এই বিমান থেকে নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্রে পাঠানো হয়ে থাকে।

তবে এই খবরদারী যন্ত্র নিয়ে একটা অসুবিধে এই যে কে শত্রু কে মিত্র তার বাছবিচার এই যন্ত্রের দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়, যতোই তা ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার সর্বোত্তম উৎকর্ষের নিদর্শন হোক। ফলে একটা উড়ন্ত পাখিও বিপদসূচক সংকেতের কারণ হতে পারে।

এমনি নানা ধরনের খবরদারী যন্ত্র সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কি জেলখানা, কি বিশ্ববিদ্যালয়, কি কল-কারখানা, কি সরকারী দপ্তর—খবরদারী যন্ত্রের আওতা থেকে কেউ বাদ পড়েনি। ওয়াশিংটনের এক সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, আমেরিকার রাজধানীর এত বেশি সংখ্যক বাড়ি এইসব খবরদারী যন্ত্রের আওতায় পড়েছে যে অনেক সময় একটা কুকুর বা একটা খরগোশ চলে যাবার ফলেও বা এমন কি একটা গাছের ডাল পড়ার ফলেও নিকটবর্তী পুলিশ-স্টেশনে 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক পৌঁছে যায়। পুলিশ স্টেশনগুলোও অনেক সময়েই নির্বিকার থাকে, কেননা সময় নেই অবসর নেই, অনবরতই এই ডাক শোনা যাচ্ছে। প্রকৃতই সাপে বাঘ পড়েছে কিনা তা অন্তত এই যন্ত্রের বার্তা থেকে বোঝার উপায় নেই।

মার্কসের লণ্ডন জীবন

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

মধ্যযুগের অন্ত এবং বর্তমান যুগের বসন্ত পর্যন্ত প্যারিস যেমন ছিল শিল্প-[illegible] ও রাজনৈতিক বিপ্লবের ধাত্রী, লণ্ডন তেমনি ছিল বিপ্লবীদের আশ্রয়-[illegible]। কয়েকশ বছর ধরে দেশ-দেশান্তরের [illegible] বিপ্লবীরা স্বদেশের রাষ্ট্রীয় [illegible] থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে লণ্ডনে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে [illegible] প্রখ্যাতরা হচ্ছেন মার্কস-এঙ্গেলস, [illegible]জিনী, গ্যারিবল্ডি, লেনিন ও সান [illegible]য়াৎসেন। তাঁরা ছাড়াও কত যে অগণিত [illegible]প্লবীজীবনের কোন-না-কোন সময় এই [illegible]-বান্ধব, উদার-নিস্পৃহ, পূর্ণস্বাধীন, [illegible] নগরীতে কাটিয়ে গেছেন তার [illegible] নেই। কিন্তু তাঁদের কেউই কমিউ-[illegible]দের মন্ত্র-উদ্গাতা সাধক ঋষি কার্ল [illegible]সের মতো এই নগরীকেই জীবনের [illegible] সাধনার ক্ষেত্রে পরিণত করেন নি।

তখন ভিক্‌টোরীয়ান যুগের আদি [illegible]। আমাদের এই গ্রহের সর্বত্র বৃটেনের [illegible] ও প্রভাব অপ্রতিহত।। তার স্থল-ভাগের এক-তৃতীয়াংশ বৃটেনের সাম্রাজ্যভুক্ত। তার সপ্তসমুদ্রের ঢেউ বৃটিশ নৌবহর-শাসিত। অনস্তমিত-সূর্য সাম্রাজ্যের কোন দূর-দিগন্তেও করতালি প্রমাণ কালো মেঘের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। দেশের অভ্যন্তরে সবে ক্রীতদাস প্রথা বিলোপ করা হয়েছে। কারখানাগুলিতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের খাটানোর সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেশ তখনো শতাব্দীর অন্যতম প্রখ্যাত রাষ্ট্রনেতা ডিসরেলীর ভাষায় পুরোদস্তুর দুজাতিতে, অতি দারিদ্র্যে এবং অতি ধনী ও অবসরবহুল সম্পত্তি-সম্পন্ন মধ্যবিত্তে বিভক্ত। মেয়েদের তো দূরের কথা, পুরুষদের অধিকাংশেরও ভোটাধিকার নেই। কারণ ভোটাধিকার তখনো সম্পত্তির পরিমাণের ওপর নির্ভর-শীল। নির্বাচন কেন্দ্রগুলি দীর্ঘদিনের সংস্কারের অভাবে, শাসকশ্রেণীর স্বেচ্ছাকৃত অব্যবস্থায় নির্বাচন কারচুপির স্বর্গ। সাহিত্যে একদিকে ডিকেন্স অন্যদিকে স্কুনটিভিল্লীরা যথাক্রমে সমাজে বঞ্চিত, নীচের তলার মানুষদের জীবনের বিড়ম্বনা এবং ওপরতলার সুখ-ঐশ্বর্যের জমকালো মেছলকে বিধৃত করছেন। কাব্যের ক্ষেত্রে তখন প্রকৃতি প্রেমিক কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ সমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, দর্শনে ও ইতিহাসে জন স্টুয়ার্ট মিল ও টমাস কার্লাইল সর্বজনখ্যাত, মানবসেবার ক্ষেত্রে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল একটি পবিত্র নাম, মিসেস এ্যানী বাসেন্ট তাঁর দুঃসাহসী মতবাদে উদ্ভিন্ন খ্যাতি। এঁরা কেউ যে কখনো কার্লমার্কস নামে কোন ব্যক্তির লণ্ডনে উপস্থিতির কথা অবগত ছিলেন এমন প্রমাণ মেলে না। বরং মার্কসের আগে ও সমকালে রাজা রামমোহন রায় ও প্রিন্স দ্বারকানাথ টেগোর নামে দুই অনন্যসাধারণ ভারতীয় তদানীন্তন বৃটিশ সমাজের বিশিষ্টদের মধ্যে রীতিমত আলোড়ন জাগান। মার্কসের মত তাঁরা দুজনেই বৃটেনেই মারা যান এবং সমাধিস্থ হন (১৮৩৩ এবং ১৮৪৬ সালে)।

এই পরিবেশে ১৮৪৯ সালে কার্ল-মার্কস নামে একত্রিশ বছর বয়স্ক এক সবলদেহ প্রবল প্রাণ, বিপুল মেধা জার্মান বিপ্লবী কেন-যে ইংলিশ প্রণালী পার হয়ে লণ্ডনে এসে আশ্রয় নিলেন তার খবর তদানীন্তন বৃটিশ সমাজের উল্লেখ্য কেউই রাখেননি। অথচ সেই বিপ্লবীর জীবনের বাকি ৩৪ বছর প্রায় একটানা লণ্ডন প্রবাসের অচিন্তনীয় সাধনায় লব্ধ সিদ্ধান্তের মধ্যেই দুনিয়ার শোষিত মানুষ নবদিগন্তের সন্ধান পেল। মানুষের সমাজ, রাজনীতি, দর্শন বিজ্ঞান ও অর্থ-

নীতির নতুনভাবে যাচাই শুরু হলো। মানব ইতিহাসের কালান্তর দেখা দিলো।

মার্কসের জন্ম ১৮১৮ সালে জার্মানীর ট্রেভস নামক স্থানে। তখনকার ট্রেভস ছিল ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুগের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত। সুতরাং জন্মসূত্রেই মার্কস আন্তর্জাতিক। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ইহুদী রাবি বা ধর্মযাজক। কিন্তু মার্কসের শৈশবে তাঁর পিতামাতা খৃষ্টানধর্ম অবলম্বন করেন। তাঁরা ছিলেন রীতিমত সম্পত্তিসম্পন্ন। বন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কস ইতিহাস ও দর্শন পাঠ করেন। কিন্তু সে পাঠ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমঅনুযায়ী শেষ করেননি।

মার্কসের স্ত্রী জেনিভন ওয়েস্ট ফালেন ছিলেন ধনীর দুহিতা। তাঁদের অভিজাত-বংশের সংগে ছিল স্কটিশ আভিজাত্যের দূর সংযোগ। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী তিনি ছিলেন সুন্দরী, আয়ত-লোচনা। আর তাঁর জীবনী পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে তিনি ছিলেন সর্বংসহা, স্বামী নিবেদিতাপ্রাণা এবং স্নেহময়ী মাতা। তাঁদের যখন বিয়ে হয় তখন মার্কস ছিলেন রাইনল্যান্ডের একটি কাগজের সম্পাদক। বিয়ের কিছুদিন পরেই বিপ্লববাদ প্রচারের অভিযোগে জার্মান সরকার কাগজটি বন্ধ করে দেয়। এরপর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে শিক্ষার জন্যে মার্কস ফ্রান্সে যান। সেখানে ফেডারিখ এঙ্গেলস নামে এক ধনীর সন্তান, প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী কিন্তু বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন স্বজাতীয় তরুণের সংগে তাঁর পরিচয় ঘটে। এংগেলস্ তখন ইংল্যান্ডের শিল্পপ্রধান নগরী ম্যানচেসটারে পিতার একটি কারখানায় ম্যানেজার ছিলেন। এঙ্গেলসের কাছে মার্কস তদানীন্তন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শিল্পপ্রধান দেশ ইংল্যান্ডের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প-বাণিজ্য এবং হুজুর-মজুর সম্পর্কের অনেক কথা জানতে পারেন। তাঁদের প্রীতি ও বন্ধুত্ব ক্রমশ নিবিড় হয়ে ওঠে। জগতে এমন আশ্চর্য, আন্তরিক সহযোগিতায় নিবিড় ও যুগপ্রবর্তনকারী বন্ধুত্বের নিদর্শন আর নেই। তাই মার্কস ও এঙ্গেলসের নাম চিরস্মরণীয়ভাবে যুগলে গাঁথা।

ফ্রান্সেও মার্কস দীর্ঘদিন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারলেন না। জার্মান সরকারের প্ররোচনায় ফরাসী সরকার তাঁকে ফ্রান্স থেকে বহিষ্কার করে দিল। মার্কস গেলেন ব্রাসেলসে। জেনি এসে এখানে তাঁর স্বামীর সংগে মিলিত হলেন। সেখানেই মার্কস কমিউনিস্ট শাস্ত্রের গীতা 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' রচনা করেন। ১৮৪৮ সালে সারাটা ইউরোপ আবার বিপ্লবের ঢেউএ দুলে উঠলো। মার্কস জার্মানী ও ফ্রান্সের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বিপ্লব কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলো। নিরুপায় মার্কস ১৮৪৯ সালে ইংলিশ প্রণালী পাড়ি দিয়ে লণ্ডনে উপনীত হলেন।

এর কিছুদিন পরেই জেনি তাঁর তিন সন্তান এবং লেন্চেন ডেলমুথ নামে এক পরিচারিকা ও পরিবারহিতৈষিণীকে নিয়ে লণ্ডনে এলেন। মার্কসের পারিবারিক গাথায় লেনচেন ডেলমুথের স্থান বিশিষ্ট। সেই পরিবারের চরম দুরবস্থার সময় তিনি তাঁদের ত্যাগ করা তো দূরের কথা, অপরিসীম ধৈর্যে, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে, স্নেহে কঠোর শাসনে, ব্যয়সংক্ষেপে ও সংগঠনে তিনি সেই সংসারটিকে চালু ও আনন্দময় রেখেছিলেন। বিপ্লবিনী, দুরন্ত দুঃসাহসী, শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম চিন্তাবীর কার্লমার্কসের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল অমোঘ, স্নেহময়ী, শুভাকাঙ্ক্ষী জননীর মত। মৃত্যুর পরও তিনি মার্কস পরিবারকে ত্যাগ করে যান নি। লণ্ডনের হাইগেট সমাধিক্ষেত্রে তিনিও ঐ পরিবারের অন্যদের সংগে সমাধিস্থ হন।

লণ্ডন প্রবাসের কৃচ্ছ্রতা ও সাধনা

বর্তমান লণ্ডনের বিখ্যাত অভিজাত পল্লী, ধনী ও সচ্ছল বোহেমিয়ান, শিল্পী ও চলতি হাওয়ার পন্থীদের বাস ও বিচরণ ক্ষেত্র চেলসি পল্লীতে এসে মার্কসপরিবার প্রথম সংসার পাতেন। কিন্তু শীঘ্রি ভাড়া বাকি পড়তে থাকলো এবং শেষ পর্যন্ত পাঁচ পাউন্ড পাওনা ভাড়ার জন্যে বাড়ী-ওয়ালার পক্ষ হয়ে কোর্টের পেয়াদারা সেই অর্ধভুক্ত শরণার্থী পরিবারটির তৈজসপত্র ও আসবাব ক্রোক নিল এবং শেষ পর্যন্ত ত্রস্ত বিভ্রান্ত তিনটি শিশুসমেত পরিবারটিকে পথে বের করে দিল। শ্রীমতী মার্কস তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখে গেছেন, 'শেষ পর্যন্ত যখন বিছানাগুলি সরানো হচ্ছে তখন বাড়ীওয়ালা দুজন কনস্টেবল সংগে করে ছুটে এলো। বলতে লাগলো ওগুলির মধ্যে তার নিজের কিছু কিছু জিনিস থাকতে পারে এবং আমরা হয়তো তা বিদেশে পাচার করে দেবো। ওদিকে পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে শ' দুতিন লোক, সারা চেলসির জনতা, আমাদের দরজার সামনে জড়ো হলো। বাড়ীওয়ালার পাওনা শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত মিটিয়ে দিতে আমাদের যা কিছু ছিল সবই বিক্রী হয়ে গেল। এরপর আমরা লেসটার স্কয়্যারে একটি জার্মান হোটেলে উঠে এলাম। সেখানে আমরা মানবিকতাপূর্ণ অভ্যর্থনা পেলাম।'

অবশ্য এসব উৎপীড়নে ও জঘন্য অনটনে মার্কস দমবার পাত্র নন। তিনি ইউরোপের দেশ-দেশান্তরাগত রাজনৈতিক স্মরণার্থীদের নিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সঙ্ঘ বা ইনটারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস এ্যাসোসিয়েশন গঠনে উদ্যোগী হলেন। বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের অনেক খ্যাত নেতা তাঁকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলেন। লেসটার স্কয়্যারের কয়েকশ গজের মধ্যেই সেন্ট মার্টিন হলে ওডগার নামে এক ইংরাজ পাদুকাকার সেই প্রথম আন্ত-র্জাতিকের আহবায়ক হলেন। ফ্রান্স, ইতালী, পোল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ড থেকে প্রতিনিধিরা তাতে যোগ দিলেন; জার্মান শ্রমিকদের প্রতিনিধি ছিলেন স্বয়ং মার্কস এবং ইতালীয়ানদের প্রতিনিধি গ্যারিবল্ডির এ্যাডজুটান্ট মেজর ওলফ্। সেই প্রথম সম্মেলনের আকারে ঘোষিত হলো যে সমস্বার্থের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ দেশ-বিদেশের শ্রমিকশ্রেণী একটি আন্তর্জাতিক শক্তি। 'প্রায় নিঃস্বরায় রুদ্ধ হয়ে আসে' এমনিভাবে ভীরুকরা সেই সভা সম্পর্কে মার্কস তাঁর বন্ধু এঙ্গেলসকে লিখতে গিয়ে লেখেন যে 'শেষ ঘোষণাটি' আমি সম্পাদনা করতে গিয়ে সত্য, নৈতিকতা ও সুবিচার প্রভৃতি সম্পর্কে এমনি সব বাক্য জোর করে বসিয়ে দিলাম যাতে সেগুলি কোন ক্ষতি না করতে পারে।' মনে হয় মার্কসের সম্মেলনটির মার্কসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মাৎসিনি মারফৎ ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদের যে আল… ও মরচেধরা প্রভাব তখনো আন্তর্জাতি… গণ আন্দোলনের ওপর বর্তমান ছিল … অপসারিত করা। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো… মত সম্মেলনের চরম ঘোষণাটিও 'দুনিয়া… শ্রমিক এক হও' ধ্বনি দিয়ে শেষ হয়। জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে… শ্রমিক আন্দোলনের সংহতি রক্ষার জ… একটি আন্তর্জাতিক কমিটিও গঠিত হ… মার্কস তার সদস্য নির্বাচিত হন।

মধ্য লণ্ডনের লেসটার স্কয়ার, আ… সঠিকভাবে বলতে গেলে তার সংল… পৃথিবীর প্রায় সর্বদেশের জনতা মিশ্র… সর্বদেশের খাদ্যের ও মদ্যের, গণিকা… বাউণ্ডুলেদের, হরেকরকম তামাশা… প্রেক্ষাগৃহের অবাক আস্তানা, সর্পিল গ… ও রহস্যজনক চত্বরে গঠিত সোহ স্কয়… থেকে মার্কস-পরিবার কিছুদিনের ম… নগরীর উত্তরাঞ্চলে কেনটিস টাউন না… পল্লীর গ্রাফটন টেরেসে উঠে গেলে… শহরের ঐ অঞ্চলটা যদিও দ্রুত পরিবর্তি… হয়ে যাচ্ছে, ভিকটরীয় যুগের পুরো… থামওয়ালা দোতলা বাড়ীগুলি ভেঙে ন… নতুন আকাশ-ছোঁয়া মিউনিসিপ্যাল ফ্ল… উঠছে তবু এ শতাব্দীর সত্তর দশক পর্য… গ্রাফটন টেরেস ঠিক আছে। তারই এ… বাড়ীতে বর্তমানে বৃটেনের হিন্দু সেন… প্রতিষ্ঠিত। সেটি মন্দির এবং প্রবা… হিন্দুদের নানা সামাজিক ও ধর্ম… অনুষ্ঠানের মিলনক্ষেত্র। গ্রাফটন টে… ছেড়ে, আরো কিছুদিন পরে, মার্কস-পরি… তার কয়েকশ গজ দূরে হ্যাভারস্টক হি… মেইটল্যান্ড রোডে উঠে এলেন। এখা… মার্কস দম্পতিজীবনের শেষদিন পর্য… ছিলেন। এই পল্লীটি বা বেলসাইজ পা… আজ বহু ভারতীয় বিশেষ করে বাঙা… বাস। বস্তুত প্রবাসী বাঙালীরা নিজে… মধ্যে অঞ্চলটিকে পরিহাসের স… 'বাঙালীটোলা' বলে উল্লেখ করেন।

লেস্টার স্কয়ারে মার্কসের একটা মহাসুবিধে ছিল যে সেখান থেকে পৃথিবীর বৃহত্তম যাদুঘর ও পাঠাগার বৃটিশ মিউজিয়াম ছিল পায়ে হেঁটে মিনিট দশেকের পথ। বেলসাইজ পার্ক থেকে মিউজিয়ামটি এখন অন্তত তিন-চার মাইল দূরে হয়ে গেল এবং মার্কসের আর্থিক সঙ্গতিতে তখনকার দিনে হেঁটে আসা ছাড়া উপায়ন্তর ছিল না। অথচ ঐ মিউজিয়ামই ক্রমে মার্কসের জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ালো। মিউজিয়ামটি দূরে চলে গেলেও নগরীর বিখ্যাত ও বিশাল উপবন হ্যাম্পস্টেড হীথ খুব কাছে এসে গেল। সেদিনের মত আজো ওই হীথ নিদাঘ দিনে প্রেমিক-প্রেমিকাদের নন্দন-কানন ও চড়ুইভাতির আদর্শ স্থান। সেদিনের মত আজো সেখানে ছোট ছেলে-মেয়েদের চড়বার মত গাধা ভাড়া পাওয়া যায়। মার্কস-পরিবার প্রায়ই তাঁদের বিদেশাগত বিপ্লবী অতিথিদের নিয়ে সেই হীথে দিন কাটাতে যেতেন। লেনচেন ডেলমুথের তত্ত্বাবধানে প্রকাণ্ড ঝুড়িতে করে যেত চা চিনি, রুটি মাখন বীয়ার, চীজ, রোস্ট করা মাংস চিংড়িমাছ, স্যালড, শাক। সারাটা দিন সেই বনভূমিতে ঘুরে-খেলে-গান গেয়ে, গাধার পিঠে চড়ে তাঁরা দারিদ্র্য, হয়তো বিশ্ববিপ্লবের গুরুদায়িত্বের কথাও ভুলে যেতেন। স্বয়ং মার্কস তাঁর ছোট-বেলায় পাওয়া তিন-তিনটে ঘোড়ায় চড়া-পাঠের গর্ব করতে গাধায় চড়তেন। চক্রাকারে বসে নানাধরনের বুদ্ধির খেলা চলতো। তারপর উত্তরমণ্ডলের দীর্ঘদিনেরও যখন অবসান ঘটতো, বনভূমিতে অন্ধকার ক্রমশ জমাট বাঁধতো তখন তাঁরা ঢালু পথ বেয়ে হৈহট্টগোল কিম্বা শেকসপীয়ার আবৃত্তি করতে করতে, হরেক ভাষায় গান গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরতেন। স্বভাব-স্বল্পবাক, নিস্পৃহ, একান্ত ইংরেজরা হয়তো তাঁদের দিকে আড়চোখে তাকাতো কিম্বা বিদেশাগতদের সরব স্বভাবে একটু বিস্ময় প্রকাশ করতো। কিন্তু কেউ কি একবারও ভাবতে পারতো যে দুনিয়ার সমাজব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্দেশ্যে ঐ দলটি একত্র হয়েছে?

মার্কস দাবায় খুব ভালো না হলেও প্রায়ই দাবা নিয়ে বসতেন। তবে বিশুদ্ধ বৃটিশ খেলা ড্রাফটে তাঁর হাত ছিল পাকা। কাফেতে যখন মাঝে মাঝে তিনি তা খেলতে বসতেন তখন তাঁর চারপাশে সমঝদারের ভীড় জমে যেতো। মাঝে মাঝে ফরাসী সোস্যালিস্টদের সঙ্গে তিনি প্রচণ্ড উৎসাহে তরোয়াল খেলতেন। এসব ছাড়াও অকস্মাৎ মার্কস ও তাঁর সঙ্গী সোস্যালিস্টদের বিপুল উৎসাহ ও প্রাণশক্তি একটু বেয়াড়া-ভাবে ফেটে পড়তো। হয়তো কোন সন্ধ্যায় পাবে পানটা একটু মাত্রাধিক হয়ে গেল। বাইরে বেরিয়ে পানাচ্ছন্ন মাথায় খেয়াল চাপলো দাও একটা অসুটবিন উলটে, কি রাস্তার একটা বাতি ভেঙে। তারপর দৌড়-দৌড়-দৌড়। এক পাল দুরন্ত বালকের মত গিয়ে জেনির কাছে হাজির। জেনির কপট ক্রোধে তিরস্কার। তারপর হেসেলে গিয়ে সুপ কিম্বা রুটির টুকরো, যা কিছু আছে তা পরিবেশন করা।

অবশ্য উপরোক্ত খেয়াল-খুশিগুলি ছিল মার্কসের গুরুগম্ভীর কঠোর জীবন-সাধনা থেকে ক্ষণিক ছুটি। তিনি তাঁর বিপ্লবী সহকর্মীদের বারংবার হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলতেন, 'পড়ো, পড়ো, পড়ে চলো। বৈপ্লবিক পথের সন্ধান পেতে হলে পড়ে চলা ছাড়া উপায় নেই।' প্রধানত তিনি তাঁদের বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস পড়তে বলতেন। কিন্তু নিজে বৃটিশ মিউজিয়মে গিয়ে বইয়ের সমুদ্র মন্থন করতেন। বৃটিশ মিউজিয়ম তখন নতুন। এখনকার মত সেখানে তখন আলোর, শীতনিয়ন্ত্রণের ও নানাবিধ যান্ত্রিক ব্যবস্থার সুবিধা ছিল না। শীতের দিনে মধ্যাহ্নে আঁধার ঘনাতো। অন্য সময় বেলা তিনটে নাগাদ আলো কমে গিয়ে পড়া বন্ধ হতো। তার ওপর বাড়ী থেকে দীর্ঘ পথ হেঁটে আসতে হতো। সুতরাং বাড়ী গিয়ে আবার বই ও নোট নিয়ে তাঁকে মগ্ন থাকতে হতো। মার্কসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই অবশ্যই দাস্ ক্যাপিটাল। ঠাসা অক্ষরে ছাপা বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২২৭ এবং ওজন ছ' পাউণ্ড। বইটি তাঁর চল্লিশ বছরের পরিশ্রমের ফল, যার অধিকাংশই কাটে বৃটিশ মিউজিয়ামে। মার্কস যেখানে বসতেন সেই স্থানটি আজ মিউজিয়াম কর্মীরা সগর্বে দেখান। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের মিউজিয়ম রেজিস্টারে মার্কসের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিত। কিন্তু ১৯০২ সালে মার্কসেরই মত আরেকজন রাজনৈতিক শরণার্থীও ডাঃ জেকব রিখটার নামে রেজিস্টারী করেন। তিনি তাঁর 'রেফারেন্স' ঠিকানা দেন পেন্টনভিল পল্লীতে। মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ সেটি অনুসন্ধান করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। ওই নামে ওখানে কেউ থাকতো না। অনুসন্ধান-কারীর কোন দোষ ছিল না। কারণ রেজিস্টারকারীর প্রকৃত নাম ভ্যাডিমির ইলিইচ উলইয়ানোভ ওরফে লেনিন।

মার্কসের প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত কোন রোজগার ছিল না। কিন্তু দি নিউইয়র্ক ট্রিবিউনে লিখে তিনি কিছু টাকা পেতেন। টাকা পাওয়া ছাড়া শিল্পাগ্রসর উত্তর আমেরিকার ওপর মার্কস ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রীদের বিপুল ভরসা। প্রথম শ্রমিক বিপ্লব সেখানেই ঘটবে বলে তাঁদের ধারণা। তাই যতটা সম্ভব ততটাই নিউইয়র্ক

এ্যাভেলিঙের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগে তাঁকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হলেন। [illegible]

ডাঃ এ্যাভেলিঙের [illegible] [illegible] সম্পর্কের নানারকম [illegible] [illegible]। ১৮৯৫ সালে মৃত্যুর আগে এঙ্গেলস তাঁর উইলে টুসিকে ও ডাঃ এ্যাভেলিংকে ৩০০০, পাউণ্ড দিয়ে যান। নিছক বিনিময়ের হারে যা হচ্ছে প্রায় ৫৫ হাজার টাকা। কিন্তু সেদিনের এবং এদিনের ক্রয়ক্ষমতার হিসেবে অন্তত [illegible] লক্ষ টাকা। এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর টুসি ও এ্যাভেলিঙ তাঁর চিতাভস্ম ইস্টবোর্নে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। তারপর স্যাডেনহ্যামে একটি বাড়ী কেনেন। সেই বাড়ীতেই টুসির জীবনের মর্মান্তিক অবসান ঘটে।

এ্যাভেলিঙের প্রথমা বিবাহিতা স্ত্রীর মৃত্যুর পরেও তিনি টুসিকে বিয়ে না করে একজন তরুণী অভিনেত্রীকে বিয়ে করেন। জনশ্রুতি এই যে ওই তরুণী অভিনেত্রী টুসিকে এ্যাভেলিঙের সঙ্গে একটি আত্মহত্যার কপট চুক্তিতে আবদ্ধ হতে প্ররোচিত করেন। এ্যাভেলিঙ নিজে আত্মহত্যার বিষ [illegible] [illegible]। [illegible] একজন [illegible] দেওয়া সেই বিষ ছিল অব্যর্থ। [illegible] একটি সাদা রঙের পোশাক পরিধান করে টুসি সেই বিষ পান করে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে একটি মর্মস্পর্শী চিঠিতে তিনি লেখেন, 'প্রিয়তম, আর খানিক পরেই সব শেষ হয়ে যাবে। দীর্ঘ [illegible] বহু বছর ধরে যে কথা বলে এসেছি সেইটিই আমার শেষ কথা, তোমাকে ভালোবাসি'। যে সময়ে টুসি তার [illegible] বিষ পান করছিলেন সে সময় এ্যাভেলিঙের নিজেরও বিষ পান করার কথা। তার বদলে তিনি চলে গেলেন সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশনের অফিসে। পরে অবশ্য তিনি নাটকীয়ভাবে শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

অপর দুই মার্কস দুহিতা লোরা ও জেনির বিয়ে হয় পল লাফার্গ ও চার্লস লঙ্গে নামে লণ্ডন পলাতক দুই ফরাসী বিপ্লবীর সঙ্গে। তাঁরা [illegible] মার্কস পরিবারের আশ্রয় নেন এবং পরিবারটির সঙ্গে [illegible] একাত্ম হয়ে যান। [illegible] দম্পতি তাঁদের মাথায় যেন তাঁদের [illegible] মত [illegible] ফিরে [illegible]। কিন্তু [illegible] হবে কি? যে শ্বশুরমশাই ব্যক্তিজীবনে পরম স্নেহময় ও কৌতুকপ্রবণ তিনিই রাজনৈতিক মতবাদের ব্যাপারে একেবারে উগ্র, অসহিষ্ণু, কঠিন, কঠোর, রূঢ়। লাফার্গের জন্ম হয় কিউবাতে। তাঁর ঠাকুমা ছিলেন বর্ণসঙ্কর। তাই রাজনৈতিক বিতর্কে [illegible] উঠলে [illegible] [illegible] [illegible] বলে [illegible] ওর [illegible] [illegible] [illegible] ঢোকানো [illegible]। আফ্রিকার [illegible]

জামাইয়ের রাজনৈতিক বেচাল দেখে তিনি মহাআক্ষেপে বলে গেছেন যে লঙ্গে হচ্ছে শেষ প্রুধোপন্থী আর লাফার্গ শেষ বাকুনীনপন্থী।' প্রুধোঁ এবং নৈরাজ্যবাদী প্রিন্স বাকুনীনের [illegible] [illegible] মার্কস প্রবল সমালোচনা করে গেছেন। [illegible] সেই সঙ্গে নিজের সম্পর্কেও [illegible] বলে গেছেন, আমি আর যাই হই কোনক্রমেই মার্কসপন্থী নই।

অস্তগমন

১৮৮১ সালে মার্কসপত্নী জেনি ক্যানসার ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন। প্লুরিসি ও ব্রনকাইটিসে মার্কসের সবল-প্রবল দেহও ভেঙে পড়লো। অনেক অনেক বছর পরে তাঁরা আলাদা-আলাদা ঘরে শুতে বাধ্য হলেন। টুসি ও লেনচেন তাঁদের আপ্রাণ সেবায় রত হলেন। পরে টুসি তাঁর স্মৃতিমন্থনে বলে গেছেন, 'মা সামনের ঘরে শুতেন আর মূর শুতো তার পাশে ছোট ঘরটিতে। তাঁরা পরস্পরের [illegible] অভ্যস্ত ও নির্ভরশীল ছিলেন যে তাঁদের জীবন সম্পূর্ণভাবে যেন মিশে গিয়েছিল। এখন আর তাঁরা একই ঘরে থাকতে পারলেন না।' মনে পড়ে 'মূর আবার সুস্থ হয়ে উঠলেন। যেদিন সকালে মায়ের ঘরে যাবার মত শক্তি তিনি ফের ফিরে পেলেন সেদিনের কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। ও'রা যেন আবার সেই ফেলে আসা প্রথম যৌবনে ফিরে গেলেন। মা যেন একটি প্রেমময়ী আনন্দময়ী তরুণী এবং মূর প্রেমোৎফুল্ল, তৎপর তরুণ। কে বলবে তাঁরা ক্লান্ত জীবনের শেষে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন? একজন ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধ, অপরজন মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধা?'

ঐ বছরই ২রা ডিসেম্বর জেনি মারা গেলেন। আর অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হবার আগেই যে মার্কসের মতবাদ মানুষের চিন্তাধারাকে পরিবর্তিত করে দেবে, দেশে দেশে রাষ্ট্রের ও সমাজের পরিবর্তন ঘটাবে সৌভাগ্যক্রমে তার সূচনা তিনি দেখে যান। 'মডার্ন থট' নামক পত্রিকায় লিডার্স অব মডার্ন থট নামক প্রবন্ধমালার ২৩ সংখ্যায় মার্কসের ওপর লেখা প্রবন্ধটি তিনি দেখে যান। জেনির মৃত্যুর পর হাইগেটের কবরখানায় দাঁড়িয়ে তাঁর শেষকৃত্য উপলক্ষে পরিবারের চিরবন্ধু এঙ্গেলস বললেন, 'অন্যদের সুখী করাই জীবনের একমাত্র আনন্দ—এমন যদি কোন মহিলা থেকে থাকেন, তবে এই মহিলাই ছিলেন তিনি।'

স্ত্রীর মৃত্যুর সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই মার্কস আবার পুনোদ্যমে লিখতে শুরু করলেন। এ সময় তিনি ইউরোপের নানা দেশের মধ্যবিত্ত লেখকেরা মার্কসের দাস ক্যাপিটালের বহু চিন্তা এবং হুবহু অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদ নিজের বলে চালানোর বিরুদ্ধে বহু দীর্ঘ প্রতিবাদপত্র লেখেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কন্যা জেনি মারা যেতে বৃদ্ধ রুগ্ন মার্কস আরেকবার বড় রকমের আঘাত পেলেন। এর কিছু পরেই ফের তাঁর ব্রনকাইটিস হলো। ফুসফুসে একটি টিউমার দেখা দিল। যে দুধে তাঁর চিরদিন বিতৃষ্ণা ছিল সেই দুধ ছাড়া আর সব কিছু খাদ্য নিষিদ্ধ হয়ে গেল। ১৪ই মার্চ নাগাদ বেশ বোঝা যেতে লাগলো যে তাঁর জীবনের মশালের দাহ্য শেষ হয়ে যাচ্ছে। টুসি বলে গেছেন, 'মূর শোবার ঘর ছেড়ে পড়ার ঘরে গিয়ে বসলেন। সেখানেই আরাম কেদারায় বসে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।'

আবার হাইগেটের মার্কস পরিবারের বাকি লোকজন, মুষ্টিমেয় শরণার্থী বিপ্লবী ও মার্কস বন্ধু এঙ্গেলস জড়ো হলেন। শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম চিন্তাবীর আর চিন্তা করবেন না। বিষাদউদ্বেলিত হৃদয়ে এঙ্গেলস বললেন যে মার্কস তাঁর সমকালের সবচেয়ে নিন্দিত ও ঘৃণিত ব্যক্তি। দেশে দেশে বহু সরকার তাঁকে বিতাড়িত করেছে। বুর্জোয়ারা তাঁর বিরুদ্ধে ঘৃণার আন্দোলন পরিচালনায় প্রতিযোগিতায় নেবেছে। কিন্তু 'একথা আমি সাহস করে বলতে পারি যে তাঁর বহু প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কিন্তু কোন ব্যক্তিগত শত্রু ছিল না।' —একথার আজ পর্যন্ত কোন বিরুদ্ধপ্রমাণ মেলেনি।

[illegible] মুহূর্তে এমনভাবে বেরসিকের মতো কথাটা বলে [illegible] প্রত্যয় [illegible] মনে [illegible]। সীমা, [illegible] কথাটা [illegible]

সীমাকে [illegible] সীমা হয়তো বলতো [illegible] মতো ভাবো?' [illegible] প্রত্যয়কে চুপ করেই থাকতে হতো। [illegible] প্রত্যয় জানে যে [illegible] সীমা [illegible] অনেক আগেই [illegible] নার্সিং হোমে [illegible] দুবার কিউরেট করিয়েছে। কিন্তু সেকথা তো মুখ ফুটে বলা যায় না। তাই প্রত্যয়কে চুপ করেই থাকতে হতো।

কিংবা এনাকে যদি প্রশ্নটা করতো? এনা হয়তো, চাপা হাসি হেসে বলতো—'অনেকে অনেকদিন [illegible]ভাবে এখানটায় আদর করেছে।' [illegible] হাসির পাঁচিল ডিঙিয়ে কোনদিনই [illegible] কথা প্রত্যয় জানতে পারতো না। [illegible] প্রায় সব সময়ই মিথ্যা কথা বলে। [illegible] বোধহয় কোনদিন ভুলেও [illegible] না। তবু সীমাকে প্রত্যয় বুঝতে পারে। কিন্তু [illegible] কি এনাকে সে ঠিক কোনদিনই [illegible] উঠতে পারেনি।

বেখাপ্পাভাবে কথাটা বলে ফেলে প্রত্যয় যখন হাবুডুবু খাচ্ছে তখন ঝুমঝুম কী ভাবছে কে জানে। একটু আগেও ঝুমঝুমের শরীরটা সতেজ ছিল—সবুজ ছিল। প্রত্যয়ের কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে ঝুমঝুম নিজের আড়ষ্ট শরীরটা প্রত্যয়ের হোঁচট-খাওয়া শরীরের পাশ থেকে সরিয়ে নেয়। উঠে দাঁড়িয়ে বেশবাস ঠিক করতে করতে ঠাণ্ডা গলায় কয়েকটা শব্দ ছুঁড়ে মারে প্রত্যয়কে—'উঠে পড়ো। তিতির আসবার সময় হয়ে গেছে।'

তিতি ঝুমঝুমের মেয়ে। আসছেবার হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেবে। তিতির কথা মাঝে মাঝেই ভুলে যায় প্রত্যয়। যেমন একটু আগেই গিয়েছিল। তিতিকে স্কুলে যাওয়ার জন্যই তিতির মত পিতার কথাও প্রত্যয়ের মনে ছিল না। থাকলে, নিশ্চয়ই সে এরকম বেরসিকের মতো একটা কথা বলে ফেলতো না।

প্রত্যয়ের সঙ্গে যেদিন ঝুমঝুমের প্রথম আলাপ হয়, সেদিনটা ছিল রবিবার। সেদিন সকালে 'সিনে ক্লাবের' একটা 'শো' ছিল। প্রত্যয় যে ক্লাবটার মেম্বার সে-ক্লাবের বেশিরভাগ 'শো' হয় রবিবার সকালে। ফলে প্রত্যয়ের যাওয়া ও না-যাওয়া দুটোই প্রায় অনিশ্চিত। যাবে কি যাবে না সেটা প্রত্যয় আগে থাকতে ঠিক করতে চায় না। এমন কি যাবে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েও শেষ পর্যন্ত [illegible] যথাস্থানে, যথাসময়ে পৌঁছতেই হবে এমন কোন নিশ্চয়তাকেও প্রত্যয় রবিবার নিজের ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

ছোট ক্লাব। প্রায় সবাই সবাইকার মুখ চেনা। অবশ্য এ চেনা বোধহয় সিনেমা হলের [illegible] চেনা। [illegible] অন্যত্র [illegible] চিনতে পারবে না। [illegible]

[illegible] কে জানে। সিনেমা হলের ভেতরে [illegible] বাইরে অন্যরকম [illegible]। [illegible] তো তাই [illegible]।

[illegible] ঝুমঝুমকে [illegible]। ওকে তার আগেও দেখেছিল। [illegible] কিন্তু সেকথা বিশ্বাস করতে চায়। [illegible] নীচের ঠোঁটটা উল্টে সে বলে—'কাই? [illegible]-বাসে তোমাকে কতোদিন দেখেছি। আমি তাকাতাম তোমার দিকে। কিন্তু—' এক মুখ হাসি ঝুমঝুমের মিষ্টি গন্ধের দুটু কাটা দাগটার উপর ঢেউ খেলে যায়।

প্রত্যয় অবাক চোখে সেই ঢেউটার দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু অসোয়াস্তি বোধ করে সে। হতে পারে ঝুমঝুম ঠিকই বলছে। হয়তো হলের বাইরে সে ঝুমঝুমকে সত্যি চিনতে পারতো না। কিন্তু চিনতে না পারলেও ঝুমঝুমের দিকে সে তাকাতো না এটা কেমন করে সম্ভব? ঝুমঝুমের মতো একটা সুন্দর মেয়ে-শরীরের দিকে সে তাকাবে না এমন ভালো ছেলে সে কোনদিনই নয়। তাই বিস্মিত দৃষ্টি এবার কণ্ঠকেও বিস্মিত করে—'তুমি তাকাতে আর আমি বুঝি চোখ বুজে থাকতাম।'

হাসির ঢেউ-এ এবার কপট রাগের ফেনা—'দেখবে না আবার কেন। ড্যাবড্যাবে চোখ দিয়ে হাঁ করে গিলতে।' তারপর হাসির ঢেউটাকে আলতোভাবে প্রত্যয়ের ঠোঁটে ছুঁইয়ে ঝুমঝুম বলে—'কিন্তু আমাকে তুমি চিনতে পারতে না।'

নিজের শরীরটা ওর শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চায় প্রত্যয়। এবং তার মধ্যেই সে প্রশ্ন করে—'কী করে বুঝতে?'

প্রত্যয়ের মাথাটা নিজের বুকে টেনে নিয়ে ঝুমঝুম বলে—'তখন তোমার চোখে শুধু একটা মেয়ে থাকতো। আমার কোন আলাদা জায়গা ছিল না সেখানে।'

ঝুমঝুমের সেই কাটা দাগটার ওপর প্রত্যয়ের আঙুল খেলা করছে। এই দাগটা সম্পর্কে প্রত্যয়ের দুর্বলতা ঝুমঝুম জানে। তাই ওই দাগটার উপর প্রত্যয়ের স্পর্শই তাকে সবচেয়ে দুর্বল করে দেয়। থরথর করে কেঁপে ওঠে ঝুমঝুম।

প্রত্যয়ও কাঁপে। তার গলাও কাঁপে—'আর সিনেমা হলের ভিতর আমার চোখে তোমার কতোটা জায়গা খুঁজে পেতে ঝুমঝুম?'

শরীরী কাব্যের তুঙ্গ মুহূর্তে ঝুমঝুমও বুঝি কবি হয়ে উঠতে চায়। তাই সে প্রায় ফিসফিস শব্দে বলে—'তখন মনে হতো তুমি শুধু আমার।' তারপর ছন্দিত শরীরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ছন্দিত কণ্ঠে বলে—'যেমন তোমার রবিবার।'

ঝুমঝুমের সঙ্গে আলাপ হওয়ার সময় প্রত্যয় জানতো না যে ঝুমঝুম বিধবা। চার বছর আগে প্রত্যয়ের সঙ্গে যখন ওর প্রথম আলাপ হয় তখন ঝুমঝুমের বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ এবং তিতির বয়স দশ। তিতিকে না দেখলে প্রত্যয় বিশ্বাসই করতে পারতো না যে ঝুমঝুম বিবাহিত এবং [illegible]

[illegible] এক [illegible]। [illegible] উপায়ও [illegible] না। [illegible] অথবা [illegible] পরিচয় সে-পরিচয় [illegible] না [illegible] ছুঁইও ছিল না।

মাসে যে—একস্থানটা [illegible] সিনে ক্লাবের [illegible] দেখতে [illegible] হয়তো ঝুমঝুমকে [illegible] থাকতে দেখতো। দেখেই [illegible] মহিলা একটু গম্ভীর [illegible]। [illegible] চেহারায় বিষাদের একটা [illegible]।

যেদিন প্রত্যয় [illegible] মতো দু-চার মিনিট [illegible]। সিনে ক্লাবের শো-এ নির্দিষ্ট আসন নেই। [illegible] আলো দিয়ে আসন দেখিয়ে দেবার লোকও থাকে না। আগে থাকতে [illegible] নিতে হয় ফিল্মটা কতো মিনিট [illegible]। [illegible] হলে সামনে এবং [illegible] পেছনে বসাই সুবিধা। তাই [illegible] মিনিট আগে গিয়েই পৌঁছতে হয়। একদিন কিন্তু দেরী হয়ে গিয়েছিল। বাইরের আলো থেকে হঠাৎ অন্ধকার হলে ঢুকে প্রত্যয় কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। একটু দাঁড়িয়ে থেকে চোখটা ধাতস্থ করে নিতে পারলে বোধহয় সুবিধা হয়। তবে পরিচিত হল। তাই আন্দাজে আন্দাজে সারিবদ্ধ আসনের একটা সারির দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে প্রত্যয়। প্রায় অন্ধের মতোই হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে যায় সে। বই আরম্ভ হয়ে গেছে। অনেকের দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সে। মৃদু গুঞ্জন আর অস্ফুট মন্তব্যে বিরক্তি ঝরে পড়ছে [illegible] থেকে। বরং প্রত্যয় একটা আসনের সারি খুঁজে পেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। [illegible] এখন কনের পা মাড়িয়ে প্রায় [illegible] খেয়ে পড়ে। যাঁর পাটা মাড়িয়ে ফেলে তিনি কিন্তু যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহারই করেন। নিজে তাড়াতাড়ি পাশের আসনে সরে গিয়ে প্রত্যয়কে বসতে সাহায্য করেন। কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য এবং পা মাড়িয়ে ফেলার দুঃখ প্রকাশ করার জন্য প্রত্যয় পাশের জনের হাতটার উপর নিজের হাতটা রেখে কি যেন বলতে যায়। কিন্তু বলা হয় না। চুড়িপরা একটি হাতের উপর থেকে চকিতে নিজের হাত সরিয়ে নেয় প্রত্যয়। চোখ একটু ধাতস্থ হলে সে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে: তার পাশে বসে আছে ঝুমঝুম।

অবশ্য সেদিন সেই মুহূর্তে কেউ কারুর নাম জানতো না। কিন্তু সেদিনের সেই ঘটনার সূত্রেই তারা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে।

ঝুমঝুমের বিয়ে হয়েছিল বাইশ-তেইশ বছর বয়সে। বিয়ের পরই কোলে [illegible] তিতি। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সেই স্বামীকে হারায়। তিতির বাবার [illegible] কারবার হয়েছিল। [illegible] সংসার ছিল। বাপের বাড়িতেও [illegible] করার মতো [illegible] ছিল না। [illegible] পাশ করা ছিল। [illegible] ছিল না। আর চাকরীর বাজার [illegible]

চেষ্টা করেছিল যে, প্রত্যয়কে ভালবাসে বলেই সে তাকে ডাকছে। বিয়ের আগে সীমা প্রত্যয়কে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে সে ছাড়া অন্য কোন পুরুষ তার জীবনে নেই। বিয়ের পর বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে প্রত্যয় এবং সীমার স্বামী ছাড়া অন্য কোন তৃতীয় পুরুষের উপস্থিতি সীমার মনের বনে কিংবা শরীরের উপবনে নেই। উপস্থিত হবার সম্ভাবনাও নেই। প্রত্যয় সীমার ডাকে সাড়া দিতে পারেনি। কেন পারেনি? সীমা বিবাহিত বলে? বিয়ের আগেও তো সীমার জীবনে একাধিক পুরুষের কথা প্রত্যয় জানতো। তাহলে কেন সে সীমার বিয়ের পর আর তার ডাকে সাড়া দিতে পারলো না? সাড়া দেবার ইচ্ছে যে হয়নি তাও তো নয়। সীমার দৈহিক যতোই হাল্কা হোক শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে তার ভূমিকাটা কিন্তু আদৌ তুচ্ছ নয়। বিছানাটা জীবনের সব না হলেও বিশেষ অংশ নিশ্চয়ই। এবং এই অংশটিতে অন্তত এনা বা ঝুমঝুমের চেয়ে সীমার আকর্ষণ অনেক অনেক বেশি!

সীমার বিয়ের পর সীমার ডাকে সাড়া দিতে পারলো না। আবার বিয়ের জন্য এনাকে কোনদিন ডাকতে পারলো না। এনা কি এখনো—বিয়ে করেনি? বাঁকুড়া জেলার একটি মেয়ে স্কুলের মাস্টার নিয়ে এনা কলকাতা ছেড়েছে অনেকদিন। এনাদের বাড়ি শ্রীরামপুরে: কলকাতার হোস্টেলে থেকে পড়তো।

এনা বাঁকুড়া চলে যাবার পর প্রত্যয় খুব ঘনঘন চিঠি লিখতো তাকে। হঠাৎ যেন আবেগের জোয়ার এসেছিলো যেন ওর মনে। এনা বরাবরই বড় চাপা স্বভাবে। প্রত্যয়ের তিন-চারখানা লম্বা লম্বা চিঠির উত্তরে সে যদিও বা একটা উত্তর দিতো, তবে সেই অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রত্যয়ের আবেগ দমনের পক্ষে প্রায় যথেষ্ট। তারপর ক্রমশঃ প্রত্যয়ের উৎসাহ পর্বও শেষ হয়েছে। দুপক্ষেরই চিঠিপত্র বন্ধ।

প্রায় বছর তিনেক আগে এনার সঙ্গে হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গিয়েছিল ডালহৌসিতে। এনা ওর স্কুলের কাজে সরকারী দপ্তরে এসেছিল। ফেরার পথে জি পি ওর সামনে প্রত্যয়ের সঙ্গে ওর দেখা। জি পি ওর ঘড়িতে তখন দুপুর সওয়া একটা। প্রত্যয় ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রোদে পুড়ছে। কাঁদো কাঁদো দুচোখ এক ঘাড়ে রয়েছিল দুজনেই।

পাশা খেতে খেতেই ওরা একটা মাদ্রাজি রেস্টুরেন্টে পৌঁছে গিয়েছিলো। দুটো কফির অর্ডার দিয়ে ওরা একটা ছোট টেবিলের দুধারে দুজন বসেছিল। একথা-সেকথার চিঠির ব্যাপারটাও উঠে পড়ে। তখন এনার চাকরী জীবনের দু বছর বয়স। চিঠি-পর্ব প্রথম দুমাসেই শেষ হয়ে গেছে। তবু প্রত্যয় দেড় বছরের পুরোনো অভিমানটাকে সতেজভাবেই প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু এনা কফি-ভেজা ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বলে—দূরে বাপু! তোমার চিঠিতে এতো বানান ভুল থাকে যে পড়তে পড়তে আমার হাসি পায়।'

প্রত্যয়ও এবার হেসে ফেলে। তারপর হেসেই বলে—'মাস্টারিটা কিন্তু তোমার পেশা থেকে অভ্যাসে পরিণত হতে চলেছে এনা।'

এনার সঙ্গে সেই শেষ দেখা। সেও প্রায় তিন বছর হয়ে গেল। এনা বিয়ে করেছে কিনা কিংবা সেই স্কুলেই আছে কিনা প্রত্যয় কিছুই জানে না।

এনার কিংবা সীমার কারুর কথাই প্রত্যয় ঝুমঝুমকে বলতে পারেনি। ভাগ্যিস বলেনি। ঝুমঝুম তো এখন এমনিতেই নানা সন্দেহ করে। প্রত্যয়কে নিয়ে ঝুমঝুম এখন বড়ই দিশাহারা। রাখতেও পারছে না ফেলতেও পারছে না।

আজকাল সন্ধ্যার পরই কলকাতার রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা হয়ে আসে। ঝুমঝুম দেরী করে বাড়ি ফিরতে ভয় পায়। ওকে আটকে রাখতে প্রত্যয়ও খুব বেশী ভরসা পায় না। ফাঁকা সময়টাকে ফাঁকি দেবার জন্যই সে মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে বার-এ যায়। এতেও ঝুমঝুমের কতো অভিমান। ঝুমঝুমের সঙ্গে আলাপ হবার অনেক আগে থেকেই মদের আস্বাদ প্রত্যয়ের জানা ছিল। নিতান্তই মাঝে মাঝে এক-আধদিনের ব্যাপার। আগেও তাই ছিল। এখনও তাই আছে। মাঝে কয়েক বছর প্রায় একেবারেই বন্ধ ছিলো। তখন প্রায় রোজ সন্ধ্যাতেই ঝুমঝুমের ফ্ল্যাট-এ চায়ের আমন্ত্রণ থাকতো। তিতিকে নিয়ে আজকাল ঝুমঝুম বড়ই বিব্রত। তিতির স্বাস্থ্য বড় খারাপ। চোদ্দ বছর বয়স দেখে বোঝাই যায় না। স্বাস্থ্যের মতো তিতির মনটাও বড় দুর্বল। গোটা শরীরের মধ্যে ওর ডাগর ডাগর চোখ দুটোই শুধু চোখে পড়ে। ভাসা ভাসা চোখ দুটোয় সর্বদাই ভয় আর বিহ্বলতা। তিতির ভয়-পাওয়া চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে ঝুমঝুমও বোধহয় ভয়ই পায়। তাই সে প্রত্যয়কে আর আগের মতো সঙ্গ দিতে পারে না। সোমবার থেকে শনিবার সপ্তাহের দুটো দিনই দেখা অবশ্য এখনও হয়। তবে সে দেখা শুধু দেখা হওয়াই। বাড়ি যাবার তাড়াতে সব সময় মনে কাঁটা হয়ে থাকে। তবু রবিবারটাকে নিয়ে ঝুমঝুমের কতো রাগ, কতো অভিমান। ঝুমঝুম যেহেতু সিনে ক্লাব-এর মেম্বার অতএব প্রত্যয়কে প্রায় প্রতি রবিবার সকালেই ওখানে হাজিরা দিতে হবে। সে কিন্তু এতে রাজী নয়। আগে থাকতে পরিকল্পনা করে বন্ধুদের সঙ্গে এদিন সে বার-এ যেতেও রাজি নয়। রবিবার প্রত্যয় সিনেমা যেতেও রাজি আছে, —বার-এ যেতেও তার কোন আপত্তি নেই। শুধু কোন কিছুকে আগে থাকতে ঠিক করতে সে রাজি নয়। একটা দিনও কি তার নিজের বশে থাকতে নেই। যে দিনটার প্রতিটি মুহূর্ত শুধু তার, একান্তভাবে তার।

সোমবার থেকে শনিবার একটা দিনও ঝুমঝুম আজকাল প্রয়োজন ও ইচ্ছামতো মিশতে পারে না। কিন্তু তবু প্রত্যয়ের রবিবারটির প্রতি তার প্রচণ্ড আক্রোশ। তিতি যখন ছোট ছিল, ঝুমঝুম যখন প্রত্যয়কে নিয়মিত সঙ্গ দিতে পারত, তখন রবিবারগুলোর উপর তার এতো চোখ ছিল না। দিনদিন ও যেন বড় অবুঝ হয়ে পড়ছে। এদিকে দেহমনে প্রত্যয়ও অস্থির হয়ে পড়ছে। একটা প্রায় নিয়মিত অভ্যাসের আকর্ষণ বড় তীব্র হয়ে উঠছে। নিষিদ্ধ পল্লীতে যাবার সাহস প্রত্যয়ের নেই। নতুন করে প্রেম করার সুযোগ সুবিধাও তেমন নেই, সোমবার থেকে শনিবারের মধ্যে শনিবারটাই ও ঝুমঝুমকে একটু বেশী সময় পায়, আর তাই দিয়েই প্রত্যয় চেষ্টা করে দেহমনের সব অতৃপ্ততা ও অস্থিরতাকে অস্বীকার করতে।

গতকাল এমনি এক শনিবার ছিল। প্রত্যয়ের সিনেমা দেখার ইচ্ছা ছিল, ঝুমঝুম কিন্তু উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে চাইল। প্রস্তাবটা প্রত্যয়েরও মন্দ লাগেনি, বড় অদ্ভুত আবহাওয়া এখন। বোশেখ মাসের রাত্তিরেও মাথার দিকের জানলা বন্ধ করে শুতে হয়। আকাশে মেঘ আর প্রায় সব-সময়ই। কদিন রাত্রেই পরপর একটানা বৃষ্টি। ফলফলে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভোর-রাত্রে গায়ে চাদর পর্যন্ত টানতে হচ্ছে। গায়ে চাদর টানতে টানতে রবীন্দ্রনাথের 'সার্থকতাহীন বৈশাখী দিন' কবিতাটার মনে পড়ে গেছে প্রত্যয়ের।

এখন বোশেখ মাস। বোশেখ মাসের দুপুর দুটোতেও গড়ের মাঠে ঠাণ্ডা আমেজ। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। ফাঁকে ফাঁকে রোদ মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে তাতেও তেমন তাপ নেই। যেমন প্রথম শীতের মিঠে রোদ।

একটা রেস্টুরেন্টে একটু চা টা খেয়ে

তারা ঘুরতে আরম্ভ করল। চৌরঙ্গীর ফুটপাথ দিয়ে আজকাল হাঁটাও যায় না। ফুটপাথের দুধারেই অস্থায়ী হকার্স স্টল। মাঝে ভিড়ে ভিড়। ঝুমঝুম এটার দাম করছে, ওটা নেড়ে-চেড়ে দেখছে। দু-একটা প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিসও কিনছে। এদিকে ভিড়ের ধাক্কা খেতে খেতে প্রত্যয়ের প্রাণান্তকর অবস্থা।

পার্ক স্ট্রীটটা পেরিয়ে একটু ফাঁকা। ঘুরতে ঘুরতে একসময় ওরা বিড়লা মানমন্দিরের পিছনের মাঠটার কাছে এসে পড়লো। অল্প দূরে পিছনের দিকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। সামনের দিকে কলকাতার সবচেয়ে উঁচু বাড়ি—টাটা বিল্ডিং। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়েছিল পাকাপাকিভাবে রানী ভিক্টোরিয়ার আমলেই। তারই প্রায় পাশাপাশি আধুনিক ভারতের বণিক সমাজের দুই দিকপাল টাটা ও বিড়লা।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল-এর কাছে বেশ ভিড়। সার সার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। এদিকের ভীড়টা একটু পাতলা। মাঠটার চারপাশে তেমন কোন জোরালো আলো নেই। মানমন্দিরের অনুজ্জ্বল আলো মাঠটার অন্ধকারকে আঘাত করে না। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সারাদিনই আজ মেঘের আনাগোনা। অফিস ফেরতা বাবুদের তাড়া নিয়ে অন্ধকার এগিয়ে আসছে। বাদলা পুবে বাতাস বইছে। তবে একেবারে অন্ধকার হয়নি। খুব কাছের মানুষকে বেশ চেনা যায়।

জোড়ায় জোড়ায় সব বসে আছে। একটু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গোটা মাঠটা জুড়ে সবাই বসেছে। অন্ধকার যতো ঘনিয়ে আসছে জোড়ার নর-নারীরাও ততোই ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছে। হাটতে হাটতেই প্রত্যয়ের একটা হাত ঝুমঝুমের কোমরে জড়িয়ে গেছে। হাতের নীচে গুরু-নিতম্বের দোলা।

হঠাৎ প্রত্যয়ের মনে পড়ে গেল অনেকদিনের আগের একটা ঘটনা। কলেজ স্ট্রীটের কাছে একটা রেস্টুরেন্টে বসে একদিন সন্ধ্যায় প্রত্যয় তার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে চা খাচ্ছিল। রেস্টুরেন্টের মাঝখানে কয়েকটা খোলা টেবিল। আর চারপাশে গোটা ছয়-সাত পর্দা-ফেলা কেবিন। প্রত্যয়রা খোলা টেবিলেই বসেছিল। বসে বসে ওরা পদার ফাঁকগুলো দিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিল চা-পানের নামে মধুপান কেমন চলছে। এমন সময় একটি কেবিন থেকে একটি জোড়া বেরিয়ে এলো।

প্রত্যয়ের একজন বন্ধু খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জোড়াটিকে লক্ষ্য করছে জোড়াটি আস্তে আস্তে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যয়দেরও চা-খাওয়া হয়ে গেছে। বেয়ারা বিল আনার আগেই সেই বন্ধুটি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে নিজে থেকেই কাউন্টারে পয়সা মিটিয়ে দিলো। তারপর বন্ধুদের দিকে চোখের ইশারা ছুঁড়ে তাড়াতাড়ি বাইরে পা বাড়ালো। জোড়াটির প্রতি বন্ধুর বিশেষ দৃষ্টি এবং বন্ধুর পরবর্তী আচরণ দেখে অন্য দু বন্ধুও হতক্ষণে কিছু একটা আঁচ পেয়েছে। তখন ছাত্র জীবন। সেই সবে কলেজ পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ ছোঁওয়া।

জোড়াটি ভবানী দত্ত লেন দিয়ে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে চলেছে। এদিকেও বড় রাস্তা প্রায় পাশেই—কলেজ স্ট্রীট, জোড়াটি কিন্তু এদিক দিয়ে না গিয়ে, ওদিক দিয়ে একটু ঘুরে মহাত্মা গান্ধী রোডের দিকে এগুচ্ছে। পেছনে পেছনে প্রত্যয়রা তিন বন্ধু। প্রত্যয় মৃণালকে প্রশ্ন করে—'চিনিস নাকি?'

'না। তবে দেখে মনে হচ্ছে চিনেছি।'

এবার তপন বলে—'ঠিক বুঝলাম না।'

মৃণালের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তখন সামনে এগিয়ে-চলা ছেলে-মেয়েটির দিকে। তাই তার সংক্ষিপ্ত উক্তি—'নাম-ধাম জানি না। ক'দিন আগে এদেরই বোধহয় রিকসায় চাপতে দেখেছি।'

'রিকসায় চাপতে দেখেছিস?' প্রত্যয় এবার দাঁড়িয়ে পড়ে। একজন যুবক-যুবতীর রিক্সা চেপে যাওয়াটা এমনকি আশ্চর্যের ব্যাপার? ট্যাক্সি চাপলে তো কথাই নেই। শুধু পাশাপাশি বসাটাই সেক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। একজনের বুকের উপর অন্যজনের মাথা চাপানো না-থাকাটাই অশোভনতা।

প্রত্যয়ের দাঁড়িয়ে পড়ায় মৃণাল বিরক্ত। জোড়াটিকে চোখের আড়াল করতে চায় না সে। জোড়াটি ওদিকে ডানদিকের গলিতে বাঁক নিয়েছে। একটুখানি গলিটা পেরুলেই মহাত্মা গান্ধী রোড। প্রত্যয়ের হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে মৃণাল বলে—'চল বে শালা, লদগা-লদাগ দেখতে চাস তো তাড়াতাড়ি চালা।'

তিনজনই পা চালায়, তবু চলতে চলতেও তপনের সংশয়—'রিকসায় চাপাটা লদুগ্গে-লদুগি হবে কেন?'

মৃণালের মন বিক্ষিপ্ত। জোড়াটিকে ঠিক চিনতে পেরেছে কিনা বুঝতে পারছে না। তবু তার রসিকতায় ভাটা নেই। প্রত্যয়ের দিকে তাকিয়ে সে বলে—'আকাশে নিশ্চয়ই এখন রোদ নেই।'

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ভবানী দত্ত লেনে আবছা অন্ধকার হামাগুড়ি দিচ্ছে। একটু দূরে রাস্তার ধারে ইঁট পেতে একদল বেদে জাতীয় পরিবার রান্না করছে। ভর সন্ধেবেলা রোদের কথা শুনে প্রত্যয় তাই সত্যই বিস্মিত—'তুই কি আজ দুপুরে বেলা ঠান্ডা-ভাঙ্গ শিকার করেছিস?'

মৃণাল প্রত্যয়ের কথার কোন জবাব না দিয়ে শুধু হাসে। তারপর তপনের দিকে চেয়ে হেসেই বলে—'নিশ্চয়ই বৃষ্টিও পড়ছে না। কিংবা ঠান্ডা কনকনে হাওয়াও নেই।'

কদিন ধরে আকাশে এক ফোটা বৃষ্টি নেই। একমুঠো হাওয়া নেই। ভাদ্র মাসের ভ্যাপসা-পচা-গরমে প্রাণ যায় যায়। তপন তাই মৃণালের দিকে আঙুল উঁচিয়ে প্রত্যয়কে বলে—'কোল্ড বীয়ার-এর নেশা নয় রে, ও বোধহয় গাঁজার নেশা করেছে।'

ততক্ষণে ওরা তিনজনই সরু গলি থেকে বড় রাস্তায় পৌঁছে গেছে। জোড়াটি তখন বড় রাস্তার ট্রাম লাইন পেরিয়ে উত্তরদিকে আর একটা গলির মধ্যে দক্ষিণদিকের ফুটপাথে। গ্রেস সিনেমার একটু পাশে কয়েকটা রিক্সা দাঁড়িয়ে। মেয়েটি একটা রিকসাওয়ালার সঙ্গে দরদাম করছে। মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। ছেলেটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ওর চেহারায় যেন বেশ একটু অপরাধবোধ। নিজের সঙ্কুচিত ভাবটাকে কাটিয়ে ও যেন স্বাভাবিক হয়ে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা করছে নিজেই মনে মনেই।

মৃণাল একদৃষ্টে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। দরদাম নিশ্চয়ই ঠিক হয়ে গেছে। ওরা রিকসায় উঠে বসলো। মেয়েটি উঠে বসতে বসতে রিকসাওলাকে কি যেন বললো। রিকসাওয়ালা মাথার ছাউনিটা টেনে দিল। পেছনের পর্দাটা গোটানো ছাউনির সঙ্গেই লাগানো। ছাউনিটা টেনে দিতেই সেটা স্বস্থানে ঝুলে পড়লো। রিক্সাওয়ালা পাশে গুঁজে রাখা সামনের পর্দাটাও এবার টাঙিয়ে দিলো। তারপর সে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রিকসা তুলতে গেলো। কিন্তু সামনের পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়িয়ে মেয়েটি তাকে কি যেন বলল। রিকসাওয়ালা এবার বিরক্ত মুখে রিকসা নামালো। তারপর জোড়াটির উদ্দেশ্যে কি যেন বললো। ছেলেটি ও মেয়েটি এবার রিকসা থেকে নেমে দাঁড়ালো। রিক্সাওয়ালা রিক্সার আসনের গদিটা তুলে খোলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দুটো ছোট ছোট পর্দা বার করলো। এবং যথারীতি সে দুটো রিকসার দুপাশে আটকেও দিলো। ওরা আবার রিক্সা চাপলো। সামনে-পেছনে, উপরে-পাশে পর্দা ঝুলিয়ে রিক্সা চললো।

ও-ফুটপাথের ধারে পর্দানশীনদের জন্য যখন রিক্সায় পর্দা টাঙানো হচ্ছে, এ-ফুটপাথের উপর তখন আর এক কান্ড। সদ্য রতিক্রিয়া সমাপ্ত একজোড়া কুকুরের করুণ অবস্থা। বিপরীতদিকে মুখকরা একজোড়া কুকুর; একজন অন্যজনের শরীর থেকে প্রায় ঝুলে আছে। শম্ভু চ্যাটার্জি স্ট্রীট থেকে বস্তির একপাল ছেলেমেয়ে গলি থেকে বেরিয়ে এসে ওদের লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়ছে। কুকুর দুটো পালাতে পারছে না, মার খাচ্ছে, কেঁউ-কেঁউ শব্দ করছে।

হো-হো করে হেসে উঠলো মৃণাল।

এবার তিনজনেই একসঙ্গে হেসে ওঠে। তপন তারই ফাঁকে একটা মন্তব্য ছোঁড়ে—'রাস্তার নামটাও আমরা দিয়েছি চমৎকার—মহাত্মা গান্ধী রোড।'

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, টাটা বিল্ডিং আর বিড়লা মানমন্দিরের এই ত্রিবেণী সঙ্গম থেকে মহাত্মা গান্ধী রোড অনেক দূর। পঁচিশ বয়সের সঙ্গে পঁয়ত্রিশে বয়সের ব্যবধানও অঙ্কের হিসেবে দশ বছর আর জীবনের অভিজ্ঞতার হিসাবে আরো অনেক অনেক বেশি। তবু সেদিনকার সেই হাসিটা আজও যেন শুনতে পায় প্রত্যয়। সেই হাসির ধাক্কাতেই তার বাঁ-হাতটা ঝুমঝুমের কোমর থেকে নিজের অজান্তেই আলগা হয়ে নেমে আসতে চায়।

প্রত্যয়ের হাত নেমে আসার আগেই

ঝুমঝুম নিজেই হঠাৎ এক ঝটকায় দু-তিন হাত সরে যায়। প্রত্যয় একটু অন্যমনস্ক ছিলো। তাই ঝুমঝুমের হঠাৎ এভাবে সরে যাওয়ায় ও একটু সচকিত। সামনের একটি জোড়া থেকে একটি পুরুষ ততক্ষণে ওদের সামনে উঠে দাঁড়িয়েছে। পুরুষটির বয়স অন্তত চল্লিশ। মেয়েটি ফ্রক-পরা হলেও আঠারো-উনিশ বছরের নিশ্চয়ই। পুরুষটির চোখে-মুখে ধরা-পড়া ভাব। মেয়েটির স্লিভ-লেস ফ্রকটার তলা হাঁটুর উপর উঠে গেছে। ও তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে বসার চেষ্টায় ফ্রকটা নিয়ে টানাটানি করছে।।

প্রত্যয় এদের চেনে না। ঝুমঝুম পুরুষটিকে প্রশ্ন করে—'বেলা কেমন আছে?'

পুরুষটির গলায় সোনার হার। পানের ছোপ-ধরা দাঁত বার করে সে হাসবার চেষ্টা করে—'ভালোই আছে। তবে এখন নার্সিং হোমে আছে।'

ঝুমঝুমও এবার একটু হাসে। হেসেই বলে—'আবার! এবার ছেলে হয়েছে?'

পুরুষটির কণ্ঠে বিরক্তি—'না। এবারও মেয়ে। এবারটা দেখি, এবারটা দেখি করতে করতে সাত সাতটা মেয়ে হয়ে গেলো—তবুও বেলার ছেলের নেশা বাচলো না!'

ওদের কথাবার্তা প্রত্যয়ের কানে যাচ্ছে। কিন্তু সে তাকিয়ে আছে মেয়েটির দিকে। মেয়েটিও সামলে-সুমলে উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করেই পুরুষটি এবার মেয়েটিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে ঝুমঝুমকে বলে—'এ হচ্ছে বেলার মাসতুতো বোন।' পরিস্থিতির সব কথা চাপা দেবার জন্যই যেন তাড়াতাড়ি বলে—'একদিন যাবেন আমাদের বাড়ি। বাবা-মা এখনও আপনার কথা বলেন।'

ঝুমঝুমও সরে পড়ার সুযোগ খুঁজছে—'যাবো একদিন। মাসিমা-মেসোমশাই ভালো আছেন?'

'আছেন একরকম। বয়স তো দুজনেরই অনেক হলো। একটা-না-একটা অসুখ লেগেই আছে।' ধরা পড়া ভাবটার প্রাথমিক অবস্থাটা কিছুটা কাটিয়ে উঠেছে পুরুষটি। তাই সে একবার ঝুমঝুমের বিধবা সিঁথির দিকে চকিতে তাকিয়ে তারপর প্রত্যয়ের দিকে একটা বাঁকা দৃষ্টি হেনে বলে—'আপনার মেয়েটির বয়স হলো কতো। যেদিন আসবেন সেদিন ওকেও সঙ্গে করে আনবেন।'

ঝুমঝুম তিতির বয়সের হিসেব দিতে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়। সামনের মেয়েটির দিকে চেয়ে একটু তির্যক হেসে বলে—'এর চেয়ে বছর চার পাঁচেকের ছোট।' তারপর দু-এক মুহূর্ত সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মেয়েটির দিকে। সঙ্কুচিত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঝুমঝুম এবার সরাসরি মেয়েটিকেই বলে—'তোমাকে তোমার দিদির বাড়িতে কোনদিন দেখেছি বলে তো ...।'

পুরুষটি এবার তাড়াতাড়ি কথা দিয়ে ঝুমঝুমের কথাটা বাধা দেয়—'ও পাকিস্তান থেকে মাত্র মাস তিনেক হলো এসেছে।' তারপর সবকিছু চাপা দেবার তাগিদে সে বলে—'আমাদের বাড়িতে একদিন আসবেন কিন্তু। ভুলবেন না যেন।'

বিদায় পর্ব শেষ করে একটু সরে আসার পর প্রত্যয় জানতে চায়—'মহাপুরুষটি কে?'

'আগের বাড়িওয়ালার বড় ছেলে।'

আগের বাড়ি অর্থাৎ তিতির বাবা বেঁচে থাকতে ওরা যে বাড়িতে ছিল। প্রত্যয় আবার প্রশ্ন করে—'ওদের দেখে ওভাবে ঝটকা মেরে সরে গেলে কেন?'

ঝুমঝুম প্রত্যয়ের গলার ঝাঁঝ অনুভব করে কিন্তু কথার কোন জবাব দেয় না। প্রত্যয় আবার বলে—'ও'নারা শাস্ত্রী ভক্তপণ্ডিতও আমাদের চেয়ে এমন কিছু পুণ্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন না।'

গোটা মনটায় একটা বিস্বাদ। অনেকদিন বাদে ঝুমঝুমকে এতো কাছে পেয়েছিলো প্রত্যয়। হয়তো আজ ঝুমঝুম শেষপর্যন্ত তার ফ্ল্যাট-এ প্রত্যয়কে চা খেতে ডেকে নিয়ে যেতো। প্রত্যয়ও তো রক্তমাংসের মানুষ। মনের কথা মুখে বলা অসভ্যতা। কিন্তু অন্য মানুষের মনের কথাকে বাদ দিয়ে তো আর মানুষের কথা হয় না। এই মুহূর্তে প্রত্যয়ের ইচ্ছে হচ্ছে এই অন্ধকার মাঠটায় ঝুমঝুমকে জড়িয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু তার উপায় নেই। মাঠ তো দূরের কথা, কোন হোটেলের ঘর ভাড়া করতেও ঝুমঝুম রাজী নয়। ঝুমঝুমের মনটা আজ বেশ হালকা ছিলো। হয়তো তাকে আজ কাছে পেতে পারতো প্রত্যয়। কিন্তু চল্লিশ বছরের ওই রাসকেলটাই সব নষ্ট করে দিলো। আঠারো বছরের একটা মেয়েকে নষ্ট করছিস কর—কিন্তু—ধ্যাৎ—এদিকটায় না এলেই হতো।

ছেঁড়া তারকে জোড়া দেবার চেষ্টা করে প্রত্যয়—'একটু চা খেলে হতো না?'

'বেশ তো চলো না, আমার সঙ্গে যাবে?'

প্রত্যয় নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মেঘ না চাইতেই জল। প্রত্যয়ের চোখের প্রত্যাশায় ঝুমঝুম যেন একটা হোঁচট খেলো। খোঁড়ানো গলায় সে বলল—'তিতি কিন্তু বাড়ি আছে।'

'কেন, কোচিং-এ যায়নি?'

'ওর গলাটা বেশ ব্যথা হয়েছে?'

একটু চুপচাপ। তারপর ঝুমঝুমের কণ্ঠে অস্থিরতা—'আমার বড় ভয় করছে।'

প্রত্যয় এবার একটু বিরক্ত। আহত প্রত্যাশা আস্তে আস্তে রাগে পরিণত হচ্ছে—'সামান্য গলা ব্যথায় এতো ভয় পেলে চলবে কেন?'

ঝুমঝুম বোধ হয় নিজের উৎকণ্ঠাকে ঠিক-মতো প্রকাশ করতে পারছে না—'ওর বাবারও তো গলাতেই—'।

প্রত্যয় একটু ধমকের সুরেই ঝুমঝুমকে থামিয়ে দেয়—'ক্যানসার ছোঁয়াচে রোগ নয়, বংশগতও নয়।'

ঝুমঝুম তবু যেন স্থির হতে পারছে না—'কিন্তু ওই বাড়িওয়ালার ছেলেকে দেখে ভয় করছে।'

'কেন?' প্রত্যয়ের কণ্ঠে অগাধ বিস্ময়।

'ওর স্ত্রীর বাবা আর ভাই-এর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। বেলার বাবা আর ভাই, দুজনেরই ফুসফুসে ক্যানসার হয়েছিল।'

প্রত্যয় একটু চুপ করে থাকে। ঝুমঝুমের জন্য একটু আশ্বাস মনের মধ্যে খুঁজে পাবার অপ্রাণ চেষ্টা করে—'এটা হয়তো নিতান্তই কাকতালীয় ব্যাপার।' তারপর একটু থেমে আবার বলে—'গরম নুন জলে ভালো করে গার্গল করিও।' আবার স্তব্ধতা। দুজনেই যেন দুজনের পক্ষে সহজ কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না। শেষে প্রত্যয়ই আস্তে আস্তে বলে—'তুমি বরং আজ বাড়িই যাও ঝুমঝুম।'

তারপর দুজনেই যে-যার বাড়ি ফিরে গেছে। ঝুমঝুম গিরিশ পার্ক-এর কাছে তার ফ্ল্যাট-এ। প্রত্যয় পাতিপুকুরে তাদের বাড়িতে।

আজ সকালে উঠেও প্রত্যয় দেখেছে আকাশ জোড়া ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, মাঝে মাঝে রোদ। তারপর একসময় সে সিনে ক্লাব-এর কার্ডটা পকেটে ফেলে শ্যামবাজার পোস্ট অফিসের কাছে নির্দিষ্ট সিনেমা হল-এ এসে উপস্থিত হয়েছে।

কিন্তু ঝুমঝুম-এর সঙ্গে দেখা হলো না। ঝুমঝুম নিয়মিত আসে। প্রত্যয় না এলে অনুযোগও করে। আজ কিন্তু ঝুমঝুম আসে নি। বই আরম্ভ হলো। শেষ হলো। ঝুমঝুম কিন্তু এলো না।

শো শেষ হতে আর এক ফ্যাসাদ। হল থেকে দল বেঁধে বেরিয়ে দেখে চিত্রগৃহের প্রধান গেটে তালাবন্ধ। কারুরই রাস্তায় বেরুবার উপায় নেই। শো আরম্ভ হয়েছে দশটায়। আর এগারোটা থেকে এলাকা-তল্লাসীর জন্য পুলিশ ও মিলিটারির যৌথ ঘেরাও। বিধান সরণীর এ ফুটপাতে কর্ডনিং। ও-ফুটপাতে কিন্তু দিব্যি লোক চলাচল করছে। খবর নিয়ে জানা গেছে যে, বেলা একটার আগে ঘেরাও ওঠার কোন সম্ভাবনাই নেই।

দর্শকদের নানা মন্তব্য : শো বন্ধ করে আমাদের জানানো উচিত ছিলো; রবিবার সকালে এভাবে কর্ডনিং করার মানে হয় না; ইত্যাদি ও প্রভৃতি।

প্রত্যয় আবার হল-এ ঢুকে একটা সিটে চুপচাপ বসে পড়ে। শো শেষ হয়ে গেছে। তবু হল কর্তৃপক্ষ ক্লাব কর্তৃপক্ষের অনুরোধে হল-এর আলো-পাখা এখনও বন্ধ করে দেননি।

ঝুমঝুমের কথাই প্রত্যয়ের মনে ভাসছে। আর ঝুমঝুমের কথা মনে পড়লেই গতকাল রাত্রির স্বপ্নটার কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও স্বপ্নটার কোন খেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রত্যয় স্বপ্ন দেখেছে : একটা ফাঁকা মাঠে সে আর ঝুমঝুম কানামাছি খেলছে। তিতি বুড়ি হয়েছে। সে কখনো প্রত্যয়ের চোখ বেঁধে দিচ্ছে, কখনো বা ঝুমঝুমের।

আসলে কাল রাতে ঘুমোবার আগে ঝুমঝুমের কথা সে নিশ্চয়ই অনেক ভেবেছে। ইদানীং কারুর কথাই আর বড় বেশী ভাবে না প্রত্যয়। আজকাল সে যেন কেমন হয়ে গেছে। সে যেন এখন শুধু একটা নিয়মিত অভ্যাস-মাত্র। কাল রাতে কিন্তু ঝুমঝুমকে নিয়ে ভাবতেই হয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় প্রত্যয় বড় রূঢ় হয়ে পড়েছিল। তিতির জন্য ঝুমঝুমের ব্যাকুলতা ওর কাছ থেকে নিশ্চয়ই আরো কিছু বেশী সহানুভূতি আশা করেছিলো। হয়তো কিছু সাহায্য আর সাহচর্যের

প্রত্যাশাও ঝুমঝুমের ছিল। ঝুমঝুমের অনুরোধ সত্ত্বেও তার ফ্লাট-এ না যাওয়াটা খুবই দৃষ্টিকটু হয়েছে। বড় নগ্ন হয়ে পড়েছে তাদের উভয়ের সম্পর্কটা। একমাত্র শরীর-সম্পর্ক ছাড়া আর যেন কোন সম্পর্কই নেই তাদের মধ্যে। অথচ ব্যাপারটা তো আর সত্যি সত্যি তাই নয়।

আজ সকালে ঝুমঝুমকে এখানে দেখতে না পেয়ে ব্যাপারটা আরো বেশী খারাপ লাগছে। অশান্ত মনে অসোয়াস্তির মিছিল। প্রত্যয় আবার উঠে পড়ে। হল থেকে বেরিয়ে আসে। তালাবন্ধ গেটের সামনে আটকে-পড়া দর্শকদের হতাশা, গুঞ্জন আর সিগারেটের ধোঁয়া।

প্রত্যয় পায়ে পায়ে দোতালায় উঠে আসে। ম্যানেজারের ঘরে ম্যানেজার উপস্থিত আছেন। সিনে ক্লাব-এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর গভীর আলোচনা চলছে। স্থানীয় থানায় ফোন করা হয়েছে। আটকে-পড়া দর্শকদের অন্ততঃ ও-ফুটপাতে যেতে দেওয়া চলে কিনা তার চেষ্টা করা হচ্ছে। স্থানীয় থানা থেকে লাল-বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

আলোচনার এক ফাঁকে প্রত্যয় একটা ফোন করার অনুমতি চেয়ে নেয়। ঝুমঝুমের ফ্লাট-এ ফোন নেই। পাশের ফ্লাট-এ একটি অবাঙালী পরিবারে ফোন আছে। একতলার ওষুধের দোকানেও ফোন আছে। প্রত্যয় একটু ভেবে নেয়। তারপর ওষুধের দোকানেই ফোন করে। ওখানে সবাই ঝুমঝুমকে চেনে। ওখানকার একজন কর্মী দোতলায় ঝুমঝুমকে ডাকতে গিয়ে একটু পরে ফিরে এসে জানায়: ঝুমঝুম বাড়ি নেই। গতকাল রাতে তিতির খুব কষ্ট হয়েছে! মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও তার গলা দিয়ে গরম দুধটুকুও নামানো যায় নি। ঝুমঝুম ভোরবেলাতেই একটা ট্যাক্সি করে তিতিকে ভবানীপুরে তার মেজ জ্যাঠার বাড়ি নিয়ে গেছে।

প্রত্যয় ফোন নামিয়ে রাখে। তিতির মেজ জ্যাঠা ডাক্তার। প্রায় পৌনে দুটোয় সিনেমা হল থেকে দর্শকরা ছাড়া পেল। বাড়ি পৌঁছাতে প্রায় আড়াইটা বেজে গেলো। দিনকাল অশান্ত। তাই বাড়ির সবাই উদ্বিগ্ন। সব শুনেও মায়ের অনুযোগ—একটা ফোন করতেও তো পারতিস।'

প্রত্যয়দের বাড়িতে ফোন আছে। খেতে খেতে তাই সে বৌদিকে জিজ্ঞেস করে—আমার কোন ফোন এসেছিল?'

বৌদি কথাটা শুনে অবাক হয়েই বলে—'রবিবার তোমাকে আবার কে ফোন করবে?'

কথাটা সত্যি। খুব বিপদ-আপদ না হলে রবিবার প্রত্যয়কে কেউ খোঁজ করে না। কিন্তু তিতির ব্যাপারটা তো জরুরী। ঝুমঝুম তো অনায়াসে একটা ফোন করতে পারতো।

বিকেল প্রায় সাড়ে পাঁচটায় প্রত্যয়ের ঘুম ভাঙে। চা নিয়ে বৌদি ডাকাডাকি না করলে আরো কতোক্ষণ সে ঘুমোত কে জানে।

বেশ মেঘ করেছে। সাড়ে পাঁচটাতেই বেশ অন্ধকার করে এসেছে। প্রত্যয় ঠিক করে আজ আর কোথাও বেরুবে না। ঝুমঝুম ফোন করতে পারে।

সাতটা অবধি বসে থেকেও কোন ফোন এলো না। প্রত্যয় উঠে পড়ে। পোশাক পাল্টে তারপর এক সময় সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে।

চৌরঙ্গীর পরিচিত একটা বার-এ ঢুকতেই বন্ধুরা সবাই ওকে দেখে হৈ-হৈ করে ওঠে। ওরা প্রায় এখানে রোজই আসে। প্রত্যয়কে পেয়ে ওরা খুবই খুশী। বন্ধু-মহলে দু-একটি নতুন মুখ। পরিচয় হয়। প্রত্যয় চেষ্টা করছে গল্পগুজবে নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে। দু পেগ হুইস্কি, বন্ধুদের হাসি-ঠাট্টা সব কিছুর মূল্যে সে যেন নিজেকে ভুলতে চাইছে। ভুলতে চাইছে কিন্তু ভুলতে পারছে না। নিজের অস্বস্তি-কর অস্তিত্বটা যেন একটা প্রচণ্ড ভারী পাথরের মতো বুকের উপর চেপে বসেছে। হাজার চেষ্টা করেও পাথরটা সে সরাতে পারছে না।

দশটা বাজতেই প্রত্যয় উঠে পড়ে। বন্ধুরা আরো কিছুক্ষণ বসবে। ট্রামের জন্য ট্রাম স্টপে দাঁড়িয়েও একটা খালি-ট্যাক্সি পেয়ে তাতেই সে চেপে বসে। একটা সিগা-রেট ধরায়। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। চিন্তার সুতোগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে। এলোমেলো চিন্তার অসংলগ্ন আনাগোনা। ট্যাক্সি ড্রাইভার এতো রাত্রে এতো সহজে পাতিপুকুরের দিকে যেতে চাইলো কেন? ড্রাইভারের পাশে হেলপার। তার দিকে তাকিয়ে আছে প্রত্যয়। কোন বদ মতলব নেই তো? না, হয়ত ওসব কিছু নয়। হয়ত ওদিকেই ওদের গ্যারেজ। আসল ব্যাপার নেশা হয়েছে। খুব না হলেও হয়েছে।

বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তে, চাকর খুলে দেয়। দোতলার সিঁড়ির মুখেই মা-এর ঘর। দরজা বন্ধ। আলো নেভানো। তাইতাই আর তুলতুল তাদের ঠাকুরমার কাছেই শোয়। ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় মা-এর কণ্ঠ-স্বর ভেসে আসে—'তোর খাবার তোর ঘরেই চাপা দেওয়া আছে।'

'আচ্ছা'। প্রত্যয় নিজের ঘরের দিকে এগোয়। বৌদির ঘরেরও দরজা বন্ধ। তবে জানলার বন্ধ খড়খড়ির ফাঁকে আলোর আভাস। দাদা-বৌদির কথা বলার চাপা আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

জামা-কাপড় ছেড়ে, হাত-মুখ ধুয়ে প্রত্যয় খেতে বসে। খাওয়া শেষ হয়ে গেলেও চুপচাপ বসে থাকে। ঝুমঝুমের কাছ থেকে কোন খবর এলো না। ভবানীপুরে একটা ফোন করবে? কিন্তু ফোনটা তো আবার দাদার ঘরে। তাছাড়া ঝুমঝুমের শ্বশুর-বাড়ির লোকজনদের প্রত্যয় স্বাভাবিকভাবেই একটু এড়িয়ে চলে।

বৌদি দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কতোক্ষণ দাঁড়িয়েছে কে জানে। প্রত্যয় তো একমনে খালি থালার উপর আঙুল বুলিয়ে চলেছে।

'খাওয়া হয়েছে?'

বৌদির উপস্থিতিতে প্রত্যয়ের ঝিমধরা চেতনা খাড়া হয়ে ওঠার চেষ্টা করে—'হ্যাঁ।'

'তুমি বেরিয়ে যাবার পর রাত আটটা নাগাদ ত্রিবেণীর মা ফোন করেছিল।'

ত্রিবেণী, তিতির ভালো নাম। বৌদি বলে চলেছে—'ত্রিবেণীর ডিপথেরিয়া হয়েছে। ত্রিবেণীর মা কাল সকাল আটটার মধ্যে তোমাকে বেলেঘাটার হাসপাতালে অতি অবশ্যই যেতে বলেছে। ওখানেই ওর দেখা পাবে।'

বৌদি এঁটো থালাটা উঠিয়ে নিয়ে যায়। চাকর এসে টেবিলটা সাফ করে চলে যায়। প্রত্যয় হাতমুখ ধুয়ে একটা সিগারেট ধরায়। ঘরের আলোটা নিভিয়ে দেয়। জানলার পাশে এসে দাঁড়ায়।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। ডিপ-থেরিয়া নিশ্চয়ই শক্ত অসুখ। তিতি বাঁচবে তো? ডিপথেরিয়া তো বাচ্চাদের হয়। এতো বড় মেয়েরও হয়?

নিজের মনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রত্যয় চমকে ওঠে। তিতি মাঝখানে না থাকলে কি ঝুমঝুমকে পাওয়া সহজ হবে? মাথাটাকে একটু ঝাঁকিয়ে চিন্তার মোড় ফেরাবার চেষ্টা করে প্রত্যয়। সিগারেটের টুকরোটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তারপর এক সময় সে মশারীর ভেতর ঢুকে পড়ে।

পাতলা নেশা আর আবছা তন্দ্রা এক-সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। প্রত্যয়ের ঘুম পাচ্ছে কিন্তু সে ঘুমোতে পারছে না। প্রত্যয়ের দু'হাতে সময়টা যেন জট-পাকানো সুতোর গুলি হয়ে পড়ে আছে। খেই-হারানো সময়টা দু'হাতে নিয়ে প্রত্যয় যেন একটা প্রকাণ্ড মাঠে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

গতকাল রাত্রের স্বপ্নটাই কি ফিরে আসছে? কিন্তু কই মাঠে তো তিতি নেই। ঝুমঝুমও নেই। তবে কি সে একা? বড় ভয় করছে তার।

একটু লক্ষ্য করে প্রত্যয় বুঝতে পারে মাঠে সে একা নয়। আর একজন আছে। সে আর রবিবার। দুজনেই দুজনকে ধরতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। দিন আর রাত্রির মতোই —চেতনা আর অস্তিত্বের মতোই তারা একে অন্যের পিছনে ছুটছে—শুধু ছুটছে।

অঙ্গনা

লৌকিকতা : একটি ব্যাধি

সেদিন এক বন্ধুর সঙ্গে সপিং করতে যেতে হলো। বিয়ের প্রেজেন্টেশন কেনার জন্যই। এমনিতে আমার পছন্দ খুব একটা সুবিধের নয়। আমার সম্বন্ধে বাজারচলতি এই অপবাদটা আগেভাগেই বন্ধুকে জানিয়ে দিলাম। কিন্তু সে প্রায় নাছোড়বান্দা। আমি যত আপত্তি করি, বন্ধু আমায় তত চেপে ধরে। সে অনেক করে ইনিয়ে-বিনিয়ে বললো যে সামান্য একটাকিছু কিনবে তাতে পছন্দের এমন কোন ব্যাপার নেই। অগত্যা দোকানে যেতেই হলো। কেনাকাটা যে আমার খুব অপছন্দ তা নয়। তবে এ-দোকান আর সে-দোকান করে মাথা খারাপ করা আমার মোটে ধাতে সয় না। বিশেষত, এই বিয়ের প্রেজেন্টেশন। এক দোকানে একবারে পছন্দ করা এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই হয় না। তাই এ ব্যাপারে আমি যথাসম্ভব গা-ঢাকা দিয়ে চলার চেষ্টা করি। কিন্তু এবারে কিছুতেই পারলাম না।

যেতেই হলো। কিন্তু রোগ এবং রুগী এক্ষেত্রেও অভেদ। দোকান থেকে দোকানে ঘুরতে হচ্ছে। কোন জিনিসই বন্ধুর পছন্দসই হচ্ছে না। এদিকে আমার বিরক্তির ব্যারোমিটারে পারা চড়ছে। সে আমাকে মাঝে মাঝে সান্ত্বনা দিচ্ছে, এবার পছন্দ হলে হবে। আর এ তো বেশ খানিকটা ঘোরাও হলো। সেইসঙ্গে কতো জিনিস দেখা গেল। মুখ বুজেই সব শুনে যাচ্ছিলাম। একবার যখন এসেই পড়েছি তখন তো আর কোন উপায় নেই। এবং বুঝলাম যে আমি আগ বাড়িয়ে পছন্দ না করলে ওর আর আজ কেনা হবে না। চুপিচুপি বাজেটটা জেনে নিলাম। তারপর ওকে আর কোন সুযোগ না দিয়ে প্রায় জোর করে একটা জিনিস গছিয়ে দিলাম। দাম চুকিয়ে দুজনে পায়ে পায়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। বন্ধু মুখে কিছু না বললেও মনে মনে বেশ একটু বেজার হলো। দোকান থেকে বেরিয়েই সে বললো, কোণের টেবিল ল্যাম্পটা দেখেছিলে, কি সুন্দর। আমি সেকথায় আমল না দিয়ে বললাম, এটাও উপহারের পক্ষে ভালোই হবে।

একথার পরও বন্ধু একটু মনমরা হয়ে রইলো। এমনিতে ও খুব কথা বলে। কিন্তু এখন নিঃশব্দে পথ হাঁটছে। বুঝলাম, কাজটা ভালো হয় নি। এমনভাবে ওকে জোর করে জিনিসটা গছিয়ে দেওয়া খুব ভুল হয়েছে। এটা ওর পছন্দ নয়। তাই বললাম, চল না হয় সেই টেবিল ল্যাম্পই নেওয়া যাক এটা বদলে। এবার বন্ধু একটু সহজ হলো, আসল কথাটা কি জানিস ওরা আমার দাদার বিয়েতে যে জিনিসটা দিয়েছিল সেটার দাম একটু বেশি। এটা একটু কম দামী হয়ে গেল। তাই ভাবছি যে, বিয়ের পর প্রেজেন্টেশনের লিস্ট মিলাতে গিয়ে যদি কিছু ভাবে।

এতক্ষণে বন্ধুর খুঁতখুঁতুনির মূলে সূত্র আমার বোধগম্য হলো। এই মানুষের এক স্বভাব। যে যা দেবে ঠিক সেরকমটি ফিরিয়ে দেওয়া চাই। একটু উলটোপাল্টা হলেই মুখ ব্যাজার। পাড়াপ্রতিবেশী বা বন্ধুবান্ধব পরম্পরায় সে মন্তব্যটি ঠিক কানে আসবে, আমরা এতো ভাল জিনিস দিলাম আর আমাদের বেলা এমন খেলো জিনিস। দেবার কি দরকার ছিল, বাবা। একেই বলে নেবার বেলা খুব আর দেবার বেলা নেই। কিন্তু খেলো বা কমদামী জিনিস পাবার ক্ষোভে একটা সহজ জিনিস আমাদের বিচারবুদ্ধিতে লোপ পেয়ে যায় যে, নেবার সময় যেমন ফরমায়েস দিয়ে নেয় না তেমনি দেবার সময়েও আবার মিলিয়ে ফেরত চাওয়া হয় নি। এই দেয়া-নেয়ার ব্যাপারটা নিছকই শুভেচ্ছাপ্রণোদিত এবং সামর্থ্য-ঘটিত। একজনের সামর্থ্যে যা কুলোয় অপরজনের পক্ষে তা সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু সেপথে আমরা হাঁটি না। আমরা সোজা কথার মানুষ অর্থাৎ যেমন দেব তেমনি চাই। এতে ত্রুটি হলে সইবো না।

এদিক থেকে আমার শান্তাদি অনেক পরিষ্কার। বিয়েতে দেওয়া-থোওয়ার মধ্যে তিনি নেই। এর সপক্ষে তাঁর যুক্তি হলো যে, আমার যা আয় আমাকে সেরকমভাবে চলতে হবে। কোন বড় বাড়িতে নেমন্তন্ন হলে প্রেজেন্টেশনও সেরকম হওয়া চাই। না হলেই মুখ ভার। তাই এসব ঝামেলার মধ্যে যাওয়ার কোন দরকার নেই। নেমন্তন্ন করেছ তো দিব্যি গুটগুট করে গিয়ে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে খেয়ে আসবো। ছেলের বিয়ে হলে বউ দেখবো আর মেয়ের বিয়ে হলে বর দেখবো। বিয়েবাড়িতে অনেকের সঙ্গে দেখা হবে, তাঁদের সঙ্গে গল্পগুজব করবো। ব্যস, মিটে গেল। তবে জন্মদিন বা অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন হলে টফি-খেলনা দিই। এসবে তাতেই মানিয়ে যায়। কিন্তু বিয়েতে নৈব-নৈব চ। আমি কাউকে কিছু দিতেও চাই না, কারু কাছ থেকে কিছু পেতেও চাই না।

আমরা অনেকেই শান্তাদির মত সমর্থন করবো। কিন্তু সে পথের পথিক হতে পারবো না। তাই পুরেনো পথেই চলতে হয়। প্রেজেন্টেশন অর্থাৎ লৌকিকতা যার অপর নাম এমন একটা বিদঘুটে জিনিস যে আমরা প্রায় অধিকাংশই একে সহ্য করতে পারি না অথচ এড়িয়েও চলতে পারি না। নেমন্তন্ন খেতে কার না ভালো লাগে? কিন্তু সব আনন্দ মাটি হয় এই এক চিন্তায়। নেমন্তন্নের চেয়ে লৌকিকতাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। এ যেন সেই উপলক্ষ্য, আসলকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। বিয়েটা যেন উপলক্ষ্য, লৌকিকতাই হলো আসল। অথচ নেমন্তন্নের চিঠিতে পরিষ্কার লেখা থাকে, লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়। কিন্তু কার্যকালে বোঝা যায় যে, প্রেজেন্টেশন ছাড়া আশীর্বাদ অর্থহীন। তাই ইদানীং কেউ কেউ মন্তব্য করে থাকেন যে, বিয়ে খাওয়ার যে খরচ তাতে বাড়িতে দু-একদিন বেশ ভালোভাবে সবাই মিলে খাওয়া হতে পারে। লৌকিকতা যেরকমভাবে আমাদের অত্যাবশ্যক প্রথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাতে দিনে দিনে যে এই মানসিকতা আরো বৃদ্ধি পাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আগাগোড়া কিন্তু এরকম কোন নিয়ম চালু ছিল না। ঠাকুমা-দিদিমার মুখে যা শোনা যায় তা থেকে যে, সে সময় বিয়ে-বাড়িতে জ্ঞাতিভোজনই প্রাধান্য পেত। এর সঙ্গে কাছে-দূরের আত্মীয়-স্বজনরা অবশ্যই থাকতেন। তবে বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। গ্রামকেন্দ্রিক সেদিনের সংস্কৃতিতে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনরা দু-চার গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো। খাওয়া-দাওয়ার ঘটা ছিল খুব তবে আজকের মতো জৌলুস ছিল না। আই-টেমের এতো প্রাচুর্য ছিল না। সাদাসিধে খাওয়া। মনের আনন্দে সবাই খেয়ে নব-দম্পতিকে আশীর্বাদ করে চলে যেতো। সেদিন নেমন্তন্নের চিঠিও ছিল না, আর তার নীচে লেখাও থাকতো না, লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়। লৌকিকতার তেমন চলই তখন ছিল না এখন যেমনভাবে সকলকে স্পর্শ করেছে। লৌকিকতা যা ছিল তা একান্ত আপনজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সকলের জন্য ছিল শুধুই নিমন্ত্রণ আর পরিবর্তে আশীর্বাদ।

পরবর্তী সময়ে লৌকিকতার আমদানী ঘটে। কিন্তু তাও ছিল একেবারে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিয়েবাড়িতে সবাই মিলে খেতেন। নতুন বউকে আশীর্বাদ করতেন একটি বা দুটি টাকা দিয়ে। কৃষি-ভিত্তিক জীবন যখন ক্রমেই শিল্পমুখীন হচ্ছিল তখনই এই রূপান্তর ঘটে। এর আগে

বিয়ে বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রিতদের কোন খরচ ছিল না বরং পুরোটাই লাভ। এরকম টাকা দিয়ে বিয়েবাড়িতে জ্ঞাতিভোজনের রেওয়াজ এখনো সীমিতভাবে প্রচলিত আছে। তবে এই লৌকিকতার উত্তাল স্রোতে তা কতদিন টিকবে সেকথা বলা শক্ত।

তাই বিয়েবাড়ির নেমন্তন্ন আজ আর শুধু একটা মজার ব্যাপার নয়। বরং রীতি-মতো লড়াইয়ের ময়দান। এই লড়াই হলো মর্যাদায় যা নিরূপিত হয় প্রেজেন্টেশনে। আমার জানাশোনা একটি বাড়ির কথা এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে। তাঁদের বাড়িতে কোন নেমন্তন্ন হলেই খেরোবাঁধানো লাল একটি জাবেদা খাতা বের করে দেখতে বসেন তাঁদের বাড়িতে ওঁরা কি ধরনের জিনিস দিয়েছিলেন। তার উপর নির্ভর করে লৌকিকতা। এই খাতায় তাঁরা এ পর্যন্ত কাদের কাদের নেমন্তন্ন করেছেন এবং কি কি পেয়েছেন তার সম্পূর্ণ হিসেব তোলা আছে। তেমনি আবার কে কে নেমন্তন্ন করেছেন এবং তাঁদের কি কি দিয়েছেন তাও লেখা আছে। যদি নেমন্তন্ন নতুন হয় তবে নিমন্ত্রিতের নাম সে খাতায় উঠবে এবং তাঁর আর্থিক ও সামাজিক অবস্থানুযায়ী লৌকিকতা ধার্য হবে। এই নিয়ম সে বাড়িতে অনেক দিন ধরেই চলে আসছে। আর খাতাপত্র না রাখলেও আমরা অনেকেই এই নিয়ম অনুসরণ করে চলি।

লৌকিকতা আমাদের অনেকের পক্ষে নিদারুণ অত্যাচার বিশেষ। গায়েগতরে অত্যাচার হলে তবু প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ করা চলে। কিন্তু এক্ষেত্রে চুপচাপ মুখ বুজে সয়ে যেতে হয়। মাঝে মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য মুখ খোলেন তবে একান্তে সঙ্গোপনে। এই তো আমাদের পাশের বাড়ির গিন্নি সে-দিন বলছিলেন, আর পারি না ভাই, এমাসে চারটে বিয়ের নেমন্তন্ন। এসব তো আর নেমন্তন্ন নয়, টাকার শ্রাদ্ধ। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর এসেছিলেন গল্প করতে। বিয়ের নেমন্তন্নের কথা উঠতেই তিনি মনের ভাব প্রকাশ করে দিলেন। এরকম অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই কমবেশি আছে। কোন না কোন সময়ে বিরক্তিবোধ হলে মনের কথা আমরা এমনিভাবে প্রকাশ করে ফেলি। কিন্তু এই প্রথার সরাসরি বিরোধিতা করার সাহস আমাদের নেই। কেউ যদি কারো বিয়েতে কিছু না দিয়ে খালি হাতে খেতে যান তবে তাকে টিটকিরি শুনতে হয়। তাকে কেন্দ্র করে ঘরে-বাইরে মস্করা আরম্ভ হয়ে যায়।

কিছুদিন আগে আমার এক বন্ধুর বোনের বিয়ে হলো। আমাদের পাঁচজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে সে নেমন্তন্ন করলো। দীর্ঘদিন ধরেই তার বাড়িতে আমাদের সকলের যাতায়াত। তার বিবাহপরবর্তী জীবনে ঠিকানাটা শুধু বদলেছে। বাপের বাড়ির বদলে বরের বাড়ি। পরিচয় এতো নিবিড় যে বিয়েতে সবাইকে যেতেই হবে এবং যাওয়ার ব্যাপারে কারো অমতও নেই। কিন্তু গোল বাধলো প্রেজেন্টেশন নিয়ে। সবাই একমত হতে পারলাম না। প্রেজেন্টেশনের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে আমরা চার বন্ধু দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গেলাম। একজন নিরপেক্ষ। সে দুদিকেই আছে। তবে প্রেজেন্টেশন দেওয়ার পক্ষেই তার ঝোঁক বেশী। এবং সে একটা মধ্যস্থতাও করলো, এবারের মতো দেওয়া হোক। এরপর অন্য চিন্তা করা যাবে। প্রেজেন্টেশন কেনার ভার সেই নিলো। তবু শেষরক্ষা হলো না। কমদামী জিনিস কেনা হয়েছে এজন্য একজন বিয়েতে যেতে রাজি হলেন না এবং তাঁকে রাজি করানোও গেল না। অবশেষে তাঁকে বাদ দিয়েই আমাদের যেতে হলো।

লৌকিকতার অত্যাচারে আমরা সবাই অতিষ্ঠ। তবু এর কোন বিহিত করা সম্ভব হচ্ছে না শুধু এ কারণেই। একজন বিরোধিতা করেন তো অপরজন সমর্থন করেন। লৌকিকতার সঙ্গে আমরা এক অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছি। তাই এর হাত থেকে কোনরকমেই নিস্তার পাচ্ছি না। সংসার খরচ কাটছাঁট করেও এদিকটা বজায় রাখতে হচ্ছে। প্রতিমাসে যদি তিন চারটে বিয়ের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে হয় তবে এছাড়া কোন পথও নেই। কারণ, আয় তো আমাদের একই এবং তার মধ্যেই চলতে হবে। তাই কাটছাঁট করেই চলতে হবে। নিজে কষ্ট করেও লৌকিকতা রাখতে হবে।

এতো কষ্ট করে যে প্রেজেন্টেশন দেওয়া হলো সে নিয়ে কাটাকাটি তো হয়ই আবার অনেক সময় জিনিসপত্রের সদ্ব্যবহারও হয় না। প্রেজেন্টেশন পাওয়া টেবিল ল্যাম্পের ডাণ্ডা দিয়ে ছেলে পিটানোর গল্প অনেকেরই জানা। এ সম্পর্কে জনৈক গৃহস্থবধূর উক্তি খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন যে, ভালবেসে উপহার দিয়েছে ব্যবহার করার জন্যে। তা একরকমভাবে ব্যবহার করলেই হলো। হয় আলো জ্বালিয়ে না হয় ছেলে ঠেঙিয়ে।

আবার এক ভদ্রমহিলাকে দেখেছিলাম প্রেসার কুকারের বাটিতে শাড়ি রাখতে। আমি বিস্ময় প্রকাশ করতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, তাতে কি হয়েছে? একরকম ব্যবহার হলেই হলো। প্রেসার কুকার সম্বন্ধে তাঁকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। রান্নাবান্না কত সহজে এবং চটপট হয়ে যায় সেকথা বুঝিয়ে বললাম। পরিশেষে একদিন প্রেসার কুকারে মাংস রান্না করে খাওয়ার পরামর্শ দিলাম এবং তাহলেই যে এর রহস্য তাঁর বোধগম্য হবে সেটাও যোগ করলাম। সব শুনে তিনি বললেন ঠিক একদিন করে দেখা যাবে তুমি যখন বলছ। তাঁর এই উত্তর শুনে মনটা আরো খারাপ লাগলো। টেবিল ল্যাম্প আর প্রেসার কুকারের অপব্যবহার এক পাল্লায় বিচার করা যায় না। টেবিল ল্যাম্পের অপব্যবহার সম্ভবত এই বস্তুটির প্রাচুর্যের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু প্রেসার কুকার সম্বন্ধে একথা ভাবা যায় না।

আসল কথা হলো যে, প্রেজেন্টেশন সংক্রান্ত উত্তেজনা বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে থিতিয়ে আসে। শাড়ি গয়না বাদ দিয়ে বাদ-বাকি বস্তুর কি গতি হলো সে সম্বন্ধে অনেকেই উৎসাহী নন। তাছাড়া প্রেজেন্টেশনের জিনিসপত্র নতুন বউয়ের অধিকারে। তার ইচ্ছেমতো সে সব জিনিস ব্যবহার করবে। তবে সবকিছুর ব্যবহার যে তাকে শিখিয়ে দেওয়া দরকার সে কর্তব্যটুকুও কেউ কেউ পালন করেন না। তাই প্রেসার কুকার ভাত রাখার বাসনে পরিণত হয়।

লৌকিকতার মধ্যে একটা স্বাস্থ্যকর সিমটম ইদানীং নজরে পড়ছে তা হলো বই উপহার দেওয়া। এই রেওয়াজটা মাঝখানে প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। বই সবচেয়ে উপহার দেওয়া যায় এবং যে কোন উপলক্ষে। বিয়ের লৌকিকতায় যদি বই সম্মানের আসন লাভ করে তবে খুব একটা আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। শাড়ি ক্ষণস্থায়ী, গয়নাগাটি অসময়ের বন্ধু আর বই সব সময়ের বন্ধু। এই বন্ধুত্ব যত দৃঢ় হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু অনেকেই প্রেজেন্টেশনে বইয়ের কৌলীন্য স্বীকার করেন না। আবার অনেকের দিতেও আপত্তি। মনোভাব এরকম যে, বই কি একটা দেওয়ার যোগ্য, না দিলে মান থাকে?

এই মান রাখতে গিয়ে প্রাণ যাবার দাখিল। লৌকিকতার তুলনা সম্ভবত একমাত্র পণপ্রথার সঙ্গেই চলতে পারে। পণ দিতে না পারলে একসময়ে মেয়ে ছিল অচল। পণের টাকা জোগাড় করতে না পেরে এক সময়ে মেয়ের বাবাকে কি দুরবস্থায় পড়তে হতো সে অনেক কাহিনীই আমাদের জানা। এখনো এ প্রথা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। নানাপ্রকারে পণপ্রথা আজো টিকে আছে। যদিও আইনত পণ গ্রহণ দণ্ডনীয়। লৌকিকতা এখন সেই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রেজেন্টেশন ব্যতিরেকে বিয়ে বাড়ির দরজা নেমন্তন্ন থাকা সত্ত্বেও কার্যত বন্ধ। এটা হলো নেমন্তন্নবাড়ির ছাড়পত্র। একসময়ে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে দক্ষিণা দেওয়ার রীতি ছিল আর এখন সবাইকে লৌকিকতার ছদ্মনামে মানানসই দক্ষিণা দিয়ে নেমন্তন্ন খাওয়ার অধিকার অর্জন করতে হয়। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

—প্রমীলা

ট্রামে-বাসে প্রেম

প্রেম স্বর্গীয়, সুন্দর। অথচ সেই প্রেমের জ্বালায়ই একদিন ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়েছিল, মার্ক এন্টনির বিশাল রোম সাম্রাজ্য অবহেলা করেছিলেন। যুগ যুগ ধরে ইতিহাস প্রেমের যশোগাথায় মুখর। আসুন না আমরাও একবার ট্রামে-বাসে সেই প্রেম-রসে অবগাহন করি।

আচ্ছা, আপনিই বলুন তো আজকাল-কার মেয়েরা কি আর ট্রামে-বাসে, পথে-ঘাটে পুরুষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে, ছায়া এড়িয়ে চলতে পারে না পারে? এতে নিশ্চয়ই কারু দ্বিমত নেই। তবুও মেয়েরা এত মানিয়ে চলার মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়, ভুরু কুঁচকে বয়স্ক মানুষ তরুণ বা জোয়ান ছোকরার দিকে তাকায়। আর এরাই ভুরু কোঁচকানোর পাল্টা জবাব দিতে চেষ্টা করে ভাবলে কি রকম অবাক লাগে। আমরা নাকি দিনকে দিন সুসভ্য হচ্ছি।

'কখনো এমন ঘটবে সেও কি আমার সামনে, আশ্চর্য!' আক্ষেপ করেছিল আমার এক বান্ধবী। ওর মুখেই শোনা। পরপর দুদিন এক আধবয়সী বুড়ো প্রেম জানাতে গিয়ে কেমন নাজেহাল হলেন, ভাবলেও কেমন কৌতুক হয়।

বছর আঠারো কি কুড়ি একটি কলেজের ছাত্রীকে বাধ্য হ'য়ে ভীড় বাসে উঠতে হয়। চেহারাটি টিপটাপ, সাজের আধিক্যও যেমন নেই, তেমনি কমতি একটুও হয়নি। যেখানে যেমনটি দরকার তাই আছে। মেয়েটি তো মানুষজন ভরা বাসে ঠেলাঠেলি ক'রে উঠে যতদূর সম্ভব লেডিজ সীটের গা ঘেঁসেই দাঁড়ায়। তাতে অবশ্য অসুবিধে বেশী ছিল না। কিন্তু যত গণ্ডগোল ঐ নামার সময়েই।

মেয়েটি নামার জন্য গেটের কাছে এগিয়ে যেত একরকম প্রায় কুস্তি-লড়ে কিন্তু ফুটবোর্ডটাই যত গোল বাধাতো। মেয়েটির এক পা ফুটবোর্ডে, অন্য পা মাটিতে সবে নেমেছে, কনডাকটার ঘণ্টি মারতে প্রস্তুত অমনি আধ-বয়সী বুড়ো লোকের জামার বোতাম মেয়েটিকে যেতে নাহি দেব বলে চুল ধরে টেনে রাখতো। লোকটি মুখে একটু চুকচুক শব্দ তুলে চুল খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়তো।

বাসসুদ্ধু অফিস যাত্রী। কয়েক মিনিটের দেরিতে তাদের নামের পাশে লাল কালির আঁচড় পড়বে তাই তাঁরা হৈ-হৈ শব্দ তুলতেন অসভ্য ঘটনা যা বলে। ঘটনার কাছাকাছি উপস্থিত দর্শক মুচকি মুচকি হেসে পরে গোটা বাসে আসল কাহিনীটা রসিয়ে রসিয়ে চাউর করতেন। মেয়েটি অপ্রস্তুত মুখ নিয়ে নেমে যেত। আধবয়সী বুড়ো লোকটি খানিকটা ফোকলা দাঁতের হাসিতে চমচমের রস গেলার মত উপভোগ করতো। ঘটনা ঘটল পরপর তিনদিন। এই একটি কলেজের মেয়েকে কেন্দ্র ক'রে কি আধবয়সী বুড়োর প্রেম জেগেছিল?

জেগেছিল, কিংবা চেষ্টা হচ্ছিল সেটা পরে জানা গেল। চতুর্থ দিনে মেয়েটি বোধহয় প্রস্তুত হ'য়েই ছিল। যেই মাত্র তার চুলে টান পড়েছে অমনি সে হ্যাঁচকা টানে চুল ছাড়িয়ে নিল সংগে খুলে নিল জামার বোতামগুলো। মেয়েটি তো তরতর করে ফুটপাত ধরে এগিয়ে চললো। বুড়ো বেচারার জামাটার সামনেটা হা-হা করে খুলে গেল। মনে হল, বুড়োর ফোকলা দাঁতের হাসিটা বুকে এসে জমাট বেঁধে হা ক'রে রইল। এবার নাটকের নায়ককে নিয়ে বাসে হাসির হুল্লোড় উঠলো। পাশ থেকে মন্তব্য করলো, 'দাদু এ-লাইনে কতদিন হ'ল, এবার এসব ছাড়ুন।'

মনে মনে বুড়ো নিশ্চয়ই ভেবেছিল প্রেমের বড় জ্বালা। ছাড়বো বললেই তো ছাড়া যায় না। তবু এ একটা সান্ত্বনা রইল আমার জামার বোতামগুলো মেয়েটা নিশ্চয় গুছিয়ে রাখবে।

সেদিন যা ঘটলো সেটা তো খোলা-খুলিই হ'ল। কিন্তু এরপর থেকে যে আধ-বুড়োকে আর বাসে-ট্রামে ঐ রুটে কোথাও দেখা গেল না। সে কি আবার নতুন করে কোথাও প্রেম জমালো?

আর একবার এক সুদর্শনা তরুণী বাসে উঠেই ঘামতে আরম্ভ করতো, যে মুহূর্তে ওর চোখ পড়তো বিশেষ কোন ব্যক্তির দিকে। এ এক খামখেয়ালী সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। যুগ-যুগ ধরে মানুষ একে অপরকে ঈর্ষা করে, খুন করে, জালিয়াতি করে ধন-সম্পত্তি, প্রতিপত্তির জন্য। প্রেমের জন্যও যে করে না সেটা আমি বলছি না তবুও প্রেম তখনি সৌন্দর্য আনে, যখনই দুজনের বোঝাপড়া স্বাভাবিক হয়। একতরফা মানুষ কতদিন খরচ করতে পারে। কিন্তু এ ঘটনা সম্পূর্ণ এই নিয়মের বিপরীত।

সুদর্শনা যেই বাসে উঠতো, অমনি বাসের এক কোণ থেকে বছর সাঁইত্রিশ আটত্রিশ বছরের একটি লোক বেশ কায়দা করে আস্তে আস্তে ভীড় সরিয়ে মেয়েটির প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়াতো। সুদর্শনা সম্ভবতঃ স্বল্পভাষী, তাই এত উৎপাতেও কোন শব্দ করতো না। শুধু মুখের বিরক্তিটুকুই প্রকট হ'য়ে উঠতো। তাতে লোকটি হয়তো ভেবেছিল মেয়েটির এটিতে নিশ্চয়ই মৌন সম্মতি রয়েছে। কনডাকটার হাত বাড়াতে লোকটি দুটো টিকিটের দাম তার হাতে ফেলে দিয়ে পরিতৃপ্তির হাসি হাসতো। মেয়েটিকে ফিসফিস করে জানিয়ে দিত যে তার টিকিট কাটা হয়েছে। মেয়েটি গো-বেচারার মত মুখ করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকতো। এমনি করে চললো বেশ কিছুদিন। জানি না এটা আর কার কার নজরে পড়েছিল। আমি কিন্তু রোজ আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করতাম এর শেষ কোথায় দেখার জন্য।

একদিন সুদর্শনা ওরই প্রায় সমবয়সী একটি ছেলেকে নিয়ে বাসে উঠলো। লোকটি খেয়াল করেছিল কিনা জানি না। সম্ভবতঃ নয়। তাহলে বোধহয় সবার সামনে এতটুকু আঘাতটা স্বেচ্ছায় বরণ করতো না। লোকটি যথারীতি কণ্ডাকটারের দিকে দুটি টিকিটের পয়সা দিতেই সেই ছেলেটি লোকটির হাত খপ্ ক'রে ধরে ফেলে বেশ মজা করেই উচ্চস্বরে বললো। 'আজকে দুটো নয়, আমারটাও কাটতে হবে।' হায়রে অবোধ মন এতদিন কি এরই প্রতীক্ষা করছিল!

লোকটি একেবারে বোবা হ'য়ে গেল। ওর সাজানো বাগান নিমেষে শুকিয়ে গেল। প্রেমের উজ্জ্বল আলোতে কে যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে মসীলিপ্ত করে দিল। লোকটির মুখ হ'য়ে উঠলো বাতাসহীন আঁধারের মত থমথমে।

এতো গেল বিরহের কথা, বিচ্ছেদের ব্যথা। চলতি পথে এমনি কত কত প্রেমের সূচনা দেখলাম, শেষ শুনলাম তার [illegible] লেখাজোখা নেই।

এবার কাহিনীর নায়িকা অল্প বয়েসী, নায়কও তথৈবচ। কিশোর মনের প্রেম, সহজেই সাড়া দিল। কিশোরীটি বাসে বসে সাপ্তাহিক পত্রিকার পাতা ওলটাতো। ছেলেটিও সেই পত্রিকা চেয়ে নিয়ে প্রেমের সূত্রপাত ঘটালো। মাত্র দিনকয়েকে ওরা প্রেমে হাবুডুবু খেল, সন্ধ্যার আবছা আঁধারে গায়ে গা লাগিয়ে খোলা মাঠে উদার মনে গল্প করতো। ওদের পরিণতিটা নিশ্চয়ই সুখের হয়েছিল।

ট্রাম-বাসে প্রেমের পরিণতি নিয়ে কজনই বা মাথা ঘামায়। জনা-কয়েক আছেন যারা যে কোনভাবে প্রেম জানিয়ে মেয়েদের উত্যক্ত করতেই ভালবাসেন। অথচ স্থান, কাল ভুলে সীমার বাইরে হাত বাড়াতে গিয়েই যত গণ্ডগোল।

অঞ্জলি চৌধুরী

বীরভূমে অশনি সংকেত ছবির আউটডোর স্যুটিং-এ পরিচালক সত্যজিৎ রায় একটি দৃশ্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন ববিতাকে (বাংলা দেশ)। ফটো : অমৃত

পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে

পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র, তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় গেল মঙ্গলবার, ৮ আগস্ট স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার সপ্তাহব্যাপী যে দেশাত্মবোধক ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত বাঙলা ও হিন্দী ছবির বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন, সেই সম্পর্কে একটি সাংবাদিক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন তাঁরই কক্ষে। কথায় কথায় বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্কটের কথা উঠে পড়াতে শ্রীমুখোপাধ্যায় বলে উঠলেন : পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্পকে সাহায্য করতে আমরা বদ্ধপরিকর এবং এর জন্যে পক্ষকালের মধ্যেই আমরা চলচ্চিত্র উন্নয়ন পরিষদ (ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বোর্ড) গঠন করছি। বাংলা ছবির মুক্তিলাভের অসুবিধা দূর করবার জন্যে আমরা কলকাতা শহরে তিনটি জোড়া-হাউস (বোম্বাইয়ের বাদল বিজলী, গঙ্গা যমুনা, অপ্সরা অলংকার প্রভৃতির অনুকরণে) তৈরী করব এবং পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি বাছা বাছা জায়গায় আরও সাতটি। আমাদের মনে হয়, বাংলা ছবিকে আরও 'কমার্শিয়ালাইজড' করতে হবে। এখানে এ-কথাটির অর্থ হচ্ছে, আরও জনপ্রিয় হতে হবে এবং তা বাঙলা ছবির ধারাতেই, হিন্দী ছবির অনুকরণে নয়। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে হিন্দী ছবি করবার জন্যে আমরা প্রতিজন প্রযোজককে এক লাখ টাকা করে উৎসাহ-জ্ঞাপন সাহায্য (ইনসেন্টিভ) দেবার কথাও ভাবছি।'

লোকসভার অন্যতম সদস্য ও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির (শাসক) সম্পাদক প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর প্রস্তাব হচ্ছে : কলকাতায় স্থানীয় ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন স্থাপন করা, যার মাধ্যমে ছোট ছোট প্রযোজকরা সাহায্য পাবেন, পরীক্ষামূলক প্রয়াস রূপায়িত হবে। সরকার উদ্যোগী হয়ে কলকাতায় নিজস্ব কিছু হাউস করে ছবি চালাতে পারেন। একটা কলার (রঙীন) ফিল্ম ল্যাবরেটরী নির্মাণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কলকাতার স্টুডিওগুলিতে আধুনিক প্রক্রিয়ার যন্ত্রপাতি বসানোর ব্যবস্থা করা, যাতে কলা-কৌশলের বিভিন্ন বিভাগে উন্নতি ঘটে। কলকাতার স্টুডিওগুলিতে হিন্দী ছবি তোলার ব্যবস্থা হোক। বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের ফিল্ম ডিভিশনের মাধ্যমে যে-সংখ্যক ডকুমেন্টারী চিত্র নির্মাণ হয় সেগুলি রাজ্যভিত্তিক ভাগ করা যেতে পারে—সমহারে। এখন শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগ পাচ্ছে বম্বে এবং মাদ্রাজ। কিছু সংখ্যক এখানে নির্মিত হলে বেশ কিছু কলাকুশলী কাজ করতে পারেন ।

শ্রীদাসমুন্সী নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি চান। সেই কারণেই উপরে লিখিত তাঁর ছটি প্রস্তাবের মধ্যে প্রথম ও শেষেরটিকে একটু পরিবর্তিত আকারে দেখতে চাই। কেন্দ্রীয় ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের হেড অফিস যেমন বোম্বেতে আছে, তেমনই থাকুক। কিন্তু এই সংস্থার পূর্ব-ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় শাখা যথাক্রমে কলকাতা ও মাদ্রাজে অনতিবিলম্বে স্থাপিত হওয়ার দাবী জানাচ্ছি। বোম্বাই প্রধানত সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ছবি করে এবং ওখানকার চলচ্চিত্র প্রযোজনার কর্মকাণ্ড একটি বিশেষ ধারায় প্রবাহিত হয়। তার থেকে কলকাতা ও মাদ্রাজ কেন্দ্রের ধারা অন্যতর, বিশেষ করে কলকাতা বেশীর ভাগই আঞ্চলিক ভাষায় ছবি নির্মাণ করে। সেই কারণে কলকাতার প্রযোজকদের চাহিদা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করা, তাদের প্রস্তাবের যাথার্থ্য নিরূপণ করা প্রভৃতির জন্যে কলকাতায় শাখা স্থাপন করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। মনে রাখতে হবে, ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। কাজেই পশ্চিমাঞ্চলের প্রযোজকদের মত পূর্বাঞ্চলের প্রযোজকদেরও তার সাহায্য প্রত্যাশা করবার ন্যায্য অধিকার আছে এবং তা ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ হতে পারে কলকাতায় একটি পূর্বাঞ্চল শাখা প্রতিষ্ঠিত হলে, তবে

দেখতে পাচ্ছি, আর রত্না চট্টোপাধ্যায় রূপা সেন নাম ধারণ করে 'প্রেম' পত্রিকার প্রতিনিধিরূপে সুশান্ত মুখোপাধ্যায়ের ইণ্টারভিউ নিতে নিতে তার প্রেমে হাবুডুবু খান। 'বহুরূপী' ছবির কাহিনীতে অস্বাভাবিকতা অনেক।

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, বিজয় ভট্টাচার্য, ভারতী দেবী, মধুচ্ছন্দা, রুমা বসু প্রভৃতি সকলেই বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অপেক্ষিকতর কৃতী শিল্পী। কিন্তু আসল কাহিনীটি যদি দুর্বল হয়, তার চরিত্রগুলি যদি মেরুদণ্ডহীন মেকী হয়, তাহলে নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ কোথায় তাঁদের? সারা আকাশ-খ্যাত মধুচ্ছন্দার চলচ্চিত্রোপযোগী রূপ আছে, তার গুণও যে আছে, তারও আভাস পাওয়া গেল জোহরার ভূমিকাভিনয়ের ভিতরেই। আশা করব, বলিষ্ঠ কোনো চিত্রে যোগ্যতর পরিচালকের অধীনে তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মোটামুটি ভালো।

একটি প্রচারধর্মী কাহিনীচিত্র

নয়া সংসার নিবেদিত এবং খাজা আমেদ আব্বাস রচিত প্রযোজিত ও পরিচালিত "দো বুন্দ পানী" ছবিটিকে যদি সরকারী প্রকল্প রিহান্দ ডাম প্রোজেক্ট-এর অনুকূলে একটি প্রচারচিত্র বলা যায়, তাহলে তা যেমন সর্বাংশে সত্য ভাষণ হবে, তেমনই একথাও দিবালোকের মতোই সত্য যে, 'দো বুন্দ পানী'র মধ্যে প্রচারটাই বড়ো নয়, প্রচারের ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও ছবিখানি কাহিনী-চিত্র হিসেবে যথেষ্টই সার্থক। ছবিটিকে 'জাতীয় সংহতি' বিষয়ে ১৯৭১-এর শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে জাতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়েছে; কিন্তু ছবিটির জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়ক রূপটিই আমাদের চোখে বেশী করে ধরা পড়েছে।

রাজস্থানের যে-অংশ ঊষর মরুভূমি, সেখানেও মানুষ বাস করে এবং তাদের নিত্যকার জলের চাহিদা মেটাতে তাদের মেয়েরা দশ-বারো মাইল পথ অতিক্রম করে জলসংগ্রহ করে ফেরে। জলের এত অভাব কিন্তু তাদের গ্রামছাড়া করতে পারে না। এমনই এক গ্রামে বধূরূপে এল কিছুটা শিক্ষিতা সুন্দরী গৌরী। গৌরীর স্বামী, ঠাকুর সিংয়ের ব্যাটা গঙ্গা কিন্তু বর্ণজ্ঞানবর্জিত, তার অনূঢ়া ভগ্নী সোণিও তাই। একদিন গ্রামে এল সরকারী ট্যুরিং সিনেমা। তাতে সবাই মিলে দেখল—রিহান্দ ডাম প্রোজেক্ট-এর অনেকখানি রূপায়ণ; তারই এক অংশে এক নবীন ইঞ্জিনীয়ার যেন দর্শকদেরই অনুরোধ করছে—ঐ প্রকল্পে কর্মী হিসেবে যোগদান করবার জন্যে। গৌরী গঙ্গাকে অনুরোধ করল এই প্রকল্পে যোগ দেবার জন্যে; তলওয়ার দিয়ে নিজের আঙুল কেটে রক্ততিলক তার কপালে এঁকে তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল, গাঁয়ে জল আসবার পথ উন্মুক্ত না করে সে গ্রামে ফিরবে না।

এরপর চলল উভয় পক্ষের কঠোর সাধনা। একদিকে গঙ্গা নিজের চেষ্টায় গর্ত-ড্রাইভার থেকে ট্রাক্টর-চালক রূপে পরিণত হল, নিজেকে নিরক্ষরতার অন্ধকার থেকে বাইরে এনে যথেষ্ট শিক্ষিত করে তুলল; অন্যদিকে গৌরী বৃদ্ধ শ্বশুর ও ননদের সঙ্গে গৃহকর্মে নিজেকে সমর্পণ করল। অকস্মাৎ সোণিকে নিরুদ্দেশ হবার পরে একাই রুগ্ন শ্বশুরের সেবা করতে থাকল নিজে সন্তানসম্ভবা হওয়া সত্ত্বেও। অবশেষে শ্বশুরের মৃত্যুর পরে একলাই ভিটে আগলে বসে রইল কবে স্বামী সংকল্পে সিদ্ধিলাভ করবার পরে গ্রামে ফিরে আসবে সেই প্রতীক্ষায়। পোস্টাপিসের পিওনের সহায়তায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়; পিওন গৌরীর অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীও বহন করে আনে বহু দূরাঞ্চল থেকে। গৌরী স্বামীর পত্র থেকেই জেনেছে, সোণি তার সর্বশক্তি দিয়ে মঙ্গল সিংকে গলীর দ্বারা নিহত করে গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে তারই কর্মস্থলে বাজিকোজগারের ধান্দায় এবং আকস্মিকভাবে তার চোখে পড়বার পরে তাদের শাস্তাকাঙ্ক্ষী সেই ছবিতে দেখা নবীন ইঞ্জিনীয়ার সিং মোহন কাউলের বিবাহিতা স্ত্রীরূপে বসবাস করছে। —এরও বহু পরে একদিন গৌরী তার পুত্রসন্তান যমুনা সিংকে নিয়ে যখন ঘরের দাওয়ায় বসে আছে, তখন দেখল একটি মোটরে চেপে কারা যেন এল। শেষে সে প্রত্যক্ষ করল, তার ননদ সোণি তার স্বামীকে নিয়ে হাজির তাকে নিয়ে যাবার জন্যে। গঙ্গা? গঙ্গা এল না কেন? সে কি এখনও তার সঙ্কল্প সিদ্ধ করতে পারে নি? না, সে তা পেরেছে এবং আশ্চর্যভাবে পেরেছে। বিরাট জলাধারের চাবি টিপল গঙ্গারই বাচ্ছা ছেলে যমুনা, গঙ্গার জয়ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত। কিন্তু গঙ্গা কোথায়?

—পাঠকদের বুঝতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হচ্ছে না যে, কাহিনীটি যথেষ্টই চিত্তাকর্ষক। কিন্তু কাহিনীকার-পরিচালক আব্বাস সাহেব 'দো বুন্দ পানী'কে বিয়োগান্ত করলেন কেন? এতে তাঁর কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হল? বরং বলব, গঙ্গাকে একটা অসমসাহসিক কাজ করবার পরে যদি বাঁচিয়ে রাখা হত এবং তাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হচ্ছে দেখানো হত, তাহলে ছবির সমাপ্তি ঢের বেশী আনন্দদায়ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের প্রতিও সুবিচার করা হত—পোয়েটিক জাস্টিস বজায় থাকত।

ছবিটির প্রাণ হচ্ছে এর পটভূমিকা, বিস্তীর্ণ মরুভূমিটি যেন ছবির জন্যে এখানে ছিল। জলাভাবকে প্রত্যক্ষ করে মন আনন্দে নেচে ওঠে ওই বহির্দৃশ্য দেখে। রামচন্দ্রের চিত্রগ্রহণকে অসামান্য বললে অত্যুক্তি হবে না। বংশী চন্দ্রগুপ্তের শিল্পনির্দেশনা তাঁর দক্ষতার এক নতুন দিক উদ্ঘাটিত করেছে। মোহন রাঠোর চরিত্র পরিস্থিতি অনুযায়ী সম্পাদনা [illegible] নিজের কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। [illegible] ও [illegible] সংগীত [illegible] কে [illegible] তুলেছেন সার্থকভাবে। পরিস্থিতি অনুযায়ী [illegible] চিত্রায়ণেও [illegible] পরিচয় পাওয়া যায়।

নায়িকা গৌরী, নায়ক গঙ্গা এবং [illegible] চরিত্র [illegible] ভূমিকায় যথাক্রমে [illegible] ও মধুচ্ছন্দা [illegible] চতুর্ভুজ দেখিয়েছেন। ছবির তিনটি দৃশ্য সব সময় [illegible] ধরে রাখে। [illegible] সিংয়ের ভূমিকায় সজ্জন কিছুটা [illegible] ভালোই অভিনয় করেছেন। মোহন [illegible] [illegible] ইঞ্জিনীয়ার ও মঙ্গল সিং ভূমিকায় যথাক্রমে কিরণকুমার ও [illegible] পাও চরিত্রোচিত অভিনয়ের নিদর্শন রেখেছেন। অপরাপর ভূমিকা যথাযথ।

'দো বুন্দ পানী' চলচ্চিত্রটি একটি সর্বাংশে সার্থক চিত্ররূপে অভিনন্দিত হবে।

আধুনিক সমস্যাকে ঘিরে ফর্মুলা ছবি

বর্তমান যুগের তরুণ-তরুণী বেপরোয়া স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে চায়। কিন্তু এই স্বাধীনতা কতদূর পর্যন্ত তারা পেতে পারে, তাই নিয়ে বাদানুবাদের শেষ নেই। এ-বিষয়ে 'অভিজ্ঞতাই বড় শিক্ষক', এ-কথা তরুণ-তরুণীরা মানতে চায় না। তারা হয়তো ঠেকে শেখার পক্ষপাতী।

উদ্যোক্তা হচ্ছেন রাজ্য চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি। সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এই চলচ্চিত্র প্রদর্শনী উৎসব সমাধা হবে।

আজ শুক্রবার ১৮ এবং কাল শনিবার ১৯ আগস্ট রবীন্দ্রসদনে সুখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার তাঁদের বাৎসরিক উৎসবের অনুষ্ঠান করবেন। লোকগীতি, গণসংগীত এবং ভারতীয় নৃত্যসম্বলিত অনুষ্ঠানসূচীতে এবারে বহু নূতন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ আকর্ষণীয় হচ্ছে 'যুবযুগ ও ভারত বাদ্যভান্ড'।

থিয়েটার কমপ্লেকস : জনগণের মানসিকতার পরিবর্তন ব্যতিরেকে কোন জাতি তার দেশকে সুশৃংখলভাবে মুক্তশক্তির সাহচর্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। আর সেই মানসিকতার পরিবর্তন নাট্যের মাধ্যমে অতি সহজেই ঘটানো সম্ভব। এ-চরম সত্যতা সম্পর্কে, সম্প্রতি কলকাতার 'থিয়েটার কমপ্লেকস' নাট্য সংস্থা পরিবেশিত এবং শ্যামল রায়চৌধুরী কর্তৃক পরিচালিত শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'উত্তর তরঙ্গ' নাটকাভিনয় দেখে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

বিবদমান দু দল যুবককে স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে কীভাবে ধীরে ধীরে তাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হলো সেই ঘটনা নিয়েই এই নাটকটি রচিত। মূলত পাগলাবাবাকে কেন্দ্র করেই নাটকের বিষয়বস্তু নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে সাবলীলগতিতে যবনিকা টানতে সক্ষম হয়। বর্তমান সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচাতে এ-ধরনের নেতৃত্বের কথা বিশেষভাবে দর্শকদের মনকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে। এই বলিষ্ঠ চরিত্রটিকে শ্যামল রায়চৌধুরী অভিনয়ের মাধ্যমে সুদৃঢ়ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন। নাটক পরিবেশন সার্থক হওয়ার মূলে পরিচালকের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের সহযোগিতা প্রমাণিত হয়। এ-নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যে পাগলাবাবার কণ্ঠে কয়েকটি দেশাত্মবোধক গান যথার্থই সময়োপযোগী হয়েছিল। মিউজিকের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও নাটকের বক্তব্যবিষয় দর্শকচিত্তে দাগ কেটে দিতে সক্ষম হয়েছে।

নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অংশগ্রহণ করে অভিনয়গুণে দর্শকদের মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁদের মধ্যে তারাচাঁদ ভাদুড়ি, পীযূষকান্তি সরকার, সমরকুমার, সমীরণ ব্যানার্জি, শ্যামল রক্ষিত, সুমন রক্ষিত, শেখর হাজরা ও অজিতকৃষ্ণ দে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মিনুর ভূমিকায় মাস্টার শিবাশিষ-এর উল্লেখযোগ্য চরিত্র-চিত্রণ দর্শকদের বিশেষভাবে তৃপ্ত করে। আলোকনিয়ন্ত্রণ ও মঞ্চসজ্জার কাজ নাট্যোপযোগী হয়।

এপিক থিয়েটার গ্রুপ : বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে এপিক থিয়েটার গ্রুপ ২০ আগস্ট, রবিবার সকাল ৯টায়, রঙ্গনাতে প্রবীণ অভিনেতা সন্তোষ সিংহ ও সাহিত্যিক সমরেশ বসুকে সম্বর্ধনা জানানোর পর দ্বিজেন্দ্রলালের 'পুনর্জন্ম' ও অশোক চৌধুরীর নাটিকা 'বুকে রক্ত' অভিনয় করছেন।

স্টুডিও সংবাদ

আপন [illegible] পথে আবিরে রাঙানো : অশ্রু দিয়ে লেখা এবং পান্না হীরে চুনির পরিচালক অমল দত্তর নতুন ছবি 'আবিরে রাঙানো' আসন্ন মুক্তি প্রতীক্ষায়। সম্পূর্ণ নতুন মুখ নিয়ে তোলা এ ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে এক আপোষহীন নাট্য-পরিচালক, এক পতিতায় রূপান্তরিতা নায়িকা এবং এক প্রচন্ড সংঘাতমুখর নাট্যজগৎকে কেন্দ্র করে।

কিরণধর্মী এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রের রূপারোপ করেছেন সুচন্দ্রা, অনিল, মন্মথ, বাচ্চু, কালী, সলিল, আরতি, অজন্তা, শংকর, দুলাল, প্রত্যুষ সৌজিৎ, শশাঙ্ক প্রভৃতি।

মান্না দে, পিন্টু ভট্টাচার্য, নীলা মজুমদার, সুজাতা মুখার্জি, মৃণাল ব্যানার্জির কণ্ঠে আরোপিত বিভিন্ন গানের চিত্রগ্রহণ এবং সম্পাদনা করেছেন শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীরমেশ যোশী। সুরারোপ করেছেন শ্রীসত্যদেব চট্টোপাধ্যায়।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে শ্রীদত্তের পরিচালনায় আরও দুটি নতুন ছবির কাজ শুরু হয়েছে। ছবি দুটি হোল নেপথ্য নায়ক এবং ষোল থেকে ষাট।

গেল রথযাত্রার সন্ধ্যায় ১২ জুলাই তারিখে গ্র্যান্ড হোটেলের ব্যাংকোয়েট হলে এস আর-বি প্রোডাকসন্স-এর প্রথম ছবি "জীবন যে-রকম"-এর শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত কাহিনীকে চিত্রে রূপান্তরিত করবেন পরিচালক স্বদেশ সরকার। মহরৎ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কানন দেবী।

গেল ১৭ জুলাই ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে কনক চিত্রম্ সংস্থার প্রথম ছবি "মানুষের জন্য"-এর শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়। কুমারেশ দাশ স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির পরিচালনা করবেন। ছবির [illegible] শিল্পী, শিল্পনির্দেশক ও সম্পাদক হচ্ছেন যথাক্রমে নৃপেন দাস, সত্যেন রায়চৌধুরী ও রবীন দাশ। শ্রীমতী পদ্মা দেবীকে নিয়ে মহরৎ শটটি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রখ্যাত পরিচালক সুধীর মুখার্জি যাঁর 'পাশের বাড়ী' [illegible] 'শশীনাথের সংসার' [illegible] গুলো এককালে দর্শকদের [illegible] দিয়েছিল—এবারে তিনি সেই ধরনের [illegible] হাসির গল্প [illegible] 'নবগোপালের [illegible]' [illegible] মনস্থ করেছেন। [illegible] থাকছেন। ছবির [illegible] মনোরঞ্জন [illegible]।

গত ২২শে জানুয়ারী [illegible] ফিল্মসের [illegible] নামে একটি ছবির মহরৎ [illegible] [illegible] অনিল সরকার [illegible] [illegible] বিশ্ব চট্টোপাধ্যায়। [illegible] শিল্পী [illegible] নবাগতা মীনা [illegible]।

পরিচালক পীযূষ বসু বর্তমানে [illegible] নিউ থিয়েটার্সে [illegible] ভোরের [illegible] ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন। সমরেশ বসু রচিত [illegible] কে এল কাপুর ফিল্মস প্রযোজিত [illegible] প্রধান দুই চরিত্রের শিল্পী—উত্তম [illegible] ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় [illegible] ছাড়া দুটো গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে [illegible] দত্ত ও রবি ঘোষকে দেখা যাবে। চিত্রগ্রহণে আছেন—কানাই দে এবং শিল্পনির্দেশনায় আছেন—সুবোধ দাস। সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

তরুণ চিত্রপরিচালক অর্চন চক্রবর্তী তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যা

জীবনের জটিলতা' অবলম্বনে 'নির্জন সংলাপ'-এর স্যুটিং এগিয়ে নিয়ে চলেছেন—সেই অর্চন চক্রবর্তী গত কয়েকদিন আগে শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'অভিমানী আন্দামান'-এর চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন। পরিচালক শ্রীচক্রবর্তী চিত্রনাট্য রচনার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। খবরে প্রকাশ, প্রধান দুটি চরিত্রের জন্য তিনি বিবেক চট্টোপাধ্যায় ও ঊর্মিলা দেকে মনোনীত করেছেন।

শেষ সংবাদ : রেখা পিকচার্স নামে নবগঠিত এক প্রযোজক সংস্থা তাদের প্রথম প্রচেষ্টা ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চোর' অবলম্বনে 'বাবুয়া'-র চিত্রগ্রহণ খুব শীঘ্রই শুরু করছেন। কুণাল মুখোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করবেন—মনীশ রায়। সম্ভাব্য শিল্পী-তালিকায় যাদের নাম এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে তাঁদের মধ্যে—অনিল চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক, দিলীপ রায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে থাকছেন—অজিত ঘোষ।

'অন্তরীক্ষ', 'গংগা' ছবির স্রষ্টা প্রখ্যাত অংকনশিল্পী-পরিচালক রাজেন তরফদার তাঁর পরবর্তী ছবি নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত "পালংক" ছবির কাজ ওপার বাংলায় শুরু করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি ঢাকার বিক্রমপুর এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে চার-পাঁচ দিনের স্যুটিং শেষ করে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন পরবর্তী স্যুটিং শুরু করছেন এ মাসের ২০ তারিখ থেকে। বিভিন্ন চরিত্রে এপার-ওপার এই দুই বাংলার শিল্পীদেরই দেখা যাবে। আগামী পর্যায়ে স্যুটিং-এ অংশগ্রহণ করার জন্য সন্ধ্যা রায় ও উৎপল দত্ত ২০।২২ তারিখ ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যাবেন। ওপার বাংলার শিল্পীদের মধ্যে আনোয়ার ছাড়াও অন্যান্য প্রখ্যাতনামা শিল্পীরা অংশগ্রহণ করবেন।

খবরে প্রকাশ ছবিটি ইন্ডো-বাংলাদেশের যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মিত হচ্ছে। ছবির বেশীরভাগ দৃশ্যই স্টুডিওর বাইরে তোলা হবে। চিত্রগ্রহণ ও সংগীত-পরিচালনায় আছেন—শৈলজা চট্টোপাধ্যায় ও সুবীন দাশগুপ্ত।

এবারে টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ায় একটু চক্কর কাটা যাক।

ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে জানতে পেরেছি আগামী সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে বম্বেতে "যদুবংশের" স্যুটিং শর্মিলা ঠাকুরকে নিয়ে শুরু করছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে শর্মিলার মত ব্যস্ত শিল্পীকে এখানে এনে স্যুটিং করা এবং ডেট পাওয়ার ঝামেলা এড়াবার জন্য পরিচালক শ্রীচৌধুরী শর্মিলার অংশটুকু বম্বেতেই টেক্ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থা। খুব সম্ভবতঃ পরিচালক শ্রীচৌধুরী সেপ্টেম্বরের ৪।৫ তারিখ তাঁর ইউনিট নিয়ে বম্বে যাচ্ছেন। শিল্পীর মধ্যে শুধু ধৃতিমান চ্যাটার্জি এই পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবেন। তাছাড়াও জানতে পারা গেছে—উত্তমকুমারও অকটোবর মাসে চার-পাঁচদিনের ডেট্ দিয়েছেন। বাকী অংশটুকু ডিসেম্বরে গৃহীত হবে উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন প্রমুখ শিল্পীদের নিয়ে।

বর্তমান যুবসমাজের বিপন্ন বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত বিমল করের ওই নামেরই উপন্যাস অবলম্বনে ছবির পরিচালনা ছাড়াও চিত্রনাট্য রচনা ও সংগীত-পরিচালনা করছেন—পার্থপ্রতিম চৌধুরী।

মণ্ডাল্জ ফিল্মস-এর পতাকাতলে ছবিটি নির্মিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে ছবির অন্যান্য শিল্পীদের নিয়ে প্রায় আটআনা কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ শিল্পী তালিকায় আছেন—উত্তমকুমার, শর্মিলা ঠাকুর, অপর্ণা সেন, ধৃতিমান চ্যাটার্জি, সন্তোষ দত্ত, বাপী বন্দ্যোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ দত্ত ও অশোক চট্টোপাধ্যায়।

১৫ই আগস্ট কোলকাতায় একটি রঙীন হিন্দী ছবির প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। হৃষীকেশ মুখার্জির অন্যতম সহকারী অনিল ঘোষের পরিচালনায় ছবিটি গৃহীত হবে।

এম এস এস প্রোডাকসন্স-এর পতাকাতলে নির্মিত ছবির বিভিন্ন চরিত্রে থাকবেন—রাধা সালুজা (নায়িকা), অমিত ভঞ্জ, উৎপল দত্ত, ধর্মেন্দ্র, হেমা মালিনী, শত্রুঘ্ন সিনহা প্রমুখ। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন—দিলীপরঞ্জন মুখার্জি ও হৃষীকেশ মুখার্জি।

পরিচালক রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী তাঁর পরবর্তী ছবি "নতুন আকাশ" নামে একটি ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে তিন-চারদিনের স্যুটিং হয়ে গেছে। শিল্পীতালিকায় এপর্যন্ত যাঁদের নাম পাওয়া গেছে তাঁদের মধ্যে—দিলীপ রায়, কৃষ্ণা বসু, চিন্ময় চ্যাটার্জি, শিবানী বসু, পুলক মালিক, জ্ঞানেশ মুখার্জি ও মন্মথ মুখার্জির নাম উল্লেখযোগ্য। নায়কচরিত্রে খুব সম্ভবতঃ আশীষকুমারকে নেওয়া হবে। ছবির সুর সংযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন—কার্তিক-বসন্ত। এই মাসের ২১ তারিখ ছবির দুখানি গান আরতি মুখার্জির কণ্ঠে বাণীবদ্ধ করা হবে বলে খবরে প্রকাশ।

জলসা

গান্ধর্বীর গুণীসম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে পদ্মশ্রী পংকজ মল্লিকের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন প্রধান অতিথি কানন দেবী।

পংকজ মল্লিক সংবর্ধিত

সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম প্রেক্ষাগৃহে গান্ধর্বী সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত ও কবিগুরুর 'অভিসার' নৃত্যনাট্য ইত্যাদি অনেক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। কিন্তু সব অনুষ্ঠানকে ছাপিয়ে উঠেছিল গুণী-সম্বর্ধনা অংশ। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাপক প্রচারে, প্রসারে ও জনপ্রিয় করে তোলায় নিবেদিতপ্রাণ পদ্মশ্রী পংকজ মল্লিককে প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। সন্তোষকুমার ঘোষ পরিকল্পিত এই অনুষ্ঠানের নায়ক পংকজ মল্লিক। প্রধান অতিথি কানন দেবী, এছাড়া ডক্টর হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও [illegible] প্রবোধকুমার সান্যাল। অনুভব গাঢ়তা ও ভাবের গভীরতায় এ এক সঙ্গীতধর্মী অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে।

প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে মানপত্র পাঠ করলেন সন্তোষকুমার ঘোষ এবং শিল্পীর হাতে সে মানপত্র অর্পণ করেন প্রবোধকুমার সান্যাল।

সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে মেতে বললেন অতীতের এক মধুর স্মৃতি। চোঙা গ্রামোফোনের যুগে পংকজবাবুর রেকর্ডে গাওয়া 'প্রলয় নাচন'—এক বালকের চিত্তে মুগ্ধ আবেশ রচনা করে—এ গান আর পাঁচটা গানের থেকে আলাদা বলে। অনেক পরে 'যৌবনসরসী নীরে' এবং আরও অনেক গান শুনে তিনি পংকজবাবুর ভক্ত হয়ে যান এবং আজ জীবনের পরিণত লগ্নে তাঁকে সম্মান জানাচ্ছেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধকরূপে। ঘরানার প্রশ্ন বাদ দিলে একথা অনস্বীকার্য যে, আজ সারা দেশে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্তহীন জনপ্রিয়তা সৃষ্টির পরোক্ষভাগে যাদের স্থান রয়েছে উঁচুতে পংকজবাবু তাঁদেরই একজন। 'রবিঠাকুরের গান' অথবা 'রবীন্দ্রনাথের গানের' পর্যায় থেকে এ গানকে 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের' মর্যাদায় যথার্থ প্রতিষ্ঠা করার গৌরবের অনেকখানি তাঁরই প্রাপ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি কে এল সায়গল ও কানন দেবীর নাম উল্লেখ করে বলেন, আজ চল্লিশ বছরের নীচে যাদের বয়স তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না—কানন দেবীর গাওয়া 'সেবার বৃষ্টি' একদা জনচিত্তে কি মাদকের সৃষ্টি করেছিল!

কানন দেবী তাঁর অগণিত ভক্তের গান শোনাবার অনুরোধ রাখতে পারেন নি। কিন্তু গানের স্থায়ী অন্তরার মতই তাঁর মুক্তদীপ্ত স্বল্পভাষণ শুরু থেকে শেষ অবধি শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। প্রথমেই তিনি পংকজবাবুর কাছে দুটি বর প্রার্থনা করলেন, 'আমার গাওয়া সামান্য কয়েকখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত যদি আপনাদের এতটুকুও আনন্দ দিয়ে থাকে তবে সে কৃতিত্ব আমার নয়,—এ গৌরব প্রাপ্য আমার রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুরু পংকজবাবুর। কবির গানের কথা, সুর ও ভাব আমার অন্তরে তিনি পৌঁছে দিতেন। আমি শুধু তাঁকে অনুসরণ করতাম—যেমন মন্দিরে পুরোহিতের উচ্চারিত মন্ত্র আবৃত্তি করে অঞ্জলিদানার্থীরা। আমি গান্ধর্বীর উদ্যোক্তাদের কাছে কৃতজ্ঞ এই জন্য যে, আমার গুরুর প্রতি এঁদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের এই পুণ্য লগ্নে আমি পংকজবাবুর কাছে আমার ঋণ স্বীকারের সুযোগ পেলাম।' অন্তরের অতল থেকে উৎসারিত আবেগাসক্ত মধুর কণ্ঠের প্রতিটি শব্দের গভীরতা শুধু পংকজবাবুর নয় শ্রোতাদের চোখেও জল এনে দিয়েছে।

আবেগ এবং আন্তরিকতার উষ্ণ স্পর্শে অভিভূত পংকজ মল্লিক তাঁর ভাবগম্ভীর কণ্ঠের স্তোত্র গান ও কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে এই শ্রদ্ধার্পণের প্রাপ্তি স্বীকার করলেন।

প্রবোধ সান্যাল তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে অতীতের অনেক সুখস্মৃতির প্রতি আলোকপাত করে শিল্পীর দীর্ঘ জীবন কামনা করেন।

অনুষ্ঠান সুপরিচালনার জন্য সঙ্ঘ-সচিব সন্তোষ ঠাকুর ও সহ-সভাপতি রণজিৎকুমার সেন ধন্যবাদার্হ।

—চিত্রাঙ্গদা

খেলাধূলা

দর্শক
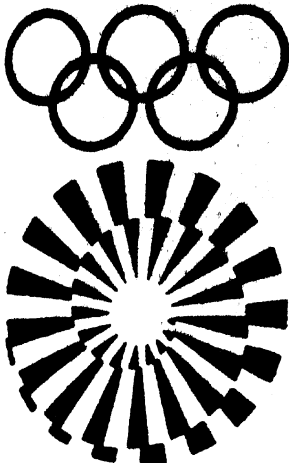
অলিম্পিক গেমস

আগামী ২৬শে আগস্ট পশ্চিম জেমানীর মিউনিখে আধুনিক কালের ২০তম অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন হবে। অনুষ্ঠান শেষ হবে ১০ই সেপ্টেম্বর। খেলা আরম্ভ হবে ২৭শে আগস্ট থেকে। ভারতবর্ষকে নিয়ে ১২৩টি দেশের প্রায় ১০,০০০ প্রতিযোগী (পুরুষ ৮,৫০০ এবং মহিলা ১,৫০০) এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন। এই প্রতিযোগী সংখ্যা মেক্সিকো অলিম্পিকের প্রায় দ্বিগুণ।

গত চারবারের মতই এবারও অলিম্পিক গেমসের চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থানটি রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্য কোন দেশের পক্ষে তাদের ধারেকাছে যাওয়া খুবই কঠিন এবং অপ্রত্যাশিত। ১৯৫২ সালে রাশিয়া অলিম্পিক গেমসে তাদের প্রথম যোগদানের বছরেই ৪৯৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে আমেরিকার সঙ্গে যুগ্মভাবে বে-সরকারী পয়েন্ট লাভের তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। রাশিয়া উপর্যুপরি ৩বার—১৯৫৬ সালের মেলবোর্ণ, ১৯৬০ সালের রোম এবং ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিক গেমসের চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় বে-সরকারীভাবে প্রথম স্থান পেয়েছিল। অপরদিকে আমেরিকা পেয়েছিল দ্বিতীয় স্থান। ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসে আমেরিকা মোট ১০৭টি পদক পেয়ে প্রথম স্থান এবং রাশিয়া মোট ৯১টি পদক লাভের সঙ্গে দ্বিতীয় স্থান পায়।

সমাজতান্ত্রিক দেশের অগ্রগতি

অলিম্পিক গেমসে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অগ্রগতি এবং সাফল্য উল্লেখ করার মত। ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিক

বিভিন্ন বিষয়ে পদকের খতিয়ান

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
অ্যাথলেটিকস	৫০	৫০	৫০	১৫০
রোয়িং	২৬	২৬	২৬	৭৮
বাস্কেটবল	১২	১২	১২	৩৬
বক্সিং	১১	১১	২২	৪৪
ক্যানোয়িং	১৮	১৮	১৮	৫৪
সাইক্লিং	১৪	১৪	১৪	৪২
ফেনসিং	২০	২০	২০	৬০
ফুটবল	১৩	১৩	১৩	৩৯
জিমন্যাস্টিকস	২৪	২৪	২৪	৭২
ভারোত্তোলন	৯	৯	৯	২৭
হ্যান্ডবল	১৩	১৩	১৩	৩৯
হকি	১৩	১৩	১৩	৩৯
জুডো	৬	৬	১২	২৪
কুস্তি	২০	২০	২০	৬০
সাঁতার	৪৮	৪৮	৪৮	১৪৪
ওয়াটারপোলো	১১	১১	১১	৩৩
মডার্ণ পেন্টাথলন	২	২	২	৬
ইকোয়েস্ট্রিয়ান	৮	৮	৮	২৪
স্যুটিং	৮	৮	৮	২৪
আর্চারি	২	২	২	৬
ভলিবল	২৪	২৪	২৪	৭২
ইয়টিং	১৩	১৩	১৩	৩৯
মোট	৩৬৪	৩৬৪	৩৮১	১১০৯

গেমসে যোগদানকারী ১১২টি দেশের মধ্যে মাত্র ৪৪টি দেশ পদক জয়ী হয়। যেখানে মোট পদক ছিল ৫২৫টি, সেখানে ১০টি সমাজতান্ত্রিক দেশ ২১৯টি এবং বাকি ৩৪টি দেশ ৩০৬টি পদক পেয়েছিল। অর্থাৎ মোট পদকের শতকরা ৪০ ভাগের বেশী পেয়েছিল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি। ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক গেমসে এই ১০টি সমাজতান্ত্রিক দেশ পদক জয়ী হয়েছিল—সোভিয়েত ইউনিয়ন, (৯১টি পদক), জি ডি আর (পূর্ব জার্মানী), হাংগেরী, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, কিউবা এবং মঙ্গোলিয়া।

অলিম্পিক ফুটবল

মিউনিখ অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতার আসরে যে ১৬টি দেশ অংশ গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করেছে তাদের মধ্যে আছে ইউরোপের ৬টি, আমেরিকার ৪টি, এশিয়ার ৩টি এবং আফ্রিকার ৩টি দেশ। গত ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় হাঙ্গেরী স্বর্ণপদক, বুলগেরিয়া রৌপ্যপদক এবং জাপান ব্রোঞ্জ পদক জয়ী হয়েছিল। এই তিনটি দেশের মধ্যে একমাত্র হাঙ্গেরী এবারের ১৬টি দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে। হাঙ্গেরী এবং পশ্চিম জার্মানী প্রচলিত নিয়মে সরাসরি মিউনিখ অলিম্পিক ফুটবল আসরে খেলার যোগ্যতা লাভ করেছে। অর্থাৎ অপর ১৪টি দেশের মত এই দুটি দেশকে প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় যোগদান করে মিউনিখ আসরে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়নি। প্রচলিত নিয়মে আছে, ঠিক আগের বারের স্বর্ণপদক জয়ী দেশ এবং অলিম্পিক গেমসের উদ্যোক্তা দেশ সরাসরি মূল আসরে খেলবে।

মিউনিখ অলিম্পিক ফুটবল আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জনকারী ১৬টি দেশের নাম :

ইউরোপ (৬টি) :
পশ্চিম জার্মানী, হাঙ্গেরী (১৯৬৮ সালের বিজয়ী), সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, পূর্ব জার্মানী এবং ডেনমার্ক

আমেরিকা (৪টি) :
মেক্সিকো, ইউনাইটেড স্টেটস, ব্রেজিল এবং কলোম্বিয়া।

এশিয়া (৩টি) :
ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া এবং ইরাণ

আফ্রিকা (৩টি) :
মরক্কো, ঘানা এবং সুদান

লীগ পর্যায়ের খেলা

ষোলটি দেশকে চারটি গ্রুপে সমান ভাগ করে প্রাথমিক ফুটবল লীগ পর্যায়ের খেলার তালিকা এইভাবে তৈরী হয়েছে।

গ্রুপ ১ : পশ্চিম জার্মানী, মালয়েশিয়া, মরক্কো এবং ইউনাইটেড স্টেটস

গ্রুপ ২ : সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রহ্মদেশ, সুদান এবং মেক্সিকো

গ্রুপ ৩ : হাঙ্গেরী, ইরাণ, ব্রেজিল এবং ডেনমার্ক

গ্রুপ ৪ : পূর্ব জার্মানী, ঘানা, কলোম্বিয়া এবং পোল্যান্ড।

অলিম্পিক হকি

মিউনিখ অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী ১৬টি দেশকে দুটি গ্রুপে সমান ভাগ করে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলানো হবে।

১৯৬৮ সালের অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় পাকিস্তান স্বর্ণপদক, অস্ট্রেলিয়া রৌপ্য পদক এবং ভারতবর্ষ ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিল। ভারতবর্ষ সেমি-ফাইনালে ১-২ গোলে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছিল।

লীগ পর্যায়ের খেলা

গ্রুপ ১ : পাকিস্তান, জার্মানী, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, স্পেন, আর্জেন্টিনা, মালয়েশিয়া, এবং উগান্ডা।

গ্রুপ ২ : ভারতবর্ষ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কেনিয়া, পোল্যান্ড, হল্যান্ড, বৃটেন এবং মেক্সিকো।

আই এফ এ শীল্ড

আগামী ২৩শে আগস্ট ১৯৭২ সালের আই এফ এ শীল্ড খেলার উদ্বোধন হবে। এ-বছরের প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ৩৯টি দলের মধ্যে বিদেশী দল ৩টি এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের ৫টি দল। তিনটি বিদেশী দলের নাম—মালয়েশিয়ার জাতীয় চ্যাম্পিয়ান স্টেট অব সেলাঙ্গর, ইরানের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান ইসফাহান্স সেপাহান এবং ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় দল ইন্দোনেশিয়া এফ এফ। পশ্চিম বাংলার বাইরে ভারতবর্ষের যে ৫টি দল প্রতিযোগিতায় খেলবে তারা হল দিল্লী একাদশ, কটক সম্মিলিত দল, সেকান্দ্রাবাদের এ ও সি সেন্টার, উত্তরপ্রদেশ একাদশ এবং হরিয়ানা একাদশ।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২৫.০০	টাকা	৩০.০০
ষান্মাসিক	টাকা	১২.৫০	টাকা	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬.২৫	টাকা	৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার (চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১.০২
ষান্মাসিক	টাকা	০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ
২য় খণ্ড

১৭ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday, 25th August, 1972 শুক্রবার, ৮ ভাদ্র, ১৩৭৯ .52 Paise

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
২৫২	একনজরে		—শ্রীপ্রত্যক্ষদর্শী
২৫৩	সম্পাদকীয়		
২৫৪	পটভূমি		—শ্রীদেবদত্ত
২৫৬	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
২৫৮	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীঅমল
২৫৯	লোক-কবি কালিদাস		—শ্রীমণিলাল খান
২৬৩	পাখনা	(বড় গল্প)	—শ্রীঅশোককুমার সেনগুপ্ত
২৬৯	রামমোহনের জীবনে তন্ত্রের প্রভাব		—শ্রীগোরাচাঁদ মিত্র
২৭২	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
২৭৫	অচেনা ভুটান		—শ্রীভক্তি বিশ্বাস
২৮৩	সবারে আমি নমি	(স্মৃতিচারণা)	—শ্রীকানন দেবী
২৮৭	পূর্বপুরুষ	(উপন্যাস)	—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
২৯১	একটি মানুষের মৃত্যু		—শ্রীপ্রণতা দে
২৯২	দুটি কবিতা	(কবিতা)	শ্রীনিখিল সরকার
২৯২	আন্তরিকতার নামে	(কবিতা)	—শ্রীকরুণাসিন্ধু দে
২৯২	রাখীপূর্ণিমার চাঁদ	(কবিতা)	—হাসনে আরা
২৯৩	দুঃখে সুখে বাঁচা	(উপন্যাস)	—শ্রীনিখিলচন্দ্র সরকার
২৯৬	প্রদর্শনী		—শ্রীচিত্ররসিক
২৯৭	বাড়ী	(উপন্যাস)	—শ্রীদেবল দেববর্মা
৩০১	রূপচর্চায় ফোটো		—শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস
৩০২	ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট	(গল্প)	—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩০৭	বিয়োগান্ত নাটকের নায়ক		—শ্রীসুজিতকুমার সেনগুপ্ত
৩১১	প্রস্তর যুগের যুদ্ধ এখনও যেখানে চলছে		—শ্রীদিলীপ মালাকার
৩১২	শিক্ষা সংকট কেন?		—শ্রীক্ষিতিমোহন মুখোপাধ্যায়
৩১৪	কাশ্মীরের রূপসীরা		—শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৩১৫	অংগনা		—শ্রীপ্রমীলা
৩১৭	অমর মল্লিক		—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়
৩১৯	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৩২৬	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক
৩২৮	চিঠিপত্র		

প্রচ্ছদ : শ্রীনির্মল সাহা

এক নজরে

দুঃসাহসিক অভিযান : উত্তর আমেরিকার আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে, ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ার কয়েক হাজার বছর আগে পশ্চিম এশিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ফিনিশীয়রা আমেরিকায় যায় এবং ঐ মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে সভ্য জনপদ গড়ে তোলে। মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার কয়েকটি দেশে যে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসের শেষ দেখা যায় তার সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ফিনিশীয় সভ্যতার আশ্চর্য সাদৃশ্য রেড ইণ্ডিয়ানদের ঐ কাহিনীর সমর্থনে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। রেড ইণ্ডিয়ানদের কাহিনীতে আরও বলা হয় যে, ফিনিশীয়রা এসেছিল ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে, অতলান্তিক মহাসাগর দিয়ে নয়। সে কারণে আমেরিকার পশ্চিম দিকেই ফিনিশীয় সভ্যতার নিদর্শন বেশি পাওয়া যায়।

রেড ইণ্ডিয়ানদের ঐ কাহিনীর সত্যতা প্রমাণের জন্য জার্মানীতে বসবাসকারী কানাডিয়ান শ্রী ডয়াটি ডম্ব্রো গত ২৯শে জুলাই এক দুঃসাহসী অভিযানে লিপ্ত হয়েছেন। ৪৬ বছর বয়স্ক ডম্ব্রো, তাঁর স্ত্রী ইসাবেলা এবং দুই পুত্রকে নিয়ে একটি ত্রিশ ফুট লম্বা নৌকায় চেপে ঐদিন লেবাননের উপকূলবর্তী ঐতিহাসিক স্থান টায়ার থেকে যাত্রা করেন। সেখানে তিন হাজার লেবানী তীরে দাঁড়িয়ে হর্ষধ্বনি ও করতালি দিয়ে ডম্ব্রো পরিবারকে বিদায় সম্বর্ধনা জানায়। এক টন ওজনের তিন পালের ঐ নৌকাটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ফিনিশিয়া'। নৌকাটি প্রথমে বেরুটে থামবে। তারপর সেটি স্থলপথে সিরিয়ার মধ্য দিয়ে বহন করে জর্দানের আকাবা বন্দরে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রকৃত অভিযান শুরু হবে সেখান থেকে। নৌকাটি লোহিতসাগর পেরিয়ে এসে পড়বে আরবসাগরে, সেখান থেকে ভারত মহাসাগর, তারপর প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে আমেরিকার উপকূলে। ঐ দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে তাঁদের দু বছর সময় লাগবে বলে তাঁরা ধরে নিয়েছেন। অথচ নৌকাটিতে তেমন উপযোগী সরঞ্জাম নেই বললেই চলে। নৌকাটি তৈরি হয়েছে ফিনিশীয় যুগের নৌকার অনুকরণে এবং যাতে বৈজ্ঞানিক প্রামাণিকতা অটুট থাকে, কোন আধুনিক সরঞ্জাম নেওয়া হয়নি। তিন-চার হাজার বছর আগে প্রচলিত শুকনো খাদ্য ছাড়া কোন খাদ্যও নেওয়া হয়নি সঙ্গে। বৃষ্টির জল থেকে পানীয় সংগ্রহ করা হবে এবং মুক্ত আকাশে ঝড়, জল, সূর্যের উত্তাপ মাথায় নিয়ে আধুনিক সভ্যতায় অভ্যস্ত চারটি প্রাণী নিরবচ্ছিন্ন দুটি বছর সমুদ্রের বুকে ভেসে চলবে।

প্রাগৈতিহাসিক দণ্ডবিধি : প্রথম লিখিত আইনের প্রবর্তকরূপে খ্যাত, চার হাজার বছর আগের ব্যাবিলনের রাজা হামুরাবির দণ্ডবিধির মূল লক্ষ্য ছিল অপরাধ ও তার শাস্তির মধ্যে সমতা রক্ষা। তিনি চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, জীবনের বদলে জীবন দণ্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন। আজ চার হাজার বছর বাদে জীবনের বদলে জীবন নেওয়ার ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত থাকলেও চোখ-দাঁত উপড়ে বা হাত-পা কেটে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা অনেক দিন আগেই সভ্য জগতে বর্জিত হয়েছে।

গত ২৯শে জুলাই আফ্রিকার অন্যতম রাষ্ট্র সেণ্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক-এর প্রেসিডেণ্ট জাঁ বেদেল বোকাসা সে-দেশের চোরদের শাস্তি দিতে যে দণ্ডবিধি ঘোষণা করেছেন, তা **ভয়ংকরতায় ও নিষ্ঠুরতায় হামুরাবির আইনকেও হার মানিয়েছে।** তার চেয়েও বড় কথা, হামুরাবি অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সমতা রক্ষার দিকে যে দৃষ্টি রেখেছিলেন, মধ্য আফ্রিকার ঐ প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশটির শাসকরা তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। ঐ রাষ্ট্রের তথ্যমন্ত্রী ভিকটর টৌটিয়া সদ্য-ঘোষিত আইনটি বিশ্লেষণ করে বলেছেন, চুরির অপরাধে প্রথমবার ধরা পড়লে তার ডান কানটি কাটা যাবে, দ্বিতীয়বার ধরা পড়লে কাটা যাবে বাঁ কান, দু কান কাটা যাওয়ার পরও যদি কারও শিক্ষা না হয় ও চুরির অপরাধে তৃতীয়বার ধরা পড়ে, তবে সেবার তার একটি হাত কেটে নেওয়া হবে, আর দু কান ও একটি হাত কাটা কেউ যদি চতুর্থবার চুরির দায়ে ধরা পড়ে, তবে তাকে প্রকাশ্য দিবালোকে সমবেত জনতার সামনে ফায়ারিং স্কোয়াডের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে গুলী করে হত্যা করা হবে।

আইন কঠোর হলেই যে অপরাধ হ্রাস পায় না, বরং ক্ষেত্রবিশেষে আরও বেড়ে যায় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এ-শিক্ষা মানুষের হয়েছে বলেই বিশ্বের সব দেশে দণ্ডবিধির কঠোরতা দিনে দিনে হ্রাস পেয়েছে। যে ইংলণ্ডে একদা দুই শতাধিক বিভিন্ন ধরনের অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল, আজ সেখানে মৃত্যুদণ্ডের বিধানই সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে। ইতিহাসের এই শিক্ষা না গ্রহণ করে সেণ্ট্রাল আফ্রিকা রিপাবলিকের শাসকবর্গ যে একেবারে প্রাগৈতিহাসিক যুগে চলে গেলেন তার সমর্থনে ঐ রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট বলেছেন, চুরি ডাকাতি রাহাজানি ইত্যাদি অপরাধে তাঁর দেশের সম্মান যে ভূলুণ্ঠিত হতে বসেছে তা তিনি আর বরদাস্ত করবেন না।

সব গ্রহই নিরাশ করছে : এই পৃথিবীতে মানুষের স্থান সঙ্কুলান হওয়া ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়ছে। এখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা ৩৬০ কোটির কাছাকাছি। এবং যে হারে লোক বাড়ছে তা যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে এই শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই পৃথিবীর লোকসংখ্যা দ্বিগুণিত হয়ে ৭০০ কোটি অতিক্রম করে যাবে। তখন খেয়ে-পরে বেঁচে থাকা ত পরের কথা, দু পা ফেলতে রেখে বাস করাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। পাঁচশ বছর আগে একবার পৃথিবীকে এই বিপর্যয়ের সংকট থেকে রক্ষা করেছিলেন কলম্বাস, পৃথিবীর অপর গোলার্ধ আবিষ্কার করে। তারপর এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এই গ্রহে আর কোন ভূমিখণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে [illegible] তুলনায় [illegible]। এই [illegible] বসবাসের [illegible] সম্পূর্ণরূপে মানুষের [illegible] তথ্য মানুষ সংগ্রহ করেছে [illegible] নানা যান পাঠিয়েছে ভিনাস—৮। কিন্তু মানুষের উৎসাহিত হওয়ার সংবাদ কোথাও নেই। চাঁদ সম্পূর্ণ মৃত, কোন প্রাণের অস্তিত্ব সেখানে স্বাভাবিকভাবে সম্ভব নয়। মঙ্গল গ্রহের [illegible] পৃথিবীর মানুষের পক্ষে [illegible] আর ভিনাস ৮ সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের যেসব তথ্য পাঠিয়েছে তা আরও নৈরাশ্যকর।

গত ২৩শে জুলাই ভিনাস—৮ শুক্র গ্রহে অবতরণ করে মাত্র ৫০ মিনিট টিকে থাকে। তারপর সেখানকার উত্তাপ ও আবহমণ্ডলীর চাপে সেটি গলিত ও পিষ্ট হয়ে যায়। ঐ সামান্য সময়টুকুর মধ্যে ভিনাস—৮ যে-কটি সাংকেতিক বাক্য পাঠায় তাতে জানা যায় যে, শুক্র গ্রহের উত্তাপ ৮৭০ ডিগ্রী ফারেনহাইট (পৃথিবীতে ২১২ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপে জল বাষ্পে পরিণত হয়), এবং তার আবহমণ্ডলীর চাপ পৃথিবীর তুলনায় ৯০ গুণ বেশি। সুতরাং সে স্থানও কোনদিন মানুষের বাসযোগ্য হবে না। এবং পৃথিবীর মানুষকে শুকতারা নামধারী ঐ গ্রহটির নিষ্কম্প উজ্জ্বল দ্যুতি দেখেই পরিতৃপ্ত থাকতে হবে। কিন্তু মানুষ যাবে কোথায়? এই ক্ষুদ্র বসুন্ধরায় তার বৃহৎ ও দ্রুতবর্ধিষ্ণু সংসারের **স্থান সঙ্কুলান হওয়া যে ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়ছে।**

—প্রজ্ঞাবাণী

একটি বিরোধের অবসান

অবশেষে একটা অবাঞ্ছিত বিরোধের অবসান ঘটল। ফরাক্কা প্রকল্পের জলরাশির পরিমাণ নিয়ে দিল্লির সঙ্গে পশ্চিমবাংলার মতান্তর ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠছিল। গঙ্গার ওপর ফরাক্কায় যখন ব্যারাজ দেবার কথা ওঠে তখনি পশ্চিমবাংলা থেকে দাবি করা হয়েছিল যে কলকাতা বন্দরকে রক্ষা করবার জন্য ভাগীরথী দিয়ে অন্তত ৪০ হাজার কিউসেক জল দেওয়া হোক। কারণ, এই পরিমাণ জল না পেলে পলিমাটির ভারে ভাগীরথীর নাব্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তার ফলে কলকাতা বন্দর অচল হয়ে যাবে। অনেক আশা নিয়ে পশ্চিমবাংলার মানুষ বসেছিল। কলকাতা শুধু পশ্চিমবাংলারই নয়, গোটা পূর্ব ভারতের প্রধান বন্দর এবং এই বন্দরের ওপর এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভরশীল। সুতরাং আশা করা গিয়েছিল যে, ভাগীরথী বা হুগলী নদী দিয়ে প্রবাহিত জলরাশির পরিমাণ নিয়ে কোনো বিরোধের প্রশ্নই উঠবে না। কিন্তু ফরাক্কা প্রকল্পের সমাপ্তির পরই এ নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। স্বয়ং কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রীই বললেন যে, এত জল কলকাতা বন্দরের জন্য দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, চল্লিশ হাজার কিউসেক জল দেবার কথাই নাকি কোনোদিন ছিল না।

গঙ্গার জলের অন্যান্য দাবিদারও দেখা দিল। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের সেচ প্রকল্পের জন্য জল বাঁচাবার কথাও উঠল। কিন্তু হুগলী নদীর নাব্যতা নষ্ট করে গঙ্গার জল অন্যান্য রাজ্যের অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ সেচ প্রকল্পের জন্য সরিয়ে রাখার যৌক্তিকতার প্রশ্নটি তলিয়ে দেখা হল না। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় পশ্চিমবাংলার দাবি নিয়ে জোর তদ্বির করলেন। এবং তার ফলেই ফরাক্কার জল নিয়ে আপাতত একটা মীমাংসার সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সূত্র অনুযায়ী ১৯৭৪ সাল থেকে ফরাক্কা প্রকল্পের ফীডার ক্যানেল দিয়ে পাঁচ বছর ৪০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হবে। পরবর্তী দুই বছর এই জলরাশির পরিমাণ কমবেশি হতে পারে পর্যবেক্ষক কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী। মুখ্যত কলকাতা বন্দর রক্ষা করার জন্যই যে ফরাক্কায় গঙ্গার ওপর ব্যারাজ নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প তৈরি হয়েছে তা কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী স্বীকার করেছেন। তা সত্ত্বেও কলকাতা বন্দরের জন্য কতটুকু জল দরকার সে বিষয়ে সেচমন্ত্রী একটা প্রশ্ন রেখেই দিয়েছেন। অর্থাৎ পশ্চিমবাংলা যে বরাবর ৪০ হাজার কিউসেক জলের কথা বলে আসছে তাকে সেচমন্ত্রী বিশেষজ্ঞদের অভিমত দিয়ে আবার যাচাই করে নিতে চান। অথচ যত বিশেষজ্ঞ এ পর্যন্ত হুগলী নদীর নাব্যতা নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন সকলেই বলেছেন যে, কমপক্ষে ৪০ হাজার কিউসেক জল না ছাড়লে কলকাতা বন্দরের কাজকর্ম অচল হয়ে যাবে।

যাই হোক, আপাতত একটা মীমাংসার সূত্র পাওয়া গেছে সেটাই বড় কথা। পশ্চিমবাংলা একটি সমস্যাজর্জর রাজ্য। তার প্রয়োজনের দিকে কেন্দ্রীয় সরকার এবার সহানুভূতির সঙ্গে তাকাবেন এটা আমরা সঙ্গতভাবেই আশা করতে পারি। উত্তরপ্রদেশ, বিহার বা সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশ গঙ্গার জল কতখানি পাবে বা পাওয়া দরকার তা নিশ্চয়ই সরকার বিবেচনা করবেন। গঙ্গার জলের ওপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপনের প্রশ্নই এখানে ওঠে না। পশ্চিমবাংলা শুধু দাবি করেছিল, তার ন্যূনতম প্রয়োজনের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করুক। আপাতত সেই বিবেচনা তাঁরা করেছেন।

আমরা শুধু একথা বলতে চাই যে, একটি রাজ্যের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের প্রশ্ন নিয়ে এ ধরনের রাজনৈতিক বিতর্ক অবাঞ্ছিত। রাজ্যে রাজ্যে বিরোধ বা মনোমালিন্য কখনই কাম্য নয়। জাতীয় সংহতির কথা আমরা হামেশাই বলি। কিন্তু একে অপরের জন্য কানাকড়ি স্বার্থ বিসর্জন করতে চাই না। প্রত্যেকটি রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সমস্তরে গিয়ে পৌঁছুলেই অন্যান্য বিরোধ সহজে মীমাংসা হবে। কলকাতা বন্দরকে আমরা শুধু পশ্চিমবাংলার বন্দর না ভেবে যদি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর ও বিদেশী মুদ্রা অর্জনকারী বন্দর বলে ভাবি তাহলেই তাকে রক্ষা করতে ৪০ হাজার কিউসেক জল দিতে কারো আপত্তি উঠতে পারে না। যাই হোক, বিশেষজ্ঞদের অভিমতের কথা যখন উঠেছে তখন তা যাচাই করে নেওয়াই ভাল। বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে ফরাক্কার জল নিয়ে বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাবে, এটাই আমরা আশা করি।

যদি বলি পশ্চিম বাংলার রাজনীতি আপাতত নিস্তরঙ্গ তবে তা নিশ্চয়ই অন্যায় বলা হবে না। এক পক্ষ মাঠে হাজির থাকলে খেলা কোনো সময়েই জমতে পারে না। বিরোধী পক্ষ মাঠ থেকে স্বেচ্ছা—নির্বাসিত। তাঁরা ভাবছেন এইটেই প্রতিবাদের সেরা পথ। কিন্তু রাজনৈতিক মঞ্চে তাঁদের এই অনুপস্থিতিতে লোকে যে তাঁদের ভুলতে বসেছে, এ-কথাটা খেয়াল হচ্ছে না একবারও। অবশ্যই আমরা জানি যে, বিধানসভার বাইরেও রাজনীতির বিস্তৃত অঙ্গন রয়েছে এবং আমাদের বামপন্থী দলগুলি নাকি ছা-পোষা বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি পার্টি নয়। প্রত্যেকেরই বৈপ্লবিক কর্মসূচী আছে এবং পার্লামেন্টারি পথটা একটা সাময়িক রণকৌশল মাত্র। কিন্তু বিধানসভার বাইরে যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ সেখানেও কোথায় দেখা মিলছে তাঁদের?

বর্তমান পথ সম্পর্কে বামপন্থীদের মধ্যেই যে তীব্র মতভেদ রয়েছে তা আর এস-পি'র রাজ্য কমিটির সর্বশেষ বৈঠকের পর আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আর এস-পি গোড়া থেকেই এই কথা বলে এসেছে যে, বিধানসভা বর্জনের সিদ্ধান্ত চিরকালের জন্যে নয়। এই সিদ্ধান্ত মাঝে মাঝেই যে পুনর্বিবেচনা করতে হবে তা আর এস পি নেতারা প্রায়ই বলেছেন। সেই পুনর্বিবেচনার সময় যে এসেছে, সে-কথাটা অন্ততঃ জুন মাসের শেষ থেকে তাঁরা বলছেন। অবশ্য পুনর্বিবেচনা করা মানেই যে বিধানসভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তা নয়। আর এস পি নেতাদের বক্তব্য ছিল, যেহেতু মার্চ মাসে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে চোখ-কান বুজে সেটা বরাবরের মতো মেনে চলাটা কোনো কাজের কথা নয়। আজ আবার ঐ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা হোক। দেখা যাক, অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে কী কর্তব্য, না-হয়ে থাকলেই বা কী কর্তব্য।

কিন্তু এই মাসের গোড়ায় রাজ্য কমিটির বৈঠকে যে-সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো তা থেকে মনে হয় আর এস পি আরো এক ধাপ এগিয়েছে। বিধানসভা বর্জন যে অনির্দিষ্টকালের জন্যে চলতে পারে না, এ-কথা আগেই বলা হয়েছিল। এবার খুবে স্পষ্ট করেই বলা হলো যে, জনগণের অভাব-অভিযোগকে প্রকাশ করতে এবং সরকার-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে এই বিধানসভাকে লাগাতে হবে। বিধানসভার বাইরে গণ-আন্দোলন এবং বিধানসভার ভেতরের কর্মসূচী একই সঙ্গে চলতে পারে।

রাজ্য কমিটি এই সিদ্ধান্ত নেওয়া মানেই যে আর এস পি এখনই বিধানসভায় যোগ দিচ্ছে তা নয়। দলের সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন ছাড়া আর এস পি রাজ্য বিধানসভায় যোগ দিতে পারবে না। কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক হচ্ছে আগামী মাসে দিল্লীতে। ঐ বৈঠকের পরই নিশ্চিতভাবে জানা যাবে আর এস পি বিধানসভায় যোগ দেবে কিনা।

ইতিমধ্যে বাম ফ্রন্টের অন্য সব শরিকেরা আর এস পি'র এই সিদ্ধান্তকে কোন চোখে দেখবে? বিধানসভাকে সরকার-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগানোর যুক্তি তারা মেনে নেবে কি? আর এস পি অবশ্য তাদের সামনে বিহার বিধানসভার নজির তুলে ধরতে পারে। বামপন্থীরা স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত বিধানসভার বিশেষ বৈঠকেও যোগ দেয় নি। যোগ দেওয়ার কথাও ওঠে না। সি পি এম লোকসভা বা রাজ্যসভা বর্জন করে নি, তবু ১৪ আগস্ট মধ্যরাত্রের অনুষ্ঠানে যোগ দেয় নি। সেখানে পশ্চিম বাংলা বিধানসভার বিশেষ বৈঠকে সি পি এম বা তার সহযোগীদের যোগ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু বিহার বিধানসভার বিশেষ বৈঠকের সময় বিরোধীরা যা করলেন তাতে বেশ হৈ-চৈ সুরু হয়ে গেছে। না, তাঁরা বৈঠক বর্জন করেন নি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেদার পাণ্ডে যেই বক্তৃতা দিতে উঠলেন তখনই বিরোধী পক্ষের সদস্যরা একযোগে দাবি তুললেন, আগে বিহারকে দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করতে হবে, তারপরে অন্য কথা। সেই নিয়ে অনেক গণ্ডগোল হয়। বিধানসভার বিশেষ বৈঠকের মতো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে এই ধরনের গণ্ডগোল করা শোভন কিনা তা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু ধরুন, বামপন্থীরা যদি পশ্চিম বাংলা বিধানসভার বিশেষ বৈঠকে যোগ দিতেন, তারপর বক্তৃতা করতে উঠে রাজ্যের খরাগ্রস্ত মানুষের দুর্দশার কথা বলতেন এবং শেষে কোনো গণ্ডগোল না-করে বিধানসভা ত্যাগ করে চলে যেতেন তাতে কি বামপন্থীদের বক্তব্য আরো নাটকীয়ভাবে প্রকাশ পেত না?

•

যারা আর এস পি'র কথা অনুযায়ী চলতে চায় না তাদের মধ্যে সি পি এম তো আছেই, কিন্তু এ-ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার এস ইউ সি। জুলাইয়ের গোড়ায় বাম ফ্রন্টের বৈঠকে আর এস পি বিধানসভা বর্জনের প্রশ্ন পুনর্বিবেচনার দাবি তুলতে পারে, এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর সবচেয়ে বেশি ক্ষেপে ওঠে এস ইউ সি।

ঐ দলের মতে আর এস পি'কে জড়িয়ে এই যে সব খবর বেরোচ্ছে তাতে বাম ফ্রন্ট সম্পর্কে লোকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ লোকে ভাবছে, ফ্রন্টে মতভেদ দেখা দিয়েছে। আর এস পি নেতারা এইসব খবরের সত্যতা অস্বীকারও করেন নি।

কিন্তু লোকের মন থেকে বিভ্রান্তি দূর করতে গিয়ে এস ইউ সি যা করলে

[illegible] বিভ্রান্তি বাড়লো বৈ কমলো না। [illegible] ইউ সি বাম ফ্রন্টের শরিকদের কাছে একটি চিঠি পাঠালো। সেই চিঠিতে বলা হলো যে, গত নির্বাচনে যে সর্বাত্মক [illegible] হয়েছে তার অকাট্য প্রমাণ [illegible]। কারচুপি করে, তৈরি একটি বিধান-সভায় যোগদানের অর্থই হলো ঐ সাজানো বিধানসভাকে মেনে নেওয়া। আর এই কয়েক [illegible] মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় নি যাতে বিধানসভা বর্জনের সিদ্ধান্ত বদল [illegible] দরকার হতে পারে।

ঐ চিঠিটা ছিল আর এস পি'র [illegible] এস ইউ সি'র পরোক্ষ ধমক। [illegible] এস ইউ সি সেটাকেই যথেষ্ট মনে [illegible] চিঠিটা আবার খবরের কাগজে [illegible] জন্যে দিয়ে দিলে। তার ফলে [illegible] এস পি গেল চটে। ফ্রন্টের শরিকদের [illegible] ব্যাপারটাকে এ-ভাবে প্রকাশ্য আলোচনার ব্যাপার করে তোলা কি ঠিক [illegible]? কিন্তু যখন এস ইউ সি ঐ পথেই [illegible], তখন আর এস পি'কেও প্রকাশ্য [illegible] দিতে হয়। আর এস পি'র পক্ষে [illegible] তাই আবার জানালেন যে, বিধানসভা বর্জনের সিদ্ধান্ত আর এস পি [illegible] একটা সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে। [illegible] ঐ সময়ে বামপন্থীদের পক্ষে ব্যাপক-[illegible] গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব [illegible] না। কিন্তু অনির্দিষ্টকালের জন্যে বিধানসভা বর্জনের সিদ্ধান্তে অটল থাকার [illegible] আমাদের ভেবে দেখতে হবে, বিধান-সভা বর্জনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে কিনা।

[illegible] মাখনবাবু এস ইউ সি'র [illegible] কটাক্ষ করতেও ছাড়েন নি। শরিকদের মধ্যে মতভেদ থাকতেই পারে। কিন্তু সেই মতভেদ যদি আন্তরিক হয়, [illegible] পিছনে যদি কোনো [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] থাকে তবে সেই মতভেদে আপত্তি কেন? এস ইউ সি যেভাবে তার নিজের [illegible] ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছে সেটা মোটেই শোভন নয়। অথচ শরিকদের একটা নির্দিষ্ট আচরণ-বিধি মেনে চলা উচিত বলে ঐ দলই সবচেয়ে বেশি সোচ্চার।

দুই প্রধান শরিকের এই ধরনের মতবিরোধের মধ্যেই বাম ফ্রন্টের বৈঠক বসেছিল। ফ্রন্টের বৈঠকে অবশ্য বিধান-সভা বর্জন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়। সেই সঙ্গে স্থির হয় যে গণ-আন্দোলনও সুরু করা হবে।

কিন্তু ফ্রন্টের ঐ সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও আর এস পি বিধানসভা বর্জন সম্পর্কে বিবেচনার পালা শেষ করে দেয় নি। রাজ্য কমিটির বৈঠকে এই প্রশ্নটিই ছিল আলো-চনার প্রধান বিষয়। রাজ্য কমিটি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা আমরা আগেই দেখেছি। এখন কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের জন্যে প্রতীক্ষা।

•

আর এস পি অবশ্যই চাইছে বিধান-সভায় যোগ দিতে। কেন্দ্রীয় স্তরের অনেক নেতাও দলের বিধানসভায় যোগদানের পক্ষপাতী। কারণ তাঁরা মনে করছেন, এ-ভাবে বিধানসভা বর্জনের মধ্যে দিয়ে কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে না। বিশেষতঃ যতোই দিন যাচ্ছে, ততোই ব্যাপারটা অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বামপন্থী নেতারা দিব্যি মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় বসছেন, বিভিন্ন সরকারী কমিটিতে যোগ দিচ্ছেন। অথচ যে বিধানসভার সংখ্যা-গরিষ্ঠতার ওপর নির্ভর করে এই সরকার তৈরি হয়েছে সেই বিধানসভাকে বে-আইনী বলে চলেছেন।

কিন্তু আর এস পি নেতাদের মধ্যে এই মনোভাব থাকলেও যে তাঁরা এখনই যে বিধানসভায় যোগ দেবেন তা মনে হয় না। কারণ, আর এস পি'র সিদ্ধান্তের পিছনে যুক্তির যতো জোরই থাকুক না, তবু তাঁদের পক্ষে একা বিধানসভা বর্জনের সিদ্ধান্ত বদল করা কঠিন। তাই আর এস পি চাইবে আরো কোনো কোনো দলকে সঙ্গে পেতে। সেই দল যদি সি পি এম হয় তবে তো আর কথাই নেই। কারণ সি পি এম এবং আর এস পিই বাম ফ্রন্টের দুই স্তম্ভ (বিধানসভায় সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ১৪ ও ৩)। তারা যদি যায় বাকি সকলেও পিছনে পিছনে যাবে। কিন্তু সি পি এম যদি যেতে না-চায় তবে আর এস পি'র পক্ষে খানিকটা মুস্কিল হয়ে যায়। সি পি এম এখনও তার পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল। এস ইউ সি'র মনোভাব কী তা আমরা আগেই দেখেছি। এই অবস্থায় ওয়ার্কার্স পার্টি বা মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক ইচ্ছে থাকলেও হয়ত বিধান-সভায় যেতে চাইবে না।

সে ক্ষেত্রে আর এস পি কী করবে? আর এস পি নীতিগতভাবে বিধানসভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলেও এখনই বিধানসভায় যোগ না দিয়ে অন্যান্য শরিকদের মত-পরিবর্তনের আশায় থাকবে বলে মনে হয়। আর সেই প্রার্থিত মত-পরিবর্তনের জন্যে চাপও সৃষ্টি করতে পারে। তবু একা এখনই বিধানসভায় যাবে না। কারণ তাহলে বামপন্থী ঐক্য ভাঙার দায়ে পড়তে হবে আর এস পিকে। এই মুহূর্তে আর এস পি নিশ্চয়ই তা চায় না। বিশেষতঃ বামপন্থীরা যদি পুজোর আগে সত্যিই গণ-আন্দোলন সুরু করেন তবে এখন আর এস পি 'এক ঘরে' হতে চাইবে না।

১৮।৮।৭২ দেবদত্ত

বীরভূমের আমেদপুরে চিনিকল পরিদর্শনরত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ

দেশে বিদেশে

পঁচিশ বছর আগেকার এক মধ্যরাত্রে যে ঐতিহাসিক ক্ষণটিতে ভারতবর্ষের মানুষ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ভাষায় 'ভাগ্যদেবতার সঙ্গে অভিসারে' লিপ্ত হয়েছিলেন সেই ক্ষণটি দিল্লির সংসদ-ভবনে ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে স্মরণ করা হল।

১৯৪৭ সালের ১৪/১৫ আগস্টের সেই মধ্যরাত্রিতে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু গণ-পরিষদের সদস্যদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, "ইতিহাসের সেই কোন্ ঊষালগ্নে ভারত তার অন্বেষণের যাত্রায় বেরিয়েছে এবং তার এষণার দ্বারা, তার সাফল্য ও তার ব্যর্থতার মহত্ত্বের দ্বারা শতাব্দীর পর শতাব্দীর ইতিহাস আকীর্ণ হয়ে রয়েছে। কি সম্পদের দিনে, কি বিপদের দিনে, ভারত কখনও তার সেই অন্বেষণ থেকে ভ্রষ্ট হয়নি অথবা যেসব আদর্শ তাকে শক্তি দিয়েছে সেগুলি কখনও বিস্মৃত হয় নি। আজ আমরা একটি দুর্ভাগ্যের কাল সমাপ্ত করছি এবং ভারতবর্ষ পুনরায় নিজেকে আবিষ্কার করছে।

"আমরা আজ যে সাফল্যের জন্য উৎসব করছি সেটা একটা পদক্ষেপ মাত্র একটা সুযোগের উন্মোচন মাত্র—আমাদের সামনে আমাদের জন্য যেসব মহত্তর বিজয় ও বৃহত্তর সাফল্য অপেক্ষা করে আছে সেইসব সাফল্যের লক্ষ্যে পৌঁছবার সুযোগ। এই সুযোগ আঁকড়ে ধরার ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মত যথেষ্ট সাহস ও যথেষ্ট বিজ্ঞতা কি আমাদের আছে?"

২৫ বছর পরে ১৯৭২ সালের ১৪/১৫ আগস্ট মধ্যরাত্রিতে জওহরলালের ঐ কথাগুলির প্রতিধ্বনি করে দিল্লির পার্লামেন্ট ভবনের সেন্ট্রাল হলে ভারতের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী, জওহরলালের কন্যা, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বললেন "শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ কাল আমরা অতিক্রম করে এসেছি। এই সময়ের মধ্যে আমরা সফলতা ও ব্যর্থতার ভাগ, বিজয় ও বিপর্যয়ের ভাগ আমরা পেয়েছি। তবুও আমরা এই অনস্বীকার্য সত্যের জন্য গর্ববোধ করতে পারি যে, বহু চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও আমরা আজ অধিকতর শক্তিশালী—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে আগের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। আমাদের জাতীয় একতা, গণতন্ত্র, ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র মজবুত ও দৃঢ়ভিত্তিক।"

সেন্ট্রাল হলের এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি বললেন যে, "দারিদ্র্য দূরীকরণ একটি বিরাট কাজ। এই কাজ আমাদের না করে উপায় নেই। জনসাধারণ আমাদের এই কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছে এবং এই কাজ সম্পন্ন করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যত দ্রুত ও যত সুষ্ঠুভাবে সম্ভব আমাদের এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।"

রাজধানী দিল্লিতে যখন এই অনুষ্ঠান হচ্ছিল ঠিক তখনই বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীতেও একই ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার পঞ্চবিংশতি বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হচ্ছিল। যদিও এইসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পঁচিশ বছর আগেকার সেই দিনটির উৎসাহ উদ্দীপনার স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা হয়েছে তাহলেও সেই চেষ্টা যে পুরোপুরি সফল হয়েছে তা নয়। কারণ, এই সিকি শতাব্দী কালের মধ্যে যেসব ব্যর্থতার ভার আমরা সঞ্চয় করেছি, যেসব উজ্জ্বল আশা ইতি-মধ্যে ম্লান হয়ে গেছে অনিবার্যভাবেই সেগুলি এই অনুষ্ঠানের উপর ছায়া বিস্তার

রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি ১৬ আগস্ট নয়াদিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে 'অরবিন্দের স্বপ্নের ভারত' সম্পর্কে আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন। তদুপলক্ষে সাহিত্য আকাদেমী কর্তৃক প্রকাশিত অরবিন্দ সম্পর্কে একখানি গ্রন্থেরও প্রচারের সূচনা করেন। চিত্রে দেখা যাচ্ছে সাহিত্য আকাদেমীর সভাপতি ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কিত গ্রন্থখানি রাষ্ট্রপতির হাতে দিচ্ছেন। কেন্দ্রীয় পর্যটন ও অসামরিক বিমান দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ করণ সিংও চিত্রে রয়েছেন।
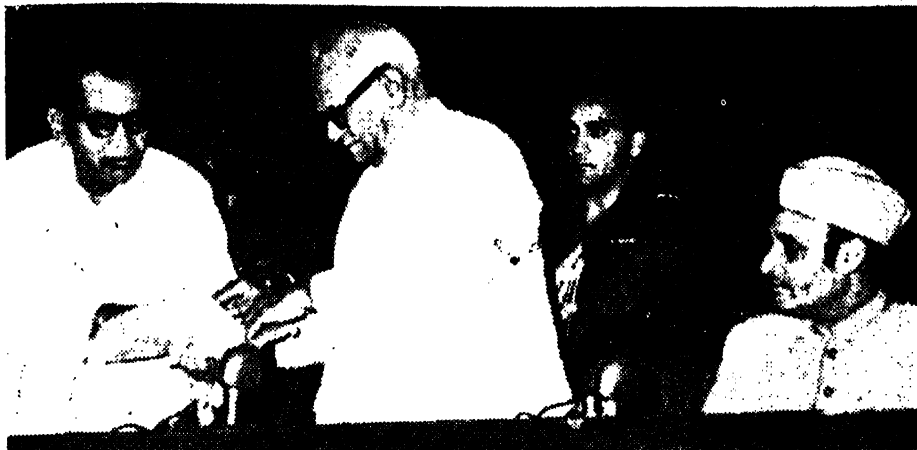
করেছে। বিশেষ করে, স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পূর্তির উৎসব যখন হচ্ছে তখন দেশব্যাপী যে অনাবৃষ্টিজনিত দুর্গতি চলছে সে কথাটাকেও উৎসবের আঙিনা থেকে খুব বেশি দূরে রাখা যায়নি। এই দুর্গতির কথা স্মরণ রেখেই উৎসবের আলোকসজ্জা স্তিমিত করা হয়েছে, উৎসব থেকে সরকারী খানাপিনার সব কর্মসূচী বাদ দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, এবারকার এই উৎসবের সময় ভারতবর্ষের স্বাধীনতাযুদ্ধের কাহিনী স্মরণ করার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে দিল্লিতে ও রাজ্য রাজধানীগুলিতে মধ্য রাত্রির অনুষ্ঠানে সকল স্বাধীনতাসংগ্রামী শহীদদের স্মৃতিতে শ্রদ্ধানিবেদন করা হয়। তাছাড়া, ১৫ আগস্ট ঐতিহাসিক লালকেল্লার দেওয়ান-ই-আম-এ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সারা দেশ থেকে বাছাই করা সহস্রাধিক স্বাধীনতাযোদ্ধাকে 'তাম্রপত্র' উপহার দেন। স্বাধীনতাযোদ্ধাদের সম্মানিত করার জন্য অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে অবশ্য কিছু বিভ্রাট হয়েছিল। যেমন, প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে তাম্রপত্র গ্রহণ করার জন্য যেসব স্বাধীনতাসংগ্রামীকে বাছাই করা হয়েছিল তাঁদের কোন পরিষ্কার নীতির ভিত্তিতে বাছাই করা হয়নি। এই অনুষ্ঠানের জন্য যাঁদের সরকারী অতিথি হিসাবে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁদের তুলনায় অনেক যোগ্যতর মানুষও বাদ পড়ে গেছেন। এমন অভিযোগ উঠেছে। আবার যাঁরা দিল্লিতে গিয়েছিলেন তাঁদেরও সেখানে উপযুক্ত সমাদর করা হয়নি বলে বলা হয়েছে। তবুও একথা সত্য যে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এই স্মরণ অনুষ্ঠান স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উৎসবকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

ভারত-মার্কিণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্প্রতি যে অবনতি ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী উৎসবের সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, এই উপলক্ষে ভারতকে অভিনন্দন জানিয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

মার্কিণ সিনেটে গৃহীত ঐ প্রস্তাবের একটি অংশে বলা হয়েছে, বিশেষ করে আগামী ২৫ বছরে ভারতবর্ষের যা হবে তাতে এশিয়ার অন্যান্য দেশের ভবিষ্যৎ নির্ণয়ে সাহায্য হবে। ঐ দেশগুলি পথ দেখাবার জন্য ও নির্দেশের জন্য এই গণতান্ত্রিক শক্তির মুখের দিকেই চেয়ে থাকবে। কারণ গণতান্ত্রিক শক্তির সহায়তায় যে ন্যায় বিচার ও অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জন করা যায় সেকথাটার প্রমাণ ও পরীক্ষা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মতই ভারতেও হচ্ছে। গণতন্ত্রের মুক্ত হাওয়ায় ভারত যে কল্যাণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে তার তাৎপর্য সেদেশের পাঁচ লাখ গ্রাম ছাড়িয়ে ভারতের সীমানার বাইরেও বিস্তৃত হচ্ছে।

ঐ প্রস্তাবের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন জন শেরম্যান কুপার—যিনি এক সময় ভারতে মার্কিণ রাষ্ট্রদূত ছিলেন এবং এখন রিপাব্লিকান দলভুক্ত সিনেট সদস্য।

এই উপলক্ষে ভারতবর্ষের আরও দুজন প্রাক্তন মার্কিণ রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য লক্ষণীয়। ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত ভারতীয় দূতাবাসের পত্রিকায় তাঁরা প্রবন্ধ লিখে তাঁদের এই বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।

জন কেনেথ গলব্রেথ তাঁর প্রবন্ধে এই বলে আশা প্রকাশ করেছেন যে, ওয়াশিংটনের আমলা মহলের সবচেয়ে বায়ুরুদ্ধ গভীরতম অন্তঃপুরেও এখন আর কেউ ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশে আবার অস্ত্রশস্ত্র চালান দেওয়ার কথা ভাবছেন না। পাকিস্তানকে ভারতের সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গড়ে তোলার 'স্বপ্ন' দেখে আমেরিকা যে ভুল করেছিল গলব্রেথ তার উল্লেখ করেছেন এবং এই মিথ্যা স্বপ্নের ফলে উপমহাদেশের শান্তি ও ভারসাম্যের যে ক্ষতি হয়েছে তার কথাও তিনি বলেছেন। তিনি এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রান্ত কূটনৈতিক নীতিগুলি এখন চিরকালের মত পরিত্যাগ করা হয়েছে এবং 'উত্তর আমেরিকার যে ধরনের ভারসাম্য রয়েছে তার কতকটা অনু-

রূপে ভারসাম্যের উদ্ভব এই উপমহাদেশে হবে।

আর একজন প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত চেষ্টার বোলজ লিখেছেন, তিনি শুধু এ বিষয়েই সুনিশ্চিত নন যে, 'ভারত এশিয়ায় ও সমগ্র পৃথিবীতে সংযম ও শান্তির শক্তি হিসাবে কাজ করছে' তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাসও জন্মেছে যে, 'পরবর্তী ২৫ বছরে ভারত তার জনগণের জন্য উন্নততর জীবনের সংস্থান করার পথে এগিয়ে যাবে।' অনেক পাশ্চাত্য পর্যবেক্ষক ভারতের টিকে থাকার সম্ভাবনা সম্পর্কে যে সংশয় প্রকাশ করেছেন মিঃ বোলজ তার উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন, 'কে ভাবতে পেরেছিল, ভারতীয় শিল্প এতটা এগিয়ে যাবে, ম্যালেরিয়া এমন প্রায় উৎখাত হয়ে যাবে, এত বড় একটা জন্মনিয়ন্ত্রণের কার্যসূচী চালু করা হবে, ভূমি সংস্কারের কাজ এতটা এগোবে, তিনটি যুদ্ধে ভারত নিজেকে এভাবে সাফল্যের সঙ্গে রক্ষা করবে?' বোলজের মতে, পরবর্তী পঁচিশ বছরে ভারত বৃহত্তর সাফল্য অর্জন করবে।

এগুলি কি ভারত ও আমেরিকার পারস্পারিক শীতল সম্পর্কের বরফ গলার পূর্বাভাষ? হয়ত এখনও পরিষ্কার করে বলা যায় না। তবে দুই পক্ষ থেকেই মধ্যে মধ্যে যেভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে সেটা একেবারেই তাৎপর্যহীন না হতে পারে। যেমন প্রায় একই সময়ে শ্রীমতী গান্ধী আমেরিকার 'প্যারেড' প্রতিনিধিকে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ছিন্নসূত্রগুলি আবার জোড়া দিতে উৎসুক তবে নিকসন সরকার এগিয়ে কোন আগ্রহের পরিচয় দেন নি। তিনি বলেছেন, 'যা ঘটেছে তা আমরা ভুলে যেতে একান্তভাবেই ইচ্ছুক এবং আমেরিকার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কও আমরা নতুনভাবে গড়ে তুলতে চাই। আমরা আপনাদের বন্ধুত্ব চাই।'

ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের ক্ষেত্রে যখন অন্তত কিছু মিষ্টি কথার আদান-প্রদান হচ্ছে তখন ভারত-চীন সম্পর্কের উন্নতির ক্ষীণ সম্ভাবনাও সুদূরে পরাহত হয়ে যাচ্ছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্বরণ সিং লোকসভায় বলেছেন যে, বাংলাদেশকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য করার ব্যাপারে চীন যে ভিটো প্রয়োগ করবে বলে ভয় দেখিয়েছে সেটা খুব উৎসাহব্যঞ্জক লক্ষণ নয় অথবা ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রয়াসের পরিচায়ক নয়।' স্বরণ সিং এই বলে আফশোষ করেছেন যে, যে চীন নিজে একদা রাষ্ট্রসংঘের প্রবেশাধিকারের জন্য তার দেওয়ালে মাথা ঠুকেছে সেই চীনই এখন আবার বাংলাদেশকে রাষ্ট্রসংঘের বাইরে রাখার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

বাংলাদেশকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাবের একেবারে সূচনাতেই চীন যেভাবে এই প্রস্তাবের প্রতিরোধ করছে তাতে এটা পরিষ্কার যে, ভারতের বিরুদ্ধে চীন ও পাকিস্তানের মিতালি এতটুকু শিথিল হয় নি। একথাও মনে করার কারণ দেখা দিয়েছে যে, চীনের উস্কানিই পাকিস্তানকে বাংলাদেশ সম্পর্কে অধিকতর বাস্তবসম্মত নীতি গ্রহণ করতে দিচ্ছে না। এই সেদিন প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বললেন যে পাকিস্তান যদি সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয় তাহলে রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তান একঘরে হয়ে পড়বে। অথচ বাংলাদেশকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাবটি যেই এল তখনই প্রেসিডেন্ট ভুট্টো সুর বদলে বললেন, তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবেন না আর বাংলা দেশ যাতে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখবে পাকিস্থানের বন্ধু চীন।

লোকসভায় সম্প্রতি যখন মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা চলছিল তখন কোরামের অভাবে একদিনে দুবার ঘণ্টা বাজিয়ে সদস্যদের সেই আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য ডেকে আনতে হয়েছিল।

১৭।৮।৭২ —দর্শক

লোক-কবি কালিদাস

মণিলাল খান

মহাকবি কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যের একটি অমর কবি-নাম। তাঁর কবি-খ্যাতি তাঁকে এত উত্তুঙ্গে স্থাপন করেছিল যার জন্যে পাঠক-সাধারণের কাছে তিনি হয়ে ওঠেন সরস্বতীর বরপুত্র। ফলে, খুব স্বাভাবিকভাবেই ব্যাস-বাল্মীকির মত কালিদাস—ব্যক্তি-মানুষটিও একদিন হারিয়ে গেলেন নিজের নামের মধ্যেই। আর তাই সমালোচকদের বিচারশালায় 'কালিদাস' আজও একটা সমস্যা।

তিনি শুধু যে পাঠকসাধারণের কাছেই মুখোচ্চারিত কবি-স্মৃতি তা নন, সেকালের পটু-অপটু অনেক কবির কাছেও তাঁর নাম—কল্পলোকের সুধাভাণ্ড তুলে ধরত। তাই দেখা যায় এই কবির সমসাময়িক বা কিছু পরবর্তী অনেক কবির রচনাও কালিদাসের নামে চলে এসেছে।১ অষ্টম-নবম শতকেই এক রাজশেখরের গ্রন্থেই তিনজন কালিদাসের অস্তিত্বের কথা জানা যায়।২

সুদূর অতীতের কথা ছেড়ে দিলেও, বর্তমানকালের অন্যতম পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথের কল্প-তরী কতবার কত রূপেই না কবিকে একালের যন্ত্রণা-কাতর পরিবেশ থেকে মহাকবি কালিদাসের চির-সৌন্দর্যের অমরাবতীতে পৌঁছে দিয়েছে। তাই তো কবিকে বলতে শুনি—

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে
দৈবে হতেম দশমরত্ন নবরত্নের মালে;

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ও নব-রত্নের অন্যতম রত্ন কুমারসম্ভব-মেঘদূতের কবি কালিদাস আজ কেবল ভারতীয় সাহিত্যেই নয়, পৃথিবীর নানান সাহিত্যেও সসম্মানে সমাদৃত।

সুতরাং কালিদাসের কালে না জন্মেও স্বয়ং বিশ্বকবির যদি কালিদাস-সুখ-সান্নিধ্য লাভের বাসনায় দশমরত্ন হতে সাধ যায়, সেখানে অখ্যাত লোক-কবিই বা সরাসরি কালিদাস হয়ে আত্মপ্রকাশ করার প্রবল ইচ্ছা দমন করেন কি করে?

তাই দেখা যায় লোকসাহিত্যে বা মৌখিক সাহিত্যের ধাঁধা শাখায় কোন একজন বা একাধিক লোক-কবি কালিদাসের ভনিতায় ধাঁধা রচনা করেছেন।

কিন্তু 'কহেন কবি কালিদাস' বা 'কহে কবি কালিদাস হেঁয়ালির ছলা'—ইত্যাদি ভনিতা ব্যবহারের ঘটনা লোক-সাহিত্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে ঃ 'কোনোটির কোনো কালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই এবং কোন্ শকের কোন্ তারিখে কোনটা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না'।৩ এ হেন ব্যক্তি-বিশেষ বর্জিত ধাঁধার রাজ্যে রচয়িতা হিসাবে 'কালিদাস' নাম গবেষকদের চিন্তার খোরাক বইকি।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে,—কে এই কালিদাস, আর কেনই বা তাঁর এমন ভনিতা ব্যবহার? অন্য কোন কবির ভনিতাও তো ব্যবহৃত হতে পারত?

এর উত্তরও বেশ সরল। কারণ যদি এটা ছদ্মনাম না হয়ে থাকে, তাহলে 'শিব-ঠাকুরের'৪ মত ইনিও একজন পৈতৃক নাম ব্যবহারকারি অতি সাধারণ লোক-কবি।

কিন্তু ব্যক্তিগত নামের ভনিতাযুক্ত ধাঁধা বাঙলা-লোক-সাহিত্যে নেই বল্লেই চলে।৫ সেখানে কালিদাস নামটাকে ব্যক্তিগত নামরূপে গ্রহণ করলে ভুল হবে।

তাছাড়া, এটা যে এখানে ছদ্মনাম তারও একটা প্রাঞ্জল প্রমাণ হচ্ছে এই যে, কালিদাসকে 'পণ্ডিত'রূপেও কোন কোন ধাঁধায় বিশিষ্ট করা হয়েছে। যেমন—

জলে চলে, না ছোঁয় জল,
কালিদাস পণ্ডিত দেখে বলে
এ এক মজার কল।
(নিজস্ব সংগ্রহ, যশোরজেলা)

সাধারণ লোক সচরাচর 'পণ্ডিত' বলতে সংস্কৃতজ্ঞকেই বোঝায়। ধাঁধা রচয়িতা লোক-কবিও তাই কোথাও 'কবি' কোথাও 'পণ্ডিত'-রূপেই পরোক্ষভাবে কুমারসম্ভব-মেঘদূতের কবিকে বুঝিয়েছেন।

এখন দেখা যাক, কেনই বা লোক-কবি অন্য কবিকে বাদ দিয়ে কালিদাস হতে গেলেন।

কথিত আছে, একদা স্ত্রীর দ্বারা অপমানিত হয়ে মহামূর্খ কালিদাস আত্ম-হননের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেন। কিন্তু দৈবক্রমে ঘটনার ধারা ভিন্নদিকে মোড় ঘুরল। তাই দেখা যায়, দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হন এবং কালিদাসকে কবিত্ব-শক্তি লাভের বরদান করেন। অতঃপর মহামূর্খ কালিদাস মহাকবি হয়ে ঘরে ফিরলেন।

নিরক্ষর মানবসমাজের যে চিত্তশক্তি মহা-কবির সম্পর্কে এমন একটি অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব গল্পের স্রষ্টা—সেই চিত্তশক্তিই মৌখিক সাহিত্য সৃষ্টি করে এসেছে। কালিদাস সম্পর্কে এই কাহিনী অতীতকাল ধরে যৌক্তিকতার বেড়া টপ্‌কিয়ে কথা, রূপকথা ও গীতিকার মত এ দেশের কোটি কোটি মানুষের চিত্তলোক জয় করে রয়েছে। যিনি স্বয়ং বাগ্দেবীর কৃপালাভে ধন্য, যাঁর প্রতিভার সাথে সুদীর্ঘকাল ধরে এ দেশের লোক পরিচিত—সেই সরস্বতীর বরপুত্র কবি কালিদাস সর্বজন চিত্তের বিস্ময়।

অতএব সেই কবির পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ মৌখিক বা লোকসাহিত্যের কবি। আপনার

১। শৃঙ্গারতিলক, দুর্ঘট কাব্যচিত্রকা, দুষ্করমালা, চিদ্‌গগন চন্দ্রিকা, ভ্রমরাষ্টক, বৃন্দাবনকাব্য, লঘুস্তব, শ্রুতবোধ ইত্যাদি কাব্যগুলোকে কালিদাসের রচিত বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।

২। একোপি জীয়তে হন্ত কালিদাসো
ন কেনচিৎ।
শৃঙ্গারে ললিতোদ্‌গারে
কালিদাসত্রয়ী কিমু।।
(সূক্তি-মুক্তাবলী)

৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য দ্রষ্টব্য।

৪ ছড়ার জগতের এই শিবুঠাকুর বা শিবু ঠাকুর আসলে সেকালের জনৈক কুলীন-কুলতিলক শিবুসদাগর। কারণ—

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান:
শিবু ঠাকুরের বিয়ে হ'ল তিন কন্যে দান।।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান।
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান।।
'এ-পার গঙ্গা, ও-পার গঙ্গা মধ্যিখানে চর।
তারি মধ্যে বসে আছে শিবু-সদাগর।।'

দ্রষ্টব্য ঃ লোকসাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫ কালিদাসের হেঁয়ালি নাম দিয়ে ভীমরেণ্ট লাইব্রেরী প্রকাশিত পুস্তিকায় কৃষ্ণচন্দ্র ভনিতাযুক্ত অসংখ্য হেঁয়ালি লক্ষ্য করা যায়। বলা বাহুল্য সেগুলো কৃষ্ণচন্দ্র বা অপর কোন অর্বাচীন কবির রচনা।

ক্ষুদ্র কবি-প্রতিভাকে যে সেই অমর কবি-নাম দিয়েই ঢেকে দিতে চাইবেন তাতে আর বিস্ময়ের কি থাকতে পারে! আর সেই জন্যেই বাঙলা মৌখিক সাহিত্যে কবি কালিদাসের জন্ম।

এই লোক-কবিও যে কালিদাসের কাব্য ও সংস্কৃত পুরাণাদি পড়েছেন তার প্রমাণ তাঁর সৃষ্ট বিচিত্র বিষয়ের ধাঁধার মধ্যেই পাওয়া যায়। ফলে, ভাবে ও রূপে এই ধাঁধাগুলোর সহজ স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। যথা—

সূর্যবংশে জন্ম তার অজরাজার নাতি।
দশরথ পুত্র হয় নয় সীতাপতি।।
রাবণের অরি নয় লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ।
কহে কবি কালিদাস হেঁয়ালির শ্রেষ্ঠ।।

একদা আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় রামায়ণের রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, দশরথ প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর চরিত্রাবলীর তুলনায় পবিত্রতম ভরত-চরিত্রের প্রতি মহাকবি বাল্মীকির অহেতুক উপেক্ষার প্রতি কটাক্ষপাত করেন এবং ভরত চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেন।৬ শুধু তাই নয়, বরঞ্চ পাদপ্রদীপের আলোয় আচার্য সেন রামায়ণ পাঠকগণের, সমবেদনাও আকর্ষণ করে আনেন।

অতএব উক্ত চরিত্রের প্রতি লোক-কবি কালিদাসও যে ক্ষীণতর ধাঁধার শরীরে সম্মাননায় সচেষ্ট হয়েছেন উপরোক্ত ধাঁধাটিই তার প্রমাণ। এ দৃষ্টান্ত ধাঁধার রাজ্যে বিরল। এতে বলা হয়েছে যে, দশরথের পুত্র ও লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ অথচ সীতাপতি নন এবং রাবণেরও তিনি শত্রু নন—কে সেই ব্যক্তি? নিশ্চয়ই ভরত।

আর একটি ধাঁধায় বলা হয়েছে :—

গায়ত্রী নাহিক জানে যেই মহাশয়।
ব্রাহ্মণ বলিয়া তারে গণনা করয়ে।।
সকলে তাহার শিষ্য দেখ সমুদায়।
কহে কবি কালিদাস হেঁয়ালি বচন।।

জন্মসূত্রে যিনি ব্রাহ্মণ নন, সেই বিশ্বামিত্র মুনি তপস্যার বলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন এবং ব্রাহ্মণশ্রেণীভুক্ত হন। সেই ঋষির উদ্দেশ্যে ছড়া কেটে লোক-কবি কালিদাস হেঁয়ালি করে বলছেন যে, এমন কে ব্রাহ্মণ আছেন যিনি গায়ত্রী জানেন না অথচ তাঁকে ব্রাহ্মণরূপে গণ্য করা হয় এবং সকলেই যাঁর শিষ্যত্ব লাভে ধন্য।

এই পুরাণ-বিষয়ক ধাঁধাগুলির সবকটিই যে কালিদাসের স্বপ্রতিভাজাত তা নয়, ভনিতা-সর্বস্ব অনেক ধাঁধাও কালিদাসের নামে চলে এসেছে। যথা—

পিতার ঔরস নাহি জন্ম দিল পরে।
জন্মের সময় তার মা ছিল না ঘরে।।
কে বা সেই জন্মদাতা কে বা সেইজন।
যাহার পিতার নামে পলায় শমন।।৭

চিরপরিচিত রামায়ণ কাহিনী থেকে বিষয়-নির্বাচন করে যে এমন একটা সার্থক ধাঁধা সৃষ্টি হতে পারে উপরোক্ত উদ্ধৃতিতেই তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন দৃষ্টান্ত ধাঁধার রাজ্যে অন্যত্র বিরল।

কার্য ও কারণ ছাড়া কোন ঘটনা ঘটতে পারে না। অথচ ধাঁধার রাজ্যে যে উল্টোটাই ঘটতে পারে, এখানে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। পিতার ঔরস বর্জিত একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল যখন তার মাও সেই সময়ে ঘরে ছিলেন না। কেই বা সেই পুত্রের জন্মদাতা আর কেই বা সেই সন্তানের পিতা যে পিতার নামেই শমন পর্যন্ত দূরে হয়ে যায়! উত্তরের জন্য শ্রোতাকে ভাবতে হয়, অথচ উত্তর এর মধ্যেই নিহিত। কুশের জন্মদাতা হচ্ছেন বাল্মীকি, আর তার পিতা হচ্ছেন রামচন্দ্র।

সংস্কৃত মহাকাব্য ও পুরাণ কাহিনী কেবল নয় অন্যান্য বিষয়কে নিয়েও কালিদাস যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গে ধাঁধা রচনা করেন; জীবজগৎ, প্রকৃতি, সমাজের দোষ-ত্রুটি, গৃহস্থালির নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি—যেকোন তুচ্ছ বা বড় জিনিসই হোক না এগুলো পরিবেশন নৈপুণ্যে শ্রোতাদের যথেষ্ট ভাবিয়ে তোলে। যথা—

জনলে চলে না ছোঁয় জল,
কালিদাস পণ্ডিত দেখে বলে
এ এক মজার কল।।৮

(নিজস্ব সংগ্রহ)

এখানে লোক-কবি কালিদাস পণ্ডিত এমন এক মজার কলের কথা বলেছেন যে, বস্তুটি 'জনলে' চলে অথচ 'জল' স্পর্শ করে না। শ্রোতাদের মনে অনেক কিছু ভিড় করবে, কিন্তু 'জোনাকির' ক্ষীণতম আলোক সেই মনকে নাড়া দেবে কিনা সন্দেহ। এখানে 'জনলা' ও 'জলের' অভিন্ন উচ্চারণেই মৌখিক সাহিত্যে যথেষ্ট রহস্যময়তা সৃষ্টি করে এসেছে।

আর একটি ধাঁধা—

কহেন কবি কালিদাস, পথে যেতে যেতে।
নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে।।

(নিজস্ব সংগ্রহ)

হেঁয়ালি করে কবি এখানে বলছেন যে, নেই বলেই খাওয়া জুটছে, থাকলে জুটত না। অর্থাৎ একটি গরুর লেজ নেই, তাই তার পিঠের ঘায়ে মাছিরা ভোজসভা বসাবার সুযোগ পেয়েছে। তাই কবি ব্যঙ্গ করে বলছেন যে অতিপ্রয়োজনীয় সেই লেজ থাকলে কি মাছিরা এমন সুযোগ পেত?

অনেকগুলো ধাঁধায় হেঁয়ালির সঙ্গে লোককবি কিঞ্চিৎ হাস্যরসও পরিবেশন করেছেন। যেমন।

কহেন কবি কালিদাস
হেঁয়ালির ছন্দ,
জানলা দিয়ে ঘর পালায়
মালিক পড়েন বন্ধ।৯

এখানে কবি হেঁয়ালি করে বলছেন যে জানলা দিয়ে ঘর পালিয়ে যায়। কিন্তু ঘরের মালিক আটকা পড়েন। অর্থাৎ জল হচ্ছে মাছের ঘর। কিন্তু জেলেরা যখন জাল ফেলে, তখন জালের ফুটো দিয়ে তখন জানলা দিয়ে ঘর (জল) বেরিয়ে যায়। কিন্তু মালিক অর্থাৎ মাছ আটকা পড়ে যায়।

ধাঁধাটির উপস্থাপনায় জানলা দিয়ে ঘর পালানোর ব্যাপারে শ্রোতাদের মুখে কিঞ্চিৎ হাস্যরসের উদ্রেক করে থাকে।

এইরকম আর একটি ধাঁধায় দেখি—

বারো মাস বয়স তার তের মাসের কালে।
অগনন প্রসবে সে গণ্ডা গণ্ডা ছেলে।।
কহে কবি কালিদাস হেঁয়ালির ছলা।
মূর্খেতে নাহি বোঝে পণ্ডিতে
বোঝে কলা।।

এখানে এমন এক প্রসবিনীর কথা বলা হয়েছে যার বয়স বার মাস ছাড়িয়ে তের মাসে পড়েছে, তখন তার অসংখ্য ছেলের জন্ম হয়। তাই কবি হেঁয়ালি করে বলছেন যে এর পরিচয় বের করা মূর্খ ও পণ্ডিত দুজনের পক্ষে সমান অসম্ভব। বলা বাহুল্য ধাঁধাটির রহস্যভেদ কবি নিজেই করে দিয়েছেন। কেননা, 'কলা'—শব্দটি এখানে শ্লেষাত্মকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর সাধারণ অর্থ অসম্ভব বা অসাধ্য এবং প্রকৃত অর্থে কলাগাছ।

হাস্যরস অনেক সময় শিষ্টতার বেড়াটিকেও ধরে টানাটানি করে—এমন ধাঁধাও লোক-কবি কালিদাস যথেষ্ট রচনা করেন। কিন্তু সেগুলোর প্রকৃত অর্থ জানতে পারলে ধাঁধার পাঠক বা শ্রোতা, এদের অবাঞ্ছিতের তালিকায় কোন মতেই নিক্ষেপ করতে পারবেন না।

যথা—
এটির মধ্যে ওটি দিয়ে।।
মাগ ভাতারে রইল শুয়ে।।
বাইরেতে ছিল যারা।
ঠেলাঠেলি করে তারা।।
কহে কবি কালিদাস।
ভাব বসে বারমাস।।

বাটামের মধ্যে খিল এঁটে দিয়ে স্বামী স্ত্রীতে ঘরে শুয়ে আছে। বাইরে যারা ছিল তখন তারা বন্ধ দোর ঠেলাঠেলি করে—এই সাধারণ ব্যাপারটা কবি তীর্যক ভঙ্গিতেই শ্রোতাদের উপহার দেন। রহস্যটা সহজ না হওয়া পর্যন্ত ধাঁধাটি শ্রোতাদের রীতিমত চঞ্চল করে তুলবে, তাতে সন্দেহ নেই।

আবার, এমন অনেক ধাঁধা আছে যাদের অর্থ, শব্দ ভেঙে ভেঙে বের করতে হয়। যেমন—

৬ আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, রামায়ণী কথা দ্রষ্টব্য।

৭ নিজস্ব সংগ্রহ ব্যতীত অন্যান্য ধাঁধাগুলো শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত সচন্দ্রমুক্তাবলী এন্ড প্রেস, তারা আর্ট প্রেস মুদ্রিত পুস্তক, শ্রীযশোদানন্দন বসাক সম্পাদিত, সীতানাথ আদর্শ প্রেস এবং শ্রীকালীকৃষ্ণ শীল সম্পাদিত অরুণ লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত 'কালিদাসের হেঁয়ালি' পত্রিকাগুলো থেকে ব্যবহৃত হয়েছে।

৮ নিজস্ব সংগ্রহের ধাঁধাগুলো পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত মেদিনীপুর, বর্ধমান, এবং পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া ও চব্বিশ পরগণার একাধিক প্রবীণ ও প্রবীণাদের মুখ থেকে অবিকল সংগৃহীত হয়েছে।

৯ আচার্য ডঃ সুকুমার সেনের গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। ধাঁধাটির সংশোধিত একটি পাঠরূপ কালিদাস ভনিতা বর্জিতভাবে শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'কালিদাসের হেঁয়ালিতে' লক্ষ্য করা যায়।

কি বাহার ধরিয়াছে যুবতী হিয়ায়।
পিতা পুত্র সকলেই এক দৃষ্টে চায়।।'
ভাল রূপ চিন্ত ভাই কালিদাস কয়'
যে বস্তু ভাবিয়াছ মনে সেই বস্তু নয়।।

যুবতীর হৃদয়ে এমন বাহার ধরেছে যে পিতা ও পুত্র এক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। কবি তাই বলছেন, ভাল করে চিন্তা কর, যেমনটি মনে মনে যে বস্তুর কল্পনা করছো, আসলে সে জিনিস নয়।

এখানে প্রথম চরণটি ভেঙে এইরকম করলেই অর্থ মিলবে—কিবা হার ধরিয়াছে যুবতী হিয়ায়।'

সাধারণ শ্রেণীর ধাঁধাও আবার কালি-দাস—ভনিতা বাঁধ ভেঙে চলে এসেছে এবং এমন ধাঁধার সংখ্যাও কম নয়। ছাপা পত্রিকাগুলোর মধ্যে এর প্রচুর দৃষ্টান্ত মিলবে। তবে সেখানে সাধারণ শ্রেণীর লৌকিক ধাঁধাও বেশ কিছু ঢুকে পড়েছে। কিছু অন্য লোক-কবিরও ধাঁধা দেখা যায়। বলা বাহুল্য এই সমস্ত ধাঁধার রাজ্য থেকে লোককবি কালিদাসের ধাঁধাগুলো পৃথক করা সহজ নয়। তবে এই সংগ্রহ-পত্রিকা-গুলোতে এমন কিছু ধাঁধা দেখা যায় যেগুলো সব পত্রিকাগুলোর মধ্যেই স্থান পেয়েছে, এবং সেগুলোকেই কালিদাসের বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

এই শ্রেণীর একটা ধাঁধায় দেখা যায়—
ক্ষুর ঘষানং ক্ষুর ঘষানং
ছিটিক ছিটিক ফেলাও পানি,
তোমার যা মনের কথা
তা তো আমি জানি।

(নিজস্ব সংগ্রহ)

বহুল প্রচলিত কালিদাসের এই ধাঁধাটি সম্পূর্ণ ব্যঞ্জনাধর্মী। এর সাধারণ অর্থটি হল এরকম: একটা বাড় মাটিতে পাতের ক্ষুর দিয়ে ঘষে মাটি সরিয়ে ফেলাও এবং তার অক্রমণোদ্যতে সকল লক্ষণগুলো ফুটে উঠতে দেখে কবি তার মনের ইচ্ছাটা যে টের পেয়েছেন তাই-ই তিনি ছড়া করে বলেছেন। এখানে কালিদাস একজন বক্তা মাত্র।

এটির অন্তর্নিহিত রহস্যটা এই যে কোন এক রাজা তাঁর একজন নাপিতকে কোন সময় শাস্তি দেন। মনে মনে রাজার ওপর তাই নাপিতের বড় রাগ। একদিন দাঁড়ি কামানোর সময় রাজার গলাটা এক পোঁচে কেটে দেবে—এই পরিকল্পনা করে রাজার গলায় ও গালে একটু একটু জল লাগায় আর ক্ষুরে ধার দিতে থাকে।

ব্যবস্থা সবই প্রায় পাকাপাকি, গোল বাঁধাল কালিদাস। পূর্বোক্ত ষাঁড়টির আক্রমণাত্মক ভাবটা ছড়া কেটে কেটে বলায় চতুর নরসুন্দর ভাবল, কালিদাস তো তার মনের কথা তাহলে জেনে ফেলেছে। অতএব ভয়ার্ত নাপিত সমস্ত স্বীকার করায় ধরা পড়ে যায়।

কেবল বিষয় বৈচিত্র্যেই নয় রূপগত দিক থেকেও ধাঁধার কবি কালিদাসের বিশিষ্টতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্ন প্রকার শব্দ-বিন্যাসে, অলংকার ও ছন্দ ব্যবহারে লোক-কবির কবি-প্রতিভা ধাঁধায় অত্যন্ত সীমিত দায়িত্বের মধ্যেও সুপ্ত থাকেনি।

প্রথমত, দেশীশব্দ, গ্রাম্য বা আঞ্চলিক শব্দ যে লোকসাহিত্যের প্রাণ তাও কালিদাসের ধাঁধায় যথেষ্ট দেখা যায়। যথা—

ঢাকি, ঠ্যাং, খাচ্চ, পানি, ছোঁয়, পগার, মাগ, ভাতার ইত্যাদি।

ছাপা পত্রিকাগুলোতে সম্পাদনার আঘাতে বহু শব্দ পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে বলে মনে হয়।

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দেরও যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। যথা—সূর্য, অগ্নি, পঞ্চমুণ্ড, ত্রিভুজ অনঙ্গ, সুধা, গায়ত্রী, প্রসব, বচন, মহিমা, বাদ্য, শ্রেষ্ঠ, তুণাদি, সর্বক্ষণ দন্তরাজি, চক্ষুষ্মতী, মুদ্গর, আলিঙ্গন, পঞ্চমুখ প্রভৃতি।

নামধাতু : বিচারিয়া, প্রবেশী, তাড়িল ইত্যাদি।

ধাঁধায় কবি-কৃতিত্ব প্রদর্শনের খুব বেশি অবকাশ নেই। তবু কালিদাসের ধাঁধায় নানান ধরনের কিছু কিছু অলংকার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

অনুপ্রাস : 'রাবণের অরি নয় লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ'

'কহে কবি কালিদাস
হেঁয়ালির ছলা',
'অগণন প্রসবে সে গণ্ডা
গণ্ডা ছেলে'

শ্লেষ : 'কি বাহার ধরিয়াছে যুবতী হিয়ায়'
(কিবা হার ধরিয়াছে যুবতী
হিয়ায়),
'মূর্খেতে নাহি বোঝে পণ্ডিতও
বোঝে কলা'
(কলা—ফল অর্থে কলা—অর্থাৎ না
বুঝতে পারা বা অসাধ্য)

যমক : 'জলে চলে না ছোঁয় জল'
(আঞ্চলিক উচ্চারণে)

অলংকার ছাড়া কিছু কিছু ধাঁধায় ছন্দেরও আশ্রয় গ্রহণ করতে দেখা যায়। তবে সেগুলোর বেশির ভাগই ছড়াজাতীয়, আর না হয় পয়ার জাতীয় ছন্দ।

যেমন—
কহেন কবি। কালিদাস। হেঁয়ালির। ছন্দ।
জানলা দিয়ে। ঘর পালায়। মালিক পড়েন
বন্ধ।
কিংবা, 'এটির ভিতর। ওটি দিয়া।
মাগ ভাতারে। রইল শুয়ে।।'

চার বা তিনমাত্রা বিশিষ্ট এই একটি মাত্র ছন্দই লোকসাহিত্যে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে আছে। কিন্তু কালিদাসের ধাঁধায় তার কিছু ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। কারণ এখানে পয়ার ছন্দের দৃষ্টান্ত প্রচুর মিলবে। যেমন—

'গায়ত্রী নাহিক জানে। কেই মহাশয়।
ব্রাহ্মণ বলিয়া তারে। গণনা করয়।।'
উচ্ছিষ্ট করিয়া সেই। দেয় অন্য জনে।
হেঁয়ালীর শেষে কবি। কালিদাসে ভণে।।'

তবে মনে হয় ছাপা পত্রিকাগুলিতে সম্পাদকগণের সংগৃহীত এবং সম্পাদিত ধাঁধায় অনেক সময় সম্পাদকদের কলমের আঁচড়ে ধাঁধার ভাষার ওপর অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। ফলে, মৌখিক ভাষার স্বাভাবিকত্বটুকু নষ্ট হয়ে গিয়ে ভাষারূপ কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। সেই কারণে তার ছন্দরূপও বদলাতে বাধ্য। যেমন—

'কহেন কবি কালিদাস, হেঁয়ালির ছন্দ,
জানলা দিয়ে ঘর পালায়, মালিক
পড়েন বন্ধ।

ছড়াছন্দে প্রচলিত আচার্য সুকুমার সেন মহাশয়ের মুখ থেকে সংগৃহীত এই ধাঁধাটির একটি লিখিত রূপ পাওয়া যায় শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কালি-দাসের হেঁয়ালি' পত্রিকায়। যথা—

ঠাকুরপো! কেন বসে নিরানন্দ।
একটা কথা শুনে মোর পাইবে আনন্দ।।
জানালার ভিতর দিয়া পলাইল ঘর।
গৃহস্থ পড়িল বাঁধা তাহার ভিতর।।
কিবা এর অর্থ হয় বল বিচারিয়া।
জেলে পাড়া গিয়া ভাই আসিবে দেখিয়া।।

সম্পাদক এখানে এটিকে পয়ার ছন্দেই ছেপেছেন। বলা বাহুল্য এই ব্যাপারটা লোক-কবি কালিদাসের নামে ছাপান অন্যান্য পত্রিকাগুলোতেও দেখতে পাওয়া যায়।

তাছাড়া একই ধাঁধা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভিন্ন ভিন্ন পাঠরূপে সংগৃহীত হয়। উপরোক্ত ধাঁধাটি তুলনা করলে অবশ্য তার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। এখানে ছাপান ধাঁধাটির মধ্যে লোক-কবির ভনিতাটি পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেছে।

যাই হোক, লোক-কবি কালিদাস এক-দিকে যেমন পুরাণ, মহাকাব্য অলংকারশাস্ত্র এবং অন্যান্য কিম্বদন্তীকে ভিত্তি করে ধাঁধা

রচনা করেন, অন্যদিকে তেমনি সমাজের নানা দোষ-গুণে নিত্যব্যবহার্য বস্তু নিয়ে কিংবা প্রাকৃতিক নিতান্ত অবহেলিত প্রাণীদের ধাঁধার আলোচ্য বিষয় করে তুলেছেন। এই বিষয়বৈচিত্র্যই তাঁর ধাঁধার একটা বড় বৈশিষ্ট্যও বলা যায়।

তাছাড়া ধাঁধা রচনার জন্যেই যে তিনি ধাঁধা রচনা করেছেন তা নয়, তাকে ভাব ও ভাষায়, ছন্দ ও অলংকরণেও কেমন সুন্দর করে সাজিয়েও দিয়েছেন। তাছাড়া হাস্যরস তো কবির কাছে উপরি পাওনা। এই সমস্ত দিক থেকে অন্যান্য লোক-কবিদের মধ্যে লোক-কবি কালিদাসের স্বাতন্ত্র্য সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।'

ধাঁধার রাজ্যে এই লোক-কবি যে একজন 'পণ্ডিত-কবি' তাতে কোন সন্দেহই নেই। আর সেদিক থেকে তিনি মহাকবির উত্তর-সূরী অথবা ভাবশিষ্য কিংবা দ্বিতীয় কালিদাস—বাংলা লোকসাহিত্যে তিনিই এক-মাত্র এবং যথার্থ কালিদাস।

।। লোককবি কালিদাসের ধাঁধার তালিকা ।।

১। বার মাস বয়স তার তের মাসের কালে।
অগণন প্রসবে সে গন্ডা গন্ডা ছেলে।।
কহে কবি কালিদাস হেঁয়ালির ছলা।
মূর্খেতে নাহি বোঝে পণ্ডিতে
বোঝে কলা।।'
(—কলাগাছ)

২। কহেন কবি কালিদাস, পথে যেতে
যেতে,
সেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে?
(লেজহীন বেঁড়ে গরু ও মাছি)

৩। কি বাহার ধরিয়াছে যুবতী হিয়ায়।
পিতা পুত্র সকলেই এক দৃষ্টে চায়।।
ভাল রূপ চিন্ত ভাই কালিদাস কয়।
যে বস্তু ভাবিয়াছ মনে সেই বস্তু নয়।।
(কি বাহার—কিবা হার)

৪। অর্ধচন্দ্র সম তার দেহের গঠন।
তৃণাদি কর্তন সেই করে সর্বক্ষণ।।
অগণন দন্তরাজি নাই তার শেষ।
অনুমানে বুঝে ভাই ইহার বিশেষ।।
উচ্ছিষ্ট করিয়া সেই দেয় অন্য জনে।
হেঁয়ালির শেষে কবি কালিদাসে
ভণে।।
(কাস্তে)

৫। এটির ভিতর ওটি দিয়ে।
মাগ ভাতারে রইল শুয়ে।।
বাইরেতে ছিল যারা।
ঠেলাঠেলি করে তারা।।
কহে কবি কালিদাস।
ভাব বসে বার মাস।।
—(বোতাম ও খিল)

৬। সূর্যবংশে জন্ম তার অজ রাজার নাতি।
দশরথ-পুত্র হয় নয় সীতাপতি।।
রাবণের অরি নয় লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ।
কহে কবি কালিদাস হেঁয়ালির শ্রেষ্ঠ।।
(—ভরত)

৭। গায়ত্রী নাহিক জানে সেই মহাশয়।
ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁরে গণনা করয়।।
জনমে তাহার পিতা দেখ বুকজন।
কহে কবি কালিদাস হেঁয়ালি বচন।।
(—বিশ্বামিত্র)

৮। জলে চলে না ছোঁয় জলে,
কালিদাস পণ্ডিত দেখে বলে
এ এক মজার কল।
(—জোনাকি)

৯। সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে।।
হাঁড়িকাঠে ফেলে দিই, ধরে দুই ঠ্যাং।
সে সময়ে বাদ্য করে ভ্যাডাং ভ্যাডাং।।
এমন বস্তুর নাম যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়বংশ
বোকা।।
(—পাঁঠা)

১০। কহেন কবি কালিদাস, হেঁয়ালির
ছন্দ,
জানলা দিয়ে ঘর পালায় মালিক
পড়েন বন্ধ।
(—ঘর=জল; মালিক=মাছ,
জানলা=জালের ফুটো)

১১। ঠাকুরপো। কেন বসে নিরানন্দ।
একটা কথা শুনে মোর পাইবে
আনন্দ।।
জানলার ভিতর দিয়া পালাইল ঘর।
গৃহস্থ পড়িল বাঁধা তাহার ভিতর।।
কিবা এর অর্থ হয় বল বিচারিয়া।
জেলেপাড়া গিয়া ভাই আসিবে
দেখিয়া।।
(—ঐ)

১২। ক্ষুর ঘষানং ক্ষুর ঘষানং
ছিড়িক ছিড়িক ফেলাও পানি;
তোমার যা মনের কথা
তা তো আমি জানি

(—নাপিতের ক্ষুরে ধার দেওয়া=
ষাঁড়ের আক্রমণোদ্যত ভাব)

১৩। হাসতে হাসতে আসছ তুমি ঠাট্টা
করতে মোকে।
আমার শ্বশুরে বিয়ে করেছে, তোমার
শ্বশুরের মাকে।
ভেবে দেখ মোর সনে কি সম্বন্ধ হয়
উপহাসের পাত্রী কিনা জানিবে
নিশ্চয়।।

(—শাশুড়ী)

১৪। মা, মাসী, ভগ্নি, পিসি, খুড়ী,
জ্যাঠাই, আই।
সকলের দেখিয়াছি স্ত্রীর দেখি নাই।।
অতি সোজা কথা ভাই ভেবে
দেখলে পাবে।
স্ত্রীর কাছে বললে কিন্তু গলাধাক্কা
খাবে।।
(—বৈধব্য)

১৫। শুন ওগো ঠাকুরপো শুন মোর কথা।
এ কথাটি বলে দাও, খাও মোর
মাথা।।
জালেতে দিতেছি জাল সারাদিন ধরে।
তবু না তাতিল জল কপালের
ফেরে।।
ইহার কি অর্থ হয় বল দেখি ভাই।
নতুবা জানিব তোমার কিছু বুদ্ধি
নাই।।
(—[illegible])

১৬। প্রবেশী মাতার গর্ভে বলো
কোন জন।
খণ্ড খণ্ড করি গর্ভে করিল ছেদন।।
তাহাতে জন্মিল উনপঞ্চাশ পবন।
বল দেখি বুদ্ধিমান কেবা সেইজন।।
—(ইন্দ্র দেবমাতা দিতির গর্ভে থাকা অবস্থায় ইন্দ্র তা উনপঞ্চাশটি খণ্ডে ভাগ করেন।)

১৭। পিতা জন্ম দিল বটে মা ছিল না
কাছে।
ভূমিতে উৎপন্ন কিন্তু নাহি ফলে
গাছে।।
অপরূপ গল্প বলি না শুনে বচন
উত্তর দেখিলে তুমি পাইবে কারণ।।
(—সীতাদেবী)

১৮। নিশি যোগে গোপনেতে জন্মে
যার ঘরে।
তার বাড়ীর লোকজন কান্নাকাটি
করে।।

জন্মদাতা জন্ম দিয়া সত্বর পলায়।
মূর্খের নাহিক শক্তি পণ্ডিতে
বুঝা দায়।।
(—চুরি)

১৯। কোন নারী দরশনে পুণ্য হয় অতি।
আলিঙ্গনে মোক্ষলাভ শাস্ত্রের
ভারতী।।
চুম্বন করিলে হয় পবিত্র জীবন।
হেন কোন নারী আছে জগতে এমন।।
(—গঙ্গা)

২০। দ্বিভুজা রমণী কিন্তু, কিন্তু পতি
দশভুজ।
পশুপতি নয় তবু পতি পঞ্চমুখ।।
পুত্রহীন শ্বশুর যে অকালে মরিল।
কে বা সেই নারী হয় চিন্তা
করি বল।।
(—দ্রৌপদী ও পঞ্চপাণ্ডব)

২১। পশু সঙ্গে ভ্রমে সেই কিন্তু পশু নয়।
কভু রাজবেশে কভু যোগীবেশে রয়।।
অসম্ভব কার্য তার শুনে হাসি পায়।
পিতার কন্যার গর্ভে সন্তান
জন্মায়।।
(—রামচন্দ্র)

২২। রামায়ণে লেখা আছে অতি পুরাতন।
স্বামী-স্ত্রী দুইজনে বাইশ হাত হন।।
কি নাম তাঁদের হয় বলহ সত্বর।
বুদ্ধিমান বলি বুঝি পাইয়া উত্তর।।
(—রাবণ ও মন্দোদরী)

২৩। হেন কোন নারী বল বিধি
সৃষ্টি করে।
রাজ ঘরে জন্ম যার রাজা
বিয়ে করে।।
চক্ষুষ্মতী হইয়াও দেখিতে না পারে।
নিজ গর্ভ নষ্ট করে লোহার
মুগুরে।।
(—গান্ধারী)

(লোকের মুখে মুখে ঘুরছে, এমন কিছু কালিদাসের ধাঁধা থাকতে পারে, যেগুলো তালিকায় দেওয়া সম্ভব হয়নি)।

'জাস্ট এ রিলিফ বুঝলেন দাদা, এর ভেতর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। ব্যবসা যে করছি না রেট দেখেই নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন। আসলে পাখনার জন্য শহুরে মানুষকে এই তিক্ততা, ভিড়, ঘিঞ্জি, শব্দ থেকে কয়েক ঝলক মুক্ত বাতাসের স্বাদ পাইয়ে আনা।' শঙ্করের মাথার চুল উড়ু উড়ু কোঁচকান রোগা, গায়ের রং শ্যামোজ্জ্বল, পাঞ্জাবী আর চাদর ফেলা কাঁধে, ধুতি, চেহারা দেখেই অনুমান করা যায়, শিক্ষিত, রাজনীতি হয়ত বা করে—তবে মনপ্রাণ ঢেলে দেয়নি। নতুবা এ সবে ঝোঁক কেন—সুদাসকে মাথা ঝাঁকিয়ে বক্তৃতার ঢং-এ কথাগুলো বলেছিল।

সুদাস সেদিন হেসে বলেছিল, 'এখন পান্থাগারের দিকে মানুষের খুব ঝোঁক দেখেছে। [illegible]'

শঙ্কর রিডের মত লুফে নিয়েছিল কথাটা। বলে ছিল, 'সত্যি মশাই, শহর যেন জেল-খানা।' তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে, 'তাইত আমাদের পাখনার জন্ম। আমরা চার বন্ধু, রাজীব, পার্থ আমি আর গোপাল এর আগে প্ল্যান করে দীঘা ঘুরে এলাম। প্যাসেঞ্জার হয়েছিল। এবার সেই সাহসেই বক্রেশ্বর বোলপুর তারাপীঠের দিকে বের হচ্ছি। প্যাসেঞ্জার হয়ে গিয়েছে। আর চার-জন, ব্যস, বাস ভর্তি। আরও হয়ত নেওয়া যেত নেব না—প্যাসেঞ্জারদের কষ্ট হবে। তা আপনি কি একলা যাবেন? ফ্যামিলি নিয়েও যেতে পারেন। ছোটদের কিন্তু হাফ নেই।'

সুদাস বলেছিল, 'আমি একলাই যাব।' শঙ্কর মুখে ফিকে হাসি, কথার রেশ থামেনি, বলে গিয়েছিল, 'লোকসান হবে না ফ্যামিলি নিয়ে গেলেও। ট্রেনে যাতায়াতে যা খরচা হত, তারচেয়ে ঢের কম হবে।' একটু থেমে সুদাসকে নীরব থাকতে দেখেই বোধকরি বলেছিল, 'বাসে ওঠার পর আমরা একটাই ফ্যামিলি। কোনরকম অসুবিধা হবে না।'

নেতাজী সুভাষ রোডের ধারে 'সুরুচি' নামে রেস্টুরেন্টের ভিতর সুদাসের সেদিন শঙ্করের সঙ্গে কয়েক মুহূর্তে আগে আলাপ হয়েছে। শঙ্কর দাস। সুদাস গিয়ে দাঁড়িয়েই শঙ্করের খোঁজ করতে বলেছে, আমিই শঙ্কর দাস। শঙ্করের পাশে তখন বড় একটা মোটা গোলাপী কাগজে সবুজ লাল আর হলদে রং-এ লেখা—তারাপীঠ বক্রেশ্বর বোলপুর ঘুরে আসুন—বড় বড় অক্ষরে ওটা। নীচে ক্ষুদে অক্ষরে শুভযাত্রার তারিখ—ছাব্বিশে জানুয়ারী, রাত্রি এগার ঘটিকা। তারপর যোগাযোগ করুন—শঙ্কর দাস, সুরুচি। দিনের আলোয় ফুলের মত উজ্জ্বল ও দেখাগুলো।

সুরুচি ফাঁকা এখন। দোকানের বয় মাংস রান্নায় ব্যস্ত। ভুরভুরে আদা-রসুন-পেঁয়াজ তেলের ঝাঁঝালো গন্ধে সারাটা পথ ভরে আছে। শো-কেসে ডিসের উপর সিদ্ধ ডিম, মুরগীর ঠ্যাং, পেঁয়াজ, টমেটো সাজান। কাচের ভেতরে যেন জ্বলছে ওগুলো।

শো-কেসের উপর এলুমিনিয়ামের ডেকচি। শহরের উপর মানাবে না। আলো জ্বলছে কিছু কিছু। পিচঢালা পথের উপর ঝাঁকে ঝাঁক রিকসা, বাস, লরি ট্যাকসি, মানুষজন হেঁটে যাচ্ছে। খানিকটা আগে বাজার। কিন্তু ভিড়ের সুরু এখান থেকেই। শঙ্কর সম্ভবতঃ খদ্দেরের আশাতেই বসেছিল। হাতে আর মাত্র তিনদিন। শীতটা দিন-কয়েক আগে পুরোপুরি সপ্তাহখানেক বেশ জাঁকিয়েছিল, এখন কেমন যেন উঠি উঠি ভাব। বসন্তের আবহাওয়ার মত অনেকখানি। তবু গরমের সাজ চাদর সোয়েটার কোট এখনও ঘর ঢোকেনি, পথে চলেছে। যাই হোক এ-রকম আবহাওয়া এবং ছুটির মওসুমে যে প্যাসেঞ্জার তার হবেই, বাসে শেষাবধি সবাইকে জায়গা দিতে পারলে হয় এমন ভাবনা শঙ্করের মাথায় বাসা বেঁধেছে। তবু রাজীব পার্থ বা গোপালকে ভরসা নেই, সে বিকেলের দিকে সুরুচিতে বসে থাকে। সুদাসকে পেয়ে সে তাই আপ্যায়ন করে বেঞ্চিতে বসিয়েছিল। তার ফাঁকা রেস্টুরেন্ট থাকার ফলে সেদিন সুদাসও শঙ্করের সঙ্গে একটার পর একটা কথা বাড়িয়ে গিয়েছিল। এমন কি এই যে বাসযোগে এই ভ্রমণের লাভের ব্যাপারটাও শঙ্কর বলে ফেলেছিল 'না টাকা-কড়ির লাভ কিছু হয় না'—শঙ্কর হাসতে হাসতে বলেছিল, 'বেকার মানুষ, বি-এ পাস করে তিনটি সম্বল টিউশনি, আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না, শহর যন্ত্রণা, বেঁচে থাকা যন্ত্রণা, সংসারে তো গঞ্জগ্রহ, এ সুযোগে কিছুদিন ভুলে থাকতে পারি। অবশ্য একটা উদ্দেশ্য আছে—চুপি চুপি আপনাকে বলছি, পাখনা যদি আমাদের লাভ দেয় তবে এতেই নেমে পড়ব।' পরমুহূর্তে কেমন যেন নিরাশার সুরে বলেছিল, 'পাড়ায় পাড়ায় যা আজকাল বাস যাচ্ছে তাতে করে তাতে চলা কঠিন।' সুদাস বলেছিল, 'যা লোক বাড়ছে শহরে, অভাব হবে না, ভাল চলবে।' সুদাস বেশী-ক্ষণ বসেনি। এক কথা থেকে সাতকথা এসেইছিল, আসত সহস্র কথা। শঙ্কর, সন্দেহ নেই তারও অনেক কথা বলত। ঘড়ির কাঁটা অবশ্য ও কথাতেই তৎক্ষণে ছয়ের ঘর প্যার। আলোকোজ্জ্বল পিচঢালা শহুরে পথে দোকানপাটে সন্ধ্যে কতখানি গড়ান বোঝার উপায় ছিল না। তবে টাকা হাতে নিয়ে খসখস করে বিল কাটার পর শঙ্কর যে কথা বলেছিল, সেই কথা শোনার পর সুদাস কেমন যেন হতচকিত এবং রক্তের অণুতে অণুতে তীব্র আলোড়ন অনুভব করেছিল, সেই অবস্থা এখন যাত্রার পর এতখানি পথ পার হয়ে এসে ভুলতে পারে না। শঙ্কর বলেছিল, 'চলুন সহরে যে আপনি মানুষ সেটা তো ভুলে গিয়েছেন। ওখানে খুঁজে পাবেন।'

খুঁজে পাবেন। সুদাস শঙ্করের কথাটা মনে করে এ মুহূর্তে। পাখনার জানলা বন্ধ। মোটা কাঁচের ভিতর প্রত্যুষের ছবি ফুটছে। বোঁয়াটে, সবুজ গাছগাছালি, শীতের শূন্য শস্যভূমি, মাটির ঘর, খড়ের চাল, শূন্য প্রান্তর, ক্ষুদে মফস্বল সহর পলকা গ্রাম সব গাঢ় কুয়াশার ভিতর। কিন্তু সবই ছুটন্ত। পরি-ষ্কার দেখা যায় না, বোধকরি তাই আশ্চর্য রহস্যময়তা যেন বুকের ভিতর সুদাসের ডাক দেয়। শীত গাঢ়, তবু দেহ স্পর্শ করে না, উষ্ণ রক্ত, ভেতরে সম্ভবতঃ ঘাম অথবা দেহ যেন সবের ঊর্ধ্বে কোথাও বহু দূরের পরিচিত আশ্চর্য এক প্রান্তরের মধ্যে স্মৃতির পাখিরা যেখানে শব্দ করে খুনসুটি করে খেলা করে তার ভিতর হারিয়ে যেতে চায়।

সেন বা তন্দ্রা পেয়েই সুদাস পাখনার অভ্যন্তর দেখে এখন। আলো জ্বলছে ভেতরে। সব জানালা বন্ধ। না, বাসখানা বেশই বড়। খুব পুরাতন নয়, এখনও ভেতরের রং উজ্জ্বল। গুরু নানক আর পাশাপাশি অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের রঙ্গীন ছবি আঁটা। মাঝে একখানা আয়না। চল্লিশ জন বসার মত সিট রয়েছে। তবে মেঝেয় একখানা বেঞ্চি দিয়ে আরও কিছু লোক বাড়ান হয়েছে। ছোট ছেলেমেয়ে বলতে তিনজন। সুন্দর ছোট ছেলেমেয়ে তিনটি, পরিষ্কার ঝরঝরে পাখির মত চঞ্চলতা ছুট-ফটানি প্রথম দিকে ছিল, এখন ঘুমুচ্ছে। মোটমাট দশজন রমণী। বয়স কত সুদাস তা অনুমান করতে পারে না। তবে দুজন বৃদ্ধা, বাকী সকলেই বোধকরি ত্রিশের এপারে ওপারে, চারজন অল্প বয়স্কা অবিবাহিতা যুবতী। সম্ভবতঃ বন্ধু সব এক কলেজের ছাত্রী। সুদাস অবশ্য ভেবে নেয়। কেন না একরাত এই দীর্ঘ চলন্ত বাসটির ভিতর থাকলেও ওদের পরস্পরের সঙ্গে কার কি সম্পর্ক, কোন কোন জন একই পরিবারের তা সে ঠাওর করতে পারেনি। পাশের ভদ্রলোক তার চেয়ে বয়সী, হ্যাঁ ভদ্রলোক যে খাটের কোটা ছুঁই ছুঁই করছেন অথবা ছুঁয়ে ফেলেছেন তা দেহ দেখে জরিপ করা যায়, নাম শ্রীযুক্ত নিরাপদ ঘোষ, মানিকতলায় খাবারের দোকান, বাগের আমলের দোকান, চলতি মোটামুটি, তা সুদাস না জানতে চাইলেও রাতের মধ্যে ভদ্রলোক শুনিয়ে দিয়েছেন। এমন কি তিন পুত্র, তিন কন্যা, ছোট কন্যাটিকে পাত্রস্থ করতে না পারার জন্যে মনে শান্তি নেই, ইত্যাদিও সুদাসের শোনা হয়ে গিয়েছে। আর সুদাস নাম জেনেছে ওই ছোকরাটির। হ্যাঁ পাখনার উদ্যোক্তা জন্মদাতা শঙ্করের পাশে বসে থাকা ছোকরা, গলায় ফুলকাটা মাফলার, সোয়েটার, প্যান্ট, রোগা শরীর, তবু শীতকে পরোয়া নেই, ঘনঘন সিগারেট খাচ্ছে, নাম পিন্টু। পিন্টু তাকে তাস খেলতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সুদাস মুখে হাসি নিয়ে বলেছিল, 'ব্রিজ জানি না ভাই। আমরা টুয়েন্টিনাইনের লোক।' এর ভেতর চেনা বলতে শঙ্কর। পার্থ কি গোপাল কি রাজীব কোন কোন জন অথবা পিন্টুরই ভাল নাম ওর ভেতর একটা কিনা তা সে জানে না। আর শেষাবধি জানবেও না। কেননা সুদাস এদের ভিতর থাকলেও এদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকবে ইচ্ছে করেই। অথচ এদের সঙ্গে থাকতে পারার প্রলোভনেই তো তার যাওয়া। একলা যেতে পারত। কেন এদের সঙ্গ নিল? পাখনার সাইনবোর্ড-খানা চোখে পড়ার পর কেনই বা মনের ভিতর পরিকল্পনার একটা খসড়া প্রস্তুত হয়ে গেল? কেনই বা মনে হল এদের সঙ্গে থাকলে শীতে জবুথুবু হয়ে থাকা অবস্থায় মাফলারে কোটে চাদরে ঢাকা থেকে সে ঘরের ক্ষুদে জানলা দিয়ে কোন রাজপথের পরিষ্কার ছবি দেখতে পাবে, অথচ রাজ-পথে কোন মানুষ জানবে না, দেখবে না জানলায় একখানা মুখ চেয়ে আছে? কেনই বা মনে হল ভিড়ের ভিতর গেলে স্পষ্টতঃই সে নিজেকে আড়াল করতে পারবে? সুদাস—সুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতারই মানুষ থাকবে। না, সুদাস কেন এসেছে এদের সঙ্গে কোন পরিষ্কার উত্তর দিতে পারলেও, উত্তর দিতে পারবে না কেন এদের সঙ্গে সে থাকতে পারছে না। ব্রিজ খেলা জানলেও নামল না, এমন কি কত না আলোচনার ভিতর সিনেমা, খেলা, রাজ-নীতি, শেষাবধি কৌতুক, চটকি ইত্যাদিতে নিজেকে মেশাতে পারেনি। আসলে সুদাস এদের হাতে টাকা দেওয়ার পর ভেতরে ভেতরে যে চাপা উত্তেজনা অনুভব করে-ছিল, বাসে ওঠার পর সে উত্তেজনা এখন তার রক্তের ভিতর মস্তিষ্কের কোষে কোষে এই হিমরাতেও ভয়ঙ্কর উষ্ণতা এনে দিয়েছে। এবং সুদাস মুখের উপর এক-খানা মুখোস আঁটার জন্যে প্রাণপণ শক্তিতে

প্রস্তুতি চালাচ্ছে। মুখোস আঁটার প্রস্তুতি-পর্বে এই পাখনা এই পাখনার ভিতরকার মানুষজন সকলই তার দৃষ্টির এবং মনের পর্দা থেকে মিলিয়ে গিয়েছে। অথচ এরাই সুদাসের সহায় সাহস, এদের ভরসাতেই তো আসা বক্রেশ্বর! বক্রেশ্বর। রক্তের ভিতর কেমন যেন ডাক। কতদিন কত বছর পরের ডাকে সে শিহরিত হয়েছিল কিন্তু দাঁড়ানর সাহস ছিল না। পাখনা তাকে দিয়েছে সেই সাহস। এতগুলো মানুষ নিশ্চয় তার পাশে দাঁড়াবে। যদি—যদি কোন গম্ভীর কণ্ঠ বেজে ওঠে, সুদাস তুমি এত-কাল পরে এলে। তারপর ক্রমশঃ কর্কশ শিরওঠা লোমে ভর্তি দুখানা খসখসে শুকনো হাত তার দিকে এগিয়ে আসবে! হ্যাঁ সুদাসের তাই তো সংগ কামনা। নিজে স্পষ্টতঃ সে না বুঝলেও রক্তের ভিতর চাপা উত্তেজনায় সেটা খেলা করছে। এবং এখনও সুদাস সে ভরসাতেই সিটের উপর নিজের শরীরখানা রাখতে পেরেছে।

এখন সুদাস আবার পাখনার জানলা দিয়ে বাইরের ছবি দেখে। পাখনার ভেতরটা তো সেই সহর কলকাতা, যার গলায় সম্প্রতিকালের একটা অতি চলতি হিন্দী গানের সুর, হাসি, সিগারেটের ধোঁয়া, ছোকরাগুলোর মুখে শহুরে শব্দ। সুদাসের মন বাইরে। চার চাকার পাখনার তালে তালে বাইরের ছবি ছুটছে। মোটা কাচ, সরু দুদিকে উপর নীচে কাঠ, তার ভিতর বাইরের ছুটন্ত ছবি স্পষ্ট করে আসছে না: কুয়াশায় ঢাকা মনে হচ্ছে। আসলে কাচটা অপরিষ্কার। ফাঁকে ফোকরে হিমহাওয়া, এবং সুদাস সেই কাচে মুখ ঠেকিয়ে দেখে পাতলা ওড়না ঢাকা বাংলাদেশ মাটি গাছ-পালি চারদিকের আশ্চর্য নির্জনতা, সকালের ডানাভাসান পাখি, কদাচিৎ গরু, পাতলা দীঘি, হলুদ রোদের ছড়াছড়ি। এবং মুখঠেকান অবস্থায় স্পষ্টতঃই সে অনুভব করে দূরে—বহুদূরে কোথায় যেন সে চলেছে। বক্রেশ্বরের সেই পুরাতন আকর্ষণে নয় অথবা দীর্ঘ কয়েক বছরের দিবসরজনী পার করে বুকের ভিতর অদম্য কৌতূহল নিয়ে নয় যেন সুদাস একটা বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে পাখনায় ভর করে অন্য এক জগতের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। দুপাট কপাট খুলে সেই বিশাল দরজা আহ্বান জানাবে, এসো সুদাস। সুদাস জানে তার ভিতরে আলাদা এক পৃথিবী অন্য এক সূর্য ভিন্ন এক বাতাস।

সুদাস! সুদাস! হিম কাচে কান ঠেকায় সুদাস। সেই আহ্বান শোনে। আধ-বোজা চোখ, মোটা কাচ অপরিষ্কার, বাইরে যেন গাঢ় কুয়াশা তার ভিতর কোন এক ছায়াশরীর দোল খেয়ে খেয়ে ফিরছে। রক্তের ভিতর সে টের পায় বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া এক বস্তু যেন তারই চোখের সামনে। কিন্তু হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায় না। আসলে ধরা-ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে, অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে, শুধু অনুভূতি টের পায় কোন এক ছায়াশরীর দুলছে আহ্বান জানাচ্ছে অবিকল তারই হারিয়ে যাওয়া শরীরের একখানা ফটোগ্রাফ হয়ে।

উনিশ'শ পঞ্চাশ। হ্যাঁ উনিশ'শ পঞ্চাশেই সরমা এল তার জীবনে। ছিপছিপে সতেজ ডাঁটির মত মাদকতাহীন বাহুল্য-হীন ষোল বছরের একখানা শরীর, বড় বড় চোখ, চাঁপার মত মুখ, ফরসা নয়, শ্যামোজ্জ্বল গায়ের রং, সারা শরীরে যেন সমর্পণের ভংগীমা, ছটফটে চঞ্চলা নয় শান্ত। বাবার কলেজের বন্ধু বর্ধমান শহরের বুদ্ধদেব রায়ের ছোট মেয়ে। এল বাবার সঙ্গে। থাকবে ডি-বক্রেশ্বরে। আব-হাওয়া বদলের জন্যেই আসা। তখন বক্রে-শ্বর বর্তমানের রূপ পায়নি। শুধু শ্মশান, উষ্ণ প্রস্রবনগুলি দেবতার আশীর্বাদস্বরূপ তারই রূপের প্রকাশ হিসেবে ও অঞ্চলে পরিচিত। বাস চলে না। নদীতে ব্রীজ নেই। দুবরাজপুর সিউড়ী দুদিকে দুটি মফস্বল শহর যেতে গো-গাড়ী। পাশে তাঁতিপাড়া গেলে অবশ্য সিউড়ীর বাস মেলে। আবহাওয়া বদলের জায়গা হিসেবেও তখন চিহ্নিত হয়নি। আসলে ভদ্রলোক বন্ধুর বাড়ী থাকার সুযোগ নিয়েছিলেন। মধ্যবিত্ত মানুষ, ডাক্তারের পরামর্শে দার্জিলিং গোপালপুরে গিরিডি দেওঘর এক মাসের বাসের সংগতি ছিল না, সুতরাং বক্রেশ্বরের পথেই পা বাড়িয়ে ছিলেন। সুদাসের বাবাও অবশ্য সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন এই আসা। জানিয়ে-ছিলেন, 'তোমাদের বর্ধমানের চেয়ে আমাদের বক্রেশ্বরের আবহাওয়া অনেক ভাল। তোমার মেয়ের ভাঙ্গা শরীর এখানে ভালই থাকিবে। তুমি অবশ্যই লইয়া আসিও। বহুদিন তোমার সহিত সাক্ষাৎ নাই। তোমার পত্র পাইয়া সকল পুরাতন কথা মনে পড়িতেছে ইত্যাদি। ইত্যাদি। সুদাসের স্পষ্টতই সরমার আসার সেই দিনটি মনে পড়ে। শীতকাল। আকাশ মেঘলা। সকালের বাতাসে কেমন যেন হিম হিম কুয়াসা ছড়ান। তার ভিতর ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। তাদের বাড়ীর ছাউনি দেওয়া গরুর গাড়ী করে বাবার বন্ধু বুদ্ধদেববাবু গোল মুখ, ফরসা, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, ধুতি-পাঞ্জাবী, চোখে চশমা, মোটা মোটা সুন্দর

স্বাস্থ্য, সঙ্গে সরমা এসে নামল তাদের দরজায়। সরমা তাকে প্রণাম করেছিল। শান্তিকে প্রণাম করতে গিয়েছিল। শান্তি বলেছিল, 'না। না আমাকে প্রণাম করো না।' দু হাতে সে সরমার শরীর জড়িয়ে ধরেছিল।

রাতে বিছানায় পাশে শুয়ে শান্তি বলেছিল, 'মেয়েটা খুব ভাল না গো।' সুদাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'ওর কি অসুখ করেছিল?' শান্তি চমকে উঠেছিল, 'অসুখ! অসুখ আবার কি?' সুদাস ঘাড় ফিরিয়েছিল, 'বাঃ অসুখ না হলে হাওয়া-বদল করতে আসে কেন?' শান্তি বলেছিল, 'বাবার শরীর ভেঙে গেছে তাই।' সুদাস মুখে অস্পষ্ট 'ও' করে উঠেছিল। তারপর বলেছিল, 'তুমি অসুখের নামে ভয় পেয়ে গেলে।' শান্তি ধরা গলায় বলেছিল, 'না। ভয় পাইনি। অসুখে মানুষের হাত কি! পাপ করলে ভগবান অসুখ দেন, শরীরে যন্ত্রণা দেন।' সুদাস শব্দ করে হেসেছিল। বলেছিল, 'তুমি বড় বোকা।' সুদাসের হাসিতে সম্ভবতঃ শান্তি মুখ গোমড়া করেছিল অভিমান করে।

আসলে শান্তির স্বভাবটাই ছিল অমন। সব কিছুতেই যেমন উচ্ছ্বাস, অতি অল্পে তেমন দিশেহারা। কতই বা বয়স তখন, ষোল সতের কি আঠার, সুন্দর সুঠাম যৌবনভরপুর দেহবল্লরী, এক মাথা চুল, গায়ের রং কালো, কিন্তু আশ্চর্য কমনীয় মুখচোখ। পাড়াগাঁর মেয়ে, বিদ্যে থ্রি-ক্লাস, পতি পরম গুরু, দেহের এবং মনের প্রতি ছত্রে ছত্রে লেখা। এবং সুদাস কলকাতার শান্তিকে নিয়ে তখন সুখী পরিতৃপ্ত। শান্তির ছেলেমানুষী তখন তার কাছে শৈশবের খেলার মতই যৌবনের খেলা। মাকে বহুকাল আগেই সে হারিয়েছিল। বাবার আর তার সংসার। বাবা গাঁয়ের স্কুলে মাস্টারী করতেন। বাপবেটাতে দুজনে। শান্তি তাই তার জীবনে বড় তাড়াতাড়ি এসেছিল। আর তেমন কামনা তবু তার চব্বিশ পঁচিশের যৌবনের নদীর জলতরঙ্গে অপরূপ আলোর নিঃশব্দে অগণন রুপোলী ঢেউ তুলে সুখের শব্দ অবিরল শুনতে শুনতে সে মাসের পর একটার পরে একটা দিন পার হয়ে যাচ্ছিল। পাশের গাঁয়ে বি-এ পাশ করার পর স্কুলশিক্ষকতা এই ঘর আর শান্তি যেন তাকে পূর্ণ করে রেখেছিল। তবু জীবনের কোথায় যে কেমন করে শূন্যতা থেকে যায়!

'শান্তি।' সুদাস সেদিন ফিসফিস করে বলেছিল, 'বেশ ভাল ছিলাম আমরা। কোথা থেকে আবার জুটল ওরা। ঝামেলা যত সব।' শান্তি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল, 'ছিঃ, ও রকম বলো না। ওঁরা আমাদের অতিথি, বাবার বন্ধু। বন্ধুকে দেখে বাবার কত আনন্দ দেখলে না। উঃ কত গল্প যে সব দুজনে করছেন। আচ্ছা বুড়ো হয়ে গেলে এ রকম হয় না, ছেলেবেলার গল্প বলতে ভাল লাগে? আচ্ছা আমরাও তো বুড়ো হয়ে যাব। ভারী কষ্ট না?' সুদাস শব্দ করে হেসেছিল। শান্তি তার হাতের পাতায় সুদাসের মুখ চাপা দিয়ে মৃদু ভৎর্সনা করেছিল, 'ছিঃ, তুমি কিগো। পাশের ঘরে ওঁরা রয়েছেন।' সুদাস বলেছিল, 'বুড়ো হয়ে যাওয়া কষ্ট কি! আমরা তো টেরই পাব না কখন আমরা বুড়ো হয়ে যাব। আচ্ছা, তোমার বুড়ো হতে ইচ্ছে করে না, না?' শান্তি ভয় পাওয়া গলায় বলেছিল, 'না, একদম ইচ্ছে করে না।' সুদাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'কি আশ্চর্য, তবু আমরা বুড়ো হব। আর দেখো একদম কষ্ট হবে না।' শান্তি কথা বলেনি। সুদাস আবার বলেছিল, 'আমার সন্তান......।' কথা শেষ করতে দেয়নি। সুদাসের বুকের উপর চুড়িপরা হাল্কা হাতে কিল বসাতে বসাতে বলেছিল, 'সন্তান। সন্তান। তার মানে ছেলে। আমার কিন্তু বড্ড ভয় করে।' সুদাস তখন রুক্ষ, শান্তির যৌবনশরীর বুনো লতা, লজ্জায় ভয়ে অভিশপ্ত আলোর পিপাসায় সুদাসকে জড়িয়ে ধরে। সুদাস তপ্ত শ্বাস টের পায়। কোমল উষ্ণ যুবতী-শরীর নিয়ে সে বিড় বিড় করে, 'ভয় কি! এই তো আমি, এই তো আমি রয়েছি শান্তি।'

শীতের একটা মাস যেন সুদাসের সামনে নতুন আশ্চর্য এক ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। সে ফুলের রূপ বর্ণ সৌরভ সকলই তার অচেনা। শুধু বুকের ভিতর আমোদিত হওয়ার রোমাঞ্চে দিবস রজনীর মুহূর্তগুলো নিয়ে সে ভাবতে পারে এক পালা বদলের খেলা সুরু হয়েছে, তার ভিতর। শুধু চোখ নয় সরমার ব্যবহার কথাবার্তা প্রমাণ করে দেয় যেন সরমা এদের চেনা এ পরিবারেরই মানুষ। আর আশ্চর্য শান্তি তার নতুন সখী পেয়ে আনন্দে বিশ্বাসে আপন করার মোহে ওর সব দোষ ত্রুটি ঢাকা দিয়ে নেয়। অবশ্য শান্তির এটা স্বভাবই। বড় অল্পে উচ্ছ্বাস বড় বেশী ভাবপ্রবণ। শহুরে বান্ধবী পেয়ে বায়স্কোপের গল্প বাইরের এই পৃথিবীর গল্প মুগ্ধ হয়ে শোনে। বাবার কথাও তাই। পুরানো দিনের বন্ধু। তার বন্ধু নয় যেন পুরানো দিনগুলিই আবার ফিরে এসেছে। সুদাস কিন্তু প্রথম প্রথম মিশতে পারেনি। কেমন যেন সঙ্কোচ কেমন যেন বাধ-বাধ মনের অবস্থা তার। হয়ত সরমার চোখ, সরমার শরীর বড় চেনা, যেন কতকালের চেনা তার অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে রাখার ফাঁকে বুকের ভিতর ভয়ের একখানা কোমল হাত ঘোরাফেরা করত। তবে কয়েকদিনের ভেতর সে হাত সরে গেল। সরাল সুদাস নয় সরমা। মুখে ফিকে হাসি নিয়ে সরমা একদিন বলল, 'সুদাসদা, আপনি আমাকে বড্ড লজ্জা করেন। আমার খুব খারাপ লাগে।' সুদাস ভাবেনি এ-রকম কথার মুখোমুখি তাকে হতে হবে। সুতরাং সে বিব্রত হয়। ছেলেমানুষের মত দুকানে ঝাঁ ঝাঁ উষ্ণতা, ভিতরে রক্তের মধ্যে উত্তেজনা। বলেছিল, 'লজ্জা কোথায়। আমি খুব ব্যস্ত। দোষটা আমারই। আমাদের বাড়ী এসেছ। কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগই পাই না।' সরমা বলে, 'বৌদিও বলেন আপনি নাকি ওরকমই। মেয়েমানুষের কাছে খুব লজ্জা পান।' সুদাস আরও লজ্জিত হয়। বলে, 'শান্তি বড় বোকা।' সরমা হাসে। বলে, 'বাবে এর ভেতর বৌদির বোকামি কোথায়। বোকামি আপনার।' সুদাস কথা বলে না। সে সরমাকে স্থির চোখে দেখে। সরমা বলে, 'আসলে নিজে বোকা হলে অন্য সকলকে বোকা দেখে।' সুদাস শব্দ করে হেসে ওঠে। বলে, 'তার মানে তুমি আমাকেই বোকা প্রতিপন্ন করছ।' সরমার মুখ রাঙা। চোখে কিসের যেন আভা। সুদাসের আবার সেই অনুভূতি, আবার মনে হয় ওই চোখ যেন তাকে বলছে, তুমি আমাকে চেন। চেন! কি আশ্চর্য, এখন তুমি চিনতে পারছ না! সুদাস তখন অন্যদিকে মুখ ফেরায়। উঠোনের সজনে গাছের সবুজ পাতা তির-তির করে কাঁপছে, সাদা ফুলের টুপিপরা প্রতিটি ডাল। টুপটাপ ফুল বাতাসের ঝাপটায় ঝরছে। একটা চড়ুই মুখ ঘষছে সজনের ডালে। ওদিকে বাবা অর্ধ-সাপ্তাহিক সংবাদপত্র নিয়ে। শান্তি রান্নাঘরে। সুদাস বলে, 'কেমন লাগছে তোমার এই জায়গাটা?' সরমার মুখচোখ উজ্জ্বল হয়। 'ভাল। খুব ভাল জায়গা। জায়গার চেয়ে আপনারা আরও ভাল। কাকাবাবু, শান্তি বৌদি, আপনি—আমার তো মনে হয় আপনারা একেবারে আমাদের ঘরের লোক।' সরমা গলগল করে বলে যায়। সুদাস বলে, 'ব্যবহার তোমারই ভাল সরমা। তোমার ব্যবহারই এ সংসারকে আমাদেরকে তোমার চোখে এমন ভাল করেছে।' সরমা বলে, 'বাবা বলেছিলেন আমাকে বীরভূমের নানা জায়গা বেড়াতে নিয়ে যাবেন। কই! আমার বেড়াতে ভীষণ ভাল লাগে।' সুদাস অবাক হয়। বলে, 'এখান থেকে কোথাও যাওয়া? সে ভারী কষ্ট। তুমি বরং নদীর ধার, পাথরের গা, ধানক্ষেত এসব দেখতে পার।' শব্দ করে হাসে সরমা। বলে, 'তবে নিয়ে চলুন না আমাকে।' সুদাস বুকের ভিতর কেমন যেন আলোড়ন টের পায়। বলে, 'আমি!' চোখ বড় বড় করে সরমা বলে, 'আপনি ছাড়া আবার কে?' সুদাস বলে, 'না, আমি নই, তুমি শান্তির সঙ্গে যেও।' সরমা যেন অভিমানী হয়, 'বৌদিই তো আপনার সঙ্গে যেতে বলেছেন আবার আপনি বৌদিকে দেখাচ্ছেন। তার মানে আমি একা একা ঘুরে বেড়াই আর কি।' অভিমান, কিশোরীর মত অভিমানে সুদাসের বুকের ভিতর সুখ আসে। সে খুব অল্প করে হাসে। বলে, 'ঠিক আছে বিকেলবেলায় আমি তোমাকে নিয়ে বের হব।'

শান্তির ভালবাসায় কি কোন খাদ ছিল? সুদাসের মনের কোণে কোথাও অতৃপ্তি? কোন জ্বালা? না-পাওয়ার কোন বেদনা? শান্তি তার স্ত্রী, সহজ সরল, পতিপরম গুরু, ধ্যানজ্ঞান সর্বস্ব, স্বামীর আসন সে রেখেছিল মাথার উপর ভক্তিতে শ্রদ্ধায়। তার সমগ্র নারীত্ব দিয়ে সে সেবা

করেছিল মানুষটার। সুদাস তো অনুভবই করেছিল বিয়ের পর তার স্ত্রী শান্তির সঙ্গে দিবস আর রজনী পার করার মধ্যে পূর্ণতালাভের আভাস শুধু নয়, প্রকৃতই পূর্ণতা। শান্তিকে নিয়ে জীবনে কোন ক্ষুব্ধতা কোন বেদনা ছিল না। পরিপূর্ণ নদীর মত ছিল সংসার। তবু কি যে হয়, কোথা থেকে কি যে ছুটে আসে, তারপর রক্তের অণুতে অণুতে দ্রুত তার ক্রিয়া, ক্রমান্বয়ে রঙ বদল, কোথায় যেন এক শূন্যতাকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দেওয়া। শূন্য নয় পূর্ণ, তবু চোখ তখন হলুদ, চোখে দ্বিতীয় এক পৃথিবী। হয়ত এর নামই গ্রহের প্রকোপ। যার সাথে মানুষ আর মানুষ থাকে না, সব হারায়, সেই গ্রহের ভয়ঙ্করতম শক্তিতে চোখের সামনে জীবন্ত দৃশ্যকেও শূন্য করে দেয়। তখন সব ভাল লাগায় দুর্গন্ধ, সব দৃশ্যে ঘোর কালিমা, সব অনুভূতি জুড়ে বিষাদ আর তিক্ততা।

রাতে বিছানায় শুয়ে শান্তি ফিসফিস করে বলেছিল, 'দেখ কিছু দিনে সরমা কত ভাল হয়ে গিয়েছে। কেমন ফ্যাকাশে ভাব ছিল চেহারায়, এখন কত উজ্জ্বল, কত সুন্দর হয়েছে। জান ওর বিয়েতে মা আমাদের নিয়ে যাবে। আমি কিন্তু যাব। কোথাও আমি যাই নি।' একটু চুপ করে থেকেছিল শান্তি। সুদাস শব্দ করে নি। ঘোর অন্ধকার ঘর। চার পাশে আশ্চর্য স্তব্ধতা। ঘুমে রাত নেমেছে। কচিৎ রাতচোরা পাখির ডানার শব্দ, কখনও বা শিয়ালের হুক্কাহুয়া রব। শান্তি, সুদাসের নীরবতায় গায়ে ঠেলা দিয়ে অভিমানে বলেছিল, 'এই, তুমি আমার কথা শুনছ না।' সুদাস বলেছিল, ঘুম আসছে। ঠোঁট ফুলেছিল শান্তির, 'আহা এইমাত্র শুলে এখনি বুঝি ঘুম আসে।' সুদাস বলেছিল, 'কারও না আসুক, আমায় এসেছিল। কিন্তু তুমি তাড়িয়ে দিলে।' শান্তি বলেছিল, 'বেশ করেছি তাড়িয়েছি।' সুদাস শব্দ করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, 'সে আর বলতে। তোমার তাড়ানিতে ঘুম বেচারী ঘর নয় গাঁ ছেড়েছে।' বস্তুত সুদাস সহজ হতে চেয়েছিল। যদিও বড় কঠিন ছিল তার পক্ষে সহজ হওয়া। কেননা মস্তিষ্কের কোষে বোধহয় তার তীব্র এক যন্ত্রণা। কোথা থেকে যে আগুনের শীষের মত সেই যন্ত্রণা উঠছিল। উঠে মাথার শিরায় শিরায় তার তীব্র প্রবাহ। রক্তের ভিতর ভয়ংকর আলোড়ন আর উত্তেজনা। স্পষ্টত সুদাস তখন আত্মযন্ত্রণাদগ্ধ বিষণ্ণ মানুষ। বুকের ভিতর তার কোলাহল। মাঝে নদী, দু পারে ডাঙা, যেন নদীতে সরিয়ে দু পার একাকার হয়ে যেতে চায়। অথৈ জল তার কোথায় জায়গা? কেমন করেই বা তা সম্ভব? কেমন করেই বা নদীগহ্বর পূর্ণ করা যায়? না অসম্ভব অলীক। সুদাস জানত, তবু কি যে আশায় সে তখন সেই অসম্ভবকে নিয়েই খেলা করছে। মুখে ফিকে হাসি নিয়ে যে রাতে সুদাস বলেছিল, 'বল কি বলবে।' শান্তি পিছন ফিরে শুয়েছিল।

বলেছিল, 'কিছু না।' সুদাস দু হাতে শান্তির শরীর নিজের দিকে টেনে বলেছিল, 'সোনা আমার। এত অল্পে তুমি রাগ কর না।' শান্তি তখন আবার সহজ। বলেছিল, 'সরমা তোমার খুব প্রশংসা করে। বলে অমন মানুষ হয় না। সুদাস বলেছিল, 'আর তোমার—তোমার প্রশংসা করে না?' মুখে শব্দ করেছিল শান্তি, 'উহু।' বলেছিল, 'আমি প্রশংসা চাই না। তোমার প্রশংসাই আমার প্রশংসা। তুমি আমি কি আলাদা?' সুদাস দু হাতে শান্তির শরীর জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'তুমি কত ভাল শান্তি। অথচ আমি...।' শান্তি কিছু বলে নি, তবু হাত দিয়ে সুদাসের মুখ চেপে ছিল।

বিকেলে নদীর ধার, জলহীন বালিতে সাদা ঝকঝকে বালিতে ভর্তি নদী, মাঝে বিশাল বিশাল পাথর, নামেই বক্রেশ্বর নদী আসলে পলকা একটা খাল তার উপর দিয়ে যেন জনমস্থান খুঁজে বেড়ানর জন্যে হেঁটে যাওয়া অথবা শীতের শূন্য ধান ক্ষেত বেয়ে চড়ুই ময়না আর বন পায়রার ভিড়ের ভিতর হাঁটা-ফেরা অথবা সামনের গাঁ তাঁতিপাড়ার দিকে মাটির লাল ধুলোর পথ ধরে হেঁটে যাওয়ার ভিতর সুদাস সরমাকে যেন নতুন করে পাচ্ছিল। উজ্জ্বল এক কিশোরী যেন সরমা। সারা দেহ জুড়ে নৃত্যের ভঙ্গীমা, উজ্জ্বল ঘোর নীল শাড়ী-ব্লাউজ, টুকরো কথা, পাশাপাশি হাঁটার স্পর্শ যেন সুদাসকে আর এক পৃথিবীর মোহে ভরা ছিল। বিকেলের লাল আলো, ঘরে ফেরা গরুদের খুরের ধুলো, পাখপাখালির বাসার দিকে ডানা ভাসান, সুদাস যেন নতুন করে অনুভব করছিল। অথচ সরমাকে সে ধরতে পারছিল না। স্পষ্টতই সে অনুভব করছিল তার গড়া পৃথিবীর ভিতর এই প্রকৃতির ভিতর সে একা—সরমা নেই—সরমা আসছে না। অথবা কে জানে সরমার অনুভূতিকে সুদাসের মন হয়ত বা ছুঁতে পারে নি।

'সুদাসদা, আমি কিন্তু এখান ছেড়ে যাব না। বাব্বাঃ, কলেজ আর ঘর। ভাল লাগে না। কি সুন্দর জায়গাটা। আচ্ছা বক্রেশ্বর নদীটা কত বড়? কোথা থেকে বেরিয়েছে? পাহাড় থেকে? পাহাড় দেখাতে একদিন নিয়ে চলুন না আমাকে। বড় বড় পাথর কেন নদীতে? আচ্ছা বর্ষায় কত জল হয়? তখন নৌকা চলে বুঝি! ওমা, নৌকা চলে না, তাহলে লোক পারাপার করে কেমন করে? সাঁতার কাটতে হয়! আমি সাঁতার কাটব। জানেন সুদাসদা, বর্ধমানে বাজারের কাছে আমাদের বাড়ী। কি ভিড়? কি শব্দ! এ দিকটা কেমন নির্জন, কি সুন্দর গাছ। মানুষেরা কত ভাল। আপনি—আপনি বিকেলে ঘরে বসে থাকতেন কেন? আমি কিন্তু থাকতাম না একদম। রোজ বিকেলে আমি বের হতাম। এই যে দূরের কি যেন গাঁ দেখা যাচ্ছে খড়ের চাল, সূর্য ডুবছে যেখানে, সেখানে গিয়ে হাজির হতাম।' সরমার কথার সুদাস কখনও উত্তর দিত।

কখনও দিত না। হাসত শুধু। তবে সরম
পরিবর্তনটা তার চোখে ধরা পড়ত। আস
সে যে ধীর শান্ত ভেবেছিল সরমা
আদপেই এ মেয়ে তা নয়। সম্ভব
ভিতরের রোগ তাকে অমন করেছি
তারপর এখানকার আবহাওয়া নতুন
চোখে মুখে উজ্জ্বলতা এনে দিতেই বু
মধ্যেকার আসল সরমাকে বের করে দি
আর সুদাস এ উচ্ছ্বলতাই সরমার দেহে ম
নতুন লাবণ্যের বন্যায় আরও যেন কাছাকা
যাবার উদগ্র পিপাসা রক্তের ভিতর অনু
করতে থাকল। 'সরমা, তোমার জ
নতুন করে এই গাঁ গাছগাছালি পা
পাখালি আমি চিনলাম।' সুদাস অস্ফ
গলায় বলে। সরমা হাসে, 'ধেৎ, আপন
জন্যে আমি দেখলাম বলুন।' সুদ
দুজনকে মিলিয়ে নেয়। বলে, 'পাশাপা
আসার ফলে আমরা নতুন জিনিস যে
আবিষ্কার করলাম।' সুদাসের কণ্ঠস্ব
অথবা দৃষ্টির মুখোমুখি সরমা যেন কে
হয়ে যায়। হাসবার চেষ্টা করে। ব
'জানেন শান্তিবৌদিকে বললাম চলু
বৌদি বললেন না ভাই আমার ঘর-দুয়ে
রয়েছে। তোমাদের মত তো নই।' সুদ
বলে, 'সত্যি কথাই বলেছে।' চোখ বড়
করে সরমা। বলে 'ঘর-দুয়ার তো আপনার
একলা বৌয়ের নাকি?' সুদাস হাসে। মা
দোলায়। বলে, 'হ্যাঁ।' সরমা বলে, 'পুরুষ
বড় স্বার্থপর।' সুদাস বলে, 'তবু
স্বার্থপরদেরই বিয়ে করতে হয়। ভ
দুঃখের কথা কিন্তু।' সরমা সুদাসের ক
বলার ঢঙে হেসে ফেলে শব্দ করে। তার
বলে, 'কে বলে মেয়ে মানুষের সঙ্গে ক
বলতে আপনার লজ্জা লাগে, বেশ তো ক
জানেন।' সুদাস হাসে। বলে, 'কথ
তোমারই সরমা, আমি তোমার কথাটা
মিথ্যে প্রমাণ করে দিচ্ছি। অথচ দ
চাপাচ্ছ তুমি আমারই ঘাড়ে। হায়রে কপা
সরমা হাসতে হাসতে বলে, 'আপনি-আপ
না...।' সুদাস বলে 'আমি—আমি কি!

তারপর এমন করে কথার জ
পরস্পরের সান্নিধ্যে মাথার উপর আকা
মুক্ত বাতাস, মাঠঘাট নদী, প্রান্তরে গ
ছাগল বাছুর, গাছগাছালিতে পা
পাখালি তার ভিতর দিয়ে সুদাস
ভয়ংকর অবস্থায় নিজেকে নিয়ে হাঁ
হল। আসলে নিজেকে প্রতিরোধ করার
শক্তি তার তখন নিঃশেষিত। সরমার ব
বিশ্বাস করে মেয়েকে এ পরিবারের হা
তুলে দিয়ে গিয়েছেন। যাবার সময় ব
গিয়েছেন 'দেখো বাবা সুদাস। কাজ
মানুষ নইলে আমিও থাকতাম। মাসখান
বাদে আমি নিয়ে যাব।' সুদাস সে
বলেছে, কিচ্ছু ভাবনা নেই আপন
আমাদের ঘরে ভাল থাকবে।' আজ
বিশ্বাস শুধু, বোন —মায়া মমতা, ভালবা
শান্তির কথা, নিজের কথা, আত্মসম্ম
বোধবুদ্ধি জ্ঞান বিবেক সকলই তখন
ভিতর থেকে বিসর্জিত। রক্তের ভি
এক প্রত্যাশার আগুন শুধু ধিকিধি
জ্বলছে। উত্তেজনায় সারা দেহ কাঁপা

রামমোহনের জীবনে তন্ত্রের প্রভাব

গোরাচাঁদ মিত্র

আমাদের যুগের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রাজা রামমোহন রায়। রামমোহনের অন্যতম জীবনীকার মিস সোফিয়া ডবসন কলেটের ভাষায়—'ইতিহাসে রামমোহন এমন একটি জীবন্ত সেতুস্বরূপ যাহার উপর দিয়া ভারতবর্ষ সুদূর অতীত হইতে অতিদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত অগ্রসর হইবে। তিনি ছিলেন যেন একটি খিলান, যাহা প্রাচীন জাতিভেদ ও বর্তমান মানবপ্রীতি, কুসংস্কার ও বিজ্ঞান, স্বেচ্ছাতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র, স্থাবিরগতি স্যারবাদ ও রক্ষণশীল উন্নতিশীলতা, এবং বিভ্রমকারী বহু দেবার্চনা ও অস্পষ্ট হইলেও পবিত্র একেশ্বরবাদের যে পার্থক্য তাহার সমন্বয় করিয়া গিয়াছেন' (গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীকৃত অনুবাদ)। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে আদম্য কৌতূহল হয় রামমোহন কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন কি না? রামমোহন মানসিকতার মূল ভিত্তি ছিল যুক্তিবাদ ও মানবহিতবাদ। একহাতে যুক্তি এবং অন্যহাতে শাস্ত্র নিয়ে তিনি ভাঙা ও গড়ার কাজে নেমেছিলেন। ইসলামী 'মোতাজেলা' সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদ, মুওহাদ্দিন সম্প্রদায়ের একেশ্বরবাদ, বেদান্ত-উপনিষদ চর্চা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির দ্বারা রামমোহন অনুপ্রাণিত হলেও তাঁর বহুমুখী কর্মধারায় ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব কম ছিল না। এই সমস্ত বিচিত্র ভাবনা কেমন করে রামমোহনের মধ্যে সুসমন্বিত হয়েছিল—সে তত্ত্ব দুরবগাহ্য।

রামমোহন-জীবনী অধ্যয়ন করলে আমরা একজন তন্ত্রসাধকের সঙ্গে পরিচিত হই। ইনি হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধূত। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার। গোবিন্দপ্রসাদ রায় বনাম রামমোহন রায় বৈষয়িক মামলায় রামমোহন পক্ষের সাক্ষী হরিহরানন্দের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়—চোদ্দ বছর বয়সে রামমোহন হরিহরানন্দের সঙ্গে পরিচিত হন। রামমোহনের অন্যতম সুহৃদ শিষ্য জন এডাম ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে রামমোহন প্রসঙ্গে লিখছেন—

> 'He seems to have been religiously disposed from his early youth having proposed to seclude himself as a Sannyasi (ascetic) or devotee, at the age of fourteen, from which he was only dissuaded by the entreaties of his mother.

(মিস কলেটের 'লাইফ এ্যান্ড লেটারস্ অব্ রাজা রামমোহন রায়' পুস্তক হইতে গৃহীত, পৃঃ-৭)। উভয় ঘটনার সাদৃশ্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় হরিহরানন্দের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তাঁর সন্ন্যাস-জীবন কিশোর রামমোহনের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং পরবর্তী জীবনেও রামমোহন তীর্থস্বামীর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। হরিহরানন্দ ছিলেন একাধারে রামমোহনের গুরু ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তীর্থস্বামীর শিষ্যসমাজেও রামমোহন 'তান্ত্রিক ব্রাহ্মাবধূত'রূপে পরিচিত ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতে আমরা এ সম্পর্কে একটি বিবরণী পাই। মহর্ষি লিখছেন—'এখানে (দিল্লীতে) সুখানন্দনাথ স্বামীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তান্ত্রিক ব্রহ্মোপাসক। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য।...সুখানন্দ স্বামী বলিলেন যে, আমি ও রামমোহন রায় হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য; রামমোহন রায় আমার মতন তান্ত্রিক ব্রাহ্মাবধূত ছিলেন' (প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত সংস্করণ, পৃঃ—১৪৯)। তীর্থস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ রামমোহনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য নিযুক্ত হন।

রামমোহন একদিকে যেমন ছিলেন ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক জাতীয় সংস্কারক তেমনি অপরদিকে তাঁর অন্তরের উদার অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন ভাবটিও লক্ষণীয়। 'ভারত পথিকের' সঙ্গে সঙ্গে তিনিই প্রথম 'বিশ্বপথিক'। এই উদারতার পাঠ তিনি গ্রহণ করেছিলেন তন্ত্রশাস্ত্র থেকে। কারণ রামমোহন-পূর্ববর্তী যুগে বৈদিক সংস্কৃতি তার চারদিকে নিষেধের বেড়া তুলেছিল। সমস্ত কিছুতেই ব্রাহ্মণদের ছিল একাধিপত্য। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল। তন্ত্রের বিশ্বজনীন উদার দৃষ্টিভঙ্গীর অনুরণন দেখতে পাই রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্ট ডীডে। ট্রাস্ট ডীডে লেখা আছে, এই স্থান

> 'to be used, enjoyed, applied and appropriated as and for a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly sober religious and devout manner for the worship and adora-

> tion of the Eternal Unsearchable and Immortal Being who is the Author and Preserver of the universe.'

(মিস কলেটের গ্রন্থ, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ—৪৭১।

বাংলা তথা ভারতবর্ষের নবজাগরণের সূচনা 'জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনস্বী-সাধক রামমোহন রায়ের কলকাতায় বসবাস থেকে, আরো ঠিক ঠিক বলতে গেলে তাঁর বেদান্তগ্রন্থ ও তার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশের কাল থেকে' (কাজী আবদুল ওদুদ—'বাংলার জাগরণ', পৃঃ—৩)। 'রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্যের' ভাষায়—'রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বরে তাহার সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের সে সকল কর্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না' (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৮৫ শক, অগ্রহায়ণ সংখ্যা)। রামমোহনের কলকাতায় আবির্ভাব বেদান্তের অনুবাদ প্রকাশের মাধ্যমে। এ যুগে তিনিই সর্ব প্রথম মৃত বেদালোচনাকে পুনরায় জাগ্রত করেন। বেদান্তের মাধ্যমে রাজা হিন্দু ধর্মের সত্য রূপটিকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছিলেন। রামমোহন রচিত গ্রন্থাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় তাঁর রচনাবলীর অনেকখানি জুড়ে আছে বেদান্ত সম্পর্কিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল অনুযায়ী এগুলি পর্যায়ক্রমে হল—বেদান্ত (১৮১৫), বেদান্তসার (১৮১৫), তলবকার উপনিষৎ বা কেনোপনিষৎ (১৮১৬), ঈশোপনিষৎ (১৮১৬), কঠোপনিষৎ (১৮১৭), মাণ্ডুক্যোপনিষৎ (১৮১৭), মুণ্ডকোপনিষৎ (১৮১৯) এবং আত্মানাত্ম-বিবেক (১৮১৯)। সেযুগে রামমোহন যে অন্যতম বৈদান্তিকরূপে পরিচিত ছিলেন তার পরিচয় আমরা পাই সমসাময়িক পত্র-

সীমান্তের আকর্ষণ

সিকিম খুব দূরের দেশ নয়, আবার খুব সহজে সেখানে যাওয়াও যায় না। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের কিউ বোটানিক্যাল গার্ডেনের ডাইরেক্টর স্যার উইলিয়াম হুকার-এর পুত্র স্যার যোশেফ হুকার সিকিমের আকর্ষণে এদেশে এসেছিলেন। ১৮৩৯ থেকে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি আন্টার্কটিক অভিযানে সহকারী চিকিৎসকের কাজ নিয়ে গিয়েছিলেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যথেষ্ট দক্ষতা সত্ত্বেও সেই বৃত্তি তিনি গ্রহণ করেন নি। প্রকৃতিবাদী এই বিজ্ঞানী আর্টিক অভিযানে অনেক ফুল, জীবাশ্ম প্রভৃতি সংগ্রহ করেন। তিনি ব্রিটিশ সরকার থেকে বৃত্তি নিয়ে এদেশে আসেন, পরে লর্ড ডালহাউসীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সেই জাহাজে বসেই তিনি সিকিম প্রবেশের অনুমতি সংগ্রহ করেন। সেই বছর ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি সিকিমে পদার্পণ করেন। স্যার যোশেফ দীর্ঘকাল সিকিমের সর্বত্র ঘুরেছেন এবং তাঁর গবেষণার উপকরণ হিসাবে অনেকরকম পার্বত্য বস্তু সংগ্রহ করেন। তারপর সিকিমের প্রতি নজর পড়ল বহির্জগতের, জরীপ সুরু হল ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ থেকে ক্যাপ্টেন সেরউইলের নেতৃত্বে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার তরফ থেকে ক্যাপ্টেন হারম্যান-সাহেব অনেক প্রকার শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করেও জরিপের কাজ করেন শেষ পর্যন্ত। 'ফ্রস্ট-বাইট' বা তুষার-দংশনের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।

এইভাবে ধীরে ধীরে সিকিমের রহস্য বহির্জগতের মানুষের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে, বহু মানুষের প্রচেষ্টায়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বাঙালী অভিযাত্রী শরৎচন্দ্র দাস সিকিম অতিক্রম করে তিব্বত গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র ভালো ছাত্র ছিলেন তিনি তিব্বতী ভাষা শিখেছিলেন। শরৎচন্দ্র দাস রচিত বাথাং-লা (জন-সাং-লা) নামক তুষারমণ্ডিত গিরিপথ পর্যটনের রিপোর্ট উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর। লা-কথাটির অর্থ—গিরিপথ। বাঙালী ভূ-তাত্ত্বিক প্রমথনাথ বসু (রমেশচন্দ্র দত্তের জামাতা ও চিত্রপরিচালক মধু বসু-র পিতা)—১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে সিকিমের ভূ-তাত্ত্বিক বিবরণ সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন।

এই সিকিমের বর্তমান যুগে প্রশাসক ছিলেন আই-সি-এস অফিসার নরি রুস্তমজী। নরি রুস্তমজী কেমব্রিজ ক্রাইস্ট কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তিনি একজন ব্যায়ামবিদ, বেহালাবাদক এবং ধুরন্ধর গবেষক। এইসব গুণাবলী ব্যতীত তিনি একজন সুদক্ষ সরকারী কর্মচারী। বর্তমানকালে এই দেশে যেসব সুযোগ্য প্রশাসক আছেন তিনি তাঁদের অন্যতম।

তিনি সিকিমের দেওয়ান ও ভুটান সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন প্রায় দুই দশক কাল ধরে। এছাড়া তিনি ভারতে উত্তর-পূর্ব সীমান্তের উপজাতিঅধ্যুষিত অঞ্চলের ছিলেন প্রধান কর্মসচিব।

সর্বপ্রথম লখিমপুর জেলার ডিব্রুগড় অঞ্চলে তিনি ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। এইখানেই তাঁর প্রশাসক হিসাবে অগ্নিশুদ্ধি এবং একালের রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকারেও পরিণত হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে উত্তর বর্মা যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে এই লখিমপুর ছিল সমরোপকরণের ঘাঁটি। যুদ্ধান্তে প্রচুর অব্যবহৃত মার্কিন রণসম্ভার এই জেলায় পড়েছিল। ফলে এই জায়গাটি চোরাচালানীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়। চিনি এবং কাপড়ের ব্যাপারে অচিরাৎ কালোবাজার গড়ে উঠল। তরুণ অফিসার নরি রুস্তমজী হুঁসিয়ারী দিলেন যে অপরাধীদের শুধুমাত্র যে জরিমানা হবে তা নয় তাদের কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী—এই নীতি অনুসারে কালোবাজারীরা এই নির্দেশ উপেক্ষা করে দুহাতে মুনাফা লুটতে লাগল। তারা আশা করেনি যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিজে সরেজমিনে গুদাম পরীক্ষা করতে আসবেন কিংবা তাদের ধরে ধরে জেলে পাঠাবেন। তরুণ রুস্তমজী কিন্তু তাই করলেন। হঠাৎ হাজির হয়ে তিনি স্বচক্ষে সব ঘটনা দেখলেন এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। কালোবাজারী কিছু পরিমাণে রোধ করা গেল।

একটা তল্লাসীর ফলে আরেক তল্লাসী। এক সূত্র থেকে আরেক সূত্রের সন্ধান। তিনি একজন প্রচণ্ড ধনী কংগ্রেসী প্রাক্তন এম-এল-এ'কে গ্রেপ্তার করলেন। লোকটি কোটিপতি। লোকটির জামিন প্রত্যাখ্যাত হল এবং তাকে রাখা হল জেল-হাজতে বিচারাধীন বন্দীদের সঙ্গে।

আসামের চীফ মিনিস্টার বরদোলই ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁকে বদলী করা স্থির করলেন। লখিমপুর জেলা থেকে অন্যত্র। রুস্তমজী সেকপীয়রের জুলিয়াস সীজার নাটকের মার্ক এন্টনীর ভঙ্গীতে বরদলুই সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

'a good sand aintly man'

চিরকালই সৎ অফিসারদের উপরওয়ালার হাত থেকে এই জাতীয় সমাদর লাভ ঘটে। রুস্তমজী সে যাত্রা অন্যত্র স্থানান্তরিত হলেন। ডাঃ ভেরিয়ার এলউইন ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে নেফা অঞ্চল প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

"When I came to NEFA I found that here and in other parts of the frontier the tribes had retained their ancient culture and were developing their arts in a way that was rare elsewhere in India".

তাঁর কাছে উপজাতীয়দের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সম্পদ অতিশয় মূল্যবান মনে হয়েছে। তিনি এদের মাঝে কাজ করে এবং বসবাস করে খুঁটিনাটি জেনেছিলেন, এবং তিনি তখনই নরি রুস্তমজী সম্পর্কে মন্তব্য করেন :

"Tribal life was vigorous. It still meant something. It was not a question of reviving anything; it was more a problem of introducing change without being destructive of the best values of the old life Nari Rustomji had been thinking about these problems for a number of years and his ideas were being put into practice on the frontier.

এই প্রশস্তি নিঃসন্দেহে তরুণ একজন অফিসারের কাছে বিশেষ মূল্যবান। নরি রুস্তমজী যদি অবাধে তাঁর কর্মপরিচালনার সুযোগ পেতেন তাহলে তাঁর কর্মদক্ষতার অন্য পরিচয় পাওয়া যেত। অদৃষ্টপুরুষ অন্যপ্রকার ব্যবস্থা করছিলেন। নয়াদিল্লীর ওপরমহলের কাছে এসব তেমন প্রীতিকর নয়। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা না উপজাতিদের উপর বিমান সাহায্যে গুলিচালনা দ্বারা সমস্যার সমাধান করা যায় না।

নরি রুস্তমজী ফিজো এবং রানী গাইদালো সম্পর্কে চমৎকার রেখাচিত্র এঁকেছেন। প্রায় কুড়ি বছর ধরে তিনি ফিজোকে এবং তাঁর স্ত্রীকে অন্তরঙ্গভাবে জানতেন। ফিজো সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে দেখা করে প্রশ্ন করেছিলেন স্যার আকবর হায়দরী প্রদত্ত 'নাইন পয়েন্টস' এখনও সচল কিনা। নরি রুস্তমজী লিখেছেন—ফিজো

...বাকে কথা বলার মানুষে [illegible], [illegible] ...বলেই তিনি চলে যেতেন।

তিনি শ্রীমতী ফিজোর অসুখের সময় ...জোক কারাগার থেকে মুক্তিদানের স্বপক্ষে ...ছেন—এই কাজ উপযুক্ত হয়েছিল, নতুবা ...বক কারণে উপজাতি সম্প্রদায় বিরুদ্ধ ...

...ব্রিটিশ আমলের বিখ্যাত বিপ্লবী- ...নিকা রানী গাইদালো তাঁর বৈপ্লবিক ...জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। নাগা- ...প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা নরবলিও ...ছেন। দীর্ঘকাল তিনি কারাদন্ড এড়িয়ে ...গোপন করেছিলেন। কুড়ি বছর তিনি ... ছিলেন। স্পেনের লা-পাসিওনারার ...ই রানী গাইদালোর বৈপ্লবিক ক্রিয়া- ...। তিনি মণিপুরের অধিবাসী। পণ্ডিত ... স্বাধীনতা সংগ্রামী এই বিপ্লবী ...কে জানতেন এবং ক্ষমতাসীন হয়ে ... মুক্তিদান করেন। রানী গাইদালো ...র্কে নরি লিখেছেন :

"Her suffering had taught her resignation and there was gentleness and humanity in her manner that moved me so deeply.

...প্রথম সাক্ষাৎকারে প্রচলিত রীতি ... রানী তাঁকে একটি সিল্কের চাদর ...

সিকিম ও ভুটানে নরি রুস্তমজীর ...র প্রশাসন ব্যবস্থা তাঁকে মর্যাদার আসনে ...প্রতিষ্ঠিত করে। এই আলোচনায় সেই পর্বের ... বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়, তবে ... যায় সিকিম ও ভুটানের বিদেশী ... পর্যটকদের প্রাথমিক কর্মকাণ্ডের ... রুস্তমজী এক অনন্যসাধারণ ... পরিচয় দিয়েছেন এবং তার ... এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায়।

—[illegible]

ENCHANTED FRONTIERS: By NARI RUSTOMJI Oxford University Press : Rs 45/- only

...মোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য (প্রবন্ধ)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী, ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬। পনেরো টাকা।

যুগপুরুষ রামমোহন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যখন আমাদের আর্থিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণতম, যখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি মোহাবৃত, সৃষ্টিশক্তি আড়ষ্ট, ...যুগের কোনো প্রশ্নের নূতন উত্তর ...র মত বাণী যখন আমাদের ছিল না, ...পন চিত্তদৈন্য সম্বন্ধে লজ্জা করবার ...া চেতনাও যখন দুর্বল, সেই দুর্গতির ...নেই রামমোহন রায়ের এদেশে আবির্ভাব।' ...বললে আমাদের এই অবস্থা, সেকালে তিনি তাঁর অনন্যসাধারণ শক্তিবলে বিপ্লবীর মত, সমগ্র দেশের ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এক বিস্ময়কর আলোড়ন ও পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিলেন। উনিশ শতকের নবজাগরণের পথিকৃৎ, নূতন যুগের প্রবর্তক রামমোহনের এই সৃষ্টির মাহাত্ম্য নানা বিদ্বজ্জনের গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক নানা গ্রন্থে নানা ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই গ্রন্থতালিকারই একটি উল্লেখযোগ্য পরিপূরক। গ্রন্থকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় খ্যাতনামা গবেষক ও তত্ত্বানুসন্ধানী। এই মূল্যবান গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায় ও পরিশিষ্টের মধ্যে তিনি তার মনীষিতা ও বিজ্ঞতার অসাধারণ পরিচয় দিয়েছেন।

যে পরম্পরাগত ক্রমধারায় এই ৪৯৬ পৃষ্ঠা সজ্জিত হয়েছে, তার মধ্যে যথেষ্ট সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য' নামের ব্যাপকতা ও তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে তথ্যানুগ উদ্ধৃতি এবং ঐতিহাসিক সত্যাবলম্বনে। পরিশিষ্টের মধ্যে লর্ড মিন্টোকে লিখিত রামমোহনের পত্র, মোহন রায় রচিত গ্রন্থের তালিকা, এই পুস্তক প্রণয়নে ব্যবহৃত বাংলা গ্রন্থসমূহের নাম ও নির্দেশপঞ্জীটি গ্রন্থের মূল্যবান সংযোজন। প্রবীণ গ্রন্থকারকে আমরা সাধুবাদ দিই।

'বাঙালির ভাষা ও বাঙালির আশা' (প্রবন্ধ) —গোপাল হালদার। গ্রন্থায়তন, ৮৬। ৩৮বি, রফি আহমদ কিদোয়াই রোড, কলিকাতা ১৩। ছয় টাকা।

ভাষার প্রশ্নে আজ পাশাপাশি দুদেশই সোচ্চার। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত তো এই ভাষা নিয়েই। আমাদের ভারতবর্ষে, বহু ভাষাভাষী দেশের মধ্যে পশ্চিমবাংলার বাংলা ভাষা যতই সমৃদ্ধ হোক, তবু নানা কারণে, নানা সমস্যা জর্জরিত। এখনও রাজকর্মে ও সরকারী ভাষারূপে বাংলা সম্পূর্ণ মর্যাদা পায় নি।

বাংলা সাহিত্যের বিদগ্ধ লেখক ও শিক্ষাবিদ শ্রীযুক্ত হালদার বিভিন্ন সময়ে বাংলা ভাষার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যে সকল নিবন্ধ লিখেছিলেন, সেগুলি একত্রে এই গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। এই নিবন্ধগুলি সামগ্রিকভাবে আমাদের জাতীয় জীবনের উপর ভাষার মর্যাদা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির উপর অবশ্যই রেখাপাত করবে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থকার বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালীর এখনও পর্যাপ্তভাবে দায়িত্ববোধ বাড়েনি বলে যে অভিযোগ করেছেন, এই গ্রন্থের সাহায্যে তা কিছুটা বাড়বে বলেই আমাদের ধারণা। শ্রীযুক্ত হালদারের রচনা পরিচ্ছন্ন এবং সর্বত্রই বক্তব্য স্পষ্ট।

ভূতপুরাণ (শিশু-সাহিত্য)— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। চার টাকা।

ভূত-পেত্নী, রাক্ষস-খোক্কসের গল্প কেবলমাত্র ছোটদেরই নয়, বড়দেরও আকৃষ্ট করে। রচনার গুণে সে কাহিনী হয় শাশ্বতকালের পাঠকের স্বাদু পাঠমালা। প্রাচীনকালের লেখক ত্রৈলোক্য মুখুজ্জের এমনি কিছু গল্প আছে,—আছে উপেন্দ্রকিশোর, যোগেন সরকার ও দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের। আলোচ্য 'ভূতপুরাণ' গ্রন্থখানি প্রখ্যাত লেখক স্বর্গত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। পরিণতদের রচনায় সিদ্ধহস্ত তারাশঙ্কর ছোটদের রচনাতেও যে কি পরিমাণ দক্ষতাসম্পন্ন এই গ্রন্থখানি সেই বৈশিষ্ট্যের ধারক। কিন্তু এ এক স্বতন্ত্র ধরনের ভূতদের কথা, এর সঙ্গে পূর্ব-উল্লেখিত লেখকদের রচনার কোন সাদৃশ্য নেই। এ লেখার সঙ্গে বরং কিছুটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার। আসলে লেখকের বন্ধু যম দত্তের সঙ্গে ভূততত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার মধ্যে ভূতকে জাহান্নামে পাঠাবারই চেষ্টা হয়েছে। সবই আছে, অর্থাৎ ছড়া আছে, বিষম-বিষম-ভূতপেত্নী, দৈত্য-দানার ছবি আছে, কিন্তু বিজ্ঞান-বুদ্ধিতে মানুষ মরে ভূত হোক আর নাই হোক, ভূত মরে যে মানুষ হচ্ছে, এইটাই যেন প্রমাণ হয়েছে বইয়ের মধ্যে। আসলে ভূতদের অস্তিত্ব নিয়ে বেপরোয়া যেন ঠাট্টাই করেছেন তারাশঙ্কর।

অনাগত (গল্পগ্রন্থ)—নরেন্দ্রনাথ মিত্র। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। ছয় টাকা।

গ্রন্থের মধ্যে সূচীপত্র না থাকায় উপন্যাস মনে করে পড়তে পড়তে হঠাৎ ৩৭ পৃষ্ঠায় পৌঁছে উপলব্ধ হয়, গ্রন্থখানি উপন্যাস নয়, গল্পগ্রন্থ। অনাগত, অনাস্বাদ,

পুনরাবৃত্তি, অভিসার, দ্বিতীয় অধ্যায়, নিরুদ্দেশ এবং দুই যোদ্ধা এই সাতটি ছোট বড় গল্পের সমষ্টি নিয়ে 'অনাগত'। মোটামুটিভাবে প্রত্যেকটিই সুখপাঠ্য এবং লেখকের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। বিষয়বস্তুর মধ্যে অতি সাধারণ তরুণ-তরুণীর প্রেমের ব্যর্থতা ও সফলতাই প্রায় সর্বত্র ব্যক্ত হয়েছে। যেমন 'অনাগত' গল্পের পুষ্পিতা ও সারিৎ-এর ব্যর্থ প্রণয়, 'অন্যস্বাদ' গল্পের হেনা ও সুবীরের প্রণয় স্থায়ী হবার পথে, কিন্তু তখনও সার্থক হয়নি, 'অভিসার' গল্পের নন্দিতা ও সুবিরের প্রেম—সুবীর টি বি রোগগ্রস্ত হওয়াতেও নন্দিতা দমেনি, তখনও তার আশা সুবীর সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু নন্দিতা যখন দেখল সুবীরকে সুস্থ করে তোলা আর সম্ভব নয়, তখন সে বিবাহ করল মণিময়কে। কিন্তু তা করলেও, সে কুমারী সেজে সুবীরকে দেখতে আসত এবং তার এই অভিনয় শেষ পর্যন্ত সুবীর ধরেই ফেলেছিল। হাল্কা রসের এই গল্পগুলি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী তরুণ-তরুণীদের অধিকতর আনন্দদান করবে।

এবং জীবন (গল্পগ্রন্থ)—রণেন মোদক। চলন্তিকা প্রকাশক, ৪, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। তিন টাকা।

শ্রীরণেন মোদক একাধিক গ্রন্থের লেখক। এই তরুণ ঔপন্যাসিকের গল্পগ্রন্থ 'এবং জীবন' লেখকের লেখার প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর বহন করে। আলোচ্য লেখক কোনমতেই সস্তা রোমান্টিক প্রেমের গল্পের লেখক নন। লেখা পড়েই বোঝা যায়, জীবনকে দেখতে চান ইনি, জগতের মধ্যে মানুষের বাঁচার অধিকারকে সবচেয়ে বেশী মূল্য দিতে চান। মোট তেরোটি গল্পের সংকলন গ্রন্থ 'এবং জীবন'। শেষ গল্পটি গ্রন্থের নামগল্প। গল্পগুলি আকৃতিতে বড় নয়, কয়েকটি গল্প খুবই ছোট, বিশেষ করে 'রক্ত ধুলো দেয়াল এবং সে' ইত্যাদি। কিন্তু আলোচ্য লেখক যে জীবনের গভীরতম প্রত্যয়ের অনুসন্ধানী, কয়েকটি গল্প তা প্রমাণ করে। 'পাহাড়ের ঢাল, পথে' গল্পে আছে জীবন বাস্তবতার পটভূমিকায় পঙ্গু জীবনকেও বাঁচার সত্যে বাঁচিয়ে রাখার আশ্বাস। 'খবর পড়ুন' গল্পের বসু পরিবারের চিত্রে বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিন জীবনভাবনায় লেখকের সুস্থ জীবনার্তি। 'বৃত্তের চারপাশে' গল্পে সুতপার ঘর বাঁধার স্বপ্ন ও স্নেহাশিসের সেই ঘরের স্বপ্নের মূলে সংশয় প্রকাশের স্পন্দনটি যে কোন আধুনিক যুবক যুবতীর কথা হয়ে উঠেছে। 'মিছিলের দুটি মুখ,' 'এবং জীবন', স্বদেশে নির্বাসন : যুদ্ধ', 'চার দেয়ালের কান্না' উন্নত মানের গল্প। গল্পগুলিতে তরুণ লেখকের জীবন অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বাস্তবমুখীন কল্পনাশক্তির সার্থক পরিচয় আছে।

অন্ধকারের প্রতিবাদে (কাব্যগ্রন্থ)—তুলসী মুখোপাধ্যায়। বিশ্বজ্ঞান, ৯।৩, টেমার লেন, কলকাতা-৯। তিন টাকা।

শ্রীতুলসী মুখোপাধ্যায় বয়সে তরুণ ও ছয়ের দশকের একজন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কবি। এঁর সম্ভবত প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'অন্ধকারের প্রতিবাদে' কবি সমকালকে ভোলেন নি, অস্বীকার করেন নি তাঁর কবিতায়। দুই বাংলা এখন সমস্ত বুদ্ধিজীবীকেই ভাবিত করেছে। আলোচ্য কবি সেই আবেগ, আশা, মোহ, যন্ত্রণা থেকে যে মুক্ত নন এবং সংগত কারণেই যুক্ত, গ্রন্থের প্রথম কবিতাই তা প্রমাণ করে। কবি কবিতা লিখছেন তখন, ওই বাংলাদেশ লক্ষ লক্ষ করিম মক কামানের গোলার মুখে ঝাঁপ দিচ্ছে। সাহসে।' এই চিত্র দেখে এপার বাংলা ব কিভাবে ধরে রেখেছে, কবি তার অ নির্ভীকতার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। অ কবি সমাজ, বর্তমান কাল, তার চতুর্দি যন্ত্রণাকে ভোলেননি, বা বলা ভাল, ব ভুলতে দেয়নি। ঈষৎ শ্লেষ কবির দুর্লক্ষ্য নয়। তবে সত্যকারের বেদনা (কবিপ্রাণতায় যে শ্লেষের জন্ম ঘটে, শ্রী পাধ্যায় তার কাব্যে সেই শ্লেষকেই কল্পের ব্যঞ্জনায় অশরীরী করেছেন।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

সমাজবিজ্ঞান : সংখ্যা ১, ১৯৭২। সম্পাদক —মৈত্রালী মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক, বিংশ শতাব্দী, ২২।এ শ্রীঅরবিন্দ সরণী, কলকাতা—৫। প্রতি সংখ্যা তিন টাকা।

রুশদের কাছে আমরা দুটি বিষয়ে ঋণী। কলকাতায় কেন ভারতে প্রথম থিয়েটার বা নাট্যমঞ্চ স্থাপন করেছিলেন রুশ নাগরিক লেবেডেফ। সেই থেকে কলকাতায় নাট্যমঞ্চ ও আধুনিক নাটকের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে।

অনেককাল পরে কলকাতায় বাংলা ভাষায় সমাজবিজ্ঞানের ওপর পত্রিকা প্রকাশ করেছেন সোভিয়েত আকাদেমি অব সায়েন্সেস। বাংলা ভাষায় আগে সমাজ-বিজ্ঞানের ওপর কোনো পত্রিকা ছিল না। এ বিষয়ে আমরা সোভিয়েতের কাছে ঋণী রইলাম। এ বিষয়ে তাঁরা অগ্রদূত।

সোভিয়েত আকাদেমি অব সায়েন্সের 'সোস্যাল সায়েন্স' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ইংরেজী, ফরাসী ও স্প্যানিশ ভাষায় মস্কো থেকে। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা গেল বাংলার বেলায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে এই প্রথম প্রকাশিত হল আকাদেমি অব সায়েন্সের একটি পত্রিকা। আকাদেমিসিয়ান ফেদোসিয়েভ ভূমিকায় সেকথা উল্লেখ করেছেন।

সমাজবিজ্ঞান পত্রিকার বিষয়বস্তু দুরূহ। বাংলায় লেখা সোজা নয়। সম্পাদক ও প্রকাশক সে দুরূহ কাজ অতি যত্নের সঙ্গে সমাধা করেছেন। সাড়ে তিনশ পৃষ্ঠার এই বিরাট পত্রিকা সমাজবিজ্ঞানী-দের কৌতূহল মেটাবে।

সমাজবিজ্ঞান পত্রিকার প্রথম সংখ্যা লেনিন সংখ্যারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সংখ্যায় লিখেছেন আকাদেমিসিয়ান ফেদোসিয়েভ, রুমিয়ান্তসেভ ও ঝুকভ, লেনিনের সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিষয়বস্তু নিয়ে। তা ছাড়া আছে আরও পাঁচজন আকাদেমিসিয়ানের লেখা যেমন, মিলিয়ন-শ্চিকভ, কনস্তাভ, লেবেদেভ ও জিলাকিনের। গোটা দশেক বই-এর সমালোচনাও পেয়েছে এই সংখ্যায়।

সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষা ব এখনও সহজ হয়নি। সমাজবিজ্ঞান চা লেখার মাধ্যমে তার প্রসার ঘটবে আমাদের আশা। বইএর ছাপা ও অ সৌষ্ঠব প্রশংসনীয়।

নিম সাহিত্য (দ্বাদশ সঙ্কলন)—সম সুধাংশু সেন ও বিমান চট্টোপা ৩এ।৪৯ রামকৃষ্ণ একস্টে দুর্গাপুর ৪, বর্ধমান।

'নিম সাহিত্য' বিশ্বাস করে, ঘণ্টায় আকাশের চেহারার মত মা মুখের রঙও পাল্টায়, কাজেই অ লেখাই লেখকদের লিখতে হবে। এ স কয়েকজন লেখক, যথাক্রমে—মৃণাল বিমান চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র গুহ, ব সিংহ, সুভাষ ঘোষ, নৃসিংহ রায়, ঘোষ, অজয় নন্দী এবং সুধাংশু পত্রিকাটি কারো ভালো লাগবে, লাগবে না।

OCARINA (JAN-FEB 72)—E Amal Ghose, The Nook Jais 30-B Chamiers Road, Madra Price Re 1.50.

ইংরেজীতে প্রকাশিত কবিতা কবিতা-বিষয়ক আলোচনার স্বিম হিসেবে পত্রিকাটি এরই মধ্যে বেশ স অর্জন করেছে। দেখতে শুনতে পরিচ্ছন্ন। এ সংখ্যার একমাত্র গদ্য শিশিরকুমার ঘোষ। লিখেছেন কা স্বাধীনতা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ। প কবিতার অনুবাদগুলো সাবব আধুনিক কবিদের মধ্যে আছেন ভূ হাজারিকা, যামিঝোভিয়ান, নমিতা ক্রিস্টোফার পিয়েল, ওয়াজির আলী চন্দর, কমলাকান্ত, রামেন্দ্র দেশ পতঞ্জলি শেঠী, সুদেব, এম-এ, হা অশোক পোদ্দার, সুভাষ মুখোপা সুবিনয় মুস্তাফী, শঙ্কর কুরূপ, পরম সরস্বতী, করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য এবং ব কয়েকজন।

নেপাল, সিকিম, ভুটান—আমাদের তিনটি নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র। সিকিম ও নেপাল সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু খবর রাখি, কিন্তু ভুটান? সে চিরদিনই তার দ্বার আমাদের কাছে রুদ্ধ করে রেখেছে। হিমালয়ের সুদীর্ঘ পর্বতরাজ্য ছড়িয়ে আছে ভারতবর্ষ ও এই তিনটি দেশের সীমান্ত জুড়ে, নানা রূপে-রসে ভরে, তারই ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বেড়াই, আহরণ করি আনন্দ, আর বারবার ভাবি ভুটানের কথা। কখনো কি হিমালয়ের এই নিষিদ্ধ অঞ্চল দেখতে পাবো? ভুটান-হিমালয়কে দেখবার জানবার সৌভাগ্য কি কখনো হবে?

অপেক্ষা করে থাকি, নানাভাবে খবরাখবর নিই, তারপর একদিন সত্যিই সুযোগ আসে। ভুটান গবর্ণমেন্টের কাজ করে দেবার জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট কিছু ভারতীয়কে সেদেশে পাঠিয়েছেন, তাদেরই কারুর কারুর সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তাঁদেরই অতিথি হয়ে ভুটান প্রবেশ করবার অধিকারও পাই অনেকানেক তদ্বির করে। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে প্রথম ভুটান গবর্ণমেন্টের অনুমতি পাওয়া গেল সেখানে যাবার। কিন্তু সেবার ভুটানের প্রধান দুটি শহর থিম্পু ও পারো দেখবার অনুমতি কেবল পাওয়া গেল। পরবৎসর বহু তদ্বির করে অবশ্য ভুটানের অন্যান্য বড় শহরগুলিও দেখবার অনুমতি মিলল। আমরা পরমসৌভাগ্য বলে মনে করলাম। এ এক অপূর্ব সুযোগ!

পারো :

শুভস্য শীঘ্রম্! অনুমতি পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা রওনা হয়ে পড়ি। পারোতে যাবার প্লেন সার্ভিস আছে সপ্তাহে একবার করে, আমরা সেটারই সুযোগ নিই ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে। ১৫ই মে বৃহস্পতিবার, ভোর চারটেয় প্লেন ছাড়বে, এয়ার অফিসে পৌঁছাতে হবে রাত আড়াইটায়, সুতরাং প্রথম রাত্রেই এয়ার অফিসে গিয়ে আশ্রয় নিই আমরা তিনজনা, আমার স্বামী ডাঃ বিশ্বাস, ভাগ্নে বন্ধু ও আমি।

উত্তরবঙ্গের হাসিমারা পৌঁছাতেই বেশ বেলা হয়ে গেল, মাঝপথে জলপাইগুড়িতে কয়েকজন যাত্রী নেমেছেন, উঠেওছেন জনকয়েক। চায়ের রাজ্য এটা সুতরাং কিছু মালও উঠলো, নামলো।

এখানে কিন্তু আমাদের অপেক্ষা করতে হল, প্রবল বৃষ্টি সুরু হয়েছে, আকাশ কালো মেঘে আচ্ছন্ন। তাকিয়ে দেখি, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, দিগন্তরেখাতে হিমালয় পর্যন্ত মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেছে। ভাবি এমন আবহাওয়া, আজ বুঝি আর প্লেন উড়লো না! আধ ঘন্টার উপর বসেই আছি। যেমন হুড়মুড় করে বৃষ্টি এসেছিল দেখতে দেখতে তেমনি ধরেও এলো, প্লেনও ছাড়লো, কিন্তু তখনো আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। উঁচুতে উঠতেই তরাই-এর ঘন-জংগলের ফাঁকে ফাঁকে চা-বাগানগুলি দেখা গেল, যেন মস্ত মস্ত ঘন সবুজ রঙের গালিচা পাতা। সোজা উত্তরে চলেছি। খানিক পরেই দেখি ভুটানের পার্বত্যভূমি শুরু হয়েছে। এতক্ষণ নীচে তোরষা নদীর অনেকগুলি রূপালী ধারা বালুচরের মধ্যে চিক-চিক করছিল, এখন কেবল একটি সরু ধারাই দেখা যাচ্ছে উপত্যকার কোলে। এখানে এর নাম দেওয়া হয়েছে। আম্-মো-চু। আম্-মো-চু তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা থেকে বেরিয়ে ভুটানের মধ্য দিয়ে বয়ে এসে সমভূমিতে নেমে তোরষা নাম নিয়েছে। পরে এই তোরষাই ধরলাতে পড়ে ব্রহ্মপুত্র নদে মিশেছে। আরও একটি রেখা পাহাড়ের গায়ে গায়ে এঁকে বেঁকে নদীর প্রায় সমান্তরাল চলেছে, এটি ভুটানের রাজপথ। দুটি যেন জোড়মানিক, একজন অন্যজনকে কিছুতেই ছাড়ছে না। আমাদের প্লেন এঁকে বেঁকে এই দুটি রেখাকে অনুসরণ করে চলেছে। সে চলাও ছন্দোময়, হাল্কা মেঘের পর্দা ঠেলে স্তরে স্তরে পর্বতমালার দিকে বিপুল বেগে এগিয়ে চলা। এই বুঝি পর্বতের সাথে সংঘাত লাগে, আবার পরক্ষণেই দেখি না, পাহাড় এড়িয়ে, যেন একটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে কি সুন্দর ভাবে নদীর ধারাকে অনুসরণ করে এগিয়ে নিয়ে চলেছে সুদক্ষ পাইলট। ক্রমে ক্রমে নীচের পাহাড়গুলির উপরের বনভূমির দৃশ্যেরও পরিবর্তন হয়। পাইন ও ফারগাছের বন এগিয়ে আসে, বোঝা গেল আমরা অনেকটা উঁচুতে উঠে এসেছি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই পারো এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলাম। বিস্তীর্ণ উপত্যকার উপর পারো চুর তীরে এয়ারপোর্টটি। নামতেই এয়ারফোর্স অফিসার এগিয়ে এসে অনুমতিপত্র চাইলেন। আমাদের পরিচয় জেনে নিজের পরিচয়ও দিলেন। ইনি এখানকার এরোড্রামের কর্তা স্কোয়াড্রন-লিডার এস আর গাঙ্গুলি। বললেন যে, আমাদের নেবার জন্য ডাঃ মুখার্জি জীপ নিয়ে এসেছেন। আর থাকবার ব্যবস্থা এখানকার রাজকীয় অতিথি-নিবাসে হয়েছে। পারোতে অতিথি-নিবাস ছাড়া বহিরাগতদের থাকবার আর অন্য কোন স্থান নেই, খাবার ব্যবস্থা করাও মুস্কিল। তাই এই ব্যবস্থা হওয়াতে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

অতিথি-নিবাসে যেতে এয়ারপোর্ট থেকে মাইল ছয়েক দূরে উঁচুতে পাহাড়ের উপর উঠতে হয়। বেশ কয়েকটি সাদায়-সবুজে মেশানো ছোট ছোট সুদৃশ্য বাংলো নিয়ে একটি মালভূমির পর পারোর রাজকীয় অতিথি-নিবাস। আধুনিক আসবাব ও সরঞ্জামের অভাব নেই, ইলেকট্রিক লাইট অবধি আছে, অভাব কেবল জলের। নিকটস্থ যে ঝরণার ধারাটি এতদিন এই অতিথি-নিবাসের জলের অভাব মিটিয়ে আসছিল, এখন সেটি প্রায় শুকিয়ে এসেছে। তাই জীপে করে দু মাইল দূরের নদী থেকে ড্রাম ভরে জল এনে জলাভাব মেটাতে হচ্ছে। একজন ভুটানী লামা এখানকার ব্যবস্থাপনার ভার নিয়ে আছেন, তিনিই আমাদের দেখাশোনারও ভার নিলেন।

প্রায় সমতল উপত্যকায় অবস্থিত পারো ভুটানের একটি প্রাচীন বড় শহর। উপত্যকার মাঝ বরাবর চলেছে একটি বড় পাহাড়ী নদী, নাম তার পারো চু। ছিমছাম পরিচ্ছন্ন শহরটি, ৭৭৫০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত, বেশ শীত। এ অঞ্চলের বৃষ্টিপাত কম। একই সময়ে যখন আমরা হাসিমারা ও সীমান্ত শহর ফুন্টশোলিংএ মেঘবৃষ্টির খেলা দেখেছি, তখন পারোর আকাশ নীল, আবহাওয়া খটখটে শুকনো। বেলা দশটা থেকে এখানে ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে, তখন ঠাণ্ডায় হাড়ের ভিতর অবধি যেন কাঁপিয়ে দেয়। বাইরে দাঁড়ানো মুস্কিল হয়ে পড়ে। চারিদিকের পাহাড়গুলি খুব উঁচু নয়, দুই-তিন হাজার ফুটের বেশী উঁচু হবে না। দূরে কেবল দু-একটা পাহাড়ের মাথায় হালকা তুষারের প্রলেপ পড়েছে।

নদীর ওপরে পাহাড়ের গায়ে, নদী থেকে খানিক উঁচুতে বিরাট একটি দুর্গ আছে, নাম পারো-জংগ্। পারো জংগ্-এর খানিকটা উপরে আরেকটি গোলাকার বাড়ী আছে, তার নাম দা-জংগ্। নদীর তীর ঘেঁসেই ঘরবাড়ী আরম্ভ হয়েছে, আছে ক্ষেত-খামার, পাহাড়ের চূড়ো অবধি। শহরটি ছড়ানো তবে বেশী বড় নয়। ছবির মত সুন্দর দেখতে।

মালপত্র রেখে চা খেয়ে আমরা জংগ্ দেখতে বেরিয়ে পড়ি। ফিরবার সময় নদীতে স্নান সেরে ফিরবো এই ইচ্ছা। ক্ষেতের আলপথে উপত্যকার নীচে নদীর তীর অবধি

পুনাখা জং-এর ভিতরের দৃশ্য (বোধিদ্রুম)

াজারে পৌঁছানো গেল। পথে উইলো
মস্ত বাগানের মধ্যে সুন্দর একটি
ও কাঠের কারুকার্য করা বাড়ী দেখ-
শুনলাম সেটি মহারানীর প্রাসাদ
না প্যালেস'। খানিক নীচেই বাজার।
। নামেই বাজার, একটা চওড়া রাস্তার
ধারে বিশ-পঁচিশখানা কাঠের ও
রর তৈরী একতলা বা নীচু দোতলা
এই নিয়েই বাজার। দোকান নামে অভি-
ঘরগুলিতে পণ্য প্রায় নেই বললেই
কোন কোনটাতে সামান্য কিছু সব্জি
না হয়ে গেছে, কোথাও বা আট-দশটা
ীর ডিম সাজানো। অবশ্য সবগুলিতেই
ভুটানের সীমান্ত-শহর সামচিতে
। অরেঞ্জ স্কোয়াস এবং দিশি মদ শোভা
। কতকগুলি কৌতূহলী মুখ ঘরের
লা থেকে উঁকি দেয়, খোলা দোকান
ও সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, দু-
অস্ফুট কথাও কানে আসে
' 'বাঙালী', কিন্তু কেউ এগিয়ে

এসে আলাপ করে না। এখানকার মেয়ে-
পুরুষ সকলেরই মাথার চুল ছোট ছোট
করে ছাঁটা। ডাঃ মুখার্জি বললেন, রাজ-
পরিবারের মেয়েরা ছাড়া কেউ বড় চুল রাখতে
পারে না। অবশ্য এখনকার প্রগতিশীল মহা-
রাজার সহায়তায় এসব নিয়ম ক্রমশঃ অচল
হয়ে আসছে।

বাজারের সীমানা পেরোতেই ছয়-
সাতটি চৌকোণা মস্ত মস্ত বৌদ্ধ চোর্টেন
বা স্তূপ রাস্তায় পড়ে। নীচের দিকটা
পাথরের তৈরী, উপরের দিকটা কাঠের কারু-
কার্য করা। সুবর্ণময় চূড়াগুলি সূর্যালোকে
জ্বলজ্বল করছে। এগুলি দেখতে মন্দিরের
মত, কিন্তু চারিদিক বন্ধ, ভিতরে ঢুকবার
দরজা নেই। চোর্টেনগুলি পার হলেই প্যুরো-
চু বা পারো নদীর উপর ব্রীজ। ভুটানী
ভাষায় চু মানে জল বা নদী। ১৯৬৮ সালের
অক্টোবরে উত্তরবঙ্গে যে প্রবল বন্যা হয়
তখন এখানেও বন্যা হয়েছিল, সেই সময় এ
অঞ্চল ভেসে যায়। তখনই এই ৩।৪ শত
বছরের পুরনো ব্রীজটি দারুণভাবে ক্ষতি-
গ্রস্থ হয়েছিল। সেটিকে এখন সারানো
হচ্ছে। ব্রীজ পার হয়ে পাহাড়ের চড়াই বেয়ে
প্রায় পাঁচশত ফুট উঠে তবে এখানকার জং
বা দুর্গের প্রবেশদ্বারে পৌঁছানো গেল।
বিরাট দুর্গ, পুরোটাই মস্ত মস্ত পাথরের
টুকরো দিয়ে তৈরী, দরজা জানালাগুলি
সব কারুকার্য করা কাঠের তৈরী, নানারকম
উজ্জ্বল রঙে রাঙানো, ভারি সুন্দর দেখতে।

জং-এর সম্মুখভাগে একটি বেদী,
তাতে সুন্দর একটি ময়ূর আঁকা। বেদীতে
আটকানো উঁচু উঁচু বাঁশে অনেকগুলি
পতাকা উড়ছে। বেদীর পিছনেই কাঠের
ঝোলানো ব্রীজ, ব্রীজ পার হয়ে কয়েকটি
চওড়া পাথরের সিঁড়ি পেরিয়ে জং-এর
প্রধান ফটক। মস্ত ভারি কাঠের দুটি দর-
জায় লোহার বড় বড় গজাল লাগানো, সব-
দাই দরজা দুটি খোলা থাকে। ভিতরে
ঢুকে ছোট্ট আধ অন্ধকার বারান্দা পেরিয়ে
উঠান। উঠান ঘিরে দালান উঠেছে, অসংখ্য
ঘর চারিদিক ঘিরে। এমনি উঠানও আছে
অনেকগুলি, ঘরও অনেক। হাজার কয়েক
লোক অনায়াসে থাকতে পারে বলে মনে হয়।
অন্ধকার বারান্দায় মইএর মত দেখতে খাড়া
মোটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলি, পথে
কাউকে দেখতে পেলাম না। পাঁচতলা অবধি
উঠে একেবারে ছাদে পৌঁছানো গেল, কেউ
কেউ নেই। আবার নীচে নেমে লোকজনের
খোঁজ করি, ঘরগুলি সবই প্রায় তালাবন্ধ।
অনেক খোঁজাখুঁজি করে একজন লোককে
পাওয়া গেল। অনেক কষ্টে তাকে বোঝানো
গেল যে, আমরা জং দেখতে চাই। সে
চাবি এনে তালা খুলে আমাদের একটি মস্ত
ঘরে নিয়ে গেল। এটি উপাসনা গৃহ। ঘরের
শেষ প্রান্তে মস্ত উঁচু পাথরের বেদীর উপর
প্রকাণ্ড সুবর্ণময় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। দুই
পাশে অমনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটি মূর্তি
বসানো। লামা বলে এঁরা 'গুরু'। একজনা
তো বুঝলাম, গুরু পদ্মসম্ভবম্, যিনি
অষ্টম শতাব্দীতে তিব্বত থেকে ভুটানে
বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন, অন্য-
জনা যে কে তা বুঝতে পারলাম না। দেয়াল-
ভরা উজ্জ্বল রঙে আঁকা অসংখ্য ফ্রেসকো
পেন্টিং। বিভিন্ন গুরুদের ছবি আঁকা।
অনেকগুলি তন্ত্রোক্ত দেবীর ছবিও আছে।
মনে হল যেন তার মধ্যে দশ মহাবিদ্যার
ছবিও দেখলাম। খুব উজ্জ্বল রঙে আঁকা।
মূর্তিগুলির সম্মুখভাগে একটি সরু
পাথরের বেদী, হস্তিদন্তশোভিত। বেদীর
উপর সারি সারি পাত্রে ঘিয়ের প্রদীপ
সাজানো।

জংটি মস্ত। ভিতরের উঠান পেরিয়ে
অনেকজন পীতবস্ত্র পরিহিত লামার দেখা
পেলাম। একটা মস্ত ঘরের মেজেতে বসে
কয়েকজন মুণ্ডিত মস্তক ক্ষুদে লামা।
পড়াশোনা করছে। ডাঃ মুখার্জি বলেছিলেন,
জং-এ কেবল লামারাই বাস করবার অধি-
কারী। সাধারণ গৃহস্থ বিশেষ করে মেয়েরা

এখানে রাত্রে থাকতে পারে না। মহারাণীও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নন। মহারাজা পারোতে এলে জংগে তাঁর নির্দিষ্ট ঘরে থাকেন, কিন্তু মহারাণীকে নদীর ওপারে ডোরিণা প্যালেসে থাকতে হয়। কেবল যুদ্ধ বা অনুরূপ কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে আশপাশের গ্রামবাসিগণ সপরিবারে জংগে আশ্রয় পায়, তখনই কেবল মেয়েরা এখানে থাকতে পায়। জংগে লামাদের থাকবার ঘর, উপাসনাগৃহ, রাজকীয় শস্যাগার, বিচারালয়, কয়েদখানা সবই আছে। সরকারী অফিসও এখানেই। এখানকার খরচ সব ভুটান-সরকার বহন করেন। জং অর্থে বিহার-সহ দুর্গ।

দু-জংটি পারো জং থেকে অনেক ছোট, আরও দু' পাঁচেক ফুট উঁচুতে অবস্থিত। দূরে থেকে এই ক্ষুদ্র প্রাচীন গোলাকার জংটাকে ভারি সুন্দর দেখায়। এখন এটাকে মেরামত করে একটি মিউজিয়ামে পরিণত করা হচ্ছে। ছোট্ট জংটির ভিতর কাঁচের আলমারীতে নানা-রকম সংগ্রহ রাখা হচ্ছে। আপাততঃ কিছু প্রাচীন মুদ্রা, পুরাতন ভুটানী অস্ত্রশস্ত্র, জলকাপড়, অশ্ব, হাতির দাঁত, পিতলের পাত্রবর্গান প্রভৃতি রাখা আছে, পরে সাজানো হবে।

পারো থেকে প্রায় পনের কিলোমিটার দূরে 'দুক-গেল-জং'। প্রাচী পর্যবেক্ষকদের লেখা বই-এ এই জংটির উল্লেখ পাওয়া যায়। পরদিন ডাঃ মুখার্জির সহায়তায় আমরা একটি জীপ সংগ্রহ করে বেরলাম। সুন্দর পিচ-ঢালা বাঁধানো রাজপথ পারো নদীর তীর ধরে এঁকেবেঁকে চলেছে। অনেক জায়গা বন্যায় ধ্বসে পথ নদীগর্ভে চলে গেছে, এখন মেরামত করা হচ্ছে। খানিক এগিয়ে পথের বাঁকে চার-পাঁচ কিলোমিটার দূর থেকেই এই সুপ্রাচীন জংটিকে দেখা গেল। তার পিছনে দিগন্ত রেখাতে সবুজ পাহাড়ের পর নীলাভ পাহাড়ের সারি, তার চূড়ায় উজ্জ্বল তুষারপুঞ্জ ঝলমল করছে। ওটিই ভুটানের বিখ্যাত চোমোলহরি শিখর (২৩,৯৯৭ ফুট)। মনে পড়ে গেল, এই সুন্দর তুষারমৌলী শিখরটি আরোহণের কথা। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ নেতৃত্বে একটি দল ঐ শিখরে আরোহণ করতে যান, এফ স্পেনসার, চ্যাপম্যান ও শেরপা পাসাং দাওয়া এই শিখরে সর্বপ্রথম পদার্পণের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

১৯৭০ খৃষ্টাব্দে আমরা যখন দ্বিতীয়বার ভুটানে যাই, তখন ভুটান ও ভারতের মিলিত পর্বতারোহী দল লেঃ কর্নেল এন কুমারের অধিনায়কত্বে এই শিখরটিতে দ্বিতীয়বার আরোহণ করেন ২৩শে এপ্রিল। ভুটানের মহারাজা এই অভিযানের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। প্রথম শিখর আরোহণকারী দলে ছিলেন ক্যাপ্টেন প্রেমচাঁদ, দোরজে লাটু, এস অরোরা ও শেরপা খেনডুপ। দ্বিতীয় দলে ছিলেন ক্যাঃ এস এল ক্যাং, ক্যাঃ ধরমপাল ও শেরপা নিমা। দ্বিতীয় দলটিকে শেষ দেখা যায় শিখরে আরোহণ করবার শেষ গিরিশিরার উপর, তারপর আর তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। আশঙ্কা করা হয় যে, তারা কঠিন গিরিশিরার পশ্চিমপ্রান্তে পিছলে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।

পথের ধারে জীপ রেখে আমরা হেঁটে জংটি দেখতে গেলাম। প্রাচীন জংটি এখন সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। চারিদিক ঘুরে ঘুরে দেখলে কিন্তু বেশ বোঝা যায় কোথায় উপাসনাগৃহ ছিল, কোথায় ছিল লামাদের বাসগৃহ, রন্ধনশালা, সিপাই-শান্ত্রীদের পাহারা দেবার উঁচু স্তম্ভ, দরজা, কিন্তু সবই এখন কালের গর্ভে পতিত হয়েছে। আমরা ঘুরে ঘুরে অতীতকে বুঝবার চেষ্টা করি, অতীতের কাহিনী সব ঘুরে ফিরে মনে আসে, বর্তমানের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। লোকজন কেউ কোথাও নেই, দু-একজন পর্যটক এসেছিলেন, তাঁদের স্বহস্তলিখিত পরিচয় ছাড়া আর কিছু দ্রষ্টব্যও নেই। উপাসনাগৃহ ভেঙে পড়েছে, দেবমূর্তি অপসারিত, অনেক কষ্ট করে একটা ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে সে ঘরে পৌঁছানো যায় মাত্র।

ফিরবার পথে পড়ল কিচু-বিহার। পাথরের তৈরী, সাদা রং করা, নানা রঙের কাঠের কারুকার্যযুক্ত সুবর্ণময় চূড়া ঝলমল করছে, অপূর্ব সুন্দর। অন্ত একটি উপাসনাগৃহে গুরু পদ্মসম্ভবের সুবর্ণময় মূর্তি স্থাপিত। মূর্তিটি অন্ততঃ বিশ ফুট উঁচু হবে। গুরুমূর্তির মাথার উপর ছোট্ট একটি বুদ্ধমূর্তি বসানো। সেটিও সোনার। সমস্ত দেয়ালজুড়ে ফ্রেসকো আঁকা। হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিও আঁকা আছে, কালী, সরস্বতীর ছবি স্পষ্ট বোঝা যায়। ভুটানের ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ও প্রাচীন তান্ত্রিক ধর্ম এমন মিশে আছে যে এদের ধ্যানধারণা আমাদের পক্ষে বোঝা খুব মুস্কিল।

ঘরের সম্মুখভাগে প্রশস্ত জানালার ধারে উঁচু গদি-আঁটা আসনে প্রধান লামা বসে আছেন। সৌম্য শান্ত বৃদ্ধ, পীতরঙের বসন পরিহিত, গাঢ় লাল পশমী চাদরে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত, মস্তক মুণ্ডিত, প্রশান্ত বদন, দেখলেই সম্ভ্রম জাগে মনে। আরও অনেক লামা আছেন, সকলেই কোন না কোন কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন।

বিহার দুটির কাছেই আরও একটি সুদৃশ্য বাড়ী দেখা গেল। শুনলাম, এটি মহারানীর আরেকটি প্রাসাদ, এখনো তৈরী সম্পূর্ণ হয়নি।

আমাদের বেড়াবার আগ্রহ দেখে ডাঃ মুখার্জি বললেন, চলে যান, হা-জং দেখে আসুন। এখান থেকে ঘোড়াতে গেলে দুদিনেই পৌঁছে যাবেন। মোটর রাস্তা অবশ্য তৈরী হয়েছে অনেকদূর অবধি, তবে শেষ হয়নি বলে সে পথে যাওয়া খুব অসুবিধা। আপনারা আগেকার হাঁটা পথেই ঘোড়া নিয়ে চলে যান। হা-জং থেকে তিব্বত সীমান্ত খুব কাছে।

আমরা তৎক্ষণাৎ রাজী। ঘোড়ার বন্দোবস্ত করবেন বলে ডাঃ মুখার্জি চলে গেলেন। কিন্তু পরে খবর পাঠালেন যে হা-জংগে যাওয়া যাবে না। ওখানে অনেক মিলিটারী আছে। আসলে হা-জং একটি ভুটানী মিলিটারী শিক্ষণ শিবির। ওখানে যেতে হলে ভুটান গভর্নমেন্টের আলাদা অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হবে। নতুন নিয়ম চালু হয়েছে, সুতরাং হা-জং দেখার আশা পরিত্যাগ করতে হল। অগত্যা ঠিক হল, আমরা পারো থেকে যাবো রাজধানী থিম্পু বা তাসি-চো-জংগে, সেখান থেকেই আমাদের ফিরতে হবে ভারতে। পর বৎসর আবার ভুটানে আসি, এবার যাই সোজা থিম্পুতে, সেখান থেকে অনুমতি নিয়ে ভুটানের অন্যান্য শহরগুলি দেখতে বের হই। এসব কথা পরে বলছি।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর পারোকে আমাদের খুবই ভালো লাগছে। আমরা অতিথি-নিবাসের বাইরের চত্বরে দাঁড়িয়ে চারিদিকের দৃশ্য মুগ্ধ হয়ে দেখি। ওপারে স্তরে স্তরে নীলাভ পাহাড়, নীচে প্রশস্ত সবুজ উপত্যকাতে ঝিকমিক করে পারো চু'র আঁকাবাঁকা নীল জলধারা, তার দুই তীরে সবুজ শস্যক্ষেত্র। ওপারে দূরের নীল পাহাড়ের কোল থেকে নেমে এসেছে একটি ক্ষুদ্র উচ্ছলা পাহাড়ী নদী, এসে আত্ম-সমর্পণ করেছে পারো চু-তে। ছোট্ট শহরটি পারো নদীর কোল ঘেঁষে যেন এলিয়ে শুয়ে পড়েছে। ওপারের সুদৃশ্য জংটি যেন এই সুন্দর ছবিটিকে সম্পূর্ণ করতেই কেবল তৈরী করা হয়েছে। অতিথি-নিবাসের বারান্দায় বসে বসে কেবল এই অপরূপ দৃশ্যই দেখি।

এপারের পিছন দিককার পাহাড়ের চূড়াতে ঘন সবুজ জঙ্গলের প্রান্তদেশে নীল আকাশের গায়ে একটি ছোট্ট সাদা ধবধবে বাড়ী দেখা যায়, বুঝি না সেটি কি? অমন উঁচুতে একটিমাত্র বাড়ী এল কোথা থেকে! কৌতূহল দমন করতে না পেরে বিকালের দিকে আমরা সেদিকে রওনা হয়ে পড়ি। অতিথি-নিবাসের পিছনে গভীর খাদে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটা সরু পাকদণ্ডী পথ দিয়ে চলা। পথের ধারে ধারে বুনো গোলাপের ঝাড়ে অজস্র ফুল ফুটেছে। ছোট্ট একটা ঝরণা পথের উপর দিয়ে বয়ে নীচে নেমে গেছে। খাদ পেরিয়ে ওপারের পাহাড়ে অনেকটা উঁচুতে উঠে কয়েকজন ভুটানীর দেখা পেলাম, জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে নিয়ে চলেছে, ইঙ্গিতে বোঝাল, ওপারের গাঁওয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গাঁও আবার কোথায়? অবাক হয়ে তাদের অনুসরণ করে চলি। খানিক এগিয়ে দেখি, পথের উপর একটি পাথরের তৈরী বৌদ্ধ চোর্টেন, তার পাশে লাগানো উঁচু বাঁশে অনেকগুলি পতাকা উড়ছে। প্রথামতঃ স্তূপটিকে ডাইনে রেখে আমরা এগিয়েই অনেকগুলি ঘরবাড়ী দেখতে পেলাম, তাই তো গ্রামই বটে! আমরা অতিথি-নিবাস থেকে কেবল গ্রামের একখানা ঘরমাত্র দেখতে পেয়েছি, পুরো গ্রামখানি চোখের আড়ালে পাহাড়ের খাঁজের মধ্যে পড়েছে। অনেকগুলি কৌতূহলী মানুষ আমাদের ঘিরে ধরল। তাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না, ভাষা তো বুঝি না। ওরা ওদের

একটি ছোট উপাসনাগৃহে নিয়ে গেল। অন্ধকার ঘর, তার মধ্যে উঁচু পাথরের তৈরী বেদীতে মস্ত সুবর্ণ গুরুমূর্তি স্থাপিত। তৈলাক্তগৃহ, ছোট ছোট দু-চারটে প্রদীপ জ্বলছে কেবল। সামনের একখানা থালাতে বহু পুরাতন কয়েকটি ভুটানী মুদ্রা রাখা, সেখানে আমরা কয়েকটি ঝকঝকে নতুন ভারতীয় মুদ্রা প্রণামী দিই। পূজারী লামা ভারী খুশী। দেয়ালের গায়ে অনেকগুলি মুখোশ টাঙানো, সেগুলি নাকি উৎসবের নাচের সময় পরা হয়।

ভুটানীরা গ্রামের বাড়ীঘর এমনি পাহাড়ের উঁচুতেই তৈরী করে, যদিও চাষের জমির বেশীর ভাগই থাকে উপত্যকার নিম্নভাগে নদীর তীরে, যাতে শত্রুর আগমন সহজেই চোখে পড়ে। ভুটানের লোকসংখ্যা কম, তাই গ্রামগুলিও ছোট ছোট হয়। দশ-বারোখানি ঘর হলেই একখানা গ্রাম তৈরী হয়ে যায়।

বাসায় ফিরতেই দেখি উৎকণ্ঠা নিয়ে লামা দাঁড়িয়ে। বলেন, তাড়াতাড়ি এসে পড়েছেন ভালই হয়েছে। ওই জংগলে অনেক বুনো জানোয়ার আছে, বিশেষ করে বুনো ভালুক এ অঞ্চলে প্রায়ই দেখা যায়। নেকড়েও আগে দেখা যেত। এখন অবশ্য নেই বললেই হয়। —কথাবার্তা ইংরেজীতেই হয়।

আবার বলেন, ওদিককার বড় বাড়ী-খানাতে কিছুদিন আগে ভারতের সহকারী প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই এসে স-পারিষদ উঠেছিলেন। তখন অতিথি-নিবাসের সব বাড়ীগুলিই ভরে গিয়েছিল। বলেন, দূরে, ওপাশের দিকের পাহাড়ের নীচে একটু দূরে স্কোয়াড্রন লিডার গাঙ্গুলিবাবুর বাড়ী, আপনারা বেড়িয়ে আসুন না, তিনিও তো বাঙালী। তাছাড়া নদীর ওপারে হাইড্রো-ইলেকট্রিকের কারখানা আছে, তা-ও দেখে আসুন। এটা ভারতের তৈরী।

তাৎসাং বিহার

পারোতে গিয়ে তাৎসাং বিহার না দেখলে পারো কেন ভুটান দেখাই যেন সম্পূর্ণ হয় না। ভুটানীরা বলে, অষ্টম শতাব্দীতে গুরুপদ্মসম্ভবম ভুটানে এসে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তিনি বাঘের পিঠে চড়ে এসে একটি পাহাড়ের-গুহাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কাল-ক্রমে সেখানে একটি বৌদ্ধবিহার গড়ে ওঠে। সেইটিই তাৎসাং-বিহার। ভুটানী ভাষায় 'তাৎ' মানে বাঘ, বিহারের নাম 'বাঘের বাসা'।

তাৎসাং বিহারে যেতে হলে একটি দিন হাতে করে যেতে হয়। আমরা সেইমত ব্যবস্থা করি। সকালে চা-পর্বের পর দুপুরের খাবার সংগে নিয়ে রওনা হয়ে পড়ি। লামা সংগে লোক দিয়ে দিয়েছেন, সে খাবার বয়ে নিয়ে যাবে, পথও দেখাবে। একটা জীপের ব্যবস্থা করেছেন, তাতে করে প্রধান সড়ক ধরে আট কিলোমিটার যেতে হবে। এ সেই দুক-গেল-জংগের রাস্তা ধরে চলা। একটা পাহাড়ের নীচে এসে হাঁটা পথ শুরু হল। আমার হাঁটুতে ব্যথা বলে একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ভোরবেলা রওনা হয়ে ঘোড়াওলা ঘোড়া নিয়ে আগেই এসে পথের ধারে হাজির হয়েছে।

খানিকটা দূরে জংগলের মধ্য দিয়ে সরু পায়ে চলা পথে হাঁটা। নদীর ধারে এসে একটা কাঠের সেতু দিয়ে পারো চু পার হতে হল। সেতুটি অদ্ভুতভাবে তৈরী করা। সম্পূর্ণ সেতুটিই হয় কাঠের বড় গুঁড়ি না হয় তক্তা দিয়ে বানানো, লোহার সম্পর্ক নেই। তাছাড়া যেমনটি আমরা সাধারণতঃ দেখে অভ্যস্ত, তেমনও নয় দেখতে, কিন্তু বন্য আবহাওয়ার সংগে কেমন মানানসই। অদ্ভুত ইঞ্জি-নীয়ারিং শিল্প, এর ওপর দিয়ে ঘোড়া অনায়াসে পার তো হলই, আর একটু চওড়া হলে জীপও পার হতে পারত মনে হয়।

নদী পেরিয়ে কিছু ক্ষেত-খামার, গ্রাম পড়ে, মাঝে মাঝে জংগলপথে চড়াই ওঠা। পথ সুন্দর, তবে আগাগোড়াই চড়াই। জংগলের কোথাও কোথাও লাল রডোডেনড্রন ফুটে আছে, তাছাড়া অন্যত্র প্রায় সর্বত্রই পাইনের বন। লাল মাটির পথ সবুজ পাহাড়ের গায়ে এঁকেবেঁকে উঠে গেছে। গ্রামবাসীরা এসে কৌতূহলী হয়ে আমাদের সংগে আলাপ করতে চায়। কিন্তু এখানেও সেই ভাষার দুর্লংঘ্য বাধা। সুতরাং কথা জমে না। আমরা এগিয়ে চলি।

পুরো পাহাড়টি প্রায় হাজার তিনেক ফিট উঁচু। তার প্রায় দু' হাজার ফিট উঁচুতে তাৎসাং বিহারটি অবস্থিত। যে পাহাড়ে বিহারটির অবস্থান, তার পাশের পাহাড়টি বেয়ে আমাদের চলার পথ। খানিকটা উঠে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি নীচের পাহাড়ে এক জায়গায় ধস নেমেছে। সবুজ পাহাড়ের গায়ে খানিকটা লালমাটি দেখা যাচ্ছে। মনে হয় কে যেন ধারাল অস্ত্র দিয়ে পাহাড়ের একটা টুকরো কেটে নিয়েছে। না থেমে আমরা ধীরে ধীরে জঙ্গলের পথে উঠে চলি। বিহারের সমান্তরালে উঠে পাহাড়টির বাঁকে ফিরে নামতে হয়, প্রায় দুশো ফিট। এখান থেকে আর ঘোড়া চলে না, পথ খুব সরু। একটা ঝরনা পার হতে হবে, সরু একটা কাঠের পোল আছে। ঝরনা পেরিয়ে একটা নেড়া পাহাড়ের পথে পা বাড়ালাম। এবার কেবল সিঁড়ি ওঠা। অগুনতি পাথরের সিঁড়ি বেয়ে আবার উঠে একেবারে বিহারের দোরগোড়ায় পৌঁছানো গেল।

তাৎসাংএর অবস্থিতিও ভারি অদ্ভুত। এমনটি আর কোথাও দেখিনি। নেড়া পাথরের পাহাড়ের দেয়ালের মত খাড়া গায়ের মাঝখানে যেন ছয় সাতটি রঙিন মৌচাক ঝুলছে। দূর থেকে দেখতে এমনি মনে হয়। সুন্দর অথচ অদ্ভুত বিপজ্জনক এটির অবস্থিতি। গুরু পদ্মসম্ভবম যে গুহাতে থাকতেন, সেটি কেটে আরও বড় করে তৈরী করা হচ্ছে। সেখানে অমিতাভের বিশাল স্বর্ণমূর্তি স্থাপিত। এ ছাড়া আরও অনেকগুলি ঘরবাড়ী আছে। সেগুলিতে লামাদের থাকবার ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি আছে। বাড়ীগুলি পুরনো হওয়াতে ভেঙে-চুরে গেছে, তাই সমস্ত বিহারটিই সারানো হচ্ছে। খুঁজে খুঁজে একজন লামাকে মাত্র দেখতে পেলাম, তিনিই আমাদের সংগে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখালেন। কাঠ ও পাথরের তৈরী দোতলা বাড়ীখানার দোতলার মস্ত একটি উপাসনা গৃহে নিয়ে গেলেন। এখানে আছে সুবর্ণময় গুরুর মূর্তি, মস্ত দুটি হস্তিদন্তশোভিত বেদীর উপর স্থাপিত। সামনে অন্য একটি বেদীর উপর অনেকগুলি ঘিয়ের প্রদীপ সারি সারি সাজানো। কতকগুলি পাত্রে সযত্নে আহরিত ম্যাগ্নোলিয়া ফুল, তার সুবাসে ঘরটি আমোদিত। ঘরের দেয়াল-গুলি উজ্জ্বল রঙের ফ্রেস্কো ছবিতে ভরা। কাঠের মেজে পরিচ্ছন্ন ঝকঝক করছে, দেখে মনটা খুশীতে ভরে উঠল। লামা এগিয়ে গিয়ে মূর্তির বিপরীত দিকের দেয়ালের নিকট প্রধান লামার উঁচু আসনের পাশের একটি জানালা খুলে দিলেন। সংগে সংগে ঘরখানি উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে ভরে গেল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, অপূর্ব একখানা ছবি যেন। সবুজ পারো উপত্যকার মধ্য দিয়ে পারো-চুর রূপালীধারা বয়ে চলেছে, তার ওপারে সবুজ পাহাড়ের সারি স্তরে স্তরে নীলাভ হয়ে আকাশের গায়ে যেন মিলিয়ে গেছে। চোখ ফেরানো যায় না।

আমরা ওইখানেই মেজেতে বসে পড়ি। অমিতাভ বুদ্ধের পদতলে ঠাণ্ডা কাঠের মেজেতে আমরা বিশ্রামের আশায় বসে পড়েছি। মনে হল, বুদ্ধের পামহস্ত যেন আশীর্বাদ করে নিঃশেষে আমাদের সমস্ত ক্লান্তি হরণ করে। অপার শান্তি আসে মনে।

ফুন্টশিলিং

ভুটানের সীমান্ত শহর ফুন্টশিলিং-এর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যে। ফিরছিলাম পারো ও থিম্পু দেখে, ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে।

হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত আর পাঁচটা শহরের মতই খানিকটা, একটু একটু ভিজে ভিজে স্যাঁতসেঁতে, গরম, সামান্য উঁচু নীচু, শান্ত মিষ্টি আবহাওয়া, একটু বুনো বুনো ভাব। উত্তরবাংলার হাসিমারার খুব কাছেই।

শহরের মাঝবরাবর একটা চওড়া রাস্তা দুভাগ হয়ে গেছে, একটা মস্ত তোরণ আছে সেখানে, ওটার ভিতর দিয়ে গেলে ভুটানী ফুন্টশিলিং, বাইরের রাস্তাটা ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। বাজার কিন্তু একটিই, সব দোকানী ভারতীয়। লোক-জনেরা যাতায়াত করছে দুটি রাজ্যেই, শহর একটিই। কতকগুলি সরকারী অফিস এ রাজ্যের, কতকগুলি ও রাজ্যের, আর টাকা পয়সা? ভুটানে ভারতীয় মুদ্রারও চলন আছে সুতরাং হাঙ্গামা নেই কিছু। দেখেশুনে ভারি মজা লাগল।

শহরের মধ্যস্থলে বাজারের কাছে কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় একটা বাসস্ট্যান্ড আছে, সেখানে এসে দাঁড়ায় ভুটানের থিম্পু

...আসা ভুটানী বাস, আবার শিলিগুড়ি কালিম্পং থেকে আসা ভারতীয় ও ...নী বাস। তবে অফিস ভিন্ন, কাজ-...র লোকজন ভিন্ন, যদিও চেহারাতে ...র মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই. কেননা ...েই হয় ভারতীয় নয় নেপালী। ভুটানে নেপালী থাকে, ভুটানের অভ্যন্তরে ...েত বেশী করে তারাই। এছাড়া, ...অনেক ভারতীয় কুলি, রাস্তা তৈরী ...র পেশা, আর কিছু আছে সরকারী ...র, তাদের মধ্যেও ভারতীয়ই প্রচুর। ... মত্ত টুরিস্টের সংখ্যা নগণ্য, তার ...ল ভুটান টুরিস্ট গ্রহণ করতে প্রস্তুত -- Bhutan is not prepared to ...eive tourists— ...ছিলেন ভুটানের ডেপুটি চিফ সেক্রে-...। খাস ভুটানী যাত্রী কিছু যাতায়াত করে ...র্জিলিং-কালিম্পং অঞ্চলে, তবে তাদের ...্যা নগণ্য।

বাজারে ঘুরে ঘুরে দেখি, ছোট ছোট ...নঘর, আছে সবই। শাকসব্জি ফল-...সরী চাল-ডাল-নুন-তেল, মাছ-মাংস, ...ীন দ্রব্য মায় বিলিতি মদ অবধি। ...র আছে ভুটান থেকে আসা 'দ্রুক'-এর ...রঙ্গ স্কোয়াশ, সামচিতে তৈরী। ...টেল-রেস্টুরেণ্টও আছে, তার ব্যবস্থাও ...াপ নয়। খাস ভুটানী হোটেলও আছে : 'দ্রুক-হোটেল'। সেখানে বিলিতি ...ে, চাইলে দিশি খানাও মেলে। এই ...র থেকে প্রচুর মালপত্তর চালান হয়ে ...। থিম্পুতে, সেখান থেকে অন্যান্য ...রে। তাই এটি একটি বেশ বড় ব্যবসায় ...দ্র।

একটা শহরের প্রয়োজনীয় সব কিছুই ...ছে এখানে। অর্থাৎ স্কুল, হাসপাতাল, ...োস্টাপিস ইত্যাদি, আর আছে হিমালয়ের ...। এখান থেকে হিমালয় শুরু হয়েছে, ...ই ভুটানে যাবার সর্পিল রাজপথ এখান ...কেই উঁচুতে উঠেছে পাহাড় বেয়ে। কিছু ...ছ, ঘরবাড়ী পাহাড়ের গায়ে ছড়ানো ...তোলো। গাঢ় সবুজ পাহাড়ের গায়ে ...াচ্ছে যেন আঁকা ছবি।

...েশন থেকে দেখা রাজপথে চলতে ...মাদের আগ্রহ হওয়াতে ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে ...মরা ফুন্টশিলিংএ এসে বাস ধরে থিম্পু ...র ব্যবস্থা করে ফেলি। এবারও উঠি ...নী দ্রুক-হোটেলে।

তাসি-চো-জঙ (থিম্পু) ও সিমটোকা জঙ

থিম্পু যাবার যাত্রীবাহী একখানা বাস ...রে ছাড়ে, অন্যখানি ছাড়ে খানিক ...াতে। বিকালে ও সন্ধ্যার পর তেমনি ...খানি বাস ফিরে আসে। বাসগুলি বি, ..., এস, টির অর্থাৎ ভুটান গবর্নমেণ্ট স্টেট ...সপোর্টের। স্থানীয় এস ডি ওর কাছ ...কে যথারীতি অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে ...মরা প্রত্যুষের বাসখানা ধরেই অগ্রসর ...। করেকজন ভুটানী যাত্রী আছে বাসে, ...র বেশীর ভাগই নেপালী ও ভারতীয় যাত্রী। ভুটানীরা দেখতে একেবারে ভিন্ন-রকম। লম্বা চওড়া মজবুত চোয়াড়ে চেহারা, ঢোলা পোশাক পরা, পানের রসে ঠোঁট রাঙা টুকটুক করছে।

পাহাড়ী আঁকাবাঁকা পথে বাস উঁচুর দিকে উঠে চলেছে। মাইল তিনেক পরই একটি প্রাচীন ছোট বৌদ্ধ বিহার ভুটানী বৈশিষ্ট্য নিয়ে পথের পাশে দেখা যায় খারবন্দিতে। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে ভুটানে প্রবেশ করেছি। পথের দৃশ্য দার্জিলিং বা কালিম্পংএর মতন অনেকটা। পথ চলেছে, ঘনজঙ্গলে ঢাকা বনফুলের সমারোহ পথের ধারে, কিছুটা পর পর ঝরনার কলগুঞ্জন, স্যাঁতসেঁতে ভিজে পাহাড়, সবই আছে। ঘুরে ঘুরে পথ উঁচুতে উঠে চলে, নীচে দেখা যায় আমু-মো-চ্যুও বয়ে চলেছে সাথে সাথে। প্রথম দিকে গ্রাম প্রায় নেই বললেই হয়। গ্রাম পেতে পেতে প্রায় অর্ধেক পথ চলে এলাম। এবার দেখা গেল ছোট্ট ভুটানী বস্তি গ'লাথার, পুটলীবির, গেদু, আমিনাবাড়ী। এগুলিতে আছে কেবল দরিদ্র গ্রামবাসীদের খোড়ো ঘর, আশেপাশে জুম্-প্রথায় চাষ করা জমি, ক্বচিৎ কোথাও সামান্য সিঁড়ি কেটে চাষের ব্যবস্থা।

পাহাড় ঘুরে ঘুরে পথ উঁচুর দিকে উঠে চলে, ঠাণ্ডার আমেজ আসে। চিমা-কোটীতে এসে দুপুরের মত বাস থামল। বেশ শীত এখানে, এখানকার উচ্চতা ৭,৩৮৫ ফিট, পথের ধারে একটা সাইন-বোর্ডে লেখা। পথের পাশেই পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি ভুটানী রেস্টুরেন্ট আছে, খুবই নোংরা। ভাত, ডাল, আলুর
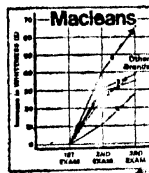
তরকারী পাওয়া যায়, আর কিছু নেই। এখানে ওই খাবারই সবাইকে খেতে হল।

ক'দিন আগে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি, ভি, গিরি ভুটান সফরে এসেছিলেন, ফিরবার সময় আবহাওয়া খারাপের জন্য বাধ্য হয়ে তাঁকে মোটরে ফিরতে হয়। পথে পাহাড়ে ধস নামে, অল্পের জন্য তাঁর প্রাণ রক্ষা হয়, কিন্তু একজন খবরের কাগজের সংবাদদাতা মারা যান। এখানে সকলে সেই আলোচনাই করছে। পথে সেই নিদারুণ দুর্ঘটনার স্থানটি আমরা পার হয়ে এসেছি।

চিমাকোটী ছেড়ে আরও উঁচুতে আমাদের উঠতে হল, ৮,৬০০ ফুট অবধি। জায়গাটার নাম চাপ্‌ছা। খটখটে রোদ থাকলেও খুব শীত এখানে। এর পর অবশ্য অনেকটাই নীচের দিকে নামা। পথে বার দুয়েক পারমিট চেক হল। পারো নদী ও ছুকাচ্যু বা থিম্পু নদীর সঙ্গমে শেষ-বারের মত আবার চেক হল। জায়গাটার স্থানীয় নাম ছুজম, কিন্তু ইংরাজী 'কনফ্লুয়েন্স' কথাটাই চালু বেশী। সঙ্গমের নিকট নদীর বেলাভূমিতে একটি সুন্দর মস্ত চোর্টেন তৈরী করা। এবার পারোর রাস্তা ছেড়ে থিম্পুচুর তীর ধরে সোজা থিম্পু পৌঁছনো, ৩৮ কিলোমিটার পথ। পারো নদীর তীর ধরে গেলে পারো ২৪ কিঃ মিঃ, ফুন্টশোলিং ১৪১ কিঃ মিঃ। আরেকটি রাস্তা হা-জঙ্গের দিকে চলে গেছে, সেটা ফুন্টশোলিং থেকে আসবার সময় ছুজম পৌঁছানোর আগেই বাঁদিকে পাহাড়ে উঠে গেছে। ছুজম থেকে হা-জঙ্গের দূরত্ব ৮৩ কিলোমিটার।

ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক দৃশ্যের পরি-বর্তন হয়। রুক্ষ, শুষ্ক আবহাওয়ার মধ্যে কখন যেন এসে ঢুকে পড়েছি। বৃষ্টিপাত এ অঞ্চলে কম, তাই গাছপালাও কম, নেই সবলেই হয়, বুনো গোলাপ ও জুনিপার ঝোপ আর হঠাৎ কোথাও এক আধটা রডোডেনড্রন ও ছোট ছোট পাইন গাছ, দু' একটা গাছে দু' একটা টুকটুকে লাল রডোডেনড্রনের ঝলকানি। অনেকটা এগিয়ে একটা পাহাড়ের বাঁক ফিরতেই হঠাৎ ধসের পাহাড়ে সবুজের রঙ দেখা দেয়, এখানে সাঝি বৃষ্টি বেশী, প্রকৃতির এও বুঝি এক খেলা!

গাড়ী থামিয়ে ড্রাইভার দেখাল, ওপারের বড় দেয়ালের মত মস্ত পাথরটায় দেখুন, দেখুন একটু লক্ষ্য করে, যেন একটা শঙ্খ আঁকা রয়েছে। এখান থেকেই দেখতে পাবেন কেবল, কাছে গেলে কিন্তু মিলিয়ে যাবে।

সত্যি তো! বিচিত্র হিমালয়, বিচিত্রতর তার রূপ!

মাঝামাঝি ও যাবেণা পার হলাম। পথের ধারে নতুন তৈরী পশু-প্রজনন ও সংরক্ষণ কেন্দ্র দেখা গেল। ভুটানের অগ্রগতির প্রচেষ্টার কিছুৎ নিদর্শন।

থিম্পু পৌঁছানোর পাঁচ মাইল আগে পথের পাশেই পড়ে প্রাচীন সীমতোখা জঙ্গ। একটা টিলার মাথার উপরে অবস্থিত তার, ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।

থিম্পুর খানিক আগে থেকেই অনেক-গুলি ঘরবাড়ী দেখা যায়। যেন একটি ছোট্ট শহর। শুনলাম, সেগুলি সব ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছাউনী। আরও এগিয়ে পাহাড়ের বাঁক ফিরলে দূরে থেকে থিম্পুনগরী চোখে পড়ে। থিম্পু নদীর উপর তৈরী নতুন চওড়া ব্রীজ পার হলে থিম্পু শহর ও বাজারের শুরু।

থিম্পু শহরটি নতুন করে গড়ে উঠছে। থিম্পুচ্যু নদীর উভয় তীরে অজস্র নতুন নতুন ঘরবাড়ী তৈরী হয়েছে, এখনো হচ্ছে। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে গিয়ে দেখি আগের বছরের আধা তৈরী বাড়ীগুলি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, তাছাড়া অনেক নতুন বাড়ী হয়েছে। সব বাড়ীই ভুটানী ঢঙের কারু-কার্য করা, চকচকে নতুন রংকরা। নতুন তৈরী রাজপথ নদীর তীর থেকে সোজা জঙ্গ অবধি চলে গেছে, ঝকঝক্ তকতক করছে। কিছুদিন আগে ভারতের রাষ্ট্রপতির আগমন উপলক্ষ্যে থিম্পু আবার যেন নতুন করে সেজেছে। ভারি ভালো দেখাচ্ছে থিম্পুকে।

এটি ভুটানের একমাত্র শহর অবশ্য ফুটহিলসের শহরগুলি বাদে। যেখানে হোটেল ও রেস্টুরেন্ট আছে। আমরা গতবারের মত তাসি-কমার্শিয়াল হোটেলের আধুনিক সুসজ্জিত কক্ষে স্থান পেলাম। এটি মহারাণী ও তাঁর ভাইদের পরিচালিত সংস্থা। একতলাতে মস্ত ঘরে মস্ত দোকান। এও তাদেরই সম্পত্তি। বহুরকম সৌখীন ও অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদিতে বোঝাই। হোটেলের খাবার কিন্তু ভালো নয়, তাই একদিন পরই আমরা অন্য একটি রেস্টুরেন্টে খাবার ব্যবস্থা করে নিলাম। এই রেস্টুরেন্টটির মালিক একজন নেপালী। এছাড়া বাঙালী পরিচালিত দোকান ও রেস্টুরেন্টও আছে কয়েকটি। তবে ছোট। ইলেকট্রিকও আছে এখানে। এখানকার হাইড্রো-ইলেকট্রিক ভারতের বন্ধুত্বের আরেকটি নিদর্শন।

প্রধান রাজপথের দুই ধারে সুদৃশ্য ঘরবাড়ী ও মস্ত মস্ত দোকান। কিছুৎ দূরে নদীর তীরে আছে শাকসব্জির বাজার। সেখানে সপ্তাহে একদিন হাট বসে। একমাত্র তখনই নানারকম শাকসব্জি ও ভুটানের তৈরী জিনিসপত্র পাওয়া যায়। অবশ্য ভুটানের হস্তশিল্প প্রায় নেই বললেই হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভুটানী মেয়েদের তৈরী পোশাক ও বাঁশের তৈরী ঝাঁপি, তাতে ভুটানীরা খাবার বহন করে, আর তীর রাখবার বেত ও বাঁশের তৈরী লম্বা চোঙ।

বাজার ছাড়িয়ে আর একটু এগোলেই নদীর ধারে একটা হেলিপড পাওয়া যায়। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এখানে ভারতের

ভারতীয় আর্মির বড়কর্তা জে মানেকশ'র আগমন উপলক্ষ্যে ভুটানী বাহিনীকে কুচকাওয়াজ করতে দেখে। ভারতবর্ষ ভুটানী সেনাবাহিনীকে সাহায্য করেছে, শিক্ষাদানও করছে, উপলক্ষ্যেই জেনারেলের আগমন।

থিম্পুর উচ্চতা ৮,০০০ পারোর মত থিম্পুও খুব শুকনো, খুব। তবে পারোর চেয়ে এখানে বেশী; কেননা শহরটির এখন গ চলছে। পারোর মতই বেলা দশট এখানে ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু ফলে সমস্ত শহর ধুলোয় ঢেকে ঠাণ্ডাও যেমন, রোদ্দুরও তেমন বেশী কষ্ট হচ্ছে না।

ডাঃ বিশ্বাস বিকাল ৪টার পর পৌঁছেই সেক্রেটারীয়েটে ফোন ক ভুটানে বেড়ানোর জন্য এখানকার চিফ সেক্রেটারীর অনুমতিপত্রে হবে। ফোনে ডেঃ চিফ সেক্রেটারী যে ওয়াংদি ফোদ্রং টংসা প্রভৃতি যেতে হলে অনুমতির দরকার হয় না। আমাদের সুবিধার জন্য পরদিন আটটায় যেন আমরা তাঁর সঙ্গে করি, পথঘাটের খবর দেবেন তিনি ওসব জায়গায় থাকবার জন্য নিবাসের অনুমতিপত্র না দিলে অসুবিধা হবে। ডাঃ বিশ্বাস ফোদ্রং যাবার গাড়ীর খোঁজ করতে গাড়ীর অফিসে শুনলেন যে যাবার নিয়মিত বাস সার্ভিস গেছে কয়েক মাস হল, কিন্তু গাড়ী পাওয়া যাবে। এখানকার ম্যানেজার মিঃ আইকত বাঙালী বাংলার হাসিমারাতে বাড়ী সেখানেই বসবাস করছেন। সেখানে মেয়েরা থাকে। বছর খানেক এখানে এসেছেন, কিন্তু অতিরিক্ত তাঁর শরীর ভাল থাকছে না। সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশী।

থিম্পুর রাজকীয় হাসপাতালে ডাক্তার ডাঃ নরেন্দ্র ও ডাঃ দুজনেই ডাঃ বিশ্বাসের ছাত্র ছাত্রী। ফোনে পাওয়া গেল না তাই আম ট্যাক্সি করে তাদের উদ্দেশ্যে পড়ি। জঙ্গ-এর খুব কাছেই হাস হাসপাতাল সংলগ্ন তাদের কো খোঁজ করে জানা গেল, দুজনের বাড়ীতে নেই। একজন আয়া ফুট বাচ্চা নিয়ে খেলা করছিল। থেকে জানা গেল, ডাঃ নরেন্দ্র কুরুকুটি স্বামী-স্ত্রী এবং ওঁদেরই!! এঁরা সিকিমী মেডিকেল কলেজে লেখাপড়া ওঁদের জন্য পরিচয়পত্র রেখে হোটেলে ফেরা।

পরদিন ভোর হতে হতেই করে তিজজন ট্যাক্সি নিয়ে বেরি ভোপি-চো-জঙ্গের উদ্দেশ্যে। আগে শহরের নামও ছিল তাসি-চো-জঙ

শহর পত্তন ও রাজধানী হবার পর নাম পালটানো হয়। আটটার সামান্য আগেই আমরা পৌঁছে গেলাম। জঙে পৌঁছানোর কিছু আগে থেকেই পথের দুই ধারে মস্ত গোলাপ বাগান, অজস্র মস্ত মস্ত গোলাপ ফুটে রয়েছে। এতবড় বড় বড় গোলাপ একসঙ্গে এতগুলি আমি আর কোথাও দেখিনি। কত রংএরই বা বাহার! আমরা মুগ্ধ হয়ে ঘুরে ঘুরে দেখি। আমার আগ্রহ দেখে একজন মালী এগিয়ে এসে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করে, কি দেখছো মাইজী?

বলি, কি সুন্দর ফুল এমনটি আর কোথাও আমি দেখিনি। বলে, ফুল নেবে? তুলে দেব? বাধা দিয়ে বলি, না না তুলো না। এমন সুন্দর ফুল গাছেই তো বেশী ভালো লাগে দেখতে। তুললেই তো শুকিয়ে যাবে।

সে ডেকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দেখায়, একটা বাঁধানো মস্ত চৌবাচ্চাতে কয়েকশ' পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুল জলে ভাসছে। কি রং আর কি বাহার! আলো হয়ে আছে জায়গাটা। জঙের প্রধান ফটকের দুই ধারেও ফুলের বাগান, এক-দিকে গোলাপ, অন্য ধারে গ্ল্যাডিওলাস। গ্ল্যাডিওলাস এখনো ফুটতে শুরু করেনি। তবে বাগান হয়েছে না ক্ষেত হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। ফুল ফুটলে তার কি যে শোভা হবে, সে কথা কল্পনানেত্রে দেখতে থাকি।

জঙের ফটক দিয়ে ঢুকে বারান্দা পার হয়েই একটি চৌকোনা উঠান। সেখানেও গোলাপের বাগানে অজস্র নানারঙের গোলাপ ফুটে আছে। বারান্দা থেকে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলাতে উঠেই ডেপুটি চিফ সেক্রেটারীর অফিস। তিনি এখন অফিসে নেই। তবে আমাদের জন্য খবর রেখে গেছেন যে, অদূরে একটা ময়দানে তীর ছোঁড়বার প্রতিযোগিতা হচ্ছে। মহারাজার অনুরোধে তিনি সেখানে গেছেন।

'এই যে নমস্কার, কেমন আছেন?' বাংলাভাষা শুনে তাড়াতাড়ি চেয়ে দেখি। মিঃ পল বাঙালী, সেক্রেটারীয়েটে কাজ করেন। গত বৎসর এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কি করে যেন খবর পেয়েছেন, ছুটে এসেছেন দেখা করতে। বলেন ঃ

এই আর্চারী যে কতক্ষণ ধরে হবে, কেউ বলতে পারে না, হয়তো একঘণ্টাতেই শেষ হবে, আবার সারাদিনও চলতে পারে। রাজারাজড়ার মতিগতি কে বলতে পারে! তার উপর আগামীকাল রবিবার, কোন কাজকর্ম হবে না। দেখুন কি হয়!

অগত্যা আমরা জঙের ভিতরের অট্টালিকাগুলি দেখতে বেরিয়ে পড়ি। মিঃ পল কিছুটা এগিয়ে দেন। বলেন, এখানকার বাড়ীঘর দেখেছেন? একটাও লোহার টুকরো ব্যবহার করা হয়নি, সবই কাঠ দিয়ে তৈরী, তবু কি সুন্দর করে তৈরী হয়েছে, মজবুতও খুব।

চৌকোনা জঙের মধ্যস্থলে চৌকোনা উঠান, তারও মধ্যাংশে মস্ত উঁচু একটি প্রাচীন টাওয়ার। এটি পুরাতন জঙেরই অংশ। মইএর মত কাঠের সিঁড়ি বেয়ে অনেকটা উঁচুতে উঠতে হয়, উঠেই বারান্দা, বারান্দা পেরিয়ে প্রাচীন উপাসনাগৃহে পৌঁছানো গেল। কাঠের সিঁড়িটা অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে, ঘর বারান্দা পায়রার ময়লাতে নোংরা হয়ে আছে। উপাসনা গৃহেটি মস্ত, মস্ত একটি স্বর্ণময় বুদ্ধ-মূর্তি স্থাপিত একটি মস্ত পাথরের বেদীর উপর। দেয়ালভরা উজ্জ্বল রঙে ফ্রেসকো ছবি আঁকা। আরও কয়েকটি তলাতে ঘর আছে, সেখানে লামারা থাকেন। সিঁড়ি দিয়ে নেমে সামনে একটু এগোলে পড়ে নতুন তৈরী এসেম্বলি ভবন। ভুটানী ঢঙে তৈরী, প্রাচীন জঙের অন্যান্য অট্টালিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরী করা। এখনো তৈরী সম্পূর্ণ হয়নি। তার সুবর্ণময় চূড়া নীলাকাশের পটভূমিতে জ্বলজ্বল করছে। এসেম্বলি ভবনে ঢুকবার আগেই ডান হাতে নতুন তৈরী বিহার দেখা গেল। ঝকঝকে নতুন বাড়ী, নতুন ফ্রেসকো আঁকা, সবই প্রাচীন ঢংএ তৈরী। ভিতরের মস্ত হলে বিরাট বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত। লামারা বস্তা-বন্দী করে তাঁদের রেশন নিয়ে দলে দলে ঢুকলেন ঘরে, একদল ছোট লামা তাদের পড়াশোনা শেষ করে চৌকো ফ্রেমে বাঁধানো পুঁথিগুলি পীতবস্ত্রে জড়িয়ে বেঁধে মাথায় করে নিয়ে চলেছে। সর্বত্র সবাই ব্যস্ত।

আমরা আবার ডি, সি, এসের অফিসে ফিরে এলাম। আমার ভারি ইচ্ছা একবার আর্চারী প্রতিযোগিতা দেখতে যাই। আর্চারী ভুটানীদের একটি প্রিয় খেলা; এই দ্রষ্টব্য প্রতিযোগিতাটি হয়তো আর ভবিষ্যতে দেখা সম্ভব হবে না। কিন্তু ডাঃ বিশ্বাসকে নড়ানো গেল না। উনি ডি, সি, এসের একান্ত সচিবের সঙ্গে আলাপ করছেন, একটা দরখাস্ত লিখে অনুমতিপত্র তৈরী করে ডি, সি, এসের কাছে নিয়ে যাবেন তিনি, যদি সম্ভব হয় সেখানেই সই করিয়ে আনবেন। কাল রবিবার, কাল অফিস বন্ধ, কোন কাজ হবে না। আজই অনুমতিপত্রের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। অগত্যা এখানকার জানালা দিয়েই আর্চারী দেখবার বৃথা চেষ্টা করি। ইতিমধ্যে ডি, সি, এস ফিরে এসেছেন। আর্চারী শেষ হয়ে গেছে। আমরা নিশ্চিন্ত হলাম, যদিও আর্চারী না দেখতে পেয়ে মনে ক্ষোভ রয়ে গেল।

ডাঃ বিশ্বাসের ছাত্র ডাঃ নরবু এসে হাজির, 'স্যার, আজ সকাল থেকে সারা শহর আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কোথায় ছিলেন আপনি?'

ডাঃ বিশ্বাসকে ডেকে ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে ডেপুটি চিফ সেক্রেটারীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন ডাঃ নরবু। খানিক বাদে আমাদের ডাক পড়াতে আমরাও ঘরে গেলাম। সুসজ্জিত ঘর, চমৎকার দামী সিল্কের ভারি পর্দা ঝোলানো, মেজেতে উজ্জ্বল দামী কার্পেট পাতা। চমৎকার গদী আঁটা সোফায় বসে আছেন এক সৌম্যকান্তি বৃদ্ধ, সহাস্যবদন, আন্তরি-কতার সঙ্গে আহ্বান করে বসালেন। ইংরাজীতেই কথাবার্তা চলছিল। বলেন, ভুটান দেখতে এসেছেন, খুব আনন্দের কথা, কিন্তু ভুটান এখনো ট্যুরিস্টদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। তাই আপনাদের কষ্ট হবে। কোথাও থাকবার ঘরও পাওয়া যায় না, তাই আপনাদের জন্য গেস্ট হাউসের ব্যবস্থার জন্য চিঠি দিয়ে দিচ্ছি।

আমি বলি, আমরা বেড়াতে বেড়িয়েছি, ভুটান দেখবো এবং ভালো করেই দেখবো। শুধু তাই নয়, যেমন নেপালে বেড়ানোর সময় করেছি, তেমনি ভুটানীদের বাড়ীতে থাকব। তাদের সঙ্গে মিশবো, তাদের ভাল-ভাবে জানবার চেষ্টা করবো, তবে তো আমাদের ভুটান বেড়ানো সম্পূর্ণ হবে।

হেসে বলেন, এখানকার লোকজন, হালচাল একেবারে ভিন্নরকম, খাওয়া-দাওয়াতে আপনাদের সঙ্গে মিল নেই, কোন ভুটানী বাড়ীতে আপনারা থাকতে পারবেন না।

আমি বলি, আমাদের সঙ্গে আমাদের বিছানাপত্র, খাবারদাবার, বাসনপত্তর সবই আছে। রান্না-খাওয়া-শোবার ব্যবস্থা সবই নিজেদের। যে বাড়ীতে থাকব, তাদের কোন অসুবিধা হবে না, কেবল একখানা ঘরে থাকা, তাতে মেলামেশা জানাশোনার অসুবিধা হয় না, কোন পক্ষ বিব্রতও হয় না। আমরা নেপালের দূরাঞ্চলে গ্রামে গ্রামে এমনি থেকেছি, আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি কখনো।

উৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, আপনারাই আসল ট্যুরিস্ট! আপনারা এমনভাবে ঘুরেছেন জেনে খুব আনন্দ হচ্ছে। অজস্র শুভ কামনা জানাচ্ছি, আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।

শুনলাম, এখানে বৃদ্ধের খুব সম্মান। তিনি নাকি এবার মন্ত্রিপদের জন্য মনোনীত হয়েছেন। এখান থেকে বিদায় নিয়ে ডাঃ নরবু আমাদের এসেম্বলি হাউস দেখাতে নিয়ে গেলেন। এখন সংসদ বা এসেম্বলির সভা বসেছে। আমরা বাড়ীটির দোতলায় উঠে গেলাম। ব্যালকনি থেকে দেখি, একতলার চৌকোনা মস্ত ঘরে উজ্জ্বল রঙের আসবাবপত্র সাজানো, অনেকগুলি মাইকও আছে। একধারে স্পীকারের চেয়ারের মত একটি সুসজ্জিত উঁচু আসন আছে। শুনলাম, সেটি মহারাজার আসন। আজ মহারাজা অনুপস্থিত। উজ্জ্বল গাঢ় রঙের পোশাক পরিহিত রঙিন গরম চাদরে আবৃত অনেকজন বর্ষীয়ান ভুটানী ভদ্রলোক আলোচনা করছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন লামাও আছেন। ভিন্ন ভিন্ন পদাধিকারীর চাদরের ভিন্ন ভিন্ন রঙ। ডাঃ নরবু আমাদের বুঝিয়ে দেন। ভাষা বুঝি না তাই কি বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, বলেন।

ভুটানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শাসনকার্যে সহায়তা করেন সংসদ বা

এসেম্বলি। এই এসেম্বলির ২৫ শতাংশ সদস্য রাজকর্মচারী, এঁরা রাজা বা গভর্ণমেণ্টের মনোনীত। বাকীরা লামা ও গ্রামের প্রধানগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। এঁরা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

বর্তমান মহারাজা যুগের পরিস্থিতি লক্ষ্য করে নিজের রাজাধিকার খর্ব করবার চেষ্টা করেছেন। আমরা এখানে থাকতেই শুনলাম, মহারাজা একটি আইন প্রণয়ন করেছেন যে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধির ভোটে মহারাজাকে রাজত্ব পরিত্যাগ করতে হবে।

ভুটানের মহারাজাধিরাজ দ্রুক্ গিয়ালপো জিগমে দোরজি ওয়াংচুকের প্রাসাদ বা দ্রিচেলিং যেতে নদী পার হয়ে পাঁচ মাইল যেতে হয়। পাহাড়ের গায়ে বিশাল এলাকা নিয়ে প্রাসাদের সীমানা, মাঝখানে ছবির মত সুন্দর প্রাসাদটি। পাথরের তৈরী, সাদা রং করা, ভুটানী ঢংএ কাঠের কারুকার্য করা দরজা জানালা, ভারি সুন্দর দেখতে। প্রাসাদের সম্মুখে মস্ত একটা ফটক আছে, সেখানে জমকালো পোশাক পরা কয়েকজন ভুটানী সিপাই পাহারা দিচ্ছে। প্রাসাদে যাবার পথে পড়ে, নতুন তৈরী 'তাশা' ওয়্যারলেস স্টেশন।

তাসি-চো-জং (বর্তমান থিম্পু) অতি প্রাচীন শহর। বহু প্রাচীনকাল থেকেই তাসি-চো-জংই সম্ভবতঃ ভুটানের রাজধানী রূপে পরিচিত ছিল। যতদূর জানা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই ভুটানের সঙ্গে বাংলাদেশের অল্পবিস্তর বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। এই সম্বন্ধ দৃঢ় করবার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস বারবার চেষ্টা করেন। এজন্য ভুটানে বৃটিশ প্রেরিত প্রথম দূত সম্ভবতঃ বগলি ছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস তিব্বতে পাঞ্চেনলামার নিকট পাঠাবার জন্য বগলিকে ভুটানে পাঠালেন, সঙ্গে কিছু উপহার দ্রব্যও দিয়ে দিলেন। বগলিকে তিব্বতে যেতে হলে ভুটানের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, তাই তিনি ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে সার্জন হ্যামিল্টনের সঙ্গে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে কুচবিহার ও বকসাদুয়ারের পথে ভুটানে প্রবেশ করেন। তাঁর পথ ছিল তে-চিন-চু বা রাইডাক নদীর তীরপথ ধরে গিয়ে দশদিনে তাসি-চো-জং। সেখানে দেবরাজার অতিথি হয়ে তাঁরা পরম যত্নে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। এই সময় বগলি ও দেবরাজের মধ্যে বাণিজ্য বিষয়ে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে বগলি ফিরে আসার পরই ওয়ারেন হেস্টিংস কথাবার্তা চালাবার জন্য হ্যামিলটনকে পাঠান। হ্যামিল্টনও বকসাদুয়ারের পথে পুণাখা পৌঁছে সেখান থেকে মে মাসে তাসি-চো জংএ আসেন। এতে মনে হয় দেবরাজার শীতাবাস ছিল পুণাখা এবং গ্রীষ্মাবাস ছিল তাসি-চো-জং। কেননা পুণাখার উচ্চতা ৫০০০ হাজার ফুট মাত্র আর তাসি-চো-জংএর উচ্চতা ৮০০০ হাজার ফুট।

পরবর্তীকালে বৃটিশ প্রতিনিধি দলের কর্তা স্যার ক্লড হোয়াইটের বই থেকে ভুটান সম্বন্ধে বহুকথা আমরা জানতে পারি।

অনুমতি পাওয়া গেল এবার ওয়াংদি-ফোদ্রং যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। ডাঃ নরবু একটা ট্যাক্সি করে মিলিটারী হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। সেখানে ডিউটিরত ক্যাপ্টেন কল্ল সাহেবের বসালেন। টেলিফোন করে ওয়াংদি ফোদ্রং-এর ডাক্তার ক্যাপ্টেন পালের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সেখানে থাকবার ব্যবস্থা করে দেবেন বলে কথা হল। তারপর খানিক পরে খবর পেলাম, সব ব্যবস্থা ঠিক, আগামীকাল দুপুরে আমরা ওয়াংদি পৌঁছাবো। ক্যাঃ পাল সেদিন সকালে রোগী দেখতে পুণাখা যাবেন, ফিরতে ১২।১২॥টা হবে। তারপর তিনি আমাদের সবরকম ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। পুণাখা যাবার ব্যবস্থা, ডংসা যাবার ব্যবস্থা, দরকার হলে ঘোড়া ইত্যাদির ব্যবস্থা তিনিই ঠিক করে দেবেন কথা হয়েছে। তাছাড়া ওয়াংদিতে থাকবার ব্যবস্থা তিনিই করবেন।

এবার ওয়াংদিতে যাবার গাড়ী সংগ্রহ করা। সাহায্য করলেন মিঃ ভাইকত। ঠিক হল, কাল সকালে চা খেয়ে [illegible] ওয়াংদি রওনা হবো। আর আজ বিকালে ৫ মাইল দূরে সিমটোকা জং দেখে আসব।

থিম্পু থেকে আগেকার পথেই ৫ মাইল ফিরে চলা। দূর থেকে দেখা যায় ছোট একটি পাহাড়ের টিলার মাথায় ছোট-খাট প্রাচীন জংটি পথ থেকে প্রায় শত-খানেক ফিট উঁচুতে তৈরী করা। এটি ভুটানের প্রাচীনতম জংগুলির মধ্যে একটি। জংএ ঢুকবার আগেই দেয়ালের গায়ে অনেক উঁচুতে মস্ত মস্ত কয়েকটি মৌচাক ঝুলছে, বিশেষভাবে লক্ষণীয় অত-বড় মৌচাক খুব কম দেখেছি। গত বছর যখন এসেছিলাম, তখন জংএ কেউ ছিল না, মন্দিরের সদর দরজা বন্ধ ছিল, তাই ভিতরে ঢুকে দেখা সম্ভব হয়নি। উঠানের চারদিকে প্রধান মন্দিরের গায়ে দেয়ালে দেয়ালে খাঁজ কেটে শ্লেটপাথরে খোদাই করে আঁকা অনেক গুরু, সাধুসন্ত, দেবদেবীর ছবি আছে। ভারি সুন্দর ও প্রাণবন্ত সেগুলি, তাই ই ঘুরে ঘুরে দেখেছি। শুনেছিলাম লামারা সকলেই নদীর ওপারে অন্যান্য বিহার থেকে আসা লামাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে চা-পান করতে গেছেন। তাঁদের ফেরবার সময়ের কোন ঠিক নেই। দূর থেকে নদীর ওপারে তাদের দেখতেও পেলাম। বিহারের ভিতরটা না দেখেই অগত্যা আমাদের ফিরে যেতে হয়েছিল। আমরা ওপারে যেতে না যেতেই তাঁদের সমাবেশ ভেঙে গেল। পথে কয়েকজন লামার দেখা পেলাম। গাড়ী থামিয়ে আমি তাড়াতাড়ি তাঁদের কাছে এগিয়ে গিয়ে ইঙ্গিতে তাঁদের ছবি তুলবার অনুমতি চাইলাম। দলে একজন বৃদ্ধ লামা ছিলেন, শান্ত সৌম্য আত্মিক চেহারা। তিনি সহাস্য বদনে মাথা হেলিয়ে অনুমতি দিলেন। পরে সঙ্গী ভুটানীরা বলল, ইনিই হচ্ছেন এ অঞ্চলের প্রধান লামা!!

এবার আবার সিমটোকা জংএ প্রধান লামার সঙ্গে দেখা হল। তিনি বিহারের বারান্দায় দেয়ালে ফ্রেসকো আঁকার তদারক করছিলেন। আমাদের দেখে খুব খুশী হলেন। অবশ্য কথাবার্তা বিশেষ কিছু সম্ভব নয়। এবার আমরা বিহারের গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে সমর্থ হলাম। বিশাল সোনার বুদ্ধমূর্তি, তার দুপাশে এবং দুদিকের দেয়াল ঘেঁসে অনেকগুলি মস্ত মস্ত মূর্তি, সবগুলিই সুবর্ণময়। কিন্তু ঘরটি এত অন্ধকার যে মূর্তিগুলি ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। একজন ছোট্ট লামা কিছু [illegible] এসেছে, সে অত্যধিক ছোট্ট একটি [illegible] এনে, তারই মৃদু আলোতে যেটুকু দেখা, কয়েকটি মূর্তি দেখে মনে হল হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি। একটি দণ্ডায়মান মূর্তিকে তো মনে হল বীণাপাণি সরস্বতীর মূর্তি। কিন্তু স্বল্পালোকে [illegible] বোঝা গেল, তাতে বুঝতে পারছি এই বিশাল মানুষ প্রমাণ সুবর্ণ মূর্তি মূর্তির গঠন শৈলী অপূর্ব সুন্দর [illegible] তাদের সৌন্দর্য স্পষ্ট [illegible] যাচ্ছে।

সিমটোকা জংটি ছোট কিন্তু প্রাচীনত্বের গৌরবে সিমটোকা গৌরবান্বিত।

ইতিহাসের বহু পাতাতে সিমটোকার নাম পাওয়া যায়। বহু উত্থানপতনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত এই সিমটোকা।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের বৃটিশ প্রতিনিধি রূপে ইডেন যখন দার্জিলিং থেকে রওনা হন, তখন ভুটানে অশান্তি চলছিল। তদানীন্তন দেবরাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেছেন পুণাখার জংপেন ও টংসার পেনলোপ (পুণাখা জংএর কর্তা ও টংসার শাসনকর্তা)। দেবরাজা সিমটোকা জংএ আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই অবস্থায় ইডেন নির্দেশানুযায়ী সিমটোকা জং থেকে নতুন দেবরাজার সঙ্গে দেখা করতে পুণাখার দিকে অগ্রসর হন।

(ক্রমশঃ)

(চোদ্দ)

এ আলোচনার পর কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের বিবাহ হয়ে গেল। কিন্তু এ কি নিষ্প্রয়োজন? রেজিস্ট্রেশনের দিক থেকেই সম্পন্ন হোলো। কিন্তু আমাদের দুজনের, বিশেষ করে মিঃ ভট্টাচার্যের মত ছিল—আইনের স্বাক্ষরে ক্ষতি নেই। কিন্তু দুটি জীবনের মহা-মিলনের এই পুণ্যলগ্নটি বাঁধা থাক হিন্দুপ্রথায় বিবাহডোরে।"

সত্যি কথা বলতে কি, একটি ইচ্ছের মধ্যেই যেন আমার কাছে মানুষটির অন্তর দীপ্তিদ্যুতির মতই উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বর্ষারাতে নিকষ কালো আকাশের বুকে আলোর চমক-লাগানো বিদ্যুতের মতই। আগেই বলেছি মধুর আলাপের কোনো প্রকাশ্য ছন্দে আমাদের মধ্যে হৃদয়-বিনিময় হয়নি। তার কারণ হোলো ওঁর অন্তর্মুখী চাপা স্বভাব, যার ফলে বাইরের লোকেরা খুব সহজেই ওঁকে ভুল বুঝতেও পারে, ভাবতেও পারে উন্নাসিক, [illegible]—এমন কি বেরসিকও।

কিন্তু ওঁর একটু কাছে যে এসেছে—তার কাছে ভেতরটা স্বচ্ছ হতে দেরী হয় না। সবাই ওঁকে বলত 'সাহেব'—শুধু রং ও চেহারার জন্যই নয়। কেতাদুরস্ত নিখুঁত আদবকায়দার চালচলনের জন্যও। এটা ওঁর স্বভাবগত তো বটেই, মজ্জা-গত। পদস্থ সরকারী কর্মচারী হওয়ার দরুন সাহেবমহলে কর্মক্ষেত্রের অনেকটাই প্রসারিত ছিল বলে মানুষটা চলতি কথায় যাকে বলে এমন সাহেবী চালচলনসম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আপন দেশ ও ধর্মের প্রতি ওঁর কত অবিচল নিষ্ঠা আর ঐকান্তিক অনুরাগ সেটা বোঝা গেল ঐ একটি কথায়—"অগ্নিসাক্ষী করে নারায়ণ-শিলা সাক্ষী রেখে যদি দুটি হৃদয় পরস্পরকে গ্রহণ না করে তাহলে বিবাহ কথাটার কোনো মানেই হয়না।" গহন বনের ঘন ঝোপের আড়ালে সবার অলক্ষ্যে ফুটে-ওঠা, নাম-না-জানা এক ঝলক ফুলের গন্ধের মতই ঐ কটি কথার সৌরভে যেন মনটা ভরে উঠল।

রেজিস্ট্রেশনের ঠিক ৫ দিন কি ৭ দিনের মধ্যেই ছিল এই হিন্দুমতে বিবাহ। কিন্তু ঠিক তার আগের দিন প্রবল জ্বরে উনি প্রায় অচৈতন্য। বিয়ের দিনও টেম্পারেচার ছিল ১০৩°। উঠে দাঁড়ানো তো দূরের কথা, বসবার ক্ষমতাও ছিল না। সেইজন্যই আমি চেয়েছিলাম দিনটা পিছিয়ে যাক, যতদিন না উনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু উনি কোনো কথা শুনবেন না। ওঁর ঐ এক কথা—"শুভস্য শীঘ্রম্"। আয়োজন যখন সম্পূর্ণ তার একদিন, এক মুহূর্তও দেরী নয়। সে জন্যই হোক আর যাই হোক। (পরেও দেখেছি জীবনের সবক্ষেত্রেই ওঁর ঐ একই নীতি, কোনো সিদ্ধান্তে একবার পৌঁছলে তবে আর নড়চড় হয় না।) ডাক্তার, পুরোহিত—সবাই বললেন, অসুস্থ শরীরে একেবারে উপবাস থাকাটা অনুচিত, কিছু খাওয়া দরকার, এবং এটা প্রথাবিরোধী নয়। কিন্তু পূর্ণ উপবাসের সংকল্প থেকে কেউ ওঁকে টলাতে পারেনি।

ঐদিন এবং বিবাহলগ্নে আমার একাধারে বান্ধবী ও শিক্ষিকা, শ্রীমতী বীণা দেবী সেন ও তাঁর স্বামী ডাঃ আর এন সেন অক্লান্ত সেবা, সাহচর্য, চিকিৎসা ও সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা দিয়ে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়ে আমাদের দুজনকেই চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন। এ ঋণ অপরিশোধ্য।

ঐ দিন প্রতি মুহূর্তে ডাঃ সেন রোগীর কাছে বসে তার প্রতি লক্ষ্যই শুধু রাখেননি। প্রয়োজনীয় ইনজেকশন দিয়ে ট্যাবলেট খাইয়ে শোওয়া মানুষটাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে তবে ছেড়েছেন। বিবাহের সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পরও অতন্দ্র প্রহরীর মত আমার সঙ্গে তিনিও রোগীর শিয়রে বসে থেকেছেন আর—বারবার হাতটি ধরে পাল্স পরখ করেছেন—সজাগ থেকেছেন—রোগীর অবস্থা যাতে কোনোরকম শঙ্কার দিকে না যায়।

বিবাহলগ্নটি সংকটমুক্ত হতে পারে নি, তবু সেই মুহূর্তেই চিত্ত যেন পুলক-

হরিদাস ভট্টাচার্য এবং কানন দেবী

স্নান করে উঠল। ছবির মত আজও দেখতে পাই দীপ্ত তেজে আগুন জ্বলে উঠেছে, যেন মর্তের অতল হতে তেজ ও বিভায় উঠে এসেছেন অগ্নিদেবতা স্বয়ং, আর তারই দেহ থেকে বিচ্ছুরিত আলোর দাহে দেহ, মন প্রাণ সব যেন শুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি অনুষ্ঠানের কাব্যসৌন্দর্য আর ব্যঞ্জনার গভীরতায় চারিদিকের অতি-জানা বাস্তব পৃথিবীটা অবাস্তব স্বপ্নলোক হয়ে উঠেছিল। পুরোহিতের উচ্চারিত "যদেদং হৃদয়ং তব, তদেদং হৃদয়ং মম"-র প্রতিটি কথা জীবন্ত হয়ে উঠছিল,—আর তার পরম ভাবকে শুনেছিলাম ধ্বনিতরঙ্গের মধ্য দিয়ে নয়, তার অন্তরালের নিঃশব্দতার মধ্য দিয়ে। এ নীরবতার ছন্দ সেদিন রাতেই হৃদয়ে বেজে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে ভেতরটায় কি যেন এক ওলটপালট হয়ে গেল।

মনে হোলো মুক্ত নীল আকাশের হাজার তারা, বনবনান্ত, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল যেন নিবিড় স্তব্ধতায় এই মিলনের জীবন্ত সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর মনের মধ্যে অশ্রান্ত নূপুরের মত ধ্বনিত হচ্ছিল 'যদেদং হৃদয়ং তব।" পুজোর নৈবেদ্যর মত পরস্পরকে দান ও গ্রহণের এমন মর্যাদামণ্ডিত রীতি—হিন্দু বিবাহ ছাড়া আর কোনো বিবাহেই বুঝি নেই।

একবার চাইলাম ও'র মুখের দিকে। সে যন্ত্রণাকাতর, ক্লিষ্ট মুখ আজও আমায় পীড়া দেয়। আগুনের আভায় সারা মুখ রক্তবর্ণ, সারা কপাল, মুখ, গাল, চিবুক ঘামে ভেসে যাচ্ছে। আমি হঠাৎ যেন সম্বিৎ পেয়ে চমকে উঠলাম "ও পড়ে যাবে না ত? জ্বরের যন্ত্রণা ও উপবাস ঐ শরীরে যদি না সয়?" পিছনে দাঁড়ানো বীণা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "অত বিচলিত হোয়ো না, কোনো ভয় নেই। ডাঃ সেন ও'র পিছনেই আছেন। শেষ হতে আর বেশী দেরীও নেই। তুমি পুজোয় মন দাও।"

ঈশ্বরের কৃপায় শুভকাজ সম্পন্ন হোলো। বিবাহান্তে বাসরে গিয়ে একটু সুস্থির হবার সঙ্গে সঙ্গেই ও'র ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল সেই মিষ্টি হাসি—আর একটি কথা, "অগ্নিসাক্ষী রেখে, মালাবদল করে বিয়ে না করলে 'বিবাহ' কথাটার কোনো মানে হয়।' তারপরই ডাঃ সেনের দুটি হাত ধরে বললেন, "কিন্তু আপনি না থাকলে অগ্নিসাক্ষী ত দূরের কথা, বিয়ের পিঁড়ি অবধি পৌঁছতে পারতাম কিনা সন্দেহ।"

"যাঁর কাজ তিনিই ঠিক করিয়ে নেন, মিঃ ভাট্টাচার্য, আমরা নিমিত্ত মাত্র", বললেন ডাঃ সেন।

১৯৪৩ সাল থেকে এই দম্পতীর সঙ্গে আমার পরিচয়। ও'র সঙ্গে প্রথম সম্পর্ক ছিল শিক্ষিকা ও ছাত্রীর। আমায় পড়াতেন, আর কত যত্ন করে, দরনজন্যে কাজের ফাঁকে ফাঁকে গল্প করতে করতেই নানা বিষয়ে আমার দৃষ্টি খুলে দিতেন। মনে পড়ে একদিকে পড়ে থাকত আমার স্টুডিও ডায়লগের খাতা, অন্যদিকে substance-writing translation-এর খাতা। কোনোদিন যদি কোনো টাস্ক-এ এতটুকু অবহেলা করেছি, বকুনীর সীমা-পরিসীমা থাকত না।

এই শিক্ষিকা-ছাত্রীর সম্পর্কই পরে গভীর সখিত্বে রূপান্তরিত হয়। তারপর থেকে সুখেদুঃখে, সম্পদে, বিপদে উভয়েই উভয়ের বন্ধু হয়ে উঠেছি। অনেক ঝগড়া হয়েছে, মনোমালিন্যও ঘটেছে। কিন্তু বন্ধুত্বের বাঁধন আজও শিথিল হয়নি।

নানান দ্বন্দ্ব ও শঙ্কায় ঝড় তুফান এবারও যে মনকে বিপর্যস্ত করেনি তা নয়। নিন্দুকের রসনার বিষ, ঈর্ষার নির্লজ্জ আক্রমণ, সঙ্কীর্ণমনার পরশ্রী-কাতরতা উদ্দাম হয়ে উঠতে দেরী হয়নি। তাঁদের শুধু খবরটুকু পাবারই অপেক্ষা ছিল। রূপান্বিতা, গুণান্বিতা বিবাহ-যোগ্যাদের পিতামাতারা ত আমার সীমাহীন আস্পর্ধায় ক্ষেপেই আগুন। এমন লোভনীয় রাজপুত্রতুল্য পাত্র কিনা হাত-ছাড়া হয়ে গেল সামান্যা এক চিত্রাভিনেত্রীর জন্য? কি আছে ওর? রূপ? মরি, মরি মেকআপের প্রসাদে আর শাড়ী গয়নার দৌলতেই যা চটক? অমন মহার্ঘ সাজ-সজ্জার সুযোগ পেলে রূপবতী হয়ে উঠতে মেয়েদের এক লহমাও দেরী হয় না।

ছিদ্রান্বেষী নিষ্কর্মার দল—এবারে রুচিবিগর্হিত পত্রিকা হয় ত বার করেন নি। কিন্তু অশ্লীল কার্টুনের ছবি ইঙ্গিতে হৃদয়ের জ্বালা ছড়িয়ে দিতে ও'দের একটুও দেরী হয়নি।

বিজ্ঞম্মণ্যরা গোঁফে চাড়া দিয়ে গম্ভীর মুখে রায় দিলেন, একজনের রূপের চটক আর অর্থ, অন্যের রূপ ও পদমর্যাদার মোহজাত মিলনের এই মায়ামহল নিশ্চিহ্ন হোলো বলে! এ হোলো দেহ-তৃষ্ণা প্রদক্ষিণ করা, স্ফুরৎ বিভা আলেয়ার আলো। কামনামদির প্রতিশ্রুতির স্বপ্নই

বাঁকালেখা / কাননদেবী, অনুপকুমার এবং কমল মিত্র

হাতো ডাকা, রঙিন উৎকোচে প্রলুব্ধ করা। কিন্তু সে যে বুদবুদের মতই ক্ষণস্থায়ী, এ খবর কে না জানে?

এসব কথায় বুক যে কেঁপে ওঠেনি, দ্বিধায় মন যে কখনও সঙ্কুচিত হয়নি, এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারি কই? তবে পদে পদে ঘাত, প্রতিঘাত, বিরোধিতা অতিক্রম করে চলতে চলতে মনটা শুধু সহনশীল নয়, কঠিনও হয়ে উঠেছিল। তাই এসব বিপত্তির আঁচ প্রাণকে যদি বা স্পর্শ করত, মনকে একেবারেই ছুঁতে পারত না। শুধু বারবার ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই করতাম, "শক্তি দাও প্রভু, অভিজ্ঞের ছদ্মবেশে এইসব অপদেবতাদের অশালীন কামনার আক্রমণ থেকে আমাদের এই নিষ্ঠা সুন্দর আত্মসমর্পণকে রক্ষা কোরো।"

কিন্তু বাইরের বাধাকে দাবিয়ে রাখলেও মনের অতলে লুকিয়ে থাকা ছায়াচরের মত হাজারো অন্তর্দ্বন্দ্বের উতলা বেদনা মনকে কি কাতর করেনি? এ যন্ত্রণার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সময় লেগেছে অনেক। কত একলা-মুহূর্তের চোখের জল, বিনিদ্র রজনীর চিন্তা, প্রতিদিনের নীরব পর্যবেক্ষণ ব্যয়িত হয়েছে একটা নিশ্চিত [illegible] পৌঁছতে।

কেবলই ভেবেছি ওঁর [illegible] পরিচয়কে ঝোঁকের মাথায় এতবড় দায়িত্বের বাঁধনে বেঁধে ভুল করলাম না ত? পূর্বরাগের স্বাদ পেত না, সেটুকুই [illegible] উঠে সে স্বাদকে কায়েম করতে গিয়ে একূল ওকূল দুকূলই যদি হারাতে হয়? আমার পূর্ব জীবনের সব কটি পাতাই ত ওঁর কাছে খোলা। কিন্তু আমি ত ওঁর সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানি না। একেবারে কিছুই না জেনেশুনে অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ার এই দুঃসাহস পেলাম কোথা থেকে? এ কি রোমান্স-পিয়াসী মনের [illegible] আভিজাত্যের [illegible]? [illegible] মর্যাদার মোহে? নিঃসঙ্গ জীবনের সাথী-[illegible] উন্মুখতা? না, অনিশ্চিত জীবনের নিশ্চিত নিরাপত্তার নীড় খোঁজা?

আমার চিরদিনের সৌন্দর্যাকুল মনের রূপমুগ্ধতা অস্বীকার করব না। চির-চঞ্চল ঢেউয়ের কুলভাঙানো ফেনাকণাটি চোখকে আকর্ষণ করে,—প্রাণকেও মাতায়,—কিন্তু মন যে চায় মাঝসমুদ্রের নিস্তরঙ্গ শান্তি, উদার স্বপ্নভরা আরামকুঞ্জ, বিরামনিলয়? সে স্বপ্ন যদি ভেঙে যায় এই সংসারের অকরুণ হাতের নির্মম পরিহাস আর লজ্জার গ্লানি বইব কেমন করে?

এমনই নানান অনিশ্চিত পরিণতির আশঙ্কায় শঙ্কিত প্রতিটি দুঃসহ মুহূর্তের আঁচে নিজে দগ্ধ হয়েছি কিন্তু ওঁকে জানতে দিইনি। তবু মাঝে মাঝে এ দ্বন্দ্বের ছিটেফোঁটাও প্রকাশ হয়ে পড়ত না কি?

যাকে বলে হাই সোসাইটির 'নায়ক' ছিলেন তখনকার মিঃ ভট্টাচার্য। আর ওঁর [illegible] অজস্র বান্ধবীদের ক[illegible] থেকে। [illegible] ও [illegible] সেদিন [illegible] জবাবই [illegible] তাঁরা [illegible] ছাড়তেন না। সব প্রচুরের [illegible] ছেড়ে একের দীপে নিজেকে বন্দী করার অভ্যাস বেশীদিন থাকবে না। মায়াবিনীর ছলনা জাল একদিন ছিন্ন হবেই—তখন [illegible] ফিরে আসতেই হবে সেই চেনামহলের আশ্রয়ে। তখন দেখব বীরবরের কত গ[illegible] পণা, কত বীরত্ব। দুঃসাহসের বড়াই ক[illegible] থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। উনি হেসেই উত্তর দিতেন, "আগে জাল ত ছিঁড়ুক, তারপরের কথা না হয় পরেই ভাবা যাবে।"

াজায় বিজ্ঞতা দেখে হেসে বলতেন
অমনই মন খারাপ হয়ে গেল ? যে
কের কোনো মূল্যই নেই, তাকে অত
নাই দিলে।" মেঘ কেটে খুশীর
ন উঠত ঝলমলিয়ে।

কন্তু সে আলো ম্লান হয়ে যেতেও
হোতো না। নিরালা মুহূর্তে আবার
ঘনিয়ে উঠত আশঙ্কার অন্ধকার।
ন ওঁর ঘুমন্ত, প্রসন্ন মুখের দিকে
ভেবেছি এ প্রসন্নতা চিরদিন অম্লান
চ পারব ত ? যদি দুজনের এ
র্ণ শুধুই চোখের মোহ হয় ? মিলন-
শান্ত হলে দুজনেই যদি দুজনের
ফুরিয়ে যাই ?

কন্তু চিন্তাক্লিষ্ট পরিশ্রান্ত মন এক-
নিজেই যেন নিজেকে ভর্ৎসনা করে
জীবনের এতবড় আনন্দলগ্ন এমন
লের আশঙ্কায় ব্যর্থ হতে দিতে
? ছিঃ! জীবনের প্রথম প্রেমে
মনাকেও ত যমকে দাঁড়াতে হয়েছিল
ই হাজারটা যুক্তি, তর্ক, দায়িত্বজ্ঞানের
নষেধের জোরে। কিন্তু কি হোলো ?
নী মনের বিচারবুদ্ধি, হিসেব-
শ, অঙ্গীকার শপথের শাসনে তাকে
বেঁধে রাখতে পেরেছিলাম ? যা
র্ঘ, তা ঘটবেই। কেউ তা রোধ
পারে না। কতদিন গুরুজন রাতে
র কাছে কেউ কি বলেনি, কূল পেতে
আগে ঝাঁপ দিতেই হয় অকূলে ?
রে বুদ্ধির একটানা নির্দিষ্ট পথে
নানা সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সাফল্য লাভ
ত্য, কিন্তু তাই বলে কি কখনও
ন পাইনি যে কাটাছাঁটা মাপাজোখা,
রা জীবনের পারে নিরুদ্দেশ যাত্রা
মধ্যে যে সার্থকতা নিহিত সে এ-
অনেক ওপারে ?

কথা বললে কি সত্যের অপলাপ
হয় না যে শুধু মানুষটার রূপের
লেই আপনাকে তাঁর কাছে সঁপে
চ ? ওঁর রূপের আড়ালের ব্যক্তিত্বও
ছু কম আকর্ষণীয় ? ব্যক্তিত্বহীন
ত গন্ধহীন ফুলের মতই ব্যর্থ।
আশঙ্কায় মনের শক্তি ক্ষয় করবার
কি আর আছে ?
রপরই চিন্তার ধারা গেল পাল্টে।
মানুষটার অন্তরে প্রবেশের তপস্যা।
চায় ? কেমন তার ভাবনার ধারা ?
র ধ্যান, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা ? কেমন
র চাওয়ার সঙ্গে আমার দেওয়ার
লানো যায় ?

ন্তু এ প্রয়াসও যে একদিনেই
হয়েছে তা নয়। হোঁচট খেতে
প্রতি পদেই। দেখেছি দুজনের
প্রকৃতি, পছন্দ, অপছন্দে হয়ত
চেয়ে গরমিলই বেশী। কিন্তু
যে আমাদের সম্পর্কটা গোঁজামিল
ড়ায় নি, তার কারণ দুজনের যথার্থ
তায় কোনো খাদ নেই।
থাটা আর একটু পরিষ্কার করা
।

যেমন সব্জীর বাগানের ওঁর ভারী সখ, কিন্তু আমার সখ ফুলের বাগানের। ওঁর কপি, বেগুন, আলু, লাউডগা আর কুমড়োপ্রীতি নিয়ে আমি কত ঠাট্টা করেছি। উত্তরে উনি বলেছেন—"উদর পরিতৃপ্ত না থাকলে ফুলের গন্ধ উপভোগ করবে কে ?"

আমার গান, ঘর সাজানো, বাগানের পরিচর্যা, কিউরিও অথবা অন্যান্য সখ-শৌখিনতায় ওঁর উচ্ছ্বাস না দেখে আহত হয়েছি। কিন্তু তাই বলে ত একদিনও ওঁকে সৌন্দর্যবিমুখ স্থূলে প্রকৃতির মানুষ বলে মনে হয়নি ? আমি যে দেখেছি অনেক সময় কত আকর্ষণীয় আমোদ আহ্লাদের প্রলোভন অনায়াসে উপেক্ষা করে রাশি রাশি বই নিয়ে ওঁকে একাগ্রচিত্তে পাঠের মধ্যে তলিয়ে যেতে। একনাগাড়ে চোদ্দ পনের ঘণ্টাও বই-এর মধ্যে ডুবে থাকতে দেখেছি। এক শুদ্ধ চিন্তার রাজ্যের বাসিন্দা যেন। সেই পাঠরত জ্ঞানপিপাসুকে কত যে মুগ্ধ হয়ে দেখেছি, উনি জানতেও পারেন নি।

কোনোদিন কাব্য করে কোনো ভাল-বাসার কথা বলে উনি আমার অন্তর ভরে দেন নি সত্য, কিন্তু দেখেছি আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে দিনের পর দিন কি উৎকণ্ঠা ও ব্যগ্রতায় নিজের হাতে স্নিগ্ধ থেকে চিকেন বার করে দিয়ে রান্নাঘরে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে রাঁধুনীর দিকে লক্ষ্য রাখতে, যাতে রোগীর উপযোগী পরি-চ্ছন্নতায় পথ্য প্রস্তুতে ত্রুটি না হয়।

কোনো সাড়ম্বর সমাচারে আমার প্রতি ওঁর আগ্রহ প্রকাশ পায়নি, কিন্তু আমার মার মৃত্যুর সময় আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়ে আমার বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছেন, সারা-রাত জেগে শ্মশানে থেকেছেন, আর দিনের বেলায় অতিপ্রয়োজনীয় আরাম বিশ্রামকে অনায়াসে অবহেলা করে বাড়ীতে শোক-গ্রস্ত প্রতিটি জনের তদারক করেছেন।

আমার কল্পনাপ্রবণ মনের অনেক স্বপ্ন, আদর্শ হয়ত বা উনি ভাববিলাসিতা বলে মনে করেন, কিন্তু দেখেছি এই স্বপ্নকেই অনাহত রাখায় ওঁর ব্যাকুলতার সীমা নেই। কঠিন বাস্তবের অনেক কঠিন তথ্য ওঁর জানা আছে বলেই অনেক ক্ষতি, অনেক ঝড়ঝঞ্ঝার সঙ্কট থেকে উনি আমায় মুক্ত রেখেছেন। কত বিচক্ষণতা, ধৈর্য ও কর্মশৃঙ্খলা দিয়ে বিষয় ও কর্মক্ষেত্র সামলেছেন। অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার জন্য আমায় যাতে বিপন্ন হতে না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। মানুষকে অবিশ্বাস করতে বলেন নি, কিন্তু বিশ্বাসটা যাতে অপাত্রে না পড়ে সে বিষয়ে সাবধান করে আমায় কত সঙ্কট থেকে বাঁচিয়েছেন। "আমি নিজে ঠকব না, অপরকেও ঠকাব না", ওঁর এই নীতি মেনে সংসারের অনেক ক্ষেত্রে আমার লাভের অঙ্কই মোটা হয়েছে।

আর সারা চিত্ত ভরে উঠেছে ওঁর মা, বাবার ওপর—দেবতার মত ভক্তি, নিষ্ঠা ও সেবাপরায়ণতা দেখে। আজও একদিন যদি মা বাবার কাছে যেতে না পারেন অথবা ফোন বিভ্রাটের দরুণ যোগাযোগ করতে না পারেন, অমন উচ্ছ্বাসহীন মানুষটাও শিশুর মত অধীর হয়ে ওঠেন।

অনেক দিনের অনেক সংঘাতের মাঝেও এই সত্যই স্বচ্ছ হয়েছে যে নিছক স্বল্পকামোর পাল তুলেই উনি দাম্পত্য-জীবনের তরী ভাসাননি। বুদ্ধি ও অভিজ্ঞ দৃঢ়তায় হাল ধরে তরী সামলাবার ক্ষমতাও রাখেন।

আর যে সত্যটি উপলব্ধি করে ভারী তৃপ্তি পেয়েছিলাম সেটি হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন ফুলের মতই, বিভিন্ন মানুষেরই আছে নিজস্ব প্রকাশের ছন্দ, ফুটবার ধরণ, আছে দেওয়ার গতি, নেবার ভঙ্গী। তাকে ফোটবার অবকাশ দিতে হয়, অপেক্ষা করতে হয়। ধৈর্য হারালে চলে না। তার যথার্থ প্রকৃতিকে বোঝবার চেষ্টা না করে বাইরের একটুকু ক্ষতির তুচ্ছতায় বিচলিত হলে লাভের চেয়ে লোকসানই হয় বেশী। আর অনেক সময় এই ঠিকে ভুলের জন্যই জীবনের অনেক বড় সম্পদ থেকে আপনাকে বঞ্চিত হতে হয়।

আমাদের চাওয়ার মধ্যে কখনও কোনো অসামঞ্জস্যের বেদনা আসেনি তা নয়, আমাদের মনান্তর, মতান্তরও আছে প্রচুর, আছে প্রকৃতিগত বৈষম্য। কিন্তু এ সবকে ছাপিয়েও বড় হয়ে উঠেছে আমাদের পারস্পরিক বিশ্বাসের মিল, আদর্শের মিল, শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মিলন। বাইরের নানান ঘটনায় দুজনের প্রতিক্রিয়ার রং ও রূপ ভিন্ন হতেও পারে। কিন্তু আপাতবিরোধী রঙের উৎস নিখাদ নিরঞ্জন সরল সততার শ্রদ্ধায় আমরা এক ও অভিন্ন।

আরও একটি বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট বোঝাপড়া ছিল। সেটি হোলো এই যে কোনোদিন অতীতের কোনো প্রসঙ্গ তুলে আমরা কেউই বর্তমানের শান্তধীর জীবনে চাঞ্চল্য বা অশান্তির আবর্ত সৃষ্টি হতে দেব না। এ শর্ত উনি কোনোদিন, কোনো কারণে ভাঙেন নি। ওঁর শালীনতা-মার্জিত মনের এই সংযমকে আমি শ্রদ্ধা করি।

আমাদের সম্পর্ক অনেক ঝড়ঝাপটায় কখনও টলমল করে ওঠেনি—এ কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। কিন্তু বিবাহের পর ২৪ বছর ত কেটে গেল। কোনোদিন কেউ কাউকে ছাড়ার কথা ভাবতে পারিনি।

এই মিলনই বুঝি সেই অগ্নিসাক্ষী করা হিন্দু বিবাহের দাম।

(চলবে)

অনুলিখন—সন্ধ্যা সেন

।।৩২।।

ভগবানের বৌ মরে—সেটা কিছু মর্মান্তিকভাবেই নিমাইয়ের জীবনে সত্য হয়ে দাঁড়ায়।

মণিকা নিজে মরে জ্যাঠাইমের সঙ্গে পুনর্মিলনের সেতু রচনা করে তার যে কত উপকার করে দিয়ে গেছে, সেটা ক্রমশ আরও বেশী করে বোঝে নিমাই।

যুদ্ধ বেধেছে অনেক দিনই—কিন্তু সে যুদ্ধের ঢেউ এখানে এমনভাবে এসে লাগবে, এখানের জীবন এমনভাবে বিপর্যস্ত করে দেবে—তা ভাবে নি কেউ। কোথায় কোন বিদেশে, বিলেতে না আমেরিকায় লড়াই হচ্ছে—তাতে আমাদের কি? নিমাই রাজনীতি অত বোঝে না, যা আপিসে সহকর্মীদের মুখে শোনে তাই পথেঘাটে বা ঘরে বৌয়ের কাছে এসে সাড়ম্বরে রং চড়িয়ে বলে নিজের প্রজ্ঞা প্রকাশ করে। সেইই সমীক্ষা নিজের বলে চালাতে দোষ কি—তাতে যদি কিছুটা নিজের লেখাপড়ার ও বুদ্ধির অভাব ঢাকা পড়ে?

আপিসে শুনেছিল, ইংরেজ আর ক'দিন, দ্যাখো না জার্মানী সাত দিনের মধ্যে দেবে ঠাণ্ডা করে, খাশ বিলেতটাই দখল করে নেবে। তারপর ইংরেজ বাছাধনরা যাবেন কোথায়? এদেশে থেকেও পাততাড়ি গুটোতে হবে না? আরে নিজেদের দেশই যদি যায়, এদেশ রাখবে কি করে? জার্মানরা তো আমাদের বন্ধু, খুব ভক্তি করে, আমাদের শাস্ত্র রামায়ণ মহাভারত কালিদাস সব ওদের মুখস্থ, মোক্ষমুলের সংস্কৃত জেনেই তো অত বড় পণ্ডিত হয়েছিল। ওরা আমাদের অধীন রাখবে না এটা ঠিক—এদেশে এসে আমাদের স্বাধীন করে দেবে—সুভাষ বোস হবে প্রেসিডেন্ট। কিম্বা গান্ধী প্রেসিডেন্ট, সুভাষ বোস প্রধানমন্ত্রী।

এর আগে যে বিরাট লড়াই হয়ে গেছে—নিমাই তখন ছেলেমানুষ, তবু সেকথা মনে আছে। কাপড়ের খুব দর হয়েছিল—বিলেত থেকে কাপড় আসত না বলে, নুনেরও খুব অসুবিধা গেছে। অন্য জিনিস পত্রের দামও কিছু কিছু বেড়েছিল, দু-একটা জিনিস পাওয়া যেত না। তারপর লড়াই থামতে তেমনি হু-হু করে নেমে গেল দর। লোকের কাজ নেই, জিনিস কিনবে কে? আমেরিকায় না কোথায় এক মাসে নাকি এক লাখ লোক 'আত্মঘাতী' হয়েছিল কাজ না পেয়ে।

সুতরাং খুব ভয়াবহ অবস্থা হবে অত ভাবেনি কেউ। বরং মুখরোচক আলোচনা করার মতো খোরাক পেয়ে খুশী হয়েছিল। বোমার হিড়িকে সবাই যখন পালায় তখন একটু মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল ঠিকই—তবে নিমাই কোথাও পালায় নি, সে অবস্থা ছিল না। জায়গা ছিল, কাশীতে পাঠানো চলত, কিন্তু টাকা? এত টাকা হাতে জমে নি যে এতজন দমে করে পাঠিয়ে দেবে। তারপর আপিসে ছুটিও গেল বন্ধ হয়ে, 'এসেনসিয়াল সার্ভিস' ছুটি হবে না। তাতে একটু ভয়ে ভয়ে মুখ শুকিয়ে থাকতে হয়েছিল ঠিকই, সন্ধ্যার সময় আপিস থেকে বাড়ি ফিরতে গা ছমছম করত, রাত্রে ডিউটি পড়লে সন্ধ্যের আগে থাকতে আপিসে গিয়ে বসে থাকত। কিন্তু সে যাই হোক, এমনভাবে পেটে টান পড়ে নি। হঠাৎ সেইটেতে হাত পড়তেই চিন্তিত হয়ে উঠল। চাল চড়তে চড়তে চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর টাকা মণ হয়ে গেল। যে চাল সে তিন টাকা মণ দরে কিনেছে উনিশ শো উনচল্লিশেও। জ্যাঠাইমা বেশী দামের চাল খেত, পাঁচ টাকা সওয়া পাঁচ টাকায় চামরমণি চাল আসত, নিজের হাতে সংসার পড়ে তিন সওয়া তিনের ওপর ওঠেনি। সত্তর, শুনেছে কোথাও কোথাও আশীতে পর্যন্ত উঠেছে—ওদের বাজারে মালই ছিল না—উধাও হয়ে গেল একেবারে। তবু তখনও অন্য জিনিসের দর অত বাড়ে নি—ভাত কাপড় চিনি কেরোসিন তেল—এইতেই প্রথম টান পড়ল। সরকারী কর্মচারীদের জন্যে আগেই রেশনের ব্যবস্থা হল বটে তবে তা হতে হতে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল নিমাই। স্ত্রীর গায়ে সোনারূপো বলতে কিছু রইল না, এমন কি কমলা হবার পর হেমন্ত যে হার বালা দিয়েছিল সে পর্যন্ত চলে গেল এই হিড়িকে। কাপড়-জামা পোশাক-আশাক বহুকালই কেনা বন্ধ হয়ে গেছে, এখন তো প্রায় উলঙ্গ অবস্থা সকলকার। রেশনে যেটুকু কাপড় বরাদ্দ হয়েছে তাতে লজ্জা নিবারণ হয় না। এত লাইনেই বা দাঁড়ায় কে? গোপালের পৈতে দেবে বলে গোপনে কিছু সরিয়ে রেখেছিল আশা, তাও ধুয়ে বেরিয়ে গেল বলতে গেলে।

এ অবস্থায়—উপোস করে মরা এবং বেইজ্জৎ হওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি পাবার আর কোন পথ না দেখে শেষে কাশীতেই চিঠি লিখল, লিখতে হল। নিজে লিখল না—আশাকে দিয়ে লেখাল। 'এই অবস্থায় ছেলেমেয়ে লইয়া অনাহারের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি—এক্ষণে আপনি যদি কিছু দয়া করেন, তবেই এতগুলি প্রাণীর জীবন রক্ষা পায়।'

দয়া করেছিল হেমন্ত। চিঠির উত্তর দেয়নি তবে চিঠি পাওয়ামাত্রই আশার নামে মনিঅর্ডার করে একশ টাকা পাঠিয়েছিল। তারপর থেকে মাসে চল্লিশ পঞ্চাশ করে পাঠায়। তাতেও হেমন্তর লোকসান নেই, এই মাগ্গীগণ্ডা মন্বন্তরের ফলে নিমাইয়ের কাশীতে আসা বন্ধ হয়েছে, ওরা এলে যে খরচটা হত সেইটেই পাঠাচ্ছে সে ভাগ করে। হয়ত হিসেব ধরলে ঠিক এতটা খায় না—তা হোক, ঝঞ্ঝাটটা অনেক কম। তাছাড়া ঐ বছরে একবার আসাতেই

বিশ্বর মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে, সেটা বেশ বোঝা যায়।

আর তা হতেই পারে। এখানে কতকটা বন্দী হয়ে থাকা দুটো বাড়ির মধ্যে, নিচে যে ভাড়াটে সেও বুড়ি। একতলায় অনেক অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে আছে বটে—তবে তাদের সঙ্গে বেশী মিশতে দেয় না বিশ্বকে। দেয় না, তার কারণ, এরাই কিছু-দিন আগে, এদের ছেলেমেয়েদের যখন উপযাচক হয়ে দেখাশুনো করতে যেত, রোগে সেবা কি পথ্য যোগানোর জন্যে—তখন ওকে ডাইনী বলেছে, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ও আয়ু সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, অথচ এখন বিশু আসাতে তাদের ছেলেমেয়েদের আর আগের মতো, দরাজ হাতে খাবার ওষুধ কাপড় জামা দেবে না—এই অনুমান করে তারাই দস্তুরমতো ঈর্ষিত। কে জানে—শেষ পর্যন্ত যদি ছেলেটার কোন অনিষ্ট করে?

অবশ্য খেলার সাথী একজন বাড়িতেই আছে, ভোলা। প্রায় সমবয়সী। ভোলা এক ক্লাশ নিচেয় পড়ে তার কারণ সে অনেক বেশী বয়সে ছেলেদের তুলনায় অ-আ-ক-খ থেকে পড়তে শুরু করেছে। তাতে খেলুড়ে কি বন্ধু হতে আটকায় না। কিন্তু কে জানে কেন—বিশু ভোলাকে কেন যেন বিদ্বেষের চোখে দেখে, ভাল করে মিশতে চায় না, বন্ধুর মতো তো নয়ই। বরং—ওদের যে সাংসারিক পদমর্যাদা সমান নয়, ভোলা ঝিয়ের ছেলে, বিশুর চাকর হওয়ারই কথা তার, বড়জোর ওর ব্যক্তিগত ভৃত্যের পদবী দাবী করতে পারে—এই ইঙ্গিতটাই ওর আচারে-আচরণে কথায়-বার্তায় অহরহ প্রকাশ পায়। স্পষ্ট করে তেমন কিছু বলতে পারে না হেমন্তর ভয়ে—তবে শব্দের সাহায্যে পরিষ্কারভাবে বলা ছাড়া, সব রকমেই তা জানিয়ে দেয়।

হয়ত সহজাত ঈর্ষা, স্বভাবটাই ঐ রকম, তবে হেমন্তর বিশ্বাস এর মধ্যে নিমাইয়ের কিছু হাত আছে। সে যে আগে বছরে বছরে আসত পাঁচ-সাত দিনের জন্যে, তার মধ্যেই এই বিষটি ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। সেদিক দিয়েও, ওদের আসা বন্ধ হওয়াতে হেমন্ত খুশী অনেকটা। সেই জন্যেই সে আসবার ভাড়া পাঠাতে পারে—এমন আভাষ পর্যন্ত দেয় না আশার চিঠিতে।

বিশুকেও সোজাসুজি শাসন করতে পারে না। কেন না—যে অপরাধ প্রত্যক্ষ নয়, তার জন্যে প্রকাশ্য বিচার করা বা শাস্তি দেওয়া যায় না। তাছাড়া আর সব রকমেই এই অবজ্ঞার মনোভাব বদলের চেষ্টা করে। তবে তাতে যে বিশেষ ফল হয় না—হতাশভাবে সেটাও লক্ষ্য করে। জোর করে পাশাপাশি বসিয়ে খেতে দেয়, এক রকমের জামাপোশাক কিনে দেয় পুজোর সময়—ফল হয় বিপরীত, আরও বিরূপ হয়ে ওঠে বিশু।

অবশ্য একটা কাজ করেনি হেমন্ত, মার কাছ থেকে কেড়ে ভোলাকে স্থায়ীভাবে এ-বাড়িতে এনে তোলেনি। মুনিয়ার তাতে আপত্তি ছিল না, হয়ত ইচ্ছাই ছিল। মুখে বলেওছে বারবার, কিন্তু হেমন্ত তা করতে দেয় নি। স্পষ্টই বলেছে যে, 'যে যা—তাই থাকাই ভাল। অন্তত সে জ্ঞানটা থাকা দরকার। গোড়াটাকে যে ঘেন্না করতে শেখে তার আর ওপরে ওঠা হয় না। তোমার ঘরের ছেলে, কী ভাবে তুমি থাকো, কত কষ্ট করে ওদের মানুষ করছ—সেটা জানা দরকার। মায়ের ওপর থেকে ভক্তিচ্ছেদ্দা না চলে যায়। তাছাড়া মার কাছ থেকে ছেলে কাড়া আমি পছন্দ করি না। নিজের মাকে যে আপন ভাবতে শিখল না, ভালবাসল না—সে আমাকে আপন ভাববে?... তাই কখনও হয়!... ওতে করে আত্মসম্মানহীন স্বার্থপর অমানুষ তৈরী হয়। না, তোর জিনিস তোর কাছেই থাক, তোকে, তোর মাসীকে, তোর অন্য ছেলেকে আপন ভাবতে শিখুক, সে যে ওদেরই একজন এইটে যেন মন থেকে না যায়। আমি ওর কেউ নয়, সেই বোধটা জন্মালেই ভাল।...অনেকের কাছে অনেক স্নেহভালবাসা পেলুম—তাই আবার ওর কাছ থেকে আশা করব। হায় রে!... নাঃ, এতকাল পরে মরবার বয়স পার হয়ে সে লোভ আর নেই।'

লোভ থাক বা না থাক, আশাতীতই পায় কিছু কিছু। হয়ত লোভ বা আশা নেই বলেই পায়।

ভোলা ছেলেটা যে এদের মতো নয়—ওর শ্বশুরগুষ্টির মতো—সেটা মনে মনে ক্রমশ স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

প্রথম সে সম্বন্ধে সচেতন হল হেমন্ত ওর একটা অসুখের সময়। সামান্যই অসুখ, সর্দিজ্বর, গায়ে ব্যথা—আগে এরকম জ্বরে উঠে ঘরসংসারের কাজ সবই করেছে, এমন কি স্নান করতেও আটকায় নি। এবার এতখানি বয়স বলেই কাবু হয়ে পড়েছিল, শয্যাশায়ী ছিল তিন চার দিন। ভোলা এই কটা দিন ওর ঘর ছেড়ে, বিছানার পাশ ছেড়ে কোথাও নড়ে নি। কে ওকে 'বড়মা' বলতে শিখিয়েছিল। 'বড়মা' বলেই ডাকে ভোলা। কেবলই মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করে, 'জল খাবে বড়মা? বড়মা, বাতাস করব? এখন কেমন আছ বড়মা, শিরদরদ কমেছে? জলপট্টি লাগাব? পিসিমাকে ডাকব বড়মা, বাহার যাবে?'

আগে হেমন্ত ভেবেছিল মুনিয়াই বুঝি এটা শিখিয়ে দিয়েছে—এই আষ্টপ্রহর মুখের কাছে বসে থাকা—কিন্তু পরে বাঁদানাথের মার মুখে শুনল যে ঘটনাটা কিছু অন্য রকমই—মুনিয়া গোপনে বরং ওকে এজন্যে শাসন করারই চেষ্টা করেছে, 'ইনফ্লুয়েঞ্জা' বেমারি হয়েছে মাজীর, ভারী ছোঁয়াচে রোগ—তুই কেন ওখানে বিছানার মুখ দিয়ে পড়ে আছিস? তোর বুখার হলে কে দেখবে?' ইত্যাদি বলে বোঝাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু ভোলাকে নড়াতে পারে নি কিছুতেই, কোন কথাই শোনেনি। বলেছে, 'তোর ঐ বেমারি হলে আমাকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দিতিস? না আমিই পালাতুম! বড়মা বুড়ো মানুষ, যদি বুখার বেড়ে যায়? চেঁচাতে পারবে না, কত তকলীফ হবে বল দিকি! ওর মা বাড়ি না, আমি তো আছি!'

বাড়িও যায় নি, ইস্কুলেও না। হেমন্ত নিজেও বকাঝকা করেছে এ জন্যে, 'ঠিক যে, ইস্কুল যাবিনি কি রে? শুধু শুধু ইস্কুল কামাই পড়ার ক্ষতি করবি?...এই তো বাঁদানাথের মা আছে, তোর মা আছে—আমাকে ওরা দেখবে এখন। তুই যা—'

ভোলা যায় নি তবুও। বেশী বকাবকি করাতে কাঁদতে শুরু করেছে। বাঁদানাথের মা বলে, 'ও আর জন্মে তোমার কে ছেলে ছিল মা, নইলে, তোমারই বা এত টান কেন, আর তোমার না হয় হল—তোমার মায়াবী শরীর—ওরই বা এতখানি টান এল কোথা থেকে! কী-ই বা বয়েস, দশ-বারো বছর হবে বড় জোর, এমন কিছু বুদ্ধি বিবেচনা হয় নি। তাছাড়া এরকম বয়েসের ছেলে অসুখের কাছে ঘেঁষতে চায় না বড় একটা, আপন মা-বাপের অসুখেই থাকে না—ফাঁক খোঁজে কেবল, কখন বাইরে যাবে—কোন ছুতোয়, ইয়ার বকশী নিয়ে খেলে বেড়াবে। ...এ ছেলে একেবারেই লক্ষ্মীছাড়া বাপু, যাই বলো! এর টানটা আন্তরিক, দেখলেই বোঝা যায়!'

হেমন্তর চোখে জল এসে যায়। সেই সঙ্গে বহুদিনের ভুলে যাওয়া একটা হৃদয়াবেগে রুগ্ন মস্তিষ্ক কেমন যেন ঝিম-

বিদ্ধ করে ওঠে। এই জীবনে কোন আন্ত-রিক ভালবাসা, সত্যিকারের টান আর পাওয়া সম্ভব, অযাচিত নিঃস্বার্থ ভালবাসা —এ যেন বিশ্বাসই হয় না। এমন কোন যত্নআদরের আতিশয্য সে দেখায় নি, তার চেয়ে ঢের বেশী বাড়াবাড়ি করেছে বিশুকে নিয়ে—সে তো দিব্যি খেলেধুলে বেড়াচ্ছে, বরং চোখে চোখে রাখার লোক নেই বলে আরও বেশী বেপরোয়া—আনন্দে নেচে বেড়াচ্ছে বলতে গেলে। সে তো এ ঘরের ত্রিসীমানায় আসে না, 'ঠাকমা কেমন আছে' জিজ্ঞেস করতেও একবার এ প্রশ্ন করে না।

তবে কি—এ সত্যি সত্যিই পূর্বজন্মের সংস্কার? বদ্যিনাথের মা যা বলছে তাই? পূর্বজন্মে কেউ ছিল ছেলেটা?

সে চিন্তাটা মনে আনতে সাহস হয় না, তবুও আপনা থেকে মনে এসে যায়—সরিয়ে দেবার ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও—তবে কি এতকাল পরে তারকই এল আবার, মধ্যে আর একটা জীবন সেরে?...সে জন্মের কোন দুষ্কৃতির ফলেই নীচ কুলে জন্ম হয়েছে, কিন্তু আগের জন্মের সংস্কার ভুলতে পারে নি, অথবা সেই স্নেহের ঋণ, সেবার ঋণ শোধ করতে এসেছে?

কথাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে শিউরে ওঠেন, 'ষাট ষাট! এসব কি ভাবছে ফেলছি। ওর বাছা বেঁচে থাক, আমার ছেলে হয়ে আর কাজ নেই। ও আমার সইবে না সে বেশ জানি। অনেকবারই তো দেখলুম। দেখে নয় তো? ষাট ষাট! তারকের আর এসে কাজ নেই, সে তো থাকতে আসবে না, আবার ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে।...না, একা থাকাই ভাল। আর কারও টানে জড়াতে চাই না।'

দুর্বল শরীরে মনের চিন্তাটা অর্ধ স্ফুটোক্তি হয়ে বেরিয়ে আসে। বিড়বিড় করে বলা কথাগুলো। তর্কচূড়ামণির স্ত্রী সেই সময়টাতে দেখতে এসেছিলেন, তিনি ঈষৎ ঝুঁকে হেঁট হয়ে কথাগুলো শোনবার চেষ্টা করে বললেন, 'কী বলছেন? ও বদ্যিনাথ কাকে কি বলছেন?' তারপর বাইরে গিয়ে বদ্যিনাথের মাকে বলেন, 'অ বোকার মা (বৈদ্যনাথ তার মামাতো ভায়ের নাম), ইদিকে এসো না একবার। এ যে পাগল বিকার বলে মনে হচ্ছে, ভুল বকছে যে।'

'সে কি! জ্বর তো ছিল না, কৈ, বেশ তো সহজ মানুষ, এই তো আমি কথা বলে এলাম এক্ষুনি—'

বদ্যিনাথের মা ছুটে আসে।

হেমন্ত হেসে বলে, 'ও কিছু নয়। অ দিদি, এসো এসো। বসো। বুড়ো মানুষ তো আমরা, মনে মনে কিছু ভাবতে থাকলে তাই অনেক সময় আপনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তোমার শাশুড়িকে দ্যাখোনি, একা হলেই আপন মনে হাত-পা মুখ নেড়ে, যেন কার সঙ্গে কথা কইছে কি ঝগড়া করছে—? এসব বয়সের দোষ মা। এসো, এসো, বসো এখানে।'

তর্কচূড়ামণির স্ত্রী ঘরে ঢুকে বিছানার পাশে বসে বললেন, 'তাই বলুন, সর্বরক্ষে। আমি সত্যিই কিন্তু ভয় পেয়ে গিছলুম।'

'না মা, ভয় নেই। ভাল আছি আজ। নইলে ভোলাটা আমার বিছানার ধার ছেড়ে নড়েছে! ভাল আছি দেখেই না—'

কেমন একরকম গর্বমেশানো হাসি ফুটে ওঠে হেমন্তর দন্তহীন মুখে।

'তা ঠিক', ভদ্রমহিলাও সায় দেন, 'ও সত্যিই আর জন্মে আপনার কে ছিল মা। নইলে এ বয়সে এমন টান হয় না।'

আবারও সেই কথা। ষাট ষাট! বিশ্বনাথ ওকে রক্ষে করুন। মা সংকটী রক্ষা করুন।

ভোলার সম্বন্ধে বিশুর বিরূপতা ও বিদ্বেষ কিন্তু বেড়েই যায় ক্রমে ক্রমে। ছোট-বেলায় যেটা অত চিন্তার কারণ ছিল না, বড় হতে সেটাই উদ্বেগের ব্যাপার হয়ে ওঠে। কারণ এখন—অন্য ভাল দিকে না হোক—বুদ্ধি খুলেছে, সে বিরূপতা প্রকাশ করার বা আঘাত দেওয়ার সহস্র পথ খুঁজে বার করে নেয়ও। হেমন্তর সামনে অতটা নয়। সামনে নয় বলেই হেমন্ত শাসন করতে পারে না। কারণ সে জানে, বিশু এই সুযোগই খুঁজছে, বলবে—'আমার নামে তোমার কাছে এসে কুট-কুট করে লাগায়, কী রকম শয়তান এতেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে।' তবে চোখ এবং কান খোলা থাকায় হেমন্তর কিছুই বুঝতে বাকী থাকে না। সে চিন্তিত হয়ে ওঠে—অথচ উপায়ও কিছু খুঁজে পায় না।

বিদ্বেষের কারণ অনেক।

এখন যেটা প্রবল হয়ে উঠেছে সেটা হচ্ছে—বিশুর লেখাপড়া হয় না, ভোলার হয়। ভোলা যে প্রতিবারেই ফার্স্ট সেকেণ্ড হয় ক্লাশে—তেমন কিছু নয়, কিন্তু সব বিষয়েই মোটামুটি ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করে। বিশু ক্লাস ফাইভ থেকেই এটা ওটা নানা বিষয়ে ফেল করছে। 'পাস' যাকে বলে তা করে না, হেডমাস্টারমশাই প্রমোটেড বলে ক্লাশে তুলে দেন।

হেমন্ত বিশুকে বাড়িতে পড়াবার জন্য মাস্টার রেখেছিল। ভোলা নিজে নিজে এক পাশে বসে লেখাপড়া করত। বড়ই বিসদৃশ দেখায় বলে একদিন মাস্টার-মশাইকে বলল, 'ওকেও একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে দেবেন, যদি দরকার হয়। আমি বরং তার দরুণ পাঁচটা টাকা বেশী দোব।' আজকাল সব জিনিসেরই দাম চড়েছে, প্রাইভেট টিউটরও অল্প হয় না আর। আগে এখানে মাত্র চার-পাঁচ টাকাতে ভাল ভাল মাস্টাররা ওপরের ক্লাশের ছাত্রদের পড়াতেন। তর্কচূড়ামণির স্ত্রী বলেন, 'বাড়িতে গিয়ে পড়ে এলে এক টাকা, নয় তো বড়জোর দু-টাকা করে ছিল। তা এখন সব দিকেই আগুন লেগেছে, মাস্টারদের মাইনেও বাড়বে বৈকি। আর ওদেরও তো খেতে হবে, সত্যিই—চলে কিসে বলুন!'

হেমন্তও তা বোঝে, সেও অযথা কৃপণতা করে না। ডাক্তার উকীলের বেলা-তেও যেমন শিক্ষকদের বেলাতেও তেমনি—দু-চার টাকার জন্যে সস্তা খুঁজলে আখেরে ঠকতে হয়।

মাস্টার অবশ্য ভালই পেয়েছে, ঐ ইস্কুলেরই শিক্ষক, যত্ন করেই পড়ানোর চেষ্টা করেন। হেমন্তর সামনে বসে পড়াতে হয়—ফাঁকি দেবার সুবিধেও হয় না বিশেষ। কিন্তু তিনিও মানুষ, যে ছাত্রের মাথাতে কিছুই ঢোকে না, তার থেকে যার পেছনে অল্প পরিশ্রম করলেই ভাল ফল হয়—তার দিকেই আকৃষ্ট হবেন এ তো স্বাভাবিক। এটাও বিশুর অসহ্য লাগে। একদিন রাগ করে বইখাতা ফেলে উঠে এসে বলে, 'আমাদের আলাদা আলাদা পড়ার ব্যবস্থা করে দাও। ও একসঙ্গে বসলে পড়া হবে না।'

'কেন?' হেমন্ত প্রথমটা অত বুঝতে পারে না।

'মাস্টারটা শালা কিছু, ঐ ভোলাকে পড়ায়, আমার বেলায় একেবারে ফাঁকি দেয়, কিছু বোঝাতে চায় না। ঐ জন্যেই আমার রেজাল্ট ভাল হচ্ছে না।'

এবার হেমন্ত জ্বলে ওঠে।

'তোমার রেজাল্ট কেন ভাল হচ্ছে না তা আমি বেশ জানি, সেটা তোমার মাথার দোষ, বংশের ধারা। ...আর মাস্টার নয়—মাস্টারমশাই, পড়ায় নয়—পড়ান। ফের যদি কখনও ঐ রকম অসভ্যর মতো কথা শুনি জুতিয়ে খাল খেঁচে দোব। জানোয়ার কোথাকার! উনি কাকে কতটা পড়ান তা আমি জানি, পাশের ঘর থেকে সব কানে আসে লক্ষ্য করি। কাজেই সে কথা তোমার কাছ থেকে জানতে চাই না। তোমার পেছনে মাস্টার রাখাই আমার ভুল হয়েছে—আমড়া গাছে ল্যাংড়া ফলে না সে তো জানা কথাই।...কচুর বেটা ঘেঁচু—বড়জোর মান।...যা আমার সামনে থেকে! পড়াশুনোর নামে

সম্পর্ক নেই, মাস্টারমশাইয়ের নামে নালিশ করতে এসেছে! দূর হয়ে যা! আপদ বালাই কোথাকার!'

বিরোধ ও বিরূপতা চরমে পৌঁছল যখন ভোলা তৃতীয় হয়ে ক্লাশ এইট-এ উঠল এবং বিশু চারটে বিষয়ে ফেল করে সেই ক্লাশ এইট-এই রয়ে গেল। এবার আর কোন মতেই ক্লাশে তুলে দিতে পারলেন না হেডমাস্টারমশাই

প্রথমটা ভয়েই দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল বিশু। ঠাকুমা যতই ভালবাসুক, বাগলে সেসব কোন বিবেচনা থাকে না এটা এতদিনে ভাল রকমই বুঝেছে সে। হয়ত মার-ধোর দেবে। তার এক জ্যাঠতুতো ভাইকে নাকি বেশ বড় বয়েসেই ন্যাংটো করে চাবুক মেরেছিল, বাবার মুখেই শুনেছে। কি করবে কে জানে—কী তার অদৃষ্টে আছে! তাই বলির পাঁঠার মতোই বাড়ি ঢুকেছিল কাঁপতে কাঁপতে।

কিন্তু কে জানে কেন—হেমন্ত সামান্য একটু ধিক্কার দেওয়া ছাড়া এমন কোন বকাবকি কি চেঁচামেচি করল না—মারধোর তো নয়ই। আসলে তার মনটা অন্য এক আনন্দে ভরপুর ছিল। ভোলা সম্বন্ধে তার হিসেবে ভুল হয়নি। ভোলা তার মান রেখেছে। তাই বিশুর কথা ভাসাভাসা ছাড়া ভাবতেই পারে নি, এ ক্ষতি মনে লাগে নি।

সেবার সেই অসুখের পর থেকে হেমন্ত ভোলাকে একটু দূরে দূরেই রাখার চেষ্টা করে। কেন—সেটা মুনিয়া বা ভোলা কেউই বুঝতে পারে না, ভাবে কোথাও কোন অপরাধ ঘটল কিনা। কেমন একটা ভয়ই ঢুকে গেছে হেমন্তর, অকল্যাণের ভয়, কেবলই মনে হয় জীবনের এই শেষ পাওনা, এই ভালবাসা বোধ হয় তার অদৃষ্টে সইবে না। বেশী আপন হলেই ভগবান কেড়ে নেবেন। কিন্তু বাইরে যত দূরে ঠেলতে গেছে ততই বেশী করে মনের কাছে এসে পড়েছে ছেলেটা, হেমন্তর মন আরও যেন আঁকড়ে ধরেছে ওকে, সর্বদা একটা চোখ ও একটা কান ওর দিকেই অতন্দ্র থাকে। একটা সম্ভ্রমের ভাব তো আছেই—হেমন্ত দূরে রাখতে চেষ্টা করে দেখে একটা ভয়ও—তৎসত্ত্বেও ভোলা তাকে ভালবাসে এটা ছাপা থাকে না। ভারী ভদ্র মিষ্ট স্বভাবের ছেলে হয়ে উঠেছে, তেমনি বিনত, নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সদাসচেতন, চাল বিগড়োতে দেয় না। সেই জন্যেই—ভোলা যে বিশুকে হারিয়ে টেক্কা দিয়ে ওপরে উঠে গেছে—এতে একটা অনাবিল অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করছে সে। বিশু ফেল করাতে তার যতটা দুঃখ বা ক্ষোভ হওয়া উচিত—তার কিছুই হয়নি বলতে গেলে।

মুশকিল হল এই—বিশুর এই সূক্ষ্ম অনন্তত্ত্ব বোঝার কথা নয়—বুঝলও না। এমন কিছু মহাপ্রলয় ঘটল না দেখে তার সাহস বেড়ে গেল। সেদিন আর কিছু বলল না, পরের দিন মুখ গোঁজ করে গিয়ে বলল, 'ও ইস্কুলে আমি আর পড়ব না, আমাকে অন্য ইস্কুলে ভর্তি করে দাও।'

বিগত দিনের অননুভূতপূর্ব (এবং বিস্ময়করও) নিজের মনোভাব দেখে আনন্দের সঙ্গেই একটা প্রবল বিস্ময় বোধ করছে সে। মাধুর্যে অবগাহনের আনন্দ-স্মৃতির রেশ তখনও বুঝি একটু ছিল। সেটা একটা কুশ্রী রূঢ় আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে উঠল মন ও কণ্ঠ—দুই-ই।

'কেন?'

'আমি ফেল করে ঐ ক্লাশে থেকে যাব—আর ঐ ভোলাটা টেক্কা মারবে—সে আমি সহ্য করব না। এক ইস্কুলে এক ক্লাশে পড়তে পারব না ওর সঙ্গে।' বেশ একটু যেন মেজাজের সঙ্গেই বলল। যেন ওটা এদেরই ষড়যন্ত্র—এই ফেল করাটা। আর সহ্য হয় না হেমন্তর। এই মধুর প্রভাত, মধুরতর আনন্দানুভূতি নষ্ট করে দেওয়ার জন্যেই উষ্মা দেখা দিয়েছিল মনে—কোথায় এখন স্নান সেরে সংকটমোচনে পুজো দিতে যাবে ভাবছিল—তার ওপর এই অসহনীয় ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতায় যেন মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। টেনে একটা চড় কষিয়ে দিল বিশুর গালে। এর জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না, বিশেষ এখনও পর্যন্ত যে এই পরিমাণ শক্তি আছে বুড়ির হাতে—সে হিসেবটাও ধরা ছিল না। সে ধপ্ করে বসে পড়ল। হয়ত পাঁচ আঙুলের ছাপই পড়ে থাকবে গালে। অন্তত শব্দটা বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছল, সেই শব্দ শুনেই ওদিক থেকে বদিনাথের মা ও ছাদ থেকে মুনিয়া ছুটে এল।

'হারামজাদা, শুয়োরকা বাচ্চা! তুমি আমার কাছে এসেছ মামদোবাজি করতে! আমাকে চেনোনি এখনও। আবদার! ফেল করে মাথা কিনেছ কিনা—তাই যা হুকুম করবে তাই শুনতে হবে আমাদের। ইস্কুল বদলাব কিরে হারামজাদা—ঐ ক্লাশে ঐখানেই পড়তে হবে—যদি আমার এখানে থাকতে হয়। তাতে হয়েছে কি, ফের যদি ফেল করো ঐ ভোলাকে দিয়ে কান ধরিয়ে উঠ-বোস করাব তবে ছাড়ব।... না হয়, সিধে রাস্তা পড়ে আছে, সটান বেরিয়ে চলে যাও—কোথায় কোন বাবা, কটা বাপ আছে তাদের কাছে।...তোর বাবাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি—তা তুই তো ছেলেমানুষ! বাঁদরামির জায়গা পাওনি, ফেল করে কালামুখ নিয়ে বাড়ি এইছিস, আবার আবদার অন্য ইস্কুলে ভর্তি করে দাও। কেন, তার আগে মণিকর্ণিকায় গিয়ে শুয়ে ভর্তি হতে পারো নি! লাথখোর বেশরম কাঁহিকা।'

আজকাল বয়েস হয়ে— এ ধরনের প্রচণ্ড রাগ সহ্য করতে পারে না, দুই চোখ জবাফুলের মতো লাল হয়ে ওঠে, হাত-পা থরথর করে কাঁপতে থাকে। বদিনাথের মা ভয় পেয়ে জোর করে বসিয়ে মাথায় মুখে জল থাবড়ে দেয়—মুনিয়া বাতাস করে।

খানিকটা পরে একটু শান্ত হয়ে বদিনাথের মাকে বলে, 'ও যেখানে খুশি যেতে পারে মেয়ে, ওকে বলে দাও। তবে আমার কাছে থাকতে গেলে ওসব আবদার চলবে না, ঐ ইস্কুলে ঐ ক্লাশেই পড়তে হবে নইলে বাপের কাছে চলে যাক—মাস্টারমশাইকে বলে দোব, কলকাতার টিকিট কিনে গাড়িতে চাপিয়ে দিয়ে আসবে।'

এইটেই সম্ভব নয়—বিশু তা জানে। এই জোরটা তার একেবারেই নেই।

প্রতিমাসেই কাঁদুনিভরা চিঠি আসে ঠাকুমার কাছে। কোন মতেই সংসার চালাতে পারছে না তারা। গোপালকে ইস্কুল ছাড়িয়ে একটা কারখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছে তার বাবা, সেই খবর পেয়ে ঠাকুমা এখান থেকে যে টাকাটা পাঠাত সেটা বন্ধ করেছে কাঁদুনিটা বোধ হয় সেই জন্যেই।

তবে যেসব ফিরিস্তি দেয় ... গুলোও অবিশ্বাস্য নয়। না খেয়ে ... নিমাইয়ের শরীর ভেঙে পড়েছে, ... বলেছে টনিক খেতে দুধ ... কি ছেলেমেয়েদেরই দুধ দিতে পারে ... বেলা ভাত যোগানোই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে জলখাবারের পাট তো ঘুচেই গেছে। নিমা টনিক দুধ খায় কোথা থেকে! ইস্কুল ফ্রী পড়ে ছেলেমেয়েরা, তাও বইয়ের অভাবে পড়া বন্ধ হয়ে আছে একরকম। ... নতুন মার শরীর কঙ্কালসার হয়ে ... খেটে-খেটে আর ভুগে ভুগে—নিমাইয়ের এমন সাধ্য নেই যে একটা বাসনমাজা লোক রাখে। যেদিন শয্যাগত হয়ে পড়ে সেদিন কমলা রান্না করে—নিমাই ... বাসন মাজে, ইত্যাদি—

শেষ চিঠিতে বিস্তৃত একটা হিসেব পাঠিয়েছিল আয়-ব্যয়ের। সেই চিঠি পেয়ে ঠাকুমা একশোটা টাকা পাঠিয়েছে ... লিখেছে আশাকে কী ওষুধ খেতে বলে ডাক্তার জানালে সে টাকা নয়—এখান থেকে ওষুধই পাঠানোর ব্যবস্থা করবে, ছেলেমেয়েদের বইখাতাও।

এরপর আর সেখানে গিয়ে সেই অভুক্ত অনাহারক্লিষ্টদের দলে নাম লেখাবার সাহস হয় না, তাই চড় ও অপমান দুই হজম করে নীরবে সামনে থেকে সরে যেতে হয় শেষ পর্যন্ত। এবং পরের দিন পরে বইখাতা গুছিয়ে নিয়ে সেই পুরনো ক্লাশে গিয়ে ঢুকতে হয়।

ক্রমশ

দুটি কবিতা

নাবিক ।।

পবিত্র সরকার

কিনে রাখে চৌকশ নাবিক
বন্দরে বন্দরে প্রিয়তমা;
প্রদক্ষিণ করে সর্বদিক।

শেষে চায় ঈশ্বরের ক্ষমা।

নাস্তিক ।।

হতে সে-মাতাল, ভ্রষ্ট, আত্মঘাতবিলাসী নাস্তিক—
সকালে শিশুর হাত ধরে
পার্কে সে বেড়াতে যায়। নিজে পায় উল্লাস অধিক
শিশুর উজ্জ্বল কণ্ঠস্বরে।
পথে সে সতর্ক খুব, গাড়িঘোড়া লক্ষ্য করে ঠিক
শিশুকে ফিরিয়ে আনে ঘরে।

আন্তরিকতার নামে ।।

করুণা

সব ভুলে যাবে যদি ভাসাও জোয়ারে,
শিকড়ে যে-আত্মরথী অবশ সন্ধ্যায়
তারও সারাৎসার তুলে দেবো প্রাণ-মন।

তুমি করো সেই খেলা রচিত আঁধারে,
উভয়ের যোগাযোগ স্বার্থের ধান্দায়—
নিবিড় হৃদয়ে মেশে অনন্ত ক্রন্দন।

সুতরাং ভালো ভালো শিল্প-গাঁথা আর
অমৃত প্রেমের যেন মেঘদূত, পাখি,
অঙ্গনে প্রাঙ্গনে মুগ্ধ কৃতার্থ চারণ।

আন্তরিকতার নামে কেতন ওড়ানো,
কে করে সন্দেহ? খুঁজে মনোময় আঁখি।
হাড়-মাংসে ফোটে ফুল অপূর্ব রঙ্গন।

রাখী পূর্ণিমার চাঁদ ।।

হাসনে আরা

আমার পুরনো জীবন কাহিনীতে
তুমি স্মৃতি থেকে গিয়েছিলে,
আমার মনের খোলা জানলাটার
পর্দা সরিয়ে দেখতাম
রাখী পূর্ণিমার চাঁদটাও কেন বিষাদ।

সব স্মৃতি বিস্মৃতির অন্ধকারে
হারিয়ে গেল একে একে,
সহস্র বছরের কবরের মত ধূসর
স্মৃতির মিথ্যে বিলাস
সব—সব—স্মৃতিই
কেবল থেকে গেল একটা নাম
তুমি
ওই রাখী পূর্ণিমার চাঁদটার মত এক বিষাদ।

(আট)

অতসী নিজেও অবাক হয়ে গেছে অতখানি পথ সে হেঁটে গেল কি করে! অথচ তখন কোনরকম অসুবিধে বোধ করে নি। বাড়ি ফিরে বুঝতে পারল গা হাত পা তার ব্যথা করছে, হিম খেয়ে ঠাণ্ডাও লেগে গেছে। মাথায় ঘোমটার মতন করে শালটা জড়িয়ে নিয়েছিল, তবু কোন ফাঁকে যে ঠাণ্ডাটা ভেতরে ঢুকে গেল! গলাটা এখন কেমন ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করছে, সামান্য ব্যথাও আছে! কপালটা টিপ টিপ করছে! বার বার নাক মুখ কচলাচ্ছে সে। ভেতরে একটা সুড়সুড়ি ভাব। নিশ্বাসও গরম। কাঁচা সর্দি লাগলে যেমনটি হয়। বাড়ি এসে ঈষদুষ্ণ জলে সামান্য লিস্টারিন মিশিয়ে ভাল করে গার্গল করল। মার কাছাকাছি বেশি যাচ্ছে না অতসী। আবার বকবক শুরু করবে। অতসী কি একটা কাজে রান্নাঘরে এসেছিল।

চারু ওর মুখের দিকে চেয়ে কেমন একটু অবাক হলো, বলল, "এদিকে আয় তো, চোখ দুটো অমন ছল ছল করছে কেন?"

অতসী যেন ধরা পড়ে গেছে, কিছু না বলে এগিয়ে এলো।

চারু ওর গায়ে হাত দিয়ে উদ্বেগ বোধ করল, বলল, "যা ভেবেছিলাম তাই, গা তো বেশ গরম, জ্বরটর আসবে নাকি!"

সুরেশবাবু ওঘরে যাচ্ছিলেন, কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

চারু সামান্য উদ্বিগ্ন গলায় বলল, "দেখ তো বড়দা, আবার জ্বরটর এলো কিনা। আমার আর ভাল লাগে না কিছু!"

সুরেশবাবু অতসীর কপালে হাত রেখে একটু পরে বললেন, "গাটা তো গরমই লাগছে।"

"লাগবে না, অতটা পথ হাঁটা কি মুখের কথা! সখের বাগিহারী!"

অতসী কিছুই আজ গায়ে মাখছে না। তার মার এরকমের কথাবার্তা আগেও অনেক শুনেছে সে। এই অস্থিরতাটা মার স্বভাব। অতসী মুখ টিপে হাসছে, বলল, "আজ আর ভাতটাত খাব না আমি।"

সুরেশবাবু চারুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "এখন আর এসব বলে কি হবে।" তারপর অতসীর মুখের ওপর চোখ দুটো স্থির করতে করতে সস্নেহ গলায় বললেন, "ও সেরে যাবে, ভয় নেই।"

"নিজের শরীর বুঝে চলবে তো, ঘটে যদি এক ফোঁটা বুদ্ধি থাকে!"

"হাঁটাহাঁটি তো ভালই। তবে আজকেরটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।" সুরেশবাবু হাসলেন সামান্য।

"তুমি আর তাল দিও না তো বড়দা।" চারু চুপ করে গেল। মনে মনে মেয়ের ওপর একটু ক্ষুব্ধ হয়েছে। সাবধান থাকলে তো কোন ক্ষতি নেই! তাছাড়া শরীরটা তো এখনো পুরোপুরি সারে নি। এরই মধ্যে এত অবহেলা কেন! মাথায় মাঝে মাঝে কি যে দুর্বুদ্ধি চাপে! এতটা না হাঁটলে কি আনন্দ হতো না? একটু পরে মুখ তুলে আস্তে আস্তে ফের বলল, "● কি কম ভুগিয়েছে আমায়!"

সুরেশবাবু কিছু বললেন না, মৃদু হেসে চলে গেলেন।

অতসী হাসছিল।

চারু মেয়ের দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম গাম্ভীর্য নিয়ে বলল, "আবার হাসি দেখ না!"

অতসী হাসতে হাসতে বলল, "অত বকবে না তো!"

"না, বকবে না! আমাকে না জ্বালালে কি আর ভাল লাগে!"

অতসী কিছু না বলে হাসতে হাসতেই হঠাৎ মাকে জড়িয়ে ধরেছে, পরে আবদারের গলায় বলল, "তুমি না ভীষণ ভীষণ ভাল মা।"

"হয়েছে! এবার ছাড় আমাকে; অনেক কাজ আছে।" চারুও মেয়ের দিকে চেয়ে হেসে ফেলেছে।

অতসী আস্তে আস্তে বলল, "তোমাকে ছাড়া আর কাকে জ্বালাবো বল।"

চারু এবার জোরে জোরে হেসে উঠল, বলল, "কথার ঢঙ দেখ না আবার!"

অতসী কিছু না বলে বড় ঘরে চলে এলো। কপালের দু'পাশের শিরা দুটো খুব দ্রুত লাফাচ্ছে। তবু মনের মধ্যে কি যেন একটা তখন থেকে সমানে গুনগুন করে চলেছে। সব কিছুই যেন ভুলিয়ে দিতে চাইছে। আয়নায় নিজেকে একবার দেখল। চিরুনি দিয়ে চুলগুলো ঠিক ঠাক করে নিতে নিতে নিজের মনেই হাসল। ঠোঁট এবং গালের খানিকটা জায়গায় হাত বুলিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। এখনও যেন কিসের এক তাপ রয়েছে সারা মুখটাতেই। লজ্জা এবং সুখের এক মেলামেশা যেন। হঠাৎ মনে হলো অনীশদা যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মুখে সিগারেট, চোরা চোখে তাকে দেখছে আর হাসছে। অতসীও মুখ টিপে টিপে হাসল, চোখের মনোরম এক ভঙ্গি করে মনে মনে যেন বলল ঃ তুমি না ভীষণ অসভ্য অনীশদা, ভীষণ। কেউ যদি দেখতো তখন। গালটা আমার এখনও জ্বালা করছে। আর একটু হলেই ঠোঁটটা কেটে যেত।

খিল খিল করে হেসে ফেলল অতসী। হাসির শব্দে খেয়াল হলো তার; কী এক ঘোর ও অন্যমনস্কতা পেয়ে বসেছে তাকে। বুকের ভেতরে আজ নতুন এক রোমাঞ্চ, অভিজ্ঞতা।

অতসী নিজেও অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রথমটায়। সে একটু গম্ভীর হয়ে সরে গিয়েছে, পরে আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। নতুবা ধরা পড়ে যেত। মানু এমন-ভাবে তাকিয়েছিল ওর মুখের দিকে যে বেশিক্ষণ অতসী তাকিয়ে থাকতে পারে নি।

অতসী এবার লেপটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল। মাথার যন্ত্রণাটা যেন এখন আরো বাড়ছে। নাকের মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তার। মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছিল। গার্গল করার পর জ্বালা জ্বালা ভাবটা কমেছে কিছুটা। কিন্তু শরীরের এই অস্তিত্বও আজ বারবার চাপা পড়ে যাচ্ছে। মনের চারপাশে সেই গুঞ্জন। মার কথাটা মনে করে হাসল অতসী। হাঁটতে তার কষ্ট হয় নি মোটেই। মাকে কি করে সে বলে, যে এরচেয়েও বেশি সে হাঁটতে পারে। পাশাপাশি হেঁটে যাওয়ার মধ্যে যে এত

সুখ, আনন্দ এই অভিজ্ঞতার কথাটা যাকে বলা যাবে না। এতে কোন কষ্টই হয় নি তার। বরং উল্টোটা হয়েছে। কারণে অকারণে হেসে উঠছে। আজ বেশ হাসিখুশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল ওকে। মনের ওপরে এতদিন ভারী এক আবরণ ছিল যেন। সেই ভারী বস্তুটা ঠেলে সরিয়ে সে কখনো তার বাইরে আসতে পারে নি। আজ যেন সেই আচ্ছাদনটাই সরে গেছে। আবার ঝলমলে আলোয় ছড়িয়ে পড়েছে। সেই আলোয় চপল হরিণীর মতন যেন কেবলই ছুটছে সে। অনীশদা যেন ওর জীবনকে আজ নতুন করে সাজিয়ে দেবে বলেই অতসীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অতসীর সাধ্য নেই তাকে ফিরিয়ে দেয়, আর ইচ্ছেও নেই।

পরমুহূর্তেই আবার মনে হয়েছে, তার ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপরই কি সব কিছু নির্ভর করে! ভাগ্য বলেও একটা জিনিস আছে সংসারে। মানা না মানাতে কিছু আসে যায় না। প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে মনে নিজেকে শোনাবার মতন করে অতসী বলল : মাঝে মাঝে মন যে বিদ্রোহ না করতে চেয়েছে এমন নয়, চেয়েছে; কিন্তু পারি নি, সেই ক্ষমতাও কখন যেন হারিয়ে ফেলেছি। বোধহয় আমাদের সবারই এক অবস্থা। আমি তো শুধু ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি, আমার চারপাশে একটা গন্ডীরেখা টেনে দিয়েছে, এর বাইরে আমি যেতে পারবো না। ভেবেছি, ছেলেবেলায় ওই সময়টুকু পেরোলেই আমার আর কোন বাঁধন থাকবে না। কিন্তু বড় হওয়ার পরও দেখলাম, আমার নিজের বলতে কিছু নেই, অন্যরা যা বলবে আমাকে শুধু তাই শুনে যেতে হবে। এমন কি আমার মার অধিকারও সেখানে কেমন সঙ্কুচিত। মাঝে মাঝে বেশ মজা লাগত, দেখতাম, আমার মাও আমাকে পাঁচজনের সামনে আদর করতে, ভালবাসতে ভুলে গিয়েছে। রাতে নিরিবিলি পেয়ে আমাকে কত কি বোঝাত। আমি কি বুঝতাম জানি না। তবে সব কিছুর ওপরেই আমার

বারণটা বদলে গিয়েছিল। আমি বুঝেছিলাম, বেশি কিছু চাইবার অধিকার আমার নেই। এক নিষ্ঠুর কঠিন অভিজ্ঞতাই আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়েছে।

মনে মনে এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতে অতসী আবেগ বোধ করল। ম্লানভাবে হাসল সামান্য, একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। চোখের সামনে এই মুহূর্তে কেন যেন একটা ছবি ভেসে উঠছে বারবার।

রুমি জয়ন্তীকে পড়াতেন একজন। অতনুবাবু। মাঝে দু'একবার সে নিজেও তাঁর কাছে বুঝতে গেছে। অতনুবাবু খুব আগ্রহ নিয়ে তাকে বুঝিয়েছেন, কোন কিছু আটকালে সঙ্কোচ না রেখে তাঁর কাছে চলে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু তার এই ব্যাপারটা বাড়ির লোকে ভালভাবে নেয় নি। জয়ন্তীও অসন্তুষ্ট। মাঝে মাঝে অতনুবাবুর সামনাসামনি পড়ে গেছে অতসী। অতনুবাবু হেসে ওর দিকে চেয়ে বলেছেন, "কই, তুমি তো আর এলে না!"

অতসী সাহস করে কিছুই বলতে পারে নি। কেমন এক ভয় যেন চোখেমুখে ফুটে উঠত, বুঝতে পারত সে আড়াল থেকে সবাই তাকে দেখছে। আবার নতুন অশান্তি! কিছু না বলেই সে সরে এসেছে। শুধু উঠতে নামতে সিঁড়ির মুখে কখনো সখনো অতনুবাবুর সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়েছে। অতনুবাবু তার দিকে প্রসন্ন চোখে চেয়ে হেসেছেন। ওঁর এই সহৃদয় স্বভাব অতসীকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু কাছে যাওয়ার সাহস ছিল না। অতসী বুঝতে পারত তাকে দেখলে অতনুবাবু খুশি হন। এটাই সকলের কাছে এক সময় মুখরোচক আলোচনার বিষয় হয়েছিল। জয়ন্তী একে ক্ষমা করত না। মাও তাকে এ নিয়ে তিরস্কার করেছে। অথচ এতে তার কিছুই করণীয় ছিল না। এক একবার মনে হতো তার অতনুবাবুর সামনে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সব কথা বলে দেয়, এদের ভদ্রতার মুখোশটা খুলে দিয়ে বলে, শুধু কেন আপনি আমার সঙ্গে কথা বলেন, আপনি কি জানেন, এরা এ নিয়ে কতটা নীচে নামতে পারে! কিরকম নোংরা! আমার জন্য কাউকেই ভাবতে হবে না। আপনার সাথে ওদেরই দাবী বেশি, আমার কিছুই নেই!"

অতসীর বুক ফুলে ফুলে উঠছে, চোখ ঝাপসা হয়ে উঠছে। কাউকেই আর কিছু বলা হলো না তার। আড়ালে চোখের জল মুছেছে।

কিছুদিন পর অতনুবাবু এখানে আসা বন্ধ করে দিলেন। খবর পাঠিয়েছেন, তিনি আর পড়াবেন না। ফল হয়েছে এই, বাড়িশুদ্ধ লোকের ধারণা, এর পেছনেও অতসীর কোন হাত আছে, হয়তো ওর কাছে এদের সম্বন্ধে কিছু বলাবলি হয়েছে। জয়ন্তীর রাগটাই বেশি। অতসী কেন এত কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। অথচ জয়ন্তীর বাড়াবাড়িটা কারো চোখে পড়ে না! আশ্চর্য, রুমি একদিন মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করেছিল তাকে, "কি গো অতসীদি, কি ব্যাপার, অতনুদা খালি তোমার কথা অত জিজ্ঞেস করে কেন?"

অতসী কোন জবাব দিতে পারে নি। তার সম্পর্কে কেউ যদি কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করে থাকে, এজন্যে সে কি করতে পারে! তবু রুমিটার মধ্যে কোন ঘোরপ্যাঁচ একটা নেই।

মাঝে কলেজ থেকে ফেরার সময় একদিন বাস স্টপে তার দেখা হয়ে গেল অতনুবাবুর সঙ্গে। তিনি তার কাছে এসে বলেছিলেন "আমার ছাত্রীরা ভাল আছে তো?"

অতসী কোনরকমে ঘাড় হেলিয়ে একটা জবাব দিল। সে যেন হঠাৎ কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। কেউ যদি দেখে ফেলে একটু ভয় ভয়ও করছিল তার। বাস বা ট্রাম কোনটারই পাত্তা নেই এখন। অথচ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে মনের অস্থিরতা হয়তো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কিছু একটা কথা বলা দরকার। কি ভেবে জিজ্ঞেস করল, "আপনি ওদের পড়ানো ছেড়ে দিলেন হঠাৎ?"

"আমার ভাল লাগছিল না।"

আবার কথা ফুরিয়ে গিয়েছিল অতসীর। অতনুবাবু একটুক্ষণ নীরব থেকে সহানুভূতির গলায় বলেছিলেন, "তোমার কথাও আমি কিছু কিছু শুনেছি।"

অতসীর বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠেছিল। এমন মমতা নিয়ে আগে কখনো কেউ তার সঙ্গে কথা বলে নি। স্নেহের সামান্য স্পর্শ পেয়েছে কি, আবেগে বুক ভরে উঠে, গলা ধরে আসে। আর একটু হলেই চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসত। এমন সময় একটা ট্রাম এলো। অতসী কোন রকমে 'যাচ্ছি' শব্দটা বলেই মাথা নীচু করে ট্রামে উঠে পড়েছে। অতনুবাবুর দিকে তাকাতেও তার সঙ্কোচ হচ্ছিল।

এর পর অতনুবাবুর সঙ্গে আর কখনো দেখা হয়নি অতসীর। মাঝে মাঝে এটা মনে হলে মন খারাপ হয়ে যেত।

অতসী ম্লানভাবে হাসতে গিয়েও টের পেল, তার বুকটা কখন ভারী হয়ে উঠেছে। ভয়টাকে এত দিনে সে অনেকখানি জয় করেছে। তবু আজকের এই সুখের মুহূর্তেও তার চোখ দুটো বার বার কেন যেন ছল ছল করে উঠছে। ঠেলে ঠেলে এতদিনকার এক কান্না, না কওয়া যন্ত্রণা সবটাই উঠে আসতে চাইছে। মাঝে মাঝে এমন এক একটা মুহূর্ত আসে মানুষের

জীবনে শত সুখের মধ্যেও মন অকারণ এক বিষণ্ণতায় ভরে যায়, লুকিয়ে লুকিয়ে শুধু কাঁদতে ইচ্ছে করে। অতসীরও আজ সেই অবস্থা। এত সুখ কি সে সইতে পারবে! এতটা পাওয়ার অধিকারও কি তার আছে! বুকের ভেতরটা টন টন করতে থাকে। কি এক ভাবনা যেন তাকে বার বার অন্যমনস্ক করছে। মনে মনে অনীশকে উদ্দেশ্য করে বলল: তুমি তো আমার অনেক কিছুই শুনেছো অনীশদা, মুখ ফুটে কারো কাছে কখনো কিছু চাইতে পারি নি আমি, আমার নিজের মধ্যেই শুধু হারিয়ে যাচ্ছিলাম! ঠিক সেই সময়েই তুমি এসে আমার সাহস বাড়িয়ে দিলে। তোমার কাছে যে আমার এই ঋণ রয়ে গেল চিরদিনের জন্যে। আমার কেন যেন খালি মনে হয় অনীশদা। আমি জানি কোন দামেই শোধ হবে না এর।

অতসী মনে মনে কথাগুলো বলে নিজেই লজ্জা বোধ করছিল। 'আপনি'-র জায়গায় কখন 'তুমি' হয়ে গেছে। এখন তাকে আপনিটা বাদ দিতে হবে। শব্দটা কেমন আলগা আলগা লাগে, দূরত্ব থেকেই যায়। দু একবার চেষ্টাও করেছে বলতে পারে নি, একরাশ লজ্জা এসে মুখের কথা কেড়ে নিয়ে চলে গেছে। এখন পর্যন্ত বলা হলো না আর। এবার এক-দিন বলে ফেলবে। ভাবতে ভাবতে আবেগ ও রোমাঞ্চ বোধ করছিল অতসী। খালি ভয় হয় তার এই সুখটুকুও কি বিধাতা কোন এক সময়ে কেড়ে নেবেন? জীবনে সে অনেক দুঃখই সে সয়েছে, আরও কত সইবে। একটুও কি সুখের মুখ সে দেখতে পাবে না? এ চাওয়াটা কি খুবই বেশি? তার ভাগ্যদেবতা কি এতই অকরুণ? ভগবান তো মুখ ফিরিয়েই ছিল। সে চোখে জল এসে গেল তার। নিজেকে যতই সামলাতে চাইছে, আরো যেন তা বেড়ে গেল। পারছে না সামলাতে। 'কাঁদালে তুমি মোরে ভালবাসারই ঘায়ে', অনীশদা কি তার মনের কথাটা পড়তে পেরেছিল? অতসী বালিশে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। বালিশ ভিজে গেছে। ভালবাসায় যে এত বেদনা, ব্যথা আগে কখনো তা অনুভব করে নি অতসী। আজ করল। অনীশদা যেন জাদু জানে। তার জীবনে আলো এনে দিয়েছে। শান্ত হলে চোখের জল মুছল। অনীশকে তারিফ করে মনে মনে আবার বলল: তুমি কোন দেশের জাদুকর গো অনীশদা! তুমি মানুষকে হাসাতে পার, কাঁদাতে পার, তোমার অনেক গুণ। আমিও সেটা জেনে ফেলেছি।

অতসীর গাঢ় চোখ দুটোতে হাসি ফুটল আবার।

জানলার ফাঁক দিয়ে বাগান থেকে ফুলের গন্ধ আসছে ঘরে। অতসী যেন আজ এতদিন পরে বেঁচে থাকার আর একটা অর্থ ধরতে পেরেছে। সব কিছুই আবার সুন্দর ও মধুর হয়ে উঠেছে। এ চোখ দুটোই যেন এতকাল তার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বাইরে কোথায় যেন একটা পাখি ডেকে উঠল।

অতসী আজ অনীশকে নতুন করে চিনেছে। মানুষের মুখেই শুনেছিল তার দাদা গান জানে। এখন আর গায়টায় না, ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ যখন ওর গান শুনল, অতসী মুগ্ধ ও অবাক হয়েছিল। সে কিছুতেই ভাবতে পারছিল না, এমন যার কণ্ঠ, সে শিখতে শিখতেও কেন ছেড়ে দিল? শুধু সে-ই নয়, আরো অনেকেই তার মতন অভিভূত হয়েছিল। সবাই কেমন চুপ করে গিয়েছিল। ফেরার সময় অনেকেই ওদের দেখছিল। আঙুল দিয়ে কেউ কেউ আবার অনীশকে চিনিয়ে দিচ্ছিল। অতসী মনে মনে এজন্যে কেমন গর্ববোধ করেছে। বুকটা আবেগে ভরে উঠেছে। 'তোমরা অমন করে যাকে দেখাচ্ছো, সে যে আমারই কাছে ধরা দিল!' কেমন এক গর্বিনী ভঙ্গিমা যেন।

অতসীর গা থেকে লেপটা সরে গিয়েছে, টেনে নিতে নিতে অনীশকে যেন বলল: তুমি কি গো অনীশদা, এমন গলা নিয়েও কিছু করতে পারলে না! আজ আমি নিজের চোখেই তো দেখলাম, এজন্যে এখনও তোমার ভেতরে একটা কষ্ট আছে। আর কি নতুন করে শুরু করা যায় না? এ দুঃখ কি তুমি জীবন ভোরই পুষবে? আমারও যে ভাবতে খারাপ লাগছে।

অতসীর চোখ বুজে এসেছে গভীর আবেগে। নিবিড় অন্তরঙ্গ এক উষ্ণতায় ভরা যেন এই মুহূর্তটি।

অতসীর কোনদিকে খেয়াল নেই। নিজের মধ্যেই ডুবে রয়েছে। চোখে মুখে আগুনের তাপ। শরীরও যেন পুড়ে যাচ্ছে। ভাল করে তাকাতে পারছে না। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। ঘরের বাতি নেবানো ছিল।

সুইচ টেপার শব্দ হলো। অতসীকে এভাবে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখে সুরেশবাবু এগিয়ে এলেন, "কি রে, এমন করে শুয়ে আছিস যে!"

অতসী মাথা বের করল, আলোর দিকে তাকাতে পারল না কিছুক্ষণ। কিছু না বলে খানিক পরে সুরেশবাবুর দিকে তাকিয়ে সে হাসল।

সুরেশবাবু ওর কপালে হাত রেখে বললেন, "ভালই জ্বর এলো দেখছি!" একটু নীরব থেকে কি ভাবলেন যেন, বললেন, "ট্যাবলেট খেয়ে নে একটা।" সুরেশবাবু আলো নিবিয়ে অন্য ঘরে চলে গেলেন।

অতসীর উঠতে ইচ্ছে হলো না। অন্ধকারের মধ্যে কিছু সময় সে উদাসভাবে চেয়ে থাকল। একটু একটু জলতেষ্টা পাচ্ছে। তবু শুয়ে রইল। মাথাটা কেমন ভারী ভারী ঠেকছে। মনে হলো, শরীর কাঁপিয়ে ভীষণভাবে জ্বর আসছে তার। ভেতর থেকে একটা কাঁপুনি উঠে আসছে। লেপটা আবার মাথা পর্যন্ত টেনে নিল। এর মধ্যেও ভাবতে ভাল লাগছে, তার ভীষণ জ্বর এসেছে, অনীশদা যেন শিয়রে এসে বসেছে, মানুষরাও তাকে দেখতে এসেছে। তাকে ঘিরে সবাই যেন কেমন ব্যস্ত। চোখে মুখে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছে। একটু নিরিবিলি পেয়ে অতসী অনীশকে মিনতি করে বলছে, 'এই যে জাদুকর মশাই, তোমার ঝুলি থেকে কিছু বের কর এবার, আমাকে ছু'মন্তর দিয়ে সারিয়ে তোল, আমি যে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি!'

ভাবতে ভাবতে অতসী যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। তার চোখে যেন ঘোর নেমে এসেছে। আস্তে আস্তে নিঃশব্দে কখন ঘুম এলো।

অতসী একটা স্বপ্ন দেখল। বিয়েবাড়ি, অথচ বেশি হৈচৈ নেই। তাকে সাজানো হয়েছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে যেন চিনতে পারল না অতসী। কেমন যেন অবাক হয়ে গেছে। বেনারসী পরেছে সে, গায়ে গয়না, কপালে চন্দন, ফুলের মালা আর একটু পরেই লগ্ন। কিন্তু সেই মানুষটির তো এখনো দেখা নেই! চাপা অস্বস্তি, অস্থিরতা। বুকটা এমন করে কাঁপে কেন?

এমন সময় কিসের শব্দ হলো। অতসীর চোখের ওপর থেকে ধীরে ধীরে আবরণ সরে যায়। দেখল, তার মা ওকে ডাকছে, হাতে জলের গ্লাস, ওষুধ। স্বপ্নটা ভেঙে যাওয়ার জন্যে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল এখন। বুকের মধ্যে দুরু দুরু কাঁপুনিটা যেন এখনও কমে নি। ওষুধ খেয়ে আবার অন্যমনস্ক হলো। আবার কাঁদতে ইচ্ছে করছে তার।

(ক্রমশ)

সম্প্রতি বিড়লা অ্যাকাডেমীতে শ্রী এস কে রাজাভেলুর একটি একক প্রদর্শনী হয়ে গেল।

শ্রীরাজাভেলুর জন্ম ১৯৪১, মাদ্রাজের এরোড-এ। ১৯৬৩ সালে তিনি মাদ্রাজের সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা লাভ করে ভারত সরকারের চারু-কলা বৃত্তি নিয়ে মাদ্রাজে শ্রী কে সি এস পানিকর ও বরোদায় অধ্যাপক এন এস বেন্দ্রের কাছে পাঠ গ্রহণ করেন। ললিত কলা আকাদেমীর পুরস্কার পান ১৯৬৭ সালে।

এ'র সম্পর্কে বিশদভাবে বলবার কারণ এই, কলকাতার যেসব চিত্রামোদী রাজাভেলুর ছবি দেখতে যাবেন তাঁরা এমন একটি রস পাবেন যা বিশেষভাবে দ্রাবিড়—যার স্বাদ আর্যাবর্তে প্রায় অজ্ঞাত। ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ অংশ শুধু ভৌগোলিক অর্থে নয়, চারিত্রিকভাবে, আত্মিকভাবেই পৃথক—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দ্রাবিড় সভ্যতা তার অভিজ্ঞতার নিজস্বে সমৃদ্ধ হয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে, যার বিচ্ছিন্ন কিছু স্বাদ আমরা পেয়ে যাই কথাকলিতে, মৃদঙ্গে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, রেডিয়োতে হঠাৎ ধরা-পড়া কর্ণাটকী মার্গসঙ্গীতে, হয়ত দেশপ্রিয় পার্কে তামিল তরুণীর পুষ্পাভরণে আর কেশসজ্জায়। এই সমস্ত থেকে দ্রাবিড় সংস্কৃতি বিষয়ে আবছা একটা ধারণা গড়ে ওঠে আমাদের। রাজাভেলুর ছবিতে আমরা পাই বিশদভাবে দ্রাবিড় চেতনা—সেই জন্যেই তাঁর ছবি দেখা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, আমরা যাঁরা ভারত সংস্কৃতির আপাত-বিচ্ছিন্নতার অন্তস্থলে নিহিত ঐক্যসূত্র খোঁজার প্রয়াস পাই।

রাজাভেলু বৃত্তিতে ভারত সরকারের তাঁতশিল্প প্রতিষ্ঠানের আর্ট ডিজাইনার—তাই তাঁর ছবিতে প্রভাব পড়েছে কমার্শিয়াল ডিজাইনের, বিশেষত বয়নযোগ্য নকশার। এবং আধুনিক য়োরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত বলে তাঁর হাতের রেখাও য়োরোপীয় ভাষায় কথা বলে—আমাদের যে-কোন শিল্পীর মতোই। তাঁর ভারতীয় মন ও দ্রাবিড় চেতনা ধরা পড়ে তাঁর বিষয় নির্বাচনে, ও ক্যানভাসকে ভাগ করে কম্পোজিশন তৈরী করার পদ্ধতিতে।

সঙ্গের ছবিটি লক্ষ্য করুন। বিষয়বস্তু ঐতিহ্যগতভাবে ভারতীয়—বোধ হয় এমন কোন ভারতীয় ভাষা নেই যে ভাষায় এই বিষয়ের উপরে গান রচিত হয় নি। কিন্তু নারী মূর্তিটির গঠনে চোল স্থাপত্যের প্রভাব স্পষ্ট। তাঁর দণ্ডায়মান মূর্তির ছবিগুলিতে এই সাদৃশ্য আরো প্রকট।

শিল্পী : এস কে রাজাভেলু

কলকাতায় প্রদর্শনী করার পক্ষে ভুল সময় বেছেছেন ইনি। দু মাস পর বিড়লা অ্যাকাডেমীতে এই প্রথম প্রদর্শনী হচ্ছে, যাঁরা শীতকালে 'কিছু না কিছু আছেই', এই বিশ্বাসে সেখানে সন্ধ্যেবেলায় চলে যান নতুন ছবি দেখবার আশায়, তাঁরা অনেকেই হয়তো যাবেন না। কিন্তু যাঁরা যাবেন, তাঁরা একটি বিরল অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরবেন—যার কথা অনেক দিন পরেও স্মরণশ্লেট থেকে মুছে যাবে না।

*　*　*

শিশুচিত্রীদের প্রদর্শনীর আয়োজন করা আজকাল বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে—এটা সুলক্ষণ। আমরা শিশুদের জন্য যথাযোগ্য আয়োজন করতে বড়ই কুণ্ঠিত—আমরা চিরকাল বয়স্ক জাতি। সুখের বিষয় আজকাল অনেক সংস্থা, এমন কি বিশুদ্ধ বাণিজ্যিক সংস্থাও শিশুচিত্র প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে এক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছেন। অ্যাকাডেমী গ্যালারীতে সম্প্রতি এমনি একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল—এটির উদ্যোক্তা ফিলিপস প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মুখপত্র 'পরিচয়'।

অবশ্য ফিলিপসের এই প্রচেষ্টা নতুন নয়। ফিলিপস কর্মীদের সন্তানদের উৎসাহ দেবার জন্য তাঁরা সাত-আট বছর যাবৎ এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছেন। বেশ কয়েকটি প্রতিশ্রুতিময় ছবি এই প্রদর্শনীতেও চোখে পড়ল। প্রায় চারশো ছবি নিয়ে বিশাল উদ্যোগ করেছিলেন ফিলিপস—যদি সংখ্যা কিছু কমাতেন—অন্তত অর্ধেক ছবি নির্দ্বিধায় বর্জন করা যেত—তাহলে বাকী ছবিগুলির উপর সুবিচার করা হত সন্দেহ নেই।

বাচ্চাদের আঁকা ছবির বিশেষত্বই হল তার ঋজু ভঙ্গী। কারিকুরি নেই, অনাবশ্যক অনুপুঙ্খ নেই, যা বলার তা সহজে, সামান্য রেখায় ও মিশ্রণহীন রঙে বর্ণিত। লক্ষ্য করে দেখবেন, বাচ্চাদের আঁকা মানুষের মুখে সাধারণতই কান বাদ পড়ে। কারণ মুখের আদলের মধ্যে কান বাহুল্যমাত্র, যা দেখে একজন মানুষকে মানুষ কিম্বা রাজেনবাবু বলে চেনা যায় তার মধ্যে কান পড়ে না। শিশুশিল্পী তাই দ্বিধাহীনভাবে কান ছাড়া মুখ আঁকতে পারে—এঁকে যায়। কিন্তু বয়স্ক শিক্ষিত শিল্পী জানেন কান মুখের অপরিহার্য অঙ্গ। ছবিতে প্রয়োজন না থাকলেও শারীরতাত্ত্বিক যাথার্থ্যের কারণে কান আঁকতেই হয় তাঁকে, প্রয়োজন না থাকলেও। এদিক দিয়ে শিশুচিত্র যথার্থ আধুনিক। আধুনিক শিল্পও আমাদের শেখায়, বাহুল্য বর্জন করে মূলে পৌঁছতে। কিন্তু শিক্ষিত আধুনিক শিল্পীর কাছে যা আয়াসসাধ্য ও বহু চিন্তার ফলশ্রুতি, শিশু তা করে চিন্তাহীন ঋজু হাতে, অমোঘভাবে, তাই শিশুচিত্রীর কাছে বয়স্ক অভিজ্ঞ আধুনিক শিল্পীর চিরকালই কিছু শেখার থেকে যায়—শেখবার থাকে চেষ্টাহীনতা। শিক্ষিত শিল্পী বহু 'আয়াসে' যা করেন, শিশু তা করে নিতান্ত চেষ্টাহীনভাবে। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আসে দ্বিধা ও স্ববিরোধ—জ্ঞানের আনুষঙ্গিক এই দুই পাপ থেকে শিশু মুক্ত। তাই শিশুরা রসিকজনের কাছে চিরকাল শ্রদ্ধাভয়ে দ্রষ্টব্য।

—চিত্রজিৎ

—তিন—

গেটের কাছে মিলির সঙ্গে দেখা।

এগিয়ে এসে বিন্তি শুধোল,—'আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলি বুঝি? কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছিস রে?'

মিলি ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। 'অনেকক্ষণ', সে কপট রাগের ভঙ্গি করে মুখটা অন্যদিকে ফেরাল।

—'আহা! আর রাগ করতে হবে না।' বিন্তি ওর গাল দুটো আলতো করে টিপে আদর করল। বলল—'ভেরি সরি ম্যাডাম। আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেল। কি করি বল? নাচের ক্লাস শেষ হতেই দশটা বাজল। ভাগ্যিস ছুটির দিন, তাই প্রথম বাসটাতে উঠতে পেরেছি। অন্যদিন হলে আর রক্ষা ছিল না। বেলা দশটায় কি বাসে ওঠা যেত?'

মিলি ফিক করে হাসল। 'থাক আমার কাছে আর জবাবদিহি করতে হবে না। ওপরে আর একজন তোমার জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে। যা বলবার তাকেই ব'লো।'

বিন্তি লজ্জা পেল। গলা নামিয়ে শুধোল,—'ওপরে কে বসে আছে রে? তোর রতীশদা?'

—'আবার কে?' মিলি সুন্দর একটি ভ্রূ-ভঙ্গি করল। গেটের সামনে একটা ঝক-ঝকে ফিয়াট গাড়ি দাঁড়িয়ে। সেদিকে ইঙ্গিত করে মিলি বলল,—'রতীশদার গাড়ি। সকাল নটা থেকে এসে বসে আছে। সাড়ে দশটা পর্যন্ত তুই এলি না দেখে ও বেচারী একেবারে হতাশ। বলছিল,—তোর বন্ধু আর এল না মিলি। তখন মুখখানা যা হয়েছিল, দেখলে তোর মায়া হ'ত।' মিলি হি-হি করে হাসিতে ভেঙে পড়ল।

বিন্তি ওকে একটা মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলল,—'যাঃ। তুই ভীষণ ফাজিল হয়েছিস। এমন করিস না—'

মিলি দুহাত বাড়িয়ে ওকে প্রায় জড়িয়ে ধরল। 'চল, চল। তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে বিন্তি। রতীশদা সেইজন্যেই এসেছে।' তখন আবদার করে বলল,—'তুই রাজি না হলে কিন্তু আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে যাবে।'

বিন্তি খুব অবাক হ'ল। শুধোল,—'কি কথা বল দিকি? আমি তো কিছু বুঝতেই পারছি না। আমার সঙ্গে তোর রতীশদা কি কথা বলবেন?'

মিলি মাথা নেড়ে বলল—'উঁহু। এখন কিছু বলতে পারব না। তুই আগে ওপরে চল। রতীশদা নিজে তোকে সবকথা বলবে।'

—'বেশ, তাই চল।' বিন্তি হাসতে হাসতে বলল, 'কিন্তু তার আগে একটা কথা বলি শোন।' মিলির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বিন্তি ফিস-ফিস করে কি যেন বলল।

মিলি ওর মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল। —'তাই হবে বাবা। কিন্তু তোকে এমনিতেই যথেষ্ট ভালো দেখাচ্ছে বিন্তি, আর মেকাপ নেবার কোনো দরকার ছিল না।'

—'দূর! মেক-আপ কিসের।' বিন্তি হেসে ফেলল। 'এক ঘণ্টা ধরে নাচের তালিম নিয়েছি। মুখের উপর কি রকম ঘাম জমেছে দেখছিস না? একটু ধুয়ে মুছে নেব। নইলে এই অবস্থায় কোনো ভদ্রলোকের সামনে বেরোনো যায়,'

দোতলায় উঠবার সিঁড়ির পাশেই একটা ঘর। সঙ্গে লাগোয়া বাথরুমও আছে। মিলি ওকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। বলল,—'নাও গো সুন্দরী। কি সাজগোজ করবে করো। আমি চোখ বন্ধ করে বসে রইলাম।' এই বলে একটা সোফার উপর সে প্রায় এলিয়ে পড়ল। তারপর সত্যি চোখ বুজল।

বিন্তি এগিয়ে এসে ওর গালে একটা টোকা মারল। বলল,—'চোখ খোল শিগগির, তোর এই ঢঙ আমার ভালো লাগে না। এমনি করলে কিন্তু আমি সোজা বাড়ি চলে যাব।'

অগত্যা মিলি চোখ খুলে হাসল।

বিন্তি বলল,—'হাঁ, অমনি তাকিয়ে থাক। বাথরুমে যাচ্ছি। ফিরে এসে যেন দেখি তুই ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছিস।'

মিলিরা বনেদী বড়লোক। বাথরুমটাই কত সুন্দর। ঝকঝকে শ্বেতপাথরে বাঁধানো ঘর। বেশ বড় সাইজ। ঘরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বাথ-টব। ইচ্ছে করলে বিন্তি ওর মধ্যে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। কাচের একটা স্ট্যাণ্ডের উপর দু-তিনটে সাবানের কেস। একটা ছোট বাটি, এক শিশি সুগন্ধী তেল। ছোট একটা স্নো। কিছুটা ফেস-পাউডার, টুকিটাকি আরো কত জিনিস রয়েছে।

বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে বিন্তি ভালো করে মুখখানা ধুয়ে ফেলল। হাতের তেলোয় অল্প একটু সাবানের ফেনা করে মুখে বুলোল। তারপর আঁজলা করে জল নিয়ে চোখ-মুখে দিতে লাগল। গাল, গলা, চিবুকের উপর থেকে সাবানের নরম ফেনা-গুলি ধুয়ে গেলে বিন্তি পিতলের রডে ঝোলানো একটা গোলাপী রঙের তোয়ালে টেনে নিয়ে মুখের উপর আলতোভাবে চেপে ধরল।

বাঁ দিকে দেওয়ালে বসানো একটা বড় আয়না। বিন্তি ঘুরে দাঁড়াতেই দর্পণে তার ছায়া পড়ল। তোয়ালেটা সরাতেই আয়নায় একটি উজ্জ্বল মুখের প্রতিবিম্ব। ভালো করে দেখে বিন্তি নিশ্চিন্ত হ'ল। মুখের ময়লা, ঘাম-টাম সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার। গালের উপর আঙুল বুলিয়ে বিন্তি একবার পরখ করল। ঠিক একটা খোসা ছাড়ানো আধ-সেদ্ধ ডিমের মত নরম তুলতুলে মনে হচ্ছে। আঙুলের ডগায় একটু স্নো নিয়ে বিন্তি গালে, চোখের নীচে ঘুব ঘষল। তারপর পাউডারের পাফটা গলায়, মুখের নানা অংশে সযত্নে অনেকক্ষণ ধরে বুলোল।

দরজা খুলতেই মিলি মুখ নেড়ে বলল, —'বাব্বা! ধন্যি তোর রূপচর্চা। মিনিট পনেরো ধরে শুধু মুখ পরিষ্কার করলি?'

বিন্তি কোনো উত্তর না দিয়ে শাড়িটা এপাশ-ওপাশ সরিয়ে টেনে টুনে ঠিক করে নিল। বলল,—'বাজে বকা রাখ। চল, এবার ওপরে যাই।'

মিলি এগিয়ে এসে বন্ধুর গলাটা আলগোছে জড়িয়ে ধরল। বিন্তির মুখের উপর একনজর চোখ বুলিয়ে বলল,—'সত্যি! তোকে গ্র্যান্ড দেখাচ্ছে কিন্তু।' ফের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে শোনাল,—'দেখিস, রতীশদা আবার না তোর প্রেমে পড়ে যায়।'

বিন্তি ওকে একটা ঠ্যালা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল। বলল, —'কি হচ্ছে মিলি? দিন দিন ভীষণ ফাজিল হচ্ছিস। আজকাল বুঝি প্রেম-টেমের কথা খালি চিন্তা করিস?'

মিলি খুব একটা হতাশ ভঙ্গি করে বলল,—'চিন্তা করে লাভ কি বল? ভালো নাচতে পারলে না-হয় উপায় ছিল। রতীশদার মত আর কেউ হয়তো গাড়ি ড্রাইভ করে কোনো বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করত।'

কথা শুনে বিন্তি খিলখিল করে হেসে উঠল। ওর পিঠে একটা ছোট্ট কিল মেরে বলল,—'চল মাসীমাকে গিয়ে বলছি। মিলির এবার একটা বিয়ে দিন। নিজে গাড়ি চালাতে পারে এমনি কোনো ছেলে। মিলিকে পাশে বসিয়ে সে একটা লং ড্রাইভে বেড়োবে। অনেকদূর বেড়িয়ে আসবে, কি বলিস?'

মিলির পড়ার ঘরটা ছোট্ট। কিন্তু ভারী সুন্দর। সাজানো গোছানো। পড়ার টেবিল, চেয়ার। আলমারিতে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও গল্প, উপন্যাস আরো কত সব বই। দেওয়ালের একদিকে সুদৃশ্য বিলিতি ক্যালেণ্ডারের পাতায় পঞ্চদশ শতাব্দীর এক দুর্গের ছবি। অন্যদিকে চোরে দেখার মতো একটি নিসর্গ-চিত্র। জানালার পাশে মানিপ্ল্যান্টের একটি লতা দেওয়ালের বুকে সাপের মতো হেঁটে চলেছে। দরজার মাথায় সামান্য উঁচুতে পেলমেটের উপর ভারতের নানা অঞ্চলের আট-দশটা সুদৃশ্য পুতুল সারবন্দী দাঁড়িয়ে।

মিলি বলল,—'তুই ব'স বিন্তি। আমি রতীশদাকে ডেকে আনি।'

—'কোথায় উনি?' বিন্তি গলা নামিয়ে শুধোল।
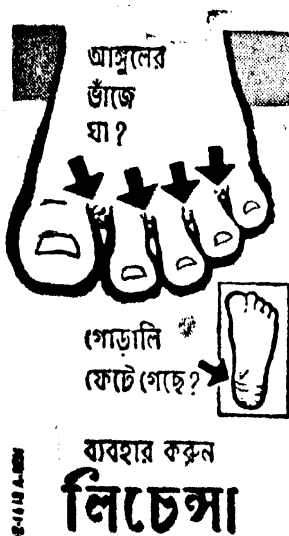
—'আছে বাড়িতেই। বোধহয় মায়ের সঙ্গে গল্প-টল্প করছে। তুই ব'স না। আমি এখুনি ওকে ধরে আনছি।'

—'তাড়াতাড়ি আসিস ভাই।' বিন্তি প্রায় মিনতি করল।

মিলি ঘর থেকে বেড়িয়ে যেতেই সে চেয়ারের উপর ধপ করে বসে পড়ল। বিন্তির মনে হ'ল তার বুকের ভিতরটা যেন ঢিপ-ঢিপ করছে। হৃদপিন্ডের দ্রুততালে ওঠা-নামা। কেমন একটা নার্ভাস অবস্থা। রতীশের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে সে এমন চঞ্চল বোধ করছে কেন? জন্মদিনে তার সঙ্গে মিলি আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। বেশী বয়স নয় ছেলেটার। বড় জোর উনিশ কুড়ি হতে পারে। পরনে ছাই রঙের সুট। ঘি রঙের সিল্কের জামা আর লাল টকটকে একটা টাই। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। পরিচয় হতেই সে হেসে বলল,—'ভারী সুন্দর নাচ আপনার। খুব ভালো লেগেছে।'

প্রশংসা মানেই স্তুতি। বিশেষ করে পুরুষের মুখে স্তুতি শুনলে কোন মেয়ের না ভালো লাগে? বিন্তি খুশি হয়ে শুধোল,—'সত্যি বলছেন?'

রতীশ হেসে বললে,—'রিয়েলি।' তারপর বিন্তির মুখের উপর স্থির দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে সে কেমন অদ্ভুতভাবে হাসল, ফের বলল,—'আমি ভাবছি আপনার পারফরমেনস আবার কবে দেখতে পাব।'

একলা ঘরে বসে রতীশের কথাটা বিন্তির মনে পড়ল। সত্যি, মিলি এমন করে তাকে ডেকে পাঠাল কেন? রতীশ কি ফের তার নাচ দেখতে চায়? আর সেজন্যই আজকের সাদর নিমন্ত্রণ। কিন্তু এখানে কোথায় নাচবে বিন্তি? তাছাড়া শুধু রতীশের সামনে? ধ্যেৎ! তাই কি কখনও সম্ভব?

জন্মদিনের ফাংশনের কথা ফের মনে পড়ল বিন্তির। অনুষ্ঠান শেষ হতে রাত অনেক হল। প্রায় সাড়ে নটা। তাকে আনবার জন্য মিলি গাড়ি পাঠিয়েছিল। ফেরার সময়ও গাড়ির ব্যবস্থা। ওঠার আগে মিলি তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে শুধোল,—'কি রে, রতীশদাকে তোর কেমন লাগল?'

প্রশ্নটা অর্থবহ। অথচ ইচ্ছে করলে সহজভাবেও নেওয়া যায়। বিন্তি তাই করল। মুখ না ফিরিয়েই সে জবাব দিল,—'কেমন আবার? এমনি, মানে আলাপ হলে যেমন লাগে আর কি—'

মিলি আগের মতই ফিস ফিস করে বলল—'রতীশদার কিন্তু তোকে খুব পছন্দ। বলছিল, তোর ফিগার খুব সুন্দর। চর্চা রাখলে নাচে তোর নাম হবে।'

গাড়িতে উঠে বিন্তি প্রথমেই রতীশের কথা ভাবল। কি বেহায়া ছেলে। মেয়েদের ফিগারের দিকে অমন করে তাকায় কেন? কিন্তু একটু পরেই সে অন্য রকম ভাবতে শুরু করল। রতীশ তার ফিগারের প্রশংসা করেছে মনে করে সে খুশী হল। বিন্তি ভাবল নাচের সময় রতীশ তার দিকে তাকিয়ে তাকে খুঁটিয়ে দেখেছে। রতীশের মুগ্ধ দৃষ্টি সারাক্ষণ তার দেহের উপর লুব্ধ ভ্রমরের মত ইতস্তত ঘুরে বেড়িয়েছে।

চেয়ার ছেড়ে বিন্তি ফের উঠল। ক্যালেন্ডারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বিলিতি ক্যালেন্ডার। প্রতি মাসের আলাদা পাতা। বিন্তি এলোমেলো কয়েকটা পাতা সরিয়ে ছবি দেখল। তারপর জানালার কাছে গিয়ে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল।

দরজার কাছে পায়ের শব্দ হতেই বিন্তি ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে মিলি নেই...রতীশ একা। হাসিমুখে তাকিয়ে।

বিন্তি শুধোল—'মিলি কই? সে তো আপনাকেই খুঁজতে গেল।'

হাত তুলে নমস্কার করল রতীশ। বলল,—'ও আসছে এখুনি। আপনি বসুন না। মিছিমিছি আপনাকে কষ্ট দিয়ে এত দূরে আনালাম।'

বিন্তি চেয়ারে বসল। 'কষ্ট কিছু নয়।' সে হেসে বলল,—'তবে অনেকটা দূর। বাসে আসতে কখনও এক ঘন্টাও লেগে যায়।'

রতীশ পকেট হাতড়ে বেশ চকচকে এবং চৌকো গোছের একটি চীজ বের করল। বলল,—'আমাদের ওখানে নিশ্চয় আপনাকে বাসে যেতে হবে না। যাওয়া-আসার ব্যবস্থা আমরাই করব। মানে গাড়ি থাকবে। অবশ্য আপনি যদি রাজি হন।'

—'গাড়ির ব্যবস্থা করবেন মানে?' বিন্তি অবাক হয়ে শুধোল, 'আমি তো কিছু বুঝতেই পারছি না।'

—'কেন? মিলি কিছু বলে নি আপনাকে?'

বিন্তি মাথা নেড়ে জবাব দিল,—'না তো।'

চকচকে এবং সুদৃশ্য বস্তুটি আসলে একটি নতুন ধরনের সিগারেট কেস। রতীশ সেটি খুলতেই চক পেন্সিলের মত সরু সরু অনেকগুলি সিগারেট দেখতে পেল। বেশ কায়দা করে ঠোঁটের প্রায় কোণে একটা সিগারেট চেপে ধরল রতীশ। বলল,—'মিলির আপনাকে কথাটা বলা উচিত ছিল। কেন যে বলে নি বুঝতে পারছি না।'

—'তাতে কি হয়েছে? আপনি বলুন না—' বিন্তি সাগ্রহে তাকাল।

রতীশ পকেট থেকে একটা লাইটার বের করে সিগারেটটা ধরাল। বলল,—'ব্যাপারটা সামান্য। সামনের মাসে আমাদের বাড়িতে একটা ফাংশন হতে পারে। ঘরোয়া অনুষ্ঠান। আমার দাদুর জন্মদিন। এবারই ও'র পঁচাত্তর বৎসর পূর্ণ হবে। ফাংশনে আমরা একটা ছোট নাটক করছি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে নায়িকার রোলটা নিয়ে। বইতে তিন-চারটে নাচ আছে তার। কিন্তু ভালো নাচতে পারে এমন কোনো মেয়েই পাচ্ছি না।' একটু থেমে সে ফের বলল,—'আপনি যদি রোলটা করতে রাজি হন, তাহলে একটা সমস্যা মিটে যায়।'

নায়িকার রোল? বিনিত এক মুহূর্ত ভাবল। তার মানে থিয়েটারের রিহার্সাল দিতে তাকে প্রায় প্রতিদিনই রতীশের বাড়ি যেতে হবে। অবশ্য যাতায়াতের ব্যবস্থা ওরাই করবে। কিন্তু তাই কি সব? আজকাল নিত্যি গণ্ডগোল, হাঙ্গামা। তার পাড়াতে আজ ভোরে কি তুলকালাম কাণ্ড। বিনিতর মত থাকলেও তার মা-বাবা কি রাজি হবেন? ঠোঁট কামড়ে সে কথাটা ভাবল।

মুখে অবশ্য বিনিত সেকথা বলল না। ভুরু কুঁচকে, ঠোঁট টিপে সে প্রায় বইয়ের নায়িকার মতই ভঙ্গী করল। রতীশের মুখের উপর দ্রুত চোখে বুলিয়ে বলল,—হিরোইনের রোলে আমায় মানাবে কেন? আর আমি কি তেমন ভালো নাচতে পারি?'

রতীশ সোজা হয়ে বসল। 'কি যে বলেন আপনি। নায়িকার পার্টে আপনাকে ওয়াণ্ডারফুল মানাবে।' বিনিতর দিকে আলগোছে একবার তাকিয়ে সে ফের বলল,—'যা সুন্দর ফিগার আপনার। মিলিকে আমি কি বলেছি জানেন? ছেড়ে না দিলে নাচে একদিন আপনি খুব ফেমাস হবেন।'

—'আমি সেকথা ওকে আগেই বলেছি দাদা। ঘরে পা দিয়েই মিলি কথাটা সগর্বে জানাল। তারপর বিনিতর পিঠে একটা আলতো চাপড় মেরে বলল,—কি রে নায়িকার রোলটা করতে রাজি হয়েছিস তো?'

রতীশ চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালার কাছে গেল। সিগারেটে ছোট্ট একটা টান দিল। মুখটা উঁচু করে ধোঁয়া ছাড়বার সময় সে ধোঁয়াটা ছোট ছোট রিং করবার চেষ্টা করল। কিন্তু সবগুলো ঠিকমত হল না।

আসলে বিনিতর খুব লজ্জা করছিল। সে জানে তার ফিগার সুন্দর, নাচের উপযোগী। আঁকাবাঁকা পাতিপাত কৃষ্ণচূড়ার মত তার দেহবল্লরী। কিন্তু রতীশ কেন আজও সেকথা উল্লেখ করল? ও কি সারাক্ষণ তার দেহের উপর চোখ বুলোচ্ছে? রতীশের মত একজন সুন্দর যুবা পুরুষের মুখে বার বার ফিগারের প্রশংসা শুনলে কোন মেয়ে সহজ হয়ে কথা বলতে পারে?

বিনিত মুখ তুলে দেখল, মিলি একা নয়। তার পিছনে খাবারের প্লেট হাতে আর একজন এসেছে। লোকটি টেবিলের উপর জলভর্তি কাচের গ্লাস, সন্দেশের ডিশটা নামিয়ে রাখল।

—'এ কি!' বিনিত বিস্ময়ের সুরে বলল, 'এত বেলায় এসব খাওয়া যায় নাকি?'

—'খুব যায়। মোটে তো চারটে সন্দেশ। তোর জন্যে মা পাঠিয়ে দিল। তুই না খেতে চাইলে কিন্তু মাকে নিয়ে আসব।'

বিনিত অসহায় ভঙ্গিতে তাকাল। ঘড়ির কাঁটার উপর এক নজর বুলিয়ে বলল,—'বড্ড দেরী হয়ে গেল রে। বাড়ি পৌঁছুতে প্রায় সাড়ে বারোটা হয়ে যাবে।'

মিলিকে কুণ্ঠিত দেখাল। সে লজ্জিতভাবে বলল,—'গাড়িটা আজ সকালেই বাবা নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। কখন ফিরবেন ঠিক নেই। নইলে ড্রাইভার তোকে পৌঁছে দিয়ে আসতে রে।'

—'তাতে কি হয়েছে?' বিনিত তাড়াতাড়ি বলল,—'আমি বাসে করে ঠিক চলে যাব। আর এখন ভরদুপুরে ট্রাম-বাস ফাঁকা। আমার কোনো অসুবিধে হবে না।'

—'তোর না অসুবিধে হতে পারে। তবু আমার উচিত ছিল তোকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা।' বাম হাতের কড়ে আঙুলের অগ্রভাগ ঈষৎ কামড়ে মিলি কি চিন্তা করল। পরে হঠাৎ মুখ উজ্জ্বল করে সে বলল,—'আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না? রতীশদার তো গাড়ি আছে। সেই তোকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

বিনিত আপত্তি করল। 'না, না। উনি আবার কেন মিছিমিছি অতদূর যাবেন?'

—'আহা! যাবে না কেন?' মিলি চোখ নাচিয়ে সুন্দর একটি ভঙ্গি করল। তারপর রতীশের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুধোল,—'কি, কষ্ট করে ওকে একটু পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবে তো?'

রতীশ জানালার কাছ ছেড়ে যেন এদিকে এল। হেসে বলল,—'কষ্ট কিসের? তাছাড়া ওকে পৌঁছে দিয়ে আসা তো আমাদের কর্তব্য।'

মিলি হি-হি করে হেসে উঠল। 'দেখলি তো রতীশদা ডিউটি সম্বন্ধে কি রকম সচেতন, একবার বলতেই রাজি।' এক মুহূর্ত ভেবে সে ফের বলল,—'তাছাড়া তোর বাড়িটাও রতীশদার চিনে আসা দরকার। রোজ তোকে আনবার জন্য গাড়ি যাবে। ড্রাইভার কোনদিন ডুব দিয়ে বসবে কে জানে। সেদিন তো রতীশদাকেই রথের সারথী হতে হবে।'

রতীশ বেশ গম্ভীর মুখ করে বলল,—'তুমি আগে থেকেই এত সব ভাবছ মিলি। উনি কিন্তু আমাদের প্রস্তাবে এখনও রাজি হন নি।'

—'ওমা, রাজি হয় নি নাকি!' মিলি ঠিক নিপুণ অভিনেত্রীর মত অবাক হবার ভান করল। তারপর বিনিতর কাঁধের উপর একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল,—'শিগ্‌গির রাজি হ বলছি। নইলে কিন্তু তোকে আজ আর যেতে দিচ্ছিনে।'

বিনিত নিজেকে মুক্ত করে বলল,—ছাড়, ছাড়। কি পাগলামি করিস। ফস করে কি অমনি রাজি হওয়া যায়? মার মত নিতে হবে না?'

—'মাসীমা ঠিক রাজি হবেন। তোর মত আছে কিনা শুধু তাই বল।'

রতীশের দিকে আড়চোখে চকিত দৃষ্টি হেনে বিনিত ফিক করে হাসল। বলল,—'আমার নিজের অমত নেই। তবে কি জানেন? চারদিকে যা গণ্ডগোল। রোজ রিহার্সাল দিতে আসতে পারব কিনা কে জানে?'

—'আহা! তোকে আনার দায়িত্ব তো আমাদের।' মিলি ঠিক রাজহাঁসের মত গলা বাড়িয়ে কথা শেষ করল।

—'কেমন করে আনবি বল?' বিনিত রগড় করে বলল, 'আমাদের গলির মুখে পৌঁছবার আগেই হয়ত দেখবি রাস্তাঘাট ফাঁকা। সামনে ঠিক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। হৈ-হৈ কাণ্ড। দুম দুম বোমা ফাটছে। এক-একটা বোমার কি শব্দ। শুনলে তোর পিলে চমকে যাবে।'

—'ও বাবা! বলিস কি রে?' মিলি চোখ দুটো প্রায় কপালে তুলল।

রতীশ একটু সতর্কভাবে শুধোল,—'আপনাদের পাড়ার অবস্থা এরকম নাকি?'

বিনিত হেসে বলল,—'ভয় পাবেন না। কাল পর্যন্ত আমাদের পাড়াটা শান্ত ছিল। কিন্তু আজ ভোরবেলাতেই এক তুলকালাম কাণ্ড হয়ে গেল। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে সে কি বোমাবাজী। আমরা তো ভয়ে কাঠ। রাত চারটে থেকে জেগে বসে আছি।'

—'তারপর সব থেমে-টেমে গেল তো?' মিলি জানতে চাইল।

—'নিশ্চয়। এক ঘণ্টা পরই সব স্বাভাবিক। নইলে আমি এলাম কেমন করে? এখন গেলে তুই বুঝতেই পারবি না যে, আজ ভোরে অতগুলো বোমা ফেটেছে।'

—'তাহলে আর ভাবনা কিসের?' মিলি নির্ভাবনায় বলল।

—'চিন্তা আছে বৈকি।' বিন্তি বিজ্ঞের মত কথা কইল, 'মেজদা বলছিল, গণ্ডগোল একবার শুরু হলেই মুস্কিল। হাঙ্গামা লেগেই থাকবে। তুষের আগুনের মত ভিতরে জ্বলবে। সুযোগ পেলেই মারামারি আর বোমাবাজী শুরু হবে।'

রতীশ অন্যমনস্কভাবে ধুতনীতে হাত বুলোচ্ছিল। বিন্তির মুখের দিকে তাকিয়ে সে শুধোল,—'আচ্ছা আপনাকে যদি আমরা সন্ধ্যের মধ্যে পৌঁছে দিই। তাহলে কি একটু সুবিধে হবে?'

বিন্তি ফের হাসল। বলল,—'আপনি এত চিন্তা করছেন কেন? গণ্ডগোল হয়েছে বলেই কি আমরা সকলে বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকব? আমার বাবা অফিস যাবেন, বড়দারও চাকরি আছে। মেজদার হাসপাতাল ডিউটি। তারপর বাজার-হাট কেনাকাটা সবই হবে।'

মিলি ফিক করে হেসে বলল,—'তাহলে তুইও নির্ঘাত বেরোবি, কি বলিস?'

বিন্তি চোখ ঘুরিয়ে মুখখানা ঈষৎ হেলিয়ে জবাব দিল,—'দেখি চেষ্টা করে।'

রতীশ হাতঘড়ির দিকে একনজর তাকিয়ে বলল,—'আমি নীচে গিয়ে গাড়িতে বসছি মিলি, তুমি ওকে নিয়ে এসো।'

প্লেটে সন্দেশগুলো পড়ে। বিন্তি একটিও ছোঁয় নি। মিলি বলল,—'ওগুলো খেয়ে নে এবার। রতীশদার স্বভাব জানিস না তো? বেশীক্ষণই একলা থাকতে পারে না। একটু পরেই হর্নের তাড়া শুনতে পাবি।'

বিন্তি সলজ্জ গলায় বলল,—'মিছিমিছি তুই ভদ্রলোককে ট্রাবল দিলি। আমি বাসে দিব্যি যেতে পারতাম।'

মিলি গা দুলিয়ে হি-হি করে হাসল। 'ট্রাবল বলছিস? দূর বোকা। বরং রতীশদা খুশী হয়েছে। তোকে পাশে বসিয়ে এতটা রাস্তা যাবে, একটা প্লেজার-ট্রিপ বল?'

বিন্তি কপট রাগ দেখাল। 'কি যা-তা বলছিস? এমনি করলে আমি কিন্তু তোদের থিয়েটারে নেই—'

—'আহা। রাগ দেখো না মেয়ের,' মিলি সকৌতুকে তাকাল। হেসে বলল,—'নে, খুব হয়েছে। এবার চটপট সন্দেশগুলো খেয়ে ফ্যাল দেখি।'

বিন্তি একটা সন্দেশ মুখে ফেলে ঢক-ঢক করে খানিকটা জল খেয়ে উঠে দাঁড়াল। মিলি বাধা দিয়ে বলল,—'ওকি? বাকীগুলো কে খাবে?'

ওর গাল টিপে একটু আদর করল বিন্তি। বলল,—'আর পারব নারে। তুই মাসীমাকে বুঝিয়ে বলিস।'

ড্রাইভারের আসনে রতীশ। বিন্তি কাছে আসতেই সে দরজা খুলে দিয়ে সহাস্যে তাকাল। কোনো বাক্যব্যয় না করে বিন্তি লক্ষ্মী মেয়ের মত টুপ করে পাশের আসনে বসে পড়ল। মিলি সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে বলল,—'পারমিশনটা আজই মাসীমার কাছে করিয়ে নিবি, বুঝলি?'

বিন্তি কোনো কথা বলল না। ঘাড় হেলিয়ে ঈষৎ হাসল।

বালীগঞ্জ প্লেস থেকে বেরিয়ে গড়িয়া-হাটা যাবার কথা। কিন্তু গাড়ি যেন অন্য দিকে চলেছে। বিন্তি উসখুস করছে দেখে রতীশ বলল,—'একটু সাদার্ন অ্যাভেনিউ ঘুরে যাচ্ছি। ভাবছি আমাদের বাড়িটা আপনাকে একবার দেখাব।'

—'এত বেলাতে আবার? দেরী হবে না'— বিন্তি মৃদু আপত্তি করল।

রতীশ ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলল,—'বাইরে থেকে শুধু বাড়িটা দেখবেন। আমি গাড়ি থামাচ্ছি নে। তাছাড়া রাস্তা খুব ফাঁকা। পৌঁছতে মিনিট পাঁচেক বড়জোর বেশী লাগবে।'

রবিবার। তায় বেলা দুপুর। পথে লোক চলাচল প্রায় নেই। রাস্তার ধারে বিরাট সব অট্টালিকা। হঠাৎ গাড়ির গতি মন্দ হতেই বিন্তি কৌতূহলী হল। তিনতলা একটা বাড়ির পাশে গাড়িটা প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছে।

রতীশ ইঙ্গিত করে বলল,—'এই বাড়িটা আমাদের। মিলিদের বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়, কি বলুন?'

বিন্তি তাকিয়েছিল। সামনের বাগানে নানা ফুলের বাহার। বড় বড় গোলাপ। তুলোর মত সাদা, লাল, নীল আরো কত সব মরশুমী ফুল। গেটের থামে মার্বেল পাথরে লেখা,—'স্মৃতির ভেলা।'

কয়েক সেকেন্ড পরেই গাড়ি ফের সবেগে ছুটল। রতীশ শুধোল,—'বাড়িটা কেমন লাগল আপনার?'

—'খুব সুন্দর।' বিন্তি ঘাড় ফিরিয়ে রতীশের মুখের উপর চোখ রাখল। বলল,—'বাড়ির নামটা আমার খুব পছন্দ। কে দিয়েছেন বলুন না?'

রতীশ ঈষৎ হেসে জবাব দিল,—'নামটা আমার দাদু দিয়েছেন। উনি বলেন একটা বাড়ি মানেই হাজার স্মৃতি। তিন-চার পুরুষ ধরে মানুষের বাস। শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য,—কত স্মৃতি সেখানে ছড়িয়ে আছে।'

—'তা সত্যি।' মুগ্ধ নায়িকার মত বিন্তি কথা কইল, 'আমার বাবাও ঠিক আপনার দাদুর মত কথা বলেন, দেশের বাড়ি-ঘরের উপর বাবার ভীষণ মায়া।'

—'আপনার দেশ কোথায়?'

—'বাঁকুড়ায়।' বিন্তি ইচ্ছে করেই আর গ্রামের নাম বলল না।'

—'মাঝে মাঝে সেখানে যান নিশ্চয়?'

—উঁহু।' বিন্তি তাচ্ছিল্যের সুরে বলল,—'আমরা কেউ যাই নে। দু-এক বছর অন্তর বাবা শুধু যান।'

রতীশ হঠাৎ বলল,—'জানেন, আপনার কথা কাল আমি মাসীকে চিঠিতে লিখেছি।'

—'আমার কথা?' বিন্তি খুব অবাক হল, 'কেন বলুন তো?'

রতীশ রহস্য করে বলল,—'সে কথা আর একদিন আপনাকে বলব। তবে আমার মাসীকে হয়ত আপনি চেনেন'—

—'আমি চিনি? ওমা, কি বলছো আপনি! উনি থাকেন কোথায়? কলকাতা নিশ্চয়?'

—'উঁহু।' রতীশ ঘাড় নাড়ল, 'উনি যেখানে থাকেন, সে জায়গাটা এখান থেকে অনেক দূরে। প্রায় তেরশ' মাইল।'

—'তাহলে আমি চিনব কেমন করে? কলকাতা থেকে অত দূরে আমি কোনোদি যাই নি।'—

রতীশ হাসল। 'জানেন, ছোটবেলা মাসী খুব ভাল নাচতে পারত। সুন্দ ফিগার ছিল। এখনও অবশ্য চমৎকা দেখাতে। বলা যায় না, আপনিও একদি মাসীর মত ফেমাস হবেন।'

—'কি জানি?' বিন্তি হাত ঘুরিয় বলল,—'আপনার কথার মানেই বুঝ পারছি না। কি যে সব বলছেন।'

বিন্তির কথামত গলির মুখেই রতী গাড়ি থামাল। দরজা খুলে বিন্তি নী নামল। বলল,—'ধন্যবাদ, গলির মধ্যে আ আপনাকে গাড়ি নিয়ে যেতে হবে ন এইটুকু আমি হেঁটেই যেতে পারব।'

রতীশ একটু হাসল। বলল,—'চ তাহলে। শিগ্গির নিশ্চয় দেখা হ আবার।' সে গাড়িটা ঘুরিয়ে দ্রুত বেরি গেল।

আমির বারিক লেনটা এখন বেশ নির্জ গলির মুখে একটা চায়ের দোকা দু-তিনটি ছেলে হয়তো বিন্তিকে দেখে দোকানঘর থেকে বেরিয়ে এল। পর চোঙা প্যান্ট, ঊর্ধ্বাংগে চিত্র-বিচিত্র স সার্ট। মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। ব ষোল-সতেরোর বেশী নয়।

—'সেই মেয়েটা নারে? পুজোর স ফাংশনে নেচেছিল?' একজন শুধোল।

অন্য একটি ছেলে বিন্তিকে শু গান ধরল,—'সোহাগ চাঁদবদনী ধনী, না তো দেখি—'

বিন্তি দ্রুত হাঁটছিল। ছেলে তিনটি সে আগেও দেখেছে। ওরা এই গলিতে থ না। কিন্তু এর আগেও দু-একদিন ছে গুলো তার পিছু নিয়েছিল। বাজে ছে সব—

বাড়ির কাছে এসে বিন্তি মুখ ফি একবার দেখল। আশ্চর্য। ছেলেগুলো তখ দাঁড়িয়ে। তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই । লম্বা মতন ছেলেটা নাচের ভঙ্গিতে পাক ঘুরে ফের গেয়ে উঠল,—

নাচো তো দেখি,
বালা, নাচো তো দেখি।

তারপর তিনজনেই বিশ্রীভাবে হি করে হেসে উঠল।

(ক্রম

বাংলা ভাষায় 'ফোঁটা' কথাটার চলন আছে। কাব্য-সাহিত্যেও 'ফোঁটা' কথা নানা অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু তুলি দিয়ে রংয়ের লিখনে বা আঙুলের টিপে যে ফোঁটা একটা রূপের ছাপ নিয়ে প্রকাশ হয় তার মূল্য রূপচর্চার ক্ষেত্রে বড় কম নয়। নববধূর কপালের সিঁদুরের ফোঁটা বা টিপ অথবা ছোট্ট মেয়েটির কপালে কাজলের ফোঁটা রূপচর্চার একটা অংগ বিশেষ। বিবাহবাসরে কনের কপালে যদি চন্দনের ফোঁটা না থাকে তবে যত অলংকার আর সাজসজ্জা থাকুক না কেন অঙ্গসজ্জায় একটা ফাঁক থেকেই যায়। ভারতীয় নারীদের বিশেষ করে হিন্দু সধবা ও কুমারী মেয়েদের সজ্জায় টিপ বা ফোঁটার চলন আজও রয়েছে। কিন্তু চারুশিল্পে এই ফোঁটার ব্যবহার হয়েছে নানা ভাবে। ভারতীয় চিত্রকলায় অলঙ্করণে এবং মূর্তি গঠনে নানা আকারে যে ফোঁটার ব্যবহার হয়েছে তা প্রাচীন শিল্পকলা দেখলে বোঝা যায়। এবং রচনাকৌশলের দক্ষতা রসিক-মনে বিস্ময় জাগায়। বাংলার পটুয়াদের যাঁরা পটচিত্র অঙ্কন করতে দেখেছেন এবং তাঁদের শিল্পধারার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত, তাঁরা জানেন এই শিল্পীরা ফোঁটাকে কত-ভাবে সাজিয়েছেন। পটুয়াদের চিত্রে অলঙ্কার রচনায়—যেমন হাতের বাজু, রতনচূড়, গলার হার, পায়ের নূপুর, মাথার মুকুট এমনি কত অলঙ্কারে ফোঁটা দিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে।

কয়েকটি ফোঁটার লিখনে চিত্রের বিষয়-বস্তু কিভাবে পরিস্ফুট হয় ও সৌন্দর্য-মণ্ডিত হয়, তার একটি সুন্দর কাহিনী উল্লেখ করছি। এক বৃদ্ধ দক্ষ পটুয়া একবার এক রাজপরিবারের জন্য কয়েকখানি চিত্র রচনার ভার পান। চিত্রের বিষয়বস্তু কৃষ্ণলীলা। শিল্পী বিভিন্ন চিত্রের মধ্যে একখানি আঁকলেন বিরহিনী রাধা। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের প্রতীক্ষায় বসে আছেন। ক্রমে নিশি ভোর হয়, কিন্তু কৃষ্ণের দর্শন মেলে না। সখীরা নানা কথায় শ্রীরাধিকাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, ভুলিয়ে রাখছেন। কিন্তু শ্রীরাধার কৃষ্ণের জন্য মন-প্রাণ ব্যাকুল।

একদিন মহারাজা চিত্রখানি দেখলেন। বেশ খুঁটিয়ে নিবিষ্ট মনে চিত্রের অঙ্কন-কৌশল, ভাব, অলঙ্করণ সমস্ত দেখলেন। শ্রীরাধার অন্তরবেদনা, মুখভঙ্গিতে সুন্দর ফুটে উঠেছে। কিন্তু মহারাজা একটি বিষয়ে শিল্পীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, তা হ'লো রাত্রির গভীরতা তেমন প্রকাশ পায়নি। নৈশ দৃশ্যের কোথায় যেন কি অভাব রয়েছে।

বৃদ্ধ পটুয়া স্থির দৃষ্টিতে চিত্রখানি আবার দেখলেন। সত্যই মহারাজা যা বলে-ছেন তা ঠিক। ছবি এখনও অসম্পূর্ণ।

শিল্পী চিত্রখানি বাড়ী নিয়ে এলেন। সমস্তদিন ধরে তা বারবার দেখতে থাকেন আর ভাবেন কোথায় রং দিলে, কি করলে রাত্রির গভীরতা প্রকাশ পাবে। দিনমণি অস্ত গেল, সন্ধ্যা হ'লো, তারপর রাত্রি এল। শিল্পীর আহার নেই নিদ্রা নেই, শুধু চিন্তা আর চিন্তা। মনের অস্থিরতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। রাত্রি নিঝুম। শিল্পী ঘরের ভিতর থেকে এবার বাইরে এলেন। উপরে কালো আকাশের দিকে একমনে চেয়ে রইলেন। তারা, আকাশে অসংখ্য তারা জ্বলজ্বল করছে। শিল্পী অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নীচে চারদিকে দৃষ্টি দিলেন। হ্যাঁ, পেয়েছেন তিনি রূপের সন্ধান, নিশীথ রাত্রির রূপ। বৃদ্ধ শিল্পী আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে গেলেন। গভীর রাত্রে নির্জন ঘরে বসে তখনই তাঁর সেই চিত্রে যেখানে অনন্ত আকাশ গাঢ় নীল রংয়ে রচনা করেছেন সেই পশ্চাদপটে কতকগুলি সাদা রংয়ের ফোঁটা দিয়ে দিলেন। এবার ছবিটি দেখে মনে হ'লো আকাশে অসংখ্য তারা। আর মনে হ'লো গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা। চিত্রটি যেন নতুন রূপে অপরূপ হয়ে উঠলো। পরদিন মহারাজা ছবিটি দেখে মুগ্ধ হ'লেন এবং শিল্পীর চিন্তাশক্তির প্রশংসা করে পুরস্কার দিলেন।

এই কাহিনী কতটুকু সত্য তা জানি না, কিন্তু একথা সত্য যে, কয়েকটি ফোঁটার অভাবে চিত্র ও রূপসজ্জা শ্রীহীন হয়।

পোড়ামাটির শিল্পকাজের মধ্যেও ফোঁটার মত ছোট বড় মাটির 'টোপ' দিয়ে নানা অলঙ্কার সৃষ্টি করা হয়েছে। এমন কি গাছের পাতা, ফুল, ফল, জীব-জন্তুর রূপ-সৃষ্টিতে 'টোপ' দিয়ে সাজান হয়েছে।

আলপনা রচনায় ফোঁটা যে কতভাবে ব্যবহার করা হয় তা লেখায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। গ্রামের মেয়েদের ব্রত অনুষ্ঠানে এবং আধুনিক কালের উৎসব অনুষ্ঠানে যে আলপনা দেওয়া হয় তার রেখার বিচিত্র অলঙ্করণের মধ্যে ফোঁটার ব্যবহার অপরি-হার্য। মাটির ঘরের দেওয়ালে এবং দরজার মাথার উপর রং বা সিঁদুর চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি অথবা মঙ্গলচিহ্ন রচনা করা হয়।

বাংলাদেশের পূজা-পার্বণে যে দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণ করা হয় তাতে আজও 'ডাকের সাজে'র চলন আছে। ডাকের সাজে যে 'চুমকি' ব্যবহার করা হয় তাও ফোঁটার আকার ছাড়া আর কিছু নয়। এই গোলা-কার ছোট বড় আকারের চুমকি না থাকলে 'ডাকের সাজ' অসম্পূর্ণ থাকে। দেবীর অংগসজ্জায় নানা অলঙ্কারে এবং কাপড়ের 'আঁচলা' ও 'কল্কা' প্রভৃতি রচনায় নানা রংয়ের চুমকি বা ফোঁটা ব্যবহার করা হয়।

বস্ত্রশিল্পে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত এই ফোঁটার সাহায্যে পাড়ের নানারকম নক্সা করা হয়েছে। এবং আজও ছাপা শাড়ী ও অন্যান্য কতরকম কাপড়ে নিত্য নতুন ডিজাইনে ফোঁটা ব্যবহার করা হচ্ছে। সুতরাং একথা অবশ্যই বলা যায় ভারতের চারু ও কারু শিল্পে গঠন এবং সৌন্দর্য সৃষ্টিতে অলঙ্করণ রচনায় আধুনিক রুচি অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটলেও কিন্তু আধুনিক কালে ভারতের নবীন এবং প্রবীণ শিল্পীদের অলঙ্করণ কাজে তাই ফোঁটা কিন্তু বরবাদ হয়ে যায়নি। আধুনিককালে ভারতের নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদের অলঙ্করণ কাজে তাই ফোঁটার ছন্দ ছাঁদের রকমফের দেখা যায়। প্রবীণ শিল্পী যামিনী রায় মহাশয়ের চিত্রকলা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা অবশ্যই লক্ষ্য করে-ছেন এই প্রবীণ জাতশিল্পী ফোঁটাকে কত ভাবে রূপ দিয়েছেন। 'নন্দলাল বসু মহাশয়ও তাঁর নানা শিল্পরচনার মধ্যে এই সামান্য ফোঁটাকে অলঙ্কাররূপে ব্যবহার করেছেন। বর্তমানে শিল্পকলা ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। বর্ণলেপন এবং অঙ্কন ধারার কত পরিবর্তন হচ্ছে, অলঙ্করণের মধ্যে ফুটে উঠছে ফোঁটার নিত্য নব ছন্দিত বিচিত্র রূপে। প্রকরণগত হাজারো ফারাক সত্ত্বেও এবং যুগে যুগে কালে কালে রূপ-রীতির বদল ঘটলেও প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত সকল শিল্পী তাঁদের রূপসৃষ্টিতে এই ফোঁটাকে সাদরে স্থান দিয়েছেন এবং সৌন্দর্যের প্রতীক রূপে গ্রহণ করেছেন।

ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষ চলে। পায়ের সঙ্গে মনটাও যদি চলে তবে বহু বিচিত্র জিনিস চোখে পড়ে—জীবজগৎ ও মানুষের বিভিন্ন দিক। তেমনই একটা দেখানোর জন্যে একটা পুরানো কাহিনীর অবতারণা। একদিকে শিক্ষিত সমাজের কত ওপরে থেকেও মানুষ অবস্থা বিশেষে কত নীচে নেমে যেতে পারে, অপরদিকে যাকে নীচ বলে ধরা হয় তার মধ্যেও কত মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সেইটুকু দেখানোর জন্যে একটা নিকৃষ্টতম পরিস্থিতি লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরা। জানি না এটার আর কোন সার্থকতা আছে কিনা।

একবার দুর্গাপুজোর নিমন্ত্রণ পেলা[ম] এক সুপ্রসিদ্ধ লোকের দেশের বাড়ীতে যাবার জন্যে। একটা জঘন্য ঘটনার সঙ্গে ভদ্রলোকটির নাম না জড়ানোই ভাল। প্রসিদ্ধ লোকটির নাম ধরা যাক স্বর্গী[য়] নধর কর। তিনি ছিলেন কলকাতা[র] কয়েকটি বিখ্যাত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সর্বম[য়] কর্তা। দেশেও ছিল জমিদারি। রাজনৈতি[ক] প্রতিষ্ঠাও বড় কম ছিল না।

তাঁর এক ভাই অধর, চটুরাজ আর আ[মি] নধর করের অফিসে কাজ করি। তাছা[ড়া] আর যা করতাম তা স্বর্গীয় নধর করে[র]

নামটা ইতিহাসের পাতায় নধর রূপে থাকার পাথেয় যোগান দিয়েছিল মাত্র। অধর কিন্তু তাতে ছিল না। তাই ইতর-জনের চোখে আমাদের দুজনের খাতিরটা ছিল বেশী। ঠিক তা নয়, মইয়ের সিঁড়ির মতো কাজে লাগানো।

সেবার পুজোয় নধর করের কলকাতার বাড়ী থেকেও সবাই চলেছে দেশের বাড়ীতে। তাছাড়া অফিসের অনেক কর্মচারীও আছে, তারা যায় যে যার বাড়ীতে বাৎসরিক ছুটিতে। তবে সদর শহর পর্যন্ত সকলকেই যেতে হবে। অত বড় পার্টির মধ্যে থেকেও আমরা তিনজন যেন একটা স্বতন্ত্র পার্টি। এটা নিয়ে অপর কারো মাথাব্যথা হয়নি।

কলকাতা থেকে রওনা দিলাম সন্ধ্যায়। পথে কিছু অদলবদল ছিল, সে সব শেষ করে সদর শহরটায় পৌঁছলাম সকালে। সেখানে নধর কর নতুন বাড়ী কিনেছেন। নদীর ধারে, সাহেবি কেতায় সাজানো। তখন পর্যন্ত কর্তা বাড়ীটি দেখেন নি। আগেই ঠিক ছিল দুপুরটা সেখানে থাকা হবে। বিকেলে রওনা দিলেই সন্ধ্যের আগে পৌঁছনো যাবে গাঁয়ের বাড়ীতে।

এইখানে রজনী দাসের সঙ্গে দেখা। অবশ্য সে এসেছে বড়কর্তার সঙ্গে দেখা করতে। আমাদের সঙ্গে দেখাটা ফাউ মাত্র। রজনী নধর করের এস্টেটের সদর উকিল. বড় দঁদে লোক। সে প্রায়ই কলকাতায় যায় কার্যোপলক্ষে। তাই আমাদের সঙ্গে বিশেষ পরিচয়, বন্ধুত্বও। কলকাতায় গেলে আমরা তাকে খাতির যত্ন করি। তার পাল্টা দেবার সুযোগ না পেয়ে বড় দুঃখিত হল সে। একটা রাত না থাকলে তা সম্ভবও হয় না। অতএব ফিরতি মুখে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করবার ইচ্ছা জানিয়ে, বা নোটিশ জারি করে রাখল।

সে বছর বাংলা দেশে অনেক রাজ-নৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। তার সঙ্গে নধর করের ছিল সম্যক যোগাযোগ। এবং সেই জন্যে তার পক্ষে দেশে যাওয়াটাও এক বিশেষ ব্যাপার হয়ে ওঠে। নানা লোক তাঁর দর্শনাভিলাষী, নানা গ্রাম থেকে তাঁর আমন্ত্রণ আসে। তার কিছু ভাগ আমরাও পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে আমরাও চারপাশে ভোজ খেয়ে বেড়িয়েছি। বর্ষার জলটা তখনো মাঠঘাট থেকে নেমে যায় নি। তাই সে অঞ্চলে তখনও এক পাড়া থেকে অন্য পাড়া বা গ্রামে যেতে হয় নৌকোয়। সেই জলের গন্ধ, চারপাশের দৃশ্য, গ্রামের সকলের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ চাহনি, তাদের আতিথেয়তা, ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ও অপরাপর সরকারি কর্মচারীর কার্যকলাপ —এসব বিষয়ে বলবার মতো অনেক কথা আছে। সেসব অন্যত্র চলতে পারে, এখানে নয়।

নিজের বাড়ীর দুর্গাপুজো বহু দিন আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। তাই নিতান্ত আত্মীয়সম একজনের বাড়ীতে থেকে পুজো-টার সকল আনন্দ পেলাম, দুঃখও পেলাম। আনন্দ, কারণ বহু দিন পর এমন এক গ্রামের পুজোয় যে অনাবিল আনন্দ পেলাম যাতে আমি আশৈশব অভ্যস্ত। সেটাই মনের মধ্যে বড় হয়ে উঠে দুঃখ দিল। কারণ, নিজের পৈত্রিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে আজ সেটা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। কোন দিন কি এমন ক্ষমতা হবে যে নিজের গ্রামে গিয়ে সকল গ্রামবাসীর মধ্যে এমন আনন্দে কয়েকটা দিন প্রতিবছর কাটাতে পারব! তখন সে সব কথা মনে উঠে মনটাকে মোচড় দিয়েছে, আজ আর তেমন দেয় না। সে স্বপ্নের শেষ হয়ে গেছে পাকি-স্তানের জন্ম হবার সঙ্গে।

বিজয়া-দশমী পার হল। লক্ষ্মীপুজোর পরই আমাদের অফিস। তাই ফেরবার সময় শুধু আমরা তিনজন আর অধরের চাকর। আমরা এলাম ট্রেনে, বিকেলেই পৌঁছে গেলাম শহরে। নধর কর আসছেন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের লঞ্চে। শহরে পৌঁছে ম্যাজি-স্ট্রেটসাহেবের বাড়ী ডিনার খেয়ে বাড়ী ফিরতে হবে অনেক রাত।

আমরা তিনজনই এক গোত্রের। অধরের সঙ্গে তার বাড়ীতে আত্মীয়কুটুম্বের আন্ত-রিক ব্যবহারের স্বাদ পেয়েছি। তার ওপর আর একটার স্বাদ পেলেই না সব পূর্ণ হত। কিন্তু তাতে একটা অন্তরায়। বাড়ীর বাইরের দিকে, অর্থাৎ বারবাড়ীতে নধর করের বসবাস। সেখান থেকে তিনি কোন দিকে যান না, সবাই সেখানে যায়। যত ভিড় ঐখানে, তিনি যেখানে বসে থাকেন। তাঁর দুটি অদৃশ্য চক্ষু কিন্তু সকলের ওপর। তা দিয়ে তিনি সব দেখেন, সকলের সব খবর রাখেন। অপরকে নিয়ে কোন ভাবনা নেই, যত ভাবনা আমাদের নিয়ে। আমরাও সে খবর রাখি। তাই চলতে হয় বড় সাবধানে। শহরে ফিরে, এতদিন পর একটা ফাঁক-ফুরসৎ পাওয়া গেল। অত রাত করে ফিরে তিনি আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে কথা বলতে আসবেন না। অতএব ফ্রি ল্যান্স।

বাইরে গেলে লোকবিশেষের ভোগ-বাসনা হেরফের করে নেবার ইচ্ছাটা যেন চাগাড় দিয়ে ওঠে। যেটা কদিন ধরে দম আটকে ছিল, সেটা বেরিয়ে আসবার একটা সুযোগ পেল। চট্টরাজের নামটা সংক্ষেপ করে বললাম—রাজা, সন্ধ্যাটা কি করে কাটানো যায়?

কথাটা চট্টরাজ লুফে নিয়ে, আমায় অমাত্যের আসনে বসাল। সে তৎপর জবাব দিল—তুমিই বল না মন্ত্রী, কি করা যায়!

আমাদের দুজনের পরিহাসের আদান-প্রদানটা ভাঁড়ামিতে পরিণত করতে, অধর আমাকে একটা ঠোকর দিয়ে বললে—জ্বালার ছিডা দিছ্ছ, থা বেডা লগারের কৌতকা।

সেটা মোলায়েম করে দিতে বললাম—আসল মন্ত্রী যার হাতে লেখে, তার মন্ত্রী!

একটা ঝাঁকানি দিয়ে অধর বললে—হ বেডা, অহনে ঐ আনন্দে থাক!

বেশ রাজসিক চালে চট্টরাজ হাসল—ঠিক আছে, তাহলে মন্ত্রী চটপট একটা প্রোগ্রাম দাখিল করো সন্ধ্যের জন্যে।

—আফনেরা রাজা-মন্ত্রী তো খুব প্রোগ্রাম করেন, এই গরিবটারে কি বেজিকের দলে ফেলাইলেন নি?

তিনজনই একসঙ্গে চোখ ফিরিয়ে দেখি —রজনী।

তাকে দেখামাত্র মনে পড়ল—যাবার সময় সে এমনই একটা নোটিশ জারি করে রেখেছিল। সকলেরই যেন ফাঁসী হারাবার জোগাড়। প্রবলেম সল্‌ভড।

পাশ্চাত্য জগতে ডিনারের মেনুটা ছাড়া সবই প্রায় লুকোছাপা—শেষ মুহূর্তে সরপ্রাইজ। মেনুটা খুলেও যেন ঢেকে রাখে ফরাসী ভাষার আবরণে। তাই করে যেন স্বাদটা বাড়ায়। আমাদের দেশে ওসবের বালাই নেই। রজনী তৈরি হয়েই এসেছে। প্যাকেট খুলে দেখাল আসল বস্তু—সিগারেট ও বোতল দুটোরই এক মার্কা, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। বাঃ! কি সুন্দর মিল তার পছন্দের! সবাই তাকে তারিফ করলাম। একটু পর আরো মিল পাওয়া যাবে।

একটা মাইফেলের ব্যবস্থাও হয়েছে। আর দেরী নয়, চটপট বেরিয়ে পড়া চল। পথে রজনী কত বিনয় করল। সে বললে —আপনাদের এন্টারটেন করবার মতো স্থান এখানে নেই। তবে যেখানে যাচ্ছি—বেস্ট ইন দা টাউন।

সবাই অমন বিনয় করে, ওসব নতুন কিছু নয়। তার পছন্দ সম্বন্ধে সবাই নিঃসংশয় —ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট দেখার পর। রাজা বললে— কিছু ভাববেন না। আমাদের একটা বসবার জায়গা হলেই হবে। তাতো আপনি ঠিক করেছেন—বেস্ট ইন দা টাউন! আবার কি চাই?

বড় রাস্তা থেকে সুট করে ঢুকে গেলাম একটা গলিতে। দু-পাশে কয়েকটা খুব পুরানো একতলা বাড়ী, তারই একটার মধ্যে ঢোকা হল। বাড়ীটার দেওয়ালের বালি মাঝে মাঝে খসা। কোথাও একটা চাপড়া হেলে আছে, যেন পড়ে আর কি! তা হোক। যে শহরে বাবুদেরই বাস টিনের চালের ঘরে, সেখানে এটা তো দালান। দালানটা দাঁত খিঁচিয়ে অভ্যর্থনা করল। এই যা। তা অমন হয়। নিশ্চয়ই ভেতরে মন মাত করে দেবে।

বারান্ডার ভেতর দিয়ে গিয়ে পৌঁছলাম একটা এঁদো সেঁতসেঁতে ঘরে। তবে যে তাতে চুণকাম হয়েছিল তা বোঝা যায় না। হয়তো শতখানেক বছর আগে যখন বাড়ীটা তৈরি হয়েছিল তখন তা হয়ে থাকবে। ঘরটা বেশ লম্বা, কিন্তু পাশে তেমন নয়। মেঝের অর্ধেকটায় ধপধপে ঢালা বিছানা, বাকী অর্ধেকে শীতলপাটি বিছানো—মাঝখানে বাইরে যাবার দরজা।

মাথার ওপর বনবন করে ঘুরছে একটা ছত্রিশ ইঞ্চি পাখা, জরদার দোকানের মত। তবে ঢুকে যা দেখলাম তা-ও ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। অর্থাৎ ঘরে প্রবেশমাত্র অভ্যর্থনার বহরে কৃষ্ণাঙ্গী গৃহাধীশ্বরীর দন্তরুচি কৌমুদী বিকশিত হয়ে উঠল। তার ছিপছিপে দেহটি হিল্লোলিত হয়ে উঠে যেন কত রূপগুণ জাহির করল। আধুনিক কায়দায় দেহটাকে জড়িয়ে রয়েছে একটা টকটকে লাল সিল্কের শাড়ি। হাতে ও গলায় বেশ ভারী সোনার গয়না তো আছেই, তারও ওপর একটা মেখলা। মস্ত বেমানান একটা নাকছাবি ঢেকে রেখেছে নাকের একটা পাশ, কানেও ঝুলছে ঝুমকো। অর্থাৎ তার চলনটাও যেন সিধে নয়।

রাজার সঙ্গে আমার একটা দৃষ্টি বিনিময় হল। অধরের নিজের দেশ, সে জানে এখানকার হালচাল। তবে অনেক দিন তার সরাসরি যোগাযোগ নেই এসবের সঙ্গে, এতটা হয়তো আন্দাজ করে উঠতে পারে নি। রজনী বুঝল, কি বুঝল না। আমাদের সঙ্গে কলকাতায় যা দেখেছে, তাতে না বোঝার কথা নয়। তবে বেচারা কি করবে! আগেই তো জানিয়েছে—বেস্ট ইন দা টাউন! পূর্ব বাংলার সেই টাউনটিকে তো সে ঢেলে সাজতে পারে না।

ফাঁকটা যতবড়ই হোক, রজনী সেটা পুষিয়ে দিতে চায় খাতির করে। মেয়েটিকেও সে আগে থাকতে বুঝিয়েসুঝিয়ে তৈরি করে রেখেছে। মন না বসলেও, দেহকটা বসল সেই বিছানার একপাশে। ওদের দুজনের খাতির-যত্নের অন্ত নেই, কিন্তু অভ্যাগতদের মুখ গম্ভীর। রজনী ভেবে নিল মৌতাতের সময় কয়েকটা রাউন্ড হয়ে গেলেই মেজাজ আসবে। তাই হল, তবু কারো মুখে একটু হাসি ফুটল না। যেন শ্মশানের কাজ শেষ করে সবাই বসেছে সেখানে। অথবা এমনই একটা ভাব সকলের। শব্দের মধ্যে—সোডার বোতল খোলা, গেলাসে মাল ঢালা, আর সিগারেট টানা। ঐ পাখাটা সশব্দে না ঘুরলে বোধ হয় নিঃশ্বাসটাও চেনা যেত এক-একজনের।

রজনীর নির্দেশে মেয়েটি গান গাইল কয়েকটা, কিন্তু জমল না। রজনী ছাড়া আর কোন সমঝদার পেল না। যাদের তৃপ্ত করতে গাওয়া তারা শুনল কি না, তা-ও বোঝা গেল না। গানবাজনা ও সেবাযত্ন দিয়ে খাতির সে যতই করতে ব্যস্ত হোক, তার মধ্যে একটা আড়ষ্ট ভাবও আছে। সেটা তার এসেছে আমাদের দেখার পর থেকে। তার ঘরে এসে লোকগুলো যদি মুখ গুমরে বসে থাকতে বদ্ধপ্রতিজ্ঞ, তবে সে বেচারা আর করে কি?

ওরা বোঝে, কে কেমন লোক! তারই প্রতিক্রিয়া মেয়েটির মনে, মুখে চোখে। মনের সঙ্কোচ তার দেহটাকেও যেন সঙ্কুচিত করে দিয়েছে। তার নাড়ী যেন হাওয়া ঠেলতে চায় না গানের প্রচেষ্টায়। গলায় যেন ল্যারিনজাইটিস হয়েছে। জিবটা কেঁপে সব বেসুরো করে দিচ্ছে। স্মৃতিশক্তিও বিদ্রোহী। গানের কথায় ভুল করে মাঝে মাঝে জিবটা কাটছে, মা-কালীর মতো।

সব দেখেশুনে রজনী হাল ছেড়ে দিয়েছে। সে বারবার দুঃখ প্রকাশ করছে—অভ্যাগতদের ফূর্তি দিতে না পারায় জন্যে, কষ্ট দেবার জন্যে।

মেয়েটি তা শোনে—তার মুখ হয় ফ্যাকাশে। তার বেসাতীর সঙ্গে ব্যথা-বেদনার সম্যক সম্বন্ধ। তাই অন্তরে যেন অসহ্য বেদনা। এমন তার হয়নি কখনো। তা তো হবেই। সবাই তো শ্রীকৃষ্ণের বাধ্য হয়ে চলতে পারে না। কাজ করে, ফলাফলও আশা করে সবাই। এখানে ফল উল্টো। তবুও সে করে চলেছে। মানুষ যতটা পারে সে করে চলেছে ততটা, তারও বেশী। হয়তো রজনীর খাতিরে সে অতটা করছে, অতটা তাচ্ছিল্য সহ্যও করছে।

বড় কষ্ট হল মেয়েটার অবস্থা দেখে। রাজাকে চুপি চুপি বললাম—অনিবার্যকে দুঃখের পরিস্থিতিতে টেনে নিয়ে কি লাভ! এরই মধ্যে যতটা সম্ভব করে নেওয়া যাক, সুখের ব্যবস্থা। কয়েকটা ঘণ্টা বইতো!

রাজা সিধে হয়ে বসল, বলল—ঠিক বলেছ! যথার্থ মন্ত্রীর কাজ করেছ। আচ্ছা তাই হচ্ছে।

তারপর সে যেন ঘরটাকে একটা ধমক দিয়ে বলল—বেচারা একলা এত কাজ করছে, তার ওপর এতক্ষণ গান গাইছে। তার কষ্ট হচ্ছে না!—মন্ত্রী, তাকে জিরেন দাও। এবার তোমার পালা। তুমি গান ধর।

একটা দমকা বাতাসে তার মনের গগন যেন মেঘমুক্ত হল। এইটুকু সহানুভূতির কথা মেয়েটিকে বড় খুশী করল। যেন অমাবস্যার আকাশে চাঁদ দেখা দিল। তার মুখের ওপর দিয়ে একটা তৃপ্তিপূর্ণ হাসির ঝলক খেলে গেল। আমাদের সঙ্গে তার হাসির যোগাযোগ এই প্রথম। এর আগে তার সে চেষ্টা উৎসাহের অভাবে মুখের ওপর ভেসে ওঠার সঙ্গেই মিলিয়ে গেছে। সাগ্রহে সে বাজনাটা আমার সামনে এগিয়ে দিল।

রাজা যেন রেডিওর প্রোগ্রাম আনাউনসার। বাজনাটায় হাত দেবামাত্র ঘোষণা করল—ঠুংরি গাও।

—আমি কি ঠুংরি জানি?

—এক থাপ্পড় মেরে এখান থেকে বার করে দেব। বলে, রাজা তার লম্বা হাতটা তুলে ধরলো।

—বাপরে! বলেই, হারমোনিয়মটায় সুর ঠেলে বার করি —আ-া-া-া!

এই প্রহসনে সকলেই জোর গলায় হেসে ফাটল। মেয়েটিও বাদ দেয় নি। ঘরখানায় এই প্রথম উঠল বারোয়ারি হাসির দমকা ঝলক।

গান শুরু হল—

 লোয়ে লোয়ে মুখপর
  বেসর শোহে—

সকলেই খুশী। বেশী খুশী রজনী আর মেয়েটি।

গান থামতেই রাজা বলল—উঁ, বেসর! ব্যাসর দ্যাখলা কই? অর নাকে তো একটা নাকছাবি।

অধর আর রজনীর কথায় জেলার ঢং আছে। রাজার আর আমার—এপার-ওপার দুটো কথাই আসে।

রাজার চুটকিতে মেয়েটির দেহ একটু সঙ্কুচিত হল। মুচকি হেসে হাত দিয়ে তার নাকছাবিটা ঢাকল।

—ব্যাসর দ্যাখলাম তোমার নাকে।

এবার হাসির টালটা সামলাতে গিয়ে সে বেসামাল হল। মেয়েটির হাতটা সরে গেল নাক থেকে।

—হোইছে হোইছে, আর ফাইজলামি কোরতে হোইবো না। একটা রবিঠাকুরের গান গাও। না হোইলে এক থাপ্পড়—

—লাগবো না, লাগবো না—এই গাইতে আছি।

আবার সবাই হেসে নিল। গানও শুরু হল সেই হাসি ঠেলে।

বঁধু কোন মায়া লাগলো চোখে—

গান বন্ধ হতে রাজা বলে উঠল—উঃ, খুব যে মায়া চোখে! রজনী, সাবধান! শ্রীমতী কিন্তু গেল।

রজনীও কম যায় না, সে তৎপর সায় দিয়ে বললে—আরে ভাই, অরা তো যাওনের জন্যই বইসা আছে। ঠেকাইবো কেডা!

শ্রীমতী পড়ল মহামুশকিলে, অর্থাৎ মহালজ্জায়। সে মুখ ফিরিয়ে নিল। নিজের দেহটা দিয়ে নিজেকে আড়াল করে লুকিয়ে রইল। একটু হাসল, যার ঢেউটা পেট থেকে উঠে তার বন্ধ মুখের মধ্যেই সংযত ও আবদ্ধ থাকল।

রাজা যেন রজনীর কথাটা শুনতে পেল না, মেয়েটার কাণ্ডও দেখতে পেল না। সে বললে—থামলা ক্যান্? শিগ্গির গান ধর। না হোইলে এক—

—থাপ্পড়। রাজার কথাটা কেটে ছিনিয়ে নিয়ে বললাম—নইলে এক থাপ্পড়! থাক তার দরকার নেই।

এবারও হাসির রোল ভেদ করে গানের সুর উঠল—

 প্রাণের পরে নুয়ে গেল
 বসন্তেরি বাতাসটুকুর মত—

মেয়েটির নাম মনে নেই। আদর করে হোক, অথবা ডাক নাম বলেই হোক, রজনী তাকে ডাকছিল—বুঁচি। নাক তার মোটেই বোঁচা নয়। তবে সব মিলিয়ে মনে হয়—তার গা থেকে তখনো মেঠো গন্ধ যায় নি। এটা একটা আন্দাজ মাত্র, সঠিক বলা যায় না। এরা চিনে ফেলে সবাইকে, এদের চেনা দুষ্কর। গান থামতেই গেলাসটা ভরতি করে সে দরাজ হাতে ধরল আমার সামনে। এতক্ষণ অবশ্য সে-ই পরিবেশন করছিল সব। সেটার মধ্যে ব্যক্ত ছিল দুটি ভাব—কর্তব্যের নিষ্ঠা, আর ত্রুটির সঙ্কোচ!

এবার সে সব নয়—দিল যেন দরিয়ার মতো প্রবহমান

রজনী খুশী হয়ে বলল —হু-হু, মন্ত্রীরে খুব খাতির কর। আইজ তাইন-ই আসরডা জমাইসুন।

রাজার যেন তাতে আপত্তি। তবু একটা মিনমিনে সায় দিল—আইচ্ছা, গেলাসটা শেষ কর। প্রাণের থেইকা বসন্তের হাওয়া টাইনা বাইর কইরা দিমু একটু পরে। এই নেও সিগারেট।—বঁুচি! থামা-থামি নাই। তুমি অনেক-খন জিরান পাইছ। তুমি একটা গাও।

কাজ করতে বললে মেয়েদের খুশী হবার কথা। সেটা পুরুষের আনন্দের কারণ হলে তো কথাই থাকে না। তবু একটু হেলেদুলে—ইচ্ছা ও অনিচ্ছা দুটোই দেখাল। বাজনাটা টেনেও নিল।

ওটা এক শ্রেণীর লজ্জা, এতক্ষণ পর সেটা এসেছে। সে বুঝেছে তখন সেটার দাম পাবে। ঐখানে যত মজা। যারা বোঝে, ওরই মধ্যে রস পায়।

সে গান শুরু করল—

মন কুসুমের রং ভরা
ঐ পিচকারিটি রাধে—

বঁুচির গানের কথায় রজনীর কত না স্মৃতি জড়ানো। তাই যেন তার চোখমুখ বিশেষভাবে নেচে উঠল। সে বলল—মনের এরাম তো রঙে ভরাইছ। এইবার কানডারে লাল কর। ঘুংগুর জোড়া লামেয়া লওছে।

তা বটে। কারো রং ধরেছে মনে, কারো চোখে। তারপর এল কানের পালা। ওসব প্রায় একই কথা। এখানে ধারাবাহিকতার ধার ধারে না কেউ, বিবর্তনের বা ভাবান্তরের বেশী সময় লাগবার কথা নয়। শরতের আঁটির মতো আর কয়েকটা গেলাস পেটে দিলেই সব একাকার হতে পারে। আসমানী তো যখন তখন, নির্বিকল্প সমাধিও অসম্ভব নয়।

ঘুংগুর জোড়া সে হাতে নিল। তার চোখজোড়া সকলের মুখের ওপর বুলিয়ে স্থির হল রজনীর মুখের ওপর। সে বললে —গান গাইবো কে?

আদরের ভঙ্গিতে রাজা তেড়ে উঠল—আইচ্ছা, গান আমি গাইমু। তুমি ঘুংগুর বান্ধ না।

সে ঘুংগুর বেঁধে রাজার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

রাজা অমনি হুকুম দিল একটা নাচের গান ধরতে। নইলে এক থাপ্পড়।

সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়মটা ভেঁপু বাঁশির মতো ভ্যাঁ—করে বেজে উঠল, গানও শুরু হল—

কার মঞ্জির বাজে রিনিঝিনি,
প্রাণের মাঝে সদা বাজে
তারি রাগিণী।

তার সঙ্গে বঁুচি নাচল।

প্রকাশ পেতে হলে বধু চাই, ভাল লাগানো চাই আপনাকে। তাই তো বিশ্ব-সংসারে কত আয়োজন। মানুষ শব্দ থেকে সৃষ্টি করে সুর, রেখা থেকে রূপ। শব্দ ও রেখা দুটোই হাতের সামনে। কটা মানুষ তার ব্যবহার জানে! তাতে চাই মনের উৎকর্ষ, নিপুণ হাত।

নগ্ন চোখে রূপটা ধরা পড়ে না। চাই রেখার বিচারশক্তি। যা ভেবেছিলাম তা তো নয়। মেয়েটি বেশ স্মার্ট, শেষের গানখানা বেশ গেয়েছে। কালোর মান রেখেছে তার কণ্ঠ। নাচ দেখার পর তার রূপ বর্ণনা না করে পারা যায় না। রূপটা এতক্ষণ চোখেই পড়েনি, নয়তো ঢাকা ছিল। যেন—তন্বী শ্যামা শিখরীদশনা পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠি। তার বঙ্কিম তনুরেখার প্রান্ত হতে নৃত্যের ছন্দ-স্পন্দনের অনুরণন হয়ে নাচিয়ে তুলেছে সকলের মন। অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় তার পায়ের পাতা, হাতের আঙুল। বাহু দুটি যেন মৃণালের মতো লীলায়িত হয়ে এনেছে নব-বসন্তের সমীরণ। নূপুরের গুঞ্জরণ নাচিয়ে তুলেছে যেন বসন্তপরশ-কম্পিত সদ্যমুকুলিত ফুলের পাপড়ি। পক্ক বিম্বের মতো দুটি ওষ্ঠে পিষ্ট হাসি দিয়ে পুনরাবৃত্তি করে চলেছে কত যুগ-যুগান্তরের কৌতূহলভরা কাহিনী। স্বপ্নাবিষ্ট তার দুটি চক্ষু দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে যায় স্বপ্নলোকে। তার তির্যক চাহনি কত কথা জানিয়ে গেল গোপন ইঙ্গিতে।

এদেরই পূর্বকুল ইন্দ্রের সভায় কত কাজ করেছে দেবলোকের হিতার্থে, উত্তর-কালে মর্তলোকে হয়েছে ইতরজনের সেবা-ব্রতী—বৈশ্যা। শব্দের 'ঐ'-কারটা বদলে 'এ'-কার দিয়ে হয়েছে একটা কদর্য শব্দের সৃষ্টি। তাই আজ আর তার মর্যাদা নেই তেমন।

আনন্দ-সৌরভে ভরে গেল ঘরখানা। সকলের মনে আতর মাখিয়ে নাচ বন্ধ হল। সেদিন সে রজনীর মান রেখেছে। সেই বঁুচি আজ যদি লণ্ডনে আসত মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতায়, তবে দেশের মানও রাখতে পারত। যেখানে গায়ের রং দিয়ে রূপের বিচার হয় না, হয় রেখা দিয়ে, রেখার ভেতরের বস্তুটির ওজন দিয়ে। রীতা ফারিয়ার কাঁচা চেহারাটা দেখেই তা বোঝা গেছে। কিন্তু বঁাচি আজ কোথায়! সাত সমুদ্রের পারে বসে একজন তার কথা ভাবছে—তার কিছুই সে জানতে পারল না।

একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য মানুষ কত করে, এটাও তাই। দৈবাৎ যদি এটা বঁুচির চোখে পড়ে যায়! তবে নিশ্চয়ই সে জানবে। কত আনন্দ হবে তার, ব্যথায় বুকটা দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে যেতে চাইবে। কত সুখের ভাঙ্গন সেটা!

দুঃখ, যে সেই বঁুচি পাবে না এটা। তার মাথার ওপর দিয়ে আরো পঁয়ত্রিশটা শীত বয়ে গেছে। বুঝবে, একজন তার কথা রেখেছে। কম আনন্দের সেটা!

গেলাসের বাকীটুকু শেষ হল। তাতে পরিবেশিত হল নতুন রাউণ্ড। এটার স্বাদ যেন বদলে গেছে। যা নিয়ে দেবাসুরে কাড়া-কাড়ি লেগেছিল, এ যেন তাই।

চট্টরাজ এবার সত্যই রাজা। তার সিংহাসন থেকে সে হুকুম করল—এবার মন্ত্রী নাচবে।

নাচিয়ে আমি নই। তবে কার্যক্ষেত্রে নাচতে বাধ্য না হয়ে উপায় থাকে না। যারা অভিজ্ঞ তারা বোঝে, অপরকে বোঝানো দায়। ফুর্তিটা জমিয়ে রসিয়ে তুলতে অনেক উপাদান লাগে। তারই একটা অংশ মাত্র। ডান্স্। তাই এটাতে বিশেষ আপত্তি ছিল। কিন্তু রাজার মনে যেন এক খেয়াল চেপেছে। হঠাৎ সে যেন রজনীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পড়েছে। রজনীকে দেখাবে আমরাও কত বড় বাহাদুর! ওর ভাবটা ভাল লাগল না। নিছক আনন্দের জন্যেও এমন করা যেতে পারে। বাহাদুরী দেখাবার ভাব বাদ দিয়েও অনেক কাজ চলে, এটাও চলত।

শেষ পর্যন্ত থাপ্পড়ের হাত থেকে রক্ষা করতে হল নিজেকে। রাজার নির্দেশে নাচটা শুরু হয় রবি ঠাকুরের গানের সঙ্গে। তার হাতে তবলা দিয়ে অধর গান ধরল।

আজ সবার রঙে রং মেশাতে হবে—

আমাদের দিকে বুঁচিরও দৃষ্টিভঙ্গি ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছিল। এবার যেন তা পূর্ণতা লাভ করল।

মাইফেলটা যে এতখানি উন্নতি লাভ করবে তা স্বপ্নেও ভেবে উঠতে পারে নি রজনী। তার মন আনন্দে উপচে পড়ছিল। সে নিজের হাতে একটা গেলাস বেশ কড়া করে তৈরি করল। বসামাত্র আমায় বকশিস দিল সেটা রজনী। বলল—মন্ত্রী এইবার জিরাইবো। বুঁচি একটা গান ধর।

রজনীও বোধহয় রাজার সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়। যাক, রাজার ভাবটা বদলে গেছে, সে আপত্তি করল না। আসর জমা নিয়ে কথা। সে যেন খুবই খুশী। এই তো চাই।

বুঁচি এখন সহজ সরল। আমাদেরই একজন। বলামাত্র শুরু করল গান।

আমার চোখের জলের পিছল পথে
চলবে কেমন করে,
তোমার পরাণ আমায় না চায় যদি
রাখব না আর ধরে—

গানের সঙ্গে রজনীর চোখে যেন জল গড়িয়ে পড়ল। নেশার সঙ্গে গানের ভাবটা জড়িয়ে বেশ ঘোর হয়ে উঠেছিল। গান থামতে নিজেকে সামলে সে স্মার্ট হয়ে বসল। বুঁচিকে বলল—তোমার চোখের জলে কেউ চোলবো না, তোমারেই তার উপর নাচতে হইবো।

রাজা ও আমি তার প্রস্তাবের তারিফ করলাম। অর্থাৎ বুঁচি নাচবে।

অধর প্রতিবাদ করে বলল—আরে এইডা কয়েন কি? পইড়া গেলে ধরবো কে? যা মন্ত্রী উঠ, তুই লগে থাক। দোহিস্ ফড়ে না জেন্। জাগাটা পিছলা কইরা দিছে চোহের জলে, খরাব কিন্তু!

বটতলায় যাও—নির্ঘাৎ তোমার হিল্লে হয়ে যাবে।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক চলে গেলেন। তাঁর দেওয়া পয়সায় রাজকৃষ্ণ তাঁর বন্ধুকে সংগে নিয়ে একটা মিষ্টির দোকানে আকণ্ঠ ভোজন করলেন—সে যুগে আট আনার মূল্য নেহাৎ কম নয়। যতক্ষণ খাচ্ছিলেন, ক্ষুধার তাড়নায় আর কোন কথা মনে পড়েনি রাজকৃষ্ণের। রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে কিন্তু বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দুটি কথা রাজকৃষ্ণের বার-বার মনে এল। একটি কথা, বই লেখো, দ্বিতীয় কথা, বটতলায় যাও।

'বটতলা'-র তখন দারুণ নামডাক। বই প্রকাশনা ও বিক্রির এতবড় ক্ষেত্র তখন বাংলা দেশের আর কোথায়?

রাজকৃষ্ণ পথের সন্ধান পেলেন। এইবার বই লেখবার পালা। প্রথমে লিখলেন একটি নাটক ও পরে নীতি শিক্ষামূলক কবিতা সংকলন। দুরুদুরু বক্ষে একদিন দুপুরে নাগাদ এলেন বটতলায়। সেখানে কত হাঁকা-হাঁকি, কত লোকের আনাগোনা, রাজকৃষ্ণ তো একেবারে দিশেহারা! কিন্তু দিশেহারা হলে তো চলবে না, বই দুখানার একটা গতি তো করতেই হবে। অতএব দোকানের পর দোকান ঘোরা, সংগে কাতর কণ্ঠে অনুরোধ, মশায়, বই কিনবেন?

কেউ এককথায় রাজকৃষ্ণকে হাঁকিয়ে দেয়। কেউবা পাণ্ডুলিপি দুটি খানিক উল্টেপাল্টে দেখে ফেরত দিয়ে দেয়, আবার কেউ কেউ তো কোন কথাই বলে না। অবশেষে বিকেল নাগাদ এক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে বই দুখানা নেড়েচেড়ে বললেন, আজ কিছু বলতে পারছি না। বই দুখানা আমার কাছে রেখে যাও আর কালকে ঠিক এই রকম সময়ে আমার দোকানে এস। দেখি কি করা যায়।

ভাল কথা, রাজকৃষ্ণের মনে এইবার একটু আশা এল। পাণ্ডুলিপি দুখানা সেই ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে একটা নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন সেদিনকার মত। পরের দিন যথাসময়ে রাজকৃষ্ণ সেই বইয়ের দোকানে হাজির। খবরও খুব ভাল, ভদ্রলোক বই দুখানা নিতে রাজি। এমনকি সেদিনই কিনে নিতে রাজি আছেন। চমৎকার, চমৎকার—রাজকৃষ্ণ মাটিতে দাঁড়িয়ে আছেন না শূন্যে ভাসছেন ভেবে পান না।

দরদস্তুর কেমন হবে? সে ভালই—দুটি বইয়ে পাঁচ টাকা পাঁচ টাকা করে মোট দশ টাকা পাবেন রাজকৃষ্ণ।

তবে কিনা, লেখক হিসেবে নাম থাকবে ঐ প্রকাশক ভদ্রলোকেরই, রাজকৃষ্ণ রায়ের নাম-গন্ধও বই দুখানিতে থাকবে না। আর সত্ত্ব যখন বিক্রিই হয়ে গেল, তখন ভবিষ্যতে এই বই দুখানি থেকে এক পয়সাও পাবেন না রাজকৃষ্ণ।

অবিশ্যি এটা জুলুমবাজী আদৌ নয়, তখনকার লেখকদের বই ছাপাবার সময় প্রকাশকদের এই-ই ছিল দস্তুর। নিজের পয়সায় যে সব লেখক বই ছাপাতেন, তাদের কথা অবশ্য আলাদা।

যাই হোক, রাজকৃষ্ণ খুব খুশী। নগদা-নগদি দশটি টাকা নিয়ে পাণ্ডুলিপি দুটি হস্তান্তরের কাজ মিটে গেল নির্বিঘ্নেই।

যাক একটা বড় দুশ্চিন্তার হাত থেকে তো রেহাই পাওয়া গেল—এই দশ টাকায় তাঁর এক মাসের খোরাক চলবে। [তখনকার যুগে ১০ টাকায় একটা লোকের মাস কেটে যেত।]

খুব দ্রুত লিখতে পারতেন তিনি, ক্রমে ক্রমে খান বারো বই লিখে ফেললেন। ঠিক আগেরই মতো বটতলার বাজারে বিক্রি করতেও অসুবিধে হল না।

সেই প্রকাশক ভদ্রলোক একদিন রাজকৃষ্ণকে কিঞ্চিৎ উৎসাহ দিয়ে বললেন, লিখে যাও হে, তোমার হবে। এই নাও, গোটা দশেক বাড়তি টাকা।

ব্যাপারখানা কি? রাজকৃষ্ণও এতদিনে সেয়ানা হয়েছেন। লুকিয়ে খবর নিলেন। জানতে দেরি হল না তাঁর বইগুলো বেশ চলছে। সেই কারণেই প্রকাশক অতটা দিল-দরিয়া।

কিছুদিন ধরেই রাজকৃষ্ণের মনে একথাটা ক্রমাগত খোঁচা দিচ্ছে এরকমভাবে বইগুলো বিক্রি করে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। একে তো তার নাম কেউ জানছে না, দ্বিতীয়তঃ তাড়াহুড়ো করে কোনরকমে এক-একখানা বই লিখে প্রকাশকের হাতে তুলে দিয়ে কিছু টাকা আয়ের দিকেই প্রবণতাটা বেড়ে যাচ্ছে। ভাল লেখার দিকে আর মন যাচ্ছে না একেবারেই। কয়েকদিন ধরেই আপত্তিটা মনে পাক খাচ্ছিলো, আজকের ঘটনায় তা দৃঢ়মূল হল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ রাস্তাটা ছাড়তেই হবে। একটা উপায়ের কথাও মনের কোনে উঁকিঝুঁকি মারছে বটে।

সামান্য আয় থেকেই তিলতিল করে কিছু সঞ্চয় করেছেন তিনি, আরও কিছু জমিয়ে নিজের একখানা ভাল বই নিজেই প্রকাশ করলে কেমন হয়? আরও দুচারখানা বই বটতলার সেই প্রকাশককে দিয়ে আরও কিছু টাকা সংগ্রহ করলেন রাজকৃষ্ণ। এই সমস্ত সঞ্চয় উজাড় করে স্বনামে প্রকাশ করলেন তাঁর কবিতার সংকলন 'অবসর-সরোজিনী' (১৮৭১)।

ইতিমধ্যে আরও কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। কিছুদিনের জন্য নিউ বেঙ্গল প্রেসে কাজ করেছেন রাজকৃষ্ণ, এবং এডুকেশন গেজেট, আর্যদর্শন, জ্ঞানাঙ্কুর প্রভৃতি সাময়িক পত্রে লেখা পাঠিয়েছেন। সুখের কথা, বিনিময়ে টাকাপয়সা না পেলেও লেখাগুলি ছাপা হয়েছে।

মেছোবাজারের অ্যালবার্ট প্রেসে ... সরোজিনী' ছাপা হয়েছিল। এই সময়ে ... বিচিত্র ঘটনা ঘটে। অ্যালবার্ট প্রেসের ... ঘোর দুর্দিন। দেখাশোনা করবার ... লোকের অভাবে প্রেসটি উঠে ... অবস্থায়। রাজকৃষ্ণের সপ্রতিভ ... একাগ্র মানসিকতায় অ্যালবার্ট প্রেসের ... খুবই আকৃষ্ট হলেন। তাঁর কাছ ... রাজকৃষ্ণর কাছে প্রস্তাব এল, (১) ... এই প্রেসের তত্ত্বাবধায়ক হোন (২) ... বলে এখন কিছু পাবেন না, শুধু ... প্রয়োজনীয় খরচাটা নিতে পারবেন ... প্রেসের একটা অংশের শেয়ার তিনি ... যদি প্রেসটিকে লাভজনক অবস্থায় ... করাতে পারেন। (৪) নিজের বই এই ... থেকে বিনিপয়সায় ছাপাতে ... রাজকৃষ্ণ। বই ছাপাতে যা খরচ পড়বে ... এখন শুধু খাতায় লেখা থাকবে, ... অ্যালবার্ট প্রেস, রাজকৃষ্ণবাবু ও মা... অবস্থা বুঝে হিসেব-নিকেশ হবে।

রাজকৃষ্ণের পক্ষে এর চেয়ে ভাল ... তো আর কিছুই হতে পারে না ... খাইখরচার ভাবনা নেই, উপরন্তু ... পয়সায় বই ছাপাতে পারা!!

রাজি, রাজি—খুব রাজি, তক্ষুনিই ... অ্যালবার্ট প্রেসের মালিক গিরীশব... তাঁর সম্মতি জানিয়ে এলেন।

এবার আরম্ভ হল এনতার বই ... পালা। বাছবিচারও কিছু নেই, ... সংকলন, গল্প সংকলন, ঐতি... উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস, নাটক, প্র... সব কিছু।

'অবসর সরোজিনী' প্রকাশের ... সংগেই সাহিত্যরসিক মহলের ... পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রথম নাটক ... বিজলী' একদম চলল না। ইতিপূর্বে ... পাঠ্য বই হিসেবে 'কবিতা কৌমুদী' ... ছেড়েছিলেন, চলেতো নি-ই উপরন্তু ... ছি-ছি, করেছে।

ঠিক আছে, রাজকৃষ্ণও দমে যাবা... নন। 'ঘোড়ারডিম' নামে নতুন একখা... প্রকাশ করলেন। উঃ তার কি বিক্রি ... যুগের বইয়ের বাজারেও এক মাসের ... দুটি সংস্করণের মোট বাইশশো কপি ...

কিন্তু এত করেও অ্যালবার্ট ... রাখা গেল না। রাজকৃষ্ণ প্রেসের না... ঝামেলার আংশিক মাত্র সুরাহা ... পেরেছিলেন, সম্পূর্ণভাবে পারেননি। ... মালিক প্রেস বিক্রি করে সেই টাকা ... ব্যবসায়ে লগ্নী করলেন।

অবশ্য এইবার আর রাজকৃষ্ণ আগে... অকূলপাথারে ডুবলেন না, কারণ ত... বইয়ের বাজারে তাঁর খানিকটা নাম হয়ে... স্বাভাবিক কারণেই রাজকৃষ্ণ অ্যালবার্ট ... মালিক গিরীশবাবুর প্রতি হৃদয়ে কৃ... পোষণ করেছেন চিরদিন—পরে তাঁর ক...

[illegible] চক্ষুভরে উৎসর্গ

[illegible] সম্বন্ধ দর্পণ' নামে [illegible] পত্রিকা প্রকাশ করলেন। [illegible] এটি চলল না, এক বছরের [illegible]।

[illegible] রাজকৃষ্ণ দময়ার পরে [illegible] 'বীণা' নামে আবার [illegible] পত্র প্রকাশ করেন। প্রধানতঃ [illegible] প্রকাশ করা হতো। [illegible] এই পত্রিকাটি রীতিমত জন- [illegible]। বস্তুত এই চারটি [illegible] জীবনে সবচেয়ে [illegible] পত্রিকা চলেছে ভাল। কবি, [illegible] চেনে না, এমন [illegible] পরিবারবর্গের [illegible] সমস্ত, কাল কাটিয়ে [illegible] সংসারে [illegible] হাসতে হবে। [illegible] প্রকার হিতৈষিক [illegible] এই [illegible] একটি [illegible] তিনি।

[illegible] একটি সাময়িক পত্র অবসর [illegible] লেখা হল (সেপ্টেম্বর, [illegible] রাজকৃষ্ণ রায়ের রচনা পাঠ [illegible] পুলকিত হয়? এমন [illegible], [illegible] অদ্ভুতভাবে [illegible] কে করিতে পারিয়াছে? [illegible], কখনও নয়নের অশ্রু [illegible] আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে। [illegible] লেখনীতে যে অসাধা- [illegible] আমাদিগের [illegible] তাঁহারে [illegible] জগদীশ্বরের [illegible] রাজকৃষ্ণ রায়ের লেখনী [illegible]।

[illegible] এই সময় অজস্র ধারায় [illegible] কিন্তু [illegible] রাজকৃষ্ণের এই [illegible] অবসানে [illegible]। তাতে প্রচুর [illegible] আসতে [illegible] আনন্দ উপভোগের [illegible] ধরেছিলেন, [illegible] সেখানে অভিনীত [illegible]। এই সঙ্গে [illegible], কখনও [illegible], কখনও [illegible], [illegible] অভিনয় [illegible] এই [illegible] পেশাদার রঙ্গমঞ্চে [illegible] নাটক বেশ জন- [illegible]।

[illegible] রাজকৃষ্ণের মাথায় গেল [illegible] একটি পেশাদার রংগমঞ্চ খুলে তাতে নিজের সমস্ত নাটক-গুলি মঞ্চস্থ করতে পারলে না জানি কত খ্যাতি ও টাকা আসবে।

যে কথা সেই কাজ। পঞ্চম বর্ষের 'মাসিক বীণা' আর প্রকাশই করলেন না। যে সব গ্রাহক অগ্রিম টাকা জমা দিয়েছিলেন, তাঁদের টাকা ফেরত দিয়ে দিলেন। পেশাদার রংগমঞ্চ চালাতে গেলে যে কত মারাত্মক অসুবিধের সৃষ্টি হতে পারে তা তিনি একবার ভেবেও দেখলেন না। দুঃখের কথা, এই সুখের সময়ে তাঁর কিছু মোসাহেব জুটেছিল। তারা তাঁর উৎসাহের আগুনে যথেষ্ট পরিমাণ ঘি ঢেলে দিতে কার্পণ্য করেনি। দু-একজন শুভানুধ্যায়ী অবশ্য রাজকৃষ্ণকে এ পথে না আসতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন। কিন্তু রাজকৃষ্ণকে তাঁর নিয়তি তখন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এই অনুরোধে তিনি কর্ণপাতও করলেন না।

১৮৮৭ খৃস্টাব্দে ঠনঠনের কালীবাড়ীর পাশে 'বীণা রংগভূমির' পত্তন করলেন তিনি। এই 'বীণা' থিয়েটারেই নাটক রচনা, পরিচালনা ও প্রযোজনার সূত্রপাত করলেন রাজকৃষ্ণ রায়। এই সময় থেকেই তাঁর জীবনের মোড় সম্পূর্ণ অন্য রাস্তায় ঘুরে গেল।

এইখানে আমরা একটু থেমে রাজকৃষ্ণ রায়ের সমগ্র সাহিত্য জীবনটি একবার আলোচনা করে নিয়ে পরিশেষে তাঁর শেষ জীবনে অর্থাৎ তাঁর নাট্যজীবনের শেষ অধ্যায়ের আলোচনায় ফিরে যাব।

রাজকৃষ্ণ সারা জীবনে একশোটিরও বেশি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে স্বনামেই প্রকাশিত হয়েছে ৮৯ খানি। যে লেখকের আয়ু ছিল মাত্র ৪৫ বছর, তার পক্ষে এতগুলো গ্রন্থ রচনা করা প্রায় অসম্ভব কাণ্ড বলেই মনে করি। অবশ্য একটা হিসেব দিলেও এযুগের পাঠকেরা চমকে উঠতে পারেন। এই স্বল্পকালস্থায়ী জীবনে রাজকৃষ্ণ স্বনামে যে সব বই প্রকাশ করেছেন, তার মুদ্রিত পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ৭০০০।

কি বিষয়ের ওপর গ্রন্থ রচনা করেননি? যে কোন বিষয়েই কলম চালাতে তাঁর এতটুকু দ্বিধা ছিল না। তাঁর কয়েকখানি বইয়ের নাম করলেই এযুগের পাঠকেরা [illegible] আঁচ করতে পারবেন।

[illegible] (উপন্যাস), তরণীসেন বধ (নাটক), নিভৃত নিবাস (কাব্য), [illegible] ইতিহাস (ইতিহাস), হিন্দী বাংলা বর্ণপরিচয় তুমি ও আমি (প্রেমের গল্প), দুটী শিকারী (উপন্যাস), জীবন সন্ধ্যা (কাব্য), ভারত গাথা (কাব্য), জগা পাগলা (প্রহসন), লোভেন্দ্র গবেন্দ্র (প্রহসন), বেল্লিক বাজারের বিবি (প্রহসন), কঁকর প্রহ্লাদ (ব্যঙ্গ নাটক), মীরাবাই (ঐতিহাসিক নাটক), জীবন সাথী (সামাজিক নাটক), লক্ষহীরা (নাটক), খোস-গল্প, দুই পাখী (গান), হৃদয় তরণী (কবিতা)। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাত খণ্ডে তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয় তাঁর রচনার অংশবিশেষকে নিয়ে।

১৮৮৭ খৃস্টাব্দে কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয় রাজকৃষ্ণের নির্বাচিত কবিতার একটি সংকলন সম্পাদনা করেন। গ্রন্থটির নাম 'কবিতা' ও পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৪৮।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঘটনাটি অভিনব সন্দেহ নেই। অক্ষয় বড়াল মহাশয় ভূমিকায় সম্পাদকের বক্তব্যে বলেন যে, রাজকৃষ্ণ রায় এত লিখেছেন যে একটা মানুষের জীবনে তা পড়ে ওঠা দুঃসাধ্য। অথচ এই ভাল কবিতাগুলি পাঠ না করলে পাঠকেরই ক্ষতি। তাই তিনি রাজকৃষ্ণের সমগ্র রচনা থেকে বেছে বেছে কবিতা চয়ন করে পাঠকদের উপহার দিচ্ছেন। এই বৃহদায়তন 'কবিতা' গ্রন্থখানি রাজকৃষ্ণ রায়ের জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। নিজের গ্রন্থ প্রকাশ ছাড়াও ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে দুই বছরের অমানুষিক চেষ্টায় সাতটি স্বতন্ত্র খণ্ডে বৃহদায়তন সপ্তকাণ্ড রামায়ণ সম্পূর্ণ আকারে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন তিনি।

বারো বছর ধরে চেষ্টা করে (১৮৮০-৯২) ১৬৫০ পৃষ্ঠার তিন খণ্ড ভারত-কোষ অভিধান রচনা করেন। এতেও হল না, সাত বছর চেষ্টা করে (১৮৮৬-৯৩) তিন পর্ব সমগ্র মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুর ফলে মহাভারতের শেষ অংশটি তিনি অবশ্য পুরোপুরি শেষ করে যেতে পারেন নি।

রাজকৃষ্ণ রায়ের অলৌকিক কার্যাবলী সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকেও বিস্মিত করেছিল। ১৮৮৮ খৃস্টাব্দের ৭ই আগস্ট রাজকৃষ্ণকে একটি অযাচিত পত্র লিখে সাহিত্য সম্রাট জানালেন

'আমি আপনার কৃত মহাভারতের পদ্যানুবাদ দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। লোকশিক্ষার্থ মহাভারতের এমন একটা অনুবাদ চাই যাহা সংস্কৃতের অনুযায়ী হইবে, অথচ সাধারণ পাঠকের উপযোগীও হইবে। আপনার কৃত পদ্যানুবাদের দ্বারা উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে। আপনার অনুবাদ সকলের বোধগম্য ও আনন্দ [illegible] হইতেছে। এই কথা [illegible] [illegible]। আপনার ন্যায় কঠোর পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী ভিন্ন আর কাহারও এ কার্য নহে। ভরসা করি আপনি ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন এবং সকল প্রকার বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন ...।'

এই অসামান্য সার্টিফিকেট সম্বন্ধে আর কিছু বলার নেই। এ চিঠি পাওয়ার সৌভাগ্য যাঁর ঘটে, তিনি যে একজন পরম ঈর্ষার পাত্র বলে পরিগণিত হবেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে কি?

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতেও নিয়মিত আসাযাওয়া ছিল রাজকৃষ্ণের। ঠাকুর পরিবারের বিভিন্ন উৎসব ও আনন্দ অনুষ্ঠানের তিনি একজন বিশিষ্ট অতিথি বলে গণ্য হতেন। ১৮৮১ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত 'বাল্মীকি প্রতিভার' প্রথম অভিনয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজকৃষ্ণ। এই অভিনয় দেখে মুগ্ধ রাজকৃষ্ণ 'বৈশাখ সংখ্যা' 'আর্যদর্শনে' বালিকা-প্রতিভা নামে যে প্রশস্তি কবিতাটি লেখেন তা সর্বত্র প্রশংসিত হয়।

এবার এযুগের পাঠকের মনে প্রশ্ন উঠবে জানি, কেমন লিখতেন রাজকৃষ্ণ? সত্যের খাতিরে একথা স্বীকার করতে হবে বাংলা চলনসই লিখলেও, প্রচন্ড পরিশ্রমী হলেও, তিনি প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন না আদৌ। প্রচুর লিখে সমসাময়িক কালের খোরাক যোগালেও পরবর্তীকালের জন্য প্রায় কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। অবশ্য তাঁর সম্পাদিত রামায়ণ, মহাভারত ও ভারত-কোষের মান যে রীতিমত উচুদরের তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং তাঁর অন্যান্য রচনা-গুলির মধ্যেও ওঁর পাণ্ডিত্য, সরসতার চিহ্ন সুস্পষ্ট, এমন কি মধ্যে মধ্যে তাঁর রচনায়, সামান্য হলেও, প্রতিভার স্ফুরণও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু দুঃখের কথা অতিরিক্ত লেখার জন্যই হোক আর অন্য যে কোন কারণেই হোক সে স্ফুরণকে তিনি ধরে রাখতে পারেননি।

তবে সাহিত্য সাধনায় রাজকৃষ্ণ রায়ের অকল্পনীয় পরিশ্রম ও অসামান্য নিষ্ঠা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা থাকবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এবার আমরা তাঁর জীবনের শেষ পর্বে অর্থাৎ নাট্যজীবনে ফিরে যাব। আগেই উল্লেখ করেছি তিনি বীণা থিয়েটার স্থাপন করে নিজের নাটক মঞ্চস্থ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সে যুগে নাটকের স্ত্রী ভূমিকা-গুলি দুভাগে অভিনীত হত। (১) পুরুষের দ্বারা (২) বারবনিতাদের দ্বারা। প্রথম প্রথম রাজকৃষ্ণ তাঁর নাটকের স্ত্রী চরিত্রগুলি পুরুষ দিয়েই অভিনয় করাতেন। বারবনিতা দিয়ে অভিনয় করান না বলে, সুলভ সমাচার ও কুশদহ প্রভৃতি পত্রিকা তাঁর গুণগান করে প্রচুর ঢাক পিটিয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। এক বছরের মধ্যেই তাঁর সমস্ত সঞ্চয় উবে গেল। তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। দেনার জ্বালায় অন্য একটি থিয়েটার কোম্পানীকে বীণা থিয়েটার ভাড়া দিয়ে দিলেন, কিছুদিন পরে আরো একটি দলকে। কিন্তু দেনার হাত থেকে বাঁচার রাস্তা কই? দুঃখের অমানিশা যে আরও গাঢ় হয়ে আসে। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারেন না, রাস্তায় বার হলেই পাওনাদারেরা ছেঁকে ধরে। তবে কি হবে উপায়? কি হবে?

একেবারে মরীয়া হয়ে ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে অনেকগুলি বারবনিতা সংগ্রহ করে মেয়েদের ভূমিকায় মেয়েরা—এই বিজ্ঞাপন দিয়ে আবার নতুন নাটক মঞ্চস্থ করলেন। এবার দেড় বছরের মধ্যে একেবারে সর্বস্বান্ত—পথের ভিখারী। তাঁর সাধের বীণা থিয়েটারও বিক্রি হয়ে গেল। মাথার চুল পর্যন্ত দেনায় বিকি, হতাশায় দুঃখে রাজকৃষ্ণ কিছুদিনের জন্য প্রায় উন্মাদ হয়ে গেলেন।

'অনুসন্ধান' পত্রিকায় ২৯ ডিসেম্বর বিজ্ঞাপন সরাসরি ভিক্ষায় নামলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজ
এই হতভাগ্য বাংল
কবি। দুর্ভাগ্যক্রমে
কবিতাকানন ছাড়িয়
ভূমির সংস্কার কর
তাই তিনি সর্বস্ব
অবস্থায় পতিত।
যদি দেশের সহৃদয়
কিছু কিছু সাহায্য
আর তাঁহার কোন
আজ তিনি সাধারণে
প্রার্থী। এখন সকলে
সাধ্য রাজকৃষ্ণকে
সাহায্য করিয়া তাঁহা
বিপদ হইতে মুক্ত ক
প্রতি এই আমাদের
রোধ।

এই ঘটনার পর আর বেঁচেছিলেন তিনি। মৃত্যুই তাড়ি এসে তাঁর দুঃখকষ্ট তবে একটা কথা বলার মৃত্যুর দেড় বছর আগে কর্তৃপক্ষ মাসিক ১০০ টাক স্টার থিয়েটারের 'গ্রন্থকা করেন। এই পদে থেকেও নাটক স্টার থিয়েটার কর্তৃ ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের ১১ ম বোঝা মাথায় নিয়ে ভগ্ন এজগত ছেড়ে চলে গে বয়স মাত্র ৪৫।

প্রস্তর যুগের যুদ্ধ এখনও যেখানে চলছে

দিলীপ মালাকার

আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার দাপটে শহরে অনেক মানুষ বিরক্ত। শহরের যন্ত্রণা কারখানার ধোঁয়া আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলেছে বলে বহু লোক শহর ছেড়ে পাহাড়ে সমুদ্রের ধারে চলে যেতে চায় একবিন্দু শান্তির জন্যে।

পৃথিবীর মানুষ চাঁদে গেছে। অন্য গ্রহে কী হচ্ছে জানার জন্যে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন দেশ-বিদেশের বহু বিজ্ঞানী। ... যখন আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার ... উৎকর্ষ, সভ্যতার জয়যাত্রা যখন ... ঠিক তখন দেখা যাচ্ছে ... অঞ্চলে এখনও শান্ত-নির্জন ... একদল লোক প্রস্তর-যুগে বাস ... সভ্যতা গ্রহান্তরের কৌতূহলের ... নয়।

... বহু অঞ্চল এখনও যান্ত্রিক ... থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। পাঁচ কি ... বছর আগে প্রস্তর যুগে যেমন ... তেমনি ভাবে চলছে ... অনেক অঞ্চলে। পশ্চিম নিউ-গিনির ... পাহাড়ে এখনও একদল ... বাস করছে। যান্ত্রিক ... সেখানে লাগেনি। এখনও ... শান্তিতে নির্বিবাদে বাস ... উপজাতি ও সম্প্রদায়ের ... লেগেই আছে। যুদ্ধে যে ... বিপক্ষ পক্ষের মানুষের ... উল্লাস।

... নিউগিনির পাপুয়ানদের মধ্যে ... রয়েছে। জালে ও পাসিকানি ... কথাই ধরা যাক। চাষবাস এরা ... ফল-মূল খায়। পশুপাখি যা ... খায়। তাছাড়া মানুষের মাংস তো ... এক উপজাতির এক-এক ভাষা। ... বিভিন্ন দেশের মহাকাব্যে যেমন ... সুন্দরী নারীর কারণ হয় ঝগড়া ... কেন্দ্রিত ব্যাপার। মহাভারতে ... কটি কারণে যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছে ... কারণে প্রস্তর যুগের মানুষ- ... এখনও ঘটছে। একটি উপজাতি ... কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ... সেই থেকে যুদ্ধ সুরু হয় উপজাতি অথবা সম্প্রদায়ের মধ্যে। ... সব যুগ থেকে বহু সম্প্রদায় বা ... মধ্যে যুদ্ধের কারণ হয়েছে নারী-ব্যাপারে। নারীর প্রতি ব্যাভিচারের

অভিযোগে যুদ্ধ ... প্রায়ই জালে অথবা পাসিকানি উপজাতির মধ্যে। প্রথমেই যদি মীমাংসা হয়ে যায় তাহলে অপরাধী সাব্যস্ত দল অপর পক্ষকে একটা শুয়োর জরিমানা দিয়ে রেহাই পায়, নইলে লড়াই অনিবার্য। এই নিয়ে ওদের কবিরাও নিশ্চয়ই কোনো মহাকাব্য রচনা করেছেন সেটা হয়ত আমাদের জানা নেই। অবৈধ প্রণয় যে অনর্থের মূল সেটা প্রস্তর যুগের মানুষরাও ভাল করে জানত। তার প্রমাণ পেতে হলে পশ্চিম নিউগিনির প্রস্তর যুগের মানুষের কাছে গেলেই সব জানা যাবে।
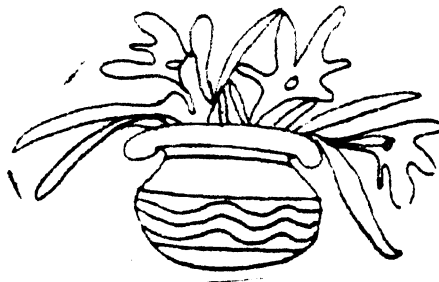
জালে উপজাতির সামাজিক জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। জালেদের মধ্যে আবার দুটো সম্প্রদায়। ... বিয়ে করে ... অপর পক্ষের ছেলে-মেয়েদের। একই গ্রামের ছেলে-মেয়েরা বিয়ে করে না তাদের ... পুরুষের আধিপত্য তাদের মধ্যে এখনও বিরাজ করছে। দুই গ্রামের মধ্যে যেমন বিয়ে হয়, তেমনি আবার যুদ্ধ। প্রত্যেক গ্রামে দুই ধরনের বাড়ী থাকে। সব-চেয়ে বড় বাড়ীতে থাকে পুরুষেরা। প্রাপ্ত-বয়স্ক ছেলেরা থাকে পুরুষদের বাড়ীতে। খুব ছোট ছেলেরা থাকে মায়েদের সঙ্গে মেয়েদের বাড়ীতে।

মেয়েদের জন্যে আলাদা বাড়ী। সেগুলো আকারে ছোট। পুরুষদের বাড়ীতে থাকে নেতার অফিস। পুরুতের ঘর। যুদ্ধবিগ্রহের পরামর্শ সেখান থেকেই হয়।

সম্প্রদায়ের নেতা হন তিনিই যিনি জানেন পুরুতের কাজ, তুকতাক ইত্যাদি। আর হন যিনি, তিনি অন্যের কাছ থেকে পশুপাখি জোগাড় করতে পারেন। অর্থাৎ যার গৃহপালিত পশু বেশী থাকে তিনি এক কথায় পুঁজিপতি। সুতরাং তিনিই নেতা। এর জন্যে বুদ্ধির দরকার।

বিবাদ-বিসম্বাদ লেগে থাকে মেয়েঘটিত ব্যাপারে, শুয়োর চুরি নিয়ে অথবা জমি নিয়ে। কোনো ফয়সালা করতে হলে চাই শুয়োর। নইলেই লড়াই। যুদ্ধ লাগলে তার মীমাংসা সহজে হয় না। প্রায় সময়েই নরবলি দিতে হয়। বলি দিয়ে ক্ষান্ত হয় না বিজয়ীর দল। তার মাংস খাওয়া হয় নৃত্য-সহযোগে। তবে এদের যুদ্ধে অনেক নিয়মকানুনও খাটে। যেমন পরিচিত ব্যক্তির মাংস এরা ভক্ষণ করে না।

যুদ্ধ যখন লাগে তখন দলের একজন এগিয়ে যায় যুদ্ধ ঘোষণা করতে। তার হাতে থাকে তীর-ধনুক। অনেক সাহসের প্রয়োজন হয় এই যুদ্ধ ঘোষণায়। তার প্রাণ থাকে তার করতলে। প্রথম বলি হওয়া তার পক্ষে মোটেই অভাবনীয় নয়।

কয়েক সপ্তাহ যুদ্ধের পর দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। পেটের জ্বালায় তখন শুরু হয় গৃহপালিত পশুর চুরি।

যুদ্ধের সময়ে মেয়ে ও বাচ্চারা পালিয়ে নেয় রক্ষিত স্থানে আশ্রয়। যে দল হারে তারা পালিয়ে নেয় আশ্রয় পুরুষদের বাড়ীতে। ওদের নিয়ম অনুযায়ী কিন্তু ওরা বাড়ী ভাঙে না বা পোড়ায় না।

তারপর শুরু হয় সন্ধির প্রস্তাব। হারে তাদের কাছ থেকে মানুষ নিয়ে উৎসব পালন করে বিজয়ীরা। পরাজিত গ্রামও দখল করে তারা। পর অনেক সময় আশ্রয় নেয় আত্মীয় ও বান্ধবদের বাড়ীতে।

যুদ্ধ শেষ হলে সন্ধি প্রস্তাব আলোচনা চলে বহুকাল ধরে। অনেক লাগে কয়েক বছর। প্রথমে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় শুয়োর। তাতেও না মিটলে দাবী করে মানুষের মাংস। যদি তা মেটে, তাহলে আবার বাধে যুদ্ধ। শুরু হয় নর-পিশাচদের তাণ্ডব। শান্তি প্রতিষ্ঠা করে তারাই যারা শক্তিশালী। এইভাবে গড়িয়ে চলেছে যুগের আদিম মানুষের জীবন হাজার বছর ধরে।

শিক্ষা-সংকট : কেন ?

ক্ষিতিমোহন মুখোপাধ্যায়

শিক্ষাজগতে বর্তমানে যে অরাজকতা চলেছে তা নিয়ে যে আলোচনা তার থেকে আলোকপাতের চাইতে উত্তাপ সৃষ্টিই বেশী হচ্ছে বলে মনে হয়। দু'একটা তত্ত্বপূর্ণ ও গভীর প্রস্তাবনা যে আমাদের সামনে আসে নি এমন নয়। সমাজের সামনে যে-কোন বড় প্রশ্ন উঠলে তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কারও যদি লিখিত বা মৌখিক আলোচনা যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠ না হয়, তাহলে সেই আলোচনা সমস্যা সমাধানের সহায়ক না হয়ে, বিভ্রান্তির সৃষ্টিই করে বেশী। বর্তমান ক্ষেত্রে যে সেই ধরনের কিছু একটা ঘটছে তাতে সন্দেহের বিশেষ কারণ নেই। এই ধারার একটা প্রধান লক্ষণ হচ্ছে যে, মূল সমস্যা আলোচনার চাইতে পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করার প্রবণতাই এর মধ্যে বেশী করে দেখা যায়। এক্ষেত্রে 'পরস্পর' বলতে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ছাত্র ও শিক্ষক সমাজ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, বিশেষ করে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনব্যবস্থাকে ধরা যেতে পারে।

আলোচনাটা এই পর্যায়ে আটকে যাবার যে সবচেয়ে দুঃখজনক পরিস্থিতি তা হচ্ছে এই যে, একটু গভীর বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে, ছাত্র, শিক্ষক-সম্প্রদায় এবং শিক্ষাসংস্থানের প্রশাসন-ব্যবস্থা আপাতদৃষ্টিতে এই প্রসঙ্গে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মনে হলেও, আসল সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই তিন পক্ষের স্বার্থ সম্পূরক। তার মধ্যে দ্বন্দ্বের কোন অবকাশ নাই। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনাটা এই তিনপক্ষের, পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষারোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, ততক্ষণ মূল সমস্যা সমাধানের পথে মোটেই অগ্রসর হতে পারবে না। ফলে বস্তুতঃ দায়িত্বটা কোথায় সেটা আলোচনার বাইরে থেকে যাবে এবং যাঁরা সেই দায়িত্বটা পালন করবেন, তাঁরা দূরে থেকে মজা দেখেই এই বিরাট বিপদটা পাশ কাটিয়ে যাবার সুযোগ পেয়ে যাবেন।

শিক্ষাজগতের প্রশাসনব্যবস্থার যে কোন দোষ ত্রুটি নেই এমন কথা কেউ বলবেন না। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, শিক্ষা-জগতের প্রশাসনব্যবস্থা ও শিক্ষকদের মধ্যে মূলগত পার্থক্য নির্ণয় করা শক্ত। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাজগতের প্রশাসন-ব্যবস্থাটা মোটামুটিভাবে শিক্ষকসমাজেরই হাতে আছে। সবটাই অবশ্য শিক্ষকের হাতে নেই। কিন্তু মোটামুটি যাঁদের হাতে আছে তাঁরা শিক্ষকই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক আইনের ভিত্তিতে সেটা প্রায় বাধ্যতামূলকভাবেই বাস্তব অবস্থার মধ্যে এসে যাচ্ছে। সুতরাং শিক্ষাজগতে প্রশাসনব্যবস্থা ও শিক্ষকদের কর্তব্যের মধ্যে কোন মূলগত বিরোধ আছে মনে করা অযৌক্তিক। এই প্রসঙ্গে দ্বিপাক্ষিক রূপে দু'টি, অর্থাৎ শিক্ষ কর্তব্যনিষ্ঠা এবং প্রশাসনের দায়িত্ব অযোগ্যতা বা প্রশাসনের আপ্রাণ ও শিক্ষকসমাজের কর্মবিমুখতা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়।

আসল কথা শিক্ষক বলতে নির্দিষ্ট কিছু বোঝায় না। কর্মনিষ্ঠ, কর্মবিমুখ, শিক্ষিত, শিক্ষিত, লোভী, নির্লোভ, দরদী, ছাত্র-বিদ্বেষী নানারকম তো আছেন। এর মধ্যে বিশেষ একগোত্রের শিক্ষক প্রশাসনিক ক্ষমতা সুযোগ পাচ্ছেন অন্যেরা পাচ্ছে এ বিশ্লেষণ বস্তুনিষ্ঠ হতে পা আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে কেবলমাত্র কর্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষক তাঁরা রূপী রাজনৈতিক নেতাদের হাতে হচ্ছেন। এই সিদ্ধান্তটির আংশিক অস্বীকার করা শক্ত হবে। কি ক্ষেত্রেও প্রকৃত শিক্ষকদের প্র অযোগ্যতা ও রাজনৈতিক নির্লি অংশতঃ দায়ী না করে পারা যা শিক্ষকসমাজও তাঁদের নির্বাচনে শিক্ষকদের নির্বাচিত না করে শিক্ষ রাজনীতি-বিশারদদের নির্বাচিত তাহলে অপরকে দোষ দেওয়া বস্তুতপক্ষে শিক্ষকসমাজ ও শিক্ষা প্রশাসনের মধ্যে একটা পরিষ্কার নির্ণয় আদপেই করা যায় না। এক্ষেত্রে যে পরস্পর পরস্পরকে দো করার প্রয়াস সেটা ব্যক্তিগত স্তরে

…কার করার অপচেণ্টাজনিত সে বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই।

শিক্ষক বলতে যেমন ঠিক একরকম কিছু বোঝায় না, ছাত্রসমাজের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। নানারকম ছাত্র আছে। কেউ লেখাপড়া করে, কেউ করে না, কেউ নকল করে, কেউ নকল করে না কেউ শিক্ষককে নিগ্রহ করতে পারে কেউ পারে না। ছাত্রদের মধ্যেও আবার প্রকৃত ছাত্র এবং প্রধানত রাজনীতি-বিদ ছাত্রের মধ্যে পার্থক্য করা চলে। অবশ্য রাজনীতিও করে অথচ প্রকৃত ছাত্র, এমন ছেলেও বিরল নয়। এক্ষেত্রে কিন্তু আসল কথাটা এই না যে, কিছু প্রধানত রাজনীতি করে এমন ছাত্র আসলে আদপেই লেখাপড়া করে না এবং সুযোগ পেলেই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে যে কোন উপায়ে একটা ডিগ্রি লাভের চেষ্টা করে। এ ধরনের একটা নেতৃত্ব যে নেই বা সেটা যথেষ্ট ব্যাপক নয় এমন কথা বলা শক্ত। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বহু অংশে সত্য যে প্রকৃত ছাত্রদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্যেও এই ধরনের রাজনীতিবিদ ছাত্রেরা নেতৃত্বটা নিয়ে নিতে পারে। এই ধরনের ছাত্রনেতৃত্বটা যে প্রকৃত ছাত্রস্বার্থবিরোধী তাতেও সন্দেহের অবকাশ কম। তার চেয়ে যেটা বড় কথা শিক্ষাজগতে এই ধরনের ছাত্রনেতাদের সুযোগসুবিধা করে দেওয়ার ব্যাপারে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা … এ ব্যাপারে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা খুবই হাস্যকর।

…তও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে … সম্ভবত প্রধান সমস্যা বলা চলবে না। …, অর্থনৈতিক মান-উন্নয়ন …, রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি, জনসংখ্যার …স্ফোরণ ইত্যাদি সব কিছু জড়িয়ে … ছেলে-মেয়ে প্রায় হঠাৎ প্রথমে স্কুলে, তারপর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে …ছেছে। যে সামাজিক পরিবেশ থেকে … এসেছে সেখানে লেখাপড়া, সংযত … মধ্যবিত্ত জীবনের সংস্কৃতি, শৃঙ্খলা, এই বালাই ছিল না বললেই চলে। একথা বলার অর্থ এই নয় যে, এদের উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে একটা নতুন ও বৃহত্তর … জীবনে আসার সুযোগ দেওয়াটাই … হয়েছে। রবিনস্ ও কোঠারী কমিটির …তিবেদনের পরে সেকথা অবশ্যই কেউ …বেন না। কিন্তু সেই একই সূত্রে এটাও …ষ্ট হয়ে উঠবে যে উচ্চশিক্ষার থেকে … হতে হলে এদের পরিবেশের …ব থেকে যেভাবে মুক্ত করে আনার …জন প্রয়োজন ছিলো সেটা সেই সব …ছাত্রীর স্কুলজীবন থেকেই করে ওঠা …নি। যার ফলে এই সব ছাত্রছাত্রী শিক্ষা-…তে একটা অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে …গেছে। মূল সমস্যার একটা প্রধান সূত্র পাওয়া যাবে এখানে এবং একথা অনস্বী-কার্য যে এর সঙ্গে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত স্কুল-জগতের শিক্ষাব্যবস্থা ও পরীক্ষাপদ্ধতির যোগাযোগ অঙ্গাঙ্গিভূত। প্রথম কর্তব্য যেখানে স্পষ্টতই অবহেলিত হচ্ছে সেখানে পরের স্তরের সমস্যা প্রসঙ্গে মূল দায়িত্ব যে বিশ্ববিদ্যালয় বা তার সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও ছাত্রসমাজের উপর আরোপ করা চলে না এটা বলাই বাহুল্য।

সমস্ত সমস্যাটা কিন্তু এরই মধ্যে আবদ্ধ থাকছে না। প্রথমত স্কুলজগতে শিক্ষার তেমন প্রসার হচ্ছে না। সুতরাং শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী হিসাবে যে সব প্রায় লক্ষের ঘরে কিছুটা শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়ে চাকুরী পেতে পারতো, তারা সেই চাকুরী পাচ্ছে না। অন্যথায় উপার্জনের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা হলে স্কুল থেকে বেরিয়ে বহু ছাত্রছাত্রীই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভিড় করত না। উপযুক্ত জীবিকার অভাবেই বহু ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভিড় করছে এমন একটা আশা নিয়ে, যে আশা পূরণ করার ক্ষমতা কোন বিশ্ববিদ্যালয়েরই থাকতে পারে না। তারা মনে করে যে একটা পরীক্ষার পর কোনরকমে আর একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তাদের উপার্জনের পথ সুগম হবে, তারা কোথাও না কোথাও একটা চাকুরী পাবে। অথচ উপার্জন বা চাকুরীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যোগাযোগটা পৃথিবীর কোথাওই প্রত্যক্ষ নয় এবং কোন বিশ্ববিদ্যালয় কোথাও কখনও বলে না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লে চাকুরী হবে। এই সব যুবক-যুবতীদের বেকারদশা ঘোচাবার দায়িত্বটা প্রথমত তাদের নিজেদের উপর এবং পরোক্ষভাবে তাদের শিক্ষকসমাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর চাপিয়ে সমাজ বা রাষ্ট্রের মজা দেখার অধিকার আসে কোথা থেকে সেটা একটা গভীর চিন্তার বিষয়।

এতেও বিবাদটা মিটছে না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে ছাত্রছাত্রীরা চাকুরী পাচ্ছে না। না পেয়ে মনে করছে যে, যে-শিক্ষা তাদের দেওয়া হয়েছে সেটাই নিরর্থক হয়েছে। তারা মনে করছে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা, পরীক্ষাপদ্ধতি সব কিছুই ভুল পথে চলছে। শিক্ষাব্যবস্থা নাকি এমন হওয়া উচিত যাতে শিক্ষা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তৈরী করে দেবে। তাদের হাতে একমাত্র তথ্যাগত হাতিয়ার হচ্ছে যে তারা চাকুরী পাচ্ছে না। কিন্তু তার জন্য তারা সমাজ, রাষ্ট্র বা সরকারকে দায়ী না করে দায়ী করছে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে। তাদের অভিজ্ঞতা অতিসীমিত। সুতরাং তাদের এই বিভ্রান্তির জন্য তাদেরই সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু এই বিভ্রান্ত যুব-শক্তিকে সংযত করার, তাদের উৎপীড়ন থেকে শিক্ষকদের বা শিক্ষাব্যবস্থাকে রক্ষা করার দায়িত্ব কার? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যদি ছাত্রসমাজকে দেশের মূল সমস্যা সমাধান করার উপযুক্ত মানসিকতা সৃষ্টি করে দিতে পারে তাহলেও যে তাদের চাকুরী হতো না, অর্থাৎ হতো না যদি না দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি দ্রুততর না হতো, একথা তাদের বোঝাবার দায়িত্ব কি রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে থাকার কথা নয়?

প্রসঙ্গক্রমে দু'একটা বিষয় কিছু বলা যেতে পারে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যে নানা ধরনের ত্রুটি থাকতে পারে এবং আছেও সে কথা ঠিক। কিন্তু একটা এতবড় পদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের কথা বলা যত সহজ, করা ততো সহজ নিশ্চয়ই নয়। জীবনের অথবা চিন্তাজগতের যে বিভিন্ন অসমাধিত সমস্যা, সেই সব সমস্যার সমাধান করার উপযুক্ত মানসিকতা সৃষ্টি করাটা আর যাই হোক স্বচ্ছন্দে হয় না, বিশেষ করে যদি না যুগপৎ শিক্ষক ও ছাত্রসমাজের সেইদিকে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। তার উপর সেই ধরনের উপযুক্ততা অর্জন করতে হলে যে ধরনের সাধনা, অনুশীলন ও স্বাভাবিক যোগ্যতা প্রয়োজন সে শুধু ছাত্রদের নয়, শিক্ষকদেরও আছে কিনা সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ করার কারণ আছে। একথা ঠিক যে সাধারণভাবে ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা অতিমাত্রায় কেতাবী এবং সমস্যা সমাধান-মুখি নয়। এব্যাপারে দেশের সাধারণ ঐতিহ্যও এমন নয় যে, অতি অল্প চেষ্টাতেই একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে ফেলা যাবে। এছাড়াও শিক্ষার যে একটা সাংস্কৃতিক দিক আছে সেটা অস্বীকার করার চেষ্টার মধ্যেও যে চিন্তার দুর্বলতা আছে সেটাও পীড়াদায়ক।

শিক্ষাব্যবস্থার মত পরীক্ষাব্যবস্থারও পরিবর্তন ও উন্নতি হওয়া প্রয়োজন এবং সম্ভবও। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও কথা বলা এবং সেই প্রসঙ্গে দাবী করা যতটা সহজ মূলে সমস্যার সমাধান করা ততটা সহজ নয়। পরিচিত এবং পরীক্ষিত যে সব সমাধান আছে তা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করার প্রধান অসুবিধা যে, সে সব ব্যবস্থাই বর্তমান ব্যবস্থার তুলনায় অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষ। অন্যদিকে সেই সব পদ্ধতির কোনটাই বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও ব্যাপক নকল করার প্রবণতা থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে মুক্ত করতে পারবে মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। যাকে সাধারণত তথ্যনিষ্ঠ বিচার 'অবজেকটিভ টেস্ট' বলা হয়, তাতে দুর্নীতির সাহায্যে পরীক্ষায় পাশ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে পড়বে।' তাছাড়াও বস্তুত না জানার ফলে অনেকে তথ্যনিষ্ঠ বিচার সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকেন। ব্যাপারটা আদপেই সহজ নয় এবং ভাসা ভাসা ভাবে কার্যকরী করতে গেলে সম্পূর্ণ আন্দাজে পাস করে যাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে থেকে যায়। সেই সম্ভাবনা এড়াবার জন্য যদি ভুলের জন্য শূন্যের চেয়ে কম নম্বর দেওয়া হয়, তাহলে পাশের হার কিভাবে উল্টেপাল্টে যাবে তা যথেষ্ট গবেষণা না করে বলা যায় না।

নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের কাশ্মীরী ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দুধের পাত্র হাতে নিয়ে এমন বাড়ী-বাড়ী, হোটেলে-হোটেলে পৌঁছে দেয়। জন্ম হতে ওরা জানে দারিদ্র্য র জন্যে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়তেই হবে। তাই ছোটবেলা থেকে ওদের এই প্রস্তুতি।

কাশ্মীর ট্যুরিস্টদের তীর্থক্ষেত্র। শুধু ভারতবর্ষ নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে এখানে প্রচুর জনসমাগম হয়। এই সময়টাই কাশ্মীরীদের জীবনের সুদিন। দুর্দিনের সঞ্চয় এ সময়েই করতে হয়। সুদিনে কাশ্মীরের ডাল হ্রদে 'হাউস বোট' ভেসে বেড়ায়। তাতে ভ্রমণবিলাসীদের সাময়িক সংসার গড়ে ওঠে। কাশ্মীরের স্ত্রী-পুরুষ এসময়েই মোটা কিছু উপার্জনের আশা নিয়ে দিন গুনতে থাকে।

কাশ্মীরী মেয়ে ঝাড়ুদারের রূপ দেখে যোগী, তপস্বীর ধ্যান ভঙ্গ হয়। ফল-বাগিচায় ফলের রং-এর সঙ্গে ওদের গালের রং-এর এমন সাদৃশ্য বিদেশী ট্যুরিস্টদের কৌতূহল বাড়ায়। বহুদিনের শোনা গল্পে আনে বাস্তবতার ছোঁয়া। স্ত্রী-পুরুষ সমবেতভাবে বিদেশী ও স্বদেশী ভ্রমণবিলাসীদের সামনে এনে ধরে হরেক রকমের ফুলের তোড়া আর ফল। কাশ্মীরী ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রংবেরং-এর ফুল তুলে তোড়া বানাতে বেশ দক্ষ।

সুসময়ের অবসানে যখন অসময় আসে, প্রকৃতির খেয়ালখুশিতে যখন পাহাড়ের গা বেয়ে ঢল নামে তখন ওরা ঘরে বসে জীবনধারণের পথ খোঁজে। ওরাই তখন প্রকৃতির ফুলকে শালের গায়ে অতি ধৈর্য, পরিশ্রম, দক্ষতার সঙ্গে অদ্ভুত এক যাদুবলে যেন জীবন্ত করে তোলে। কার্পেটের বিচিত্র রং-এও তো ওদেরই হাতের পরশ। আজকাল অবশ্য বাস্তব কিছু ডিজাইন বাদ দিয়ে এ্যাবস্ট্রাক্ট ফুল-লতা-পাতা ও অন্যান্য নানারকম নমুনা দেখতে পাওয়া যায় শালের গায়ে বা কার্পেটে।

কাশ্মীরী মেয়েরা এত কর্মঠ যে কোন পরিশ্রমই ওদের ম্লান করতে পারে না। তাই বোধহয় ওরা এত সুখী, এত সুন্দর। সমতলভূমির মানুষের মত জীবনযুদ্ধের জটিলতা ওদের এখনও গ্রাস করতে পারেনি। তাই বোধহয় ওদের কথায় এত সুর, চলাফেরায় এত ছন্দ, হাসিতে এত লাবণ্য, রূপে এত পবিত্র জৌলুষ।

অঞ্জলি চৌধুরী

সহ্যের সীমা

সেই অবাঙালী ভদ্রমহিলার কথা মর এখনো কানে বাজছে. মিলন্দুলকে সুখ শান্তিকে রাইয়েগা। এর বড়ো সত্য আর কিছু নেই। এই আমাদের চিরদিনের কামনা। সুখে-শান্তিতে, উত্থানে-পতনে আমরা এই জিনিসটি খুঁজে চেয়ে এসেছি। একাধিকবার হাতের নাগাল পেয়েছিও কিন্তু ধরে রাখতে পারিনি। সেটাই আমাদের চরম দুর্ভাগ্য। যেন কাব্যে বর্ণিত সেই হতভাগ্য কটির দুর্ভাগ্যের কথাই মনে করিয়ে দেয় কিনা আরেকটু হাত বাড়ালেই আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের সন্ধানা পেতো। আমাদের অবস্থা ঠিক এতটা করুণ নয়। আমরা হাতে পেয়ে সেই জিনিস হারাতে বসেছি।

কথায় বলে সহ্যশক্তি হলো মানুষের বড় গুণ। এক সময়ে আমাদের এই গুণের অভাব ছিল না। আমরা সবকিছু সহ্য করতে পারতাম। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব হচ্ছে না। এখন আর সহসা সহ্য হয়ে উঠতে চায় না। বয়স হলে মানুষের শক্তি কমে আসে। আবার অনেকদিন রোগে-অসুখে ভুগলেও তাই হয়। এরকম একটি ঘটনা আমি নিজে দেখেছিলাম। এক মহিলার সুখের সংসার। ছেলেদের সব বিয়ে-থা দিয়েছেন। মেয়েদেরও বিয়ে হয়ে গেছে। নাতি-নাতনিতে তাঁর সংসার ভরা। এই বয়সে এর থেকে আনন্দের আর কি হতে পারে। কর্তা অনেকদিন গত হয়েছেন। তবে এই ভরা সংসারে তিনি সে দুঃখ ভুলতে পেরেছেন। সবসময় তিনি নাতি-নাতনি নিয়ে মশগুল হয়ে থাকেন। হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুখ আর সারে না। এতোদিন তাঁর যা ছিল না এবার তাই হলো। দিনে দিনে তিনি খিট-খিটে হয়ে পড়লেন। বউরা নাতি-নাতনিদের তাঁর কাছে এগিয়ে দিতেন যদি তিনি একটু শান্তি পান এই ভেবে। কিন্তু এতে ফল হলো আরো বিপরীত। তিনি ওদের আর একদম সহ্য করতে পারতেন না। বিছানার চারদিকে কেউ এলেই খিটখিট করে উঠতেন। এতোদিন যারা ছিল তাঁর প্রাণ এখন তাদেরই তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না। এর অবশ্য যুক্তি আছে। দীর্ঘ রোগভোগই এর কারণ। আর বুড়ো বয়সে এরকম হয়েই থাকে।

কিন্তু আজ যে আমাদের সহ্যশক্তি সব সময়েই সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে তার কারণ সম্ভবত মানসিক অসুস্থতা। না হলে এমনটা হয় কি করে! সব মা-ই চায় ছেলে বিয়ে করুক বউমাকে নিয়ে সুখে সংসার করবেন। আর ছেলেরাও ঠিক তাই চায়। বোনেরা জানে যে, আজ হোক আর কাল হোক তাদের পরের সংসারে যেতেই হবে। যতদিন ননদ-ভাজে মিলেমিশে থাকা যায়। এই চিন্তা বোনেদের মনের পরতে পরতে। দাদা যদি বিয়ে করতে না চায় বা দেরি করে তবে বোনেরা তাদের সঙ্গে খুনসুটি করতে ছাড়ে না। দাদার বিয়েতে বোনেদেরই সবচেয়ে বেশি আনন্দ। সবাইকে ডেকে ডেকে তারা নিজের খুশি প্রকাশ করে। আর বিয়ের সময় এমন একটা ভূমিকা নেয় যেন তারাই আসল বরকর্তা। বউয়ের কাছে সবাগ্রে নিজের পরিচয় দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে বলে দেয়, আমি সেই যম ননদিনী। একটু চোখ পাকিয়ে শাসনের সুরে বলে, আমাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করো তাহলেই সবদিক রক্ষা। তারপর বউয়ের সঙ্গে রসিকতায় নিজেই হেসে ওঠে। হাসি থামলে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বলে, আসল কথা কি জান, তুমি যেমন বাপ-মা ছেড়ে পরের সংসারে এলে আমাদেরও একই গতি হবে। এই কটা দিন মিলেমিশে দুজনে হাসি-খুশিতে কাটানোর জন্যই এসব কথা বললাম। তুমি এগুলো ধরো না, ভাই।

ননদ-ভাজের এই মনস্কামনা অনেক সময় পূরণ হয়। একে অপরকে এমনভাবে আপন করে নেয় যে বুঝতেই পারা যায় না নতুন বউ এ সংসারে আগন্তুক। সে যেমন তার ন্যায্য অধিকার পায় তেমনি ননদও যোগ্য মর্যাদা পায়। তারপর একসময় ননদের বিয়ে হয়ে যায়। নতুন বউকে সংসারে আনতে ননদ যে ভূমিকা নিয়ে-

ছিল এখন সেই ভূমিকা নিয়ে সে এগিয়ে যায় ঠাকুর-জামাইকে বরণ করে আনতে। বিয়ের পরও তাই ননদের সঙ্গে বউয়ের সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকে। যদিও তখন তারা পৃথক পৃথক সংসারে অধিষ্ঠিতা।

উভয়ের আন্তরিকতা থাকলে এই সম্পর্ক অনেকদিন অম্লান থাকে। এ সম্পর্কে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা চলে। এক বাড়িতে প্রতি বছর বাপের বাড়ি থেকে জামা-কাপড় আসে। শুধু ননদ বা ঠাকুর-জামাইয়ের জন্য না মাত্র ছেলেমেয়েদের জন্য। এতোদিন পর্যন্ত পুজোর তত্ত্ব আসায় আমার একটু কৌতূহল হয়েছিল। আমি একদিন জিগ্যেস করলাম যে, আপনার তো মা-বাবা নেই কিন্তু এখনও বছর বছর ঠিক ঠিক তত্ত্ব আসছে তো? এর উত্তরে ভদ্রমহিলা বললেন, কেন আসবে না। আমার বৌদি তো আছে। মা যেমন যেমন করতো বৌদি ঠিক তেমনটি করে। তারপর তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, মা মারা গেছে সেই কবে আমার বিয়ের বছর তিনেক পরেই। সেদিন ভেবেছিলাম যে এবার বাপের বাড়ির পাট উঠলো। কিন্তু আমার সে ধারণা ছিল ভুল। বৌদি এগিয়ে এলেন মায়ের মতো। বাপের বাড়ির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক একই রকম রইলো। বৌদি মায়ের মতোই আমাদের সব বোনের সঙ্গে একই রকম ব্যবহার করেন। কাউকেও দূর্নজরে দেখেন না। বাপের বাড়িতে কোন কাজ হলে বৌদি আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে আসেন আগে। আবার আমরাও তাই করি। এতে একটু অসুবিধা হয়েছে যে আমরা বাপের বাড়ির সঙ্গে বেশি সম্পর্ক রাখি বলে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজনরা অসন্তুষ্ট। কিন্তু সবাইকে তো আর সন্তুষ্ট করা যায় না। বাপের কাছে এতো বড়টা হলাম তাঁদের তো আর ভুলতে পারি না। বিশেষতঃ তাঁরা যখন সম্পর্ক রাখছেন। আর না রাখলে অন্যভাবে চিন্তা করা যেতো। তবে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেও আমি যথাসম্ভব মানিয়ে চলি।

ভদ্রমহিলার একথা শুনে আমি বেশ অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। এখনকার দিনকালেও ননদ-ভাজের সম্পর্ক এমন মধুর হতে পারে তা চোখে না দেখলে আর কানে না শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন। তারপর আমার দিকে বললেন, ভাজের সঙ্গে আমাদের লাগবে কেন? আমরা তো জানিই যে দুদিন পরেই আমাদের পরের সংসারে যেতে হবে। আর ওই সংসারের আসল কর্ত্রী হলো আজকের নতুন বউ। দু-এক বছর পরেই সে তার নতুন থাকবে না। হয়ে যাবে পুরনো। তখন আমার বাপের বাড়ির সংসার সেই চালাবে। তাই তার সঙ্গে ঝগড়ার আমাদের কোন প্রশ্নই নেই। বরং বৌদির কাছে আমরা আদর-আবদার করবো। কোন জায়গায় যেতে আসতে তার একটা শাড়ি চেয়ে নিয়ে পরে যাবো। আমার ধারণা, অনেক বৌদি ননদের এই আবদারটুকু হাসিমুখে মেনে নেয়। এ তো আর এমন কিছু ব্যাপার নয়।

এমন সময় আমার মুখে কথা জুগিয়ে যায়, যদি বৌদি ননদের এই আবদার না রাখে? ভদ্রমহিলা একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, যদি না রাখে তখনই আরম্ভ হবে মন-কষাকষি। একে অন্যেকজনকে সহ্য করতে পারবে না। ননদ-ভাজের সম্পর্ক তো গেল। শুরু হলো এক প্রচণ্ড অশান্তি। বাড়ির সকলেই যার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। আর সেই সম্পর্ক যে পরবর্তীকালে কেমন হবে সে তো বুঝতেই পারছেন।

কিন্তু এমনি ছোটখাটো ব্যাপার নিয়েই তো সর্বদা ননদ-ভাজে অশান্তি শুরু হয় না। কারণটা আরো গভীরে। ছেলের বিয়েতে সাধারণ মায়ের আনন্দ দাদার বিয়েতে বোনের আহ্লাদের শেষ নেই। কিন্তু নতুন বউকে ঘিরে মা এবং মেয়ের অবচেতন মনে একই চিন্তার দ্রুত ওঠাপড়া চলতে থাকে। মা মনে করেন যে ছেলের উপর এবার তার কর্তৃত্বের অবসান। আর বোন মনে করে যে, আমার কথা ডিঙিয়ে দাদা এবার বউয়ের কথাই বেশি পাত্তা দেবে। আমি দাদার কাছ থেকে দূরে সরে যাবো। এই চিন্তা থেকেই অশান্তির তুফান ওঠে।

কিন্তু যারা চালাক তারা এই চিন্তা মনে রেখেও সম্পর্ক সুন্দর রাখার চেষ্টা করে। যখন দুজনে পেটে খেয়ে যায় তখন আর সেই ভাবনা প্রাধান্য পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু কেউ কেউ ঐ ভাবনা থেকেই নতুন বউয়ের সঙ্গে সম্পর্ক শুরু করে। আর এ তো শুরুই মনে ভাবিস যে বিয়ের পর মায়ের ছেলে আর বোনের দাদা বউয়ের কথা কিছুটা শুনবেই। সারা-জীবন যাকে নিয়ে ঘর করবে তাকে তো অবহেলা করা চলে না। এটা ননদেরা সহ্য করতে পারে না। দাদা যদি তার কল্পনার মতো কোন জিনিস এনে দেয়নি তার স্ত্রীকে, এই ধরে ভাই-বোনে শুরু হয় ঝঞ্ঝাট। আর এর মধ্যে এসে পড়ে নতুন বউয়ের প্রসঙ্গ। সে বেচারা কোনকিছুতে না থেকেও দোষী হয়ে যায়। তখন তারও মন খিঁচড়ে যায় ননদের উপর। সেখানে তার ভালো সম্পর্কের আশা করাই তো ভুল।

আমি ভদ্রমহিলাকে বলি, ননদের তো এমনিতেই বদনাম। জটিলা-কুটিলাই তো তার উদাহরণ।

তিনি হেসে ফেললেন, এই উদাহরণটাই আমাদের কাল হয়েছে। বউরা ননদ সম্পর্কে এক অজানা আশঙ্কায় শঙ্কিত থাকেন আর ননদেরা বউকে মনে করেন প্রতিপক্ষ। মুখোমুখি সাক্ষাৎ হলেই সংঘাত। কিন্তু সব ননদই খুব একটা খারাপ নয়। যেমন হাতের পাঁচটা আঙুল সমান নয়। এক, যেমন ননদের দোষ নয় তেমনি এক বউয়েরও দোষ নয়। তবে একটা ঠিক যে নিজেরা বরণ করে আনতে গিয়ে যদি একটা বেশি সহানুভূতির পরিচয় দিতে পারেন ভাজের প্রতি, ননদকেও তাই করতে হবে। আর তাছাড়া তো এই জিনিস একান্ত দরকার। কেউ কাউকে সহ্য করতে চায় না। সকলেই অসহ্য এবং সকলেই অস্বীকৃতির ভাব। এই মানসিকতা নিয়ে তো আর সমঝোতা চলতে পারে না। তাই সম্পর্ক চিড় খেয়ে যাচ্ছে। আর এর শত্রুরা নন্দাই ভাগ্য থেকে অসুস্থ মানসিকতাপ্রসূত বিকারের জন্য। এবং এই বিকৃতি থেকে আরোগ্যের আর কোন সম্ভাবনাই নেই। ননদ-ভাজের মধুর সম্পর্কও তাই আমাদের কাছে অতীত। ননদের জটিলা-কুটিলা উদাহরণটি দিন দিন জয়যুক্ত হচ্ছে।

—প্রমীলা

অমর মল্লিক

• পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

দেবকীকুমার বসুর প্রথম কাহিনী-চিত্র 'চণ্ডীদাস' যখন উত্তর কলকাতার 'চিত্রা' সিনেমায় হপ্তার পর হপ্তা ধরে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছয়, তখন ঐ অঞ্চলের পথেঘাটে [illegible] সে-দুটি সংলাপ ছেলেছোকরাদের মুখে মুখে ফিরত, সে-দুটি হচ্ছে : (১) [illegible] এ কি সাজা? এবং (২) ভজ্জা, [illegible], এই ভজ্জা। প্রথমটি ছবির নায়িকা [illegible] ভূমিকাভিনেত্রী শ্রীমতী উমার (সে-সময় তিনি উমাশশী নামে খ্যাত ছিলেন) এবং দ্বিতীয়টি ঐ ছবিতে গ্রামের [illegible] ভূমিকাভিনেতা **অমর মল্লিকের।**

এর পর যে ছবিতে অমর মল্লিককে [illegible] দর্শকেরা তাঁকে অসামান্য চরিত্রাভি-নেতা বলে তারিফ করেছিল, সেটি ছিল প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'দেবদাস'। যে [illegible] দেবদাসকে গণিকাপল্লীতে নিয়ে [illegible] হাজির করেছিল, সেই চুণীলালকে [illegible] সে যুগে দেখেছিলেন, তাঁরা কি সে [illegible] কোনোদিন ভুলতে পারবেন? কিংবা [illegible] পরে নীতীন বসু পরিচালিত [illegible] ছবির থিয়েটার ম্যানেজারকে? সেই যে সেই লোকটি, যে কৃষ্ণচন্দ্র দেকে [illegible] গাইতে দেখে থিয়েটারে নিয়ে [illegible] দেশের মাটি'র সেই দৃশ্যটি কি কেউ ভুলতে পারে, যেখানে অমর মল্লিক বলছেন, [illegible], কত হাওয়া খাবি খা!'?

না, তিরিশ চল্লিশ দশকের বাঙলা ছবির দর্শকেরা প্রধানত সিরিও কমিক চরিত্রাভিনেতা অমর মল্লিককে কোনোদিনই ভুলতে পারবেন না। বিশেষ করে, বিভিন্ন ভূমিকায় তাঁর অর্থবহ চোখের চাউনির তুলনা কোথায়? তবে এ-সবই উনিশ শো তিরিশ দশকের কথা, যার সঙ্গে আজকের দর্শকের কোনো যোগই নেই। শুধু দর্শকই বা বলি কেন, আজকের চলচ্চিত্র-সমালো-চকদের ক'জন অমর মল্লিকের অভিনীত নিউ থিয়েটার্সের 'দেনা-পাওনা' (১৯৩১) থেকে শুরু করে 'ডাক্তার' (১৯৪০) পর্যন্ত প্রতিটি ছবি দেখেছেন?

১৯৩১ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত দীর্ঘ একচল্লিশ বছরের মধ্যে মল্লিকমশাই—অমর মল্লিক তাঁর যুগের চলচ্চিত্র-জগতে এই বিশেষ নামেই পরিচিত ছিলেন—অন্তত একশোটি ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করলেও নিউ থিয়েটার্সের পতাকাতলে নির্মিত ছবিগুলিতেই তাঁর অভিনয় হয়েছিল স্মৃতির পটে ধরে রাখবার মতো। যদিও সিরিও-কমিক চরিত্রাভিনেতারূপেই তাঁর নাম, তবু ওরই মধ্যে মতলববাজ, খল চরিত্রে তাঁর পারদর্শিতার যেন তুলনা নেই। এই বিভাগে 'দেবদাস'-এ চুণীলালের পরেই নাম করা যায় 'বিজয়া'তে রাসবিহারী চরিত্রের। মনে পড়ে, মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র নিয়ে বিজয়া নরেনের সঙ্গে বাক্যালাপে রত, পাশের ঘর থেকে রাসবিহারী তাঁর ছেলে বিলাসকে সঙ্গে করে গোপনে তাই লক্ষ্য করছেন। এক সময়ে অধৈর্য হয়ে বিলাস বলে উঠল : আর চুপ করে থাকতে গেলে আমি পাগল হয়ে যাব। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে থামিয়ে দিয়ে রাসবিহারী নিম্নকণ্ঠে বললেন : যদি (পাগল) হতে হয়, একটু পরে হোয়ো, বাবা!—যে আশ্চর্য ভঙ্গীসহকারে মল্লিকমশাই কথাগুলি বলেছিলেন, তা আর কারুর পক্ষে সম্ভব বলে মনে করতে পারছি না। 'বিদ্যাপতি'তে রাজার উৎসব পর্বে কে-একজন উৎসবরত মল্লিকমশাইকে (ভূমিকাটির নাম মনে নেই) বললে : অমুককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না; সে হারিয়ে গেছে। উৎসবের মত্ততায় উনি বললেন : সে ইচ্ছে করে হারিয়ে গেছে। —ওঁর ভঙ্গী দেখে এবং মুখের কথা শুনে প্রেক্ষাগৃহ হাসিতে ফেটে পড়েছিল। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে-দেখা মল্লিকমশাই অভিনীত প্রতিটি ভূমিকার প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করে আলোচনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, চরিত্রাভিনেতারূপে অমর মল্লিক যে বিশেষ ছাপ রেখে গেছেন, সেখানে তিনি একক এবং অনন্য।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, ১৯৩২ সালের চব্বিশে সেপ্টেম্বর তারিখে মুক্তি-প্রাপ্ত 'চণ্ডীদাস' ছবির আগে অন্তত তিন-খানি সবাক ছবিতে এবং দুটি নির্বাক ছবিতে মল্লিকমশাই অভিনয় করেছিলেন। তাঁকে প্রথম দেখা যায়, ১৯৩১-এর ডিসেম্বর প্রান্তে চিত্রায় মুক্তিপ্রাপ্ত নির্বাক চিত্র ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্রাফট-এর প্রথম ছবি 'চোরকাঁটা'তে। তাঁর দ্বিতীয় চিত্রাবতরণ হচ্ছে ঐ একই প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় ছবি 'চাষার মেয়ে'তে, যার মুক্তি ঘটেছিল চিত্রাতে ঐ বছরেরই চৌঠা সেপ্টেম্বর। ঐ একই সালের শেষাশেষি তিরিশে ডিসেম্বর নিউ থিয়েটার্সের প্রথম সবাক ছবি, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরিচালিত 'দেনাপাওনা' মুক্তি-লাভ করে চিত্রাতে এবং ঐ ছবিতে জনার্দন রায়ের ভূমিকাই হচ্ছে মল্লিকমশাইয়ের প্রথম সবাক চরিত্রাভিনয়। এর পরে তিনি নিউ থিয়েটার্স নিবেদিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পুনর্জন্ম'-এ অবতীর্ণ হন যাদব চক্রবর্তীর ভূমিকায় এবং তার ঠিক পরেই রবীন্দ্র-নাথের 'চিরকুমার সভা'য় চন্দ্রবাবুর চরিত্রে। এ দুটি ছবিও প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর পরি-চালনায় গৃহীত হয়েছিল।

বি. এন. সরকার, যাঁর পুরো নাম বীরেন্দ্রনাথ সরকার—নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠা করবার আগেই নির্বাক চিত্র-প্রযোজনায় যোগ দেন ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্রাফট নামে একটি সংস্থা খাড়া করে। এই সংস্থায় অফিস ছিল রফি আহমেদ

কিদোয়াই রোড (পূর্বতন ওয়েলেসলী স্ট্রীট) ও ধর্মতলা স্ট্রীটের সংযোগস্থলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের চারিতলবিশিষ্ট বাড়ীর একাংশে। এবং এই সময় থেকেই অমর মল্লিক ছিলেন মিঃ সরকারের বা সরকার সাহেবের দক্ষিণ হস্ত। 'চোরকাঁটা' ও 'চাষার মেয়ে'—এই নির্বাক ছবি দুটির শুটিংয়ের যা-কিছু কাজ, সবই ছিল মল্লিকমশাইয়ের স্কন্ধে অর্পিত। এবং ওই সঙ্গেই চলেছিল নিউ থিয়েটার্সের পত্তনের ব্যাপার। তার জন্যে টালিগঞ্জে জমি লিজ নেওয়া থেকে শুরু করে ফ্লোর এবং তৎসংলগ্ন আট-দশ কক্ষবিশিষ্ট দ্বিতল গৃহনির্মাণের সকল দায়িত্বই ছিল মল্লিক-মশাইয়ের ওপর। চিত্রব্যবসায়ে ব্রতী হবার আগে মিঃ সরকারের যে কন্ট্রাকটরী প্রতিষ্ঠান ছিল হেস্টিংস স্ট্রীটে, তারও সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অমর মল্লিকমশাই।

কিন্তু কিভাবে মিঃ সরকারের সঙ্গে মল্লিকমশাইয়ের প্রথম পরিচয় হয়, তা শুনলে পাঠক এবং পাঠকের সঙ্গে অনেকেই তাজ্জব বনে যাবেন। ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্যে ভারতস্থ ব্রিটিশ সরকারের ল' মেম্বার স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের দ্বিতীয় পুত্র বীরেন্দ্রনাথ সরকার যখন কিছুদিন লন্ডনে অবস্থান করে-ছিলেন, সেই সময়ে তিনি একদিন ট্যাক্সি চেপে গন্তব্যস্থানে পৌঁছুবার পরে ভাড়া দিতে গিয়ে জেনে বিস্মিত হলেন যে, যে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে তিনি তার মুহূর্ত আগে পর্যন্ত কাফ্রী বলে ভেবেছিলেন, সেই ট্যাক্সি-ড্রাইভার আসলে হচ্ছেন একজন বাঙালী এবং শুধু বাঙ্গালীই নয়, একেবারে খাস কলকাতার অধিবাসী ভদ্র-সন্তান। তা হঠাৎ লন্ডনে ট্যাক্সি চালাচ্ছেন কেন—এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মিঃ সরকারের মনে উদয় হয়েছিল এবং তা তিনি ব্যক্তও করেছিলেন।

তিনি শুনলেন কলকাতার গোল-দিঘির দক্ষিণে মির্জাপুর স্ট্রীটের (বর্ত-মানে সূর্য সেন স্ট্রীট) বিখ্যাত সুবর্ণ-বণিক বংশ মল্লিক পরিবারের সিংহদাস মল্লিকের সন্তান অমরদাস মল্লিক মাত্র কলেজে ঢোকার পরই লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে যখন পাড়ার মাস্তানদের দলে নাম লিখিয়েছিলেন, তখন তাঁকে তখনকার দিনের নাম করা বিলিতী ঔষধ কোম্পানী স্মিথ স্ট্যানিস্ট্রীট-এ একটি চাকরী করে দেওয়া হয়। ভদ্রলোক যতদূর সাধ্য মনোনিবেশ করেই চাকরীর কর্তব্য পালন করছিলেন। কিন্তু একদিন দোকানের মালিকপক্ষীয় জনৈক ইংরাজপুঙ্গব কথাপ্রসঙ্গে বাঙালীকে 'নেটিভ নিগার' বলে গালি দেওয়ায় মল্লিকসন্তান ক্রোধান্ধ হয়ে তার নাকের উপর এক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করে তাকে ধরাশায়ী করেন এবং দ্বিতীয় কোনো কথা উচ্চারিত হবার আগেই দোকান ত্যাগ করে চলে আসেন। এর পরে গুরুজনদের সমবেত প্রচেষ্টায় তাঁকে ওখানে আর ফেরত নিয়ে যেতে পারেনি এবং 'আমার আচরণের জন্যে আমি দুঃখিত'—একথা লেখানো দূরের কথা বলাতেও পারেনি। এই ঘটনার কিছু পরেই সিংহদাস পরলোকগমনের আগে অমরদাসকে নগদ এক লক্ষ টাকা উত্তরাধিকার হিসেবে দিয়ে যান। সে যুগে এই বিরাট পরিমাণ অর্থ বেশ কিছুটা নয়-ছয় হয়ে যাবার পরে অমরদাসের সুবুদ্ধির উদয় হয় এবং তিনি একটি বিলাতগামী কার্গো জাহাজে কোলবয় হিসেবে চাকরী নিয়ে ইংলণ্ড পাড়ি দেন। সেখানে পৌঁছে নানা কায়দাকানুন করে নিজের পাশপোর্টটি পাকা করে নেন এবং কিছুদিন টুকিটাকি কাজ করবার পরে ট্যাক্সি ড্রাইভিং লাইসেন্স যোগাড় করেন মোটর চালনায় রীতিমত পারদর্শিতার পরিচয় দেবার পরে। মোটর চালনা ছাড়াও মোটর মেকানিকরূপেও তাঁর দক্ষতা ছিল। —মিঃ সরকার যখন আরও শুনলেন, মল্লিকমশাইয়ের বাবা সিংহদাস মল্লিকমশাই একজন নামকরা বিল্ডিং কন্ট্রাকটর ছিলেন এবং মল্লিকমশাইও তাঁর বাবার কাজে কিছুকাল যোগ দিয়েছিলেন, তখন তিনি ট্যাক্সি-ড্রাইভার মল্লিককে তাঁর নিজের নাম-ঠিকানা দিলেন এবং তাঁর নাম-ঠিকানাও নিয়ে রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, কলকাতায় আপনি যখন ফিরছেন জানালেন, তখন ওখানে গিয়ে আমি আপনার খোঁজ নেব। বলা বাহুল্য, মিঃ সরকার কলকাতায় ফিরে যখন নিজের কন্ট্রাকটরী ফার্ম খুললেন, তখন একদিন সত্যিই মল্লিকমশাইয়ের মির্জাপুরের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়ে তাঁকে তাঁর ফার্মে যোগ দেবার প্রস্তাব করেন। সেই থেকেই মল্লিকমশাই মিঃ সরকারের প্রতি-ষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্রাফট ও নিউ থিয়েটার্সের অন্যতম স্তম্ভরূপে কাজ করতে থাকেন।

নিউ থিয়েটার্সের প্রতিষ্ঠার সময়ে বীরেন্দ্রনাথ সরকারের সহকর্মী হিসেবে ছিলেন অমর মল্লিক, আই এ, হাফেসজী (বর্তমানে মেট্রো সিনেমার ম্যানেজার), প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নীতীন বসু প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে অমর মল্লিকমশাই ছিলেন প্রোডাকসান ম্যানেজার এবং হাফেসজী সাহেব ছিলেন স্টুডিও ম্যানেজার। প্রতিষ্ঠার অনতিবিলম্বেই যে নিউ থিয়েটার্স সারা ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল, তার জন্যে মল্লিক-মশাইয়ের অদম্য অক্লান্ত পরিশ্রম অল্প দায়ী নয়। উদয়াস্ত পরিশ্রম নয়, বহু সময়েই তাঁকে যাকে বলে রাউন্ড দি ক্লক, সেই চব্বিশঘণ্টা পরিশ্রম করতে হয়েছে। এবং একথা আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি, যতদিন অমর মল্লিক ছিলেন, নিউ থিয়েটার্সের প্রোডাকসন ম্যানেজার, ততদিন এবং মাত্র ততদিনই নিউ থিয়েটার্স ছিল একটি 'সুখী পরিবার', ততদিন সকল কর্মী একাত্ম হয়ে খাটত ও ভাবত—আমাদের নিউ থিয়েটার্স।

অমর মল্লিক প্রথম চিত্রপরিচালনার কাজে অবতীর্ণ হন ১৯৩৮ সালে। তাঁর প্রথম ছবি—বাঙলা ও হিন্দীতে 'বড়দিদি' ও 'বড়ী দিদি' অসামান্য সাফল্য অর্জন করে। ফিল্ম ইণ্ডিয়ার সুখ্যাত সম্পাদক বাবুরাও প্যাটেল লিখেছিলেন : তোমরা ছবি দেখতে চাও? —যাও, বড়ীদিদি দেখগে (ইউ লাইক টু সী এ পিকচার? গো অ্যাণ্ড সী বড়ীদিদি)। নিউ থিয়েটার্সে তাঁর দ্বিতীয় ছবি 'অভিনেত্রী' (হিন্দীতে—হারজিৎ) কিন্তু সে-রকম সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। অবশ্য এর পরে ১৯৪৬-এ মুক্তিপ্রাপ্ত তাঁর তৃতীয় ছবি 'বিরাজবৌ' বাঙালী রুচিবান দর্শকদের তৃপ্তি দিতে পেরেছিল। নিউ থিয়েটার্সের বাইরেও তিনি বেশ কয়েকটি ছবি পরিচালনা করেছিলেন। তার মধ্যে তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের 'স্বামিজী' ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ।

ব্যক্তিগত জীবনে মল্লিকমশাই ছিলেন সদালাপী, হাস্যপরিহাসপ্রিয়, খাঁটি মজলিসি বাঙালী। প্রথম যুগে তাঁকে আমরা গড়গড়া বা আলবোলাও খেতে দেখেছি; পরবর্তী যুগে তিনি শীতকালের রাতে সিগার বা পাইপ এবং অন্য সময়ে সিগারেটে অভ্যস্ত ছিলেন। বহুদিন পর্যন্ত তাঁর স্পোর্টস মডেল 'স্কোডা' গাড়ীটি তাঁর সঙ্গের সাথী ছিল। ১৯৩৯-এর শেষাশেষি যে-নারী তাঁর জীবনকে মধুময় করতে নিউ থিয়েটার্সে আবির্ভূতা হলেন, তাঁর নাম হল ভারতী দেবী। বসন্তের বাধাবন্ধনহীন দক্ষিণা বাতাসের মতোই এই অকপট তরুণী সহকার শাখার মতোই মল্লিকমশাইয়ের নিরাপদ আশ্রয়কে বরণ করে নিয়েছিলেন।

পাম অ্যাভেনিউয়ে নিজস্ব বাড়ী করবার সময়েও মল্লিক-দম্পতি যথেষ্ট প্রাচুর্যের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছেন। মাত্র শেষ বছর আট-নয়ের মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছি তাঁদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং তারই সঙ্গে স্বাস্থ্যের অবনতি। যুগের পরিবর্তন ঘটেছে। নূতনের আবির্ভাবের জন্যে পুরাতনকে পথ ছেড়েই দিতে হয়। তাই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রাভিনয়ের জন্যে মল্লিকমশাই বা ভারতী দেবীকে আহ্বান জানাবার কথা কারুর মনে পড়ে না। এই-ভাবেই জীবন চলছিল। হঠাৎ বছরখানেক আগে পড়ে গিয়ে মল্লিকমশাইয়ের নিতম্ব-অস্থিতে ফাট ধরে। তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এই শয্যা থেকে তিনি আর উঠলেন না। চরম আশাবাদী হওয়া সত্ত্বেও মল্লিক-মশাই ধীরে ধীরে অন্তোন্মুখ হলেন। গেল বুধবার, ১৬ আগস্ট বৈকাল সাড়ে পাঁচটায় অস্তগামী সূর্যের সঙ্গে তিনি অন্তিম শ্বাসত্যাগ করেছেন। বাঙলার চলচ্চিত্রজগতের বিগত যুগের রণক্লান্ত সৈনিক দিকপাল তাঁর জীবনাবসানের সঙ্গে আমাদের মনে রেখে গেলেন এক বিরাট শূন্যতা।

চিত্র-সমালোচনা

শহর কলকাতায় সামন্ততন্ত্রের শেষ চিহ্ন

বেবী জন প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় নিবেদন, সলিল দত্ত পরিচালিত ছবি 'স্ত্রী'র মূল কাহিনীটি বিশিষ্ট কথা-সাহিত্যিক বিমল মিত্রের রচনা। শ্রীমিত্র রচিত অধিক-তর প্রসিদ্ধ উপন্যাস "সাহেব-বিবি-গোলাম"-এর সঙ্গে আলোচ্য ছবির কাহিনীটির বেশ কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসের যিনি পটেশ্বরী, এখানে তিনিই মৃন্ময়ী বা মিনু, মেজবাবু হচ্ছেন ফড়েপুকুরের মাধব দত্ত এবং উপন্যাসের ভূতনাথ এখানে সীতাপতি ওরফে ক্যামেরাবাবু। 'সাহেব-বিবি-গোলামে'র ছিল বিস্তৃত পরিধি, স্ত্রী'র কাহিনীর পরিসর অল্প।

দত্ত-পরিবারের ছেলেরা গোঁফের রেখা দেখা দিতে না-দিতেই সিগারেট তামাক খেতে অভ্যস্ত, সমবয়সী বন্ধুবান্ধব নিয়ে মধ্যে-মধ্যে মদের স্বাদও গ্রহণ করে থাকে। আঠারো-কুড়ি বছর বয়সে তারা রীতিমত নারী ও সুরার সম্রাটের পদে আসীন। কাজেই ওদের বিবাহিতা স্ত্রীরা

ফুলশয্যার রাতেও মাতাল স্বামীর সাক্ষাৎ পায় রাতের শেষ প্রহরে। এবং স্বামীসঙ্গ মেলাও ঐ একদিনই। কারণ ওদের অভ্যাস নিত্যনতুন নারী সম্ভোগ। মাধব দত্তও তাই করতেন। মো-সাহেব সংসার চাটুজ্জে অল্প বয়সী বারবণিতাদের গৃহস্থ ঘরের সলজ্জ ভাগিনী কুমারী, সধবা অথবা বিধবা বলে চালাবার চেষ্টা করত। মাধব দত্তও এতে প্রচুর আনন্দ পেতেন। সংসারেরই মধ্যস্থতায় সীতাপতি মাধবের কাছে ক্যামেরাবাবু হিসেবে বহাল হল। তার কাজ, বাবুর নৈশ অভিযানের সঙ্গী হয়ে নিত্য-নতুন নারীদের বিভিন্ন অবস্থার ফটোগ্রাফ তোলা। ভাবনাচিন্তাহীন একক সুখী জীবনযাপনের জন্যে এ এক তিক্ত অভিজ্ঞতা। কিন্তু সীতাপতি চমকে উঠল সেই দিন, যে-দিন আকস্মিকভাবে তার ডাক পড়ল অন্দরমহলে মাধব দত্তের স্ত্রীর ছবি তোলবার জন্যে। ক্যামেরার মধ্যে দিয়ে ফোটোগ্রাফের পাত্রীর দিকে চোখ পড়তেই সে আবিষ্কার করল, মাধবের স্ত্রী হচ্ছে তারই প্রথম যৌবনের সহচরী মৃন্ময়ী বা মিনু। সে যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। তার হারিয়ে-যাওয়া মৃন্ময়ী আজ ঐ মাতাল, লম্পট মাধব দত্তের স্ত্রী! সীতাপতিকে ঘিরে মৃন্ময়ীরও ছিল কত স্বপ্ন! আজ আবার সে তার নাগাল পেয়েছে, তাই সে ওকেই আশ্রয় করে দত্ত-কারাগার থেকে মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু সীতাপতির দ্বারা অন্যায় সম্ভব নয়। সে মিনুর অনুরোধকে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করল। তবে তারই কাতর মিনতিতে ওই বাড়ীতে সে রয়ে গেল এবং গোপনে সাক্ষাৎও চলতে থাকল। এরই মধ্যে এক বর্ষার রাতে দৈবক্রমে মাধব দত্ত সকাল সকাল বাড়ী ফিরে এলেন এবং কি আশ্চর্য, স্ত্রীর কক্ষে রাত্রি যাপন করলেন। যথাসময়ে মৃন্ময়ীর কোলে এক পুত্র-সন্তানের আবির্ভাব ঘটল। দত্তবাড়ীর ধারাকরণ মৃন্ময়ীর সন্তান বৃন্দাবনেও বর্তাল। কিন্তু সীতাপতি বৃন্দাবনকে উৎসন্নে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে বদ্ধ-পরিকর। বৃন্দাবনের চরিত্র রক্ষায় সীতাপতির এত মাথাব্যথা কেন সেকথা মাধব দত্ত বুঝতে পারেন না। সহসা অপঘাতে স্ত্রীর ঘটল মৃত্যু এবং মৃতা স্ত্রীর হারের লকেটের মধ্যে পাওয়া গেল সীতাপতির ছবি। ওই ছবির মুখ এবং বৃন্দাবনের মুখ যে অনেকটা এক। তাহলে! তাহলে! মাধব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বন্দুক হাতে ছুটলেন সীতাপতির সন্ধানে। এর পর সীতাপতি ও মাধব— আরও দুজনের মৃত্যুর পরে ছবির সমাপ্তি।

এমন অনেক কাহিনী আছে, যা পাঠ করে প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায় এবং যার অন্তর্বর্তী কোনো ঘটনাকেই অসম্ভব বলে মনে হয় না। কিন্তু সেই কাহিনীরই চিত্ররূপ দেওয়া হলে তার বহু ঘটনাকেই সুস্থচিত্তে সম্ভাব্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। যেমন, আলোচ্য 'স্ত্রী' ছবির ক্ষেত্রে। ছবির প্রথমাংশ, যেখানে মাধব দত্তর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে দর্শকের পরিচয় ঘটছে, সেখানকার বিচিত্র ঘটনাবলী দর্শক আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে উপভোগ করেন। যেখানে ক্যামেরাবাবু সীতাপতির সঙ্গে তিনি নারী নিয়ে কৌতুক করছেন এবং দুজনে 'সাঁঝ, কালো আমার ভালো লাগে না ......ওসে যতই কালো হোক, আমার ভালো লেগেছে'— গানের মাধ্যমে নিজেদের ভিন্ন প্রকৃতিকে ব্যক্ত করছেন, সেখানেও ছবির উপভোগ্যতার অভাব নেই। যখন প্রকাশ পেল যে, মিনু ওরফে মৃন্ময়ীর সঙ্গে সীতাপতির পূর্ব-প্রণয় ছিল, তখন তো দর্শক রীতিমত কৌতূহলাক্রান্ত—কি হয়, কি হয় তার মনোভাব। এমন কি, যেখানে বর্ষার রাতে বাড়ী ফিরে এসে মৃন্ময়ীর শয়নকক্ষে মাধব দত্ত সীতাপতির 'এস' মার্কা রুমাল আবিষ্কার করেন তখনও পর্যন্ত ছবি সম্ভাব্যতার পথেই অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু এর পরের কাণ্ডকারখানা—বালক বৃন্দাবনের সমবয়সীদের নিয়ে তামাকু সেবন ও মদ্য-

দেবর-এর জানোয়ার আউর ইনসান-এ রেখা এবং শশীকাপুর

কলকাতায় হিন্দী ছবি : অভিনব চিত্রের মহরতে পরিচালক অনিল ঘোষ, নায়ক শমিত ভঞ্জ, নায়িকা রাধা সালুজা, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

গানের দৃশ্যাবলী, সেখানে সীতাপতির হাতে তার শাসন, মৃন্ময়ীর সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে অপঘাত মৃত্যু, অসহযোগ আন্দোলনের শোভাযাত্রার সামিল হয়ে সীতাপতির কারাগমন ও জেল থেকে মুক্তিলাভের পরে সহসা নাম-না-জানা কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু, বৃন্দাবন সীতাপতিরই সন্তান, এই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে মাধবের ক্ষিপ্ত হওয়া এবং বন্দুক হাতে মৃত্যুপথযাত্রী সীতাপতিকে আক্রমণ করা এবং সবশেষে আত্মঘাতী হওয়া—এ সব গেছে নিতান্ত অসম্ভাব্যতার পথে দর্শকমনে ক্রমাগত বিরক্তি উৎপাদন করে। অযৌক্তিক পরিস্থিতিগুলি মাধব ও সীতাপতির চরিত্র দুটিকেও করেছে ভ্রষ্ট—ক্ষুণ্ণ। অথচ সম্ভাব্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করে কাহিনীটিকে যদি একটি সুষ্ঠু ন্যায়সংগত পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া হত, তাহলে 'সন্ধী' ছবিটি যে একটি সর্বাংশে উপভোগ্য রসোত্তীর্ণ শিল্পসৃষ্টি-রূপে অভিনন্দিত হত, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

উত্তমকুমার অভিনীত মাধব দত্ত একটি অবিস্মরণীয় চরিত্রসৃষ্টি বলে চিহ্নিত হতে পারত, যদি না ছবির শেষাংশ চরিত্রটিকে উদ্ভট পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে বাধ্য করত। বৈকাল চারটায় নিদ্রাভঙ্গের পরে শিবলিঙ্গের সামনে বন্দী হয়ে বসে থাকা ও পরে পঞ্চপ্রদীপ ধরে ঘন্টা নেড়ে আরতি করা থেকে শুরু করে 'হাজার টাকার ঝাড় বাতিটা রাতটাকে যে দিন করেছে' এবং 'ও সে যতই কালো হোক, আমার ভাল লেগেছে' প্রভৃতি গান গাওয়া পর্যন্ত মাধব দত্তরূপী উত্তমকুমার নাটনৈপুণ্যতার অসামান্য। সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন উচ্ছৃংখল ব্যক্তিত্বকে তিনি জীবন্ত করে তুলেছেন। এই অংশের মাধব দত্তকে না দেখলে দর্শকরা একটি বিশিষ্ট উপভোগ্য চরিত্রচিত্রণ দেখবার সুযোগ হারাবেন। সীতাপতির ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও চরিত্রটিকে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক রূপ দান করেছেন। উত্তমকুমারের সঙ্গে সৌ গানের লড়াইও (আসলে মান্না দে ও হেমন্তকুমারের লড়াই) চমৎকার জমেছে দুজনের অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে। মঞ্চে আমরা আরতি ভট্টাচার্যকে দেখেছিলুম 'নহবৎ' নাটকে দীপ্তিময় অভিনয়কুশলতার পরিচয় দিতে। চলচ্চিত্রে তাঁকে আমরা এই প্রথম দেখলুম একেবারে নায়িকার ভূমিকায়। আন্তরিক অভিনয়ের গুণে তিনি মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী করতে সমর্থ হয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকায় কালী রায়, কল্যাণী ঘোষ, ঝুমা মুখোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সুলেতা চৌধুরী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, পারিজাত বসু, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সু-অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে উচ্চমান রক্ষিত হয়েছে। ছবির পাঁচখানি গানের মধ্যে দুটির উল্লেখ আগেই করেছি। নচিকেতা ঘোষ দ্বারা সুরসমৃদ্ধ গানগুলি ছের স্বাভাবিক হত আনুষঙ্গিক আবহসংগীত গুলির অধিকতর সংযত ব্যবহার দ্বারা। এদিকে দৃষ্টি দেবার সময় এসে গেছে।

কে সেই অন্নদাতা ?

এল, বি, ফিল্মস নিবেদিত, এল, বি, লছমন প্রযোজিত এবং অসিত সেন পরিচালিত রঙীন ছবি 'অন্নদাতা'র প্রধান চরিত্র কোটিপতি অম্বা প্রসাদ উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন, এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওপর নানা ধরনের দাবি পেশ করার জন্যে নকল আত্মীয়স্বজনের ভীড় হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যে রত্নাকে একান্ত অনাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও অম্বাপ্রসাদ নিতান্ত বালিকা অবস্থা থেকে নিজের কন্যাজ্ঞানে ভরণপোষণের ভার নিয়ে বড়ো করে তুলেছেন, সেই রত্না নিজের নাম জড়িয়ে অম্বাপ্রসাদের নামে মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা চাপাবে কোন্ অভীষ্টসিদ্ধির জন্যে তা সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝে ওঠা কঠিন। এবং এর পরে অম্বাপ্রসাদ যখন সশরীরে আবির্ভূত হয়ে উড়োজাহাজের দুর্ঘটনাকে

মিথ্যা প্রতিপন্ন করলেন, তখন মনে হল, কত সহজেই না মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ খবরের কগজের হেড-লাইন হয়ে প্রকাশিত হয়। রত্না তাঁর নামে মিথ্যা কলঙ্কের কথা বলেছে শুনে অম্বাপ্রসাদ তাঁর অ্যাটর্নী প্রেস্টনজীর তত্ত্বাবধানে তাঁর সকল সম্পত্তি রেখে দিয়ে নিজে বেরিয়ে পড়লেন মনুষ্যত্বের সন্ধানে এবং বহু পথপরিক্রমার পর অসুস্থ অবস্থায় নীত হলেন মফস্বলের অধিবাসিনী আরতির বাড়ী। আরতি সেলাইকলের সাহায্যে জামাপত্তর সেলাই করে, টাইপ মেশিনে লেখা টাইপ করে, পরলোকগত বাপের কাছ থেকে পাওয়া কবিরাজীও চালায়। নিজের আর্থিক দৈন্য সত্ত্বেও সে অম্বাপ্রসাদকে পিতৃজ্ঞানে সেবা করে তার শুভার্থী আর্টিস্টের বহু প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে।—শেষ পর্যন্ত কেমন করে অম্বাপ্রসাদ স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে আরতি এবং আর্টিস্টের মধ্যে মিলন ঘটালেন, তাই নিয়েই ছবির শেষাংশ রচিত।

কাহিনীর প্রতিপাদ্য যে ভালো, এ সম্বন্ধে দ্বিমত না থাকলেও যে-সব অবাস্তব অসম্ভাব্যতাপূর্ণ পরিস্থিতি-সমূহের সমন্বয়ে কাহিনীটির বিস্তার, দর্শকের মনকে ছবিটির প্রতি বিমুখ করবার জন্যে তা যথেষ্টের চেয়েও বেশী। স্বয়ং রচিত কাহিনীকে চলচ্চিত্রের জন্যে বিশেষভাবে লিখেছেন ভোলানাথ এবং একে চিত্রায়িত করেছেন যশস্বী পরিচালক অসিত সেন।

ছবিটির মধ্যে একমাত্র প্রাণকর্ত্রীরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন আরতির ভূমিকায় জয়া ভাদুড়ী। আশ্চর্য নাট্যনৈপুণ্যের প্রয়োগে তিনি শুধু তাঁর ভূমিকাটিকেই জীবন্ত করে তোলেননি, ছবিটির মধ্যেও প্রাণের সঞ্চার করেছেন। এবং এ বিষয়ে তিনি সহায়তালাভ করেছেন দুজনের কাছ থেকে। এক, অম্বাপ্রসাদবেশী ওমপ্রকাশ এবং দুই, আর্টিস্ট ও রোমান্টিক নায়কের ভূমিকাভিনেতা অনিল ধাওয়ান। এঁরা দুজনেই সংযমের সঙ্গে নিজেদের ভূমিকাকে উপভোগ্য করে তুলেছেন। অ্যাটর্নী প্রেস্টনজীর ভূমিকায় কৃষ্ণকান্তের অভিনয় অতিনাটকীয়। শামিম, দুলারী ও লীলা মিশ্র নিজেদের গৃহীত ভূমিকার প্রতি সুবিচার করেছেন। মধুমতী ও গোপীকিষেণের ফিল্মী নাচ হয়ত সাধারণ দর্শককে খুশী করবে।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আলোকচিত্রের কাজ প্রশংসনীয়। সঙ্গীতাংশ ছবিটির একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ। যোগেশ লিখিত গানগুলিতে উপযোগী সুরারোপ করেছেন সলিল চৌধুরী। এবং এরই মধ্যে কিশোরকুমার গীত 'গুজর যায়ে দিন দিন দিন' গানটি বারংবার শোনবার মতো।

স্টুডিও সংবাদ

সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত বিভিন্ন বাঙলা ছবিতে দুর্বল কাহিনী, দুর্বলতর কাহিনীবিন্যাস, উপযুক্ত চিত্রভাষা প্রয়োগের অভাব, কলাকৌশলগত ত্রুটি প্রভৃতি দেখে বাঙলার চলচ্চিত্রজগৎ সম্বন্ধে যখন দারুণ হতাশায় মন ভারাক্রান্ত, ঠিক তখনই আর একদিক দিয়ে নতুন আলোর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ যেন চোখের সামনে এসে হাজির হল। পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রজগৎ বলতে যে টালিগঞ্জকে বোঝায়, সেই টালিগঞ্জে ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতের যশস্বী প্রযোজক-পরিচালক-সম্পাদক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় একটি ইস্টম্যানকলারে হিন্দী ছবির শুভ সূচনা করলেন গেল ১৫ আগস্ট, স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী দিবসে টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে। এম-এস-এম প্রোডাকসন্স-এর পতাকাতলে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সহকারী অনিল ঘোষের পরিচালনায় 'অভিনয়' নামে যে হিন্দী ছবিখানির মহরৎ ঐদিন অনুষ্ঠিত হল, তার কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার, সংলাপলেখক, চিত্রশিল্পী, শিল্পনির্দেশক ও সম্পাদক হচ্ছেন যথাক্রমে অমিত, ডি-এন-মুখোপাধ্যায়, গুলজার, দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সুর্য চট্টোপাধ্যায় ও হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। সুরযোজনায় আছেন মদনমোহন। ব্যবসায়িক পরামর্শদাতার কাজ করবেন এন-সি-সিপ্পি। চলচ্চিত্রজগতের বহু গুণীজনের সামনে যে মহরৎ শটে ক্ল্যাপ দিলেন তপন সিংহ, তাতে শিল্পীরূপে উপস্থিত ছিলেন রাখী গুলজার, অমিত ভঞ্জ এবং উৎপল দত্ত। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন আসরাণী, চিন্ময় রায় ও কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়।

ঐদিনই একই সময়ে টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে সঙ্গীতগ্রহণের বিশেষ ফ্লোরে সিনে ক্র্যাফট-এর প্রথম নিবেদন 'ফেরার' ছবির জন্যে তিনখানি গান গৃহীত হল মান্না দে ও সন্ধ্যা সেনগুপ্তের কণ্ঠে।

গানগুলির রচয়িতা হচ্ছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও গুরুবক্স সিং। ছবিটির পরিচালনা করছেন অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুচিত্রা কলামন্দিরের রোমান্টিক চিত্র 'রূপে তোরা মস্তানা' ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার দ্বারা পরিবেশিত হয়ে কলকাতার অন্যতম প্রেক্ষা আকর্ষণরূপে মুক্তিলাভ করবে। খালিদ আখতার পরিচালিত ও লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল দ্বারা সুরসংযোজিত এই চিত্রের বিশিষ্ট ভূমিকাগুলিতে আছেন জিতেন্দ্র, মমতাজ, প্রাণ, আই-এস জোহর প্রভৃতি শিল্পী।

'কলঙ্ক আমার ভাল লাগে'

চিত্রকথা প্রযোজিত শ্রীকান্ত ও রথীন্দ্র নাথ নিবেদিত কুমার বিশ্বনাথের এক ভিন্ন স্বাদের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'কলঙ্ক আমার ভাল লাগে'র শুটিং আরম্ভ হতে চলেছে। ছবিটির চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী। গানে সুর দিয়েছেন বৈদ্যনাথ সরকার ও অনুপম মুখোপাধ্যায়। ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে গান রেকর্ডিং করা হয়ে গেছে। কণ্ঠ দিয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং আরতি মুখোপাধ্যায়। ছবিটির আলোকচিত্র গ্রহণে, সম্পাদনায় ও শিল্পনির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে ননী দাস, অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও সঞ্জিত সেন।

অধিকলাল

সুখ্যাত ঔপন্যাসিক বনফুলের বহুপঠিত উপন্যাস 'অধিকলাল'-এর চলচ্চিত্র রূপ দিচ্ছেন পরিচালক স্বদেশ সরকার। পূরবী ফিল্মস্-এর পতাকাতলে ছবিটির প্রযোজনা করছেন কয়েকজন তরুণ কলাকুশলী। শক্তিমান শিল্পী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। এর্নেস্তম বম্বের প্রতিভাময়ী শিল্পী শ্রীমতী অচলা সচদেবও এ-ছবির একটি মুখ্য চরিত্রে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। ছবিটির অনেকটা অংশই তোলা হবে উত্তর বিহারের মণিহারী, কাটিহার, পূর্ণিয়া ও ভাগলপুর-এর সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলগুলির পটভূমিকায়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, পরিচালক স্বদেশ সরকার 'অধিকলাল' ও 'জীবন যে রকম' এই দুটি ছবির কাজই তাঁর নির্দিষ্ট কর্মসূচীর মাধ্যমে পাশাপাশি পরিচালনা করে চলবেন।

'অগ্নিসাক্ষী' ছবির সংগীত গ্রহণ।

তারু মুখোপাধ্যায় পরিচালিত সিনে কো-অপারেটিভ কনসার্নের প্রথম নিবেদন 'অগ্নিসাক্ষী' ছবির কয়েকটি গান রথযাত্রা পুণ্যতিথিতে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর সংগীত গ্রহণ কেন্দ্রে গৃহীত হয়েছে। আনন্দ মুখোপাধ্যায় ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত গানগুলিতে নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্তা এবং নবাগত কণ্ঠশিল্পী সোমেন দত্ত। তাপস মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন পরিচালক তারু মুখোপাধ্যায় স্বয়ং। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন আনন্দ মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে দীপক দাস এবং অমিয় মুখোপাধ্যায়। জনপ্রিয় শিল্পী সমন্বয়ে ছবিটির চিত্রগ্রহণ এ-মাসের শেষ সপ্তাহে শুরু হবে।

'নকল সোনা' ছবির চিত্রগ্রহণ শেষ হতে চলেছে

ছায়াছবির জগতে সুপরিচিত চিত্র-পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'নকল সোনা' এক নতুন পদক্ষেপ। অনন্যসাধারণ এই কাহিনী রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। পরিচালক এ-ছবিতে গতানুগতিক প্রথার বাইরে কাজ করেছেন। বাংলা চিত্র-জগতে, নায়ক এবং অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে চিত্রজগতের কলাকুশলীদের প্রাধান্য দিয়ে ছবি তৈরী করা এই প্রথম। কলাকুশলীরা এই ছবির নায়ক। আমাদের নামকরা শিল্পীরাও এ-ছবিতে অংশগ্রহণ করেছেন। ছায়াচিত্র কলাকুশলীদের দুঃখ, হাসি, ব্যথা ও আনন্দ থেকে ছবির জন্ম-বৃত্তান্তের ইতিহাস নিয়ে এই ছবির গল্প এবং চিত্রনাট্যের বাঁধুনী ও বিন্যাস অত্যন্ত ঠাস। এই ছবির নাম ছিল 'ছায়ার মায়া'। এখন সবদিক থেকে বিচার করে এই ছবির নাম বদলে 'নকল সোনা' করা হয়েছে। 'নকল সোনা' দর্শকদের মনে রেখাপাত করবে। এই ছবির চরিত্রচিত্রণে আছেন পিনাকী সেনগুপ্ত, কল্যাণী মণ্ডল, পিনাকী মুখোপাধ্যায়, কাজল মজুমদার, জগদীশ মণ্ডল, রবীন মজুমদার, জহর রায়, কৃষ্ণা বসু, সুখেন্দু, সতীন্দ্র হালদার, অমিয় মুখোপাধ্যায়, পারিজাত বসু, সুনীল দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব ঘোষ, গণেশ বসু, নচিকেতা ঘোষ, শ্যামল মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, শ্যামসুন্দর ঘোষ, সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনায় আছেন নচিকেতা ঘোষ, শিল্পনির্দেশনায় সুনীতি মিত্র, চিত্রগ্রহণে বিজয় ঘোষ, কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনায় এবং পরিচালনায় অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রযোজনায় হিমাংশু চক্রবর্তী। নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র ও স্বপ্না সেনগুপ্তা। ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন মিলি পিকচার্স।

পরিচালক তরুণ মজুমদারের পরবর্তী ছবি হচ্ছে "ঠগিনী"। সুবোধ ঘোষ রচিত কাহিনী অবলম্বনে এই ছবির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে এন-টি স্টুডিওতে ১৭ আগস্ট থেকে। ছবিটির যুগ্ম-প্রযোজক হচ্ছেন শর্বানী ভট্টাচার্য ও চিত্রা ভট্টাচার্য। ছবির তিনটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে সন্ধ্যা রায়, রবি ঘোষ এবং উৎপল দত্ত। ছায়া ও ছবি প্রোডাকসন্স-এর পতাকাতলে নির্মিত হবার জন্যে প্রস্তুত ছবিটির সুরকার হেমন্তকুমারের সঙ্গে আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দুখানি গান রেকর্ড করা হয়েছে ১৪ আগস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে।

শুভেন্দু চ্যাটার্জি, অঞ্জনা ভৌমিক, সাবিত্রী চ্যাটার্জি ও সুখেন্দুকে নিয়ে পরিচালক শ্রীসৌমেন তাঁর প্রথম ছবি 'জীবন যেরকম' ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে। পুনা ইনস্টিটিউটের স্নাতক বিমান সিংহ চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে আছেন।

পরিচালক দেবকীকুমার বসুর পুত্র দেবকুমার বসু খুব শীঘ্রই একটি বাঙলা ছবি শুরু করছেন। ছবির নাম—'ভোরের অন্ধকার'। নায়কচরিত্রে থাকবেন—সমিত ভঞ্জ। সেইসঙ্গে অন্যান্য চরিত্রে এপর্যন্ত নির্বাচিত হয়েছেন—তপেন চ্যাটার্জি, শমিতা বিশ্বাস, কল্যাণ চ্যাটার্জি ও ভাস্কর চৌধুরী। নায়িকাচরিত্রে অভিনয়ের জন্য নতুন মুখের সন্ধান চলছে।

এক খবরে জানা গেছে 'মায়া ফিল্মস' ছবির প্রযোজক সংস্থা মান্না মানস ডিস্ট্রি'বিউটার্স' প্রখ্যাত বাণী রায়ের 'পাওয়া' গল্পটিকে চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন। চিত্রনাট্য রচনা করবেন প্রখ্যাত বাণী স্বয়ং এবং পরিচালনা করবেন—পীযূষ গাঙ্গুলী।

পরিচালক অরবিন্দ মুখার্জি তাঁর "ছায়ার মায়া"-র কাজ শেষ করেই সুবোধ ঘোষের "অলীক" গল্পের চিত্ররূপ দেবেন। চিত্রনাট্য রচনা করছেন—কুণাল মুখার্জি এবং নায়কচরিত্রে উত্তমকুমার থাকছেন। এবারে এখানেই শেষ করছি। নমস্কার।

ঠগিনী । সন্ধ্যা রায়। পরিচালনা : তরুণ মজুমদার। ফটো : অমৃত

মঞ্চাভিনয়

'সাহেব বিবি গোলাম' : শিল্পীদের অভিনয়ের প্রাণোচ্ছলতাই একটি নাট্য প্রযোজনাকে অসাধারণ বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করতে পারে। এই সত্যই সেদিন অমৃত-বাজার পত্রিকার সাংবাদিকদের নাট্য-প্রযোজনায় প্রাণময় ভাষা পেয়েছে। ষ্টার থিয়েটারে পরিবেশিত সেদিনকার নাটক ছিল বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম'। বলতে কোন দ্বিধা নেই যে, এই নাটকটির প্রযোজনায় নির্দেশক ও শিল্পীদের নিবিড় নিষ্ঠার সেতুবন্ধন হয়েছে। অনেকেই 'সাহেব বিবি গোলামে'র মঞ্চরূপ ও চিত্ররূপ দেখেছেন। কিন্তু বোধহয় সেদিনকার দর্শক এর মধ্যে এক নতুনতর স্পন্দন অনুভব করেছেন।

এই নাটকটির প্রয়োগ-পরিকল্পনায় গভীরতর শৈল্পিক মানসিকতার পরিচয় রাখেন শ্রীদিলীপ মৌলিক। কয়েকটি আবেগদীপ্ত ও উজ্জ্বল মুহূর্ত সৃষ্টিতে তাঁর সূক্ষ্ম নাট্যবোধই প্রকট হয়ে উঠেছে। নাটকটি শুরুও হয়েছে অন্যে রূপে, অন্য ছন্দে।

চরিত্রের সঙ্গে সুষম তাল রেখে অভিনয় করেছেন শিল্পীরা। আর এতেই টিমওয়ার্ক হয়েছে অটুট। এ নাটকে একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র হল 'পটেশ্বরী'। এই প্রদীপ্ত চরিত্রটির প্রাণময়তার সঙ্গে যেন মিশে গিয়েছিলেন বীথি গাঙ্গুলী। তাঁর প্রতিটি অভিব্যক্তি, প্রতিটি সংলাপে ঝরেছে হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় বেদনার কান্না। তাঁর কণ্ঠে গানও হয়েছে অপূর্ব। শ্রীমতী গাঙ্গুলীর শিল্পী-জীবনে এটি একটি স্মরণীয় চরিত্রচিত্রণ হয়ে থাকবে নিশ্চয়ই। নাট্যনির্দেশক দিলীপ মৌলিকের 'ভূতনাথ'ও হয়েছে প্রাণবন্ত, তাঁর দরদী কণ্ঠে ও মরমী অভিব্যক্তিতে সংযত ও সংহত চরিত্রচিত্রণের বৈশিষ্ট্যই ভাষা পেয়েছে। অসাধারণ দক্ষতার নজির রেখেছেন প্রশান্ত বসু 'বংশী' চরিত্রে। তাঁর সাবলীল অভিনয় নাটকটির গতিকে এগিয়ে যেতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। আর একটি অপূর্ব অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন অর্ণব ঘোষ (ঘড়িবাবু), প্রতিটি মুহূর্তকেই তিনি মুখর করে রাখতে পেরেছেন। সমীর মিত্রের 'কৌস্তুভমণি'ও একটি সপ্রতিভ চরিত্রচিত্রণ হতে পেরেছে। তাঁর অভি-ব্যক্তিকেও দৃঢ়তা ও চাপা বেদনা প্রত্যাশিত-ভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। 'জবা'র চরিত্রে স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেন মন্দিরা রায়।

এ নাটকের কয়েকটি হাল্কা চরিত্রের অভিনয়ে শিল্পীরা প্রচুর সার্থকতার নজির রেখেছেন। প্রথমেই নাম করতে হয় 'ভৈরব'-রূপী অচ্যুত সিনহার, তাঁর প্রাণোচ্ছল ভঙ্গিমা দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। অবিনাশ দে'র 'লোচন', ও দিলীপ দত্তের 'গন্ধবাবা'ও বৈশিষ্ট্যে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন নিশীথ বড়াল (ননীলাল), গোপাল মুখার্জি (সুবিনয়), জগবন্ধু ভাণ্ডারী (ব্রজরাখাল), সরোজ মল্লিক (হিরণ্যমণি), শ্যামল দে (বৃন্দাবন), দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (বেণী), দীপনারায়ণ মুখো-পাধ্যায় (নটে দত্ত), কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র (হাবুল দত্ত), অজিতকুমার ঘোষ (ইদ্রিস), অমিতাভ চ্যাটার্জি, সত্তোন বসু (ঝুটকমল), অঞ্জলি ভট্টাচার্য (চুনী দাসী), মণিকা ঘোষ (চিন্তা) মঞ্জু গাঙ্গুলী (মেজবৌ), কৃষ্ণা মুখার্জি (নায়েবাঈ)।

লালবাঁধ : নবকুমার গড়াইয়ের ঐতি-হাসিক নাটক 'লালবাঁধ' সম্প্রতি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হল ষ্টার থিয়েটারে। অভি-নয়ের আয়োজন করেন কাশীপুর আই ও এফ এ রিক্রিয়েশন সাব কমিটির শিল্পীরা। শ্রীজ্যোতি বর্মণের পরিচালনায় নাটকটির সামগ্রিক অভিনয় বেশ প্রাণবন্তই হয়ে ওঠে। প্রায় প্রতিটি শিল্পীই তাঁদের চরিত্র-চিত্রণে নিবিড় আন্তরিকতার পরিচয় রাখতে পেরেছেন। রণেন রায়ের 'রঘুনাথ সিংহ', সত্য দাসের 'ইসলাম আলী' দুটি বিশিষ্ট চরিত্রচিত্রণ হতে পেরেছে। জ্যোতি বর্মণ 'ঔরংগজেব' চরিত্রে প্রত্যাশিত দৃঢ়তা আনতে পেরেছেন। 'চন্দ্রপ্রভা' ও 'লালবাই' চরিত্র দুটি মন্দিরা রায় ও ছন্দা চট্টো-পাধ্যায়ের সাবলীল অভিনয়ে অসাধারণ দীপ্তি নিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন হরিশ দাস, আশিস মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন রায়, দুর্গা মুখোপাধ্যায়, বিজয় মুখোপাধ্যায়, অশোক বসু, অনাদি ভট্টাচার্য, অনিল মহাপাত্র, ভূপেশ দাস, রবীন দাস, লোকনাথ চক্র-বর্তী, সমর সরকার।

আলোকসম্পাত ও মঞ্চসজ্জায় ছিলেন শ্রী এ কে বিশ্বাস।

কাল : ইউল ইলেকট্রিকাল রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা কয়েক দিন আগে তৃতীয়

বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষ্যে শৈলেশ গুহ-নিয়োগীর 'ফাঁস' নাটকটি পরিবেশন করেন বিশ্বরূপার মঞ্চে। নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব নেন দিলীপকুমার দাশগুপ্ত। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন সুব্রত সেনগুপ্ত (ডেপুটি), মিহির চক্রবর্তী (সোমনাথ), অর্ধেন্দু বিশ্বাস (বিমান), চুণীলাল দত্ত (সুভাষ), বিজয় মালাকার (কপিল), দ্বিজেন্দাস চক্রবর্তী (অশোক), কমল সরকার (নবীনকুমার), শৈলেন্দ্রনাথ সিনহা (জনার্দন), অশোক মুখার্জি (তপন), কাশীনাথ ব্যানার্জি (অঘোর), সমীর পোদ্দার (কমলেশ), জামিল আহমেদ (ভুরাব), মহঃ কোরান, রঘুনাথ গোপাল, হরিহর প্রধান, বরুণ দে, মহুয়া সেনগুপ্ত (সোনালী), মিতা দাশগুপ্ত (রেবা)।

'বিশ বছর আগে' : লেকটাউন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের চতুর্থ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সংস্থার সদস্যরা সম্প্রতি বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'বিশ বছর আগে' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন বিশ্বরূপায়। নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন রথীন ঘোষ।

নাটকটি সুপ্রযোজিত হয়েছিল। কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অংশ নেন রথীন ঘোষ, অমরেন্দ্র ঘোষ, শ্যামল দত্ত, অলকা গঙ্গোপাধ্যায় ও সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাট্যানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সংগতের সম্পাদক শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র।

রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম সমিতির 'বিদ্যাপতি'

রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম সমিতির শিল্পীরা তাঁদের সংস্থার ৬৫তম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি মহাজাতি সদনে ভক্তিমূলক নাটক 'বিদ্যাপতি' পরিবেশন করেন। দেশীয় যাত্রার রীতিতেই নিষ্ঠার সঙ্গে এ নাটক পরিবেশিত হয়েছে।

সংস্থার পূর্বপ্রযোজনা 'জয়দেব' বা 'রামপ্রসাদে'র মতো এ নাটক ততটা প্রাণবন্ত না হয়ে উঠলেও সংঘবদ্ধ অভিনয়ে মোটামুটিভাবে আন্তরিকতা অটুট ছিল। বিভিন্ন ভূমিকায় সেদিন অংশ নেন প্রভাত কুমার ঘোষ, আশীষ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ দে, রুবা দাস, সুনীতি দাস, দীপালী দাস, শিবসুন্দর সিংহ, কানাইলাল ঘোষ, রাধিকামোহন মুখোপাধ্যায়, কার্তিকচন্দ্র দাস, মধু দাশগুপ্ত, শিবনাথ ভট্টাচার্য ঋণা ঘোষাল, শিপ্রা ঘোষ। সঙ্গীতপরিবেশনায় উমাপতি শীল দক্ষতার পরিচয় দেন। নৃত্য-পরিকল্পনায় চিত্রশংকর সার্থক। মাঝে মাঝে যন্ত্রসঙ্গীতের উচ্চগ্রাম নাটকের গতিকে ব্যাহত করেছে বলে মনে হয়।

'শবরী' ও 'উত্তাল তরঙ্গ' : চুঁচুড়া ষণ্ডেশ্বরতলা সবুজ সংঘের শিল্পীরা তাঁদের বার্ষিক মিলনোৎসবে দুটি নাটক পরিবেশন করেন। নাটক দুটি হোল শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'শবরী' ও শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'উত্তাল তরঙ্গ'।

তরুণের আহবানের 'স্বদেশী মেলা'র প্রবেশদ্বার

বিবিধ সংবাদ

'হিমচক্রে'র রূপকুণ্ড অভিযান

অনাদিকাল থেকে হিমালয় সমতলবাসীদের ডাক দিয়ে যাচ্ছে। সেভাবে সাড়া দিয়ে অজানাকে জানবার, অদেখাকে দেখবার অজেয়কে জয় করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় বারে বারে মানুষ ঘরছাড়া হয়েছে। ১৯৫৩ সালে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ বিজয়ে ভিনদেশীদের সঙ্গে সামিল হয়েছিলেন একজন বাঙালী—তিনি শ্রীতেনজিং নোরকে।

এর ক বছর পরেই ১৯৬০-এ বাঙালী পর্বত অভিযাত্রীদের নন্দাঘুন্টি বিজয় বাঙালী তরুণ-তরুণীদের পর্বতপ্রেমিক করে তোলে। তারই ঢেউ লাগে গিয়ে গ্রাম-গঞ্জে পশ্চিম বাংলার নানা জনপদে।

হুগলী জেলার মাহেশ অঞ্চলের তরুণরাও পিছিয়ে রইলেন না। এই তরুণ পর্বতপ্রেমিকদের সংস্থা : 'হিমচক্র' প্রতিষ্ঠিত হল ১৯৭০-এ। 'হিমচক্রে'র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল স্থানীয় তরুণ মনকে পর্বত অভিযানে উৎসাহী করা এবং এই সম্পর্কে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দান। অবশ্য 'হিমচক্র' প্রতিষ্ঠার বহু আগে থেকে 'হিমচক্রে'র উদ্যোক্তারা নানান সংস্থা ও সঙ্ঘ মাধ্যমে পর্বত অভিযানের প্রাথমিক জ্ঞান ও বিদ্যা অধিগত করেন হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চল পর্যটন করে।

প্রখ্যাত পর্বত অভিযাত্রী প্রাণেশ চক্রবর্তী আছেন 'হিমচক্রে'র পুরোধায়। প্রতি মাসে পর্বত-আরোহণ সম্পর্কে প্রখ্যাত অভিযাত্রীদের আলোচনা এবং সিনেমা ও স্লাইডসহযোগে পর্বত আরোহণ কৌশল ইত্যাদি দ্বারা স্থানীয় তরুণদের পর্বত অভিযান সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তোলার কাজ এ সংস্থা সার্থকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। সংস্থার সদস্যরা এখন অপেক্ষায় আছে দার্জিলিংয়ের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট পরিচালিত পর্বতারোহণে বেসিক ট্রেণিং গ্রহণের।

পর্বত অভিযাত্রী এবং অ্যাডভেঞ্চারপ্রি মানুষেরা শুনে খুশী হবেন যে, আগামী সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সংস্থা সেক্রেটারী শ্রীবিভূতিভূষণ গাঙ্গুইয়ের অধি নায়কতায় 'হিমচক্রে'র আয়োজন সহ দুর্গমতীর্থ 'রূপকুণ্ড' পিণ্ডারী গেলসিয় অভিযানে যাত্রা করেছেন। এই অভিযা দলে থাকছেন : সর্বশ্রী বিভূতিভূষণ গা (ম্যানেজার), অসিত মুখোপাধ্যা (কোয়ার্টার মাস্টার), ডাঃ সুব্রত (মেডিক্যেল অফিসার), অরিন্দম চট্টো পাধ্যায়, শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়, পল্লব দা নীলমণি দাস, গোপাল নাগ, অরুণ গঙ্গো রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, জয়ন্ত হালদার, সরো গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্ত কুণ্ডু, প্রশান্ত ঘো শিশির চক্রবর্তী, চন্দ্রকান্ত দাস, অভি ঘোষ, তারকনাথ দে এবং তারানাথ দাস।

মৃণাল সেন পরিচালিত এবং দয়াশঙ্ক সুলতানিয়া প্রযোজিত 'ক্যালকাটা '৭ ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎস দেখাবার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে। উৎসব শুরু হয়েছে ২১ আগস্ট থেকে এবং চল ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

স্বদেশী মেলা

সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু ক '৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের চিত্র, প্রদর্শনী, মডেল, ছায়াচিত্র শহীদদের প্রতিকৃতির মাধ্যমে এই মে আমাদের দেশের এক গৌরবজনক অধ সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে।

মেলার দ্বারোদ্ঘাটন করেন প্র বিপ্লবী শ্রীহরিদাস দত্ত এবং সভাপ

রয়েছেন শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় এম-পি। এঁদের সঙ্গে রয়েছেন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুময় রায়, শ্রীপ্রণব ঘোষ প্রমুখ।

সুরারের নিবেদন 'মেলেছে এই মেলা'

সৃষ্টির মেলা। এই মেলাতেই স্রষ্টা নিজেকে মেলেছেন, মিলিয়েছেন সকল বস্তুকে। সূর্য আর তৃণ কণিকা সেই একেরই গ্রন্থিবন্ধনে মিলিত।

'মেলেছে এই মেলা' রবীন্দ্র দর্শনের এই বক্তব্যেরই শিল্পরূপ। এটি প্রযোজনা করেছেন সুরার। সংগীতে আছেন শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র, শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুপ্রকাশ চাকী। রচনা ও পরিচালনাঃ শ্রীজ্যোতিভূষণ চাকী।

অনুষ্ঠানটি হবে আগামী ২রা সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় রবীন্দ্রসদনে।

কবি গোবিন্দ হালদারের ঢাকা সফর

বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার শ্রীগোবিন্দ হালদার সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করে এসেছেন। ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, রাষ্ট্রপতি আবু সঈদ চৌধুরী, তথ্য ও বেতারমন্ত্রী জনাব মিজানুর রহমান, মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী জনাব মোশারফ হোসেনসহ বহু বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাহিত্যিক, লেখক ও শিল্পীদের সঙ্গে দেখা করেন। শ্রীহালদার সর্বত্র বিশেষভাবে অভিনন্দন পান। উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে প্রচারিত গানগুলির মধ্যে শ্রীহালদার রচিত গানগুলিই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিশেষ করে তাঁর রচিত 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি' গানটি বাংলাদেশের প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী আপেল মেহমুদের কণ্ঠে প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল জনসমাদর লাভ করে। সংগ্রামী বাঙালীজাতিকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে তোলে তাঁর এই গান। বাংলাদেশের হাটে-মাঠে-ঘাটে, পথে-প্রান্তরে, ঘরে ঘরে, মুক্তিযোদ্ধাদের শিবিরে-শিবিরে কণ্ঠে-কণ্ঠে ফিরতে থাকে তাঁর গান।

শ্রীহালদারের রচিত অন্যান্য যে গানগুলি 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে প্রচারিত হয়ে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তার মধ্যে 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে', 'রক্তলাল রক্তলাল', 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা' 'তোমার আমার ঠিকানা', 'হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!', 'লেফট রাইট লেফট রাইট নওজোয়ান সব এগিয়ে চলো', 'চলো বীর সৈনিক মুক্তির চির অভিযাত্রী', 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা' প্রভৃতি গানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্তলাল রক্তলাল' ও 'হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার' গান দুখানি যথাক্রমে এইচ এম ভি ও হিন্দুস্থান গ্রামোফোন কোম্পানী কর্তৃক রেকর্ডও করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী মহোৎসব : আগামী ৩১ ও ১ সেপ্টেম্বর বাগবাজার ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের পত্রিকা ভবনে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীনাম-যজ্ঞ, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অভিষেক ও পূজার্চনা, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ধর্মসভা ও বৈষ্ণব-সম্মেলন, নন্দোৎসব, মীরাবাঈ ও বিদ্যাপতি নাট্যাভিনয় হবে।

রবীন্দ্র স্মরণে : সম্প্রতি এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে বারুইপুর রাজপুর শাখার ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক বিশ্বকবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি ঐতিহাসিক তৈলচিত্র পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে উন্মোচন করেন ডাঃ পঙ্কজ রায়। উক্ত ঐতিহাসিক তৈলচিত্রটি অনেক কষ্টে তৈরী করেছেন অঙ্কনশিল্পী শ্রীঅচ্যুতকুমার অধিকারী। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য এবং বক্তাদের মধ্যে ছিলেন তরুণ নাট্যকার-পরিচালক ও হাসপাতাল শ্রমিক নেতা শ্রীনীলয় চৌধুরী। তিনি রবীন্দ্রনাথকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করেন ও পরে কবি সুকান্তের 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। ডাঃ বি বি সিনহা, ডাঃ জে মল্লিক ও ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বারুইপুর শাখার সম্পাদক ডাঃ দুর্গাপদ ব্যানার্জি ছাড়াও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিশ্বকবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন।

উত্তর রবি'র আয়োজন : পাঁচই আগস্ট শনিবার এ বি টি এ হলে হিমাদ্রের প্রযোজনায় উত্তর রবি সমকালীন সংস্কৃতি চক্রের শিল্পীরা 'বর্ষাভিসার' নৃত্যনাট্য অভিনয় করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগীতাচার্য শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক 'যুগান্তর' পত্রিকার সহবার্তা-সম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতি ও প্রধান অতিথির সময়োপযোগী ভাষণের পর মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়।

শ্রাবণ সন্ধ্যায় 'বর্ষাভিসার' নৃত্যনাট্যের এই অনুষ্ঠান বিশেষ উপভোগ্য হয়। মনোজ্ঞ পরিবেশে উত্তর রবির নবীন শিল্পিগণ শিল্পকুশলতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় টিমওয়ার্কের। নৃত্যপরিচালনায় ছিলেন কুমারী তপতী ব্যানার্জি, সংগীত পরিচালনায় শ্রীঅমলেন্দু ভট্টাচার্য ও আবহসংগীত পরিচালনায় শ্রীদিলীপ ঘটক অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখেন। নৃত্যে যেসব শিল্পী নৈপুণ্যের পরিচয় দেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কুমারী তপতী বসু (বুলবুল), কুমারী সীমা মিত্র, কুমারী রিণা হালদার, কুমারী সুস্মিতা ব্যানার্জি ও কুমারী তপতী ব্যানার্জি। সংগীতে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী অমলেন্দু ভট্টাচার্য, প্রদোষ মুখার্জি, বাসুদেব আচার্য, কুমারী গার্গী চ্যাটার্জি, পঞ্চানন দাস (বাঁশী), সুনীত কাঞ্জিলাল ও অভিজিৎ ব্যানার্জি (তবলা)। গ্রন্থনা করেন শ্রীজগৎ মিত্র। গ্রন্থনা রচনা করেন শ্রীমতী রমলা বড়াল। শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু সকলকে ধন্যবাদ জানান।

রূপকুণ্ড ও পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার অভিযানে মহেশ ঘটীর বাজার হিমচক্র-সদস্যবৃন্দ।

দর্শক

অলিম্পিক গেমস

আগামী ১৬ দিনে (অগস্ট ২৬—সেপ্টেম্বর ১০) মিউনিখের আধুনিক কালের ২০তম অলিম্পিক গেমসকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর বিপুলসংখ্যক ক্রীড়ানুরাগীর উৎসাহ উদ্দীপনা নিঃসন্দেহে দুলে উঠে যাবে। প্রাচীন গ্রীসের সুমহান অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের আদর্শ এবং ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণায় আধুনিক কালের এই অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন হয় ১৮৯৬ সালে এথেন্সে। সেই সময় থেকে প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিক গেমসের রীতি অনুসারেই প্রতি চতুর্থ বৎসরে আধুনিক কালের অলিম্পিক গেমসের আসরও বসছে। তবে দুটি বিশ্বযুদ্ধের দরুন ৩ বার নির্দিষ্ট বছরে অলিম্পিক গেমস হয়নি—১৯১৬ সালে বার্লিনে, ১৯৪০ সালে টোকিওতে এবং ১৯৪৪ সালে লণ্ডনে। একই শহরে অলিম্পিক গেমসের আসর দুবার বসেছে এমন নজির আছে মাত্র দুটি—প্যারিসে ১৯০০ ও ১৯২৪ সালে এবং লণ্ডনে ১৯০৮ ও ১৯৪৮ সালে। এশিয়া মহাদেশের ভূখণ্ডে অলিম্পিক গেমসের আসর মাত্র একবার বসেছে জাপানের টোকিওতে ১৯৬৪ সালে।

মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে এই অলিম্পিক গেমসের প্রভাব অপরিসীম এবং তা সারা পৃথিবী জুড়ে। অলিম্পিক গেমসকে বলা হয় বিশ্বভ্রাতৃত্বের জীবন্ত প্রতীক এবং অলিম্পিক গেমসের আসর এক মহান মিলনক্ষেত্র।

বিংশতিতম অলিম্পিক গেমসের আসর এই মিউনিখ শহর—ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানীর (অর্থাৎ পশ্চিম জার্মানী) অঙ্গরাজ্য ব্যাভেরিয়ার রাজধানী। মিউনিখ ইসার নদীর তীরে অবস্থিত। সমুদ্রতট থেকে ৫৩০ মিটার উচ্চতায় মিউনিখ শহরটি আপন বৈশিষ্ট্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। জার্মানদের কাছে মিউনিখের অপর এক নাম 'গুপ্ত রাজধানী'। গত চার বছর ধরে মিউনিখে অলিম্পিক গেমসের প্রস্তুতি চলেছে। বিভিন্ন দেশের চার হাজার কারিগর, ২৫০ জন ইঞ্জিনিয়ার এবং স্থপতিদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ মিউনিখ অলিম্পিক গেমসের আসরের কাজ সমাপ্ত। মিউনিখের প্রধান অলিম্পিক স্টেডিয়ামের আয়তন ৭৫ হাজার বর্গ-মিটার। এখানে ৮০,০০০ দর্শকের খেলা দেখার ব্যবস্থা আছে। এই প্রধান স্টেডিয়ামের মাথার ওপরের টেলিভিশন টাওয়ার এবং স্টেডিয়ামের প্লাস্টিক ও ইস্পাতের ছাদ অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে অভিনব আয়োজন। মিউনিখের প্রধান অলিম্পিক স্টেডিয়ামের আশেপাশের অঞ্চলেও বিভিন্ন খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকি দূরাঞ্চলের স্টেডিয়ামেও কয়েকটি খেলার আসর বসবে। যেমন মিউনিখ থেকে ৫৬২ মাইল দূরের কীল শহরে। মামুলি আতসবাজির পরিবর্তে কৃত্রিম রামধনু দিয়ে মিউনিখ অলিম্পিক গেমসের সমাপ্তি উৎসব উদযাপিত হবে। প্রখ্যাত প্রাক্তন অলিম্পিক পদক বিজয়ী এবং অলিম্পিক গেমসে যাঁদের যথেষ্ট অবদান আছে এমন ব্যক্তিদের নামে মিউনিখের সেতু এবং রাস্তাগুলির নামকরণ হয়েছে। ভারতবর্ষের মাত্র একজন খেলোয়াড় এই সম্মান লাভ করেছেন—তিনি হলেন হকির 'যাদুকর' ধ্যানচাঁদের ভাই রূপসিং। অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী ভারতীয় হকি দলে এই দুই ভাই খেলেছিলেন। সাহিত্য, চারুকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি নিয়ে সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী এবং উৎসবেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক কথায় ২০তম অলিম্পিক গেমস উপলক্ষে মিউনিখে এখন এলাহি কাণ্ড চলেছে।

কিন্তু মিউনিখের আকাশে কাল মেঘ পুঞ্জীভূত হচ্ছে—রোডেশিয়ার মিউনিখ অলিম্পিক গেমসে যোগদানের প্রতিবাদে। ইতিমধ্যেই আফ্রিকার ১৫টি দেশ মিউনিখ অলিম্পিক গেমস বর্জনের হুংকার ছেড়েছে। তাদের সমর্থন জানিয়েছেন আমেরিকার অলিম্পিক ট্র্যাক এণ্ড ফিল্ড দলের সমস্ত নিগ্রো অ্যাথলীটরা। ঘটনার এই পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লাভাকিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। ভারতবর্ষকেও ঘটনাপ্রবাহের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে হচ্ছে। সুতরাং রোডেশিয়ার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি যদি তাঁদের আগের গোঁ না-ছাড়েন তাহলে মিউনিখ অলিম্পিক গেমস শেষ পর্যন্ত শিবহীন যজ্ঞে পরিণত হবে বলে অনেকেরই ধারণা।

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

পঞ্চম টেস্ট ক্রিকেট

ওভালের শেষ পঞ্চম টেস্ট ক্রি[illegible] খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৫ উইকেটে ইংল্যান্ড[illegible] পরাজিত করে ১৯৭২ সালের টেস্ট সি[illegible] ২—২ খেলায় (ড্র ১) শেষ পর[illegible] অমীমাংসিত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনি[illegible] ৩৯৯ রানের মাথায় শেষ হলে ত[illegible] ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসের ২৮৪ রা[illegible] থেকে ১১৫ রানে এগিয়ে যায়। চ[illegible] দিনের বাকি সময়ের খেলায় ইংল্যান্ড [illegible] ইনিংসের ৫ উইকেট খুইয়ে ২২৭ [illegible] সংগ্রহ করে।

পঞ্চম দিনে ইংল্যান্ডের ২য় ইনি[illegible] ৩৫৬ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রে[illegible] জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৪২ রানের ম[illegible] ১ উইকেটের বিনিময়ে ১১৬ রান সং[illegible] করে।

৬ষ্ঠ অর্থাৎ শেষ দিনে অস্ট্রে[illegible] আরও চারটে উইকেট খুইয়ে জয়লা[illegible] প্রয়োজনীয় বাকি ১২৬ রান সংগ্রহ ক[illegible] ৫ উইকেটে জয়ী হয়। অস্ট্রেলিয়ার [illegible] ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৫ উইকেটে ২৪[illegible] লাঞ্চের কিছু পরেই খেলায় জয়-পরাজ[illegible] নিষ্পত্তি হয়।

ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় অস্ট্রেলি[illegible] কিথ স্ট্যাকপোল উভয় দলের পক্ষে শী[illegible] স্থান লাভ করেন—মোট রান ৪৮৫ [illegible] গড় ৫৩·৮৮। ইংল্যান্ডের পক্ষে শীর্ষস্থ[illegible] পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার টনি গ্রেগ—[illegible] রান ২৮৮, গড় ৩৬·০০। উভয় দলের প[illegible] এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রান ([illegible] আউট ১৭০) করেছেন অস্ট্রেলিয়ার [illegible] এডওয়ার্ডস। ইংল্যান্ডের পক্ষে [illegible] ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রান (৯[illegible] করেন লাকহার্স্ট।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সেঞ্চুরী করে[illegible] এই তিনজন—গ্রেগ চ্যাপেল—১৩১ [illegible] (লর্ডস) এবং ১১৩ রাণ (ওভাল), [illegible] স্ট্যাকপোল—১১৪ রাণ (ট্রেন্টব্রিজ), এডওয়ার্ডস—নটআউট ১৭০ রাণ (ট্রে[illegible] ব্রিজ) এবং আয়ান চ্যাপেল—১১৮ [illegible] (ওভাল)। অপরদিকে ইংল্যান্ডের প[illegible] কেউ সেঞ্চুরী করেননি। পাঁচটি খেলার এ[illegible] টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের পক্ষে [illegible] দ্বিতীয়বার কোন খেলোয়াড় মোট ৩[illegible] রান সংগ্রহ করতে পারলেন না। প্রথম [illegible] নজির সৃষ্টি হয় ১৯০৯ সালে, অস[illegible] লিয়ারই বিপক্ষে।

বোলিংয়ের গড় তালিকায় উভয় দ[illegible] পক্ষে শীর্ষ স্থান পেয়েছেন ইংল্যা[illegible] ডেরিক আণ্ডারউড (১৬টি উইকেট [illegible] গড় ১৬·৬২)। অপরদিকে অস্ট্রেলি[illegible] পক্ষে ডেনিস লিলি (৩১টি উইকেট [illegible] গড় ১৭·৬৭)। উভয় দলের প[illegible] সর্বাধিক উইকেট (৩১টি) পাওয়ার গৌ[illegible] লাভ করেছেন ডেনিস লিলি। তাছ[illegible] লিলি ৩১টি উইকেট পাওয়ার স[illegible]

স্বদেশের ইতিহাস

শ্রীঅংশুরঞ্জন সেনের 'ধনঞ্জনবাব রাণ-নন্দিকা' পড়ছি। গল্পের ঢঙে ইতিহাসের বর্ণনা সুস্বাদু সন্দেহ নেই। কিন্তু ইতিহাস নিয়ে অসতর্কভাবে খেলতে যাওয়ার বিপদ অনেক। যেমন, তিনি ৩০ জুন অমৃতে তাঁর তিন নম্বর কিস্তিতে লিখছেন : '(তাঁ ঘসেটি বেগমের) জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কয়েকটি ঘটনা ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং নবাব সিরাজদ্দৌলার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। এই বিচ্ছেদ চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে পলাশীর যুদ্ধে।' উক্তিটি অন্যমনস্ক, অসতর্ক এবং বাস্তবতাবিরোধী। পলাশীর যুদ্ধের ঐতিহাসিক সত্যকে ব্যক্তিগত বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যে লেখক গুলিয়ে ফেলেছেন। ব্যক্তিই সব করে—কিন্তু ইতিহাসের একটি অবজেকটিভ ব্যক্তি-ইচ্ছা-নিরপেক্ষ নিয়ম আছে—সেখানে ব্যক্তি অসহায় এবং সেই নিয়মের অচেতন যন্ত্র মাত্র। নবাবী আমলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অর্থাৎ ব্রিটিশ শক্তির ঐতিহাসিক ভূমিকা কী ছিল, তা বিশ্লেষণ করলে তবেই সত্য বেরিয়ে আসে। ব্যক্তিগত ঘটনার ভূমিকা গৌণ এবং অবাস্তব হয়ে পড়ে তখন।

পলাশীর যুদ্ধ আমাদের বাঙালী জাতির বুকের গভীরে অক্ষয় ক্ষতচিহ্ন। শুধু বাঙালীর কেন, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সে এক ক্রান্তিবিন্দু। তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য অসামান্য। তাই তৎকালীন বাঙালী শাসক আর বহিরাগত আক্রমণকারী ইংরেজের ভূমিকাকে খুঁটিয়ে ঐতিহাসিক গভীর বাস্তবতার পটে ফেলে বিচার করা দরকার। স্বাধীনতার পরবর্তী [illegible] থেকে একটা অদ্ভুত রেওয়াজ হয়ে গেছে যে কেবলমাত্র নবাব সিরাজদ্দৌলাকে যতদূর সম্ভব হেয় প্রতিপন্ন করেই ইংরেজের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বর্ণনা করা হয়—সিরাজ খামখেয়ালী, অসংচরিত্র মাতাল নরহত্যাকারী ইত্যাদি ইত্যাদি এবং এসব কারণেই নাকি জনসমর্থন (!) হারান, আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে, পরিণামে ইংরেজের হাতে হেরে যান। তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'পলাশীর যুদ্ধ' নামক জনপ্রিয় বইটিতে প্রথমে এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করা যায়। তারপর তো অজস্র প্রবন্ধ, আর তথাকথিত ঐতিহাসিক উপন্যাস (!) বেরিয়েছে। এবং শ্রীঅংশুরঞ্জন সেনও সে-সুরেই লিখেছেন তাঁর ঐতিহাসিক আখ্যানভাগটি।

আজকাল যিনিই ইতিহাস লিখতে চেষ্টা করেন, কিংবা ঐতিহাসিক কাহিনী, কিংবা উপন্যাস—অসীম দুঃখে লক্ষ্য করি—তাঁরা স্বদেশের সঠিক ইতিহাস অশেষ শ্রমে ও নিষ্ঠায় উদ্ধার করার বদলে সোজা তৎকালীন ইংরেজের কুটিল কলমের শরণাপন্ন হন—কারণ, সেটা সোজা। এবং হয়তো বা ইংরেজ চলে যাবার পর যে মনোভাবে আমরা এ্যাংলিয়ানায় রপ্ত হচ্ছি—সেই অবচেতন দাসমনোবৃত্তি এসব আমাদের করায়। দেশমাটি ঐতিহ্য তো অধুনা আমাদের কাছে নিতান্ত তামাশা!

হায়, আজও তবু ধোপদুরস্ত এদেশী সায়েব ইংরেজের বর্ণের পায়ে পায়ে অপমানিত হয়—কালি নিগারের টীকা আজও মোছা যায় না! (স্টেটসম্যানে ২ জুলাই প্রকাশিত এক পার্শীসাহেবের চিঠি দ্রষ্টব্য)

অবশ্য আমার উপরোক্ত অভিযোগ মোটেও অংশুবাবুর প্রতি নয়—ওই রকম মানসিকতার প্রতি। তাঁর রচনাটি উপলক্ষ্য করে আমার কিছু বক্তব্য নিবেদন করতে চেয়েছি মাত্র। কতকগুলো ব্যাপারে নবাব সিরাজ সম্পর্কে স্পষ্ট চোখে পড়তে বাধ্য। যা থেকে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রের সিদ্ধান্তই যুক্তিসহ মনে হয়। জাতীয়তাবাদ স্বদেশপ্রেম ইত্যাদি বোধ তৎকালে আমরা আশা করিনে। কিন্তু একটা কথা অস্বীকার করা যায় না, বাংলাদেশে মোটামুটি চমৎকার একটা অর্থনৈতিক ইংরেজ বিধ্বস্ত করতে চাইছিল নিজের বাণিজ্য দখলের উদ্দেশ্যে, এবং মুখ্যত যুদ্ধটা বেধেছিল সেই স্বার্থকে কেন্দ্র করেই। যতবার আমি মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক জায়গাগুলো দেখতে গেছি, একটা ব্যাপার ভারি নাড়া দিয়েছে। এই এক [illegible] সিরাজের আর বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই কেন? মীরজাফরের অনেক কিছু রয়েছে—ব্রিটিশ আমলেরও কত কী লক্ষ্য করা যায়। অথচ সিরাজ কবরে ছাড়া কোথাও নেই। স্পষ্টই বোঝা যায়, তাকে সবদিক থেকে [illegible] নির্মূল করে ফেলা [illegible] ত্রাগিদেই। জনমনে তার সম্পর্কে অদ্ভুত বীভৎস সব গল্প প্রচার করা হয়েছিল রীতিমতো প্ল্যান করে। সম্পত্তিবান মানুষমাত্রেরই জ্ঞাতিশত্রু মামলাবিবাদ খুনজখম ঘটেই থাকে—এটাই স্বাভাবিক রীতি। সম্পত্তিবান—বিশেষত সামন্তযুগের শাসককুলের তরুণ, সিরাজের পক্ষে চরিত্রের [illegible] কেমন—তাও বোঝা যায়। কিন্তু তাই বলে তার বীরত্ব, বুদ্ধিবিবেচনা, বাস্তবতাকে বুঝবার ক্ষমতাও অস্বীকার করা যায় না। নিন্দা দূরের কথা, প্রশংসাই করতে হয় তার ঐতিহাসিক ভূমিকাকে। প্রবীণদের প্রাজ্ঞ-পণ্ডিতকতা, কায়েমী স্বার্থের প্রতি বশম্বদ-শীলতা, গোঁড়ামি, অত্যধিক মাত্রায় স্বার্থপরতা, নীতিজ্ঞানহীনতা—যা আমরা স্বাধীন দেশেও প্রত্যক্ষ করেছি এবং [illegible] মতই তাদের ছোট নবীনদের হাতে [illegible] দায়িত্ব তুলে দিয়েছি। জগৎশেঠ মীরজাফরকে পাত্তা না দিয়ে তরুণ মোহনলালকে প্রধান সেনাপতি করার মধ্যেই সিরাজের [illegible] মান বাস্তবতাবোধের পরিচয় রয়েছে। [illegible] হাসের চেহারা বদলায়, মানবসভ্যতা এগোয় [illegible] মানুষের মূল ব্যাপারগুলো [illegible] ভারতের যুগ থেকে আজও অবিকৃত [illegible] এখনও মানুষের তেমন কোন [illegible] পরিবর্তন ঘটেই নি। তাই আজ [illegible] বাহাদুর ঘাঁটিতে বসেও সহজে [illegible] মানুষের বিচার করা খুব কঠিন নয় [illegible] বলেই তো আজও [illegible] নাটক আমাদের উপভোগ্য। যেন [illegible] একই 'সমকাল' চোখের সামনে ভেসে [illegible]

সিরাজকে শুধুমাত্র হেয় করার [illegible] বুকে হাত দিয়ে ইতিহাসের কোন [illegible] দাবী করতে পারেন নি তিনি [illegible] জলে ধোয়া তুলসীপাতাটি [illegible] মানুষের থাকে—থাকবে। [illegible] অস্তিত্ব বিশ্বজগতের বস্তুগত [illegible] সুন্দর-কুৎসিতের দ্বন্দ্ব-সমাহার নিয়েই [illegible] প্রগতি। কিন্তু শুধুমাত্র বিশ্বনিন্দুকের [illegible] দেখেছেন সিরাজচরিত্রের [illegible] দেখাতে থাকবেন তপনবাবুরা [illegible] এটা আত্ম-অচেতন দাসমনোবৃত্তি। [illegible] পরিণাম বর্তমান ও ভাবী [illegible] এক অসত্য ধারণায় সঞ্চার [illegible] জানবে সিরাজের 'অপরিণামদর্শিতা' [illegible] পরবিচারবোধহীনতা এবং [illegible] 'নিষ্ঠুরতা' বুদ্ধিই নাকি [illegible] কারণ। তারা জানবে না এই [illegible] ভাগ্য শাসকের বীর্যবত্তা [illegible] প্রতিজ্ঞা পালনে নিষ্ঠা [illegible] অসাম্প্রদায়িকতা। টেরই পাবে না [illegible] ভারতের মতো অনেক [illegible] ষড়যন্ত্র ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের [illegible] আম্রবাগানে, এমনি বর্ষার কালো [illegible] নিচে!

সব ইতিহাস নতুন করে লেখার [illegible] এসেছে। তার জন্যে চাই অশেষ শ্রম, [illegible] সংস্কারমুক্ত মন এবং সত্যানিষ্ঠা। যা [illegible] অক্ষয়কুমার মৈত্র শুরু করেছিলেন [illegible] আর এগোল না—আমাদের [illegible] স্বদেশকে স্বদেশী চোখেই চিনতে [illegible] তথাকথিত ইতিহাসে সত্য একেবারে [illegible] তা নয়। সেটা কেমন? একজন বনে [illegible] ছিল—তাকে বাঘে খেল, এইটুকু। [illegible] নিয়ে বাঘে খাওয়ার ঘটনার সঙ্গে [illegible] অজস্র ব্যাপার স্বভাবত [illegible] নতুন করে খুঁজে বের করতে হবে। [illegible] লিখেছে সে বনে গেল আর বাঘ [illegible] আয় তোকে খাই—এটাই মাথা [illegible] শুনে নিয়ে মুখস্থ বলে যেতে হবে [illegible]

—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কলকাতা-[illegible]

[illegible] প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩, [illegible] ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। রচনার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্য গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য অমৃতের কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।
২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে অমৃত কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা		মফঃস্বল	
বার্ষিক	টাকা	২৫·০০	টাকা	৩০·০০
ষাণ্মাষিক	টাকা	১২·৫০	টাকা	১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬·২৫	টাকা	৮·০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার (চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১·০২
ষাণ্মাষিক	টাকা	০·৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০·২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ
২য় খণ্ড

২০ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক ২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday, 15th September, 1972 শুক্রবার, ২৯ ভাদ্র ১৩৭৯ **.52 Paise**

'এক নজরে'

বিবাহ ও মদিরা : প্রেমে ব্যর্থতা বা একক জীবনের অসহনীয় নিঃসঙ্গতা বহুক্ষেত্রে সুরাসক্তির কারণ হয়, এইরকমটাই আমরা ভাবতে অভ্যস্ত। কারণ সিনেমায় বা রোমাঞ্চকর প্রেমের কাহিনীতে এ প্রায়শঃ আমরা দেখে থাকি। কিন্তু সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরা শহরে এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে, একক অপেক্ষা দ্বৈতজীবনে সুরার আকর্ষণ বেশি। অস্ট্রেলিয়ার স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ঐ সমীক্ষা চালানো হয় এবং নগরীর বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ১৪২২ জনকে, অর্থাৎ শহরের মোট লোক-সংখ্যার এক-শতাংশকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাতে জানা যায় যে, বিবাহিত পুরুষদের মধ্যে শতকরা তেত্রিশ দশমিক তিন শতাংশ নিয়মিত মদ্যপানে অভ্যস্ত, অথচ অবিবাহিত পুরুষদের মধ্যে মাত্র আঠেরো দশমিক আট শতাংশ ঐ লাইনের লোক। স্ত্রী সুরাসেবিকাদের ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। বিবাহিতা নারীদের শতকরা পঁচিশজন আর অবিবাহিতা-দের মধ্যে শতকরা নয় দশমিক একজন সুরাপানে অভ্যস্তা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সুরা নিঃসঙ্গকে যত না সান্ত্বনা দেয়, পরিতৃপ্তকে আনন্দ দেয় তার চেয়ে বেশি।

স্নান ও ডাইভোর্স : গ্রীসের সালোনিকা শহরের আদালতে এরিস্টটল কাইরিয়াকিডস-এর, বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা চলাকালে, আলাদা বসবাসের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। আটচল্লিশ বছর বয়স্ক ঐ ব্যক্তিটি বিবাহের তিন বছর পরে তাঁর আটত্রিশ বছর বয়স্কা স্ত্রী ক্রাইসৌলার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন, আদালতের মতে তা অভিনব হলেও প্রণিধানযোগ্য এবং মামলার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত ঐ অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামীকে আলাদা বসবাসের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। শ্রীমতীর বিরুদ্ধে স্বামীর অভিযোগ, বিয়ের পর তিন বছরের মধ্যে সে একদিনও স্নান করেনি, এবং তার ফলে সুন্দরীর দেহ ও বসন থেকে এখন যে সূচিভেদ্য দুর্গন্ধ বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা আর তার পক্ষে কিছুতেই সহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না।

বিপদসঙ্কেত : ঘটনাটি কদিন আগে ঘটে থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাঙ্কক শহরে। ব্যাঙ্কের সঙ্গে শহরের থানার একটি সরাসরি বিপদ সঙ্কেতের সংযোগ ছিল। শহরে ইদানিং চুরি ডাকাতি বৃদ্ধি পাওয়ায়, সঙ্কেতধ্বনি শোনা মাত্র পুলিশ কত তাড়াতাড়ি আসে তা পরীক্ষার জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ একদিন ঐ সঙ্কেতধ্বনি বাজান। কিন্তু তাঁরা অবাক হয়ে দেখলেন যে কিছুক্ষণ বাদে পুলিশের বদলে একটি অল্পবয়সী ছেলে কয়েকটি টিফিন ক্যারিয়ারে ভর্তি খাবার নিয়ে সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগচিত্তে সেখানে উপস্থিত। পরে কর্তৃপক্ষ খোঁজ নিয়ে জানলেন, ঐ থানারই গায়ে লাগানো একটি হোটেল থেকে অফিসে কর্মরত করণিকদের জন্য ঐসব খাবার এসেছে। ঐ হোটেলে কোন ফোন না থাকায় ব্যাঙ্কের কর্মীরা থানার সঙ্গে বলাকওয়া করে ঐ ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। তারই ফলে বিপদ সঙ্কেতের ব্যবস্থাটি কার্যত খাবারের ঘণ্টিতে পরিণত হয়েছে।

ইংরেজি হটাও : অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট জর্জ পঁপিদু এবং তাঁর ক্রোধানল প্রায় সবটুকুই বর্ষিত হয়েছে ঐ দেশের সাংবাদিকদের উপরে। তাঁরা শুধু দায়িত্বহীন ও হটকারিই নন, তাঁদের জাতীয় মর্যাদাবোধেরও অভাব ঘটেছে—সাংবাদিকদের সম্বন্ধে এমন কটু কথা বলতেও দ্বিধাবোধ করেননি ফরাসি রাষ্ট্রপ্রধান। সাংবাদিকদের অপরাধ, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অথবা বৈজ্ঞানিক কারণে যখন যে ইংরেজি শব্দটি একটু বেশি চালু হয়, সেইটিকে নিজ ভাষায় তর্জমার কোনরকম চেষ্টা না করেই তাঁরা কাগজে লিখে দেন। তারপর লোকমুখে অনতিবিলম্বে ঐ বিদেশি শব্দটি ফ্রান্সের সর্বক্ষেত্রে চালু হয়ে যায়। আর এইভাবে অনুপ্রবিষ্ট ইংরেজি শব্দ এখন ফরাসি ভাষার মূল বৈশিষ্ট্যকেই প্রায় আঘাত হানতে বসেছে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট তাই পনেরোজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছেন যাঁদের কাজ হবে প্রতিটি ইংরেজি শব্দের উপযুক্ত পরিভাষা সৃষ্টি করে ফ্রান্স থেকে ঐ বিদেশি ভাষাটিকে সম্পূর্ণ উৎখাত করা।

কিন্তু ঐ কাজ যে সহজসাধ্য নয় তা ফরাসি বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করেছেন। যেমন ফরাসি একাডেমি বলেছেন 'ম্যানেজমেণ্ট' কথাটি এমনই সুগঠিত ও ফরাসি ভাষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত যে তাকে সম্পূর্ণ উৎখাত করা ঠিক হবে না এবং সম্ভবও হবে না। সুতরাং একটু ফরাসি ধাঁচে কথাটিকে উচ্চারণ করে জাতে তুলে নিলেই সব দিক থেকে ভাল হয়। একইভাবে ফরাসি ভাষায় স্থায়ীভাবে স্থান করে নিয়েছে 'উইকেণ্ড', 'গ্রাণ্ড স্লাম', 'লীডারশিপ', 'ইন্টারভিউ' প্রভৃতি শব্দগুলি, ফরাসি ভাষার ক্ষতি না করে যাদের উৎখাত করা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানীমহলও বলেছেন, 'স্প্ল্যাশডাউন'-এর মতো অমন সুন্দর অর্থবহ শব্দ সমস্ত ফরাসি অভিধান তোলপাড় করেও পাওয়া যাবে না। আর সাংবাদিকরা এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে বেলায় উল্কার বেগে এ্যাপোলো মহাকাশযানগুলি যখন পৃথিবীর বুকে ফিরে এসে প্রশান্ত মহাসাগরে অবগাহন করে তখন কোন ভাষাবিদ ত তাঁদের পাশে থাকেন না, তাই তাঁদেরও টেলিপ্রিন্টার থেকে পাওয়া 'স্প্ল্যাশডাউন' শব্দটি হুবহু কাগজের পাতায় বসিয়ে নিতে হয়। ক্রীড়া সাংবাদিকরা বলেছেন, 'স্পোর্টস', 'টীমওয়ার্ক', 'ফেয়ারপ্লে' প্রভৃতি শব্দগুলি বর্জন করলে তাঁদের খুবই অসুবিধায় পড়তে হবে। ফরাসিরা এখন নিজেরাই নিজেদের প্রশ্ন করছেন, 'কামব্যাক', 'কাউণ্ট ডাউন', 'কংগ্লোমারেট', 'শপিং সেণ্টার', 'ড্রাইভইন'—এসব শব্দের কি আবার ফরাসি অনুবাদ হয়?

অনেকে আবার একথাও বলছেন, এক ভাষার শব্দের অপর ভাষায় অনুপ্রবেশ অপ্রতিরোধ্য এবং তাতে লজ্জার বা অসম্মানের কিছুই নেই। সুতরাং কত ইংরেজি শব্দ ফরাসি ভাষায় অনুপ্রবেশ করেছে তার গবেষণা না করে বরং 'বুর্জোয়া', 'ক্যু', 'মেনু' প্রভৃতি কত ফরাসি শব্দ ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় স্থায়ী আসন লাভ করেছে তার গবেষণা করা হক।

একদা জার্মান অভিধানকেও বিদেশি শব্দমুক্ত করার নেশায় মেতেছিল নাৎসি জার্মানি। কিন্তু আজ জার্মানির যে কোন সংবাদপত্রের কটি লাইন কানে শুনলে গোয়েবলসকেও কবরে পাশ ফিরে শুতে হবে। 'এস্টাব্লিশমেণ্ট', 'স্টেউয়ার্ড', 'ওয়ে অফ লাইফ', 'বিল্ডার্স', 'বেস্টসেলার', 'সেল্ফমেডম্যান'। এখন জার্মানির সংবাদপত্রগুলিতে জার্মান শব্দের মতোই অবাধে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কদিন আগে 'প্রাভদা'য় এক ভদ্রলোক চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন, এখন প্রায়ই যে সংবাদপত্রে 'প্রেস রিলিজ' বলে একটি কথা দেখা যায়, সেটার মানে কি?

—প্রত্যক্ষদর্শী

মৌলানা ভাসানির অপপ্রচার

গত বছর বাংলাদেশের বুকে পাকিস্তানী তান্ডবের সময় বীর বিপ্লবী নেতা মৌলানা ভাসানি ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বৃদ্ধ মৌলানা এখন ভারতের সেই আতিথেয়তার মূল্য শোধ করছেন ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে বিদেশী চক্রের স্বার্থে ভারত ও বাংলাদেশের মৈত্রীতে ফাটল সৃষ্টির চেষ্টা করে। তাঁর এই অপপ্রয়াসের জুড়িদার হিসেবে তিনি সঙ্গে জুটিয়েছেন সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ও চীনপ্রেমিকদের।

রাষ্ট্রসংঘে চীনের ভিটোর পরও মৌলানার চীনপ্রেমে ভাঁটা পড়ে নি। চীনের হয়ে সাফাই গেয়ে তিনি এখন বলেন, বাংলাদেশ যতদিন ভারতের দাস হয়ে থাকবে ততদিন চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে না। দরাজভাবে তিনি বলে দিয়েছেন, মুজিব তাঁর সঙ্গে চলুন, তিনি পিকিং থেকে বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায় করে দেবেন। মৌলানা সাহেব যে মক্কেলের হয়ে ওকালতি করছেন সেই চীন কিন্তু তাঁকে বাধিত করার কোন লক্ষণই দেখায় নি। ভারতে বসে ত তিনি চৌ-এন-লাইয়ের কাছে পত্র পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে তিনি চীনের মন গলাতে পেরেছেন, এমন কোন প্রমাণই চীনের আচরণ থেকে পাওয়া যায় নি।

চীনা ভিটোর পর মৌলানা ও তাঁর সাকরেদেরা যে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছেন তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই এখন ভারতের উপর যত গায়ের ঝাল ঝাড়ার চেষ্টা করছেন। ভারতের বিরুদ্ধে তাঁদের নালিশ, ব্যাপক চোরাচালানে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পণ্যদ্রব্য পাচার হয়ে যাওয়ার ফলেই নাকি সেখানে জিনিসপত্রের অভাব দেখা দিচ্ছে। অথচ, আসল ঘটনা এই যে, চোরা পথে ভারতে যে পরিমাণ পণ্যদ্রব্য আসছে তার ২০ গুণ ভারত থেকে বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। ভারত সরকারের একজন প্রতিনিধি কলকাতায় জানিয়েছেন, মে থেকে আগস্ট এই চার মাসে বাংলাদেশ থেকে চোরাই পথে আসার সময় যেসব জিনিস আটক করা হয় তার দাম ৬৫ হাজার টাকা। অথচ, ঐ একই সময়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে চোরাই পথে আটক করা হয়েছে ১১ লাখ ২০ হাজার টাকার জিনিস। বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আরও একটি কারণ মৌলানা সাহেব ও তাঁর অনুচরেরা আবিষ্কার করেছেন। ভারত থেকে নাকি দৈনিক ত্রিশ লাখ মানুষ বাংলাদেশে যাচ্ছে এবং তার ফলে সেখানে জিনিসপত্রের টানাটানি পড়ছে। ভারত সরকার ও বাংলাদেশ সরকার, উভয়েই এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং ভারত সরকার এত দূর পর্যন্ত বলেছেন যে, বাংলাদেশ সরকার চাইলে তাঁরা সীমান্ত সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু ভারতের বদনাম রটাতে এবং ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে কোন প্রকারেই ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করতে যাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাঁদের মুখ বন্ধ হচ্ছে না।

অন্যান্য যেসব অপপ্রচার চালান হচ্ছে সেগুলির মধ্যে আছে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এখনও গা ঢাকা দিয়ে বাংলাদেশে রয়ে গেছে, এমনকি বাংলাদেশ সৈন্যবাহিনীর পোশাক পরে ভারতীয় ফৌজ ঢাকায় ঘুরছে, ভারতীয় অফিসাররা এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার অথবা ট্রেনিং অফিসার হিসাবে বাংলাদেশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত আছেন ইত্যাদি। ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার এইসব রটনার প্রতিবাদ করেছেন এবং বাংলাদেশ সরকার এই বলে আক্ষেপ করেছেন যে, প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে কোন কোন পত্রিকা এমন মিথ্যা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

মৌলানা সাহেব আর একটি মারাত্মক খেলায় নেমেছেন। তিনি বৃহত্তর বাংলার আওয়াজ তুলেছেন। তিনি বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন রাজনৈতিক মহলকে তিনি ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং তাঁরা নাকি এই ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি আছেন। বৃহত্তর বাংলার আওয়াজটি নতুন নয়। যাঁরা ভুলে গেছেন তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে পশ্চিম বার্লিনের একটি রহস্যজনক সূত্র থেকে এই ধরনের একটি পৃথক ও স্বাধীন বৃহত্তর বাংলার পরিকল্পনা বিভিন্ন সংবাদপত্রে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই পরিকল্পনার সঙ্গে আওয়ামী লীগকেও জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তান ও ভারতের কোন কোন সংবাদপত্র সেই পরিকল্পনার কথা প্রচার করেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এই প্রচারের পিছনে একটি আন্তর্জাতিক চক্র রয়েছে, যদিও ঠিক কে কাকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছিল তা বোঝা যায় নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এখন আবার সেই একই পরিকল্পনার কথা পিকিংপ্রেমিক মৌলানার কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে, এটা তাৎপর্যপূর্ণ। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মুজাফফর আহমেদ গোষ্ঠী) ও বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি এবিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, মৌলানা সাহেব পাকিস্তানের স্বার্থে চীন-মার্কিন চক্রের হাতের পুতুল হিসাবে কাজ করছেন। তাঁর এই আচরণের দ্বারা তিনি তাঁর নেতৃত্বেরই কবর খুঁড়ছেন।

সরকারীভাবেই স্বীকৃত। কিন্তু তাদের সেই কৌশল ব্যর্থ হলেও একথা ঠিক যে, অন্য কোনো উপায় না থাকাতেই এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। পশ্চিম জার্মান সরকারের এই ব্যবস্থা ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রীরও অনুমোদন পেয়েছে। আটক ইস্রায়েলিদের মুক্তি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, কারণ ইস্রায়েলের কারাগারে বন্দী আরব সন্ত্রাসবাদীদের ছেড়ে দিতে ইস্রায়েল প্রস্তুত নয়। মিউনিখেই আটক ইস্রায়েলি খেলোয়াড়দের মেরে ফেলা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। সে-হুমকি তখন কার্যকর করা না-হলেও পরে নিশ্চয়ই হতো।

ইস্রায়েলের কারাগারে বন্দী আরবদের মুক্তির দাবিতে গেরিলারা যে এই প্রথম একটা নাটকীয় কাণ্ড করে বসলো তা নয়। মাত্র গত মে মাসে তারা যখন বেলজিয়ামের একটা বিমান ছিনতাই করে তখনও তাদের দাবি ছিল একই। কিন্তু সেবার আরবদের ওপর টেক্কা দিয়েছিল ইস্রায়েলিরা। দুজন ইস্রায়েলি সেই সময়ে মেকানিক সেজে ঐ ছিনতাই করা বিমানে ঢুকে দুজন আরব গেরিলাকে মেরে ফেলেছিল।

সে-যাত্রায় গেরিলারা বুদ্ধির পাল্লায় হেরে গেলেও তারা যে হাল ছাড়েনি তার প্রমাণ পাওয়া গেল ঐ মে মাসেরই ৩০ তারিখে। ইস্রায়েলের রাজধানী তেল-আবিবের কাছে লিডডা বিমান বন্দর। কাস্টমস হলে শ' তিনেক লোক। হঠাৎ সেখানে তিনজন জাপানী বেপরোয়া গোলা-গুলি চালাতে সুরু করলো। জন ২৬ খুন হলেন, জখম-হওয়া লোকের সংখ্যা দাঁড়ালো ৭০। অবশ্য পাহারাওয়ালাদের গুলিতে দুজন জাপানী মারা গেল। তৃতীয় জন ধরা পড়লো।

এইভাবে নিরপরাধ বিমানযাত্রীদের প্রাণ নেওয়াও নাকি আরব আন্দোলনেরই অংগ। প্যালেস্টাইন মুক্তি ফ্রন্ট এই কাজের জন্যে ঐ তিনজন জাপানিকে ভাড়া করেছিল। তাদের নাকি এই কাজের জন্যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল লেবাননে। অবশ্য জাপান সরকারের সংগে এর কোনো যোগাযোগ ছিল না। বরং ঐ দেশের তিনজন লোক যে এই ঘটনার সংগে জড়িত, সে জন্যে জাপান সরকারের পক্ষ থেকে ইস্রায়েলের কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়েছিল।

কিন্তু ঐ নৃশংস ঘটনায় আরব জগতে দেখা দিয়েছিল উল্লাস। সেখানকার বাম-পন্থী মহলে আর খবরের কাগজে লিডডার ঘটনাকে বিরাট সাফল্য বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। মিশরের প্রধানমন্ত্রী তো বলে বসেছিলেন যে এই ঘটনার ফলে নাকি একথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেল যে ইস্রায়েল অপরাজেয়। আর একজন আরব নেতা বললেন, এর ফলে পৃথিবীর মানুষের মনে প্যালেস্টাইন বিপ্লবের যাথার্থ্য চিরতরে অঙ্কিত হয়ে গেল।

মিউনিখের ঘটনার পরেও হয়ত আরব জগতের কেউ কেউ এই কথাই বলবেন। কিন্তু সত্যিই যে মানুষের মনে কী ধারণা অঙ্কিত হলো সে-বিষয়ে নিশ্চয়ই সন্দেহের অবকাশ নেই। তা ছাড়া ব্যাপারটা যে এখানেই শেষ হয়ে যাবে তাও হয়ত নয়। কারণ ইস্রায়েল ইতিমধ্যেই হুঁসিয়ারি দিয়েছে সেই সব দেশের উদ্দেশ্যে যারা ঐ সব গেরিলাকে আশ্রয় ও উৎসাহ দেয়। অবশ্য মিশর জানিয়ে দিয়েছে যে এই ঘটনার সঙ্গে মিশর সরকারের কোনো যোগ নেই। এদিকে খবর এসেছে যে, লেবানন ও সিরিয়ার সীমান্তে ইস্রায়েল প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করেছে। লেবানন হলো আরব গেরিলাদের একটা বড় ঘাঁটি। কারণ সেখানে লাখ তিনেক প্যালেস্টাইন উদ্বাস্তুর বাস। আর প্যালেস্টাইন আন্দোলনের মূলে এই উদ্বাস্তুরাই।

* * *

সিমলা চুক্তিকে বাঁচানোর জন্যে দিল্লীতে যে চুক্তি হলো তার এখনও অপমৃত্যু ঘটেনি ঠিকই, কিন্তু উৎসাহিত হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি। কারণ জম্মু ও কাশ্মীরে নতুন নিয়ন্ত্রণ রেখা চিহ্নিত করে তা নির্ধারণের কাজ শেষ করতে নির্দিষ্ট মেয়াদের চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগছে। ৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ঐ সীমারেখা চিহ্নিত হওয়ার কথা ছিল। তারই সংগে কথা ছিল ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তান পরস্পরের অধিকৃত এলাকা ছেড়ে দেবে। কিন্তু প্রথম তারিখটি যখন বজায় রাখা যায়নি তখন তার ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়ায় দ্বিতীয় তারিখটিও পিছিয়ে যেতে বাধ্য।

সীমান্ত ঘাঁটি ওয়াগায় ভারত ও পাকিস্তানের সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে দৈনিক আলোচনার শেষে প্রচারিত সরকারী বিবৃতিতে অবশ্য অগ্রগতির কথাই বলা হচ্ছে। অগ্রগতি হয়ত কিছুটা হচ্ছে, তা না হলে তো বৈঠক

আগেই ভেঙে যেত। কিন্তু অগ্রগতি হলেও এতই শম্বুক গতিতে হচ্ছে যে, তার ফলে নানা জল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। সরকারী মহলে জানা যাচ্ছে, দুপক্ষের মতবিরোধটা নাকি নিয়ন্ত্রণ রেখার মানচিত্র তৈরি নিয়ে। শোনা গেছে যে, ঐ মানচিত্রে কী 'স্কেল' বা মাপ ব্যবহার করা হবে মতবিরোধটা তা নিয়েই। কিন্তু এই একটা সামান্য বিষয়েই যে মতবিরোধ সীমাবদ্ধ নেই, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। আসল বিরোধটা সম্ভবত লিপা উপত্যকার পাক অধিকৃত ঘাঁটি দুটি নিয়ে। ১৭ ডিসেম্বর যুদ্ধবিরতির পর পাকিস্তান ঘাঁটি দুটি দখল করেছিল। দিল্লীতে ভারত - পাক প্রতিনিধিদের আগে সুচেতগড়ে দুপক্ষের সামরিক কর্তাদের আলোচনা যে ব্যর্থ হয়েছিল তার একটা কারণ ছিল, ঐ দুটি ঘাঁটি ছেড়ে দিতে পাকিস্তানের অনিচ্ছা। দিল্লী বৈঠকের শেষে যে যুক্ত বিবৃতি প্রচারিত হয় তাতে ঐ ঘাঁটি দুটির প্রশ্ন উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু পাক প্রতিনিধিরা মৌখিক আশ্বাস দেন যে, ঘাঁটি দুটি ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ওয়াগায় আলোচনার অবস্থা দেখে মনে হয় পাকিস্তান এখনও তার জিদ ছাড়েনি।

এদিকে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো অবশ্য আশ্বাস দিয়েই যাচ্ছেন যে, সিমলা চুক্তি তিনি কার্যকর করবেনই। শুধু ঐ চুক্তিতে যে-সব কথা লেখা আছে তাই নয়, ঐ চুক্তির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকেও তিনি সফল করে তুলবেন। তিনি আবার নতুন করে জানিয়েছেন যে, শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে তাঁর আবার সাক্ষাতের সম্ভাবনা আছে, যদিও হয়ত সেই সাক্ষাতের দিন কিছুটা পিছিয়ে যেতে পারে। সাংবাদিকদের কাছে এই সব কথা বলার সময় অবশ্য প্রেসিডেন্ট ভুট্টো কাশ্মীরের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা প্রভৃতি উল্লেখ করতেও ভোলেন নি। অর্থাৎ তাঁর সুর এখনও নরম-গরম।

প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর নরম-গরম কথা-বার্তার একটা চমৎকার উদাহরণঃ 'আমরা ছাম্ব ছাড়বো না।' কথাটা খুবই বীরত্বব্যঞ্জক শোনায়, কিন্তু আসলে এর মধ্যে বীরত্ব তেমন নেই। ছাম্ব ভারতের এলাকা ঠিকই, কিন্তু গত লড়াইয়ের সময় পাকিস্তান ঐ এলাকা দখল করেছে। ১৭ ডিসেম্বর যখন যুদ্ধবিরতি হয় তখন ঐ এলাকা পাকি-স্তানের দখলেই ছিল। সিমলা চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, অন্যান্য অধিকৃত এলাকা দু দেশের সৈন্যরা ছেড়ে এলেও, কাশ্মীরে যে যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে। সুতরাং পাকিস্তানের ছাম্ব ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্ন উঠছে না। তবু যে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো এই কথাটা বললেন, তাঁর উদ্দেশ্য একটাই হতে পারে। পাকিস্তানের লোককে তিনি হয়ত বোঝাতে চাইছেন যে, দেখ, ভারত পাকি-স্তানের পাঁচ হাজার বর্গ মাইল এলাকা ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পাকিস্তান ছাম্ব ছেড়ে আসছে না! এই ধরনের কথাবার্তা বলে তিনি হয়ত স্বদেশবাসীকে একটু চাঙ্গা করে তুলতে চাইছেন। নানা বক্তৃতায় ভুট্টোর নরম-গরম সুরের একটা কারণ অন্ততঃ তাই।

*

পুরানো কংগ্রেসের একটা বড় রোগ ছিল রাজ্যে রাজ্যে দলীয় কোন্দল। পুরানো দল দু'টুকরো হয়ে যখন নতুন কংগ্রেসের জন্ম হলো তখন অনেকেই আশা করেছিলেন যে নতুন আদর্শবাদ ও কর্মোদ্যোগের বন্যায় ঐ সব দলাদলি ভেসে যাবে। কিন্তু সাম্প্রতিক নানা ঘটনা থেকে মনে হচ্ছে, সেই আশা পূরণ হয় নি। বিশেষতঃ লোকসভা এবং বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরাট জয় এবং বিরোধী দলগুলির বিপর্যয়ের পর এই কোন্দলের চেহারাটা আরো প্রকট হয়েছে যেহেতু অধিকাংশ রাজ্যেই কোনো গণনীয় বিরোধী দল নেই, তাই কংগ্রেসের বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যেই শক্তি পরীক্ষায় নেমেছেন। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম, দেশের সব প্রান্তেই একই ধরনের ছবি ফুটে উঠছে।

উত্তর প্রদেশের বিবাদটা প্রধানমন্ত্রীর কাছ পর্যন্ত গড়িয়েছিল। জন ১৪ কংগ্রেসী এম-এল-এ গত মাসের শেষের দিকে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ পেশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য কংগ্রেস সভাপতিও প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। বিক্ষুব্ধ এম-এল-এদের শক্তি এমন নয় যে তাঁরা বেঁকে বসলে সরকারের পতন ঘটবে, কিন্তু সরকারকে বিব্রত করার মতো ক্ষমতা তাঁদের আছে। মধ্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রকাশচন্দ্র শেঠি মন্ত্রিসভার আয়তন বাড়িয়ে বিক্ষুব্ধদের ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাতেও বিশেষ কাজ হয়নি। আঠারোটি জেলা কংগ্রেস কমিটি ভেঙে দিতে হয়েছে। তবে এর পরেও তিনি ডি পি মিশ্র বা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শুক্লাকে কাবু করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। ওদিকে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর চাকরিটা যাওয়ার পরে হনুমন্তিয়া মহীশূরে ফিরে মুখ্যমন্ত্রী দেবরাজ উরসের বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছেন। তিনি বলেছেন, রাজ্য কংগ্রেসকে 'ধোলাই' করে তবে তিনি ছাড়বেন। ওড়িশায় নতুন মুখ্যমন্ত্রী নন্দিনী শতপথীর বিরুদ্ধেও একদল কংগ্রেসী রীতিমতো সোচ্চার। বিহারে কেদার পাণ্ডের অবস্থাও খুব সুখকর নয়।

এই পটভূমিতেই দিল্লীতে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি বোর্ডের বৈঠক হয়ে গেল। স্বভাবত এই বৈঠকে প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় দলীয় শৃংখলা রক্ষার সমস্যা। কংগ্রেস সদস্যরা প্রকাশ্যে যে-রকম বেপরোয়াভাবে কংগ্রেসী সরকারের সমালোচনা করছেন তাতে নেতাদের মধ্যে রীতিমতো উদ্বেগ দেখা দেয়। তবে তাঁরা যে এই ধরনের সমালোচনা একেবারে বন্ধ করে দিতে চান তা নয়। দু দিকই যাতে বজায় থাকে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তা যাতে প্রকাশ করা যায় অথচ প্রকাশ্যে তা নিয়ে বাদবিতণ্ডা না-হয় সেই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ পদ্ধতি ভবিষ্যতে অনুসরণ করা হবে। দলের কোনো সদস্য যদি কোনো মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনতে চান তবে সেই অভিযোগের প্রমাণপত্র প্রধানমন্ত্রী অথবা কংগ্রেস সভাপতির কাছে পেশ করতে হবে। তাঁদের যদি আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সেই সব অভিযোগের সত্যতা আছে তবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলা হবে।

এই পদ্ধতি ভবিষ্যতে কতোটা অনুসৃত হবে তা নির্ভর করবে, প্রধানমন্ত্রী বা কংগ্রেস সভাপতি বিভিন্ন অভিযোগ সম্বন্ধে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তার ওপর। অবশ্য এই পদ্ধতির প্রস্তাব নতুন কিছু নয়। বছর কয়েক আগেও এই পদ্ধতি অনুসরণের কথা উঠেছিল, কিন্তু পরে নানা কারণে চাপা পড়ে যায়।

৮।৯।৭২

দরজাটা এককালে সবুজ রঙের ছিল, এখন খানিক কাঠ বার করা, খানিকটা ভাসার কালচে খোসা ওঠা চেহারা। খুটখুটে শব্দে কড়া নাড়ে উঠতে প্রণতি খুলে দিলে দেখল সিতাংশু। কিছুক্ষণ হল বিকেল গড়িয়ে চারিদিক আবছা হয়ে এসেছে। ঘরে-বাইরে কোথাও এখনো আলো জ্বলেনি। সিতাংশুর মুখ স্পষ্ট দেখতে পেল না প্রণতি।

—সমর ফেরেনি এখনো? সিতাংশু দরজায় দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করল।

—না, প্রণতি পথ ছেড়ে দাঁড়াল, এখুনি এসে যাবে। ভেতরে এসে বসুন না।

সিতাংশু ঢুকে এলে প্রণতি দরজা বন্ধ করে দিল। শেষ শীতের সন্ধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়া ধুলো আর জমে থাকা ধোঁয়ায় কেমন বিষন্ন লাগে। বস্তুত এরকম সময়টা শহরতলির এই পরিবেশ, ইতস্ততঃ ঝাঁকড়া গাছপালা, মলিন আলো, কচুরিপানায় আকীর্ণ পুকুর, থেকে-থেকে মশা এবং ঝিঁঝির ডাকে কেমন দম আটকানো মনে হয়।

সিতাংশু দু' মিনিট ওদের উঠোনে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল। উঠোনের এককোণে কুয়োতলা, তার পাশে টিন-ঘেরা কলঘর। নীচু পাঁচিলের ধারে ধারে লম্বা লম্বা কটি গাছ, বিছিয়ে আসা অন্ধকারে সবকিছু ঝাপসা ধূসরবর্ণ।

প্রণতি এতক্ষণে দালানে উঠে আলো জ্বেলেছে। ওর পিছু পিছু দালান পেরিয়ে ঘরে ঢুকে এল সিতাংশু। প্রণতির ছোট ভাই নীলু নিজের তৈরী ট্রানজিস্টরে বিবিধ-ভারতী চালিয়ে রেখেছিল। সিতাংশুকে দেখে তাড়াতাড়ি রেডিও বন্ধ করল।

—পড়তে বসিসনি এখনো? সিতাংশু অভিভাবকসূচক গাম্ভীর্যে প্রশ্ন করল ওর দিকে তাকিয়ে।

—এইতো বসব। নীলু তক্তপোশ থেকে নেমে গায়ে চাদর মুড়ি দিল।

—পরীক্ষা তো এসেই গেল, আর কটা দিন মাত্র, সিতাংশু অন্যদিকে চোখ রেখে বলল, এখন ফাঁকি দিলে আর দেখতে হবে না, সিওর গাড্ডু।

প্রণতি তাকের ওপর থেকে কাপ-ডিশ পাড়ছিল, পেছন ফিরে খুকখুক কাশির শব্দে হাসি চাপল। ওর দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে নীলু নিঃশব্দে পাশের ঘরে পড়তে চলে গেল। ক'বছর আগে যখন বেকার ছিল, তখন কিছুদিন নীলুকে পড়িয়েছিল সিতাংশু, সেই ভয় ও সম্ভ্রম-বোধটা এখনো বজায় রেখেছে নীলু, বিশেষ করে দাদার বন্ধু বলে।

—হাসছ কি, সিতাংশু প্রণতির দিকে তাকাল একবার, তুমি নিজেও তো একটি ফাঁকিবাজ, নীলুর সংগে হায়ার সেকেন্ডারিটা অনায়াসেই দিতে পারতে তা নয় খালি আড্ডা আর ঘুরে বেড়ানো।

—আমার ভাল লাগে না ওসব, প্রণতি ঠোঁট কুঁচকে বলল, পড়াশোনা একদম মাথায় ঢোকে না আমার, গল্পের বই ছাড়া কোন বই ভালবাসি না।

ওর কথার ভঙ্গিতে হেসে ফেলল সিতাংশু, তারপর বলল,

—সময় শুনতে পেলে কান মলে দিত তোমার।

—ইস, প্রণতি ভ্রূ কোঁচকালো, বড় হয়ে গেছি না এখন, আমার কান এখন দাদার নাগালের বাইরে। বলে প্রণতি হাসতে হাসতে কাপ-ডিশ হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। চেঁচিয়ে বলল,—একটু বসুন, চা করছি।

দালানের লালচে ক্ষীণ আলো উঠোনের খানিকটা অংশে পড়ায় সদর পর্যন্ত তবু দেখা যায়। ওপাশের কুয়োতলা অন্ধকার। ঝুপসি গাছগুলোর মাথায় আকাশ ধোঁয়াটে বর্ণহীন। সেদিকে একবার তাকিয়ে দরমা-ঘেরা রান্নাঘরে ঢুকল প্রণতি। ওঘর থেকে নীলুর গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। পাশের একচিলতে জায়গা ঘিরে মায়ের ঠাকুরঘর, সেখান থেকে শাঁখের আওয়াজ এল তিনবার। দূরের বড়রাস্তা থেকে বাসগুলোর যাতায়াতের শব্দ পাওয়া যায়। সিতাংশু একা বসে আছে, প্রণতি ভাবল দাদা এসময় এসে পড়লে ভাল হত।

চা নিয়ে ঘরে ঢুকতে প্রণতি দেখল সিতাংশু জানলার ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। বাইরে একটুকরো মাঠে একটা লেবুগাছ, হিমেল হাওয়ায় লেবু ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। দু'একটা জোনাকি অন্ধকার থেকে এসে জানলার গরাদের কাছে পাক খেয়ে গেল। পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে সিতাংশু প্রণতিকে দেখল।

—এখনো আসছে না যে সময়? সিতাংশু কব্জি তুলে ঘড়ি দেখল।

—কি জানি আজ কেন দেরি হচ্ছে, প্রণতি কপালে ভাঁজ ফেলল, যাই হোক আপনি এখন চা খান তো।

টেবিলের ওপর কাপ-ডিশ নামিয়ে রাখল প্রণতি সিতাংশু এসে চেয়ারে বসল আবার। চা খেতে খেতে অনামনস্ক চোখে ঘরের চারিদিক চোখ বোলাল। এটা সময়ের শোবার ঘর। স্বল্পবিত্ত পরিবারের অবিবাহিত ছেলের অপরিসর ঘর, অতএব একটা তক্তপোশ দেয়ালে ঝোলান আলনা বইয়ের র‍্যাক ও চেয়ার টেবিল ছাড়া চিহ্নিত করার মত বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না। একপাশে তাকের ওপর বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য কটি ভাল কাপ-ডিশ কাঁচের প্লাস তুলে রাখা।

পাশের ঘর থেকে নীলুর পড়া মুখস্থ করার অনুচ্চ-স্বর অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, বাইরের দরমা-ঘেরা রান্নাঘর থেকে ফুটন্ত তরকারির গন্ধ আসছে, মা রান্না চাপিয়েছেন। প্রণতি ক্ষণকাল জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিল। এসময় সিতাংশু বলে উঠল,—সময়কে একটা কথা বলবার জন্যে এসেছিলাম। তোমাদেরও বলতাম, সবাইকেই।

—কি কথা, প্রণতি ফিরে তাকাল।

—একটা নতুন খবর, সময় এলেই বলব ভাবছিলাম।

—নতুন খবর? বিয়ে করছেন বুঝি? প্রণতি বড় বড় চোখে-মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল।

—বাজে কথা বললে চুল টেনে দেব কিন্তু।

—ইস, এত বড় মেয়ের চুলে হাত দিতে নেই।

—খুব হয়েছে। মাসীমা কোথায়, দেখছি না যে?

—এই তো আমি, আঁচলে হাত মুছতে মুছতে প্রণতির মা ঘরে ঢুকলেন, এতক্ষণ ওদিকে এত ব্যস্ত হয়ে ছিলুম, তোমার সংগে দেখা করতে পারিনি।

—বসুন মাসীমা, সিতাংশু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

—থাক বাবা, তুমিই বোসো, মা স্নেহের গলায় বললেন, তারপর ফিরে তাকালেন প্রণতির দিকে।

—সিতাংশুকে শুধু চা দিয়েছিস কেন, দুটো নিমকি ভেজেও তো দিতে পারতিস।

—না মাসীমা, ওসব আজ থাক, সিতাংশু বিনয়ে বলল, আজ একটা খবর দেব বলে এলাম। আমার কানপুরের চাকরিটা হয়ে গেছে, আজ চিঠি পেলাম।

—তাই নাকি, বিস্ময় ও খুশী মেশানো গলায় বললেন প্রণতির মা, বাঃ খুব ভালো হয়েছে। এখানকার চাকরিটা ছেড়ে দেবে তো তাহলে।

—হ্যাঁ তা তো ছাড়তেই হবে, অনেক ভাল চান্স পাচ্ছি যখন।

—মা-বাবাকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হবে না? প্রণতির মায়ের দু'চোখ মমতায় জলজল করে উঠেছিল।

—জানি না, তবে মায়ের খুব কষ্ট হবে জানি; হয়ত বাবা বা ভাইবোনদেরও।

প্রণতির মা হালকা শ্বাস ফেললেন, তারপর অনামনস্ক গলায় বললেন,

—মায়ার জিনিসকে দূরে রাখতে সকলেরই বুকে বাজে।

—তবুও এসবগুলোর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত, সিতাংশু ঈষৎ হাসল। ছেলেরা বড় হলে, মাথার ওপর দায়িত্ব এলে তার সামনে তখন উপার্জনটাই একমাত্র বস্তু। তখন আর কাছে বা দূরে থাকায় অথবা স্থান-অস্থানের প্রশ্ন নেই।

—তা সত্যি। মৃদুগলায় প্রণতির মা বললেন। তোমার উন্নতির ওপরেই যে সংসারের ভালমন্দ নির্ভর করছে এখন। তা যাই হোক, সময় কিন্তু তোমার এ খবরটা শুনলে দারুণ খুশী হবে।

—ওর জন্যেই তো অপেক্ষা করে আছি মাসীমা। সিতাংশু হাতঘড়ি দেখল আবার।

—এসে যাবে হয়ত এখুনি, এক একদিন তো ফিরে আসে অন্যদিন।

—আর একটুক্ষণ দেখে চলে যাবো।

—বেশ তো। তুমি বসো বাবা, আমি একটু রান্নাঘরে যাই কেমন?

এতক্ষণ প্রণতি নিঃশব্দে টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে সকালের খবরের কাগজ দেখছিল। মা ঘরের বাইরে চলে যেতে এবার সিতাংশুর দিকে তাকাল, সিতাংশু অনামনস্ক চোখে ঘরের সিলিং এর দিকে চেয়ে কিছু ভাবছিল। প্রণতি সরে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়াল। বাইরে অন্ধকার মাঠে ছোট ছোট গাছে ঝোপে ঝাঁক ঝাঁক মশার একটানা গুন গুনানি ক' হাত দূরে একটা পুকুর, সকালে রোদে জল চকচক করে, এখন অন্ধকারে বিলুপ্ত, অস্তিত্বহীন। পুকুরের ওপারে বাড়ীতে আলো জ্বলছে। যেন কি রকম দূরাশ্রয়ী অলৌকিক অস্তিত্বের মত মনে হচ্ছে বাড়ীটাকে।

—তুমি কিছু বললে না যে প্রণতি? ঘরের নৈঃশব্দ ভেঙে সিতাংশু মিহি গলায় প্রশ্ন করল।

—কি বলব, প্রণতি সিতাংশুর চোখের দিকে তাকাল না, ভাবলেশহীন গলায় উত্তর দিল, খবরটা আনন্দের, সুতরাং আনন্দই হচ্ছে।

—খুশী হলে মানুষ বুঝি এমন নিশ্চুপ হয়ে যায়?

—কোথায় চুপচাপ, এই তো কথা বলছি প্রণতি সারা মুখে হাসি বিছিয়ে দিল, কাছে সরে এল ওর। বলল,

—ছেলেদের জীবনে অনেক আডভেঞ্চার থাকে তাই না, যেখানে খুশী চলে যেতে পারে যেমন খুশী থাকতে পারে।

—মেয়ে বলে তোমার বুঝি খুব দুঃখ?

দারুণ, প্রণতি মাথা ঝাঁকাল। শুধু মেয়ে নয়, অতি সাধারণ মেয়ে হওয়ার যে কি ভীষণ দুঃখ আপনি বুঝবেন না।

ঘরের বিষন্ন আলোয় সিতাংশু প্রণতির মুখ চোখ চেহারার দিকে তাকাল। প্রণতি আজ চুল বাঁধে নি, নিজের প্রতি কেমন যেন অনাদরের ভঙ্গি। কপালে কানের পাশে ঘাড়ের কাছে খুচরো চুল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, লেবু ফুলের হালকা মিষ্টি গন্ধ ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। অনেক দূরে প্রায় শ্রুতির শেষ সীমানা থেকে কোন বিয়েবাড়ীর সানাইয়ের সুরে ভেসে আসছে। শেষ বারের মত ঘড়ি দেখে নিয়ে সিতাংশু বলল,

—অনেক দেরি হয়ে গেল, এবার চলি কেমন, সময় এলে বলো আমি আবার আসবখন। চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে সিতাংশু দরজার দিকে এগোল। চেঁচিয়ে বলল,

—আমি আজ চলি মাসীমা।

—এসো বাবা, প্রণতির মা রান্নাঘর থেকে উঠে এলেন। প্রণতির দিকে ফিরে বললেন, মালুকে এইমাত্র দোকানে পাঠালাম, তুই-ই না হয় পিনু, সিতাংশুকে টর্চ জেলে দু'পা এগিয়ে দিয়ে আয়। বাড়ীর সামনেটায় ক'দিন আলো জ্বলছে না, তার ওপর যা এবড়ো খেবড়ো রাস্তা।

পাতায় পাতায় সরসর শব্দ হতেই গাছের গায়ে টর্চ ফেলল প্রণতি।

—ও কিছু নয়, বোধহয় কাঠবেড়ালী, সিতাংশু আশ্বাস দিল।

টর্চের ক্ষীণ রশ্মি মাঝে মাঝে ফেলে দু'জন বাড়ীর সামনের পথটুকু পার হয়ে এল। খানিক দূরে বাস রাস্তা। লাইট-পোস্ট, দোকানের আলো সব মিলিয়ে এখানটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে আছে। ঐ বাস-রাস্তা ধরে বাঁ দিকে হাঁটলে সিতাংশুদের বাড়ী মিনিট চারেকের পথ। প্রণতি ওদের বাড়ী চেনে, ছোটবেলায় সমরের সঙ্গে অনেকবার গেছে। ওর পরিবারের সকলের সঙ্গেই পরিচিত, বাড়ী ফেরার বিশেষ তাড়া না থাকায় সিতাংশু খুব শ্লথ পায়ে হাঁটছিল ওর সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা চলে এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল প্রণতি, এবং এতক্ষণে কথা বলল,

—কবে কানপুর চলে যাবেন ?

—সামনের মাসে জয়েন করার কথা, আর বোধহয় দিন বারো আমি এখানে।

প্রণতি ঝাপসা আলো আঁধারিতে সিতাংশুর দিকে তাকাল একবার। ফরসা পায়জামা পাঞ্জাবির ওপর পরনো শাল জড়ানো দোহারা লম্বা চেহারা। স্বল্প আলোর আভায় ওর উঁচু নাক ঝকঝকে চোখ ও দৃঢ় চিবুক জ্বলজ্বল করছে। প্রণতি আর কিছু বলল না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখল। সামান্যক্ষণ অপেক্ষা করে এবার সিতাংশু কথা বলল,

—এর পর থেকে তিন চার কিংবা ছ'মাস পরে পরে হয়ত দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে, প্রণতি।

—ভাল, প্রণতি অস্ফুটে উচ্চারণ করল তারপর আস্তে আস্তে বলল, এবার বাড়ী যাই।

—এক্ষুনি নয়, আর একটু থাকো। যাবার আগে এরকম একা আর দেখা হবে না। সিতাংশু অনুরোধের গলায় বলল, তুমি কিছু বলছ না দেখে আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।

—বলার কি আছে, প্রণতি স্বাভাবিক স্বরে বলল, জীবনে বড় হবার চান্স, উন্নতির চান্স পেলে সবাই সেইদিকে ছুটে যায়, পিছন ফিরে তাকায় না, সেটাই তো স্বাভাবিক, তার জন্যে দুঃখ করার বা ভেঙে পড়ার তো কিছু নেই।

প্রণতি মুখ তুলে তারা-ভরা কালচে রঙের আকাশ দেখল, অন্ধকার বিছানো ঝোপ ঝাপে জোনাকির জ্বলা-নেভা দেখল, তারপর মৃদু শ্বাস ফেলে বলল,

—বিশ্বাস করুন, আমি খুশী হইনি, আপনার এ ধারণা ভুল।

কদাচিৎ দু'একটি সাইকেল রিকসা, দু'একজন মানুষ আশপাশ দিয়ে যাতায়াত করছিল। সিতাংশুর সে সব ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তার সমস্তক্ষণ ফিরে যাবার জন্য পা সরছিল না। প্রণতির কাছাকাছি সামান্য সরে এসে ঈষৎ ভারী গলায় সিতাংশু বলল,

—তোমার কথা জানি না প্রণতি, তবে এটা বলতে পারি, আমি নিজে এতটুকুও উৎসাহ পাচ্ছি না।

—কেন? প্রণতি হাওয়ায় কণ্ঠস্বর মিলিয়ে বলল।

—আমরা পরস্পরের প্রতি এত দুর্বল, সিতাংশু এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে বলল, সেটা বোধহয় এর আগে এরকম করে বুঝি নি, তাই না ?

প্রণতির বুকের ভেতর থেকে গলার ভেতর থেকে একটা দমকা বাতাস যেন বাইরে আসবার জন্যে ছটফট করছিল। অতি কষ্টে নিজেকে দমন করল ও। ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে বলল,

—দূরে চলে যাবার সময় অমন সকলেই অসহায় বোধ করে।

—শুধু আমার কথা নয়, সিতাংশু দাঁতে দাঁত চাপল, স্থান কাল ভুলে প্রণতির সরু আঙুলগুলিকে সবল কঠিন হাতে পেষণ করল। বলল, তুমি একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ তো। আয়নার সামনে এই মুহূর্তে যদি দাঁড়াও, সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে।

প্রণতি খানিকক্ষণ আর কথা বলল না, ওর হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল, তারপর মৃদু গলায় অন্যদিকে তাকিয়ে বলল,

—অনেকক্ষণ বাইরে রয়েছি, মা হয়তো ভাবছেন। এবার চলি, সিতাংশুদা।

—তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা কিছু শুনিয়ে যাও না হয়, প্রণতি, একলা থাকার সময় যা নিয়ে চিন্তা করতে পারব।

—কি আশা করব, প্রণতি বাড়ীর দিকে এক পা এগোল, আমি জানি আপনার মাথার ওপর অনেক বোঝা। বাড়ীর বড় ছেলে, অতএব একটা পুরো সংসারের সব দায়-দায়িত্ব আপনার। তার মধ্যে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলোর জায়গা কোথায় বলুন তো ? সে তো শূন্য মাঠেই মারা যাবে শেষ পর্যন্ত। বলতে বলতে শব্দ করে হেসে উঠল প্রণতি।

—তবু চিরদিন একভাবে যায় না প্রণতি, সিতাংশু ভারী গম্ভীর গলায় বলল, মানুষ তো সুদিন সুসময়ের অপেক্ষা করেও থাকে অনেক সময়, থাকে না ?

—হয়ত থাকে, প্রণতি খরখরে শুকনো গলায় বলে উঠল, কিন্তু আমার পক্ষে বোধহয় বেশি দিন ঐ সুসময়ের জন্যে অপেক্ষা করে থাকা সম্ভব হবে না, সিতাংশুদা। বলতে বলতে প্রণতি সিতাংশুর একটু কাছাকাছি সরে এল, গলার স্বর নামিয়ে বলল, আমার সোনামাসি আছে জানেন তো, তার ভসুরপো দিলীপ, মধ্য গোলগাল

শ্যামবর্ণ চেহারা, পি ইউ পাশ, সংসারে কোন ঝামেলা নেই, বাটানগরে থাকে, সেখানেই চাকরী. ইদানীং প্রায় ঘনঘনই আসে আমাদের বাড়ীতে, মাঝে মাঝে তার নেমন্তন্ন হয়। দাদা ঘটা করে খাওয়ায় আর সে এলে আমাকে ছেঁড়া বা ময়লা শাড়ী পরতে দেয়া হয় না, চা সরবত মশলা জল এগিয়ে দিতে হয়। বুঝলেন তো ? আমি এখনো দাদার অন্নে প্রতিপালিত, মাথার ওপর মা, অতএব— প্রণতি হি হি করে হাসতে সুরু করল, একটানা এতগুলি কথা বলে হাঁপিয়ে উঠেছিল সে. এখন হাসির ধমকে চোখে জল এসে গেল তার।

সিতাংশু দীর্ঘসময় ধরে সেই বিছানো আবছায়ায় প্রণতির হাসিতে বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর খুব শিথিল মৃদুতম উচ্চারণে বলল,

—রাত হয়ে যাচ্ছে, এবার বাড়ী যাও প্রণতি।

রাত ঘন হওয়ার সংগে সংগে চারদিকে জমাট কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ে। একটা আধ-খাওয়া ঘোলাটে চাঁদ কখন যেন কুয়োতলার ওপাশে লম্বা গাছগুলির মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার বিবর্ণ আলো কুয়াশায় মাখামাখি হয়ে কি রকম একটা অদ্ভুত নির্জন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অন্যদিন রাতের খাওয়া শেষ করেই শুয়ে পড়ে প্রণতি, আজ আর সহজে ঘুম এল না চোখে। আলোনেভা দালানে পান্ডুর জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে। চটা ওঠা সরু থামের গায়ে হেলান দিয়ে প্রণতি অনেকক্ষণ বসে থাকল চুপচাপ। একটা অদ্ভুত শূন্যতার ভার তার সমস্ত শরীর মন আচ্ছন্ন করে আছে। আমার আশা আকাঙ্ক্ষা থাকতে নেই। প্রণতি মনে মনে উচ্চারণ করল। আর সকলের সুখেই আমার সুখ। একথা ভাবতে গিয়ে ছোটবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ল প্রণতির। বছর পাঁচ ছয় হবে তখন, রাস্তায় খেলতে গিয়ে প্রণতি একটা চকচকে লাল কলম কুড়িয়ে পেয়েছিল, বাড়ীতে আনতে মা হাত থেকে কেড়ে নিলেন সেটা। বললেন, ভেঙে যাবে। সমর ক'বছরের বড় ওর থেকে, স্কুলে যায় তখন, পরীক্ষা দেয় ক্লাসে ওঠে। ওর প্রয়োজনে লাগবে ভেবে মা কলমটা তুলে রেখে দিলেন। সেই পেয়ে হারানোর দুঃখটা প্রণতির মনে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল, আজকের এই রিক্ততার ভাব সেইরকমই একটা কিছু দুঃখ, ভাবল প্রণতি।

—এ রকম ঠান্ডায় এখনো বাইরে বসে আছিস যে, মা এসে পাশে দাঁড়ালেন ঘর-সংসারের টুকিটাকি কাজ সেরে।

মাথাটা ভীষণ ধরেছে মা। চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগছে।

—শরীর খারাপ নাকি? মা কপালে উদ্বিগ্ন হাত রাখলেন, জ্বাল করে খোল না পর্যন্ত।

—নাঃ, ও কিছু নয়, এখুনি সেরে যাবে, তুমি যাও শুয়ে পড় মা।

মা আর কিছু বললেন না। নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলেন পাশে খানিকক্ষণ। শির-শিরে হাওয়ায় সুপুরি আর নারকেল গাছের পাতায় একটা বৃষ্টি পড়ার মতন ঝিরঝিরে শব্দ উঠছে। কোথা থেকে হাস্নু-হানার গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। পাঁচিলের কোলের কাছে কটা ছোট ছোট ফুলগাছে লাল টকটকে কুঁড়ি, ধোঁয়াটে জ্যোৎস্নায় সবকিছুর অস্তিত্ব কেমন ছায়াসর্বস্ব। কদাচিৎ দু একটা রাতচরা পাখী লতার আড়ালে ডানায় শব্দ তুলছে।

—সিতাংশু তোকে কি বলল রে? অনেক দ্বিধা সংকোচ গলা থেকে ঝেড়ে ফেলে মা অবশেষে জিজ্ঞাসা করলেন। কয়মুহূর্ত চুপ করে রইল প্রণতি তারপর খুব সহজ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল,

—কি আর বলবে। গুরুত্বের কিছুই না।

—অতক্ষণ তবে কি বকবক করছিলি, বাড়ী ফিরলি তো আধ ঘণ্টা পরে। মায়ের কণ্ঠস্বর প্রশ্নে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো।

—আধঘণ্টা নিরিবিলিতে কথা বললেই বুঝি প্রাণের সব কথা বলা হয়ে যায়। প্রণতি শব্দ করে হেসে উঠল এবার, একটু অস্বাভাবিকই বুঝি লাগল গলার আওয়াজ, হাসির ভঙ্গি। মা সামান্য সময় মেয়ের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। থম-থমে বিমর্ষ জ্যোৎস্নায় মায়ের মনে হল, বয়স্থা মেয়ের ভাবনা চিন্তা মন মেজাজ সব কিছুই আপাতত তাঁর বুদ্ধির অগম্য হয়ে গেছে। সেখানে নাগাল পেতে চাওয়া মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই না।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে মা দূপা সরে গেলেন ওর কাছ থেকে, তারপর কি ভেবে যেন নিজেকে শুনিয়েই বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলেন,

—যত ভাল চাকরিই থাক সিতাংশু নিজের সাধ-আহ্লাদ নিয়ে মেতে থাকা লোক এজীবনে কোনদিনই সম্ভব হবে না ওর পক্ষে। সংসারের এতবড় হাঁ সব সময় তাকিয়ে থাকবে ওর আয়টুকুর দিকে। বুড়ো মা, বাবা, ছোট ছোট চার-পাঁচটি ভাই বোন সকলে ভরসাতেই তো ওই একজনের উপর।

—আমি তা জানি মা, শুকনো গলায় বলে উঠল প্রণতি, তোমাদের মেয়ে এত কাঁচা নয়, সখ করে সে বেনো জলে ভাসবে না। তাছাড়া তোমার অত চিন্তা কি মা, তোমাদের তো অমন সোনার টুকরো দিলীপই রয়েছে। বলতে বলতে খিলখিল করে হেসে উঠল প্রণতি।

—এই, থাম বলছি, এখুনি সমর ঘুম ভেঙে উঠে পড়বে। মা মৃদু ধমক দিয়ে উঠলেন।

—আচ্ছা আচ্ছা থামছি, কি জানি কেন হাসিটা এসে গেল, প্রণতি গম্ভীর সুরে বলল, দাদার নিশ্চিত ঘুমটা ভেঙে যায় তা আমিও চাই না, তুমি ঘরে যাও মা, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

মা পায়ে পায়ে ধীরে ধীরে ঘরের দিকে চলে গেলেন। প্রণতি আরও খানিকক্ষণ বসে রইল নিশ্চুপ। খানিকটা ধূসর মেঘের আড়ালে ভাঙ্গা চাঁদ ঢাকা পড়ে গেছে। আবহাওয়ায় কেমন একটা ভৌতিক আলো-আঁধারি বিছানো। হাস্নুহানার গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে অনেক তীব্র হয়ে। একটানা ঝিঁঝির ডাক ক্রমশ তীক্ষ্ণ হচ্ছে। চারিদিক নিঃশব্দ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সুসময়ের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছে সিতাংশু। কে অপেক্ষা করবে? প্রণতি না তার মা আর দাদা? অনেক সুসময়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে দিলীপ এসে দাঁড়িয়ে আছে দরজায়, মায়ের সোনামাসির ভাসুর-পো। ভাল চাকরি করে, দামী পোষাক পরে, প্রণতিদের বাড়ী আসার সময় খুচরো দু-একটা উপহারদ্রব্য কিনে আনে ওদের পরিবারের জন্য। এখন শুধু ওর মা-বাবার সংগে যোগাযোগটাই বাকী। দিলীপের প্রসংগ ভাবতে গিয়ে একদিনের ঘটনা মনে এল প্রণতির। সোনামাসির বাড়ী একদিন বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল মা ওকে। বাড়ীর পেছনে ছোট ফুলবাগানে বেড়াতে বেড়াতে প্রণতি দেখেছিল তার সংগে সংগে দিলীপ আসছে। আচমকা একটা ফুল তুলে ওর খোঁপায় দিতে গিয়েছিল দিলীপ, ভয়ে বিস্ময়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে এসেছিল প্রণতি সেখান থেকে। পরে বাড়ী ফিরে মায়ের কাছে অভিযোগ করেছিল।

—কি অদ্ভুত অসভ্য লোক, মা, কথা নেই কওয়া নেই হঠাৎ এমন অপমান করতে আসে।

—অপমান আবার কি, মা বিরক্ত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, ওহে তোকে পছন্দ করেছে এটাই ভাগ্য বলে মানিস।

সেই ভাগ্য মেনেই বসে আছে প্রণতি। হঠাৎ কোন ঝুঁকি নিতে গিয়ে সেই ভাগ্যকে খোয়াতে যাবে কোন দুঃখে। বিশেষ করে দাদার অন্ন আর মায়ের আঁচলের ছায়াটুকু তার আছে যখন।

বুকের নিভৃতে একটা শ্বাস গুমরে উঠল প্রণতির, যেখানে শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নেই।

ঈশ্বরগুপ্তের প্রেম-কবিতা

বিভাস সরকার

শ্বর গুপ্তের প্রেম কবিতা'—কথাটা
অদ্ভুত লাগা স্বাভাবিক। কারণ,
গুপ্ত যে ধরণের কবি তাতে তাঁকে
যাই হোক প্রেমের কবি হিসেবে
ই যেন কল্পনা করা যায় না। প্রেমের
কন, আধুনিক দৃষ্টিকে ঈশ্বর গুপ্তকে
কে স্বীকার করতেই অনেকে নারাজ
কারণ 'কবিতার মধ্যে চাই কবির
স্বার স্বাক্ষর—তাঁর এমন আনন্দ বা
দনা যা কেবল নির্দিষ্ট অর্থমাত্র
ব্যঞ্জনাময় ভাবের সঞ্চার।'

শ্বর গুপ্তের কবিতায় তা তো নেই-ই,
যায়, তাঁর কবিতার বিষয় 'এমন
এমন বেদনা যা কেবল নির্দিষ্ট,
ব্যঞ্জনাময় ভাবের সঞ্চার' নয়।
বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য অত্যন্ত
তিনি বলেছেন, 'মনুষ্য হৃদয়ের
গম্ভীর উন্নত অস্ফুট ভাবগুলি
তাহাকে গঠন দিয়া অব্যক্তকে তিনি
করিতে জানিতেন না, সৌন্দর্য
তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না।...
কাব্য সুন্দর, করুণ, প্রেম এসব
বড় বেশী নাই।'

ঈশ্বর গুপ্ত কিরকম কবি?
ব্যাপারেও বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যই
প্রধান সহায়।—'ঈশ্বর গুপ্তের
চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধুঁয়ায়,
মাসির ধর্নির ঠেলায়, নীলের
হোটেলের খানায় পাঁটার অস্থিস্থিত

—রসভরা রসময় রসের ছাগল
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল।...

রূপ
পরূপ হেরে রূপ পুত্রশোক হবে।
মুখে দেওয়া দূরে থাক গন্ধে
পেট ভরে।।

ই তাঁর কবিতার নমুনা।

দ্বিতীয় এবং প্রধান কথা—সার্থক কবি
গেলে যে জিনিসটির একান্ত
ন—সেই জগৎ ও জীবনের প্রতি
বোধ, মানুষের প্রতি ভালবাসা,—এক-
একটা ইতিবাচক মনোভাব— তারও
অভাব ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে! প্রথম
শেষ পর্যন্ত তিনি একটা অন্ধ
মূলক মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত।

নারী চিরদিন যুগভেদে দেশভেদে ছোট বড় প্রায় সমস্ত কবির কল্পনাকেই কমবেশি উত্তেজিত করেছে। এক্ষেত্রে গুপ্ত কবির সুযোগও ছিল বেশি। বহুকাল থেকে এদেশে সমগ্র নারীজাতির প্রতি একটা অবিচারের মনোভাব গড়ে উঠেছিল। নারীর ভাগ্যে সেদিন অবজ্ঞা আর লাঞ্ছনা ছাড়া কিছুই জোটেনি। ছলে বলে লোকাচার শাস্ত্রাচারের বন্ধনে বেঁধে নারীকে কোন-রকমে গৃহকোণে বন্দী করে রাখাটাই ছিল সেদিনের একমাত্র চেষ্টা। ঊনিশ শতক প্রধানত নারীর এই বন্ধন মোচনের যুগ। এসেছেন রামমোহন, এসেছেন করুণার মূর্ত বিগ্রহ বিদ্যাসাগর,। নারী সম্বন্ধীয় এই নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠার যুগে আবির্ভূত হয়ে ঈশ্বর গুপ্তও যদি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হতেন, বিদ্যাসাগরের অপার করুণার এক কণাতেও যদি তাঁর অধিকার থাকত—তাহলে হয়ত তাঁর কাব্যের স্বভাবই অন্যরকম হয়ে যেত।

কিন্তু বলেছি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি একটা অন্ধ নৈতিমূলক মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত। আর তাঁর নারী সম্বন্ধীয় ধারণার মধ্যে এই নৈতিমূলক মনোভাবের প্রকাশ অবিশ্বাস্য রকমের উগ্র।—'স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে ব্যঙ্গের পাত্র। ঈশ্বর গুপ্ত তাহাদের দিকে আঙগুল দেখাইয়া হাসেন, মুখ ভেঙ্গান, গালি পাড়েন, তাহারা যে পৃথিবীর পাপের আকর তাহা নানা প্রকার অশ্লীলতার সহিত বলিয়া দেন।...তিনি বলেন,... উহারা শুড় রঙ্গের জিনিস। মানুষে যেমন রূপী বাঁদর পোষে...পুরুষে তেমনি মেয়েমানুষ পোষে, উভয়কে মুখ ভেঙ্গানোতেই সুখ।' (বঙ্কিমচন্দ্র)

এহেন অবস্থায় এই মানসিকতায় ঈশ্বর গুপ্ত প্রেম সম্বন্ধে চিন্তা করবেন বা প্রেম কবিতা লিখবেন এ একরকম অবিশ্বাস্য।

কিন্তু অবিশ্বাস্য ব্যাপারও অনেক সময় সত্যি হয়। ঈশ্বর গুপ্তের বেলাতেও তাই হয়েছে। পঞ্চশর তাঁকেও দগ্ধ করেছে; মন দেওয়া-নেওয়ার খেলায় তাঁকেও মাততে হয়েছে! এর সাক্ষ্য রয়েছে তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতায়।

'প্রেম'কে কবি কি চোখে দেখেন? ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবনে স্বভাবতঃই তা 'দরিদ্রের ধন' এবং 'হৃদয় সদনে' সযতনে সাবধানে রাখার জিনিস—

> সুখময় শুকপক্ষী ভাল ভালবাসা।
> মানস বৃক্ষেতে তার মনোহর বাসা।।
> ...পোষমানা পড়াপাখী দরিদ্রের ধন।
> সাবধানে রাখি কত করিয়া যতন।।
>
> (প্রেম)

প্রেমের যে একটা সর্বদুঃখহর আনন্দ-ময় রূপ আছে, সেইটিই কবির কল্পনাকে উত্তেজিত করে তোলে। প্রেমের সেই রূপের

সাক্ষাৎ অভিশপ্ত জীবনে মেলেনি বলেই হয়ত তার আকর্ষণ তাঁর কাছে বেশি—

...দেখাইব কত সুখ এ তিন ভুবন
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন।।
নয়নে নিরখি প্রকটিত পদ্মবন।
সুমধুর গীতশ্রুতি করয়ে শ্রবণ।।
...এইরূপ স্বর্গভোগ লভি সর্বক্ষণ।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন।।

(প্রণয়ের প্রথম চুম্বন)

কবিগানের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। কবির দলে, হাফ আখড়াইয়ের দলে তিনি গান বেঁধে দিতেন,—এমন প্রমাণও আছে। এদিক থেকে, তার প্রেম-কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে স্বভাবতই কবিগানের কথা এসে পড়ে। কবি সঙ্গীতের মত ঈশ্বর গুপ্তের প্রেম-কবিতারও একটা সাধারণ লক্ষণ—সহজ আন্তরিকতা।

গুপ্ত কবির আত্মনিবেদনের মধ্যে কোথাও ফাঁকি নেই। তিনি যথার্থই ভাল-বাসতে চেয়েছিলেন তাঁর ভালবাসার জনকে। তার হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন—মন-প্রাণ-সর্বস্ব। কয়েকটি কবিতায় ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর সেই ভালবাসার আলো।—

কারে আমি কই আমাতে তো আমি নই
আমারে তোমার দিয়ে হয়েছি তোমার।
...তোমারে হৃদয়ে ধরি সর্ব দুঃখ পরিহরি
তৃণসম জ্ঞান করি নিখিল সংসার"

আর একটি কবিতায়—

বহুদিন যার লাগি হয় প্রেম অনুরাগী
আশাপথে আশা ছিল একা।
সদয় হইয়া বিধি দিয়াছেন সেই নিধি
গোপনে পেয়েছি তার দেখা।।
...মনে মনে এই চাই কোনখানে নাহি যাই
ক্ষণমাত্র তার সঙ্গ ছেড়ে।
প্রেমভাবে কাছে এসে ঈষৎ কটাক্ষে হেসে
একেবারে প্রাণ নিল কেড়ে।।

(প্রণয়)

বহুদিন পরে প্রিয়জনকে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পেয়ে কবির প্রেমিক হৃদয়ে যে আনন্দ জেগেছে, এগুলি তারই সহজ প্রকাশ। এ নিছক কবিতা লেখার জন্যে কবিতা নয়, এ একান্তভাবে কবির জীবন-সাধনারই অঙ্গীভূত। তাই ভাষা, ছন্দ তথা আঙ্গিক মামুলী ধরনের হওয়া সত্ত্বেও এদের অঙ্গে একটা সহজ কবিত্বের স্পর্শ লেগেছে।

কিন্তু কবির জীবনে এ আনন্দ স্থায়ী হয়নি। যে প্রেমের স্বপ্নে কবি সব দুঃখ ভুলতে চেয়েছিলেন, সে প্রেমও তাঁকে শেষ পর্যন্ত বঞ্চনা করেছে! যত্নে সাজানো তাঁর প্রাণের অর্ঘ্য বাঞ্ছিত গৌরব লাভ করেনি,—শুধু ধুলোয় লুটিয়েছে। মাইকেল মধুসূদনের মত ঈশ্বর গুপ্তও তাই বিলাপের সুরে বলতে পারতেন,—

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে
কি ফল লভিলি?
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায় ধাইলি অবোধ হায়
না দেখিলি না শুনিলি এবে রে
পরাণ কাঁদে!

(আত্মবিলাপ)

অতঃপর তাঁর প্রেম-কবিতাগুলি আর কিছু নয়,—এক দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের কান্নার করুণ ইতিহাস! কবির এই বেদনা-মথিত মনের পরিচয় কয়েকটি কবিতায় নিখুঁত-ভাবে ফুটে উঠেছে। কখনো কবি বলেন—

...সে যখন মনে লাগে কিছু নাহি ভাল লাগে

ভাবি শুধু বিরলেতে বসি।
স্থির নাহি ক্ষণমাত্র চিন্তাপূর্ণ চিন্তাপাত্র
গাত্র হতে অস্থি পড়ে খসি।।

(প্রণয়)

আবার কখনো,—

দুঃখভোগে শ্রান্ত হয়ে ঘুমায়েছে মন।
আর প্রাণ আলাপের নাহি প্রয়োজন।।
বিচ্ছেদেরে বুকে রেখে সুখে প্রাণ আছি।
চোকে মাত্র দেখি শুধু যতদিন বাঁচি।।
...বিরহে বিরলে বসি কাঁদি আমি একা।
স্বপনে তোমার সহ শুধু হয় দেখা।।

(ভালবাসা)

সবচেয়ে বড়ো দুঃখ, কবির ভালবাসাকে যে অস্বীকার করেছে, দুপায়ে দলে গেছে, কবি তাকে ভুলতে পারেন না। মন হারানোর বেদনা, কবির বুকে বড়ো বেশি করে বাজে—কণ্ঠে তাঁর ধ্বনিত হয় প্রেমিকের সেই চিরন্তন অভিযোগ :

যদি না আসিবে সেই বাঁধা প্রেম ছেড়ে।
ভুলাতে আমার মন কেন নিলে কেড়ে?
ইঙ্গিতে বলিতে সব যে সুখেতে আছি।
ছাড়া হয়ে কাড়া মন ফিরে পেলে বাঁচি।।

(প্রণয়ের আশা)

ক্ষণিক মিলনের চেয়ে কবির কাছে চিরবিচ্ছেদ অধিকতর সহনীয়। কেননা সেক্ষেত্রে 'দ্বিগুণ আগুনে পুনঃ জ্বলে' ওঠার সম্ভাবনা থাকে না।—

বরঞ্চ সে ভাল ছিল না হইত দেখা।
বিরলে তোমার ভাবে কাঁদিতাম একা।।
দেখা হয়ে যত দুখ কি কহিব বলে।
দ্বিগুণ আগুন পুন উঠিয়াছে জ্বলে।।

(বিচ্ছেদের পর মিলন—মানসমোহন)

কাব্য-সাহিত্যে বিরহের একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকৃত। কেননা, বিরহ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই প্রেম সম্পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের বেলায় ফল হয়েছে উল্টো: কবি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। নিরবচ্ছিন্ন বঞ্চনা আর অবহেলার আঘাতে জর্জর কবির ভালবাসা রূপান্তরিত হয়েছে এক সর্বব্যাপী তিক্ততায়! নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তিনি নিঃসংকোচে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সত্যিকারের ভালবাসা হৃদয়ে থাকা সত্ত্বেও, এ-জগতে কেউই প্রেমের ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে পারে না। আর এ অনাসক্তির মূলে হল নারী! 'দাস সুখ' কবিতায় নায়কের উক্তির মধ্যে এই ঘোষণাই স্পষ্ট ও সোচ্চার—

...যদি কেউ গুনে থাকে সাগরের ঢেউ।
পৃথিবীর সীমা যদি পেয়ে থাকে কেউ।।
...এইরূপে যার চেয়ে যোগ্য আর নেই।
নারীভাব নিরূপণে পরাভব সেই।।
এমন কি আছে কেউ রমণী রতন।
স্থিরভাবে যে পেয়েছে রমণীর মন।।"

'রমণীর মন' পাওয়ার প্রধান বাধা কোথায়? কবির উত্তর—তা রমণীর স্বভাবের মধ্যেই নিহিত—

...যতদিন থাকে তার যৌবনের বস।
ততদিন নাহি হয় পুরুষের বশ।।
...যুবতী যৌবনে যদি পীরিতি জানিত।
পুরুষের মনে তবে কি সুখ হইত!

একটি বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে কবিতার সমাপ্তি ঘটে—

...গুপ্ত প্রেম গুপ্ত থাক ফুটিবে না আর।
রহিল মনের খেদ মনেই আমার।।

প্রেম সম্বন্ধে গুপ্ত কবির এই শেষ কথা! একটি যন্ত্রণাদগ্ধ অসম্মানিত অসফল প্রেমের স্বাক্ষর রেখে গেছেন তিনি তাঁর এই পর্যায়ের কবিতাগুলিতে। দুঃখ-যন্ত্রণাকে জয় করে নীলকণ্ঠ হতে পারেননি কবি—নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন তার অতল তলে! অন্য ভাষায়, প্রেমের আগুনে পুড়ে পুড়ে তাঁর হৃদয় সোনা হয়ে ওঠেনি, অঙ্গারে পরিণত হয়েছে।— বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিতেও এর পরোক্ষ সমর্থন মেলে।— 'দুর্গামণি (ঈশ্বর গুপ্তের স্ত্রী)-র রূপ ছিল কিনা তাহা জানি না! যে আগুনে ভিতর হইতে শরীর পুড়ে, সে আগুন তাঁহার হৃদয়ে ছিল কিনা, জানি না। ঈশ্বরচন্দ্রের ভিতর কবিতায় দেখিতে পাই। অনেক দাহ করিয়াছে দেখিতে পাই'

॥ঊনবিংশ শতাব্দীর সুবর্ণ যুগে বাংলা॥

ঊনবিংশ শতাব্দী ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক সন্ধিক্ষণ। মধ্যযুগীয় সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিকতার সদ্য নির্মিত বাঁধা সড়কে উত্তরণের কালটি এই বাংলাদেশের নবজাগরণের কাল হিসাবে চিহ্নিত। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম প্রতিক্রিয়া এই অঞ্চলে ঘটল। ব্রিটিশ শাসক শোষণ নীতির সঙ্গে শিক্ষা বিস্তার এবং মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন আশীর্বাদও ছিল, যার সুযোগ সেদিনের বাঙালী পরিপূর্ণভাবে নিতে দ্বিধা করেননি। বাঙালী সমাজের বিভিন্ন বিভাগে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটল যা ধীরে ধীরে সারা ভারতের সর্বত্র বিস্তারিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই কালটির ইতিহাসকে এক হিসাবে সমকালীন ইতিহাস বলা যায়, কারণ এসব ঘটনা বেশী দিনের নয়। নথিপত্র এখনও দুষ্প্রাপ্য নয়। সুতরাং নবজাগরণের বাংলা নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ অতীতে হয়েছে এবং বর্তমানেও তার বিরতি ঘটেনি।

এশিয়াটিক সোসাইটি কাউন্সিলের কালচারাল অ্যান্ড সায়েন্টিফিক এডভিসরি কমিটি 'রেনেসান্ট বেঙ্গল ১৮১৭—১৮৫৭' এই অভিধায় একটি দুদিনব্যাপী আলোচনাচক্র বা সেমিনারের আয়োজন করেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সভানেতৃত্বে। সেই আলোচনা সভায় শশীভূষণ চৌধুরী, বিনয় ঘোষ, সুনীলকুমার সেন, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (সদ্য মৃত কথাসাহিত্যিক নন) ও চিত্তব্রত পালিত এই সাতজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি, রাজনীতি, সামাজিক রূপান্তর, অর্থনৈতিক পরিবর্তন, সাহিত্যের ধারা, ধর্মীয় আন্দোলন, ইয়ং বেঙ্গল (সাধারণ বিচার), ইয়ং বেঙ্গল (আত্ম-সমীক্ষা) প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন ও স্বতন্ত্র রচিত প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। সেই আলোচনা সভায় বিশেষভাবে আমন্ত্রিত কিছু সংখ্যক ব্যক্তিমাত্র শ্রোতা ছিলেন। বর্তমানে সেই সমস্ত রচনাবলী গ্রন্থাকারে পরিবেশন করে এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষগণ জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হলেন। এই গ্রন্থটির ভূমিকা রচনা করেছেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, যিনি আলোচনা সভার সভাপতি ছিলেন। তাঁর ভূমিকাটি সংক্ষিপ্ত হলেও মনোজ্ঞ।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-[illegible]

ক্যাল ফ্রেম' নামক প্রবন্ধে ১৮১৭—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ শাসন কিভাবে নবজাগরণের কাজে সহায়তা করেছে তার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন—বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে দেখা যায় কিছু অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছিল। ব্রিটিশ সওদাগরদের সঙ্গে দীর্ঘ সংযোগের ফলে এমন এক শ্রেণীর উদ্ভব হয় যাদের নিজেদের অস্তিত্ব ব্রিটিশের স্বার্থের সঙ্গে গাটছড়াবন্ধ ছিল। সুতরাং তাদের মনোভংগী ছিল ব্রিটিশঅভিমুখী এবং সেই কারণে তাঁরা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহে ব্রিটিশসমর্থক ছিলেন। লর্ড ক্যানিংকে রাজভক্তবৃন্দ যে অভিনন্দন প্রদান করেন তার মধ্যে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ব্রিটিশ অভ্যুদয়কে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়।

'সামাজিক পরিবর্তন' বিষয়ে লিখেছেন বাংলার নবজাগরণ বিষয়ে দীর্ঘদিন গবেষণারত সাহিত্যকর্মী বিনয় ঘোষ। তিনি এই বিষয়ে একজন অধিকারী ব্যক্তি। সুতরাং তাঁর প্রবন্ধটিকে এই সংকলনের মধ্যমণি বলা যায়। ঊনবিংশ শতকের সামাজিক পরিবর্তন বিষয়ে তিনি সংক্ষেপে যে বিশ্লেষণ করেছেন তা নানাদিক থেকে মূল্যবান বিবেচিত হবে। অন্য বক্তা 'অর্থনৈতিক রূপান্তর' বিষয়ে বলেছেন, তাই বিনয় ঘোষ অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও তজ্জনিত সামাজিক ধারার রূপান্তর ব্যাখ্যা করেছেন। আগেকার সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক এবং পরে যা হল তা তাঁর মতে 'ইকনমিক ডিসঅর্ডার' বা অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা। এর কারণ 'টাকা' দ্বারা সব জিনিষের মূল্য নির্ধারণ। এইখানে তিনি মার্কসের একটি অতি-পরিচিত উক্তির উধৃতি দান করেছেন :

> "Money then appears as a disruptive power for the individual and for the social bonds, which claim to be self-subsistent entities". (Karl Marx: Economic and Philosophical Manuscripts, 1844).

ডঃ চৌধুরীর মত তিনিও বলেছেন, এই রকমটি হওয়ার হেতু ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষণ। অবাধ বাণিজ্য, ব্যবসা এবং জমি ও জমিরাজস্ব নিয়ে 'ফাটকা খামার' ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

তাঁর মতে শহরে বাঙালী অভিজাত সম্প্রদায় যা [illegible] ধনী সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল পাঁচমিশেলী মানুষ নিয়ে যাদের সামাজিক উদ্ভব ছিল বিভিন্ন রকমের। তাঁরা ব্রিটিশ সওদাগরী সরকারের বশংবদ ছিলেন। মোটামুটি এই বক্তব্য ডঃ শশীভূষণ চৌধুরীর প্রবন্ধেও পাওয়া যায়। ডঃ বিনয় ঘোষ সেই বিষয়টিকে বিস্তারিত করেছেন। এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, ভূকৈলাসের ঘোষাল বংশ, পাইকপাড়ার রাজারা, শোভাবাজারের দেব পরিবার, হাটখোলার দত্তগণ, সিমলার দে-সরকার ইত্যাদি 'নন্‌ডেস্‌ক্রিপট-ননেন্টিস' বা অজ্ঞাতকুলশীলদের আকস্মিক কলরব-মুখরিত সম্ভ্রান্ত সমাজে উন্নীত হওয়ার কথা বলেছেন। মনে হয়, বিনয় ঘোষ যেভাবে ইংরাজ আমলের গোড়ার দিকের এই সব 'মনি-নবাব' (এই আখ্যা দান করেছেন এই প্রবন্ধের লেখক বিনয় ঘোষ)—যেভাবে ঠুকেছেন তা কতখানি যুক্তিযুক্ত হয়েছে তা বিচার্য। তিনি লিখেছেন—

> "Their only pride was in the parade of all sorts of feudal vices in social and cultural life without showing any sign of modern bourgeois spirit. They were, in fact, a peculiar kind of feudal species evolving out of the new exchange economy in a colonial city".

বিনয় ঘোষের বিশ্লেষণ আপাত দৃষ্টিতে মধুর মনে হতে পারে, কারণ মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে এই জাতীয় উক্তিই জনসাধারণের কাছে মুখরোচক, কিন্তু মনে হয় সৎ ঐতিহাসিকের বিচার কিঞ্চিৎ পক্ষপাতহীন হওয়া প্রয়োজন নতুবা প্রকৃত চিত্রটির বিকৃত রূপই দেখতে হয়। এতকাল পরে এবং ঘটনা থেকে এত পরে জন্মগ্রহণ করে অতীতের একটি কাল এবং সেই কালের অন্তর্গত চরিত্রাবলীর একপেশে মূল্যায়ণ মুখরোচক হলেও অভ্রান্ত মনে করতে বাধে। তিনি একটি কথায় সামগ্রিকভাবে [illegible] করেছেন—

> "The urban middle class of Bengal were all climbers, and strugglers in this period, trying to exploit as unscrupulously as possible all the ways and means of money making, as these romantic fortune makers had done before".

প্রবন্ধটির আকার অতিশয় সংক্ষিপ্ত হওয়ায় মনে হয় লেখক আরো যা বলবার ছিল তা উহ্য রেখে গেছেন। ফলে প্রবন্ধটি [illegible] অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি যে [illegible]-

বস্তু গ্রহণ করেছেন তা এক সুবৃহৎ গ্রন্থের বীজস্বরূপ। যদি কোনোদিন সেই গ্রন্থ তিনি রচনা করেন তাহলে হয়ত তাঁর বক্তব্য অনেক সুস্পষ্ট হবে। আপাততঃ পাঠককে এই লাইনটি পড়ে থমকে দাঁড়াতে হবে,—তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন, যতক্ষণ সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ পন্ডিতগণ করবেন না ততদিন—

"..... it remains doubtful whether what happened in the 19th-century Bengal can be called 'Renaissance' at all".

এই বিশ্লেষণ কর্মের জন্য তিনি যথেষ্ট যোগ্যতা রাখেন। সুতরাং মনে হয় এ কাজের ভার তাঁর অচিরাৎ গ্রহণ করা উচিত। তিনি যে প্রশ্ন তুলেছেন তার উত্তরও তাঁর অজানা নেই।

ডঃ সুনীলকুমার সেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান। তিনি লিখেছেন, 'ইকনমিক টেনসিয়ন ইন বেঙ্গল'—এবং প্রবন্ধটিও মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে লিখিত। তিনি বলেছেন—

"The most-important contribution to the Renaissance was the creation of the bourgeoise or the middle class. They were the heralds of our Renaissance'.'

আশ্চর্যের বিষয় এই প্রবন্ধটি ঠিক বিনয় ঘোষের প্রবন্ধের পরই স্থান লাভ করেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভারতীয় ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক ডঃ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'ট্রেনডস ইন লিটারেচার'—এবং এই প্রবন্ধে তিনি ১৮০০ থেকে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা করেছেন। নতুন বাংলা সাহিত্যের উদ্ভবের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংযোগের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। ডঃ দাশগুপ্তের প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত হলেও তথ্যপূর্ণ এবং সুলিখিত।

এই গ্রন্থের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হল ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দি ইয়ং বেঙ্গল : এ জেনারেল এষ্টিমেট' নামক প্রবন্ধটি। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিষয়ের শিক্ষক। তাঁর প্রবন্ধটি বিশ্লেষণধর্মী এবং ইতিহাসনিষ্ঠ। তাঁর প্রবন্ধটির পরিপূরক অংশ 'সেলফ-এষ্টিমেট' লিখেছেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিষয়ের শিক্ষক চিত্তব্রত পালিত। তাঁর মতে—

The young Bengal appealed to the head in a country of educational backwardness and inevitably their efforts were 'cribbed, cabined and continued' to the charmed circle".

শ্রীযুক্ত চিত্তব্রত পালিতের মতে ডিরোজিও কর্তৃক যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল সে বিষয়ে অধিকতর গবেষণা প্রয়োজন।

ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়—(ইতিহাস বিষয়ের রীডার—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) বিগত শতাব্দীর ধর্মীয় জাগরণের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। মনে হয় বিষয়টির গুরুত্বানুসারে যতটুকু বিস্তার প্রয়োজন ছিল স্থানাভাবে তা সম্ভব হয় নি।

এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টাটিকে সার্থক করার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষদের অভিনন্দন জানাই।

—অভয়ঙ্কর

RENASCENT BENGAL (1817-1857) — Proceedings of a seminar organised by the Asiatic Society, Calcutta: (1972): Price Rs 10.00 only.

সাহিত্যের খবর

বিভূতিভূষণ সম্বর্ধনা

সে একটা সময় ছিল, যখন লোকের মুখে মুখে ঘুরত গণশা, ঘোতনা, কে গুপ্ত আর ত্রিলোচন—এই চার ইয়ারের সঙ্গে পুঁটুরাণীর কথা। ঠাট্টা, মস্করার মাঝে মাঝে কল্পের উজ্জ্বল তরবারির মতো শাণিত সংলাপে ঠাসা 'বরযাত্রী'র তুলেছিল পাঠক সমাজে দারুণ আলোড়ন। এর পরেও সেই 'বরযাত্রী'র স্রষ্টা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যকে করেছেন রসোজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ।

মাত্র কয়েকদিন আগে সেই প্রবীণ রস-সাহিত্যিক বিভূতিভূষণকে পাটনায় ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন হলে দেওয়া হল এক সম্বর্ধনা। বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন, রবীন্দ্র পরিষদ, পাটনা কালীবাড়ি, বি এন কলেজ বেঙ্গলি সোসাইটি, সায়েন্স কলেজ বেঙ্গলি সোসাইটি, সরোদমন জিমন্যাসিয়াম, মিলনী মহিলা সমিতি, কদমকুয়ান মহিলা সমিতি, হেমচন্দ্র লাইব্রেরী, সুহৃদ পরিষদ প্রভৃতি বারোটিরও বেশি সংগঠনের যুক্ত উদ্যোগে হয়েছিল অনুষ্ঠানটি। বলাবাহুল্য, এ বছরেই বিভূতিভূষণকে রবীন্দ্র পুরস্কার দান করা হয়।

রবীন্দ্রনাথের পত্রগুচ্ছ

সাহিত্যের জগতে লেখকদের চিঠিপত্রের দাম সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়া আজকাল নেহাতই বাহুল্য। কেননা, লেখকদের পত্রগুচ্ছ শুধু তথ্য হিসেবেই নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে উন্মোচন করেছে নতুন দিগন্ত। মধুসূদনের চিঠিপত্র যেমন জীবন্ত, রবীন্দ্রনাথের পত্রগুচ্ছ তেমনি আমাদের কাছে এনে দেয় আরেক জগতের সন্ধান। বলাবাহুল্য পত্রসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্যান্য সাহিত্যসৃষ্টির মতোই আলোকিত পাহাড়চূড়া। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের কিছু চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে সাগরপারের দেশে, খোদ মার্কিন মুলুকে। চিঠিগুলো লিখেছিলেন শিল্পী রোদেনস্টাইনকে। বিখ্যাত বৃটিশ চিত্রশিল্পীও নিয়মিত উত্তর দিতেন রবীন্দ্রনাথকে। এই পত্র বিনিময় ঘটেছে ১৯১১ ও ১৯৪১ সালের মধ্যে। 'ইম্পারফেক্ট এনকাউন্টার' গ্রন্থেই পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথ ও রোদেনস্টাইনের পত্রগুচ্ছ।

আরেকটি পত্রসংকলন বেরিয়েছে 'বিলাভেড প্রফেট' নামে। সম্পাদনা করেছেন ভার্জিনিয়া হিলান। লেবাননের বিখ্যাত লেখক খলিল গিব্রান ও মেরী হাসকেলের মধ্যে বিশ বছর ধরে যেসব চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়েছিল, তাই সংকলিত হয়েছে উপরোক্ত গ্রন্থে। সত্যি কথা বলতে কি, গিব্রানের জীবনের অনেক অপ্রকাশিত খবরেরই সন্ধান দিয়েছে 'বিলাভেড প্রফেট'।

গুরু নানক সম্পর্কিত সংকলন

মস্কোর প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠান থেকে গুরু নানক সম্পর্কে একটি গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায়। ভারতীয় ও সোভিয়েত পন্ডিতদের প্রবন্ধে সমৃদ্ধ এই সংকলনটির ভূমিকায় শিক্ষাবিদ বাবাজান গাফুরোভ বলেছেন, ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাকে জয় করতে, পাঞ্জাবের মানুষকে সংহত করতে, এবং ভারতীয় ধর্মাদর্শের গণতান্ত্রিক ধারাকে শক্তিশালী করতে নানকের চিন্তাধারা সাহায্য করেছে।

কম্বোডিয়া। অমিতাভ রায়। মৌসুমী প্রকাশনী, ১৫।২এ কলেজ রো, কলিকাতা—৯। নয় টাকা।

আজকের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ও আগ্রাসী মনোভাব, বর্বরতম আদিম ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ও মুক্তিযোদ্ধাদের তাজা রক্তের মুক্তির উল্লাসকে মনে রেখে যদি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে তাকানো যায়, তা হলে যে প্রধান অসহায় দেশগুলি আগে চোখে পড়বে, সেগুলি হল থাইল্যান্ড, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, উত্তর ভিয়েৎনাম, লাওস আর কম্বোডিয়া। এই কম্বোডিয়ার এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা করেছেন অমিতাভ রায় তাঁর সুবৃহৎ 'কম্বোডিয়া' গ্রন্থে। এর আগে তিনি তাঁর 'আশা-নিরাশার দিনগুলি' গ্রন্থে এদেশের রাজনৈতিক অবস্থার সুনিপুণ চিত্র এঁকেছিলেন অভ্রান্ত ঐতিহাসিক নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে, সেই নিষ্ঠা ও সততার আরও একবার নজির মিলল 'কম্বোডিয়া' গ্রন্থে। বলা বাহুল্য নিরপেক্ষ নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে লেখক দেখেছেন কম্বোডিয়াকে। তার জন্ম, গৌরব, বেদনা ও অবক্ষয়ের ইতিহাসকে এমন মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আগে লিখিত হয়নি। অনাড়ম্বর ভাষায় ঐতিহাসিক সততার মধ্যে এমন শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশ [illegible]

বাস্তবিকই দুর্লভ। 'কম্বোডিয়া' গ্রন্থটি বাংলাভাষার রচিত একটি অসহায় দেশের রক্তাক্ত ইতিহাসের সার্থক দলিল।

বিভূতিভূষণ। চিত্তরঞ্জন ঘোষ। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী। কলিকাতা—৬। নয় টাকা।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ রচিত 'বিভূতিভূষণ' গ্রন্থটি আজ থেকে বছর তেরো আগে প্রথম প্রকাশিত হয়। সে সময়েই গ্রন্থটি হয় বহু-আলোচিত এবং বুদ্ধিজীবী পাঠকমহলেও নানাকারণে আদৃত হয়। বর্তমান সংস্করণটি দ্বিতীয় সংস্করণ, কিন্তু পূর্ববর্তী গ্রন্থ থেকে এর মধ্যে কিছু নূতন আলোচনার সংযোজন ও নূতনভাবে কিছু অংশের পরিবর্ধন ঘটেছে। কল্লোল-উত্তর কালে কল্লোলের চিহ্নিত লেখক হিসেবে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—তিনজন সমান প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি পেয়েছেন। এ'দের তিনজনের উপর আলোচনা সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে—যদিও পাঠকদের আকাঙ্ক্ষার তুলনায় যথেষ্ট কম। বিভূতিভূষণকে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন ঘোষ এক নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। ইতিপূর্বে প্রকাশিত অন্যান্য বিভূতিভূষণ সংক্রান্ত আলোচনা গ্রন্থে এই মৌলিক দৃষ্টিকোণের পরিচয় কম, কিম্বা তা থাকলেও যুক্তি-তর্কে তাদের মৌলিকতা স্থিত হয় না। গ্রন্থটির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক আছে। এক, বিভূতিভূষণের সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী গ্রন্থের শেষে মূল্যবান অংশ হিসেবে সংযুক্ত। দুই, ইংরাজী 'পথের পাঁচালী'র কয়েকটি মূল্যবান সমালোচনা অংশও গ্রন্থের শেষে মুদ্রিত হয়েছে। তিন, শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত 'শরৎচন্দ্র' শীর্ষক বিভূতিভূষণের ছোট লেখাটি মূল্যবান। লেখাটি বাস্তবিকই দুষ্প্রাপ্য ছিল। চার, প্রবন্ধকার বিভূতিভূষণের জীবন ও সাহিত্যকৃতিকে—সমস্ত রকম দৃষ্টিকোণ থেকে মৌলিক ভাবনার মধ্য দিয়ে দেখেছেন। আমাদের মতে বর্তমান গ্রন্থটি বিভূতিভূষণের সমস্ত অ্যাভারেজ ও স্বভাবী—উভয় ধারার পাঠকের কাছে মূল্যবান বলে মনে হবে। গবেষকদের কাছে এ গ্রন্থ নিশ্চয়ই সংগ্রহ করে রাখার মত। শ্রীযুক্ত ঘোষের রচনার ভঙ্গি সরস এবং অন্তরঙ্গ। অথচ কোথাও তথ্যগত বিভ্রান্তি ও তত্ত্বগত কারণহীন জটিলতার সৃষ্টি হয়নি। গ্রন্থটি পড়লে বিভূতিভূষণ মানুষটিকে ও বিভূতি-প্রতিভাকে অপার রহস্যময় ও কাছের বলে মনে হয়।

সোনালী দুপুর ঃ শৈলেন রায়। বাক সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা-৯। চার টাকা।

শ্রীশৈলেন রায় নতুন লেখক। কিন্তু নতুন হলেও এ'র 'সোনালী দুপুর' উপন্যাসটি আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। নায়ক অসীম ছোটবেলা থেকেই এক অলৌকিক নিঃসঙ্গতার শিকার। তার বাবা গভীর রাতে ফেরে, মায়ের প্রতি অত্যাচার করে। বাবা তার থেকে অনেক দূরে। মায়ের জন্যে আছে বিচিত্র গভীর অন্তরঙ্গ অনুভব। মায়ের জন্য তার ভীষণ কষ্ট হয়। ছোট বোন রিনা হওয়ার পর যদিও বাবা প্রথম প্রথম তাড়াতাড়ি বাড়ি আসত, পরে আবার পুরনো দিনগুলির মত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে। এর কারণ অসীমের কাছে অজ্ঞাত। মায়ের মৃত্যু ঘটে। ওরা ভবানীপুরের দিকে চলে আসে। সেখানে বন্ধু অনিন্দ্যর বোন সোনালীর সঙ্গে পরিচয় হয়। এই সোনালী ওকে নাড়া দিয়ে একদিন দূরে চলে যায়। তারপর আসে বন্ধু রতনের বোন বাসবী। রতন রিণাকে ভালবাসে, অসীমও ক্রমশ ভালবাসতে থাকে বাসবীকে—যদিও অসীমের মনে তখনও সোনালীর স্মৃতি স্পষ্ট। রতন নিদারুণ দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ। তাই শেষে যখন অসৎ উপায়ে তিস্তার ওপর ব্রীজের ট্রাক চালানে প্রচুর টাকা উপার্জনে মাতে ও অসীমকে সঙ্গী করতে চায়, তখনি অসীমের বিবেক দংশন, বোন রিণাকে সব কথা বলা ও ভাই-বোনের মধ্যে বাবার আগমন ঘটে। অসীমের একাকীত্ব ঘোচে। কাহিনী, ঘটনা ও চরিত্র সু-অংকিত। এক নিঃশ্বাসে পড়ার মত সহজ, সুখপাঠ্য।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

রং রুট (দ্বিমাসিক, আগস্ট-সেপ্টেম্বর '৭২) —সম্পাদক ঃ রতন চক্রবর্তী। ১৮সি, টেমার লেন, কলকাতা-৯। এক টাকা।

রং রুট সাময়িক সাহিত্যে নবাগত। যাত্রারম্ভ আশাপ্রদ। তরুণদের মনোমত করে তুলতে নানা বিভাগের আয়োজন প্রশংসনীয়। যত্নের ছাপ আছে রচনাচয়নে এবং প্রকাশে। তরুণদের সঙ্গে আছেন প্রতিষ্ঠনামারাও এই রংরুটে। গল্প লিখেছেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ সেনগুপ্ত। কবিতা লিখেছেন অমিতাভ দাশগুপ্ত ও সত্য গুহ। লেখার দিক দিয়ে সবচেয়ে 'সিরিয়স' শক্তিমান ছোটগল্পকার অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। যে পত্রিকায়ই লিখুন না কেন তাঁর আনুগত্য সব আগে তাঁর লেখার ওপর। তাঁর 'সার্কিট হাউস' নতুন করে সে কথাই মনে করিয়ে দিল।

শতরূপা (বৈশাখ-আষাঢ়)—সম্পাদক ঃ নির্মলকুমার খাঁ। ১৪ কেওড়া রোড। কদমতলা। হাওড়া-১।

বর্তমান সংখ্যার সব থেকে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু-মুসলমান যুক্তধারা ঃ সত্যপীর'। একটি নাটক লিখেছেন কবিতা সিংহ। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলপ্রসাদ সেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজনের বিচিত্র ধরনের চিঠি সংখ্যাটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। কয়েকটি আলোচনা আছে।

ক্রান্তি (জানুয়ারি-জুন)—সম্পাদক ঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ৮বি কলেজ রো। কলকাতা-৯। দাম দেড় টাকা।

ক্রান্তি শিল্প, সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক। প্রতিটি রচনাই চিন্তাশীল পাঠককে আকৃষ্ট করে। এই জাতীয় পত্রিকা বহুল প্রচারলাভ না করলেও, সংস্কৃতির প্রবাহে যথেষ্ট অবদান রেখে যেতে পারে। সম্ভবত এতদিনে ক্রান্তি সে গৌরব অর্জন করেছে।

তরুণী চলেছো দ্রুত পায় ॥

শিশিরকুমার দাস

মাথায় ঘটের পর ঘট
তরুণী চলেছ দ্রুত পায়,
ঢেউ দোলে, ঢেউ ভেঙে যায়
স্থির থাকে তবু দুই তট।

আলো পড়ে শেষ গোধূলির
শীর্ণ নদীর বালুকায়,
জলসন্ধানী সন্ধ্যায়
চলমান তুমি মন্দির।

মাথায় ঘটের পর ঘট
তরুণী চলেছ দ্রুত পায়;
নন্দিকা মাঠের ব্যথায়
হাসে মরুবায়ু লম্পট।

কোথাও পেয়েছ সন্ধান
কোথায় শ্যামল তরুতল
মসৃণ তৃষাহরা জল
বাতাসে ছড়ায় যার ঘ্রাণ?

মাথায় ঘটের পর ঘট
অচল তোমার প্রতিভায়,
নিস্ফলতার অতিকায়
চাপে ভাঙে স্বপ্নের পট

তবুও ফিরোনা ভীরু পায়
জলহীন তৃষিত মরুর
প্রতিবাদী শ্রাবণের সুর
বিদ্যুৎ-রাগে ঝলসায়

বিশাল আকাশময় বট
অবারিত বিস্তৃত ডাল
চাঁদ তারা মেঘের আড়াল
মেঘের ঝুরিতে কালো জট;

যতদূরে বৃষ্টি কপাট
ততদূরে চলো দ্রুত পায়
কম্পিত আসন্নতায়
মাথায় ঘটের পর ঘট।।

দ্বারপথ ॥ রমানাথ চট্টোপাধ্যায়

বিগত সেই বিপুল বেলা,
আকাশ চিরে সন্ধে আসে।
দরজা ধরে দিলুম নাড়া
তোমার।
আঁধারে এ কেমন খেলা,
পড়শি সবাই মুচকি হাসে—
খিড়কি খুলে জাগছে পাড়া
তোমার।

পাতায় পাতায় বাজছে আষাঢ়
হুম্বি-তম্বি শূন্য জুড়ে
ভাল ঠুকেছে মাদল-কাড়া
এখন!
টাল-মাটালে অথৈ অপার
জল ছিটিয়ে রাত দুপুরে
কার দ্বারে দিই হতাশ নাড়া
এখন!

বিগত সব বিপুল বেলা
অন্ধকারে তীব্র খেলা
পড়শি ব্যস্ত কলোচ্ছ্বাসে
আকাশ ছিঁড়ে বর্ষা আসে!!

ভো কাট্টা ॥ প্রতিভা সেনগুপ্ত

ঐ সুতোকাটা ঘুড়িটা
বুঝি কখনও
 বাঁধনহারা হাওয়ার বুকে
 কল বাঁধতে চেয়েছিল,

কিন্তু পারল না,
তীব্র ঝাপটায় ছিঁড়ে কুটি কুটি হয়ে
 আবার কোথায় হারিয়ে গেল!

হাওয়াটা বোধহয় সেই কৌতুকে
 হা হা করে হেসে উঠেছিল
 ওর পাগলামী দেখে।

।। এগার ।।

সুরেশবাবু সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেট আর দেশলাইটা অনীশের হাতে দিলেন। অনীশও ওর থেকে একটা সিগারেট বের করে নিয়ে ধরাল। প্যাকেট, দেশলাই সে সুরেশবাবুকে ফিরিয়ে দিল।

তিনি আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়ছিলেন। পরে কি একটা ভাবতে ভাবতে মানুর মুখের দিকে একবার তাকালেন, সহাস্য মুখে বললেন, "কি মানু, আগে কালী ময়রাটা সেরে নেবে নাকি?"

"হুঁ—।" মানু ঘাড় হেলিয়ে বলল। প্রস্তাবটা তার ভালই লেগেছে। তাকে বেশ উৎফুল্ল দেখাল। কালী ময়রার সব খাবারই ভাল, টাটকা। সেঁউ ভাজার তো তুলনাই নেই।

"না না, এখন নয়, পরে।" অতসী হাসি হাসি মুখে বলল।

"মানুটার খালি খাওয়া!" সানু মৃদুভাবে হাসে।

"হ্যাঁ, শুধু আমিই তো খাই, আর কেউ খায় না!"

সুরেশবাবু হাসলেন ওর কথা শুনে, বললেন, "উহুঁ, শুধু তুমি হবে কেন, আমিও আছি।"

"বলুন, এখানে আসাই তো এইজন্যে। কাজের মধ্যে তো খাওয়া বেড়ানো আর ঘুম।"

"এই যা একটা বলেছো না, লাখ কথার এক কথা!"

"রাঙামামার দেখছি খুব মনে ধরেছে কথাটা!" অতসী নীচু গলায় হাসল।

"ধরার মতন কথা হলে, ধরবেই!" সুরেশবাবুও হাসলেন। খানিকটা ধোঁয়া তিনি গিলে ফেলেছেন, বাকিটা নাক দিয়ে বের করে দিলেন। অনীশের দিকে মুখ ফিরিয়ে পরে বললেন, "জান ভাই, এসব ব্যাপারে বরাবরই আমি একটু দুর্বল। কোথাও গেলে আগেই আমার লক্ষ্য থাকে, ভাল খাবারের দোকানটোকান আছে কিনা!"

অনীশ মৃদু হেসে জবাবে বলল, "খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বাঙালী জাতটার বরাবরই একটা সুনাম আছে। এটা দিয়ে আমাদের চরিত্রও চেনা যায়।"

"ভোজনের ব্যাপারটা তো আমাদের জীবন থেকে প্রায় উঠেই গেল!"

"সবই ভীষণ তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে।" অনীশ সিগারেট টানতে টানতে বলল।

"আগে আগে দেখেছি নেমন্তন্ন বাড়িতে ভাল কোন ভোক্তা পেলে, খুশি হতো খাইয়ে। এখন ঠিক তার উল্টো।" খানিকক্ষণ নীরব থাকলেন তিনি। কি ভেবে হেসে ফেলেছেন, হেসে বললেন, "কম বয়েসে আমারও, খাইয়ে হিসেবে একটু নামটাম ছিল।"

কথা শুনতে শুনতে অতসীর হাসি পেল। হঠাৎ কি একটা তার মনে পড়ে গেল। সে অনীশের মুখের দিকে চেয়ে আস্তে করে বলল, "মার কাছে শুনেছি, রাঙামামা নাকি ছেলেবেলায় ভীষণ পেটুক ছিল। একবার চিনি খেতে গিয়ে চুন খেয়ে ফেলেছিল। মুখ পুড়ে গিয়ে সে এক কেলেঙ্কারী।" অতসী হাসতে লাগল। হাসছে তো হাসছেই। হাসতে হাসতে তার চোখে জল এসে গেল। শেষের কথাটাও সে স্পষ্টভাবে বলতে পারছে না।

"অত হাসছিস যে, কি হলো!"

অনীশও হাসছে অল্প অল্প, বলল, "আপনার খাওয়ার কথাই বলছে। চিনি খেতে গিয়ে নাকি কবে চুন খেয়ে ফেলেছিলেন!"

সুরেশবাবু হো হো করে হেসে উঠেছেন, একটু পরে বললেন, "খুব ছোট ছিলাম তখন" আবার হাসতে থাকেন তিনি। হঠাৎ কাশি এলো গলায়। কাশতে কাশতে দম বুঝি ফুরিয়ে এলো তাঁর। একটু পরে সামলে নিয়ে সিগারেটে টান দিলেন।

মানুর তো পেট ফেটে যাওয়ার দশা। সে মাটিতেই বসে পড়েছে। "খুব যে হাসি হচ্ছে, তোর কথাটা এবার বলে দিই?" আসলে সানুর কাছে এটা খুব খারাপ লাগছিল। মানুটার যদি কোন বুদ্ধি-সুদ্ধি থাকে। উনিই বা কি মনে করছেন! এতে সে নিজেই কেমন সংকোচ বোধ করছিল। একটু ঘাবিয়ে দেওয়ার জন্যেই মানুকে সে কথাটা বলেছে। কি ভেবে সানু সুরেশবাবুর মুখের দিকে চেয়ে সামান্য হাসল, বলল, "ও-ও কম নয়, চুরি করে রসগোল্লা খেয়ে কী কাণ্ডই না ও করেছিল, যায় যায় অবস্থা।"

সুরেশবাবু আবার হেসে উঠেছেন জোরে জোরে। মানুর মুখের ওপর চোখ রেখে তিনি বললেন, "পেটুকদের এসব পাস্ট হিস্ট্রি কিছু থাকেই।"

মানু উঠে দাঁড়িয়েছে। দিদির দিকে চেয়ে সে জিভ ভেংচাল, বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, "কাঁচকলা, তোকে বলেছে!"

রাস্তার কিছু লোকজন মজার চোখে ওদের দেখছিল।

কথা বলতে বলতে ওরা স্টেশনে এসে পড়েছে। ওভার ব্রিজের ওপর মানু দাঁড়িয়ে পড়ল। অতসী এলে মানু বলল, "আজ ওদিকটায় বসবো চলো।"

সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওরা ডানদিকের প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছে। আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে গোল বেদীর মতন একটা জায়গায় এসে বসল। বেদীর মাঝখানে একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ। হাত বাড়িয়ে একটা পাতা ছিঁড়ে নিল অতসী।

"আজ যেন ভীড় কম মনে হচ্ছে!" অনীশ চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

"অনেকেই তো ফিরে যাচ্ছে। লোকজন কমছে, আরো কমবে কয়েকদিনের মধ্যে।"

"হ্যাঁ, আগের জমজমাট চেহারাটা আর নেই।"

সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়েছেন সুরেশবাবু। একটু পরে ধীর গলায় বললেন, "আমরাও তো এবার ফিরে যাবো।" কথাটা বলতে গিয়ে বড় করে একটা শ্বাস ফেললেন।

অতসীর বুকের ভেতরটা যেন ধড়াস করে উঠল। এক মুহূর্তে মুখের ওপর থেকে কে যেন তার সব লাবণ্য, প্রসন্নতা শুষে নিয়েছে। পরিবর্তে গভীর দুশ্চিন্তা ও ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। সে কোন কথা বলতে পারল না। এক পলক চেয়েই সে চোখ নত করেছে। কী এক অব্যক্ত কষ্ট যেন তার সারা শরীরে লেগে রয়েছে। সরাবার চেষ্টা করেও পারছে না। ফিরে যাওয়ার কথায় এত যন্ত্রণা কেন! এক মুহূর্ত আগেও

তো এসব কথা সে মনে আনে নি। এমন একটা দিন যে সত্যসত্যই আসতে পারে, তা এর মধ্যে একবারও মনে আসে নি। রাঙা-মামা যেন সেই রূঢ়, নিষ্ঠুর সত্যটাকেই কিছু না ভেবে খুব সহজভাবে বলে ফেলেছে। আস্তে আস্তে মাথা তুলেছে অতসী। মুখখানা বিষণ্ণ। আকাশের গায়ের আলোটুকুও এই শেষবেলায় ম্লান করুণ হয়ে উঠেছে। রেললাইন সমান্তরাল রেখার মতন অনেক দূরে চলে গেছে। এই পথেই তারা একদিন কলকাতা থেকে এখানে এসেছিল। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলল অতসী। একথাটা তো ভুলেই গিয়েছিল, আবার ফিরতে হবে। এখানে চিরকাল থাকতে আসে নি তারা। কিন্তু কোথায় ফিরবে? না না, সেখানে আর নয়। মনে মনে আর্তনাদ করে উঠতে ইচ্ছে করে অতসীর। মনটা কী এক বেদনায় ভরে উঠেছে তার।

অনীশ অতসীর মুখের দিকে তাকাল একবার। ওর এই বিষণ্ণতা তাকেও বেদনাতুর করে তুলেছে। একটু চুপচাপ থেকে অনীশ বলল, "দেখতে দেখতে দিনগুলো কেমন ফুরিয়ে গেল!" গলাটা তার ভারী হয়ে উঠেছে বলতে বলতে।

"ভাবলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়, তাই না অতসীদি!"

অতসী কিছু বলতে পারল না। ছল ছল চোখে একবার তাকিয়েই ও দৃষ্টি আনত করেছে। তার বুকে যে কী হচ্ছে না। কাউকেই এই দুঃসহ যন্ত্রণার কথাটা বোঝানো যাবে না। যখন কিছু ছিল না, তবু সওয়া গেছে। ভেবেছে, হয়ত এই তার ভাগ্য, এর বেশি সে কিছু আশা করতে পারে না যেন। কিন্তু যখন আলোর মুখ দেখল, সব কেমন ধীরে ধীরে বদলে গেল। নতুন করে স্বপ্ন দেখার পালা শুরু হলো যেন। কত কি ভেবেছে মনে মনে। কিন্তু আবার যে সব ম্লান হয়ে আসছে। দুঃখ তো তার এতে আরো বাড়লই। অতসী এর কি জবাব দেবে! তার মুখে কোন কথা ফুটল না।

সবাই চুপচাপ। সুরেশবাবু সামান্য হাসলেন, বললেন, "মন খারাপ করে লাভ নেই, এখনও তো বাকি আছে।"

"তারচেয়ে আপনি বরং একটা গল্প বলুন।" মানু হেসে হেসে সুরেশবাবুকে বলল।

"সানু যে তখন থেকেই চুপচাপ আছ, কিছু বলোটলো!" সুরেশবাবু হেসে ফেললেন।

"কি বলবো· আমার বেশি কথাটথা আসে না, শুনতেই ভাল লাগে।"

"বেশি তো দূরের কথা, সময় সময় বোঝাই যায় না যে তুমি আছ।" সুরেশবাবু জোরে করে একটা হাই তুললেন।

সানু ম্লানভাবে একটু হাসল। মাথা নীচু করে বসে থাকল।

অনীশ সুরেশবাবুর দিকে চোখ ফেরাল একবার। মৃদু মৃদু ও হাসছে। তারপর চোখ সরিয়ে আনতে আনতে বলল, "সেই ভালো, গল্পই বলুন, শুনি।"

"আরে, তুমিও ক্ষেপলে নাকি শেষে"

"কেন, আপনি তো অনেক ঘুরেছেন ঘুরেছেন সেগুলোই বলুন না!"

"ঠিক আছে বলছি, তার আগে চায়ের কথাটা একবার বলে দাও ওখানে।"

"নিশ্চয়ই।" অনীশ উঠে দাঁড়াল, কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে চায়ের স্টল-এর একটা ছেলেকে পাঁচটা চা দিতে বলল। আরো অনেকেই এসে ভিড় করেছে এখানে। চেঞ্জারদের অধিকাংশই বিকেলে সেজেগুজে বেড়াতে আসে। আগের মতন জমজমাট না দেখালেও লোক একেবারে কম নেই। বড়দের অনেকেই বেদীর ওপর বা ঘাস পেতে বসেছে। ছোটরা হুল্লোড় করছে। বিভিন্ন গলার হাসি, কথাগুলো মিশে গিয়ে যেন এক ঐকতানের সৃষ্টি করেছে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নেমে আসছে। অনীশ সিগারেট ধরিয়ে আবার ফিরে এলো আগের জায়গায়।

সুরেশবাবু একটু সময় চুপ করে থেকে বললেন, "আমার একবারের অভিজ্ঞতার কথাই বলি।" তিনি পকেট থেকে সিগা-রেটের প্যাকেট বের করলেন, বললেন, "দাঁড়াও, সিগারেটটা আগে ধরিয়ে নেই।" আরো একটু সময় নিলেন তিনি। সামান্য অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল তাঁকে, পরে বললেন, "অনেক জায়গায়ই আমি ঘুরেছি, জঙ্গলের ভেতরেও ঢুকেছি· কিন্তু বকসা রোডে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে এর তুলনা নেই। আমার মাথায় যেন তখন কি একটা ভর করেছিল। না হলে এমন হয় না।" সুরেশবাবু থামলেন। আস্তে আস্তে আরো কিছুটা সময় নিয়ে সিগারেট টানলেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "ঘাড়ে ভূত না চাপলে এমন হয় না; কখনই তা সম্ভব নয়। পরে ভাবতে গিয়ে আমি নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছি।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সুরেশবাবু। কথাগুলো যেন তিনি নিজেকেই শোনাচ্ছেন। চোখমুখ হঠাৎ তাঁর দীপ্ত হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে, এটা যেন এই সেদিনের ঘটনা। নীরব থেকে আরো কিছু তিনি এই মুহূর্তে ভাবছিলেন, শেষে বললেন, "বাংলা ভুটানের বর্ডার স্টেশন এই বকসা রোড। বকসা ফোর্টের নাম তো শুনেছো।" সুরেশ-বাবু তাকালেন অনীশের দিকে, উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার বলতে লাগলেন, "ফোর্ট অবশ্য স্টেশন থেকে বেশ দূরে, পাহাড়ের ওপরে। ইংরেজ আমলে ভয়ঙ্কর ধরনের রাজবন্দীরা এখানে থাকত। যাক গে ওসব, যা বলছিলাম; আমি আমার বন্ধুর

ওখানে এসে উঠেছি, বন্ধুটি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। জায়গাটা ভারী সুন্দর, ফাঁকা, উঁচু নীচু পাহাড়ী পথ, ধরে বসেই পাহাড় দেখা যায়, পাহাড় আর পাহাড়, জয়ন্তী পাহাড়ের সারি চলে গেছে ঢেউয়ের মতন হয়ে। অজস্র গাছপালা। সবচেয়ে ভাল লেগেছে ঝরণাটা দেখে। আমাদের বাংলোর ঠিক পেছন দিয়েই ওটা ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে, জল পড়ার একটানা একটা শব্দ।" এই পর্যন্ত ধীরে ধীরে কথাগুলো বলে সুরেশবাবু থামলেন কিছুক্ষণের জন্যে। সিগারেটের টুকরোয় শেষ কটা টান দিলেন, পরে টুকরোটা ফেলে দিয়ে বললেন, "ঝরণাটা দেখে দেখে আমার লোভ হলো কেমন। ভোর ভোর উঠে পড়েছি সেদিন; ঝরণার কাছে গিয়ে মাথাটা যেন কি রকম হয়ে গেল হঠাৎ। চারপাশে বড় বড় সব পাথর ছড়ানো। কোন কোন পাথরের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে জলের ধারা সশব্দে বয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম এই পাথর ধরে ধরে ওপরে উঠবো। কিছু না ভেবেই কী এক নেশার ঝোঁকে আমি উঠতে শুরু করলাম। দেখে দেখে খুব সাবধানে আমি একটা একটা পাথর টপকে অনেকটা ওপরে উঠে এলাম। গাছে গাছে কত রং বেরঙের সব পাখি, কিচির মিচির শব্দ। তখনো আবছা অন্ধকার জমে আছে দুপাশের ঘন গাছ গাছালির মধ্যে। বিশ্বাস কর, এসব পাখি আমি আর কখনো দেখিনি। ময়ূর দেখেছি, নতুন রকমের সব বাঁদর। আরো অনেকটা উঠেছি। একটা জায়গায় দেখলাম, পাথরের গা বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ছে।" সুরেশবাবু হাসলেন ওদের দিকে চেয়ে। চাওলা চা নিয়ে এলো। কাপটা হাতে নিতে নিতে ফের তিনি বললেন, "এ এক দারুণ এক্সপিরিয়েন্স।"

অনীশও হাসল, "আমিও যেন জায়গাটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।"

চা খেতে খেতে মানু এক ফাঁকে সুরেশবাবুকে দেখল, হাসি হাসি মুখে বলল, "একা একা যেতে ভয় করল না আপনার?"

"প্রথমটা তো আমি বুঝতেই পারি নি, এক সময় খেয়াল হলো যে আর ওঠা যাবে না, কি একটা শব্দে আমার নেশা কেটে গেল। মনে হলো, এ জায়গা থেকে আমি আর ফিরে যেতে পারব না, গভীর বন। মরে গেলেও কেউ কোনদিন টের পাবে না। এসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে আমার ভয় হলো, আমার গা হাত পা কাঁপতে লাগল। এখন আমি ফিরবো কেমন করে?" সুরেশবাবু চায়ে চুমুক দিলেন, খানিকটা খেয়ে মুখ তুলতে তুলতে ফের বললেন, "চেয়ে দেখি একটু দূরে ছোট ছোট বাঘ ঝরণার জল খেতে এসেছে। সর্বনাশ! আমি সেদিকে চেয়ে থাকতে পারলাম না। কয়েকটা আবার আমার দিকে যেন লোলুপ চোখে চেয়ে রয়েছে; আমি কি যে পথে এসেছি আবার ফিরতে পারব? দুপাশে জলের ধারা। একেবারে মাঝখানে একটা বড় পাথরে আমি বসে পড়লাম, চোখ বুজে বসে রইলাম বেশ খানিকক্ষণ। কি আশ্চর্য, ভয়টা ধীরে ধীরে আমার চলে গেল। মনটা কী এক গভীর প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে। ভাষায় ঠিক প্রকাশ করা যাবে না এমন এক অনুভূতি। তারপরও আমি বসে থাকলাম সেখানে। আমার সামনেই হরিণের দল জল খেয়ে চলে গেল। আরো কত রকমের জন্তুজানোয়ার আছে ওখানে কে জানে! আমার খিদেও পেয়েছে তখন। তবু কেন যেন ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছে না। অনেকটা জল খেয়ে নিলাম। কত সময় যে এভাবে গেল, বুঝতে পারছিলাম না। আবছা আলো ছড়িয়ে আছে। তাও যেন এরই মধ্যে ঘোলা হয়ে উঠেছে মনে হলো।" সুরেশবাবু কাপের বাকি চাটুকু শেষ করে কাপটা একধারে রেখে দিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

"তারপর?" মানু যেন অবাক চোখে তাঁকে দেখছিল।

সুরেশবাবু হেসে ফেলেছেন, "তারপর আর কি, ফিরে এলাম।"

মানুও হাসি হাসি মুখে জবাবে বলল, "না এলে তো আজ আর এ গল্পও শুনতে পেতাম না।"

"ভাগ্য জোরেই ফিরেছি বলতে হবে।" সুরেশবাবু সামান্যক্ষণ নীরব থেকে আবার বললেন, 'নামতে নামতে তো এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি, দেখি খানিকটা দূরেই গাছপালাগুলো ভীষণভাবে নড়ছে। ঠিক বুঝতে পারলাম না, ব্যাপারটা কি। একটু পরেই মনে হলো, এ বুনো হাতীর দল। মুহূর্তে আমার বুকটা কেমন কাঁপতে লাগল। গলাটা শুকিয়ে উঠেছে। শুনেছি বুনো হাতী নাকি ভয়ংকর হিংস্র হয়। ওরা শুঁড়ে করে পাথর উঠিয়ে ছুঁড়ে মারে, আর ধরতে পারলে একবারে পায়ের তলায়। এমন সময় এক সঙ্গে কয়েকটা হাতী ডেকে উঠল। বাপরে বাপ, সে কি আওয়াজ, যেন বাজ পড়েছে। সেই শব্দে অসংখ্য পাখি উড়ে গেল, কিচির মিচির, ঝোপঝাড়ে শব্দ, আরো সব অন্য পশুরা ত্রাসে ভয়ে পালাচ্ছে, চীৎকার করছে, গোটা বন জুড়ে এক ভয়ংকর রকমের সোরগোল। পাহাড়ে ঝরণায় গাছে গাছে তারই প্রতিধ্বনি। বেশ কিছুক্ষণ ধরে এটা চলল। আমি ভীষণ ঘাবড়ে গেছি, এমন দৃশ্য জীবনে দেখিনি, এত বিচিত্র ধরনের চেঁচামেচিও শুনিনি। কি করবো বুঝতে না পেরে আমি জড় বস্তুর মতন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর মনে হলো, ওরা ফিরে যাচ্ছে। বনে যেন ঝড় উঠেছিল। যখন নীচে নেমে এলাম, তখনও আমার ভয় কাটেনি। মনে হচ্ছিল, পেছন থেকে বুঝি কিছু একটা লাফিয়ে পড়বে আমার ওপর, আমাকে নিয়ে আবার গভীর বনে চলে যাবে। তখনও বেশ বেলা রয়েছে। আমার বন্ধু তো এসব শুনে আমার চেয়েও ভয় পেয়ে গেছে। ওর কথা শুনে আমি আরো ভয় পেলাম। ওখানে গিয়ে জীবন নিয়ে নাকি কেউ ফিরে আসতে পারে না। শুধু তাই নয়, ওখানকার লোকের ধারণা, মহাকাল কাউকেই ফিরতে দেয় না। ওই যে ছোট ছোট বাঘের কথা বলেছি, ওগুলোকেই ওরা মহাকাল বলে। ভীষণ ধূর্ত আর হিংস্র হয় নাকি ওরা। তাহলেও এরকম অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম হয়ত বা শেষও।" সুরেশবাবু এই মুহূর্তে সামান্য অন্যমনস্ক হলেন। তাঁকে যেন একটু ক্লান্ত, উদাসীন দেখাল। খানিক পরে তিনি হাসি মুখে অনীশের দিকে তাকালেন।

"আপনার সাহস আছে বলতে হবে!" বলে হাসল অনীশ।

"সাহস আর কি, নেশা; তাছাড়া বয়েসটাও তখন অনেক কম ছিল।" সুরেশবাবু হাসলেন একটু, বললেন, "দাও, একটা সিগারেট দাও।"

অনীশ প্যাকেটটা ওঁর হাতে দিতে দিতে বলল, "বাইরে বেরোলে লাভই হয় দেখছি।" কথাটা বলে অনীশ এক পলক অতসীকে দেখল। অতসীও সেই মুহূর্তে চোখ তুলেছে। মৃদু হেসে আবার ও অন্যদিকে চোখ ফেরাল। দুজনের মধ্যে কি যেন একটা কথা হয়ে গেল নীরবে।

সুরেশবাবু সিগারেট ধরিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, "সবচেয়ে বড় লাভ হলো, অভিজ্ঞতা বাড়ে, দেখার চোখটা আরো পরিষ্কার হয়।"

"আপনি তো অনেক জায়গা ঘুরেছেন, না?"

"মোটামুটি। সাউথ ইণ্ডিয়ার কিছু জায়গা এখনও বাকি আছে।" চুপচাপ থেকে তিনি সিগারেট টানছিলেন।

চা-অলা কাপ আর পয়সা নিয়ে চলে গেছে।

বিকেল ফুরিয়ে গেল। ওপারে যাত্রীদের মধ্যেও অস্থিরতা বেড়েছে। ঘণ্টি

বাজল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন আসবে। চারপাশটা মুহূর্তে কোলাহলে ভরে উঠেছে। ওদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অনীশ বলল, 'এ সময়টা আমার কাছে দারুণ লাগে।' 'আমারও।' সুরেশবাবু সিগারেটের ধোঁয়া মুখে নিয়ে ফের বললেন, 'আমার খালি মনে হয়, ট্রেন আসবে, লোকজন নামবে, কিছু উঠবে, হই হই, চীৎকার হাঁকা হাঁকি, কত রকমের ব্যস্ততা, তাড়া-হুড়ো। ট্রেনটি ছাড়লেই আবার ফাঁকা, নির্জন হয়ে আসে।' সুরেশবাবু একটু সময় চুপ করে থেকে কি ভাবলেন গভীর ভাবে। তাঁর গলায় যেন সামান্য বিষন্নতার সুর। একটু পরে থেকে থেমে বললেন, 'একটু তলিয়ে দেখলে দেখবে, আমাদের জীবনটাও অনেকটা এই রকম, কত আশা, উৎসাহ, স্বপ্ন; জীবনের চারপাশে কত গুঞ্জন, হাসি, কলরব। দেখতে দেখতে আবার কেমন ফাঁকা হয়ে আসে। এক এক করে আমাদের কাছ থেকে কত কিছু চলে যায়, বড় নিঃসঙ্গ, খারাপ লাগে তখন।' সুরেশবাবুকে কেমন উদাসীন দেখাচ্ছিল।

আবার ঘণ্টি বাজল।

সানু আস্তে আস্তে বলল, "উঠবে না তোমরা?"

অতসী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনুচ্চ গলায় বলল, "আমারও ভাল লাগছে না আর।" গায়ের চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিল।

"উঠবো, ট্রেনটা চলে যাক।"

"বসে থেকে আর কি হবে, বরং ওভার ব্রিজে গিয়ে দাঁড়াই।" মানু বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল।

সুরেশবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "কালীময়রা তো হলো না?"

"ওসব শুনছি না!" মানু তাকাল একবার।

"আমিও না মানু।" অতসী হাসল মুখ টিপে টিপে।

ওরা ব্রিজের ওপর এসে দাঁড়াল। ট্রেন এসে পড়েছে। অনেকেই নামল এখানে। কিছু লোক ওপারে গেল। বাস ধরবে। হাজারীবাগ টাউনে যাবে ওরা।

চেয়ে থাকতে থাকতে অনীশ অবাক হওয়ার গলায় বলে উঠল, "আরে, সন্দীপ-বাবু মনে হচ্ছে!" ও এগিয়ে গেল একটু।

সানু যেন চমকে উঠেছে, বুকের ভেতরটা ছলাৎ করে উঠল। প্রচন্ড এক ধাক্কায় কেমন বিমূঢ় হয়ে গেল সানু।

মানুও ক' পা এগিয়ে গেছে, কৌতূহল বোধ করছিল। প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা হয়ে এসেছে. সেও কম অবাক হলো না। সোনাদা ঠিকই দেখেছে, সন্দীপদাই বটে। সঙ্গে বুড়ো মতন একজন। মনে হচ্ছে ওর মা। খুব আস্তে আস্তে হাঁটছেন তিনি। দূর থেকে সন্দীপদাকে যেন আরো রোগা লাগছিল দেখতে। মানু দিদির কাছে এসে আস্তে করে বলল, 'হ্যাঁরে দিদি সন্দীপদাই?'

সানু এবার আর না চেয়ে পারল না। কতকাল পরে ওকে দেখল আবার। এর মধ্যে কত কি ঘটে গেল তার জীবনে। ওকি তার সব খবর রাখে? এ মুখ আজ সন্দীপকে সে কেমন করে দেখাবে? চলে যেতে পারলে সবচেয়ে ভাল হতো। মুখো-মুখি হলে সে কি বলবে! সে যেন ক্রমশই অবশ হয়ে পড়ছে। অতসী ওর মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে, আস্তে আস্তে সে শুধোয়, 'তোমাদের আত্মীয় বুঝি?'

সানু কিছু বলতে পারল না। এর কি জবাব দেবে সে? আত্মীয়? মনে হলো বলে: হ্যাঁ অতসী হ্যাঁ, ও আমার ভীষণ আত্মীয় ছিল একদিন। তোমাদের আমি বোঝাতেও পারব না। একদিন আমার কাছে ও কী ছিল; কিন্তু আজ আর কিছু নয়, তবু এই অবেলায় কেন এলো সে, আমার যে আর কিছুই নেই।

সানুকে এখন ক্লান্ত মনে হচ্ছে। ভেতরে ভেতরে সে যেন অস্বস্তি বোধ করছিল। নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে ধরা গলায় সানু অতসীর কথার জবাব দিল, 'সন্দীপদা আমাকে পড়িয়েছে, সেই থেকে চেনাজানা।'

অনীশ আরো এগিয়ে গেল, কাছে গিয়ে বলল, 'সন্দীপবাবু যে।'

'আপনি এখানে?' সন্দীপের গলায়ও বিস্ময় ফুটল।

'শুধু আমিই নয়, আমরা সবাই এখানে।' অনীশ হাসছিল। একটু পরে আবার বলল, 'অনেক কাল পরে দেখা হলো, আপনি তো ভুলেই গেছেন আমাদের।'

'না না, ওসব কিছু নয়, আসলে সময় পাই না।' সহজ অনাড়ম্বর গলায় বলল সন্দীপ, কি ভেবে মার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি তো সানুকে চিনতে মা, উনি সানুর দাদা।'

'সানু ভাল আছে বাবা?'

'এই আছে একরকম, ও ও তো আছে আমাদের কাছেই।'

কথা বলতে বলতে ওরা সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওপরে উঠছিল। অনীশ হাসতে হাসতে বলল, 'এত দেরি করে এলেন এখানে?'

'মার জন্যেই আসতে হলো শেষ পর্যন্ত। বাতে একেবারে পঙ্গু হওয়ার জোগাড়। ড্রাই ক্লাইমেট নাকি এসব রোগের পক্ষে ভাল।'

এমন সময় সামনে মানু এসে দাঁড়িয়েছে। মুচকি হেসে সে সন্দীপকে শুধলো, 'কি, চিনতে পারছেন সন্দীপদা?'

সন্দীপও হাসল, হেসে বলল, 'না চেনার কোন কারণ নেই, আগের চেয়ে চেহারাটা ভাল হয়েছে তোমার।'

'আপনাকে তো চেনাই যায় না, ভীষণ রোগা হয়ে গেছেন।'

'এমনভাবে বলছো যে আগে যেন ইয়া মোটা ছিলাম?' সন্দীপ হাসতে লাগল।

'কোথায় উঠবেন?'

'আলোয়ার রোডের ওপর, দুর্গাবাড়ীর কাছে, বাড়ীটার নাম পত্রপুট'

ওরা ব্রিজের ওপর উঠে এলো। সানু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। তার বুকের ভেতরটা কেমন ধড়াস ধড়াস করছে। সে সন্দীপের মুখের দিকে কিছুতেই তাকাতে পারছে না। এগিয়ে এসে সন্দীপের মাকে প্রণাম করল, সন্দীপকেও করতে যাচ্ছিল, ও সরে গেল।

সন্দীপের মা ওকে জড়িয়ে ধরলেন, কান্নায় ভেঙে পড়ার মতন করে বললেন, 'আহারে, এ-ও দেখতে হলো আমাকে।'

সানু কিছুক্ষণ সেই বুকে মুখ লুকিয়ে রেখে কাঁদল, কিছুই বলল না। বলতে পারল না। বুকটা যে তার ফেটে যাচ্ছে। সকলাই তো তার সুখ চেয়েছে। তার মতন সুখী এ জগতে আর কে!

সন্দীপকে কেমন গম্ভীর দেখাল। এত-দিন পরে এভাবে সানুর সঙ্গে যে আবার তার দেখা হয়ে যাবে, ভাবতেই পারে নি। সানুর ঘটনা সবই সে শুনেছে। ওর চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখতে তার খারাপ লাগছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাঢ় কণ্ঠে সে বলল, 'এ কি চেহারা করেছো সানু!'

সানু আরো খানিকক্ষণ পরে ওর চোখে চোখে তাকাল, শান্ত গলায় বলল, 'এমন আর খারাপটা কি!' বলে ম্লানভাবে ও হাসল।

'তোমাকে দেখলে মনে হয়, অনেক বদলে গেছ তুমি।'

'এটাই তো স্বাভাবিক সন্দীপদা।'

সন্দীপ চুপ করে থাকল। পরে অনীশের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, 'আপনাদের পেয়ে ভালই হলো।'

'হ্যাঁ, বিদেশে চেনাজানা কাউকে পেলে, তাকে পরম সুহৃদ বলেই মনে হয়।'

কুলী এগিয়ে গেছে, একটা টাঙায় মাল-পত্র এনে চাপিয়েছে। এরাও নেমে এলো। সন্দীপের মার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। তিনি টাঙায় এসে উঠলেন, সানুদের লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা এসো মা, তোমরাই এখানে আমরা বল ভরসা।'

ওরা চলে গেলে অনীশ মানুকে বলল, 'কিরে, সেঁউভাজা খাওয়ার ইচ্ছে কি এখনো আছে?'

ওর হয়ে সানু জবাব দিল, 'তখন থেকে বলছে যখন, চলো যাই।'

মানু বলল, 'আজ বাড়ি চলো, কাল'ক হবে।'

সুরেশবাবু হেসে বললেন, 'তাই হোক'।

'আমরাই দেখছি ঠকে গেলাম'। বলে অতসী হেসে ফেলেছে।

অনীশ একটু পিছিয়ে পড়ে অতসীর খুব কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, 'মাঝে মাঝে ঠকাটা খারাপ নয়।'

অতসী কিছু না বলে ওর গায়ে আলতো করে একটা চিমটি কাটল।

পথের ধারে ধারে মাঝে মাঝে অন্ধকার জমে রয়েছে। গাছ-গাছালির জন্যে আরো জমাট মনে হয়। আকাশে অগুনতি নক্ষত্র। এসব দেখতে দেখতে ওরা ঘরের পথ ধরল। অতসীর মনটা আবার কেন যেন এক বিষন্নতায় ভরে উঠতে থাকে।

(ক্রমশঃ)

সবারে আমি নমি

কানন দেবী

(ষোলো)
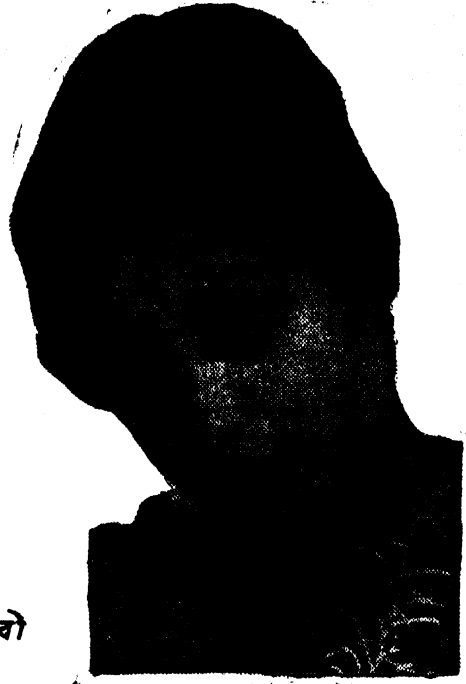
আনন্দভরা দিনগুলির যেন পাখা গজালো। দেখতে দেখতে কটা মাস কেমন করে কেটে গেল টেরই পাওয়া গেল না। এরই মধ্যে দেশ থেকে একদিন মার চিঠি এল—রাণা খুব অসুস্থ। চিন্তার কোনো কারণ নেই, তবে সম্ভব হলে যেন তাড়াতাড়ি ফিরি।

চিঠিটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ানো, আনন্দ, হৈ-হৈ সবই যেন মাথায় উঠল। উনি তৎক্ষণাৎ ফোন করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্যাসেজ বুক করে জিনিষপত্র প্যাক করার কাজে লেগে গেলেন। আমার কোনো কাজেই যেন আর হাত পা উঠছিল না। শুধু রাণারই জন্য বোধহয় হাজারখানেক টাকার খেলনা কিনেছিলাম। সেইগুলিই সবচেয়ে আগে গুছোতে বসলাম। উনি হেসে বললেন, "এতসব খেলনা দেখলেই রাণা তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে তেজী ঘোড়ার মত টগবগ করবে। সেই দৃশ্যটা মনে করে অন্ততঃ উৎসাহ পাবার চেষ্টা কর। বেবিদের ওরকম একটু আধটু অসুখ বিসুখ হতেই পারে। ওর জন্য এত হতাশ হলে চলে?"

উদ্বিগ্নচিত্তে যাত্রা করলাম। যথাসময়ে দেশে পৌঁছলাম। রাণা তখন অনেকটাই ভালো ছিল। কিন্তু আমাদের গৃহ-চিকিৎসক ডাঃ পালের কাছে যা শুনলাম, তা রীতিমত ভয় পাবারই মতন। ও নাকি একেবারে ব্লু-বেবী হয়ে গিয়েছিল। সে যাত্রা সামলেছে বটে, তবু একবার হার্ট-স্পেশালিষ্ট দেখানো প্রয়োজন। এটা হার্টেরই কোনো সীরিয়াস ব্যাপার বলে তিনি আশঙ্কা করছেন। ডাঃ পাল শুধু আমাদের বাড়ীর ডাক্তারই নন। আমাদের পরিবারের সঙ্গে ও'র দীর্ঘকালের পরিচয় ও আসা যাওয়ার ফলে গড়ে-ওঠা ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তার পর্যায়েই পড়ে। আমাদের বাড়ীর সকলের অসুখে বিসুখে আজও উনি ও'র স্নেহসজাগ হৃদয়ের ব্যগ্রতা নিয়ে দেখাশোনাই শুধু করেন না, অভিভাবকের মতই সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। একজনের অসুখে দেখতে এলে সঙ্গে-সঙ্গে আর সকলের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও তদারক করতে ভোলেন না। প্রত্যেকের ধাতু ও'র অতি-পরিচিত।

[illegible]-র একটি [illegible]

ও'রই পরামর্শে রাণাকে হার্ট-স্পেশালিষ্ট দেখানো হোলো। কোলকাতার যতজন ছিলেন প্রায় প্রত্যেককেই। সকলের রায় সমান হোলো না। কেউ বললেন ভয়ের কিছু নেই। ওষুধপত্র খেলেই সেরে যাবে। অন্যেরা যা বললেন তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। তাঁদের মতে হার্টে একটা 'হোল' হয়েছে। ইমিডিয়েট অপারেশন দরকার। নৈলে ও একেবারেই ইনভ্যালিড হয়ে যাবে। বিশেষ করে একথা জোর দিয়ে বললেন ডাঃ বিধু চ্যাটার্জি। আর হার্ট-স্পেশালিষ্ট না হলেও তাঁর মতকেই সমর্থন করেছিলেন ডাঃ পাল।

আমরা দুজনেই খুব ভয় পেয়ে গেলাম। সে অপারেশন এদেশে তখনও বিশেষ চালু হয় নি। এর সাফল্যও অনিশ্চিত। আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর ত অপারেশনে একেবারেই মত ছিল না। সায়

তুমি আর আমি/কানন দেবী, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্ধ্যা

পরিবারে ঐ একটিই পুত্রসন্তান। বংশের কুলতিলক। ওর যদি কিছু...না, তার চেয়ে যেমনই থাকুক বেঁচে থাক। আমার স্বামী অন্য সবদিকে এত নিঃশংকচিত্ত হলেও ছেলের ক্ষেত্রে একেবারে অসহায়া নারীর মতই ভীতু হয়ে পড়লেন। ওঁরও ঐ একই মত। [illegible] এখন থাক।

আমার তখনকার মনের অবস্থা বলে বোঝাবার ভাষা নেই। সিরিয়াস অপারেশন? যদি সাকসেসফুল না হয়? আর ভাবতে পারতাম না। চোখের সামনে যেন মুঠো, মুঠো [illegible] আসত। সারাজীবনের [illegible] জীবন্ত রূপে আমার রাণা। সে যদি [illegible] হয়ে পড়ে থাকে, আমার জীবন [illegible] অর্থহীন হয়ে পড়বে। আবার [illegible] মানেই ত জীবনের আলো [illegible] কি করব? কি করা উচিত? [illegible] পৌঁছতে পারলাম না। [illegible] লেগেছিল মনস্থির করতে। [illegible] পড়ে কতদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম [illegible] করে চমকে উঠে [illegible] হাত দিয়ে দেখেছি নিঃশ্বাস [illegible] নি ত? প্রতি মুহূর্তের [illegible] বর্ণনা করতে [illegible]।

এমনই বিক্ষিপ্ত, উদ্বিগ্ন চিত্ত নিয়েই 'দর্পচূর্ণ'র কাজ সুরু করলাম। শ্রীমতী পিকচার্সের ব্যানারে এবং আমার স্বামীর পরিচালনায় এ ছবি দর্শকদের খুশীই করেছে। নায়কের রোলে ছিলেন রাধামোহন, নায়িকা আমি। রাধামোহনবাবুকে আমাদের দুজনেরই খুব ভাল লেগেছিল, শুধু উচ্চশিক্ষিত বলেই নয়, যথার্থ শিক্ষিত বলে। স্বভাব-ব্যবহার মার্জিত, বিনম্র। শুধু সুঅভিনেতাই নন, চলচ্চিত্র সম্বন্ধে ওঁর জ্ঞানের পরিধি ও দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা শ্রদ্ধা করবার মতই।

এরপর ওঁরই পরিচালিত 'নববিধান'কে হিট পিকচার্সের তালিকায় ফেলা যায়। এ ছবিতে কতজন অভিনন্দন জানিয়েছেন একাধারে আমার অভিনয়-প্রযোজনার যুগ্ম সাফল্যকে। অনেকে এমন কথাও বলেছেন এতদিন অবধি চিত্রজগতে আমার প্রতিষ্ঠার মূলে আমার কণ্ঠের অবদানই ছিল প্রবল। এখানে গান একটা দুটো থাকলেও অভিনয়টাই ছিল প্রধান। আর শুধু অভিনয়ে যে আমি এতটা চিত্তস্পর্শী হতে পারি এটা তাঁরা ধারণাও করতে পারেন নি। নিছক গান ও চেহারার ম্যাগনেটিক ফোর্সে অভিনয়টাকে বক্স অফিসের দোরে পৌঁছে দেবার অভিযোগ যাঁরা করতেন—তাঁদের ক্ষোভ দূর করতে পেরেছি এই আনন্দটাই আমার কাছে মস্তবড় পুরস্কার হয়ে উঠেছিল।

তখন রাণার জন্য মনের উৎকণ্ঠার কথা আগেই বলেছি। স্টুডিওতে জহরবাবু, কমলবাবু নানারকম হাসি-তামাশায় পরিবেশকে এমন ভাবে জমিয়ে তুলতেন যে কয়েক মুহূর্তের জন্যও যেন চিন্তাভারটা একটু হাল্কা হয়ে যেত। কমলবাবু খুব রসিক আর আমুদে ছিলেন। সকলকেই খুব টীজ করতেন, আর ওঁর একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, যে যেরকম স্বভাব ও প্রকৃতির তার সঙ্গে ঠিক সেই ভাবেই মিশতেন। স্টুডিওর প্রত্যেকেই ওঁকে খুব পছন্দ করত।

জহরবাবুর প্রসঙ্গ বিশেষভাবে এসেছিল রাধা ফিল্মসের যুগেই। তখন তিনি ছিলেন প্রাণচঞ্চল, তরুণ। এখন পরিণত বয়সে দেখলাম ওঁর পরিণত পরিবর্তন। আগেকার হাসিখুশী ভাব ছিল। কিন্তু তার আড়ালে কাজ করত এক সংবেদনশীল কোমল মন। যেদিন সুটিং থাকত আমরা দুজনে সবচেয়ে আগে স্টুডিওতে যেতাম। ইউনিটের আর সবাই নিজেদের [illegible] অনুযায়ী আগে ও পরে আসতেন। একদিন গিয়ে দেখি এক ভদ্রলোক [illegible]

বসে রয়েছেন। এত সকালে স্টুডিওতে কে এলেন? আমি আর আমার স্বামী দুজনেই একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কাছে গিয়ে দেখি ভদ্রলোক আর কেউ নন, স্বয়ং জহরবাবু। আমাদের সাড়া পেয়ে মুখ তুলে সোজা হয়ে বসলেন। চুলগুলো উস্কোখুস্কো, চোখ লাল, মুখখানা শুকনো। সর্বাঙ্গে একটা ক্লান্তির ছাপ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কি হোলো জহরবাবু? আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? আর এত সকালেই বা এলেন কেন? আপনার টেক্ ত সেই লাঞ্চের পর।"

উনি বললেন, "কাল রাত্রে একটা বড় মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে গেছে। আমাদের পাড়ায় একটি ছেলে ছিল। তাকে আমার সন্তানতুল্য কেন, একেবারে সন্তানই বলা যায়। কাল তাকে হারালাম। সারারাত শ্মশানে ছিলাম। কিছুক্ষণ আগে বাড়ী ফিরেছি। দেখলাম একবার যদি শুয়ে পড়ি সারাদিন আর চোখ খুলতে পারব না। তাই বিছানায় না গিয়ে একেবারে স্টুডিওতেই চলে এলাম।"

বাঁকা লেখা/কানন দেবী

পরে অন্যের মুখে শুনেছি এই ছেলেটিকে জহরবাবু শুধু আপন সন্তানের মত স্নেহই করতেন না, অভিভাবকের মতই তার পড়াশোনা ও যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করছেন। কিন্তু তার জন্য কোনো জাহিরী-পনা অথবা শোকপ্রকাশের আতিশয্য নেই। এ হারানোর ব্যথা তাঁকে যে কতখানি বেজেছে তারই স্বাক্ষর বহন করছে তাঁর ব্যথিত, বিষন্ন চেহারা।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে। ওঁর ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হয়েছিল। তবু স্যুটিংএ এসেছেন। উনি জ্বরকে আমল না দিলেও—চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল কি আন্দাজ ঘায়েল হয়ে পড়েছেন। আমি খুব রাগ করে বললাম, "এত শরীর খারাপ নিয়ে আসবার কি দরকার ছিল? একটা ফোন করে দিলেই ত হোতো। আপনার সবতাতেই বাড়াবাড়ি।"

উনি সেই পরিচিত ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে বললেন "আহাহা! তুমি ব্যাপারটা বুঝছ না। এটা তো শুধু তোমার, আমার

মেজদিদি চিত্রে

শ্রীমতী পিকচার্স ইউনিটের জহর গাঙ্গুলী, অজয় কর, হরিদাস ভট্টাচার্য, বিন্দু চক্রবর্তী, বিজন মুখার্জি, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, কে এ রেজা, কানাই দে এবং ক্যামেরাম্যান ও অন্য সহকর্মীদের সঙ্গে।

অথবা ভট্টাচার্যির ব্যাপার নয়। অনেকজনকে নিয়ে কাজকারবার। একজন না এলে হোল সেটটাই যে আপসেট হয়ে পড়বে। জ্বর ত কি হয়েছে? সুটিং সে-এ-রে বাড়ী গিয়ে মৌজ করে আদা দিয়ে এক কাপ চা খে-এ-য়ে আর মাথামুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ব। কাল সকালে উঠে দেখব, জ্বর ত জ্বর—জ্বরের বাবা দেশ ছেড়ে পালাবে।"

ও'র কথা শুনে না হেসে পারা যায়? হাসতে হাসতেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল এ যুগের ছবিতে কাজ করলেও জহরবাবু সেই যুগেরই মানুষ—যে যুগের মানুষের কাছে কাজটাই ছিল সবচেয়ে বড়। আর এই কাজের দায়িত্ব সম্বন্ধে ও'রা ছিলেন সদা-সচেতন। কোনোরকমে কোম্পানীতে একটা খবর পাঠিয়ে আইনগতভাবে দায়দায়িত্ব মুক্ত হওয়াটাই এ'দের কাছে মুখ্য নয়। যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত, স্বল্পকালের জন্য হলেও তার ভালমন্দ, সাফল্য-অসাফল্যের জন্য ভাবাটাও এ'দের মজ্জাগত শুধু নয়—এ ভাবনা তাঁদের কাছে ধর্মের মতই অপরিহার্য।

এর পরের ছবি নিরুপমা দেবী লিখিত 'দেবত্র'। ও'রই পরিচালনায়। এটা শরৎবাবুর কাহিনী না হলেও খানিকটা তাঁরই ঘরোয়া উপন্যাসগুলির ধাঁচ বলেই—এ উপন্যাসের আকর্ষণ মন টেনেছিল।

এই ছবির কাজের সময়ই উত্তমকুমারের সঙ্গে পরিচয় হোলো। ওর ভূমিকা ঠিক পুরোপুরি না হলেও অনেকটা নায়কের মতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ও তখনও 'গুরু' হয়ে ওঠে নি। কিন্তু পরবর্তীকালের নায়ক গোষ্ঠির পুরোধা হয়ে উঠতে যে আর দেরী নেই সেটা ঐ সামান্য পরিসরেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমরা দুজন ওর অভিনয় দেখে সেই কথাই আলোচনা করতাম। আজ ও নায়কশীর্ষ। তখনই ওর এই বিরাট সম্ভাবনার কথা আমরা উপলব্ধি করেছিলাম, একথা বললে অনেকেই হয়ত মুখ টিপে হাসবেন, এই ভেবে যে, একথা বলাটাই এখনকার ছকে-বাঁধা গৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সে আলোচনা থেকে বিরত হলাম। উত্তমকুমারের প্রতিভা যে আমাদের দৃষ্টি এড়ায় নি সেই খবরটাই শুধু জানিয়ে দিলাম।

এরপরের ছবি 'আশা'। ও'র পরিচালনা ও জ্ঞানবাবুর (জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ) সঙ্গীত পরিচালিত এ ছবির ব্যবসায়িক সাফল্য একেবারেই শূন্য। কিন্তু আমার নিজের কাছে এ ছবি অত্যন্ত আদরের হয়ে উঠেছিল এর সঙ্গীত মাধুর্যের কারণে।

অনেক আগে দিলীপদা আমার [illegible] রোডের বাড়ীতে আসতেন। তখন [illegible] গানে আসর জমে উঠত। উনি আমার [illegible]

বাবুও আসতেন, আমার গানের সঙ্গে [illegible] বাজাতেন। তখন থেকেই ও'র অমায়িক, আড়ম্বরহীন ব্যবহারে ও'র সঙ্গে একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। 'আশা' ছবির কাজের সময় সেই হৃদ্যতাই বন্ধুত্বের পর্যায়ে এল। আমি এ ছবিতে কিছুতেই [illegible] গাইব না। উনিও ছাড়বেন না। একটি গানে উনি গজলের ঢঙে সুর দিয়েছিলেন প্রসূন ভারী সুন্দর গেয়েছিলেন। সব গান গুলিই মন দিয়ে শোনবার মত। [illegible] গ্রামোফোন কোম্পানী রেকর্ডও করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নানান গন্ডগোলে হয়ে ওঠে নি। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় রেকর্ডগুলো করিয়ে নিলেই হোতো। তাহলে গানটা তো অন্ততঃ থেকে যেত আর সেই সঙ্গে আমার গানের স্বপ্নটাও। শ্রীমতী পিকচার্সের সঙ্গীতপ্রধান চিত্র ছিল ঐ একটিই।

এই গানের প্রসঙ্গেই মনে পড়ে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কথা। 'মেজদিদি' ও 'নববিধান' ছবিতে উনি কয়েকটি গান গেয়েছেন। সামান্য অভিনয়ও ছিল। 'মেজদিদি' ছবিতে ও'র 'জনম মরণ' গানটি হিট্ সং হয়ে ওঠে। ধনঞ্জয়বাবুর কণ্ঠ যেমন উদাত্ত গম্ভীর, তেমনই মধুর। তাঁর ছন্দ ও আবেগের [illegible] প্রতিফলিত হয় গাইবার [illegible]। ছবিতে গাইবার অবকাশ [illegible] কিন্তু ও'র [illegible]

ঐশ্বর্যসম্ভার যে সামান্য নয়, তারই পরিচয় পাওয়া যেত স্টুডিওতে কাজের অবকাশের অনেক টুকরো মুহূর্তে। ও'র নাম, সম্মান যথেষ্ট। তবু কেন জানি না মাঝে মাঝে মনে হয় ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের যথার্থ মূল্যায়ন হয় নি। এখনও যেখানে আছেন—তার চেয়ে অনেক ওপরে আসন পাবার যোগ্যতা উনি রাখেন।

পরের ছবি 'আঁধারে আলো' হিট করে নি। কিন্তু সর্বভারতীয় ছবির ভিত্তিতে দ্বিতীয় স্থান পাবার জন্য হরিদাস ভট্টাচার্য পরিচালিত 'আঁধারে আলো' রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিল। একদিকে ক্ষতির বেদনায় মনটা যখন ভারাক্রান্ত হয়, তখনই বুঝি অন্যদিকে দুলে ওঠে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস। বিধাতার এ এক বিচিত্র লীলা।

এ ছবির নায়িকা সুমিত্রার রূপের খ্যাতি তখন চিত্ররসিকদের মুখে মুখে ফিরত। লাস্যময়ী নায়িকার নিষ্ঠুর লীলা, ছলনা ও প্রণয়ের দ্বন্দ্ব, সুমিত্রার মধ্যে মূর্ত করে তোলার জন্য ও'র সেই নিষ্ঠা ও শ্রম দেখবার মতই। ও'র কাজ দেখতে দেখতে কত সময় মনে হত উনি যেন সুমিত্রাকে ঠিক সেইভাবেই উদ্দীপিত করেছেন যেভাবে আমায় 'বিদ্যাপতি'র অনুরাধার ভূমিকায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন দেবকীবাবু।

'আঁধারে আলো' কার্লোভিভ্যারী (চেকোশ্লোভিয়া) ফিল্ম ফেস্টিভেলে দেখানোর জন্য নির্বাচিত হোলো।

এত বিস্তৃত কাজের অধ্যায় রচনা করে গেছি রাণার জন্য চিন্তা ও উদ্বেগ বুকে নিয়ে। এইসময় মিঃ ও মিসেস ম্যানিং আমাদের টেনান্ট ছিলেন। কিন্তু ল্যান্ডলেডী ও টেনান্টশিপ-এর সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূরে এগিয়েছিল আমাদের পারস্পরিক অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ। এইসময় ভেলোর থেকে এক হার্ট স্পেশালিস্ট এসেছিলেন। তাঁর কাছেও রাণাকে নিয়ে যাওয়া হোলো। তিনিও ঐ একই রায় দিলেন।

ঠিক এই সময়ই 'আঁধারে আলো' বিদেশে দেখবার জন্য মনোনীত হওয়ায়—আমাদের দুজনেরই বিদেশ যাত্রার আমন্ত্রণ এল ছবিটির প্রযোজিকা ও পরিচালক হিসাবে। এই সুযোগে রাণাকেও সঙ্গে নিলাম ওখানের বিশেষজ্ঞদের দেখাবার জন্য।

এই ফেস্টিভেলেই জুরীদের অন্যতম ছিলেন নির্মলবাবু (সুবিখ্যাত এন কে জি)। উনি আমাদের বন্ধুস্থানীয়। ও'কে সঙ্গী পেয়ে একাধারে যাত্রা, প্রবাস ও ফেরার সময়ের দিনগুলি বেশ আনন্দেই কেটেছে। বিদেশে স্ব-দেশীর সঙ্গমাধুর্য যে কি মনোরম সে কথা ভুক্তভোগী ছাড়া কেই বা উপলব্ধি করতে পারে?

এই সময় রাণাকে দেখানো হোলো। ওখানের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বিশেষ পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে একেবারে সুনিশ্চিতভাবেই জানালেন,—অবস্থা সিরিয়াস, ইমিডিয়েট অপারেশন প্রয়োজন।

আমি তখনই একেবারে অপারেশন করিয়ে আনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। কিন্তু উনি কিছুতেই মনস্থির করতে পারলেন না। বললেন, 'একবারটি দেশে ঘুরে আসি চল। মা, বাবাকে বুঝিয়ে বলি, দেখি তাঁরা কি বলেন।'

এই প্রথম দেখলাম ও'কে এত দুর্বল হয়ে পড়তে।

যাইহোক, অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ও অবসন্ন মন নিয়ে দেশে ফিরলাম। এবারে রোম, বুডাপেস্ট, সুইজারল্যান্ড আরো কত দেশ ঘুরলাম। কিন্তু বিদেশ ভ্রমণের অনেকখানি আনন্দই ম্লান হয়ে গিয়েছিল ঐ একটি উদ্বেগে।

দেশে ফেরার পরও অপারেশন ব্যাপারে উনি দোদুল্যমানচিত্ত। শ্বশুরশ্বাশুড়ীরও মত নেই।

ম্যানিং দম্পতি আমায় বললেন, 'করছ কি তোমরা? ছেলেটাকে কি ইনভ্যালিড করে রাখবে? আর দেরী করলে কিন্তু সত্যিই দেরী হয়ে যাবে।'

কি করা যায়? এদিকে আবার অর্থবিভ্রাট। স্টার্লিং-এর সঙ্কট। কোথা পাব?

কানন দেবী, অনিল চন্দ এবং অন্যান্য কয়েকজন

এত ডাক্তার ও পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে কতদিনের কত ব্যাপক পরিচয়। কিন্তু কেউ এ বিষয়ে কোনো সাহায্যে এগিয়ে ত এলেনই না, উপরন্তু এ সমস্যার সমাধানকে 'অসম্ভব'-এর এলাকায় ফেলে নিরুৎসাহ করে ফিরিয়ে দেন। কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে চোখে অন্ধকার দেখলাম। তবে কি আমার রাণার চিকিৎসা ঐ সামান্য একটা কারণের জন্য আটকে থাকবে?

মিঃ ম্যানিংই বুদ্ধি দিলেন, 'ডাঃ রায়কে (বিধান রায়) জানাও। তুমি ক্যানসার হস-পিটাল, দুর্ভিক্ষ, আরো কত চ্যারিটিতে দেশের জন্য হাজার হাজার টাকা গভর্ণমেণ্ট ফাণ্ডে দিয়েছ। আর তোমারই একমাত্র শিশুসন্তানের জীবন বিপন্ন। তারজন্য তিনি তোমার এতটুকু সাহায্য করবেন না?'

আমার তখন ভাববার শক্তি নেই। মিঃ ম্যানিংই চিঠি ড্র্যাফ্‌ট করে দিলেন। আমার স্বামীকে না জানিয়েই সে চিঠি এবং ওদেশের ডাক্তারদের রিপোর্ট ডাঃ রায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

২।১ দিনের মধ্যেই জবাব এসে গেল। আমার প্রার্থনা তিনি সানন্দে মঞ্জুর করেছেন। প্রয়োজনীয় স্টার্লিং-এর ব্যবস্থা উনি করেই দিয়েছেন। আমি যেন অবিলম্বে রাণাকে নিয়ে বিদেশযাত্রা করি। ডাক্তারের কর্তব্য ও শুভানুধ্যায়ীর সমস্ত আন্তরিকতা দিয়ে তিনি রাণার আরোগ্য কামনা করেছেন।

এমনিভাবে যতবারই দুঃখে কষ্টে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে, শোকেতাপে আমার হৃদয়ে আঁধার [illegible] এসেছে তখনই পেয়েছি ঈশ্বরের আশ্বাসের আলো-ভরসা, করুণার নিত্য পাথেয়।

এ চিঠি আসার পর ওঁকে সব কথা বললাম। ডাঃ রায়ের চিঠিটাও দেখালাম। আমার কাতরতা ও মরীয়া প্রয়াস দেখে উনি আর আপত্তি করলেন না।

সুদিন, সু-সময় দেখে সকলের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা নিয়ে রাণাসহ আমরা যাত্রা করলাম।

রাণাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাবার আগে ডাক্তার আমাকে ও রাণার বাবাকে বন্ড সই করতে বললেন। সে কি? বন্ড সই করতে হবে? তবে যে শুনেছিলাম এতে কোনো রিস্ক্ নেই?

"Why says that? At least the doctors cannot. Of course it is a risky operation. But in most cases the failure is almost nil."—

সই করতে গিয়ে হাত কেঁপে যাচ্ছিল। ডাক্তার হেসে বললেন,

"Be quiet. We will try our level best to make the operation successful."

কণ্ঠ তখন রুদ্ধ। শুধু ডাক্তারের দুটি হাত ধরে কম্পিত কণ্ঠেই বলেছিলাম, 'আমার ছেলেকে তোমার হাতেই সঁপে দিচ্ছি ডাক্তার। আশাকরি তুমি তাকে আবার আমায় ফিরিয়ে দেবে।'

রাণাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেল। আমার সকল চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে, পৃথিবীর সকল আলোকে নিভিয়ে দিয়েই যেন মনে জেগেছিল শুধু একটি জিজ্ঞাসা 'রাণাকে আবার ফিরে পাব ত'?

পলকে সেদিকে মনে ঝলকে উঠেছিল একটি ধ্যানের কথা। অর্জুন কি বলতে চেয়েছিলেন মাছের চোখকে লক্ষ্যবিদ্ধ করার মুহূর্তে? দ্রোণাচার্য জিজ্ঞেস করলেন, 'অর্জুন তুমি কি দেখছ?' অর্জুন বললেন, 'আমি দেখছি সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লীন হয়ে গেছে মাছের ঐ একটি চোখে। শুধু ঐ চোখই আমার কাছে হয়ে উঠেছে নিখিল।'

আমার জগৎ, আমার সকল সত্তাও সেদিন লীন হয়ে গিয়েছিল ঐ একটি জিজ্ঞাসায় 'রাণাকে ফিরে পাব ত?'

কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। এক সময় দেখি আমার স্বামী হাসিমুখে সামনে এসে দাঁড়ালেন। তার পাশে উজ্জ্বল চোখে ডাক্তার দাঁড়িয়ে। করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,

"Madam I am happy to declare that your son is perfectly alright now".

চোখের জল আর বাধা মানেনি। ডাক্তারকে সেদিন মনে হয়েছিল দেবদূত। আর জীবনদেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতায় উপচেপড়া সেই নিটোল মুহূর্তে মনে হয়েছিলো এরচেয়ে আনন্দময় সংবাদ জীবনে আর কি এসেছে?

(চলবে)

অনুলিখন—সন্ধ্যা সেন।

পুনশ্চ: কিছু প্রসঙ্গ পূর্বে কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকতে পারে? প্রয়োজনীয় বোধেই তার উল্লেখ করা হোলো। —কানন দেবী।

একজন ডাক্তার, একজন ইঞ্জিনীয়ার, একজন ব্যাঙ্ক কর্মচারী এবং একজন অধ্যাপক। যে কোন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কাছে এদের যে কেউ আকাশের চাঁদের সামিল—হাতে পেলে ছেড়ে দেয়ার মত আহাম্মক মেয়ের বাপ বিংশ শতাব্দীর এই অর্ধে একজনও আছেন কিনা সন্দেহ।

মেয়ের বাপের পক্ষে যা, মেয়ের পক্ষেও তাই। এক আকাশের চার-চারটে চন্দ্রের দিলের কোহিনূর বেলা চ্যাটার্জির রাতে প্রায়ই ঘুম হয় না, দিনের বেলায়ও মন লাগে না কাজকর্মে। একটা বিরাট প্রবলেম তার সব মনোযোগ আকর্ষণ করে নিয়েছে' কি করা যায়?

বেলা চ্যাটার্জি সুন্দরী, সুগায়িকা। ডাক্তার সজল ব্যানার্জিই প্রথম আকৃষ্ট হয় তার প্রতি। রূপ দেখে নয়, গান শুনে। তখন বেলার বয়স ছিল কম, মুক্ত বাতাসে বিহঙ্গের মত অবাধ বিহারে আরো কিছুটা সময় কাটাবার ইচ্ছেটা ছিল প্রবল। সজল ডাক্তার বেলার এই ইচ্ছেটাকে নস্যাৎ করে দিতে হয়তো পারতো সে সময়। কিন্তু তারও তখন ছিল প্র্যাকটিশের প্রথম দশম—ডিসপেন্সারীর ঘরভাড়া-ও উঠত না আয় থেকে।

গোল বাধল সেখানেই। ইঞ্জিনীয়ার পরেশ চট্টরাজ এক বিয়েবাড়ীর অনুষ্ঠানে

গায়ে পড়ে আলাপ জমিয়ে বেলা চ্যাটার্জির সব পরিকল্পনা ভেস্তে দিল। এবং—সমস্যাটিকে জটিলতর এবং জটিলতম করবার জন্য—তার মাস দুয়েকের মধ্যেই বেলা চ্যাটার্জির মনের আকাশে উঁকি দিল ব্যাঙ্কের চাকুরে সত্যানন্দ এবং অধ্যাপক অরিন্দম।

রীতিমত চতুর্ভুজ প্রেম। পাত্র যদি দুজন হয় এবং দুজনেই একই ব্যক্তির অনুসরণকারী হয় তাহলে টস করার সুযোগ থাকে। চারজনই যদি ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার বা ব্যাঙ্কের চাকুরে অথবা অধ্যাপক হত তাহলেও সমস্যাটা সহজ হত আরো।

কিন্তু তা হল না। চারজন চার রকম, এবং বিয়ের বাজারে চারজনই বিরাট দাঁও—বেলা ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছে। অতএব মনস্থির করতে করতে বছর ঘুরল, তারপর দু বছর, তারপর তিন—

ছেলেরাও ক্রমশ অস্থির হল। জীবন-সঙ্গিনী হিসেবে বেলা চ্যাটার্জি যে কোন পুরুষমানুষের কামনার পাত্রী। সংসারের টবে সে একটি ম্যাগনোলিয়া ফুল। এ সবই ঠিক, কিন্তু তার এভাবে কালহরণের কারণ কি?

'আমি একটা পজিটিভ উত্তর চাই', বলে গেল ডাক্তার সজল।

আর কত দিন অপেক্ষা করে থাকবো?' জানতে চাইল ইঞ্জিনীয়ার পরেশ।

'হ্যাঁ না একটা কিছু বলে দাও,' অনুনয় করল ব্যাঙ্কের চাকুরে সত্যানন্দ।

'প্রিয়ে, এ প্রতীক্ষার শেষ হবে কবে?' বলল অধ্যাপক অরিন্দম।

বান্ধবীরা পেছনে লাগল। বেলার সৌভাগ্যে যারা রীতিমত ঈর্ষান্বিত তারা খোলাখুলিভাবে কটূক্তি করতে লাগল, কিন্তু দু-একজন, যারা বেলা চ্যাটার্জির পুনর্বাসনের জন্য সত্যি সত্যি আগ্রহী, তারা বলল, 'ছেলেদের বেশী বিশ্বাস করিস নে বেলা, এখনই যা হোক একটা ঠিক কর।'

বিদেশিনী অথবা বাংরেজ-নন্দিনী হলে বেলা চ্যাটার্জি কি করত জানি না, তবে সে ফুল-ব্লাডেড বাঙালী কন্যা যখন, তখন তার মনের অবস্থাকে আঁচ করা আমাদের সাধ্যাতীত নয়। চিন্তার ভার বইতে বইতে তার দেহ ক্রমশ শীর্ণ হয়ে পড়ল, আচরণে কেমন একটা ক্লান্ত ভাব দেখা দিল।

একটা সন্দেহের পোকা কামড়ে দিয়ে গেল সজল, পরেশ, সত্যানন্দ, অরিন্দমকে। পরস্পরের মধ্যে আলাপ পরিচয় ছিল, কিন্তু তারা জানত না কেউ অন্যদের বেলা চ্যাটার্জির ভবিষ্যতের দাবীদার বলে। এবার তারা ভাবতে শুরু করল। সেই ভাবনার ইন্ধন যোগাল বেলা চ্যাটার্জি সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত বান্ধবীরা। তারা বেলার মনের খবর অনেকটাই রাখত। প্রাচীন যুগে যেমন এ যুগেও তেমনি—প্রেমপীড়িতা শকুন্তলাদের মনের কথা খুলে বলবার জন্য সখী চাই-ই।

তারপরই ঘটল বিপর্যয়।

বিপর্যয়ের শুরু অধ্যাপককে দিয়ে। একদিন অধ্যাপক অরিন্দম বেলার বাড়ী এসে একটা চিঠি দিল। চিঠিটা ছাপানো, ওপরে লেখা—'শুভবিবাহ'। বেলা মনের ভাবকে অপ্রকাশ রেখে চিঠি খুলে পড়ল এবং যারপরনাই দুঃখিত হল, কিন্তু সে দুঃখকেও চেপে রাখল মুখে কাষ্ঠ হাসি ফুটিয়ে। সে বলল, 'কনগ্র্যাচুলেশনস। মেয়েটি কি করে?'

'পড়ায়। স্কুলে।'

'অ।'

রইল বাকী তিন। ডাক্তারের পসার জমে উঠছে, ইঞ্জিনীয়ার ভালো চাকরী পেয়ে গেছে, ব্যাঙ্কের চাকুরের নাম প্রমোশনের তালিকা ছুঁই ছুঁই করছে,

চাকরী পাবার পর ইঞ্জিনীয়ার পরেশ উধাও। সে কলকাতাতেই নেই। বড় কর্তাদের সুনজরে পড়বার জন্য ব্যাঙ্কের চাকুরে সত্যানন্দ সারাক্ষণ কর্মব্যস্ত।

ডাক্তারের ফুরসৎ হয় না প্রায়ই।

'বেলা, ব্যাপার সুবিধের নয়। আর দেরী করিস নে।' শুভানুধ্যায়িনীরা বলল। ঈর্ষান্বিতারা পরস্পরকে চিমটি কেটে বলল চাপা হেসে, 'গর্বিনীর হালটা এবার দেখ।'

দ্বিতীয় আঘাত হানল সত্যানন্দ। একেবারে বিয়ে করে তারপর বেলাকে জানাল, 'আমি দুঃখিত। কিন্তু এ ছাড়া উপায় ছিল না।'

চোখের জলে ভাসল বেলা চ্যাটার্জি। পুরুষ জাতটাই বেইমান। উপায় ছিল না—ছোঃ!

ইঞ্জিনীয়ার তখনও না-পাত্তা। অতএব বাকী রইল ডাক্তার। আর সময় নষ্ট না করে ডাক্তার সজল ব্যানার্জির বাড়ী ছুটল বেলা। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয় নি।

সজলের মা ভেতরে নিয়ে বসালেন বেলাকে। বললেন, 'খোকা একটু বেরিয়েছে, পাশপোর্ট অফিসে গেছে।'

'পাশপোর্ট অফিসে? কেন?' চমকে উঠে প্রশ্ন করল বেলা।

'ওমা, তুমি শোন নি? খোকা তো বিলেত যাচ্ছে সামনের মাসে।'

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। বিলেত যাচ্ছে সজল? তাকে না বলে? একটা অজানা শঙ্কা বেলা চ্যাটার্জির মনে ছড়াতে লাগল।

প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে সজল ফিরল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চার্জ করল বেলা, 'তুমি বিলেত যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।' অত্যন্ত সহজভাবে জবাব দিল সজল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট ফুলে উঠল বেলার। ঠোঁট ফোলালে ওকে খুব সুন্দর দেখায়, কিন্তু আগেই বলেছি, ডাক্তার সজল ওর প্রেমে পড়েছিল ওর গান শুনে, চেহারা দেখে নয়। ডাক্তারদের ওপর স্ত্রীলোকের রূপে প্রভাব খুব কমই পড়ে, কারণ সেই চেহারার ভেতরের খবর অন্যের জানা।

'পড়তে যাচ্ছি কাজেই।' হাসি-হাসি মুখ করে বলল সজল।

'বিলেত তাহলে'—হায়রে দুরাশা, হিসেব করে বেলা চ্যাটার্জির মত সুন্দরী, সংগীতজ্ঞার দুরাশা।

'যাওয়ার আগেই হবে।' সজল ব্যানার্জি অকপটে বলল, 'শ্বশুরমশাই আমার যাওয়ার এবং পড়ার খরচ দিচ্ছেন।'

বেলা চ্যাটার্জির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল এবং তারপর কি হল সে-সব খবরে আপাতত আমাদের কোন লাভ নেই।

এইভাবে, সম্পূর্ণ নিজের দোষে পরপর তিনটে চাঁদ আকাশ থেকে খসবার পর এবং চতুর্থটির হদিশ তিন মাসের মধ্যেও না মিলবার পর বেলা চ্যাটার্জির মনের অবস্থা কি হল তা সহজেই কল্পনীয়। বেলার বেশভূষার ধরণ-ধারণ পালটে গেল, গানও প্রায় ছেড়েই দিল একরকম। যেটুকু গায় তাও করুণ রবীন্দ্রসংগীত, তেতলার জানালার পাশে চুল এলিয়ে বসেস, একা একা।

মা বাবা প্রমাদ গণলেন। আইবুড়ো মেয়ের হল কি?

ঈর্ষান্বিতারা মুখ টিপে হাসল। শুভানুধ্যায়িনীরা সমবেদনায় বশবর্তী হয়ে যাতায়াত কমিয়ে দিল।

বেলা চ্যাটার্জিদের মত রোমান্টিক মেয়েদের মন সত্যি সত্যি আকাশের মতই—সে আকাশে চাঁদ উঠবেই শেষ পর্যন্ত। বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলেন একজন প্রৌঢ় ব্যবসায়ী একদিন। বেলা মৃদুকন্ঠে তাকে বসতে বলল এবং বাবাকে ডাকতে চলে গেল। ব্যস।

ব্যবসায়ী বললেন 'আপনার মেয়ের স্বভাবটি তো বেশ। ওকে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন?'

কথাটাকে হেসেই উড়িয়ে দিতে চাইলেন বেলার বাবা। 'আপনি বিয়ে করবেন? এই বয়সে? ঠাট্টা করছেন?'

'না না, ঠাট্টা নয়। আমার এই বেয়াল্লিশ চলছে, এবং আমি বিপত্নীক, উইথ নো চাইল্ড।'

এবার একটু গম্ভীর হলেন বেলার বাবা। বললেন, 'আমার মেয়ে কি রাজী হবে? মনে তো হয় না।'

'জিজ্ঞেস করুন না ওকে। আমার নিজের বড় ব্যবসা আছে, বাড়ী-গাড়ী সব আছে। ওকে বলুন এ'সব।'

বেলা চ্যাটার্জিরা একবারই ঠকে, দুবার নয়। ওকে সবকিছু বিশদভাবে বুঝিয়ে বলারও দরকার হল না। সে শুধু শুনল—বড় ব্যবসায়ী, বাড়ী-গাড়ী আছে, ব্যস। অত্যন্ত স্পষ্ট উচ্চারণে, কোনরকম দ্বিধা বা জড়তাকে পাত্তা না দিয়ে সে বলল, 'আমি রাজী আছি।'

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'—বাঙালীর চিরন্তন কামনা। বেলা চ্যাটার্জি হাজার হোক, বাঙালীর ঘরের মেয়ে। সে জানে, এবং বেশ ভালো করেই জানে—লাখ টাকার গায়ে বয়সের ছাপ মারা থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিবিদ বা অর্থনীতিবিদ নন কোন বিশেষ অর্থে। তিনি কবি। শিল্পী। জীবনের রূপকার। অরূপের অন্বেষায় সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্রে লীলা করেছেন নানাভাবে, বারবার।

অবশ্যই। তবু তাঁর ব্যাপক সৃষ্টিক্ষেত্রে জীবনের নানান কল্লোল এসে বাসা বেঁধেছিল নানা দিক থেকে। মানুষের মুখর শোভাযাত্রা থেকেই প্রধানত শিল্পের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। যদিও অভিযুক্ত করেছেন তাঁকে অনেকেই যে তিনি জীবনানুগ শিল্পী নন। খেয়ালী, ভাববাদী তবু তাঁর জীবন ও সাহিত্য শিল্প সাধনায় নানা পর্ব থেকে আমি দেখেছি, দেখাতে পারি যে আমাদের দেশে একা এবং একমাত্র রবীন্দ্রনাথই জীবনকে দেখেছেন নানাভাবে, নানা দিক থেকে; জীবনের নানান দিকের কথা তিনিই বলেছেন সকলের চেয়ে অধিক আন্তরিকতার সঙ্গে এবং / অথবা সততার সঙ্গে। এবং যা তিনি পারেন না, পারেন নি —নিন্দনীয় তা' তাকেও স্বীকার করেছেন অকপটে। সংসারের নানান প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁর অবহিতি কবি হয়েও এত ব্যাপক ছিল যা যে কোন সাংসারিক মানুষটিকেও লজ্জা দেয়। যদিও অভিযোগ করা হয়েছে, হয় স্বপ্নচূড়াসীন রবীন্দ্রনাথ হস্তিদন্ত মিনার ছেড়ে, মধুর গবাক্ষকোণ থেকে মাটির মাঝখানে নেমে আসেন নি। দেখেন নি, শোনেন নি মাটির কান্না। এদেশের মাটির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। নিবিড় নয়।......মাটির সঙ্গে যেই মানুষের নিত্যকার সম্পর্ক; তাকে যারা ভালবাসে, পালন করে, দোহন করে, পরিপাটি করে—সেই ব্যাপক মানবসমাজ—কৃষককুলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল না।

এই অভিযোগকারীদের অভিযোগ ভিত্তিহীন। কারণ কেবলমাত্র সাহিত্যকর্মে কৃষক সম্প্রদায়ের কথা বলেই কর্তব্য শেষ করেন নি রবীন্দ্রনাথ যেমন করেছেন অনেকেই। ওয়াল্ট হুইটম্যান, বার্নস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শরৎচন্দ্র, টলস্টয় প্রমুখ লেখক ও শিল্পীরা। রবীন্দ্রনাথ এদেশের কৃষককুলকে তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রতিষ্ঠা দিয়েই সস্তায় বাজীমাৎ করেন নি। শিল্পী সুলভ সহানুভূতি ও দরদ দেখানোর মতন বাহ্যিক কর্মে কর্তব্য শেষ করতে স্বাভাবিক কুণ্ঠা ছিল তাঁর মনে যদিও লেখাতেও তাঁর (অভিযোগকারীদের জানা উচিত এদেশের কৃষকদের কথা অনুপস্থিত নয়) কৃষক সম্প্রদায়ের বহুতর ক্রন্দন না থাকলেও অন্তরঙ্গ, ঘনিষ্ঠ ক্রন্দন আমি শুনেছি। শোনাতে পারি।......আমরা চাষ করি আনন্দে / মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল থেকে সন্ধ্যে এবং চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল, ...ইত্যাদি পংক্তি রবীন্দ্রনাথের লেখায় বিরল হলেও, দুর্লভ নয় একেবারে।

কিন্তু এইসবই সাহিত্য ও শিল্পের অঙ্গনের ফসল। আমি তা আহরণে কালক্ষেপ করতে অনিচ্ছুক আপাততঃ। আমি বলতে চাই এখন যে অর্থনীতিবিদ বা রাজনীতিবিদ না হয়েও, কবি রবীন্দ্রনাথ এদেশের কৃষি সম্বন্ধে বিশেষ বিচলিত ও ভাবান্বিত ছিলেন।

বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি যে কৃষির উপরেই নির্ভরশীল—এ বোধ কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথের যত গভীর ছিল, আমার তো মনে হয় সমকালীন অর্থনীতিবিদদের অনেকেরই তা ছিল না। জানিনে, তাঁর মতন করে এ দেশের কৃষকদের দুর্দশার কথা আর কে ভেবেছিলেন সে যুগে? হয়তো ভেবেছিলেন এবং সহানুভূতিতে, দরদে, অনুকম্পায় মনোবেদনাও অনুভব করেছিলেন কথায় ও লেখায় আর্দ্র, ঘনীভূত হয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে সমস্যার আলোচনাতে। আর রবীন্দ্রনাথ যাঁর সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিচর্চায় কাল কাটালেই চলতো অনায়াসে তিনি সক্রিয়ভাবে এদেশের অবহেলিত কৃষির কথা নানাদিক থেকে নানানভাবে ভেবেছিলেন এবং সমস্যার সমাধানও দিতে চেষ্টা করেছিলেন একজন যথার্থ অর্থনীতিবিদের মতনই।

এদেশের কৃষককুলের কাছে অন্যতম সমস্যা যে ভূমির খণ্ডতা—তাতে আধুনিক ব্যবস্থায় যন্ত্রপাতি প্রয়োগ দ্বারা কৃষিকর্ম চালানোয় যে অসুবিধা বিদ্যমান তা যে কোন অর্থনীতিবিদের চেয়েই গভীর চিন্তাচ্ছন্ন কবি রবীন্দ্রনাথের মগজে ছিল। তিনি ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এদেশের বহুধা খণ্ডিত জমিতে সাবেকী প্রথায় চাষ করে এককভাবে কোন কৃষকই উন্নতি করতে পারবে না। তাই তিনি প্রথমদিকে তাদের সমবায় নীতি চালু করবার উপদেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—'তোমরা যে পঞ্চাশজনে চিরকাল পাশাপাশি পৃথক পৃথক চাষ করিয়া আসিতেছ তোমরা তোমাদের সমস্ত জমি হাল-লাঙল গোলাঘর পরিশ্রম একত্র করিলেই গরীব হইয়াও বড়ো মূলধনের সুযোগ আপনিই পাইবে।'

দেখা যাচ্ছে কৃষি উন্নয়নের জন্যে যে 'বড়ো মূলধনের সুযোগ' আবশ্যক তা রবীন্দ্রনাথ উত্তমরূপেই অনুভব করেছিলেন।

মোটকথা এদেশের কৃষি সম্পর্কে, তার সমস্যাবলী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার অন্ত ছিল না। জমিদার ও মহাজনরা এদেশের কৃষককুলকে কিভাবে শোষণ করে, জমিদারসন্তান হয়েও তার বেদনাতে তিনি নীরব, উদাসীন হয়ে থাকতে পারেন নি। তিনি তাকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই, তাহলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই, যে লোক চাষ করে না কিন্তু যার টাকা আছে, অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই। ......এমনি করে ছোট ছোট জমিগুলি স্থানীয় মহাজনদের বড়ো বড়ো বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে। তার ফলে জাঁতার দুই পাথরের মাঝখানে গোটা রায়ত আর বাকি থাকে না। একা জমিদারের আমলে জমিদারের যেটুকু অধিকার, জমিদার মহাজনের দ্বন্দ্ব-সমাজে তা আর টেকে না।'

রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলিকে একজন যথার্থ প্রয়োগশীল অর্থনীতিবিদের চিন্তা প্রসূত বলেই আমার মনে হয়। তিনি সমস্যাকে উপর থেকে না দেখে একেবারে তার গভীরে ঢুকেছেন। এই পরিমণ্ডলে কবির প্রবেশ, প্রবেশ না বলে অনুপ্রবেশই বলা সংগত, কবিকে এক বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছে। এতে ধরা দিয়েছে তাঁর উন্নত অর্থনৈতিক মানস। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মূলে ভিত্ ধরেই টান দিয়েছেন তিনি তাঁর এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে।

এদেশের কৃষি সমস্যার আরও গভীরে চলে গিয়েছেন তিনি অতঃপর। এবং তার সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণে প্রমাণ করেছেন, আমাদের এই প্রত্যয় দৃঢ় করেছেন যে তাঁর কৃষি চিন্তা ও আলোচনা বায়বীয়, ধূসর সারফেস স্পোর্টিং মাত্র নয়। এদেশের কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জোতদার, জমিদার, মহাজন অর্থাৎ তামাম মুনাফাখোর ও মতলবীদের চরিত্র সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। তাই তিনি লিখেছেন—'মনে করো, আজ কোন কারণে বাংলার উৎপন্ন ফসলের প্রতি মাড়োয়ারি-দখল-স্থাপনের উদ্দেশ্যে ক্রমশ প্রজার জমি ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে, তাহলে অতি সহজেই সমস্ত বাংলা তার ঘানির পাকে ঘুরিয়ে তার সমস্ত তেল নিঙরে নিতে পারে। এমন মতলব এদের কারো মাথায় যে কোনদিন আসে নি, তা মনে করবার হেতু নেই। যে সব ব্যবসায় এরা নিযুক্ত আছে তার মুনাফায় বিঘ্ন ঘটলেই আবদ্ধ মূলধন এইসব আবদ্ধ খাতের সন্ধান খুঁজবে। ...এসব রায়ত-খাদক যে কত সর্বনেশে তা আমার জানা আছে।'

যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ এমন মোহমুক্ত বক্তব্য রাখতে পেরেছিলেন জমিদার নন্দন হয়েও, সে সময়, বলাই বাহুল্য অন্যান্য জমিদার, জোতদারেরা তেমনটি চিন্তা করতে পারেন নি এবং/অথবা তাঁরা তা' চিন্তা করতে কুণ্ঠিত ছিলেন। সমস্বরে চিন্তার স্রোত এগলে আজ এতদিন পরেও এদেশের কৃষির অবস্থা এ পর্যায়ে দাঁড়াতো না বলেই আমার বিশ্বাস। ভূমি সংস্কার ও পতিত জমি উদ্ধার এবং যথার্থ কৃষকসমাজে তার বণ্টনের প্রগতিশীল আইন প্রণয়ন অনেকদিন আগেই হতো। জমিদারী উচ্ছেদের আইন পাশ করতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো না।

রবীন্দ্রনাথ বৃহৎ জোতদারীর অভিশাপের কথা সে যুগে বসেই চিন্তা করেছিলেন। লিখেছিলেন—'রায়তের জমিতে জমা-বৃদ্ধি হওয়া উচিত নয়—একথা খুব সত্য। রাজসরকারের সঙ্গে দেনা-পাওনায় জমিদারের রাজস্ব বৃদ্ধি নেই, অথচ রায়তের স্থিতি-স্থাপক জমায় কমা সেমিকলন চলবে, কোথাও দাঁড়ি পড়বে না, এটা ন্যায়বিরুদ্ধ।'

দেখা যাচ্ছে এদেশের কৃষির উন্নয়নের জন্য চিন্তাচ্ছন্ন কবি কেবলমাত্র সাবেকী বিধি প্রয়োগের উপরেই গুরুত্ব দেন নি। ন্যায়নীতি—ন্যাচারেল জাস্টিস সম্বন্ধেও অবচেতন এবং চেতনমনে তিনি অবহিত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া সংস্কৃতির বাহক—এই অভিযোগ এনে তাঁকে অচ্ছুৎ করে না রেখে যদি যথার্থ সহিষ্ণুতার সঙ্গে তাঁর জীবনসাধনার নানা পর্যায়ের বিশ্লেষণ করা যায়, করা উচিত এখনই, অবিলম্বে তবে আমার বিশ্বাস, আমাদের কাম্য সমাজবাদ ও বাঞ্ছিত সাম্যবাদের পথে, শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থায়নে উত্তরণ ঘটা অনেক সুবিধাজনক হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই শ্রমিক কৃষাণের খুব কাছাকাছি না আসতে পারলেও, বেদনা ছিল না আসতে পারায় অবশ্যই তাঁর মনে, তাদের মাঝখানে কোন প্রাচীর প্রথায় বিশ্বাসী ছিলেন না। কৃষক ও কৃষির উন্নয়নের জন্য তাঁর আবেগ ও উদ্বেগ অনেকেরই চেয়েই অধিক ছিল।

তিনি প্রকৃতই উপলব্ধি করেছিলেন যে কৃষিব্যবস্থায় সর্বাঙ্গীন শোষণের অবসান না ঘটলে এই সমস্যা সমাধানের কোন পথ নেই। কৃষক শ্রেণীর মঙ্গল নেই। আজকে এদেশের সাম্যবাদীরা ব্যাপক কৃষি আন্দোলনের আওয়াজ তুলেছেন। তার জন্য লড়াই করছেন—ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত—যে পথেই হোক। সমাজবাদীরা তুলেছেন সবুজ বিপ্লব ঘটানোর জিগির। ভালো কথা নিঃসন্দেহে।

রবীন্দ্রনাথ সে যুগে বসেই এইসব কথাগুলি ভেবেছিলেন। এই বাস্তব সত্যকে অনুভব করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে লড়াই ও আন্দোলনে শামিল হওয়া সম্ভব হয় নি এককভাবে। তা ছাড়াও বাধা হয়েছিল, তিনি স্বীকার করেছেন অকপটে, [illegible] জীবনযাত্রার।

কৃষকদের ঋণদানের জন্য তবু যে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা চালু করা দরকার—আজ যা' ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের পর আমাদের চিন্তায় এসেছে তা' অনেক দিন আগেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় এসেছিল। এইজন্যই তিনি স্থাপন করেছিলেন 'পতিষর কৃষি ব্যাঙ্ক।' 'হিতৈষী ফণ্ড' নামক তহবিলের জন্য বার্ষিক খাজনার সঙ্গেই চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থাও তিনিই চালু করেছিলেন। এই ফণ্ড থেকে কৃষিসংলগ্ন ব্যক্তিবর্গের শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা হতো। জমির খাজনা বাকী পড়লে জমি খাস করে নেওয়া হতো। জমির মালিককে দখলে রেখে রায়তকে বা বর্গাদারকে জমি চাষ করতে দেওয়া হতো। ফসলের অর্ধেক দিয়ে কিস্তীতে বকেয়া খাজনা শোধ হলেই জমি চাষীকে ফিরিয়ে দেওয়া হতো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিস্তীর্ণ জমিদারীতে এই ব্যবস্থাকে চালু রেখেছিলেন। আমার তো মনে হয়, বর্তমানের বর্গাদারী আইনের চেয়েও অনেক প্রগতিশীল ছিল কবির এই ব্যবস্থা।...

রবীন্দ্রনাথ এ-যুগের কৃষিতে যন্ত্রায়ণের কথা, অ্যাগ্রেরিয়ান চাষের কথা সে-যুগে বসেই ভেবেছিলেন। লিখেছিলেন—'এই আজ আমাদের চাষীদের ভাবিবার দিন আসিয়াছে। নহিলে তাহারা বাঁচিবে না। কিন্তু এসব কথা পরের কারখানা ঘরের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ভাবা যায় না। নিজে হাতে কলমে ব্যবহার করিলে স্পষ্ট বোঝা যায়। য়ুরোপ আমেরিকার সকল চাষী এই পথে হু-হু করিয়া চলিয়াছে। তাহারা কলে আবাদ করে, কলে ফসল কাটে, কলে আঁটি বাঁধে, কলে গোলা বোঝাই করে। ইহার সুবিধা কি তাহা সামান্য একটু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায়।' বলেছিলেন—'কলের লাঙ্গল, কলের ফসল কাটা যন্ত্র থাকিলে সুযোগমাত্রকে অবিলম্বে পুরোপুরি আদায় করিয়া লওয়া যায়। দেখিতে দেখিতে চাষ সারা ও ফসল কাটা হইতে থাকে। ইহাতে দুর্ভিক্ষের আশংকা অনেক পরিমাণে বাঁচে।'

এ-দেশের কৃষি-সমস্যার সমাধানের পথ যে যৌথখামার গড়ে তোলবার মধ্যে, সে-কথা 'সমবায়' শীর্ষক একাধিক প্রবন্ধে সে-যুগে বসে কবিগুরু বারবার উচ্চারণ করেছেন। এছাড়া আর কোন বিকল্পই তাঁর মনে আসেনি। এ-দেশের কৃষি-সমস্যার কারণ, অনেকদিন বাদে কবি নজরুল যা উচ্চারণ করেছেন—'মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ, মাটির মালিক তাহারাই হয়' রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক আগেই তা অনুভব করেছিলেন। কৃষককুলকে ভূমিহীন রেখে কখনোই উন্নত কৃষির আশা করা যায় না—এটি অতি উত্তমভাবেই অনুভব করেছিলেন কবিগুরু। অনুভব করেছিলেন যে, কোটি কোটি চাষীর সৃজনশীল শক্তিকে অবারিত করে দেবার এবং তাদের কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টির প্রাথমিক পূর্বশর্ত হচ্ছে জমিতে এক-চেটিয়া স্বার্থের মুষ্টি ভেঙে দেওয়া। গরীব চাষীদের মধ্যে জমি বিলি করে দেওয়া ও তাদের ঋণ মকুব করা। তাছাড়া এ-কথাও রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন যে, সাবেকী কৃষি-ব্যবস্থায় প্রতি বছর যে হাজার হাজার কোটি টাকা খাজনা ও সুদ হিসেবে জমিদার ও জোতদার এবং মহাজনদের কবলে চলে যায়, সেই সুবিপুল অর্থ উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত না হয়ে ব্যবহৃত হয় ফাটকাবাজীতে ও তেজারতি কারবারে। এইসব কৃষি-সম্পর্কের অবসান ঘটালে আমাদের কৃষির জন্য অতি আবশ্যক মূলধনের গুরুত্বপূর্ণ উৎসমুখ অবারিত হবে।

রবীন্দ্রনাথ এ-দেশের কৃষি-উন্নয়নের জন্য তামাম ইউরোপীয় কৃষি-ব্যবস্থার উপরে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। বিপ্লবের পরে রাশিয়ার কৃষি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন তাঁর মনে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল।

তথাপিও কৃষি সমবায় প্রথা যে ভারতবর্ষেও অজানা ছিল না পুরাকালে সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতন। তাই তিনি 'সমবায় নীতি' প্রবন্ধে এক জায়গায় বলেছেন—'আমাদের এই গ্রাম প্রতিষ্ঠিত কৃষিপ্রধান দেশে একদিন সমবায়-নীতি অনেকটা পরিমাণে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তখন মানুষের জীবনযাত্রা ছিল বিরলায়তনিক। প্রয়োজন অল্প থাকাতে পরস্পরের যোগ ছিল সহজ।...

...আজ ভারতবর্ষের জীবিকা যদি সমবায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ভারত-সভ্যতার ধাত্রীভূমি গ্রামগুলি আবার বেঁচে উঠবে ও সমস্ত দেশকে বাঁচাবে।

...সমবায় নীতি ছাড়া আমাদের উপায় নেই। আমাদের দেশে তার বাধাও অল্প।

আমাদের গ্রামীণ তথা নগরের অর্থনীতি তথা সমগ্র দেশের অর্থনীতির মূলে এবং/অথবা আদি ভিত্তি রচনা করেছে কৃষি। কৃষি উন্নয়ন ছাড়া আমাদের রক্ষা নেই। এই চিন্তা সমকালীন এবং বর্তমান অর্থনীতিবিদদের চেয়েও অধিকতর মননশীলতার সঙ্গেই অনুধাবন করেছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ। কৃষিকর্মকে তাই এক শান্তিযজ্ঞ বলেই মনে করতেন। কৃষি-ব্যবস্থার আদি সূত্র ধরে নাড়া দিয়ে তিনি লিখেছেন, '...তারপর এলো কৃষি। কৃষির মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছে। পৃথিবীর গর্ভে যে জননশক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল, সেই শক্তিকে আহ্বান করেছে। তার পূর্বে সাহায্যের পরিমাণ ছিল স্বল্প পরিমাণে এবং দৈবায়ত্ত। তার ভাগ ছিল অল্প লোকের ভোগে, এইজন্য তাতে স্বার্থপরতাকে শান দিয়েছে এবং পরস্পর হানাহানিকে উদ্যত করে রেখেছে। সেই সঙ্গে জাগলো ধর্মনীতি। কৃষি সম্ভব করেছে জনসমবায়।

মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলবার, পৃথিবীর অন্যসত্রে একত্র হবার যে বিদ্যা, মানব-সভ্যতার মূলমন্ত্র যার মধ্যে, সেই কৃষি-বিদ্যার প্রথম উদ্ভাবনে আনন্দস্মৃতির মত গ্রহণ করবো এই অনুষ্ঠানকে।' কৃষিকর্ম রবীন্দ্র-চেতনায় ছিল এক পবিত্র অনুষ্ঠানের মতন। কবিতা রচনায় যতনই আবেগ উচ্ছ্বাসে অনুরঞ্জিত।

।। ৩৫ ।।

হেমন্ত আগে ভেবেছিল শ্রাদ্ধশান্তি চুকলেই কাশীতে ফিরে যাবে—কিন্তু তা হল না। আশা এত কান্নাকাটি করতে লাগল, ওদের এমনই অসহায় অবস্থা যে, সে দেখে আর ফেলে যেতে পারল না। ভোলাকেই পাঠিয়ে দিল, বলে দিল, 'আমি চিঠি লিখলে কি তার করলে এসে নিয়ে যাস।'

ভোলার অবশ্য বড়মাকে এভাবে একা ফেলে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এরাও মাত্র দেড়খানা ঘরে বাস করে এতগুলি প্রাণী—এর মধ্যে অপরিচিত ও আপাত-পরিচয়ে-হিন্দুস্থানী জোয়ান ছেলেকে কোথায় রাখে, কোথায় শুতে দেয়! যে দুদিন ছিল, বাড়ীওলাদের বলে ছাদে শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল আশা, কিন্তু সে খোলা ছাদ, মশারি টাঙাবার কোন উপায় নেই, দু-রাত্রেই চোখে-পাতায় করতে পারে নি বেচারী। তবু সে নিজে থেকে যেতে চায় নি। হেমন্তই বুঝিয়ে বলে ফেরৎ পাঠাল।

এদের যে অবস্থায় ফেলে গেছে নিমাই তা অবর্ণনীয়। মাইনে মাগ্‌গীভাতা সব জড়িয়ে মাস গেলে গোপাল পায় মাত্র একশো কুড়ি টাকা। সর্বাদন ওভারটাইম হয় না—হলে আর কিছু বেশি। এ-ই এদের এখন একমাত্র ভরসা। আর কোথাও কিছু নেই—পোস্ট আপিসে বোধহয় গোটা চল্লিশ টাকা পড়ে আছে, সেও নিমাইয়ের নামে, সে এখন বিশ হাত জল। গহনা বলতে আশার হাতে ব্রোঞ্জের ওপর সোনা বাঁধানো তিনগাছি করে চুড়ি, চারগাছা করেই ছিল—অতবড় মেয়ে কমলা শুধু হাতে ঘুরে বেড়ায় বলে তাকে একগাছা করে পরিয়ে দিয়েছে।...ভাল খবরের মধ্যে এ পক্ষের বড়ছেলে আশিস এবার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে—যতদূর যা মনে হয়—অন্য পরীক্ষার ফলাফল দেখে—পাসও করবে। তারপর দুটি ছেলেমেয়ে—মেয়েটি ক্লাস এইট, ছেলেটি সেভেন্‌এ পড়ে।

আশিসের আর পড়া হবে না—নিমাইয়ের বন্ধুরা আশ্বাস দিয়েছে যে—তারা 'সায়েব'কে বলে রেখেছে (এখনও আপিসের ওপরওলা মাত্রেই সাহেব)—নিমাই বেচারী পেন্‌সন্‌ গ্রাচুইটি কিছুই পেল না, এতকাল কাজ করে গেল—সেই হিসেবেই ইউনিয়নের অনুমতি নিয়ে তিনি ওকে একটা চাকরি দেবেন, আপাতত অস্থায়ী—তারপর লোক দেখানো একটা পরীক্ষায় বসিয়ে পাকা করে দেবেন। এ সুযোগ কোনমতেই ছাড়া উচিত নয়, জিনিসটা পুরনো হয়ে গেলে এর কোন গুরুত্বই থাকবে না; নিমাইয়ের কথা ভুলেই যাবে হয়ত—আজ যারা এত চেষ্টা করছে তাদেরও উৎসাহ জুড়িয়ে যাবে, এ সাহেবও হয়ত বদলি হয়ে যাবেন। ইউনিয়নের কে নতুন সেক্রেটারী হবে—সেও তখন বাগড়া দিতে পারে, আজকের সহানুভূতির আবেগ তাকে স্পর্শ করবে কেন? সুতরাং শুভস্য শীঘ্রম্‌।

এদিকে কমলার একটা সম্বন্ধ অনেক-দূর এগিয়ে আছে, মেয়ে সুশ্রী দেখে তারা অল্পেই রাজী হয়েছে। ছেলেটি গোপালের কারখানাতেই কাজ করে, অনেক আগে ঢুকেছে—একটা পাস—মোটামুটি শ' তিনেকের মতো পায়, আগড়পাড়ায় নিজেদের বাড়ি আছে। পাঁচশো টাকা নগদ, হার-চুড়ি—তা চুড়ি ব্রোঞ্জের ওপর হলেও চলবে—বাকী যা সাধারণ দান, বরের আংটি বোতাম ইত্যাদি। ঘড়ি দিতে হবে না, বর নতুন ঘড়ি কিনেছে সম্প্রতি। তাহলেও—সব সুদ্ধ, ঘরখরচা ধরে হাজার তিনেকের কম নয়। যার হাতে একটা পয়সাও নেই, সে এ সম্বন্ধ করছিল কী ভরসায় কে জানে—হয়ত হেমন্তরই ভরসায়। সবাই গিয়ে পায়ে পড়বে জেনে রেখেছিল।

এখন সব শুনে হেমন্ত আশাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুই কি বুঝেছিস, ছেলে ভাল?'

আশা মাথা হেঁট করে জবাব দিল, 'যতদূরে শুনেছি—খুবই ভাল। খোকার সঙ্গে এসেও ছিল দু'একবার, কথাবার্তা তো মন্দ নয়। দেখতেও মোটামুটি ভালই, কমলার সঙ্গে বেমানান হবে না।'

'তবে দ্যাখ—বিয়ের দিন ঠিক কর।'

'এখনই—?' চমকে ওঠে আশা, কালাশৌচ চলছে তো! তা ছাড়া—এই মনের অবস্থা—'

'আমার সাহায্য যদি পেতে হয় তাহলে আর দেরি করা চলবে না।' স্পষ্টভাষণই করতে হয় হেমন্তকে। আশা এত ভেঙে পড়েছে—দেহে ও মনে দুইই যে, এখন এধরনের কথা বলতে কষ্টই হয়—তবু, ওরও আর সময় নেই। একটু থেমে তাই আবার বলে, আমার বয়েসের অবস্থাটা ভেবেছিস? তাছাড়া—মন খারাপ, চুপ করে বসে থাকলে আরও খারাপ লাগবে, আরও মুষড়ে পড়বি। আমার কথাটা ভাব দিকি, যেমন আমাপা পরমায়ু দিয়েছেন তেমনি শোকও যুগিয়ে রেখেছেন ছালা বোঝাই করে। কতগুলো শোক পেলুম বল দিকি জীবনে। ও কিছু না, কাজ করতে হবে, ছেলেমেয়েদের মানুষ করে সংসার দাঁড় করাতে হবে—এত ভেঙে পড়লে চলবে কেন?...এদের ওপরই তো ভরসা। তোরও একটা গলার কাঁটা রয়েছে—সেটা ওলাবার কথাও তো ভাবতে হবে, তার বের কথা!

ওটাকে পায় না, করলে চলবে কেন? লেখা-পড়া শিখলেও না হয় চাকরি বাকরি করে খেতে পারত। এমনি দুব্বো মেয়ে বাড়িতে বসিয়ে রাখলে—শেষে হয়ত একটা রিকসাঅলার সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। মা না, এসব কোন কাজের কথা নয়, তুই পুরুত ডাক। আমি যতদূর জানি, বের ব্যাপারেই কালাশৌচ কাটিয়ে নেওয়া যায়—আগামী সপিণ্ডিকরণ করিয়ে। তা যদি হয় সামনের কেষ্টপক্ষে একাদশী দেখে সেরে নিক গোপাল। বসে বসে কাঁদলে চলবে না এখন, কান্না তো পড়েই রইল জীবনভোর।'

হেমন্তর মনের জোর ওদের ঠেলে নিয়ে যায়। সক্রিয় হতে বাধ্য হয় ওরা। এইটুকু জায়গার মধ্যে থাকা, পাঁচটা ভাড়াটে, ক্যালব্যাল করছে ছেলেমেয়েরা—খুবই কষ্টকর, কিন্তু এদের একটা কিছু সুব্যবস্থা না করে যেতেও পারে না, আরও আশার মুখ চেয়ে। আশাটা যেন কী পেয়ে বসেছে ওকে। ছোট্ট মেয়েরা অপরের কাছে মার খেলে বা ভয় পেলে যেমনভাবে মাকে জড়িয়ে ধরে—তেমনিভাবে যেন আঁকড়ে ধরেছে ওকে।...থাকে বিয়ে দিয়ে এনেছিল, সে কখনও এমনভাবে ওর ওপর নির্ভর করতে পারল না—যে কখনও দেখে নি ওকে, সব সম্বন্ধ বোধহয় গোনা যায় কদিনের পরিচয়—সে-ই আপন করে নিল অনায়াসে। একেই বোধহয় বলে প্রারব্ধ—পূর্বজন্মের সংস্কার।

যত তাড়াতাড়িই করুক—কমলার বিয়ে চুকতে প্রায় তিনমাস গড়িয়ে গেল। আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ ছাড়া বরপক্ষ রাজী হল না। তাদের বড় ছেলে, জ্যৈষ্ঠ মাসে দেবে না, বৈশাখ ছেলের জন্মমাস।

অগত্যা থাকতে হল হেমন্তকেও।

খুব খারাপও লাগে না বোধহয়।

আশা খুবই যত্ন করে। জীবনে এমন সেবা কখনও পায় নি সে। এমনি যতই অসুবিধে হোক—এই লোভেই আরও থেকে যায়। রোজ রাত্রে গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে পা টিপে ঘুম পাড়ায়। পাখা নেই বাড়িতে, রাত্রে উঠে উঠে গায়ে হাত দিয়ে দেখে ঘাম হচ্ছে কিনা, তা বুঝে বসে বাতাস করে হাতপাখা দিয়ে।

অবশ্য একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই এই তিনমাস।

ব্যাপারগতিক দেখে কী করতে হবে আগেই মনস্থির করে ফেলেছিল। আশিস তখনও আপিসে ঢোকে নি।—যেসব পুরনো দালাল কাজকারবার করত ওর সঙ্গে—ঠিকানা দিয়ে দিয়ে পাঠিয়েছিল তাদের খোঁজে। দেখা গেল, সবাই মরে গেছে—এক যাদুবাবু ছাড়া। যাদুবাবু যখন প্রথম ওর সঙ্গে কাজ করে, একটা জমি বিক্রী করিয়ে দেয়—তখন তার বয়স ছিল ত্রিশ, এখন ষাট পেরিয়ে গেছে। তবু নাম করতেই এসেছে সে এতখানি পথ পাতিপুকুর পর্যন্ত।

কার জন্যে কী জন্যে তখনও বলে নি আশাকে। কমলগোপালকেও বলল না। শুধু বলল, 'কাশীপুরে অঞ্চলে কি দমদমে—যদি খাস কাশীপুরে না পাওয়া যায়—একটা ছোট বাড়ি দেখে দিতে পারেন? এমনভাবে বাড়ি হবে—হয় ওপরে থেকে নিচে ভাড়া দেওয়া যাবে, নয়তো—একতলা তিনখানা ঘর দরকার। দেখে দিতে পারেন?'

'টাকা? কত টাকার মধ্যে হবে কিছু বাঁধাবাঁধি আছে?' যাদুগোপাল জিজ্ঞাসা করে।

'যতটা কমে হয়। এ তো সোজা কথা। যে কিনবে সে চাইবে কম দিতে, যে বেচবে সে চাইবে যতটা বেশী পাই—এই তো? তবে তিরিশের মধ্যে হলেই ভাল হয়।'

'উঁহু। হবে না। এখন অত্যাধিক দাম জমিবাড়ির, সেদিন আর নেই। দিন দিন হু-হু করে বাড়ছে।'

'সেই সে আমিও জানি। নইলে তিরিশ বলব কেন, দশই তো বলতুম। তা দেখুন কতয় পান। তবে কোন গোলমাল না থাকে কিম্বা একশো বছরের পুরনো না হয়।'

দু-একটা খবর নিয়ে এল যাদুগোপাল দুচার দিনের মধ্যেই—কিন্তু কোনটা জুৎ লাগল না। তার ভাষাতে 'অত্যধিক' দাম, 'অত্যন্ত' বেশী। যেটা কম দাম—একটু খোঁজ নিতেই দেখা গেল ওয়ারিশন নিয়ে গোলমাল।

শেষে দিন পনেরো পরে একদিন এল লাফাতে লাফাতে।

'পাওয়া গেছে মা, ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন। বামুনের গরু একেবারে যাকে বলে। কাশীপুরে হল না, এ সিঁথির মধ্যেই—একটু ভেতর দিকে, মানে বড় রাস্তা থেকে খানিকটা যেতে হয়—তবে বেশ পাড়াগাঁয়ের মতো। রিক্সা যায় ভেতরে বাড়ির দোর পর্যন্ত, সেদিক দিয়ে কোন অসুবিধে নেই। পনেরো বছরের বাড়ি, মাল মেটিরিয়েল ফার্স্ট কেলাস, বলেছে ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে দেখাতে পারেন, যদি খারাপ বলে তার খরচা আমি দোব। একতলা বাড়ি, দোতলার ভিত—চাই কি হাল্কা করে তেতালাও উঠবে। খালি জমি পড়ে আছে সেও পেরায় ধরুন দেড় কাঠার মতো, দুটো নারকোল গাছও আছে ভদ্দরলোক। বাড়িওলা থাকে দুখানা ঘর নিয়ে, একটা বেশ বড়—মাঝে পার্টিশান দিয়ে দুটো মাঝারি ঘর বেরোবে, তাছাড়া রান্নাভাঁড়ার আছে, অ্যাসবেস্টশের চাল, সেও স্বচ্ছন্দে রান্নাঘরে ভাঁড়ার রেখে একটা শোয়ার ঘর করে নেওয়া যায়। রাস্তার দিকে এক ফালি বারান্দাও আছে, সেও ধরুন ঘিরে নিতে পারেন। যেদিক দিয়ে যাবেন—ফার্স্ট কেলাস একেবারে!'

'আর? আমি যা চেয়েছিলুম?' হেমন্ত প্রশ্ন করে।

'আছে, সেও আছে। বলছি। সবদিক না দেখে কি আর উর্দ্ধশ্বাসে এইছি? দেড়টা ট্যাকাই খরচা হয়ে গেল এখেনে আসতে!...একদিকে একখানা ঘর, একটা ছোট রান্নার জায়গা, আলাদা কল পাইখানা নিয়ে একঘর ভাড়াটে আছে, ষাট টাকা ভাড়া দেয়। হিন্দুস্থানী কোথায় কি কারবার আছে, স্বামীস্ত্রী, একটা বাচ্চা—কোন ঝঞ্ঝাট নেই, খুব ভাল ভাড়াটে ও'রা বললেন, কোন মাসে দু'তারিখ হয় না ভাড়া দিতে। বললে, সময় দিলে ও'রা ভাড়াটে তুলে দিতে পারবেন—তবে লাভ কি? বাড়ী-অলারা বললেন, ভাড়াই যখন দেবেন তখন এমন ভাড়াটে তুলবেন কেন? এখানে এক-খানা ঘরে কে এত ভাড়া দেবে? নিহাৎ ওর এইখানে দোকান তাই—।'

'তা বাড়িওলা বেচছে কেন?'

'ছেলের দিল্লীতে চাকরি হয়েছে, পাকা চাকরি, সেইখানেই থাকতে চায়। একই ছেলে। তাই ইচ্ছে এদিকের সব বেচেকিনে সেখানেই একটা কিছু করে, মাথা গোঁজবার জায়গা। দিব্যি বাড়ি মা, কী বলব, নিজেরা থাকবে বলে শখ করে করেছে, দক্ষিণ খোলা একটু বাগান মতোও রয়েছে, আর চাই কি?'

'তা দক্ষিণে কত?' একটু চুপ করে থেকে প্রশ্ন করে হেমন্ত।

'ঐখানেই যা একটু গোলমাল। পঁয়ত্রিশ হাজারের এক পয়সা কমে দেবে না। লোকটা একটু রোখা আছে। বলছে, দর করার হলে খদ্দের আনবেন না, এই দামে কেনবার হিম্মৎ থাকলে আনবেন, পছন্দ হলে নেবে নয়ত নেবার দরকার নেই।'

বলে যাদুগোপালই যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে হাত কচলাতে থাকে।

'কথা শুনে তো মনে হচ্ছে লোকটা ভাল।' হেমন্ত বলে, 'আমি রোখা লোকই পছন্দ করি। কিন্তু তুমি কি বলো? অত ভেতরে—সে হিসেবে দামটা একটু বেশী হচ্ছে না?'

ভেতরে বলেই এত কম, ঐ বাড়ি কালী-চরণ ঘোষ রোড কি সাউথসিঁথি রোডের ওপর হলে প'য়তাল্লিশ পঞ্চাশের কম হত না মা!'

'বেশ চলো, একটা রিক্সা ডাকো, দেখে আসি।'

'এখনই যাবেন? এক্ষুনি?' যাদু যেন একটু হকচকিয়ে যায়।

'হ্যাঁ। তা কি? এখন এমন তো কোন রাজকার্য করছি না। আর এটাও তো কাজ, যা করতেই হবে তা সেরে ফেলাই ভাল। শিয়রে শমন এসে দাঁড়ালো—দেখতে পাচ্ছ না, তুমি যখন ছেলেমানুষ আমাকে বাড়ি দেখেছ, তুমিই বুড়ো হয়ে গেলে। আমার কি বয়সের গাছ পাথর আছে? নাও, নাও—চলো। রিক্সা ডেকে আনো।'

তাড়া লাগিয়ে ওঠে হেমন্ত।

বাড়ি দেখে পছন্দ হল। পছন্দ হবার মতোই বাড়ি, বেশ খোলামেলা। ভাড়াটে বৌটির সঙ্গেও আলাপ হল, তার বাপের বাড়ি গাজিপুর জেলায়। বেনারসী বুলি শুনে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, দেশী মানুষ ভেবে। একটা তারের ফাইল খুলে পরপর ভাড়ার রসিদ দেখালে, পয়লা দোসরা

তারিখের রসিদ সব, এমাস পর্যন্ত ভাড়া দেওয়া আছে।

তখনই বাড়িওলার সঙ্গে কথা বলে এল, ভাল দিন দেখে বায়না করবে। বায়না অ্যাটর্নীই করবেন, তাঁর কাছেই কাগজপত্র দিতে হবে। সার্চ শেষ হলে তিনিই দিন বলে দেবেন—কবে রেজেস্ট্রী হবে।

বাড়িওলা বললেন, 'সার্চ করার কোন দরকার ছিল না—তবে সে আপনার যেমন অভিরুচি।'

হেমন্ত বললে, 'এ তো সব বাড়িজমির মালিকই বলে থাকেন—কিন্তু কে সত্যি কথা বলছেন আর কে মিথ্যা বলছেন তা তো বোঝার উপায় নেই। যাদুগোপালের কাছে শুনেছি আপনি স্পষ্ট কথা শুনতে বলতে ভালবাসেন—কিছু মনে করবেন না আশা করি, বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে বিশ্বাস নিজের ছেলেকেও নেই। এতগুলো টাকার জিনিস, গোলমাল বেরোলে আপনাকে কোথায় পাবো বলুন। আপনি তো বেচে দিয়ে সরে পড়বেন। শেষে—আপনার ধন পরকে দিয়ে দৈবজ্ঞ বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে—সেই অবস্থা হবে তো আমার!'

ভদ্রলোক অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে রইলেন।

পরের দিন যাদুকে নিয়েই খুঁজে খুঁজে ন্যাটর্নী অফিসে গেল হেমন্ত। মেজোবাবুর ছেলে এখন বুড়ো হয়ে গেছে, তবু চিনতে পারল, উঠে এসে প্রণাম করল।

হেমন্ত বাড়ির বিবরণ এবং কেনার অভিপ্রায় জানিয়ে বললে, 'আমার এটুকু আসতেই দম বেরিয়ে গেছে আমি আর ছুটোছুটি করতে পারব না। সংসারবুদ্ধে যদি আমার কিছু করার থাকে তুমি করিও। এই বাড়ি, পাঁয়ত্রিশ হাজার দাম—নিজের বৌ আশার নামে কেনা হবে—আশালতা চাটুয্যে। বায়না করা সার্চ করা—সব তোমার ওপর ভার—মায় রেজেস্টারী পর্যন্ত। টাকা—এখানকার ব্যাঙ্কে যা আছে তা থেকেই নিতে হবে, কবে কোথায় সই করতে হবে বলো. একদিন মরিবাঁচি করে এসে না হয়—'

'না না। তার দরকার নেই। এই ভদ্রলোক যদি আসেন—সঙ্গে করে নিয়ে গেলে আপনি যেখানে আছেন আমি গিয়ে করিয়ে আনব। আপনার এভাবে আসা উচিতই হয় নি।'...

এরা কিছুই জানতো না, ন্যাটর্নীপাড়া থেকে ফিরে এসে আশাকে খবরটা দিল হেমন্ত।

একটা বাড়ি দেখেছে, ছেলেদের একটু হয়ত অসুবিধে হবে—বাসএর পথ বড় রাস্তা থেকে একটু দূরে—কিন্তু সব দিকে তো আর সুবিধে হয় না। ভাল বাড়ি সে হিসেবে দাম কম—যাদুদের পর, এমন আর কোথায় পাওয়া যাবে? বড় রাস্তার ওপর হলে এ বাড়িরই ডের দাম হত!

বাড়ির পূর্ণ বিবরণ দিয়ে, মায় ভাড়াটের কথা সুদ্ধ জানিয়ে বলে, 'শুধু তোর নামে কিনতে বলেছি। ছেলেমেয়ে নিয়ে বৌ-নাতি নিয়ে থাকবি বৈকি, আশীর্বাদ করি শান্তির সংসার হোক—কিন্তু খবরদার কোন কারণেই বাড়ি ছেলেদের নামে লিখে দিসনি কি বিক্রী করে টাকাটা ওদের হাতে দিসনি। যদি বলে যে আরও ভাল বাড়ি কিনবে এই বাড়ি বেচে—সে বাড়ি নিজে দেখে, দরদস্তুর করে, এ বাড়ি বেচার দরকার হলে সে টাকা নতুন বাড়িওলাদের ডেকে এনে সোজা তাদের দিবি। অনেক দেখলুম সংসারে—বুড়োবয়সে দুর্গতির শেষ থাকবে না—বেটা বৌয়ের এক্তারজারী হলে! বাড়িখানা থাকলে তবু ওর লোভেও কেউ দেখবে। বাড়ি জ্যান্তে ছেলেদের ভাগ বাটোয়ারা করেও দিসনি—মরার পর যা হয় ওরা করুক গে—চুলোচুলি। আর এই ভাড়ার টাকাটা নিজে রাখবি স্বাধীন। এখন তো জমাতেই হবে মেয়ের বে পর্যন্ত, তার পরও জমাবি সংসারে যেন ঘুষ দিসনি। এখন তো দু'ছেলের রোজগার হল—যেমন চলে ওতেই সংসার চালাবি। আরও একটা কথা বলে যাই, ছোট মেয়েটার বরে না হলে যেন আহ্লাদ করে গোপালের বিয়ে দিয়ে বসো না। বিয়ে হলেই বৌয়ের অধীন। ছেলের নিজের ইচ্ছে থাকলেও কিছু করতে পারবে না।'...

এসব উপদেশে আশার কান ছিল কিনা কে জানে, তার দুই চোখ দিয়ে তখন ঝর ঝর করে জল পড়ছিল। অনেকক্ষণ পরে অশ্রু-বিকৃত স্বরকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'এখানেও প্রায়ই বলত, আমি যদি এইবেলা মরতে পারি তবু, তোমাদের একটা হিল্লে হয়ে যায়। জ্যাঠাইমা তোমাকে ভালবাসে, তোমাকে দেখবে। আমিই দিষ্ট-নজরে পড়ে আছি, সেই জন্যে কিছু হচ্ছে না।...আমি বলতুম দেখছেন না আর কোথায়—এই তো যখনই যেদিকে জল পড়ছে সেদিকে ছাতা ধরছেন। বড়ো মানুষ তিনি আর কত দেখবেন, এখন তো উল্টে আমাদেরই তাঁকে দেখা উচিত, খাওয়ানো উচিত। তা বলত, তুমি জানো না, আমার একটু ভুলেই সম্বন্ধ ফোয়ালনে। নইলে আমি তো রাজা। আবার বিলেটাকে দিলমে, সেও জীবনটা ছারেখারে দিলে।...বলত আর চোখের জল ফেলত।'

হেমন্ত ওর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'একটা কথা ভুল বলেছে মা, শুধু ও বিষনজরে পড়ে নি, সমস্ত শ্বশুর গুষ্টির ওপরই আমার ঘেন্না হয়ে গেছে। ঝাড়ে বংশে বেইমান ওরা, বেইমান আর বদ। তার ওপর বোকা—নিজেদের পায়ে চিরকাল কুড়ুল মারে।...যেখানে এদের এক ফোটা রক্ত আছে সেখানেই অশান্তি, সেখানেই আহাম্মকি। ওরা জানেই না কাউকে আপন করতে, ভালবাসতে। নিজেদের স্বার্থটা বোঝে, অথচ সেজন্যে যে একটু মেহনৎ করতে হয়—একটু বুঝে সমঝে চলতে হয়—কি অপরের মন যুগিয়ে সেটা আদায় করতে হয়—এটুকু বোঝার মতো জ্ঞান ওদের নেই, অত ধৈর্যও নেই। তাই তো তোকে বলছি, খুব সাবধান, ছেলেদের ওপর একতিল ভরসা করিস নি। ঐ ঝাড়েরই বাঁশ ওরা!'

তারপর একটু দম নিয়ে বলে, 'তবে এও সত্যি, তোর টানেই এসেছি। তোর জন্যেই যেটুকু চিন্তা। তোকে না পথে বসে ভিক্ষে করতে হয়,—আমার সাধ্যমতো সেইটুকু করে যাবো। তবে এর বেশী নয়। তাহলেই তো ঐ ছেলেরা হাল ছেড়ে দিয়ে আরাম করতে নবাবী করতে শুরু করবে। বেশিতে দরকার নেই, মাথা গোঁজার একটা জায়গা করে দিয়ে গেলুম, তোর একটা পেট—দিনগুজরান খরচা—বুঝে চলতে পারলে ওতেই চলে যাবে। তারপর তুই বোকামি করে কোয়াস—তুইই পথে বসবি!'

কমলার বিয়ের আগেই চিঠি লিখে ভোলাকে আনিয়ে ছিল। বিয়ের পরদিন পরকালে চলে যাবে, সেও গাড়িতে উঠবে। অনেক বলে আশা সেটা বন্ধ করল। অন্ততঃ ফুলশয্যের ঝঞ্ঝাট চুকে যাক—তারপর যেও না, একটা দুটো দিন আর কী এমন

এসে যাবে। ভোলাও আপনার থাক না, এ কটা দিন তো জায়গার অসুবিধে নেই।'

এতে আর 'না' বলতে পারল না। এই শেষ, আর আসবে না। আসা হবে না—এক রকম নিশ্চিত, আর সত্যিই, এতদিনই রইল। দুটো দিনে আর এমন কি ক্ষতিবৃদ্ধি হবে।

জায়গারও অভাব ছিল না। পাড়ার লোকের দয়াতেই সে ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। সকলেই খুব করছে এদের বিপদে। করছে—হেমন্ত যা বুঝল—আশার জন্যেই। তার স্বভাবের জন্যেই সকলে তাকে ভালবাসে। ভাগ্যক্রমে সামনের বাড়ির নিচের তলার ভাড়াটে সেই সময়ই উঠে যাচ্ছে, নতুন ভাড়াটে অবশ্য প্রস্তুতই ছিল। পাড়ার লোকরা ভদ্রলোককে ধরে—চার পাঁচটা দিনের জন্যে আটকাল বাড়িটা। বর্ষাকাল, ম্যারাপ করতে অনেক খরচা পড়বে গরিব মানুষদের, তাও অসুবিধে, বাসরঘর, ভাঁড়ার, আত্মীয়-কুটুম্বদের থাকার ব্যবস্থা—সবই তো দরকার। বরং উনি যদি কিছু ধরেও নেন সে বাবদ—তো এদের লাভ।

বাড়িওলা অবশ্য কিছুই নিলেন না। হেমন্ত নিদেন চুনকামের খরচাটা দিতে চেয়েছিল তিনি তাতেও হাত জোড় করলেন। বললেন, 'চুন তো আমাকে দেওয়াতেই হত—সেটাই না হয় দুদিন পরে দেওয়াব। ব্রাহ্মণের কন্যাদায় উদ্ধার হচ্ছে, অনাথা মেয়ে—এতে যদি এটুকুও না করতে পারি তো কী করলুম জীবনে।'

বিয়ে নির্বিঘ্নেই মিটে গেল। জামাইকে দেখেও ভাল লাগল হেমন্তর। তবে এ দেখার কোন মূল্য নেই তাও সে জানে। কিছুদিন না গেলে বোঝা যাবে না, মেয়ের কপালে কী উঠল লটারীর ফল।

হেমন্ত উপস্থিত থাকাতেই আরও—বিয়ে বেশ ভালভাবে মিটল। মেয়েকে ব্রোঞ্জের নয়—সোনার চুড়িই গড়িয়ে দেওয়া হল, উপরন্তু বারোমাস পরে থাকার মতো মাঠাবালা এক জোড়া। ফুলশয্যায় তত্ত্বও অল্পের ওপর বেশ গুছিয়ে দিল হেমন্ত, কোন খুঁৎ থাকতে দিল না।

ফুলশয্যের তত্ত্ব সঙ্গে নিয়ে সবাই রওনা হয়ে গেলে মোটামুটি ঘরদোর গুছিয়ে আশা হেমন্তর কাছে এসে বসল। চোখে জল টলটল করছে তার, আগেই টিকিট কাটা হয়ে আছে, পরের দিন বেনারস এক্সপ্রেসে যাওয়া। সেইটেই যত ভাবছে তত যেন নিজেকে নতুন করে অসহায় বোধ করছে আশা, কথাটা ভাবতেই বারবার চোখে জল এসে যাচ্ছে। নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করা পর্যন্ত থাকতে বলেছিল, হেমন্ত রাজী হয়নি। সে আরও পনেরো কুড়ি দিন দেরি হবে—ততদিন এখানে থাকতে রাজী নয়।

সকাল থেকেই বিয়েবাড়ির কাজে মন নেই আশার, কেবল যেন শাশুড়ির পায়ে পায়ে জড়াচ্ছে। হেমন্তই ধমক দিয়েছে সে জন্যে, 'মর আবাগী—থৈথৈ করছে লোক, অসুমের কাজ পড়ে। তুই বাড়ির গিন্নি, কেবল আমার সেবার তদ্বির করার জন্যে ঘুরছিস কেন? আমারটা আমি ঠিক করিয়ে নেব, তুই অন্য দিকে মন দে—'

এখন এসে পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে কেঁদেই ফেলল আশা।

'আবার কবে আসবেন মা?'

হেমন্ত হাসল। ম্লান হাসি। এই সেবা এই আন্তরিকতা কি তার মনেও দোলা লাগায় নি, আসন্ন বিচ্ছেদের চিন্তা কি তার মনকেও একটু ভারাক্রান্ত করে তোলে নি?

হয়ত সেই জন্যেই তার এত ব্যস্ততা, এমন দড়িছেঁড়া করে চলে যাওয়া।

খানিকটা চুপ করে থেকে বলল, 'আর আসব না। অন্তত আসার আর ইচ্ছে নেই।'

'আর কোনদিনই আসবেন না? সে কি? আপনার গোপাল কি শুভার বিয়েতে?'

'এলে তোর টানেই আসতুম পাগলী। কিন্তু তুইও যে আমার শ্বশুরকুলেরই এক-জন। এবার এই চিরদিনের মতোই এদিকের সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে গেলুম। অবিশ্যি চির-দিন আর কদিন আমার। ভোলা বলে ওভার-ডিউ—আমার আর একজন্মও ঘুরে ফের মরার বয়স হয়ে গেল।...তবে যদিনই বাঁচি—আর না। অনেক হয়েছে। নেড়া বেলতলায় যায় কবার, তা আমি তো অনেকবারই গেলুম, আর কেন?'

'তাহলে আর দেখা হবে না কোনদিন। যেন আর্তস্বরে প্রশ্ন করে আশা।

'কী লাভ আর চোখের দেখা দেখে—এই তো এতদিন রইলুম। আমার কি আর মরার সময় হয়নি? ধরে নে, মরেই গেছি।'

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে চোখের জল ফেলল আশা। তারপর বলল, 'আমি—আমি যদি কাশীতে যাই, তাড়িয়ে দেবেন?'

আবারও অনেকক্ষণ চুপ করে রইল হেমন্ত, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তাড়িয়ে দোব না, তবে না গেলেই ভাল হয়। আর পেছনের দিকে তাকাস নি মা, সামনের দিকে তাকা, ছেলেমেয়েদের দিকে মন দে, ওরা যাতে মানুষ হয়, সুখী হয়—সেই দিকে দ্যাখ। আমার সংস্পর্শে বিষ আছে, আমার এ টাকাও অভিশপ্ত। এদিকে তাকিয়ে থেকে ওরা কেউ সুখী হল না, বরং জ্বলেপুড়ে মল আরও। নিজেদের মতো থাকলে হয়ত একরকম কাটিয়ে যেতে পারত। সেইজন্যেই তোকে বেশী টাকা দিলুম না, এই যে দিলুম—তাতেই ভয় হচ্ছে—হয়ত তোর অশান্তির কারণ হয়ে রইল।'

তারপর একটু থেমে গাঢ় কণ্ঠে বলে, 'মেয়েছেলের—বিশেষ আমাদের হিন্দু-ব্রাহ্মণের ঘরে—স্বামী চলে গেলে সুখের কথা বলা বিড়ম্বনা—তবু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, তাও হয়ত উচিত হচ্ছে না, ভগবান আমার কোন কথাই শোনেন না—তবে তোর মন ভাল, দয়ামায়া আছে, হয়ত তোর ভাল হবে; তুই সুখী হ' শান্তি পা—আমার কথা আর ভাবিস নি। আমি মরেই গেছি এইটে ভেবে নে। চিরদিন জ্বলে আর জ্বালিয়েই গেলুম মা, আমার নজর থেকে আমার নিশ্বাস থেকে দূরে থাকাই ভাল। ছোটবেলায় শাশুড়ি বলতেন পিশাচে পাওয়া—কে জানে কথাটা সত্যিই কিনা। আমার সংস্রবে এসে কেউ সুখী হয় নি মা। সেই-জন্যেই চিরদিনের মতো দূরে সরে যেতে চাইছি।'

আশা আর শুনতে পারল না—হেমন্তর কোলের মধ্যে মুখটা গুঁজে দিয়ে যেন হাহাকার করে কেঁদে উঠল, 'আমারও যে আর কেউ নেই মা, আমার মুখের দিকে চাইবার কেউ যে রইল না!' (ক্রমশঃ)

লণ্ডনে রবিশঙ্করের সঙ্গে

প্রায় যেন বাতায়নের সমান্তরালে, উত্তর ইউরোপের দীর্ঘ দিনান্তের রঙিন আলোর আকাশের বুকে বর্ণলঘু ধূসর পিঙ্গল, সোনালী-সিঁদুর, রুপোলী-বেগুনি মেঘেরা ভেসে যাচ্ছিলো, ধেয়ে আসছিলো, মেশা-মেশি করছিল, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলো। আর নীচে দিগন্ত প্রসারিত হাইড পার্কের ওক, এলম ও প্লেন তরুর পাতার ঝলমলানিতে, বিসর্পিল হ্রদের জলতরঙ্গে ও তৃণশ্যামল প্রান্তরে সেই মেঘ বিচ্ছুরিত আলো আরেক মায়াজাল বিস্তার করে ছিল।

সেই নগর উদ্যানেরই নামানুসারী হোটেলের আট তলার একটি স্যুইটে ভারত-গৌরব সুরশিল্পী রবিশঙ্কর আমার জন্যে নিরালায় অপেক্ষা করছিলেন। চায়ের নিমন্ত্রণ।—এক হিসেবে রবিশঙ্করের বৃটেন সফর নতুনত্ব হারিয়েছে। কারণ তাঁর প্রায় একক চেষ্টায় ভারতীয় সঙ্গীত এদেশের সংস্কৃতির যেন অঙ্গ হয়ে গেছে। তবু তাঁর জনপ্রিয়তা কত যে ব্যাপক, তাঁর আবেদনের যাদু যে কত আশ্চর্য তা আগের দিন সন্ধ্যায় সাদারল্যাণ্ড্যাণ্ডের একটি অনুষ্ঠানে আরেকবার অনুভব করেছিলাম। অনুষ্ঠানটি ছিল অরবিন্দ শতবার্ষিকী উপলক্ষে অরবিন্দ ভবনের জন্যে সাহায্যার্থে। অনুষ্ঠানের অন্যতম শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জগৎবিখ্যাত বেহালাবাদক ইহুদী মেনুহিন। আমরা রীতিমত মহার্ঘ টিকিট কিনেও প্রায় পেছনের দিকে বসতে বাধ্য হয়েছিলাম। অর্থাৎ আরো অনেক অধিক মূল্যে কেনার মত লোক সেই আসরে কম ছিলেন না। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি আসন পূর্ণ। সেই বিপুল দর্শকমণ্ডলী এক দিকে যেমন উদ্দীপনায় উদ্বেলিত অন্য দিকে তেমনই উপলব্ধিতে তন্ময়।

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে

রবিশঙ্কর একান্তভাবে শুধু ভারতীয় নন, তিনি প্রায় অনড় ঐতিহ্যবাদী। তবু নিঃসন্দেহে তিনি আজ আরো অনেক দেশের। সে দিন সন্ধ্যায় রবিশঙ্কর দেশ দেশান্তরে তাঁর ভারতীয় সঙ্গীত প্রচারের বিচিত্র ও বিস্ময়কর কাহিনী কিছু কিছু বলছিলেন। বিশেষভাবে বলছিলেন তাঁর দক্ষিণ আমেরিকা সফরের কথা। সেই মহাদেশটিতে তিনি প্রথম যান গতবছর সেপ্টেম্বরে। তারপর এ বছরের মার্চে। আবার কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি তৃতীয়বার যাবেন। তিনি বলছিলেন যে গতবার একটি ছোট রাজনৈতিক ঘূর্ণী জাগায় তিনি পেরুর রাজধানী লিমাতে যেতে পারেন নি। কিন্তু তাছাড়া ব্রেজিল, বলিভিয়া, ইকোয়াডর, কলম্বিয়া, আর্জেন্টিনা, চিলি, পেরাগুয়ে, উরুগুয়ে কিম্বা মধ্য আমেরিকার মেকসিকো, গুয়াতেমালা, হনডুরাস ও এল সালভেডর প্রভৃতি দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার প্রত্যেকটি দেশ সফর করেন। প্রতিটি দেশেই জনসাধারণের, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে, যে সাড়া পান তাতে তিনি বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে যান। তিনি বল্লেন ওরা আমাদের চেয়েও আবেগময়। তাই অনুষ্ঠানের সময় যেমন মোহিত, তদগত, অনুষ্ঠান শেষে তেমন উদ্বেলিত, উন্মত্ত। শতশত লোক জড়ো হয়ে শিল্পীকে কাঁধে করে নাচে। 'সুভেনির' বা স্মারক সংগ্রহের আগ্রহে তাঁর বোতাম ছিঁড়ে নেয়, রুমাল কেড়ে নেয়, পারলে যেন জামাটাও ছিঁড়ে নেয়।

অথচ, শিল্পী একটু বিস্মিত ক্ষোভের সঙ্গেই বল্লেন, ওদের সমগোত্রীয়দের, খোদ লাতিন দেশ ইতালীতে তাঁর ভারতীয় সংগীত প্রচারের কাজ তেমন এগোয় নি। তার প্রধানতম কারণ হচ্ছে উপযুক্ত এজেন্ট কিম্বা প্রযোজক আজো পাওয়া যায় নি। —আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে ভারতীয় দূতাবাসগুলি এ বিষয়ে কোন সাহায্য করতে পারে কিনা? তিনি বললেন, সম্ভবত নয়। কারণ সেটা তাদের কাজ নয়। ও বিষয়ে তাদের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতাও নেই। থাকার কথাও নয়। কিন্তু তারা যেটা পারে দুঃখের বিষয়, সর্বত্র তা করে না। যেমন, যে কোন দেশেরই একজন বড় শিল্পী দেশবিশেষে সফরে গেলে এটা তিনি আশা করতে পারেন যে সেই বিশেষ দেশটিতে তাঁর স্বদেশের দূতালয় তাঁর পরিচয় প্রচারে যথাসাধ্য করবেন। যেমন ইহুদী মেনুহিন যখন ভারত সফরে যান তখন বৃটিশ হাই-কমিশন অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই ঐ মহাশিল্পীর ভাবমূর্তি তুলে ধরবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। আমরাও তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান করি। তিনি রাষ্ট্রপতি ভবনের অতিথি হন। হয়তো এর একটা বড় কারণ এই যে ইউরোপীয়রা আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে যতটা জানে আমরা তাদের সম্পর্কে তার চেয়ে জানি অনেক বেশি। কিংবা গুণের কদরে আমরা আরো উদার। —তবু এ বিষয়ে বিশেষ কোন সন্দেহ নেই যে ও বিষয়ে আমাদের দূতাবাসগুলির আরো অনেক বেশি করণীয় আছে।

কোনো মহাগুণী শিল্পীর ভাবমূর্তি যথার্থভাবে প্রযোজিত না হলে যে কতখানি বিব্রত হতে হয় তার একটা বেদনাদায়ক উদাহরণ হচ্ছে তাঁর সোভিয়েট সফর। কয়েক বছর আগে অনেক আশা নিয়ে তিনি ঐ বন্ধুরাষ্ট্র সফরে যান। কিন্তু উপযুক্ত প্রচার ও পরিচয় পরিবেশনের অভাবে তাঁকে গণশিল্পী বলে পরিচয় দেওয়া হতে থাকে এবং কয়েকজন ফিল্ম সঙ্গীত পরিচালকের নাম করে বলা হতে থাকে যে তাঁদের ইতিপূর্বে ঐসব জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিচালকের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ হয়, এবার শঙ্করের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁরা খুশি হলেন।—কেউ এটুকু পর্যন্ত পরিষ্কার করে বলে দেয় নি যে রবিশঙ্কর 'লোক' নয়, ধ্রুপদী সঙ্গীতের সাধক।

এবার রবিশঙ্কর ইহুদী মেনুহিনের সঙ্গে অলিম্পিকের উদ্বোধন বাদ্য বাজিয়ে যাবেন ফ্রান্স সফরে। তারপর ইংল্যাণ্ড হয়ে কানাডায় এবং কিছু দিনের জন্যে আমেরিকায়। শেষে আবার ফিরে আসবেন লণ্ডনে। ২৮শে অকটোবর লণ্ডনের বৃহত্তম

হল, এলবার্ট হলে। ভিলি আলী আকবরের সঙ্গে যুগলে বাজাবেন।

আমি মাত্র ক'দিন আগে দেশ থেকে ফিরেছি। তাই রবিশঙ্কর দেশের খবর পেতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু সে-সব খবর রাজনৈতিক, সামাজিক, কিংবা চোখে দেখার বিবরণ। সাংস্কৃতিক যেটুকু তা হচ্ছে হালের কলকাতার নাট্যধারা। চলতি প্রায় সব নাটকই দেখে এসেছিলাম। রবিশঙ্কর তার অনেক কিছু জানতে চাইলেন।

আমি জানতে আগ্রহী ছিলাম ভারতের সংগীত সাধনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর মতামত। তিনি মনে করেন, যে যন্ত্রসংগীতে বহু মহৎ সম্ভাবনাময় তরুণ শিল্পীর আবির্ভাব ঘটছে। তাই আগামী তিশ-চল্লিশ বছর ভাবনার কিছু নেই। কিন্তু কণ্ঠ সংগীতের বেলায় তা বলা চলে না। যেন কণ্ঠ সংগীতের একটা মহা গর্ব ও গৌরবের যুগের পর এখন একটা ভাঁটা চলেছে।

রাগ

আলোচ্য সাক্ষাৎকারের সপ্তাহখানেক আগে পশ্চিম লন্ডনের একটি অতি অভিজাত পল্লীতে ছোট্ট একটি সমাবেশে রবিশঙ্করের আত্মজীবনীমূলক 'মাই লাইফ মাই মিউজিক' নামে বইটি অবলম্বনে গৃহীত রাগ নামে একটি রঙিন ছবির প্রাগমুক্তি প্রদর্শনীতে গিয়েছিলাম। স্বয়ং রবিশঙ্কর এবং বিটল-নায়ক জর্জ হ্যারিসন সংখ্যায় স্বল্প কিন্তু বিশিষ্ট অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান।

ছবিটির প্রযোজক ও পরিচালক হচ্ছেন হাওয়ার্ড ওয়ার্থ। সেই ছবিটিতে যদিও মহাশিল্পী রবিশঙ্করের শিল্পী জীবনের পরিণতির প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়, তিনিই তা নায়ক, তবু তা কোনক্রমেই রবিশঙ্করের জীবনের তথ্যমূলক চিত্র নয়। —এ হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বিপুল পট-ভূমিতে ভারতীয় সঙ্গীত ঐতিহ্যের একটি মনোজ্ঞ কাহিনী, রবিশঙ্কর যার এক বিশ্ব-বিশ্রুত অভিব্যক্তি। ছবিটি ইতিপূর্বে আমেরিকায় প্রদর্শিত হয়েছে এবং কান চিত্রোৎসবে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

আমার মনে হয় ছবিটি দুঃসাহস, কল্পনা, সহানুভূতি ও সৌন্দর্যবোধের এক অনন্য সমন্বয়। এতে একদিকে যেমন ভারতীয় শিল্প স্থাপত্য ও নৈসর্গিক দৃশ্যের জমকালো, মহিমান্বিত, পেলব, সূক্ষ্ম ও কোমল দিকগুলি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে অন্যদিকে তেমনি তার কঠিন কঠোর রুক্ষতা, বৈচিত্র্যহীনতাও বাদ পড়েনি। সেইভাবেই আমাদের সামাজিক জীবনের গরিমাময় মহত্ত্ব, ঐতিহ্য যেমনভাবে প্রতিভাত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তার কুসংস্কার দীনতা ও কুশ্রী নগ্নতাও অকুণ্ঠিত ঋজুতায় উদ্ঘাটিত। এ যেন বিবেকানন্দের পৌরুষ-গর্জন আরেকবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—আমাদের সভ্যতার যা কিছু মহৎ ও বৃহৎ তা নিয়ে ন্যায্যতই আমরা গর্ব ও গৌরব অনুভব করবো। কিন্তু অপর দিকে যা নীচ ও ক্ষুদ্র তাকে ধিকৃত ও ত্যজ্য করবার সাহস যেন না হারাই। অবশ্য প্রতিটি রীতি-নীতিরই একটা তাৎপর্য কিংবা আর্থিক ও সামাজিক ব্যুৎপত্তিগত কারণ আছে। এবং অনেক কিছুও আছে যা বর্তমানে পরিত্যক্ত হতে পারে, কিন্তু তার সম্পর্কে দীনতাবোধের দরকার নেই।

আসল কথা হল সহানুভূতি। হৃদয়ে সহানুভূতি জাগলে আমাদের নগরীগুলির পথে-ঘাটে লুঙ্গি-ল্যাঙোট, পাজামা, ট্রাউজার, কৌপীন-গামছা কিংবা শাড়ী, স্কার্ট আলখাল্লা যোরখা পরিহিত নর-নারীর বিচিত্র-বিশৃঙ্খল ভিড়কে কখনো কখনো নরনারায়ণের মিছিল বলেও মনে হতে পারে। ট্রাম-বাস, এক্কা-ফটফটে, ট্যাকসি, গরুর গাড়ীর শব্দ, খোল-করতাল, ঢাক-ঢোল, মাইক ও জগঝম্পের বিকট বাদ্য গঙ্গার জল তরঙ্গের ধ্বনির মত ছন্দিত ও মন্দ্রিত হয়ে ওঠে। কাশীর ঘাটের সারিবদ্ধ চিতার লেলিহান শিখার পান্ডুর আলোকে আরেক রহস্যময় জগৎ উদ্ঘাটিত হয়। নিঃসীম দারিদ্র্য ও একটা নিষ্করুণ সৌন্দর্য বিকশিত করে তোলে।

ছবিটির প্রায় প্রত্যেক পর্বে তার প্রধান অভিব্যক্তা রবিশংকর যেন একটি মগ্ন-বিষণ্ণ, শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন চিন্তায় আকুল : ভারতের দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তার ধ্রুপদী সংগীতের আবেদন ও তাৎপর্য কি অব্যাহত থাকবে? কালে কি তার অস্তিত্ব বিপন্ন হবার পর্যন্ত সম্ভাবনা নেই? তাই যদি হওয়া সম্ভব হয়, তা হলে পাশ্চাত্যে তার আবেদন কতটুকু? তার প্রভাব স্থায়ী হবার আশা কি অলীক? অর্থাৎ তা হলে কি পাশ্চাত্যে ভারতীয় সংগীতকে সমাদৃত ও সম্মানিত করার জন্যে তাঁর এত বছরের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে? মোগল যুগের সিংহবর্ণ পাথরের চত্বরে কিংবা ক্যালি-ফোর্ণিয়ার পর্বত প্রতিবিম্বিত নয়নাভিরাম সমুদ্রোপকূলে নিঃসঙ্গ পদচারণায় সময় সেই একটি চিন্তাই তাঁকে উন্মনা ও উদভ্রান্ত করেছে।

আমি নিজে মনে করি এবং রবি-শঙ্করকেও বলেছি যে তাঁর ঐ দুঃখ স্বপ্ন স্বাভাবিক হলেও বহুল পরিমাণে নিরর্থক। কারণ, সংস্কৃতির অন্যান্য সিদ্ধি, যেমন স্থাপত্য ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প কিংবা সাহিত্য, যদি কালের ও পরিবেশের পরিবর্তনে তার আবেদন হারিয়ে না ফেলে তবে সঙ্গীতই বা তা করবে কেন? বস্তুত, আজকের ঘনিষ্ঠতর পৃথিবীতে তো নানা জাতীয় সংস্কৃতির আবেদন ক্রমশই আন্তর্জাতিক হয়ে উঠছে।

ছবিটিতে অতীত প্রতিফলনে শিল্পীর জীবনের বহু গৌরবময় মুহূর্ত ঝলক দিয়ে উঠেছে। প্রারম্ভের দিকে তাই বালক শিল্পীকে আমরা দেখি প্যারিসে তাঁর দাদা উদয়শঙ্করের অবিস্মরণীয় নৃত্যদলে। দেখি সহস্র আমেরিকান তরুণের উদ্বেলিত অভিনন্দনের সামনে বীরের মত, দেখি লণ্ডনের ফেসটিভ্যাল হলে আলোড়ন উন্মত্ত দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণে। কখনো বিশ্ব-বিখ্যাত বেহালাবাদক ইহুদী মেনুহিনের সঙ্গে যুগল বাদ্যে, কখনো জর্জ হ্যারিসনের গুরু রূপে। তবু আদ্যন্ত ছবিটির এক মহান ভারতীয় শিল্পীর বিনম্র বিনয়ের হেম শিখায় উদ্ভাসিত। ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যখন তাঁকে তাঁর 'একক চেষ্টায় পাশ্চাত্যে ভারতীয় সংগীতকে জনপ্রিয় করে তোলার স্বীকৃতিতে ডকটরেট সম্মানে ভূষিত করলেন রবিশঙ্কর তখন তার উত্তরে বললেন যে 'সে সম্মান একজন দীন অভিব্যক্তকের মাধ্যমে মহান ভারতীয় সংগীত ঐতিহ্যের প্রতি।'— সেটা শুধু মুখের বাক্য নয়। সমগ্র ছবিটিতে শিল্পীর ঐ অন্তরের বিনয় তাঁকে আরো মহিমান্বিত করে তুলেছে।

ঐ বিনয়েরই আরেক অপরূপ বিকাশ দেখি তাঁর মহাগুরু আলাউদ্দীন খাঁর মধ্যে। মৈহারের সহজ সরল পরিবেশে গুরু-শিষ্যের মিলন দৃশ্যটি ছবিটির সবচেয়ে মর্মস্পর্শী ক্ষণ।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

সেই সঙ্গে পার্লে থেকে পাবেন আরো ৪টি সুস্বাদু বিস্কুট

PARLE CHEESLINGS

GOLD MEDAL WORLD SELECTION AWARD BRUSSELS
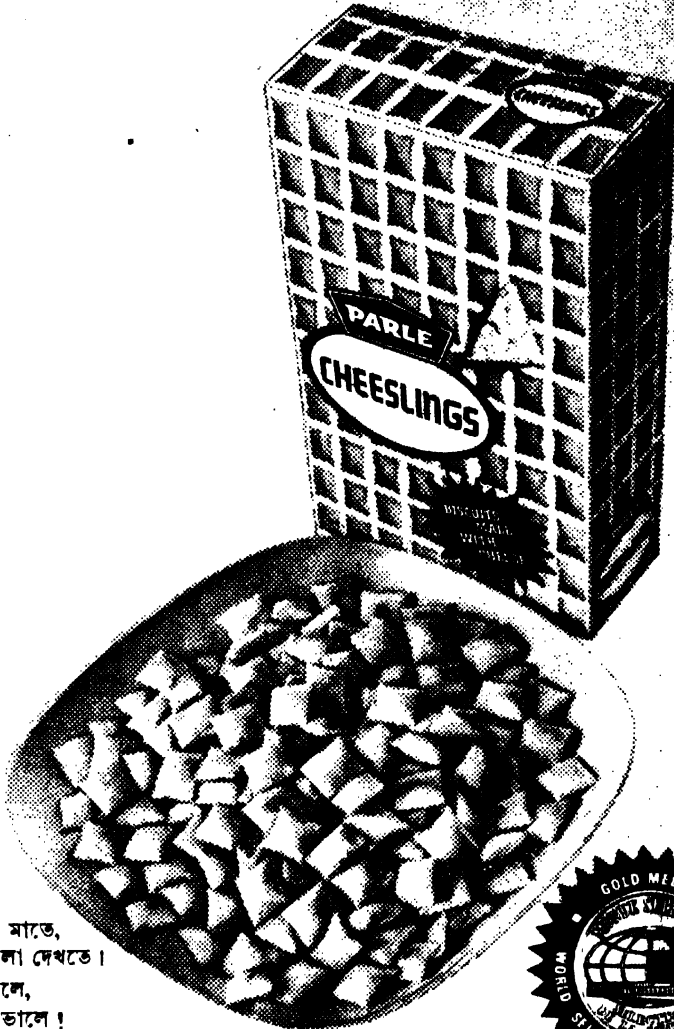
জেকস্—স্বাদগন্ধে মন মাতে,
একদম পাতলা দেখতে।
ওর্লে—খাস্তা মুখে দিলে,
মসলায় মন ভোলে!
কানিয়ান্—পেঁয়াজের স্বাদ তাজা,
খেয়ে দেখুন বড় মজা!
স্পিন-এচ্—মেথি দিয়ে তৈরী,
সকলেরই প্রিয় ভারী!
চীজলিং —খেয়ে তৃপ্তি, দিয়ে আনন্দ—
আসরেবাসরে খুশীর স্রোত!

পার্লে
আপনার জন্য ভারতে সেভারী
স্ন্যাকের সর্বপ্রথম নির্মাতা

everest/277d/PP-ben

ছোট্ট খুপরি জুড়ে। ডি. সি সেই ঘর-খানা দেখিয়ে দিয়ে দুম-দুম করে পা ফেলে চলে গেলেন।

আমরা ডি সির অভদ্র ব্যবহারে স্তম্ভিত বিমূঢ়। এতদিন কোথাও এমন ব্যবহার পাইনি। আমরা কি করব ঠিক করতে পারি না। বন্ধু ও আমি সব মাল-পত্র নিয়ে বারান্দায় বসে রইলাম। ডাঃ বিশ্বাস ১০১ ইউনিটে চলে গেলেন, যদি ওখানে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। না হলে, সঙ্গে আনা তাঁবু খুলে বাইরের মাঠে লাগাতে হবে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর বিফল মনোরথ হয়ে ডাঃ বিশ্বাস ফিরে এলেন। ১০১ ইউনিটের বড়কর্তা নেই, সেখানেও দেখেন ডি. সি বসে আছে। মহারাণীর কয়েকজন বিদেশী বন্ধু এসেছেন, তাদের জন্য পেট্রলের তদ্বির করতে এসেছেন। মেজকর্তা কোন ব্যবস্থা করতে পারবেন না জানালেন, হয়তো ডি সির ভয়েই। কিন্তু ওজুহাত দিলেন যে, তাঁদের ওখানে একজন ভি আই পি এসেছেন, তাই স্থান দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। ডাঃ বিশ্বাস অবশ্য সব বিস্তারিত জানালেন, বিশেষ করে ডেঃ চিফ সেক্রেটারী সঙ্গম দোর্জোর এবং ক্যাপ্টেন সি কে দত্ত যা করেছেন সব বললেন, তাতেও কোন ফল হল না। অবশ্য আগামীকাল মেইল ভ্যান বেলা একটার সময় রওনা হবে, তাতে আমাদের যাবার অনুমতি দেবেন বললেন। আমরা টংসা ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচি এখন।

ইতিমধ্যে বাঙালী ভদ্রলোকেরা আমাদের সঙ্গে এসে আলাপ করলেন, চা-ও খাওয়ালেন। তাদের দপ্তরকরা তাদের ঘর-গুলির একখানা খালি করে সেখানে আমাদের থাকবার জন্য অনুরোধ জানালেন। ডাঃ বিশ্বাস ফিরে এলে আমরা সেই ঘরেই রইলাম। ছোট্ট অন্ধকার খুপরিটাতে মাল-পত্র বোঝাই করে একপাশে রান্নার ব্যবস্থা হল। বেশ শীত এখানে, এখানকার উচ্চতা ৭,৫০০ ফুট।

মনটা খিচড়ে রইল। এতদিন সর্বত্র ভাল ব্যবহার পেয়েই এসেছি। এই বিদেশে এমন খারাপ ব্যবহার পাব, এ যেন কল্পনার অতীত। বাঙালী ভদ্রলোকেরা কিন্তু এই বিপদে আমাদের অসুবিধা দূর করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদেরই বা শক্তি কোথায়? তাঁরা বলেন, তাঁরাও গভর্ণমেন্টের কাজেই বেরিয়েছেন, কিন্তু এখানে সাতদিন ধরে বসে আছেন ঘোড়ার জন্য। ওঁরা যাবেন উত্তরে বুমথাং-এর দিকে। সেখানে যেতে তিনদিন লাগবে, অনেকটা চড়াই উঠতে হবে, মালপত্র বইবার ঘোড়াও চাই। কিন্তু অনেক খোঁজ করেও ঘোড়া সংগ্রহ হচ্ছে না। আগামীকাল কয়েকটা ঘোড়া পাবেন, এই ভরসা দিয়েছেন ডি. সি।

বললেন, চলুন, আমাদের সঙ্গে বাজারের এর দিকে। ওদিকের দৃশ্য চমৎকার। কিন্তু আমাদের হাতে সময় কম, তাই লোভ সামলাতে হল।

পরদিন সকালে রান্না করছি, এমন সময় ডি সি হাজির। ভয়ে ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি, না জানি আবার কি হল। কিন্তু এবার ডি. সি মূর্তি বদলেছেন। বারবার ক্ষমা চাইলেন, বললেন, আমি বুঝিনি সঙ্গম দোর্জোরের সই আছে, আমি তো ইংরাজী জানি না। আমায় মাফ করো। আমি এগারোটার সময় তোমাদের জন্য কুলি পাঠিয়ে দেব, তারা মাল নিয়ে ১০১ ইউনিটে পৌঁছে দেবে, কিছু ভেবো না। তোমরা তৈরী হয়ে একটার আগেই চলে যেও। আমি ১০১ ইউনিটের ও-সিকেও বলে রেখেছি।

ঘরে ডাঃ বিশ্বাস নেই, তিনি নীচের ঝরণাতে স্নান করছেন, তাই আমি আর বন্ধু ভালমন্দ কোন কথা বলতেই আর সাহস করি না। এই আচমকা ভালমানুষীর অন্তরালে অন্য কোন ভাব আছে কিনা বুঝতে পারি না। ডি. সি এখানকার সর্বময় কর্তা, তাঁর বিনানুমতিতে আমরা ফেরৎ যাবার গাড়ী নাও পেতে পারি। সুতরাং বুদ্ধিমানের মত চুপচাপ থাকাই শ্রেয়।

সকাল বেলাতেই বাঙালী ভদ্রলোকেরা বলেছেন, তাঁরা তৈরী হয়ে নিয়েছেন, আজ ঘোড়া পাওয়া যাবে, তাঁরা আজ সকালেই চলে যাবেন। তাঁরা সকলেই খুশী তাই সকাল থেকেই তাদের ব্যস্তসমস্ত ভাবে গোছগাছ করছেন। আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে নিলেন সবাই। পথে দরকার হতে পারে বলে আমাদের কিছু আলু ও টাটকা তরকারী দিলেন। বললেন, আমাদের তো আর বেশী দরকার হবে না, কাল আর পরশু, তার পরের দিন তো পৌঁছেই যাব।

বেলা দশটার মধ্যে রান্নাবান্না সেরে তৈরী হয়ে নিয়ে জঙ্গ দেখতে বেরলাম। আমাদের ঘরের পাশেই অনেকগুলি পাথরের সিঁড়ি আছে, সেগুলি ধরে উঠে গেলেই জঙ্গ-এর একটা দরজাতে পৌঁছানো যায়। সেই পথেই আমরা ভিতরে ঢুকলাম। সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে গেলে আরও অনেক ঘুরতে হবে।

টংসা একটি ছোট সহর। একটি মাঝারি আকারের দুর্গ ও তার বাইরে একদিকে পাহাড়ের গায়ে গুটিকয়েক ঘর, সেখানেই বাজার, এই নিয়েই মোটামুটি সহরটা গড়ে উঠেছে। দূরে দূরে অবশ্য কতকগুলি গ্রাম দেখা যায়, কয়েকটা গ্রাম এখানে আসবার সময় পথে পড়েছে। একটা তিব্বতী উদ্বাস্তুদের বাড়ী আছে, সেই নতুন তৈরী গোলাকার বাড়ীটি পাহাড়ের গায়ে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। তাছাড়া এদিক ওদিকে ভারতীয় মিলিটারীদের ব্যারাক ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই।

কিন্তু ছোট হলেও ভুটানের ইতিহাসে টংসা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। যার ফলে ক্রমান্বয়ে ভারতবর্ষ বৃটিশের সঙ্গে ভুটানের বিবাদ ঘনীভূত হয়ে পরে যোগাযোগ বেশী হয়। টংসার অবস্থিতিও গুরুত্বপূর্ণ। ভুটানের পূর্ব ও পশ্চিমের প্রধান সহরগুলির মধ্যে যোগাযোগের প্রধান সড়ক এই জঙ্গের মধ্য দিয়েই গেছে।

প্রাচীন ভুটানের পর্বতাঞ্চলের দক্ষিণে একখন্ড সমতল ভূখন্ড ছিল। এটি বাইশ মাইল চওড়া ও আড়াইশো মাইল লম্বা— পশ্চিমে তিস্তা নদী অর্থাৎ দার্জিলিং-এর সীমান্ত থেকে পূর্বে-আসামের ধনসিরি নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সমৃদ্ধ-শালী ভূখন্ডের নাম ছিল ভুটান-ডুয়ার্স বা দুয়ার। ভুটানের পাহাড় থেকে আঠারোটি গিরিপথে এই অঞ্চলে পৌঁছানো যেত। প্রত্যেকটি দুয়ার বা গিরিপথ এবং তৎসংলগ্ন ভূখন্ড এক একজন জঙ্গপেনের (জঙ্গের শাসক) অধীনে ছিল। এই পুরো অঞ্চলটি আঠারো দুয়ার নামে পরিচিত ছিল।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এই দুয়ার অঞ্চলে সীমান্ত বিরোধ প্রায় লেগেই থাকত। ভুটানীরা যখন তখন পাহাড় থেকে নেমে এসে কুচবিহার ও রংপুরের বাসিন্দাদের উপর হামলা চালাত, লুটপাট করত। এই অশান্তির একটা মীমাংসা করবার জন্য ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ইডেনকে পাঠানো হয়। ইডেন দার্জিলিং থেকে একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে পুনাখার দিকে রওনা হন। কিন্তু তাকে বারবার বাধা দেওয়া হয়, অসুবিধার মধ্যে ফেলা হয়। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে ইডেন শেষে পুনাখা পৌঁছলেন। তাঁর সঙ্গে এখানে ভুটান দরবার খারাপ ব্যবহার করে এবং জোর করে একটা সন্ধিপত্রে সই করিয়ে নিলো। প্রাণভয়ে ইডেন রাতারাতি সই করেই পালিয়ে চলে আসেন, সেখান থেকে কলকাতায় ফিরলেন।

এই বাধা দেবার কাজ, শোনা যায়, টংসা পেনলোপের শাসনকালে নির্দেশেই করা হয়েছিল। এর আগে ইংরেজেরা কয়েকটি আসাম দুয়ার দখল করে নিয়েছিল, সেগুলি এরই অধিকৃত অঞ্চল ছিল। সম্ভবতঃ এগুলি ফিরে পাবার আশাতেই তিনি আলোচনা চালাতে বাধা দেন।

এর ফলে এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হল, যার ফলে সুরু হল ভুটান যুদ্ধ এবং পরিণামে হল সিনচুলা সন্ধি।

যুদ্ধে হেরে ভুটান এই সন্ধি করতে বাধ্য হয়। সমস্ত ডুয়ার্স অঞ্চল ও কিছু কিছু পার্বত্য ঘাঁটি, যেগুলি ভুটানে ঢুকবার গিরিপথগুলি রক্ষা করত, ইংরেজরা শান্তির খাতিরে সে সব দখল করে নিলো। আম-বাড়ী-ফালাকাটাসহ সমস্ত আঠারো দুয়ার তাদের অধিকারে চলে এল। পরিবর্তে ইংরাজেরা বার্ষিক ৫০,০০০ অনুর্দ্ধ হাজার টাকা কর দেবে কথা হল। ভুটানীর কথা ছিল, তারা ভবিষ্যতে আর হামলা করবে না, হামলা হলে হামলাকারীকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেবে, ভারতের সঙ্গে অবাধ ব্যবসা বাণিজ্য চলবে ইত্যাদি। বিরাট এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন। এই অঞ্চলেই এখন উত্তর বাংলার অধিকাংশ চা-বাগিচাগুলি অবস্থিত, অর্থাৎ ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার একটা মোটা অংশ এই অঞ্চলের দৌলতে আসে।

পরবর্তী টংগসা পেনলোপ ছিলেন এরই পুত্র, উগ্যুয়েন ওয়াংচুক। তিনি বৃটিশের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন ছিলেন। তিব্বতে একটি বৃটিশ মিশনের সঙ্গে গিয়ে তিনি সুষ্ঠুভাবে নিজ কর্তব্য সম্পন্ন করেন। সেই জন্য ১৯০৫ সালে ভারতস্থ বৃটিশেরা তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। পর বৎসর স্যর উগ্যুয়েন ওয়াংচুক সমগ্র ভুটানের লামাগণ, নেতৃবর্গ ও জনসাধারণ কর্তৃক প্রধান বলে মনোনীত হন। ইনি হলেন ভুটানের প্রথম বংশানুক্রমিক মহারাজা।

বর্তমান মহারাজা দ্রুক গিয়ালপো জিগমি দোর্জি ওয়াংচুক হলেন এরই পৌত্র। ইনি প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন, তাই তিনি ভুটানকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে নিয়ে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। এ জন্য ভারতের সহায়তায় দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভুটানের শিক্ষা, হাইড্রো-ইলেকট্রিক, চাষবাস, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি করে চলেছেন। অল্প কিছুদিন আগে ভুটান ইউ এন ওর সদস্যও মনোনীত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করে ভারত প্রথম, দ্বিতীয় ভুটান।

এই সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ জংটির অনেকাংশ ভেংগে গেছে, কিঞ্চিৎ মেরামতের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অন্যান্য জংগগুলির মতই এটি একই ধরণে তৈরী করা কয়েকটি চতুষ্কোণ উঠান ঘিরে জংগের দালান তৈরী করা হয়েছে। অনেকগুলি মস্ত মস্ত উপাসনা গৃহ আছে, আর আছে লামাদের জন্য অগণ্য বাসগৃহ। আমরা ভিতরে ঢুকতেই দলে দলে লামারা এসে আমাদের ঘিরে ধরল। কিন্তু তাদের সংগে কথা বলা সম্ভব নয়। আমরা নিজেরাই তাই ঘুরে ঘুরে দেখবার চেষ্টা করি। এখানেও আবার ডি সির সঙ্গে দেখা। এবার তিনি ডাঃ বিশ্বাসের কাছে বারবার

কিচুং-বিহারের দৃশ্য (মাঝখানে অমিতাভ, দুদিকে গুরু সাংদুং ও গুরু পদ্মসম্ভব)

ক্ষমা চাইলেন। মনে হল, হয়তো কথাগুলি তাঁর সত্যিই আন্তরিক।

উঠানে চ্যাটাই পেতে রোদে মাংসের টুকরো শুকোনো হচ্ছে। মাংসগুলির উপর লক্ষ লক্ষ মাছি বসে কালো করে রেখেছে। মাংসের দুর্গন্ধে টেঁকা দায়। সবগুলি উঠানেই একই দৃশ্য। কিন্তু কোন উপাসনা গৃহেই ঢুকতে পারলাম না, সবগুলি ঘরই তালা বন্ধ। ডি, সি চাবি এনে একটা ঘরে নিয়ে যেতে বলেন লামাদের। অন্যান্য জংগ-এর মতই মই-এর মত করে তৈরী কাঠের সিঁড়ি এখানে। উপরে উঠে প্রথম ঘরখানাতে দেখি, সমস্ত দেয়াল জুড়ে উজ্জ্বল রং-এ আঁকা ফ্রেসকো পেন্টিং আর ঘরের শেষ প্রান্তে বেদীর উপর প্রকান্ড সুবর্ণময় মূর্তি, মনে হয় যেন নৃসিংহ মূর্তি। অনেকগুলি মাথা, আঠারোটা হাত, চারটে পা। দুই পাশে খোপে খোপে আরও কয়েকটা সুবর্ণমূর্তি সাজানো। এগুলির সবগুলিই সম্ভোগরত মিথুন মূর্তি। লামারা বড় মূর্তিটিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখাল—'ব্যাটা। বেটি।' ভাল করে দেখি সেটিও মিথুন মূর্তি।

আমরা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। একি দৃশ্য এখানে? এই মূর্তিরই কি পুজো হচ্ছে? লামাদের জিজ্ঞাসা করতে পারি না, কাজেই এই বীভৎস মূর্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যও বুঝতে পারি না, কেন এমন পবিত্র স্থানে এমন কুৎসিৎ মূর্তি এনে স্থাপন করা হয়েছে।

বন্ধু এ ঘর ছেড়ে পাশের ঘরে চলে গেছে। এবার এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল। বলে, ওখানে ভাল জিনিস দেখবার আছে। পাশের ঘরে গিয়ে দেখি, প্রথমটির মত বেদীর উপর বিরাট সুবর্ণময় বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত। আরও উজ্জ্বল আরও সুন্দর। ঘরের সাজসজ্জাও উজ্জ্বল, দেয়ালের ফ্রেসকো অপূর্ব সুন্দর করে আঁকা। ঘরটি সুগন্ধে পরিপূর্ণ। পুজার পবিত্র আবহাওয়া ঘরটিতে বিরাজিত।

চমকে উঠে ভাবি, এই বুঝি নিয়ম। পার্থিব ভোগসম্ভোগের কামনা বাসনা আগে পরিত্যাগ করে তবে প্রভু অমিতাভের পদতলে স্থান নিতে হবে। যে তা পারে না, সে সংসারের ভোগসুখেই মত্ত হয়ে থাকে। ভগবান বুদ্ধের নিকট পেঁছিবার আর উপায় থাকে না তার। তারই ইংগিত বুঝি ওই ঘর দুটি বহন করেছে। আরও কয়েকটা উপাসনা গৃহে গুরু পদ্মসম্ভবের মূর্তি স্থাপিত রয়েছে।

ডি সি আজ আমাদের সঙ্গে সংগেই আছেন, তবে ঘরে ঢোকেন নি তিনি। সত্যি বুঝি তাঁর অনুশোচনা হয়েছে। তিনি না দেখালে এখানে কিছুই আমাদের দেখা হত না। (আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

ভুটানী কারুকার্য ও দীপ দেওয়াল

বিজ্ঞানের কথা

- অ্যাপোলো-১৫ অভিযানের সাক্ষ্য থেকে চাঁদের বয়স
- জীবন ও মৃত্যুর প্রতীক
- ভিয়েতনামে আগুন লাগিয়ে জংগল সাফ করার পরিকল্পনা ব্যর্থ

অ্যাপোলো-১৫ অভিযানের তারিখ ছিল ২৬শে জুলাই থেকে ৭ই আগস্ট ১৯৭১। এটি ছিল মার্কিন নভশ্চরদের চতুর্থবার চাঁদের মাটিতে পদার্পণ। এই অভিযানেই প্রথম ব্যাটারি-চালিত রোভার গাড়ি চাঁদের মাটিতে চালানো হয়। এই অভিযানে চাঁদ থেকে ৭৭ কিলোগ্রাম মাটি ও পাথর পৃথিবীতে নিয়ে আসা হয়েছে।

এই মাটি ও পাথরের বিভিন্ন নমুনার প্রাথমিক বিশ্লেষণের ফলাফল জানা গিয়েছে।

একটি নমুনার নম্বর ১৫৫৫৫, এটি হচ্ছে ব্যাসল্ট—হ্যাডলি রিল এলাকার শেষ লাভাপ্রবাহের নিদর্শন। কাজেই এই নমুনাটির বয়স থেকে চাঁদের এই লাভা-প্রবাহের বয়সের সীমা সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে। চারটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে রেডিও-আইসোটোপ বয়সের মাপ নিয়ে বয়স নির্ধারিত হয়েছে প্রায় ৩৩০ কোটি বছর। বয়সের এই মাপটির গুরুত্ব যে কতখানি তা বোঝা যায় অ্যাপোলো-১৪ অভিযানে সংগৃহীত নমুনার বয়সের সংগে তুলনা করলে। শেষোক্ত নমুনার বয়সের চেয়ে অ্যাপোলো-১৫ অভিযানের নমুনার বয়স ৫০ কোটি বছর কম। অ্যাপোলো-১৪ অভিযানের নমুনা সংগৃহীত হয়েছিল ফ্রা মরো এলাকা থেকে। সেটিও ছিল একটি বেসিন—ইম্ব্রিয়াম। এই দুই এলাকার নমুনার বয়সের তুলনামূলক বিচার থেকে ধারণা করতে হয় যে নমুনাদুটির উদ্ভব চাঁদের আগ্নেয় কোনো তৎপরতা থেকে। অন্য যে ধারণাটি প্রচলিত আছে—চন্দ্রপৃষ্ঠে উল্কা ইত্যাদি পতনের ফলে চাঁদের গহ্বর সৃষ্টি এবং এই সংঘাত-জনিত উত্তাপের গলিত চন্দ্রাংশই লাভা—অতঃপর এটি আর টিকে থাকতে পারে বলে মনে হয় না।

ভিন্ন উপায়ের একটি মাপ থেকে জানা গিয়েছে (ক্রিপটন ও আর্গন আইসোটোপের মাপ) যে এই নমুনাটি চাঁদের উপরিতলে খোলা জায়গায় থেকেছে প্রায় ১ কোটি বছর। এ থেকে হ্যাডলি রিল এলাকার কাছে চাঁদের মাটির 'রূপপরিবর্তন' সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি।

দ্বিতীয় নমুনাটির নম্বর ১৫৪১৫, এটি হচ্ছে ফেল্ডস্পার শিলা—আপেনাইন পর্বত থেকে সংগৃহীত। এই নমুনায় তেজস্ক্রিয় পদার্থের মাত্রা সামান্য, কিন্তু যতটুকু আছে তা থেকেই বয়স নির্ধারিত হয়েছে ৪০৯ কোটি বছর। এ থেকে এই প্রচলিত তত্ত্বেরই সমর্থন পাওয়া যায় যে চাঁদের ইতিহাসের গোড়ার পর্বে বিশেষ একটি প্রক্রিয়ার ফলে প্রচুর পরিমাণে ফেলসপার-সমৃদ্ধ শিলা তৈরি হয়েছিল। এই শিলা ব্যাসল্টের চেয়ে হালকা হওয়ায় দ্রুত উপরিতলের দিকে উঠে এসেছে এবং গহ্বর তৈরি হওয়ায় সংঘর্ষের সময়ে পর্বত তৈরি হয়েছে। অতএব আশা করা যেতে পারে যে চাঁদের উচ্চভূমিতে এই বিশেষ জাতীয় শিলারই প্রাধান্য। ব্যাপারটা যে তাই তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে চাঁদের কক্ষে পরিক্রমারত কম্যান্ড মডিউলের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে।

দ্বিতীয় নমুনার বয়সের মাপ অন্য উপায়েও নির্ধারিত হতে পারে। যদি দেখা যায় যে বয়সের মাপ বজায় থাকছে তাহলে ভেবে নিতে হয় যে প্রাথমিক চান্দ্র ত্বকটি গড়ে উঠেছে চাঁদের ইতিহাসের প্রথম ৩০ থেকে ৪০ কোটি বছরের মধ্যে। গহ্বরের শিলার বয়স অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিচের দিকে ৩২০ কোটি ও ওপরের দিকে ৩৮০ কোটি বছর। অন্যদিকে ফেলসপার শিলার বা উচ্চভূমির শিলার বয়স ৪১০ কোটি বছর। এ থেকে ধরে নিতে হয় যে ফেলসপার-এর পরে, একটি ত্বক তৈরি হবার জন্যে ৪০ বা ৫০ কোটি বছর সময় লেগে গিয়েছিল; চাঁদের গহ্বরের (মারিয়া) সৃষ্টি তারপরে, সংঘর্ষের ফলে এই ত্বকটি ফুটো হয়ে যাবার ফলে।

জীবন ও মৃত্যুর প্রতীক

স্বনামখ্যাত জে জি ক্রাউথার এই শিরোনামায় একটি ভাবনা উপস্থিত করেছেন, যেটি আমিও সংক্ষেপে উপস্থিত করতে চাই।

রুশ বিপ্লবের ফলে মুক্তি পেয়েছিল বিপুল এক সৃজনমূলক শক্তি। কুড়ির দশকে শুরু হয়েছিল শিল্পায়নের ভিত্তিতে নতুন এক সমাজ গড়ে তোলার কাজ। তৎকালীন রুশ শিল্পীরা এই চেতনাকে প্রকাশ করেছিলেন কবিতায়, চিত্রে ও নাটকে।
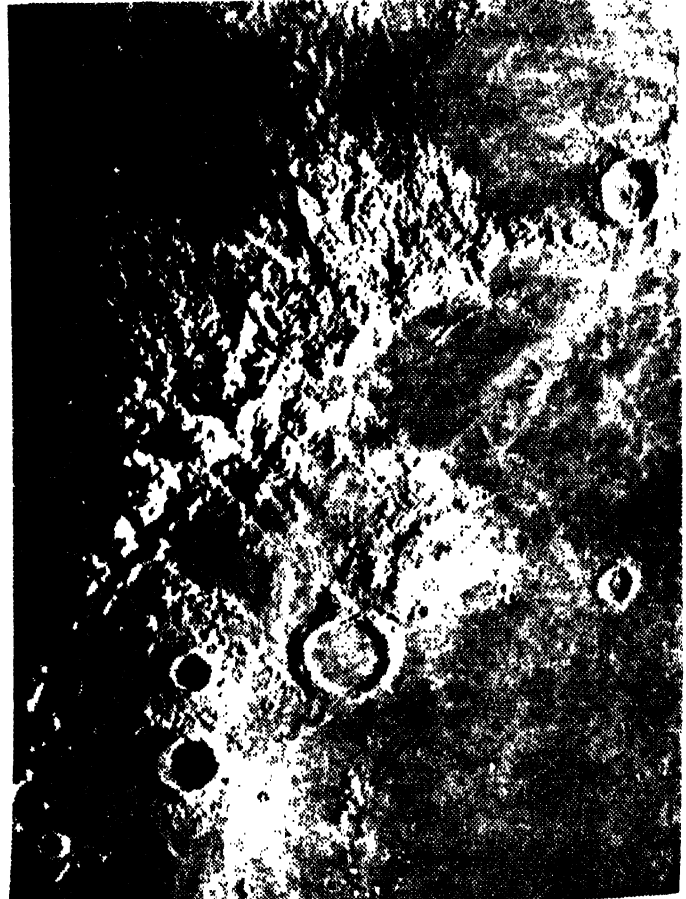
চন্দ্রপৃষ্ঠের পর্বতমালা—আপেনাইন। পাশেই মেয়ার ইম্ব্রিয়াম। এই পর্বতমালা প্রায় ৮০০ কিলো মিটার দীর্ঘ।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্য নিয়ে মায়াকভস্কি কবিতা রচনা করেছিলেন। নতুন শিল্পোন্নত এলাকা সৃষ্টি করা নিয়ে বীরত্বপূর্ণ নাটক প্রযোজনা করেছিলেন মেয়ারহোলড। মায়াকভস্কি তাঁর কবিতার সংগে চিত্র জুড়ে দিতেন যাতে দেখানো হত কারখানা থেকে কুণ্ডলী প্যাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। মেয়ারহোলড মঞ্চের দৃশ্যসজ্জা রচনা করতেন সারি সারি প্রকাণ্ড চিমনি বসিয়ে আর সেই চিমনি থেকে নির্গত ধোঁয়া বিজয়ের সংকেত জানাত। তাঁদের কাছে ধোঁয়া ছিল জীবনের প্রতীক, সৃজনমূলক প্রয়াসের নিদর্শন, যা মানবসমাজকে মুক্তি দেবে অমানবিক অবস্থা থেকে। ধোঁয়া যতো উচ্ছ্বসিত, জাগতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মানুষের জয়লাভও ততো সার্থকতামণ্ডিত।

আজকের দিনে ধোঁয়া হয়ে উঠেছে অপচয়ের প্রতীক, রোগ অমনোযোগ লোভ ও ধ্বংসের প্রতীক। যেখানেই ধোঁয়া নির্গত হয়, বুঝতে হবে চুল্লী বা ইঞ্জিন বা চিমনি বা নিঃসরণ-নলের ডিজাইন ও ব্যবহার ত্রুটিপূর্ণ। বুঝতে হবে এই চুল্লী বা ইঞ্জিন বা চিমনি বা নিঃসরণ-নলের মালিকদের ভাবনাচিন্তা যতোটা-না মানবিক চেতনার মুক্তি নিয়ে তার চেয়ে বেশি মুনাফা বা নীচতা নিয়ে।

ছবির দিক থেকে যদি ভাবতে হয়, ধোঁয়ার এখন চেষ্টা নিজের অস্তিত্ব গোপন করার, আঁকাবাঁকা ক্রমবিলীয়মান ভুজঙ্গের আকার ধারণ করে নির্লজ্জের মতো পরিত্রাণ পাওয়ার, কিংবা স্বচ্ছ রংহীন গ্যাসরূপে বিলীন হওয়ার। পঞ্চাশ বছর আগেও যা ছিল জীবনের প্রতীক, এখন তা মৃত্যুর। তার মানে এই নয় যে পূর্ববর্তীদের চেয়ে আমাদের অবস্থা আরো ভালো, কিংবা সামাজিক পরিস্থিতি বদলেছে। গোড়ায় শিল্পায়ণ উদ্ভাবিত হয়েছিল মুনাফা বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্যে। তা সত্ত্বেও তা নিয়ে গিয়েছিল একটা পরিণতির দিকে, শিল্পায়ণের অতি-বড়ো সমর্থকরাও যা আগে থেকে কল্পনা করতে পারেনি। এই পরিণতি উচ্চতর এক সমাজব্যবস্থার। দেখা গেল শিল্পায়ণ এমন উপায়ের সন্ধান দিচ্ছে যার সাহায্যে প্রাচীন স্থাবির অতীতের বন্ধনকে চূর্ণ করা চলে। গোড়ার পর্বে শিল্পায়ণ ছিল প্রগতিশীল, লাভজনকও বটে। সুতরাং তার আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকেও যদি প্রগতির প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়, সেটা অসংগত ব্যাপার হয় না। সে সময়ে বৈপ্লবিক শক্তি মারাত্মক অশুভের চেয়ে অনেক বেশি ভারী ছিল। কিন্তু শিল্পায়ন ব্যাপকভাবে উন্নত হয়ে উঠতে প্রশ্ন দেখা দিল—এই নতুন ব্যবস্থা ব্যবহার করা হবে শুধু মুনাফা বাড়িয়ে তোলার জন্যে, না, সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্যে?

আঠারো শতকে শিল্পোন্নতির কুফল সামাজিক দিক থেকে শিল্পায়ণের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শিল্পায়ণ মানেই ছিল সামাজিক পরিবর্তনের নতুন এক মানসিক প্রস্তুতির সৃষ্টি। পরিবর্তনের সম্ভাবনা

ভূপৃষ্ঠের পর্বতমালা—হিমালয় ১৬০ কিলোমিটার ওপর থেকে তোলা ছবি।
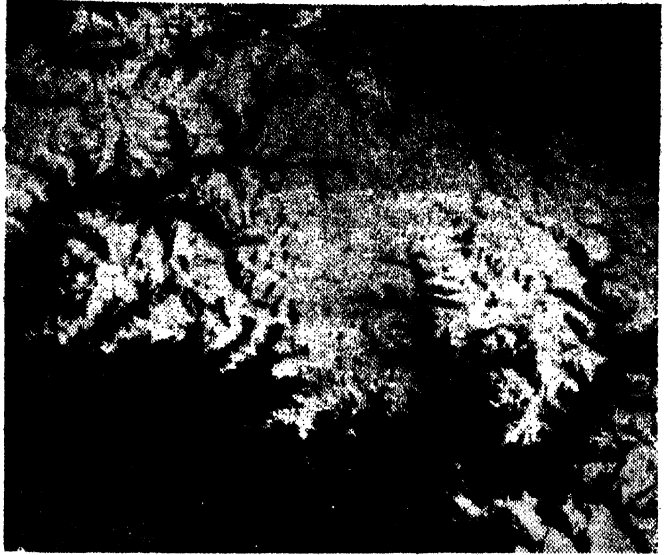
সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হয়েছিল সমাজকে। আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু করে জনসংখ্যা অভূতপূর্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারই মধ্যে দিয়ে শিল্প-বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল এমন এক ধীগত পরিবেশ যেখানে সম্ভব হয়েছিল বিবর্তন-তত্ত্বের সার্থক ধারণা। এ থেকেই ডারউইনের জন্ম, ওয়াট-এরও। এই বিপুল সামাজিক ও মতাদর্শগত অবদানের মধ্যে নিরর্থক ফলগুলো চোখে পড়তেই চায়নি, বরং ব্যবহৃত হয়েছিল প্রগতির প্রতীক হিসেবে। কিন্তু শিল্পোন্নতি যতোই অগ্রসর হতে থাকে ততোই তার নিরর্থক ফলগুলো গোড়ার সদর্থক সৃজনমূলক অবদানগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানাতে শুরু করে—কি আকারে, কি প্রভাবে। তখন সেগুলো পরিবর্তিত হয় মৃত্যুর ধারকচিহ্নে।

আজকের দিনের মুখ্য সমস্যা শিল্পোন্নতির উদ্ভাবন নয়, যা মানবসমাজকে স্থবির সামাজিক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে সাহায্য করবে। আজকের দিনের মুখ্য সমস্যা—বাধাবন্ধহীনভাবে সম্প্রসারমান শিল্পোন্নতিকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসা।

মানবমন
(বিশেষ ছাত্র-যুব সংখ্যা)

মনোবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক ধারা পরিচায়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা মানবমন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে ও উত্তরোত্তর শ্রীসম্পন্ন হচ্ছে এটা নিশ্চয়ই আনন্দের খবর। বর্তমান সংখ্যাটি (একাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭২) প্রকাশিত হয়েছে বিশেষ ছাত্র-যুব সংখ্যা হিসেবে। বলা বাহুল্য মানবমন পত্রিকায় ঐতিহ্যগত উচ্চমান এই বিশেষ সংখ্যাতেও বজায় আছে।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে বলছেন, 'বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি গত কুড়ি বছরে আমাদের অধিকাংশ প্রচলিত ধ্যানধারণার মূলোচ্ছেদ করেছে। স্থানকালের ধারণা পালটেছে, ইলেকট্রনিক কম্পিউটার চিন্তার রাজ্যে বিপ্লব এনেছে। আণবিক জীববিজ্ঞানের বৈপ্লবিক আবিষ্কার: বংশগতি—ডি এন এ, আর এন এ সম্পর্কিত নতুন জ্ঞান, ল্যাবরেটরিতে প্রাণকোষ তৈরির সম্ভাবনা, ইত্যাদি ভ্রূণের পরিবর্তন-সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছে। মহাশূন্যে ও সমুদ্রতলে অভিযান জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও খাদ্যাভাব সমস্যার সমাধান করতে পারবে, অনেকে মনে করছেন। আমরা বয়স্করা আজ ধ্বংসায়ুধ বাড়িয়ে চলেছি, উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে সংগে আকাশ সমুদ্রকে কলুষিত করছি, যে পরিমাণে উর্বর জমির প্রাণরস নিংড়ে নিচ্ছি, সেই পরিমাণে নতুন অনুর্বর জমিকে প্রাণ দিতে পারছি না, নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সকলের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলোর মীমাংসার আন্তরিক চেষ্টা করছি না। ছাত্র-তরুণের বিক্ষোভ কি ইঙ্গিত বহন করছে যে আমরা নতুন পৃথিবীর নতুন সমস্যা সমাধানে অক্ষম? অনুমানিক জগতের জটিল বহুমাত্রিক প্রশ্নের উত্তর আমাদের, জ্যেষ্ঠদের, জানা প্রচলিত পথে পাওয়া যাবে না। ছাত্র-তরুণ এক সমাজরথের রশি ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে, ওদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ভার ওদের হাতে তুলে দিয়ে আমাদের সসম্মানে বাণপ্রস্থে যাবার নির্দেশ জানাচ্ছে? আগামী দিনের ছবি হয়তো আমাদের দূরকল্পনারও বাইরে।'

আর শ্যামল চক্রবর্তী তাঁর প্রবন্ধ শেষ করেছেন এই প্রশ্নে 'সমাজকে বদলাবার জন্য নিজেদেরও বদলাবার কাজে লাগাতে পারবো তো?'

চন্দ্রপৃষ্ঠের ছবি। এটি নেওয়া হয়েছে চন্দ্রকক্ষে পরিক্রমারত একটি ব্যোমযান থেকে, ১৯৬৬ খৃঃ ২৪ নভেম্বর তারিখে। ছবিটি কোপার্নিকাস গহ্বরের। চন্দ্রপৃষ্ঠের চেহারা কেমন তার একটি ধারণা এই ছবি থেকে পাওয়া যেতে পারে।
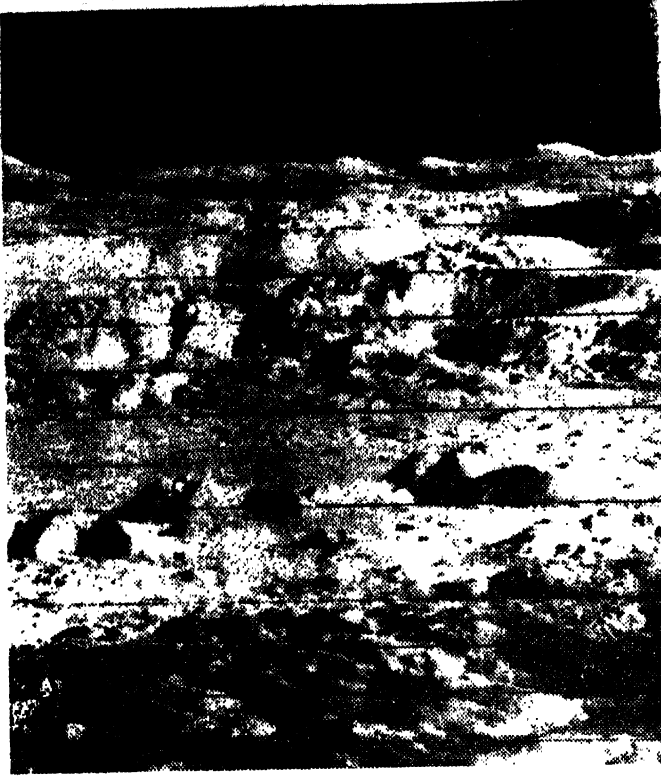
আজকের দিনের সবচেয়ে জ্বলন্ত সমস্যার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ যাঁরা জানতে চান, এই সংখ্যাটি পড়লে তাঁরা উপকৃত হবেন।

ভিয়েতনামে আগুন লাগিয়ে জঙ্গল সাফ করার মার্কিনী পরিকল্পনা ব্যর্থ

ভিয়েতনামের জঙ্গল নিষ্পত্র করবার জন্যে মার্কিনীরা রাসায়নিক প্রয়োগ করছে, এটা পুরনো খবর। বিজ্ঞানের কথার পাঠকরা এ-খবর জানেন। গত ৩রা আগস্ট তারিখের 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকায় এ-সম্পর্কে আরো কিছু খবর বেরিয়েছে, সেটুকুও জানাতে চাই। বিশেষ করে আরো এ-কারণে যে এবারে মার্কিনী সর্বনাশা পরিকল্পনার ব্যর্থতার খবর এসেছে।

ভিয়েতনামের জঙ্গল এত ঘন যে শুধু রাসায়নিক প্রয়োগ করে ভিয়েতনামের জঙ্গলকে পুরোপুরি নিষ্পত্র করা যায় নি। মার্কিনী সমরকর্তারা তাই সব সময়েই ভিয়েতনামের জঙ্গলকে পুরোপুরি নিকেশ করে দেবার জন্যে অন্য কোনো পদ্ধতির সন্ধানে ছিল। সম্প্রতি জানা গিয়েছে মার্কিনী সমরকর্তারা ভিয়েতনামের গোটা জঙ্গল পুড়িয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছিল।

ভিয়েতনামের জঙ্গলের গাছগুলো থাকে-থাকে প্রায় একশো ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। রাসায়নিক প্রয়োগ করে নিষ্পত্র করা যায় শুধু ওপরের থাকটিকে। নিষ্পত্র হয়ে যাবার পরে শুকিয়ে যেতেও বিশেষ সময় লাগে না। আর এটাই হয়ে দাঁড়ায় সুযোগ। এই শুকনো ডালগুলোতে কোনো রকমে যদি আগুন ধরিয়ে দেওয়া যায় তাহলেই তো মার্কিন সমরকর্তাদের মতলব হাসিল হতে পারে। অর্থাৎ, জঙ্গলের ঘন পাতার আড়াল আর থাকে না, মার্কিন বিমান থেকে খুব সহজেই শত্রুর সন্ধান করা চলবে।

আগুন লাগিয়ে জঙ্গলকে জঙ্গল সাফ করার এই পরিকল্পনায় মার্কিনী সমরকর্তারা অন্তত একটি ক্ষেত্রে সফল হয়েছিল। সেই জঙ্গলটি ছিল উ মিন ডার্ক ফরেস্ট, ১৫৫০ বর্গমাইল আয়তনের। এই বিরাট জঙ্গলকে নিষ্পত্র করার চেষ্টায় বিরাম ছিল না, তবুও নিষ্পত্র করা যায় নি। তখন আগুন লাগানো হয়েছিল। পাঁচ সপ্তাহের আগুনে জঙ্গল পুড়ে ছাই। মার্কিনী সমরকর্তাদের কাছে এই সাফল্য অবশ্যই চমকপ্রদ মনে হয়েছে। কেননা তার আগে তিন বছর ধরে জঙ্গলে আগুন লাগাবার অনেক চেষ্টা হয়েছিল, একটিও সফল হয় নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অরণ্য বিভাগের ক্রেইগ শাণ্ডলার ছিলেন সে সময়ে ভিয়েতনামে দাবানল সৃষ্টির সামরিক প্রয়াসের পরামর্শদাতা। বিজ্ঞানের সাহায্যে কি করে দাবানলকে ইচ্ছামত চালনা করা যায় তাই নিয়েই তিনি এখনো গবেষণা করছেন।

ভিয়েতনামের জঙ্গলে আগুন ধরাবার প্রথম প্রচেষ্টা হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। সেই প্রচেষ্টার নাম ছিল 'অপারেশন শেরউড ফরেস্ট'। এই প্রচেষ্টা সফল হয় নি, আগুন ধরাবার আগেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছিল।

১৯৬৬ সালের অনুরূপ প্রচেষ্টার নাম দেওয়া হয়েছিল 'অপারেশন হট টিপ'। এই অপারেশনে জঙ্গলে আগুন লাগানো গিয়েছিল বটে কিন্তু সেই আগুনকে ছড়ানো যায় নি।

১৯৬৭ সালে 'অপারেশন পিঙ্ক রোজ'। এবারেও জঙ্গলে আগুন লাগে কিন্তু আগুন ছড়াতে পারে না, কেননা আগুন লাগার পরেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই অপারেশনের যে বিবরণ পাওয়া গিয়েছে তাতে অনেকের ধারণা, বৃষ্টি শুরু হওয়ার কারণ ছিল ওই আগুন।

তারপরে ১৯৬৮ সাল থেকে মার্কিনী পত্র-পত্রিকায় খবর বেরোচ্ছে যে, আগুন লাগিয়ে জঙ্গল সাফ করার মার্কিনী পরিকল্পনা নাকি সফল হয়েছে। এই বছরটিতে অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময় ধরে খরা চলছিল। এক দল অসন্তুষ্ট উপজাতি কোনো কারণে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের ওপরে ক্রুদ্ধ হয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল উ মিন ডার্ক ফরেস্টে। মার্কিন বিমান টের পেয়ে যায় ব্যাপারটা কি ঘটছে। তারা তখন বিপুল পরিমাণ নাপাম বোমা ও হোয়াইট ফসফরাস ফেলে আগুনকে উস্কে তোলে এবং আগুনের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের যে-সব সৈন্য লড়াই করছিল তাদের ওপরে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করে। এমনিভাবেই ১৯৬৮ সালের 'চমকপ্রদ' সাফল্য!

তাছাড়া বিশাল এক আগুনের ঝড়ের কথাও বলা হচ্ছে। আগুনের ঝড়ে থাকে তীব্র একটি উত্তাপ-কেন্দ্র। সেই কেন্দ্রের দিকে অক্সিজেনের এমন একটা প্রচণ্ড টান পড়ে যে ঘণ্টায় একশো মাইল বেগের একটা প্রবাহ সৃষ্টি হয়ে যায়। জঙ্গলের আগুন থেকে এমনিভাবে আগুনের ঝড় দেখা গিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ফ্রান্সে ও অস্ট্রেলিয়ায়। তবে স্বয়ং শাণ্ডলার-ই বলছেন, ভিয়েতনামের আর্দ্র জঙ্গলে এমনি আগুনের ঝড় সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিশাল এক আগুনের ঝড় সম্পর্কিত সমস্ত কথাই ভিত্তিহীন বলে মনে হয়।

ভিয়েতনামে এখনো প্রচুর জঙ্গল। মার্কিনী সমরকর্তারা হাজার চেষ্টা করেও আগুন লাগিয়ে জঙ্গল সাফ করতে পারে নি। এ থেকে ধরে নিতে হয়, তাদের দাবানল সৃষ্টি করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। বিপুল অরণ্য-সম্পদ নিয়েই ভিয়েতনাম বেঁচে আছে বেঁচে থাকবে।

—অমলকান্ত

॥ ছয় ॥

হাসপাতালের গেট পেরোলেই রাস্তা। খানিকটা এগিয়ে গেলে ট্রামের লাইন। বাঁ দিকে গেটের চওড়া থামটার উপর গা এলিয়ে একটা বোগেনভিলিয়ার ঝাড় দিব্যি তরতর করে খানিকটা উঠে ডালপালা মেলেছে। থোকা থোকা লাল ফুলে কি বাঁচে সেজেছে গাছখানা, ঠিক যেন অলংকার-পরা একটি সুন্দরী মেয়ে। বোগেনভিলিয়া গাছটাকে এখন রীতিমত রূপবতী মনে হচ্ছে।

গেট পেরিয়ে কিরণ আর বেশী এগোল না। একটু আগে থেকেই সে ধীরে ধীরে পা ফেলছিল। হাসপাতালের চৌহদ্দী ছাড়িয়ে ট্রাম লাইনটার কাছে এসে শ্লথগতি গাড়ির মত ক্রমে নিশ্চল হল।

রাস্তার ওপারে খানিক দূরে একটা সিনেমা হল। বিশ ত্রিশ গজের বেশী হবে না। বাড়িটার প্রায় মাথায় বসানো একটা সাইনবোর্ডের উপর হালফিল এক নায়িকা অভিনেত্রীর চেনা মুখ। কিরণের চোখ দুটো প্রথমে সেখানেই স্থির হল, কিন্তু অল্প দু-এক সেকেন্ডের জন্য। ফের চোখ নামিয়ে খুব ব্যগ্রতার সঙ্গে সিনেমা হলটার সামনে এবং ধারেপাশে কাউকে খুঁজতে লাগল।

বেলা বারোটায় রীতাবরীর আসবার কথা। এই সিনেমা হলটার সামনে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করবে। শুধু আজ নয়, আরো কতদিন রীতাবরী এখানে দাঁড়িয়েছে। হাসপাতালের গেট পেরোবার আগেই কিরণ ওকে দেখতে পেয়েছে। দূর থেকে রীতাবরীকে চিনতে তার একটুও সন্দেহ হয়নি।

হাতের কবজি উল্টিয়ে কিরণ একবার হাতঘড়ি দেখল। বেলা অনেক, প্রায় সওয়া বারোটা বাজে। জ্বরো রুগীর মুখে থার্মোমিটার গুঁজে দিলে পারা যেমন তীরের মত ঠেলে উপরে ওঠে, বেলা ঠিক তেমনি চড়চড়িয়ে বেড়েছে।

সূর্য মাথার উপরে। দেহের ছায়া হ্রস্ব, —পোষা জানোয়ারের মত পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছে: সামান্য হলেও কার্তিকের রোদের ঝাঁঝ আছে। জ্যৈষ্ঠমাসের কাঠফাটা রোদ্দুর নয় ঠিক, কিন্তু তাই বলে পৌষ মাঘের মতো নরম মোলায়েম নয়। রোদে পিঠ দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেই গা তেতে ওঠে কপালে, চিবুকের কাছে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে অস্বোয়াস্তি লাগে।

মুখ তুলে আরো কয়েকবার কিরণ এ-পাশে ও-পাশে তাকিয়ে হতাশ হ'ল। না, সিনেমা হলের সামনে কিম্বা আশে-পাশে কোনো মেয়ে দাঁড়িয়ে নেই। অথচ বেলা বারোটার সময় রীতাবরীর আসার কথা। তবে কি কিরণকে দেখতে না পেয়ে সে চলে গেছে? অথবা ওর ট্রেন লেট। গাড়ির গন্ডগোল তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। হামেশাই লেগে আছে।

কিন্তু কিরণ কতক্ষণ অপেক্ষা করবে? খিদেয় তার পেট চুঁই চুঁই করছে। সওয়া বারোটা বাজে। বাড়ি পৌঁছতে নির্ঘাত একটা হবে। কোন সকালে চা, টোস্ট আর ডিমসেদ্ধ খেয়ে ডিউটিতে বেরিয়েছে কিরণ। তখন সাড়ে সাতটার মত হবে। তারপর এই চার-পাঁচ ঘণ্টায় দু-তিন কাপ চা আর কয়েকটা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়া কিছুই তার পেটে যায় নি।

আউটডোরে বানের জলের মত রুগী। সামাল দিতে হাউস-স্টাফরা হিমসিম খায়। অসুখের খুঁটিনাটি শোনার সময় কোথায়? সেই হাঁ দেখে হাওড়ার লোক চেনার অবস্থা। কোনোমতে জোড়াতালি দিয়ে চিকিৎসা করার চেষ্টা। নিয়মমাফিক পরীক্ষা করে ওষুধপত্তর দিতে হলে এমন পাঁচটা হাসপাতালের দরকার। তা ভিন্ন এত রুগীর ঠিক ঠিক বিলিব্যবস্থা কেমন করে হবে?

তবু হাসপাতাল থেকে কিরণ আজ তাড়াতাড়ি বেরিয়েছে। নইলে বেলা একটার আগে কবে সে ছাড়া পায়? বেশী ভিড় থাকলে আরো দেরি। হাসপাতালের আউট-ডোরে পঙ্গপালের মত শয়ে শয়ে রুগী আসছে। আজ বারোটা পর্যন্ত সকলকে পরীক্ষা করে আসা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। অল্প কিছু রুগী রয়ে গেল। নেহাৎ রীতাবরী এসে সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাই ওদের টিকিটগুলো বন্ধু অম্বরীষকে গছিয়ে হাতমুখ ধুয়ে সে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এসেছে।

কিরণ ভাবছিল চট করে একবার স্টেশনে যাবে কিনা। গাড়ির গন্ডগোল থাকলে এখনি জানা যাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি ট্রেন এসে থাকে আর রীতাবরী যদি স্টেশন থেকে বেরিয়ে এদিকেই আসছে, রাস্তায় যা মোটরগাড়ি আর রিকশর ভিড়। তেমনি জনস্রোত। মুখোমুখি দেখা হবেই এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

কাঁধের উপর কার হাত পড়তেই কিরণের চিন্তা ছিন্ন হল। মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল পরিতোষ পিছনে দাঁড়িয়ে হাসছে। তারই মত হাউস-স্টাফ পরিতোষ পাল। তবে কিরণ আছে মেডিসিনে আর পরিতোষ গাইনিকোলজী অ্যান্ড অবস্টেট্রিকস্ ডিপার্টমেন্টকেই বেছে নিয়েছে।

মুচকি হেসে পরিতোষ শুধোল,—কিরে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে রঙ দেখছিস নাকি?'

রঙ অর্থাৎ মেয়ে। কথাটা পরিতোষের আবিষ্কার,—নিজস্ব কোডও বলা চলে। পরিতোষ বলে,—মেয়েরাই তো আসল রঙ বাবা। মনের আকাশে ওরাই তো রঙ ছড়ায়। তাছাড়া মেয়ে মানেই একটি রঙবাহার শাড়ি। সুতরাং ওরা রঙ ছাড়া আর কি বল?

কিরণ চোখ নাচিয়ে একটা তেরছা ভঙ্গি করে মৃদু হাসল। বলল,—বেশ মুডে আছিস মনে হচ্ছে। চার ঘণ্টা এক-নাগাড়ে রুগী দেখার পর এত রস কিসের?'

পরিতোষ দু-তিন সেকেন্ড ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ফের শুধোল,—'ব্যাপার কি তাহলে? রাস্তার ধারে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

—'একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি। বেলা বারোটায় আসবার কথা। কিন্তু এখনও দেখা পাচ্ছি নে।'

—'কার জন্যে এমন হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে আছিস? একটু খুলে [illegible] না বাবা।' পরিতোষ জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করল।

কিরণ আড়চোখে বন্ধুর [illegible] দিকে এক পলক তাকিয়ে নিল। পরিতোষ[illegible] সে ভালোভাবে চেনে। ভীষণ [illegible]র।

ঠিক মেয়েদের মত স্বভাব। একটু রহস্যের গন্ধ পেলেই হল, ব্যস, পরিতোষকে আর দেখতে হবে না। গ্রীষ্মদিনের কাটা ফলের গায়ে উড়ে বেড়ানো ভনভনে নীল মাছির মত সে আর সরতেই চাইবে না।

রাস্তার উপর দৃষ্টি মেলে কিরণ আর একবার বহুদূর পর্যন্ত দেখে নিল। পরিতোষের দিকে মুখ না তুলেই সে বলল,—'একটু দাঁড়া না, কার জন্যে অপেক্ষা করছি চোখেই দেখতে পাবি।'

—'আমার সময় নেই রে,—ভোঁর বিজি।' পরিতোষ একটু হেলেদুলে ফের সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল,—'তাছাড়া কখন সে আসবে তারও তো ঠিক নেই। কতক্ষণ থাকব বল?'

কিরণ এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বন্ধুর মুখোমুখি হল। বলল,—'তাড়া কিসের? কোথাও যাবি নাকি?'

—'হ্যাঁ। ভবানীপুরে যেতে হবে একবার—'

—'ভবানীপুরে?' কিরণ ভুরু কোঁচকাল। 'এখনই যাবি? কি দরকার সেখানে?'

—'উহুঁ, এখন নয়। খাওয়া দাওয়া সেরে একটু রেস্ট নিয়ে বেলা আড়াইটে নাগাদ বেরুবো। ফিরতে দেরি হবে। ডকটর তালুকদার একটা অপারেশন কেসে অ্যাসিস্ট করবার জন্য ডেকেছেন,' পরিতোষ বেশ আস্থার সঙ্গে কথা কইল।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কিরণ মজা অনুভব করল। এসব কথা পরিতোষ একটু রেখে ঢেকে বলতে ভালবাসে। অবশ্য বেশীক্ষণ নয়। আলতো খোঁচা দিলেই তার মনের ভাব গলগল করে বেরিয়ে আসে। কিরণ তাই ইচ্ছে করেই প্রথমে একটু সংযত হল। আর ব্যাপারটা কি সে আঁচ করতে পারছে না? বড় বড় ডাক্তারদের পিছু পিছু ঘোরা পরিতোষের স্বভাব। উদ্দেশ্য একটাই। হাসপাতালের বাইরে কোনো প্রাইভেট কেসে তাকে যদি অ্যাসিস্ট করবার জন্য ডাকা হয়, তাতে জ্ঞান আর অর্থ দুই লাভ। তাছাড়া পাঁচজনের সঙ্গে পরিচয় হয়। রুগীর বৃত্তটা ধীরে ধীরে বাড়ে।

মুচকি হেসে কিরণ শুধোল—'অপারেশন কোথায় হবে?'

—'মৃণালিনী নার্সিং হোমে। একটা সিজারিয়ান কেস। কাল রাত্তিরে নাকি পেশেন্ট এসেছে। এখনও ডেলিভারী হয়নি। নার্সিং হোমের ব্যাপার বুঝিস তো. —কে ঝামেলা পোহায়। পেট কেটে ছেলে বের করে দিলেই ল্যাঠা চুকে গেল। তাছাড়া সিজারিয়ান হলে নার্সিং হোমের ডাক্তার, নার্স সকলেরই পকেট ভারী হয়।'

কিরণ আগের মতই হেসে বলল,—'তোরও আজ পকেট ভারী হবে। একশ টাকা নির্ঘাত পাবি।'

—'পাগল নাকি? অত টাকা কে দিচ্ছে? ডকটর তালুকদারকে চিনিস না তো, ব্যাটা হাড় কঞ্জুষ,—বড় জোর গোটা পঞ্চাশ টাকা দেবে. তার বেশী নয়।' একটু থেমে সে গলার স্বরটা ঈষৎ খাটো করে বলল,—'আসলে নার্সিং হোমটা তো ওরই সম্পত্তি।'

মৃণালিনী নার্সিং হোমটা ডকটর তালুকদারের, এমন কথা কাগজে কলমে নিশ্চয় নেই। কিন্তু লোকে তাই বলে। ডাক্তার-নার্স, মেডিক্যাল স্টুডেন্ট অনেকের মুখেই শুনেছে কিরণ। নার্সিং হোমটা ডকটর তালুকদারের বেনামী কারবার। কিন্তু তাই নিয়ে কোনোদিন সে মাথা ঘামায় নি।

বন্ধুর মুখের উপর চোখ রেখে কিরণ বলল,—'পঞ্চাশ আর একশ যাই হোক, তবু তো তুই কিছু কামাচ্ছিস। আমার বরাতে অ্যালাউন্সের টাকা কটাই জোটে। কিন্তু এতে কারো চলে, তুই বল—'

পরিতোষ বিজ্ঞের মত জবাব দিল,—'তুই যেমন গিয়েছিস মেডিসিনে, বুক দেখে আর নাড়ি টিপে টাকা রোজগার করতে গেলে সময় লাগে,—তাড়াতাড়ি হয় না। টাকা যদি কমাতে চাস, তাহলে সার্জারি না হলে আমার মতো মিড-গাইনিতে আসতে হবে। তাছাড়া সাধারণ অসুখে, জ্বর-জাড়িতে কে ডাক্তারের চেম্বারে আসছে বল? নিজেরাই সব দোকান থেকে ট্যাবলেট কিনে রোগ সারাচ্ছে।'

—'তা যা বলেছিস।' কিরণ সায় দিল।

পরিতোষ বলল,—'আরে আমি তো অনেকদিন থেকে বড় ডাক্তার হবার স্বপ্ন দেখছি। স্রেফ টাকা রোজগার করব বলে।'

—'তাই নাকি? তুই ছোটবেলা থেকেই ডাক্তার হবার কথা ভাবতিস?'

পরিতোষ ঘাড় হেলিয়ে প্রশ্নটা স্বীকার করে নিল। খুব উৎসাহের সঙ্গে চোখ বড় করে শুরু করল,—'একটা মজার ঘটনা বলি শোন। আমি তখন স্কুলে,—ক্লাস নাইনে পড়ি। ইংরেজী লেটার-রাইটিং এর পিরিয়ড. স্যার এসে বললেন,—ভবিষ্যতে কি হতে চাও, তাই জানিয়ে বন্ধুকে একটা চিঠি লেখ দিকি। আমি বেশ সুন্দর করে লিখলাম, ভবিষ্যতে আমি ডাক্তার হতে চাই। খুব বড় ডাক্তার। কলকাতায় আমার চেম্বার হবে। ষোল টাকা ভিজিট। আমার একটা বড় গাড়ি থাকবে। সেই গাড়িতে করে আমি সকাল-বিকেল আসব যাব। রুগী দেখবার জন্যে কলে বেরুবো। শেষকালে লিখলাম, অনেক—অনেক টাকা রোজগার করব বলেই আমি ডাক্তার হতে চাই।'

কিরণের বেশ মজা লাগছিল। সে বলল, —'গ্র্যান্ড লিখেছিলি চিঠিখানা। তোর স্যার নিশ্চয় খুব ভালো বললেন।'

'আহ্, আগে সবটা শোন না।' পরিতোষ ওকে থামিয়ে দিল। বলল—'খাতাটা পড়ে স্যার আমাকে কাছে ডাকলেন। চোখ পাকিয়ে বললেন,—কি লিখছ এসব? এখন থেকেই তুমি অনেক টাকা রোজগারের কথা ভাব বুঝি? ক্লাস শুদ্ধ ছেলে তাই শুনে হো-হো করে হেসে উঠল। আর অপমানে, লজ্জায়, চোখ মুখ লাল করে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। লেখাটা কেটে দিয়ে স্যার বললেন, যত সব পাগলামি. ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা ভালো নয় পরিতোষ। আমার প্রায় কান্না পাচ্ছিল, কি জবাব দেব স্যারকে? বাবা সরকারী অফিসের লোয়ার ডিভিসন কেরানী,—ছা-পোষা মানুষ! ছেঁড়া কাঁথার উপমাটা স্যার বোধহয় মিথ্যে বলেন নি।

—'তারপর?'

—'তারপর আবার কি? আমি কেন ডাক্তার হতে চাই, উনি তাই লিখে দিলেন, আমাদের গরীব দেশে মানুষের অন্ন-বস্ত্রই জোটে না। চিকিৎসা তো দূরের কথা। বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে। সেখানে রোগে, বিনা চিকিৎসায় কত লোক মারা যাচ্ছে। এই নিরন্ন, দুঃখীদের জন্য কিছু করাই আমার ব্রত। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হয়ে এদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে পারলেই আমি ধন্য হবো।' এক মুহূর্ত থেমে পরিতোষ ফের বলল,— সে বছর ক্লাসের পরীক্ষায় এই প্রশ্নটাই এলো। আর আমি স্যারের কথাগুলো হুবহু মুখস্থ লিখে অনেক নম্বর পেলাম।—'

কিরণ হাসতে হাসতে বলল,—'বেশ অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স তো। অবশ্য এই রকমই হয় রে। পরীক্ষার খাতায় আমরা যে কলমে লিখি, জীবনের পাতায় তার আঁচড়টিও পড়ে না। জীবন ভিন্ন,—তার অন্য রঙ। অন্য দৃষ্টি। খোঁজ নিয়ে দ্যাখ ডক্টর তালুকদারও নিশ্চয় তোর দলে। উনিও পরীক্ষায় তোর মত দীন দরিদ্র গ্রামবাসীর সেবার কথা লিখে প্রচুর নম্বর পেয়েছেন। তারপর বিলিতী ডিগ্রীওলা বড় ডাক্তার হয়ে বেনামে মৃণালিনী নার্সিং হোম খুলে বসেছেন।'

—'দেখবি ওর চেয়েও বড় নার্সিং হোম করব আমি।' পরিতোষ প্রায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞের মত বলল। 'একবার বিলেত থেকে ঘুরে আসি আগে।'

—'নিশ্চয়। আই উইস ইউ সাকসেস।' কিরণ ওর পিঠ চাপড়ে উল্লাসে ফের বলল—'নে একটা সিগারেট ছাড় দিকি।'

পরিতোষের পকেটেও সিগারেট নেই। হাসপাতালের গেটের পাশের দোকানটা বন্ধ। রাস্তার ওপারে ফুটপাতের গায়ে একটা দোকান খোলা দেখে সে বলল,—'চল ওখান থেকেই একটা প্যাকেট নিই।'

ওষুধের কটু গন্ধের মত ঝাঁঝালো দুপুর হলে কি হবে, রাস্তায় লোকজনের কিছু কমতি নেই। তেমনি বাস-ট্রাম, ঠ্যালা আর রিকসাগাড়ির প্রতিযোগিতা। শিয়ালদর অবশ্য এমনি চেহারা। শুধু খুব সকালের দিকে ঘণ্টা দেড়-দুই নিরাভরণ বিধবার মত ঈষৎ ফাঁকা ফাঁকা লাগে। তারপর থেকেই অবিরাম জনস্রোত। বেলা নটা বাজলেই অসংখ্য মানুষ ঠিক পিঁপড়ের পালের মত পিল পিল করে কোথা থেকে বেরিয়ে আসছে। রাত নটা দশটা অব্দি এমনি ভিড়।

সিগারেট ধরিয়ে কিরণ ভাবল, এবার বাড়ি ফিরবে। সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। আর অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না। রীতাবরী নিশ্চয় আজ এল না। মনের ভিতর ট্রেণ মিস করার মতো একটা অস্পষ্ট ব্যথা। বাড়িতে মা তার জন্য ভাত আগলে বসে আছে। খানিকটা হেঁটে মোড়ের কাছে সে বাসে উঠবে ভাবল।

হঠাৎ বাঁ দিকে তাকাতেই কিরণের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আশ্চর্য! রীতাবরী এল কখন? পরনে সবুজ শাড়ি আর সবুজ রঙের জামা। জলের মাছের মত স্বাস্থ্য মেয়েটার। এই মুহূর্তে ঠিক একটা সবুজ বনটিয়ার মত লাগছে ওকে। যেন কোথা থেকে উড়ে এসেছে। কিরণ কাছে না গেলেই আবার ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাবে।

গ্রীবা বাড়িয়ে রীতাবরী হাসপাতালের গেটটার দিকে বার বার তাকাচ্ছিল। মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত চাউনি। কিরণকে দেখতে না পেয়ে সে খুব ব্যস্ত এবং কিছুটা হতাশ হয়ে উঠেছে মনে হল।

ইঙ্গিতে রীতাবরীকে দেখাল কিরণ। পরিতোষ এক নজর তাকিয়ে বলল,—'তোর গার্ল ফ্রেন্ড বুঝি? কি নাম ওর?'

—'রীতাবরী।'

—'বেশ নাম।' পরিতোষ তারিফ করে বলল।

—'চল, আলাপ করিয়ে দিই তোর সঙ্গে।' কিরণ প্রস্তাব করল।

—'পাগল নাকি? এখন সময় কোথায়? পরে একদিন হবে।' ঈষৎ হেসে পরিতোষ ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চাইল। যাবার আগে গলা খাটো করে সে ফের বলল,—'শুধু নাম কেন, তোর গার্ল ফ্রেন্ডের চেহারাও চমৎকার। কিন্তু মেয়ের বাবা কি করেন বললি না তো? বিয়ের পরে তোকে বিলেত পাঠাবেন নাকি?'

কিরণ চুপ করে রইল। এ কথার কি উত্তর দেবে সে? পরিতোষ এমনিই,—ভীষণ ক্যারিয়ারিস্ট। তারা সকলে অবশ্য অল্প-বিস্তর তাই। নিজের ভালো, ভবিষ্যতে উন্নতি কে না চায়? কিন্তু তবু পরিতোষ যেন বড্ড বেশী সিরিয়াস। ক্যারিয়র ছাড়া জীবনে আর কিছুই বোঝে না। ওর প্রতিটি পদক্ষেপ অঙ্ক কষে মাপা। যে কোনো কাজের মধ্যে পরিতোষ উন্নতির সিঁড়ি খোঁজে। চট করে খুঁজে না পেলে নিজের মন থেকেই সে একটা উদ্দেশ্যের ছবি গড়ে নেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পরিতোষ সব কিছু বিচার করে। তার বেলাতেও ব্যতিক্রম হয় নি।

তাকে দেখে রীতিবরী সলজ্জ হেসে বলল,—'ওমা! তুমি কোন দিক থেকে এলে? আমি গেটের মুখে বারবার তাকাচ্ছি।'

—'তাকালে কি হবে? তুমি তো এই-মাত্র এসে দাঁড়ালে।' কিরণ কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে কথা কইল।

—'আহা! রাগ করছ কেন?' রীতাবরী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একটি মেয়েলি কটাক্ষ করল। বলল,—শুধু তোমার জন্যে এসেছি মশায়। নইলে মা খুব বারণ করছিল। বলছিল,—আজ কি তোর না গেলেই নয়?'

কিরণ বলল,—'আমি আধঘন্টার উপর ঠায় দাঁড়িয়ে আছি, খালি ভাবছি, তুমি বুঝি এইবার এলে। আর একটু পরে চলেই যেতাম।' সে ইচ্ছে করে পরিতোষের বৃত্তান্তটা চেপে গেল।

—'সত্যি! তোমার খুব দুর্ভোগ।' রীতাবরী সমবেদনার সুরে বলল, 'কোন সকালে খেয়ে দেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। হাসপাতালের খাটাখাটুনির পর রাস্তার মধ্যে এমনি দাঁড়িয়ে থাকতে কারো ভালো লাগে?'

কিরণ নরম গলায় শুধোল,—'তোমার কেন দেরি হল বল তো? ট্রেন লেট না অন্য কিছু?'

—'ট্রেন সামান্য লেট। কিন্তু অন্য ব্যাপারও আছে।' রীতাবরী হাঁসের মত ঘাড় বেঁকিয়ে হাসল। বলল,—'আমাদের ওদিকে আজ বন্ধ ডেকেছে। দোকানপাট সব তালা আঁটা। রাস্তায় বাস রিকসাগাড়ি কিছুই চলছে না।'

—'তাহলে এলে কেমন করে? তোমাদের বাড়ি থেকে স্টেশন তো অনেকটা দূর—'

—'কেমন করে আবার?' রীতাবরী ভুরু নাচিয়ে রহস্য করল। বলল,—'পায়ে হেঁটে স্টেশনে এলাম। তাই তো দেরি। নইলে হয়তো আগের ট্রেনটা পেয়ে যেতাম।'

—'কি ফ্যাসাদ! তোমার কপালেও দুর্ভোগ দেখছি।' কিরণ ম্লান হাসল। ফের শুধোল,—'কিন্তু তোমাদের ওদিকে বনধ কেন? আজকের কাগজে কই দেখলাম না।'

—'আহা! কাগজে আর কত খবর ছাপবে?' রীতাবরী বিরক্তমুখে বলল, 'কিসের বনধ, কেন বনধ তাই নিয়ে কে মাথা ঘামাচ্ছে বল? কাল রাত্তিরেও আমরা ব্যাপারটা জানতাম না। আজ সকালে বাজার করতে বেরিয়ে দাদা প্রথম খবর পেয়েছে।'

—'নিশ্চয় কিছু ঘটেছে। নইলে বনধ ডাকবে কেন?' কিরণ ভুরু কুঁচকে কথা কইল। 'তোমাদের ওদিকে তো কদিন ধরেই খুব গন্ডগোল, মারামারি চলছিল, তাই না?'

—'ও বাবা! সে আবার বলতে।' রীতাবরী বিস্ময়ে চোখ দুটি বড় করে তাকাল। 'আমাদের ওদিকের যা অবস্থা। গন্ডগোলের কোনো কালাকাল, সময়-অসময় নেই। সকাল-সন্ধ্যে, রাত্তির-দুপুর যে কোনো মুহূর্তে মারামারি লেগে গেলেই হল। অমনি দুম দুম বোমা ফাটবে। হৈ-হৈ চিৎকার। মাঝে মাঝে গুলির শব্দও মেলে হয়। একদিন কি হয়েছে জানো? সন্ধ্যের মুখে বাজার থেকে ফিরছি। হঠাৎ আমার সামনে গজ দশ-পনের দূরে একটা বোমা বিকট শব্দে ফাটল। বললে বিশ্বাস হবে না, দোকান-পাটগুলো নিমেষে চটপট বন্ধ হয়ে গেল। আমি কোনোমতে প্রায় দৌড়ে একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম।'

—'ইস্! কি সাংঘাতিক কান্ড! একটা দুটো স্প্লিন্টার ছুটে এসে তোমার গায়ে লাগতে পারত।'

—'কিছু অসম্ভব নয়।' রীতাবরী ঘাড় দুলিয়ে জবাব দিল। 'পথেঘাটে এমন ঘটনা কি আর হচ্ছে না? আমরা কতটুকু খোঁজ রাখি বলো?'

ঘন্টা বাজিয়ে একটা ট্রাম ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। ঢং ঢং শব্দ। সামনে জ্যাম্—বৌবাজারের মুখে অনেক গাড়ি। ট্রামটা তাই দাঁড়িয়ে পড়ল। লাইনের উপর উজ্জ্বল রোদ্দুর,—এখানে ওখানে কেমন চকচকে দেখাচ্ছে।

নিশ্চল গাড়িটার দিকে চোখ পড়তেই রীতাবরী হঠাৎ হাতঘড়ির উপর ঝুঁকল। 'এই যাঃ। আর মোটে দশ মিনিট দেরি। এই ট্রামটাতেই তাহলে উঠে পড়ি, কি বল?' সে সম্মতি পাবার আশায় কিরণের মুখের দিকে তাকাল।

—'এখুনি যাবে?' কিরণের কণ্ঠে হতাশার সুর বাজল। সে বলল,—'এইমাত্র তো এলে, এখনও পনের মিনিট হয়নি।'

—'কি করব বলো?' রীতাবরী ওকে বোঝাতে চাইল। 'একটার সময় মিঃ চ্যাটার্জির ক্লাস। ভারী সুন্দর পড়ান ভদ্রলোক। এতদূর যখন এসেছি, তখন ওর ক্লাসটা আর মিস করতে চাই না।'

—'বেশ, তাহলে চল,' কিরণ অনিচ্ছুক বালকের মত রাজি হল। দুঃখ করে সে বলল—'দূর! এমন করে আর ভাল লাগে না। পনের মিনিট কি আধঘন্টার জন্য দেখা। অমন করে না এলেই পার।'

—'আহা! রাগ করছ কেন?' রীতাবরী মুখ ফিরিয়ে হাসল। সামনের রবিবার আবার আসছি। সমস্ত দুপুর তোমার সঙ্গে ঘুরব। তাহলেই হবে তো?'

—'রবিবার তো তোমার ক্লাস নেই।' কিরণ সন্দেহের চোখে তাকাল। 'ক্লাস না থাকলে তোমাকে কলকাতায় আসতে দেবে? মানে তুমি বেরোতে পারবে কি?'

—'পারব, পারব। তুমি নিশ্চিন্ত থেক।' রীতাবরীর গলায় প্রত্যয় বেজে উঠল। ঠোঁট টিপে হেসে সে বলল,—'বেশ মানুষ তুমি। ক্লাস নাই বা রইল। কিন্তু রবিবার কি লাইব্রেরী খোলা নেই? আমি তো সেখানে আসতে পারি।'

—'নিশ্চয় পার।' কিরণ মনে মনে ওর বুদ্ধির তারিফ করল। মুখে বলল,—'কিন্তু আমি কোথায় থাকব? এইখানে, না কলেজ স্ট্রীটে ইউনিভার্সিটির সামনে?'

—'উহুঁ', রীতাবরী সজোরে মাথা নাড়ল। 'কলেজ স্ট্রীটে কে যাচ্ছে? তুমি প্ল্যাটফর্মে বইয়ের স্টলটার সামনে থেক। আমরা শেয়ালদা থেকেই এসপ্ল্যানেডের ট্রামে উঠব। তারপর গংগার ধারে কিম্বা—

বাকিটুকু কোনো রহস্য কাহিনীর পরবর্তী পরিচ্ছেদের মত সে ইচ্ছে করেই উহ্য রাখল।

(ক্রমশঃ)

আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য নেপালের ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতির যোগ নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। নেপালী ভাষার জননী সংস্কৃত, রামায়ণ মহাভারত ওদের মহাকাব্য, বেদ-উপনিষদের প্রতি ওদের আগ্রহ গভীর। দীর্ঘদিন অবজ্ঞাত, অবহেলিত থাকায় নেপালী সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহির্জগতের কোন স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি।

নেপালের আদি কবি ভানুভক্ত আচার্য। প্রধানতঃ রামায়ণ অনুবাদক হিসেবেই তিনি প্রখ্যাত। লক্ষ্মীপ্রসাদ দেওকোটা আধুনিক নেপালী সাহিত্যের জনক। দেওকোটা নামেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত। নেপালী-সাহিত্যের অগ্রগণ্য কবি, প্রতিভাশালী বিদগ্ধ পন্ডিত লক্ষ্মীপ্রসাদ দেওকোটার সাহিত্য ও জীবনে সম্পর্কে অবহিত করার জন্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

দেওকোটার একটি কবিতার অংশ এই রকম— "উদ্দেশ্য কে লিনু
উড়ি ছুনু চন্দ্র এক।"

এই ছোট কথাটির তাৎপর্য কম নয়। আশা করতে হবে চাঁদ ছোঁবার তাই নজর নিচু করতে নেই। উচ্চ আশা থাকলে অনেক বড় হওয়া যায়। বড় হতে নিজেকেই সব অর্জন করতে হবে। ছোটবেলা থেকে তাঁর ইচ্ছে ছিল, লেখাপড়া শেখা দরকার। বড় হয়ে অধ্যাপক, চিকিৎসক, বা সাহিত্যিক হতে পারলে খ্যাতি, অর্থ অর্জন করা যাবে। চেষ্টা করতে হবে, অনেকে বড় হতে পারে, অনেকে পারে না। আইনস্টাইন, লিঙ্কন খুব ছোট অবস্থা থেকে বড় হয়েছেন। তাঁর মত ছিল, মানুষের অসাধ্য কোন কাজ নেই। পৃথিবী অনেক এগিয়েছে, সেই পুরান পৃথিবী আজ আর নেই।

১৯৬৬ বিক্রম-সম্বত, ইংরেজি ১৯১০ খৃস্টাব্দে, কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে লক্ষ্মীপূজোর রাত্রে কাটমান্ডুতে তাঁর জন্ম। পিতা বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত তিলমাধব দেওকোটা। লক্ষ্মীপূজোর রাত্রে জন্ম বলে এর নাম রাখা হল লক্ষ্মীপ্রসাদ। পিতা-মাতার তৃতীয় সন্তান তিনি।

ছোট থেকেই লেখাপড়ার দিকে ঝোঁক ছিল। আপনমনে লেখাপড়া শিখতেন। তার ধাই মা ছোটবেলা থেকেই কানের কাছে বারবার বলতেন—বড় হয়ে তোমায় ইংরেজি শিখতে হবে, মাস্টার হতে হবে, অনেক টাকা উপার্জন করতে হবে। এই কথাগুলি তাঁর মনে বাসা বাঁধে। তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন—ছোটবেলা থেকেই আমার মনে একটি সাধ, আমায় বড় হতে হবে। তাই খেলা ছেড়ে বই নিয়ে বসে থাকি, বই মাথায় দিয়ে ঘুমোই। নয় বছরের পাঠ্য তালিকা পাঁচ বছরে শেষ করি। এই সময় কারো সঙ্গে মেলামেশা করিনি, কথা বলিনি, গল্প করিনি। এমন কি জুতো পর্যন্ত পরিনি। অল্প বয়সেই তিনি এনট্রান্স পাশ করেন।

তাঁর পিতার কাছে সংস্কৃত শিক্ষা চলতে থাকে। অমরকোষ শেষ করে কালিদাসের রঘুবংশম্ পড়েন ও মুখস্থ করেন। তাঁর পিতা বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত ছিলেন, সেই সঙ্গে হাস্যরসিক ও সুগায়ক। তিনি সংস্কৃত ও নেপালী উভয় ভাষাতেই কবিতা লিখতেন। লক্ষ্মীপ্রসাদ বাবার লেখা খাগের কলমে কপি করতেন। তাই তাঁর হস্তাক্ষর খুব সুন্দর হয়।

একবার তিনি সংস্কৃত ও নেপালী মিশিয়ে একটি কবিতা লেখেন। তার বাবা সেটি দেখে ছিঁড়ে ফেলেন। মন খারাপ হলেও লেখার চর্চা ছাড়েন নি। আরো ভালো লেখার চেষ্টা করেছেন। দশ বছর বয়সে বড়বৌদির তাগাদায় কবিতা লিখলেন একটি, কিন্তু মন ভরেনি। তাঁর মতে, তাঁর প্রথম কবিতার একটি পংক্তি—

'সংসার ঘোর দুখ-সাগর জান ভাই।
ন গরে ঘমন্ড, জানু ছ হাসিলাই।।'

অর্থাৎ এই পৃথিবী ঘোর দুঃখসাগর, এটা জেনে রেখো, কখনো অহংকার কোর না, হাসিমুখেই এই দুঃখ সাগররূপ পৃথিবীতে কাটিয়ে পাড়ি দিতে হবে।

দরবার স্কুলে ইংরেজি ও ভূগোল পড়তে থাকেন। সহপাঠী বন্ধু পিনাকী তাকে কবিতা লেখায় উৎসাহ দেন। পিনাকী পরবর্তীকালে নেপালের বিখ্যাত চিকিৎসক হন।

ডবল প্রমোশন পেয়ে প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পাশ করে কাটমান্ডুর ত্রিচন্দ্র কলেজে আই-এস-সি ক্লাশে ভর্তি হন দেওকোটা। এই সময় প্রচুর টুাশানি করেন তিনি। নিজের পড়ার খরচ নিজেই উপার্জন করেন। ছাত্র-পড়ানো, নিজের লেখাপড়া, বাকি সময় কবিতা লেখা—এরই মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নিজেকে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী ও শেক্সপীয়রের কবিতা মন দিয়ে পড়তে থাকেন। নিজে কবিতা লিখে অধ্যাপকদের দেখাতেন। নেপালী ছাড়া ইংরেজিতেও কবিতা লেখেন।

ত্রিচন্দ্র কলেজে পড়ার সময় তাঁর বিবাহ হয়। তাদের দাম্পত্য-জীবন সুখের হয়নি। স্ত্রী অত্যন্ত বাস্তববাদী, স্বামী অন্য জগতের লোক। আই-এস-সি পাশ করে তিনি পাটনায় যান বি-এ পড়তে।

১৯৮৬ বিক্রম সম্বতে (ইং ১৯৩০ খৃঃ) বি-এ পাশ করে কাটমান্ডুতে ফিরে এলেন। এক বন্ধু প্রস্তাব করলেন—একটি পাঠাগার খোলা যাক। প্রস্তাবটি তাঁর ভালো লাগল। তিনি এবং আরো কয়েকজন সচেষ্ট হলেন। নেপালে তখন প্রচন্ড রাণা-শাহী অত্যাচার চলছে। রাজা নামে মাত্র রাজা, রাজত্ব চালান 'রাণা'। জনসাধারণ পরাধীন, তারা মুখ খুলতে পারে না। একদিন তাই খেতে বসেছেন, রাণার লোকেরা এসে ধরে নিয়ে গেল। আরো অনেকে ধরা পড়লেন। বিচারে তাঁর তিন মাস জেল হল। অপরাধ পাঠাগার খোলার চেষ্টা। অনেক চেষ্টার পর একশ টাকা জরিমানা দিয়ে সেযাত্রা রক্ষা পান, জেলে যেতে হল না। সেই সঙ্গে মুচলেকা দিতে হল, বারো বছর কোন জনহিতকর কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখবেন না।

দেওকোটার ইচ্ছে ছিল ইংরেজিতে এম-এ পাশ করবেন। কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের চাপে ও অনুরোধে তিনি পাটনায় গিয়ে আইন পড়তে আরম্ভ করলেন। ইংরেজিতে এম-এ পাশ না করলেও তিনি খুব ভালো ইংরেজি জানতেন, ইংরেজিতে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতেন। পরবর্তী একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ 'হায় হায় আংগ্রেজিতে' লিখেছেন— ইংরেজি ভাষায় লিখে নাম করা যাবে না। বড় হওয়া যাবে না। সেখানে অনেক দিকপাল আছেন। তার চেয়ে মাতৃভাষা নেপালীতে লিখলে ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হবে।

সংসারে আকস্মিক বিপর্যয় দেখা দিল। বড় ও মেজ ভাই স্ত্রী-পুত্র কন্যা নিয়ে আলাদা হয়ে গেল। সংসারের ভার পড়ল তার ওপর। এই সময় বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা টুাশানি করতেন। অনেকেই বলতেন চাকরির চেষ্টা করতে। তার মন সায় দেয়নি।

তখন নেপালে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা চলত না। দেওকোটা সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন নি। তবে তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা স্পষ্টবাদী। এ জন্য তাকে অসুবিধায় পড়তে হত। নেপালের রাজা তখন ত্রিভুবন (রাজা মহেন্দ্র

আজকাল বেশীরভাগ বাড়ীর গিন্নিরাই স্পা ওয়াশিং পাউডার ব্যবহার শুরু করেছেন—কারণ কি?

এর কারণ, কাপড়চোপড় পরিষ্কার করতে স্পা অনেক বেশী শক্তিশালী। এর গাঢ় ফেনায় ময়লা কেটে যায়! যেসব ময়লা দাগ কিছুতেই উঠতে চায় না, তা'ও পরিষ্কার হয়ে যায়—এমন কি খরজলে কাচলেও।

সত্যি তাই। ঘরে ঘরে গিন্নিরা দিন-দিনই দেখছেন যে স্পা-ই একমাত্র শক্তিশালী পরিষ্কারক, যা দিয়ে খরজলে কাচলেও কাপড়চোপড় অনেক বেশী পরিষ্কার ঝকঝকে হয়। এর কারণ, স্পা বিশেষ উপাদানে তৈরী। তাই তো, স্পা-র ওপর সবার এত ঝোঁক! আপনিই বা বাকী থাকবেন কেন?

স্পা

—এই শক্তিশালী ওয়াশিং পাউডারে জামাকাপড় সহজেই পরিষ্কার হয়ে যায়

KPS 6032A

কুসুম প্রডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা—১

পিতা) কিন্তু ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী রাণার হাতে। প্রকৃত শাসনকর্তা রাণা। নেপালে তখন চলছে 'হুকুমি শাসন', অর্থাৎ কোন আইন নয়, রাণা যা হুকুম করবেন তাই আইন, তাই মেনে চলতে হবে। দেওকোটার ছাত্ররাই পরবর্তীকালে এই 'রাণাশাহী' উচ্ছেদ করেন এবং পরবর্তীকালে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। দেওকোটা তাদের বিশ্ব-রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন করেন এবং অনগ্রসর নেপালের ওপর থেকে জগদ্দল পাথর সরাবার জন্যে সচেষ্ট হতে বলেন। দেওকোটার অতি প্রিয় ছাত্ররাই আজ নেপালের কর্ণধার।

তখন নেপালের অধিবাসীরা ছিল খাঁচায় বন্দী পাখীর মত। এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ কবি লেখনাথের একটি কবিতা—'পিঞ্জরাকো সুগা' অর্থাৎ খাঁচার টিয়া আজো নেপালে বহুল প্রচারিত। এই বন্দী-জীবন দেওকোটার ভালো লাগত না। তখন নেপালের কয়েকজন বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিতকে প্রকাশ্য ময়দানে ফাঁসি দেওয়া হয়, কয়েকজনকে গুলী করে মারা হয়। এঁদের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন গঙ্গালাল, ধর্মভক্ত, দশরথচন্দ্র ও শুক্ররাজ শাস্ত্রী। শুক্ররাজ গীতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাজনীতি শিক্ষা দিতেন। দেওকোটা ভয় পান নি। তিনি জনসাধারণের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে চাইতেন, বন্ধন-মুক্তির চেষ্টা করতেন। নিভৃতে, নীরবে বসে সাহিত্য-সাধনা করায় তার মন সায় দিত না।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে নেপালের প্রথম শ্রেণীর কবিতা-পত্রিকা 'সারদায়' দেওকোটার রচনা প্রকাশিত হয়। তার প্রথম দিকের রচনায় কবি লেখনাথের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সারদায় প্রকাশিত তাঁর গরীব কবিতাটি সাড়া জাগায়। এই কবিতার বক্তব্য, বাইরে গরীব হলেও অন্তরে বড় হওয়া যায়। পরবর্তী কবিতা 'কিষাণ'; তবে 'ভিখারি' কবিতাটি মর্মস্পর্শী। এই কবিতায় তাঁর মানবতাবোধ ও সহানুভূতি লক্ষণীয়। 'জন্মের পর হয়ত ওর মা-বাবা খুশি হয়েছিল, তখন কে জানত ও ভিখারি হবে। ও আমাদের ভাই, ওকে সাহায্য করা দরকার। ঘৃণা করা উচিত নয়। 'কবিতাটির মূল বক্তব্য এইরকম।' গরীবের সেবা, আর্তের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন।'

দেওকোটার প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অন্যতম বিখ্যাত কবিতা 'বাদল'। লুসির অনুসরণে লিখেছেন 'চারু'। ছোট ছেলে-মেয়েদের তিনি খুব ভালোবাসতেন। হাতে পয়সা থাকলে তাদের এটা-ওটা কিনে দিতেন। ছোটদের জন্যে লেখা, তার বিখ্যাত কবিতা 'সুনকো বিহান' (সোনালি সকাল) ও পুতলি (প্রজাপতি)।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁর গীতিকা 'মুনা-মদন' প্রকাশিত হয়। নেপালী সাহিত্যে 'ঝাউরে' ছন্দে লিখিত প্রথম গীতিকা। তখনকার শিক্ষিত সমাজ 'ঝাউরে গীত' গাইতে লজ্জা পেত। তাতে নাকি সম্মানহানি হয়। ঝাউরে গান বা ছন্দ একেবারে অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের জন্যে। এই বিধি-নিষেধ রীতি-নীতি মানেন নি দেওকোটা। গ্রাম্য-জীবন, গ্রামীণ সভ্যতা, পল্লীগীতির ঢঙে এই গীতিকায় উপস্থাপিত করেছেন। আজ পর্যন্ত নেপালের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সর্বাধিক বিক্রীত বই এটি। এই বইয়ের জন্যে তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন। তাঁর নিজের সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থ এটি। তিনি বলেছিলেন, তাঁর সব সৃষ্টি যদি ধ্বংস হয়ে যায় ক্ষতি নেই, শুধুমাত্র 'মুনামদন' থাকলেই তিনি খুশি। এই একটি কাব্যই তাঁকে অমর করবে।

মদন গ্রাম্য যুবক, মুনা তার সুন্দরী স্ত্রী। সংসারে বৃদ্ধা মা আছেন। গ্রামের মহাজনের কারসাজিতে সর্বস্বান্ত হয়ে মদন তিব্বতে (ভোটদেশ) যায় সোনা আনতে। অনেক কষ্ট সহ্য করে সে যখন ফিরে এল, দেখল মা আরো বৃদ্ধা ও অথর্ব হয়েছেন, স্ত্রী মারা গিয়েছে। তখন মদন আক্ষেপ করে বলে—

'হাতকো ময়লা সুনকো থাইলা
কে গরনু ধনলে?
শাকর শিগনু খায়েক বেশ
আনন্দি মনলে।'

সোনার থালি হাতের ময়লা, অর্থ-দিয়ে কি করব, এর চেয়ে ঘরে বসে শাক-পাতা খেলেও মনে আনন্দ থাকতো।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে নেপালী ভাষানুবাদ পরিষদে মাসিক সত্তর টাকা বেতনে চাকরি নেন দেওকোটা। দিন চলে না, দুঃসহ দারিদ্র্য, সংসারের বিরাট বোঝা ঘাড়ের ওপর। এই সময় প্রায়ই স্ত্রীকে বলতেন,—ছেলে-মেয়েদের কথা চিন্তা করেই মরতে পারি না। নইলে বিষ খেয়ে জ্বালা জুড়োতাম। দু-তিন দিন অভুক্তও থেকেছেন এই সময়। আবার হাতে যখন টাকা থাকত, তখন তিনি অন্য মানুষ। তখন অভাব, দারিদ্র্য, সংসারের টানাটানি ভুলে যেতেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাতের টাকা শেষ করে ফেলতেন। প্রচণ্ড ভোজনবিলাসী ছিলেন, খেতে ও খাওয়াতে ভালোবাসতেন। দল জুটিয়ে পিকনিকে যেতেন, সব খরচ নিজে করতেন।

চুরুটের প্রতি ছিল প্রচণ্ড আসক্তি। চুরুটের বিনিময়ে অনেক পাণ্ডুলিপি হাতছাড়া করেছেন।

দেওকোটা একাধিক মহাকাব্য রচনা করেছেন। 'সুলোচনা' কাব্যের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—এটি বাজি ধরে জেদের বশে লেখা। মাত্র দশদিনে এই কাব্য শেষ হয়েছে। এক ঘন্টায় পঁয়তাল্লিশটি শ্লোক লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, পঁচিশ বছর কবিতা লেখায় অভ্যস্ত হওয়ায় আমি অনর্গল শ্লোকে কথা বলতে পারি, অনায়াসে লিখতে পারি। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ছিল তাঁর। খুব দ্রুত লিখতে পারতেন বলে তাঁর নাম ছিল 'আশুকবি'। তাঁর লেখার জন্যে কোন নির্জন স্থানের প্রয়োজন ছিল না, নির্দিষ্ট সময় লাগত না। কোন লেখাই সংশোধন, পরিমার্জন করতেন না। একবার যা লিখতেন, বদলাতেন না। ব্যাকরণ বা ছন্দ প্রকরণের দিকে নজর দিতেন না। তাঁর মতে, এতে কবিতা লেখা ব্যাহত হয়।

একবার একজন সম্পাদক তাঁর কাছে গল্প চাইতে এসেছেন। হাতে লেখা নেই, অথচ একদিন মাত্র সময়। তিনি বললেন—আমি বলে যাই, তুমি লিখে নাও। চার ঘণ্টায় পাঁচটি ছোট গল্প শেষ হল। সম্পাদক ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, তাই বাধ্য হয়ে থামাতে হল।

লেখার সময় তিনি সমাজ সংসার সব ভুলে যেতেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, স্ত্রীর অভিযোগ কিছুই মনে থাকত না। অনেক সময় কাগজ-কলমের অভাবে লিখতে পারতেন না, মনে মনে ছটফট করতেন। একবার একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন—আপনি কত লিখেছেন? হেসে জবাব দিলেন তিনি,—তার কি হিসেব আছে! কয়েক ঝুড়ি তো হবেই! এক ঝুড়ি দিয়েছি সাহিত্য-সমিতিকে ছাপাবার জন্যে। অনেক লেখা ছাপা হয়নি, এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে নষ্ট হয়েছে। দেখাশোনা করার কেউ নেই।

অনেক ফরমায়েস আসত তাঁর কাছে। কেউ চাইতেন হাসির কবিতা, কেউ গল্প-প্রবন্ধ, কেউ নাটক, কাউকে ফেরাতেন না। তাঁর রম্য-রচনা অত্যন্ত উপাদেয় ছিল। পড়তে আরম্ভ করলে ছাড়া যায় না। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা—'হায় হায় আংগ্রেজি' 'পখা বুদ্ধিমানকি [illegible]'

সমাজের বাহ্যাড়ম্বর অসংগতি নিয়ে একাধিক বিদ্রূপাত্মক রচনা লিখেছেন। এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'ভালা আদমি'। স্বদেশ নেপাল ও নেপালের অধিবাসীদের তিনি খুব ভালোবাসতেন। 'কে নেপাল সানু ছ?' প্রবন্ধে লিখেছেন—'শান্ত নির্জন নেপাল আমার অতি প্রিয়। নেপালে অনেক রত্ন, অনেক ঐশ্বর্য আছে কিন্তু আজো তা অজ্ঞাত, অবহেলিত। নেপালের রহস্য অনুদ্ঘাটিত। এখানকার শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির যথার্থ পরিচয় সভ্য পৃথিবী আজো জানে না। নেপাল কারো চাইতে ছোট নয়।'

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে নেপালের রাজা তখন মহেন্দ্রর পিতা ত্রিভুবন, কিন্তু প্রকৃত শাসক মোহন সামসের রাণা। অন্যান্য উন্নতির পথে এগিয়ে গেলেও নেপাল ছিল অনেক পিছিয়ে। উচ্চশিক্ষার সুব্যবস্থা নেই, পথঘাট অনুন্নত, ব্যবসা-বাণিজ্য অনাধুনিক। জনসাধারণের অধি-কাংশই অশিক্ষিত, দরিদ্র। যাদের অবস্থা একটু ভালো তারা প্রচন্ড স্বার্থপর, যে যার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। পরের মঙ্গলের কথা কেউ চিন্তা করে না। অথচ নেপালের বাইরের নেপালীরা, যাঁরা দার্জিলিঙ, দেরাদুন, পাটনা, কাশীতে থাকতেন, তারা চিন্তা করতেন কিভাবে নেপাল ও নেপালী জাতির উন্নতি করা যায়। দেওকোটা কাশীতে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে রাণাশাহীর বিরুদ্ধে লিখতে আরম্ভ করলেন। অনেকের ধারণা হয়েছিল তিনি তীর্থদর্শনে কাশী গিয়েছেন।

কাশীতে তখন রয়েছেন মাতৃকাপ্রসাদ কৈরালা, বালচন্দ্র শর্মা (বর্তমানে রাশিয়ায় নেপালের রাজদূত), বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ কৈরালা ও ভট্টরাই বন্ধু প্রমুখ জ্ঞানীগুণী বুদ্ধিজীবী ও নেতৃবৃন্দ। দেওকোটা ভট্টরাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন।

কাশী থেকে 'যুগবাণী' পত্রিকা প্রকাশিত হত। এই পত্রিকায় দেওকোটা প্রজাতন্ত্র বিষয়ক রচনা লিখতে আরম্ভ করেন। আব্রাহাম লিঙ্কনের বক্তব্য উদ্ধৃত করে প্রজাতন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন, রাণাশাহীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করেন। নেপালীদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগাবার চেষ্টা করেন। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে তাদের সচেতন হতে আহ্বান জানান। অশিক্ষা অনাহার দূর করার কথা বলেন। তাঁর মতে অসিযুদ্ধ ছাড়া মসীযুদ্ধ কম শক্তিশালী নয়। এক্ষেত্রে ভলটেয়ারকে তিনি গুরু হিসেবে দেখেন। বন্দী করেও যার কলম থামানো যায় নি। মোহন শামসের ভয় পেলেন, ক্রুদ্ধও হলেন। তাঁর নেপালের বাড়ি অবরোধ করা হল, সামান্য জমি জমা সরকার নিয়ে নিলেন। দেওকোটার এক ছেলে টাইফয়েডে ভুগে বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। তার স্ত্রী এক ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে কাশীতে চলে গেলেন।

কিছুদিন পরই দেওকোটা কাঠমান্ডুতে ফিরে এলেন। মোহন শামসের তার ভাইকে পাঠিয়ে ওঁকে আনালেন। বাড়ি জমি ফেরৎ দেওয়া হল। দেওকোটার বাড়ির নাম 'কবিকুঞ্জ'।
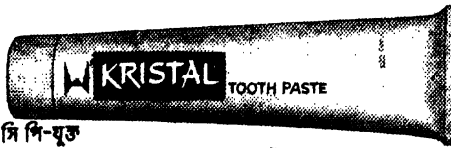
আবার টিউশানি শ্বরু করলেন। কয়েকদিন পরে ত্রিচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনার চাকরি পেলেন। কোনদিন নির্দিষ্ট সময়ে কলেজে যেতেন না। ঠিক সময়ে খেতে দিলেও বন্ধ্-বান্ধবদের সঙ্গে গল্প করতে করতে খাবার কথা ভুলে যেতেন। কখনো এমন মন দিয়ে কবিতা লিখতেন, আর সব ভুলে যেতেন। কলেজে গেলে মনপ্রাণ ঢেলে পড়াতেন। সেখানেও সময় মানতেন না। দ্বতিন ঘণ্টা একই বিষয় নানাভাবে ব্যাখ্যা করতেন। ছাত্ররাও মন্ত্রম্বগ্ধ হয়ে শ্বনতো।

ছোট গল্পের প্রতি তার তীব্র আকর্ষণ ছিল। ছোটগল্প লিখতে ভালবাসতেন। তাঁর মতে ছোটগল্প হবে একটি ছোট জানালা, যার ভেতর দিয়ে একটি ছোট প্বথিবী দেখা যাবে। তিনি বলেন, আজকের পৃথিবীতে সময়াভাবে, তাই বড় রচনার আদর কম, সবাই ছোট রচনা চায়। লেখকের কাজ হচ্ছে 'অন্ধকার রাতে' আলো দেখানো। কারণ লেখককে সকলে বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে, তার দেখানো পথে হাঁটে।

১৯৫১ খ্ৰীষ্টাব্দে নেপালে রাণার শাসন শেষ হল। প্রতিষ্ঠিত হল প্রজাতন্ত্র। যদিও রাজা রইলেন ওপরে। বন্ধ হল স্বেচ্ছাচার, স্বৈরাচার, রাণাদের অত্যাচার। মাতৃকাপ্রসাদ, বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ, বালচন্দ্র শর্মা, গণেশ মানসিং নেপালে এসে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। মন্ত্রিত্বের প্রতি কোন মোহ ছিল না দেও-কোটার। তাই প্রথম আমন্ত্রণ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন।

১৯৫৩ খ্ৰীষ্টাব্দে দেওকোটা দার্জিলিঙ ও কালিম্পংয়ে আসেন। পরবর্তী বছরে রুমানিয়ায় বিশ্বযুব সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেন। কুড়িদিন বুখারেস্টে ছিলেন। এরপর চীন ও রাশিয়ায় যান। সর্বত্রই বক্তৃতা দিয়ে-ছেন নেপালী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে, কবিতা পাঠ করেছেন।

১৯৫৫ খ্ৰীষ্টাব্দে দার্জিলিং থেকে আমন্ত্রণ পান টেক্সট ব্বক সিলেকশন কমিটির তরফ থেকে। দার্জিলিং থেকে গেলেন নয়াদিল্লী এশীয় লেখক সম্মেলনে যোগ দিতে। তখন খবর পেলেন তাঁর ছেলে প্রকাশ মারা গিয়েছে। খ্বব ভেঙে পড়েন তিনি। চিত্রশিল্পী হিসেবে প্রকাশের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। খ্বব ভালো ছবি আঁকত প্রকাশ।

১৯৫৭ খ্ৰীষ্টাব্দে আবার নয়াদিল্লী গেলেন লেখক সম্মেলনে যোগ দিতে। নেপালী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে স্বন্দর ভাষণ দেন। এই প্রথম নেপালী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে বহির্জগতের আগ্রহ বাড়ে। ভারত সরকারের সম্মানিত অতিথি হিসেবে তিনি বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। আকাশবাণী থেকে 'হামী নেপালী' (আমরা নেপালী) নামে কথিকা পাঠ করেন।

১৯৫৮ খ্ৰীষ্টাব্দে তিনি নেপালের শিক্ষা ও স্বায়ত্ত শাসন মন্ত্রীরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। চারমাস পরই অবশ্য পদত্যাগ করেন। মন্ত্রিত্বের মোহ তাঁর ছিল না। এই অল্প-সময়ে তিনি অনেক কাজ করেন। ত্রিচন্দ্র কলেজে এম-এ পড়ার ব্যবস্থা করেন। ত্রিচন্দ্র কীর্তিপ্বরে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্দেশ করেন। বর্তমানে ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যা-লয় ওখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নিজের শরীর ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে মোটেই সচেতন ছিলেন না। সারারাত জেগে লিখতেন, খাওয়ার কথা মনে থাকত না। অত্যাচারে অনাহারে অস্বস্থ হয়ে পড়লেন। কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে কিছ্বটা স্বস্থ হলেন। ফিরে আসতেই আমন্ত্রণ পেলেন আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে। স্ত্রী একা থাকতে রাজী নন। বাধ্য হয়ে স্ত্রী এবং অন্য একজন সঙ্গী নিয়ে তাসখন্দে গেলেন।

তাসখন্দের সাহিত্য সম্মেলনে ইংরেজি ভাষায় নেপালী সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। নেপালী কবিতা পাঠ করে সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিতে তর্জমা করে দেন। এরপর মস্কোয় গিয়ে একমাস হাসপাতালে ছিলেন।

ফিরে আসার পর ধরা পড়ল তাঁর ক্যান-সার হয়েছে। নেপালের শান্তভবনে ভর্তি হলেন চিকিৎসার জন্যে। রাজা মহেন্দ্র দ্বহাজার টাকা পাঠিয়ে দিলেন। জনসাধা-রণও এগিয়ে এল। সাধারণ মান্বষ তাঁকে ভালোবাসতো, শ্রদ্ধা করত। তাঁকে কলকাতায় আনা হল। একমাস পর ফিরে গেলেন। চিকিৎসকরা কোন ভরসা দিতে পারলেন না। অবস্থার অবনতি হতে থাকে ক্রমশঃ। শ্বধ্বমাত্র ফলের রস পান করে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল আবার রাশিয়ায় গিয়ে চিকিৎসা করাবেন। তা সম্ভব হয়নি। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বলতেন—আমায় পটাশিয়াম সায়নায়েড দাও।

রাজমাতা টাকা পাঠালেন। রক্ত দেবার জন্যেও অনেকে প্রস্তুত। দিবারাত্র বহ্ব লোক আসে তাঁকে দেখতে, খোঁজখবর নিতে। তিনি রক্ত নিতে অস্বীকার করলেন। পশ্বপতিনাথের কাছে আর্যঘাটে নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে। কবি শিরোমণি লেখনাথ দেখা করতে এলেন। তাঁকে প্রণাম করতে উঠতে গেলে বাধা দিলেন—তুমি সবচেয়ে বড়, আমার প্রণাম করতে হবে না।

স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন—কত টাকা আছে তোমার কাছে?

—শ' দ্বই-তিন হবে। উত্তর দেন তাঁর স্ত্রী।

ম্লান হেসে বলেন দেওকোটা—আর বেশিদিন বেঁচে থাকলে খেতে দিতে পারবে না। এই কথা শ্বনে চোখের জল ফেললেন তাঁর স্ত্রী।

মন্ত্রী গণেশ মানসিং দেখা করতে এলেন। জানতে চাইলেন কবির শেষ ইচ্ছা কি। উত্তর দিলেন দেওকোটা—আমি মাটিতে মিশে যাব কিন্তু তারপরও যেন নতুন নেপালের জন্ম হয়। নেপালে যেন যথার্থ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মান্বষ যেন স্বখে থাকে, স্বাধীনভাবে বসবাস করার স্বযোগ পায়। কারো প্রতি আমার রাগ নেই, ক্ষোভ নেই, প্রতিটি নেপালীর প্রতি, প্রতিটি বিশ্ব-মানবের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমি সকলের ভালোবাসা পেয়েছি, সকলের সহায়তা, সহান্বভূতি পেয়েছি।

২০১৬ বিক্রম সম্বতে (১৯৬০ খ্ৰীষ্টাব্দে) ২৯শে ভাদ্র সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সমগ্র নেপালকে শোকসাগরে ভাসিয়ে দিয়ে যান।

প্রথম শোকবার্তা পাঠান রাজা মহেন্দ্র। এরপর গণেশ মানসিং, কৃষ্ণপ্রসাদ ভট্টরাই তাঁদের বার্তায় বলেন—একটি অতুলনীয় প্রতিভার মৃত্যু হল। ভারতীয় দূতাবাসের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি শিউমঙ্গল সিং 'স্বমন' বলেন—'দেওকোটার আবির্ভাব একটি ঘটনা। একটি যুগান্তকারী প্রতিভা। এমন একজন কবির জন্যে রাষ্ট্রকে তপস্যা করতে হয়। তাঁর মৃত্যুতে যে ক্ষতি হল তা অপূরণীয়। একজন কবির জন্যেই নেপালী সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের পাশে ঠাঁই করে নিতে পারবে। রাহ্বল সাংস্কৃত্যায়ন বার্তা পাঠালেন— 'প্রসাদ-পন্থ-নিরালার সমন্বয়ে এক মহাকবি দেওকোটার সৃষ্টি হয়েছে।

লক্ষ্মীপ্রসাদ দেওকোটা রচিত উল্লেখ-যোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ :

মহাকাব্য : শাকুন্তল, স্বলোচনা, মহারাণা প্রতাপ।

খণ্ডকাব্য : ম্বনামদন, রাজকুমার প্রভাকর, কুঞ্জিনী, রাবণ জটায়্ব যুদ্ধ, কৃষিবালা, বনকুস্বম, নবরস, সীতাহরণ, মায়াবিনী সরসী, লূনী, দ্বষ্মন্ত-শকুন্তলা ভেট।

গীতিকাব্য : বাসন্তী, স্বন্দরী প্রজোপিনা, মৈনা।

কবিতা সংগ্রহ : প্বতলি, ভিখারি, স্বনকো বিহান, মনোরঞ্জন, আকাশ-গঙ্গো।

নাটক : সাবিত্রী-সত্যবান।

উপন্যাস : চম্পা।

প্রবন্ধ : লক্ষ্মী-নিবন্ধ সংগ্রহ।

অন্বাদ : প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ-সংগ্রহ।

বেলোয়ারি

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

ছেঁড়া চটিটা ফটর ফটর করে অল্প খুঁড়িয়ে চায়ের দোকানে ঢুকলো বিপ্লব।

দোকানের মালিক আধবুড়ো সুচাঁদ মোদক চশমার ফাঁক দিয়ে একবার দেখে নিলে বিপ্লবকে। এ চত্বরে সুচাঁদের চায়ের দোকানের নাম-ডাক আছে। দোকান যে মোদক কখন খোলে আর কখন বন্ধ করে তা কেউ সঠিক বোলতে পারে না। ভোর চারটের সময় রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ালে দেখা যাবে সুচাঁদের দোকান খোলা। বেলোয়ারী উনুনে কালিপড়া তোবড়ানো ড্রামে জল ফুটছে টগবগ্ করে। এ সময়ের খদ্দেররা দোকানের ভেতর বড় একটা বসে না। বাইরের বেঞ্চিতে বোসেই এ্যালুমিনিয়ামের গেলাসে চা-পান পর্ব শেষ করে। পাটকলের টাইমবাবু থেকে শুরু করে জেলের দল, সবাই এসে জমায়েত হয় এই সময়ে। লেড়ো বিস্কুট সহযোগে চা-পান শেষ করে চলে যায় যে যার কাজে। রাত বারোটা সাড়ে বারোটাতেও শোনা যায় পরোটা ভাজার খপাখপ শব্দ। ছোকরা বিশু লোহার চাটুর ওপর বনস্পতি ছিটিয়ে খপাখপ সিঁকছে পরোটা। আলুর তরকারী আর পেঁয়াজ কুচো দিয়ে পরোটা দিচ্ছে কলাইয়ের থালায় ওপর। মাংসের আয়োজনও আছে। খদ্দেরের চাহিদা মত দিয়ে দিচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের বাটি করে। এ সময়ের খদ্দেররা নিশাচর। অনেকেই তখন অন্য জগতে বিচরণ করছে। চোখে তাদের রঙের নেশা, দেহ টলমলে। কুলোকে বলে, সুচাঁদের দোকানে বিশেষ দামে বিশেষ সময়ে গোপনে রঙের ব্যবস্থাও আছে। সে যাই হোক, সুচাঁদের চায়ের কিন্তু মস্ত নাম। বেশ দূরে দূরে থেকে চায়ের জন্যে আসে মানুষ। পাড়ার বা আশেপাশের লোকের তো কথাই নেই। প্রবাদ, সুচাঁদ নাকি চায়ের সঙ্গে আফিং দেয়, তাই একবার খেলে আবার আসতে হয়।

পাজামাটা হাঁটুর ওপর তুলে পা দুমড়ে বেঞ্চির ওপর বাবু হয়ে বসে পড়লো বিপ্লব। টেবিলের ওপর ছড়ানো সস্তা কাগজের একটা পাতা নিজের কাছে টেনে নিয়ে হাঁক দিলে—'বিশু, একটা মাঝারী হাফ্ আর একটা লেড়ো।'

কাগজ পড়ায় মন দিলে বিপ্লব। বিশু চা আর বিস্কুট রেখে গেলো সামনে। বিস্কুটে একটা কামড় দিয়ে কাগজ পড়তে পড়তে চেঁচিয়ে ওঠে বিপ্লব—'শালা, যতসব বুজরুকি! পাঁচ হাজার লোকের সমাবেশ! হুঃ!' সুচাঁদ চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলে—'কি হোল বিপ্লববাবু?'

এক চুমুকে চা গলায় ঢেলে দিয়ে বিস্কুট শুদ্ধ কোৎ করে গিলে ফেললে বিপ্লব। তারপর সুচাঁদের দিকে চেয়ে বলে—'শালা, এই কাগজের অফিসের লোকগুলো হচ্ছে অজ্ঞানের একশেষ। পাঁচ হাজার লোকের সমাবেশ! মাজাকি করার জায়গা পায়নি! আমি বলে নিজে ছিলুম মঞ্চের সঙ্গে। খুব বেশী হয় তো দেড়হাজার।'

কষা কষা কালো দাঁত বার করে হি-হি করে হেসে বলে উঠলো সুচাঁদ—'তোমার তাহলে কাল ডাক পড়েছিলো?'

—'আর বলো কেন, যতসব ঝুট ঝামেলা। শালা চারটে টাকার জন্যে তিন মাইল হাঁটা, তার ওপর পুলিশের গুঁতো। এই দ্যাখো না, পুলিশের তাড়া খেয়ে ছুটতে গিয়ে হোঁচট লেগে ডান পায়ের তেরোটা বেজেছে একেবারে। এখনো টন্‌টন্‌ করছে,'—বিপ্লবের মুখে বিরক্তি ফুটে ওঠে।

দোকানে ঢুকলো ফটিক। গায়ে খবরের কাগজ মার্কা হাওয়াই সার্ট, কোমর থেকে আঁট হয়ে নেমে এসেছে সবুজ রঙের প্যান্ট।

পায়ের গোছের কাছ পর্যন্ত এসে থেমে গেছে আর নামার সুযোগ পায়নি। বিপ্লবের উল্টোদিকের বেঞ্চির ওপর বসে পড়ে জিজ্ঞেস করলে—'কিরে, আজ কলেজ যাবি না?'

—'নারে। পায়ে ভীষণ ব্যথা।'

—'কাল মিছিলে গেছলি বুঝি? পুলিশের তাড়া খেয়েছিস?'

বিপ্লব কাগজের ওপর চোখ নামিয়ে শুধু ঘাড় নাড়লে।

—'তবে তো মাইরি তোর পকেট ভর্তি আজ। ছাড়না বাবা কিছু। বোলে দেনা বিশুকে।'

বিপ্লব কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলের এক-পাশে সরিয়ে রাখলে। তারপর পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে পকেট শুদ্ধু ফটিকের নাকের ওপর ঘসে দিয়ে বোলে উঠলো—'দেখছিস্ না, পকেট একেবারে পয়সায় ঝন্ঝন্ করছে।'

—'কেন ভড়কি দিচ্ছিস বাবা! তুই কি সেই চীজ যে চার চারটে টাকা রাতারাতি খরচ করে ফেলবি? সোজাসুজি বল না, খরচ হবার ভয়ে বাড়ীতে রেখে এসেছিস।'

টেবিলে একটা চাপড় মেরে বলে ওঠে বিপ্লব—'যে শলা মিছে কথা বলে সে শলা......।'

কথার মাঝখানেই হাঁ হাঁ করে ওঠে মোদক, বলে—'থাক থাক বিলুবাবু, খুব হয়েছে। আর এগিয়ে দরকার নেই।'

ফটিক ছাড়বার পাত্তর নয়। বিপ্লবের থুতনি ধরে একটু নাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—'চার চারটে টাকা রাতারাতি কিসে খরচ করলি মানিক?'

আরে চারটাকা কি হাতে পেয়েছি। এক টাকা কেটে নিলে মহেশলাল, বললে কমিশন। শলা রোদে পুড়ে, বৃষ্টি মাথায় করে তিন মাইল পথ গলা ফাটাতে ফাটাতে যাবো আমরা, আর শুয়োরের বাচ্চা কমিশন নেবে আমাদের হকের পাওনা থেকে। দেবো একদিন এমন রগড়ানি যে জীবনে আর কমিশনের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করবে না।' রগড়ানি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব হাতটা কাল্পনিক মহেশলালের দেহের নিচের দিক থেকে ওপরের দিকে রগড়াতে রগড়াতে নিয়ে গেল। তারপর আবার শুরু করলে—'তিনটে টাকা পকেটে নিয়ে সবে পৌঁছেছি মনুমেন্টের কাছাকাছি, পুলিশ করলে তাড়া। দে ছুট, দে ছুট। খানিকটা গিয়ে হাঁপিয়ে বোসে পড়লুম মাঠের ওপর। ওমা, কোথায় ছিল শুঁটকি শিবানী। গায়ের ওপর ঘেঁসে বোসে পড়ে আদুরে গলায় বললে-বিপ্লবদা চিনেবাদাম খাওয়াও।' ঐ তো চেহারার ছিরি, দেখলেই খোলা চোখ বুজে আসে। তবু কি করি, আঁশটে গন্ধ তো আছে। নে বাবা, খা। চিনে বাদাম আর কত খাবে, দু আনা নয়তো চার আনা। আমারো অদৃষ্ট মন্দ। সবে চিনে-বাদাম খাওয়া শেষ হয়েছে, অমনি ঝাল-মুড়ি হাঁকিতে হাঁকিতে পূর্ববঙ্গ সন্তানের আবির্ভাব। শুঁটকির নোলা একেবারে চুলকে উঠলো.—বিপ্লবদা মাখাচোখা খাবো। মাইরি মনে হোল গায়ে যেন বিছুটি ছিটিয়ে দিলে। ইচ্ছে হোল চটকে দুমড়ে ওকেই মাখা-চোখা বানিয়ে দি। কিন্তু কি করবো, তখনো বাদ আলো রয়েছে। শলা পয়সাও গেল, হাতের সুখও হোল না। বেকুবের মত দিতে হোল পয়সা বার করে। চিনেবাদাম আর মাখাচোখায় গেল একটা টাকা। রইল বাকি দুই। সেটা কি হোল বল দেখি?'

ফটিক দেড় ইঞ্চি ঢোকা চোখ দুটো দিয়ে মরা ভাড়ার মত চেয়ে রইল বিপ্লবের দিকে।

—'শুঁটকিটা যাবার সময় চেয়ে নিয়ে গেল বাকি দুটো টাকা। বললে নইলে ওদের হাঁড়ি চড়বে না।'

—'তাই বলে তুই দিয়ে দিলি দু দুটো টাকা!' ফটিকের চোখে মুখে বিস্ময়।

—'কি করি বল না, কেঁদে ফেললে যে।'

—'চোখের দু ফোঁটা জল দেখেই তুই অমনি গলে গেলি?'—এ প্রসঙ্গ অসমাপ্ত রেখেই ফটিক হঠাৎ মুখে একটা শব্দ করলে চক্ চুক্,—চু......ক্।

—'কিরে কি হোল?'

ফটিকের দুটো চোখ নেচে উঠলো, ফিস্ফিস্ করে বললে—'মাল আসছে।'

দুজনেই তাকালো দোকানের সামনের রাস্তার দিকে।

একটি সতেরো আঠারো বছরের মেয়ে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে, হাতে কিছু বই খাতা। দোকানের সামনে আসতেই ফটিক গলা থাকারি দিয়ে থিয়েটারি ভঙ্গীতে বলে উঠলো—হায়, পাষাণ-প্রতিমা। তুমি তো দিবে না ধরা। কৃপা করি তোল আঁখি বারেকের তরে, জুড়াক এ তৃষিত হৃদয়।

মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো একবার। তারপর রাস্তার ওপর এক ধ্যাবড়া থুতু ফেলে এগিয়ে গেল হন্হন্ করে।

ফটিক সামনে ঝুলে পড়া চুলগুলো কপালের ওপর থেকে হাত দিয়ে তুলে নিয়ে বলে উঠলো—'দেখলি, দেখলি থুতু ফেলে গেলো।'

—'ফেলবেই তো। রাস্তায় না ফেলে তোর মুখে যে ফেলেনি এই তোর ভাগ্যি। পাড়ার মেয়েদের নিয়ে অত নোংরামি করিস কেন?'

—'আরে মাইরি, তুই যে হঠাৎ ব্যাসদেব বনে গেলি রে। আমি বাবা যা করি—সামনা-সামনি করি। ঢাকঢাক গুড়গুড় আমার ভালো লাগে না। মাইরি, মেয়েটাকে দেখলে আমার বুকের ভেতরটা যেন কিরকম করতে থাকে। মনে হয় ছুটে গিয়ে......।'

ফটিকের কথার মাঝখানেই বিপ্লব হাঁক পাড়ে—'বিশু, আর একটা কড়া হাফ্ দিয়ে যা।'

ফটিক বিপ্লবের মুখের দিকে চেয়ে বলে ওঠে—'তুই মাইরি একের নম্বরের ছোট-লোক। একটা বললি কোন আক্কেলে!'

বিপ্লব আবার হাঁক দেয়—'আচ্ছা দুটো দিয়ে যা।'

—'শুধু চা কিরে! একটা লেড়ো অন্ততঃ দিতে বল।'

—'নারে পকেট একেবারে খালি। তাছাড়া অনেক ধার জমে গেছে দোকানে।'

—'কেন দিক করছো গুরু। সকালে বাজার করতে তো গেছলে, কিছু [illegible] আর হাতাওনি বাজারের পয়সা থেকে।'

ভেংচি কেটে বলে ওঠে বিপ্লব—'বাজার করতে গেছলে। ফুঃ, বাজারের পয়সা থেকে হাতাবে! বরং পকেট থেকে কিছু দিলে ভালো হয়। তিনটে টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে মা বলবে বাজারটা তুলে নিয়ে আসতে। শলা এক প্যাকেট চারমিনারের দাম তুলতে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়।'

চা নিয়ে আসে বিশু। চা শেষ করে [illegible] পড়ে বিপ্লব। সুচাঁদকে বলে—[illegible] রাখ মোদক।'

সুচাঁদের [illegible] পড়ে আবার। চশমাটা [illegible] দিয়ে আমতা আমতা [illegible] জমে গেল, কিছু দিয়ে [illegible] বিলুবাবু।'

—'তুমি বড় [illegible] তো পয়সা হাতে [illegible]

ফটিক কুট [illegible] ভালো মোদক যে [illegible] দোকানে চা খেতে। [illegible] করে তাগাদা [illegible] দোকান। না আছে [illegible] না ঢোকে কোন [illegible] দোকানে। কতদিন [illegible]

সাজিয়ে গুজিয়ে বোস। দেখবে খদ্দেরে খদ্দেরে ভরে যাবে। রং বেরংয়ের শাড়ীর রংয়ে ঝলসে যাবে তোমার চোখ।'

বেরিয়ে পড়ে সুচাঁদের কয়া কালো দাঁত, বলে—'ফটিকবাবু, আম জাম কাঁঠাল পাকলে খেতে ভালো লাগে, দামেও বিক্রী হয়; কিন্তু বয়েস বাড়লে মানুষ কোন কাজেই আসে না। তাকে দেখলে মেয়েমানুষ দশ হাত দূরে সরে যায়। আমার দোকানে মেয়ে মানুষ আসবে কি গো! তোমাদের এখন বয়সকাল, তোমাদের দেখলে বরং মেয়েমানুষ ছিটকে এগিয়ে আসবে।' বিপ্লব ও ফটিক দুজনেই গলা ফাটিয়ে হেসে উঠলো, তারপর নেবে গেলো দোকান থেকে।

সুচাঁদ কপালে তোলা চশমাটা নাবিয়ে দিলে নাকের ওপর। চেয়ে চেয়ে দেখলে ওদের চলে যাওয়া। তারপর নিজের মনেই বলে উঠলো—'উঃ, শালা ছেলে হয়েছে আজকালকার বটে। ঐ তো গোলাপী রেউঁড়ি মার্কা তেলপাতার সেপায়ের মত চেহারা, তাব আবার চ্যাটাং চ্যাটাং বাক্যি দেখ না। যেন বেনায়ের দোকান পেয়েছে যে মাগনায় রোজ চা-বিস্কুট খেয়ে যাবে। দোবো একদিন চায়ের সঙ্গে ফলিডল মিশিয়ে টের পাবে সেদিন।'

বাড়ী ঢুকেই বিপ্লব শুনলো মা আপন মনেই গজ্-গজ্ করছে। বিপ্লবকে দেখেই চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—'হ্যাঁরে বিলু, কি ছাইভস্ম বাজার করেছিস্? আমি কি দিয়ে কি করি বল দেখি? আমার মুণ্ডুটা রেঁধে কি তোদের পাতে দোবো?'

শরীর মন দুই অবসন্ন। বিপ্লব বিরক্তির সঙ্গে জবাব দেয়—'শুধু শুধু বক্-বক্ কোরো না। বাজার তো যাওনা, জানবে কি করে বাজারের অবস্থা।'

—'তোকে বলেছিলুম একটা সিঙি মাছ আনতে, তা আনিস নি। রোগা মেয়েটাকে কি দিয়ে খেতে দিই এখন'—মার খেদোক্তি।

—'তোমার কথার কোন মাথামুণ্ডু নেই মা। তিনটে টাকা দিয়ে বোলবে বাজারশুদ্ধু তুলে আনতে। মাছওলা কি আমার শালা-সম্বন্ধি হয় যে মুফতে দিয়ে দেবে।'—কথা বোলতে বোলতে বিলু গিয়ে ঢোকে ঘরের মধ্যে। জমাটা ছেড়ে সবে বিছানায় একটু বসেছে, আবার মায়ের আবির্ভাব—'হাঁরে, মিনুর ওষুধটা আনবি না?'

চেঁচিয়ে উঠলো বিপ্লব—'আমি এখন আর ওষুধ আনতে যেতে পারবো না।'

—'তাহলে ওষুধ আনবার জন্যে আমি কি লোক খুঁজতে বেরোবো নাকি?'

—'বাজার যাবার সময় দাওনি কেন?'

মা নিজের কপাল চাপড়ে [illegible]—'এই বুদ্ধির জন্যেই তো পাশ করতে [illegible] না তুই। ডাক্তার এসে দেখে [illegible] তবে তো আমি দেবো তোকে।'

বিপ্লব বিছানা থেকে [illegible] জামাটা গলিয়ে নেয় গায়ে। তারপর [illegible] 'দাও, টাকা আর প্রেসক্রিপসন।'

মা প্রেসক্রিপসনটা [illegible] ধরিয়ে দিয়ে বল্লেন—'ওষুধটা [illegible] খানা থেকে নিয়ে আয় [illegible] মিটিয়ে দোব।'

প্রেসক্রিপসনটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে ওঠে বিপ্লব—'আমার দ্বারা হবে না ওসব। খালি ধার ধার আর ধার। তুমি তো বলে খালাস। ডাক্তারের কম্পাউণ্ডারের বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা, শুনলে খুন চেপে যায় মাথায়। শেষে কি রক্তগঙ্গা করবো একটা?'

মেঝে থেকে প্রেসক্রিপসনটা কুড়িয়ে মা শান্ত গলায় বলেন—'যা বাবা তিনদিন ধরে ছেলেটা একজ্বরী। ওষুধ না পড়লে কিছুতেই ছাড়বে না জ্বর।'

গজ্ গজ্ করতে করতে প্রেসক্রিপসনটা মার হাত থেকে নেয় বিপ্লব—'সকাল থেকে উঠে যতসব ঝুট ঝামেলা। শালা কম্পাউণ্ডার তেড়াব্যাঁকা বললে দেবো আজ দাঁতের পাটি খসিয়ে।'

—'না বাবা, রাগারাগি করিস নি। মিষ্টি কথায় ওষুধটা নিয়ে আয়। বলবি যা দাম বাকি পড়েছে মাসকাবারে মিটিয়ে দোব।'

চৌকাঠ পেরিয়ে চটিটা পায়ে গলায় বিপ্লব। যেতে যেতে ফিরে দাঁড়ায়। মাকে বলে—'আজ ছটা টাকা দিতে হবে মা। চটিটা একেবারে ছিঁড়ে গেছে। একটা না কিনলে আর রাস্তা চলা যাবে না।'

অবাক হয়ে মা চেয়ে থাকেন বিপ্লবের মুখের দিকে। বলেন—'সে কি রে! এখন টাকা পাবো কোথায়! পেরেক টেরেক ঠুকে কটা দিন চালিয়ে নে। মাসকাবারে বরং দেখবো চেষ্টা করে।'

ঝাঁঝিয়ে ওঠে বিপ্লব—'ধ্যুৎ তোর মাসকাবারের নিকুচি করেছে। ওষুধের দাম—মাসকাবার, চটিজুতো—তাও মাসকাবার। কাল বলবে'খন বাজার করে নিয়ে আয়, মাসকাবারে দাম দোবো। কত কি করবে তুমি মাসকাবারে?'

চালাতে [illegible] অপগণ্ড ভাই-বোনেদের দুবেলা [illegible] পুজোতেই তো মাইনের সব কটা টাকা বেরিয়ে যায়, অন্য জিনিস আর হবে কোথা থেকে?'

মেজাজটা বিগড়েই ছিল বিপ্লবের। মায়ের কথার জবাবে চেঁচিয়ে বলে ওঠে—'খেতে দেবার ক্ষমতা যদি না থাকে তো এতগুলো ছেলেপিলে হয় কেন?'

ঝুলে পড়া আঁচলটা কাঁধের ওপর ফেলে মা-ও চীৎকার করে ওঠেন—'কি বললি। মুখ সামলে কথা বলবি বিলু।' মা-র চীৎকারে সম্বিৎ ফিরে পায় বিপ্লব। আর একটিও কথা না বলে তাড়াতাড়ি পা বাড়ায় সদরের দিকে।

আঁচলটা যখন মা কাঁধের ওপর ফেলেন বিপ্লব দেখতে পেলো আঁচলের কাছে কাপড়টা ফালাফালা হয়ে ছিঁড়ে গেছে। রাস্তায় বেরিয়ে বিপ্লবের মনটা কেবলই খচ্ খচ্ করতে লাগলো,—মা অত ছেঁড়া কাপড় পরে আছে! মার কি আস্ত কাপড় একেবারেই নেই? তার ওপর মুখ ফসকে ঐ কথাটা বেরিয়ে পড়ায় আফশোসের অন্ত নেই বিপ্লবের।

নিজের জুতোর কথা ভুলে গেলো বিপ্লব। একটা পেরেক উঠে ফুটছিল পায়ে। ব্যথা ব্যথা করছিল গোড়ালির তলায়। পেরেকের ব্যথার কথাও ভুলে গেল বিপ্লব; মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলো মার ছেঁড়া আঁচল।

ডাক্তারখানায় এসে প্রেসক্রিপসন দিয়েছে কম্পাউণ্ডারের হাতে। মিষ্টি করে বলেছে

দামটা দিয়ে যাবে মাসকাবারে। কম্পাউণ্ডার চেনে বিপ্লবকে। ধারে দেবার ইচ্ছে না থাকলেও বলতে সাহস করেনি সে কথা। প্রেসক্রিপসন নিয়ে ঢুকে গেছে ডিসপেন-সারির ভেতরে।

সামনের বেঞ্চটাতে ওষুধের অপেক্ষায় বসে আছে বিপ্লব। মার ছেঁড়া আঁচলের ছবিটা ফুটে উঠছে চোখের সামনে আর বিতৃষ্ণায় ভরে যাচ্ছে মন। একখানা নতুন কাপড় কি বাবা কিনে দিতে পারে না মাকে? সঙ্গে সঙ্গে ছ'টা ভাইবোনের মুখ ভেসে উঠলো চোখের সামনে। ছ'টা ভাই-বোন মা-বাবা, এতগুলো পেটের অন্নের সংস্থান করতে হয় বাবাকে। কেরানীর চাকরি, কতই বা আর মাইনে পান। যা পান সবই তো তুলে দেন মার হাতে। তাতে বোধহয় নতুন কাপড় পরা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ মনে হয় বিপ্লবের, বাবা খুবই অবিবেচক। কেন হয় এতগুলো ছেলেমেয়ে যদি তাদের খেতে পরতে দেবার সঙ্গতি না থাকে? তখনি মার মুখটা ভেসে উঠলো মানসপটে, চিন্তার ধারাটা বইতে শুরু করলো অন্যদিকে। সে তো আজ উপযুক্ত সন্তান, তার তো উচিত সংসারে সাহায্য করা। কিন্তু কোথায় চাকরি? কে দেবে চাকরি? এম-এ—বি-এ পাশ করে রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কত লোক। কত পাশ-করা ইঞ্জি-নীয়ার বসে বসে বাত ধরাচ্ছে দেহে। আর সে তো সবে কলেজে ঢুকেছে। তার চাকরি পাবার আশা দুরাশা। তাহলে কি করবে সে? শুধু দর্শকের মত বসে বসে দেখে যাবে মার ছেঁড়া কাপড়, বাবার তালিমারা জুতো, ভাই-বোনদের শুকনো মুখ আর ডিগডিগে চেহারা! নাঃ, কিছু একটা তাকে করতেই হবে। কিন্তু কোনদিকেই আলোর ইঙ্গিত দেখতে পায় না বিপ্লব। সর্বদিকই অন্ধকার। চাকরি হবে না। ব্যবসা করতে গেলে মূলধনের প্রয়োজন। তবে কি করবে সে? ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে পকেট মারবে? ধরা পড়লে মুখে চুন-কালি পড়বে, গায়ে পড়বে চোরের ঠ্যাঙানি। তবে—? তবে কি তাদের জন্যে কোন পথই খোলা নেই? হঠাৎ মনে পড়লো মহেশলালকে। কি যেন একটা ব্যবসার কথা বোলেছিল। মূলধন কিছু লাগবে না। কাজের ওপর কমিশন পাওয়া যাবে মোটা। মহেশলালটা শয়তান, এক নম্বরের স্মাগলার। হোক স্মাগলার, তবু তো যা হোক একটা রোজগারের পথ করে দিতে রাজী সে।

সন্ধ্যের সময় বিপ্লব আসে মহেশ-লালের বাড়ীতে। মহেশলাল তখন রংয়ের ঘোরে খানিকটা রঙীন। বিপ্লবকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে টালসামলাতে না পেরে আবার বসে পড়ে তাকিয়া ঠেস দিয়ে। বসে বসেই আহ্বান জানায় বিপ্লবকে—'আরে বিলুবাবু যে। আসুন, আসুন। কি ভাগ্য আমার, আপনার পায়ের ধুলো পড়লো আমার এই গরীবখানায়।' পরে অন্তরালে কাকে উদ্দেশ করে বলে উঠলো—'ওরে চা নিয়ে আয়।'

বিপ্লব ততক্ষণে বসে পড়েছে মহেশ-লালের সামনে পাতা ফরাসে। —'না না, চা-টার দরকার নেই। একটা কাজের জন্যে এসেছি তোমার কাছে।'

মহেললাল বিলক্ষণ চেনে বিপ্লবকে। বিপ্লবের কথা শুনে বলে ওঠে—'কাজ না থাকলে কি বিলুবাবু শুধুশুধু সময় নষ্ট করার জন্যে আমার মত একটা চামচিকের কাছে আসে। কাজ তো আছেই, কিন্তু এক কাপ চা খেতে দোষ কি। ভয় নেই আমার বাড়ীর চায়ে আফিং মেশানো হয় না।' টেনে টেনে হাসে মহেশলাল। পরে বলে—'বলুন কি কাজ?'

বিপ্লব একটু আমতা আমতা করে বলে—'সেদিন যেন কমিশন বেসিসে কি ব্যবসার কথা বলছিলে?'

বিপ্লবের কথা শুনে হো-হো করে হেসে ওঠে মহেশলাল, বলে—'ব্যবসা তো আছে হরেক রকমের। কিন্তু আপনি কি করবেন সেসব ব্যবসা?'

—'না না, মহেশলাল। একটা কিছু না করলে আর চলছে না। বাবার একার রোজগারে সংসারের কোনদিকেই কিছু হচ্ছে না।'

চা এসে গেল।—'নিন, চা খেতে খেতে কথা বলা যাক বিলুবাবু।'

বিপ্লব চুমুক দেয় চায়ের কাপে।

—'আপনাকে তো কতদিন বলেছি বিলুবাবু, আসুন, ভাগে কারবার করি। আপনি আমার কথায় কানই দেন না। কিছু মনে করবেন না বিলুবাবু, আপনারা, বাঙালীরা, ব্যবসা বোঝেন না। নইলে কলকাতায় পয়সা উড়ছে, ধরে নিতে পারলেই হল।'

খালি কাপটা একপাশে সরিয়ে রেখে বিপ্লব বলে—'বল, আমার দ্বারা কি ব্যবসা হতে পারে?'

—'আরে বাপ, আপনি যাতে হাত দেবেন, তাতেই সোনা ফলবে। আপনার বুকটা চওড়া কতখানি। আর ঐ চওড়া বুকে সাহস কত।' একটু থেমে মহেশলাল আসল কথায় আসে— 'দেখুন বিলুবাবু, ব্যবসা অনেকরকম আছে। যে ব্যবসায় ঝুঁকি বেশী, সে ব্যবসায় পয়সাও বেশী।'

মহেশলালের এইসব অবান্তর কথা ভাল লাগছিল না বিপ্লবের। একটু বিরক্তির সুরে বলে ওঠে বিপ্লব—'তুমি পরিষ্কার করে খুলে বল মহেশলাল।'

—হে হে......হাসে মহেশলাল। 'আমার কাছে সবই খোলা বিলুবাবু।' বিপ্লবের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলে মহেশলাল—'মেয়েমানুষের ব্যবসা করতে পারবেন?'

বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে বিপ্লব—'মেয়েমানুষের ব্যবসা!'

—'অবাক হচ্ছেন কেন? আজকাল এই ব্যবসাই তো খুব ফলাও করে চলেছে। যতসব ভেকধারী দেখছেন, সব ব্যাটা ডুবে ডুবে জল খায়। দুটো পয়সা ভিক্ষে দেবে না কিন্তু মেয়েমানুষের জন্যে এক রাত্তির দুশো টাকা খরচ করতে পেছপাও নয়। আর এই যে সব কোট-প্যাণ্টপরা দিশী সাহেব দ্যাখেন, বড় বড় সভা সমিতিতে যারা বড় চেয়ারটা দখল করে বড় বড় গালভরা কথা বলে, বাড়ীতে পাশপোর্ট রেখে দিয়েছে একটা বিয়ে করা বউ, কিন্তু বাইরের মেয়ে-মানুষের জন্যে হন্যে কুকুরের মত ঘুরে বেড়ায়। ওদের পকেট ভর্তি কালো টাকা, তার বেশীরভাগই তো যায় এই মেয়ে-মানুষের নেশায়। আমাদের ভাগ্যেও আসে তার একটা মোটা অংশ।' —একনাগাড়ে কথা বলে মহেশলাল থামে।

বিপ্লবকে একটু ভাবার সময় দেয় মহেশলাল। পরে জিজ্ঞেস করে—'বলুন রাজী তো?'

বিপ্লবের বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। আপন মনে উচ্চারণ করে—'মে-য়ে-মা-নু-ষে-র ব্য-ব-সা!'

—'এতে এত অবাক হবার কি আছে বিলুবাবু! কতলোক এই ব্যবসা করে ফুলে ফেঁপে উঠলো চোখের সামনে।'

—'তুমি বলছো কি মহেশলাল! পয়সার জন্যে মেয়েমানুষের দালালী করবো?'

—'কেন করবেন না? ব্যবসা, ব্যবসাই। আপনি আমাকে দেখাতে পারেন যুধিষ্ঠির হয়ে কেউ ব্যবসায়ে উন্নতি করেছে? কার-বারের পারমিট, লাইসেন্স থেকে আরম্ভ করে ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করতে যান, ঘুষ ছাড়া কোন কাজই হবে না। তাছাড়া আপনার জানাশোনা অনেকেই তো করছে এই ব্যবসা।'

বিপ্লবের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়—'আমার জানা-চেনা! কে সে?'

মহেশলাল জিভ কেটে বলে ওঠে—'তা কি কখনো বলতে পারি? ট্রেড সিক্রেট বলে তো একটা কথা আছে।'

—'তুমি বলই না, আমি কারো কাছে প্রকাশ করবো না।'

মহেশলাল মুখটা কানের কাছে নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলে—'আপনার বন্ধু ফটিকবাবু।'

—ফটিক। ফটিক মেয়েমানুষের দালালী করে।'—বিপ্লবের চোখে মুখে বিস্ময়।

—হ্যাঁ বিলুবাবু। ফটিকবাবু করে এ কাজ। তবে বেশী কিছু পায় না, কারণ ওর প্রেজেন্টেশন খুব ভালো না।'

বিপ্লব দৃঢ়কণ্ঠে বলে ওঠে—'করুক ফটিক। আমি ও কাজ পারবো না।'

কথা বলে উঠে পড়ছিল বিপ্লব। মহেশলাল হাঁ-হাঁ করে উঠলো—'আরে উঠছেন কেন? ব্যবসা কি শুধু ওই একটাই আছে? আরো আছে।'

আবার বসে পড়লো বিপ্লব। বললে—'বল, আর কি কাজ আছে তোমার কাছে?'

—মালপত্তরের লেনদেনের কারবার করুন, তাতেও ভালো পয়সা পাবেন। পঁচিশ পারসেন্ট কমিশন মিলবে।'

—মালপত্তরের লেন-দেন, মানে স্মাগলিং?'—বিপ্লবের মুখটা ফুলে উঠলো রাগে।

—সে আপনি যেমন বলেন।'

—তারপর যখন ধরা পড়বো তখন কি আমার হয়ে জেল খাটবে তুমি?'

হেসে উঠলো মহেশলাল—'আরে বিলু বাবু, দুনিয়াজোড়ে এই কারবার চলছে। কে কাকে ধরে? যারা ধরবে তারাও তো মানুষ। পয়সা তো তাদেরও আছে। পকেটে পয়সা থেকে আপনার জেল হলে আপনি জেলে থাকবেন না। আপনার নামে অন্য লোক জেল খাটবে, বুঝলেন?'

এ প্রস্তাবেও বিপ্লবের মন ঠিক সায় দিচ্ছিল না। বোধহয় ওর মুখে সেটা ফুটে উঠেছিল। লোক চরানো ব্যবসা মহেশলালের, তাই চাল তার ভুল হোল না। বিপ্লবের মুখের ভাব লক্ষ্য করে বললে—'চিন্তাভাবনার কিছু নেই বিলুবাবু। ভেবে দেখুন।'

বিপ্লবের চোখের সামনে তখন ভাসছে মার ছেঁড়া আঁচল, বাবার শীর্ণ কুঁজো চেহারা, নিজের জরাজীর্ণ চটিজুতো, আর ভাই-বোনদের হাড়-পাঁজরা বার করা লিকলিকে দেহ।

ফরাসের ওপর একটা চড় মেরে বলে উঠলো বিপ্লব—'ঠিক আছে, এ কাজ আমি করবো মহেশলাল। অফিসের দপ্তরে কে আর আমাকে চাকরি দিচ্ছে বল?'

মহেশলাল মওকা বোঝে। বিপ্লবের কথা শুনে সান্ত্বনা দেয়—'কাজটাকে আপনি ছোট ভাবছেন কেন? চাহিদা মাফিক মালের যোগান দেওয়া। আপনারা তো পড়ালিখা করা লোক। আপনাদের ইকনমিক্সেও তো বলে সমাজের কল্যাণে এটা দরকার।'

যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো বিপ্লব। আবার কি ভেবে বসে পড়লো ফরাসের ওপর। মুখটা কাঁচুমাচু করে কোনরকমে বলে ফেললো—'হাত একেবারে খালি। অগ্রিম কিছু দিতে পারো মহেশলাল?'

মহেশলাল ঝানু শিকারী। ফাতনা নড়া দেখলেই বুঝতে পারে চারে মাছ এসে কিনা। তখুনি গদগদ হয়ে বলে ওঠে—'এর জন্যে এত কিন্তু কিন্তু করছেন কেন বিলুবাবু। বলুন কত চাই আপনার?'

'আপাততঃ গোটা পঁচিশেক টাকা হলেই আমার চলে যাবে,'—বিপ্লবের মুখে যেন একটু লজ্জা লজ্জা ভাব।

ব্যাগ থেকে পঁচিশ টাকা বার করে মহেশলাল জোর করে গুঁজে দেয় বিপ্লবের হাতে।

টাকা নিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ায় বিপ্লব। পেছন থেকে শুনতে পায় মহেশলালের কণ্ঠ—'আমার প্রথম প্রস্তাবটা একটু ভেবে দেখবেন বিলুবাবু। বড় লাভজনক ব্যবসা। মওকা এলে এক রাতেই দু-পাঁচশো এসে যেতে পারে।'

মহেশলালের বাড়ী থেকে বেরিয়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে আরম্ভ করে বিপ্লব। পকেটে তার পঁচিশটা টাকা, মনটা কিন্তু বিরক্তিতে ভরপুর। বড় ছোট মনে হচ্ছে নিজেকে। এতদিন মহেশলালকে সে চোখ রাঙিয়ে কথা বলে এসেছে, আজ কিনা তার কাছেই টাকা চেয়ে বসলো?

পথ চলতে চলতে মনটা থিতিয়ে এসেছে, ও চিন্তা চলে গেছে মন থেকে। তার বদলে মন জুড়ে বসেছে ব্যবসার চিন্তা—যে ব্যবসার কথা একটু আগে বলেছে মহেশলাল। মেয়েমানুষের ব্যবসা—মোটা পয়সা। ক্ষতি কি? সে নিজে তো আর মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করছে না। যারা তার যুগিয়ে দিচ্ছে তাদের। বিনিময়ে কিছু দালালী। নিচু কাজ? কেন, কিসের নিচু কাজ? কে বলে নিচু কাজ? এ কাজেও পরিশ্রম আছে, বিপদের ঝুঁকি আছে। মহেশলাল ঠিকই বলেছে—ব্যবসা, ব্যবসা। খেটে রোজগার করলেই হোল। সত্যিই বাঙালীরা ব্যবসা বোঝে না। নইলে সে যদি নাও করে, অন্য লোক করবে। পয়সাটা তার পকেটে না এসে অন্যের পকেটে যাবে।

বৌবাজারের চৌমাথায় এসে থামতে হোল বিপ্লবকে। পর-পর কয়েকটা ট্রাক চলেছে লালবাজারের দিকে। একটু পরে রাস্তা পেরিয়ে আবার ফুটপাথ ধরলো বিপ্লব। চিন্তাটা এখন চলেছে ভিন্ন পথ ধরে। মেয়েমানুষ চাইলেই তো আর পাওয়া যায় না। কোথায় পাবে সে মেয়েমানুষ? পর-পর কয়েকটা মেয়ের চেহারা ভেসে উঠলো ওর চোখের সামনে। শিবানী। আরো ছিঃ। ওকে দেখলে তো চরম লম্পটও শিউরে উঠবে। চোখ ঘুরিয়ে নেবে যেন একটা ন্যাকড়া জড়ানো বাঁখারী। গালটা যেন চড়িয়ে চড়িয়ে কে তুবড়ে দিয়েছে। ওর কলেজের রেবা, বসু—পাড়ার মিতা, রুবি—পার্টির শান্তা, শোভনা—সবই এক অবস্থা। চেহারা দেখে যেন মানুষের আকৃতিতে দাঁড়কাক। বুক-পিঠ পেট সব সমান। পেটপুরে খেতে পায় না যে। প্রত্যেকের সংসারে কাঁড়ি-কাঁড়ি ছেলেমেয়ে। বাপ, দাদা ভাত দিতেই ফুরিয়ে যায় সব পয়সা।

চোখের সামনে ভেসে উঠলো রুবীর মুখখানা। অতীন মিত্তিরের বোন রুবী, কলেজে পড়ে। যার জন্যে ফটিক পাগল। সত্যিই বড় খাসা চেহারাখানা। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। ওকে জপাতে পারলে বেশ মোটা রকমের দাঁও মারা যায়। কিন্তু ও-কি রাজী হবে? আর এ কথা ও রুবীকে বলবেই বা কি করে? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো ছোট বোন সবিতাকে। সবিতার বন্ধু রুবী। দু-একবার দেখেছে সবিতার সংগে ওদের বাড়ীতে আসতে। সবিতার কথা মনে হতেই বিপ্লব মনে মনে ধিক্কার দেয় নিজেকে। ছিঃ-ছিঃ, ওর বোনকে নিয়ে যদি কেউ সরে পড়ে তাহলে ওর নিজের কি-রকম হয়?—না ফটিককে আর বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না সে। ফটিকটা একের নম্বরের নচ্ছার, ও সব পারে। হয়তো পয়সার লোভে কোনদিন মহেশলালের আড্ডায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে সবিতাকে।

মেডিক্যাল কলেজের গেটের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বিপ্লব। গেটের এক পাশে সুকুমার দাঁড়িয়ে আছে ওর মার হাত ধরে। সুকুমারের মা অঝোরে কেঁদে যাচ্ছেন। বিপ্লবকে দেখেই সুকুমারের মার কান্না বেড়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'ও বিলু, এ আমার কি সর্বনাশ হোল?'

ব্যাপার বুঝতে না পেরে বিপ্লব ইসারায় জিজ্ঞেস করলে সুকুমারকে। সুকুমার বিপ্লবের পাড়ার বন্ধু, একই দলে কাজ ওদের। সুকুমার কয়েক পা এগিয়ে এসে চুপি-চুপি ফিস-ফিস করে বললে—'মোনা বোম বার্স্ট করে সিরিয়াসলি ইনজিওর্ড। হাসপাতালের ইমার্জেন্সীতে আছে।' মোনা সুকুমারের ছোট ভাই।

কথাটা শুনে চমকে উঠলো বিপ্লব। জিজ্ঞেস করলে—'আর কারুর কিছু হয়নি তো?'

জবাবে বললে সুকুমার—'না'।

বিপ্লবের মনে পড়ে গেল সামনের শনিবার ঘোষপাড়া রেড করার জন্যেই বোমা বাঁধার তোড়জোড় হচ্ছিল। ঘোষপাড়াকে কাবু করে ফেরার সময় মদন মিত্তিরের সোনার দোকানে দু একটা ছুঁড়ে দিয়ে যা পারে হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়বে। বোমা ছোড়াতে আর চাকু চালানোয় ফটকেটা সিদ্ধহস্ত। ওর ওসব চলে না। যা করবে পল্টু—রিভলবার—। কথা ছিল ও সংগে থাকবে রিভলবার নিয়ে।

হঠাৎ বিপ্লবের মনে পড়ে গেল মণ্ডলদের বাগানে রাখা বোমাগুলোর কথা। বাগানের পশ্চিম কোণে পেয়ারা গাছের তলায় গর্তের মধ্যে লুকোনো আছে আটটা তাজা বোমা। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে—'আরে, মণ্ডলদের বাগানের মালগুলো ঠিক আছে তো?'

—হ্যাঁ, ওদিকের সব ঠিক আছে। এটা রয়েছে রতনবাবুর গ্যারেজের পেছনের ঢাকাঘরে।'

—মালপত্তর সব কে সরালে?'

—'দুখীরাম সব সরিয়ে ফেলেছে।'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো বিপ্লব—। জিজ্ঞেস করলে—'পুলিশ এসেছে নাকি?'

—না, তখনো আসেনি। আর এলেই বা কি পাবে? সারা ঘরময় পোড়া মবিল ছড়িয়ে দিয়েছে মন্টে। হাসপাতালে জিজ্ঞেস করছিল কি করে ইনজিওর্ড হল? স্রেফ বলে দিলুম ভি-আই-পি রোড দিয়ে আসার সময়ে শত্রুপক্ষের কেউ বোমা ছুঁড়ে দিয়ে পালিয়েছে। কবুক না গিয়ে এনকোয়ারি। ও শালার এমন জায়গা, কেউ কোন খবর বলতে পারবে না।'

বিপ্লবের ইচ্ছে হচ্ছিল একবার ইমা-র্জেন্সীতে গিয়ে দেখে আসে মোনাকে। সুকুমার বারণ করলে—না, এখন যাসনি। শালা ছোকরা ডাক্তারটার বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। শেষে হয়তো একটা মার দাঙ্গা বেঁধে যাবে। তোর যা মেজাজ।'

ইচ্ছে দমন করে নিলে বিপ্লব। এ-সব ব্যাপারে সুকুমারের পরামর্শ দলের সকলেই মানে. নেয়। সুকুমার ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে পারে বলে ওর সুনাম আছে।

ও প্রসঙ্গ ছেড়ে বিপ্লব বললে সুকুমারকে—'মাসীমাকে নিয়ে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বাড়ী চলে যা।'

—'যাবো তো কিন্তু বাসে যা ভিড়, মাকে নিয়ে উঠতেই পারছি না।'

সুকুমারের মার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে বিপ্লব—'না-না এ-রকম অবস্থায় বাসে নিয়ে যাসনি। একটা ট্যাক্সি করে নিয়ে যা।'

মুখে একটা শব্দ করলে সুকুমার। তার-পর বললে—'যাবো তো ট্যাকসি করে, কিন্তু পকেট যে ফাঁকা। চারটে টাকা ছিল, তিনটে গেল ওয়ার্ড-বয় আর স্ট্রেচারম্যানকে দিতে। পকেটে পড়ে আছে শুধু একটা টাকা।'

একটা ট্যাকসি এসে দাঁড়ালো মেডি-ক্যাল কলেজের গেটের সামনে। ট্যাকসির আরোহী নামামাত্রই বিপ্লব দরজার হাতলটা ঘুরিয়ে সুকুমারকে বললে—'নে, উঠে পড়।'

সুকুমার মাকে নিয়ে উঠে পড়লো ট্যাকসিতে। দরজা বন্ধ করে বিপ্লব সুকুমারের হাতে গুঁজে দিলে একটা পাঁচ-টাকার নোট। ট্যাকসি চলে গেল সুকুমারকে নিয়ে। বিপ্লব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো মেডিক্যাল কলেজের বাড়ীটাকে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল এই হাসপাতা-লেরই একটা বেডে তার ছোট ভাইটা শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল। মোটর এ্যাকসিডেন্টে বুকের পাঁজরাগুলো ভেঙে গেছল বিজুর। অ্যাম্বুলেন্সে করে সেই-ই নিয়ে এসেছিল বিজুকে। ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আর পারেনি। বিজুর মৃতদেহটা জড়িয়ে তার মার সে কি কান্না। এখনো সে দৃশ্যটা তার চোখের সামনে ভাসে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো বিপ্লবের বুক থেকে। আবার হাঁটা শুরু করে দিলে বিপ্লব।

একটুখানি এসেই মির্জাপুরের ক্রসিংয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো বিপ্লব। রাস্তার ওপারেই একটা কাপড়ের দোকান। চোখের সামনে ভেসে উঠলো মার ছেঁড়া আঁচল। রাস্তা পেরিয়ে দোকানের ভেতরে ঢুকলো বিপ্লব। পকেটে তার তখনো দুখানা দশ টাকার নোট। চোদ্দ টাকা দিয়ে একটা কালো নক্সা পাড় শাড়ী কিনলে বিপ্লব। কালো নকসা পাড় শাড়ী খুব পছন্দ মার। কাপড় পেয়ে মার মুখের হাসিটা কল্পনা করে বিপ্লবের মনটা ভরে উঠলো খুশীতে। এই প্রথম সে তার নিজের পয়সায় হাত তুলে কিছু একটা দিলে মাকে।

কাপড়ের বান্ডিলটা হাতে নিয়ে বাসে উঠলো বিপ্লব। হেঁটে যেতে আর ভালো লাগছিল না। মন চাইছিল তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌঁছতে। কাপড় হাতে নিয়ে মার হাসি-মাখা মুখখানা দেখার জন্যে মনটা আকুলি-বিকুলি করে উঠলো বিপ্লবের। তার মা অল্পেই সন্তুষ্ট, অল্পেই খুশী।

হেদোর মোড়ের স্টপেজে এসে বিপ্লব একরকম লাফিয়েই নেমে পড়লো বাস থেকে। মুহূর্তের বিলম্বও তার মনকে পীড়া দিচ্ছিল।

বাঁদিকের ফুটপাথ ধরে বেশ জোরে পা ফেলে হাঁটছিল। বিপ্লব। মোড়ের বাঁকটা বেঁকতেই চোখে পড়লো ফটিক আসছে, সঙ্গে রুবী। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বিপ্লব।

ফটিক কিছু বলার আগেই রুবী বলে উঠলো—'আমাদের খুব বিপদ বিপ্লব দা। দাদার এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেছে দাদাকে। ফটিকদা খবর পেয়ে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে হাসপাতালে।' রুবীর চোখ দিয়ে কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে পড়লো।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো বিপ্লবের। সে কি! এইতো একটু আগে সে বাসে আসতে আসতে দেখেছে অতীনদা দোকানে রয়েছে, খদ্দেরকে জিনিস দিচ্ছে। এর মধ্যে...!

বিপ্লব চাইল ফটিকের মুখের দিকে ফটিক চোখ টেরে একটা কি ইসারা করল। ইসারাটা ঠিক বুঝতে না পারলেও ফটিকের মনের কথা পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে। সংগে সংগে মনে পড়লো ফটিক মেয়ে-মানুষের দালাল।

কোন কথা না বলে বিপ্লব ঝাঁপিয়ে পড়ে ফটিকের জামার কলার ধরে হ্যাঁচকা টান মারলে। ফটিক টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে এসে পড়লো বিপ্লবের একেবারে গায়ের ওপর। মুখে বললে—'এই বিলু, কি ইয়ারকি হচ্ছে।'

দাঁত কড়মড় করে বলে ওঠে বিপ্লব—'ইয়ারকি, না?' কাপড়ের বান্ডিলটা রুবীর হাতে দিয়ে ফটিকের কাকের বাসার মত চুলের গুচ্ছ ধরে মুখটা তুলে ধরলে ওপরের দিকে।

ফটিক যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে বললে—'ভাল হবে না বলছি বিলু। ছেড়ে দে, ভয়ানক লাগছে।'

—'ছেড়ে দেবো? শুয়ার, তুই এত নীচে নেমে গেছিস যে পাড়ার মেয়েদের নিয়ে গিয়ে তুলছিস মহেশলালের আড্ডায়। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড ঘুসি গিয়ে পড়লো ফটিকের চোয়ালে।

ফটিক ছিটকে গিয়ে পড়লো ফুটপাথের ওপর।

আবার কিছু একটা করার জন্যে ফটিকের দিকে এগোচ্ছিল বিপ্লব। ফটিক বুনো শুয়োরের মত তেড়ে উঠে জড়িয়ে ধরলে বিপ্লবকে।

ফুটপাথের আলো-আঁধারির মধ্যে অল্প সময়ের জন্যে চললো ধস্তাধস্তি। তারপরেই একটা তীব্র আর্তনাদ করে বিপ্লব লুটিয়ে পড়লো ফুটপাথের ওপর। মুখ দিয়ে তার শুধু একটা কথাই বেরোলো—'ছুরি মারলি আমাকে।'

হাসপাতালে যখন জ্ঞান ফিরে এল বিপ্লবের প্রথম চাউনিতে দেখলে সব অন্ধকার, সব ঝাপসা চোখের সামনে। অতি কষ্টে আবার চোখ চাইলে। অন্ধকার কেটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। ঐ তো মা বসে আছে পাশের টুলে। খাটের এপাশে কে দাঁড়িয়ে? —বাবা। এখনো অঙ্গে অফিসের পোশাক। পায়ের দিকে ওরা কারা? খুব চেনা চেনা মুখ। ঐ তো রুবী, পাশে অতীনদা। রুবীর হাতে সেই কাপড়ের বান্ডিল।

উঃ, পাঁজরাগুলো যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। বড় যন্ত্রণা। তবুও অতি কষ্টে ডান হাতটা তুলে বিপ্লব ইসারায় কাছে ডাকলো রুবীকে। ইসারায় বান্ডিলটা চাইল। বান্ডিলটা হাতে নিয়ে কোন রকমে বাড়িয়ে দিলে মার দিকে, অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বললে—'তোমার কাপড়'।

আবার ঝাপসা হয়ে এলো চোখের দৃষ্টি। দু-চোখ বুজে গেল বিপ্লবের। বিপ্লবের মা অশ্রু-সজল চোখে নার্সের মুখের দিকে চাইলেন। নার্স বললে—'মরফিয়ার র‍্যাকশন'।

অঙ্গনা

অগ্রগতির পথে : ফুলের শোভায়

প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেশের অগ্রগতি সম্বন্ধে দেশবাসীকে ওয়াকিবহাল করার চেষ্টা ইতিপূর্বেও যে হয়নি তা নয়। শিল্প প্রদর্শনী এবং মেলার মাধ্যমে এ সংক্রান্ত সেকথা বারবার বলা হয়েছে। সে সব প্রদর্শনী দেখতে ভিড়ও কম হয় নি। লোক ভেঙে পড়েছে। সবাই দু চোখ ভরে দেখেছেন অগ্রগতির নানা চিত্র। কিন্তু তা দীর্ঘক্ষণ মনে রাখা সম্ভব হয় নি। মেলার চেহারায় প্রদর্শনী তেমন মনে ধরে নি। বড় প্রদর্শনী থেকে বেরিয়ে আসার পরই লোকে প্রায় সবই ভুলে যান। এরকম যদি হয় তবে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যই মার খেয়ে যায়। তাই প্রদর্শনীর দিক থেকেই মনো-[illegible] প্রয়োজন আছে।

স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বর্ষে দেশের অগ্রগতি সম্পর্কে এরকম একটি প্রদর্শনী দেখার সুযোগ হলো। সাতদিন ধরে প্রদর্শনী চলে। প্রতিদিনই অজস্র দর্শক প্রদর্শনীটি দেখতে গেছেন। নানাকথা তাঁরা [illegible] জেনে নিয়েছেন। এই যে [illegible] এর প্রধান কারণ হলো প্রদর্শনীর মনোগ্রাহিতা। কলকাতা ইনফরমেশন সেন্টারে এটি অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের [illegible] শ্রীমতী উমা বসু এর [illegible] করেন। এই নামটির সঙ্গে কলকাতার প্রদর্শনী রসিকদের বিশেষ পরিচয় [illegible] কথার পর নিশ্চয়ই আর [illegible] দিতে হবে না যে, এটি পুষ্পসজ্জা প্রদর্শনী। আরো সহজ করে বলা যায় যে, ফুলের শোভায় দেশের অগ্রগতিকে তুলে ধরা হয়েছে। নিঃসন্দেহে অনবদ্য প্রয়াস।

এই তো কিছুদিন আগে তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন 'দি ক্যালকাটা থ্রু ফ্লাওয়ার্স' নামে একটি প্রদর্শনী অর্থাৎ ফুলের শোভায় কলকাতা। যে শহর নিয়ে নিন্দার অন্ত নেই তার আকর্ষণ যে কত ব্যাপক পুষ্পসজ্জায় তিনি সেকথা দর্শকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। বস্তির পাশাপাশি গগনচুম্বী অট্টালিকা—কি মারাত্মক বৈষম্য অথচ কি সুন্দর সহাবস্থান। এই হলো কলকাতার অন্তর-[illegible]। শ্রীমতী বসু সেই ভাষা পাঠ করে আমাদেরও উপহার দিয়েছেন আশ্চর্য নৈপুণ্যে।

স্বাধীনতা অর্জন করেছি আমরা অনেক দুঃখ-রক্ত-প্রাণের বিনিময়ে। পরাধীনতার শিকল মোচন করতে গিয়ে তাই প্রথমেই এই আত্মদানের কথা এসে পড়ে। সেকথা বলা হয়েছে 'স্বাধীনতা অর্জনের মূল্যে' শীর্ষক পুষ্পসজ্জায়। কয়েকটি প্রতীকে সমস্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের চিত্রটি বিধৃত। ফাঁসি দড়ির মতো মোচড়ানো ডাল উপরে ঝুলছে। পরাধীনতার গ্লানি এবং বেদনার প্রতীক ধরা পড়েছে দোমড়ানো পাতায়। সেই-সঙ্গে আছে জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি। নরপশু ডায়ার সেদিন যে ঘৃণ্য হিংস্রতায় মত্ত হয়েছিলেন থার্মোকলের গায়ে কালো কালো দাগে তা যেন সেই নৃশংসতাকে নতুন করে মনে পড়িয়ে দেয়। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে আমাদের স্বাধীনতার লড়াই তীব্রতর হয়। লবণ ও খাদি সেই-কথা আবার সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

এই সুকঠোর আন্দোলনলব্ধ সম্পদ আমাদের স্বাধীনতা। সেদিন আমাদের কাছে এক বিশেষ বার্তা বহন করে আনে। সে বার্তা মুক্তির আনন্দের। এইদিনটিতে সব বেদনা ভুলে আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠি। প্রদর্শনী কক্ষে ঢুকতেই সেই আনন্দের জোয়ার প্রতিটি দর্শককে স্পর্শ করে। কলাগাছ আর ঘটে শুভদিনের বার্তা ঘোষিত হয়েছে। উজ্জ্বল রং আনন্দের প্রতীক। আলোক-পতাকায় স্বাধীনতার স্মরণীয় দিন সকলের চিত্তে এক আনন্দ পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। আনন্দ কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ভারতীয় মুক্ত জীবন অপূর্বভাবে রূপায়িত রঙীন পালক আর ছড়িয়েপড়া রেখায়। সাদা পালক উড়ছে বিশ্বের বুকে আমাদের নতুন বাণী বহন করে—সে বাণী শান্তির এবং সৌহার্দের।

স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশ আর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। এবার গতি তার সম্মুখপানে। আর তাই তো নিয়ম। বহতা নদীই তো নির্মল জলের আকর। বদ্ধ

স্বাধীনতা জয়ন্তী উপলক্ষে পুষ্পসজ্জা প্রদর্শনী—'অগ্রগতির পথে'।

...জলসম্ভারে জীবন তো পরে ওঠার কথা। অগ্রগতি প্রমাণ দেবে আমাদের সতেজ প্রাণের। দেশ যেন নতুন প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে। নতুন নতুন পরিকল্পনায় আমাদের সমৃদ্ধি আসছে। কত যোজনা আর কত পরিকল্পনা। শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটেছে। গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে বিদ্যুৎ। মরা নদী জলের বেগে নতুন জীবন সৃষ্টি করছে। একটিমাত্র পুষ্পসজ্জায় এই এতো কথা সুন্দরভাবে ধরে রাখা হয়েছে। ঝর্ণা থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে, পাহাড়ের বুকে লুকিয়ে রয়েছে খনিজ সম্পদ। আর সেইসঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নানা পরিকল্পনা। লাল-নীল ফুল দিয়ে বিদ্যুতের কথা বলা হয়েছে।

স্বাধীনতার জয়দূত হয়ে আমরা দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছি। দিকে দিকে উড়ছে আমাদের বিজয়কেতন। বাণিজ্যে আমাদের বিস্তার ঘটেছে। অনেক আগের দিনে ভারতের পণ্য-তরণী বিদেশের ঘাটে-ঘাটে ভিড়তো সেদিন আজ আর নেই। কিন্তু বিদেশে ভারতীয় দ্রব্যের চাহিদা আজো তেমন কমেনি। তাই বাণিজ্যসম্ভারে নৌকাকৃতি ডালে অপরূপ ভঙ্গিমায় স্থাপন করা হয়েছে। আর এই বাণিজ্যে আমরা অর্জন করছি বিদেশী মুদ্রা। সোনালী চুমকিতে এই স্বর্ণোপার্জনের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

দেশে ইতিমধ্যে ঘটে গেছে সবুজ বিপ্লব। আমাদের খাদ্যে আমরাই নির্ভরশীল। সবাই ধরে নিয়েছিল, আমাদের দেশ চিরকাল খাদ্যের জন্য অপরের মুখ চেয়ে থাকবে। কিন্তু তাঁদের সে অভিলাষ ব্যর্থ হয়েছে। খাদ্য-উৎপাদনে এখন আমরা স্বনির্ভর। এই স্বনির্ভরতা কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাচুর্যে দর্শকদের কাছে নতুন জীবনের বাণী বহন করে আনে।

আমাদের এই অগ্রগতির পথে বাধা এসেছে বিস্তর। বারবার আমাদের চলার ছন্দকে ব্যাহত করেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দুর্বোধ্যতায় আমরা বিমূঢ় হয়ে পড়েছি। এসেছে বন্যা আর খরা। কয়েক বছর আগে খরার প্রচণ্ডতা আমাদের জনজীবন ভীষণভাবে বিপর্যস্ত করেছিল। কঠিন সংকল্পে কোমর বেঁধে আমরা তার মোকাবিলা করেছি। কিন্তু এই খরার রূপ আমাদের পক্ষে ভোলা শক্ত। শ্রীমতী বসু খরার এক অপূর্ব রূপকল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন। জমির মাটি ফেটে চৌচির, ভাঙ্গা হাঁড়ি ছড়িয়ে আছে জীবনের উপর প্রকৃতির সুকঠিন আঘাতের প্রতীক হয়ে। এখানেই কিন্তু তার পরিকল্পনা শেষ নয়। তা পূর্ণতা পেয়েছে মেঘের আবাহনে। গাছের ডাল যেন মানুষের মতো হাত বাড়িয়ে মেঘকে ডাকছে।

খরার পর আসে বন্যা। যে বৃষ্টির বারিধারায় মানুষ নতুন জীবন লাভ করার

স্বাধীনতা জয়ন্তী উপলক্ষে পুষ্পসজ্জা প্রদর্শনী— অগ্রগতির পথে।

স্বপ্ন দেখে তাই বয়ে নিয়ে আসে আরেক বিপদের সম্ভাবনা। অতি বৃষ্টিতে নদী ফুলে ওঠে—গ্রাম-জনপদ ভেসে যায়। মানুষের জীবনে ঘনিয়ে আসে সুগভীর দুঃখ-দুর্দশা। বন্যায় মানুষের ঘরদোর ভেসে যায়। দিকে দিকে ওঠে হাহাকার। মাঝে মাঝে মনে হয় এত দুঃখ রাখার বুঝি জায়গা নেই। ফুল লতাপাতা জলে ভাসছে। অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। মানুষের দুঃখ নীল ফুলে যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

এতো গেল প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এ ছাড়াও সমস্যা আছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আমাদের উপরও তার চাপ আসছে। এমনিতেই আমাদের দেশে জনসংখ্যা বিপুল। এবং এটাই হলো আমাদের দুঃখ-দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ গত তিন দশকে এক নয়া ইতিহাস রচনা করেছে। এরই জের টেনে তিনি এসেছেন পরিবার পরিকল্পনা। ছোট পরিবার যে কিরকম সুখী পরিবার হতে পারে তা তিনি দেখিয়েছেন সুন্দর এবং সীমিতসংখ্যক পুষ্পের সমাহারে। ভারতের অগ্রগতির এবং সুখদুঃখের সঙ্গে আর একটি জাতির জীবন ভীষণভাবে জড়িয়ে গেছে। তা হলো বাংলাদেশ। ইয়াহিয়া জল্লাদশাহীর বিরুদ্ধে নিজের স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলাদেশের মুক্তি সেনানীরা যে বীরবিক্রমে লড়াই করেন এবং ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছান সেকথাও এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কাহিনী দেখানো হয়েছে কংকাল সদৃশ পোড়া কাঠ আর পোড়া তালপাতায়। ঝরে পড়েছে লাল ফুল। —শত সহস্র অমূল্য জীবনের প্রতীক। এরই মধ্যে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশ —সবুজ পাতা আর উদিত সূর্যের প্রতীক।

আমাদের অগ্রগতি আর ব্যর্থতার মধ্যেও আমরা নতুন স্বপ্ন দেখি। সে স্বপ্ন বাঁচার স্বপ্ন। মহাকাল চক্র যেন আমাদের এক নতুন ভবিষ্যতের কথা শোনাচ্ছে। সুন্দর এবং সমৃদ্ধিশালী ও শান্তিপূর্ণ ভারতের আশা চুমকি আর সাদা পালকে এক অপরূপ ভাব-গাম্ভীর্যে দণ্ডায়মান। এই সমৃদ্ধি স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমাদের চোখ চলে যায় অন্যত্র। সেখানে রয়েছে গতির বিকাশের কথা। আমরা গরুর গাড়ির যুগ পেরিয়ে জেট বিমানের যুগে পৌঁছেছি—এই চিত্রকল্পটি প্রদর্শনীর এক উল্লেখযোগ্য সম্পদ।

শ্রীমতী বসুর এবারকার প্রদর্শনীর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো যে, তিনি পুষ্পসজ্জাকে এক বিশেষ শিল্পের পর্যায়ে না রেখে তার অগ্রগতিকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তাই তিনি টিপিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্ট থেকে আধুনিক রূপের বিবর্তন করে রাখার চেষ্টা করেছেন। কয়েকটি পুষ্পসজ্জা সুন্দর বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। পুষ্পসজ্জার এই ব্যবসায়িক দিক তাঁর এক নতুন উদ্ভাবন। আবার কয়েকটির ডিজাইনটি অনায়াসে সেলাই-ফোঁড়াইয়ে ফুল তোলার কাজেও আসতে পারে। সেই সঙ্গে পুষ্পসজ্জায় যে কতলোক পারোক্ষে উপকৃত হন সেকথাও ভেবে দেখার মতো।

পরিশেষে শ্রীমতী বসুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এতো কথা একসঙ্গে ফুলের ভাষায় বলতে পারলেন কি করে?

উত্তরে তিনি মৃদু হেসে জানালেন যে সাজানোর বাতিক আমার অনেকদিন। বাবার কাছ থেকে এই অভ্যাসটি পেয়েছি। ছেলেবেলায় পুতুল দিয়ে অনেক কিছু সাজাতাম। নেতাজীর অন্তর্ধান, গান্ধীজীর নোয়াখালি ভ্রমণ আর দেশভাগের কথা আমি পুতুল দিয়ে বাড়িতে সাজিয়েছি সেই কবে। তখনও দেশে ইকেবানা তেমন প্রসারলাভ করেনি। তবুও আমার প্রতীক ছিল খুবই ভালো। পৌরাণিক চিত্রকে নতুন রূপ দিতাম। সে সাজানো দেখতে বাড়িতে খুব ভিড় হতো। তারপর পুষ্পসজ্জা শিখেছি। ইকেবানা শিখেছি। এবার আমার কথা আর ভাবনা আমি নিজের মতো করে প্রকাশ করার চেষ্টা করি। সফল হয়েছি কি না হয়েছি তা বিচারের ভার আপনাদের।

কাছের মানুষ আলাউদ্দিন

সন্ধ্যা সেন

ভারতীয় যন্ত্রসংগীতের স্বর্ণযুগস্রষ্টা গুরু আলাউদ্দিনের জীবনাবসান ঘটল। অনেককেই বলতে শুনেছি আলাউদ্দিন খাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে একটি যুগের অবসান ঘটল। কিন্তু এর চেয়ে ভুল কথা আর কিছু নেই। যন্ত্রসংগীতের যে যুগান্তর গুরু আলাউদ্দিন তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা দিয়ে সৃষ্টিই শুধু করেননি তাকে সার্থক-বিকাশের চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েছেন।

উচ্চমানের যন্ত্রীর সংখ্যা আজ কণ্ঠ-সংগীত শিল্পীদের সংখ্যাকে ছাপিয়ে উঠেছে—। সুরের প্রবাহে যুগ-উচ্ছল। তার যুগকে তার এই জয়গৌরবের চরম সীমায় পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলেন যুগ-স্রষ্টা। তাঁর সাধনা আজ সিদ্ধ, এত দীর্ঘ-জীবন—এমন কঠোর সঙ্গীতব্রত আর তার ফসলের এমন অফুরন্ত প্রাচুর্য দেখে যাওয়া আর কোন শিল্পীর ভাগ্যে ঘটেছে বলে মনে পড়ে না। তাই আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে শুধু শিল্পী, গুরু অথবা স্রষ্টা বলে মনটা তৃপ্তি পায় না—তিনি সেই মহাসাধক যিনি অলোকসম্ভবের অবতরণ ঘটিয়েছেন—তাঁর আশ্চর্য বাদনশৈলিতে।

একবার সাহিত্যিক শংকরীপ্রসাদ আমাদের বাড়ীতে টাঙ্গানো স্মিত, হাস্য-দীপ্ত উদার ও উদাস ভঙ্গীর ছবিখানির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিলেন 'আহা এ ছবিতে ইনি একেবারে বাউল হয়ে গেছেন।' কথাটা বড় ভাল লেগেছিলো। মনে হোল ঐ একটি কথাতেই যেন পুরো মানুষটার মর্মাত্মা মূর্ত হয়ে উঠল। যদি কারো মনে প্রশ্ন জাগে 'শিল্পী আলাউদ্দিনের ধর্ম কি?' তার উত্তর ঐ একটি কথাতেই পাওয়া যায় 'বাউল।' এ শুধু তার ধর্মই নয় স্বধর্মও বটে। বাউল বলতে আমরা বুঝি এমনই এক ব্যক্তিকে যিনি মুক্তপ্রাণ, যিনি শুধু হিন্দুই নন, আবার মুসলমানও

নন—কিন্তু উভয়েরই সমান আপন। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে উদার মন সকলকেই সমান স্নেহে বুকে টেনে নেয়। জীবনবিমুখ নয়, আবার জীবনমুক্ত ঊর্ধ্বমুখী মন সীমাতীতের ধ্যানে বিভোর। হাতে একতারা, কণ্ঠে সব সময় গান, এ গানে সকলের জন্যই আনন্দের ডালি সমান সাজানো। সকলের কাছেই নত নত। কারণ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন সকলের মধ্যেই।

এমনই এক ব্যক্তিত্বে মহিমান্বিত ছিলেন সুরের গুরু আলাউদ্দিন। তাঁর প্রসন্ন, স্নেহময় মূর্তি যে দেখেছে 'বাবা' বলে তাঁর চরণে মাথা তার আপনিই নত হয়েছে। যিনি বিশ্ববরেণ্য শিল্পীর স্রষ্টা, সেই বহু দূরের বহু ঊর্ধ্বের মানুষটির কাছে যখনই

গেছি তাঁকে মনে হয়েছে একান্ত কাছের, একান্ত আপনার মানুষ। বিস্ময় জাগত, কেমন করে এটা সম্ভব হোল? হয়ত দুর্লভের ধর্মই হোল সুলভ হওয়া। তাই ত এঁদের মত যুগাবতার তুল্য, দুর্লভমান ব্যক্তিত্বের সাধক—আমাদের মত অতি সাধারণকে এমন উদার স্নেহে কাছে টানতে পেরেছেন।

একবার আলি আকবর খাঁ সাহেবের কবীর রোডের বাড়িতে আমায় বলেছিলেন 'লোকে জিগেস করে আমায় মুসলমান বলে মা,—আমি হিন্দু।' সেদিন ছিল শুক্রবার। মসজিদে নমাজ পড়াতে যাবেন একটু বাদেই। তবু, স্নেতেই খুব আদর করে, কাছে বসালেন। বললাম 'আপনার দেরী হয়ে যাচ্ছে না ত?' অমনই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন অতিথি-বৎসল মানুষটি। 'কিছু না, মা, কিছু না। তোমার পিতার কাছে যেমন স্বচ্ছন্দ বসতে বসে থাক, তেমনই সহজ স্নেহে আমার কাছে বোসো।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'নমাজ পড়াতে যাচ্ছি বলে আমায় গোঁড়া মুসলমান ভেবে বোসোনা মা। যে ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছি তার ধর্ম পালন করা আমার কর্তব্য। কিন্তু মনকে আমি তারই মধ্যে আবদ্ধ রাখিনি। মাইহারে আমার বাড়িতে সরস্বতী ঠাকুর, লক্ষ্মী মূর্তি, কালীমূর্তি। আরো অনেক দেব-দেবীর মূর্তি আছে—

আমি তাঁদের পুজোও করি। আমার বাড়িতে প্রতি বছর সরস্বতী পুজো হয়। বহুকর চৌকিতে সেই সব দেবদেবীর উদ্দেশে প্রণাম জানালেন। তারপর আত্মগতভাবেই যেন বলে চললেন হিন্দু বল, মুসলমান বল, সকলেরই আরাধ্য সেই ঈশ্বর। তবু কেন যে এই ভেদজ্ঞান। আমরা মহামূর্খ মা মহামূর্খ।'

চমকে উঠলাম। মনে হয়েছিল যুগান্তরের সাধক, ভক্ত, কবীর, দাদুর সকলের কণ্ঠ যেন ঐ কণ্ঠে সুর মিলিয়ে কথা বলে উঠল 'দেতি কাঁহাসে ঢুঁড়ে যাতাও।'

আর একদিন। শ্রীমতী শরণরাণী তাঁর কাছে তালিম নিতে এসেছেন। সে বছর সদারং সঙ্গীত সম্মেলনে বাজিয়ে ইনি প্রভূত যশ অর্জন করেছেন। তাছাড়াও যন্ত্র-সঙ্গীতে ইনি তখন সুনামে সুপ্রতিষ্ঠিত। শীতের সকাল। গুরু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রাগ শিখাব আজ?' আহির ভৈরো। বাঁধ যন্ত্র, রেখাব, নিষাদ, কোমল। আর সব শুদ্ধ। আহির মানে গোয়ালা। সকালে গোয়ালারা উঠে যে যার কাজে যাচ্ছে। তারপর একটু থেমে আমাদের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'কিছু মাখন থেকে, কিছু ননী থেকে, কিছু মিছরী থেকে নিয়ে এই রাগে ঢালা হয়েছে। তাই এ রাগ এত মধুর।' যন্ত্র বাঁধতে দেরী হচ্ছে, কি বাঁধা শেষ হলেও গুরুর কানের উপযুক্ত হয়নি ভেবে আবার বাঁধছেন শরণ-রাণী, ওস্তাদ তাড়া দিলেন তাড়াতাড়ি বাঁধ। বাইরে এক ভদ্রলোক বসে আছেন। তাঁকেও দেখাতে হবে।' তারপর আমার দিকে চেয়ে সেই সরল হাসির সঙ্গাতে বললেন, 'তিনি ধরেছেন এমন একটা রাগ শেখাতে হবে যা সকাল থেকে সুরু করে রাত অবধি যে কোন সময় বাজানো চলে। তাঁর আবার অফিসের তাড়া আছে। আমি একটু দেখিয়ে দিয়ে আসি। বলেই একছুটে বাইরের ঘরে চলে গেলেন। আশিরও ওপরে তখন বয়স। কিন্তু সারাদেহে কি ক্ষিপ্রতা। সারাজীবন ধরে যে সংযত শুদ্ধ জীবনযাপন করেছেন শরীরের বলিষ্ঠতা তারই দাম দিয়েছে।

তারপর ত্বরিৎগতিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, এবার শিখতে দিই এঁকে।— শিখাতে শিখাবারকালে আমি দুরন্ত হয়ে থাকব—তাই সরল মুখ, সন্তোষ চোখ। তারপর সুরু হোল শেখানো। অমনই এতক্ষণের হাসি-খুশী, আনন্দময় মানুষটি যেন নিমেষে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। সামান্যতম ত্রুটিও সহ্য করতে যেন নারাজ। 'তোমরা সব কনফারেন্সের বড় বড় শিল্পী,— এই সামান্য জিনিস হাত দিয়ে বেরোয় না? কিন্তু বেরোবে কি? গুরুর রোষ কষায়িত দৃষ্টির সামনে হাত যেন পাথরের মত অনড় হয়ে গেছে। চলতেই চাইছে না। শীতের সকালেও ব্যাচারী শরণরাণী ঘেমে নেয়ে অস্থির। 'আমি আজ আসি বাবা' বলে সেদিন পালিয়ে বেঁচেছিলাম।

তারপরের দিন। একটু নিরালায় পাবার জন্য আরো সকালে গেলাম। গিয়ে দেখি চুপচাপ বসে আছেন। সেই প্রসন্ন সৌম্য মুখ। চোখ দুটিতে সাগরের গভীরতা। যেন ধ্যানে বসেছেন। যেতেই 'এস মা এস' বলে সেই আদর আহ্বান। পাশেই একটা খাতা পড়ে। খাতাটি দেখিয়ে বললেন, একটি মেয়ের জন্য লিখছি। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে। বেশী সময় পায় না। তাই অনুরূপ এতে গলা সাধার কিছু লিখে দিচ্ছি। খাতাটি খুলে বিস্ময়ের সীমা রইল না। এক ওস্তাদের কাছে কিছুদিন সেতার শিখেছিলাম। মীড় শিখতে চাইলেই তিনি বলতেন 'মীড় কাউকে শেখানো যায় না, ও ক্রমে তৈরী হয়ে গেলে আপনিই হাতে আসে।' কিন্তু এই খাতায় শুধু মীড়ই নয়—গমক, জমজমা আরো কঠিন সব অলঙ্কার শিক্ষা করবার এমন সব আশ্চর্য পদ্ধতি দেওয়া আছে দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। 'আমি এগুলো লিখে নেব বাবা?' 'নিশ্চয় নেবে মা। তোমাদের সেবার জন্যই ত আমার সব।'

তারপর মেয়ের প্রসঙ্গে বললেন, মা অন্নপূর্ণা আমার সাক্ষাৎ ভগবতী। আমার গুরুপদ প্রসাদে যা কিছু সব তাকেই দিয়েছি। তবে অন্নপূর্ণাকে সে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেনি তাই বাইরে কোথাও বাজায় না। রাত্রিশেষে আপন মনে সে বাজায় ঈশ্বরকে পাবার জন্য।' তারপর হেসে বললেন, 'অন্নপূর্ণাকে তোমরা সামান্য মনে কোরো না। আলি আকবর রবিশঙ্করের চেয়ে সে কোন অংশে কম নয়। যাক তুমি লিখে নাও কথায় কথায় দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

লিখতে সুরু করলাম। উনি খুঁকে পড়ে দেখতে লাগলেন 'বিলোম' 'অনুলোম' কাকে বলে, কি পুঙ্খানুপুঙ্খ বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। খানিকটা লিখে বললেন এই অবধি থাক আজ। উনি ব্যস্তসমস্তভাবে বললেন কিন্তু সবটা ত হোল না। আমি ত কালই চলে যাব। খাতাটি যার সে আজ নিয়ে যাবে।' তারপর মুহূর্তকাল ভেবে বললেন, 'এক কাজ কর। অন্নপূর্ণার কাছে দেখে নিও।' 'আচ্ছা বাবা'—'ঠিক দেখে নিও কিন্তু।' 'নিশ্চয় নেব' বলে চলে এলাম।

এই লিখে নেওয়া এবং দেখে নেওয়া আমার মত অর্বাচীনের কতটা কাজে লাগবে জানি না। কিন্তু এই লিখিয়ে নেওয়া এবং দেখিয়ে দেওয়ার আগ্রহে আর একজনের কণ্ঠে যে সুর ধ্বনিত হোলো তার বাগ্র ব্যাকুলতা যেন পুজোর নৈবেদ্যর মতই তার জীবনবিধাতার চরণে পৌঁছালো। এ যেন অসমাপ্ত পুজো সাঙ্গ করার জন্য ভক্তের ব্যাকুলতা। জীবনটাই যাঁর কাছে পুজোর মত কোন কাজ অসম্পূর্ণ রাখা, তাঁর কাছে পুজোর অঙ্গহানির সমান অপরাধ।

তাই বলছিলাম আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব ছিলেন বাউল। উদার মনকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন সকলের মধ্যে। আপন সাধনলব্ধ ধন সবাইকেই বিলোবার সমান আগ্রহ। কনফারেন্সের নামী শিল্পীকে ধমকানোর তৎপরতা যেমন, অখ্যাতনামা অফিসগামী ভদ্রলোককে শেখানোর আগ্রহও তেমনই প্রবল। আবার আমার মত অজ্ঞকে পাঠ লিখিয়ে দেবার জন্যও উৎকণ্ঠার অবধি নেই। এমন মুক্ত, প্রেমী, উদার অন্তঃকরণ বৈরাগী বাউলেই সম্ভব। সারা বিশ্ব যে তাঁর আপনার।

এই বাউলের সাধনপর্ব যেমন অভিনব তেমনই বিস্ময়কর। রোমাঞ্চকর-সম্ভবত তার চেয়েও বেশী। তাঁর সাধনা সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর' এর ক্ষ্যাপার মতই বাস্তব জগতের সকল সুখ-সম্পদে জলাঞ্জলি দিয়ে এমন কি প্রাণাধিকা পত্নীকে পর্যন্ত ত্যাগ করে এই সুরক্ষ্যাপা পাগলের মত ছুটে বেড়িয়েছেন গুরুর সন্ধানে। তবে পরশ পাথরের ক্ষ্যাপার সঙ্গে তাঁর তফাৎ কিছু আছে। সেই ক্ষ্যাপা পরশ পাথর যখন হাতে পেল, তখন তা হৃদয়ঙ্গম করার মত চেতনা তার ছিল না। তাই পরশ পাথর হাতে পেয়েই সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তার স্পর্শে 'লোহা সে হয়েছে সোনা জানে না কখন।' কিন্তু আমাদের এই ক্ষ্যাপা বাউল তাঁর নিরলস সাধনার বলে পরশ পাথর মুঠোর মধ্যে পেয়ে নিজের জীবনে সোনা ফলিয়েই ক্ষান্ত হননি, তাঁর হাতের পরশ পাথরের স্পর্শে সোনা ফলেছে সারা ভারতের শিল্পজগতে, সঙ্গীত ভাণ্ডারে। এই সাধনার সোনার ফসলই ত পান্নালাল ঘোষ, তিমির-বরণ, আলি আকবর, রবিশঙ্কর, নিখিল, শ্যাম গাঙ্গুলি, শিশিরকণা, শরণরাণী তারও পরের যুগের আশীষ, ইন্দ্রনীল, ধ্যানেশ এবং আরো কত। দুই যুগের শিল্পীগোষ্ঠী তাঁরই অবদান। পুত্র ও জামাতার মাধ্যমে এই সোনা আজ সারা জগতে পরিব্যাপ্ত।

যাক সে কথা। পথে বেরোলেম সন্ধ-সন্ধানী। কিন্তু বেরোলেই ত আর পাওয়া যায় না, তা পাবার জন্য মন বিবাগী। দীন ভিখারীর মত গুরুদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে

বেড়ান। কিন্তু তাঁর আবেদন কারোরই কানে পৌঁছায় না। অনেক হাতে-পায়ে ধরে কাকুতিমিনতি করায় যদিই বা কেউ একটু কাছে আসতে দিলেন—তার তামাক সেজেই কাটে বছরের পর বছর। আসল বস্তুর নাগালই পান না। তৃষ্ণা জয় করে শুধুমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ রেখে এইসব কৃপণের দ্বার থেকে খুদ কুঁড়ো সংগ্রহ করেছেন। শিখেছেন যেটুকু, ভাবতে হয়েছে, অনুশীলন করতে হয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশী। তাই তিনি শুধু শিল্পী নন,—স্রষ্টাও। ছোট-বেলায় জারী, সারী, বাউল, ভাটিয়ালী, যাত্রার আসরে নিয়মিতভাবে উচ্চাঙ্গ সংগীত ভিক্ষে গান-শোনা, যাত্রা পার্টির সঙ্গে পালিয়ে বেহালাবাদক হওয়া, শহরে থিয়েটারে ঢোল দলের (স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা) পরিচালনাধীনে কাজ, নুলোগোপালের শিষ্যত্ব গ্রহণ, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবার-ওস্তাদের কাছে সুরবাহার শিক্ষা—পরে রাজা জগৎকিশোরের সভাশিল্পী ওস্তাদ আলি আহাম্মেদ হোসেনের কাছে সরোদের তালিম ইত্যাদি নানা অধ্যায় সমাপ্ত করে—অবশেষে রামপুরের ওস্তাদ উজীর খাঁর মধ্যে প্রকৃত গুরুর সন্ধান পেলেন। এবং সে কাহিনী রোমাঞ্চ উপন্যাসকেও হার মানায়।

বহুদিন ওস্তাদের বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঘুরে ভৃত্যবর্গকে অনেক সাধ্যসাধনা করেও যখন ওস্তাদের কাছে পৌঁছতে পারলেন না, ওস্তাদের শিষ্য ও প্রতিপালক রামপুরের নবাবের প্রাত্যহিক বৈকালিক ভ্রমণের সময় তাঁর চলন্ত গাড়ীর সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়ে রইলেন। হয় প্রাণ যাক—নয় আপনার গুরু গ্রহণ করুন আমায়—এই ছিল সেই সুরপাগলের পণ। মুহূর্তের মধ্যে ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে না দিলে সেইখানে, সেইদিনই তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত। দীনহীন বেশ, উপবাসে জীর্ণ ক্লিষ্ট মুখ—পাগলের মত ছেলেটাকে দেখে নবাবের বড় দয়া হোল। কাছে ডেকে তার উদ্দেশ্য ও বক্তব্য মন দিয়ে শুনলেন। মলিন বেশ কিন্তু চোখ দুটিতে যেন কিসের আলো জ্বলছে। একে ত উপেক্ষা করা যায় না? নিজে সঙ্গে করে তাকে ওস্তাদের দরবারে নিয়ে গেলেন। অজানা ছেলের সংগীতের জন্য অজান বিবাগী ব্যাকুলতা দেখে ওস্তাদ মুগ্ধ হলেন। কিন্তু তখনকার দিনে ওস্তাদদের বিদ্যা শুধুমাত্র তাঁদের সন্তান-সন্ততি বা বংশধরদের জন্যই সংরক্ষিত থাকত। বাইরে বিলানোর রেওয়াজ ছিল না। তাই আলাউদ্দিনের জন্য ওস্তাদের সহানুভূতি যথেষ্ট থাকলেও আপন পুত্রের কথা ভেবে বড় দ্বিধায় পড়লেন।

তখন জ্যেষ্ঠপুত্র পিয়ারী খাঁকে ডেকে বললেন, 'তোমার জন্য সমস্ত পড়ে আছে। তার থেকে দু ফোঁটা জল যদি একে দিই তোমার কোন আপত্তি আছে? এরই জন্য এই উন্মাদ আজ প্রাণ দিতে যাচ্ছিল।' আলাউদ্দিনের ম্লান ব্যথিত মুখের দিকে চেয়ে পিয়ারী খাঁ বললেন, 'হ্যাঁ বাবা একে দেখে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। আমার খুব ইচ্ছে এ আপনার কাছে কিছু শিখুক।' উজীর খাঁর কাছে নাড়া বেঁধে—আলাউদ্দিন তাঁর শিষ্যত্বে গৃহীত হলেন। নবাবের চেষ্টায় রামপুরের থিয়েটার পার্টিতে একটি কাজও পেলেন। ঐ ৩০৲ টাকায় তাঁর ভরণ-পোষণ চলত। কোনদিন কুমড়োসিদ্ধ ভাত, কোনদিন ছাতুজল, কোনদিন অনাহারে, কোনদিন অর্ধাহারে থেকে শুধুমাত্র সংগীতের স্বপ্ন বুকে নিয়ে সাধনার কৃচ্ছতায় অতি-বাহিত হোত যে কিশোরের, সেই কিশোর বাঙ্গালী। —ভাবতেও গর্ব হয় না?

শিষ্যপদে গৃহীত হলেও গুরুর পুরো অনুগ্রহ তখনও লাভ করেননি। কিন্তু এ দুর্ভাগ্যের রাতও শেষ হয় একদিন।

কিছুদিন বাদে পুত্র পিয়ারী খাঁর মৃত্যুতে উজীর খাঁ খুবই শোকাহত হ'য়ে পড়লেন। একটু শান্ত হলে—শিষ্যকে ডেকে বললেন, 'আজ থেকে তুমি আমার পুত্র, শিষ্য সব। এতদিন তোমাকে বঞ্চিত রেখে খোদাতালার চরণে যে অপরাধ করেছি, আজ থেকে তারই প্রায়শ্চিত্ত করব।'

এরপরই আলাউদ্দিনের প্রকৃত শিক্ষা-জীবন সুরু। যন্ত্রসংগীত, কণ্ঠসংগীত সবেরই তালিম ও রেওয়াজ চলল পুরোদমে। এই পথে লক্ষ্য স্থির রেখে সেদিনের মহা-সাধক হলেন উত্তরকালের ভারতীয় যন্ত্র-সংগীতের যুগাবতার। মৃত্যুকালে তাঁর মাথায় হাত রেখে গুরু আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন 'পৃথিবীর যেখানে চন্দ্র-সূর্য উঠবে সেখানেই তোর মহিমার জয়গান হবে।'

গুরুর আশীর্বাদের সত্যতা আমরা আজ প্রত্যক্ষ করছি। আলি আকবর রবিশঙ্করের মাধ্যমে ভারতীয় সঙ্গীত সারা বিশ্বে আজ যে মর্যাদার আসন পেয়েছে তা তো তাঁদের গুরু আলাউদ্দিনেরই কীর্তি।

প্রতিভার ছিটে-ফোঁটাও যাঁদের মধ্যে আছে, তাঁরাই তাঁর শিক্ষাধীনে থেকে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু প্রতিভাহীন অধ্যাবসায়ও তাঁর কাছ থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসেনি। নিজের বিরাট হৃদয়ের সঙ্গীতভাবনার গভীরতার মানদণ্ডেই সকলের আগ্রহকে বিচার করেন, তাই তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানুষও তাঁর কাছে ছোট নয়।

যন্ত্রসঙ্গীতের বৈচিত্র্যে গায়কী অঙ্গের প্রবর্তনা। ধ্রুপদের ভক্তিভাবের সঙ্গে লোকসঙ্গীতের সাদামাটা আবেগ তাঁরই অবদান। এর সঙ্গে খেয়ালের রং বাহার মিশিয়ে—এ সঙ্গীতধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁরই পুত্র ও জামাতা। আজকের যন্ত্রীদের বাজনায়—জ্ঞানে, অজ্ঞানে—আলাউদ্দিন সৃষ্ট বাদনশৈলীর প্রভাব স্পষ্ট।

'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম'—এই সত্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন আলাউদ্দিন খাঁ। এই প্রসঙ্গে একটি মজার কাহিনী স্মরণীয়। একবার যোধপুর রাজসভায় তাঁর বাজনার আয়োজন করেন স্বয়ং মহারাজ। সভায় যাওয়ার আগে রবিশঙ্করজী তাঁকে বারবার সাবধান করে দিলেন মহারাজ যখন তাঁর বাজনার তারিফ করবেন, তিনি যেন বাজনা ছেড়ে উঠে বিনয় প্রকাশ না করেন। কারণ সেখানে তিনি শিল্পী। মহারাজের চেয়ে কম সম্মানীয় নয়। 'আচ্ছা বাবা তাই হবে।' পুত্রসম শিষ্যের পিঠ চাপড়ে গুরু আশ্বাস দিলেন। জাদুকর সরোদীর হাতের অপূর্ব সুর মূর্ছনায় মুগ্ধ হয়ে মহারাজ যেই না 'আহা' বলে উঠলেন অমনই ওস্তাদ বাজনা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে 'আমার অন্নদাতা মালিক' বলে আভূমি নত হয়ে নমস্কার জানান। যেন সত্যিই ঐ প্রশংসার ওপরই তাঁর আর নির্ভর করছে। শিল্পীকে উঠতে দেখে অমনি মহারাজ উঠে দাঁড়ালেন। আর মহারাজকে উঠতে দেখে দরবার শুদ্ধ লোক। কাণ্ড দেখে পণ্ডিতজীর মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল। গুরুর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন 'বাবা কি করছেন? আপনার জন্য মহারাজ আর মহারাজের জন্য দরবার শুদ্ধ লোক যে উঠে দাঁড়িয়েছে। এমন করলে বাজনা এগোবে কেমন করে?'

'তাই ত বাবা বড্ড ভুল হয়ে গেছে' বলেই আবার বসে পড়েন। আজকের যুগের কোন জটিলতা স্পর্শ করতে পারেনি তাঁর শিশুর মত নির্মল চিত্তকে।

শুধু বিনয়েই আপূর্যমান নয় কৃতজ্ঞতাতেও অচলপ্রতিষ্ঠ ছিলেন সাধক। অন্নপূর্ণাদির কাছেই শুনেছি 'কোথায় কোন ওস্তাদের কাছে বাবা এতটুকু শিখেছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের নাম স্মরণ করে তাঁদের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। এই সব তালিকায় এমন সব নাম আছে যাঁরা কিছুই শেখাননি। বাবা শুধু তাঁদের কাছে একবার ঘুরে এসেছেন মাত্র।

শুধু কি তাই? মাইহার রাজ্যে আশ্রয় পাবার পর প্রতিবেশী রাজ্যের এক মহারাজ বিরাট অট্টালিকা ও মাইহার রাজের দশগুণ বেশী মাসোহারা দেবার প্রস্তাব করে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তখন পুত্র, কন্যা ছাড়াও তাঁর পোষ্য অনেক। অর্থের প্রয়োজন খুবই। তবু হাতজোড় করে তিনি বলেছিলেন 'অসময়ে যাঁর কাছে আশ্রয় পেয়েছি তিনি আমার কাছে ঈশ্বরতুল্য। তাঁকে ত্যাগ করা আমার কাছে ধর্মত্যাগ করার মতই অপরাধ। এই কঠিন কঠোর জগতের সীমাহীন নিষ্ঠুরতার আঘাতে যাঁকে বারবার ছোট থেকে হয়েছে এতটুকু প্রাপ্তির উল্লাস তাঁরই কণ্ঠে এমন উচ্ছল সুরে বাজতে পারে। যে দিল সে কতটা দিল, তা আমার বিচার্য নয়, এই কৃপণ জগতের কাছে আমি যতটুকু পেলাম তাই নিয়েই আমার মাথাব্যথা।

মাইহারের রাজার প্রতিজ্ঞা ছিল অনেক-গুলি (প্রায় সম্ভবত ১০টি) যন্ত্রের ওপর পুরো দখল আছে এমন গুরুরই শিষ্যত্ব তিনি গ্রহণ করবেন। আলাউদ্দিনের মধ্যেই তিনি সেই গুরুর সন্ধান পেয়েছিলেন। অথচ বাঙ্গালী বলে ওস্তাদমহলে এঁকে কম লাঞ্ছিত হতে হয়নি। বাঙ্গালীকে ভুল শিক্ষা দিয়ে পথভ্রষ্ট করবার চেষ্টাও হয়েছে। তখন সব সরোদীরা 'ডিরিডিরি' বোলে সরোদ বাজাতেন। এক ওস্তাদ আলাউদ্দিনকে 'ডারাডারাই' (ইচ্ছে করেই) দিয়ে বাজাতে নির্দেশ দেন। গুরুজ্ঞানে সে আদেশ নিষ্ঠাভরে পালন করতে গিয়েই সরোদে নতুন পদ্ধতির তাল সৃষ্টির দরজা খুলে দিলেন তিনি।

বীরেন্দ্রকিশোর এঁকে পণ্ডিচেরি নিয়ে যান। প্রত্যহ দুবেলা শ্রীঅরবিন্দ এঁর বাজনা শুনে বলেছিলেন, সঙ্গীতসাধনার মাধ্যমে দিয়েই তাঁর ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে গেছে।

সুরকে এমন করে পেয়েও তাকে বলতে শুনেছি 'হাত দিয়ে একটা সুরও ত বেরোয় না। সবই বেসুরো হয়ে যায়।'

নিউটনও বলেছিলেন জ্ঞানসমুদ্রের তীরে নুড়ি কুড়োচ্ছেন। বোধহয় সকল সাধক সকল জ্ঞানতপস্বীর অন্তরেই ঐ একই কান্না বাজছে।

বাজুক। ক্ষতি নেই। তবু পরিবর্তনশীল জগতে এঁরাই চির অপরিবর্তনীয় সম্পদ। এঁদেরই তপস্যায় সকল অশুচিমুক্ত হয়ে পৃথিবী আবার সুন্দরের স্বপ্নে বিভোর হয়।

যে বীজ তিনি বপন করে গেছেন পুত্র শিষ্য জামাতা ও অন্যান্য শিষ্যবর্গের মাধ্যমে আগামী যুগের ফসলে তারই মূল্য যাচাই হবে। এই ভারতের শিল্পীতে একদিন ভারত ভরে যাবে। কিন্তু আলাউদ্দিন আর জন্মাবেন না। শতাব্দীর সাধনায় এমন একজন মানুষেরই আবির্ভাব সম্ভব!

চলচ্চিত্রের ভূমিকা কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশিরকুমারের অনুজ মুরারী ভাদুড়ীকে ১৯২৯ সালে এক চিঠিতে ব্যক্ত করেছিলেন। চিঠিটি ছিল :

'কল্যাণীয়েষু,—

উপকরণের বিশেষত্ব অনুসারে কলা-রূপের বিশেষত্ব ঘটে। আমার বিশ্বাস, ছায়াচিত্রকে অবলম্বন করে যে নতুন কলা-রূপের আবির্ভাব প্রত্যাশা করা যায় এখনো তা দেখা দেয়নি। রাষ্ট্রতন্ত্রে স্বাতন্ত্র্যের সাধনা, কলাতন্ত্রেও তাই। আপন সৃষ্টি জগতে আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা কলাবিদ্যার লক্ষ্য—নইলে তার আত্মমর্যাদার অভাবে আত্মপ্রকাশ ম্লান হয়। ছায়াচিত্র এখনো পর্যন্ত সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে চলেছে—তার কারণ কোন রূপকার আপন প্রতিভার বলে তাকে এই দাসত্ব থেকে উদ্ধার করতে পারি নি। কাজ কঠিন, কারণ কাব্যে বা চিত্রে বা সংগীতে উপকরণ দুর্মূল্য নয়। ছায়াচিত্রের আয়োজন আর্থিক মূলধনের অপেক্ষা রাখে, শুধু সৃষ্টিশক্তির নয়। ছায়াচিত্রের প্রধান জিনিসটা হচ্ছে দৃশ্যের গতিপ্রবাহ। এই চলমান রূপের সৌন্দর্য বা মহিমা এমন করে পরিস্ফুট করা উচিত যা কোনো বাক্যের সাহায্য ব্যতীত আপনাকে সম্পূর্ণ সার্থক করতে পারে। তার নিজের ভাষার মাথার উপরে আর একটি ভাষা কেবলি চোখে আঙুল দিয়ে মানে বুঝিয়ে দেয় তবে সেটাতে তার পঙ্গুতা প্রকাশ পায়। সুরের চলমান ধারায় সংগীত যেমন বিনা বাক্যেই আপন মাহাত্ম্য লাভ করতে পারে তেমনি রূপের চলৎপ্রবাহ কেন একটি স্বতন্ত্র রসসৃষ্টিরূপে উন্মেষিত হবে না? হয় না যে সে কেবল সৃষ্টিকর্তার অভাবে এবং অলসচিত্ত জনসাধারণের মূঢ়তায়। তারা আনন্দ পাবার অধিকারী নয় বলেই চমক পাবার নেশায় ডোবে।

ইতি ২৬শে নভেম্বর, ১৯২৯।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

সাহিত্য ও চলচ্চিত্র শিল্প হিসাবে কোনটি মূল্যবান, এ ধরণের প্রশ্নের কোন তুলনামূলক আলোচনা অবান্তর বলে মনে হয়। কারণ স্বাতন্ত্র্য বিচারে দুটি শিল্প-মাধ্যমই স্বতন্ত্র রূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অনেকের ধারণা, উপন্যাসে যে কাহিনী আমরা পড়ি, চলচ্চিত্রে তারই চিত্ররূপ দেখি। নাটকে যার সীমিত পরিধি চলচ্চিত্রে তারই সীমাহীন পরিব্যাপ্তি। এ ধারণাও সঠিক নয়। চলচ্চিত্রের প্রথম পর্বে আমরা দেখতে পাই, পরিচালক তার নিজের ভাবনা অনুযায়ী ছবি তুলছেন। কাহিনীর তেমন প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয় পর্বে এল 'সাহিত্যিক চলচ্চিত্র'। প্রচলিত উপন্যাসের

কাহিনী অবলম্বনে ছবি তৈরী হতে লাগল। তৃতীয় পর্বে চলচ্চিত্র সম্পূর্ণ স্বাধীন হল। পরিচালকরা উপলব্ধি করলেন, চলচ্চিত্রের ভাষা স্বতন্ত্র, কাহিনী-সর্বস্ব নয়। চিত্র এবং শব্দ মিলে চলচ্চিত্রের নতুন ভাষা 'চিত্রনাট্য'-এর জন্ম হল। উপন্যাসের কাহিনীকে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করে আধুনিক চলচ্চিত্র নির্মিত হতে লাগল।

সাহিত্য হল একক প্রতিভার ফলশ্রুতি। অর্থাৎ লেখকই সেখানে সব। তাঁর একক চিন্তা এবং ভাষার প্রয়োগে জন্ম নেয় সাহিত্য। কিন্তু চলচ্চিত্র তা নয়। শুধু মাত্র পরিচালকের একক প্রয়াসের ফলে চলচ্চিত্র নির্মিত হতে পারে না। পরিচালকের সংগে কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার, আলোকচিত্রী, শিল্পনির্দেশক, শব্দধারক, সুরকার অভিনেতৃ, সম্পাদক প্রভৃতি কুশীলবের যৌথ প্রচেষ্টায় একটি চলচ্চিত্র সৃষ্ট হয়।

চলচ্চিত্র একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্প। এ প্রসংগে সত্যজিৎ রায়ের একটি বলিষ্ঠ বক্তব্য তুলে ধরছি :

"চলচ্চিত্র শিল্প কিনা সে নিয়ে এখনো তর্ক ওঠে। যাঁরা একে সে মর্যাদা দিতে নারাজ তাঁরা বলেন যে চলচ্চিত্রের নিজস্ব সত্তা বলে তো কিছু নেই, এ হল আর পাঁচটা শিল্প-সাহিত্য মিশ্রিত একটা পাঁচ-মেশালি কিম্ভূত।

আসলে গোলমালটা ওই শিল্প কথাটাকে নিয়েই। শিল্প না বলে যদি ভাষা বলা হয়, তাহলে বোধহয় চলচ্চিত্রের স্বরূপটা স্পষ্ট হয়, এবং তর্কেরও আর অবকাশ থাকে না।

লেখকের হাতে যেমন কথা, চলচ্চিত্র রচয়িতার হাতে তেমনি ছবি (ইমেজ) ও শব্দ (সাউণ্ড)। এই দুইয়ে মিলে ভাষা, তার প্রয়োগে যদি মুন্সীয়ানার অভাব হয়, তার ব্যাকরণ যদি রচয়িতার আয়ত্ত না থাকে, তাহলে ভাল ছবি হবে কী করে? এত যে লেখা হয়, তার কতটুকুই বা সাহিত্য হয়ে ওঠে। শিল্পী আগে, তার পরে তো শিল্প। যেখানে শিল্পী নেই, সেখানে শিল্পের উপকরণ থাকলেও শিল্পের উদ্ভব সম্ভব নয়।

চলচ্চিত্রে যে অন্য শিল্প-সাহিত্যের লক্ষণ আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নাটকের দ্বন্দ্ব, উপন্যাসের কাহিনী ও পরিবেশ বর্ণন, সংগীতের গতি ও ছন্দ, পেন্টিং-সুলভ আলোছায়ার ব্যঞ্জনা, এ সবই চলচ্চিত্রে স্থান পেয়েছে। কিন্তু ইমেজ ও ধ্বনির যে ভাষা, দেখানো শোনানোর বাইরে যার প্রকাশ নেই, সে একেবারে স্বতন্ত্র ভাষা। ফলে বক্তব্য এক হলেও ভঙ্গির তফাৎ হতে বাধ্য। এ ভঙ্গি চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভঙ্গি। তাই অন্য শিল্প-সাহিত্যের লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও চলচ্চিত্র অনন্য।"

সাহিত্যের কাহিনী এবং চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য যে এক নয়, তা উদ্ধৃতি সহযোগে তুলে ধরা যেতে পারে। যেমন, 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দৃশ্যটিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

'দেশের স্টেশনে নামিয়া বৈকালের দিকে সে হাঁটিতে হাঁটিতে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। পথে বড় একটা কাহারও সহিত দেখা হইল না, দেখা হইলেও সে হন্-হন্ করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কাহারও দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া বাড়ির দিকে চলিল। দরজায় ঢুকিতে ঢুকিতে আপন মনে বলিল —উঃ দ্যাখো কাণ্ডখানা, বাঁশঝাড়টা ঝুঁকে পড়েছে একেবারে পাঁচিলের উপর। ভুবন-কাকা কাটাবেনও না—মুশকিল হয়েছে আচ্ছা।—পরে সে বাড়ির উঠানে ঢুকিয়া অভ্যাসমত আগ্রহের সুরে ডাকিল—ওমা দুগ্‌গো—ও অপু—

তাহার গলার স্বর শুনিয়া সর্বজয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। হরিহর হাসিয়া বলিল—বাড়ির সব ভাল? এরা সব কোথায় গেল? বাড়ি নেই বুঝি?

সর্বজয়া শান্তভাবে আসিয়া স্বামীর হাত হইতে ভারি পুঁটলিটা নামাইয়া লইয়া বলিল—এসো ঘরে এসো। স্ত্রীর অদৃষ্টপূর্ব শান্তভাব হরিহর লক্ষ্য করিলেও তাহার মনে কোন খটকা হইল না—তাহার কল্পনার স্রোত তখন উদ্দাম বেগে অন্যদিকে ছুটিয়াছে—এখনই ছেলে-মেয়ে ছুটিয়া আসিবে—দুর্গা আসিয়া বলিবে—কি বাবা এর মধ্যে? অমনি হরিহর তাড়াতাড়ি পুঁটুলি খুলিয়া মেয়ের কাপড় ও আলতার পাতা এবং 'সচিত্র চণ্ডীমাহাত্ম্য' বা 'কালকেতুর উপাখ্যান' ও টিনের রেল-গাড়িটা দেখাইয়া তাক্ লাগাইয়া দিবে। সে ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল— বেল কাঠালের চাকি বেলুন এনেছি এবার। পরে কিছু নিরাশা মিশ্রিত সতৃষ্ণ নয়নে চারিদিকে চাহিয়া বলিল—কৈ অপু দুগ্‌গো এরা বুঝি সব বেরিয়েছে—

সর্বজয়া আর কোনমতেই চাপিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওগো দুগ্‌গো কি আর আছে গো—মা যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েচে গো—এতদিন কোথায় ছিলে!'

সত্যজিৎ রায়-কৃত 'পথের পাঁচালী' চিত্রনাট্যে উপরোক্ত দৃশ্য-পর্যায় এইভাবে রচিত হয় :

(১) মেঘলা দিন। মেঠো রাস্তা।

অপু গাঢ় রঙের চাদর গায়ে কেরো-সিনের খালি বোতল হাতে রাস্তা দিয়ে দূরে চলে যায়।

ডিজল্‌ভ টু [আবহসংগীত চলেছে]

(২) মেঘলা দিন। ইন্দির ঠাকরুণের দাওয়া।

ক্লোজ আপ : উনুনে বসানো হাঁড়িতে ভাত সিদ্ধ হচ্ছে। ফুটন্ত ফ্যান ফুলে ফুলে উঠে প্রায় উপচে পড়ে। হাঁড়ির ঢাকনা ওঠা-নামা করছে। টিলট আপ : সর্ব-জয়ার মুখ। ডান হাতে থুৎনিটা ভর করে সে উদু হয়ে বসে আছে। দৃষ্টি শূন্য, নিষ্পলক।

[আবহসংগীত চলেছে]

(৩) মেঘলা দিন। সর্বজয়ার বাড়ির উঠোন। মিড সট : উঠোনের দরজা দিয়ে একটি দশ-বারো বছরের মেয়ে (বিনি) এসে ঢুকল। তার হাতে ঝুড়িতে সবজি।

সে সর্বজয়ার দাওয়ার পাশে এসে দাঁড়াল। (সর্বজয়াকে দেখা যাচ্ছে না)

বিনি : নতুন খুড়িমা

[আবহসংগীত চলেছে]

(৪) মেঘলা দিন। উঠান থেকে ইন্দিরের দাওয়ার দিকে দেখছি।

মিড সট : বিনি ডান দিকে ফোর গ্রাউণ্ড এ ক্যামেরার দিকে পিঠ করে। সর্বজয়া বাঁ দিকে পিঠ করে সেইভাবে বসে আছে।

বিনি : নতুন খুড়িমা

সর্বজয়া। নিরুত্তর।

বিনি : মা এগুলো পাঠিয়ে দিলেন। এই এইখেনে রাখলুম।

বিনি ঝুড়িটা হাত থেকে দাওয়ায় নামিয়ে রাখে।

[আবহসংগীত চলেছে]

(৫) মেঘলা দিন।

ক্লোজ সট : বিনি ঝুড়িটা রেখে সর্ব-জয়ার দিকে তাকাতে তাকাতে দরজার দিকে পিছিয়ে যায়।

[আবহসংগীত ফেড আউট করে।
ডিজল্‌ভ টু

(৬) মেঘলা দিন। হরিহরের ভিটার পিছনের বাঁশবন। লং টপ সট : দূরে থেকে দেখা যায় হরিহর আসছে।

হরিহর : অপু!

(৭) মেঘলা দিন। ইন্দিরের দাওয়া।

ক্লোজ আপ : হরিহরের গলার স্বর শুনে সর্বজয়ার রিঅ্যাকশন—গালটা হাত থেকে সামান্য সরে গিয়ে মাথাটা আলগা হয়ে একটুখানি নীচের দিকে নেমে এলো।

(৮) মেঘলা দিন। হরিহরের ভিটার দক্ষিণের পাঁচিলের পাশে।

মিড সট : হরিহর এসে থমকে দাঁড়ায়। একটা আমডাল ভেঙে পাঁচিলের উপর পড়ে তার খানিকটা অংশ ভেঙে দিয়েছে।

হরিহর : (স্বগত) ইস্—আর কটাদিন সবুর সইল না? হরিহর ডালটা ডিঙিয়ে এগিয়ে আসে—ক্যামেরা সংগে সংগে প্যান করে। হরিহর এগিয়ে এসে বাড়ির দিকে মুখ করে দাঁড়ায় তার ভগ্ন কোঠার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর উঠোনের দরজার দিকে ছবির গণ্ডীর বাইরে চলে যায়।

ক্যামেরা আর প্যান করে না — ভাঙা পাঁচিলের পিছনে ভাঙা গোয়ালে গরুটা জাবর কাটছে। তার পিছনে হরিহরের দাওয়া।

[নেপথ্যে হরিহরের দরজা খুলে ঢোকার শব্দ।]

কিছুক্ষণ পরে হরিহরকে লং-এ দেখা গেল তার দাওয়ায় পৌঁছেছে। সে উদ্বিগ্নভাবে এদিক ওদিক চায়।

হরিহর : (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) খোকা! দুর্গা!

সর্বজয়া হরিহরের পাশ দিয়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দাওয়ায় ওঠে।

হরিহর : ওঃ—তুমি আছ!

সর্বজয়া : এসো......

হরিহর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করে।

(৯) মেঘলা দিন। হরিহরের দাওয়া।

মিড সট : হরিহর সিঁড়ি দিয়ে উঠে হাত থেকে টিনের অ্যাটাচিকেস ও পুঁটলি দাওয়ার মেঝেতে নামিয়ে রাখল। তারপর দু হাতের কবজিগুলো রগড়ে নিয়ে ধুতির খুঁট দিয়ে ঘাম মুছতে লাগল।

হরিহর : কেমন আছ?

সর্বজয়া ঘটি থেকে হরিহরের পা ধোয়ার গাড়ুতে জল ঢালল, তারপর ঘর থেকে একে একে খড়ম, পিঁড়ি ও গামছা এনে গাড়ুর পাশে রাখল।

হরিহর : এরা সব বেরিয়েছে বুঝি?

সর্বজয়া কোনো কথা না বলে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। হরিহর তার কাঁধে হাত দিয়ে তাকে থামায়।

হরিহর : ও-কি? যাচ্ছ কোথায়? জিনিসগুলো এনেছি দ্যাখো!

সর্বজয়া থামে।

হরিহর উবু হয়ে বসে পুঁটলির গেরো খুলতে আরম্ভ করে।

(১০) মেঘলা দিন। হরিহরের দাওয়া।

মিড ক্লোজ সট : সর্বজয়া ফোর গ্রাউন্ড ক্যামেরার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে হরিহর দাওয়ায় বসে পুঁটলি খুলছে।

হরিহর : আগে আসতে পারলে কি আর আসতুম না? বাব্বা, কম ঘোরাম ঘুরেছি!...শেষটায় বিষ্ণুপুরে এসে ভাগ্যটা খুলে গেল—তাই, এই দ্যাখো—চড়কের মেলা থেকে লক্ষ্মীর পট আনতে বলেছিলে? কেমন...কাচ দিয়ে বাঁধিয়ে এনেচি। আর এই...কাঁঠাল কাঠের জিনিস—

কাঁঠাল কাঠের জিনিস—

চাকি বেলুন রেখে হরিহর একটা ডুরে শাড়ি সর্বজয়ার দিকে এগিয়ে দেয়।

হরিহর : আর এই দ্যাখো—

(১১) মেঘলা দিন।

ক্লোজ আপ : দুর্গার ডুরে শাড়ি।

হরিহর : (নেপথ্যে) দুর্গার জন্য কেমন ...

সর্বজয়ার হাত শাড়িটা আঁকড়ে ধরে। শাড়ি সমেত হাত উপর দিকে ওঠে, ক্যামেরা সঙ্গে সঙ্গে টিলট আপ করে।

সর্বজয়ার মুখ কান্নার আবেগে বিকৃত হয়ে যায়। সে দাঁত দিয়ে শাড়িটাকে কামড়ে কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ে।

[কান্নার শব্দের বদলে তারসানাই-এর তার সপ্তকে করুণ সংগীত]

(১২) মেঘলা দিন।

মিড ক্লোজ সট : (সেমএ্যাঙ্গেল এ্যাক টেন)

সর্বজয়া কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ে। হরিহর তীব্র উদ্বেগে সর্বজয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

সর্বজয়া মেঝেতে ঢলে পড়ে।

[তারসানাই-এ আবহসংগীত]

(১৩) মেঘলা দিন।

ক্লোজ সট : সর্বজয়া কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে শুয়ে পড়ে। হরিহর তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়। ভাবটা—কী হল? কী হল?

সর্বজয়া মাথা নেড়ে জানায়—দুর্গা নেই! ক্যামেরা ট্রাক ফরওয়ার্ড করে হরিহরের মুখের দিকে যায়।

হরিহর বুঝতে পেরেছে। সে হতজ্ঞানের মতো ওঠার চেষ্টা করে—তারপর ধপ্ করে বসে পড়ে কান্নায় ভেঙে লুটিয়ে পড়ে।

ক্যামেরা ট্রাক ব্যাক করে প্রথম জায়গায় পিছিয়ে যায়। হরিহর আর্তনাদ করে ওঠে—

হরিহর : দুর্গাগো! দুর্গাগো মা-—

[তারসানাই সংগীত]

(১৪) হরিহরের ভিটার পিছনের পুকুর।

মিড সট : অপু তেলভরা বোতল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হরিহর : (নেপথ্যে) দুর্গাগো মা!—

অপু ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে—কেমন যেন অসহায়, থতমত ভাব। ক্যামেরা দ্রুত ট্রাক ফরওয়ার্ড করে অপুর মুখের দিকে এগিয়ে যায়।

[তারসানাই সংগীত ফেড আউট করে]

ফেড আউট

উপরোক্ত সাহিত্যের বর্ণিত অংশের চিত্রনাট্য থেকে বোঝা যায় চলচ্চিত্রের নিজস্ব সত্তা বলে একটি বস্তু আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'ছায়াচিত্র এখনো পর্যন্ত সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে চলেছে—' কথাটি এখন সকল পরিচালকের বেলায় প্রযোজ্য নয় বা প্রতিটি চলচ্চিত্র যে সাহিত্যের কার্বন-কপি, এটিও আর বলা চলে না।

নিশিকন্যায় মিঠু মুখোপাধ্যায়। পরিচালনা আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত।

প্রেক্ষাগৃহ

ভারতীয় চলচ্চিত্র—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারতের দুটি জায়গায় সবাক চলচ্চিত্র-উৎপাদন কেন্দ্র ছিল : এক, কলকাতা, দুই বোম্বাই (এর সংগে পুণার নামটিও যুক্ত করতে হয়)। কলকাতায় ছিল (১) নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও, (২) ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টুডিও, (৩) রাধা ফিল্ম স্টুডিও, (৪) শ্রীভারতলক্ষ্মী স্টুডিও, (৫) ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিজ স্টুডিও (পরবর্তী নাম কালী ফিল্মস স্টুডিও), (৬) অরোরা ফিল্ম স্টুডিও, (৭) দেবদত্ত ফিল্ম স্টুডিও, (৮) ফিল্ম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া স্টুডিও এবং (৯) ম্যাডান স্টুডিও। বোম্বাই শহরে ছিল (১) ইম্পিরিয়াল স্টুডিও, (২) সাগর মুভীটোন স্টুডিও, (৩) রঞ্জিৎ স্টুডিও, (৪) মিনার্ভা স্টুডিও, (৫) বোম্বে টকীজ স্টুডিও, (৬) প্রভাত মুভীটোন স্টুডিও (পুণাতে) এবং আরও দু-পাঁচটি স্টুডিও।

কলকাতা এবং বোম্বাই—দু জায়গারই স্টুডিও মালিকেরা ছিলেন নিজেরাই ছবির প্রযোজক। প্রতিটি স্টুডিওতে ছিল বাঁধা মাস মাইনেতে শিল্পী এবং কলাকুশলীর দল। এঁরা স্টুডিও-মালিক তথা প্রযোজকের পরামর্শ মতো ছবির পর ছবি তৈরী করে যেতেন। কলকাতার নিউ থিয়েটার্স তখন বাংলার সংগে হিন্দী এবং উর্দু ছবিও তৈরী করতেন সারা ভারতে প্রদর্শিত হবার জন্যে। এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তখন নিউ থিয়েটার্সের ছবিরই জনপ্রিয়তা বেশী। নিউ

বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা/শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং মধুছন্দা

থিয়েটার্সের চণ্ডীদাস, পূরণ ভকত, প্রেসিডেন্ট, দিদি, বিদ্যাপতি, স্ট্রীট সিঙ্গার, ভাগ্যচক্র, দেবদাস, প্রভৃতি ছবি ভারতের যেখানেই প্রদর্শিত হয়েছে সেখানেই প্রশংসার সঙ্গে অর্থ উপার্জন করেছে প্রভূত পরিমাণে। কলকাতার নিউ থিয়েটার্স ছাড়া ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীও বহু হিন্দী এবং উর্দু ছবি তুলেছেন। এখানে পরিচালক ছিলেন এ আর কারদার, আখতার নাওয়াজ, সি. এম. প্রভৃতি এবং শিল্পী ছিলেন গুল হামিদ মজাহার খাঁ, মুক্তিয়ার বেগম, সাবিত্রী দেবী, আনওয়ারী, সুলতানা প্রভৃতি।

এছাড়া কলকাতার বিভিন্ন স্টুডিওতে তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া এবং আসামী ভাষায় ছবি তৈরী করাবার জন্যে এসে হাজির হতেন প্রযোজক, পরিচালক, সঙ্গীত-পরিচালক ও শিল্পীদল। কারণ, দক্ষিণ ভারতে, আসাম বা উড়িষ্যাতে সে-যুগে কোনো স্টুডিও গড়ে ওঠেনি। দক্ষিণ ভারত থেকে বোম্বাই না গিয়ে কলকাতায় আসার একমাত্র কারণ ছিল কলকাতায় ছবি তৈরী করতে বোম্বাইয়ের তুলনায় খরচ পড়ত অনেক কম।

বোম্বাইয়ের প্রথম যুগে নাম ছিল প্রভাত স্টুডিওর প্রধানত ভী শান্তারামের জন্যে। পরবর্তী কালে বিখ্যাত হল বোম্বে টকীজ এবং তার ছবিগুলির নায়িকা দেবিকারাণী ও নায়ক অশোককুমার। প্রায় চার দশক ধরে অভিনেতা হিসেবে অশোককুমার নিজেকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন, তার তুলনা পৃথিবীর চলচ্চিত্রেতিহাসে নেই। প্রভাত ও বোম্বে টকীজ ছাড়া মিনার্ভা, শ্রীরঞ্জিৎ ও মেহবুব স্টুডিওর অনেক ছবি—পুকার, পৃথিবল্লভ, তানসেন, রোটী, জেলার, আউরৎ প্রভৃতি—প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

কিন্তু স্টুডিও কর্তৃপক্ষই নিজেদের ছবির প্রযোজক—এই ধারার পরিবর্তন ঘটল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। শিল্পীরা কোনো স্টুডিওর সঙ্গে মাস মাহিনায় চুক্তিবদ্ধ থাকার পরিবর্তে ইচ্ছামত যে কোনোও ছবির জন্যে সাময়িকভাবে চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে ঢের বেশী লাভজনক দেখতে পেলেন। এবং এঁদের অনুসরণ করলেন ক্রমে ক্রমে পরিচালকেরা, সংগীত পরিচালকেরা, আলোকচিত্রশিল্পীরা, সম্পাদকেরা, শিল্পনির্দেশকেরা ও রূপসজ্জাকারীরা। এমন কি গান রেকর্ড এবং সংলাপের সঙ্গে আবহসঙ্গীতের সংমিশ্রণ ঘটানো বা রি-রেকর্ডিংয়ের কাজের জন্যেও বিশেষজ্ঞের দল গজিয়ে উঠল। এছাড়া ছবিকে চমকপ্রদ করবার কাজে বিশেষ রূপে সাহায্য করবার জন্যে অঘটনঘটনপটিয়সী 'অপটিকস'-এর পারদর্শীর দলও এর সঙ্গে যোগ দিলেন।

প্রশ্ন হতে পারে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে শিল্পী, পরিচালক প্রভৃতি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবার সুযোগ পেলেন কিভাবে? তাঁরা মাস-মাহিনা পাওয়ার নিশ্চিন্ত পথকে পরিত্যাগ করতে প্রলুব্ধ হলেন কাদের দ্বারা? নিশ্চিধায় বলা চলে, যুদ্ধের কালো-বাজারে বরাত ঠুকে যাঁরা রাতারাতি ধুলোকে সোনায় পরিণত করতে পেরেছিলেন, একেবারে কিছু না থেকে দশ-বিশ-পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে বসেছিলেন, তাঁদেরই একটি অংশ কিছু বুদ্ধিধারী বন্ধুদের পরামর্শে 'কালো' টাকাকে 'সাদা'য় পরিণত করবার লোভে এই চলচ্চিত্র শিল্পের প্রযোজক সেজে বসেছিলেন এবং নামকরা আর্টিস্টদের নিয়ে ছবি করতে পারলে মার খাবার অর্থাৎ অসাফল্যমণ্ডিত হবার আশঙ্কা থাকবে না, এই অভিমত পোষণ করে জনপ্রিয় শিল্পীদের প্রলুব্ধ করবার মতো অর্থের অঙ্ক তাদের সামনে তুলে ধরলেন। যে শিল্পী মাসে পেত এক হাজার টাকা, তাঁকে একখানা ছবিতে তিন মাসের জন্যে চুক্তিবদ্ধ করলেন দশ বা পনেরো হাজার টাকায়। শিল্পী তাকিয়ে দেখলেন, এমন দশ-পনেরো হাজার টাকা দেওয়ার মত প্রযোজক অন্তত ডজনখানেক

রয়েছে তাঁর চোখের সামনে। অতএব 'অর মা বলে ভাসা তরী'! একলপ্তে ছখানা কন্ট্রাক্টে সই করে তিনি পেয়ে গেলেন হাজার বারো টাকা। এবং ওখানেও শুরু হয়ে গেল কালোবাজারী হিসাবে। সই করব দশ, নেব তিরিশ এবং তিরিশ থেকে দশ বাদ দিয়ে বিশ নেব আগাম।

যুদ্ধ-পূর্বকাল পর্যন্ত ছিল প্রতিষ্ঠান ও পরিচালকের কদর। এখন শুরু হল অভিনেতা-অভিনেত্রীর দাপট এবং সে দাপট আজও চলেছে প্রায় অপ্রতিহতভাবে মাত্র কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া। বাংলা চলচ্চিত্র-জগতে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহ প্রভৃতি যশস্বী পরিচালক তাঁদের বৈশিষ্টগুণে শিল্পীদের শ্রদ্ধা-ভাজন এবং তাঁরা ছবি তৈরী করেন তাঁদের নিজস্ব চিন্তাকে অনুসরণ করে, শিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়েই। বোম্বাইয়ের হিন্দী চলচ্চিত্রজগতেও সম্প্রতি বাসু ভট্টাচার্য, বি আর ইশারা, বাসু চট্টোপাধ্যায়, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কিছু পরিচালক তাঁদের চিন্তানুযায়ী ছবি তৈরী করে ব্যবসায়িক জগৎকে স্তম্ভিত করে দিচ্ছেন এবং সংগে সংগে চলচ্চিত্রের সৃষ্টিকার্যে শিল্পী থেকে পরিচালকের গুরুত্ব যে ঢের বেশী, এই সত্যটি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। কিন্তু দশক যতদিন শিল্পীদের স্তবস্তুতি করতে থাকবে, ততদিন শিল্পীদের আর্থিক চাহিদা আকাশ-চুম্বীই থাকবে। এবং কয়েকজন পরিচালকের সৃষ্টিধর্মী ভাবনা ছবির প্রযোজককে সেই আসনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না, যেখানে যুদ্ধপূর্ব যুগে বসেছিলেন বি এন সরকার, হিমাংশু রায়, চণ্ডুলাল শাহ, সোরাব মোদী প্রভৃতি স্টুডিও মালিক-প্রযোজকেরা।

—নান্দীকর

বনপলাশীর পদাবলী : পরিচালক উত্তমকুমার নির্দেশ দিচ্ছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়কে।
ফটো : অমৃত

এই সপ্তাহে

বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা : জাহ্নবী চিত্রের বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা এ সপ্তাহে মিনার, বিজলী ছবিঘরে মুক্তি পাচ্ছে। শঙ্কু মহারাজের ওই নামের ভ্রমণ কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন হীরেন নাগ। সংগীত পরিচালনা করেছেন পংকজকুমার মল্লিক। শিল্পী-তালিকায় আছেন শুভেন্দু, মধুছন্দা, কালী ব্যানার্জি, সবিতাব্রত, শমিতা বিশ্বাস প্রভৃতি।

মন তেরা তন মেরা : নীতিন ফিল্মসের মন তেরা তন মেরা আজ থেকে নিউ এম্পায়ার, জেম, প্রিয়া, মিত্রা প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। পরিচালনা করেছেন বি আর ইশারা, সংগীত পরিচালনা করেছেন স্বপন জগমোহন, বিভিন্নাংশে আছেন রেহানা সুলতান, অনিল ধাওয়ান, মনমোহনকৃষ্ণ, অসিত সেন ও শত্রুঘ্ন সিনহা প্রভৃতি।

শাহজাদা : এ সপ্তাহের আর একটি মুক্তিপ্রাপ্ত চিত্র শাহজাদা। কে শংকর পরিচালিত ও আর ডি বর্মণ সুরারোপিত চিত্রটির মুখ্য চরিত্রে আছেন রাজেশ খান্না ও রাখী। জ্যোতি, দর্পণা, প্রভাত প্রভৃতি কলিকাতার বহু চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হবে।

পদি পিসীর বর্মি বাক্স : অরুন্ধতী দেবী প্রযোজিত ও পরিচালিত অনিন্দ্য চিত্র-এর রঙীন ছবি 'পদি পিসীর বর্মি বাক্স' রাধা, পূর্ণ ও অন্যান্য চলতি ছবির পরই মুক্তি পাবে। কাহিনী রচনা করেছেন—লীলা মজুমদার। সুর : অরুন্ধতী দেবী। পদি পিসীর চরিত্রে—ছায়া দেবী। অন্যান্য চরিত্রে আছেন—রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, জহর রায়, হরিধন, অতিশ, কেতকী, রুদ্রপ্রসাদ, শম্ভু, নির্মলকুমার, পদ্মা দেবী, মাঃ তপন ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

স্টুডিও সংবাদ

বিনা নোটিশে যখন তখন বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধের ফলে টালিগঞ্জ ... পাড়ায় অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ... যেখানে সপ্তাহে তিন দিন অর্থাৎ ... ও শনিবার বিদ্যুৎ ... থাকতো—এখন প্রায় রোজই ... বিভ্রাটের ফলে স্টুডিওগুলোতে ... ঘণ্টা কাজ বন্ধ থাকছে। কখনও বা ... করতে হচ্ছে। ফলে ছবির শুটিং ... ৩।৪ শট আবার কোন ... একেবারেই বাতিল করতে হচ্ছে।

নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত ... শিল্প এমনিতেই ক্ষয়িষ্ণু ... বিদ্যুৎ সংকটের ফলে সে সমস্যা ... এখন এমন ... এ অবস্থা চললে সব স্টুডিওগুলোতে তালা ঝুলবার সম্ভাবনাই বেশী। ... শুটিংয়ের কাজই ব্যাহত হচ্ছে তাই নয় ... সংগে সংগে ল্যাবরেটরীগুলোতে ... ক্ষতি হচ্ছে। ফিল্ম ডেভেলাপিং, প্রিন্টিং করবার সময় হঠাৎ হঠাৎ বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়ার ফলে প্রচুর ফিল্ম ও সাউন্ডের অপচয় হচ্ছে। এমতাবস্থায় বাংলা ছায়াছবির আকাশে ... দুর্দিনের পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এবার পুজোতে দুখানি বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করছে। দুটো ছবিই উত্তমকুমার অভিনীত। ছবি দুটি হল 'মেম-সাহেব' ও 'ছিন্নপত্র'।

অসীমা ভট্টাচার্য প্রযোজিত এ সুরারোপিত এবং পিনাকী মুখার্জী পরিচালিত 'মেমসাহেব' ছবিটি উত্তম, পূরবী, উত্তমকুমার রায়, ... অনিল, কেতকী, রুদ্রপ্রসাদ ...

প্রখ্যাত অবহেলিত উচ্চাভিলাষী এক সাংবাদিকের জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের পিছনে এক কল্যাণময়ী তরুণীর অকৃত্রিম ভালবাসা, প্রেম, অনুপ্রেরণায় সেই সাংবাদিক অভ্যুত্থান সফলতা অর্জন করেছিল এবং ওদের দুজনের ছোট্ট সুন্দর, সুসংবদ্ধ সংসার গড়ার স্বপন যখন বাস্তবে রূপায়িত করার সময় এল তখনই বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত সেই অনুপ্রেরণাদাত্রী মেমসাহেবকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন বিধাতা পুরুষ। ভাবাবেগে ও করুণা রসে আপ্লুত নিমাই ভট্টাচার্যের ঐ নামেরই রোমান্টিক উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রগুলোর রূপায়ণে আছেন—উত্তমকুমার (সাংবাদিক—বাসিত) অপর্ণা সেন (মেমসাহেব অর্থাৎ কজল) বিকাশ রায়, সুব্রতা চ্যাটার্জী, ললিতা চ্যাটার্জী, সুমিত্রা মুখার্জী, জহর রায়, গীতা দে, বাসন্তী চ্যাটার্জী, সুব্রত সেন ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি। নেপথ্য কণ্ঠদান করেছেন মান্না দে ও অসীমা ভট্টাচার্য।

বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্রকার পরিচালক ঋত্বিককুমার ঘটক তাঁর পরবর্তী দুখানি বাংলা ছবির চিত্রগ্রহণ এপার-ওপার দুপার বাংলায় নিয়মিত চিত্রগ্রহণ চালিয়ে যাচ্ছেন। পরিচালক ঋত্বিক বর্তমানে ওপার বাংলায় তিতাস একটি নদীর নাম-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের স্যুটিং করতে গেছেন। গত মাসে তিনি কলকাতায় তাঁর স্বরচিত কাহিনী 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' ছবির ৪।৫ দিনের কাজ করেছেন। ছবির বহির্দৃশ্যগ্রহণ করা হয়েছে ভবানীপুরের নন্দন পার্কে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডে তাঁর পুরনো ভাড়া বাড়িতে এবং কলেপুকুর অঞ্চলের একটি ভাঙা বাড়িতে। তাছাড়া তিনি তাঁর নিজস্ব সুরারোপে ছবির কয়েকটি গানও রেকর্ড করিয়েছেন। গেয়েছেন—আরতি মুখার্জী, দেবব্রত বিশ্বাস এবং জনৈক লোকগীতি শিল্পী। এ ছবিটির পর্বে বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছেন—তৃপ্তি মিত্র, শাওলী মিত্র এবং ঋত্বিক ঘটক স্বয়ং। চিত্রগ্রহণে ছিলেন ওপার বাংলার বিখ্যাত চিত্রগ্রাহক বেবী ইসলাম। ভারত সরকারের ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের আর্থিক সহায়তায় ছবিটি নির্মিত হচ্ছে।

অন্ধকার রাত। মাঠের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে একটি মেয়ে। সমস্ত শরীর তার ভেঙে পড়ছে অবসাদে। সন্ধানী আলোর রশ্মি পেছনে আর দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটি ক্লান্ত অবসন্ন হাতে এক অজানা দরজায় করাঘাত করল।.. নীরার বুকে আসা চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি বিবাহ-বাসর। সানাই বাজছে, কুমকুম চন্দনে শোভিত তার কপোল। প্রচণ্ড কোলাহল। শিবনাথ দরজা খুলে দেখল একটি মেয়ে চেতনা হারিয়ে তার স্টুডিও দরজায় পড়ে আছে এক অপরূপা রূপসী। তারপর? না, ছবির শেষটুকু বলা যাবে না। সিনেমার পর্দায় বাকীটা দেখে নেবেন। ছবির নাম 'হার মানা হার।' কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহাশ্বেতা' অবলম্বনে রচিত সম্বাক চিত্র প্রাইভেট লিমিটেডের প্রযোজনায় ছবির স্যুটিং নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে দ্রুত সমাপ্তির পথে। স্ব-রচিত চিত্রনাট্যে ছবিটি পরিচালনা করছেন—সলিল সেন এবং সুরারোপে আছেন—সুধীন দাশগুপ্ত। ছবির মুখ্য দুই শিল্পী হলেন—উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন। চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিমিটেডের পরিবেশনায় ছবিটি মুক্তিলাভ করবে।

যেসব নতুন ছবির স্যুটিং শুরু তাড়াতাড়ি শুরু হতে চলেছে তার একটা তালিকা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

বিজয় বসুর পরিচালনায়—'আমার নাম বকুল', পীযুষ গাঙ্গুলীর পরিচালনায় 'জন্মভূমি', সুধীর মুখার্জীর পরিচালনায়—'ননীগোপালের বিয়ে', অসিত সেন পরিচালনায় 'জীবন যে রকম', অরুন্ধতী মজুমদারের পরিচালনায় 'কাজো হাইল জোন', বিকাশ রায়ের পরিচালনায় 'কাজললতা', অগ্রদূতের পরিচালনায় 'সেদিন দুজনে', সুনীল ব্যানার্জীর পরিচালনা—'কবি', পীযুষ বসুর পরিচালনায় 'পথের দাবী', অরবিন্দ মুখার্জীর পরিচালনায় 'অলীক', দীনেন
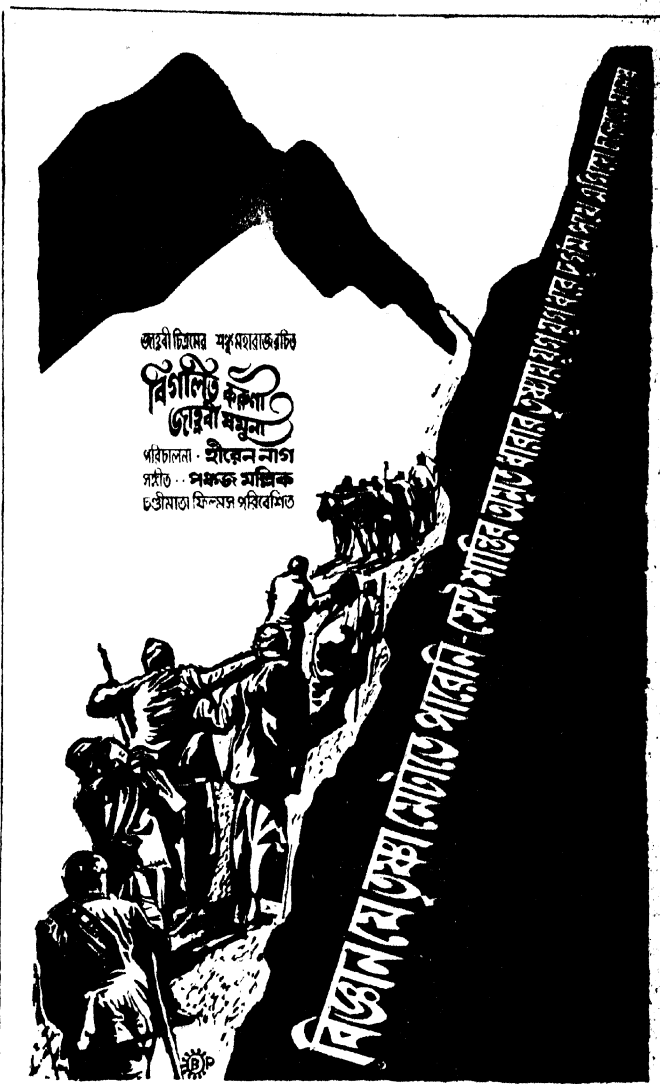
আমি সিরাজের বেগম/বিশ্বজিৎ-সন্ধ্যা রায়

গুপ্তের পরিচালনায়—'ওমান আপ টু ডাউন।' এবারে এখানেই শেষ করছি।

'ছিন্নপত্র' আসছে: যাত্রিক পরিচালিত কলামন্দিরের দ্বিতীয় নিবেদন 'ছিন্নপত্র' ছবিটি রূপবাণী, অরুণা, ভারতী-র পরবর্তী আকর্ষণ হিসেবে মুক্তি প্রতীক্ষায়। নীহাররঞ্জন গুপ্তের জনপ্রিয় উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন

পরিচালক 'যাত্রিক'। সংগীত পরিচালনা করেছেন—নচিকেতা ঘোষ। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন—আরতি মুখার্জি, বনশ্রী সেনগুপ্ত ও দীনেন চৌধুরী। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন [illegible]—অনিল গুপ্ত ও অমিয় মুখার্জি। দ্বৈত চরিত্রে উত্তমকুমারের অসাধারণ অভিনয় তাঁর শিল্পীজীবনের শ্রেষ্ঠতম চরিত্র-চিত্রণ হিসেবে চিহ্নিত হবার দাবী রাখবে। দুটি নায়িকার চরিত্রে রূপদান করেছেন—মাধবী চক্রবর্তী এবং সুপ্রিয়া দেবী। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন—কমল মিত্র, অসিতবরণ, চন্দ্রাবতী দেবী, অমরনাথ মুখার্জী, হরিধন মুখার্জী, সাধন সেনগুপ্ত ও অপর্ণা দেবী। শুভ চিত্রম ছবিটির পরিবেশক।

'টুরিস্ট' চিত্রের সংগীত গ্রহণ: অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও [illegible] কণা রায় প্রযোজিত 'টুরিস্ট' ছবির চারখানা গান ৩ সেপ্টেম্বর টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে সত্যেন চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে গৃহীত হয়েছে। গানগুলি লিখেছেন ও সুর দিয়েছেন নবীন সরকার আনন্দ মুখার্জি, গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন রেণু চৌধুরী, বাচ্চু রহমান ও যোগেশ। ছবিটির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ এ মাসের মাঝামাঝি সুরু হবে। চরিত্র-চিত্রণে আছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, জুঁই ব্যানার্জী, অজয় ব্যানার্জী, বিনোদকুমার, সুচন্দ্রা দত্ত, রবি ঘোষ, জ্ঞানেশ মুখার্জী, চিন্ময় রায়, অনু দত্ত, চন্দ্রাবতী দেবী, রঞ্জনা রায় ও সোমা দে প্রভৃতি এবং আরো অনেকে।

ফুলু ঠাকুরমা ছবির সংগীত গ্রহণ: গত সপ্তাহে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে সাধন ফিল্মসের প্রথম ছবি 'ফুলু ঠাকুরমা'-র কয়েকটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। গানগুলি গেয়েছেন—শ্যামল মিত্র ও আরতি মুখার্জি। ছবিটিতে সুরারোপ করছেন—শ্যামল মিত্র। শৈলেশ গুহনিয়োগী ও প্রবোধবন্ধু অধিকারী রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করছেন—প্রখ্যাত অভিনেতা পরিচালক সাধন সরকার। গানগুলি লিখেছেন—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। এ মাসের শেষ সপ্তাহে ছবিটির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ সুরু হবে।

পিয়াসী মন ছবির শুভ মহরৎ: নবগঠিত প্রযোজক সংস্থা সুর-শিল্পী ইউনিটের প্রথম নিবেদন 'পিয়াসী মন' ছবির শুভমহরৎ সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত। ক্ল্যাপস্টিক দেন—জহর রায়। মহরৎ শিল্পী ছিলেন নবাগতা নায়িকা সীমা দাস। অরুণ ঘোষ প্রযোজিত ছবিটির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন—সুনীলবরণ। সুরারোপে থাকবেন তরুণ সুরকার সুমিত ব্যানার্জি। চিত্রগ্রহণ ও প্রধান কর্মসচিবের দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে বিজয় দে ও পশুপতি কুণ্ডু। বাংলার জনপ্রিয় শিল্পীদের সঙ্গে কয়েকজন নবাগত। নবাগতাকে নিয়ে এমাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ছবিটির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ সুরু হবে।

মঞ্চাভিনয়

কালচারাল সেমিনারের নতুন নাটক: আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় [illegible] কালচারাল সেমিনারের শিল্পীরা তাঁদের নতুন নাটক 'অজগর' পরিবেশন করবেন মিনার্ভার মঞ্চে। নাটকটি লিখেছেন [illegible] মুখোপাধ্যায়, নাট্য-নির্দেশনার দায়িত্বও রয়েছে তাঁর ওপর।

বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন [illegible] সমর মুখার্জি, [illegible] ঘোষ, [illegible] তপন মুখার্জি [illegible] দে, [illegible] দিলীপ ভট্টাচার্য, [illegible] দে ও [illegible] রায়চৌধুরী। আলোকসম্পাতে ও [illegible] প্রক্ষেপনে রয়েছেন বাবুলাল ঘোষ ও [illegible] দাস।

নটনজ্ঞানের 'সাধক রামপ্রসাদ': সাধক রামপ্রসাদের ভক্তিবিহ্বল জীবনকে [illegible] করে রচিত একটি নাটক কয়েকদিন আগে 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হোল। নাটকটির নাম 'সাধক রামপ্রসাদ'; প্রযোজনা করেছেন নটনজ্ঞানের শিল্পীরা। শিল্পীদের নিখুঁত অভিনয়ের প্রাণোলোকে সামগ্রিক প্রযোজনাটি বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেন ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারী তিনি, তাঁর অনুপম চরিত্রচিত্রণের মধ্য দিয়ে সাধক রামপ্রসাদের ভাবমূর্তিটি যেন রেখায় ও রঙে বিকশিত হয়ে উঠেছে। নাট্য-নির্দেশনার দায়িত্বও নিয়েছিলেন তিনি। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, জমিদার 'দুর্গাচরণ মিত্র' একটি বলিষ্ঠ চরিত্র-চিত্রণ হয়ে উঠেছে। চন্দ্র মল্লিকের 'নরহরি'ও দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে প্রচুর। অন্য কয়েকটি ভূমিকায় ছিলেন আবু সালেক সিদ্দিকী (সিরাজ), অমূল্য মুখোপাধ্যায় (ভজহরি), জলি দাস (দেবী), বাণী বন্দ্যোপাধ্যায় (রামপ্রসাদের মা), পশুপতি ঘোষ (মোহনলাল), কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আজু

গোসাই), রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (গোপাল ভাঁড়), মলি দাস (রামদয়াল), পঞ্চানন নন্দী (নেপাল), সুবীর রায় (নায়েব), নিমাই সাহা (মীরজাফর), দেবেশ ব্যানার্জি (কাজী সাহেব), শান্তি চ্যাটার্জি (কৃষ্ণ), সবিতা মিত্র (রামপ্রসাদের স্ত্রী), তাপসী ব্যানার্জি (রামপ্রসাদের কন্যা) ও লিলি দাস।

যাত্রিকের 'আমার জননী' : মফস্বল নাট্যগোষ্ঠীর মধ্যে নৈহাটির 'যাত্রিক' একটি বিশিষ্ট নাম। ইতিপূর্বে বহু পূর্ণাঙ্গ ও একাংক নাটকের অভিনয় করে নাট্যরসিকদের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি এই গোষ্ঠীর শিল্পীরা অর্জন করেছেন এবং তাঁদের ব্যাপকতর প্রচেষ্টায় নাট্যচর্চার সুগভীর আন্তরিকতাই সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি তাঁরা কাঁচরাপাড়া রাইন্ডমাস ইনস্টিটিউটে আর একটি বলিষ্ঠ নাট্য-প্রযোজনার স্বাক্ষর রাখলেন। নাটকটির নাম হোল 'আমার জননী'। একুশে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনকে পটভূমিকা করে এই জীবন্ত নাটকটি রচনা করেছেন রবীন্দ্র ভট্টাচার্য।

নাটকটির মধ্যে যে কাহিনী আবর্তিত হয়েছে তার কেন্দ্রবিন্দু হোল একটি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী পরিবার। এই পরিবারের প্রত্যেকেই গর্ব অনুভব করতো বাঙালী বলে। তারা ভাবতো আমাদের প্রিয় ভাষা বাংলাই হবে আমাদের মাতৃভাষা; এই বাংলা শুধু হিন্দুর ভাষা নয়, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের ভাষা আমাদের প্রাণের ভাষা। অন্যদিকে ঘৃণ্য শাসক শ্রেণীর আমলার দল এই উপলব্ধি থেকে এতটুকু অর্থ খুঁজে পায়না। তাঁদের মতে উর্দুই হবে একমাত্র ভাষা। এই উর্দুকে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে পাকিস্থানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। তাই সংঘর্ষ অনিবার্য হোল, উৎপীড়ন, অত্যাচার শুরু হোল বাংলা ভাষাভাষীদের উপর। এই সংঘাতের আবর্তেই 'আমার জননী' নাটকের ধারা এগিয়েছে।

নাটকটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল, আনসার আলী প্রভৃতির গান ব্যবহৃত হয়েছে। এতে নাটকটির গতি আরো অর্থময় হয়ে উঠতে পেরেছে।

প্রায় প্রতিটি চরিত্রের শিল্পীরাই সাবলীল অভিনয় করতে পেরেছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবী কুমার ভট্টাচার্য, স্বপন ভট্টাচার্য, নিখিল ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রথীন ভট্টাচার্য, হরিমোহন ঘোষ, সমীর রায়, সৌমেন্দ্র ভট্টাচার্য, যূথিকা চক্রবর্তী, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়।

নাট্য-নির্দেশনার দায়িত্ব নেন নিখিল ভট্টাচার্য। আলোকসম্পাতে ছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও অনুপ দাশ।

লিপটন ড্রামাটিক ক্লাবের 'দাবী' : শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্তের বাস্তবজীবনরসসমৃদ্ধ নাটক 'দাবী' সম্প্রতি অভিনীত হোল 'রবীন্দ্র সদন' মঞ্চে। প্রযোজনা করলেন লিপটন ড্রামাটিক ক্লাব। ক্লাবের চতুর্দশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত এই নাটকটির পরিবেশনা সব দিক দিয়ে বেশ প্রাণবন্তই হয়ে ওঠে। প্রয়োগ পরিকল্পনার আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় রাখেন শ্রীদীনেন রায়।

বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন মৃণ্ময় রায়চৌধুরী, অমরেন্দ্রনাথ মিত্র, জেরাল্ড গোমস, পিটার জ্যাকসন, কৌস্তভ চ্যাটার্জি, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, দিবাকর চক্রবর্তী, টেরেন্স গোমস, অপূর্ব বসু, তনুকুমার রায়, তপনকুমার দাস, সুশীল বোস, শক্তি ব্যানার্জি, দীপঙ্কর রায়চৌধুরী, গীতশ্রী দেবী, মমতা ব্যানার্জি, প্রতিমা পাল, শ্রীমতী পাইন, তৃপ্তি দাস, গীতা দে ও মল্লিকা দত্ত।

সপ্তর্ষির এরাও বাঙালী : গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর রঙ্গনা মঞ্চে সপ্তর্ষি নাট্যসংস্থা একটি সফল নাটক 'এরাও বাঙালী' মঞ্চস্থ করেন। প্রতি মুহূর্তে সংঘাত ও চরিত্র সৃষ্টির কৃতিত্বে নাট্যকার-পরিচালক গৌরচন্দ্র সাহা প্রশংসার্হ। অভিনয়ের কথা বলতে গেলে আদর্শ স্থানীয় হোসেন শা চরিত্রটি নাট্যকার পরিচালক শ্রীসাহার নব্যরচিত গাম্ভীর্য ও অভিনয় কলাকৌশলের জন্য স্মরণীয়। তবে স্বরভঙ্গতার জন্য কোন কোন সময় তাঁর কণ্ঠস্বর দর্শকদের শ্রুতিগোচর হয়নি। যখন হরিদাসের ভূমিকায় উমাশংকর বসু এক ... চরিত্র সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। ... রামলালের ভূমিকায় ... চমৎকার। বৃদ্ধ ... ভক্তি সাহা প্রশংসনীয়। ... ভূমিকায় প্রণব ঘোষ চরিত্রানুগ। ... সুঅভিনয়ের জন্য দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছেন—রণেন বসু, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত সেন, বাণী মিত্র ও আশা বোস।

কালিদাস রঙ্গালয় : স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত নাট্য-আন্দোলনের জোয়ার যে বিহারেও নতুন সুরে মুখর হয়ে উঠেছে, এ তথ্য আজ নাট্যরসিকদের কাছে আর হয়তো অজানা নেই। নাট্যচর্চার এই গভীরতর ব্যাপকতার অন্তরালে যে গোষ্ঠীর শৈল্পিক নিষ্ঠাই অর্থময় আলোয় সমুজ্জ্বল হয়ে আছে, তার নাম হোল 'বিহার আর্ট থিয়েটার'। বিশেষ করে এর প্রতিষ্ঠাতা অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম, সুগভীর আন্তরিকতা ও সূক্ষ্ম নাট্যবোধ, সর্বোপরি ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর সপ্রতিভ উপলব্ধিই এর নেপথ্যে সীমাহীন উদ্দীপনার প্রদীপ হয়ে

দশক

অলিম্পিকের সমাচার

মিউনিখ অলিম্পিক স্টেডিয়ামে বিপুল উৎসাহে অলিম্পিকে গোল্ডেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান যেখানে মহাসমারোহ এবং আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে উদ্‌যাপিত হয়েছিল সেখানে দেখা গেল এক বিষাদক্লিষ্ট পরিবেশের মধ্যে সমাপ্তি-অনুষ্ঠানের আয়োজন। আরব গেরিলা দলের হাতে নিহত ১১জন ইজরায়েলী অলিম্পিক খেলোয়াড়ের আত্মার সম্মানার্থে সমস্ত-আমোদ-উৎসব বর্জন করা হয়। মিউনিখ অলিম্পিক গেমসের সঙ্গে এই ভয়াবহ ঘটনাটি এমনভাবে জড়িত যে, চিরকাল তা মিউনিখ অলিম্পিক গেমসের কলঙ্ক হয়ে থাকবে।

৫ই সেপ্টেম্বর, অলিম্পিক গেমসের একাদশ দিনে, একদল আরব গেরিলা অলিম্পিক গ্রামে ইজরায়েলী খেলোয়াড়দের আস্তানায় সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। ঘটনাস্থলেই দুজন ইজরায়েলী খেলোয়াড় মৃত্যুবরণ করেন এবং গেরিলাদের হাতে ৯জন ইজরায়েলী বন্দী হন। পরদিন মিউনিখের নিকটবর্তী এক সামরিক বিমান ঘাঁটিতে ইজরায়েলী বন্দী খেলোয়াড়দের নিয়ে পালাবার সময় আরব গেরিলা দলের সঙ্গে পশ্চিম জার্মান পুলিশ দলের যে মেশিনগানের লড়াই হয় তাতে ৫জন গেরিলা এবং ১জন জার্মান পুলিশ নিহত হন। অপরদিকে আরব গেরিলারা ৯জন বন্দী-ইজরায়েলী খেলোয়াড়কে গ্রেনেড নিক্ষেপে হত্যা করে। এই শোকাবহ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অলিম্পিক গেমসের অনুষ্ঠান সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল। অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে এমন শোকাবহ ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি।

ফুটবল প্রতিযোগিতা

অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে পোল্যান্ড অপ্রত্যাশিতভাবে ২-১ গোলে হাঙ্গেরীকে পরাজিত করে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে। এ যেন হাঙ্গেরীর বাড়া ভাতে ছাই পড়ার অবস্থা। হাঙ্গেরী ইতিপূর্বে তিনবার (১৯৫২, ১৯৬৪ ও ১৯৬৮) অলিম্পিক ফুটবলের স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে এবং এবার স্বর্ণ পদক পেলে তারা উপর্যুপরি তিনবার স্বর্ণ পদক জয়ী হত যার নজির অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতার ইতিহাসে নেই। উপর্যুপরি দুবার করে স্বর্ণ পদক পেয়েছে মাত্র এই তিনটি দেশ—ইংল্যান্ড (১৯০৮, ১৯১২), উরুগুয়ে (১৯২৪ ও ১৯২৮) এবং হাঙ্গেরী (১৯৬৪ ও ১৯৬৮)। এখানে উল্লেখ্য, পোল্যান্ড ইতিপূর্বে অলিম্পিক ফুটবলের কোন পদকই জয়ী হয়নি, এই তাদের প্রথম পদক জয়। রাশিয়া বনাম পূর্ব জার্মাণীর খেলা ২-২ গোলে শেষ হওয়াতে তাদের প্রত্যেককেই ব্রোঞ্জ পদক দেওয়া হয়েছে।

ইউরি তারমাক (রাশিয়া) হাইজাম্পে স্বর্ণপদক বিজয়ী

ফেইনা মেলনিক (রাশিয়া) ডিসকাসে স্বর্ণপদক বিজয়িনী

এবারের শেষ ফুটবল লীগ পর্যায়ের খেলায় 'এ' গ্রুপ থেকে হাঙ্গেরী এবং 'বি' গ্রুপ থেকে পোল্যান্ড অপরাজিত অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সুবাদে ফাইনালে উঠেছিল। লীগের খেলায় পোল্যান্ড ২-১ গোলে রাশিয়াকে হারিয়ে প্রমাণ করেছিল এবার সে অলিম্পিক ফুটবলের 'ডার্ক হর্স'।

হকি প্রতিযোগিতা

অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে পশ্চিম জার্মানী ১-০ গোলে পাকিস্তানকে পরাজিত করে স্বর্ণ পদক জয় করেছে। প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলাতেও পশ্চিম জার্মানীর কাছে পাকিস্তান হেরেছিল (১-২ গোলে)। ভারতবর্ষ ২-১ গোলে হল্যান্ডকে হারিয়ে গতবারের মত এবারও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। ভারতবর্ষ বনাম হল্যান্ডের লীগের খেলাটি ১-১ গোলে ড্র ছিল।

পশ্চিম জার্মানীর এই স্বর্ণ পদক জয়ের ফলে অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান তথা এশিয়া মহাদেশের সুদীর্ঘ ৪৪ বছরের একাধিপত্যের অবসান হল। অলিম্পিক গেমসে হকি খেলা প্রথম তালিকাভুক্ত হয় ১৯০৮ সালে। কিন্তু ১৯১২ ও ১৯২৪ সালের অলিম্পিক গেমসের তালিকায় হকি খেলা বাদ পড়ে। ১৯০৮ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সময়ে যে ১২টি অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতা হয়েছে তাতে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে মাত্র ৪টি দেশ—ইউরোপের দুটি (ইংল্যান্ড এবং পশ্চিম জার্মানী) এবং এশিয়ার দুটি (ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান)। অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে ভারতবর্ষ ৭-বার (এর মধ্যে উপর্যুপরি ৬বার), ইংল্যান্ড ২ বার (১৯০৮ ও ১৯২০) পাকিস্তান ২ বার (১৯৬০ ও ১৯৬৮) এবং পশ্চিম জার্মানী ১ বার (১৯৭২)।

১৯৭২ সালের প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় 'এ' গ্রুপ থেকে পশ্চিম জার্মানী এবং 'বি' গ্রুপ থেকে ভারতবর্ষ অপরাজিত অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে সেমি ফাইনালে উঠেছিল। অপরদিকে পাকিস্তান 'এ' গ্রুপের এবং হল্যান্ড 'বি' গ্রুপের রানার্স-আপ হিসাবে সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল।

the best range
money can buy
CO—80 DELUXE MK II
COSMIC
Solid State
Stereo
CO-60 DELUXE
COSMIC LAB 3000
COVOX-3500

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানানো হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য অমৃত কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।
২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে অমৃত কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার (চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১.০২
ষাণ্মাসিক	টাকা	০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

Friday 22nd September, 1972 শুক্রবার, ৫ আশ্বিন, ১৩৭৯ .52 Paise

এক নজরে

রামায়ণের কাল : বৈদিক যুগের অন্যতম মহাকাব্য রামায়ণের রচনাকাল নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নানা মতভেদ আছে। এমনকি সমগ্র গ্রন্থটি একই সময়ে একই ব্যক্তির রচনা বলে কেউই প্রায় স্বীকার করেন না। অনেক পণ্ডিতের অভিমত, বাল্মীকি কর্তৃক রামায়ণ মহাকাব্য রচিত হওয়ার অনেক আগে একটি লোকগাথা-রূপে রামকাহিনী প্রচলিত ছিল এবং বাল্মীকি তাঁর কাব্য-প্রতিভাবলে সেই লোকমুখে প্রচারিত কাহিনীকেই শাশ্বত মহাকাব্যে রূপায়িত করেন। এই জন্য 'রামজন্মের ষাট হাজার বছর আগে রামায়ণ' কথাটির প্রচলন। রামায়ণ ও ইলিয়ড মহাকাব্যের কাহিনীর সাদৃশ্য দেখিয়ে অনেক ঐতিহাসিক বলেন, আর্যরা এশিয়া ও ইউরোপের দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ার কালে একই লোকগাথা সর্বত্র প্রচার করে এবং দেশ-কাল ভেদে সে-সব কাহিনী মূলত এক থেকেও ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিগ্রহ করে। কোন কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যের সমারোহ সৃষ্টি করে এমন পর্যন্ত প্রমাণের চেষ্টা করেছেন যে, রাম আসলে মিশরের ফারাও রামাসেস। তবে রামায়ণ যে একেবারে আরব্য উপন্যাসের মতো কাহিনী মাত্র নয়, নানাভাবে পল্লবিত হলেও তার মূল ভিত্তি যে ইতিহাস সেটা বোঝা যায় কাহিনীতে উল্লিখিত অযোধ্যা, মিথিলা প্রয়াগ, শৃঙ্গবেরপুর, বিথুর, দণ্ডকারণ্য, লঙ্কা প্রভৃতি স্থানের নামে যাদের অস্তিত্ব আজও অটুট আছে। তাছাড়া ঋগ্বেদ, দশরথ জাতক, বাসরামায়ণ প্রভৃতি কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে একই কাহিনীর উল্লেখে রাম-কাহিনীর ঐতিহাসিকতা আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ ভারতের উগ্র আঞ্চলিকতাবাদীদের কাছে রামায়ণ দ্রাবিড় সভ্যতার উপর উত্তর ভারতীয় আর্যদের আক্রমণ-কাহিনীরূপে বিবেচিত এবং সিংহলের বৌদ্ধদের কারও কারও মতে মহাকবি বাল্মীকি সিংহলের বৌদ্ধদেরই রাক্ষস বলে বর্ণনা করেছেন। এই উক্তি কোন কারণেই সমর্থনযোগ্য না হলেও এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে রামায়ণ-কাহিনী বুদ্ধোত্তর যুগে লিখিত হয়। কারণ, কাহিনীর বিভিন্ন স্থানেই বারবার বৌদ্ধদের উল্লেখ দেখা যায়।

সম্প্রতি গোয়ালিয়রের জীবাজি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক শ্রী বি বি লাল ঘোষণা করেছেন, রামায়ণ যুগ সঠিক নির্ধারণের জন্য তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান শুরু হবে। তাঁরা তিন বছর ধরে অনুসন্ধান চালাবেন এবং তাঁদের অনুসন্ধান ক্ষেত্র হবে রামরাজ্যের রাজধানী অযোধ্যা, বনবাসে যাত্রাকালে শ্রীরামচন্দ্র যেখানে গঙ্গানদী অতিক্রম করেন সেই শৃঙ্গবেরপুর, বাল্মীকির আশ্রমস্থান বিথুর ও এলাহাবাদস্থ ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম যেখানে শ্রীরামচন্দ্র চিত্রকূট যাওয়ার পথে একদিন বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন।

অধ্যাপক লাল ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে 'ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব ও দুই মহাকাব্য' এই বিষয়ে ভাষণদানকালে বলেন যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে তিনি যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেগুলি ঠিকমতো বিশ্লেষিত হলে এমনও হয়ত প্রমাণিত হতে পারে যে রামায়ণ রচিত হয় মহাভারত মহাকাব্যের পরে।

কলম্বাস ইহুদি ছিলেন? : নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের পাকড়াও করার কাজে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন সাইমন উইসেনথাল। তাঁর বৃহত্তম শিকার হল এডলফ আইখম্যান। সম্প্রতি উইসেনথাল আবার এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কর্তা ক্রিস্টোফার কলম্বাসকে তাঁর সদ্য-প্রকাশিত এক গ্রন্থে ধর্মান্তরিত ইহুদি বলে ঘোষণা করে। তিনি বলেছেন, হারিয়ে যাওয়া দশটি ইহুদি উপজাতি ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে—এই জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে তিনি ভারতের সন্ধানে জলপথে যাত্রা করেন এবং তারই ফলে আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়। তিনি আরও বলেছেন যে, স্পেনে ইহুদিদের বসবাস অসম্ভব হয়ে পড়েছিল বলে সেখানকার ধনী ইহুদিরা প্রচুর অর্থ ও লোকবল দিয়ে কলম্বাসকে সমুদ্রযাত্রায় উৎসাহিত করেন। এবং কলম্বাস যাতে কোন অসুবিধায় না পড়েন তার জন্য তিনি ইহুদি দোভাষী এবং ইহুদি ধর্মযাজকও সঙ্গে নিয়ে যান।

ইতালীয় অভিযাত্রী কলম্বাসকে রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী বলেই জানেন সবাই। কিন্তু উইসেনথাল জোর দিয়ে বলেছেন, কলম্বাস যে স্পেনে অবস্থানকালে ইহুদিদের সংস্পর্শে এসে ধর্মান্তরিত হন তার কয়েকটি বেশ জোরালো প্রমাণ তিনি দেখাতে পারেন। তিনি কলম্বাসের সমুদ্রযাত্রাকালে লিখিত দিনপঞ্জীর নানা অংশ উদ্ধৃত করে বলেছেন, ঐসব উদ্ধৃতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, ইহুদিদের ক্যালেণ্ডার, ইহুদিদের প্রফেট ও ইহুদি ইতিহাস সম্পর্কে কলম্বাসের ভালই জানা ছিল।

একটি ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে উইসেনথাল তাঁর তত্ত্ব গড়ে তুলতে চেয়েছেন। রোমানদের আক্রমণে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইহুদিরা ইস্রায়েল ত্যাগে বাধ্য হওয়ার পর পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতেও তাদের একটি বড় অংশ এসে কেরলের উপকূলে বসতি গড়ে তোলে। মধ্যযুগে মুস্লিম অধিকৃত স্পেনই ছিল ইউরোপে ইহুদিদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। সে-সময় সেখানে ইহুদিদের উদ্যোগে আরবি ও হিব্রু ভাষায় একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়ে ওঠে। কিন্তু ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে স্পেন খৃষ্টানদের অধিকারে গেলে ইহুদিদের উপর আবার নির্যাতন শুরু হয় এবং ইহুদিদের পক্ষে স্পেনে বসবাসও অসম্ভব হয়ে পড়ে। লক্ষণীয় যে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দেই কলম্বাস ৩রা আগস্ট সমুদ্রযাত্রা করেন এবং তার পাঁচ দিন পরে ইহুদিদের উপর স্পেনের রাজ-সরকারের ব্যাপক নির্যাতন শুরু হয় যা ইতিহাসে 'স্প্যানিশ ইনকুইজিশন' নামে খ্যাত। উইসেনথাল বলতে চেয়েছেন, ঐ গণপীড়নের আশঙ্কা করেই স্পেনের প্রতিপত্তিশালী ইহুদিরা নতুন বাসস্থানের সন্ধানে, এবং সম্ভবত ভারতে বসবাসকারী ইহুদিদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের আশায় তাঁদের ধর্মে নবদীক্ষিত কলম্বাসকে ভারতের অনুসন্ধানে পাঠান।

শুক্রগ্রহে আলো : মনুষ্যবিহীন সোভিয়েট রকেট ভিনাস-৮ শুক্রগ্রহে ধীর অবতরণের পর যেসব তথ্য পাঠিয়েছে তা বিশ্লেষণ করে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শুক্রগ্রহের মেঘবলয় নিশ্ছিদ্র নয়। তার ঘন মেঘের আবরণ ভেদ করে সূর্যের আলো কিছুটা তার মাটি স্পর্শ করে। এতদিন যে মনে করা হত, শুক্রগ্রহের মেঘবলয় সূর্যের সবটুকু তাপ ও আলো লেহন করে নিয়ে গ্রহটির অভ্যন্তরকে ঘনান্ধকার ও হিমশীতল করে রেখেছে সেটা ঠিক কথা নয়। সুতরাং, সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের অভিমত, শুক্রগ্রহে জীবনের অস্তিত্বের সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। তার মাটি ও পাথর সম্পর্কে যেটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তাও পৃথিবীর সঙ্গে শুক্রগ্রহের নিকট সাদৃশ্য প্রমাণ করে।

—[illegible]

ওলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গন, রণাঙ্গন

ওলিম্পিকের খেলাধুলোর আসরে এর আগেও যে রাজনীতির বেসুরো বাজনা বাজেনি, এমন নয়। আমেরিকার নিগ্রো খেলোয়াড়রা অতীতে ওলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রতিবাদের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এমনকি, এবারকার ওলিম্পিকের প্রাক্কালেও রাজনৈতিক প্রশ্নে খেলা ভাঙার উপক্রম হয়েছিল। প্রশ্নটা ছিল, দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রতিযোগীদের ওলিম্পিকে যোগ দিতে দেওয়া হবে কিনা। স্বাধীন আফ্রিকার দেশগুলি এক বাক্যে জানিয়ে দিয়েছিল, ক্ষমতা-অপহারী ইয়ান স্মিথের দেশের খেলোয়াড়দের যদি ওলিম্পিকে যোগ দিতে দেওয়া হয় তাহলে তারা এই ওলিম্পিক বয়কট করবে। মিউনিখের ক্রীড়াঙ্গনে যদি দক্ষিণ রোডেশিয়াকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হত তাহলে এই আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর আসর এবার আদৌ বসত কিনা সন্দেহ আছে। কিন্তু বিতর্কটা, সৌভাগ্যের বিষয়, অত দূর গড়ায়নি। দক্ষিণ রোডেশিয়ার খেলোয়াড়রা ওলিম্পিক কমিটির সর্ত অনুসারে বৃটিশ পাসপোর্ট নিয়ে আসতে রাজি নয়, এই কারণ দেখিয়েই দক্ষিণ রোডেশিয়াকে বাদ দেওয়া গেছে।

তবে মিউনিখ ওলিম্পিক যেভাবে শেষ হল তাতে মনে হচ্ছে, এমন ওলিম্পিক আদৌ শুরু না হলেই বোধ হয় ভাল ছিল। এবারকার ওলিম্পিক ত ক্রীড়াঙ্গন নয়, যেন এক রণাঙ্গন। সেখানে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা যেন বেগের সঙ্গে বেগের, কুশলতার সঙ্গে কুশলতার, শক্তির সঙ্গে শক্তির নয়, বরং সেখানে প্রতিযোগিতা যেন হিংসার সঙ্গে প্রতিহিংসার, মারের বদলে পাল্টা মারের। শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়ে রইল, মিউনিখ একটি খেলার নাম নয়, একটি লড়াইয়ের নাম। রাজনৈতিক আসর ছাপিয়ে জাতিবৈর তার রক্তাক্ত থাবা বসিয়েছে মিউনিখের ক্রীড়াঙ্গনের উপর। অবার ক্রীড়াঙ্গনের এই রক্তপাত পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতিকে উত্তপ্ত করে তুলেছে। এই রক্তের ধারা মিউনিখ থেকে গড়িয়ে পড়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘে, সিরিয়া ও লেবাননের আকাশে। আরব গেরিলাদের হাতে মারা গেলেন ১১ জন ইজরায়েলি ক্রীড়াবিদ। পাল্টা গুলিতে যে গেরিলারা নিজেরা প্রাণ দিলেন ও পশ্চিম জার্মানির যে পুলিশ নিহত হলেন তাঁদের ধরে মোট প্রাণহানির সংখ্যা ১৭। ইজরায়েল মিউনিখের বদলা নিচ্ছে সিরিয়া ও লেবাননের গেরিলা ঘাঁটির উপর হাওয়াই হামলা চালিয়ে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র। একদিকে চীন ও সোভিয়েট রাশিয়ার ভিটো, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিটো রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বস্তি পরিষদকে পঙ্গু করে রেখেছে।

এটা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, মিউনিখ ওলিম্পিক সম্পর্কে এই কথাগুলিই বড় হয়ে রইল। কোথায় হারিয়ে গেল কে কত সোনা কুড়োলেন তার হিসেব, কোন্ খেলায় কেমন রেকর্ড হল তার খতিয়ান। কোথায় ওলিম্পিক হবে একটা বিশ্বমৈত্রীর আনন্দবাসর, তা নয়, সেখানে শিবিরে শিবিরে সশস্ত্র প্রহরী, স্টেডিয়ামের মাথার উপর জঙ্গী বিমান আর স্টেডিয়ামের ভিতরে জলপাই-সবুজ মিলিটারি ইউনিফর্মের ছড়াছড়ি। এমন বিষণ্ণ, সন্ত্রস্ত, বিপর্যস্ত ওলিম্পিক আর বুঝি হয়নি, আর যেন না হয়।

ওলিম্পিক আদর্শের অবমাননার আরও যেটুকু বাকি ছিল তার ষোল কলা পূর্ণ করল পাকিস্তান। হকির বিজয়মঞ্চে যে স্থান ভারত পাকিস্তানকে ছেড়ে দিয়েছে সেই স্থান এবার পাকিস্তান হারাল। হারাল, কিন্তু হার স্বীকার করল না। ফাইনালে হেরে সে রৌপ্যপদক পেল কিন্তু পাকিস্তানী খেলোয়াড়রা সেই রৌপ্যপদক মাথায় তুলে না নিয়ে পায়ের জুতোয় ভরে রাখল। এর আগে আর কোন ওলিম্পিকে কোন দেশের সমগ্র দলটি এমন অশোভন আচরণ করেননি। সেজন্য পাকিস্তান আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটির কাছ থেকে কঠোর দণ্ডও লাভ করেছে—পাকিস্তানী হকি খেলোয়াড়রা ওলিম্পিক থেকে চিরকালের জন্য এবং পাকিস্তান সমস্ত আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা থেকে চার বছরের জন্য নির্বাসিত।

ভবিষ্যতে যতদিন বিশ্বভ্রাতৃত্বের সামান্যতম অর্থও থাকবে, খেলাধুলোর নির্দোষ প্রমোদক্ষেত্রে সব মানুষ সব বিভেদ ভুলে এক হতে পারে, এই বিশ্বাস যতদিন অটুট থাকবে ততদিন আরও ওলিম্পিক হবে। এবং ততদিন মিউনিখের এই রক্তাক্ত, তিক্ত স্মৃতি জাগরূক থাকবে।

দেশে বিদেশে

দেড় মাসেরও বেশি পরে রোগমুক্ত হয়ে দেশে ফেরার পথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান দিল্লিতে থেমেছিলেন মাত্র ঘণ্টা তিনেকের জন্যে। কিন্তু এই সময়ের মাপকাঠি দিয়ে তাঁর ভারতের মাটিতে অবস্থান অথবা শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে আলোচনার গুরুত্ব পুরোপুরি বিচার করা যায় না। বাংলাদেশের মুক্তির পর এটা ছিল ইন্দিরা-মুজিবের তৃতীয় সাক্ষাৎ। প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল এই দিল্লিতেই। সেবারও তিনি বিদেশ থেকে স্বদেশে ফিরছিলেন, তবে রোগমুক্ত হয়ে নয়, কারামুক্ত হয়ে। সেবারও আমাদের রাজধানীতে তিনি কয়েক ঘণ্টার বেশি থাকতে পারেন নি। কারণ তাঁর স্বাধীন স্বদেশে ফিরে যাওয়ার জন্যে তিনি ছিলেন উদগ্রীব। তা ছাড়া সেই সময়টা কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পক্ষেও প্রশস্ত ছিল না। কারণ উপলক্ষটা ছিল আবেগআপ্লুত।

সেই তুলনায় মার্চে যখন শ্রীমতী গান্ধী ঢাকায় গেলেন তখন অনেক খোলাখুলি আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। আর সেই সফরের পরেই সই হয়েছিল ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি এবং কিছুদিন পরে বাণিজ্য চুক্তি। তারপরে মাস ছয়েক কেটে গেছে। ইতিমধ্যে দু-দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে কোনো যোগাযোগ হয়নি। অথচ এই সময়ের মধ্যেই ঘটে গেছে এই উপমহাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ভারত আর পাকিস্তান সই করেছে সিমলা চুক্তিতে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা সম্পর্কে ভারত বাংলাদেশকে অন্ধকারে রেখে দিয়েছে। সিমলা বৈঠকের আগে ও পরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী যেমন এদেশে এসেছেন তেমনই ভারতের পক্ষ থেকে দুর্গাপ্রসাদ ধর এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব পি এন হাকসার ঢাকা ঘুরে এসেছেন।

তবু দু-দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দিল্লিতে এই যে আলোচনা হলো তার একটা স্বতন্ত্র গুরুত্ব আছে। কারণ সিমলা চুক্তির পর তাঁরা যে শুধু এই প্রথম মুখোমুখি আলোচনার সুযোগ পেলেন তাই নয়, ইতিমধ্যে আরো কয়েকটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে দু-দেশের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি সৃষ্টির যে-চেষ্টা চলেছে সে-বিষয়েও খোলাখুলি কথাবার্তার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। এই আলোচনায় আবার নতুন করে এই কথাই জানা গেল যে নানা রাজনৈতিক প্রশ্নে ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই।

এই সব রাজনৈতিক প্রশ্নের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন অবশ্যই বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতিদান। এই স্বীকৃতি দেওয়া-না-দেওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান, এই দু-দেশের মধ্যে বিবেচ্য বিষয়। এর মধ্যে ভারতের সরাসরি কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু পরোক্ষ স্বার্থ অবশ্যই আছে এবং সেই স্বার্থ এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তির পথ প্রশস্ত করা। রাওয়ালপিণ্ডি যতোক্ষণ পর্যন্ত ঢাকাকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক না-করে তুলছে ততোক্ষণ পর্যন্ত উত্তেজনার আবহাওয়া বজায় থাকতে বাধ্য। সেই কারণেই শ্রীমতী গান্ধী ও সর্দার স্বরণ সিং বারবার এই প্রশ্নটির ওপর এত গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। দ্বিতীয় কথা হলো, স্বীকৃতি না-পেলে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসতে পারছে না। অথচ এই আলোচনা না-হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যর্পণের ব্যাপারটিও ফয়সালা হতে পারছে না, কারণ যুদ্ধবন্দীরা ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের হাতেই বন্দী।

শেখ মুজিব দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে এই কথাটা আবার পরিষ্কার করে দিয়ে গেলেন যে, এ-বিষয়ে তাঁর মনোভাবের কোনোই পরিবর্তন হয়নি। আগে স্বীকৃতি পরে আলোচনা—এই নীতিতে তিনি এখনও অচল। অস্ত্রোপচারের জন্যে তিনি যখন লণ্ডনের নার্সিং হোমে ছিলেন তখনও প্রেসিডেন্ট ভুট্টো টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একই জবাব পেয়েছিলেন। শেখ মুজিব নতুন করে এই পুরানো কথা জানিয়ে দেওয়ায় দেখা গেল এ-বিষয়ে ভারতের মনোভাবের সঙ্গে বাংলাদেশের মনোভাবের কোনো পার্থক্য নেই।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর সঙ্গে শেখ মুজিবের মনোভাবের এখনও ফারাক থেকে যাচ্ছে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট চাইছেন অন্ততঃ একবার মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় বসে তারপরেই তিনি স্বীকৃতি দেবেন—আর কোনো শর্ত তাঁর নেই। ভুট্টোসাহেবের এই বক্তব্যের মধ্যে কোথায় যেন একটা ছেলেমানুষির ভাব আছে। আর অন্য কোনো শর্ত যদি না থাকে তবে শুধু একবার মুজিবের সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাবকে এক ধরনের বায়না ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। দিল্লিতে ভারত-পাকিস্তান বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্যে যে-সব পাক অফিসারেরা এসেছিলেন তাঁরা নাকি কথা দিয়ে গেছেন যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নটাকে তাঁরা খুবই অগ্রাধিকার দেবেন। কিন্তু এখনই যে পাকিস্তান এই স্বীকৃতি দিতে পারছে না তার কারণ "ঐ রাস্তাটা এখনও কাদা—কাদা।" প্রেসিডেন্ট ভুট্টো নিজেও দিনকয়েক আগে বলেছেন যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সঙ্গে একটা ভাবাবেগের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। যে-দেশ এতদিন পাকিস্তানেরই অঙ্গ ছিল তাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নেওয়া কষ্টকর বৈ কি। কিন্তু এই শেখ মুজিবের সঙ্গে "একবার মাত্র দেখা করার" দাবি থেকে মনে হচ্ছে এ-ব্যাপারটাকেও প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বোধহয় ভাবাবেগের ব্যাপার করে তুলেছেন। তিনি যেহেতু বলে আসছেন যে মুজিবের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবেন না, সেই জন্যে নিয়মরক্ষার জন্যে হলেও একবার সেই দেখা হওয়াটা দরকার। এটাকে ভ্রান্ত প্রেস্টিজ-জ্ঞানও বলা যায়, আবার জিদ বলতেও বাধা নেই।

●

এদিকে শেখ মুজিবের নাম জড়িয়ে একটা চক্রান্তের রোমহর্ষক কাহিনী আবিষ্কার করে পাকিস্তানী কর্তারা হাওয়া গরম করতে চাইছেন। লোকের মুখে এই তথাকথিত চক্রান্তের নাম দাঁড়িয়েছে 'লণ্ডন চক্রান্ত'। সংক্ষেপে ঐ চক্রান্তের কাহিনীটা এই রকম : শেখ মুজিব যখন লণ্ডনে ছিলেন সেই সময় পাকিস্তানের জাতীয় আওয়ামি পার্টির (ন্যাপ) খান ওয়ালি খান এবং অপর দুই নেতা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পাকিস্তানকে টুকরো টুকরো করার মতলব আঁটেন। সেই মতলবটা হলো পাকিস্তানের প্রদেশগুলিকে নিয়ে একটি শিথিল কনফেডারেশন গঠন। পরে সুযোগমতো বাংলাদেশও ঐ কনফেডারেশনে যোগ দেবে। সেই সঙ্গে ন্যাপ নেতারা নাকি মুজিবকে বলেছিলেন, মুজিব ভারতকে অনুরোধ করুন যে ভারত যেন পাকিস্তানের অধিকৃত এলাকা থেকে সৈন্য সরিয়ে না-নেয়। কারণ সৈন্য সরাতে যতো দেরি হবে ততোই পাকিস্তানে অসন্তোষ বাড়বে এবং প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর পায়ের তলা থেকে মাটি সরতে থাকবে। তা হলেই তিনি কনফেডারেশন গঠনের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হবেন।

এই 'লণ্ডন চক্রান্তের' সব খুঁটিনাটি বিশ্বাস না করলেও অনেকে ভেবেছিলেন যে, খান ওয়ালি খানের সঙ্গে শেখ মুজিবের লণ্ডনে দেখা হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক নয়। আর দেখাই যদি হয় তবে কি শুধু বিলিতি আবহাওয়া নিয়েই আলোচনা হয়েছে? নিশ্চয়ই বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক, এমন কি হয়ত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধেও আলোচনা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ঐ ধরণের আলোচনা হওয়া দূরে থাক, শেখ মুজিবের সঙ্গে খান ওয়ালি খান অথবা অন্য কোনো ন্যাপ নেতার দেখা পর্যন্ত হয়নি।

চোখের রোগের চিকিৎসার জন্য খান ওয়ালি খান গত বছরও লণ্ডনে গিয়েছিলেন। কিন্তু রোগ পুরোপুরি সারেনি বলে আবার এ-বছরও তাঁকে যেতে হয়েছে। কিন্তু তিনি লণ্ডনে পৌঁছবার আগেই শেখ মুজিব লণ্ডন ছেড়ে জেনিভা চলে যান। সুতরাং দু-জনের সাক্ষাতের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। খান ওয়ালি খানের ভাষায় এই চক্রান্তের কাহিনী পুরোপুরিই বানানো। সিমলা চুক্তি বানচাল করার চেষ্টা করা দূরে থাক, তাঁর দল ঐ চুক্তিকে নিঃশর্তভাবে সমর্থন করেছে। তবে খান ওয়ালি খান শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত থাকেন নি। তিনি [illegible]

রেছেন, ভুট্টো সাহেব বিরোধী পক্ষকে কাবু করার জন্যে যে-কোনো ছলের আশ্রয় নিতে পারেন। কিন্তু তিনি, অর্থাৎ ভুট্টো সাহেব কাউকেই বোকা বানাতে পারবেন না।

প্রেসিডেন্ট ভুট্টো এবং তাঁর অনুচরেরা এই ধরনের চক্রান্তের কাহিনী প্রচার করে এসব বোকা বানাতে চাইছেন পাকিস্তানের জনসাধারণকে। পাকিস্তানের সংবিধান সম্পর্কে যা-হয় একটা পাকা সিদ্ধান্ত শীঘ্রই নিতে হবে। মিঃ ভুট্টো চান কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী রাখতে। তা চাওয়া ছাড়া তাঁর উপায়ও নেই। কারণ প্রেসিডেন্ট থাকতে গেলে তাঁকে সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাবিদের ওপর নির্ভর করতেই হবে, আর পাঞ্জাবিরা কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী রাখারই পক্ষপাতী। অন্য দিকে বালুচিস্তান, সিন্ধু আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লোকেরা চান প্রদেশগুলির হাতে অধিক ক্ষমতা। তাই ভবিষ্যৎ সংবিধানে তাঁরা লোকসভার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যসভার ব্যবস্থা রাখার পক্ষপাতী। কারণ লোকসভায় পাঞ্জাবিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবেই, সেক্ষেত্রে যদি রাজ্যসভায় সব প্রদেশ থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হয় তবে পাঞ্জাবিদের দাপট কিছুটা কমে। কিন্তু পাঞ্জাবিরা এবং ফলতঃ ভুট্টো সাহেব নিজেও প্রদেশগুলির হাতে বেশি ক্ষমতা তুলে দিতে রাজি নন। সেই জন্যেই পাকিস্তানের অন্যতম বিরোধী দল ন্যাপের নেতাদের নামে কলঙ্ক আরোপের চেষ্টা হচ্ছে। চক্রান্তের কাহিনী সেই চেষ্টারই অঙ্গ। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী দেশের মানুষকে এই কথা বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে, দেখো, এইসব দল প্রদেশের হাতে বেশি ক্ষমতা চাইছে, কিন্তু এদের আসল উদ্দেশ্য হলো শেখ মুজিব এবং ভারতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাকিস্তানকে টুকরো টুকরো করে ফেলা। সুতরাং সাবধান! কিন্তু পাকিস্তানের মানুষ, বিশেষতঃ সংখ্যালঘু অ-পাঞ্জাবিরা কি এত সহজে বোকা বনবেন?

*

এতদিন এ-দেশে দুঃস্বপ্নের নগরী বলতে শুধু কলকাতাকেই বুঝিয়ে এসেছে। সেটা যে শুধু জওহরলাল নেহরু কলকাতাকে ঐ বিশেষণে ভূষিত করেছিলেন বলে তাই নয়। কলকাতার সামান্যতম গোলযোগের সংবাদও দেশের অন্যান্য শহরের খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়েছে। ফলে দেশময় এমন একটা ধারণাই সৃষ্টি হয়েছে

যে, যতো ধর্মঘট, যতো মিছিল, যতো হাঙ্গামা, যতো দাঙ্গা সবই হয় শুধু কলকাতায়। আর দেশের অন্য সব শহর-নগর নিতান্তই স্বর্গোদ্যান। এই ধরনের বদনামের ওপর কলকাতার যে একচেটিয়া অধিকার ছিল তা সে হারাতে চলেছে। বেশ কয়েক বছরের ডামাডোলের পর কলকাতা যখন আজ শান্তির মুখ দেখতে সুরু করেছে তখন দেশের অন্য দুই মহানগরী—বোম্বাই ও দিল্লি থেকে আসছে দুঃসংবাদ।

ধর্মঘটের সংখ্যায় যে মহারাষ্ট্র পশ্চিম বাংলাকে ছাড়িয়ে গেছে, এ খবর বেশ কিছু-দিন আগেই জানা গেছে। গত বছরে পশ্চিম বাংলায় যেখানে মাত্র ৩৩৬টি ধর্মঘট হয়েছে সেখানে মহারাষ্ট্রে হয়েছে ৯৮২টি। এইসব ধর্মঘটের বেশির ভাগই হয়েছে বোম্বাই থানা শিল্প অঞ্চলে। কিন্তু শুধু শ্রম-বিরোধই মহারাষ্ট্রের উদ্বেগের একমাত্র কারণ নয়। সেই শ্রম-বিরোধ যদি শুধু ধর্মঘট—লক আউটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো তা হলেও তেমন আশঙ্কিত হওয়ার কারণ ঘটতো না। কিন্তু এখন সেখানে শ্রমিক-বিরোধের আঙিনায় প্রবেশ করেছে হিংস্রতা। শ্রম-বিরোধকে উপলক্ষ্য করে খুনোখুনি যে … বিরল নয়। তার সর্বশেষ উদাহরণ বোম্বাইয়ের কাছে থানায় গোডরেজ কলোনির ঘটনা।

দিল্লিতে গত মাস খানেকের মধ্যে উপর্যুপরি যে-সব হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে গেল তার সঙ্গে অবশ্য শ্রম-বিরোধের কোনো সম্পর্ক নেই। দিল্লির কাছে শাহদারায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয় হোমগার্ড বাহিনীর জনৈক অফিসারের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। আর এই সপ্তাহে মধ্য দিল্লির বাপা নগরে যে-সব কান্ড-কারখানা হয়ে গেল তার মূলে জনৈক হরিজন বালিকার আত্মহত্যা। ঐ বালিকাটি ছিল কস্তুরবা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। গত জন্মাষ্টমীর দিন সে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষাকে কিছু মিষ্টি উপহার দিতে যায় কিন্তু অধ্যক্ষা সেই উপহার নিতে অস্বীকার করেন; কারণ বালিকাটি অস্পৃশ্য। তাই ক্ষোভে আর অভিমানে মেয়েটি কুয়োর মধ্যে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করে বলে প্রকাশ।

যদিও হরিজন মেয়েটির আত্মহত্যার ঘটনার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ নেই, তবু এই সুযোগে দিল্লির ছাত্ররা দিল্লির বাস কর্তৃপক্ষের ওপর পুরনো ঝাল মিটিয়ে নিতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। শহরে গন্ডগোলের জন্যে বাস চলাচল অনিয়মিত হয়ে উঠেছিল, সেই অজুহাতে ছাত্ররা রাস্তা থেকে বাস ছিনতাই করে নিয়ে যেতে সুরু করে। এই … কেন্দ্র করে দেখা দিল আর এক দফা উত্তেজনা।

দিল্লিতে হাঙ্গামা যে-ভাবে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে তা থেকে দুটো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো চলে। এক—রাজধানীর আপাত শান্তির নিচে চাপা রয়েছে অশান্তির আগুন। তাইতেই যে কোনো ঘটনাকে উপলক্ষ্য করেই সেই আগুন বাইরে বেরিয়ে আসছে। দুই—বিরোধী দলগুলি এই অবস্থার সুযোগ নিচ্ছে। জনসংঘের একাধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে কংগ্রেস দিল্লিতে আবার ক্ষমতায় এসেছে। শীঘ্রই তাদের ক্ষমতাচ্যুত করার আশা নেই। সুতরাং সামান্যতম সুযোগে গোলযোগ সৃষ্টি করে বিরোধী পক্ষ শাসক দলকে বিব্রত করতে চায়। এই কৈফিয়ত ব্যাখ্যার মধ্যে কিছুটা সত্য থাকতে পারে কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছে বেশি উদ্বেগের বিষয় হওয়া উচিত প্রথম কারণটা। কলকাতার মতো জায়গায় যে-সব সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে দিল্লিতে তার অনেকগুলিই নেই। তবু কেন সেখানে কর্তৃপক্ষ আগ্নেয়গিরির ওপর বসে আছেন?

১৫।৯।৭২ —দেবদত্ত

জগৎ মজুমদার ঠিক রাত আটটা পঁচিশ মিনিটের সময় মাথায় হাত দিল। মাথা ভর্তি টাক। নাহলে ওই সঙ্গে কয়েক চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলত। পেট চোঁ-চোঁ করছে। হাতে একটা ... টুকিটাকি জিনিসপত্রে বেশ ওজন। শরীর ক্লান্ত। পা দুটো ভেঙে পড়তে চাইছে! কোন সকালে খেয়েদেয়ে কলকাতায় সওদা করতে এসে এই জ্বালা। ...দূরে দুটো ছোকরা কি একটা রসিকতা নিয়ে হি-হি করছিল। জগৎ মজুমদারের ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে দুটোর কানই ...করে মলে দেয়, ই-ই-ইয়ারকি পেয়েছো? খুব রেগে গেলে কি ভয় পেলে ...র কথা জড়িয়ে যায়। এবার পাশে ...পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি নিভার দিকে ...তো-তো-তোমার জন্যেই এই অবস্থা!

—আমার নামে মিথ্যে কথা বললে ভাল ...না বলছি!—দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দশাসই নিভার ...রও কম রাগ নেই : তুমিই না বলেছিলে ...রবিবার, চল কলকাতায় গিয়ে বাজার ...। কেন, আমাদের বারুইপুরের দোকানে ...কাপড় পাওয়া যায় না?

প্ল্যাটফর্ম ভর্তি লোক। সবাই এক ...পর পর কপালের ঘাম মুছে ঘড়ি দেখছে। তারপর প্ল্যাটফর্মের খুব মাঝে ...পড়ে দেখছে, যদি দৈব বলে ...আলোটা জ্বলে ওঠে! স্টেশনের অফিস ...তিনজন কেরানীবাবু ঠকঠক করছে। ...কেউ কড়া ভাবে জিজ্ঞাসা করলেও ...মাথা ঠাণ্ডা রেখে উত্তর দিয়ে শেষে ...আমাদের কি দোষ বলুন যদি ট্রেন ...চলে—।

একজন মুখে বসন্ত, মাঝ বয়সী ...গিয়ে এল।

—আপনারা যাবেন কোথায়?

—বা-বা-বারুইপুর।

—কি মুশকিলের কথা বলুন দেখি। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে মার্কেটিং-এ এসে ভাল ফ্যাসাদ। যাব সুভাষগ্রামে।

নিভার মনে হল একজন ভাল সাক্ষী পাওয়া গেছে, অতএব চুপ করে থাকা ঠিক নয়। বলল, আমি একটুও আসতে চাই নি! গিয়ে তো হাঁড়ি ঠেলতে হবে আমাকেই। পাঁচটি ছেলেমেয়ে রেখে এসেছি। দিনকাল খারাপ। বলি, কয়শো টাকার সওদা করেছ?

জগৎ মজুমদারের উভয়সংকট। একে অপরিচিত লোকের সামনে তোতলামি আটকানোর চেষ্টা, তারওপর নিভাকে ঘাঁটাতে যাবার বিষম ফল। উত্তরের চেষ্টা করে বলল, টে-টে-ট্রেন বন্ধ হলে আমি কি করব! আ-আ-আমি কি জানতাম আগে?

মাঝ বয়সী ব্যাপারটা বুঝে শুকনো হাসল।

—কাকে দোষ দেবেন বলুন। টিকিট কেটে দাঁড়িয়ে আছি ট্রেন আসছে না। কোথায় নাকি তার চুরি গেছে। রোজ রোজ ঝামেলা ভাল লাগে?

সামনে জমা তিনেক লম্বা জুলফি ক্রমাগত মুখ খিস্তি করছিল। একজন টিকিট ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল, শালাদের ধোলাই দিয়ে মাজাকি বের করে দেব!

মাঝ বয়সী জগৎ মজুমদারের কানের কাছে মুখটা নিয়ে ফিসফিস করল, শুনলেন তো। এরা যে রেগে যায় তার লজিক আছে মশাই। ইয়ং ব্লাড!

জগৎ মজুমদার মুখে কিছু না বলে ঘাড় কাৎ করে সায় দিল। তারপর নিভার পাশে থলিটা রেখে প্ল্যাটফর্মের এক ধারে গিয়ে অন্ধকারের নীল আলোটায় হদিশ ঠাহর করার চেষ্টা করল।

প্ল্যাটফর্ম জুড়ে মেলাই ফ্যাকাসে মুখ গিজগিজ করছে। এই দেখে একটু আনন্দ হল মনে। ছুটির দিনে সে একাই বোকার মত কাজ করে নি। কিন্তু মাঝ বয়সীর গায়ে-পড়া আলাপ ভাল লাগছে না। দুশ্চিন্তা কি তারই কম? বড় মেয়ে ষোল ছাড়িয়ে সতেরোয় পা দিয়েছে। একদিন খামের চিঠি এসেছিল ওর নামে। চিঠিটা আবার জগৎ মজুমদারের হাতেই পড়ে। ছেলেটা মটর মেকানিকের কাজ শেখে স্টেশনের কাছে। বিচ্ছিরি দেখতে। চাকরী পাওয়ার আশা নেই। সেই থেকে দুজনে চোখে চোখে রাখে শীলাকে। তবে একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত, বাব-মা আজ যদি নাই আসে, ভাইবোনকে আলুসেদ্ধ ভাত ফুটিয়ে দিতে পারবে।

বারুইপুরের এক প্রাথমিক স্কুলের মাস্টার জগৎ মজুমদার। কলকাতায় বড় একটা আসা হয় না। খবরের কাগজে বড় বড় হরফে গোলযোগের কথা লেখা থাকে। কিন্তু সেটা যে কিভাবে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে, সে সম্পর্কে কোন আইডিয়াই ছিল না। এবার পুজোর বেশ একটু আগেই ডি-এ'র টাকা এসে যাওয়ায় গেল সপ্তাহে মনে ভ্রমণের সাধ জেগেছিল: যদিও বারুই-পুরের বাজারে আজকাল সব কিছুই পাওয়া যায়, তামাক পাতা থেকে গ্রামো-ফোনের রেকর্ড পর্যন্ত, তথাপি সখ হয়ে-ছিল নিভাকে নিয়ে রবিবারের দুপুরে কল-কাতা ঘুরে আসি। হা কপাল, শেষ কালে এই দশা!

ট্রেন যখন চলবেই না, তখন অনর্থক স্টেশনে দাঁড়িয়ে কি লাভ! ফলে ভিড় কিছু পাতলা হতে আরম্ভ করল। যাদের ট্রেন ছাড়াও অন্য উপায় আছে, তারা বাস কিম্বা ট্যাক্সির খোঁজে হৈ-হৈ করে বেরিয়ে গেল। যাদের কোনই উপায় নেই, তাঁদের প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর কাউন্টারে গিয়ে 'হাঁ দাদা, কোন খবর এল' এ কথা জিজ্ঞাসা করা ছাড়া কোন কাজ রইল না।

সীমা সোমা হারু টুকুদের জন্যে আছে জামা প্যান্ট। শীলা আর তাদের শাড়ি ধুতি! এ বাদে কিছু নগদ টাকাও আছে। ভয় সেই খানেই। এখন দিনকাল খারাপ। চুরি ছিন-তাই হামেশাই হচ্ছে। নাহলে জগৎ মজুমদার খামাখা ভয় পাবার পাত্র নয়। একদা কল-কাতার কলেজে পড়ার সময়ে অনেক রাত নাইট শোয়ে সিনেমা দেখে বন্ধুদের সঙ্গে লেকের পাড়ে শুয়ে কাটিয়েছে। একবার পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল থানায়। যা মশার কামড় সেখানে!

সিগন্যাল দেখা এবং কাউন্টারে খোঁজ নেওয়া শেষ করে জগৎ মজুমদার পুরোনো জায়গায় ফিরে এল। নিভা এক রকমের শীতল চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে। মাঝ বয়সী আবার উৎপাত শুরু করল, আসুন না এই প্ল্যাটফর্মেই শুয়ে থাকি। এত রাতে কোথায় যাবেন?

ঠিক তখনি মনে পড়ে গেল অধীর মুখার্জীর কথা। অধীর জগৎ মজুমদারের কলেজ লাইফের বন্ধু। পাশ করার পর কলকাতার এক স্কুলে দুজন এক সঙ্গে মাস্টারীও করেছে। অধীর তখন নিরুবাবুর আখড়ায় রোজ বুকডন দিয়ে দুটো ডিমের অমলেট খেত। গায়ে প্রচুর শক্তি ছিল। ফলে ইস্কুলের মাস্টারী ছেড়ে দিয়ে কণ্ট্রাক্টারির লাইনে গেল। এখন বৎসরান্তে একবার মাত্র যোগাযোগ হয় চিঠিপত্রে। লিখেছিল, বাড়ি তৈরী করছি ঢাকুরিয়া স্টেশনের কাছেই। একবার বৌকে নিয়ে এসে কয় রাত থেকে যাস।

মাঝ বয়সী তখনো হাত কচলে বলে যাচ্ছিল, এক সঙ্গে থাকলে অনেক বল ভরসা। আসুন না হোটেল থেকে কিছু খেয়ে নিয়ে এই ত্রিপলটা বিছিয়ে—

জগৎ মজুমদার এবার চোখের দি... মোজাসুজি তাকাল, না মশাই, ট্রেন ... চললে আমার বয়টা! এদিকে আমার বন্ধু বান্ধব নেই নাকি? আমি স্টেশনে ভিখিরি মত পড়ে থাকতে পারব না।—নিভার দি... তাকিয়ে: এসো।

রাগ পড়ে যাওয়ায় তোতলামিটা দে... গেছে। চলতে চলতে পাশের পাঁচ ফুট তি... ইঞ্চি লক্ষ্য করে বলল, অত ঘাবড়াচ্ছ কে... অধীর তো আছে। আমাদের এক বার ও... ওখানে তিন রাত কাটাতে বলেছিল না...

আর রাগারাগি করে লাভ নেই... দোষটা ওনার নয়, রেলের বাবুদের। কিন্তু যারা তার চুরি করেছে তাদের। সুতরাং গলায় খানিকটা উদ্বেগ মিশিয়ে নিভা বলল... আমরা যা হোক করে কাটিয়ে দিতে পারব... কিন্তু ভাবনা হচ্ছে ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে...

—যা হোক মানে? তোফা থাকবে বল... অধীর আমার ছেলেবেলার বন্ধু। ... ভাবনা করে কি হবে, শীলা তো আছে... ভাইবোনদের জন্যে দুটো ভাত ফুটি... দিতে পারবে না?

—আহা, ওদের বসিয়ে রেখে এসেছি... বলেছিলাম চকলেট নিয়ে ফিরব, চানাচুর ভাজা কিনে দেব!

—তাতে কি হয়েছে? কাল ভোরের ট্রেনেই তো পৌঁছে যাচ্ছি। ঠিকানাটা তোমার মনে আছে তো? লিখেছিল, স্টেশন থেকে পাঁচ মিনিট, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড... একটা মুদি দোকানের পাশেই—

আরো কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল একটা অসমাপ্ত বাইরের ঘরে তিনজন মুখোমুখি বসে। বহুকালের জমানো কথাগুলো এক সঙ্গে বলবার জন্য জগৎ মজুমদার চেয়ারটাকে ক্রমাগত কাছে টেনে আনছে। নিভার মুখ থেকে বিপদে পড়ার ভাবটি হয়ত মুছে গেছে। এখন সেখানে অমায়িক হাসি। তবে অধীর মুখার্জি ঘন ঘন হাই তুলছে।

—তোমার বিজয় দেবকে মনে আছে? সেই যে আমাদের সঙ্গে লেকের পাড়ে রাত কাটিয়েছিল, থানায় গিয়ে পুলিশের সঙ্গে তর্ক করল, ও এখন ভাল চাকরী করছে টিটলাগড়ে। কাছেই ওয়ালটেয়ার। আমাদের সবসুদ্ধ বেড়াতে যেতে লিখেছে। তোমার বাড়িটা মনে হচ্ছে কমপ্লিট হয় নি? আমার বারুইপুরে কত খেতে লিখলাম। ত... গরীবের বাড়ি যাবে কেন? আজকাল একসারসাইজ ছেড়ে দিয়েছ বুঝি, বেশ ভুঁড়ি হয়েছে। তোমার ছেলেমেয়েরা কই?

এতগুলি কথার মধ্যে অধীর মুখার্জি মাত্র একটি কথাই তুলে নিল, বাড়ি কমপ্লিট হবে কি করে? মার্কেট ভীষণ ডল।

তোমরা তো খালি বাড়ি গাড়ি দেখ, অনেক রিস্ক আছে ভায়া এ লাইনে।

সে কথায় কান না দিয়ে জগৎ মজুমদার দরজার দিকে ছুটে গেল। ওখানে অধীরের সাত বছরের ছেলে সলজ্জ ভাবে দাঁড়িয়ে। থলের ভিতর থেকে চকলেট চানাচুরের প্যাকেট বের করে ওর হাতে গুঁজে দিল। এই সময় ভীষণ কাশি পেল নিভার। ভিতর থেকে দু কাপ গরম চা এল, সঙ্গে ঠান্ডা সিঙ্গারা। নিভার কাশি তো থামলই না, আরো বেড়ে গেল। রাত দশটায় চা দিতে দেখে জগৎ মজুমদার এবার কাশিটার মানে বুঝতে পারল। কিন্তু যেন কিছুই হয় নি, এমনি ভাবে চা শেষ করতে হল। শরীর ভেঙে আসছে।

—মমতা কোথায় ?

—শুয়ে পড়েছে। ওর আবার বেশী রাত জাগা অভ্যাস নেই।

শুয়ে পড়েছে শুনে আর পর্দার ফাঁক দিয়ে মশারী ধবধবে বিছানা দেখতে পেয়ে জগৎ মজুমদারের চোখেও সা-সা করে ঘুম নামতে লাগল। একটু পরে অধীর মুখার্জি দাঁড়িয়ে উঠে হাই তুলল। দেখাদেখি নিভাও। জগৎ মজুমদার অতি কষ্টে গদী আঁটা চেয়ার থেকে নিজেকে বিযুক্ত করল। তারপরে রাস্তায়।

স্টেশনের কাছে পবিত্র হিন্দু হোটেলের ঝাঁপ তখনো পড়ে নি। চেয়ারগুলো টেবিলের ওপর উল্টে দেওয়া হয়েছে মাত্র। দুজনে ঢুকল। পায়ের নিচ দিয়ে নোংরা জলের রেখা গড়িয়ে যাচ্ছে। নিভার গা ঘিন ঘিন করছে। বদ গন্ধ, ছোকরাগুলোর চোয়াড়ে চেহারা, হলুদ দেওয়াল, ঝুলকালি মাখা আলোর ডুম—যে কোন শক্ত পাকস্থলী থেকে বমি ঠেলে বের করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। আলুর দম ফুরিয়ে গেছে কাই আছে। ঠান্ডা ভাত ডাল আর কাই। দাম কিন্তু পুরোই দিতে হবে। ছোকরাটি শিস থামিয়ে সে কথা জানাল। জগৎ মজুমদারের মনে হল, অনেক দিন পর বড়লোকের বাড়িতে ভোজ খাচ্ছে। খাওয়াদাওয়ার পর দু গেলাস জল খেয়ে ঢেকুর তুলে নিভার দিকে তাকাল, কিগো, তোমার হল?

স্টেশন এখন ফাঁকা। প্ল্যাটফর্মে যে চায়ের দোকানটা ছিল, বোধ হয় তার মালিক, খালি গায়ে এক রাশ খুচরো গুণছে। ক'দিন আগে স্টেশনের পাশে যাত্রা হয়েছিল। এখন বাঁশের ফ্রেমে দাঁড়িয়ে আছে। টিকিট ঘরের কাছে ত্রিপল বিছিয়ে মুখে বসন্ত মাঝ বয়সী ধ্যামিল নিয়ে নাক ডাকাচ্ছে। নিভার ভিতরটা শিরশির করে উঠল। সারা রাত এখানেই পড়ে থাকতে হবে নাকি কুকুর বিড়ালের মত। টকু হয়ত এতক্ষণে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। দিনকাল খারাপ। এ কথা মনে হতেই নিভা আঁচল দিয়ে গলার সরু হারটা ঢাকল। যাক একটা নিশ্চিন্ত, মাথার ওপর দুশো পাওয়ারের বাল্ব জ্বলবে সারা রাত।

জগৎ মজুমদারের শরীরে এক ফোঁটা শক্তি নেই এখন। বারুইপুরে দুখানা ঘরের বাড়িকে, তেল চিটচিটে বালিশ আর ময়লা বিছানাকে মনে হচ্ছে রাজভবন আর পালঙ্ক। তবে মাঝ বয়সীর ব্যবস্থাটাও মন্দ নয়। কিন্তু চোখের ওপর বেশী পাওয়ারের বাল্ব জ্বালা থাকলে তো মুশকিল। ঘর পুরো অন্ধকার না হলে তাঁর ঘুম আসে না।

মাঝ রাতে অর্ধেক ভিজে যাবার পরেই দুজনের ঘুম ভাঙল। জোরে বৃষ্টি পড়ছে। নিভার পায়ের কাছে বিচ্ছিরি একটা কুকুর কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে। হেই হেই করতে গিয়ে টকুর কথা মনে পড়ল। যতই ওপরে শোয়ানো হোক না কেন, মাঝ রাত্তিরে ঠিক পায়ের কাছে চলে যাবেই। হঠাৎ গলায় হাত দিয়ে নিশ্চিন্ত হল নিভা।

কড়া আলো তুচ্ছ করে জগৎ মজুমদারের চোখে বেশ ঘুম নেমেছিল। টিনের চালে ঝমঝম শব্দ হচ্ছে। বাইরে ঘন কালো অন্ধকার। হাই উঠছে ওই দিকে তাকিয়ে।

—হে-হে, আপনারাও আছেন তাহলে! —বৃষ্টির ছাঁট মাঝ বয়সী উঠে পড়েছে এদিকে বন্ধু-বান্ধব আছে বলছিলেন না ?

কথা জড়িয়ে যাচ্ছে দেখে নিভাই এগিয়ে এল, তা আমরা কি আর জানি, গিয়ে দেখি, তালা ঝুলছে। সবাই বেড়াতে গেছে দিল্লীতে।

এই সময় জগৎ মজুমদারের কাশি পাওয়ায় নিভা আলতো করে ধমক দিল, কোঁচার খোঁটটা গায়ে জড়িয়ে বোসো। ঠান্ডা লাগবে।
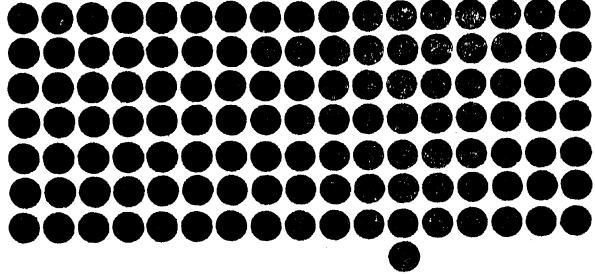
অমৃতবাজারের প্রথম লাইবেল মামলা

পুলকেশ দে সরকার

শিশিরকুমারের তৃতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ের সাংবাদিকতা আরম্ভ হয় খানিকটা সাংসারিক ও বৈষয়িক সংকটের মধ্য দিয়ে। পিতৃবিয়োগের পর উপার্জনের উৎস ক্ষীণতর হয়ে পড়ায় পুত্রদের অর্থোপার্জনে আত্মনিয়োগ করতে হল। শিশিরকুমার কোন্নগর স্কুলে হেডমাস্টার পদ গ্রহণ করেন। কিছুকাল পর এখানকার কাজ ছেড়ে সাতক্ষীরার স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। কিন্তু কোন্নগরে থাকতেই তিনি স্কুল-ইনসপেকটর ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে পড়েছিলেন। তাই মাসিক ৭৫ টাকা বেতনের একটি ডেপুটি ইনসপেকটর পদ খালি হতেই তিনি শিশিরকুমারকে সে পদে নিয়োগ করেন।

এদিকে এই ঘোষ-পরিবারের সুহৃদ, যশোরের তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট, মিঃ জেমস মনরো হেমন্তকুমার ও শিশিরকুমারকে আরও বেশী বেতনের ইনকাম ট্যাক্স এসেসরের পদে নিয়োগ করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অজ্ঞাতসারেই এটি হয়েছিল। তিনি জানতে পেরে তাঁর অভিযোগক্রমে শিশিরকুমারের দুটি সরকারী কাজই যায়। বলা যায়, ঘোষ পরিবার ও শিশিরকুমারের এই সাময়িক অধোগতিপর্যায়ে সাংবাদিকতায় এক নব-দিগন্ত উদ্ভাসিত হল। শিশিরকুমার সর্বতোভাবে সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করলেন।

ইতিমধ্যে শিশিরকুমার যশোরে ডেপুটি ইনসপেক্টর পদে থাকতে ভগ্নস্বাস্থ্য বসন্তকুমার ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ পরলোকগমন করেছিলেন। সুতরাং, এবার দাদার পরামর্শ ও সাহায্য থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন বটে কিন্তু সক্রিয় সহযোগিতার এগিয়ে এলেন মেজদাদা হেমন্তকুমার। হেমন্তকুমারও এসেসর পদ ছেড়ে দিলেন। ছোটভাই মতিলাল সঙ্গী হলেন।

পাক্ষিক 'অমৃতপ্রবাহিনী' এবার হল সাপ্তাহিক বাংলা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'। গ্রামের নামেও বটে মায়ের নামেও বটে। সেই অমৃতপ্রবাহিনী থেকেই। প্রথম সংখ্যা বেরোলো ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী। বাংলা সাল ১২৭৪, ৯ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার।

কিন্তু যাত্রাপথ আদৌ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। ছত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হবার পর শিশিরকুমার নিজেই (১) ১৯০৪-এর ৪ঠা জানুয়ারী ইংরেজী দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখেছিলেন :

> Romance of an Indian Newspaper: "Mr Foulger delivered an address in London,—his subject being Romance of an English newspaper,—to show how the 'Daily Mail' rose from a small beginning to its present eminence Hes says that the 'Daily Mail' costs £1,500 a day, that the bill for the printing paper alone is £180,000 a year. But is the public aware that this humble journal, the 'Amrita Bazar Patrika', has also a romance of its own,—a romance which is perhaps more enthralling than that of the 'Daily Mail' or any other paper in the world? ......
>
> "Any visitor to the workshop of the 'Patrika' of the present day, will possibly be a little impressed with its linotype and printing press machines, worked both by electricity and an oil engine, but its origin was humble enough, nay, of the humblest description. Mr. Foulger does not state the amount of capital, which must be very large, with which the 'Daily Mail' was started, but the 'Patrika' cost its founders only Rs. 240 when they ushered into existence".

কোন্ প্রাণশক্তি বলে?

কিন্তু কি প্রাণশক্তিবলে অমৃতবাজার শুধু নয় শতাব্দীরও বেশী কাল, উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে তার যাচাই হয়েছিল তখনই যখন পত্রিকা মাত্র চার মাসের শিশু।(২)

প্রসংগতঃ শিশিরকুমার স্বয়ং বলেছেন:

> "When the paper was only four months old, that is to say, in its seventeenth issue, it published an article which was considered libellous; and the proprietors, editor, and the printer as also a villager were hauled up on a charge of criminal defamation before Messrs Monro and O'kineally, the former being then the District Magistrate of Jessore and the latter his Joint. For eleven months the case dragged on its slow length, the Bengal Government taking an active interest in the case. In the end the proprietors were ruined, that is to say, they had to part with a portion of their patrimony to meet the cost of defence. The printer and the writer of the alleged libel were sent to jail,—the former to six and the latter to one year's simple imprisonment, but the proprietors in spite of the earnest efforts of the authorities, escaped."

শিশিরকুমারের কনিষ্ঠ সহোদরা শ্রীমতী সৌদামিনী এই সম্পর্কে লিখছেন :

'কিছুদিন কাগজ চলিবার পর 'ঘোর অত্যাচার' বলিয়া একটি প্রবন্ধ বারাসত নিবাসী রাজকৃষ্ণ মিত্র লিখিয়াছিলেন। সেটি আমাদের কাগজে ছাপা হয়। এইটি একজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে। সুতরাং কাগজের বিরুদ্ধে লাইবেল আসিল। যদি সেই সময়ে রাজকৃষ্ণ মিত্রের পাণ্ডুলিপিখানি আদালতে দাখিল করা হইত তাহা হইলে আমার ভ্রাতাদিগের ঘাড়ে আর কোন দায়িত্ব থাকিত না। কিন্তু রাজকৃষ্ণবাবুর সহিত আমার ভ্রাতাদিগের বন্ধুত্ব ছিল।......মহাশয় সেজদাদাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, কেন বৃথা তোমরা এত ঝুঁকি লও। সেজদাদা এই কথা শুনিবামাত্র সেই পাণ্ডুলিপিখানি পোড়াইয়া ফেলিলেন। ...আমার ভায়েরা বন্ধুত্বের খাতিরে সমস্তই আপনাদিগের ঘাড়ে লইলেন ও যথাসম্ভব মকোদ্দমার তদ্বির করিতে লাগিলেন। আজকাল সংবাদপত্রের অভাব নাই ও মামলারও অভাব নাই। কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকার নামে যেরূপ লাইবেল মকোদ্দমা হইয়াছিল, সেরূপ ভয়ানক কাণ্ড এ পর্যন্ত কোন এডিটারের নামে হয় নাই। দেশের মধ্যে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। শিশিরকুমার ঘোষকে জেলে দিবার জন্য নূতন জেল প্রস্তুত হইয়াছিল। মকোদ্দমায় তিনশত সাক্ষী। রোজ দু-তিন গাড়ী করিয়া মাগুরা

---

(১) শিশিরকুমার ইতিমধ্যে কার্যতঃ অবসর গ্রহণ করলেও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল উভয়েই বলেছেন, এ লেখাটি শিশিরকুমারের।

(২) পত্রিকা প্রথম বছর ছিল পুরোপুরি বাংলা; দ্বিতীয় বছর বাংলা-ইংরেজি; দশম বছরে পুরোপুরি ইংরেজি। প্রকাশকাল ছিল সাপ্তাহিক। ১৮৯১-এর ১৯এ ফেব্রুয়ারী থেকে প্রকাশকাল হল দৈনিক।

হইতে সাক্ষীদিগের জন্য তরকারী যাইত। কলিকাতা হইতে ব্যারিস্টার মনমোহন ঘোষ আমাদের পক্ষে আসিয়াছিলেন। আমার চতুর্থ ভ্রাতা শ্রীমান মতিলালের বয়স তখন কুড়ি বৎসর, বালক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহাকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একাকী আপনার কামরায় লইয়া আটদিন পর্যন্ত সাক্ষ্য লইয়া ছিলেন। এই বালক নির্ভীকচিত্তে সাক্ষাৎ যম-সদৃশ এই ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে বীরের ন্যায় সাক্ষ্য দিয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট ফিরাইয়া ঘুরাইয়া ভয় দেখাইয়া ও প্রলোভন দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কিন্তু ভাই আমার আটদিন পর্যন্ত সাক্ষ্য একভাবেই দিয়াছিল। ইহার একটি কথার হেরফের হয় নাই। ইহার যদি একটু কথার চালবেচাল হইত তাহা হইলে আর রক্ষা ছিল না। কিন্তু ভগবানের কৃপায় এই ঘোর বিপদ হইতে ভাইরা আমার মুক্তিলাভ করিলেন। কেবল প্রিন্টারের ছয় মাস জেল ও তিনশত টাকা জরিমানা হইয়াছিল। রাজকৃষ্ণ মিত্রের এক বৎসর জেল ও হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছিল।'(৩)

কেন এই বিরূপ ভাব?

কেন এই আক্রোশ? পত্রিকার সূচনায় যে রাজকুল তার সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁরা এমন ক্ষেপে গেলেন কেন? ম্যাজিস্ট্রেট মনরো ও তাঁর 'জয়েন্ট' পত্রিকার গ্রাহক হয়েছিলেন; ওকিনিলি দশ কপি করে নিতেন। মনরো বিজ্ঞাপন হিসাবে সরকারী নোটিশ পাঠাতেন। তাঁরই সুপারিশে চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ গিডিস (Geddes) গ্রাহক হয়েছিলেন। নলডাংগার রাজাও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তবে কেন এই সংঘবদ্ধ ক্রোধ? ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে প্রকাশিত যে দুটি 'প্রস্তাব' লাইবেল মামলার উপলক্ষ্য হয় তারপর ৯ই জুলাই অমৃতবাজার পত্রিকার এক প্রবন্ধে ঐ মেঘসঞ্চারের আভাষ পাওয়া যায়। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ঐ দুই 'প্রস্তাব' নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে গজেনের সৃষ্টি হয়েছে। তাই তখন পত্রিকা লিখলেন :

"আমাদের পত্রিকার উপর কোন কোন কর্তৃপক্ষীয়েরা বৈরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের পত্রিকায় যদি মিথ্যা কথা লিখি, তবে কাহারও ক্ষতি হই‑ত পারে না। যদি সত্য কথা লিখি, তবে কর্তৃপক্ষীয়দের আমাদিগকে তাড়া দিয়া ক্ষান্ত করিবার কিছু লাভ নাই। বলের দ্বারা সত্য লুকাইয়া রাখা এবং কাপড় দিয়া আগুন বাঁধার চেষ্টা সমান। আমরা প্রায়ই স্পষ্ট কথা বলি। যে ঘটনা যেরকম, তাহা সাধারণকে স্পষ্ট করিয়া দেখাই। কাহার অনুরোধ কিংবা কাহাকে বিরক্ত করিবার ভয়ে কোমল করিয়া লিখি না। ফল আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে কর্তৃপক্ষকে প্রার্থনা করা আমাদের তত উদ্দেশ্য নয়; আমাদের দেশীয়েরা কিরূপ অবস্থায় আছেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে কিরূপ হীনাবস্থায় আছেন, তাহা তাঁহারদিগকে দেখানই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা ফটগ্রাফার মাত্র। সামাজিক ও রাজনৈতিক ফটগ্রাফ লইয়া আমরা এদেশীয়দিগকে দেখাইয়া থাকি, যদি ফটগ্রাফি তুলিতে এরূপ ছবি উঠে যে, কেহ২ অন্যের মুখের ভাত কাড়িয়া খাইতেছে; বলবান দুর্ব্বলের গলা টিপিতেছে; অভদ্র অপমান করিতেছে; একজনের ন্যায্য স্বত্ত্ব অন্যকে দেওয়া হইতেছে, বিচারক অবিচার করিতেছেন, তবে আমাদের হাত কি?

"......আমরা ইংরাজ অপেক্ষা এদেশীয়দিগকে অধিক ভালবাসি, একথা স্বীকার করি। কিন্তু বোধহয় ন্যায়পরতা আমাদের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। মনে একটি মুখে অন্য প্রকার যাহারা প্রকাশ করেন, তাহাদের অপেক্ষা মনের কথা যাঁহারা খুলিয়া বলেন, তাঁহারা কি ভাল করেন না? অতএব সত্য কথা বলিতে যে ফল হউক না কেন, আমরা তদ্বিষয় একবার চিন্তাও করি না।......"

১৯০৪-এ শিশিরকুমার যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতেও 'কর্তৃপক্ষীয়ের' ক্রোধের কারণ জানা যায় :

"The paper they started...... began by teaching that 'we are we' and 'they are they'. This alarmed the authorities very much, for, in those days, the Indian newspapers never dared or cared to say that the people had their separate rights and entitles from those of their rulers.'

এই সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "পত্রিকা নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী ছিল। ইহাতে শিশিরকুমার বাঙালী-সমাজের দোষ-ত্রুটি যেমন নিঃসংকোচে প্রদর্শন করিতেন, তেমনি আবার শ্বেতাঙ্গ-সম্প্রদায়ের অন্যায় ব্যবহার ও অনাচারের তীব্র সমালোচনা করিতেও ভীত হইতেন না। ইহার ফলে পত্রিকা ক্রমে ক্রমে রাজপুরুষগণের চক্ষুশূল হইয়া উঠিতেছিল। কোন 'নিম্নশ্রেণীস্থ' ম্যাজিস্ট্রেটের নারী-ঘটিত দুর্বলতার কথা প্রকাশ করিয়া 'অমৃতবাজার পত্রিকার' ১৭শ সংখ্যায় (১২-৬-৬৮) 'ঘোর অত্যাচার' ও ১৯শ সংখ্যায় (২৬ জুন) 'পাঠকগণের প্রতি' দুইটি প্রস্তাব মুদ্রিত হয়। শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষেরা সুযোগ বুঝিয়া 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রথম প্রস্তাবটির জন্য সম্পাদক শিশিরকুমার ও মুদ্রাকর চন্দ্রনাথ রায়ের বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবটির লেখক বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় ফৌজদারির হেডক্লার্ক রাজকৃষ্ণ মিত্রের বিরুদ্ধে এক জটিল মানহানির মামলা রুজু হইল। সদ্য বিলাত প্রত্যাগত মনোমোহন ঘোষ আসামীদের তরফে মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন।"

এ সুর অশ্রুতপূর্ব

ইংরেজি ভাষায় 'ওয়েফেয়ারার' লিখিত 'লাইফ অব শিশিরকুমার ঘোষ'-এ বলা হয়েছে :

'সমকালীন পত্র-পত্রিকা থেকে অমৃতবাজার পত্রিকার সুর একান্ত পৃথক বলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল; সকল লেখার মধ্যেই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে এই একটি ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠতে চাইত যে—আমরা আমরাই, ও'রা ও'রাই। অথবা শাসকেরা তাঁদের স্বার্থসাধনেই সচেষ্ট, সে স্বার্থ ঠিক আমাদের নয়, আমাদের স্বার্থ আমাদেরই রক্ষা করতে হবে। মুষ্টিমেয় দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া এ সুর ছিল সাধারণের একেবারেই অশ্রুতপূর্ব। সাধারণের ধারণা ছিল তাদের কোন দাবী বা অধিকার নেই, শাসকদের কাছ থেকে যা আসে তা ও'দেরই করুণা-নির্ভর। শিশিরকুমারের এই রাজনৈতিক দর্শনে তাঁর দেশবাসীরাও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, অন্তরঙ্গেরা তাঁকে এই বলে সাবধানও করে দিলেন যে, এই নতুন কথার প্রচার চলতে থাকলে শিশিরকুমার শিগগিরই বিপদে পড়বেন। কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা থেকে নিরস্ত হলেন। ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করে রাজপুরুষ মহলে রীতিমত উত্তেজনা সঞ্চারিত হল। শিশিরকুমারের একদা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু মনরো ও ওকিনীলিও প্রথমে কুঞ্চিত ললাট, পরে, প্রকাশ্য বিরোধিতায় উষ্ণ হয়ে উঠলেন।

'সুযোগও এসে গেল। একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট একটি স্ত্রীলোকের শ্লীলতাহানি ঘটিয়েছেন বলে পত্রিকার ১৭শ সংখ্যায় এক সংবাদ বেরোলো। কারও নাম দেওয়া হয়নি। পরবর্তী সংখ্যায় কঠোরতর ভাষায় বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হল। এ লেখাটা আসলে জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ওকিনীলির হেডক্লার্ক রাজকৃষ্ণ মিত্রের; কিন্তু নাম প্রকাশ করা হয়নি বলে মামলা রুজু হল শিশিরকুমার, মতিলাল, তাঁদের এক খুল্লতাত এবং রাজকৃষ্ণ মিত্রের বিরুদ্ধে। রাজকৃষ্ণ মিত্রের জড়িয়ে যাওয়ার কারণ অনেকটা তিনি নিজেই। মামলা নিয়ে যখন চারদিকে হৈচৈ এবং লেখাটা খুব জোরালো বলে আলোচনা হচ্ছে তখন রাজকৃষ্ণ মিত্র কিছু বাক্‌শৈথিল্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এমনও বলে ফেললেন যে, ওটি তাঁরই লেখা। কথাটা রাজপুরুষদের কানে গেল। ওকিনীলি ছিলেন এই মামলার বিচারক। তিনি শিশিরকুমারের কারাদণ্ড সম্পর্কে এতই নিশ্চিত ছিলেন যে, একদিন তিনি যশোর জেল পরিদর্শনে গিয়ে জেলারকে একটি সেল পৃথক করে রাখতে বলেন। কিন্তু হাইকোর্টে এক আবেদনের (মোশনের) ফলে মামলা ওকিনীলির আদালত থেকে জেলা ও দায়রা জজের আদালতে স্থানান্তরিত হল। জেলা ও দায়রা জজ ছিলেন লফোর্ড। হাইকোর্টের আদেশে জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের শেষ ধৈর্যটুকুও আর রইল না, প্রতিশোধ গ্রহণের সঙ্কল্প নিলেন।

"একদিন শিশিরকুমারের সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি দেখাও হয়ে গেল; দেঁতো-হাসি হেসে বললেন, তবু জেলে আপনাকে যেতে হবেই, আমার ফাইল থেকে মামলা আর কোথাও যাক কি না-যাক। শিশির-

---

(৩) অমৃতবাজারের ঘোষ-পরিবার আষাঢ়, ১৩২০, পৃঃ পৃঃ ৫৫-৫৬

কুমার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, কখখনো না। শিশিরকুমারের ন্যায়ের প্রতি এমনি অটুট বিশ্বাস ছিল।

নির্দিষ্ট দিনে জেলা জজের আদালতে মামলা উঠল। বাদীপক্ষ সময় চাইলেন, তাঁরা নাকি তৈরী হতে পারেন নি। আসল ব্যাপার হচ্ছে, জজ লফোর্ড গেছলেন ছুটিতে এবং অস্থায়ীভাবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন মিঃ লুইস। বাদীপক্ষ এ'র ওপর ভরসা করতে পারছিলেন না।

"কয়েক মাস পর লফোর্ড ফিরে এলেন, মামলার শুনানী আরম্ভ হল। যশোহরের সরকারী উকিল এবং শিশিরকুমারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দক্ষিণাপ্রসাদ বসু উঠলেন বাদীপক্ষে এবং প্রখ্যাত ব্যারিস্টার মনমোহন ঘোষ উঠলেন আসামীপক্ষে। ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আসার পর মনমোহনের এই প্রথম 'ব্রিফ'। শিশিরকুমার ১০০০ টাকা জামিনে মুক্ত রইলেন।

"শিশিরকুমারই যে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক, সুতরাং, ঐ মানহানিকর প্রবন্ধের জন্য দায়ী, একথাটি প্রতিপন্ন করার জন্য অসংখ্য সাক্ষীর নামে শমন জারী হয়েছিল ও তাদের জবানবন্দী নেওয়া হয়েছিল। কোন এক সময়ে শিশিরকুমার ব্যক্তিগতভাবে মনরোকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন; মামলার সময় মনরো অন্যত্র বদলি হয়েছিলেন, তিনিও ঐ চিঠিখানি পেশ করতে হাজির হলেন। কিন্তু শিশিরকুমারকে ঐ লেখার জন্য দায়ী করা গেল না। মতিলালের বয়স তখন উনিশ। বাদীপক্ষ আশা করেছিলেন, সম্পাদক হিসেবে শিশিরকুমারের দায়িত্ব প্রতিপন্ন করার মতো কিছু বলে ফেলবেন মতিলাল। তাই তাঁকে আসামী-তালিকা থেকে মুক্ত করে বাদীপক্ষীয় সাক্ষী হিসেবে ধরা হল। কিছু কারণও ছিল। ইতিপূর্বে পত্রিকা প্রকাশের জন্য আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র (ডিক্লারেশন) পেশ না করায় যখন শিশিরকুমার ও তাঁর ভাইয়েরা অভিযুক্ত হয়েছিলেন তখন সেই মামলায় জজ ঐ সাক্ষ্যের সুযোগ নিতে চাইলেন। সুতরাং, তিনি এই উনিশ বছর বয়স্ক তরুণকে ভীষণ জেরার মধ্যে ফেললেন।

মতিলালের জেরা

জজ : অমৃতবাজার পত্রিকার মালিক কে?

মতিলাল : কেউ নয়, এটি সাধারণের সম্পত্তি।

জজ মেজাজ হারিয়ে ফেললেন এবং বললেন : এর আগে তুমি ছোট আদালতে বলেছ যে চন্দ্রনারায়ণ এর মালিক। এখন বলছ কেউ মালিক নয়। এর মানে কি? তোমার কোন্ কথাটি সত্য? মনে রেখো, শপথ করে মিথ্যে বিবৃতি দেবার জন্য তোমায় শাস্তি দিতে পারি।

মতিলাল : আপনি বিচারপতি, আপনি অবশ্যই মিথ্যে সাক্ষ্য দেবার জন্য তা করতে পারেন। কিন্তু আপনার কি মনে হচ্ছে আমি মিথ্যে সাক্ষী দিচ্ছি?

জজ : তুমি নিম্ন আদালতে আগে একরকম বলেছ; এখন এই আদালতে আর একরকম বলছ। কোন্‌টি সত্যি?

মতিলাল : দুটিই সত্যি?

জজ : কী! এর মানে কি?

মতিলাল : চন্দ্রনারায়ণ প্রেসের মালিক, আমি আগে যা বলেছি তাই। কিন্তু মাননীয় বিচারপতি বোধহয় খেয়ালে রাখছেন না যে, প্রেস আর অমৃতবাজার পত্রিকা এক নয়। একটি হচ্ছে সরঞ্জাম প্রভৃতি নিয়ে মেসিন, আর একটি হচ্ছে সংবাদপত্র—যেটি এখানে ছাপা হয়।

হতভম্ব বিচারপতি এবার তাঁর আক্রমণ ভিন্ন দিকে চালনা করলেন : অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক কে?

মতিলাল : পত্রিকা মাত্র কয়েক মাস আগে শুরু হয়েছে, এখনও ঠিক হয়নি কে সম্পাদক হবেন।

জজ : তাই যদি হবে তবে স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, উকিলেরা, মাস্টারের ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি কেন এই বলে সাক্ষ্য দিয়ে গেলেন যে, তাঁরা শিশিরকুমারকেই সম্পাদক মনে করেন?

মতিলাল : সম্ভবতঃ এই কারণে যে, তাঁরা সবাই জানেন যে, তিনি একজন ভাল লেখক।

জজ যেন শরাহত হলেন।

তুমি কি মনে কর, এদেশে তাঁর মত লেখক আর কেউ নেই?

মতিলাল : আমি একথা নিশ্চিত বলতে পারিনে যে, তাঁর মত লেখক আর কেউ নেই; তবে আমার বিশ্বাস, এদেশে বহু মোটা বেতনের ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীর তুলনায় তাঁর লেখার স্টাইল উৎকৃষ্টতর।

জজ যেন খানিকটা বিস্ময় খেয়ে কিঞ্চিৎ প্রশান্ত হলেন এবং অপেক্ষাকৃত নম্রকণ্ঠে জিগগেস করলেন : তুমি তো জান, এ লেখাটা কে লিখেছে, জান না?

মতিলাল : আজ্ঞে না, আমি জানি নে।

জজ : জান, জান, মনে করে দেখ দেখি।

মতিলাল : কি মনে করব আজ্ঞে?

জজ : আমি তোমায় পাঁচ মিনিট সময় দিলাম; আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

জজ ঘড়ি বের করলেন। মিনিটের কাঁটার গতিতে চোখ চেয়ে রইলেন। পাঁচ মিনিট কাটল।

এবার বল, কে এই লেখক।

মতিলাল : আমি জানি নে।

জজ আর রাগ চেপে রাখতে পারলেন না। টেবিলে ঘুষি মেরে আবার বললেন : নিশ্চয়ই জান, তোমাকে বলতেই হবে।

মতিলাল স্মিতহাস্যে বললেন : তবে তো আপনাকে খুশি করার জন্য মাথা থেকে একটা কিছু বের করতেই হবে।

অর্থাৎ, এই সংসারানভিজ্ঞ বালকের মনোবল ভেঙে ফেলার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। বাদীপক্ষ মতিলালকে 'হোস্টাইল' (বিরুদ্ধাচারী) বলে বর্জন করলেন। কৌসুলি মনমোহন ঘোষ প্রগাঢ় কর-মর্দন করে বললেন, এ মতির জুড়ি পাওয়া ভার।

"আট মাস ধরে মামলা চলেছিল। প্রিন্টার ও রাজকৃষ্ণ মিত্রের যথাক্রমে ছ'মাস ও এক বছর কারাদণ্ডে তার পরিসমাপ্তি হল। শিশিরকুমার অব্যাহতি পেলেন। কিন্তু এ মামলা শেষ হতে না হতেই বিক্ষত রাজপুরুষেরা অর্থাভাবক্লিষ্ট শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে আর একটি মামলা খাড়া করলেন। তখন সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ওয়েস্টল্যান্ড (পরবর্তীকালে বড়লাট-পরিষদের অর্থমন্ত্রী হয়েছিলেন)। এবারকার অভিযোগ

হল, শমন দেওয়া সত্ত্বেও মানহানি মামলায় রাজকৃষ্ণ মিত্রের প্রবন্ধ (পাণ্ডুলিপি) পেশ না করায় অপরিহার্য দলিল গোপনের অপরাধ করেছেন। এ মামলায়ও শিশিরকুমারকে জেলে পাঠানো যায়নি।' (৪)

স্থির সৌদামিনীর ও ওয়েফেয়ারারের বিবরণে রাজকৃষ্ণ মিত্রের পাণ্ডুলিপির গতি সম্পর্কে কিছু তারতম্য দেখা যায়। প্রথমটিতে বলা হয়েছে, শিশিরকুমার তা পুড়িয়ে ফেলেন; দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে রাজকৃষ্ণকে তা প্রত্যর্পণ করা হয়। সমগ্র ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটি তেমন কিছু নয়; পাণ্ডুলিপিটি সরকারপক্ষের হস্তগত হয়নি এইটিই আসল কথা—তা ওটা যিনিই নষ্ট করে ফেলুন।

প্রবাহে প্রতিবন্ধক

এই মামলা সম্পর্কে ১৯০৪এ শিশিরকুমার নিজে যা বলেছেন তার খানিকটা তুলেছি; ১৯০৭এ মতিলাল কি বলেছিলেন তাও আমরা তুলব; আপাতত ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দেই ৩১এ ডিসেম্বর পত্রিকার ৪০নং সংখ্যায় কি বেরিয়েছিল তা তুলি। ৩৯নং সংখ্যাটি বেরিয়েছিল ৩রা ডিসেম্বর। গুণতিতে ২৮ দিনের ব্যবধানে। সপ্তাহ হিসেবে ৪০নং সংখ্যা বেরোনোর কথা ১০ই ডিসেম্বর, ৪১নং ১৭ই ডিসেম্বর, ৪২নং ২৪-এ ডিসেম্বর। তার মানে, তিন সপ্তাহ বেরোয় নি পত্রিকা। বলা যায়, বেরোতে পারেনি। বিগত ক'মাসে মাথার ওপর দিয়ে এতরকমের অশান্তি ঝাপ্টা গেছে যে, পত্রিকার নিজস্ব তথ্যেও কিছু ভ্রান্তি লক্ষ্যণীয়। ৩১এ তারিখের বিবরণে বলা হয়েছে দু' সপ্তাহ কাগজ বেরোয়নি। প্রকৃতপক্ষে তিন সপ্তাহ। ঐ বিবরণে বলা হয়েছে :—

'গত দুই সপ্তাহের কাগজ বাহির না হওয়াতে অনেকে আমাদের উপর বিরক্ত হইতে পারেন, কিন্তু আমরা যে দায়ে পড়িয়া কাগজ বাহির করিতে পারি নাই শুনিলে আমরা ভরসা করি, তাহাদের কোন বিরক্তির কারণ থাকিবে না। বরং দুঃখিতান্তঃকরণে আমাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহারা আমাদের এ ত্রুটিকে ত্রুটি জ্ঞানই করিবেন না। আজ সাত মাস ধরিয়া (১৯০৪ এর বিবরণে আছে আট মাস, for eight months) আমরা রাইট সাহেব সম্বন্ধীয় লাইবেল মকর্দমায় বিব্রত। এই সাত মাস মধ্যে এই পত্রিকা সংক্রান্ত কয়েকজন প্রধান লোকের উপর ঝঞ্ঝাট ও অত্যাচার গিয়াছে, তাহা এক্ষণে লিখিবার প্রয়োজন নাই। সময়ে তাহা প্রকাশ হইতে বাকী থাকিবে না। তখন সুসভ্য, অসভ্য, সমুদায় জগত জানিতে পারিবেন, আমাদের ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি রাজপুরুষদিগের কিরূপে বিষ-নয়নে পড়িয়াছে, কিরূপে তাঁহারা উহা উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হন, কিরূপে কয়েকটি ভদ্রলোক ভয়ানক ষড়যন্ত্রের স্বীকার হইয়া প্রভূত কষ্ট সহ্য করেন—কোন কোন মহাত্মা কিরূপে স্বীয় ধর্ম ও বিবেকের মাথা খাইয়া আপনার প্রতিবিধিৎসা চরিতার্থ করিতে বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আরো কত কত নূতন বিষয় যাহা ব্যক্ত করিবার সময় এ নয়। ফল আমরা পূর্বে বলিয়াছি, সময়ে এ সমুদয় নিশ্চিত ব্যক্ত হইবে। গত ১০ই ডিসেম্বর লাইবেল মকর্দমা যশোহরের লফোর্ড সাহেবের নিকট উপস্থিত হয়। ছাপাখানার অনেকে সাক্ষ্য দিতে সেখানে উপস্থিত থাকেন। ১০ দিন পর্যন্ত অনবরত মকর্দমা হয়। গত শনিবারে সাক্ষ্য-জবানবন্দী শেষ হইয়া গিয়াছে।' (৫)

এই ৪০ সংখ্যায়ই একটি বিবরণ ও ঘটনাপরম্পরার তাৎপর্য বিশ্লেষণ আছে: তার মধ্যে নিম্নোক্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখযোগ্য :—

'গত সোমবারে আমাদের লাইবেল মকর্দমার হুকুম জজসাহেব দিয়াছেন। ইহাতে রাজকৃষ্ণবাবুর এক বৎসর মিয়াদ ও ১০০০ টাকা জরিমানা ও প্রিণ্টার বাবু চন্দ্রনাথ রায়ের ছয় মাস মিয়াদ হইয়াছে। শিশিরবাবু অব্যাহতি পাইয়াছেন।' (৬)

বার হিসেবে পত্রিকার প্রকাশ হত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার। ৩১এ ডিসেম্বর এক বৃহস্পতিবার ধরলে ১০ই ডিসেম্বরও এক বৃহস্পতিবার হয় এবং ঐ তারিখ ও ঐ বারেই জজ লফোর্ডের আদালতে মামলার শুনানী শুরু হয়। দশদিন ধরে অনবরত চললে ১৯এ ডিসেম্বর শুনানী শেষ হয়। সেটি শনিবার। তার দুদিন পর সোমবার রায় বেরিয়ে থাকলে তারিখটা দাঁড়ায় ২১এ ডিসেম্বর। বৃহস্পতিবার হিসেবে পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা ২৪এ ডিসেম্বর বেরোনোর কথা। কিন্তু বেরিয়েছে আরও সাতদিন পর ৩১শে ডিসেম্বর। এর মাঝে আর এক সোমবার ছিল ২৮এ ডিসেম্বর। সুতরাং পত্রিকা ৩১এ ডিসেম্বর যে 'গত সোমবারের' কথা লিখেছেন তা হচ্ছে ২১এ ডিসেম্বর।

প্রকৃতপক্ষে মামলাটা ছিল উপলক্ষ্য, লক্ষ্য ছিল 'অমৃতবাজার পত্রিকা।' ঘটনা-পরম্পরা থেকে এই উপসংহারে আসতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। সমগ্র রাষ্ট্র-যন্ত্রটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজপুরুষেরা সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তখন পত্রিকা লিখেছিলেন :—

"যাঁহারা ভাবিতেন এ মকর্দমা সুদ্ধ কেবল দুই ব্যক্তিকে লইয়া তাঁহাদের ভ্রম গিয়াছে। যাঁহারা এই মকর্দমাটিতে সুদ্ধ একটি সামান্য মকর্দমা ভাবিতেন, তাঁহারা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রাইটকে অপবাদ করাতে এত গোল কখন হইত না, ইহার অন্য কোন নিগূঢ় কারণ আছে। এ মকর্দমার বাদী প্রতিবাদী উভয়েই নগণ্য ব্যক্তি তবু লং সাহেবের বিরুদ্ধে নীলকরেরা যে লাইবেল মকর্দমা আনেন তাহা অপেক্ষা ইহাতে অধিক জনরব কেন হইল?

"১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধে কোম্পানি বাহাদুরের প্রাণ ধ্বংস হয়। আর যে দিবস কোম্পানি বাহাদুরের লয় হয়, সেই দিবস হইতে আর একটি বৃহত্তর সমরের সূত্রপাত হয়। বাঙ্গালীমাত্রের যেন মনে থাকে যে, ইংরেজ বাহাদুরেরা বাঙ্গালা কখন সমরে অধিকার করেন নাই। সেরাজদ্দৌলার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বাঙ্গালীরা ইংরেজদিগকে আহ্বান করে, আর এই ছুতো অবলম্বন করিয়া ইংরেজেরা বাঙ্গালা শাসন করিতেছেন। সমরে পরাজিত হইলে অধিবাসিগণ যেরূপ নিস্তেজ হইয়া যায়, বাঙ্গালীদের সে অবস্থাটি হয় নাই।'

আধুনিক চিন্তানায়কেরা লক্ষ্য করে খুশী হবেন যে যাকে বলা হয় ইতিহাসের দ্বন্দ্বপ্রাগতিক ব্যাখ্যা (dialectical interpretation) অমৃতবাজার পত্রিকার এই ব্যাখ্যাটি সেই তত্ত্বানুসারী হয়েছে। কোম্পানী আমলের উপসংহারে যে আমলই স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাক না কেন তার মধ্যে একটা বিরোধের বীজও (contradiction) উপ্ত হয়েছিল, 'বৃহত্তর সমরের সূত্রপাত' হয়েছিল। 'সেরাজদ্দৌলা' যদি সামন্ত প্রথার প্রতীক হয়ে থাকে এবং ক্লাইভ প্রমুখের সঙ্গে শেঠেদের ষড়যন্ত্র যদি নব বুর্জোয়াতন্ত্রের আবির্ভাব-বেদনা বলে গণ্য হয়, তবে তার মধ্যে এদেশীয়দের 'স্বায়ত্ত-শাসন' বা স্বাধীনতার অঙ্কুরোদ্গম অবশ্যম্ভাবী। বাংলাদেশেই 'ভারতের দিবাকর' অস্তগত হয়েছে, বাংলাদেশেই 'উদিবে সে রবি রাঙিয়া পুনর্বার' কথাটি সত্য হয়েছে। তার আভাস একালেই ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দেই অমৃতবাজার পত্রিকায় পাওয়া যায় :

"বাঙ্গালীরা যদি স্বভাবত ভীরু, কিন্তু এক্ষণে অযোধ্যা ও পাঞ্জাবের লোক যেরূপ ভীরু ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, বাঙ্গালীরা সেরূপ হয় নাই। কোম্পানি বাহাদুর একশত বৎসর পর্যন্ত নানাপ্রকারে দেশের ধন শোষণ করিয়া অধিবাসীদিগকে যন্ত্রণার শেষ দিলেন, তখন পৃথিবী আর ভার সহ্য করিতে পারিলেন না, কোম্পানি বাহাদুরের ধ্বংস হইল, মহারাণীর স্বীয় হস্তে ভারতের ভাগ্য ন্যস্ত হইল। বাঙ্গালীর শুষ্ক হৃদয়ে তখন বারি সঞ্চারিত হইল। নিরাশ বাঙ্গালীর আশার অঙ্কুর হইল, আর মহারাণীর সুশাসনে সেই অঙ্কুরের ক্রমে সম্বর্ধন হইতেছে, এই আশা ইংরেজদিগের স্বেচ্ছাচারিতার বাধা পদে পদে জন্মাইতেছে। আধা ডিক্রি আধা ডিসমিসের সময় আর নাই, অনেককাল গিয়াছে।

নব-সূর্যোদয়ের আভাস

সূক্ষ্মদর্শী দেখিবেন যে, ইংরেজ ও বাঙ্গালীতে এই বিবাদ ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। ইংরেজের ইচ্ছা বাঙ্গালীকে পদানত রাখা, বাঙ্গালীর ইচ্ছা উঠিয়া দাঁড়ান। কাহার না ইচ্ছা করে অন্যকে পদানত করা, আর কাহার অন্যের পদানত থাকিতে ইচ্ছা করে? চোখ পাকান, অন্তর টিপুনি,

(4) Life of Shishir Kumar Ghosh. wayfarer, pp. 27-29

(৫) ১৮ই পৌষ, ১২৭৫, ৩১এ ডিসেম্বর, ১৮৬৮, ৪০ সংখ্যা

(৬) ঐ

পার্লে গ্লুকো—
আরো বেশী
ভাল স্বাদ—
অনেক বেশী
পুষ্টিকর
এতে
সবসময়ে পাবেন—
ভিটামিন এ-ডি-বি১-বি২-
ক্যালসিয়াম-প্রোটীন,
দুধ, গম, চিনি,
গ্লুকোজ—
PARLE
BISCUITS
Gluco
everest/306-L/PP BN
পার্লে গ্লুকো বাচ্চাদের হেসে-
খেলে বেড়ে ওঠার মজার সাথী
ভারতে সবচেয়ে বেশী কাটতির বিস্কুট পার্লে গ্লুকো

উৎকোচ প্রভৃতির দ্বারা অগ্রে যেরূপ বাঙ্গালীদিগকে অনায়াসে করায়ত্ত করা যাইত, এক্ষণে আর তাহা যায় না, কাজেই ইংরেজদিগের যথাসাধ্য বল প্রয়োগ করিতে হইতেছে। বাঙ্গালীর মধ্যেও সহস্র এক্ষণে ন্যায্য দাবীর নিমিত্ত 'মন্ত্রের সাধন, কিম্বা শরীর পাতন' পণ করিয়াছেন। এ সময়ে ইংরেজের দোষ দেই না, বাঙ্গালীর দোষ দেই না। আমাদের কমিশনার চ্যাপম্যান সাহেব যদি প্রেসিডেন্সি ডিবিসনে বাঙ্গালীদিগকে কিছু স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় দেখেন, তিনি স্বচ্ছন্দে এই তেজ খর্ব করার চেষ্টা করুন, ইহাতে জাতির স্বার্থ আছে, কিন্তু আবার বাঙ্গালী মহাশয়দের বলিবেন, তাঁহারা তাঁহাদের কর্তব্য কর্ম করেন, তাহা হইলে চ্যাপম্যান পারিবেন না, কারণ পরমেশ্বর আমাদের দিকে। তিনি দুর্বলের দিকে থাকেন, তিনি উপায়হীন দাসের দিকে থাকেন, আর তাঁহার নিকট ইংরেজ, হিন্দু, সাদা, কালা, খৃষ্টিয়ান পৌত্তলিক সব সমান। (নিম্নরেখা আমার দেওয়া)

"আমাদের লাইবেল মকদ্দমার এত গোল হইবার কারণ এই। **যদি বাঙ্গালীরা একজন ইংরেজকে জব্দ করিতে পারে, তবে ইংরেজের 'প্রেস্টিজ' আর থাকিবে না,** অতএব সত্য হউক, মিথ্যা হউক, ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, এরূপ কখন করিতে দেওয়া হইবে না, এক্ষণে ইংরেজ কর্মচারীদিগের এই রাজনীতি। **এরূপ বাঙ্গালীদিগের প্রশ্রয়** দিলে আমাদিগের বাঙ্গালা শাসনের অনেক **বাধা জন্মিবে,** অতএব একটি রাজ্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই একটু কুকর্ম করায় দোষ নাই এইরূপে তর্ক করিয়া **অনেক প্রকৃত সৎ ইংরেজও এইরূপে উদ্ধত বাঙ্গালীদিগকে খর্ব করিবার নিমিত্ত জুটবদ্ধ হয়েন।** এই রাজনীতি ভাল কি মন্দ, আমরা কিছু বলিব না, আমরা কেবল রোজ রোজ যাহা হইতেছে তাহাই লিখিতেছি। (নিম্নরেখা আমার দেওয়া)

"রাইট সাহেবকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনেক ইংরেজ দলবদ্ধ হয়েন। **হাইকোর্টে এক্ষণে মকদ্দমার আপীল হইতেছে,** সুতরাং তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকুন, মকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেলেই, তাঁহাদের নাম ও ব্যবহার যে প্রকাশ করিলাম না, এ ত্রুটি সংশোধন করা যাইবে। **হাইকোর্টের আজ্ঞাক্রমে এ মকদ্দমা ম্যাজিস্ট্রেটের হাত হইতে সেসন জজের হাতে যায়। মকদ্দমার দশ** দিন বিচার হয়। সুদ্ধ ফরিয়াদির সাক্ষীর **জমানবন্দি হয়, প্রতিবাদীরা সাফাই সাক্ষী দেন না। সাক্ষীর মধ্যে ছয়জন ইংরেজ, আর অবশিষ্ট প্রধান প্রধান বাঙ্গালী। জমানবন্দি ছয়জন ইংরেজের হয় বটে, কিন্তু যোগাড় দিতে আরো অনেকে আইসেন। সেই কয়েক দিবস প্রায় সকল কাছারি বন্দ ছিল, আর দেশ দেশান্তর হইতে লোকে মকদ্দমা দেখিতে আইসে।** মনমোহনবাবু প্রতিবাদীর পক্ষের ব্যারিস্টার—অত্যন্ত সুখ্যাতি লইয়া গিয়াছেন। **কাছারিতে লোক ধরিত না, আর ইংরেজ মহাশয়েরা অনেকে উপস্থিত থাকিতেন।** আমাদের দেশের কর্তা, আমাদের ধন, মন, প্রাণের মহারাণী নিযুক্ত ট্রাস্টি **চ্যাপমান সাহেবও একদিন দেখিতে যান। সুদ্ধ ফরিয়াদির সাক্ষীর পথের ব্যয় এক হাজার টাকা গবর্নমেন্টের লাগিয়াছে।**

"আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে, এই মকদ্দমায় জজ লফোর্ড ও আসামীদ্বয় রাজকৃষ্ণ ও চন্দ্রবাবু উভয়েই চিরস্মরণীয় হইবেন। লাইবেল মকদ্দমার এরূপ গুরুতর দণ্ড কেহ কখন শুনে নাই, অতএব লাইবেল মকদ্দমার কথা হইলেই জজ লফোর্ডের কথা মনে পড়িবে। [জজ লফোর্ড প্রথমে পরিশ্রম সহিত (সশ্রম) মেয়াদের হুকুম দেন, পরে তাঁহার আমলারা আইন খুলিয়া দেখাইলে তাহা কাটিয়া আবার বিনা পরিশ্রম করিয়া দেন।]"

বলাবাহুল্য, এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে। লফোর্ডের কথা যত নয় তার অনেক বেশী দুই দণ্ডিত ব্যক্তির এবং সর্বোপরি অমৃতবাজার পত্রিকার বিপদোত্তরণের কথা মনে পড়বে। এক নিদারুণ ষড়যন্ত্রে যা নিশ্চিহ্ন হতে বসেছিল মহাকালের অফুরন্ত আশীর্বাদে তার শ্রী সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হয়ে আছে।

প্রসঙ্গত পত্রিকা ঐ নিবন্ধেই আরও লিখেছেন :

"রাজকৃষ্ণ ও চন্দ্রবাবুর সম্বন্ধে একটি কথা বলিব। রাজকৃষ্ণবাবুর বাড়ী বারাসতে। তিনি রাইট সাহেবকে কখন চক্ষে দেখেন নাই, চন্দ্রবাবুর বাড়ী যশোহর সবডিভিসনে। রাইট সাহেবের ঝিনিদহ হইতে দুইদিনের পথ। ইনি রাইট সাহেবকে দেখেনও নাই, কখন নামও শুনেন নাই। উভয়ে অতি কঠোর দণ্ড পাইয়াছেন। পাঠক মহাশয়েরা, ইহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত মনের সহিত ঈশ্বরকে বলিবেন অদ্য এই পর্যন্ত।"

বলেছি, এই লেখার তারিখও ৩১শে ডিসেম্বর; রাহুমুক্তির পর প্রথম যে সংখ্যা বেরিয়েছিল তাতেই এই বিবরণ প্রকাশিত হয়। একটানা উৎকণ্ঠা, বিপর্যয়, লাঞ্ছনায় ক্লান্ত, কিন্তু অটুট মনোবল, চিন্তাধারায় অসাধারণ স্থৈর্যের পরিচয়, বিরল বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস। তাই বিচ্ছিন্ন সূত্রকে সংযোজিত করেছে, তারপর আবার তেমনি দৃঢ় পদক্ষেপ; লেখনী আরও অগ্নিগর্ভ!

প্রতিশ্রুত বিবরণ

পরবর্তী সংখ্যায় প্রসঙ্গটির পুনরুত্থাপন করে লিখলেন :

"এ পর্যন্ত লাইবেল মকদ্দমার বিবরণ আমরা প্রকাশ করি নাই, অদ্য অতি সংক্ষেপে তাহাই লিখিতেছি। ১৭ সংখ্যক পত্রিকায় 'ঘোর অত্যাচার' প্রস্তাব প্রকাশ হইবা মাত্র, তখনকার যশোহরের ম্যাজিস্ট্রেট এই পত্রিকার প্রকাশক, সম্পাদক ও অধ্যক্ষের নাম দিয়া এই মর্মে একখানা পত্র লিখিলেন যে, যে ব্যক্তির কথা 'ঘোর অত্যাচার' প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে সে ব্যক্তি কে? মনরো সাহেব পত্র ইহাই বলিয়া শেষ করেন, 'আপনার ন্যায় আমারো নিতান্ত ইচ্ছা যে, আমি এই বিষয়টা ইহার তল পর্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখি।' কিন্তু মনরো সাহেবকে নামের বিষয় কিছু আভাস না বলিয়া কাহার কাহার নিকট হইতে এ বিষয় অনুসন্ধানের উপায় জানা যাইতে পারে, তাহা লিখিয়া দেওয়া হইল। মনরো সাহেব নামের জন্য বারম্বার জিদ করিলেন, কিন্তু ইহা বলিয়া নাম দেওয়া হইল না যে, প্রস্তাবে নাম দেওয়ার কথা নাই। অনুসন্ধানের উপায় বলিয়া দেওয়ার কথা, তাহা হইয়াছে। ইহাতে মনরো সাহেব গোপনভাবে সেই কয়েক ব্যক্তিকে (ইহার সকলেই প্রধান প্রধান ব্যক্তি) ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা সকলেই বলিলেন যে, ঝিনিদহের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রাইটের সম্বন্ধে তাঁহারা ঠিক এইরূপ একটি কথা শুনিয়াছেন। যে গ্রামে এইরূপ ঘটনা হয় সেই গ্রামের লোকেরা তাহাদিগকে এই প্রস্তাব মুদ্রিত হইবার অনেক দিন পূর্বে বলিয়াছে। মনরো সাহেব এ সমুদয় লিখিয়া লইলেন। সেই গ্রামস্থ লোক যাহারা বলে যে, তাহারা চাক্ষুষ দেখিয়াছে, কেহ কেহ যশোহরে উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে আহ্বান করিতেও লেখা হইয়াছিল, কিন্তু মনরো সাহেব তাহাদিগকে ডাকিলেন না এইখানেই অনুসন্ধান বন্ধ করিলেন। ইতিমধ্যে ১৯ সংখ্যক পত্রিকায় 'পাঠকগণের প্রতি' প্রস্তাব প্রকাশিত হইল।

"রাজকৃষ্ণবাবু ফৌজদারির হেডক্লার্ক। ইনি পত্রিকায় কখন কখন লিখিতেন। কোন কারণবশতঃ মনরো সাহেবের রাজকৃষ্ণবাবুকে 'পাঠকগণের প্রতি' প্রস্তাব লেখক বলিয়া সন্দেহ হইল। আর তখন তিনি ঘোর অত্যাচারের বিষয় অনুসন্ধান ক্ষান্ত দিয়া, 'পাঠকগণের প্রতি' প্রস্তাব রাজকৃষ্ণবাবু লিখিয়াছেন কিনা ইহা অতীব উৎসাহের সহিত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রাজকৃষ্ণবাবুকে উক্ত প্রস্তাবের লেখক, কে, জানিতে পাঠাইলে, তিনি উত্তর দিলেন যে, লেখককে তিনি জানেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছেন, নাম বলিতে পারেন না। মনরো সাহেব তখন লিখিয়া পাঠাইলেন, তাহা অবশ্য বলিতে হবে। রাজকৃষ্ণবাবুর তখন দারুণ জ্বর। বাটী হইতে উত্তর দিলেন যে, তাঁহার অত্যন্ত জ্বর হইয়াছে। তখন মনরো সাহেব ডাক্তার সাহেবকে সাথে করিয়া রাজকৃষ্ণবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার সাহেব হাত দেখিয়া বলিলেন যে ভারি জ্বর হইয়াছে। মনরো সাহেব ইহাতে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রশ্নের উত্তর দিলে কোন বিঘ্ন হইবে কিনা। ডাক্তার সাহেব বলিলেন, না। এইরূপে রাজকৃষ্ণবাবুর জবানবন্দি এজাহার লইয়া, রাজকৃষ্ণ 'পাঠগণের প্রতি' প্রস্তাব লিখিয়াছেন, বলিয়া তাঁহাকে সসপেন্ড করিলেন।

'এদিকে মনরো সাহেব রাইটকে নালিশ করিতে আজ্ঞা দিলে, ও সেই কথাক্রমে রাইট যশোহরে আইলে, তিনি পূর্বে গোপনানুসন্ধান করিয়া যাহা যাহা অবগত হইয়াছিলেন, সেই সমুদয় কাগজপত্র তাঁহাকে দিলেন। রাইট দুই প্রস্তাবের নিমিত্ত দুইটি নালিশ করিলেন। প্রথম মকদ্দমার আসামী শ্রীযুক্ত চন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, হেমন্তকুমার ঘোষ,

শিশিরকুমার ঘোষ ও প্রিন্টার চন্দ্রনাথ রায় ও দ্বিতীয় মকদ্দমার আসামী ঐ চারিজন আর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মিত্র। এ সকলের নাম মনরো সাহেব রাইটকে বলিয়া দেন। এ মকদ্দমা জাইন্ট (জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট) ওকিনিলির কাছে উপস্থিত হইল।

মকদ্দমা আরম্ভ হইলে, হেমন্তবাবু ব্যতীত আর সকলে উপস্থিত হইলেন। ওকিনিলি সাহেব প্রথমে, প্রথম মকদ্দমা না লইয়া দ্বিতীয় মকদ্দমা লইলেন। তখন শিশিরকুমার এই আপত্তি করিয়া দরখাস্ত করিলেন যে এ মকদ্দমা ওকিনিলি সাহেব না করেন, কারণ ওকিনিলি সাহেবের সহিত শিশিরবাবুর হৃদ্যতা থাকাতে এই মকদ্দমা সম্বন্ধে, মকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্বে অনেক গোপনীয় কথা হইয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহাকে সাক্ষ্য মান্য করিতে হইবে। ওকিনিলি সাহেব এ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করায় তদ্দণ্ডে মনরো সাহেবের ওখানে আপীল করা হয়। তিনি অগ্রাহ্য করিলেন। আবার আসামীদিগের ব্যারিস্টার মনমোহনবাবু ওকিনিলি সাহেবকে দুদিন মকদ্দমা ক্ষান্ত রাখিতে টেলিগ্রাম করেন তাহাও না শুনিয়া বলিলেন- তোমাদের ব্যারিস্টারকে বলিও এরূপ গোস্তাকি আর না করে। কাজেই মকদ্দমা চলিতে লাগিল। আসামীদিগের পক্ষে উকিল মুক্তিয়ার কেহ ছিল না: আসামীরা সকল উকিল ও মোক্তারের বাসায় অর্থ লইয়া ভ্রমণ করেন, কিন্তু সকলেই উত্তর দিলেন যে সাহেবরা বেজার হইবে, ইঁহাদের এই ভয় করে বলিয়া তাঁহারা যাইতে পারিবেন না।'

সেকালের মানসিকতা

কি ভয়ানক অবস্থা ! সেকালের বাস্তব ঘটনা, আজ তা কল্পনাও করা যায় না। পাছে 'সাহেবরা বেজার' হয় এজন্য একটা মানহানি মামলায় উকিল, নিদেন মোক্তার পাওয়া যায় না; টাকা দিলেও না—এমনি নিঃস্বার্থ ভয়। হত্যা নয়, শ্লীলতাহানি নয়, রাহাজানি নয়, এমনকি রাষ্ট্রদ্রোহিতাও নয়। তবু ভয়। ভয় নয়, একরকমের বয়কট। জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারিস্টারের অনুরোধ মানেন না, বিধিগত মামলার শুনানী স্থগিতের আবেদন নামঞ্জুর, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট একজোট, উদ্দিষ্ট আসামীর অসুস্থতা নগণ্য—ঘোষেদের সমুচিত দন্ড দিতে হবে একাধারে শক্তিমান ও কাপুরুষদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিজ্ঞা। কিন্তু বিপদ এখানেই শেষ হয়নি।

'বাবু চন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এক দরখাস্ত দিলেন যে যদিও তিনি রেজিস্টারি প্রোপাইটার: কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ইহার উপস্বত্ব ভোগী নয়। ওকিনিলি সাহেব এই দরখাস্তের পোষকতা নিমিত্ত একটি সাক্ষ্য লইয়া, চন্দ্রবাবুকে খালাস দিলেন ও খালাস দিয়াই তখনই তাঁহাকে সাক্ষী শ্রেণীভুক্ত করিয়া জমানবন্দী লইলেন: আসামীর পক্ষে কোন উকিল না থাকায় ধাঁ-ধাঁ করিয়া জমানবন্দী হইতে লাগিল ও মকদ্দমার দ্বিতীয় দিনে রাজকৃষ্ণবাবুর বাটী খানাতল্লাসী হইল। দ্বিতীয় মকদ্দমার বাদীর পক্ষের সাক্ষ্য তামাম হইয়া গেল। মতিবাবু দ্বিতীয় মকদ্দমায় সাক্ষ্য দেওনকালে বলেন যে 'সে কপি আমি হাতে করিয়া মুদ্রিত করিতে দেই।' ইহাতে ওকিনিলি সাহেব বলেন, 'যাও তবে তুমি আসামী শ্রেণীর মধ্যে যাও।' আর রাইট সাহেবকে তখনই তিনি বলিলেন যে ইহাকেও আসামী করিতে পার। প্রথম মকদ্দমা বিচার আরম্ভ হইল। এমন সময় হাইকোর্ট হইতে টেলিগ্রাম আইল যে, দ্বিতীয় হুকুম পর্যন্ত মকদ্দমা স্থগিত থাকে।

'পূর্বে বলা হইয়াছে হেমন্তবাবু উপস্থিত হন না, তিনি কলিকাতায় ছিলেন। সেখান হইতে হাইকোর্টে ইহাই বলিয়া তিনি আফিডেবিট করেন যে, ওকিনিলি সাহেব অত্যাচার করিতেছেন, আর মকদ্দমা হাইকোর্টে উঠাইয়া লওয়া হউক। সেই আফিডেবিট অনুসারে উপরিউক্ত হুকুম আইসে। হুকুম আইলে ওকিনিলি সাহেব আসামীদিগকে বলিয়া দিলেন যে, হাইকোর্টের হুকুমানুসারে মকদ্দমা এক্ষণে স্থগিত রাখা গেল। কিন্তু সন্ধ্যার সময় আসামীগণকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত এক ওয়ারেন্ট উপস্থিত। আসামীরা কাছারিতে নীত হইয়া দেখিলেন যে, কাছারিতে জনমানব নাই, ওকিনিলি ও মনরো বসিয়া, কোর্ট ইন্সপেক্টর দাঁড়াইয়া। আসামীরা উপস্থিত হইলে ওকিনিলি সাহেব সহাস্যবদনে শিশিরকুমারকে বলিলেন, 'দেখেছ, হেমন্ত কি আফিডেবিট দিয়াছে, পড়ে দেখ' ইহাই বলিয়া হাইকোর্টের পত্র তাঁহার হাতে দিলেন। শিশিরবাবু পড়িয়া দেখিলে, ওকিনিলি সাহেব বলিলেন, 'দেখেছ, হেমন্ত মিছামিছি আমার কত বদনাম করিয়াছে।' শিশিরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ প্রশ্ন ম্যাজিস্ট্রেট আসনে আরূঢ় হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন কিনা। মনরো সাহেব চুপ করিয়া থাকিলেন। ওকিনিলি সাহেব বলিলেন, 'না, তোমার সঙ্গে যে বন্ধুত্ব আছে, সেই বন্ধুতার অনু-

বোধ করিতে চাহিয়াছি।' শিশির উত্তর করিলেন, 'যে না আমি আর কোন কথা বলিব না, সরলভাবে চাই তোমাদের কাছে যখন যে কথা বলিয়াছি, তাহা লিখাইয়া লইয়াছ। আরম্ভ করিয়াছি আমি আর তোমাদের বিশ্বাস করি না, তবে আমার ভাই অ্যাফিডেভিটে যাহা বলিয়াছেন, তাহার একটাও মিথ্যা নয়।' ইহাতে ওকিনীলি সাহেব বলিলেন, তোমার মত মিথ্যাবাদী আমি কখন দেখি নাই। আসামীরা যখন গ্রেপ্তার হইয়া আনীত হয়, তখন তাহাদের সঙ্গে অনেক লোক আইসে, তাহাদের সমক্ষে এই কথাবার্তা হয়।

তিনি আসামীদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। পরে রাজকৃষ্ণ ও শিশিরবাবু উভয়ে একত্র পরেই কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

ইঁহারা হাইকোর্টে যাইয়া হেমন্তবাবু যেরূপ অ্যাফিডেভিট করেন, সেইরূপ করিলেন। ইহাতে হেমন্তবাবুর অ্যাফিডেভিটে যে হুকুম দেওয়া হয়, তাহা উঠাইয়া লইয়া পরের ঐ তিন অ্যাফিডেভিট হলে আর এক হুকুম হইল যে রাইট সাহেব হেতু দেখান কেন মকদ্দমা হাইকোর্টে উঠিয়া আসিবে না। আর ওকিনীল সাহেবের কৈফিয়ত তলব হইল।

এদিকে মনরো ওকিনীলি উভয়েই বদলি হইলেন। যশোহর পরিত্যাগ করার কিছুকাল পূর্বে মনরো সাহেব আর একটি নূতন মকদ্দমা তুলিলেন। বাবু চন্দ্রনারায়ণ রেজিষ্টারি প্রোপাইটার। অথচ তিনি আসামী হইলে মুদ্রাযন্ত্রের উপস্থিত থাকেন না, বলিয়া দরখাস্ত করিয়া অব্যাহতি পান। এখন মনরো সাহেব বলিতে লাগিলেন যে, চন্দ্রনারায়ণ মিথ্যা ডিক্লারেশন দিয়াছে, অতএব ৬৭ সালের ২৫ আইন মতে দণ্ডের যোগ্য।

মিথ্যা ডিক্লারেশন দণ্ড ৫০০০ টাকা জরিমানা, ও ২ বৎসর মিয়াদ। ফিরে একটি মকদ্দমা উপস্থিত হইল, পরে চন্দ্রবাবু এক্ষণকার ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টল্যান্ড সাহেবের নিকট অকাট্য প্রমাণ দিয়া অব্যাহতি পান।

মনরো সাহেব ও ওকিনীলি বদলি হইয়া গেলেন। আর হাইকোর্ট বলিলেন তবে আর মকদ্দমা উঠাইয়া লইবার প্রয়োজন কি কিন্তু এ মকদ্দমায় অনেক আইনের তর্ক উঠিতে পারে, মফস্বলের হাকিমেরা তা বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না। যদি তাঁহাদের বিবেচনায় মকদ্দমা বেশ প্রমাণ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাঁহারা জজের হস্তে মকদ্দমা সোপর্দ করিবেন। হাইকোর্ট আরো বলিলেন যে মকদ্দমা জজের হাতে গেলে তখন আসামীরা ইচ্ছা করিলে উহা হাইকোর্টে উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারিবেন।

আবার এক প্যাঁচ

'ওয়েস্টল্যান্ড সাহেব আবার মকদ্দমা উপস্থিত করিলেন, আবার সাক্ষ্য জমানবন্দি হইল, আবার উকিল মুক্তিয়ারেরা অস্বীকার হইলেন। এবারেও হেমন্তবাবু অনুপস্থিত থাকেন। মকদ্দমা শেষ হইয়া গেলে, ম্যাজিস্ট্রেট আসামীদের নিকট জওয়াব চাহিলেন, আসামীরা কোন উত্তর করিলেন না। পরে ওয়েস্টল্যান্ড সাহেব শিশিরকুমার ও চন্দ্রনাথকে উভয় মকদ্দমায় এবং রাজকৃষ্ণকে দ্বিতীয় মকদ্দমায় দাওরায় সোপর্দ করিলেন। দাওরায় সোপর্দ করিবার পূর্বে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত ওয়েস্টল্যান্ড সাহেব বাঙ্গালায় একটি বক্তৃতা করিলেন। কিন্তু তিনি বাঙ্গালা ভাল জানেন না বলিয়াই হউক, কি যে জন্যই হউক, উপস্থিত সকলে তাহা বুঝিতে পারিল না।

যখন ওকিনীলি ও মনরো বদলি হবেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে জজ লফোর্ডও বদলি হয়েন। ইঁহাদের তিনজনে বড় সম্প্রীতি ছিল। লফোর্ড সাহেব গেলে, তাঁহার স্থানে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি জজ আসিয়া যাইয়া, পরে বর্তমান অ্যাডিসনাল জজ লাউইস সাহেব আইলেন। ইহার নিকটেই মকদ্দমা উপস্থিত হইল, ও মকদ্দমার দিনে আসামীরা একজন হাইকোর্ট প্লিডার-সহ হাজির হইয়া দেখিলেন, বাদী স্বয়ং এবং বাদীর পক্ষে সাক্ষী কেহ হাজির নন। ইহাতে মকদ্দমা কেন খারিজ হইবে না, এই আপত্তি উপস্থিত করায় উহা গ্রাহ্য হইল না। পরে একজন আসামী লাউইস সাহেবকে এই কয়েকটি কথা বলেন, 'এই যে সাক্ষী, ফরিয়াদী হাজির নাই, এ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা হাজির করিতে পারেন নাই, বলিলা নয়। ইহাতে বোধহয়, আরো নিগূঢ় আছে। জজ লফোর্ড আগতপ্রায়, বোধহয় ইঁহাদের ইচ্ছা মকদ্দমাটি লফোর্ড সাহেবের হাতে হয়, এইজন্য ইতস্ততঃ করিতেছেন।'

ওকিনীলি সাহেবের নিকট মকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্বে বাবু চন্দ্রনাথ রায় এই মর্মে কমিশনার চ্যাপম্যান সাহেবের নিকট এক টেলিগ্রাম পাঠান যে, রাইটকে ঝিনাইদহ হইতে স্থানান্তরিত করিয়া মফস্বলে তদন্ত করিলে তার অত্যাচারের নিশ্চিত অনুসন্ধান হইবে। তিনি প্রায় দুই সপ্তাহ পরে উত্তর করিলেন (তখন ওকিনীলি মকদ্দমা গ্রহণ করিয়াছেন) যে, তিনি ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না, মনরো সাহেব ইহার কর্তা। পরে মকদ্দমা দাওরায় সোপর্দ হইলে লেফটেনান্ট গবর্নরকে রাইটকে বদলি করিতে লেখা হয়। কিন্তু তিনি প্রায় একমাস পরে উত্তর দিলেন যে, 'তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না।'

সে যাহা হউক, মকদ্দমা স্থগিত থাকিল। আর একটি দিন সাব্যস্ত হইল, সে আবার লফোর্ড সাহেবের যেদিন আসিবার কথা তাহার দুই চারি দিন পরে। লফোর্ড সাহেবের কাছে মকদ্দমা না হয় ইহা আসামীদিগের নিতান্ত ইচ্ছা, তাহার কারণ, রাজকৃষ্ণবাবু এক দিবস লফোর্ড সাহেবকে সেলাম করেন না, ইহাতে জজ সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে জজের কাছারি যাইতে নিষেধ করেন। ইহা আবার এই পত্রিকায় মুদ্রিত করা হয়, বিশেষতঃ শিশিরবাবুর সহিত একদিন তাঁহার কথান্তর হয়। মনরো ও ওকিনীলি সাহেবের সহিত তাঁর অত্যন্ত সম্প্রীতি ছিল। আর মকদ্দমা যখন প্রথম উপস্থিত হয় তখন তিনি যশোহরে ছিলেন, ও ওকিনীলি সাহেবের সহিত আসামীদিগের যে মকদ্দমা আরম্ভ হইতে বিবাদ হয়, তাহা দেখিয়া মন এ সমুদয় ভাবিয়া আসামীদিগের বুক দুর দুর করিতে লাগিল। ইহার মধ্যে শুনা গেল যে, লফোর্ড দিন কয়েক পিছাইয়া আসিবেন। ইহাতে আসামীরা নিরপেক্ষ হইলেন। জজ লাউইস সাহেবের উপর তাঁহাদের বড় ভক্তি। মকদ্দমার অনেকদিন থাকাতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জজ লাউইসকে পত্র লিখিলেন, যে লফোর্ড সাহেব আগত প্রায়, অতএব আপনি এ কয়েক দিনের মকদ্দমা করিয়া উঠিতে পারিবেন না, মকদ্দমার দিন বদলিয়া দিউন। লাউস সাহেব হাইকোর্টে এই রিপোর্ট লিখিলেন, হাইকোর্টও ঐরূপ বলিলেন, কাজেই মকদ্দমা লফোর্ড সাহেবের হাতে হইল অথচ আসামীরা মকদ্দমা উঠাইয়া লইবার অবসর পাইলেন না।" ([illegible]শে পৌষ, ১২৭৫। ৭ই জানুয়ারী, ১৮৬৯)

অবিস্মরণীয়

শিশিরকুমারকে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক প্রতিপন্ন করে সাজা দেওয়ার চেষ্টার মত শ্রীঅরবিন্দকে 'বন্দেমাতরম'-এর সম্পাদক প্রতিপন্ন করে সাজা দেওয়ার চেষ্টা হয় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে 'বন্দেমাতরম' মামলার উপসংহারে শিশিরকুমারের মতই তিনিও খালাস পান; কেননা, কাউকেই সম্পাদকরূপে প্রতিপন্ন করা যায় নি। এই উপলক্ষে ম্যাজিস্ট্রেট যে মন্তব্য করেছিলেন তা থেকে বোঝা যায় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ঐ লাইবেল মকদ্দমা কি গভীর রেখাপাত করেছিল পত্রিকা-পরিচালকদের মানসিকতায়, ঘটনার পুনরুল্লেখ তা স্পষ্ট।

'Perhaps, is is not generally known to the present generation that this journal was the first in whole of India to be prosecuted for political purpose. The complainant was no doubt a European Deputy Magistrate who brought a case of criminal libel against the conductors. But his superiors—the District Magistrate the commissioner of the Division, nay, the Lt. Governor—openly backed him. The libel case failed that is to say, the Prosecution failed to convict the principal accused—the founder of this journal, who was hauled up as the Editor. So, another case was brought against the latter. This time he was charged with having concealed evidence, that is, the manuscript of the defamatory article........The Magistrate of Jessore who tried the case was Mr. J. Westland, latterly sir J. Westland, Financial Minister. The Magistrate saw that there was no case whatever against the accused and so he told the vakils that they had no need to address the court on behalf of the accused. Thereupon Babu Tarapada (Banerjee of the Krishnagar bar) rose and addressing the court said : we profoundly thank your Honour.' Instead of pleasing Westland, this rather offended him, for he said in reply :'Am I to be thanked for having done my duty and justice? Babu Tarapada stammered out some excuse and there the matter ended.
(Sept. 25, 1907. P. 6, A.B.P.).

শরৎ অনুরাগী সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা একযোগে স্থির করলেন শরৎচন্দ্রের একটি বিরাট সম্বর্ধনা দান করা হবে। স্থির হল টাউন হলে হবে মূল সভা, তারপর অন্যত্র বাকী অনুষ্ঠানগুলি হবে। 'শরৎবন্দনা' নামে এই অনুষ্ঠানটির নামকরণ করা হল। খ্যাত কল্লোল-কালিকলম গোষ্ঠীর সাহিত্যিকগণ এবং সুভাষচন্দ্র পরিচালিত 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী এই অনুষ্ঠানটিকে সার্থক করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। 'বঙ্গবাণী' সম্পাদক গোপাললাল সান্যাল এই প্রস্তুতি কমিটির একজন কর্মকর্তা ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের অদৃষ্টটা কিন্তু মন্দ; একদিকে তিনি বাঙালী সাহিত্য রসিকের কাছে 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' অন্যদিকে আরেকদল শরৎ-বিরোধী, প্রচণ্ড আক্রোশ তাঁদের শরৎচন্দ্রের ওপর। এ'দের মধ্যে কিছু ছিলেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথের আশপাশে ঘুরতেন, আর ছিলেন শনিবারের চিঠির কর্তারা। শনিবারের চিঠির উগ্র শরৎ বিরোধিতা সর্বজনবিদিত। সেই সঙ্গে আরো দু-চার জন যোগ দিলেন যাঁরা দু নৌকায় পা দিয়ে চলেন—অর্থাৎ শরৎচন্দ্রকেও দাদা বলে অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন আবার শনিবারের চিঠির বিরাগভাজন হতেও রাজী নন। এইসব শরৎ-বিরোধীরা একযোগে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় একটি চিঠি ছাড়লেন যে শরৎচন্দ্রের সম্বর্ধনার কাজটি ঠিক উপযুক্ত হচ্ছে না। সেই সময়কার রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তাল ছিল।

শরৎ অনুরাগীরা সভা স্থগিত রাখতে রাজী হলেন না। টাউন হলে সভা হবে—সবাই উপস্থিত। আয়োজন নিখুঁত, কিন্তু ইদানীং যে শ্রেণীর মানুষদের গুণ্ডা বলা হয় সেই শ্রেণীর মানুষের সেদিনও অভাব ছিল না—তাই সভা পণ্ড করা হল। ইট-পাটকেল ছোড়া হল, চেয়ার-টেবিল ভাঙা ইত্যাদি নানাবিধ মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করে 'শরৎ বন্দনা'কে প্রতিরোধ করা হল।

শনিবারের চিঠি ব্যঙ্গ করে বললেন—'শরৎবেদনা' ইত্যাদি।

সভার উদ্যোক্তারা বেহালায় মণীন্দ্র রায়ের বাড়ি ফিরে এসে পরবর্তী কর্মপদ্ধতি স্থির করলেন। মণীন্দ্র রায় ছিলেন শরৎচন্দ্রের বিশেষ প্রীতিভাজন। 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসের অনেকখানি অংশ মণীন্দ্র রায়ের বাসভবনে অবস্থানকালে রচিত।

শরৎচন্দ্র এইসব ব্যাপারে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন সমগ্র ব্যাপারটির পিছনে যে অশোভন চক্রান্ত ছিল তার জন্য। এবং এর সঙ্গে এসেছিল রবীন্দ্রনাথের এক পত্র, পক্ষপাতহীন বিচারে যাকে বলা যায় অনুদার সেই জাতীয় মন্তব্য ছিল রবীন্দ্রনাথের পত্রে।

শরৎচন্দ্র তবু শরৎচন্দ্র।

একবার এক জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় শরৎচন্দ্র বলেছিলেন ৩১শে ভাদ্র আবার ফিরে আসবে কিন্তু আমি আর সেদিন থাকব না।—

এমন কিছু নূতন কথা নয়, তবু শরৎচন্দ্রের এই উক্তিতে বেদনা ছিল। আমরা শরৎচন্দ্রকে আজো ঠিকমত বুঝিনি। আজো কিছু অর্বাচীন সমালোচক আছেন যাঁরা শরৎচন্দ্রকে তুচ্ছ করার জন্য সদা সচেষ্ট। তাঁদের আস্ফালন দেখলে আমার সেই টাউন হলের সভার কথা মনে পড়ে।

এই বছর শ্রীঅরবিন্দ শতবার্ষিকী। শরৎচন্দ্রের একটি পত্র পাঠ করে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন :

"Sarat Chatterjee's letter is not a glory of the vital at all, even though it may have come through the vital—but not from it; it is psychic throughout in every sentence. It I were asked how does the psychic work in the human being I could very well point to the letter and say "like that".

বলা বাহুল্য শ্রীঅরবিন্দ এরপর আরো অনেক মূল্যবান উক্তি করেছেন। তিনি শরৎ-অনুরাগী ছিলেন এবং শরৎচন্দ্রের একটি গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ আগাগোড়া দেখে দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র যে কালের মানুষ, সেই কালে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী ছিলেন। সকলেই জানেন তিনি কি পরিমাণ শরৎ-অনুরাগী ছিলেন। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'আহুতি' নামক গ্রন্থটি শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গীকৃত।

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল লেখা এবং লেখক চেনার। তিনি শরৎচন্দ্র সম্পর্কে লিখেছিলেন—

'বহু বৎসর পূর্বের কথা আজ মনে পড়ে—যেদিন আমি 'রামের সুমতি' পাঠ করি; সেদিন এই অজ্ঞাতকুলশীল লেখকটির ক্ষুদ্র রচনা পাঠ করিয়া এতটা বিহ্বল হইয়াছিলাম যে, সেই রচনাটির উপর চার-পাঁচ দিন ক্রমাগত অশ্রুপাত করিয়াছিলাম। আমি তখনই বুঝিয়াছিলাম এই লেখকের স্থান বঙ্কিমবাবু ও রবিবাবুর পার্শ্বে এবং এই কথা বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করি নাই।'

দীনেশচন্দ্র সেন সেই সময় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'শরৎ প্রতিভা' এই নামে শরৎচন্দ্রের কয়েকটি গল্পের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছিলেন।

বিপিনচন্দ্র পালও সাহিত্য-বিচারে সূক্ষ্ম মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি একটি প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে লিখেছিলেন—

'শরৎচন্দ্রের আমি যতটুকু পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে মনে হয় তিনি বাংলার বর্তমান সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর। তাঁহার 'পল্লীসমাজে' ইহার প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হই। তাঁকে চিত্রকর বলিতেছি, ফটোগ্রাফার নহে।'

এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে 'শ্রীকান্ত' থেকে 'পথের দাবী' পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন 'বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন যুগ-স্রষ্টা, শরৎচন্দ্র হইয়াছেন যুগ-প্রকাশক।'

প্রমথ চৌধুরী মহাশয় লিখেছিলেন—'আমি কি ইংরাজী, কি বাংলা কোন বই পড়ে সহসা চমকে উঠিনে। থেকে থেকে চমকে ওঠা আমার ধাতে নেই। কিন্তু কোনও বই যদি আমাকে চমক লাগায়—তাহলে তার যে অপূর্ব বিশেষত্ব আছে অন্ততঃ আমার কাছে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

আমি বহুকাল পূর্বে 'কুন্তলীন পুরস্কারে' এই ছোটগল্প পড়ে বিস্মিত হয়েছিলুম। সে গল্পটির নাম বোধ হয় 'মন্দির'। গল্পের নীচে লেখকের নাম ছিল না। পরে খোঁজ করে জানতে পারলুম যে, এই নতুন লেখকের নাম শরৎচন্দ্র। যে শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে আমরা সকলেই শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করতে প্রস্তুত।'

এরপর প্রমথ চৌধুরী শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত এবং চরিত্রহীনের কিরণময়ী চরিত্রের আলোচনা করেন।

যে তিনজনের উদ্ধৃতি দান করা হল এঁরা সকলেই শরৎচন্দ্রের সমকালীন। সমকালীনের মূল্যায়ন সর্বকালেই নির্মোহ হয়, তাই মনে করা যেতে পারে যে শরৎচন্দ্র ইদানীং এক শ্রেণীর হঠাৎ-সমালোচকের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করছেন তিনি তাঁর সমকালের সর্বজনবরেণ্য সাহিত্যকার ও সাহিত্য-সমালোচকদের প্রশস্তি লাভ করেছেন।

মোহিতলাল মজুমদারের 'শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত' বাংলা সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুর কিছু কাল পূর্বেও শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এক চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন।

তাই আজ শরৎচন্দ্রের তাঁর এক জন্মদিনে মনে হয় শরৎবন্দনার সাথে শরৎ বেদনা জড়িয়ে আছে। তিনি নিন্দা ও প্রশংসা উভয় বস্তুর অংশভাগী। তাঁর জীবনে লাঞ্ছনা ঘটেছে বারবার কিন্তু তবু তাঁর মানসিক প্রশান্তি ক্ষুণ্ণ হয় নি।

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য অবিচ্ছেদ্য —এই জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। বলিষ্ঠ আদর্শবাদ ও অননুকরণীয় চরিত্র চিত্রণে শরৎচন্দ্র অদ্বিতীয়। ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, গহর, জীবানন্দ, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, পার্বতী, কিরণময়ী, দেবদাস, বিজয়া প্রভৃতি চরিত্রাবলী কল্পিত কাহিনীর ঘটনাবলীর পারম্পর্য রক্ষার জন্যই সৃষ্ট হয়নি—এমন জীবন্ত ও নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ইদানীংকালে আর কোনো ভারতীয় লেখকের রচনায় প্রকাশিত হয়নি।

স্বপ্ন নয়, ভাববিলাস নয়, কুৎসিত ঘটনা সংস্থাপন নয়, সহানুভূতি ও সমবেদনার মাধুর্যে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকর্ম অভিষিঞ্চিত।

শরৎ-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্টে নিম্নলিখিত মন্তব্য করা হয়—

> "When all is said, it is rather by intellectual effort than by political agitation that Indians will win for themselves [illegible] place they claim in the great society of nations."

অনেক দিন আগের কথা হলেও, শরৎচন্দ্রের আরেক জন্মদিনে এই কথাগুলি আমাদের ভাবায়।

শরৎবন্দনা বাঙালীর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। নিপীড়িত শোষিত মানুষের অভিনন্দন শরৎচন্দ্রের মত মানুষের সর্বকালের প্রাপ্য।

—অভয়ঙ্কর

নতুন বই

সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ । সত্যেন্দ্রনাথ রায়। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। বারো টাকা।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ভাবনার কথায় 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নিখিলের কথা তুলে বলা যায়—'তাঁর সব তর্ক গান হয়ে ওঠে।' বাস্তবিকই রবীন্দ্রনাথ যেহেতু মৌল অর্থে কবি, তাই তাঁর কবিতা ছাড়া সাহিত্যের আর সমস্ত শাখায়—যেখানেই তিনি পদচারণা করেছেন, যুক্তি-তর্কে মুখর হয়েছেন, অথবা বুদ্ধির উপর ভর করে কোন কিছুর সাম্য বিচারণায় মনোনিবেশ করেছেন, সেখানেও তাঁর সৃজনধর্মী মনীষ্ক্রিয়া ও নিয়ত প্রবহমান ভাষা কবির সূক্ষ্ম অনুভূতির তারে গানের মত বড় আপন, অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। এ হল রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, এক কথায় রাবীন্দ্রিক। রবীন্দ্রনাথের গান যেমন কারোর নয়, রবীন্দ্রনাথের যুক্তি-তর্ক-তত্ত্ব জিজ্ঞাসাও আর কারোর নয়। একদা নেপোলিয়ন গোটেকে বলেছিলেন, 'হিয়ার ইজ এ কমপ্লিট ম্যান', রবীন্দ্রনাথও তা-ই, আর সেই কারণেই এক পূর্ণ ব্যক্তিত্বের দীপ্তিময় অস্তিত্ব তাঁর সাহিত্য ভাবনাতে ওতপ্রোত। এ কথা প্রমাণিত হয়েছে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় রচিত 'সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে, তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে আদৌ ততটা নয়। শ্রীযুক্ত রায় সেই বুদ্ধিজীবী মানুষের অভাব-জনিত পিপাসাকে আশ্চর্যভাবে চরিতার্থ করতে পেরেছেন আলোচ্য গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই রোমান্টিক রসবাদী সমালোচক। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটস যে অর্থে রসবাদী বলে স্বীকৃত, রবীন্দ্রনাথও তা-ই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে সেই গোষ্ঠীর সমালোচকদের সীমাকে আপন স্বাতন্ত্র্যে অতিক্রম করেছেন, শ্রীযুক্ত রায়ের গ্রন্থে তার নিপুণ বিশ্লেষণ আছে। সমালোচক রবীন্দ্রনাথের অখণ্ড এবং সামগ্রিক পরিচয়কেই আসল পরিচয় বলে মেনেছেন 'নিবেদন' অংশে, কিন্তু তিনি কবির সাহিত্যচিন্তার তত্ত্বগত পরিচয়কেই প্রধান করেছেন। গ্রন্থের 'রবীন্দ্র দর্শন ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য তত্ত্ব', 'কল্পনাতত্ত্ব' 'লীলাবাদ', 'সৌন্দর্য সামঞ্জস্য আনন্দ' ও 'প্রকাশতত্ত্ব' পরিচ্ছেদগুলি লেখকের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তি ও বিচার ক্ষমতার পরিচায়ক। লেখকের সহজ, সরল অথচ বুদ্ধিদীপ্ত গদ্যভঙ্গি গ্রন্থপাঠে আত্মীয়তার সহায়ক হয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষ চৌধুরী সম্পাদিত। প্রকাশক—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশতবার্ষিকী সমিতি। ৭৯।২২, পদ্ম এভিনিউ, কলিকাতা-১৯।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতা সত্যেন্দ্রনাথ ও মাতা জ্ঞানদানন্দিনী। সুরেন্দ্রনাথ একমাত্র পুত্র এবং সুরেন্দ্রনাথের একমাত্র ভগ্নীর নাম ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, প্রমথ চৌধুরীর স্ত্রী। সুরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের একান্ত প্রিয় ভাইপো। এই উজ্জ্বল বংশ পরিচয়ে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল আজ থেকে ঠিক একশ' বছর আগে, ১২৭৯-এর বারোই শ্রাবণে, পুণা শহরে। এঁর একশ' বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসুভাষ চৌধুরীর যুগ্ম সম্পাদনায় আলোচ্য মূল্যবান জীবনী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। ঠাকুর পরিবারে সুরেন্দ্রনাথ অন্যতম জ্যোতিষ্ক ছিলেন। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা করেছেন 'সাধনা'র পাতায়। অসাধারণ সুরজ্ঞান ছিল গানের ক্ষেত্রে খুব ভাল এস্রাজ বাজাতে পারতেন। স্বদেশ প্রেমে দীপ্ত ছিল তাঁর হৃদয়। তাই সে সময়ে চিত্তরঞ্জন দাশ, সখারাম গণেশ দেউস্কর, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বড় বড় বিপ্লবী ব্যক্তিত্বের বন্ধুত্ব পেয়েছিলেন তিনি। জাপানী শিল্পী ও বিপ্লবী কাকুজো ওকাকুরার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেও ছিলেন দীর্ঘকাল। এইরকম নানা বিবিধ বিচিত্র কর্মতৎপরতা ও গভীর মনস্বিতার স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত স্বাক্ষর রেখে গেছেন সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আটষট্টি বছরের জীবনে। সেই বিচিত্র রঙীন জীবনের তথ্যনিষ্ঠ কথা হল আলোচ্য গ্রন্থ। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, সংজ্ঞাদেবী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথের বেশ কিছু লেখার সমবায়ে এই সংকলন গ্রন্থ। সম্পাদকদের পরিশ্রম নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতা রীতিমত প্রশংসনীয়।

যৌবন অগ্নি আত্মা (কাব্যগ্রন্থ)—পরিতোষ বসু। কল্লোল পাবলিশিং, ৫৪ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম : দু' টাকা বাইশ পয়সা।

কবিতার দিক থেকে খুব একটা পরিণতি নেই। তবে, বেকারীর যন্ত্রণা, প্রাত্যহিকের দুঃখকষ্টে কবি বিচলিত তা বোঝা যায়। কখনো বা নিজেকে বিদ্রূপ করে, কখনো বা সমাজকে আক্রমণ করে, তিনি তাঁর দুঃখের বোঝা হালকা করেছেন একাধিক কবিতায়।

তবু, কবিকে আমরা অভিনন্দন জানাই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য। সমাজসচেতন মানুষের মতই তিনি সমকালীন জীবনের

টানাপোড়েনে শিক্ষিত ও প্রাণিত হয়ে চলেছেন ক্রমাগত। তাই কাব্যগ্রন্থটি অনেকেরই ভালো লাগবে।

স্বগত উচ্চারণ (কাব্যগ্রন্থ)—জ্যোতির্ময় দাশ। সিন্ধুসোরস প্রকাশন, ৫০ কাঁটাপুকুর থার্ড বাই লেন, হাওড়া-১। তিন টাকা।

কয়েকটি কবিতা বেশ ভালো। তবে, প্রভাবমুক্ত কবিতা লেখার সময় বোধহয় কবির জীবনে এখনো আসেনি। এখন তাঁর প্রার্থনার সময়, অন্বেষণের কাল।

কয়েকটি কবিতা পড়লে মনে হয়, নিহিত অন্ধকার থেকে আলোকে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা কবির অন্তঃসত্তায় জিজ্ঞাসার সূত্রপাত ঘটিয়েছে। সময়ের নিবিড় সান্নিধ্য থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন একেকটি চমৎকার ইমেজ। আমাদের বিশ্বাস, এই কাব্যগ্রন্থে, জ্যোতির্ময় দাশ ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে সঞ্চারিত করার সাফল্যে তরুণতম কবিদের কাছে জনপ্রিয় হবেন।

চিত্রে ১৯৭১ সালের যুদ্ধ। প্রকাশন বিভাগ। তথ্য ও বেতার মন্ত্রক। ভারত সরকার। পনের টাকা।

ভারতীয় উপমহাদেশে ১৯৭১ সালের ভারত পাকিস্থান যুদ্ধ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। মার্চে বাঙলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে পদদলিত করে বিরাট এক সামরিক বাহিনী বর্বর অত্যাচার ও নির্যাতন চালায়। ৩০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয় এবং দুই লক্ষ নারী ধর্ষিত হয় ও এক কোটি মানুষ দেশ ছেড়ে পালায়। পাকিস্থানের যুদ্ধবাজরা সুপরিকল্পিতভাবে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। ভারতের ওপর পাকিস্থানের এটি হোল চতুর্থ আক্রমণ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অতুলনীয় সামরিক নৈপুণ্যে পাকিস্থানের সামরিক শক্তির দম্ভ ভেঙে পড়ে।

বর্তমান গ্রন্থখানি হোল বাঙলাদেশে পাক নির্যাতন এবং ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধের চিত্রাবলীর সংকলন। ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তরের ফটো ডিভিশন এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের জনসংযোগ বিভাগের আলোকচিত্রশিল্পীরা দুঃসাহসে ভর করে এইসব ছবি গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের সামরিক বাহিনীর রণনৈপুণ্যের জীবন্ত কাহিনী তুলে ধরেছেন আলোকচিত্রশিল্পীরা অসামান্য দক্ষতায়। ছবির পর ছবি সাজিয়ে ইতিহাসকে যে জীবন্ত করে তোলা যায় অসামান্য নৈপুণ্যে তার পরিচয় 'চিত্রে ১৯৭১ সালের যুদ্ধ'।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

লোক ঐতিহ্য (ভাদ্র ১৩৭৯) সম্পাদক : আনোয়ারুল করীম। লোক সাহিত্য গবেষণা কেন্দ্র। ঈশ্বরদী রোড। কুষ্টিয়া। দাম দু টাকা।

লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা যে কোন দেশের সুস্থ মানসিকতার পরিচায়ক। বাঙলাদেশে লোকসাহিত্য গবেষণা চলছে দীর্ঘকাল যাবৎ। বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি কুষ্টিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লোকসাহিত্য গবেষণা কেন্দ্র। এই সংস্থার মুখপত্ররূপেই 'লোক ঐতিহ্যে'র আত্মপ্রকাশ। সম্পাদকের নিবেদনে বলা হয়েছে লোকঐতিহ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির পুনরুদ্ধার ও পুনর্মূল্যায়ন। অবহেলিত গ্রামীণসভ্যতা ও কৃষ্টি যা বলতে গেলে, গোটা বাঙালী সমাজেরই কৃষ্টি, তার সকল ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।' প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত আলোচনায় সম্পাদকের বক্তব্যের স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। মযহারুল ইসলাম, আবদুল হাফিজ, আনোয়ারুল করিম, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, রোকেয়া সুলতানা, আবুল আহসান চৌধুরী, খোন্দেকার রিয়াজুল হক-এর আলোচনায় নতুন তথ্য আছে।

লোকসংস্কৃতির তরুণ গবেষক দুলাল চৌধুরী ফোকলোর শব্দটির পরিভাষা বিষয়ক আলোচনাকে যথেষ্ট যুক্তি ও তথ্যের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্যের আলোচনাটি তাঁর খ্যাতির স্বাক্ষরবহ হয় নি। 'লোক-ঐতিহ্যে' লোকশিল্পকলা সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা প্রকাশ করা উচিত। পত্রিকাটির সমৃদ্ধি কামনা করি।

অর্শান (সংকলন)—চনমন গোষ্ঠী। মিলপাড়া। কুষ্টিয়া। বাংলাদেশ। পঁচিশ পয়সা।

একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম পেরিয়ে স্বাধীন বাংলার জন্ম। বাংলাদেশে আভ্যন্তরীণ সংকট মন্দীভূত হোয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চিন্তারও বিকাশ ঘটছে। কুষ্টিয়ায় নবগঠিত চনমন গোষ্ঠীর মুখপত্র 'অর্শান' তারই ইঙ্গিতবহ। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লিখেছেন আনোয়ারুল করিম, ধ্রুব গুপ্ত, সাবিহা চৌধুরী, আতাউর রহমান বাদল, আমিরুল-উল ইসলাম মধু, পারিজাত মজুমদার, মানিক, ক্ষণিকা, পান্নালাল আগরওয়ালা, সালেহা খাতুন, আবুল আহসান চৌধুরী, মতিয়ার রহমান, সুকুমার পাল, কাজী রশীদুল হক পাশা, শওকত আলী, মোহাম্মদ সামসুল আলম, শুকদেব সাহা, অনু ইসলাম, মোহাম্মদ মনির-উজ-জামান এবং নুরুল ইসলাম চৌধুরী।

বিশ শতক (১ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা)—সম্পাদক : শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়। ৩৪ ডায়মন্ড হারবার রোড। বেহালা। কলকাতা-৬০। দাম ৬০ পয়সা।

অতি সাধারণ মানের সাহিত্যপত্রিকা। সম্পাদক আরও সুরুচি ও পরিচ্ছন্ন সম্পাদনায় পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা বাড়াতে পারেন।

সারস্বত (মাঘ-চৈত্র)—সম্পাদক অমিয়কুমার ভট্টাচার্য। ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা ৬। দেড় টাকা।

আন্তরিক নিষ্ঠা থাকলে নানা অসুবিধার মধ্যেও যে সত্যিকারের ভালো কাগজ বের করা যায়—সে কথাই বারবার মনে পড়ে সারস্বতের একেকটি সংখ্যা পড়ে। এ সংখ্যায় প্রকাশিত সুকোমল চৌধুরীর প্রবন্ধটি (বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম) রীতিমত চাঞ্চল্যকর। অনেক পরিশ্রম করে তিনি লিখেছেন এই প্রবন্ধটি। 'কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে' লিখেছেন পল্লব সেনগুপ্ত। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কবিতা লিখেছেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক, বিতোষ আচার্য ও তুলসী মুখোপাধ্যায়। লু সুনের একটি গল্প—'একজন উন্মাদের রোজনামচা'র অনুবাদ সংখ্যাটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এ সংখ্যার প্রচ্ছদ। যামিনী রায়ের ছবিটি বাঁধিয়ে রাখার মতো।

রূপম (আষাঢ়)—সম্পাদক : আনওয়ার আহমদ। বি-৯১। এফ-৭ মতিঝিল কলোনী। ঢাকা। দাম দেড়শত পয়সা।

বাংলাদেশের সিনেমা ও সাহিত্যপত্রিকা রূপমের নবপর্যায় আত্মপ্রকাশকে সুধীসমাজ অভিনন্দন জানাবেন। দুই বাংলার লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ সংখ্যাটি আকৃষ্ট করবে সবশ্রেণীর পাঠককে। সুসম্পাদিত এবং সুমুদ্রিত সংখ্যাটি সম্পাদনায় যথেষ্ট যোগ্যতার স্বাক্ষর রয়েছে। লিখেছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, রাধারাণী দেবী, আশা দেবী, বাণী রায়, উমা দেবী, আতাউর রহমান, সালাহউদ্দীন চৌধুরী, হাবিবুর রহমান, দিলওয়ার, আবু কায়সার, গোলাম সাবদার সিদ্দিকি, সাদিক আনওয়ার, কাজী সিরাজ, বেবী আনওয়ার, আনওয়ার আহমদ, শহীদ আশরফ, লীলা মজুমদার, রণেশ দাশগুপ্ত, সিরাজউদ্দীন আহমেদ, মাহফুজ সিদ্দিকি, অন্নদাশঙ্কর রায়, নির্মল সেন এবং আরো কয়েকজন।

প্রাপ্তি স্বীকার

কিশোর সাথী (মে-জুন '৭২)—সম্পাদক : তপনকুমার ভট্টাচার্য। গড়বেতা, মেদিনীপুর। পঁয়তাল্লিশ পয়সা।

অন্যদিন অন্যকথা (কবিতাগ্রন্থ)—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য। হিমাচল প্রকাশনী, বিবেকানন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি, ১·৫০ টাকা।

স্মরনিকা (বৈশাখ, '৭৯)—সম্পাদক : সমরেন্দ্র বিশ্বাস, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। কৃত্তিবাস সাহিত্য পরিষদ, ফুলিয়া, নদীয়া।

অনির্বাণ (রবীন্দ্র সংখ্যা '৭৯)—সম্পাদক : রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য। ৫৪।১।১২।১ এল রোড, বেলগাছিয়া, হাওড়া-৫। পঁচিশ পয়সা।

বুলবুল (মে '৭২)—সম্পাদক : এস এম সেরাজুল ইসলাম। ২ ওয়ালিউল্লা লেন, কলকাতা-১৬। পঁচাত্তর পয়সা।

কাকলি (নববর্ষ সংখ্যা, '৭৯)—সম্পাদক : পারুল দাশ। মলয়নগর, ডাকঘর—যোগেন্দ্রনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা। এক টাকা।

ঝড় (কবিতা সংকলন)—সম্পাদক : গোপাল চক্রবর্তী। ৪২।১ হাজরাপাড়া লেন, বালি, হাওড়া। কুড়ি পয়সা।

স্বর্ণচাঁপা বুকের ভিতর ॥

গণেশ সেন

স্বপ্নের মধ্যে একদিন পোঁছে যাব তোমার স্বর্ণচাঁপা
বুকের ভিতর—
সমস্তক্ষণ যেখানে বাজে নীল জাহাজের ঘণ্টি,
বিষণ্ন কড়ির শব্দ—পাখিদের ওড়াউড়ি।
ছায়াচ্ছন্ন আলোয় নীচু দড়ির সিঁড়ি বেয়ে মুমুক্ষু মানুষ
যাত্রা করে কামরাঙা দ্বীপে।
আমাদের হার্দ্য ভালবাসা সরাইখানার প্রতি ঘরে ঘরে
ফেলে যায় সময়ের ভুক্তাবশেষ—
ভাঙা হাঁড়ি—ছেঁড়া কাগজ—চূর্ণ মাংসের হাড়।
অজীর্ণ অন্ধকারে গভীর ঘুমের মধ্যে গর্জে ওঠে সমুদ্র।
রক্তে ফুঁসে ওঠে টাইফুন। শ্বাসে লাফিয়ে পড়ে সরীসৃপ।
আমাদের স্তিমিত শিরা-উপশিরাবাহী হাত ইচ্ছায় অনিচ্ছায়
মুঠিবন্ধ করে ক্ষিপ্ত অশ্বের কেশর।
প্রতি রোমকূপে বাতাসের হলুদ কামড়।
জিহ্বায় লম্বমান বাদামী তৃষ্ণা।
আমাদের অনস্তিত্বে প্রতি মুহূর্তেই ঘুরতে থাকে পুড়তে থাকে
নিদারুণ বদরাগী সূর্যটা।
একদিন কোনদিন নিজের কবরের মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে
আমাদের মৃত শীতল আঙুল খনিজ অন্ধকার থেকে
লুঠ করে আনবে সোনার চাবির আশ্চর্য উত্তরাধিকার।

বত্রিশ বছর আমি ॥ দিব্যেন্দু পালিত

বত্রিশ বছর আমি তোমার দরজায় এসে দেখেছি পাহারা—
স্পন্দনহীন খোলা ঘর, কপাটের ধুলো গেছে উড়ে
শেষদিনকার ঝড়ে; বাস্তুসাপের মতো দেয়ালের খাঁজে এঁকে বেঁকে
ক্রমশ নির্ভয় উই চ'লে গেছে অহংকার রেখে
যেখানে তোমার সংগে ছিল কথা, ছিল কিছু খেলা।

আমার ছুটির দিন হাওয়া বদলের ঝোঁকে তোমাকেও নিয়ে
যায় দূরে—
হাওয়া বদলের ঋতু প্রতিদিন বত্রিশ বছর
বিধবা মেয়ের স্বপ্নে মৃতের লিঙ্গের মতো করে আজও খেলা।
প্রতিটি ঘুমের পর বত্রিশ বছর ধ'রে কাচের গেলাসে
ওষ্ঠলগ্ন নেমে যায় কণ্ঠলগ্ন নেমে নেমে যায়
জঠরে পারদের মতো শুধু বিষ, শুধু স্মৃতিবিষ...

প্রিয়তম নেমিসিস ॥

দেবারতি মিত্র

গ্রীক নাটকের স্তব্ধ নেমিসিস সারাদিন
কাঁপাচ্ছে আমাকে
আচমকা মাঝরাত্রে
বুক ধড়ফড় করে ঘুম ভেঙে যায়
কেন যেন ব্যথিত চোখে ধুয়ে দিচ্ছে নিঝুম শরীর
কে যেন, কে যেন......
আজন্ম অজানা এক গান কিংবা উপহার

ভেঙেছে পাষাণ তার ধ্যান,
রক্ত শিরশির করে—
সূক্ষ্ম কালো ছায়া ফেলে আত্মার গম্বুজ
মেরুবাসী ভাল্লুকের নিভৃত পর্বাশা,
সে কি নির্জর সূর্যমন্দির?
চুম্বক পাহাড়,
তার কাছে গেলে জাহাজের স্ক্রু খুলে যায়
আলগা হালকা নিষ্ঠ নির্জন শরীর।

॥৩৬॥

কথাটা মনে এসেছে কমলার বিয়ের সময়ই। ভোলা মাত্র আগের দিনই এসেছে কিন্তু সে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকবার ছেলে নয়—আসামাত্রই অনায়াসে গোপাল আশীষদের দলে মিশে গেছে। বিয়ের দিন বেলা তিনটে নাগাদ মনে হল যে ভোলারই বোনের বিয়ে—সেই এ বিবাহের কন্যাকর্তা। সব জায়গায় সব কাজে অগ্রণী।

চেহারা হিসেবেও ওকেই মানায় কর্তা বলে। গোপালের রংটা মায়ের মতো ফরসা হলেও চেহারার আড়াটা দাঁড়িয়েছে এখন অনেকটা নিমাইয়ের মতো—অর্থাৎ কোন আসর বা মজলিসে পাত্তা পাওয়ার মতো নয়। আশীষকে তো আরও ছোট, আরও ছেলেমানুষ দেখায়। তাছাড়া তারা এখনও ভার নিয়ে অগ্রণী হয়ে কোন কাজ করেনি—তাদের এখানে এমন কোন আত্মীয়ও নেই যাদের বাড়িতে গিয়ে বিয়েথা কাজে-কর্মে খাটা-খাটনী করবে। সুতরাং এবিষয়ে দুজনেই অনভিজ্ঞ ও অপটু; বাকীরা তো নিতান্তই ছোট। যা করছে প্রতিবেশীদের উপদেশ ও নির্দেশে। তাতে গোলমালও হচ্ছে—কারণ একজন একটা পরামর্শ দিচ্ছেন পরক্ষণেই আর একজন সেটা উড়িয়ে অন্য রকম করতে বলছেন।

ভোলাকে দেখে কিন্তু মনে হল নেতৃত্বটা যেন তার সহজাত। সেও কখনও একাজ করেনি, বিশেষত তার এ সমাজ নয়—বাঙালীর বাড়ির—আরও ব্রাহ্মণদের ক্রিয়াকলাপ কিছুই জানে না—কিন্তু কিছুটা এদের কথাবার্তায়—কিছুটা হেমন্ত ও আশার কাছ থেকে শুনে অতি সহজে এবং অনায়াসে ব্যাপারটা বুঝে নিল। তারপর থেকে কিছুই বলতে হল না, দেখতেও না। শুধু পুজো অনুষ্ঠান, স্ত্রী আচার প্রভৃতি সম্বন্ধে যেগুলো তথ্যের ব্যাপার—সেগুলো মেয়েদের জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছিল।...

ওকে দেখাচ্ছিলও বড় চমৎকার। সাধারণ মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরা আর একটা গেঞ্জি—সন্ধ্যার সময় তার ওপর একটা সাধারণ পাঞ্জাবী চাপিয়েছিল—তাতেই যেন চোখ ফেরানো যাচ্ছিল না। সহস্র কাজ সহস্র কথাবার্তার মধ্যে হেমন্ত ওকেই চেয়ে চেয়ে দেখছিল এবং অবসরমতো চেয়েই থাকছিল! দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, প্রশস্ত বক্ষ—তাতে গেঞ্জিটা আঁট হয়ে বসা, আরও ঘামে ভিজে গিয়েই গায়ের সঙ্গে বসে গেছে—তাতে দেহের নিখুঁত রেখা স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে; উত্তেজনা ও ছুটোছুটিতে ওর উজ্জ্বল শ্যাম মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠেছে—তার মধ্যে সব সময় সব অবস্থাতেই মুখে অভ্যস্ত হাসিটি; মধ্যে কাশীর রেওয়াজ মতো পান জর্দা খাওয়া ধরেছিল, হেমন্তর কাছে বকুনি খেয়ে ছেড়ে দিয়েছে, সুতরাং এখনও নিষ্কলঙ্কই আছে হাসি, কালো ছোপপড়া দাঁতে অপ্রীতিকর হয়ে ওঠেনি; রং ফরসা বা মুখ-চোখ কাটাকাটা না হওয়া সত্ত্বেও তাকেই সবচেয়ে সুন্দর লাগছিল, কেবলই মনে হচ্ছিল হেমন্তর—ভোলা যদি তার সতীকান্তের ছেলে বা নাতি হত তাহলে এতদিনের সব ক্ষোভ সব দুঃখ শোধ হয়ে সুখের পাত্র উপচে পড়ত জীবনে।

আবার পরক্ষণেই মনে হয়েছে, তা যে হয়নি সেই ভাল, আপনার নাতি হলে ঐ বিশুর মতো বাঁদর—বাঁদরও না তাদের তবু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে কিছু—আস্ত শুয়োর একটা তৈরী হত। সম্পর্কে আপন নয় বলেই যথার্থ আপন হয়ে উঠতে পেরেছে।...বেঁচে থাক, সুখী হোক—রক্তের সম্পর্কে আর দরকার নেই।

ওর দিকে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকতে থাকতেই মনে হয়েছে কথাটা। বিশেষ শুভদৃষ্টি স্ত্রীআচারের সময়, বরের পিছনে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি—হাসাহাসি করছে যখন—মনে হয়েছে এই ভোলার সঙ্গেই কমলার বিয়ে দিলে হত, ভারী চমৎকার মানাত। এ পাত্রের চেয়ে অনেক ভাল পাত্র হত ভোলা, শুধু চেহারায় নয়—মানুষ হিসেবেও হেমন্ত জোর করলে আশা বোধহয় অমত করত না।

তখন অবশ্য এসব ভেবে লাভ ছিল না। তাছাড়াও পরে মনে হয়েছে, সে কথা যে মাথায় যায়নি বা সে চেষ্টা করেনি, এটা ভগবানেরই অনুগ্রহ। ওর ওপর, ভোলার ওপরও। ঐ ঝাড়েরই মেয়ে তো কমলা, বাপের বংশের বদবুদ্ধি ও মায়ের বদমেজাজ যদি পেয়ে থাকে তো যেখানে যাবে তাদের জীবন সংসার নষ্ট করে দেবে। বাপরে ভোলার অমন দুর্গতি ভাবলেও যেন গা শিউরে ওঠে!

কিন্তু কথাটা মাথাতে ছিল সেই থেকেই।

কাশীতে ফেরার পর—এতদিনের পরিশ্রম, পথকষ্ট ও মানসিক উত্তেজনা আবেগের ধকলে কদিন খুব শরীর খারাপ হয়ে পড়েছিল, চুপ করে শুয়ে থাকা ছাড়া কিছু করতে পারেনি। মুনিয়া আর ভোলা স্নান প্রভৃতি প্রাত্যহিক কাজগুলো করিয়ে নিয়েছে, মুখ ধুইয়ে দিয়েছে—বাড়িওলারা নারায়ণের অন্নপ্রসাদ দিয়ে গেছেন। তিন দিনের দিনই অবশ্য মুনিয়া একটা রান্নার লোক এনে দিয়েছে, নইলে কতদিন ওঁদের সাহায্য নিতে হত তার ঠিক নেই। জ্বরজারি কিছু নয়, পেটের গোলমাল তো নয়ই—শুধুই ক্লান্তি আর অবসাদ। গত তিন-চার মাসে দেহের থেকে মনের ওপর দিয়ে ঝড় অনেক বেশী বয়ে গেছে, এ তারই প্রতিক্রিয়া।

দিন সাতেক পরে সব জড়তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উঠে বসে আবার। সন্ধ্যার পর কাছে বসিয়ে বলে, 'ভোলা তুই বিয়ে কর, ভাল মেয়ে দেখি একটা। তোদের হিন্দুস্থানী মেয়ে যদি চাস তো তাই চেষ্টা করি। তবে ও বাড়িতে কি এখানে থাকা চলবে না। আলাদা বাসা করে থাকবি বৌকে নিয়ে, মুনিয়া তো এখানেই থাকে বেশির ভাগ—তোর দাদা তো থাকেই না—ও বাসা তুলে দে।'

ভোলা চমকে ওঠে যেন, 'বিয়ে! না না, তোমাকে কে দেখবে তাহলে? ওসব হাঙ্গামা বাধিও না বলে দিচ্ছি। বিয়েতে আমার দরকার নেই। কে আসবে কেমন মেয়ে—তোমাকে কি চোখে দেখবে—না, সে হবে না। তোমাকে পর করতে পারব না!'

দু চোখে জলের বন্যা নামে হেমন্তর। বহুদিনের শুষ্ক চোখের কোল বেয়ে বাধা-বন্ধহারা জলের স্রোত ঝরতে থাকে।

আনন্দের অশ্রু এই বোধহয় জীবনে প্রথম।

আছে, এখনও কিছু পাওনা তাহলে আছে।

বোধহয় ভগবান এইটুকুর জন্যই এই একশ বছর বাঁচিয়ে রেখেছেন; অথবা একশ বছর ধরে পরীক্ষা করে জ্বালিয়ে গালিয়ে পাপের খাদ শূন্য করে নিলেন এই পুরস্কারের জন্যে।

মনে হল এতকাল পরে তারকই কথা কয়ে উঠল এই হীনজন্ম ছেলেটার মুখ দিয়ে। ঝিয়ের ছেলে, তায় সম্ভবত জারজ।

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকে কেঁপে ওঠে, একটা হিম আশঙ্কা বোধ করে।

তারক যাকে এমনি ভালবাসত, সে বাঁচেনি। ওর যা কপাল যদি এও যায়? ভগবান তার আগে ওকে কেন নিচ্ছেন না, আরও কি কাজ বাকী আছে তাঁর, আরও কত শাস্তি কত আঘাত দিতে চান? আরও কত পোড়ানো দরকার মনে করেন?

অন্ধকারে বারান্দায় বসে কথা হচ্ছিল। গঙ্গার ওপরের বারান্দা। নিচে ঘাটের দু-একটা আলো আর রাস্তায় কটা আলোর যা সামান্য আভা এসে পড়েছে—তাতে চোখের জলটা দেখতে পাবার কথা নয়, দেখতে পায়ওনি বোধহয় ভোলা, তবে হয়ত ঐ ধরনের কিছু অনুমান করে থাকবে—তাই সে চুপ করেই রইল।

অনেকক্ষণ বসে রইল এমনিই তরঙ্গাঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া আলোর টুকরোগুলোর দিকে চেয়ে। দূরে কোথায় কোন দেবালয়ে আরতির শব্দ হচ্ছে, নিচে পথের ওপাশে কে একটি হিন্দুস্থানী মেয়ে কর্কশ কণ্ঠে ঝগড়া করছে সম্ভবত তার মেয়ের সঙ্গেই—খিস্তি করে বাপ-মা তুলে গাল দিচ্ছে তাকে, মিষ্টির দোকানে ভোলানাথবাবু নেতাজী যে বেঁচে আছেন তাই প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন—সবটা জড়িয়ে এটা যেন তাদের চিন্তার একটা পৃষ্ঠপট রচনা করেছে. এই মিলিত কোলাহল ও গঙ্গার বুকে ভেসে যাওয়া আলোর প্রতিবিম্বগুলো। এ দৃশ্য বা শব্দ কোনটাই তাদের ইন্দ্রিয় গোচর হচ্ছে না, দুজনেই নিজেদের মনের গহনে ডুব দিয়েছে।

অবশেষে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে গাঢ় কণ্ঠে হেমন্ত বলে, 'তাই বলে তুই বিয়ে করবি না। নাই বা সে দেখল আমাকে!...আমার এতকাল কাটল কি তোর ভরসায়? তাছাড়া সেইজন্যেই তো দূরে সরিয়ে দিতে চাইছি, আমার কপালে সেবা-যত্ন সয় না রে! তোর কোন কিছু—কোন, মানে বিপদ-আপদ ঘটবার আগে তুই সরে যা, সেই ভাল!'

অকস্মাৎ দুহাতে জড়িয়ে ধরে ভোলা ওকে, কচি মেয়ের মতো কোলে টেনে নিয়ে বলে, 'আমার কিছু হবে না। আর তুমি বা কদিন? সত্যিই তো অমর নও! যে কটা দিন আছ, আমি থাকি না তোমার কাছে! তুমি গেলে আমি ঠিক বিয়ে করব—তোমাকে জবান দিচ্ছি!'

'কিন্তু সে বিয়ে সে বৌ তো তাহলে আমি দেখতে পাবো না!'

'নাই বা দেখতে পেলে। কত বিয়ে কত বৌ তো দেখলে আজ তক। তাতে কি চারটে হাত বেরোল তোমার?'

আর কথা বাড়ায় না হেমন্ত। ছোট মেয়ের মতো এই বলিষ্ঠ পুরুষ দেহের আদর উপভোগ করে। আবারও আনন্দে চোখ সজল হয়ে আসে তার।

কিন্তু কৈ, আরও একটা বছর কেটে যায়, সে বহু প্রতীক্ষিত মৃত্যুর তো দেখা মেলে না।

শুধু শরীরটাই ক্রমশ আরও অথর্ব, একেবারে অচল হয়ে আসে, ক্রমশ যেন তাল-গোল পাকিয়ে যায়। এখন আর মুনিয়া ধরে না নিয়ে গেলে কলঘরে যেতেই পাবে না। রান্নার শখ এত, খুন্তি ধরতে গেলে হাত থেকে খসে পড়ে, সাঁড়াশি আর কড়া নামানোর তো প্রশ্নই ওঠে না।

এবার এই প্রথম যেন ভয় পেয়ে যায়। তাহলে কি এই ভাবেই শয্যাগত হয়ে পড়ে থাকবে নাকি— দু-চার বছর? কে দেখবে তাকে এখানে? দেখার লোক আছে অবশ্য, ভোলাই তো আছে। মুনিয়া গুছিয়ে সেবা করতে পারে না, তার দিকে অতটা আন্তরিক টান থাকারও কারণ নেই। পুরনো ঝি এই মাত্র। তবে ভোলা একাই একশ'। কিন্তু ঠিক এইটেই চায় না সে, ভোলাকে জড়াতে চায় না এমনভাবে, তার জীবনটা বিড়ম্বিত করতে চায় না। কতকাল আরও বাঁচবে তার ঠিক কি, ভগবান তার কপালে মৃত্যু লিখতেই বোধহয় ভুলে গেছেন,—এইভাবে তাকে নিয়ে পড়ে থাকবে ছেলেটা, ওর কাজ-কর্ম, উন্নতি গার্হস্থ্য জীবন—সব থেকে বঞ্চিত করবে? তাছাড়াও তার জীবনের অভিশাপ তো আছেই কেবলই ভয় হয়, তাকে যে ভালবাসবে, তাকে যে দেখবে সে আর বাঁচবে না।...

না, আর নয়, এখান থেকে পালাতে হবে।

কাশীতে মৃত্যু, মণিকর্ণিকা-প্রাপ্তি তার কপালে লেখেননি ভগবান। অবশ্য ভগবান কিছুই ভাল লেখেননি তার কপালে, কোন সাধই তার পূর্ণ হবে না—তা সে জানে। এখন আর তার সে ঝোঁকও নেই। এ একটা কথার কথা মাত্র তার কাছে, বহুদিনের সংস্কার এই পর্যন্ত। মণিকর্ণিকায় দেহটা ভস্ম হলেই চতুর্ভুজ হয়ে শিবলোকে চলে যাবে—এমন ধারণা তার এখনও গড়ে ওঠেনি মনে। অথবা একটু একটু করে—বার বার ঘা খেয়ে খেয়ে—এই ধরনের ভক্তি বিশ্বাস—যেটুকু বা ছিল, কমেই যাচ্ছে, কমে গেছে।

সুতরাং এবার কোথাও মরতে যাওয়া দরকার। সেই সঙ্গে দরকার টাকাগুলোর সদ্গতি করা—আর তার আগে ভোলার স্নেহের ঋণ শোধ করে যাওয়া। অনেকদিন আগে একটা উইলের মতো লিখে রেখে ছিল এ্যাটর্ণীর কাছে—কিন্তু সে ইচ্ছা এখন আর নেই। নতুন ব্যবস্থা করতে হবে। সোজা হচ্ছে ভোলাকে দিয়ে যাওয়া, লোভও হবে—তবে তা দেবার সাহস নেই। হয়ত মনের ভুল, তবু যে ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে গেছে তাকে যুক্তি তর্ক দিয়ে নির্মূল করা যায় না। কেবলই মনে হয় এই টাকার জন্যে বহুলোকের নিঃশ্বাস পড়েছে, বহুলোকের লুব্ধ প্রত্যাশা ছিল, এ টাকায় অভিশাপ আছে। ভোলার জীবন হয়ত নষ্ট হয়ে যাবে। তার চেয়ে সে নিজে চেষ্টা করে গড় হচ্ছে সেই ভাল।

কাকে দেবে আর কোথায় যাবে?

দীর্ঘকাল ধরেই ভাবছে কথা দুটো। এক আশার কাছে যেতে পারে, সে মাথায় করে রাখবে। কিন্তু তারও যা শরীর সেখানে গিয়ে পড়া মানে তার ওপর অত্যাচার করা। তাছাড়া, তার ছেলেমেয়েরা কী চোখে দেখবে কে জানে!

সুরেন? সে এ টাকা নেবে না। দাদার কোন ছেলেমেয়েই নেবে না। তাদের ঠাকুর্দার নিষেধ। বড় ভাইপোও মারা গেছে। তার স্ত্রীকে কখনও দেখেনি পর্যন্ত। পাকিস্তান হওয়ার পর সুরেন দেশে গিয়ে বসেছে, তার ভাইপো-ভাইঝি—ছোট ভাই এদের সংসার। সুরেন বিয়ে করেনি কেন করল না শেষ পর্যন্তও—সেটা হেমন্ত কতকটা আঁচ করতে পারে—বোধহয় সেই জন্যেই তার শরীরও ভেঙ্গেছে। শেষ যেবার কাশী এসেছিল, সেবারই দেখেছে হাঁপানির মতো। দীর্ঘকাল কষ্ট করে করে শরীরের যন্ত্রগুলো এমনিতেই বিকল হয়ে এসেছে, তার ওপর মনে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা চেপে রাখার ফলেই সম্ভবত—একেবারেই যেন বুড়ো হয়ে গেছে। চিকিৎসার নাম করে কিছু দিতে চেয়েছিল হেমন্ত—সুরেন তাও নেয়নি; হাসিমুখে এড়িয়ে গিয়েছিল বলেছিল, 'সবই তো আপনার দৌলতে পিসীমা, এত বড় চাকরি কি আমার পাবার কথা? যা দু-চার টাকা জমেছে, সেও তো একরকম আপনারই দেওয়া!...ওঁরা এখানে কল খুলেও আমাকে ডেকেছিলেন, দু বছর

কাজও করেছি, সেও অনেক দিয়েছেন। আর কেন—মিছিমিছি?'

অর্থাৎ মিছিমিছি বাপের হুকুমটা অমান্য করি কেন?

তাকে আর বলে অনুরোধ করে কোন লাভ নেই। তাহলে বাকী থাকে নিভা।

নিভাদেরও বিপর্যয় বড় কম হয়নি। ওদের সম্পত্তি বলতে জমি-জমাই বেশী ছিল, গুরুপুরুতের বংশ, বাসনকোসনও তিন-চার সিন্দুক, নগদ টাকার জোর খুব একটা কোন কালেই ছিল না। আর মন্দ ছিল না হয়ত কিন্তু ওর শ্বশুর গুরুদাস-বাবুর হাত ছিল দরাজ—সবই খরচ করে গেছেন, পয়সা জমাবার কথা কোনদিন ভাবেননি। জমেওনি। তাই, পাকিস্তান হবার পরও অতুল বা নিভার শাশুড়ি এখানে আসতে রাজী হননি প্রথমটায়। ওখানেই টিকে ছিল কোনমতে। কে ওদের বুঝিয়েও ছিল যে ওদিকটা ভারতেই এসে যাবে, পাকিস্তান যেতে পারে না।

আগে এলে সব না হোক, অনেক আনতে পারত। সম্পত্তি বদল করলেও ভাল সম্পত্তি পেত। কেউ কেউ পাঁচ-সাতখানা বাড়ি পেয়ে গেছে ওখানের জমির বদলে। ওরা যখন মন স্থির করল, যখন আর কোন-মতেই থাকা সম্ভব হল না, তখন একরকম সব ফেলেই চলে আসতে হল। ভাগ্যে ছিল তাই—গুরুদাসবাবুর অনেক দানপুণ্যে ছিল—একেবারে শেষ মুহূর্তে এইটুকু সম্পত্তি বদলে পাওয়া গেল। যা ফেলে আসতে হল তার তুলনায় কিছুই নয়—তবু একটা পাকা বাড়ি, বিঘে তিনেকের বাগান, বিঘে দুই জলকর, আর দশ এগারো বিঘের মতো ধান জমি। এও ভাগ্য বলতে হবে—এ ভদ্রলোক একটা পাকাপাকি দখল চাই-ছিলেন তাই, নইলে ওরা যখন এসেছে তখন আর ওখানে কেউ হিন্দুর বাড়ি দাম দিয়ে কিনছে না, জানে সবই তো মুফতে আসবে।

খুবই কষ্টে দিন যাচ্ছে ওদের। চিরদিন স্বচ্ছলতার মধ্যে কাটিয়ে এসে পাইপয়সার হিসেব করে সংসার চালানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। এখন তাই করতে হচ্ছে ওদের। অতুল একবার এসেছিল এখানে। বাপ-মার 'গয়া' করতে এসেছিল—সেই সময় কাশীতে এসে দেখা করে গিয়েছিল। এই ক বছরের মধ্যেই যেন খুব বুড়ো হয়ে গেছে বেচারী। তার মুখেই শুনল—গাছের নারকেল কি আম কাঁঠাল ছেলেমেয়েরা খেতে পায় না—জমা ধরিয়ে দিতে হয়েছে, নইলে নগদ টাকা হাতে আসে না। তবু অতুল এখানেও একটা মাষ্টারী জুটিয়ে নিয়েছে, তবে সেও ঐ স্থানীয় ইস্কুলে নিচের ক্লাসে পড়ানো—কটা টাকাই বা পায়।

বড় ছেলেটিকে সম্প্রতি কি একটা কার-খানায় ঢুকিয়েছে—অতুল বিনয় করে বলল, সেও একরকম হেমন্তরই দয়ায়। কারণ সুরেন তার মনিবকে দিয়ে আর একজনকে সুপারিশ ধরিয়ে এটা করে দিয়েছে। নইলে ওর মতো ছেলের, বিশেষ এত বয়সে এ চাকরি নাকি হবার কথা নয়। সুরেনের জন্যে যে এত করেন ভদ্রলোক—সে নাকি এই বর্তমান মালিকের বাবা হেমন্তর বন্ধু-স্থানীয় ছিলেন বলে, হেমন্তর ভাইপো বলেই সুরেনের এত খাতির।...

নিভার কাছেই যাবে নাকি শেষ পর্যন্ত?

নিভা তাকে ফেলবে না। অতুলও না।

অতুল তিন-চার দিন ছিল, ভাল করেই লক্ষ্য করেছে, মানুষটা যথার্থ ভদ্র এবং ভাল মানুষ। আর ওদের কাছে যেসব ছেলেমেয়ে মানুষ হয়েছে—তারাও ভদ্র হবে, এইটেই আশা করা যায়।

কিন্তু নিভা কি টাকা কড়ি নিতে রাজী হবে? ওর কোন বাধা নেই—চায় না—কিছু পাঠালে তার দুগুনো ফেরৎ পাঠায় কোন না কোন ছলে। সেইজন্যেই আজকাল আর কিছু দেয় না হেমন্ত।

ওকেই একটা চিঠি লিখে দেখবে নাকি?

যদি অন্তত খরচাটুকুও নেয়।

অনেক ভেবে অনেক চিন্তা করে শেষ অবধি নিভাকেই একটা চিঠি লেখে। এখন আর কলমও যেন ধরতে পারে না, হাত কাঁপে। তবু হাতের লেখা একেবারে যে দুষ্পাঠ্য হয়নি এই তো আশ্চর্য।

নিভার উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে এধারে কাজে লেগে যায়। ভোলাকে গৃহী করে না গেলে তার কর্তব্যে প্রত্যবায় ঘটবে।

সব বেচে দিয়ে এখনও ওর কাশীতে দুখানা বাড়ি আছে। একটা খুব ছোট বাড়ি—পাতালেশ্বরে, আর একটা একটু বড় লক্ষ্মীকুন্ডর কাছে, মিষ্টির পোখরায়। এই বাড়িটায় ওপর নিচে দু-তিন ঘর ভাড়াটে ছিল—সম্প্রতি তেতলা খালি হয়েছে, ভোলাই মেরামত করিয়ে চুনকাম ফিরিয়ে দিয়েছে ভাড়াটেও হাঁটাহাঁটি করছে কিন্তু হেমন্ত ভাড়া বসাতে বারণ করেছে এখন।

কারণ ভোলাকে কিছু বলেনি। আসলে এই বাড়ি খালি হওয়ার প্রসঙ্গেই কথাটা মনে পড়েছে তার, এটাকে ভগবানের নির্দেশ বলেই মনে হয়েছে।

পাতালেশ্বরের বাড়ির দোতলায় এক ভদ্রলোক থাকেন অনেকদিন ধরেই দেখছে ওকে, আগে সিমন চৌহাট্টায় ওর যে বাড়ি ছিল সেখানেই ইনি প্রথম ভাড়া আসেন—ইস্কুল মাষ্টারী করতেন, রিটায়ার করেছেন, এখন দুটো-তিনটে টিউশনী করে সংসার চালান। দুটি ছেলেমেয়ে ছিল ভদ্রলোকের, ছেলেটি বি-এ পাস করে একটা চাকরিও পেয়েছিল, সেই সময় স্নায়ু শুকিয়ে আসা রোগ ধরে। ভদ্রলোক সাধ্যের অতীত চিকিৎসা করিয়েছিলেন। ইস্কুল থেকে যা পেয়েছিলেন, যা হাতে ছিল, মার স্ত্রীর ধুলিগুঁড়ি যা গহনা ছিল—সব বেচে দিয়েও সে ব্যয় বহন করেছিলেন কিন্তু তাকে বাঁচাতে পারেননি। এখন শুধু সন্তান বলতে ঐ একটি মেয়ে রমা, উনিশ-কুড়ি বছর বয়স, স্কুলের পড়া শেষ করেছে অর্থাভাবেই কলেজে দিতে পারেননি তপনবাবু। বেশী বয়সে বিয়ে করেছেন, ও'র নিজেরই এখন চৌষট্টির কাছাকাছি বয়স, এ বয়সে আর এরচেয়ে রোজগার করে টাকা জমিয়ে মেয়ের বিয়ে দেবেন তা আর সম্ভব হবে না এ তিনি বোঝেন। অথচ কী করবেন তাও জানেন না, শুধুই বিলাপ করেন আর কপাল চাপড়ান।

ভাড়া ছিলেন ভদ্রলোক কুড়ি টাকায়—কিন্তু তাও দিতে পারেন না সব মাসে। হেমন্ত চায় না, ভোলাকেও তাগাদা করতে বারণ করে। দিতে হবে না, একথা বলতেও সংকোচে বাধে। ভদ্রলোক অপমানিত বোধ করতে পারেন। দেওয়া না দেওয়া মিলিয়ে চলছে। দিতে এলে 'না' বলে না, না দিলেও চায় না।

তপনবাবুর স্ত্রী মেয়েটিকে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন কয়েকবারই, মধ্যে মধ্যেই আসেন। যখন বুকটা ফেটে যাবার মতো হয়—তখনই ছুটে চলে আসেন হেমন্তর কাছে—ব্যথার ব্যথী বলে। রমাকে ভাল করেই দেখেছে হেমন্ত, ভারী শান্ত ও ভদ্র মেয়েটি। সুন্দরী বলা চলে না কোন মতেই—খারাপ দেখতেও নয়। মোটের ওপর হেমন্তর ভালই লাগে। তপনবাবুরা ব্রাহ্মণ, চক্রবর্তী উপাধি—শাণ্ডিল্য গোত্র। আগে চব্বিশ পরগণার হরিনাভির কাছে দেশ ছিল, বহু-কাল হল সব ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন,

সেখানে কে আছে আর কি আছে তাও জানেন না।

এই তপনবাবুকেই একদিন লোক দিয়ে ডেকে পাঠাল হেমন্ত। বলে দিল বিকেলের দিকে আসতে, তিনটে চারটের সময়। এই সময়টা ভোলা কোনদিনই বাড়ি থাকে না—ভোলা আজকাল এই বাড়িতেই থাকছে, রাত্রেও কাছে শোয়, কারণ এক-একদিন—ওঠা তো দূরের কথা— পাশ ফিরিয়ে দেবার জন্যেই লোক ডাকতে হয়।

তপনবাবু এসে বসতে মুনিয়াকে একটা অছিলায় বাইরে পাঠিয়ে দিল। যে বাড়ি রান্না করে সে এই সময়টায় পাঠ শুনতে যায় রাণীভবানীর গোপালবাড়ি—বাড়ি খালিই থাকে।

হেমন্ত কোন রকম ভণিতা না করে সোজাসুজিই প্রশ্ন করে 'রমার বিয়ে দেবেন?'

ভদ্রলোক রীতিমতো থতমত খেয়ে যান। তিনি ভাবতে ভাবতে আসছিলেন বোধহয় অনেক টাকা বাকী পড়েছে বলেই বোধ মালেকা ডেকে পাঠিয়েছেন। আর যাই হোক এমন অনুকূল অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি আমতা আমতা করে বল্লেন, 'দেওয়াই তো উচিত, মানে দিতে পারলে তো বেঁচে যাই, কিন্তু সামর্থ্য যে একেবারেই নেই—সেইজন্যে কোন চেষ্টাও করি না।'

'যদি সামর্থ্যে কুলোয়? তেমন পাত্র যদি থাকে—দেবেন? একটু সাহসের পরিচয় দিতে হবে কিন্তু।'

'আমার যে একেবারেই কিছু নেই। কিছু নয় কিছু নয় করেও কোন না দু-তিন হাজার খরচ হবে—'

'সে ব্যবস্থাও যদি হয়?'

'তাহলে তো বেঁচে যাই মাসীমা। সত্যি বলছি এই দুর্ভাবনায় আরও পাগল হতে বসেছি—'

আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, হেমন্ত শেষ করতে দেয় না, পুনশ্চ সোজা প্রশ্ন করে, 'আমার ভোলার সঙ্গে দেবেন?'

'কে?' চমকে ওঠেন তপনবাবু, 'কার সঙ্গে? ভোলা—মানে ঐ যে ভাড়া নিতে যায়?'

'হ্যাঁ। ও-ই।'

'ও, মানে—ওতো এদেশী হিন্দুস্থানী—তারপর ও তো মানে—'

'আমার ঝিয়ের ছেলে। হাঁ, তাই। কিন্তু তপনবাবু ও বি-এ পাস করেছে। রিকশার ব্যবসা করে। আমি ছখানা রিকশা দিয়েছিলুম সেই আয় থেকে আরও আটখানা করেছে। এখানের হিন্দী কাগজে কি কাজ করে—সেখান থেকেও দুশো টাকার মতো পায়, তা বাদে আরও কোন কোন কাগজে রিপোর্টারের কাজ করে, সেখান থেকেও কিছু কিছু পায়। এখন আমার এখানে থাকে—প্রতিদিনের বাজার খরচা ও দেয়, আমার পয়সায় খায় না। স্বাস্থ্যবান, সুশ্রী—সে তো নিজের চোখেই দেখছেন। অমন চরিত্র আজকালকার সাথে একটাও মেলে নাং সেগুলোও হিসেবে ধরুন!'

'তা ঠিকই। সবই তো বুঝছি। তবু সমাজ বলে একটা জিনিস আছে তো। আমরা ব্রাহ্মণ—'

'ভোলারও শুনেছি ব্রাহ্মণেরই ঔরসে জন্ম, তবে বৈধ নয়। আমি কোন কথাই গোপন করতে চাই না তপনবাবু, কিন্তু আপনি নিজের কথাটাও ভাবুন। এই মেয়ে যদি একটা ভাঙ্গী কি চামার ছেলের সঙ্গে প্রেম করে রেজেষ্ট্রী করে বিয়ে করত—কী করতেন? এই কাশী শহরেই এমন বিয়ে কটা হল তার খবর রাখেন?......আপনি তো নিজেই বলছেন যে এক পয়সা খরচ করার ক্ষমতা নেই আপনার। তাহলে কি করবেন? মেয়েকে তো একটা চাকরিতেও ঢোকাতে পারেন নি, এই বাজারে যে পারবেন বলেও মনে হয় না। আপনার এই বয়স আর এই শরীর—শোকাতপা মানুষ, আপনি আর কদিন এইভাবে ছেলে পড়িয়ে সংসার টানতে পারবেন বলে মনে করেন? আপনি অপারগ হলে কি মারা গেলে রমা আর রমার মার কি হবে ভেবেছেন? তখন হয়ত—[illegible] যে দুর্গতি কল্পনা করলেও পাপ হয়—মেয়েকে সেই দুর্গতিই দাঁড়াবে সেই পথেই নামতে হবে। একথা ভেবে দেখেছেন কি?'

ভেবেছেন বৈকি তপনবাবু, তবে বেশী ভাবতে পারেন নি। যখনই ভাবনায় ভাবতে চেষ্টা করেন বুকের মধ্যে কেমন করে, সব শরীর ঝিমঝিম করতে থাকে—তখনই সে চেষ্টা ছেড়ে দেন, বাবা বিশ্বনাথের উপর দায় চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হন।

আজও এইভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার ফলে তপনবাবু ঘেমে উঠলেন, আজও ওঁর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। জলে ডোবার মতো হলে মানুষ যেমন আকু পাকু করে ওঠে, এবং বিরাট হাঁ করে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করে—তপনবাবুও কতকটা সেইভাবেই আকুলিবিকুলি করে উঠলেন। ব্যাকুলভাবে কী যেন বলবার চেষ্টা করলেন খানিকটা, তারপর বলার মতো কিছু খুঁজে না পেয়ে অন্যদিনের মতোই হাল ছেড়ে দিয়ে করুণভাবে হেমন্তর মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

হেমন্ত কিন্তু নির্মম। সে ওঁকে বৃথা চিন্তার ঘরে—যে চিন্তায় কোন ফল হয়নি আজ পর্যন্ত এবং হবার কোন উপায়ও নেই—হাতড়াতে দিল না। তেমনি সহজেই বলল, 'আপনার আর ছেলেপুলে নেই যে তাদের বিয়ের সময় এ প্রশ্ন উঠবে, আর ওদের ছেলেমেয়ের যখন বিয়ের প্রশ্ন দেখা দেবে তখন এত খবর বোধহয় কেউ নেবেও না, তারা নিজেরাই নিজেদের বিয়ে ঠিক করবে হয়ত। ভোলার পদবী রায় বলেই বলে, রায় সব দেশেই আছে, সব জাতেই আছে, আমার নাতি বলে পরিচয় দেবে। ওর যে জন্মদাতা সে শুনেছি মুখুয্যে, ভরদ্বাজ গোত্র, ভরদ্বাজ গোত্র বলেই চালাবে। এমন কত চলছে তার খবর রাখেন? এই কাশী শহরে স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে যারা বাস করে—তাদের কজন বিবাহিত—তা কেউ জানে? দেখুন এখানে আমারও অনেকদিন কাটল, অনেক দেখেছি। কলকাতা শহরেও দের

দেখেছি, বিয়ের সম্বন্ধের সময় বংশপরিচয় নিয়ে একটু চাপ দিলেই বহু লোক আমতা আমতা করে।'

তারপর গলার সুর একটু নামিয়ে বলে, 'এসব রেখে দিন। শুনুন, এ বিয়েতে রাজী হলে আমি ঐ বাড়ি রমার মাকে দান নয়—সাফ বিক্রীকোবালা লিখে দোব—দান বিক্রী যাকে যা খুশি করতে পারবেন, আপনার অবর্তমানে ঐ বাড়ির যা সামান্য ভাড়া ওঠে তাতেই চালিয়ে নিতে পারবেন। আর মিশ্রী-পোখরার বাড়ি রমা ভোলা দুজনের নামে লেখাপড়া করে দোব—রমাকেই দিতুম, আজ-কালকালকার মেয়েদের বিশ্বাস নেই—নাতি-নাতবোয়ের বিয়ের যৌতুক। ওর তেতলা খালি হয়েছে, ঐখানেই সংসার পেতে দোব ওদের। ভোলার মা অনেকদিন ধরেই তীর্থে যেতে চাইছে, বৃন্দাবনে থাকতে চায়—সে ব্যবস্থাও আমি করে দোব, তবে মা বলে পরিচয় দেবে না তা নয়—অসুখবিসুখে হলেও অবশ্য ভোলার কাছে এসে থাকবে। মাকে দেখবে না কি মা বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করবে—সে শিক্ষা ভোলার নয়।......এখন ভেবে দেখুন কী করবেন। বরং রমার মার সঙ্গেও পরামর্শ করুন।...তবে আমার আর সময় নেই, উত্তর আমার কালকের মধ্যেই চাই।'

(আগামীবারে সমাপ্য)

পাঠ্য পুস্তক রচনায় বিদ্যাসাগর

অজয়েন্দ্র নাথ সরকার

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাদেশে প্রতিভা-ঋদ্ধ যে ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটেছিল, তাঁদের কেউ ছিলেন ধর্মসংস্কারক, কেউ সমাজসংস্কারক, কেউ বা শিক্ষাসংস্কারক। ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষা—তিন ক্ষেত্রেই নিজেদের কমবেশি নিয়োজিত করেছেন এমন কর্মিষ্ঠ ব্যক্তিও যে তখন ছিলেন না তা নয়। কিন্তু একটি মাত্র লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির রেখে সমাজ ও শিক্ষার সংস্কার এবং পাঠ্যপুস্তক রচনা একমাত্র বিদ্যাসাগর ছাড়া, বোধহয় আর কেউই করেননি।

বিদ্যাসাগর ছিলেন মূলতঃ শিক্ষক। তাঁর এই শিক্ষকসত্তার প্রকাশ ঘটেছিল দুটি বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে—জরদ্গব সমাজকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করবার কর্মসূচী রূপায়ণে এবং নিরক্ষরকে সাক্ষর ও সাক্ষরকে উপযুক্ত বিদ্যায়তনিক শিক্ষাদানের প্রচেষ্টার মধ্যে। বিদ্যাসাগরের এই দুই কর্মধারাই নিঃসৃত হয়েছিল একই প্রেরণাগঙ্গোত্রী হতে। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, সফল জীবনচর্চার ক্ষেত্রে প্রয়োজন শিক্ষার। এই শিক্ষার জন্যেই আবার প্রয়োজন হয় সুস্থ সামাজিক পরিবেশের। শিক্ষক বিদ্যাসাগর তাই একই সঙ্গে শিশুদের জন্যে লিখেছেন পাঠ্যপুস্তক আর বৃদ্ধদের জন্যে লিখেছিলেন মোহমুদ্গর। একই সঙ্গে যেমন তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে শিক্ষা দিয়েছিলেন চলবার, শিশু ও কিশোরদেরও তেমনি শিক্ষা দিয়েছিলেন বাঁচবার। বস্তুতঃপক্ষে দেখা যায়, বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আর শিক্ষাপ্রচার একই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন প্রচেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাছাড়া বিদ্যাসাগর এও উপলব্ধি করেছিলেন, কুসংস্কারে নিমজ্জিত সমাজকে শুধু সংস্কারমুক্ত করলেই চলবে না, সেই সংস্কৃত সমাজের রথ চালিয়ে নেবার সারথীও প্রয়োজন। এই সারথি গড়বার জন্যেই তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন পাঠ্যপুস্তক রচনায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর পাঠ্যপুস্তক রচনার তাৎপর্য না বুঝে বা বুঝবার আদৌ চেষ্টা না করে সে যুগের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও তাঁকে নিছক পাঠ্যপুস্তকরচয়িতা বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন বা তাঁর যথোপযুক্ত স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছিল শিক্ষকতা ও শিক্ষা-সংক্রান্ত কাজে। বহুদিন ধরে ধীরে ধীরে শিক্ষার বিষয় ও তার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মধ্যে একটি নিজস্ব ধারণা গড়ে উঠেছিল। এই সম্পর্কে দেশী-বিদেশী বই-ও তিনি অনেক অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত ধারণা ইতিপূর্বে নানাভাবে প্রকাশও পেয়েছিল। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭), 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৪৮) এবং 'জীবন চরিত' (১৮৪৯) গ্রন্থ তিনটির ভূমিকায় বিজ্ঞাপনে বা ঐ ঐ গ্রন্থের বিষয়বস্তুর উপস্থাপননৈপুণ্যে এ সত্য ধরা পড়বে। তবে ১৮৫০ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার আগে, উক্ত কলেজের পঠন-পাঠনাদি সম্পর্কে বিদ্যাসাগর যে রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন তার মধ্যেই শিক্ষার বিষয়, পদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক রচনার নীতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা আরও সুসংহত ও সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই কারণেই পাঠ্যপুস্তকরচয়িতা বিদ্যাসাগরের শিক্ষকসত্তার বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে রিপোর্টটির আলোচনা না করলেই নয়।

সংস্কৃত কলেজে নানা বিভাগের পঠন-পাঠনে এবং পাঠ্যবিষয়ের নির্বাচনে নানা অবৈজ্ঞানিক রীতি অনুসৃত হয়ে আসছিল। অলঙ্কার বিভাগে অনাবশ্যক গ্রন্থের পঠন-পাঠন দেখে বিদ্যাসাগর ঐ বিভাগের ছাত্রদের অলঙ্কার পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় পড়াবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। জ্যোতিষ বিভাগেরও প্রচলিত শিক্ষাধারার সমালোচনা করেছিলেন তিনি। ঐ বিভাগের ছাত্রদের জন্যে নির্দিষ্ট পাঠ্যগ্রন্থ ভাস্করাচার্য প্রণীত 'লীলাবতী' ও 'বীজগণিত'-এর রচনারীতির সমালোচনা করে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, 'পুস্তকদ্বয়ে কোন প্রকার শৃঙ্খলা নাই ও ইংলণ্ডীয় ভাষায় রচিত তৎসদৃশ পুস্তকের ন্যায় উহাতে কিছুই নাই।'*

মন্তব্যটি হতে সহজেই বুঝা যায়, পাঠ্যপুস্তকরচনার রীতি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর কত সচেতন ছিলেন; বিদেশী গ্রন্থের মূল্যমানতা বুঝতেও তাঁর কষ্ট হয়নি; পাঠ্য বিষয়ে নির্বাচন ও বিন্যাস সম্বন্ধেও তিনি অবহিত ছিলেন। কোন্ বিষয়ের পর কোন্ বিষয় শেখালে শিক্ষাকার্য মনোবিজ্ঞান-সম্মত হতে পারে, বিদ্যাসাগরের সে বোধ পরিপূর্ণভাবেই বর্তমান ছিল। পাঠ্যবিষয় নির্ধারণে বিদ্যাসাগর কতখানি বস্তুনিষ্ঠ ছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় স্মৃতি বা আইন শ্রেণীর পাঠ্য-গ্রন্থাদির বিষয়ে তাঁর নিম্নলিখিত মন্তব্যটিতে—

"অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের অধ্যাপনা বন্ধ হওয়া উচিত। ইহা যাজন ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের শিক্ষোপযোগী ওরূপ গ্রন্থাদি বিদ্যালয়ে অধীত হইবার সম্পূর্ণ অনুপোযোগী।"

বিদ্যালয়ে যাজন বিদ্যা শেখানোর প্রয়োজন হয় না, সকলের এ শিক্ষা গ্রহণ করবার দরকারও নেই, বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষকের পক্ষেই সে যুগে একথা বলা সম্ভব হয়েছিল। এই বস্তুনিষ্ঠতার জন্যেই তিনি সে যুগে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষাকে অবশ্য পাঠ্য করবার পক্ষে মত দিতে পেরেছিলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর প্রেরিত উল্লিখিত রিপোর্টে আরও অনেক সুপারিশ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে বিদ্যাসাগরের পাঠ্যগ্রন্থের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে তাদের উল্লেখ করা যাবে। যাই হোক, কাউন্সিল অব এডুকেশন এই সুপারিশগুলি মেনে নিলে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সংস্কারকার্যে ব্রতী হন এবং ঐ কাজেরই প্রেরণাতে তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনায় এগিয়ে আসেন। অবশ্য এ কথা সত্য, এর আগেও এবং সংস্কৃত কলেজের প্রয়োজনের বাইরে পরেও তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন; কিন্তু তবুও বলতে হয়, উক্ত রিপোর্ট স্বীকৃত হলে বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক রচনায় অনেক বেশী প্রেরণা লাভ করেছিলেন।

সে যুগে বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার বিষয় এবং পদ্ধতি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যে কতখানি সচেতন ছিলেন, তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তকের বিচার বিশ্লেষণেই তা ধরা পড়বে।

"বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) বিদ্যাসাগরের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। ফোর্ট উইলিয়ম

---

* পাঠ্যগ্রন্থের নির্বাচনাদি সংক্রান্ত ব্যাপারে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত সচেতন ছিলেন বলে তৎকালীন অনেক পাঠ্যগ্রন্থের সমালোচনা করতেন। কিন্তু এর জন্যে অনেকে বিদ্যাসাগরকে তিরস্কার করতে লজ্জা পেতেন না। (দ্রঃ সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৩য়) : বিনয় ঘোষ পৃঃ ৪৫৬)

কলেজের ছাত্রদের জন্যে নির্দিষ্ট 'হিতোপদেশ' আদর্শ পাঠ্যগ্রন্থ না হওয়ায় ঐ কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরকে উপযুক্ত পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করতে 'আদেশ দেন'। ঐ আদেশের ফলশ্রুতিরূপেই হিন্দী 'বেতাল পচ্চীসী'র অনুবাদ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র আবির্ভাব ঘটে। আলোচ্য গ্রন্থটি, বলা-বাহুল্য, প্রথমে বয়স্ক বিদেশী সিভিলিয়ান-দের পাঠ্যপুস্তকরূপেই পরিকল্পিত ও রচিত হয়েছিল। প্রথমে অই মূল হিন্দী-গ্রন্থের আদিরসাত্মক কাহিনীও এতে সংযোজিত হয়েছিল; পরবর্তীকালে, এদেশের বালক-বালিকাদের পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হওয়ায়, এই সব কাহিনী পরিত্যক্ত হয়েছিল। গ্রন্থটির ভাষাগত পরিশোধনের কাজেও তিনি পরবর্তী সময়ে অধিকতর মনোযোগী হয়েছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণের সময় থেকেই এই কাজ শুরু হয়েছিল। দশম সংস্করণে গ্রন্থটিতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল;—এই সময়ই তিনি গ্রন্থটিতে ইংরেজী ভাষার রীতি অনুযায়ী বিরামচিহ্নের ব্যবহার করেন। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ঘটনাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ; পাঠ্যপুস্তকের ইতিহাসেও ঘটনাটি কম উল্লেখযোগ্য নয়।

বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ 'বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ' (১৮৪৮) মার্শম্যানের 'আউটলাইনস অব দি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল ফর দি ইউজ অব ইউথ ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত; অবশ্য মার্শম্যানের অংশমাত্রকেই তিনি অবলম্বন করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মার্শম্যানের হুবহু অনুবাদ করেন নি। নিজ বৈশিষ্ট্যের ছাপ তিনি গ্রন্থটিতে কৃতিত্বের সঙ্গেই অঙ্কিত করতে পেরেছিলেন।

আলোচ্য গ্রন্থটি সে যুগের ইতিহাস সম্বন্ধীয় স্কুলপাঠ্য বই-এর তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। বিষয়বস্তুর অবতারণা এবং রচনারীতির বিশিষ্টতা উভয় দিক দিয়েই বইটি অ-পূর্ব স্বাতন্ত্র্য-মণ্ডিত ছিল। সে সময় বহু গ্রন্থে বাংলার ইতিহাস ছিল পরিত্যক্ত বা অবহেলিত। এদিক থেকে বিচার করলে বিদ্যাসাগরের গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার না করে উপায় নেই।

ইতিহাস তথ্যনিষ্ঠ, কল্পনার অবকাশ এখানে নেই। কিন্তু তবুও দেখা যায়, অনেকের হাতে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসও সাহিত্যরসস্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। ছাত্রদের পাঠ্য-পুস্তকে ইতিহাসের উপস্থাপনা এমনটি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইতিহাস পরিবেশনে বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে সামান্য একটু নমুনা দিলে, বোধহয়, উদ্ধৃতিবাহুল্যের দোষ বর্তাবে না,—

"রাজধানীর প্রধান প্রধান লোক ও প্রধান প্রধান রাজকীয় কর্মচারী সমবেত হইলেন। অবিলম্বে এক দরবার হইল, ক্লাইব আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, মীরজাফরের কর গ্রহণপূর্বক সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব বলিয়া সম্ভাষণ ও বন্দনা করিলেন।"

'জীবনচরিত' (১৮৪৯)-এ 'এগজাম্পলারী বাইওগ্রাফী' (চেম্বার্স) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কজন মহাপুরুষের জীবনী অনুবাদ করা হয়েছে। প্রথমবারের 'বিজ্ঞাপনে' জীবনচরিতপাঠের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যা বলেছিলেন তা থেকেই বুঝা যায়, পাঠ্যবিষয়ের নির্বাচন সম্পর্কে বিদ্যাসাগর কত বলিষ্ঠ ধারণার অধিকারী ছিলেন।

গ্রন্থটিতে পরিভাষা ব্যবহারে বিদ্যাসাগর নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যাসংক্রান্ত পরিভাষা নির্মাণে আজকের দিনেও কম অসুবিধায় পড়তে হয় না; বিদ্যাসাগরের সময়ে এ অসুবিধা যে আরো বেশী ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। অথচ তিনি যে হতোদ্যম হয়ে আরব্ধ কাজ থেকে নিবৃত্ত হবেন এমন মানুষ তিনি ছিলেন না। বহু পরিশ্রম স্বীকার করেও তিনি বহু পরিভাষা নির্মাণ করেছিলেন; তবে এ-বিষয়ে তিনি যে সম্পূর্ণ সফল হয়েছিলেন এমন দাম্ভিক দাবী তাঁর ছিল না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বিদ্যাসাগরের প্রায় সব পাঠ্যপুস্তকই অনুবাদমূলক রচনা। কিন্তু নিজস্ব মন ও মননের স্পর্শে তাঁর কোন রচনাই অনুবাদগন্ধী হয়ে ওঠেনি। কোন ক্ষেত্রেই তিনি আক্ষরিক অনুবাদের পথে যাননি। আধুনিক বাঙলা অনুবাদ-সাহিত্যের ধারা বেশ পুষ্ট হয়ে উঠেছে; কিন্তু তার এই পুষ্টির ইতিহাসে বিদ্যা-সাগরের অবদান কম নয়। অনুবাদকে তিনি যথার্থ সাহিত্য করে তুলেছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থটি সম্বন্ধে অবশ্য এ কথা অংশত প্রযোজ্য।

বহু সতর্কতা অবলম্বনে রচিত হলেও 'জীবনচরিত' দোষ-ত্রুটি হতে একেবারে মুক্ত হতে পারে নি। অবশ্য স্বয়ং লেখকই এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

বইটির বিষয়বস্তুতে একটি ত্রুটি ছিল বলে বিদ্যাসাগরকে তখন সমালোচনার পাত্র হতে হয়েছিল গ্রন্থটিতে বাঙলা তথা

ভারতের কোন মনীষীর জীবনকথা স্থান পায়নি। বাঙালীছেলের পাঠ্যগ্রন্থে এ একটি ত্রুটিই বটে; তবে বিদ্যাসাগর সে সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন।

"বোধোদয়" (১৮৫১) একাধিক ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। গ্রন্থটির বিষয়বৈচিত্র্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিচিত্র বিষয়ে এখানে প্রাথমিক জ্ঞান পরিবেশিত হয়েছে। এই জ্ঞান পরিবেশনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরই বলেছিলেন—

"যে কয়টি বিষয় লিখিত হইল, বোধ করি, তৎপাঠে অমূলক কল্পিত গল্পের পাঠ অপেক্ষা, অধিকতর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।"

'বোধোদয়ে'র প্রথম সংস্করণে ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু না থাকায় বিদ্যাসাগরকে সমালোচনা করা হয়েছিল। উপরে উদ্ধৃত বক্তব্যের দিকে দৃষ্টি ছিল বলেই, মনে হয়, ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন বক্তব্য শিশুদের সামনে তিনি রাখতে চাননি। যা হোক, পরবর্তী সংস্করণে অবশ্য বিদ্যাসাগর ঈশ্বর-বিষয়ক একটি ছোট্ট রচনা গ্রন্থটিতে সংযোজিত করেছিলেন।

বোধোদয়ে'র গদ্যরীতিতে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার জন্যেই এই বৈচিত্র্য। অবশ্য শিক্ষার্থীদের গ্রহণক্ষমতাকে অস্বীকার করে এই রীতি অনুসরণ করা হয়নি। গ্রন্থটিতে অনেক সময় তিনি 'অপ্রচলিত দুরূহ শব্দের প্রয়োগ' করেছিলেন। তবে শিক্ষার্থীদের যাতে অসুবিধা না হয়, তার জন্যে তিনি তাদের অর্থও লিখে দিয়েছিলেন।

"সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা" (১৮৫১) রচনার পশ্চাতে বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা কার্যকরী হয়েছিল। বিদ্যাসাগর যখন ছাত্র তখন সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক। পরবর্তীকালে, আগেই বলা হয়েছে, ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে তিনি সেই অবৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারসাধন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী সংস্কৃত শেখাবার জন্যে তিনি ক'খানি পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেছিলেন। 'উপক্রমণিকা' তাদের মধ্যে প্রথম।

পূর্বে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই সংস্কৃত ব্যাকরণ শেখাবার চল ছিল। সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশক শিক্ষার্থীদের এতে কষ্টের আর অবধি থাকতো না। বিদ্যাসাগর এই অবস্থার অবসান চেয়েছিলেন। 'কাউন্সিল অব এডুকেশন'-এর সম্পাদকের কাছে ব্যাকরণ বিভাগের সংস্কারসাধনের বিষয়ে পূর্বোক্ত রিপোর্টে তিনি বাংলাভাষায় রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াবার অনুকূলে মতামতও জ্ঞাপন করেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, বৃহৎ ব্যাকরণশাস্ত্রের সকল বিষয়ে মন না দিয়ে শুধু প্রয়োজনীয় 'নিয়ম ও সূত্রগুলি' আয়ত্ত করলেই ছাত্রেরা উপকৃত হতে পারবে। বিদ্যাসাগরের ঐ রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে নিলে বিদ্যাসাগর নিজেই নিজের পরিকল্পনামত 'উপক্রমণিকা' রচনা করেছিলেন।

উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে 'উপক্রমণিকা'র সঙ্গে বিদ্যাসাগরের তিনখণ্ড 'ঋজুপাঠ' (১৮৫১-৫২) অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বিদ্যাসাগর তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্টে বলেছিলেন, ব্যাকরণ অধ্যয়নের নানাস্তরে শিক্ষার্থীদের সেই সেই স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংস্কৃত সাহিত্যের নির্বাচিত অংশের পাঠ দেওয়া প্রয়োজন। ছাত্ররা যে এতে অনেক উপকৃত হবে 'উপক্রমণিকা'য় সে কথা বিদ্যাসাগর নিজেই বলেছিলেন—

"বাস্তবিক, ব্যাকরণ শাস্ত্রে সম্যক ব্যুৎপন্ন ও অগ্রে সহজ সহজ গ্রন্থ পাঠ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ প্রবিষ্ট না হইলে, কোনও ক্রমেই উৎকৃষ্ট কাব্য নাটকাদি গ্রন্থের অধ্যয়নে অধিকারী হইতে পারে না।"

এই জন্যেই বিদ্যাসাগর রচনা করেছিলেন তিন খণ্ড 'ঋজুপাঠ'। ঋজুপাঠের তিনটি খণ্ডই উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত কাব্য, মহাকাব্য ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত রচনার সংকলনগ্রন্থ। তবে দেখা যায়, এই সংকলনে সব সময়ই মূল গ্রন্থের অংশ অবিকৃতভাবে গ্রহণ করা হয়নি। বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি এখানে প্রাধান্য পেয়েছিল। অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদের পক্ষে কোন্ অংশ কতখানি গ্রহণযোগ্য সেদিকে নজর রেখেই তিনি 'ঋজুপাঠের' রচনা সংকলন করেছিলেন। এই জন্যেই কখনো কখনো মূল গ্রন্থের অংশ বিশেষ 'ঋজুপাঠে' বর্জিত হয়েছিল। পরিবর্তিতও হয়েছিল কখনো কখনো।

বিদ্যাসাগর শিক্ষাসংস্কার ও শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে শুধু পরিকল্পনা তৈরী করেই বা প্রস্তাব উত্থাপন করেই ক্ষান্ত হতেন না। নিজের পরিকল্পনা ও প্রস্তাবকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্যে এগিয়েও আসতেন। 'উপক্রমণিকা', তিন খণ্ড 'ঋজুপাঠ' ইত্যাদি পুস্তক রচনা এই এগিয়ে আসারই অন্যতম সাক্ষ্য বহন করে।

শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতভাষা শিক্ষার কাজকে সহজ পথে সফল করবার অভিপ্রায়ে বিদ্যাসাগর বিভিন্ন সময়ে ক'খণ্ড 'ব্যাকরণ কৌমুদী' (১৮৫৩-১৮৬২)ও রচনা করেছিলেন। ব্যাকরণের সূত্রাদির নির্বাচন-কুশলতা ও তাদের বিন্যাসনৈপুণ্য এত বিজ্ঞানসম্মত যে বর্তমান যুগেও এই 'ব্যাকরণ কৌমুদী'র প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় নি।

বিদ্যাসাগর অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে দুই খণ্ড 'বর্ণ পরিচয়' (১৮৫৫) রচনা করেছিলেন।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের নব নব উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন শিক্ষণপদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়েছে। এ বিষয়ে গবেষণাও চলছে কম নয়। কাজেই 'বর্ণপরিচয়ে'র পদ্ধতির সঙ্গে আজকের শিক্ষাদান পদ্ধতির তুলনা করা বাতুলতা মাত্র। তবু [illegible] বলতেই হবে, আজ হতে শতাধিক বছর আগে 'বর্ণ পরিচয়' রচনায় বিদ্যাসাগর নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

"বর্ণ-পরিচয়' ১ম ভাগে বিদ্যাসাগর শিক্ষার্থীদের সবার প্রথমে বর্ণমালা চিনিয়েছেন। বর্ণ চেনানোর ব্যাপারটি তিনি দুভাবে কার্যকরী করেছেন। প্রথমে পরাম্পরানুযায়ী শিশুরা বর্ণ চিনেছে, কিন্তু দেখা যায়, পরাম্পরানুযায়ী বর্ণমালা শিখতে গিয়ে শিশুরা মুখে মুখেই বর্ণের পারম্পর্য মুখস্থ করে ফেলে। তার ফলে সকল বর্ণ অনেক শিশু ভালোভাবে না চিনেই বর্ণমালার নাম পর পর বলে যেতে পারে। এই জন্যে বর্ণের নাম জানা সত্ত্বেও শিশুরা বর্ণের রূপ সঠিক চিনলো কিনা বুঝা যায় না। বিদ্যাসাগর এই কারণে বর্ণগুলিকে এলোমেলোভাবে সাজিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের বর্ণজ্ঞানের পরীক্ষা নিয়েছেন। অবশ্য এমনটি তৎকালে রচিত অন্যের পাঠ্যপুস্তকেও দেখা যায়। যা হোক, বর্ণ তো চেনা হলো, কিন্তু শুধু বর্ণ চিনলেই তো হবে না। কি করে বর্ণের সংযোগে শব্দ গঠিত হয়, তাও জানতে হবে। বর্ণের অর্থযুক্ত সংযোজনাতেই গড়ে ওঠে শব্দ। বর্ণপরিচয়ের পরে তাই বিদ্যাসাগর শিখিয়েছেন 'বর্ণযোজনা'। বর্ণযোজনায় তিনি প্রথমে দুই বর্ণের, পরে তিন বর্ণের সংযোজনায় শব্দগঠনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সহজ থেকে কঠিনে যাবার মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষণপদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

পরবর্তীস্তরে তিনি ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের সংযোগে শব্দগঠন কিভাবে সম্ভব তাই শিখিয়েছেন। 'আকার যোগ'-এ 'আ' থেকে 'ঔ' পর্যন্ত দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে প্রযুক্ত হয়েছে। তারপরে একই শব্দে একাধিক স্বরবর্ণের যোগ কিভাবে ঘটেছে, তার উদাহরণ দেখিয়ে বর্ণের ব্যবহার-বৈচিত্র্যের বিষয় সম্বন্ধে শিশুদের অবহিত করেছেন। অনুস্বার যোগ, বিসর্গ এবং চন্দ্রবিন্দু যোগও তিনি ধাপে ধাপে শিখিয়েছেন। তারপর দিয়েছেন 'পাঠ' (লেশন)। এই 'পাঠ' দানের সময়েও তিনি মনোবিজ্ঞানসম্মত রীতি মেনে চলেছিলেন। সহজ থেকে অপেক্ষাকৃত কঠিন এক থেকে কুড়িটি 'পাঠ শেষ করলে, দেখা যায়, শিশুরা বই পড়ার যোগ্যতা কিছুটা আয়ত্ত করে ফেলেছে। 'বর্ণপরিচয়ের'র প্রথম ভাগে শিশুরা ছোট ছোট সহজ বাক্যের মধ্য দিয়ে পারম্পর্যযুক্ত বক্তব্যের স্বাদ গ্রহণে সক্ষম হয়ে থাকে।

পাঠ্যপুস্তক রচনায় বিদ্যাসাগরের শ্রম ও নিষ্ঠা ছিল বলে শিক্ষকদেরও তিনি শিক্ষণ-সংক্রান্ত নির্দেশ দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। 'বর্ণপরিচয়ের' প্রথম ভাগেই এর প্রমাণ মেলে। শিশু-শিক্ষার্থীরা যাতে 'স্বরের অ, স্বরের আ' না বলে শুধু অ, আ বলে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের উপদেশ দেবার জন্যে বিদ্যাসাগর শিক্ষকদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। শিশুদের হলন্ত ও অকারান্ত

শব্দের উচ্চারণ যাতে সঠিক হয় সেদিকে দৃষ্টি দেবার জন্যেও শিক্ষকদের কাছে তাঁর নির্দেশ ছিল। শিশুদের জন্যে রচিত এই বইটি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর খুবই সচেতন ছিলেন। এই জন্যেই পরবর্তী অনেক সংস্করণে, বইটির কিছু কিছু সংশোধন-কার্যে তিনি মনোযোগী হয়েছিলেন।

'বর্ণপরিচয়ের' দ্বিতীয় ভাগে সংযুক্ত বর্ণের সঙ্গে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পুস্তকেও তিনি শিক্ষকদের কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন। নির্দেশটি খুবই মূল্যবান বলে উদ্ধার করা হলো—

"সংযুক্ত বর্ণের উদাহরণ স্থলে যে সকল শব্দ আছে, শিক্ষক মহাশয়েরা বালকদিগকে উহাদের বর্ণবিভাগ মাত্র শিখাইবেন। অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না।"

শিক্ষার্থীদের বর্ণবিভাগ শেখানো যেখানে অভিপ্রায়, এবং শিক্ষার্থীরা যেখানে শিশু, সেখানে পূর্বোক্ত শব্দগুলির অর্থ বুঝাবার প্রয়োজন সত্যিই নেই। বুঝাবার চেষ্টাও কষ্টদায়ক।

অতএব গোটা ব্যাপারটাই অ-বিজ্ঞান-সম্মত।

দ্বিতীয় ভাগের প্রথমেই বিদ্যাসাগর 'য-ফলা—য্য' শিখিয়েছেন। 'ক' থেকে 'হ' পর্যন্ত প্রথমে '্য' ফলার ব্যবহার দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখিয়েই তিনি 'প্রথম পাঠ' দিয়েছেন। এই 'পাঠ' দান সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তার মধ্যে তাঁর শিক্ষানিপুণ-তারই পরিচয় পাওয়া যায়। অভিজ্ঞ সহানুভূতিশীল প্রকৃত শিক্ষাদাতার কথাই এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগরের মুখেই তাঁর বক্তব্য শোনা যাক—

"ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণ বিভাগ শিক্ষা করিতে গেলে, অতিশয় নীরস বোধ হইবেক ও বিরক্তি জন্মিবেক, এজন্যে মধ্যে মধ্যে এক একটি পাঠ দেওয়া গিয়াছে।"

'পাঠ'গুলি সহজ-সরল ভাষায় লিখিত; নীরস বিষয়ের শিক্ষার মধ্যে এগুলি সত্যিই শিক্ষার্থীদের মানসিক শ্রান্তি দূর করতে পারে।

'য' ফলার পরে শেখানো হয়েছে 'র ফলা—র ্র', তারপর 'ল ফলা—ল ্ল', তারপর 'ব ফলা—ব্ব'। এইভাবে পরপর 'ণ ফলা—ণ্ন' 'ন ফলা—ন ্ন', 'ম ফলা—ম্ম'—ও শেখানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ সবের মাঝে মাঝে আছে নানা 'পাঠ'। দ্বিতীয় ভাগে [illegible]ও শেখানো হয়েছে 'রেফ—র্'; 'মিশ্র সংযোগ—দুই অক্ষরে 'এবং' তিন সংযোগ—তিন অক্ষরে।' তারপর দেওয়া হয়েছে ক'টি পাঠ। 'পাঠ'গুলিতে বিদ্যা-সাগর যা শেখাতে চেয়েছিলেন তার পরীক্ষা [illegible]; শিক্ষার্থীদের মনের মুক্তির জন্যেই [illegible]গুলি লেখা হয়েছিল; এজন্যে অনেক পাঠে, বিশেষ করে নবম ও দশম পাঠে গল্পরসের একটা অস্পষ্ট আভাসও লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় ভাগেরও কিছু কিছু সংশোধন পরবর্তী সংস্করণে করা হয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'কথামালা' প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে। তদানীন্তন শিক্ষাধিপতি উইলিয়ম গর্ডন ইয়ঙের 'অভিপ্রায় অনুসারে' বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি ঈশপের গল্প নীতিমূলক; বিদ্যাসাগরও গল্পের শেষে

নীতিবাক্য ব্যবহার করেছিলেন। কখনো কখনো অবশ্য এই নীতিবাক্য শিশুর পক্ষে, খুব একটা সহজবোধ্য হতে পারে নি। তবে 'কথামালা'র গদ্যরীতি অত্যন্ত সহজ-সরল; গল্প লিখবার ঢঙটি বইটিতে অনায়াসেই অনুসৃত হতে পেরেছে।

'চরিতাবলী' (১৮৫৬) বিদ্যাসাগরের অন্য একটি অনুবাদমূলক গ্রন্থ। এখানে ক'জন 'মহানুভবের বৃত্তান্ত' বর্ণিত হয়েছে। যাতে 'বালকদিগের লেখাপড়ায় অনুরাগ জন্মিতে ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে' সে জন্যেই গ্রন্থটির পরিকল্পনা ও রচনা। এতদ্দেশীয় বালক শিক্ষার্থীদের মনগ্রাহ্য ও বুদ্ধিভেদ্য বিষয়ই বিদ্যাসাগর সংকলন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, 'চরিতাবলী'র বিষয় নির্বাচনের সময় বিদ্যাসাগর শিক্ষকদের শিক্ষাদানের ক্ষমতা-অক্ষমতার কথাও মনে রেখেছিলেন। (দ্রঃ 'চরিতাবলী'র বিজ্ঞাপন')

আলোচ্য গ্রন্থটিতে নানা ব্যক্তির জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করে ঐ ঐ জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কি আছে সে সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর শিক্ষার্থীদের অবহিত করেছিলেন। ভঙ্গিটা অনেকটা নীতিমূলক গল্পের উপসংহারের মত। 'জীবনচরিতে' কিন্তু এ রীতি অনুসৃত হয় নি।

'জীবনচরিতে'র দুটি রচনার সঙ্গে 'চরিতাবলীর' দুটি রচনার কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ একই বিষয় নিয়ে দুটি গ্রন্থে দুটি নিবন্ধ রচিত হয়েছে বলা যায়। 'জীবনচরিতে'র বলন্টিন জামিয়ে ডুবাল' এবং 'চরিতাবলী'র ডুবাল' নামেই বোঝা যায় এক; তবে একটিতে ডুবাল জীবনী লেখা হয়েছে বিস্তৃতভাবে, আর একটিতে সংক্ষিপ্ত আকারে। দ্বিতীয় রচনাটির প্রকাশভঙ্গি প্রথমটি অপেক্ষা সহজ ও সরল। রচনাদুটির উপসংহারও ঘটেছে ভিন্নভাবে। 'চরিতাবলী'র সমস্ত প্রবন্ধের উপসংহারই, আগেই বলা হয়েছে, নীতিমূলক। 'জীবনচরিতে'র 'জামস জেঙ্কিনস' ও 'চরিতাবলী'র 'জেঙ্কিনস' রচনা দুটি সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা যায়।

জীবনচরিতে'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশ হবার পরে বিদ্যাসাগর আদ্যোপান্ত ঐ বই পাঠ করে বুঝতে পেরেছিলেন, বইটি খুবই ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে। ইংরেজী ভাষা থেকে তিনি আর অনুবাদ করবেন না সে কথাও তিনি বলেছিলেন। বইটি পুনর্মুদ্রিত করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। তবে তিনি 'বাঙ্গালায় এক নূতন জীবনচরিত পুস্তক সংকলন' করবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু কার্যগতিকে সে কাজ না করতে পেরে তিনি শেষপর্যন্ত সংশোধনান্তর ঐ 'জীবনচরিতে'ই পুনর্মুদ্রণ করেন।

এই তথ্য হতে সহজেই বোঝা যায়, 'জীবনচরিতে'র পুনর্মুদ্রণ না করে তিনি নতুন এমন একখানি জীবনীগ্রন্থ সংকলিত করতে চেয়েছিলেন যা পূর্বপ্রকাশিত 'জীবনচরিত' অপেক্ষা সর্বাংশে দোষমুক্ত হবে। কিন্তু সময়াভাবে তা করতে না পেরে পূর্বের অনেক ত্রুটি দূর করে 'জীবনচরিতে'ই পুনর্মুদ্রণ করেছিলেন। এই সংশোধন ও পুনর্মুদ্রণ কার্যের সময় 'চরিতাবলী'র পরিকল্পনা তাই আর ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে সময় করে বিদ্যাসাগর যখন 'চরিতাবলী' রচনা করেন তখন 'জীবনচরিত'-এর প্রথম সংস্করণ সম্বন্ধে ব্যক্ত মনোভাব নিশ্চয়ই তাঁর মনে ছিল। মনে হয়, সেইজন্যেই, ডুবাল ও জেঙ্কিনসের জীবনবৃত্তান্ত 'জীবনচরিত' অপেক্ষা 'চরিতাবলী'তে অধিকতর সহজ-সরল ভাষায় বর্ণিত হয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের 'আখ্যানমঞ্জরী' তিনখণ্ডে বিভক্ত; অবশ্য একাধিক খণ্ডে গ্রন্থটিকে বিভক্ত করবার কোন পরিকল্পনাই বিদ্যাসাগরের প্রথমে ছিল না। ১৮৬৩ সালে বিদ্যাসাগর 'আখ্যানমঞ্জরী' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু ভাষার বিচারে গ্রন্থটি ঠিক বালবোধ্য না হওয়ায় কোন এক প্রধান শিক্ষক গ্রন্থটির সমালোচনা করে বলেছিলেনঃ

> 'আখ্যানমঞ্জরী যেরূপ ভাষায় লিখিত হইয়াছে, তদপেক্ষা সরল ভাষায় পুস্তকান্তর প্রস্তুত হইলে, অল্পবয়স্ক বালকদিগের অনেক উপকার দর্শে।'

এই জন্যেই পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর পূর্ববর্তী গ্রন্থের অপেক্ষাকৃত সহজ ক'টি আখ্যানের সঙ্গে নতুন আরও কিছু আখ্যান সংযোজিত করে 'আখ্যানমঞ্জরী'র নতুন রূপ দিলেন এবং পূর্ববর্তী 'আখ্যান মঞ্জরী'কে দ্বিতীয় ভাগ ও নতুন 'আখ্যান মঞ্জরী'কে প্রথম ভাগে চিহ্নিত করলেন। এর পরে আরও একখানি 'আখ্যান মঞ্জরী' রচনা করে তাকে দ্বিতীয় ভাগ এবং পূর্বপরিচিত দ্বিতীয় ভাগকে তৃতীয় ভাগরূপে অভিহিত করলেন। শিক্ষার্থীদের গ্রহণ ক্ষমতার তারতম্যের দিকে দৃষ্টি রেখে বই লিখতেন বলেই বিদ্যাসাগরের একখণ্ড 'আখ্যান মঞ্জরী' হয়েছিল তিনখণ্ড। শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে তিনি যদি তত সচেতন না হতেন তাহলে পূর্বোক্ত প্রধান শিক্ষকের সমালোচনার উত্তরে পরবর্তী সংস্করণের সময় 'আখ্যানমঞ্জরী'র কিঞ্চিৎ সংশোধন করেই ক্ষান্ত হতে পারতেন।

'আখ্যান মঞ্জরী'র কোন খণ্ডই বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা নয়—বিদেশী গ্রন্থের অবলম্বনে রচিত। তবে, অন্যান্য গ্রন্থের মতোই, বলা বাহুল্য, 'আখ্যান মঞ্জরী'ও অনুবাদগন্ধী হয়ে ওঠে নি। অনাড়ম্বর স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে নানা আখ্যান তিনি বর্ণনা করেছিলেন; গ্রন্থটির অনেক ক্ষেত্রে গল্পরস বেশ জমে উঠেছে দেখা যায়। তৃতীয় ভাগ সম্বন্ধে একথা সব চাইতে বেশী প্রযোজ্য।

'আখ্যানমঞ্জরী'তেও দেখা যায়, বিদ্যাসাগর কঠিন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ বা পরিচয় পাদটীকায় সংযোজিত করেছিলেন।

১৮৬৪ সালে বিদ্যাসাগরের 'শব্দমঞ্জরী' প্রকাশিত হয়। শিক্ষার্থীদের জন্যেই এটি পরিকল্পিত হয়েছিল। 'শব্দমঞ্জরী' অভিধান।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীতিবোধ' গ্রন্থে ক'টি রচনা বিদ্যাসাগর লিখিত। গ্রন্থটির 'বিজ্ঞাপনে' রাজকৃষ্ণ লেখক নিজেই জানিয়ে গিয়েছিলেন। 'নীতিবোধ' কোন বিদেশী গ্রন্থের 'সারাংশ সঙ্কলন করিয়া সঙ্কলিত' হয়েছিল; বইটি 'ঐ পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে।' কাজেই বিদ্যাসাগরের এই রচনা ক'টিও 'অবিকল অনুবাদ' নয়। রচনাগুলিতে উপদেশদাতার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। 'বোধোদয়ে' যে গদ্যরীতি লক্ষ্য করা গিয়েছে সেই গদ্যরীতিরই বলিষ্ঠ রূপ এখানে অনুসৃত হয়েছে। আলোচ্য গদ্যাংশগুলিতে কোন গল্প বা দৃষ্টান্তসহযোগে নীতি শেখানো হয়নি। এজন্যেই গদ্য যে বেশ গম্ভীর ও ভারী তা অনেকটা স্বীকার করা যায়। তবে 'নেপোলিয়ন বোনাপার্ট' একটু ভিন্ন ধরনের রচনা। 'দুরাকাঙ্ক্ষা' যে পতনের কারণ নেপোলিয়নের জীবনের উল্লেখ করে তা বোঝানো হয়েছে। এজন্যে রচনাটির গদ্য বেশ কিছুটা হাল্কা হতে পেরেছে।

বিদ্যাসাগর নিজে পাঠ্যপুস্তক রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে যেসব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তাদেরই পর্যালোচনা করা গেল; বিদ্যাসাগরের দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' পরবর্তীকালে পাঠ্যপুস্তক রূপে ব্যবহৃত হয়েছিল; কিন্তু যেহেতু পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গ্রন্থদুটি লেখা হয়নি সেহেতু বর্তমান আলোচনা হতে তারা বাদ পড়েছে।

পাঠ্যপুস্তক রচনাকে অনেকে, এমনকি বহু শিক্ষকও, অত্যন্ত তুচ্ছ ও অনুল্লেখ্য কাজ বলে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষকের লেখা উপযুক্ত পাঠ্যগ্রন্থ না থাকলে শিক্ষার্থীরই অসুবিধা। শিক্ষক বিদ্যাসাগর এই জন্যেই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। একই কারণে তিনি নিজের গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণকালে সে গ্রন্থের আরও উন্নতিসাধনের সচেষ্ট হতেন। এই নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সত্ত্বেও, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বিচারে তাঁর রচিত গ্রন্থ যে সর্বত্র নির্দোষ হয়েছে তা নয়; কিন্তু ঐ নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের কি কোন মূল্য নেই? আজকের দিনেও কি এই পরিশ্রম ও প্রযত্ন দুর্লভ নয়? শিশু বলে তার পাঠ্যগ্রন্থ অবহেলায় রচনা করতে হবে এ মনোভাব প্রায় শিশুবধতুল্য। এমন অবহেলাভরে লেখা অপেক্ষা না লেখাই ভালো। আজ যখন অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিকে অযোগ্য লেখকের বইতে বা না পড়েই অন্য কারও বইতে অর্থের বিনিময়ে নাম ব্যবহার করবার অনুমতি দিতে দেখি তখন বিদ্যাসাগরের নাম বড্ড বেশী করেই মনে পড়ে।

প্রমাণপঞ্জী

(১) বিদ্যাসাগর রচনাবলী (৪ খণ্ড)—শ্রীদেবকুমার বসু সম্পাদিত।

(২) ভূমিকা— ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীবসু সম্পাদিত পূর্বোক্ত রচনাবলী)

(৩) বিদ্যাসাগর রচনাবলী—সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।

(৪) সাহিত্য সাধক চরিতমালা (২য় খণ্ড)

সতেরো
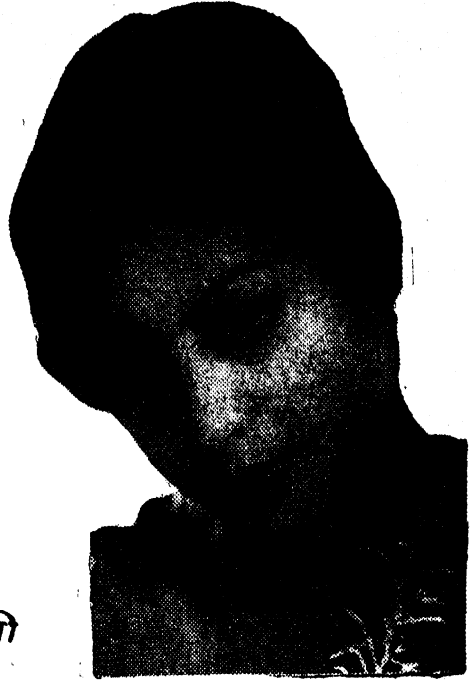
রাণা সুস্থ হয়ে হেসেখেলে বেড়িয়ে চারদিকের নানা বস্তু সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। সবকিছু জানা ও চেনার ঔৎসুক্য প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবী যেন আবার আলোয় হেসে উঠল। এইসময়ই অনুভব করেছিলাম আকাশ, পৃথিবী, সূর্যের প্রদীপ, চাঁদের স্বপ্নমাখা আলো সবই যেন এক আনন্দধারার গতিসূত্রে চলেছে। হাওয়ার গন্ধে, তারার চাউনিতে, চাঁদের ঝর্ণায় যেন সেই আনন্দময়ের মঙ্গলস্পর্শ ছড়ানো, যিনি দূরে থেকেও সবচেয়ে আপন, আড়ালে থেকেও সকলের চেয়ে বাস্তব।

সারা চেতনাকে প্লাবিত করে হৃদয়ে নেমেছিল একটা অপার্থিব আনন্দের ঢল,—একটা বরাভয়ের আশ্বাস—আমার প্রতি কাজে, চিন্তায়, ঝঞ্ঝায়, বিপদে, শঙ্কায় তিনি আছেন আমার পাশেই। যেই ভাবা অমনই মনে হল যে তিনি শুধু আমাদের সবার সাথী নন। তিনি আছেন বলেই আকাশের প্রতি তারা আমার, চাঁদ আমার। ঐ পাহাড়, নদী, হাজারো তৃণ, লতা, ফুল কে সাথী নয়? এ সংসারে একলা কে? ঐ যে চাঁদ, তারা, গ্রহ, উপগ্রহ সবাই একলা পথে চলছে বলে কি সত্যি ওরা নিঃসঙ্গ? কত অদৃশ্য আকর্ষণ, বিকর্ষণ ওদের ধরে রয়েছে তাই না ওরা চলে? স্পষ্ট অনুভব করলাম যে শূন্যের পিছনে এক পরম অবলম্বন সদা সজাগ। নৈলে এ নিরাকারে এত আকারের সমারোহ এল কোথা থেকে? সেদিন মনের তারে বারবারই বেজে উঠতে লাগল বহু উপলব্ধ একটি অনুভূতির সুর—যখন আমাদের চলার পথে মনের মুখর প্রদীপ আর কাজে আসে না—তখনই জ্বলে ওঠে হৃদয়ের তল থেকে সেই মৌন আলো, যে শুধু দেখায় না, দেখে। যে শুধু শোনায় না, শোনে।

এ উপলব্ধির আলো থাকে সুপ্ত। হাজার শিখায় জ্বলে ওঠে তখনই—যখন সংকটের আঁধারে ভুবন ঢেকে যায়। আর এসব নিয়ে অন্যের সঙ্গে তর্ক করার মত বিড়ম্বনা আর কিছু নেই। কারণ এ অনুভব যার হয়নি—আর যার হয়েছে তাদের মধ্যে প্রকাশের এমন কোনো ভাবমাধ্যম নেই যা দিয়ে ভাববিনিময় হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে বিছিয়ে গেল এক গভীর শান্তি এই ভেবে যে বিশ্বভুবনে সবাই যদি আমার এ অনুভবকে অস্বীকার করে তাহলেই বা কি আসে যায়? যার হৃদয়ে এ আলো একবারও জ্বলেছে সেই বোঝে এ আলোর ক্ষণ-আবির্ভাবেও যুগান্তরের তামস কেটে যায় এক লহমায়, যেমন করে পরমহংসদেবের ভাষায় হাজার বছরের অন্ধকার কাটে চকমকির একটি ঝলকে।

রাণাই আমার জীবনে এমন দিব্য অনুভূতির স্বাদ এনে দিয়েছে। তাই বারবারই মনে হয়েছিল [illegible] সন্তানই নয়, স্বয়ং বালগোপাল আমার ঘরে এসেছেন রাণারই রূপ ধরে। নাহলে এতটুকু শিশু কেমন করে আমার চোখের সামনে এতবড় আনন্দলোকের দ্বার খুলে দিতে পারল?

গত দুবারের বিদেশভ্রমণে আনন্দের ঘাটতি ছিল না। কিন্তু এবারের আনন্দ যেন আমার চেতনার জগতে মস্ত একটা রূপান্তর ঘটালো। তাই এ ভ্রমণস্মৃতি শুধু আমার হৃদয়ের পরম সম্পদই নয়,—জীবনের ধ্রুবতারা। এরপর যখনই সংশয়ে মন আচ্ছন্ন হয়েছে বিপদের ভ্রূকুটিতে চোখের সামনে নেমে এসেছে অন্ধকার—তখনই মনে হয়েছে তিনি ত আছেন—যিনি চরম সংকটের সীমা থেকে আমার রাণাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তবে আর ভয় কাকে?

ফেরার পথে বোম্বে হয়ে এলাম। বোম্বেতে অনেকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হয়েছিলো। এখানের চিত্রজগতে বহির্মুখী চটক, মত্ততার প্রাবল্য ও উত্তেজনার চমকের প্রখরতা আছে মানি। মানি—এখানের চিত্রে কোনো বড় স্বপ্ন অথবা তপস্যার প্রশান্তির দৈন্য। কিন্তু সব মেনেও একটা কথা না মেনে পারি না যে এখানের অভিনেতা অথবা অভিনেত্রীরা দেহসৌষ্ঠবকে অনাহত রাখবার জন্য যে অনলস পরিশ্রম করেন তার একাগ্রতাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। দেহলাবণ্যের একটা মূল্য আছেই। চোখকে উপবাসী রেখেও মনের দ্বারে নাড়া দেবার মত ব্যক্তিত্ব তা 'কোটিকে গোটিক'। গড়পড়তা জীবনে রূপের রাজাসন অস্বীকার করতে পারে কে?

মেজদিদি চিত্রের একটি দৃশ্যে

পাশ্চাত্যের কোন এক কবি যেন বলেছিলেন যার রূপ আছে তার অন্য কিছু না থাকলেও চলে। এতটা রূপপ্রশস্তি অবশ্যই বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ে। তবু রূপসী নারী অথবা রূপবান পুরুষ সৌন্দর্যপিপাসুকে আকর্ষণ করেই।

এই রূপকে অচঞ্চল রাখতে হলে যে মূল্য দিতে হয় তা দিতে পেছপা নয় বলেই বোম্বাই তারকারা এত মনোহারিণী। ব্যায়াম, সাঁতার, রাইডিং, নৃত্য, আসন ওদের দৈনন্দিন জীবনের অবশ্যকর্তব্য তালিকার মধ্যেই পড়ে। এই প্রাণচাঞ্চল্যের দিকটি আমার ভারী ভাল লাগে। বাংলাদেশের শিল্পীদের এদিকে একটু তৎপর হওয়া দরকার।

এইপ্রসঙ্গে মনে পড়ে চিত্রজীবনের প্রথমের দিকে আমি এদিকটায় শৈথিল্য করিনি। নিয়মিত ঘোড়ায় চড়া, সুইমিং, ড্রাইভিং—আমারও নিত্যকর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'রাইডিং এক্সপার্ট' আখ্যাও পেয়েছিলাম। কত অনায়াসে, কত উঁচু উঁচু হার্ডলজাম্প করতে পারতাম। একবার একটি আনকোরা নতুন ঘোড়া নিয়ে হার্ডলজাম্প করবার সময় ঘোড়াটি বোল্ট করে আমায় ফেলে দেওয়ায় জ্ঞানহারা হয়ে পড়ি। জ্ঞান হতে দেখি বাড়ীতে শুয়ে। চারপাশে ডাক্তার-নার্স। ডাক্তার বললেন—স্পাইন্যাল কর্ড ফ্র্যাকচারড্। সেই থেকে রাইডিং ছেড়ে দিতে হোল।

'সাথী'তে অভিনয় করবার সময় কিছুদিন নাচ শিখেছিলাম, শম্ভু মহারাজের কাছে। উনি জানতেন ছবির প্রয়োজনেই অল্প কদিনের জন্য নাচ শিখেছি। তবু স্বল্পকালীন শিক্ষাদানেও ও'র কোথাও এতটুকু শৈথিল্য দেখিনি। ঠিক তেমনই স্নেহে, যত্নে ও সস্নেহ পর্যবেক্ষণে পন্ডিতজী শেখাতেন প্রতিটি তোড়া, ভাও, পদক্ষেপণ যেমন করে আশ্রমের গুরুরা শিক্ষা দিয়ে থাকেন তাদের নাড়া-বাঁধা শিষ্য-শিষ্যাদের। পান্ডিত্য, নিষ্ঠা ও সরল বিনয়ের এক পরিণত চিত্র যেন শম্ভু মহারাজ। আমাকে উনি বলেছিলেন 'নাচ ছেড়ো না। এ নাই বা হোল তোমার পেশা। নাচের আনন্দ তোমার ভাবনায়, চলনে একটা ছন্দের মাধুর্য এনে দেবে, সব ক্লান্তি ভুলিয়ে দিল ভরিয়ে রাখবে। তোমার এমন পদ্মফুলের মত চোখ, নমনীয় দেহ নাচেরই উপযুক্ত আধার। ভগবান সকলকে কি এ জিনিস দেন ?'

নাচতে আমারও খুব ভাল লাগত। কিন্তু অনেকেই তখন বলেছিলেন নাচলে গানের গলা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই নিয়মিতভাবে নৃত্যের রেওয়াজ রাখা সম্ভব হয়নি!

কিন্তু নাচ যে কি তীব্র আনন্দ শিহরণের দোল জাগাত দেহমনে। মনে পড়ে 'সাথী'তে নাচের দৃশ্য স্যুটিং-এর আগে ক্রমাগত ৮ ঘণ্টা রেওয়াজ করে চলেছি, একটুও না থেমে। সবাই বললেন, এত পরিশ্রম হোল সেদিনটা না হয় টেক মুলতুবী থাক। পরের দিন হবে। আমি

বোম্বাইয়ে শান্তারামের সঙ্গে

নবিধান চিত্রে

বলতাম, 'থামলে আর পারব না। যত রাতই হোক সেদিনই 'ফাইনাল 'টেক' হওয়া চাই।' তারপর দেখা গেল রাত রাতই থেকে গেল। একদিন বেলা ১টা থেকে পরদিন সকাল ৭টা অবধি স্যুটিং চলেছিল।

পরদিন গা, হাত, পায়েই শুধু প্রচণ্ড ব্যথা নয়, পা ভীষণভাবে ফুলে গিয়েছিলো—আর সে ফোলা কমাতে সাত দিন সময় লেগেছিল। কিন্তু সব ব্যথা ভুলে গিয়েছিলাম একটি আনন্দের অনুভূতিতে, টেকটা ত সুন্দরভাবে হয়ে গেছে।

আজ ভাবি,—তখন প্রতিটি কাজের মধ্যে ছিল কত পরিশ্রম, কত উৎসুক প্রতীক্ষা—কিন্তু এতটুকুও ক্লান্তিকর মনে হয়নি ত। উৎসুক চিত্তে প্রতীক্ষা করেছি পরের মুহূর্তের ফলাফল দেখবার জন্য। সে রোমাঞ্চের অভিনব স্বাদ আজকের শিল্পীরা কল্পনা করতে পারবেন?

যাই হোক,—দেশে ফিরলাম খুব উৎফুল্ল মন নিয়েই। ওদেশে যাবার আগেই 'রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত' এবং শ্রীকান্ত ও অন্নদাদিদি'র কাজ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিলো এবং 'শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী' মুক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং হিট পিকচার্সের তালিকাভুক্ত হয় বলা বাহুল্য দুটি ছবিরই পরিচালক ছিলেন হরিদাস ভট্টাচার্য।

'রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত'র নায়ক-নায়িকা ছিলেন সুচিত্রা ও উত্তম—বাংলা চিত্র জগতের তাতানত আকর্ষণীয় জোড়।

আগে সুচিত্রার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছি। মনে আছে সুচিত্রার পর পর কয়েকটি ছবি হিট করার পর ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিরই একজন এসে বললেন, 'সত্যিকারের একজন হিরোইন ফিল্মে এসেছেন ম্যাডাম। শিল্পীর সব ক্যাপচার করেছেন বলে। ঠিক আপনার মতন দেখতে।'

খুব স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল জেগেছিলো ওর অভিনয় দেখবার। দেখেই মনে

পুরস্কার গ্রহণ করছেন কানন দেবী

হয়েছিলো ছবিতে কাজ করবার সবচেয়ে বড় গুণ যাকে বলে ফটোজিনিক ফেস তাতে ও অতুলনীয়া। এইজন্যই ও চট করে দর্শকচিত্ত আকর্ষণ করতে পারে। ওর চেহারার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হোল দুটি চোখ আর হাসি। চাউনীর মধ্যে একটা বিস্ময় ও ইনোসেন্স ওকে এমন মায়াময়ী করে তোলে। এইরকম নানান কথা ভেবেছিলাম ওর সম্বন্ধে। ও বড়, আরো অনেক বড় হবে সে সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিন্তো এলাম ওর একটা ছবি দেখেই।

'রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত'র কাজের সময় ওকে নতুন করে জানলাম। খুব আনন্দোজ্জ্বল, প্রাণচঞ্চল স্বভাবের মেয়ে—যাকে বলে স্পোর্টিং।

নানান গল্পগুজব করতে করতে একবার ওকে বলেছিলাম, 'সুচিত্রা', তুমি নাম করেছ। আরও অনেক নাম করবে। অনেক বড় হবে। কিন্তু প্লীজ, টাকার জন্য আজেবাজে রোল এ্যাকসেপ্ট করে নিজের প্রতিভার অপচয় ঘটতে দিও না। এ কাজ আমাদের করতে হয়েছে এবং তার জন্য চিরগ্লানির হাত থেকে রেহাই পাইনি। কারণ ওতে নিজের শিল্পীসত্ত্বাকে বিড়ম্বিত করা হয় যে অধিকার আমাদের একেবারেই নেই। সে সত্য তখন বুঝিনি, আজ বুঝেছি। ওর মনও একথায় সায় দিয়েছিলো।

...তারপর কত বছর কেটে গেছে। আজ স্থির নক্ষত্রের মতই আপন স্বাতন্ত্র্যে আপনি উজ্জ্বল। নিজেকে দুর্লভ রাখতে জানে বলেই আজও ও ফুরিয়ে যায়নি।

আরো একটা কারণে বয়সে ছোট হলেও সুচিত্রার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। আমাদের যুগ ছিল ডিকটেটরশিপের যুগ। মন সায় না দিলেও ডিরেক্টর, প্রোডিউসরদের অনেক অন্যায় জুলুম আমাদের মানতে হয়েছে। কারণ সে অধ্যায় শিল্পীদের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র নয়, কর্তৃপক্ষের অহমিকা-বিকাশের যুগ। কিন্তু সুচিত্রা সে যুগ উল্টে দিয়েছে। প্রথম যুগের সকল অবিচার, অত্যাচার অন্যায়ের প্রতিবাদ,—এক কথায় একটা যুগের বিদ্রোহ ওর মধ্য দিয়ে কথা বলে উঠেছে।

অনেকসময়ই ওর উগ্রতা হয়ত অনেককে অসহিষ্ণু করে তোলে। কিন্তু

ফয়শালা/কানন দেবী এবং পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক পর্বতের বাধা, খাদ, গহ্বর, অসমতল পথ অতিক্রম করে আসা নদীর বেগ দুর্বার দুর্দমনীয়। সুচিত্রাও তাই। প্রচলিত সংস্কার, প্রথার বেড়া ভাঙার বিদ্রোহে উগ্রতা ত থাকবেই। পরে যখন ব্যালান্সড হবে সবই স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। যে প্রতিবাদ জানানো নানান কারণে আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি—তা এসেছে ওরই মাঝ দিয়ে। এইখানেই ও অনন্যা। এ সত্য মানতেই হবে।

ব্যক্তিগতভাবে ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই মধুর। কয়েকবছর আগে আমার হার্ট অ্যাটাকের খবর পেয়েই ও খবর নিয়েছে, দেখতে আসতে চেয়েছে। তখন ডাক্তারের অনুমতি ছিল না,—তাই আসতে পারেনি। কোলকাতার বাইরে চলে গেছে। এসেই আবার খবর নিয়েছে। ওর এই স্নেহ-সজল উদ্বেগ আমি সকৃতজ্ঞে স্মরণ রাখব।

পরের ছবি 'ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও অন্নদা-দিদি'তে অন্নদাদিদির চরিত্রে নিজেকে যেন নতুন করে খুঁজে পেলাম। স্বামীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেও অন্নদাদিদি কুলত্যাগিনী ধর্মভ্রষ্টা। কি বিচিত্র বিধান। বিকাশবাবু অন্নদাদিদির স্বামীর ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করেছিলেন। ওঁর অভিনয়-প্রতিভার ডাকেই শাহজী যেন বই-এর পাতা থেকে উঠে এসে পর্দার বুকে দাঁড়িয়েছিলেন।

প্রযোজিকা জীবনের নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে এক কৌতুকবহ অভিজ্ঞতার কথা আজও ভুলতে পারিনি। কোন এক হিরোইন, প্রতিদিন সকালে সাঙ্গপাঙ্গোসহ সেটে এসেই তার অর্ডার হোত ৬টা হাফ বয়েলড ডিম, এক পাউন্ড রুটি আর—একটিন মাখন। লাঞ্চে চাইনীজ হোটেলের ফ্রায়েড রাইস আমজাদিয়ার চিকেন রোল, আমিনীয়ার চাপ, স্কাইরুমের চিকেন স্ট্রোগানফ। বিকেলে চাই মুড়ি, গরম তেলেভাজা সমেত ২ পট চা, আঙগুর, আপেল, কমলালেবু, কলা, পেঁপে এবং সম্ভব হলে আরো রকমারী ফল।

বলা বাহুল্য, এ সকল চাহিদাই পূর্ণ করতে হয়েছে বিনা বাক্যব্যয়ে, আর মনের পটে ভেসে উঠেছে পাশাপাশি দুটি ছবি। দুটি যুগের। একযুগের নায়িকাকে সেটে এসে অবধি আপন আসেন ত্রস্ত হয়ে বসে থাকতে হয়েছে প্রতিমুহূর্তে পরিচালক ও কর্তৃবৃন্দের নির্দেশ ও আদেশ তামিলের প্রতীক্ষায়। সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রমের পর লাঞ্চ হিসাবে কপালে জুটত ডাল, ভাত, একটুকরো মাছ, আর স্পেশ্যাল লাঞ্চ যেদিন থাকত, পাওয়া যেত দু-এক টুকরো রুটি মাংস ও একটুকরো আলু।

পরের যুগ। চর্বচষ্যলেহ্যপেয় নিয়ে কর্তৃপক্ষ হিরোইনদের সেবায় রত, তাঁর তুষ্টি বিধানে ব্যগ্র। তাঁর মুড যাতে নষ্ট হয়ে না যায় তার জন্য সদাসন্ত্রস্ত।

নিস্পৃহ দর্শকের দৃষ্টিতে দেখলে এও এক উপভোগ্য অভিজ্ঞতা বইকি।

(চলবে)

—অনুলিখন সন্ধ্যা সেন

দুঃখে সুখে বাঁচা

নিখিলচন্দ্র সরকার

॥ বারো ॥

সানু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। উত্তুরে হাওয়া বইছে মাঝে মাঝে। বেশ শীত করছিল তার। গায়ের শালটা আরো টেনে-টুনে নিয়েছে। চোখমুখ টানছে, কিসের শ্রান্তি যেন গোটা শরীরে। ঠোঁট দুটো শীতে ফেটে ফেটে গেছে। একটু টান পড়লেই ব্যথা লাগছে। জিভ দিয়ে তাই ঠোঁট ভিজিয়ে নিচ্ছিল বারবার। বারান্দায় ও পায়চারি করছিল। কাল কেন যেন সে ঘুমোতে পারেনি। রাতভর খালি ছটফট করেছে। অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে কত কী ভেবেছে। এখনও মাথাটা গরম হয়ে রয়েছে। ঘুমটা একটু পরে পরেই ছিঁড়ে গেছে। সন্দীপ, সন্দীপই তাকে এমনটা করেছে! অথচ মুখ ফুটে কাউকেই সে একথাটা বলতে পারছে না। এতদিন পরে যে আবার কখনো তার সঙ্গে দেখা হবে, ভাবতেই পারেনি। চোখ দুটো জ্বালা করছিল। মা কেমন অবাক চোখে তাকে দেখছিল। উৎকণ্ঠার গলায় জিজ্ঞেস করেছে, 'কি হয়েছে রে তোর, এমন দেখাচ্ছে কেন?'

সানু লজ্জা পেয়ে গেছে। তার কেন যেন মনে হচ্ছিল, সে গোপনে যা কিছু ভেবেছে, সবই বুঝি মুখের উপর ফুটে উঠেছে। এই বুঝি ধরে ফেলেছে। মাকে সে সাহস করে সন্দীপের কথাটা বলতে পারে নি। কোন রকমে সে বলেছে, 'না, কিছু হয়নি।' ভাল করে বোঝা গেল না কথা-গুলো। বলতে বলতে কলতলায় গিয়ে ভাল করে জল ছিটিয়েছে চোখে মুখে। ফিরে এসে অল্প একটু হেসে বলেছে, 'ভাল ঘুম হয়নি।' অথচ কি যেন একটা সন্তর্পণে গোপন করে গেল। মা তবু তার দিকে এমন-ভাবে চেয়ে রইল যে সানু চোখ নামিয়ে নিয়েছে। চা খেয়ে গায়ে চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে বারান্দায় এলো।

মানু তখন ঘুম থেকে উঠেছে, কল-তলায় গেল।

সবে কুয়াসা ঠেলে ঠেলে রোদ ঝিকি-মিকি করে উঁকি দিয়েছে। গাছে গাছে কাকের দল ডাকছে, পাখিদের চীৎকার। ফুলের গন্ধ। দূরের মাঠ খেত তখনো ঘন কুয়াসায় শুয়ে রয়েছে। গাছের পাতা থেকে টুপটাপ করে ফোঁটা ফোঁটা হিম পড়ছিল। ঘাসের ওপর কিরণ পড়ায় চকমক করছে। ভোরের এমন স্নিগ্ধ স্বর্গীয় সুষমাভরা রূপ এখানে এসেই যেন সে প্রথম চোখ মেলে দেখেছে। এত বড় আকাশ কলকাতায় কখনো চোখে পড়েনি তার। সেখানেও তো অনেক ভোরেই উঠেছে সে, তবু এখানকার সঙ্গে কলকাতার অনেক তফাত। তাদের বাসায় আলো ঢোকে অনেক পড়ে, তাও দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়। নিছক রসিকতা যেন। তাদের বাসার তলাতেই রাত একটু গভীর হলে রাস্তার ওপর বড় বড় ট্রাক বিশ্রাম নিত, আবার ভোর হতে না হতেই বিকট আওয়াজ করতে করতে চলে যেত। এই ছবি শুধু ছেলেবেলা থেকেই তার মনে গাঁথা হয়ে গেছে। এরপর একে একে শব্দের এলোমেলো খেলা শুরু হয়ে যেত। কোন কোন দিন অস্ফুট আলোয় ঘুম ঘুম চোখে দেখেছে কারা যেন গঙ্গায় স্নান করতে চলেছে। আবার কখনো বা শুনেছে, আবছা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে কিছু লোক 'রাম নাম সৎ হায়' বলতে বলতে নিমতলার দিকে চলে যাচ্ছে। এমনি টুকরো টুকরো আরও কত ছবি। সব মনেও পড়ে না। কি ভেবে হাসি পেল তার।

মানু বাইরে এলো। দিদির দিকে চেয়ে কি মনে করে সেও একটু হাসল, বলল, 'কি দেখছিস রে দিদি অমন করে?'

সানু ওকে দেখল একবার। সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিল না।

মানু এরই মধ্যে কিছুটা সাজগোজ করেছে, মুখে ক্রীম, শাড়ি পাল্টেছে, চুল আঁচড়ে খোঁপা করেছে। গায়ে অলেস্টার। বেশ দেখাচ্ছিল ওকে। স্বাস্থ্যটাও ওর অনেক ফিরেছে। আগের চেয়ে আরো চটপটে খুশি খুশি দেখায়। গায়ে মুখে লাবণ্য ওর বেড়েছে। ওকে বেশ সুন্দর লাগে আজকাল।

সানু বোনের দিকে কিছুক্ষণ অপলকে চেয়ে থাকল। ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কী যেন তার মনে পড়ে গেল। এই ভোরেই বুকের ভেতরটা কেন যেন খচ করে ওঠে। ওকে দেখতে গিয়ে কখন যেন নিজের কথা মনে পড়ল। পুরনো ছবি-গুলো একে একে তুলে আনল। সবে কিশোরী বয়েসটা গা থেকে খুলেছে এবং যৌবনের উত্তাপে ভরা দিনগুলোয় সেও তো এমনি উজ্জ্বল হয়েছে, কত ভাবে যে নিজেকে সাজিয়ে তুলেছে সেদিন। তার এই প্রসাধন নিয়ে মা কতদিন রাগারাগি করেছে। সন্দীপ-দা যখন তাকে প্রথম পড়াতে এলো, তার সাজগোজ দেখে কেমন এক ধরনের চোখে সে তাকিয়েছিল। সেখানে যেন নীরব একটু তিরস্কারই ছিল। সাজতে তার ভালই লাগত। অথচ সে দিনগুলোর কথা মনে হলে শুধু দুঃখই বাড়ে আজ। কতদিন হয়ে গেল! একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। মানুর প্রশ্নের কি জবাব দেবে সে। সত্য সত্যই কি কিছু দেখছিল সানু? অথবা বলা যায়, সব কিছুই সে কেমন উদাস শূন্য দৃষ্টিতে দেখছিল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে অন্য কথা ভাবছিল। এই মুহূর্তে তার পক্ষেও বলা মুসকিল, আদৌ সে কিছু দেখছিল কিনা। সে কি তন্ময় হয়ে কিছু দেখছিল? কি দেখবে, এই তরুলতা পাখি আকাশ কিংবা অন্য কোন পবিত্র ছবি-টবি? আরো কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে সানু পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আজ কদ্দুর যাবি?'

'কদ্দুর আর!' মানু খিল খিল করে হাসল। সিঁড়ি পেরিয়ে সে বাগানে পা দিল। পরে দিদির মুখের ওপর চোখ রেখে বলল, 'বিশ্বাস কর তুই, বেশি দূরে যাব না। কাছাকাছিই হাঁটবো।' মানু কি ভেবে আবার বলল, 'চল না ঘুরে আসি একটু।'

সানু ইতস্তত করল, বলল, 'বেশি হাঁটাহাঁটি করলে দম ফুরিয়ে যায়।'

'সেরকম বুঝলে হাঁটাব না।' মানু বাগান থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে নিল, পরে ফের বলল, 'ভোরের বাতাসটা খুব ভাল। এটা কলকাতায় গিয়ে আর পাব না।'

'চল তাহলে।'

রাস্তায় ঘাস তখনো ভেজা। সানু আস্তে আস্তে হাঁটছিল। মানু খানিকটা এগিয়ে গেছে। কিছুদূর এগোতেই অতসীর সঙ্গে দেখা। হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো অতসী, বলল, 'সানুদিকে আজ কেন কি রকম লাগছে একটু!'

'কি রকম?' সানু অতসীর মুখের ওপর চোখ দুটো আলতোভাবে ছুঁইয়েই ধীরে ধীরে গুটিয়ে নিয়েছে।

অতসী হেসে ফেলেছে, 'সে বলতে পারব না।' একটু পরে আবার বলল, 'জান সানুদি, আমি আর মানু না মাঝে মাঝে বেশ মজা করি।'

'তোমাদের মজা করার এই তো বয়েস।'

'কী যে বল না সানুদি, তুমি যেন দিদিমা ঠাকুমার মতন বুড়ী হয়ে গেছো।'

'তা বলতে পার।' সানু বলল।

'যাই বলো, ঘরে বসে থাকতে থাকতেই তোমার এই অবস্থা।' অতসী হাসল।

মানু আর অতসী এগিয়ে গেছে। সানু ধীরে ধীরে হাঁটছে। একটা বাড়ির কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে মানু, বলল, দেখতো অতসীদি, ফুলগুলো কেমন রাস্তার ওপর এসে পড়েছে!' বলে চারিদিকে সে তাকাল। বোঝা যাচ্ছে, কিছু একটা মতলব আছে।

কামিনী ফুলের গাছ, গাছে থোকা-থোকা ফুল। কয়েকটা ডাল রাস্তার ওপর এসে নুইয়ে পড়েছে। অতসী হেসে বলল, 'ওভাবে দেখছো কি, কয়েকটা ডাল ভেঙে নিলেই হয়।' বলে এগিয়ে গেল অতসী। ছোট ছোট কয়েকটা ডাল ভাঙল। মানুও তাই। ছোট ছোট পাতায় তখনো শিশিরকণা, দু-একবার নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকল।

সানু বারণ করল, 'এই চলে এসো অতসী, কে কি বলবে আবার।'

অতসী হাসতে হাসতে বলল, 'কিচ্ছু বলবে না।'

মানু আর অতসী খেলা করতে করতে এগোচ্ছে। আরো অনেকে বেড়াতে বেরিয়েছে। গাছগাছালি মাটির একটা গন্ধ উঠছে। দুজনের মধ্যে কিসের এক প্রতিযোগিতা যেন। সানু আরো পেছনে পড়েছে। এভাবে হাঁটতে তার ভালই লাগছে। অতসীরা অনেকটা এগিয়ে গেছে। সেই গাছ পর্যন্ত এসে গেছে। আরো অনেকটা সে যেতে পারে। আজ কোন কণ্ট হচ্ছে না হাঁটতে। আর এগোবে নাকি? দুর্গা মণ্ডপ তো বেশি দূর নয়। সন্দীপদাদের কোন্ বাড়িটা? সে দাঁড়িয়ে পড়েছে। গাছে হেলান দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কোন ফাঁকে আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

খানিক পরে সেই ঘোর কাটলে, সানু দেখে, তার সামনে সন্দীপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মুখে অল্প অল্প হাসি। সানু অবাক হলো। অত আকাশ পাতাল কি ভাবছিল সে! মানুষটা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এটা সে একেবারেই টের পেল না। এমনই তন্ময় হয়ে ছিল? কেমন বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকল খানিকক্ষণ। পরে চোখ আনত করল।

সন্দীপ ধীরে ধীরে বলল, 'দূর থেকে মনে হলো তুমি, একদৃষ্টে কী দেখছো যেন, আমি হাসলাম, অথচ কোন সাড়াশব্দ নেই। তবে কি আমিই ভুল করেছি? কাছে এসে দেখি, হ্যাঁ, আমি ঠিকই দেখেছি।' সন্দীপ ম্লানভাবে হাসল এবার, পরে মুখের ওপর চোখ রেখে বলল, 'চিনতে [illegible] না, কি ব্যাপার?' [illegible]

'তা নয়, এরকম খেয়াল করিনি।' সানু চোখ আনত রেখেই বলল।

'কিন্তু এখানে একা একা এভাবে দাঁড়িয়ে আছ?'

'একা নয়, মানু অতসীও আছে। ওরা এগিয়ে গেছে। আমি ওদের মতন অত হাঁটতে পারব কেন!'

'অতসী!' নামটা শুনেও কিছুই বোঝা গেল না।

'তুমি ঠিক চিনবে না।' সানু ওর চোখের দিকে তাকাল, একটু পরে বলল, 'এখানে এসেই প্রথম আলাপ, বড় ভাল মেয়ে।'

চুপ করে থাকল সন্দীপ, একটু পরে বলল, 'মানুকে তো চেনাই যায় না এখন, কেমন গিন্নী গিন্নী চেহারা হয়ে গেছে।'

'সব সময় কি আর এক চেহারা থাকে!' বলতে বলতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সানু। চোখ দুটো তার কী এক বিষাদে ভরে উঠেছে। টলটলে ভেজা ভেজা চোখ দিয়ে সে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকল সন্দীপের দিকে, পরে অনুচ্চ, ঈষৎ ক্লান্ত গলায় বলল, 'তুমি যখন দেখেছো, তখন ও অনেক ছোট।'

'তাই হবে। দেখতে দেখতে কতগুলো বছর হয়ে গেল!' মুহূর্তের জন্যে সন্দীপ অন্যমনস্ক হয়েছিল। এই ক' বছরের মধ্যে একবারও ওদের সঙ্গে দেখা হয়নি তার। অথচ অনেক কিছুই ঘটে গেছে এর মধ্যে। সবই সে শুনেছে। মনে মনে কণ্ট পেয়েছে। কিন্তু তীব্র এক অভিমানে কোথাও যেতে পারে নি। কেন যাবে? যদি ওরা তাকে আগের মতন না নেয়? সন্দীপ সানুর দিকে চেয়ে চেয়ে কি ভাবল। মৃদু হেসে পরে বলল, 'তোমাদের সঙ্গে আবার যে দেখা হবে ভাবি নি।' সন্দীপ অন্যদিকে চোখ ফেরাল।

'আমিও তো অবাক হয়ে গেছি।'

'যাক ওসব কথা, তোমরা আরো কিছুদিন এখানে থাকবে তো?'

'সেরকমই ইচ্ছে, তবে অনেক দিন তো হয়ে গেল!' সানু আরো কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, 'এত দেরি করে এলে তোমরা? এখন তো চলে যাওয়ার পালা; শীতও ফুরিয়ে এলো বলে।'

'তাতে ক্ষতি নেই, আমরা মাস দুয়েক আরো থাকবো এখানে। খুব শীতের চেয়ে এ সময়টাই মার পক্ষে ভাল। এ ক'বছর কী যে কণ্টা পেয়েছে মা, ভাষায় বলা যাবে না।'

'চেহারাও তো ভীষণ ভেঙে পড়েছে।'

'বয়েস হয়েছে, সে না হয় এক-আধটু ভাঙল, কিন্তু কণ্ট? চোখে দেখা যায় না।'

'তোমার শরীরও তো খারাপ হয়ে গেছে।' সানুর গলায় মমতা ছিল।

'আমার জন্যে আর ভাবি না।' উদাসীনের মতন কথাটা বলে হাসল সন্দীপ।

সানু কিছুক্ষণ মুখ নীচু করে রইল। ওর বলার মধ্যে এক ধরনের অভিমান ছিল। একদিন তো ও অনেক কিছুই ভাবত। আজ আর ভাবে না। এসব কথা শুনলে ভীষণ কণ্ট হয় [illegible] যেন

গরগর করে ওঠে। ধীরে ধীরে মুখ তুলল সানু। একটু পরে নম্রকণ্ঠে শুধোল, 'মাসীমাকে আনলে না?'

'আজ আর বেরোতে চাইল না। তাছাড়া ট্রেন ফেলের ধকলটা একটু সামলে নিক।'

সানু কিছু বলল না। আরো খানিকক্ষণ সে চুপ করে থাকল। তার মনের মধ্যে অন্য একটা চিন্তা উঁকি দিল, বলল, 'ঘরের কাজকর্ম তাহলে কে করে?'

'কে আবার, আমি।' শেষের শব্দটার ওপর সামান্য জোর দিয়ে হেসে ফেলেছে সন্দীপ।

'খুব কাজের হয়েছো তাহলে বল!' সানুও হাসল মুখ টিপে।

'উপায় কি!' সন্দীপ তখনো ওর চোখের দিকে চেয়ে আছে।

'কোন উপায়ই কি আর ছিল না বলতে চাও!' সানু অন্যদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি ভেবে হাসল সামান্য।

'থাকলে কি সাধ করে আর কণ্ট করে কেউ!'

'কেউ করে কিনা জানি না, তবে তুমি করছো দেখতে পাচ্ছি।' সানু এবার ওর চোখে চোখে তাকাল।

'বেশ তো, আর যাতে না করতে হয়, সেরকম কিছু একটা কৌশল বলে দাও না।'

'বললে শুনবে তো?' সানু ঘাড় হেলিয়ে হাসল।

'আগে না শুনে আর কথা দেবো না।'

সন্দীপের কথার মধ্যে সামান্য অভিমান ও বেদনা ছিল। কথাটা তাকেই বলা। কথা কি শুধু সে-ই রাখতে পারে নি! সব দোষ কি তার একলার? সামান্যক্ষণ কোন কথা বলল না সানু। শেষে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'এবার একটা বিয়ে করে ফেল।'

সানুর এই কথায় সন্দীপ যেন সামান্য আহত হয়েছে। সে কোন কথা বলল না আর। এক পলক সানুকে শুধু দেখল। মুখ থেকে তার হাসি হাসি ভাবটা কখন যেন মিলিয়ে গেল। একটু গম্ভীর দেখাচ্ছিল। সানু কি সত্য সত্যই তার এই অবস্থার কথা শুনে তাকে সহানুভূতি দেখাচ্ছে, না অন্য কিছু? ঠিক বোঝা গেল না। আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'মাও এই কথাই বলে।'

'উনি ঠিকই তো বলেন।'

'ঠিক বেঠিকের ব্যাপারটা তো সবার কাছে আবার এক রকম নয়!

'তোমার ভালর জন্যেই এসব বলা।'

সন্দীপ ম্লান ভাবে হাসল, এবার বলল, 'কি জান সানু, ভাল মন্দর ব্যাপারটা আমার কাছে আজকাল একই রকম মনে হয়। কোনটাতেই আর তেমন সুখও নেই, দুঃখও পাই না।' সন্দীপ তাকাল ওর মুখের দিকে। কেমন অনাসক্ত ও ক্লান্ত শোনাল গলাটা। পরে কি ভেবে আবার বলল, 'মা আর এসব নিয়ে কিছু বলে না আজকাল, বলে বলে যখন দেখে, কিছুই হওয়ার নয়, তখন [illegible]'

'এ যে দেখছি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।'

'না, ঠিক তা নয়, এমন প্রতিজ্ঞা করার স্পর্ধাও আমার নেই।' একটু থেমে কি ভাবতে ভাবতে সন্দীপ আবার বলল, 'আমি কিন্তু বিয়ে করতেই চেয়েছিলাম। ঘটনাচক্রে হয়ে উঠলো না। এটাকেই আমি মেনে নিয়েছি এই পর্যন্ত, ওসব প্রতিজ্ঞা টতিজ্ঞা কিছু নয়।' বলে হেসে ফেলেছে সন্দীপ।

সানু চুপ করে গেল। তাকে কেমন করুণ, ম্লান দেখাচ্ছে। খানিকক্ষণ পরে মুখ তুলতে তুলতে বলল, 'আমাদের জীবনে কত রকমের ঘটনাই তো ঘটে, তার সবগুলোই কি মনে রাখতে হয়?'

'সব হয়ত মনে থাকে না, থাকবার কথাও নয়; তবে এমন ঘটনাও থাকে, যা ভোলা তো যায়-ই না, বরং জীবনের মোড়টাকেই অন্যমুখী করে দেয়।'

'এতে কি লাভ সন্দীপদা?'

'হয়ত কিছু একটা আছে, না হলে এমন হবে কেন?'

'নিজেকে বড় অপরাধী লাগছে আজ।' সানুর গলা ধরে এলো।

'মন খারাপ করে লাভ নেই, আমাদের যার যেটুকু পাওনা পেতেই হবে।'

'আমাকে যে আরো বেশিই পেতে হয়েছে।'

'আমি কিন্তু তোমার আশীর্বাদই করেছিলাম সানু।'

'সবাই তাই করেছে, আমাকে সুখী দেখতেই চেয়েছে, কিন্তু—।' ঠোঁট কামড়ে ধরেছে সানু। কথাটা সে শেষ করতে পারল না। তার কণ্ঠ রুদ্ধ হচ্ছিল। চোখ কেমন ঝাপসা হয়ে উঠেছে। সে মুখ নীচু করে রইল। ভেতরে ভেতরে গভীর এক আবেগ বোধ করছিল। মুখ দিয়ে শ্বাস বের করে দিল। আঁচল দিয়ে এক ফাঁকে চোখমুখ মুছে নিল।

'তোমার যে এমন হয়েছে, আমি তা অনেক পরে শুনেছি। বিশ্বাস কর, আমিও এতে ভীষণ কষ্ট পেয়েছি।' সন্দীপ টেনে-টেনে কথাগুলো বলল। খানিক পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ম্লান গলায় বলল, 'তখন একবার মনে হয়েছে, তোমার কাছে ছুটে যাই; কিন্তু যেতে পারি নি। পর মুহূর্তেই মনে হয়েছে, তোমার কাছে যাওয়ার অধিকার কি আমার আছে? যা ছিল, তা তো আগেই নষ্ট হয়ে গেছে।'

'যাওনি তখন, ভালই করেছো; কে জানে কষ্ট হয়ত এতে আরো বাড়তই।' সানু কেমন করুণ, শুকনোভাবে হাসল একটু। হেসে বলল, 'আর অধিকারের কথা বলছো, সে কি আজ আমারই আছে!'

'তা না থাকলেও, এখানে এসে তোমাদের দেখে কিন্তু ভালই লাগছে, খুব কাছের লোক বলেই মনে হয়েছে।'

'কাছের লোক!' সানুর কাছে কথাটা যেন উপন্যাসের মতন শোনায়।

'আমরা কিন্তু তোমাকে এভাবেই দেখতে চেয়েছিলাম।' কথাটা বলে আরো কি যেন ভাবল সন্দীপ। মনে মনে যেন ওকে উদ্দেশ করে বলতে ইচ্ছে হলো : আমাদের এ চাওয়ার কি দাম আছে সানু! মা তো সত্যি সত্যি বিশ্বাস করত, এ ঘরে তুমিই আসবে একদিন। তুমিও তো জান, তোমাকে কী ভালবাসত মা। বাবার কথা আমার মনেও পড়ে না, কোন অস্পষ্ট ছেলেবেলায় তাঁকে আমি হারিয়েছি। মা-ই আমাকে অনেক কষ্টের ভেতর দিয়ে বড় করে তুলেছে। আমিও চেয়েছিলাম, মাকে সুখী পরিতৃপ্ত দেখবো। তোমার কথা মার কাছে কিছুই লুকোই নি আমি। আমার মা তোমাকে সেই মর্যাদাই দিতে চেয়েছিল। আমাদের ঘরে কি তোমাকে খুবই বেমানান দেখাত! তুমি জান না সানু, মা খুব দুঃখ পেয়েছিল তোমার খবর শুনে। প্রথমে তো বিশ্বাসই করতে পারে নি। আর আমি? আমার কাছেও এ এক অভিজ্ঞতা।

সন্দীপকে চুপ করে থাকতে দেখে সানু বলল, 'তোমরা চাইলে কি হবে, আমার কপালটাও তো দেখতে হবে!'

সন্দীপ আরো কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, 'ওসব কথা থাক সানু।' দীর্ঘ করে একটা শ্বাস ফেলল ও। ধীরে ধীরে আবার বলল, 'তোমাকে যে শেষপর্যন্ত এই চেহারায় দেখবো, ভাবি নি কখনো।'

'আমিই কি ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে আমার!'

'তুমি যেন এরই মধ্যে কেমন বুড়িয়ে গেছ সানু।'

'তার আর দোষ কি বল।' সানু সোজা হয়ে দাঁড়াল। কি ভেবে হাসল সামান্য। এখানে আসার পর এই প্রথম একটু অন্যরকম লাগছে তার। সন্দীপের চোখে চোখে চেয়ে বলল, 'তুমি কি এখনো সেই আগের জায়গাতেই আছ?'

'না না, সে বাসা কবে ছেড়ে দিয়েছি, তারপরও দুবার বাসা বদলেছি।'

'এখন তাহলে কোথায়?'

'বেহালা।'

'এদ্দূর থেকে স্কুলে আস?'

সন্দীপ হেসে ফেলল, বলল, 'স্কুলও ছেড়ে দিয়েছি অনেকদিন হয়।'

'তবে?' সানুর চোখে বিস্ময়, একদৃষ্টে সে চেয়ে আছে।

'এখন একটা কলেজে আছি; ক কাছেই তাই বাসা নিতে হলো।'

'যাক, তোমার একটা আশা ফলেছে।'

সন্দীপ যেন কি ভাবল এই মুহূর্তে কেমন আচ্ছন্নের গলায় বলল, 'তোমার কথাটা আমি কোনদিনও ভুলবো না স্কুলের কটা টাকা দিয়ে সংসার চলে সুতরাং তোমাকে বিয়ে করার কোন অধি আমার নেই।' গলাটা তার একটু শোনাল।

সানু ক' মুহূর্ত চুপ করে থেকে আস্তে বলল, 'বাবার আর দোষ কি মানুষ তো বাইরেটাই আগে দেখে, বাবাও তাই দেখেছিল।'

'আমি দোষের কথা বলছি না; দিক থেকে তিনি যা করেছেন, হয়ত করেছেন!' সন্দীপ কথা বলতে বলতে চোখে চোখে চাইল, কি ভেবে হাসল। 'তিনি তোমার সুখই চেয়েছেন, তাতে বলার নেই আমার; তবে এভাবে কথা বলে তিনি অন্যভাবেও তাঁর অপছ কথাটা বলতে পারতেন। বিশ্বাস কর; কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন, নিজেকে মনে হয়েছিল।' সন্দীপ এবার মাঠের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত 'আমারই দোষ, আমিও সেদিন জোর পারি নি।' একটু সময় নীরব থাকল খানিক পরে আবার বলল, 'এরপরও কাছে আমি ছুটে গিয়েছিলাম, দেখা না, মাসীমার কাছে তোমাকে হোক একবারটি দেখা করার এসেছিলাম, তুমি আর এলে না!' গলা আর্দ্র হয়ে এলো, চোখ দুটো গাঢ় হয়ে উঠেছে। 'এরপর আর ইচ্ছে না দেখা করতে; বারবার শুধু একটা আমার মনে হয়েছে, তোমার বাবা বাইরেটাই দেখলেন, আর কিছু চাইলেন না।'

'আমরাও বোধহয় তেমন করে পারি নি।'

'হবে হয়ত।'

কিছুক্ষণ পরে সানু বলল, 'ছেড়ে যা গেছে সেসব ভেবে আর কি হবে বল!'

'তা ঠিক, এখন এসব চুলচেরা হিসেব কোন মানেই হয় না। দেখা হলো প্রসঙ্গ উঠলো।' সন্দীপ হেসে ফেলল। এক যন্ত্রণাকে সে যেন খুব সযত্নে ওই হাসি মধ্যে লুকিয়ে নিল। সে অন্যকথা ভাবছি আজ তার সেই ঘোর কেটে গেছে। এতো পরে থাকবার কথাও নয়! দৃষ্টি স্বচ্ছ। তাই নির্মোহ হয়ে সে আজ করতে পারে, দেখতে পারে। সানুর যৌবন একদিন যেমনটি দেখেছিল আজ আর তার কিছুই নেই। এই অকালেই সব ফুরিয়ে গেল যেন। শরীরটাই কেমন শুকিয়ে জীর্ণ হয়ে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকলে মায়া হয়। দুঃখও কম পায়নি ও। কি একটা ভাবতে

সন্দীপ কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল, পরে হাসিমুখে বলল, 'কই, মানুরা তো এখনো এলো না!'

'কী ঘুরতেই না পারে ওরা!' সানুও সেইভাবে হাসে।

সন্দীপের চট করে কি একটা মনে পড়ে গেল, সহাস্য মুখে বলল, 'একদিন তুমিও তো খুব ঘুরতে!' ঠোঁট চেপে ধরে হাসছিল ও।

সানু একপলক চেয়েই দৃষ্টি আনত করেছে। হুহু করে বাতাস বয়ে গেল। আগের চেয়ে শুকনো, পাতলা মনে হলো ওকে। মুহূর্তে অনেকগুলো ছবি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। মানের অলিন্দে অনেকদিন পর্যন্ত সেই ঝকঝকে ছবিগুলো যে গেঁথে রেখেছিল, কখন কোন ফাঁকে যে সেগুলো পড়ে গেছে, খেয়াল নেই। এখন, আর কি কখনো সেগুলো সে ফিরে পাবে? কলেজে যাওয়ার নাম করে কত দুপুর সে ঘুরেছে সন্দীপের সঙ্গে, ফিরতে দেরি হলে কত মিথ্যে কথা বলেছে বাড়িতে। জীবনের এক লুকোচুরি খেলায় সেদিন মেতে উঠেছিল সানু। তার মুখের ওপর এই মুহূর্তে ম্লান, দুঃসের এক ছায়া নেমে এসেছে। ধীরে ধীরে সন্দীপের চোখের ওপর চোখ অপলক রেখে সানু বলল, 'একদিন যা পারতাম, আজ আর তা পারি না সন্দীপদা, এর কারণটা কেন বলতে পার?'

সন্দীপ সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিল না। একটা নিঃশ্বাস ফেলল। সত্যিই একদিন তারা সব ছেলেমানুষি করেছে! সময়টা আজ অনেক দূরে ফেলে রেখে এসেছে। আর তা ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। সানুর ওপর কেমন যেন লোভ হয় আবার। এ তো শুধু সানুর একার কথা নয়, তারও। খানিক পরে সন্দীপ বলল, 'শুধু তুমি কেন, আমারও সেই অবস্থা।'

সামান্য পরে সানু বলল, 'আমার কাছে সব ব্যাপারটাই কেমন যেন ভোজবাজির মত মনে হয়।' আবার চুপচাপ। সানু যেন ভেতরে ভেতরে এক গভীর যন্ত্রণা অনুভব করছে। সামলে নিতে একটু সময় নিল। কিছু পরে আবার সে বলল, 'আমার হারাবার মতন যে আর কিছুই নেই সন্দীপদা।' অনেক আর্তনাদের মত শোনাল তার গলা।

সন্দীপ মমতা বোধ করছিল, সান্ত্বনা দেওয়ার মতন তার কাছেই বা কী আছে। সে জানে ওর দুঃখটা অনেক। বেচারা! একটু পরে গভীর সমবেদনার গলায় ও বলল, 'সবাই তো আর একইভাবে বাঁচে না সানু, তোমার যা ক্ষতি হয়েছে, তার আর কখনো পূরণ হওয়া সম্ভব নয়, আমিও এটা বুঝি, তারপরও তো আমাদের বেঁচে থাকতে হয়, তার জন্যে, যা থাকল সেখান থেকেই কিছু কিছু জোগাড় করতে হয়।' সন্দীপ ওর দিকে চেয়ে আসল এবার।

'মনে হলে যে আর সইতে পারি না।' সানুর চোখের পাতায় বিষণ্ণতা।

'মজাটা কি জান, সবই সয়ে যায় এক সময়।' সন্দীপ ওর চোখে চোখে তাকাল, হাসল একটু, বলল, 'তা না হলে কি হতো ভাবতে পার!' ওকে অন্যমনস্ক দেখাল। সামান্য পরে ভারী গলায় বলল, 'আমিও কি ভেবেছিলাম, এতসব ঘটে যাওয়ার পরও তোমাকে এভাবে আমার হারাতে হবে!'

সানু প্রত্যুত্তরে কিছু বলতে পারল না, অন্যদিকে চেয়ে থাকল। পাতার আড়ালে বসে অনেকক্ষণ ধরে একটা পাখি শিস দিচ্ছে, ঘাস মাটির গন্ধটাও এখন অনেক কম। রোদে সব ভেসে যাচ্ছে। এরকম করে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। গা থেকে চাদরটা সে খুলে ফেলল। আরো খানিকক্ষণ রাস্তার দিকে সে চেয়ে থাকল, আত্মীয়দের তখনো দেখা নেই। পরে বলল, 'চল, আমরা এগোতে থাকি, ওরা পরে আসবে।'

'আমিও বাজারে যাবো বলেই বেরিয়েছি।'

'দেরি করে দিলাম তো তোমার?'

'আর তা দিলেই বা।' সন্দীপ হাসল, হেসে বলল, 'বাজার মানে তো, কিছু শাক-সব্জি।'

'কেন?'

'আমিও আজকাল নিরামিষ খাই।'

'অনেক পরিবর্তন দেখছি!' সামান্য পরে কি একটা ভাবতে ভাবতে সানু বলল, 'আগে তো মাছ মাংস ছাড়া খেতেই পারতে না তুমি!' সানু যেন একটু আহত হলো এতে।

'সব কিছুই মানিয়ে নিতে হয়, বুঝলে?' সন্দীপ হালকাভাবে হাসল।

সানু বলল, 'উঁহু, বোঝা গেল না কিছু।'

সামান্য চুপ করে থাকল সন্দীপ, পরে বলল, 'বড় ঝামেলা, যার জন্যে নিরামিষ আমার জন্যে আমিষ, তার চেয়ে ছেড়েই দিলাম। এখন খারাপ লাগে না কিন্তু।'

'ভাল, খুব ভাল!' সানুর গলায় ঠাট্টা ছিল একটু। পরে গম্ভীর, উদাস হয়ে বলল 'এমন বৈরাগী না সাজলে কি আর চলতো না তোমার!'

'বৈরাগী?'

'বৈরাগী ছাড়া আর কি!'

সন্দীপ ওর মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলেছে। খানিক পরে বলল, 'নিরামিষ খেলেই বৈরাগী হয়, এটা তোমায় আবার কে বলেছে!'

'বলবে আবার কে, আমি জানি।'

কথা বলতে বলতে ওরা ধীরে ধীরে হাঁটছিল। স্টেশনের কাছাকাছি চলে এসেছে। হঠাৎ কি ভেবে দাঁড়িয়ে পড়েছে সন্দীপ। এখান থেকেই বাজার চলে যাবে সে। একটু পরে বলল, 'মা তোমাকে যেতে বলেছে।' বলে সন্দীপ সরলভাবে হাসল।

সানু নিরুত্তর থাকল একটু সময়। পরে আবেগের সঙ্গে অস্ফুট গলায় বলল, 'তোমার মার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার আর মুখ নেই আমার।' সানু চোখ নত করেছে আবার।

'আমার মাকে তো তুমি জানই, এরপরও কি সঙ্কোচের কোন কারণ আছে?'

সানু বলল, 'আমি যে তাঁকে কথা দিয়েছিলাম!'

সন্দীপ প্রত্যুত্তরে বলল, 'কথা রাখার সবটাই তো তোমার ওপর ছিল না।'

আবার চুপচাপ কাটে কিছুক্ষণ। সানু একটু অন্যমনস্ক। সামান্য পরে সন্দীপই বলল, 'যেও তুমি, মা তাতে খুশিই হবে।'

সানু ঘাড় হেলিয়ে জবাব দিল, 'বেশ, যাবো।'

সন্দীপ আর অপেক্ষা করল না, বেলা হয়ে যাচ্ছে, আরো অনেক কাজ পড়ে আছে তার।

সানু সেখানে অন্যমনস্কের মতন আরো কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকল। সন্দীপকে ওদের বাড়ি যাওয়ার কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না। এতদিন পরে আবার কে কিভাবে নেয়! গাছের ডালে বসে আবার একটা পাখি শিস দিচ্ছে। মনটা থেকে থেকে কেমন যেন উদাস হয়ে যায় তার। সানু আস্তে আস্তে ঘরের পথ ধরল। মানুদের তখনো দেখা নেই, রোদ ক্রমশই বাড়ছে। আজ সানুকে বেশ একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

...রিক সাহেব পরে অ্যালুমিনামের ...ত তৈরী করে প্রমাণ করলেন যে, ...লুমিনামের গালাই ও ঢালাই ...ভব। এই ধাতুটির ঘনত্বর সংগে তিনি ...একটি বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে উপনীত ...। তিনি বলেন যে, মানুষের পরিচিত ...তুর মধ্যে অ্যালুমিনাম সবচেয়ে হালকা। ...যে এই সময় আর একটা বিষয় নিয়ে ...নও সংশয়ের দোলা চলছিল। এই ...বিষ্কৃত ধাতুটির মধ্য দিয়ে তাপ ও ...দ্যুৎ সঞ্চরণ সম্ভবপর কিনা সে বিষয়ে ...শেষজ্ঞরা নিঃসন্দেহ হতে পারছিলেন না। ...রপর এই ধাতু কতটুকু পরিমাণ মিলবে ...র সম্পর্কেও প্রশ্নের অবধি ছিল না। ...ব বিতণ্ডা সুরু হয় এর দামের ব্যাপারে।

ফ্রেডারিক সাহেবের এই সাফল্যের ...ও শিল্পজগতে অ্যালুমিনামের আসন ...য়েম করতে বহু বছর কাবার হয়ে যায়। ...র কারণ অবশ্য আগ্রহের অভাব বা এই ...তুর উপযোগিতার সম্পর্কে ইঞ্জিনীয়ারদের ...ীক্ষার ঘাটতি নয়। অ্যালুমিনামের ...ৎপাদনে এতো বেশী খরচ পড়ত যে, ...ল্পে তার ব্যাপক ব্যবহারের কথা ভাবাই ...তুলতা মনে হত। আধ সেরটাক অ্যালু- ...নাম বার করতে বহু হাজার ডলার খরচ ...ড়ে যাচ্ছিল। তার পরের যুগে রসায়নিক ...দ্ধতিতে অ্যালুমিনাম বার করলেও ...নেক শ' ডলার তার পেছনে ব্যয় হয়ে ...ত। কাজেই এত মহার্ঘ ধাতুকে ব্যবহার ...রার ব্যাপারে শিল্পের পক্ষে এগিয়ে আসা ...ম্ভব হল না।

মানুষের কল্যাণে পরমাণুকে কাজে ...াগানোর ব্যাপারে এই একই প্রতিকূলতার ...কাবেলা মানুষকে করতে হচ্ছে। যাই হোক ...ধিকরণের সহজ পদ্ধতি, হাল্কাভাব, তাপ ...বিদ্যুৎ সঞ্চরণের সহজ সরল মাধ্যম ...সেবে ক্রমেই অ্যালুমিনাম শিল্প প্রবর্ত্ত- ...ারদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে ...কে। অ্যালুমিনামের অণুগুলো বাতাস থেকে ...্যান অণু চট করে গ্রহণ করে না। সে ...রণেই লোহায় যত তাড়াতাড়ি ও সহজে ...চে ধরে, অ্যালুমিনামে তা ঘটে না। ...বার উদযান অণুকে অ্যালুমিনামের সংগে ...িশিয়ে দিতে পারলে তার বিচ্ছেদ ও সহজ- ...াধ্য নয়। লোহাকে বিযুক্ত করা সেক্ষেত্রে ...াটেই কঠিন নয়। চুল্লিগুলোতে অহরহ সে ...জ চলছে। কিন্তু অ্যালুমিনামে তাপ ...াগালে বা অ্যাসিড ঢাললেও ঐ বিচ্ছেদ ...ম্ভবপর নয়। এই সমস্ত কারণেই অ্যালু- ...িনাম গোড়ায় সস্তা হয়ে ওঠেনি, আর ...র ব্যবহারেও যথেষ্ট সময় লেগে গেছে।

প্যারিসে ১৮৫৫ খৃঃ একটা বিশ্বমেলা ...স। ঐ মেলাতে প্রখ্যাত ফরাসী রসায়নিক ...েরী সাঁতে ক্লারে দ্য ভিলে ছোট্ট একখণ্ড

ওপরেঃ আমেরিকার অ্যালুমিনাম রিসার্চ কোম্পানীর বাড়ীর সম্মুখ ভাগ। এর সমস্তটাই অ্যালুমিনাম দিয়ে তৈরি।
নীচেঃ ঢালাই-এর পর নরম অবস্থায় যন্ত্রে অ্যালুমিনাম সিট তৈরি হচ্ছে।

অ্যালুমিনামকে অন্যতম দ্রষ্টব্য হিসেবে উপস্থাপিত করেন। বহু জটিল ও ব্যয়সাধ্য পদ্ধতিতে এটিকে উৎপাদন করতে হয়েছিল। ধীরে ধীরে এই দ্য ভিলের উৎপাদনের ব্যয়ের হার কমে আসতে থাকে। সংগে সংগে তার ব্যবহারের ক্ষেত্রও প্রসারিত হতে থাকে। খাবার টেবিলের কাঁটা, চামচ, ছুরিতে অ্যালুমিনামের ব্যবহার সুরু হয়ে যায়। দাম চড়া হওয়ায় অভিজাত জগতে সোনা-রুপোর সাথে অ্যালুমিনাম পাল্লা দিতে সুরু করে।

অ্যালুমিনামকে নতুন যুগে টেনে নিয়ে এল এক মার্কিন ছাত্র। ওবারলীন কলেজের রসায়নের অধ্যাপকের ক্লাসে অ্যালুমিনামের আকর্ষণকারী গুণগুলো সম্পর্কে বক্তৃতা শুনতে শুনতে তরুণ ছাত্র চার্লস মার্টিন হল বেশ আবেগ অনুভব করে। সে তার পাশের ছেলেটির কাঁধে নাড়া দিয়ে ফেস্কে একটা কিল মেরে বলে ফেলল—সস্তায় অ্যালুমিনাম মেলাবার ব্যবস্থা আমিই করব। এটাই হল তার শপথ। সেই কাজে দেহ-মন সে নিয়োগ করে। তারই সাধনার ফল আজ দুনিয়া ভোগ করছে।

হল একের পর এক প্রতিকূলতার মধ্যে পড়ে, কিন্তু কোনও কিছুই তাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। বহু প্রতীক্ষার পরীক্ষা-নিরীক্ষার চূড়ান্তে সাফল্যকে সে ছিনিয়ে এনেছে। কিন্তু সেই সাফল্যের বৈভব ভোগ

করা তার বরাতে ছিল না। অকালে এই কুসুম ঝরে গেলেও তার শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফসল সে সমগ্র মানবজাতির উৎসর্গ করে গেছে।

১৮৬৩ খৃঃ ২৩ ফেব্রুয়ারী ওবারলীনের পৈতৃক বাসভবনে বসে হল যে ধাতু বার করে এসে উজ্জ্বল চোখে সাফল্যের হাসি হেসেছিল, তাকেই বিশ্বের অ্যালুমিনাম ধাতু শিল্পের বনিয়াদ বলা সমীচীন। হল অবশ্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কাজ করেনি। অ্যালুমিনাম কণাগুলোকে পৃথক করার ধারায় সে বিদ্যুতের সাহায্য নিয়েছিল। সস্তায় অ্যালুমিনাম তৈরী করার কাহিনী অতি রোমাঞ্চকর। অ্যালুমিনামের প্রথম বটিকা নির্মাণে এই শিল্পে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ঘটে।

নতুন পথ ধরে হল সাফল্য অর্জন করেন। বহু বছর আগে স্যার হামফ্রে ডেভি যে প্রস্তাব করেছিলেন, হল সেই প্রস্তাব অনুযায়ী অ্যালুমিনাম ও অক্সিজেন অণু আলাদা করার জন্য বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োগ করে। ক্রাই ওটাইট নামে একটি গলিত খনিজ পদার্থে অ্যালুমিনাম অক্সাইড দ্রব করে তার মধ্য দিয়ে শক্তিশালী বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিয়ে দেন। এতে তিনি মটরের আকারের সাদা নমনীয় কয়েকটি বস্তু পেলেন এর আগে ওয়েলারের তৈরী দানা আলপিনের আকারের ছিল।

অ্যালুমিনাম আজ দুনিয়া ছেয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও গুণগত প্রাধান্যের ফলে। বিমানপোত, মোটরগাড়ী ও অপরাপর পরিবহনে, বৈদ্যুতিক শিল্পে আর বেতারযন্ত্রে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে অ্যালুমিনাম। পিটসবার্গে আমেরিকার অ্যালুমিনাম কোম্পানী প্রয়োগের বিবিধ ক্ষেত্রে অ্যালুমিনামের ব্যবহারের জন্য গবেষণা চালাচ্ছে।

তামা বা রূপো ছাড়া বিদ্যুৎ সঞ্চরণের ব্যাপারে সমপরিমাপের তারে বহন ও গতিতে অ্যালুমিনামের জুড়িদার কেউ নেই। তাপের ব্যাপারেও তাই।

অ্যালুমিনামের একদিকে একটা দুর্বলতা অবশ্য রয়েছে। জাত হিসেবে এরা ম... একে কড়া করার জন্য গবেষণা হয়... এবং হচ্ছে। মিশ্রিত অ্যালুমিনাম দিয়ে ... ট্রেন বিমানের কোচ বা বহিরাবরণ তৈরী... নয় ইঞ্জিনের অংশ নির্মিত হচ্ছে। এছাড়া... গেরস্থালির উপকরণ ও অফিস কাছারী... আসবাবপত্র এবং অপরাপর জিনিষপত্র ... রয়েছেই। এখন বেতারের সূক্ষ্ম কলকব্জা... এর কদর বেশী। প্রলেপ দেবার ব্যাপারে অ্যালুমিনামের ব্যবহার কম নয়। পেট-টি... মলম, দাঁতের মাজন বার করার টিউব... অ্যালুমিনাম বাজার একচেটে করে ফেলেছে... আর সত্যি কথা বলতে গেলে, আমাদের...

দেশে পেতলের ব্যবহার তো ভুলেই দিয়েছে এই অ্যালুমিনাম। অপেক্ষাকৃত অনেক ... দামের জন্য গ্রামে-ঘরেই শুধু নয় মধ্যবিত্ত পরিবারের সর্বত্রই এই ধাতব দ্রব্য নির্মিত পাত্রের প্রচলন সহজ পরিমাণে বা... পেয়েছে।
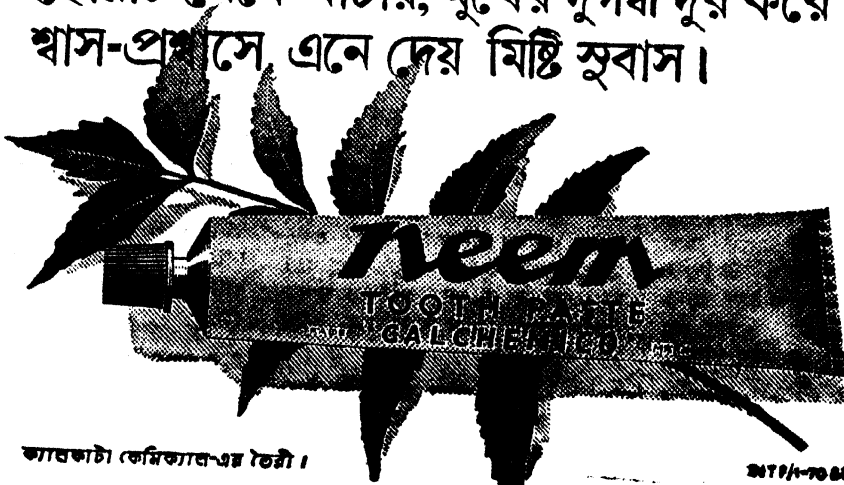
প্রদর্শনী

শিল্পীঃ মাধবী পারেখ

কেমোল্ড গ্যালারীতে শ্রীমতী মাধবী
খের দশটি ছবি এবং চারটি স্কেচের
নী সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।
তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী।

লক্ষণীয় এই ছোট্ট প্রদর্শনীর অসামান্য
য। সংবাদপত্রের অকুণ্ঠ প্রশংসা ছাড়াও
বিক্রির কথা যদি ধরি, তাঁর চারটি বড়
ও চারটি স্কেচ বিক্রি হয়েছে দ
বের প্রদর্শনীতে — যা যে-কোন
ষ্ঠত ও কুশলী তরুণ শিল্পীর পক্ষে
সাফল্য। বহু দর্শক, যাঁরা নিয়মিত
নী দেখে অভ্যস্ত, তাঁরাও সাধুবাদ
ন এই গৃহস্থ বধূ তরুণী শিল্পীকে।
ফল্যের কারণ অনুসন্ধান করার আগে
পারেখের ছবির বর্ণনা প্রয়োজন।

গুজরাটের লৌকিক কাঁথাশিল্পের
ফ তাঁর ছবির ভিত্তি। তার সঙ্গে
ক আধুনিক ক্যানভাস, তেলরং ও
জল. এবং কিছু-কিছু আধুনিক
বন্যাস। ছবির ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ
ক্ষত, কোনো শিল্পনিকেতনে তাঁর
ড়ি হয় নি।

লত. এক বিরল ও মনোমোহন মিশ্র
ক তৈরী হয়েছে তাঁর ছবিতে, তিনটি
বিষয় একত্র মিলিত হয়েছে। প্রথম,
লোকায়ত গ্রামীণ পটভূমি, যেখানে
বড়ো হয়ে উঠেছেন, তাঁর মানসিকতা
হয়েছে; মাতৃভাষা যেমন সহজ
র্ভাবে আসে জিহবায়, তেমনি আসে
হাতে লৌকিক মোটিফ। দ্বিতীয়, তাঁর
হ জীবনের নগরবাস, মনের বুদ্ধিগ্রাহ্য
নাগরিকতার কিম্ভাকার জটিলতা।
তৃতীয় ও সম্ভবত সবচেয়ে জরুরী,
ত শিক্ষার অভাবহেতু, তিনি প্রকৃত
র্থে বলে. তাঁর শিল্প সৃষ্টির শিশু-
সারল্য ও ঋজুতা। তাঁর ছবির বর্ণ
না প্রচ্ছায়াবর্জিত।

ই তিনটির যৌগিক বলে মাধবী
খর ছবি আমাদের এক বিরল
তার সম্মুখীন করে দেয়ঃ নাগরিক
তাকে স্বীকার করে নিয়েও তার
নি সম্ভাব্য সারল্য ও ঋজুতার জগৎ.
আমরা 'বাস্তব' বলি তার তলে-তলে
লীলা রূপকথার জগৎ মাধবীর ছবিতে
ওঠে। তাঁর ছবির রং রৌদ্রের মতো,
আকাশের মতো. গাছের পাতার মতো
নির্মল, মালিন্যহীন: তাঁর ক্লান্তিহীনভাবে
ব্যবহৃত সুতোর ফোঁড়ের মোটিফ যে-কোন
প্রাকৃতিক রেখার মতো সহজ, গ্রাম্য কুমোরের
তৈরী হাঁড়ির মতো সরল। তারই ভিতর
থেকে দাঁড়িয়ে ওঠে শৈশবস্মৃতির রাক্ষস-
খোক্কস, কিম্ভাকার রেখাবিন্যাস, মাঝে-মাঝে
ঝলসে ওঠে দুঃসাহসী নিয়মভাঙ্গা রেখা।
নাগরিকতার বুদ্ধিবাঁধা রাস্তায় আমরা
পেয়ে যাই লোকশিল্পীর সারল্য ও শিশুর
ঋজুতা, যে-দুটি গুণ বহু চেষ্টায় হারাতে
হয় দক্ষ শিল্পীকে। দক্ষ শিল্পী প্রথমে
আয়ত্ত করেন প্রকৃতির নিখুঁত প্রতিকরণ.
তারপর তাকে বহু আয়াসে ভেঙ্গে, ভেঙ্গে-
ভেঙ্গে-ভেঙ্গে, তাকে নিজস্ব জগতে
পৌঁছতে হয়। ফলত তার ছবি হয়ে ওঠে
(যা হয়ে পড়ে) নিতান্ত ব্যক্তিগত, বুদ্ধির
সাহায্য বিনা হৃদয়ের আঙিনায় দর্শক
কোনমতেই পৌঁছতে পারে না। বৃহৎ
মানবস্রোতের সঙ্গে সহজ যোগ তাঁর আপনা
থেকেই বিনষ্ট হয়ে যায়। খাঁটি লোক-
শিল্পীর কাজে যে সহজ সর্বজনগ্রাহ্যতা
থাকে. সর্বমানবিক আবেদন থাকে. তার
থেকে আধুনিক শিল্পী স্বেচ্ছাবঞ্চিত।

সেই সহজ, সার্বিক আবেদন মাধবী
পারেখ বিনা আয়াসে তাঁর ক্যানভাসে
ছড়িয়ে দেন। তৎসত্ত্বেও তিনি আধুনিক
এইখানে, লোকশিল্পীর মতো তিনি প্রথা-
বন্দী নন। লোকশিল্পী স্বাধীনতা নিতে
পারেন না, তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে লোক-
মানস কথা বলে, ব্যক্তিমানসকে সেখানে
খুঁজে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ একজন
শিল্পীর কাজের সঙ্গে আরেকজন শিল্পীর
কাজের গুণগত ছাড়া আর কোন পার্থক্য
থাকে না। মাধবী পারেখের ছবি এই জনাই
ভালো, যে লোকমানসের মধ্য দিয়ে আমরা
নির্ভুলভাবে তাঁর ব্যক্তিমানসকে খুঁজে
পাই: আমাদের বিশশতকী অহংবোধ আহত
হয় না, আবার লোকমানসের সঙ্গে সাযুজ্য
অনুভব করার পথেও কোথাও ব্যাহত বোধ
করি না। এই কারণেই, আধুনিক রসবেত্তার
চোখে মাধবী পারেখের ছবি, ছবি হিসেবে
প্রতিষ্ঠিত হতে পারল।

তবে একটি বিষয়ে বোধহয় তাঁর এখন
থেকে একটু সাবধান হওয়া উচিত। তাঁর
ছবির একটি অভাব—বৈচিত্র্যের। একটি
ছবি যত ভালো, দশটি ছবি তত ভালো নয়।
লোকশিল্পেরই লক্ষণাক্রান্ত এই ন্যূনতা—

পৌনঃপুনিকতা। আধুনিক শিল্পী একটি স্টাইলে ক্লান্ত হলে, সচেতন চেষ্টায় নিজের কর্ম ভেবে নেন—যার চরম উদাহরণ পিকাসো। মাধবী পারেখ দীর্ঘদিন ধরে একই ভঙ্গিতে ছবি আঁকছেন—এবার বোধহয় নিজেকে অতিক্রম করে যাবার চেষ্টা করা ভালো—তাতেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ।

* * *

আকাদামি অফ ফাইন আর্টসের স্টুডিয়োর শিশুশিল্পীদের একাদশ বার্ষিক প্রদর্শনী সম্প্রতি আকাদামিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। শিশুচিত্রীদের যে-কোনো প্রদর্শনীই সাধারণত উপভোগ্য হয়ে থাকে, এবং কলকাতায় আজকাল শিশুশিল্পীদের প্রদর্শনী বহু পরিমাণে হচ্ছেও। কিন্তু তার মধ্যেও এই প্রদর্শনীটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুশো ছবির বিশাল আয়োজন, কিন্তু দেখতে দেখতে ক্লান্তি আসে না, কারণ শিল্পী সংখ্যাও শতাধিক, এবং তারা প্রায় সবাই শিল্পী নামের যোগ্য; এমন ছবি প্রায় নেই বললেই চলে যা প্রদর্শনযোগ্য নয়।

রেখার বিন্যাসে, রং ব্যবহারে কল্পনাশক্তির প্রয়োগে বহু শিল্পী সম্ভাবনাময়। সঞ্জয় ভট্টাচার্য (বয়স ৯) জলতরঙ্গের মাধ্যমে যেভাবে ক্যানভাসকে ভাগ করেছে তা দেখে চমকে উঠতে হয়— এ কি ন'বছরের বালকের কাজ? জয়তী দাশের (বয়স ৬) নেমন্তন্ন বাড়ির প্যান্ডেলের মধ্যে পরিবেশনের ছবিটি ভোলবার নয়। [illegible] আলোকচিত্রের মতো তথ্যধর্মী প্রায়, নিখুঁতভাবে অনুপুঙ্খবর্জিত। যূথিকা ঘোষ (বয়স ১১) জলে ভাসমান কয়েকটি পালতোলা নৌকোর ছবিতে কিউবিক পদ্ধতিতে এমনভাবে স্পেস ভাগ করেছে, নীল ও হলুদের এমন বর্ণধ্বনিনির্ভর সমন্বয় ঘটিয়েছে যা আর্ট কলেজের বার্ষিক প্রদর্শনীতে দেখলে সাধুবাদ করা যেতো। ইলিরা কুণ্ডু (বয়স ৭) ...রং ব্যবহারে চমৎকার কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছে। শিরাজ কোতোয়ালের (বয়স ১০) কালো-মেরুন ছবিটি রহস্যময়তা সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের ছবি মনে পড়িয়ে দেয়। কস্তুরী দাশগুপ্ত (বয়স ৬) গভীর লাল রংয়ের প্রয়োগে অসাধারণ ব্যারোক আবহাওয়া তৈরি করেছে। সুনন্দা সাহার (বয়স ১২) আলংকারিক পাখিটি ভালো সংগ্রহে থাকার মতো।

আরো অনেকের নাম করা যেতো। কিন্তু শিশু শিল্পীদের প্রশংসা করেই মন খারাপ হয়ে যায়। এদের কজন পারবে ছবি আঁকা চালিয়ে যেতে, রং-তুলির খরচ জোগাতে, কজন পাবে ছবি আঁকার সত্যিকারের স্বাদ, কজন পারবে পেঁয়াজের খোসা একটি একটি করে ছাড়িয়ে মৌল শূন্যতায় পৌঁছতে?

* * *

বিড়লা আকাদামিতে প্রাতঃস্মরণীয় চার ঠাকুরের শতাধিক ছবির প্রদর্শনী চলছে—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের ছবি বিষয়ে নতুন কথা কিছু বলার নেই, যা বলতে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখতে হয়। অবনীন্দ্রনাথেরও বিশাল প্রদর্শনী দীর্ঘকাল ধরে ... অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। বিশেষভাবে যে ... 'ঠাকুরের' ছবি দেখার সুযোগ ... [illegible] জন্য বিড়লা আকাদামি ... [illegible], তাঁরা হলেন জ্যোতির... ও গগনেন্দ্রনাথ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিখ্যাত পে... স্কেচ পোর্ট্রেট অনেকগুলি এখানে ... গেলো, অবিখ্যাত ও অদৃষ্টপূর্বও ... গুলি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছবি-আঁকা ... নি, প্রাথমিক আইনকানুনও কিছুই জা... না; তাঁর সমস্ত প্রতিকৃতিগুলি ... বাঁদিকে তাকিয়ে থাকা প্রোফাইল। ... বিন্দুমাত্র মানুষের মুখ আঁকতে ... করেছেন তিনিই জানেন, এই ভঙ্গি ... সর্বপ্রথম অকুশলী শিল্পীর হাতে ... পোর্ট্রেট-এর অন্যতম প্রথম নিয়ম, ... মানুষটি যেদিকে তাকিয়ে থাকবে সে... কাগজের বেশি জমি ছেড়ে দিতে। ... এটুকুও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জানতেন বলে ... হয় না। তাঁর বেশির ভাগ পোর্ট্রেটের ... সামনে কাগজ ফুরিয়ে যায়।

কিন্তু অসম্ভব অশিক্ষিতপটুত্বে ... যে কেবল তাঁর চারপাশের মানুষের নি... প্রতিকৃতি এঁকেছেন তাই নয়, সেই ... সামান্য পেন্সিলের টানে ফুটিয়ে... অসামান্য পারিপার্শ্বিক। তাঁর ছবিতে ... মানুষগুলিকে পেলাম তাই নয়, সেই ... পেলাম ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভা... কলকাতাকে, ও সবান্ধব ঠাকুরপরিবার... নানাজনের স্মৃতিকথা পড়ে তদানী... কলকাতা ও ঠাকুরপরিবার সম্পর্কে যে ... ধারণা মনে গড়ে ওঠে, তাকে জ্যোতিরিন্দ্রনা... ছবির সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মি... নেয়া যায়।

গগনেন্দ্রনাথের একুশটি ছবি একসা... আমি অন্তত আগে কখনো দেখিনি। ... সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি, কেমন প্রথানুগত... ছবি আঁকা আরম্ভ করেছিলেন তি... খানিকটা পাশ্চাত্য, খানিকটা বিশুদ্ধ ... বর্মা, খানিকটা দূরপ্রাচ্য শৈলী। ধী... ধীরে দেখা দিতে লাগলো সরলরে... কিউবিক ত্রিভুজ। তারপর সহসা আবিষ্কা... করি অতিপরিচিত সেই রহস্যময়ীর ছবি... আর আরব্যোপন্যাসের মতো ঐশ্বর্যজটি... সেই আবছা জগৎ, যেন জলের ভিতর দি... দেখা, যাকে মুহূর্তেই গগনেন্দ্রনাথ ব... চিনে নিতে ভ্রম হয় না।

পুরো ঠাকুরবাড়ির চিত্রচর্চার সম্পূ... ইতিহাস না হলেও, তার চুম্বকটুকু এ... প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে ধরে দেয়া হয়েছে... সে কারণে, বাংলা ছবির আধুনিক আরম্ভ... কোথা থেকে শুরু হয়েছে তা বুঝতে গেলে... এই প্রদর্শনীটি বিশেষভাবে মূল্যবান... চিত্রচিন্তিত প্রত্যেকের পক্ষে এই প্রদর্শ... অবশ্যদ্রষ্টব্যের তালিকায় পড়বে—সম্ভব... এ বছরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রদর্শ... এটি।

—চিত্রামি...

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লন্দ্রাই

বেলা এগারোটা বাজতে বাজতেই চায়-কুলি সত্যি এসে হাজির। ১৩১ নং ট থেকে ফিরবার সময় ডাঃ বিশ্বাস খবর দিয়ে এসেছিলেন, তারাই কিংবা সর পাঠানো, কিছুই জানবার বুঝবার নেই। এদিকে এসে দেখি, বাঙ্গালী রবাবু একা চলে গেছেন, ফরেস্ট সের দুজনা রয়ে গেছেন। তাঁরা বললেন, ন কান্ড! চারটে মাত্র ঘোড়া পাওয়া ডাক্তারবাবু একাই সবগুলি নিয়ে নন। তিনি তাঁর চাকর দুটোয়, আর য় মালপত্র চাপিয়ে চলে গেলেন। তাঁর গ অনেক ওষুধপত্র আছে। কেমন র্পের দেখুন একবার!

আমাদের আর বলবার কি আছে?

১৩১ নং ইউনিটে গিয়ে সেকেন্ড-ইন-ন্ড মিঃ বার্তারিয়া বসে, এবার আর াদের হতাশ করেন না তিনি। তাঁর মতিপত্র সহজেই পাওয়া গেল। আমরা মেইল ট্রাকে করে সীমান্তবর্তী শহর ইএ যেতে পারব, সেখান থেকে 'দন্তক' গাড়ী পেলে গেলেফু বা হাতিসার য় যাবে। 'দন্তক' হল ভুটানে রাস্তা রিত ভারতীয় 'গ্রেফ' ইউনিটের নাম; ন নে-ফার ইউনিটের নাম 'ভর্তক'। সিভিল ডিপার্টমেন্টের অধীনে কিন্তু কর্তারা প্রায়ই মিলিটারী থেকে ধার য়া। লন্দ্রাই পৌছালে সেখানে হয়ত ও মিলতে পারে।

আমাদের এবারকার গন্তব্যস্থল হল স-গং-জং। আমরা এবার ভুটানের ান্তবর্তী শহর হাতিসার যাব, সেখান ক বাস ধরে ভারতের মধ্যে বনগাইগাঁও ানে পৌছাবো। বনগাইগাঁও থেকে ট্রেনে রাঙ্গিয়া। রঙ্গিয়া থেকে আবার ভুটানে ব, যাব সীমান্ত শহর সমদ্রুপজঙ্কার। দ্রুপজঙ্কার থেকে তাসি-গং-জং অবধি সার্ভিস আছে।

অন্য আরেকটি পথে তাসি-গং-জঙে য়া যায়। সেটা হল, টঙ্গসা থেকে র্ব বায়াকার জঙ্গ হয়ে উরা-লা ১,৪৯০ ফুট) গিরিসঙ্কট পার হয়ে র জঙ্গ ও মঙ্গার জঙ্গ-এর পথে য়া। তাতে দিন সাতেক লাগবে, কেননা থে হাঁটতে হবে। আমাদের অত সময় ত নেই। সঙ্গে খাবারও নেই অত। তাই য়া সহজ পথ ধরি।

শুনলাম, আজ সারা দিন চলে ট্রাক ৬৭ কিলোমিটার দূরে খোসলা পর্যন্ত যাবে। তখন সমস্যা হল, খোসলাতে রাত কাটাবো কোথায়? এ সমস্যার সমাধান ডাঃ বিশ্বাসের অনুরোধে মিঃ বার্তারিয়াই করে দিলেন। টেলিফোনে সেখানকার কর্তা মিঃ আর পি সিংকে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে বলে নিশ্চিন্ত করলেন।

গাড়ী ছাড়তে ছাড়তে বেলা দুটো বেজে গেল। রাস্তা খানিকটা পিচঢালা বাঁধানো, বাকীটা পাথরের হলেও বেশ ভালো, তবু ট্রাক নাচতে নাচতে চলল, ধুলোও উড়ল খুব। ট্রাকভরা যাত্রী। এপথে বাস সার্ভিস নেই, তাই সকলেই এই রকম 'দন্তকের' ট্রাকেই যাতায়াত করে। সকলকেই অবশ্য অনুমতিপত্র নিতে হয়, আর সবাইকেই অনুমতিপত্রের সঙ্গে সই করে দিতে হয় যে, সে নিজ দায়িত্বে দন্তকের ট্রাকে যাচ্ছে। অবশ্য অনেকে অনুমতি না নিয়েও চড়ে বসল, ড্রাইভার অপ্রয়োজন বোধে বিশেষ কিছু বলল না।

ঝাঁকুনি খেতে খেতে পিছনে বসে সবাই সাড়ে বত্রিশ ভাজা হচ্ছি। ভুটানের বৃক্ষ পরিপূর্ণ অনুচ্চ পর্বতমালার গায়ে গায়ে পথ ক্রমশঃ নীচের দিকে নামছে। খুব দূরে দূরে অবস্থিত কেবল কয়েকটা গ্রাম পথে পড়ল। এইভাবে তাসিদিং, যুশা, সামচিলিং রেকে, গেমদং পার হলাম। অনেক নীচে পাহাড়ের খাদে পার্বত্য নদীর জল ঝিক-মিক করে। আমাদের গাড়ী চলার শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোন আওয়াজ নেই।

পথের ধারে একপাল গরু চলেছে—ড্রাইভার গাড়ী থামিয়ে নেমে গেল—যাত্রীদের বেশীর ভাগই তার সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেল। অন্যান্যরা বলল, এখন গ্রামে গরু দোয়াবে ওরা। সকলে দুধ খেতে গেল। তাজ্জব ব্যাপার। আবার মনে পড়ল—'সাব হঁয়ে ভুটান হ্যয়!'

খোসলা পৌছাতে পৌছাতে ছটা বেজে গেল, সন্ধ্যা নেমে এসেছে। যাত্রীরা সকলে যার যার মালপত্র নিয়ে কে কোথায় যে গেল, টেরই পেলাম না। আমরা মিঃ আর পি সিং-এর খোঁজ করতে লাগলাম। মিঃ সিংকে পাওয়া গেল না, তিনি কাজ সেরে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে গেছেন, তবে আমাদের থাকবার জন্য সব রকম ব্যবস্থা করে গেছেন। ওখানকার রেস্টহাউসে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। সুন্দর বাড়ীখানি, ছোট একখানি বাগান সামনে, থাকবার জন্য ভালো একখানি ঘর, খাবার ব্যবস্থাও টাকা দিলে সেখানেই হবে। ইলেকট্রিক, জলের কল, সব কিছু আছে সেখানে। বহুদিন পর আরামের মুখ দেখা। কাল প্রত্যুষে চলে যেতে হবে ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

পরদিন প্রত্যুষে আর পি সিং সাহেবের নির্দেশ মত তাঁর লোকজনেরা আমাদের মালপত্র বয়ে নিয়ে পোস্টাপিসের সামনে গিয়ে ট্রাকে উঠিয়ে দিল। দেখতে দেখতে লোকে আর মালে গাড়ীর পিছন দিক ঠাসা হয়ে গেল। চুপ করে একটি কোণে বসে পড়ি কোনমতে। কয়েকজন ভুটানী চলেছে, একজন নেপালী দম্পতিও চলেছে, বাকীরা সকলেই রাস্তা তৈরীর কুলি। সকলের সঙ্গেই কিছু কিছু মাল আছে, তবে আমাদের মালের সংখ্যাই সব-চেয়ে বেশী। ছয়টা নাগাদ ড্রাইভার এল। মনে হল বাস এবার ছাড়বে। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। ড্রাইভার একটি রাগী-বাবু, সে এসেই হাঁক ছাড়লো—সব আদমী উতার যাও, সব কোই সামান উতারো।

সবাই যার যার মালটুকু হাতে নিয়ে নেমে গেল। আমার পক্ষে ট্রাকে ওঠা যেমন মুস্কিল, নামাও তেমনি, অগত্যা আমি ভিতরেই বসে রইলাম। তাছাড়া আমাদের অগুনতি সামান, নামায় কে? ডাঃ বিশ্বাস ড্রাইভারকে বলে, মিঃ সিংকে আপনা আদমী সামান চড়ায়া, কোন উতারেগা ইসকো?

সে উত্তর দিল, সিং ইয়া নে-সিং সামান সব উতারো।

সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। আর কিছু না বলে ড্রাইভার গাড়ীর ভিতর উঠে দুটো টিন থেকে গাড়ীতে পেট্রল ঢালল। আবার সকলে চড়ে বসল। কেবল কালকের চারজনা ভুটানী চড়বার অনুমতি পেল না, তাদের সঙ্গে অনুমতিপত্র নেই বলে। গাড়ী ছাড়বার আগে ড্রাইভার আবার হাঁক ছাড়ল।

—মেমসাব সামনে বৈঠেগী!

ভয়ে ভয়ে নেমে আসি, বন্ধু সাহায্য করে। কিন্তু মনে মনে খুশী হই, সামনে ঝাঁকুনি কম লাগবে, ধুলো লাগবে না, পথের সৌন্দর্যও ভাল করে দেখা যাবে।

ড্রাইভার চালায় খুব জোরে। আর খুব বেপরোয়া। ডাঃ বিশ্বাস সঙ্গীদের কাছে জানলেন, ড্রাইভারের বিরুদ্ধে চার্জশীট এসেছে তেল চুরির অপরাধে। তাই সে সর্বদা রেগেই আছে। অযথা চারজন ভুটানীকে নামিয়ে দেওয়া হল, সবাই বলাবলি করতে লাগল। কিন্তু পিছনে লোক কম থাকাতে সবাই ঘুমাতে ঘুমাতে চলল।

সামনে বসে আরাম হলে হবে কি, একা একা নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগলাম। রাগীবাবুর সঙ্গে কথা কইতে সাহস হচ্ছে না। পাহাড়ী পথ এঁকে বেঁকে চলেছে, বেশীর ভাগই বনের মধ্য দিয়ে। কালই অনেকটা নীচে নেমে এসেছি, তাই বনভূমির

তাসী-গং-জঙ্গ

চেহারারও পরিবর্তন বুঝতে পারছি। ঘন-সন্নিবদ্ধ বৃক্ষপূর্ণ বনরাজি, নানা রঙের অজস্র পাখীর মেলা। কোথাও কোথাও অনেকটা নীচে নেমে এসে আবার চড়াই বেয়ে ওঠা। দূরে পাহাড়ের নীচ দিয়ে একটা নদী বয়ে চলেছে, সম্ভবতঃ ওইটিই মাঙ্গদে চু বা টঙ্গসা চু। কোথাও কোথাও পাহাড়ের বাঁকে ঝরণা দেখা যায়, দূরে দূরে পাহাড়ের গায়ে বনের মধ্যে পরিষ্কার জায়গায় দু-একটা গ্রাম উঁকি মারে। পথ নির্জন, কেবল দু-এক জায়গায় দু-একজন মজুর পথ সংস্কার করছে। কোথাও দু-একটা মিলিটারী ক্যাম্প।

খানিকটা এগিয়ে একটা ছোট্ট শহর পড়ল। গ্রামই বলা চলে তাকে, নাম শ্যাম-গঙ্গ-জঙ্গ (৬,৩২০ ফুট)। দূর থেকে সেখানে একটি প্রাচীন জঙ্গ দেখা গেল। মনে হল, কোনকালে হয়ত জায়গাটি জম-জমাট ছিল, আজ আর তার কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নেই। জঙ্গটি ঘিরে কয়েকটি পুরনো বড় বাড়ী, আশেপাশে অনেকগুলি কুটির ও শস্যভরা ক্ষেত।

ঘুরে ঘুরে পথ নেমে নদীর তীর অবধি পৌঁছে আবার উঁচুতে উঠলো। পথে পড়ল ডাখোনি (৪,৫০০ ফুট), মাঙ্গদে চু গ্রাম (১,৯৯০ ফুট), তামা, নৈনী (৬,৯৩৯ ফুট)। কাতাসিয়া পৌঁছানোর আগে ট্রাকের রাস্তা একটা পাহাড়ের নাভিভূমিকে একেবারে পেঁচিয়ে ঘুরে তবে নেমেছে নীচের দিকে। দূরে অনেক নীচে, নদীর সরু রুপালী রেখা দেখা গেল, সবুজ বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে অনেক নীচে নেমে গেছে। এখন সাড়ে বারোটা বাজলো। গাড়ী থামিয়ে আমাদের না বলেই ড্রাইভার নেমে কোথায় চলে গেল। সঙ্গী যাত্রীরাও সকলে যে যার মত কোথায় কে চলে গেল। কতক্ষণ গাড়ী থামবে কে বলতে পারে? আমরা সকালবেলাকার জলখাবার থেকে বাঁচানো পরোটা আর শব্জীটুকু ভাগ করে খেয়ে নিই, তাতে কারুরই পেট ভরলো না।

কিছুক্ষণ পরে একজন নেপালী যাত্রী ফিরে এল। সে বলল এখানে খানা পাওয়া যেতো, ড্রাইভার আর যাত্রীরা সকলে এখানেই খেতে গেছে। সে-ও খেয়ে এসেছে। কিন্তু সেকথা আমরা জানবো কি করে? নেপালীটি আমাদের খাওয়া হল না বলে দুঃখিত হল, কি আর করা!

আবার গাড়ী চললো: এবার পথ কেবল নীচের দিকে নেমেছে, আর কোথাও ওঠবার নেই। খানিকটা একঘেয়ে হলেও ভালই লাগছে। বিশেষ করে নানা রঙের জানা-অজানা পাখীর মেলা—তাদের কল-কাকলী বনভূমি মুখরিত করে রেখেছে বলে বেশ লাগছে।

লুদ্রাই পৌঁছাতে আরও ঘন্টাখানেক লাগল। তরাইএ অবস্থিত এটি একটি ছোট্ট শহর। মস্ত একটা লোহার তৈরী সেতু আছে আই নদীর উপর। তার আগে লুদ্রাই-এর চেকপোস্ট। গাড়ী অবশ্য থামাতে হল না। ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলেই চেকপোস্টের লোকেরা গাড়ী ছেড়ে দিল। আমরা লুদ্রাই-এর সরকারী অফিস-গুলি পার হয়ে পোস্টাপিসের সামনে এসে দাঁড়ালাম। শুনলাম, এ গাড়ী আর যাবে না। এখন দন্তকের অন্য একটা ট্রাকে মেল যাবে। সুতরাং মালপত্র নামাতে হবে।

পাহাড় শেষ হয়ে গেছে খানিক আ আই নদীর বিশাল চওড়া শুভ্র বালু মধ্য দিয়ে ক্ষীণ জলধারা চিকচিক করে চলেছে। জায়গাটা নির্জন, খানিকটা বুনো। বেশ গরম আর স্যাঁতসেঁতে। গাছতলায় বসে ঝিরঝিরে হাওয়াতে তত গরম বোধ হচ্ছে না। বসে বসে একঝাঁক বুলবুলি কেমন এগাছ ওগাছ খেলা করছে আর কিচিরমিচির করছে

দন্তকের গাড়ীতে যেতে হলে এ কার ও, সি'র অনুমতি নিতে হবে। মালপত্রের পাহারায় রইল, আমরা দু দন্তকের অফিসে গেলাম। শুনলাম, রবিবার, তাই ও, সি মিঃ চক্রবর্তী অ আসবেন না, সুতরাং তাঁর মেসে যেতে হ মেসটি খুব কাছেই। মস্ত ফুলের বা ঘিরে কয়েকটি নীচু একতলা বাড়ী। অ গোলাপ ফুটেছে। মিঃ চক্রবর্তী আমা দেখে খানিকটা অবাকই হলেন। খাওয়া নি আন্দাজ করে সঙ্গে সঙ্গে খাবার করবার হুকুম পাঠিয়ে দিলেন। ওঁ পোস্টাপিসে জানিয়ে দিলেন, তাঁকে জানিয়ে যেন ট্রাক না ছাড়ে। সুতরাং বন্ধ ডেকে এনে নিশ্চিন্তে বসা গেল।

লম্বা ছিপছিপে ফরসা চেহারা, মি ভাষী, অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার। মিঃ চক্রব এখানে একাই আছেন। এটা অ অফিসার্স মেস। ওঁর স্ত্রী ও দুটি কলকাতাতে থাকেন। তাঁরা শিশ ছুটিতে এখানে চলে আসবেন। আমা বেড়ানোর গল্প শুনলেন উৎসুক হ প্রশ্ন করে করে। বর্ডার রোড কনস্ট্রাকস কাজে নেফাতেও বহু দিন ছিলেন। কা

কথায় জানা গেল 'অমৃত'তে আমার লেখা 'গোসাইবুড়ের ডায়েরী' পড়েছেন। বললেন, নেফাতেও ঘুরে আসুন, আপনাদের যখন এত বেড়ানোর শখ।

আবার বললেন, এ পথেও আগে বাস-সার্ভিস চালু ছিল, সেটা যাত্রীর অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। ভুটানীরা বড় গরীব, কে পয়সা দিয়ে বাসে চড়বে?

অবশেষে এখানে পেটভরা খাবার জুটলো। নেশাখোর বন্ধুর মনোমত চা-ও জুটলো। এমন কি খাবার আগে এক ফাঁকে স্নানও সেরে নিয়েছি। বিধাতা কোথায় যে কার অন্ন মেপে রেখেছেন, কে জানে? ভুটানে বেড়াতে বেড়াতে বারবার একথাই মনে পড়েছে।

অনেক দেরী করে ট্রাক এল। ডাক নিয়ে, মাল তুলে পৌনে পাঁচটায় ছাড়লো। ট্রাক মালে ভরে গেল, লোকে বোঝাই। এবারও আমার সামনে বসার সৌভাগ্য হল, পাশে একটি নেপালী মেয়ে। বাপের বাড়ী কাঠমাণ্ডুতে চলেছে সে। পথ খুব খারাপ। চওড়া রাজপথ নতুন করে তৈরী হচ্ছে, দিনরাত এজন্য কাজ হচ্ছে, তাই অনেকটা পথই পাশের কাঁচা রাস্তা ধরে চলতে হল। বাকী পথটাও ভাল নয়, খানা-খন্দলে বোঝাই। সত্তর কিলোমিটার পথ আসতে আসতে পুরো আড়াই ঘন্টা লাগল। দূর থেকে আলোর মালায় সাজানো হাসাইগাঁও স্টেশন দেখা গেল, অন্ধকার নেমে এসেছে।

সাড়ে এগারোটায় প্যাসেঞ্জার ট্রেন এল। কোথাও জায়গা নেই। সেকেণ্ড ক্লাশে বসবার স্থান হল, কিন্তু সে কেবল কাগজ-কলমে। সকলেই যে যার মত জায়গা করে নিয়ে ঘুমোচ্ছে। অগত্যা সীটের মাঝখানে মাল রেখে তারই উপর বসে বসে রাত কাটলো।

সমদ্রুপ্জঙ্কার

হাসাইগাঁও পৌঁছানোর আগেই আমরা আসামে প্রবেশ করেছি। রঙিয়াতে ট্রেন থেকে নেমেই স্টেশনের বাইরে অপেক্ষারত সমদ্রুপ্জঙ্কারগামী বি জি এস টি (ভুটান গভর্ণমেন্ট স্টেট ট্রান্সপোর্ট)এর বাস পাওয়া গেল। দেখতে বেশ নতুন। সকাল ৬টায় বাস ছাড়লো। মনে হল, তাড়াতাড়িই সমদ্রুপজঙ্কার পৌঁছনো যাবে। কিন্তু, পথে অনবরত যাত্রী নিতে নিতে চলে তাই ক্রমান্ত থামতে থামতে চলল বাস। খানিক-পরে বোঝা গেল বাসটা মাকাল ফল, বাইরেটাই নতুন এর, আসলে খারাপ। প্রায়ই থেমে যায়। ড্রাইভার মেরামত করে, আবার চলে।

দিগন্ত-বিস্তৃত ধানের ক্ষেত, পথের ধারে ধারে ছোট ছোট গ্রাম। এখন আমরা আসামে এসেছি, তাই পথের ধারে দোকান-পাটের বিজ্ঞাপনগুলি অসমীয়া ভাষাতে লেখা। অসম্ভব রোদ্দুর, তার উপর বাসের বারবার থামা, আমরা একেবারে ভাজা ভাজা হয়ে ঘন্টা তিনেক পর সমদ্রুপজঙ্কার পৌঁছলাম।

দূর থেকে কতকগুলি মিলিটারী ব্যারাকের মত ঘর দেখতে পেলাম। শুনলাম, ওগুলি দন্তকের মজুরদের ক্যাম্প। বেশ ছিমছাম পরিচ্ছন্ন। ক্যাম্প এলাকা পার হবার পর শহরের একতলা ছোট ছোট ঘরবাড়ী সুরু হল।

সমদ্রুপ্জঙ্কার জায়গাটি ছোট্ট, গাছ-পালা ঘেরা, পরিচ্ছন্ন শান্ত। আমাদের গাড়ী ঠিক বাজারের মধ্যে নামিয়ে দিল। অনেকগুলি মাঝারি আকারের দোকানঘর আছে, মালপত্রও যথেষ্ট আছে, কয়েকটা খাবারের ও চায়ের দোকান আছে, এমন কি একটা সিনেমা হল পর্যন্ত দেখা গেল। এখানেও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা জাঁকিয়ে বসেছে। নেপালীদের জীপ ট্যাক্সি আছে গোটা দুই। জায়গাটা সমতল, তবে এখান থেকে ভুটানের পার্বত্য এলাকার চড়াই সুরু হয়েছে। অনেকটা কুর্টশিলিংএর মতন, ঠিক তেমনি সবুজ, বুনো বুনো, ভিজে স্যাঁত-সেঁতে মিষ্টি মিষ্টি শান্ত আবহাওয়া। এখান থেকে তাসি-গঙের রাস্তা দেখা যাচ্ছে, সবুজ পাহাড়ের গায়ে উঠে গেছে। পাহাড়ের ঠিক নীচ দিয়ে পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে।

বাস যেখানে থেমেছে, তার পাশেই একটা বেশ বড় মনিহারী দোকান, তার মালিক একটা বাঙালী ছেলে। আমরা রোদ বাঁচাতে তার দোকানে গিয়ে বসি। ডাঃ বিশ্বাস থাকবার জায়গা ঠিক করতে গেলেন।

কথায় কথায় গল্প জমে ওঠে। বললেন, এখন আর কি দেখছেন, সমদ্রুপ্জঙ্কার বছর কয়েক আগে পর্যন্ত অনেক বড় জমজমাট ছিল, রাস্তা তৈরী করবার জন্য মজুররাই তো

ওয়াংকি-কোরং জঙ্গল

ছিল দশ বারো হাজারের ওপর। তারপর তাদের জন্য ছিল, দোকান, বাজার হাট আরও কত কিছু। এখন রাস্তা তৈরী শেষ হবার পর অধিকাংশ লোকই চলে গেছে।

আমরা প্রশ্ন করি, কিন্তু আপনারা কোথা থেকে কি করে এখানে এসে জুটলেন ?

হেসে বলেন, আমরা উদ্বাস্তু, আমাদের দেশ পাকিস্তানে ছিল। দেশ ছেড়ে এখানে এসে পথের ধারে পড়েছিলাম। এখানকার এস ডি ও দেখতে পেয়ে ডেকে নিয়ে গেলেন। হ্যাঁ, প্রায় ডেকে নিয়েই তিনি সব দিয়েছেন। এসব দোকানঘর তুলবার টিন কাঠ তিনিই বিনে পয়সায় দিয়েছেন, তাছাড়া দোকানের মাল কিনবার ঋণের টাকার ব্যবস্থাও তিনিই করে দিয়েছেন। বড় ভালো লোক। তাঁর দয়াতেই আমাদের সব।

বলেন, এখন লোকজন কমে গেছে, তবে ব্যবসা এখনো ভালই চলছে।

ডাঃ বিশ্বাস ফিরে এসে বলেন, এখানে থাকবার চলনসই কোন হোটেল পাচ্ছি না, আমি বোসসাহেবের চিঠি নিয়ে এস ডি ও'র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

ফিরে এসে খুশী খুশী ভাবে বলেন, মিঃ সংগয়ের কাছে খুব ভালো রিসেপশন পেয়েছি। এস ডি ও মিঃ সংগয় বারবার বলছিলেন, আপনারা আমাদের ভুটান দেখতে এসেছেন বলে খুব খুশী হয়েছি।

নতুন অতিথি নিবাসটি মহারাণীর বিদেশী বন্ধুদের জন্য রিজার্ভ করা আছে, তাই আমাদের থাকবার ব্যবস্থা পুরানো বাড়ীটাতেই করে দেবার জন্য সঙ্গে লোক দিয়েছেন। এই বাড়ীটাতে জল নেই, তবে জলের জন্য ভারীর ব্যবস্থাও তিনিই করে দিয়েছেন। তাছাড়া তাসী গঙ অতিথিনিবাসে ফোন করে আমাদের সেখানে থাকবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন।

বাজার থেকে অতিথি নিবাসটি খুব কাছেই; বড় রাস্তার ধারেই। তিনখানি মস্ত মস্ত ঘর, একটি ঢাকা বারান্দা। সামনে একটা ছোট ফুলবাগান। একটি ঘরে একজন তিব্বতী লামা বাস করছেন বছর দুই ধরে। অন্য ঘরখানি আমরা অধিকার করলাম। অতিথি নিবাসের অনতিদূরেই নদী। ঘর থেকেই নদীর নীলাভ শুভ্র জল দেখা যায়। ওঁরা দুজন নদীর রূপ দেখে লোভ সামলাতে পারলেন না, স্নান করতে চলে গেলেন।

নতুন অতিথি নিবাসটি কাছেই, একই বাড়ীর চৌহদ্দীর মধ্যে। এখনো সেখানে কোন লোকজন আসে নি। অতিথি নিবাসের চৌকীদারের স্ত্রী বলল, চৌকীদার রাত্রের খাবার তৈরী করে দিতে পারবে। তাই আমরা বাজারে ছুটলাম। ছোট বাজার, কিন্তু দৈনিক প্রয়োজনীয় সবকিছুই পাওয়া যায় সেখানে। ফল-মূল শাক সব্জী কিনে নিয়ে এসে চৌকীদারকে রাঁধবার জন্য দিলাম সব।

সন্ধ্যে হতেই আকাশ ভেঙে ধারা না এদিকে চৌকীদারের পাত্তা পাওয়া য না। মহারাণীর অতিথিরা গিয়েছেন। সে তাদের জন্য ব্যস্ত রয়েছে। ওদিককার বাড়ী থেকে লোক হাঁকডাকও শোনা যাচ্ছে। অনেক রাত্রে খ জুটল, কিন্তু তাতে কারুরই পেট ভরলো চেঁচামেচি করেও কোন ফল হল না। হলো সকালবেলা আর চৌকীদারের ভরসা করা হবে না।

লামাজী অবশ্য আমাদের খুব সা করলেন। ভাঙা ভাঙা হিন্দী ও ইংর দুই-ই বলতে পারেন, কাজেই আম বিশেষ অসুবিধা হল না। দু বছর ই নি তিব্বত থেকে এসেছেন, বোধ ইত্যাদি তীর্থদর্শন করে এখন আপা এখানেই আস্তানা নিয়েছেন। নিজের সা রান্নাবান্নাটুকু নিজেই করে নেন। আমা সর্বদাই সাহায্য করবার জন্য উন্মুখ আছেন।

কিন্তু রাত্রে ঘুমায় সাধ্য কার! মশা। মশারী নেই, কাজেই খুব অস হচ্ছে। তাছাড়া ইঁদুরও আছে।

ঘুম হল না বলেই সকলে প্রত্যুষে হতে অসুবিধা হল না। মালপত্র নিয়ে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকি। বাস এ চেকপোস্টের কাছে থেমে আমাদের নিলো। তারপর নদী পার হয়ে সামান্য এসে বাসের অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আর চলবার নামটি নেই।

কাল সারা রাতই বৃষ্টি পড়ে সুন্দরী সমদ্রুপজুঙ্কার যেন স্নান সেরে উজ্জ্বল নতুন সবুজ শাড়ীটি পাড়ে নীলাভ শুভ্র নদীর জলের পাড়ে তার খানি আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। উজ্জ্ নীলাকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁ আছে সে। অপরূপ রূপ তার আজ।

তাসী-গঙ-জঙ্গ

সাড়ে আটটায় বাস ছাড়লো। স বাঁধানো রাজপথ, নির্জন ঘন বনের দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে। এত গভীর এতদিন কোথাও দেখিনি। পথের ধারে ঝোপে নানারঙের ফুল ফুটেছে। পাহা গায়ে গায়ে এখানে ওখানে বাস্ব অর্কি ফুটে আলো করে রেখেছে। গাছগুলি সরু বাঁশ গাছের মত, ফুলগুলি অর্কি মত দেখতে হালকা বেগুনী পাপড়ি। মধ্যে এক টুকরো গাঢ় বেগুনী ভেলভে লাগানো যেন। ভেলভেটের কোণে গভী গাঢ় হলুদ ছোপ। অদ্ভুত সুন্দর দেখতে অগুনতি পাখী, নানা জাতের, নানা রং অনেকটা লুদ্রাই-এর পথে যেমন দেখে তেমনি।

পথ ঘন বনের মধ্যে যেন হারিয়ে গেছে নীচের পথ থেকে উপরের দিকের পথে অস্তিত্বের কথা বোঝাও যাচ্ছে না, এমনি ঘন হয়ে গাছপালা জন্মেছে। নানা রক গাছের মধ্যে কোথাও কোথাও প্রচুর কলাগা জন্মেছে, কিন্তু কোন গাছে কলা নেই।

মেঘ করে এল। খানিক খানিক বৃষ্টি পড়ল, তবে বেশী জোরে নয়। উঁচুতে উঠবা সাথে সাথে কুয়াশা ভীড় করে
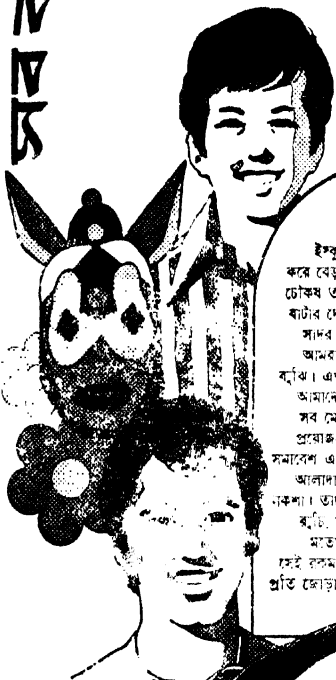
সব বয়সের পুরুষের জন্য
লিলিপুট ৩১
১০.৫০
পিণ্টু ৩৯
৮.৯৫
লিলিপুট ৩০
৮.৯৫
ইস্কুলে যাওয়া দৌড়-ঝাঁপ
করে বেড়ানো ছেলে, ফ্যাশন-সচেতন
চৌকশ তরুণ, এবং প্রবীণ—আসুন,
বাটার দোকানে আপনাদের সকলের
সাদর আমন্ত্রণ। পুরুষ বলতে
আমরা সব বয়সের পুরুষকেই
বুঝি। এখানে বয়স ও রুচির গরমিল
আমাদের কাছে অবান্তর। কারণ
সব মেজাজের এবং সব বয়সের
প্রয়োজন মেটাবে এমনই জুতোর
সমাবেশ এখন বাটার দোকানে-দোকানে।
আলাদা-আলাদা রঙ ও নানারকম
নকশা। তাছাড়া সুন্দর গড়ন ও মার্জিত
রুচি, সব মিলিয়ে চোখে পড়ার
মতো। যার যেরকম পছন্দ।
সেই রকমই পাবেন। সেই সঙ্গে বাটার
প্রতি জোড়া জুতোর ষোল আনা আরাম।
জলসা ১৭
২৫.৯৫
ক্যাভ্যাডিস ০৭
২৭.৯৫
জুবিলি ৪৭
১৯.৯৫
এক্সক্লুসিভ ২৬
৪৮.৯৫
Bata

কোথাও কোথাও জমাট কুয়াশার জন্য রাস্তা প্রায় দেখাই যাচ্ছে না।

পথের ধারে ধারে খানিকটা দূরে দূরে মোটরচালকের জন্য সাবধানবাণী লেখা সাইন-বোর্ড লাগানো আছে, তাতে লেখা—

"It is better to reach late than not to reach at all !"
"Life is short, do not make it shorter".
"We love our children. Do you?"
"It is better to be late. Mr. motorist, than to be late Mr. Motorist" ইত্যাদি।

আমাদের ড্রাইভার এসব লেখা দেখে বলে মনে হয় না। সে চালায় কিন্তু খুব ভালো। ঘণ্টাখানেক পর দেওথানে পেণীছলাম। এখানে রাস্তার বাঁকে মস্ত একটা শুভ্র শহীদস্তম্ভ তৈরী করা হয়েছে। তার গায়ে রাস্তা তৈরীর কাজে ভুটানী, নেপালী ভারতীয় যেসব মজুর এবং অফিসার প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের নাম উৎকীর্ণ করা আছে। বাঁক পেরোলেই একটু উঁচুতে ছবির মত সুন্দর একটি বাড়ী দেখতে পেলাম, তার চারপাশে সুন্দর ফুলবাগান, আশেপাশে আরও অনেক ঘরবাড়ী আছে। শুনলাম, ওইটিই এখানকার রাজকীয় অতিথি নিবাস। জায়গাটি খুব ছোট নয়।

শহর বা গ্রাম যাই বলা যাক, খুব দূরে দূরে অবস্থিত। অধিকাংশ পথই জঙ্গলে ঢাকা। সোরোং পার হয়ে এলাম, পেণীছলাম নরফোঙে। শুনলাম, আমরা অর্ধ পথ অতিক্রম করে এসেছি। এখানে বাস আমাদের নামিয়ে দিল মধ্যাহ্নভোজনের জন্য। পথের ধারে গুটিকয়েক ছোট ছোট ঘরে রেস্টুরেন্ট করা হয়েছে, কয়েকটা দোকানঘরও আছে। আশেপাশে কয়েকখানা ঘর ও চাষকরা জমি নিয়ে ছোট্ট জায়গাটি গড়ে উঠেছে। এখানটা যেন একটা গিরিশিরার উপরে ছোট্ট মালভূমি, দু পাশেই খাদের পরে সবুজ পাহাড়ের সারি দেখা যাচ্ছে। আমরা একটা নেপালী রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়লাম। আমাদের সঙ্গী যাত্রীরাও দেখছি বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে ঢুকে খেতে বসে পড়েছেন। সবগুলির অবস্থাই অবশ্য একই রকম দুর্দশাপন্ন অর্থাৎ নোংরা। তবে যে খাদ্য পরিবেশন করছে সবই সদ্য রান্না করা গরম ধোঁয়া উঠছে।

দুজন ভুটানী একটা খালি টেবিলে মুখোমুখি বসেছে। তারা সঙ্গে করে বেতের টুপির মত কৌটোতে অনেকটা ভাত রান্না করে এনেছে। এখানে সেটাই ভাগ করে খাচ্ছে। একটা দোকানঘরে একটি সুশ্রী ভুটানী তরুণী তাঁত বুনছে। হাত দেড়েক, দুয়েক চওড়া মোটা কাপড় তৈরী করছে সে। এই ভাবে কাপড় জোড়া দিয়ে তাদের পরনের পোশাক তৈরী করে এরা। গাঢ় ডগমগে রঙের পোশাক।

আবার চলা শুরু। ক্রমে তাসিলিং পার হয়ে রিসারবু এলাম। এগুলি ছোট ছোট গ্রাম। রিসারবু ছাড়ার পর দেখা গেল, একটা জীপ অচল হয়ে পথে পড়ে আছে। দেখে গাড়ী থামিয়ে ড্রাইভার নেমে গেল। জীপের বনেট খুলে জীপটি মেরামতের চেষ্টা করতে লাগল। সময় গড়িয়ে যায়, সকলেই একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি। তাসিগাং নতুন জায়গা, সেখানে থাকবার ব্যবস্থা করতে হলে বেলাবেলি পেণীছানোই সুবিধাজনক। কিন্তু এখানেই প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল, আরও কত সময় নষ্ট হবে কে জানে!

অধৈর্য হয়ে আমি নেমে এসে ড্রাইভারকে অনুনয় করে বলি ড্রাইভারজী, আপনি যদি দয়া করে আমাদের নিয়ে চলেন, তবে খুব খুশী হই। আমরা বিদেশী, তাসী-গঙ নতুন যাচ্ছি, দিনে দিনে সেখানে না পেণীছালে আমাদের বাড়ী খুঁজে নিতে খুব অসুবিধা হবে।

ড্রাইভার বাধ্য হয়ে চলে এল, কিন্তু খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গজগজ করতে লাগল। খুব রেগে গেছে সে, কিন্তু আমাদের আর উপায় নেই। আমরা কিন্তু খুশী হয়ে যে যার সীটে বসে পড়ি। গাড়ী চলতে আরম্ভ করে। মাঝে মাঝে দেখি পথের ধারে ভুটানীরা দলবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বাসে ওঠে না তারা, তারা বড় গরীব পয়সা খরচ করে বাসে চড়ার সামর্থ্য নেই, তারা অপেক্ষা করছে বিনা পয়সায় যদি কোন পথচলতি ট্রাক পাওয়া যায় তাতে চড়বে বলে।

রিসারবু ছাড়ার পর থেকে গাড়ী পাহাড় ঘুরে ঘুরে উঠছে, কেবলই উঠছে। খালিং, গোমচা, ইয়াংকু পার হয়ে কাঙলুং পেণীছলাম। ধীরে ধীরে আমরা অনেক উঁচুতে উঠে এসেছি। প্রতিটি গ্রামই দূরে দূরে অবস্থিত, গ্রামগুলি ছোট ছোট। কাংলুং পেণীছবার আগে দূরে পাহাড়ের উঁচু থেকে অপেক্ষাকৃত নীচু সবুজ মালভূমিতে গ্রামটি দেখা গেল। অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর বড় বাড়ীও দেখতে পেলাম। রাস্তাটা এখানে মস্ত একটা বাঁক ঘুরেছে। বাঁকের মুখে ভুটানী ঢঙে নানা রং-এ তৈরী করা মস্ত একটা প্রবেশদ্বার। অদূরে অনেকগুলি বড় বড় দালান, সেগুলিও ভু ঢঙে ডগমগে রং দিয়ে কারুকার্য করা নির্মিত। শুনলাম, এগুলি কাংলুং স্কুল, ভুটানের একমাত্র হায়ার সেকেন স্কুল। স্কুলটি এখনো ভালভাবে হয়েছে বলে মনে হল না, অধিকাংশ তালাবন্ধ। মনে হয়, এসব বোসসাহেবের কীর্তি। বোসসাহেবেই আমাদের ভু আসবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি ক বছর ভুটানের এডুকেশন ডিপার্টমে ডিরেক্টর ছিলেন, সম্প্রতি রিটায়ার করে

এখানে দুটি ভুটানী মেয়ে উঠ সম্ভবত তারা মা ও মেয়ে। মেয়েটির ১২।১৩ বছর, কোলে ছোট্ট একটি কুকুরের বাচ্চা। ভারি মিষ্টি দেখতে আমার পাশে এসে বসল মেয়েটি। বাচ্চাটার গা-ভর্তি লোম, লোমে ঢেকে গেছে। হাত দিব্যি আমার কোলে চলে এল। গরম চাদরের তলায় চুপ করে শুয়ে রইল। মেয়েটিকে আমাকে বাচ্চাটা?

মেয়েটা হাসে, মাথা নাড়ে পর দুজনে একটা গ্রামে নেমে গেল, সময় বাচ্চাটাকে নিতে ভুলল না।

ভুটানীরা কুকুর খুব পছন্দ করে। দেশের কুকুরগুলিও খুব সুন্দর প্রত্যেক বাড়ীতেই প্রায় কুকুর দেখা যায় কুকুরগুলিকে আদরও করে খুব। জঙ্গ-এর বাইরে রাস্তায় বিরাট একটা কুকুরকে আপনমনে বেড়াতে দেখে শিউরে উঠেছিলাম দুর্দান্ত ও বিরাট দেখতে কুকুরটি সেটি মহারাজার নিজস্ব কুকুর আপনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারীর মতন।

আরও উঁচুতে ওঠে গাড়ী। লাগছে। এবার একটা গিরিসংকট নামবার পালা। এবার হুড় হুড় করে চললো গাড়ী। যাত্রীরা বলতে লাগল, অনেক নীচে নেমে তবে নদী পার হয়ে দূরে তাসী-গঙ। সঙ্গে সঙ্গে দূরের পাহাড়ে রাস্তা তৈরী হচ্ছে, রাস্তা তৈরী শেষ হলে তাসী-গঙ সোজা থিম্পু আর পারো যাওয়া অর্থাৎ ভুটানের মধ্যাঞ্চল দিয়ে পশ্চিম প্রান্ত সঙ্গে পূর্বপ্রান্তের যোগাযোগ সম্পূর্ণ হবে। এখন এপথে পর্যন্ত যাওয়া যাবে। এসব রাস্তাও গবর্ণমেন্টের সহযোগিতায় তৈরী হচ্ছে

দেখতে দেখতে আমরা অনেক নেমে এলাম। তাসী-গঙের উচ্চতা ৩,৫০০ ফুট। আবহাওয়ারও পরিবর্তন সঙ্গে সঙ্গে, পাহাড়গুলির রঙেরও। বনভূমির রাজ্য ছেড়ে শুষ্ক ভূমির দেশে এলাম। ডংমা চু নদী পাহাড়ের খাদের দিয়ে বয়ে চলেছে। নীচে নেমে উপরকার ব্রীজ পার হয়ে আবার চলা। পাহাড়টায় পথ ঘুরে ঘুরে চোখের আড়া চলে গেছে। আরও খানিক এগিয়ে

...ই পাহাড়ের গায়ে ছোট পুরনো জঙ্গ ... গেল। তার পাশেই তাসি-গঞ্জের ছোট্ট ... বাজার ঘিরে শহরের ঘরবাড়ী।

ভুটানের সবগুলি প্রধান জঙ্গই মধ্য ... কোন না কোন বড় নদীর তীরে ... করা হয়েছে। সবগুলিই শুকনো দেশে ... তিব্বত থেকে আগত ভুটানীরা ... জায়গা পছন্দ করে বলেই হয়ত ... জঙ্গগুলি এমনি শুকনো দেশে ... করা।

বাজারের ঠিক মাঝখানে বাস এসে থামল। আমাদের সঙ্গী একজন নেপালী-যাত্রী অতিথি নিবাসটি দেখিয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু তাসী-গঞ্জে নেমে আর তার পাত্তা পাওয়া গেল না। তাসী-গঞ্জের চেকপোস্ট থেকে একজন পুলিশের লোক এসেছিল, সেই কয়েকজনা কুলি সংগ্রহ করে দিল। তারাই আমাদের নিয়ে অতিথি-নিবাসে পৌঁছে দিল। নদী পার হয়ে বেশ খানিকটা উঁচুতে অতিথি নিবাসটি। চমৎকার বাংলো, চৌকিদার ওখানেই থাকে। সে এসে ঘরগুলি খুলে দিয়ে চেয়ার এনে বারান্দায় পেতে দিল। সম্মুখে বেশ বড় একটি ফুলের বাগান, রংবেরঙের মরশুমী ফুল ফুটেছে। বাইরে হুহু করে হাওয়া দিচ্ছে। দূরে নীচের পাহাড়ে, নদীর ওপারে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসাতে জঙ্গ ও তার আশ-পাশের ঘর-বাড়ীগুলি আবছা হয়ে এসেছে।

পরদিন প্রত্যূষে উঠে তৈরী হয়ে নীচে জঙ্গ দেখতে রওনা হই। পাহাড়ী পথে

ভুটানী মা ও মেয়ে

নীচে নেমে বাজার পার হয়ে জংগ-এ পৌঁছাতে প্রায় মাইলখানেক হাঁটতে হয়। ঠিক নদীর উপরেই পাহাড়ের গায়ে জংগটি। ছোট, তবে বহু প্রাচীনকালের। ভিতরে ঢুকবার মুখেই দেখি একদল লোক নানা রকম রঙিন মুখোশ পরে শিঙ্গা ও ঢাক-জাতীয় বাদ্য বাজাতে বাজাতে নাচছে। তারা বলল, তারা তাংগাঁও থেকে এসেছে। দলের সকলেই পুরুষ, দুজনা রাক্ষসের মুখোশ পরেছে, একজন অনেকটা হনুমানের মত লোমওয়ালা পোষাক পরেছে, তার পিছনে মস্ত লেজ ঝুলছে। আমরা নাচ দেখতে বসে গেলাম। দেখতে দেখতে বেশ ভিড় জমে গেল। একঘেয়ে নাচ। খানিকক্ষণ দেখে আমরা জংগ-এর ভিতরের উঠানে ঢুকলাম। অন্যান্য সব জংগ-এর মতনই চৌকো উঠান ঘিরে ঘর উঠেছে, তেতলা অবধি। একতলার একটা ঘরে মন্দিরে বুদ্ধদেবের ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় মস্ত মূর্তি, সবর্ণময়। দেয়াল জুড়ে উজ্জ্বল ফ্রেসকোর ছড়াছড়ি। তেতলায় উঠতে ঠিক একইরকম মই দিয়ে উঠতে হয়। একটা ঘর থেকে ছোট ছোট কচি কচি লামারা বেরিয়ে এল, তাদের খাওয়া হয়ে গেছে, এঁটো থালা হাতে করে সারি দিয়ে নেমে চলেছে। আর একটু উঠেই দেখি, সিঁড়ির পাশে বারান্দাতে বর্ষীয়ান লামারা মেজেতে আসন পেতে খেতে বসেছেন। খাদ্য হল লাল লঙ্কা দিয়ে সেদ্ধ করা ভাত।

ভুটানীরা সাধারণভাবে নোংরা হলেও এই সব জংগ-এর লামারা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকেন। এমন কি সব জংগ-গুলিতেই আমরা ছোট-বড় নানা বয়সের লামাদের দেখেছি, তাঁরা সকলেই পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। জামা-কাপড়ও সাফসুতরো থাকে, তাঁদের ব্যবহারও সর্বত্র শান্ত ও ভদ্র।

নর্তকেরা দ্রুততালয়ে নাচ সুরু করেছে, তার আওয়াজও এখান থেকেই শুনতে পাচ্ছি। ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে তারা ভিতরের উঠানে প্রবেশ করেছে। একদল লামা নীচের উঠানে ও উপরের বারান্দার জানালা থেকে দেখছে। একজন বাঙালীকে দেখতে পেলাম, আমাদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে আলাপ করলেন, পরিচয় দিলেন ম্যালেরিয়া ইনস্পেকটর মিঃ চক্রবর্তী। ভারত গভর্ণমেন্ট তাঁকে পাঠিয়েছেন। আদিম বাড়ী কুমিল্লাতে, এখন থাকেন জলপাইগুড়িতে। আমরা এই অজগর বিজনবনে নিছক বেড়ানোর উদ্দেশ্যে এসেছি শুনে যারপরনাই বিস্মিত হলেন। বলেন, কি আছে এদেশে যে দেখতে এসেছেন? কিচ্ছু নেই মশাই এখানে। আমরা বলি, আমরা তো দেশটাই দেখতে এসেছি। এখানকার সবইতো আমাদের কাছে নতুন। হিমালয়ের অনেক অঞ্চলে ঘুরেছি, কত রূপ দেখেছি তার, কত দেশের কত রকম লোকের সংগে আলাপ পরিচয় হয়েছে, কেবল সুযোগের অভাবে ভুটানটাই বাকি ছিল। এবার আশ মিটিয়ে দেখে গেলাম।

জংগ দেখা শেষ করে তিনি সংগে করে জংগ-এর পুরাতন রেস্ট হাউসে নিয়ে গেলেন। সেখানে আরও একজন বাঙালী আছেন, ইনিও ভারত গভর্ণমেন্টের লোক। যত্ন করে তাঁদের ঘরে বসালেন, চা খাওয়ালেন। বলেন, এখানে তো কিছুই পাওয়া যায় না, না হলে আপনাদের এখানেই খাওয়াতাম। আপনারা আবার যে নিরা-মিশাষী, সব্জী এখানে মোটেই মেলে না।

এঁদের সংগে কথা বলতে বলতেই বাজনার আওয়াজ শোনা গেল, সেই নাচের দল এল। তারা এখন সারা শহরে নাচ দেখিয়ে টাকা সংগ্রহ করছে। আমাদের সামনে আরও খানিকক্ষণ নেচে গেল।

মিঃ চক্রবর্তীর সংগে বাজারে জংগ-এ আসবার সময় পথের ধা ছোট টিনের ঘরে মেয়েদের তাঁ দেখেছি। শুনলাম সেই কাপড়ই এ মেয়েরা পরে। ভুটানী মেয়েদের ক নাম হল 'খারু', সেই খারু কিনলাম, খুব দাম। কিন্তু ওদের কারুকার্য করা পছন্দমত বেল্ট পেল না। ছেলেদের পোষাক কিনলাম, ভুটানের চিহ্ন হিসাবে লম্বা ঢিলেঢালা পোষাক, লম্বা পর্যন্ত ঝুলে, মোটা কাপড় দিয়ে তৈরি গরমকালে এই জামাই আটকে হাঁটু অবধি তোলা গুটিয়ে কনুই অবধি মেয়েদের পোষাক অবশ্য মোটা খানা চাদরের মতন। নানারকমভাবে ফিরিয়ে কাঁধে রূপার পিন দিয়ে কোমরে বেল্ট বেঁধে পরতে হয়। অবশ্য লম্বা হাতা ব্লাউজও পরেন সুন্দর পোষাক।

এখানে আরও কয়েকজন আছেন। সকলে এক পরিবারের লোক নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে তাছাড়া উপায়ই বা কি। তাঁরা ব্যবহারে ভিন্নধর্মী ভুটানীদের সংগে দের খাপ খাওয়াতে পারেননি। ওঁরা বলেন, ভুটানীরা অমিশুকও বটে এই নির্জন রাজ্যে বাস করবার জন্য খুসী নন।

সন্ধ্যাবেলা ডাঃ বিশ্বাসকে তাঁরা তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন, তাঁদের খুব কাছেই। আমার খাবার উপায় রান্নাবান্নার ঝামেলা নিয়ে বসেছি। হুকুম পরোটা খাওয়াতে হবে। না, আমাকে সাহায্য করছে বলে। এসে খবর দেন, আগামীকাল বাস কিনা সন্দেহ, বাসের ইঞ্জিন বিগড়ে তাসী-গংগে একটি মাত্র বাসই করে, একদিন আসে, পরদিন চলে সমদ্রুপজংকার। তবে মেইলভ্যান ডাক রোজই যাতায়াত করে। মেইলভ্যান বলে হয়েছে সমদ্রুপজংকার থেকে একটা নিয়ে আসতে, তাহলে বাস গেলেও পারে।

পরদিন ভোর সাতটায় বাস কথা, যথাসময়ে গিয়ে দেখি সব ঠিক। বাস যাবে।

তাসী-গঙ্গ ছাড়বার সাথে আমাদের ভুটান দেখাও শেষ হল। আমরা সমদ্রুপজংকার হয়ে রঙ্গিয়া ফি সেখান থেকে যাব আসামে গৌহাটিতে

ভুটান আমাদের নিকটতম প্রতি রাষ্ট্র হলেও আমাদের সংগে এদেশের মেশা খুব কম। তাদের আচার একেবারে অন্যরকম, চেহারারও মিল আমাদের সংগে। তাই আবার বলি আমাদের অচেনা প্রতিবেশী।

(শেষ)

।।সাত।।

আমহার্স্ট স্ট্রীটের স্টপে ট্রাম ছাড়ল করণ। রীতাবরী আরো এগিয়ে কলেজ ট্রীটে নামবে। এদিকটায় তেমন ভিড় নেই। ষ্যালদর মত গম গম করে না। আকাশ কা,—নীল, সর্বত্র নীল, শুধু কার্তিকের াদের জমজমাট আসর। ঘড়িতে ঠিক একটা জল। অমিয় বারিক লেনটা এখান থেকে হই, —তেমন দূরে নয়। হাঁটলে বড়-র দশ মিনিট লাগে। তবু ভরদুপুরে রণের পা উঠছিল না। সে বাসের আশায় তের মত মুখ উঁচু করে রাস্তার দিকে কাল। পথে আরো যানবাহন,—ট্যাক্সি, কশ, লরীও যাচ্ছে। কিন্তু বাস কোথায়? লাইনে এমনিতেই বাস কম। দুপুরে রো দূরবস্থা, বাসের জন্য দাঁড়ালে আধ টা কিম্বা চল্লিশ মিনিটও লাগতে পারে। গতিক বুঝে কিরণ অনিচ্ছুক পা টাকে টেনে বাড়ির দিকে চলল।

হাঁটতে হাঁটতে সে রীতাবরীর কথা বছিল। চিন্তা করলেও আশ্চর্য লাগে। মন করে সে ওর প্রেমে পড়ল। অথচ মাস ক আগেও কিরণ ওকে চিনত না। এই জন মাসে ওর সঙ্গে পরিচয়, সেও টা অদ্ভুত, বিচিত্র যোগাযোগ। এমন ঘটনা বুঝি কলকাতাতেই সম্ভব।

সেদিন দুপুর থেকেই আকাশ মেঘলা। া তিনটে নাগাদ হুড়মুড় করে জল ল। অবশ্য খানিক পরেই ঝমঝমে বৃষ্টি ন, কিন্তু জল থামল না। ততক্ষণে গর গর্তে—ফাটলে, নীচু জায়গায় জল জমেছে। পথে প্যাচপেচে কাদা। পা নো এক নরকযন্ত্রণা।

কলেজ স্ট্রীটে এসে আচমকা কিরণ ল গেল। এত জলে যাবে কেমন করে? শ্যামবাজারে একটা জরুরী দরকার । বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ সেখানে তেই হবে। এদিকে কোথায় কোন র পাড়ার ছেলেরা স্টেটবাসের কটাকে দুপুর আটকেছে। তার প্রতি-বাদে দুপুর থেকে বাস বন্ধ। এতক্ষণ ট্রাম চলছিল। এখন তাও যাচ্ছে না। বৃষ্টির জলে ট্রামও নিশ্চয় কোথাও আটকা পড়েছে। মাঝে মাঝে দু-একটা প্রাইভেট বাস দেখা দিচ্ছে বটে, কিন্তু তাতে মাছি গলবারও ফাঁক নেই।

ওয়াই এম সি এ-র দরজার কাছে কিরণ কোনোমতে গা বাঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখনও জলের ফোঁটা বেশ বড়। হু-হু হাওয়া। বৃষ্টির ছাটে জামাকাপড় কেমন মিইয়ে গেছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে সাত-পাঁচ ভাবছিল কিরণ। আর গাড়ির আশায় রাস্তার দিকে বারবার তাকাচ্ছিল।

হঠাৎ চোখের সামনে প্রায় ভোজবাজির মত ব্যাপার। একটা ফাঁকা ট্যাক্সি এগিয়ে চলেছে। দেখতে পেয়ে কিরণ জলের মধ্যেই পথে নামল। ক্রশিঙের মুখে গাড়িটা নিশ্চল হবার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রায় দৌড়ে গিয়ে পিছনের সীটে বসল। উল্টোদিক থেকে রীতাবরীও এসেছিল ট্যাক্সিটা নেবে বলে। কিন্তু কিরণ সেটা আগেই দখল করেছে। জলে ভিজতে ভিজতে বেচারী বিফল মুখে ফের কোথাও মাথা গুঁজতে যাচ্ছিল।

কি ভেবে কিরণ শুধোল,—'আপনি কোথায় যাবেন? শ্যামবাজারের দিকে নাকি?'

রীতাবরী মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখল। বলল,—'হ্যাঁ, ওদিকেই তো যাবার ইচ্ছে।'

একলা মেয়েছেলে, তায় অচেনা। কিরণের দ্বিধা হচ্ছিল বলতে। বিশ্বাস কি? যদি মুখের উপর স্পষ্ট না বলে বসে। সে বিশ্রী হবে,—প্রায় অপমান। কিন্তু আকাশে কালো মেঘ,—বৃষ্টি ধরবে বলেও মনে হয় না। এই দুর্যোগে ফের কি আর একটা ট্যাক্সি পাবে?

'ইচ্ছে হলে আপনিও এই ট্যাক্সিতে যেতে পারেন।' ঈষৎ চিন্তিতভাবে কিরণ প্রস্তাব করল। 'আমিও শ্যামবাজারের দিকে যাচ্ছি।'

কিন্তু রীতাবরী তখুনি গাড়িতে উঠল না। ভুরু কুঁচকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মেয়েটার দ্বিধা আর সংশয় কিরণের ভালো লাগল। তা সত্যি, চেনাজানা নেই, একবার বলতেই কেন হুট করে তার সঙ্গে ট্যাক্সিতে এসে বসবে? কিন্তু বৃষ্টি যেন আবার ঝেঁপে এল। সেই সঙ্গে জলের ছাট। পথে দাঁড়িয়ে ও এমন করে ভিজছে কেন? কিরণ প্রায় ধমক দিয়ে বলল,—'আঃ! কি করছেন আপনি? গাড়িতে উঠে আসুন, না হলে চটপট কোথাও গিয়ে দাঁড়ান। একেবারে ভিজে গেলেন যে।'

কিরণের কথায় কিংবা বৃষ্টি জোরে এল বলে রীতাবরী এগিয়ে এসে গাড়িতে উঠল। সে পাশে বসতেই কিরণ লজ্জিতভাবে হাসল। বলল,—'দেখুন, কিছু মনে করবেন না। আমি ডাক্তার কিনা। আপনি জলে ভিজছেন দেখে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারিনি।'

ডাক্তার শুনে রীতাবরী চোখ তুলে আর একবার ওকে দেখল। বলল,—'না, না, এতে মনে করবার কি আছে? আপনি তো ঠিকই বলেছেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে জলে ভিজলে অসুখ-বিসুখ করতে পারে।'

সমস্ত পথে আর কোনো কথা হয়নি। অবশ্য কতটুকু সময়? ফাঁকা রাস্তা। বৃষ্টি-বাদলায় লোকজন কম। ছাতায় মাথা ঢেকে যারা হাঁটছে, তারা সকলেই প্রায় ঘরমুখো। কিরণ অবশ্য অন্য রকম আশা করেছিল। গাড়িতে উঠে রীতাবরী নিশ্চয় তাকে ধন্য-বাদ জানাবে। মামুলি ভদ্রতাসূচক দু-একটা কথা। কিন্তু মেয়েটা হয়তো দেমাকী। নইলে অমন মুখ টিপে বসে থাকে।

গ্রে স্ট্রীটের ক্রসিংটা পেরোতেই রীতাবরী নামবে বলল। ইঙ্গিত বুঝে ড্রাইভার তখুনি গাড়ি থামাল। নামার আগে একটা কাণ্ড করল রীতাবরী। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার

নোট বের করল। তারপর ট্যাক্সির ড্রাইভারের দিকে সেটি এগিয়ে দিল।

কিরণ ভুরু কুঁচকে বলল,—'একি! আপনি ভাড়া দেবেন কেন? আমি তো ট্যাক্সিটা নিয়েছি। আরো খানিকটা পথ আমাকে যেতে হবে।'

—'তাতে কি হয়েছে?' রীতাবরী মিষ্টি হাসল। 'আমি এটা দিই। আপনি আবার বাকি পথের ভাড়া দেবেন।'

এই নিয়ে অনেক কথা, অনুরোধ-বিরোধ হতে পারত। কিন্তু পাঞ্জাবি ড্রাইভার পরিষ্কার জানাল তার কাছে চেঞ্জ নেই। সুতরাং দশ টাকার নোট নিয়ে সে কি করবে?

রীতাবরী ফাঁপরে পড়ল। তার কাছে আর টাকা ছিল না। তবু সে ভ্যানিটি ব্যাগের এদিক ওদিক তন্ন তন্ন ভাবে খুঁজছিল। যদি দু-একটা টাকা বাড়তি থেকে যায়।

ওর হতাশভাব দেখে কিরণ মুচকি হাসল। বলল,—'আহা! আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? টাকাটা না হয় পরে আমাকে দেবেন।'

রীতাবরী মুখ না তুলেই জবাব দিল—'পরে আবার আপনাকে কোথায় পাচ্ছি?'

—'কেন পাবেন না?' কিরণ ওর দুর্ভাবনা হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল। বলল, —'পরশু আমি আবার কলেজ স্ট্রীটে আসব। ওয়াই এম সি এ-তে একটা কাজ আছে। বেলা তিনটের সময় ওখানে আমাকে নিশ্চয় দেখতে পাবেন।'

কিরণ ভাবতে পারেনি। কথাটা তার মনেও ছিল না। ওয়াই এম সি এ-র দরজার সামনে রীতাবরীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে খুব অবাক হয়ে শুধোল,—'একি! আপনি এখানে?'

রীতাবরী কোনো ভূমিকা না করেই বলল,—'ট্যাক্সি ভাড়াটা বাকি ছিল। তাই দিতে এসেছিলাম।'

কিরণের সেদিনের কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল। হ্যাঁ, সে বলেছিল বটে। শুক্রবার ওয়াই এম সি এ-তে তার কাজ আছে। বেলা তিনটের সময় ওখানে তাকে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। আশ্চর্য! রীতাবরী সে কথা ভোলে নি। ঠিক মনে রেখেছে। ঘড়িতে অবশ্য তিনটে বেজে পাঁচ-ছ মিনিট হবে। মেয়েটি তাহলে আরো আগে থেকে এখানে অপেক্ষা করছে?

মেয়েটার হাতে বইখাতা। এইমাত্র বোধহয় কলেজ থেকে বেরিয়েছে।

কিরণ হেসে বলল,—'চলুন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

—'আমার সঙ্গে কথা?' রীতাবরী অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে তাকাল। ফের শুধোল, —'কি কথা? কোথায় বলতে চান?'

—'কফি হাউসে চলুন। ওখানে যেতে নিশ্চয় আপনার আপত্তি নেই?—'

—'ভীষণ আপত্তি আছে।' রীতাবরী ঠোঁট ফাঁক করে হাসল। বলল,—'ওখানে ইউনিভার্সিটির কত ছেলেমেয়ে। অনেকে আমাকে চেনে। আপনার সঙ্গে কফিহাউসে ঢুকলে ওরা কি ভাববে বলুন তো?'

কে কি ভাবল, এই নিয়ে রীতাবরীর ভীষণ দুশ্চিন্তা। আশঙ্কা অহেতুক জেনেও সে ভয় পেত। প্রথম প্রথম তার সঙ্গে থাকতে চাইত না। খালি ভয়-ভাবনা—যদি কেউ তাদের দেখে ফেলে। তার দাদা, বাবা, কিংবা কোনো আত্মীয়বন্ধু। তাহলেই তো সে ফেঁসে যাবে। জিজ্ঞেস করলে কি বলবে রীতাবরী? কি কৈফিয়ৎ দেবে তাদের কাছে?

অবশ্য দিনে দিনে চন্দ্রকলার মত সাহসও বেড়েছে। ইদানীং আর তত ভয় করে না। ছুটিছাটার দিনে কোনো ছল-অজুহাতে রীতাবরী কলকাতায় চলে আসে। দুজনে মিলে গঙ্গার ধারে যায়,—ফোর্টের কাছে মখমলের মত সবুজ ঘাসের উপর কিংবা আউটরাম ঘাটের জেটিতে গিয়ে বসে। পশ্চিমের আকাশে সূর্য হেলে পড়ে......গঙ্গার বুকে গাংচিল পাক খায় আর ওড়ে। কোন ফাঁকে যে সময়ের কণাগুলি হারিয়ে যায় কেউ খেয়াল করে না।

কিরণ একদিন মজা করে বলল,—'এখন কিন্তু তোমার খুব সাহস হয়েছে। দিব্যি আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছ। তোমার বাবার সঙ্গে এবার আলাপ করে আসা দরকার। কবে নিয়ে যাবে বল দিকি?'

—'দাঁড়াও এত তাড়াতাড়ি কিসের?' রীতাবরী ভুরু কুঁচকে তাকাল। চোখ ঘুরিয়ে রহস্য করে বলল,—'তোমাকে আর একটু বাজিয়ে-টাজিয়ে দেখি মশায়। এত শীগ্গির কি মা-বাবার কাছে নি[য়ে] চলে?'

—'খুব চলে।' কিরণ স্পষ্ট জব[াব দিল।] 'তুমি না নিয়ে গেলে এবার আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হ[ব।]'

কিরণের গলায় স্বরে পরিহা[স] না। একটা জিদ কিংবা অনমনীয় ফুটে উঠল। থমকে গেল রীতাব[রী।] ভাবে বলল,—'এই, না-না। অমন [করো] না। শেষে একটা বিশ্রী লজ্জার [ব্যাপার] হবে।'

—'লজ্জা কিসের?' কিরণ ও[জর] করল। 'বরং এমনি লুকিয়ে-চুরিয়ে দিয়ে দেখা করতে আমার আরো লজ্জা করে।'

—'বিশ্বাস কর। উপায় থাকলে অনেক আগে আমি বাবার সঙ্গে [আলাপ] করিয়ে দিতাম।' রীতাবরী ম্লান [হেসে] বলল,—'এসব ব্যাপারে আমার [বাড়ির] লোকেরা ভীষণ কনজারভেটিভ। এ[ই] মেশা, আলাপ-পরিচয়, কেউ পছন্দ [করে] না। উল্টে সন্দেহের চোখে দেখবে। কি আমার ইউনিভার্সিটিতে পড়তে [যাওয়া,] একা একা ঘোরাফেরা পর্যন্ত বন্ধ [হয়ে] যেতে পারে।'......

অমিয় বারিক লেন বেশী দূরে [নয়।] আর মিনিট চার-পাঁচ হাঁটতে [হবে।] একটু এগোলেই বাঁদিকে [...] মহম্মদ লেন। কিরণ ভাবল, [...] ডান দিকের ফুটপাত ধরবে। অমিয় [বারিক] লেনটা ডানদিক থেকে বেরিয়েছে। [...] ওপাশে যাওয়াই সুবিধের হবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিকট [...] বোমার শব্দ। খুব নিকটেই কোথাও [...] সেটা ফাটল। কয়েক মুহূর্ত পরে [...] একটা....তারপর আরো তিন-চারটে [...] শব্দে কানে প্রায় তালা লাগবার [...] দু-পাশের বাড়ি-ঘরগুলো থরথর [করে] কেঁপে উঠল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সমস্ত [...] ফাঁকা হয়ে গেল। যাত্রী নিয়ে দ[ু-একটা] রিকসা উত্তর দিকে যাচ্ছিল। তারা ঘুরিয়ে যেদিক থেকে আসছিল, সেদিকে ফিরে গেল। পথচলতি [...] গুলো কর্পূরের মত কোথায় মিলিয়ে [গেল] কিরণ ঠাহর করতে পারল না। [...] দরজা প্রায় বন্ধ, কিংবা খিড়কির [...] মত অল্প একটু খোলা রইল। কিরণ [...] ছিল কি করবে। মাথা তুলে সে [...] কেউ কেউ ছাদে উঠে কি যেন লক্ষ্য [...] অনেকে দোতলা কিংবা তিনতলার [...] ভিড় করে দাঁড়িয়ে। গন্ডগোলটা [...] পীর মহম্মদ লেনের ভিতরে। বোমার [আওয়াজ] ওখান থেকেই এসেছে। ইতস্তত [...] হৈ-চৈ। কতকগুলি মানুষের [...] কণ্ঠস্বর। কিরণ আর এক মুহূর্ত [দেরি] না করে, রাস্তা পেরিয়ে ডানদিকের [ফুট]পাতে এসে দাঁড়াল।

পিছন থেকে কে যেন তাকে উদ্দেশ্য করে বলল,—'হাঁ করে কি দেখছেন দাদা? চটপট ভিতরে ঢুকে পড়ুন। এখুনি রাস্তার উপর বোমবাজী হলে কি করবেন?'

ঠিক তখুনি পীর মহম্মদ লেনের ভিতর থেকে কারা যেন দৌড়ে বেরিয়ে এল। চার-পাঁচজন মস্তান গোছের ছোকরা,—উনিশ-কুড়ির মধ্যে সব বয়স। কেমন অপরাধীর মত অস্থির দৃষ্টি। প্রত্যেকের হাতেই অস্ত্র, —ছোরাছুরি লোহার রড। একজনের হাতে বন্দুকের নলের মত হাত দুই লম্বা কি একটা বস্তু।

বনের মধ্যে হঠাৎ দস্যুর দলকে এগিয়ে আসতে দেখলে পথিক যেমন গাছপালার আড়ালে আত্মগোপনের চেষ্টা করে, কিরণ তেমনিভাবে খুব দ্রুত একটা ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। সে তাকিয়ে দেখল, আরো অনেকে আগেই সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। প্রায় সাত-আটজন লোক। সকলেই খুব ভীত, সন্ত্রস্ত। যেন কিছু একটা ঘটতে পারে, এই দুর্ভাবনায় তারা অস্থির।

আশ্চর্য! যুবকের দল কিন্তু কোনো দিকে তাকাল না, কাউকে গ্রাহ্য করল না। [illegible] রাস্তা পেরিয়ে ওদিকের ফুটপাতটায় এসে উঠল। তারপর তেমনি দৌড়ে আরো খানিকটা দক্ষিণে গিয়ে ডানদিকের একটা গলির মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হল।

ঘরের দরজা ঈষৎ ফাঁক করে অনেকেই দেখছিল। কে একজন বলল,—ইস! কি মারাত্মক কাণ্ড। ওই কোঁকড়া চুলওলা ছেলেটার হাতে একটা পাইপগান মশায়।

আর একজন টিপ্পনী কাটল,—শুধু পাইপগান কেন বলছেন? প্রত্যেক মস্তানের হাতেই তো একটি করে যন্তর দেখছি। খুঁজে নিয়ে দেখুন পকেটের ভিতর হয়ত রিভলবারও আছে।'

কানফাটানো শব্দে ফের একটা বোমা ফাটল। এবারে গলির ভিতরে নয়, রাজপথের বুকে। কিরণ মুখ উঁচু করে দেখল পীর মহম্মদ লেনের মুখে আট-দশজন জোয়ান ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে। বোমাটা খুব সম্ভব এরাই কেউ ছুঁড়ে মেরেছে। শত্রুপক্ষ চম্পট দিয়েছে দেখে নতুন মস্তানের দল আর এগোল না। পীর মহম্মদ লেনের মুখে আরো দু-চার মিনিট দাঁড়িয়ে তারা গলির মধ্যে নিজেদের ডেরায় ফিরে গেল।

কিরণ ভাবল, আর কতক্ষণ এমন ইঁদুরের মত গর্তের ভিতর লুকিয়ে থাকব? তার নিজেকে একটা ভীরু কাপুরুষের মত মনে হচ্ছিল। ঘরের মধ্যে তার মত আরো সাত-আটজন মানুষ। সকলেই হীনবল, শংকায় ব্যাকুল। শুধু এই ঘরই বা কেন? গলির ভিতরে, রাজপথের দুপাশে প্রতিটি ঘরেই এখন আশ্রয়প্রার্থীর ভিড়। আশ্চর্য! কয়েকটা মাত্র ছেলের ভয়ে এরা এতগুলি লোক দুর্যোগের রাতের মত কেমন জড়সড় হয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে [illegible] প্রাণটা বাঁচাচ্ছে।—

পিছন থেকে কে একজন বলল,—'চলুন মশায়, এবার বেরিয়ে পড়া যাক। এরপর আবার পুলিশের হাঙ্গামা শুরু হবে।'

—'পুলিশ?' কিরণ ভুরু কুঁচকে শুধোল।

—'হ্যাঁ। মস্তানরা সব হাওয়া,—পুলিশের তো এই আসবার সময়।' লোকটি ব্যঙ্গ করে বলল, 'দাঁড়িয়ে থাকলে দেখবেন, কয়েকটা নিরীহ নির্দোষ ছেলেকে পুলিশ কেমন করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।'

এরকম টিকা-টিপ্পনী, সরস সমালোচনা ট্রামে-বাসে, পথে-ঘাটে হামেশাই কানে আসে। এসব কথার একতরফা শুনানীই ভাল। কোনো আলোচনা করতে যাওয়া মানেই বোকামী। বলতে গেলে কথার সুতো বাড়তে থাকবে। কিরণ তাই কোনো জবাব না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

রাস্তায় অনেক লোক। গন্ডগোল কমে যেতেই ভিড় বেড়েছে। এখানে সেখানে জটলা, আলোচনা। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে কিরণ একটা ছোট ভিড়ের পাশে দাঁড়াল। সমস্ত শরীরটা বাইরে রেখে, সে উটের মত ভঙ্গিতে মাথাটা ভিতরে গুঁজে দিয়ে কথা শুনবার চেষ্টা করতে লাগল।

কে একজন বলল—'ওরা তক্কে তক্কে ছিল মশায়। ছেলে দুটো একসঙ্গে ফিরছিল। ফাঁক পেয়ে চার-পাঁচজনে মিলে একেবারে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে।'

—'তারপর? দুটোই শেষ?'

—'তা বলতে পারব না। তবে শুনলাম একজনের পেটে ছুরি মেরেছে। বোমা লেগে আর একজনের ডান পা কিংবা বাঁ হাতটার নাকি আধখানা উড়ে গেছে।

—উঃ! কি সাংঘাতিক কাণ্ড। দিনে দিনে দেশের কি হাল হচ্ছে মশায়?' শ্রোতা সখেদে বলে উঠল। ফের শুধোল,—'তা ছেলে দুটোর বয়স কত? বাঁচবে মনে হয়?'

—'কি করে বলব? আমি তো আর চোখে দেখিনি। তবে শুনলাম কাঁচা বয়েস, —দুজনেই স্কুলের ছেলে।'

—স্কুলের ছেলে? কিরণ অস্ফুটে বলল। তার মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করতে লাগল। একটা অজানা ভয়ের স্রোত শিরা-উপশিরায় ছড়াচ্ছে। মনের ভিতর চিন্তাগুলো সব ভোঁতা....একটা অমঙ্গল আশংকা, দুর্বল সন্দেহ ঘুণপোকার মত কুরে কুরে খাচ্ছে। অমিয় বারিক লেনটা তো এখান থেকে দূরে নয়? সে যা মনে করতেও ভয় পায়, তাও কি সত্যি ঘটতে পারে?

আর একটি মুহূর্ত দেরি না করে কিরণ ভিড় সরিয়ে বেরিয়ে এল। কেউ তাকে লক্ষ্য করল না, তার দিকে তাকাল না। পীর মহম্মদ লেনটা বাঁ দিকে রেখে সে খুব দ্রুতপায়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

দরজা খুলে ছেলের মূর্তি দেখে ভীষণ ভয় পেল মনোরমা। কিরণের একি চেহারা! মুখ কালিবর্ণ, অস্থির দৃষ্টি। উস্কোখুস্কো চুল গায়ের জামাটা ঘামে ভিজে সপসপ করছে।

—'কি হয়েছে তোর কিরণ?' মনোরমা ব্যস্তভাবে শুধোল। 'অমন হাঁপাচ্ছিস কেন বাবা?'

—'বলছি মা। আগে তুমি আমাকে বলো, হিরু কোথায়? সে কি স্কুল থেকে ফিরেছে?'

—'কেন বল তো?' মনোরমা ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। 'হিরু তো আজ স্কুলে যায় নি। সকাল থেকে বাড়িতেই আছে। ডাকব তাকে?'

—'না, না। ডাকতে হবে না।' কিরণ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মনোরমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,—'হিরু আজ স্কুলে না গিয়ে ভালই করেছে মা। একটু আগে পীর মহম্মদ লেনের ভিতর দুটো ছেলে বোধ হয় খুন হয়ে গেল।'

—'খুন হয়ে গেল? বলিস কিরে?' মনোরমা যেন আতনাদ করে উঠল।

হ্যাঁ মা, উত্তেজনায় কিরণের চোখ দুটো চকচকে দেখাল। সে বলল, —'ছেলে দুটো সম্ভবতঃ স্কুল থেকে ফিরছিল। বাগে পেয়ে একজনকে ওরা ছুরি মেরেছে। বোমা লেগে আর একজনের ডান-পা কিংবা বাঁ হাতটার আধখানা উড়ে গেছে। দুজনের কেউই বোধ হয় বাঁচবে না।'

—'গন্ডগোলটা কোথায় হচ্ছিল কিরণ?' পিছন থেকে পুরুষ কণ্ঠে কেউ প্রশ্ন করল।

চেনা গলা। তবু কিরণ অবাক হল। এখন বড়জোর দুটো হবে। কিন্তু এত সকালে বাবা কেমন করে অফিস থেকে ফিরলেন? তবে কি হিরুর মত উনিও আজ বাড়িতে আছেন? সকালবেলায় খাওয়া দাওয়া করে অফিসে যান নি?

দরজার সামনে বাণীব্রত দাঁড়িয়ে-ছিলেন। কেমন ক্লান্ত, অবসন্ন দেখাচ্ছিল তাকে। পরণে একটা আধময়লা জামা আর ধুতি। এতক্ষণ ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে-ছিলেন, ছেলের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন

—'পীর মহম্মদ লেনে খুব গোলমাল, খুন জখম হয়ে গেল বাবা।' কিরণ ধীরে ধীরে বলল। 'দুটো ছেলে বোধ হয় মারা যাবে। এতক্ষণ তো বিকট শব্দে বোমা ফাটছিল সেখানে। তোমরা শুনতে পাওনি?'

—'শুনেছি বৈকি।' মনোরমা এগিয়ে এসে বলল। 'কিন্তু বোমার শব্দ তো এদিক ওদিক চারদিক থেকেই পাচ্ছি কিরণ। একটু আগে যে পীর মহম্মদ লেনে বোমা ফাটছিল, তা কেমন করে বুঝব বল?'

—'তুমি কি এতক্ষণ সেখানেই ছিলে?' বাণীব্রত ভ্রূ কুঁচকে শুধোলেন।

—'ঠিক সেখানে নয় বাবা।' কিরণ ঘটনাটা প্রাঞ্জল করতে চেষ্টা করল। 'আমি আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরে বাড়ি ফিরছি। পীর মহম্মদ লেনের কাছাকাছি আসতেই একটা গন্ডগোল, বোমার আওয়াজ কানে এল। অমনি দোকানপাট সব ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে গেল বাবা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই রাস্তাটা ফাঁকা। মানুষজন কে কোথায় পালাল, তা বুঝতেও পারলাম না। ভয় পেয়ে আমিও তাড়াতাড়ি একটা ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম।'

—'বেশ করেছিস বাবা।' মনোরমা সস্নেহে ছেলের মুখের দিকে তাকাল। বলল,—'গন্ডগোল, মারামারির সময় বাইরে থাকতে নেই। সকলেই ধারে কাছে কোথাও আশ্রয় নেয়।'

বাণীব্রত চুপ করে কি ভাবছিলেন। জানালার ফাঁক দিয়ে বহু দূরের এক টুকরো নীল আকাশ চোখে পড়ে। কি শান্ত, সুন্দর ছবি! সেদিকে তাকিয়ে প্রায় স্বগতোক্তির মত তিনি বললেন,—'কলকাতার বাস এবার গুটোতে পারলে বাঁচি। চন্দনপুরে গেলেই আমি নিশ্চিন্ত হই কিরণ।'

বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলে শুধোল,—'কলকাতা ছাড়তে পারলেই তুমি স্বস্তি পাবে বাবা? চন্দনপুরে গেলেই কি সব সমস্যার সমাধান হবে?'

—'তা জানি না।' বাণীব্রত মৃদু হাসলেন 'তবে সেখানে নিশ্চয় এসব দুর্ভাবনা নেই। তোদের কলকাতার এই গন্ডগোল, মারামারি, খুনোখুনী কিছুই সেখানে পোঁছবে না।'

জানালার ফাঁকে নীল আকাশটার দিকে তাকিয়ে বাণীব্রত ফের উন্মনা হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, —'জানিস কিরণ, আমাদের চন্দনপুরের বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা গন্ধরাজ গাছ আছে। ডাল-পালায় এখন প্রকান্ড হয়েছে সেটা। চন্দন-পুরে রোজ ভোরে ঘুম ভাঙলে দেখতাম, গন্ধরাজ গাছটার ডালে বসে একটা পাখি কি সুন্দর শীস দিচ্ছে।'—

কিরণ হেসে বলল,—'কলকাতার উপর তুমি মিছিমিছি রাগ করছ বাবা। এত গন্ড-গোল, মারামারি কেন হচ্ছে, কারা এসব করছে তাই নিয়েও ভাববার আছে। সমস্যার সমাধান না হলে চন্দনপুরে গিয়ে নিস্তার নেই। গন্ডগোলের ঢেউ যে একদিন সেখানে পোঁছবে না, তাই কি জোর করে বলা যায়?'

বাণীব্রত কোনো জবাব দিলেন না। ছেলে আরো কি বলে তাই শুনবার জন্য ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিরণ বলল,—'শুধু কলকাতা কেন, সমস্ত পশ্চিমবাংলার অবস্থাটা চিন্তা কর বাবা। ঠিক জ্বরে বেঁহুশ একটা রুগীর মত হাল। বিকারের ঘোরে সে অর্থহীন প্রলাপ বকছে। মাঝে মাঝে হাত-পা ছুঁড়ছে। তাকে সুস্থ, স্বাভাবিক করে তোলাই আপনজনের কাজ। ফেলে পালিয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই বাবা।'

বাণীব্রত বললেন—'আর সে যদি স্বাভাবিক না হয়ে ওঠে?'

—'তাহলেও আমাদের চেষ্টা যেতে হবে। ঘরের চালে আগুন কেউ কি বাড়ি ছেড়ে পালায় বাবা ঢেলে, লাঠি মেরে আগুন নেভাতে

—'কি জানি।' বাণীব্রত অন্যম মত বললেন, 'তোদের সব কথাই হেঁয়ালির মত কিরণ। আমরা লোকেরা ঠিক বুঝতে পারি না।'

—'ওসব তর্কের কথা এখন থাক খাবি চল দিকি। দুটো কখন বেজে সে খেয়াল কারো আছে?' মনোরমা তাড়া দিল। ফের স্বামীকে বলল, অমন দাঁড়িয়ে রইলে কেন? শরীর বলে, অফিস থেকে চলে এলে। গিয়ে শুয়ে থাক গে।'

—'বাবার শরীর খারাপ কিরণকে চিন্তিত দেখাল।

—'ও কিছু নয়।' বাণীব্রত লঘু করতে চাইলেন। 'অফিসে শরীরটা হঠাৎ কেমন খারাপ লাগল কাছে একটা ব্যথা তাই ট্যাক্সি ডেকে চলে এলাম।'

—'বুকের কাছে ব্যথা?' কিরণ কোঁচকাল। বলল,—'ঠিক আছে সকালে আমার সঙ্গে তুমি হাসপা চল বাবা। প্রফেসর সিনহাকে দেখাব ইউরিন, প্রেসার,—দরকার হলে ইলেকট্রো কার্ডিয়োগ্রাফও করতে হ

* * *

ছেলের সামনে ভাতের থালা সা রেখে মনোরমা বলল,—'তোকে একটা বলব কিরণ?'

—'কি কথা মা?'

—'বিন্তি বড় হচ্ছে। তার জন্যে ভাবিস?'—

—'কেন? কি হয়েছে বিন্তির? অসুখ বিসুখ?'

—'বালাই ষাট।' অসুখ কেন যাবে? আমি তোকে অন্য কথা কিরণ।' একটু থেমে মনোরমা ফের করলেন,—'তোর বাবার কথা শুনলি চন্দনপুরে উনি যাবেনই। যুক্তি-তর্ক, অনুরোধ মানবেন না। কিন্তু যাবার বিন্তির একটা বিয়ে দিতে পারলে হত। ওই নাচুনী মেয়ে কখনও চন্দনপু মত গ্রামে গিয়ে থাকতে পারে?'

—'বিন্তির বিয়ে?' কিরণ ঠোঁট কা প্রশ্নটা ভাবল। মা অনেক দূরে দেখেছেন। বলার মধ্যে যুক্তি আছে। আশ্চর্য! বিন্তির বিয়ের কথা গীতাবরীর মুখটা কেন তার মনে পড়

(ক্রম

অস্বাস্থ্যের কারণে এখান থেকে বদলী নিয়েছিলাম পাটনায়। শীতের ক'মাস বড় কেটেছিল সেখানে। জল-হাওয়ার গুণে ফলে শরীরও সেরে এসেছিল। গ্রীষ্মের শেষে আঁচ করতে পারলাম গরমের তীব্রতা কি রূপ নিতে পারে। সেই সময়ে গরমের দাপট দেখে শিউরে উঠলাম।

শারীরিক হাল দেখে বদলী নিলাম ছোটনাগপুরের হাজারীবাগ জেলায়—পাহাড় উপত্যকা, বনজঙ্গলে ঘেরা শহর। বনবিভাগের সংরক্ষিত উপবন, দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের ড্যামের কল্যাণে গরম সেখানে নামমাত্র, নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নীলানিকেতন জায়গাটি।

নামে শহর—পল্লীশ্রী তার সারা অঙ্গ জুড়ে। অফিসে, বাংলোতে ফুলফলে, লতাপাতায় ছাওয়া। মন ভরে গেল প্রকৃতির অজস্র সুধা পান করে। শরীরের রুক্ষতা মিলিয়ে, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে উঠল দেহমন। সজল স্বাস্থ্য ফিরে পেলাম অনেকদিন পরে।

ছুটির দিনে বাংলোতে শুয়ে বসে থাকতে ভাল লাগত না আমার। অবসর কাটাতে সংরক্ষিত বনের ডাকবাংলোতে ডেরা পাততাম শিকারীর মতন। আত্মরক্ষার জন্য বন্দুক সঙ্গে থাকলেও ব্যবহার করতে হয়নি কখনও। বাংলোর আশপাশে বন বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতাম, পাহাড়ী নদীর ধারে এসে বসতাম, সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নামতে দেখে বাংলোতে ফিরে আসতাম।

শরতের শেষে বাতাসে শীতের আমেজ জমতে সুরু করে। বনের ভেতর নানা জাতের ফুল ফুটে ওঠে। সম্বর, হরিণ দলে দলে চরে বেড়ায় গাছতলায়। দল বেঁধে কিচির-মিচির ডাক ছেড়ে পাখীরা দানা খুঁটে বেড়ায় জংলা বজরা জোয়ারের তলায়। দু' চোখ ভরে পশুপাখী দেখে মন ভরে যায়।

রবিবারের বেলা শেষে ডাকবাংলো ছেড়ে বেরিয়েছিলাম পাহাড়ী ঝর্ণার ধারে। দাঁড়িয়ে দেখছিলাম হরিণেরা জল খেতে নেমেছে ঝর্ণার জলে। বুনো শুয়োরের পাল কন্দ খুঁড়ে খাচ্ছে বাঁশ-ঝাড়ের নতুন গজানো চারা থেকে।

সেদিক পানে চেয়ে চোখে পড়ল অদূরে শিলার উপর বসে ঝর্ণার জলে পা ডুবিয়ে একটি মেয়ে বসে হরিণগুলোর পানে চেয়ে। নির্জন বনভূমিতে তাকে একা বসে থাকতে দেখে আমি বিস্মিত হলাম। সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছে, লোকালয় অনেকখানি দূরে, বনভূমিতে রাতের অন্ধকার নেমে এল বলে, অথচ তার ওঠার লক্ষণ নেই।

কাছে-পিঠে তার সঙ্গীসাথী কাউকে দেখলাম না। ভাবলাম সে কি একা একাই বেরিয়েছে ঝর্ণা দেখতে! আমার কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরেই বসেছিল সে। বন-পথ ধরে আমাকে ফিরতে হবে তার পাশ

দিয়ে। ঘনায়মান সন্ধ্যার ছায়া নামতে দেখে ডাকবাংলোর পথ ধরলাম।

শিলার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে আমার মনে খটকা বাধল। সে আমার উপস্থিতি টের পেল না। কিছুটা পথ এগিয়ে গিয়েও ফিরে এসে তাকে হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলাম—রাত হয়ে আসছে, বাড়ী ফিরবে না?

আমার কথা শুনে পেছনে তাকাতে দেখতে পেলাম হরিণীর মত করুণ চোখ দুটি তার, শ্যামলী মেয়ের ঢলঢলে মুখখানিতে যাদুর মায়াজাল—অফুরন্ত মায়া-জাগানো চোখমুখ তার। মাথার বেণী পেছনে দোলানো, অফুরন্ত সৌন্দর্য ভরে থাকতে দেখলাম তার সারা দেহে—তাকে বনদেবী বলে ভ্রম হল আমার। মেয়েটির নিঃসঙ্গতার কথা ভেবে দাঁড়িয়ে পড়লাম শিলার পেছনে।

আমার কথার জবাব না দিয়ে সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হরিণগুলোর দিকে, ঝর্ণা তার পা ছুঁয়ে লুটোপুটি খেয়ে বয়ে চলল পাহাড়ী নদীর পানে। কোনদিকে তার খেয়াল নেই, নিজের মনে নিজেই মশগুল সে। একঠাঁই বসে রইল শিলার উপর—না দিল আমার কথার উত্তর, না দেখলাম তার ওঠার লক্ষণ।

ফিরে যাব কিনা ভাবছিলাম। গায়ে পড়ে ভাব জমাতে চাইছি ভেবে সে বিরক্তি বোধ করতে পারে। শ্বাপদসংকুল অরণ্যে তাকে একা ফেলে যেতে পৌরুষে বাধল। মেয়ে হলেও সে মানুষ। মানুষের ভাল-মন্দ বুঝিয়ে দেবার অধিকার মানুষের আছে, সে পরিচিতই হোক, অপরিচিতই হোক।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে দাঁড়িয়ে রইলাম মেয়েটির পেছনে। অস্তমিত রবির শেষ রশ্মি ঝর্ণার জলে আবির গুলে তার পা-দুখানি রাঙিয়ে যেতে দেখলাম। ছোট রুপোলী মাছ ঝর্ণার জলে ঝিকমিক করে খেলা করতে লাগল, মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম সেদিকে।

পূর্ণিমা রাত। সূর্য্যি ডুবতে না ডুবতে গাছের শিরে উঁকি দিয়ে উঠল থালার মত গোল চাঁদ। ফিরে যেতে স্থির করে শেষবারের মত তাকে বললাম—আমি ফিরে চলি? কথাটা বলে ফেলে লজ্জা বোধ করলাম, যেন ফিরে চলার সম্মতি চাইছি তার।

আমার কথা শুনে ফিক করে হেসে বাংলায় বলল—'এত দূর কষ্ট করে, যা দেখতে এসেছিলে না দেখেই ফিরে যাবে?'

—আমি কি দেখতে এসেছিলাম, তা তুমি জানলে কেমন করে?

—সঠিক জানি না। অনুমানে বললাম। সংরক্ষিত বনে মানুষ হিংস্র জানোয়ারের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি দেখতে ভালবাসে।

—তুমিও তাই দেখতে এসেছ?

—পূর্ণিমা রাতে, ভর সন্ধ্যাবেলা হরিণেরা ঝর্ণায় জল খেতে আসে। ওরা দের আগেভাগেই জল খেয়ে যেতে দেখে বুঝেছিলাম, বাঘের দল কাছাকাছি কোথাও রাতের অপেক্ষায় আছে।

—রাতে একা একা হিংস্র জানোয়ারের সামনে তোমার ভয় করে না?

—ভয় করবে কেন? জন্তু-জানোয়ার আমার চেনা-জানা। না ঘাঁটালে মানুষকে কিছু বলে না তারা।

মুখে হাত চাপা দিয়ে চুপ করার ইঙ্গিত জানিয়ে আঙুল বাড়িয়ে আমাকে দেখাল হরিণগুলো যেখানে জল খাচ্ছিল। বিরাট বিরাট বাঘ নেমেছে সেখানে জল-খেলা করতে। বাঁশজঙ্গলের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল হাতীর পালও নেমেছে সেখানে। একই ঝর্ণার জলে—বাঘ আর হাতী, উভয়ের দুষমণ। কেউ কারও হিংসে কচ্ছে না। আপন মনে জল খেলায় ব্যস্ত তারা।

শুঁড় দিয়ে জলের ধারায় হাতী নাইয়ে দিচ্ছে হস্তিনীকে, বাঘও তাই করছে বাঘিনীকে। এ যেন চরম আনন্দ উপভোগের রম্যভূমি। জীবনে এ দৃশ্য না দেখলে অনেকখানি ফাঁক থেকে যেত বুঝলাম। জন্তুজানোয়ারেরাও তাদের সঙ্গিনীকে আগলে রাখে, প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, এ যে সব তারই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

আমাকে এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পাশের জায়গা দেখিয়ে ইসারায় সে বসতে ইঙ্গিত করল আমাকে। হাতীর পাল, বাঘের দল চলে গেল, তাদের স্থান অধিকার করল সম্বর ভালুকের দল। জানোয়ারদের তারস্বরে

জনহীন বনভূমি কেঁপে উঠল, ... গেল ঝর্ণার ধারে, শশক, বনমোরগ খড়হাঁস জলে নেমে পড়ল জোড়ায় আনন্দ মুখরিত উৎসবের ... উঠল পাহাড়ী ঝর্ণাকে ঘিরে।

রাত বাড়ছে, চাঁদের আলো পড়ছে গাছের ডালপালায়। ... ডাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ... ঝর্ণার জলে চাঁদের আলো ... ফুটিয়ে তুলছে শতসহস্র চাঁদ, আর বাতাসে চাঁদ, ঝর্ণার জলে চাঁ... পাতায় শিশিরের বুকে চাঁদ, চাঁদের বান ডেকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ... বনভূমিকে।

পাশে বসা মেয়েটিকে আমার ... মূর্ত প্রকৃতি—চাঁদের জোছনা ... উপভোগ করছে সে। অরণ্যের ... দেবীর অঙ্গীভূতা মনে হল তাকে। জগতের সব যেন তার আপন ... জানোয়ার, গাছপালা, পাহাড় পর্বত ...

নিস্তব্ধতা ভেঙে সে বলে ... ওঠা যাক, যা দেখার কথা বলেছিলাম ... কেমন লাগল তোমার?

—অপূর্ব, না দেখলে ... জীবনে, দেখার শেষ নেই, মনে হয় ...

—আমার পেছনে পেছনে এস, ... পাহাড়ী পথ ধরে তোমাকে ... পৌঁছে দেব।

তার পেছন পেছন চলতে ... আমি। অপরিচিত পাহাড়ের ... চলতে এতটুকুও সঙ্কোচ দেখলাম ... আমি যেন তার পরম আত্মীয় ... বলে চলছিলাম আমরা—সে আগে ... পেছনে। চড়াই উৎরাই পথে ... চলা অভ্যেস নেই আমার। ... গড়িয়ে পড়লাম তার গায়ে ... পেলাম। সে আমাকে আগলে না ... গড়িয়ে পড়তাম খাদের ভেতর।

হাত ধরে উঠিয়ে গভীর ... সে বলল—আহা! লাগেনি তো ... এলেই ভাল করতাম। আমার ... তোমার দুর্ভোগ।

—অঘটন যেভাবেই হোক ঘটে, ... সেজন্য দায়ী হবে কেন?

—তাই দেখছি, অঘটন আজও ঘ...

তার কথার ভেতর কি যেন ... ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে বুঝলাম। সে ... হাত ধরে সারাটা পথ এগিয়ে নিয়ে ... চলার গতি মন্থর হয়ে এল। আলো-আঁ... ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে পথ চলেছি ... ধ্যানগম্ভীর নিস্তব্ধতা আমাদের চা... ঘিরে। গাছের পাতা বেয়ে শিশির মাটিতে পড়ার শব্দটুকুও আমাদের ভেসে আসছে। শীতের হাওয়া শির ... করে দোলা দিচ্ছে গাছের ডালে, তার ... লাগছে আমার মনে।

পথ চলতে ভাল লাগছিল না মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছিলাম জন্যে। চড়াই পথ ধরে চলতে হচ্ছিল। একটু জিরিয়ে নেবার —একটু থামবে? হাঁটু টনটন

একটু এগোলেই, সামনে সমতল সেখানে টুরিস্টরা চড়ুইভাতি বসব।

জলাভূমির সামনে খানিকটা মাঠ, তালাওয়ের জলে অগণিত পদ্ম ফুটে আছে। সারা মাঠ জুড়ে বড় বড় চাঁই, ধ্যানাসনের মত তারই একটার উপর আমাকে তালাওয়ের তীর থেকে ওষধির ছিঁড়ে রস বের করে সে প্রলেপ দিল হাঁটুর উপর। ইথারের মত গেল কাটাছেঁড়া জায়গাটা। করলাম আমি।

বাড়ছে দেখে আমি উঠে দাঁড়ালাম। সে আমাকে বলল—আর একটু উপশম হবে এখনই।

বাংলোতে ফিরে ব্যান্ডেজ বেঁধে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। বাঁধার দ্রব্যগুণে আমার পরীক্ষা ব্যান্ডেজ বাঁধার দরকার হবে

পেয়েছে ভেবে পদ্মমূল দিল সে আমাকে। এক দিয়ে আস্বাদে বুঝলাম কি স্বাদ। খিদেতেষ্টা নিমেষে দূর সবটুকু খণ্ড খাওয়ার পর বলল—এখন কেমন বোধ করছ?

আরাম লাগছে। পদ্মমূলের যে আগে জানতাম না।

দেশের সাধুসন্তেরা পদ্মের কন্দ খেয়ে বেঁচে থাকে। তাদের দেহে অটুট বল। জল তুলে কত জায়গায় দিয়ে বলল—আর একটু কাল বাথার উপশম হয়ে এল বলে। আমার মনে হল সে পরিচিত আপনার জন। তাকে ততই ভাবছি মানুষের কায়া দেবী আমার সামনে আবির্ভূতা তার সঙ্গে আমার পরিচয় ক-ঘণ্টা অথচ কত আপন করে নিয়েছে সে সেবার ভেতর দিয়ে তার অন্তরের আমি পেয়েছি, তা তার দেহের ম্লান করে গেল। তার পরিচয় উদগ্রীব হয়ে বললাম—কোথায় থাক

বাংলোর কিছুটা দূরে।

কর এখানে?

কিছুই করি না একেবারে বলা যায় ফরেস্ট অফিসে ছোটখাটো কাজ নিয়েছি।

—তোমাদের দেশ?

—বাংলার এক অখ্যাত পল্লীতে ছিল এককালে। কতকাল আগে ছেড়ে এসেছি।

—কোন্ জেলাতে তোমাদের বাড়ী ছিল?

—যা হারিয়ে এসেছি, তা মনে করে আজ আর লাভ কি?

—তোমার না থাকলেও, আমার থাকতে পারে।

—না, থাকতে নেই।

—আমার সাথে এভাবে পথ চলতে ভয় করল না তোমার?

—না, ভয় করবে কেন?

—কারণ, জানতে পারি?

—তোমাকে ত আজ নতুন করে দেখলাম না। কতদিন ধরে দেখছি তোমাকে। বিশ্রামাগারের ভিজিটার্স বুক থেকে তোমার পরিচয় আমার জানা হয়ে গেছে অনেককাল আগে।

—তোমার পরিচয় কি আমি জানতে পারি?

—না জানাই ভাল।

তার কথা শুনে আমার বিস্ময় বেড়ে গেল। সে আমাকে চেনে, জানে, অথচ তার পরিচয়টুকু জানাতে এত আপত্তি কিসের? এমন কি দেশের নাম পর্যন্ত চেপে গেল সে। রাতে নির্ভয়ে যার সঙ্গে সে অরণ্যের পথ ধরে চলছে, যার সেবা করছে, যাকে তার জানা আছে, তার কাছে পরিচয়ের সূত্রটুকু তুলে ধরতে চাইছে না কেন সে? আমার পরিচয় কি তার ভিজিটার্স বুক থেকেই জানা, না আগে থেকেই চিনত সে আমাকে?

চাকরী জীবনের পরিচয় ছাড়া, আমার আর একটা পরিচয় ছিল—সেটা লেখক হিসেবে। মাঝে মাঝে সাপ্তাহিকে, রবিবাসরীয় আলোচনাতে আমার লেখা বের হত। নিবিড় অরণ্যের ভেতর বসে আমার সে পরিচয়ও কি তার জানা? আমাকে পরিচয়ের গোলক ধাঁধার ভেতর ঘুরতে দেখে সে জিজ্ঞেস করল—চুপ করে গেলে যে? তোমার কথা ফুরিয়ে গেল?

—না ভাবছি তুমি কি সূত্রে আমার পরিচয় গেলে?

—সে ত একটু আগেই বলেছি, ভিজিটার্স বুকে তোমার নাম, ধাম, পদমর্যাদা জেনে।

—তা ছাড়াও আমার সব পরিচয় তোমার জানা আছে দেখছি।

পরিচয়ের সূত্র তুলে ধরতেই হয়ত প্রসঙ্গ বদলে সে জিজ্ঞেস করল—তোমার বাড়ীর খবর কি?

—আমার বাড়ীর খবর তুমি জান?

—জানতাম একদিন।

—কোথায়, কিভাবে?

—মাসীমা বেঁচে আছেন?

—বছর পাঁচেক আগে তিনি মারা গেছেন।

—দেশের বাড়ীতে কে কে আছেন?

—নিজেদের কেউ নেই। ঝি, চাকর আছে বাড়ী আগলাতে।

—জোত জমার দেখাশুনো করে কে?

—চাষীরাই দেখে। সময় সময় ছুটিছাটা নিয়ে দু একদিন ঘুরে আসি।

—তোমার সংসারে কে কে আছেন?

—নিজের বলতে সংসারের ভেতর ও বাইরে আমি একাই। যখন যেখানে থাকি, সেখানে একটা লোক জুটিয়ে নি আমার খবরদারী করতে।

কথায় কথায় বাংলোর কাছে এগিয়ে এসেছি আমরা। গেটের কিছুটা দূরে থেমে সে বলল—রাতেই কি শহরে ফিরবে?

—চা খেয়েই ফিরব ভাবছি, আধ ঘণ্টার ড্রাইভের পথ, এমন কিছু নয়।

—হাঁটুতে চোট পেয়েছ, পাহাড়ী পথে সাবধানে ড্রাইভ করো।

—তাকে ফিরে যেতে দেখে বললাম—এসো না আমার সঙ্গে চা খেয়ে যাবে।

—আজ থাক, আর একদিন হবে।

তার কথা ভাবতে ভাবতে ফিরছিলাম বাংলোতে। আমার নাড়ীনক্ষত্র জানে কে সে। শহরে মামার বাড়ীতে মানুষ। দেশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব কম। তাই চিনতে পার-

লাম না তাকে। অনুমানে বুঝে নিলাম আমাকে সে ভাল করেই জানে। কতকাল পরে দেখেও, চিনতে তার ভুল হয়নি এতটুকু।

পা পা করে আনমনে হাঁটছিলাম। পেছন থেকে সে ডেকে বলল—এই, শোন।

দাঁড়িয়ে পড়লাম তার ডাক শুনে। ফিরে দেখলাম আমাকে কিছু বলবার জন্য উন্মুখ হয়ে ফিরে এসেছে সে। আমার মুখের পানে তাকিয়ে সে বলল—আমার কথা বাংলোর কাউকে জিজ্ঞেস করো না যেন? কবে আসবে?

রিজারভেশন পেলেই একদিন আসবো।

—সেদিন রাতে থেকে যেও। এখানে অনেক দেখার ও জানার জিনিস পাবে তুমি। তোমার লেখার খোরাক জুটবে।

—দ্রুত পায়ে সে মিলিয়ে গেল বাংলোর পথ ধরে।

দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। আমার জন্য তার দরদের কারণ একটু একটু করে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল আমার কাছে। আবছা কুয়াসার ভেতর যেন আলোক সম্পাত দেখতে পেলাম। একি সেই, যার গুণপনার সুখ্যাতিতে সময় সময় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখতাম তার মুখ।

চা খেয়ে বাংলো থেকে বের হতে রাত নটা বেজে গেল। চার মাইল বনপথ চড়াই উতরাইয়ে ভরা। পাহাড়ী ঝর্ণার উপর দুটো নড়বড়ে কাঠের পুল। গাড়ীতে উঠে তার সাবধানী সঙ্কেত স্মরণ করে, মনে মনে ছক কেটে নিলাম, গাড়ীর গতি, স্টিয়ারিংয়ের মেনোভারিং হেডলাইট জ্বালিয়ে ধীর গতিতে গাড়ী ছাড়লাম।

পথের দু ধারের শাল গাছের পাতায় হেডলাইটের আলো জাগিয়ে তুলল যাদুর মায়া জাল। পথের উপর আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে বসে পড়ল খরগোস, দাঁড়িয়ে রইল চিতল হরিণ। সুইচ অফ্ করে তাদের পথ করে দিয়ে, গাড়ী চালিয়ে চললাম আমি। গাড়ীর গতিতে নির্জন বনভূমিতে একটানা বন্‌বন্‌ শব্দ কানে ভাসতে লাগল। পূর্ণিমার রাতে আমার চোখে নূতন করে ধরা পড়ল প্রকৃতির রূপ।

বনপথ ছেড়ে পাকা রাঁচি রোডের উপর দেওয়া বনবিভাগের সাইনবোর্ড গাড়ীর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। রঙিন এ্যালুমিনিয়ম রঙে লেখা কথাগুলি চোখে ভেসে উঠল আমার—বনের পাখী বনেই সুন্দর। হাতের একটি পাখীর মূল্য ঝোপ ঝাড়ের উড়ন্ত পাখীর চেয়ে অনেক বেশী।

রাজপথে পড়ে আমার মনে হল আমি হয়ত এমনি এক বনের পাখীকে আহত করে এলাম। তার মূল্যায়ন করতে বা ভুল করি ভেবে সে আমাকে বিদায়ের মুহূর্তে নিষেধ করে গেল তার কথা কাউকে না বলতে। গাড়ীর গতিবেগ [illegible] [illegible]

মনের গতির কাছে সে হার মানল। গাড়ী যতই এগিয়ে চলল, মন ততই পেছোতে পেছোতে চলে গেল ঝর্ণার শিলার উপরে, সমতলের পাথরে চাঁইয়ের পাশে। দূরে থেকে চোখে পড়ল ক্যানারিজ অবজারভেশন টাওয়ারের আলোক সজ্জা, শহরের আলোকমালা। বনভূমির অন্ধকারের কাছে তারা ম্লান ঠেকল আমার চোখে।

অফিসে কাজে মন বসাতে পারলাম না আমি। সব সময় সে আমার সামনে এসে দাঁড়াত। তার চোখ মুখ, চলার ছন্দটুকুও ধরা পড়ত আমার মনের দর্পণে। কৌতুহলের বশে শহরে বনবিভাগের হেড অফিসে তার পরিচয় জানার ইচ্ছে হয়েছিল আমার। তার নিষেধ ভেবে জানবার চেষ্টা করিনি।

রাতে বাংলোতে বসে বসে তার কথা ভাবতাম। তাকে দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হতাম। মনের ভাব মনে চেপে রেখে জোর করে বলগা টেনে ধরে সংযত করতাম নিজেকে। ভাবতাম সামনে ছুটির দিনে বেড়াতে যাব সেখানে—রিজারভেশন পাই না পাই।

শনিবার জরুরী কাজের জন্য পাটনায় তলব পড়ল আমার। রবিবারের ছুটি মাঠে মারা পড়ল। যাওয়া আর হয়ে উঠল না। পাটনা থেকে ফিরে রিজারভেশন করতে গিয়ে জানলাম বিদেশী পর্যটকদের জন্য দিনপনের বাংলো রিজার্ভড। পর সপ্তাহে রবিবার দিন রাতের মত বাংলো রিজার্ভ করে ফিরে এলাম তার কথা ভাবতে ভাবতে। কাজের মাঝে দিন কাটলেও তার কথা মন থেকে এক মুহূর্তও মুছে ফেলতে পারলাম না। সে তার বৈশিষ্ট্য, মমতা দিয়ে গভীর রেখাপাত করে গেছে আমার মনে।

ঠিক একমাস পরে ফিরে এসেছি সংরক্ষিত উপবনে, প্রকৃতির রম্য কাননের বিশ্রামাগারে। সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট সেরে উঠেছিলাম বাংলোতে। ছোট নাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চলে হেমন্তের শেষেই শীত সুরু হয়ে যায়। শিশির পড়তে সুরু করে বৃষ্টি ফোটার মত। সূর্যের তেজ কমে আসে। বিশ্রামাগারের লনের লতায় পাতায় শিশিরকণা জেগে আছে তখনও। শীতের আমেজে গোলাপ, ডালিয়া, প্লাম্ভিডফ্লোরা থোকায় থোকায় ফুটে উঠেছে লতানে গাছগুলোতে। প্রকৃতির অঢেল সৌন্দর্যে ভরে উঠেছে সারা বনভূমি।

ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে উপভোগ করছিলাম অফুরন্ত সৌন্দর্যের উৎস। দু চোখ সজাগ করে রেখেছিলাম তাকে দেখবার আশা নিয়ে। আশে পাশে কোথাও তার দেখা পেলাম না। রোদ বাড়ছে, সেদিনের পাহাড়ী পথ খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম। ডাক বাংলোর অদূরে পাহাড়ী নদীর পুল পার হয়ে উঠতে লাগলাম পাহাড়ের উপর—ওধারে সমতল ভূমি। টিলার উপর থেকে চোখে পড়ল তালাওয়ের জলে কুমুদ কুমুদ ফুটে আছে

অফুরন্ত শোভা ছড়িয়ে। বেলা
ফিরে এলাম বাংলোতে।

শুয়ে বসে দুপুর কাটিয়ে
নেমে এলে বেরিয়ে পড়লাম ঝর্ণ
এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে
লাম সেদিনের ঝর্ণা তীরের শি
জনশূন্য ঠাঁই, কেউ কোথাও নে
দেখার আশা বুকে নিয়ে ছুটে
খানি পথ, তার দেখা পেলাম না
বিপদের ঝুঁকির কথা ভেবে শু
পা করে ফিরে চললাম পাহাড়ী প

চড়াই পথে চলতে চলতে
এল। পূবে আকাশে চাঁদ ঝলমল
দিয়ে উঠল। উত্তরাই পথ ধরে না
আধো আলোয় দূর থেকে চো
তালাওয়ের এক ধারে আনমনে
সে। তাকে চমকে দেবার জন্য প
পেছন থেকে এগিয়ে গেলাম ত
একেবারে পেছনে এসে দাঁড়িয়ে
তার নজরে পড়ল না আমার উ
স্থপতির খোদাই করা ভাস্কর্যের
দৃষ্টি তালাওয়ের জলে ভেসে
কোড়ি মানিক জোড়ের উপর।

পাশে দাঁড়িয়ে বললাম — কি
এক মনে?

আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে
—পাখীদের মনস্তত্ত্ব তলিয়ে দেখ

—অমন উদাস দৃষ্টি মেলে বুঝি
বিশ্লেষণ করতে হয়?

—নিরালায় পাখীদের মনে
মানুষে বুঝতে পারে। চেষ্টা কর
পারবে।

—কি বুঝলে ওদের কথা?

—সে জেনে তোমার লাভ?

—লাভ ক্ষতি বুঝি না, তু
জেনেছ তাই জানতে চাইছি।

—সত্যি জানতে চাও?

—জানতে চাই বৈ কি?

—ওরা রাতের বিশ্রামের জন্য
নীকে কুলায় আহ্বান করছে।

তার মুখের হাসি পলকে মিলিয়ে
উদাস দৃষ্টিতে দূরান্তের পাহাড়ে
তাকিয়ে রইল সে। তার পাশে আমা
স্থিতিও সে ভুলে গেল। পাখীর
না জানাবার আপত্তির কারণ বুঝতে
হল না আমার। অজান্তে তার মনে
আঘাত করে বসেছি বুঝলাম।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল
তুমি আসবে জানতাম। পাখীগুলোকে
চমকে উঠতে দেখে তোমার উপস্থি
টের পেয়েছিলাম। ওদের কথা তখন
সারা মন জুড়ে, তাই তুমি বুঝতে
আমাকে।

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল
তুমিও ঠিক বনের পাখীর মত, বন
মত সাবলীল তুমি।

ারী !
র্মস্পর্শিনী
বিহ্বলকারিণী ।
উত্যক্তকারিণী
অথচ আনন্দদায়িনী ।
ারী আর তার
কমারি মেজাজে
অনুপ্রাণিত করেছে
মেফ্রিন'
মেফ্রিন

—তুমিও কি আমায় মত জু্ওলজিস্ট যে জন্তু জানোয়ারের মনের কথা তুমি বোঝ?

—তুমি বুঝি জু্ওলজিস্ট?

—একাধারে ফিলজফার ও জু্ওলজিস্ট বলতে পার। অদ্ভুত কম্বিনেশন ছিল আমার। এখন পুরোদস্তুর জু্ওলজিস্ট।

—পশু পাখীদের রক্ষক এক কথায়।

—ঠিক তা নয়, আরণ্যক জন্তুদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করার কাজ আমার।

—মানুষ কি অপরাধ করল? স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে ছেড়ে নিকৃষ্ট জীবের মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করতে গেলে?

—দার্শনিকের বিষয়বস্তু ওসব, আমার এক্তিয়ারের বাইরে।

—তোমাকে দেখে তা মনে হয় না, তুমি আসলে দার্শনিক, প্রাণি-বিদ নও।

আমার কথা শুনে হেসে ফেলল সে। তার দু'গালে অপূর্ব সুন্দর টোল পড়তে দেখলাম। কাছে এগিয়ে গিয়ে আদর জানাবার ইচ্ছে করল আমার সৌজন্যের খাতিরে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

এতক্ষণ পর তার খেয়াল হল আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমাকে পাশে বসতে আহ্বান জানিয়ে সে বলল—তুমি কি চিরকাল এমনি করেই একা একা ঘুরে বেড়াবে?

—একা একা ঘুরে বেড়াতে ভালবাসি আমি। কিন্তু তুমি?

—আমি একা কোথায়? দেখছ না বনের পশুপাখী সবাই আমার আপনার।

—তারা কি মানুষের মনের কথা বোঝে, তাকে সান্ত্বনা দিতে পারে?

—বোঝে বৈ কি? মানুষের চেয়ে তাদের দরদ অনেক বেশী।

—মানুষের উপর তুমি এত বীতশ্রদ্ধ কেন?

—কে বললে তোমাকে?

—তোমার কথাতেই তা বুঝেছি।

—মেয়েদের মন বোঝা কি এতই সহজ? তুমি সাহিত্যিক, বোঝ না?

'রমণীর মন, সহস্র বর্ষের সখা সাধনার ধন।'

—সাহিত্যেও তোমার অধিকার কম নয় দেখছি।

আমার কথা শুনে হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ল সে। তার হাসি দীঘির জলে, পাহাড়ের শিখরে, শাল পিয়ালের ডালে ডালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। শিলা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাতে টান দিয়ে বলল—এবার ওঠ, ফিরতে হবে না?

—ফিরতে ইচ্ছে করছে না আমার। তোমার পাশে বসে কথা শুনতে শুনতে আমি নিজের অস্তিত্ব ভুলে গেছি। তুমি চলে গেলে, আমার সত্তারও বুঝি বিলুপ্তি ঘটবে।

—সাহিত্যিকের মত কথাগুলো বললে তুমি, বাস্তব জীবনের সংঘাতে সাহিত্য, দর্শন, মনস্তত্ত্ব সব কিছুর বিলুপ্তি ঘটে। চল এবার।

জোছনার আলোতে পথ দেখে পাশাপাশি ফিরছিলাম আমরা। বাংলোর অদূরে দাঁড়িয়ে তাকে বললাম—একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

—তোমার প্রশ্ন আমার জানা। তোমাকে এত আপনার জনের মত ভাবলাম কি করে?

—ঠিক তাই, অনুমানে বুঝলেও, তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই সে কথা।

—শুনলে তুমি স্বস্তি পাবে?

—হ্যাঁ, পাব।

—না শুনলেই ভাল করতে। তবে তুমি যখন উৎসুক জানতে, তবে শোন—আমি মাধুরী।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই মাধুরী পথ ধরল। নিরুত্তর আমি নত দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রইলাম পথের উপর। আমার বাগদত্তাকে, আমি দেখতেও চাইনি তার কালোরূপের কথা জেনে। অরণ্যের ভেতর আমার বাগদত্তাকে মনে হল রূপে রসে, মাধুর্যে সৌন্দর্যে, অপরিসীম লাবণ্যবতী সে।

তাকে চলে যেতে দেখে ডেকে বললাম—শোন মাধুরী!

আমার ডাক শুনে কাছে এসে সে বলল—কিছু বলবে?

—তোমার কাছে আমার অপরাধের অন্ত নেই, আমাকে ক্ষমা করবে তুমি?

—তোমার আমার সম্পর্ক কি ক শত্রুকে ক্ষমা করা চলে, আপনার জনের সে কথা ওঠেই না, অনুপম।

—তুমি ফিরে চল মাধুরী?

—কোথায়?

—আমার কাছে?

—মনে মনে সব সময় তো কাছে আছি, বাস্তবে নাই বা গেলাম তো কাছে? তাতে ক্ষতি কি?

—ক্ষতি অনেক, আমি চিরদিন অ হয়ে থাকব তোমার কাছে।

—লাভও হবে না তাতে। কতকাল অরণ্য পশু, পাখী জন্তু, জানোয়ার— ভেতর আমার সত্তা ছড়িয়ে রেখেছি। মনে কোন ক্ষোভ নেই সেজন্য। আ বাতাসে, জলে স্থলে, পাহাড় পর্বতে কিছুর ভেতর আমি তোমাকে খুঁজে তোমার লেখার ভেতর দিয়ে। চাকরীর কাটিয়ে লেখার সাধনার ভেতর ডুবে তাতে নিজের ও দশের, উপকার হ শান্তিতে ভরে উঠবে তোমার মন।

আমাকে নিরুত্তর দেখে আমার এব হাত হাতে তুলে নিয়ে মাধুরী বলল— করো না অনুপম, জীবনের পথ সবার ফুলে ঢাকা নয়।

মাধুরী চলে গেল—আমার ভাসতে লাগল তার কথা জীবনে লাভ ক খতিয়ান মিলিয়ে দেখতে নেই। কাছে থাকার চেয়ে দূরে দূরে থাকা অ সুখের। পশুপাখীদের নিজস্ব সত্তা —তারা মানুষকে ভালবাসে, মানুষের তাদেরও সহানুভূতি জাগে। সাহিত্যকে ভালবাসে মানুষ, প্রকৃতি, জীবজগ সবাইকে তারা ভালবাসে। সাহিত্যের প পাদ্য বিষয়বস্তু তাদের সকলের মনস্তত্ত্ব

মাধুরীর কথাগুলো এক মনে ভা ভাবতে ফিরে এলাম ডাকবাংলোতে। রা মত ডেরা বাঁধলাম সেখানে। নিশীথ রা নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতার মাঝে সব পাখ আনন্দ সাগরে মথিত হয়ে উঠল অ অন্তর। মনে হল—সত্যি ত মাধুরী কাছে কাছেই আছে, দূরে কোথ দেহাতীত মনে আমরা দুজনে এক মিশে গেছি রাতের অন্ধকারে, দি আলোতেই শুধু আমরা দূরে।

আনন্দ মেলার মেলা

আকাদমি অফ ফাইন আর্টসে 'আনন্দমেলা' আয়োজিত চতুর্থ বর্ষের প্রদর্শনীটি অভিনবত্বে ছিল ভরপুর। মাত্র দু'দিনের জন্য প্রদর্শনীটির আয়োজন করা হয়। 'আনন্দমেলা' বিশেষ কোন সমিতি নয়, মাসিক বা বাৎসরিক কোন হিসেব নিকেশের পালা বা লাভ-লোকসানের কোন খতিয়ান এদের নেই। এখানে কেউ শিক্ষিকা বা ছাত্রী নন। অথচ বছরের বিশেষ এক সময়ে সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার এক সুন্দর ও সুষ্ঠু ফল।

উত্তর ক'লকাতার বনেদী পরিবারের মহিলাদের অবসর-বিনোদন শুধুমাত্র গল্প-গুজবে না কেটে কোন কিছু সৃষ্টির মাধ্যমে অতিবাহিত হয় সেটাই আনন্দমেলার প্রধান লক্ষ্য। শ্রীমতী কাজল সেন এই আনন্দমেলার প্রধান উদ্যোক্তা হলেও সকলেই সমান উৎসাহী। শ্রীমতী সেনই আমাকে বলেছিলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে উত্তর ক'লকাতার মহিলাদের হস্তশিল্পে সচেতন করে তোলা। সেই ইচ্ছাতেই প্রথম বছর আমরা মিলিত হই বাগবাজার সেন-এদের বাড়ী।'

সারা বছর মহিলারা সুচের কাজ, উলের কাজ, চটের কাজ থেকে শুরু করে আচার, বড়ি, প্রভৃতি যেসব তৈরী করেন সেগুলোই এই প্রদর্শনীতে সাজানো হয়। সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারীদের তৈরী দু'দিনের রকমারী মুখরোচক খাবার যেটা দর্শক মুখ চালানোর জন্য অল্প দামে কিনতে পারেন।

আনন্দমেলার উদ্‌যোগীদের এই প্রদর্শনী থেকে কোনরকম লাভ করার ইচ্ছে নেই, শুধু মাত্র খরচটুকু তোলাই এদের উদ্দেশ্য।

প্রদর্শিত জিনিষগুলোর মধ্যে পুরনো কাপড় সরু দড়ির মত ছিঁড়ে চটের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়ে সুন্দর একটি ব্যাগ তৈরী করা হয়েছে। এই ব্যাগের ওপরে সুতো দিয়ে একটি মানুষের মুখ আঁকা। মেয়েরা স্বচ্ছন্দে বেশ ফ্যাসান করে শাড়ীর সংগে ম্যাচ করে এই ব্যাগ ব্যবহার করতে পারেন। তাছাড়া রঙীন চটের বটুয়ায় মোটা কাপড়ের গোল, চৌকো নানারকম ফুল তৈরী করে বসানো হয়েছে। এগুলো বেশ আর্টিষ্টিক। এছাড়া ঠিকোজী তৈরী করা হয়েছে অতি সাধারণ কাপড়ের টুকরো ও সরু লেস দিয়ে। ঠিকোজীর আকারটা টোপরের মত অথচ কেটলির ঢাকা হিসেবে জিনিসটাতে বেশ নতুনত্ব আছে। শ্রীমতী কৃষ্ণা মজুমদার অনেক পরিশ্রমে শাড়ীতে ময়ূর এমব্রয়ডারী করেছেন। এই শাড়ীটি তিনি শ্রীমতী গান্ধীকে উপহারস্বরূপ (ন্যাশনাল বার্ড নামে) পাঠাবেন এরকমই আশা করছেন। কেলন (চটের সুতো ও সিনথেটিক মেশানো) দিয়ে তৈরী অল্পদামের সোয়েটারগুলো বিশেষ আকর্ষণীয়। কেলন-এ তৈরী সোয়েটারের মূল্য অতি অল্প অথচ শীতকালে ব্যবহারের পক্ষে বেশ আরামদায়ক। খরচের স্বল্পতার জন্য রোটারী ক্লাব খুব সম্ভবত এদের দিয়ে কিছু জিনিস তৈরী করিয়ে নেবে।

আনন্দমেলার আয়োজন প্রথমে বেশ ছোটখাটোই ছিল। উত্তরোত্তর সকলের উৎসাহে আকাদমির একটি কক্ষে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হয়। প্রদর্শনীতে তৈরী জিনিসের বিক্রীর পরিমাণ অনেক হলেও 'আনন্দমেলা' এখানেই প্রচুর অর্ডার সংগ্রহ করে।

'আনন্দমেলা' শুধুমাত্র একটি প্রদর্শনী নয়, যেন অংশ-গ্রহণকারীদের খুশির এক বন্যা। একে বোধহয় আনন্দের মেলা বলাই ভাল।

আনন্দমেলা দেখে মনে হ'ল এরকম গোটাকয়েক মেলার আয়োজন করলে দিন-দিন এগুলির জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মহিলারা গাল-গল্পে সময় না কাটিয়ে কাজের বা অবসরের ফাঁকে ফাঁকে সাধ্য অনুযায়ী অনেক কিছু সেলাই বা তৈরী করে সংসারের বাড়তি খরচের জন্য কিছু আয়ও করতে পারবেন।

—অঞ্জলি চৌধুরী

অঙ্গনা

বাজারে আগুন : পুজো আসছে

কর্তা-গিন্নীর মধ্যে মনের অমিল। কোন গুরুতর কারণ নয়। খুবই সাধারণ ব্যাপার। এমনি আগেও কতো হয়েছে। আবার হাসি-ঠাট্টার মধ্যেই তার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। কিন্তু এবার মিটমাটের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। কর্তার মেজাজ চড়েই আছে। সামান্য কথায় চটে ওঠেন। এমন কি ভালো কথাও সবসময় ভালোভাবে নিতে পারেন না। আর গিন্নীর মুখ ভার। সেই যে সেদিন সামান্য কথা নিয়ে দুজনের মধ্যে কি হলো তারপর থেকে গিন্নীর মুখের অন্ধকার আর কাটে না।

এরকমই কদিন চলছে। খুব শিগগির যে এর কোন ফয়সালা হবে সে রকম সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। তবে ধৈর্যেই সব কিছুর নিষ্পত্তি। দুপক্ষই হয়তো মনে মনে সেরকম একটা ক্ষীণ আশা পোষণও করতেন। তাছাড়া পরস্পরের আচরণও কিছুটা নরম হয়ে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ আবার পরিস্থিতি জটিল হয়ে গেল। নরম থেকে একেবারে চূড়ান্ত গরমে। কর্তা বাজার থেকে এসে থলেটা নামিয়ে রেখে এক কাপ চা চাইলেন। আর তাতেই এই অনাসৃষ্টি।

কর্তার চায়ের ফরমায়েশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন আগুনে ঘৃতাহুতি হলো। এমনিতেই গিন্নীর মুখ ভার হয়েছিল। এবার সুযোগ পেয়ে তিনি আর তা হারাতে রাজি হলেন না। কর্তার মুখের উপর স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিলেন, চা চাইলেই চা দেওয়া সম্ভব নয়। চিনি আনার বেলা তো খুব দরের ফিরিস্তি শোনানো হলো। মাসকাবারি এলেই তো বলে দেওয়া হয়েছে যে, এই চিনিতে একমাস চালাতে হবে। ফুরিয়ে গেলে চিনি ছাড়াই চলতে হবে। তা এখন চা চাওয়া হচ্ছে কেমন মুখে। সকাল আর বিকেল এই দুবেলা ছাড়া এক কাপ চাও কাউকে দেওয়া হবে না। তা সে যেই হোক।

কর্তার যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো অবস্থা। মেজাজ চড়া থাকলেও তিনি আর কোন উত্তর দিতে ভরসা করলেন না। সত্যিই তো মাসকাবারি এলেই তিনি বলে দিয়েছেন, চিনির দর সাড়ে তিন টাকা ছুঁয়েছে। সুতরাং হিসেব করে চলতে হবে। আগেকার মতো আর যখন-তখন ফুরিয়ে গেছে এনে দাও বললেই এনে দেওয়া যাবে না। এই যা এনে দিলাম এতেই যা হোক করে সারা মাস চালাতে হবে। তাই চায়ের আশা ছেড়ে দিয়ে তিনি বাজারের থলেটা ঠেলে দিয়ে ঘরে চলে গেলেন।

কর্তা অল্পের উপর দিয়ে নিস্তার পেতে চাইলেও কিন্তু সেদিন তার জন্য ঝক্কি-ঝামেলা আরো তোলা ছিল। গিন্নী বাজারের থলেটা হাতে নিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখলেন। তারপর উপুড় করে ঢাললেন। একজোড়া কাঁচকলা, আলু আর সামান্য কুচো চিংড়ি। বাজারের ছিরি দেখে তো গিন্নী জ্বলে উঠলেন, আজো সেই কুচো চিংড়ি। বাজারে কি অন্য মাছ নেই? রোজ রোজ ছেলেমেয়েকে এই চিংড়ি মাছ খাইয়ে খাইয়ে আমশা ধরিয়ে ছাড়বে। আর এই বাজার। দুটো কাঁচকলা আর আলু। নিজের খাওয়াটা ঠিকমতো হলেই হলো। বাড়ির আর সকলে কি দিয়ে খায় সে খেয়াল করার দরকার নেই। সামলাতে তো হয় আমাকে। পাতে পাতে দেবার সময় তো আর উনি থাকেন না। একটু শাক নেই, বেগুন নেই যে একটা বাড়তি কিছু করবো। এ হুঁশ কি ওঁর আছে।

কর্তা প্রথমটায় মুখ বুজে সব সহ্য করেছিলেন। এবার কিন্তু আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। ঝাঁঝালো গলায় জবাব দিলেন, চিংড়ি নয় তো কি পোনা মাছ আনব। এই কুচো চিংড়িই ছ'টাকা কিলো। পোনা মাছে হাত দেওয়া আমার সাধ্য নয়। কাটা পোনা বার টাকা কিলো। ইলিশ মাছও তাই। তা আমার সাধ্যে যা কুলোবে তাই তো আনব। আন বললেই তো আর আনার উপায় নেই। আমার ট্যাঁকের জোর আছে কিনা সেটাও তো বুঝতে হবে। যা আনাজ এনেছি তা দিয়েই দুবেলা করতে হবে। এরপর আর কিছু আসবে না। শাকপাতা, বেগুন কোনটা কি ছোঁবার জো আছে। ধরলেই দাম শুনে হাতে ছ্যাঁকা লাগার জোগাড়। অত তরিজুত করে খাওয়ার দিন আর এখন নেই।

কর্তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে গিন্নী পাল্টা চাপান দিলেন, এই ম... আর মুখের বদল সম্ভব নয় ... রোজ এই এক মাছ না এনে ডিমও তো ... পারে। আর কে এমন মাথার দিব্যি দিয়েছে যে, পোনা মাছ ইলিশ মাছ হবে। আনাজও আনতে ... আমার নয়। আমি তো আর সকলের ... বসি না। যারা বসিয়ে বসিয়ে ... তাদের জন্যই বলা। নইলে আমার পড়েছে গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়ার ... তিনি মাছের ... বসলেন।

চিংড়ি মাছের বদলে ... কর্তার চড়া মেজাজ আরো চড়... ভেবেছিলেন তিনি চুপ করে থাকবেন ... উত্তর না দিয়ে পারলেন না, ... খুব শখ। বলি ... দামের খেয়াল ... ভেবেছে যে ডিম আনলে সুবিধে ... কিসে সুবিধা আর অসুবিধা সেটা ... আর এবয়সে কারো কাছে শিখতে হ... চিংড়ি মাছ আনলে তবু শাক-আড়াইয়ে যায়। আর এতো মাছ খাওয়া নয়। ... সার। ডিম আনতে গেলে গোটা ছয়ে হবে না। সে প্রায় আড়াই টাকার আশি পয়সা জোড়া ডিম। শুনে মাথা খারাপ দাখিল। বেগুন দেড় টাকার নামছে না। সামান্য কলমি এক আঁটি ... পয়সা। আর মাছ কিনতেই তো বরাদ্দের প্রায় সবটা বেরিয়ে যায়। কেনবার পয়সা কোথায়?

দরের ফিরিস্তি শুনে গিন্নী নরম হলেন। কিন্তু তিনি কর্তার পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাই বেশ চটেমটেই বললেন, তোমার

যে দাম বেড়েছে। বিশ্ব-সংসারে আর তো একথা শুনি না। এই তো সেদিন বাড়ির ওরা বলাবলি করছিল যে, বছর আগে জিনিসপত্রের দাম যা ছিল এবার নাকি সে তুলনায় তেমন । খবরের কাগজেও একথা লিখেছে। দাম শুধু তোমার জন্যই বাড়ছে। শুনলাম না এ জিনিসটার দাম কম একটু বেশি করে নিয়ে এলাম। সব-কমতে কমতে এখন তো একেবারে কে এসে দাঁড়িয়েছে। তবে কি ওরা থ্যে কথা বলছে না খবরের কাগজে কথা লিখেছে? সবকিছু ছেড়ে ওঁর কথাই মেনে নিতে হবে।

ন্নীর এই অবিশ্বাস কর্তার সহ্য হবার নয়। তাই তিনি প্রায় বাধ্য হয়েই দিলেন, বিশ্বাস না হয়তো একদিন গিয়ে দেখলেই হয়। তবেই হাতে-প্রমাণ হয়ে যাবে কে সত্য আর কে কতদিন তো বলেছি যে, বাজার শিখে নাও। কত বাড়িতে তো ই হিসেবপত্র করে সংসার চালায়। সটা করলেই তো অশান্তি মিটে যায়। রোজ এই ঝামেলা আর আমাকে হয় না।

তাঁর নরম হওয়া দেখে গিন্নীও নরম লেন। এবার তিনি অনুযোগের স্বরে অশান্তি বুঝি তোমার একার, আমার আমার বাজার করতে অশান্তি, আমার ছেড়ে নিতে বুঝি খুব শান্তি। যেরা খেতে বসে একটু চাইলে তো না বলতে পারি না। দিতেই হয়। কুলোতে পারি না। এ যে কি তোমায় বলে বোঝাতে পারবো না। তোমায় এক কাপ চা করে দিচ্ছি। তিনি পরিহাস তরল কণ্ঠে বললেন, বলাম বলে রোজ রোজ আবার বায়না। জানোই তো, হিসেবের চিনি।

ঘটনা আমার পাশের বাড়ির। আর ধ্যে কোন একটি বাড়িতে এই ঘটনা নেই। আনাজ আর মাছ নিয়ে প্রায় বাড়িতেই কর্তা-গিন্নীতে খটাখটি কর্তার সেই এককথা, জিনিসপত্রের আগুন। গিন্নীর সাফ জবাব যে, পারছি না। এই নিয়ে পরিবারে অশান্তির শেষ নেই। ভুল বোঝা-চড়ান্ত হচ্ছে।

নীতিদিও সেদিন আমার কাছে এই কথা বলছিলেন। মানুষ কি খাবে পারো? সরষের তেল ছ'টাকার কাছা-চলে গেছে। বাজারে মাছ পাওয়া পাটের পর পাট ফাঁকা। খুব দামের র একদম কম দামের মাছ। এর মাঝা-মাঝি নেই। তাহলেই বুঝতে পারছ মাদের মতো নিম্ন আয়ের মধ্যবিত্ত-কি দুরবস্থা। সাধারণ বেলে মাছ আট টাকা কিলো। এই মাছ যখন কায় উঠেছিল তখনই আমরা বেশ উঠেছিলাম। কিন্তু আজ আর সেসব না। এই তো সেদিন ভাবলাম আর চিংড়ি মাছ কিনবো। মাছ ভাল। কিন্তু ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে যে চলবো তার উপায় নেই। গত বছরও এমন সময় যে চিংড়ি বিক্রি হয়েছে আড়াই তিন টাকা দরে এখন তা কৌলিন্য অর্জন করেছে। দাম বাঁধা পড়েছে ছ'টাকায়। তাই কিনলাম খানিকটা। তবে এরপর আর চালকুমড়ো কেনা হলো না। ষাট-সত্তর পয়সা কিলো। দাম শুনেই চলে আসতে হলো। এক কিলো আনলে তো আর আমার চলবে না। তাছাড়া টাকা দুয়েক বা দেড়েকের চালকুমড়ো কেনা আমার পক্ষে বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়।

মিনতিদি নিজেই বাজার-হাট করেন। কিন্তু সম্প্রতি মাছ-আনাজ আর অন্যান্য জিনিসের দামে তিনি বড় ঘাবড়ে গেছেন। অথচ আগে আগে আমরা যদি কখনো দাম বাড়ার অভিযোগ করতাম তাহলে মিনতিদি বলতেন, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন কর, দামের জিনিস কম করে খাও। আর এখন তাঁর মুখেই অন্য কথা। পরিশেষে মিনতিদি বললেন, তবু ভাল বলতে হবে যে, আলুর দরটা এবার তেমন বাড়েনি। এক টাকা থেকে এক টাকা দশের মধ্যেই আছে। এই আলু আর ডালই এখন ভরসা।

সামনেই পুজো। আমাদের জাতীয় উৎসব। প্রতি বছর এ আমাদের এক তিক্ত অভিজ্ঞতা যে, পুজোর মুখে সব জিনিসের দাম বাড়তে শুরু করে। দাম বাড়ার কারণ অবশ্য ব্যবসায়ী মারপ্যাঁচ। এসময় কল-কারখানা আর সওদাগরি অফিসের লোকেরা বোনাস পান। সরকারী বাবুরাও অ্যাডভান্স পান। মোটামুটি হাতে কিছু টাকা আসে। তাছাড়া পুজোয় নতুন জামা জুতো বড়দের না হোক নিদেন বাচ্চাদের তো দিতেই হবে। এই সঙ্গে কোন কোন আত্মীয়স্বজনকেও প্রণামী হিসেবে ধুতি-শাড়ি পাঠাতে হয়। এবং খরচটা কোনক্রমেই একতরফা নয়, দু'তরফা। এই সুযোগ ব্যবসায়ীরা ছাড়তে রাজি নন। বরং এটা তাঁদের দু পয়সা কামানোর মওকা। তাই দাম বাড়ে। এই তো সেদিন আমার স্বামী বলছিল যে এমনিতে তো দোকান টিমটিম করে চলে। পুজোর সময়ই সারা বছরের খরচ তুলে নিতে হয়। ওর বাবার জুতোর দোকান। শাড়ি, গয়না বা রেডিও-এর কোনটা চাইলেই কর্তা যেমন গিন্নীকে প্রবোধ দেন হবে হবে পুজোর সময় হবে। সবাই পুজোর দিকে লক্ষ্য রেখে চলেন। যেমন আমরা তেমনি ব্যবসায়ীরা।

মাছ-আনাজ আর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম এবার আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। ঠাণ্ডা মাথায় তাই পুজোর বাজারের কথা চিন্তা করতে পারছি না। শুধু আমি নই এমনি অনেকেই। নৌলিদির কথাই ধরা যাক। পুজোর বলতে যথার্থ অর্থে যা বোঝায় ও'রা সেরকম কেনাকাটাই করেন। আত্মীয়-স্বজনের সংখ্যা অনেক তায় আয়টাও মন্দ নয়। তাই এসময় ও'রা বেশ মন খুলেই দু পয়সা খরচ করেন। নৌলিদির কাছেই পুজোর বাজারের হালচাল জানতে গেলাম। কিন্তু প্রতিবারের মতো এবার পুজোর কেনাকাটার ব্যাপারে তিনি আর তেমন উৎসাহ দেখালেন না। আমি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নানাকথা জিগ্যেস করলে তবে উত্তর পাই। নিজে থেকে প্রায় কোন কথাই বলতে চায় না।

একসময় মুখ খুললেন নৌলিদি, কি আর পুজোর বাজার করব ভাই এমনি রোজকার বাজারেই মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এই দেখ না তুমি এসেছ আর তোমাকে চা দিয়েছিও ঠিক। কিন্তু স্যাকারিনের। লোকজন এলে যে, এক কাপ চা দিয়ে আপ্যায়ন করবো তারও উপায় নেই। আর তুমি তো জান যে, পুজোর সময় আমরা সারা বছরের কাপড়চোপড় কিনে ফেলি। কিন্তু এবার যে কি করবো কিছুই বুঝতে পারছি না। কয়েকদিন আগে সপিং-এর উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম একটু। সঙ্গে ছিলেন তোমার দাদা। কিন্তু কোন জিনিসে হাত দিতে পারলাম না। আগুনে দাম। গতবারের তুলনায় দেড়া দাম। সেবার যে জুতো কিনেছি দশ টাকায় এবার তা ষোল টাকা। দাম বাড়ার অভিযোগ পুজোর বাজার করতে গিয়ে আমরা বরাবরই করি। তবে এরকম দাম বাড়তে আমি অন্ততঃ বাপের জন্মে দেখিনি। ঘুরে ঘুরে হতাশ হয়ে অবশেষে ও'র জন্য একটা লুঙ্গি আর গেঞ্জি কিনে পালিয়ে এসেছি। ভাবছি যে, এবার আত্মীয়স্বজনের ব্যাপারটা তোলা থাক। আর আমাদেরও সারা বছরের চিন্তা ছেড়ে শুধু পুজোর কথাই ভাবছি। ছেলে-পুলেদের না দিলে নয় তাই ওদের জন্য জামা-কাপড় কিনতেই হবে।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, মিনতিদি বললেন, পুজোর কেনাকাটার আর এবার আর তেমন উৎসাহ নেই। দোকানপত্র একদম খাঁ-খাঁ করছে। দোকানীরাও অভি-যোগ করলেন যে, লোকজন এবার তেমন আসছে না। দাম বাড়ার কথা তাঁরা স্বীকার করেও বললেন, কয়েক বছর ধরেই তো এমনধারা হচ্ছে। তবে আসলে এবার চারদিক থেকে সংসার সামাল দিতেই সবাই হিমসিম খাচ্ছেন। তাই এদিকে এখনও তেমন কেউ ভিড়ছেন না।

সত্যি জিনিসপত্রের দাম যেভাবে দিনে দিনে বাড়ছে তাতে পুজোর বাজারের কথা এখনও অনেকেই মনে ঠাঁই দিতে পারেননি। এর বিরুদ্ধে দিকে দিকে বিক্ষোভও সংগঠিত হচ্ছে। এমন কি মহিলারাও গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে শহরের বুকে ছুটে আসছেন প্রতিবাদ জানাতে। রাস্তায় রাস্তায় মেয়েদের জমায়েত হচ্ছে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে। সকলের গলায় একই আওয়াজ, নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম কমাতে হবে। অবিলম্বে সরকারী ব্যবস্থাপনায় ন্যায্য মূল্যে সব জিনিস সরবরাহ করতে হবে। তাঁদের আরো একটা এবং আমাদের ধারণা যে বাস্তব ক্ষেত্রে জিনিসপত্রের খুব একটা অভাব নেই। মুনাফাখোররা বরাবরের মতো এবার মুনাফার হারটা মাত্রাতিরিক্ত চড়িয়ে দিয়েছে। তারা আরো সুযোগ নিয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের। ব্যাপক খরা আমাদের

দুর্গতির মুখে ঠেলে দিয়েছে একে মুনাফা লোটার সুযোগ মনে করেছেন। দের দুঃখের বোঝার উপর তারা ফার শাকের আঁটি চাপিয়েছেন। কিন্তু ভারটুকু বইতেই আমরা বিপর্যস্ত। তাই সম্বে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ জন হয়ে পড়েছে। না হলে তাদের া সীমা ছাড়িয়ে যাবে।

কিছু কিছু ব্যবস্থা অবশ্য সরকার মধ্যে নিয়েছে। ন্যায্য মূল্যের দোকান ত ডাল, তেল সরবরাহের কথা ঘোষিত ছ। রেশনে চিনির পরিমাণও কিছু ছ। ইতিমধ্যে সরকার মাছের পাইকার ভেড়ির মালিকদের অনুরোধ করেছেন, যেন সরকারের কাছে মাছ বেচেন। লে সেই মাছও ন্যায্য মূল্যে ক্রেতা সাধারণকে পৌঁছে দেওয়া হবে। আবার পুজোর আগেই নাকি বাংলাদেশ থেকে ইলিশও আসছে। এবং ন্যায্যমূল্যেই বিক্রি হবে। সাত টাকা কিলো। তবে এ সম্বন্ধে আমাদের আর কোন কৌতূহল অবশিষ্ট নেই। অনেকদিন ধরেই শুনেছি। তাই বাংলা-দেশের মাছের সরকারী ভরসায় আস্থা রাখা দায়।

রোজকার বাজারটা সামলে উঠতে পারলে তবেই পুজোর কথা ভাবা যাবে। একটা আশার কথা শোনা যাচ্ছে যে, ন্যায্যমূল্যে কাপড়চোপড় বিক্রির ব্যবস্থাও সরকার করবেন। সবরকম কাপড়ই এখানে পাওয়া যাবে। পুজোর আগে এব্যবস্থা হলেই ভাল। তাহলে উৎসবের আমেজ আমরা উপভোগ করতে পারবো। তবে সরকার নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দিচ্ছেন ঠিকই কিন্তু সামনেই শীত তখন সব জিনিসের দামই কমে। ব্যবসায়ীরা যেন ধরে না নেন যে, এই মূল্যমানই নির্দিষ্ট হয়ে রইলো। সরকারকে সেদিকেও নজর রাখতে হবে। কারণ, সবকথার সার হলো বাজার দর। এখানে শান্তি থাকলে সর্বত্র শান্তি। তাহলেই উৎসব আর আমোদ-প্রমোদ। কর্তার চড়া মেজাজ আর গিন্নীর মুখ ভার দূর হয়। নাহলে হাজার আলোর রোশনাইয়েও উৎসবের আসল সুর হারিয়ে যাবে। ভাংগা রেকর্ডের মতো সেই একই আওয়াজ বারবার শুনতে হবে। এক-ঘেয়ে সেই ক্লান্তিকর পরিবেশের হাত থেকে আমরা নিস্তারই চাই।

—প্রমীলা

স্মরণীয় একটি দিন

গত যুদ্ধের সময় লণ্ডনের সাধারণ রা প্রত্যক্ষভাবে সৈন্যবাহিনীতে যোগ-না করেও অপ্রত্যক্ষভাবে কি ভাবে ধর কাজে স্থির এবং দৃঢ় মনে সাহায্য ছিলেন, তারই ঘটনা মনে পড়ছে। বিশেষ টি দিন আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে ছ সেই দিনটির কথাই প্রথমে জানাই। শীতের সন্ধ্যা। তিনটে বাজতে না তেই লণ্ডনের বুকে অন্ধকার নেমে ছে, আর সংগে সংগে তুষারে রাস্তাঘাট ভরেই গেছে। আমি আর আমাদের ডলেডি দুজনে হেস্টারকম্ব টেরাসের মেন্ট অর্থাৎ মাটির নীচের তলায় বসে া করছিলাম। সামনে গনগনে কাঠের ন জ্বলছে চুল্লীতে। একটা ছোট টেবিলে শ-কুড়ি বছরের একটি সুদর্শন ছেলের । লক্ষ্য করেছি এমন দিনে মিসেস র্ভনের মন স্মৃতির অতলে তলিয়ে যায় তার জীবনের গভীর বেদনাদায়ক অথচ এক গৌরবময় ঘটনার কথা মনে পড়ে। সস আর্ভিন সেই ছবিখানির দিকে চেয়ে ু করলেন—জানো বেল (আমাকে তিনি ু বলেই ডাকতেন) হ্যারল্ড আমার মাত্র সন্তান ছিল। যেমন স্বাস্থ্যবান, মনি সুন্দর ছিল তার মন। তখন ১৯৪১ লের শীতকাল। হ্যারল্ড বিকেলে স্কুল কে ফিরে এসে বলল, মা আমার বন্ধুরা াই সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে এসেছে—আমি ভর্তি হব মা? সেই মুহূর্তে আমি কিছু াব দিতে পারিনি— বুকটা ক্ষণেকের জন্য ঁপে উঠেছিল। শুধু বলেছিলাম—তুমি ধবা মায়ের একমাত্র ছেলে—তোমার সৈন্য-ল ভর্তি হওয়ার তো কোন বাধ্যবাধকতা ই। হ্যারল্ড কোনো জবাব দেয়নি। মাকে খুব ভালবাসত! সেদিন রাতে নেক কথা আমার মনে ভীড় করে এসে-ল। ভেবেছিলাম হ্যারল্ড হয়তো কোনো সম্মুখে যুদ্ধেও মারা যেতে পারে কিংবা দি বেঁচেও থাকে তাহলে তার জীবনে রদিনের জন্য এই খেদ থেকে যাবে যে সুস্থ সবল হওয়া সত্ত্বেও জাতির চরম সংকটের সময় সে এগিয়ে আসতে পারলো না। হয়তো তার বন্ধুরা কেউই ফিরে আসবে না। কাজেই আমার কি কোনো অধিকার আছে, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের তাগিদে পুত্র হ্যারল্ডকে আটকে রেখে দেওয়া? জানি, যদি ও মারা যায় তবে আমার আর কেউ থাকবে না সত্যি, তবু আমি মনে করবো, আমার ছেলে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে। এছাড়া আমি তো একলা নই—আজ ঘরে ঘরে মায়েরা তাঁদের উপযুক্ত সন্তানদের রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

পরেরদিন মনে কঠিন বল ও সাহস নিয়ে হ্যারল্ডকে স্কুলে যাবার সময় আদর করে বললাম, 'যাও সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে এসো' —হ্যারল্ড যেভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল—সে দৃষ্টি আমি আজো যেন দেখতে পাচ্ছি। সে দৃষ্টিতে ছিল আনন্দ আর গর্ব, আর ছিল কৃতজ্ঞতা। বেল, হ্যারল্ড যখন চলে গেল আমার কি যে কষ্ট হয়েছিল সে-কথা আমি বলতে পারব না। নিয়মিত চিঠি পেতাম না। চিঠির জন্য ব্যাকুল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। ঈশ্বরের কাছে তার দীর্ঘায়ুর জন্য প্রার্থনা করতাম।

১৯৪৪ সাল। ইতিমধ্যে হ্যারল্ড কয়েকবার আমার কাছে এসেছিল। যুদ্ধ তখন পুরোদমে চলেছে। সকালবেলায় আমি রান্না করছিলাম। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠলো। মনে হলো শুনতে পেলাম হ্যারল্ড আমায় ডাকছে—বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, আমি যেন দেখলাম অর্ধমৃত সৈনিকদের একটা তাঁবুর মধ্যে ফেলা হোল আর তাতে পেট্রল ঢেলে জ্বালিয়ে দেওয়া হোল। সেই আহত সৈন্যদের মধ্যে আমার হ্যারল্ডকেও দেখলাম। যাঁদের কাছে এই ঘটনা বললাম—তাঁরা আমাকে সান্ত্বনা দিলেন বোঝালেন, এ-সব সত্যি নয়। যদি কিছু ঘটে থাকে খবর পাবে।

তারপর অনেকদিন কেটে গেল হ্যারল্ডের কোন খবর পেলাম না। সরকারী সূত্রেও তার মৃত্যুসংবাদ জানা গেল না। তাই ভেবে-ছিলাম সে বেঁচে আছে হয়তো একদিন ফিরে আসবে।

১৯৪৫ সাল : জার্মানী বিজয় দিবস। খুব ঘটা করে দিনটি পালন করা হচ্ছে। যুদ্ধ-শান্তির জন্য চারিদিকে সাদা পতাকা দিয়ে সাজানো হয়েছে। বাজি পুড়ছে—আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছি। পিয়ন চিঠি নিয়ে এলো—খুলে দেখি সরকারী খবর এসেছে, জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে হ্যারল্ড নিহত হয়েছে। ঠিক একটি বছর এইদিনেই সে মারা যায়, আমি ঠিকই বুঝতে পেরে-ছিলাম। হ্যারল্ড আমায় খুব ভালবাসত কিনা! ওর কিছু হলেই আমি বুঝতে পারতাম।' টেবিল থেকে পুত্রের ছবিখানি নামিয়ে কোলের উপর রেখে মিসেস আর্ভিন অশ্রুসজল চোখে আমার দিকে চেয়ে বললেন 'হি ওয়াজ ও ব্রেভ বয়' তাই না বেল? চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে মাতৃসমা বিদেশিনীকে বলেছিলাম 'বীরমাতার বীর সন্তান' এমন কত ঘটনাই মনে পড়ে—ওদের সততা, দেশপ্রেম জাতীয়তাবোধ ও কর্তব্য-নিষ্ঠার কাছে সেদিন শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম। আমাদের দেশের মেয়েরাও সাহস ও দেশ-প্রেমে কোনদিনই পিছিয়ে পড়ে নেই। তাই দেখি, দেশের সংকটকালে : চীন ও পাক-স্তানের হামলার সময় প্রতিশোধ ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের মেয়েদের মধ্যেও যে চেতনা ও অভূতপূর্ব সাড়া জেগেছিল, দেশের অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তি-শালী করতে এই অল্প সময়ের মধ্যে তারা যেভাবে এগিয়ে এসেছিল, তা সত্যিই প্রশংসনীয় : যে কোনো বিপদই আসুক না কেন, আমাদের মেয়েরা অবিচলিত নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতার সংগে দেশরক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে স্বাধীন ভারতের মর্যাদা রক্ষায় পেছিয়ে থাকবেন না।

—বেলা দে

রেহানা সুলতান [illegible] জেরা জন মেরা চিত্রে

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

গোমুখীর উৎস সন্ধানে এক তরুণের [illegible]

[illegible]বোধকুমার সান্যাল বিরচিত, আজকের ক্লাসিক পদবাচ্য 'মহাপ্রস্থানের পথে'র তুষারমৌলি হিমালয়কে আশ্রয় করে [illegible]কটি রচনা বাঙলা সাহিত্যকে [illegible] করেছে তার মধ্যে শঙ্কু মহারাজ-[illegible] 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী যমুনা' সার্থকতম সৃষ্টিরূপে স্বীকৃতি- একদা নিউ থিয়েটার্সের পতাকা-[illegible] পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায় [illegible]থান পথের চিত্ররূপ দান করে [illegible]কে [illegible] করে তুলেছিলেন এবং তার জন্যে উচ্চ প্রশংসিতও হয়েছিলেন। বোধকার শ্রীচট্টোপাধ্যায় কৃত মহাপ্রস্থানের পথের জনপ্রিয়তার সঙ্গে আর্থিক সাফল্যের কথা স্মরণ করেই জাহ্নবী চিত্রম শঙ্কু মহারাজের জনপ্রিয় রচনা 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী যমুনার' চিত্ররূপ দিয়েছেন হীরেন নাগের পরিচালনাধীনে। প্রযোজকের আশা [illegible] জয়যুক্ত হয়েছে, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে জুটেছে তীর্থযাত্রীর দল। গঙ্গা যমুনার উৎস দর্শনের অভিপ্রায়ে। হিমালয়ের পাদমূলে হৃষিকেশে এই যাত্রার শুরু। পাহাড়ী পথে ঘুরতে ঘুরতে বাস গিয়ে থামে কুথনোর। এর পরেই আরম্ভ [illegible] পদযাত্রা যমুনোত্রীর পথে। যারা নিজেরা পারে না, তারা ডুলী, ঝাপান প্রভৃতি আসনে চেপে মনুষ্য বাহিত হয়ে গন্তব্যাভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। কারুর কারুর আবার নিজের পদদ্বয়ের উপর নির্ভর করেই চলবার মানত থাকে, তা সে যতো কষ্টই হোক না কেন। এই তীর্থযাত্রীদের মাঝে চলেছে বাঙালী যুবক কুমার। তার মনে তীর্থধর্মের কোনো বাসনা নেই, সে শুধু জানতে চায়, কি সব লোভে অনাদি অনন্তকাল ধরে লক্ষ লক্ষ নরনারী এই মহাপ্রস্থানের পথের পথিক হয়েছে। তার মনের এই প্রশ্নের জবাব পেলেই সে খুশী হবে এবং এই জবাব পাবার জন্যে সে হিমতীর্থ গোমুখ পর্যন্ত অগ্রসর হতে বদ্ধপরিকর। সেখানে যাওয়ার পথ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল, সেখানে যারা গেছে তাদের কেউই নাকি আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি—এই সব নিষেধবাক্যও তাকে সংকল্পচ্যুত করতে পারেনি।—যদিও এই দুস্তর পথে সে একাই যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল, কিন্তু হাজারো বারণ সত্ত্বেও তার সঙ্গিনী হল মহারাষ্ট্রের তরুণী সুমন পালসকর। এই সুমনকে কুমার দু দুবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে; একবার তার অসহ্য যন্ত্রণা উপশমের জন্যে নিতান্ত অপটু হাতে ইঞ্জেকসন দিয়ে এবং দ্বিতীয়বার, যখন সে জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উন্মত্তা ফেনিলোচ্ছলা যমুনার তুষার শীতল জলে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল, তখন তাকে নিবৃত্ত করে। কুমারই তাকে সাহস দিয়েছিল, তার মনে সঞ্চার করেছিল রোগজয়ের প্রেরণা, কুমারকে

নের প্রসব করে সুমন এই পৃথিবীতে
থাকতে চায়, কাজেই কুমার সে-পথে,
ও সেই পথে। যখন বহু আয়াস
ার করে ওরা গোমুখীর চিরতুষারাচ্ছন্ন
দে এসে উপস্থিত, তখন সহসা উঠল
কের তুষারঝড় দুটিকে আচ্ছন্ন করে—
ঝড়ের মধ্যে ওরা দুজনে তীরবেঁধা
ির মতো দুজনে দুজনকে নিবিড় ভাবে
ে ধরল, তারপর, বোধ করি, গেল
দের জন্যে হারিয়ে।

—এই যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী যাত্রার
নীকে যতদূর সম্ভব বাস্তবভাবে রূপা-
করতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি পরিচালক
না নাগ প্রযোজকের সহায়তায়। বহু
ী ও কলাকুশলীর একটি বিরাট দল
কেশ থেকে শুরু করে যমুনোত্রী পর্যন্ত
ন এই ছবির বাস্তব রূপায়নের জন্যে।
র অবশ্য গঙ্গোত্রীর পথে শিল্পীদের
ন মাত্র দুজন—শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও
ন্যা কাহিনীরই প্রয়োজনে। বহির্দৃশ্য
যেখানে সম্ভব হয়নি, সেখানে স্টুডিওর
বহির্দৃশ্য অনুযায়ী সেট গড়তেই
ছ এবং এই সেটগুলি যতদূর সম্ভব
বানুগ হয়েছে।

গোড়ারদিকে চিত্রনাট্য কিছুটা শিথিল
সম্পন্ন হলেও ছুটন্ত বাসের মধ্যে ও
র বিশ্রাম স্থানে নানা উপভোগ্য ঘটনার
র দিয়ে চরিত্রগুলির উপস্থাপনা করা
ছ সুকৌশলে। এর পরে যখন থেকে
পালুসকরের সঙ্গে কুমারের প্রথম
াৎকার ঘাটে একটি নাটকীয় মুহূর্তে,
থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত দর্শক
চিত্তে ঘটনাবলীকে অনুসরণ করতে

বিকালে ভোরের ফুল / উত্তমকুমার ও সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়

বাধ্য হন। এবং এইখানেই চিত্রনাট্যকার-পরিচালকের কৃতিত্ব।

অভিনয়ে স্বাভাবিকত্বেই সর্বাধিক মনোযোগ আকর্ষণ করেন নায়ক কুমারবেশী শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। চরিত্রটির জিজ্ঞাসু এবং আত্মানুসন্ধানী রূপটিকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অনায়াস স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে। তাঁর সঙ্গে আশ্চর্যভাবে সহযোগিতা করেছেন সুমনের ভূমিকায় মধুচ্ছন্দা। ছবির গোড়ার দিকে তাঁর মহারাষ্ট্রীয় রূপটিকে তিনি চমৎকারভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, আকৃতি, দৃঢ়সংকল্প এবং অন্তর্মুখিতাকে তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর নাট্যনৈপুণ্য গুণে। বাংলার চলচ্চিত্র জগতে মধুচ্ছন্দা অতি শীঘ্রই প্রথম সারির শিল্পীরূপে পরিচিত হবার ক্ষমতা রাখেন। অপরাপর ভূমিকায় চরিত্রোচিত সু-অভিনয় করেছেন শমিতা বিশ্বাস, সুবিতাব্রত দত্ত, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, গীতা দে, বিদেশী শিল্পী এইচ ও লেম্যান এবং আরও অনেকে।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এর চিত্রগ্রহণ ও শিল্প নির্দেশনা। সামান্য কিছু ব্যতিক্রমকে উপেক্ষা করলে বহির্দৃশ্য-গুলি অধিকাংশ স্থলেই নয়নাভিরাম। বহির্দৃশ্যকে স্টুডিওর মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে গঠনে শিল্পনির্দেশক তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। "মহাপ্রস্থানের পথে"র মতোই এই ছবিরও একটি বিশেষ আকর্ষণ হওয়া উচিত ছিল প্রবীণ সুরকার পঙ্কজকুমার মল্লিকের পরিচালনায় গৃহীত গানগুলি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, একমাত্র কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীত রবীন্দ্রসঙ্গীত 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' ছাড়া অপর পাঁচখানি গানের একখানিও নিখুঁত হয়ে উঠতে পারেনি। বিশেষ করে সমবেত সঙ্গীতগুলির প্রতি যা সংখ্যায় অন্তত তিন-খানি—যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়নি, যার ফলে গানগুলির গায়ক-গায়িকাদের কণ্ঠে প্রচুর অমিল থেকে গেছে। এবং অবশেষে বলব, আজকের দিনে বাংলা ছবির জন্যে সংস্কৃত স্তোত্র ব্যবহার করার পরিবর্তে উপযোগী বাঙলা গানই রচনা করিয়ে নেওয়া ভালো—তাতে গানগুলি সাধারণের সুখশ্রাব্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোধগম্যও হয়।

কিছুটা ত্রুটি সত্ত্বেও জাহ্নবী চিত্রম-এর নিবেদন 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী যমুনা' বাংলা ছবির জগতে একটি বিশিষ্ট চিত্র-প্রযোজনা বলে কীর্তিত হবে।

(২) বহু গুণান্বিত আদর্শ পুরুষ

তপন সিংহের 'গল্প হলেও সত্যি'তে যা ছিল কল্পনার বস্তু, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত, রূপম চিত্র নিবেদিত "বাবুর্চি" নামক হিন্দী রঙীন ছবিতে তাকে করা হয়েছে বাস্তব, অত্যন্ত বাস্তব। বাবুর্চির রঘু বাবুর্চি ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি, ইন্দিরা গান্ধী থেকে শুরু করে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের বাড়ী পর্যন্ত সর্বত্র কাজ করেছে এবং সেই কারণে সে যেমন রাজনীতিতে, তেমনই গানে, নাচে, সংস্কৃত ভাষায়, অঙ্কশাস্ত্রে, যুযুৎসু বিদ্যায় মুখে মুখে কবিতা রচনায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার আসল কাজ রন্ধনবিদ্যায় এমনি অসাধারণভাবে ব্যুৎপন্ন যে, সে আজকের এই অতীতের প্রতি অতীব অশ্রদ্ধাপরায়ণ যুগেও প্রতিটি মানুষের মনের মধ্যে যে একটি আদর্শ পুরুষের চিত্র মুদ্রিত আছে, তার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। তাই দেখি, বাবুর্চি ছবির দর্শকরা—তরুণ-তরুণী থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত রাজেশ খান্না অভিনীত রঘু বাবুর্চিকে একান্ত আপন জ্ঞানে ভালোবেসে ফেলেছে। শান্তি নিবাসের কর্তা বৃদ্ধ শিব-নাথ শর্মার অশান্তিপূর্ণ ভেঙে-পড়োপড়ো সংসারকে আবার নিখুঁতভাবে জোড় লাগাতে এবং তার প্রতিটি উদ্বেগপূর্ণ পরি[illegible] করবার জন্য সে

...রে মোলায়েম কথাবার্তা এবং আচরণে ...ন নিপুণ যাদুকরের ভূমিকা গ্রহণ ...ছ তাতে কাহিনগত অপরাপর চরিত্রের প্রতিটি দর্শকও তাকে একটি দুর্লভ ...র টুকরো জ্ঞানে মনেপ্রাণে ভালোবাসতে হয়েছে। ছবির প্রায় শেষ পর্যায়ে ...পাধ্যায় এই রঘু বাবুর্চি চরিত্র ...র দর্শকমনে একটি অপ্রত্যাশিত বিচিত্র সৃষ্টিরও ব্যবস্থা করেছেন। রঘুর ... ও নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় শান্তি নিবাসে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় শান্তি স্থাপিত ..., তখন একরাত্রে রঘুকে দেখা গেল, ...বাড়ীর প্রতিটি জনকে কি এক তরল ...স্প্রে করে ঘুমে আচ্ছন্ন করে রাখতে এর ফলে কর্তা শিবনাথ থেকে শুরু ...কলেরই বেলায় ঘুম ভাঙল এবং ... আবিষ্কার করলেন, তাঁর খাটের ...লোহার চেন বাঁধা ট্রাঙ্ক থেকে অলঙ্কার ...পেটিকাটি অন্তর্হিত এবং ঐ সঙ্গে ...বাবুর্চিও। ঐ বাড়ীতে রঘুর হঠাৎ ...নের দিন থেকেই দর্শকদের ...লে দেখিয়ে রাখা হয়েছে যে, ঐ ...রা ট্রাঙ্কটির প্রতি রঘুর দৃষ্টি বারে-আকর্ষিত হয়। কাজেই দর্শকদের অসুবিধা হয় না ঐ গহনার বাকসটির ... রঘু এবং বাড়ীর সকলের মন জয় ...ছিল। হাঁ, সত্যিই রঘু ঐ গহনার ...টিকে নিয়ে ...আত্মগোপন ... না। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের চমকপ্রদ ...দিয়েছে বাবুর্চির শেষ কয়েকটি ...ক দৃশ্য।

...টির চিত্রনাট্যটিকে হাসি, প্রেম, ...চ, কৌতূহল এবং বিভিন্ন দৈনন্দিন ...সুন্দর সমাধানসূচক শ্রুতিমধুকর ...র ...সংলাপোজ্জ্বল দিয়ে পরিচালক ...পাধ্যায় এমন দক্ষতার সঙ্গে ভরাট ... যে, দর্শক ছবিটিকে প্রতিটি ... উপভোগ করেন। ছবির মধ্যে এমন ...ও নেই, যেখানে দর্শক ছবির দিক ...মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যমন হতে ... এবং যেখানে আজও একান্নবর্তী ...র ... আছে, সেখানে পরি-...লোকেরা এই ছবি দেখে যে ...ণী মানিয়ে নিয়ে চলতে শিখবেন, ...হলপ করে বলতে পারি।

...ভিনয়াংশে প্রকাণ্ড বিস্ময়ের সৃষ্টি ...র বাড়ীর কর্তা শিবনাথের ভূমিকায় ...নাথ চট্টোপাধ্যায়। নিজের সন্তান ও ...দের মধ্যে আড়োআড়ো ছাড়ো-...বে এবং সংসার পরিচালনায় তাদের ...তায় ক্ষুব্ধ শিবনাথ নিজের ব্যক্তিত্ব ...বই প্রতীক অলঙ্কার-পেটিকাকে ...ধরে আছেন শত অশান্তির মধ্যেও। ...য পর্যন্ত যখন দৈবপ্রেরিত রঘু ...ণর মতোই ঐ অশান্তির সংসারে অনুকূল আবহাওয়া বইয়ে দিতে ...ল, তখন বৃদ্ধ শিবনাথ নিজের ছোট্ট ঘরটি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে অপর সকলের সঙ্গে গানই শুধু গাইলেন না, নেচেও উঠলেন। এই শিবনাথকে জীবন্ত করে তুলেছেন হারীন্দ্রনাথ—তাঁর অভিনয় ক্ষমতার এতখানি সদ্ব্যবহার সাম্প্রতিককালে আমরা কোনো ছবিতে দেখতে পাইনি। রঘু তো শুধু বাবুর্চি নয়, সে ঐ 'শান্তি নিবাসে' যেন এক দেবদূতের মতো আবির্ভূত হয়েছিল শীতের কুয়াশা ভেদ করে। রাজেশ খান্না তাঁর মিষ্টি হাসিতে, মধুর বচনে, নম্র সহানুভূতিশীল ভঙ্গীতে এই রূপটিকে অতি সহজেই তুলে ধরেছেন দর্শকের সামনে। রাজেশ খান্না অভিনীত রঘু বাবুর্চি একটি স্মরণীয় ভূমিকা হয়ে থাকবে।

এর পরেই যে-ভূমিকাটি দর্শকদের বেশী করে নজরে পড়ে, সে হচ্ছে জয়া ভাদুড়ী অভিনীত কৃষ্ণা। বৃদ্ধ শিবনাথের মা-বাপ-হারা নাতনীটি সেই ভোর বেলা সকলের মুখের কাছে চায়ের কাপ ধরা থেকে শুরু করে হাসিমুখে সকলেরই ফাইফরমাশ খাটে উদয়াস্ত। এবং ওরই মধ্যে সে পড়াশুনো করে কলেজে এবং ওই পড়াশুনো করারই উপলক্ষে সহপাঠী অরুণের সঙ্গে ওর বেশ কীর একটু ভালোবাসাও জন্মায়। এই ভালোবাসার ব্যাপারটি নিয়ে ওকে কতোই না লাঞ্ছনাগঞ্জনাও সইতে হয়।—এই কৃষ্ণা চরিত্রটিকে রূপরসে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন জয়া ভাদুড়ী। শিবনাথের বড়ো

ছেলে রামনাথের নৃত্যশিক্ষার্থিনী কন্যার ভূমিকায় নবাগত মনীষাও দর্শকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছেন। শিবনাথের মেজো ছেলে কাশীনাথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন আমাদের বাঙলা চলচ্চিত্রের সুপ্রসিদ্ধ চরিত্রাভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। হিন্দী চলচ্চিত্রে তাঁর এই প্রথম আবির্ভাব অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ। এ-ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে সু-অভিনয় করেছেন এ. কে. হাঙ্গাল (রামনাথ), দুর্গা খোটে (বড় বৌ), পেন্টল (নৃত্যশিক্ষক), উষাকিরণ (ছোট বৌ), সুরেশ (অরুণ), মাস্টার রাজা (পিন্টু) প্রভৃতি।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসনীয়। কুয়াশা ভেদ করে রঘু বাবুর্চির আবির্ভাব-দৃশ্যটি আলোকচিত্রশিল্পী জয়ন্ত পাথারের শিল্পসম্মত দক্ষতার পরিচায়ক। দাস ধায়মাদের সম্পাদনাগুণে ছবিটি আশ্চর্য গতিসম্পন্ন হয়েছে। কৈফী আজমী রচিত গানে মদনমোহন কৃত সুর যোজনার গুণে ছবির গানগুলি প্রাণবন্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাধুর্যমণ্ডিত হয়েছে।

রূপম্ চিত্র নিবেদিত এবং হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'বাবুর্চি' শুধু প্রমোদোপকরণ হিসেবে একান্ত উপভোগ্য চিত্রই নয়, ওরই সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার পথে বিচিত্রভাবে সহায়ক উপদেশবাণী সংবলিত একটি আদর্শচিত্রও বটে।

(৩) সেই সুপ্রাচীন গরীব ও বড়লোকের মধ্যে প্রেম-কথা

শিরী-ফরহাদ, লায়লা-মজনু, হীর-রঞ্ঝা, ডালিমকুমার-রূপবতী—বহু কাব্য, গাথায় ছড়িয়ে আছে যে ধনী কন্যা ও দরিদ্র যুবকের প্রেমকাহিনীর ট্রাজেডি সেই প্রেম-কাহিনীই আবার নতুনভাবে বর্ণিত হয়েছে আধুনিক সমাজের পটভূমিকায় রচিত নীতীন বোস-এর 'মন তেরা, তন মেরা'র মাধ্যমে। ওরা দুজনেই কলেজে পড়ত একই ক্লাশে—গরীব অন্ধ মায়ের ছেলে দীপক, আর বড়লোক বাপের মেয়ে জ্যোতি। দীপকের আদর্শ দ্বারা আকৃষ্ট হল জ্যোতি প্রথমে এবং ক্রমে উভয় উভয়কে ভালোবাসল, ঠিকও করল বিবাহ করবার জন্যে। ইতিমধ্যে জ্যোতিরই এক বন্ধু রূপার দাদা, কোটিপতি রাজনের লুব্ধ নজরে পড়ল জ্যোতি; সে ওকে বিবাহ করবার জন্যে সুকৌশলে অগ্রসর হল। কিন্তু একমাত্র কন্যার মন জেনে ধনী পিতা দীপকেরই হাতে তুলে দিতে চাইলেন প্রচুর অর্থসম্পত্তি-সমেত। কিন্তু শিক্ষিত গরীবের ছেলের বুঝি গরীবানারও একটা অভিমান থাকে। সে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করল ধনীর অর্থসম্পত্তি নিতে; বলল—আমি জ্যোতিকে ভালোবাসি, মাত্র ওকেই চাই, ওর সম্পত্তি ছাড়াই। ধনী পিতা বললেন, আমি তোমার মনোভাব বুঝি; কিন্তু আমার মেয়েকে তো আমি জানি, সে যে গরীবী চালে কোনো দিনই চলতে পারবে না; তাই সে মনে মনে ভোগ করবে অশান্তি এবং এই অশান্তি তোমাদের ভালোবাসার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তবু দীপক রইল তার মতে অটল। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তাঁর হয়ে দীপককে বোঝাতে মনে হল দীপক যেন বাস্তব পরিস্থিতিটাকে হৃদয়ঙ্গম করল। কিন্তু ঠিক তখনই বেঁকে বসল জ্যোতি অভিমানভরে। সে বলল, আমার জন্যে তোমায় মত পরিবর্তন করতে হবে না। তুমি তোমার গরীবী নিয়েই সুখে থাক; বড়লোকে গরীবে সত্যিকারের মিল কোনো দিনই হয় না।—অতএব জ্যোতির বিবাহ হল ধনী চরিত্রহীন, মদ্যপ রাজেনের সঙ্গে। রাজনের মতে টাকা দ্বারা সব কিছু কেনা সম্ভব।—কিন্তু কিছু দিন বাদেই সে আবিষ্কার করল, অর্থ দ্বারা সে জ্যোতির দেহটাকেই কিনতে পেরেছে, তার মনকে পারেনি। তাই অসময় মৃত্যুকালে সে বলল তার স্ত্রী জ্যোতিকে—আমি তোমার দেহটাকেই কিনেছিলুম, কিন্তু তোমার পবিত্র মনে হাত ছোঁয়াতে পারিনি; এই মন তুমি যাকে দিয়ে রেখেছ সেই দীপককেই তুমি জীবনেও বরণ করে নিও।

বাবুর্চি চিত্রে জয়া ভাদুড়ী

'চেতনা' ও 'জরুরৎ' ছবির লেখক-পরিচালক বি. আর. ইসারা এই 'মন তেরা তন মেরা' ছবিরও লেখক-পরিচালক। তবে এ-ছবিতে তিনি চিত্রগ্রহণের মাধ্যমে বা দৃশ্য-রচনায় তেমন কোনও দুঃসাহসের পরিচয় দেন নি, যা তাঁর আগের দুখানি ছবিকে চিহ্নিত করেছিল। এ-ছবিটিতে মাত্র মাসিক পাঁচ হাজার টাকা দক্ষিণা দিয়ে রক্ষিতা রাখার সঙ্গে রাজনের নিবিড় সান্নিধ্যের দৃশ্যটি অতি সুকৌশলে ব্যঞ্জনাপূর্ণ করা হয়েছে। অবশ্য 'জরুরৎ' আগে দেখানো হলেও 'মন তেরা তন মেরা'র পরে 'জরুরৎ' তোলা হয়েছে।

অনিল ধাওয়ান ও রেহানা সুলতান ছবিটির নায়ক নায়িকা হলেও এই ছবিতে দর্শকের মনকে বিশেষভাবে অধিকার করেছেন শত্রুঘ্ন সিংহ ধনী, চরিত্রহীন, মদ্যপ রাজেনের ভূমিকায় অসামান্য নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে। ব্যক্তিত্ব তাঁর তো আছেই, কিন্তু এই ছবির প্রতিটি দৃশ্যে প্রতিটি শটে তিনি ঠিক যেন মেপে মেপে চলেছেন, ফিরেছেন, তাকিয়েছেন, সিগারেট-লাইটার জ্বালিয়েছেন, গেলাস ধরেছেন পড়েছেন, গালে বিশেষ ভঙ্গিমায় আঙুল ঠেকিয়েছেন, ঠোঁটের উপর দিয়ে আঙুল বুলিয়েছেন এবং একটি একটি করে সংলাপ বলেছেন। চরিত্রাভিনেতারূপে ইনি ইতিমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা এঁকে ভিলেন ছাড়াও ভিন্নতর চরিত্রে দেখতে পেলে সুখী হব। রেহানা সুলতান 'চেতনা' থেকে শুরু করে 'দস্তক' ও 'হারজিৎ' পেরিয়ে এই 'মন তেরা তন মেরা' ছবিতে এসে উপস্থিত হয়েছেন বটে, কিন্তু এ-ছবিতে তাঁর অসামান্য নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দেবার সুযোগ তিনি অত্যন্ত কম পেয়েছেন। শুধু বিশেষ বিশেষ স্থানে ফুটে উঠেছে তাঁর ব্যক্তিত্ব। নায়ক দীপক বেশে অনিল ধাওয়ান সু-অভিনয় করেছেন এই মাত্র বলতে পারা যায়। অপরাপর ভূমিকায় মনোমোহন কৃষ্ণ (জ্যোতির বাবা), রশ্মি (দীপকের প্রতি নীরব ভালোবাসায় মগ্ন প্রতিবেশিনী), রুখশানা (বারনারী শিখা), অসিত সেন (মোটারাম), দুলারী (দীপকের অন্ধ মা), মধুমতী (নর্তকী) এবং কলেজ ছাত্র বেশে অভিজিৎ সেন, শকীল, রবি, হামিদ প্রভৃতি সু-অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। ছবিতে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে 'অপটিকস'-এর কাজে দয়াভাই এবং সম্পাদনায় প্রযোজক আই. এ.

নবমঞ্জরীর অনুষ্ঠানে শান্তিগোপাল, মঞ্জু বসু এবং রঞ্জিত মল্লিক

কৃষ্ণ বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। পুণ্যাব বহির্দৃশ্যগুলি ছবির বিশিষ্ট সম্পদ। নাকশ লায়ালপুরী কৃত গানে সপন জগমোহন প্রদত্ত সুর যোজিত হয়ে চিত্তগ্রাহী হয়ে উঠেছে।

বি, আর, ইসারা পরিচালিত নবীন ফিল্মস্-এর নিবেদন 'মন তেরা তন মেরা' একটি দর্শনীয় চিত্র।

(৪) একটি গ্রাম্য সরল ধর্মবিশ্বাসী চরিত্র অবলম্বনে একখানি মামুলি ছবি

এ, জি, ফিল্মস (প্রা) লিমিটেড নিবেদিত, এ, এ, নাদিয়াদওয়ালা প্রযোজিত এবং মনোমোহন দেশাই পরিচালিত 'রামপুর বা লক্ষ্মণ'-এর নায়ক লক্ষ্মণ বোধকরি রামায়ণের হনুমানের চেয়েও রামভক্ত এবং রাম নামের অলৌকিক শক্তির প্রতি বিশ্বাসী। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই সে অজানা, অচেনা বোম্বাই শহরে এসে উপস্থিত হয়েছিল তার পিতার বন্ধুপুত্রের খোঁজে। কিন্তু খোঁজ সে যখন পেল, তখন দেখল, ঐ বন্ধুপুত্র মিথ্যা হত্যাপরাধে অভিযুক্ত। আদালতে সে বিচারকের সামনে জোর গলায়, সরল বিশ্বাসে বলল, বেচারাকে মিথ্যা হত্যার অভিযোগে জড়ানো হয়েছে, কিন্তু এ-ব্যাপারে সাক্ষ্যপ্রমাণ সে দাখিল করতে পারল না বলে সে দোষী সাব্যস্ত হয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে কারাগারের অন্ধকারময় কক্ষে ফাঁসীর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকল। লক্ষ্মণ তার নিজের মতো করে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল প্রকৃত হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে। ধনীকন্যা রেখা, যে তার সারল্যে মুগ্ধ—তাকে ঘিরে লক্ষ্মণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় চোরাই কারবারের এক দুর্ধর্ষ দলপতি কুমার সাহেবের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত কুমার সাহেব যখন নিজের লোকেদের হাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন জানা যায়, তিনি হচ্ছেন লক্ষ্মণেরই বাল্যকালে ট্রেন দুর্ঘটনার ফলে হারিয়ে যাওয়া ভাই রাম এবং ওর বাপের বন্ধুপুত্রের হত্যাকারী।

—অতএব শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মণের রাম নামে বিশ্বাস কার্যকরী হয়ে ফাঁসীর আসামীর মুক্তি ঘটালো।

মামুলি খুন, জখম, জুডো প্রক্রিয়ার মারামারি, ক্যাবারে নাচগান প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ 'রামপুর কা লক্ষ্মণ' ছবির নায়কের ভূমিকায় রণধীর কাপুর মুখে রাম নাম বলেছেন। সরল বিশ্বাসের কথা কয়েছেন, অথচ প্রয়োজনে জুডো প্রথায় করেছেন বহুজনের সংগে মারামারি, নেচেছেন ও গেয়েছেন, প্রেমও করেছেন, যা আরও পাঁচটা হিন্দী ছবির নায়ক করে থাকে। এবং শত্রুঘ্ন সিংহ হয়েছেন ভীলেন-সর্দার কুমার সাহেব।

তবু নায়কবেশী রণধীর কাপুরকে দর্শকসাধারণের ভালো লাগবে তাঁর সরল বিশ্বাসী দেহাতী ভংগী ও কথাবার্তার জন্যে। নায়িকা রেখা (চরিত্রের নামও রেখা), মনোমোহন কৃষ্ণ, শত্রুঘ্ন সিংহ, সুলোচনা প্রভৃতি কাহিনীর প্রয়োজন মিটিয়েছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ নিয়মমাফিক উচ্চমানের। মজরুহ সুলতানপুরীর গানে সুরযোজনা করেছেন রাহুল দেববর্মণ।

স্টুডিও সংবাদ

দশটা সাধারণ ছেলের মত বিনুও চেয়েছিল ভালভাবে বাঁচতে। চেয়েছিল ভালবাসা আর একটি সংসার। স্বপ্ন দেখেছিল লক্ষ্মীকে নিয়ে ঘর বাঁধার। কিন্তু লক্ষ্মীকে সে লম্পটের লালসার হাত থেকে বাঁচাতে পারে নি। আলোর জীবনে নেমে এল অন্ধকার। হতাশার জ্বালায় ন্যায়নীতিহীন পংকিল জীবনের আবর্তে সে আকণ্ঠ ডুবে গেল। সমাজবিরোধীদের দলে মিশে বিনু হল চোর। পুলিশ পিছু নিল। তার নীতি-ভ্রষ্ট জীবনে রাখতে পারেনি কোন আদর্শ—রাখতে পারেনি ভালবাসা, কিন্তু রেখেছিল তার জীবনের পরম সত্য।

নরক যেমন অতল তার পথও তেমনি পিচ্ছিল। সেখানে নামলে আর ফিরে আসা যায় না। বিনুও পারেনি ফিরে আসতে। তবুও কয়লার নিকষ কালোর মধ্যে যেমন হীরকের দ্যুতি লুকিয়ে থাকে তেমনি সমাজচ্যুত এই মহাপাতকদের মধ্যে হঠাৎ জেগে ওঠা সুস্থ চেতনা বলে—'ওরে বিনু ফিরে যা—' ফিরে সে গিয়েছিল -জবান সে রেখেছিল কিন্তু— না, ছবির শেষটুকু বলা বারণ। তাহলে আগ্রহ কমে যাবে। উপরোক্ত কাহিনীটি শুভ প্রোডাকসন্স নিবেদিত 'জবান' ছবির। স্ব-রচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্যে ছবিটি পরিচালনা করেছেন পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুরারোপে আছেন সুধীন দাশগুপ্ত। বিনু এবং লক্ষ্মী চরিত্রে অভিনয় করেছেন সমিত ভঞ্জ ও রাধা সালুজা। অন্যান্য চরিত্রে আছেন কল-কাতা ও বম্বের স্বনামখ্যাত শিল্পীরা। তার মধ্যে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, কাজল গুপ্ত, দিলীপ বসু এবং বম্বের ধর্মেন্দ্র, বিশ্বজিৎ, শত্রুঘ্ন সিন্হা, অমিতাভ বচ্চন, সোনিয়া সাহনী প্রভৃতি। ছবিটি মন্ডীমায়া প্রাইভেট লিমিটেডের পরিবেশনায় মুক্তিলাভ করবে।

এবারে যেসব ছবির চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হয়ে মুক্তির অপেক্ষায় আছে তার একটি তালিকা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। টেকনিসিয়ান্স ওন প্রোডাকসন্স নিবেদিত 'মেঘের পরে মেঘ'।

ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়; সুরারোপে আছেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—অনিল চ্যাটার্জি, জহর ব্যানার্জি, কণিকা মজুমদার, রবি ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, অজয় গাঙ্গুলী, জ্ঞানেশ মুখার্জি প্রভৃতি।

বিমল করের কাহিনী অবলম্বনে সোনালী প্রোডাকসন্স-এর 'বসন্ত বিলাপ' অভিনয়ে আছেন : সৌমিত্র চ্যাটার্জি, অপর্ণা সেন, রবি ঘোষ, কাজল গুপ্ত, অনুপকুমার, সুমিত্রা মুখার্জি, চিন্ময় রায়, শিবানী বসু, কণিকা মজুমদার, তরুণকুমার, বঙ্কিম ঘোষ প্রভৃতি। ছবিটি পরিচালনা করেছেন দীনেন গুপ্ত এবং সুরারোপ করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত।

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে 'নিশিকন্যা' ছবিটি বর্তমানে মুক্তির অপেক্ষায়। ছবিতে সুরারোপ করেছেন বর্তমানে সব চাইতে ব্যস্ত সংগীত পরিচালক সুধীন দাশগুপ্ত। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—সৌমিত্র চ্যাটার্জি, মিঠু মুখার্জি, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, দিলীপ রায়, অশোক মিত্র, সুব্রতা চ্যাটার্জি, রুমা গুহঠাকুরতা ও প্রসেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

অজিত লাহিড়ী পরিচালিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' ছবিটিও বর্তমানে মুক্তির অপেক্ষায়। ভাইপ্রেম প্রোডাকসন্স নিবেদিত এবং কালিপদ সেন সুরারোপিত ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন: শমিত ভঞ্জ, সোনিয়া সাহনী, বিদ্যা রাও, সুব্রতা চ্যাটার্জি, প্রসেন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ চ্যাটার্জি, মিহির পাল, রবি দাস, নরেন্দ্র শর্মা, বকুল মজুমদার, পিনাকী ভট্টাচার্য, অরূপ মুখার্জী, উৎপল সরকার, স্নেহরাজী, সন্তোষ নন্দী, মঞ্জু দেওগাঁও প্রভৃতি। ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন—সীমা ফিল্মস্।

বাদল পিকচার্সের 'নতুন দিনের আলো' ছবিটিও অজিত গাঙ্গুলীর পরিচালনায় শেষ হয়ে বর্তমানে মুক্তির অপেক্ষায় আছে। বিভিন্ন চরিত্রে : সৌমিত্র, সাবিত্রী, অনুপ, হাসু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। সুরারোপ করেছেন : রাজেন সরকার।

তাছাড়া গুরু বাগচী পরিচালিত 'ছন্দপতন', নবেন্দু চ্যাটার্জি পরিচালিত 'চিঠি', অরবিন্দ মুখার্জি পরিচালিত 'নকল সোনা', অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত 'রাতের রজনীগন্ধা', অগ্রদূত পরিচালিত 'সোনার খাঁচা', তপন সিংহ পরিচালিত 'আঁধার পেরিয়ে', পীযূষ বসু পরিচালিত 'বিকেলে ভোরের ফুল', তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ', সলিল দত্ত পরিচালিত 'শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন', অমল দত্ত পরিচালিত 'আবীরে রাঙানো', অজয় কর পরিচালিত 'কায়াহীনের কাহিনী' প্রভৃতি ছবিগুলোর মধ্যে কোনটা সমাপ্ত, আবার কোনটা দ্রুত সমাপ্তির পথে।

বিকালে ভোরের ফুল : দুটি নীরব মন। একটি পড়ন্ত আর একটি ফুটন্ত। ওদের নীরব প্রেম আর নীরব অন্তরঙ্গতা। এ নিয়েই কে এল কাপুর ফিল্মস প্রযোজিত পরবর্তী ছবি 'বিকালে ভোরের ফুল'। বেশ কয়েকদিন চিত্র গ্রহণের পর সম্প্রতি টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে এ-ছবির সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় চারখানি গান রেকর্ড করলেন আরতি মুখোপাধ্যায় এবং নিজের কণ্ঠে। পীযূষ বসু পরিচালিত এ-ছবির কাহিনীকার সমরেশ বসু। চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালক শ্রীবসু নিজেই। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে রূপদান করছেন—উত্তমকুমার এবং সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব কে এল কাপুর ডিস্ট্রিবিউটর্স।

শ্বেতময়ূরের চিত্রায়ণ : 'চিত্ররূপ' নামে নবগঠিত প্রযোজক সংস্থা সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'শ্বেতময়ূরে গল্পের' চিত্রসত্ত্ব ক্রয় করেছেন। ছবিটি পরিচালনার দায়িত্ব উজ্জ্বল মিশ্রের। সংগীত পরিচালকরূপে থাকছেন ওস্তাদ বাহাদুর খান—চিত্রগ্রহণে দীপক দাস। সম্ভবত সর্বপ্রথম নায়কের ভূমিকায় একজন জার্মান যুবক বাংলা ছবিতে অভিনয় করছেন। সম্পূর্ণ ছবিটিই প্রায় স্টুডিওর বাইরে গৃহীত হবে।

গত ১৭ আগস্ট থেকে ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে পরিচালক তরুণ মজুমদার তাঁর পরবর্তী নতুন ছবি সুবোধ ঘোষ রচিত 'ঠগিনী'-র চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন।

প্রথমদিন যে দৃশ্যটি গৃহীত হয়েছে সেটি নিম্নরূপ : ফ্লোর জুড়ে বেবুতলা অঞ্চলের একটি স্যাঁত-স্যাঁতে এঁদো বাড়ির সেট পড়েছে। এই বাড়িতে আজ বিয়ে। বাড়ির কর্তা হরিপদবাবু চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। হরিপদবাবু একটি কোম্পানীর ক্যাশিয়ার। তাঁরই মেয়ে সুধার আজ বিয়ে—কিন্তু বিয়ের দিনই ঘটলো একটা অঘটন। ক্যাশ ভাঙার দায়ে হরিপদ গ্রেপ্তার হলেন। বিয়ে ভেঙে গিয়ে সুধা লগ্নভ্রষ্টা হোল। হরিপদবাবু ও সুধার চরিত্রে উৎপল দত্ত ও সন্ধ্যা রায় চমৎকার অভিনয় করলেন। ছবির আরও একটি উল্লেখযোগ্য বন্ধু চরিত্রে রবি ঘোষও আছেন। ছায়া ও ছবির পতাকাতলে নির্মিত এই ছবির অন্যান্য চরিত্রে আছেন—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় রায় অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, জহর বন্দ্যোপাধ্যায়, সীমা বসু, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। নায়ক চরিত্রে পরিচালক শ্রীমজুমদার একটি নতুন মুখকে নির্বাচিত করেছেন এবং তিনি এখনই তা প্রচার করতে চাইছেন না।

এই ছবির আলোকচিত্রশিল্পী হচ্ছেন প্রখ্যাত চিত্রগ্রাহক শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্প নির্দেশনায় আছেন—সুনীতি মিত্র এবং সম্পাদনায় আছেন—দুলাল দত্ত।

মঞ্চাভিনয়

বাঙলার সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণতম নাট্যকার মন্মথ রায় নাট্যামোদীদের উপহার দিয়েছেন '১৮৭২' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। এবং রঙ্গসভা নামক নাট্যগোষ্ঠী দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েই তিনি যে এই নাটকখানি রচনা করেছেন তাও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। উপযুক্ত নাট্যগৃহ, উপযুক্ত দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা ব্যতীতই সাধারণের কাছে টিকিট বিক্রয় করে অভিনয় করা এবং থিয়েটারের নাম ন্যাশনাল থিয়েটার দেওয়া নিয়ে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে দলের অন্যান্যদের মতবিরোধ হওয়ায় তিনি যে দলত্যাগ করেন, একথা সকলেই জানেন। এই মতানৈক্যকেই কেন্দ্র করে শ্রীরায় গড়ে তুলেছেন তাঁর '১৮৭২' নাটক। কেন শ্যামবাজার নাট্যসমাজের নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী প্রমুখ সভ্যরা বৃন্দাবন পাল তথা নবীনচন্দ্র পালের বাড়ীতে 'লীলাবতী' অভিনয় করবার পর সাধারণ দর্শকদের কাছে টিকিট বিক্রয়ের কথা ভেবেছিলেন, সেই কথা মনে রেখে এবং ঐ সময়কার সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকাকে যথাসম্ভব বজায় রেখেই নাটকখানিকে রচনা করলেও বাস্তব ঘটনার সঙ্গে কল্পনার রঙ মেশাতে নাট্যকার কার্পণ্য করেন নি। কারণ, নাট্যকার বা ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক নন, ইতিহাসকে বজায় রেখে তাঁকে কল্পনার জাল বুনতে হয় রসসৃষ্টি, বৈচিত্র্য সৃষ্টি, নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে। এরই পরাকাষ্ঠা দেখি শ্রীরায় যখন ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭২-এর 'নীলদর্পণ'-এর প্রথম প্রকাশ্য অভিনয় অন্তে সেখানে মঞ্চে গিরিশচন্দ্রকে এনে হাজির করেন। সেকি গিরিশ কি তাঁরই শিষ্যস্থানীয়দের সাফল্যে উল্লসিত হয়ে তাদের অভিনন্দন না জানিয়ে

নটমল্লারের খন্দর : গত ৬ আগস্ট নটমল্লারের প্রযোজনায় মিনার্ভা থিয়েটার মঞ্চে 'খন্দর' নাটকটি অভিনীত হয়। রচনা ও পরিচালনা করেন শ্রীপ্রিয়প্রসাদ অগ্নিহোত্রী।

সমাজের এক ধরনের লোক-মানুষের অভাব ও অনটনের সুযোগ নিয়ে কেমন করে তাদের সর্বনাশার পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সেটাই হলো এই নাটকের মূল বক্তব্য। আর সেই বক্তব্য শেষ দৃশ্যে পরিচালক বেশ সুষ্ঠুভাবেই প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং এর জন্য তিনি প্রশংসা পাবার যোগ্য।

অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন সর্বশ্রী কান্তি গাঙ্গুলী, দেবদাস গাঙ্গুলী, সৌরেন মুখার্জি, গোপাল দাস, অজিত ব্যানার্জি রেণু ঘোষ, অঞ্জলি ভট্টাচার্য, আরতি মল্লিক, প্রবীর সেনগুপ্ত, নির্মল শিকদার, সমীর ঘোষ, অনুপ বোস, গৌতম সিনহা, প্রফুল্ল দত্ত ও জ্যোৎস্না মিশির। নাট্যকার নিজেও একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেন।

সর্জন নাট্যগোষ্ঠীর আগামী প্রযোজনা : দক্ষিণ কলকাতার মননশীল নাট্যগোষ্ঠী 'সর্জন' দুটি নতুন নাটক উপহার দিচ্ছেন। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় অন্ধ এ্যাসোসিয়েশন হলে তাঁরা পরিবেশন করবেন মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'জবাব নেই' এবং 'স্বপ্ন-মঙ্গল-কথা' (দিলীপ চট্টোপাধ্যায় রচিত)। নাট্যকারদ্বয় নিজেরাই দুটি নাটকের নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

বিবিধ সংবাদ

কলকাতার আধুনিক যন্ত্রসঙ্গীত জগতে **ভি, বালসারা** একটি অনন্য বিশিষ্ট নাম। ১৯৫৪ সালে কলকাতার মাটিতে পদার্পণ করার দিন থেকে যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পীরূপে তাঁর খ্যাতি উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়ে আজ প্রায় তুঙ্গস্থানে পৌঁছেছে। ভি, বালসারা এখন পঞ্চাশোত্তীর্ণ, তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৯২২-এর ২২ জুন তারিখে। গেল শনিবার, ৯ সেপ্টেম্বর 'সম্ভাবনা' সাংস্কৃতিকগোষ্ঠী ভি, বালসারার একটি একক অনুষ্ঠানের

ভি বালসারা

আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্রসদনে। সঙ্গীতজগতে বালসারার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কাজী সব্যসাচী প্রদত্ত সুললিত নেপথ্য ভাষণের ফাঁকে ফাঁকে শ্রীবালসারা একে-একে তাঁর গুণপনার পরিচয় দিচ্ছিলেন প্রয়োজন মতো সহশিল্পীদের সহযোগে। কিন্তু প্রথমেই তিনি আমাদের অবাক করে দেন তাঁর ছ' বছর বয়সে প্রথম গাওয়া 'মেরে দিলমে দিলকা প্যেরা, হায় পাগল, মিলতো নাহী'—গানখানি গেয়ে। যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পী যে এমন সুললিতকণ্ঠে গানও গাইতে পারেন, তা আমাদের জানা ছিল না। এর পর তিনি ধরলেন একের পর এক যন্ত্র ম্যান্ডোলিন, বেহালা, হার্মোনিয়ম (বলা ভালো, এই হার্মোনিয়মই ছিল শ্রীবালসারার প্রথম প্রেম—ফার্স্ট লাভ), টেবিল অর্গান, বা ফুট হার্মোনিয়ম, (যাতে তিনি বাজালেন পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া 'পিয়া মিলনকো জানা'), পিয়ানো (১৯৩৪এ যখন তিনি আদৌ পিয়ানো বাজাতে জানেন না, সেই সময়ে এক খৃষ্টমাসের দিন তাঁকে ঐ যন্ত্র বাজাতে হয় কিছু না জেনেই এবং তারই ফলে তাঁর ডাক আসে মুস্তাক হোসেন খাঁ সাহেবের কাছ থেকে তাঁর সহকারী হবার জন্যে), ইউনিভক্স (১৯৫৪ সাল থেকে—নচিকেতা ঘোষের আনুকূল্যে), পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ান, মেলোডিকা, টাইসোকটো, স্টাইলোফোন। অবাক করে দিলেন তিনি পিয়ানোতে দক্ষিণ ভারতীয় রাগ 'মধুমালতী' বাজিয়ে। তাঁর শেষ বাজনা ছিল একটি স্বরচিত সঙ্গীত মেলোডিকা দিয়ে শুরু করে পর পর ইউনিভক্স, টাইসোকটো, ঐ যন্ত্রই পেন্সিলের সাহায্যে (সন্তুরের মতো), আবার সাধারণভাবে টাইসোকটো, স্টাইলোফোন, পিয়ানো, অ্যাকর্ডিয়ান এবং সবশেষে আবার মেলোডিকা বাজিয়ে। পুরো তিনঘণ্টা সময় শ্রীবালসারা সমগ্র প্রেক্ষাগৃহকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন।

শ্রীবালসারা দীর্ঘজীবী হোন।

রক্তকরবী সব পেয়েছির আসর

গত ৮, ৯, ১০ সেপ্টেম্বর যাদবপুর অঞ্চলের সন্তোষপুরে 'রক্তকরবী সব-পেয়েছির আসরের' ৪র্থ বাৎসরিক উৎসব প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হয়। সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' কে কেন্দ্র করে একটি কাব্যনাট্য, মূকাভিনয়, ছড়ানৃত্য, জিমনাস্টিক, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকনৃত্য ইত্যাদি ছিল অনুষ্ঠানের মূল কর্মসূচী। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সোনারকাঠিরা অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়ে দর্শকদের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়। রক্তকরবীর অনবদ্য সৃষ্টি 'আবোল তাবোল' সুরে-কথায়-নাচে-সাজে আলোকসম্পাতে এক মায়াময় জগতে নিয়ে যায় দর্শকদের। ভারতের আটটি প্রদেশের লোকনৃত্যও সমান প্রশংসার দাবী রাখে। নৃত্য-পরিচালনা করেন ঝর্ণা দত্ত এবং সংগীতে ছিলেন প্রণব চৌধুরী। শেষ দিনে অভিভাবক ও কর্মীদের প্রচেষ্টায় অভিনীত হয় 'লৌহপ্রাচীর' নাটক। বিভিন্ন দিনে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন রমা চৌধুরী, ইন্দিরা দেবী, শৈলেন ঘোষ, নরেশ চক্রবর্তী, বিভূতি সেনগুপ্ত ও স্বপনবুড়ো।

বিষাণের 'ঋতুরঙ্গ' : নেতাজী সুভাষ ইনস্টিট্যুট মঞ্চে 'বিষাণ' নাট্য সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত রবীন্দ্রসঙ্গীত অবলম্বনে নৃত্য-আলেখ্য 'ঋতুরঙ্গ' অনুষ্ঠিত হয়। বর্ষের বিভিন্ন ঋতুর রূপ রূপায়ণে 'বিষাণে'র এই প্রচেষ্টা মোটামুটি সার্থক হয়েছে বলা যায়। এই সার্থকতার জন্য যুগ্মভাবে সংগীত-পরিচালক ও নৃত্য-পরিচালক প্রশংসার দাবী রাখেন। সংগীতের ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও কয়েকখানি গান নৃত্যের আশ্রয়ে ঋতুর সার্থক রূপ-রূপায়ণে দর্শকচিত্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছে। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে কুনাল সরখেল, অমিত মল্লিক ও কৃষ্ণা ভট্টাচার্যের নামই উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য, ঐ দিনের অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন অপেক্ষা নৃত্য পরিবেশন যথার্থই ভাল হয়। এ ব্যাপারে নৃত্য পরিচালক পূর্ণিমা পাইন দর্শকদের প্রশংসা পাবার দাবী রাখেন। নৃত্যে যে সব শিল্পী অংশ গ্রহণ করে নৃত্য পরিবেশনে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন তাঁরা হলেন পূর্ণিমা পাইন, অঞ্জনা চৌধুরী, শ্যামলী ভট্টাচার্য ও সীমা চক্রবর্তী।

একটি সার্থক সঙ্গীতানুষ্ঠান : সম্প্রতি পরিচিত প্রতিষ্ঠান 'অনিন্দ্যম' একটি মনোজ্ঞ সঙ্গীত অধিবেশনের আয়োজন করেছেন। প্রারম্ভে শিল্পী মজুমদারের কণ্ঠে খেয়াল ও তারানা সুপরিবেশিত হয়। সঙ্গতে ছিলেন শেখর মজুমদার। কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করেন বিমলভূষণ, প্রশান্ত ভট্টাচার্য এবং ওস্তাদ সাগিরউদ্দিন খাঁ (প্রখ্যাত সারেঙ্গীবাদক)। এঁদের সঙ্গে সঙ্গতে অংশ গ্রহণ করেন গোবিন্দ বসু, রেবন ভট্টাচার্য ও আমীর খাঁ।

দর্শক

ওলিম্পিক সমাচার

১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিক গেমসের চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় রাশিয়া মোট ৯৯টি পদক জয়ের সূত্রে শীর্ষস্থান এবং আমেরিকা মোট ৯৪টি পদক পেয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। রাশিয়া সর্বাধিক ৫০টি স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে। রাশিয়ার এই ৫০টি স্বর্ণ পদক জয় অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে তৃতীয় নজির। ইতিপূর্বে একই বছরে ৫০টি অথবা তার বেশী স্বর্ণ পদক জয়ের নজির আছে মাত্র দুটি—১৯০৪ সালে আমেরিকার ৭০টি স্বর্ণ পদক এবং ১৯০৮ সালে গ্রেট বৃটেনের ৫৬টি স্বর্ণ পদক।

১৯৭২ সালের বিংশতিতম অলিম্পিক গেমসের চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় প্রথম দশটি স্থানের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশই পাঁচটি স্থান এইভাবে পেয়েছে: রাশিয়া ১ম, পূর্ব জার্মাণী ৩য়, পোল্যাণ্ড ৭ম, হাঙ্গেরী ৮ম এবং বুলগেরিয়া ৯ম স্থান। তালিকার প্রথম দশটি দেশের বাকি পাঁচটি দেশ আমেরিকা ২য়, পশ্চিম জার্মাণী ৪র্থ, জাপান ৫ম, অস্ট্রেলিয়া ৬ষ্ঠ এবং হল্যাণ্ড ১০ম স্থান। তালিকার প্রথম দশটি দেশের মধ্যে পাঁচটি সমাজতান্ত্রিক দেশ যেখানে মোট ২৪৩টি পদক পেয়েছে (স্বর্ণ ৮৯, রৌপ্য ৭৮ ও ব্রোঞ্জ ৭৬), সেখানে বাকি পাঁচটি দেশ পেয়েছে মোট ১৯৮টি পদক (স্বর্ণ ৭২, রৌপ্য ৬০ ও ব্রোঞ্জ ৬৬। আরও উল্লেখ্য, যেখানে পাঁচটি সমাজতান্ত্রিক দেশের মোট স্বর্ণ পদক সংখ্যা ৮৯টি, সেখানে বাকি পাঁচটি দেশ পেয়েছে ৭২টি স্বর্ণ পদক।

১৯৭২ সালের অলিম্পিক গেমসে যোগদানকারী ১২২টি দেশের মধ্যে মাত্র ৪৬টি দেশ পদক জয়ী হয়েছে। মোট ৬০১টি পদকের মধ্যে ১১টি সমাজতান্ত্রিক দেশ পেয়েছে মোট ২৮৬টি পদক এবং বাকি ৩৫টি দেশ জয়ী হয়েছে মোট ৩১৫টি পদক। ১৯৭২ সালের অলিম্পিক গেমসে যোগদানকারী ১১টি সমাজতান্ত্রিক দেশ এইভাবে মোট পদক জয়ী হয়েছে: রাশিয়া ৯৯টি, পূর্ব জার্মানী ৬৬টি, হাঙ্গেরী ৩৫টি, পোল্যাণ্ড ২২টি, বুলগেরিয়া ২১টি, রুমানিয়া ১৬টি, কিউবা ৮টি, চেকোশ্লোভাকিয়া ৮টি, যুগোশ্লাভিয়া ৫টি, উত্তর কোরিয়া ৫টি এবং মঙ্গোলিয়া ১টি।

অলিম্পিক পোলভল্টের স্বর্ণ পদক বিজয়ী পূর্ব জার্মানীর উলফগাং নরডুইগের কণ্ঠলগ্ন হয়েছে তাঁর শিশুপুত্র। এখানে উল্লেখ্য, অলিম্পিক গেমসের সূচনা থেকে (১৮৯৬) উপর্যুপরি ১৯ বার আমেরিকা পোলভল্টের স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছিল।

এশিয়ার গৌরব

চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় জাপান মোট ২৯টি পদক জয়ের সূত্রে ৫ম স্থান অধিকার করে এশিয়ার মুখোজ্জ্বল করেছে। এখানে উল্লেখ্য, জাপান ১৯৬৪ সালে মোট ২৯টি এবং ১৯৬৮ সালে মোট ২৫টি পদক জয়ের সূত্রে চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় তৃতীয় স্থান লাভ করেছিল।

১৯৫২ সালে অলিম্পিক গেমসে রাশিয়ার প্রথম যোগদানের সময় থেকেই শীর্ষস্থান নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে রাশিয়ার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে। রাশিয়া ১৯৫২ সালে তার অলিম্পিক গেমসে প্রথম যোগদানের বছরেই আমেরিকার সমান ৪৯৪ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে যুগ্মভাবে বে-সরকারী পয়েন্ট তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করে। পরবর্তী উপর্যুপরি তিনটি অলিম্পিক গেমসে (১৯৫৬, ১৯৬০ ও ১৯৬৪) রাশিয়া প্রথম স্থান এবং আমেরিকা দ্বিতীয় স্থান পায়। ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসে আমেরিকা প্রথম স্থান এবং রাশিয়া দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল। ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিক গেমসে রাশিয়া পুনরায় প্রথম স্থানে উঠে গেছে এবং আমেরিকা দ্বিতীয় স্থানে নেমেছে।

আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল

মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের ১৯৭২ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলাটি দুর্বল খেলা পরিচালনা, দুই দলের খেলোয়াড়দের ফাউল ও বাক-বিতণ্ডা এবং সমর্থকদের রেষারেষির মধ্যে অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হয়েছে। কোন পক্ষেই গোল হয়নি।

বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতার স্কোর বোর্ড

চূড়ান্ত ফলাফল

	ববিস স্প্যাসকি			ববি ফিশার		
খেলা	ঘুঁটি	কত চালে খেলা শেষ	পয়েন্ট	ঘুঁটি	কত চালে খেলা শেষ	পয়েন্ট
১নং	সাদা	৫৬	১	কালো	৫৬	০
২নং	কালো	×	১	সাদা	অনুপস্থিত	০
৩নং	সাদা	৪১	০	কালো	৪১	১
৪নং	কালো	৪৫(ড্র)	½	সাদা	৪৫(ড্র)	½
৫নং	সাদা	২৭	০	কালো	২৭	১
৬নং	কালো	৪১	০	সাদা	৪১	১
৭নং	সাদা	৪৮(ড্র)	½	কালো	৪৮(ড্র)	½
৮নং	কালো	৩৭	০	সাদা	৩৭	১
৯নং	সাদা	২৯(ড্র)	½	কালো	২৯(ড্র)	½
১০নং	কালো	৫৬	০	সাদা	৫৬	১
১১নং	সাদা	৩১	১	কালো	৩১	০
১২নং	কালো	৫৫(ড্র)	½	সাদা	৫৫(ড্র)	½
১৩নং	সাদা	৭৪	০	কালো	৭৪	১
১৪নং	কালো	৪০(ড্র)	½	সাদা	৪০(ড্র)	½
১৫নং	সাদা	৪৩(ড্র)	½	কালো	৪৩(ড্র)	½
১৬নং	কালো	৬০ (ড্র)	½	সাদা	৬০(ড্র)	½
১৭নং	সাদা	৪৫(ড্র)	½	কালো	৪৫(ড্র)	½
১৮নং	কালো	৪৭(ড্র)	½	সাদা	৪৭(ড্র)	½
১৯নং	সাদা	৪০(ড্র)	½	কালো	৪০(ড্র)	½
২০নং	কালো	৪১(ড্র)	½	সাদা	৪১(ড্র)	½
২১নং	সাদা	৪০	০	কালো	৪০	১
		মোট পয়েন্ট	৮½		মোট পয়েন্ট	১২½

সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান ৩—০ গোলে ইন্দোনেশিয়াকে এবং ইস্টবেঙ্গল ২—০ গোলে স্টেট অব সেলাঙ্গর দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। এ বছরের ফাইনাল খেলাটি ছিল মোহনবাগানের ২১তম এবং ইস্টবেঙ্গল দলের ১৯তম আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলা। উভয় দলই ১০-বার করে আই এফ এ শীল্ড জয়ী হয়েছে। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দলের মধ্যে ইতিপূর্বে যে ১০-বার আই এফ এ শীল্ড খেলা হয়েছে তার ফলাফল: ইস্টবেঙ্গলের জয় ৬-বার (১৯৬১ সালে যুগ্ম বিজয়ী), মোহনবাগানের জয় ৩-বার, খেলা পরিত্যক্ত ২-বার।

চূড়ান্ত পদক তালিকা

(প্রথম দশটি দেশ)

দেশ	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
রাশিয়া	৫০	২৭	২২	৯৯
আমেরিকা	৩৩	৩১	৩০	৯৪
পূর্ব জার্মাণী	২০	২৩	২৩	৬৬
পঃ জার্মাণী	১৩	১১	১৬	৪০
জাপান	১৩	৮	৮	২৯
অস্ট্রেলিয়া	৮	৭	২	১৭
পোল্যান্ড	৭	৫	১০	২২
হাঙ্গেরী	৬	১৩	১৬	৩৫
বুলগেরিয়া	৬	১০	৫	২১
ইতালী	৫	৩	১০	১৮

অসাধারণ মার্ক স্পিজ

অসাধারণ ব্যক্তিগত সাফল্যের [illegible] হিসাবে কোন একটি বছরের [illegible] গেমসকে প্রতিযোগীর ব্যক্তিগত বে-সরকারীভাবে উৎসর্গীত করার [illegible] আছে। সেই হিসাবে ১৯৭২ সালের [illegible] অলিম্পিক গেমসকে আমেরিকার [illegible] সাঁতারু মার্ক স্পিজের নামে [illegible] উৎসর্গ করা যায়।

রোল্যান্ড ম্যাথেস (পূঃ জার্মানী) পুরুষদের সাঁতারে ১০০ ও ২০০ মি [illegible] বিজয়ী

রুথ ফুকস (পূঃ জার্মানী) মেয়েদের জাভেলিনে স্বর্ণ পদক

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

আজকালকার ছেলেমেয়েদের মতিগতির নকশা
ইভা ১০
১৪.৯৫-১৯.৯৫
ইভা ৬৪
১৩.৯৫-১৭.৯৫
পিণ্টু ৬১
৭.৯৫-১০.৯৫
ওয়েফাইণ্ডারস ৭০
১৩.৯৫-২১.৯৫
ওয়েফাইণ্ডারস ০৩
১৮.৯৫-২৪.৯৫
নিউ স্প্রিং ৪১
১৫.৯৫-২০.৯৫
সুপারস্টাফ ০৪
২০.৯৫-২৪.৯৫
সানওয়ে ৪১
৯.৯৫-১৪.৯৫
যেমন তরুণ মনের, তেমনি
তরুণ পায়েরও তল পাওয়া ভার।
বাটার কারিগরদের সারা জীবনের
সাধনাই তো এই নিয়ে। বাটার দোকানে
এলে তাঁদের সেই গবেষণা, অনুশীলন
আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল পাবেন
হাতে হাতে। আরামভরা ও টেকসই,
বাহারে ও মানানসই। কাজও দেয়,
আরামও দেয় একই সঙ্গে।
বাড়ন্ত পায়ের দুরন্তপনার সকল
ধকল সইতে পারে এমনভাবেই এই
জুতো তৈরি। ছোটোদের যার যার
নিজের জুতো বেছে নিতে দিন।
Bata

১২শ বর্ষ
২য় খণ্ড

২২ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
ডাক—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday, 29th September 1972 শুক্রবার, ১২ আশ্বিন, ১৩৭৯ .52 Paise

প্রচ্ছদ : শ্রীদিলীপ দাস

এক নজরে

বিশ্বের দারিদ্র্য বাড়ছেই : বিশ্ব ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে ১৯৭২ সালের বিশ্বের যে অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, কোন কোন দেশের জাতীয় উৎপাদন ও ঐশ্বর্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও সমগ্র বিশ্বের গড় দারিদ্র্য অপ্রতিহতভাবেই বেড়ে চলেছে। এমনকি যেসব দেশ উৎপাদন বৃদ্ধি ও বহির্বাণিজ্য সম্প্রসারণে বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার তাদেরও জনগণের একটি বড় অংশের দারিদ্র্যের বোঝা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বে এখন যা খাদ্য উৎপাদন হয় তা সমভাবে বণ্টিত হলেও এ গ্রহের সকল মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব নয়। তার ওপর অর্থনৈতিক অসাম্য ও বণ্টনের অব্যবস্থা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এখন পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক উপবাসের সীমায় বাস করে এবং আর এক-তৃতীয়াংশকে দারিদ্রের পর্যায়েই ফেলা যায়।

মানুষের এই দুর্জয় দারিদ্র্যের জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্টে জন-বিস্ফোরণকেই সর্বাধিক দায়ী করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে উন্নয়ন প্রয়াস কিছুতেই পাল্লা দিয়ে চলতে পারছে না। যেটুকু কাজ হচ্ছে তার সবটাই দুর্নিবারগতিতে এগিয়ে আসা নবাগতদের ভোগে লেগে যাচ্ছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের আশঙ্কা, এই অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন শেষ নেই, সুতরাং দারিদ্র্যও বেড়েই চলবে সারা দুনিয়ায়। ধনবণ্টনে দারুণ অসাম্য, দ্রুতবর্ধিষ্ণু বেকার সমস্যা, অত্যধিক হারে শিশুমৃত্যু, শিক্ষার ক্রমহ্রাসমান হার, অপুষ্টি ও জন-স্বাস্থ্যের ব্যাপক অবনতি—বিশ্ব ব্যাঙ্কের মতে এই হল আজকের পৃথিবীর অর্থনৈতিক চিত্র।

নিরোধের রমরমা কারবার : মানুষের ভাগ্য যত খারাপ হয়—মাদুলি গুরু ইত্যাদির উপর নির্ভরতা তার তত বাড়ে। এও যেন অনেকটা সেইরকম একটা ব্যাপার। দেশের জনসংখ্যা হ্রাসের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না, দশ বছরের ব্যবধানে বারো কোটি লোক বেড়েছে এদেশে। কিন্তু আশ্চর্য বৃদ্ধি ঘটছে জন্ম-নিয়ন্ত্রক ব্যবহারপণ্য—নিরোধ-এর প্রচার ও বিক্রয়। পপুলেশন কাউন্সিল-এর পক্ষ থেকে ডঃ এ কে জৈন কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তাতে দেখা যায় যে, ১৯৬৮ সালে যেখানে নিরোধের মাসিক বিক্রয় ছিল বিশ লক্ষ, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬০ লক্ষ। ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসের তুলনায় ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে নিরোধ বিক্রয় হয়েছে দ্বিগুণের বেশি।

পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে শহরাঞ্চলের শতকরা ৬৫টি দম্পতি কোনরকম জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করে না। সুতরাং শহরাঞ্চলের অধিবাসীরা পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে বিশেষ সচেতন বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে সেটা ঠিক নয়। আরও দেখা গেছে যে, যে শতকরা ২৫.৭ ভাগ দম্পতি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিষয়ে অবহিত তাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১.২ ভাগ দীর্ঘদিন ধরে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করে আসছে এবং শতকরা ২.৫ ভাগ হালে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপায় প্রয়োগ করছে। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে দেশের এত সামান্যসংখ্যক লোক উদ্যোগী হতেই নিরোধের ব্যবসায় এত রমরমা হয়ে উঠেছে। সুতরাং জনগণকে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সম্পর্কে যথার্থ সচেতন করে তুললে, নিরোধ ও জন্মনিয়ন্ত্রণে সহায়ক পণ্যগুলি উৎপাদনের কারখানা যে অনতিবিলম্বে বৃহৎ শিল্পের মর্যাদা লাভ করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

নাম নিয়ে নাকাল : এক মার্কিন মহিলার নাম ও উপাধি বদলের অনুরোধ আদালতে মঞ্জুর হয়েছে। কারণ ঐ নামে তার যে কোন সুবিধা নেই, পরন্তু লোকের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রায় প্রাণান্ত হতে হয়, আদালত তা যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে করেছেন। ভদ্রমহিলার নাম ছিল জুন লুই নিকসন। সেই অপরাধে, অপরিচিত যার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে তারই কৌতূহল নিবৃত্তি করতে তাঁকে বলতে হয়েছে, না, প্রেসিডেন্ট নিকসনের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। নামের জন্য বিশেষ কোন সুযোগ তিনি নিতে চান না আবার নাম নিয়ে নাকালও তাঁর ভাল লাগে না।

আদালতের অনুমোদনক্রমে ভদ্রমহিলার নতুন নাম হয়েছে শ্রীমতী জিন ফ্রান্সিস কার্কপ্যাট্রিক। নতুন নামে ভদ্রমহিলা খুশিই হন কিন্তু পরে তাঁর খেয়াল হয় যে, অজ্ঞাতসারে তিনি আর এক বিভ্রান্তির আশঙ্কা ডেকে এনেছেন। তাঁর নামের তিন আদ্যাক্ষর জে-এফ-কে যে নিকসন-বিজয়ী নিহত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির স্মৃতিবাহী তা তাঁর নব নামে ভূষিত হওয়ার কালে একেবারেই মনে হয়নি।

কোকো দ্বীপের কথা : ভারত মহাসাগরের বুকে পৃথিবীর দূরতম দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত নারকেলকুঞ্জের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কোকো প্রবাল দ্বীপপুঞ্জের কথা বিশ্ববাসীর বিস্তারিত জানার বিশেষ কোন কারণ নেই। কিন্তু হঠাৎ অস্ট্রেলিয়ার রক্ষণাধীন ঐ দ্বীপপুঞ্জটি সেদিন অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টে এক ক্রুদ্ধ বিতর্কের কারণ হয়ে ওঠে এবং তাই থেকে দ্বীপপুঞ্জটির বর্তমান অধিবাসীদের ও তাদের অবস্থার কথা বিশ্ববাসী জানার সুযোগ পায়। দ্বীপপুঞ্জটি ১৮২৫ সাল থেকে এক শ্বেতাঙ্গ রাজপরিবারের শাসনাধীন এবং তাদের প্রজাপুঞ্জ সেখানে প্রায় ক্রীতদাসের জীবনযাপন করে।

উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের সূচনায় ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন র‍্যাফেলস যখন জাভা জয় করেন তখন তাঁর প্রধান সঙ্গী ছিলেন আলেকজান্ডার হেয়ার। তারপর ক্যাপ্টেন র‍্যাফেলস তাঁর সঙ্গী হেয়ারকে বোর্নিওর উপকূলে জলদস্যু দমনের জন্য নিয়োগ করেন, যাতে হেয়ারের ভাগ্য ফিরে যায়। শুধু বিপুল সম্পদই নয়, তাঁর প্রতি অত্যন্ত খুশি বাঞ্জেরমাইসনের সুলতানের কোলতে সযত্নে বাছাইকরা ৩৪টি পলিনেশিয়ান সুন্দরীকেও লাভ করেন তিনি। ৩৪ জন সুন্দরী নিয়ে আলেকজান্ডার হেয়ারের যে হারেমের সূচনা, পরে তা আরও স্ফীত হয় এবং তাঁর হারেম-বাসিনীর সংখ্যা দাঁড়ায় ষাট। হেয়ার প্রথমে জাভায় বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু চুক্তি অনুসারে জাভা ওলন্দাজদের হাতে চলে গেলে হেয়ার তাঁর বিশাল সংসার নিয়ে চলে যান সুমাত্রায়। কিন্তু সুমাত্রার জলবাতাস ভাল না লাগায় পাটিবাটি গুটিয়ে চলে যান সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপে। কিন্তু সেখানেও রাজনৈতিক কারণে বসবাস কঠিন হয়ে পড়ায় হেয়ার ১৮২৫ সালে তাঁর বিশাল হারেম ও সন্তানসন্ততিদের নিয়ে চলে আসেন নির্জন নিঃসঙ্গ শান্ত সুন্দর কোকো দ্বীপপুঞ্জে। ঐ কোকো দ্বীপপুঞ্জে সেই থেকে চলে আসছে ঐ শ্বেতরাজাদের শাসন। দ্বীপের অভিজাত শ্রেণীর সকলেই হেয়ারের বংশধর এবং তাদের অধীনে ঐ দ্বীপের আদিবাসীদের প্রায় ক্রীতদাসের মতো জীবন-যাপন করতে হয়। ঐ ক্রীতদাস ব্যবস্থার অবসানের দাবিতেই সেদিন অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টে বিক্ষোভের ঝড় ওঠে।

—[illegible]

অলক্ষণের সংকেত

সম্প্রতি দিল্লির একটি বড় ইংরেজি দৈনিকের একই দিনের সংখ্যায় একটি সংবাদের শিরোনামে এবং আর একটি সংবাদের মুখবন্ধে যেভাবে কলকাতাকে টেনে আনা হয়েছে সেটা লক্ষণীয়। শিরোনামটি হচ্ছে "আই এন টি ইউ সি-র জঙ্গী মনোভাব বোম্বাইকে কলকাতার পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।" অন্য সংবাদটিতে বলা হয়েছে, "কলকাতার মত পাটনাও এখন মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ঘেরাওয়ের শহর হিসাবে খ্যাতি অর্জন করছে।"

এই দুটি সংবাদের মধ্যেই অলক্ষণের সংকেত রয়েছে। রাজ্যে রাজ্যে রাজনীতির উত্তাপ বাড়ছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ মিছিল, ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের পথে পা বাড়াচ্ছেন। বোম্বাইয়ের পৌরকর্মীদের ধর্মঘট, সিমেন্ট কারখানাগুলির কর্মীদের ধর্মঘট, দক্ষিণ রেলওয়ের লোকো কর্মচারীদের ধর্মঘট, একটার পর একটা এই সব ঘটনা শিল্পে ক্রমবর্ধমান অশান্তির ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে। বোম্বাইয়ের গোদরেজ কারখানার দুই দল শ্রমিকের মধ্যে বিরোধের পরিণতিতে দুজন পুলিশ অফিসারসহ চারজন মারা গেছেন এবং খুনের দায়ে বিধানসভার একজন কংগ্রেস সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তামিলনাড়ুতে ইউনিয়নের রেষারেষির ফলে সিম্পসন গোষ্ঠীর কলকারখানাগুলিতে বলতে গেলে কোন কাজকর্মই হচ্ছে না। ঐ রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা, শিক্ষকরা, কোইম্বাটোরের কাপড়ের কলের শ্রমিকরা, সাত লাখ তাঁতী, ২৪,৫০০ ট্যানারি কর্মচারী প্রভৃতি নিজেদের দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য ধর্মঘটের প্রস্তুতি করছেন।

দীর্ঘ অশান্তির পর কলকাতায় যখন কতকটা শান্তি ফিরে আসছে তখন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তের মানুষ নতুন অশান্তির সম্মুখীন হয়ে নিজেদের প্রশ্ন করছেন, "এবার কি আমরাও কলকাতার পথে চললাম?"

এমনকি, খাস রাজধানী দিল্লিতেও শান্তি নেই। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে দিল্লির দুটি এলাকায় দুটি বড় রকমের হাঙ্গামা হয়ে গেল। পুলিশের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষে একটি বালক মারা গেছে। থানায় হামলা হয়েছে, বাস, লরি, জীপগাড়ি পুড়েছে, দোকানপাট লুট হয়েছে, ডাকঘর, রেলস্টেশন ইত্যাদি আক্রান্ত হয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ শঙ্করদয়াল শর্মা অভিযোগ করেছেন যে, রাজধানীর এই সব হাঙ্গামার পিছনে বিরোধী দলগুলির চক্রান্ত রয়েছে। তিনি বলেছেন যে, যেসব দল মহাজোট বেঁধেছিল এখন তারা আবার একজোট হয়ে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছে। বিরোধী দলগুলির নেতারা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, সরকারের ব্যর্থতার ফলেই জনসাধারণের অসন্তোষ বাড়ছে, বিরোধী দলগুলির চক্রান্তে নয়।

রাজনৈতিক উত্তাপ বৃদ্ধির এই সব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এমন এক সময়ে যখন আমাদের অর্থনৈতিক ব্যাধিরও কতকগুলি লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠছে। শিল্পের উৎপাদনে মন্থরতা দেখা দিচ্ছে, কৃষি উৎপাদনবৃদ্ধির হারও আশানুরূপ নয়, সরকারের ঘাটতি ব্যয় এবং জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। এই দুর্লক্ষণগুলি সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাঁদের সাম্প্রতিক রিপোর্টে সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। উৎপাদন বৃদ্ধির পথে যেসব বাধা আছে সেগুলি দূর করার জন্য, ঘাটতি ব্যয় কমাবার জন্য, শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। এবং এটা যে বিশেষ জরুরি হয়ে উঠেছে বিভিন্ন রাজ্যের খবরের মধ্যে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

আর এস পি'র কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে পশ্চিম বাংলা সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল তাকে কোনো রকমেই অপ্রত্যাশিত বলা চলে না। বামপন্থীদের বিধানসভায় যোগ দেওয়া উচিত, এই কথা বলা সত্ত্বেও আর এস পি যে বিধানসভা বর্জন চালিয়ে যাবে, এই মনোভাবের মধ্যেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

আর এস পি যে পুরোপুরি পাঁচ বছরের জন্যে বিধানসভা বর্জনের পক্ষপাতী নয়, তা তো তারা নির্বাচনের পরেই জানিয়ে দিয়েছিল। ঐ বর্জন ব্যাপারটা অন্তত আর এস পি'র চোখে কোনো মান-অভিমানের বিষয় ছিল না। ওঠা ছিল একটা সাময়িক কৌশল। সেই কৌশলে কোনো ফল হচ্ছে কিনা তা যে মাঝে মাঝেই নতুন করে বিবেচনা করে দেখতে হবে, এ-কথাও আর এস পি বারবারই বলেছে। গত আগস্টে রাজ্য কমিটির বৈঠক বসেছিল ঐ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্যেই। এবং ঐ বৈঠকে নেতারা এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছিলেন যে, জনগণের অভাব-অভিযোগকে প্রকাশ করা এবং সরকার-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে বিধানসভাকে কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর এস পি বিধানসভায় যোগ দিতে ছোটে নি, কারণ দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হওয়ার আগে তা করা সম্ভব ছিল না।

কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকেও এখন রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হল। কোনো রকম ঢাক ঢাক গুড় গুড় না করেই কেন্দ্রীয় কমিটি বলেছে যে পশ্চিম বাংলায় বামপন্থীদের বিধানসভায় যোগদান করা উচিত। অন্যান্য অনেকের মতো আর এস পি'র কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছেও এটা বিসদৃশ লেগেছে যে, বামপন্থীরা শ্রম উপদেষ্টা বোর্ডের মতো নানা সরকারী কমিটিতে যোগ দিচ্ছেন, মন্ত্রীদের সঙ্গে ওঠা-বসা করছেন, অথচ তবু বিধানসভা সম্পর্কে একটা ছুঁৎমার্গ বজায় রেখে চলেছেন। বিধানসভার শক্তিবলেই মন্ত্রীরা রাইটার্স বিল্ডিংসে আসীন হয়েছেন, সুতরাং বিধানসভা সাজানো বা জাল হলে মন্ত্রীদেরও সাজানো বা জাল হওয়া উচিত। অথচ বামপন্থীরা অন্তত আপাতদৃষ্টিতে তা মনে করছেন না। সেই যে সি পি এম নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত কিছু দিন আগে বলেছিলেন, ;আমরা সরকারকে মানি কিন্তু বিধানসভাকে মানি না,' তার মধ্যেও একই ধরনের অসঙ্গতি ছিল।

আর এস পি যে বিধানসভায় যোগ-দেওয়ার পক্ষপাতী তার একটা কারণ এই অসঙ্গতি দূর করা, আর দ্বিতীয় কারণ বিধানসভাকে জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ প্রকাশের একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজে লাগানো। তবে আর এস পি যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তার সব অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছে তা নয়। সেই এপ্রিল মাসেই আর এস পি নেতারা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁদের দলের ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত অনেকটাই নির্ভর করবে কংগ্রেসের মনোভাবের ওপর—অর্থাৎ কংগ্রেস বিরোধী দলগুলিকে কাজকর্ম চালাতে দেবে কিনা তার ওপর। তখন আর এস পি'র পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, কংগ্রেস বিভিন্ন জায়গায় বিরোধী দলের অফিস দখল করে নিচ্ছে অথবা ভেঙ্গে-চুরে দিচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগও তোলা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় কমিটি এখনও মনে করতে পারছেন না যে, কংগ্রেসের মনোভাব বিশেষ পাল্টেছে। কিন্তু তবু যে আর এস পি মনে করছে বামপন্থীদের বিধানসভায় যোগদান করা উচিত তার কারণ দলের নেতাদের মনে এই ধারণা ক্রমেই বাসা বাঁধছে যে, বিধানসভা বর্জনের দ্বারা কোনো কাজের কাজ হচ্ছে না। বামপন্থীদের বাদ দিয়েও দিব্যি বিধানসভার কাজ চলছে, সরকারও চলছে গত ছ মাস ধরে। এদিকে বিধানসভায় ক্রমাগত অনুপস্থিতির দরুণ কংগ্রেস যে বামপন্থী ফ্রন্টের সদস্যদের সদস্যপদ খারিজ করার সুপারিশ করতে চলেছে তাও নয়। সেটা যদি কংগ্রেস করত তবে বামপন্থীদের সংকট অনেক কমে যেত। তার ওপর যতোই সময় যাচ্ছে, নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগের ধারও ততোই কমে আসছে। এই অবস্থায় বিধানসভা বর্জন চালিয়ে যাওয়ার অর্থ কী থাকতে পারে?

আর এস পি'র এই সিদ্ধান্তের পেছনে যতো যুক্তিই থাক না কেন, তবু ঐ দলের পক্ষে এখনই বিধানসভায় যোগ দেওয়া যে সম্ভব হবে না, এটা তো জানা কথাই। কিছু দিন আগে এই প্রসঙ্গ আলোচনার সময় লিখেছিলাম যে, আর এস পি নীতিগতভাবে বিধানসভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলেও এখনই বিধানসভায় যোগ না-দিয়ে অন্যান্য শরিকদের মত পরিবর্তনের আশায় থাকবে বলে মনে হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকেও এই ধরনের সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়েছে। বামপন্থী ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদের বাদ দিয়ে আর এস পি একা বিধানসভায় যাচ্ছে না। তার কারণ, একা আর এস পি কেন, ফ্রন্টের অপর কোনো শরিকের পক্ষেই একা বিধানসভার বয়কট প্রত্যাহার করা কঠিন। সেক্ষেত্রে বামপন্থী ঐক্য ভঙ্গের দায়ে পড়তে হবে সেই শরিককে।

* * *

অবশ্য ফ্রন্টের অন্যান্য শরিককে এই বিধানসভা বর্জনের ব্যাপারে রাজী করানো যে সহজ কাজ তা কিন্তু মোটেই নয়। কারণ রাজনীতিতে যুক্তি দিয়েই সব কাজ হয় না। বিধানসভা বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বামপন্থী ফ্রন্টের মর্যাদার প্রশ্ন। যে-বিধানসভাকে তাঁরা পুরোপুরিই জাল এবং সাজানো বলেছেন সেই বিধানসভায় যোগ দেও মানেই নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তু নেওয়া। যে-অভিযোগ নিয়ে এত হৈ-চৈ ক হয়েছে এখন পরোক্ষে হলেও সেই অভিযো তুলে নেওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। অন্ত এযাবৎ ফ্রন্টের কোনো শরিকই এ-বিষ প্রকাশ্যে তাঁদের মত পরিবর্তন করেন নি

তবে এই প্রসঙ্গে মার্কবাদী কম্যুনি পার্টির পলিট ব্যুরোর সর্বশেষ প্রস্তাবে একটি অংশকে অনেকে তাৎপর্যপূর্ণ ব মনে করছেন। ঐ প্রস্তাবে দেশের মানুষে সাম্প্রতিক আর্থিক দুর্গতির প্রশ্নটি বিশ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। 'জীব ধারণের মানের ওপর এমন আক্রম সাম্প্রতিককালে আর হয় নি বলে পলি ব্যুরো রায় দিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বেড়ে চলে তাতে প্রতিটি গৃহ, প্রতিটি পরিবার ক্ষতি গ্রস্ত। এর ফলে লাখ লাখ পরিবার উপোস, আধা-উপোসে দিন কাটাতে হচ্ছে প্রত্যাশিতভাবেই সি পি এম পলিট ব্যু বলেছে যে, এই সব ঘটনা হল ঘোর অর্থ নৈতিক সংকটেরই প্রকাশ এবং কংগ্রেসে নীতি সেই সংকটকে ঘোরতর করে তুলছে আর এই ক্রমবর্ধমান সংকট সাধার মানুষের অনেক মোহের অবসান ঘটাচ্ছে অথচ এই মোহের বশেই মাত্র কয়েক মা আগে লাখ লাখ লোক কংগ্রেসকে ভো দিয়েছিল। তারা মনে করেছিল যে, বিধা সভায় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে এক চেটিয়া ব্যবসাদার ও বড় জমিদারদে শায়েস্তা করা হবে।

সি পি এমের এই আক্রমণ অবশ্যই প্রত্যাশিত, কারণ দাম যে চড়ছে একথা কেউ অস্বীকার করছে না এবং দ্বিতীয়ত কংগ্রেস যখন ক্ষমতাসীন দল তখন এর জন্যে সব দোষটা কংগ্রেসের ঘাড়ে গিয়েই পড়বে। কিন্তু ঐ যে পলিট ব্যুরোর প্রস্তাবে বলা হয়েছে, মাত্র কয়েক মাস আগে বিধানসভার নির্বাচনে লাখ লাখ লোক কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে, ঐ কথাগুলোকে অনেক মহলে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ মোহের বশে হোক অথবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, লাখ লাখ লোক কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে এই কথা স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে কি পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে যে পশ্চিম বাংলায় নির্বাচনে কারচুপি ছাড়াই কংগ্রেস জিতেছে?

অবশ্য পলিট ব্যুরোর এই মন্তব্য সাধারণভাবে সব রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন সম্পর্কে। কিন্তু গত নির্বাচনে অন্যান্য রাজ্যে কংগ্রেস যে জনগণের ভোটেই জিতেছে, একথা সি পি এম আগেও বলেছে। শুধু পশ্চিম বাংলায় যে জনগণের ভোটে কংগ্রেস জেতে নি সে-কথাও সেই সঙ্গে বলা হয়েছিল। কিন্তু এবারের পলিট ব্যুরোর প্রস্তাবে পশ্চিম বাংলার কথা আলাদাভাবে কিছু বলা হয় নি। সেই থেকে কোনো কোনো মহলে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, সি পি এম হয়ত ক্রমশঃ পশ্চিম
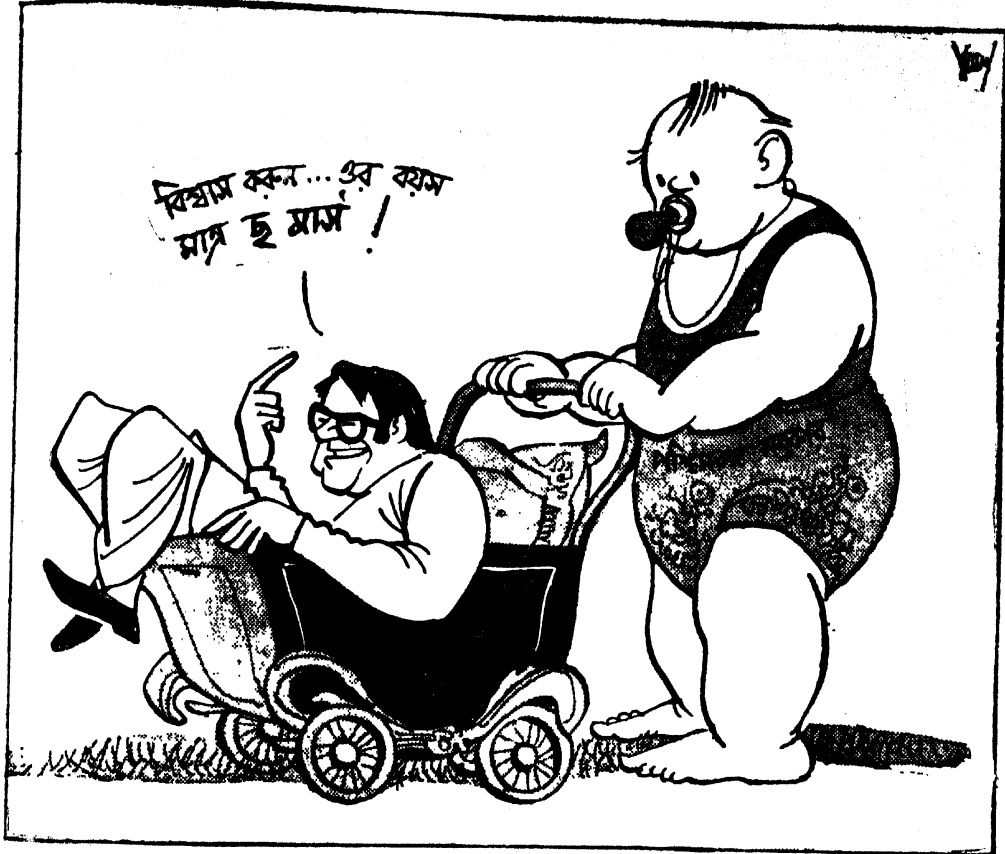
বাংলার নির্বাচনকেও মেনে নেওয়ার পথ প্রশস্ত করছে।

* * *

সি পি এম পলিট ব্যুরোর ঐ প্রস্তাবের মূল কথা ছিল অবশ্য এই দেশব্যাপী আর্থিক দুর্গতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্যে আহ্বান জানানো। কারণ বিভিন্ন গণসংগঠন এবং গণতান্ত্রিক দলের মিলিত আন্দোলন ছাড়া কংগ্রেসের আক্রমণকে রোখা অথবা জনগণের দাবী-দাওয়া আদায় করা সম্ভব বলে সি পি এম মনে করে না। জনসাধারণের গভীর অসন্তোষের ফলে অনেক দমন-পীড়ন সত্ত্বেও দিকে দিকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে ওঠার চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন মার্কসবাদী নেতারা। এই ধরনের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান পার্টির মাদুরাই কংগ্রেস থেকেও জানানো হয়েছিল। সেই আহ্বান যে একেবারে ব্যর্থ হয় নি তার প্রমাণ সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে সি পি এমের মিতালি।

প্রমোদ দাশগুপ্ত আগেই জানিয়েছিলেন যে, পশ্চিম বাংলায় মিলিতভাবে সরকার-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে সি পি এম এবং সমাজতন্ত্রী দল রাজী হয়েছে। পাটনায় দু দলের নেতাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত হয়। তারপর সমাজতন্ত্রী দলের সাধারণ সম্পাদক মধু দন্ডবাতেও এই কথা ঘোষণা করেছেন।

সমাজতন্ত্রী দলের এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দিক দিয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। গত বছর যখন নতুন সমাজতন্ত্রী দলের জন্ম হয় তখন স্থির হয় যে এই দল রাজনীতির ক্ষেত্রে পুরোপুরিই 'একলা চল' নীতি গ্রহণ করবে। তারা বামপন্থী দক্ষিণপন্থী কোনো দলের সঙ্গেই হাত মেলাবে না। কিন্তু এখন মধু দন্ডবাতে যে-নীতি ঘোষণা করলেন তার মধ্যে সমাজতন্ত্রী দলের রাজনৈতিক জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। আর সেই নতুন অধ্যায়ে সমাজতন্ত্রীরা যে মার্কসবাদীদের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী হলেন এটা মার্কসবাদীদের একটা জয় বলা যেতে পারে।

সমাজতন্ত্রীরা কেন যে তাঁদের ঘোষিত নীতি বদল করে সি পি এমের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন তার কারণও অবশ্য দেখান হয়েছে। কংগ্রেস অবশ্যই সমাজতন্ত্রীদের কাছে অস্পৃশ্য। কারণ তাঁরা বলেন, কংগ্রেস হল বুর্জোয়া-আমলা-ধনী চাষী-শাসক গোষ্ঠীর প্রধান হাতিয়ার। তাই কংগ্রেসী শাসনে দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সি পি আইকে আর বামপন্থী দল বলা চলে না, ওরা এখন পুরোপুরিই কংগ্রেসের মিত্র। স্বতন্ত্র পার্টি হল বিত্তমান সমাজের মুখপাত্র। আর জনসঙ্ঘ তো হিন্দু গোঁড়ামির প্রবক্তা। সংগঠন কংগ্রেসের নীতি হল প্রতিক্রিয়াশীল। যদিও ১৯৭২ সালে লোকসভার নির্বাচনে স্বতন্ত্র জনসংঘ আর সংগঠন কংগ্রেসের সঙ্গে মিলেমিশে সমাজতন্ত্রীরা গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্স বা মহাজোট তৈরী করেছিল, এখন ঐ সব দল সম্পর্কে আর কোনো মোহ নেই। বাকী থাকে সি পি এম।

কিন্তু সি পি এম সম্বন্ধেও তো সমাজতন্ত্রীদের এক সময়ে আপত্তি ছিল। এখন সেই আপত্তি নেই কেন? নেই, তার কারণ চীন এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন উভয়কেই সমালোচনা করে সি পি এম যে আদর্শগত স্বাধীনতার পরিচয় দিয়েছে তাতে সমাজতন্ত্রী নেতারা খুশি। দ্বিতীয়ত ভারতের বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নেও সি পি এম তার মত পরিবর্তন করেছে গত মাদুরাই কংগ্রেসে। সুতরাং সি পি এমকে এখন আর বিচ্ছিন্নতাবাদী দল বলা যায় না। সেই জন্যে সি পি এমের সঙ্গে মিলিত সংগ্রামে সমাজতন্ত্রীদের আর আপত্তি নেই।

সমাজতন্ত্রীদের কাছ থেকে এই সার্টিফিকেট পেয়ে সি পি এম নিশ্চয়ই খুশি হবে।

২২।৯।৭২   —নবদত্ত

রামুদা আমার ছেলেবেলার বন্ধু। পনেরো-কুড়ি বছরের বড় হলেও,—বন্ধু। রামুদার কোলেপিঠে চড়ে কত আনন্দ করেছি ছেলেবেলায়। গাঁয়ের চাষী হারাধন মন্ডল আমাদের জমি চাষ করতো। রামুদা সেই হারাধন মন্ডলের একমাত্র ছেলে রামচন্দ্র মন্ডল। সামান্য লেখাপড়া শিখেছিল। সেই স্বল্পবিদ্যাই হলো তার কাল। ওটুকু বিদ্যায় ভদ্র চাকরি মেলে না। আবার ঐ বিদ্যাটুকুর গুমরে লাঙ্গল-বলদ নিয়ে চাষ করতে মাঠেও যেতে চায় না রামুদা। তাই নিয়ে বাপ-বেটায় একদিন দারুণ ঝগড়া। ফলে রামুদা নিরুদ্দেশ। বছর দশেক তার কোনো খবর নেই।

কলেজে পড়ি তখন। পুজোর ছুটিতে বাড়িতে এসেই শুনি—রামুদা দেশে ফিরেছে। আমার আসার খবরও বোধহয় রামুদা কারও কাছ থেকে পেয়েছিল। আমাদের আসা-যাওয়ার মাঝপথে দুজনের দেখা। রামুদা আমাকে দেখামাত্র জড়িয়ে ধরে বললে, 'কত বড় হয়েছ দাদাবাবু।'

রামুদাকে বাড়িতে নিয়ে এলাম।

রামুদা তার দশ বছর প্রবাস-জীবনের ইতিহাস শোনালে। শেষটায় চমকে দিলে : রামুদা, বোম্বাই শহরে ম্যাজিক দেখিয়ে পয়সা রোজগার করতো। স্টেজ খাটিয়ে ম্যাজিক দেখানো নয়—রাস্তার ধারে মাটিতে বসে ম্যাজিক। এই ম্যাজিক দেখিয়েই রামুদার দিন চলে যেত। বললাম, 'আমাদের একদিন ম্যাজিক দেখাও না, রামুদা।'

'একদিন বলছো কি দাদাবাবু? তোমাকে এক্ষুনি আমি একটা ম্যাজিক দেখিয়ে দিচ্ছি।' এই কথা বলে রামুদা পকেট থেকে একজোড়া তাস বের করলে। রামুদাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে, আশপাশের বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিলাম। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে জড়ো হলো।

কলকাতায় আমি রাতের বেলা বড় স্টেজের ওপর অনেক নাম-করা ম্যাজিসিয়ানের খেলা দূর থেকে দেখেছি। কিন্তু এ ম্যাজিক দিনের বেলা। আমাদের চোখের সামনে তাস বের করলো রামুদা। একখানা হরতনের বিবির ওপর স্রেফ হাত বুলিয়ে তাকে হরতনের সাহেব ক'রে দিলে। কেবল তাই নয়—তাস জোড়া আমার হাতে দিয়ে বললে—খুঁজে বের কর তো হরতনের বিবি। আমরা সব তাস আঁতিপাতি ক'রে খুঁজেও হরতনের বিবির নাগাল পেলাম না। রামুদা আমার হাত থেকে নিয়ে সব তাসগুলো উপুড় করে মেলে ধ'রে একজনকে বললে—যে-কোনো একখানা তাস টেনে নাও। সে একখানা টেনে নিতেই দেখা গেল সেই তাসখানা হরতনের বিবি। আমি কলেজে পড়া ছেলে—বুদ্ধিশুদ্ধি একটু হয়েছে বৈ কি? সবই হাতসাফাই-এর ব্যাপার বুঝছি। কিন্তু এত লোকের চোখের সামনে, চারদিকে লোকের ভিড়, তার মধ্যে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে এ ম্যাজিক দেখানো কম হাত-সাফাই-এর কাজ নয়। তাসের আরও কয়েকটি খেলা দেখালে রামুদা। আমরা তাজ্জব বনে গেলাম।

রামুদার ম্যাজিকের খবর চারদিকে রটে গেল। পাশের গাঁয়ের জমিদারবাবুরা একদিন রামুদাকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, —'তুমি ম্যাজিসিয়ান হয়েছো, ফী কত?'

রামুদা বললে—'আজ্ঞে গাঁয়ে আবার ফী।'

জমিদারবাবু বিবেচক ব্যক্তি। বললেন—'গাঁয়ের ডাক্তাররা ফী নেয়, মাষ্টাররা মাইনে নেয়, মজুররা মজুরী নেয়, তুমি নেবে না কেন? বোম্বাই-এ ছিলে শুনলাম। সেখানে কত নিতে?'

'আমার কোনো বাঁধা ফী ছিল না বাবু। কেউ কোনোদিন ডাকতোও না আমাকে। রাস্তার ধারে কোনো একটা জায়গায় ব'সে খেলা দেখাতাম। অনেক লোক জড়ো হতো। সামনে পাতা কাপড়ের ওপর পয়সা, সিকি, আধুলি—কেউ কেউ টাকাও ছুঁড়ে ফেলে দিত। ঘণ্টাখানেক খেলা দেখিয়ে চারপাঁচ টাকা রোজগার হতো।'

জমিদার-বাড়িতে একদিন বিকেলবেলা রামুদার ম্যাজিক। রামুদা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসেছে। জমিদারবাবুরা সামনেই চেয়ারে বসে। বাড়ির ছেলেমেয়েরাও এসেছে। জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারী কয়েকজন এসে রামুদার দু'পাশে দাঁড়িয়েছেন।

সেদিন রামুদা একটা গেরুয়া রং-এর আলখাল্লা পরে এসেছে। ঘাড়ে ঝোলানো কালো কাপড়ের একটা থলে। ঐ থলের মধ্যেই রামুদার খেলার সব সরঞ্জাম।

থলের ভিতর থেকে রামুদা বের করলে বেশ কালো কুচকুচে একটা হুঁকো। তার নলচের উপর একটা কলকে। একটা পেতলের তেপায়ার মাথায় গর্ত-করা জায়গায় কলকে সমেত হুঁকোটিকে বসিয়ে দিলে। থলে থেকে দুটো কাঠের পেয়ালা বের করে রেখে দিলে হুঁকোর কাছেই। বের করলে

এক জোড়া তাস, কতকগুলো কড়ি। দুটো কড়ি বেছে নিয়ে বাকিগুলো থলের মধ্যে ফেলে দিলে।

প্রথমেই আরম্ভ হলো তাসের খেলা। রামুদা তাসজোড়া জমিদারবাবুর হাতে দিয়ে বললো—'দেখুন, তাসের মধ্যে কোনো কারচুপি আছে কি না।'

জমিদারবাবু নিজে দেখলেন। আশপাশের দু'একজন তাসজোড়া চেয়ে নিয়ে তাঁরাও দেখলেন, সন্দেহজনক কোনো কিছুই মিললো না। রামুদা সকলের সম্মুখে তিনখানা তাস বেছে নিল—হরতনের সাহেব, ইস্কাবনের বিবি আর রুইতনের গোলাম। তিনখানি তাস দর্শকদের সামনে মেলে ধরে রামুদা বললে—'এ এক রকম জুয়াখেলা। কিন্তু এ জুয়াখেলায় হারলে আপনাদের কিছুই লোকসান হবে না। যদি জিততে পারেন, তাহলে লোকসান আমার। আপনারা লক্ষ্য রাখবেন রুইতনের গোলামখানার উপর। ঐ রুইতনের গোলামের উপরেই বাজি। ঐ রুইতনের গোলামের উপর যত টাকা বাজি ধরবেন, জিতলে আপনি ডবল পাবেন। নগদ টাকা বাজি ধরতে হবে না—মুখের কথাতেই হবে।' বলে ঐ তাস তিনখানি আবার সকলকে দেখিয়ে, দু-চারবার এ-হাত ও-হাত ক'রে হাত দুখানা এ-দিক ও-দিক ঘুরিয়ে উপুড় ক'রে রেখে দিল মেঝের উপর। তারপর বেশ রসিয়ে রসিয়ে বললে,—'এ একরকম ভাগ্যপরীক্ষা। ধরুন কে কে বাজি ধরতে চান।'

প্রথমেই জমিদারবাবু যে, তাসখানাকে রুইতনের গোলাম ভাবলেন, তারই উপরে হাত দিয়ে বললেন, 'পাঁচ টাকা।' জমিদারের পার্শ্ববর্তী একজন ভদ্রলোক অন্য একখানি তাসের উপর এক টাকা বাজি রাখলেন। আরও দু'তিনজন এক-একখানা বিভিন্ন তাসের উপর বাজি ধরলো এক টাকা ক'রে। রামুদা যেন দারুণ চিন্তায় পড়লো। বললো—'তাইতো বাবু, আপনারা তিনখানা তাসের উপরেই বাজি ধরলেন! কেউ-না-কেউ জিতবেনই। লোকসানটা পোহাতে হবে আমাকেই। এখন আপনারা বেশ করে মনে রাখবেন, কে কোন তাসের উপর বাজি ধরেছিলেন। আমি তাস উলটে দিচ্ছি।'

এই কথা বলে রামুদা উপুড়-করা তাসকে উল্টে চিত করে দিলে। দেখা গেল—ও তিনখানি তাসের একখানিও নেই। তার বদলে রয়েছে হরতন, ইস্কাবন আর রুইতনের টেক্কা।

সমস্ত দর্শক হাততালি দিয়ে রামুদাকে অভিনন্দিত করলে।

দ্বিতীয় খেলা : রামুদা এবারে কাঠের পেয়ালা দুটি তুলে নিয়ে সকলকে দেখিয়ে দিলে শূন্য পেয়ালা, ভিতরে কোনো-কিছু নেই। কেবল পেয়ালাই নয়, তার খালি হাতও সকলকে দেখিয়ে দিলে। তারপর বললে, 'এই দেখুন, আমি প্রত্যেক পেয়ালার মধ্যে একটি করে কড়ি রেখে দিচ্ছি'—ব'লে যেই প্রথম পেয়ালার ভিতর কড়িটি রেখেছে, অমনি একজন তরুণ দর্শক বললে, 'আপনি কড়িটি পেয়ালার মধ্যে রাখেন নি, দুটো কড়িই আপনার হাতের মধ্যে আছে।' রামুদা হাত খুলে দেখিয়ে দিল একটি কড়ি, পেয়ালাটাও তুলে দেখালো অন্য কড়িটি সেখানে রয়েছে। তারপর হাতের কড়িটি অন্য পেয়ালার মধ্যে রেখে শূন্য হাত সকলকে দেখিয়ে দিলে। সেই তরুণ দর্শকটি আবার বলে উঠলো, 'আপনি কড়িটি পেয়ালার মধ্যে রাখেন নি, —থলের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন, আমি দেখেছি। আপনি তুলুন পেয়ালাটি।'

দর্শকদের আদেশ মতো পেয়ালাটি তুলতে হলো। দেখা গেল, সত্যিই শূন্য পেয়ালা। দর্শকটি জয়গৌরবে উৎসাহিত হয়ে বললে—'বাবা, আমি অনেক ম্যাজিসিয়ানের কারচুপি ধরেছি।' রামুদা অপ্রস্তুত ও লজ্জিত ভাব দেখিয়ে বললে, 'বাবু, এ সবই হাতসাফাই-এর কাজ। কিন্তু আপনি আমার কারচুপি ধরতে পারেন নি বাবু। আমি থলের মধ্যে কড়িটি রাখিনি। যেখানে রেখেছিলাম, আপনি দেখতে পান নি। এই দেখুন—' বলে রামুদা প্রথম পেয়ালাটি তুলে দেখিয়ে দিলে, তার মধ্যে দুটো কড়ি।

আবার সমবেত হাততালি।

জমিদারবাবুর পাশেই বসেছিল তাঁর কিশোরী কন্যা। তাকে উদ্দেশ ক'রে রামুদা বললো, 'মা আপনার গলার হার ছড়াটি আমাকে দিতে পারেন? ভাববেন না, ওটি নিয়ে আমি পালাবো। আবার ফিরিয়ে দেবো আপনাকে।'

মেয়েটি তার বাবার দিকে চাইলে। বাবা অনুমতি দিলে পর হার ছড়াটি গলা থেকে খুলে রামুদার হাতে দিলে। রামুদা হার ছড়াটি একটি পেয়ালায় চাপা দিয়ে ঢেকে দিলে। সকলে ভাবলে, ঐ সোনার হার নিয়ে না-জানি কী খেলাই দেখাবে রামুদা। কিন্তু রামুদা থলের ভিতর থেকে বার করলে একটা দেশলাই-এর বাকস। দেশলাই-এর বাকস থেকে সব কাঠিগুলো বার করে সামনের দিকে ছুঁড়ে দিলে। আর সকলকে শুনিয়ে বললে, 'কাঠিগুলো আমি পুষেছি বাবু। ওদের দুবেলা খেতে দিই। আমার পোষমানা কাঠি। যা বলি তাই শোনে।'

এই কথা বলে দেশলাই-এর যে বাক্সটার মধ্যে কাঠিগুলো ছিল, সেটিকে তার কোলের কাছে রেখে ডাকতে লাগলো—'আয়, আয়'। আয় আয় বলে, আর এক-একটি কাঠি নাচতে নাচতে এসে ঢোকে ঐ বাকসটার মধ্যে। মিনিট তিনেকের মধ্যে সব কটি এসে বাকসটি ভরতি করে দিলে।

হাততালি পড়লো আবার।

এর পর রামুদা বললে, 'এবার আমি হুঁকোর খেলা দেখাবো।'

বলে রামুদা সেই তরুণ দর্শকটিকে আহবান করে বললে, 'বাবু আপনি এসে আমার হুঁকোটি পরীক্ষা করুন। দেখুন, এর মধ্যে কোনো রকম কারচুপি আছে কি না। ভদ্রলোক ইতস্ততঃ করছিলেন। জমিদারবাবু বললেন, 'এসো না?' ভদ্রলোকটি এলে পর রামুদা হুঁকোটি হাতে তুলে নিয়ে, নলচের উপর থেকে কলকেটি নামিয়ে ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বললে, দেখুন, নতুন কলকে, একেবারে খালি, ভেতরে কিছুই নেই।' তারপর হুঁকো থেকে নলচেটি খুলে হুঁকোর খোলটা বারবার উচুনীচু করে ভেতরটা দেখিয়ে বললে, 'দেখুন, এটার মধ্যেও কিছু নেই—একেবারে খালি।' ভদ্রলোক তীক্ষ্ন দৃষ্টি দিয়ে সবই দেখলেন। হুঁকোর পরীক্ষা হয়ে গেলে ভদ্রলোক স্বস্থানে ফিরে গেলেন।

রামুদা, হুঁকোয় নলচেটি এঁটে, নলচের উপরে কলকেটি বসিয়ে জমিদারবাবুর দিকে চেয়ে বললে, 'বাবু, আমার বেআদবী মাফ করতে হবে। আমি আপনাদের সামনে এখন তামাক খাবো।'

জমিদারবাবু হাসতে লাগলেন। তারপর রামুদা হুঁকোটা তুলে নিয়ে হুঁকোর ছিদ্র-পথে মুখ লাগালো আর হুঁকোর ভিতরকার জলের ভড় ভড় ডাক সকলে শুনতে পেল যখন, তখন আর বিস্ময়ের অবধি নেই। কী করে এটা সম্ভব হচ্ছে, ভাবতে না ভাবতে, রামুদা যখন হুঁকো থেকে মুখ তুলে বাইরে এক গাল ধোঁয়া ছাড়লো, তখন লোকে স্তম্ভিত। আবার পড়লো হাততালি।

হুঁকোর খেলাটি দেখিয়ে রামুদা তার খেলার সরঞ্জামগুলি একে একে সবই থলের মধ্যে পুরলো: কাঠের পেয়ালা দুটি শুধু কেবল বাকি। জমিদারবাবুর দিকে হাতজোড় করে বললো, 'পেন্নাম হই বাবু। খেলা আমার শেষ।'

জমিদার-কন্যা হঠাৎ বলে উঠলো—'আমার নেকলেস?'

রামুদা লজ্জিত ভাব দেখিয়ে বললে, 'তাইতো মা, আপনার গলার হারের কথা তো ভুলেই গেছি। এই নিন আপনার হার' বলে পেয়ালাটি তুলে দেখে—হার নেই!

রামুদা গর্জে উঠলো—'কে নিলে হার? আমি সকলের সামনে পেয়ালা-ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম। কে নিলে এই হার? আমি এখানকার সকলের পকেট খানাতল্লাশ করবো। নিশ্চয়ই কারও পকেটে আছে।'

রামুদার কথা শুনে যে-যার পকেটে হাত দিয়েছে। সেই তরুণ দর্শকটি তার পকেট থেকে হার বের করে এনে দিল রামুদার হাতে। বললে—এ হার আমার পকেটে কখন পুরলেন, মশায়?'

রামুদা কিন্তু বেশিদিন রইলো না দেশে। ভাই-এর সঙ্গে বনলো না। আবার নিরুদ্দেশ। কিছুদিন পরে আমাদের পাড়ার রাসবিহারী বললে সে দিল্লী যাবার সময় হাওড়া স্টেশনে ট্রেণের কামরার মধ্যে রামুদাকে দেখেছে। সে এক কাণ্ড। থার্ড ক্লাসের থ্রি-টায়ার স্লিপার গাড়ি দাঁড়িয়ে। টিকেট-চেকার উঠলো কামরায়। একে একে প্যাসেঞ্জারদের টিকেট দেখতে দেখতে রামুদার কাছে এসে হাজির। রামুদা টিকেট বার করে দেখাতেই চেকার বলে উঠলো—'এখুনি নেমে যান—গাড়ি ছেড়ে দেবে।'

রামুদা বললে, 'নামবো কি মশায়? দিল্লী যাবো, আর ট্রেণ থেকে নেমে পড়বো? না রে!'

চেকার চটেছে। বললে, 'প্ল্যাটফরম টিকেটে দিল্লী যাওয়া যায় না। নেমে যান।'

রামুদাও চটেছে। পাশের প্যাসেঞ্জারের দিকে চেয়ে বললে, 'দশ দিন আগে টিকিট কিনেছি আর উনি বলেন পেলাটফরম টিকিট। দেখুন তো মশায়, এটা পেলাটফরম টিকিট?'

সহযাত্রীটি টিকেটখানি হাতে নিয়ে রামুদাকে ফিরিয়ে দিয়ে চেকারকে বললে, 'এ তো দিল্লীর টিকেট?'

টিকেটখানা আবার রামুদার হাত থেকে নিয়ে সেই ভদ্রলোকটিকে চেকার বললে, 'ভালো বিপদে পড়া গেল তো। জলজ্যান্ত প্ল্যাটফরম টিকেটখানাকে আপনি বলছেন দিল্লীর টিকেট?

চেকারের হাত থেকে টিকেটখানা নিয়ে রামুদা আরও চার পাঁচজনকে দেখালে। সকলেই বললে—দিল্লীর টিকেট।'

চেকার দেখে প্লাটফরম টিকেট, আবার প্যাসেঞ্জাররা বলে টিকেটখানি দিল্লীর। শেষ পর্যন্ত রাসবিহারী টিকেট-চেকারকে বললে, 'উনি ম্যাজিসিয়ান।' এই কথা শুনে সব প্যাসেঞ্জার ধরে বসলো রামুদাকে। ম্যাজিক দেখাবার জন্যে। টিকেট-চেকার নেমে গেল।

আর রামুদার কোনো সন্ধান পাইনি।

বছর কয়েক পরে। এলাহাবাদে কুম্ভ-মেলায় গেছি। সারাদিন ঘুরেছি। নানান দেশের নানা জাতের তীর্থযাত্রী। নানা রকমের বেশভূষায় নানান জাতের সাধু—আবার একেবারে সম্পূর্ণ ন্যাংটা সাধুর দলও এসেছে। একদিন সকালবেলায় একজন বাঙালী যাত্রীর সঙ্গে আলাপ হলো। তাঁর ইচ্ছা—একজন সিদ্ধ মহাপুরুষের কাছে দীক্ষা নেবেন। কিন্তু দর্শন মাত্র ভক্তির উদ্রেক হয়, এমন সাধুই তিনি খুঁজছেন। এপর্যন্ত মাত্র একজন সাধুর অলৌকিক শক্তি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। দর্শকদের অন্তর তিনি যেন দেখতে পান। কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো উত্তর নেই। অথচ তিনি মৌনীও নন। আসনে বসে আছেন—সৌম্য শান্ত মূর্তি। শরণার্থীরা গেলে, কে কোন প্রকৃতির লোক বুঝে তিনি কাউকে দেন ফুল, কাউকে তুলসী, কাউকে বেলপাতা, কাউকে বা একটি হরিতকী। ও-সব বস্তু কিন্তু তাঁর কাছে থাকে না। খালি হাত শূন্যে একটুখানি তুলে যখন কোনো ভক্তের হাতে দিলেন, তখন দেখা গেল একটি ফুল। এ যেন আকাশ-কুসুম। আকাশের বাগান থেকে তুললেন যেন। ভদ্রলোক আমাকে বললেন, কিছুদূরে এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবেন একটি ছাউনির গায়ে লেখা—সিদ্ধাশ্রম। সাধুর নাম পরমানন্দ বাবা। এখুনি যান। সকালবেলায় ভিড় হয় না।

মিনিট পাঁচেক পথ এগিয়ে যেতেই পেলাম সিদ্ধাশ্রম। সাধুজির দীর্ঘ কেশ, দীর্ঘ শ্মশ্রু ও সুপ্রশস্ত গুম্ফ এবং স্নেহ-ভরা দৃষ্টি দেখে আকৃষ্ট হলাম বৈ কি?

আমার পূর্ববর্তী চার-পাঁচজন ভক্ত তাঁকে প্রণাম করতে উদ্যত হতেই তিনি হাত তুলে ইঙ্গিতে বারণ করলেন। ঐ হাত তোলা অবস্থাতেই ডান হাত ঈষৎ চালনা করে আশীর্বাদী বস্তুগুলি একে একে সকলের হাতে দিলেন। ভক্তদের বসবার জায়গা একটু দূরে। তারা সেইখানে গিয়ে বসছে। সকলের শেষে আমি তাঁর কাছে যেতেই তিনি একটি গোলাপ ফুল আমার হাতে দিয়ে অতি মৃদু স্বরে বললেন—'চলে যেয়ো না। কথা আছে।'

আমিও ভক্তদের কাছে গিয়ে বসলাম। মনের মধ্যে কেবল ধ্বনিত হচ্ছে—চলে যেয়ো না। কথা আছে। কী কথা বলবেন সাধু আমাকে? কথা কয়টি কিছুতেই মন থেকে সরতে চায় না। পাশের ছাউনি থেকে বেলা নটা বাজার সঙ্কেত এলো। সাধু আসন থেকে উঠে পড়লেন। ভক্তরাও চলে গেল। সাধুজি স্বয়ং ছাউনিতে ঢোকার দরজাটি ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে আমার কাছে এসে বললেন—আমাকে চিনতে পারো নি। আমি কিন্তু তোমাকে দেখা মাত্র চিনেছি দাদাবাবু।'

'রামুদা!'

উদ্বাস্তু ॥

শামসুর রাহমান

আমি কি কখনো জানতুম এত দ্রুত
শহরের চেনা দৃশ্যাবলী লুপ্ত হয়ে যাবে? একটি রাত্তিরে
আমার সারাটা মাথা বিষম রুপালি হয়ে যাবে?
কেমন বদলে গেছি অতি দ্রুত নিজেরই অজ্ঞাতে।

আমার চৌদিকে দরদালান কেবলি যাচ্ছে ধ্বসে,
আমার সম্মুখে এবং পেছনে
দেয়াল পড়ছে ভেঙে একে একে, যেন
মাতাল জুয়াড়ী কেউ নিপুণ খেলায়
হাতের প্রতিটি তাশ দিচ্ছে ছুঁড়ে। আমি
শুধো ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে হাঁটি
করাল বেলায়। জনসাধারণ ছিন্ন
মালার মুক্তোর মতো বিক্ষিপ্ত চৌদিকে।
সমস্ত শহর আজ ভয়াবহ শবাগার এক। কোনোমতে
দম নিই দমবন্ধ ঘরে। জমে না কোথাও আড্ডা,
রেস্তোরাঁ বিজন। গ্রন্থে নেই মন, আপাতত জ্ঞানার্জন বড়ো
অপ্রয়োজনীয় ঠেকে। দম ছেড়ে পথে

পা বাড়াতে ভয় পাই। যেদিকেই যাই,
ডাইনে অথবা বাঁয়ে, বিষম স্বদেশে বিদেশীরা
ঘোরে রাজবেশে। রেস্তোরাঁয়, পার্কে অলিতে গলিতে
শহরতলীতে শুধু ভিনদেশী ভাষা যাচ্ছে শোনা।
বস্তুত বিষম এ শহরে হত্যাময় এ শহরে

স্বদেশীর চেয়ে বিদেশীর সংখ্যা বেশী। নাগরিক
অধিকারহীন পথ হাঁটি ঘাড় নিচু, ঘাড়ে মাথা
আছে কিনা নেই বোঝা দায়। এই মাথার ওপর
আততায়ী, শাসক সবার
আছে পাকাপোক্ত অধিকার। কেবল আমারই নেই।

বাঁচিও যাই নি পরবাসে, তবু আমি
বিষম উদ্বাস্তু একজন। ক্লান্ত মনে ধরে ঘুণ, শুধু ঘুণ

চালচিত্র ॥

বিজয়কুমার দত্ত

কথার অজস্র টানাপোড়েনের সূক্ষ্ম-বিনিময়ে
ঢের দিন গেছে মুখোমুখী—
এখন সর্বত্র আলো আঁধার আভাসে
একান্ত অস্তিত্ব নিয়ে বালক সুলভ
শুধু খেলা আপন স্বপনে,
কেউ যে বুকের মধ্যে বাঁধা নেই, কাকে
ডেকে বলি, মস্তিষ্কক্ষরণে এত রক্ত ঝরে যায়
যতবার বেলা পড়ে আসে—
রৌদ্র নিভে এলে শুধু মনে পড়ে, তখনি তোমাকে!

অথচ কোথাও কোন মমতার গাঢ় উচ্চারণ
ছিল না প্রার্থনা—
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পথ পেরিয়ে আবার
যেখানেই থেমে যেতে চাওয়া,
সে কি শেষ? অথবা শুধুই
পরিচিত পুরনো ঘটনা?

সময়ের স্বচ্ছ ক্যানভাসে
একদা চিত্রিত ছিল, অস্থির চাহনি যেন কার—
আজ তারই ভাঙা ফ্রেম জুড়ে আছে, বুকের আঁধার!

নিস্তরঙ্গ পথে ॥

অরুণ চক্রবর্তী

নিস্তরঙ্গ পথে হেঁটে হেঁটে
আমি যখন হয়রান
কালো গম্ভীর মেঘে দুধারের
সবুজ বন অন্ধকার।
বার বার মেঘের গর্জন শুনে
ভয়ে দাঁড়িয়েছিলাম
গাছের পায়ের কাছে।
গাছ ও পাতারা যেন শতাব্দীর পাথর, অনড়,
অবশেষে বৃষ্টি এলো,
আমি তখন সবুজে গা মিশিয়ে
বাড়ীর পথে।

চোখের জল ও রবীন্দ্রনাথ

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ, রাত্রির গাঢ় অন্ধকার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীকে সম্পূর্ণ ভাবে ঢেকে রেখেছে। সমস্ত বাড়ীটাই একেবারে নিশ্চুপ। শুধু তেতলার অন্তঃপুরের ঘরটিতে কয়েকটি মানুষের নিঃশব্দ আনাগোনা।

রাত গড়িয়ে চলে। বাড়ীর ছোট ছেলে-মেয়েরা দোতলার ঘরে ঘুমিয়ে—ঘরের কোণে মিটমিট করে জ্বলছে রেড়ির তেলের এক প্রদীপের বাতি।

শেষ রাত্রির দিকে বাড়ীর নিটুট নিস্তব্ধতা গেল ভেঙে। বাড়ীর অনেক-কালের পুরনো ঝি প্যারী বুড়ী ছোটদের ঘরে এক দৌড়ে ঢুকে তীক্ষ্ম স্বরে চীৎকার করে উঠল, 'ওরে তোদের কি সর্বনাশ হল রে।'

ছোটরা সেই আকস্মিক চীৎকারে বড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে।

কি হল? কি হল? বালক রবি সেই ঘোর অন্ধকার ঘরে স্তম্ভিত হৃদয়ে চিন্তা করতে থাকে—ব্যাপারটা কি? কিন্তু ভেবে তার কূলকিনারা কিছু পায় না। নিদ্রাচ্ছন্ন চোখ এবং মস্তিষ্ক সবই যেন ঝাপসা হয়ে আসে।

এমন সময়ে ঘরে প্রবেশ করেন নতুন বৌঠান, কাদম্বরী দেবী। তিনিও তখন ছেলেমানুষ, রবির চেয়ে মাত্র দু বছরের বড়। কিন্তু এই ষোল বছরের শান্ত স্নিগ্ধ লাবণ্যময়ী বালিকা বধূটির প্রচন্ড ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা করার সাধ্য কারো ছিল না।

তিনি প্যারী বুড়ীকে ধমক দিয়ে হাত ধরে টেনে ঘরের বাইরে নিয়ে গেলেন তৎক্ষণাৎ।

বউঠাকরাণী বুঝতে পেরেছিলেন গভীর রাত্রিতে নিদ্রাচ্ছন্ন বালকদের অবশ মস্তিষ্কে প্যারী বুড়ির এই উৎকট চীৎকার দারুণ প্রভাব ফেলতে পারে।

প্যারী বুড়িকে নিয়ে বউঠাকুরানী বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘর আবার নিস্তব্ধ। দেওয়ালে শুধু রেড়ির তেলের প্রদীপের শিখা রহস্যময় কম্পিত সব ছায়ার সৃষ্টি করে চলে। বালক রবি আরও কিছুক্ষণ বিছানায় চুপ করে বসে থেকে আবার শুয়ে পড়ে। গভীর ঘুম ঘনিয়ে আসে তার চোখের পাতায়।

পরের দিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে রবি শুনতে পায় তার মা'র মৃত্যুসংবাদ। বাইরের বারান্দায় এসে দেখতে পায় অজস্র ফুল ও চন্দনে ভূষিতা মা সারদা দেবী খাটে শুয়ে আছেন, মুখে প্রশান্তি—ব্যাধির মালিনা তাঁকে একটুও ছুঁতে পারে নি।

১৪ বছরের বালক রবির জীবনে এই প্রথম মৃত্যুশোক। কিন্তু কই, মনের গভীরে
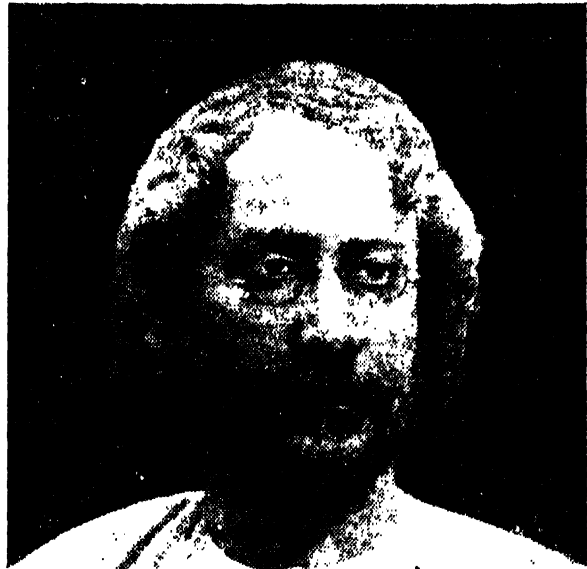
১৯০৭ খৃঃ গৃহীত ছবি। মৃত্যু কালোছায়া পড়েছে তখন তাঁর পরিবারে। ১৮৯৯ খৃঃ মারা গেছেন ভাইপো বলেন্দ্রনাথ, ১৯০২ খৃঃ মারা গেছেন স্ত্রী মৃণালিনী দেবী, ১৯০০ খৃঃ মারা গেছে মেজমেয়ে রেণুকা, ১৯০৫ খৃঃ মারা গেছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ১৯০৭ খৃঃ ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথ মারা যায়।

বেদনায় ঝংকার তো তেমন বাজল না। মাকে কখনও খুব কাছে পায়নি বালক রবি, তাই মায়ের অভাব তার মনে তেমন সাড়া জাগাবে কি করে?

সেই দুঃখের দিনে কাঁদে নি একটুও—একটুও না। শুধু শববাহকের দল যখন মায়ের খাট কাঁধে নিয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ীর সদর দরজা পার হয়ে শ্মশানের দিকে রওনা হল, তখন তাদের পিছু পিছু চলতে চলতে কিছুক্ষণের জন্য বালক রবির মন একটা কথা চিন্তা করে হাহাকারে আচ্ছন্ন হয়েছিল। মা এই যে বাড়ীর দরজা দিয়ে বের হয়ে এলেন এই তো তাঁর শেষ যাত্রা—তাঁর সাধের সংসারের ঘরকন্নার কাজে আর ফিরে আসবেন না কোন দিন। দাহকার্য শেষ হতে হতে অনেক বেলা হল। রবি শ্মশানঘাট থেকে ফিরে আসে দুপুর প্রায় দুটো নাগাদ। গলির মোড় থেকে তাদের বাড়ীর তেতলার ঘর ও তার সামনের বারান্দাটা স্পষ্ট দেখা যায়। ঐ ঘরেই থাকেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। রবি গলির মোড় থেকেই দেখতে পায় মহর্ষি বারান্দায় স্থির হয়ে একাগ্রচিত্তে উপাসনারত। পিতৃদেবের সেই অকম্পিত হিমালয়ের মত মূর্তিটি রবি মনে রেখেছে চিরদিন। পরবর্তীকালে তরুণ রবি তাঁর চাদরের খুঁটে একমুঠো বেলফুলের কুঁড়ি বেঁধে কতদিন বাড়ীর ছাদে বা বাগানে উদ্দেশ্যবিহীন খ্যাপার মত ঘুরেছেন, সেটা ছিল তাঁর কবি চিত্তের উন্মেষের সময়। আশ্চর্যের কথা সেই শুভ্র বেল কুঁড়িগুলির দিকে তাকিয়ে কখনো মায়ের কথা মনে পড়েছে—মায়ের আঙুলগুলিও ছিল এমনি শুভ্র, এমনি সুচিক্কণ।

মাতৃহীন বালককে বুকের কাছটিতে টেনে নিলেন দুজন—নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং বৌঠান কাদম্বরী দেবী। রবির জীবনে এঁরা এলেন ধ্রুবতারার মত। বস্তুতপক্ষে রবির দীর্ঘজীবনের সবচেয়ে সুখের সময় কেটেছে এঁদের আশ্রয়েই। অপর্যাপ্ত স্নেহ ভালবাসায় ভরা এই স্বপ্নের মত দিনগুলিকে রবীন্দ্রনাথ ভুলে যান নি কখনও!

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে তখন সাহিত্য ও সংগীতের জোয়ার এসেছে। কিশোর রবিকে সেই সাহিত্য ও সংগীতের মহোৎসবে সাদরে সামিল করে নিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

অত্যন্ত দ্রুত বাংলা লেখার ক্ষমতা কিশোর রবির আয়ত্ত ছিল শুরু থেকেই। নতুন বৌঠান ছিলেন কিশোর রবির সাহিত্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণার সবচেয়ে বড় উৎস। তাঁর উজ্জ্বল মুখের প্রসন্ন হাসিটি রবিকে একটুও থামতে দেয় নি। দ্রুত কলমে রবি লিখেছে একটির পর একটি কাব্যগ্রন্থ। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেষ্টায় 'ভারতী' মাসিক পত্রের আবির্ভাবের ফলে রবির গদ্য রচনারও সূত্রপাত হয়। নতুন বৌঠান কিশোরের রচনার মধ্যেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আলোর মশাল! কিশোর রবিকে তাই সব রকম হতাশা ও বেদনার বাইরে আড়াল করে রেখেছিলেন নিবিড় স্নেহে।

এক দিনের কথা রবির মনে গাঁথা হয়ে গেছে। জ্যোতিদাদা মধ্যে মধ্যে হাওয়া বদলাতে জোড়াসাঁকোর বাড়ী ছেড়ে গঙ্গার ধারে কোন বাগানবাড়ীতে কিছু দিন কাটিয়ে যেতেন। তাঁর সঙ্গে থাকতেন মাত্র দুজন। কাদম্বরী দেবী ও কিশোর রবি।

গঙ্গার দু-ধারে তখনো কলকারখানার আবির্ভাব হয়নি, প্রকৃতি দেবীর আসন ছিল পাতা। সেবার বর্ষায় ছোট্ট একটি দোতলা বাড়ীতে এলেন তাঁরা। বর্ষার সেকি অসামান্য রূপ। গঙ্গার জলে গেরুয়া রংয়ের ঢল নেমেছে। ওপারে বনের মাথায় কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে মেঘের ছায়া।

কিশোর রবির মনে গুঞ্জরিত হল বিদ্যাপতির সেই বিখ্যাত পদটি,

এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর।

পদটিতে সুর সংযোগ করে গানে রূপান্তরিত করে নেয় সে। বৌঠান কি একটা কাজে বাইরে গিয়েছিলেন সকালবেলা, ফিরে আসতেই সেই গানটি রবি শুনিয়ে দেয় তাঁকে। ঝমঝম করে তখন বৃষ্টি নেমেছে, হু হু করে বইছে ঝোড়ো হাওয়া, কূলে-কূলে ভরা গঙ্গার ঢেউয়ের শব্দ একটু কান পাতলেই শোনা যায়। রবির সেই প্রথম বর্ষা সঙ্গীতটি এমন পরিবেশেই শুনলেন বৌঠান, একাগ্রচিত্তে গানটি শুনলেন তিনি তারপর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

ভাল লাগল কি খারাপ লাগল সে সম্বন্ধে একটি কথাও বললেন না, কিন্তু সম্ভবত কিছু না বলার মধ্যেই তাঁর সব কথা বলা হয়ে গিয়েছিল।

বৌঠানের এই অনুচ্চারিত উৎসাহকে উপলব্ধি করতে কিশোর রবির ভুল হয় নি। বর্ষা সংগীতের সেই হল শুরু। —'গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনে করা এই বাদল-দিনটি আজও রয়ে গেছে আমার বর্ষাগানের সিন্দুকটাতে।'

তরুণ রবি ২৩ বছর বয়সের মধ্যেই ১৩ খানি গ্রন্থ রচনা করেন, সেগুলি হল—কবিকাহিনী, বনফুল, ভগ্ন হৃদয়, রুদ্রচণ্ড, য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র, সন্ধ্যা সঙ্গীত, কালমৃগয়া, বউ ঠাকুরাণীর হাট, প্রভাত সঙ্গীত, বিবিধ প্রসঙ্গ, ছবি ও গান, প্রকৃতির প্রতিশোধ এবং ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী।

এর মধ্যে কবি কাহিনী, বনফুল, সন্ধ্যা-সঙ্গীত কালমৃগয়া ও বিবিধ প্রসঙ্গ কাউকেই উৎসর্গ করেন নি তরুণ রবি।

বাকি আটখানি গ্রন্থের ৪টি কাদম্বরী দেবীকে, ৩টি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন তিনি।

১২৯০ বংগাব্দের ২৪ অগ্রহায়ণে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয় মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে বইছে নিরন্তর আনন্দের স্রোত। মাত্র কয়েক মাস পরেই অজ্ঞের কারণে আত্মহত্যা করলেন বৌঠান কাদম্বরী দেবী। সেদিনটা ১২৯১ বংগাব্দের ৮ই বৈশাখ (১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৯ এপ্রিল)। বৌঠানের বয়স তখন মাত্র পঁচিশ বছর।

সুখের হাট গেল ভেঙ্গে, ঠাকুর পরিবারে আনন্দের প্রভাতেই নেমে এল অন্ধকার। সোনালী তবক দেওয়া স্বপ্নময় দিনগুলি মিলিয়ে গেল সকলের জীবন থেকে। তরুণ রবির হৃদয় এই প্রচণ্ড আঘাতে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। মৃত্যুশোক এই প্রথম স্পর্শ করল তাঁকে—শুধু স্পর্শই নয়, তীক্ষ্ণধার তরোয়াল তাঁর হৃদয়ে প্রোথিত হল অত্যন্ত গভীরভাবে—মৃত্যুকে চিনলেন, জানলেন। এই প্রসঙ্গে অনেক বছর পরে তিনি বলেছেন, 'আমার ২৪ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদ শোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশু বয়সের লঘুজীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়, কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুকে পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।......চারিদিকে গাছপালা, মাটি জল, চন্দ্র সূর্য, গ্রহতারা তেমনিই নিশ্চিত সত্যেরই মতো বিরাজ করিতেছে, অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মতো যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল, এমন কি, দেহ-প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহক তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমেষে স্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল, তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, একি অদ্ভুত আত্মখণ্ডন। যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনমতে মিল করিব কেমন করিয়া।'

বেশ কিছু দিন স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পথ থেকে অনেকটাই দূরে সরে গেলেন তরুণ রবি। রাত্তিরে ঘুমোন না—অন্ধকার ছাদে ঘুরে বেড়ান একা একা, কখনো বা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন রাতের অন্ধকারে। ভোরবেলার দিকে ঘুম এলে যেখানে সেখানে শুয়ে থাকেন। এমন কি প্রবল বর্ষা ও দারুণ শীতেও তিন তলার খোলা বারান্দায় রাতের পর রাত কাটাতে কিছুমাত্র অসুবিধে অনুভব করেন নি। কতদিন তো এমন হয়েছে, প্রবল বর্ষা তাঁর দেহের ওপর দিয়েই বয়ে গেছে, কিন্তু তবু—তাঁর ভ্রূক্ষেপ কোথায়! খাওয়া একদম কমিয়ে দিয়েছিলেন। কোন কোন দিন তো একেবারেই কিছু খেতেন না। আমিষ খাবার বর্জন করেছিলেন একেবারেই। সামাজিকতার ঠাট বজায় রাখা এবং সাজপোশাকের দিকেও এসময় তাঁর নিদারুণ উপেক্ষার ভাব দেখা গেল। কত দিনই তো খালি গায়ে যেমন তেমন একখানি মোটা চাদর জড়িয়ে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় একলা হেঁটে ফিরেছেন।

কিন্তু ক্রমেই তরুণ রবির জীবন থেকে এই অশ্রুসিক্ত দিনগুলি বিদায় নিল। অশ্রুর বহিঃপ্রকাশ বন্ধ হয়ে তা জমাট বাঁধল রবির অন্তরে।

নতুন সাহিত্য ও সংগীত সৃষ্টির কাজে আবার এগিয়ে এলেন তিনি। একটির পর

হায়রে কপাল, হায়রে অর্থ,
যার নাই, তার সবই ব্যর্থ!!
ইত্যাদি ইত্যাদি

কাব্যবিশারদের কলমটি ছিল অত্যন্ত জোরালো। তরুণ রবি এ প্রচণ্ড আঘাতে বেদনায় একেবারে বিহ্বল হয়ে গেলেন। কিন্তু কি অসামান্যই না তাঁর ভদ্রতা বোধ। সেযুগের প্রধানতম্বী সাময়িকপত্র পত্রিকায় 'কাঁধর লড়াই ও খেউড়ে' না নেমে প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মসংবরণ করে রইলেন তিনি।

চতুর্দিকে যখন একরকম প্রচণ্ড অশালীন আক্রমণের ঝড় উঠেছে তখন কি অসহ্য মনোবেদনায় হৃদয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন তরুণ রবি সেকথা আজ আমরা উপলব্ধি করতে পারি। হৃদয়ের শব্দহীন কান্না আজও আমাদের কানে অনুরণিত হয়।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের একটি বিশেষ গুণ ছিল (?) যে, তিনি একলাই রবীন্দ্রনাথকে গালাগাল দিয়ে তৃপ্ত হতেন না, তাঁর বহুল প্রচারিত পত্রিকা, মাসিক পত্রে অন্যান্য রবীন্দ্র-বিদ্বেষীদের লেখা ছাপাতেন।

কি সেসব লেখা। বলে আর কাজ নেই। না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু, ঈর্ষায় বিষে জর্জরিত কতগুলো লোকের কুৎসিত প্রলাপ। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ('সাহিত্য' দশম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩০৬—বৈশাখ) হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ 'প্রণয়ের পরিণাম' নামে একটি গল্প লিখলেন। গল্পটিতে তরুণ রবিকে সরাসরি আক্রমণ করা হয়েছিল আগা-গোড়াই।

গল্পটির প্রথম লাইনটি আরম্ভ করা হয়েছিল এই রকম, 'বড় ঘরের ছোট ছেলে, বিশেষ অল্প বয়সে মাতৃহীন।'

দীর্ঘ গল্পটির শেষ লাইনটিতে পর্যন্ত রবীন্দ্র চরিত্রের ওপর অতি তীব্র কটাক্ষ।

রবীন্দ্রনাথ গল্পটি পড়েননি, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের মুখে গল্পটির বিষয়বস্তুটি শুনে একেবারে স্তম্ভিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি সকলেই এ জঘন্য গল্পটি পড়ে মর্মাহত হলেন।

এইবার রবীন্দ্রনাথের সহ্যের বাঁধ ভাঙল, অভিন্ন হৃদয় বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে (যিনি সেযুগের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক বলে পরিগণিত হতেন) আহ্বান জানালেন এ আক্রমণের পাল্টা প্রতি আক্রমণে।

চিঠিটি হল এই,

২১ জুন, ১৮৯৯

ভাই,

ক্ষুব্ধ আত্মীয়দের পত্রে সংবাদ পাইলাম যে, 'সাহিত্যের' কোন গল্পে আমাকে অত্যন্ত কুৎসিত আক্রমণ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যদি তোমার কোন বন্ধু-কৃত্য করিবার থাকে তো করিবে।

তোমার রবি।

বন্ধুতে অসুবিধে হয় না বেদনার বিহ্বল রবীন্দ্রনাথ সেদিন চোখের জলে আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে খুঁজে ফিরছিলেন সমব্যথী অন্তরের বন্ধুকে, যিনি এ প্রবল আঘাতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন তাঁরই পাশে।

আনন্দের কথা, প্রিয়নাথ সেন তাঁর প্রিয়তম বন্ধুর এই অশ্রুসজল মুহূর্তে এগিয়ে এলেন। রবীন্দ্রনাথকে সমবেদনা জানিয়ে একটি অত্যন্ত আন্তরিক চিঠিতে আগেই লিখেছিলেন, এবার সমাজপতি মহাশয় ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে পাল্টা আক্রমণ করতে একটি দুর্দান্ত, গায়ে জ্বালা ধরানো প্রবন্ধ চিঠির আকারে লিখতে শুরু করে দিলেন অবিলম্বেই।

ভাবতে কি অবাকই না লাগে ৩৮ বছরের নবীন রবি কি অসামান্য একক প্রচেষ্টায় বেদনার এই অগ্নিপরীক্ষা সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের কলুষতা এই মহাপুরুষকে স্পর্শও করতে পারল না। অশ্রু গেল মুছে, তার বদলে জেগে উঠল সত্য শিব সুন্দরের কঠোর প্রতিজ্ঞা।

মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানেই প্রিয়নাথ সেনের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের দুটি অসামান্য চিঠি এযুগের পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করছি।

পৃথিবীর পত্র সাহিত্যের ইতিহাসে এমন দুটি পত্রের তুলনা আছে কিনা জানিনে।

২৯ জুন, ১৮৯৯

ভাই,

আমি সাহিত্য পড়ি নাই, কিন্তু তুমি যে নিন্দুক লেখকের প্রতি এতটা ঘৃণা অনুভব করিয়াছ তাহাতে আমি সান্ত্বনা পাইলাম। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু লেখকের কাপুরুষতার প্রতি ঘৃণা এবং আমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া একখানি সুন্দর পত্র লিখিয়াছেন, তোমার এবং তাঁহার এই পত্রে আমি মনের মধ্যে বিশেষ বল লাভ করিয়াছি।

ইতি—
তোমার রবি।

দ্বিতীয় পত্রটি এল এর ৭ দিন পরে।

২রা জুলাই ১৮৯৯
শিলাইদহ

ভাই,

তুমি সাহিত্য সম্পাদকের উদ্দেশ্যে যে পত্রখানি রচনা করিয়াছ—আমি তাহার সম্বন্ধে কি আর বলিব। তুমি তোমার অন্তরের আক্ষেপ যেরূপে আবেগের সহিত ব্যক্ত করিয়াছ তাহার মধ্যে বন্ধুবাৎসল্য ও কর্তব্য-বোধ দুই-ই ব্যথিতভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—সেই উদার বন্ধু-প্রীতিটি আমি আমার অংশ বলিয়া প্রেমানন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম, বাকিটা সম্পাদকের হস্তে এবং সেই সঙ্গে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা সংগত হইতেছে কিনা বিচার্য। অবশ্য প্রাইভেট ভাবে সম্পাদকের নিকট গেলে ক্ষতি দেখি না কিন্তু ইহা লইয়া কাগজে-পত্রে বিচার বিতর্ক উত্থাপিত করিতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না। এই সকল কথার প্রকাশ্য আলোচনায় এমন একটি অসম্ভ্রম আছে যে তাহা সহ্য করিতে নিতান্ত সংকোচ বোধ হয়।—ও দূরে করিয়া ফেলিয়া দাও।

যেমন করিয়া মাছি তাড়াইয়া দিতে হয়, তেমনি করিয়া বামহস্তের একটা আঘাতে মন থেকে ওটাকে অপসৃত করিয়া দিলেই ঠিক হয়।

'সকলেরি আছে অবসান—
শুকায় সমুদ্র জল, নিভে যায় দাবানল—'
আর নিন্দুকের মিথ্যা বাক্যের দাহই কি চিরকাল থাকিবে!

তোমার রবি।

এই বছরই রবীন্দ্রনাথের ভাইপো বলেন্দ্রনাথের (১৮৭০—১৮৯৯) মৃত্যু হয়। এ শোক রবীন্দ্রনাথকে গভীর আঘাত দিল। মধুর ব্যক্তিত্বের অধিকারী, মিষ্টভাষী প্রিয়-দর্শন যুবকটি ঠাকুর পরিবারের সকলেরই অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন। এছাড়া মাত্র ২৯ বছর বয়েসেই তিনি বাংলা গদ্য রচনায় যে দক্ষতার পরিচয় রেখে ছিলেন তা বাংলাদেশের বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির সপ্রশংসদৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথকে বড় ভালবাসতেন আদর করে ডাকতেন বলু। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কালে বলেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে আপন প্রতিভায় অতি উচ্চ আসন লাভ করবেন। রবীন্দ্রনাথ বলুর গদ্য রীতিকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন, বলতেন বলুর গদ্যরীতি প্রায় নিখুঁত। এমনটি সহজে দেখা যায় না।

বলেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুর মাত্র আড়াই বছর পরেই রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর (১৮৭৩-১৯০২) মৃত্যু হয়। রোগটি সম্ভবত ছিল অ্যাপেন্ডিসাইটিস—কিন্তু সে যুগে এ রোগের চিকিৎসা ছিল না, অপারেশনের পদ্ধতিই আবিষ্কৃত হয়নি। সম্ভবত অ্যাপেন্ডিসাইটিস বলেই এই কারণেই যে ডাক্তারেরা রোগটি ধরতে পারেন নি, আন্দাজে চিকিৎসা চলেছিল—প্রথমে অ্যালোপ্যাথী ও পরে হোমিওপ্যাথী।

রোগের লক্ষণ দেখে পরবর্তীকালে অনেকেরই ধারণা হয়, মৃণালিনী দেবীর অ্যাপেন্ডিসাইটিসই হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ দিনরাত তাঁর স্ত্রীর শয্যার পাশে থাকতেন অতন্দ্র প্রহরীর মত। তাঁর সেবা করার অসামান্য ক্ষমতা দেখে সে যুগের স্বনামধন্য ডাক্তাররা পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। অবশেষে সেই দুঃখের দিনটি এসে গেল নির্মম অপ্রতিরোধ্য গতিতে। স্বামী ও ছেলে রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে অজস্রধারায় অশ্রুপাত করতে থাকেন মৃণালিনী দেবী। তাঁর ঠোঁট দুটি কি যেন বলবার জন্য বৃথাই কেঁপে কেঁপে ওঠে। কিন্তু হায়! কথা বলার শক্তি তখন তাঁর নেই—বাকরোধ হয়েছে। বার বার স্বামী ও সন্তানের দিকে অসহায় বেদনার্ত চোখে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

সেই রাত্রিতেই (৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৯) মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল মাত্র ২৯ বছর। পাঁচটি সন্তানকে রেখে ইহজগত ছেড়ে চলে গেলেন তিনি।

এ দারুণ শোকেও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বেদনার বাহ্যপ্রকাশ নেই, চোখের জল তাঁর মনের গভীরেই আকুল হয়ে কেঁদে ফিরেছে, আর বাইরে তিনি অচঞ্চল, স্থির—আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে অতি শান্ত কণ্ঠে আলোচনা করছেন তাঁর স্ত্রীর সৎকারের প্রসঙ্গ।

শ্মশান থেকে ফিরে এসে একটু—একটুখানি অন্তরের গভীর বেদনাকে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন ১৪ বছরের ছেলে রবীন্দ্রনাথের কাছে। মৃণালিনী দেবীর চটিজোড়া সযত্নে সংগ্রহ করে এনে রথীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়ে ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে বলেছিলেন, 'এটা তোর মায়ের খুব প্রিয় চটি, তোর কাছে যত্ন করে রেখে দিস—হারাসনি, তোকেই দিলুম।

সারা জীবন পরমযত্নে সেই চটিজোড়াকে সংরক্ষণ করেছিলেন রথীন্দ্রনাথ। বর্তমানে এটি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে।

এইবার আমরা রবীন্দ্রনাথের পুত্র ও কন্যাদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করে নেব। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের দুই ছেলে তিন মেয়ে। এঁরা যথাক্রমে মাধুরীলতা
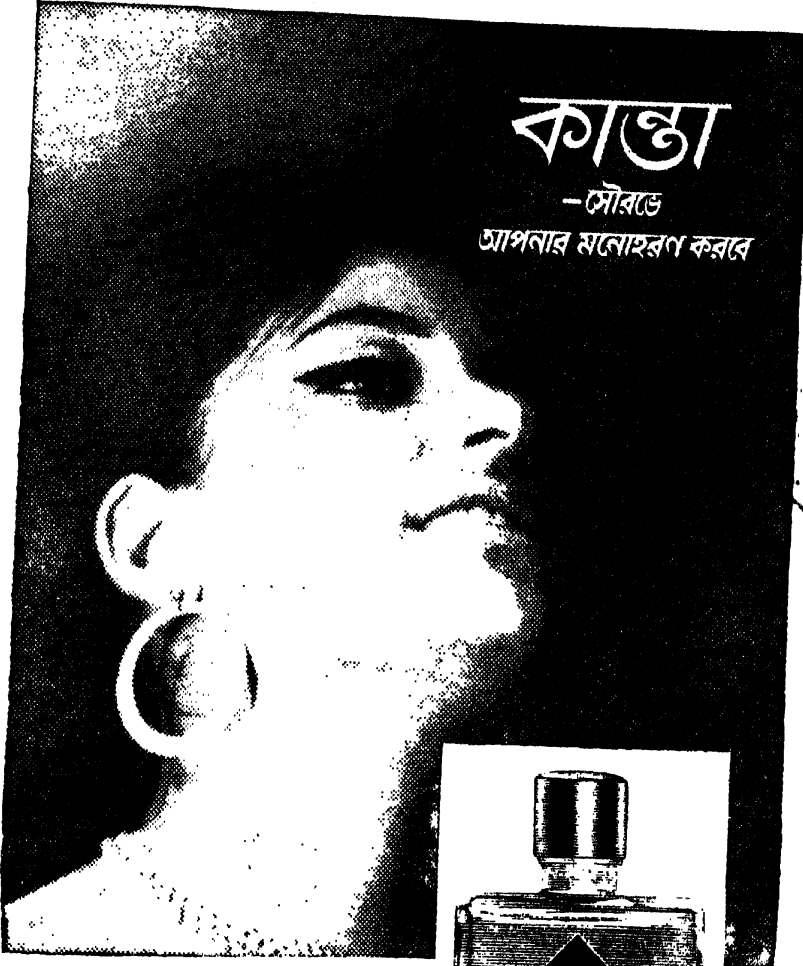
(বেলা), রথীন্দ্রনাথ, রেণুকা, মীরা, শমীন্দ্রনাথ।

১৯০১ খৃস্টাব্দে মৃণালিনী দেবী বেঁচে থাকতে থাকতেই মাধুরীলতা ও রেণুকা—এই দুই মেয়েরই বিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ। বড় মেয়ে মাধুরীলতার সঙ্গে বিহারীলাল চক্রবর্তীর চতুর্থ ছেলে শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর বিবাহ হয়। তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এম-এ। ল' পাশ করে এ সময় তিনি ওকালতি করছিলেন। দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকার বিয়ে হয় সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে। ইনি ছিলেন একজন ডাক্তার। মাত্র দেড় মাসের ব্যবধানে দু মেয়ের বিয়ে হয়। বিয়ের সময় মাধুরীলতার বয়স ১৪, রেণুকার সাড়ে এগারো।

বিয়ের পর বছর ঘুরল না, রেণুকা গুরুতর অসুস্থতায় শয্যাশায়ী হয়। পরীক্ষা করে জানা গেল, সে যুগের প্রায় দুরারোগ্য ব্যাধি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়েছে সে। নিজের কাছে রেখে মেয়েকে চিকিৎসা করালেন রবীন্দ্রনাথ। অ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, কবিরাজী —কিছুরই আর বাদ রইল না। কিন্তু কোন সুফল তো কিছু দেখা যায় না। বরং দিন দিন রেণুকার দেহে আসন্ন মৃত্যুর করাল ছায়া স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর ১৯০৩ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে মৃত্যুপথযাত্রী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ হাজারিবাগে গেলেন। উদ্দেশ্য, যদি এ হাওয়া বদলে রেণুকার অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটে।

এত দুঃখেও রবীন্দ্রনাথের অসামান্য সাহিত্য সৃষ্টির এতটুকু বিরাম নেই। রথের চাকার দুর্দমনীয় গতিতে তা ছুটে চলেছে। পর পর অনেকগুলি রচনা শেষ করেন এই হাজারিবাগে। নতুন উপন্যাস 'নৌকাডুবি'র সূচনা হল এখানেই। কিস্তিতে কিস্তিতে এক-একটা পরিচ্ছেদ লিখে কলকাতায় পাঠাতে থাকেন রবীন্দ্রনাথ।

ওদিকে ক্রমেই রেণুকার স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ লক্ষণ ভাল নয় দেখে আবার কলকাতায় একাই ফিরে এলেন ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শের জন্য। কলকাতার ডাক্তাররা এবার পরামর্শ দিলেন রেণুকাকে নিয়ে আলমোড়ায় চলে যেতে। যক্ষ্মারোগীদের পক্ষে নাকি আলমোড়ার শুকনো আবহাওয়াটা ভাল।

আবার হাজারিবাগ ফিরে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। হাজারিবাগ থেকে মেয়েকে নিয়ে গেলেন আলমোড়ায়। সে যুগের এই-সব জায়গার রাস্তাঘাট মোটেই ভাল ছিল না, যানবাহনের অভাবও ছিল অত্যন্ত। বহু কষ্টে রুগ্না মেয়েকে পথের দুর্দশা থেকে বাঁচিয়ে আলমোড়ায় পৌঁছোলেন তিনি। কিছুদিন আলমোড়ায় থাকার পর সত্যিই দেখা গেল রেণুকার অসুখটা অনেকটাই আরোগ্যের দিকে চলেছে।

এদিকে মাসের পর মাস কলকাতার বাইরে থাকার ফলে কাজকর্মের যেমন গুরুতর সংকট দেখা দিল, বাকি চারটি সন্তান, যারা সকলেই ছিল কলকাতায়—তাদের জন্যেও তেমনি গুরুতর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন রবীন্দ্রনাথ। সে সময় আবার তাঁর অতিপ্রিয় ভাইপো সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ে।

রেণুকাকে আলমোড়ায় তার মামার কাছে রেখে কয়েক দিনের জন্য কলকাতায় ফিরে এলেন রবীন্দ্রনাথ। রবিকে অনেকদিন পরে কাছে পেয়ে ঠাকুর পরিবারে আনন্দের আর সীমা নেই, ঠিক এমনি সময় আলমোড়া থেকে টেলিগ্রাম এল, রেণুকার অবস্থা আবার অবনতির দিকে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে আবার আলমোড়ায় ছুটলেন রবীন্দ্রনাথ। গিয়ে দেখলেন সত্যিই মেয়ের অবস্থা খুবই আশংকাজনক।

রেণুকাও যেন শুনতে পেয়েছিল আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি। সে কিছুতেই আর আলমোড়ায় থাকতে চাইল না। বলল, বাবা এবার আমাকে কলকাতায় নিয়ে চল। কতদিন বাড়ীর লোকজন দেখি না।'

এই কথাটির মধ্যেই রেণুকার আর্ত-কান্নাটি লুকিয়ে ছিল, বাবা আমার জন্য তো অনেক করলে, কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি বাঁচব না। আমাকে এই নির্বান্ধব জায়গায় আর চিকিৎসা না করে কলকাতায় প্রিয়জনদের মধ্যেই মরতে দাও।

কথাটা শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর দিন-দুয়েকের মধ্যেই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন তিনি।

রেণুকার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে, সমালোচনা শুনতে হয়েছে আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকেও। একেবারে ছোটবেলা থেকে রেণুকার প্রকৃতি ছিল অদ্ভুত। অত্যন্ত জেদী ও একগুঁয়ে—সে যা একবার ঠিক করত, কার সাধ্য তার মত বদলায়। বকাবকি মারধোর কিছুতেই কিছু হবার নয়। বরং মারধোরের পর তার জেদ আরও বেড়ে যেত। মাছ মাংস ডিম বা অন্যান্য সুখাদ্য কিছুতেই খেতে চাইত না সে, একটু দামী বা ভাল পোশাক হলেও পরতে চাইত না। কোন মতেই শত জবরদস্তি করেও একটুকরো গয়না তাকে পরানো যায়নি কোনদিন। শত ঐশ্বর্যের মধ্যে বালিকা ছিল যেন এক সন্ন্যাসিনী।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বড় ভালবাসতেন রেণুকাকে। শত সমালোচনা ও গালাগালি মারধোরের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে বুকের কাছে আগলে রাখতেন, বলতেন, ও হলই বা একটু আলাদা রকমের, তাতে ক্ষতি কি?

রেণুকাও সবসময়ে আঁকড়ে থাকতে চাইত বাবাকে, বাবাকে ঘিরেই ছিল তার জগৎ।

কলকাতায় ফিরে আসার পর থেকেই রেণুকার অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যেতে থাকে, জীবনপ্রদীপের শিখা নির্বাপিতপ্রায়।

সমগ্র বাংলাদেশে তখন চলেছে জাতীয় চেতনার উন্মেষের এক অভূতপূর্ব কল্লোল। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের পূর্বাভাষ সূচিত হয়েছে। তৎকালীন খ্যাতনামা সাহিত্যিক, মনীষী, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক—সকলেই ঘন ঘন আসছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে পরামর্শের জন্য। কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের এ সময়ে উপস্থিতিতে সকলেই যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছেন।

এমনি এক দিনে রেণুকার মৃত্যু হল। সকাল থেকেই বাবার ডান হাতটি আঁকড়ে ধরে চুপ করে শুয়েছিল সে। রবীন্দ্রনাথ সস্নেহে তার মাথার উস্কোখুস্কো চুলগুলিকে ঠিক করে দিচ্ছিলেন, হঠাৎ রেণুকা ফুঁপিয়ে উঠে বলে, বাবা, সব যে অন্ধকার হয়ে গেল, কিছুই যে আর দেখতে পাচ্ছি না। তুমি আমাকে 'পিতা নোঽসি' মন্ত্র পড়ে শোনাও।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই ঠাকুরবাড়ীর বৈঠকখানায় জাঁদরেল জাঁদরেল সব নেতারা এসেছেন। কথায় কথায় রাত্তির প্রায় সাড়ে দশটা হয়ে গেল। বৈঠক শেষে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিদায় দিতে দরজা পর্যন্ত এসেছেন রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় জুতোর ফিতেটা বাঁধতে বাঁধতে রোজকার অভ্যাস মত প্রশ্ন করলেন, রবিবাবু, আজ আপনার মেয়ে কেমন আছে? একটু ভাল তো?

রবীন্দ্রনাথ শান্ত কণ্ঠে বললেন, সে আজ মারা গেছে।

অতিথিরা স্তম্ভিত! অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ রবীন্দ্রনাথের শান্ত স্থির মুখের দিকে তাকিয়ে দ্রুত বেগে প্রস্থান করলেন। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর দশ মাসের মধ্যেই রেণুকার মৃত্যু হয়। বয়স তখন তার মাত্র ১৩।

১৯০৫ খৃস্টাব্দে পরিণত বয়সে মৃত্যু হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের (১৮১৭-১৯০৫)। এর মাত্র দু বছর পরেই আবার মৃত্যু অতিথি এল রবীন্দ্রনাথের জীবনে। তাঁর ছোট ছেলে, তেরো বছর বয়সী শমীন্দ্রনাথের পালা এবারে। যাঁরা শমীন্দ্রনাথকে দেখেছেন, একবাক্যে তাঁরা সকলেই স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আকৃতি ও প্রকৃতিগত মিল সবচেয়ে বেশি ছিল এরই। শিশু বয়সেই তার মধ্যে সাহিত্যিক প্রতিভার স্ফুলিংগ লক্ষ্য করা গেছে—এমনকি সময়ে সময়ে শিশু শমীন্দ্রনাথের সাহিত্যরসজ্ঞ মনের প্রকাশে তৎকালীন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিও রীতিমত বিস্ময় প্রকাশ করতেন।

১৯০৭ খৃস্টাব্দের নভেম্বরে শান্তিনিকেতনের দু অধ্যাপকের সঙ্গে মুঙ্গের বেড়াতে গিয়েছিল শমীন্দ্রনাথ—আর ফিরে এল না। ২৩ নভেম্বর কলেরায় মৃত্যু হয় তার। খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন মুঙ্গের পৌঁছোলেন তখন শমীন্দ্রনাথের শেষ অবস্থা। ভোর রাত্তিরের দিকে শমীর মৃত্যু হল, রবীন্দ্রনাথ তখন পাথরের মত স্থির হয়ে ধ্যানমগ্ন। খানিকক্ষণ পরে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক দুজনকে [illegible]

কণ্ঠে বললেন, আমি তো কৃত্য করে দিলাম, এবার আপনারা শমীকে দাহ করে আসুন।

নির্জন নদীর ধারে শমীকে দাহ করে আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেন অধ্যাপকরা। এসেও দেখেন রবীন্দ্রনাথ হিমালয়ের মত অটল, দু চোখ মুদ্রিত, হাত দুটি জোড় করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন। তাঁর সেই অলৌকিক মূর্তিটি দেখে অধ্যাপকরা সাহস করে সে ঘরে ঢুকতে পারলেন না, বাইরে দাঁড়িয়েই কাঁদতে লাগলেন।

একটু পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের ডেকে শান্ত সস্নেহ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কি, শমীর দাহ ঠিকমত হয়েছে তো ?

কথা বলতে বলতে তাঁর দু-চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল।

রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক স্তব্ধতায় অধ্যাপক দুজন খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, এবার তাঁর চোখের জল দেখে এই দুঃখের মধ্যেও তাঁরা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলেন।

সেদিনই রেলে বোলপুর রওনা হলেন তাঁরা। পথে সাহেবগঞ্জে গাড়ী ঘন্টাখানেক দাঁড়ায়। আগে থেকে খবর পেয়ে জনৈক অধ্যাপকের মামা, যিনি সাহেবগঞ্জের বাসিন্দা, খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন মুখে তাঁর সংগে গল্প করতে লাগলেন, যেন কিছুই হয়নি। অধ্যাপক দুজন তো হতবাক। সুবিধেমত মামাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে ভাগ্নে অধ্যাপকটি শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর খবরটা জানাতে মামা একেবারে স্তম্ভিত, বলেন কি? রবীন্দ্রনাথের হাবভাব দেখে তো তিনি কিছুই বুঝতে পারেন নি।

শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার পরের দিন থেকেই আবার কাজে ডুবে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। কেবল মধ্যে মধ্যে তাঁর কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল, গলাটা ভার-ভার। স্নেহবৎসল বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটুক্ষণ পর-পরই ঘরে ঢুকে ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুসজল কণ্ঠে ডাকছিলেন—'রবি' 'রবি'। এই রবি সম্বোধনটি ছাড়া আর কিছু বলতে পারছিলেন না দ্বিজেন্দ্রনাথ।

এত দুঃখেও কাজ ঠিক এগিয়ে চলে। 'প্রবাসী'তে তখন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে "গোরা"। যথাসময়ে নির্দিষ্ট কিস্তি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে ঠিকই পৌঁছে গেল।

শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমবেদনার উত্তরে লিখলেন, 'ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিয়াছি, আরো দুঃখ যদি দেন তো তাহাও শিরোধার্য করিয়া লইব—আমি পরাভূত হইব না!' আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর চিঠির উত্তরে জানালেন—"তোমার চিঠি পাইয়া বিশেষ সান্ত্বনা অনুভব করিয়াছি। আমাদের চারিদিকেই এত দুঃখ, এত অভাব, এত অপমান পড়িয়া আছে যে, নিজের শোক লইয়া অভিভূত হইয়া এবং নিজেকেই বিশেষরূপ দুর্ভাগ্য কল্পনা করিয়া বসিয়া থাকিতে আমার লজ্জা বোধ হয়।'

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু হল বড় মেয়ে মাধুরিলতার (বেলা)। বয়স হয়েছিল মাত্র ৩২ বছর। জামাই শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মজঃফরপুরে ওকালতি করতেন, রবীন্দ্রনাথই তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। উদ্দেশ্য ছিল দুটি—(ক) কলকাতার কোর্টে জামাইয়ের পশার বেশি হবে, (খ) বড় মেয়েকে সর্বদাই চোখের সামনে দেখতে পাবেন। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই মেয়ে-জামাইকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ। সোজা কথায়, ঘরজামাই করলেন।

বড় মেয়ে বেলা ছিল অসাধারণ সুন্দরী, বরাবরই সে গোটা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারেরই সবচেয়ে আদুরে মেয়ে। বিয়ের পরও বেলাকে দূরে চোখের আড়ালে যেতে হল না দেখে সকলেই তো মহা খুশী। ওদিকে জামাই শরৎচন্দ্রের কলকাতার কোর্টে প্র্যাকটিশও খুব জমে উঠল। ভালো পয়সা রোজগার হতে লাগল তাঁর। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য এই সুখের মধ্যেও দেখা দিল ঘোরতর অশান্তি। ঠাকুর পরিবারের সংগে জামাই শরৎচন্দ্রের খুব মন কষাকষি, পরে তা পর্যবসিত হল দারুণ তিক্ততায়। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী স্ত্রী মাধুরীলতা (বেলা)কে সংগে নিয়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী ছেড়ে অন্যত্র বাড়ী ভাড়া করে চলে গেলেন। এ-বিচ্ছেদ আর কখনও জোড়া লাগেনি।

বেলার যখন যক্ষ্মা হল, রবীন্দ্রনাথ রোজ জামাইয়ের বাড়ীতে গিয়ে মেয়েকে দেখে আসতেন, অনেকক্ষণ বসে থাকতেন তার শয্যার পাশে।

দিনের পর দিন সোনার পুতুলের মত মেয়ে বিছানায় মিশে যেতে থাকে। বাবা আসার সময়টা মেয়ের মলিন মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, উৎকর্ণ হয়ে থাকে রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজ শোনবার জন্য। বারবার উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দরজার দিকে।

রবীন্দ্রনাথ যখন চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হন বেলার আয়ত চোখদুটি জলে টলমল করে। কিন্তু অভিমানী মেয়ে তো কিছু বলে না। শুধু পাশ ফিরে চুপ করে শুয়ে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ সবই বোঝেন। এ মেয়েকে যে আর বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না তা বুঝতে পারেন তিনি।

এ সময়ে দিন পাঁচেকের জন্য শান্তিনিকেতনে কি একটা জরুরী কাজে তাঁকে যেতে হয়। সেখান থেকে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা একটি চিঠিতে তার মনের ভাব স্পষ্ট।

'কাল থেকে কলকাতায় যাবার জন্য মনটা দ্বিধা করছে। জানি বেলার যাবার সময় হয়েছে। আমি গিয়ে তার মুখের দিকে তাকাতে পারি, এমন শক্তি আমার নেই। এখানে আমি জীবন-মৃত্যুর ওপরে মনকে রাখতে পারি, কিন্তু কলকাতায় সে আশ্রয় নেই। আমি এইখান থেকে বেলার জন্যে সারাকালের কল্যাণ কামনা করছি। জানি আমার আর কিছু করবার নেই।"

একথা লিখলেন বটে, নিজেকে সরিয়ে কিন্তু রাখতে পারলেন না শান্তিনিকেতনে। মনে পড়ে বেলার জলভরা ডাগর দুটি চোখ, কানে সব সময়ে অনুরণিত হয় মেয়ের আকুল কণ্ঠের "বাবা" ডাকটি। মেয়ে মৃত্যুশয্যায় তাঁকেই বারবার খুঁজে ফিরছে, তিনি কি দূরে থাকতে পারেন? ফিরে এলেন কলকাতায়। আবার আগের মতই রোজ সকালে মেয়ের সংগে দেখা করে আসেন।

১৬ই মে সকালের দিকেই বেলার মৃত্যু হয়। রোজ যেমন যান এদিনও তেমনি মেয়েকে দেখতে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সংগে ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ মহাশয়। মেয়ের বাড়ীর সদর দরজায় ফিটন

খচ করে বুড়ো আঙুলটা গিয়ে লাগল খাটের পায়ায়। কাজ সেরে শুতে যাবার সময়ই এই বিপত্তি। যন্ত্রণায় অস্ফুট শব্দ করে বসে পড়ল চন্দ্রিকা।

ঘুম-জড়ানো গলায় প্রশ্ন করল সন্দীপ, 'কী হলো?'

'পায়ে লাগল।' কঁকিয়ে উঠল চন্দ্রিকা।

'একটু সাবধানে চলাফেরা করলেই পার।' বলতে বলতে পাশ ফিরে শুলে সন্দীপ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভারী নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কানে আসতে লাগল। চন্দ্রিকা বুঝল, সন্দীপ আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

অন্ধকার ঘর। দৃষ্টি তীক্ষ্ন করে খাটের দিকে তাকাল চন্দ্রিকা। একজন মানুষের অস্পষ্ট আভাষ। শুয়ে আছে। নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোচ্ছে। উৎকট শব্দের লহরী বাতাসে ভাসছে।

পায়ের যন্ত্রণা আর পায়েই সীমিত নেই, ক্রমশ মাথায় ছড়িয়ে পড়ছে। মাথার শিরাগুলো দপ-দপ করে নাচছে। দুই হাত দিয়ে শক্ত করে মাথা চেপে ধরল চন্দ্রিকা।

অনেকক্ষণ ধরে সেইভাবে বসে রইল।

বিরক্তিকর শব্দ ঘরের মধ্যে পাক খাচ্ছে। ক্রমাগত পাক খাচ্ছে। উদ্বেগহীন আরাম-মিশ্রিত শব্দের লহরী। ক্রমশই উদ্দাম হয়ে উঠছে, চন্দ্রিকাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলতে চাইছে। অসহায়ভাবে ওপরের দিকে তাকাল চন্দ্রিকা। ফ্যানটা স্থির হয়ে রয়েছে। দিন কয়েক হোল একটু ঠাণ্ডা মতন পড়েছে। ওর প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। না হলেও চলতো। বাতাস কাটার শন-শন শব্দ এই বিদঘুটে শব্দটাকে বন্ধ করে দিতে পারতো। বন্ধ না করলেও কিছুটা অন্তত কমাতে পারতো।

সহসা চন্দ্রিকা আকুলভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলল—এই মুহূর্তে কোন কুকুর-টুকুর তীব্রভাবে ডেকে উঠুক, কিম্বা সময় সময় বিকট শব্দ করতে করতে যে লরীগুলো যাতায়াত করে তারা সামনের রাস্তা দিয়ে চলতে থাকুক, বা পাশের বস্তিতে অতর্কিতে ঝগড়া মারামারি বেধে যাক, মোট কথা, এমন একটা কিছু ঘটুক, যার গভীরে এই শব্দটা তলিয়ে যেতে পারে। কিম্বা—উপায়ান্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত চন্দ্রিকা ভেবে বসল, প্রচণ্ড শব্দ করে ঝাড়টাড় কিছু একটা পড়ুক।

একজন ঘুমন্ত মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের তীব্র শব্দটা চন্দ্রিকাকে ক্রমশই ক্ষিপ্ত করে তুলতে লাগল। আর বসে থাকা যাচ্ছে না। শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে উঠে দাঁড়াল চন্দ্রিকা। টলতে টলতে খাটের ওপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

বিরক্তি-মেশানো শব্দ করে নড়ে-চড়ে উঠল সন্দীপ। বিড়-বিড় করে নিজের মনে কি সব বলল। একঘেয়ে শব্দটার অপমৃত্যু ঘটলো সহসা।

সন্দীপ আর ঘুমোচ্ছে না।

মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠল চন্দ্রিকা। কিন্তু পরমুহূর্তেই গভীর হতাশায়

আবিষ্কার করল, সেই একটানা শব্দটা আবার ঘরময় পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। চন্দ্রিকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে শাওনের ঝড় বইয়ে দিচ্ছে। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে চন্দ্রিকার। ঘরের আবহাওয়া ভয়ানক রকমের দূষিত বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু কত নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোচ্ছে সন্দীপ।

বহুক্ষণ কেটে গেল, চন্দ্রিকার ঘুম এল না। অথচ ঘুমনো দরকার। একান্ত দরকার। খুব ভোরে ঝি আসে। তাকে দরজা খুলে দিতে হয়। রান্নার যোগাড়-যন্ত্র করতে হয়। দেরী করে ওঠা চলে না তার। সুতরাং ঘুমনো দরকার। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। নিদ্রাহীন চোখ খর-খর করছে। দৃষ্টি গিয়ে বার বার অস্পষ্ট দেওয়ালের ওপর আছাড় খাচ্ছে। সেখানে একটা ফটো টাঙানো রয়েছে। খুব চেনা ফটো। অন্ধকারেও চেনা যায়। তাদের বিয়ের দিন কয়েক পরেই তোলা হয়েছিল ফটোটা। চন্দ্রিকা দেখছিল, সেজে-গুজে চেয়ারে বসে আছে একটি মেয়ে। আর চেয়ারের পিঠে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে একজন পুরুষ। পিছন দিয়ে এঁকে-বেঁকে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে, গোল মতন একটা চাঁদ উঠেছে আকাশে, ওপারে ঘন বনের আভাষ। সমস্ত দৃশ্যটাই কাপড়ের ওপর আঁকা একটা সীন। রীতিমত হাস্যকর পরিবেশ। তবু হাসে নি চন্দ্রিকা। বরং খুশী হবার ভান করেছিল। সন্দীপ যাতে মনে ব্যথা না পায়, তার আনন্দ উৎসাহ যাতে না একটুও খর্ব হয়, সেই বিষয়ে কত বেশী সতর্ক ছিল চন্দ্রিকা।

আর সেই সন্দীপই কিনা এমন নিরুদ্বেগে ঘুমিয়ে পড়ল!

জেগে জেগে একটা স্বপ্ন দেখতে লাগল চন্দ্রিকা। মানসীদির স্বপ্ন। শুধু মানসীদির না, অবনীশ জামাইবাবুরও। কত দিন আগেকার একটা দৃশ্য, অথচ কত উজ্জ্বল হয়ে মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে।

তখনও চন্দ্রিকার বিয়ে হয় নি।

মানসীদিরা তার বাপের বাড়ির খুব কাছাকাছি থাকতো। মানসীদির সঙ্গে দারুণ ভাব ছিল চন্দ্রিকার। দিনের বেশীর ভাগ সময়ই সেখানে কাটতো।

সেই দিন একটু বেলা করে মানসীদিদের বাড়ি গেল চন্দ্রিকা। এই সময়টা মানসীদি সাধারণত নিচে থাকে, রান্না-বান্নার তদারক করে। আজ সেখানে তার দেখা মিলল না। এঘর ওঘর করে শেষ পর্যন্ত মানসীদিকে আবিষ্কার করা গেল দো-তলায় শোবার ঘরে। কিন্তু সেখানে যে এমন একটা দৃশ্য তৈরী হয়েছিল কে জানতো। ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল চন্দ্রিকা। দেখল, খাটের ওপর শুয়ে আছে মানসীদি আর পায়ের দিকে মুখ নিচু করে বসে রয়েছেন অবনীশ জামাইবাবু। যাঁর কিনা এই সময় অফিসেই থাকার কথা।

দৃশ্যটা রীতিমত বিভ্রান্তকর। কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকল চন্দ্রিকা। কিন্তু তার উপস্থিতি কারও নজরে পড়ল না। না মানসীদির, না জামাইবাবুর। চন্দ্রিকা দেখল, মানসীদির চোখ বোঁজা, অবনীশ জামাইবাবু কোট-প্যান্ট নিয়েই খাটে উঠে বসেছেন, এবং পরম আশ্চর্যের বিষয় হলো, মানসীদির একটা পা জামাইবাবুর কোলের ওপর তোলা। তিনি গভীর তন্ময়তার সঙ্গে সেই পায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। মানসীদির পা হাঁটু পর্যন্ত নগ্ন এবং আঙুলের দিকে একটা কাপড়ের ফেটি জড়ানো।

চন্দ্রিকার মনে অদ্ভুত ধরনের একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল সেই সময়। মনে হয়েছিল, অবনীশ জামাইবাবু যে অমন একাগ্রচিত্তে শুধুমাত্র মানসীদির ক্ষত স্থানই পরীক্ষা করছিলেন, তা হয়তো নয়। তিনি মুগ্ধ নয়নে পরম এক সৌন্দর্যকে নিবিড়-ভাবে হৃদয়ে অনুভব করার চেষ্টা করছিলেন।

ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল চন্দ্রিকা, ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। সন্দীপের ডাকে, চোখ মেলে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখল, সন্দীপ ব্যগ্রভাবে তার মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। তার কপালে একটা হাত ঠেকিয়ে সন্দীপ বলল, 'জ্বরটর হয় নি তো? চোখ মুখ ফোলা ফোলা মনে হচ্ছে।'

চন্দ্রিকা উত্তর দিল না। উত্তর দেবার মত উৎসাহ সে যেন হারিয়ে ফেলেছে।

'তবে? তবে শুয়ে আছ কেন শুধু-শুধু।' চন্দ্রিকাকে উত্তর দিতে না দেখে সন্দীপ ধরে নিয়েছিল চন্দ্রিকার জ্বর হয় নি। গা-ও গরম বলে মনে হচ্ছে না।

'জ্বর না হলেও মানুষ শুয়ে থাকে, মরার মত ঘুমায়। ঘুমোতে পারে।'

সন্দীপ হাসার চেষ্টা করে বলল, 'তোমরা সুখী মানুষ, যতক্ষণ খুশী ঘুমোতে পার।' তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কারখানার হুইশিল বাজার সময় হয়ে এল, চলি।'

খপ করে তার একটা হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল চন্দ্রিকা, 'আমাকে এভাবে ফেলে রেখে তুমি যেতে পারো না। কিছুতেই পারো না।'

অতর্কিতে বুড়ো আঙুল যেন চিন-চিন করে উঠল।

'এ অবস্থায় মানে? তোমার কি হয়েছে?' যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়াল সন্দীপ।

'কিছুই মনে নেই তোমার? রাত্রে পায়ে অমন জোরে লাগল, আর তুমি ঘুমিয়ে রইলে।' দারুণ অভিমানে চন্দ্রিকার গলার স্বর ভারী শোনাল।

'সমস্ত দিন যা খাটাখাটুনী যায়, শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ি।' সন্দীপের কথায় অনুতাপের সুর বাজল যেন।

'তাই বলে একজন মানুষ মরে গেলেও তুমি জাগবে না, তার দিকে তাকিয়ে দেখবে না। একটা পশুও তার সঙ্গিনীকে—অসুস্থ সঙ্গিনীকে পাশে নিয়ে অমনভাবে ঘুমোয় না।'

সন্দীপের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল, 'আর যারা খুব উঁচু ধরনের মানুষ, তারা স্বামীকে না খেয়ে কাজে যেতে দেখেও একটু লজ্জিত হয় না।' সন্দীপ আর দাঁড়াল না, দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

চন্দ্রিকা উঠে বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই যন্ত্রণায় অস্ফুট শব্দ করে শুয়ে পড়ল। বাধ্য হয়েই ফিরে আসতে হোল সন্দীপকে। খাটের পাশে বসে পড়ে কোমল কণ্ঠে বলল, 'কি হয়েছে বলতো। না বললে বুঝি কী করে?'

চন্দ্রিকা কথা বলল না; বলতে পারল না। শুধু ধীরে ধীরে পায়ের কাপড় টেনে তুলতে লাগল। সন্দীপ সেই দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে। শির শির করে কাঁপছে চন্দ্রিকা। চোখের পাতা ক্রমশই ভারী হয়ে আসছে। তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।

সন্দীপ ঝুঁকে পড়ে ক্ষত স্থান দেখার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কারখানার ডাক্তারের কাছ থেকে মালিশ-টালিশ নিয়ে আসব একটা। ততক্ষণ জল-পটী লাগানো থাক।' সেই ব্যবস্থা করতেই সন্দীপ খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

চিন চিনে ব্যথাটা দুরন্ত গতিতে মাথার দিকে ছুটে চলেছে। মাথায় গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল মুহূর্তের মধ্যে। শিরাগুলো উন্মত্তের মত দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে। চন্দ্রিকা আশঙ্কা করছিল, যে কোন মুহূর্তে ওদের দু-একটা ছিঁড়ে যাবে।

দুই হাতে মুখ ঢেকে চন্দ্রিকা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'কিছুই করতে হবে না তোমাকে। দোহাই তোমার, আমাকে একটু একলা থাকতে দাও। তুমি যাও।'

কিছুক্ষণ বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সন্দীপ। আর দাঁড়িয়ে থাকার মত সময় তার হাতে অবশিষ্ট ছিলও না।

এতক্ষণে শেষ হুইশিলটাও পড়ে গেছে নিশ্চয়।

অবহেলিত অনুবাদ সাহিত্য

এই বছরের শারদ-সাহিত্যের যে সব বিজ্ঞাপন এ পর্যন্ত চোখে পড়েছে তাতে লক্ষ্য করা গেছে যে অনুবাদ সাহিত্যকে কোনো আসন দেওয়া হয় নি। দু' একটি চটকদার পত্রিকায় অবশ্য সেক্স-ঘেঁষা কিছু রচনার সংক্ষিপ্ত অনুবাদের প্রকাশ সম্ভাবনা বিজ্ঞাপিত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলা সাহিত্যে ইদানীং অনুবাদ অবহেলিত।

অনুবাদ সাহিত্য কথাটির আদিতে 'অনু' কথাটি থাকার জন্যই হয়ত অনুবাদ সাহিত্য সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে অবজ্ঞা আছে। সেই অবজ্ঞা আজকাল একটু বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উক্তির তাৎপর্য পরে ব্যাখ্যা করা যাবে।

সাধারণ পাঠকের ধারণা (১) অনুবাদ-কর্ম সৃজনীমূলক সাহিত্য নয়। (২) মৌলিক রচনা প্রণয়নে অক্ষমতার ফলে অনুবাদই অনুবাদকের সাহিত্যিক-কন্ডুয়ন প্রবৃত্তির একমাত্র পথ। (৩) অনুবাদ সর্বদাই উদ্দেশ্যমূলক অর্থাৎ লাভের দিকে লক্ষ্য রেখে অনুবাদ করা হয়ে থাকে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

একালের একজন বিখ্যাত সমালোচক ডেভিড রাইট এই প্রসঙ্গে বলেন :

"Translation is the Cinderella of literature, and no wonder. We take it for granted (1) that a work in the original must ipso-facto be better than translation, (2) that translation is less 'creative than other kind of writing--a matter of compromise or of making to somebody elses blue-print."

দেখা যাচ্ছে অনুবাদের অবস্থা সর্বত্র একই প্রকার। অথচ অনুবাদ করা না হলে পৃথিবীর যাবতীয় মহৎ সাহিত্যের সঙ্গে মূল ভাষ-অনভিজ্ঞ পাঠকের কোনো সংযোগ থাকত না। তিনি শুধুমাত্র মাতৃভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থগুলির কানাগলিতে আবদ্ধ থাকতেন।

এজরা পাউন্ড এক জায়গায় বলেছেন :

"Great periods of literature are really great ages of translations, or are preceded by them".

অনুবাদের অর্থ অবশ্য এ নয় যে কোনো বিদেশী ভাষায় রচিত গ্রন্থকে শুধু ভাষান্তরিত করে পরিবেশন করা, কিম্বা যে ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ করা হয় সেই ভাষাকে সমৃদ্ধ করা। বরং আরো কিছু বেশি। তাই ডেভিড রাইট বলেছেন—'গ্রেট ট্রানশ্লেটরস অ্যাজ ডিসটিনক্‌ট ফ্রম দি মিয়ারলি কমপিটেন্‌ট—আর অ্যাজ ক্রিয়েটিভ অ্যাজ অরিজিন্যাল রাইটার্স।'

বাংলাদেশে রামমোহন রায়, তারাকুমার কবিরত্ন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, চন্ডীচরণ সেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ লেখকবৃন্দ অনুবাদ-সাহিত্যে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বাঙালী তার জন্য সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁদের স্মরণ করবেন। কল্লোল যুগের লেখকদের মধ্যে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার, শিবরাম চক্রবর্তী, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রমুখ গল্প উপন্যাস নাটক প্রভৃতি প্রচুর অনুবাদ করেছেন এবং বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে প্রচুর কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অজস্র বিদেশী কবিতার সুদক্ষ অনুবাদ করেছেন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিমল মিত্র, অজিতকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি প্রখ্যাত লেখকবৃন্দও অনেক অনুবাদ করেছেন। মণীন্দ্র রায় অনেক বিদেশী কবিতার উল্লেখযোগ্য অনুবাদ করেছেন।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্গ-সাহিত্যে যেটুকু সমৃদ্ধি ঘটেছে তা মূলতঃ এইসব লেখকের প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে। অনুবাদ গ্রন্থকে তাঁরা জনপ্রিয় করার কাজে সহায়তা করেছেন।

অনুবাদ এবং অনুবাদক যে অবহেলার বস্তু নয়, তাঁরা যে অবজ্ঞেয় বা অপাংক্তেয় নন তার অজস্র প্রমাণ আছে। ফিটজিরালড যদি ওমর খৈয়াম অনুবাদ না করতেন তাহলে ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎগুলির রস কজনে আস্বাদনের সুযোগ পেতেন? বাংলা ভাষায় যাঁরা ওমর খৈয়াম থেকে অনুবাদ করেছেন তাঁরা সবাই এডওয়ার্ড ফিটজিরালডের সাহায্য নিয়েছেন। একাজে অবশ্য কান্তিচন্দ্র ঘোষের মত সাফল্য কেউ অর্জন করেন নি। কান্তিচন্দ্র ঘোষ ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ অনুবাদক হিসাবেই বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। অথচ মূল ফারসী থেকে ইংরাজী অনুবাদে ফিটজিরালড অনেক স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন এবং তেমনই স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন কান্তিচন্দ্র ঘোষ তাঁর বঙ্গানুবাদে।

ফিটজিরালড লিখেছেন—'লোফ্ অফ ব্রেড', কান্তিচন্দ্র বলেছেন 'খাদ্য কিছু' আর মূল ফারসীতে আছে 'গমের শাঁস আর পাঁঠার রাণের মাংস'। কান্তিচন্দ্র যদি 'খাদ্য কিছু' না বলে 'গমের শাঁস এবং পাঁঠার রাণের মাংস' চালাতেন তাহলে কেমন হত? অনুবাদ অবশ্য মূলানুগ হল না।

এমন অনেক অনুবাদক আছেন যিনি মূলের কোনো অর্থই বোঝেন নি। যা খুশী অনুবাদ চালিয়েছেন, নিজের মনগড়া মানে করেছেন, অনেকের হাতের কাছে অভিধান-খানাও বোধহয় থাকে না। কে আর মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ছে, এই বোধহয় তাঁদের ধারণা, কিন্তু কেউ যদি তা পড়েন তাঁর কাছে ধরা পড়ে যাবে ভালো অনুবাদ আর মন্দ অনুবাদ কাকে বলে।

স্থানাভাব এবং শব্দবৃদ্ধির আশঙ্কায় দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা সম্ভব হল না, নতুবা এই বক্তব্য যে কি নিদারুণ সত্য তা বোঝা যেত।

একথা বলা বাহুল্য দুটি ভাষায় যদি সমান দখল না থাকে তাহলে শুধু অভিধান নির্ভর করে অনুবাদ সম্ভব নয়। প্যারীচাঁদ সরকারের 'ফার্স্ট বুক' প্রায় সকলেই পড়েছেন। সেখানে 'হি ক্যান ডিগ' এই কথাটি আছে, গ্রামের স্কুলের কোন কোন প্রাচীন পণ্ডিত অর্থ করতেন 'তিনি পারা খালকরা', অর্থাৎ 'হি' মানে 'তিনি', 'ক্যান' মানে 'পারা' এবং 'ডিগ' অর্থে খাল করা। হাস্যকর হলেও অনুবাদে ভুল নেই।

বলাই বাহুল্য দক্ষ অনুবাদক যিনি তাঁর কাজ পুনর্জীবন দান করা, পরিবর্তন ও পরিবর্জন করা।

বাংলা ভাষায় ইদানীং দেখা গেছে সুবৃহৎ গ্রন্থের কঠিন অংশ বিশেষ পরিহার করে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। ফলে মূল গ্রন্থের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনি

কৌতূহল বশে মাতৃভাষায় অনূদিত গ্রন্থ পাঠ করলে অনুবাদ এবং অনুবাদকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হবেন সন্দেহ নেই।

তারপর স্থানকালপাত্র জ্ঞানের অভাবও দুটির অন্যতম কারণ। একথা সত্য যে, 'পুলিস আর পেট্রলিং দি স্ট্রীট' এই কথাটি একটি বিখ্যাত দৈনিকে অনুবাদ করা হয়েছিল—'পুলিশরা পথে পেট্রল ছড়াইতেছে।' বিলাতে থাকাকালে গান্ধিজীকে এক খন্ড মেনু বা খাদ্য তালিকা দেওয়া হয়। দৈনিকের অনুবাদক 'মেনু' কথাটির সঙ্গে বোধহয় পরিচিত ছিলেন না, তিনি ভাবলেন গান্ধিজীকে সম্ভবত 'মনুসংহিতা' দেওয়া হয়েছে, মেনু কথাটি ছাপার ভুল। সুতরাং অনুবাদ করা হল—গান্ধিজীকে এক খন্ড মনু-সংহিতা দেওয়া হল।

সাম্প্রতিককালে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির অর্থানুকূল্যে—সুলভে অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়েছে। এই গ্রন্থগুলির জন্য নোট-বই লেখকদের পারিশ্রমিকের হারে ফর্মা বা অক্ষর হিসাবে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। ফলে যে কোনো ব্যক্তি যেন তেন প্রকারেণ অনুবাদ করছেন। মূল লেখক বা তাঁদের স্বদেশবাসী যদি বাংলা জানতেন তাহলে হয়ত হারিকিরি করতেন। রবীন্দ্রনাথের 'তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে' এই লাইনটির ইংরাজী অনুবাদ একজন পন্ডিত ব্যক্তির হাতে—"Standing silently behind a whale" হয়েছে—এ সংবাদ হয়ত অনেকেরই জানা আছে।

তবু একথাও এই সূত্রে বলা প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের অনূদিত কবিতাই নোবেল প্রাইজ এনে দিয়েছে—মূল বাংলা ভাষার সঙ্গে নোবেল কমিটির পরিচয় ছিল না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মূল ফরাসী ও সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনুবাদের একটা বিশেষ রীতি ছিল অথচ তাঁর অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য অক্ষুন্ন থেকে গেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথ অনেক সৎ বাঙালী গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুড়ি এবং মিছরি তুল্যমূল্য হওয়ায় অনেক শক্তিমান লেখক এখন আর অনুবাদ করেন না।

কিছু ভালো অনুবাদ প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগটি অবহেলিত হয়ে এখন প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে।

আঁদ্রে জিদের জার্নালে আছে তিনি গুরুদেবকে রবীন্দ্রনাথের ডাক-ঘর পড়ে তার-যোগে অনুবাদের অনুমতি প্রার্থনা করেন। এদেশে একখানি সদগ্রন্থ পাঠের পর অনুরূপ উৎসাহের কোনো সংবাদ পাওয়া যায় নি।

—অভয়ঙ্কর

শরৎ শতবার্ষিকীর পদধ্বনি

আর মাত্র তিন বছরের মাথায় হয়তো বাংলাভাষা ও সাহিত্যানুরাগী মাত্রেই মেতে উঠবেন সেই মানুষটিকে গভীর শ্রদ্ধা-ভালোবাসা জানাতে। হয়তো গোটা বছর ধরেই চলবে নানান আলোচনা, আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান আর তাঁর স্মৃতি ও অবদানকে অক্ষয় করে রাখার নানান প্রয়াস, কার্যকর ব্যবস্থা। অথচ সকলেই জানেন রক্তের মতোই মিশে আছেন তিনি বাঙালির জীবনে, ভারতীয় সাহিত্যে। কেননা জীবনকে খাড়া রেখেই যে তিনি লিখতেন। আর সেই অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৯৭তম জন্মজয়ন্তী এবার পালিত হল বিশেষ উদ্দীপনার সঙ্গে। শরৎ-শতবার্ষিকীর পদধ্বনিতে এবছরে দেখা গেল প্রাণের জোয়ার গ্রামে শহরে সর্বত্রই।

১৭ সেপ্টেম্বর কলকাতার শিল্পী সংস্থা শরৎবন্দনার আয়োজন করেছিলেন বয়েজ ওন লাইব্রেরি হলে। সভাপতি ছিলেন মনোজ বসু। দক্ষিণারঞ্জন বসু, সুধীর ঘোষ, শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। আর কবি জসীমউদ্দিন তাঁর ভাষণে বলেন, 'শরৎচন্দ্র ছিলেন সচেতন শিল্পী। হিন্দু সমাজের সুখদুঃখের কথা যেমন তিনি বলেছেন, তেমনি লিখেছেন মুসলমান সমাজেরও অন্তরের কথা।'

হুগলী জেলার ব্যান্ডেলের কাছাকাছি গ্রাম দেবানন্দপুর বাংলাসাহিত্যে একটি স্মরণীয় নাম। শরৎচন্দ্রের জন্মভূমি এই দেবানন্দপুরে দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের ১৮ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ঘোষণা করেন অমর কথাশিল্পীর পৈতৃক বাসভবনটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার হাতে নেবেন। তিনি এই গ্রামে ভ্রমণার্থীদের জন্য প্রস্তাবিত 'শরৎ আবাস'-এর শিলান্যাস করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তিনি শুধু মানুষকেই ভালোবাসেন নি, ভালোবেসে ছিলেন তাঁর দেশকেও গভীরভাবে'। এদিনকার অনুষ্ঠানে সভাপতি শ্রমমন্ত্রী গোপালদাস নাগ ও শরৎচন্দ্র জন্মোৎসব কমিটির সম্পাদক ভবানী সিংহ রায়ও ভাষণ দেন।

শরৎ দিবস পালন করেন সারা বাংলা রামমোহন ও শরৎ জন্মজয়ন্তী কমিটিও। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী। আলোচনা করেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, মানিক মুখোপাধ্যায়।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য সংরক্ষণ সমিতির কলকাতার দপ্তরে অনাড়ম্বর ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে পালিত হয় শরৎ জয়ন্তী। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সম্পাদক লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় বহু তরুণ কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়িকে অবিলম্বে জাতীয়করণ আর আগামী শরৎ-চন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে শরৎ সাহিত্যের সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করার দাবি রেখেছেন হাওড়া সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ তাঁদের অনুষ্ঠানে। সভাপতি ছিলেন জগন্নাথ সাহু। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আলোকনাথ পাঁজা।

আর ঐদিনেই সামতাবেড়ের বাসভবন শরৎ স্মৃতি মন্দিরে জ্যোতিষ শাস্ত্রী অমূল্যচরণ ঘোষালের স্তোত্রপাঠের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের জন্মউৎসব পালনের সূচনা করেন শরৎ স্মৃতি গ্রন্থাগার। এখানে বিকেলবেলার অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কল্যাণপুর অঞ্চল প্রধান নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়।

বালী শিশুসমিতি গ্রন্থাগারের সভাগণ পালন করেন শরৎচন্দ্রের ৯৭তম জন্মদিবস। সম্পাদক জয়দেব গোস্বামী শিল্পীর মূর্তিতে মাল্যদান করেন এবং বিভিন্ন বক্তা শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন সম্বন্ধে করেন আলোচনা।

রোমাণ্টিক কবি ও কাব্য। বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—বাক সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য ছয় টাকা।

সতেরো শ' আটানব্বই-এ ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'লিরিক্যাল ব্যালাডস'-এর প্রকাশের সংগে সংগে ইউরোপে রোমাণ্টিক যুগ ও আন্দোলন সুরু হয়। সে সময়ের রোমাণ্টিক আন্দোলনে সাহায্য করে জার্মান অতীন্দ্রিয়বাদ, ফরাসী বিপ্লব, মধ্য যুগের পুনরাবিভাব, কবিদের প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন ও বিস্ময়ের বোধন। প্রকৃতি ও মানুষে নিগূঢ় সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে কথা বললেন কাব্যে, তাঁর সমসময়বর্তী কবিরা সেই রোমাণ্টিক অভীপ্সাকে নূতন নূতন বিষয়ে, চিত্রকল্পে নবব্যাখ্যা দিতে প্রয়াসী হলেন। শেলী, কীটস্, বায়রন, কোলরিজ, ব্রাউনিং, ব্লেক, বার্নস্, ডেলা মেয়ার, হোলডার্লিন, লেওপার্দী, বোদলেয়ার ইত্যাদি ইউরোপ-বিস্তৃত খ্যাতকীর্তি কবিদের নাম এ প্রসংগে উল্লেখ্য। শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় এঁদের সম্পর্কেই বিস্তৃত আলোচনা করেছেন স্বতন্ত্র কবির স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদের মাধ্যমে। গ্রন্থের প্রথমে আছে—শোক থেকে শ্লোক : কাব্যের জন্ম' নামে পরিচ্ছেদ, শেষে আছে 'রোমাণ্টিক কাব্য : স্বরূপ ও সার্থকতা'। গ্রন্থটি মূল্যবান এই কারণে—এর আগে কেউই এমন বিস্তৃত করে ও তীক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে বিদেশী রোমাণ্টিক আন্দোলনের প্রবক্তাদের সম্পর্কে বাংলা ভাষায় আলোচনায় হাত দেননি। প্রথম ও শেষ পরিচ্ছেদে লেখকের মৌলিক ভাবনা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। হোলডার্লিন, লেওপার্দী ও বোদলেয়ারকে সংকলনে স্বতন্ত্র আলোচনা করায় গ্রন্থটির মান আরও বেড়েছে, লেখকের ভাষা ও গদ্যভঙ্গী সহজ, সরল। এবং এই কারণেই শুধু ছাত্র নয়, সাধারণ স্বভাবী পাঠকদের এ গ্রন্থ যথেষ্ট রসতৃপ্তি দেবে বলে মনে করি।

রাজর্ষি রামমোহন (জীবনী)—নির্মল সেনগুপ্ত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ২১১ বিধান সরণী। কলকাতা-৬। দাম তিন টাকা।

বাঙালী জীবনের এক সন্ধিমুহূর্তে রাজা রামমোহনের আবির্ভাব। ইতিহাসে এই যুগপুরুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ এই যুগপুরুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনগ্রন্থ পাওয়া যায় না। যা দু'একখানি বেরিয়েছে, তা নিয়েই [illegible] জীবন এবং জীবনাদর্শ বিশ্লেষণে বিশেষ গুরুত্ব দেয় নি। সেই অভাব পূরণ করবে নির্মল সেনগুপ্ত রচিত 'রাজর্ষি রামমোহন'। বইটি সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছেই সংগ্রহযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

অভিযোগ : অমল চন্দ। এই দশক, ৭৪০, শরৎ চ্যাটার্জী রোড, হাওড়া-৪। তিন টাকা।

বেশ কিছুকাল আগেই 'এই দশক' নামের একটি ক্ষীণকায় পত্রিকাকে মুখপত্র করে একদল তরুণ তথাকথিত শাস্ত্রবিরোধী গল্প রচনায় একজাতীয় আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। গল্পে গল্প থাকলে নাকি খুন করা হবে। তথাকথিত পরীক্ষার নামে শুধু রক্তে লাল চোখ দিয়ে ধমকাতেই এঁরা শিখেছেন। যার মধ্যে এঁরা মানুষ, সেখানে যে কত গল্প, জীবনের কথা, ভালবাসা ও ব্যর্থতার কথা আছে, তা ভাবেন না। আর ভাবেন না বলেই 'অভিযোগ' উপন্যাসে শ্রীঅমল চন্দ বিনয়ের মত এক বায়বীয় নায়ক চরিত্র নিয়ে, তার বানানো একাকীত্বকে একমাত্র সম্বল করে বক্তব্য রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। উপন্যাসের বিষয় যদি স্বতঃস্ফূর্ত ও সত্যিকারের জীবনানুগ না হয়, ফর্ম তো লেখককেই মৃতের কংকাল দেখিয়ে ভয় দেখানোর মত ভ্যাংচাবে! আমরা নিশ্চয়ই টানা স্বাধীনতা কলার কথা বলছি না, পুরোনো কতাপচা গল্পে বিশ্বাসী নই, কিন্তু সমস্ত পরিচিত অপরিচিত মানুষ, সমাজ, জীবন, প্রেম, দুঃখ, হতাশা—সব মনে নিয়ে গল্পে ও উপন্যাসে জীবনের সত্যে বিশ্বাসী। শ্রীঅমল চন্দ 'অভিযোগ' উপন্যাসে তাঁর সত্যিকারের রচনাশক্তি নিয়ে যেভাবে বসেছেন, আমরা তার মধ্যে জীবনের সেই গভীরতম ব্যক্তিত্বের আপনজনটিকে আদৌ স্পর্শ করতে পারি না।

রত্ন বিজ্ঞান ও মানবজীবন—সুধাময় জ্যোতির্ভূষণ। আনন্দময়ী প্রকাশন, ১৮, হরিঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৬। দাম—চার টাকা।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের মধ্যে রত্ন ধারণের নির্দেশ একটি অতি সাধারণ 'প্রেসক্রিপশান'। কিন্তু এর মধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা—এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে। বর্তমান লেখক এই বিষয়টি নিয়েই বিস্তৃতভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার ভঙ্গি বৈজ্ঞানিক মানসিকতার, বিশ্লেষণ যুক্তিবহ।

প্রধানতঃ রত্নের প্রকৃত পরিচয়, তার বর্ণবিন্যাস, মানুষের মন ও শরীরের ওপর রত্নের প্রতিক্রিয়া—এই বিষয়গুলি নিয়েই লেখক আলোচনা করেছেন। এছাড়া আছে, রত্নের জন্ম বৃত্তান্ত, তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ, আয়ুর্বেদের সংগে তার যোগসূত্র, রত্ন ধারণে কেন শুভাশুভ ফল দেয় প্রভৃতি

বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই রত্নের জগৎ সাধারণের কাছে সম্পূর্ণ অনালোকিত। যাঁরা এই শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা ও আলোচনা করেন, তাঁরা শুধু নন, সাধারণ পাঠক এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হবেন।

ঋষি অরবিন্দের যোগ-জীবন ও সাধনা—হরেন্দ্রনাথ মজুমদার। শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি, ৩ রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা-৪০। ৬২, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—পাঁচ টাকা।

যুগে যুগে এ পৃথিবীতে নেমে এসেছেন মহামানব মানবকে দিতে মুক্তির বা আনন্দের সন্ধান। যুগোপযোগী সাধনার ধারায় হয়েছে বিস্তার। মহামানবদের বাণীমন্ত্রও নিয়েছে যুগোপযোগী রূপ: আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জগৎ-ই সাংস্কৃতিক সূত্রে হয়েছে যুক্ত। তার সঙ্গে একদা অন-আর্য বলে আখ্যাত যারা তারাও এসে নতুন যজ্ঞে দিয়েছে যোগ। মহামানব অরবিন্দ এই নতুন যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা ও মন্ত্রদাতা ঋষি। সেই ঋষি অরবিন্দের যোগ-জীবন ও সাধনার কথা এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের জন্ম-শতবর্ষের এই অবদান বাঙালী তথা সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই মূল্যবান। গ্রন্থের শেষাংশ 'সাধনা' অংশে যোগ, পূর্ণযোগ, যোগের পথে চলতে হলে কি চাই, পূর্ণযোগের পথে অগ্রগতি, চৈত্যপুরুষ ও চৈতন্য প্রভৃতি বিষয় সুন্দরভাবে বোঝানো হয়েছে। এই ধরনের মূল্যবান গ্রন্থ নিশ্চয়ই সমাদৃত হবে।

রক্তাভিযাত্ (কাব্যগ্রন্থ)—বিধান দত্ত।। রায়চৌধুরী, ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯। দাম—তিন টাকা।

সারল্যের সঙ্গে বলিষ্ঠতা মিশ্রিত হলে যে-রকম হয়, বিধান দত্তের কবিতারও ধরন-ধারণ অনেক তেমনি। এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটি (রণক্লান্ত) পড়তে পড়তে নজরুলের কথা মনে পড়ে যায়। সময়ের প্রত্যক্ষতায় বিধান দত্ত যতটা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, ততটা সেই সময়ের নির্যাসকে আত্মসাৎ করতে পারেন নি বলেই অনুমান। তবু তাঁর বক্তব্যের বলিষ্ঠতাকে যে-কোনো সমাজসচেতন পাঠক অভিনন্দন জানাবেন বলে আমাদের ধারণা।

ক্লান্ত যন্ত্রণা (কাব্যগ্রন্থ)—মধুসূদন বর্মণ। আধুনিক কবিতা প্রকাশনী, মিলন পল্লী, দমদম, কলকাতা-৫১। দাম—আড়াই টাকা।

নিয়ন্ত্রিত জীবন থেকে, যৌবনের আত্মজিজ্ঞাসায় অনেকটা স্বচ্ছন্দ হতে চাইছেন মধুসূদন বর্মণ। ভালোবাসার উত্তাপেও কখনো বিষন্ন, কখনো উজ্জ্বল। এই কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় তিনি বর্তমান সময়ের চালিকাশক্তির যতটা বিব্রত, ততটাই প্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হয়েছেন তারই অন্তঃসত্তার আলোয়। পুরনো ইমেজ ও শব্দের ব্যবহারে যদিও তাঁর গণ্ডিবাঁধিতে কুণ্ঠার ছাপ স্পষ্ট, তবু বক্তব্যের বলিষ্ঠতায়, এক নিজস্ব জগতের নির্মাণে তিনি যে অনেকটা দূরে এগিয়ে গেছেন, সে বিষয়ে সংশয় নেই।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

অঙ্কুশ—ভিয়েতনাম সংখ্যা। সম্পাদক : পরিমল মুখোপাধ্যায় এবং অরবিন্দ ভট্টাচার্য। ১১৩ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট। কলকাতা-৯। দাম এক টাকা।

ভিয়েতনামের শিল্পসাহিত্য সংস্কৃতির সম্পর্কে কয়েকটি আলোচনা এবং গল্প ও কবিতার অনুবাদ বর্তমান সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। সুদীর্ঘ যুদ্ধকালে ভিয়েতনামীদের জীবনের স্বার যে রুদ্ধ হয় নি তা জানা যাবে রচনাগুলি পাঠ করে। তোহু-র 'চাচার পদচিহ্ন ধরে' সুদীর্ঘ কবিতার অংশ অনুবাদ করেছেন রামবাবু। যারা বিভিন্ন দেশের মুক্তিসংগ্রামের সংবাদ রাখেন, তাঁরা উপকৃত হবেন বর্তমান সংখ্যাটি পড়ে।

কিছু ধ্বনি—সম্পাদক : বেবী আনওয়ার। বি-৯১।এফ-৭ মতিঝিল কলোনী, ঢাকা। বাংলাদেশ। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

বাঙলাদেশের কবিতা পত্রিকা 'কিছু ধ্বনি' খুব ছোট আকারের হলেও, সুসম্পাদিত এবং সুনির্বাচিত। দুপার বাঙলার কবিরা লিখেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, আতাউর রহমান, রফিকুল হক, আসাদ চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুপ্ত, সালাহউদ্দিন চৌধুরী, মহাদেব সাহা, বেবী আনওয়ার, কাজী সিরাজ, আনওয়ার আহমদ, রেণুকা রায়, সাদিক আনওয়ার, সালেহ আহমদ, কবিতা সিংহ, দিলওয়ার, গিরিধারী কুণ্ডু, আহিদুর রহমান, জিয়াদ আলি, জাহিদুল হক এবং আরো কয়েকজন কবিতা লিখেছেন।

বেঙ্গলী ইন্টারন্যাশনাল (দ্বিতীয়, তৃতীয় সঙ্কলন)—সম্পাদক সমীর দে। ১০৭।২ রাজা রামমোহন সরণী, কলকাতা-৯। প্রতি সংখ্যার দাম দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ইংরেজীতে অনূদিত বাংলা কবিতার কাগজ। প্রবন্ধ বা আলোচনা ছাপা হয়নি একটিও। বোধহয়, কবিতা পাঠকের কাছে, কবিতা পৌঁছে দেওয়াই সম্পাদকের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই দুটি সঙ্কলনে লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, সময় সেন, মণীন্দ্র রায়, নরেশ গুহ, শামসুর রহমান, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কবিতা সিংহ রত্নেশ্বর হাজরা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। অবাঙালী পাঠকের কাছে বাংলা কবিতা প্রচারের ব্যাপারে পত্রিকাটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।

বারবেলা (১০ম সংকলন)—সম্পাদক : অর্ধেন্দুশেখর দেব। বাণীপুর, ২৪ পরগণা। পঁচিশ পয়সা।

তরুণ সাহিত্যপিপাসুদের মুখপত্র নতুনরীতির গল্প ও কবিতা স্থান পেয়েছে। একটি প্রবন্ধও। প্রবন্ধটি ভালো জাতের। লিখেছেন : গৌরীশংকর দে। শিরোনামটি বিশেষ রকমের বড়। 'লুপ্ত নদী, লুপ্ত সময়, লুপ্ত জনপদ'।

অভিভাবক (১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা '৭৯)—সম্পাদক : জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুণ্ডু। ১৯, ললিতমোহন ভট্টাচার্য স্ট্রীট, হুগলী। পঁচিশ পয়সা।

আজকের সমাজ জীবনে ও শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু নয়—সব ক্ষেত্রে নীতিনিয়ম শৃঙ্খলহীনতা। ছাত্রসমাজ বিভ্রান্ত এবং বিপথগামী। এই নৈরাজ্য থেকে স্বাভাবিক জীবনে তাদের পুনর্বাসন ঘটাবার শুভ উদ্দেশ্য নিয়েই এই সাময়িক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। লিখেছেন : ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ এদেশের সুনামীরা।

রঙ্গমঞ্চ (১৫ জুলাই '৭২)—সম্পাদক : সমীর ঘোষ। ১০৭ বি, রায়বাহাদুর রোড, বেহালা, কলকাতা : ৩৪। কুড়ি পয়সা।

প্রমোদমঞ্চের পাক্ষিক পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা। চিত্র ও মঞ্চের নানান সংবাদ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া লিখেছেন শক্তিপদ রাজগুরু ও নির্মলেন্দু গৌতম।

চিত্রাঙ্গদা (১২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা '৭৯)—সম্পাদক : অজিতমোহন গুপ্ত। ৭২।১ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা—১২। এক টাকা।

মুদ্রণ পরিচ্ছন্নতা ও রুচিস্নিগ্ধ শিল্পীসুষমার মিলন ঘটাবার জন্যে 'চিত্রাঙ্গদা' বরাবরই বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। এ সংখ্যাতেও তার পরিচয় পাওয়া গেল। বহিরঙ্গের মতো অন্তরঙ্গেও এই যত্নের ছাপ ও মননশীলতা পাঠকমনকে আকর্ষণ করবে। গল্প লিখেছেন কিরণময় গঙ্গোপাধ্যায়। খেলাধুলা সম্পর্কে লিখেছেন প্রীতিভূষণ ঘোষ ও মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকার। রামমোহন সম্পর্কে হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটিও উল্লেখ্য। 'পশ্চিমবাংলা' শীর্ষকে অজিতমোহন গুপ্তের বলিষ্ঠ বক্তব্য পশ্চিমবঙ্গবাসীদের জীবনসত্যকে সোচ্চার করে তুলেছে।

॥ ৩৭ ॥

উত্তর আশানুরূপই পাওয়া যায়। দু দিনের মধ্যেই দু দিক থেকে দুটি উত্তর এসে হেমন্তের ভবিষ্যতে যবনিকা টেনে দিল।

তপনবাবুর রাজী হওয়াতে একটু কৌশলের ব্যাপারও ছিল। হেমন্ত খুশীই হল সে খবরে। মনে হল ভোলার সঙ্গে যাকে জন্মের মতো গেঁথে দিচ্ছেন—সে হয়ত একেবারে অনুপযুক্ত হবে না ভোলার মূল্য বুঝবে।

তপনবাবুর স্ত্রী এই 'সম্বন্ধে'র প্রস্তাবে ঝুঁকে পড়লেও, তপনবাবুর প্রাচীনপন্থী ইস্কুল মাস্টারের মন শেষ পর্যন্তও দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। এ ধরনের মন বর্তমান বা ভয়াবহ ভবিষ্যৎ — কোনটাই দেখতে পায় না। দেখে না—একটা অতীত সংস্কারের কঙ্কালকে জড়িয়ে থাকে। সেও একটা আবছা অস্পষ্ট ধারণাতে মাত্র পর্যবসিত হয়েছে। সে সংস্কারের যথার্থ মূল্যায়ন করার সামর্থ্য বা সময়ও নেই। বিধি-নিষেধের অর্থও বোঝার চেষ্টা করে না—বিচার বা যাচাই তো নয়ই। যে কায়া কবেই অন্তর্হিত হয়েছে, তার ছায়া—ছায়াও নয়, ছায়ায় স্মৃতিটাকেই কর্তা বলে জেনে আসছে, সেইখানেই ধুনো গঙ্গাজল চড়াচ্ছে।

তপনবাবুর মন এই বদ্ধ সংস্কারের বন্ধন থেকে কিছুতেই হয়ত নিজেকে মুক্ত করতে পারত না, যদি না তাঁর স্ত্রী—নির্বোধ, যুক্তিবধির, তথ্যান্ধ স্বামীকে বোঝাবার সমস্ত চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা ক্ষীণ সূত্রে, সুদূর আশাকে অবলম্বন করার চেষ্টা করতেন। বোধ হয় হঠাৎই মনে এসেছিল তাঁর কথাটা, হয়ত ভবিতব্যই যুগিয়ে দিয়েছিল—বলেছিলেন, 'আচ্ছা বেশ তো, মেয়েকেই একবার জিজ্ঞেস করো না, দ্যাখো না ও কী বলে।'

তপনবাবু তাচ্ছিল্যের সুরে উত্তর দিয়েছিলেন, 'ও আবার কী বলবে, ও কি বোঝে!'

'তা কেন বুঝবে না!' জবাব দিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা, 'একেবারে তো আর ছেলেমানুষ নয়। তাছাড়া ওকেই তো বুঝতে হবে। বলা যায় না, তোমারই যদি কোন ভালমন্দ হয়, এই তো নো প্রেসারের রুগী, না একটু ওষুধ, না একটু ভালমন্দ খাওয়া—তখন তো ওকেই দাঁড়াতে হবে, মাথার ওপর আর তো কেউ নেই দাঁড়াবার মতো।'

কী বুঝেছিলেন তপনবাবু কে জানে, বোধ হয় ভেবেছিলেন মেয়ে তাঁর মতেই মত দেবে—তিনি উদাসীনভাবে বলেছিলেন, 'তা দ্যাখো, তুমিই জিজ্ঞাসা করো।'

ওঁরা ঘরের ঠিক বাইরে বসে কথা বলছিলেন, রমা ঘরে ছিল, সবই শুনেছে সে, সুতরাং নতুন করে কোন প্রশ্ন [illegible] হল না। মা ঘরে ঢুকতে সে নিজেই সে কথার সূত্র ধরলে, 'আমাকে বেহায়া ভেবো না মা, নিজের বিয়ের কথায় কথা বলছি বলে, তোমরা জিজ্ঞেস করলে তাই, নইলে হয়ত নিজেকেই পাড়তে হত—লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে, সেইটেই ভাবছি কাল থেকে—। শুধু তো আমার ভবিষ্যৎ নয়—তোমারও ভবিষ্যতের প্রশ্ন আছে — হয়ত বাবারও। বাবাও কত দিন বাঁচবেন—কীভাবে বাঁচবেন, কেউ বলতে পারে না।...আমার তো মনে হয়, বাবা যদি আমাকে কলেজে পড়িয়ে বি-এ পাস করাতে পারেন কিম্বা এই অবস্থায় একটা চাকরি করে দিতে পারেন—যত অল্প টাকারই হোক সে আলাদা কথা, নইলে এইখানে বিয়ের কথাতেই রাজী হওয়া উচিত। বাবা কি মনে করেন উনি কোন দিন সুঘরের একটা চলনসই পাত্র দেখেও বিয়ে দিতে পারবেন, না দৈবাৎ কোন মোটা টাকা এসে পড়বে বলে ভাবছেন? ওঁর যা শরীর বেশী দিন তো এমনভাবে ছুটোছুটি করে খাওয়াতেও পারবেন না আমাদের। তার পর কী হবে? সেটা কি ভেবে দেখেছেন? আমি তো টিউশনীরও চেষ্টা করেছিলুম, তাও তো সবাই বি-এ বি-এস-সি পাস চায়—আর পাচ্ছেও তো—আমাকে কেন দেবে?'

কথাগুলো বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলেছিল রমা, তপনবাবুর শুনতে কোন অসুবিধা হয় নি। কণ্ঠস্বরে যে প্রচ্ছন্ন তিক্ততা ছিল, তাও তাঁর কান এড়ায় নি। এর পর, আর কিছু বলতে না পেরে কোন যুক্তি খুঁজে না পেয়ে বলেছিলেন, 'কিন্তু এ তো [illegible] মেয়ে, [illegible] হল [illegible]'

[illegible] তো শুনেছি—এই

রকম কিছু কিছু সুবিধে বা টাকার বদলেই। তুমিও তাই মনে করো না। এমনিও তো—আমারই খাওয়ানো উচিত রোজগার করে—তাই ধরে নাও।'

তবু, মজ্জমান ব্যক্তির তৃণ অবলম্বনের মতো, শেষ ক্ষীণ চেষ্টা করেন একটা তপনবাবু, স্ত্রীর প্রচেষ্টার পাল্টা হিসেবে, 'আচ্ছা ছেলেটাকে তো তুই দেখেছিস। তুই পারবি ওকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে, শ্রদ্ধার চোখে দেখতে? লজ্জা করিস নি—বড় হয়েছিস, এত কথা বললি বলেই জিজ্ঞাসা করছি—'

এবার একটু দেরী হল উত্তর দিতে—এই বিলম্বতে তপনবাবুর মনে কোন আশার সঞ্চার হয়েছিল কিনা কে জানে—যদি বা হয়ে থাকে তাকে সমূলে বিনাশ করে মেয়ে ঈষৎ লজ্জিত, অপ্রতিভ কণ্ঠে বলেছিল, 'কেন, অপছন্দ করার মতো কি শ্রদ্ধা না করার মতো তো কিছু মনে হয় না আমার!'

এর পর আর তপনবাবু অমত করতে বা অন্য কোন বাধা সৃষ্টি করতে ভরসা পান নি।

তপনবাবুর কাছ থেকে কথা পেয়ে এই-বার ভোলাকে বলল হেমন্ত।

ভোলা একেবারে লাফিয়ে উঠল, 'না-না, এ কী করেছ! না না, এ হতে পারে না। আমি তো তোমাকে বলেইছিলুম। না, ছিঃ! এভাবে কথা বলা ঠিক হয় নি। আর ওঁরা—সত্যিই তো বাঙালী ব্রাহ্মণ, এ কথনও ওঁরা রাজী হন—'

হেমন্ত অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিয়ে ওঠে, 'তুই থাম দিকি! তারা রাজী হয়েছে—তুই এখন সেই চিন্তা করছিস! এখন থেকে আর অত ওদের দিক টানতে হবে না।'

চোখে তার প্রসন্ন কৌতুকের আভাস, অনেক দিন পরে।

কেমন যেন বোকা হয়ে যায় ভোলা। তারপর মুখ গোঁজ করে বলে, 'সে আমি অত জানি না। আমি তো বিয়ে করব না বলেছি, সেটার কি?'

'উঁহু, বিয়ে করবি না বলিস নি, বলেছিলি আমি মলে তবে বিয়ে করবি। নইলে আমাকে যদি সে বৌ না দেখে—এই তো? কথাগুলো পরিষ্কার মনে আছে আমার। উল্টে বলেছিলি, আমি মলে নিশ্চয় বিয়ে করবি। জবান দিয়েছিলি আমাকে, ইয়াদ আছে?'

'আছে। তা তুমি বেঁচে থাকতে তবে সে কথা উঠছে কেন?'

'বেঁচে থাকতে উঠছে না। এবার মরতেই যাচ্ছি যে। আমার সেবার ভাবনা—দেখার ভাবনার দায়িত্ব থেকে তোকে ছুটি দিয়ে যাচ্ছি। আমার জন্যে কত দিন তোর বিয়ে আটকে রাখব বল!'

'তার মানে? তার মানেটা কি কিছুই তো বুঝছি না। হেঁয়ালী ছেড়ে পরিষ্কার করে বলো দিকি!'

এবার ভোলার অসহিষ্ণু হবার পালা।

হেমন্ত আস্তে আস্তে ওর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, 'আমি যে এখান থেকে চলে যাচ্ছি রে, চিরদিনের মতো।' আর থাকব না এখানে, আসবও না। ভাইঝির কাছে চলে যাচ্ছি। সেই যে নিভা, কত তো গল্প করেছি তোর কাছে—সেইখানেই চলে যাচ্ছি।'

'সে কি! না, সে হবেটবে না। না। আমার চোখের বাইরে যেতে দেব না। হয় তো সে ভাইঝি এখানে আসুক। তুমি যাবে কেন? না, সো নেহি হোগা!'

বিষম উত্তেজিত হয়ে ওঠে ভোলা।

আবারও শুষ্ক কুঞ্চিতচর্ম চোখের কোলে এক ঝলক তপ্ত অশ্রু উছলে ওঠে। আনন্দের, সুখের অশ্রু।

'দূর ক্ষ্যাপা। সে আসবে কি, তার জাজ্বল্যমান সংসার। শোন, পাগলামি করিস নি। দেখছিস তো ক্রমশ আমি ডেলা পাকিয়ে যাচ্ছি। কেউ ধরে না তুললে আমি উঠতে পারি না। এক উপায় এখানে দিন-রাত নার্স রেখে থাকা। তা সে আজকালকার নার্স তো দেখছি, সব ফাঁকিবাজ। তাছাড়া এক তুই, তোর কাজকর্ম ফেলে দিন-রাত পাহারা দেওয়া তো আর তোর সম্ভব নয়, এই জোয়ান বয়েস, উন্নতির সময়। ভূতের মতো খাটবি এখন—একটা মড়া বুড়িকে আগলে বসে থাকবি কেন?'

পিঠের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে দেয় রাগ করে, বলে, 'না না, তা হোক। কেন, তারাই আপনার লোক—আমি কেউ নয়। তুমি আমার নিজের ঠাকুমা হলে কি করতে? না কি আমিই ফেলতে পারতুম! সে হবে না, তাহলে আমাকেও সেখানে যেতে হয়।'

'তা হয় না।' এবার হেমন্তর কণ্ঠস্বরেও অভ্যস্ত দৃঢ়তা প্রকাশ পায়, 'তোর কাছ থেকে দূরে থাকব বলেই আমি এই নির্বাসনে যাচ্ছি। ওরে, ছেলেকে হারিয়েছি—সে আজ ষাট বছরের কথা—তার পর আর তোর মতো এত আপন, এত বুকের ধন আর কাউকে পাই নি। তোর যদি কোন ভাল-মন্দ হয়—সে আমি সইতে পারব না। বুড়ো বয়সে—গঙ্গায় গিয়ে ডোববার শক্তি নেই, মেঝেতে মাথা ঠুকে মরতে হবে!'

ভোলা বলে উঠতে যায়, 'যত সব বাজে কথা আর বাজে ভাবনা তোমার—'

ওর মুখে একটা হাত চাপা দিয়ে হেমন্ত বলে, 'হয়ত বাজে, কিন্তু জানিস তো বুড়ো মানুষের মাথাতে একটা কথা ঢুকলে আর সহজে যেতে চায় না। তাছাড়া—জীবনের শেষ সাধ আমার—তোর বৌ দেখে তোকে থিতু দেখে যাবো। কোন সাধই তো মিটল না জীবনে—ভেবেছিলুম টাকা হাতে এলে সব হবে। টাকাটাই আরও অভিশাপ হয়ে উঠল। এই শেষ সাধটা মিটিয়ে দে। দুঃখু করিস নি—তোর কাছ থেকে এই জীবনের শেষে যা পেলুম, আর কারও কাছ থেকেই পাই নি। কে জানে তারক বেঁচে থাকলে বিয়ে থা করলে কী মূর্তি ধরত!...তোর হাসিমুখ দেখে নিজেও হাসিমুখ করে যাই—তুই আর বাধা দিস নি।'

ভোলার চোখও জলে ভরে ওঠে, সে হেমন্তর কোলে মাথাটা গুঁজে দিয়ে বলে, 'কেন আমাকে এমন করে পর করে দিচ্ছ বড় মা, কেন, কেন? কী করলুম আমি তোমার এই সময় চলে যাচ্ছ, কোথায় কখন ম যাবে—টেরও পাব না, শেষ সময়টায় কা থাকতেও পারব না। না না, সে ভাল নয় বিয়ে না হয় করছি—তুমি এখানে থাকে লক্ষ্মীটি!'

'মরার সময় যদি খবর না পাস, আ জনে জনে বলে যাব—মরার খবর যেন তো অতি অবিশ্যি দেয়, তুই এখানে আম একটা পিণ্ডি দিস, সেই আমার আস পাওনা!...যদি পরলোকে স্বর্গ বলে কিছু থাকে—তোর পিণ্ডিই আমি হাত পে নেব।'

নির্জন ঘরে আস্তে আস্তে অন্ধকা নেমে আসে। যেন অন্ধকার নেমে আ এমনি করে একটি অতি প্রবীণ ও একা অতি নবীন জীবনেও।...

ঘরে আলো রইল কিনা, আলো জ্বল কিনা—এদের কেউই টের পেল না, চো চেয়ে দেখলও না। দুজনের মনের ক দুজনের চোখে জলেই প্রকাশ পেল শুধ আর কারও কিছু বলার প্রয়োজন রইল না

অনেক-অনেকক্ষণ পরে হেমন্তই জো করে ওর মুখখানা তুলে ধরে, প্রাণপণে লঘ হবার চেষ্টা করে বলে, 'অমন করিস পাগল, এই সময় তুই কোথায় আমা মনের জোর যোগাবি — মদত দেও না কি যেন বলিস তোরা—না তুই-ই কে ভাসাচ্ছিস!...বড্ড বুড়ো হয়েছি রে, সাহায্য না করলে তো যাওয়ার আগে এ কাজ সেরে যেতে পারব না!...অনেক, অনে কাজ যে, এতদিন ফেলে রাখাই উচিত হ নি। এবার চটপট সেরে নিতে হবে, একটু শক্ত হয়ে দাঁড়া, নইলে আমি এস করব কী করে?'

সত্যিই অনেক কাজ। আরও কা বাড়ল। বাড়িয়ে দিল নিভাই।

নিভার চিঠিটা এসেছে দুপুরে। তপন বাবু তাঁর বার্তা জানিয়ে যাওয়ার খানিক আগে।

বুক যে এখনও অনেক শক্ত আ স্নায়ু যে পেশীর থেকে এখনও অনে বলবান, আজ তা আর একবার নতুন ক বুঝল হেমন্ত।

নিভার চিঠিতে বুকে যে প্রলয়ের ঝ উঠেছিল—আবেগ-স্মৃতি বেদনা হতাশা-সব মিলিয়ে। সে একটা সব অনুভূ একাকার করা তুফান, সাইক্লোন বললে বুঝি তাকে বোঝানো যায় না। তাও তে শান্ত হয়ে, নিথর হয়ে বসে থেকে সহ করল। কৈ, হার্টও তো ফেল করল না, আজ কাল যাকে স্ট্রোক বলে তাও তো হল না বহু আঘাত সহ্য করারই বুঝি ফল এটা পাথর হয়ে গেছে বুক, অসাড় হয়ে গেছে অনুভব শক্তি।

তার পর আবার তপনবাবুর এই খবর।

আনন্দ? হ্যাঁ, আনন্দই তো হবার কথা। যা চেয়েছিল তাই পেল, তাই হল। আনন্দ হবে বৈকি।

কিন্তু, — একটা জিনিস কখনই করে নি হেমন্ত এতখানি জীবনে, সেটা হচ্ছে আত্মপ্রবঞ্চনা। ভাবের ঘরে চুরি করা, নিজেকে ঠকানো—এটা তার ধাতে সয় না। এক-আধবার করতে গিয়ে দেখেছে ওর ভেতরে অতি জাগ্রত, অতিসচেতন যে ব্যক্তি-সত্তা আছে—বা বিবেক, কী বলবে?—তাকে ফাঁকি দেওয়া যায় নি।

তপনবাবুর এই সম্মতি জানানোতে, বিশেষ রমার বাস্তববুদ্ধির পরিচয় পেয়ে, ভোলার দিকে ঈষৎ আকর্ষণের আভাস পেয়েও খুশী হবার কথা, হয়েছেও, কিন্তু তার মধ্যেই যেন কোথায় একটা বেসুর বেজেছে, কোথায় একটা আশার পিছনকার আশা-ভঙ্গ হওয়ার সামান্য একটু হতাশা বোধ, শেষ অবলম্বন হারিয়ে যাওয়ায় উদ্বেগও—সেটাই বা অস্বীকার করে কী করে?

বুকের মধ্যে একটা হিম হিম ভাব, সেই সঙ্গে একটু যেন—কী বলবে হেমন্ত—ঈর্ষা কি? — ঈর্ষা বললে হয়ত ঠিক বোঝানো যায় না, অথচ আর কোন সংজ্ঞাও খুঁজে পাওয়া যায় না—একটা বিরূপ অনুভূতিও কি বোধ করে নি? যখন তপনবাবুকে ডেকে পাঠিয়ে যুক্তি দিয়ে লোভ দেখিয়ে প্রস্তাবটা পেড়েছিল তখন কি মনের অগোচরে তাহলে একটা ক্ষীণ আশা ছিল সেই সঙ্গে যে তপনবাবু হয়ত রাজী না-ও হতে পারেন? আর তাহলে অন্তত—মেয়ে খোঁজার অজুহাতে আর কটা দিন সময় পাওয়া যাবে?...এখন আর কোন ছুতো কোন অজুহাতই রইল না—তাই কি এই হিম ভাব বুকের মধ্যে?... এটা কি ভোলা পর হয়ে যাবারই আশঙ্কা, তাকে চিরদিনের মতো হারাবার ভয়?... সত্যিই তাহলে পর হয়ে গেল? আর জীবনের এই শেষ অবলম্বন ছেড়ে তাকে সেই কোন সুদূরে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে আর কোন বাধা রইল না।...

কিন্তু সে যা-ই হোক, সময় আর মোটে নেই।

সত্যিই অনেক কাজ তার, অনেক দায়িত্ব।

এ কাজের বোঝা নিভাই চাপিয়ে দিয়েছে—তার চিঠিতে।

চিঠি পাওয়া মাত্র উত্তর দিয়েছে, সাগ্রহে। আন্তরিকতার অভাব নেই। কিন্তু তার ভাইঝি তার ভাইঝির মতোই জবাব দিয়েছে।

লিখেছে—

'এতদিন পরে তোমার চিঠি পাইয়া যেমন আনন্দও হইল, তেমনি কিছু দুশ্চিন্তাও যে না হইতেছে তা নয়। কথাটা অনেক দিন ধরিয়াই আমাদের মনে হইয়াছে, প্রায়ই আলোচনাও করি। মেজদা (সুরেনদা)-ও এই বাড়িতে আসিয়াই কথাটা বলিয়াছিলেন, পিসীকে এখানে রাখা যায় না? তাহলে খুব ভাল হয়। কোথায় পড়ে আছে, অনাত্মীয়দের মধ্যে, বিশ্বনাথের ওপর ভরসা করেছিলুম, সেও তো গোয়ার পথই ধরল। পিসীর বয়সও বোধ হয় একশো পেরিয়ে গেল, এখন আপনার লোকের কাছেই থাকা দরকার। অন্তত মরার সময় একটু জল, মরার পর আগুন দেবার জন্যেও।

'তা তবু আমরা ভরসা করি নাই। অবস্থায় আগের সচ্ছলতা নাই, তাহা তো

তুমি জানই। কোনমতে সংসার চলিয়া যাইতেছে—এই মাত্র। বাড়িটা পুরানো আমলের, পাড়াগাঁয়ের বাড়ি, মোটা মোটা মাটির গাঁথুনি দেওয়াল। দর-দালানে ঘেরা বাড়ি। সেজন্য একটু স্যাঁৎসেতে ভাব চারিদিকে বাগান থাকা সত্ত্বেও ঘরে যেন তেমন হাওয়া খেলে না। এখনও ইলেকট্রিক আসে ন্যাই, তবে শুনিতেছি দুই-চারি দিনের মধ্যেই আসিবে, টাকা জমা লইয়াছে। মা গঙ্গাও এখান হইতে অনেক দূরে, মরিলে গঙ্গায় দেওয়া বোধ হয় হইবে না। তবে জ্যান্তে তো অনেক গঙ্গা স্নান করিলে, বোধ করি হাজার বার পুরাইয়া গেল—মরার পর দেহটা, দেহের ছাইটা গঙ্গায় গেল কিনা, অত দেখার প্রয়োজন বা কি!

'এসব অসুবিধা জানিয়াও যদি আসো—আমরা মাথায় করিয়া রাখিব। যত দিন আমরা দুই বুড়াবুড়ি আছি যত্নের অভাব হইবে না। কবে নাগাদ আসিতে পারো জানিলে তোমার জামাই গিয়া লইয়া আসিবে। কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার বলিয়া রাখিতেছি—খরচপত্র দিবার চেষ্টা করিও না, তোমার কাছ হইতে এক পয়সাও লইতে পারিব না। যদি আত্মীয়ের মতো, গুরুজনের মতো আসিয়া থাকিতে চাও তো এসো—আবারও বলিতেছি, মাথায় করিয়া রাখিব, সাধ্যমতো নগেন বাঁড়ুয্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করিব।

'একটা কথা বলি, কিছু মনে করিও না। টাকার অহঙ্কার বড় বেশী তোমার, তুমি সর্বাগ্রে টাকা দিয়া মানুষকে কিনিয়া নিতে, তাহাকে বিনত করা চেষ্টা করো—সেই জন্যই জীবনে বার বার ঘা খাও। আমি বলি কি, ও পাপ চুকাইয়া দিয়া চলিয়া এসো। টাকার চিন্তা থাকিলে মরিয়াও সুখ হইবে না। টাকার জন্য যাহারা আত্মীয়তা করিবে তাহারা কেহ আত্মীয় নয়। অনেক দিন তো হইল, আর কতকাল ও বোঝা টানিবে? যাহাকে হোক দিয়া দায়মুক্ত হইয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া এসো। ঐ বোঝা নামিয়া গেলে অনেক শান্তিও পাইবে।

'অনেক কিছু হাবড়হাটি বকিয়া গেলাম নিজগুণে ক্ষমা করিয়ো। আমাদের সকলের প্রণাম নিয়ো। ইতি—

সেবিকা নিভা।'

বুকের মধ্যে যে ঝড় যত বড় ঝড়ই উঠুক, ভেতরে উঠে ভেতরেই মিলিয়ে যায়। শক্ত হ'তেই হবে, এতকাল এত ঝড়-ঝাপটা কাটিয়ে এসে আজ আবেগের কাছে হার মানবে না—এটা ঠিক। গোটা নাটকটা পেরিয়ে এসে শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে খুঁৎ রাখা চলবে না। দর্শকদের বাহবার মধ্যে বিদায় নেওয়া চাই।

অবশ্য অন্যদিক থেকে জোরও পেয়েছে খানিকটা।

নিভার চিঠিটা তার গুরুমন্ত্রের কাজ করেছে. মুক্তির, মোক্ষের সন্ধান দিয়েছে। আশ্চর্য, একথাটা এতদিন কেউ বলেনি কেন?

সত্যিই তো এই টাকাটা ... শিকলটাই পায়ে বেড়ির মতো, পেছনে বাঁধা পাথরের মতো তাকে বেঁধে রেখেছিল। এই টাকার অহঙ্কার, টাকার শক্তি সম্বন্ধে একটা অতি উচ্চ অপ্রাকৃত ধারণা তার জীবনে বহু অশান্তি এনেছে, তাকে বেঁধে মেরেছে। অথচ এ টাকার সে কাউকেই আপন করতে পারে নি। যে কিছুটা আপন হয়েছিল—সে সুরেন তার এক কপর্দকও আশা করেনি, নেয়নি। ভোলা যে আপন হয়েছে তার পিছনে একটু স্নেহ একটু উৎসাহ ছাড়া সে প্রায় কিছুই খরচ করেনি।

শুনেছে আগে নাকি চন্দননগরে—ফরাসীদের রাজত্ব ছিল, তখন কেউ মাতলামি বা অন্য কোন ঐ ধরনের অপরাধ করলে 'তুড়ুম ঠুকত'। একটা তেকোণা কাঠের বেড়িমতো ফ্রেম গলায় পরিয়ে হাতটা ওপরে বেঁধে দিয়ে ঐ কাঠের ফ্রেমের তিনটে কোণ থেকে তিনটে পাথর বা লোহা ঝুলিয়ে তাকে রাস্তা দিয়ে হাঁটানো হ'ত, প্রতি পদে ঐ পাথরগুলো এসে হাঁটুতে লাগত, অথচ বেচারীরা থামতেও পারত না, চলতেই হ'ত। যত আস্তে যত সাবধানেই চলুক না কেন—ঐ আঘাত থেকে অব্যাহতি ছিল না। তা ওরও এই সম্পত্তি চিরদিন পদে পদে তাকে আঘাতই দিয়ে যাচ্ছে—রেহাই পায়নি একটি মুহূর্তও।

এতদিনে ভুল ভেঙেছে—আর দেরি করবে না সে।

এবার সে ছুটি নেবে। নিঃস্ব, রিক্ত হবার পরম শান্তি উপভোগ করতে চায় সে। তার জীবনে এ হবে এক অভিনব অভিজ্ঞতা।

শুরু করল এক অদ্ভুত ব্যাপার দিয়ে।

ভোলার সঙ্গে কথা হওয়ার পরের দিনই সে পাড়ার পণ্ডিতমশাই জ্যোতি কাব্য-তীর্থকে ডেকে পাঠাল। কোন মেয়ে-ইস্কুলে পণ্ডিতি করেন ভদ্রলোক, অবসর সময়ে কিছু কিছু যজমানিও করেন, তবে সে খুব সীমাবদ্ধ ক'টি ঘরে। তাঁকে দিয়ে দু'-একটা কাজ করিয়েছে হেমন্ত, অক্ষয়-তৃতীয়ার কলসী উৎসর্গের ব্রত ইত্যাদিতেও তাঁকেই ডেকেছে। বিশুর পৈতেও দিয়েছে।

তাঁকে ডেকে ভোলার বিবাহের একটা দিন দেখতে বলল, খুব তাড়াতাড়ি কাজটা সারতে চায় সে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। শমন শিয়রে তার—শিয়রে বলা বোধহয় ভুল, পায়ে ধরেছে তার, চলৎশক্তি রহিত ক'রে দিয়েছে প্রায়। সময় আর মোটে নেই। এখন ওর যা জ্ঞাতব্য—পণ্ডিতমশাই এ-বিয়ে দেবেন কি?

পণ্ডিতমশাই লোভ ও সংস্কার দুইয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ দোল খেয়ে বললেন, 'না-ই বা দিলুম মা। আমি বরং অন্য ভাল লোক দেখে দিই—?'

'দিলেনই বা!' হেমন্তর শানিত কণ্ঠ যেন ও'র গলায় কেটে কেটে বসে।

'আপনি যত বিয়ে দিয়েছেন পণ্ডিতমশাই, সকলেরই কি ঠিকুজি-কুলজী উলটে দেখতে গিছলেন—তারা সবাই বৈধ সন্তান কিনা? না তাদের সকলের বাপ-মার বিয়েতে আপনি উপস্থিত ছিলেন?...পণ্ডিতমশাই দিন-কাল বড় আজব পড়েছে—আপনিও মেয়ে, ছেলে, নাতি-নাতনী নিয়ে ঘর ক... আপনার নাতি বা নাতনী যে জাতে ... করবে তা আপনি জোর করে বলতে পারে... আপনার পাশের বাড়িতেই তো শু... সেদিন বদ্যির ছেলের সঙ্গে শুঁড়ির মে... বিয়ে হয়েছে!'

পণ্ডিতমশাই ভাঙেন তবু মচকান ... কাষ্ঠ হাসি হেসে বলেন, 'না, সে ... কাজের কথা নয়। তবে আপনি বল... যখন—তখন দেব।'

'তাহলে দিন দেখুন একটা। আর এ... কথা, খুব গরিবের মেয়ে। পয়সার ... বিয়ে হচ্ছে না, এমন আপনার সং... আছে? যথার্থ দুঃস্থ? মানে টাকা ... বিয়ে হয় এমন? তাহলে—যদি এর ... মানে এই মাসখানেকের মধ্যে বিয়ে ... করতে পারে—খরচা যা লাগে আমি দোব!'

কথাটা নিচেরতলার ভাড়াটে মহ... আশ-পাশেও বলে দেয় সবাইকে।

অনেকেই হাঁক-পাঁক করে, কিন্তু ... পর্যন্ত তিনটির বেশী পাকা সম্বন্ধ পা... যায় না। এমন আবুহোসেনী খেয়া... জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না, যারা ... দরিদ্র, তারা কেউ মেয়ের পাত্র খোঁজও ... না—দৈবের ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে থা... যে তিনটি পাওয়া গেল—তিনজ... পাত্রী ও পাত্রপক্ষকে ডাকিয়ে দেনা-পা... হিসেব নিকেশ ক'রে পুরো খরচা ... দিল, মায় সম্ভাব্য তত্ত্ব-তাবাশের ... শুদ্ধ।

যত তাড়াহুড়ো করুক, দেড় মাস ... লেগে যায় সব গুছিয়ে নিতে।

অনেক কাজ সারতে হয়েছে এর ম...

রমার মাকে ও ভোলাদের বাড়ি দা... লেখাপড়া ক'রে দিয়েছে। ওদের বিয়ের ... কাজ উৎসব সারা হয়ে গেছে। এক... চেয়ারে ক'রে তেতলায় উঠে ওদের সংস... কাটিয়েও এসেছে। রমাকে দিয়ে রাঁ... সেখানে বসে খেয়েছেও সেদিন ওদের সং... গুছিয়ে দিতেও কম সময় লাগে... আগেকার দিন হলে নিজেই রিকশা ... সমস্ত শহর চষে ফেলত, এখন কিন্তু ... ভোলার শরণাপন্ন হতে হয়। এবং ... স্বভাবতই ভোলার একটা ... সেজন্যে লোক ডাকিয়ে এনে বাড়িতে ... ফরমাশ দিতে হয়। মনের মতো ... দেখে নিতে পারে না বলে ছটফট ... সময়ও লাগে।

খাট বিছানা, আলমারি, ড্রেসিং টেব... বসার চেয়ার, সোফা, বাসন, নাইটসেফ—... ছাড়া গহনা। খুব আতিশয্য করেনি ... ঐশ্বর্যের শেকল আর কাকেও পরাবে ... মড়োয়া গহনা একখানিও দেয়নি—তবু ... সাজানো সবরকম—সেও তো কম নয়।

ভোলা বলেছিল, 'বাসন-কোশন ... তোমারই একগাদা রয়েছে। এত ছিষ্টি খর... করছ কেন—মিছিমিছি?'

তাতে হেমন্ত জবাব দিয়েছে, '... তো প্রথম খরচ ক'রে সুখ হচ্ছে রে। তাছা... —সবই পড়ে থাকবে, আমি চলে গেলে ...

কিছু রাখতে চাস রাখিস। তবে আমি বলি কি, আমার কোন জিনিস নিয়ে দরকার নেই। অবশ্য স্মৃতি হিসেবে যদি রাখতে ইচ্ছে হয়—যা খুশি রাখিস, সব রাখলেও ক্ষতি নেই। তোর যা ইচ্ছে হয় করিস।'

মুনিয়ার নামে দু-হাজার টাকা পোস্ট-অপিসে জমা ক'রে দিয়েছে। বলে দিয়েছে এটা তোর অসুখের জন্যে রইল—যদি এতেও না কুলোয়, ছেলে তো রইলই, ছেলে দেখবে। মনে হয় এতেই তোর চলে যাবে।'

আরও একটা ব্যবস্থা সে ক'রে দিয়েছে মুনিয়ার, বৃন্দাবনে একটি মঠে হাজার-তিনেক টাকা দিয়ে লেখাপড়া করিয়ে নিয়েছে—যতদিন মুনিয়া বাঁচবে তাঁরা একটা ঘর দিয়ে রাখবেন এবং দুবেলা প্রসাদ দেবেন। সব ব্যবস্থা ক'রে মঠের লোকের সঙ্গে মুনিয়ার মোকাবেলা করিয়ে মুনিয়াকে বলে দিল, 'তাই বলে তোকে জোর ক'রে পাঠাচ্ছি না—যখন খুশি, যতদিন খুশি এসে ছেলের কাছে থাকিস, তবে তুই তো বৃন্দাবনে থাকতে চেয়েছিলি—সেই জন্যেই পাকা বন্দোবস্ত করে দিলুম। আর কি জানিস, বেটা-বৌয়ের সংসারে চিরদিন না থাকাই ভাল। ওতে বড় অশান্তি হয়। মাঝে মাঝে আসবি, আদর খেয়ে চলে যাবি সেই ভাল।'

আরও কিছু কিছু খুচরো খয়রাতের কথাও মনে ছিল তার। এই দু-বাড়ির নিচের তলার যত দরিদ্র ভাড়াটের দল, আশ-পাশের কিছু-কিছু হতভাগ্য গৃহস্থ; বাকী যা কিছু থাকবে—উকীলের প্রাপ্য এবং আইনের খরচা বাদে—শহরের কটি হাসপাতালে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে। অযোধ্যার এক হাসপাতাল এসে ধরেছিল এই দান-ছত্রের খবর পেয়ে—তাদেরও কিছু টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করল—তারা তারক আর কমলাক্ষের নামে দুটি ব্লক ক'রে দেবে সেখানে।

তবে এসব হিসেব-নিকেশ লেখা-পড়ায় কিছু সময় লাগবে। অতদিন থাকবে না সে। প্রতি রাত্রেই বৌকে সেখানে ফেলে ভোলা এ-বাড়ি এসে শোয়—কারও কোন কথাই শোনে না। এতে আনন্দও যতখানি, দায়িত্বও সেই পরিমাণে বেশী। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটি দেওয়া ও নেওয়া দরকার। বিয়ের চার-পাঁচটা আর অষ্টমঙ্গলার দিন ভোলা থাকতে পারেনি হেমন্তই দেয়নি থাকতে—ও নিজেই বলে। 'মড়া আগলে বসে থাকা'—কিন্তু সেই কটা দিনেই যে অসহায় ভাব বোধ করেছে সে, মনের কোন গোপন প্রকোষ্ঠে একটা ক্ষতি-বোধের বেদনা ও অকারণ সূক্ষ্ম একটা অভিমান—তার পর আর নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছে না। দ্রুত সরে যেতে হবে তাকে যত দ্রুত হয়। সই-সাবুদ সব ক'রে দিয়েছে, এখন যেটুকু কাজ বাকী আছে—উকীল করবে। ঠিক ঠিক করে কিনা দেখবার ভার রইল ভোলার ওপর। একটা আম-মোক্তার-নামাও ক'রে দিয়েছে ভোলার নামে—যদি কোন দরকার পড়ে শেষ মুহূর্তে। আর, সব ফেলে মুক্ত হয়েই যখন যাচ্ছে—তখন পেছনে কী হ'ল তা দেখার অত মাথা-ব্যথাও নেই।

এবার যাত্রার পালা।

ভোলাকে বলে, 'অতুলকে তো সব বলাই আছে। একটা টেলিগ্রাম ক'রে দে এবার, যত তাড়াতাড়ি পারে যেন এসে নিয়ে যায়।'

'দাঁড়াও ভট্টাচার্যিতশাইকে পাঁজি দেখতে বলি—দিন দেখি।'

'দূর বোকা। আমি যাবো তার আবার দিনক্ষণ কি। মরতেই তো যাচ্ছি। মরার যাত্রা তো গাল নেই।'

'মরার বাড়াও গাল আছে বৈকি। একটা য়্যাকসিডেন্ট হয়ে যদি হাত-পা ভেঙে পড়ে থাকো—কী প্যারালিসিস হয়—তখন?...না না, অদিনে অক্ষণে যাওয়া হবে না।'

'ঐ ক'রে তুমি যাওয়াটা পিছিয়ে দিতে চাইছ, না? সে ওষুধও আমার আছে। পাঁজী দেখতে ভটচার্যিকে ডাকতে হবে না। দিন আমিই দেখে নিচ্ছি। আমি জানি—'

'কিন্তু অতুলবাবুকেই বা আসতে লিখছ কেন? বুড়োমানুষ আবার এত দূরে—?'

'সে-ই তো নিয়ে যাবে রে!'

'সে কিসের জন্যে নিয়ে যাবে। আমিই যখন যাচ্ছি, তখন আর তাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?'

'তুই কোথায় যাবি?' হেমন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'না না, দরকার নেই। সে-ই আসবে বলেছে—মিছিমিছি—'

'উ-সব বাত ছোড় দাও মাজী।...সো নেহি হোগা। আমি গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব—এক বাত। নইলে যাওয়া হবে না।' ভোলাও দৃঢ় স্বরে বলে।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে হেমন্ত। অতুলকে আসতে বলা মানে তার খানিকটা খরচান্তও বটে। এ গাড়ি ভাড়াও সে নেবে না। নিভাকে লিখেছিল যে, 'কিছুই কি নিয়ে যাবো না? শ্রাদ্ধের খরচটা অন্তত রাখা?' তাতে সে উত্তর দিয়েছে, 'শ্রাদ্ধ আমরা যেমন পারি তেমনিই করব—তার জন্যে তোমার টাকা লাগবে না। কটা তোমার উপযুক্ত বেটা আছে শুনি যে দানসাগর কি বৃষোৎসর্গ করতে হবে? যতটুকু যা হওয়া দরকার—আশা করছি সেটুকু করতে পারব।' সুতরাং অতুলের গাড়ি ভাড়া যে সে নেবে না এও জানা কথা।

সে বলল, 'বেশ, তুই-ই চ সঙ্গে। তবে একটা কথা—তুই হাওড়া থেকে তাদের হাতে সঁপে দিয়ে চলে আসিস। এটা আমার হুকুম।...সেখানে—সেখানে কেমন ঘর-বাড়ি, কী অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়ব—সে তোর না দেখাই ভাল। মিছিমিছি হয়ত দুঃখ পাবি। আর সেখানে যদি তেমন ভাল না লাগে, তুই চলে আসার সময় আমারও কষ্ট হবে, ছাড়তে ইচ্ছে করবে না।...কী লাভই বা সে অবধি না-ই গেলি!'

ভোলা যেন হঠাৎ বড় বেশী নির্বাক হয়ে যায়। প্রাণপণে গঙ্গার দিকে চেয়ে থেকে শুধু বলে, 'আচ্ছা, তাই হবে।'

তা বলে যে ঠিক এমন কাণ্ড করবে, তা' কে জানত।

ট্রেন থেকে নামতে অতুল নিভা, নিভার দুই ছেলে যখন এসে প্রণাম করছে, কুশল প্রশ্ন ইত্যাদিতে কয়েক মিনিট ব্যস্ত থাকবে হেমন্ত—এ-তো স্বাভাবিকই। তার পরই এদের সঙ্গে পরিচয় করাতে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে আর ভোলাকে দেখতে পেল না। মালও নামানো হয়নি গাড়ি থেকে—ভোলা কোথায় গেল? প্রথমটা ভেবেছিল বাথরুমে গেছে হয়ত, কি এদিক-ওদিকে কী কাজে গেছে, কিন্তু বেশ খানিকটা অপেক্ষা করেও তার দেখা পাওয়া গেল না, প্ল্যাটফর্ম ক্রমশঃ জনবিরল হয়ে এল।

এরা সকলেই বিস্মিত, উদ্বিগ্নও।

নিভার ছোট ছেলে বলল, 'কী রকম দেখতে—মানে মোটামুটি—বলুন না। তাহলে খুঁজে দেখি।'

হেমন্ত তখন একটা বাক্সর ওপর বসে পড়েছে।

অকস্মাৎ আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে পা-দুটো। বুকটাও বড় খালি-খালি, কেমন যেন কাঁপছে—

সে চোখ বুজেই অবসন্ন কণ্ঠে বলল, 'না ভাই। তাকে আর খুঁজে লাভ নেই। চলো আমরা চলে যাই—'

নিভা একটু অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে?'

হেমন্ত বিশ্বাসঘাতক চোখদুটোকে সামলাতে না পেরেই বোধহয় চোখের পাতা বুজে বসেছিল প্রাণপণে, এখন হাসির একটা চেষ্টা ক'রে আস্তে আস্তে উত্তর দিলে, 'ওকে বলেছিলুম হাওড়া থেকেই তুই ফিরে আসিস, ওদের জিম্মে ক'রে দিয়ে—ওদের বাড়ি পর্যন্ত তোকে নিয়ে যাবো না—সেই জন্যেই, সেই অভিমানেই বোধহয় সরে পড়েছে।'

তারপর আরও আস্তে কতকটা যেন আপন মনেই বললে, 'কিম্বা—কিম্বা বলে কয়ে যেতে পারবে না বলেই; তোদের সামনে অতবড় ছেলেটা চোখের জল ফেলে ব্যাভ্রম হতে চায় না—। কিম্বা আমাকেই কষ্ট দেতে চায়নি।...তো ভালই তো। ভালই করেছে। এ-ই ভাল হ'ল।'

তারপর—ঈষৎ উৎসুক, কেমন যেন ছেলেমানুষের মতোই নিভাকে বলে, 'সেই ঠিকানাটা তোকে লিখে পাঠিয়েছিলুম, রেখে দিয়েছিস তো, যত্ন করে? আমি ম'লে ওকে অতি অবশ্য খবরটা দিস। আমি কাশীতে বসে কথা দিয়ে এসেছি—বাক্যদত্ত।'

বলে নিজেই উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা ক'রে অভ্যাসমতোই হাতটা বাড়ায়—ভোলাই প্রয়োজন বুঝে চট ক'রে এসে ধরে তোলে। তাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে দীর্ঘকাল—এখন সে অবলম্বন না পেয়ে বসে পড়ে আবার।

আবারও আপন মনেই বলে, 'বেশ করেছে। ভালই করেছে। এই ভাল হ'ল।'

—শেষ—

পুরাতত্ত্বের সন্ধানে

প্রণব রায়

বর্তমানে ভারত-তথা বাঙলার প্রাচীন সংস্কৃতি ও পুরাতত্ত্বের প্রতি জনসাধারণের নতুন করে এক শ্রদ্ধাবোধ জেগে উঠছে। পশ্চিম বাঙলা তথা বর্তমান বাঙলাদেশের নানাস্থানে অনুসন্ধান করে আজ পাওয়া যাচ্ছে অনেক দুষ্প্রাপ্য পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। বাঙলার অনেক দুর্গম অঞ্চলে যে-সব স্থানে মানুষ কখনও কল্পনাই করত না যে এসব স্থানে প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য কিছু পাওয়া যেতে পারে সে-সব স্থান থেকেও আজ পাওয়া যাচ্ছে হাজার, দেড় হাজার বা তারও আগের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত চেতুয়া পরগণার পান্নাগ্রামের উল্লেখ করা যেতে পারে। পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ এরূপ একটি গণ্ডগ্রামে দেড় হাজার বছর আগের মাটির তৈরী যে-সব বস্তু একটি পুকুর খুঁড়ে উদ্ধার করেছেন তা থেকে জানতে পারা যায় যে—এ অঞ্চলে ঐ সময় বা তারও আগে থেকে এক সুসভ্য জাতি বাস করত। শিলাই নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত এ গ্রামটিকে দেখলে আজ কিছুতেই একথা মনে হ'বে না। আজ এ গ্রামে পৌঁছবার মতো একটিও ভালো রাস্তা নেই. আর যানবাহনের প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো—গরুযানই যেখানে চলতে চায় না, সেখানে অন্য যানের কোন কথাই উঠতে পারে না। আর পান্নার যে পুকুর থেকে গুপ্তযুগের যে-সব পুরাতন মূর্তি ও জিনিষ উদ্ধার করা হয়েছে সে পুকুরটিকে এখন দেখলে একথা একেবারে অবিশ্বাস্য ব'লে মনে হ'বে। পাড়াগাঁয়ের এরকম শত-শত পুকুর দেখতে পাওয়া যায়—তাদের মধ্যে এটিকে আদৌ অসাধারণ ব'লে মনে হ'বে না। চারপাশে মাঠ আর মাঝখানে পান্নাগ্রামটি বর্ষায় যে কীরূপ দুর্গম ও বিপজ্জনক হ'য়ে ওঠে তা শহরের অট্টালিকায় বসে কল্পনাই করা যাবে না। বর্ষায় যেখানে নৌকো ও ডিঙি ছাড়া যাওয়াই যায় না, অন্য সময় যেখানে যেতে হলে মেঠো রাস্তা ছাড়া উপায় নেই, সে স্থান থেকে কী করে যে সুন্দর সুন্দর মাটির মূর্তি ও নানান জিনিষ বেরুল তাতে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। আবার উপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে জানা গেছে সে-সব জিনিষ গুপ্তযুগ বা তারও বেশী পুরানো। পান্নার এ আবিষ্কারের কথা আজ হয়তো অনেকেই জানেন। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এ-থেকে সমৃদ্ধিশালী ও সুসভ্য এক জাতি বহু প্রাচীনকাল থেকেই যে এ অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করেছেন তা আজ অনুমান করতে পারেন।

পান্নার মতো এমন শত-শত গ্রাম বাঙলা দেশে আজও অবহেলিত হয়ে পড়ে রয়েছে। অবশ্য কোন কোন্ গ্রাম গবেষকদের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলে বিস্মৃতির দুর্ভেদ্য অন্ধকার থেকে তার অতীতের সমৃদ্ধি ও সভ্যতার অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন নিয়ে আজ উপস্থিত হয়েছে বর্তমান মানুষের কাছে। মহেঞ্জো-দোড়ো ও হরপ্পার কথা এ প্রসঙ্গে না হয় বাদই দিলাম। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেই হরিনারায়ণপুর (হাওড়া), পাণ্ডুয়া (বর্ধমান) বেড়াচাঁপা (২৪-পরগণা) প্রভৃতি গ্রামে খননকার্য চালিয়েও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সুপ্রাচীন বহু নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। কোন কোন স্থানে শীলমোহর বা স্বর্ণমুদ্রার মতো বহু দুর্লভ জিনিষেরও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যা থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা যায়।

পান্না, হরিনারায়ণপুর, পাণ্ডুয়া বেড়া-চাঁপা প্রভৃতি গ্রামের মতো বাঙলার অগণিত গ্রাম যেগুলি এখনও পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারের দ্বারা খ্যাতিলাভ করেনি, তাদের মধ্যে কিছু কিছু স্থান অনুসন্ধান করলে হয়তো এমন অনেক পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন মিলতে পারে। পল্লীর পথে, প্রান্তরে, হয়তো বা কোন গাছতলায়, প্রাচীন ভাঙা মন্দিরের এক কোণে এরকম বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যাঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন তাঁদের সহজেই চোখে পড়বে। পাথর, পোড়ামাটি বা মাটির তৈরী এসব মূর্তি বা নিদর্শনের প্রাপ্তিস্থান অনুসন্ধান করলে হয়তো, আরও অনেক গ্রামের নাম জানতে পারা যাবে, খননকার্যের দ্বারা যেখান থেকে হয়তো আরও অনেক মূল্যবান বস্তু আবিষ্কৃত হতে পারে।

হাজার, দেড় হাজার বা তারও আগের প্রাচীন নিদর্শনগুলির কথা বাদ দিলেও আজ থেকে একশো, দুশো বা চারশো বছর আগে আমাদের দেশের ঘরে ঘরে যে-সব জিনিষের ব্যবহার চ'লতো তা আজকের মানুষের কাছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে। এমন কি সে-সব জিনিষের নাম ও কোন্ ব্যাপারে তাদের ব্যবহার হ'ত সেকথাও মানুষ আজ ভুলে গেছে। যখন আমাদের দেশে মুদ্রণ-যন্ত্র ছিল না, ছাপার অক্ষরে যখন বই পাওয়া যেত না, তখন আমাদের দেশের জ্ঞানী-গুণীরা যে পুরু তুলট কাগজে লেখাপড়ার কাজ করতেন, কোন জনপ্রিয় কাব্য বা রচনা হাতে-হাতে লিখে কিভাবে ঘরে-ঘরে প্রচার লাভ করত, আজকালের সাধারণ মানুষ হয়তো সেকথা চিন্তা করে আশ্চর্য হবেন। আজ তাই 'পুঁথি' কাকে বলে জিজ্ঞাসা করলে অল্প সাধারণ মানুষের কাছে হয়তো পুঁতির মালার কথা মনে হবে—আবার যারা এঁদের থেকে আর একটু এগিয়েছেন, তারা হয়তো পুঁথি বলতে পুজো বা মন্ত্র-পড়ার বইকেই বুঝবেন। কিন্তু শত-শত সংস্কৃত ও বাঙলা কাব্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলায় পুরু তুলট কাগজ বা তালপাতায় যে রচিত হ'ত তার কথা তাঁদের হয়তো মনে আসবে না। একশো দুশো বছর আগের কুপা, তাঁবি প্রভৃতি জিনিষগুলির সঙ্গে আমাদের পূর্ব-

চেতুয়া বাসুদেবপুর গ্রামের পটীদার সম্প্রদায়ের অঙ্কিত পটশিল্প

পুরুষেরা পরিচিত ছিলেন। আজ আমরা সেগুলি কি তা হয়তো অনেকে ভুলে গেছি। কিন্তু যাঁরা আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি কৌতূহলী ও শ্রদ্ধাশীল, তাঁদের কাছে এসব জিনিষের এক বিশেষ মূল্য আছে। সৌভাগ্যের বিষয় বাঙালী গবেষকদের মধ্যে আজ এগুলি সম্পর্কে এক দারুণ কৌতূহল দেখা যাচ্ছে, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টা ও যত্নে গড়ে তুলেছেন এক-একটি সংগ্রহশালা বা মিউজিয়ম। শহরে-নগরে সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগে গঠিত সংগ্রহশালা বা মিউজিয়ম অনেক দেখতে পাওয়া যায়। আবার ব্যক্তিগত সংগ্রহশালাও আছে, যেমন ক'লকাতার গুরুসদয় মিউজিয়ম। এসব সংগ্রহশালা সাধারণতঃ কোন সংস্থা বা সরকারী সাহায্যে পুষ্ট। কিন্তু গ্রাম-বাঙলার অনেক স্থানে যেখানে কোন প্রচারের ব্যবস্থা নেই, সরকারী বা বেসরকারী সাহায্যে আশা না করেই কোন বিশেষ ব্যক্তির জীবনব্যাপী চেষ্টায় কিছু কিছু সংগ্রহশালা যে আজ গড়ে উঠেছে, গ্রামের খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা আজ তা দেখতে পাবেন। বর্তমান প্রবন্ধে এ-ধরণের একটি উল্লেখ্য সংগ্রহশালার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

সংগ্রহশালাটির নাম হ'ল, 'ভারতচন্দ্র স্মৃতি কেন্দ্র' নামটির সঙ্গে অনেকের পরিচয় না থাকলেও, বাঙলাদেশের অনেক খ্যাতনামা লেখক, পুরাতাত্ত্বিক ও শিল্পী মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার চেতুয়া বাসুদেবপুর গ্রামে এ সংগ্রহশালাটি দেখে এসেছেন। এটির প্রতিষ্ঠাতা হ'লেন প্রবীণ সাহিত্যিক ও গবেষক, মহাকবি রায়-গুণাকর ভারতচন্দ্র বংশীয় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ জ্যোতির্বিনোদ মহাশয়। এ সংগ্রহশালাটি তাঁর বাড়ীর একটি ঘরে অবস্থান করলেও পুরাতত্ত্বপ্রেমী স্বর্গত ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন এটির ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। শ্রীযুক্ত কাব্যতীর্থ মহাশয় শৈশবকাল থেকেই পুরাতত্ত্ব, পুঁথিপত্র ও মন্দির-মঠ-মসজিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। অতি অল্প বয়স থেকেই এ-সব নিয়ে গবেষণা ও লেখায় তিনি নিজেকে সমর্পিত করেছেন। এ-সবের অনুসন্ধানের জন্যে বাঙলাদেশের (বিশেষ করে পশ্চিম বাঙলার) গ্রামে গ্রামে পায়ে হেঁটে ঘুরে তিনি সংগ্রহ করেছেন এমন অনেক দুর্লভ বস্তু যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও মূল্য খ্যাতনামা সংগ্রহশালায় রক্ষিত বস্তুর তুলনায় কোন অংশে কম নয়। শ্রীযুক্ত কাব্যতীর্থ মহাশয় শুধু বাঙলাদেশ ঘুরেই এসব সংগ্রহ করে আনেন নি, সারা ভারত তিনি পর্যটন করেছেন এবং হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিখ্যাত ও দ্রষ্টব্য স্থান থেকে অনেক প্রাচীন নিদর্শন তাঁর সংগ্রহশালায় পরম সমাদরে স্থান দিয়েছেন। তাঁর সংগ্রহশালায় কয়েক লক্ষ বছরের পুরানো পাথর থেকে শুরু ক'রে ঊনিশ শতকের শেষদিকের একটি ছোট্ট দোয়াতও স্থান লাভ করেছে। তাঁর মত হ'ল কয়েক লক্ষ বা কয়েক হাজার বছর আগের দুষ্প্রাপ্য বস্তুও যেমন আমাদের কাছে মূল্যবান, তেমনি গত বা তৎপূর্ব শতকে বহুল ব্যবহৃত দ্রব্যগুলি যা আজ অনেকের বিস্মৃতির দ্বারে উপস্থিত হয়েছে তাও উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করে রাখতে হ'বে যাতে ভাবিকালের লোকেরা এদের বিষয় ভুলে না যায়। এদিক থেকে শ্রীযুক্ত রায়ের এ সংগ্রহশালাটি অন্যান্য সংগ্রহশালা অপেক্ষা যে অভিনব ও তাৎপর্যপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে দূরদৃষ্টি নিয়ে তিনি এ সংগ্রহশালাটিকে গড়ে তুলেছেন, তা' যে প্রশংসনীয় হ'বে তাতে সন্দেহ নেই।

শ্রীযুক্ত রায়ের এ সংগ্রহশালাটির মোট চারটি বিভাগ আছেঃ (১) ন্যায়ভূষণ পুঁথিঘর (২) সুরেনাথ সংগ্রহশালা (৩) সতীশচন্দ্র গ্রন্থাগার ও (৪) যাজ্ঞসেনী বস্তুভাণ্ডার। ন্যায়ভূষণ পুঁথিঘরের নামকরণ করা হয়েছে শ্রীযুক্ত রায়ের প্রপিতামহ ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধের বিখ্যাত নৈয়ায়িক উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের স্মৃতিতে। ন্যায়ভূষণ মহাশয় ছিলেন চেতুয়া-বাসুদেবপুর গ্রামেরই অধিবাসী। তাঁর সংগৃহীত ও স্বহস্তলিখিত বহু পুঁথি ছিল। সেকালে ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের টোলের ছাত্রেরা এসব পুঁথি থেকে পাঠ নিতেন। বর্তমান সংগ্রহশালায় ন্যায়ভূষণের কিছু কিছু পুঁথি ও শ্রীযুক্ত রায়-সংগৃহীত অনেক পুঁথি আছে। ন্যায়ভূষণ মহাশয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কিছু পূর্ববর্তী ছিলেন। তবে ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা-বিবাহ ইত্যাদি আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বাসুদেবপুর গ্রামে খ্যাতনামা এই পণ্ডিতের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হয়েছিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের আগে থেকে ঈশ্বরচন্দ্র যখন বিধবা-বিবাহ আন্দোলন সুরু করেন, তখন তিনি ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের মতামত চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। ন্যায়ভূষণ লিখিত ঈশ্বরচন্দ্রের পত্রের উত্তর আজও শ্রীযুক্ত রায়ের সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত রয়েছে। এটিকে ঊনিশ শতকের একটি মূল্যবান দলিল বলে মনে করা যেতে পারে। এবিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছে আছে। সে-যুগে পণ্ডিত ন্যায়ভূষণ মহাশয় নিজের বাড়ীতে বারোজন ছাত্রকে প্রতিদিন আহার বাসস্থান দিয়ে বিদ্যা-দান করতেন এবং নিজের হাতে চাষবাস করতেন। ক'লকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্বর্গত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের টোল দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। অধ্যক্ষ মহেশ ন্যায়রত্ন মহাশয় ছিলেন ন্যায়ভূষণের ও দাসপুর থানার অধীন নিমতলা-রসিকগঞ্জ নিবাসী অধ্যাপক ঠাকুরদাস চূড়ামণির ছাত্র। তাই, "আপনার আদিম শিক্ষাগুরুযুগলের প্রেরণায় পাশ্চাত্য-পণ্ডিতকুলকে প্ররোচিত করিয়া সমগ্র ভারতে আবার সংস্কৃত পঠন-পাঠন, পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রচলন ও মহাপণ্ডিতগণের উৎসাহবর্ধক মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রবর্তন করিয়া

সেকালের নকসা করা খাল চিত্রস্বত্ব : আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা
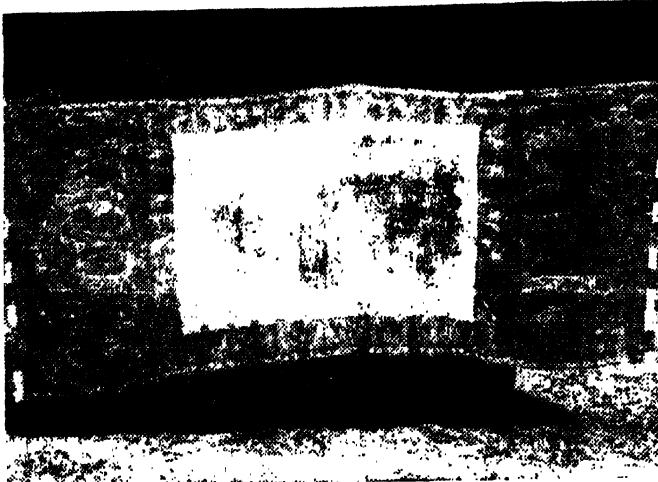
সংস্কৃতী ভারতীয় কৃষ্টিকে বাঁচাইয়া রাখেন। তাঁহার আদর্শের অনুসরণে নিখিল ভারতের সকল প্রদেশেই আদ্য, মধ্য ও উপাধিশ্রেণীর পরীক্ষাসমূহের প্রচলন হয়। কলিকাতা সংস্কৃত সমিতির সাতান্নটি শাখাও ভারতের নানা স্থানে স্থাপিত হয়। ইংরাজপুঙ্গব মেকলের ভাববিজয় (Cultural Conquest) এই-রূপে অনেকাংশে ব্যাহত হয়। Bengal Education Code-এ Sanskrit Teaching সম্বন্ধে নিয়মাবলী সম্বলিত একটি পরিচ্ছেদ নিবদ্ধ করা হয়। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র সমগ্র বঙ্গদেশ—তৎকালীন বিহার, উড়িষ্যা, আসাম সমেত পরিভ্রমণ করিয়া সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, উহাদের অধ্যাপক ও অধ্যাপনা-পদ্ধতি এবং ছাত্রগণ সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধানের ফল "A Report on the Tols of Bengal" নামক পুস্তকে সন্নিবদ্ধ করেন। উহা ইংরাজী ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়। এই বিবরণটি ভারতের পূর্বাংশের তৎকালীন সংস্কৃত শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচক একখানি প্রমাণ্য ইতিহাস।...ঐ বিবরণীকে serial No 716 কলমিজোড়বাসী অধ্যাপক লক্ষ্মণ শিরোমণির গুরুরূপে উদয়চন্দ্রের নাম আছে।'১ পণ্ডিত উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণের পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ মনীষার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে তাঁরই সুযোগ্য বংশধর শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় তাঁর সংগ্রহশালার পুঁথি সংগ্রহের নামকরণ করেছেন 'ন্যায়ভূষণ পুঁথিঘর'। এ পুঁথি-ঘরে রক্ষিত উল্লেখযোগ্য পুঁথি সম্পর্কে পরে আলোচনা করব।

'ভারতচন্দ্র কৃষ্টি কেন্দ্রের' সুরনাথ সংগ্রহশালায় শ্রীযুক্ত রায় কর্তৃক সংগৃহীত বহু দুষ্প্রাপ্য পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহ আছে। এতে প্রাচীন প্রস্তরযুগের নিদর্শন থেকে শুরু করে, বিভিন্ন সময়ে নির্মিত প্রস্তরক্ষোদিত মূর্তি, প্রায় তিন-চারশো বছরের পুরানো নানাবিধ পট, বিভিন্ন সময়ের মুদ্রা, এমন কি এই শতকের গোড়ার দিকে তোলা শহীদ ক্ষুদিরামের মজঃফরপুর যাত্রার ছবি ও অরবিন্দ-বারীন্দ্রের কিশোর বয়সের ছবিও স্থান পেয়েছে। পণ্ডিত ন্যায়ভূষণের সুযোগ্য পুত্র সুরনাথ চূড়ামণির স্মৃতির উদ্দেশে সংগ্রহ-শালার নাম রাখা হয়েছে। ন্যায়ভূষণের ন্যায় সুরনাথও নিজের বাড়ীতে দৈনিক বহু ছাত্রকে অন্ন ও বিদ্যাদান করতেন। ইনি অল্পবয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ সংগ্রহশালাটির একটি বিবরণী পরে দিচ্ছি।

কৃষ্টি কেন্দ্রের তৃতীয় বিভাগ 'সতীশ-চন্দ্র গ্রন্থাগারে' বহু দুষ্প্রাপ্য মুদ্রিত প্রাচীন পুস্তক ও পত্রিকা সংরক্ষিত আছে। এদের মধ্যে প্রাচীন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও 'সাহিত্যসংহিতা'র নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্তের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'শালফুল' নামক একটি অধুনালুপ্ত উপন্যাসও এ গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া বাসুদেবপুর গ্রামের জনকয়েক প্রাচীন গ্রন্থ-রচয়িতার পুস্তকও এখানে আছে। এসব গ্রন্থ আজ আর কোথাও পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে 'সাহিত্যসংহিতা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' গবেষকদের কাছে খুবই মূল্যবান বলে মনে হবে। শ্রীযুক্ত রায়ের পিতৃদেব স্বর্গত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ঐ অঞ্চলে সে সময়ে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সদ্গুণের অধিকারী, পরোপকারক ও দেশ-প্রেমী ছিলেন। বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্যে তিনি আজীবন চেষ্টা করে গিয়েছেন। এই সংশপ্তক সতীশচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে শ্রীযুক্ত রায় প্রতিষ্ঠিত এ গ্রন্থাগারটি অনুসন্ধিৎসু গবেষকের কাছে খুবই মূল্যবান।

ভারতচন্দ্র কৃষ্টিকেন্দ্রের চতুর্থ ও শেষ বিভাগটির নাম হল যাজ্ঞসেনী বস্তু-ভাণ্ডার। মাতৃদেবীর উদ্দেশে উৎসর্গিত এই বস্তুভাণ্ডারে বিভিন্ন অঞ্চলের কারিগর-দের তৈরী পিতল-কাঁসার অনেক বাসন এ বিভাগে রয়েছে। এগুলি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে মেদিনীপুর জেলার পিতল-কাঁসার আঞ্চলিক শিল্প-কর্মের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ধরনের অনেক শিল্পকর্ম আজ লুপ্ত। তাই এ শিল্পকর্মগুলির কিছু কিছু নিদর্শন এ বিভাগে সযত্নে সংগৃহীত রয়েছে।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'ভারতচন্দ্র কৃষ্টিকেন্দ্র' প্রাচীন ও নবীন বস্তুর এক আশ্চর্যজনক সংগ্রহশালা। সম্পূর্ণ একক পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় গড়ে-ওঠা এ প্রতিষ্ঠানটি হল বাঙালীমাত্রেরই গৌরবের। মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার সুপ্রাচীন নিদর্শনগুলি বা চন্দ্রকেতুগড়ের শীলমোহর বা স্বর্ণমুদ্রা নিঃসন্দেহে নগরের সুরক্ষিত যাদুঘরে বা সরকারী সংগ্রহশালায় দেশ-বিদেশের জ্ঞানীগুণী বিদগ্ধজনের মনোরঞ্জন করবে সন্দেহ নেই, কিন্তু ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও বাংলার পল্লীর ক্ষেত্র-প্রান্তরে অনেক পুরাবস্তু আজও অবহেলিত হয়ে পড়ে রয়েছে যেগুলির দিকে অবিলম্বে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হলে সেগুলি যে ভবিষ্যতে অবলুপ্ত হবেই তাতে সন্দেহ নেই। অথবা গ্রাম্যলোকদের অনেকের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে কোন অসাধু ব্যবসায়ী চড়াদামে বিদেশের বাজারে সেগুলি বিক্রী করে প্রচুর লাভ করবে। এ বিষয়ে পুরাতত্ত্বপ্রেমী স্বর্গত ডেভিড ম্যাককাচ্চন লেখককে একটি চিঠিতে যা লিখেছিলেন তার একটু অংশ এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করছি। এ চিঠিতে ভারতীয় শিল্প-কলার নিদর্শনগুলি অনেক সময় বিদেশে চলে যাওয়ায় তিনি গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন :

"I am appalled at the way Indian art is being carried overseas all the time". (Letter dated, Calcutta, 26th August, 1970)

ভারতীয় শিল্পকলার যা কিছু নিদর্শন আমাদের পুরাবস্তুর মধ্যে দেখতে পাই সেগুলির যথার্থ মূল্য যদি দিতে হয় তো সেগুলিকে উপযুক্তভাবে সংরক্ষিত করতে হবে। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় এদিক থেকে তাঁর অসামান্য নিষ্ঠা ও অত্যুজ্জ্বল আদর্শের যে নিদর্শন দেখিয়েছেন তা আশা করি সকলেরই প্রশংসা অর্জন করবে।

১ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় কাব্য-তীর্থ জ্যোতির্বিনোদ রচিত 'দাসপুরের ইতিহাস', পরিবর্ধিত সং ১৩৬৫ পৃষ্ঠা ৫-৬ ও ১৪।

।। তের ।।

সানুকে আজ একটু ব্যস্ত মনে হলো। খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতে সে উঠেছে। অবশ্য এতে এমন কিছু নতুনত্ব ছিল না। তার কারণ, বরাবরই তো সে সকাল সকাল উঠে। তবু আজকের সকালটা একটু অন্যরকম; অন্যরকম শুধু তার কাছেই নয়, সকলের কাছেই। মানুকে সে ডেকে তুলেছে, মার সঙ্গে ঘরের টুকটাক কাজ সেরেছে, চা করেছে, বিছানাপত্তর তুলেছে, ঘরদোর পরিষ্কার করেছে। তাকে বেশ খুশী খুশী দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছিল, মুখের ওপর থেকে বিষাদের ছায়াটা অনেক মিলিয়ে গেছে, আর কোনরকম গ্লানি বা মলিনতা নেই; থাকলেও তা স্পষ্ট নয়। মুখটা বহুদিন পরে আবার যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। ওর মাও কেমন অবাক হয়েছে, সানুর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কী যেন ভাবছে। নীলিমাদেবী ভাবলেন, যাক এতদিনে মেয়েটা আবার হাসতে পারছে। উঃ, দিন দিনই কিরকম শুকিয়ে শুকিয়ে ও কাঠ হয়ে যাচ্ছিল, বেঁচে থাকাটাই বুঝি তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল আর যেন নিতে পারছে না। মেয়েটা ভাবনায় ফেলে দিয়েছিল। দেখে মনে হচ্ছিল এতে সানুর যা শাস্তি সকলের চাইতে বেশীই পেয়েছে, তা নয়, তিনিও স্বস্তি বোধ করেছেন। তিনি এবার খানিকটা হালকা বোধ করলেন। মেয়েটার জন্যে তাঁর মনেও তো কম দুঃখ নেই! ওর কথা ভেবে তিনিও কাতর হয়েছেন, কত রাত দুশ্চিন্তায় যে ঘুম হতো না তাঁর! সানুর মুখের দিকে তাকাতে তাঁর কষ্টই হয়েছে।

মানু দিদির দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। কিছু বলল না।

ঘরের কাজ সেরে সানু বাইরে এলো। আজ আর তাকে ডাকতে হয়নি। মানুও সঙ্গে রয়েছে। খানিক আগে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে সব জায়গায়।

মানুর কাছেও একটু খটকা লেগেছে। দিদির আজ হলো কি! যাকে বলে বলেও বের করা যায় না, আজ সে নিজে থাকতেই বেরিয়ে পড়েছে। চোখমুখ আনন্দে ভরপুর। কিছুটা সে আন্দাজ করেছে। পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে মানু দিদিকে এক পলক দেখে নিল। হাসি গোপন রেখে সে ধীরে ধীরে শুধোয়, 'তোর কি ব্যাপার রে দিদি?'

কথার জবাব দিল না সানু। বোনের মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থাকল সামান্য। যতখানি সম্ভব মনের ভাবটাকে আড়ালে রাখবার চেষ্টা করছে সে। তবে কি ওরা ধরে ফেলেছে তাকে? প্রথম যেদিন সন্দীপকে সে এখানে দেখল, খুব চমকে উঠেছিল। কেমন একটু ভয়ও হলো তার। কিন্তু কাল ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে সানু যেন অনেক সহজ, স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। কোনরকম ভয় বা সন্দেহ থাকল না আর। বরং এক ধরনের আকর্ষণ বোধ করেছে সানু। এখানে এসেও একটু একটু করে যেমন করে সে তলিয়ে যাচ্ছিল, সন্দীপ এসে যেন তাকে বাঁচাল। তাকে বোঝার মতন, প্রশ্রয় দেওয়ার মতন সহৃদয় একজনকে এতদিন পরে আবার যেন ফিরে পেয়েছে সানু। এই প্রথম যেন সে বুঝতে পারল সন্দীপ যেভাবে তাকে ভালবেসেছিল, সানু তা পারেনি। বরং ওর দুঃখই সে বাড়িয়েছে। দেখে কেমন মায়া হলো তার। সন্দীপকে আরো কাছের ঘনিষ্ঠ মনে হলো সানুর। ওর মার কাছে যাওয়ার কেমন লোভ হলো তার। তিনি এখনও ওকে মনে করে রেখেছেন! আশ্চর্য! একবার দেখা না করলে যেন স্বস্তি নেই।

সানুর বুকের গভীর থেকে এক দীর্ঘশ্বাস উঠে এলো। পরে নম্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'হাঁরে মানু, মা কি জানে সন্দীপদারা যে এখানে এসেছে?'

মানু মুখ টিপে টিপে হাসল, একটু পরে বলল, 'হয়তো শুনেছে, সোনাদা হয় কিছু বলেছে মাকে।'

'তোকে কিছু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করেনি?' সানু ওর চোখে চোখে তাকাল, পরে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। তাকে এই মুহূর্তে সামান্য চিন্তিত ও উদাস উদাস মনে হলো।

'না।'

সানু সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না এবার। আরো কিছুক্ষণ কি ভাবল যেন, পরে বলল, 'আমার সঙ্গে যাবি এক জায়গায়?'

মানু অবাক চোখ করে দেখল একবার, বলল, 'কোথায়?'

সানু মৃদু হেসে জবাব দিল, 'সন্দীপদাদের ওখানে।' ওর গলায় এখন কোন রকম সংকোচ বা আড়ষ্টতা ছিল না।

মানু প্রথমটায় কি বলবে ঠিক করতে পারল না। ওখানে যাওয়ার ব্যাপারে তার কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। সন্দীপদাকে তার ভালই লাগে। অনেকদিন আগে মানু তখন আরো ছোট, সন্দীপদাকে নিয়ে বাড়িতে কেমন চাপা এক অশান্তি হয়েছিল। আসলে কথাটা দিদিই মার কাছে ফাঁস করে দিয়েছিল। তারপর থেকেই বাড়িতে উত্তেজনা, অশান্তি। অথচ দিদি আবেগে অনেক কথাই তাকে বলেছে, আর কাউকেই সে বলেনি। সন্দীপদার সঙ্গে দিদির একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ওকে তখন খুব খুশী খুশী দেখাত। মার কাছে না বললে হয়তো এমনটা হতো না। দিদির মুখটা তখন মেঘলা আকাশের মতন থমথমে থাকত। বাবাকে ভীষণ গম্ভীর রাগী দেখাত। মাও ওই সময়টায় দিদিকে খুব বকাবকি করেছে। ব্যাপারটা যে শেষ পর্যন্ত এরকম একটা বাঁক নেবে, ভাবতে পারেনি ওরা। দিদিটার মুখের দিকে তাকাতে খুব কষ্ট হতো তার! ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারত না, সন্দীপদা সম্পর্কে মা-বাবার এই বিরূপ মনোভাব কেন? দিদির কথাটা একবারও ভাবল না! দিদি রাত্তিরে ওর পাশে শুয়ে অন্ধকারে ফিস ফিস করে বলেছিল: আমি না একদিন মরে যাবো দেখিস, আর পারছি না রে।

দিদিটা সেদিন খুব কেঁদেছিল। এতে কি ওর দুঃখ সত্যিই কমেছিল, না আরো বেড়েছে?

মানুও এই সকালে এসব ভাবতে গিয়ে দড় করে একটা শ্বাস ফেলল। দিদিকে এক পলক দেখে নিল, বলল, 'আমারো যেতে ভীষণ ইচ্ছে করছে, কিন্তু অতসীদি যে আমার জন্যে বসে থাকবে!'

'তাহলে আর কি করে যাবি!'

'তুই যা, আমি বরং অতসীদিকে নিয়ে পরে যাবো।'

সানু কিছু বলল না।

কুয়াসা সরিয়ে রোদ ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গাছের ডালে বসে একটা পাখি শিস দিচ্ছে। কালও ওই পাখিটাই যেন শিস দিয়েছে। খুব পরিচিত মনে হলো। সানু অন্যকথা ভাবছিল। সন্দীপদার মা নিশ্চয়ই তাকে দেখে চমকে উঠবে।

ওরা আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটল। মানু দাঁড়িয়ে পড়েছে, সানু দেখল, অতসীদের বাড়ির সামনে এসে পড়েছে ওরা।

মানু বলল, 'যাচ্ছি তাহলে?'

সানু মাথা নাড়াল। মানু ভেতরে চলে গেল।

এবার কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে সানুর। পা দুটো যেন ক্রমশ ভারী হয়ে আসে। খালি মনে হচ্ছে, একা একা এভাবে তার যাওয়াটা ভাল দেখাচ্ছে না। মানুটা সঙ্গে থাকলেও হতো। কিন্তু অতসীকে না নিয়ে ও বেরোবে না। হয়তো সে বলতে পারত, ঠিক আছে, অতসীও সঙ্গে আসুক। কিন্তু সানু চায় না, অতসী এসব কিছু জানুক। এলে কিছু একটা নিশ্চয়ই আন্দাজ করবে। মাঝখান থেকে আরো অস্বস্তি, অস্বস্তি দু পক্ষেরই। পা দুটো এখন আরো অবশ লাগছে। কেমন যেন দ্বিধা, লজ্জা। প্রতি পদে সংকোচ এসে জড়িয়ে ধরে। মনে হলো, এ যাওয়ার মধ্যে কি কোন গৌরব আছে আজ? পরিচয় দেওয়ার মতন কি আর আছে তার? কাল সন্দীপদা এমন করে না বললে কিছুতেই সে আসতে পারত না। তাছাড়া এখানে আসার পর তারও তো ভাল লাগছে না কিছু। তবু একদিন যে জোর ছিল সানুর, আজ আর নেই। একবার মনে হলো, গিয়ে আর কাজ নেই, ঘুরেটুরে বাড়ি ফিরে যায়। ভাবতে ভাবতেও অনেকখানি পথ সে চলে এসেছে। বুকের ভেতরটা যেন কেমন কাঁপতে থাকে, বাড়ির কাছে এসে একসময় ভেতরে ঢুকে গেল।

সন্দীপ বারান্দায় রোদে বসে চা খাচ্ছিল। সানুকে দেখে সে হাসিমুখে উঠে এলো, বলল, 'এসো, ভেতরে এসো।'

সানু অল্প একটু হেসে বলল, তোমার অত ব্যস্ত হতে হবে না, তুমি বসো তো।'

সন্দীপ ছেলেমানুষের মতন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'এদিকে একবার এসো মা, দেখে যাও কে এসেছে!'

সানুর চোখমুখ মুহূর্তে লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে, বলল, 'এই, কি হচ্ছে, তাহলে কিন্তু আমি চলে যাচ্ছি।' ওকে কেমন একটু অপ্রতিভ দেখাচ্ছে।

'যাচ্ছি বললেই হলো আর কি, যাও না দেখি!' সন্দীপ হাসতে লাগল।

সানু চুপ করে থাকল। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

একটু পরে সন্দীপের মা প্রিয়লতা বাইরে এলেন, সানুকে দেখে তিনিও মুহূর্তে কেমন আবেগ বোধ করলেন। খানিকক্ষণ তিনি কোন কথা বলতে পারলেন না। এখানে এসেও প্রথম যেদিন ওকে দেখলেন, মনটা গাঢ় এক বিষাদে ভরে উঠেছিল। তারপর থেকেই মনের মধ্যে ওর এই ক্লান্ত, অসহায় মুখটা বার বার ঘুরেফিরে যাওয়া-আসা করেছে। এতদিন পরে চোখের সামনে ঠাকুর তাঁকে এই দৃশ্য কেন আবার দেখালেন! তাঁর চোখ দুটো কেমন ঝাপসা হয়ে এলো। তিনি বিমূঢ় বিহ্বল।

সানু এগিয়ে এসে নীরবে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। ও-ও নীরব। বুকের ভেতরে তারও আথাল-পাতাল। চোখ দুটো কেমন ভিজে উঠেছে।

প্রিয়লতা ওকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। সানুও ওখানে মুখ লুকিয়ে ধীরে ধীরে সহজ হয়ে নিল। খানিক পরে প্রিয়লতা বললেন, ঠাকুরের যে কী ইচ্ছে, বুঝি না আমরা!'

সানু আস্তে আস্তে মুখ তুলে ও'র চোখের দিকে চেয়ে থাকল, পরে ধীরে ধীরে বলল, 'আমি কিছু কিছু বুঝেছি মাসীমা!' গলার স্বরটা কেমন করুণ শোনাল, বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

'প্রিয়লতা বললেন, 'আমাদের বোঝায় অনেক ভুল থাকে মা।'

সানু চুপ করে থাকল। ও ঠিক বুঝতে পারল না, এরপরও তার ভুলটা কোথায়। পর পর এমন কতগুলো ঘটনা ঘটে গেল তার জীবনে যে তার ধাক্কা সামলানো সোজা ব্যাপার নয়। এরপর কি করে সে মেনে নেবে যে এর আড়ালেও তার ভাগ্যদেবতার অন্যরকম দুর্বোধ্য কোন ইংগিত আছে। এমন অভিজ্ঞতার পর সে নিজেও আগের বিশ্বাস অনেক হারিয়ে ফেলেছে। বরং এসব কথা শুনলে মনে মনে সে বিরক্ত হয়। দুঃখে ক্ষোভে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করে। এরপর সেই অদৃশ্য দেবতা তার আর কী ক্ষতি করবেন? যা করবার তা তো করেই ফেলেছেন। সুতরাং এসব দেবতা সম্পর্কে তার দুর্বলতা নেই, উপরন্তু, এক ধরনের অবজ্ঞা উপহাস আছে। কিন্তু সানু প্রিয়লতাকে আঘাত দিতে চায় না। আরো কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, 'আপনাদের সঙ্গে আবার যে কখনো দেখা হবে, ভাবি নি।' সানু সামান্য সরে এসে দাঁড়াল। দৃষ্টি আনত রেখে আঁচলে সে আঙুলে জড়াচ্ছে বারবার।

'এ তো ভালই হয়েছে মা।' বলে প্রিয়লতা হাসলেন, বললেন, 'বিশ্বাস করবে না, আজ কদিন ধরে তোমার কথা কেন যেন খুব মনে পড়ছিল। তোমাকে দেখে তো প্রথমটায় আমি অবাকই হয়ে ছিলাম। অবশ্য ভালও লাগল খুব।'

সানু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। পরে আস্তে আস্তে একটু উদাস গলায় বলল, 'অবাক হওয়ারই কথা মাসীমা।' বলে সামান্য হাসল সানু। কিন্তু হাসিটা কেমন শুকনো আড়ষ্ট মনে হলো। সে যেন তখন আরো কিছু একটা ভাবছিল।

প্রিয়লতা কিছু বললেন না। তাঁর এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। তিনি বসে পড়লেন মেঝেয়। বসতে বসতে বললেন 'আমি আবার বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না মা!'

সানু কেমন উদ্বেগ বোধ করল মুহূর্তে, ব্যস্ত গলায় বলল, 'তবে আর এখানে বসলেন কেন?'

প্রিয়লতা হাসলেন সামান্য, নরম গলায় বললেন, 'রোদে বসা তো একটু ভাল।'

বারান্দা তখন রোদে ভরে উঠেছে। সন্দীপ মার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, 'ঘর থেকে বিছানাটা নিয়ে আসি তাহলে?'

'ওসব কিছু লাগবে না এখন।'

সানুও প্রিয়লতার পাশে এসে বসেছে। একটু পরে ও'র মুখের ওপর চোখ রেখে শান্ত গলায় বলল, 'আপনারও তো শরীর ভীষণ ভেঙে পড়েছে।'

'তা আর দোষ কি বল, বয়েসও তো কম হলো না।' বলে মৃদুভাবে হাসলেন প্রিয়লতা। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার তিনি বললেন, 'বাতেই আমি শেষ হবো। সে যে কী কষ্ট মা!'

সন্দীপ চা শেষ করে কাপটা রেখে দিল, মার মুখের দিকে চেয়ে হেসে হেসে বলল, 'বাজার যেতে হবে নাকি?'

'সে তো তুই-ই জানিস।' প্রিয়লতা হেসে ফেলেছেন।

'তবে আজ না গেলেও চলবে।'

সানু কেমন কৌতুক বোধ করছিল, শুধলো, 'কি রান্না হবে শুনি?'

সন্দীপ ওর চোখে চোখে চেয়ে হাসল, হেসে জবাব দিল, 'কি আর, একটা সেদ্ধ, ডাল আর ভাজা।'

প্রিয়লতা আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি সানুর মুখের দিকে তাকালেন, বললেন, 'তুমিই বলতো মা, এসব কাজটাজ কি আর ওকে মানায়!'

সানু মুখ টিপে হাসল, আস্তে করে বলল, 'নিশ্চয়ই না।'

'আমি তো আজকাল একেবারে অচল; তাও বলি, মাছটাছ বা ডিমটিম কিছু একটা কবিস, তা শোনেই না।' প্রিয়লতা চুপ করলেন। গলার স্বরে সামান্য যেন বেদনা ছিল। একটু পরে আবার বললেন, 'এই জোয়ান বয়েসে এসব সেদ্ধ আর ভাজা খেয়ে থাকতে পারে কেউ?'

'ভারী অন্যায় তো!' সানু মৃদু হেসে সামান্য আড়চোখে সন্দীপকে দেখল।

'আমি চোখ বুজলে যে ওর কী হবে!' প্রিয়লতা বড় করে একটা শ্বাস ফেললেন। তাঁর চোখেমুখে এই মুহূর্তে ভাবী দুশ্চিন্তার এক ছায়া পড়েছে মনে হলো। তিনি চুপ করে থাকলেন।

সন্দীপ হেসে ফেলল, বলল, 'এই বুঝি শুরু হলো আবার!'

সানু অল্প অল্প হাসছে, সন্দীপকে বলল, 'মাসীমা তো ঠিকই বলছেন।'

'আমি যে মরেও শান্তি পাব না!'

'অত সহজে তোমাকে কে মরতে দিচ্ছে শুনি!' বলে হাসতে থাকে সন্দীপ।

'পাগল ছেলের একবার কথা শোন মা; বয়েস হয়েছে, মরতে তো হবেই।' প্রিয়লতা সানুর মুখের ওপর এক পলক দৃষ্টি রেখে চোখ সরিয়ে নিলেন আবার। তাঁকে

বলল, 'কোথায় কি আছে আমাকে দেখিয়ে দাও। এবার আর ভুল হবে না।'

সন্দীপ হেসে ফেলল। সে সানুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকল খানিকক্ষণ। ও কি তবে অন্য কোন ভুলের কথা বলছে?

সানু কি একটা কথা ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে একসময় বলল, 'কি যে তখন হয়েছিল আমার, একবারও খেয়াল হলো না যে চিনির বদলে নুন দিয়ে বসে আছি।' বলে মুচকি মুচকি হাসছিল সানু।

সন্দীপও হাসছিল, ওর চোখের দিকে সোজাসুজি চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'তখন কি আর তোমার কোন কিছু খেয়াল করার ব্যাপার ছিল?'

'আহা, যেন আমি একাই ওরকম ছিলাম, নিজে বুঝি কম ছিলে!'

'থাকলেও তোমার মতন ছিলাম না।' সন্দীপ চোখ সরিয়ে আনতে আনতে মধুর ভঙ্গিতে হাসল।

সানু স্টোভ ধরিয়েছে, চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসেছে। কেটলিতে জল চাপিয়ে কাপগুলো ধুয়ে নিচ্ছিল সে, নিতে নিতে বলল, 'কি নোংরা করে রেখেছো।' হাসিমুখে সন্দীপকে দেখতে দেখতে আবার বলে, 'শুধু এই জনেই তোমার বিয়ে করা উচিত ছিল। ঘরের শ্রী থাকত।'

'আমার কি কোন আপত্তি ছিল? ছিল না। তবু যে হলো না, এটা কপাল।'

'কপাল না ছাই!' সানু কেমন যেন সামান্য আহত হলো, একটু পরে বলল, 'মাসীমার দিকটা একবার ভেবেছো?'

'মা বুঝি কানে কানে তোমায় এসব কথা বলল!'

'তা কেন, না বললে কি বোঝা যায় না কিছু?'

'ও প্রসঙ্গটা এখন থাক সানু।'

'আমারই কি ভাল লাগছে এসব কথা বলতে। মাসীমাকে দেখে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমার।'

সন্দীপ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সানু বলল, 'তোমার জেদটাই বড় হলো সন্দীপদা?'

সন্দীপ আস্তে আস্তে চোখ তুলল, বলল, 'এটাকে জেদ বলছো কেন, জেদ নয় বরং অহঙ্কার কি অভিমান বলতে পার।' সন্দীপ হাসল ম্লানভাবে। তাকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছিল। কি একটা ভেবে নিয়ে শান্ত গলায় পরে বলল, 'অনেক কিছু খোয়ানোর পরও তো মানুষ একটা না একটা নিয়ে বাঁচে, ধরে নাও, আমিও এ নিয়ে বাঁচতে চাই।'

'এটা কি বাঁচা? সানুও চোখে চোখে চেয়ে থাকল।

'কেন নয়, সবার কাছে তো বাঁচার সংজ্ঞাটা এক নয়, মানুষে মানুষে এর অর্থ বদলায়।'

'কোন মানে হয় না এর।' কণ্ঠস্বর ম্লান শোনাল।

'হয়তো হয় না, কিন্তু আমার কাছে এর অর্থটা মিথ্যে নয়।' সন্দীপ হাসল কি মনে করে।

সানুও অপলকে চেয়ে থেকে এবার চোখ সরিয়ে নিল। স্টোভ নিবিয়ে ফেলেছে সে। কেটলি থেকে টী-পটে গরম জল ঢালল; চা-পাতা ভিজিয়ে দিয়ে পরে মুখটা ঢেকে রাখল। কাপগুলোয় পরিমাণ মত দুধ চিনি মেশালো। সুন্দর একটা ঘ্রাণ। একটু পরে চা ঢেলে একটা কাপ সন্দীপের দিকে এগিয়ে দিল সানু, 'নাও।' পরে আর একটা কাপ নিয়ে বারান্দায় এসে প্রিয়লতাকে দিল, বলল, 'চা-টা খান, আমি এক্ষুনি আসছি।'

ঘরে এসে নিজেও চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে সন্দীপের সামনে উঠে এলো। একটা চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে সানু। সন্দীপের মুখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হেসে বলল, 'মিষ্টি হয়েছে তো?'

সন্দীপ কিছু না বলে হাসল।

সানু চায়ে চুমুক দিয়ে নিজের মনেই বলল, 'খারাপ হয়নি।'

সন্দীপ বলল, 'খালি চা কেন, বিস্কুট আছে টিনে, নাও।'

'চায়ের সঙ্গে আর কিছু ভাল লাগে না। কিছু খেলেই চায়ের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।'

সন্দীপ যেন অবাক হলো একটু, বলল, 'অনেক পরিবর্তন দেখছি!'

'এটা কি শুধু আমার একারই, আর কারো নয়?' সানু চেয়ে চেয়ে হাসে।

'একার হবে কেন, আমরা সবাই এর মধ্যে কিছু না কিছু বদলে গেছি; হয়তো সেটাই স্বাভাবিক।' সন্দীপ চায়ে চুমুক দিল কয়েকবার, পরে আস্তে আস্তে আবার বলল, 'তবে তোমার এই না-টা হঠাৎ কেমন কানে লাগল; আগে তো চা-টাই ছিল তোমার কাছে গৌণ ব্যাপার, টা-টাই ছিল মুখ্য, আজ ঠিক তার উল্টো।' বলে সন্দীপও হাসতে থাকে।

সানু খানিকটা চা খেয়ে নিয়ে বলল, 'আগের কথা টেনে আর লাভ কি এখন, তখন তো আমার অনেক কিছুই ছিল।'

সন্দীপ চুপ করে গেল। সে টানতে না চাইলেও, কথা প্রসঙ্গে এসে যায়। কত কিছুই তো সেদিন ছিল; আজ অনেক কিছু স্মৃতির ধূসর দিগন্তে হারিয়ে গেছে, সব মনেও পড়ে না। প্রথম প্রথম মনে পড়ত, দুঃখ বাড়ত। সানুর মধ্যে তখন কত উচ্ছ্বাস, আবেগ চাঞ্চল্য। আজ আর চেনবার কোন উপায় নেই ওকে। এতদিন পরে যেন এক নতুন সানুকে সে দেখছে। সব দিক থেকেই ও বদলে গেছে। সন্দীপও কি বদলায় নি? আগের মনটা তো সেও হারিয়ে ফেলেছে। সানুর বিয়ের খবর সে শুনেছিল। সন্দীপ যেন এ পরাজয় কিছুতেই মানতে রাজী নয়। ভাবতে ভাবতে এমন একটা পর্যায়ে সে চলে এসেছিল যে তখন মনে হয়েছে, বিয়ের আসরেই সোজা চলে যাবে সে, সবাইকে সানুর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলবে। বাড়ির কাছাকাছিও এসেছিল। কিন্তু আরো দ্বিগুণ, চতুর্গুণ জ্বালা ও অভিমান বুকে নিয়ে ফিরে এলো। সানুর ওপর এ প্রতিশোধ সে নিতে গিয়েও নিতে পারেনি। মাঝখান থেকে নিজেই শুধু এক নিদারুণ ব্যর্থতায় জ্বলেপুড়ে একাকার হয়েছে। এরপরও মনে মনে ভাবত, সানু একদিন তার কাছে আসবে, মার্জনা চাইবে। তখনো সে তাকে গ্রহণ করতে পারে। আরো কত কী ভাবনা এলোমেলোভাবে মনের চারপাশে গুঞ্জন করে বেড়াত। আস্তে আস্তে সব থিতিয়ে এলো একসময়। দেখতে দেখতে সন্দীপও কেমন পাল্টে গেল। পরে এসব কথা ভেবে সে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়েছে। সানুর জন্যে তার দুঃখই হয়েছে। সে যেন আরো বড় কোন সত্যের সন্ধান পেয়েছে ততদিনে।

সন্দীপকে সামান্য অন্যমনস্ক দেখে সানু শুধোলো, 'কি ভাবছো অত?'

সন্দীপ তাকাল ওর মুখের দিকে। খানিকক্ষণ অনিমেষে চেয়ে থেকে আরো কি যেন ভাবছিল, একটু পরে স্বাভাবিক হতে হতে বলল, 'দেখছিলাম আগের কথাগুলো সব মনে আছে কিনা!'

'কি দেখলে?' সানু মুখ নীচু করে চা খেতে লাগল।

সন্দীপ এবার হেসে ফেলেছে, বলল, 'দেখলাম, অনেকগুলোই হারিয়ে ফেলেছি।'

'বেশ করেছো।' সানু হালকা গলায় বলে হাসল একটু। ওর চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে, পরে সন্দীপের দিকে হাত বাড়িয়ে ও বলল, 'দাও, কাপটা আমার হাতে দাও।'

সন্দীপ আপত্তি জানিয়ে বলল, 'তোমাকে আর কিছু করতে হবে না, আমি ধুয়েটুয়ে গুছিয়ে রাখছি।'

সানু বাধা দিল, 'হয়েছে, আর কাজ দেখাতে হবে না।'

'আরে না, তুমি চুপচাপ এক জায়গায় বস তো, কতকাল পরে কোথায় একটু গল্পটল্প করবে, তা নয় কাজ নিয়ে পড়লে। তাছাড়া এসব কাজে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি।'

'যাই বল, দেখতে খুব খারাপ লাগছে আমার!'

'প্রথম দেখছো তো, তাই।'

'সেজন্যেই তো বলছি, এতে তোমাকে ঠিক মানায় না।'

'তাতে কি, চালিয়ে তো যাচ্ছি।'

'উঁহু, এবার অন্য ব্যবস্থা কর।' সানু মুচকি মুচকি হাসছিল।

সন্দীপ যেন আবার গম্ভীর হলো সামান্য। খানিকক্ষণ নীরব থেকে সে বলল, 'আগে হলে হয়তো হতো, কিন্তু এখন আর তা হয় না সানু।' সন্দীপ যেন অন্যমনস্ক হলো।

সানুও চুপ করে থাকল। তারও অনেক কথা মনে পড়ছিল এই মুহূর্তে।

বাড়িতে কিছু না জানিয়ে সন্দীপের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল সানু। আসলে

সেদিন ওদের সিনেমা কি সার্কাসে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কী যে খেয়াল হলো সন্দীপের, দক্ষিণেশ্বরে চলে এলো। গঙ্গার পারে বসে অনেক গল্প করল। সানুর কোলে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ নদীর ঢেউয়ের শব্দ শুনল সন্দীপ। সানু গান করল। পরে খুশীতে বলেছিল, 'এলাম যখন, চলো মন্দিরে একটা পুজো দিয়ে আসি।'

ঘাটে নেমে গঙ্গার জলে হাতমুখ ধুয়ে ছোট একটা ডালি কিনে মন্দিরে ঢুকেছিল সানুরা। মায়ের কাছে সেদিন ওরা, একান্ত-মনে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিল। তারপর দ্বাদশ শিবমন্দির ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে ওরা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সামনে ভরা নদী। হাওয়ায় সানুর মাথার চুল উড়ছিল। হাতে মায়ের প্রসাদ। ওরা প্রসাদ খেল। সন্দীপ ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একসময় জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমার মাকে তোমার কেমন লাগে সানু?'

সানু মাথাটা ওর কাঁধে হেলিয়ে দিয়ে অস্ফুটে বলেছিল, 'খুব ভাল লাগে আমার।'

'মাও তোমাকে ভীষণ পছন্দ করে।'

কাঁধে মাথা রেখেই গাঢ় গলায় ও বলেছিল, 'আমি তা জানি গো, জানি।' একটু পরে কি ভেবে সে খিল খিল করে হেসে উঠেছিল।

সূর্য ডুবে গিয়েছিল। অন্ধকার নেমে আসছিল ধীরে ধীরে। কী যেন একটা খেয়াল হলো সন্দীপের, আস্তে করে ডাকল, 'সানু, এই সানু!'

'হুঁ' গলাটা কেমন জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল ওর।

সন্দীপ ডালাটা থেকে একটা ছোট পাতা বের করে নিল। পাতাটায় সিঁদুর ছিল। হাতে সিঁদুর মাখিয়ে নিয়ে বা হাতে সানুর চিবুকটা তুলে ধরে কপালে সিঁথিতে তা মাখিয়ে দিল খুব আস্তে আস্তে। অস্ফুটে সন্দীপ বলেছিল, 'এই নদী মন্দির সন্ধ্যা সব কিছু সাক্ষী রেখে আমি বলছি সানু, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার নতুন সম্পর্ক। তুমি, তুমি আমার...।' আবেগে ওর কথাগুলো কেন জড়িয়ে জড়িয়ে অস্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

সানুও কি ভেবে ওকে প্রণাম করেছিল। সন্দীপ ওকে তুলে নিয়ে চুমু খেয়েছিল। সন্দীপ বলেছিল, 'আমার মারও খুব ইচ্ছে, তুমি আমাদের ঘরে আস।'

সানু অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিয়েছিল, 'আমার কেমন ভয় করছে সন্দীপদা। সিঁদুরটা না দিলেও পারতে।' গলাটা কেমন কেঁপে গিয়েছিল।

ঘটনাটা মনে পড়তেই শরীরে কেমন বিদ্যুৎ খেলে গেল সানুর। গায়ে কাঁটা দিল। এ ঘটনার কথাটা সে মুখ ফুটে মাকে বলতে পারেনি। হয়তো এই জন্যেই তার ওপর দেবতার এই রোষ, অভিশাপ।

সানু কিছু না বলে বারান্দা থেকে কাপ নিয়ে এলো, একসঙ্গে সব জড়ো করে, সন্দীপের মুখের ওপর চোখ দুটো রেখে ম্লান গলায় বলল, 'আর একটু পরেই আমি চলে যাবো, তখন তো তুমিই সব করবে; এটুকু না হয় আমিই করে গেলাম। আমার জন্যে তো শুধু কষ্টই পেলে তোমরা!'

সন্দীপ মুহূর্তে চোখ তুলে ওকে দেখল, বলল, 'অমন করে বলো না, আমিও তো তোমাকে দুঃখ দিয়েছি।'

সানু আর কোন কথা বলল না। ওগুলো নিয়ে সে কলকাতায় চলে গেল।

সন্দীপ রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

সানু কাজ সেরে একসময় বারান্দায় এলো। প্রিয়লতার দিকে চেয়ে বলল, 'একটু দেরী হয়ে গেল।' সানু শিশি থেকে মালিশের তেল নিয়ে ওঁর পিঠে কোমরে মাখাতে শুরু করল। রোদের ঝাঁজ যেন একটু বেড়েছে ইতিমধ্যে।

প্রিয়লতা বললেন, 'এর জোরেই মা এখনও যা একটু চলতে ফিরতে পারি!'

আরো খানিকটা তেল ঢেলে নিয়েছে সানু, মাখাতে মাখাতে বলল, 'আরো কিছু দিন আগে এলে পারতেন, শীত তো প্রায় শেষই হয়ে এলো।'

'বেশী শীতে আসতে সাহস হলো না।' একটুক্ষণ থেমে প্রিয়লতা আবার বললেন, 'তোমরা তো এখনও আরও কিছুদিন আছো?'

'সেরকমই তো শুনেছি!'

'ভালই হলো।'

'রোদে একটু হাঁটাহাঁটি করবেন, দেখবেন, ভাল লাগবে।'

'কটা দিন যাক আগে!' প্রিয়লতা হাসলেন।

'জায়গা খুবই ভাল; কদিন আগেও তো কত লোক এখানে।

'জায়গার গুণ তো মা আছেই।' প্রিয়লতা ঘাড় বেঁকিয়ে সানুকে দেখলেন একবার, সামান্য হেসে বললেন, 'আর লাগবে না মা, অনেকক্ষণ তো দিলে।'

বেলা বাড়ছে দেখে সানুও সামান্য চঞ্চলতা বোধ করছিল। একটু পরে উঠে দাঁড়াল সে, কলে এসে হাতটা ধুয়ে নিল ভাল করে, আবার বারান্দায় ফিরে এলো সানু, প্রিয়লতার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'আমি এবার যাবো মাসীমা।'

'তা কি হয় মা, এখানে চানটান করে একেবারে খেয়ে যাবে।'

'বাড়ি থেকে বলে আসিনি, ভীষণ ভাববে মা।'

'সন্দীপ না হয় বলে আসবে একবার।'

'আজ নয় মাসীমা, অন্য একদিন এসে খাবো।'

'খুব খারাপ লাগবে আমার, এসে তো না খেয়ে কখনো যাওনি!'

সানু মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। এই আন্তরিকতাকে কোন দিনও সে উপেক্ষা করতে পারেনি। এরকমভাবে বললে এখনও তার কষ্ট হয় খুব। অথচ থাকার কোন উপায় নেই বলেই সে চলে যেতে চাইছে। এখানে যে সে এসেছে, এক মানুটাই জানে। আর কাউকেই সে কিছু বলেনি। এদিক বেলাও বাড়ছে। মানু তো এলো না। বোধ হয় বাড়ি ফিরে গেছে। ফস করে যদি মাকে কিছু বলে ফেলে আবার। এভাবে চলে আসতে হচ্ছে বলে তারও কষ্ট কিছু কম নয়। এ বাড়ির ওপর তার কত আবদার, অধিকার ছিল একদিন। কতদিন এদের এখানে এসে চান করেছে, খেয়েছে, প্রিয়লতার পাশে শুয়ে শুয়ে গল্প করেছে, খেয়াল হলে পাকা-চুল বেছে দিয়েছে। সেসব দিনগুলো যে তার এমনভাবে মিথ্যে হয়ে যাবে কে ভাবতে পেরেছিল। কতদিন প্রিয়লতার সঙ্গে রান্না-ঘরে ঢুকে রেঁধেছে সে! প্রিয়লতা মজা করে বলেছেন, 'অত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে মা, আস্তে আস্তে সব শিখবে।' সানুও জবাব দিয়েছে, 'আপনার মতন কোনদিন পারবোই না রাঁধতে!'

সানুর চোখ দুটো যেন ঝাপসা হয়ে এলো এই মুহূর্তে। বুকের ভেতরে আবার সেই যন্ত্রণা। সে আস্তে আস্তে বলল, 'আজ যাই মাসীমা।'

প্রিয়লতা সস্নেহ গলায় বললেন, 'যাই বলতে নেই মা, এসো।'

সানু কি ভেবে আবার প্রণাম করল ওঁকে। এটা যে তিনি কতবার শুধরে দিয়েছেন সানুকে। ঘরের দিকে তাকাল সানু। সন্দীপকে দেখার বড় লোভ হলো একবার, দেখা গেল না। ঘরে যেতেও লজ্জা হচ্ছিল সানুর। তার কথা শুনে যদি বেরিয়ে আসে একবার। কিন্তু এলো না। আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একসময় চলে এলো সানু। রাস্তায় নেমে মনে হলো, না এলে, একটা বড় উপলব্ধি থেকে সে বাদ পড়ে যেত।

যা ভেবেছিল সে, ঠিক তাই। মানু বাড়ি ফিরে এসেছে। মা বারান্দায়। দেখে মনে হলো, তার জন্যেই যেন ওরা অপেক্ষা করছে। সানু একবার চেয়েই চোখ নত করেছে। বুকের ভেতরটা যেন কেমন করছিল তার। মা একদৃষ্টে তাকে দেখছে। মানু মুখ টিপে হাসছে। এক অস্বস্তিকর ব্যাপার। তার মুখখানাও বিষণ্ণতায় কেমন ভরে রয়েছে। মা কোন ভূমিকা না করেই সরাসরি তাকে বলল, 'সন্দীপদের একদিন আসতে বলিস এখানে।' কণ্ঠস্বরে সহানুভূতি ও মমতা ছিল।

সানু অবাক হলো। মার চোখে চোখে একপলক তাকিয়ে সে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছে। হঠাৎ এরকম একটা কথার অর্থ সে ধরতে পারল না। মার এই কথাটা যেন তাকে আরো বিষণ্ণ করে তুলেছে। তাকে কি সবাই আজ সান্ত্বনা দিতে চায়! হায় রে, এমনই দুঃখী সে আজ! কিছু না বলে মাথা হেঁট করে ঘরে চলে এলো সে। বুকের ভেতর থেকে কী এক অব্যক্ত কষ্ট যেন এই মুহূর্তে ঠেলে উঠতে চাইছে। দাঁড়িয়ে থাকতে তার পা যেন টলছে। ঘরে এসে নিরিবিলিতে সে কেঁদে ফেলল এবার।

(ক্রমশঃ)

বিখ্যাত কিছু নয়। 'আহা মরি'ও নয়। তবে সুন্দর। রাজস্থানের আলোয়ার শহরটিকে দেখলেই মনে ধরে।

একবার। দিল্লী থেকে রেওয়াড়ী জংশন হয়ে ওখানে পৌঁছুলুম। থাকবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি দেখে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বেরোতে হবে। লক্ষ্য জয়পুর।

কিন্তু লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষও বড় হয় এক-একসময়। অন্ততঃ আলোয়ারের বেলায় তাই হয়েছিল।

ওখানে পৌঁছে গাড়ি ডাকতে গেলেন এক সহযাত্রী। আমি সেই অবসরে বেরিয়ে পড়লুম।

স্টেশন-চত্বর থেকে বেরোতেই দেখি, পীচ-ঢালা বাঁধানো পথ, রোদে খাঁ খাঁ করছে। খানিকটা দূরে শহরকে ঘিরে পাহাড়। জায়গায় জায়গায় ফুসে খসে-যাওয়া মালার মতো। কোথাও পূর্ণ মহিমায়, আবার কোথাও বা একরকম না-থেকে, সমতল প্রান্তরের সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়ে মালার সুতোটুকু শুধু জানান দিয়ে।

পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু অংশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দুর্গ আছে সেখানে, চূড়া বরাবর, প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

কিন্তু না, দুর্গ নয়; প্রাচীর বা পরিখাও নয়; সামনেই এক জলাশয়কে পাশ কাটিয়ে [illegible] চললাম।

ওখানে জল-সেচন চলছিল। কূপ থেকে ইলেকট্রিক পাম্প দিয়ে জল ওঠাচ্ছিল কে যেন।

এগিয়ে গেলাম। দেখি, পাম্প চালু। জল আপনার থেকেই উঠছে। সামনে একটি নালা। জল এসে ওতে পড়ছে। পড়বার আগে স্নান সেরে নিচ্ছে কেউ কেউ। আবার কেউ বা ধোয়ামোছা। স্নানরত একজনকেই দূর থেকে দেখে ভেবেছিলাম, বুঝি জল ওঠাচ্ছে। পাম্প-এর তদারকীতে ব্যস্ত বুঝি।

নালাটি বরাবর তাকালাম। দেখি, অনেক শাখাপথ; দুপাশে। ক্ষেত-বরাবর, শিরা-উপশিরার মতো।

খানিক বাদেই বধূ এল একজন। কলসী কাঁখে নয়, মাথায়। কাঁসার কলসী। চওড়ামুখো থ্যাবড়া। অদ্ভুত কৌশলে পর পর চারটি ব্যালান্স করা।

বধূটি জল নিয়ে ধীরে ধীরে এগোল; ক্ষেতের গা-ঘেঁষে, পাহাড়ের দিকে মুখ করে। আমি ওর পথ-চলা দেখতে দেখতে পাহাড়ের দিকে তাকালাম আবার।

পাহাড়গুলো ন্যাড়া, শিখর থেকে সানুদেশ অবধি রুক্ষ ঊষর। রোদে ঝলসাচ্ছে। যেন তপ্ত লৌহ, তেতেপুড়ে আগুন। সামান্য আঘাতেই দুমড়ে যাবে।

দুর্গটি অপরূপ দেখাচ্ছে এখন। আগের তুলনায় আরও স্পষ্ট, আরও বিস্ময়। এবং কেন জানি না, [illegible] বার

মনে হচ্ছে, রাজস্থানের আসল চরিত্র ঠিক এইরকম পরিবেশেই ধরা যায়। এই পাহাড়-চূড়ায় দুর্গ, কৃষিক্ষেত্রে এই জলসেচন, এই রুক্ষ ও তপ্ত ভূমিতে বধূটির জল-অন্বেষণ --এরা সবাই যেন চিরকালের রাজস্থানের প্রতীক।

কত রাজা, কত রাজ্যের উত্থান-পতন এখানে। কিন্তু পাহাড়-চূড়ায় দুর্গটি ঠিক চাই। শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলায় নিজ নিজ ঘাঁটি সুরক্ষিত না রাখলে কি চলে? আবার ঘাঁটি আগলালেই শুধু হয় না, রসদও চাই। নীরস মাটিকে জল ঢেলে সরস করে নিয়ে ছিনিয়ে আনা চাই ফসল।

মেয়েরা এসব জানে। মায়ের বুকে যেমন, পৃথিবীরও বুকে যে তেমনি সুধা লুকিয়ে থাকে, তা ওদের অজানা নয়। তাই হদিস পাওয়া মাত্রই ছোটে ওরা। জলভরা কলস মাথায় নিয়ে খুশিমনে ঘরে ফেরে।

সেদিন একা একা দেখছিলাম সবকিছু। আকাশ-পাতাল কত কী ভাবছিলাম। হঠাৎ সহযাত্রীদের কথা মনে এলো। হয়তো বা গাড়ি ঠিক হয়েছে এতক্ষণে; আলোয়ার দর্শনের তোড়জোড় চলছে। স্টেশন-চত্বরে ফেরাই সমীচীন।

ফিরলাম। সদলবলে বেরোলাম এবার। কিন্তু গাড়িতে বসে কার সাধ্য। আসনগুলোর সবই যেন তপ্ত কড়াই। [illegible]

মানিয়ে নিলাম তবু। দেখতে দেখতে গেলাম। পীচ-ঢালা পথটা ঝলসাচ্ছে। চুপর থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা একখণ্ড ইস্পাত যেন। হাওয়ায় আগুনের হলকা। জানালার ফোকর দিয়ে জিভ বের করছে বুকে থেকে। যেন ছোবল মারছে।

খানিকক্ষণ চল্লো এইরকম। তারপর, হঠাৎ—যেন ম্যাজিক; মেঘছায়া চারিদিকে, রোদ্দুরের নামগন্ধ নেই।

ছায়া-ঢাকা আলোয়ারকেই দেখলাম সেদিন। স্তব্ধ নিঝুম। যেন ভর-দুপুরে রোদে জ্বলতে জ্বলতে মেঘের ছাতা-মাথায়।

সাগর-হ্রদ দেখলাম। পাহাড়ের গা-ঘেঁষা। শহর থেকে নিরাপদ দূরত্বে। অপরূপ। হ্রদটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নগর-প্রাসাদ। পাহাড়ের গায়ে, খানিকটা উঁচুতে। প্রাসাদের ভেতরে যাইনি। যেতে পারিনি। রক্ষীদের একজন আপত্তি করেছিল, অর্ডার নহী।

অথচ শুনেছি, ওখানে নাকি দেখবার অনেক কিছু আছে; দুষ্প্রাপ্য অনেক পুঁথির পাণ্ডুলিপি। মুঘলসম্রাট আকবর জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানের তরবারি। অগত্যা প্রাসাদ না দেখেই ফিরতে হল। সাগর-হ্রদ তখন মায়াময়। ঊষর মরুপ্রান্তে যেন এক পেয়ালা সুধার মতো। টলটল করছে হ্রদের জল। যেন একটু নাড়া দিলেই আশেপাশে উপচে পড়বে।

হ্রদের ঠিক উপরেই ছোটখাটো রাজমহল আর একটি। যেন আর একটি রক্ষী। নির্জন, অচঞ্চল। হ্রদে নামার ব্যাপারে সবধান করে দিচ্ছে,—অর্ডার নেহী।

ফিরে চললাম। এবার অন্য এক হ্রদ শিলীশেড়-এর দিকে। দূর থেকে নগর-প্রাসাদ চোখে পড়ল। বাগিচা-ঘেরা, কয়েকটি অট্টালিকায় সুশোভিত।

শিলীশেড়-এর পথ আঁকাবাঁকা, বন্ধুর। অনবের ধূসর পাহাড়ের গা-ঘেঁষে। পাহাড়গুলোর প্রায় সবই ছোটখাটো। মাঝে মাঝে ছাড়া। সাগর-হ্রদ থেকে শিলীশেড় যেতে বাঁ-দিকে পড়ে সেটি। তার মাথায় দুর্গ, শিরস্ত্রাণের ঢং-এ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

বিরাট প্রাচীর। চূড়া এলাকার অনেকটা অংশ জুড়ে। যেন আর ফুরোতে চায় না। সমগ্রদেশকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছে। মনে পড়ল, এই প্রাচীরটিকে আগেও দেখেছি। স্টেশন-চত্বর থেকে বেরোবার ঠিক পরেই।

কিন্তু কে গড়ল একে? আলোয়ার-এর কোন্ মহারাজা?

ঠিক জানি না। জানবার চেষ্টাও করিনি। করে লাভ? রাজস্থানে কি একটিই দুর্গ? না কি প্রাচীরপুরী শুধুমাত্র একটি?

আসলে দুর্গ ও প্রাচীর ছাড়া এদিক-কার মহারাজাদের একটি দিনও চলতো না। তাই রাজা যেখানে, ওরাও সেখানে। তামাম রাজস্থান জুড়ে আজও ওদের অসংখ্য স্মৃতি।

অবশ্য রাজা প্রতাপ সিংজীর কথা

আলোয়ার : একটি হ্রদের দৃশ্য

আলাদা। অন্য অনেকের কথা মুছে গেলেও তার নাম মুছবে না। অন্ততঃ আলোয়ার-এর মানুষ তাকে মনে রাখবে। কেননা, ১৭৭১ খৃঃ স্বাধীন আলোয়ার রাজ্যের পত্তন তিনিই করেছিলেন। আজকের এই জেলা-শহর আলোয়ার ছিল তাঁর রাজধানী।

কিন্তু সে-আলোয়ার আর আজকের আলোয়ারে কত তফাৎ! প্রতাপ সিংজীর মহিষী সতী হয়েছিলেন সেদিন। স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গিয়েছিলেন। সেদিন চরম আত্মনিপীড়নেরই অন্য নাম ছিল পতিভক্তি। আর আজ!... ...

শিলীশেড় পৌঁছে আজকের আলো-য়ারকে দেখলাম। সে চাইছে বাঁচতে। চাইছে আত্মনিপীড়ন নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠা।

ঘটনাটা খুলেই বলি। শিলীশেড়-এর কথা বলতে বলতে।

ভর-দুপুর তখন। বেলা প্রায় দুটো। শিলীশেড় পৌঁছলাম। হ্রদটির দুদিকে পাহাড়, ঘন সবুজ, প্রায় সমান্তরাল। পাহাড়ের মাঝখানে টলটল করছে জল। ছোট ছোট ঢেউ উঠছে। বাঁধের গায়ে ঢেউ-গুলো আছড়ে পড়ছে কেবলই। ছলাৎ ছলাৎ শব্দ উঠছে। বাঁধটিকে দেখছিলাম। দুটি পাহাড়কে যোগ করেছে কেমন সুন্দরভাবে। তার উপরকার সমতল অংশটুকুতে কেমন সুন্দর ফুলবাগিচা।—

হঠাৎ পাশে এসে দাঁড়াল জোয়ান-জবরদস্ত এক পুরুষ।

—কী চাই? কে তুমি?—প্রশ্ন করতেই সহজ সরল হিন্দীতে ও যা বলল, তার মানে দাঁড়ায়,—চিনলে না? সে কী! আমি সুরয সিং ড্রাইভার।

মনে পড়ল; হ্যাঁ, এ লোকটিই এতক্ষণ গাড়ি চালাচ্ছিল। অন্যমনস্ক ছিলাম; চট করে তাই চিনতে পারিনি।

নিজের অজ্ঞতা ঢাকবার চেষ্টা করে বললাম,—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বটে।

—বহুৎ আচ্ছা,—সুরয সিং মুখোমুখি এবার,—মুঝে মালুম হোল, ভুলে গেলে।

সিলিসেড় : আলোয়ার

—না না, তা কখনও হয়!

—হয় না তো পয়সা নিকাল। চার আনা। রেউড়ী খায়গা।

দ্বিরুক্তি না করে পয়সা বের করলাম। কেননা, বাইরে ঘুরতে গিয়ে দেখেছি, ড্রাইভাররা এ ধরনের ছোটখাটো আবদার হামেশাই করে থাকে। যাত্রীদেরও এতে সায় না দিলে চলে না।

সুরয সিং পয়সা নিয়ে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ কী মনে করে ফিরে দাঁড়াল। কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল,—বাবুজী, খায়গা? তুম ভি? ইধারকা রেউড়ী বহুৎ সাচ্চা।

বললাম,—তাই নাকি? তবে তো খেতে হয় একটু।

সুরয সিং বললে,—ঠ্যারো, দেখনে দেউ দেউকী হ্যায় কী নেহী। উ রহেগা তো দুনিয়াকা সব সে সেরা রেউড়ী খিলাবে।

ভাগ্য ভালো। বাঁধের উপরকার ফুল-বাগিচা ধরে খানিক দূরে যেতেই দেউকীর দেখা মিলল। সুরয সিং-এর কথা থেকে বুঝলাম, সামনেই ও। সওদা নিয়ে বসে।

সেদিন দেউকীর কাছ থেকে বেশ খানিকটা রেউড়ী কেনা গেল। এই রেউড়ী রাজস্থান মুলুকের নিজস্ব জিনিস। তিল আর চিনি দিয়ে এ তৈরী।

পরিতৃপ্তির সঙ্গেই রেউড়ী খাচ্ছিলাম সেদিন। হঠাৎ দেউকীর সঙ্গে চোখাচোখি। —কম করে বছর তিরিশ বয়স হবে মেয়েটির; কিন্তু হাবভাব তেরোয় পা-দেয়া কিশোরীর মতো।

যেন যৌবন আসছে, অথচ হুঁস নেই ঠিক। নিজের সম্পর্কে সচেতন হবার কায়দাকানুন এখনও ঠিক রপ্ত হয়নি।

সুরয সিং-এর দেখলাম, এসব গা-সহা। দেউকীকে অনেক আগে থাকতেই ও চেনে। কুশল-বিনিময়ের পর দিব্যি ওদের হাসি-ঠাট্টা চলল।

ফেরবার সময় সুরয সিং একটু গম্ভীর। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই দেউকীর কথা বলল,—ও বহুৎ সেয়ানা মেয়ে বাবুজী, সতী নেহী।

শুধালাম,—কী বলতে চাও তুমি?

—ওর পহেলা পতি পল্টন ছিল বাবুজী, —সুরয সিং ধীরে ধীরে শুরু করে,—নেফাতে চায়নার সাথে লড়াই করতে গিয়ে খতম হল। দুসরা—অর্জুন সিং, সাত বরষ নিখোঁজ। উ ভি পল্টন ছিল। লাদাখে পাকিস্তানী দুশমনদের বদলা নিচ্ছিল।

—আর তিসরা?—অনেকটা রসিকতা করেই শুধালাম।

—তিসরা লছমন প্রসাদ,—সুরয সিং আবার শুরু করে,—পুরা বুরবক হ্যায় বাবুজী। দিনভর রেউড়ী পকায়। ওর দেউকী ব্যাওসার ফিকিরে ইধার-উধার ঘুর-ঘুর করে, মজা লোটে।

বললাম,—এতে তোমার কী? দেউকী ওর জীবনকে বরবাদ হতে দেয়নি।

সুরয সিং মুহূর্তের মধ্যে গর্জে উঠল, —লেকিন হামার জীওন যে বরবাদ হয়ে গেল!

—বলো কী! তোমার?—সুরয সিং-এর কথা শুনে আমি স্তম্ভিত। এদিকে সুরয তখনও থামেনি। বলছে,—গলতি হামারা বাবুজী। উনকো নেহী। আজ সে ষোল সাল পিছে। দেউকীর সাথে বহুৎ দোস্তি ছিল তখন। ও ভি বহুৎ খুব-সুরতী ছিল। একরোজ, ওকে লিয়ে ঘুমতে গেলুম। হিয়া সে থোরা দূরে রাজা পরতাপ সিংজীর সমাধি দেখতে গেলাম। নজদিক থা ঔর এক সমাধি। উ থা রাণী কা। পরতাপ সিংজী কো মহিষী কা। সমাধি দেখে আমি বললুম,—দেউকী, ইয়াদ রাখ না, রাণী-মা থা পুণ্যবতী সতী বিলকুল। মহারাজাকা সাথ এক চিতামে জীওন দিয়া। ...দেউকী কথা শুনে বিগড় গেল। গোসা হল। বলল, খামুস। ঝুটমুট চিল্লাতা কিউ? জবরদস্তি ঔর বেফায়দা কাম কো কিউ বলতা পুণ্য?...ব্যস, তখন থেকে গড়বড়। আমি 'হ্যাঁ' বললে দেউকী 'না'। আর আমি 'না' বললে দেউকী 'হ্যাঁ'। লেকিন একরোজ, নিজেকে আর সমঝাতে পারলুম না। অর্জুন সিং নিখোঁজ শুনে দেউকীকে বললুম,—মুঝে তো গলতি হো গিয়া। রাণী-মা কো সতী বনায়া ঝুটমুট।...দেউকী আমার কথা বিশোয়াস করল না। শুধু বলল,—গলতি তুমহারা নেহী, মেরা। মুঝে সতী হো নেহি সেকতা।

—সাচ্, সাচ্ বাত হুজুর,—সুরয সিং উত্তেজিত এবার,—দেউকী সতী হোল না। লছমন প্রসাদকে সাদি করে বুরবক বনাল। ঔর নিজে লুটল মজা।

বললাম,—তা কেন, ও বাঁচতে চাইছে।

সুরয সিং বললে,—লেকিন হামার জীওন যে বরবাদ হয়ে গেল।

ওদিকে খেয়ালই ছিল না। কথা বলতে বলতে কখন যে বাঁধের উপরকার লনে উঠে এসেছি।

সুরয সিং তাড়া দিল,—হুজুর কা দেখতা? তলাউ?

বললুম,—হ্যাঁ। ভারী সুন্দর দেখতে। ছবির মতো, দু-পারে ঘন অরণ্য।

সুরয সিং বললে,—অসলী নজারা তো প্যালেস দেখো।

—প্যালেস?

—জী হুজুর, নজদিক।

এগিয়ে চললাম। অবশ্য বেশি দূরে নয় প্যালেস। বাঁধ থেকে এক ফার্লংও নয়।

'প্যালেস'-এর কাছাকাছি গিয়ে দেখি, আসলে ওটা 'রেস্ট হাউস'। হ্রদের মুখোমুখি। যে কেউ প্রাণ চাইলে এবং পয়সা কুলোলে ওখানে থাকতে পারেন।

'রেস্ট হাউসটি' সুন্দর। তার সোপান, গবাক্ষ, ঝুল-বারান্দা এবং গম্বুজাকার ছাদ—সবই যেন রাজকীয় বৈভবের সাক্ষী।

কিন্তু তবু ওখানে ঠিক জমল না। খানিকটা দূরে জয়সামন্দ বাঁধেও জমল না আর। অথচ বাঁধটি অপরূপ। ঠিক শিলীশেড়-এর মতো ছবির মতো। বাহারী ফুল-বাগিচায় ঘেরা। তবে শিলীশেড়-এর সঙ্গে এ বাঁধের ফারাকও অনেক।

শিলীশেড় আরণ্যক, সবুজের সমারোহে আদিম। আর জয়সামন্দ ঘরের কাছে দীঘিটি যেন। লোকালয়ের অনেক কাছা-কাছি। তার আশেপাশের পাহাড়গুলোতে আরণ্যক অকৃত্রিমতা নেই, আদিম রহস্যও নেই। তাতে দাঁড়ালে হ্রদের প্রায় সবটুকুই একসঙ্গে চোখে পড়ে, শিলীশেড়-এর মতো খানিকটা আবার চোখের আড়ালে থাকে না।

—আসলে কোনটা ভালো?—সেদিন জয়সামন্দ থেকে ফিরবার পথে ভাবি,—আধো-আড়াল? না মুখোমুখি একেবারে?

জবাব পাই না। [illegible] সিং-এর কথাই মনে আসে ঘুরে ফিরে—লেকিন হামার জীওন যে বরবাদ হয়ে গেল!

একদল ব্যক্তি তা গ্রহণ করে থাকে সমন্বয়-পূর্ণ অস্তিত্বের জন্যে, পারস্পরিক মঙ্গলের জন্যে। সমাজ হতে পারে কম-বেশি সুসংগঠিত, আবার সমাজে দেখা দিতে পারে দাঙ্গা, অপরাধমূলক কাজকর্ম ও দুঃখ। তেমনি মানুষের শরীরের উপাদান হচ্ছে কোষ—টিস্যু ও অঙ্গের সমাজে। এখানেও সেই সংঘবদ্ধ জীবন বা সুশৃংখল বিকাশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, নিয়ত নতুন করে হয়ে ওঠা ও মেরামতীর দ্বারা রক্ষিত। স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা প্রত্যেকেই হচ্ছি উপাদানগত অংশগুলির সুশৃংখল একটি গোষ্ঠী। তা সত্ত্বেও ক্রম-বর্ধমান বিশৃংখলার আওতাতেও পড়তে হয়। সমাজের ক্ষেত্রে যেমন সমস্ত অপরাধ-মূলক কাজের কারণ এক নয়, সামাজিক সমাধানও এক নয়, তেমনি টিস্যুর ক্ষেত্রেও সবরকমের বিশৃংখলার কারণ এক হতে পারে না। অর্থাৎ, ক্যানসারের নিরাময়ও কখনো এক নয়।

যে-সব উপাদানে আমাদের শরীর তৈরী তা অক্ষয় নয়। এই যায় এই আসে, বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে একের জায়গায় অন্যে এসে হাজির হয়, কয়েকদিন পরে পরেই নতুন রূপলাভ ঘটে। একটিমাত্র কোষ থেকে নিখুঁত একটি মানুষের উদ্ভব হতে পারে, এটাই তো আশ্চর্য ব্যাপার। তারপরেও প্রতিদিনকার এই তুমুল অদল-বদল ও মেরামতীর মধ্যে মানুষটি চার-কুড়ি-দশ বছর বেঁচে থাকতে পারে। এমন একটি জটিল সংগঠন কখনো যদি বিগড়ে যায় তাহলে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। সহজে যে বিগড়োয় না সেটাই অবাক হবার বিষয়।

ক্যানসারকে রহস্যময় মনে হয় বলেই ক্যানসারকে এত ভয়। তাছাড়া আজকাল ক্যানসারে মৃত্যুটাই যেন সবচেয়ে বেশি। কেউ যদি অল্প বয়সেই যুদ্ধে মারা যায়, বা অনাহারে, বা সংক্রামক রোগে, তাহলে সেই লোকটির টিস্যু জগতে এমন কোনো বিশৃংখলা ঘটার অবকাশই পাওয়া যায় না যাতে সে মারা পড়তে পারে। সে যদি অনেক বেশিদিন বাঁচত তবেই এমন একটি ব্যাপার ঘটতে পারত। তাহলে ক্যানসারে মৃত্যুর সংখ্যাবৃদ্ধি কী প্রমাণ করছে? প্রমাণ করছে, জীবনযাপনের মান উচ্চ, গোষ্ঠী-জীবনের স্বাস্থ্যরক্ষার কর্মসূচী ফলপ্রসূ।

প্রতিষেধ

ক্যানসার সমস্যার সমাধানের সবচেয়ে ভালো উপায়, ক্যানসার যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করা। এটা লক্ষ্য করা গেছে, ক্যানসার যে-যে আকারে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়, সেই-সেই আকারের ক্যানসারকেই সবচেয়ে বেশি দমন করা যেতে পারে। টিস্যুর বিশৃংখলা সবচেয়ে বেশি সেই সমস্ত টিস্যুতেই যেগুলো পরিবেশের দ্বারা ক্ষতি-গ্রস্ত হতে পারে। যেখানে বহুকাল যাবৎ মেরামতী হওয়া দরকার অথচ হচ্ছে না, বহুকাল যাবৎ কাজ হওয়া দরকার অথচ হচ্ছে না—বিশৃংখলা ঘটার সম্ভাবনা সেখানেই প্রবল। তাই হয়ে থাকে আর সেটা এমনই মাত্রায় যে শতকরা ৭৫টি ক্ষেত্রে ক্যানসার হয়ে থাকে অনধিক পাঁচটি ক্ষেত্রে। অনধিক পাঁচটি—পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রে ফুসফুস চামড়া ও পরি-পাক-নালী, পুরুষের ক্ষেত্রে মূত্রনালী ও প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড, স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্তন ও জরায়ু। কাজেই প্রতিষেধের ব্যবস্থা করতে হলে আমাদের সবচেয়ে আগে দেখতে হবে যে, বাইরের কোনো কারণে চামড়া বা শ্বাস ও রেচন-নালী বেষ্টনকারী শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তারপরে নজর দিতে হবে—প্রজননের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো কোনো অঙ্গের ক্রিয়ার ওপরে যে আভ্যন্তরিক চাপ পড়ে তার ওপরে। কী করতে হবে? বাইরের পরিবেশের ক্ষতি-করতা কমাতে হবে নিশ্বাসের বায়ু খাদ্য ও পানীয় শুধরে নিয়ে, আভ্যন্তরিক পরি-বেশের ক্ষতিকরতা কমাতে হবে রাসায়নিক চাহিদায় ও টিস্যুর সাড়ায় অদলবদল ঘটিয়ে।

দুটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—ফুসফুস ও পরিপাক-নালী। নিশ্বাসের বাতাসে দূষিত পদার্থ থাকলে ব্যাপারটা খুবই গুরুতর হয়ে পড়ে। ফুসফুসের ক্যানসারে যতো লোক মরছে সেই সংখ্যা হিসেবে না ধরলে অন্য সমস্ত ক্যানসার থেকে মৃতের মোট সংখ্যা এই শতাব্দীতে প্রত্যেক বয়সেই কমছে। ১৮৭১ সালে যাদের জন্ম তাদের বয়স যখন ছিল ৪৫ বছর, তাদের মধ্যে ক্যানসারে (ফুসফুসের ক্যানসার বাদে) মৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ৭·৫। কিন্তু ১৯০১ সালে যাদের জন্ম তাদের ৪৫ বছর বয়সে ক্যানসারে মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২·৫-এরও কম। তবে পুরুষদের ক্ষেত্রে ফুসফুসের ক্যানসারে মৃত্যুর হার এই শতাব্দীতে গুরুতর রকমের বেশি। ১৯০১ সালে জন্ম ৪৫ বছর বয়সী পুরুষরা ফুসফুসের ক্যানসারে যতো সংখ্যায় মরেছে তা ১৮৭১ সালে জন্ম ৬৫ বছর বয়সী পুরুষদের মৃত্যুর সংখ্যার সমান। ধূমপানের ফলে মেয়েদের মধ্যে অবস্থাটা কী রকম তা এখনো লক্ষ্য করার বিষয়।

এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ফুসফুসের ক্যানসার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটেছে সিগারেটের ধূমপান করার দরুন। ইংলণ্ডের একটি মেডিকেল কলেজের হিসেব থেকে জানা যায় যে ১৯৫১ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে ধূমপায়ী ডাক্তারদের সংখ্যা শতকরা ৪৩ থেকে ২১ পর্যন্ত কমে গিয়ে-ছিল। এই সংযম অসামান্য নয়, কিন্তু তারই ফল হিসেবে প্রতি বছরে ৩০ থেকে ৬৪ বছর বয়সী আশিজন ডাক্তারের প্রাণ বেঁচে গিয়েছিল। অর্থাৎ গোটা একটি মেডিকেল কলেজ থেকে যতো সংখ্যক ডাক্তার পাওয়া যেতে পারে ততো সংখ্যক। যে-কোনো দেশের পক্ষে এইটেই সবচেয়ে কম খরচে ডাক্তার পাওয়ার একটা পথ হতে পারে।

আমেরিকার কোনো কোনো অংশের মানুষ যতো-না বৃহৎ অন্ত্রের ক্যানসারে ভোগে, আফ্রিকার কোনো কোনো অংশের মানুষ ভোগে তার চেয়ে ১৪ গুণ কম। কেন? একজন ক্যানসার-বিশেষজ্ঞ বলেছেন, আফ্রিকার মানুষের খাদ্য সাদামাটা হবার ফলে মল হয়ে থাকে নরম এবং অন্ত্রদেশ পার হতে মলের সময়ও লাগে খুব কম। এ-কারণে শুধু ক্যানসার-ই নয়, অন্ত্রদেশের অন্যান্য অসুখ ও গোলযোগও খুব কম। সে-তুলনায় ইউরোপের ও আমেরিকার মানুষের খাদ্যের ধরনই এমন যে তার বেশির ভাগটাই হজম হয়ে যায়, শরীর মোটা হয়ে পড়ে, অহেতুক চাপ সৃষ্টি হয়—তারই অনিবার্য ফল মলাশয় ও মলনালীর ক্যানসার।

ক্যানসার হবার পরে গোড়াতেই তাকে ধরার ও চিকিৎসার ব্যবস্থার চেয়ে ক্যানসার যাতে একেবারেই না হয় সেই ব্যবস্থা করা অনেক কম খরচের।

গোড়াতেই ধরা

গোড়াতেই ধরতে পারলে অসুখ সারিয়ে তোলা সহজ কিন্তু গোড়াতেই ধরতে পারাটা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। সচরাচর যে-সব টিউমার হয়ে থাকে সেগুলো একেবারে বন্ধ করা যাবে এমন সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। তবে সময়ে ধরা পড়লে অবশ্যই সারানো যায়। 'সময়ে' বলতে এখানে 'রোগের লক্ষণ প্রথম প্রকাশ পাওয়ার' অবস্থা বোঝাচ্ছে না—বোঝাচ্ছে রোগের প্রক্রিয়ার গোড়ার অবস্থা যখন ওষুধে কাজ হয়। কোনো কোনো টিউমার এত আস্তে আস্তে বাড়ে যে কয়েক মাস বিলম্ব হলেও চিকিৎসার আওতায় থাকে, কোনো কোনো টিউমার এত দ্রুত বাড়ে যে টের পাবার আগেই চিকিৎসার আওতার বাইরে।

স্ক্রীনিং

ক্যান্সার রোগ গোড়াতেই ধরতে পারার একটি উপায় হচ্ছে স্ক্রীনিং—অর্থাৎ রোগ হবার পরে রোগীর নিজের থেকেই উপস্থিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকা নয়, তার আগে সাধারণ একটি পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা। স্ক্রীনিং-এর ব্যবস্থা যেখানেই করা হয়েছে সেখানেই সুফল পাওয়া গেছে। কখনো রোগী যতোক্ষণে শরীরের [illegible] অসুখটি টের পায় ততোক্ষণে [illegible] হয়তো খুবই বাড়াবাড়ি অবস্থা। তখন আর চিকিৎসায় ফল হয় না। বলা বাহুল্য, সর্ব-জনীন স্ক্রীনিং-এর ব্যবস্থা করা খুবই ব্যয়-সাধ্য ব্যাপার।

ধূমপান ও স্বাস্থ্য

ধূমপান যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এতে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। গ্রেট-ব্রিটেনে বাধ্যতামূলক আইন করা হয়েছে যে, সিগারেট-উৎপাদকরা প্রত্যেকটি প্যাকেটে ও প্রত্যেকটি বিজ্ঞাপনে সরকারের এই সতর্কী-করণ জানিয়ে দেবেন যে ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

ধূমপান (বিশেষ করে সিগারেটের ধূম-পান) থেকে যে ক্যান্সার ও অন্য কতকগুলো ব্যাধি হতে পারে তার পক্ষে দুই ধারার সাক্ষ্য রয়েছে। একটি সাক্ষ্য—যাকে বলা হয় এপি-ডেমিওলজিক্যাল, অর্থাৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে

বিভিন্ন রোগের প্রকোপ ও বিস্তার পর্যবেক্ষণ করে যে বিজ্ঞান সেই বিজ্ঞানমূলক। অপরটি এক্সপেরিমেন্টাল বা পরীক্ষামূলক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩০ সালে ফুসফুসের ক্যান্সারে মারা গেছে ৩০০০ জন. ১৯৬০ সালে তার দশগুণ। ইংলণ্ড ও ওয়েলস-এ ১৯১৬ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে এই রোগে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ২০০, কিন্তু ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে ১০০০০ ছাড়িয়ে যায়। অবশ্য শুধু এই সংখ্যাগুলো থেকে বোঝা যায় না রোগ কেন বাড়ছে। এখনও হতে পারে, রোগ বাড়ছে খাদ্যে পরিবর্তনের দরুন, বেশি মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার দরুন, বায়ুমন্ডল দূষিত হওয়ার দরুন; উল্লিখিত প্রত্যেকটি কারণেই রোগ বাড়তে পারে।

কিন্তু পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকটি রোগীর বিবরণ ও জীবনযাত্রার খবর নিলে স্পষ্টভাবেই দেখা যায়, ফুসফুসের ক্যান্সারে যারা মারা যাচ্ছে তাদের বেশির ভাগই ধূমপায়ী। তার মানে কিন্তু এই নয় যে অ-ধূমপায়ীদের কখনো এই রোগ হয় না বা ধূমপায়ী মাত্রেই এই রোগে আক্রান্ত হবে। কত ধূমপায়ী ক্যান্সারে আক্রান্ত না হয়ে ৯০ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচেছে কিন্তু অধূমপায়ী অল্প বয়সেই ফুসফুসের ক্যান্সারে মারা গেছে, এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। তবে দু-একটা বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত কোনো কিছুই প্রমাণ করে না।

পরিসংখ্যানের সাক্ষ্য ধূমপায়ীদের বিপক্ষে। ১৯৬৭ সালের একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, দিনে কুড়িটিরও কম সিগারেট খায় এমন ব্যক্তিরও ফুসফুসের ক্যান্সারে মারা যাবার সম্ভাবনা অধূমপায়ীর চেয়ে ৩০ গুণ বেশি।

সিগারেটের ধোঁয়ার বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে ক্যান্সারের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তা নিয়ে পরীক্ষামূলক কাজও কম হয়নি। দু-রকমের পরীক্ষা হয়েছে। একটি পরীক্ষায় কুকুর ইঁদুর খরগোশ জাতীয় প্রাণীদের প্রচুর পরিমাণে সিগারেটের ধোঁয়া খাওয়ানো হয়েছে। কিছুকাল পরে পরীক্ষাধীন প্রাণীদের ফুসফুস পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে সিগারেটের ধোঁয়া থেকে ফুসফুসে ক্যান্সারের আক্রমণ ঘটা সম্ভব।

দ্বিতীয় পরীক্ষায় সিগারেটের ধোঁয়া বা সিগারেটের ধোঁয়ায় প্রাপ্ত উপাদান লেপে দেওয়া হয়েছে নানা জন্তুর চামড়ার ওপরে ও অন্যত্র। কিছুকাল পরে বহু ক্ষেত্রেই এই লেপে দেওয়া অংশে ক্যান্সারের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে।

এ থেকে সিদ্ধান্ত করতে হয়, তামাকের ধোঁয়ায় এমন এক বা একাধিক উপাদান আছে যা ক্যান্সার-সহায়ক কোষগত পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

তামাকের ধোঁয়ার উপাদান নিয়েও প্রচুর গবেষণা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে একটি মুশকিল এই যে, তামাকের ধোঁয়ায় যে-সব উপাদান থাকে তার সবগুলিই কিন্তু মূল তামাকে পাওয়া যায় না, তামাক পুড়বার সময় অনেকগুলি তৈরি হয়েছে। কাজেই গবেষণাটি চালাতে হয় তামাক-পোড়ানো ধোঁয়া ও কালি নিয়ে।

তামাকের এই ধোঁয়ার মধ্যে রয়েছে পঞ্চাশোর্ধ গন্ধযুক্ত হাইড্রোকার্বণ। এখনো পর্যন্ত গবেষণার যা ফলাফল, তাতে কোনো একটি বিশেষ হাইড্রোকার্বনকে ক্যান্সারের জন্যে দায়ী করা চলে না। এমনও হতে পারে, সবকটি উপাদান একযোগে এমনভাবে ক্রিয়াশীল হয় যার ফলে ক্যান্সারের অবস্থা সৃষ্টি হয়। এই কথাটি ধরে নিলে ব্যাখ্যা করা যায় কেন পাইপের ধোঁয়ায় ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা সিগারেটের ধোঁয়ার চেয়ে কম।

যাই হোক, এত সতর্কবাণী সত্ত্বেও সিগারেটের বিক্রি কিন্তু কমছে না, বরং বাড়ছে। এ অবস্থায় অনেকেই বলছেন, সিগারেটের বিক্রি কমাবার চেষ্টা করে এখন আর কোনো লাভ নেই। বরং চেষ্টা করা উচিত এমন সিগারেট তৈরি করা যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। এই বিশেষ দিকে ইতিমধ্যেই কিছু চেষ্টা চলছে, জনস্বাস্থ্যে আগ্রহী ব্যক্তিরা অবশ্যই আশা করবেন এই চেষ্টা সফল হোক।

ভারতে রকেট ঘাঁটি

অন্ধ্র রাজ্যের নেলোর জেলার শ্রীহরিকোটা দ্বীপে একটি রকেট উৎক্ষেপণ ঘাঁটি স্থাপিত হয়েছে। শ্রীহরিকোটা বঙ্গোপসাগরের পূর্ব উপকূলের একটি দ্বীপ, লম্বায় ২১ কিলোমিটার ও চওড়ায় ৮ কিলোমিটার। এই দ্বীপটিতে এমনিতে চাষ-বাস কিছু ছিল না, আশেপাশের সমুদ্রে মাছ ধরার কোনো রেওয়াজ নেই—এদিক থেকে রকেট উৎক্ষেপণের ঘাঁটি হিসেবে এটি একটি উপযুক্ত স্থান। ১৯৭১ সালের অকটোবর মাসে এই থেকেই রোহিণী আর-এইচ ১২৫ রকেট উৎক্ষিপ্ত হয়। সেটি নির্মিত হয়েছিল থুম্বা মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে।

শ্রীহরিকোটায় এখন মাঝারি আকারে রোহিণী ব্যোমযান মহাশূন্যে প্রেরণের জন্যে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অতঃপর হবে বড়ো আকারের কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের ব্যবস্থা। ১৯৭৪ সালের মধ্যে ব্যবস্থাদি শেষ করা যাবে, আশা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ঘোষণা শোনা গিয়েছে যে, ১৯৭৪ সালে সোভিয়েত সহযোগিতায় ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হবে।

বিজ্ঞান বিনা আধুনিক জীবন অসম্ভব

কথাটি বলেছেন বোম্বাই-এর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যক্ষ ডঃ পি কে কেলকর। তবে সঙ্গে সঙ্গে আরো বলেছেন, তাই বলে মানুষ শুধু বিজ্ঞান নিয়ে বাঁচতে পারে না। তারপরে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, স্বাধীনতার মতো বিজ্ঞানও অবিভাজ্য, বিজ্ঞানকে লালন করতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল স্তরে।

প্রবন্ধটির নাম 'বিস্ময়ে পিছনের দিকে তাকাই', প্রকাশিত হয়েছে 'স্প্যান' পত্রিকার গত আগস্ট সংখ্যায়। এই প্রবন্ধে ডঃ কেলকর বলছেন, স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে বিজ্ঞান ও সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রযুক্তিবিদ্যার গুরুত্ব কোনো সচেতনতা ছিল না, বিজ্ঞানের চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগ ও গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে।

নাটকীয় পরিবর্তন ঘটল ১৯৪৭ সালের অল্প কিছুকাল পরেই। বৈজ্ঞানিক কারিগরী ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় এবং গবেষণায় বিরাট সুযোগসুবিধা তৈরি করা হল, বিরাট কর্মসংস্থানও। এই সময়ে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বড়ো হয়ে ওঠে ও দেশের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সামনের সারিতে এসে দাঁড়ায়। ডঃ কেলকর তাঁর প্রবন্ধে এমন কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন।

টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, বোম্বাই : পঁচিশ বছরের এই প্রতিষ্ঠানটির খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে। নিউক্লিয়ার শক্তির বিকাশসাধনে ও পরমাণুর শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে এই প্রতিষ্ঠানের অবদান প্রচুর, যা প্রমাণ করে বিজ্ঞান ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরীর মধ্যে সার্থক সম্পর্ক কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে কম্পিউটার ও কম্পিউটারবিজ্ঞান প্রবর্তনেও এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিকস, কলকাতা : এই প্রতিষ্ঠানে সাইক্লোট্রন যন্ত্র বসানো হয়েছে ও অন্যান্য বহু জটিল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বিন্যস্ত হয়েছে। এতে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অসামান্য আত্মনির্ভরতা লাভ করেছেন।

ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি, আমেদাবাদ : এই প্রতিষ্ঠান ভারতে মহাকাশ গবেষণায় পথ দেখিয়েছে। থুম্বায় এতে সংশ্লিষ্ট যে বৃহৎ কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে তা এই গবেষণারই ফল।

ডঃ সি ভি রামন : সম্প্রতি প্রয়াত নোবেলপুরস্কার-বিজয়ী এই বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের প্রচারে যেভাবে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন তার সমকক্ষ কেউ নেই। দেশের তরুণদের কাছে তিনিই ছিলেন বিজ্ঞানের প্রতীক।

কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ : এই সংস্থার আওতায় স্থাপিত হয়েছে জাতীয় গবেষণাগারসমূহ। উদ্দেশ্য, দেশের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিশদ-জ্ঞান আয়ত্ত করা ও ভারতীয় শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধিতে সাহায্য করা। বিজ্ঞান যে অনেকের কাছেই জীবিকা হতে পেরেছে, তা এই সংস্থার জন্যেই।

পাঁচটি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি : ভারতে কারিগরী বিদ্যার প্রসারে এই পাঁচটি ইনস্টিটিউটের অবদান অসামান্য।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ : সারা দেশ জুড়ে স্থাপিত রয়েছে গবেষণা কেন্দ্র, কৃষির জ্ঞান বেড়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গবেষণা—সব মিলিয়ে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ।

তা সত্ত্বেও, ডঃ কেলকর বলছেন, এ সবই বিজ্ঞানের প্রতি প্রতিষ্ঠানগত সমর্থন, সাধারণভাবে দেশের মানুষের মনে বিজ্ঞান কোনো প্রকৃত সাড়া জাগায়নি।

—অয়স্কান্ত

—আট—

সন্ধ্যের খানিক আগে রিহার্সাল শেষ হল।

শুরুতে অবশ্য আরো একটু তোড়া ভাড়ি হত। আসলে প্রথম দিকে যেমন হয়, —কেউই তেমন সিরিয়াস ছিল না। প্রতিদিন একজন কিংবা দুজন গরহাজির! ফলে পুরো বইটার মহলা হয়ে উঠত না। কিন্তু এখন তড়িঘড়ির ব্যাপার। সামনেই ফাংশন। হাতে আর মোট সাত-আটটা দিন। সময় বেশী নেই বলে রতীশ যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এই কটা দিন ভালো করে তালিম না দিলে ফাংশনের রাত্তিরে নাটক জমবে কেন?

বিশ্তির পা দুটো টন টন করছিল। মোটে দেড় ঘণ্টার বই। কিন্তু ওরই মধ্যে তার তিন-চারটে নাচ আছে, ভালো করে তালিম নেবার জন্য প্রত্যেকটি নাচ একবার-দুবার এমনকি তিনবারও নেচেছে বিশ্তি। সে নাচে ভালো, সকলেই প্রশংসা করছে। যার নৃত্য-পরিকল্পনা যার, সেই ভদ্রলোক পর্যন্ত। বিশ্তি নিজেও খুব খুশি। এই নাটকের সে নায়িকা,—নর্তকী রূপসনা। তার নাচগুলি মুখ্য আকর্ষণ। বইটাতে নাচ আর গান বেশী। অভিনয়ের তেমন সুযোগ নেই। সুতরাং অন্য কারো বাহবা কুড়োবার আশা কম।

মিলি এসে বলল,—'চল বিশ্তি। তোর গাড়ি রেডি। নীচে সারথিমশায় তোকে নিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

ড্রাইভার এসেছে শুনে বিশ্তি তখনি উঠল। লোকটা সর্বদাই গাড়ি নিয়ে এখানে সেখানে ছুটছে। ভীষণ ব্যস্ত, সময় মত তাকে পাওয়াই কঠিন। রতীশদের বাড়িতে গাড়ি দুটো,—কিন্তু ড্রাইভার একজন। তব, অসুবিধে নেই। কারণ সকলেই ড্রাইভিং জানে, লাইসেন্স আছে। ইচ্ছেমাত্র গাড়ি নিয়া যে কেউ বেরোতে পারে। ড্রাইভার না থাকলে রতীশই তাকে পৌঁছে দিতে যায়। আর তাই নিয়ে মিলি আড়ালে ঠাট্টা করে, মুখ টিপে হাসে। অবশ্য শুধু মিলি নয়, অন্য মেয়েরাও ফিসফিস, গা-টেপাটেপি করে। সে রতীশের সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠলেই ওরা চোখিয়ে চোখিয়ে তাকায়। কেউ বা ফিক করে হাসে।

নীচে এসে বিশ্তি দেখল গেটের কাছে গাড়িটা দাঁড়িয়ে। কিন্তু চালকের আসনে ড্রাইভার নয়, রতীশ বসে আছে।

মিলি তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে মিহি গলায় বলল,—'কিরে, সারথিকে দেখে খুশি হলি তো?'

বিশ্তি খুব খুশি। ড্রাইভারের সঙ্গে যেতে তার একটুও ভালো লাগে না। এতখানি পথ স্রেফ মুখ বুজে যাওয়া অথচ রতীশ গাড়ি নিয়ে গেলে দুজনে গল্পে মত্ত থাকে। সমস্ত পথটা কখন হুস করে ফুরিয়ে আসে বিশ্তি টেরও পায় না।

কিন্তু এসব ব্যাপারে মনের খুশি ভাঙতে নেই। আশেপাশে আরো মেয়েরা আছে, তারা শুনলে কি ভাববে? তাছাড়া মিলিটা সাংঘাতিক,—ভীষণ দুষ্টু। ওর মুখে কিছু আটকায় না। এমনিতেই যখন তখন তাকে ঠাট্টা করে। বলে,—রতীশদা নির্ঘাত তোর প্রেমে পড়েছে। ব্যাপারটা তুই লুকোচ্ছিস।'

—'পাগল নাকি?' বিশ্তি মৃদু হাসে, ভুরু কুঁচকে কেমন একটা ভঙ্গি করে শুধোয়,—'দুদিন গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দিলেই ছেলেরা বুঝি প্রেমে পড়ে যায়?'

—'কি জানি!' মিলি অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা দোলায়। বলে,—'তুই না চাপা মেয়ে। প্রেমে মজলেও আমার কাছে কি কোনোদিন ভাঙবি?'

রতীশদের বাড়িটা ভারী সুন্দর। চারপাশে অনেকখানি লন। সবুজ ঘাস,...ঠিক মখমলের মত নরম। এখানে সেখানে নানা গাছ। সামনের দিকে খানিকটা জায়গা জুড়ে বাগান। মালিটার বাহাদুরি আছে। এই কার্তিকের শেষেই কত বিচিত্র বর্ণের ফুলে ভরিয়ে রেখেছে বাগানে। কি সুন্দর সব মরশুমী ফুল। প্রত্যেকটির বিচিত্র বর্ণবাহার। গাড়িতে ওঠার আগে বিশ্তি কয়েক সেকেণ্ড মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

সাদার্ণ অ্যাভিনিউ ধরে খানিকটা পথ গিয়ে গাড়িটা ফের একপাশে থামল। বিশ্তি পিছনের সীটে বসেছিল। গাড়িটা থামতেই সে দরজা খুলে বেরিয়ে আবার রতীশের পাশে এসে বসল। আসলে প্রতিদিনই এই লুকোচুরি। গেটের সামনে গাড়িতে ওঠার সময় বিশ্তি পিছনের সীটে বসে। অল্প কিছুটা পথ গিয়ে গাড়িটা ফের থামে। আর তখন আসন বদল করে বিশ্তি সামনের সীটে রতীশের কাছে চলে আসে।

গাড়ি ফের চলতে শুরু করলে বিশ্তি শুধোল,—'বইটা মনে হয় ভালো হবে, তুমি কি বল?'

—'নিশ্চয়। তোমার নাচ তো খুব সুন্দর হচ্ছে। সবাই প্রশংসা করে। এমনকি মন্মথবাবু পর্যন্ত।' একটু থেমে রতীশ যোগ করল,—'উনি কিন্তু চট করে কাউকে ভালো বলেন না।'

কথাটা সত্যি। মিলির কাছ থেকেও বিশ্তি শুনেছে। মাস্টারমশায় তার নাচের প্রশংসা করেছেন। এই নাটকের নৃত্যগুলি মন্মথবাবুর পরিকল্পনা। তাদের কাউকে নাচ শেখান, তালিম দেওয়ার ভার উনি নিয়েছেন। অথচ বিশ্তি যে ভালো নাচে, একথা কোনোদিন মন্মথবাবুর মুখ থেকে সে শোনেনি। উনি শুধু বলেছেন,—'তুমি চেষ্টা করে যাও। একদিন হয়তো ভালো নাচতে পারবে।'

সন্ধ্যের মুখে সাদার্ণ অ্যাভিনিউ প্রায় ফাঁকা। ইদানীং সব রাস্তারই যে দশা এই দশা। গাড়ি জোরে ছুটছিল বলে হাওয়ায়

মাথার চুলগুলো উড়ছে। কানের কাছে, মুখের নরম চামড়ায় জোরে বাতাস লাগছে। বিন্তি কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে বলল—'ভীষণ হাওয়া। কাচটা তুলে দাও বরং।'

রতীশ বাঁ হাতটা বাড়িয়ে বেশ কসরৎ করে উইণ্ড গ্লাসটা তুলে দিল।

বিন্তি নড়েচড়ে আরাম করে বসল। বলল,—'রোজ রোজ আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছ। ওরা সবাই আড়ালে হাসাহাসি করে।'

—'তাই নাকি?' রতীশ আড়চোখে তাকাল। 'কিন্তু রিহার্সালের পর তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব, এই কথা ছিল না আমাদের?'

—'আহা! তার জন্যে তো ড্রাইভার আছে মশায়।' বিন্তি মুচকি হাসল। 'রোজ রোজ তোমার অত পৌঁছে দেবার গরজ কিসের?'

—'ড্রাইভার কোথায়?' রতীশ সামনের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল। 'সে বোধহয় এখনও ফেরেনি। তার সংগে যেতে হলে তোমার আরো এক ঘণ্টা নির্ঘাত দেরি হত।'

'ও বাবা! তাই নাকি?' বিন্তি প্রায় আঁতকে উঠল, 'তাহলে বাড়ির লোকে আমাকে আর আস্ত রাখত না।' কয়েক সেকেণ্ড পরে সে ফের বলল,—'কিন্তু তোমার কথা ওরা কেউ বিশ্বাস করবে না মশায়, মিলি তো নয়ই। সে পরিষ্কার বলে—সব রতীশদার চালাকি। তোকে নিজে পৌঁছে দেবে, তাই ছলছুতো করে ড্রাইভারকে অন্য কাজে পাঠিয়ে দেয়। আমরা যেন আর কিছু বুঝিনে।'

—'তাই নাকি? মিলি বুঝি তোমাকে এই সব বলে?' রতীশ হা-হা করে হাসল।

—'শুধু এই নয় মশায়,' বিন্তি সহাস্যে তাকাল। 'তোমার বোনটি একটি চিজ্‌। সে আরো অনেক কথা আমাকে জিজ্ঞেস করে।'

—'আবার কি জিজ্ঞেস করে?' রতীশ শুধোল।

—'আহা! তুমি দিন দিন ভীষণ ন্যাকা হচ্ছ।' বিন্তি সুন্দর একটি ভ্রূভঙ্গি করল। বলল,—'মিলি কি জানতে চায়, তুমি বুঝতে পার না?'

—'কিছুটা পারি বৈকি।' রতীশ হেসে ফেলল। আড়চোখে বিন্তির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,—'তবু তোমার কাছ থেকে শুনতে ইচ্ছে করে যে।'

বিন্তি মুখ নামিয়ে অল্পক্ষণ ভাবল। ব্যাপারটা মুখ ফুটে জানাতে বোধহয় তার লজ্জা করছিল। কয়েক সেকেণ্ড পরে ঈষৎ সংকোচের সংগে সে বলল,—'জানো, মিলি আমাদের ভীষণ সন্দেহ করে। ওর ধারণা তুমি নির্ঘাত আমার প্রেমে পড়েছ। তাই আমার দিকে তোমার এত নজর। আমাকে একা পেতে চাও বলেই রোজ গাড়ি নিয়ে আমাদের বাড়ির দিকে ছোটো—'

—'বাঃ! মিলিটা তো খুব ইনটেলিজেণ্ট। ব্যাপারটা ঠিক আন্দাজ করেছে।' রতীশ বোনের বুদ্ধির তারিফ করল। মুচকি হেসে বিন্তিকে শুধোল,—'তুমি প্রেমের সম্পর্কটা স্বীকার করলে তো?'

—'পাগল নাকি?' বিন্তি চোখ ঘুরিয়ে জবাব দিল।

—'তাহলে আর তোমাদের বাড়ি যেতে পারব? মিলি আমাকে দিনরাত্তির ক্ষেপিয়ে মারবে। তাছাড়া এসব কথা তাড়াতাড়ি স্বীকার করবার প্রয়োজন কি?'

—'ঠিক বলেছ তুমি।' রতীশ খুশি হয়ে বলল। 'আরো কিছুদিন যাক না। ভালোবাসার কথা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জানাতে নেই। প্রেমের একটা রঙ আছে বিন্তি। সে রঙ ঠিকই চোখে পড়বে। দশজনের কাছে লুকোবার উপায় নেই।'

রতীশ খুব সুন্দর কথা বলতে পারে। বিন্তির ভীষণ ভালো লাগে। ওর কথাগুলো সে আবিষ্টের মত শোনে। প্রতিটি শব্দ বিন্তির কানে এমন মধুর মনে হয়। মিলির জন্মদিনে প্রথম ওর সংগে আলাপ। সেদিন কি সুন্দর দেখাচ্ছিল রতীশকে। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। গলায় একটা টকটকে লাল রঙের টাই। পরনে ছাই-রঙা সুট আর ঘিয়ের রঙের সিল্কের জামা। রতীশের ঠোঁট দুটোর এমন সুন্দর লালচে রঙ। ওর সংগে চোখাচোখি হলে বিন্তির বুকের ভিতরটা আজও কেমন শিরশির করে।

গড়িয়াহাটার ক্রসিঙে লাল আলোর সঙ্কেত দেখে গাড়িটা দাঁড়াল। ছোটখাটো জ্যাম্‌। সারবন্দী অনেকগুলো গাড়ি। ক্রসিঙটা পার হতে সময় লাগবে। রতীশ স্টিয়ারিং থেকে হাত নামিয়ে বলল,—'মিলি কিন্তু সত্যি কথা বলেছে। দশজনের ভিড়ে তোমাকে দেখে, কাছে পেয়ে আমার মন ভরে না বিন্তি। আমি সকলের কাছ থেকে আড়াল করে তোমাকে একা পেতে চাই। আর একলা পাব বলেই এই পথটুকু আমি নিজে ড্রাইভ করে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে ভালবাসি।'

সবুজ বাতি জ্বলে উঠতেই গাড়িটা ফের স্টার্ট নিল। সন্ধ্যে হতে অল্প কিছুক্ষণ বাকি। রতীশ বলল, 'এখনই বাড়ি ফিরতে চাও?' গঙ্গার ধারে একটু বেড়িয়ে গেলে হত না?'

মুমূর্ষু রোগীর মত বিকেল প্রায় মরতে বসেছে। গ্রাম-বাংলায় এখন গোধূলির ছবি। বড় গাছের নীচে, ঝোপঝাপের তলায় আবছা অন্ধকার ঘন হতে শুরু করেছে। গঙ্গার ধারে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে আসতে বিন্তির বোধহয় অমত ছিল না। তবু মৃদু আপত্তি করে সে বলল,—'বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাবে না?'

—'কিচ্ছু দেরি হবে না?' রতীশ ওর মনের মেঘ সাহসের বাতাসে উড়িয়ে দিতে চাইল। হাতঘড়ির দিকে এক পলক তাকিয়ে ফের বলল,—'এখন প্রায় ছটা বাজে। আমি সাতটার আগে তোমাকে বাড়ির কাছে নামিয়ে দেব।'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। গাড়িটা প্রায় নিঃশব্দে চলেছে। কয়েকটি মৌন মুহূর্ত নিঃশেষ হল।

নীরবতা ভেঙে বিন্তি প্রথম বলল,—'দ্যাখ, মাঝে মাঝে আমার ভীষণ ভয় করে। মনে হয় তোমার সংগে অনেকদূর এগিয়ে গেছি। শেষকালে কি হবে বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, তুমি আমায় ভুলে যাবে না তো?'

—'কি জানি!' রতীশ ভুরু কুঁচকে কিছু চিন্তা করছিল। ফের বিন্তির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল,—'উল্টোটাও তো হতে পারে। আমার তো ভয় হয়, তুমিই না শেষে আমাকে ভুলে যাও।'

—'আমি ভুলে যাব? কি বলছ তুমি?' বিন্তি প্রায় প্রতিবাদ জানাল।

—'বারে! এসব কথা কি আগে থেকে বলা যায়?' রতীশ হাসল। 'আর ক'বছর পরে হয়তো তুমি একজন মস্ত বড় নৃত্যশিল্পী হবে। দেশজোড়া নাম, কত লোক চিনবে তোমায়। তখন আমার মত একজন সাধারণ মানুষকে তোমার পক্ষে চিনে রাখা একটু কঠিন হবে বৈকি।'

—'যাও, তুমি ভীষণ বাজে কথা বলতে পার।'

—'বাজে কথা নয় বিন্তি, আমার মাসীর কথা তোমাকে বলেছি না? আগে যখন নাম হয়নি, তখন মাসী আমাদের কত খোঁজখবর নিত। নিয়মিত লেটার আসত। আর এখন একটা চিঠি দিলে এক মাসের আগে উত্তর পাই না। তাও একপাতার ছোট্ট চিঠি। অবশ্য আমি বুঝতে পারি, মাসীর কোনো দোষ নেই। হপ্তার সাতটা দিন অত ব্যস্ত থাকলে চিঠি লিখবে কখন? মানুষটার ফুর্সৎ কোথায়?'

একটু থেমে রতীশ ফের বলল,—'ফেমাস হওয়ার এই এক জ্বালা। নিত্য-নতুন মানুষের সংগে পরিচয় হচ্ছে। বইয়ের পাতা ওলটানোর মত পরিবেশ পালটাচ্ছে। পুরানো মানুষগুলোর মুখ আর মনেই থাকে না।'

বিন্তি মুখ তুলে শুধোল—'তোমার মাসী বুঝি খুব ফেমাস মহিলা? কিসে এত খ্যাতি? ভালো নাচতে পারেন? কি নাম বললে না তো?—'

—'উঁহু! নাম এখন বলব না। তবে আমার মাসীকে তুমি নিশ্চয় চেন। আর নাচের কথা শুধোচ্ছ? এককালে মাসী অবশ্য খুবই ভালো নাচত। এই কলকাতার কত শো করেছে। মাসী নাচবে শুনলে কম টিকিট বিক্রি হত শহরে?'

—'কি আশ্চর্য!' বিন্তি বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় করল। 'তুমি ঠিক বলছ, তোমার মাসীকে আমি চিনি? কিন্তু কেমন করে চিনব বল ত? উনি তো কলকাতার বাসিন্দা নন। যেখানে থাকেন, সে জায়গাটা তো বলছিলে এখান থেকে তেরশ মাইল দূরে।'

—'সে কথাও সত্যি।' রতীশ হেসে উত্তর দিল। 'মাসী যেখানে আছে, কলকাতা থেকে সেটা অনেক দূরে।' সাত সমুদ্দুর না হোক, তের নদীর পার তো বটেই।'

—'তাহলে বলো আমি কেমন করে ওঁকে চিনতে পারি?' বিন্তি একটা যুক্তি খাড়া করতে চাইল। কয়েক সেকেন্ড পরে রতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে সে ফের শুধোল,—'আচ্ছা মিলির কাছে তো কোন দিন তোমার এই মাসীর গল্প শুনি নি।'

—'আহা! মিলি কেমন করে মাসীর কথা জানবে? উনি তো আমার নিজের,—মানে মার রক্তের সম্পর্কের বোন নন।'

—'তাহলে?'

—'মাসী আমার মার বন্ধু। অবশ্য বয়সে অনেক ছোট। আট-দশ বছর আগের কথা আমার বেশ মনে পড়ে। মাসে একবার কি দুবার আমরা মাসীদের বাড়ি বেড়াতে যেতাম। তারপর মাসী হঠাৎ একদিন কলকাতা ছেড়ে চলে গেল। অনেক দিন কোন খোঁজ-খবরই পাই নি। আর এখন তো মাসী রীতিমত ফেমাস। কলকাতার কত লোক নাম বললেই চিনবে। মাঝে মাঝে মা অবশ্য দুঃখ করে। বলে,—আট-দশ বছর আগের দিনগুলো আশা বোধ হয় এক রকম ভুলেই গেছে।'

—'এই যাঃ!' বিন্তি হাততালি দিয়ে উঠল। 'ভুল করে মাসীর নামটাই কিন্তু বলে ফেললে।'

—'ওটা সাবেকী নাম।' রতীশ একটুও অপ্রতিভ না হয়ে জবাব দিল। 'ও নামে এখন মাসীকে কেউ চিনবে না। মা তাই সেদিন বলছিল, নতুন নাম নিলে মানুষটাও বোধ হয় বদলে যায়। আমাদের আশারও ঠিক সেই দশা হয়েছে।'

আউটরাম ঘাটের কাছে এসে গাড়িটা থামল। গঙ্গার বুকে জলের উপর আবছা অন্ধকারের ছায়া একটা ভারী পর্দার মত ঝুলছে। ময়দানে, কেল্লার চার পাশে এখন আর নজর চলে না। সর্বত্রই আঁধারের কালিমা থিক থিক করছে। দূরে রেড রোডের ওপারে চৌরঙ্গীর আলোকজ্জ্বল প্রাসাদশীর্ষ, গল্পে-পড়া রূপকথার রাজ-পুরীর মত স্বপ্নময় মনে হয়।

গাড়ি থেকে নেমে রতীশ ফের কথা কইল। 'তাই তো বলছিলাম তুমিও একদিন মাসীর মত ফেমাস হবে। আর তখন কল-কাতার এই দিনগুলোর কথা কে জানে, হয়তো তুমিও বেমালুম ভুলে যাবে।'

—'কক্খনো না।' বিন্তি প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠল। 'মেয়েরা অত চট করে কিছু ভোলে না মশায়, বুঝলে? তবে তোমার মাসীর সঙ্গে মিছিমিছি আমার তুলনা করছ। আমি ভালো করে নাচতে শিখলে তবে তো আমার নাম-ডাক হবে।' একটু থেমে সে ফের বলল, —'কে জানে, আমার হয়তো আর নাচ শেখাই হবে না।'

—'কেন? নাচ শেখা ছেড়ে দেবে নাকি?'

—'সে অনেক কথা রতীশ।' বিন্তি ম্লান মুখ করে বলল। 'আমরা হয়তো আর বেশী দিন কলকাতায় থাকব না।'

—'কলকাতায় থাকবে না? তাহলে কোথায় যাবে?'

—'দেশে। বাঁকুড়া জেলায় চন্দনপুর বলে একটা গ্রাম আছে। সেখানেই আমাদের বাড়ি। রিটায়ার করে বাবা এখন গ্রামে ফিরে যেতে চান।'

—'আশ্চর্য! শহর থেকে আবার কেউ গ্রামে ফেরে? আমি তো জানতাম গ্রাম থেকেই লোকে শহরে চলে আসে। একবার এলে আর কেউ সেখানে ফিরে যায় না। যেতে চায় না। কেন যাবে বলো? কি আছে গ্রামে?—'

—'ঠিক তাই। আমার মা বার বার সেকথা বলেন। কি হবে গ্রামে গিয়ে? রিটায়ার করলেই কি লোকে দেশে ফিরে যায়? খরচ-পত্তর সেখানেও যেমন, এখানেও তেমনি। কিন্তু বাবা অবুঝ, জীবন স্থির করেছেন। কারো কথা শুনবেন বলে মনে হয় না।'

—'খুব মুশকিল ব্যাপার।' রতীশ চিন্তিতভাবে বলল। 'তোমার এমন সুন্দর ফিগার। ভালো করে নাচ শিখলে একদিন নাম-যশ সব হবে তোমার। আর তুমি কিনা নাচ ছেড়ে দিতে চাইছ—'

—'চন্দনপুরে গেলে আর কেমন করে নাচ শিখব?' বিন্তি একটা হতাশ ভঙ্গি করল। ফের বলল,—'তবে এখনও কিছু পাকাপাকি হয় নি। এই যা ভরসা।'

রতীশ হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল,—'তোমাকে গ্রামে যেতে দেব না বিন্তি। চন্দনপুরে গেলে তোমার প্রতিভার অপমৃত্যু হবে। দরকার হলে আমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে বলতেও রাজি আছি।'

—'পাগল! বাবা তোমার কথা শুনবেন কেন? আমার মা, দাদারা দিন-রাত্তির কত বোঝাচ্ছে। কিন্তু চন্দনপুর বাবাকে একটা শক্তিশালী চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। হাজার বোঝালেও মত বদলাবে বলে বিশ্বাস হয় না।'

অন্ধকার ঘন হতে গঙ্গার তীর নির্জন হয়ে এল। সন্ধ্যে অতিক্রান্ত হবার পর বাতাসের শিরশিরানি আরো তীক্ষ্ম হুঁচোল হয়ে উঠেছে। দিন ফুরোবার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতা নিঃশেষ হয়ে ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। কৃষ্ণপক্ষ বলে আকাশে চাঁদ নেই। এতক্ষণ আশে-পাশে দু-চারজন লোক দেখা যাচ্ছিল। রাত বাড়ছে দেখে তারা কে কোথায় সরে পড়ল।

গাড়িতে বসে স্টার্ট দেবার আগে রতীশ বাঁ হাত বাড়িয়ে বিন্তির গলাটা জড়িয়ে ধরল। প্রথমে আলগোছে নরমভাবে, কিন্তু বিন্তি উথথুস করছে দেখে সে বেশ হেসে পড়ে হাতটা ভারী এবং কিছুটা শক্ত করল।

—'এই কি করছ! ছাড়ো, ছাড়ো—' বিন্তি নিজেকে মুক্ত করতে চাইল।

রতীশ মাথা হেলিয়ে বলল,—'লক্ষ্মীটি, এখানে কেউ নেই। শুধু একটা—' বাকিটুকু সে ইঙ্গিতে প্রকাশ করল।

বিন্তি ছদ্ম কোপ দেখিয়ে বলল,—'আমি কিন্ত ভীষণ রাগ করব। রোজ রোজ এসব ইংরেজী সিনেমার মত কাণ্ড আমার একটুও ভালো লাগে না। এইজন্যেই বুঝি তুমি আমাকে গঙ্গার ধারে বেড়াতে নিয়ে আস?—'

—'দূর! তুমি মিথ্যে রাগ করছ।' রতীশ ওকে ছেড়ে ফের সোজা হয়ে বসল। তারপর ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল,—'আমি তোমাকে ভাল-বাসি বিন্তি, ভীষণ ভালবাসি। একদিন না দেখা হলে ছটফট করে মরি।'

—'সত্যি বলছ?' বিন্তি ঠোঁট ফুলিয়ে কেমন আব্দার করে শুধোল।

—'সত্যি, সত্যি। তিন্য সত্যি। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না বিন্তি?' রতীশ একটু সরে ওর গা ঘেঁষে বসল।

—'বিশ্বাস করি বৈকি। নইলে তোমার সঙ্গে এমনি ঘুরে বেড়াতে পারি?' বিন্তি অকপটে মনের কথা ব্যক্ত করল।

এবং সেই মুহূর্তে রতীশ আবার ওর গলা জড়িয়ে ধরল। তারপর রাক্ষস যেমন সুন্দরী মেয়েকে অসহায় পেলে তার হৃদয়ের রক্ত চুষে খায়, রতীশ অনেকটা তেমনি ভঙ্গিতে নিজের মুখখানা ওর বুকের মাঝখানে প্রায় গুঁজে দিল। বিন্তির সমস্ত দেহে একটা শিরশিরানি ও রোমাঞ্চ। সে প্রায় থর থর করে কাঁপছিল। ধীরে ধীরে রতীশ তার মুখটা উপরে তুলে বিন্তির নরম গাল, গলা এবং কানের লতির নীচের দিকটা আলতোভাবে স্পর্শ করল। বিন্তি ক্রমশ অবশ এবং অসাড় বোধ করল। আবছা অন্ধকারে রতীশের উষ্ণ নিশ্বাস তার মুখের উপর এসে পড়ছিল। লালচে ঠোঁট দুটো ক্রমেই নিশানার দিকে এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরে সে চোখ বুজে, প্রায় অনাস্বাদিত দুর্লভ স্বর্গসুখের কল্পনায় স্বল্প কটি মুহূর্ত অতিবাহিত করতে লাগল।

মিনিট তিন-চার পরেই গাড়িটা আবার চলতে শুরু করল। বিন্তি প্রায় নির্জীবের মত সীটে মাথা হেলিয়ে চুপ করে বসেছিল। খানিক পরে রতীশ বল,—'কাল হয়তো তাড়াতাড়ি রিহার্সাল শেষ হবে। বাড়ি ফেরার পথে একটা নতুন জায়গা ঘুরে যেতে চাও?—'

—'কোথায়?' বিন্তি মুখ না তুলেই শুধোল।

—'পার্ক স্ট্রীটে। একটা ভালো রেস্তোরায়। দেখবে বিকেলবেলায় আমাদের বয়সী কত ছেলেমেয়ে সেখানে গেছে। বাজনা শুরু হলেই সকলে মিলে কেমন নাচতে শুরু করবে। অবশ্য তোমার মত অমন সুন্দর নাচের ভঙ্গিমা নয়। ওরা সাধারণত টুইস্ট নাচে। একবার দেখলেই তুমি সহজে শিখে নিতে পারবে।'

বিন্তি এবার উৎসাহের সঙ্গে শুধোল, —'ছেলেমেয়ে সব একসঙ্গে নাচে? খুব মজা হয় তাহলে?'

'—খুউব। তুমি গেলেই বুঝতে পারবে—'

—'কিন্তু আমার বাড়ি ফিরতে দেরী হয়ে যাবে না?'

'একটুও না। আমি তোমাকে ঠিক সাতটার সময় গলির মুখে পৌঁছে দেব।' রতীশ তাকে আশ্বাস দিল।

• • •

সদর দরজা খোলা ছিল। বাড়িতে পা দিয়ে বিন্তি অবাক। বারান্দায় রীতিমত বৈঠক চলছে। চৌকো টেবিলটার চারপাশে বাণীব্রত, কিরণ, মনোরমা এবং হিরণও উপস্থিত। কিরণের হাতে দু-তিনটে কাগজ এবং আরো কি সব বস্তু। খুব হৈ-চৈ করে সে মা, বাবা এবং ছোট ভাইকে কি যেন বোঝাতে চাইছে।

বিন্তিকে দেখে মনোরমা বলল,—'এই যে, এতক্ষণে ফিরলি মা? সন্ধ্যে থেকে উনি দশবার করে তোর খোঁজ করছেন।'

বিন্তি মুখ নীচু করে বলল,—'কাল থেকে ফুল রিহার্সাল চলছে বাবা। সামনের সপ্তাহেই তো ফাংশন। আর কটা দিন হয়তো এমনি দেরী হবে। তার জন্যে তুমি কিছু বল না বাবা।'

বাণীব্রত সস্নেহে মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। দিনে দিনে কুমোরের হাতে গড়া প্রতিমার মত মেয়ের রূপ যেন খুলছে। কতটুকুই বা বয়েস। জীবনের গলি ঘুঁজি, বাঁকা পথ কিছুই জানে না। সন্ধ্যের পর বিন্তি বাড়ি না ফিরলে তিনি তাই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

মেয়েকে বললেন, — 'সামনে তোর পরীক্ষা আসছে বিন্তি। সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ি না ফিরলে কখন পড়াশুনো করবি? তা বেশ, আর কটা দিন যাক। ফাংশনের পর তুই কিন্তু ঘরের বাইরে বেশী বেরোস নি মা।'

দু দিন হল বাণীব্রত অফিসে যান নি। সেই অসুস্থ হবার পর থেকেই ঘরে আছেন। বিন্তি তাই কাছে এসে শুধোল, —'তোমার শরীর ভাল আছে তো বাবা?'

—'সেই কথাই তো এতক্ষণ হচ্ছিল মা।' বাণীব্রত হেসে বললেন, 'কিরণ আজ রিপোর্টগুলো পেয়েছে। তেমন কোন গণ্ড-গোল নেই। ভাবছি কাল থেকেই আবার অফিসে বেরুবো।'

—'কিছু পাওয়া না গেলেও তোমাকে সাবধানে থাকতে হবে।' কিরণ অভিজ্ঞ ডাক্তারের মত বাপকে সতর্ক করে দিতে চাইল। বলল,—'ডাক্তার সিনহা আমাকে তাই বলেছেন। চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কিছু বিধি-নিষেধ তোমাকে মেনে চলতে হবে বাবা।'

—'নিশ্চয়।' বাণীব্রত স্বীকার করলেন। বুড়ো বয়সে অনিয়ম কেন সহ্য হবে বল? এখন ভাঙা শরীর, জোড়াতালি দিয়ে যে কটা দিন কাটে। তবে তোর ভরসাতেই আছি কিরণ। তেমন কিছু হলে বুড়ো মা-বাপকে নিশ্চয় দেখবি।'

বিন্তি বলল—'কিন্তু চন্দনপুরে চলে গেলে মেজদাকে তুমি কোথায় পাবে বাবা? ওকে তো কলকাতাতেই থাকতে হবে।'

—'তাতে ক্ষতি নেই।' বাণীব্রত একটুও চিন্তা না করে জবাব দিলেন, 'চন্দনপুর তো দূরে নয়। মোটে এক রাত্তিরের পথ। চিঠি লিখলেই কিরণ চন্দনপুরে গিয়ে বুড়ো মা-বাপকে দেখে আসবে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে মিলন ঘরে ঢুকল। তাকে খুব উত্তেজিত এবং চঞ্চল দেখাচ্ছিল।

বাণীব্রত ছেলের দিকে তাকিয়ে শুধোল,—'কি ব্যাপার মিলু? তোকে খুব ব্যস্ত আর ছটফটে দেখাচ্ছে।'

মিলন একটা চেয়ারের উপর ধপাস করে বসে পড়ে বলল,—'আমি একটা ভালো চাকরি পাচ্ছি বাবা। মানে ইঞ্জিনিয়রের কাজ মনে হয় এটা পেয়ে যাব।'

—'তাই নাকি?' মনোরমা উজ্জ্বল মুখ করে বলল। 'এ তো মস্ত সুখবর মিলু। এত দিনে ঠাকুর বোধহয় মুখ তুলে চাইলেন।'

—'চাকরি হলে তোকে কোথায় জয়েন করতে হবে? এই কলকাতায় না আরো দূরে?'—বাণীব্রত প্রশ্ন করলেন।

—'অনেক দূরে বাবা। আমার চাকরিটা সাত-সমুদ্দুর তের নদীর পারে—'

—'তার মানে? চাকরি করতে তোকে কোথায় যেতে হবে রে মিলু?' মনোরমা চিন্তিতভাবে শুধোল।

মিলন ধীরে ধীরে বলল,—'ইউনাইটেড স্টেটস মানে আমেরিকায় মা।' (ক্রমশঃ)

নারার গল্প

অজিতকুমার দত্ত

শীতের রোদ্দুরে কোথাও বাইরে বেরিয়ে পড়ার কথা ভাবতে গেলেই কি জানি কেন, মনে পড়ে যায় নারায় যাওয়ার ব্যাপারটা। সকালে রওয়ানা হয়ে সন্ধ্যেয় ফিরে আসা আর নতুন কিছু দেখা বা জানার সঙ্গে, পাহাড়ী পথে পার্কে বা জঙ্গলার ধারে ঘুরতে ঘুরতে বাড়তিও যেন কিছু মিলেছে সেখানে। পাওয়া গেছে একটা পিকনিকের মজা। তাই বোধহয় সেই যাওয়াটা বিশেষ-ভাবে স্মরণে রয়ে গেছে।

বহুকাল পূর্বে, কিয়োটোরও আগে, একসময় পাহাড়ে ঘেরা এই জায়গাটায় ছিল জাপানের রাজধানী। সে-পরিচয় কালক্রমে হারিয়ে গেলেও, বৌদ্ধধর্মের সূত্রে এক মহত্তর পরিচয়ে চিহ্নিত হয়ে উঠেছে এ-শহর। লাখ-দুয়ের লোকের বাস। সে-অর্থে তেমন বড় নয়। কিন্তু লোকজনের অবিরাম যাওয়া-আসা আছে। তাই যোগাযোগ এবং অন্যান্য সব কিছুরই ভাল ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রোগ্রামটা ছিল কিয়োটো থেকে গিয়ে আবার দিনে দিনেই ফিরে আসার। সেখান থেকে নারার দূরত্বও খুব বেশী নয়। যাওয়া ইলেকট্রিক ট্রেনে। গদীমোড়া ঝকঝকে গাড়ী। ট্রেন বলতে প্যাসেঞ্জার গাড়ীর ভিড় হৈ হট্টগোল কিছুই নেই। খুবই আরামের যাত্রা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যায়।

নারার এ-স্টেশনটি নতুন চেহারার। যাত্রীর ভিড় সত্ত্বেও লক্ষ্যণীয় যে খুব ঝকঝকে-তকতকে। প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরুবার মুখে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এগিয়ে এসে সঙ্গী জাপানী ছাত্রটিকে কি যেন জিজ্ঞাসা করলেন। পরিচয়ে জানা গেল যে এ-শহরেরই বাসিন্দা তিনি। জাপান সাংস্কৃতিক সমিতির তরফে বিদেশী অতিথিকে স্বাগত জানাতে ও সঙ্গদানের জন্য এসেছেন। ভদ্রতা বা আতি-থেয়তাবোধের এই স্বতঃপ্রবৃত্ত ধরনটা সম্ভবত এদেশের একান্তই নিজস্ব ব্যাপার। জগৎসভায় মাথা তুলে এরা দাঁড়াবে বৈকি!

স্টেশনের বাইরে এসেও চওড়া রাস্তা আর সেই পরিচ্ছন্নতার ছাপ। ভৌগোলিক অবস্থানজনিত কারণে আর তাছাড়া নভেম্বর পেরিয়ে ডিসেম্বর হতে চলেছে, তার দরুণ বাতাসে একটা ঠাণ্ডা আমেজ রয়েছে। রোদটুকু সেজন্য খুব আরামদায়ক। স্টেশন আর আশে-পাশের দোকান বাজারের ছাতা ছাড়িয়ে আসতেই নজরে পড়ে বড় বড় গাছ, মাঠ-ময়দান আর সামনে দূরে পাহাড়ের মাথা।

বলতে গেলে শহর জুড়েই পার্ক। ইতস্তত চড়ে বেড়াচ্ছে হরিণের দল। কোথাও বা দল বেঁধে, কোথাও বা একটি আর দুটি। লোকজন হেঁটে যাচ্ছে, শিশুরা কোলাহলমুখর। কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই তাতে। রাস্তার ধার ঘেঁষেই জলা।

এই পার্কেই নারার বিখ্যাত মিউজিয়ামটি অবস্থিত। টোকিও আর কিয়োটোর মিউ-জিয়মের মতো এটিও একটি 'জাতীয়' সংগ্রহশালা। বৌদ্ধ-ধর্ম ও সংস্কৃতির অঙ্গীভূত নানাবিধ শিল্পসম্ভার এই মিউ-জিয়মের অন্যতম আকর্ষণ।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কোরিয়া থেকে জাপানে বৌদ্ধধর্মের আমদানী ঘটে। চীন তথা ভারতের বৌদ্ধধর্মীয় চিন্তা বা প্রভাবেরই অনুপ্রবেশ এটা। শাক্যমুণি বুদ্ধের মূলতত্ত্ব বা পরবর্তী দিনের মহাযান-হীনযান মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও, একটা পর্বে পৌঁছে জাপানী তত্ত্ব-দর্শনও এসে যুক্ত হয়েছে সেই বৌদ্ধচিন্তার সঙ্গে। এ-প্রসঙ্গে জেন-বাদের উল্লেখ করা যেতে পারে। মোটামুটিভাবে দীর্ঘ কয়েক শতকের যোগাযোগের ফলে নারা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে বহু বৌদ্ধ-মন্দির ও মঠ গড়ে উঠেছে এগুলো নিছকই ঐতিহাসিক নিদর্শন নয়, অনেকগুলোই আজও ব্যবহারাধীন।

মিউজিয়মের স্বীয় সংগ্রহভুক্ত ছাড়াও, আশেপাশের নানা মন্দির ও ট্রাস্টের বহু জিনিসও গ্যালারীতে রয়েছে। বিশেষ কার্য-ক্রম অনুযায়ী জাপানী বৌদ্ধ-শিল্পের নানা দিক নিয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা হয়। গোটা বারো স্থায়ী গ্যালারীতে ছড়ানো রয়েছে—গৌতম-বুদ্ধ তথা জাতকের নানা চরিত্রের প্রতিমূর্তি, মন্দির-ভাস্কর্য, দেব-দেউলের স্কেল মডেল, স্ক্রীন ও ব্যানারে-করা ছবি, স্থাপত্য বা স্থাপত্য-অলঙ্করণের টালি প্রভৃতি নানা নিদর্শন, মুখোশ, পুঁথি এবং ধর্মীয় আচার-আচরণে ব্যবহৃত ঘণ্টা, ধাতুপাত্র ইত্যাকার বহুবিধ জিনিস। বলা বাহুল্য, ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়াও, শিল্পগত উৎকর্ষেও এর অনেকগুলোই স্মরণীয়। ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও, খবর পেয়ে কর্মাধ্যক্ষ এসে, নিজেই সঙ্গে ঘুরে সব দেখালেন। আবার স্মরণ হল যে ভদ্রতায় এঁদের জুড়ি মেলা ভার।

কাছেই তোডাইজীর মন্দির। ছেলেমেয়ে, বড়ছোট সবাই দলে দলে আসছে, যাচ্ছে। প্রবেশপথের মুখে দোকানের সব সারি। খোলামেলার ব্যাপার, গলিপথ নয়। কাজেই লোকজন, দোকানপাট সত্ত্বেও দম আটকানো মনে হয় না। এখানেও হরিণ। এদের খাওয়ানোর জন্য বিস্কুটই বিক্রী হচ্ছে আলাদা প্যাকেটে।

আদি মন্দির তৈরী হয়েছিল অষ্টম শতকে। বর্তমান প্রধান দেবগৃহটির বয়স তিনশো বছরের মতো। প্রায় ১৬০ ফুট উঁচু কাষ্ঠনির্মিত এই দালানটি এ ধরনের বাড়ী-ঘরের মধ্যে সর্ববৃহৎ আর ভেতরকার ডাই-বাৎসু (বৈরোচন)-এর মূর্তিটিও পৃথিবীর বৃহত্তম ব্রোঞ্জমূর্তি হিসাবে পরিগণিত।

দলে দলে লোক আসছে। দর্শনী দিয়ে ঢুকছে। প্রধান মূর্তির বা আশেপাশের মূর্তি বা কারুকর্ম দেখছে, আলোচনা করছে। দর্শক-পরিবৃত গাইডও এরই মধ্যে তার বক্তব্য বলে চলেছে। যারা ফটো তোলার তুলছে; সব সত্ত্বেও কোনও হৈ-চৈ নেই। সবাই মনে হয় সজাগ, পাশের কারুর কোনওরকম অসুবিধা না হয়।

পরবর্তী গন্তব্যস্থল কাশুগা দেবস্থান। পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত এটি একটি শিন্টো মন্দির। সিঁড়ির ধাপ ভেঙে ওঠার সময়

নজরে পড়ে বর্তিকা-স্তম্ভ। পাথরের তৈরী সব। ব্রোঞ্জের বাতিদানও রয়েছে। গুনতিতে মোট প্রায় তিন হাজারের মতো। আলো দেওয়া হয় উৎসবের দিনে। গাছপালার সবুজের পটভূমিতে, লালচে-মেটে সিঁদুর রঙের মন্দির-গৃহটি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। উদ্যানও রয়েছে সঙ্গে। শিন্টো মতানুযায়ী পূর্বপুরুষ, প্রেতলোক ও বীর পূজার একটা বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। মন্দিরে দেবতা বলে আলাদা কিছু বিশেষ ছিল না। কিন্তু পূজা-পাঠ চলছে। সদ্য-বিবাহিত এক দম্পতিকে ক্যামেরার সামনে দণ্ডায়মান দেখা গেল। তবে তোডাইজীর তুলনায় ভিড়টা এখানে কম।

বেরুবার মুখে আবার একপাল হরিণ দাঁড়ানো। বছর সাতেকের একটা ছেলে খুট্‌-খুট্‌ করে হরিণের স্ন্যাপ নিয়ে চলেছে একটার পর একটা। সামনেই সাজানো গোছানো একটা দোকান। এপাশে একটু চা-কফি খেয়ে জিরিয়ে নেবার ব্যবস্থা রয়েছে। ওপাশে নানা ধরনের স্যুভেনির—খেলনা, পাখা, হরিণের শিংয়ের জিনিস এমনকি ছবি আঁকার রং-তুলিও রয়েছে।

দ্বিপ্রাহরিক ভোজন শহরের শপিং এরিয়াতে সারা গেল। ফল, প্যাকেট খাবারের দোকান ইত্যাদি থেকে শুরু করে পুরো-দস্তুর রেস্তোরা সবই রয়েছে। ভিড় সব-খানেই। তবে সবই পরিপাটি সাজানো আর পরিচ্ছন্ন চেহারার। মেয়েরা তদারকী করছে। ভিড় সত্ত্বেও খুব একটা বসে থাকতে হচ্ছে না। আর যাদের হয়ে যাচ্ছে, তারাও অনর্থক চেয়ার আটকে কেউ বসে নেই। সঙ্গী ভদ্র-লোকদের সঙ্গে খাওয়ার ফাঁকে কথাবার্তা হল। বুদ্ধ একবার এসে ভারতবর্ষ ঘুরে গেছেন। গান্ধী-ভক্ত লোক। পড়াশুনাও করেছেন গান্ধীবাদ সম্পর্কে। তবে আজকের ভারতের সমস্যা বা স্বরূপ সম্বন্ধে খুব খবর রাখেন না বা রাখার সুযোগও তাঁর হয়নি। ভাল লাইব্রেরী বা হাতের নাগালে প্রয়োজনীয় বইপত্র না থাকাই এর কারণ। তবে জানার আগ্রহের কোনও অভাবই নেই। আশা প্রকাশ করলেন যে আবার তাঁর ভারতে আসার সুযোগ ঘটবে।

পুরানো শহর থেকে কিছুটা দূরে নতুন এক উপনগরীর পত্তন হয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার পর সেদিকটায় যাওয়া হল। রাস্তা

তোডাইজীর মন্দির—অভ্যন্তরে ডাইবুৎসুর মূর্তি
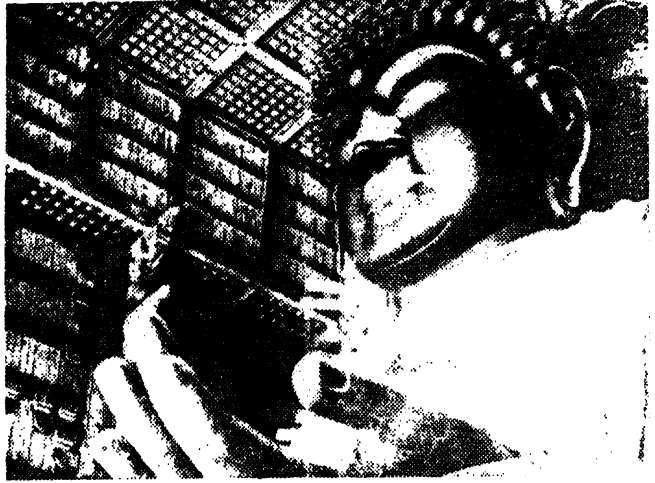
গেছে প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপ ঘেঁষে। অবশ্য প্রাসাদের চিহ্ন বিশেষ আর নেই। সব বাড়ীঘরে ছেয়ে গেছে। এ উপ-নগরী টাউন প্ল্যানিং-এর এক সুন্দর নিদর্শন। পাশাপাশি নানা ধরনের হাউসিং স্কীম। দোতলা থেকে শুরু করে চার পাঁচতলা অবধি সব গ্রুপ হাউসিং বড় একটা এলাকা জুড়ে। দোকান-পাট ইত্যাদিও রয়েছে, বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে ছোট পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে সাজানো বাংলো ধরনের সব বাড়ী। কেয়ারী-করা গাছ আর ফুলবাগানে সবগুলোই যেন ঝলমল করছে। শহর বসেছে অথচ ভিড় হৈ-হট্ট-গোলের চিহ্নমাত্র নেই। একদিককার সীমানা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে চওড়া হাইওয়ে—বাস মোটর চলছে আর আছে বৈদ্যুতিক ট্রেন।

জনবসতি ছাড়িয়ে উঁচু মাথাওয়ালা গাছের ভিড় কাটিয়ে একটা টিলার একপাশে কেটে সমান-করা জায়গাটায় ট্যাক্সিটা গিয়ে দাঁড়াল। নেমে বোঝা গেল যে পার্ক এরিয়া. একটা গেট রয়েছে সামনে। এগিয়ে যেতে ঝাঁকড়া-মাথা গাছ-গুলোর ফাঁকে নজরে এল অতি-আধুনিক এক স্থাপত্য নিদর্শন। প্রকৃতির মনোরম এই পরিবেশ আর তার সঙ্গে অনন্য বিস্ময় এই আধুনিক কেতার বাড়ীটি। সবমিলিয়ে দৃষ্টি বা মন দুই-ই আকর্ষণ করে।

বছর দশেকের পুরনো, নারার এই নতুন সংগ্রহশালা য়ামাটো বুনেকাবন-এর একটু ইতিহাস আছে। যে প্রাইভেট রেল কোম্পানীটি বছরের পর বছর এত যাত্রী বয়ে নিয়ে আসছে নারায়, এটি তারই অবদান। লাভের অংশ কিছু কিছু জমিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এটির। কোম্পানীর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বা চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত সংগ্রহ এবং অন্যান্য সূত্রে সংগৃহীত নানাবিধ সব শিল্পকাজ স্থান পেয়েছে এখানে। চীনদেশীয় ছবি, ভাস্কর্য ইত্যাদি জাপানী শিল্প-সম্ভার ত আছেই। সংগ্রহভুক্ত কিছু কাজ 'জাতীয়' পর্যায়ের। এক কথায় ছোট হলেও সুনির্বাচিত একটি সংগ্রহের আধার এ মিউজিয়ম।

পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তৈরী এ বাড়ীটি কেবল বাইরে নয়, অভ্যন্তরেও প্ল্যানের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। বাঁশের একটি ঝোপকে মাঝে রেখে চারপাশ ঘুরে গেছে গ্যালারীগুলো। ওপর থেকে প্রাকৃতিক আলো এসে পড়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। আর রক্ষণাবেক্ষণের গুণে সর্বক্ষণই ঝকঝক তকতক করছে এর কি দেওয়াল, কি মেঝে। অধ্যাপক ইশোয়া যোশিদা এই সংগ্রহশালা ভবনটির স্থপতি।

বেলা গড়িয়ে এসেছে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া শুরু হয়েছে আবার। তবুও হেঁটে আসতে ভালই লাগছিল। নতুনে-পুরনোয় মেশানো নারাকে যেন আরও ভাল দেখা যাচ্ছিল, বোঝা যাচ্ছিল। তবে এ-দেখা ত পরিচয়ের মুখবন্ধ মাত্র।

সত্যি কত দেখার রয়েছে! ভাল করে বুঝতে জানতে হলে দিনের পর দিনই এসে ঘুরতে হয়। তাই বোধহয় অপেক্ষায় থাকতে হয়, কবে এক শীতের ভোরে আবার বেরিয়ে পড়া যাবে—রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে লম্বা পাড়ি উদ্ধার করা যাবে। [illegible]

দক্ষিণ ভারতের বর্তমান চিত্রকলা

নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

শিল্পী : সীতা রাও

কিছুকাল হোলো বাঙালোরে এসে দক্ষিণাবর্তের সাম্প্রতিক চিত্রকলার সান্নিধ্য লাভ করেছি।

সান্নিধ্য লাভে কিছু যে হয়নি, এমন বলা যায় না। বলা যায়, মন্দের ভাল।

বোম্বে থেকেছি বহু বছর। ছবি-আঁকা পেশা বলে ছবির রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে অনেক। প্রতি মাসেই কোন-না-কোন হলে চিত্র-প্রদর্শনী সেখানে একটা স্থায়ী ব্যাপার। একক, নয়তো সমষ্টিগতভাবে।

সচেতন মন ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে এই স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে কুড়িয়ে পেয়েছি শুধু নৈরাশ্য। এই দক্ষিণাবর্তের শ্রেষ্ঠ নগরীতে এসে ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি হল। ছবির কম্পোজিশান, বর্ণ-প্রলেপ, বা যে মতবাদ ফরমুলায় বাঁধা নিয়ম দেখেছি বোম্বের চিত্রকলা জগতে, এখানেও তার কোন ব্যতিক্রম চোখে পড়ছে না। স্বাতন্ত্র্য-বোধের কোন বালাই নেই বললেই চলে। দিল্লীর 'হরকিষাণ'—'বীরেন দে', বা বোম্বের 'আরা'-'সাবন্ত' অথবা বাঙালোরের 'আম্পাক্কুটন'-'সিনয়'—একই মতবাদের ফরমুলায় বাঁধা। তারতম্য শুধু 'কম্পোজিশানে'।

আজকাল আবার এইসব 'কম্পোজিশান' কোন নাম বহন করে না। এক নম্বর 'কম্পোজিশান', দুই নম্বর কম্পোজিশান, নয়তো তিন নম্বর। বেশীর ভাগই 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' যাকে বলা যায় 'বিষয়শূন্য বর্ণালীচিত্র।' 'ব্রাশ স্ট্রোকের' কেরামতিতে ভরা। বুদ্ধি খরচ করে এসব চিত্রের মর্মোদ্ধার সহজ ব্যাপার নয়। ত্রিশ বছরের ছবি-আঁকার জীবনে উক্ত অ্যাবস্ট্রাক্টধর্মী চিত্রের অন্তরে প্রবেশ করতে পারিনি আমি অন্ততঃ।

কিছুকাল আগে এখানকার 'বিশ্বেশ্বর-রাইয়া ট্রেডিং সেন্টারে' এক চিত্রসমালোচক বন্ধুর সঙ্গে কোন এক প্রখ্যাত চিত্রকরের একক প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম। মাত্র চোখ বুলিয়েই উনি ফিরে যেতে চাইলেন; মুখে কঠিন ঔদাসীন্য প্রকাশ করে বললেন : 'ডিসগাসটেড। বিদেশ-চুরি ভাবলক্ষণ সমাপ্ত এমনি চিত্র আর কতকাল চলবে, বলতে পারেন? এ'সব চিত্রের কদর কোথায়? আপনি কি মনে করেন, 'ফরেন টুরিস্ট' বেড়াতে এসে এ'সব চিত্রে একেবারে মুগ্ধ বিগলিত হয়ে পড়েন? আরে মশাই, এ ধরণের চিত্রের জন্মদাতাই ত' এ'রা? হরেক রকম রিসার্চ আর মতবাদের 'রোলার' চালিয়ে ওরা যথেষ্ট হাত পাকিয়ে ফেলেছে, তাই ওখানে আর মজা না পেয়ে দিগ্বিদিকে বেরিয়ে পড়েছে ভালর খোঁজে। এখন ভারতের মত বিচিত্র সমৃদ্ধ দেশে এসেও যদি দেখে তাদের দেশের সেই উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে এরা ঘর আর লোকের মন ভোলাবার চেষ্টা করছে, তখন তাদের কাছে আমাদের 'পোজিশান' কোথায় দাঁড়ায়, বলতে পারেন?...আপনাকে বলি, ওরা আসে স্বাধীন সভ্যতার ভারতের রূপ দেখতে, সেই সঙ্গে ভারতীয় 'ট্রাডিশন' ও 'কালচারের' সঙ্গে পরিচিত হতে। কিন্তু এসে যদি দেখে 'ইন্ডিয়ান কনটেমপোরারী মডার্ণ আর্ট' নামে ওদের দেশের ভাবের ঘরে চুরির কতকগুলো বস্তাপচা মাল, তবে ভারতের শিল্পকলা নিয়ে আমাদের যে অহংকার, তার কিছু থাকে কি? আমার প্রশ্নের জবাব দিন?' বস্তুতঃ এক্ষেত্রে শিল্প-সমালোচকের যে প্রশ্ন, ভেবে দেখলাম, আমারও ঠিক একই জিজ্ঞাসা।

শিল্পী : কে রাজাইয়া

অবশ্য, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আর্টের ক্ষেত্রে সার্বজনীন ভাবের ঘরে চুরি অধুনা অল্পবিস্তর অজানিতে ঘটে যায়, কিন্তু তাই বলে জেনে-শুনে জ্ঞানপাপীর মত চিত্রকলা ক্ষেত্রে এমন চুরি কল্পনা করা যায় না।

কিন্তু কেন?

কেন এ-দেশীয় শিল্পীগোষ্ঠীর বর্তমানে এমন বৈদেশিক অন্ধ-অনুকরণ, বা প্রকাশ্য চৌর্যবৃত্তি?

অতীত ঐতিহ্য থেকে এ-পর্যন্ত, ভারতীয় চিত্রকলা ক্ষেত্রের ট্রাডিশান কি কিছুই নেই?

সেই ট্রাডিশনকে বাঁচিয়ে রেখে ভারতীয় চিত্রকলাকে নানা ভাবে উপস্থাপিত করার প্রয়াস কি একেবারেই অসম্ভব?

অর্ধশতাব্দী আগে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন ভারতীয় চিত্রশিল্পী নতুন আঙ্গিকে ভারতীয় চিত্রকলার পথ প্রদর্শন করে গেছেন। এমনি পথ ভাল কি মন্দ, তার ব্যাপক সমালোচনায় একদিন প্রমাণ করেছে যে, ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংগতি রেখেই এমনি নব্য-ভারতীয় চিত্রকলার সৃষ্টি,—যাকে সর্বতোভাবে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব শুধু শিল্পীগোষ্ঠীর নয়, তথা ভারতীয়ের।

নব্য-ভারতীয় চিত্রকলার আদর্শকে নানা ভাবে প্রচার ও শিক্ষার ব্যাপক অভিযানে কিছু সংখ্যক অবনীন্দ্র-ছাত্র-শিষ্য ভারতের নানা ক্ষেত্রে আর অঞ্চলে নেমে পড়েন সে সময়ে...ফলে, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, আমেদাবাদ, বরোদা, বোম্বে, হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ, বাঙালোর প্রভৃতি বহু-বহু স্থান থেকে অবনীন্দ্র প্রবর্তিত শিল্পধারা, অনুসৃত নতুন গোষ্ঠীর সৃষ্টি হ'তে বিলম্ব ঘটে না।

বোলপুরে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হবার পর অবনীন্দ্র-চিত্রকলার ভাবধারাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসে সেখানে শিল্পগুরু অসিতকুমার হালদার ও নন্দলাল বোসের কর্তৃত্বাধীনে যে কলাভবনের পত্তন ঘটে, তাতে ভারত তথা বহির্ভারত থেকে বহু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এসে নব-ভারতীয় চিত্রকলার আদর্শ গ্রহণান্তে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন।

এতে অবনীন্দ্রনাথ চিত্রধারার প্রচার ও প্রসারতা লাভ করলেও বেশ কিছুকাল পর দেখা যায়, ভারতীয় জনসাধারণের মনে এমনি নব্যচিত্রধারার কোন গভীর রেখাপাত করতে সক্ষম হয়নি। প্রধানতঃ এর দুটি কারণ মনে করা যেতে পারে; এক : বহুকাল ইংরেজ-শাসনাধীন থাকায় ভারতীয়দের মনে বৈদেশিক চিত্রসমূহের অপরিসীম প্রভাব; দ্বিতীয় : সে সময়ে দেশীয় সংবাদ-পত্রগুলোর প্রচার-বিমুখতা।

তার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারগুলোর মতই সাহিত্য-শিল্পক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় ঘটিয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের পর মনে হয়েছিল যে, নব্য-ভারতীয় চিত্রকলার গতিকে নানাভাবে অব্যাহত রাখা সম্ভব হ'বে কিন্তু তখন ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে, অন্যান্য কৃতবিদ্যদের মতই যাবতীয় শিল্পগোষ্ঠী প্রচন্ড অর্থসংকটের মুখে পড়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অনাহার থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবসায়-সুলভ মনোভাবে চিত্র প্রস্তুতিকরণ তথা যেন-তেন-প্রকারেণ অর্থোপায়ে নেমে দাঁড়ায় এরা। সে এক আশ্চর্য পরিস্থিতি!

বলতে গেলে এমনি অকল্পনীয় পরিস্থিতির মুখেই অবনীন্দ্র প্রবর্তিত চিত্রধারার গতিপথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। নব্যধারায় অনুপ্রাণিত ভাল ভাল শিল্পীরা শুধু বাঁচার অধিকারে চিত্র-বিক্রয়ের ব্যবসায়ে নেমে পড়েন এবং ব্যবসায়িক অংকন-রীতিতে নিজেদের সম্পূর্ণ সঁপে দিয়ে সপরিবারে বেঁচে থাকেন।

ঠিক এমনি সংকটের মুখে বৈদেশিক যুদ্ধ-পরবর্তীকালীন 'পেসিমিস্ট' ও ভক্তপন্থী চিত্রগুলো ভারতের বাজারে অত্যধিক বে-পরোয়া ঢুকে পড়ে একশ্রেণী সুবিধাবাদী শিল্পগোষ্ঠীর মস্তিষ্কে বিস্ময়ের সূচনা করে, আর ফলে, প্যারাশুটের মত [illegible] [illegible] আন্তর্জাতিক শিল্পরা অপ্রাকৃত স্বরূপে ভাস্করের বাছাই করা হয়েছে।

ইনটেলেকচুয়ালদের মধ্যে যাঁরা সাহিত্যিক গোষ্ঠী, তারা এই নব-জাতককে বাঁচিয়ে তোলার কাজে দেশের বিভিন্ন কাগজে-পত্রে প্রচারধর্মী সমালোচনায় উঠে-পড়ে লেগে থাকেন।

তাদের মোদ্দা কথা : আর্টের মধ্যে কোন জাতীয়তাবাদ বা সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। এটি আন্তর্জাতিক। যেমন সৌন্দর্যের রাজা সুগন্ধ গোলাপ, আন্তর্জাতিক আবেদন নিয়ে স্বীকৃত ও প্রকাশিত, তেমনি যে-কোন চিত্রশিল্পীর হাতের কাজে বিশ্বজনীন হ'তে বাধা নেই। সৌন্দর্যের প্রকাশই তার একমাত্র স্বাক্ষর। এমনি প্রকাশের টেকনিক জাতীয়তাবাদের ধারাবাহিক পথেই যে হ'তে হবে, তার মানে নেই। বাইরের যে কোন দেশের শিল্প-চাতুর্য প্রয়োগ সব সময়েই করা যেতে পারে,...যদি তা উপস্থিত প্রতিপাদ্য বস্তুতে রূপ-রস-সৌন্দর্যে উত্তীর্ণ হবার পক্ষে সহায়তা করে। তারপর কনটেমপোরারী আর্ট যে-কোন বস্তুতে আপেক্ষিক হলেও একেবারে মননশীলতা নেই, এমন ভাববার কোন কারণ নেই। আন্তর্জাতিক শিল্পজগতের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ যোগ ও সত্তা জড়িয়ে আছে, একমাত্র সেই পারে এমনি আপেক্ষিক চিত্রের মননশীলতার বিচার...সেই পারে এর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের ব্যাখ্যান...ইত্যাদি ইত্যাদি।

বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকদের সুন্দর-সুন্দর কথা...যা পড়া মাত্র মনে চমক লাগে। কিন্তু আর্টের ভেতর জাতীয়তাবাদ চাই না, একথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য নই।

পৃথিবীর অনেক দেশ আছে, যারা আর্টের জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী এবং আত্মনেপদী। কনটেমপোরারী আর্টের পীঠস্থান প্যারিস বা আমেরিকা কি আজো পর্যন্ত জাতীয়তাবাদের বাইরে কোনপ্রকার কলা-শিল্পের রূপভেদ ঘটিয়েছে? কখনো কি এসব দেশ প্রাচীন চীন, জাপান বা ভারতীয় চিত্রের অনুকরণ বা ভাব-গ্রহণের দ্বারা তাদের দেশের চিত্রশিল্পকে সমৃদ্ধ বা ভাব-রসগ্রাহী করার চেষ্টা করেছে? চীন, জাপান আজো তাদের জাতীয়তাবাদী চিত্রকলায় আত্মপ্রতিষ্ঠিত,—যেখানে পরের ভাবের ঘরে চুরি নেই, হুবহু অনুকরণ নেই। আর্টের আন্তর্জাতিকতার দরবারে তাই বলে কি এই দুটি দেশের চিত্রশৈলী একেবারে অপাংক্তেয় হয়ে গেছে বা যাবে?

চিত্র-শিল্পক্ষেত্রে চীন-জাপানের মত ভারতীয় ট্রাডিশান-ও খুব সুদূরপ্রসারী ও গভীর। ললিতকলা, ভাস্কর্য, দারুশিল্প ও পোড়ামাটির কাজের যেসব আবিষ্কৃত নমুনা ঐতিহাসিক ভারতের পথে-প্রান্তরে, গুহায়, মন্দির-গাত্রে মৌন অতীত ভারতের সংস্কৃতির স্বাক্ষর রূপে ভাস্বর হয়ে ছড়িয়ে আছে, তার মূল্য রূপায়ণ আজো হয়েছে বলে মনে হয় না।

অজন্তার বুদ্ধ-জাতকমালার রঙিন চিত্রাবলী, ইলোরার জৈন, বৌদ্ধ, আর হিন্দু-

ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকলা প্রাচীন ভারতীয় কলাশাস্ত্রের অঙ্গীভূত ষড়ঙ্গের এক যুগান্তকারী অভিব্যক্তি।

উত্তর ভারতের এলিফ্যান্টা, কানহারি, বাঘ, সাঁচি, ভরহুত্, খাজুরাহো, ভুবনেশ্বর, কোণার্ক প্রভৃতি স্থানেও যেমন পাথরের অলিখিত ভাষায় দুর্মূল্য ও প্রক্ষিপ্ত ইতিহাস ভারতীয় আর্য-সভ্যতার ক্রমবিকাশকে পথনির্দেশ করেছে, তেমনি ভারতের দক্ষিণাবর্তে, যেখানে-যেখানে বিখ্যাত দেব-দেউল—যেমন তামিলনাদুর মাদুরা, মহাবলীপুরম্, রামেশ্বর, ত্রিবেন্দ্রুর, তিরুনেভেলী, সুচিন্দ্রম্,— মহীশূরের বেলুড়, হলাবিদ, শ্রাওনবেলগোলা, বাদামী, হাম্পী,—কেরলের ত্রিবান্দ্রম্, কবিয়ুর,—আন্ধ্রার লেপাক্ষী, তিরুপতি প্রভৃতি স্থানগুলোতে দ্রাবিরিয়ান সভ্যতা ও ধারাবাহিক সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল পতাকা আজো অম্লান, উড্ডীন।

ভারতী চিত্রকলা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, প্রখ্যাত সমালোচক সিংহলের আনন্দ কুমারস্বামী, 'ইন্ডিয়ান পেন্টিঙস্' পুস্তকে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক হিসেবে উপরোক্ত স্থানগুলোর নামোল্লেখে সর্বভারতীয় শিল্পীগোষ্ঠীকে শুধু আকর্ষণ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, ইতিকর্তব্যও নির্দেশ করে গেছেন।

বাংলার চিত্রকলারসিক ও সমালোচক শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁর লিখিত পুস্তকাবলীতে ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

ভারতীয় চিত্রকলা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ও প্রখ্যাত সমালোচক 'পারসী ব্রাউন সাহেব' 'ইন্ডিয়ান আর্ট ও আর্কিটেকচার পুস্তকে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পনীতি-রীতি যথাযথ ব্যাখ্যা দ্বারা সমকালীন স্থপতিদের শুধু প্রয়োগনৈপুণ্যের প্রশংসা করেন নি, তাদের গভীর শিল্পজ্ঞান ও সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধেও অকুণ্ঠ স্বস্তিবাচন করেছেন।

ভারতীয় চিত্রকলাকে নতুনভাবে রূপদান ও নিরীক্ষা-পরীক্ষা করার আগে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রের রীতি ও ধারা পুংখানুপুংখভাবে পর্যালোচনা করেছেন, যাতে ভারতীয় জনসাধারণ তথা কলা-রসিকদের মনে প্রশ্ন না জেগে বসে যে, শুধু প্রক্ষিপ্ত ও ভাবাদর্শের উপর ভর করে নতুন ভারতীয় চিত্রকলার জন্ম হয়েছে।

ভূমিকারম্ভেই তিনি চিত্র কি এবং তা কোন্ রীতি-পদ্ধতিতে হওয়া প্রয়োজন, ব্যক্ত করেছেন। 'চিত্রকরের চয়নের স্বাভাবিক পরিণতি যে চিত্তহরণ অকৃত্রিম ষড়ঙ্গমালা, তারাই চিত্র', মত প্রকাশ করেছেন উনি।

রূপভেদাঃ প্রমাণাণি ভাবলাবণ্য যোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্।।

এই হচ্ছে রীতি-পদ্ধতি। আর এই মন্ত্রেই শিল্পাচার্য নব্যতন্ত্রের ভারতীয় চিত্রকলার নিয়ন্ত্রণ করেছেন।...

অবনীন্দ্রনাথ ছাত্র-শিষ্য ভেংকটাপ্পা ব্যাঙ্গালোরের মানুষ।

শিল্পী : কে ভিটল ভান্ডারী

কয়েক বছর হোলো তিনি বিগত হয়েছেন। তাঁর অংকিত চিত্রাবলী এখানকার শিল্পীগোষ্ঠী ও সুধীসমাজে বিশেষভাবে স্বীকৃত, যদিও সংখ্যায় অত্যন্ত সীমিত।

ভেংকোটাপ্পার ব্যক্তিগত কোন ছাত্র-শিষ্য ছিল না : বোধহয় একারণেই নব্য ভারতীয় চিত্রকলার ধারাপদ্ধতির সরাসরি কোনরূপ পরিবর্তন ঘটেনি এতদঞ্চলে। যেটুকু ঘটেছে, তা' কেবল মাদ্রাজের গভর্ণমেন্ট কলেজ অব্ আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফ্টসের কল্যাণে,—যার তদানীন্তন অধ্যক্ষ ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের অন্যতম শিষ্য শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

অবনীন্দ্রচিত্রধারার প্রভাব এতদঞ্চলে বিস্তার লাভ না করার অন্যতম কারণ দুটি। এক : রাজা রবিবর্মার পাশ্চাত্য প্রভাবিত যুগান্তকারী চিত্রাবলীর আকর্ষণ, দ্বিতীয়ঃ প্রাচীন মহীশূরে চিত্রাংকন ধারার গতানুগতিক ট্র্যাডিশন। রবি বর্মার প্রচন্ড প্রভাব দক্ষিণাবর্তের চিত্রশিল্পীদের মনে অনেকদিন ছিল, সম্প্রতি রাহুমুক্তি ঘটেছে পাশ্চাত্য ধারার অবাধ অনুপ্রবেশে।

সুপ্রাচীন মহীশূরে চিত্রাংকন ধারা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন মহীশূরে বংশানুক্রমিক মহারাজাগোষ্ঠী ; কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক অব্যবস্থায় তাও বর্তমানে মুমূর্ষু। বর্তমানে যা.. দক্ষিণাবর্তের চিত্রকলার কর্ণধার,—যেমন কে, সি, এস পাণিক্কার, পনপালা, লক্ষ্মণপাই, এ পি দাস, কে এস রাও, জি এস, সেনয়, পুঞ্জিত্রিয়া, কে মাধবন, আপ্পাকুটন প্রভৃতি কনটেমপোরারী আর্টের উপাসক।

প্রাচীনপন্থী আছেন মুষ্টিমেয় (যারা অবনীন্দ্রধারা, মহীশূরী পদ্ধতিতে আস্থাশীল) যেমন : পবনজী, এস এন স্বোয়ামী, ভি আর চিত্রা, শ্রীতংকাশালে, পাইডে রাজু, সুব্রহ্মণ্য রাজু, এস কুক্কে আর নরসিংহাইয়া: তেলরঙের প্রতিকৃতি চিত্রে : ভি আর বি রাও, এস আর আয়েংগার; আর নিসর্গ-চিত্রে : এম জে শুদ্ধোধন, হনুমাইয়া, গোবিন্দরাজ, সোমসুন্দর প্রভৃতি।

মন্ডনচিত্রে প্রসিদ্ধ আছে মাদ্রাজের শ্রীনিবাসালু এবং আর কৃষ্ণরাও-এর। আরো যারা অখ্যাত আছেন ; যেমন—শ্রীআলফেনজো, শ্রীমতী পুষ্প দ্রাবিড়, প্রভৃতি—তাঁরা এখনো পরীক্ষামূলক স্তরে। আসল কথা, দক্ষিণাবর্তের শিল্পীগোষ্ঠীর 'ন যযৌ, ন তস্থৌ' অবস্থা। না পেরেছে দক্ষিণী ট্র্যাডিশনকে ধরে রাখতে, না পেরেছে পুরোপুরি আন্তর্জাতিক মানসিকতাকে স্বীকার করে নিতে। কাজেই, যদি বলি, যে আর্ট ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ট্র্যাডিশান নিয়ে একদিন দক্ষিণী মানুষ ভেংকটাপ্পা অবনীন্দ্র প্রবর্তিত নতুন চিত্রধারাকে ভগীরথের গংগাবতরণের মত দক্ষিণাপথে টেনে নিয়ে এসেছিলেন, তাকেই আবার নতুন ধারাপথে, প্রাণ-প্রাচুর্য ভরিয়ে দিয়ে দক্ষিণাবর্তের শিল্পীগোষ্ঠী যদি একটা কিছু করতে পারেন, তবে জাত ও কুল দুই-ই রক্ষা পাবে। অন্ততঃ বিদেশীয়দের কাছে অহংকার করার স্পর্ধা জাগবে এই বলে যে, ভারত ভাবের ঘরে কারো চুরি করে না, অন্যের অনুকরণ করে না,—যা' আছে তার সবই নিজস্ব ভাবনার, আপন স্বাতন্ত্র্যের!...ভারত চিরদিনের স্বয়ং-সম্পূর্ণ।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুই নায়িকা সুচিত্রা মিত্র এবং কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরের এই ঝর্ণা ধারায়

সন্ধ্যা সেন

আজকের রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে প্রধানা দুই নায়িকা হলেন সুচিত্রা মিত্র ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের কনভেনশন মেনেও এ'রা নিজস্ব ব্যক্তিত্বের আলোয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিভিন্ন রূপরস ফোটাতে সমর্থ হয়েছেন।

সুচিত্রার গায়কী দিবালোকের মতই স্বচ্ছ স্পষ্ট, প্রখর দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। তাঁর গানের বক্তব্য যেন তীরের মত সোজা-সুজিই মরমে পশে, নির্দ্বিধায়। বিনা ভূমিকায় তিনি গহনরাতের আর্তি প্রকাশ করেন "আজি নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে"তে, স্তব্ধ-গম্ভীর সুরে প্রশ্ন করেন "কার মিলন চাও বিরহী"? নিঃসঙ্কোচে তিনি অনুরণিত করেন ফাগুন মাসের উতলা নিঃশ্বাস "ভেবেছিলেম আসবে ফিরে তাই সাহস করে দিলেম বিদায়।" মুক্ত, দীপ্ত, ঋজু ভঙ্গীতেই যেন তিনি সঙ্গীত-লক্ষ্মীর কাছে স্বীকার করেন "তোমার আমার এই যে মিলন নিতান্তই এ সোজাসুজি।"

আর কণিকা? যেন আধো আলোছায়ার ঝিকিমিকি আর সাঁঝগগনে আধো লালিমা জড়ানো গোধূলি-লগ্নে অবগুণ্ঠিতা, অভিসারিকা। রহস্যের ওড়না খুলে মুখখানি দেখানোয় তাঁর কুণ্ঠা। পাছে কৌতূহলী জনতার দৃষ্টি পড়ে তাঁর জীবন-দেবতার বরধন্য সার্থক মুখের পরে। শুধু অঙ্গের অলঙ্কারের রুনুঝুনু গুঞ্জনে তাঁর চলার ছন্দটির বঙ্কিম ঠাট অনুভব করা যায়। রামধনুর সাতটি রঙের আলো বিচ্ছুরিত তাঁর অশ্রুভেজা আবেগে "বড় বিস্ময় লাগে—হেরি তোমারে"। যেন অন্তরের আকুলতায় বলে আমি আর কি বলব? "যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন যে বাণী নীরব নয়নে"—তারই মধ্যে পড়ে নিও আমার মনের ভাষা। লজ্জাময়ী কিন্তু "যে মোর অশ্রু"র "অশ্রু"তে রংবাহারী মীড়ের উষ্ণ উত্তাপ ছড়িয়ে দিতে ভোলেন না। কণিকার গান শুনে মনে হয় যেন চিরন্তন বিরহিণী তাঁর একাকীত্বের দ্বীপে অশ্রুময়ী হয়ে প্রতীক্ষা করছেন তাঁর যার পরশ প্রাণে বেজেছিল গানেরই সুরে।

কণিকা সঙ্গীতরসিক মহলে যিনি 'মোহরদি'—তাঁর গান শোনবার সুযোগ হয়েছে বহুদিন রেকর্ডে, রেডিওয়, জলসায়। চিত্ত দুলে উঠেছে তাঁর সূক্ষ্ম কাশ্মীরী কাজের মত কারুকলা সমৃদ্ধ কণ্ঠের দ্যুতিময় ব্যঞ্জনায়। মুগ্ধ হয়েছি তাঁর নারীসুলভ সৌকুমার্যের ললিত মাধুর্যে। তারিফ করেছি শিক্ষামার্জিত কণ্ঠের ত্রিসপ্তক বিহার ও ধ্বনিলাবণ্য, কিন্তু সে যেন টুকরো আলোর দ্যুতি।

বছর দুয়েক আগে পরপর দুটি আসরে যেন আকস্মিকের আলোয় তাঁর অন্তর-সম্পদ শিল্পীকে নতুন করে আবিষ্কার করলাম। প্রত্যক্ষ করলাম তাঁর কল্পনার প্রসার, অনুভবগাঢ়তার অন্তর্দৃষ্টি যার ফলে শিল্পীর সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারাও [illegible] উপলব্ধির রাজ্যে। নতুন করে দীক্ষালাভ করলাম যে সত্যে সেটি হচ্ছে এই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিস্তীর্ণ পটভূমিকা অবশ্য প্রয়োজনীয় হলেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের মহিমা নির্ভর করে তার ভাবের ওপর।

টপ্পা অঙ্গের গানে কণিকা খ্যাতিমানা। কিন্তু সেদিনের নির্বাচিত গানগুলি শুনে মনে হোল শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও কর্ণাটকী স্বরকম্পনের সঙ্গে কীর্তন বাউলের দুর্লভ সমন্বয়ই তাঁর গায়কীকে এমন সমৃদ্ধ করে তুলতে পেরেছে। "হৃদয়-নন্দন-বনে"তে ধ্রুপদের অবিচল প্রশান্তি ও অতিকোমল শ্রুতিতে তাঁর নিষ্পলক স্থায়িত্ব। "বন্ধু রহো সাথে"তে টপ্পার দানা ও ঢেউখেলানো সরস শ্রুতিকম্পন আবার "হে মোর দেবতা"তে খেয়ালের ঢঙের তানের জমকালো বিস্তারের পর "বড় বিস্ময় লাগে" তে দেশী তোড়ির মীড়, গমক ও মূর্ছনার আবেদনের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রগত সুরের যে মায়াপুরী রচনা করলেন তা শুধু প্রতিভা-ময়ীর অবদানই নয়,—সৃষ্টিময়ীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠ স্বাক্ষরদীপ্তি।

গানের পর সমাগত গুণী, শিল্পী সকলের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন কলরোলের মাঝখানে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে বিস্ময়বিহ্বলা বলে ওঠেন "ওমা সো... [illegible]

আলো আর খোঁপায় দোলানো রজনীগন্ধাও যেন দুলে ওঠে ঐ কথারই নীরব প্রতি-ধ্বনির ছন্দে। কণিকার গান বুঝি স্বভাবের নারীলাবণ্য থেকেই এই মাধুর্যঘন রূপ অজান্তেই আহরণ করে বসে আছে।

শুনেছিলাম ইনি নাকি নিজের সম্বন্ধে একেবারেই সচেতন নন। কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি। যে নারীর লাবণ্য, হাসির দীপ্তি, কণ্ঠস্বরের রঙিন মায়া অপরের চিত্তেও রং ছড়ায় তিনি কি সে সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে পারেন?

একদিন তাঁকে প্রশ্ন করলাম—সত্যিই কি আপনি বোঝেন না রসপিপাসু চিত্তকে আপনি কি ভাবে দুলিয়ে দিতে পারেন?

সন্ধ্যা, গুরুদেবের নামে শপথ করে তোমায় বলছি জীবনে কোনো বড় পাওয়াকেই আমি কখনও 'প্রাপ্য' বলে ভাবি না, ভাবি এ যেন 'মহাপ্রাপ্তি'। যে কোনো শ্রোতার এ্যাপ্রিশিয়েশনে আমার হৃদয় যেন বিস্ময়ে দুলে ওঠে। বারবার তাঁকে প্রণাম জানিয়ে জিজ্ঞেস করি "সত্যিই কি আমি এত ভালো গেয়েছি?" অশ্রু-আভাসে ঝিকিয়ে ওঠে দুটি ছায়াঘন চোখ।

"কয়েকদিন আগে আপনার গান শুনে মনে হোল শিল্পী কৃতার্থ হয়ে ওঠেন তখনই যখন সে সংগীত আমাদের প্রাণমন অন্তরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাঁর পানে যিনি গানের ও প্রাণের পরম প্রিয়তম। সৌন্দর্যবোধের পথ বেয়ে আত্মপ্রকাশ করলেও এ বোধের গভীরায়মান লগ্নে শিল্পীর অন্তর অজানতেই অনুভব করে "দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে।"

এক মুহূর্ত দ্বিধা করেই সংশয়মুক্ত কণ্ঠে কণিকা বলেন, আমার ভাবের প্রতি-ধ্বনি তোমার কথায় পাচ্ছি বলেই স্বীকার করছি। গান শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় আমি যেন কোন অতলে তলিয়ে যাই। মনে হয় যেন আমার সকল বেদনা, দৈন্য আনন্দ, গ্লানি তাঁরই চরণে নিবেদন করছি, যাঁর কাছে অযোগ্যতার জন্য লজ্জা-বোধ নেই! মালিন্যের জন্য কুণ্ঠিত হবার কারণ নেই। তিনি যে ত্রুটিভরা 'আমি' কে গ্রহণ করবার জন্যই প্রসন্ন হাসির বরাভয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আজকের এমন উদ্ধত, অবিশ্বাসের যুগেও এমন অচলপ্রতিষ্ঠ 'ভক্তি'-বিশ্বাসে পৌঁছলেন কেমন করে?

আমি গোঁড়া ব্রাহ্মণবংশের মেয়ে। আমার মা, বাবা অথবা পরি-বারের কেউ অর্থকে কোনোদিন বড় করে দেখেন নি। ঈশ্বরে আত্মনিবেদনই ছিল তাঁদের জীবনবেদ। এর সঙ্গে মিলেছিল গুরুদেবের সান্নিধ্য ও আশ্রমের অনাড়ম্বর পরিবেশ।

আমি অতি ক্ষুদ্র সন্ধ্যা। কিন্তু গুরু-দেবের স্নেহ আদর আমায় যেভাবে ঘিরে রেখেছিল ঈশ্বরের করুণা ছাড়া তা পাওয়া সম্ভব নয়। গুরুদেব মনীষী, মহাকবি, মহা-মানব এসব ভাববার, বোঝবার অথবা উপলব্ধি করবার মত বয়স তখন হয় নি। তিনি ছিলেন সঙ্গীর মত। সব সময় কাছে ডাকতেন মজার গল্প বলতেন। বড়দের গান শেখবার সময় ক্ষুদেটিকেও সঙ্গে নিয়ে বলতেন 'তুইও গা।' আমার নাম ছিল অনিমা। সে নাম পাল্টে গুরুদেবই নাম দিলেন "কণিকা"। শৈলজাদা, শান্তিদা, দীনুদা, বিবিজি (ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী) সবাইকে বলতেন "ওকে খুব ভাল করে শেখাবি।"

কি নাটক কি গীতিনাট্য সবেতেই বড়দের সঙ্গে আমাকেও উনি সঙ্গে নেবেনই। "শারদোৎসবে" ওঁর সঙ্গে এক সঙ্গে অভিনয়ও করেছি। উনি হয়েছিলেন 'ঠাকুর্দা'। 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যের সময় আমায় দিয়ে গাওয়াবার জন্যই উনি বিশেষ করে "কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়" গানটি জুড়ে দিয়েছিলেন। ও গানটা "তাসের দেশ" এ ছিল না।

ওঁর সঙ্গে কোলকাতায় জোড়া-সাঁকোতে যখন আসি সেই আমার প্রথম বাইরে আসা। কতজন কবির কাছে আসতেন, অবাক হয়ে দেখতাম।

হিন্দুস্থানে প্রথম যে রেকর্ড করে-ছিলাম কি কারণে মনে নেই সেটা রবীন্দ্র-সংগীত হয় নি বলে ওঁর মনে খুব দুঃখ ছিল। পরে উনি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ে বেশ কয়েকটি গান রেকর্ড করে-ছিলেন। তার মধ্যে "ওগো পঞ্চদশী"ও ছিল। তারপর হেম সোমের আমলে গ্রামোফোন কোম্পানীর আর্টিস্ট হলাম। বিখ্যাত সব রেকর্ড হয়েছে এখানেই। পি. কে. সেন ও এ. সি. সেন রবীন্দ্রসংগীত ও নাটকে ভরিয়ে দিয়েছেন। ঠিক মায়ের মত সজাগ স্নেহে উনি আমায় আড়াল করে রাখতেন ছোটবড় সকল ঝড়ঝাপটা থেকে।

শেষের দিকে যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন আমার সব সময় গান শোনাতে বলতেন। আমি ওঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গাইতাম।

১৯৪১এ আমি ও অরুন্ধতী (দুজনে খুব বন্ধুত্ব ছিল) এক সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করে ওঁকে পাশের খবর দিতেই হেসে বললেন "তবে আর কি। তুই ত আমার চেয়েও পন্ডিত হয়ে গেলি।"

এমনই নিশ্চিন্ত নির্ভরতার পাল তুলে দিন কেটে যাচ্ছিল। এর ব্যতিক্রমটা ভাবতেও পারতাম না। গুরুদেব থাকবেন না? এ কি হয় না হতে পারে? কিন্তু তা-ও হোল। সে খবর যখন এল মনে হোল হাজারো বাতির আলো-জ্বলা দীপালি উৎসব যেন এক ফুঁয়ে নিভে গেল। শান্তিনিকেতনের আকাশ, বাতাস ও প্রকৃতির বুকেও যেন হু হু-করা শূন্যতা কেঁদে উঠে বলেছিল "সে নেই।"

উপচে-পড়া চোখের জল মুছতে মুছতে বলেন, এই দুঃখ আজ কিছুতেই ভুলতে পারি না—বড় হয়ে কেন তাঁকে পেলাম না? সেই বয়সে তাঁকে বোঝবার মত মনের পরিণতিতে যে পৌঁছতে পারি নি। সববাই ওঁর কাছ থেকে হাতে লেখা কবিতা, গান আদায় করতে যেত। আমি উকিঝুঁকি দিয়ে দেখতাম কখন একলা থাকেন। লোভ থাকত ওঁর কাছে রাখা লজেন্স ভর্তি শিশির দিকে। অন্তর্যামী! সবই বুঝতেন। লিখতে, লিখতে আমার দিকে চোখ পড়লেই "আয়" বলে দুহাত বাদাম লজেন্সে ভরে দিতেন। বেদনাভরা স্মৃতির মধ্যে যেন থমকে দাঁড়াল কণিকা।

আর অন্তর ভরে দিতেন অ-পার্থিব রসে। সেই রসই বুঝি এমন গহনসঞ্চারী হয়ে আপনার গানকে এমন স্বতঃস্ফূর্ত ও তন্মুখী করেছে।

একটু ভেবে বললেন, হতেও পারে। গুরুদেবের সঙ্গে গানের ঘরে বাস করতে করতে গানটা যেন খেলার মতই সহজ আনন্দের বস্তু হয়ে উঠেছিল। গুরুদেবের কাছে যখন-তখন গান শেখা ছাড়াও ছিল সকালবিকেল, বর্ষা-গ্রীষ্ম প্রকৃতির মেজাজের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে গান শেখা আর গাওয়া। উন্মুক্ত প্রান্তরের একদিকে আমরা গাইছি—অন্যদিক থেকে গানে গানে সাড়া দিয়ে উঠল আর একদল।

প্রকৃতির সঙ্গে এইরকম কথা বলাবলির অভ্যেসই হয়ত আপনার গানে এমন ভাব-গ্রাহিতা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এই ভাব-মগ্নতা এবং ঈশ্বরদত্ত আওয়াজ ছাড়াও যে বস্তু আপনার গানকে বিচিত্রসমৃদ্ধ করেছে, যেমন কোন পর্দায় প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া আবার কোন স্বরকে আলগাভাবে ছুঁয়ে যাওয়া তার মধ্যে শাস্ত্রীয় সংগীতের শিক্ষা ও অনুশীলনের সুস্পষ্ট ছাপও আছে।

ঠিকই ধরেছ। ক্ল্যাসিক্যাল শেখাটা আমাদের কম্পালসারী ট্রেনিংএর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আশ্রমে হেমেন্দ্রলাল রায়ের দাদা, বি ভি ওয়াজেলা ক্ষিতিজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে রাগসংগীত পাল্টা, সার্গম শিখতাম। তাছাড়া আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব, বড় বীণকার, সেতারী—বড় বড় ওস্তাদ ছিলেন শান্তিনিকেতন আশ্রমের নিত্য অতিথি। ওস্তাদদের প্রতিও গুরুদেবের নির্দেশ ছিল আমায় ভাল করে শেখাবার। আমি ও অরুন্ধতী ম্যাট্রিকের সঙ্গে সঙ্গেই সংগীত ভবনের কোর্স শেষ করেছি।

কোন কোন তথাকথিত রবীন্দ্রসংগীত-তজ্ঞ গা-জোয়ারী সুরেই আমায় অনুযোগ করেছেন আমার মত ক্ল্যাসিক্যালভক্ত শ্রোতার পক্ষে রবীন্দ্রসংগীতের রসগ্রহণ সম্ভব নয় বলে। কিন্তু আমার উচ্চাঙ্গসংগীতের বহুধা বৈচিত্র্যে অভ্যস্ত মনও আপনাদের কয়েকজনের গান শুনে মুগ্ধ হয়েছে—অনুভবের দুরবগাহতায় ভেসে গেছে সকল বাধা। আর আগে যে এমন করে এ গানের বারতা মর্মে পশেনি তার জন্য কিন্তু আমার অন্তরকে দায়ী করব না। দায়ী করব দায়িত্ব-জ্ঞানহীন কিছু শিল্পীদের যাঁরা গানের আবেদন প্রাণে পৌঁছে দেবার অধিকারী না হয়েও শিল্পী পদ-বাচ্য হবার অধিকার গ্রহণে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না।

তুমি যথার্থ শিল্পপূজারী, তাই সৌন্দর্যানুভূতির দুয়ার তোমার কাছে বন্ধ থাকতে পারে না। তাছাড়া উচ্চাঙ্গসংগীতের

সঙ্গে গুরুদেবের 'অহিনকুল' সম্পর্ক ছিল এ ধারণা সম্পূর্ণই ভ্রান্ত। তাঁর কল্পনার স্ফটিকছায়ায় নানা রাগের রং ও বাহার আপন স্বরূপে ধরা দিয়ে কথা ও সুরের এমন মিলন ঘটালো কেমন করে যদি না মনের অতলে তাদের গভীর ছাপ থাকত? শান্তিনিকেতনে অত ওস্তাদকে উনি কেন আমন্ত্রণ জানান যদি না তাঁদের মধ্যে গ্রহণীয় কিছু আছে বলে ভাবতেন? ওঁর বিরাগ ছিল নিম্নশ্রেণীর গায়কগায়িকার অলংকার প্রপীড়িত সুরের হু-হুঙ্কারের প্রতি। উচ্চশ্রেণীর শিল্পীর তানালাপের সংযমের প্রতি নয়।

আর একটি প্রশ্ন আছে। "বলিগো সজনী যেওনা যেওনা" গানটি যতবারই শুনি ভাল লাগে এই ভেবে যে রবীন্দ্রনাথের এমন দেবদুর্লভ রূপ সুরে, গানে, কাব্যে, সৌন্দর্যে ত্রিভুবন তাঁর কাছে বাঁধা তবু তাঁকে ত বেদনার্তচিত্তে বলতে হয়েছে "আমায় যখন ভাল সে না বাসে, পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে।" কিন্তু আমার এক বান্ধবী কিছুতেই এ কথা মানবে না। তার মত হচ্ছে এই যে রবীন্দ্রনাথের অনুভব সর্বগামী তাই সকল বেদনাকেই তিনি এমন করে মেলে ধরতে পেরেছেন। কিন্তু এ ইন্টারপ্রিটেশন আমার মন নিতে চায় না। আমরা ভাবতে ইচ্ছে করে জীবনের কাছে যা চাইবার তা তিনি আমাদের মতই ব্যাকুলভাবে চেয়েছেন, অপূর্ণতার ক্ষোভে কেঁদেছেন চঞ্চল হয়েছেন। তাঁকে ইম্পার্সনাল ফিলসফার এসব ভাবতে মন শিরোপা তোলে।

এবিষয়ে তোমার সঙ্গে আমিও একমত। নিজের বেদনা দিয়েই মানুষ অপরের বেদনা বোঝে। আর "কবি" বলেই তাঁর স্পর্শকাতরতা আরও তীব্র। পার্সোন্যাল অনুভূতির পথ বেয়েই ত মানুষ ইম্পার্সোন্যাল স্টেজে পোঁছায়। মানুষের হৃদয়রাজ্যের অন্তঃপুরেই সবচেয়ে গোপন সবচেয়ে পর্দানশীন। এইসব লাজুক, সুকুমার অনুভবগুলি যেন অকরুণ কৌতূহলের হাটে ঘোমটা খুলতে লজ্জা পায়। কবি, গায়ক, শিল্পী এঁরা গানের ভাষায়, সুরের ইঙ্গিতে এদের কিছুটা আভাস দিতে পারেন। গাইবার সময় গুরুদেবের গানের কথা আমারই কথা হয়ে ওঠে বলেই অজান্তেই যেন ভাবতাম 'মনের কথা, অপরকে বলা'? ছিঃ।

কিন্তু আপনার পাবলিক পারফরমেন্সে ত এ কুণ্ঠার ছায়া দেখি না।

এটা একদিনে হয়নি। প্রথমে গাইতে চাইনি। তারপর নানান কারণে গাইতে হলো। গাইতে গাইতে কখন কোন অজানা মুহূর্তে শ্রোতাদের সঙ্গে আমার মনটা মিলেমিশে একাকার হয়ে একটা আত্মিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছে—বুঝতেই পারিনি। আজ তোমাদের চোখে দেখি আমারই হৃদয়াবেগের ছায়া। এই আত্ম-প্রতিফলনের আলোই আমায় নূতন করে জ্বলে ওঠবার প্রেরণা দেয়।

সুচিত্রা মিত্র

সদা ব্যস্ত, ঝড়ের মত দ্রুত বেগে আবির্ভূতা ও নিষ্ক্রান্তা সুচিত্রা মিত্রের বিরামহীন কর্মজীবন। কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তেই তিনি উদ্ভাসিতা। হাজারো ব্যস্ততা ও কাজের ভিড়ে মুহূর্তের জন্যও ওঁর সঙ্গে দেখা হলে অন্তরের উপচে-পড়া আনন্দস্রোত স্বল্প পরিচিতের অন্তরেও যেন সঞ্চারিত হয়।

এত আনন্দ কোথা থেকে পেলেন? জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর আসে, আনন্দময়ের গানের প্রবাহ থেকে আর কিছু গ্রহণ করতে পেরেছি কিনা জানি না, কিন্তু ঐ একটি জিনিস কেমন করে আমার সকল দুঃখকে আলো করে দিয়েছে জানতেই পারিনি।

জানতে চাইলাম সব গান সমান দক্ষতায় পরিবেশন করতে পারলেও বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীতকেই 'জীবনসংগীত'রূপে বরণ করে নেবার কারণ কি?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই কলোচ্ছলা আবেগে যেন ছলছলিয়ে ওঠেন,—বাবা-মা উভয়েরই আমার গান সম্বন্ধে আগ্রহের যেন অন্ত ছিল না। কিন্তু ঠিক কোন্ গান হবে আমার সংগীতজীবনের প্রকাশবাহন—সে সম্বন্ধে কোনো মতামতই তাঁরা প্রকাশ করেননি। শ্রদ্ধেয় পঙ্কজ মল্লিকের আগ্রহাতিশয্যেই শান্তিনিকেতনে শিক্ষার্থী হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম। ১৯৪১ সালের ২৭শে আগস্ট ২০ টাকার এক স্কলারশিপ পেয়ে শান্তিনিকেতনে সংগীতভবনে যোগ দিলাম। তার মাত্র ২০ দিন আগে গুরুদেবের অন্তর্ধান ঘটেছে।

..মনে পড়ে জোড়াসাঁকোতে কতদিন কত উৎসবে বাবার সঙ্গে কবির কাছে গেছি, গানও শুনেছি। অবাক হয়ে দেখেছি সেই ঋষিতুল্য রূপ, সাগরের মত গভীর দুটি চোখ। খুব কাছে থেকেও যেন কত দূরে—আর দূরের বলেই হয়ত আরো আকর্ষণীয়।

রবীন্দ্রসংগীত গাইতাম। সব গানের মতই ভালো লাগত। বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাবার মত মন তখনও তৈরি হয়নি। তারপর শান্তিনিকেতনে যখন সংগীত শিক্ষা শুরু হোল, তখন বুঝলাম, 'মধুর তোমার শেষ নাই যে।' উচ্চাঙ্গসংগীত শেখাতেন ভি ভি ওয়াজেলিয়া, রবীন্দ্রসংগীত শান্তিদেব ঘোষ, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর কাছে।

এঁদের সবার কাছেই আমার ঋণ অপরিসীম। তবু বলব রবীন্দ্রসংগীতের অন্তরপ্রবাহী রসধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটালেন শান্তিদা। ওঁর গায়কী এবং শিক্ষার পদ্ধতিতে একটা পরিবেশ যেন আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়ে যায়।

তখন কবি সবে গেছেন। কিন্তু অস্তমিত রবির আলো যেন শান্তিনিকেতনের আকাশে, বাতাসে, বাসিন্দাদের মনে ছড়ানো। সে আভা আমার মনেও প্রতিফলিত হোল বইকি!

রাগসংগীত শিক্ষার পর রবীন্দ্রসংগীত শিখতে গিয়ে দেখি এ-গানেও রাগ আছে, সুরের আকাশপ্রসারী ভাবের আবেশ আছে, আর আছে কথা। কথাকে বাদ দিয়ে বাংলা গানের চিরকুমার ব্রত গ্রহণ করার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু কথা এখানে সুরের পায়ে শৃঙ্খল হয়ে ওঠেনি। হয়েছে অপরিহার্য বাহন—যার মধ্যে সুরের আকৃতি পথ খুঁজে পেয়েছে।

প্রথম যখন কবির গান গাইতাম, কেমন একটা না-বোঝা ব্যাকুলতায় মনটা দুলে উঠত। তারপর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও যখন পরিণত হয়ে উঠল, তখনই যেন আলোর মত স্বচ্ছ হয়ে উঠল কবির গানের নিজস্ব দর্শন। এর মধ্যে রাগ আছে, তবে সেটা নিছক রাগপ্রয়োগের প্রয়োজনেই নয়। ভাবের অন্তরপ্রবাহী রসধারার মত ভাবনুসারী রাগ যেন আপনা থেকেই ধরা দিয়েছে ভাবার প্রাঙ্গণে।—

একটা কথা—শিল্পীকে বাধা দিয়ে অসংকোচে প্রশ্ন করি—কথা যদি বাদ দেওয়া যায় তবে রবীন্দ্রসংগীতের এমন কোন বৈশিষ্ট্য আছে কি, যা সর্বদেশের, সর্বকালের সকল মানুষের মনকে নাড়া দিতে পারে? যেমন ধরুন জৌনপুরী রাগের ওপর সুনন্দা পট্টনায়কের বিখ্যাত রেকর্ডটি 'শ্যামসুন্দর অব হো নেহি আয়ে'—। এ গানের কথা বাদ দিয়ে শুধু সুরটিই যদি যন্ত্রে বাজানো যায় তবু কেমন যেন এক অনির্ণেয় ব্যথায় মনটা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের যে-কোনো পদ,—যেমন ধরুন 'অনেক দিয়েছ অনেক কথা ব্যাকুলতে, বাঁধা-ভেদন দোলে'— এখানে কথা বাদ দিয়ে কেবল সুরটি বাজে তবে শুধু 'গাগারেসা' 'গাগারেসা'-স্বরে কোন ভাব মনে জাগে কি?

কথার অনবদ্য অবদানই ত রবীন্দ্রসংগীতের সম্পদ। ভাষার মাঝ দিয়ে ভাবাতীতকে কেমন করে প্রকাশ করা যায়, তারই উত্তর রবীন্দ্রসংগীত? যেমন ধর 'শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে' গানটি গাইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের মায়ায় মনটা হারিয়ে যায় না কি? এবং এ শুধু কথারই যাদুতে। অথচ এ গানে সুর, রাগ নেই একথা বলা যায় না। সবই আছে। কিন্তু কিছুই আরোপিত নয়। এসেছে বাণীবিস্তারের স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদে। অথচ কথা এখানে বন্ধন নয়। সুরের মুক্তি ঐ কথাতেই। কথাকে কথা বলাতে সবাই ত পারে না। তিনি পেরেছেন। তাই তাঁর গান বাণীসম্পদে এমন অনন্য হয়ে উঠেছে।

এইজন্যই কি রবীন্দ্রসংগীতকে একান্ত আপনার গান বলে বেছে নিয়েছেন?

শুধু এইজন্যই নয়। আমাদের পরিবেশ, ঋতুবদল এবং সকাল থেকে শুরু করে রাত অবধি প্রতি প্রহরের একটা নিজস্ব মেজাজ আছে, রংও আছে। আমরা আমাদের পটভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সৃষ্টিছাড়া জীব নই। এই পটভূমিকার ভাষাকে উপলব্ধি করে তারই ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে না চললে সবই হয়ে ওঠে অবাস্তব ছায়া। কাব্য ও গান রবীন্দ্রনাথের জীবনে বাস্তব হয়ে উঠেছিল বলেই সংগীত সম্বন্ধে তাঁর এই

কর্তব্য-বোধ ছিল। প্রকৃতি ও তার রূপ-রসের মাধুর্যমন্ত্রে আমাদের দীক্ষা দিয়েছেন তিনিই।

'আর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো', 'আমার কি বেদনা'—এসব গানে যেমন বর্ষার নিজস্ব ভাব মুখর হয়ে উঠেছে—তেমনই আবার ফাগুনের রং লেগেছে 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে', 'কিশোর ওগো' 'দেখা পেলেম'। এমন করে সব ঋতুর সৌন্দর্যের মর্মমূলে আর কোন কবি এমন করে প্রবেশ করেননি—আর তার রস-রূপটি এমন অপরূপ মায়ায় মেলে ধরেননি। দুহাত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে অপ্রতিভ হাসি হেসে শ্রীমতী মিত্র বলেন—আমি বড্ড সেন্টিমেন্টাল ভাই। গুরুদেবের কথা উঠলে কিছুতেই যেন নিজেকে সামলাতে পারি না। তাই সহজে এসব আলোচনার মধ্যে যাই না। খুব আপনার লোক নাহলে কি মনের কথা বলা যায়?

এই মনের পরশটুকুই আমার উপরি-পাওনা হয়ে থাকবে।

আর কি জানতে চাও বল।

রবীন্দ্রসঙ্গীত বলতে অনেকেই বোঝেন চাপা গলার এক কৃত্রিম সুর। কিন্তু আপনার গানে ত খোলা গলার মুক্ত আবেগের জোয়ার। এই গায়কীর প্রেরণা পেলেন কোথায়?

শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রসঙ্গে চাপা গলার আইডিয়া লোকের কেমন করে আসে বুঝতে পারি না। শান্তিনিকেতনের মুক্ত আকাশ, দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর অকৃপণ হাওয়া সবই ত প্রাণখুলে গাইবার দুর্নিবার ইচ্ছেয় মনকে পাগল করে তোলে। ওখানে চারপাশের পরিবেশ দেখে মন ভরে উঠত কানায় কানায়। ভাবতাম, কেমন উদার ছন্দে কবে নিজেকে উজাড় করে দিতে পারব? তোমার কথার ঠিক জবাব দিতে পারলাম কি?

এর চেয়ে প্রাঞ্জল জবাব ভাবাই যায় না। সেকালের শ্রোতা ও শিল্পী সম্বন্ধে কিছু বলুন?

আগে শিল্পীরা গাইতেন আত্মপ্রকাশের প্রেরণায়। শ্রোতারাও শুনতেন নির্বিচারে। এখনকার শ্রোতারা বড় বিচার-প্রবণ। শিল্পীরাও তাই সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং আমার আপত্তি ঐখানেই।

কেন সবসময় অত বিচার করে, হিসেব করে চলতে হবে? শ্রোতাদের রুচির পর্যায়ে নেমে না এসে শিল্পীরা নিজেদের কল্পনার রাজ্যে কেন শ্রোতাদের মনকে পৌঁছে দেবেন না?

শিল্পী কেন সব বাধাকে অতিক্রম করে জীবনে একবারও শিল্পী হয়ে উঠবেন না? টেকনিকের মূল্য অনস্বীকার্য। কিন্তু টেকনিক সর্বস্ব হয়ে উঠলে গানের রসমূল্য কমে থাকে কি?

তাছাড়া আজকের জীবন বড় ক্রান্ত। সেদিন হেমন্ত ঠাট্টা করে বলছিলেন, 'এরপর হয়তো তিন মিনিট নয়—১৫ মিনিটে ১৫খানা গান গাইতে হবে।' কথাটা ঠাট্টা হলেও একেবারে মিথ্যে নয়। আজকের দিনের শ্রোতারা বড় অস্থির এবং স্বাভাবিক কারণেই এ অস্থিরতার ছোঁওয়া শিল্পীর গানেও লেগেছে।

শিল্পীজীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে আপনাকে সংগ্রাম করতে হয়নি?

বিধাতার ইচ্ছেয় কোন বাধা বলতে যা বোঝায় তার সম্মুখীন কোনোদিন হতে হয়নি। গান গাওয়া সুরু করতে না করতেই প্রেস থেকে শুরু করে গুণীমহল অবাধ যেভাবে আমায় অনুপ্রাণিত করেছেন, খুব কম শিল্পীর ভাগ্যেই তা জোটে। এখন শুনছি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে রাজনীতি ও ঈর্ষার প্রশ্ন। আমার সময়ে আমি, জর্জ, হেমন্ত, মোহর—সবাই গাইতাম এবং এখনও গাইছি। কই আমাদের মধ্যে প্রীতির বাঁধন ত কোনদিন শিথিল হয়নি?

এখন শিক্ষার এত সুযোগ, প্রতিষ্ঠিত হওয়াও অনেক সহজ। তবু সত্যিকারের ভাল শিল্পীর সংখ্যা এত কম কেন?

বাধা না থাকলে নিষ্ঠা আসে না। তাছাড়া কার সার্থকতা কোন পথে সেটাও নিজেকে খুঁজে নিতে হবে। অন্যকে নকল

করে বড় হওয়া যায় না। যেমন ধর জর্জের (দেবব্রত বিশ্বাস) কথা। তাঁর মৌলিক সগীতভাবনা ও অস্বিদ্ধ মন আছে বলেই সকল বিরুদ্ধ সমালোচনাকে জয় করে আপন সংগীতব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন। তা বলে কেউ অন্ধভাবে অনুসরণ করতে গেলে কি ও-জায়গায় পৌঁছতে পারবেন? কানন দেবী, সায়গল মাত্র দুচারিখানি রবীন্দ্রসংগীত গেয়েও আজও স্মরণীয় তাঁদের এক্সপ্রেশনের ব্যক্তিত্বের জোরে।

আপনার প্রথম হিট সং কি?

'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান'—'কৃষ্ণকলি' অনেক পরের। শুনলে আশ্চর্য হবে, শান্তিনিকেতন যাবার আগেই রেকর্ড করার অফার পেয়েও আমি গ্রহণ করিনি। জানিই না কিছু। রেকর্ড করে কি হবে? কিন্তু এখনকার শিক্ষার্থীদের ভাল করে শেখবার আগেই পাব্‌লিসিটির দিকে ঝোঁক। ফলে পূর্ণতা না আসার দরুণ আবেদনহীন হয় তাদের গান। কত প্রতিভার এইভাবে অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে যায়।

অনেকের অভিযোগ আছে রবীন্দ্রসংগীতের একঘেঁয়েমির বিরুদ্ধে। বলেন এ গান প্যান্‌পেনে। এর জবাবে কি বলবেন?

এর জবাবে এই কথাই বলব, রবীন্দ্রনাথ এমনই এক ব্যক্তিত্ব যাঁর কাছে সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন কোনটাই ব্যক্তিগত হয়ে ওঠেনি। ব্যক্তিক হয়েও তা নৈর্ব্যক্তিক। সীমার মধ্যেও অসীম, বাঁধনের মধ্যেও মুক্ত। সেই মুক্ত মনের ধারাকে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহের গণ্ডিতে বাঁধতে যেয়েই তাকে একঘেঁয়ে করে ফেলি। এ দৈন্য রবীন্দ্রসংগীতের নয়—আমদের মনের।

আরও একটা কথা। রবীন্দ্রসংগীত অথবা হিন্দুস্থানী সংগীত কোনটাকেই নির্ভেজাল ভাবসম্পদের সীমায় চিহ্নিত করা যায় না। আমি রবীন্দ্রসংগীত গাই, তবু আলি আকবরের সরোদ শুনে চোখে জল আসে। একবার সুনন্দা পট্টনায়কের তারাণা শুনেছিলাম। মনে হয়েছিল সেতারে ঝালার মত সুন্দর ও অদ্ভুত। এত স্পষ্ট ও এমন সুরেলা। সবই নির্ভর করে শিল্পীর পরিবেশনার ওপর। তাই ত আগে মনটা আগে তৈরী হওয়া চাই। আধার বড় না হলে বড় জিনিস ধরবে কেমন করে?

দেবব্রত বিশ্বাস

জর্জদার চালচলন আচার-আচরণ সবই তাঁর গানের মতই অনন্য গতানুগতিকতা-বিরোধী। জর্জদার সঙ্গে প্রথম পরিচয় কবে? ছাত্রী কালেই।—একবার এক বিষণ্ণ মুহূর্তে মঞ্জুশ্রী নিয়ে গিয়েছিল—ও'র গান শুনে মনকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য।

অনেক গান শোনালেন—'আকাশভরা সূর্য-তারা'-র মতন সভায় গান জাগা থেকে শুরু করে ওপারের স্বপনভরা—উপবনের আশ্বাস দুলিয়ে এ পারের ধূ-ধূ মরুর অধিবাসীদের তরী নিয়ে বেলা থাকতে থাকতেই ওপারে পৌঁছে দেবার নিমন্ত্রণ। এ নিমন্ত্রণের আভাস অন্তরের অতলে একটা প্রত্যাশা দুলিয়ে দেয়নি কি?

দেবব্রত বিশ্বাস

গান গাইতে গাইতে এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করলেন 'তা বন্ধুটি এমন বিষাদিনী কেন?'—মঞ্জুশ্রী উত্তর দিল 'সেইজন্যই ত নিয়ে এলাম'—

'অঃ—এ্যা-ই কথা'—তারপরই গান আর গান। সমুদ্রের ঢেউ-এর মত দিগন্ত অভিসারী সুরের বন্যায় এলোমেলো ঘর আর তার মধ্যে বসা তিনটি মানুষ যেন কোন সুদূরে ভেসে গেছে।

প্রথম দিনের অভ্যর্থনায় প্রাণখোলা উদারতা মাখানো হলেও—পরের অনেকগুলি অধ্যায় কিন্তু খুব সুখপ্রদ নয়। কোথা থেকে যেন জর্জদা দুটি খবর পেয়ে ছিলেন এক নম্বর আমি ক্ল্যাসিক্যাল আসরের নিয়মিত শ্রোতা, দু নম্বর রবীন্দ্রসংগীত একেবারেই পছন্দ করি না।

ঐ দুটি খবর জর্জদার কোপদৃষ্টিতে পড়বার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এরপর যতবার জর্জদার কাছাকাছি এসেছি ও'র কল্পিত আমার ওস্তাদিয়ানার ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের রসগ্রহণে অক্ষমতার জন্য উত্তম-মধ্যম খোঁচা মনে শেলসম বাজত একথা অস্বীকার করি কেমন করে?

...তারপর বহুদিনকেটে গেছে। রবীন্দ্রসংগীততীর্থে পুণ্যস্নানে সিক্ত মন নিয়ে জর্জদার দুয়ারে একদিন দাঁড়ালাম। দেখলাম বিরুদ্ধভাবের মেঘ কোথায় উড়ে গেছে—ঝলমলিয়ে হাসছে যেন ঝুলন পূর্ণিমার রাখী বাঁধার প্রসন্নতা। সেই সনাতন হার্মোনিয়ম—জননীর মত স্নেহে ধারণ করে আছে—পেয়ালা ভর্তি চা, বাক্সভর্তি সন্দেশ। মাঝে মাঝে তারই একটা-আধটার সদ্ব্যবহার চলছে। তারপরই রীডের ওপর দুরন্ত শিশুর মত হাত বুলিয়ে কত না সুরের ঝটিকা সৃষ্টি। এই ঝটিকা শান্ত হয়ে মধুর গুঞ্জনে পরিণত হয় যখন তার সঙ্গে মেশে—ভাবগাঢ় কণ্ঠের গান।

একদিন সসঙ্কোচেই জর্জদাকে প্রশ্ন করি—জর্জদা আপনার গান যতবারই শুনি একটি কথাই মনে হয়। আপনার নিজস্ব একটা অন্তর্জগত আছে যার মধ্যেই আপনি তীব্রভাবে বাঁচেন আর যার বাইরে বাই কোলাহল। স্তুতিবাদ নিন্দা সব কিছু ধাক্কা দিয়ে ফিরে আসতে হয় প্রবেশপথ পেয়ে। কিন্তু যত সন্তর্পণেই আপনার পৃথিবীকে হৃদয়ের অন্তঃপুরে আদরে, লালন করুন। এ পৃথিবী শ্রোতাদের চো সামনে আপন স্বরূপে পরিদৃশ্যমান মতই বাস্তব হয়ে ওঠে—যখন আপনি শুরু করেন। আপনার নির্বাচিত গানগু প্রথম থেকে শেষ অবধি এমন একটা সংহতি থাকে, অনুভূতির প্রতিটি ক্রমবিকাশ ছবির মত ফুটে ওঠে যার রবীন্দ্রনাথ আর জর্জ বিশ্বাস দুজন পাই শুনতে পাই তাদের যুগলমিল শঙ্খধ্বনি। আমার প্রশ্ন এটা কি মনের সৃষ্টি না আত্মবিস্মৃত মুহূর্তের চকিত আলোক দ্যুতি?

আর একটি প্রশ্ন—এই রসানুভূ স্বাদ আপনার রেকর্ডের গানগুলিতে পাওয়া যায় না কেন?'

'শোনেন' জর্জদা ফাইল খুলে করেন এক ভক্তশ্রোতার প্রায় একই ধর কয়েকটি প্রশ্নের একটি উত্তরলিপি। মর্ম হোল 'আমি কোন সংগীত সভার গাইতে বসি প্রথমটায় খানিকটা অনি ভাবের একটা অসোয়াস্তি আমায় ঘিরে থা তাই প্রথম গানটা তেমন জমে না। তার আস্তে আস্তে যেন কোন একটা শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করে কি নেয়, করিয়ে নেয় আমি নিজেই বুঝি গান শেষ হলে দেখি আমার হৃদয়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন অগণিত শ্রো দল আর তারাই কখন হয়ে উঠেছেন আ গানের ঘরের বাসিন্দা, প্রতিবেশী।

রেকর্ডের গানের আবেদনহীনতা—খ স্বাভাবিক ঘটনা। কারণ নানারকম প্র ও বিধিনিষেধের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আ মনটা ভয়ের চোটে দরজা-জানালাগু বন্ধ রেখে দেয়, যার ফলে ভৌতিক শক্তিটি প্রবেশ করতে পারে তারই ফলে যে গান গাই আমার কাছেই নিষ্প্রাণ মনে হয় আপনা খুশি করতে পারবে কি করে? আপনা মত স্বল্প কয়েকজন সংবেদনশীল শ্রো যাঁরা আমারই মত ভালবেসে আমার গান শোনেন তাঁদের কাছেই আমার অভিমান সংগীতলক্ষ্মী ঘোমটা খুলে ধরেন। এটা উভয়পক্ষের বোঝাপড়া ভালবাসাবা ব্যাপার—এর মধ্যে কোন সঙ্গীতে শাস্ত্রীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন রাসায় বস্তু নেই।' উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকান্ত আদেশ করেন 'বড় একটা আড়মাছের চা দিয়ে লাউঘন্ট সন্ধ্যাদিরে দাও?' ফিরেছে দেখলাম।

জর্জদা সহৃদয় শ্রোতার অকৃপণধারে গান শোনাতে যতখানি বাসেন ঠিক ততখানিই বিতৃষ্ণা বোধ কোন সাংবাদিকের কাছে ইন্টারভ্যু তাই মনে রাখছি এটা ইন্টারভ্যু ইন্টারভ্যু লেখলেই আমি প্রতিবাদ

কাগজে চিঠি ছাপাম'—বলে জর্জদা আমায় শুনিয়েছেন।

রবীন্দ্রসংগীত রসিক মহলে দেবব্রত বিশ্বাস একটা বিরাট নাম। কবির গানের সুর ও ভাব অক্ষুণ্ণ রেখেও আপন ব্যক্তিত্বের শক্তিতে জর্জদা যে অনন্য গায়নশৈলীর সৃষ্টি করেছেন তাকে অনায়াসেই স্বতন্ত্র ঘরানার গায়কী বলে চিহ্নিত করা যায়।

এজন্য তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে বৈ কি, জীবনব্যাপী সংগ্রাম। অক্ষমের হীন উত্তেজনা, নিন্দুকের রসনার বিষ সবই পান করে নীলকণ্ঠ হয়ে বসে আছেন। কিন্তু নির্বিকার মানুষটা আর কি নির্বিচল উদাসীন চারপাশের জীবন ও জগত সম্পর্কে। কিন্তু মনের ভেতর থেকে গুনগুনিয়ে উঠছে 'ন্বারে কেন দিলে নাড়া'।

বললাম, জর্জদা গতানুগতিকতা থেকে দূরে সরে এই বলিষ্ঠ গায়কীর প্রেরণা পেলেন কেমন করে? কার কাছে?'

'অনেক' বেশ খানিকটা পানের পিক ফেলে জর্জদা প্রায় মেরেই বসেন আর কি—

'বলেছি না, ওসব তত্ত্বকথাটথা বুঝি না? তবু?'

'না না, তত্ত্বকথা নয়' মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলি 'যে কোনো শিল্পীরই, তিনি বড়ই হোন আর ছোটই হন নিজস্ব একটা ভাবনা বা উপলব্ধি নিশ্চয় আছে এটা তো মানেন?'

'মানি, কিন্তু আমি নিজেকে শিল্পী বলেই মনে করি না। গান গাইতে ভালো লাগে তাই গাই। সে গান কারো মনকে যদি ছুঁতে পারে আনন্দ হয়। না যদি পারে তা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করবার প্রবৃত্তি হয় না। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ঝগড়া চলে কিন্তু রসোপভোগের ক্ষেত্রেও যদি সে ঝগড়াকে টেনে আনতে হয় তবে তার চেয়ে লজ্জাকর ব্যাপার আর কিছু নেই। কিন্তু খবরদার এ্যার একটি কথা যদি কাগজে বাইর হয়'—

'আমার জান নিকাল যাবে এই তো?'

'একেবারে।'

'আচ্ছা জর্জদা—রবীন্দ্রসংগীতে এক-ঘেয়েমির অভিযোগ যা থেকে আপনার গান একেবারেই মুক্ত—এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?'

'কিসুই বলি না। কারণ আমার কাজ গান গাওয়া। বক্তৃতা করা নয়।'

এমনই কথার ফাঁকে ফাঁকে একদিন বললেন, 'ওরাই রাবীন্দ্রিক, রাবীন্দ্রিক কইরা রবীন্দ্রনাথকে একঘরে কইরা রাখছেন, রবীন্দ্রনাথ অরকম শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন না। মনে আছে একবার ওঁর গানের সংগে একজন শিলং-এর ক্যান্ডি নাচ নেচেছিলেন। কিন্তু মুখ দেখে ওঁকে বেশ খুশী-খুশীই মনে হয়েছিল। এমন মানুষকে 'আমাদের' 'আমার' গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখার মত মূর্খতা আর কি থাকতে পারে?'

মাত্র কয়েকদিন আগে জর্জদার কাছে গিয়ে মনে হোল বিধি প্রসন্ন। জর্জদার মনের দরজা-জানালাগুলো বোধহয় খোলাই ছিল, তাই সাহস করে বলে ফেললাম—জর্জদা প্রথম যখন আপনার গান শুনেছিলাম মনে হয়েছিল তার মধ্যে একটা দাপট একটা গর্জন ছিল। এখানকার গান কোমল, কান্ত নমনীয় যেন তরপুর

রসউজ্জ্বল। এটা কি সঙ্গীতজীবনের বিচিত্র ঋতুর ফসল?'

'আমার মনে হয় আগে আপনারই মনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিরুদ্ধে গর্জন ছিল'—

'ভুল জর্জদা একেবারে ভুল ধারণা আপনার। বিশ্বাস করুন।'

'এতটাই যখন বললেন, বাকীটাও বলেন'—

আমার মনে হয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিরুদ্ধে মেয়েলীপনার অভিযোগের বিরুদ্ধে আপনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই অজ্ঞাতসারেই বেছে নিয়েছিলেন এমন সব গান যার মধ্যে বীর্যভাবেরই প্রাধান্য ছিল।'

'ধরেছেন তবে অজ্ঞাতসারে নয় সজ্ঞানে এবং স্থিরচিত্তেই করেছি।'

'এখন'—

'কচি নিমগাছের পাতা দেখেছেন কি যে কোন গাছের? দেখেছেন তার শ্যামল, সুকুমার বুকে একটু সুকুমার লজ্জায় রক্তাভা? রবীন্দ্রনাথের ভাষাও ঐ কচি পাতার শ্যামলতা-ধর্মী। ওঁর গান গাইবার সময় সেই কথাটাই মনে রাখতে হয়। আহাড়া প্রতিটি কথা—যেমন 'আকাশ' 'নদী' 'বৃষ্টি' এসব কথার মধ্যেও একটা মিউজিক আছে। সেটা কি? তাদের নিজস্ব সুর, শব্দ। এ সুর আমি শোনবার চেষ্টা করি। আমার চেয়েও অনেক বেশী ভাল করে শুনেছিলেন অই ভদ্রলোক যাকে তোরা রবীন্দ্রনাথ বলিস্।'

একদিন আলোচনায়, জর্জদা রহস্যময় হাসি হেসে বললেন—'একটা গল্প শোনেন।'

একবার সম্রাট আকবর বীরবলকে বললেন, 'যা করছ সবই বড় একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে একটা নতুন কিছু কর। নইলে...শেষটা সহজেই অনুমেয়।' 'তথাস্তু' বললেন বীরবল।

তারপর একদিন সভায় এসে বললেন, শাহেনশাহ, সবাইকে ডেকে আসরের আয়োজন করুন—বেহেশত থেকে হুরীদের (পরী) এনে নাচাব। কিন্তু জানবেন যারা বেইমান হবে—হুরীও দেখতে পাবে না, নাচও না। সম্রাট ত মহাখুশী। তারপর বিরাট সভা ডাকা হোল। সেখানে হোল বিরাট গুণী সমাবেশ। বীরবল সভায় উপস্থিত হলেন—জমকালো সাচ্চা জরীর পোশাক পরে। মাথায় বিরাট পাগড়ী। সাজ দেখে সবাই তাজ্জব বনে গেল। হঠাৎ বীরবল হাততালি দিয়ে ওঠেন—'ঐ হুরীরা নামছেন। দেখেন সবাই।' বেইমান প্রতিপন্ন হবার ভয়ে সবাই বলে 'বাঃ কি সুন্দর'—এবার নাচ হচ্ছে। নাচ দেখে সবার উচ্ছ্বাস আর ধরে না। এমনটি তারা কেউ দেখেননি। বীরবল প্রচুর পুরস্কৃত হলেন।

এর কিছুদিন বাদে। মাঝরাতে দরজায় কার করাঘাতে বীরবলের ঘুম ভাঙে। দরজা খুলে দেখে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং সম্রাট। বীরবল ত হতবাক। 'সে কি সম্রাট একটা এত্তেলা দিলেই ত হোত। আপনি কেন এত কষ্ট করে এলেন? আজ্ঞা করুন।'

সম্রাট বলেন, 'এই নির্জন রাতে চুপিচুপি তোমায় বলি বীরবল সেদিন নাচটার কিছুই দেখিনি। তবে কি আমি বেইমান?'

'আলবৎ আপনি বেইমান সম্রাট। আমি এতদিন ধরে আপনার সেবা করলাম। তবু আপনি আমার আন্তরিকতায় সন্দেহ করেন। এর চেয়ে বড় বেইমানী মানুষ মানুষের সঙ্গে কি করতে পারে? তবে নাচ-টাচ সবই ফাঁকি, হুরীর আগমনও ফাঁকি। সত্য যখন বিড়ম্বিত হয়—তখন নিরুপায় হয়েই মানুষকে মিথ্যার ভেল্কি রচনা করতে হয়।'

একটু থেমে জর্জদা বলেন, 'আমারও সব ফাঁকি। আসল বস্তু নিজেই দেখি নাই ত অন্যেরে দেখামু কি?'

জর্জদা অস্থির, হৃদয়ের কান্না শুনলাম ঐ কটি কথায়। তিনি শুধু শিল্পী নন অস্থিরও। কত রং রস দিয়ে ছবি আঁকছেন। পছন্দ হচ্ছে না। আবার ছিঁড়ে ফেলছেন। কবিগুরুর সেই অতি অন্দরের পথ ক্ষ্যাপা বাউলটার মতই উনি যেন পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। একটি লক্ষ্যে পৌঁছলে আবার পথের মোড় ঘোরে অন্য বাঁকে। খোঁজার শেষ নেই। গানেও সে আকুতির অন্তহীন বৈচিত্র্যরূপের রঙিন ছায়া। এ রং অফুরান বলেই জর্জদার গান চির নূতন।

অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রসঙ্গীতে অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তার খবর কানে এসেছিল অনেকদিন। কিন্তু শিল্পীকে জানার সৌভাগ্য হোল বছর দুয়েক আগে আকাদমি অফ ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে কৌশিকী নিবেদিত একক রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি আসরে। এই প্রসঙ্গে সঙ্গীত রসিকদের একটি জ্ঞাতব্য তথ্য, এই যে অধুনাকালে অতি জনপ্রিয় একক সঙ্গীতের আসর—অশোকবাবুরই অবদান। উক্ত আসরের আগে তার একটি অনুরূপ একক সঙ্গীতের আসরে প্রতিটি সঙ্গীতের পটভূমিকা ও ভাবসহ ক্রমান্বয়ে দু ঘণ্টা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগীদের একেবারে জয় করে নিয়েছেন—এমন কথাও শুনেছি। সে আসরে আমি ছিলাম না।

আকাদমি অফ ফাইন আর্টসে উদ্যোক্তারা সেদিন পূজাবেদীর মত শুচি-শান্ত পরিবেশ রচনা করেছিলেন। শিল্প-শ্রীমণ্ডিত আলপনার পশ্চাৎপট পরিবেশিতব্য প্রতিটি সঙ্গীতের রচনাকালে রচয়িতার

অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাবনার ধারা বিশ্লেষণ করে চ... ভাষ্যকার—তার সঙ্গে আপনভোলা ... আত্মহারা আবেগে গেয়ে চলেছেন এ... পর একটি গান। মনে হয়েছিল প্র... গান যেন পুষ্পাঞ্জলির ফুলের ... সঙ্গীতলক্ষ্মীর চরণবন্দনা করছে ... সুরের রঙে, রসে, গন্ধে, বর্ণে।

বিশেষ করে মনে রেখাপাত ক... শেষের গানটি 'আঁধার রাতে একলা ...' (যার মধ্যে রবীন্দ্রভাবনার বিশেষ রং ...) 'কানাড়া'র বিশেষ এক ঝলকে-ওঠা ... মনটা অভিভূত না হয়ে পারে না)। গান শুনে একটি ছবিই মনে জেগে... আকাশের আর একটি নাম 'কৃষ্ণসী-...' পূর্ণতার জন্য মহাশূন্যের হাহাকার ... সেই কান্নার দুরোভাষী রেশটি যেন ... গেল অশোকতরুর উচ্চগ্রামে কণ্ঠ ... পরই আবার মন্দ্র সপ্তকে সহজ ... নেমে এসে স্তব্ধ স্থায়ীতে আত্মসমর্পণে...

...অশোকবাবুর সঙ্গে আলোচনা... জানা গেল প্রথমে খেয়ালিয়া ... ইনি রবীন্দ্রলাল রায়ের কাছে ... সঙ্গীতের তালিম নিতে শুরু করেন। ... ইচ্ছেয় শান্তিনিকেতনে ... সঙ্গীত শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন।

—রাগসঙ্গীতে নিবিষ্ট চিত্তের ... সঙ্গীতের দিকে মোড় ফেরায় ... আসেনি?

—এসেছিল। তারপরে শান্তিনিকে... প্রথমে মারাঠি অধ্যাপক ... কাছে তালিম নেওয়ার রীতি ছিল। ... ইচ্ছে ছিল আমায় খেয়ালিয়া ...

এরপরই রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিক্ষা ... ক্ষেত্রের শুরু। তখন থেকেই ... যাব? একটায় সুরের সীমা... আপনাকে প্রকাশের পথ ... বিস্তারের বর্ণসমারোহ, অন্যটায় ... ভাষাগীতের সঙ্গে মিলন ... দুটি দিকই আমায় সমান ... রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বেছে নিয়েছিলাম ... সম্পদের কারণে তার চেয়ে বেশী ... সাফল্যের অব্যর্থ সোপানরূপে।

—রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষাগুরু... সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

—ইন্দিরা দেবী ও শৈলজাদা ... কাছেই আমি নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রস... শিখেছি।

—এখানেও আমার একটি প্রশ্ন ... 'বিভিন্ন শিল্পীর প্রকাশভঙ্গী ও ... ব্যক্তিত্বে তফাত থাকাটাই স্বাভাবিক। ... কোনো সমস্যাক্লিষ্টতা ঘটেনি?

—একেবারেই না। আত্মীয় সম্বন্ধ ... রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গেও ইন্দিরা দে... ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল শান্তিনিকে... আগের যুগে। কবির গানের প্রথম... হুবহু ছবিটি পাওয়া যেত বি... (ইন্দিরা দেবী) গাইবার ঢঙে। আর শা... নিকেতনের রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি... পাওয়া যেত শৈলজাদার গানে। ... গানের দুটি বিভিন্ন অধ্যায়ের ধারা ... ধর্মী হওয়ার দরুন সংঘাত ত হয়...

এবং উভয়ে উভয়ের পরিপূরক হয়ে উঠছে।

এইভাবে শিখতে শিখতে হঠাৎ কোন ফাঁকে রবীন্দ্রসংগীতের কাছেই মন-প্রাণ সঁপে দিয়ে বসে আছি—জানতেই পারিনি। অন্তর-[illegible] এই রূপান্তর সম্বন্ধে সচেতন [illegible] কলকাতায় এসে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে শিক্ষাগ্রহণের সময়। তাঁরই কাছে [illegible] ও রবীন্দ্রসংগীতের—মিতালীর হদিস পেয়ে মনটা আনন্দে ভরে উঠেছিল।

উচ্চাঙ্গসংগীতজ্ঞ হলেও সুরেশবাবুর [illegible] উদার, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। অনেক [illegible] সিক ওস্তাদদের মত রবীন্দ্রসংগীতকে সংগীত নয় বলে কখনও উড়িয়ে দিতেন না। আমার মানসিক প্রবণতা লক্ষ্য করেই তিনি আমায় ধ্রুপদের তালিম দিতেন। [illegible] সম্বন্ধেও শিক্ষা দিতেন।

[illegible] রাগের তালিম দিয়েই সেই রাগের ছোঁয়া-লাগা নানারকমের রবীন্দ্র-সংগীত শোনাতে চাইতেন। গান শোনার পর [illegible] সুরবিন্যাস বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতেন কোন রাগের পর্দা কেমন করে [illegible] মিশে এক অপরূপ পরিণতিতে [illegible] সুরকে পৌঁছে দিয়েছে। তিনি [illegible] চোখের সামনে রবীন্দ্রসংগীতের [illegible] নতুন দিকের দরজা খুলে দিলেন। [illegible] শুধু গাইবার আনন্দেই গেয়ে [illegible] এখন থেকে গাইবার সঙ্গে সঙ্গে [illegible] যেন ভাবতে শুরু করে দিল।

—একটা কথা অশোকবাবু। রবীন্দ্রসঙ্গীত [illegible] আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তাই [illegible] শিল্পীর পক্ষে এ সঙ্গীতকে [illegible] বাহনরূপে গ্রহণ করা সম্ভব [illegible] মনে করেন; এ সম্বন্ধে [illegible] জানতে ইচ্ছে করে।

—[illegible] স্বরলিপিকে প্রাধান্য দেওয়াটা [illegible] আজকালকার প্রথা। আমি বিশ্বাস [illegible] বিদ্যায়। আগেকার দিনের [illegible] রেকর্ডের চেয়ে আজকালকার [illegible] রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর অনেক [illegible] স্বরলিপি অনুসারী। কিন্তু রবীন্দ্র-[illegible] বেশী করে পাওয়া যায় যেন [illegible] দিনের রেকর্ডেই। রবীন্দ্রনাথের [illegible] প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা গান শিখেছেন [illegible] মধ্যেও কিছু পার্থক্য হয়ত [illegible] যায়। সেটা একেবারেই বাইরের [illegible] অন্তর্লীন ভাবের ঐক্যে সকলে [illegible]। শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পী-[illegible] একটি স্থান চিরদিনই আছে বা [illegible] এ থেকেই প্রমাণিত হয় স্বরলিপির [illegible] অনেক বড় আর জীবন্ত হোল [illegible] রাবীন্দ্রিক ভঙ্গিমাকে অক্ষুণ্ণ [illegible] শিল্পীর আত্মপ্রকাশই হোল রবীন্দ্র-[illegible] বড় কথা। স্বরলিপির সামান্য [illegible] কিছু যায় আসে না। এই গায়কী [illegible] বিশেষজ্ঞদের কাছে শিক্ষা না নিয়ে [illegible] স্বরবিতানের বিদ্যাকে সম্বল করেই [illegible] রেডিওতে অথবা সাধারণ সভায় [illegible] পরিবেশন করতে ছোটাটা [illegible] অপমান বলেই মনে করি।

—রবীন্দ্রসঙ্গীতের একঘেয়েমির অভি-[illegible] আপনার কিছু [illegible]?

—নিশ্চয় আছে। বহুল প্রচার অথবা জনপ্রিয়তার বাঞ্ছিত পরিণতিতে পৌঁছানোটা অবশ্যই রবীন্দ্রসংগীতের এক উজ্জ্বল দিক। কিন্তু এই বহুল প্রচারেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি পরিবেশনায় সহজীকরণের প্রবণতা।

রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যবিরোধী কোন উদ্ভট কাজ করেন নি। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ঐতিহ্যকেই তিনি ভাব ও কল্পনা অনুযায়ী গড়ে নিয়ে অকল্পিত রসলোক সৃষ্টি করেছেন। এই জন্যই সাধারণভাবে কণ্ঠচর্চা ও শিক্ষা দিয়ে গাইবার উপযুক্ত কণ্ঠ তৈরী ও রাগরাগিণী সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট করে নিয়ে—তবে কবির ধ্যানলোককে প্রত্যক্ষ করবার সাধনা করতে হয়। শুধুমাত্র সুকণ্ঠকে সম্বল করে কোনরকমে সুরটা ওপর-ওপর আয়ত্ত করে গাইতে গেলেই রস-সৃষ্টির পরিবর্তে কৃত্রিমতা এবং একঘেঁয়েমো এসে পড়ে।

এই হোল একঘেঁয়েমোর একটা কারণ, আর একটা কারণ শিল্পীর দিক থেকে রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন ধারার বিচিত্র অধ্যায়ে বক্তব্যকে উপলব্ধি করার অভাব।

—যেমন ধরুন 'স্বপন যদি ভাঙিলো' এখানে মপমা মা সগমপা র...সার রসর-র মীড়ে যে ছবি ফুটে উঠল রবীন্দ্রনাথ কি বলতে চেয়েছিলেন সে কথা না বুঝে শুধুমাত্র স্বরলিপি অনুসরণ করে গাইলে সে ছবি ফোটা সম্ভব কি? এভাবে গাইতে গেলে গাওয়া হয়ত একরকম হোল। কিন্তু ছবিটি হারিয়ে গেল তাই মাঝে মাঝে একটা ব্লাইন্ড এস্থেটিক সেন্সের তাগিদে এক আধবার হয়ত ভাল হয়ে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সেই ভাবটির যেন অন্তর্ধান ঘটল। কিন্তু বুঝে গাইলে সে রিস্ক থাকে না।

—রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার সময় বিশেষভাবে কোন্ দিকটি আপনি নিজস্ব ভাবকল্পনার রেখা নিয়ে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন?

—পুরুষ মানুষের পুরুষালী ঢং-এ গায়নশৈলীর দিকটি—দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, আত্মভোলা শিল্পী—গান শুরু করবার সময় থেকেই রবীন্দ্রসংগীতে মেয়েলিপনার অভি-যোগ অনেকের কাছেই শুনে আসছি। কারণ কি? চিন্তা করে দেখলাম আগেকার দিনে রবীন্দ্রসংগীতে মূলতঃ মহিলা শিল্পীদেরই প্রাধান্য ছিল। কবি গান লিখেই আশেপাশের স্নেহের পাত্রীদের শিখিয়ে নিতেন, তার দ্বারাই হয়ে উঠতেন কবির গানের জীবন্ত স্বরলিপি। তার ফলেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম যুগে এক মহিলা শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে ওঠে এবং তাঁদের গাওয়া গানগুলিই সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

এরপর পুরুষরা যখন গাইতে শুরু করলেন অজ্ঞানতেই এই রীতি অনুসরণের ফলে তাদের পরিবেশনায় ওজস্‌বর্জিত এক মেয়েলি গায়নরীতি চালু হয়ে গেল। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গিয়ে একটা পুরুষালী গায়কীর অভাব আমায় বড় পীড়া দিত।

—কিন্তু জর্জদার গান? তাঁর গানের পৌরুষদৃপ্ত ওজস ত তাঁর বিরুদ্ধ সমা-লোচনাকে ছাপিয়ে প্রবাদ বাক্যের শামিল হয়ে উঠেছিল। আর তিনি আপনারই পূর্ব-সূরী। তাহলে পুরুষালী গায়কী ছিল না বলছেন কেন?—শিল্পীর উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়েই প্রশ্ন করি।

—জর্জদার গানে ম্যাসকুলিনিটি নিশ্চয় ছিল। কিন্তু তখন কোলকাতায় রবীন্দ্র-সংগীতের ধারা অনুসরণ করলেই দেখা যেত জর্জদার ছাত্ররা জর্জদার মত আর সুচিত্রাদির ছাত্র-ছাত্রীরা সুচিত্রাদির মত করে গাইবার চেষ্টা করছেন। আর জর্জদা আপনার কণ্ঠ ও মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী বেছে নিতেন এমনই সব গান যা তার মত তেজী কণ্ঠেই মানায়। কিন্তু 'রূপে তোমায় ভোলাব না' অথবা 'সার্থক জনম আমার' ধরনের গান জর্জদা গাইতেন না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হোল তা কেন হবে? পুরুষ শিল্পীকেও সব গানই গাইতে হবে—পুরুষমানুষরাও কি ভালবাসতে অথবা সেন্টিমেন্টাল হতে পারেন না? তবে তাঁদের আবেগের প্রকাশ অবশ্যই মেয়েদের চেয়ে স্বতন্ত্রধর্মী।

—কিন্তু 'এবারে কেন দিলে' 'সেদিন দুজনে', 'জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে'—'কে যাবি পারে' এইরকম অনেক মধুর রসাত্মক গান ত জর্জদার কণ্ঠে কমনীয় মাধুর্যেই ঝরতে শুনেছি।

—সে পরের যুগে। আমি তাঁর প্রথমের যুগের গানের কথা বলছি।

—এখনকার মহিলা শিল্পীদের মধ্যে কাকে আপনি শ্রেষ্ঠ স্থান দেবেন?

—সুরের সূক্ষ্মকার্যে মোহরদি, ঋজু বলিষ্ঠতার পরিপ্রেক্ষিতে সুচিত্রাদি।

—রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোন দিকটি আপনাকে বেশী টানে?

—দেখুন, রবীন্দ্রসঙ্গীতের যুগ সত্যি করে শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর। তাঁর ভাবসঙ্গীত, প্রেমসঙ্গীত, ভক্তিসঙ্গীত অন্যান্য সকলের মত আমাকেও টানে। তবু বলব তাঁর শেষের গানের অ্যাবস্ট্র্যাক্ট রূপের প্রতিই আমি আকর্ষণ বোধ করি বেশী। যেমন 'এসেছিলে তবু আস নাই'—গানটি। এখানে শব্দগুলো যেন রং হয়ে উঠে একটা ছবির সৃষ্টি করেছে। এই কল্পনার দুঃসাহসই আমায় পাগল করে দেয়।

—রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্ব-ধর্ম সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

—যথার্থ জনগণের গান বলতে যা হওয়া উচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতে সে উপাদান কতটা আছে তা সন্দেহাতীত নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র গীতিকার অথবা সুরকার নন। অনেক কিছু জড়িয়েই তিনি রবীন্দ্র-নাথ। তাঁর ব্যক্তিত্বও তাঁর গানের বহুল প্রচারের সহায়ক।

আপন চাহিদায় শিল্পী হয়ত শ্রোতা তৈরী করে নিতে পারেন। আবার শিল্পীর কাছ থেকে বড় কিছু আদায় করতে হলে শ্রোতার দিক থেকেও বিদগ্ধ ও জাগ্রত চিন্তাশক্তি প্রয়োজন। সবসময়ই আমাদের কাব্যসঙ্গীতের ধারাকে কোন না কোন রচয়িতা প্রবহমান রেখেছেন যাদের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ হলেন রবীন্দ্রনাথ।

ছেলেটা জন্মের পর থেকেই কিভাবে যেন বেঁকে গিয়েছে। আজ পর্যন্ত কিছুতেই তার মেরুদন্ড টান হল না।

নাম তপন।

তপনের বাপ একটা লম্পট। মদ ও মেয়েমানুষেই তার সময় কাটে। তপন ভূমিষ্ঠ হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মা যখন মারা গেল তখন তপনের দিকে নজর দেবার কেউ আর রইল না। শিশু তপন যদি শিশু-অবস্থাতেই তার মায়ের মতই অস্ত যেত, তাহলে তাকে নিয়ে এই কাহিনী রচনার সুযোগ অবশ্যই ঘটত না।

কিন্তু তপন টিকে গেল।

তপনের মাসি বড়লোক। পীরপাড়ায় তাদের মস্ত কোঠাবাড়ি ও এন্তার ধান-জমি। প্রথমে ঝামেলা বাড়াতে মাসি রাজী হয়নি, অবশেষে অগত্যাই রাজি হতে হল মাসিকে। তেতাল্লিশ-দিনের শিশু তপন মাসির ঘর আলো করতে পীরপাড়ায় চলে গেল।

মাসির কোল আলো করে তিন ছেলে ও এক মেয়ে পীরপাড়ার কোঠাবাড়িতে কিলবিল করছিল, তাদের মধ্যে তপনের আবির্ভাব একখন্ড উপদ্রবের শামিল মনে হল। তাছাড়া, তপনটা একটা দেখবার জিনিসই হয়ে দাঁড়াল। কাকের বাচ্চার মত গলা লিকলিকে সরু, চড়াই-ছানার মত জীর্ণ চেহারা, তার উপর শরীরের ছাঁদটা আবার বাঁকা। লম্পট বাপের এমন ছেলেই তো হবে—এ আর কী হয়েছে। হঠাৎ যদি একদিন দম মরেই যায় ছেলেটা তাহলে বাঁচে কিন্তু অন্তত তপন তো তাহলে বাঁচে। মরা দূরের কথা, ধীরে ধীরে তপন করে আওয়াজ করতে শিখছে আবার। ছত্রে দোলনার ফাঁক দিয়ে মাসির মেয়েরা যখন তপনকে খোঁচা দেয়, তপন একটু-আধটু আপত্তি করে। কখনো কেঁদে ওঠে, কখনো-বা ম্যাঁ করে চার হ আছড়ায়। তপনের এইরকম উল্লাসে উ হয়ে ওঠে ছেলেমেয়েরা। ভারি মজা তাদের। আরও খোঁচা দিয়ে আরও পেতে চায় তারা।

ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে তপন আবার হাসেও। আশ্চর্য! অন্যসব বাচ্চাদের মত ঘুমের মধ্যে হাসতেও জানে ছেলেটা!

শুধু হাসা কেন, যথানিয়মে ও যথাসময়ে বসা, দাঁড়ানো ও হাঁটা শুরু করে দিল তপন। চড়ুই-পাখির ছানা যে মানুষের বাচ্চার মতন জ্যান্ত হয়ে উঠবে এ কথা ভাবেনি কেউ।

তপন বড় হয়ে উঠল। বড় হয়ে সে বুঝল, বাড়ির আর-পাঁচটা ছেলেমেয়ের থেকে সে কিছুটা আলাদা। বাড়ির পিছন দিকের পোড়ো-জমিটা যেন বাড়িরই অংশ, কিন্তু তা পরিত্যক্ত ও অশ্রদ্ধেয়, তপনের অবস্থা অনেকটা সেই রকমের।

বাড়ির পাঁচজন ছেলেমেয়ে দল বেঁধে জলখাবার খেতে বসে তপন তখন খায় না। ওর খাবার ব্যবস্থাই আলাদা। আলাদা জায়গা আলাদা সময়, আলাদা খাদ্য। এক কোণে বসে তপন চোরের মত আর পাঁচ জনের খাওয়া দেখে।

মাসিমার মেয়ে মনা বলে, 'দ্যাখ বীরু, তপনের দিকে তাকা। ওর চাউনিটা ঠিক চোরের মত। বড় হলে নিশ্চয় চোর হবে।'

চোরের তাকাবার ভঙ্গির সংগে পরিচয় ওদের আছে। সিঁদ কেটে চুরি করার মতলবে এই বাড়িতে এসেছিল একটা চোর। সে ধরা পড়েছিল। রাত কেটে সকাল হবার পর তাকে যখন বাইরের বারান্দায় বসানো হয়েছিল, তখন অজস্র লোকের চোখের সামনে বসে চোরটা নাকি ঠিক এমনি ভাবেই তাকিয়ে ছিল।

মনার কথা শুনে সবাই তপনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছিস, দিদি।'

একটু দূরে বসেছিল তপন, এদের কথার মানে বুঝতে না-পেরে সে শুধু গা কাঁপাতে লাগল। চোখের চাউনির কোনো বদল হল না তার। বদল তো হলই না, তার দৃষ্টি আরও যেন করুণ হয়ে উঠল।

এতে ছেলেমেয়ের দল আরও মজা পেয়ে গেল। তারা তপনকে ঘিরে দাঁড়াল ও আনন্দে নাচতে লাগল।

শীতে কাঁপছিল তপন। গায়ে তার জামা নেই, একটা পুরনো কাপড় ভাঁজ করে তার গায়ে জড়িয়ে বাঁধা। শীতে সে কাঁপছিল, ওদের রকম দেখে এবার কেঁদে উঠল তপন।

কান্না শুনে মাসিমা ছুটে এলেন। তপনের পিঠে একটা চাপড় বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'সবাই হাসছে। উনি কাঁদছেন। কান্নার হয়েছে কী। এই নাও, খাও।'

তখন কান্না ভুলে গেল। মুড়ির বাটিটা কাপড়ের উপর টেনে নিয়ে মুঠো মুঠো সে মুখে পুরতে লাগল মুড়ি।

সত্যি, খাওয়ারও একটা ছিরি নেই ছেলেটার। অন্যসব ছেলেমেয়ে কেমন স্থির হয়ে বসে ধীরে-ধীরে খায়। সেসব দেখেও কি শেখে না? শিখবে কী করে, শিখবে কার থেকে? রক্ত, রক্তের ধারা যাবে কোথায়। যেমন বাপের ছেলে, তার ব্যাটাও তো হবে তেমনি।

কিছুতেই নাকি ভালো হল না তপন। মাসিমার এত চেষ্টা সবই ভস্মে ঘী ঢালাই হল।

ইস্কুলে তপন নাকি চুরি-বিদ্যে শুরু করে দিয়েছে। আজ এর পেন্সিল, কাল ওর বই, তার খাতা—অনবরতই নাকি হারাচ্ছে। তপন ইস্কুলে ভর্তি হবার আগে, কই এমনটি তো ঘটত না।

বুঝতে তাই কষ্ট হয় না কারও—চোর কে।

তপনকে জেরা করেন মাসিমাই। বলেন 'কোথায় রেখেছিস বল্। আমার বাড়ির নাম ডোবালি তুই। বল শিগগির রেখেছিস কোথায়।'

মাসিমার চোখের দিকে তাকাতে সাহস পায় না তপন। চোরের মত মাথা নীচু করে সে ভয়ে কাঁপে। আসলে সে যে কিছু জানে না, এই সামান্য কথাটাই মুখ ফুটে বলার ভরসা তার হয় না।

মনা আর বীরু এসময়েই প্রায় বলে ওঠে 'নিশ্চয় বেচে দিয়েছে মা। আমরা সব খুঁজেছি, কোথাও পেলাম না।'

মাসিমা একটু ভেবে বলেন, 'তা হতে পারে।'

সমস্ত সমাচার শুনে মেসোমশায় বললেন, 'আমার বিশ্বাস হয় না। অত বুদ্ধি ওর নেই। চোর-চোর বলে তোমরা ওকে চোর বানাবে।'

মাসিমা এতে তেতে উঠলেন, 'বানাব আবার কি! বনেই গেছে ও। দেখো, একদিন ওকে হাতে-নাতে ধরা পড়তেই হবে। চোখের দৃষ্টিটা ওর লক্ষ্য করেছ কোনোদিন?'

ক্রমশই চুরির মাত্রা বেড়ে চলল বাড়িতে ও ইস্কুলে। সকলে চিন্তিত হয়ে উঠল ক্রমশই। এর একটা প্রতিকার খুঁজতে আরম্ভ করল সকলে।

প্রতিকার আবার কী। তপনকে এবার তার বাপের কাছে পাঠিয়ে দিলেই 'ল্যাঠা' চুকে যায়। অনেকরকম ঝক্কি সহ্য করে ছোঁড়াটাকে অনেক কাল তো তোলা হয়েছে। এবার পাঠিয়ে দিলেই মিটে যায়। তার বাপের কাছে একখানা চিঠিতে খবর পাঠানোও হল।

উত্তরে তার বাপ লিখে পাঠাল যে, ছেলেকে সম্বন্ধে কোনো দায়িত্ব নিতে সে নারাজ; ও ছেলে যে তার, তার কোনো প্রমাণ নেই।

এতে তপনের লাঞ্ছনা বেড়ে যাবার কথা। যেখানে সে আছে সেখানেও তার স্থান নেই, যেটা তার ন্যায্য জায়গা সেখানেও তাকে অস্বীকার করা হচ্ছে।

কত মার, কত বকুনি, কত উৎপীড়ন—সব সহ্য করছে তপন। কিন্তু চোখের দৃষ্টি তার বদলাচ্ছে না কিছুতেই। চোরের মত টুলটুল করে শুধু সে তাকায়। গা জ্বলে যায় মাসিমার। তাঁর শিক্ষা পেয়েও ছেলেটা মানুষের মত মানুষ হতে পারল না। সবার সামনে বুক টান করে দাঁড়াতে শিখল না। চোখের দৃষ্টি সহজ ও সরল করতে পারল না। ভয়ে সব সময় ভীত হয়ে থাকে। কেন, ভয়টা কিসের? মেরুদণ্ডটা টান করে নিতে ক্ষতিটা কোথায়। মনে পাপ না থাকলে কারও চোখের দৃষ্টি ভীরু হয় না, ভয়ে সব সময় কেউ কাঁপে না। তপন জন্ম-পাপী, তার শিরায়-শিরায় পাপের রক্ত বয়ে চলেছে। যেমন বাপ তেমনি তার ব্যাটা।

মেসোমশায়ের পকেট থেকে সেদিন একটা সিকি খোয়া গেল। মেসোমশায় বললেন, 'হয়তো পড়ে গেছে কোথাও।'

মাসিমা তা মানতে রাজি নন। এতদিন পড়ে গেল না, আজ পড়ে যাবে কেন। নিশ্চয় চুরি গিয়েছে। চুরি যে গিয়েছে এ বিষয়ে তাঁর এতটুকু সন্দেহ নেই। অনবরতই তো এটা হারাচ্ছে, ওটা হারাচ্ছে!

মাসিমা তপনকে ডেকে বললেন, 'সিকিটা দে।'

কিসের সিকি? তপন তো কিছু জানে না। সে শুধু চোরের মত তাকাল মাসিমার দিকে। মেরুদণ্ডটা বাঁকা, একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে সে যেন জানাতে চাইল কিসের সিকি।

মাসিমা রেগে যান, চেঁচিয়ে ওঠেন, 'কথা বলছ না কেন। ত্রিভঙ্গ মুরারির মতন দাঁড়িয়ে চোরের মতন তাকাচ্ছ কেন। বাপ, রেখেছ কোথায়?'

তপন কথা বলতে সাহস পায় না, মাথা নেড়ে কেবল জানায় যে, সে নেয়নি। ভয়ে সে একটু বেঁকেই যায়। তার পিঠের যে জায়গাটা বাঁকা তারই উপর কিল বসিয়ে দেন মাসিমা। গুম করে একটা শব্দ হয়, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে তপন, শব্দ করে কাঁদতে তার ভয় হয়।

চুরি? চুরি কাকে বলে? তপন তা জানে। তা পড়েছে—না-বলিয়া পরের দ্রব্য—

বাঁকুড়া শিল্পকলার প্রদর্শনী

শিল্প আর শিল্পীর দেশ বাঁকুড়া। খানকার মানুষের প্রতি পদে আর ছন্দে যেন রই অভিব্যাক্তি। কারুশিল্পে, চারুশিল্পে কর্যে, হস্তশিল্পে বাঁকুড়া দীর্ঘকাল তার তিহ্য অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে রক্ষা করে সছে। মল্লরাজাদের আনুকূল্যে বাঁকুড়ার ল্প যে পরিপূর্ণতা এসেছিল, আজও তা লান। এরই জীবন্ত স্বাক্ষর সর্বভারতীয় তশিল্প বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত রিজিওন্ল ডিজাইন সেন্টারে গত ৬ সেপ্টেম্বর কে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাঁকুড়ার রাম শিল্প প্রদর্শনীটি।

ধমর্নীয় সংস্কার, পৌরাণিক কাহিনী, যা সংস্কার বা বিশ্বাস প্রভৃতির সঙ্গে নীয় চরিত্রের একত্র সমন্বয়ে বাঁকুড়ার ল্প গড়ে উঠেছে। বাঁকুড়ার তৈরী নানা নিস শুধু ভারতে নয়, বিশ্বের বাজারে প্রিয়তা ও চাহিদা রয়েছে। পোড়ামাটির ত. ঘোড়া. ষাঁড়. পুতুল, পাথরে খোদাই, ক ঝিনুক, কাঠের বেলমালা, বিষ্ণুপুরের শ. সোলা ও নানারকম কাপাস সুতো য় তৈরী বিভিন্ন রকমারী জিনিসই ড়ার শিল্পীরা তৈরী করে থাকেন।

প্রদর্শনীটি ছিল হরেক রকম সোলা কেটে ন্দরভাবে সাজানো। প্রদর্শনী কক্ষে কাতেই অপূর্ব কারুকার্যখচিত বিরাট আকারের কাঠের ঘোড়াগুলো দর্শকের নজরে র্বপ্রথমেই পড়ে। বাঁকুড়ার ডোকরা শিল্প সংগ্রহে আধুনিক মানুষের অকৃত্রিম চাহিদা। পোড়ামাটির ঘোড়া, হাতি, ষাঁড় প্রভৃতি মূর্তিগুলির সঙ্গে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের লোকোৎসবের আত্মিক যোগ রয়েছে। এসব স্থানে বড়ামপুজো, ভৈরবপুজো, চন্ডী পুজো, ধর্মপুজো, মনসাপুজো, অন্যান্য উৎসবের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' বইটিতে লিখেছেন এই কুদ্র, বড়াম্‌ ও ভৈরব বনে-জঙ্গলে, গাছতলায় মাঠে মাঠে থাকেন, ভৈরব হলেন ঝোপঝাড়ের' ভৈরব। কুদ্র ও বড়ামও প্রায় তাই। এঁদের জন্য গাছতলায় বড় জোর মাটির বেদি থাকতে পারে, কিন্তু কোনরকম আলয় থাকতে পারবে না। সকলেই বনদেবতা, বন হাসিল করে ক্রমে গ্রাম ও নগর গড়ে উঠেছে, তাই আজ আর তাঁরা বনে থাকতে
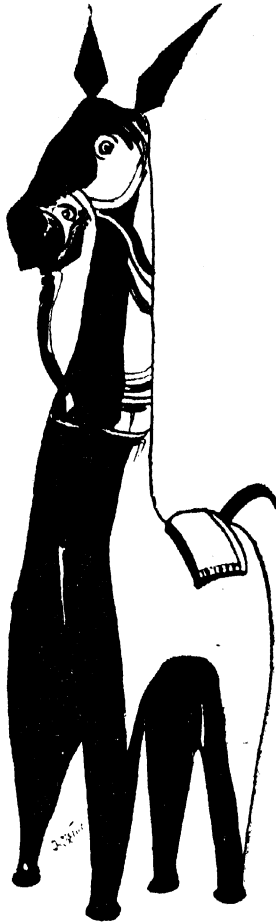
পারেন না, অতীত অরণ্যের নির্জন প্রতীক বৃক্ষের তলায় থাকেন।

এদের মূর্তি কি রকম? কোন ধ্যানলব্ধ কল্পিত মূর্তি কিছু নেই, এইটাই হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মনসার মূর্তি হল, মাটির ঘটের উপর সারিবদ্ধ সাপের ফণা, থাকে থাকে সাজানো। বাকি সব দেবতার মূর্তিই হল হাতি আর ঘোড়া। নানারকমের ঘোড়া আর হাতি, নানা আকারের, কিন্তু নানা রং-এর নয়, হয় কালো, না হয় পোড়ামাটির মতন রং। ভৈরবও তাই, চন্ডীও তাই, বড়ামও তাই—এমনকি কোথাও কোথাও ধর্মরাজ ও মনসা পর্যন্ত তাই। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে পথ চলতে, গ্রামে গ্রামে, অসংখ্য গাছতলায় দেখা যায়, সিঁদুরল্যাপা মাটির হাতি-ঘোড়া সাজানো। বেশ যে সাজানো-গোছানো তাও নয়, নতুনও নয়। বছরে বছরে বদলানো হয়। পাশে স্তূপীকৃত হয়ে থাকে ভাঙাচোরা মাটির সব হাতি-ঘোড়া। এ কোন্ দেবতা? জিজ্ঞাসা করলে কেউ বলে বড়াম, কেউ বলে ভৈরব, কেউ বলে কুদ্র, কেউ বলে হাজাগ্রহ চন্ডী ও মনসা, কেউ বা তার সঙ্গে ধর্মঠাকুরের নাম করে।'

তাছাড়া প্রদর্শনীর অন্যতম দ্রষ্টব্য জিনিষ ছিল বালুচরী শাড়ী ও বিষ্ণুপুরী সিল্ক। বাটিকের কাজ করা জুতো, চাল মাপার কুনকো, পর পর ক্রমশঃ বড় থেকে ছোটতে সাজানো। শুশুনিয়া পাহাড়ের পাথরের গায়ে খোদিত ভাস্কর্যও এই প্রদর্শনীর একটি অঙ্গ। তাছাড়া ছিল শাঁখের আংটি, লকেট, ঝিনুকের রকমারী লকেট। বাঁকুড়া শিল্পের সঙ্গে জনসাধারণের যদিও গভীর যোগ রয়েছে, তথাপি এ ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন হলে জনসাধারণের মধ্যে শিল্পচেতনা যেমন বাড়ে, তেমনি বাঁকুড়ার শিল্পীদের বেঁচে থাকার পথ খানিক সুগম হয়।

—অঞ্জলি চৌধুরী

আঠারো

ওদেশ থেকে রাণাকে নিয়ে আমি ফিরে এলাম। উনি রয়ে গেলেন—কিছু কাজ বাকী ছিল বলে।

ছবির কাজের চাপ একটু কমল, রাণা সুস্থ হোলো বিদেশ ভ্রমণও সাঙ্গ হোলো। দীর্ঘদিনের ব্যস্ততা ও অনবকাশের পর এলো সেই শান্ত লগ্ন—যখন মনের কোণে সঞ্চিত ইচ্ছেগুলোর দিকে তাকাবার সময় পাওয়া গেল।

বহুদিন আগে। একবার স্টুডিও থেকে বাড়ী ফেরবার সময় গাড়ীতে উঠতে যাব—এমন সময় ঘোমটায় সারা মুখ ঢাকা এক মহিলা সামনে এসে দাঁড়িয়ে ডান হাতটি মেলে ধরলেন। ফর্সা হাত; শীর্ণ হাতের শিরাগুলো বড় বেশী স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেদিন ব্যাগে বিশেষ কিছুই ছিল না। সব মিলিয়ে হয়ত মোটা পাঁচেক টাকা, কি তাও হবে কিনা সন্দেহ, তাঁর হাতে দিলাম।

স্টুডিওর কয়েকজনের কাছে শুনলাম ইনি এককালের নামকরা শিল্পী। আজ অবস্থার ফেরে এই দশা। আর একটি ঘটনার কথা শুনেছিলাম। এক ভারতখ্যাত অভিনেতাকে স্টুডিও-ফ্লোরে একজন গিয়ে খবর দিল এক ভিখারিণী শ্রেণীর মহিলা ঘোমটায় তার মুখ ঢাকা; শুধু উক্ত শিল্পীর কাছেই তাঁর বক্তব্য নিবেদন করবেন। উক্ত অভিনেতা সাহায্যপ্রার্থিনী সেই মহিলার সঙ্গে দেখা হতেই চমকে উঠলেন। আরে! ইনিই ত সেই মহিলা যিনি তাঁকে প্রথম অভিনয়জগতে প্রবেশের সুযোগ করে দেন।

যাইহোক, সেদিন ঐ ঘটনার পর থেকে বেশ কয়েকদিন ধরে মনটা খুবই বিচলিত হয়ে রইল। সকল কাজের মাঝখানে চোখের সামনে ভেসে উঠেছিলো দুটি দৃশ্য। একটি ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে ঝলমলে নায়িকা, যাঁর একটি কটাক্ষ ও হাসির জন্য সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত। আর একটি ঘোমটায় মুখ-ঢাকা মলিনবসনা এক দুর্ভাগিনীর শীর্ণ হাতখানি মেলে ধরার করুণ ছবিখানি। আজ যে লক্ষ লক্ষ লোকের নয়নমণি কাল তার দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনের ভয়াবহ পরিণতিতে 'আহা' বলবারও কেউ নেই। এ মুহূর্ত ত যে কোনো শিল্পীর জীবনেই আসতে পারে। সাধারণ মানুষের ধারণা শিল্পীরা বাস করেন এক ইন্দ্রধনু ঘেরা স্বপ্নলোকে। প্রাত্যহিক জীবনের অভাব-দৈন্যের গ্লানিরা সেখানে ছায়াপাত করতে পারে না।

এ সত্য স্বল্প কয়েকজন শিল্পীর জীবনে সত্য হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ শিল্পীর জীবনের প্রসঙ্গে মহাকবি গিরিশ চন্দ্রের দুটি চরণই প্রযোজ্য 'দেহপট সনে নট সকলই হারায়'—।

কিন্তু আমরা যদি হারাতে না দিই। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন হঠাৎ জ্বলে ওঠা নতুন পথের একটা আলোরেখা দেখতে পেলাম। বাংলাদেশের মহিলা শিল্পীরা মিলে একটা সংস্থা গড়ে তুললে কেমন হয়? তারপর অবসর সময়ে নাটক মঞ্চস্থ করে—তারই সঞ্চিত অর্থে একটা বাড়ী তুলে শিল্পী বোনেদের দুর্দিনের আশ্রয়ের সংস্থান করি? মলিনা, সরযূ, সুনন্দা, চন্দ্রা, রেণুকা প্রত্যেকের বাড়ী গিয়ে এই পরিকল্পনার কথা বলতে ওরাও খুব উৎসাহিত হোলো।

কিন্তু তারপরই মনে দুলাল সংশয়ের ছায়া। এও কি সম্ভব? সামান্য কজন মহিলা মিলে এতবড় ব্যাপার? দূর! সবই যদি শেষকালে ছায়াবাজি হয়ে দাঁড়ায়? লোকে হাসবে না?

কিন্তু যদি সফল হই? তাহলে ত সারা ভারতবর্ষে আমরা এই আদর্শ রেখে যেতে পারব যে দুর্ভাগ্যবিড়ম্বিত মহিলাশিল্পীদের সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়েছেন মহিলাশিল্পীরাই। আর স্বপ্ন যদি স্বপ্নই থেকে যায় তাতেই বা দুঃখ কিসের? মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন নাই হয় সাধনাটা ত মিথ্যে নয়?

আমরা সবাই মিলে উঠে পড়ে লাগলাম। প্রথমে আমাদের মিলনসভার কোনো নির্দিষ্ট গৃহ না থাকায় কোনোদিন আমার বাড়ী, কোনোদিন চন্দ্রার বাড়ী, কোনোদিন মলিনার বাড়ী, কোনোদিন বা সুনন্দার বাড়ী এই

দর্পচূর্ণ চিত্রে রাধামোহনের সঙ্গে

এখানেও আমরা একটা বিরাট পরিবারের মত। সবার মধ্যের স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও উদ্দেশ্যের সততার প্রতি সকলেরই এমন একটা আন্তরিক ভালবাসা আছে যে তারই টানে আমরা যেন অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা আছি।

মহিলাশিল্পীমহলের সার্থকতা আমায় যতটা আনন্দ দিয়েছে এমন অনাবিল আনন্দ জীবনে কমই পেয়েছি। আমার ওপরে সকলের ভালবাসা, নির্ভরতা প্রতি মুহূর্তে আমায় কর্মে উদ্দীপ্ত করেছে। মলিনা, সরযূ, মঞ্জু, অনুভা, নমিতা, সাধনা এবং আরো কত নামকরা শিল্পী যাঁদের কত নাম, যশ, সম্মান। কিন্তু সব দায়িত্বভার শিশুর মত নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় এঁরা আমায় সঁপে দিয়েছেন। হৃদয়ের কতখানি প্রসারতা থাকলে তবে এটা সম্ভব একথা ত সারাজীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝি।

সব সময় ক্ষমতাকে একচেটিয়া করে রাখলে আখেরে লাভের চেয়ে ক্ষতিরই সম্ভাবনা বেশী। সেই কথা ভেবেই একবার আমরা সবাই মিলে ঠিক করলাম প্রতিবারই মলিনা, সরযূ, মঞ্জুর পরিচালনায় 'মিশর-কুমারী' এবং অন্যান্য নাটকের সার্থকতা ত ট্রায়েড। একবার কম বয়েসীদের সুযোগ দিয়ে তাদের যোগ্যতার পরীক্ষা হোক না। ছন্দার পরিচালনায় 'মঞ্জরী অপেরা' মঞ্চস্থ হোলো এবং রসিকমহল তা সাদরে গ্রহণ করেছেন।

আর একটা কথা ভোলবার নয়। মহিলাশিল্পীমহলের বাড়ী হওয়ার পর আমাদের টাকায় টান পড়ে। তখন সভাদের মধ্যে অনেকেই সাধ্যমত ঋণ দিয়ে সংঘকে সাহায্য করেছেন। কিন্তু আমাদের এই মহিলাশিল্পীমহলেরই একটি মেয়ে, ব্যাচারা থিয়েটার ছাড়াও যাত্রা ইত্যাদিতে প্রাণান্তকর পরিশ্রমে অর্থ উপার্জন করে সে যখন ৫০টি টাকা এনে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'দিদি এটা তোমার কাজে লাগলে খুশী হব। এ টাকা আর আমি ফেরৎ চাই না!' চোখের জল আর রাখতে পারিনি। ঐ ৫০ টাকাই সেদিন আমার কাছে ৫০ লক্ষ টাকার সমান মনে হয়েছে।

কিন্তু এমন আনন্দের হাটে বসেও কোনো নিরালা মুহূর্তে বিষণ্ণতার সুর কি প্রাণে বাজেনি? যে মহিলাশিল্পীমহল আমার প্রাণ, এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি সত্তার সাধনার পীঠস্থান, সেই মহিলাশিল্পীমহলের সকলের প্রাণের সুর—আমার সুরের সঙ্গে সমতালে বাজবে এইটেই আমা[র] মর্মের একান্ত বাসনা। অনেক সময়ই ... বেজেছে। কিন্তু সুরে বাঁধা বীণার তা[র] কখনই ছিঁড়ে যায়নি এমন কথাও ক[লা] যায় না।

নানাদিক থেকে এমন ইঙ্গিত ... কখনও আসেনি যে এ প্রতিষ্ঠানের জ[ন্য] আমার প্রাণঢালা পরিশ্রম নিখাদ, নিঃস্বার্থ আদর্শের খাতেই চলেনি? আমার ক্ষমতা-লিপ্সু মনের গোপন তাগিদেই আমি একা[জ] করেছি? নিজের নামটা চিরদিনের জন্য স্বার্থত্যাগী কর্মব্রতীর পুরোভাগে রাখবা[র] আকাঙ্ক্ষা নেই এমন কথাও জোর দি[য়ে] বলা যায় না।

কথাটা উড়িয়ে দেবার নয়। ভে[বে] দেখবার মতই। অবসর সময়ে নির্জনে ব[সে] নিজের সমস্ত দোষ-ত্রুটির চুলচেরা বিশ্লেষণ করে নিজের দুর্বলতাকে চিনে নেওয়া এবং তাকে জয় করবার চেষ্টাটাও মানুষের অবশ্য পালনীয় কাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত বলেই আমি মনে করি। এ কাজে আমি হেলা করিনি। আর চিত্তশুদ্ধির নির্মল আলোয় বার বার হৃদয় ভরে গেছে এই পথেই।

মহিলাশিল্পীমহল ও তাদের অসংখ্য দুঃস্থ শিল্পীদের গৃহনির্মাণে আমার সার্থক কর্মজীবনের অন্যতম ফসল হয়ে থাক— এটা আমি চাইনি একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে।

কিন্তু অনেক ভেবে এইটুকুই ... কিনারায় এসেছি যে সংসারে ছোট জিনিস যেমন স্বার্থকেন্দ্রী বড় জিনিসও তাই। মানুষের ছোট আদর্শ যেমন তার স্বার্থ সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত বড় আদর্শও তেমনই উদারতর স্বার্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বড় স্বার্থ তার সার্থকতার জন্য অন্য পাঁচজনকেও কমবেশী সার্থক করে তোলে, যেখানে ছোট স্বার্থ তার পরিসরেরর সঙ্কীর্ণতার দরুন একেবারে কোনো গভীর আনন্দের পরশ পায় না।

একই নিঃশ্বাসে দুটো নাম উচ্চারণের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে এখানে বিঠোফেনের প্রসঙ্গ আনছি শুধু আমার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করবার জন্য বিঠোফেন তাঁর মুনলাইট সোনাটা অথবা নাইনথ সিম্ফনি রচনা করেছিলেন মূলতঃ তাঁর সৃষ্টির প্রেরণায়। তাই এ প্রেরণার উৎসে যে প্রকাশ-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার স্পর্শ আছে সে কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে জীবনের মধ্যে একটা গভীর মিলের সুর আছে বলেই বিঠোফেনের অনুপম সংগীত সৃষ্টিতে শুধু তাঁর স্বার্থের সার্থকতাই মেলেনি, মানুষ এর মধ্যে একটা অভিনব রসনির্ঝরের সন্ধানও পেয়েছে। জীবনের অশেষ দুঃখদৈন্যের মাঝখানে এ মিলের সুরের রেশটি পরম পবিত্র।

তাই ভাবছিলাম মহিলাশিল্পীমহল যদি আমার কীর্তিপ্রকাশের উদ্দেশ্যেও

দৃষ্টি হয়ে থাকে এর সঙ্গে যুক্ত সকলেরই তাতে ক্ষতির চেয়ে লাভটাই কি বড় হয়ে ওঠেনি?

আজকের এই দ্রুত কর্মব্যস্ত জীবন ও যুগে যে যার আপন কাজে ও স্বার্থে সীমিত। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও ত সবাই স্বার্থের গন্ডী ছেড়ে বিনালাভের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে মিলেছি। প্রত্যেকেই সাধ্যমত সময়, পরিশ্রম ও প্রতিভার মূল্য দিয়ে এমন একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাতে পেরেছি যা সারা ভারতে দ্বিতীয় রহিত। গৃহনির্মাণের পর যদি একটি শিল্পীও তাঁর শেষজীবনে চিররোগে, জীর্ণশয্যায়, অনাহারে বিনা চিকিৎসায় ব্যাকুলচিত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন যাপন করার অভিশপ্ত মুহূর্ত থেকে মুক্তি পেয়ে থাকেন, যদি নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় এইটুকু সুখস্মৃতি নিয়ে যেতে পারেন যে তাঁর কর্মজীবনের শেষে রিক্ত-হাত ভরে উঠেছিলো। শিল্পী বোনদের সেবা যত্নে, সেবায়, আদরে, তবে সেই মুহূর্তে আনন্দটুকু বড় করে দেখে নিজেদের কথা মনে করব না, কল্পিত জমা-খরচের খাতা খুলে গম্ভীর মুখে এই হিসেব করে প্রমাণ করব যে এর মধ্যে পরিকল্পনা-কারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা কামনাই বড় আর সব মিথ্যা?

যে মেয়েটি নিজের অনেক বাস্তব-ক্ষতিকে স্বচ্ছন্দে অগ্রাহ্য করে বহু আয়া-সলব্ধ অর্থের অনেকখানি সমিতিকে দিয়ে গেল সে কি একাজ পারত যদি প্রতি-দিনের অভ্যস্ত সীমায় বাঁধা থাকত? সীমাকে অতিক্রম করার এই মহৎ আবেগ, কি তার জীবনের অন্য একটা পরিণতির ইঙ্গিত দেয় না?

মানুষের জীবনের এই পরিণতির রূপই আমি চিরকাল দেখে এসেছি। আর এই রূপকেই বাস্তবসত্যের মত প্রত্যক্ষ করেছি আমার চারপাশের মানুষের জীবনে। মহত্বের স্পর্শটুকুই আমার কাছে বড় মানুষের ছোটখাটো দীনতা ও ক্ষুদ্রতার চেয়ে।

যদি এমনদিন আসে এত সাধের শিল্পীশিল্পীমহল আমায় ছেড়ে চলে যেতে হয়, তার জন্যও বিধাতার কাছে কোনকিছু নালিশ জানাবো না। যিনি আমার জীবনপাত্র অকৃপণ দানে ভরে দিয়েছেন তাঁর নির্দেশই দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেব। শুধু এই মধুর স্মৃতিটুকুই মনের দিগন্ত রাঙিয়ে রাখবে যে আমরা মিলেছিলাম। আমাদের অনেক অসাম্য, অনেক বিরোধিতা অনেক অসম্পূর্ণতার বাধাকে অতিক্রম করে আমরা এক হয়ে-ছিলাম আমাদের স্বপ্নে, আদর্শে, ঔদার সংগীতে, এবং এ মিলনে কোনো খাদ ছিলো না। আর ছিল না বলেই আমরা এর প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে এক বিদেশী উপকথার গল্প।

এক নিঃসঙ্গ দরিদ্র ছেলে—পথে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সে দেশের রাজকুমারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল রাজপ্রাসাদের অলিন্দের নীচে। রূপসী রাজকন্যা তাকে অন্তরঙ্গ

দিল্লীতে আঁধারে আলোর পুরস্কার গ্রহণের পর দেবিকারাণীর সঙ্গে

দাসী মারফৎ ডেকে নেন—আপন প্রাসাদে। রাজকন্যার রূপ দেখে কিশোরের চোখের পলক পড়ে না। মানুষের দেহে এত রূপ সম্ভব? রাজকন্যাও মুগ্ধ তার বিস্ময়ভরা নিষ্পাপ দৃষ্টি ও কিশোর লাবণ্য দেখে। দুজনের বিবাহ হয়ে গেল।

নিত্য নতুন রং বাহারের আলোকিত রাতে শিল্পিত কক্ষে, সুরভিত বসন-ভূষণে স্বপ্নের মত কাটে তাদের দিন: একদিন কিশোর গেছে বেড়াতে। তখন রাজকন্যার ওপর আসক্ত—তার প্রতিদ্বন্দ্বী যাদুবিদ্যা আয়ত্ত করে রাজকন্যাসহ রাজ-প্রাসাদ অদৃশ্য করে নিয়ে গেল আপন দেশে। কিশোরটি ফিরে দেখে ধূধূ করছে প্রান্তর। রাজপ্রাসাদ নেই, নেই সেই নানারঙা ফুলের স্বর্গোদ্যান। আর সবচেয়ে বড় ক্ষতি, কোথায় সেই রূপময়ী, প্রেমময়ী রাজকন্যা যাকে দেখলেই মনের মধ্যে আলোর নূপুর বেজে উঠত? তবে কি সবই মায়া?

সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি পড়ে আঙুলে রাজকন্যার আপনহাতে পরানো লাল মণি-বসানো আংটির দিকে। লাল মণিটি ত ঠিকই জ্বলছে তাদের রাঙা হৃদয়ের ভাল-বাসার মত। সবই যদি মায়া তবে এ মণির কায়া রইল কেমন করে? আংটিসুদ্ধ আঙুল গালে চেপে ধরে। চোখের জল টপটপ করে পড়ে ঐ অঙ্গুরীয়কের মণির পরে। (চলবে)

অনুলিখন—সন্ধ্যা সেন

ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন-এর সাহায্য-পুষ্ট লো-বাজেট (অল্পব্যয়ে নির্মিত) ছবি

মৃণাল সেনের "ভুবন সোম", বাসু চট্টোপাধ্যায়ের "সারা আকাশ" বা বাসু ভট্টাচার্যের "অনুভব" হচ্ছে ফিনান্স কর্পোরেশন-এর সাহায্যপুষ্ট লো-বাজেট ছবি, যা সাদা-কালো ফোটোগ্রাফীতে গৃহীত হয়েছে, যাতে দশ-বারো লাখ টাকা পারিশ্রমিক নেনেওয়ালা 'তারকার ঘটা নেই ('অনুভব'-এর নায়িকা তনুজা বা নায়ক সঞ্জীবকুমার নিশ্চয়ই বোম্বে চিত্রজগতের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক নন), কিন্তু যার সংলাপ হচ্ছে হিন্দী। অর্থাৎ ছবিগুলি শুধু লো-বাজেট ফিল্ম নয়, লো-বাজেট হিন্দী ফিল্ম। আঞ্চলিক ভাষার ফিল্মে থেকে সর্বভারতীয় হিন্দী ভাষার ফিল্মকে ধার দিলে টাকাটা ফেরত আসবার সম্ভাবনা বেশী, এই নিরাপত্তা বোধ ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনকে চালিত করে নিশ্চয়ই: যে-দিন থেকে মিস্টার করঞ্জিয়া এই সংস্থার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন, সে-দিন থেকে এই লো-বাজেট হিন্দী ফিল্মকে অর্থ সাহায্য করবার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং বলা চলে, এর ফলও ভালো হয়েছে। অর্থাৎ ফিল্মগুলিতে লগ্নীকৃত টাকা ফেরত আসবার পথ প্রশস্ততর করা হয়েছে। কিন্তু এ-সম্পর্কে দুটি ব্যাপার লক্ষ্য করবার মতো। এক, হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন যতখানি উদার, আঞ্চলিক ভাষা, বিশেষ করে বাঙলাভাষার ক্ষেত্রে ততখানি নন আদপেই। দেখা যাচ্ছে, সম্প্রতি ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের কাছ থেকে অগ্রিম ঋণ পেয়ে একখানি বাঙলা ছবি তৈরী করছেন। দুই, 'ভুবন সোম বা 'অনুভব' যতো ভালো ছবিই হোক না কেন, এমন কি যতো জনপ্রিয়তাই লাভ করে থাকুক না কেন, ছবিগুলি সাধারণ ব্যবসায়িক চিত্রগৃহগুলিতে—যাকে আমরা কমার্শিয়াল সার্কিট বলি তাতে মুক্তিলাভ করবার সুযোগ পায়নি। সকলেই জানেন, 'ভুবন সোম' দেখানো হয়েছিল এলিট সিনেমায় এবং 'অনুভব' এখনো দেখানো হচ্ছে 'গ্লোব'-এ। অর্থাৎ ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন-এর অর্থপুষ্ট লো-বাজেট হিন্দী ফিল্মগুলির আর্থিক সাফল্য সম্বন্ধে হিন্দী ছবির নামী ও দামী পরিবেশক ও প্রদর্শকরা এখনও যথেষ্ট সন্দিহান। বোধ করি, এই কারণেই এই সংস্থার নবনিযুক্ত বোর্ড অফ ডাইরেক্টার্স তাঁদের এক সাম্প্রতিক সভায় স্থির করেছেন যে, ভারতের চারটি প্রধান নগরে—কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও

অশনি সংকেত/সন্ধ্যা রায় এবং পরিচালক সত্যজিৎ রায়। ফটো: অমৃত

দিল্লীতে তাঁরা নিজস্ব চিত্রগৃহে তাঁদের সাহায্যপুষ্ট ছবির প্রদর্শনী ব্যবস্থা করবেন এই বছরেরই ১৪ নভেম্বর থেকে। অবশ্য যতদিন না তাঁরা সিনেমা হাউস কিনতে বা তৈরী করতে পারছেন, ততদিন ভাড়া নেওয়া হাউসেই ছবি দেখানো হবে। সংস্থা পরিকল্পনা করেছেন, আসছে ১০ বছরের মধ্যে সারা ভারতে অন্তত ১০০টি চিত্রগৃহ তাঁদের নিয়ন্ত্রণে আসবে এইসব লো-বাজেট ছবি দেখাবার সুবিধার জন্যে।

বেশ কিছুকাল—বোধকরি, বৎসরখানেক—আগে সংস্থার চেয়ারম্যান শ্রীকরাঞ্জিয়া কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে বলেছিলেন, পূর্বাঞ্চলের চলচ্চিত্র-প্রযোজকদের সুবিধার জন্যে তাঁরা কলকাতায় ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের এক আঞ্চলিক শাখা খোলবার কথা চিন্তা করছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁর কথা শুধু 'কথার কথাই রয়ে গেছে; কোনো বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবার দিকে এক পাও অগ্রসর হবার কথা শোনা যায় নি।

আমাদের প্রস্তাব, ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন-এর প্রধান কর্মকেন্দ্র হওয়া উচিত দিল্লীতে—যে-কোনও চলচ্চিত্র-প্রযোজনা কেন্দ্র থেকে দূরে এবং কে সরকারের তথ্য ও বেতার বি কাছাকাছি এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ কলিকাতা—এই তিনটি চিত্র-প্রযোজন থাকা উচিত তার তিনটি শাখা, চিত্র প্রযোজকদের সঙ্গে যোগাযোগ সুবিধার জন্য।

চিত্র-সমালোচনা

একটি বিশেষ চিত্র সম্পর্কে

হিন্দী "অনুভব"—বাসু ভট্টাচা যে-ছবিটি একটি আধুনিক দম্ পারস্পরিক সম্পর্ক ঘটিত অনুভূতিরই তারই একটি কন্টিনেন্টাল ইয়োরোপীয় সংস্করণ দেখলুম সেপ্টেম্বর, রবিবার সকালে প্রাচী সি **সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার** সৌজন্যে নাম "দি কম্প্রোমাইজ"। হ্যাঁ, শেষ দম্পতির মধ্যে আপোষ-মীমাংসাই এ-ছবির নায়ক হ্যান্সও হচ্ছে খ কাগজের সম্পাদকীয় দলভুক্ত এবং তার মায়া নানা জায়গায় মডেলের কাজ ক দুজনেই যেন সুখী; ছকে-বাঁধা চলে। এমন সময়ে শহরে এল আমে "লিভিং থিয়েটার"-এর দল। তার প্র সদস্য নাকি বিপ্লবী; বাঁধাধরা শ্লোগান—ভিয়েতনাম চিরজীবী হোক, কর এই বর্বরতা ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বাভ জৈব ধর্মে তারা বিশ্বাসী। এদের মেলামেশা করবার সুযোগ পেল স্ত্রী। মায়ার রীতিমত একটি ছে ভালো লেগে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছেলেটি জৈবধর্মের সেবাকারী; ভালোবাসার ধার ধারে না। মায়া গেল: এমন কি, নিজের স্বামীর প্র যে নাকি ওর নাকের ডগাতেই কো নামে মেয়েকে আলিঙ্গন করে, চুম্বন অতএব সে স্বামীকে ত্যাগ করে চলে চায়; কিন্তু না, হান্স তাকে ভালো এবং মায়া সহসা যেন আবিষ্কার করল, হান্সকে ভালোবাসে। অতএব দু মিলনের মধ্যে দিয়েই আপোশ-মী হল। 'অনুভব'-এর শেষটুকু মনে কর "কি চাও, ছেলে না, মেয়ে?"—"দ চাই"। সেই যে অপটিক্স্-এর দ এখানে সেইটিই অত্যন্ত বাস্তবধর্মী উঠেছে।

আধুনিক সমাজজীবনের পরিপ্রে তোলা-ফিলো রেগুস্টিন পরিচালিত ছ অত্যন্ত বাস্তবধর্মী এবং বিক্ষুব্ধ সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তির চিত্রও বটে। শব যন্ত্রসঙ্গীতের সমন্বয়ে একটি বিচিত্র ক্রিয়ার সৃষ্টি করে দর্শকমনে শ্লোগান করার দৃশ্যে।

স্টুডিও সংবাদ

অনেকদিন থেকে বাংলা চিত্র শিল্পের [...]ভিন্ন মহল থেকে নতুন নায়ক-নায়িকার [...]ভাবের কথা শোনা যাচ্ছে। সবারই [...]আশঙ্কা—নতুন মুখের আমদানী না হলে [...]৪ জন নামী-দামী নায়ক-নায়িকার হাতের [...]ঠেয় থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাছাড়া [...]রিবেশক এবং প্রদর্শকদের চাহিদানুযায়ী [...]সব খ্যাতমান শিল্পীদের দরজায় ধর্ণা [...]ওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কেননা ঐ [...]থাকথিত 'বকস অফিস' শিল্পীদের [...]কর্ষণটাও ভাববার বিষয়।

কিন্তু ঠান্ডা মাথায় ভাবতে গেলে [...]তিমেয় শিল্পীদের নিয়ে এক সঙ্গে [...] ছবি করা সম্ভব? আর যদিও বা [...]ব শিল্পীরা এক সঙ্গে সব ছবিতেই [...]ভিনয় করেন তাহলে একটা ছবি করতে [...] মাস সময় প্রয়োজন? ছবি শুরু করার [...]র থেকে মোট ৩।৪ মাসে যদি একটা [...]র শেষ করা না যায় তাহলে ছবির খরচ [...]খানি বেড়ে যায় তা নিশ্চয়ই ভুক্ত[...]ভোগীরা জানেন।

আমার আলোচ্য বিষয় এখানে তা নয়। [...]লোচনার বিষয় হচ্ছে ঐসব মুষ্টিমেয় [...]জন শিল্পীদের বাদ দিয়ে যদি নতুন এবং [...]য়নোদের দিয়ে ভাল গল্প নির্বাচন করে [...]ব করা যায় তাহলে কি সে ছবি বকস [...]ফিসের আনুকূল্য লাভ করতে পারে না?

জানি, আমার এ প্রোপোজাল আমাদের [...]শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকের [...]পূত হবে না। অথচ ভাবতে অবাক [...]গে—বাংলাদেশের নবাগত এবং নবাগত [...]ক-নায়িকারদের নিয়ে বম্বের প্রযোজকরা [...]রে পর ছবি করছেন এবং 'বকস অফিস' [...]ফল্য লাভও করছেন।

এ প্রসঙ্গে রাখী বিশ্বাস ও জয়া [...]দুড়ীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [...]খী এবং জয়া এখানকার প্রযোজক-[...]রিচালকের নজরে পড়ে নি। কিন্তু [...]মানে বম্বের বাজারে এ দু'জনের [...]প্রিয়তা সর্বজনবিদিত। জয়া ভাদুড়ী [...] রীতিমত সকলকে তাক লাগিয়ে [...]য়েছেন। এখন যে ক'টা ছবি এখানে [...]প্রদর্শিত হচ্ছে তার বেশীর ভাগ ছবিরই [...]নায়িকা জয়া ভাদুড়ী। এনার পর বম্বের [...]বাজারে এখন যার নাম শোনা যাচ্ছে তিনি [...]হলেন বালিকা বধূ-র সেই কিশোরী [...]নায়িকা মৌসুমী চ্যাটার্জী। মৌসুমী [...]বর্তমানে বম্বেতে ৬।৭ খানা বড় বড় [...]ছবিতে অভিনয় করছে। সর্বশেষ খবরে [...]প্রকাশ, মৌসুমীকে নিয়ে নাকি বম্বেতে [...]কাড়াকাড়ি লেগে গেছে। সব প্রযোজকরাই [...]নাকি এখন এই পঞ্চদশী মৌসুমীকে [...]তাঁদের পরবর্তী ছবিতে নায়িকা করতে [...]উৎসাহী। অথচ এখানকার প্রযোজক-পরি-[...]চালকরা রাখী, জয়া, মৌসুমীর মত [...]শিল্পীদের নিয়ে ছবি করতে ভরসা পান না।

শুধু এই তিনজনের কথাই বা কেন—এ'দের মত অসীমকুমার স্বরূপ দত্ত, সুমিত্রা সান্যাল, আশীষকুমার, কালী ব্যানার্জী, সমিত ভঞ্জ প্রভৃতিরাও এখন হিন্দী ছবিতে মোটামুটি আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। শোনা যাচ্ছে—কৃষ্ণা বসু, জয়শ্রী রায়, সন্ধ্যা রায়ও নাকি কয়েকটা হিন্দী ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। তারপরে ভবিষ্যতে হয়তো একদিন দেখবো এখানকার অন্যান্য উদীয়মান শিল্পীরাও একে একে তাদের পূর্বসূরীদের পথ অনুসরণ করেছে। বাংলাদেশের প্রযোজক-পরিচালকদের কাছে অনুরোধ মুষ্টিমেয় ক'জন শিল্পীর হাতের ক্রীড়নক না হয়ে নতুন কিছু ভাবুন। তা না হলে অদূর ভবিষ্যতে আরো সমস্যার সম্মুখীন হবেন।

স্থান : অখ্যাত অজ পাড়াগ্রামের অনাথ আশ্রম। সেই আশ্রমের ৮।৯ বছরের এক কিশোর নাম—তপন। যেমন অবাধ্য, তেমনি একরোখা ও বেপরোয়া। কারো কথায় কর্ণপাত করে না—নিজের বদমতলব ও খেয়াল-খুশীতে সদাই ব্যস্ত। কখনও আশ-পাশের বাড়ীর খাঁচায় আবদ্ধ পোষা পাখীকে খাঁচা থেকে মুক্ত করে দিচ্ছে, কখনও বা জেলেদের জালে-ধরা মাছকে আবার জলে ছেড়ে দিচ্ছে, এ সব নানাবিধ ছুটির ঘণ্টা বাজিয়েই যেন ওর আনন্দ। হ্যাঁ, তা বলে ভাল কাজও যে সে করে না তা নয়। ঐ গ্রামেরই এক অন্ধ কিশোর অমলের সে বন্ধু এবং খেলার সঙ্গী। তপন তাই রোজ অন্ততঃ একবার অমলের বাড়ীতে যায়—গল্প-গুজবে তাকে মাতিয়ে রাখে। অন্ধ অমলের বড় বোন কৃষ্ণা যার নাম—বড় সুন্দর কথা বলে। ঐ গ্রাম্য পরিবেশে সে যেন একান্ত বেমানান।

এ সময় কোলকাতা থেকে ঐ অনাথ আশ্রমে তপনের মত কিছু দুষ্টু এবং বেপরোয়া ছেলেদের দেখাশুনা করার ভার নিয়ে আসেন এক অকাল-বিধবা তরুণী নাম ঝর্ণা। মিস্ট্রেস ঝর্ণার ঐ আশ্রমে আসার পর তপনদের মত বল্গাহীন অবাধ্য কিশোর-দের বাগে আনার প্রয়াসে তিনি ব্রতী হন। আস্তে আস্তে মিস্ট্রেস ঝর্ণার প্রচেষ্টায় ঐসব ছেলেদের মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায়। তপন যেন নতুন নেশায় মেতে ওঠে: ঝর্ণার কাছে নাওয়া, খাওয়া, শোওয়া—নানাবিধ আব্দারে ঝর্ণাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ঝর্ণারও যেন তপনের জন্য কোথায় একটা মমত্ববোধ জাগে। সন্তানস্নেহে তপনকে মানুষ করতে থাকেন তিনি।

ঝর্ণার আসার পর কয়েক মাস অতি-বাহিত হয়ে গেছে। সে সময় ঝর্ণা কোলকাতায় চিঠি লেখে তাঁর স্বামীর বন্ধু সাহিত্যিক সঞ্জয়কে এ গ্রামে এসে বেড়িয়ে যেতে। (প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল সাহিত্যিক সঞ্জয় এক সময় ঝর্ণাকে ভাল-বাসতো। কিন্তু যে কোন কারণে ওরা মিলতে পারে নি) ঝর্ণার চিঠি পেয়ে সঞ্জয় ভাবে হয়তো ঝর্ণা তাকে আহ্বান জানিয়েছে তার পুরনো স্মৃতি টানে। তাই সঞ্জয় কোলকাতা ছাড়বার সময় ঝর্ণার জন্য একটি বেনারসী শাড়ী সঙ্গে নিয়ে আসে প্রেজেন্টেশান হিসেবে। মনে তার অনেক আশা—আবার তারা দু'জনে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মিলিত হবে। মনে মনে কল্পনার জাল বুনতে থাকে সাহিত্যিক সঞ্জয়'...

গল্পের শেষের দিকে দুষ্টু তপন নিজের জীবনের বিনিময়ে মাতৃসমা ঝর্ণাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে ছুটির ঘণ্টা চিরতরে বাজিয়ে চলে যায় পরপারে।

এ মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে সবাই যখন বিমূঢ় তখন ভেসে আসে তপনের অন্ধ বন্ধু অমলের একান্ত প্রিয় একটা গান :

'রোমাঞ্চ ভরা এ ছুটির আনন্দে

সে যেন গো চলে অভিসারে।'

ভাবাবেগ, বাৎসল্য ও করুণ রসের ত্রিবেণী সঙ্গমে রচিত আলোচ্য কাহিনীটি প্রশান্ত পাট্টাদার নিবেদিত ঐকতান প্রযোজিত 'ছুটির ঘণ্টা' ছবির। নবাগত তরুণ পরিচালক বরুণ কাবাসী তাঁর নিজস্ব কাহিনী ও চিত্রনাট্যে ছবির স্যুটিং স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ স্টুডিও শুরু করেছেন গত সপ্তাহ থেকে।

ছবির বিভিন্ন চরিত্রে এ পর্যন্ত যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে আছেন—মাধবী চক্রবর্তী (ঝর্ণা) দিলীপ রায় (সাহিত্যিক সঞ্জয়), জুঁই ব্যানার্জী (কৃষ্ণা), মাস্টার সাশ্বনু (তপন), জ্ঞানেশ মুখার্জী, বিশু চ্যাটার্জী প্রভৃতি।

অমল মুখোপাধ্যায়ের সুরারোপে ছবির দু'খানি গান আরতি মুখার্জী ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে বাণীবদ্ধ করা হয়েছে

রয়েছে। এ ছবির চিত্রগ্রহণে আছেন পূর্ণোর ন্যাতক বিমান সিনহা, সম্পাদনা ও শিল্প নির্দেশনায় আছেন অনিল সরকার ও বিজন বসু। পরিচালক শ্রীকাবাসীকে পরিচালনায় সহযোগিতা করছেন—অর্চন চক্রবর্তী।

চিত্রপরিচালক সলিল রায়ের আগামী ছবি 'জীবন রহস্য'-এ একটি খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন বম্বের জনপ্রিয় ভিলেন প্রাণ। বর্তমানে শ্রীরায় বম্বে গেছেন প্রাণের সঙ্গে স্যুটিং ডেট ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে। এ ছবির অন্যান্য চরিত্রে আছেন মাধবী চক্রবর্তী, শুভেন্দু চ্যাটার্জী, সোনা দে প্রভৃতি। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের স্যুটিং শুরু হবে বলে খবরে প্রকাশ।

যান্ত্রিক গোষ্ঠীর পরিচালনায় 'নাগচম্পা'-র দ্বিতীয় পর্যায়ের স্যুটিং শুরু হয়েছে টেকনীসিয়ান্স স্টুডিওতে। নারায়ণ সান্যালের বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন প্রশান্ত দেব। এক বেকার যুবকের জীবন-সমস্যার নানা ঘটনা ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নাটকের বিস্তার।

ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, সুপ্রিয়া দেবী, রুমা গুহঠাকুরতা, অসিতবরণ এবং রাশভারী এক ব্যারিস্টারের চরিত্রে অভিনয় করবেন উত্তমকুমার।

'ডাক দিয়ে যাই'র মহরৎ ঃ ১৭ সেপ্টেম্বর, নিউ থিয়েটার্সের দুই নম্বর স্টুডিওতে, প্যারাগন পিকচার্সের নতুন ছবি 'ডাক দিয়ে যাই'র শুভ সূচনা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভানেতৃত্ব করেন (এরূপ অনুষ্ঠানে এই প্রথম) রবীন্দ্র ভারতীর উপাচার্য ডক্টর রমা চৌধুরী এবং প্রধান আতিথ্য গ্রহণ করেন রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী। ক্ল্যাপস্টিক দেন—পাহাড়ী সান্যাল। এই নতুন ধরনের ছবিটির সংগঠনায় আছেন—বিধায়ক ভট্টাচার্য (কাহিনীকার), অমর লাহা (চিত্রনাট্যকার-পরিচালক), দ্বিজেন মুখার্জী (সংগীত পরিচালক), বটু সেন (শিল্প নির্দেশক), সুজিত সিংহ (চিত্রগ্রহণকারী), অজিত মুখোপাধ্যায় এবং মিঃ মণি (ব্যবস্থাপক), দেবেন বসু (কর্মসচিব), কামাখ্যা ব্যানার্জী (উপদেষ্টা), কনক দত্ত (প্রযোজক), মৌসুমী ফিল্মস (পরিবেশক) এবং দিলীপ দাশগুপ্ত (প্রচার সচিব)।

বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিল্পী যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের ভিতর—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নরেন মিত্র, কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সেবাব্রত গুপ্ত, সরোজ সেনগুপ্ত, অখিল নিয়োগী, কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিক, পাহাড়ী সান্যাল, নির্মলকুমার, মাধবী দেবী, চন্দ্রাবতী দেবী এবং পদ্মা দেবীর নাম উল্লেখ্য।

মঞ্চাভিনয়

।। নাট্য প্রতিযোগিতা ।

নব-ব্যারাকপুর শক্তি সঙ্ঘ কর্তৃক আয়োজিত চতুর্থ বর্ষ একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী নভেম্বর মাসে। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক (সাংস্কৃতিক বিভাগ), শক্তি সঙ্ঘ, নব-ব্যারাকপুর, ২৪-পরগণা।

ইউ-টি-সি (৮১, ভৈরব ঘটক লেন, হাওড়া-৬)-এর পরিচালনায় সারা ভারত বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে আগামী ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে। নাম দেবার শেষ তারিখ ১লা অকটোবর।

সেমসাইড ঃ উচ্ছল রঙ্গ রসের একটি প্রাণবন্ত নাটক 'সেমসাইড' সেদিন পরিবেশিত হোল 'রঙ্গনা'র মঞ্চে। প্রযোজনা করলেন নর্থ ক্যালকাটা ইয়ুথ লীগ। আঙ্গিক পরিকল্পনার সামান্য শৈথিল্য থাকা সত্ত্বেও সামগ্রিক অভিনয় ভঙ্গিমা প্রায় সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রায় প্রতিটি মুখের দৃশ্যে উঠেছে অনাবিল হাসির আলোড়ন।

প্রতিটি শিল্পীই প্রাণোচ্ছল অভিনয় করেছেন। তবে বিশেষ করে যাঁর কথা সবার আগে মনে আসে তিনি হোলেন 'প্রজাপতি' বেশি ডাঃ অসিত সাহা। তাঁর প্রতিটি অভিব্যক্তি, সংলাপ বলার সাবলীলতা দর্শকদের প্রতিটি মুহূর্তেই অভিভূত করেছে। আর যাঁরা নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন তাঁরা হলেন শান্তি অধিকারী, দুলাল সাঁতরা, নরেন মজুমদার, শুভেন্দু কুণ্ডু, হেমন্ত দত্ত।

নাটকটির নির্দেশনায় বিশিষ্ট মানসিকতার পরিচয় রাখেন রায়চৌধুরী।

দুটি একাঙ্ক ঃ কার্টুন থি[য়েটার]-এর শিল্পীরা সম্প্রতি 'মুক্ত অঙ্গনে' একাঙ্ক নাটকের সার্থক প্রযোজনা [দ্বারা] করে নাট্য-চর্চায় তাঁদের নিবিড় পরিচয় রেখেছেন। একাঙ্ক দুটি গিরিশঙ্করের 'চেরাগ বিবির হাট' ও বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নবনাট্য'।

'চেরাগ বিবির হাট' একটি কাব্য[ধর্মী] সংলাপে ও সংঘাতে রয়েছে এক তন্ময়তা। নাটকটির আঙ্গিক পরি[কল্পনায়] পরিচালক কমল ঘোষদস্তিদার গ[ভীর] শিল্প বোধের স্বাক্ষর রাখেন। এ[ছাড়া] স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত চরিত্রচিত্রণে ছিলেন সেনগুপ্ত, শুক্লা রায়চৌধুরী, মাধ[ব] প্রশান্ত চ্যাটার্জী, সুবীর দাসমাল।

উজ্জ্বল সেনগুপ্তের নির্দেশনায় নীত হয়েছে দ্বিতীয় একাঙ্ক 'ন[বনাট্য]'। হাল্কা রসের এই নাটকটিকেও [দ]মঞ্চের আলোয় বেশ খানিকটা [উজ্জ্বল] করে তোলেন। এই নাটকের [বিভিন্ন] ভূমিকায় ছিলেন কমল ঘোষদা[স্তিদার], গোরা তরফদার, উজ্জ্বল সেনগুপ্ত।

সাজাহান ঃ নাট্যাচার্য শিশি[র] ভাদুড়ীর ত্রয়োদশ মৃত্যুবার্ষিকী উ[পলক্ষে] সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটি[উটে] দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' ন[াটকটি] সাফল্যের সঙ্গে পারবেশিত হোল। '[শিশির] স্মরণ সমিতি' প্রযোজিত এই না[টকের] সামগ্রিক অভিনয় আকর্ষণীয় হয়ে উ[ঠেছে] বলতে হবে।

নাটকটির প্রধান কয়েকটি ভূ[মিকায়] ছিলেন অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় (সাজ[াহান]), দীপক মুখোপাধ্যায় (দারা), চক্রবর্তী (সুজা), মণি লাহিড়ী (ঔর[ঙ্গজেব]), মণি শ্রীমানি (জহন আলি খাঁ), চিত্ত ভাদুড়ী (দিলদার), মধুসূদন (যশোবন্ত), রাজলক্ষ্মী ছোট (জাহ[ানারা]), কেতকী দত্ত (পিয়ারা), [...] (নাদিরা), কেকা চৌধুরী (মহামায়া), শ্রীমান রাজা (সিপার)।

অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান [অতিথি] ছিলেন ডাঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

পি ডবলিউ ডি রিক্রিয়েশন [ক্লাব] 'সাজাহান' ঃ পি-ডবলিউ-ডি রিক্রি[য়েশন] ক্লাবের সভ্যরা তাঁদের পঞ্চম ব[ার্ষিক] সম্মেলন উপলক্ষ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল 'সাজাহান' নাটকটি পরিবেশন করেন রঙ্গমঞ্চে। আশুতোষ [বন্দ্যো]পাধ্যায়ের নির্দেশনায় নাটকটির প্রযোজনা উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন দিলীপ [...], পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ, গীতশ্রী দেবী, আরতি ঘোষ, [...] মিত্র, কালীপদ দত্ত, সলিল দাস, [...]

বিকালে ভোরের ফুল/পরিচালক : পীযূষ বসু এবং সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়।

ফটো : অমৃত

নিত্যানন্দ সরকার, গঙ্গাধর পাল, দিলীপ কর, নরেন্দ্রচন্দ্র পাল, বেলা সেন, অঞ্জলি বসু সরকার, অসীমা লাহা।

একটি সফল প্রয়াস : গত ১৫ সেপ্টেম্বর 'মেনটেনেন্স কনট্রোল' বিভাগ (রি-ইউনিয়ন কমিটি, টেলিফোন ভবন) তাদের দ্বিতীয় প্রয়াস নাট্যকার রতন ঘোষের 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে রঙ্গনায় মঞ্চস্থ করেন। সুন্দর পরিচালনা আর দলগত অভিনয় নৈপুণ্যে নাটকটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। শক্তি মুখার্জীর নির্দেশনা নৈপুণ্য, আলো, মঞ্চ ও আবহসঙ্গীতের প্রয়োগ সত্যই অভিনন্দনযোগ্য। অভিনয়াংশে প্রত্যেকেই স্ব-চরিত্রে প্রাণবন্ত অভিনয় করেন।

জলসা

সুর-বাহারের বার্ষিক উৎসব : পঞ্চম ও ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সুর-বাহার সংগীত শিক্ষায়তনের পক্ষ থেকে সম্প্রতি এক মনোজ্ঞ আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আকাদমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে। অনুষ্ঠান সভাপতি সুকমলকান্তি ঘোষ অল্প কথায় সংগীত-সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে 'সুর-বাহার'এর উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানান। উৎসবে পরিবেশিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে অশোক পাঠকের নির্দেশনায় সেতারে ঐকতান, ত্রিদিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গীটার ও অন্যান্য যন্ত্রে বাদ্যবৃন্দ রুচি ও বৈচিত্র্যের ছাপ রাখে। সুর-বাহার সঙ্গীত গোষ্ঠী'র প্রায় অর্ধশতাধিক শিল্পীর সম্মিলিত কণ্ঠে অতুলপ্রসাদের 'নীচুর কাছে নীচু হতে', কৃষ্ণচন্দ্র দে'র 'মুক্তির মন্দির' ও অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুশো বছরের গোলামী ছেড়েছি' নিষ্ঠার পরিচয় দেয়। এই মহতী প্রচেষ্টা বিগত যুগের 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘের' কর্মধারাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শেষাংশে অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'কালমৃগয়া'র নৃত্যনাট্য রূপ। নবীন শিল্পীদের অভিনয়ে সংগীতে ও নৃত্যে সুর-বাহারের এটি একটি সর্বার্থসাধক প্রযোজনা। জ্যোৎস্না দত্তের নির্দেশনায় একক-নৃত্যে ঋষিকুমার রূপী দীপান্বিতা চট্টোপাধ্যায়, বিদূষকরূপী উত্তরা গোস্বামী দশরথের ভূমিকায় ছন্দা দে অনবদ্য। সংগীতাংশে নির্দেশক অমল ভট্টাচার্য (অন্ধমুনি ও বিদূষক), রথীন বন্দ্যোপাধ্যায় (দশরথ) কৃষ্ণা সমাদ্দার (ঋষিকুমার) এবং অলকা মৌলিক (লীলা) নেপথ্য কণ্ঠে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন।

গ্রামোফোন কোম্পানীর পুজোর রেকর্ড : ই পি ডিস্কে গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও মাধুরী মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'ভগবতী পুষ্পাঞ্জলী স্তোত্রম' ও "শিবস্তোত্রম" "বৃন্দাবন চন্দ্র স্তোত্রম" ও "অচ্যুতস্তোত্রম"—ভাগ্যলাঞ্ছিত দুঃখ-দৈন্য-চঞ্চল বাঙালী জীবনের অপরিবর্তনীয় অচঞ্চল আকৃতির শিখার মত জ্বলে উঠে যেন আসন্ন মহাপূজার পূজাবেদীকে স্মরণ করিয়ে দিল। উদ্ভাসিত করে তুলল সেই কটি মুহূর্তকে যখন দুর্ভাগ্যকে ভুলে উচ্চনীচ নির্বিশেষে সবাই বিশ্বজননীর চরণে অঞ্জলি দেয় বরাভয়প্রার্থী হয়ে।

আর একটি ই পি ডিস্কে মঞ্জু গুপ্তার ভাবমধুর কণ্ঠে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দুটি ভক্তিগীতিতে ("পতিতোদ্ধারিণী" ও "আজি তোমার কাছে") ডি. এল রায়কে পাওয়া যায়।

ঐ একই ডিস্কের অপর দিকে কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দুটি প্রেমসঙ্গীত ("এ জীবনে সাধ" ও "আমরা এমনই এসে") শুনতে ভালো লাগে।

বিশেষ অবদান সুরসাগর হিমাংশু দত্ত ও অনুপম ঘটকের সুরে গাওয়া ৮টি গানের দুটি ই পি ডিস্ক। শিল্পীরা হলেন শ্যামল মিত্র, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, (হিমাংশু), অনুপ ঘোষাল, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিপ্রা বসু। প্রায় সব গানগুলিরই গীতিকার শৈলেন রায়। জনপ্রিয় শিল্পীদের কণ্ঠে আগেকার প্রতিভাবান সুরস্রষ্টাদের অবদান এইভাবে তুলে ধরার মহৎ প্রচেষ্টার জন্য গ্রামোফোন কোম্পানী অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

আবৃত্তির একটি ই পি ডিস্কে শোনা যায় শম্ভু মিত্রের সুললিত কণ্ঠে জীবনানন্দ দাসের "কুড়ি বছর পরে" ও উৎপল দত্তের তেজোদীপ্ত সুরে "জেলখানার চিঠি" দুটি ভিন্ন-স্বাদের চিত্তগ্রাহী আবৃত্তি। কাজী সব্যসাচী ও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে শামসুর রহমান, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা পাঠ আনন্দদায়ক।

বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে বেগম আখতারের কণ্ঠে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সুরে দুটি ঠুংরিচালের গান 'কোয়েলিয়া গান' ও "পিয়া ভোলো অভিমান।"

গীতা দত্তর গাওয়া চারখানি গানের সুর ও বাণীস্রষ্টা হলেন যথাক্রমে সুধীরলাল, মুকুল রায়, বসুদেব ও পবিত্র মিত্র। সব গানগুলিই রূপময় হয়েছে শিল্পীর উজ্জ্বল কণ্ঠে।

রুশ নাট্যকার আন্তন চেখভের অনুসরণে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "তামাকু সেবনের অপকারিতা" শিল্পীর একাধারে নাট্যরচনা, নির্দেশনা ও একক অভিনয়ের এক উজ্জ্বল সৃষ্টি। হাল্কা সুরে গভীর কথা বলার সেই অজিতেশী ভঙ্গীটিরও একটি বিশেষ দাম আছে।

ছোটদের জন্য আছে "পিন্টুমেতু"। শ্যামল গুপ্ত রচিত মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সুরারোপিত "পিন্টু-মিতু"তে অংশগ্রহণ করেছেন মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু, ভবানী চট্টোপাধ্যায়, রাজকুমার বিশ্বাস ও চন্দ্রকান্ত শীল। পুজো দেখার অবসরে ছোটরা এ রেকর্ড নিয়ে মেতে উঠবে। ভূপেন হাজারিকা (নীচে আলোচিত) ৪৫, আর, পি এমএ জনপ্রিয় তারকাদের মধ্যে বহুদিন বাদে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের স্বরচিত সুরে দুটি প্রেমসঙ্গীত শোনা গেলো শিল্পীর উদাত্ত মধুর কণ্ঠে। দুটি গানই শিল্পীর আবেগ, গায়নশৈলী ও অনুরাগকতা আগের যুগকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর দুটি সুসংবদ্ধ গানে নিজের জায়গাতেই সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন।

মান্না দের স্বরচিত সুরে গাওয়া দুটি গানের মান গত বছরের তুলনায় আশাপ্রদ।

শ্যামল মিত্র তাঁর জনরঞ্জনী ঢঙে গেয়েছেন দুটি স্বরচিত সুরের গান।

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় তাঁর স্বাভাবিক উচ্চমান বজায় রেখেছেন সুন্দর দুটি গানে। একটি গান শান্তরাগাশ্রিত, অপরটি ছন্দ-দোদুল। হিট্-সং হবার সকল উপকরণ গান দুটিতে রয়েছে প্রচুর।

স্বরচিত সুরেই এবং ভাবভক্তির ভঙ্গীতে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া দুটি গানই মানবভক্তদের আনন্দের উৎস হয়ে উঠবে।

নির্মলেন্দু চৌধুরীর দুটি লোকসঙ্গীত সেই সুপরিচিত প্রাণবন্ত উল্লাসে যেন নেচে উঠেছে।

স্বরচিত সুরেই তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় গীত দুটি গানেই সুরের নতুনত্ব আছে। বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে—সলিল চৌধুরীর সুরে গীত পিন্টু ভট্টাচার্যের দুটি গান। পিন্টুবাবুর উজ্জ্বল কণ্ঠ এবার উজ্জ্বলতর। গানের সুর তার পরিশীলিত কণ্ঠে অপূর্ব ভাবমূর্তি পেয়েছে। আর এক সার্থক উদীয়মান শিল্পী হলেন সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায় অজন নিয়োগীর কথা ও সুরকে যিনি রসোত্তীর্ণ করেছেন।

জীবনানন্দ দাসের সুবিখ্যাত 'বনলতা সেন'কে অনুপ ঘোষালের সঙ্গীতরূপ দেওয়ার সাহসিক প্রচেষ্টা অভিনন্দনীয়। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের সুরে নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দুটি ভক্তিমূলক গানে তরুণ শিল্পীর হৃদয়োচ্ছাসকে অনুভব করা যায়।

চণ্ডীদাস মালের আগমনী সঙ্গীত দুটিও সুগীত।

মহিলা শিল্পীদের মধ্যে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে শুনলাম এক নতুন গীতিকার ও সুরকারের দুটি গান। নতুন হলেও অনস্বীকার্য প্রতিভার নিশ্চিত স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর রচিত দুটি গানে ও সুরে। 'ও চাঁদমামা শোনো'—শুনে শুনে যেন আশ মেটে না—মালা থেকে ফুল'ও সুন্দর। প্রশান্ত ভট্টাচার্যের অদৃষ্টও সুপ্রসন্ন, যে প্রতিমার মত প্রথম শ্রেণীর জনপ্রিয় এবং অসাধারণ কণ্ঠসম্পদের অধিকারিণী শিল্পী তাঁর গান দুটিকে পুজোর গান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নবাগতকে এইভাবে রসিক সমাজের কাছে তুলে ধরে প্রতিমা শিল্পীজনোচিত উদারতারই পরিচয় দিয়েছেন।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে উচ্ছল আবেগে দুলে উঠেছে নচিকেতা ঘোষের সুরে গাওয়া দুটি গান।

সুধীন দাসগুপ্তের সুরে রমা গুহ-ঠাকুরতা যথাযোগ্য প্রাণসঞ্চার করেছেন।

ঐ একই সুরকারের গান গেয়েছেন আরতি মুখোপাধ্যায়। পপের ঢংএ ইনি পূর্বের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এ গানও জনপ্রিয় গানের তালিকারই অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু এমন কণ্ঠে কেন তিনি ভাবসঙ্গীত গেয়ে নিজেকে চিরন্তনী করলেন না?

সবিতা চৌধুরী তাঁর যথাযোগ্য মান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন সলিল চৌধুরী রচিত ও সুরারোপিত দুটি গানে। নীতা সেনের সুরে বাংলাদেশের শিল্পী সাবিনা ইয়াস্মিনের গান আনন্দদায়ক।

ইলা বসু এবার গেয়েছেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের সুরের দুটি গান। এ গান দুটি তাঁর আগের গানগুলিকে ছাপিয়ে উঠবে। নজরুলের দুটি গান গেয়েছেন ফিরোজা বেগম।

বনশ্রী সেনগুপ্তের সুকণ্ঠে সুধীন দাসগুপ্তের সুরের গান দুটি অত্যন্ত সুশ্রাব্য।

হিমাংশু বিশ্বাস তাঁর স্বভাবানুগ নতুনত্ব প্রয়াসী মনের স্বাক্ষর রেখেছেন মাধুরী চট্টোপাধ্যায় গীত দুটি মধুকরী গানে।

নির্মলা মিশ্রর কণ্ঠবৈশিষ্ট্য নচিকেতা ঘোষ শিল্পসম্মতভাবেই কা[জে] লাগিয়েছেন।

চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় ও ললিতা চৌধুরী তরুণের শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে উজ্জ্বল তারকা। এবারে এঁরা গেয়ে[ছেন] যথাক্রমে রবীন্দ্র জৈন ও রবীন চট্টোপাধ্যা[য়ের] সুরের গান।

শ্রীচণ্ডী মজুমদারের আগের গান[ের] সঙ্গে সমমানেই দাঁড়াতে পারে তাঁর এবা[রের] গান দুটি। ভি. বালসারার সুরে [এ] আরো জমে উঠেছে।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে [ক] রাণু মুখোপাধ্যায়ের গানদুটি শুনে ম[ন] খুশী হয়ে ওঠে।

বোম্বাই তারকাদের মধ্যে শচীন [দেব] বর্মণ যথারীতি স্বরচিত সুরে মীরা [দেব] বর্মনের দুটি গানে ভক্তি ও পল্লীগী[তির] সুরের মিলন ঘটিয়েছেন তাঁর অননুকরণ[ীয়] ভঙ্গীতে।

লতা মঙ্গেশকার গেয়েছেন স[লিল] চৌধুরীর কথা ও সুরের এমন দুটি গান যার মধ্যে বোম্বাই-ই মত্ততার পরিবর্তে আ[...] ভাবের ছোঁওয়া। মুকেশের কণ্ঠ এবং [...] বালসারার সুরের সমন্বয়ে উত্তরে গে[...] মিন্টু ঘোষ রচিত দুটি গান।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরের প্র[তি] সুবিচার করেছেন সুমন কল্যাণপুর। উ[...] মুঙ্গেশকার দু বছর আগে ছিলেন উজ্জ্বল সম্ভাবনা। এবারের গাওয়া 'পালকী' [...] সাগ্রহে গৃহীত হবে। কথা ও সুর [...] মুখোপাধ্যায়।

নায়ক বিশ্বজিতের গায়ক [...] উদাম যথারীতি চলেছে। এবারে [...] সফল।

ভূপেন হাজারিকা গীত, রচিত ও [...] সৃষ্ট অসময়ি গানের ই পি [...] আছে।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌতু[ক...] সার্বজনীন যমপূজা, কৌতুকের [...] শিল্পীর বক্তব্য অত্যন্ত উপভোগ্য। [...] হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের।

মিন্টু দাশগুপ্তের 'নেশায় মাতো [...] ও প্লাক-আউটের কথা বিশে[ষ] উপভোগ[্য]।

মান্না দে'র বারখানি হিট্-সঙের এ[ক]খানি এল পি ডিস্ক ও ছবি বন্দ্যো[...] পাধ্যায়ের 'রাসলীলা' ও 'কুঞ্জভঙ্গ' পদাবলী কীর্তন চিত্তাকর্ষক। পদাবলীর [...] ভাব ও সুরের মিলন এবং [...] স্পর্শমণিতে নানা ভাবাবেগের সমন্বয় [...] কীর্তনের নাটকীয়তা যথাযোগ্য রূপ [লাভ] করেছে ভক্তিমতী শিল্পী ছবি বন্দ্যো[...] পাধ্যায়ের কণ্ঠে।

সুরকারদের কথা গানের প্রসঙ্গে আ[লো]চিত হয়েছে। গীতিকারদের মধ্যে আছে[ন] সুনীলবরণ, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরী[...] প্রসন্ন মজুমদার, বীরেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, কামাখ্যা ঘোষ, শ্যামল গুপ্ত, সলিল চৌধু[রী], প্রশান্ত ভট্টাচার্য, মুকুল দত্ত, রবীন চ[ট্টো...]

পাধ্যায়, প্রণব বসু, সুধীন দাশগুপ্ত, অভিজিৎ আনন্দ মুখোপাধ্যায়।

সব বলা হয়ে গেলেও উপসংহারে এই কথাটা না বলে পারছি না, সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিকে এত জোর না দিয়ে—সংগীতমূল্যের ওপর আর একটু মন-সংযোগ করে কোম্পানী ৪৫ আর. পি. এম রেকর্ডের সংখ্যা না বাড়িয়ে আগেকার সুরকারদের গানের বেশ কয়েকটি এল. পি ডিস্ক প্রকাশ করলে শ্রোতাদের উন্নত রুচি এবং শিল্পীদের উচ্চমানের ধারণা সৃষ্টির সহায়ক হোতো। অল্প কয়েকজন ছাড়া প্রতিভাবান গীতিকার ও সুরকারের বড়ই অভাব দেখলাম।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী পলিডোর কোম্পানীর উদ্যোগ

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বংসমৃদ্ধ পলিডোর কোম্পানী এবার সংগীত, বিশেষ করে বাংলা-সংগীত প্রচার ও প্রসারে উৎসুক বলে সম্প্রতি একটি সাংবাদিক মহলে আমাদের জানান।

উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত, লোকগীতি এবং চলচ্চিত্রের মূল সাউন্ড ট্র্যাক মিউজিকের বৈচিত্র্যে এনে পলিডোর লেবেলের ডিস্ক-কে জনপ্রিয় করার পরিকল্পনায় এ'রা মন দিয়েছেন। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের জনপ্রিয় সঙ্গীতের সঙ্গে ভারতের শ্রোতাদের পরিচিত করাটাও এ'দের কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। এবার এ'দের পুজোর রেকর্ডের শিল্পী-তালিকায় বোম্বের আশা ভোঁসলে, মালা সিংহ, মায়া ও বাণী বিশ্বাস ও অর্চনা গুপ্ত, মানস মুখার্জি ছাড়াও যেসব শিল্পীবৃন্দ আছেন তাঁরা হলেন জহর রায়, বটুক নন্দী, সনৎ সিংহ, জপমালা ঘোষ, বাপী লাহিড়ী, ইন্দ্রানী গাঙ্গুলি, বাঁশরী লাহিড়ী, প্রশান্ত আচার্য, কুমকুম চট্টোপাধ্যায়, সোনালী মুখোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র।

গত সপ্তাহে পলিডোর অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড এবং দেবাসন প্রাইভেট লিমিটেডের যৌথ আয়োজনে হিন্দী হাইস্কুলে পুজো-সম্মেলনে উপরোক্ত শিল্পীদের অনেকেরই গান শোনা গেল। এ-উৎসবের বক্তাদের মধ্যে ছিলেন দেবু চৌধুরী, হিতেন চৌধুরী, সলিল চৌধুরী এবং পলিডোর কোম্পানীর অধিকর্তা শ্রীবেহেকে।

ত্রিবেণী প্রযোজিত 'ওগো বিদেশিনী'

সম্প্রতি কালে রবীন্দ্র-সঙ্গীতানুষ্ঠানের অন্তহীন তরঙ্গের মধ্যে অন্যতম ত্রিবেণী প্রযোজিত 'ওগো বিদেশিনী'।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিদেশী সুরের প্রভাব কিভাবে এসে তার অনুপম বাণীগুলিতে বৈচিত্র্যের রং লাগিয়েছে তারই এক মনোজ্ঞ ছবি তুলে ধরা হয় মূল ইংরাজী গান এবং তদ্ভাবিত বাংলা গানগুলি পাশাপাশি নিবেদন করে।

দেবব্রত বিশ্বাসের গানগুলিতে ভাবের অভিব্যক্তার 'আমি যাবোই', 'এলেম নতুন দেশে', 'সুনীল সাগরে' 'বিদেশিনী কে সে—কাছে যবে ছিল', 'কাছে ছিলে দূরে গেলে',—একবারে সুর, রস ও অনুভবের যে মাধুর্যকে সৃষ্টি করেছে তা দেবব্রত বিশ্বাসের মত জীবন-রসরসিকদের পক্ষেই রচনা করা সম্ভব।

সুচিত্রা মিত্র 'তুমি ঊষার বিন্দু', 'আকাশে মোর তেমনি আছে ছুটিতে শিল্পীর মনপ্রাণের আবেগে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে মূল ইংরাজি গানসহ শোনা গেল 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে', 'সকলি ফুরালো' 'কালী, কালী বলরে', 'কতবার ভেবেছিনু' গানগুলি। গানগুলি পরিবেশনায় ত্রিবেণীর উদ্যোক্তাদের নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও সন্ধানী মনের খোঁজার ব্যাকুলতা মুগ্ধ করে। কয়েকটি ইংরাজি গান বিশুদ্ধ সুর ও উচ্চারণে সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন করবীনাথ।

সুমিত্রা সেনের পরিশীলিত মধুর কণ্ঠে 'সে কোন পাগল যায় পথে'—শ্রোতাদের মন কেড়ে নিয়েছে।

ইন্দ্রাণী সেনের গাওয়া 'মানে না মানিল' প্রশংসা করার মতই। প্রভাত ভঞ্জের কণ্ঠে সংগীত হয়েছে 'এবার আমায় ডাকলে দূরে'।

'ফুলে ফুলে' মূল ইংরাজী গানটি বিখ্যাত গায়িকা ক্যাথারিন ফেরিয়ারের রেকর্ড বাজিয়ে শোনানো হয়। নীলাভ আলোর পটভূমিকার পরিকল্পনা কবিষমর। আবহসংগীত পরিচালনা ও ভাষাপাঠের কৃতিত্ব প্রাপ্য অভিজিৎ নাথ ও প্রদীপ ঘোষের।

কিন্তু গানগুলি অনুষ্ঠানের উচ্চমানের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারেনি। কেন? যদিও সরলা দেবীকৃত স্বরলিপি অনুসরণে কোনো ত্রুটি ছিল না। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুপরিচালনার জন্য সাধুবাদ প্রাপ্য সুমিত্রা সেন ও অনিল সেনের।

কলামন্দিরের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান: জলসাঘর নূতন হলেও উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। অনুষ্ঠান পরিবেশনার অভিনবত্বের কারণে।

বহুদিন নীরবতার পর এ'রা চমকে দিলেন কলামন্দিরে একটি সন্ধ্যার মনোরম অনুষ্ঠান উপহার দিয়ে।

প্রথমেই সংস্থার পক্ষ থেকে রবীন পাল সঙ্গীতরসিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এক নবাগত বেহালাবাদকের সঙ্গে। দিলীপ গাঙ্গুলির শিক্ষা তাঁর পিতা তারাপদ গাঙ্গুলির কাছে। ইনি বাজালেন 'যোগ'। রাগশুদ্ধতা, মীড় তানে রেওয়াজী হাতের স্বাক্ষর প্রশংসা করবার মতই। পরিবেশনা-পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সংহত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হলে আকাঙ্ক্ষিত উচ্চমানে পৌঁছতে এ'র দেরী হবে না।

পরের অনুষ্ঠান কণ্ঠ-সঙ্গীতের। শিল্পী সবিতা দেবী ও তাঁর জননী বেনারসের সুবিখ্যাতা গায়িকা সিদ্ধেশ্বরী দেবী।

সবিতাদেবী পণ্ডিত কিষণ মহারাজের পত্নী। কয়েক বছর আগে জলসাঘরের অনুষ্ঠানেই শুনেছিলাম এ'র উচ্চাঙ্গের সেতারবাদন। পণ্ডিত কিষণ মহারাজের তবলাসঙ্গত সহ।

এবারে শুনলাম এ'র কণ্ঠ-সঙ্গীত। একই শিল্পীর দুটি বিষয়ে দক্ষতার এমন নজীর আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

ইনি পরিবেশন করেন 'রাগেশ্রী'—স্বল্প পরিসরেও শিক্ষা ও সুকণ্ঠের ছাপ আনন্দদায়ক। জননীর কণ্ঠ-সহযোগে 'জয়-জয়ন্তী'

সুন্দরতর পরিবেশনা। অনেক মন-রাঙ্গানো সাবেকী ঢঙের ঠুংরীর পর অবাঙ্গালী শিল্পীদের কণ্ঠে কবিগুরুর 'কবে তুমি আসবে' রীতিমত উপভোগ্য। এ'দের সঙ্গে সুযোগ্য তবলা-সঙ্গতে ছিলেন অনিল পালিত।

বাসবী নন্দীর গাওয়া একটি গান—কলম্বিয়া লেবেলে প্রকাশ করেছে। গানটি শ্রোতাদের আনন্দ দেবার যোগ্যতা রাখে: 'ও' বাঁশী শুনে' ও 'রিমিক ঝিমিক' গান-দুটির রচয়িতা ও সুরকার হলেন গৌরী-প্রসন্ন মজুমদার ও শ্যামল মিত্র। শিল্পী অত্যন্ত আন্তরিকতা ও যত্নের সঙ্গে দুটি গান গেয়েছেন।

নব মঞ্জরীর রবীন্দ্র সংগীতানুষ্ঠান: সম্প্রতি শ্রীশিক্ষায়তনে দক্ষিণ কলকাতার প্রখ্যাত সংগীত প্রতিষ্ঠান 'নবমঞ্জরী' রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের এক বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন। এই সঙ্গীত সভায় অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারী মঞ্জু বসু, বাণী ঠাকুর, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ও প্রভাতভূষণ প্রভৃতি রবীন্দ্রসঙ্গীতের খ্যাতনামা শিল্পিবৃন্দ মনোমুগ্ধকর ভঙ্গীতে অনেকগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। এই অনুষ্ঠানের পূর্বে শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এবং 'নতুন খবর' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীধীরেন মল্লিকের প্রধান অতিথিত্বে গুণীজন সম্বর্ধনা সভায় বর্তমান বাংলার বিখ্যাত যাত্রাভিনেতা শান্তিগোপাল ও কার্লোভিভ্যারীতে ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রাভিনেতা হিসাবে সম্মানিত রঞ্জিত মল্লিককে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। নবমঞ্জরীর কুমারী মঞ্জু বসুর ব্যবস্থাপনায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি বিশেষ উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

দীনেন্দ্র সংগীতায়তনের বর্ষামঙ্গল: গত ৩১ আগস্ট আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডস্থ রামমোহন লাইব্রেরী হল-এ দীনেন্দ্র সংগীতায়তনের বর্ষামঙ্গল উদ্‌যাপিত হয়। সম্পাদকের প্রতিবেদনে প্রফুল্লকুমার দাস উত্তর কলকাতায় রবীন্দ্রসংগীত ও সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানরূপে দীনেন্দ্র সংগীতায়তনকে গড়ে তোলার জন্য জনসাধারণের আনুকূল্য ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন। সমবেত কণ্ঠে 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে' গান দিয়ে অনুষ্ঠান শুরুর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহে একটি সংগীতমুখর ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্ট হয়। শ্রোতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানটি পূর্বাপর উপভোগ করেন এবং অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের নিষ্ঠা, সাধনা ও অধ্যবসায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সর্বসমেত ১৪খানি গান, একক ও সমবেতভাবে, তন্মধ্যে ৩ খানি নৃত্যসহযোগে এই অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। শ্রুতিমাধুর্যে ও উপভোগ্যতায় প্রতিটি গান পৃথকভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। প্রকৃতপক্ষে, এ-রকম অনুশীলিত মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান ঘন ঘন হওয়াই কাম্য, বিশেষত যখন রবীন্দ্রসংগীতের বিকৃত পরিবেশনে চারপাশ ছেয়ে যাচ্ছে। সংগীতে অংশগ্রহণ করেন অঞ্জলি ঘোষ, আরতি মণ্ডল, উমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্চিতা রায়, মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমূল্যকুমার দাস, তপন মুখোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু দত্ত, বাসুদেব কয়াল, আদ্যনাথ ঘোষ প্রমুখ। নৃত্যে ছিল তিন কিশোরী: ইন্দিরা দাস, ইন্দ্রাণী সাহা ও দেবযানী চৌধুরী। নৃত্য-পরিচালনায় ছিলেন খেলেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সংগত করেন কামাখ্যা ঘর। তানপুরা, এস্রাজ ও বেহালা সহযোগে পরিচালিত সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেন প্রফুল্লকুমার দাস।

বিবিধ সংবাদ

বাঁকুড়ায় বিচিত্রানুষ্ঠান: সম্প্রতি বাঁকুড়া শহরে 'রবীন্দ্র ভবনে' স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বাঁকুড়া শাখা কর্তৃক স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, আবৃত্তি, গীতি-আলেখ্যর মাধ্যমে স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। একক সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন রেবা চট্টরাজ, অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, রত্না সরকার ও সঞ্চিতা মল্লিক। শ্রীমতী চট্টরাজ তাঁর মাধুর্যমণ্ডিত কণ্ঠে সমবেত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ও সঙ্গীতে নিজস্ব দক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখেন। আবৃত্তিতে ছিলেন লালমোহন গাঙ্গুলী এবং সুভাষ কুণ্ডু। শ্রীমঞ্জুর বলিষ্ঠ ও দৃপ্তভঙ্গীতে আবৃত্তি সমবেত অতিথিদের মুগ্ধ করে রাখে। সবশেষে অনুষ্ঠিত হয় গীতি-আলেখ্য অনুষ্ঠানটি। 'সুরনির্ঝর' সাংস্কৃতিক সংস্থা থেকে এটি উপস্থাপিত করা হয়। রচনা ও গ্রন্থনায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ সামন্ত। সঙ্গীত পরিচালনা করেন 'সুরনির্ঝরের' পরিচালক অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং সংস্কৃতি-সম্পাদক তরুণ চট্টোপাধ্যায়। কণ্ঠসঙ্গীতে 'সুরনির্ঝরের' শিল্পীদের সঙ্গে স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের পক্ষ থেকে দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় নির্মল চৌধুরী, প্রবীর গুপ্ত, শরৎ প্রামাণিক, ধ্রুব বন্দ্যোপা… পার্থসারথি গঙ্গোপাধ্যায় অংশগ্রহণ…

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য উন্নয়ন সমিতি… …সেপ্টেম্বর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশ… পশ্চিমবঙ্গ নাট্য উন্নয়ন সমিতির সম্মেলনে কলকাতা ও মফঃস্বলে… শতাধিক প্রতিনিধি যোগ দেন। সভা… মণ্ডলীতে ছিলেন সর্বশ্রী সুধী… দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুবোধ… শ্রীদিলীপ ঘোষাল খসড়া ঘোষণাপ… করেন। মোট ১৩ দফা ঘোষণাপত্রে… উল্লেখযোগ্য দাবীগুলি: ১৮… নাটকাভিনয় আইন বাতিল করা, … ওপর প্রমোদকর ও পৌরকর প্র… রেলওয়ে সুবিধায় পুনঃ প্রবর্তন, … স্বলের সরকার ও পৌর কর্তৃ… নিয়ন্ত্রণাধীন হলগুলি স্বল্প ভাড়া… হারের অনুমতিদান, অসমাপ্ত রবীন্… গুলি সম্পূর্ণ করা, রবীন্দ্রসদনকে … নাট্যশালারূপে স্বীকৃতি দিয়ে স্বয়ং… সংস্থার হাতে পরিচালনভার অর্প… দুঃস্থ শিল্পী ও মঞ্চকর্মীদের সাহা… সরকারী কর্মীদের আচরণ… সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের… বন্ধকতা দূর করা, নাট্য পাঠাগার … প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় একজন … সাংস্কৃতিক মন্ত্রী নিয়োগ প্রভৃতি। … গঠনতন্ত্র শ্রীশান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় স… পেশ করলে তা কয়েকটি সংশোধ… গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে … সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষপূর্তি… কলকাতা ও মফঃস্বলের সতীর্থ… গোষ্ঠীগুলির সহযোগিতায় একটি না… সবের মাধ্যমে বাংলা নাটকের স… ধারাকে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত সর্বসম্ম… গৃহীত হয়।

নালন্দা সংস্কৃতি পুনর্মিলন উ… গত ২ ও ৩ সেপ্টেম্বর নালন্দা সং… (হাওড়া) ২৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উ… বর্তমান ও প্রাক্তন সভ্যদের পুন… উৎসব মহাসমারোহে উৎসাহ ও উদ্দী… মধ্যে পালিত হয়। অনুষ্ঠানের দ্বি… দিনে ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী হলে… আনন্দানুষ্ঠানে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত ও নাটকের আয়োজন করা… এই অনুষ্ঠানের সভাপতি, প্রধান অ… ও প্রধান বিচারকের আসন গ্রহণ … যথাক্রমে দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ… প্রসাদ বসু ও পার্থ ঘোষ (পরিচা… পল্পদাদুর আসর), আবৃত্তি প্রতিযো… ক বিভাগে পাপিয়া মুখোপাধ্যায়, দি… মুখোপাধ্যায় ও সুবর্ণা মেউর ও খ বি… মিত্রা মুখোপাধ্যায়, শিখা দত্ত ও মু… বাউল যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও … স্থান লাভ করেন। অনুষ্ঠানের … আকর্ষণ ছিল শ্রীমতী সুচিত্রা … রবীন্দ্রসঙ্গীত, শ্রীপ্রদীপ ঘোষের আ… ও সংস্কৃতির সভ্য-সভ্যাদের 'বকবধ' … নাটকাভিনয়।

শিশুসন্তানসহ রাশিয়ার অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী কুস্তিবীর অলেকজান্দার মেড্‌ভেড। ইনি মিউনিখ অলিম্পিক ফ্রিস্টাইল কুস্তির সুপার হেভীওয়েট বিভাগে স্বর্ণপদক জয়ের সঙ্গে উপর্যুপরি তিনটি অলিম্পিক স্বর্ণপদক জয়ের দুর্লভ সম্মান লাভ করেছেন।

পত্র-পত্রিকায় সেখানকার অন্যান্য রীতি-নীতি বিরুদ্ধ কাজ-কর্মের ছিল। সেই সব খবর এবং তা একত্র করলে এই রকম দাঁড়ায় : (১) ম্পিক গ্রামে ভারতীয় খেলোয়াড়দের বাসস্থানে বাইরের লোকের ভি খেলোয়াড়দের বিশ্রাম এবং সুখ যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটেছিল, (২) স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে মল্লযোদ্ধারা খাট-বিছানা ছেড়ে দিয়ে ঘরের রাত্রের শয়নের ব্যবস্থা করতে ছিলেন, (৩) পকেট খরচ বাবদ ডলার করে না পাওয়াতে হকি আর্থিক দুরবস্থায় পড়েছিলেন, যোদ্ধাদের পোষাক-পরিচ্ছদ বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও ছেঁড়া পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়ে তাঁরা মিউনিকে গিয়েছিলেন এবং শেষ একটি বিখ্যাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কল্যাণে তাঁরা নতুন জুতো পায়ে অপরের পোশাক ধার করে লড়াই নামেন; (৫) কুস্তির লড়াইয়ের প্রেমনাথ আহত হলে ভারতীয় চি অভাবে পাকিস্তানের চিকিৎসকের নিতে হয়েছিল এবং (৬) উদ্বোধনী মার্চপাস্টে কয়েকজন হকি খেলোয়াড় দলের ভারোত্তোলককে বসিয়ে তাঁ স্থানে কর্মকর্তাদের দিয়ে পূরণ করা ইত্যাদি।

ভারতীয় অলিম্পিক এসো সভাপতি এবং মিউনিখ অলিম্পিক ভারতের শেফ দ্য মিশন শ্রীরাজা স্বদেশে ফিরেই এক সাংবাদিক বৈ উপরের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার হেন। উদ্বোধনী উৎসবের অনুষ্ঠানে কর্মকর্তাদের অংশ গ্রহণ তিনি যা বলেছেন, তা পর্যন্ত যেমন মার্চপাস্টে কোন অবাঞ্ছিত গ্রহণ করেননি, ভারতীয় প্রতিযোগী যাঁরা ঠিকমত মার্চপাস্ট করতে পার তাদের বাতিল করে নতুন দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করা হয়েছিল উদ্বোধন উৎসবের পরদিন ভারতে খেলা থাকায় বিশ্রামের জন্য মার্চপাস্ট অনুষ্ঠান থেকে অব্যাহতি হয়েছিল।

• শ্রীবলিন্দর সিং কোথাও বলেনি দলের যাঁরা অসুস্থ ছিলেন প্রয়োজনে তাঁদের মার্চপাস্টে নামানো তাহলে জিজ্ঞাসা, হকি দলের স বিশ্রাম দেওয়া হল না কেন? উৎসবের পরদিন শুধু ভারতবর্ষের খেলা ছিল না। পাকিস্তানকে নিয়ে দেশের হকি খেলা ছিল। এই দেশের হকি খেলোয়াড়দের বিশ্রাম উদ্দেশ্যে মার্চপাস্ট থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়নি। বিশ্রাম দেওয়ার থাকলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর উল্লেখ ক

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।
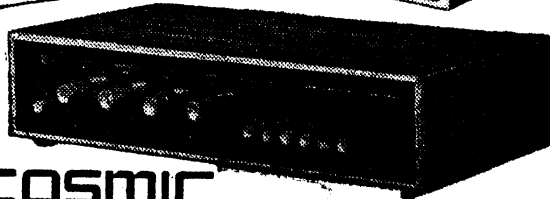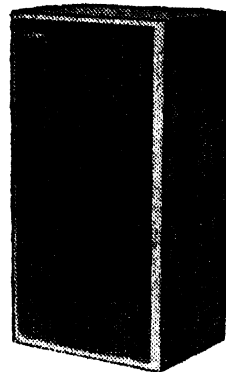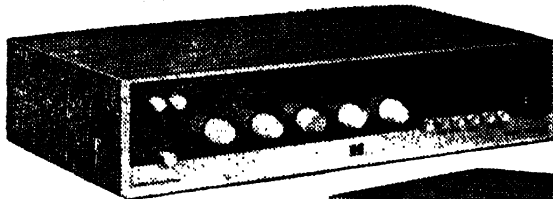
লভ্য সর্বশ্রেষ্ঠ ইলেকট্রনিক কারিগরী যথোচিত ব্যবহারের দ্বারা আমরা আমাদের উৎপাদন সামগ্রীগুলিকে এমনভাবে নির্মাণ করি, যাতে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। অনবদ্য ধ্বনি ঝংকার আমাদের বহুকথার মাত্র একটি অংশ। বাদবাকী কথাটি হল এগুলির ত্রুটিহীন ফিনিশ এবং অসাধারণ কার্যকারিতা। ঠিক এই কারণেই আমরা প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি যে, কসমিক দ্রব্যসম্ভার অর্থব্যয়ে প্রাপ্য সম্ভারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

COSMIC RADIO

3/A SHANTINAGAR., VAKOLA, SANTACRUZ (EAST), BOMBAY-55 ■ PHONE: 632318/10 ■ GRAM: SOLIDSTATE

পূর্ব ভারতের ডিস্ট্রিবিউটরগণ :

এস পি ইলেকট্রনিক্স, পি-২২, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা-১৩;
কেবলমাত্র নিম্নোক্ত অনুমোদিত ডীলারদের প্রদত্ত গ্যারান্টি বৈধ।
ব্যালেরিনা : ৩০জি, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬। **ব্যাম্বিনো :** ৪০ই, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬।
ব্যাম্বিনো : ৪৭/২সি, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-১৯। **হ্যারিজ মিউজিক হাউস :** ১৮এ, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬।
আর শান্তিলাল এন্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ : ৫৩এ, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
শুগেনস : ৭, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা ১৬। **সিম্ফনি :** বি ৬৮-৬৯, নিউ মার্কেট, কলিকাতা--১৩।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানানো হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা		মফঃস্বল	
বার্ষিক	টাকা	২৫·০০	টাকা	৩০·০০
ষাণ্মাসিক	টাকা	১২·৫০	টাকা	১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬·২৫	টাকা	৮·০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার (চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১·০২
ষাণ্মাসিক	টাকা	০·৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০·২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ
২য় খণ্ড

২৩ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা।

Friday, 6th October, 1972 শুক্রবার, ১৯ আশ্বিন, ১৩৭৯ .52 Paise

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৭৩৩	সম্পাদকীয়		
৭৩৪	দেশেবিদেশে		—শ্রীদেবদত্ত
৭৩৬	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীঅমল
৭৩৭	খরা	(গল্প)	—শ্রীনির্মল সরকার
৭৪১	সভাসমিতির আদিপর্ব		—শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ
৭৪৭	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৭৫০	কাচিং	(কবিতা)	—শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী
৭৫০	ছায়ায় সবুজে প্রেমে	(কবিতা)	—শ্রীদীপেন রায়
৭৫০	আমরা সবাই	(কবিতা)	—শ্রীঅরুন্ধতী সেনগুপ্ত
৭৫১	ছয় ঋতু	(উপন্যাস)	—শ্রীশৈলেন রায়
৭৫৭	সবারে আমি নমি	(স্মৃতিচারণ)	—শ্রীকানন দেবী
৭৬৩	মন পবনের নায়ে	(গল্প)	—শ্রীসবিতা সেনগুপ্ত
৭৬৭	এস্তোনিয়ার স্মৃতি		—শ্রীদিলীপ মালাকার
৭৭০	এক নজরে		—শ্রীপ্রত্যক্ষদর্শী
৭৭১	দুঃখে সুখে বাঁচা	(উপন্যাস)	—শ্রীনিখিলচন্দ্র সরকার
৭৭৬	প্রাচীন ভারতের নৌশক্তি		—শ্রীদীপকমোহন সেন
৭৭৯	বাড়ি	(উপন্যাস)	—শ্রীদেবল দেববর্মা
৭৮৩	জয়ন্তীর বনে পাহাড়ে		—শ্রীঅঞ্জন রায়
৭৮৫	নদী থেকে সাগরে	(গল্প)	—শ্রীতারাপ্রণব ব্রহ্মচারী
৭৮৯	পুরাতত্ত্বের সন্ধানে		—শ্রীপ্রণব রায়
৭৯২	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৭৯৪	কোথায় উৎসব		—শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৭৯৬	কৃষ্ণলীলা থেকে আন্তর্জাতিকতা		—শ্রীনন্দলাল ভট্টাচার্য
৭৯৮	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৮০৬	খেলাধূলা		—শ্রীদর্শক
৮০৮	চিঠিপত্র		

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রদীপ দাস

পুজো আসছে

ুজোর আগের ভাবনা

ঠিক পুজোর আগেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সামনে কয়েকটি ভাবনার কারণ এসে গেল। প্রথম ভাবনা, সারা বছর
় যে উৎসবের দিনগুলির দিকে চেয়ে থাকেন তার মুখে মুখেই জিনিসপত্রের দাম হু হু করে চড়ছে। ঠিক আবার এই
য়েই খোলা বাজার থেকে চিনি উধাও অথবা তার দাম নাগালের বাইরে। কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে ন্যায্যমূল্যের দোকান
ল মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার কথা বলছেন, যদিও স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলছেন, উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে
ছুটা মূল্যবৃদ্ধি অপরিহার্য। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের পাইকারি ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করার পরামর্শ
ছেন। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাজার দর আয়ত্তে রাখার জন্য
তরক্ষা আইন ও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইনের ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন। কিন্তু বাজার দর আয়ত্তে আসার কোন
শই দেখা যাচ্ছে না। অন্যান্যবারের মতো এবারও পুজোর আগে শালিমারের গুদামে বা ওয়াগনে মাল আটকে রেখে
সায়ীরা মজুতদারির খেলায় নেমেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখানেও ভারত রক্ষা আইন প্রয়োগ করে মজুতদারদের
রুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু সব মিলিয়ে বাস্তব ঘটনা হচ্ছে এই যে, বাজারের থলি হাতে বেরিয়ে
চমবঙ্গের সাধারণ গৃহস্থ আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করতে হিমসিম খাচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের এখনকার দ্বিতীয় বড় ভাবনার বিষয় হল, পুজোর আগেই রাজ্যের রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে
ছে। বেশ কিছুদিন মাথা নিচু করে থাকার পর মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি তাদের দোসরদের নিয়ে আবার আন্দোলন
ম্ভের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। পার্টির মুখপাত্র জানিয়েছেন যে, তাঁদের এবারকার আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের "অবৈধ"
গ্রেস সরকারকে উচ্ছেদ করার আন্দোলন। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে,
ন্দোলনে নেমে কেউ যদি ট্রাম বাস পোড়ায় বা রেল লাইন তুলে দেয় তাহলে সরকার শুধু কঠোর নয়, অতীব কঠোর
স্থা অবলম্বন করবেন। সি-পি-এম-এর মুখপাত্র অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাঁদের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ হবে।
মন্ত্রীর বক্তব্যকে "প্ররোচনামূলক" বলে পার্টির তরফ থেকে অভিহিত করা হয়েছে। সি-পি-এম-এর এই আন্দোলনের
কাবেলা করার জন্য কংগ্রেস যেভাবে তৈরি হচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে, কংগ্রেস এই আন্দোলনকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ
ছে। কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ শঙ্করদয়াল শর্মা অভিযোগ করেছেন যে, দেশের বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে যে
সাত্মক আন্দোলন চালান হচ্ছে তার পিছনে আমেরিকান সি-আই-এ-র হাত আছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও অভিযোগ
ছেন যে, বিরোধী দলগুলি হিংসা প্রচার করছে। এইসব ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ক্ষেত্র
তৃত হচ্ছে, এটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ লক্ষ্য করছেন। পশ্চিমবঙ্গের ঘরের পাশে বিহারে ত সম্প্রতি ছাত্র আন্দোলনের সময়
রি বাস ও মালগাড়ি জ্বালান হল, ডাকঘর লুঠ হল, রেলস্টেশন ও পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা হল: পশ্চিমবঙ্গের মানুষ
বঙ্গের সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করছেন যে, এই রাজ্যের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চার দুই শরিক কংগ্রেস ও সি-পি-আইয়ের
রা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দোষারোপ করছেন। এমনকি, কংগ্রেসের ভিতরকার কিছু কিছু বিরোধও প্রকাশ হয়ে
ছে।

ঘরপোড়া গরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায় তেমনি পশ্চিমবঙ্গের মানুষও রাজনীতির আকাশে দুর্যোগের
টা দেখে আতঙ্ক বোধ করছেন। অশান্তি, সংঘাত, শরিকি কোন্দল, মোকাবেলার রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গের বুকে গভীর
চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল। সেই ক্ষত যখন সবে শুকোতে আরম্ভ করেছে, সবে যখন এই রাজ্যে কলকারখানার চাকা আবার
তে শুরু করেছে, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস মন্ত্রিসভার প্রথম ছয় মাস যখন সবে পূর্ণ হয়েছে, সেই সময়েই নতুন রাজনৈতিক
ইরের পাঁয়তাড়া সদ্যোবিগত দিনগুলির ভয়াবহ স্মৃতি জাগিয়ে তুলছে। এবার পুজোর আগে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের
র প্রার্থনা শুধু এইটুকু যে, ফেলে-আসা সেই রক্তাক্ত দিনগুলি যেন পশ্চিমবঙ্গে ফিরে না আসে।

দেশে বিদেশে

জয়তু গান্ধীজী
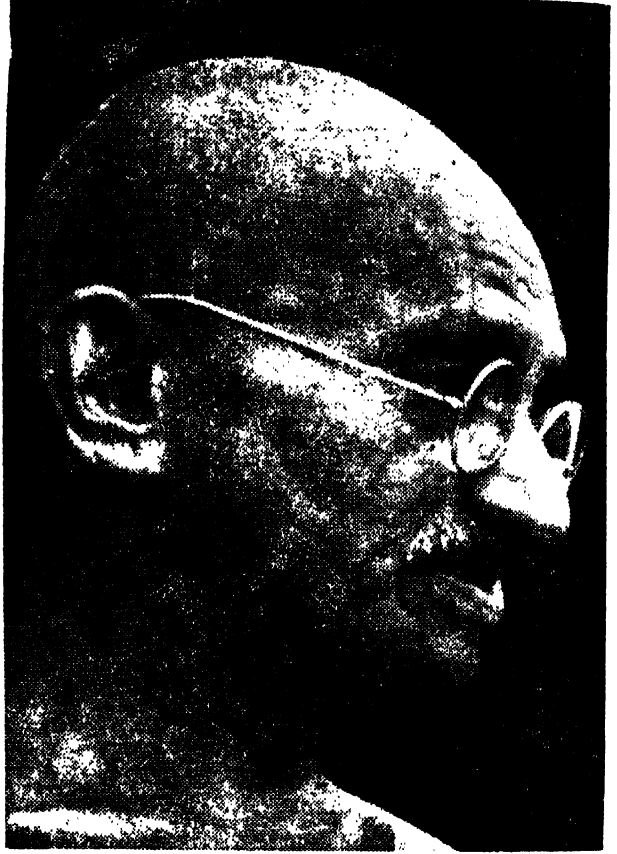
প্রেসিডেন্ট নিকসনের যেমন একজন হেনরি কিসিঙ্গার আছেন, জাপানের প্রধান-মন্ত্রী কাকুই তানাকার তেমন কোনো পয়লা নম্বর উপদেষ্টা নেই—অথবা থাকলেও লোকে তার খবর রাখে না। তাই মার্কিন প্রেসিডেন্টের পিকিং সফরের আগে ডঃ কিসিঙ্গার যেমন সেখানে গোপন অভিসারে গিয়ে সব কিছু ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে এসেছিলেন, আর তা নিয়ে যে-নাটক সৃষ্টি হয়েছিল, তানাকার পিকিং সফরের আগে তেমন কোনো নাটক জমে ওঠে নি। কিন্তু তাই বলে তানাকার সফর যে নিকসনের সফরের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ, এমন কথা কেউ বলেন নি। বরং পূর্ব এশিয়ার রাজনীতির দিক থেকে দেখতে গেলে অনেকে এই সফরকে ফেব্রুয়ারীর নিকসন-সফরের চেয়ে আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করেছেন।

নিকসনের চীন সফরে ছিল একটা ঢাক-ঢাক-গুড়-গুড় ভাব, তানাকার সফর যেন ঠিক তার উল্টো। তানাকা জাপানের প্রধান-মন্ত্রীর গদিতে বসবার আগেই চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই বেশ স্পষ্টভাবে আভাস দিয়েছিলেন যে, তানাকার পূর্বসূরী আইসাকু সাতোর সঙ্গে চীন দহরম-মহরম করতে রাজি নয়, কিন্তু সাতোর পরে যিনি আসবেন তাঁর সঙ্গে মাখামাখি করতে চীনের অনিচ্ছে নেই। সত্যি কথা বলতে কি, কাকুই তানাকাকে যে জাপানের লিবারেল পার্টি নেতা নির্বাচন করেছিল তার অন্তত একটা কারণ তিনি সাতোর খুব ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বলে পরিচিত ছিলেন না, আর সেই কারণেই ছিলেন চীনের কাছে আরো গ্রহণ-যোগ্য।

লিবারেল পার্টির হিসেবে যে ভুল হয় নি তার প্রমাণ পাওয়া গেল তানাকার নির্বাচনের পরেই। এই নির্বাচনে চীন যে খুশী তা চৌ এন লাই গোপন করলেন না। তানাকাও কিছু দিন পরে ঘোষণা করলেন যে, তিনি চীন সফরে যেতে ইচ্ছুক। প্রেসি-ডেন্ট নিকসন যখন চীনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসেন তখন যে-সব দেশ সব-চেয়ে শঙ্কিত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল জাপান। জাপানের ভয়, তার দীর্ঘ দিনের মিত্র আমেরিকা তাকে বাদ দিয়েই পূর্ব এশিয়ায় এমন একটা ফয়সালা করতে চলেছে যেখানে চীনের আধিপত্য হবে সুপ্রতি-ষ্ঠিত। আর অন্য দিকে এ-কথাও শোনা গিয়েছিল, চীন যে আমেরিকার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চায়, তার একটা কারণ হল জাপান। আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট জাপানের জঙ্গীপনা একদিন চীনের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে, এই ছিল চীনের ভয়। সুতরাং আমেরিকার সঙ্গে দোস্তি করতে পারলে তাকে জাপানের কাছ থেকে কিছুটা সরিয়ে আনা যেতে পারে—এই ছিল চীনের অঙ্ক। প্রেসিডেন্ট নিকসন অবশ্য বারবারই আশ্বাস দিয়েছেন যে, বন্ধুদের সঙ্গে কোনো বিশ্বাসঘাকতা করে তিনি চীনের সঙ্গে মিতালি করবেন না। কিন্তু তাতে জাপান পুরোপুরি আশ্বস্ত হয়নি। তাই তানাকা চেয়েছিলেন চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে সরাসরি মোলাকাৎ এবং বোঝাপড়া।

চীনেরও এই রকম একটা বোঝাপড়ায় যে আগ্রহ নেই তা নয়, কিন্তু বোঝাপড়াটা হতে হবে চীনেরই শর্তে। তিরিশের দশক থেকে সুরু করে জাপান চীনের ওপর যে হামলা চালিয়েছিল সে-কথা ভুলতেও চীন রাজী। এমন কি যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির জন্যে ক্ষতিপূরণও না চাইতে পারে। কিন্তু চীনের সবচেয়ে বড় শর্ত হল চিয়াং কাইশেকের ফরমোজার সঙ্গে জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে সেই সঙ্গে স্বীকার করে নিতে পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না চীনের একমাত্র আইনসঙ্গত ফরমোজা হল চীনেরই অঙ্গ, ফর মুক্তির ব্যাপারটা চীনের ঘরোয়া এবং ঐ ব্যাপারে অপর কোনো নাক গলাবার কোনো অধিকার নেই। হতো অত বড় একটা দেশের সঙ্গে পড়া যদি করতেই হয় তবে তার ফরমোজার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পক করতে জাপানের তো রাজি হয়ে উচিত। কিন্তু মুস্কিল এই যে, ফর সঙ্গে জাপানের তো শুধু কূট সম্পর্কই নেই, গত বিশ বছর ধরে দু মধ্যে গড়ে উঠেছে নিবিড় ব্যব সম্পর্ক। ছোট-বড় জাপানী ব্যবসায় ছোট্ট দ্বীপটিতে ঢেলেছেন কোটি ডলার। এখন চীনের সঙ্গে সৌ খাতিরে যদি ফরমোজার সঙ্গে সম্পর্ক করা হয় তবে সেই বিপুল পরিমাণ কী দশা হবে?

এই প্রশ্নটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলেই পর্যবেক্ষকরা ধরে নিয়েছিলেন যে, তানাকার এই সফরে চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে না। নিকসনও তো কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন না করেই চীন সফর করে গেলেন। সুতরাং তানাকাও ঐ মহাজনের পথই অনুসরণ করবেন। কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে না, কিন্তু অন্যান্য সম্পর্কের পথ আরো প্রশস্ত হবে। এখনই দু দেশের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। প্রতিনিধি দলেরও যাতায়াত আছে। এই সব চালিয়াতে চলবে আরো জোর কদমে।—এই রকম ছিল হিসেব।

কিন্তু কাকুই তানাকা পিকিংয়ে গিয়ে শুধু চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে চার দফায় অলাপ-আলোচনাই করলেন না, শুধুই খানাপিনা করলেন না, 'মহান কর্ণধার' মাও সে-তুঙের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করলেন, এবং অনেককে অবাক করে দিয়ে চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে এলেন। দু দেশের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময়ে আর বেশি দেরি হবে না। জাপান স্বীকার করে নিল যে, ফরমোজা চীনেরই অংশ। আর এই স্বীকৃতির অনিবার্য পরিণাম ফরমোজার সঙ্গে জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ।

যুক্ত বিবৃতিতে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, জাপান ও চীনের মধ্যে শিগগিরই একটি শান্তি চুক্তি সই হবে। চীনের মতে, জাপানের সঙ্গে তার যুদ্ধাবস্থা এখনও শেষ হয়নি। ১৯৫২ সালে জাপান ফরমোজার সঙ্গে যে শান্তি চুক্তি করেছিল, চীন তা মানে না। তাই নতুন করে শান্তি চুক্তি দরকার। এই চুক্তি সই হলে ফরমোজার সঙ্গে জাপানের বিশ বছর আগের চুক্তিটি আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যাবে। আর চীন-জাপান এই বোঝাপড়ার ফলে ফরমোজা কূটনৈতিক দিক দিয়ে আরো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। আমেরিকা আগেই চীনের দিকে ঝুঁকেছে, এখন আর এক বন্ধু জাপানও চীনের দিকে ঢলল।

চীন-জাপান বোঝাপড়াটা শুধু এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, চীন হল দুনিয়ার সবচেয়ে জনবহুল দেশ আর জাপান হল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুনিয়ার তিন নম্বর রাষ্ট্র। এই বোঝাপড়ার ফলে জাপানের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে সারু হল বলা চলে একটা নতুন অধ্যায়। এত দিন জাপানের পরিচয় ছিল এমন এক দেশ হিসেবে যার অর্থনৈতিক তাগদ অনেক, কিন্তু রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রায় কিছুই নেই। তার কারণ পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে জাপানের ছিল আমেরিকার সঙ্গে গাটছড়া বাঁধা। তাছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তার কার্যকলাপের জন্যে একটা অপরাধবোধও তাকে পীড়া দিয়ে আসছিল। কিন্তু চীনের সঙ্গে বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে জাপান তার নিজের স্বাধীন রাজনৈতিক অস্তিত্বকে ঘোষণা করল স্পষ্টভাবে। আর চীনের দিক থেকে দেখতে গেলে, জাপানের স্বীকৃতি রাজনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক হবে তো বটেই, তার ওপর এখন জাপানের কাছ থেকে কারিগরি সাহায্য পেতেও খুব সুবিধে হবে।

চীন-জাপান বোঝাপড়াকে দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্র আমেরিকা আর রাশিয়া কোন্ চোখে দেখবে? চীনের সঙ্গে আমেরিকা এখন নিজেই মিতালি করছে, সুতরাং চীন-জাপান মাখামাখিতে তার খুব আপত্তি হবে না। পিকিং যাওয়ার আগে তানাকা হনলুলু গিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকসনের সঙ্গে এ-বিষয়ে কথাবার্তা বলে এসেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাপানে যে অসংখ্য মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে, তার ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ

চীন-জাপান বোঝাপড়ার পর জাপানকে কি আর চীনের বিরুদ্ধে সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে?

ওদিকে রাশিয়াও চীন-জাপান বোঝাপড়াকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে। রাশিয়া বেশ কিছু দিন ধরে চেষ্টা করছে জাপানের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া, এবং শেষ পর্যন্ত একটা শান্তি চুক্তি করতে। রাশিয়ার এই আগ্রহের একটা কারণ, সাইবেরিয়ার অনন্ত সম্পদ অন্বেষণে জাপানের কারিগরি সাহায্য পাওয়ার ইচ্ছে। এই বোঝাপড়া হলে জাপানও রাশিয়ার কাছ থেকে কুরিল দ্বীপপুঞ্জ ফিরে পেতে পারে। চীন-জাপান বোঝাপড়ার পর রাশিয়াও চাইবে জাপানের সঙ্গে তার সম্পর্ককে দৃঢ়তর করতে। তার ভয়, জাপান পুরোপুরি চীনের খপ্পরে গিয়ে না পড়ে।

•

কৃষিপণ্য মূল্য কমিশন যে খরিফ মরশুমে খাদ্যশস্য সংগ্রহ জোরদার করার সুপারিশ করেছেন তা বিনা কারণে নয়। এ-বছর দেশের অনেক জায়গায় খরা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে জোর গলায় ঘোষণা করা হয় যে, দেশে ৯৫ লাখ টন খাদ্যশস্য মজুত আছে, সুতরাং ভয়ের কিছু নেই। অনেকে অবশ্য ঐ পরিমাণ খাদ্যশস্য সত্যিই সরকারি গুদামে আছে কিনা সে-সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন। কিন্তু যদি সত্যিই ৯৫ লাখ টন মজুত থাকে তা হলেও যে খুব একটা নিশ্চিন্ত থাকা চলে না, সে-কথাটা কৃষিপণ্য মূল্য কমিশন আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কারণ চড়া দামের মোকাবিলা করার জন্যে সরকার এখন আগে বেশি পরিমান খাদ্যশস্য বাজারে ছাড়বেন বলে স্থির করেছেন। সরকার যদি আগামী মার্চ পর্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে ন লাখ টন খাদ্যশস্য বাজারে ছাড়েন তবে এপ্রিলে নতুন আর্থিক বছরের সুরুতে খুব বেশি পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত থাকবে না। গত এপ্রিলে যে, সরকারি গুদামে ৬০ লাখ টন খাদ্যশস্য মজুত ছিল তাতে সরকারের মনোবলটাও ছিল যথেষ্ট। সুতরাং আগামী এপ্রিলের মধ্যে যাতে আবার সরকারের হাতে যথেষ্ট খাদ্যশস্য মজুত থাকে তার ব্যবস্থা করা দরকার।

কৃষিপণ্য মূল্য কমিশন তাই সুপারিশ করেছেন, খারিফ মরশুমে ৪০ লাখ টন চাল আর ছ লাখ টন বজরা ও জওয়ার সংগ্রহ করা হোক। গত বছরে কমিশন খারিফ খাদ্যশস্য সংগ্রহের যে-লক্ষ্য সুপারিশ ছিলেন এই অংক তার চেয়ে সামান্য
কিন্তু গত বছর আসলে খাদ্যশস্য
হয়েছিল নির্দিষ্ট লক্ষ্যের চেয়ে প্রা
লাখ টন কম। এবারও যাতে সেই
না হয় সে-জন্যে কমিশন বিভিন্ন
সরকারকে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে
ছেন। ধানকলগুলির কাছ থেকে
আদায়ের ব্যাপারে কোনো কোনো রাজ
কার যে-ভাবে ঢিলে দিয়ে আসছেন
কমিশন অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।
হলে রাজ্য সরকার যাতে একচেটি
খাদ্যশস্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন তার
কমিশন সুপারিশ করেছেন।

কমিশনের আর একটি সুপ
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হল অ
রাজ্যে ধানের সংগ্রহ মূল্য কুইন্টাল প্রতি
টাকা করে বাড়ানোর সুপারিশ। এ
সরকার গম-চাষীদের স্বার্থই বেশি
দেখে এসেছেন। বছরের পর বছর
সংগ্রহ মূল্য বাড়ানো হয়েছে। গমের
ফলন হওয়ায় কৃষিপণ্য মূল্য কমিশন
বছর ঐ মূল্য সামান্য কমাবার যে স
করেছিলেন সরকার তাও অগ্রাহ্য করেন

২১-৯-৭২ —

রাস্তায় চলতে চলতে স্যান্ডেলের স্ট্র্যাপটা খুলে গেল। অপর পাশের ফুটপাথে একটা মুচি বসেছিল তাই বাঁচোয়া, তা না হলে হয়তো ঘষতে ঘষতে অরুণোদয়কে অনেকটা পথ হাঁটতে হোত। জুতোটা মুচির হাতে তুলে দিয়ে সে পরম নিশ্চিন্ত হোল। মুচির কাজটা একদৃষ্টে লক্ষ্য করছিল অরুণোদয় এমন সময় একটা অস্পষ্ট আওয়াজ কানে এল তার। অনেক দিন আগে এই ডাকটার সঙ্গে সে পরিচিত ছিল।

—নরুন তুই? শুক্লা তার পাশে এসে দাঁড়াল। এতক্ষণ ডাকছি তুই শুনতে পাসনি?

—পেয়েছি তবে অরুণকে নরুন বলে কে ডাকত সেটা ভাবতে একটু দেরী হচ্ছিল, অরুণোদয় শুক্লাকে দেখল ভাল করে, তুই রোগা হয়ে গেছিস শুক্লা।

—স্লিমিং করছি রে, দেখ না পায়দল কতদূর চলে এসেছি। গাড়ীটা ছেড়ে দিয়েছি প্রায় ঘন্টাখানেক আগে। নরুন তোর ঝুলপী কি হল, সেই কাল কুচকুচে ত্যারচা সেকসপিরীয়ান ঝুলপী?

—কামিয়ে ফেলেছি, অরুণোদয় নিজের গাল স্পর্শ করল একবার।

—তোকে কেমন যেন লাগছে, বাঁকা চোখে তাকায় শুক্লা।

—কেমন আবার? অরুণোদয় শুক্লাকে ভাল করে দেখল আবার। শুক্লার চোখের কোলে কালি পড়েছে, সামনের চুল গিয়েছে বেশ কিছুটা।

—কি দেখছিস, শুক্লা অস্বস্তি বোধ করে।

—তোকে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করছি, হাসল অরুণোদয়।

—থাক আর খুঁজতে হবে না, হ্যাঁরে, তোর সেই ভাষাগুলো ভুলে গেছিস?

—ভুলিনি, তবে চর্চার অভাবে মড়চে পড়ে গেছে বলতে পারিস।

—সেই যে কথায় কথায় শালা শালা করতিস, একটা মুখভঙ্গী করল শুক্লা।

—তুই কি কম যেতিস নাকি, প্রফেসাররা সুদ্ধ নাজেহাল হয়ে যেত। মনে নেই· বি-কের তো নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে গেল, উচ্ছল হয়ে উঠল অরুণোদয়।

—মনে আছে একবার বি-কে কি রকম রেগে চেয়ার ছুড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছল, বলল শুক্লা, দৃশ্যটা ওদের চোখের সামনে ভেসে উঠল যেন।

—খুব মনে আছে, আচ্ছা, বুবলাকে মনে আছে তোর? প্রশ্ন করল অরুণোদয় সঙ্গে সঙ্গে।

—বুবলা?—হ্যাঁ মনে পড়েছে, একটু ভেবে বলল শুক্লা, সেই দার্জিলিং এসকারসানে যে ঘোড়ায় চড়েছিল?

—শুধু ঘোড়ায় চড়েছিল, রেসে সকলকে হারিয়েছিল মনে নেই। আর নাকানি-চোবানি খাইয়েছিল পি, আর-কে।

—তাহলে বুবলা প্রদ্যুত রায়ের প্রেমে পড়েনি বলতে চাস?

—পাগল, বুবলা ঘোড়া থেকে পড়তে পারে, কিন্তু প্রেমে পড়বে না, মাথা নাড়ল অরুণোদয়।

—তুই কি করে জানলি? শুক্লা অরুণোদয়ের দিকে তাকাল।

—দেখ শুক্লা, কতকগুলো মানুষ আছে যারা ভালবাসা বোঝে না, বুঝতে চায় না।

—ভালবাসায় আবার বোঝাবুঝির কি আছে, শুক্লা হাসল একটু, ভালবাসবে অথবা ভালবাসবে না, এই ত জানি।

—বলিস কি, এত সিম্পল ব্যাপার, এত সহজ ফরমুলা তুই পেলি কোথায় শুক্লা?

—না ফরমুলা নয়, তবে বুবলা প্রদ্যুত রায়কে ভালবাসত না এটা বিশ্বাস করা কঠিন আমার পক্ষে, শুক্লা যেন চিন্তিত হল।

—দেয়ার ইউ আর, উৎসাহ বোধ করে অরুণোদয়, তোর পক্ষে অর্থাৎ একজন

মেয়ের পক্ষে হয়ত কঠিন ঠেকতে পারে। তবে আসল কথা কি জানিস—

—কি? বুবলার সেই হাসি হাসি মুখটা মনে পড়ছে শুক্লার।

—আসল কথা হল পরিবেশ। ভালবাসতে পারা বা না পারা সম্পূর্ণ পরিবেশের ওপর নির্ভর করে, শিক্ষকের ভঙ্গিতে কথাটা বলে অরুণোদয়।

—দার্জিলিং কি ওদের কাছে উপযুক্ত পরিবেশ বলে মনে হয়নি?

—কি মুস্কিল, শুক্লা তুই ভুল করছিস। ওটা পরিবর্তন মাত্র।

—কিন্তু ওই সামান্য পরিবর্তনেও পাহাড় টলে যায়, শুক্লা যেন জোর পায়, মনে নেই পূরবীর কথা। যে মেয়ে পুরুষের নামে জ্বলে উঠত—

—ওটা কি জানিস, বাধা দিয়ে বলল অরুণোদয়, ওটা হল রিপ্রেসান।

—থাক তুই আর মনোবিজ্ঞানের ওপর লেকচার ঝাড়িস না।

—হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আবার শুরু করল অরুণোদয়, পূরবী ওসময় দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল যাকে বলে লস্ট হার হেড।

—তার মানে সমুদ্রের ঢেউ ওর রিপ্রেসান একেবারে ধুইয়ে দিল বলছিস, অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকায় শুক্লা।

—মনের বাঁধন খুলতে সাহায্য করেছিল বৈকি। পূরবীর কথা থাক, বুবলার প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসি—বুবলা দারুণ স্মার্ট ছিল মনে আছে তোর কিন্তু সেটা ওর একসপ্রেশানের সামান্য অংশ মাত্র। একসপ্রেশানটা অন্যভাবে দেখা গিয়েছিল শেষ-পর্যন্ত।

—কি ভাবে, শুক্লার কৌতূহল হয় সব জানতে।

—ও পুরুষকে ঠকাতে চাইত। ভীষণ আনন্দ পেত তাতে। কিন্তু ভালবাসতে ও পারত না।

—বার বার তুই ওই কথাটাই বলছিস কিন্তু কেন ভালবাসতে পারত না সেটা বলবি তো! ভালবাসার বিরুদ্ধে কিছু শুনতে চায় না শুক্লা।

—ওর মা একজনের রক্ষিতা ছিল, অত্যস্ত কথাটা উচ্চারণ করল অরুণোদয়।

—অরুণ—

—না রে শুক্লা, আমি বাজে কথা বলছি না। সব জেনেই বলছি কথাটা। বড় হয়ে বুবলা যখন ব্যাপারটা বুঝল, তখন থেকেই ওর ভিতর এক ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। আর সেই থেকেই এই বিপত্তি।

—চল ওই পার্কটায় বসি একটু, শুক্লা এগিয়ে গেল সেইদিকে।

—দেরী হবে না তোর, অরুণোদয় একটু দ্বিধাগ্রস্ত।

—হোক গে, কতদিন বাদে তোকে পেলাম, এখন আর সামনের কথা ভাবতে ইচ্ছে করছে না। হ্যাঁরে তুই আর লিখিস না?

—না, এখানটায় বস। ঘাস শুকনো মনে হচ্ছে জায়গাটায়। দাঁড়া দাঁড়া—স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের মত একটা কিছু বিছিয়ে দি, পকেট থেকে রুমাল বার করল অরুণোদয়। এই চিনেবাদাম খাবি।

—খাব, মুখটা খুশিতে ভরে গেল শুক্লার, ফুচকা পেলে আরও ভাল হোত। অনেকদিন খাইনি রে।

—কেন তুই তো এসব খুব ভালবাসতিস, অরুণোদয় বাদামওলাকে ডাকল।

—এখনও বাসি কিন্তু সুযোগই পাই না, একটু হাসল শুক্লা, এই তুই যে সবগুলো নিয়ে নিলি।

—এই, মনে আছে সুব্রতার জন্মদিনের পার্টিতে, বাদাম ছাড়ায় অরুণোদয়।

—খুব মনে আছে। কি রকম চুরি করে চপ-কাটলেট খেয়েছিলাম, জোরে হেসে উঠল শুক্লা।

—আর আলুকাবলিওয়ালাকে হেল্প করার নাম করে কত আলু গাঁড়া দিতিস—শালা।

—বাঃ এইত আগেকার ফর্ম ফিরে পেয়েছিস নরুন, হাসি থামে না শুক্লার।

—তোর আর সে রোগ গেল না, চেঁচিয়ে হাসার জন্যে কি হয়েছিল মনে আছে? অরুণোদয়ও হাসছে।

—খুব মনে আছে, একেবারে গম্ভীর হয়ে গেছলাম তারপর।

—সে আর ক'দিনের জন্যে—এই তুই আমার চিনেবাদামে ভাগ বসাচ্ছিস যে, মৃদু আপত্তি জানায় অরুণোদয়।

—ভাগ বসাতে ভীষণ ভাল লাগে রে, শুক্লা অন্যদিকে তাকায়, তাছাড়া এখন খাবার চান্সই পাই না। শুধু পার্টি আর পার্টি—

—পার্টি মানে, অরুণোদয় ওর দিকে একবার দেখল ভাল করে। ওর চেহারা আর সাজসজ্জা দেখে একটু অবাক লাগল তার।

—তুই ভাবছিস এ রকম অবস্থায় তাহলে বাইরে বেরিয়েছি কেন? নরুন আমি এখন ইনকগনিটো——কেউ আমায় চিনতে পারবে না, গাড়ীটাও ছেড়ে দিয়েছি মাঝ রাস্তায়।

—কেন?

—হাঁপিয়ে উঠেছি—মোদি, সোন্ধি, কাপাড়িয়া—কত নাম করব। সেই ককটেল ঝকমকে স্যুট, শাড়ি, দেঁতো হাসি আর নানা রকমের অসভ্যতা—আই এ্যাম ফেড-আপ—

—তুই কি কোথাও—

—চাকরী বলছিস, আবার হেসে উঠল শুক্লা, হেভেন ফরবিড, তবে এও এক ধরনের চাকরী বৈকি।

—কিন্তু এই বেশে তুই যাচ্ছিলি কোথায়?

—মাসিমার বাড়ী।

—তোর আবার মাসিমা কোথা থেকে এল? জিজ্ঞেস করে অরুণোদয়।

—আসবে কেন, বরাবরই ছিল তো!

—তোর সব আত্মীয়দেরই চিনতাম এককালে—সে যাক, তোর সেই দুষ্টু ভাইটা কি করছে রে, সেই যে দারুণ বল খেলত তোদের গলির ভেতর।

—ছেনু? ছেনুকে কারা যেন খু[illegible] করে মেরে ফেলেছিল।

—ইস, তোকে আবার মনে পড়ি[illegible] দিলাম শুক্লা।

—না, না—ও কিছু নয়। জানিস স[illegible] সহ্য হয়ে যায়। এই, একটা দেশলাই কা[illegible] দে তো—

—কেন, কি হল?

—দাঁতে চিনেবাদাম আটকেছে।

—এই নে, মনে আছে সিগারেট খাওয়া কথা। সেই যে রমাদের বাড়ী—কি কাণ্ড বাধিয়েছিলি। শালা আমি তো লজ্জা অস্থির।

—তোর আবার লজ্জা কিসের! আ[illegible] তো নিজেই জোর করে সিগারেট খেয়ে[illegible] ছিলাম, হাসিমুখে তাকায় শুক্লা।

—আর খেয়ে কি অবস্থা হয়েছিল কেসে, বমি করে—একেবারে ডাক্তার ডাকা যোগাড়—

—এই, তুই আর লেখাপড়া করিস ন[illegible] অন্য প্রসঙ্গে গেল শুক্লা।

—বুড়ো বয়েসে লেখাপড়া, [illegible] বলছিস? তবে ক্লাশ নিতে হলে যেটু[illegible] দরকার। তুই তো উপন্যাসের একেবারে [illegible] ছিলি, পেলে আর ছাড়তিস না—

—এখন আর সময় পাই না রে, এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল শুক্লা।

—তুই তো বুদ্ধদেবের দারুণ ভক্ত ছি[illegible] মহাভারতের ওপর লেখাগুলো পড়েছিস?

—পড়েছি কিছু কিছু। সন্তো[illegible] ঘোষও স্টাইল নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরী[illegible] করছে বলে মনে হয়, একটু ভেবে বল[illegible] শুক্লা।

—যাঃ শালা সিগারেট ফুরিয়ে গে[illegible] খালি প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় অরুণে[illegible] দয়, লক্ষ্য করে দেখেছিস, যে জিনিস যখন সব থেকে বেশী প্রয়োজন, সেটা অ[illegible] পাওয়া যায় না ঠিক সময়ে।

—ঠিক বলেছিস, আজ এই শাড়ি খুঁজতে আমার জান বেরিয়ে গেছে। সি[illegible] সিফন আর বেনারসীর মধ্যে এটা লুকি[illegible] ছিল। এ কাপড় পরতে দেখলে সোসাইটি[illegible] কেউ জায়গাও দেবে না।

—তাহলে পরলি কেন? একটু আ[illegible] হয় যেন অরুণোদয়।

—মাসিমার বাড়ী যাব বলে। ও[illegible] বাড়ী তালতলায়, অবস্থাও ভাল ন[illegible] ওরকম জায়গায় গাড়ী চড়ে সিফন উড়ি[illegible] যাওয়ার কোন মানে হয়?

—তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু তোর [illegible] হয়ে গেল না, অরুণোদয় একটু ব্যস্ত হ[illegible]

—হোকগে, কাল না হয় যাব। এই কালই তো সেগলের বাড়ী। মরুক গে, অ[illegible] তোকে তো আসল কথাই জিজ্ঞেস [illegible] হয়নি।

—আসল কথা আবার কি? অরুণোদয় তাকায় শুক্লার দিকে।

—ছেলেদের বেলায় চাকরি আর মেয়েদের বিয়ে।

—ওই তো বললাম স্কুলে চাকরি করি, অরুণোদয় দেশলাইটা নাড়তে থাকে ধীরে ধীরে, আর তুই?

—আমি বিয়ে করেছি কিনা জানতে চাইছিস? করেছি বৈ কি, তা নাহলে গাড়ী বাড়ী সোসাইটি পার্টি আসবে কোথা থেকে? নরুন, তুই চিরকালই বোকা রয়ে গেলি। এবার বল তুই বিয়ে করেছিস কিনা।

—না করিনি, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় অরুণোদয়।

—তাহলে স্নিগ্ধা? বিস্মিত হয় শুক্লা।

—আরে সে তো কলেজের ব্যাপার। চল, এবার উঠি, দাঁড়াল অরুণোদয়, গল্প পেলে তুই আর সহজে উঠবি না।

—তোর রুমালটা, শুক্লা অরুণোদয়ের রুমালটা এগিয়ে দিল।

—থ্যাঙ্কু, চল ওই দোকান থেকে আগে এক প্যাকেট সিগারেট কিনি।

—এত সিগারেট খাওয়া বাড়িয়েছিস কেন, আগে তো এত ঘন ঘন খেতিস না। সিগারেট খেলে গ্যাস্ট্রিক আলসার, ক্যানসার—

—এই, বাজে ফড় ফড় করিস না। চান্স পেলেই সবাই জ্ঞান দেয়, শালা কোথাও শান্তি নেই।

—চুপ কর রাস্তায় ওসব বলবি না, কেউ শুনতে পাবে, বাধা দেয় শুক্লা।

—এই রে—আর্তনাদ করে ওঠে অরুণোদয়।

—কি হল? অবাক হয় শুক্লা।

—টাকাটা নেই—একটা পাঁচটাকার নোট ছিল, পকেট হাতড়ায় অরুণোদয়।

—ব্যাগটা হয়ত পার্কে পড়ে গেছে, বলল শুক্লা।

—আরে না, আমার পকেটে ব্যাগই ছিল না। এমনি পকেটে নোটটা রেখেছিলাম।

—তাহলে রুমাল বার করতে গিয়ে নিশ্চয় পড়ে গেছে। চল পার্কে খুঁজি, একপা এগিয়ে যায় শুক্লা।

—নাঃ কোন লাভ নেই। অত লোক আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওকি আর পড়ে থাকবে। চিন্তাগ্রস্ত মুখে দাঁড়িয়ে রইল অরুণোদয়।

—তুই কি সিগারেট খাস? পার্সটা খুলল শংকা।

—চারমিনার, তুই কিনবি নাকি? অবাক হয়ে অরুণোদয়।

—হ্যাঁ, তোর আপত্তি আছে নাকি, শংকা ওর দিকে রুক্ষদৃষ্টিতে তাকায়।

—আরে না না, পাগল নাকি। তোর খেয়েই তো মানুষ রে—

—এই ফাজলামী করিস না, গুনে গুনে পয়সা দিল শংকা, তারপর প্যাকেটটা অরুণোদয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নে এবার কত টানবি টান।

—এতো হল, কিন্তু—একটা সিগারেট ধরায় অরুণোদয়।

—বুঝেছি, তুই ভাবছিস পয়সাটা কি করে শোধ দিবি? আরে তুই তো অলরেডি আমায় চিনেবাদাম খাইয়েছিস, সুতরাং কুইটস্—কি ঠিক না?

—ঠিক, তবে আমি ভাবছি একটি কণ্ঠস্বরের কথা। যার রেঞ্জ প্রায় এক মাইল, সেকেন্ডে তিনশো তিরাত্তর কিলোমিটার যার গতি আর ভাঙ্গা সাইরেনের মত যার ভ্যলুম। কি বুঝলি না—আমার মায়ের কথা বলছি।

—কেন, মায়ের কি হল?

—পকেটে প্রেসক্রিপসানটা আছে কিন্তু শুধু হাতে বাড়ী ফিরলে যে রিএ্যাকশানটা হবে তারই একটা পিকচার দিলাম আর কি, একটু হাসল অরুণোদয়।

—কি হয়েছে মায়ের, প্রশ্ন করে শংকা।

—কিছুই নয়, তবে ওষুধ না খেলেই বিপদ। বাড়ীতে টিকতে পারা যাবে না। বাবা মারা যাবার পরই মনের অসুখটা দেখা দিয়েছে, ম্লান হাসল অরুণোদয়।

—তাহলে তোর তো সমূহ বিপদ। এই নে আমার কাছে খুচরো গোটা তিনেক আছে, পার্সের মধ্যে আঙ্গুল ঢোকাল শংকা, আর সব বড়নোট।

—দশ টাকার?

—না একশো, মাসিমার দরকার তাই দিতে যাচ্ছি।

—দে তাহলে, কিন্তু তোকে ফেরৎ দেব কি করে, অরুণোদয় যেন একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে।

—ভাবছিস কেন, আবার হয়ত একদিন এইরকম দেখা হয়ে যাবে।

—নারে শংকা, সেটা ঠিক হবে না, তার চেয়ে তোর ঠিকানাটা দে, আমি বরং—অরুণোদয়কে কথাটা আর শেষ করতে হল না।

—মনি অর্ডার করবি? ফর হেভেন সেক, ও কর্মটি আর কর না। তিন টাকার মণি-অর্ডার আমার নামে গেলে বেয়ারাদের কাছে পর্যন্ত মুখ দেখাতে পারব না—মিস্টার তো দূরের কথা—

—তোর মিস্টারের সঙ্গে আলাপ—মানে অন্তত বিয়ের ভোজটা তো খাওয়াতে পারতিস, অভিযোগ করে অরুণোদয়।

—কি করব বল, কলেজের বন্ধুদের বলতে সুগতর আপত্তি ছিল।

—সুগত, আমাদের সেই রাজপুত্র সুগত সেন? অবাক হয় অরুণোদয়। চোখ দুটো তার বিস্ফারিত হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু—

—এই ট্যাকসি, চলি রে। ট্যাকসিতে উঠে পড়ল শংকা।

অরুণোদয় বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে-রইল।

বড় রাস্তায় ট্যাকসিটা দাঁড় করিয়ে শংকা তার ভাড়া চুকিয়ে দিল, তারপর ঢুকল অন্ধকার গলিটাতে। মাটির সরু গলি, পাশে কাঁচা নর্দমা—দুর্গন্ধে জায়গাটা ভরে আছে। ডান দিকে ঘুরে সামনের বাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়াতেই অন্ধকার থেকে একটা লোক এগিয়ে এল।

—কে? চমকে উঠেছে শংকা।

—আপনি এই বাড়ীতে থাকেন? জিজ্ঞেস করল লোকটা।

—কেন, কাকে চাই আপনার?

—বিনোদ হাজরাকে, অনেকক্ষণ থেকে কড়া নাড়ছি কারুর পাত্তা নেই। একবার ডেকে দেবেন। সেদিকে না তাকিয়ে শংকা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল ক্ষিপ্রগতিতে।

—কে? ঘরের ভেতর থেকে আওয়াজ এল। কর্কশ কণ্ঠস্বর।

—আমি, শংকা ঢুকল ঘরের মধ্যে।

তক্তাপোষের ময়লা বিছানার ওপর যে লোকটি বসে আছে, তাকে হঠাৎ দেখলে ভয় পাবার কথা। মিসকালো রং, রোগা চেহারা, গাল দুটো বসা, মাথায় প্রায় চুল নেই বললেই হয়।

—এতক্ষণ পর বাড়ীর কথা মনে পড়ল মহারানীর। আমায় জিজ্ঞেস না করে গেঞ্জিটা কেচে দিয়েছ কেন?

—ভয়নক ময়লা হয়েছিল—

—আহা কি পরিষ্কার, সারাদিন ছিলে কোন্ চুলোয়?

—তোমায় নিচে কে ডাকছে, থামা দিতে চেষ্টা করে শংকা।

—জানি, হারামজাদা—এখান পর্যন্ত ধাওয়া করেছে।

—লোকটা কে? জিজ্ঞেস করল শংকা।

—সে খবরে তোমার কি দরকার। আগে জবাব দাও, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে।

ভাবতেও পারনি যে, আমি দুপুরেই ফি... তাই না? বিনোদ হাজরাকে ফাঁকি দে... বড় শক্ত। তোমার মত কলেজী মেয়ে ... অনেক দেখেছি, কুৎসিত মুখটা শ... কাছাকাছি এসে পড়ল।

—লোকটা আবার কড়া নাড়ছে, ... পিছিয়ে গেল।

—নাড়ুক, তার জন্যে তোমায় ... ঘামাতে হবে না। আমার ইনজেকশান ... বিছানার চাদর এনেছ?

—ওদিকে ট্র্যাফিক জ্যাম—তাড়া... বলল শংকা।

বিনোদ হাজরা স্ত্রীর দিকে অবিশ্ব... দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তা... ধীরে ধীরে বলল—কলকাতায় কি ডা... বা কাপড়ের দোকানের অভাব আ... কি জবাব দিচ্ছ না কেন? ব্যস্ত হয়ে... যেন খুঁজতে শুরু করল। বিছানার ... হাতড়িয়ে, তক্তাপোষের তলায় উঁকি ... কয়েকবার দেখল সে। তার মন অন্য... লক্ষ্য করে শংকা একটু আশ্বস্ত ... বলল :

—কি খুঁজছ?

—তোমার মাথা, এইমাত্র বিড়ির বা... রাখলাম এখানে, দেশলাই রয়েছে ... বাকসটা উধাও—যত শালা লক্ষ্মীছাড়ার দ...

—আমি খুঁজে দেখছি, একটা ... পেয়ে বেঁচে গেল শংকা।

—তাহলেই হয়েছে, আবার অবিশ্বা... দৃষ্টিতে তাকায় বিনোদ হাজরা—এ... শালা দরজাটা ভেঙ্গে ফেলবে দেখছি, ... পোষ থেকে লাফিয়ে সে সিঁড়ির ... এগিয়ে গেল।

শংকাও কি যেন হাতড়াচ্ছে। ... পড়েছে, কয়েক ঘন্টার ব্যবধান, কিন্তু ... হচ্ছে কতদিন আগের কথা। আজই অরু... দয় প্রায় একই ভাবায় কথা বলেছে—... কত তফাৎ। বিড়ির বাকসটা সে খুঁ... লাগল তক্তাপোষের নিচে।

বিনোদ হাজরার অবিশ্বাসের দৃষ্টি ... অরুণোদয়ের মধ্যেও একবার লক্ষ্য করে... যেন। কখন ঠিক মনে পড়ছে না, কি ব... অরুণোদয়ের অবিশ্বাস হয়েছিল? এমন ... কথা—বিড়ির বাকসটা শংকা খুঁজে পে... —অরুণোদয় কখন তার দিকে অবিশ্বা... দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল—এবার তার ... পড়েছে। সুগত সেনের কথায়—। সু... সেন যে এ্যাকসিডেন্টে অনেকদিন আ... মারা গেছে, এটা ভুলে গেল কি করে?

জোরে হেসে উঠল শংকা—একা... অফুরন্ত হাসি।

—কি হচ্ছে? বিনোদ হাজরা ঢুকে... ঘরে মধ্যে।

—তোমার বিড়ির বাকস, শংকা ... তুলে দেখায়।

—তাতে হাসির কি আছে, ধমকে ... বিনোদ হাজরা।

—ওটা দুধের বাটির মধ্যে লুকি... ছিল—

একটানা হেসে চলল শংকা।

সভাসমিতির আদিপর্ব

শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

পশ্চিম বাঙলায় আজ সভা-সমিতি, সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগারের ছড়াছড়ি। কলকাতায় পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার, অলিতে গলিতে ক্লাব। দেড়শ বছর আগেও এসব ছিল না। মঠে, মন্দিরে, টোলে কিছু পুঁথি রাখা হত। কিছু ধনীলোকের গৃহে গ্রন্থাগার ছিল। শিক্ষিত বড়লোকেরা মাঝে মাঝে বাড়ীতে সামাজিক বা সাহিত্যের আসর বসাতেন।

তার অনেক আগে সভা-সমিতির কথা, গোষ্ঠীর কথা আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে জানা যায়। সভা বলতে বোঝাত সামাজিক মেলামেশার বৈঠক, যা থেকে বৈঠকখানার প্রচলন। সমিতি ছিল জনসাধারণের মত প্রকাশের ক্ষেত্র। আর গোষ্ঠী সভা-সমিতির সমার্থক শব্দ। পরিষদও ছিল যেখানে সাধারণকে ধর্মোপদেশ দেওয়া হত। সাধারণ লোক কাজের শেষে অপরাহ্নে সেইসব স্থানে এসে যোগ দিত, মেলামেশা করত। সভা-সমিতির অনুশাসন তারা কঠোরভাবে পালন করত।

আধুনিককালে পাশ্চাত্য আদর্শে গঠিত সভা-সমিতির শুরু হয় আঠারো-উনিশ শতকে। বিভিন্ন বই থেকে উদ্ধারকরা সেই সময়কার সমিতিগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিগ্‌দর্শন হিসেবে উল্লেখ করা হল।

১৭৮৪, ১৫ জানুয়ারিঃ **এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল**—আঠারো শতকের শেষ পাদে কয়েকজন বিদগ্ধ ইংরেজ ঠিক করলেন কলকাতায় প্রাচ্য ব্যাপারে আলোচনার জন্য, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ের অনুশীলনের জন্য এক সমিতি গঠন করবেন। ফোর্ট উইলিয়মের সুপ্রীম কোর্টের জজ স্যার উইলিয়াম জোনসের উদ্যোগে কলকাতার ত্রিশজন গণ্যমান্য ইংরেজদের নিয়ে ১৭৮৪ খৃঃ ১৫ জানুয়ারি এক সভা আহূত হয়। এই সভায় স্যার রবার্ট চেম্বার্স (সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ) সভাপতি হন ও এই দিনেই "এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল" স্থাপিত হয়। নিয়ম-কানুনও তৈরি হয়। সদস্য—ডাঃ হোরেস হেমান উইলসন, টমাস কোলব্রুক, জেমস প্রিন্সেপ ও ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র। উদ্দেশ্য—সংস্কৃত বিদ্যায় পুনরভ্যুত্থান করা, নানা বিষয়ের পুঁথি ও প্রত্নবস্তুর সংরক্ষণ ইত্যাদি। যার ফলে ভারতীয় যাদুঘরের সৃষ্টি। দেশময় তখন একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

সভাপতি—স্যার উইলিয়াম জোন্স; সম্পাদক—জর্জ হিলারো বারলো কিন্তু দুমাস পরে জন হার্বার্ট হ্যারিনটন; কোষাধ্যক্ষ—মিঃ ট্রেল, দেশীয় কর্মচারী—রামকমল সেন। ইনি পরে দেশীয় সম্পাদক হয়েছিলেন।

১৮১৪ খৃঃ : **আত্মীয় সভা**—রামমোহনের ধর্মান্দোলনের জন্য রামমোহন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সভা। সম্পাদক— বৈকুন্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮১৭ খৃঃ ৪ঠা জুলাই : **কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি**—ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকের অভাব মোচনের জন্য এই সভা গঠিত হয়। দেশীয় ও ইংরেজি ভাষায় বহু পাঠ্যপুস্তক রচনা, ছাপা ও বিতরণ করা হয়।

এই সোসাইটির কর্মকর্তারা ছিলেন—স্যার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট, জে এচ হ্যারিনটন, ডবলিউ বি বেলী, জে পিয়ারসন, উইলিয়াম কেরী, তারিণী-চরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব।

দেশীয় সম্পাদক—তারিণীচরণ মিত্র। প্রথম বর্ষের পরিচালন সমিতি—মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব ও তারিণীচরণ মিত্র।

১৮১৮ খৃঃ ১ সেপ্টেম্বর : **কলকাতা স্কুল সোসাইটি**—এটি একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। উদ্দেশ্য কলকাতার বিদ্যালয়সমূহের উন্নতি সাধন ও নতুন বিদ্যালয় গঠন। একটি পরিচালন সমিতি গঠিত হয়। সভ্য—স্যার অ্যান্টনি বুলার, জে এইচ হ্যারিনটন, ডাঃ কেরী, রেভাঃ ডবলিউ ইয়েটস, ই এস মন্টেগু, ডেবিড হেয়ার, রাধামাধব ব্যানার্জি ও রসময় দত্ত। প্রথমে লেঃ আয়ারভিন ও মিঃ মণ্টেগু যুগ্ম সম্পাদক হন। পরে ডেভিড হেয়ার—ইউরোপীয় সম্পাদক ও রাধাকান্ত দেব—দেশীয় সম্পাদক। পরি-দর্শক—গৌরমোহন পণ্ডিত।

১৮২০ খৃঃ ১৪ সেপ্টেম্বর : **ভারতবর্ষীয় কৃষিসভা**—শ্রীরামপুরের খৃষ্টান ধর্মযাজক বিখ্যাত উইলিয়াম কেরী এই সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজরাই এর সভ্য ছিলেন। ১৮৩৭ খৃঃ-র আগে পর্যন্ত কোনও দেশীয় লোকের এই সভার সদস্য-পদ গ্রহণের অধিকার ছিল না। ঐ বছরে সাতজন বাঙালী সদস্য-পদ গ্রহণ করেন। কৃষির উন্নতিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য এবং 'বাগান স্কুল' করে শিক্ষা-দান। এই সভার উদ্যোগে বঙ্গীয় কৃষি প্রদর্শনীর সূত্রপাত হয়।

১৮২০ খৃঃ : **ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি** — সভাপতি—রেভাঃ ডবলিউ এইচ পিয়ার্স। উদ্দেশ্য—স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।

১৮২৩ খৃঃ ফেব্রুয়ারি ৪ : **গৌড়ীয় সমাজ**—হিন্দু কলেজে স্থাপিত। উদ্দেশ্য—

বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জন। সম্পাদক—রামকমল সেন ও প্রফুল্লকুমার ঠাকুর। সভ্য—কালীশঙ্কর ঘোষাল, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, কালাচাঁদ বসু প্রমুখ।

১৮২৩ খৃঃ মার্চ : কলকাতা মেডিক্যাল ও ফিজিক্যাল সোসাইটি — চিকিৎসকদের সভা। সভাপতি—ডাঃ জেমস হেয়ার। সম্পাদক—ডাঃ অ্যাডম।

১৮২৪ খৃঃ : লেডিস সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন — উদ্দেশ্য—স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার।

১৮২৬ খৃঃ ২০ আগস্ট : ব্রাহ্মসমাজ—রামমোহন রায় ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেন প্রথমে নিজ বাড়ীতে। পরে ১৮২৭ খৃঃ কমল বসুর বাড়ীতে ব্রহ্মসভা স্থাপন করেন। এই সভাই পরে ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হয়। ১৮৩০ সালে ২৩এ জানুয়ারি নতুন মন্দির-বাড়ী তৈরি হয়। এই সময় দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ব্রাহ্মসমাজের ভার লয়। পরে এই সমাজের প্রচেষ্টায় নানা স্থানে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্ধমানের মহারাজা মহাতপ চাঁদ বর্ধমানে ও কৃষ্ণনগরের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রায় কৃষ্ণনগরে (১৮৪৪) ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধ হলে ১৮৬১ সালে ১১ নভেম্বর কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন। তখন থেকে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হয়। ১৮৮০, ২৫ জানুয়ারি 'নববিধান' আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়।

১৮২৮ খৃঃ : অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন—ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে সামাজিক, নৈতিক, ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলার বাগান-বাড়ীতে এই সভা বসত। সভাপতি ডিরোজিও সাহেব। কখনও কখনও তাঁর বাড়ীতে বসত। পরে হেয়ার স্কুলে অ্যাসোসিয়েশনের স্থান বদল হয়। এই সময় ডিরোজিও পদত্যাগ করলে হেয়ার সাহেব অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হন। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা এতে যোগদান করত, বহুক্ষণ আলোচনা চলত। বক্তৃতার অভ্যাস করা হত। সপ্তাহে একবার সভা বসত। ডিরোজিওর ছাত্ররা এই সভায় যোগ দিতেন—রেভাঃ কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিক মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ সিকদার, মাধব মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ। স্যার এডওয়ার্ড রায়ান ও লর্ড বেন্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারি কর্ণেল বেনসন প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন।

১৮৩০ খৃঃ ১৭ জানুয়ারি : ধর্মসভা—'সতীপ্রথা' নিবারণের বিরুদ্ধে ও হিন্দু-ধর্ম বজায় রাখার জন্যে এই সভা স্থাপিত হয়। সম্পাদক—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সভায় সংশ্লিষ্ট ছিলেন—তারিণীচরণ মিত্র, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, গোকুল মল্লিক, আশুতোষ দেব, শিবচন্দ্র দাস।

১৮৩০ খৃঃ : এপিস্টোলারি অ্যাসোসিয়েশন—এই সভার বিশেষ ইতিহাস জানা যায়নি। সমিতি গঠিত হওয়ার অল্প-দিনের মধ্যে উঠে যায়।

১৮৩০ খৃঃ : অ্যাংগলো ইণ্ডিয়ান হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন— এই অ্যাসোসিয়েশন
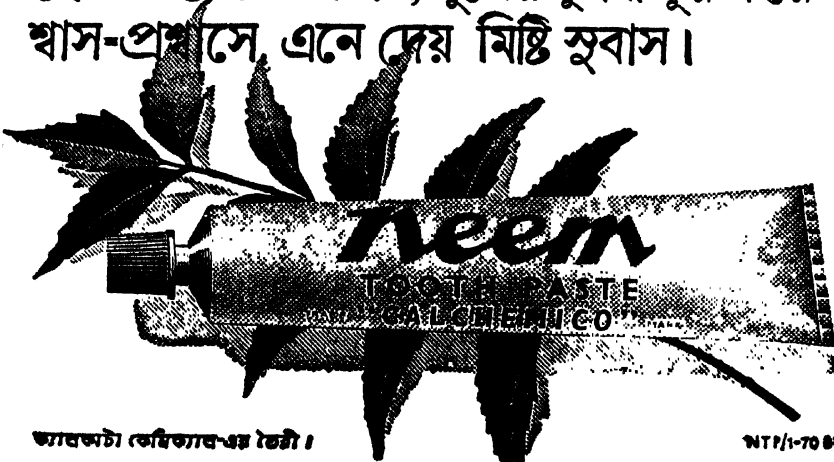
পটলডাঙ্গার বিদ্যালয়ে স্থাপিত। উদ্যোক্তা—ডেভিড হেয়ার ও পটলডাঙ্গার হিন্দু কলেজ ও সিমলার অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের ছাত্ররা। প্রতি মাসে দুবার সভা হত দ্বিতীয় ও চতুর্থ বুধবার সন্ধ্যায়। ধর্ম বিষয়ে কোন আলোচনা হত না।

১৮৩০ খৃঃ: **জ্ঞানসন্দীপন সভা**—পাথুরিয়াঘাটার উমানন্দ ঠাকুরের বৈঠকখানায় এই সভা স্থাপিত হয়। এই সভা প্রতি মাসে দ্বিতীয় ও চতুর্থ রবিবার সন্ধ্যায় সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত চলত। বহু বিদ্বান ব্যক্তির সমাগম হত। ধর্ম বিষয়ের আলোচনা নিষিদ্ধ ছিল। সভার কোনও সদস্য অনুপস্থিত থাকলে পূর্বাহ্নেই তাঁকে জানাতে হত। কয়েকবার অনুপস্থিত হলে নাম খারিজ হয়ে যেত।

১৮৩০ খৃঃ: **বঙ্গহিত**—কয়েকজন টোলের ছাত্র মিলে এই সভা স্থাপন করে। এই সভায় ছাত্ররা নানা বিষয়ে বক্তৃতা করত।

১৮৩০ খৃঃ: **ডিবেটিং ক্লাব**—চোরবাগান নিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাড়ীতে এই ক্লাব স্থাপিত হয়। এই সভা প্রতি শনিবার বসত। দুজন অধ্যক্ষ প্রতি রবিবারে বক্তৃতা দিতেন। মাসে মাসে সভাপতি ও সম্পাদকের পরিবর্তন হত। সভ্য ছাড়া দর্শকরাও বক্তৃতা দিতে পারতেন।

১৮৩০ খৃঃ: **ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি**—লালবাজারে এই সমাজ সর্বজাতীয় দুঃস্থ লোকের উপকারার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সোসাইটিতে এক সাধারণ কমিটি ও বিভিন্ন পল্লীবাসীদের স্থানীয় কমিটি গঠিত হয়।

সাধারণ কমিটিতে লর্ড বিশপ, সুপ্রীম কোর্টের জজ, সুপ্রীম কোর্টের কৌন্সিলের সাহেবেরা আর নানা পল্লীর বাসিন্দারা এবং যাঁরা একশো টাকা চাঁদা দিতেন তাঁরা থাকতেন।

সাধারণ কমিটির সভাপতি—স্যার এডওয়ার্ড রেয়ান। সেক্রেটারি—থিবস সাহেব। দ্বারকানাথ ঠাকুর এক লক্ষ টাকা দান করেন।

১৮৩০ খৃঃ: **(নবাবিশন্ট গণসভা) বঙ্গরঞ্জিনী সভা**—কলকাতা সিমুলিয়াবাসী কয়েকজন মিলে বাঙলাভাষা শুদ্ধ করে লেখা ও পড়ার উদ্দেশ্যে নবাবিশন্ট গণসভা নামে এক সভা স্থাপন করেন। কিন্তু বড় নামের উচ্চারণে অসুবিধে হওয়ায় নাম পরিবর্তন করে 'বঙ্গরঞ্জিনী' সভা রাখা হয়। এই সভায় ধর্মদ্বেষী বা নাস্তিক, আর যাঁরা মাতৃভাষা ত্যাগ করে বিদেশী ভাষার চর্চা করেন তাঁরা ছাড়া সকলে যোগ দিতে পারতেন। সম্পাদক—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

১৮৩১ খৃঃ: **সাহিত্যসমালোচনী সভা**—ডিরোজিওর সময়ে হিন্দু কলেজে বাঙলা ভাষার চর্চা হত না, তার প্রতি অশ্রদ্ধা ও অনাদর ছিল। সেই সময় ডিরোজিওর ছাত্ররাই এগিয়ে এল বাঙলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য। দমদমার রামকৃষ্ণ মল্লিকের বাগানবাড়ীতে কয়েকজন একত্র মিলে সাহিত্যসমালোচনী সভা স্থাপন করেন। এখানে নানারকম বক্তৃতা ও আলোচনা হত। তাঁদের স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য তাঁরা এক কাগজ বার করলেন 'জ্ঞানান্বেষণ' ১৮৩১ সালের ১৮ জুন।

১৮৩১ খৃঃ, ২১ জুলাই: **বৈদ্যসমাজ**—সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব বৈদ্যপণ্ডিত খুদিরাম বিশারদের উদ্যোগে জোড়াসাঁকো নিবাসী ভৈরবচন্দ্র বসুর বাড়ীতে তাঁরই সম্পাদনায় এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য—অন্য জাতীয় চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ না করা। এই সমাজ দ্বারা যে ওষুধ তৈরি হবে তা বৈদ্য ব্যতীত কাকেও বিক্রি করা নিষিদ্ধ, কোন কঠিন রোগের চিকিৎসা ব্যাপারে সমাজকে জানালে সমাজ তার যথাশাস্ত্র ওষুধ ও ব্যবস্থাপত্র করে দেবে ইত্যাদি।

১৮৩২ খৃঃ: **ক্যালকাটা ইণ্ডিজেনাস ক্লাব**—এর সম্বন্ধে কিছু জানা যায়নি।

১৮৩৩ খৃঃ, ১ জানুয়ারি: **সর্বতত্ত্বদীপিকা**—১২৩৯, ১৭ পৌষ রবিবার সিমুলিয়ার রামমোহন রায়ের হিন্দু স্কুল বাড়ীতে এই সভা স্থাপিত হয়। বাঙলা ভাষার আলোচনা ও অনুশীলন এই সভার উদ্দেশ্য। সভাপতি—রমাপ্রসাদ রায়, সম্পাদক—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রতি মাসে সভা বসত। প্রতি মাসে সভাপতি পরিবর্তনের ব্যবস্থা ছিল।

১৮৩৬ খৃঃ: **বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা**—এই সভায় নানা বিষয়ের আলোচনা হত, এমনকি রাজ-সংক্রান্ত ব্যাপারেও। সভাপতি—গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। সভার পৃষ্ঠপোষক—রামলোচন ঘোষ, কালীনাথ রায়, মহেশচন্দ্র সিংহ, প্যারীমোহন বসু, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ।

১৮৩৬ খৃঃ ৩১ মার্চ: **কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি**—এসপ্ল্যানেড রোডে ডাঃ স্টক নামে জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোকের বাড়ীতে এই লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর যেখানে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ছিল সেখানে ১৮৪৪ সালে জুন মাস পর্যন্ত লাইব্রেরি ছিল। এর পর বড়লাট মেটকাফের অবসরগ্রহণের স্মৃতিতে মেটকাফ হল তৈরি হলে সেখানে এই লাইব্রেরি উঠে যায়।

সম্পাদক ও লাইব্রেরিয়ান—মিঃ স্টোস। ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান ও সহ-সম্পাদক—প্যারীচাঁদ মিত্র। চব্বিশজনকে নিয়ে এক কমিটি গঠিত হয়। এই লাইব্রেরি পরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ও ভারত স্বাধীন হবার পর ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পরিণত হয়।

১৮৩৬ খৃঃ সেপ্টেম্বর: **জ্ঞানচন্দ্রোদয় সভা**—ঠনঠনিয়া কলেজ স্ট্রীটে স্থাপিত। উদ্দেশ্য—বাঙলাভাষার আলোচনা। অধ্যক্ষ—শ্যামাচরণ শর্মা। সম্পাদক—রাধানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় বসত।

১৮৩৮ খৃঃ ১২ মার্চ: **সাধারণ জ্ঞানার্জনী সভা বা সাধারণ জ্ঞান উপার্জিকা সভা**—ডিরোজিও সাহেবের খুব নাম। ইংরেজি-পড়া ছাত্রও তাঁর অনেক। সেইসব হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্ররা আর পূর্বোক্ত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যরা মিলে এই সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার উদ্দেশ্য—জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতির আলোচনা।

সভাপতি—তারাচাঁদ চক্রবর্তী। সহ-সভাপতি—কালাচাঁদ শেঠ, রামগোপাল ঘোষ। সম্পাদক—রামতনু লাহিড়ী ও প্যারীচাঁদ মিত্র, কোষাধ্যক্ষ—রাজকৃষ্ণ মিত্র।

১৮৩৮ খৃঃ ঃ বঙ্গীয় জমিদার সভা—জমিদারদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট আলোচনার জন্য এই সভার প্রতিষ্ঠা হয়। সাধারণ প্রজাদের সঙ্গে এই সভার কোনও যোগাযোগ ছিল না—কেবলমাত্র জমিদার ও প্রজার উভয়ের স্বার্থ যেখানে ব্যাহত হত সেইখানে তাঁরা যুক্তভাবে আলোচনা করতেন।

এই সভার দুজন সম্পাদক—একজন ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক—উইলিয়াম কব হ্যারি ও অন্যজন প্রসন্নকুমার ঠাকুর। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাড়ীর কাছে এর কার্যালয় ছিল।

১৮৩৯ খৃঃ ঃ মেকানিক ইনস্টিটিউট—শহরের বড় বড় ইংরেজ ও বাঙালী মিলে এই ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে স্থাপিত হয় বটে কিন্তু বেশিদিন টেকেনি। উদ্দেশ্য—এদেশীয়দের শ্রমশিল্প শিক্ষা দেওয়া ও শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধন। সভাপতি—স্যার জন পিটার গ্রান্ট। যুগ্ম সম্পাদক—জর্জ ও কোলসওয়ার্দি গ্রান্ট। সহ-সম্পাদক—রেভা বোয়াজ। এদেশীয় সভ্য—রমানাথ ঠাকুর, হরিমোহন সেন ও প্যারীচাঁদ মিত্র।

১৮৩৯ খৃঃ (তত্ত্বরঞ্জিনী সভা) তত্ত্ববোধিনী সভা—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক বাড়ীতে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে তত্ত্বরঞ্জিনী সভা স্থাপিত হয়। পরে নাম পরিবর্তন হয়ে তত্ত্ববোধিনী সভা হয়।

১৮৪০ খৃঃ ঃ সামাজিক সভা

১৮৪০ খৃঃ ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ (হিন্দু বিশুদ্ধ-প্রেমোদ্দীপনী সভা) দি হিন্দু থিওফিলানথ্রপিক সোসাইটি—নীতি ও ধর্ম বিষয়ে স্বদেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা ও হিন্দু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রচার করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল।

কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর নিমতলার বাড়ীতে এই সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভায় নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন—ডাঃ ডাফ, রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কিশোরীচাঁদ মিত্র। ১৮৪৬ পর্যন্ত এই সভার অস্তিত্ব ছিল।

১৮৪৩ খৃঃ ২০ এপ্রিল ঃ বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি—ভারতে রাষ্ট্রচেতনার উদ্বোধক ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সভ্য জর্জ টমসন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে কলকাতায় আসেন। তিনি কলকাতায় থাকাকালীন বহু স্থানে রাজনৈতিক বক্তৃতা করেন। ১৮৪৩ খৃঃ ২০ এপ্রিল তাঁরই সভাপতিত্বে কলকাতায় ফৌজদারী বালাখানায় এক বড় সভা হয়, তাতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সভাপতি—জর্জ টমসন, অস্থায়ী সভাপতি—প্যারীচাঁদ মিত্র, কোষাধ্যক্ষ—রামগোপাল ঘোষ, সভ্যগণ—জি এফ রেমফ্রি, জি টি স্মিড, এম ক্রো, হরিমোহন সেন, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, গোবিন্দচন্দ্র সেন, চন্দ্রশেখর দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রজনাথ ধর, রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ সেন ও সাতকড়ি দত্ত। পরে রেমফ্রি ও রামগোপাল ঘোষ সহ-সভাপতি হন।

এই সোসাইটি সেই সময় একদল তরুণ কর্মী ও রাজনীতিবিদদের মিলন-কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তাঁদের চিন্তাধারা ও স্বাধীন মনোভাব প্রকাশের উন্মেষ ঘটে এখানে। দলে দলে সপ্তাহে সপ্তাহে বহু লোক তাঁদের বক্তৃতা শুনতে আসত।

টমসন বিলেতে চলে যাবার পর ৮ জুন থেকে ডবলিউ থিওবোল্ড সভাপতি হন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে রামগোপাল ঘোষ সভাপতি হন।

১৮৪৪ খৃঃ ১২ এপ্রিল ঃ ক্যালকাটা লিসিয়াম—ক্যালকাটা মেকানিক ইনস্টিটিউট হঠাৎ ভেঙ্গে-যাওয়ায় তার বদলে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। সদস্যরা পরস্পরের মধ্যে বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। অন্যতম সভ্য ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র।

১৮৪৭ খৃঃ ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ চেস ক্লাব—মেটকাফ হলে দাবা খেলার সমিতি স্থাপিত হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পাদক।

১৮৫১ খৃঃ ১৯ অক্টোবর ঃ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি কিছুকাল চলার পরে ভাটা পড়ে। তখন 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' জমিদার সভা'র সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নামে গঠিত হয়। সভাপতি—রাধাকান্ত দেব, সহ-সভাপতি—রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, সম্পাদক—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহ-সম্পাদক—দিগম্বর মিত্র, সদস্য—হরকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রফুল্লকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখার্জি, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, আশুতোষ দেব, হরিমোহন সেন, জগদানন্দ মুখার্জি, উমেশচন্দ্র দত্ত।

১৮৫১ খৃঃ ১১ ডিসেম্বর ঃ বীটন সোসাইটি—এই সোসাইটি সেকালে শিক্ষিতদের বিশেষত ইংরেজ ও বাঙালীদের প্রধানতম মিলনকেন্দ্র ছিল। শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা হত।

সভাপতি—জে এফ মোয়াট (ইনি মেডিকেল কলেজের সম্পাদক), সম্পাদক—প্যারীচাঁদ মিত্র, সহ-সম্পাদক—রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো (১৮৬৭ হতে), সদস্য—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচরণ সরকার, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮৫৩ খৃঃ ১৪ জুন ঃ বিদ্যোৎসাহিনী সভা—কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক স্থাপিত। উদ্দেশ্য—বঙ্গভাষার অনুশীলন ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্বর্ধনা ইত্যাদি।

সম্পাদক—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সভ্য—উমেশচন্দ্র মল্লিক, ক্ষেত্রনাথ বসু, রাধানাথ বিদ্যারত্ন, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ।

প্রথম সম্বর্ধনা—মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮৬১, ১২ ফেব্রুয়ারি), তারপরে রেভাঃ লঙ

১৮৫৩ খৃঃ ঃ ১৫ ডিসেম্বর ঃ অ্যাসোসিয়েশন অফ ফ্রেণ্ডস ফর দি প্রমোশন অফ সোসিয়াল ইমপ্রুভমেণ্ট (সমাজ উন্নতিবিধায়িনী সুহৃৎ সভা)—সামাজিক উন্নতিসাধনের জন্য এই সভা কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাড়ীতে স্থাপিত হয়। সম্পাদক—অক্ষয়কুমার দত্ত।

১৮৫৩ খৃঃ ঃ সোসিয়াল রিফর্মস অ্যাসোসিয়েশন— প্রতিষ্ঠাতা— কিশোরীচাঁদ মিত্র। এই সভায় বহুবিবাহ রহিত ও বিধবা বিবাহের অনুকূলে ধারাবাহিক আলোচনা হত।

১৮৫৪ খৃঃ ঃ সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস (শ্রমশিল্প উন্নতিবিধায়ক সমিতি)— শিল্পকলার অনুশীলনে স্থাপিত। এই সমিতির তত্ত্বাবধানে ঐ বছর ১৪ আগস্ট 'স্কুল অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস' নামে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন এটি গভর্নমেণ্ট স্কুল অফ আর্টস নামে পরিচিত।

১৮৫৪ খৃঃ ঃ ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি—সম্পাদক ঃ প্যারীচাঁদ মিত্র। এই সভা পরে স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হয়।

১৮৫৪ খৃঃ ১৫ ডিসেম্বর ঃ সুহৃদ সমিতি বা মিত্র সমিতি— উদ্দেশ্য সামাজিক উন্নতিসাধন। স্ত্রী-শিক্ষা, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ, বাল্যবিবাহ বর্জন, বহুবিবাহ প্রথা রহিত ইত্যাদি।

সভ্য অক্ষয়কুমার দত্ত, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ সিকদার, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রমুখ।

১৮৫৬ খৃঃ ৯ ডিসেম্বর : **আওয়ার ক্লাব**—সভাপতি—রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সভ্যগণ—রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রমানাথ লাহা, নলিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ শেঠ, গোপীনাথ শেঠ।

১৮৫৭ খৃঃ মে : **ক্যামিলি লিটারারি ক্লাব**—এটি সাহিত্য সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘ ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মিলন সংঘ ছিল।

১৮৬০ খৃঃ : **সংগত সভা**—কেশবচন্দ্র সেন তাঁর অন্তরংগদের নিয়ে এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মীয় আলোচনা এর উদ্দেশ্য।

১৮৬১ খৃঃ ৪ সেপ্টেম্বর : **কলিকাতা পশু ক্লেশ নিবারণী সভা**—সম্পাদক—কোলসওয়ার্দি গ্রান্ট। অন্যতম সদস্য—প্যারীচাঁদ মিত্র।

১৮৬৩ খৃঃ : **ব্রাহ্মবন্ধু সভা**। ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রতিষ্ঠিত।

১৮৬৩ খৃঃ : **মহমেডান সাহিত্য সমিতি**—নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য মুসলমান সামাজিক ভাব ও সাহিত্যের অনুশীলন।

১৮৬৫ খৃঃ : **ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা**—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কেশব সেনের মতানৈক্য হলে এবং ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে বৈষম্য দেখা দিয়েছিল তার নিষ্পত্তির জন্য এই সভা গঠিত হয়। সভ্য—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী ও শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৬৭ খৃঃ ২২ জুন : **বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সমিতি** সভাপতি—কিশোরীচাঁদ মিত্র, সম্পাদক—প্যারীচাঁদ মিত্র ও এইচ বিভারিজ। এই সভায় ১৮৭০ খৃঃ ২৮ ফেব্রুয়ারি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৮৭০ খৃঃ ২ নভেম্বর : **ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন**—কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে এই সভা স্থাপিত হয়। অন্যতম সভ্য—কিশোরীচাঁদ মিত্র। জাতি গঠন পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিভাগ হয়—(১) নারীগণের উন্নতি, (২) সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা, (৩) দরিদ্রদের জন্য সুলভ সাহিত্য প্রচার (৪) মাদকতা নিবারণ, (৫) বিপন্নদের সাহায্য।

১৮৬৬-৭০ খৃঃ : **জাতীয় সভা—বঙ্গশাখা**—ইউরোপীয় ও দেশীয়দের মধ্যে সামাজিক সংযোগ ও মৈত্রী এবং স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার উদ্দেশ্যে কুমারী মেরী কার্পেন্টার এই সভার প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৭২ খৃঃ ১০ মার্চ : **ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভা** আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মদের দ্বারা এই সভার সূচনা হয়। সম্পাদক—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্র। রাজনারায়ণ বসু, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রমুখ ধর্ম, বিজ্ঞান, নীতি ও শাস্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। এই সভা প্রায় দু বছর চলেছিল।

১৮৭৪ খৃঃ ১৮ এপ্রিল : **বিদ্বজ্জন সমাগম সভা** জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাঝে মাঝে সাহিত্যিক অনুষ্ঠান হত। বহু সাহিত্যিক এতে যোগ দিতেন। কয়েক বছর এটা চলেছিল।

১৮৭৫ খৃঃ সেপ্টেম্বর : **ইণ্ডিয়ান লীগ**—শিশিরকুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠিত। সম্পাদক—রেভাঃ কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৭৬ খৃঃ : **ভারতীয় বিজ্ঞান সভা**—প্রতিষ্ঠাতা— ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। বৌবাজারে স্থাপিত। সম্পাদক—ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। পরবর্তীকালে সম্পাদক—স্যার সি ভি রমন। এই বিজ্ঞান সভা ও গবেষণাগারটি ভারতে প্রথম।

১৮৭৬ খৃঃ ২৬ জুলাই : **ভারত সভা**—আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মিলে বাঙলাদেশে মধ্যবিত্ত লোকদের জন্য রাজনীতির শিক্ষা আন্দোলন করবার জন্য 'ভারত সভা' প্রতিষ্ঠিত করেন। সভাপতি—শ্যামাচরণ শর্মা-সরকার, সম্পাদক—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদক— দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

১৮৭৭ খৃঃ : **সঞ্জীবনী সভা**—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঠনঠনের এক পোড়ো বাড়ীতে 'হামচুপামুহাফ' বা 'সঞ্জীবনী সভা' মাৎসিনির কার্বোনারির অনুকরণে এক গুপ্ত সভা স্থাপিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এর উদ্যোক্তা। সভাপতি—রাজনারায়ণ বসু। সভ্য—নবগোপাল মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র।

১৮৭৯ খৃঃ : **ছাত্র সমাজ**—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যরা ছাত্রদের জন্য 'ছাত্র সমাজ' স্থাপন করেন। প্রতি রবিবার সকালে সিটি কলেজে এই সমাজের অধিবেশন বসত। আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ সভায় উপদেশ দিতেন। উদ্দেশ্য—ধর্মসংস্কার, সমাজ সংস্কার, সাধারণ জ্ঞানোন্নতি প্রভৃতি।

১৮৮২ খৃঃ ৩ এপ্রিল : (ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি) **থিওসফিক্যাল সোসাইটি**— আমেরিকার থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কর্নেল অলকট এবং মাদাম ব্লাভট্স্কি কলকাতায় আসেন এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে অলকট সাহেবের সভাপতিত্বে কলকাতার থিওসফিক্যাল সোসাইটি গঠিত হয়। অস্থায়ী সভাপতি—প্যারীচাঁদ মিত্র, সম্পাদক—নরেন্দ্রনাথ সেন, সহ-সম্পাদক—বলাইচাঁদ মল্লিক, কার্যকরী সমিতির সভ্য—জানকীনাথ ঘোষাল, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, ডি এন কারভোজা। এর পর ১৭ এপ্রিল অলকট সাহেবের সভাপতিত্বে রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে নতুন করে কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

সভাপতি : প্যারীচাঁদ মিত্র, সহ-সভাপতি—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা শ্যামশঙ্কর রায় মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক—নরেন্দ্রনাথ সেন, কোষাধ্যক্ষ—বলাইচাঁদ মল্লিক, উদ্দেশ্য অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলন। এই সভার কার্যালয় ছিল ২ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটের ইণ্ডিয়ান মিরর অফিসে। মাসে দুবার করে অধিবেশন বসত। আজও এই প্রতিষ্ঠান গোলদীঘির পূর্ব পার্শ্বে বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটি নামে তত্ত্ববিদ্যার প্রসারকল্পে বর্তমান আছে।

১৮৮২ খৃঃ ১৭ জুলাই : **কলিকাতা সারস্বত সমাজ**—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ঠাকুরবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত। সভাপতি—রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সহ-সভাপতি—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পাদক—কৃষ্ণবিহারী সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দু তিনটি অধিবেশনের পর সভা উঠে যায়।

১৮৮৩-৮৪ খৃঃ : **শোভাবাজার হিতৈষী সমাজ** পৃষ্ঠপোষক মহারাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, প্রতিষ্ঠাতা—বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর। উদ্দেশ্য : জাতিধর্মনির্বিশেষে সাধারণকে নানা বিষয়ে সাহায্য করা।

১৮৮৬ খৃঃ : **বড়বাজার ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব** ২৩এ এপ্রিল এখানে কিশোরীচাঁদ মিত্র বক্তৃতা দেন।

১৮৮৫ খৃঃ : **ভারতীয় জাতীয় মহাসভা**—ভারতের জাতীয় রাজনৈতিক মহাসভার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম মিঃ হিউম। এর প্রথম অধিবেশন বসে বোম্বাই শহরে উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির সভাপতিত্বে। পরাধীন ভারতবাসীদের মধ্যে আত্মচেতনা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাবার প্রচেষ্টা এই সভার উদ্দেশ্য। কলকাতায় এর দ্বিতীয় অধিবেশন হয়—সভাপতি দাদাভাই নৌরজি ১৮৮৫ সালে।

১৮৮৬ খৃঃ : **উত্তরপাড়া হিতকারী সভা**।

১৮৮৭ খৃঃ : **সখি সমিতি**—রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী 'সখি সমিতি' নামে এক মহিলা সমিতি স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য—সম্ভ্রান্ত মহিলাদের একত্র সম্মেলন, দেশহিতকর কাজের অনুষ্ঠান, মহিলা শিল্পমেলা, সখি সমিতি ভাণ্ডার ইত্যাদি।

১৮৮৮ খৃঃ : **ব্রাহ্ম সমিতি**—যাঁরা আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম নন তাঁদের জন্য এই সভা গঠিত হয়।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট—বাঙলার ছাত্রদের মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক উন্নতিবিধানের জন্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের উদ্যোগে দি সোসাইটি ফর দি হায়ার ট্রেনিং অফ ইয়ংমেন নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। কোষাধ্যক্ষ হন রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

কিছুদিন পরে সি আর উইলসন এই সমিতির সম্পাদক হয়ে এর নাম ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট রাখেন। গোলদীঘির পূর্ব পারে এটি অবস্থিত।

১৮৯৭ খৃঃ : **ভারত সংগীত সমাজ**—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ীতে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সম্পাদক—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মৃত্যুঞ্জয় যতীন দাস

বিগত ১৩ই সেপ্টেম্বর ভবানীপুরের হরলালকা হলে বীর বিপ্লবী যতীন দাসের মৃত্যুদিবস উপলক্ষে শহীদ যতীন দাস স্মৃতি সমিতি আয়োজিত এক স্মরণ সভায় পৌরোহিত্য করেন প্রবীণ বিপ্লবী এবং সাংবাদিক নলিনীকিশোর গুহ। এই সভায় শহীদ যতীন দাস ও ভারতের বিপ্লব আন্দোলন নামক একটি তথ্যমূলক গ্রন্থ আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থটির প্রথমতম ক্রেতা হলেন পশ্চিমবঙ্গের ডেপুটি স্পীকার হরিদাস মিত্র। সভাস্থলে অনেক প্রাক্তন বিপ্লবী উপস্থিত ছিলেন এবং পর পর অনেকগুলি কপি বিক্রীত হয়। এই গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী। এই সংবাদটি প্রকাশিত হতে দেখিনি এবং প্রাসঙ্গিক বোধে এইখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

মৃত্যুঞ্জয় শহীদ যতীন দাসের মহান আত্মত্যাগের তুলনা ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে আর নেই। আয়ার্ল্যান্ডের বীর বিপ্লবী টেরেন্স ম্যাকসুইনী প্রায় অনুরূপভাবে আত্মবলিদান করেন এবং সেই মহান বিপ্লবী এক হিসাবে যতীন্দ্রনাথের পূর্বসূরী।

এই গ্রন্থটির ভূমিকায় নলিনীকিশোর গুহ লিখেছেন—

'বিপন্ন দেবতাগণের দৈত্যনাশের অমোঘ অস্ত্র চাই। সমগ্র ভারতবর্ষে তেত্রিশকোটি দেবতা। মানুষ কাউকে পাওয়া গেল না যার বুকের অস্থি দিয়ে সেই বজ্র তৈরী হতে পারে। কিন্তু মানুষ হয়েও দেবতারও বড় অপাপবিদ্ধ বিশুদ্ধ 'দেহ-মন' আত্মায় অনা দধীচীকে পাওয়া গেল। তাঁর শরণাপন্ন হলেন দেবতারা। দধীচি সম্মত হলেন বিপন্ন দেবতাদের দৈত্যনাশক বজ্র তৈরীর জন্য এক এক করে বুকের অস্থি-দানের দুষ্কর সাধনা সম্পন্ন করতে, যা আর কারো দ্বারা সম্ভব ছিল না। তেমনি বাংলার দধীচি যতীন দাস।'

এই মহান বাঙালীর আত্মদানে সেদিন ভারতে এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথের জন্ম। যতীন দাসের পিতা বঙ্কিমচন্দ্র দাস ও তাঁর অনুজ কিরণচন্দ্র দাস স্বাধীনতা যজ্ঞে সর্বস্বপণ করেছিলেন। কিরণচন্দ্র দাস সৌভাগ্যক্রমে আজো জীবিত এবং যতীন্দ্রনাথের জীবনের অনেক দুষ্প্রাপ্য তথ্য তাঁর সংগ্রহে আছে। তিনি এই গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে অনেক তথ্য সরবরাহ করেছেন।

যতীন্দ্রনাথের পুণ্য জীবনের কাহিনীর সংগে হয়ত এযুগের বেশী মানুষের তেমন পরিচয় নেই, তাই সংক্ষেপে তাঁর জীবনের বিবরণ দান করা কর্তব্য বিবেচনা করি।

১৯২১-এ যতীন্দ্রনাথ যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলেন তখন দেশে চলেছে অসহযোগ আন্দোলনের তুমুল আলোড়ন। যতীন্দ্রনাথ সেই উত্তাল প্লাবনে গা ভাসিয়ে দিলেন। পিতা রুষ্ট হলেন। যতীন্দ্রনাথের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। কিন্তু দেশ যখন আন্দোলনের প্রায় চরম সীমায় পৌঁছেছে তখন গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন চৌরি চৌরার একটা তুচ্ছ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে। গান্ধীজীর এই জাতীয় নীতি সেদিন বিপ্লবীরা মেনে নিতে পারেন নি। ফলে সারা ভারতে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠল। যতীন দাসও বিভ্রান্ত হয়ে সাউথ সুবারবান কলেজে (বর্তমান আশুতোষ কলেজ) ভর্তি হলেন এবং ইউনিভারসিটি টেরিটোরিয়াল কোরেও যোগ দিলেন। এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সুভাষচন্দ্র ১৯২৮-এর কলিকাতা কংগ্রেসে যখন জি ও সি হয়েছিলেন তখন যতীন সেই বাহিনীর মেজর ছিলেন।

যতীন দাসের পিতা ভবানীপুরে গিরীশ মুখার্জী রোডে যখন থাকতেন সম্ভবতঃ তখন তাঁর সংগে বিপ্লবীনায়ক শচীন্দ্রনাথ সান্যালের পরিচয় ঘটে। শচীন সান্যাল ছিলেন রাসবিহারীর সহকর্মী এবং ভারতের বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংস্থাকে এক সূত্রে বাঁধার জন্য শচীন সান্যালের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। এই শচীন্দ্র সান্যালই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের ১৮ তারিখে রাসবিহারীর কাছে বোমা ছোঁড়ার অনুশীলনের কালে আহত হন। সন্তোষকুমার অধিকারী রচিত এই গ্রন্থে ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা এবং রূপায়ণ বিষয়ে সংক্ষেপে অনেক মূল্যবান তথ্যাদি পরিবেশিত হয়েছে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শচীন্দ্র 'হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে ছিলেন। আর যতীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র কুড়ি তখন তিনি এই দলে যোগদান করেন। পরে তিনি শচীন্দ্র সান্যালের ডান হাত হয়ে দাঁড়ান—একথা বলেছেন শচীন্দ্র সান্যালের স্ত্রী শ্রীমতী প্রতিভা সান্যাল। তরুণ যতীন দাস সম্পর্কে সেকালের বিপ্লবীরা একবাক্যে প্রশংসা করেছেন তাঁর দৃঢ়তা, সৎসাহস ও নির্ভীক মনোভঙ্গীর জন্য।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দ অনেক দিক থেকে বিপ্লবের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য বৎসর। এই বছর জানুয়ারী মাসে চৌরঙ্গীর প্রকাশ্য রাজপথে আরনেস্ট ডে নামক জনৈক ইংরাজ ভদ্রলোককে টেগার্ট ভ্রমে হত্যা করেন গোপীনাথ সাহা। গোপীনাথ তার মৃত্যুর কালে বলেছিলেন—'আমার রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে বিপ্লবের বীজ ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়বে।'

দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র এবং দেশের অন্য সকল নেতৃবৃন্দ গোপীনাথের দেশপ্রেমের প্রশংসা করেন। সুভাষচন্দ্র জেল-গেটে উপস্থিত ছিলেন। পরে সেই বছরই তিন আইনের বলে সুভাষচন্দ্রকে আটক করা হল।

যেহেতু শচীন সান্যালের সহকারী যতীন দাস সেই হেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায় তাঁকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের আওতায় জেলে আটক করা হল। আর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ তারিখে যতীন্দ্রনাথের ছোট ভাই কিরণচন্দ্র দাসকে বাংলা থেকে বহিষ্কার করে দিল্লীতে রাখা হল। এদিকে যতীন্দ্রনাথকে ময়মনসিং জেল থেকে পাঠানো হল পাঞ্জাবের মিয়ানওয়ালী জেলে। ১৯২৮-এ যতীন্দ্রনাথের ভগ্নীর অসুস্থতার জন্য কলকাতায় আনা হয় পরে তাঁকে চট্টগ্রামে অন্তরীণ রাখা হয় কিন্তু সেই বছর অক্টোবরে তিনি মুক্তি লাভ করেন এবং বঙ্গবাসীতে বি এ ক্লাশে ভর্তি হন।

সমস্ত দেশ যখন প্রস্তুত তখন কিন্তু দেশের নেতৃবৃন্দ অপ্রস্তুত। এই কথাটি সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন। এই সময় রংপুরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে যতীন দাস, সতীশ পাকরাশি, অম্বিকা চক্রবর্তী, নিরঞ্জন সেন মিলিত হয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আকস্মিক অভ্যুত্থানের জন্য পরিকল্পনা করেন।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে লালা লাজপত রায়কে পুলিশ লাঠির দ্বারা নির্মম আঘাত করে সাইমন কমিশন বিরোধী এক জনসভায় বক্তৃতার সময়। লালাজীর এই আঘাতে ১৯২৮-এর ১৭ই নভেম্বর মৃত্যু হয়। ১০ই ডিসেম্বর চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বে স্থির হল হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিক্যান আর্মি (দলের পরিবর্তিত নাম) স্কট এবং স্যান্ডার্সকে হত্যা করে লালাজীর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। ১৭ই ডিসেম্বর স্যান্ডার্সকে গুলী করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডে পুলিশ ও সরকার বিশেষ বিচলিত হয়ে উঠে। এরপর যতীন দাসকে ভগৎ সিং বলেন,...

এইচ এস আর এ' পার্টির পক্ষ থেকে আমি আপনার সাহায্য চাই। ভগৎ সিং চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে। তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন বটুকেশ্বর দত্ত। এরপর ১৯২৯এর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করা হল এবং যতীন দাসকে লাহোর বোরস্টাল জেলে আটক করা হল।

ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দাবী করেছিলেন যে, লাহোর মামলার সকল বন্দীদের এবং তাঁদের সকলকে রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এই দাবী নিয়ে তাঁরা অনশন করেছিলেন। অন্য সঙ্গীরাও সমবেতভাবে অনশনের সংকল্প করলেন। যতীন দাসের পূর্বে অভিজ্ঞতা ছিল অনশনের। তিনি বলেছিলেন আমাদের মধ্যে যদি কেউ সফল হয়ে মরতে না পারি অনশনের ফলে, তাহলে আমাদের এই অনশন ধর্মঘট ব্যর্থ হবে। সরকার কিছুতেই রাজী হবেন না।

১৩ই জুলাই তারিখে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ঐতিহাসিক অনশন শুরু হল। রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি মানবিক আচরণ দেখানো হোক এই দাবীতে রাজবন্দীগণ অটল। জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা হল—কিন্তু তা ব্যর্থ হল। যতীন দাসই এই কাজে বাধা দিলেন। কিন্তু তিনি বাধা দিতে গিয়ে আহত হলেন।

সমগ্র দেশে যতীন দাসের অনশনে এক মহাচাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। সরকার নানাভাবে চেষ্টা করলেন যতীন দাসের মৃতদেহটা যেন কলকাতায় আনা না হয়। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। যতীন দাস বুঝতে পেরেছিলেন সরকারি চাল। তিনি অনুমতি আদায় করে নিয়েছিলেন যে কেওড়াতলায় তাঁর মাতা জননী ও ভগ্নীর চিতার পাশে তাঁকে যেন সমাহিত করা হয়। কিরণ দাসকেও যতীন দাস সেই নির্দেশ দান করেন।

ইতিমধ্যে সকলেই যতীন দাসকে অনুরোধ করেন অনশন ত্যাগের। তাঁর সহকর্মীগণ এমন কি ভগৎ সিংও অনুরোধ করেন অনশন ত্যাগে। যতীন্দ্রনাথ অবিচল।

সরকার চেষ্টা করেছিলেন জামিনে যতীন দাসকে ছেড়ে দিতে। তাহলে মৃত্যুর দায়িত্ব এড়ানো যায়। কিরণ দাস সে চালাকিটা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি তাই প্রত্যাখ্যান করলেন সেই ঘৃণিত প্রস্তাব।

দেশের সর্বত্র এদিকে দারুণ চাঞ্চল্য। সত্যেন্দ্রচন্দ্র পরিচালিত দৈনিক 'লিবার্টি' পত্রিকার ১১ই আগস্ট তারিখে প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধের নিম্ন উদ্ধৃত অংশটুকু পাঠ করলে সেদিনের জনসমাজের মানসিক আকুলতা উপলব্ধি করা যায়। লিবার্টি লিখেছিলেন—

"the fate of these high spirited youngmen is trembling in the balance, any morning we may woke up to learn they have passed beyond the reach of the Jail Codes."

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯ —জেলের ভিতর ১-০৫ মিঃ বিপ্লবী নায়ক যতীন দাস মৃত্যুবরণ করলেন। পাশে দাঁড়িয়ে জেলের অফিসার, ডাক্তার আর অনুজ কিরণ দাস। জেল গেট পর্যন্ত জেলের বন্দীরা মরদেহ বহন করে নিয়ে এল। নতমুখে সবাই গেয়ে উঠল বন্দেমাতরম্। পুলিশ সুপার হ্যামিলটন হার্ডিংও হ্যাট খুলে মৃতের প্রতি সম্মান দেখালেন।

লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকা সেদিন লিখেছিল 'ম্যাকসুইনির মৃত্যুতে আয়ারল্যান্ড স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। কে বলতে পারে দাসের এই আত্মাহুতিতে ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হবে না?' টেরেন্স ম্যাকসুইনির স্ত্রী এই কথাই বলেছিলেন কলিকাতার মেয়রকে প্রেরিত তারবার্তায়।

হয়তো ... নব দধীচির হাড়ে ... সবাই মহৎ ... হয়েছেন। সেদিনের সেই সর্বজনের শোক আজো অন্তরে আগুন জ্বেলে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ তপতী নাটকের মহড়া দিচ্ছিলেন সেই সময় এই নিদারুণ সংবাদ এলো। তিনি মহড়া বন্ধ করে লিখলেন—

'দূরে করো মহারাজ, যা মুগ্ধ যাহা ক্ষুদ্র
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ, প্রাণের উৎসাহ।'

মৃত্যুঞ্জয় যতীন্দ্রনাথের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য জীবনী। কবি ও প্রবন্ধকার সত্যেন্দ্রকুমার অধিকারী অসামান্য কৃতিত্বে সুন্দর ভঙ্গীতে এই অবিস্মরণীয় মহাজীবনের কাহিনী রচনা করেছেন তার জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য। সমৃদ্ধিত ও সুকল্পিত এই গ্রন্থটিতে অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য ছবি আছে।*

—অভয়ঙ্কর

* শহীদ যতীন দাস ও ভারতের বিপ্লব আন্দোলন (জীবনেতিহাস) —সত্যেন্দ্রকুমার অধিকারী। জে এন ঘোষ এণ্ড সন্স, কলিকাতা-১২।। দাম-চারটাকা মাত্র।।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অষ্ট সপ্ততিতম জন্মোৎসব : গত ২৮ ভাদ্র শনিবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাকক্ষ রমেশ ভবনে ... প্রয়াত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অষ্ট সপ্ততিতম জন্মোৎসব উদযাপিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন। সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত এই মনোজ্ঞ সভায় খ্যাতিমান সাহিত্যিক, সুধী ও অনুরাগীদের সমাবেশ হয়। বিভূতিভূষণের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন কথাসাহিত্যিক মনোজ বসু, বনফুল, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ এবং সমালোচক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এঁদের অনবদ্য ভাষণে ... বিভূতিভূষণের অন্তরঙ্গ জীবনকথাই নয়—বাংলা সাহিত্য সেবায় তাঁর স্বকীয়তা ও মৌলিকত্বের দিকটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বনফুল, বিভূতিভূষণের উদ্দেশ্যে স্বরচিত দুটি কবিতা পাঠ করে সভার আনন্দবর্ধন করেন। অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষণে বিভূতিভূষণের সাহিত্যের অবিনশ্বরতার দিকটি প্রকটিত করে তোলেন। সভাপতি ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর ভাষণে বলেন—বিভূতিভূষণের মনটি ছিল শিশুর মত। তাঁর সাহিত্যের লক্ষণীয় দিক একেবারে সহজ কৌতূহলে সারল্য ... দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি ছিলেন মাটির কাছাকাছি মানুষ। ... তাঁর সাহিত্য তাঁর রচনা আগামী কালের পাঠক সমাজকে আনন্দ দান করবে ও ... সাহিত্য রসপিপাসাকে চরিতার্থ করে তুলবে। পরিষদের চিত্রশালায় বিভূতিভূষণের একখানি তৈলচিত্র স্থাপন-বিষয়ক কালীপদ ...চার্য মহাশয়ের প্রস্তাবটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পরিষদ সম্পাদক অধ্যাপক মদনমোহন কুমার অনুষ্ঠান সভাপতি, অতিথিবৃন্দ, সমবেত সজ্জন ও সুধীবৃন্দকে পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মন্মথ রায়ের সম্বর্ধনা : সাহিত্য সংস্থার উদ্যোগে ১৭ সেপ্টেম্বর নাট্যকার মন্মথ রায়কে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কবি গোপাল ভৌমিক এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসু।

সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীমন্মথ রায় বলেন এতে আমি অভিভূত। ভবিষ্যতে আমি থাকব কি থাকব না, তা বিচার করবে মহাকাল। আমি চাই, বাংলা নাটকের মান এত উন্নত হোক, যাতে কেউ আর ভবিষ্যতে আমার নামও করবে না।

সাহিত্য সংস্থার পক্ষ থেকে নাট্যকারকে মানপত্র অর্পণ করা হয়। তাঁর জীবন ও সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করেন দেবনারায়ণ গুপ্ত, জয়কৃষ্ণ সান্যাল, স্বপনবুড়ো। কয়েকজন কবিতা পাঠ করেন।

পুরস্কার : কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণ মন্ত্রক আঞ্চলিক ভাষায় রচিত গ্রন্থ ও পান্ডুলিপির জন্য সাতজন লেখককে পুরস্কৃত করবেন। মাতৃভাষা বা হিন্দী ও সংস্কৃত বাদে অন্য কোন ভারতীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। পুরস্কারের সম্মান মূল্য ১০০০ টাকা। মারাঠী লেখিকা শ্রীমতী সরোজিনী কামাতনারকার বাংলা ভাষায় শ্রীনামক নাটক রচনার জন্য ১৯৭১-৭২ খৃঃ এই পুরস্কার গ্রহণ করবেন।

রবীন্দ্রকাব্যে অলংকার : জটাধারী মালাকার। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা—৩২।

ডকটর জটাধারী মালাকার তাঁর এই গবেষণা-গ্রন্থে পর পর আটটি অধ্যায়ে কবিতার উৎস-ভাবনা থেকে শুরু করে, কাব্যে অলঙ্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে রবীন্দ্র-কাব্যে অলংকারের বৈচিত্র্য ও রবীন্দ্র-কবিমানসের বিভিন্ন সন্ধান ও উপলব্ধি সূত্রে অলঙ্কারের পর্যায়ভেদ দেখবার চেষ্টা করেছেন। 'পরিশিষ্ট' অধ্যায়টিতে অলঙ্কার-তালিকা ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'শৈশব-সংগীত', 'সন্ধ্যা-সংগীত' ইত্যাদি থেকে শুরু করে 'শেষ লেখা' অবধি মোট বাহান্নখানি কবিতার বইয়ের ২৮৭০টি কবিতার মোট ৯০৩৫০ পংক্তি তাঁর এই আলোচনার বিষয়ীভূত। তিনি দেখিয়েছেন যে, এইসব রচনায় ৫৫৫২টি অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটেছে। অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী রবীন্দ্রকাব্যে চিত্রধর্মিতার দিকটি প্রধান বলে উল্লেখ করেছিলেন। ডকটর মালাকার সেই সঙ্গে স্বভাবোক্তির প্রসঙ্গও বিশেষভাবে দেখিয়েছেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃত আলঙ্কারিক পরিভাষার লক্ষণে পুরোপুরি মিল না পেয়ে তিনি নিজেই নতুন নাম ব্যবহার করেছেন, যেমন সাঙ্গরূপকের ধারণা থেকে 'সাঙ্গ-উপমা' নামটি (৬১ পৃষ্ঠা)। ১৮৭৮—৮৬ কবির আত্মানুসন্ধান ও আত্মোপলব্ধির যুগ, ১৮৮৬—১৯০০ প্রেম ও সৌন্দর্যোপাসনার যুগ, ১৯০০—১৯১৫ অধ্যাত্ম-ভাবনার যুগ,—এই ধরনের পর্যবিভাগ সংগত কিনা, সে-বিষয়ে ডকটর মালাকার নিজেই আরো পরিণত জীবনে পুনর্বিবেচনার সুযোগ পাবেন। এবইয়ে এইসব কথা বলতে গিয়ে তাঁকে তাঁর মূল বিষয় থেকে কতকটা অন্য প্রসঙ্গে কালক্ষেপ করতে হয়েছে। এইসব অংশের অনাবশ্যক বিস্তার কমালে বইখানি আরো সংহত আলোচনার আধার হতে পারতো। বরং সংস্কৃতের সমাসোক্তির তুলনায় রবীন্দ্রনাথের সমাসোক্তি ঠিক কোন্ কোন্ কারণে পৃথক, কী কী লক্ষণে বিশিষ্ট (পৃষ্ঠা ১৪৭—৪৮) এ প্রসঙ্গে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলে ভাল হোতো। এই রকম আরো কোনো কোনো কথা মনে জেগে ওঠে। 'পরিশিষ্ট' অধ্যায়ে 'রবীন্দ্র-কাব্যে অলঙ্কার—সম্পূর্ণ তালিকা'টিই এ-বইয়ের সর্বাধিক আকর্ষণ। তবে এই তালিকায় অনুপ্রাস, সঙ্কর, সংসৃষ্টি ধরা হয় নি—সে কথা ডকটর মালাকার নিজেই জানিয়েছেন।

লেখকের অধ্যবসায়, অন্তর্দৃষ্টি ও অনুরাগের ফলে এই বইখানি বাংলায় রবীন্দ্র-চর্চার ধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে স্বীকৃত হবে।

অনির্বাণ দীপ (উপন্যাস) **:** অধীর বিশ্বাস। বিহার সাহিত্য ভবন, ৩৭এ কলেজ রো, কলকাতা—৯ থেকে প্রকাশিত। দাম চার টাকা।

পপুলার সাহিত্য বলতে যা বোঝায় অধীর বিশ্বাসের অনির্বাণ দীপ ঠিক তাই। সহজ বুদ্ধির পাঠক শ্রেণীকে তাৎক্ষণিক আনন্দ দেওয়ার ক্ষমতা এ-উপন্যাসে প্রচুর। উপন্যাসের আরম্ভ এবং শেষে যেসব ঘটনা বিস্তার, বিদগ্ধ মহল তার যৌক্তিকতা বা বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে পারেন, কিন্তু সিনেমা-থিয়েটারে দেখেছি, এই রকম সব পরিস্থিতিতেই দর্শকরা হাততালিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখর করে তোলেন। সহজভাবে লেখা সহজবোধ্য বিষয়বস্তুর জনপ্রিয়তা সর্বদেশে, সর্বকালে।

তবলার ইতিবৃত্ত : শম্ভুনাথ ঘোষ। ইন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৬৬, বিবি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, লিলি লজ, কলিকাতা—১২। মূল্য দশ টাকা।

বর্তমানে সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হচ্ছে, বিশেষ করে কণ্ঠ-সংগীত এ বিষয়ে অগ্রগণ্য। যন্ত্রসংগীতের মধ্যে তবলা সম্বন্ধে উপপত্তিক আলোচনা-সমন্বিত পুস্তকের বিশেষ অভাব রয়েছে, যদিও ক্রিয়াত্মক আলোচনার কিছু বই বেরিয়েছে।

অধ্যাপক ঘোষের "তবলার ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে তবলা সংক্রান্ত মোটামুটি সকল বিষয়ই স্থান পেয়েছে এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের আলোচনা পরিমিত, তথ্যপূর্ণ ও সুলিখিত। বাংলা এবং ভারতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ তবলাবাদকের জীবনী পুস্তকটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। তবলাজ্ঞানান্বেষীরা এই পুস্তকটির দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। পুস্তকটির ছাপা এবং বাঁধাই বেশ পরিচ্ছন্ন।

—হরপ্রসাদ মিত্র

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

তিনটে বেড়াল ও আমি (কাব্যগ্রন্থ)—অজয় নাগ। বিশ্বজ্ঞান, ৯।৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯। দু টাকা।

স্মৃতির বিষাদে অজয় নাগ একজন আত্মমগ্ন কবি। যৌবন ও শৈশবের স্বপ্নময়তায় তিনি শুনতে পান অলৌকিক ঘণ্টার শব্দ। যদিও স্বপ্নভঙ্গের ক্লান্তিই ফুটে ওঠে তাঁর কণ্ঠস্বরে। স্বগত সংলাপে।

এই কাব্যগ্রন্থে কবিতা আছে ছেচল্লিশটি। অধিকাংশই ব্যক্তিগত উপলব্ধির ফসল। কয়েকটি কবিতা লেখা হয়েছে নিস্তেজাল গদ্যে। ইমেজের ব্যবহারেও তিনি আত্মনিষ্ঠ। আমাদের বিশ্বাস, সমকালীন তরুণদের কাছে, তাঁর কাব্যগ্রন্থটি উপযুক্ত মর্যাদায় অভিনন্দিত হবে।

কদাচিৎ ॥ গোবিন্দ চক্রবর্তী

কদাচিৎ,
হাসিস্-মারিজুয়ানার নেশার মত,
দ্রৌপদীর দুর্বার, দেব শাড়ীর মত—
অসাধারণ কিছু অলৌকিক কবিতার ছায়া এসে পড়ে।
এত চটক, এত চমক
গা-মা-রে'র মত তীব্র-তীক্ষ্ম এত তির্যক দ্যুতি—

চৈতন্য থিতুতে না থিতুতে,
কলম বাগাতে না বাগাতে,
আকাশ যেমন নীল, তেমনি নীল।
মাটি যে সবুজ, সে-ই সবুজ।

বুকের মধ্যে,
বি-ফিফ্‌টিটু থেকে একশটন বোমা-ফাটার ক্ষত—
ইয়া-ইয়া পাহাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেও,
বোজে না।

আশ্বিনের এক শিউলি-ছাপা ভোরে,
চারিদিকে ঘোর বেগবান প্রখর শহর,
আমার চৌহদ্দির সীমানা-পাঁচিলে
যেখানে করমচা ঝোপের সরু নরম ডালের
নখ বিঁধে আছে,
নীল-হলুদ-বেগুনী-লালের মৌরীফুলী কোটিং :
অবিশ্বাস্য একটি হংসবলাকা এসেছিল
রাজকীয় গৌরবে, একদিন।

চমক ভাঙতে-না-ভাঙতে—
আস্তিন গোটাতে না গোটাতে,
চন্দ্রলোকে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের মত
হঠাৎ সাতরঙে জ্বলে উঠল ইথার।

বুকের মধ্যে,
সীমানা-পাঁচিলের সেই প্রগাঢ় শূন্যতা
ফুলন্ত করমচার সেই কঁকিয়ে-ওঠা হাহাকার—
এখনো থেকে-থেকে চাবুক কষায়।

ছায়ায় সবুজে প্রেমে ॥ দীপেন রায়

তুমি কোল পেতে দাও আমি মাথা রেখে
সম্মিলিত একাকারে প্রত্যাহার করে নিই
এতদিন যা কিছু গোপন রেখেছি শুধু
একাকী বিজনে শ্বেতপত্রে ঢাকা শোক
মৃত অহঙ্কার,—
অভিনিবেশের মতো জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে দেখেছি
প্রত্যহ খাঁচার থেকে উড়ে গিয়ে পাখি
ফসলের ক্ষেতে
প্রসব ব্যথার মতো কেবলই যন্ত্রণা ডানা নেড়ে
ছড়িয়ে দেওয়ার সব অস্থিরতায়
ফিরে পেতে চায় স্থিরতর সবুজ প্রত্যহ।
এখুনি এ যুদ্ধ জয়ে আত্মঅবিচলতার মাঠে
প্রতিদিন ঝড়ে হাজার পাখির
পালক খসানো নতা,
প্রচণ্ড আবেগে ঘন-চতুর্দিকে সূর্যে
প্রতিভাত দেবদারুর আশ্চর্য সে সহনশীলতা
বুক দিয়ে মানুষের জলাধার বাঁধার মতই
কেবল কঠিন থেকে কঠিনতর যে
তাকে ছুঁয়ে জেগে ওঠা মগ্ন বীজে যেন
মাটি থেকে আকারে প্রকারে দীর্ঘ ছায়ায় সবুজে প্রেমে।

আমরা সবাই ॥ অরুন্ধতী সেনগুপ্ত

আমরা সবাই চোরাবালিতে ঘর বেঁধে আছি
আমরা সবাই।
বর্তমান ধরব সে সাধ্য নেই
রুপোর মত ঝকঝকে ট্রেনের হাতল
পিছলে যায় চটচটে ঘামে
আমরা কোন নতুন পৃথিবীর মুখ দেখিনা
আমাদের মাঝখানে কাচের দেওয়াল
তোমাকে স্পর্শ করতে পারি না
তাই তো আমি তুমি অসম্পূর্ণ।
কয়েকটি ইঙ্গিত শুধু বহন করে
অনুমানের অপেক্ষায়—
পলিমাটির মত ভালবাসা।
বিদ্রোহী চেতনা বহন করে
দিনের পর দিন
ছেঁড়া পাতার মত অবিচ্ছিন্ন পড়ে থাকি।

[উপন্যাস]

দুজনে পাশাপাশি হাঁটছিলাম। আমার গা ঘেঁষে একটি রাজহংসীর মত হেলেদুলে চলছিল সুপ্রিয়া। ওর গা থেকে একটা মৃদু গন্ধ আসছিল। হয়তো কোন ফুলের গন্ধ, যে-ফুল আমি চিনি না। অথচ গন্ধটা খুব মিষ্টি এবং ফুল-ফুল মতন। অফিস ছুটির পর রোজ এই রাস্তা ধরে আমরা হেঁটে আসি। হাঁটতে হাঁটতে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত যাই, তারপর বাসে চড়ে বাড়ি ফিরি। সুপ্রিয়া যায় দক্ষিণে, আমি উত্তরে। ওর সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটতে আমার ভাল লাগে। আমার ধারণা, সেই ভাল-লাগা ওর মধ্যেও আছে। না হলে নিশ্চয়ই এতটা পথ ও হাঁটতো না। গোলদীঘির ধার থেকে ট্রামে কিম্বা বাসে চড়তো। একটা কথা কোনদিন মুখ ফুটে ওকে জিজ্ঞেস করা হয়নি, আমার সঙ্গে পাশাপাশি গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে হাঁটতে ওর ভাল লাগে কিনা। জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচ হয়, যেহেতু এ-ধরনের কথা জিজ্ঞেস করার মত নরম কোন সম্পর্ক ওর সঙ্গে গড়ে ওঠেনি আমার।

সুপ্রিয়াকে আমি ভালবাসি না। ওকে আমার ভাল লাগে। ওর সঙ্গে হাঁটতে সুখ হয়, কথা বলে আনন্দ পাই—এই পর্যন্ত। একে প্রেম বলে না। ব্যর্থতাকে আমি ঘৃণা করি। প্রেম ব্যর্থতা নিয়ে আসে। আমি সুপ্রিয়ার ব্যর্থ প্রণয়ী হতে চাই না। আমার বিশ্বাস সুপ্রিয়ার চিন্তাধারাও অনেকটা আমার মত। বিশেষ করে প্রেমের ব্যাপারে। তাই খুব সহজভাবে ও আমার সঙ্গে মিশতে পারে। এত সহজভাবে, যে সময় সময় ভুলে যাই, সুপ্রিয়া একজন মেয়ে; মনে হয়, ও আমার কোন পুরুষ বন্ধু।

দুজনে পাশাপাশি হাঁটছিলাম। মধ্য-ঋতু শরতের আরম্ভ। সর-সর করে হাওয়া দিচ্ছে। রোঁয়ায় কাঁপুনি ধরাচ্ছে, সেই কাঁপুনি মনে ছড়িয়ে পড়ছে। ঠিক কাঁপুনি না অবশ্য, কী বলবো, একটু যেন শিহরণ জাগছে মনে। অকারণে পুলকের ছোট ছোট ঢেউ মনের ওপর দিয়ে আনাগোনা করছে। ঠিক অকারণে যে তা-ত না। সুপ্রিয়া পাশে থাকলে, এ-ধরনের একটা অনুভূতি আমার মনে আসে। একে মনের দুর্বলতা বলে না। দুর্বলতা আসে তখনই, যখন মানুষ প্রেমে পড়ে। সুপ্রিয়ার সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক নয়। ঈশ্বর করুন, সে-ধরনের কোন সম্পর্ক যেন আমাদের মধ্যে গড়ে না ওঠে কোনদিন।

আজকের আকাশ গাঢ় নীল। তাতে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য অস্ত যাবে। বড় এক খণ্ড মেঘকে কাটিয়ে দিয়ে সূর্যের তীক্ষ্ন কোমল রশ্মি নীচে এসে পড়েছে। নীচে এসে সুপ্রিয়াকে ঘিরে ধরেছে। সুপ্রিয়া যেন জ্বলছে। জ্বলছে ঠিক না, ওকে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। সমস্ত দিনের মধ্যে এই সময়টা আমার খুব ভাল লাগে। এই যে আলোর তীব্রতা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছে, একটা প্রখর দিনের পরিসমাপ্তি ঘটে যাচ্ছে, অথচ এই পরিসমাপ্তির মধ্যে কোন উত্তেজনা নেই, কিম্বা তীব্র বিষাদ মনকে উদ্বেল করে তুলছে না, শুধু এক নিবিড় অনুভূতি অন্তরে অপার্থিব মমতা-বোধ এনে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, কী যেন ছিল, সে হারিয়ে গেল। কিন্তু এই হারানোর মধ্যে কোন দুঃখবোধ নেই। আছে এক ধরনের মমতামাখানো প্রচ্ছন্ন পুলক, যা সেই মুহূর্তে আমাকে সীমাহীন এক জগতে নিয়ে যায়।

দিনান্তের এই মন্থর আলোয় এক-একদিন আমি একটা ছবি খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। মুহূর্তের মধ্যে চারপাশের লোকজন, বাস, গাড়ি, ট্রাম-চাকার ধাতব ঘর্ষণ—সবকিছুই হারিয়ে যায়। এক স্তব্ধ জগতের মাঝে দাঁড়িয়ে তখন ছবিটা দেখতে থাকি।

অথচ ছবিটা কবে কোথায় দেখেছি বলতে পারবো না।

হয়তো খুব ছেলেবেলায় কোন এক মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, কিম্বা কাগজে আঁকা কোন ছবি, বা এমনও হতে পারে, এ-ধরনের কোন ছবি আদৌ আমি দেখিনি।

কিন্তু ছবিটা, কী জানি কী করে, আমার মনের মধ্যে রয়ে গেল।

ছবিটা একটা বিরাট আকাশের, আকাশের রং গাঢ় নীল, তার গায়ে নিস্তব্ধ মেঘের বড় বড় স্তূপ, আর প্রকাণ্ড বড় সাদা একটা পাখি, ওর ডানাদুটো দুদিকে ছড়ান। পাখিটা উড়ছে না, শুধুই ভাসছে। নীচে একটা মাঠ, টিয়া-টিয়া রং। দিগন্ত-বিস্তৃত এই মাঠের সমাপ্তি নীল আকাশের গায়ে গা দিয়ে। এই ছবিটা এক-একদিন আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ভেসে ওঠে তখনই যখন আমার মন খুব ভাল থাকে।

কনুই দিয়ে ছোট্ট একটা খোঁচা দিয়ে সুপ্রিয়া বলল, 'অ্যাই, কী ভাবছো তখন থেকে?'

চমকে তাকালাম। সুপ্রিয়া শব্দ করে হাসল, বলল, 'কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গেলে?'

সে কথা ওকে বলা যায় না। ও হাসবে, অন্যরকম ভাববে, ওকে অন্যরকম ভাববার অবকাশ দিতে চাই না। বললাম, 'কিছু না।'

'কিছু একটা নিশ্চয়, না হলে মানুষ হঠাৎ অন্য জগতে চলে যায় না।' সুপ্রিয়া ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল।

'ভাবছিলাম ঠিক না, দেখছিলাম, [illegible] নীল আকাশটা ধীরে ধীরে [illegible] রকম [illegible] হয়ে উঠছে।'

সুপ্রিয়া কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দৃষ্টি সরিয়ে নিতে নিতে বলল, 'সেটাই নিয়ম, কোন কিছুই চিরস্থায়ী হয় না।'

ওর বলার মধ্যে একটা নীরস সুর ছিল। ভাল লাগল না। সুপ্রিয়ার দিকে তাকালাম। ওর মুখে মৃদু একটা হাসি লেগে রয়েছে। ও যেন আমাকে উপহাস করছে। বললাম, 'তুমি একজন দার্শনিকের মত বললে।'

সুপ্রিয়া এবার স্পষ্ট করে হাসল। আমার দিকে ফিরে তাকাল। ওর হাতে চিনেবাদামের একটা ঠোঙা ছিল। সেটা আমার হাতে গুঁজে দিতে দিতে বলল, 'তোমার খিদে পেয়েছে। সেই কখন টিফিন খেয়েছো।' সুপ্রিয়া তখনও হাসছিল। হাসলে সুপ্রিয়ার চোখের পাশের কোণা-দুটো কুঁচকে যায়। এতদিন ধারণা ছিল, এ-ধরনের হাসি যে মানুষ হাসতে পারে, সে-মানুষ ভাল হয়। হঠাৎ সেই মতের পরিবর্তন ঘটল। মনে হল হাসার সংগে সংগে যার চোখ ছোট হয়ে যায়, আর দু' পাশের চামড়ায় কুঞ্চন ঘটে, সেই জাতের মানুষ কখনও সরল সাদাসিধে হয় না।

'তোমার মনে এখনও নীল আকাশটা খুব কাজ করছে। অথচ, তাকিয়ে দেখো, এখন আকাশে কোন রং নেই।'

তাকিয়ে দেখার প্রবৃত্তি হল না। মড়-মড় করে বাদামের খোলা ছাড়াতে লাগলাম। কে বলবে, কিছুক্ষণ আগেই আমি নিস্তব্ধ একটা জগতের মধ্যে দাঁড়িয়ে নীল আকাশের গায়ে বিরাট একটা পাখি দেখছিলাম, টিয়া-টিয়া রংয়ের বিশাল মাঠটা আমার চোখেরই খুব নিকটেই ছিল। এই মুহূর্তে আমার মনে হল সেই ছবিটা হয়ত জন্মের মত হারিয়ে গেল।

দুজনে পাশাপাশি হাঁটছি, সুপ্রিয়া দ্রুত গতিতে আমার সংগে তাল ঠুকে হাঁটছে, আমি জোরে হাঁটছিলাম, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সকালে অফিসে বেরোবার আগে মা খুক খুক করে কাশছিল। যদিও মা বলেছে 'ও কিছু না' আমি জানি এ ধরনের কাশি হলে মার জ্বর হতে চায়। যদি জ্বর হয়, মাকে দেখবার কেউ নেই। ঠিকা মেয়েটি সন্ধ্যে হবার আগেই চলে যায়। মা সম্পূর্ণ একলা হয়ে পড়ে।

'তোমাকে কি কুকুর তাড়া করল?' বলেই আমার একটা হাত ধরে ফেলল সুপ্রিয়া, পর মুহূর্তেই হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, 'হঠাৎ ছুটতে শুরু করলে কেন?'

'একটু তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার, মার শরীরটা ভাল না।'

'সেই কথাটা হঠাৎ মনে পড়ল? আগেই ট্রাম বাস ধরা উচিত ছিল,' যদিও সুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকাইনি, ওর কণ্ঠ-স্বরে স্পষ্ট বিরক্তির আভাষ।

উত্তর দিলাম না। এ ধরনের কথা শুনতে আমি পছন্দ করি না। কেউ উপদেশ দিতে এলে আমার বিরক্তি বোধ হয়। বিশেষ করে সে যদি মেয়ে হয়। আঠাশ বছরের কোন পুরুষ তার সমবয়সী বা এক আধ বছরের ছোট কোন স্ত্রীলোকের উপদেশ শুনলে যে খুশী হয় না, সুপ্রিয়ার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের সে কথাটা অন্তত জানা উচিত। সুপ্রিয়ার বয়স যে আমার বয়সের খুব কাছাকাছি এ কথাটা সুপ্রিয়াই গায়ে পড়ে আমাকে জানিয়ে দিয়েছে। অথচ ওকে দেখে অনেক কম বয়স বলেই মনে হয়েছিল আমার। কথাচ্ছলে ও আমাকে জানিয়েছিল যেবার ফিজিক্স অনার্স নিয়ে আমি বি-এস-সি পাশ করি তার পরের বছরই ইকনমিকসে অনার্সে বি. এ পাশ করেছে ও, তারপর অ্যাসিসট্যান্ট হয়ে ঢুকলাম আমি, আর সুপ্রিয়া ঢুকল টাইপিস্ট হয়ে। প্রায় বছর পাঁচেক আগের কথা এসব। শুনেছি সুপ্রিয়া নাকি শিগগিরই প্রমোশন পাবে। বড় সাহেবের পি-এ হবে নাকি। আমার এক কলিগ সামু মজুমদার (সামু না বলে শামুক বলাই হয়ত ঠিক, যেহেতু আমার ধারণা লোকটা সব সময়ই একটা শক্ত আবরণের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। ওর আসল চেহারাটা যে কী, আজ পর্যন্ত জানা হল না) সেদিন অকারণে হাসতে হাসতে বলেছিল, 'চাকরির ব্যাপারে চেহারাটাই হচ্ছে মেয়েদের মেইন অ্যাসেট। তাছাড়া—' চোখ ছোট করে দূরবীনের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে দেখবার মত করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলন বলনও ভাল। এই সব মেয়েরাই তো পি-এ হবার উপযুক্ত মানুষ।' গায়ে পড়ে মজুমদারের আমাকে এসব কথা বলার একেবারে যে কোন অর্থ নেই, তা না, সুপ্রিয়া আর আমি প্রায় দিনই একসংগে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত হেঁটে যাই। মজুমদার নাকি একদিন সুপ্রিয়ার সংগে হেঁটে যাবার প্রস্তাব করেছিল। তখন আমি ফ্লুতে শয্যাশায়ী। সুপ্রিয়া বলেছিল ওরও নাকি ফ্লু ফ্লু মনে হচ্ছে, তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা দরকার, সেদিন ওকে ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল, কথাটা আমার জানার কথা না। অফিসে আসতে সুপ্রিয়াই বলেছিল সব, আর নকল রাগ দেখিয়ে আমার কাছ থেকে ট্যাক্সির ভাড়াও চেয়েছিল। সেদিনই সামু মজুমদারকে মনে মনে শামুক মজুমদার বলে ভাবতে শুরু করেছিলাম। সুপ্রিয়ার কোন ব্যাপার নিয়ে আমাকে কিছু বলার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা ক্ষোভের ইংগিত আমি বুঝতে পারি। বুঝতে পারি বলেই মজা পাই। মজুমদার তা বোঝে না। অথচ লোকটা প্রচণ্ড বুদ্ধিমান। মনে হয়, সময় সময় ওর বুদ্ধিটাও শক্ত আবরণের আড়ালে হারিয়ে যায়।

আচমকা পা পিছলে গেল, অন্যমনস্ক-ভাবে পথ চলার এই দোষ। কে কোথায় কি ফেলে গেল, পা গিয়ে পড়ল সেখানে, আর অমনি—

'কী হলো!' সুপ্রিয়ার বলার সংগে সংগে দু' হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। মনে হল মুহূর্তের জন্য সুপ্রিয়াও যেন আমাকে ধরে ফেলেছিল। এত লোকজনের মাঝে আলিংগনাবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বিষম অপ্রস্তুত বোধ করলাম। নিমেষে দূরে সরে গিয়ে বলে উঠলাম, 'শালা! রাস্তাটা যেন ডাস্টবিন করে তুলেছে।' কথা বলতে বলতে সুপ্রিয়ার মুখ দেখবার চেষ্টা করছিলাম, ওর মুখটা রেড রোডের দিকে ফেরানো, সূর্য অস্ত গেছে। বাতাসে একটা লাল আভা ছড়ান, সুপ্রিয়ার মুখের যে অংশটুকু নজরে পড়ছিল, মনে হল সেই আভা সেখানেই পড়েছে। আরও একটা কথা মনে পড়ল, যে মুহূর্তে আমার পা পিছলে গিয়েছিল, দু হাত দিয়ে সুপ্রিয়াকে জড়িয়ে ধরেছিলাম, তখন আমার মুখ সুপ্রিয়ার বুক স্পর্শ করেছিল। প্রথমে মনে হয়নি, এখন যেন মনে হচ্ছে, সেই মুহূর্তে আমার মুখে খুব কোমল একটা স্পর্শ অনুভব করেছিলাম।

রাজভবনের পাশ দিয়ে এসপ্ল্যানেডের দিকে চলেছি। পিছনে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বাড়িটা, ডান পাশে রেড রোড। সুপ্রিয়ার মুখ তখনও রেড রোডের দিকে ফেরানো। ইচ্ছে হচ্ছিল সুপ্রিয়ার হাত চেপে ধরে খুব মিনতি করে বলি, 'তুমি রাগ করো না সুপ্রিয়া, ইচ্ছে করে আমি তোমার বুক স্পর্শ করিনি। ইচ্ছে করে আমি সবার সামনে তোমাকে জড়িয়ে ধরিনি।' এখন যেন আমার মনে হচ্ছিল আমি যদি আর একটু সাবধানে হাঁটতেম, হয়ত পা পিছলাতো না, কিম্বা পিছলালেও এমন প্রচণ্ডভাবে সুপ্রিয়াকে জড়িয়ে ধরবার বা ওর বুকে মুখ ছোঁয়াবার প্রয়োজন পড়ত না। জানি না, সুপ্রিয়া এ-ধরনের কথা ভাবছিল কিনা। হয়ত মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটার জন্যে সুপ্রিয়া আমাকেই দায়ী করছিল, না হলেও স্বাভাবিকভাবে আমার সংগে কথা বলতে পারত। অথচ সরল মন নিয়ে দেখতে গেলে ব্যাপারটায় আদৌ কোন গুরুত্ব নেই। হঠাৎ একজন পুরুষ পা পিছলে পড়ে যেতে যেতে হাতের সামনে একটি নারীকে অবলম্বন হিসেবেই জড়িয়ে ধরেছিল, আর দৈব ঘটনার মত সেই নারীর বুকে এসে পুরুষের মুখ স্পর্শ করেছিল। নেহাতই একটা ঘটনা। যে-ঘটনার ওপর নারী কিম্বা পুরুষটির কোন হাতই ছিল না। অথচ সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই, সুপ্রিয়ার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে সরল ব্যাপারটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে অন্যরকম করে বুঝল। চকিতে আর একটা কথাও মনে পড়ে গেল সুপ্রিয়া কি সত্যি সত্যিই রেগেছে, না লজ্জা পেয়েছে?

বিব্রত ভাবটা কাটিয়ে ফেলবার একটা সুযোগ পাওয়া মাত্রই গলা ছেড়ে চীৎকার করে উঠলাম, 'এই মুড়িঅলা।' দূরে একটা লোক একটা টিন মাথায় নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল।

ধমকের সুরে সুপ্রিয়া বলে উঠল 'ওর মাথায় মুড়ি নেই।'

'আলবাৎ আছে।' জানি না, সামান্য একটা বিষয় নিয়ে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ার মত কী হলো।

সুপ্রিয়া রেড রোডের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল। ও কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, এ ধরনের টিনে মুড়ি থাকে না।' সুপ্রিয়ার চোখদুটো চেরা-চেরা মতন, আর দুদিকে লম্বাটে ধরনের। এ-ধরনের মেয়েরা খুব জেদী হয়, সুপ্রিয়াকে দেখে সেই কথা আমার মনে হয়েছে। কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম হঠাৎ সুপ্রিয়া বাঁদিকে মোড় ঘুরল বললাম, 'ওদিকে কোথায় যাচ্ছো? আমরা তো এখন রাস্তা ক্রশ করবো।'

সুপ্রিয়া দাঁড়াল না, কিম্বা পিছনও ফিরলো না, যেতে যেতে উত্তর দিল, আমার কাজ আছে।'

শপথ আমি হলফ করে বলতে পারি ওর কোন কাজ থাকতে পারে না। যদি থাকে কাজ শেষ না করে এতটা পথ হেঁটে আসার মেয়ে সুপ্রিয়া না। এতক্ষণে আমি স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলাম, সুপ্রিয়া সঙ্গ পায়নি, রেগেছে। মানুষের সহজাত রীতি হচ্ছে, স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা। জোরে নিশ্বাস ফেলতে গিয়ে অতর্কিতে মনে হল আমি সুপ্রিয়াকে বিষম ভয় করি। অথচ ভয় করার মত কোন কারণ কোনদিন ঘটেছে বলে মনে পড়ল না। বরং সুপ্রিয়া যে আমাকে বন্ধু বলে ধরে নিয়েছে, তার বহু ছোটখাটো নিদর্শন একে একে মনে পড়তে লাগল। সামান্য চিনেবাদামের ঠোঙাটা হাতের মধ্যে গুঁজে দেওয়ার মধ্যেও আমি এখন বন্ধুত্বের ছোঁয়া পেলাম। হাঁটতে হাঁটতে সুপ্রিয়া একবারও পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না। ওর ঋজু শরীর, সোজা হয়ে পথ চলা, দিনান্তের মন্থর আলো, গাছের মাথায় মাথায় চক্রাকারে পাখিদের ওড়াউড়ি দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার মনে হল, সুপ্রিয়ার মত মেয়ে আজকালকার পৃথিবীতে নিতান্ত প্রয়োজন, যারা কিনা দৃঢ় পদক্ষেপে স্থির সিদ্ধান্তে লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে যেতে পারে। তুলনায় নিজেকে বড়োই দুর্বল আর অসহায় বলে মনে হতে লাগল। কোন কোন বিরল মুহূর্তে মনে হয়, এই বিরাট পৃথিবীর মধ্যে আমি সম্পূর্ণ একলা হয়ে পড়েছি। আমার চারিপাশে জীবনের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। কোলাহলের জগৎ এতক্ষণ আমাকে ঘিরে রেখেছিল, হঠাৎ সেটা ভীষণ রকমের নীরব হয়ে পড়েছে। তখন নিজেকে অসহায় মনে হয়। মনে হয় আমি যেন হাত বাড়িয়ে কোন অবলম্বন খুঁজে বেড়াচ্ছি। অথচ কোথায় সেই অবলম্বন, আমি জানি না।

কতক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না, চলতে চলতে কখন আমার গতি রোধ হয়ে গিয়েছে তাও বলতে পারব না, হঠাৎ [illegible] করে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। অফিসের মজুমদার, আরও কজন লোক। দরজা খুলে দিয়ে মজুমদার বলল, 'আসুন।' অটোমেটিকের মত গাড়িতে উঠে বসলাম। পিছনে একবার তাকিয়ে দেখলাম, সুপ্রিয়ার দীর্ঘ ঋজু শরীর মানুষের ভীড়ে কোথায় হারিয়ে গেছে।

ভাগ্য ভাল মজুমদার বিশেষ কথা বলল না। শ্যামবাজারের মোড়ে সবাই নেমে গেল। ট্যাক্সি নিয়ে আমি চললাম। এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে, বাসে বাসে মানুষ ঝুলছে। মনে হল এভাবে ঝুলতে ঝুলতে আমি কিছুতেই আর যেতে পারব না। অথচ রোজ তো এভাবেই ফিরতে হয়।

মাঝপথে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে সিগারেট কিনলাম। অথচ সিগারেট বিশেষ খাই না। মনে হচ্ছিল কিছু একটা করা দরকার। হাত-পা গুটিয়ে থাকাটা ভয়ানক অস্বস্তিকর। তার চেয়ে বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া অনেক বেশী থ্রিলিং। হাসি পেল। একই মানুষ ক্ষণে ক্ষণে কী বিচিত্র চিন্তা করতে পারে। সবাই পারে কিনা জানি না, আমি পারি, দুর্বল মানুষেরা পারে, কিন্তু সুপ্রিয়া নির্ঘাৎ একসময় একই ধরনের চিন্তা করে, ও যেই মুহূর্তে মনে করেছিল, আমার সঙ্গ ওর ভাল লাগছে না, সেই মুহূর্তে ওর গতিপথের পরিবর্তন ঘটল। আমি শত চেষ্টা করলেও সেই পথ থেকে ওকে অন্য পথে নিয়ে যেতে পারতাম না, সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটাও মনে হল, সুপ্রিয়া ইচ্ছে করলে যে কোন মুহূর্তে আমাকে ওর নির্দিষ্ট পথে চালিত করতে পারে। সিগারেট ধরিয়ে ঘাড় নাড়লাম, না পারে না। যদিও বা পারত, আজ এই মুহূর্ত থেকে আর পারবে না। মুহূর্ত কথাটা কিন্তু বেশ। এক একটা বিশেষ মুহূর্ত কী দারুণ রকমের থ্রিলিং। শুনেছি ভয়ানক বর্ষার এক রাত্রিতে আমার জন্ম। সেই একটা বিশেষ মুহূর্ত যদি না আসত, আমি, শ্রীমান অংশুমান চট্টোপাধ্যায় পৃথিবীর আলো, গাছপালা পশুপাখি, এমনকি সুপ্রিয়াকেও দেখতে পেতাম না। কী বিচিত্র ব্যাপার! শুধুমাত্র একটা মুহূর্ত কী ভয়ানক ঘটনার সৃষ্টি করে চলেছে। সেই মুহূর্তে যদি পা না হড়কাতো, সুপ্রিয়া আমাকে পিছনে ফেলে রেখে দ্রুতবেগে অন্য পথ ধরত না নিশ্চয়ই।

'বাবু—' ড্রাইভারের ডাকে মনে পড়ল আমি একটা ট্যাক্সি চেপে বাড়ি ফিরছি, আমার মা সকাল থেকেই কাশছিল; কাশতে কাশতে মার জ্বর আসে, জ্বর বেশ কদিন ভোগায়, মা দুর্বল হয়ে পড়ে। আরও মনে পড়ল, অনেকক্ষণ আগেই কাজের মেয়েটি চলে গিয়েছে। এবারে সব সময়ের জন্য একটি লোক রাখতে হবে, মা আপত্তি করলে আর শোনা হবে না। ড্রাইভারকে পথের নিশানা জানিয়ে গভীর আরামে গা এলিয়ে দিলাম। এতক্ষণ যেন এক মল্লযুদ্ধে মগ্ন হয়েছিলাম, যুদ্ধে জয়ী হয়ে আমি উল্লসিত হয়ে পড়েছি, এই ধরনের একটা চেতনা আমার মধ্যে কাজ করতে শুরু করেছে হঠাৎ।

বাড়ি ফিরে দেখলাম মা সামনের বারান্দায় বসে পাশের বাড়ির দত্ত মাসীমার সঙ্গে গল্প করছে মা একটুও কাশছে না, কাছে গিয়ে মার কপালে হাত ঠেকাতেই মা বিস্মিত হল, জিজ্ঞেস করল, 'হঠাৎ আমার কপালে হাত দিচ্ছিস কেন রে?'

একটা ভারী বোঝা বুক থেকে নেমে গেল, মার গা একটুও গরম বলে মনে হল না। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম, মা বলল, 'হাত মুখ ধুয়ে আয়, আমি চা করে আনছি।'

হঠাৎ বলে ফেললাম, 'আমি চা খেয়ে এসেছি, তুমি বসো।' কেন যে মিথ্যে কথাটা বললাম জানি না অথচ বলে ভাল লাগল। এই মুহূর্তে মার সঙ্গে গল্প করতে ভাল লাগছিল। মুহূর্তগুলো সত্যি সত্যি কী বিচিত্র! এক একটা মুহূর্ত ক্ষণে ক্ষণে কী অপূর্ব অনুভূতির সৃষ্টি করে চলেছে, ভাবতে বিস্ময় জাগে।

দত্ত মাসীমা কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠে গেলেন মাও উঠবার চেষ্টা করছিল, হাত ধরে বসিয়ে রাখলাম। মা বসে বসে ছটফট করতে লাগল, 'রাত হয়ে গেল, তোর ভাতটা চাপিয়ে দিয়ে আসি।'

'আজ আর ভাত খাব না, খিদে নেই।'

'খিদে নেই কেন?'

'খুব খেয়ে এসেছি।'

'হঠাৎ বাইরে খেতে গেলি কেন?'

'অফিসের একজনের জন্মদিন ছিল, সে-ই খুব খাওয়ালো।' কী আশ্চর্য, পরপর এতগুলো মিথ্যে কথা বলতে একটুও আটকাল না। অথচ অকারণে মিথ্যে বলতে যে খুব একটা ভাল লাগে, তা না। আমি হয়ত এখন মার সঙ্গ কামনা করছিলাম। মনে মনে বিচার করে দেখলাম, সাধারণ নিয়ম অনুসারে আমার এখন দারুণ খিদে পাওয়া উচিত। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমার একটুও খিদে পায় নি। কেউ যেন সত্যি সত্যি কোন রেস্টুরেন্টে আমাকে বিষম পেট ভরে খাইয়ে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ দুজনে পাশাপাশি বসে রইলাম। দমদমের এদিকটা বেশ নির্জন, বাড়িগুলো একটু দূরে দূরে, প্রায় প্রত্যেক বাড়ির সামনেই এক ফালি করে জমি। আমাদের জমিতে একটা হাসনুহানার ঝাড় রয়েছে। মা অনেকবার গাছটা কেটে ফেলতে চেয়েছে, আমি দিই নি। মা বলে হাসনুহানা ফুলের গন্ধে সাপ আসে। আমি যুক্তি দেখাই, কিছুদিন আগে মল্লিকদের বড় ছেলেকে একটা ঢেলে সাপে কামড়েছিল, আর সবচেয়ে বড় কথা ওদের বাড়ির ত্রিসীমানার মধ্যে কোন হাসনুহানার ঝাড় ছিল না। তাই ঝাড়টা শেষপর্যন্ত রয়ে গেল। শুধু রয়েই গেল না, ও যেন আমার ওপর কৃতজ্ঞ হয়ে আরও বেশী করে গন্ধ ছড়াতে লাগল। আজ পূর্ণিমা টুর্ণিমা কিছু একটা হবে। গেটের কাছে বড় একটা আমগাছ রয়েছে। পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো এসে উঠোনে পড়েছে। গোটা উঠোনটা কাকখী-কাটা বলে মনে হচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখেছি পূর্ণিমার দিন হাসনুহানার গন্ধ খুব উগ্র হয়ে [illegible] আজ গন্ধটা ভয়ানক উগ্র আর মন মাতানো বলে মনে হতে লাগল।

হঠাৎ বলে উঠলাম, 'একজন সব-সময়ের লোক রাখো এবার।'

মা যেন কথাটা শুনতেই পেল না। বলল, 'শোবার আগে একটু দুধ খাস।'

'একা একা তোমার সময় কাটেই বা কি করে। তাছাড়া যখন তখন ঘাটলায় যাও, কোনদিন আছাড়টাছাড় খেয়ে পড়বে।'

মা উঠে দাঁড়াল, বলল, 'তোর দুধটা গরম বসিয়ে দিই।'

বললাম, 'এমাসের কটা দিন যাক, সামনের মাসের পয়লা থেকে লোক রাখা হবে কিন্তু। অফিসে হরবিলাসকে বলেও এসেছি লোক দেখতে।'

এতক্ষণে মা যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারল, 'লোক দিয়ে কি হবে?'

'বাড়ির কাজকর্ম করবে, জল তুলবে—'

মা যেতে যেতে বলল, 'বিয়ে করে বউ এনে দে, সে-ই কাজকর্ম করবে।'

'বাড়ির বউকে দিয়ে তুমি ঝিগিরি করাবে?'

মা উত্তর দিল না, ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

বউয়ের কথা উঠলেই বাবার কথা খুব মনে পড়ে। বাপ-মার একমাত্র সন্তান আমি, আমি যখন ষোল বছরের বাবা তখন মারা যান। বাবার অনেকগুলো সখ ছিল, তার মধ্যে বড় সখটা হল, আমার বিয়েতে নিমন্ত্রিতদের প্রচুর মাছ খাওয়ানো, তাই বাড়ির পিছন দিকে ছোট্ট একটা পুকুর কাটিয়েছিলেন, আর অনেক মাছের বাচ্চা ছেড়েছিলেন। পর বছরই বাবা মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাগুলোও ডানা মেলে উড়ে গেল কিনা জানি না, ওদের আর হদিশ মিলল না। পড়ে থেকে থেকে পুকুরটাও মজে এল, ওকে এখন ডোবা ছাড়া কিছুই ভাবা যায় না। জলটা ভারী হয়ে উঠল, আর রংটা কীরকম সবুজ সবুজ মতন। ঘাটলায় ক্রমশ শ্যাওলা জমতে লাগল। শেষপর্যন্ত এমন হয়ে দাঁড়াল যে থকথকে শ্যাওলা ভেদ করে সিমেন্ট-বাঁধানো ঘাটলা আর নজরেই পড়ে না।

বিয়ে করার কথা মা মাঝে মাঝে বলে, আমার মনে হয়, সেটা মার মুখের কথাই শুধু। মা হয়ত অন্তর দিয়ে চায় না যে এক্ষুণি আমি বিয়ে করে ফেলি। দত্ত মাসীমার দুই ছেলেই বিয়ে করে ভিন্ন হয়ে গেল। মা কথার কথায় বলে, দত্তগিন্নীর ছয় ছেলে; দুই গেলে রইল চার। বলতে বলতে মার চোখেমুখে যেন আতঙ্ক ঘনিয়ে আসে। মা যেন মনে মনে হিসেব করে, মার শুধুমাত্র একটি, তার সেইটি গেলে রইল কি, রইল শূন্য। আমার বিশ্বাস মা চোখের সামনে শূন্য দেখে বলেই বিয়ের কথায় জোর দেয় না। না দিয়ে ভালই করে। বিয়ে নামক বস্তুটির সঙ্গে চোখাচোখি তাকাতে আমিও রাজী নই এখন। এখন কেন, কোনদিনই না। বিয়ে করলে মানুষ নির্ঘাৎ প্রেম করে, আর প্রেম করে বলেই মানুষ কী দারুণ অস্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে। অফিসের নিমাইবাবু বউকে ভয়ানক ভালবাসেন। ভালবাসেন বলেই বউয়ের অসুখে অফিস কামাই দেন। বউটাও ভীষন ভোগে। নিমাইবাবুর নির্ঘাত মাইনে কাটা যায়! ইউনিয়নের পাণ্ডা বলে চাকরিটা যায় না।

নিমাইবাবু এমনিতে বেশ বুদ্ধিমান, কিন্তু বউয়ের ব্যাপার নিয়ে সবাই যে ওঁকে ক্ষেপায়, উনি একটুও বুঝতে পারেন না।

অফিস থেকে ফিরে হাত-মুখ পর্যন্ত ধুইনি। কী রকম একটা আলস্য যেন ব্যূহ রচনা করে আমাকে ঘিরে রেখেছে। উঠতে ইচ্ছে করছিল না। গরম দুধের বাটিটা সামনে দিয়ে মা আবার ভেতরে চলে গেল। দুধে চুমুক দিতে দিতে মনে হল, আজকের বিশ্রী ব্যাপারটার জন্যে আমাকে কোনমতেই দায়ী করা যায় না। বরং সমস্ত ব্যাপারটাকে বিশ্রী করে তোলার সমস্ত দায়-দায়িত্বটাই সুপ্রিয়ার। সুপ্রিয়া যদি স্বাভাবিক ভাবে আমার পা হড়কানোর ব্যাপারটা গ্রহণ করতে পারত, ঐ বেমক্কা ঘটনাটা আদৌ ঘটত না। ধীরে ধীরে সুপ্রিয়ার ওপর রাগ জন্মাতে লাগল। একসময় এমনও মনে হল, সুপ্রিয়া একদিন সেধে আমাদের বাড়িতে আসতে চেয়েছিল, ওকে বাড়িতে আনা হবে না। ওকে বাড়িতে না আনার সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে ওকে বড় রকমের একটা শাস্তি দেওয়া গেল।

আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে ধীরে ধীরে উঠে পড়লাম। ঘরে এসে দেখলাম, মা ঘুমিয়ে পড়েছে। মা হাঁটু মুড়ে পাশ ফিরে শুয়ে ছিল, মাকে খুব ছোট মেয়ে বলে মনে হচ্ছিল। শুধু ছোট না, খুব অসহায় [illegible]। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, মা যত আপত্তি করুক না কেন, মার জেদ এবার ভাঙতে হবে। মার চোখদুটো বড় আর টানা-টানা, চিবুকটা গোল মতো। এ-ধরণের মানুষ জেদ করে না, করলেও এদের জেদ ভাঙা একটুও শক্ত কাজ না। বাড়িতে কাজের জন্য সব সময়ের একজন লোক রাখতেই হবে।

মার কথা ভাবতে ভাবতে [illegible] ঘুমিয়ে পড়লাম।

—দুই—

পরদিন অফিসে গিয়ে সুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা হল। দেখা হওয়া ঠিক নয়, [illegible] দূরে থেকে ওকে দেখলাম। ওরা চার-পাঁচ [illegible] ডিপার্টমেন্ট একটা চেম্বারে বসে। সেলস ডাইরেক্টর পি এন কাপুরের এক-চোখকে [illegible] পেওন ওদের ঘরে গিয়ে ঢুকল; [illegible] পেছন বেরিয়ে এল সুপ্রিয়া। [illegible] সুপ্রিয়া যেন আমার দিকে তাকাল একবার, কিন্তু সেই মুহূর্তটা এত বেশী সংক্ষিপ্ত যে ভাল করে বোঝাই গেল না, সুপ্রিয়া যথার্থ আমাকে দেখবার জন্যই এদিকে তাকিয়েছিল, না অতর্কিতে ওর দৃষ্টি এদিকে, অর্থাৎ কিনা সেলস ডিপার্টমেন্টে এসে পড়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ পরে সুপ্রিয়া কাপুরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল, মজুমদারের কথাটা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। সুপ্রিয়া যদি কাপুরের পি-এ হয়, মাইনে তো বাড়বেই, তাছাড়া পজিশনটাও ভাল হবে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে হল, কাপুরের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোন ধারণা নেই; বড় পোস্টের মানুষ এরা আধটু মদ খায় নিশ্চয়ই, কিন্তু স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারে ওর সম্বন্ধে কোন কথা আমার কানে আসেনি। কথাটা মনে হতে হাসি পেল। সুপ্রিয়ার পি-এ হওয়ার সঙ্গে কাপুরের ব্যক্তিগত চরিত্রের কী সম্পর্ক থাকতে পারে, আর তা নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর প্রয়োজনটাই বা কোথায়।

ছুটির পর ইচ্ছে করেই সুপ্রিয়া আমাকে এড়িয়ে গেলো। ধীরে ধীরে অফিস খালি হল। বড় হলঘরের এক কোণে বৃদ্ধ যতীনবাবু রোল্ডগোল্ডের চশমা এঁটে তখন ভারী লেজারের ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছেন। লেজার-কীপার যতীনবাবু সত্যি সত্যি আমার কাছে একটি প্রচণ্ড বিস্ময়।

ভদ্রলোক যে সেই সকাল থেকে [illegible] আটটা পর্যন্ত কী এত দেখেন বইগুলোর মধ্যে, জানেন উনি, আর জানেন [illegible] ইষ্টদেবতা। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর আমাকে উঠে পড়তে হল। কাঁহাতক [illegible] হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায়। নাকথ

সুপ্রিয়াদের চেম্বারের সামনে দিয়ে ঘুরেও এলাম একবার। কাচের মধ্য দিয়ে দেখলাম, শূন্য ঘরে একলা বসে টাইপ করছে সুপ্রিয়া। পিওনটা টুলের ওপর বসে ঝিমোচ্ছে। না হ'লে নির্ঘাৎ ঘরে ঢুকে সুপ্রিয়াকে বলতাম, আর কেন, এবার ওঠ। আমি জানি ও কাজ করছে না, কাজের ভান করছে শুধু।

পরদিনও সেই এক অবস্থা। আটটা বেজে গেল, তবু ওদের ওঠার নাম নেই। সুপ্রিয়ার আর সেই বুড়ো শালিখটার' সুপ্রিয়া যে ইচ্ছা করেই আমাকে এড়িয়ে চলছে, সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অথচ ওর সঙ্গে দেখা করা দরকার: একান্ত দরকার। একটা চরম বোঝাপড়া না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না। যদিও সুপ্রিয়ার এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের পর আমার উচিত হচ্ছে তার সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে থাকা, কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও মন নামক দুরন্ত ঘোড়াটাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছিলাম না। ফলে নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ছিলাম, আর এই ঘোটনায় পড়ে আমার মন হয়ে পড়ছিল বিক্ষিপ্ত, এবং কর্তব্য কাজে অবহেলাও যে দেখা দিচ্ছিল না, সেকথা আমি বলতে পারি না। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সুপ্রিয়ার ঔদাসীন্য আমাকে তীব্রভাবে ওর প্রতি আকর্ষণ করতে লাগল। সুপ্রিয়া ক'বার চেম্বার ছেড়ে বাইরে যায়, কাপুরের ঘরে ঘন ঘন ওর ডাক পড়ছে, কিছুই আমার দৃষ্টি এড়াস না। যতীনবাবু সম্বন্ধেও নতুন করে ভাবা প্রয়োজন। সুপ্রিয়াই একদিন কথায় কথায় বলেছিল, ভদ্রলোক ওদের পরিবারের সূত্রে আত্মীয়। ও আরও বলেছিল, সম্পর্কটা এত ক্ষীণ, যে এই ধরনের আত্মীয়ের চেয়ে অনাত্মীয় মানুষ সময় সময় ঢের বেশী কাছের হয়ে ওঠে। জানি না, এই কথার মধ্য দিয়ে ও কী বোঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি, সেই যতীনবাবুই ওর কাছের মানুষ! এত কাছের, যে সুপ্রিয়ার টিফিন বাক্সটা পর্যন্ত আজ যতীনবাবুর টেবিলে চলে গেল। গেল আমার চোখের সামনে দিয়েই। এসব কিছুই আমি দেখতে চাই না। অকারণ কৌতূহল আমার নেই। ছিল না কোনদিন। কিন্তু এখন দেখছি যা আমি চাই না, তাই আমাকে করতে হচ্ছে। কেউ যেন ঘাড় ধরে আমাকে দিয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। অথচ সেই অদৃশ্য কেউকে আমি চিনি না। চিনবার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না। ফলে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় একজন মানুষ বলে মনে হচ্ছে।

দিন সাতেকের মধ্যেই অফিস-নোটিশ বেরিয়ে গেল। সুপ্রিয়া সত্যি সত্যিই কাপুরের পি-এ হয়ে গেল। টিফিনের সময় মজুমদার এসে আমার টেবিলের ও পিঠে বসল। কোন কোন মানুষের চেহারাটাই বিরক্তি উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট। মজুমদার সেই জাতীয় মানুষ। লোকটা লেজায় লম্বা আর রোগা, যদিও হাতের রিস্ট বেশ চওড়া। চোয়াল দুটো প্রকট হয়ে রয়েছে, গাল ভাঙা, কোল বসা চোখে দৃষ্টি অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ। সেই দৃষ্টিতে নিয়তই অপরের অন্তর ভেদের প্রয়াস। এইসব কারণেই যে লোকটা মনে বিরক্তির উদ্রেক করে তা হয়তো না। হয়তো যে সময়টাতে ওর সংগে আমার দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল, সেই ক্ষণটাই ছিল মারাত্মক রকমের অশুভ। সেই মুহূর্তে যাকে দেখতাম, তাকেই হয়ত খারাপ লাগত। হয়তো সুপ্রিয়াকেও।

সুপ্রিয়াকে দেখলে যে আমার এখন খুব একটা ভাল লাগে তা না। দূর থেকে যখন ওকে দেখি, স্বস্তির চেয়ে অস্বস্তিই হয় বেশী। তবু তো দেখার বিরাম নেই। ওকে দেখার তীব্র যে বাসনা মনের মধ্যে উদ্বেল হয়ে ওঠে, তাকে সংযত করার শক্তি ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছি। ফলে আমি হয়ে উঠছি অস্থিরচিত্ত এক মানুষ।

সময় সময় মনে হয়, ছুটে ওর ঘরে ঢুকে পড়ি। একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাক। কিন্তু কীসের নিষ্পত্তি। ও তো আমার বিরুদ্ধে কোন সংগ্রাম ঘোষণা করে নি। শুধু নিজেকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার চেষ্টা করছে। সে অধিকার নিশ্চয়ই ওর আছে। মনে দ্বিধা আসে, যার ফলে আমি হয়ে পড়ি নিষ্ক্রিয়।

মন যখন বিচিত্র দোলায় দুলছিল, সেই সময় মজুমদার এসে হাজির।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। বিনা কাজে মজুমদার বড় একটা আসে না। মজুমদার কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর পকেট থেকে সিগারেটের কাগজ আর তামাক পাতার কৌটো টেবিলের ওপর রেখে বলল, 'হাতে তৈরী সিগারেট খাবেন নাকি একটা?' ঘাড় নেড়ে না জানালাম। মজুমদার কাগজের ওপর যত্নসহকারে তামাক ছড়াল, তারপর ধীরে ধীরে কাগজ গোটাতে শুরু করল। গোটান শেষ হলে কাগজের প্রান্ত জিভের এ-ধার ও-ধার করালে। চেপে চেপে মুখ জুড়লে।

সমস্ত প্রক্রিয়াটাই অসহ্য রকমের মন্থর। দেশলাই দিয়ে তামাক ঠাসতে ঠাসতে মজুমদার বলল, 'দেখুন মশাই, আমরা ছা-পোষা ঘরের ছেলে আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খোঁজ রাখাটা যদিও খুবে অন্যায় তবুও কৌতূহল বলে যে বস্তুটা মনের মধ্যে রয়েছে—' মজুমদার শব্দ করে দেশলাই জ্বালল। 'তা ছাড়া ভগবান দুটো বড় বড় কান দিয়েছেন, অনেক কথাই কর্ণকুহরে প্রবেশ করে।'

কাজের সময় হলে কাজের অজুহাতে লোকটাকে উঠিয়ে দেওয়া চলত, কিন্তু দেওয়ালের বড় ঘড়িটা আমার চোখের সামনে। সবে মাত্র দেড়টা। ইচ্ছে করলে ও আরও আধ ঘণ্টা আমাকে জ্বালাতে পারে। হঠাৎ মজুমদার টেবিলের ওপাশ থেকে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল, ফিস-ফিস করে বলল, 'মিস ইউনিভারস কম্পিটিশনের খোঁজ-খবর রাখেন কিছু?'

ওর মুখ থেকে অতর্কিতে এ-ধরনের প্রশ্ন শুনব বলে আশা করিনি। ঘাড় নাড়লাম, মজুমদার সেই রকম চাপা সুরে বলল, 'লেটেস্ট যাচ্ছে, ৩৮"×২৪"×৩৫"। আপনার কি মনে হয় মিস মিত্র এই ক্যাটিগরিতে পড়ে?'

মজুমদার এমন ঘন করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, যেন আমার উক্তিই এই ব্যাপারে চরম রায়। হেসে বললাম, 'প্রথম কথা, আমি এখন পর্যন্ত মিস মিত্রকে ফিতে-মাপা করিনি। দ্বিতীয়ত, এই ব্যাপারে আপনার ইন্টারেস্ট ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'

মজুমদারের সিগারেটের আগুন নিভে গিয়েছিল। ও আবার দেশলাই জ্বালাতে যাচ্ছিল। বললাম, 'এভাবে পাকিয়ে খান কেন? কোম্পানীগুলো তো আমাদের হয়ে পাকিয়ে দেবার জন্যে বসেই আছে।'

মজুমদার ততক্ষণে আগুন ধরিয়ে নিয়েছে। সামান্য যেটুকু ধোঁয়া জমেছিল, তাই ছড়াতে ছড়াতে বলল, 'তা আছে। তবে শুধুমাত্র পাকানোই না, ভেজাল মেশানোর আইটেমটাও ইনক্লুড করে নিন।' বলে জোরে হেসে উঠল। কিছু কিছু মানুষ আছে, যাদের হাসিতে শব্দ ওঠে, কিন্তু হাসি থাকে না। মজুমদার সেই ধরনের মানুষ। হাসি থামিয়ে মজুমদার আবার বলল, 'দেখুন স্যার, আপনাকে একটা সার কথা বলে যাই। আজকালকার দিনে মানুষ শুধু-হাতে কিছু করে না। আমি যদি ডান হাত উপুড় করি, নির্ঘাৎ জানবেন বাঁ হাত চিৎ করে বসে আছি। কিছু চাই। আপনি কি মনে করেন মিস্টার কাপুরকে দেবার মত কিছুই নেই মিস মিত্রের। ডু ইউ নো, দু বছর আগে মিস্টার কাপুরের ডিভোর্স হয়ে গেছে?'

কথাটা সত্যি সত্যি জানতাম না। মজুমদার বলে চলল, 'জানতেন না। কেউ জানত না। আমি জানি। জিজ্ঞেস করতে পারেন, কেম জানি, কী করে জানি। কেন জানি বলতে, আমার স্ক্যান্ডেল করতে ভাল লাগে। ইয়েস, মাইডিয়ার স্যার, ইয়েস, ভাল লাগে। আপনার সিনেমা দেখতে ভাল লাগে, মুরগীর ঠ্যাং চিবোতে ভাল লাগে, আমার ভাল লাগে মানুষ যে সুন্দর সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই আবরণটা ছিঁড়ে ফেলে নীচের

কঙ্কালটাকে দেখতে। কেন লাগে জানি না। কিন্তু লাগে। আপনার কি একবারও মনে হয়নি, মিসেস টেইলর এই অফিসের সবচেয়ে সিনিয়র স্টেনো. তাকে বাদ দিয়ে হঠাৎ—তবেই বুঝুন ব্যাপারটা।' সিগারেটের আগুন আবার নিভে গিয়েছে। এবারে আর দেশলাই জ্বালল না মজুমদার। আধ-পোড়া সিগারেট অ্যাসট্রেতে ঠাসতে ঠাসতে বলল, 'আসল কথাটা কী জানেন স্যার, মিসেস টেইলর মাঝপথে এসেই ফুরিয়ে গেল হঠাৎ। তখন কাপুর সাহেব এইভাবে ঠেসে ঠেসে ওকে মেরে ফেলল।' মজুমদার এমন জোরে সিগারেট চাপতে লাগল, ভয় হল পোরসিলিনের এ্যাসট্রেটা না ভেঙ্গে যায়।

মজুমদার কিছুক্ষণ পর চলে গেল। কিন্তু ওর এই ক্ষোভের যথার্থ কারণ নির্ণয় করা গেল না।

দিন দশেক পরের ঘটনা।

হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হলো। বাজটা এসে পড়ল আমার মাথার বরাবর। নোটিশ বেরোল, আমাকে পাটনা অফিসে ট্রান্সফার করা হয়েছে। এসম্বন্ধে বিন্দু-বিসর্গ আমি জানতে পারিনি। এমনকি মজুমদার পর্যন্ত দারুণ অবাক হলো। এতদিন পর্যন্ত ওর গর্ব ছিল, অফিসের কোন কোণায় বসে কে দাবার ঘুঁটি চালছে, সমস্তই ওর নখদর্পনে। কিন্তু আমার এই বদলির ব্যাপারে আগে থেকে ও কিছুই জানতে পারে নি। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে বসে রইল মজুমদার। ও যে গভীর চিন্তায় তলিয়ে রয়েছে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, একসময় ধীরে ধীরে বলতে লাগল মজুমদার, 'আপনাকে একটা কথা বলবো, মনে কিছু করবেন না। এই সব মেয়েদের সঙ্গে মেলা-মেশা করাটা আমি পারসোনালি খুব পছন্দ করি না। এইসব মেয়ে বলতে এই কেরিয়া-রিস্ট মেয়েরা আর কী। নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য এরা পারে না এমন কাজ নেই।'

বিভ্রান্ত ভাবে বললাম, 'কিন্তু আমাকে সরিয়ে দিয়ে ওর লাভ?'

'লাভ কিছু একটা আছে নিশ্চয়ই, ঠিক ধরা যাচ্ছে না। কিন্তু যাচ্ছে না বললে তো চলবে না, ধরতেই হবে। আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?'

'বলুন?'

'সেদিন আপনারা দুজনে তো একসঙ্গে অফিস থেকে বেড়োলেন, হাঁটতে হাঁটতে রাজভবন পেরোলেন।'

'কোনদিন?'

অসহিষ্ণু ভাবে মজুমদার বলে উঠল, 'বড্ড সর্ট মেমারি আপনার, মশাই। সেই যেদিন ট্যাক্সি থামিয়ে আপনাকে তুলে নেওয়া হল।'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু মাঝপথে আপনাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, রাগারাগি হয়েছিল?'

মজুমদার এমনভাবে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল যে বিব্রত বোধ করলাম। ও আমার বলল, 'বলুন, লজ্জা কীসের। আমাকে বন্ধু বলে ভাবতে পারেন অংশুবাবু। যদিও বয়সে আপনি অনেক ছোট।', মজুমদার আজই প্রথম আমার নাম উচ্চারণ করল।

'না না, লজ্জা কী। লজ্জা করার মত কোন কারণ তো সেদিন ঘটেনি। মিস মিত্র হয়তো একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিল।'

'কারণটা জানতে চাইব না, আপনি বিব্রত বোধ করতে পারেন। আপনি না হয়ে আর কেউ হলে এ নিয়ে দস্তুরমতো স্ক্যান্ডেল করে বেড়াতাম।'

'স্ক্যান্ডেল করে বেড়াতেন?'

'ইয়েস স্যার। স্ক্যান্ডেল করতে আমার ভাল লাগে। বলতে পারেন, আমার মোস্ট ফেভারিট হবি হচ্ছে এই। যাক গে, তবেই বুঝুন ব্যাপারটা। এই মিস মিত্রই আপনাকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে চায়। তাই কাপুর মারফৎ কাজটা করাল।'

হঠাৎ দারুণ উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'কিন্তু সে ধরণের চক্রান্ত ওর কিছুতেই করা উচিত না। তা ছাড়া এই অফিসের হর্তা-কর্তা বলতে আমরা কিছুতেই সুপ্রিয়াকে বুঝব না।'

হাতের ইসারায় আমাকে চুপ করতে বলে মজুমদার বলতে লাগল, 'এতদিন ওর হাতে হয়ত ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু এখন ও যে প্রচন্ড পাওয়ার পেয়েছে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই। দেখছেন না, বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ দুম করে যতীনবাবুর মাইনেটা কীভাবে বেড়ে গেল। হবে নাই বা কেন। এ অফিসে কি ডিসিপ্লিন আছে? একটা বউ খেকো লোক। যেখানে বস্, আর সুন্দরী এক যুবতী তার পি-এ—' মজুমদারের চোখ ধ্বক ধ্বক করে জ্বলতে লাগল। ওর এই ইঙ্গিত ভাল লাগল না। মনে হল, সুপ্রিয়াকে নিয়ে সবার সঙ্গে এভাবে আলোচনা করাটা আমার পক্ষেও ঠিক শোভন হচ্ছে না। একটা ফাইল টেনে নিয়ে চোখ বুলোতে বুলোতে বললাম, 'অর্ডার যখন হয়ে গেছে, যেতেই হবে। যাবার আগে জঞ্জাল পরিষ্কার করে ফেলি।' বেগতিক দেখে মজুমদার উঠে পড়ল।

যাবার সময় বলে গেল, 'বলা যায় না, ট্রান্সফার হয়ে আপনার কপাল খুলে যেতে পারে। মেয়েদের রাগটা অনেক সময় অনুরাগ হয়ে দেখা দেয় কিনা।'

'আপনি বিয়ে করেন নি, মেয়েদের সাইকোলজির সূক্ষ্ম তত্ত্ব তো জানার কথা না আপনার।'

ভেবেছিলাম মজুমদার অপ্রস্তুত বোধ করবে। কিন্তু কী ভয়ানক ধুরন্ধর লোক। হাসতে হাসতে বলল, 'মাছ না খেলেই যে সে মাছ চিনবে না তার মানে নেই। আমার এক বাল-বিধবা পিসীমা ছিলেন, দশ হাত দূরে থেকে বলে দিতে পারতেন মাছটা টাটকা না বাসি।' মজুমদার আর দাঁড়াল না। মুখে কুলিবেগুনের পিছনে হাসি নিয়ে সরে পড়ল।

শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়েই সুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা করলাম। রাত তখন আটটা বেজে গিয়েছে। অফিসের সামনে ক্রমাগত ঘন্টা দুয়েক পাইচারি করে পায়ের অবস্থা সঙ্গীন। সুপ্রিয়া যতীনবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে এল। মনে হ'ল এক নিমেষের জন্য আমার দিকে তাকিয়েও ছিল, কিন্তু মুহূর্তটা এত ভয়ানক রকমের ক্ষণিক, যে সঠিক বোঝা গেল না, সত্যি সত্যি ও আমাকে দেখেছিল কিনা। ওরা দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল, ভেবেছিলাম সুপ্রিয়া ইচ্ছে করে পিছিয়ে পড়বে বা আমাকে ডেকে কিছু বলবে। কিন্তু ও যতীনবাবুর গা ঘেঁষে চলতে লাগল, মনে হল ওরা নীচু স্বরে কথা বলছে। রাগটা গিয়ে পড়ল যতীনবাবুর ওপর। ভদ্রলোক কাজের ব্যাপারে অসম্ভব ঢেলা, কিন্তু হাঁটার বিষয়ে বেশ চৌকস তর-তর করে একজন যুবকের মত হাঁটছিলেন। সুপ্রিয়া ও'র সঙ্গে পায়ে দিয়ে হাঁটছে। ওরা গোলদিঘি ছাড়িয়ে দক্ষিণ দিকে চলেছে তারপর ওরা অল ইন্ডিয়া রেডিওকে ডাইনে রেখে রাজভবনের নীচু পাঁচিলের ধার দিয়ে এসপ্লানেডের দিকে যাবে। এ পথ আমার খুব পরিচিত। বহুদিন এই পথ ধরে আমি আর সুপ্রিয়া হেঁটেছি।

'তোমার সঙ্গে কথা ছিল, আমি সুপ্রিয়ার পাশে পাশে হাঁটতে লাগলাম।

'আজ সময় নেই। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।'

ইচ্ছে হল চীৎকার করে বলি, 'তাই ট্রাম, বাস ছেড়ে হাঁটা পথ ধরেছো।'

যতীনবাবু একটু এগিয়ে গিয়েছিলেন। সুপ্রিয়ার একটা হাত খপ করে ধরে মিনতি মাখানো গলায় বললাম, 'প্লীজ সুপ্রিয়া ভয়ানক জরুরী কথা—'

সুপ্রিয়া হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে রুক্ষ ভাবে বলল, 'হাত ছাড়ো।'

সুপ্রিয়া খুব দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে যতীনবাবু অনেকটা এগিয়ে গেছেন সুপ্রিয়া যেন জীবন-পণ করে যতীনবাবুকে ধরতে ছুটছে। অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছে রাস্তার টিমটিমে আলোগুলো সেই অন্ধকারকে আরও রহস্যঘন করে তুলেছে। এই আলো-অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার বারবার মনে হতে লাগল, সুপ্রিয়া আমার পৌরুষকে আজ দারুণ অপমান করেছে সঙ্গে সঙ্গে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা মনের মধ্যে বাসা বাঁধতে লাগল, এই অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হবে। যেমন করেই হোক এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

(ক্রমশঃ

বহু পরিচিত ব্যক্তির বিস্ময় এবং অপরিচিতের চিঠিতে থাকে একটি প্রশ্ন—কেন আমি অভিনয় ছেড়ে দিলাম? অন্নদা-দিদি অথবা মেজদিদির চরিত্রাভিনয় কি এই সত্যকেই পরিস্ফুট করেনি যে, আজও আমার অভিনয়-ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়নি? তবে কি হিরোইনের রোল ছাড়া অন্য কোনো রোলে অভিনয় করার কথা ভাবতে পারি না বলেই আমি চিত্রজগৎ ত্যাগ করলাম?

হয়ত তাঁদের কথা মিথ্যে নয়। হয়ত উপযুক্ত রোল পেলে আমার অভিনয় আজও ব্যর্থ নাও হতে পারে। হয়ত আমার অভিনয়-ক্ষমতার কিছু অবশিষ্ট আজও আছে। কিন্তু ঐখানেই ত যত গোল।

আপনাপন ক্ষেত্রে কোনো শিল্পীর ক্ষমতা একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেলে সকলের করুণার পাত্র অথবা পাত্রী হয়ে অবসন্ন দেহ ও মন নিয়ে তবে তিনি ফিরে আসবেন—এর চেয়ে অশিল্পীজনোচিত আচরণ আর কিছু হতে পারে না। সকল বৈভবে উদ্ভাসিত তার যে ব্যক্তিত্ব শিল্পরসিক শ্রদ্ধার আদরে বরণ করে নেন, সেই অপরূপ সুষমার ছবিটি তাঁদের স্মরণপটে চিরদিন জাগিয়ে রাখার সুক্ষ্ম সুকুমার বোধও শিল্পীর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত বলেই আমি মনে করি। এই প্রসঙ্গে আমার এক বান্ধবীর কাছে শোনা একটি কথার উল্লেখ করতে ইচ্ছে করে। সে বলে বে-সরকারী অফিসে ক্ষমতালিপ্সু মানুষের চেয়ারের আসক্তি এমনই সীমাছাড়ানো যে, কাজ করবার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যাবার পরও তরুণদের জন্য চেয়ার ছেড়ে দিতে তাঁরা নারাজ। একেবারে অপারগ অবস্থায় ইনভ্যালিড চেয়ারে করে সরানো না হলে তাঁরা সরেন না।

কথাটি কৌতুকাবহ হলেও এর অন্তরের ভয়াবহতা ও করুণা হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি জীবনের শেষদিন অবধি নিজের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার মত বোধ ও বুদ্ধি তিনি যেন কেড়ে না নেন। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই ভারসাম্য হারিয়ে নিজেকে অপরের হাসি অথবা করুণার পাত্রী করে না তুলি। জীবনে এগিয়ে চলার দুর্দমনীয় আবেগ যতখানি প্রয়োজন, ঠিক ততখানি প্রয়োজন আছে ঠিক জায়গায় থামতে জানার। এই ঠিকে ভুল হওয়াটা গান হওয়ার পরও সমে পৌঁছতে না পারার মতই অপরাধ। কবি-গুরুর 'যাবার সময় হলে যেও সহজেই'—কথাটিতে আমি ভারী বিশ্বাস করি।

তা বলে কাজ কি থেমে থাকবে? কর্মবিরতি মানেই ত মৃত্যু। নদীর গতি-পথের মতই কাজের ধারারও পরিবর্তন ঘটবে। নূতন কাজের ক্ষেত্র তৈরী করে নিতে হবে। জীবনের সকল চিন্তা, আবেগ ও কর্মশক্তি দিয়ে সেই নূতন কাজের জগৎকেই সার্থক করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। সার্থক হওয়া অথবা না হওয়াটা আমাদের হাতে নয়। কিন্তু উদ্যমটাকে নিভতে দিলে চলবে না। অসংখ্য কর্ম ও বন্ধনেই জীবনে আনন্দ,—তবে লক্ষ্য রাখতে হবে বন্ধনটা যেন মানুষের প্রতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাজাত ভালবাসার বন্ধন হয়। এ যেন শৃঙ্খল হয়ে উঠে জীবনের গতিপথ রুদ্ধ না করে।

শিল্পীদের, বিশেষ করে চিত্রশিল্পীদের জীবনের যে জিনিসটি আমায় বরাবরই পীড়া দিয়েছে, সে হোলো একটা তথাকথিত অর্থহীন গ্ল্যামারের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আপনাদের সীমাবদ্ধ করে রাখা। স্টুডিওর কাজ এবং কাজ শেষ হলে কয়েকজনের সেই একঘেঁয়ে সঙ্গ, হৈ হাঙ্গামা, একই ধরনের রঙ্গরসিকতা, ড্রিংকস, লঘু ও অসার আমোদ পরিহাস জীবনে শ্রান্তি আনে, এগিয়ে চলার উদ্দীপনাকে স্তিমিত করে এবং মানুষের জীবনের অন্যান্য দিক-গুলি অনাদৃত থেকে যাবার জন্য জীবন-বোধও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। [illegible] অন্য অনেক [illegible] পরিমাণ অধিকারীর জীবনে ও [illegible] পারে না সে-বিকাশ ঘটতে পারত ঐ একটু-

[illegible] / পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কানন দেবী

খানি সীমিত জীবনের বাইরের জীবনের সঙ্গে জীবনযোগ করলে।

কথাটা বোধহয় আরও একটু প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে বলা দরকার।

ধরা যাক খ্যাতির মধ্যগগনে আসীন কোনো এক তারকা। স্টুডিও-ফ্লোরে শুটিং-এর পর ফিরলেন আপন আবাসে। তারপর বসলেন মহার্ঘ পানীয় নিয়ে। সঙ্গে জুটলেন স্তাবক ও মোসাহেবের দল, যাঁরা উক্ত তারকার ব্যয়ে সেইসব পানীয় পেয়ে কৃতার্থ হয়ে যান। সেসব পানীয়ের স্বাদ পাওয়া তাঁদের পক্ষে সাধ্যাতীত। তারপর রাত হলে কোনো অভিজাত হোটেলে অথবা বাড়ীতেই দেশী, বিদেশী নানা খাদ্যে এইসব মোসাহেবদের আপ্যায়িত করে অনেক রাতে যখন উঠে দাঁড়ান, তখন স্থির হয়ে দাঁড়াবার মত কর্তৃত্ব তাঁদের চরণযুগলের ওপর থাকে না।

কি পান তাঁরা এইসব অনুগত স্তাবকদের কাছে? এই স্তুতিগানেই তাঁদের কর্ণকুহর ভার থাকে যে তাঁদের রূপযৌবন অন্তহীন। তাঁদের দেহতারুণ্যের কাছে স্কুলের কিশোর-কিশোরীদের পিতামহ, পিতামহী মনে হয়। যশ ও খ্যাতির অমরাবতী তাঁদের দুয়ারে বাঁধা। জগতের চোখে এঁরা নন্দনকাননের বাসিন্দা ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসব স্তবস্তুতি শিল্পীকে বিভ্রান্ত করে তোলে এবং নিজের সম্বন্ধে তাঁদের নিজেরই একটা মোহগ্রস্ত ধারণা জন্মে যায়। এমনকি মানুষকে পর্যন্ত তাঁরা সম্মান করতে ভুলে যান। হয়ত ভাবেন—এক পেগের মূল্যেই যাঁদের স্তবস্তুতি কেনা যায়—অন্য কোনো মূল্য তাঁদের দেবার প্রয়োজনটা কি? বলা বাহুল্য ক্যানিউটের মত স্বচ্ছ দৃষ্টি এঁদের কাছে আশা করা মূঢ়তা।

যাই হোক এই রকম জীবন যাপনে ছবির কাজ চলে গেলেও আত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। শিল্পীও মানুষ। আর মনুষ্যত্বকে একটা মহৎ পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব তার আছেই। এ-দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়াটা পলায়নী মনোবৃত্তি বলেই আমি মনে করি।

ঈশ্বরের করুণায় চিত্রজগতের বাইরের বিরাট জগৎকে জানবার, দেখবার, বিভিন্ন চরিত্রের অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ভালমন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, অসম্পূর্ণতা দোষগুণে মেশানো মানুষের সংস্পর্শ আমার জীবনে অন্ততঃ সেটুকু প্রসারতা এনে দিয়েছে যেটুকু প্রসারতা থাকলে জীবনকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে দেখবার আগ্রহ জন্মায়।

কর্মজীবনের সামান্যতম প্রতিষ্ঠার মুহূর্তেও মনে হয়েছে আমার জীবনের অর্থ, যশ, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম সবই ত আমার দেশের জনসাধারণের দান। তাঁরা স্বীকৃতি না দিলে আমার প্রাণ, অভিনয় কোনো কিছুই মূল্য পেত না। তাঁদের স্নেহ-ভালবাসা না পেলে নিজেকে মেলে ধরবার এমন অনুপ্রেরণা জাগত না। তাঁরা বহু আয়াসে অর্জিত অর্থ ব্যয় করে আমাদের ছবি না দেখলে আমার অদৃষ্টে এমন মনোরম অট্টালিকা, গাড়ী এবং বিরাট পরিবার প্রতিপালনের আনন্দ জুটত না। তাই ত জীবনের চরম গৌরবের মুহূর্তেও এঁদেরই আমি দেবতার মত পূজ্য বলে মনে করেছি। দেবতার প্রসন্ন হৃদয়ের বরদান ত এসেছে এঁদেরই মাঝ দিয়ে। সহৃদয় পাঠক আমার বক্তব্যকে আত্মবিজ্ঞপ্তির ঢাক-পেটানো ভেবে ভুল বুঝবেন না, এ-বিশ্বাস সত্ত্বেও সসংকোচেই বলছি—আমার কানে এসেছে ক্যান্সার হসপিটালে বেড করে দেওয়া, গভর্নমেণ্টের তহবিলে বন্যা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির জন্য ডোনেশন দেওয়া অথবা মহিলা শিল্পীমহল গড়া—এসবই হোলো আমার মহত্ত্বের ভান, উদারতার সুগার কোটিং। আসলে আমি যশলোলুপ ক্ষমতাপ্রিয় ইত্যাদি।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে জানাই যখনই জীবনে প্রাচুর্য এসেছে তখনই মনে প্রশ্ন জেগেছে তাঁদের জন্য আমি কি করলাম যাঁরা আমাকে এই সমৃদ্ধির অধিকারিণী করেছেন? আমি, আমার পরিবারবর্গ চর্ব্যচোষ্য ভোজন করে, সুসজ্জিত হয়ে আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছি যখন আমার দেশের অগণিত নরনারী অনাহারে, জীর্ণবাসে, বিনা চিকিৎসায় অকালমৃত্যু বরণ করছেন। তাঁরাও ত আমারই মা, বাবা, ভাইবোন ও সন্তানতুল্য। এঁদের জন্য বুকটা ফেটে যায়। কিন্তু কি করতে পারি? কতটুকু করার সাধ্য আমার আছে? যেটুকু করতে পারব তা হয়ত তাঁদের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কিন্তু তাই বলে কি নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকব এই ভেবে যে দরিদ্র দেশের মানুষের এছাড়া উপায়ই বা কি? রামায়ণে রামচন্দ্রের জন্যে কাঠবিড়ালীর সাহায্য করার গল্পটি আমায় এঁদের সামান্যতম কাজে লাগবার প্রচেষ্টায় উদ্দীপিত করেছে।

আর ভান? সেই ভস্মমাখা ভণ্ড সাধুর গল্প ত সকলেরই জানা। যে চুরি করে পালাতে গিয়েও আক্রমণকারীদের এড়াতে না পেরে ছাই মেখে সাধু সেজে বসল তখন তাকেই সত্যকার সাধু ভেবে দণ্ডদাতারা দণ্ডবৎ করে চলে গেলেন। চোরের তখন চেতনা হোলো—তাই ত। যার ভেক দেখেই এরা মুগ্ধ, যদি সত্যি করেই তা হওয়া যায়, তবে এরা আমায় নিয়ে কি

করবে? এ উপলব্ধি জাগার সঙ্গে সঙ্গেই হীন তস্করের সত্যিকারের সাধুতে রূপান্তর ঘটল।

এতবড় মহৎ রূপান্তর জীবনে ঘটবার মত কোনো পুণ্য কাজই আমি করিনি। তবে নানা মানুষের সংস্পর্শে এসে চেতনার দিবাদৃষ্টি একটু-আধটুও মেলেনি কি আর? এই দৃষ্টির প্রসাদেই ত মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি তার আপাত-ক্ষুদ্রতা ছাপানো দেবত্বকে। একবার নয়। বহুবার। দেখেছি তার হিংসায়, দেখেছি তার উদারতায়, দেখেছি তার নীচতায়, দেখেছি তার মহত্ত্বে। অন্যের নীচতা ও ঈর্ষায় নিজেরই অনেক শক্তিকে চিনিয়ে দিয়েছে যা আগে চিনিনি। এদের মহত্ত্ব ও উদারতা আমার এই উপলব্ধির দ্বার খুলে দিয়েছে যে, ক্ষুদ্রতাই মানুষের সম্বন্ধে শেষ কথা নয়।

মনে আছে, একবার এক সতীর্থা আমায় অভিযোগ করেছিলেন, আমি তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরবশ হয়েই শরৎবাবুর বইগুলো অধিকার করে বসে আছি এবং এর সত্বাধিকারীদের তাঁকে দেওয়ার সদিচ্ছায় বাধা হচ্ছি আমিই। বহুদিন ধরে এ-অভিযোগ শুনেও গুরুত্ব দিইনি। হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। একদিন এমনই অসহ্য অবস্থায় ব্যাপারটা পেঁছিলো যে, সে-পর্যায়কে আর হেসে উড়িয়ে দেওয়া গেল না।

প্রমাণ হয়ে গেল, তার ধারণা ভুল। আমি তাকে বঞ্চিত করিনি। এর মূলে অন্য কারণ ছিল। তখন তাকে আঘাত করবার জন্য নয়, ভুল ভেঙে দেবার অভিপ্রায়েই বুঝিয়ে বলেছিলাম, 'এটা তুমি কেন বোঝো না যে, মানুষ ঈর্ষা করে তাকেই যে সমান অথবা অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতার অধিকারী হয়েও বেশী এমন অনেক সুবিধা-সুযোগ পাচ্ছে যা তার পাওয়া উচিত নয়। এক্ষেত্রে আমাদের উভয়ের কারোরই, সেরকম কোনো ক্ষোভ থাকার কারণ নেই।

প্রথমত তুমি যদি একটা প্রোডাকসন করে থাক, আমি করেছি দশটা। তোমার যদি অল বেঙ্গল ফেম থাকে, আমার আছে অল ইণ্ডিয়া ফেম। অভিনয়ে কে শ্রেষ্ঠ জানি না, তবে আমার গানেরও সামান্য খ্যাতি আছে যা তোমার নেই। তোমার একটা বাড়ী, আমার তিনটে। রূপের ওপর মানুষের কোনো হাত নেই। কারণ সেটা বিধাতার দান। কিন্তু এ-দানেও বিধাতা আমার প্রতি অকৃপণ নন। এখানে তোমাকে আমি ঈর্ষা করতে পারি কি কারণে?'

বান্ধবী নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিলেন, কিছু ক্ষুব্ধও। পরে মনে হয়েছিলো এতটা উত্তেজিত হয়ে এমন তীব্রভাবে না বললেও হতো। এ যেন খানিকটা ছেলেমানুষের ঝগড়ার মত হয়ে গেল। কিন্তু আজ মনে হয় ভুল করিনি। নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত্র অহঙ্কার করা যতখানি মূর্খতা, ঠিক ততখানিই অন্যায় অকারণ এবং অতিবিনয়ে আপনাকে অযোগ্যের কাছে ছোটো করা। একের মর্যাদা অন্যে সহ্য করতে পারে না তারই অহেতুক উত্তেজনা আর নীচতার জন্যে। এ নীচতার প্রতিবাদ না করাটা শুধু নিজের প্রতিই অবিচার করা নয়—সেই ঈশ্বরের কাছে অপরাধী হওয়া যে ঈশ্বর আত্ম মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে চলবার মত সকল সম্পদই আমায় মুক্ত হাতে দিয়েছেন।

অহমিকার ফেরে পরিণতমান, বিদগ্ধ মানুষও যে কত ক্ষুদ্র হয়ে উঠতে পারে সে অভিজ্ঞতাও আমায় বিচলিত করেছে বহুবার। মনে পড়ে আমারই আত্মীয়া এক বিদগ্ধা মাহলার কথা যাঁর আন্তরিকতায় সন্দেহ করবার কল্পনাও কোনো দিন করি নি। অনিবার্য্য ঘটনার সংঘাতে তাঁর সঙ্গে পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। তখন তারপর তিনি চেয়ে পাঠালেন সেই শাড়ীটি যে শাড়ীটি এক বিশেষ আনন্দের দিনে তিনি আমায় উপহার দিয়েছিলেন। শাড়ীটি যে খুব মূল্যবান তা নয়। সে শাড়ী হারানোটাও তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ক্ষতির পর্যায় পড়ে না। কিন্তু সেই শাড়ীটির সঙ্গে হারাতে হোলো যে বস্তুটি তা আমার পক্ষে সত্যিই বড় মর্মান্তিক। সে হোলো তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা। মানুষ যখন কারো প্রতি শ্রদ্ধা হারায় সে হারানো শ্রদ্ধার পাত্রকে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত করে জানি না। কিন্তু যে হারায় তার ক্ষতির পরিমাপ জীবনের গড়পড়তা হিসেবের মানদণ্ড দিয়ে বিচার করা যায় না। কারণ এ শ্রদ্ধা হারানো মানেই হৃদয়ের নিভৃত কোণে সঞ্চিত রসের পাত্রে টান পড়া। রূপ সমৃদ্ধা পৃথিবীর রঙ ফিকে হয়ে যাওয়া। মাঝে মাঝে তাই মনে হয় মিথ্যে অহমিকার অসংযমের কাছে মানুষ কত অসহায়। তার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা, সংস্কৃতি, বিদগ্ধ সবই বুঝি হার মেনে যায় সেই দানবীয় শক্তির কাছে।

এই প্রসঙ্গেই মনে আসে বহুবার সাধ্য মত অর্থ সাহায্য করেছি এমন এক বন্ধুকে মাত্র একবারই ফিরিয়ে দিতে হয়েছিলো, তখন আমি নিজেই অর্থ সমস্যায় বিব্রত ছিলাম বলে। এ অমার্জনীয় অপরাধে আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে আমার সম্বন্ধে যেসব অপবাদ তিনি রটনা করেছেন তা আমায় যতখানি বেদনা দিয়েছে বিস্মিত করেছে তার চেয়েও বেশী।

রাধামোহনের সঙ্গে দর্পচূর্ণ চিত্রে

রাত বারটায় আমার বাড়ীতে ঢুকতে চেয়ে যাদের গেট থেকেই ফিরে যেতে হয়েছে, নানান কাগজে সেইসব নীতিবাদী-দের প্রচারিত কুৎসার কলঙ্কও আমি নির্বিকার চিত্তে পান করেছি। জীবন ভরে এমনই কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধ্যায় চলেছে। কিন্তু সকলকে ছাপিয়ে উঠেছিলো একটি সীমাহীন নীচতার কাহিনী। এ কাহিনী যেমন নির্দয় তেমনই মর্মান্তুদ। বহুদিন আগের ঘটনা। আমি নিয়মিত পেট্রোল কিনতে যেতাম একটি দোকানে। বিক্রেতার আসনে দেখতাম এক তরুণকে। যেদিন লোক না থাকত নিজেই ছুটে এসে পেট্রোল ভরে দিয়ে যেত। চেহারাটা ভারী মিষ্টি। হাসি মুখ, নম্রস্বভাব। স্বল্পভাষী ছেলেটি প্রথম থেকেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। কথা বলার খুব বেশী দরকার হোতো না। কিন্তু সামান্য কথাবার্তার মধ্যেও তার মুখে 'মা' সম্ভাষণ আমার ভারী ভালো লাগত। অজানতে তার ওপর একটা মায়াও পড়ে গিয়েছিলো।

এমনি ভাবেই চলছিলো। হঠাৎ একদিন গিয়ে তাকে দেখতে পেলাম না। সেদিন মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। এরপর বেশ কয়েকদিন উপোর-উপোর গিয়ে তাকে দেখতে না পেয়ে খবর নিয়ে জানলাম, অরুণ খুব অসুস্থ। টাইফয়েড হয়েছে। বাড়ী কোথায়? খোঁজ নিয়ে জানলাম, এখানে তার বাড়ীঘর বলতে যা বোঝায় তা নেই। সেবা বা দেখাশোনা করবার মত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেউই কাছে নেই। মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই খবর করে সে যেখানে থাকে চলে গিয়ে দেখি প্রবল জ্বরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। ওষুধ-পথ্য ত দূরের কথা, তেষ্টা পেলে একফোঁটা জল মুখে দেবারও কেউ নেই। আমি লোকজন দিয়ে তাকে গাড়ীতে তুলে একেবারে বাড়ী নিয়ে এলাম। দু-চারদিন চিকিৎসা, সেবাশুশ্রূষার পর জ্ঞান হতে তারই কাছে ঠিকানা নিয়ে বাড়ীতে খবর দিলাম।

বেশ কিছুদিন বাদে আত্মীয়স্বজনরা এলেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে। কারণ? মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে অরুণকে বাড়ী নিয়ে এলাম—এ-দায়িত্ব গ্রহণ আমার অধিকারের এলাকায় পড়ে না। এতবড় অন্যায় করার দুঃসাহস শাস্তির যোগ্য।

যাই হোক, একটু সুস্থ হতেই অরুণকে তাঁরা নিয়ে গেলেন। কিন্তু কদিন যেতে-না-যেতেই টাইফয়েড রিল্যাপস্ করে বাঁকা দিকে মোড় নিল। রোগী ডিলিরিয়াম-এর স্টেজে চলে যেয়ে সর্বক্ষণই কেবল 'মা' 'মা' করে আমাকেই দেখতে চাইত। (অরুণের মা ছিলো না)। যে ডাক্তার দেখছিলেন, তিনিই তখন বললেন, 'রোগী যাকে দেখতে চাইছে শীগগির তাকে খবর দিয়ে আনান, নইলে একে বাঁচানো মুস্কিল হবে।'

তখন তাঁরা এসে পূর্বকৃত ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আমায় নিয়ে গেলেন। আমি ভাবলাম, যাক, এঁদের মন যদি গ্লানিমুক্ত হয়ে থাকে, তবে সেইটেই পরম লাভ। অরুণকে আমি সারিয়ে তুলবই। তারপর দিনের বিশ্রাম, রাতের ঘুম ত্যাগ করে আমি ওর রোগশয্যার পাশে জেগে থেকেছি।

একদিন রাতের ঘটনা বলছি। অরুণ ঘুমোচ্ছে। আমি খাটের ওপর ওর কাছেই আধশোওয়া হয়ে আছি। হঠাৎ মনে হোলো খাটের তলায় কারা যেন নড়ে ওঠায় খাটটা দুলে উঠল। মানুষের নীচতা সম্বন্ধে তখনও পুরোপুরি অভিজ্ঞতা না থাকায় ভাবলাম আমারই ভুল। খাটের তলায় আবার কে থাকবে? কিন্তু Facts are stranger than fiction. পরে জেনেছিলাম, অরুণের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সম্বন্ধে ওরা কোনদিন সন্দেহমুক্ত নয়। এবং রাতের পর রাত দুরন্ত কৌতূহলে ওরাই খাটের তলায় লুকিয়ে থেকেছে। কেন—সে-কথা বলতেও প্রবৃত্তি হয় না।

যাই হোক, অরুণ সুস্থ হয়ে উঠলো। বলতে ভুলেছি, এই অরুণ তোলো বোম্বাই-এর নায়ক অশোককুমারের মাসতুতো ভাই। এমন উচ্চমন, নির্মল চরিত্র ও মধুর স্বভাবের ছেলে আমি খুব বেশী দেখিনি। শুধু মুখেই সে আমায় 'মা' বলেনি। অন্তরের সবটুকু স্নেহ ও শ্রদ্ধা দিয়েই 'মা'-র আসনেই বসিয়েছে। ওর স্ত্রীকে (মেরী মুখার্জি নামেই বোম্বাই ও কোলকাতা শিল্পীমহলে জনপ্রিয়) আমি 'বৌমা' বলি। তার কাছেও আমি ঠিক সেই শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়েছি যা আশা করতে পারি আমার আপন পুত্রবধূর কাছে। রান্নার পৈতে, বিয়ে আরো কত দুর্দিনে ও যেভাবে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, আমার সংসার সামলেছে, সে সহৃদয়তা নিকট আত্মীয়ের কাছেও মেলে না। অরুণ খুব অল্প বয়সেই আমাদের ছেড়ে চলে গেল। বোম্বেতে ও বহু ছবির সংগীত-পরিচালকরূপে নাম করেছিলো। একদিন ওর দুটি মেয়েকে নিয়ে দাদা অশোক-কুমারের সঙ্গে কোথায় যেন গিয়েছিলো। ফেরবার পথে গাড়ীতেই দাদার কোলে মাথা রেখে চিরদিনের জন্যই চোখ বুজল। হঠাৎই হার্টফেলের ব্যাপার।

এমনিতে স্বল্পভাষী হলেও অরুণ ছোটোখাটো রসিকতার আবহাওয়া তৈরি করতে পারত চমৎকার। কর্মজীবনে ওকে বহু সংগ্রাম করতে হয়েছে। বৌমা ওর শুধু সহধর্মিণীই ছিলো না, ছিলো সহ-মর্মিণী। হাসিতে, খুশিতে, অফুরন্ত সংসারের কাজে, সেবায় সকল দুঃখবেদনাকে এক ঝটকায় উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা যেন ওর হাতের মুঠোয়। ওদের সংসারে তাই শান্তির অভাব কোনোদিন ঘটেনি। জীবনে কোনো কাজের জন্যই আমি কারোর ওপরই নির্ভর করি না। একমাত্র 'বৌমা' যখন আসে ওর ওপর সংসারের ভার ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। তাই ওকে বলি আমার 'ডান হাত'।

তারপর যা বলছিলাম। দুঃখকে নিয়ে হা-হুতাশ করা ওদের দুজনেরই ধাত-বিরুদ্ধ। রঙ্গ-রহস্যে দুঃখকে ওরা এমন মধুর করে তুলত যেটা উঁচুদরের আর্টের পর্যায়ে পড়ে।

বৌমার কাছে শুনেছি একবার বহুকাল একটানা সংগ্রামের অধ্যায়ে অরুণ ওকে হাসতে হাসতে বলেছে 'ভালই ত চলছে। এইবেলা প্রাণভরে দুঃখ-টুকুখো যা করবার করে নাও, নইলে পরে আবার আমায় দোষ দেবে জীবনে দুঃখ কাকে বলে তোমায় জানতেই দিলাম না বলে।' বৌমাও বলে 'মা, তোমাকে মা বলার জন্য বোম্বের আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে বন্ধুমহল ওকে কিভাবে যে ক্ষ্যাপাত কি বলব। অনেকেই মুখ টিপে হেসে অনুযোগ করত 'এত মেয়ে থাকতে বেছে বেছে তোমার সঙ্গেই এ-সম্পর্ক গড়ার এত আগ্রহ কেন?

ওর মুখখানা যে তখন কি হয়ে যেত তোমায় কি বলব মা। গুম্ হয়ে বসে থাকত। তারপর একটি কথারও জবাব না দিয়ে উঠে চলে যেত। এত শ্রদ্ধা ছিলো তোমার ওপর।'—এই প্রসঙ্গে বলি—অরুণ কোনো সাংসারিক অথবা ব্যবহারিক কারণে আমার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলো না। নামের মোহেও না। আমি তখন 'মানময়ী গার্লস স্কুলের'ও নায়িকা নই। আমার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক একেবারে নিখাদ এবং নির্ভেজাল স্নেহের। তাই ওর আত্মীয়-স্বজনের কটূক্তির মুহূর্তেও মনে পড়ে যেত দিলীপদার মুখে শোনা তারই অনুবাদ কোনো এক বিদেশী সিনিকের উক্তি ঃ—

'আত্মীয় কারে কয় জানো হায়,
　　　　রটায় যে উল্লাসে,
সেই অপবাদ শুনে যাহা,
　　　　চিরশত্রুও লাজ বাসে।'

তাই ত মাঝে মাঝে সকল নীচতার বিরুদ্ধে গর্জে-ওঠা মন প্রশ্ন করে, মানুষের সঙ্গে মানুষের শুচি-শুভ্র সম্পর্কে মানুষই কেন এমন করে কালি ঢেলে দেয়? আমাদের মনের কিরণবিলাসী কুঁড়িগুলিকে যদি অনাদরের আওতায় শুকিয়ে যেতে হয়, তাতে করে জীবনে সুষমার অপচয়ই ঘটে না কি?

অনেক ভেবে দেখেছি এর জন্য দায়ী কতকগুলি বহুল প্রচলিত অর্থহীন শব্দ যার দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রয়োগ মনের সুকুমার বৃত্তিগুলির পক্ষে অ্যাটম বোমের মতই বিপজ্জনক। এমনই একটি কথা হোলো ফ্রয়েড ও তাঁর মনস্তত্ত্ব। ফ্রয়েড মাথায় থাকুন তাঁর যথার্থ বক্তব্য সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু তাঁর থিওরী অনেকের চিন্তায় বিকৃতিই শুধু আনেনি, পচন ধরিয়েছে মনের শ্যামল লতার মূল-গুলিতে।

হাসি পায় যখন দেখি একটা বিপুল লীলার অতিকায় বৃত্তের একটি মাত্র বিন্দুতে আমাদের ছোট্ট সম্বিৎটুকুকে সংহত করে তার সমগ্র পরিধির কাছে চেয়েছি দিশা। চেয়েছি বামন মানসবুদ্ধির এই সঙ্কুচিত চেতনার অনুবীক্ষণ দিয়ে অগণ্য নীহারিকার আলো মাপতে। কিন্তু কে বলে এই আত্মম্ভরিতা আমাদের পরম-তম দিশা দেবেই দেবে? জগতের সকল প্রগলভতার দাপট যখন ম্লান হয়ে আসছে, তখনই উপলব্ধি করি মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষের ক্ষুদ্রতার মাঝেই কেন জগৎকে দেখব যখন মহৎ মানুষের জ্যোতির্বিন্দুতে উদ্ভাসিত হবার মত মুহূর্তও জীবনে দুর্লভ নয়? হোক না তা ক্ষণিক, পলাতক। এই ক্ষণিক দ্যুতিই কি যুগের আঁধারকে মিথ্যে করে দেয় না?

এমনই এক মুহূর্তকে পেয়েছি যখন আমার কবীর রোডের বাড়ীতে যামিনী রায় এসেছিলেন। খাটো করে পরা ধুতি-পাঞ্জাবীর ওপর চাদর জড়ানো মানুষটিকে দেখে মনে হয়েছিলো যেন সেই ত্রেতাযুগের কোনো তপস্বী তাঁর সাধনার অবকাশে আমায় আশীর্বাদ করতে এসেছেন। কি সম্ভ্রমের আবেগ সেদিন মনে জেগেছিলো বলতে পারি না। মনে আছে টুলের ওপর ও'কে বসিয়ে যখন পা ধুইয়ে দিচ্ছিলাম—উনি ঠিক সেই হাসি-ভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে চুপটি করে বসেছিলেন— যে-দৃষ্টি দিয়ে পিতা উপভোগ করেন শিশু-সন্তানের আদরের আবেগ। মনে হয়েছিলো এমন মানুষকে যদি শ্রদ্ধা জানাতে না পারলাম তবে 'শ্রদ্ধা' কথাটার সৃষ্টি হয়েছিলো কেন?

ও'র আগে অনেক শিল্পীর স্টুডিওতে গেছি, ছবি কিনেছি। কিছুটা শিল্পের প্রতি অনুরাগবশত, কিছুটা শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের অনুপ্রেরিত করতে। কিন্তু যামিনীবাবুর স্টুডিওতে গিয়ে শুধু ছবিকেই দেখিনি—এখানে স্পর্শ পেয়েছি তাঁদের অনুপম স্রষ্টার অনাড়ম্বর স্নেহ-প্রবণ অন্তরটির। বন্ডেল রোডের বাড়ীতে আসার পরও অনেকবারই তিনি আমায় যেতে বলেছিলেন। নানা কারণে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। সে ক্ষোভ মোছবার নয়।

এক পলকের জন্য দেখেছিলাম রবীন্দ্র-নাথকে, স্মৃতির দিগ্বলয়ে তারার মত ফুটে আছে সে মুহূর্তের ভাবগাঢ়তা। হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে উনি এসেছিলেন রেকর্ড করতে। ও'কে দেখবার জন্যই সেখানে নামী অনামী কত লোকের ভিড়। আমি ছিলাম তাদেরই একজন।

ভুলদার (প্রশান্ত মহলানবিশ) ভাই আমায় সঙ্গে করে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। প্রণাম করতেই চিবুক ধরে মুখ তুলে আদর করে বললেন, 'কি মিষ্টি মুখখানি গো তোমার? তুমি গান গাইতে পার?'—ওখানেই কে একজন বলে উঠলেন, 'গুরুদেব আপনার একটি-দুটি গান গেয়েই ও চারি-দিক মাতিয়ে তুলেছে।' উনি হেসে বললেন 'তাই নাকি? আমাকে একদিন তোমার গান শোনাও।' তারপর অনিলদাকে (চন্দ) বললেন 'একে একবার শান্তিনিকেতনে নিয়ে যেও—খুব ভাল করে ভাব করে নেব তখন।' সেই জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের একটি সস্নেহ চাউনি ও স্পর্শের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিলো যেন আলোর সমুদ্রে স্নান করছি।

মহাত্মাজীর সঙ্গে দর্শনে মনের মধ্যে বেজেছিলো একটি প্রার্থনার আকুতি 'সব্‌কো সম্মতি দে ভগবান।' বীণাই এক-দিন আমায় জেদ করে বলল, 'মহাত্মাজীকে দেখবে না? সমসাময়িক একজন মহাপুরুষ বেঁচে থাকতেও তাঁকে যদি দর্শন না কর, পরে নিজের সন্তানসন্ততির কাছে কি জবাবদিহি করবে?'

'মহাত্মাজীর দেখা পওয়া কি আমার মত সামান্য মানুষের পক্ষে সম্ভব?' সসঙ্কোচে বলেছিলাম।

'কেন নয়? উনি ত সোদপুরে এসে-ছেন।। চল দেখে আসি।'

তারপর ও মাখন সেন, সতীশ দাশ-গুপ্তর এ'দের সহযোগিতায় সোদপুরে আমায় নিয়ে গেল। প্রার্থনাসভায় বসতে পেরেছিলাম মহাত্মাজীর খুব কাছেই। দেখলাম হাতজোড় করা, প্রার্থনারত মানুষটি যেন অগণিত মানুষের ভিড়ের মধ্যেও একান্তে বসে অনন্তের সঙ্গে কথা বলছেন। কিন্তু আমার এ অনুভবনিবিড়তা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল যখন দেখলাম কানে এল চারিদিকের ফিস্‌ফাস ও গুঞ্জনের মধ্যে আমার নামটা। শুধু অস্বোয়াস্তিবোধই করিনি, ভারী অপরাধী মনে হচ্ছিলো প্রার্থনাসভার ধ্যানতন্ময়তা ভাঙার জন্য। পরোক্ষভাবে নিজেকে দায়ী ভেবে।

ক্ষিতিশবাবুই মহাত্মাজীকে বললেন, 'এর ভারী আগ্রহ আপনাকে দেখার।' অমনই মহাত্মাজীর মুখে ফুটে উঠল সেই অপার্থিব হাসি, যে-হাসির সামনে এসে তাঁর ঘোরতর বিরোধীপন্থীরও সমা-লোচনার কণ্ঠ আপনা থেকেই স্তব্ধ হয়ে

পথেবিপথে দিল চিত্রে পূর্ণিমার সংগে

যেত—সীমাহীন শ্রদ্ধার আবেগে। প্রণাম করতে দুটি হাত আমার মাথার ওপর চেপে ধরলেন। বিধাতার অভয় মন্ত্রদানের স্পর্শের আনন্দ যেন প্রবাহিত হোলো সারা দেহে। ফেরবার সময় কানে বাজছিলো সেই সুর 'সব্‌কো সন্মতি দে ভগবান'—আমিও সারাক্ষণ যেন সারা দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে মন্ত্রের মত ঐ একটি সুরেই গেয়েছি 'সব্‌কো সন্মতি দে ভগবান।'

আমার সৌভাগ্যক্রমে ঐখানেই সেদিন ছিলেন সীমান্ত গান্ধী। মহাত্মাজীকে দর্শন করে তাঁর কাছেও গেলাম। কি সীমাহীন স্নেহে তিনি কাছে টানলেন। কথা বেশী হয়নি। মনে হয়েছিল আমি এত ক্ষুদ্র, মানুষ, এ'দের সঙ্গে কি কথা বলব? এ'দের কাছে আসতে পেরেই ত জীবন সার্থক। অনেকক্ষণ ছিলাম। কি শিশুর মত সরলতা ও'র স্বভাবে, ব্যবহারে। সহজ হওয়াটাই কঠিন। কিন্তু মানুষ সহজ হলে তার যে রূপ উদ্ভাসিত হয়, তা শুধু নিজেকেই নয়—তার চারপাশের পরিবেশকেও যেন আলো করে তোলে। আমি ও'র অনেক ছবি তুললাম। যেখানে, যেভাবে বসতে বলছি বিনা প্রতিবাদে সে-আবদার পূর্ণ করছেন। সে হৃদয়ভরা স্নেহকেও আস্বাদ করেছি প্রাণভরে।

তাই ত ভাবি যাঁদের একটি স্পর্শে, একটি চাউনিতে মানুষের অন্তরকে সুন্দরের ধ্যানে বিভোর করতে পারে তাঁদের শক্তির অবধি কোথায়?

ঠিক যুগপুরুষের পর্যায়ে পড়েন না—এমন মানুষের স্নেহ ও সৌজন্যের দানও বিচিত্র রাগরাগিণীর মতই হৃদয় ভরে দিয়েছে বারবার।

মানুষের পদবী ও পদমর্যাদার অন্তরালের মানুষের মনের পরশ বারবার অন্তরকে যে পুণ্যস্পর্শে অভিষিক্ত করেছে, সে মহনীয় স্মৃতিকে বিলুপ্ত করবার শক্তি কার? একবার সরোজিনী নাইডুকে গান শোনাবার সৌভাগ্য হয়েছিলো। গানের পর আমায় জড়িয়ে ধরে ও'র সেই উচ্ছ্বাস কি ভোলার? রাজ্যপালদের মধ্যে কাটজু, হরেন মুখোপাধ্যায়, পদ্মজা নাইডু, ধরমভীরা—এ'রা কেমন করে এবং কখন যে উচ্চাসনের মর্যাদামণ্ডিত স্তর থেকে নেমে আমার পাশে কাছের মানুষটির মত এসে দাঁড়িয়েছেন অকৃত্রিম স্নেহে ও ঔদার্যে, জানতেই পারিনি।

একটি সন্ধ্যার স্মৃতি মনে বড় উজ্জ্বল হয়ে আছে। শ্রদ্ধেয় তুষারবাবুর আমন্ত্রণে একবার মহাজাতি সদনে শিশির লাইব্রেরী ইনস্টিটিউটের পুরস্কার বিতরণী সভায় ধরমভীরা ছিলেন সভাপতি। আমি পুরস্কার বিতরিকা। আমার যেতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিলো। আমি হলে ঢুকতেই ও'র বোনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব থাকা অথবা কি কারণে জানিনা "আইয়ে কানন দেবীজী' বলে ধরমভীরা উঠে দাঁড়ালেন। ও'কে দেখে তুষারবাবু, সুকমলবাবু এবং মাননীয় আব যাঁরা ছিলেন—সবাই উঠে দাঁড়ালেন। অত্যন্ত লজ্জা পেয়েছিলাম সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হয়েছিলো, আমরা মানুষকে সম্মান প্রদর্শন করে শুধু কি তাকেই সম্মানিত করি? না। এ সম্মান-জ্ঞাপন করে আমরা সম্মানিত করি নিজের বৈদগ্ধ্য, শিক্ষা ও মার্জিত রুচিকে।

এই প্রসঙ্গে অন্নপূর্ণা ও শোকিলার কথা না বললে এ অধ্যায় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।—অন্নপূর্ণা দাস হলেন সারদাচরণ দাসের (কে, সি দাসের পরিবারের) স্ত্রী। ১৯৩৯ সাল থেকে ও'র সঙ্গে বন্ধুত্ব। আর এ বন্ধনে দুই পরিবারকে আত্মীয়-বন্ধনে বেঁধেছে ও'দের অনাবিল ভালবাসার জোরে। দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে আমাদের দুই পরিবারের আসা-যাওয়া। দেখাশোনা ও খুঁটিনাটি নানা বিনিময়ের মাঝ দিয়ে আমাদের এ সম্পর্ক আরো গভীর, আরো মধুর হয়েছে। এই অকলঙ্ক শুভ্রতায় কোনোদিন যে এতটুকু মালিন্য স্পর্শ করেনি সে শুধু অন্নপূর্ণার স্নেহসজল হৃদয়ের মহত্বে। আমার যা বললেন, অন্নপূর্ণা নামেও অন্নপূর্ণা [illegible] দিয়ে আমাদের [illegible] পারত কি?

একবার কোনো এক উৎসবে আলাপ হোলো এক অবাঙালী মেয়ে শোকিলা কাপাডিয়ার সঙ্গে। সে থাকে বোম্বেতে। তখন ঘটনাচক্রে কোলকাতায় ছিল বলেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে গেল। আমার গানের ভক্ত ছিল সে আগেই। দেখা হতেই আমায় এমনভাবে ভালবেসে ফেলল যেন সে আমার জন্মান্তরের সহোদরা। আমাকে চিঠি লেখবার জন্য এবং আমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলবার জন্যই সে কত চেষ্টা করে বাংলা শিখেছে। স্বামী-সন্তানসহ সুখ-সমৃদ্ধা হয়েও আমার প্রতি তার এই আকর্ষণ কি আশ্চর্য নয়? প্রায়ই প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ও বোম্বে থেকে ট্রাঙ্ককল করে আমার খবর নেয়। সপ্তাহে একখানা করে চিঠি ত' দেয়ই। মাঝে মাঝে তার চেয়েও বেশী। তার আবেগের উত্তাপে-তপ্ত ভাষা পড়তে ভারী মিষ্টি লাগে। বোম্বে থেকে তার চেনা পরিচিত কেউ এলেই তার হাতে আসবেই আসবে শোকিলার দেওয়া কোনো-না কোনো উপহার। সুদৃশ্য দেওয়াল-ঘড়ি, পান-মশলা রাখবার মস্তবড় রুপোর ঝারি। শিল্পখচিত পেপারওয়েট ফুলদানী, ল্যাম্প এমনি আরো কত টুকিটাকি জিনিস যা আমার সর্বদা ব্যবহারে লাগতে পারে। ও চায় প্রতি মুহূর্তে ওর দেওয়া জিনিস স্পর্শ করে যেন আমি ওকে মনে করি। এত উপহার নিতে প্রথম প্রথম নিজেরও বাধো-বাধো লাগত না কি আর? এ নিয়ে ওকে কত বকেছি, বুঝিয়েছি, মানুষের অন্তরের অনুভূতি অন্তর স্পর্শ করেই। আর আমি ওর মত স্নেহকোমলা না হলেও এত কঠিন ধাতু দিয়ে গড়া নই যে, অমন হৃদয়-ভরা স্নেহকে উপলব্ধি করতে পারব না। কিন্তু বড় ব্যথা পায়। বলে তোমাকে যা দিই এর একটি জিনিসও আমার স্বামীর অর্থে কেনা নয়—এ আমার স্বোপার্জিত টাকায় কেনা। আমি দিই কে বললে? তুমি আমায় গ্রহণ করে আনন্দ দাও। এটুকু থেকে আমায় বঞ্চিত কোরো না।'—এ কথার পর আর কি বলা যায়?

তাই ভাবছিলাম, এত মানুষের এমন নিষ্কলুষ স্নেহ, অন্তহীন মমতা ও নিটোল শ্রদ্ধার স্পর্শের কাছে কোনো ক্ষুদ্রতার আঘাত কেন বাজবে? বাজতে দেওয়া উচিত নয়। আলো যে চিরদিনই ছায়াময়ী। এই প্রসঙ্গেই জানাই আমার সারা শিল্পী-জীবনে প্রণয়িনী সম্বোধিত বহু চিঠি যে পাইনি তা নয়। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী পেয়েছি মাতৃসম্বোধনের চিঠি। তাই বারবারই কবিগুরুর সেই কবিতার চরণগুলি মনে পড়ে যায় যা বহু দুঃখের লগ্নে হৃদয়কে সান্ত্বনার স্নিগ্ধ আশ্বাসে যেন আদর করেছে—

"কালো মেঘ আকাশের তারাদের ঢেকে
মনে ভাবে জিত হোলো তার
মেঘ কোথা মিলে যায় চিহ্ন না রেখে
তারাগুলি রহে নির্বিকার।"

(ক্রমশঃ)

অনুলিখন—সন্ধ্যা সেন
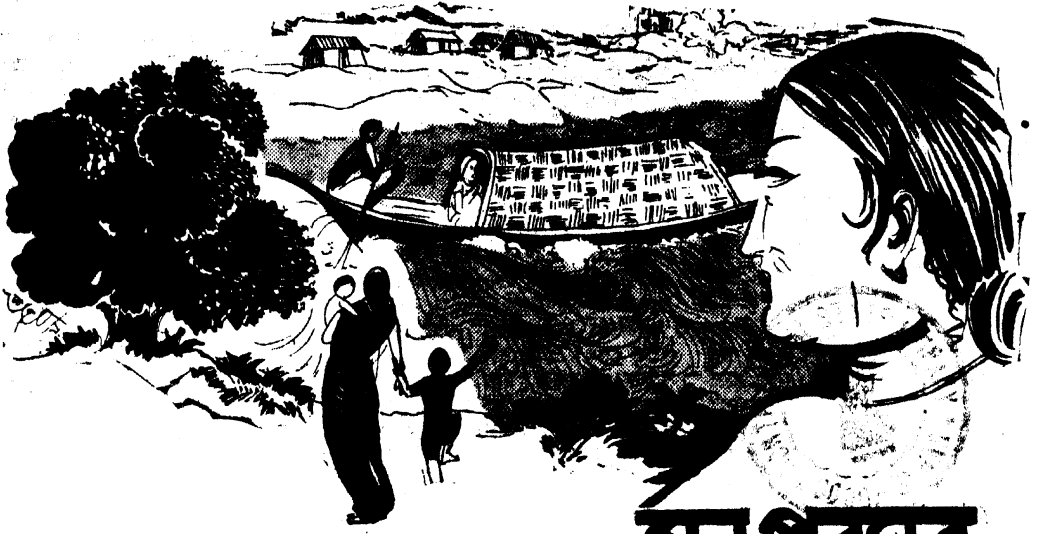
মন পবনের নায়ে

সরিতা সেনগুপ্ত

জগদ্ধাত্রী নিজের ঘরখানায় চুপচাপ মাদুর পেতে শুয়েছিলেন। ভাবছিলেন আকাশ পাতাল। আজকাল চুপচাপ শুয়ে শুয়ে ভাবতে খুব ভাল লাগে। খবরের কাগজখানা পাশে রাখা। দুপুরবেলা খুঁটে-খুঁটে বাংলা কাগজখানা পড়া চাই। সব খবরই প্রায় রাখেন দেশের। আগে পড়তেন না। শ্রাবণ মাসে মনসামঙ্গল। আর অন্য সময় রামায়ণ-মহাভারত এই তিনখানা পুঁথিই পড়তেন খালি। কিন্তু ইদানীং প্রায় সব পুঁথির নেশা গিয়ে পড়েছে বাংলা পত্রিকাখানার ওপর। আঃ আশায় মনটা ব্যাকুল হয়। কাগজখানা খুলেই। আর সন্ধ্যার পর রেডিওও শোনেন। আবার দেশে যাওয়া সম্ভব হবে। পায়ের দারুণ বাতটা নিশ্চয় যাবে। বাংলাদেশে দুর্ধর্ষ খান সেনারা পরাজিত হবে ইন্দিরা গান্ধীর হাতে, মুক্তিসেনার হাতে, আর তাঁর পায়ের বাতের বেদনাটাকে কাবু করা যাবে না। তাও কি হয়। তিনি যাবেন নিশ্চয় পুজোর সময় দেশে। দেখবেন সেই চিতাটা আর একবার। সাঁঝের বেলায় জ্বালিয়ে দেবেন দীপ।

মা। তেল মালিশটা করে নেবে নাকি এখন।

দরজার পাশে দেখা দেয় উমাশশীর মুখ।

—আয় বাছা, জগদ্ধাত্রী সাগ্রহে ডাকলেন উমাকে। উমাশশী তাক থেকে তেলের শিশিটা নামিয়ে আনে। কাগজখানা তুলে রেখে দেয় তাকের ওপর। হেসে বলে, মাগো দেশে যাবে নি পুজোতে? পুজোর আর দেরী ত নেই, আজ ত নাগপঞ্চমী। আমায় নে যাবে গো মা তোমার দেশে? তুমি যে গল্প করেছিলে তোমার দেশের মনসা বাড়ীর। সেখানে গিয়ে দেখতাম আর পুজো দিতাম।

—কেন রে এত শখ কেন তোর আমাদের দেশের মনসা বাড়ী দেখবার?

—তোমার দেশে মনসা বাড়ীর গল্প এত করেছ, শুনে আমার সখ হয়েছে, আমার কাকী যে গো নাগরসা মেয়ে। তেনাকে দেখেই নাগপুজোর বড্ড সখ আমার।

—সে আবার কি? পা দুখানা টান-টান করে মেলে ধরে জগদ্ধাত্রী শুধান।

—তবে আর বলছি কি। শোন তবে। আমার বাপের বাড়ীতে অনেক ঠাকুর-দেবতা আছেন। সেবা করত কাকীমা৷ শেতলা মা, কালি, কৃষ্ণ, মনসা, বাদ কিছু নেই। কাকীমার যেন প্রাণ পড়ে থাকত ঠাকুর-ঘরে। বিধবা মানুষ, ছেলেপুলে ছিল নি, ঠাকুর-দেবতারাই কাকীর সব ছিল। কাকীর আবার কখনো কখনো ভর হত। বড় বড় করে কত কথা যে বেরুত কাকীর মুখ দিয়ে কি বলবো।

একদিন হয়েছে কি আমার মা গেল বাপের বাড়ী। আমি যাব নি সঙ্গে, রথের মেলা জ্যেঠার সঙ্গে দেখবো বলে থেকে গেলাম। সেদিন বিকেলে আমার কেমন জ্বর ভাব এল। আমি কাকীর বিছানাতে গিয়ে শুয়ে পড়লাম একটি ধারে।

এদিকে হয়েছে কি, কাকীর কাছে আসত রোজ এক জোড়া সাপ। কাকীর দেওয়া দু বাটি দুধ তারা খেয়ে কাকীর কাছেই শুয়ে পড়ত।

জগদ্ধাত্রী চোখ বড় বড় করে বললেন, কি বলছিস আবোল-তাবোল কথা। নেশা করেছিস না কি?

—নাগো মা, এই তোমায় ছুঁয়ে বলছি, নেশা-ফেশা আমি জন্মে করি না। আমিও ঘুমিয়ে পড়েছি কখন। হঠাৎ যেন শাঁখের গর্জন খাটের নীচে শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি বুইঝতে পারছি নে, কিসের গর্জন। একবার সাগরে গিয়েছিনু কপিল মুনির আশ্রম দেখতে জ্যেঠার সঙ্গে, মনে হল বুঝি বা সেই রকম ধারা সাগরের চাপা গর্জন।

জগদ্ধাত্রীর পায়ের ব্যথা ততক্ষণে উড়ে গেছে। দেশের মনসা বাড়ীর গল্প কথাকে হার মানিয়ে দিচ্ছে।

তারপর গো মা আমার জ্যেঠার গলা শুনলাম বারান্দার থেকে, বলছেন। বৌ উমা বুঝি শুয়ে আছে তোমার কাছে, ভেতরে ঢুকে দু হাতে আমাকে তুলে এনে বারান্দায় নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলেন। কিন্তু ততক্ষণে আমার ঘুম পুরো ভেঙে গেছে। আমি উঠে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ভেতর পানে তাকিয়ে রইলাম। কাকী খাটের দুটো পায়ার কাছে দু বাটি ভরা দুধ রাখলো। দুটো মোটা বিরাট সাপ বেরিয়ে এসে দুধ খেতে লাগলো বাটিতে মুখ ডুবিয়ে। কাকী বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যে সাপ দুটো দু বাটি দুধ শেষ করলে, তারপর তক্তপোষের পায়া বেয়ে উঠে এল বিছানায়। কাকীর দু পাশে শুয়ে দুজনের মুখ তুলে দিলে কাকীর বুকের ওপর। তারাও শুয়ে রইলো, কাকীও মনে হল নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। আরে তুই কি দেখছিস, তুই শো না, জ্যেঠা আমাকে টেনে তখন বিছানায় শুইয়ে দিলে।

জগদ্ধাত্রীর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, তোর কাকীমা কি বেঁচেছিল, না বিছানাতেই মরে ছিল?

—না গো, হেসে উমা বলল। ছোট্টটি ছিনু। পরদিন কাকীকে খালি শুধাই, ও কাকী, তোমার ভয় করে না। কাকী বলে, না রে ভয় করবে কেন। আমি ত ওদের মারি না, খেতে দিই। আমার মা বলত ও যে নাগরমা মেয়ে, সাপে ওর কি করবে।

—সত্যি বলছি মা, আমার নিজের চোখে দেখা। আজকাল ভক্তি বিশ্বাস ত কারো তেমন নাই মা, বিশেষ শহুরে।

জগদ্ধাত্রী যে যুগের মানুষ, তিনি বিশ্বাস করতেই চান। তার মন চলে গেল নিজের দেশে! যেখানে জন্মেছেন যেখানে বড় হয়েছেন।

সেই বিজয় গুপ্তের মনসা বাড়ী। কত অলৌকিক গল্প মনসা বাড়ী, মনসা মাকে ঘিরে। কত লোক মানসিক দিতে যেত মনসা বাড়ীতে। কত রয়ানি হত প্রতি বছর এ বাড়ী সে বাড়ী। ছোটবেলায় একবার খুড়োর সঙ্গে গিয়েছিলেন মনসা বাড়ী। পাঁঠার মাথা নিয়ে পুরুত ঠাকুরের সঙ্গে কি বকাবকি। পুরুত ঠাকুরও ছাড়বেন না, খুড়োমশায়ও না। জগদ্ধাত্রী বললেন শেষে, পাঁঠাটা কারে দিচ্ছ খুড়ো?

—ক্যান মায়েরে।

—তবে ক্যান মাথা লইয়া যাইতে চাও ঘরে? থোও মাথা মায়ের নামে পুরুইতের কাছে। আমরা চলো মন্দিরে পেন্নাম কইরা নাওতে উঠি।

খুড়োমশায় তখন পাঁঠার মাথা ছেড়ে মন্দিরের দিকে চললেন। এত বছর বাদেও হাসি পেল জগদ্ধাত্রীর। বড় নাতি বলে, ঠাকমা, আমাদের দেশ স্বাধীন হল বলে, বাবা নাকি দেশে।

—নিয়ে যাবি ভাই, তোর দাদুর চিতাটা দ্যাখতাম রে বলু, আর একবার দ্যাখতাম? তাঁর গলায় ফুটে ওঠে ব্যাকুল আগ্রহ।

আঃ, সেই পুজোর আগে দেশে যাওয়ার কথা? সেই আনন্দ এখানকার ছেলেপিলেরা আর পেল না। তারা হাঁ করে শোনে গল্প। ভাদ্র মাসে বর্ষণক্লান্ত আকাশে রোদের ঝিলমিলানি দেখলেই মনে হত পুজো পুজো রোদ উঠেছে, আর কি আনন্দই লাগতো! শুরু হত দেশে যাবার প্রস্তুতি তখন থেকে। ছেলেমেয়েরা নাচতে থাকতো পুজো পুজো রোদ উঠেছে পুজোর —আর দেরী নেইরে। তাদের সেকেন্ড টারমিনাল পরীক্ষা অন্তে স্কুল ছুটি কবে হবে দিন গুনতে থাকতো। তখন পরীক্ষা নিয়ে এত ঝঞ্ঝাট ত ছিল না।

আশ্বিন মাস পড়তে না পড়তে ছেলে-মেয়েদের কত আনন্দ পুজোর জামা-কাপড় কিনতে। আছে ত এখনো কতই কেনাকাটা কিন্তু সে সব দিনের আনন্দ কোথায়।

দেশে যেতে স্টীমারে গোর নদীতে নেমে নৌকো করে গ্রামে যাওয়া।

—আপন ডাইন, আপন ডাইন, আপন বাঁও, আপন বাঁও, মাঝিদের সেই হাঁকডাক কানে ভাসে আজও।

—কার নৌকা গো কত্তা, কে যায়?

—মুন্সীবাড়ীর মেজহিস্যার মেজকত্তা।

নৌকার মধ্যেই হুঁকা টানতে টানতে কত্তা শুধান, আর কত দেরী মাঝি?

—বেশী না কত্তা, এই ত ঋষি বাড়ী আসে ঋষি বাড়ী মানে মুচিদের বাড়ী।

খালের দু পাশে তখন অধিবাসের বাজনা বাজে। তাদের গ্রামে দেশে বাড়ী বাড়ী মায়ের পুজো হত। কামার-কুমোরদের বাড়ী পর্যন্ত। সব বাড়ী থেকেই ঢাক-ঢোলের শব্দ আসতো।

নৌকার ছই-এর ওপর খালের তীর সংলগ্ন গাছপালার ঝাড় এসে পড়ায় সর-সর শব্দ হত। সেই শব্দ এখনো যেন কানে শুনতে পান জগদ্ধাত্রী।

আস্তে নৌকা গিয়ে বাড়ীর কাছের খালে পড়ত। সেই খাল গিয়ে মিশেছে বাড়ীর ভেতরকার দীঘির সঙ্গে। দীঘিতে কুপি নিয়ে থালা ধুচ্ছে দাসীরা, লণ্ঠন হাতে পুবের ঘরের বড় ভাশুর ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন — মাঝি এদিকে নৌকা লাগাও পাড়ে। তার পরেই হাঁক পাড়েন, ওরে ও রেজ্জা আয় শীগগির! নসুর নাও লাগল ঘাট পাড়ে, তোর দেখা নাই।

দীঘির তিন পাড়ে ছয় হিস্যার ছয়-খানা মণ্ডপে তখনো বাজনা বাজছে, ছেলে-মেয়েরা লাফিয়ে ডাঙ্গায় নামে, জগদ্ধাত্রীর শ্বশুরের আমলের তশীলদার দত্তমশায় এগিয়ে এসে ছোট ছেলেমেয়েদের হাত ধরে নামিয়ে নেন। দত্তমশায়ের ঝুলিতে রাজ্যের ভূতের গল্প, ছেলেমেয়েরা দত্তমশায়কে একবার পেলে আর ছাড়তে চাইত না। এখনো মনে পড়ে কানু জিজ্ঞেস করছে, ও দত্তমশায়, শীগগির কবে ভূত দেখলেন।

দত্তমশায় বললেন তার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার কথা। আগের রাত্রে যাচ্ছিলাম মুন্সীবাড়ীর কাছের রাস্তা দিয়ে। পোলের ওপারে বড় বটগাছটা থেকে আওয়াজ এল, কোথায় যাস? কে রে তুই? আয়, চিঁড়া খাইয়া যা। রাত দুপুরে চিঁড়া খাওয়ার একটু ইচ্ছাও আমার ছিল না, আমি এগিয়ে গেলাম। মুহূর্তে মস্ত বড় একটা ডাল আমার পিছনে এসে পড়ল। চিঁড়া খাঁবি না, তঁবে এই খাঁ! নাকি সুরে একটা আওয়াজ আমার পিঠের ওপর আছড়ে পড়ল। ভাগ্যিস বটের ডালটা পড়ে নি।

—মুন্সীবাড়ীতে বুঝি খুব ভূত আছে?

—তা থাকবে না, ওখানে কত অপমৃত্যু হয়েছে।

তা হয়েছে বৈকি! জগদ্ধাত্রী তার শাশুড়ির মুখে শুনেছেন। ও বাড়ীতে পুরুষমানুষ, মেয়েমানুষ সেই জমিদারীর রমরমা কালে অনেকেই খারাপ ছিল। একটা বড় সুড়ঙ্গ মুন্সীবাড়ীর দোতলা থেকে নীচে পাতালে চলে গেছে। ওখানে ওই মৃত্যু গহ্বরের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছে কত জনাকে। ওদের উৎপাতে হাতীশালা থেকে হাতী চলে গেল, পশুশালা থেকে পালাল ঘোড়া, সাদা ময়ূরেরা পর্যন্ত। গভীর রাতে কে একজন দেওড়ির বাইরে বসে শ্যামা-সঙ্গীত গাইছিল, হঠাৎ দেখতে পেল সুন্দরী একটি মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফটকের বাইরে এসে চলে যাচ্ছে। কাছে এসে শুধালো, কে গো তুমি, কোন ভাল-মানুষের মেয়ে? এই রাতে কোথায় যাচ্ছ?

—এ বাড়ীতে আর থাকতে পারলাম না বাবা, তাই চলে যাচ্ছি। সাদা জ্যোছনায় মিলিয়ে গেল মেয়েটি। মা লক্ষ্মী ছেড়ে চলে গেলেন। লোকটি বেশ বুঝতে পেরে-ছিল। বৌ কালে জগদ্ধাত্রী একবার মুন্সী-বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলেন। ভাঙ্গা দালানের ফোকরে বট অশ্বত্থের চারা গজিয়েছে, পায়রা বকম বকম করছে ছাদের কার্নিসে, সব মিলিয়ে কেমন কান্না পাচ্ছিল জগদ্ধাত্রীর।

বাংলা কাগজে যুদ্ধের খবর পড়তে পড়তে হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে স্মৃতির বেদনায়।

মনে পড়ে বড় দাসের বাড়ীর কথা। ও বাড়ীতে অনেক অনেক বছর আগে কারা থাকত কে জানে। চার পাশে বিরাট পরিখা, হেজে-মজে গেলেও তাতে জল ছিল কম না। দরজায় সিংহ দরজার ভগ্নাবশেষ। খুব খুদে ইঁটের সারি সারি ভাঙ্গা ঘর, মনে হয় সৈন্যদের থাকবার ব্যারাকের মত ছিল। নতুন ঘর তুলতে জমি খুঁড়বার সময় ঝন-ঝন শব্দ হত নীচে। প্রত্ন-তাত্ত্বিকরা মাটি খুঁড়লে নিশ্চয় ঘর-বাড়ীর সন্ধান পেত।

দাশের বাড়ীর ছোট হিস্যার বিমল ভূঁইঞার ইতিহাসে ঝোঁক ছিল, তিনি বলতেন, মুসলমান নবাব ছিলেন নিশ্চয়। কাছেই গোলার পার গুপ্তের বাড়ী, ওখানে গোলা-গুলি তৈরী হত, তাই ওই রকম নাম। দাশের বাড়ীর দরজায় প্রাচীন কালীমন্দির যে কত কালের পুরানো তা কে বলবে। আর ওই দীঘিটা যে কত বড়, কি সুন্দরই ছিল জল, সব যেন স্বপ্নে দেখা ছবি। কবীন্দ্র বাড়ীতে কলেজটা আছে না নেই তাই বা কে জানে। কত লোকের ভিটেতে যে এখন ঘুঘু চলছে কে জানে। জগদ্ধাত্রীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে, একবার তাঁর বড় সাধ হয় অশৈশবের জন্মভূমি, শ্বশুর গৃহ, আবার দেখে আসেন। অত বড় তাঁর শ্বশুরবাড়ীর এলাকা, সে বাড়ীর দরজায় পুকুরের উত্তর-পূবের কোণে সারি দেওয়া চিতাগুলির উপর আর একবার সাঁঝের দীপ জেলে আসেন। ওখানে যাঁরা শেষ শয্যা পেতে-ছিলেন, কে জানে তাঁরা এখনো হয়ত অপেক্ষা করে আছেন।

মনে পড়ে দূর সম্পর্কের এক শাশুড়ির কথা। নিঃসন্তানা ছোট ঠাকুরাণীর উদার অট্টহাস হেমন্তের মরা আলোয় উদ্ভাসিত পুকুর ঘাটে আজও যেন বাজছে। পুকুরে সন্ধ্যা আহ্নিক করার সময় খোশ গল্পে ঠাকুরাণীরা মত্ত হয়ে উঠতেন, আর কারণে-অকারণে হা-হা করে হাসতে থাকতেন ছোট ঠাকুরাণী।

কত কাল আগের কথা। পুজো অন্তে গ্রাম ছাড়ার সময় নৌকায় ওঠার আগে প্রণাম করে জগদ্ধাত্রী একটি রুপোর টাকা ছোট শাশুড়ির হাতে দিয়েছিলেন। সেই একটি টাকা হাতে পেয়ে যে অপূর্ব প্রসন্ন

হাসি হেসেছিলেন ছোট ঠাকুরাণী, জগদ্ধাত্রী তা জীবনে ভুলতে পারলেন না। আহা! সেই অফেপ সন্তোষের দিন কোথায় হারিয়ে গেল।

মনে পড়ে স্বদেশী-করা প্রদ্যোতের কথা। জেলে অত্যাচারে আধ-মরা হয়ে অন্তরীণ হয়ে দেশের বাড়ীতে ছিল। সেই অবস্থায় রোগে ধরে ও কিছু দিন পর মারা যায়!

কচুরি পানায়-ভরা মজা বড় পুকুরটার পাশে দাউ দাউ করে চিতা জ্বলতে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পান এখনো জগদ্ধাত্রী। প্রদ্যোতকে মানুষ করে তার বাল্যবিধবা পিসি লীলাবতী। লীলাবতীর আকুল কান্নাও তিনি কানে বাজে এখনো। সবই মনে আছে। আশ্বিনের নিস্তব্ধে টুপটাপ শিশির ঝরছে বাইরে, ভোর রাতের ঠাণ্ডায় কাঁথার আরামে বড় মধুর লাগছে। গাছের নীচে শুকনো পাতার ওপর মচ মচ শব্দ করে লীলাবতী চলছে, সেই পদধ্বনি এখনো কানে শুনতে পান জগদ্ধাত্রী। তাঁর জানালার কাছে এসে ডাকে, ও বৌ, উঠবি নাকি, নরা হাবেলীর পুকুর পাড়ে যাচ্ছি, যাবি নাকি?

—তোমার জ্বালায় আর পারি না ঠাকুরঝি, এই রাত থাকতে ওদিক পানে যাবে, ভয় করে না, চোর-ডাকাত খারাপ লোক কত কি থাকতে পারে।

—আরে চোরেরা কি করবে, তারা যেখানে সিঁদ কাটার কেটে এতক্ষণে বাড়ী গিয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। আর খারাপ লোক? ওরে এ কি তোদের শহর পেয়েছিস? গ্রামের লোক সিধা হয় কিন্তু বদমাস হয় না। নে আয়, বেলা হলে ফুল পাবো না কারো বাগানে। টুপটাপ শিউলি ঝরে গাছতলা আলো হয়ে আছে, সুবাসে ভরে আছে চারদিক।

তা প্রদ্যোত মারা যাবার পরও তেমনি শরৎকালে আকাশ নীল হয়েছে, ঝরা শিউলিতে ভরে গেছে গাছের তলা, স্থল-পদ্ম ফুটে আলো হয়ে গেছে বাগানের এ কোণা সে কোণা। প্রদ্যোতের দুর্ভাগিনী পিসি শোকের ভারে অকালে নুয়ে পড়ে কষ্ট করে দু-চারটে ফুল তুলেছে। না সাজি ভরার উৎসাহ আর ছিল না, নিষ্ঠুর ঠাকুরের পায়ে দুটো-চারটে দিতে হবে তাই!

দেশ বিভাগের পর সবাই চলে এল গ্রাম ছেড়ে। দু-চারজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা রয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিল লীলাবতী। অত বড় বাড়ীর এ কোণায় একজন ত আর একজন কত দূরে, এমনি। দিনের বেলায়ই চোরেরা এসে এ ভিটা সে ভিটা থেকে জানালা দরজা খুলে খুলে নিয়ে গেছে। প্রদ্যোতের পিসি চেঁচিয়ে মরেছে ও রাঙাদা, নিল তো সব চোরেরা।

—আঃ ঠাকরুণ, আপনার জ্বালায় মনের সুখে চুরি করারও উপায় নেই। চোরেরা নিশ্চিন্তে জবাব দিয়েছে।

লীলাবতী চিঠি লিখত, হায়রে বৌ, জার্মানী বোমার ভয়ে সেবার কলকাতা ছেড়ে কত লোক দেশে এসেছিল, সে কি রমরমা ছিল। আর আজ এ কি অবস্থা! বিধাতার পোড়া কপাল।

সেই প্রদ্যোতের পিসির জ্বালা জুড়িয়েছে ওই পুকুর পাড়েই। যাঁরা পড়ে ছিলেন তখনো, তাঁরাই চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। একবার যদি জগদ্ধাত্রী যেতে পারেন—আবার সেখানে, তিনি দুটো ফুল ছড়িয়ে দেবেন চিতার ওপরে, সাঁঝের বেলায় সন্ধ্যাতারা আকাশের গায় ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জ্বালিয়ে দিয়ে আসলেন মাটির দীপ, একবার শেষ কান্না কেঁদে আসবেন কত্তার শেষ জায়গাটায়। এই ইচ্ছা জগদ্ধাত্রীর মনকে আজকাল পেয়ে বসেছে। কিন্তু গেলেই ত সেই সব গ্রাম বৃদ্ধেরা তাঁদের চিতাশয্যা থেকে জেগে উঠে বলবেনা না: এসেছ বৌ? তাঁদের গ্রাম লোকে বলে বিদ্বানের গ্রাম! তা সত্যিই, তাবড় তাবড় পণ্ডিত ছিলেন সেই সব সহজ সাধারণ বৃদ্ধেরা। আজকালকার ছেলে-ছোকরারা হয়ত তাঁদের দেখলে, অবিশ্বাসের হাসি হাসতো। জগদ্ধাত্রীর নিজের শ্বশুর ছিলেন ইংরেজী আর ফার্সিতে পণ্ডিত। কিন্তু শ্বশুরের খুড়োমশাই যে কিসে পণ্ডিত ছিলেন না জগদ্ধাত্রী তা বুঝতে পারেন না। কত গল্প ছিল তাঁর ঝুলিতে! কোথায় গেলেন সেই কথাকোবিদ বৃদ্ধ!

বাংলাদেশ স্বাধীন হলে, যাতায়াতের রাস্তা খুলে গেলে একবার যদি যেতে পারেন জগদ্ধাত্রী সেই প্রাণের প্রিয় দেশের বাড়ীতে। আঃ, জীবনের অন্তিম অধ্যায়ে সহস্র স্মৃতিতে ঘেরা সেই গ্রাম আর ঘর-বাড়ীতে গিয়ে শেষ প্রণামটি রাখেন তাহলে। জগদ্ধাত্রীর মনে পড়ল দাদা-শ্বশুরের কথা, খুউব ভোরে উঠে তিনি বাড়ীর দরজার পুকুরে, (দরজা ত আর কাছাকাছি নয়, অন্দর মহল থেকে অনেক দূরে), সেই বড় পুকুরে সন্ধ্যা আহ্নিক সেরে পুকুরের পাড় থেকে বেশ কিছুটা দূরে হুঁকোয় করে তামাক নিয়ে বসলেন মোটা একটা গাছের গুঁড়ির ওপর। রসিয়ে তামাক খাচ্ছেন, হেমন্তের কুহেলী নিশান্তের আকাশে এক ধোঁয়াটে ভাবের সৃষ্টি করেছে, হঠাৎ কল্কে থেকে এক টুকরো আগুন ঝরে পড়ল মোটা গুঁড়িটার গায়ে—আর চনমন করে নড়ে উঠল গুঁড়িটা। এ কি রে বাবা, ভাল করে ঠাহর

হতেই কর্তা লাফিয়ে উঠে পড়লেন, ও মা— মনসা গো।

এ যে দেখছি তোমারই সম্পত্তির একটি অজগর সাপ। ওঃ তাঁরা সবাই খবর পেয়ে অন্দর মহল থেকে সদরে ছুটে এসেছিলেন অজগর সাপটাকে দেখতে।

ওরে বাবা, সেই মুন্সীবাড়ীর দরজায় একবার কি দেখেছিলেন? শীতের দুপুরে। শাশুড়ির সংগে এসেছিলেন। সেই ভাঙ্গা দালান, এখানে সেখানে বট অশ্বত্থ গাছ, শেষ দুপুরের রোদে বিষন্নতা মাখানো ঘর-বাড়ী দরজা গাছপালা সব কিছুতে। এরই মধ্যে দারুণ হৈ-চৈ, মোটা একটা অজগর সাপকে কাছি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে খালের দিকে। কেন সেদিকে নিয়ে যাচ্ছে জানতে তাঁর বড় কৌতূহল হয়েছিল। কিন্তু নিতান্তই বালিকা বধূ তখন তিনি। শাশুড়ির সংগে তেমন কথাবার্তা বলেন না, সাহস করে আর জিজ্ঞেস করতে পারলেন না।

কি অদ্ভুত প্রকৃতি সাপেদের। কবেকার কথা। খেলাচ্ছলে একবার তাঁর জ্ঞাতি এক ভাশুরপো ঢিল ছুঁড়েছিল, সেটি গিয়ে একটা সাপের গায়ে লাগে। ঢিল খেয়ে সাপ কোথায় পালাল, তাকে অনেক খোঁজখুঁজির পরও পাওয়া গেল না। কিন্তু রাত্রে সেই সাপ এল ঘরে। মশারীর ভেতর ঢুকে ঘুমন্ত অরুণকে পায়ের ওপর কামড়াল। কামড়ে চলে গেল আর কাউকে কিছু বলল না। হয়ত আগে থাকতেই ঘরে ঢুকে খাটের নীচে লুকিয়ে ছিল। হয়ত বা রাত্রের অন্ধকারে এসেছে, আশ্চর্য কারো নজরে পড়ল না। চুপিসাড়ে প্রতিহিংসা গ্রহণ করে পালাল।

আহা, অরুণ বাঁচেনি। অনেকেই বলছিল অরুণকে কলার ভেলায় করে জলে ভাসিয়ে দাও, পুড়িও না। আবার অনেকের মত হল না। সেই অরুণও বাইরের দরজায় পুকুর-পাড়ে ঘুমিয়ে আছে। তাকে যে কী ভালই বাসত। কাকীমা কাকীমা করে অস্থির হত। দুপুরে তার কাছে এসে শুতে ছুটির দিনে। কবিতা পড়ে শোনাত। স্কুলের গল্প করত। নামকরা গ্রামের স্কুল, নামকরা হেডমাস্টার মজুমদার মশায়। বিদ্যার জাহাজ। ছেলেরা যেমন ভয় পেত, তেমন ভক্তি করত। প্রতি বছর স্কুলে ভাল ফল হত পরীক্ষায়। কোথায় হারিয়ে গেল সেই দিনগুলি।

তিনি যদি দেশে যান, অরুণের নামেও তিনি সাঁঝের বেলায় সেই নির্জন পুকুর পাড়ে চিতাশয্যাগুলির মাঝে দীপ জ্বালিয়ে দেবেন। ফিস্ ফিস করে বলবেন, অরুণ, তোর কাকীমা তোকে ভোলেনি। প্রদ্যোতের উদ্দেশ্যে বলবেন তোমাকেও ভুলিনি, তুমি দেশের কাজ করেছ, সার্থক তোমার জন্ম। আরো দুটি দীপ জ্বালিয়ে দেবেন তিনি নয়া হাবেলীর বিধু ঠাকুরানী আর তাঁর স্বামীর চিতার ওপর। মৃদু একটু মধুর হাসি ফুটে ওঠে জগদ্ধাত্রীর চাপা ঠোঁটে। বিধুঠাকুরানী একটু কবিপ্রকৃতির ছিলেন। কর্তা জমি-জমার কাজে মফঃস্বলে গেলে তিনি ভারি মন-মরা হয়ে থাকতেন, একদিন একখানি পত্র লিখলেন স্বামীর কাছে ছড়া কেটে :

মাছ যেমন জল বিনে,
আমি তেমন তোমা বিনে।

নতুন তেঁতুল টিয়ায় কাটে,
পিরভুর জন্য পরান ফাটে।
ওরে ওরে ময়না, পরানে ত সয়না!

কি করে বিধুঠাকুরানীর এই অপূর্ব ছড়ায় স্বামীর কাছে চিঠি লেখার খবর পাচার হয়ে গেল নারী মহলে, তা আজ আর জগদ্ধাত্রীর মনে নেই। কোন বহুকালের কথা। নয়াহাবেলীর পুকুরে বিকেলে গেছেন গা ধুতে। সেখানে শোনেন মহিলাদের মধ্যে হাসাহাসির ধুম। সারি দেওয়া গাছের ছায়ায় সেই পুকুরের জল সকাল সন্ধ্যায় কি মায়াময় যে লাগত, মনে করলে চোখে জল আসে। বিধুঠাকুরানীর কর্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। তার কাছে বিধুঠাকুরানীও দুচার ছত্তর শিখেছিলেন। তিনি হাসাহাসিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে উদাস কণ্ঠে বল্লেন,

আহারে, দীঘির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।

—মর মাগী, রমেশের বড়োঠকুমা বিধু-ঠাকুরানীর গালে ঠোনা মেরে বল্লেন, সোয়ামী দুদিনের জন্য বাইরে গেল আর এ দীঘির জলে মরণ খোঁজে। স্বামী স্ত্রী দুজনার চিতাই পাশাপাশি ছিল সদরের পুকুরের পাড়ে।

কোথায় গেলেন ঠাকুরানী আর কোথায় তাঁর স্বামী। মরণের ওপারেও কি তাঁরা পাশাপাশি আছেন? কে বলবে। সবই যে স্বপ্ন, সবই যে দুদিনের খেলা তাতে ত আর ভুল নেই। কিন্তু বলু যে বলে, ঠাকুমা এত দীপ চিতার ওপর দেবে বলে ঠিক করে রেখেছ, চিতাগুলি খুঁজে পাবে কি করে? আবার গাঁয়ে সদা মেরে ফেলা মানুষের হাড়-গোড় কঙ্কালে ভরা যে! পাঠান সেনারা সরিয়েছে সব। আশ্চর্য, ওই প্রেতগুলির মধ্য দিয়েই কি শ্মশানকালী আর প্রেতের নাচন নাচলেন। তাঁরা ছেলে ঘুম পাড়াতেন এই গেয়ে, খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে। এখনকার মায়েরা অন্যরূপ গাইবে, খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো পাঠান এল দেশে।

আচ্ছা, দেশে গেলে কি দুর্গাপূজো দেখতে পারবেন? আবার হবে লক্ষ্মী-পূজো? আলপনার শ্বেতশতদলের ওপর মা লক্ষ্মীর মূর্তি আগের মত প্রাণ পেয়ে হাসতে থাকবে? ধানের ছড়ার মধ্যে হেমন্তের শস্যভরা মাঠের ছবি জাগাবে মনে? সারারাত্রি হাসতে থাকবে আকাশে কোজাগরী পূর্ণিমার থালার মত চাঁদখানা, আর হৈমন্তী কুহেলির জন্য আরো মায়াময় লাগবে চাঁদের কিরণ জাল। আহা, আবার যদি, আর একবার যদি সত্যিই যেতে পারতেন সেখানে। জীবনের বেশিরভাগ সময়ই ত সেখানেই কাটিয়েছেন। শহরে গেছেন অনেক পরে।

মনে পড়ে বালবিধবা পার্বতী ঠাকরুণের কথা। তিনি ছিলেন বিস্তর জমিজমা সম্পত্তির অধিকারিণী, ছেলেমেয়ে কেউ ছিল না। খড়ম পায়ে ঠক-ঠক করে কর্তাদের মত চলতেন ফিরতেন। নামাবলী গায়ে নৌকো চড়ে মফঃস্বলে যেতেন একা একা। সেই পার্বতী ঠাকরুন একবার কামাখ্যা গিয়েছিলেন—ফিরে এসে নবজাত ভাইপোর নাম দিলেন। উমানন্দ। কত পাহাড় পর্বত বড় বড় নদীর গল্প ছিল সেই ঠাকুরানীর কাছে। সন্ধ্যার পর শীতের দিনে বুকের কাছে তুষের আগুনের তাওয়া নিয়ে বাড়ীর অন্য বুড়িরা মেয়েরা গল্প শুনত ঠাকরুনের কাছে। এখন সবারই অংগে উঠেছে পশমের চাদর। পুরানো বুড়িরাও কেউ আজ আর আঁচল গায়ে তুষের আগুন পোয়ায় না।

তারপর একদিন এমন শর্মিষ্ঠা ঠাকুরানীরও দেহান্ত হল। আশেপাশের পনেরটা গ্রামের মুসলমান প্রজারা এসে তাঁদের সহৃদয়া ভূস্বামিনীর মৃত্যুতে আকুল হয়ে কাঁদলো। খাজনা মকুব করার, আপদেবিপদে দেখবার কেউ আর রইল না তাদের।

দ্যাশের রাজা ইংরাজ! কে জানে, তারা খালি স্বদেশী বাবুদের ধরতে আর অত্যাচার করতে পারে, আর এই ঠাকুরানী কত গেরামের পেজাদের রানী। এই বলে তারা কাঁদতে লাগল, আজও মনে আছে। এই ঠাকুরানী বলেছিলেন তাঁকে, ওরে তুই সত্যিই জগ-দ্ধাত্রীরে! তোর শ্বশুরের এখেনে কি ছিল রে। তোর জন্যই পয়মন্ত হল সব, বাড়-বাড়ন্ত, ভর ভরন্ত! এমন কথা বলারই আর কে আছে আজকাল।

জগদ্ধাত্রীর মনে হয় তিনি যেন এক বৃদ্ধ স্থবির অশ্বত্থ গাছ, সেই মুন্সীবাড়ীর বাইরের প্রাঙ্গণের বৃক্ষটির মত। দূরে সুদূরে ছড়িয়ে পড়েছে তার সমস্ত ডাল-পালা। ডালপালা না তাঁর সন্তানসন্ততি সব? কিন্তু মূল তার সেই দেশে, সেই গ্রামে। চোখ বুজলেই তিনি দেখতে পান পার্বতী ঠাকুরানীর ভিটেতে দুটি শুভ্র নিরাভরণ হাতে কাল কুচকুচে পাথরের বাটিতে দুধ আর কলা রাখছেন ঠাকুরানী নিজে, আর বলছেন —বাস্তু সাপের জন্য রাখলাম রে বৌ, এরা ভিটা রক্ষা করবে।

এবার তিনি যাবেনই দেখতে সত্যিই ভিটে আছে কিনা।

ওমা, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি গো। আমার তেল মাখা হয়ে গেল, এবার আসি। উমা-শশীর কথায় ত্রস্তে সম্বিত ফিরে পান জগদ্ধাত্রী। সন্ধ্যে হয়ে এল।

বিরাট সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্য এস্তোনিয়া, আয়তনে খুবই ছোট। বাল্টিক সমুদ্র তীরে অবস্থিত এই রাজ্যটি ছোট হলেও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিস্ময়কর।

এস্তোনিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত হলেও মূল ভূখণ্ডের জনজীবনের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এস্তোনিয়া, ভাষায়. দেহের গড়নে ও সংস্কৃতিতে। সাজপোশাক ফিনল্যান্ডের মতন, ভাষা তো বটেই।

এস্তোনিয়ার রাজধানী তালিনের উপকণ্ঠে সমুদ্রের তীরে. 'রোক্কা আল মারু' নামে গ্রামে গিয়েছিলাম। রোক্কা আল মার ইতালিয়ান শব্দ। সহজ অর্থ হল সমুদ্র তীরে একখন্ড পাথর। তালিন শহরে ও তার আশেপাশে ইতালিয়ান স্থাপত্যকলার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। দু-তিন শ বছর আগে কিছু ইতালিয়ান স্থপতি এখানে নগর পরিকল্পনা ও স্থপতির কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তালিনের বহু প্রাসাদে অট্টালিকায় ইতালিয়ান স্থাপত্যের নিদর্শন এখনও বিরাজমান। রোক্কা আল মার গ্রামটি কিন্তু আসলে গ্রাম নয়। বিস্তীর্ণ বনভূমিতে তৈরি করা গ্রাম। এই গ্রামে কেউ বাস করেন না। আঠার ও উনিশ শতকে এস্তোনিয়ার গ্রামে বাড়ীঘর কেমন ছিল, তাদের লোকজন কেমন ভাবে বাস করত তারই মিউজিয়ম

এস্তোনিয়ার স্মৃতি ------------ দিলীপ মালাকার

বলা যেতে পারে এই গ্রামটিকে। গোটা পাঁচিশেক কাঠের বাড়ী, হলঘর, পাতকুয়ো, উইণ্ডমিল রয়েছে এখানে। এইসব বাড়ী সংগ্রহ করা হয়েছে এস্তোনিয়ার বিভিন্ন জেলার গ্রাম থেকে। সেখানকার গ্রামে বাড়ীগুলো যেমন ছিল, ঠিক সেই ভাবে এখানেও সাজান হয়েছে। কোথায় ভাঙ্-চুর হয় নি। গ্রাম থেকে তুলে এনে নিখুঁতভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সাজিয়ে রাখা হয়েছে ঘরের আসবাবপত্র। প্রত্যেক কাঠের বাড়ীর সামনে বাড়ীর ইতিহাস ইত্যাদি লেখা।

রোক্কা আল মার দেখতে গিয়ে ভেবেছিলাম মিউজিয়ম দেখে আর কি হবে। আর্ট গ্যালারি ও মিউজিয়ম দেখে পা ব্যথা হয়ে গেছে। সকালবেলা রওনা হবার কালে মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলাম মিঃ ইগরের ওপর। দু'দিন আগে আমাদের দোভাষী শ্রীমতী এভী অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তালিন ছাড়ার আগে যেন রোক্কা আল মার দেখে যাই। তখনও ভেবেছিলাম, ও দেখে আর কি হবে।

কিন্তু এক শনিবারে রোক্কা আল মার গিয়ে দেখি প্রচুর বাস দাঁড়িয়ে আছে। টিকিট কেটে গ্রামে ঢুকছে। সামনে বেশ ভীড়। গোটাচারেক আটচালা বাড়ি। বড় বড় কাঠের ঘর তাতে। সামনে পাতকুয়ো। উঠোনটা বেশ বড়, তার চার ধারে দর্শকের দল। শুনলাম একটু পরেই লোকনৃত্য শুরু হবে। গ্রীষ্মকালে প্রত্যেক সপ্তাহে শনি ও রবিবার সকালে এখানে এস্তোনিয়ার লোকনৃত্য দেখান হয়। আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। বিরাট আটচালা হলের সামনে একদল লোক বাদ্যযন্ত্রে তালিম দিচ্ছিল। দু তিন শ বছরের পুরোনো এই সব বাদ্যযন্ত্র! কাঠের ও তারের যন্ত্রই বেশি। কয়েকটি কাঠের বাদ্যযন্ত্র অদ্ভুত আকারের। একালের ফ্লোনো সংগীতে এগুলো দেখা যাবে না।

এস্তোনিয়ার লোকনৃত্য শুরু হল। একটা নাচ দেখে আমি অবাক। জাপানি এস্তোনিয়ায় আছি না গুজরাটে? গুজরাটের গরবা নাচের মতন নাচের ভঙ্গি, লাঠি ইত্যাদি। পোশাকগুলোও সেকেলে গ্রামীণ। সবশুদ্ধ ত্রিশজন নাচিয়ে। তাদের অর্ধেক মেয়ে। বাদ্যযন্ত্র বাজিয়েও পনেরজন। পোশাক ঝলমলে রঙিন। গরবা নাচের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম জুলিয়া নামে এক নর্তকীকে। সে বললে এ নাচের বয়স ত্রয়োদশ শতকের। একদল ছেলে ও মেয়ে ছোট ছোট লাঠি হাতে নিয়ে নাচে। লাঠির ঠোকাঠুকিতে খটাখট আওয়াজ তোলে

নাচের তালে। তারপর লাঠিগুলো মাটিতে নামিয়ে রেখে তার ওপর দিয়ে তালে তালে পা ফেলে নাচতে হয়। এমনি আরেকটি লাঠির নাচ দেখে আমার মনে হল ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য নাচের কথা। এখন যেটা মিজোরাম বলে পরিচিত সেই রাজ্যের লোকনৃত্য অনেকটা এদের মতন। তফাৎ শুধু বাঁশের। মিজোরা কাঠের লাঠির বদলে বাঁশের লাঠি ব্যবহার করে। এস্তোনিয়ার লোকসংগীতের বাজনা আধুনিকের সংগে কোনোই মিল রাখে নি। কিছুটা তার সাদৃশ্য দেখা যাবে কাশ্মীরের লোকসংগীতের মধ্যে।

একটা মজার নৃত্যের নাম অশ্বনৃত্য। এক দল মেয়ে হাতে হাত ধরে গোল হয়ে নাচতে থাকে, তার পাশ দিয়ে যাবে দু-তিনটে ছেলে। ছেলেদের গলায় ঝোলে ঘোড়ার গলার চামড়ার মালা আর ঘণ্টা। ছেলেগুলো কিছু ঘাস নিয়ে এগিয়ে যায় মেয়েদের কাছে। মেয়েরা তাদের তাড়া করে। তারপর যে ছেলেটাকে তারা ধরে ফেলে, তাকে ধরে তারা নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে।

আরেকটা নাচ রুমাল নিয়ে নাচা। এটি শিল্পের দৃষ্টিতে সার্থক। আরেকটি নাচে এক দল মেয়ের কাছে এসে কয়েকটি ছেলে প্রেম নিবেদন করে। যখন কোন মেয়ে তাকে স্বীকৃতি দেয় তখন সেই ছেলেটাকে ঘিরে ধরে মেয়েরা। সেই ছেলেটা তখন পালাবার পথ খোঁজে। গায়ে জোর থাকলে ছেলে সেই মহিলা ব্যূহ ভেদ করে পালায়, নইলে বন্দী থাকে। তবে দেখা গেছে ছেলের গায়ের জোর অনেক বেশী সে একাই গোটা সাতেক মেয়েকে বাহুবলে কাবু করে পালাতে সমর্থ হয়।

পেরেক নাচ সবচেয়ে মজার। এক দল মেয়ে, শেষের মেয়েটির কাছে থাকে একটি পেরেক। ছেলের দল নাচের তালে তালে এগিয়ে গিয়ে তার কাছে পেরেক চাইলে সেও নাচের তালে দলের মধ্যে মিশে যায়। তাকে খুঁজে বার করতে ছেলের দল হয় গলদঘর্ম। শেষে অবশ্য ছেলেদেরই জয় হয়। তারা মরিয়া হয়ে সেই পেরেকপ্রাপ্ত মেয়েটার হাত থেকে পেরেক খুঁজে বার করে। ভীষণ হাসারোলের মধ্যে সাংগ হয় এই নাচ।

পোলকা নাচের ধরনে দাদুর পোলকা নাচ দেখার মতন। যৌথভাবে ছেলে-মেয়েরা নাচে, নাচতে-নাচতে ছেলে তার মেয়ে সংগীকে উর্ধ্বে তুলে ধরে।

এস্তোনিয়ার লোকনৃত্যে যতখানি আছে শিল্পী মনের ছাপ তার চেয়েও বেশী দেখা যাবে শারীরিক কসরৎ। এস্তোনিয়ানদের স্বাস্থ্য ভাল। সবাই প্রায় লম্বা। দেহের গড়ন সুঠাম। মাথায় এক ঝাঁকড়া সোনালী চুল। সব মিলিয়ে শিল্পীসুলভ চেহারা।

রোক্‌কা আল মারের মিউজিয়ম গ্রামে যাঁরা নাচেন তাঁদের সংগে আলাপ-পরিচয় করে অনেক কিছু জেনেছি। তারা কিন্তু সবাই পেশাদার নর্তক বা নর্তকী নন। জনাপাঁচেক পেশাদার নর্তক-নর্তকী। বাকীরা শৌখিন নাচিয়ে। অন্য পেশা তাদের। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছাত্র-ছাত্রী। কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা। অবশ্য স্কুলে এ'রা গান অথবা নাচ শেখান।

লোকনৃত্য পর্ব শেষ হলে ওদের একটি ছোট্ট দল আমার সংগে আলাপ জুড়ে দিল। ওদের অনেকেই ভারতীয় দেখে নি। পরিচয় তো দূরের কথা। ওরা ছিল তিনজন মেয়ে আর দুজন ছেলে। টিনা নামে মেয়েটি ইংরেজী জানে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। সে বললে, আমি সখ করে এখানে নাচতে আসি। লোকনৃত্য আমার ভাল লাগে।

আমি জানালাম — ক্লাশের পড়াশোনা চালিয়ে তুমি নাচের সময় পাও?

টিনা বললে — লোকনৃত্য ভালবাসি বলেই এই দলে আমি নাচছি গত এক বছর ধরে। আর তাছাড়া সারা বছর আমায় রোজ নাচতে হয় না। ভাববেন না যে, এখানে যে কেউই নাচতে বা গাইতে পারে। আমাদের প্রায় সবাই কোন গানের বা নাচের স্কুলে শিখেছে। দেখলেন না সবাই প্রায় লোকসংগীত গাইছিল? শুধু নাচ জানলেই হয় না, গাইতেও জানা চাই। লোকসংগীতের ভাবার্থগুলো সবার মনে দাগ কাটে। সবাই বুঝতে পারে বলেই এত জনপ্রিয়।

ওদের ওই ছোট দলের একটি ছেলে আমায় রোক্‌কা আল মার-এর গ্রাম দেখাতে নিয়ে চলল।

ছেলেটা বলল—এস্তোনিয়ার বড় বড় শহরের অনেক অট্টালিকা আর প্রাসাদ দেখেছেন। দেশের সবাই তো আর অট্টালিকায় আর প্রাসাদে বাস করত না। সেকালে লোকসংখ্যার আশী ভাগ বাস করত গ্রামে। ওই দেখছেন না কাঠের বাড়ী, আটচালার ঘর। ওখানে। শীতকালে যখন কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইত তখন এসব বাড়ী কখনই আরামদায়ক হত না। এখন অবশ্য গ্রামে অধিকাংশই হয় বড় বড় কাঠের বাড়ী না হয় ইঁটের দালান-কোঠা। আমার দেশের জনগণ কিভাবে গ্রামে বাস করত তার পরিচয় পাবেন এই সব বাড়ীগুলো দেখলে। এস্তোনিয়া সরকার ১৯৫৮ খৃঃ এই মিউজিয়ম গ্রামের কাজ শুরু করে। ১৯৬৪ খৃঃ গ্রামে মিউজিয়ম খোলা হয়। আর ১৯৬৭ খৃঃ শুরু হয় লোকসংগীত ও নৃত্যের আয়োজন। এস্তোনিয়ার গ্রাম্য জীবন, গ্রামীণ সংস্কৃতি জানতে হলে রোক্‌কা আল মার-এ সবাইকে আসতে হবে। এ শুধু পর্যটকদের জন্যে নয়। এস্তোনিয়ার জনসাধারণ আর ছাত্র-ছাত্রীরা আসে দলে দলে তাদের দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস দেখতে। বই পড়ে যা জানা যায় তারচেয়ে অনেক সহজভাবে জানতে পারবে দর্শকরা এই গ্রাম মিউজিয়ম দেখে।

আমি ভাবছিলাম আমাদের দেশের কথা। বাংলাদেশের গ্রামগুলোর ছবি আমার চোখে ভেসে উঠল। সে দৃশ্য করুণ। পশ্চিম বাংলায় কটাই বা শহর। সবই তো গ্রাম। একশ বছর আগে, দুশো বছর আগে বাংলাদেশের গ্রামের বাড়ীগুলো কেমন
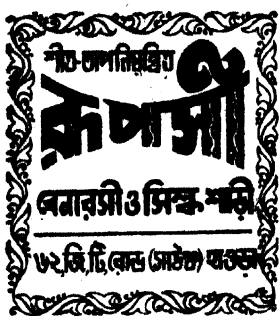
ছিল, এখনই বা কেমন, তার কি একটি গ্রাম মিউজিয়ম হতে পারে না কলকাতায় উপকণ্ঠে? বাংলাদেশের লোকসংগীত ও নৃত্য নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে ও হচ্ছে। সহানুভূতিরও কোন অভাব নেই। কিন্তু সে লোকনৃত্য হয়ত এককালে লুপ্ত হবে। প্রত্যেক জেলার লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার মতন, রোক্কা আল মার-এর মতন একটা গ্রাম মিউজিয়ম করে সেখানে যদি কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই জনসাধারণের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন তাঁরা। পাবেন সহানুভূতি ও প্রশংসা। সরকারের সাংস্কৃতিক দপ্তর এদিকে নজর দিতে পারেন।

টিনা-লিণ্ডার ছোট্ট দল আমায় আমন্ত্রণ জানাল সেদিন বিকেলে। ভারত সম্বন্ধে তাদের জানার কৌতূহল প্রবল। ওদের পাঁচজনের সবাই তরুণ। তিনজনই ছাত্র। ওরাই বলল—আসুন না আজ বিকেলে আড্ডা জমান যাবে। বললাম—আলবাৎ।

বিকেলে ওরা আমায় নিয়ে গেল তালিনের এক পুরানো কাফেতে। হান্স নামে ছেলেটা সবে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেছে। একটা কারখানায় কাজ করে। তার প্রশ্ন—কলকাতা নাকি ভীষণ বড় শহর। লোক গিজ গিজ করে রাস্তায়। উত্তরে আমি জানালাম—কথাটা মিথ্যে নয়। তোমাদের তালিনের লোকসংখ্যা তিন লাখ। আমি কলকাতার যে অঞ্চলে বাস করি সেই অঞ্চলেই লোকসংখ্যা পাঁচ লাখের ওপর। শুনে শ্রীমতী টিনা তো অবাক। আমি ওকে বললাম—চোখ বড় করে দেখছ কি? কলকাতার লোকসংখ্যা সত্তর লাখ। তোমাদের এস্তোনিয়ার মাত্র তের লাখ।

শ্রীমতী টিনা বললে—চলুন যাই আমরা টুম্পিয়া টিলার নীচে ক্যারোলিনা বারে। শীতকালে ওই বারে বেশ জমে। অধিকাংশ সময়েই তুষার পড়ে। শহরে সাদা চাদর বিছান মনে হবে। গাছপালা সব ন্যাড়া। সবুজ কোথাও নেই। পার্কে বসার জো নেই। কিন্তু এই বারটা পার্কেই। পার্কে এসে সোজা ক্যারোলিনা বারে ঢুকে পড়লেই হল। বাইরে যত ঠাণ্ডা থাকুক, ভেতরটা বেশ গরম থাকে। হয় গরম মদ না হয় গরম কফি নিয়ে পান করলে শরীরটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। যত ঠাণ্ডাই লাগুক না কেন ক্যারোলিনার বিখ্যাত গরম মদ খেলে শরীর গরম হবেই।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। রোদ স্তিমিত হয়ে এসেছে। রাত এগারটায় সন্ধ্যে হয়। পার্কগুলোতে সবুজের মেলা বসেছে। টুম্পিয়া টিলাটা ঢেউ খেলান। শহরের মাঝখানে খানিকটা পর্বতস্তূপের মতন। উঁচুনীচু চড়াই—উৎরাই আর বাগান। তারই মাথায় রয়েছে ঐতিহাসিক টুম্পিয়া দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। এই টিলার এক কোণায় ক্যারোলিনা বার। ঢুকে দেখি পাহাড়ের একটি সুড়ঙ্গ পথ। এই সুড়ঙ্গটাকেই বার বানান হয়েছে। বার-এ বসবার জায়গা নেই। মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি হয়েছে টেবিল। এই টেবিলে গেলাস রেখে, প্লেট রেখে দাঁড়িয়ে খেতে হয়।

প্রথমে জিজ্ঞাসা করলাম শ্রীমতী টিনাকে, তোমার কাহিনী শোনা যাক। টিনা হাল্কা সুরে জানালে—আমার কোন ইতিহাস নেই। পরীক্ষায় পাস করে চাকরি করব। তারপর বিয়ে করে সংসার করব। ব্যস তার চেয়ে আর কিছু নয়। বরং লিণ্ডার জীবন অনেক বৈচিত্র্যময়।

আমি বললাম, কি রকম। টিনা তখন লিণ্ডাকে খোঁচাতে লাগল—বল না তোর গল্প।

সবাই নাছোড়বান্দা দেখে লিণ্ডা বলতে লাগল তার জীবনের ইতিকথা। সব শুনলে কোন ঔপন্যাসিক একটা ছোটখাট উপন্যাস লিখতে পারতেন। লিণ্ডা যা বললে তার সংক্ষিপ্তসার এই—লিণ্ডার বাড়ীতে তিনজন মহিলার সংসার। তার মা, সে নিজে ও তার পাঁচ বছরের মেয়ে। সে নিজে একটা স্কুলের শিক্ষিকা। সেখানে সে গান শেখায়। লোকসঙ্গীত তার প্রিয় তাই সে রোক্কা আল মার-এ গান গায় ও নাচে। সামান্য পারিতোষিক পায়। মনের মতন গাইতে ও নাচতে পারে বলে সে সুখী। তার জীবনে অনেক দুঃখ এসেছে। সব দুঃখকে ম্লান করে তার জীবনে আনন্দ এনে দিয়েছে এই লোকসংগীতের দল। তারও বিয়ে হয়েছিল। সংসারও সে করেছিল। কিন্তু তার স্বামীটি ছিল পাঁড় মাতাল। লিণ্ডা আরও পড়াশোনা করতে চাইলে তার স্বামী তাকে বাধা দেয়। সেই থেকে মনোমালিন্য এবং পরে বিচ্ছেদ। তার স্বামী এই তালিন শহরেই বাস করে। বছর কয়েক আগে ফিনল্যাণ্ডের এক যুবকের সঙ্গে তার আলাপ হয়। পরিচয় থেকে প্রণয়ে জড়িয়ে পড়ে সে। সেই প্রেমের ফল হিসেবে সে উপহার পেয়েছে তার মেয়েকে। মেয়েকে নিয়ে সে সুখী। সেই ফিনিশ যুবক ফিরে গেছে তার দেশে ফিনল্যাণ্ডে। এস্তোনিয়া ভাষার সঙ্গে ফিনল্যাণ্ডের ভাষার যথেষ্ট মিল। প্রেমপর্ব সেখানেই সমাপ্ত।

লিণ্ডা বললে—আমার মেয়ে এখনও শিশু। সব দেশের শিশুই এক। ওর কি দোষ। আমি তাকে সব কিছু দিয়ে মানুষ করে তুলছি। আমি পরিশ্রম করছি আমার একমাত্র সন্তানের জন্যে। প্রেম, ভালবাসা, সংসার আমার যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়। এই তো আমার জীবনের কাহিনী।

ওদের সঙ্গে গল্পে মেতেছিলাম অনেকক্ষণ। ঘড়ির কাঁটা আমাদের জন্যে বসে থাকেনি। রাত তখন অনেক। আমাকে তারা হোটেলে পৌঁছে দিল।

ইদি আমিনের অবদান : সামরিক শক্তিবলে উগান্ডার ক্ষমতা দখলকারী জঙ্গী প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইদি আমিনের প্রকৃত পরিচয় আফ্রিকার অন্য দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানদের অজানা ছিল না। কিন্তু কূটনৈতিক সৌজন্য ও, তার চেয়েও বড় কথা, আফ্রিকার সংহতির কথা চিন্তা করে এতদিন ও প্রসঙ্গ কেউ তোলেন নি। ইদি আমিনও তার সুযোগ নিয়ে চার বিবির সংসারে সুখে দিনাতিপাত করছিলেন। কিন্তু, সৈনিক বলেই বোধহয়, একটানা সুখ ও নিশ্চিন্ত জীবনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই বোলতার চাকে ঢিল মেরে নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনলেন।

এখন জানা যাচ্ছে যে, কেনিয়ায় মাউ মাউ আন্দোলনের প্রচণ্ডতায় যখন শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশীদের পক্ষে সেখানে বসবাস অসম্ভব হয়ে ওঠে সেই সময় কেনিয়ার ইংরেজ সরকার এমন একটি প্রাণীর সন্ধান করছিলেন যাকে দেখতে মানুষের মতো হলেও হিংস্রতায় আফ্রিকার সর্বাধিক ভয়ংকর পশুও যার কাছে হার মানবে। ছয় ফুট চার ইঞ্চি দীর্ঘ দৈত্যাকৃতি ইদি আমিন কেনিয়ার ইংরেজ সরকারের সেই প্রয়োজনীয় মুহূর্তের আবিষ্কার। কিন্তু ইদি আমিন শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের পরিতুষ্টির জন্য সেদিন মাউ মাউ আন্দোলনে জড়িত সন্দেহে কিকুয়ু উপজাতীয়দের উপর এমন প্রচণ্ড পীড়ন শুরু করেন যে, তা নিয়ে বৃটিশ পার্লামেন্টে পর্যন্ত তোলপাড় হয়। মাউ মাউ নিধনকালে ইদি আমিন যে সব পীড়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন তার মধ্যে তাঁর নিজের মতে, যেটি সবচেয়ে জোরালো ও নিমেষে ফলপ্রসূ তা হল, রুমালের সাহায্যে শ্বাসরোধ করে হত্যা। কিছু দিন আগে আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার রাবাত সম্মেলনে গেরিলা আন্দোলনের মোকাবিলা সম্পর্কে আলোচনাকালে জেনারেল আমিন নিজেই ঐ পদ্ধতির কথা বলেন এবং হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে পকেট থেকে রুমাল বার করে মুহূর্তের মধ্যে শ্বাসরোধ করে হত্যার পদ্ধতি দেখিয়ে সমবেত রাষ্ট্রপ্রধানদের হতবাক করে দেন। সেই ইদি আমিনের কবল থেকে এশীয় বংশোদ্ভূতরা যে শুধু প্রাণটুকু নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারছেন, সেইটুকুকেই আপাতত সবচেয়ে বড় সম্পত্তি উদ্ধার ভেবে তাঁরা আশ্বস্ত হতে পারেন।

গুরুমারা বিদ্যা : সম্প্রতি ইউরোপ ও আমেরিকার ইহুদীদের কাছে ব্যাপকভাবে চিঠি-বোমা পাঠাতে আরম্ভ করেছে আরব সন্ত্রাসবাদীরা, সেটা তাদেরই উদ্ভাবিত কোন সন্ত্রাস পদ্ধতি নয়। পঁচিশ বছর আগে, ইহুদী রাষ্ট্র ইজরায়েল ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রাক-মুহূর্তে প্যালেস্তাইনের ইহুদী সন্ত্রাসবাদীরা ইতালীর এক ডাকঘর থেকে এই রকমই আটটি চিঠি-বোমা পাঠিয়েছিলেন বৃটেনের আটজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে। যার মধ্যে ক্যাবিনেট মন্ত্রীও ছিলেন কয়েকজন। বৃটিশ সরকারের বেলফুর ঘোষণা ইহুদীদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে একটি বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তির প্রথম জোরালো সমর্থন হলেও বৃটেনের শ্রমিক দল প্যালেস্তাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থক ছিলেন না। এ কারণে রাষ্ট্রসঙ্ঘে যখন রাষ্ট্র সদস্যদের গরিষ্ঠ ভোটে ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন সে প্রস্তাবকে সমর্থন জানালেও বৃটেন নিরপেক্ষ থাকে। ঐ ভোটাভুটির আগে বৃটেনের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য ইহুদী সন্ত্রাসবাদীরা আর্থার গ্রীনউড, স্ট্রাচি, স্টাফোর্ড ক্রিপস, এডওয়ার্ড স্পিয়ার্স প্রমুখ বিশিষ্ট বৃটিশ রাষ্ট্রনেতাদের কাছে চিঠি-বোমা পাঠায়। কিন্তু কোন দুর্ঘটনা হওয়ার আগেই বৃটেনের গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতায় চিঠিগুলি ধরা পড়ে যায়। কেবলমাত্র সিরিয়া ও লেবানন সম্পর্কিত প্রাক্তন বৃটিশ সচিব স্যার-এডওয়ার্ডের কাছে চিঠিটা আগেই পৌঁছে যায়। কিন্তু চিঠির ওপর ঢাকনাটা একটু খুলতেই একটা জ্বালানো তার বেরিয়ে পড়ায় তিনি আর ওতে হাত না দিয়ে রক্ষা পান।

তবে ইহুদী সন্ত্রাসবাদীরা যা পারে নি আরব সন্ত্রাসবাদীরা তাতে সফল হয়েছে। হল্যান্ডের এক ডাকঘর থেকে তারা যে অগুণতি চিঠিবোমা ছাড়ে তার মধ্যে একটি অন্তত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। লন্ডনস্থ ইজরায়েলী দূতাবাসের কৃষি উপদেষ্টা ডঃ আমি শ্যাচোরি না জেনে চিঠিবোমা খুলতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন।

যীশুর পা নয় : প্রায় তিন বছর আগে জেরুজালেমের এক ভগ্ন সমাধি থেকে প্রায় দু হাজার বছর আগের একটি পেরেকবিদ্ধ পা পাওয়া যায়। ঐ আবিষ্কার সারা দুনিয়ায় দারুণ আলোড়ন আনবে এটা বুঝতে পেরে আবিষ্কারকরা দু বছর ঐ জীর্ণোদ্ধার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব থাকেন। কিন্তু নানা সূত্রে গুজব ছড়িয়ে পড়ায় গত বছর জেরুজালেমের রকফেলার মিউজিয়াম থেকে ঘোষণা করা হয় যে, পা'টি নিয়ে তাঁদের গবেষণা এখনও শেষ হয় নি এবং তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা যথাসময়ে বিশ্ববাসীকে জানানো হবে।

গত ২২ সেপ্টেম্বর রকফেলার মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন, ঐ পা যে যীশুর নয় এ বিষয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহ হয়েছেন। ঐ পা'টি যে ভগবান যীশুর সমকালীন কোন ব্যক্তির তাতে কোন ভুল নেই, কিন্তু যে এলাকায় ঐ পা পাওয়া যায় সেখানে শুধু ইহুদীদেরই কবর দেওয়া হত। সুতরাং ইহুদী ধর্মত্যাগী যীশুর সেখানে সমাহিত হওয়ার কোন কারণ নেই। ইস্রায়েলে বসবাসকারী গ্রীক অর্থোডকস খৃস্টান ও বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ ভাসিলিয়াস জাফোরিস ঐ গবেষণায় অংশ নিয়েছিলেন। তিনিও নিঃসন্দেহ হয়ে জানিয়েছেন যে, যে পা পাওয়া গেছে তা যীশুর নয়। সারা পৃথিবীর যে অগণিত প্রত্নতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, ঈশ্বরতত্ত্ববিদ ও খৃস্টধর্মাবলম্বী গবেষণার ফলাফল জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে রকফেলার মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখেছেন, তাঁদের সকলকে উদ্দেশ্য করে জাফোরিস বলেছেন, খৃস্টের শেষ চিহ্ন পাওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে বলে তিনি মনে করেন না। কারণ সেদিন মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিকেই ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হত এবং তাদের হাতে পায়ে কপালে পেরেক ঠোকা হত। সুতরাং একটি পেরেক বেঁধা পা বা হাতের জীবাশ্ম পেলেই উত্তেজিত হওয়া ঠিক হবে না। কারণ, গভীর শ্রদ্ধাভরে ভগবান যীশুর দেহাবশেষ ভেবে যাকে আমরা গ্রহণ করব তা যে একটি হত্যাকারী বা ঐ ধরনের কোন গুরু অপরাধে অপরাধীর দেহাবশেষ নয় তা কেউই হলফ করে বলতে পারবে না।

সাংসারিক ব্যয় : যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে এবার ডিমক্রাটিক দলের ভাইস প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী মনোনীত হয়েছেন সার্জেণ্ট শ্রিভার। তিনি কেনেডি বাড়ীর জামাই বলে যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের ধারণা হতে পারে যে, তিনি বুঝি শ্বশুর বাড়ীর লোকেদের মতোই বড়লোক। তাই সে ভুল ধারণা নিরসনের জন্য তিনি জানিয়েছেন যে, তাঁর যা আয় তাতে তাঁর পক্ষে কোন রকমে সংসারের ব্যয় নির্বাহ হয়। বাড়তি এক পয়সাও থাকে না।

শ্রিভার জানিয়েছেন, গত বছরে তাঁর আয় ছিল এক লক্ষ আট হাজার ছ'শ ডলার, যার মধ্যে ব্যবসা থেকে পান এক লক্ষ পাঁচ হাজার, আর বাকীটা লেকচার দিয়ে। কিন্তু ঐ টাকা থেকে তিয়াত্তর হাজার ডলার বেরিয়ে গেছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কর বাবদ। শ্রিভারের এই হিসাব থেকে মার্কিন মুলুকে একটি ছোট সংসারের ব্যয় ও রাষ্ট্রীয় কর সম্বন্ধে আন্দাজ পাওয়া যাবে। —**প্রত্যক্ষদর্শী**

দুঃখে সুখে বাঁচা

নিখিলচন্দ্র সরকার

।। চোদ্দ ।।

সবাই শুয়ে পড়েছে। সানুও শুয়েছে, কিন্তু ঘুম আসছে না। ওপরে এখনও আলো জ্বলছে। সোনাদা ঘুমোয় নি। একবার উঁকি দিয়েছিল সানু, মুখ নীচু করে কি যেন লিখছিল সোনাদা। কোনদিকে খেয়াল ছিল না! বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছিল ওকে। কিছু একটা হয়েছে হয়তো। অতসীর সঙ্গে কি কিছু হয়েছে? হওয়ার মতন তো কিছু নেই। মুখটা কেমন থমথমে। বুকের ভেতরে যেন এক অসহ্য যন্ত্রণা। কিছুই বুঝতে পারল না সানু। আজ বিকেলেও অতসীরা এসেছিল। অতসী অবশ্য অনেক আগেই চলে এসেছে। ওর মা, রাঙামামা সন্ধ্যার মুখে মুখে এলো। আজকের দিনটা বেশ হই হই করে কেটেছে। অতসী এসেই কখনো ওর সঙ্গে ময়দা মেখেছে, কড়াই শুঁটি বেটেছে মার সঙ্গে, আবার সানুর সঙ্গে ইয়ার্কি ঠাট্টাও করেছে; হেসে হেসে লুটিয়ে পড়েছে। কোনরকম সংকোচ বা আড়ষ্টতা ছিল না ওর। মেয়েটাকে বড় ভাল লাগে। সকলকেই যেন নিজের মতন করে নিয়েছে। কোন ব্যাপারেই উৎসাহ কম ছিল না অতসীর। মাঝে মাঝে চা করে সবাইকে খাইয়েছে। বোঝাই যায় না যে ও অন্য বাড়ির মেয়ে। অনীশের কাছে এসেও অতসী ফিস ফিস করে, কখনো বা ইশারায় কথা বলেছে। বড় সরল, নম্র স্বভাব। ওকে দেখতে দেখতে সানুর নিজের কথা মনে পড়েছে। সেও তো এমনি করেই একদিন সন্দীপদাদের বাড়ি গিয়ে মিশে গিয়েছিল। অতসীকেও তার সেরকমই মনে হলো। সানু বুঝতে পেরেছে, অতসীর সঙ্গে তার দাদার গোপনে গোপনে একটা সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। শুধু সানুই নয়, সবার চোখেই যেন ঘটনাটা ধরা পড়েছে। ওকে আজকাল আরো খুশী খুশী দেখায়। মারও খুব পছন্দ অতসীকে; ও যদি এবাড়ির বউ হয়ে আসে, তবে সবাই সুখী হবে। এক্ষেত্রে বাধাও কিছু নেই। তবু, কখন যে কী হয়ে যায় বলা যায় না। সেও কি কখনো ভেবেছিল, তার এমনটি হবে। সানু মনে মনে বলল : আমি তোমার চেয়ে বয়েসে বড় অতসী, অভিজ্ঞতাও আমার বেশী, আমি তোমায় আশীর্বাদ করছি, তুমি সুখী হও। তোমাকে দেখে আজ আমার নিজের কথাই মনে পড়ছে। জান অতসী, আমিও একদিন তোমার মতনই একজনকে ভালবেসেছিলাম; আজ বাসি কিনা তেমন জোর করে বলতে পারি না। তুমি দেখেওছো তাকে। সেদিন স্টেশনেই তো দেখা হলো। ওদের ওখানে তোমার মতনই আমার যাওয়া-আসা ছিল। আমি তো ভাবতেই পারতাম না, কোনদিন ছাড়াছাড়ি হবে। তবু হলো, আমার কপাল বড় মন্দ অতসী, কিছুই সইল না তাই। আমার প্রার্থনার যদি কিছু জোর থাকে, তবে সেই জোরেই প্রার্থনা করছি, তোমায় বলছি, ঠাকুর যেন তোমার মঙ্গল করেন, সুখী করেন তোমায়।

মানু শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। সারাদিন খাটাখাটুনিতে মাও ক্লান্ত, শোয়ার খানিক পরেই গাঢ় ঘুমে দুচোখ জুড়ে গেল মার। সানু ছটফট করছিল। থেকে থেকে কত কথাই না মনে পড়ছে তার। সে কিছু না বললেও মা সব জেনে গেছে। অথচ আগে কিছু বুঝতে দেয় নি। ওখানে যাওয়ার সময়ও তার দ্বিধা ছিল, ভয় ছিল সামান্য। কিন্তু না গিয়েও পারে নি। সন্দীপদার কথাগুলোই যেন তার মধ্যে একটু একটু করে নেশা ছড়িয়েছে। ওগুলোই শেষ পর্যন্ত তাকে টেনে নিয়ে গেল ওখানে। মাকে বলবার সাহস ছিল না ওর। এর জন্যে সেও মনে মনে সংকুচিত হয়েছে। কিন্তু মা যে ওরকম একটা কথা বলবে তাকে, ভাবতেই পারে নি সানু। ভীষণভাবে সে চমকে উঠেছিল। মা আজ বলছে কি তাকে, সন্দীপদাদের সে আসতে বলবে এখানে।

আজ এতকাল পরে কি মা তবে অন্যরকম কিছু ভাবছে? কি ভাবতে পারে মা? সানু ভেবে শেষ পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্তে এসেছে। মার হয় তো মনে হয়েছে, এমন ধরনের কথা বললে, সে আনন্দ পাবে। আবার হাসিখুসী ফিরে আসবে। মোটকথা, তাকে নিয়ে সবাই যেন একটু চিন্তায় পড়েছিল। কারণ কোন ব্যাপারেই উৎসাহ ছিল না তার, ফুর্তি নেই। সারাক্ষণ কেমন মনমরা হয়ে থাকে। দিন দিন মনে মনে সে দুর্বল হয়ে আসছিল। খালি মনে হতো তার, কোথায় যেন সে ক্রমশই তলিয়ে যাচ্ছে। কেবলই খেই হারিয়ে ফেলে। ভাবনাগুলো সময় সময় কেমন এলোমেলো। একটা থেকে আর একটায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যায়। অথচ বাইরে এর কোনরকম প্রকাশ নেই, আলোড়ন নেই। মনের মধ্যে নিয়ত এর ওঠানামা। সবার চোখের আড়ালে একটা যে কিছু ঘটছে তার ভেতরে, এটা যে সে না বুঝত, এমন নয়, কিন্তু করার ছিল না কিছুই। হাত থেকে সুতোটা যেন তার কখন পড়ে গেছে। মনের শক্তি কি আর আগের মতন তার আছে এখন? হয়তো মাথাটাই তার খারাপ হয়ে যাবে।

সন্দীপরা এখানে আসার পর থেকেই সানুর মধ্যে হঠাৎ যেন কেমন পরিবর্তনের রঙ ফুটে উঠেছে। ভাল লাগার এক অভি-ব্যক্তি দেখেছে সবাই। এরই যেন দরকার ছিল। সবাই চেয়েছে, একটু হাসুক ও, কথাবার্তা বলুক; মনের ভারসাম্য ফিরে পাবে আবার। ওর মনের ওপর থেকে মলিন ঢাকনাটা যেন সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। প্রথমটায় নীলিমাদেবী অবাক হয়েছিলেন। ওর এই রূপান্তরটা তাঁর কাছেও ভাল লেগেছে। সোনাদাই মাকে সন্দীপদার খবরটা দিয়েছিল। মানু তাকে ঠিকই বলেছে। অথচ মা তাকে কিছু ঘুণাক্ষরেও জিজ্ঞেস করে নি, এই প্রসঙ্গে তাকে একটাও কথা বলে নি। খবরটা যে জানে মা, বুঝতেই দেয় নি। এরপর নিশ্চয়ই মানুর কাছ থেকে কিছু কিছু খবর সংগ্রহ করেছে। যা হবার তা তো হয়েইছে, এখন যদিও আবার আগের মতন সুস্থ, স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তবেই মঙ্গল। ভাবনাটা যেন অনেকটা এইরকম, সন্দীপদের সঙ্গে মিশে যদি সানুর মনের অসুখটা সেরে যায়, তবে, ওদের কাছে শুধু সেই-ই নয়, ওরা সবাই কৃতজ্ঞ, ঋণী থাকবে। একদিন যে ভুল

কষ্টেছিলেন মা এবং যে দৃশ্য দেখতে হলো চোখের সামনে, আজ হয়তো মনে মনে এমনি করে স্বীকার করে নিয়েই খানিকটা স্বস্তি, শান্তি পেতে চায়। যেখানে ওর সুখ, মানুষ সম্মান, সেখানে আর কোনরকম বাধা নয়, বরং তাকে মেনে নেওয়াতেই ষোলআনা আগ্রহ। সানু নিজেও বোঝে যে তার এই কপালের জন্যে মার অনুশোচনার কোন কারণ নেই, থাকতেও পারে না। মা এবং তার বাবা যা করেছিলেন, ভাল ভেবেই করেছিলেন; পরেরটা তার ভাগ্য, সেখানে তো কারো হাত নেই! মা হয়তো পরে ভেবেছে, জোর করে ওর মনের বিরুদ্ধে কাজটা ঠিক হয় নি। মার জন্যে এই মুহূর্তে কেমন কষ্ট হলো সানুর। সে মনে মনে মাকে উদ্দেশ করে বলল ঃ তুমি যা ভাবছো মা, আমি তা বুঝেছি। কিন্তু আজ এতদিন পরে কি এর কোন দরকার ছিল? আমি জানি, আমাকে নিয়ে তোমাদের দুশ্চিন্তা বেড়েছে। এখানেই আমাকে শেষ-মুহূর্ত পর্যন্ত থাকতে হবে। তোমার অবর্তমানে, বৌদিদির এই সংসারে আমার কী অবস্থা হবে, সেসব কথা ভেবে হয়তো তোমার ঘুম হয় না। আমি বুঝি মা, আমার মুখে হাসি না দেখলে তোমাদের কষ্টই বাড়ে; কিন্তু হাসি যে আমার জীবনের মতন শেষ হয়ে গেছে! তুমি আমাকে ভুল বুঝো না মা। সন্দীপদাকে দেখে, অস্বীকার করবো না, আমিও খুশী হয়েছি, ভাল লেগেছে; কিন্তু আজ আর নতুন করে কোন সম্পর্ক হয় না! যা ভেঙে গেছে, ভেঙেই গেছে, আর জোড়া লাগবে না। একদিন হয়তো পারতাম, তোমরাও পারতে; সেদিন যখন পিছিয়ে এসেছি তোমাদের জন্যে, আজ আর এতদিন পরে এগোনোর কথাও ওঠে না। আমি তোমাদের সবাইকেই কষ্ট দিয়েছি, এরকম পোড়া-কপাল যেন কারো না হয়। আমার সুখের জন্যে আজ এ-ও তুমি ভাবতে পারছো মা; এতে যে আমার ভীষণ খারাপ লাগছে! আমার আরও একটা জীবন ছিল। সেখানেও তো কোন ফাঁকি ছিল না। দুটোই আমার কাছে সমান সত্য। কোনটাই তো মিথ্যে নয়। আমাকে আর এসব কথা তুমি বলো না মা, এতে কষ্টই বাড়ে আমার। আমি তো ফুরিয়েই এসেছি। মা গো, আমার জন্যে তুমি আর মিছিমিছি চোখের জল ফেলো না। আজ মনে হচ্ছে, আমি তোমাদের দুঃখ দিতেই জন্মেছি।

সানু দেখল, তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। ঠোঁটটা সে দুরন্ত এক অভিমানে কামড়ে ধরেছে। আস্তে আস্তে নিশ্বাস ফেলল; হয়তো কেউ টের পেয়ে যাবে। এই অন্ধকারে বালিশে মুখ গুঁজে সে কিছুক্ষণ কাঁদল। মার ওপর সানুর মনে যে ঘন, পুরু হয়ে অভিমান জমেছিল এতক্ষণ ধরে, এখন যেন তা অনেক পাতলা হয়ে এলো, চোখের জলে তা ভিজে ভিজে কখন এক সময় মিলিয়ে গেল।

তারপরও সানু ঘরের সেই অন্ধকারে চেয়ে থেকেছে। চোখে ঘুম নেই। দূরে কোথায় একটা পাখি ডেকে উঠেছে। বাগানের আতাগাছে বাদুড় উড়ে যাওয়ার শব্দ হলো। কয়েকটা কুকুর ক্ষীণস্বরে ডাকল। দাদার ঘরে জ্বলছে আলো। গম্ভীর নিস্তব্ধ রাত্রি। আজ সকালে ওখান থেকে ফিরে আসার পর থেকেই কতগুলো চিন্তা এসে মাথায় ভিড় করেছে। কাজের মধ্যে ছিল বলে ওগুলোকে তখন ভাল করে বোঝার তার অবসর মেলে নি। এখন যেন না দেখে উপায় নেই। পথে আসতে আসতে তারও মাথায় হঠাৎ অন্য ধরনের এক ভাবনা উঁকি দিয়ে চলে গেছে। সানু মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। নিজেরই কেমন লজ্জা হলো, কান দুটো লাল হয়ে উঠেছিল। তারপর বাড়ি ফিরে মার মুখে ওরকম একটা কথা শুনে মনটা মুহূর্তে আবার বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেছে। তার হঠাৎ কেন যেন মনে হলো, মার ওই কথাটার মধ্যে অন্যরকমের এক অর্থ আছে। মা কি আজ তবে তাকে প্রলোভন দেখাচ্ছে? নিজের ওপরই রাগ হয়েছিল সানুর। এখন ভাবল, মা হয়তো কথাটা তাকে সাধারণভাবেই বলেছিল, সে-ই ভুল বুঝেছে। আসলে সানুই ওরকম কিছু ভাবছিল।

সন্দীপদের ওখানে গিয়ে সানু এমন কতগুলো ছবি দেখেছে, যেগুলো ওর মনে ধীরে ধীরে নতুন এক নেশা ছড়িয়েছে। সে যেন এর অনেকগুলোই ভুলে গিয়েছিল। এখানে এসে একে একে আবার মনে পড়েছে সব। মনে হলো, অনেকগুলো ছবিই এক সময় সে নিজের হাতে সাজিয়েছিল ওদের সংসারে, এখনো সেগুলো তেমনই আছে, সামান্য মলিন বর্ণহীন হয়েছে মাত্র। এর সঙ্গে আরও নতুন কতগুলো ছবি যোগ হয়েছে। সানু এই প্রথম সেগুলো দেখল। ওগুলো দেখতে দেখতে ও বারবার আনমনা হয়েছে।

সন্দীপকে দেখে বেশ কষ্ট হয়েছে তার। এসব ছেলেমানুষির কোন অর্থ হয় না! আজো পুরনোকে আগলে ধরে আছে সে! তবু কেন জানি, সন্দীপদাকে আজ খুব বড় মনে হলো তার। কোন দেবতার পায়ে মানুষ যেমন করে প্রণতচিত্তে অর্ঘ্য দেয়, সানুও মনে মনে সন্দীপকে তার হৃদয় তোলপাড় করা ভক্তি নিবেদন করেছে। একদিন যে অধিকারে তার খুব কাছে যাওয়া যেত, আজ আর যেন তা সম্ভব নয়। দুজনের মধ্যে কেমন এক ব্যবধান রচিত হয়ে গেছে।

ওদের এখানে এসে সানু বুঝতে পেরেছে, সন্দীপদা এখনও তাকে গভীর মমতার চোখে দেখে, তার জন্যে আজো ওর সহানুভূতির কোন অভাব নেই। সানুর ধারণা, এখনও যদি ওর কাছে মুখ ফুটে কিছু বলা বা চাওয়া যায়, সন্দীপদা না করতে পারবে না। কিন্তু কি সে আজ চাইতে পারে ওর কাছে? ওর এই কষ্ট দেখে সানুও মনে মনে কেমন দুর্বলতা বোধ করেছে। আবেগে বুকের ভেতর তার তোলপাড় করেছে। একবার যেন একান্ত বিনীতভাবে মিনতিভরা গলায় বলতে ইচ্ছে হয়েছিল ঃ তোমার এই কষ্ট আর আমি দেখতে পারছি না সন্দীপদা! আমি তো আগে জানতেও পারি নি, আমারই জন্যে তুমি এতবড় ত্যাগ স্বীকার করে বসে আছো। আজ মনে হচ্ছে, আমারো কোথায় যেন একটা মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে। আমি যদি সেদিন সব ছেড়ে দিয়ে তোমার কাছে চলে আসতে পারতাম! আজ কেন যেন বারবার মনে হচ্ছে, আমিই তোমার জীবনটা এমনভাবে ব্যর্থ করে দিলাম। আজ থেকে তোমার জন্যে আমার দুঃখই বাড়বে সন্দীপদা। পারতো, আমাকে তুমি ক্ষমা করে দিও। জান, তোমাকে দেখে আজ আবার নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছে হয় আমার। লোভ হয়, ফেলে আসা জীবনটার জন্যে; আর কি তা ফিরে পাওয়া যায় না? জীবন এত ছোট কেন গো সন্দীপদা! নতুন করে যে বাঁচতে বড় সাধ গো! বুকের তলায় ও কিসের আগুন; নিবু নিবু হয়েও সে নিবছে না! তুমি আমার ফুরিয়ে-আসা সেই আগুনটাকেই আজ উসকে দিলে। আমার জন্যে আজও তোমার এত ভালবাসা। কেন, কেন তুমি আমাকে ভুলতে পারলে না! আমাকে তুমি অপমান করলে না, কড়া কড়া কথা শুনিয়ে সেদিনের প্রতিশোধ নিলে না? সে যে অনেক ভাল ছিল আমার কাছে। মনকে তবু বোঝাতে পারতাম! আমি যে আরো, আরো দুর্বল হয়ে গেলাম! এ আমাকে তুমি কি করলে?

সানু কাত হয়ে শুয়েছিল। চোখের কোনা বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। বালিশে মুখটা আরো অনেকখানি ঢেকে নিল সানু। সে যেন আর কিছু সইতে পারছে না। মনের ওপর যে বোঝাটা তার দীর্ঘদিন ধরে চেপেছে, সেটাকে যেন আর সে বইতে পারছে না। তাকে ক্রমশই ডুবিয়ে দিচ্ছিল ওটা। আজ সেই বোঝাটাকেই সে ঠেলেঠুলে খানিকটা সরাতে পেরেছে। অবশ্য সন্দীপের জন্যেই তা সম্ভব হলো। সানুর মনে হলো, ও যেন রূপকথার সেই রাজপুত্তুর, হাতে সোনার কাঠি। ভালবাসার কাঠি। তারই ছোঁয়ায় যেন ভেতরকার ঘুমিয়ে থাকা রাজকন্যে নয়, এক দুঃখিনী চোখ মেলে তাকিয়েছে। তাকিয়েই সে রাজপুত্তুরকে অবাক হয়ে দেখতে দেখতে প্রথম কথা বলল, 'তুমি আমাকে বাঁচালে কেন?' সানুরও যেন একই কথা ঃ এ তুমি কেন করলে সন্দীপদা?

চোখের জল মুছে এবার উঠে বসেছে সানু। তার ঘুম আসছে না। চোখ দুটো কেমন জ্বালা করছে। গা থেকে লেপটা সে সরিয়ে ফেলেছে। এক ধরনের অস্বস্তি, অস্থিরতা। তার দাদা এইমাত্র আলো নিবিয়েছে। এতটা রাত্তির জেগে ও কি

লিখছিল এতক্ষণ? একবার মনে হলো তার, কলতলায় গিয়ে চোখে জল দিয়ে আসে। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে হলো না। হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে সে অন্য কথা ভাবছিল। সন্দীপদা আজো, তার চায়ে নুন দেওয়ার ঘটনাটা মনে রেখেছে! শুধু একটাই নয়, হয়তো সবগুলোই ওর মনে আছে, কোন গুপ্তধনের মতন সঞ্চয় করে রেখেছে! সব না হলেও, সানুরও, ওর কথা শুনে কিছু কিছু মনে পড়েছে। স্মৃতির পাতাগুলো, যদিও অনেক ঝরে গেছে, বিবর্ণ, ধূসর; তার মধ্যেও কয়েকটি পাতা মনের মধ্যে এখনও উড়ে উড়ে বেড়ায়! কেমন যেন অবসন্ন, বেদনার্ত করে তোলে।

সানুর সামনে এই অন্ধকারেও একটা ছবি এই মুহূর্তে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সন্দীপ তাকে যে অধিকার একদিন দিতে চেয়েছে, সানু শেষ পর্যন্ত তা নিতে পারে নি। এর থেকে একটা জিনিস সে বুঝেছে, শেষ পর্যন্ত তার নিজের মধ্যেও কেমন এক ধরনের দ্বিধা ছিল: আগে তা টের পায় নি। নতুবা এত সব ঘটনার পরে তার পক্ষে এভাবে চলে আসা কখনই সম্ভব হতো না। আসলে, তার বাবা যার সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করেছিলেন, সেখানে সরাসরি সে বিদ্রোহ করতে পারত; বেপরোয়া কোন মনোভাব বা আচরণ তার পক্ষে স্বাভাবিক হতো! সানু নিজেও খানিকটা অবাক হয়েছে। নিজেকেও চেনা কখনো কখনো
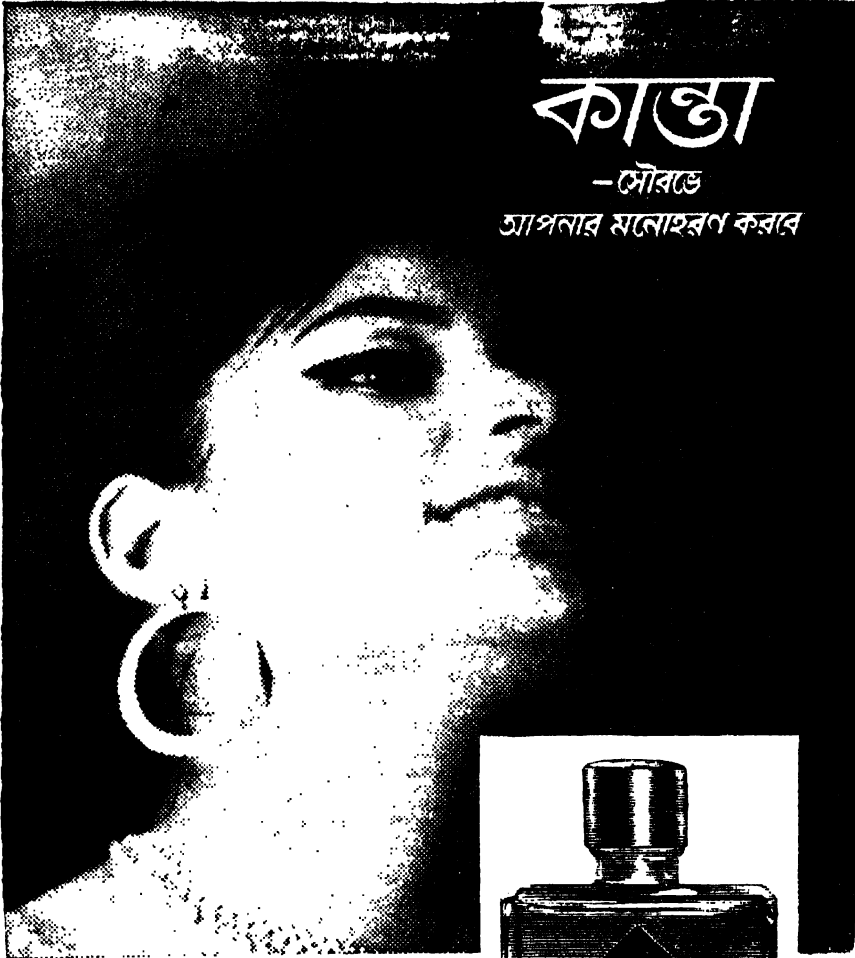
সংসারে যে কত বড় কঠিন কাজ, সানু তা বুঝেছে। সুতরাং আজ আর এজন্যে আফসোস করে কী লাভ। অথচ এই উপলব্ধিটাও মিথ্যে নয় তার কাছে। আজ সে যেভাবে সব দেখছে, বিচার করছে, তাও ঠিক।

সানু যেন মনের গভীরে ডুব দিয়েছে।

সময়টা বর্ষার শেষ। আকাশে মেঘ ছিল। সানু আর সন্দীপ সিনেমা দেখতে গেছে। আগেই টিকিট কেটে রেখেছে সন্দীপ। তবু সানু ওই আকাশের চেহারা দেখে সন্দীপকে বলেছিল, "কী অবস্থা দেখছো, কলকাতা বুঝি ভেসে যাবে।"

"ভাসলে তো ভালই হয়, আমরাও ভাসবো।"

"আমি বাবা সাঁতার জানি না!" সানু খিল খিল করে হাসছিল।

"আমিও না, এ যে একেবারে রাজ-যোটক ব্যাপার।"

"তবে আর কি, ডুববো একসঙ্গে।"

"আমি তো ডুবেই আছি।"

সানু সন্দীপের গায়ে চিমটি কেটেছিল, হাসতে হাসতে বলেছিল, "যাও, তোমার খালি ইয়ার্কি।" কি খেয়াল হতে আবার বলেছিল, "ঝড় বৃষ্টি এলো বলে, তার চেয়ে টিকিট দুটো বেচেই দাও।"

"এত কষ্ট করে আগে থেকে টিকিট কেটে রাখলাম, আর ভিড়ও হচ্ছে সাংঘাতিক, আর তুমি বলছো বেচে দিতে!"

দেখতে দেখতে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। আকাশ কালো কুচকুচে হয়ে উঠেছে। এলোমেলো বাতাস ছিল। সানুর মাথায় যেন কী এক খেয়াল ভর করেছে। সন্দীপের হাত ধরে টানল সে, বলল, "এই, আজ সিনেমা বাদ দাও, লক্ষ্মীটি।" সানুর মধ্যে যেন তখন কিসের এক অস্থিরতা, আবার বলল, "এভাবে দাঁড়িয়ে রইলে, কেন? চলো আজ বৃষ্টিতে খুব করে ভিজবো, দারুণ মজা হবে।"

"শেষে অসুখ-টসুখ বাধিয়ে একটা কেলেঙ্কারী করবে দেখছি।"

"তোমার খালি ভয়, কিছু হবে না, এসো তো আমার সঙ্গে।" বলেই হাত ধরে ওকে টানল সানু।

সানু বৃষ্টির মধ্যে নেমে পড়েছে, সন্দীপও। সানু আনন্দে হাততালি দিচ্ছে বারবার। কী মনে পড়তে সন্দীপের দিকে চেয়ে সে জিভ কাটল, "এই যাঃ, টিকিট দুটো বেচলে না তুমি!"

"সেই সুযোগই বা আর দিলে কোথায়।"

"যাক গে। আমার না কী যে মজা লাগছে ভিজতে!" সানু জলের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছিল। দেখতে দেখতে রাস্তাঘাট জলে ডুবে গেল। ট্রাম সারিবন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বাসগুলো জলের ওপর ঢেউ তুলে এগিয়ে যাচ্ছে—রিক্সার ঠুং-ঠুং শব্দ; ঝড়ো বাতাস। ওরা পাশাপাশি হাঁটছে। সন্দীপ সানুর দিকে চেয়ে বলছিল, 'এই, আমার ভীষণ শীত করছে।'

সানুর মাথায় যেন আজ কী একটা চেপেছে। তারও চোখদুটো লাল হয়ে উঠেছে, বলল, 'এই ভিজে শাড়িতে আমি এখন বাড়ি যেতে পারবো না।'

'কে এখন তোমায় বাড়ি যেতে দিচ্ছে শুনি!' একটু নীরব থেকে সন্দীপ ফের বলেছিল, 'আগে আমাদের ওখানে চলো, এই বাদলার দিনে খিচুড়ি যা জমবে না!'

'এই, একটা রিক্সা নাও না।' সানুর চোখে যেন অন্য এক নেশা জমছে।

রিক্সায় আসতে আসতে সানু ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিল। সন্দীপ যেন তখন আরো একটা কি করতে যাচ্ছিল, সানু চিমটি কেটে দিয়েছে ওকে, হাসতে হাসতে বলেছে, 'এই, অসভ্য!'

এদের এভাবে ফিরতে দেখে প্রিয়লতা উদ্বেগ বোধ করলেন, 'এ কী করেছিস তোরা, নির্ঘাৎ জ্বর আসবে, তাড়াতাড়ি এসব ছাড়, রাস্তার যত নোংরা জল।'

'কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবো মাসীমা, তাই ভিজেই চলে এলাম।'

'ভাল করেছো। এবার সাবান-টাবান দিয়ে ভাল করে চান কর।'

সানু সাবান নিয়ে কল ঘরে ঢুকে গেল। সন্দীপকে জিভ ভেংচিয়ে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'দাঁড়িয়ে থাক।' বলেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। পর-মুহূর্তেই দরজাটা খুলে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'এই, কি পরবো আমি।'

'তাই তো!' একটু পরে হাসি-হাসি মুখ করে আবার বলেছে, 'আমার ধুতি পরবে।'

'শুধু ধুতি কি হবে, আমার যে সবই ভিজে গেছে।'

'আমার আর কিছু নেই।' সন্দীপ কি ভেবে হাসতে থাকে।

সানু কৃত্রিম গাম্ভীর্য নিয়ে বলল, 'খালি অসভ্যতামি, দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।'

সন্দীপ এবার খুব অস্ফুটে বলল, 'কি আর করবে, মার সেমিজই পর।'

'তবে রে' সানু জল ছিটিয়ে আবার দরজা দিয়ে দিল।

"তাড়াতাড়ি করবে কিন্তু, আমার শীত করছে।' সন্দীপ গামছা দিয়ে গা হাত পা ভাল করে মুছে নিল। পরে সরষের তেল মেখে নিয়েছে গায়ে। তার মাথাটা একটু একটু ধরেছে।

প্রিয়লতা ওর জন্যে ট্রাঙ্ক থেকে অনেক খুঁজে খুঁজে পুরনো শাড়ি বের করেছেন; সায়া সেমিজ নিয়ে এসে কলঘরে সানুকে পরতে দিলেন। তিনি আবার চলে গেলেন।

একটু পরে সানু বেরিয়ে এলো পিঠময় ভেজা চুল ছড়ানো, ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে তখনো। নতুন পোষাকে সানুকে মন্দ দেখাচ্ছে না। বরং ভালই দেখাচ্ছিল। সানু কি ভেবে ফিস ফিস করে বলেছিল, "দেখলে তো, তোমার কিছুই নিতে হলো না!"

"সেমিজে তো ভালই লাগছে।' সন্দীপ হেসে ফেলেছিল।

সানু কৃত্রিমভাবে চোখ পাকাল। শাড়িটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে নিল এক ফাঁকে। শাড়িটা পুরনো হলেও দেখতে সুন্দর। নিজের ভেজা শাড়ি ব্লাউজগুলো তাড়াতাড়ি করে ঘরে শুকোতে দিল। প্রিয়লতা পাখা চালিয়ে দিয়েছেন। সানু চিরুনি দিয়ে চুলটা আঁচড়ে নিচ্ছিল। তার চোখও জ্বালা করছিল। পরে প্রিয়লতার দিকে চেয়ে সে বলেছিল, "আজ কিন্তু আপনার হাতের খিচুড়ি খেয়ে যাবো, ওই লোভেই চলে এলাম এত কষ্ট করে।"

"তোমার কথাই ভাবছিলাম; এমনিতেই আজ খিচুড়ি হবে, না এলে খুব খারাপ লাগত।"

সানু পেছন দিক থেকে এসে প্রিয়লতাকে জড়িয়ে ধরেছিল, নরম আদুরে গলায় বলেছিল, "আপনি না ভীষণ, ভীষণ ভাল মাসীমা।"

'তুমিও কম ভাল নয় মা।'

একটু পরে প্রিয়লতা চলে গেলেন।

সানু জানলাটা খুলে দিল। ওখানেই হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে চুল আঁচড়াচ্ছিল। বাইরের দিকে চেয়ে কেন যেন বারবার সে অন্যমনা হয়ে যাচ্ছিল। তখনো আকাশ গলে গলে পড়ছে। এলোমেলো বাতাস। আকাশটা যেন আরো কালো হয়েছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ঝন ঝন করে বাজ পড়ছে। মনটা থেকে থেকে কেমন উদাস হয়ে যায়। কী এক অনির্দেশ্য বেদনায় জীবনের পাত্র যেন ভরে ওঠে শুধু। ওই কাজল কালো আকাশের গায়ে কি আর কিছু লেখা থাকে? সানুর মন খারাপ হয়ে যায়। সে যেন নিজেকে এই মুহূর্তে ভুলে গেল! বুকের মধ্যে কিসের এক যন্ত্রণা চাপা পড়েছে। তার দাপাদাপি শুরু হলো যেন।

সন্দীপ ঘরে ঢুকেছে। সানুকে এভাবে জানালার ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও এগিয়ে এলো। অল্প অল্প জলের ছাট আসছিল। সানুর গায়ে আস্তে করে একটা ঠেলা দিয়ে সন্দীপ তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি অত ভাবছো? গায়ে জল লাগছে না?"

সানু ওর দিকে তাকিয়ে হাসল একবার। শান্ত গলায় পরে বলেছিল, "কি ভাববো, কিছুই না, আকাশ দেখছিলাম।"

"তোমাকে কিন্তু আজ দারুণ দেখাচ্ছে।'

"মোটেও না!" সানু চোখের এক অদ্ভুত ভঙ্গি করে অন্যদিকে চেয়ে হাসছিল।

"সত্যি বলছি।" সন্দীপ এবার ওর সামনে এসে দাঁড়াল। চোখে চোখে চেয়ে থাকল খানিকক্ষণ, পরে কি ভেবে বলল, "আসলে মার এই শাড়িটায় তোমাকে আরো ভারিক্কি, গিন্নী গিন্নী লাগছে।"

সানু খিল খিল করে হেসে উঠেছে। কি মনে পড়ায় হাসি থামিয়ে ও বলল,

"এই, আমার শাড়ি ব্লাউজ না শুকোলে কি করে আজ বাড়ি যাবো?"

"বাড়ি যেতেই হবে, এমন কি কথা, যাবে না।" সন্দীপ হাল্কা গলায় বলল।

সানু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বলল, আমিও তো থাকতেই চাই; এভাবে চলে যেতে আমারও খুব কষ্ট হয়, কিন্তু উপায় তো নেই।"

এবার একটু গম্ভীর হলো সন্দীপ, বলল, "তোমার বাড়িতে কথাটা এবার জানিয়েই দাও। এসে চলে যাও, আমারও খারাপ লাগে।"

সানু অস্ফুটে বলল, "হ্যাঁ, এই লুকোচুরির শেষ হওয়া দরকার।"

আবার জোরে জল এলো। রিমঝিম করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। ওরা কিছুক্ষণ চুপচাপ ওদিকে চেয়ে থাকল। শেষে সন্দীপ বলল, "এই মেঘলা দিনের অদ্ভুত এক নেশা আছে, তাই না সানু?"

সানুও গাঢ় চোখে ওকে দেখছিল। পরে দৃষ্টি সরিয়ে আনতে আনতে বলেছিল, "আছে মানে, ভীষণ এর নেশা।"

"মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়।" সন্দীপ আকাশে মেঘের সমারোহ দেখছিল। একটু পরে বলল, "যা মুষলধারে নেমেছে, যাবে কি করে, আবার তো ভিজতে হবে।"

"তবু, না গিয়ে তো উপায়ও নেই।"

ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কি যেন মনে হলো সন্দীপের। ও বলল, "এই, শোন।"

সানু মন্ত্রমুগ্ধের মতন ওর কাছে সরে এলো। সন্দীপের চোখের দিকে ও চেয়ে আছে একদৃষ্টে, তার চোখেও নেশা, ঘোর।

সন্দীপ সহসা শাড়ির খানিকটা হাতে নিয়ে ঘোমটার মতন পরিয়ে দিল, বলল, "এতে বেশ দেখাচ্ছে তোমায়।"

"এরপর একটা প্রণাম না করলে আমার পাপ হবে।" বলেই নীচু হয়ে ওর পায়ে হাত রেখেছে সানু।

সানু চমকে উঠেছে। তার বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল। কে জানে, আরো গভীর কোন পাপ হয়তো সে করেছিল। না হলে এত অভিশাপ নেমে আসে তার ওপর! মনে হলো, ঘরের অন্ধকারটাও হঠাৎ কেমন নড়ে উঠেছে। মানুটা স্বপ্নের মধ্যে বিড় বিড় করছে। সানু আস্তে করে একটা ঠেলা দিল ওকে। মাও কি একটা বলতে বলতে পাশ ফিরে শুয়েছে। ঘুমের মধ্যেই মা অনেক সময় কথা বলে। সানু এতক্ষণ ধরে তন্ময় হয়ে অতীতের যে ছবিটা দেখছিল, আজ যেন বিশ্বাস করতে রীতিমতন কষ্ট হয়। ওই মেয়েটার সঙ্গে তো কোথাও তার মিলছে না। বড় অচেনা লাগছে আজ। সানুর ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে হলো এখন। কিন্তু তাও পারছে না। এতদিন পরে যেন তার খেয়াল হয়েছে, সানু একদিন যে সম্পদ পেয়েছিল, তা কোন ফাঁকে নিজেরই ভুলে হারিয়ে বসে আছে। আজ মনে হচ্ছে জিনিসটা দুর্লভ, দামীই ছিল। আর কি তা কখনো ফিরে পাওয়া যায়? তবু সানু এই মুহূর্তে সন্দীপকে লক্ষ্য করে যেন বলতে চাইল: তোমার সামনে দাঁড়াবার আমার আর মুখ নেই সন্দীপদা, তবুও গেছি তোমার কাছে। তুমি আমাকে আগের মতনই নিয়েছো। আর নিয়েছো বলেই আমি একদিকে যেমন লজ্জায় মাথা নীচু করেছি, অন্যদিকে আবার আমার সাহসও বেড়েছে। আজ বুঝতে পারছি, কী মারাত্মক ভুল সেদিন করেছি। কিন্তু সে ভুল কি শোধরানো যায় না আর? আমার একবার কি মনে হয়েছিল জান, আমি তোমার এখানে চলে আসি, আর ফিরে যাবো না কোনদিন। কিন্তু বলতে গিয়েও পারলাম না। হয়তো ভালই করেছি। আমি ন্যায় নীতির কথা ভেবে যে চুপ করে গেছি, তা কিন্তু নয়। আমার কাছে এসব অর্থ অনেক জলো, তুচ্ছ মনে হয় আজকাল। তাছাড়া এটা এমন কিছু অন্যায়ও নয়। কিন্তু আমার সামনে আর একটা দিক পথ আটকে দাঁড়াল। আমার দ্বিধা, সংকোচ আর কাটল না। মাথা হেঁট করে চলে এলাম। এরপর আর কিছু চাওয়া যায় না সন্দীপদা! কি করে চাইবো বল! এতদিন পরে তোমাকে নতুন করে কলঙ্কিত করতে আমার ইচ্ছে হলো না। আমি তো জানি, কিছু চাইলে, আজো তুমি আমায় ফেরাতে পারবে না। কিন্তু ভালবাসার জন্যে যে মানুষ এতখানি ত্যাগ স্বীকার করে, তাকে ছোট করার অধিকারও যে আমার নেই। আমার জন্যে তোমাকে আর নামাতে চাই না। তোমার কাছে আরো বড় জিনিস পেয়েছি আজ, ভালবাসা। আজ নিজের চোখেই দেখলাম এক প্রেমময় পুরুষকে। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছো সন্দীপদা! তোমার কাছে আমি চিরদিনের মতন ঋণী হয়ে থাকলাম।

সানু আরো অনেকক্ষণ অভিভূতের মতন বসে থাকল। সে অনেকটা সামলে উঠেছে এর মধ্যে। এই দুঃখের মধ্যেও এখন অন্তত একটা সান্ত্বনা আছে যেন।

সন্দীপের কথা ভাবতে গিয়ে আরও একজনের কথা তার মনে পড়ল। সংসারে অনেক ঘা তিনি খেয়েছেন। এরপরও মনের জোরে দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হলো, প্রিয়লতা যেন এখনো তার মাথায় সস্নেহ একখানি হাত রেখেছেন, প্রাণভরে তাকে আশীর্বাদ করছেন। ওঁকে দেখে সানুরও আজ কষ্ট হয়েছে। শরীর স্বাস্থ্য মন একেবারেই ভেঙে পড়েছে। চিনতে কষ্ট হয়! মনে হয়, ছেলের জন্যেই যেন তিনি বেঁচে আছেন। এই ভাবনাতেই বুঝি সারাক্ষণ তিনি কেমন মনমরা হয়ে থাকেন। গভীর এক দুঃখ নিয়েই হয়তো শেষ পর্যন্ত তিনি চোখ বুজবেন। আজ যা দেখে এসেছে সানু, তাতে মনে হয়েছে, মনে মনে এই অতৃপ্ত আকাঙ্খা নিয়েই প্রিয়লতা একদিন চলে যাবেন। অথচ এর জন্যে কাউকেই তিনি দোষ দেন নি। বরং নিজের কপালকেই দায়ী করেছেন। দেবতার অমোঘ কোন বিধানের মতনই তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন সব। আজ কেন জানি ওঁকে দেখে, বুক ঠেলে কান্না উঠে আসতে চেয়েছে সানুর। এ সে কোন্ বিষন্ন প্রতিমা দেখে এলো? থেকে থেকে একটা কথা মনে পড়ছে সানুর। অনেক আগে প্রিয়লতা একদিন কথা প্রসঙ্গে চাবির গোছা দেখিয়ে তাকে বলেছিলেন, "এই যে চাবির গোছাটা দেখছ মা, আমার ইচ্ছে, এটা তোমার হাতেই তুলে দিয়ে যাই। সেই কবে যে শাশুড়ী আমার আঁচলে এই গোছাটা বেঁধে দিয়েছিলেন, মনেও নেই মা; তিনিও তাঁর শাশুড়ীর কাছ থেকেই এটা পেয়েছিলেন। এ আর বইতে পারছি না মা। আমার বয়েস হয়েছে, না দিয়ে গেলে আফসোস নিয়েই মরতে হবে।" সানু এর কোন জবাব দিতে পারে নি। সেও ভেবেছিল, এই দায়িত্ব নিতে পারবে একদিন। প্রিয়লতাকে দেখে ওর এইসব কথাই মনে পড়ছে। আজো তিনি সেই চাবির গোছা আঁচলে বেঁধে রেখেছেন, কাউকেই আর দিতে পারেন নি। এ দুঃখ যে ওঁর একারই নয়, সানুরও। আজ সকালে ওভাবে চলে আসার তারও খারাপ লেগেছে। এ ছাড়া যে আর কোন উপায়ও ছিল না তার। এরপর আর কখনো কি ওখানে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব? গেলেই তো এই বিষাদের ছবি দেখতে হবে। তার দুঃখই বাড়বে খালি। সানু কি ভেবে নতজানু হয়ে এই মুহূর্তে প্রিয়লতার উদ্দেশে জোড় হাত করে প্রণাম জানাল।

এবার মেঝেয় নেমে এলো সানু। চোখে জল দেওয়া দরকার। চারদিক স্তব্ধ, কোথায় একটা পাখি ডেকে উঠেছে। অন্ধকারে পা টিপে টিপে কলতলার দিকে যেতে গিয়ে আবার কেন যেন তার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে উঠছে। আলো জ্বালাতে ইচ্ছে হলো না। আজ এই অন্ধকারই বুঝি তার কাছে পরমা সান্ত্বনা, আশ্রয়।

(ক্রমশঃ)

ঋগ্বেদে শতদাঁড় বিশিষ্ট ভুজ্যুর পোত (আনুমানিক)
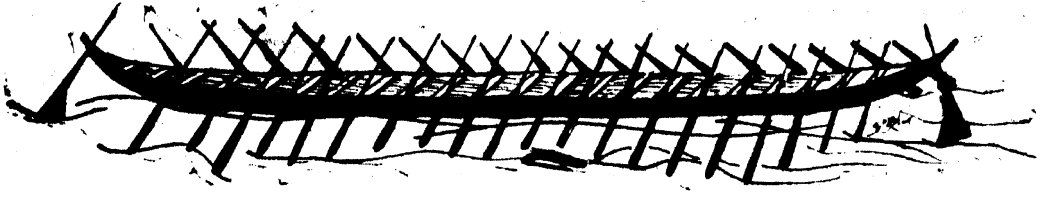
প্রাচীন ভারতের নৌশক্তি

দীপকমোহন সেন

প্রাগৈতিহাসিক কালের ভারতীয় নৌ-যানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য এখনও উদ্ঘাটিত হয় নি। তবে ভারতে আর্যসভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নৌ যানের বহুবিধ উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে "সমুদ্র" শব্দটি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং সমুদ্রযাত্রার বর্ণনাও রয়েছে। বরুণের সমুদ্রপথের জ্ঞান এবং সমুদ্রপথে জাহাজের ব্যবহারের কথা আমরা জানতে পারি। বশিষ্ঠ এবং বরুণের সমুদ্রযাত্রা এবং "নাব" শব্দটির ব্যবহার ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। আরও জানা গেছে, তুগ্র তাঁর পুত্র ভুজ্যুকে পাঠিয়েছিলেন সমুদ্রপথে শত্রুকে জয় করার জন্য। শতদাঁড় বিশিষ্ট বৃহৎ নৌকায় দেবতা অশ্বিন আসন্ন বিপদ থেকে ভুজ্যুকে রক্ষা করেছিলেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে পূর্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রের উল্লেখ থেকে সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

পরবর্তী সময়ের বহুবিধ পুঁথিপত্রের মধ্যে সমুদ্র এবং দূরপাল্লার জাহাজের যথাযথ উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ নিকায়গুলি থেকে সমুদ্রোপকূলবর্তী বহু বন্দরের নাম জানা যায়। দন্তপুর, ভরুকচ্ছ এবং সুপ্পারকের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বন্দরের কথা বহুস্থানে বর্ণিত আছে। কাবেরী-পত্তন নামে এক উল্লেখযোগ্য বন্দরের উল্লেখ রয়েছে অকিত্তিজাতকে। অন্যান্য জাতকে সমুদ্রপথে ভারতের সঙ্গে বেবিলন, সিংহল এবং পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের ব্যবসা বাণিজ্যের অসংখ্য বর্ণনা আছে। আকাশের তারকাপুঞ্জ এবং দীশাকাকের (পাখী) নির্দেশ জাহাজের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করত অঙ্গুত্তরনিকায় এবং অন্য কয়েকটি বৌদ্ধ জাতকে তার উল্লেখ আছে। এই একই জাতকে সমুদ্রপথে ছয় মাসের জন্য যাত্রার কথা বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ শীতের সময় জাহাজগুলি সমুদ্রের উপকূলে অবস্থান করত। মনুসংহিতায় অভিজ্ঞ নাবিকের প্রশংসা করা হয়েছে। রামায়ণে সুগ্রীব তাঁর অনুচরদের সীতার অন্বেষণে পাঠাবার সময় সমুদ্র উপকূলবর্তী বন্দরসমূহে বিশেষভাবে অনুসন্ধান চালাবার নির্দেশ দেন।

বহুস্থানে জাহাজ তৈয়ারীর কারখানার উল্লেখ পাওয়া যায়। জাহাজ নির্মাণ বিদ্যা ছিল একটি পৃথক বিজ্ঞান। জাহাজ নির্মাণে কাঠের গুণাগুণ বিচার করা হত এবং নির্মাণের কৌশল ও দক্ষতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হত। 'যুক্তি-কল্পতরু' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে বিভিন্ন আকার এবং আয়তনের ওপর লক্ষ্য রেখে জাহাজের শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। রামায়ণে গুহের সুগঠিত এবং সুসজ্জিত নৌযানের কথা বর্ণিত আছে—এই নৌযানের ঝড় ও ঘূর্ণিবাত্যার ভয় ছিল না।

জলযানগুলি সমুদ্র উপকূল দিয়ে ভারত, পারস্য এবং আরব দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করত এবং যাতায়াত বিস্তৃত ছিল লোহিতসাগর দিয়ে সুয়েজ পর্যন্ত। সুয়েজ অঞ্চল থেকে স্থলপথে পণ্যসামগ্রী মিশর দেশে এবং জলপথে উত্তরে তারে এবং সিডন বন্দরে পাঠান হত। অবশ্য একই জাহাজ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যেত না, রাস্তায় বহুস্থানে জাহাজ বদল হত এবং পণ্যেরও হাতবদল হত। কোন কোন সময় ভারতবর্ষ থেকে জাহাজ-গুলি পারস্য উপসাগর অতিক্রম করে ইউফ্রেতিস নদী দিয়ে আরও দূরবর্তী অঞ্চলে অগ্রসর হত।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যের গ্রীকরাজ দারায়ুস তাঁর সেনাপতি স্কাইলাক্সকে সিন্ধু উপত্যকা অভিযানে পাঠান। পারস্যের যে সেনাবাহিনী গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, সেই সেনা বাহিনীতে বহু ভারতীয় সৈন্যও যোগদান করেছিল। এই সময় থেকে স্থলপথে এবং জলপথে ভারত ও গ্রীসের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের পর নৌপথে ভারত ও গ্রীসের যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হয়। এই সময় তার বন্দর বিনষ্ট হওয়ায় ভূমধ্যসাগরের উপকূলে আলেকজাণ্ড্রিয়া বন্দরের সৃষ্টি হয়। প্রথমে ভারতীয় নাবিকেরা মিশরের বন্দরগুলিকে গুরুত্ব দিতেন না। কারণ লোহিতসাগর এবং নীলনদের মধ্যবর্তী মরুভূমি বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্য বহনের প্রতিকূল ছিল। সামুদ্রিক বাণিজ্যের সংযোগস্থল ছিল পেত্রো বন্দর। এই বন্দর থেকে আরব, মেসোপটামিয়া, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি বন্দরে পণ্য বিনিময় চলত। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মুজা বা এডেন বন্দর পর্যন্ত ভারতীয় পণ্য পাড়ি দিত এবং পশ্চিম জগতের সঙ্গে মুজাকে কেন্দ্র করে আদান প্রদান চলত।

গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ান বলেছেন যে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সময় ভারতে ক্ষত্রিয়দের অনেক জাহাজ নির্মাণের কারখানা ছিল এবং তারা ৩০ দাঁড়বিশিষ্ট বহু নৌযান আলেকজাণ্ডারকে সরবরাহ করেছিল। মৌর্য আমলে জাহাজ নির্মাণ শিল্প রাষ্ট্রের একচেটিয়া ছিল এবং সুদক্ষ কারিগরেরা রাষ্ট্রের অধীনে কাজ করতেন। কোন ব্যক্তিবিশেষের পৃথকভাবে কোন কিছু করার অধিকার ছিল না। জাহাজগুলি আকারে যথেষ্ট বড় ছিল এবং প্রচুর পণ্য বহন করার ক্ষমতা ছিল। গুহের দ্রুতগামী জলযান মানুষ, রথচালক, ঘোড়া, গরুর গাড়ী প্রভৃতি বহন করত। ঝিলম নদীর তীরে আলেকজাণ্ডারের যে সব রণতরী ভারতীয় কারিগরেরা নির্মাণ করেছিল তার সংখ্যা ৮০০ থেকে ২০০০ পর্যন্ত। ঐ জাহাজগুলি ৮০০০ হাজার সৈন্য এবং বহু ঘোড়া ও রসদ বহন করে নিয়ে যেতে পারত। মহাবংশের মতে যে জাহাজ বিজয় সিংহকে সিংহলে নিয়ে যায় সেই জাহাজে ৮০০ যাত্রী ছিল। অজন্তার চিত্রকলার মধ্য থেকেও আমরা এই সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি। মেগাস্থিনিসের মতে মৌর্য নৌসেনা বিভাগ ব্যবসায়ীদের কাছে যুদ্ধ জাহাজ ভাড়া খাটিয়ে রাষ্ট্রের রাজকোষের এক বাড়তি আয়ের পথ সুগম করে দিয়েছিল।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সমগ্র নৌ-বিভাগকে 'নাবাধ্যক্ষ' নামক অধ্যক্ষের কর্তৃত্বাধীনে এবং পরিচালনায় ন্যস্ত করা ছিল। সমগ্র রাষ্ট্রই বৃহৎ ক্ষুদ্র নৌযান নিয়ন্ত্রণ করত। নাবাধ্যক্ষের অধীনস্থ কর্মচারীরা দেশের উপকূলবর্তী স্থান এবং নদীসমূহকে শত্রু এবং জলদস্যুর আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখতেন। এই নৌবিভাগের কাজ

ছিল জলপথের কর সংগ্রহ বন্দরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং উপকূলবর্তী স্থানসমূহে অস্ত্রশস্ত্রের গোপন পাচার বন্ধ করা। জাহাজ এবং জাহাজ যাত্রীদের নিরাপত্তাবিধান এবং বিদেশী জাহাজের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করাও এই বিভাগের অন্যতম কাজ ছিল। সামুদ্রিক কর রাজ্যের রাজস্বের অন্যতম বিষয় ছিল। এই কর সাধারণত সমুদ্রোপকূলবর্তী গ্রামসমূহে, মৎস সম্প্রদায় এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নেওয়া হত। রাজ্যের জাহাজ পরিবহনের জন্য যাত্রী এবং ব্যবসায়ীদের ভাড়া দিতে হত। মৌর্য যুগে সমুদ্রপথে ভারতীয় জাহাজ বহুদূর পর্যন্ত যাওয়া-আসা করত। গ্রীস ও রোম দেশ থেকেও বহু পণ্যবাহী জাহাজ পণ্যসামগ্রী নিয়ে ভারতের উপকূলবর্তী ভূখণ্ডে নোঙর করত। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে হিপেলাস নামক এক রোমান নাবিক ভারত মহাসাগরে মৌসুমী বায়ু আবিষ্কার করেন এবং এই মৌসুমী বায়ুর সাহায্যে উত্তরোত্তর বিদেশী জাহাজগুলি অতি সহজেই ভারতের উপকূলবর্তী শহর এবং বন্দরগুলিকে সমৃদ্ধিশালী করে তোলে। পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সি' এবং গ্রীক ভৌগোলিক টলেমির গ্রন্থে ভারতের সঙ্গে পশ্চিমদেশের নৌপথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা জানা যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে রোম তথা পশ্চিমী দেশগুলির গভীর যোগাযোগ ছিল। গুপ্তযুগে এই সম্পর্ক উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছায়।, এমনকি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন সাং তাম্রলিপ্ত বন্দরের কথা উল্লেখ করেছেন এবং এই বন্দর থেকে জলপথে তিনি স্বদেশে যাত্রা করেন।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে নৌপথে চীনের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। ফা-হিয়ান সিংহল থেকে একটি বাণিজ্য জাহাজে রওনা হয়েছিলেন এবং এই জাহাজে প্রায় ২০০ ভারতীয় এবং সিংহলের ব্যবসায়ী ছিলেন। ইং-সিং তাঁর সমসাময়িক ৩৭ জন ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন যাঁরা ভারত ও চীনের মধ্যে নৌপথে যাতায়াত করতেন। খ্রীষ্টীয় ৭৫০ অব্দে চীনের ক্যান্টন শহরে বহু হিন্দু মন্দির এবং হিন্দু ব্যবসায়ীকে দেখা যায়। এই সময় আফ্রিকা, আরব দেশ এবং ভারতবর্ষের যে সব পণ্য চীনে রপ্তানী হত, সেগুলিকে পারস্যদেশের পণ্য হিসাবে গণ্য করা হত।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষদিকে পারস্যের গ্রীকদের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য হ্রাস পেতে থাকে, কিন্তু কনস্টান্টিনোপল-এর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ শতাব্দীতে দক্ষিণভারতে আবার রোমান মুদ্রা দেখা যেতে লাগল এবং মালদ্বীপ ও সিংহলের সঙ্গে রোমের রাষ্ট্রদূত বিনিময় শুরু হল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গেও নৌপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হল।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ, সপ্তম শতাব্দীতে ব্যবহৃত দেশের আভ্যন্তরীণ নৌযান (আনুমানিক)
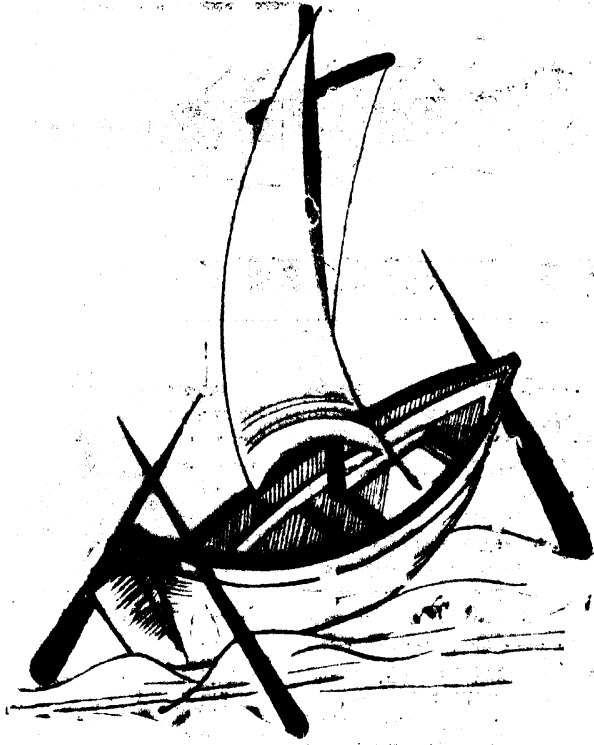
পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সি পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদক শফ্ বলেছেন যে খ্রীষ্টপূর্ব এবং খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতকে যেভাবে ভারতীয়েরা ইন্দোচীনে বসবাসের জন্য যাওয়া শুরু করেন তা থেকে স্বভাবতই মনে হয় যে ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে ভারত ও পশ্চিমী জগতের চেয়ে অনেক বেশী জাহাজ সমুদ্রপথে যাতায়াত করত। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নৌপথে এই নিবিড় যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় হাজার বছর পর চোলরাজাদের আমলে উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করেছিল। এই সময় নাবিকেরা অনেক বেশী দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

চীনের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে কম্বোডিয়ার (ফু-নান) খ্যাতনামা সেনাপতি ফন-চে-মান একটি শক্তিশালী নৌবহর তৈয়ারী করেছিলেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে ইন্দোচীনে প্রথম হিন্দু ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। চীনের হান বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ২২০ খ্রীষ্টাব্দে এবং পরবর্তী সময়ে চম্পা (আনাম) হিন্দুরাষ্ট্র হিসাবে নৌশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে। চীনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে চম্পার হিন্দুরাজা টং কিং-এ চীনের আধিপত্য খর্ব করে টংকিং উপসাগর পর্যন্ত স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ভারত ও চীনের সমুদ্রপথে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত চীনের জাহাজগুলি ভারতের পশ্চিম উপকূলে যাতায়াত করত। পারস্য উপসাগরে অবস্থিত সিরাফ বন্দরটিতে ভারত, চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন বণিকেরা মিলিত হতেন। এখানে ব্যবসায় লেনদেন প্রভৃতি চলত।

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে চীনে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা যায়, কিন্তু দশম শতাব্দীতে দেশে রাজনৈতিক স্থিতি ফিরে আসে। এই সময় চোল রাজারা চীনে রাষ্ট্রদূত পাঠান। চোলরাজ রাজরাজের রাজত্বের শেষার্ধে ১০১৫ খৃঃ চীনে একটি শিল্প প্রতিনিধি দল পাঠান হয়। চোল সম্রাট প্রথম রাজেন্দ্রের সময়ে ১০৩৩ খৃঃ এবং ১০৭৭ খৃঃ চীনে আরও দুটি প্রতিনিধি দল পাঠান হয়েছিল।

১১৭৭ খৃঃ ইহুদি পরিব্রাজক টুডেলার বেনজামিন বলেছেন যে, দক্ষিণ ভারতের কোন বন্দরে বিদেশী জাহাজ দেখা গেলেই তার ছিল চোল রাজাদের নির্দেশ. মাঝিদের উপর। বিদেশী জাহাজগুলি বন্দরে নোঙর করার সঙ্গে সঙ্গে এই মাঝিরা জাহাজ মেরামত করাতেন, জাহাজে তাদের মাল

খৃঃ পূঃ একাদশ শতাব্দীতে সুউন্নত চোল রণতরী (আনুমানিক)
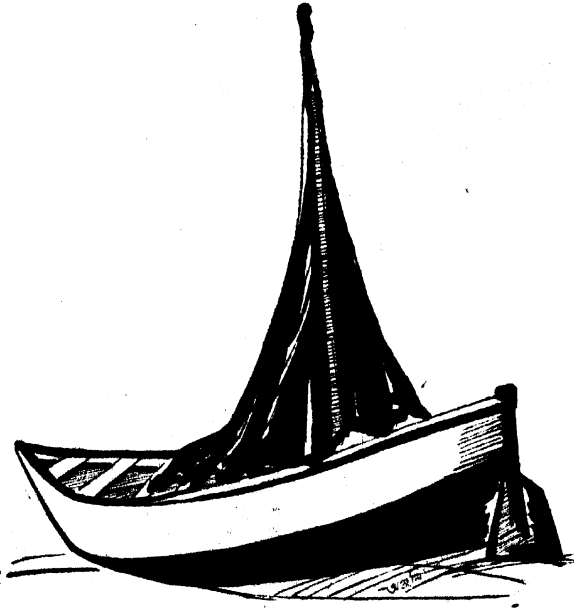
লেখা হত এবং রাজাকে জানান হত। এই প্রথা চোল সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

যে সকল বৈদেশিক শক্তি ভারতে তাদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য এদেশ আক্রমণ করেন, তাঁদের কারও সঙ্গে ভারতের জলপথে বড় একটা সংঘর্ষ হয়নি, কারণ এই বৈদেশিক শক্তিগুলি ভারতকে আক্রমণ করেছে স্থলপথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে। এখন আমাদের মনে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে—তবে কি ভারতীয় কোন সম্রাট ঐতিহাসিক যুগে জলপথে কোন দেশ আক্রমণ ও দখল করেন নি? রাজা বিজয় সিংহের লঙ্কা অভিযান যে প্রাচীন ভারতীয় নৌশক্তির একমাত্র পরিচয় সে কথা বলা ঠিক নয়। পশ্চিম উপকূলে বাদামী চালুক্য রাজাদের রেবতী দ্বীপ, পুরী প্রভৃতি বিজয়, পল্লব এবং পান্ড্যরাজাদের সিংহল এবং মালডিভ বিজয় দক্ষিণ ভারতীয় রাজাদের নৌশক্তির উৎকর্ষের পরিচায়ক। প্রাচীন ভারতীয় নৌশক্তির রণকৌশল সম্বন্ধে আমরা বিশেষভাবে পরিচয় পাই দক্ষিণ ভারতের চোলরাজাদের আমলে।

চোল রাজাদের সঙ্গে সুদূর প্রাচ্যের অর্থাৎ মালয় এবং সুমাত্রার এক বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। শিলালিপি এবং দানলিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে চোল রাজা প্রথম রাজরাজের সময়ে সুমাত্রার রাজা চূড়ামণিবর্মন এবং তাঁর পুত্র শ্রীমারবিজয়তুঙ্গবর্মন চোলরাজাকে নাগপট্টমে একটি বিহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব প্রদান করতেন। চীনের ঐতিহাসিকেরা এই দুই রাজাকে সেলি-চুল, উ-লি-ফম, টিয়াও-নি এবং সেরি-মাল-পি নামে অভিহিত করেছেন এবং রাজস্বের কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বেশীদিন স্থায়ী হল না। রাজরাজের রাজত্বের কয়েকটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে তিনি ১০০৭ খৃঃ থেকে বঙ্গোপসাগরের অসংখ্য দ্বীপ জয় করেছিলেন এবং সুদূর প্রাচ্যের বহু স্থান রণতরীর সাহায্যে জয় করবার পরিকল্পনা করেছিলেন।

রাজরাজের পুত্র রাজেন্দ্র চোল খুব দক্ষতার সঙ্গে রাজরাজের পরিকল্পনা রূপায়িত করেন এবং সমুদ্রপথে দিগ্বিজয়ের ফলে বহু স্থান অধিকার করেন। বাংলা এবং কলিঙ্গকে ঘাঁটি করে তিনি সুদূর প্রাচ্যের দ্বীপগুলির ওপর আক্রমণ চালান। অচিরেই তিনি সুমাত্রা জয় করেন এবং তাঁর জাহাজের শব্দে বঙ্গোপসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগর মুখরিত হতে থাকে। তিরুবালাঙ্গারু খোদিত পত্রে এবং তাঞ্জোর শিলালিপি থেকে জানা যায় সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করে রাজেন্দ্র চোলের নৌবহর নৌপথে সুদূর পূর্ব উপকূলের বহু স্থান দখল করে নিতে সমর্থ হয়েছিল। এই নৌ-বিজয়ে বহু স্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনা থেকে যতদূর জানা যায় তাতে মনে হয় যে রাজেন্দ্র চোল সুমাত্রার পূর্ব উপকূলে এবং মালয়ের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় অভিযান চালিয়েছিলেন এবং কটাহ ও শ্রীবিজয় নামক দুটি রাজধানী এই অভিযানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। রাজেন্দ্র চোলের এই রাজ্যজয় ১০৩০-৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শেষ হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। ক্রমশ রাজেন্দ্র মালয় ও সুমাত্রার অধিস্বররূপে পরিগণিত হন এবং তাঞ্জোর শিলালিপি থেকে জানা যায় যে কম্বোজের (কম্বোডিয়া) রাজার কাছ থেকে তিনি রাজস্ব গ্রহণ করতেন।

রাজেন্দ্র চোলের মৃত্যুর পর সুদূর প্রাচ্যের ওপর চোলদের আধিপত্য ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। রাজেন্দ্রের বংশধর প্রথম কুলত্তুঙ্গের রাজত্বে আবার দেখা যায় চোলদের সঙ্গে মালয়, সুমাত্রা এবং কম্বোজের রাজাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সৌহার্দ্য, বিজিত এবং বিজেতার সম্পর্ক নয়।

চোল নাবিকদের নৌ চালনার কৌশল পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে আরবদেশীয় নাবিকেরা বিশেষভাবে অনুকরণ করেছিলেন। ইউরোপীয়দের ভারতে আগমনের প্রাক্কালে দক্ষিণ ভারতীয় নাবিকেরা যে ক্রমাগত নৌশক্তির বৃদ্ধি ও উৎকর্ষসাধন করেছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

প্রাচীন যুগের সামরিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ভারত এবং বৃহত্তর ভারতে হিন্দুরাজারা নৌশক্তির গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, নিকটপ্রাচ্য এবং মধ্যপ্রাচ্য এশিয়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নৌশক্তির মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল। এই যুগে বিদেশী কোন শক্তি নৌপথে ভারত আক্রমণ করে ভারতীয় নৌশক্তিকে আঘাত হানতে পারে নি, পক্ষান্তরে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে নৌপথে শক্তিশালী ভারতীয় রণতরী হিন্দু সাম্রাজ্য এবং উপনিবেশ স্থাপনে সক্ষম হয়েছিল যার সাক্ষ্য আজও ইতিহাস বহন করে চলেছে। মালয়, ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, লাওস প্রভৃতি দেশে হিন্দুসভ্যতা, হিন্দু শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা প্রভৃতির নিদর্শন প্রাচীন ভারতীয়দের ঐসব দেশে প্রভাব বিস্তারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই প্রভাব বিস্তার সম্ভব হয়েছিল উপনিবেশ স্থাপনের মধ্য দিয়ে এবং উপনিবেশ স্থাপনও সমুদ্রপথে সম্ভবপর হয়েছিল, স্থলপথে নয়। কাজেই সমুদ্রপথে যে দেশ দূরদূরান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, সে দেশের নৌশক্তি যে এক সময় সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল একথা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে যে মেক্সিকোর সভ্যতা কি প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সভ্যতার বংশধর? মেক্সিকোতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে যে বিগ্রহগুলি পাওয়া যায় হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে তার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তবে কি প্রাচীন যুগের ভারতীয়রা জাপান অতিক্রম করে প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে বেরিং প্রণালী হয়ে মেক্সিকো পর্যন্ত সভ্যতা বিস্তার করেছিল? এই প্রশ্নের জবাব ভবিষ্যতে ইতিহাস আমাদের সামনে তুলে ধরবে।

—নয়—

সকলে চুপ।

দু-তিন মিনিট কারো মুখে কথা নেই। মনে মনে কেউ এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিরণ, হিরণ, বিনিত এমন কি মনোরমা পর্যন্ত। বাণীব্রতও ভাবতে পারেন নি তার বড় ছেলে মিলু এতদিন পরে ইঞ্জিনীয়ারের চাকরি নিয়ে আমেরিকায় পাড়ি দেবে। ইদানীং বাণীব্রত অবশ্য ওর কথা তেমন চিন্তা করতেন না। কত জিনিস নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন? ভাবনা চিন্তার তো শেষ নেই। বর্ষার গাছগাছালির মত কেবল গজাচ্ছে। এক একটা এমন বেড়ে ওঠে, যে অন্যগুলো তার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। মিলনের ব্যাপারটাও তেমনি। ছেলে যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বেরিয়ে এল, তখন বাণীব্রত দিনরাত ওর কথা ভাবতেন। কবে মিলন চাকরি পাচ্ছে, এই ছিল চিন্তা। প্রথম প্রথম উৎসাহ করে মিলন চাকরির দরখাস্ত পাঠাত। ইন্টারভ্যু দিয়ে বাড়িতে ফিরে সাড়ম্বরে গল্প-টল্প করত। চাকরিটা সে নির্ঘাত পাচ্ছে, এমনি একটা ভাব। ছেলেটার মুখে তখন হাসি লেগে থাকত। ভোরবেলার তাজা ফুল-টুলের মত সুন্দর হাসি। তারপর প্রায় দু-বছর ধরে মিলন বেকার হয়ে রইল। কত চেষ্টা, ইন্টারভ্যু। তবু ইঞ্জিনিয়রের চাকরি আর জুটল না। শেষে এই কেরানীর পোস্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা একদিন বাড়িতে এল। চিঠির কথা শুনে বাণীব্রতর সেদিন ভাল লাগেনি, তার মিলু, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ-করা ছেলে মিলন শেষে একটা সাধারণ কেরানী হতে চলল, মিলন চাকরি পেয়েছে একথা কতদিন অফিসে বন্ধুবান্ধবদের কাছে বলতে পারেন নি। সেই ছেলে এতদিন পরে ইঞ্জিনয়রের চাকরি নিয়ে বিদেশে যাচ্ছে। কথাটা শুনে বাণীব্রতর মনে কেমন একটা অদ্ভুত ভাব। দুঃখ-আনন্দ মিশ্রিত এক বিচিত্র উত্তেজনা।

প্রথমে বিনিতই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল। প্রায় নাচের ভঙ্গিমায় এক পাক ঘুরে সে সহর্ষে বলে উঠল,—'উঃ! আমার কি আনন্দ হচ্ছে। সত্যি, তুমি আমেরিকায় যাচ্ছ বড়দা?'

মনোরমা ছেলের মুখের দিকে চুপ করে তাকিয়ে ছিল। মিলুকে আজ তার নতুন লাগছে, কতদিন যেন ওর মুখের দিকে ভালো করে তাকায় নি মনোরমা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর চোখের দৃষ্টি, কপালের রেখা, চিবুকের দৃঢ়ভঙ্গি ঠোঁটের হাসি কিছুই লক্ষ্য করে নি। অত বড় ছেলেকে এখনও ঠিক শিশুর মত ভাবে মনোরমা, আর তাই বা মনে করবে না কেন? মিলুর মুখের দিকে তাকালেই আজও তার প্রথম মাতৃত্বের সেই দিনগুলির কথা মনে পড়ে। সে মা হতে চলেছে জানাজানি হবার পর দেহে মনে কি আশ্চর্য উত্তেজনা। স্বামী স্ত্রী দুজনে এই নিয়ে কত কথাবার্তা। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে গল্প। ছেলে হবার আগেই ওর কি নাম রাখবে তাই নিয়ে মনোরমা ব্যস্ত হয়ে উঠল।

বাণীব্রত হেসে বলতেন,—রাম জন্মাবার আগেই সাতকান্ড রামায়ণ গাইতে চাও নাকি?'

—'আহা! আমি কি তাই বলছি?' মনোরমা চোখ ঘুরিয়ে সলজ্জ হাসল। 'আমি তো শুধু একটা নাম ঠিক করে রাখতে চাই গো।'

—'আর ছেলে না হলে?'

—'না গো না,' স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে মনোরমা উত্তর দিত, আমি জানি,' সে ফিসফিস করে মৃদুস্বরে বলত,—'তুমি দেখো, ঠিক খোকা হবে আমার।' সেই মিলু। 'তার বড় ছেলে মিলন। এখন চব্বিশ বছরের এক সুপুরুষ যুবা, ছেলেবেলায় ওকে আরো সুন্দর দেখাত, তার মত ফর্সা গায়ের রং। বড় বড় চোখ। কোঁকড়ান এক মাথা চুল। সামনে তাকিয়ে মনোরমা যেন ছোট্ট মিলুকেই দেখছিল। তেড়-শু বছরের এক দামাল শিশু।...টলতে টলতে এখনই তার কোলের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বিনিতের কথা শুনে মিলন হাসল, বলল,—'কেন রে? আমি আমেরিকা যাব একথা তোর বিশ্বাস হয় না বুঝি?'

—'দূর। তা কেন? আমি বলছিলাম আমাদের ক্লাসের রঞ্জার কথা।' বিনিত মাথা দুলিয়ে জবাব দিল। ফের মায়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল,—'জানো মা, রঞ্জার বড্ড দেমাক।'

—দেমাক কেন রে বিনিতে? মনোরমা হেসে শুধোল।

—'কেন আবার? ওর দাদা যে ইংলন্ডে থাকে। কি চাকরিবাকরি করে সেখানে, তাই রঞ্জার মুখে খালি লন্ডনের গল্প মা, শুনতে শুনতে আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে গেল, আর তাই নিয়ে মেয়ের কি দেমাক, মাটিতে পা যেন পড়ে না।'

মিলন মুচকি হেসে বলল,—'তুই এবার ক্লাসে গিয়ে আমেরিকার গল্প শুরু কর। দেখবি রঞ্জার কথা আর কেউ শুনতেই চাইছে না।'

'গল্প পরে করব,' বিনিত ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'কাল ক্লাসে তোমার যাওয়ার কথাটা সকলকে জানিয়ে দিই।' একটু থেমে সে ফের শুধোল—'আচ্ছা বড়দা, যাওয়ার আগে তুমি খবরটা পেপারে ছাপাবে না?'

বিনিতটা নেহাৎ ছেলেমানুষ। ওর কথা শুনে মিলনের মজা লাগছিল। বলল,—'সে তো পরের কথা, আগে অন্য সব ব্যবস্থা করি।'

মনোরমা সব শুনে বলল,—'যাওয়ার আগে আমাকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাস মিলু, অত দূর দেশে যাবি। মায়ের পুজোর ফুল একটু সঙ্গে রাখবি বাবা।'

হিরণ এমনিতেই চাপা...সব কথাতে নিস্পৃহ, কোনো আগ্রহেই মাতে না, বাড়িতে চুপচাপ থাকে। ইদানীং আরো

বেশী স্তব্ধ হয়ে গেছে। সে হঠাৎ মুখ তুলে বলল,—'তুমি শেষ পর্যন্ত আমেরিকায় চললে বড়দা? ধনতন্ত্রের দেশে গিয়ে চাকরি করবে?'

—'ধনতন্ত্রের দেশে? তার মানে? কি বলতে চাইছিস তুই?'

হিরণ একটুও না দমে জবাব দিল,—
—'ঠিকই বলছি বড়দা, তুমি নিজেও জান, ইউনাইটেড স্টেটস একটা পুঁজিবাদী দেশ। যে দেশে পুরো সমাজব্যবস্থা পুঁজিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে, সেটা ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রি ছাড়া আর কিছু নয়।' মুখ নামিয়ে সে ফের বলল,—'ধনতন্ত্রের যে মেসিনটা সেখানে চালু তুমি তারই একটা নাটবল্টু হবে বড়দা।'

—'চুপ কর তুই,' মিলন ভাইকে ধমক দিল। 'কতকগুলো বুলি শিখেছিস শুধু। সে দেশের কতটুকু জানিস? হাজার হাজার মাইল দূরে থেকে বইয়ের দু-পাতা পড়ে একটা দেশকে জানা যায় না।'

বাণীব্রত মধ্যস্থতা করে বললেন,—'হিরুর কথায় তুই মিছিমিছি রাগ করছিস মিলু, ও তোর ছোট ভাই। এখনও স্কুলের গণ্ডী পেরোয় নি। কতটুকু জ্ঞান-বুদ্ধি,' একটু থেমে আবার ছোটছেলেকে শুধোলেন,—'তোর বড়দা কি অন্যায় কাজটা করছে হিরু? এতদিন চেষ্টাচরিত্র করেও এদেশে একটা ইঞ্জিনিয়রের চাকরি জোটাতে পারে নি। এখন ভালো কাজ নিয়ে যদি অন্য দেশে যাবার একটা সুযোগ পায়, তাহলে সেটা ছেড়ে দেওয়া কি বুদ্ধিমানের পরিচয় হবে?

কিরণ এতক্ষণ কোনো কথা বলে নি। চুপ করে শুনছিল। সে এবার মুখ উঁচু করে বলল,—'হিরুর সঙ্গে আমিও একমত বাবা, কিন্তু আমার যুক্তিটা আলাদা। শুধু চাকরি করার জন্য নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারটা আমি ঠিক সমর্থন করতে পারি না।'

মিলন ভুরু কুঁচকে মেজভাইয়ের মুখের দিকে তাকাল, 'বেশ তো, তোর বক্তব্যটা শুনি। হিরুর আপত্তি ধনতন্ত্রের দাস হতে যাচ্ছি বলে। আর তুই অখুশি, কারণ আমি বিদেশে চাকরি করতে যাচ্ছি। তাই না?'

কিরণ হেসে বলল,—'তুমি মিছিমিছি চটছ দাদা। আমার কথাটা আগে শোন, ইউনাইটেড স্টেটসে চাকরি পেলে তুমি নিশ্চয় সেখানে যাবে। আমি কিম্বা হিরু কি তোমায় যুক্তি-তর্কের জাল বিছিয়ে ধরে রাখতে পারব?'

ভাইয়ের মিষ্টি কথায় মিলন একটু নরম হল, শুধোল,—'তোর যুক্তিটা কি তাই বল দিকি?'

মাথার চুলে আলতোভাবে হাত বুলিয়ে নিয়ে কিরণ শুরু করল,—'আমার কথাটা এমনিতে সহজ, তেমন মারপ্যাঁচ কিছু নেই বলেই মনে হবে। কিন্তু এর মধ্যেও ভাবনা-চিন্তার বস্তু আছে দাদা। অবশ্য হিরুর মত আমি অত গোঁড়া নই। শুধু ধনতন্ত্রের দেশ বলেই কাউকে অস্পৃশ্য ভাবতে পারি না, আমি বলতে চাই যে তোমার মত একটি ভালো বুদ্ধিমান ছেলের কাছ থেকে তার দেশ কি লাভ করল, সেকথা কি কেউ একবারও চিন্তা করছে? তুমি হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় স্কলারশিপ পেয়েছ, ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষাতেও বেশ ভালো রেজাল্ট করেছ। কিন্তু যে দেশে তুমি জন্মেছ, যার জল-হাওয়া ফল-শস্য তোমাকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে, জীবনীশক্তি জুগিয়েছে, তার প্রতি কি তোমার কোনো কর্তব্যবোধ নেই দাদা?'

হিরুর কথার মধ্যে তীরের অগ্রভাগের মত একটা খোঁচা ছিল। সকলেই তা বুঝেছে, কিন্তু কিরণের বক্তব্যে অন্য মেজাজ, ভিন্ন সাড়া। কোথায় যেন একটা আবেদনের সুরও আছে।

বাণীব্রত শুনে বললেন,—'কিন্তু কর্তব্য-জ্ঞানটা কি শুধু তোর দাদার একার হবে, যে দেশে পড়াশুনো করে, ভালোভাবে পরীক্ষায় পাশ করে মিলুর মত ছেলে চাকরি পায় না, সে দেশের মানুষের এতখানি কর্তব্যবোধ আশা করা বোধহয় ঠিক নয় কিরণ।'

হিরু মুচকি হেসে বলল,—'এদেশে চাকরি-বাকরি এখন মগডালের রোদ্দুর বাবা। খবরের কাগজের পাতায় বিজ্ঞাপনের গায়ে মাঝে মাঝে ঝিলমিল করে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। মগডালের ছিটেফোঁটা রোদ্দুরে কারো কোনো উপকার হয় না।

মিলন ঘাড় বেঁকিয়ে ছোটভাইকে দেখছিল, সে বলল,—'হিরুটা বড় বড় কথা শিখেছে বাবা, আমার তো ওকে ভীষণ ফ্রাস্ট্রেটেড বলে মনে হয়। অথচ এই বয়সে এত হতাশার কোনো মানে হয় না।'

কিরণ বলল,—'এদেশে এখন হতাশার জোয়ার বইছে দাদা। একটা ব্যাধিও বলতে পার। কোনো কাজে উদ্যম নেই, যে কোনো প্রচেষ্টাকেই হতাশা গ্রাস করতে চায়। সবাই ভাবে, কি হবে করে? এই তো অবস্থা। আসলে জীবন সম্বন্ধে আশাবাদী হওয়াই কঠিন। আমার বক্তব্যের মধ্যে এই কথাটাই তোমাকে পরে বলতাম।'

—'কেমন করে মানুষ আশা করবে বলতে পারো?' হিরু আগের মতই ব্যঙ্গ করে কথা কইল। 'এই সমাজ-ব্যবস্থায় হতাশা অনিবার্য,—আসতে বাধ্য ঘরে ঘরে বেকারী, দারিদ্র্য, জীবন-ধারণের তিক্ত গ্লানি। দুঃখ-কষ্ট ঠিক অক্টোপাশের মত মনের রসটুকু নিংড়ে নিচ্ছে। মানুষকে নিশ্বাস ফেলার অবসর দিচ্ছে না।' একটু থেমে সে ফের শুরু করল,—'তুমি পড়াশুনো পরীক্ষা পাশের কথা বলছিলে বাবা? কিন্তু একবার ভেবে দেখ, ও দুটো কি প্রায় প্রহসনে পর্যবসিত হয়নি? আমরা কি পড়ি, কি লিখি, কেমনভাবে পাশ-টাশ করি সেকথা শুধু দেশের লোকে নয়,—এবার বিদেশের মানুষও টের পাবে।'

—'বেশ তো, তাহলে কি করতে হবে বল?'—

—'এই পুরনো পচা সমাজ-ব্যবস্থায় কিছু হবে না মেজদা, একে ঢেলে সাজানো দরকার। সবকিছু ভেঙেচুরে একটা নতুন পৃথিবী গড়তে হবে।'

কিরণ হা-হা করে হেসে উঠল, বলল,—'তোর কথাগুলো শুনতে খুব ভালো হিরু, কিন্তু কাজের বেলায় ধোপে টিকবে না। অবশ্য তোর সঙ্গে আমি একমত যে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার অনেক গলদ। সমস্ত সিস্টেমটাই কেমন গতিহীন, মন্থর, জগদ্দল পাথরের মত আমাদের বুকে প্রায় চেপে বসেছে। নিশ্চয় এর পরিবর্তন দরকার। কিন্তু পরিবর্তন মানেই কি সব কিছু ভাঙতে হবে? আমাদের যা আছে, তাকে ঘষে-মেজে রং বদলে নিলেও তো নতুন করা যায় হিরু। আমি সে কথাই বলি। দেশে দারিদ্র্য আছে ঠিকই, কিন্তু পাগলের মত সব কিছু ভাঙতে শুরু করলেই তো গরীবের মাটির সরা সোনার বাটিতে পরিণত হবে না? আমি স্বীকার করি দেশে বেকারী ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে, তার জন্য এখনই কিছু করা দরকার, চাই নতুন কাজকর্ম। চাকরি-বাকরির সুযোগ। কিন্তু সেই সুযোগ সৃষ্টি করতেও একটা সুস্থ অনুকূল পরিবেশ দরকার হিরু। ধ্বংসের আবহাওয়ায় তেমন পরিবেশ কখনও সৃষ্টি হতে পারে না।'

উত্তরে হিরু উত্তেজিতভাবে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মনোরমা তাকে প্রায় ধমকে থামিয়ে দিল। বলল,—'আঃ! চুপ কর দিকি।

কি চেঁচামেচি শুরু করেছিস তোরা। তোদের তর্কাতর্কিতে আমার যে মাথা ধরবার জোগাড় হ'ল।'

বিনিতা কোমরে হাত রেখে বলল,—'তোমার ছোট ছেলেটিকে একটু থামাও মা, তখন থেকে বড়দের সঙ্গে কেবল সমানে তর্ক করছে।'

হিরু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বোনের দিকে একনজর তাকিয়ে উঠে পড়ল। মনোরমা বিরস মুখ করে মেয়েকে বলল,—'দিলি তো ছেলেটাকে রাগিয়ে। কেন যে তুই ওর সঙ্গে অত লাগিস বাপু।'

মিলন ঈষৎ চিন্তিত ভাবে বলল,—'আচ্ছা, হিরুটা কেমন হয়ে গেছে, তাই না-রে কিরণ? কেমন বড় বড় সব কথা বলে, গম্ভীরমুখে তাকায়। দিন-রাত্তির কি এইসব চিন্তা-টিন্তা করে নাকি? অথচ বছর দেড়-দুই আগেও কি রকম ছেলেমানুষের মত কথা বলত। আমার কাছে কম আব্দার করেছে? কবে যে এতবড় হয়ে গেল, আমরা বুঝতেই পারলাম না।'

বিনিতা মুখ তুলে বলল,—'জানো বড়দা, পড়ার ঘরে অনেক রাত্তির অব্দি ছোড়দা কি-সব বই-টই পড়ে।'

মনোরমা হেসে বলল,—'তুই থাম দিকি। ওসব ওর পড়ার বই-টই হবে মিলু। অনেক রাত্তির পর্যন্ত না পড়লে হিরু কি পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে পারত?'

—'পড়ার বই নয় মা। আমি জোর করে বলতে পারি।' বিনিতা মাথা নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'একদিন ঘরে ঢুকে দেখি ছোড়দা খুব মনোযোগ দিয়ে কি একটা বই পড়ছে, আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি বইটা বন্ধ করে বালিশের নীচে রেখে দিল।'

বিনিতার কথা বলার ভঙ্গি দেখে মিলন না হেসে পারল না। সে বলল,—'তাহলে কোনো নভেল-টভেল হবে। পাছে তুই পড়তে চাস, তাই চটপট লুকিয়ে ফেলেছে।'

—'উঁহু, ব্যাপারটা অত সহজভাবে নেওয়া ঠিক হবে না দাদা', কিরণ বেশ ভারিক্কী চালে মন্তব্য করল। 'হিরু লুকিয়ে কি বই পড়ে আমাদের জানা উচিত, আজকাল রাজনীতির গন্ধ মাখানো নানা ধরণের বই বেরিয়েছে বাজারে। সাধারণতঃ লাতিন আমেরিকা কিম্বা আফ্রিকার কোনো অনগ্রসর দেশ, তার নানা সমস্যা অথবা সেই সব দেশের মুক্তি-সংগ্রামী কোনো রাজনৈতিক নেতার বৈপ্লবিক জীবনকে উপজীব্য করে এই বইগুলো লেখা হয়। হিরুর বয়সী স্কুল-কলেজের ছেলেরা এই ধরণের বই পড়তে ভীষণ ভালবাসে। অবশ্য মোহটা ঠিক কিসের, তা সঠিক বলতে পারব না। তবে মনে হয়, বইগুলোর মধ্যে যে নতুন ধরণের রাজনীতির কথা, সংগ্রামের গল্প আছে,—সেটাই ওদের এমন গভীরভাবে আকর্ষণ করে।'

বাণীব্রত মনোযোগ দিয়ে মেজছেলের কথা শুনছিলেন। তিনি হঠাৎ স্বগতোক্তির মত বললেন,—'হিরুর চাল-চলন আমারও ভাল লাগে না। কেমন কেমন মনে হয়।' ছেলের চিন্তিতভাবে কিরণকেই যেন আদেশ করলেন,—'তুই তো ইচ্ছে করলে ওর বই-পত্তরগুলো ঘেঁটে দেখলে পারিস। আজে-বাজে বই পড়ে ছেলেটা আবার না বিগড়ে যায়।'

মনের বিরক্তি আর চেপে রাখতে না পেরে মনোরমা স্পষ্ট বলল,—'তুমি থাম দিকি। ধান ভানতে শিবের গীত গাইতে শুরু করলে। ও-সব অলক্ষুণে চিন্তা ছাড়। হিরু আমার সোনার টুকরো ছেলে, ফি-বছর ক্লাসের পরীক্ষায় ফার্স্ট হচ্ছে। এমনিতেও খুব বাধ্য। কথার উপর কোনোদিন জবাব দেয় না। বিগড়ে অমনি গেলেই হল?'

বাণীব্রত বড় আর মেজ দুই ছেলেরই মুখের উপর চোখ বুলোলেন। তার স্বপক্ষে দুটো কথা ওরা নিশ্চয় মাকে বলবে। বাণী-ব্রত তাই আশা করছিলেন। কিন্তু মিলন আর কিরণ দুজনেই চুপ করে রইল। কোনো কথা বলল না।

বিনিতা গল্পের আসর ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঈষৎ ঠোঁট উল্টিয়ে কিছুটা ব্যঙ্গের সুরে বলল,—'তুমি মিছিমিছি মাকে চটিয়ে দিচ্ছ বাবা। ছোড়দার নিন্দে মা একটুও সইতে পারে না। কেন ওসব কথা বলছ?'

মনোরমা ভুরু কুঁচকে বিনিতার মুখের দিকে তাকাল। এতবড় ধিঙ্গি মেয়ে, কিন্তু দিন দিন কথাবার্তার কি ছিরি হচ্ছে। গুরু-জনদের পর্যন্ত এতটুকু সমীহ করে না। বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ির লোক বেহায়াপনা দেখলে কি ছেড়ে কথা কইবে? বলবে, মা-বাপের কাছ থেকেই এমনি শিক্ষা পেয়েছে

মায়ের চোখের সামনে বিনিতা আর দাঁড়াল না। সে চলে যেতে মনোরমা শুধোল, —'বিদেশের এই ভালো চাকরিটার খবর তোকে কে দিল রে মিলু? নিশ্চয় তোর জন্য কেউ চেষ্টা করেছে?'

—'বারে! চেষ্টা করেছে বৈকি।' মিলন একগাল হাসল। 'নইলে অত দূরে দেশের চাকরির খবর কেমন করে পাব মা? এখানে বসে তাই কি সম্ভব?'

বাণীব্রত কৌতূহল প্রকাশ করে বললেন, —'যোগাযোগটা তাহলে কে করল? তোর কোনো বন্ধু? কই তার নাম বললি না তো?'

—'নাম বললেন তুমি ওকে চিনবে না বাবা। স্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়তাম। তারপর ও অবশ্য এখান থেকে চলে গিয়ে-ছিল। ক' বছর বিলেতে পড়াশুনো করেছে। এখন একটা বড় কোম্পানীর কলকাতা ব্র্যাঞ্চের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।'

—'ওহো! বুঝতে পেরেছি।' মনোরমা মুখ উজ্জ্বল করে বলল, 'ওর নাম তো অপরেশ। তুই একদিন ছেলেটির কথা আমার কাছে গল্প করেছিস। তা, সে তো মস্ত চাকরে। মাস গেলে দেড় হাজার টাকা মাইনে পায়। তাই না রে মিলু?'

—'ঠিক ধরেছ মা।' মিলন তারিফ করার ভঙ্গিতে বলল, 'তোমার দেখছি সব কথা মনে থাকে। কিচ্ছুটি ভোল না।'

মনোরমার মনের বিরক্তি কখন ধুয়ে মুছে গেছে। সে খুশির সঙ্গে বলল,—

ছেলেটি বড় ভালো। নইলে ধ্য [illegible]। কে কার কথা মনে রাখে? [illegible] শ্বশুরের বন্ধুর [illegible] কথা [illegible] বল?'

মিলন বলল,—'[illegible] যোগাযোগটা অবশ্য অপরেশ করেনি, ওরই এক মাসতুতো ভাই স্টেটসে থাকে। তার স্ত্রী আমেরিকান মেয়ে, সত্যি কথা বলতে কি, চাকরিটা সেই ভদ্রমহিলার রেকমেণ্ডেশনেই জন্যই হচ্ছে।'

ব্যাপারটা এতক্ষণে মনোরমার কাছে পরিষ্কার হল। অপরেশ তার মাসতুতো ভাইকে মিলুর কথা লিখেছিল। আর সেই সূত্রেই মিলু চাকরিটা পাচ্ছে। নইলে কলকাতায় বসে আর এক মহাদেশের কোনো শহরে চাকরি পাওয়া কি সম্ভব? এ তো প্রায় লটারি প্রাপ্তির মত অবিশ্বাস্য ঘটনা।

—'অনেকদিন ধরেই কথাটা বলব ভাবছি মিলু।' মনোরমা প্রস্তাব করার আগে যথা-নীতি ভূমিকা করল। 'অপরেশকে একদিন আমাদের বাড়িতে নিয়ে আয়। এই ধর, কোনো ছুটির দিনে দুপুরে ওকে খেতে বলবিই কিম্বা রাত্তিরবেলায়,—তোর যেমন ইচ্ছে।'

—'অপরেশকে একদিন নেমন্তন্ন করতে বলছ?'

—'হ্যাঁ, তাই তো করা উচিত।' মনোরমা সহাস্যে তাকাল। 'ছেলেটা তোর জন্যে এত করছে। তাই আমাদেরও তো কিছু করা দরকার। ওকে একদিন বাড়িতে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আয় মিলু, কেমন?'

প্রস্তাবটা মিলনের মনে ধরল। সত্যিই তো, অপরেশের কাছে সে নানাভাবে ঋণী, আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এমনি একটা উপায় ছাড়া অন্য কি পথ আছে? কিন্তু অপরেশ কি তার কথায় রাজি হবে? বাড়িতে নেমন্তন্ন খাওয়ার ব্যাপারে ওর একটুও উৎসাহ আছে বলে মনে হয় না। অপরেশ যেখানে যেতে চায়, মিলন তার খবর রাখে। বিকেলের খেলার মাঠের মত হোটেল, বার আর রেস্তোরাগুলি বেলা পড়ে এলেই ওকে হাত-ছানি দিয়ে ডাকে। এই তো আজই সে তাকে ফোনে বলছিল,—'আমেরিকা যাওয়ার আগে আমাকে একদিন মাল খাওয়াবি না মিলন? উঁহু, জিন, হুইস্কি কিম্বা ব্র্যান্ডি নয়। শ্যাম্পেন,—ভালো শ্যাম্পেন খাওয়াতে হবে কিন্তু।'

অবশ্যই মাকে এসব কথা বলা যায় না। তাই অবশ্য সে বলল,—'বেশ তো মা। অপরেশকে একদিন কথাটা বলি। যদি আসতে রাজি হয়, তখন তোমাকে জানাব।'

—'আহা! রাজি হবে না কেন? তুই একটু জোর করবি মিলু।' মনোরমা চোখ ঘুরিয়ে একবার কিরণের মুখের দিকে তাকাল। ফের বলল,—'আজকে ছেলে, এ বাড়িতে কোনোদিন আসেনি। হঠাৎ নেমন্তন্ন করলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা তো করবেই।' স্নেহে-মমতায় মনোরমা যেন অকস্মাৎ ছেলের বন্ধুর উপর গদগদ হয়ে উঠল।

• • •

পরদিন শনিবার। সন্ধ্যের মুখে সিনেমা হল থেকে দুজনে বেরোল। এলিটে কি একটা ইংরেজী বই চলছিল। মিলনের খুব সিনেমার নেশা। শনিবার ম্যাটিনী শোতে সিনেমা দেখবার জন্য চৌরঙ্গীপাড়ায় সে নিয়মিত আগন্তুক। এই বইটা অপরেশকে দেখাবে বলে মিলন আগে থেকেই দুখানা ভালো টিকিট সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু ছবিটা মোটেই যাচ্ছে। দুজনের কারো ভালো লাগে নি।

রাস্তায় নেমে অপরেশ বিরক্তিতে ফেটে পড়ল। ঘাড়ের পেশীতে, কানের পাশের রগে, মাথার চুলে আঙুল ঘষে ম্যাসাজ করল। বলল,—'ধুত্তোর!' একেবারে রটন জিনিস। মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে। চল একটু পার্ক স্ট্রীটে ঘুরে যাই।'

এই ঘনায়মান সন্ধ্যায় পার্ক স্ট্রীটে যাওয়া মানেই অপরেশ ড্রিঙ্ক করবে। কোনো বার অ্যান্ড রেস্তোরায়, যেখানে বিলিতি বাজনার সিমফনী ঘরের মধ্যে এক বিচিত্র মায়াজাল রচনা করে। সেখানে ঢুকে এক বোতল বিয়ার কিম্বা এক পেগ হুইস্কি নিয়ে সে বসবে। এবং বন্ধুকে সঙ্গ দেবার জন্য মিলনকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু-এক ঢোক গিলতে হবে। কারণ সত্যিই মদ সে খেতে চায় না। তার কেমন বিস্বাদ মনে হয়। একটুও ভালো লাগে না।

নিথ্যা চেষ্টা। তবু বন্ধুকে নিবৃত্ত করার জন্য মিলন বলল,—'কেন, আবার পার্ক স্ট্রীটে যাবি?' খামোকা কতকগুলো টাকা গচ্চা যাবে।'

অপরেশ শুনল না। সে বলল,—'থাক গে। তুই আয় তো আমার সঙ্গে।' তার হাত ধরে অপরেশ প্রায় আকর্ষণ করল।

• • •

সমস্ত ঘরটায় এখন উদ্দাম আসর। সিগারেটের ধোঁয়ায় বাতাস ভারী। চোখ দুটো কেমন জ্বালা করে। প্রায় বিশ-পঁচিশ জন ছেলেমেয়ে খানিকটা দূরে একসঙ্গে নাচছে। বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি। কোমর দুলিয়ে, হাত নেড়ে, উর্ধ্বাঙ্গ সঞ্চালন করে ওরা টুইস্ট, গোগো, শেক, অথবা রাম্বা নাচে মত্ত। বাদ্যযন্ত্রে হালকা বাজনার সুর। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে একজন গাইছে।—

লাভ লাভ মি ডু
আই লো, আই লাভ য়ু—
আই উইল অলওয়েজ বি টু্
সো প্লীজ লাভ মি ডু।

অপরেশ বলল,—'এটা জ্যাক সেসন। সাধারণতঃ টিন-এজাররা এই সময় আসে। নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড় করে। অবশ্য ওরা এখুনি চলে যাবে। সাড়ে ছটার পর দেখবি হল খালি হয়ে গেছে।'

মিলন কমবয়সী ছেলেমেয়েদের দেখ-ছিল। কত বয়স হবে ওদের? পনের ষোল থেকে বড়জোর কুড়ি পর্যন্ত। ফড়িঙের মত চঞ্চল মন, যেন মহানন্দে ঘাসে ঘাসে উড়ে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ একটি মেয়ের দিকে নজর পড়তেই সে প্রায় ভূত দেখার মত চমকে উঠল। আশ্চর্য! বিনিতা না? একটি ছেলের সঙ্গে তালে তাল রেখে সে নাচছে। কিন্তু তাই কি সম্ভব? বিনিতা এখানে কেমন করে আসবে? [illegible] চোখের সামনে দেখেও তার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না।

অপরেশ মৃদু হেসে বলল,—'কি দেখছিস অমন করে? মেয়েটির [illegible] ভারী সুন্দর। কেমন নরম কোমল, আর কি নাইস পা। তাই না রে?'

ঠিক বোবা-ধরা মানুষের মত মিলনের মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বের হল। মাথার ভিতরটা কেমন ঝিম-ধরা [illegible] ভোঁতা। কানের পাশের রগ দুটি ঈষৎ গরম। তার সামনে বিনিতা এখনও নাচছে। উদ্ভিন্নযৌবনা কমনীয় তনু। ক্ষীণ কটি সাপিনীর মত সামনে পিছনে ফিরছে। আর অপরেশ? এতক্ষণ সে বিনিতার যৌবন-পুষ্ট দেহটাকেই দু চোখ দিয়ে গিলছিল নাকি? আবার তাকেও কিনা নিজের দলে টানতে চায়? ছিঃ—।

অবশ্য অপরেশের কথাই সত্যি। সাড়ে ছটা বাজতেই নাচ-গান থামল।

সেই ফর্সা সুন্দর মত ছেলেটা বিনিতার কটিদেশ প্রায় বেষ্টন করে আরো অনেকের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

জয়ন্তীর বনে পাহাড়ে

অঞ্জন রায়

যে কোন মিষ্টি মেয়ের মিষ্টি নাম হতে পারে জয়ন্তী! তরাই-এর ঘনসবুজ শালবন, মসৃণধূসর পাহাড় আর নির্জন প্রকৃতির সঙ্গে অনর্গল-কথা-বলা কুলকুল ঝরনার মাঝে আছে যে জনপদ জয়ন্তী—তার সত্ত্বাও বোধ হয় নারী! ঐ আকাশ-ছোঁয়া ঢেউখেলানো পাহাড়গুলি যদি তার দেহসৌষ্ঠব হয়, তবে সবুজ বনের সারি নিশ্চয়ই অঙ্গাভরণ! আর সবুজে জমিতে ঝকঝকে রূপালী পাড় হল পূব-প্রান্তের ঝর্ণাটি!

পকৃতি যে কী অপরূপ রূপসী তার পরিচয় কদাচিত পেয়েছি। যে রাতে অন্ধকার রেলস্টেশনে নেমে ঝরণার তীরে উঁচু টিলের ওপর সাজানো বাংলোটায় গিয়ে উঠেছিলাম—তখন জানতুম না যে পরদিন সকালে দরজা খুলেই এমন অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়বো। পাহাড়ের পেছন থেকে তখনও সূর্য ওঠেনি। আকাশটা লালচে। গাঢ়-নীল রঙের পাহাড়, সর্বাঙ্গে বড় বড় গাছপালার আস্তরণ। জংগলটা ক্রমশঃ নেমে নেমে ঝরনার ধারে এসে থেমে গেছে। বোধ হয় তন্বীর যৌবন তাপসী অপর্ণাকে ছন্দে ছন্দে বয়ে যেতে দিয়ে। বারান্দার নীচে সবুজ ঘাস ছাঁটা ছাঁটা। ছোট্ট ফুলের বাগান, বাঁ দিকে একটা কাঁঠাল গাছ—নীচে বসবার বেঞ্চ সাদা রঙ করা। তখন শরৎ কাল। ঝরা শেফালীর গন্ধ ওই ভিজে শীতল হাওয়াতেও ভাসছিল। বারান্দায় একা মূঢ় আমি দাঁড়িয়ে—দেখছিলাম চুরি করে প্রকৃতির ঘোমটা-খোলা-রূপ, ভাবছিলাম—এমন লগন যেন বয়ে না যায়।

অর্থাৎ প্রথম দর্শনেই জয়ন্তীকে আমার ভাল লেগে গিয়েছিল।

জয়ন্তীর 'এসপ্লানেড'—রেল স্টেশনের কাছের মোড়টিতে এসেই চেংটুয়াকে পাওয়া গেল। স্থানীয় ছেলে, আমাদের সাইট-সিইং করাতে ও গাইড হতে রাজি। বকা করতেও কোন অসুবিধা হল না। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। লক্ষ্য—মাইল আড়াই দূরে একটা পাহাড়ের চূড়োয় মজে যাওয়া আগ্নেয়গিরির মুখে বৃষ্টির জল-জমা হ্রদ—'পুখরি পাহাড়' দেখতে।

জয়ন্তীর লোকালয় থেকে উত্তরমুখি হাঁটতে শুরু করলাম রেললাইন ধরে। চেংটুয়া বললে, এই রেললাইন গিয়েছে পাহাড়ের বুকে 'হাওদা' নামক একটি জায়গা পর্যন্ত। ওখানে পাহাড়ের গা-বেয়ে নামা একটা ঝরণাকে চৌবাচ্চার মধ্যে আটকে দেওয়া হয়েছে। আর স্রোতটা যে দিক থেকে নামছে তার উল্টো মুখে চৌবাচ্চার দেওয়ালে ফুটো করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রায় ১৮ ইঞ্চি পুরু জলের পাইপ। জলটা তোড়ে পাইপের মধ্যে ঢুকে হু-হু করে চলে আসে জয়ন্তীতে উঁচু মজবুত ট্যাংকের মধ্যে। জয়ন্তীর পানীয় জলের স্থায়ী ব্যবস্থা ওইটিই।

আমাদের অবশ্য হাওদা পর্যন্ত যেতে হল না। মাইলটাক হেঁটে একটা ভুটিয়াদের বস্তীর মধ্যে দিয়ে বাঁ দিকে অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম দিকে ঘুরে ঢুকে পড়তে হল গহন বনের ভেতর। বিরাট বিরাট গাছ: ভেতরটা অপেক্ষাকৃত হালকা। সূর্যিমামা গাছের ডাল-পালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রাস্তা নেই। ছোট ছোট ডাল-পালা ঝোপ-ঝাড় ঠেলে এগুতে ভয় ভয় করছিল। চেংটুয়া জানালে, 'এ অঞ্চলে হিংস্র বুনো কুকুর আছে। কাবুকে সঙ্গে আনলে ভাল হত।' কাবু ফরেস্ট-গার্ড। ভুটিয়া ছেলে। ওর একটা এক-নলা বন্দুক আছে। পরে অবশ্য সুস্বাস্থ্যের অধিকারী সদালাপী এই যুবকটির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। যাই হোক, ওই রকম গহন বনের ভেতর কোন হিংস্র প্রাণীর অবস্থিতি শোনা প্রীতি-প্রদ নয়। মনের উদ্বেগ মনেই চেপে রেখে চেংটুয়ার খুব কাছাকাছি ঘেঁসে হাঁটতে লাগলাম। কিছুই হল না। পর পর কয়েকটা টিলে বেয়ে, সেগুন বনের ভেতর দিয়ে যখন

চূড়োয় পৌঁছুলাম ঢুকবার শক্তি তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। চেণ্টুয়ার জল কাঁধ-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এসে পৌঁছ। আকস্মিক [illegible]। গান [illegible] একটা [illegible] কণ্ঠ [illegible] [illegible] নাগাড়ে [illegible]। আমাকে [illegible]—...তুমি আমি আজ [illegible] চলে যাই [illegible] [illegible]...—গান? বাংলা গান! এখানে! এই পাহাড়ের চূড়োয়! চেণ্টুয়া বললে—স্বামীজির আছেন। বিস্ময়ের ঘোর কাটলো পরিচয় হলে। প্রায় সকলেই আত্মীয়। কেউ কলেজের কর্মী, কেউ ডলোমাইট ব্যবসায়ীর, কেউ প্রধান শিক্ষকের ছেলে। [illegible] অবস্থা ব্যক্তিরা ছিলেন।

চূড়ো হয়ে আবার ঘুরে ঘুরে। মনোহর দাস [illegible] বড় লম্বায়, তবে তিনের মাত্র আকৃতি। আর প্রায়ই জল থাকে। মাছও প্রচুর। তারা বললে—এই হ্রদের জলে 'দেও' আছে। পূর্ণিমার রাতে এক সোনালী রাজ-হাঁস [illegible] বেড়ায় পূর্ণিমায় হ্রদের জলে। তাই এর জলে মাছ মারা নিষেধ। [illegible] [illegible] ভয়াবহ! চেণ্টুয়া দেখালে একটি পাহাড়ের নীচে উঁচু পাথরে বাঁধানো বেদীতে ত্রিশূলের মাথা [illegible] পোঁতা আছে। কারা যেন ফুলও দিয়ে গিয়েছে।

পাকদণ্ডীর মত ছড়াছড়ি অবশ্য জয়ন্তীতে নেই। পথে ঝরনার ওপর একটা [illegible] ইস্পাতের পুল আছে। কবে কোন বড়দিনে এক ইংরাজ চা-কর জীপ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাঁর পেট-কাটা প্রতি-মূর্তি নাকি মাঝে মাঝে বার হয় ওই পুলের নীচ থেকে। যাই হোক, পুলটা কিন্তু চমৎকার। এর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে উত্তরে তাকালে দেখা যাবে পাহাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা কি অপরূপ গতিময় ঝরনাটির রূপ! দক্ষিণে বনের বুক ফুঁড়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে দৃষ্টির বাইরে। যে বাংলোয় আমাদের উঠতে হয়েছিল সেখান থেকেও দেখা যায় গোটা পুলটিকে আড়া-আড়িভাবে—ভারী চমৎকার দেখতে।

পরদিন সকাল সকাল বেরুতে হল মহাকাল বাবার মন্দিরের উদ্দেশে। সেই পূর্বের পাহাড়ের পথেই কিছুটা গিয়ে, সোজা হেঁটে হাওদার পাশ দিয়ে উত্তর-মুখে। ঝরনার পথ অর্থাৎ উপত্যকাই হল মহাকালের পথ। কখনও ঝরনার এপার, কখনও ওপার দিয়ে হেঁটে চলতে হল। বার বার ঝরনা পার হতে হল কাঠের নড়বড়ে সাঁকো বেয়ে। এভাবে বহুবার ঝরণা পারা-পার করে, কখনও বা পাহাড় বেয়ে বেয়ে একটা প্রচণ্ড নির্জন স্থানে এসে পৌঁছলাম। দুটো পাহাড় খুব কাছাকাছি। ফাটলের মত দেখতে। ঝরনাটার আকারও এখানে ভয়ানক। ঠাণ্ডা বরফের মত জল। ঠাণ্ডা হাওয়া। ঝরনার বুকে বড় বড় পাথরের ছড়াছড়ি। স্রোতের ধাক্কায় প্রচণ্ড শব্দ—গুঁড়ি গুঁড়ি জল উঠছে ছলকে ছলকে। চেণ্টুয়া বললে আমরা অনেকক্ষণ ভুটানের সীমানার ভিতরে ঢুকে পড়েছি। আর মহাকালের মন্দির আর কিছুটা পাহাড়টার চূড়োয় আছে। আজ উঠতে হবে খাড়াভাবে।

আমাদের অভিযানের শেষ পর্ব শুরু হল। এবার শুধুই চড়াই। যেখানে রাস্তা তৈরী করা সম্ভব হয়নি সেখানে আছে লোহার মই আর শিকল। অন্ততঃ বার তিন-চার এই ব্যবস্থা চোখে পড়লো। রাস্তাটা সরু। একদিকে পাহাড়ের দেয়াল, অন্যদিকে খাড়া গভীর ঢাল। উঠতে উঠতে পরিশ্রান্ত হয়ে বহুবার বিশ্রাম নিতে হল। এভাবে একবার বিশ্রাম করতে করতে মনে হল যেন বাদ্যযন্ত্রের ঝংকার শুনতে পেলাম। চেণ্টুয়া বললে—বোধ হয় মধুবাবা বাজাচ্ছেন একটু পরে যখন মন্দিরের ঠিক নীচে বিশ্রাম ঘরের বারান্দায় অবসন্ন দেহটাকে এলিয়ে দিলাম—ঘরের ভেতর থেকে হারমোনিয়মের ঝংকারের সঙ্গে সুরে সুরে ভেসে আসছিল একটি গানের কলি 'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে!' এই এতদূরে নির্জন পাহাড়ের চূড়োয় কে ভারত-কল্যাণ প্রার্থনা করছেন? চেণ্টুয়াকে দেখে বেরিয়ে এলেন বৃদ্ধ সাধক মধুবাবা। শীর্ণ, গেরুয়া-বসন, চোখে পুরু চশমা। এই সাধু আগে রাজাভাতখাওয়া ও দমনপুরের মধ্যে মৌচাক ভরা একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে থাকতেন। সেখান থেকেই তাঁর পরিচিতি মধুবাবা নামে। তাঁর কুটিরটি বুনো হাতির দল উল্টে দিলে তিনি জয়ন্তীতে চলে আসেন এবং মহাকাল মন্দিরের পূজারীর পদ গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে গেলাম মহাকাল বাবার মন্দিরের ভেতর। পাহাড়ের গায়ে একসঙ্গে অনেকগুলি গুহা। কাঠ, লোহা, শিকল, মই দিয়ে ঝোলানো বারান্দা তৈরী করে পরস্পরকে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। গুহাগুলির প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা দেবদেবীর নামে। কোনটি মা-কালীর, কোনটি পাগলা বাবার, তবে মূল গুহাটি হল মহাকাল বাবার। লম্বা হয়ে কনুই দিয়ে হেঁটে গুহাটির ভিতর ঢুকে গেলাম। মসৃণ পাথর। চোট লাগল না একটুও। ভেতরে জন পাঁচ-ছয় লোক এক-সঙ্গে বসতে পারে। মধুবাবা আগেই ঢুকে পড়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। দেখলাম উঁচু একটা বেদীতে কিছু গোল গোল পাথর আছে। মাঝখানে একটা ত্রিশূল। ফুল-বেলপাতা-বাতাসা; পয়সা ছড়ানো। আর ওপরের দেয়াল থেকে বড় গোল পাথরটার ওপর ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে অবিরত। মধুবাবা ঘণ্টা বাজিয়ে কিছু সংস্কৃত মন্ত্র পড়ে কপালে একটা সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিলেন। প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম গুহা থেকে। মধুবাবা সব-কটি গুহাতেই নিয়ে গেলেন। সব একইরকম দেখতে। গুহা-মন্দির থেকে বেরিয়ে নেমে এলাম নীচে বিশ্রাম ঘরে। মধুবাবা চা খাওয়ালেন। ঝরঝরে মার্জিত বাংলায় কথা বলেন এই সাধু। পরে চেণ্টুয়া বলেছিল প্রথম জীবনে ইনি নাকি অধ্যাপক ছিলেন। মন্দির থেকে ফিরে আসতে আসতে চেণ্টুয়া বললে, শিবরাত্রিতে মহাকাল মন্দিরে পূজো দিতে তামাম তরাই-এর লোক আসে। মেলাও হয় এখানে।

পরদিন বেলায় পুল পেরিয়ে উত্তর-পূর্বে কালীখোলার উপত্যকায়। কালীখোলা ঝরনার অনবাহিকাই পথ হল আমাদের। মখমলের মত সবুজ কার্পেটে মোড়া ছোট ছোট টিলা। চেণ্টুয়া দেখালে কত অগণিত অর্কিডের সমারোহ। কেবল গাছপালাও ছড়িয়ে আছে প্রচুর। দেখলাম তরতর করে জলের পাথরের নীচে চলে গেল সুন্দর পাহাড়ী কচ্ছপ। দূরে থেকে ভীরু ভীরু চোখে চেয়ে সরু সরু পাগুলি ছুঁড়ে ফেলে জঙ্গলে সেঁধিয়ে গেল সুন্দর বার্কিং ডিয়ার। চেণ্টুয়া বললে, জয়ন্তীর বাবুদের (ডলোমাইট বা কাঠ ব্যবসায়ী; রেল অথবা বন বিভাগে কর্মরত বাঙালীদের) ছেলে-মেয়েরা, যারা বাইরে পড়াশুনো করে, ছুটিছাটায় এসে পিকনিক করতে আসে এই উপত্যকায়।

জয়ন্তীতে চুনের কারখানা দেখলাম। পরিচয় হল ডলোমাইট ও লাইমস্টোন ব্যবসায়ী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি জানালেন, জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরতম প্রান্তের এই অঞ্চলটিতে যে ডলোমাইট আছে উৎকৃষ্টতায় তা ভারতশ্রেষ্ঠ। নব-ভারতের ইস্পাত কারখানাগুলির চাহিদা মেটাতে তাঁদের প্রাণান্ত। এই ভদ্রলোকের দেওয়া জীপেই ঘুরে এলাম রায়ডাক নদী-বিধৌত ভুটান ঘাট, বক্সাদুয়ারের ঐতিহাসিক পাথরের দুর্গ, ভুটানী শহর ফুন্টশোলিং, আর চিলাপাতা অরণ্যের গভীরে প্রাগৈতিহাসিক নল-রাজার গড়ের ধ্বংসাবশেষ। দেখা হল না, জলদাপাড়ার অভয়ারণ্য, আর পুবে কালীখোলার ভুটানী মেলা পৌষের।

আলিপুরদুয়ার থেকে হাওড়ার ট্রেন কামরূপ এক্সপ্রেস। জয়ন্তীর ছোট্ট স্টেশনে যেদিন আলিপুরদুয়ারগামী ট্রেনে উঠি চেণ্টুয়ার বাবা বাবুলালজী তাঁর দোকানের রসগোল্লা না খাইয়ে ছাড়লেন না। ট্রেন ছাড়লে এক এক করে জয়ন্তীর লোকালয়, চুনের কারখানা, আউটার সিগন্যাল-পোস্ট সব ছাড়িয়ে গহন বন এসে গেল। ঝাঁকুনিরত কামরার এক কোণে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমি বসে। বাইরের শালবনের শাখা-প্রশাখাগুলি হাওয়ায় দুলছিল। মনে হল, বুঝিবা বোবা সৌন্দর্য হাতছানি দিয়ে ডাকছে! ফিরে আসতে বলছে! বুকটা হুহু করে উঠলো। ইচ্ছে হল বলি, আমি কি তোমাদের কাছে না ফিরে এসে পারি? আমার বুকের সবটুকু ভালবাসা আমি যে জয়ন্তীকে দিয়ে এসেছি।

বুকের শব্দটা বড্ড বেশী দ্রুত হয়ে উঠছে। নিজের কানে নিজে শুনছেন কৌশিকী। নিশ্বাসে ঝড় বইছে আগুনের হলকা। যে আসছেন, সে শত বাধা পেলেও আসবে। এক নিমিষে নিঃশেষ করে ফেলবেন ওকে? ওর প্রাণটুকু তার হাতের মুঠোয়। অন্তত আজকের রাতটায়। দলে-পিষে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

পায়চারি করতে করতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ঘরের মাঝখানে। ঘর গরম রাখার জন্য চারকোণে আগুন জ্বলছে। চৌকো-চ্যাপ্টা অষ্টধাতুর উনুন চারটে। কিরকম কিরকম ঠেকছে আগুনের রং, আগুনের শিখা। জ্বলার ধরনটাও। চারকোণেই এক দৃশ্য। চারটের শিখা একসঙ্গে মিলে শতসহস্র হয়ে উঠতে চাইছে যেন। গোটা ঘরখানাকে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। তার আগে সাজানো পালঙ্কটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার তাক খুঁজছে। এই পালঙ্কেই বসবে এসে সে।

তার মুখের কথা শুনে কৌশিকীর দু'-কানের পরদা ফেটে যায়নি কেন তখন? বধির হয়ে যাননি কেন? যে দু'চোখে তাকিয়ে-ছিলেন, সে দু'চোখ অন্ধ হয়ে যায়নি কেন?

যে কথা শোনা যায় না, শুনেও বলা যায় না, নিজের মনে মনে চিন্তা করাও সম্ভব নয়, সেই কথা শুনেছেন তিনি সান্ধা-

সামনে বসে। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেন নি কার মুখ দিয়ে কি শুনেছেন—পরে বার বার এক কথা শুনে বিশ্বাস করলেন। সত্যিই শুনেছেন। আর শুনেছেন তার মুখ থেকেই—যাকে অতি আপনজন ভেবেছিল—প্রাণের প্রাণ।

অবিশ্বাস্য কথা শুনেছে আকাশ শুনেছে বাতাস শুনেছে আগুন। আর শুনেছে এই ঘরখানা। বাতাস ছড়িয়েছে কাশ্মীরের অলিগলি পর্যন্ত। কেউ আর শুনতে বাকি নেই। কানে হাত চাপা দিয়ে সরে গেছে ছেলেবুড়ো। মাথায় বাজ পড়েছে মেয়েদের।

তবুও এই লোককে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া কৌশিকীর পক্ষে অসম্ভব। আর তাছাড়া উচিতও হবে না মোটে। এ গেলে কাশ্মীরের সর্বনাশ নিশ্চিত। এমন শক্তি নেই কারো যে, আফগান-তুর্কীদের আক্রমণ থেকে লুঠতরাজ থেকে রক্ষে করতে পারে কাশ্মীরকে। যে-কোন উপায়ে হোক একে বাঁচিয়ে রাখতে হবেই।

তাহলে কি নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে, বিলিয়ে দিয়ে? একা ঘরে চিৎকার করে বলে ওঠেন কৌশিকী—না, না। কিছুতেই হতে পারে না। তবে কৌশিকী কি করবেন? দুটো পথের একটাও বেছে নিতে পারছেন না। অথচ হাতে সময় নেই আর বেশী। মাঝরাত হতে দেরী নেই। বলেছে ওই সময় আসবেই। কৌশিকীকে সাজতে হবে নতুন করে। যেমন সেজেছিল এর আগে আরো দু-দুবার। একবার রিঞ্চনের বেলায়, একবার উদয়নদেবের বেলায়।

কৌশিকী এগিয়ে এলেন দেয়ালের দিকে।

বড় বড় চুনি-পান্নাবসানো দেয়ালটা চকচক করছে খুব। নজেকে দেখছেন চুনিতে—লাল রঙের কৌশিকী। দেখছেন পান্নায়—সবুজ রংয়ের।

নিরাভরণা কৌশিকীকে অভিসারিকার আসরে নামতে হবে তৃতীয়বার। কড়া হুকুম। হুকুম তামিল করবেন না তিনি। কিন্তু তাহলেও মুক্তি পাবেন কি নিজে?

কৌশিকী সরে এলেন চুনি-পান্নার আয়নার কাছ থেকে।

বসলেন পালঙ্কে। পা ঝুলিয়ে বসে আছেন।

অন্তর্কোটের রাজপ্রাসাদ কয়েদখানা মনে হচ্ছে আজ। বন্দী না হয়েও বন্দিনী দশা তাঁর। ভাগ্যের নির্মম ছলনা। অনুগত-গদগদমুখ শাহমীর আসছে রাতদুপুরে। আগেকার মনোভাব নিয়ে নয়। আসছে অন্য মূর্তি ধরে, অন্য মানুষ।

কিন্তু রিঞ্চন আসেনি তাঁর কাছে এভাবে। তিনি নিজেই গেছলেন ওর শিবিরে—প্রয়োজনের তাগিদে।

রাতে ভীষণ দুর্যোগ গেছে।

ঝড়, তার সঙ্গে বরফ-বৃষ্টি। সকালে আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। ঝকঝকে-তকতকে সোনা রঙের রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়ছে পাইন-চীরের মাথায়। রাস্তায় বরফকুচির ছড়াছড়ি। সাদা হয়ে গেছে রাস্তাটা। ঠাণ্ডা ভাবটা কাটেনি সম্পূর্ণ। একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে কৌশিকী বক্তৃতা করছেন। লোকে লোকারণ্য। সবাই যেন মন্ত্রপাঠ শুনছে। মন্ত্রশক্তি প্রত্যেকের ভেতরে একটা নতুন শক্তি সঞ্চার করছে। প্রাণে প্রাণে অনুভব করছে ওরা। কৌশিকীর কথায় ওরা জীবন দিতে প্রস্তুত। রিঞ্চনকে প্রতিরোধ করবেই। রিঞ্চন দেশের দুশমন। সমবেত কণ্ঠের প্রতিশ্রুতিতে পাহাড়-জমি কেঁপে উঠল রিঞ্চনের বুকে কাঁপুনি ধরাবে বলে।

ভিড়ের মধ্যে চীরগাছের তলায় ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে আছে রিঞ্চন। সৈন্য সামন্তদের লুকিয়ে একলা চলে এসেছে। এত সৈন্য এত অস্ত্র তবু রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠছে না কেন? এই চিন্তা অহর্নিশি তোলপাড় করেছে। রিঞ্চনের মাথায়। প্রতিদিন নতুন নতুন যুদ্ধরীতি পাল্টেছে। ফল কিছু হয়নি। নিজে হারেনি বটে, কিন্তু ওদেরও হারাতে পারে নি। রিঞ্চনের একটা দম্ভ ছিল, তার বাহুবলের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য সবাই। সে ভুল ভেঙেছে।

লোকমুখে কৌশিকীর সম্বন্ধে অনেক কথাই কানে গেছে। রামচন্দ্রের ওই মেয়েটির কথা শুনলে মানুষ নিজের সমস্ত সত্তা হারিয়ে ফেলে। কৌশিকীর প্রভাবে কৌশিকীর ইচ্ছে পূরণ করতে বাধ্য হয়। স্বয়ং শিব এসে দাঁড়ালেও রুখতে পারবে না তাকে কোনমতে। ওঁর আবেগ মেশানো কণ্ঠস্বরে সম্মোহনের যাদু।

পরখ করতে এসেছে রিঞ্চন।

চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়েছে তার। 'যা রটে, তার কিছুও বটে' প্রবাদটাও হয়ে গেছে কৌশিকীর ক্ষেত্রে। এখানে যা রটেছে, তার কিছুটা সত্যি নয়—সবটাই সত্যি।

রিঞ্চন শুনছে।

বলছেন কৌশিকী।

রাজা সুহাদেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরই আশ্রিত-স্নেহভাজন রিঞ্চন বিদ্রোহ করে, শত্রু ঢোকবার সুযোগ করে দিচ্ছে দেশে। এরাই প্রধান শত্রু দেশের। এদের ক্ষমা নেই...।

সত্যিই ঘরোয়া বিবাদের এই সুযোগে বাইরের শত্রু প্রবেশ করতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। ধ্রুব সত্য। আর একদণ্ড দেরী করেনি রিঞ্চন। তাড়াতাড়ি ফিরে গেছে তাবুতে। রিঞ্চন কৌশিকীর রূপে মুগ্ধ বক্তৃতায় মুগ্ধ। গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভেবেছে, এই মেয়ে তার অর্ধাঙ্গিনী না হলে জীবন মরুভূমি। ঘোষণা করল রিঞ্চন, কৌশিকী ইচ্ছে করলে যুদ্ধবিদ্রোহ সমস্ত বন্ধ করে দিতে পারে।

রামচন্দ্র শুনলেন। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন তিনি। স্পর্ধারও একটা সীমা আছে। অর্বাচীন-বর্বরের মুখেই একথা শোভা পায়। কাকে কি বলছে, জানে না। সুহাদেবের মন্ত্রী রামচন্দ্রের মেয়ে, রাজরক্ত গায়ে আছে যার—সুহাদেবের আপন ভাই যে উদয়নদেব, তার বাগদত্তার ওপর চোখ! মরণের পালক ওঠা তার কাকে বলে।

দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন রামচন্দ্র। —একটা সন্ধি করে নেবেন ভেবেছিলেন, সে প্রস্তাবের সমাপ্তি হয়ে গেল। মন্ত্রসাধন কি শরীর পতন। উদয়নদেবকে বসাবেনই সিংহাসনে। তারপর রিঞ্চনের বিচার। জল্লাদের তলোয়ারের ঘায়ে ধড় থেকে মাথা নেমে গড়াগড়ি খাবে কাশ্মীরের রাণীর পায়ের তলায়।

খুশী হবেন বলে জানালেন মেয়েকে। কিন্তু আশ্চর্য কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন না মেয়ের মুখেচোখে। বরং ঠোঁটের ফাঁকে যে মিষ্টি হাসির রেখা ফুটে থাকতো সদা-সর্বদা—সেটাও মিলিয়ে গেল। গম্ভীর হয়ে গেলেন কৌশিকী। বললেন, উদয়নদেব এখন কোথায়?

কিশ্তওয়ারে। থতমত খেয়ে বললেন রামচন্দ্র।

দেশ ধ্বংস হোক ক্ষতি নেই। সবাই মরে শ্মশান হয়ে যাক, ক্ষতি নেই। উনি পালিয়ে পালিয়ে প্রাণে বাঁচলেই হোল! ভীত অপদার্থ! বলে, বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে কৌশিকী।

মেয়ের হঠাৎ পরিবর্তনে হতভম্ব রামচন্দ্র। হতবাকও।

দেশের লোকের সামনে গিয়ে একবার না দাঁড়ালে মানসম্ভ্রম বজায় থাকবে কেমন করে? বধিরকে শোনালেন যেন রামচন্দ্র। উদয়নদেব কর্ণপাত করল না কথায়। নেশা পাগল উদয়নদেব নেশার পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে গান শুরু করতে আদেশ করল নর্তকীকে। ফেরানোর চেষ্টায় ছেদ পড়ল রামচন্দ্রের। একা ফিরে এলেন।

দৈবচক্র ঘুরছে। ঘুরেই চলেছে বিনা বাধায়। কৌশিকীর প্রতিরোধ এ চক্রের গতি আটকাতে পারল না।

রোজের মতন সেদিনও বক্তৃতা দিতে বেরিয়েছেন কৌশিকী। যেখানে বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল, সেখানে গিয়ে শিউরে উঠলেন। তাজা রক্তের নদী বইছে। প্রতিরোধ করতে গিয়ে যে কজন প্রাণ দিয়েছে, সবাই কিশোর। গোঁফদাড়ির রেখা ওঠেনি কেশীর ভাগেরই। কারো কারো দেখা দিচ্ছে সবে। মুখ নয়তো—যেন এক একটা দেবতার প্রসাদী ফুল!

কৌশিকীর দুচোখে জল। এ কি হচ্ছে, এ কি হল! তাঁর জন্যই তো এদের এই দশা! এরা যদি এইভাবে সব চলে যায়, তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ বলে যে কিছু থাকবে না আর। পাগলের মতন চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন কৌশিকী। —এদের কিছুতেই যেতে দেওয়া হবে না আর। আর নয়, আর নয়।

ছুটতে ছুটতে প্রাসাদে এসে হাজির হলেন।

রামচন্দ্রের ঘর। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। শলাপরামর্শ চলছে পাকা মাথাদের নিয়ে। ডানদিকে রুপোর চৌকি পাতা জরির ফুলের রেশমী চাদর বিছানো। ওখানে বসে আছে জনাচারেক বৃদ্ধ, রামচন্দ্রের সমবয়সী। বাঁদিকে সোনার চৌকিতেও একই রকমের চাদর পাতা। বসে আছেন রামচন্দ্র। গভীর চিন্তার ছাপ মুখে।

দরজাগোড়ায় প্রহরী দাঁড়িয়ে। কৌশিকী ছাড়া অন্যের প্রবেশ নিষেধ। তাই কোন বাধা দিল না কৌশিকীকে। দরজা ঠেলে প্রবেশ করল ভেতরে কৌশিকী। কান্নাভেজা গলায় বলল, রিঞ্চনের শিবিরে যাবো আমি! এ যুদ্ধ বন্ধ করতেই হবে।

চমকে উঠলেন রামচন্দ্র। বললেন, নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করে স্থির কোরো। মনে রেখো, এ যুদ্ধ বন্ধ করতে ওর শিবিরে গেলে, স্বামী হিসেবে বরণ করে নিতে হবে ওকে আগে।

কৌশিকী নিঃসংকোচে বললেন, সব জেনেই বলছি। বরণ করেই নেব আমি ওকে।

কি বলছো তুমি? উদয়নদেবের স্ত্রী না হয়ে রিঞ্চনের স্ত্রী হলে, অসতী বলবে না লোকে তোমায়? ধিক্কার দেবে না সকলে? কলংকের কালি গায়ে মেখে বেঁচে থাকতে লজ্জা করবে না?

না, না, না। ঘরোয়া বিবাদে কাশ্মীর হাতছাড়া হয়ে বিদেশীর কবলে চলে গেলে কি ভালো হবে? পরাধীন কাশ্মীরে সতী হয়ে থাকার চেয়ে স্বাধীন কাশ্মীরে অসতী হয়ে থাকাও ঢের মর্যাদার ঢের গৌরবের।

...রিঞ্চনের তাঁবুতে এসে উপস্থিত হয়েছেন কৌশিকী।

বিস্ময়ে-আনন্দে রিঞ্চনের গলা দিয়ে স্বর বেরোয়নি। চোখের পলক পড়েনি। অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। স্বপ্ন নয় তো? সত্যিই কি সৌভাগ্য এসেছে তার? রামচন্দ্রের সেই তেজী মেয়ে নিজে হতে এসেছে?

রিঞ্চন!

কৌশিকীর ডাকে চমক ভাঙল রিঞ্চনের।

তোমার কাছে আসিনি। এসেছি তোমার শক্তির কাছে মাথা নোয়াতে। যার তলোয়ার রক্ষে করতে পারবে কাশ্মীরকে। রাখতে পারবে স্বাধীন, আমি সেখানে নিজে হতে বন্দী। নিজের হাতের তলোয়ার তুলে দিলেন কৌশিকী রিঞ্চনের হাতে।

রিঞ্চনও তার তলোয়ার কৌশিকীর হাতে তুলে দিয়ে বলল, আজ থেকে তোমার হাতে আমিও বন্দী।

রিঞ্চন বেঁচেছিল মাত্র বছর আড়াই।

রিঞ্চনের বাহুর শক্তি ছিল কৌশিকী। প্রেরণা ছিল কৌশিকী, বুদ্ধি ছিল কৌশিকী। রিঞ্চনকে দিয়ে কৌশিকী শান্তি আনিয়েছিলেন দেশে। সকলের পেটে অন্ন পড়ত সকাল-সন্ধ্যে। ছেলে বুকে করে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পেরেছে মা। চাষীরা ডাকাতদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। নির্বিঘ্নে ফসল কেটে তুলেছে ঘরে ক্ষেত থেকে।

রিঞ্চন চলে যাবার পর কৌশিকীর ভয় ধরল খুব। উদয়নদেবের পেটোয়া লোকেরা ইতিমধ্যে নানা গুজব রটনা করতে শুরু করে দিয়েছে। এবারকার সিংহাসনে বসবে আগের রাজরক্ত আবার। কৌশিকীর শিশু সন্তানকে বসতে দেয়া হবে না কোনক্রমে। আবার যুদ্ধ বাধবে। উদয়নদেব আসছে।

কৌশিকী দিব্য চক্ষে দেখতে পেল যেন উদয়নদেব আসছে সত্যিসত্যিই। আগেকার দৃশ্য মনে পড়ছে। দেবশিশুদের মৃত্যু......। দুচোখে হাতচাপা দিলেন। কাঁদছেন। পাশে দাঁড়িয়েছিল শাহমীর। কেমন ... জানে। কৌশিকীর মুখে ... । বলল, মিথ্যে কল্পনা করে ভয়-ব্যথা পাওয়া। আমি তো রয়েছি।

শাহমীরকে বিশ্বাস করেন কৌশিকী। ওর ওপর ভরসা রাখেন। শাহমীর রিঞ্চনের মতনই সুহাদেবের আশ্রিত ছিল। রিঞ্চনের বন্ধুও। সাহসী, বীর—বুদ্ধিমান। কৌশিকী বললেন শাহমীরকে—এটা কল্পনায় ব্যথা পাওয়া নয় শাহমীর। সত্যিসত্যিই এবার আসবে উদয়ন।

কৌশিকীর কথা যথার্থ হয়েছে। উদয়ন এসেছে। একারে বেশ তৈরী হয়েই এসেছে। শাহমীরকে বললেন কৌশিকী, যেমন রিঞ্চনের কাছে গেছলুম আমি, সেই ভাবে যাবো আবার উদয়নদেবের কাছে। হায়দরকে দিয়ে গেলুম তোমায়। এখনও শিশু। তোমার সংস্পর্শে তোমার মতন গড়ে উঠবে ও।

প্রবল বাধা দিয়েছে শাহমীর। যেতে দেবে না।

কৌশিকী মানেননি কোন বাধা। গুরু অনন্তমহারাজের কথা মনে পড়েছে তাঁর। যেমন রিঞ্চনের কাছে যাবার সময় পড়েছিল।

চণ্ডীপাঠ করছেন গুরুদেব। হঠাৎ সেই ঘরে ঢুকে পড়েছেন কৌশিকী। শুনতে বড় ভালো লাগছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন দরজার পাশে। শুনছেন।...পার্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা, কৌশিকীতি সমস্তেষু...। কৌশিকী পার্বতীরই অন্য একটি রূপ। মোহিনী রূপ। শুম্ভ-নিশুম্ভ সেই রূপেই আকৃষ্ট হয়ে যুদ্ধে হেরেছিল। কেন জানেন না ভেতরটা আনন্দে ভরে উঠছে তাঁর।

...পাঠ শেষ হল। গুরুদেব তাকালেন। মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলে

উঠলেন, এই যে স্বয়ং মা কৌশিকী দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে।

নামটা ভেতরে গিয়ে একটা ঝংকার তুলল, আলোড়ন উঠল। একটা অদ্ভুত অনুভূতি।। কোটালেশ্বরী মনে হল, সত্যিকারের কৌশিকী তিনি। তিনি যা ঠিকই থাকবেন। তাঁর কৌশিকী রূপটা শুম্ভ-নিশুম্ভকে আকৃষ্ট করার মতন মুগ্ধ করার মতন রিঞ্চনকে আকৃষ্ট করবে মুগ্ধ করবে। এ রূপ তাঁর কাশ্মীরের রাজনীতি-যজ্ঞে আহুতি হোক। কাশ্মীর বাঁচুক।

রিঞ্চনের পালা চুকেছে কৌশিকীকে নিয়ে। এবার উদয়নদেবের পালা। কৌশিকী গেলেন শ্রীনগরের প্রাসাদে। দু'হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিলেন উদয়নদেব। রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শত্রুর মুখে বন্ধ হয়ে গেল কৌশিকীর জন্য।

তুর্কীদের আক্রমণ ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাঁর রাজা উদয়নদেব সিংহাসনে বসতে। ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছে ওরা। শাহমীরকে পাশে নিয়ে যুদ্ধ করেছেন কৌশিকী। জয়ের টিকা কপালে পরে ফিরে এসে দেখেছেন উদয়নদেব পালিয়েছে কিস্টওয়ারে। ধরে এনেছেন আবার। এই রাজাকে বসিয়ে রেখেছিলেন সিংহাসনে পনের বছর ধরে। এরপর আর ধরে রাখা যায়নি। কাল ছিনিয়ে নিয়ে গেছল।

শাহমীরকে ডেকে বললেন, হায়দর রাজা, তুমি মন্ত্রী রাজী ?
হ্যাঁ।

আমাকে ছুটি দাও। আর ভালো লাগে না আমার রাজনীতি। সন্ন্যাসিনী হয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতে চাই এবার আমি।

শাহমীরের ওপর রাজ্যের ভার ছেলের ভার দিয়ে তীর্থে গিয়েও কি শান্তি পেয়েছেন কৌশিকী ? পাননি। শাহমীরের নিজেকে রাজা বলে প্রচার করার কথা শুনে ফিরে আসতে হয়েছে তাঁকে অন্তকোটে। জবাবদিহি করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন শাহমীরকে।

বর্ষার জলে চতুর্দিক ডুবেছে। একটি মাত্র সেতু জেগে রয়েছে শুধু প্রাসাদে প্রবেশের পথে। এই সেতুর ওপর দিয়েই হায়দরকে নিয়ে প্রবেশ করল প্রাসাদে শাহমীর।

সোনার পালঙ্কে বসে আছেন কৌশিকী। অনেকদিন বাদে দেখা। দেখে আগের শ্রদ্ধা-ভক্তি বেড়ে উঠল। প্রণাম করে, বিনয়ের সুরে বলল, যা শুনেছো, মিথ্যে।

কৌশিকী হাসলেন—জানি আমি মিথ্যে। তবু তোমার মুখ থেকেই এই কথাটা শুনতে চেয়েছিলুম।

কৌশিকী চলে গেছেন তীর্থে আবার। কিন্তু অদৃষ্ট তাঁর বড় চঞ্চল। স্থির থাকতে দেবে না। দিল না। এবারে আরো সাংঘাতিক কথা শুনে এলেন অন্তকোটে। হায়দরকে কারাগারে পুরে সিংহাসনে বসেছে শাহমীর। তাঁর ছেলে কারাগারে। সংবাদ বাতাসে উড়েছে। প্রজারা ক্ষেপে উঠে লড়াই শুরু করে দিয়েছে। এত বড় অন্যায় বরদাস্ত করবে না কেউ কিছুতেই।

কৌশিকীর ডাকে এসেছে শাহমীর আবার।

সোনার পালঙ্কে হাত ধরে বসিয়েছেন পাশে কৌশিকী। বলেছেন, আমার নামে তোমরা দুজনে রাজ্য চালাবে। তুমি আর হায়দর। তোমার অর্ধেক রাজ্য আর হায়দরের অর্ধেক। রাজী ?

মন্ত্রমুগ্ধের মতন মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছে শাহমীর—রাজী।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন কৌশিকী। বেশীক্ষণ নয়, একটু পরেই নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়েছে। স্বর বন্ধ হয়ে গেছে। কে যেন গলাটা সজোরে টিপে ধরেছে। সারা শরীর থর থর করে কেঁপে উঠেছে। এ কি শুনলেন তিনি, এ কি শুনছেন তিনি ! এ কি সেই শাহমীর।

গভীর রাত।

শাহমীর আসবে এবার।

সময় খুব অল্প। এর মধ্যেই শেষ ফেলতে হবে সব কাজ। খাট থেকে নামা কৌশিকী। লাল চুনির আয়নায় দেখা একবার নিজেকে ভালো করে। মনকে রাখতে হবে। পায়চারি করছেন। তাঁর কৌশিকীর রূপ এক সময়ে আশীর্বাদ। উঠেছিল। আজ কিন্তু অভিশাপ হ দাঁড়াচ্ছে।

দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে কিছুক্ষণ বাদে হাঁপাতে হাঁপাতে ফি এলেন। বসলেন খাটে। বুকের ভেতর একদম খালি হয়ে গেছে। দুচো ছাপিয়ে উঠছে জলে। এখ ভেঙে পড়লে চলবে না। শাহমীরে সঙ্গে দেখা না হওয়া অবধি নিজেকে ঠি রাখতে হবে তাঁকে যে কোন উপায়ে।

এলো শাহমীর। দাঁড়াল কৌশিক কাছে এসে। হাসতে হাসতে দু'হাত বাড়ি দিল।

কৌশিকী চেয়ে আছেন।

কত পরিবর্তন। নিজের ছেলের সঙ্গে ওর এতটুকু তফাৎ দেখেননি কোন সময় ও-ও সেই সম্মান রেখেছে। মা বলত অজ্ঞান হয়ে পড়ত। নিয়তির কি মর্মান্তি পরিহাস। সেদিনকার সেই ছেলে বিবে হারাল সিংহাসনে বসার লোভে। রাজা নাম প্রতিষ্ঠা করে তোলার জন্য মস্ত ভুল কর বসল। বেছে নিল আগের রাজাদের পথ কৌশিকীর রূপ একেও আকৃষ্ট করল রিঞ্চন-উদয়নদেব যেভাবে পেয়েছিল, যে পাওয়া অসম্ভব এর। এ যে মা আর ছেলে বুঝল না।

বুকের আঁচলটা খসে পড়ল কৌশিকীর। কোমরে গোঁজা ছোরাটা বার করেই বসিয়ে দিল নিজের বুকে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় শাহমীর। মুহূর্তমধ্যে কি যে ঘটে গেল, বুঝে উঠতে পারল না। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। ছিটকে লাগল শাহমীরের ঠোঁটে। ঢলে পড়ল দেহটা বিছানায়। শাহমীর আছড়ে পড়ল বুকের ওপর। বুকের আওয়াজটা কথা কইছে, কথা কইছে ক্ষীণ নিশ্বাসও। শুনছে শাহমীর। নিজের ছেলেকে এই ছোরাতেই শেষ করে এসেছেন কৌশিকী। শাহমীরের কণ্টক নির্মূল। তিনিও সরে গেলেন। পথ পরিষ্কার। বড় ছেলে শাহমীর বেঁচে থাকুক ! বেঁচে থাকুক কাশ্মীর।

নিজের অগোচরেই মুখ থেকে বেরিয়ে এলো শাহমীরের—মোওজ (মা)। ঠোঁটের কাছটা নোনতা লাগছে। মায়ের বুকের দুধের স্বাদ। দু' চোখের জল ঝরে পড়ল। জলভরা চোখে নিষ্প্রাণ দেহটাকে দেখছে। মায়ের দেহ। দেহটা বড় হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। কাশ্মীরের নদী পাহাড় গাছ মাটি আকাশ জুড়ে বিশাল হয়ে উঠছে।

প্রাণবল্লভ ঘোষের জাহ্নবী মঙ্গল পুঁথির দুটি পাতা (লিপিকাল ১১৯১ সাল)

পুরাতত্ত্বের সন্ধানে

প্রণব রায়

'পুরাতত্ত্বের সন্ধানে' পর্যায়ের প্রথম লেখায় মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার চেতুয়া-রাজনগরের ভারতচন্দ্র কৃষ্টিকেন্দ্র সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করেছি। এ কৃষ্টিকেন্দ্রটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এখানে একদিকে যেমন অতি প্রাচীন বস্তু স্থান পেয়েছে, অন্যদিকে এ শতকের বিস্মৃত প্রায় কয়েকটি দুর্লভ বস্তুও সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিপ্লবী ক্ষুদিরামের মজঃফরপুরে বোমা ফেলতে যাওয়ার সময় তাঁর যে রোষদীপ্ত ছবিটি ছাপা হয়েছিল, সেটি আজ হয়তো আর দেখতে পাওয়া যাবে না। সম্প্রতি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ক্ষুদিরামের পৌরুষদৃপ্ত যে মূর্তিটি কলকাতায় স্থাপিত হয়েছে, মনে হয় মজঃফরপুরে যাওয়ার আগের পৌরুষদৃপ্ত ছবিটি তার থেকে কোন অংশে কম বলে মনে হবে না। তাই আধুনিক ভারতের এসব ছবির একটা বিশেষ মূল্য আছে। প্রাচীনত্বের দিক থেকে এটিকে নিতান্ত অর্বাচীন বলে মনে হলেও ভারতের রাজনৈতিক ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এ-ধরনের দুর্লভ ছবি অবশ্যই রক্ষণীয়।

ভারতচন্দ্র কৃষ্টিকেন্দ্রের 'ন্যায়ভূষণ পুঁথিঘর' একটি বিশেষ পুঁথি-সংগ্রহশালা। এ পুঁথিঘরে সংস্কৃত ও বাংলা মিলিয়ে প্রায় পাঁচশোরও বেশী পুঁথি আছে। সংস্কৃত পুঁথির সংখ্যাই হল সব থেকে বেশী। ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের অনেক পুঁথি এখানে আছে, তাছাড়া কৃষ্টিকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ মহাশয় ঘাটাল প্রভৃতি নানা অঞ্চল থেকে যে-সব দুর্লভ পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছেন সেগুলিও এ পুঁথিঘরে সংরক্ষিত হয়েছে। সংস্কৃত পুঁথিগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হল ভট্টিকাব্যের একটি পুঁথি। ১৫৩৬ শকাব্দ বা ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে পুঁথিটি নকল করা হয়েছিল। পুঁথির শেষ পাতায় তারিখটির উল্লেখ আছে। আশ্চর্যের বিষয় আজ থেকে চারশো আটাশ বছর আগে এটি নকল করা হলেও এর অবস্থা মোটামুটি ভালো বলা যায়। প্রাচীন তালপত্রের দু পৃষ্ঠায় লেখা ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সমসাময়িক এ পুঁথিটির হস্তাক্ষর স্পষ্ট হলেও অক্ষর প্রাচীন ধাঁচের বাঙলা হরফে। যে অংশে শকাব্দের উল্লেখ আছে সে অংশটি ভগ্ন হয়ে গেলেও তাকে উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে যাতে করে পুঁথিটির প্রাচীনত্ব-বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ না থাকে। পনেরো বা ষোল শতকের বাঙলা হরফ কেমন ছিল, সে বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতূহল এর থেকে মিটতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে একজন লিপি-বিশারদ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির অক্ষরের ছাঁদ দেখে তার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করেছিলেন। ভট্টিকাব্যের এ লিপির ভঙ্গী ভালোভাবে লক্ষ্য করলে পনেরো শতকের বাঙলা লিপি কেমন ছিল তা সহজেই জানতে পারা যাবে বা চোদ্দ শতকের লিপির ধাঁচও আন্দাজ করা যাবে। অবশ্য এ পুঁথির থেকে প্রাচীন চর্যাপদের পুঁথির লিপির অক্ষরের ধাঁচও জানা গেছে। সেজন্য প্রাচীন বাঙলা লিপি নির্ণয়ের ব্যাপারে ভট্টিকাব্যের এ প্রাচীন পুঁথিটিকে ন্যায়ভূষণ পুঁথিঘরের একটি মূল্যবান সংগ্রহ বলে মনে করা যেতে পারে। [পুঁথিটির একটি আলোকচিত্র দেওয়া হল]

ন্যায়ভূষণ পুঁথিঘরের উল্লেখযোগ্য আরেকটি পুঁথি হল ভাগবতের একটি পুঁথি। পুঁথিটির শেষের একটি পাতায় সন ১০১৩ সালের উল্লেখ আছে। অতএব খৃষ্টাব্দ হল ১৬০৬ খৃষ্টাব্দ, সতেরো শতকের একেবারে গোড়ার দিক। শ্রীধর স্বামীর ভাষ্যও এর মধ্যে আছে। কিন্তু এর উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য হল, দুটি পাতার (প্রথম ও শেষ) ভেতরের অংশে নানা রঙে চিত্রিত দশাবতারের ছবি অঙ্কিত রয়েছে। প্রথম পাতার ভেতরের অংশে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও বামন এবং শেষ পাতার ভেতরের অংশে শ্রীরাম, পরশুরাম, বলরাম, বুদ্ধাবতারে জগন্নাথ ও কল্কি অবতারের ছবি আছে। রামের গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ; বামন, কল্কি ও শেষ অবতারের গায়ের রঙ নীলাভ এবং অন্যান্য অবতারের [illegible]; হিরণ্যকশিপু ও কূর্মের বর্ণও নীলাভ। মৎস্য ও কূর্মাবতারে জলের ঢেউগুলি বেশ স্পষ্ট। বামনের একটি হাতের মধ্যে পেছনের বাঁ-হাতে ছাতা ধরা আছে, আর দুটি ডান হাতের একটিতে কমণ্ডলু ও অন্যটিতে

ভাগবত পুঁথির অঙ্কিত দশাবতারের ছবি (১৩১৩ সালের —১৯০৬ খৃঃ)

বরাভয়-মুদ্রা লক্ষণীয়। বুদ্ধাবতারে জগন্নাথ মূর্তিটির বিশেষ ভংগী থেকে এ অঞ্চলে সে সময়ে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতের আভাষ মেলে। দাসপুর অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীর মন্দিরগাত্রেও দশাবতারের ক্ষোদিত মূর্তির মধ্যে জগন্নাথের মূর্তি বুদ্ধের পরিবর্তে লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দাসপুর গ্রামের রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের উল্লেখ করা যেতে পারে। এ মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল ১৭১৩ শকাব্দ বা ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে। এরূপ অনেক মন্দিরগাত্রে বুদ্ধের পরিবর্তে জগন্নাথের মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। ভাগবত পুঁথির শেষ পাটার প্রথমেই রামাবতারের ছবি আছে। পরশুরাম আছেন রামের পরে। রাম ও পরশুরাম পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী হয়ে যুদ্ধমান। মনে হয় বিজেতা ও বিজিত—এই উভয়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট ব্যক্ত করার জন্যেই রামাবতারকে পরশুরামের আগে আঁকা হয়েছে। পরশুরাম অপেক্ষা রামের পৌরুষ-দৃপ্ত ভংগীটি চিত্রের মধ্যে অধিকতর স্পষ্ট, পরশুরামের ম্লান মুখমন্ডলে পরাজয়ের ছায়া পড়েছে, তা চিত্রকর নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন দেখতে পাওয়া যায়। রামের শরাঘাতে পরশুরামের ডান হাতের শর অবনত। বলদেবের এক হাতে শিংগা ও অপর হাতে সম্ভবতঃ হল, মুখমন্ডল বাঁ-দিকে ফিরানো ও শিংগাবাদনে উদ্যত। মুখমন্ডলে রঙ উঠে যাওয়ায় মুখের ভাবটি বুঝতে পারা গেল না। কল্কি অবতারে ঘোড়ার পিঠে চড়া অবস্থায় কল্কির ওপরে প্রসারিত দু-হাতে উদ্যত খড়্গদ্বয় বিজয়ী বীরের চিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছে। ঘোড়ার কৃষ্ণাভ বর্ণের পরিকল্পনার তাৎপর্য কি তমসাচ্ছন্ন কলিকাল? মৎস্য, কূর্ম ও নৃসিংহাবতারের দেহের বর্ণ উজ্জ্বল স্বর্ণাভ। সমুদ্রের নীল জলের সাদৃশ্যে কূর্মের রঙও নীল করা হয়েছে। মৎস্যের রং কিন্তু সমুদ্রজলের অনুরূপ হয়নি। প্রথম পাটায় চিত্রিত সব কটি অবতারই চতুর্ভুজ। শেষ পাটার অবতারগুলি দ্বিভুজ। বিশেষ ভঙ্গিমায় জগন্নাথের দ্বিভুজ আকৃতি দেখানো হয়েছে। বরাহাবতারে দংষ্ট্রার সাহায্যে ধরিত্রী-মাতার উদ্ধার ও তৎকর্তৃক শতবও চিত্রে স্পষ্ট। ভাগবত পুঁথির এই দুটি পাটায় অঙ্কিত এই রঙীন চিত্রটি সতেরো শতকের গোড়ার দিকের এদেশের চিত্রাঙ্কন রীতির এক বিশেষ ভঙ্গিমার পরিচয় বহন করছে। এদিক থেকে পুঁথিটির মূল্য ও গুরুত্ব কম নয়।

প্রাচীনত্বের দিক থেকে ন্যায়ভূষণ-পুঁথিঘরের জৈমিনীভারতের পুঁথিখানিও উল্লেখযোগ্য। এটির লিপিকাল হ'ল ১৫৬৮ শকাব্দ বা ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দ। সন্তানশুদ্ধিদীপিকা নামে আরেকটি পুঁথিও বেশ প্রাচীন, এটির লিপিকাল হ'ল শকাব্দ ১৫৫৪।২২ জ্যৈষ্ঠ বা ১৬৩২ খৃষ্টাব্দ। গোয়ীচন্দ্রের অন্বিত-টীকার তারিখ ১৬০৩ শকাব্দ বা ১৬৮১ খৃষ্টাব্দ। শ্রীধর স্বামীর ভাষ্যসহ ভাগবতের আরেকটি পুঁথির লিপিকাল হ'ল শকাব্দ ১৫৮৭ বা ১৬৬২ খৃষ্টাব্দ। এগুলি ছাড়া বেশীর ভাগ সংস্কৃত পুঁথিই আঠারো শতকের দিকে নকল করা হয়েছিল। অনেকগুলি আবার উনিশ শতকেও লেখা হয়েছিল দেখতে পাওয়া যায়। সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন পুঁথিটি হ'ল কাশীদাসী বাঙলা মহাভারতের বিরাটপর্বের। এটির লিপিকাল হ'ল সন ১২৫৮ সাল বা ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে।

বিষয়বস্তুর উৎকর্ষ ও অভিনবত্বের দিক থেকে ন্যায়ভূষণ পুঁথিঘরের নিম্নোল্লিখিত কয়েকটি পুঁথির নাম উল্লেখযোগ্য :

(১) হুগলি জেলার ভূরশিট্ পরগণার খানাকুল কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক কণাদ তর্কবাগীশের 'ভাষারত্নে'র পুঁথিটি। কলকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় ভাষারত্নের রচয়িতা কণাদ তর্কবাগীশকে বেশ কিছুকাল আগে ফরিদপুর কোটালিপাড়ার ব্যক্তি ব'লে যে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন, তা আদৌ ঠিক নয়। ন্যায়ভূষণ পুঁথিঘরে রক্ষিত এ পুঁথিটির মধ্যেই তার প্রমাণ আছে। (২) মেদিনীপুর জেলার ব্রাহ্মণভূম পরগণার অধিবাসী খ্যাত-নামা প্রাচীন টীকাদার গোপাল চক্রবর্তীর 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকের (কৃষ্ণ মিশ্র বিরচিত) 'অর্থকৌমুদী' নামক টীকার পুঁথি। গোপাল চক্রবর্তীর এ টীকাটি আজও অপ্রকাশিত। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের ছ'টি অঙ্কসহ 'অর্থকৌমুদী' নামে এ টীকাটি পুঁথির ছেচল্লিশটি পাতার দু-পৃষ্ঠায় লিখিত। শেষ পৃষ্ঠায় লিপিকাল উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

'সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ। শক ১৭৪৮ সন ১২৩৩ সাল তাং ২ কার্তিক শ্রীকৃষ্ণ দেবশর্মনঃ পুস্তকমিদম্।'

গোপাল চক্রবর্তী জন্মেছিলেন সতেরো শতকের গোড়ার দিকে আনুমানিক ১৬০০ থেকে ১৬১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। সংস্কৃত-সাহিত্যের এক প্রসিদ্ধ টীকাকার নামেই তাঁর পরিচিতি ও খ্যাতি ছিল। তিনি যে বিখ্যাত টীকাগুলি লিখেছিলেন, তার মধ্যে হল, (ক) দেবীমাহাত্ম্যের (চন্ডীর) টীকা—নাম তত্ত্বপ্রকাশিকা। তাঁর রচিত সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের টীকার নাম হ'ল, সারার্থদীপিকা (গ) অধ্যাত্মরামায়ণের টীকার নাম হ'ল, বালবোধিনী [এর সম্পূর্ণ পুঁথিটি আছে এশিয়াটিক সোসাইটিতে এবং একটি খণ্ডিত পুঁথি আছে লন্ডনে], (ঘ) শ্রীমদভাগবতের বোধলেশ টীকা [এ পুঁথির পত্রসংখ্যা হ'ল ৮৬ সম্পূর্ণ পুঁথিটি আছে লন্ডনে], (ঙ) গোপাল চক্রবর্তীর রচিত একটি গ্রন্থের নাম হ'ল জ্যোতীরত্ন। এ পুঁথিটির পত্র-সংখ্যা হ'ল ১৫৭, রচনাকাল ১৫৯৪ শকাব্দ বা ১৬৭২ খৃষ্টাব্দ (চ) এছাড়া গোপাল-রচিত রূপ গোস্বামীর হংসদূতের ওপর একটি টীকার কথাও শোনা যায়। কিন্তু এটি আজও অনাবিষ্কৃত। (ছ) জয়দেবের গীতগোবিন্দের ওপর তাঁর আর একটি টীকার নাম হ'ল অর্থরত্নাবলী। এর রচনা-কাল সম্পর্কে গোপাল বলেছেন :

নবাংকবাণেন্দুমিতে শকাব্দে
মাসে মধৌ চন্ডকরস্য বারে।
টীকামিমাং রূপবতী তনূজো
গোপাল শর্মা ব্যতনোৎ সমগ্রাম্।।

এর অর্থ হ'ল, রূপবতীর পুত্র গোপাল শর্মা ১৫৯৯ শকাব্দের (বা ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে) চৈত্র মাসের রবিবারে এই কাব্যের সম্পূর্ণ টীকা রচনা করেছিলেন। ন্যায়ভূষণ পুঁথিঘরে রক্ষিত গোপাল চক্রবর্তীর অর্থ-কৌমুদী টীকার পুঁথির শেষে আছে : "ইতি গয়ঘড়ীবন্দ্য শ্রীগোপাল চক্রবর্তী বিরচিতায়াং প্রবোধচন্দ্রোদয়টীকায়া —মর্থকৌমুদ্যাং ষষ্ঠাঙ্ক বিবরণম্.' এ টীকার শেষে গোপাল তাঁর আত্মপরিচয়দান প্রসঙ্গে বলেছেন :

আসীদ্বন্দ্যাকুলোজ্জ্বলো গয়ঘড়ী গ্রামী
হিরণ্যঃ কৃতী
তৎপুত্রঃ শিব ইত্যভূচ্ছিবসুতো
জ্ঞানো মহেশস্তথা।

জ্ঞানস্যাপি সুতোঽভবদ্ গুণযুতো
দুর্গাভিধস্তৎসুতঃ
শ্রীগোপালধরামরঃ সুমতনোং
টীকামিমাং সম্মুদে।।

অর্থাৎ, গয়ঘড়ী গ্রামী বন্দ্যবংশজাত হিরণ্যর পুত্র ছিলেন শিব। শিবের দুই পুত্র হয়। তাঁদের নাম ছিল জ্ঞান ও মহেশ। জ্ঞানের পুত্রের নাম দুর্গাদাস। গোপাল ছিলেন দুর্গাদাসের পুত্র। তিনি সৎ ব্যক্তিদের আনন্দের জন্য এই টীকা রচনা করেছিলেন। অবশ্য এ অর্থকৌমুদী টীকার রচনাকালের কোন উল্লেখ এখানে নেই।

(৩) ন্যায়ভূষণ পুঁথিঘরের অপর একটি উল্লেখ্য পুঁথি হ'ল মহাকবি মাঘের শিশুপাল বধ কাব্যের একটি অপ্রকাশিত টীকার। এটির নাম হ'ল সম্পর্কীচিন্তামণি। টীকাকারের নাম চন্দ্রশেখর, (৪) শ্রীকৃষ্ণদাস সার্বভৌম রচিত 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী' টীকার পুঁথিও উল্লেখযোগ্য। পুঁথিটির পত্রসংখ্যা ৩০—৭২ শকাব্দ ১৭২০ (বা খৃষ্টাব্দ ১৭৯৮) ৩ গম্ভীসপ্তমাসে অষ্টাবিংশতি দিবসে।

(৫) গোপাল চক্রবর্তীর অধ্যাত্ম-রামায়ণের টীকাটিও ন্যায়ভূষণ পুঁথিঘরের একটি পরম সম্পদ। পুঁথিটিতে লিপিকার ও [illegible] শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশের নামের উল্লেখ আছে। এই নামে চেতুয়া বাসুদেবপুর গ্রামের এক খ্যাতনামা পন্ডিতও ছিলেন। এ পুঁথিটির লিপিকাল হল ১৭২১ শকাব্দ বা ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ সন ১২০৬ সাল। (৬) অমরকোষের বিদ্যা-[illegible] একটি টীকাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পুঁথিটির পত্রসংখ্যা হল ২২৫, গ্রন্থাধিকারী শ্রীকৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ। শকাব্দ ১৭৫৪ বা ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ। পুঁথিটির মধ্যে দু'পাতা পারসী লিপিও দেখতে পাওয়া যায়। (৭) এ ছাড়া মহেশ্বর ন্যায়ালংকার ভট্টাচার্যের মম্মটের কাব্য-প্রকাশের একটি টীকাও ন্যায়ভূষণ পুঁথি-ঘরের একটি উল্লেখযোগ্য পুঁথি। এ টীকাটি সম্ভবত অপ্রকাশিত ও অভিনব। পুঁথিটির পত্রসংখ্যা হল ১৮৯।

পন্ডিত উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণের স্বহস্ত-লিখিত কয়েকটি পুঁথিও ন্যায়ভূষণ পুঁথিঘরে রক্ষিত আছে। এর মধ্যে স্মৃতিতত্ত্ব ও মুনিস্মৃতত্ত্বের পুঁথির শেষে লিপিকার উদয়চন্দ্র বলেছেন ঃ

বসুবাণমদচন্দ্রহায়নে
শাকয়াত্মপঠনায় পুস্তকম্।
লেখ্যমেতদুদয়েন শর্মণা
চৈত্রমাসহরিসংখ্যকে গুরৌ।।

অর্থাৎ ১৭৫০ শকের (বা ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে) ৭ই চৈত্র বৃহস্পতিবার নিজ-পাঠের জন্য উদয় শর্মা পুস্তকটি লিপি করেছিলেন। এ ছাড়া নব্যন্যায়ের সিদ্ধান্ত-লক্ষণের একটি ছোট টিপ্পনীও উদয়চন্দ্র যোগ করেছিলেন। ভাষাপরিচ্ছেদের একটি পুঁথির শেষে তিনি লিখেছেন ঃ

গো গো গো গবিমে
শকাবমিপতাবঙ্গমিত্তে গোগরি
রাধে রাজসুতে দিনে

আঠারো শতকে রচিত 'জীব ন-তারা' কাব্যের একটি পুঁথি
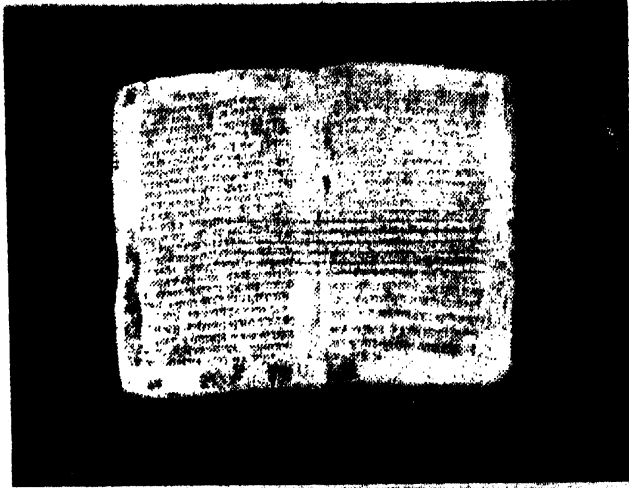
তিথৌ প্রতিপদি শ্বীয়ায় সংখ্যতঃ।
শ্রীযুক্তোদয়চন্দ্রভূমি বিবুধেনেয়ং
লিপিষ্টিপ্পনী
স্বেষ্টং শীর্ষসরোজমধ্যনিলয়ং
ধ্যাত্বাথা লেখিষ্যাম।।

জয়দেবকৃত রতিমঞ্জরী (শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত) ও কালিদাসকৃত শৃঙ্গারতিলক কাব্যও ন্যায়ভূষণ পুঁথিঘরে রক্ষিত আছে।

সংস্কৃত পুঁথি ছাড়া বাঙলা পুঁথিও এই পুঁথিঘরে রক্ষিত আছে। এদের মধ্যে সকলের থেকে উল্লেখযোগ্য পুঁথিটি হল সতেরো-আঠারো শতকের সন্ধিক্ষণের কবি প্রাণবল্লভ ঘোষের 'জাহ্নবীমঙ্গল'। [এ বিষয়ের একটি আলোচনা 'অমৃতে'র ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ সংখ্যায় লেখকের একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে।] এ পুঁথিটি আজও অপ্রকাশিত এবং এর দ্বিতীয় কোন পুঁথি আজও কোথাও পাওয়া যায় নি। এর লিপিকাল হল সন ১১৩১ সাল ১৬৪৬ শকাব্দ ৫ই জ্যৈষ্ঠ। স্থান, বাসুদেবপুর, পরগণা চেতুয়া। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে লেখা মঙ্গলকাব্যের এ পুঁথিটি নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া সতেরো শতকের বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি যদু-নন্দন দাসের 'কৃষ্ণলীলামৃত' পুঁথিটিও উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত পুঁথির অনেকগুলি পত্র, পাষন্ড-দলনের কিছু পত্র, কবিচন্দ্রের পুঁথির কিছু অংশ, রামেশ্বরের শিবায়নের কয়েকটি পত্র, রাধারসমঞ্জরী, উজ্জ্বল নীলমণিভাষা গ্রন্থ, রসকদম্ব আখ্যান, হরিদাস রচিত কৃষ্ণলীলা, রাধাকৃষ্ণলীলা ও ব্রতকথামালার পুঁথিও ন্যায়ভূষণ পুঁথিঘরে রক্ষিত আছে। সন ১২১০ সালের কাশীদাসী মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্ব ও ১২৫৮ সালের বিরাট পর্বও আছে। বিরাটের লিপিকারের নাম উল্লেখ আছে ঃ শ্রীকার্তিকচন্দ্র হড়, পাটগ্রাম, বরদা, সন ১২৫৮। এসব পুঁথির অনেক-গুলি প্রকাশিত হলেও এগুলির মধ্যে হয়তো বাঙলা সাহিত্যের নতুন কিছুর সন্ধান মিলতে পারে। প্রাণবল্লভের 'জাহ্নবী-মঙ্গল' কাব্যটি তো একেবারে নতুন। এটিকে গঙ্গামঙ্গলকাব্যের এক বৃহত্তম কাব্য বলা যেতে পারে। পুঁথিটির পত্রসংখ্যা ১৭৭, অবশ্য স্থানে স্থানে খণ্ডিত। এ ছাড়া আঠারো শতকের কবি রসিক রায়ের 'জীবনতারা' কাব্যের একটি পুঁথিও পুঁথিঘরের অন্যতম সংযোজন। এ পুঁথিটি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

মহাপন্ডিত উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণ সম্পর্কে আগের প্রবন্ধে কিছু বলেছি। উদয়চন্দ্র সম্ভবত সন ১২০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। স্বগ্রাম বাসুদেবপুরে ও নবদ্বীপে শিক্ষা-লাভ করে ইনি ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ পান্ডিত্যের জন্য প্রধানত নৈয়ায়িকরূপে খ্যাতিলাভ করেন। উদয়চন্দ্রের মাতুলবংশ ছিল বাসুদেবপুরের বিখ্যাত ভট্টাচার্য বংশ। এই ভট্টাচার্যদের বহু প্রাচীন পুঁথির সদ্ব্যবহার উদয়চন্দ্র করেছিলেন। সন ১২৬৭ সালের (ইং ১৮৬১।২৮শে মার্চ) ১৬ই চৈত্র বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা দ্বিতীয়ায় তাঁর লোকান্তর হয়। ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর পৌত্র স্বর্গত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন ঃ

'আমি শুনিয়াছি ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের মৃত্যুর পর এতদঞ্চলের বহু পন্ডিত ও অন্যান্য বহু লোক তাঁহার শবানুগমন করিয়া অত্যন্ত শোভাযাত্রায় সহিত তাঁহার সৎকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশ গৌরবহীন হইল, একটা নক্ষত্রপাত হইয়া গেল, সকলেই শোকে দুঃখে মুহ্যমান হইয়াছিলেন।'[১]

উনিশ শতকের বাঙলাদেশে ন্যায়ভূষণের ন্যায় ছাত্রবৎসল, পন্ডিত ও যুক্তিবাদী দার্শনিক খুবই বিরল। তাঁরই পবিত্র নামে উৎসর্গীকৃত এই পুঁথিঘরটি আজ বাঙালী মাত্রেরই গৌরবের বিষয়।

১। সংশপ্তক সতীশচন্দ্র, পৃষ্ঠা ১৯ (১ম সংস্করণ, ১৩৭৫)—শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ সম্পাদিত।

অঙ্গনা

শাড়ী প্রদর্শনী

ঘড়ির টিক টিক আওয়াজ সময়ের এগিয়ে চলার সংকেত। নদী যেমন সাগরে মিলোয় সময় তেমনি মহাকালে। মানুষের হাজারো ব্যথা-বেদনা আর শোক-তাপেও দাঁড়িয়ে সমবেদনা প্রকাশ করার অবসর তার নেই। আবার একটানা চলতে চলতে পেছন ফিরে তাকিয়ে চলার পথের হিসেব-নিকাশ করার কোন স্পৃহাও তার নেই। সে জানে শুধু এগিয়ে যেতে—লক্ষ্য তার সম্মুখপানে। কিন্তু যদি কখনো এরকম ঘটে। সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় ঘড়ির টিক টিক শব্দ বন্ধ হয়ে যায় তবে উচ্ছ্বসিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে…/ সঞ্চয়ের অচল বিকারে/বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে/ কলুষের বেদনার শূলে।' সে হবে সভ্যতার চরমতম দুঃখজনক অধ্যায়। না, সে আমাদের কোনসময়ই কাম্য হতে পারে না। বরং আমরা চাইবো নিরবচ্ছিন্ন গতিতে সময় এগিয়ে চলুক ঘড়ির টিক টিক শব্দ অব্যাহত থাকুক। মুহূর্তের স্তবেও যেন তাতে ছেদ না পড়ে।

তবু সব জাতির জীবনেই এমন এক মুহূর্ত আসে যখন সময় স্থির হয়ে যায়। সেখান থেকে আর এগোতে পারে না। সময় এগিয়ে চলে অবশ্য স্বাভাবিক গতিতেই। কিন্তু সেই মুহূর্তটি সময়ের বুকে বিশেষ পদচিহ্ন স্বরূপ হয়ে থাকে। রাজনীতিক অথবা সাংস্কৃতিক জীবনের এই মুহূর্তটি ঐতিহাসিক খ্যাতি অর্জন করে। একমাত্র অক্ষয় কীর্তির মাধ্যমেই এই খ্যাতি অর্জন করা যায়। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এমনি অক্ষয় কীর্তির মর্যাদায় মহিমা-মণ্ডিত হলো শাড়ি। কবে কোন ভাস্কর শাড়ির সর্বপ্রথম রূপকথা ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন আর তা বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন সেকথা আমরা সঠিক জানি না। তবে যিনিই করে থাকুন না কেন তা যে অজর-অমর কীর্তি তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এবং ঐতিহাসিক তো বটেই। সেই কবে থেকে (যার কাল নির্ণয় করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র) আজো শাড়ি সমান মর্যাদায় আমাদের অঙ্গাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মাঝে মাঝে কত ঝড় উঠছে। জাতির জীবনে ওলট-পালট ঘটে গেছে। আচার-ব্যবহার আমাদের আমূল বদলেছে। এককালে আমরা পিঁড়ি পেতে আসন করে বসে খেতাম, এখন সেখানে এসেছে ডাইনিং টেবিল। হাতের বদলে কাঁটা-চামচে দিব্যি খাওয়া-দাওয়া সারি। অতিথি আপ্যায়নে মুড়ি-চিঁড়ার বদলে বিস্কুট, প্যাটিস, প্যাস্ট্রি সুন্দর চালু হয়ে গিয়েছে। এসবে কোথাও কিছু আটকাচ্ছে না। কিন্তু পরিধানে শাড়ি আমাদের তেমনি আ… যেমন একসময় ছিল। তবে হামলা এখনে… কিছু কম হয়নি। নতুন সভ্যতার আমদা… ক্ষেত্রেও আমাদের ছেড়ে কথা কয়নি। পা… মতোনও মাঝে মাঝে হয়েছে ঝোঁক। ন… পরিধেয়ের মোহে আমরা ক্ষণিক মজেছি… তবে সে নেহাতই সাময়িক। আবার… কালস্রোতে ভেসে গেছে। এ যেন সু… মেঘের লুকোচুরি খেলা। নতুন ফ্যাশ… শাড়ির মহিমা আচ্ছন্ন করতে চেয়েছে… কিন্তু মেঘ কেটে যেতেই যেমন সূর্য দ্… তেজে আত্মপ্রকাশ করে মেঘের অহমিকা ব্যঙ্গ করে শাড়ি আর অন্য ফ্যাশনে… ব্যাপারও তেমনি। নতুন ফ্যাশান পুরো… হয়ে গেছে। আর শাড়ি চিরনবীনার ম… আমাদের বক্ষোলীনা হয়ে থেকেছে।

আলো দত্তের শাড়ির প্রদর্শনী দেখ… এসে বারবার একথাই মনে হচ্ছিল। ফ্যাশা… শাড়ির আবেদন চিরন্তন এবং চির নতু… বটে। এর যেন কোন জুড়ি নেই। … পুরোন হয়ে যায়। কিন্তু শাড়ি কোনদি… পুরোন হবে না—বাতিলের পর্যায়ে যা… না। সময় যেন এখানে এসে আটকা প… গেছে। স্থির নিশ্চল সময়। সম… এগনোর গতি তার স্তব্ধ। এ যেন নিয়মে… ব্যতিক্রম। যে নিয়মে সব বাতিল অ…
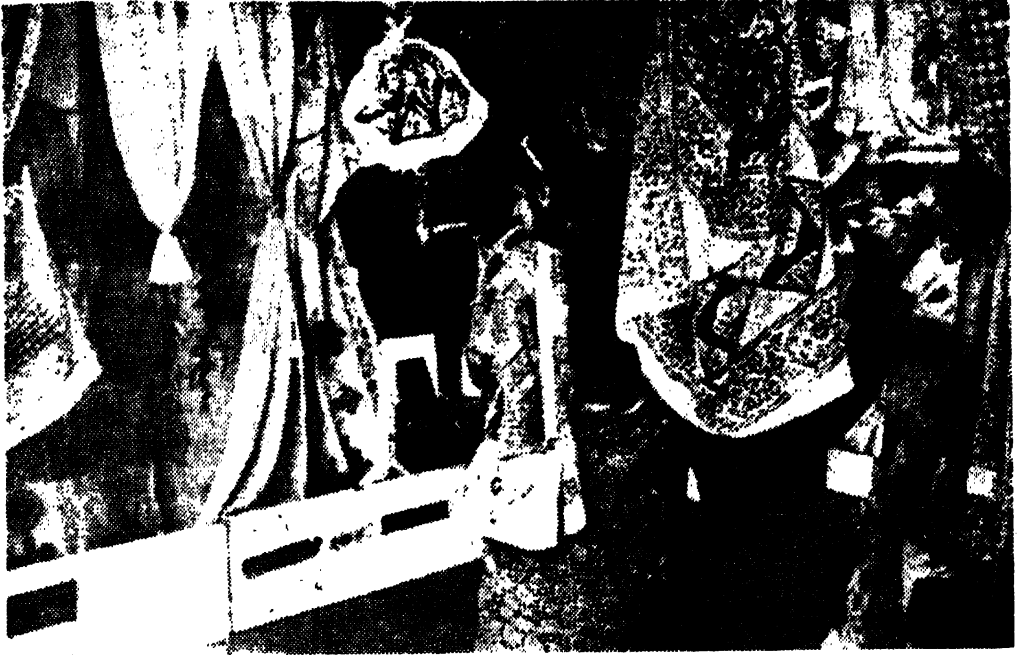
পুরনো হয়ে যায় মানে তা অচল। এই তো এক সময়ে গাড়ির মধ্যে ল্যান্ডো বা ফিটন আভিজাত্যে ছিল অতুলনীয়। ভিক্টোরীয় যুগে একমাত্র অভিজাত শ্রেণীই এই গাড়ি ব্যবহার করতেন। আর সেজন্য তাদের গর্বেরও সীমা-পরিসীমা ছিল না। একজন আরেকজনকে পাল্লা দিয়ে চলতেন। ইংরেজি সভ্যতার প্রথম যুগে আমাদের দেশেও এই জিনিসটির আমদানি ঘটে। এক সময়ে আমাদের দেশের জমিদাররা ছ বেহারা আট বেহারার সুসজ্জিত পাল্কী নিয়ে গর্ব অনুভব করতেন। তারপর এলো ল্যান্ডো-ফিটনের যুগ। ঘোড়ার সাজে আর গাড়ির বাহারে সেদিন পরস্পরের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। শহরের রাস্তা কাঁপিয়ে ল্যান্ডো-ফিটন ছুটতো।

কিন্তু ল্যান্ডো-ফিটন এখন অতীতের পর্যালোচনা মাত্র। মহাকালের গর্ভে সে কাহিনী লুপ্ত হয়ে গেছে সেই কবে। এখন চলছে রোলস রয়েস আর ক্রাইসলারের যুগ। পুরোন দিন আজ বেঁচে রয়েছে গল্প-কাহিনীতে। সেখানে কেউ ফিরে যেতে চায় না। জেট-রকেট ছেড়ে গরুর গাড়ীর যুগে ফিরে যাওয়া আর যাহোক সভ্যতার অগ্রগতি বোঝায় না। সুতরাং এমন কাজ আমাদের পক্ষে সম্ভবও নয়। কিন্তু যদি এমন হয় সময় সবকিছুতেই নিজেকে স্থির করে রাখছে। প্রবহমানতাকে অস্বীকার করে সব পুরোনকেই নতুনের মাহাত্ম্যে বুকে আঁকড়ে রাখতে চায় তবে তা হবে হাস্যকর প্রয়াস। আর তা একান্ত অসম্ভব। উদ্দাম, উধাও হয়ে চলার পথে যা কালজয়ী তাই শুধু চিরন্তন হয়ে থাকে আর সব পথের ধুলোয় নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে।

আমাদের দেশে শাড়ি ছাড়া আর অনেক অনেক ফ্যাশানের ভাগ্যেই তা ঘটেছে। রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে গিয়ে একটু নজর ফেরালেই দেখা যাবে মেয়েদের পোশাকে একটা হাওয়া বদলের ভাব। শাড়ি ছাড়াও আরো কিছু কিছু ফ্যাশানের দিকে আমরা ঝুঁকেছি। এতে হয়তো কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, শাড়ির একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হয়েই আমরা এপথে এসেছি। আসলে কিন্তু তা নয়, নতুন ফ্যাশানে একবার টুপ করে ডুব কেটে মনের সাধ মেটানো। আর মিটে গেলেই ফুরিয়ে গেল সেই পোশাকের আবেদন। এমনি দশা হয়েছে আজ লুঙ্গি আর বেল বটমের ভাগ্যে। নতুনের আবেদনই ফুরিয়ে গেছে।

আলো দত্তের প্রদর্শনীতে একটি সুন্দর শাড়ি দেখা গেল। ঝকঝকে ছাপা। একেবারে মনের মতন। এই ছাপাটি অনেকটা লুঙ্গির সঙ্গে মিলে যায়। তাই কেউ কেউ এরকম ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, এটিকে লুঙ্গি করে পরলে বেশ ভাল মানায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নজর আটকে গেছে এক টুকরো লিখনের দিকে—লুঙ্গি সেকেলে হয়ে গেছে। তারপর উৎসাহীরা মনের ভাব গোপন করেছেন। এমনি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ জুটেছে বেল বটমের ভাগ্যেও। শিল্পী আলো দত্ত স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, এই পোশাক এখন অপ্রচলিত। ল্যান্ডো-ফিটনের মতো এর ভাগ্যও এই সঙ্গে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। দুই-ই আজ অতীতের বস্তু।

শাড়ির প্রদর্শনী। হাতে ছাপা শাড়ি। শিল্পীর নাম আলো দত্ত। ইদানীং শাড়ির চাহিদা যে যথেষ্ট বেড়েছে তা এই প্রদর্শনী থেকেই বেশ বোঝা যায়। গুহাঙ্গনায় হুল শাড়ি লুফে লুফে নিচ্ছেন। ক্রেতা সমাবেশ রীতিমত আশাব্যঞ্জক। প্রদর্শনীর বক্তব্য শিল্পী বুঝিয়ে বলছিলেন। এক জায়গায় একটি ব্লক সযত্নে রাখা আছে। গয়নার বাক্সে। আর তা পাহারা দিচ্ছে দুজন সান্ত্রী। শিল্পীর প্রাণভোমরা। পাছে চুরি যায় তাই এই সতর্কতা। কিন্তু শাড়িটি নেই। জায়গাটা ফাঁকা। এমন একটি শিল্পকর্ম দেখাতে না পারার বেদনা তাঁকে বড় বাজলো। তিনি মনমরা কণ্ঠে বললেন, বিক্রি হয়ে গেছে। এবার যেন কিছুটা খুশিও হলেন। ক্রেতারা সঠিক জিনিস চিনে নিতে ভুল করেননি। তাই তিনি আনন্দিত। তারপর তিনি জানালেন, একজন শিল্পীর কাছে আদরণীয় যেমন রঙ-তুলি আমার তেমনি ব্লক। তাই এটিকে সতর্কতার সঙ্গে রক্ষার ব্যবস্থা করেছি।

শাড়িগুলো দেখে দেখে কোন ক্লান্তি আসে না। শাড়ির রং মেলানোয় এমন আনন্দ মাধুর্য বহুদিন চোখে পড়েনি। এতো দোকান নয় যে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁক ঝাঁক শাড়ি তার সামনে মেলে ধরা হবে। বস্তুর প্রাচুর্যে তাঁর রুচি ব্যাহত হবে। এ যে প্রদর্শনী। প্রতিটি শাড়ি সুন্দরভাবে সাজানো। অনেক শাড়ি। কিন্তু পছন্দসই জিনিসটি বেছে নিতে কারো কোন অসুবিধা হয় না। একটার উপর আর একটা [illegible] এসে পড়ে না। পাশাপাশি সব [illegible]। [illegible] শাড়িই নকশা রুচির সঙ্গে খাপ খায়।

শাড়ি পছন্দ [illegible] একাধারে অনেকখানি লাঘব হয়ে গেছে। এমনিতে

ছাপা শাড়ি কিনতে গেলে পছন্দ করা এক সমস্যা। প্রতিটি ছাপা মনে হয় বহুবার পরা অথবা দেখা। তাছাড়া কোন কোন ছাপা আবার রুচি মাফিক নয়। উগ্র আধুনিকতার নামে যা চলছে অথবা চাপানোর চেষ্টা হচ্ছে তাতে শাড়ি পরার আকাংখা তৃপ্ত হতে পারে না। আবার পুরোনর মিছিলও ভাল লাগে না। শাড়ি থেকে যে মানুষের দৃষ্টি সরে যাচ্ছিল এটাও তার একটা কারণ। নতুন প্রেরণায় সেই দৃষ্টি আবার যথাস্থানে নিবদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে এই প্রদর্শনীতে। আধুনিক কিন্তু উগ্রতা নেই এবং প্রাচীন মহিমার প্যানপ্যানানিও নেই। প্রতিটি শাড়ি অভিনবত্বে উজ্জ্বল। একনজর দাঁড়িয়ে দেখতে হয়।

শিল্পীর মূল বক্তব্য হলো, শাড়ি শাড়িই, তা যেরকমই হোক না কেন। সেই যে প্রিন্ট দেখে এক ভদ্রমহিলা লুঙ্গি হিসেবে ব্যবহার করার ইচ্ছে করেছিলেন সেটিও শাড়ি হিসেবেই চলবে। সত্যি কথা বলতে কি, শাড়ি ছাড়া মেয়েদের এত সুন্দর আর কোন কিছুতে মানায় না। কত ফ্যাশান তো আমরা দেখলাম, কিন্তু কোন ফ্যাশানই আমাদের মধ্যে স্থায়ী আসন করে নিতে পারেনি। শাড়িকে হটাতে এসে সবাই হটে গেছে। শাড়ি যেখানে ছিল সেখানেই আছে। বরং দিনে দিনে তার মর্যাদা আরো বাড়ছে। আচ্ছা, এরকম দৃশ্য কি আমরা কল্পনা করতে পারি যে, শাঁখের আওয়াজ আর উলু ধ্বনির মাঙ্গলিকে মুখর জীবনের এক পরম লগ্নে লুঙ্গি অথবা বেল বটম শোভিত কনে বউকে ছাদনাতলায় এনে হাজির করানো হলো। না, এ জিনিস সম্ভব নয়। দুধের স্বাদ কখনো ঘোলে মেটে না। কনে সাজাতে কাপড় ছাড়া অন্য কিছু চলে না।

শুধু জীবনের এই মুহূর্তটিতে নয় সবসময় সব রমণী শাড়ি পড়ুন। শিল্পী আলো দত্তের আবেদন, রমণীরা শাড়িতে আরো রমণীয় হবেন। আমাদের দেশের তো বটেই পৃথিবীর আরো সব মহিলারা যদি শাড়ি পরেন তাহলে তিনি খুব খুশি হন। যার যেরকম শাড়ি পছন্দ। এমন কোন কথা নেই যে, আলো দত্তের ছাপানো শাড়িই পরতে হবে। সেকথাও তিনি প্রদর্শনীতে ঘোষণা করেছেন।

প্রদর্শনী বলতে যা বোঝায় আলো দত্তের শিল্পী জীবনে তা এই প্রথম। এর আগেও দু-একবার নিজের ছাপানো শাড়ির ছোটখাটো আসর বসিয়েছেন তবে তাতে এমন ব্যাপকতা ছিল না। তাই এই প্রদর্শনী করতে পেরে তিনি খুব খুশি। আরো খুশি এই কারণে যে মাত্র তিন দিনের প্রদর্শনীতে খুব সাড়া পাওয়া গেছে। শাড়ি ভাল হলে যে সবাই কেনে এ সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছেন। এই সার্থকতার পাথেয় নিয়ে আগামী দিনে তিনি হয়তো শাড়ি ছাপায় আরো বিচিত্র স্বাদের মূল্যবান উপহার দেবেন আমাদের।

প্রদর্শনীর শেষাংশে ছিল ভারতীয় সাধনার চিরাচরিত পদ্ধতি-প্রকরণ। হয়তো এখান থেকেও প্রদর্শনী শুরু হতে পারতো। একখণ্ড কম্বল বিছিয়ে নিয়ে শিল্পী তন্ময় হয়ে সুন্দরের ধ্যান করেন। সুন্দরের সাধনাই তাঁর জীবনসাধনা। সাধনার সিদ্ধিলাভ করলেই তবেই তিনি সৃষ্টিতে ভাস্বর হন। আলো দত্তের সৃজনক্ষমতা তাঁর শিল্পকর্মে প্রাণবন্ত হয়েছে। তবু তিনি এখনো সাধনার কথা ভাবছেন। তাই যথারীতি মঙ্গলদীপ দিয়ে প্রদর্শনীর শুরু করেছেন। পরিশেষে সাধনার কথা বলেছেন। প্রদর্শনী শেষে আবার হয়তো তিনি সাধনায় ডুব দেবেন আর পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ পর্যন্ত তাঁর এই সাধনা চলবে।

—প্রমীলা

উজ্জ্বল প্রতিভার অবসান

ইন্দ্রা ভাদুড়ী

এমন কিছু মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁরা স্বীয় কৃতিত্বে অসামান্য গৌরব অর্জন করেন অতি অল্পবয়সেই। এঁদের অনেকেই ক্ষণজন্মা। সেখানেই আমাদের অসীম বেদনা, সমস্ত আনন্দের অবসান।

লক্ষ্ণৌ-এর আর এন সান্যালের নাতনী এবং প্রখ্যাত চিত্রাভিনেতা পাহাড়ী সান্যালের ভাগ্নী ইন্দ্রা ভাদুড়ীর পরিচয় দিতে গিয়ে একথাই বারবার মনে হয়, বেঁচে থাকলে হয়ত বাঙালী মেয়েদের গৌরবময় ইতিহাস আরও সমৃদ্ধ করতেন। ইন্দ্রা কোন পরীক্ষাতেই কখনও দ্বিতীয় হন নি। ছেলেবেলা থেকেই আকর্ষণ ছিল খেলা-ধুলোয়। প্রথমে হিন্দু গার্লস স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। ১৯৬৬ খৃঃ বি-এ, ইতিহাসে অনার্সসহ ফার্স্ট ক্লাস পান। ১৯৬৯ খৃঃ এম-এতে (মডার্ণ হিস্ট্রি) ফার্স্ট ক্লাস পান। এই বিভাগে পনের বছরের মধ্যে কেউ ফার্স্ট ক্লাস পান নি। জেনারেল হিন্দী জেনারেল সায়েন্স এবং ভোকাল মিউজিকেও ডিস্টিংশন নিয়ে পাশ করে-ছিলেন। এম-এ পাশ করবার পর দুবছরের মধ্যে ডঃ জে এন বাজপেয়ীর তত্ত্বাবধানে গবেষণা শেষ করেন ১৯৭১ খৃঃ মার্চে। এপ্রিলে মডার্ণ হিস্ট্রির লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৯৭১ খৃঃ ১ ডিসেম্বর টিটেনাসে আক্রান্ত হন ইন্দ্রা। নিদারুণ যন্ত্রণাভোগের পর পরলোকগমন করেন ৬ ডিসেম্বর। তারপর সংবাদ আসে ডকটরেট হওয়ার। সাফল্যের এই সংবাদ শুনে যেতে পারেন নি ইন্দ্রা।

যে কোন মানুষের সাফল্যই আমাদের কাছে আনন্দের সংবাদ। কিন্তু সাফল্যকে যদি গ্রাস করে মৃত্যুর চির নিস্তব্ধতা, তবে হৃদয়কে প্রশান্ত রাখা অসম্ভব। ইন্দ্রার লোকান্তর পারিবারিক শোক নয়, একটি উজ্জ্বল প্রতিভার অকাল অন্তর্ধান।

কোথায় উৎসব ?

পুজোর আর কটা দিন বাকি, চলুন না একবার সকলে মিলে বাজারটা ঘুরে আসি। আচ্ছা আপনারা যদি সঙ্গী হতে নাইবা চান আমিই এবারে পুজো বাজারের গোটাকয়েক খবর দি। এই যে রোববার গেল আপনার, আমার সকলেরই ছুটির দিন ভাবলাম এক-বার বাজারটা ঘুরে আসি, সেই সদিচ্ছায় আমি এক বন্ধুকে সঙ্গী করে শ্যামবাজারে হাজির হলাম।

ফুটপাত ক্রেতা-বিক্রেতায় গিসগিস। দোকানে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। হয়তো রোববার বলেই দিনটাতে ভীড় বেশী। ধনী দরিদ্র সাধ্যমত সকলেই কেনাকাটা করছেন। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা-মায়ের হাত ধরে মহা ফূর্তিতে নতুন পোশাক কেনার জন্য দোকানে-দোকানে ঘুরছে। কোথাও দোকানদার হাঁকছে 'এক টাকার শাড়ী, ব্যবহারে ও উপহারে অদ্বিতীয়'। কোথাও বা 'খোকা এ দোকানেই তোমার সুন্দর জামা আছে, চলে এসো।' কোথা থেকে একটা বেলুনওয়ালা হেঁকে বসলো, 'এই যে সুগ্রীব ভাই, খোকা তোমার একটা চাই' বলেই খোকাদের চোখের সামনে বেলুনে তৈরী হনুমানকে নাচাতে লাগলো। খোকার তো একটা বেলুন চাই নিশ্চয়ই অথচ মা-বাবারা সাধ্যের অতীত জামা-কাপড় কেনাতে খরচ করে বেলুনের পয়সা জোগাবেন কোথা থেকে? তবুও জোগান দিতে হয় কারণ বাতাসে তখন শরতের ভাষা, আকাশে আলো ছায়ার সমারোহ, কাশের বন শাদা, সরোবরের জলে মৃদু কম্পন। এককথায় মানুষের চোখে তখন রঙিন স্বপ্ন—জীবনটাকে ভালবাসার বিশেষ মুহূর্ত। তারপর পুজো শেষে একই চাকার আবর্তনে পৃথিবী ঘুরবে। মানুষ কাজেই [illegible] বাস্তবতায়। উত্তরের বাজারে ধনী-দরিদ্র সকলেরই সওদা

করার সমান তাগিদ। দেখে মনে হল—আহা, নাই এ শূন্যতাকে অন্ততঃ মানুষ দিন কয়েক ভুলে থাকবে।

ভাবলাম চৌরঙ্গীতে না গেলে অনেক কিছু দেখা বাকী থেকে যায়। তাই ভীড়বাসে দুজনে ঠেলেঠুলে উঠে পড়লাম। সে কি বোঝাই বাস। মনে হচ্ছে দুনিয়ার সব লোক ঐ একই বাসে পাড়ি দিচ্ছে। সকলেই ঘর্মাক্ত কলেবর। তার ওপর বাসটা চলছে যেন গরুর গাড়ীর মত। অসহিষ্ণু যাত্রী মাঝে মাঝে চিৎকার তোলে আবার ক্লান্ত হয়ে কেমন যেন থম মেরে যায়।

যাক, ঠুকঠুক করে তো বাস এসে ভিড়লো এসপ্ল্যানেডে। যত লোক নামবে তার চেয়ে অনেক ওঠার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। কোন গতিকে ঐ ভীড় ঠেলে সবে ফুটপাতে পা দিয়েছি সংগে সংগে এক ভদ্রলোক তাঁর বৌকে অতি সযত্নে হাত ধরে টেনে নামালেন। ভদ্রমহিলা বিরক্ত হয়ে বারবার হাত ছাড়াতে চাইছেন। মনে হল সংকোচে উনি সকলের সামনে বিরক্তির অভিনয় করছেন, না হলে স্বামীর এত সোহাগ কেউ উপেক্ষা করে না বিরক্ত হয়। বাস থেকে নেমে ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার হাত ছেড়ে দিয়ে 'এসো' বলেই এগোতে যাবেন ভদ্রমহিলা প্রায় সিংহনাদে গর্জন করে উঠলেন, 'আমাকে বাস থেকে টেনে নামিয়ে আনলেন যে?' ভদ্রলোকের এতক্ষণে সম্বিত ফিরলো। তিনি স্থির দাঁড়িয়ে লজ্জিত হয়ে বললেন 'ইস দ্যাখছেন আমার বৌ ভাইব্যা আপনারে হিড়হিড় কইর‍্যা টাইন্যা নামাইলাম। কিসসু মনে কইর‍্যান না।' এতক্ষণে স্ত্রী-মহিলা বাস থেকে নেমে ভদ্রলোকের পাশে এসে দাঁড়ালেন। পূর্বের মহিলা মুখে অসন্তোষের ভঙ্গি করে বাসে উঠবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বাসটা ততক্ষণে ষ্টার্ট নিয়েছে।

এতক্ষণে জনতার চেতনা ফিরলো। এবার সকলের মুচকি হাসির পালা। স্ত্রী ভদ্রমহিলা একটু রসিকতা করে ভদ্রলোককে বললেন, 'থাক তো বসিরহাট, তায় মাথার টাক, অখন এই বুড়ো বয়সে কেডায় তোমারে পছন্দ করবো। আমি ছাড়া আর গতি নাই।' ওরা এগিয়ে চললো। অনেক দূর থেকে ওরা এসেছে নিউমার্কেটে নয়তো বিধান মার্কেটে সওদা করতে।

আমরা দুজন এবার এয়ার কণ্ডিশন মার্কেটের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। দেখা যাক, ঐশ্বর্যে সজ্জিত, ক্রেতার স্বাচ্ছন্দ্যের সহায়ক এই মার্কেটটির অবস্থা। জাঁকজমক আর চেকনাই-এ প্রতিটি দোকানঘর উজ্জ্বল। হঠাৎ সামনের দিক থেকে একটা চীৎকার অর্থাৎ জোড়ে কথা কাটাকাটির শব্দ আসছিল। জনকয়েকের ভীড়ও সেই উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছিল। আমরাও পায়ে পায়ে তারই দিকে এগিয়ে চললাম। গিয়ে শুনি স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল বচসা চলছে। পাশে ছাড়া গরুর মতো দুটি ছেলে-মেয়ে। স্ত্রী ছেলে-মেয়েদের জন্য যে দামের জামা পছন্দ করেছেন স্বামী ভদ্রলোক অত দাম দিয়ে কিনতে নারাজ।

ক্ষমতার বাইরে এত দাম দিতে তিনি কখনই পারবেন না তাই স্ত্রীকে একরকম প্রায় অনুরোধ করলেন কম দামে পছন্দসই জামা কিনতে। স্ত্রী নাছোড়বান্দা। সকলের সামনেই স্বামীর অক্ষমতাকে তিরস্কার করলেন। সরকারের দেওয়া বাড়তি দশ টাকাকে স্মরণ করলেন। অথচ কিছুতেই কিছু হল না। স্বামী আর স্ত্রী উভয়েই যার যার কথায় অটল, অবিচলিত। শেষে কথা কাটাকাটি, তারপর প্রচন্ড রাগ। স্ত্রী সব জামা-কাপড় দোকানে ছুঁড়ে দিয়ে গটগট করে দরজার দিকে এগোতে লাগলেন। স্বামীও গোত্তা খেয়ে পিছু নিলেন। বেচারা শিশুদ্বয়। কোন্ পক্ষকে সমর্থন করবে বুঝতে না পেরে ভীতু ভীতু পা ফেলে বাবা-মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করলো। বাবা-মায়ের কলহে সন্তানরা বাঁচলো কি মরলো তার খবর কে রাখে!

কেমন একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হল। তাই এয়ার কণ্ডিশন মার্কেট থেকে বেড়িয়ে নিউমার্কেটের পথ ধরলাম। এবারের পুজোর ভীড়টা মনে হল চৌরঙ্গীতে বেশী করে জমেছে। কি জানি, চৌরঙ্গী কি জাদু জানে।

নিউমার্কেট-এ আরেক জগৎ। দেশী-বিদেশীর মিলনক্ষেত্র। সকলেরই কি দুর্গাপূজা! সকলেই কি আমাদের এই জাতীয় পূজার উৎসবে অংশগ্রহণকারী। নয়তো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এদের এত ভীড় কিসের!

ব্যাগ, জুতো, মালা, পাউডার, স্নো, লিপস্টিক থেকে শুরু করে মায় ফলস চুল আর খোঁপা কোনটাই বা কিনতে বাকি? একটি বিরল কেশের অল্পবয়স্ক ছেলে দোকানে-দোকানে জুলফির খোঁজে ঘেমে-নেয়ে অস্থির।

ছোট একটা দোকানে জনাকয়েক কিশোরী (মুখে যাদের কথায় ফুলঝুড়ি) খানকতক শাড়ীর মধ্যে সবে বাছাই শুরু করেছে হঠাৎ সেখানে আবির্ভূতা হলেন চলচ্চিত্রের এক নামী শিল্পী। কিশোরীদের কথা বন্ধ হল, হাত গুটিয়ে এলো কোলের ওপর, চোখ স্থির রইল শিল্পীর খোঁপায় নয়তো মুখে অথবা শাড়ীতে। চলচ্চিত্রের পর্দার শিল্পীকে মর্ত্যের মাটিতে দেখে যেন ওদের আর আকাঙ্ক্ষা মেটে না। ওদের বিহ্বল দৃষ্টি দেখে মনে হল ওরা কি এবার পুজোয় শিল্পীর সাজেরই চলন করবে?

এরপর আমরা এগিয়ে চললাম। ব্লকের পর ব্লক পার হয়ে এক জায়গায় দেখলাম এক ভদ্রলোকের মাথায় চুল খাড়া হয়েছে, চোখ কপালে ওঠার উপক্রম। খানিক পর্যবেক্ষণ করে জানলাম ভদ্রলোকের ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে দিলও আছে। তাই পছন্দসই জামাকাপড় কিনতে এসে দামের ফর্দ দেখে চোখ কপালে তুলেছেন। ক্ষমতারও তো একটা সীমা আছে। পছন্দ মানেই আকাশ-ছোঁয়া মূল্য। তবে কি উচ্চ মধ্যবিত্তরাও পুজোর জিনিসের দাম শুনে ব্লাডপ্রেসারে আক্রান্ত হবেন?

আবার এগোলাম। এবার ফেরার তাড়াও আছে। দিনশেষে সূর্য বিদায় নেবার ইশারা জানিয়েছে। আকাশ লাজে লাল। অথচ মার্কেটের ভেতর জমজমাট। রাস্তায় বেড়িয়ে হাঁটছি। সামনে এক ভদ্রলোক আর মহিলা গল্প করতে করতে প্রায় আমাদের পথরোধ করে এগোচ্ছেন। ওদের আলোচনা, কথাবার্তা সব। আমাদের কানে আসছিল। মহিলাটি খুশী খুশী গলায় বললেন, 'টিকলুর শাড়ীটা কিনতে তোমার নিশ্চয়ই কষ্ট হল। তবু কি জান একটু একটু করে গুছিয়ে নিলে ওর বিয়ের সময় তোমার বেশী কষ্ট হবে না। কি বলো এবারে শাড়ীটা ওর বিয়েতে বেশ সাজিয়ে দেওয়া যাবে, তাই না?'

বিয়েতে সাজানো যাবে কি যাবে না সেটা পরের প্রশ্ন। এই পুজো-আচ্চা আছে বলেই তো অগ্রিম নিয়ে বা বোনাসের টাকায় ভবিষ্যতের জন্য কিছু গুছিয়ে রাখা যায়। তবে কি আমরা গরীব, না—না খেয়ে মরছি! নুন আনতে পান্তা ফুরোলেও সাধ্যমত সকলেই তো কেনাকাটা করছি।

এবার ফেরার বাস ধরতে হবে। অল্পে অল্পে এগিয়ে চলেছি। পথচারীদের সকলেরই হাতে টুকিটাকি প্যাকেট, সকলে যেন কেমন সুখী সুখী। ওদের দেখে আমরাও খুশী হলাম। কিন্তু সব খুশীকে ছাপিয়ে এখন যা দেখলাম তার জন্য একটু পূর্বেও প্রস্তুত ছিলাম না। ফুটপাতের মাঝখানে এক ফালি কাপড় জড়িয়ে এক মুমূর্ষু নারী উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পাশে তার উলঙ্গ তিন সন্তান। তিরতির করে তাদের প্রাণবায়ু চলছে। কোন সহৃদয় ব্যক্তি নারীর জ্ঞানশক্তি ফেরাবার হয়তো চেষ্টা করেছিল তাই তখনও জল ইতস্ততঃ ছড়ানো ছিটানো ছিল। সবাই আমরা দর্শক। আকাশে বিরাট চাঁদ টপকে টপকে উঠতে শুরু করেছে। বাতাসে আগমনীর সুর। আলোয় ঝলমলে শহর। অথচ ওরা কোথায় আছে? আগমনীর সুরের ছন্দ কি ওদের কানে দোলা লাগাতে পারছে? ওরা নিস্তেজ, নির্জীব। ওরা বাঁচার চিন্তায় অসহায়, বিদ্রোহ করার, লড়াই করার শক্তিটুকুও হারিয়েছে। দর্শকেরা খানিক দাঁড়াবে আবার রসে-ঢঙে ফিরে যাবে। ওদের মনে কতটুকু রেখাপাত করবে? অথচ আমার মনে হল বাতাস হঠাৎ বিষাদে স্তব্ধ হল, চাঁদের গায়ে কে যেন আঁচড়ে দিল, কাশ ফুলের বনে গভীর অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, সমুদ্রের দুর্বার ঢেউ যেন আমাদের গ্রাস করতে এগিয়ে এল। এত আলো-ঝলমলের মাঝে আমরা হারিয়ে যাচ্ছি, হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের উৎসবের সুর। ওরা উপুড় থেকে যতক্ষণ না দাঁড়াতে পারবে সেখানে আনন্দ কোথায়? মাতৃহারা মা যদি না পায় তবে উৎসব কিসের?

—অঞ্জলি চৌধুরী

কৃষ্ণলীলা থেকে আন্তর্জাতিকতা

এক বিচিত্র মধুর জাতীয়তাবোধই কলাশিল্পের আঙিনায় যাত্রার আগমনকে করেছিল ত্বরান্বিত। সে জাতীয়তাবোধের মূলে আবার রয়েছে ধর্ম। মনে রাখতে হবে আমাদের জীবনটাই ধর্মকেন্দ্রিক—ধর্মকে আশ্রয় করেই আমাদের জীবনের চিন্তার—আদর্শের বিকাশ। আর এই বিকাশ-ধারাকে অনুসরণ করেই একদিন এসেছিল যাত্রা, প্রাথমিক স্তরে যা ছিল শুধু দেব উৎসবে দেবস্তুতি বা মহিমা প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যম। পরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা পেলাম কৃষ্ণযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, রামযাত্রা, মনসার ভাসান যাত্রা ইত্যাদি। এদের মধ্যে আবার সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে কৃষ্ণযাত্রা।

নন্দলাল ভট্টাচার্য

বোধহয় প্রাকৃতিক কারণেই বাংলাদেশের কোমল মাটিতে কৃষ্ণলীলা বা বৈষ্ণবভক্তি যতটা গভীরে শেকড় চালিয়েছে ততটা আর কেউ পারেনি। বিশেষ করে চৈতন্যের আবির্ভাবের পর থেকে বাংলাদেশে কৃষ্ণ-প্রেমের যে প্লাবন দেখা দেয় তার পলি গিয়ে জমা পড়ে দেশের শিল্প সংস্কৃতির ওপর। ক্রমে তাই যেন নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে সবকিছু। স্বভাবতই শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, রাধা বা রাই-এর সঙ্গে প্রণয়লীলা, বৃন্দাবন-লীলার প্রতি জনজনার্দনের আকর্ষণ বাড়তে থাকে। এসবের মধ্যে কালীয়দমন পালার প্রচলন এত বেশী হয় যে সাধারণ্যে কৃষ্ণ-বিষয়ক যাত্রা কালীয়দমন বা কালদমনে যাত্রা নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

শতাব্দীর সীমা অতিক্রম করে এগিয়ে চলে যাত্রা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বা তার কিছু আগে থেকে কৃষ্ণযাত্রাতেও সমসাময়িক কুরুচির ফলে এলো অশ্লীলতা। অশ্লীলতার আধিক্যে শিষ্টজন তা থেকে দৃষ্টি ফেরাল—ফলে যাত্রার হলো আরো অধঃপতন। সে রুচিবিকৃতি এমনই একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয় যে মহিলাদেরও যাত্রা গান শোনা দূষণীয় বলে মনে করা হতো। 'স্ত্রীলোকের তাবৎকর্তব্য এই২ দৃষ্টবুদ্ধিতে অন্যপুরুষ অবলোকন ও সহবাস ও যাত্রোৎসবে গমন ও একাকিনী গমন ও ব্যভিচারিণীর সংসর্গ। এই সকল কর্ম স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্যনাশের কারণ হয়।' (সমাচার দর্পণ ১৩।৪।১৮২২)

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কেঁদুলী নিবাসী জনৈক শিশুরাম অধিকারী যাত্রাগানের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন এবং তার গৌরববর্দ্ধিতে সফলও হন। ঊনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি কৃষ্ণকমল গোস্বামী 'স্বপ্নবিলাস', 'দিব্যোন্মাদ বা রাই উন্মাদিনী' 'বিচিত্রবিলাস' প্রভৃতি পালা রচনা করে একাধারে বৈষ্ণবভক্তির প্রকাশ ও যাত্রার সংস্কার সাধন করতে যান। এ প্রয়াসে তাঁর ভাগ্যে খ্যাতি জুটলেও, পুরোপুরি সাফল্য জোটেনি। ফলতঃ কৃষ্ণযাত্রার আর বৈচিত্র্য ফিরে আসেনি।

এই বৈচিত্র্যহীনতা আর পাশ্চাত্যের প্রভাবে সদ্যউদ্ভূত মঞ্চ ও নাটকের আদর্শে সেসময় গড়ে উঠতে থাকে এক নতুন যাত্রা বা সখের যাত্রা। তাতে দেখা যায় কালুয়া-ভুলুয়া প্রভৃতির নৃত্যগীত। 'নাটকের অনুরূপ যাত্রা কল্পিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিদ্যা-সুন্দর যাত্রা সকলের প্রিয় বলিয়া বিখ্যাত আছে।' (বিবিধার্থসংগ্রহ ১৮৫৯)। 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত অন্য এক বিবরণ থেকে জানা যায়, '......কলিকাতাতে নূতন এক যাত্রার প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে অনেক২ প্রকার ছদ্মবেশধারী আরোপিত বিবিধ গুণ বর্ণনাকারী মনোহর ব্যবহারী অর্থাৎ সং হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ প্রথমতো বৈষ্ণব বেশধারী ২ সং আইসে দ্বিতীয়তঃ ১ সং কলিরাজা তৃতীয়তঃ ১ সং রাজার পাত্র চতুর্থ ১ সং দেশান্তারীয় বেশধারী বিবিধ উপদেশ-কারী পঞ্চতম ২ সং চট্টগ্রাম হইতে আগত পরিষ্কৃত বেশান্বিত এক সাহেব আর এক বিবী ষষ্ঠ ২ সং ঐ সাহেবের দাসদাসী এ সকল সং ক্রমে আগত একত্র মিলিত হইয়া বেশবিন্যাস হাস্যরহস্য সম্বলিত অঙ্গভঙ্গ পুরঃসর নর্তন কোকিলাদি স্বর নাকত মধুর স্বরে গান নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদন আশ্চর্য২ প্রশ্নোত্তর ক্রমে পরস্পর মৃদু মধুর বাক্যালাপ কৌশলাদির দ্বারা নানা দিগ্দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্বজন মনো মোহন প্রভৃতি করেন...।' (২৬।১।১৮২২)।

এই সময়ই কলিরাজার যাত্রা, কামরূপ যাত্রা, নন্দবিদায় যাত্রা, নলদময়ন্তী যাত্রা প্রভৃতি কয়েক প্রকারের যাত্রার সংবাদ পাওয়া যায়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এইসব সখের যাত্রায় নানা নতুনত্ব এলেও কাহিনী অংশ কিন্তু ধর্মনির্ভর ও ধর্মের জয়গানায় সোচ্চার। এমনকি বিদ্যাসুন্দর যাত্রাতে আদি-রসের বাহুল্য থাকলেও শেষ পর্যন্ত দর্শক দেবীমাহাত্ম্যেরই জয়গান। প্রসঙ্গত বলতে হয় যাত্রার কুরুচির প্রভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বজায় ছিল।

কলকাতায় নতুন যে থিয়েটার গড়ে ওঠে তা ছিল সাধারণের নাগালের বাইরে—অথচ যাত্রা বৈদগ্ধ রুচির পরিপন্থী। তাই সৃষ্টি হলো যাত্রা ও থিয়েটারের মাঝামাঝি গীতা-ভিনয়। ১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দ থেকে গীতা-ভিনয়ের খবর পাওয়া যায়। গীতাভিনয়কে স্বাগত জানিয়ে 'সংবাদ প্রভাকর'-এ বলা হলো —'প্রচলিত যাত্রাগুলির প্রতি যথার্থ সঙ্গীত-প্রিয় ব্যক্তিগণের নিদারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। সঙ্গভঙ্গি করিয়া নাটকের অভিনয় করা [illegible] কয়েকজন শিক্ষিত যুবক সামান্যতঃ অং-প্রণালীতে গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা এদেশের পক্ষে শ্লাঘনীয় অনুষ্ঠান সন্দেহ নাই।' (১৬।১১।১৮৬৫)।

শেষে গীতাভিনয়ের স্থান নেয় থিয়েট্রি-ক্যাল যাত্রা পার্টি ১৩২০-২৫ সাল নাগাদ। এই গীতাভিনয়ের যুগ এবং থিয়েট্রিক্যাল যাত্রার যুগ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সমস্ত পালা কাহিনীরই উৎসস্থল রামায়ণ, মহাভারত বা বিভিন্ন পুরাণ। প্রত্যেকেরই কেন্দ্রে রয়েছে ধর্ম এবং প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য অধর্মের নাশ ও ধর্মের জয়ের কথা ঘোষণা করা। মঞ্চের পৌরাণিক নাটকের মত যাত্রার পালাগুলিও ছিল মিলনাত্মক। দেখা গেছে, মর্তে সে মিলন সম্ভব না হলেও স্বর্গে বা বৈকুণ্ঠে দেখান হতো সে মিলন বা মেলতা দৃশ্য।

গীতাভিনয় যুগের শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় পালাকার মতিলাল রায়। তাঁর পালাগুলির মধ্যে আছে—তরণীসেন বধ, বিজয়চণ্ডী, সীতা অন্বেষণ, রাম বনবাস, রামরাজা, কর্ণবধ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, ভীষ্মের শরশয্যা, শ্রীক্ষেত্র মাহাত্ম্য, উমা সংবাদ, পারিজাত হরণ, হরিপাদপদ্মলাভ প্রভৃতি। প্রতিটি পালাই পৌরাণিক—ধর্ম প্রচারই তার উদ্দেশ্য। অন্য জনপ্রিয় পালা-কার অহিভূষণ ভট্টাচার্যের তুলসীলীলা, দণ্ডী পর্ব, বিরাট পর্ব বা উত্তরা পরিণয়, সুরথোদ্ধার প্রভৃতি ব্রজমোহন রায়ের অভিমন্যু বধ, তারকাসুর বধ, সাবিত্রী-সত্যবান, রামাভিষেক, কংস বধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল ইত্যাদি ও মদন মাস্টার বা মদন-মোহন চট্টোপাধ্যায়ের প্রহ্লাদ চরিত্র, ধ্রুব-চরিত্র, দুর্গামঙ্গল প্রভৃতিও পৌরাণিক ও ধর্মীয় কাহিনীতেই সমৃদ্ধ।

এযুগের অন্যান্য পালাকার সতীশচন্দ্র দাস দে'র সতী, মহীরাবণ বধ, প্রহ্লাদ চরিত্র, পার্বতীচরণ ভট্টাচার্যের পারিজাত হরণ, শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ, সুবল মিলন বা অক্রুর সংবাদ, কর্ণের দান পরীক্ষা, প্রবীর পতন বা জনা, নীলকণ্ঠ দত্তর শ্রীরামচন্দ্রের মহাবিলাপ, আশুতোষ চক্র-বর্তীর চন্দ্রহাস, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস, ধনকৃষ্ণ সেনের অনন্তদেবের হরিসাধন, সত্যনারায়ণ লীলা, পাণ্ডব মিলন, উত্তরাহরণ, নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের গুরুদক্ষিণা, নরমেধ যজ্ঞ, অন্নদাপ্রসাদ ঘোষালের জয়দ্রথ বধ, জরা-

মিলের বৈকুণ্ঠ লাভ, হারাধন রায়ের নল-দময়ন্তী, সুরথ উদ্ধার, মতিলাল ঘোষের বুদ্ধলীলা, লক্ষ্মণ বর্জন, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের দাতাকর্ণ, মহীরাবণ, দুর্গাসুর, রাম নির্বাসন, জয়দেব, অন্নপূর্ণা, কেশব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপ্তর্ষিসৃজন, জড়ভরত, ভোলানাথ রায়ের কালচক্র, অতুলকৃষ্ণ বসু মল্লিকের অতিকায়, নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়ের শ্মশানে মিলন, জ্ঞানেন্দ্র নন্দীর ধুন্ধুমার, অঘোর কাব্যতীর্থের যাজ্ঞসেনী, রাধাসতী, ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর বিন্ধ্যাবলী, ধনুর্যজ্ঞ প্রভৃতি প্রতি পালাই চিরাচরিত ভারতীয় আদর্শ ও ধর্মের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত।

জাতীয়জীবন ও উদ্দেশ্যের তাগিদে রঙ্গমঞ্চে স্বাদেশিকতা প্রচারের যে প্রবণতা দেখা দেয় তার প্রভাব এসে পড়ে যাত্রাতেও। মঞ্চের আদর্শে যাত্রা যেন হঠাৎই পৌরাণিক তথা ধর্মীয় পালার পরিমন্ডল ছেড়ে দেশাত্মবোধ প্রচারে আশ্রয় নেয় ঐতিহাসিক কাহিনীর। লোকশিল্প যাত্রার মধ্য দিয়েই জনমানসে সহজে স্বাদেশিকতার উদ্বোধন ঘটানো সম্ভব, এই কথাটা মনে রেখেই যাত্রা পালাকার ও দলগুলি এগিয়ে আসেন। স্বদেশমন্ত্র প্রচারে তাঁরা শুধু এগিয়েই আসেননি, সার্থকতার সঙ্গে কাজও করেছেন। তাঁদের সেইসব পালা গ্রামবাংলার বহু মানুষকে স্বাধীনতাযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে অনুপ্রাণিত করে। স্বাদেশিকতা প্রচারে চারণকবি মুকুন্দ দাসের অবদানের কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। তাঁর মাতৃপূজা, পথসাথী, পল্লীসেবা, সমাজ, ব্রহ্মচারিণী, কর্মক্ষেত্র প্রভৃতি পালা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। রাজদ্রোহের অপরাধে মুকুন্দ দাসকে কারাবাসও করতে হয়।

প্রসঙ্গত বলতে হয় মতিলাল, ধর্মদাস রায়, ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁদের পৌরাণিক পালার (গয়াসুরের পদ্মলাভ—মতি রায়, মথুরা বর্জন—ধর্মদাস মণিপুর গৌরব, মনোজবের মহামুক্তি—ভূপেন্দ্রনারায়ণ) মধ্য দিয়েও স্বাদেশিকতা প্রচার করেন। কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাতৃপূজা', হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'রণজিতের জীবনযজ্ঞ', অঘোরনাথ কাব্যতীর্থের 'প্রতাপাদিত্য', ফণী বিদ্যাবিনোদের 'মুক্তি' ইংরাজ সরকারের আদেশে আসরস্থ হতে পারেনি।

প্রাক স্বাধীনতা বা সদ্য স্বাধীনতা যুগে যাত্রাপালায় একই সঙ্গে চলল গান্ধীজীর অহিংসামন্ত্রের আর বিপ্লববাদের প্রচার। গান্ধীজীর অনশন সত্যাগ্রহের সমর্থনে রূপকচ্ছলে ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী লিখলেন, 'জরাসন্ধ', ব্রজেন্দ্রকুমার দে 'ধরার দেবতা'। অন্যদিকে শ্রীদে আজাদহিন্দ বাহিনী ও সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে লিখলেন 'স্বপ্নসাধনা', জিতেন্দ্রনাথ বসাক লিখলেন 'বিদ্রোহী বাঙালী'। এছাড়া পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের 'বাংলার বিপ্লবী ছেলে ক্ষুদিরাম', নন্দগোপাল রায়চৌধুরীর 'বিপ্লবী কানাইলাল', 'বিদ্রোহী বাঙালী', 'বিপ্লবী নেতা', পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাস্কর পণ্ডিত' 'টিপু সুলতান', অঘোর কাব্যতীর্থের 'মেবার কুমারী', ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর 'পঞ্চনদ', 'আদিশূর', বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'মেবার গৌরব', কানাইলাল শীলের 'দলমাদল', আনন্দময়ের 'শিবাজী', শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি পালার মধ্য দিয়েও ধ্বনিত হোল স্বাদেশিকতার বাণী।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর যাত্রা যেন কিছুকালের জন্য থমকে দাঁড়াল। এদিকে দেশ বিভাগ এ শিল্পের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও হানল প্রচন্ড আঘাত। চারিদিকেই তখন কী রকম যেন এক অস্থিরতা—অনিশ্চয়তা। এ অবস্থায় যাত্রাগুলি সেই পুরাতন ধর্মীয় আর পৌরাণিক পালার সঙ্গে ঐতিহাসিক পালাগুলি আসরস্থ করে যেতে লাগলেন। আর ওইসঙ্গে অভিনীত হতে থাকে কাল্পনিক পালাগুলি। সত্যি কথা বলতে কী, তখন যাত্রার আসরে কাল্পনিক নাটকগুলিরই ভীড় বেশী। হঠাৎ স্বাধীনতা আসায় যাত্রা যে তার লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছে তা এইসব পালা দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায়। তবে কল্পনার রাজ্যে ঘুরে বেড়ান প্রায় অবাস্তব ওইসব কাহিনীর মধ্যে দিয়েও ধ্বনিত হয়ে ওঠে যাত্রার শাশ্বত শ্লোগান—সত্যের জয়, মিথ্যার পরাজয়।

যাত্রা আর মঞ্চ পাশাপাশি এলেও, মঞ্চজগতে ১৯৪০-৪১ সাল থেকেই শুরু হয়ে যায় নবনাট্য আন্দোলন। ফলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নাটক এগিয়ে চলে বেশ জোর কদমে। যাত্রায় কিন্তু সে-সময় তেমন কোন আন্দোলন দানা বাঁধেনি—তাছাড়া সংস্কৃতি কেন্দ্র কলকাতায় মনোযোগ সে তখনও তেমন আকর্ষণ করতে পারেনি। তাই একই জায়গায় সে ঘুরপাক খেতে থাকে। তবে এ অবস্থা বেশীদিন চলেনি। পঞ্চাশের দশক থেকেই যাত্রায় ধ্বনিত হয়ে উঠতে থাকে সমাজজীবনের কথা—সামাজিক ন্যায় অন্যায় ও শাসনশোষণের কথা। এই পর্যায়েই রচিত হয় ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের নিয়ে বিনয়বাবুর 'বাস্তুহারা', শ্রমিক শোষণ নিয়ে নন্দবাবুর 'অগ্নিমন্ত্র', যারা না খেয়ে ধনীদের পেট ভরায়, সেইসব নির্যাতিতদের কাহিনী নিয়ে আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীবন-মরণ'।

ক্রমশ লক্ষ্য হলো স্থির। ওদিকে ১৯৬১-৬২তে কলকাতায় অনুষ্ঠিত যাত্রা-উৎসবের পর বিদগ্ধজনের দৃষ্টিও পড়ল এর ওপর। সমাজের নানা কথা নিয়ে একের পর এক রচিত হতে থাকে সামাজিক নাটক। যাত্রাদলগুলি সাহসের সঙ্গে আসরস্থ করে চলেন দেবেন নাথের 'যাত্রা হলো শুরু' ব্রজেনবাবুর 'জীবনযজ্ঞ', 'যাদের দেখে না কেউ', 'দোষী কে?', আনন্দময়ের 'যুগের দাবী', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'আগুন' প্রভৃতি।

ভেজালদার মুনাফাখোর, সমাজ বিরোধী ও শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে জনমত সংগঠনে এগিয়ে এলো যাত্রা। অভিনীত হতে থাকে 'একটি পয়সা', 'মূর্খের পাঁচালী', 'ধর্ম ভাঙার গান', 'অঙ্গার', 'জলন্ত বারুদ', 'ফাঁসীর মঞ্চে', 'এক টুকরো রুটী', 'মরেও যারা মরে না', 'রক্ত দিয়ে কিনলাম', 'আগুন নিয়ে খেলা', 'রিকসাওয়ালা' 'গরীব কেন মরে', 'আন্দোলন', 'রাইফেল' 'পদধ্বনি' ইত্যাদি পালা। একথা আজ বাস্তব সত্য, ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনৈতিক উত্থান-পতন ঘটে, তার পেছনে যাত্রার অবদান ছিল অনেকখানি। এ পর্বের নাট্যকারদের মধ্যে নাম করতে হয় ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যপ্রকাশ দত্ত, ব্রজেন দে, শম্ভু বাগ, প্রসাদ ভট্টাচার্য, কানাই নাথ, দেবেন নাথ, নির্মল মুখার্জি, উৎপল দত্ত প্রভৃতির।

শুধু তাই নয়, ষাটের দশকেই পালা-রচনায় এগিয়ে এলেন বিধায়ক ভট্টাচার্য, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, দেবনারায়ণ গুপ্ত, উৎপল দত্ত প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠিত নাট্যকার ও সাহিত্যিকরা।

তবে সামাজিক পালাগুলি যখন যাত্রার আসরে জাঁকিয়ে বসেছে, সেই সময়ই কিন্তু আবার আসরস্থ হতে থাকে জাতীয়তাবোধক পালা 'মৃত্যুঞ্জয়ী সূর্য সেন', 'জালিয়ানওয়ালাবাগ', 'সিপাহী বিদ্রোহ', 'বিনয়-বাদল-দীনেশ', 'সুভাষচন্দ্র', 'চারণকবি মুকুন্দ দাস', 'বাঘা যতীন', 'আমি সুভাষ' ইত্যাদি। এ দশকের আরেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা জীবনী ও আন্তর্জাতিক নাটকের নাট্যরূপায়ণ। জীবনীপালা হিসেবে পাওয়া গেছে 'মাইকেল মধুসূদন', 'করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর', 'রাজা রামমোহন' প্রভৃতি।

জাতীয়তাবাদের স্বাভাবিক পরিণতিই আন্তর্জাতিকতায় উত্তরণ। তাই হঠাৎ হলেও, যাত্রায় আন্তর্জাতিকতা এলো, সূচিত হলো এক বিরাট অগ্রগতি। 'হিটলার' পালার মধ্য দিয়েই যাত্রার আসরে প্রথম আন্তর্জাতিক চরিত্রের আবির্ভাব। তারপর আমরা পাই 'লেনিন', 'নেপোলিয়ন' প্রভৃতিকে। পাই ভিয়েৎনামের বীর বিপ্লবীদের কাহিনী নিয়ে রচিত 'বিপ্লবী ভিয়েৎনাম', আফ্রিকার বুকে শ্বেতাঙ্গ অত্যাচারের কাহিনী 'রক্তাক্ত আফ্রিকা', রুশ কম্যুনিস্ট আন্দোলনের কথা 'রাহুমুক্ত রাশিয়া' বা বাঙালীদের মুক্তি সংগ্রামের কাহিনী 'আমি মুজিব বলছি', 'জয় বাংলা' প্রভৃতি। এ সবের পালাকাররূপে পেয়েছি শম্ভু বাগ, দেবেন নাথ, উৎপল দত্ত, রমেন লাহিড়ী, অরুণ রায় প্রভৃতিকে।

একদিন দেব-দেউলের প্রাঙ্গণ থেকে পৌরাণিক কাহিনীকে আশ্রয় করে যে যাত্রার শুরু—তা দৈনন্দিন সামাজিক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা ও অবিচারের কথায় সোচ্চার হয়ে জাতীয়তার পথে আজ এসে মিলেছে আন্তর্জাতিকতার মহামিলন ক্ষেত্রে। আজকের যাত্রায় তাই আর কোন গন্ডী নেই —আবর্তনের পথে সে আজ পরিপূর্ণ।

রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠিত গ্রামোফোন কোম্পানীর গানের আসরে পুজো রেকর্ড শিল্পীবৃন্দ : কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, ইলা বসু, শ্রাবন্তী মজুমদার, বনশ্রী সেনগুপ্ত, ললিতা ধরচৌধুরী নির্মলা মিশ্র, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা গুহঠাকুরতা, অনুপ ঘোষাল, মিন্টু দাশগুপ্ত, মিন্টু ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু চৌধুরী এবং শৈলেন মুখোপাধ্যায় ফটোঃ অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

'আপন জন', 'আটাত্তর দিন পরে', 'এখনই', 'ইণ্টারভিউ', 'তিন ভুবনের পারে' প্রভৃতি বর্তমানের যুব সমস্যা-ছোঁওয়া বাঙলা ছবির দেখাদেখি হিন্দী ছবি তৈরী করবার লোভ বোধকরি বোম্বাই ও মাদ্রাজের চিত্র-প্রযোজকদের পেয়ে বসেছে। কিন্তু মাত্র যুব-সমস্যাকে উপজীব্য করে যে-ছবি তৈরী হবে, তার আর্থিক সাফল্য সম্পর্কে স্থির-নিশ্চয় না হতে পেরে তাঁরা ঐ সমস্যার পাশাপাশি রাখেন তাঁদের ছবি তৈরীর সাধারণ ফর্মুলাটি, যাতে আছে প্রেম, প্রণয়, প্রতিদ্বন্দিতা, খল-নায়কের সঙ্গে নায়কের মারপিট, সাসপেন্স এবং আরও অনেক কিছু। তাই মাদ্রাজের প্রগতি চিত্র ইণ্টার-ন্যাশনাল নিবেদিত, বীরেন্দ্র সিংহ রচিত ও প্রযোজিত এবং বি, দুত্তাব পরিচালিত 'খুনিয়াদ' ছবিতে প্রাণ ও শত্রুঘ্ন সিংহের মতো জবরদস্ত দুজন চরিত্রাভিনেতার দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও রাকেশ রোশনের প্রয়োজন ঘটেছে রোমাণ্টিক নায়ক চরিত্রে অভিনয় করবার জন্যে। প্রাণ ও শত্রুঘ্ন সিংহের একই ছবিতে উপস্থিতি দর্শকমনে যে প্রত্যাশা জাগায়, দুই 'অসৎ চরিত্রাভিনেতা'র অভিনয়ক্ষমতার 'লড়াই' দেখবার জন্যে দর্শকের মনে যে ঔৎসুক্য জাগে, তার কিছুই পূর্ণ হয় না এই 'খুনিয়াদ' ছবিতে। কারণ, এখানে প্রাণ নেমেছেন একটি মহৎ চরিত্রে—আজিজ আহমেদ এমন একজন ন্যায়নিষ্ঠ সেসন জজ, যিনি যৌবনে তাঁর স্ত্রীকে পরপুরুষগামী হতে দেখে তাকে 'তালাক' দিয়েই খুশী থাকেন। এবং একদিন কলেজের পারি-তোষিক বিতরণী সভায় যে যুবককে তিনি পড়াশুনো, খেলাধুলো, তর্ক-প্রতিযোগিতা প্রভৃতি সর্ববিষয়ে প্রথম হবার জন্যে মেডেল, কাপ, শীল্ড প্রভৃতি দ্বারা পুরস্কৃত করে খুশী মনে তারিফ করেছেন, সেই যুবক বলবীর যেদিন তাঁর আদালতে নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত, সেদিন তিনি সাক্ষ্যপ্রমাণ-দৃষ্টে তাকে ন্যূনতম শাস্তি হিসেবে দশ বছরের জন্যে কারাগৃহে প্রেরণ করতে দ্বিধা করেননি। জেলের গাড়ী যখন যুবক বলবীরকে নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত, তখন জজসাহেব দেখলেন ও শুনলেন, বলবীর তার একমাত্র নাবালিকা ভগ্নীকে আশ্বাস দিয়ে বলছে, পচা, ঘুণধরা আইনকানুন দ্বারা চালিত হয়ে অক্ষমের ওপর অত্যাচারের প্রতিবিধান না করে যে বিচারক তাকে জেলে পাঠালেন, তাকে সে কোনোদিন ক্ষমা করবে না। —বলবীরের জেলে যাবার পরেই শুরু হয়ে যায় অন্য কাহিনী অনেক-দিন বাদে—অনেক বছর বাদে। কলেজের ছেলে অজিত তারই কলেজের মেয়ে সালুর সঙ্গে বহু আয়াস করে ভাব করে এবং যখন তারা ঠিক করে পরস্পরকে বিবাহ করে সুখী হবে, তখন সালুর বাবা জজ আজিজ আহমেদ আসেন অজিতের বাবার সঙ্গে বিবাহ সম্পর্কিত কথাবার্তা কইতে। কিন্তু তিনি অজিতের বাড়ীতে এসে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেন, তাঁরই 'তালাক' দেওয়া স্ত্রী অজিতের বিমাতা সেজে বসে আছে। —কাজেই ঘৃণাভরে স্থানত্যাগ করা ছাড়া তাঁর অন্য উপায় রইল না। একদিন যে ছিল সলমা, সে আজ সালোনী। শুধু তাই নয়। বিমাতা-সাজা সালোনী নিজেই অজিতের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী এবং সেই কারণে সে অজিতের সঙ্গে সালুর বিবাহ হবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত অজিত নিজ গৃহ থেকে বিতাড়িত হয় সালোনীর চক্রান্তে। অপরদিকে দশ বছর বাদে বাঙ্গালোর সেণ্ট্রাল জেল থেকে বেরিয়ে বলবীর সোজা আসে জজ সাহেব আজিজ আহমেদের বাড়ীতে 'বদলা' নিতে। যখন জজ সাহেব তাকে উপদেশবাণী শোনাতে আরম্ভ করেন, তখন বলবীর তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে : আপনি দুটো কাজ পারেন, এক, লোককে সাজা দিতে, আর দুই, ভালো বক্তৃতা দিতে। কিন্তু পদাধিকার নেই বলে প্রথমটা আমি পারি না, কিন্তু দ্বিতীয়টা যে আমি পারি এবং ভালোভাবেই পারি, তা আপনি জানেন।

খুব উদারতা অবলম্বন করে আমাকে দশ বছরের জন্যে জেলে পাঠিয়ে আমার চরিত্রে যে কলঙ্ক লেপন করেছেন, তার পরে আমি কি করব, বলতে পারেন? ——জজ সাহেব নীরব রইলেন কিছুক্ষণের জন্যে। পরে বললেন, আমি আইনের দ্বারা বাধ্য হয়ে তোমার হয়ত ক্ষতি করেছি, কিন্তু একটা বিষয়ে তোমাকে নিশ্চিন্ত করেছি। —এই যে আমার মেয়ে সালুকে দেখছ, এ আর কেউ নয়, তোমারই সেই ছোট বোন। এর পর বলবীরের জজসাহেবকে কৃতজ্ঞতা জানানো ছাড়া আর কিই বা করার থাকতে পারে? এক সময়ে দেখা যায় বলবীর ও অজিত শ্রমিকের কাজ করছে। কিন্তু সেটা ক্ষণিকের দৃশ্য। তার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে বলবীরকে অজিতের বিমাতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা। ছবির শেষদিকে দেখা যায়, অজিত এবং বলবীর—দুজনেই একটু আগে—পরে সালোনীকে হত্যা করল। বিচারের দৃশ্যে যখন দেখা যায়, ওদের প্রত্যেকেই নিজেকে হত্যাকারী বলে অপরকে বাঁচাতে চাইছে, তখন আজিজ আহমেদ এসে এজাহার দেন যে, তিনি নিজে সালোনীর হত্যাকারী এবং স্বহস্তে তাকে হত্যা করবার জন্যেই তিনি তাঁর বিচারকের পদে ইস্তফা দিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, কাহিনীর মধ্যে সামাজিক অন্যায়, অবিচার, যুবকদের ধর্ম, ন্যায় প্রভৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা, নতুন সমাজগড়া প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা থাকলেও একদিকে সলমা বা সালোনীর কামলোলুপতা এবং অপরদিকে অজিত ও সালুর প্রেম চিত্র-কাহিনীতে এমন প্রাধান্য পেয়েছে যে, এর মধ্যে শত্রুঘ্ন সিংহ অভিনীত বলবীর চরিত্রটিকে কেন সন্নিবেশ করা হয়েছে, তা বুঝে ওঠা রীতিমত কঠিন ব্যাপার। এবং প্রাণকে যদি একটি 'মহৎ' চরিত্রেই অবতীর্ণ করানো হল, তাহলে তার পাশে শত্রুঘ্ন সিংহকে দাঁড় করানো হল কেন? বহু কিছু মিলে একটি জগাখিচুড়ী সৃষ্টি হয়েছে বৈত নয়?

ছবির অভিনয়াংশে আছেন প্রাণ, শত্রুঘ্ন সিংহ, রাকেশ রোশন, যোগিতা বালী, বিন্দু, ফরিদা জালাল, ফরিয়াল এবং আরও অনেকে। কিন্তু এই জগাখিচুড়ী কাহিনীতে নাটনৈপুণ্য দেখাবার সুযোগ কোথায়? সালোনীর কামোন্মত্ততা অত্যন্ত অরুচিকর এবং দর্শকসমাজের পক্ষে অস্বাস্থ্যকরও বটে।

ছবির কলাকৌশলেও বিভিন্ন বিভাগের কাজ বর্তমানের হিন্দী চিত্রের মাপকাঠি অনুযায়ী ভালোই। ছবির মধ্যে আকর্ষণীয় বস্তু হচ্ছে এর গান। আনন্দ বকসী রচিত গানগুলি লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলালকৃত সুর-সংযোগে অত্যন্ত শ্রুতিসুখকর হয়ে উঠেছে।

যাত্রাপালাভিনয়

লোকনাট্য নিবেদিত 'সন্ন্যাসীর তরবারি' ও 'বড়বৌদি'

'ও পি—ও পোড়ারমুখী—ও প্রফুল্ল—' বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসের প্রথম লাইনটি, বোধ করি, এইরকমই কিছু। —এবং প্রফুল্ল ওরফে দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে আরও মনে পড়ে তাঁর গুরু ভবানী পাঠক ও স্বামী ব্রজেশ্বরকে, প্রফুল্ল যাকে দিয়ে তার নিজের পা টিপিয়ে নিয়েছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলের সন্ন্যাসী-বিদ্রোহকে অবলম্বন করেই বঙ্কিমচন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন তাঁর 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাস। সেই সন্ন্যাসী-বিদ্রোহই আজ নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে উৎপল দত্তের লেখনী মুখে 'সন্ন্যাসীর তরবারি' নাম নিয়ে একটি যাত্রা-পালার আকারে। হেস্টিংসের দুই প্রতিনিধি রেনেল ও ক্লিফটনের অত্যাচারে সমগ্র বাঙলাদেশ যখন উৎপীড়িত, অন্নাভাবে দুর্ভিক্ষের দ্বারে উপনীত, সেই সময়ে ঐ দুই পিশাচের প্ররোচনায় বাজপুরের জমিদার শশাঙ্ক দত্ত ভূতনাথ চৌধুরীর সম্পত্তি গ্রাস করবার উদ্দেশ্যে তার স্ত্রী প্রফুল্লমণির চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করে তার নাবালক পুত্র গৌরদাসের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তাকে সমাজচ্যুত করে। এই সময়ে ভবানী পাঠক কৃপানন্দ নাম ধারণ করে সন্ন্যাসী দল প্রতিষ্ঠিত করেন ইংরাজের পশুশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করবার জন্যে। এই দলে বাজপুরের জগাই যোগ দিয়ে হয়ে উঠল রামানন্দ গিরি। এবং প্রফুল্লমণি হলেন দেবী চৌধুরাণী। এদের কার্যকলাপে শঙ্কিত হয়ে ওঠে ইংরেজ। গুপ্তহত্যার ফলে বহু ইংরেজ অফিসার প্রাণ হারায়। শেষ পর্যন্ত শশাঙ্কের প্রাণনাশ করে তার গৃহ থেকে গৌরদাসকে উদ্ধার করে রামানন্দ রেনেলের কাছে আত্মসমর্পণ করে। পরে তাকে কারাগারে বন্দী অবস্থায় গুপ্তভাবে হত্যা করা হয়। ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধে সরাসরি জয়ী না হলেও কৃপানন্দের সন্ন্যাসী দল

বসন্তবিলাপ/অনুপকুমার, রবি ঘোষ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং চিন্ময় রায়।

বাঙলাদেশকে যে নেতৃত্ব দিয়েছিল, তার যথার্থ রূপটি শ্রীদত্ত এই পালার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। শ্রীদত্ত রচিত এই নাটকের সংলাপ, ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি, কৌতূহল এবং আবেগ সৃষ্টির বিশেষ মুহূর্তগুলি ও সর্বোপরি এর গতিশীলতা দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। এই সঙ্গে এর আকর্ষণীয় সঙ্গীতাংশ এই নাটকটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

অভিনয়ে রামানন্দ গিরি, দেবী চৌধুরাণী, শশাঙ্ক দত্ত ও রেনেলের ভূমিকায় শেখর গাঙ্গুলী, বর্ণালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাদি চক্রবর্তী এবং ইন্দ্র লাহিড়ী পালা-নাটকটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। অপরাপর ভূমিকায় সুঅভিনয় করেছেন অনুপকুমার, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন ঘোষ, মধুসূদন ভট্টাচার্য, তপন বিশ্বাস, অনন্ত মাইতি, ফণী লস্কর, অঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজা দেবী, স্বপ্না সাহা এবং অরুণা গোস্বামী।

লোকনাট্যের দ্বিতীয় নিবেদন হচ্ছে নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত পঞ্চাঙ্ক সামাজিক নাটক 'বড়বৌদি'। পালা-নাটকটির কাহিনীকাল গ্রামবাঙলায় জমিদারী অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের যুগ। যে যুগে জমিদারের ছিল অখণ্ড প্রতাপ, সেই ছিল রক্ষক ও ভক্ষক এবং যে-যুগে মানুষ একদিকে যেমন ছিল উদার, অন্যদিকে তেমনই ছিল সংকীর্ণমনা, অভিমানী, সহজে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী। হিজলডাঙ্গার জমিদার রামেশ্বর চৌধুরীর বড়ো ভাই মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আবির্ভূত হল বড়োবৌ ব্রজবালার জ্ঞাতি-ভাই শান্তশীল, যে মহাভারতের শকুনির মতোই কুচক্রী। তারই চক্রান্তে পড়ে ব্রজবালা তাঁর অত্যন্ত স্নেহের দেবরের প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন, তাঁর ছেলে বরুণ হয়ে উঠল তার কাকার প্রতি দুর্বিনীত এবং উচ্ছৃঙ্খল। রামেশ্বর বড়োবৌদির প্রতি অভিমানভরে ক্রমে ক্রমে নিজের অংশ হারাতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি প্রায় পথের ভিখারীতে পরিণত হলেন। এমন সময়ে অপরপক্ষেও ঘনিয়ে এল ঘোর দুর্দিন শান্তশীলের কারসাজিতে। সরকারে দেয় খাজনার টাকা হল লুঠ, প্রজা মানিক মণ্ডলের মেয়ে ফুলমণি হল নিখোঁজ। একদিকে জমিদারী যায় যায়, অন্যদিকে ছেলে বরুণ হল পুলিশের হাতে বন্দী। এই সংবাদ গিয়ে পৌঁছুল রামেশ্বরের কাছে। চৌধুরীবংশের ঘোরতর দুর্দিনে তিনি জেগে উঠলেন। সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিয়ে প্রজাদের দোরে দোরে হাত পেতে যোগাড় করলেন সরকারে দেয় খাজনার টাকা, শান্তশীলের কারসাজি ভাঙলেন বাপ-বেটায়। বরুণেরও চৈতন্যোদয় হল সমস্ত দেখেশুনে এবং বড়ো বৌদির সংসারে আবার ফিরে এল সুখ, সমৃদ্ধি—রামেশ্বর আর তাঁর থেকে দূরে রইলেন না।

বড়ো বৌদি ব্রজবালার দেবরের প্রতি অগাধ ভালোবাসা সত্ত্বেও তার প্রতি অবিশ্বাস জন্মানো এবং মান-অভিমানের ফলে দুজনের মধ্যে ক্রমেই ব্যবধানের সৃষ্টি—যথেষ্ট কার্যকারণসম্পর্কযুক্ত এবং অধিকতর বিশ্বাস্যভাবে গড়ে তোলবার অবকাশ আছে। মনে হয় নাটকটির প্রথমাংশটিতে আরো মনোনিবেশ ক[রে] পরিস্থিতিগুলিকে স্বচ্ছরেখায় চিত্রি[ত] করার প্রয়োজন আছে। তাহলে পালা নাটকটির অপরার্ধ দর্শককে ঢের বেশ[ি] অভিভূত করতে সমর্থ হবে।

অভিনয়ে রামেশ্বর, বরুণ, তরু[ণ] হরিহর, শান্তশীল, ভৃগুরাম, ব্রজবালা ও মধুমতীর চরিত্রে যথাক্রমে শেখর গাঙ্গুলী, অনাদি চক্রবর্তী, ইন্দ্র লাহিড়ী, রমে[শ] ভাদুড়ী, তপন বিশ্বাস, অনুপকুমার, ফিরোজা দেবী ও বর্ণালী বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যনৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। অপরাপর চরিত্রে নিরঞ্জন ঘোষ, গোকুল দেবনাথ, ফণী লস্কর, অঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা বসু, স্বপ্না সাহা ও সত্য অধিকারী সু-অভিনয় করেছেন। রঘুনাথের ভূমিকায় বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের গানগুলি হৃদয়স্পর্শী।

স্টুডিও সংবাদ

আজ থেকে ২৫ বছর আগের কথা—'দৃষ্টিদান' ছবিতে অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় নামে এক নবাগত শিল্পী ছোট্ট একটা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, সেটা খুব সম্ভব ১৯৪৭ সালের কথা। সে ছবিতে নায়ক-নায়িকা ছিলেন অসিতবরণ ও সুনন্দা দেবী।

অনেক আশা নিয়ে, স্বপ্ন নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে আস্তে আস্তে পা ফেলে এগিয়েছে অরুণ। একদিন সে বড় হবে, শিল্পীজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সবার মন জয় করবে। তারপর একে একে অভিনয় করেছে 'মায়াডোর' (হিন্দী—খুব সম্ভব ১৯৪৮ সালে, যদিও সেই ছবি মুক্তি পায় নি) 'মর্যাদা' এবং 'কামনা'। কিন্তু কিছুতেই সুবিধে করতে পারলো না। কিন্তু তা বলে নিরুৎসাহ হয় নি বরঞ্চ জেদ বেড়েছে। চলার পথে প্রতি পদে বাধা এসেছে—এসেছে ক্লান্তিকর পরিস্থিতি। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও দমে যায় নি। নতুন উদ্যমে, নতুন আশায় বুক বেঁধে আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে গেছে ধীর পদক্ষেপে।

হ্যাঁ, অবশেষে ভাগ্যলক্ষ্মী তার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়েছেন। তদানীন্তন এম, পি স্টুডিওতে ভাগ্যান্বেষণে গিয়েছিলেন অরুণকুমার। ওকে দেখে ভাল লাগলো অগ্রদূত-গোষ্ঠীর অন্যতম শ্রীবিভূতি লাহার। তিন বছরের জন্য অরুণকুমারকে 'একসক্লুসিভ আর্টিস্ট' হিসেবে চুক্তিবদ্ধ করলেন এম, পি প্রোডাকসন্স। এবারে নতুন নামে অর্থাৎ অরুণকুমার থেকে উত্তমকুমারের জন্ম হোল। অগ্রদূতগোষ্ঠীর পরিচালনাধীনে প্রথম ছবি 'সহযাত্রী'। সেই ছবিতে বাঙলার শিল্পীরা এই নবাগত শিল্পীকে সাদরে বরণ করে নিলেন। তারপর একে একে এম, পি-র 'কার পাপে', 'সাড়ে চুয়াত্তর', 'বসু পরিবার' (১৯৫৩) ছবিতে অভিনয় করে শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নিলেন।

তারপরে এল অগ্রদূত-এর 'অগ্নি-পরীক্ষা'। ঐ ছবিতে খ্যাতির চরমসীমায় পৌঁছুলেন উত্তমকুমার। বাঙলার চলচ্চিত্রাকাশে উদিত হল এক নতুন উজ্জ্বল

আঁধার পেরিয়ে/মাধবী চক্রবর্তী এবং অনিল চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা : তপন সিংহ। ফটো : অমৃত

জ্যোতিষ্ক। তারপর একে একে এসেছে অর্থ, খ্যাতি আর যশ। এটা ১৯৭২ সাল—শিল্পী হিসেবে উত্তমকুমারের পঁচিশ বছর পূর্ণ হোল। এই দীর্ঘ পঁচিশ বছরে অনেক শিল্পী এসেছেন, অনেক নতুন নায়কের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত উত্তমকুমারের সমকক্ষ কেউ হতে পারেননি।

বাঙলা ও বাঙালীর গৌরব মহানায়ক উত্তমকুমারের শিল্পীজীবনের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে অমৃতের তরফ থেকে কামনা করি সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও শিল্পীর দীর্ঘজীবন।

●

অন্যান্য বছরের মত এবারেও পুজোর আগে সিনেমাকর্মী ও মালিকদের মধ্যে বোনাস, ভাতা এবং অন্যান্য দাবী-দাওয়া নিয়ে বিরোধ চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। দুটো হিন্দী ও দুটো বাঙলা ছবি এ সপ্তাহে মুক্তিলাভ করার কথা ছিল কিন্তু তার মধ্যে দুটো হিন্দী ও একটা বাঙলা (মেমসাহেব) মুক্তিলাভ করছে বলে খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে। রূপবাণী, ভারতী, অরুণা-য় 'ছিন্নপত্র' ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু সিনেমা-কর্মী ও মালিকদের বিরোধের ফলে রূপবাণী চিত্রগৃহে লক-আউট চলছে গত শুক্রবার ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে। তাই এই সপ্তাহে ছবিটি মুক্তিলাভ করতে পারছে না। এই বিরোধ যদি না মেটে তাহলে হয়তো এই ছবিটি আগামী সপ্তাহেও মুক্তিলাভ করবে না। তাছাড়া মিনার, বিজলী, ছবিঘরেও লক-আউট চলছে এবং শুনতে পাওয়া যাচ্ছে কলকাতা ও মফস্বলের অন্যান্য চিত্রগৃহে বোনাসের বিরোধ ক্রমশ চরম পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। যদি পুজোর আগে এ বিরোধ না মেটে তাহলে হয়তো মালিকরা লক-আউটের সিদ্ধান্ত নেবেন। কর্মীরা তাদের ন্যায্য পাওনা না পেলে ধর্মঘট ইত্যাদি করবেন বলে স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

আজ চিত্রশিল্পের বিভিন্ন সমস্যার কথা সর্বজনবিদিত। তার ওপর 'গোদের ওপর বিষফোঁড়া'র মত হঠাৎ এই আকস্মিক পরিস্থিতিতে চলচ্চিত্র প্রযোজক-পরিবেশক মহল স্বভাবতই উদ্বিগ্ন।

সিনেমাকর্মী ও মালিকদের কাছে আমাদের অনুরোধ যতশীঘ্র সম্ভব সাময়িক এ বিরোধ মিটিয়ে এ শিল্পে শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে এনে নতুন চিত্রমুক্তির পথ প্রশস্ত করুন।

●

ভারতবিখ্যাত গায়ক জয়ন্ত মুখার্জি—খ্যাতি, যশ, অর্থ তার জীবনটাকে ঘিরে ফেললেও, সে কিন্তু তার জীবনটাকে একটা জুয়োর পাশা ছাড়া আর কিছুই ভাবে না।

ভালবাসায় তার বিশ্বাস নেই, ভালোবেসেও তার ততোধিক অবিশ্বাস। পথে, ঘাটে গেয়ে, বাজিয়ে অত্যাচারী আত্মীয়ের বাড়ী আশ্রিত হয়ে লোকেদের সহানুভূতি, হীনতা দেখতে দেখতে কখন যে সে সকলের নয়নের মণি হয়ে দাঁড়িয়েছে, ভাবতে গেলে এখন স্বপ্ন বলে মনে হয়।

কিন্তু সে জানে তার চারপাশে শুধু নিকষ কালো অন্ধকার। অথচ দাঁড়িয়ে আছে সে একটা আলোকিত বৃত্তের মাঝখানে। পরিক্রমণ করে চলেছে একটা উজ্জ্বল আলোকিত পটভূমি। কিন্তু সেই আলো, সেই উজ্জ্বলতা কিছুই দীর্ঘস্থায়ী নয়। যে কোন মুহূর্তে নিভে যেতে পারে, যে কোন মুহূর্তে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে—আরো গভীর, গভীরতর অন্ধকারে। কিন্তু এই ঘন অন্ধকারের ওপারেই আছে বিরাট এক আলোর জগৎ। সেখানকার সে আলো মেকী নয়, কৃত্রিম নয়।

স্বাতী যেন তার জীবনের সেই আলোর জগতের প্রতীক। কিন্তু তার পরিবেশ যে তাকে অন্ধমোহের জালে অক্টোপাশের মত বাহু মেলে ঘিরে আছে। এই অন্ধকারটুকু পেরিয়ে সে কি পৌঁছুতে পারবে সেই আলোর জগতে—যেখানে কিছুই মেকী নয়, কিছুই কৃত্রিম নয়......??

খ্যাতি ও সম্পদের সোনার খাঁচা-য় আবদ্ধ এক সঙ্গীতশিল্পীর জীবনযন্ত্রণার ইতিবৃত্ত নিয়ে গড়ে উঠেছে সরকার ফিল্মস প্রযোজিত 'সোনার খাঁচা' ছবিটি। কাহিনী রচনা ও সঙ্গীতে আছেন বীরেশ্বর সরকার। মিহির সেনের চিত্রনাট্যে ছবিটি পরিচালনা করেছেন—অগ্রদূতগোষ্ঠী। 'সোনার খাঁচা'র প্রোজেকশান আমি দেখেছি। এ ছবিটি সাধারণ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করবে বলে আমার বিশ্বাস। জয়ন্ত মুখার্জি ও স্বাতীর চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেছেন—উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন। অন্যান্য চরিত্রে আছেন—সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, তরুণকুমার, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, কণিকা মজুমদার, সুলতা চৌধুরী, রবীন মজুমদার প্রভৃতি।

ছবিতে মোট ৬ খানা গান আছে। গেয়েছেন—লতা মঙ্গেশকর, হেমন্ত মুখার্জি, দ্বিজেন মুখার্জি, মৃণাল চক্রবর্তী, মীনা মুখার্জি, কবরী নাথ ও শম্পা সরকার। সুরের বৈচিত্র্যে ও গাওয়ার গুণে অন্ততপক্ষে ৩ খানা গান হিট করবে বলে আমার বিশ্বাস। চণ্ডীমাতা ফিল্মসের

পরিবেশনায় 'সোনার খাঁচা' রূপবাণী, ভারতী, অরুণায় মুক্তিপ্রতীক্ষায়।

শেষ বিচার : সোমা ফিল্মসের প্রথম নিবেদন 'শেষ বিচার' ছবিটির কয়েকটি গান ২৪শে সেপ্টেম্বর সুধীন দাশগুপ্তের সুরে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে গৃহীত হয়েছে। গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন—আরতি মুখার্জি। এ ছাড়া অকটোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে আরও চারটি গান রেকর্ড করা হবে। সুখেন দাসের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করছেন—জগন্নাথ চ্যাটার্জি। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে শক্তি ব্যানার্জি, অনিল সরকার ও সুধীর খাঁ। চরিত্রচিত্রণে আছেন—উত্তমকুমার, শুভেন্দু চ্যাটার্জি, নবাগতা রীতা রায়, শ্যামল ঘোষাল, তরুণকুমার, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরনাথ মুখার্জি, মণ্টু ব্যানার্জি, শিবেন ব্যানার্জি, অজয় ব্যানার্জি ও চন্দ্রাবতী দেবী। অকটোবর মাসের প্রথমার্ধেই ছবিটির চিত্রগ্রহণ শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। জে, কে, ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

মুক্তি প্রতীক্ষায় শবরী : চিত্রশিল্পী অশোককুমার দাস পরিচালিত প্রথম ছবি 'শবরী'র সেন্সার সম্প্রতি হয়ে গেছে। সম্ভবত এই বছরের শেষদিকে ছবিটি মুক্তিলাভ করবে রঙলোক পিকচার্সের পরিবেশনায়। স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি করেছেন পরিচালক অশোক দাস। সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী কাহিনী নিয়ে গানে-নাচে ভরা এই ছবির সুরকার নচিকেতা ঘোষ। মান্না দে এবং আরতি মুখার্জি গানগুলি গেয়েছেন। 'শবরী' ছবির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন অনুপকুমার, বিদ্যারাও, সুব্রতা চ্যাটার্জি, বঙ্কিম ঘোষ, মন্মথ মুখার্জি, গীতা দে, অশোক চ্যাটার্জি, বাসন্তী চ্যাটার্জি, শিবু গোস্বামী ও মঞ্জুশ্রী বসু। এই ছবির কলাকুশলীরা হলেন রমেন ঘোষ—সম্পাদক, অতুল চ্যাটার্জি—শব্দযন্ত্রী, জগবন্ধু সাউ—শিল্পনির্দেশক ও দীপক হালদার—কর্মসচিব।

হাসির ছবি 'বসন্তবিলাপ' : দীনেন গুপ্ত তাঁর সর্বাধুনিক ছবি 'বসন্তবিলাপ'-এর চিত্রগ্রহণ শেষ করে ফেলেছেন। বিমল করের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। হাস্যরসসমৃদ্ধ এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, রবি ঘোষ, কাজল গুপ্ত, অনুপকুমার, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, শিবানী বসু, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, তরুণকুমার, বঙ্কিম ঘোষ, হরিধন মুখোপাধ্যায়। সোনালী প্রোডাকসন্স নিবেদিত এবং সুধীন দাশগুপ্ত সুরারোপিত 'বসন্তবিলাপ' ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব পিয়ালী পিকচার্সের।

মঞ্চাভিনয়

মুক্তধারা : রবীন্দ্রনাথের যে কোন নাটকের মঞ্চরূপায়নই একটু স্বতন্ত্র ধরনের এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের প্রোজ্জ্বলতাতেই নাটকটি নতুনতর বৈশিষ্ট্যে অর্থময় হয়ে ওঠে। সেদিন শিশিরমহলে'র মঞ্চে পরিবেশিত 'মুক্তধারা' নাটকটির অভিনয় ভঙ্গিমায়ও এই সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। নাটকটি প্রযোজনা করেছিলেন 'অনামী'র শিল্পীরা। উপলক্ষ্য ছিল সংস্থার বাৎসরিক উৎসব।

প্রাণময়তার মুক্তধারার কাছে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় সংস্কারের পাষাণ প্রচীর, হয়তো এই সত্যেরই ইঙ্গিত দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই নাটকটি। নাটকটির গভীরতর বক্তব্যের কথা মনে রেখে প্রায় প্রতিটি শিল্পীই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছেন চরিত্রের অতল গভীরে যেতে। প্রচেষ্টার এই নিষ্ঠাই প্রযোজনাটিকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পেরেছে।

ব্যক্তিগত চরিত্রচিত্রণে দক্ষতা দেখিয়েছেন মালতী চ্যাটার্জি (অম্বা), মলয় বক্সী (কংকর), শান্তি সরকার (কুন্দন), দুলাল গাঙ্গুলী (রঞ্জন), বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (গণেশ), তারক সরকার (হুব্বা), সব্যসাচী মজুমদার (ছাত্র)। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন অমল দাশগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন মিত্র, কমলা নিয়োগী, সুপ্রকাশ সান্যাল, সন্তোষ দে।

আলোকসম্পাত ও সংগীতপরিকল্পনায় দু' একটি মুহূর্তে যেন গভীরতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু মঞ্চসজ্জায় সুগভীর শিল্পবোধের পরিচয় রেখেছেন শ্রীভাস্কর।

অমৃতস্য পুত্রা : রতন ঘোষের 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' নাটকটি সম্প্রতি রঙ্গনায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হোল। অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন মেনটেনেন্স কন্ট্রোল বিভাগ (রি-ইউনিয়ন কমিটি অফ এম সি টেলিফোন ভবন) এর কর্মীরা। পরিচালক শক্তি মুখার্জির শৈল্পিক নিষ্ঠা ও শিল্পীদের চরিত্রচিত্রণের আন্তরিকতা—এ দুয়ে মিলে প্রযোজনাটিকে নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় করে তোলে।

অভিনয়ে যাঁরা বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন তাঁরা হোলেন শক্তি মুখার্জি (সনাতন), মমতা চট্টোপাধ্যায় (জিনানী), সুনীল সরকার (অধ্যাপক), মৃত্যুঞ্জয় (বানোয়ারীলাল), গীতা কর্মকার (কবিতা)। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন গণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ দাস, দুর্গাপ্রসাদ সাহা, দিনার ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, নন্দদুলাল দা, শ্যামল বোস, রেবতীরমণ দাস, রমেন্দ্রনারায়ণ গুহ, ভবনাথ কর্মকার, শুভ্রা ও পূর্ণিমা মজুমদার।

ক্লাস থিয়েটার প্রযোজিত 'শৃঙ্খল' নাটকের পুনরভিনয় : আগামী ১৬ অক্টোবর ক্লাস থিয়েটারের শিল্পীরা সকাল দশটায় মুক্ত অঙ্গনে পরিবেশন করবেন তাঁদের বহু প্রশংসিত নাটক 'শৃঙ্খল'। নাটকটির সংঘাত গড়ে উঠেছে মুক্তি সংগ্রামের পটভূমিকায়।

'সম্রাটের মৃত্যু' : খিদিরপুর অভিযাত্রী পাঠাগারের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি শচীন ভট্টাচার্যের 'সম্রাটের মৃত্যু' নাটকটি অভিনীত হয়। মধ্যবিত্ত জীবনে যন্ত্রণাদগ্ধ অধ্যায়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এ নাটকটি সবার কাছেই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন গীতা চক্রবর্তী, দেবকুমার মাইতি, সত্য ঘোষাল নির্মল মাইতি, সুভাষ সরকার, মনোজিৎ চ্যাটার্জী, বিপ্রদাস চ্যাটার্জী, বিমল রাহা, কমলচন্দ্র চন্দ, সুশীল মাইতি, নির্মল দাস, অরুণ সাহা। নাটকটির আলোকসম্পাতে ছিলেন রবি সিংহ। আবহ সংগীত পরিকল্পনায় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন শ্যামল চ্যাটার্জী।

চার অধ্যায় : 'বৈঠকী'র পরিচালনায় বহুরূপী গোষ্ঠী 'চার অধ্যায়' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন রবীন্দ্রসদন মঞ্চে, গত ১৫ সেপ্টেম্বর। নাট্য নির্দেশনায় ছিলেন শ্রীশম্ভু মিত্র। সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী হিসাবে বৈঠকী'র এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

লোহকপাট : গত ১০ সেপ্টেম্বর নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট মঞ্চে 'ফরেন পোস্ট স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন' ক্লাবের সদস্যরা জরাসন্ধের বহু অভিনীত নাটক 'লোহকপাট' মঞ্চস্থ করেন। নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন সুধীর সরকার। সুঅভিনয়ের স্বাক্ষর রাখেন ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, আশীষ সরকার, উপেন মৌলিক, সুধীর সরকার, রাধাকান্ত মুখোপাধ্যায়, বন্দনা বিশ্বাস, নিরঞ্জন দে, প্রশান্ত বোস, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিমন্যু দাস, মঞ্জুশ্রী সেনগুপ্তা এবং কৃষ্ণা দাস।

'দুই মহল' : কলকাতা হাইকোর্ট নন-গেজেটেড কর্মচারী সমিতির সদস্যরা কয়েকদিন আগে কলামন্দিরে 'দুই মহল' নাটকটি তাদের প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে পরিবেশন করেন। জোছন দস্তিদারের এই বলিষ্ঠ নাটকটি নিখুঁত টিমওয়ার্কের জন্য মঞ্চের আলোয় বেশ প্রাণবন্তই হয়ে ওঠে। নাটকটির শুরুটাই হয়েছে বেশ চমকপ্রদ। প্রয়োগ পরিকল্পনায় মনু মুখার্জির নিষ্ঠা প্রশংসার দাবী রাখে। সুঅভিনীত এই নাটকের বিশেষ কয়েকটি ভূমিকায় অংশ নেন মনু মুখার্জি (লালুয়া), তপন চক্রবর্তী (সুবীর), দীপক রায় (মনুয়া) শিবশঙ্কর মুখার্জী (ভজহরি), শিবানী ভট্টা-

চার্য (ওসমানী), বিশ্বেশ্বর চন্দ (বিটলী-প্রসাদ), সুধাংশু চ্যাটার্জি (ছোনে), ছন্দা চ্যাটার্জী (অপর্ণা), জীবন চক্রবর্তী, নারায়ণ চ্যাটার্জী, চিত্ত চ্যাটার্জী, অনাদি মুখার্জী, শঙ্খ ব্যানার্জী, প্রেমাশীষ ঘোষ, দীপক ভট্টাচার্য, অরূপ চন্দ, মৃগেন দত্ত, রমেন পাল, অচিন্ত্য মুখার্জী, রাধারমণ রায়।

আলোর প্রয়োগ ও আবহসংগীতের পরিকল্পনায় আরো গভীরতর চিন্তার হয়তো প্রয়োজন ছিল।

ফেরারী ফৌজ : পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক রিক্রিয়েশন ক্লাব (ক্যানিং স্ট্রীট) শিল্পীরা কয়েকদিন আগে 'বিশ্বরূপা'র মঞ্চে 'ফেরারী ফৌজ' নাটকটি পরিবেশন করলেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি উত্তালমুখর অধ্যায় অবলম্বনে রচিত এই নাটকটির প্রযোজনায় প্রায় প্রতিটি শিল্পীই আন্তরিক নিষ্ঠার নজীর রাখতে পেরেছেন। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নেন সুনীল মিত্র। অভিনয়াংশে ছিলেন অবনী দত্ত (অশোক), পরেশ দত্ত (হিতেন), শিবদাস কুণ্ডু (নীলমণি), আশীষ সোম, সুবোধ মিত্র, তরুণ রায় (কুমুদ), সমরেশ রায় (বিপিন), প্রশান্ত ঘোষ, অরিন্দম সরকার, সুনীল পোদ্দার, পুষ্প রক্ষিত, পি আর রক্ষিত, ফণী সেন, প্রদীপ বিশ্বাস, নরেন রায়, সাধনহরি দে, অজন্তা চৌধুরী, মীরা চক্রবর্তী ও আরতি ঘোষ।

পদ্মার জল লাল : বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি একটি নাটক মিনার্ভায় পরিবেশিত হোল। নাটকটির নাম 'পদ্মার জল লাল'। শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তীর এই নাটকটি প্রযোজনা করেন বরাহনগরের 'রূপক' নাট্যসংস্থার শিল্পীরা। সমগ্র নাটকটিকে প্রয়োগ পরিকল্পনায় সুন্দর করে তোলেন অরবিন্দ চক্রবর্তী। অভিনয়ে অংশ নেন তপন পাল, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, অরুণ সেন, কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন বসু, অনিল সেন, সনৎ রায়, কান্তি মজুমদার, দীপক ভট্টাচার্য, গোপী মিত্র, স্বপন পাল, স্বপন দত্ত, অরবিন্দ চক্রবর্তী, নীলিমা চক্রবর্তী, কল্যাণী পাল, অরুণা ঘোষ।

হাওড়াতে 'রামমোহন' নাট্যাভিনয় : লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীরা সম্প্রতি স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে হাওড়া শিবপুর লাইব্রেরী হলে সাফল্যের সংগে 'রামমোহন' নাটকটি অভিনয় করলেন। শিল্পীদের সাবলীল অভিনয়ভঙ্গিমা প্রযোজনাটিকে নিঃসন্দেহে প্রাণবন্ত করে তোলে। রামমোহনের দৃঢ় ব্যক্তিত্ব জীবন ঘোষের বলিষ্ঠ অভিনয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। রামমোহনের ভাবমূর্তি ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে শ্রীঘোষ মাঝে মাঝে অসাধারণ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ডেভিড হেয়ারের ভূমিকায় স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেন বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ও প্রবীর মুখোপাধ্যায়। স্বর্ণা চট্টোপাধ্যায় রামমোহনের সহধর্মিণীর প্রাণাবেগকে দক্ষতার সঙ্গে মঞ্চের আলোয় ভাস্বর করে তুলতে পেরেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা নৈপুণ্যের পরিচয় রাখেন তাঁরা হোলেন পরিতোষ মুখোপাধ্যায়, গৌরবময় ঘোষ, দীনেন মুখোপাধ্যায়, বেলা রায়চৌধুরী, করুণা সিনহা, অমিতা সিনহা। নাটকটি সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য পরিতোষ মুখোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন।

বহ্নিশিখার নতুন নাটক : বহ্নিশিখার শিল্পীরা অকটোবর মাস থেকে দুটি নাটক নিয়মিত অভিনয় করবার পরিকল্পনা নিয়েছেন। নাটক দুটি হোল বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাহার নামটি রঞ্জনা' ও অনিলবরণ দত্তের 'লৌহপ্রাচীর'। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীউমেশ দত্ত। বিভিন্ন ভূমিকায় থাকবেন পার্থ চক্রবর্তী, সুবোধ হালদার, উমেশ দত্ত, অসীম চৌধুরী, দেবীদাস গাঙ্গুলী, কল্যাণ তালুকদার, মানস হালদার, শঙ্কর দাস, প্রদীপ চক্রবর্তী, সমীর কর্মকার, পার্থ গুহ, দিলীপ দাস, সন্ধ্যা দাস ও মঞ্জু হালদার।

বীণাপাণি সংগীত সমাজের আসন্ন অভিনয় : বেহালার এই অতি পুরাতন নাট্য-সংস্থাটি তাদের গতিশীল কর্মধারা নিষ্ঠার সংগে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। স্থানীয় নাট্যানুরাগীদের আনন্দ বিনোদনের জন্য, কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ভিন্ন, কোনরূপ প্রচারের আকাঙ্ক্ষা না রেখে, অধিকাংশ নাটকই স্থানীয় মঞ্চে বা ময়দানেই অভিনয় করেছেন এবং স্থানীয় অনুরাগীদের সপ্রশংস আশীর্বাদ ধন্য হয়েছেন। শরৎকালীন ও শীতকালীন প্রদর্শনীর জন্য তারা, নিশিকান্ত বসুর 'দেবলা-দেবী', উৎপল দত্তের 'জালিয়ানওয়ালা বাগ' (যাত্রা), শরৎচন্দ্রের 'রমা' এবং 'বিজয়া', তরুণ চট্টোপাধ্যায়ের 'কে-থাকে-যায়' (একাঙ্ক) ও রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'মাশুল' (একাঙ্ক) নাটকগুলির জোর প্রস্তুতি চালাচ্ছেন। সুপ্রকাশ ব্যানার্জীর পরিচালনায় বিশিষ্ট ভূমিকাগুলিতে অংশ গ্রহণ করছেন--প্রকাশ চ্যাটার্জী, সুনীল ভট্টাচার্য, সুশীল ভট্টাচার্য, অরবিন্দ ব্যানার্জী, মানিক গাঙ্গুলী, প্রভাত ব্যানার্জী, বিশ্বনাথ পাল, সরোজ পালিত, দুর্গাদাস ব্যানার্জী, প্রবোধ ব্যানার্জী, কাজল চ্যাটার্জী, বেবী ঘোষ, উদয় মুখার্জী, পাপিয়া চ্যাটার্জী, নির্দেশক স্বয়ং এবং অতুল চক্রবর্তী প্রমুখ।

সন্তোষপুরে রক্তকরবী সব পেয়েছির আসর পরিবেশিত ওড়িয়া মেছুয়া লোকনৃত্যের একটি দৃশ্য।

সাজাহানের সাফল্যজনক অভিনয় : পি ডবলিউ ডি রিক্রিয়েশন ক্লাব (রাইটার্স বিল্ডিংস) গত ১৫ সেপ্টেম্বর স্টার রঙ্গমঞ্চে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকটি অভিনয় করেন। এটা ছিল তাঁদের পঞ্চম বার্ষিক অভিনয়। এদের দলগত অভিনয় দর্শকদের শেষ পর্যন্ত আকৃষ্ট করে রাখে। ব্যক্তিগত অভিনয়ে বিশেষ দক্ষতার ছাপ রেখেছেন দিলীপ বসাক (ঔরংজীব) এবং পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় (সাজাহান)। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন শ্যামরূপ মিত্র, কালীপদ দত্ত, সলিল দাস, সঞ্চিতা ঘোষ, মুকুল নাগ, চিরপ্রকাশ ওঝা, গঙ্গাধর পাল, দিলীপ কর, নিত্যানন্দ সরকার, নিতাইপ্রসাদ গুপ্ত, শ্যামসুন্দর ঘটক, তারকদ্যুতি মুখোপাধ্যায়, অশোক মণ্ডল, সত্য ভট্টাচার্য, রাজেশ্বর সিং, নরেন্দ্রচন্দ্র পাল, তুলসীরঞ্জন দাস, শচীন চন্দ্র, শুভেন্দু মল্লিক, গীতিশ্রী দেবী, বেলা সেন, আরতি ঘোষ, অঞ্জলি বসু, সরকার এবং অসীমা সাহা। নাটকটির সাফল্যের মূলে ছিলেন নাট্য-নির্দেশক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পলিডর রেকর্ড

চিত্রতারকাদের মুখে গান—ভাল কিংবা মন্দ সে প্রশ্ন পরে—শ্রোতাদের কাছে তার একটা আলাদা আকর্ষণ থাকে। পলিডর-এর পুজো গানের রেকর্ডে তিনজন চিত্রতারকা—শ্রীমতী মালা সিনহা, শ্রীমতী রাখী ও শ্রীমতী অর্চনা যে গানগুলি গেয়েছেন তার মধ্যে শ্রীমতী রাখীর গানই বেশি ভাল লাগে। বিশেষ করে 'নয়ন পিয়াসী তাই চরণ বারণ মানে না' (রচনা : মুকুল দত্ত) গানখানিতে ভাবসম্পদ এবং কণ্ঠসম্পদ দুটিই সমানভাবে লভ্য। শ্রীমতী মালা ও শ্রীমতী অর্চনাও তাঁদের গানে রেকর্ড-অনুরাগীদের খুশি করতে পারবেন বলেই মনে হয়। তিনজনের গানেই মিষ্টি সুর দিয়েছেন মানস মুখোপাধ্যায়। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের নিজের গাওয়া গানের একখানি রেকর্ডও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু রসিক মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রশংসা পাবে যে দুখানি গান সে দুটি গেয়েছেন প্রশান্ত ভট্টাচার্য ('আমার মৃত্যু হলে দিও নাকো ফুল' এবং 'কাঞ্জিভরম শাড়ি')। সমীর দেবের কথা ও সুরে গান দুটি যেমন তাৎপর্যপূর্ণ তেমনি তার সংগে মিশেছে শিল্পীর বলিষ্ঠ কণ্ঠের আশ্চর্য দরদী ভাব। জপমালা ঘোষ ও সনৎ সিংহের গাওয়া গানগুলি শিশুমনে অবিমিশ্র আনন্দের খোরাক যোগাবে। কুমকুম চট্টোপাধ্যায় ও ইন্দ্রাণী গঙ্গোপাধ্যায়ের গাওয়া আধুনিক গানগুলিও শ্রোতাদের বেশ ভাল লাগবে।

সুকুমার মিত্র গেয়েছেন দুখানি নজরুলের গান ('নিশি ভোর হল জাগিয়া' এবং 'উচাটন মন ঘরে রয় না')। শিল্পীর গাওয়ার গুণে গান দুটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

অপরেশ লাহিড়ীর সুরে বাঁশরী লাহিড়ীর গাওয়া দুখানি শ্যামা সংগীত ভক্তিরসের শ্রোতাদের কাছে যেমন আদর পাবে তেমনি হালকা রসের যাঁরা ভক্ত তাঁদের কাছে আদর পাবে বাপী লাহিড়ীর গাওয়া দুটি পপ্ গান।

বটুক নন্দী গীটারে বাজিয়েছেন চারখানি জনপ্রিয় হিন্দী গানের সুর। এই রেকর্ডে শিল্পী তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বাড়িয়ে নিতে পারবেন নিঃসন্দেহে। শারদ-কুমারের সানাই-এ মালকোষ, লোকধুন ও মিশ্র পাহাড়ী ধুন শ্রোতাদের আনন্দ দেবে।

জহর রায়ের কৌতুক-নকশা 'ফাংশন থেকে শ্মশান'-এ একই সংগে আনন্দ ও বেদনার সমাবেশ। হাসির মধ্য দিয়ে এক শিল্পীর জীবনের বেদনাকে শ্রীরায় যেভাবে প্রকাশ করেছেন তা বোধহয় তাঁর মত শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। রেকর্ডখানি এই কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ এবং অবিস্মরণীয়।

পঞ্চম বার জাপান সফরকালে বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র) জাপানের হামামাৎসু শহরে রোটারী ক্লাবে জাপানী ভাষায় ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। চিত্রে শ্রীসরকারকে বক্তৃতারত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

ছায়াদেবী / পার্দাপাস র বর্মী বাক্স ছবিতে

বিবিধ সংবাদ

বি-এফ-জে-এ কর্তৃক রঞ্জিত মল্লিক সংবর্ধিত

গেল শনিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ইস্ট ইন্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাগৃহে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন কার্লোভি ভারির আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে মৃণাল সেন পরিচালিত 'ইণ্টারভিউ' ছবির নায়ক রঞ্জিত মল্লিক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা রূপে সম্মানিত হওয়ায় তাঁকে সম্বর্ধিত করেন। সভায় বি-এফ-জে-এর সভাপতি নির্মলকুমার ঘোষ সভাপতিত্ব করেন এবং বি-এফ-জে-এর পক্ষে শ্রীমল্লিককে মাল্যভূষিত করে তাঁর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভে বি-এফ-জে-এ-র সদস্যবৃন্দ যে বিশেষভাবে আনন্দিত, সেই কথা জানান। শ্রীমল্লিক বি-এফ-জে-এর এই অভিনন্দনে সম্মানিত বোধ করছেন। এই কথা জানিয়ে বলেন যে, তিনি চলচ্চিত্রে যোগ দেবার আগে কোনোদিনই ভাবেননি যে, তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয় করবেন। তবে বিভিন্ন লোকের আচরণ ও কথাবার্তার মাধ্যমে তাদের চরিত্র বিশ্লেষণের প্রতি তাঁর একটা আগ্রহ বরাবরই ছিল এবং আজও আছে, একথা তিনি কথাচ্ছলে জানান। প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, মৃণাল সেন পরিচালকরূপে তাঁকে যা শিখিয়েছেন, তা' তিনি প্রচুর চেষ্টা করে শিখতে চেয়েছেন এবং বারংবার অভিনয় করে শ্রীসেনের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করেছেন। কার্লোভি-ভ্যারিতে তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে সম্মানিত হবেন, এ-কথা ঘুণাক্ষরেও তাঁর মনে হয়নি, কাজেই যখন এ-সংবাদ তিনি প্রথম পান, তখন তিনি আনন্দিত এবং খানিকটা অভিভূতও হয়ে পড়েছিলেন। এবং তখন তাঁর মনে হয়েছিল, এই উৎসবে উপস্থিত থাকতে পারলে কতো ভালো লাগত। সভাশেষে জলযোগের বন্দোবস্ত ছিল।

নাদেজদা চিজোভা (রাশিয়া) ঃ মিউনিখ অলিম্পিকে মেয়েদের সটপাটে বিশ্ব রেকর্ড করে (২১·০৩ মিটার দূরত্ব) স্বর্ণপদক পান।

দর্শক

অলিম্পিক অ্যাথলেটিকস

অলিম্পিক গেমসের বিষয়সূচীতে অ্যাথলেটিকসের স্থান শীর্ষে। বিগত মিউনিখ অলিম্পিক গেমসের অ্যাথলেটিকসে আমেরিকা তার পূর্ব একাধিপত্য অক্ষুন্ন রাখতে পারেনি। আজ তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে এই দুই সমাজতান্ত্রিক দেশ—রাশিয়া এবং পূর্ব জার্মানী।

অ্যাথলেটিকসের পুরুষ বিভাগে মোট ২০টি দেশ পদক জয়ী হয়েছে। পুরুষদের মোট ৭৮টি পদকের মধ্যে ৫টি সমাজতান্ত্রিক দেশ (রাশিয়া, পূর্ব জার্মানী, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী এবং চেকোশ্লোভাকিয়া) পেয়েছে ২৮টি পদক। স্বর্ণ পদক পেয়েছে এই ১০টি দেশ ঃ রাশিয়া (৭টি), আমেরিকা (৬টি), ফিনল্যাণ্ড (৩টি), কেনিয়া (২টি), পূর্ব জার্মানী (২টি), পশ্চিম জার্মানী (২টি), পোল্যাণ্ড (১টি), উগাণ্ডা (১টি), হাঙ্গেরী (১টি) এবং চেকোশ্লোভাকিয়া (১টি)। কুড়িটি পদক বিজয়ী দেশের মধ্যে ইউরোপেরই ১২টি দেশ। আফ্রিকার এই ৪টি দেশ মোট ১০টি পদক জয়ী হয়েছে ঃ কেনিয়া ৬টি (স্বর্ণ পদক ২), উগাণ্ডা ১টি (স্বর্ণ), তিউনিসিয়া ১টি এবং ইথিওপিয়া ২টি। এশিয়ার কোন দেশই পদক পায়নি।

মহিলা বিভাগের অ্যাথলেটিকসের মোট ৪২টি পদক পেয়েছে ১৩টি দেশ। সাতটি সমাজতান্ত্রিক দেশই পেয়েছে ২৭টি পদক ঃ পূর্ব জার্মানী (১৪টি), রাশিয়া (৪টি), বুলগেরিয়া (৩টি), রুমানিয়া (২টি), কিউবা (২টি), চেকোশ্লোভাকিয়া (১টি) এবং পোল্যাণ্ড (১টি)। সর্বাধিক স্বর্ণ পদক (৭টি) এবং সর্বাধিক মোট পদক (১৪টি) জয়ী হয়েছে পূর্ব জার্মানী। স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে মাত্র এই ৪টি দেশ ঃ পূর্ব জার্মানী (৭টি), পশ্চিম জার্মানী (৩টি), রাশিয়া (৩টি) এবং ইংল্যাণ্ড (১টি)। আমেরিকা কোন স্বর্ণ পদকই পায়নি। এশিয়ার কোন দেশই পদক জয়ী হতে পারেনি।

দূরপাল্লার তিনটি দৌড়েই (১৫০০, ৫০০০ ও ১০,০০০ মিটার ফিনল্যাণ্ড স্বর্ণ পদক জয়ের সূত্রে তাদের অতীত অলিম্পিক ঐতিহ্যকে দীর্ঘকাল পর অলিম্পিক আসরে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ফিনল্যাণ্ডের ল্যাসে ভিরেন দূরপাল্লার দুটি দৌড়ে (৫,০০০ ও ১০,০০০ মিটার) স্বর্ণ পদক পেয়েছেন। ১৯২০, ১৯২৪ ও ১৯২৮ সালের অলিম্পিক দূরপাল্লার দৌড়ে ফিনল্যাণ্ডের প্যাভো

অ্যাথলেটিকস

পদক জয়ের তালিকা

পুরুষ বিভাগ

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মো
রাশিয়া	৭	৭	২	১
আমেরিকা	৬	৭	৬	১
ফিনল্যাণ্ড	৩	০	২	[illegible]
পূঃ জার্মানী	২	৩	২	[illegible]
কেনিয়া	২	২	২	[illegible]
পঃ জার্মানী	২	১	১	[illegible]
হাঙ্গেরী	১	১	০	[illegible]
পোল্যাণ্ড	১	০	১	[illegible]
উগাণ্ডা	১	০	০	[illegible]
চেকোশ্লোভাকিয়া	১	০	০	[illegible]
ইংল্যাণ্ড	০	১	২	[illegible]
বেলজিয়াম	০	২	০	[illegible]
ফ্রান্স	০	১	১	[illegible]
ইথিওপিয়া	০	০	২	[illegible]
তিউনিসিয়া	০	১	০	১
ব্রেজিল	০	০	১	১
সুইডেন	০	০	১	১
জামাইকা	০	০	১	১
ইতালী	০	০	১	১
নিউজিল্যাণ্ড	০	০	১	১
মোট ঃ	২৬	২৬	২৬	৭৮

মহিলা বিভাগ

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
পূর্ব জার্মানী	৭	৪	৩	১৪
পঃ জার্মানী	৩	২	১	৬
রাশিয়া	৩	১	০	৪
ইংল্যাণ্ড	১	০	০	১
অস্ট্রেলিয়া	০	২	১	৩
আমেরিকা	০	১	২	৩
রুমানিয়া	০	২	০	২
বুলগেরিয়া	০	১	২	৩
অস্ট্রিয়া	০	১	০	১
চেকোশ্লোভাকিয়া	০	০	১	১
কিউবা	০	০	২	২
পোল্যাণ্ড	০	০	১	১
ইতালী	০	০	১	১
মোট ঃ	১৪	১৪	১৪	৪২

নুরমী মোট পাঁচটি স্বর্ণ পদক জয় এবং বিভিন্ন সময়ে ২৪টি বিশ্ব রেকর্ড করার গৌরবে ফ্লায়িং ফিন' আখ্যা লাভ করে ছিলেন। কিংবদন্তীর সেই নায়ক প্যাভো নুরমী মিউনিখ অলিম্পিক আসরে বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন।

ফিনল্যাণ্ড শেষ স্বর্ণ পদক পেয়েছিল ১,৫০০ মিটার দৌড়ে ১৯২৮ সালে, ৫,০০০ মিটার এবং ১০,০০০ মিটার দৌড়ে ১৯৩৬ সালে। দূরপাল্লার দৌড়ে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ফিনল্যাণ্ড মোট স্বর্ণ পদক পেয়েছে ১৫টি—১,৫০০ মিটারে ৩টি, ৫,০০০ মিটারে ৬টি (রেকর্ড) এবং ১০,০০০ মিটারে ৬টি (রেকর্ড)।

অ্যাথলেটিকসের দুটি বিষয়ে স্বর্ণ পদক জয়ের সূত্রে দুর্লভ 'ডাবল খেতাব' লাভ করেছেন এই তিনজন অ্যাথলীট : পুরুষদের ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে রাশিয়ার ভ্যালেরী বোরজোভ, ৫,০০০ ও ১০,০০০ মিটার দৌড়ে ফিনল্যাণ্ডের ল্যাসে ভিরেন এবং মেয়েদের ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে পূর্ব জার্মানীর রেনাটে স্টেসার।

এবার অ্যাথলেটিকসে পুরুষ ও মহিলা বিভাগের কোন একটি বিষয়ে কোন একটি দেশের পক্ষে তিনটি পদকই (স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ) জয় সম্ভব হয়নি।

বিশ্ব রেকর্ড

মিউনিক অলিম্পিকে এ্যাথলেটিকসে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব রেকর্ড :

পুরুষ বিভাগ

৪০০ মিটার হার্ডলস :
—জন আকি-বুয়া (উগাণ্ডা)
—সময় : ৪৭·৮২ সেঃ

১০,০০০ মিটার দৌড় :
—ল্যাসে ভিরেন (ফিনল্যাণ্ড)
সময় ২৭ মিঃ ৩৮·৩৪ সেঃ

ডেকাথলন :
—নিকোলাই এভিলভ (রাশিয়া)
—পয়েণ্ট : ৮,৪৫৪

১১০ মিটার হার্ডলস :
—রডনে মিলবার্ন (আমেরিকা)
—সময় : ১৩·২৪ সেঃ (বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ)

৪×১০০ মিটার রিলে :
—আমেরিকা
—সময় : ৩৮·২ সেঃ
(বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ)

মহিলা বিভাগ

১,৫০০ মিটার দৌড় :
—লুদমিলা ব্রাগিনা (রাশিয়া)
—সময় : ৪ মিঃ ১·৪ সেঃ

সটপাট :
—নাদেজদা চিজোভা (রাশিয়া)
—দূরত্ব : ২১·০৩ মিটার

পেণ্টাথলন :
—মেরী পিটার্স (ইংল্যাণ্ড)
—পয়েণ্ট : ৪৮০১

৪×৪০০ মিটার রিলে :
—পূর্ব জার্মানী
—সময় : ৩ মিঃ ২২·৯ সেঃ

হাইজাম্প :
—উলরিকা মেফার্থ (পঃ জার্মানী)
—উচ্চতা : ১·৯২ মিটার

৪×১০০ মিটার রিলে :
—পশ্চিম জার্মানী
—সময় : ৪২·৮১ সেঃ
(বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ)

২০০ মিটার দৌড় :
—রেনাটে স্টেসার (পূঃ জার্মানী)
—সময় : ২২·৪ সেঃ
(বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ)

পঙ্কজ রায়

প্রাক্তন ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় শ্রীপঙ্কজ রায় ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের খেলোয়াড় নির্বাচন কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এই কমিটির সদস্য এই পাঁচজন : সর্বশ্রী সি ডি গোপীনাথ (সাউথ-জোন)—চেয়ারম্যান, পঙ্কজ রায় (ইস্ট জোন), কে এম ঘেরপাদে (ওয়েস্ট জোন), এইচ টি দানী (নর্থ জোন) এবং এম এম জগদলে (সেন্ট্রাল জোন)।

পঙ্কজ রায়ের টেস্ট পরিসংখ্যান :

খেলা ৪৩, ইনিংস ৭৯, নটআউট ৪ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৭৩ (বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, মাদ্রাজ, ১৯৫৫-৫৬), সেঞ্চুরী ৫, মোট রান ২৪৪১ এবং গড় ৩২·৫৪।

অপেশাদার এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতা

সিঙ্গাপুরে আয়োজিত অপেশাদার এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ভারতবর্ষের আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান ৬—২, ১১—৯ ও ৬—১ গেমে ফিলিপাইনের ২৪ বছরের যুবক এডুয়ার্ডো রুজকে পরাজিত করে প্রমাণ করে দিয়েছেন তিনি তাঁর ৩৫ বছর বয়সেও যুবকের সমান শক্তি রাখেন। এই খেলায় দ্বিতীয় সেটের নিষ্পত্তি হতে ৫০ মিনিট সময় লেগেছিল। এখানে উল্লেখ্য, কৃষ্ণান উপর্যুপরি দুবার বিশ্বখ্যাত উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে উঠেছিলেন যা অপর কোন এশিয়ান টেনিস খেলোয়াড়ের পক্ষে একবারও সম্ভব হয়নি। প্রধানত কৃষ্ণানেরই জন্যে ভারতবর্ষ ৩—২ খেলায় ব্রেজিলকে হারিয়ে ১৯৬৬ সালের ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ ফাইনালে উঠেছিল। এশিয়ার মাত্র দুটি দেশ—জাপান এবং ভারতবর্ষ মাত্র একবার করে ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলেছে।

পাকিস্থান অলিম্পিক হকি প্রসঙ্গ

পশ্চিম জার্মানী বনাম পাকিস্তানের অলিম্পিক হকি খেলার ধারা-বিবরণ দিতে গিয়ে পাকিস্তানী ক্রীড়া-ভাষ্যকাররা যে নির্জলা মিথ্যা কথায় দেশের লোককে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে ধোঁকা দিয়েছিলেন তা সরকার নিয়ন্ত্রিত মর্নিং নিউজ সংবাদ-পত্রের রিপোর্টে ফাঁস হয়ে গেছে। একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের টেলিভিশন চিত্রে সমস্ত কারচুপি ধরা পড়েছে। পাকিস্তানকে হারানোর উদ্দেশ্যে আম্পায়ারদের সম্পর্কে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ অজ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে গেছে।

অলিম্পিক হকির ফাইনাল খেলার শেষে পাকিস্তান হকি খেলোয়াড়দের পশ্চিম জার্মানীর জাতীয় পতাকার প্রতি অশালীন আচরণের জন্যে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রকাশ্যে পশ্চিম জার্মানীর জনগণ এবং রাষ্ট্রের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

চিঠিপত্র

সোনার বাঙলা প্রসঙ্গে

গত ১৫ই ভাদ্র ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত শ্রীকল্যাণকুমার গুপ্তের এক চিঠিতে আমার রচিত সোনার বাঙলা প্রসঙ্গে কয়েকটি অভিযোগ দেখলাম। পত্রলেখকের প্রথম অভিযোগ রচনাটি মৌলিক নয়। তারপর এ রচনার জন্য আমি নাকি কোন আয়াস করিনি। তৃতীয় অভিযোগ ১৯৪০ সালে পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত এবং অমিয় বসু সম্পাদিত বাংলায় ভ্রমণের দুটি খণ্ড থেকে অপহৃত রচনাটিই সোনার বাংলা। অন্য অভিযোগ হল এ রচনাটিতে আমার কুম্ভীলক বৃত্তি ধরা পড়েছে। তারপর সোনার বাংলায় উল্লেখিত মহাস্থানগড়ের পুরাবস্তু উদ্ধারের ক্ষেত্রে সম্প্রতি কথাটির ভুল ব্যবহার; এসব ছাড়া পত্রলেখকের শেষ অভিযোগটি হল সোনার বাংলা রচনাটি আগাগোড়াই 'বাংলায় ভ্রমণে'র নকল বা চুরি।

পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ' বইটি দুষ্প্রাপ্য স্বভাবতই সাধারণ পাঠকের পক্ষে বই দুটি সংগ্রহ করে সোনার বাংলার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার সুযোগ কম, সেটি সম্ভব হলে এমন ভুয়া অভিযোগের বিষয় নিয়ে আমার পত্র রচনার প্রয়োজন হত না। ফলে এ অভিযোগগুলি সম্বন্ধে রসিক জনসমাজে আমার বক্তব্য পেশ করতে হল চিঠির আকারে।

ভারতের পূর্বাঞ্চলে রেলপথ চালু হবার প্রথম যুগেই সেই ১৮৫৫ খৃঃ শ্রীরামপুরে 'তমোহর' যন্ত্রে মুদ্রিত এবং শ্রীকালিদাস মৈত্র কর্তৃক বিরচিত 'বাষ্পীয় কল ও ভারতীয় রেলওয়ে' থেকে শুরু করে এই খৃষ্টাব্দের পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন রেলওয়ে ইংরাজি ও স্থানীয় ভাষায় বহু তথ্যপূর্ণ ও বিচিত্র গাইড বই ও প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। অমিয় বসু সম্পাদিত বাংলায় ভ্রমণও তার অন্যতম এক 'গাইড বুক'. এটি কোন মৌলিক রচনা বা আকর গ্রন্থ নয়। সোনার বাংলা রচনায় তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে এক দিকে যেমন কিছু ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক মৌলিক রচনা ও বই-এর সাহায্য আমায় নিতে হয়েছে, তেমনি সহযোগিতা পেয়েছি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব দপ্তরের কাছ থেকে। সে কারণেই তথ্যসমৃদ্ধ বাংলায় ভ্রমণ থেকে সুরু করে এমন অনেক রেলওয়ে হ্যান্ডবুক আমায় ব্যবহার করতে হয়েছে। তার মধ্যে যেমন আছে ১৯৩০-৩১ সালে পূর্ব-রেলওয়ে কর্তৃক প্রকাশিত বাংলায় ভ্রমণের অনুরূপ 'পূজায় ভ্রমণ' তেমনি আছে পূর্ব-পাকিস্থান রেলওয়ে দপ্তরের প্রকাশিত গাইড বই, পাকিস্থান ভ্রমণ দপ্তরের প্রচার পুস্তিকা, পাকিস্থান পুরাতত্ত্ব দপ্তরের বিভিন্ন পত্রিকা। মৌলিকত্বের প্রেরণায় বিকৃত বা কল্পনাপ্রসূত তথ্য পরিবেশনের দায়িত্ব না নিয়ে 'সোনার বাঙলা' পরিবেশিত হয়েছে। তাই এ রচনার মৌলিকত্ব রয়েছে শুধু এর পরিবেশনশৈলীটিতে।

পরবর্তী অভিযোগ 'সোনার বাংলা' রচনা প্রয়াস আয়াসহীন। আজকের খণ্ডিত বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক রূপ-রেখা রচনায় যতটা আয়াস করা প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়ই ততটা করা সম্ভব হয়নি তবু আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। প্রায় পঞ্চাশটি তথ্যনির্ভর বই ও রচনাবলীর সাহায্য নিতে হয়েছে আমায় এই সোনার বাংলা রচনায়। এছাড়া পূর্বপাকিস্থানের স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরুতে ১৯৭০ সালের ২৮শে মার্চের পর থেকে কয়েকদিনের জন্য যশোর, খুলনার রণক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, এরপর '৭১ সালে ১৮ই ডিসেম্বরের পর থেকে কয়েকদিন স্বাধীন বাংলা দেশের উত্তরাঞ্চলের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলি দেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রামের এমন অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি রূপেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি প্রকাশ করেছিলেন আমার সম্পাদিত আলোকচিত্র ও তথ্য সম্বন্ধ 'রিডিং বাংলাদেশ'। সোনার বাংলাও এই অভিজ্ঞতার অনায়াসলব্ধ ফলশ্রুতি।

তৃতীয় অভিযোগ সোনার বাংলা—বাংলায় ভ্রমণের অপহৃত রূপ। অপহৃত বা অপহরণের অভিধানিক অর্থ—অন্যায়ভাবে অপরের দ্রব্য গ্রহণ করা। বিভিন্ন বইপত্রের সঙ্গে জনগণের ব্যবহারের উপযোগী প্রচারিত এক সুসংকলিত গাইড বই থেকে তথ্য সংগ্রহে অন্যায় কি থাকতে পারে? বিশেষত যখন আমার 'সোনার বাংলা' রচনার শেষ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে ব্যবহৃত পুস্তক-পত্রিকার একটি তালিকা ছিল যেটি অমৃত সম্পাদক যে কোন কারণেই হোক প্রকাশ করেন নি, তাতে লেখিকার উপর অপহরণ দোষ বর্তায় কি করে?

পরবর্তী অভিযোগ কুম্ভিলক বৃত্তি। কুম্ভিলের অভিধানিক মানে 'শ্লোকার্থ চোর'। বাংলায় ভ্রমণের এবং সোনার বাংলার ক্ষেত্রে এ শব্দটির অপব্যবহার 'পণ্ডিতম্মন্যতা জাত'।

পত্রলেখক তারপর অভিযোগ করেছেন সম্প্রতি কথাটির ভুল প্রয়োগ সম্বন্ধে। এবিষয়ে জানাই আংশিক বাংলাদেশ পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হবার পরও এদেশের পুরাতত্ত্ব দপ্তর ও স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কিছু কিছু এদিক সেদিক পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান-কার্য চালিয়েছেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪০ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের মধ্যে চলতি অনুসন্ধান কার্য বোঝাতে-ই সম্প্রতি কথাটি ব্যবহার করেছি।

শেষ অভিযোগটি সম্বন্ধে জানাই পত্রলেখকের সু-দৃষ্টি বঞ্চিত 'সোনার বাংলা' রচনাটি স্বভাবতই পূর্ণপাঠ করার বঞ্চিত হয়েছে। তা না হলে বর্তমান দেশের সাংস্কৃতিক আলোচনায় আমি সাম্প্রতিক বিষয়বস্তু ছত্রে ছত্রে স[...] করেছি সেগুলি কি করে তার দৃষ্টি প্রথম সংখ্যার ঢাকার নামকরণ থেকে করে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, বরেন্দ্র শাখা, ময়নামতি প্রভৃতির বিশদ আ[...] সঙ্গে বাংলাদেশের ধর্ম ও সাং[...] বিবর্তন, বাংলাদেশের লোকশিল্পের প[...] পর্যটকের চোখে বাংলাদেশ ইত্যাদি বস্তুগুলি যা সম্পূর্ণ রচনার এব[...] য়াংশেরও অধিক, তার হদিশ ভ্রমণে কি করে খুঁজে পেলেন পত্রলে[...]

সর্বশেষ জানাই বাংলায় ভ্রমণের [...] সংস্করণের ভূমিকায় প্রকাশিত হয়েছে [...]দকের নাম শ্রীঅমিয় বসু এবং সহযো[...] নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর নাম। শুধু[...] না এ সঙ্কলনটির রচনায় প্রণোদিত যে ব[...] বই থেকে অল্প বিস্তর সাহায্য নেওয়া তারও একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছে লেখক এক বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের সম্পাদকরূপে প্রকাশ করেছেন, বুঝল[...] এমন গোপনীয়তার কার্যকারণ কি [...] পারে? তিরিশের দশকে প্রকাশিত রে[...] বোর্ডের ছোট ছোট প্রচার পুস্তিকা যখন বিশিষ্ট লোকেদের দিয়ে লেখানে[...] তখন তাতে সেই সব বিশিষ্ট রচয়িতাদে[...] প্রকাশের রীতি ছিল। এ ক্ষেত্রে এমন রীত রীতির কার্যকারণ কি? স্যার মার্শালের রচিত 'মনুমেন্ট অব সাঁচি'-র পুস্তিকা কি পত্রলেখকের নজরে আসে[...] সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঘোস্ট রাইটা[...] ভূত লেখকদের স্থান যথেষ্টই নিন্দনীয় পত্রলেখক এক প্রখ্যাত ঐতিহাসিককে লেখকরূপে নির্দেশ করে শুভ বুদ্ধির [...]চয় দেন নি। অকারণ ভূতের বোঝা [...] অর্বাচিনতাই প্রকাশ করেছেন।

শিপ্রা আদিত্য কলিকাতা-

লোককবি কালিদাস প্রসঙ্গে

৮ই ভাদ্রের অমৃতে প্রকাশিত মণি[...]খানের 'লোক-কবি কালিদাস' প্রবন্ধে লোক-কবির ধাঁধার তালিকায় ৯-নম্বর উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে সেটির রচ[...] কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। গুপ্ত কবির বহু[...] 'পাঁঠা' কবিতার এই ছত্র কয়টিকে লেখক করে হেঁয়ালির কবি কালিদাসের রচনা [...] নির্বিবাদে মেনে নিলেন বোঝা শক্ত। য[...] কোনো পুস্তকে কালিদাসের নামে প্রচ[...] থাকলে তা সম্পাদকের অজ্ঞতাপ্রসূ[...] লেখকের কর্তব্য ছিল সেই ভুল শু[...] দেওয়া। তবে কি এই ভুল লেখকেরও অজ্ঞ[...] প্রসূত বলে ধরে নিতে হবে?

সত্যনারায়ণ দাশ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যা[...]

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩
হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা		মফঃস্বল	
বার্ষিক	টাকা	২৫·০০	টাকা	৩০·০০
ষান্মাসিক	টাকা	১২·৫০	টাকা	১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬·২৫	টাকা	৮·০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১·০২
ষান্মাসিক	টাকা	০·৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০·২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ
২য় খণ্ড

২৪ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday 13th October, 1972 শুক্রবার, ২৬ আশ্বিন, ১৩৭৯ **.52 Paise**

প্রচ্ছদ ফটো : শ্রীপ্রফুল্ল মিত্র

এক নজরে

দরিদ্র হিন্দুস্তান : বর্তমান বাজার দরের হিসাবে, মাসে সাঁইত্রিশ টাকা প্রকৃত অর্থে কি তা ভারতবাসীর কারও অজানা নয়। ঐ টাকা দিয়ে এখন আধ মণ চালও কিনতে পাওয়া যায় না, যা এদেশের শুধু নুন ভাত খাওয়া গরিব মানুষের মাস খোরাকি বলে ধরা হয়। ভারতের অর্থনীতিবিদরা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে ঐ সাঁইত্রিশ টাকাকেই এদেশে দারিদ্র্যের ডেটাম লাইন বলে ধরেছেন। অর্থাৎ পাঁচজনের একটি পরিবারের যদি মাসে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য ৫×৩৭=১৮৫ টাকা অর্জনের ব্যবস্থা থাকে তবে সেই পরিবারকে দরিদ্র বলে গণ্য করা হবে না। মোটামুটিভাবে ঐ হিসাবের ভিত্তিতে ভারতীয় বণিক সংস্থা 'ফিক্কি' সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, ভারতের প্রায় বাইশ কোটি লোক এখন দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করছে। আবার ঐ বাইশ কোটির মধ্যে ছয় কোটি ৫৬ লক্ষ লোক বাস করে শুধু বিহার ও উত্তর প্রদেশ রাজ্যে। উত্তর প্রদেশের মোট সাত কোটি ৪৬ লক্ষ লোকের মধ্যে তিন কোটি ৮৬ লক্ষ লোক দরিদ্র। উত্তর প্রদেশ ও বিহারের পর সর্বাধিক দরিদ্র লোকের বাস অপর হিন্দি রাজ্য মধ্যপ্রদেশে। ঐ বিশাল রাজ্যটির চার কোটি ১৭ লক্ষ লোকের মধ্যে এক কোটি ৮০ লক্ষ লোক দরিদ্র। চতুর্থ স্থানাধিকারী অবশ্য অপর হিন্দি রাজ্য রাজস্থান নয়, সে স্থানে আছে তেলগু রাজ্য অন্ধ্র প্রদেশ, ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে জনসংখ্যাতেও যার স্থান চতুর্থ। অন্ধ্র প্রদেশে দরিদ্রের সংখ্যা এক কোটি আশি লক্ষ। আর এই চারটি রাজ্যেই বাস করে ভারতের মোট দরিদ্র জনতার অর্ধেকাংশ।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, জনসংখ্যার অনুপাতে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে কম দরিদ্র বাস করে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যে এবং মাথা গুনতি হিসাবে সবচেয়ে কম দরিদ্রের বাস হিমাচল প্রদেশে। শেষোক্ত পার্বত্য রাজ্যটিতে যে ৩৪ লক্ষ ২৫ হাজার লোক বাস করে তার মধ্যে ১১ লক্ষ লোকের মাসিক ব্যয়সামর্থ্য সাঁইত্রিশ টাকার কম।

একই বৃত্তির রূপান্তর : পৃথিবীর আদিমতম পাপ ব্যবসায় রাজার আইন, যাজকের ভ্রূকুটি, ধর্মের নির্দেশ ও সমাজের অনুশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সভ্যতার সূচনাকাল থেকে আজও টিঁকে আছে, এবং বিশেষজ্ঞদের অভিমত, সম্পূর্ণ পতিতামুক্ত সমাজ সম্পূর্ণ রোগমুক্ত মানুষের মতোই চিরকাল কল্পনার বিষয় হয়ে থাকবে। তবে এই বৃত্তির সংস্কার ও রূপান্তর যেমন অতীতে বার বার ঘটেছে, ভবিষ্যতেও তার ব্যতিক্রম হবে না।

কদিন আগে দিল্লীতে আধুনিক পতিতা বৃত্তির রূপ ও তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়ে গেল। সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন ভারত ও বিশ্বের বিশটি দেশের তিন শতাধিক প্রতিনিধি। প্রতিনিধিরা এসেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, স্পেন, ইতালি, মিশর, জাপান, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে। সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন ভারতের প্রধান বিচারপতি শ্রীএস এম সিক্রি। সম্মেলনের উদ্যোক্তা 'ইন্টারন্যাশনাল্লিস্ট এবলিশনিস্ট ফেডারেশন' যার সদর দপ্তর জেনেভায়। সম্মেলনের মূল বক্তব্যে বলা হয়—সাবেকি পতিতাবৃত্তির সমার্সার লেন-দেন বর্তমান সভ্য দুনিয়ায় প্রায় সম্পূর্ণই লুপ্ত হয়েছে। তার জায়গায় এসেছে নানা আবরণে ও ছলাকলায় রূপোপজীবাদের অভিসার, যাকে আইনত নিষিদ্ধ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। সম্মেলন এবিষয়ে একমত যে, পতিতাবৃত্তি সভ্যতারই উপজাত—বাইপ্রোডাক্ট, যার সঙ্গে নগরজীবন, শিল্পপ্রসার, দারিদ্র্য, প্রাচুর্য, বৈবাহিক জীবনের ব্যর্থতা, নিঃসঙ্গতা প্রভৃতির কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে। ঐসব সমস্যার সুসমাধান যেমন কোনদিন হবে না, ঐসব সমস্যা থেকে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যাগুলিও তেমনই চিরকাল সমাধানের অতীত থেকে যাবে। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা পতিতাদের শূন্য স্থান ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়ে গেছে কল-গার্লদের দিয়ে। এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ, শুধু কলকাতা শহরেই এখন কল-গার্লের সংখ্যা দশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মতে আজকের সমাজের প্রধান সমস্যা হল মানুষের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী। একদা সমাজে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন বিদ্বান ও অভিজাত বংশীয়। কিন্তু আজকের সমাজে সর্বাধিক সম্মান অর্থশালী ব্যক্তিদের, সে অর্থ কিভাবে উপার্জিত হল তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ প্রয়োজন, সুতরাং সে অর্থ উপার্জন করতে হবে ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ, নৈতিক-অনৈতিক যে কোন পথ ধরে—এই হ'ল আজকের সমাজ-চিন্তার মোদ্দা কথা। আর ন্যায় সৎ ও নৈতিক পথে যে জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনও পূরণ হওয়া কঠিন তা প্রায় ধরেই নিয়েছে সকলে। এই কারণেই অর্থোপার্জনের পথে নীতির কথাকে কেউই আর গুরুত্ব দেয় না।

নিকষিত হেম : এমন একদিন ছিল যখন তাঁর চকিত চমকের চাহনি অগণিত অনুরাগীর হৃদয়ে উচ্ছ্বাসের তুফান তুলত, তাঁর কুন্দ শুভ্র নগ্নকান্তি পুরুষের শিরায় শিরায় রক্তধারাকে উন্মত্ত করে তুলত। কিন্তু সে সব দূর অতীতের কাহিনী। ইতালির বাহাত্তর বছর বয়স্কা প্রাক্তন মঞ্চ ও চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী পাওলা বোরবোনির সুনিশ্চিত ধারণা ছিল এতদিন যে, দেহপটসনে সকলই হারিয়েছেন তিনি। কোন পুরুষের মনে আর তাঁর স্থান নেই। সংসার পাতেন নি কোনদিন, সুতরাং শ্রীমতী বোরবোনির আশঙ্কা হয়েছিল, পুরুষের সংস্পর্শ কি তা না জেনেই তাঁকে জগৎ ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু শ্রীমতীর সে মনোবেদনা দূর হতে চলেছে। ত্রিশ বছর বয়স্ক কবি ও অভিনেতা ব্রুনো ভিলার কয়েকদিনের মধ্যেই শ্রীমতী বোরবোনির সঙ্গে সংসার পাতছেন। সে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর সলজ্জ কুমারীর মতোই শ্রীমতী বোরবোনি বলেছেন, 'অভিনয়ে অনেক বার স্ত্রী সেজেছি, কিন্তু স্বামীর ঘর কাকে বলে তা সত্যিই জানি না। যদি সুখী হই ত সে সুখ ক্ষণস্থায়ী হলেও তা স্পষ্ট। আর যদি অসুখীই হই তবে তাও আর এ জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার অবকাশ নেই।' অপর দিকে শ্রীমতীর প্রণয়ী শ্রীভিলার বলেছেন, তাঁর প্রণয়িনীর বয়স বাহাত্তর হলেও প্রণয়িনীর ১০২ বছর বয়স্কা জননী শ্রীমতী জেম্মা চান না যে বিবাহ না করে তাঁর কন্যা এইভাবে কোন পুরুষের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করুক। আর তিনি যখন শ্রীমতী বোরবোনিকে ভালবাসেন তখন তাঁকে বিবাহ করতে আপত্তিই বা কি থাকতে পারে? তবে শ্রীভিলার ঐ প্রসঙ্গেই বলেছেন : আমি কবি এবং শ্রীমতী বোরবোনির সঙ্গে আমার এ ভালবাসা সম্পূর্ণই আত্মিক। এর সঙ্গে কাম বা যৌন আকাঙ্ক্ষার কোন সম্পর্ক নেই।

কবি শ্রীভিলারের মা, যাঁর বয়স ভাবী পুত্রবধূর চেয়ে বাইশ বছর কম, তিনিও এ বিবাহকে স্বাগত জানিয়েছেন।

—প্রত্যক্ষদর্শী

শারদোৎসবের বাংলা

বাঙালীর একান্ত আকাঙ্ক্ষিত শারদোৎসব তার জাতীয় উৎসবের মর্যাদা লাভ করেছে। দুর্গোৎসব শুধুমাত্র ধর্মপ্রাণ বাঙালী হিন্দুর উৎসবই নয়। এই আনন্দ অনুষ্ঠানে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের উদার আমন্ত্রণ। এই সামাজিক উৎসবকে সে কারণেই আমরা প্রাধান্য দিই। বাঙালীর জীবনে আজ আনন্দের অবকাশ খুবই সীমিত। তার দুঃখ ও মর্মবেদনা সকলেরই অবগত। এক সময়ে এই বাংলার মানুষের দিকে গোটা ভারত অনেক প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে থাকত। তার মনীষা, কর্মক্ষমতা এবং প্রগতিশীল মানবতাবাদী চিন্তা ভারতবর্ষে নবযুগের সূচনা করেছিল। তা নিয়ে বাঙালীর গর্বের অন্ত ছিল না। ভারতবর্ষে আধুনিক সমাজদর্শনের প্রবক্তা হিসাবে বাঙালী চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারকগণ সকলের নমস্য।

শারদোৎসবকে বাঙালীর উদারতা সর্বজনীন উৎসবের রূপ দিয়েছে। এই উৎসবকে সে দিয়েছে এক লোকায়ত সামাজিক রূপ। কল্যাণের উৎসব এই দুর্গোৎসব। শক্তির আবাহনে এই উৎসব শুচিসুন্দর। প্রতীকী অর্থে অকল্যাণের বিরুদ্ধে কল্যাণের, অপশক্তির বিরুদ্ধে মহাশক্তির বিজয়ই দুর্গোৎসব ও মাতৃ আরাধনার সার্থকতা লাভ। বাঙালীর মনে চিরকালই মায়ের স্নেহমধুর রূপ চির উজ্জ্বল। বাংলার কবি ও দার্শনিকরা এই উৎসবকে সে কারণেই লোকায়ত দর্শনের নিরিখে শ্রীমন্ডিত করে উপস্থাপিত করেছেন। আগমনী ও বিজয়ার গানে এই উৎসবের মানবিক রূপ কোমলপ্রাণ বাঙালীর কাছে একান্ত আদরনীয়। বৎসরান্তে সন্তানাদি নিয়ে মাতৃরূপা কন্যা আসছেন পিত্রালয়ে। তার জন্য সম্বৎসর স্নেহকাতরা জননীর কত প্রতীক্ষা, কত আকুলতা। গিরিকন্যা উমা কতদিন পিত্রালয়ে আসেন নি। আত্মভোলা, সংসারবিরাগী শিবের হাতে কন্যাকে তুলে দিয়ে মায়ের একদিকে যেমন গর্ব, অন্য দিকে তেমনি উদ্বেগ। তাই আগমনীর কবি মেনকার মুখে বসিয়েছেন সেই প্রাণ আকুল-করা আবেদন : 'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, উমা আমার কত কেঁদেছে।' এই চিত্রের সঙ্গে বাঙালী মধ্যবিত্ত সংসারের প্রতিদিনের চিত্রের অভ্রান্ত মিল পাই বলেই আগমনীর সুর আমাদের হৃদয়ের সুরে বাঁধা। এই উৎসব বাঙালীর হৃদয়ের অশ্রু ও আনন্দে একত্র গ্রথিত। এই উৎসব বাঙালীর হৃদয়েরই উৎসব।

প্রতি বৎসর এই আনন্দের দিনগুলোর জন্য ধনী গরীব নির্বিশেষে বাংলার মানুষের প্রতীক্ষার অন্ত থাকে না। এবারে এই উৎসবের তাৎপর্য আরও গভীর। কারণ, সীমান্তের ওপারেও বাঙালী হিন্দু এবার নির্ভয়ে এই উৎসবে যোগ দিতে পারবে। এতকাল ধর্মান্ধ বিদেশী শক্তির পীড়নে ওপারে এই উৎসব ছিল কার্যত নিষিদ্ধ। বাংলাদেশের অভ্যুদয় ওপারের বাঙালী সমাজে উদারতা ও সহিষ্ণুতার প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বাঙালীর দুর্বার প্রাণশক্তি, তার কল্যাণ বোধ এবং মানবিকতারই জয় হয়েছে। দুর্গোৎসবের মূল তত্ত্বও এরই ওপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্মান্ধতা নয়, আচার সর্বস্বতা নয়, উদার মানবতাবাদই বাংলার জীবনবোধ। তার ধর্মোৎসবে, তার সামাজিকতায়, তার রাজনীতিতে এই সত্যেরই জয় আমাদের আকাঙ্ক্ষিত।

ধর্মীয় সংকীর্ণতা পৃথিবীর অনেক দেশেই অনেক দুর্দৈব ডেকে এনেছে। এই উপ-মহাদেশেও ধর্মীয় বিরোধ আমাদের অনেক দুঃখের কারণ হয়েছে। অতীতের সেই ভুল ভ্রান্তি ও দুঃখ দুর্দশার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা নতুন শিক্ষা নিতে চাই। উৎসবের আনন্দ অনেকখানিই ম্লান হয়ে যাবে যদি আমরা সমাজকল্যাণের আদর্শের সঙ্গে উৎসবের আদর্শকে মেলাতে ব্যর্থ হই। বাঙালীর আর্থিক দুঃখ কষ্টের কথা মনে রেখে উৎসবের কার্যসূচী থেকে আতিশয্য বর্জন করাই হবে যুক্তিসঙ্গত কাজ। অপচয় ও অপব্যয় করার মতো মূঢ়তা যেন আমাদের না হয়। এই উৎসবের আনন্দের ভাগ দিতে হবে সমাজের দরিদ্রতম, দুর্বলতম অংশকেও। কারণ, দুর্গোৎসবের তাৎপর্যই হল সকলের কল্যাণ, সারা পৃথিবীর কল্যাণ। আজও পৃথিবীতে অশুভ শক্তির মদমত্ত উল্লাস শোনা যায়। আজও নিপীড়িত মানুষের আর্তকান্নায় আকাশ মুখর। এখনো চলছে অন্যায়, অবিচার এবং তার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ। জগজ্জননী দুর্গা একদিন এই অশুভ শক্তির হাত থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্যই হয়েছিলেন দশপ্রহরণধারিণী। তাঁর ত্রিনয়নে জ্বলেছিল আগুন। একদিকে তিনি সংহার মূর্তি, অন্য দিকে প্রসারিত তাঁর দক্ষিণ হস্তের বরাভয়। শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্বে শুভ শক্তিই জয়ী হয়। এটাই আমাদের চিরন্তন আশার আলোকবর্তিকা। আমাদের বর্তমান জীবনে দুঃখ আছে, নিরাশা আছে। ক্ষুদ্র স্বার্থ, দূরদৃষ্টিহীনতা এবং বিরোধ জীবনের সৌন্দর্যকে বার বার ম্লান করে দেয়। তা সত্ত্বেও আমাদের আশা রাখতে হবে যে, একদিন এই দুর্যোগের মেঘ যাবে কেটে। শারদোৎসবের প্রস্তুতিতে প্রকৃতি পর্যন্ত আজ নির্মল। পূর্ব দিগন্তে সূর্যোদয় নিরাশার অন্ধকার বিদীর্ণ করে চারদিক করে দিয়েছে আলোকোজ্জ্বল। এই আলোকের ঝরণা ধারায় স্নাত হয়ে আমরা আবাহন করি উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে। তিনি আমাদের জয়যুক্ত করুন। তাঁর কল্যাণস্পর্শে ধন্য হোক আমাদের জীবন।

সায়গনে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট নাগুয়েন ভন থিউ ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে আশাপ্রদ সংবাদ শোনাচ্ছেন।

দেশে বিদেশে

শ্রী আর কে খাদিলকর 'পাক্কা কংগ্রেসী' নন। কংগ্রেসে তিনি যোগ দিয়েছেন অল্প কিছুদিন আগে। তার আগে তিনি লোকসভায় নির্দলীয় সদস্য ছিলেন। শ্রীখাদিলকরের আগে যাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাঁরা অনেকেই কংগ্রেসের শ্রমিক আন্দোলনের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। শ্রীখাদিলকর সেদিক থেকে ব্যতিক্রম।

শ্রীখাদিলকরের দিনকাল এখন ভাল যাচ্ছে না। শিল্পে অশান্তি বাড়ছে এবং সেজন্য দিল্লির শাসক মহলের কোন কোন অংশ শ্রমমন্ত্রীর দিকে অংগুলি নির্দেশ করছেন। সাধারণভাবে শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলে পরিচিত শ্রীখাদিলকরের উপর যে চাপ আসছে তার একটি লক্ষণ হল, সম্প্রতি একটি বিবৃতি দিয়ে তিনি শ্রমিকদের এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, উৎপাদন নষ্ট করলে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

শ্রীখাদিলকরের নিজের রাজ্য মহারাষ্ট্রেই শিল্পে অশান্তি উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। ঘেরাও, ধর্মঘট ইত্যাদির জন্য কলকাতার যে বদনাম ছিল সেই একই বদনাম এখন বোম্বাইয়ের উপরও এসে চাপছে। মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শরদ পাওয়ার সম্প্রতি আশ্বাস দিয়েছেন, বোম্বাইকে দ্বিতীয় কলকাতা হতে দেওয়া হবে না। কিন্তু সমালোচকরা বলছেন, বোম্বাই ইতিমধ্যেই কলকাতা হয়ে গেছে। মহারাষ্ট্রে এখন পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বেশি ধর্মঘট হচ্ছে—যদিও মহারাষ্ট্রের প্রতি ধর্মঘটের গড় স্থায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় কম। এমনকি, গত কয়েক বছর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে যে কথা শোনা যাচ্ছিল, মহারাষ্ট্র সম্পর্কেও একই ধরনের কথা শোনা যাচ্ছে—শিল্পপতিরা এখন নাকি অশান্ত মহারাষ্ট্র ছেড়ে পার্শ্ববর্তী গুজরাট বা মহীশূরের অধিকতর শান্ত আবহাওয়ায় পাড়ি জমাচ্ছেন।

শিল্পে অশান্তির এই সব লক্ষণে ভারত সরকার উদ্বিগ্ন। কিন্তু এই অশান্তি

কি করে বন্ধ করা যাবে তা যেন তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না। শুধু একটা জিনিস পরিষ্কার। কেন্দ্রীয় সরকার একটা যাঁতাকলে পড়েছেন। মজুরি ও বাজার দর একটা আর একটাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ধর্মঘটী শ্রমিকদের ক্রমাগত মজুরি বৃদ্ধির দাবী মেনে নেওয়ার অর্থ মুদ্রাস্ফীতিকেই তীব্রতর করা। আবার মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্য-বৃদ্ধির জন্য যেখানে বেতনভুক মানুষদের প্রকৃত আয় হ্রাস পাচ্ছে সেখানে মজুরি-বৃদ্ধির দাবী ঠেকিয়ে রাখা কঠিন।

সম্প্রতি বোনাস সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের সময় সরকারের এই উভয়সংকট পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। সরকার প্রথমে চেষ্টা করে-ছিলেন যাতে শ্রমিকরা বোনাসের একটি অংশ নগদে না নিয়ে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে রাখতে সম্মত হন। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা মুদ্রাস্ফীতির যুক্তি অস্বীকার করেছেন এবং শ্রমিকদের হাতে নগদ টাকা তুলে দেওয়ার উপর জোর দিয়েছেন। অগত্যা সরকারকে প্রায় বিনা সর্তেই ন্যূনতম বোনাসের হার বাড়িয়ে ৮·৩৩ শতাংশ হিসেবে ধার্য করতে হল।

এই ধরনের উভয় সংকটের সম্মুখীন হয়েই ইউরোপের অন্যান্য দেশ সুসমন্বিত আয় ও মূল্য নীতি গ্রহণ করেছেন যার মূল কথা হল, একমাত্র উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে মানুষের উপার্জন বর্তমান স্তরেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। অর্থাৎ, সোজা কথায়, উৎপাদন বাড়লে তবেই মজুরি বাড়তে পারে, অন্যথা নয়। ভারত সরকারও এখন এই ধরনের একটি আয় নীতি স্থির করে দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করছেন এবং বর্তমান বছর শেষ হওয়ার আগেই এই নীতি প্রকাশিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের চেষ্টা হচ্ছে, সরকারকে এই নীতি প্রণয়নের সুযোগ দেওয়ার জন্য শ্রমিকরা যেন এখন ধর্মঘট না করে উৎপাদন চালু রাখে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীও এই উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়েছেন। কিছুদিন আগে রাষ্ট্রপতি গিরিও এক বছরের জন্য শ্রমিকদের ধর্মঘট বন্ধ রাখার উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়েছিলেন।

এটা জানা কথা যে, ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রণ্টে একতা ছাড়া এরকম একটা সরকারি আবেদন কার্যকর হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। শ্রমিকদের কিছু পাইয়ে দেওয়ার জন্য যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রেড ইউনিয়নগুলি পরস্পরের সঙ্গে রেষারেষি করে সেখানে শ্রমিকদের জাতীয় স্বার্থের মুখ চেয়ে আত্মসংযম দেখাবার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

এই কারণেই ভারত সরকারের শ্রম-মন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করে আসছিলেন। এই চেষ্টায় তাঁরা কিছু প্রাথমিক সাফল্যও লাভ করেছিলেন। আই এন টি ইউ সি, এ আই টি ইউ সি ও হিন্দ মজদুর সভা একটি পরিষদ গঠন করে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতে ও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি একাধিক কারণে এই একতায়ও ফাটল দেখা দিচ্ছে। আই এন টি ইউ সি সম্প্রতি যেভাবে অন্য দুটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার সঙ্গে পরামর্শ না করে সিমেণ্ট শ্রমিকদের ধর্মঘট মিটিয়ে নিয়েছে তাতে ঐ দুটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা ক্ষুব্ধ হয়েছে।

এদিকে সিটু, ইউ টি ইউ সি, হিন্দ মজদুর পঞ্চায়েত প্রভৃতি কয়েকটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা একটি পাল্টা সমন্বয় পরিষদ গঠন করেছেন। তাঁরা সরকারের শ্রমনীতির মধ্যে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না।

•

বোকারো ইস্পাত কারখানার প্রথম ব্লাস্ট ফার্নেসটি অবশেষে চালু হল। সব-কিছু ঠিকঠাক সময়মত কাজ হলে এই ফার্নেস অবশ্য অন্তত বছর দুয়েক আগেই চালু হত। ১৯৬৮ সালে এই ব্লাস্ট ফারনেসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। কথা ছিল ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ব্লাস্ট ফার্নেসের কাজ শুরু হবে। কাজ কয়েক পিছিয়ে যাবার পর অবশেষে গত
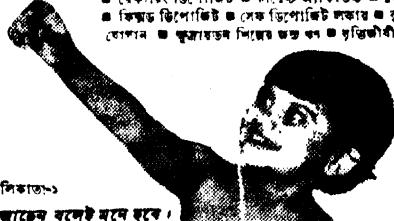
বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের সম্মুখে রাষ্ট্রপতি গিরি। সাম্প্রতিক জাম্বিয়া সফরকালে রাষ্ট্রপতি ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত পরিদর্শনে যান। চিত্রে শ্রীগিরির সঙ্গে জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট কাউন্ডাকে দেখা যাচ্ছে।

৩ অকটোবর প্রধানমন্ত্রী সেই ব্লাস্ট ফার্নেসের উদ্বোধন করলেন।

এই ফার্নেস চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে বোকারো কারখানা থেকে ইস্পাত পাওয়া যাবে তা অবশ্য নয়। সেজন্য প্রথম পর্যায়ের আরও দুটি ব্লাস্ট ফার্নেস বসানোর কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তার মানে ১৯৭৩ সালের শেষ।

বোকারো ইস্পাত কারখানার কাজ এভাবে পিছিয়ে যাওয়ায় শুধু যে খরচ বেড়ে গেছে তাই নয়, দেশে যখন ইস্পাতের প্রচণ্ড অভাব তখন এই কারখানার উৎপাদন থেকে দেশ বঞ্চিত হয়েছে।

এই বিলম্বের অবশ্য একটা সান্ত্বনাও আছে। বোকারো ইস্পাত কারখানাকে আমরা একটি পুরোপুরি স্বদেশী কারখানা হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম বলেই এই কারখানা তৈরি করতে দেরি হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত যেসব রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়েছে সেগুলির নকসা ও যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়েছে। বোকারো ইস্পাত কারখানা সেদিক থেকে ব্যতিক্রম। ঐ কারখানার যন্ত্রপাতি এসেছে প্রধানত রাঁচীর হেভি ইঞ্জিনীয়ারিং ও দুর্গাপুরের মাইনিং অ্যাংড অ্যালায়েড মেসিনারি কারখানা থেকে। ঐ দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাই সময়মত যন্ত্রপাতি তৈরি করে দিতে পারে নি। তবু এটা ভারতীয় শিল্পের পক্ষে গৌরবের কথা যে, বোকারো ইস্পাত কারখানার প্রথম পর্যায়ের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ৩৬ শতাংশের বেশি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়নি। এই প্রকল্পের কাজ যত এগোবে ততই এই কারখানার যন্ত্রপাতির ব্যাপারে পরনির্ভর-শীলতা কমবে।

সোভিয়েট সাহায্যে নির্মিত এই কার-খানা ভারতের বৃহত্তম শিল্প প্রকল্প। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ৭০০ কোটি টাকা।

•

চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পর জাপান এখন সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে হাত বাড়াচ্ছে। পিকিং থেকে দেশে ফিরে গিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাপানের প্রধানমন্ত্রী কাকুই তানাকা বলে-ছেন, জাপানী প্রবাদ হচ্ছে, একসঙ্গে দুটো খরগোশের পিছনে তাড়া করলে একটাকেও ধরা যায় না। ঐ প্রবাদবাক্য স্মরণ রেখেই জাপান আগে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে নেওয়ার উপর জোর দিয়েছে। এখন জাপানী পররাষ্ট্র বিভাগ 'গাইমুশো' প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করার জন্য সোভিয়েট সরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন।

সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী আঁদ্রে গ্রোমিকো যখন গত জানুয়ারিতে টোকিওয় আসেন তখনই স্থির হয়েছিল যে, এই বছরের ভিতরেই দুই দেশের মধ্যে আলোচনা শুরু করা হবে।

জাপান ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে বৃহত্তম বাধা হচ্ছে তথাকথিত 'উত্তরাঞ্চলের' প্রশ্ন। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সোভিয়েট রাশিয়া উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে যে চারটি দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করেছিল সেগুলি নিয়ে জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার বিরোধ অমীমাংসিত রয়েছে। জাপান দাবি করছে এই দ্বীপপুঞ্জগুলি থেকে সোভিয়েট অধিকার তুলে নিয়ে জাপানকে সেগুলি ফিরিয়ে দিতে হবে। রাশিয়া এক সময়ে এই চারটি দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে দুটি ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬০ সালে জাপান যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর করে তখন সোভিয়েট রাশিয়া এই সর্ত আরোপ করে যে, জাপান থেকে যদি সমস্ত বিদেশী সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলেই ঐ দুটি দ্বীপপুঞ্জ জাপানকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

উত্তরাঞ্চলের ঐ চারটি দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে বিরোধের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত জাপান ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধা-বস্থার অবসান হচ্ছে না, শান্তিচুক্তিও স্বাক্ষরিত হচ্ছে না।

৫-১০-৭২ পুণ্ডরীক

ছায়া বিকেল

অনিল ভৌমিক

দুপুর থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। শীতের বৃষ্টি। বড় বড় ফোঁটায় নয়। সরু সুতোর মত বৃষ্টি। সেই সংগে কনকনে ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া। নির্মলবাবু অফিস ঘরে থেকে সেটা বুঝতে পারেন নি। রাস্তায় নেমেই বুঝলেন বৃষ্টি হচ্ছে, হাওয়া দিচ্ছে। গরম চাদরের পাশটা কান পর্যন্ত তুলে দিয়ে নির্মলবাবু ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তায় নামলেন। দনু নস্কর লেনটা এমন কিছু দূরে নয়। মণিকা এত কাছে থাকতো? আশ্চর্য! ব্যাপারটা হয়তো নির্মলবাবুর অজানাই থেকে যেত যদি না মণিকার সংগে সেদিন দেখা হত। একটু পিছিয়ে গেলে হয়তো ট্রামটা কিছু ফাঁকা পাওয়া যাবে এই ভেবেই নির্মলবাবু সেদিন বেশ কটা স্টপ পিছিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। মণিকা আগে থেকেই দাঁড়িয়েছিল সেই স্টপে। ঘোর লাল রংয়ের বর্ডার-লাগানো ছাড়া ছাড়া সাদা ফুলতোলা চাদর গায়ে মণিকাকে নির্মলবাবু দেখেছিলেন। এই বৃষ্টি হাওয়ার দিনেও মণিকার চোখে গগলস ছিল। সব মিলিয়ে মণিকাকে চোখে পড়েছিল এই পর্যন্ত। চিনতে পারেন নি। মণিকাই চিনতে পেরে এগিয়ে এসেছিল—'মাস্টারমশাই না?'

নির্মলবাবু বেশ অবাক হয়েই মণিকার গগলস-পরা আবছা চোখের দিকে তাকিয়ে-ছিলেন। মেয়েটির তেলতেলে মুখ, ম্যাড়-মেড়ে রঙ ঘষা ঠোঁট। এসব দেখছিলেন আর চিনতে চেষ্টা করছিলেন।

—আমি মণিকা — মণিকা বক্সী। মেয়েটি চোখে-মুখে ঔৎসুক্য ফোটাল। নির্মলবাবু ভাবতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ও নামের কাউকেই মনে পড়ল না। নির্মল-বাবুর অসহায় মুখভঙ্গী লক্ষ্য করে মণিকা হাসল—'মানে আমার অবশ্য তখন দশ-এগারো বছর বয়েস—রোগাও ছিলাম ভীষণ—বোধহয় সেই জন্যেই আমাকে—।' এবার যেন নির্মলবাবুর মনে পড়ল। তার-পর ঠিক মনে পড়ল কিনা সেটা যাচাই করবার জন্যে জিজ্ঞেস করলেন—

—আচ্ছা তোমরা পটুয়াটোলা থাকতে না?'

—হ্যাঁ' — মণিকা এবার মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে হাসল—'এখন অবশ্য আমি এই দিকে থাকি।'

নির্মলবাবু এতক্ষণে সহজ হলেন। সেই মণিকা—ফ্রক-পরা ভীষণ রোগা মেয়েটা। এইট না নাইনে পড়ত তখন। নির্মলবাবুর বেকার জীবনের প্রথম ট্যুশনি।

—এতদিন পরে সত্যি আমাকে চিনেছো—এটাই আশ্চর্য।

—আপনি খুব একটা বদলান নি—চুলই যা পেকেছে—চশমা নিয়েছেন—স্বাস্থ্যটা আপনার বরাবরই ভালো অবশ্য—নির্মলবাবু হাত দুটো বুকের কাছে জড়ো করে টান টান দাঁড়ালেন। ট্রাম রাস্তার দিকে তাকালেন। ট্রামের তখনও দেখা নেই। চুপ করে থাকাও চলে না। কাজেই এটা-ওটা কথা চলল। ট্রামের অনিয়মিত চলাচল নিয়ে মণিকা ভ্রূভঙ্গীসহকারে বিরক্তি প্রকাশ করল। একে শীতের দিন তার মধ্যে বৃষ্টির আবহাওয়া—এই নিয়ে নির্মলবাবুও মন্তব্য করলেন। দূরে ট্রামের ভোঁতা মুখ দেখা গেল। গাছতলায় দাঁড়ানো যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ রাস্তায় নামলেন। মণিকা বলল—'আসুন না একদিন—কাছেই তো—বাহান্নর এ দীনু নস্কর লেন।' নির্মলবাবু হেসে ঘাড় নাড়লেন—'ঠিক আছে—যাব'খন।' ট্রামটা ছিল এসপ্লানেডের—নির্মলবাবু যাবেন ডালহৌসী। মণিকা ট্রামে উঠল। জানালা দিয়ে মুখ নীচু করে নির্মলবাবুর দিকে এক নজর তাকিয়ে হাসল। নির্মলবাবুও মৃদু হাসলেন।

বাহান্ন নম্বর বাড়ীটা পাওয়া গেল। বাহান্ন এ-টাও পাওয়া গেল। চিলতে গলির শেষ বাড়ীটা। কাঠের একটা খাড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজা পাওয়া গেল। কড়া নাড়তে ভেতর থেকে মেয়ে-গলায় সাড়া পাওয়া গেল। যেন এ সময় কেউ আসবে এটা জানা ছিল। দরজা খুলে মণিকা মুখ বাড়াল। পরিচিত কেউ এসেছে এবং দরজা খুলেই তাকে চলে যেতে হবে—এমনি একটা ভঙ্গী ছিল মণিকার। নির্মলবাবু মনে মনে হাসলেন—বোধ হয় ভেবেছিল কর্তা এসেছে। মণিকা নির্মলবাবুকে দেখে একটু থমকাল যেন। পরক্ষণেই হাসল—'আরে আপনি?' দরজা সবটা খুলে দিয়ে বলল—'আসুন।' একটু দ্বিধা হয়তো ছিল কিন্তু সেটা প্রকাশ পেতে দিল না।

ঘরটা মোটামুটি সাজানো-গোছানো। বেডসীট ঢাকা খাট, ড্রেসিং টেবিল। জানালা দরজার পর্দাগুলো নতুন কিন্তু জানালা দরজাগুলো পুরোনো, রঙচটা। ড্রেসিং টেবিলটা পুরোনো, কালচে দাগ-ধরা কিন্তু যে ফুলদানীটা বসানো আছে সেটা নতুন। ফুলগুলো তাজা। মেঝেয় একটা শতরঞ্চি বিছানো। —মাস্টারমশাই—আপনি বরং এখানটায় বসুন।' মুখোমুখি ও পাশের একটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মণিকা ডাকল। গায়ের গরম স্কার্ফ আর গগলস বাদ দিলে ঘরেও মণিকার সাজ প্রায় একই। অথবা এও হতে পারে যে ওরা না সাজলেও সেজে আছে বলে মনে হয়—নির্মলবাবু ভাবলেন।

দরজার পরদাটা সরালে দেখা গেল একটা গোল ঝুল বারান্দা। খুবই ছোট। একটা চেয়ার রাখা আছে বাকী জায়গাটা একজনের দাঁড়াবার মত। নির্মলবাবু চেয়ারটায় বসলেন।

—চা খাবেন তো?

—দাও, যা ঠাণ্ডা। একটু থেমে নির্মলবাবু বললেন—'কিন্তু—'

—কী?

—তোমার কর্তা এখনো ফেরেন নি বুঝি?

মণিকার মুখটা একটু কঠিন হল। পরক্ষণেই সহজ হবার ভঙ্গী করে মণিকা সামনের বাড়িঘর ছাতের দিকে তাকিয়ে কতকটা আপনমনেই বলল যেন—'সেসব পরে বলবো'খন।'

বৃষ্টি আর নেই! দমকা হাওয়ার তেজটাও কমেছে। এই অন্ধকার ঝুল বারান্দায় বসে থাকতে ভালোই লাগছে। নির্মলবাবু চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখলেন। মণিকা ওর নিজের চা আনতে গেছে। এক্ষুণি আসবে। গল্পটল্প হবে। এই প্রতীক্ষাটা তাই মন্দ লাগছিল না। দমদমের বাসার সেই দিনগুলি অনেক দূরের! আজকেই সেই দিনগুলি কেন জানি মনে পড়ছে। ছবিও চা জলখাবার দিয়ে চলে যেত। রান্নাঘরে ঠুকঠাক শব্দ করে কিসব জিনিসপত্র গোছগাছ করত। চা জলখাবার শেষ হতে হতে আসতো। ঘন হয়ে বসতো। গল্প করত। শীতের দিনগুলোতে রাতের রান্নার পাট বিশেষ থাকত না। স্টোভে দুটো ভাত ফুটিয়ে নেয়া। কাজেই সেদিনকার অবসরকে অখণ্ডই বলা চলে!

চায়ের কাপ-প্লেট হাতে মণিকা এসে দাঁড়াল। নির্মলবাবু আয়েসী ভঙ্গীতে চেয়ারে গা ছেড়ে দিলেন। মণিকা চায়ে চুমুক দিয়ে বলল—আপনি চায়ে চিনি কম খান?

—হ্যাঁ—বয়স তো হল।

—দেখে কিন্তু মনে হয় না। সেদিনও মণিকা নির্মলবাবুর স্বাস্থ্যের প্রশংসা করেছিল।

—কী যে বলো—বড় মেয়েটি এম-এ পড়ছে—আমি তো বৃদ্ধের দলে।

—আপনার স্ত্রী

—বছর নয়েক মারা গেছে।

—ও।

—তোমার কর্তার কথা কিন্তু কিছু বললে না। নির্মলবাবু নিজের প্রসঙ্গটা এড়াতে চাইলেন।

—ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। উত্তরটা মণিকা মুখস্থর মত বলে গেল। যেন আগেই ভেবে তৈরী করে রেখেছিল। নির্মলবাবু এমনি একটা উত্তর আশা করেন নি। কিছু বলার নেই এক্ষেত্রে। চুপ করে রইলেন। মণিকা কিন্তু কথাটায় জের টানল—'এ তো আজকাল আকছার হচ্ছে—বনিবনা নেই মিছিমিছি লোকদেখানো ভড়ং করে লাভ কি।'

—ছেলেপুলে?

—একটিই মেয়ে—সেটা ওর ভা[illegible] পড়েছে। মণিকা ম্লান হাসল।

নির্মলবাবু চুপ করে বাইরের অ[illegible]কারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ম[illegible] কাপপ্লেট তুলে নিয়ে যাবার জন্যে [illegible] দাঁড়াল। নির্মলবাবু একটু যেন সহা[illegible]ভূতির সুরেই বললেন—একেবারে এ[illegible] পড়ে গেছো—!

—য়াঃ—এই তো বেশ। মণিকা [illegible] দাঁড়াল।

—তোমার চলে কী করে—মানে চাকরি বাকরি—

—উরি বাপরে, চাকরির যা বাজার—

—তবে?

—এ্যামেচার ক্লাব-টাব আছে, অভিন টভিনয় করি—

নির্মলবাবু যেন জিজ্ঞেস করতে [illegible] তাই জিজ্ঞেস করলেন—কেমন দেয়?

—নায়িকার পার্ট তো আজকাল পা[illegible] না—মাসী-পিসী, বড়জোর নায়িকার সখ[illegible] —চলে যায় আর কি। মণিকা হাসল।

মণিকা কাপ-প্লেট রাখতে গেল। ঠিক তখনই দরজার কড়া নড়ে উঠল। মণিক[illegible] গলা চড়িয়ে বলল—যাই। তারপর দরজ[illegible] খুলে দিল। স্যুটকোটপরা চোখে চশম[illegible] একটি অল্পবয়সী ছেলে ঢুকল। গালে মোটা জুলপি, মাথার চুল এলোমেলো। ছেলেটি মণিকাকে কোন কথা জিজ্ঞেস না করেই সোজা মেঝেয় বিছানো শতরঞ্জিটায় এসে পা ছড়িয়ে বসল। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাল। অন্য পকেট থেকে এক প্যাকেট তাস বের করল। প্যাকেট থেকে তাস বের করতে করতে এতক্ষণে বললে—এ্যাসট্রেটা কোথায়? কিন্তু মণিকার দিকে তাকাল না। মণিকা এ্যাসট্রেটা শতরঞ্জির ওপর রেখে চলে এল। ছেলেটি পেশেন্স খেলতে লাগল। ওর এখানে আসা-যাওয়া যে প্রায় নৈমিত্তিক ব্যাপার এটা ওর ঘরে ঢোকা এবং বসে পড়ার ভঙ্গী থেকেই স্পষ্ট। এখান থেকে দেখতে ব্যাপারটা বেশ থিয়েটার থিয়েটার মত লাগছিল। এখানে অন্ধকার। পর্দার আড়াল। আলোকোজ্জ্বল ঘর। ছেলেটি ঢুকল। বসল। সিগারেট ধরাল। তাস খেলতে লাগল। নির্মলবাবু যেন অভিনয় দেখছেন।

মণিকা কখন এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্য করেন নি। একটু চিন্তিতস্বরেই যেন জিজ্ঞেস করল—

—আজকে সোমবার—না?

—হ্যাঁ। কেন বলো তো?

—উঁ—য়াঃ এমনি।' বার তারিখের কথাটা হঠাৎ এমনি এমনি মনে আসে না! নির্মলবাবু অবশ্য আর এই নিয়ে কোন প্রশ্ন করলেন না। মণিকা তবু দাঁড়িয়ে রইল। নির্মলবাবু সিগারেট ধরালেন। এখানে ঘরের যতটা আলো এসে পড়েছে তাতে মণিকার মুখটা খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সিগারেট ধরাতে গিয়ে মণিকার মনের অস্বস্তি তার মুখেও ফুটে উঠেছে। এটা

লক্ষ্য করলেন। ঠিক তখনই আবার দরজায় কড়া নড়ে উঠল। আবার মণিকা বলল 'যাই।' আগের মত সহজভাবে বলতে পারল না কেন। মণিকা দরজা খুলল। এবার ঢুকল দুজন। একজন দাড়িগোঁফ কামানো, ধুতিপাঞ্জাবী পরা। অন্যজনের একমুখ দাড়িগোঁফ—চোখে চশমা। দাড়িগোঁফঅলা মণিকার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁত বার করে হাসল—'চা—এক্ষুনি।' মণিকাও ওকে দেখা অবধি মিটিমিটি হাসছিল। এবার শব্দ করে হাসল—'এক্ষুনি।' মণিকা চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। দাড়িগোঁফঅলা এবার আপনমনে ছড়ার সুরে বলতে লাগল—'ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মাথায় মারো ডাণ্ডা।' হঠাৎ শতরঞ্জিতে বসা ছেলেটির দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—'বীরু তুই কতক্ষণ।' বীরু মুখ না তুলেই বলল—কিছুক্ষণ।' দুজনে শতরঞ্জিতে গিয়ে আয়েস করে বসল। দাড়িগোঁফঅলা বীরুর পিঠে একটা আদরের থাপড় মেরে কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল। তারপর মৃদুস্বরে কী একটা বলে খ্যাক-খ্যাক করে হাসতে লাগল।

পর্দায় ছায়া ফেলে মণিকা এসে দাঁড়াল।—আপনি আর চা খাবেন?

—নাঃ, এই তো খেলাম।

মণিকা চলে যাচ্ছিল। নির্মলবাবু ডাকলেন—শোন।

—কিছু বলবেন?

—বলছিলাম —নির্মলবাবু একবার বাইরের দিকে আর একবার মণিকার আবছা মুখের দিকে তাকিয়ে নিলেন—'মানে—এরা কারা?'

—পরিচিত—বন্ধুর মত আর কি—তাসটাস খেলতে এখানে আসে।

—ও।

—আপনি তাস খেলতে জানেন?

—এক বয়েসে খেলতাম— কে না খেলেছে। নির্মলবাবু হাসলেন।

—তাহলে তো খুব ভালো হল—আপনারা চারজনে খেলবেন—বেশ হবে।

—আমি তো আজকে হঠাৎ এলাম—অন্যদিন ওরা তাহলে—

—আমাকেই খেলতে হয়। কল দিতেই জানি না তো আমি খেলবো তাস। মণিকা ঠোঁট ওল্টাল—আপনি থাকায় বেশ ভালই হল।

—না না, আমি আবার কেন? নির্মলবাবুর আপত্তিটা খুব জোরালো নয় এটা লক্ষ্য করেই বোধ হয় মণিকা বলল—'আসুন না, আলাপ করিয়ে দি।'

অন্ধকার ঝুলবারান্দা থেকে নির্মলবাবুর মোটেই উঠতে ইচ্ছে করছিল না। মণিকা মাঝে মাঝে এসে টুকরো টুকরো কথা বলে যাচ্ছিল, সামনে নিঝুম বাড়িঘরদোর, সব শব্দ কোলাহল বহু দূরে—বেশ লাগছিল। কিন্তু ওরা আলোজ্বলা ঘরে বসে আছে আর উনি অন্ধকারে আড়ালে বসে আছেন—এটা অভদ্রতা। অগত্যা উঠতে হল।

ওদের বিস্মিত দৃষ্টি একসঙ্গে নির্মলবাবুর ওপর এসে পড়ল। ওরা ভাবতেই পারেনি আর কেউ এখানে আছে—অন্ধকার ঝুলবারান্দা থেকে ওদের হাঁটাচলা বসা লক্ষ্য করছে। মণিকা হেসে বলল—'আমার মাস্টারমশাই।' কারো চোখেমুখে ভাবান্তর দেখা গেল না। নির্মলবাবু অস্বস্তি বোধ করলেন। ওদের বিস্ময়ের ঘোরটা কাটতে সময় লাগল। মণিকা পরিচয়ের পালাটা শুরু করে পরিবেশটাকে সহজ করতে চাইল—'এ হচ্ছে—ধীরাজ—ধীরাজ বসু।' দাড়িগোঁফঅলাকে দেখিয়ে মণিকা বলল। ধুতি-পাঞ্জাবীপরা ছেলেটির দিকে ইঙ্গিত করে বলল—'ও বিপুল ঘোষ অবশ্যই চেহারায় নয়। নমস্কারের পালাটা শেষ হতে ওরা যেন বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠল। ধীরাজই প্রথমে ইয়ারীভঙ্গীতে শতরঞ্জির ওপর চাপড় মেরে বলল—'বসুন মাস্টারমশাই।' নির্মলবাবু বসলেন। না বসে উপায় নেই। সব মিলিয়ে মণিকা এমন একটা অবস্থা করে তুলেছে যে এখন আর অন্ধকার ঝুলবারান্দায় ফিরে যাওয়া যায় না। অন্ততঃ শোভন নয়। সদ্য-পরিচয়ের জের টেনে ধীরাজই কথাবার্তায় মুখ্য ভূমিকা নিল। অন্তরঙ্গভঙ্গীতে বলল—'আপনি তো আবার মাস্টারমশাই মানুষ—'

—কেন বলুন তো? নির্মলবাবু ওর কথা বলার ভঙ্গীতে হাসলেন।

—মানে—আপনার তাসটাস চলে তো?

—চলে।

—বাঃ—সত্যি, মণিদি রসিকজনের খোঁজ রাখে। বীরু তাস বাঁট। বীরু এতক্ষণ আপনমনে তাস শাফল করছিল। একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে তাস বাঁটতে শুরু করল।

নির্মলবাবু বীরুর জুটি হলেন। অন্যদিকের জুটি ধীরাজ আর বিপুল। খেলা শুরু হল। কয়েক হাত খেলা হতে মণিকা বাটি করে ঝালমুড়ি তেলেভাজা নিয়ে এল। ধীরাজ গলা চড়িয়ে ছড়া আওড়ানোর ভঙ্গীতে বলতে লাগল—'চা কৈ, কৈ চা।' মণিকা হেসে মাথা নাড়ল—'হচ্ছে হচ্ছে।' কিছুক্ষণের মধ্যে চাও এল। কিন্তু খেলা যেন কিছুতেই জমছিল না। বিশেষ করে ধীরাজের আজেবাজে কল দেওয়া, গা-ছাড়া ভঙ্গীতে খেলা—আর সবাইকে কিছুতেই মন দিয়ে খেলতে দিচ্ছিল না। নির্মলবাবু ভাবছিলেন অন্য কথা। হয়তো উনি নতুন এখানে। তার সঙ্গে খেলতে গিয়ে ওরা এই জন্যই সহজ হতে পারছিল না। একবার তাস বাঁটা হল। তাস হাতে নিয়েই ধীরাজ ছুঁড়ে ফেলল শতরঞ্জির ওপর।

—ধোৎতেরি —জান নেই এই খেলায়।

—তাহলে জান আন—স্টেক-এ খ্যালো। বিপুল প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে বলল।

—তে-তাস ছাড়া ওর মন উঠবে না। বীরু আপনমনে তাস শাফল করতে করতে বলল।

—লাগা তে-তাস। ধীরাজ চেঁচিয়ে উঠল। তারপর নির্মলবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল—'আপনার আপত্তি নেই তো?' ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে যাচ্ছিল যে নির্মলবাবু কিছু ভাববার অবকাশ পাচ্ছিলেন না। বললেন—মানে—আমি তো ওসব কোন দিন খেলিনি।

—একেবারে জল—ইজি খেলা। বলে ধীরাজ গলা চড়িয়ে ডাকল—মণিদি মণিদি। মণিকা গা ধুয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল বোধহয়। চিরুনি হাতেই এল—কী ব্যাপার?

—তুমি মাস্টারমশাইয়ের কাছে বসো—তে-তাস হবে। মণিকা একটু অপ্রস্তুত হল, অন্ততঃ তার ভঙ্গীতে সেটাই প্রকাশ পেল। কথাটার গুরুত্ব আঁচ করবার জন্যেই বোধহয় এক নজর নির্মলবাবুকে দেখে নিল। তারপর ব্যাপারটাকে লঘু করে দেবার

জন্যে বলল—কী দরকার উনি তো জানেন না খেলতে।

—তুমি শিখিয়ে দেবে। ধীরাজ মৃদু হাসল। নির্মলবাবুর মনে হল ওরা যেন প্রতিপক্ষ। হারজিতের বাজী চলছে তাদের মধ্যে। হয় খেলো নয় তো পরাজয় স্বীকার কর। ওরা বয়েসে তরুণ। দ্বিধা নেই, বিবেচনা নেই। সস্তা আবেগ, রেষারেষির মনোভাব এই তো ওদের সম্বল। আর উনি? প্রবীণ, বিচক্ষণ, সস্তা আবেগকে সংযত করতে জানেন। বাজীর জিৎ তারই। অবশ্য তিনি জুয়া কোন দিন খেলেন নি। অন্য কোথাও অন্য কোন সময় জুয়াখেলার এই প্রস্তাব উনি নাকচ করে দিতেন। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা অন্য রকম। একটা দ্বন্দ্ব, হারজিতের একটা গোপন উত্তেজনা যেন ধীরে ধীরে তাকে নাড়া দিতে লাগল। মণিকার জন্যেই খেলতে হবে। ও বুঝুক—প্রৌঢ়ত্ব উপেক্ষণীয় নয়, দম্ভ তারুণ্যের সঙ্গে তা পাল্লা কষার ক্ষমতা রাখে। তাকে খেলতেই হবে। এরপর সত্যি সত্যি নির্মলবাবু খেলতে প্রস্তুত হলেন। ধীরাজ ছড়া বলতে লাগল—'তে-তাস, তে-তাস, সব ফাঁস সব ফাঁস।' একই সুরে স্বরচিত ছড়াটা আওড়াতে আওড়াতে বাথরুমের দিকে চলল। বীরু তাস শাফল করতে লাগল। বিপুল চিৎপাত হয়ে শুয়ে শতরঞ্জিতে সিগারেট টানতে লাগল।

মণিকা নির্মলবাবুর পাশে এসে বসল। একবার বিপুল, বীরুকে দেখে নিয়ে নির্মলবাবুর প্রায় কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বলল—'সঙ্গে টাকা আছে তো?' একটা মৃদু গন্ধ নির্মলবাবুকে ঘিরে ধরল যেন। গন্ধটা মণিকার সেন্ট-এর না পাউডারের না চুলের তেলের সেটা আঁচ করবার চেষ্টা করতে করতে নির্মলবাবু ক্ষীণ হেসে মাথা নাড়লেন। নীতুর দুটো পড়ার বই কিনতেই অফিসফেরৎ নির্মলবাবু এক পাবলিশার বন্ধুর কাছে যাচ্ছিলেন। কিন্তু যাওয়া হয়নি। মণিকার ঠিকানায় চলে এসেছেন—বলতে গেলে হঠাৎই। পকেটে প্রায় পঞ্চাশ টাকার মত আছে। কে জানে হয়তো এই টাকাটাই পাঁচশ হয়ে ঘুরে আসবে।

ধীরাজ ফিরল। ভুঁড়ির কাছে প্যান্টটা দু আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে ঠিক করতে করতে এগিয়ে এল——কিরে বিপুল এখুনি নেতিয়ে পড়লি?

বিপুল উঠে বসল। কোন কথা বলল না। ধীরাজ বলল—নেঃ বীরু তাস বাঁট। মাস্টারমশাই—কিচ্ছু ভাববেন না—আপনার ছাত্রী আপনাকে ঠিক তরিয়ে দেবে। কথাটায় কী মজা ছিল কে জানে, ধীরাজ একাই খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগল। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল—মণিদি তুমি তো জানো আমাদের বোর্ডমানি কত—নিয়ম কি?

—হুঁ। মণিকা ধীরাজের চোখের দিকে তাকিয়ে সংক্ষেপে জবাব দিল।

—দেন—লেটস বিগিন। ধীরাজ নড়ে-চড়ে বসল।

খেলা শুরু হল। সকলের মুখ গম্ভীর। একটু আগের ধীরাজকে এখন চেনবার উপায় নেই। দাড়িগোঁফভর্তি মুখখানা নিথর হয়ে আছে। টিপে টিপে তাস খুলছে। মৃদুস্বরে কল দিচ্ছে। মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে। 'পাশ' 'নো' বলে পাশ কাটাচ্ছে। একরকম খেলছেই না বলা যায়। সেই তুলনায় বীরু অনেক বেপরোয়া। চশমার ফাঁকে তীব্র দৃষ্টিতে ও প্রতিদ্বন্দ্বিদের মুখ দেখছে। ব্লাইণ্ড খেলার ঝুঁকি নিচ্ছে নির্দ্বিধায়। বিপুল গম্ভীরমুখে খেলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে খেলুড়েদের মুখ দেখে নিচ্ছে শুধু। নইলে বেশিক্ষণই নিজের হাতের তাসের দিকে তাকিয়ে থাকছে। চারবার খেলা হল। দু-বারই জিতল বীরু। বাকী একবার জিতল বিপুল অর একবার নির্মলবাবু। মণিকা এর মধ্যেই মৃদুস্বরে খেলার নিয়মগুলো নির্মলবাবুকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। নিস্তব্ধ ঘর। বাইরের শব্দ এখানে মাঝে মাঝে পৌঁছচ্ছে বটে, কিন্তু কারো কানে যাচ্ছে না সেসব। তাস শাফ্ল করার শব্দ উঠছে মাঝে মাঝে। তারপরই সব নিস্তব্ধ। তাস বাঁটা চলছে। সবাই তাস তুলছে নিঃশব্দে। দুটো বড় দান জিতলো বীরু। প্রথমটা ধীরাজের সঙ্গে পাল্লা কষে। দ্বিতীয়টা নির্মলবাবুর সঙ্গে। নির্মলবাবু এতক্ষণে নিয়মটা শিখে নিজেই খেলতে শুরু করেছিলেন। এই বড় দানটা হেরে গিয়ে নির্মলবাবু পকেট হাতড়ে দেখলেন পরের বারের বোর্ড মনিও তার কাছে নেই। কথাটা মণিকাকে বলতে মণিকা বলল 'থাক তাহলে।'

কিন্তু নির্মলবাবু থামতে চাইলেন না। হাত থেকে ঘড়িটা খুলে মণিকাকে দিলেন। বেশ বুঝলেন তার হাতটা থির-থির করে কাঁপছে।

—এটা রইল—তুমি টাকা দাও।

একটু আগে বিপুল তার আংটিটা রেখে টাকা নিয়েছে। তখনও মণিকা কোন প্রশ্ন করে নি। নিঃশব্দে উঠে গিয়ে ওর লোহার আলমারিটা খুলে টাকা এনে দিয়েছে। এবারও কোন কথা বলল না। ঘড়িটা নিয়ে চলে গেল ওর লোহার আলমারিটার দিকে। খেলা বন্ধ রইল। ধীরাজ হঠাৎ একটা অদ্ভুত চাপাস্বরে বলে উঠল —'বোতল গ্লাশ বের কর।' কথাটায় যেন একটা আদেশের ভঙ্গী ছিল। মণিকা আলমারির হাতল টানতে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্য থমকাল। তারপর খুলল।

মণিকা ফিরে এল। নির্মলবাবুর হাতে নোটগুলো দিয়ে বোতল গ্লাশ শতরঞ্জির ওপর রাখল। ধীরাজ গ্লাশে কিছুটা মদ ঢালল। সোডা না মিশিয়েই খেয়ে নিয়ে মুখ বিকৃত করল। তারপর আর এক গ্লাসে কিছুটা ঢেলে সোডা মিশিয়ে বিপুলকে দিল। বীরুর দিকে তাকিয়ে বলল—'তুই তো খেলার সময় খাস না।'

বীরু তাস শাফল করতে করতে মাথা নাড়ল। নির্মলবাবু হাত বাড়ালেন। বীরুর শাফল করতে-থাকা হাত থেমে গেল। বিপুল গ্লাশে চুমুক দিতে গিয়ে চুমুক দিতে পারল না। ধীরাজ স্থির দৃষ্টিতে নির্মলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এক মুহূর্ত। তারপরে সকলেই সহজ হল। ধীরাজ নিঃশব্দে গ্লাশটা এগিয়ে দিল। নির্মলবাবু এক চুমুক খেয়ে গ্লাশটা পাশে রাখলেন। মণিকা সবই দেখল। কিন্তু কোন কথা বলল না।

আবার খেলা চলল। ঘড়ির কাঁটা কখন দশটার ঘর পেরিয়েছে কেউ খেয়াল করে নি। খেলা আর নেশা দুটোই জমে উঠেছে তখন। নির্মলবাবুর টাকা শেষ। বিপুল আর খেলছিল না। তার টাকা কয়েক দান আগেই শেষ হয়ে গেছে। নির্মলবাবু এতক্ষণে খেয়াল করলেন, মণিকা কখন নিঃশব্দে তার পাশ থেকে উঠে বীরুর পাশে গিয়ে বসেছে। নিজেকে হঠাৎ বড় ক্লান্ত মনে হল তার। একবার উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। হাত-পা কেমন যেন অবশ লাগছে। ভাবলেন মণিকাকে ডাকি। ও একটু সাহায্য করুক। কিন্তু পরক্ষণে আর ডাকতে ইচ্ছে হল না। ততক্ষণে আর একবার তাস বাঁটা হয়েছে। মণিকা বীরুর তাসের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। থাক। মণিকাকে আর ডেকে দরকার নেই। আর একবারের চেষ্টাতেই উঠে দাঁড়ালেন। বেশ বুঝতে পারলেন হাত-পাগুলো থরথর করে কাঁপছে। জোরে শ্বাস নিলেন। কিন্তু তাতে কোন সুবিধে হল না। মাথাটাও টনটন করছে। চোখ দুটো জ্বালা জ্বালা করছে। প্রায় টলতে টলতে দরজার দিকে এগোলেন। দরজাটা ধরে টাল সামলালেন। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন একবার। বীরু আর ধীরাজ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। ধীরাজের তাস হাতে ধরা। বীরুর তাস শতরঞ্জির ওপর উপুড় করা। বীরু বোধ হয় ব্লাইণ্ড খেলছে। বীরুর কাঁধ ঘেঁষে মণিকা বসে আছে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ধীরাজের দিকে। বিপুল দু হাঁটুর ওপর মুখ গুঁজে বসে আছে। সেই অন্ধকার ঝুলবারান্দা থেকে দেখা দৃশ্যের মত—কেমন থিয়েটার থিয়েটার যেন।

সিঁড়ির মাথায় একটা টিমটিমে আলো জ্বলছিল। খুব সাবধানে নির্মলবাবু পা বাড়ালেন। সিঁড়িটা শেষ হতেই খোলা গলি দিয়ে শীতার্ত হাওয়া ছুটে এল। নির্মলবাবুর সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। চাদরটা ভালো করে জড়াতে গিয়ে বুঝলেন আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সবকিছু কেমন যেন অস্পষ্ট আবছা লাগছে।

কলাবৌ-এর অবগুণ্ঠন উন্মোচন

সমরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

দুর্গাপুজোর মণ্ডপে প্রবেশ করলেই চোখে পড়ে মৃন্ময়ী দুর্গাপ্রতিমার একেবারে কাছে গণেশের ডান পাশে দণ্ডায়মানা একটি মূর্তি,—এক গলা ঘোমটায় ঢাকা মুখ, যেন লজ্জাবতী লতা। ইনি সাধারণ্যে 'কলাবৌ' নামে পরিচিতা। দুর্গাপ্রতিমার রূপ-কল্পনায় এই কলাবৌ আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দুর্গাপুজোর মহাসপ্তমীর দিন ভোর সকালে এই কলাবৌ-এর পুজামণ্ডপে প্রবেশ এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। কাছেপিঠের কোন নদী বা পুষ্করিণীতে নানা উপচারসম্ভার দিয়ে এঁকে স্নান করিয়ে, মন্ত্রোচ্চারণে পথঘাট মুখরিত করে সবাদ্যে শোভাযাত্রা করে নিয়ে আসা হয় পুজামণ্ডপে। কোথাও কোথাও আবার পুজামণ্ডপের মধ্যেই এই স্নানপর্ব সারা হয় শাস্ত্রসম্মত নানা আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা।

সাধারণ বাঙালী পরিবারের একটি মধুর চিত্র যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে দুর্গা-প্রতিমার রূপকল্পনায়। মহিষাসুরমর্দিনী শ্রীশ্রীচণ্ডীর সংহারমূর্তির চেয়ে বাঙালীর মনে যেন হিমালয়-কন্যার মাতা, বধূ ও কন্যা রূপটিই স্থায়ী আসন লাভ করেছে। তন্ত্রে দুর্গা চতুর্ভুজা, সিংহস্থা, মরকতবর্ণা রূপে বর্ণিতা হলেও, বাংলায় প্রচলিত পৌরাণিক পদ্ধতি অনুসারে ইনি অতসী-পুষ্প বর্ণাভা, দশভুজা, জটাজুট-সমাযুক্তা। এঁর পদতলে ছিন্নমস্তক মহিষ, মহিষের দেহ-নির্গত খড়্গধারী মহিষাসুরের হৃদয় দেবীর শূলে বিদ্ধ। দেবীর দু পাশে কার্তিক-গণেশ ও লক্ষ্মী-সরস্বতী বা জয়া-বিজয়ার মূর্তি। এই যুগল মূর্তির রূপকল্পনার উল্লেখ আছে কালীবিলাস তন্ত্রে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' ব্রহ্মচারী সত্যানন্দের বর্ণনায় দুর্গাপ্রতিমার এই প্রচলিত রূপটিই বর্ণিত হয়েছে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় :—

"দিগ্‌ভুজা—নানা-প্রহরণধারিণী—শত্রু-বিমর্দিনী—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী — দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী — বামে বাণীবিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।"

পুত্রকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে তিনদিনের জন্যে দুর্গার পিত্রালয়ে পদার্পণ—এই ধারণাটাই যেন প্রচলিত রূপকল্পনায় প্রাধান্যলাভ করেছে। আগমনী ও বিজয়া গানে দুর্গার স্নেহউজ্জ্বল মাতৃরূপটিই রঙে রূপে রসে ছন্দে বাঙময় হয়ে উঠেছে।

তন্ত্রোক্ত এই রূপকল্পনার সঙ্গে আর একজন এসে যুক্ত হয়েছেন কালক্রমে লৌকিক ধর্মের প্রভাবে। এই নবাগতা হলেন নববধূর বেশে সজ্জিতা, অবগুণ্ঠন-বতী কলাবৌ। গণেশের পাশে থাকার দরুন লৌকিক ধারণায় এঁকে গণেশের স্ত্রী-রূপে কল্পিত হতে সাহায্য করেছে। এই ধারণার পিছনে অবশ্য শাস্ত্রীয় কোন সমর্থন নেই। তবে এ ধরনের লৌকিক অনুমান ও কল্পনা কালক্রমে শাস্ত্রীয় অনুশাসনের মর্যাদা পেয়েছে—এমন ঘটনা আমাদের ধর্মাচরণের ইতিহাসে বিরল নয়। কে জানে, অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে একদিন হয়তো কলাবৌ সত্যিই পুজিতা হবেন গণেশের স্ত্রী-রূপে। বহু বিচিত্র ও অবিশ্বাস্য তথ্যে ভরা আমাদের ধর্মের ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাস। আজকের প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে কত শতাংশ শাস্ত্রীয় আর কত শতাংশ লৌকিক তা সঠিক নিরূপণ করা রীতিমত গবেষণা-সাপেক্ষ।

কলাবৌকে. আমরা যে-ভাবনায়ই অর্চনা করি না কেন, আসলে যে এই অনুষ্ঠানটি লোকায়ত ধর্মের বৃক্ষ-পুজার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কলাবৌ-এর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করলেই এ তত্ত্বটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'কলাবৌ' নামটি লৌকিক, এর আসল শাস্ত্রীয় নাম 'নব-পত্রিকা'। নয়টি বৃক্ষের সমাহারে যে গঠিত হয়েছে এর দেহ—এই তত্ত্বই ব্যক্ত হচ্ছে এর প্রকৃত শাস্ত্রীয় নামের মধ্যে। পুজামন্ত্রে সংস্কৃত শ্লোকাকারে বর্ণিত হয়েছে নবপত্রিকার নয়টি উদ্ভিদের নাম :—

'রম্ভা কচ্চী হরিদ্রাচ জয়ন্তী বিল্ব দাড়িমৌ।
অশোক মানকশ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকা।'

কলাবৌ-রূপী নবপত্রিকার দেহ গড়ে উঠেছে নয়টি উদ্ভিদ দিয়ে। তারা হল—কলা, কালো কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু ও ধান। পুজো-বিধি অনুসারে এই ন'টি গাছের কোনটির শাখা-প্রশাখা আবার কোনটির গোটা গাছটাকেই গ্রহণ করে তাদের একত্রে বাঁধা হয় শ্বেত অপরাজিতার লতা দিয়ে। এই গাছগুলির মধ্যে কলাগাছটিই আকারে প্রকারে সর্ববৃহৎ এবং তারই অঙ্গে অপরাজিতা লতার বন্ধনরজ্জু দিয়ে সংযুক্ত করা হয় অন্য আটটি গাছ বা তাদের অংশ-বিশেষ। দীর্ঘ-পত্রবিশিষ্ট কলাগাছটিই বাইরে থেকে দৃশ্যমান, বাকি আটটি গাছ বা তাদের শাখা-প্রশাখা তার অঙ্গে সংযুক্ত থেকে ঢাকা পড়ে শাড়ীর আবরণে।

মানুষের মধ্যে রয়েছে এক আদিম ইচ্ছা :—তা হল সব কিছুর মধ্যে নিজের রূপকে ভাস্বর করে তোলা। এই ইচ্ছাই নব-পত্রিকাকে 'কলাবৌ'-এ রূপান্তরিত করেছে ধীরে ধীরে। ক্রমে শিল্পীর নিপুণতা যুক্ত হয়েছে এই মানবীয়-রূপদানের প্রবৃত্তির

(অ্যান্থ্রোপোমর্ফিজম) সঙ্গে। মূর্তিকে বাস্তবানুগ করবার জন্যে এরবক্ষস্থলে উন্নত করা হয়েছে জোড়া বেল সংস্থাপনের দ্বারা, আর এর সর্বাঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে রক্ত-রেখা শাড়ী। নবপত্রিকার মধ্যে অন্তপত্রিকাই আজ আর বাইরে থেকে দৃষ্টিগোচর নয়, শুধু আবক্ষ অবগুন্ঠনে আবৃতা, ব্রীড়াবনতা, নববধূবেশী কলাগাছটি মন্দিত করে আমাদের দৃষ্টিকে। তাই নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই শাস্ত্রীয় নামের পরিবর্তে লৌকিক নামটিই আজ অধিক প্রচলিত; 'নবপত্রিকা'র স্থলে 'কলাবৌ' নামেই নবউদ্ভিদের সমাহার আজ সাধারণ্যে পরিচিত।

নিঃসন্দেহে নবপত্রিকা অনুষ্ঠানটি আদিম বৃক্ষ-পূজার সাক্ষ্যবহ। অন্যান্য বহু ধর্মীয় আচারের মত অনার্য-সংস্কৃতি-উদ্ভূত বৃক্ষ-পূজার ঐতিহ্যকেও আর্য-ধর্ম বহুল পরিমাণে স্বীকার ও আত্মসাৎ করে নেয়। এরই ফলে শাস্ত্রীয় দেবী দুর্গার পূজার্চনায় অঙ্গীভূত হয়েছে এই নবপত্রিকা-রূপী ন'টি বৃক্ষের পূজা।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে বৃক্ষ-পূজা আদিম মানবগোষ্ঠীর ধর্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দখল করেছিল অন্যতম প্রধান স্থান। অরণ্যের আশ্রয়ে বসবাসের ফলে আদিম মানুষ বৃক্ষকে দেখতো ভক্তি ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে। বৃক্ষ তাদের জোগাত ক্ষুধার অন্ন, আধি-ব্যাধিতে—উপশমকারী ওষধি, বন্যা ও বন্য প্রাণীর কবল থেকে করতো রক্ষা। তাই বৃক্ষের কাছে তাদের ঋণের শেষ ছিল না। এই ঋণের জন্যে কৃতজ্ঞতা-বোধ থেকেই উৎপত্তি হয়েছিল বৃক্ষ-পূজার। আদিম যুগের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় সব দেশেই বৃক্ষের ক্ষতিসাধন একটি গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য হত।

কালক্রমে মানুষ অরণ্যের বৃক্ষরাজির মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের হিতকারিতা আবিষ্কার করতে শুরু করলো। খাদ্য ও ওষধি হিসাবে এইসব বৃক্ষের অশেষ গুণ এদের প্রতিষ্ঠিত করলো বিশেষ একটি মর্যাদার আসনে। আজও আমরা কতকগুলি বৃক্ষকে বিশেষ ভক্তির চোখে দেখি এবং বিভিন্ন শাস্ত্রীয় দেবদেবীর সঙ্গে তাদের নানাভাবে যুক্ত করে থাকি। খাদ্য ও ওষধি হিসাবে মানুষের পক্ষে মহোপকারী বৃক্ষরাজির মধ্যে 'নবপত্রিকা' নামে অভিহিত ন'টি বৃক্ষকে নির্বাচন করার মধ্যে তৎকালীন সমাজ-নিয়ন্তা ব্রাহ্মণদের প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এইসব বৃক্ষ যাতে জনপদ হতে বিলুপ্ত না হয়ে যায় তার জন্যই তাঁরা পূজ্য হিসাবে এঁদের নির্দিষ্ট করেছেন ধর্মশাস্ত্রে এবং এঁদের অধিষ্ঠাত্রীদেবী হিসাবে উল্লেখ করেছেন শক্তির বিভিন্নরূপের নজন দেবীকে। নবপত্রিকার ন'টি বৃক্ষের প্রত্যেকটির জন্যে নির্দিষ্ট এই দেবীরা প্রত্যেকে পূজিতা হন পৃথক পৃথকভাবে। এঁরা হলেন ঃ—

কদলীর ব্রহ্মাণী, কচুর কালিকা, হরিদ্রার দুর্গা, জয়ন্তীর কার্তিকী, বিল্বের শিবা, দাড়িমের রক্তদন্তিকা, অশোকের শোকরহিতা, মানকচুর চামুণ্ডা ও ধান্যের লক্ষ্মী। সমবেতভাবে নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী-দেবী শ্রীশ্রীদুর্গা।

আমাদের ধর্মানুষ্ঠানের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ ও আচার-উপাদান সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে এগুলির ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে শরীরবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যতত্ত্বের ওপর। দেবতার নৈবেদ্যে প্রদের ফলমূল থেকে আরম্ভ করে পূজা-উপচারের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে রয়েছে মানুষের পক্ষে মহোপকারী দ্রব্যসম্ভার। নবপত্রিকার প্রত্যেকটি গাছই যে খাদ্য ও ওষধি হিসাবে বিশেষ গুণান্বিত সে বিষয় কারও দ্বিমত থাকতে পারে না।

এই নবপত্রিকার প্রথম ও প্রধান হল কলাগাছ। এটি যে কতভাবে আমাদের উপকারে লাগে তা বলে শেষ করা যায় না। পাকা কলা আহাররূপে শুধু সুস্বাদুই নয়, খাদ্যপ্রাণে পূর্ণ। পাকা কলার শতকরা প্রায় কুড়িভাগ শর্করা থাকে। কাঁচকলা, কলার ফুল বা মোচা ও উপকান্ড বা থোড় তরকারি হিসেবে ব্যবহৃত হয় আর খাদ্য হিসেবে আছে এগুলোর বিশেষ গুণ। তাছাড়া কলাগাছের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রয়েছে নানা দুরারোগ্য ব্যধি নিরাময়ের ক্ষমতা। এর শিকড় রক্ত-বিকৃতি, পত্রদন্ড-রসে কর্ণশূল, কন্দোদ্ভব (এঁটে) জলে হিক্কা, ভস্মোৎপন্ন ক্ষারে ছুলী, অপক্ক কলার প্রদর রোগ আরোগ্য হয়। এইভাবে বহু কঠিন ব্যাধির নিরাময়কারি ওষধি পাওয়া যায় কলাগাছের বিভিন্ন অংশের মধ্যে।

কচুও একটি বিশেষ উপকারী উদ্ভিদ। কচুর কন্দ, ডাঁটা ও পাতার সবজি হিসেবে নতুন করে পরিচয় দেবার দরকার নেই নিশ্চয়। কচুর কন্দে আছে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ভিটামিন। রোগ প্রতিকারের ক্ষমতায় ও খাদ্য হিসেবে মানকচুও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূজায় প্রার্থনামন্ত্রে মানকচুকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে—"হে মান, তুমি সুর ও অসুরগণের মাননীয়।"

নবপত্রিকার আর একটি অঙ্গ হরিদ্রা বা হলুদ। শুধু ব্যাঞ্জনের মশলা হিসাবে এটি তরকারির স্বাদ ফেরায় না, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুসারে ওষধি হিসেবে এর গুণের তুলনা হয় না। হলুদ রোগ জীবাণু-নাশক এবং কাটা ও মচকানো বেদনায় একেবারে মন্ত্রের মত কাজ করে।

এর পরে উল্লিখিত হয়েছে শ্লোকে জয়ন্তীর কথা। জ্বরে, বসন্তরোগের প্রথমাবস্থায়, ইক্ষুমেহে, বাতের ব্যথায়, এই গাছের বিভিন্ন অংশ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

বেলগাছের ফল ও পাতা একাধারে আমাদের ওষধি ও খাদ্য। প্রথম ইন্দ্রিয়ের কোপ এড়াবার জন্যে ব্রহ্মচারীরা বেলপাতার রস পান করে থাকেন। তাছাড়া এই রস কফবৃদ্ধিজনিত সর্বপ্রকার রোগের মহৌষধ। আর বেল তো কাঁচা ও পাকা উভয়রূপেই ঔষধ ও খাদ্য হিসেবে সর্বজন-আদৃত। কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে কাঁচা বেলের মোরব্বা অথবা সিদ্ধ এবং পাকা বেলের উপকারিতার বিষয় নতুন করে জানাবার প্রয়োজন নেই কাউকে।

ডালিমগাছের ফল ও ছাল নানা রোগের অব্যর্থ ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাকা ডালিম অতীব সুস্বাদু এবং খাদ্যপ্রাণে পরিপূর্ণ। এর রস রক্তবর্ধক ও বলকারক।

ওষধি হিসেবে, বিশেষ করে নানাজাতীয় স্ত্রী-রোগের প্রতিষেধক রূপে, অশোকের স্থান সবার ওপরে। এই গাছের কুঁড়ি ফুল এবং ছাল সবই ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়।

নবপত্রিকা বিষয়ক শ্লোকে সর্বশেষে উল্লিখিত ধান্যের খাদ্য হিসেবে উপযোগিতা নিঃসন্দেহে অদ্বিতীয়। পূজার শ্লোকে ধানাকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে,—"প্রাণীনাং প্রাণদায়িনী", —অর্থাৎ প্রাণীগণের তুমি প্রাণদাত্রী।

এই নবপত্রিকাকে একসঙ্গে বেঁধে রাখে যে শ্বেত-অপরাজিতার লতা তারও গুণের যেন শেষ নেই। এর রস স্মৃতিশক্তি বাড়ায়। দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলে এই উদ্দেশ্যে এর বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

কলাবৌ-এর মধ্যে আত্মগোপন করেছে আজ নবপত্রিকার অপর আটটি পত্রিকা। ধীরে ধীরে হয়তো একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে এই পত্রিকাগুলি, একচ্ছত্র আধিপত্যে বিরাজ করবে শুধু কলাবৌ-বেশী প্রথম পত্রিকাটি। এর বহিরঙ্গের রূপসজ্জা শিল্প-রুচি প্রভাবে সুন্দর হতে সুন্দরতর হবে, আর সর্বাঙ্গবসনাবৃতা লাভ করবে এর মাননীয় রূপটি। সেদিন বিস্মৃতির অতলে বিলীন হয়ে যাবে এর উৎপত্তির তত্ত্বটি। এমন অঘটন ধর্মের ইতিহাসে নজীর-বিহীন নয়।

সেকালের দুর্গাপূজা ঃ ডাচ শিল্পীর চোখে

ওয়ার্ড সাহেব ও সেকালের দুর্গাপূজা

দেবী বললেন, ভয় নেই। অসুরের বিনাশসাধন করে আমি তোমাদের ত্রাণ করব। এবং এই আশ্বাস নিয়ে দেবী পার্বতী তাঁর সহচরী ও অসামান্যা রূপসী দেবী কালরাত্রিকে বললেন এই কার্য সমাধা করতে। কালরাত্রি ভীষণা রূপময়ী সেই দেবী—গভীর রাত্রির মত কালো তাঁর কুঞ্চিত কেশদামে থরে থরে বুঝি লুকিয়ে আছে মৃত্যু, তাঁর তড়িৎভরা আয়ত আঁখির কোপন কটাক্ষে ছাই হয়ে যায় সারা বিশ্ব ভুবন, অথচ সেই সুন্দর সুঠাম আশ্চর্য বিকশিত দীপ্ত প্রভার অমোঘ আকর্ষণ উপেক্ষা করে সাধ্য কার? তাঁর পায়ের তলায় তিনটি ভুবন তাদের যথাসর্বস্ব সমর্পণ করে কৃতকৃতার্থ হয়ে যায়। সেই দেবী কালরাত্রি আবির্ভূত হতেই তাঁর দিকে মৃত্যুর মত এগিয়ে গেল দুর্গাসুরের কয়েক সহস্র সহচর—আর চক্ষের নিমেষে সেই মোহময়ী নন্দনবাসিনীর উষ্ণ নিঃশ্বাসে, ক্রুদ্ধ কটাক্ষে তারা ভস্মে পরিণত হয়ে গেল।

দেবগণ তখন নির্বাসিত। বনবাসী। ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, বরুণ, রুদ্র, বায়ু ও অষ্টবসুরা তখন রাজ্যচ্যুত। সিংহাসন হারিয়েছেন দেবরাজ। নিস্তেজ। অশক্ত। দেবীগণ তখন অসুর ভজনায় ব্যস্ত। ভীত, আর্ত তারকার দল রাত্রির আকাশে আলো জ্বালতে ভয় পায়। নদী হারিয়েছে তার ধারা। অগ্নি তার তেজ। অকালে ফুল ফোটে, ফল ধরে না গাছে। ধরিত্রী অসুরের অত্যাচারে জর্জরিত। সেই অসুরের নাম দুর্গাসুর। গভীর কঠিন তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে তাঁর বরে সে অমোঘবীর্য। দুর্বার। দুর্জয়। অন্যায়-কর্মের তার সীমা নেই। ধর্মকর্ম নিষিদ্ধ। বারণ বেদপাঠ। দিশাহারা পলায়িত দেবকুল ধরলো দেবাদিদেব ভগবান শঙ্করকে। মঙ্গলময় শিবকে। শিব বললেন, মহাশক্তি পার্বতীকে। পার্বতী পাঠালেন কালরাত্রিকে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে সিদ্ধ হলেও শেষবেশ ব্যর্থ হলেন কালরাত্রি। তখন মহাযুদ্ধে সজ্জিত হয়ে দেবী স্বয়ং নামলেন সংগ্রামে—অসুর নিধনে। সেই ভীষণ লড়ায়ের পটভূমি বিন্ধ্যপর্বত।—এই কাহিনী মূলতঃ পৌরাণিক। একটু আধটু অদল-বদল করে নানা পুরাণ কাহিনীতে বিবৃত। কিন্তু কাশীখণ্ড থেকে এই গল্পটি নিয়ে উনিশ শতকের উষালগ্নে বিদেশী মানুষদের উপহার দিলেন কোন পুরাণকার নয়, কোর্তাটুপি পরা ভাঙা-ভাঙা বাংলাবলা এক সাহেব। শুধু সাহেব নয়, হিন্দুদের মধ্যে খৃষ্টানধর্ম প্রবর্তন করতে আসা পাদ্রীসাহেব—নাম উইলিয়ম ওয়ার্ড।

সাহেবের হাল সাকিম দিনেমার রাজত্ব শ্রীরামপুর। জন কোম্পানী কলকাতায় দেশী লোকেদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে দেবে না। কি জানি যদি রাজ্য যায়। কাজেই ব্যাপ্টিস্ট মিশন বসল দিনেমার রাজত্ব শ্রীরামপুরে। সেই মিশনের কেণ্টাবিন্ট, ব্যক্তি ওয়ার্ড। বলতে কি সেই ত্রিরত্ন, যাঁরা বাংলাদেশে শুধু খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন নি, বাংলা ভাষা, গদ্য প্রচারের অন্যতম পথিকৃৎ—সেই কেরী, মার্শমানের সহযোগী। বিস্ময়ের কথা, এঁরা খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে এসে বাংলার পুরাণ উপকথার প্রতি সহজাত ঘৃণার দৃষ্টি দিয়ে তিনি তাকান নি। বরঞ্চ সযত্নে সবকিছু শুনেছেন, লিখেছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ওয়ার্ড ত কেতাবই লিখে বসেছেন সুবৃহৎ : 'এ ভিউ অফ দি হিস্ট্রি, লিটারেচার এণ্ড রিলিজান অব দি হিন্দুজ।' দুই খণ্ড বই। উনিশ শতক তখন সদ্যভূমিষ্ঠ হয়েছে। লর্ড ওয়েলেসলি, নয়া আকবর বাদশা, বিপুল সমারোহে রাজপাট চালাচ্ছেন। শহর কলকাতায় একে একে উঠছে গভর্ণর হাউস, অন্যান্য রাজগৃহ, বাড়ছে ব্যারাকপুর, সেখানে একটা চিড়িয়াখানার পত্তন হচ্ছে, আর তার উল্টোদিকে গঙ্গার ধারে জমে উঠেছে শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশন। পাদ্রী ওয়ার্ড ঘুরে ঘুরে তখন বাংলাদেশ—তার হাজারো গাঁ-গঞ্জ দেখছেন। খৃষ্টধর্ম প্রচার করছেন। কখনও নৌকা কখনও পাল্কী চেপে ঘোরেন গাঁয়ে গাঁয়ে। দেখেন সেখানে বিচিত্র মানুষ, তাদের বিচিত্র জীবনচর্যা, আচার ব্যবহার, উৎসব, পাল-পার্বণ। আর বুঝি সুগভীর নিষ্ঠায় সেই বিচিত্রতর অভিজ্ঞতার কথা লিখে রাখেন তাঁর নোটবুকে। খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য খ্যাপন করতে এক সময়ে নৌকা চাপেন উজানে। যান চুঁচুড়া, ব্যাণ্ডেল—মায় বলাগড় পর্যন্ত। কখনও বা ভাঁটার টানে যান কলকাতা। সেও সেই নৌকায়। কখনও বা গঙ্গা পেরিয়ে ব্যারাকপুর হয়ে—তারপর পাল্কীতে, ওয়েলেসলীর পাকা সড়ক ধরে। কখনও সখনও কলকাতায় রাত্রিবাস করে আসেন। কারণে অকারণে। এবং এরই মধ্যে একদিন শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে দুর্গাপূজাও দেখে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসেন শারদীয়া পূজার লেখায় রেখায় টানা একটা বিচিত্র ছবি। আঠারশ ছয়। শোভাবাজারের রাজবাড়ী। ক্লাইভের মুন্সী মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের তখন এন্তেকাল হয়েছে। রাজা রাজকৃষ্ণের আমল তখন।

কিন্তু যে কথা হচ্ছিল। কালরাত্রি ব্যর্থ হলেন অসুরদলনে। কিন্তু কেন? অসুরেরা তখন সংখ্যায় ত্রিশ হাজার। আর তারা সব ভীমকায়। তাদের পদভরে সারা পৃথিবী ঢাকা পড়ে গেল। দুর্ধর, দুর্মুখ, ক্রুর, শিরপাণি, পাশপাণি, সুরেন্দ্র, দমন, ধনু, যজ্ঞহানি, খর্গরোমা, উগ্রাস, দেবকম্পন নামের সেই বিশাল অসুরব্যূহ দেখে দেবী কালরাত্রি ভীত হলেন। তিনি শরণ

নিলেন দেবী পার্বতীর চরণে, হে দেবী রক্ষা কর। দেবী বুঝলেন, আর বিলম্ব নয়। তিনি তাঁর সৈন্য সাজালেন—বিপুল, বিরাট সেই বাহিনী। দশ কোটি রথ, দুইশ' অর্বুদ হস্তী, এক কোটি দ্রুতগামী অশ্ব এবং অগণন সৈন্য নিয়ে দেবী পার্বতী অবতীর্ণ হলেন সেই যুদ্ধে। কোথায় হল সেই লড়াই—বিন্ধ্যপর্বতের সানুদেশে—ওয়ার্ড সাহেবও তাই লিখেছেন। দেবী নিজেও কি কম অস্ত্রে সজ্জিত হলেন? বিকটানন, মেঘকেশ প্রমুখ সর্বধ্বংসকারী সেই সব পাশ, অস্ত্র। অসুররা দেবীর ওপর আঘাতের প্রবল বর্ষণের মত অস্ত্রবৃষ্টি করতে লাগল। দেবী অনায়াসে সেই সব প্রত্যাহত করে ফেললেন। দৈত্যদের অস্ত্রে বিন্ধ্যের গাছপালা নষ্ট হয়ে যেতে লাগল, তার পাদপশ্রেণী, তার দুর্ভেদ্য অরণ্যানী, নিষ্পত্র, নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে লাগল। ঘোরতর সেই যুদ্ধে নিমগ্ন দেবী পার্বতী এক সময়ে সেই দুর্ধর্ষ অসুরকে ধরে ফেলে তার বুকের ওপর পা রাখলেন। কিন্তু দুর্গাসুর কোনক্রমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে এবং নূতনভাবে দেবীকে আক্রমণ করলে। দেবীর দেহ থেকে তখন জন্ম হল যোগিনীর—যারা অচিরেই সেই দৈত্য-সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করে ফেললে। দুর্বিনীত সেই দৈত্য তখন আকাশে মেঘের সৃষ্টি করে রাশি রাশি আয়ুধের শিলাবৃষ্টি করতে লাগল। দেবী তাঁর শোষণ অস্ত্রে তাদের সংবরণ করলেন। অসুর এক পর্বতশীর্ষ ভেঙে নিয়ে তাই দিয়ে আক্রমণ করল দেবী পার্বতীকে। তাতেও পরাভূত হয়ে নিল হস্তীর আকার। ভয়াবহ আকাশের মত বিরাট সেই হস্তী। দেবী তাকে ছিন্নভিন্ন করলেন। অসুর হল মহিষ। তাকেও কেটে ফেললেন দেবী পার্বতী। অসুর তখন সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হল। এবং বলাবাহুল্য পরাভূত হল। দেবগণ জয়ধ্বনি করে উঠল। দেবীর নাম দিল দেবী দুর্গা। দেবীর নামকরণের কারণ কার্তিককে জিজ্ঞাসা করেন অগস্ত্য। কার্তিকেয় এই কাহিনী বললেন—ওয়ার্ড তাই লিখেছেন।

পাদ্রী ওয়ার্ড চণ্ডীর কথাও বলেছেন। মহিষাসুর মর্দিনীর কথাও। বলেছেন চৈত্র মাসে রাজা সুরথের বাসন্তী পুজোর কথা। সুরথের অজস্র পশুবলির কথা—যার ফল হিসেবে তিনি লক্ষ কোটি বছর স্বর্গসুখ ভোগের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এবং সাহেব বলছেন বাংলাদেশের সবচেয়ে 'পপুলার' পুজো —এই শারদীয় পুজো। ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র যা শুরু করেন বলে মনে করেন হিন্দুরা। কিন্তু এইসব পৌরাণিক বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হননি তিনি। তাঁর নিজের চোখে দেখা শোভাবাজারের রাজবাড়ীর পুজোর কথা বলেছেন। বলেছেন সেকালের নাচ গান মাইফেলের কথা। বিপুল ব্যয়ের কথা। এই শারদীয়া পুজোয় সেকালের কলকাতায় নাকি খরচ হত পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের মত টাকা। অন্যে পরে কা কথা, সাহেব বলেছেন, আঠার শ' এগার সালে কন্দর্পগুরু নামে এক কায়স্থ সন্তান আটত্রিশ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করেন। বছরে পুজোয় তাঁর খরচ গড়পড়তা পড়ত সাড়ে বার হাজার পাউণ্ড।

কিন্তু পুজো ত নিমিত্ত মাত্র। পুজোর পর রাতেই যত বোলবোলা, রমরমা জমজমা। বহু ধনীবাবুর দল সুন্দর সুন্দর পোশাক আর অলঙ্কার পড়া বাঈজীদের নাচাত দুর্গা প্রতিমার সামনে। আর সে গান নিতান্তই অশ্লীল, নাচও তথৈবচ, কি এক কাঠি বাড়া। কিন্তু সাহেব একটা বিচিত্র খবর দিচ্ছেন—'ডিউরিং দি ডান্সেস, দি ডোরস আর শাট টু কিপ আউট দি ক্রাউড, এজ ওয়েল এজ য়ুরোপীয়ানস, হু আর কেয়ারফুলি একসক্লুডেড।' অর্থাৎ এই নাচের সময় দরজা বন্ধ করে দেওয়া হত যাতে জনতার ভীড় ভেতরে ঢুকতে না পারে। শুধু জনতা নয়, সাহেবদেরও সযত্নে বাদ দেওয়া হত এই মাইফেল থেকে। এটাই অবাক ব্যাপার। কেননা, সাহেবদের দেখা পুজোর মাইফেলের বিবরণ আকছাড় ছড়িয়ে আছে সেকালের কাগজপত্রে, কেতাবে, রোজনামচায়। ফ্যানী পার্কস থেকে বিশপ হেবার হিকি থেকে এশিয়াটিক জর্নাল কেউই সে কথা সাড়ম্বরে বলতে ভোলেন নি। আর শুধু তাঁরা কেন, স্বয়ং পাদ্রী ওয়ার্ডই তাঁর এই বইয়ে রাজা রাজকৃষ্ণদেবের পুজোর যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে তিনি নিজেই ত লিখেছেন—পুজোর দরদালানে 'এ গ্রুপ অফ দি ডান্সিং ওমেন ফাইনলি ড্রেসড, সিঙ্গিং এন্ড ডান্সিং উইথ স্লিপি স্টেপস সারাউণ্ডেড উইথ য়ুরোপীয়ানস।' অর্থাৎ য়ুরোপীয়ানদের পরিবৃত হয়ে একদল সুবেশা হিন্দু বাঈজী ঢিমেতালে নাচছে আর গাইছে। —তবে বাবুদের মাইফেল থেকে সাহেবদের বাদ দেবার কথা বলছেন কেন পাদ্রীসাহেব? আসলে ত সাহেব ছাড়া মাইফেলই জমত না সেকালের বাবুদের।

শোভাবাজারের রাজবাড়ীর দুর্গাপুজোর আরও ছবি দিয়েছেন সাহেব। দিশি পর্তুগীজ জনাদুয়েক অতিথিসুজনদের দেখ্‌ভাল করত। চারিদিকে ঘর, মাঝে দালান। পশ্চিমের ঘরে প্রতিমা। মুসলমান ওস্তাদরা গান গাইত হিন্দুস্থানী। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা ঘুরে ঘুরে যখন ঢং ঢং করে দুটো বাজত তখনই ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। বাঈজীদের সরিয়ে নেওয়া হল। সরিয়ে নেওয়া হল সাহেবদেরও। কেবল ওয়ার্ড সাহেবের লোকজনদের ছাড়া। সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। কেবল প্রতিমার সামনে ছাড়া। এবং তারপর সেই ম্লান আলোকে রাজবাড়ীর সিংহদরজা খুলে দেওয়া হল।

আর সংগে সংগে সেই উন্মুক্ত সিংহদ্বারের মধ্যে দিয়ে পিল-পিল করে ঢুকল এক বিশাল জনতা—একে অপরকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে। প্রায় দেড় হাজার হাতের সেই সুবিস্তৃত দালান একটা জনসমুদ্র বলে মনে হতে লাগল। কেবল মানুষের মাথা আর মাথা। তাদের মধ্যে মাথায় লম্বা লম্বা টুপি-পড়া কয়েকজন লোক গান শুরু করে দিলে। সাহেবের মনে এই দৃশ্য—সেই গায়কদের পোশাক-পরিচ্ছদ, তাদের অশ্লীল ভঙ্গী, সব কিছুই একটা ভীষণ ভয়ের উদ্রেক করেছিল—'সেনসেসন অফ গ্রেটেস্ট হরর'। কিন্তু কি এই গান? আখড়াই, হাফ আখড়াই,

থেউড়? সাহেব তার কোন হদিশ রেখে যান নি, কিন্তু রাজকৃষ্ণের রাজবাড়ীতে শারদীয় এই আনন্দোৎসবে কলকাতার আমজনতাকে যে ভুলে যাওয়া হয় নি, সাহেবের সকল নিন্দাবাদ সত্ত্বেও এই কথাটা নজরে না পড়বার কথা নয়। আনন্দময়ীর আগমনে যখন দেশ ছেয়ে যেত তখন ধনীর দুয়ারে কলকাতার কাঙালিনী মেয়ের আমন্ত্রণ ছত—কলকাতার বাবু কালচারের এই দিকটা আমরা কেন যেন মাঝে মাঝে বিস্মৃত হই! শুধু এই উৎসবের আনন্দোচ্ছ্বাস নয়। পাদ্রীসাহেব সেকালের দুর্গাপুজোয় বাবু-দের প্রসাদের এলাহী আয়োজনের কথা লিখেছেন। শারদীয়া পুজোয় যে কোন বড়-লোক হাজার মণ মিষ্টি, হাজার মণ চিনি, হাজারখানা কাপড়, হাজার গ্রন্থ সিল্ক আর হাজারখানা ফলমূল চালকলা ভর্তি নৈবেদ্যের আয়োজন করতেন। আজকের দিনে এটা অবিশ্বাস্য হলেও সমসাময়িক অন্যান্য সূত্রে এই 'দীয়তাং-ভুজ্যতাং'-এর ট্রাডিশনের ছবি মিলেই যাচ্ছে। গোবিন্দরাম মিত্রের দুর্গাপুজোয় দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে বড় নৈবেদ্যটাতে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ মণ চাল থাকত! ভাবুন ব্যাপারখানা!

এসব ছাড়াও ওয়ার্ড সাহেবের বিবরণে বারবার যে কথাটা ঘুরে ফিরে এসেছে সেটা হচ্ছে এইসব পুজো উপলক্ষে সেকালের বিপুল পশুবলির ব্যবস্থা! নদীয়ার রাজা নাকি প্রায় চৌত্রিশ হাজার ছাগবলি দিতেন পুজোয়। নৌকা করে সেইসব বলির পশু পাঠিয়ে দিতেন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের বাড়ী। দুর্গাপুজোয় কোথাও মহিষবলিও হত। তবে তার মাংস কোন বর্ণহিন্দু গ্রহণ করত না। মিশনারি সাহেবকে কোন এক কলকাতার বাবু সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, তিনি একশ' আটটি শুধু মোষ-বলিই দেখেছেন। নিম্ন হিন্দুদের কেউ কেউ অন্য নিষিদ্ধ পশুও বলি দিত। আর মদ খেয়ে হৈ-হুল্লোড় করত। বৈষ্ণবরা দিত কুমড়ো বলি।

পাদ্রীসাহেব খুবই যত্ন নিয়ে পুংখানুপুংখভাবে সবই পর্যবেক্ষণ করে-ছেন। অন্যান্যদের মত কখনই 'হিদেন গড' বলে নাক সিঁটকাননি। তাঁর মতে দেবী-দুর্গা গ্রীক দেবী মিনার্ভা, প্যল্লা ও জুনোর একীভূত। এই তিনদেবীর শৌর্য, বীর্য ও তৎপরতা এই হিন্দুদেবীর মধ্যে বিস্তৃত। তাঁর পূর্বসূরী জন জোফানিয়া হলওয়েলের মতেরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় দুর্গাকে নিয়ে তাঁর দর্শনচর্চার মধ্যে। ওয়ার্ডের মতে দুর্গার আদি নাম যে 'পারভূতি' সেকথা ত বলাই হয়েছে। তবে সেই দুর্গাসুর যে অসৎবৃত্তির প্রতীক আর পার্বতী যে সৎ-বৃত্তির প্রতিনিধিত্ব করছেন—এইটেই হচ্ছে ওয়ার্ডের দর্শনচিন্তা। অসুরকে হারিয়ে দেবার মধ্যে সৎ এবং অসৎ-এর চিরন্তন লড়াইয়ের মধ্যে অসৎ-এর পরাজয়ের কথাই বিবৃত হয়েছে মিশনারি ওয়ার্ড এই কথাটা [illegible]।

অবশ্য এটাই রহস্য। সতের শ' নিরা-নব্বুই সালের তেরোই অক্টোবর মার্কিন জাহাজ 'ক্রাইটেরিয়ানে'র ক্যাপ্টেনের ভাড়া-করা বজরা করে উইলিয়াম ওয়ার্ড যেদিন শ্রীরামপুরে এসে নেমেছিলেন তখন তাঁর ঘোষিত উদ্দেশ্যই ছিল 'হিদেনদের' অন্ধকার থেকে আলোকের পথে নিয়ে যাওয়া। তখন জন কোম্পানী দেশী লোকেদের খৃস্টান করা মোটেই পছন্দ করত না। এবং এসব ঝামেলা থেকে অহেতুক নানা গোলমাল হতে পারে—এই ভয় তাদের তাড়া করে ফিরত। সেই সময় নিজেকে 'মিশনারি' পরিচয় দিয়েই শ্রীরামপুরে যে প্রার্থনা সভা বসে খৃস্টান-দের, তাতে বক্তা ছিলেন এই ওয়ার্ডই। সেদিন ছিল তাঁর জন্মদিন। শ্রীরামপুর মিশনকে প্রকাশনার কাজে সাহায্য করতে এসেছিলেন তিনি এবং এ কাজে তাঁর কোন ফাঁকি ছিল না। নিজের হাতে টাইপ সেটের কাজ পর্যন্ত করে উইলিয়াম কেরীকে নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম পাতাখানি উপহার দেন, তখন মাস পাঁচেকও হয়নি তাঁর শ্রীরামপুরে। আঠার শ' সাল। আঠারই মার্চ। চৈত্রের দাবদাহে শ্রীরামপুর তখন অতিষ্ঠ। গঙ্গার হাওয়া তার জ্বালা জুড়াতে পারছে না। আর সাদা চামড়া এই আজব মানুষদের অবস্থা ত বলার অপেক্ষা রাখে না।

তবে শুধু ছাপার কাজই নয়। এখানেই থেমে থাকেন নি ওয়ার্ড। নৌকা করে উজানে-ভাটায় গাঁয়ে-গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছেন তিনি। তাঁর নৌকাকে ঘিরে এসেছে গ্রামে-ঘরের মানুষ। ওয়ার্ড তাদের যীশুর বাণী শুনিয়েছেন। তাঁর ছাপাখানায় প্রকাশ করা বই বিলিয়ে দিয়েছেন হাতে হাতে। এমন কট্টর যে মিশনারি, তিনি বাংলাদেশের হিন্দু-দেবদেবীদের তালিকা তৈরী করলেন কেন? তাঁদের প্রতি এই শ্রদ্ধার দৃষ্টি কেন তাঁর চোখে। এই দেবদেবীকে নস্যাৎ করতে এসেছিলেন তিনি—তবে সেই প্রতিপক্ষ দেবতাদের প্রতি কেন এই দরদ, এই ভালো-বাসা? রহস্যটা কি?

বলা শক্ত। তবে কতকগুলো আন্দাজ করা যেতে পারে। কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ড তিন-জনই বেশ 'প্র্যাকটিক্যাল' লোক। কেরী ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-সংস্কৃতের প্রধান শিক্ষক। অথচ ইংরাজ সরকার ধর্মান্তকরণ মোটেই পছন্দ করত না। ভুললে চলবে না প্রথম খৃস্টধর্মান্তরিত হিন্দু কৃষ্ণপাল দিনেমার রাজত্বের লোক। কলকাতার নয়। হুগলী নদীর বুকে এই ধর্মান্তরণ হয় শ্রীরামপুরে। এবং তার ফলে যে 'রায়ট' হয়েছিল, তার জন্যে রঙ্গমঞ্চে সৈন্য আনতে হয়েছিল শ্রীরামপুরের গভর্ণরকে। এই প্রসঙ্গে আর একটা গল্প বলা যায়। তখন লর্ড মিন্টোর রাজত্ব। কেরীকে ডেকে পাঠান হল রাজভবনে। দোসরা সেপ্টেম্বর। আঠার শ' সাত। পৌঁছাতেই চীফ সেক্রেটারী এডমনস্টোন দুটো প্রচারপত্র তাঁর হাতে দিলেন।—একটা বাংলায় অপরটা হিন্দুস্থানীতে। শ্রীরামপুরের মিশনারি ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত। তাতে মহম্মদ আর তাঁর প্রচারিত ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে নানা আকথা কুকথা লেখা।

কেরী অবশ্য সাফাই গেয়েছিলেন যে সেটা খানিকটা অনুবাদ করেন ওয়ার্ড কিন্তু বাকীটা করেন যীশুখৃস্টে শরণ গ্রহণ করা একজন মুসলমান। তবে সেসব কথা সরকার শোনে নি। সেই প্রচারপত্রের সব কপি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্মান্তরণের সব প্রচেষ্টাই মোটামুটি বন্ধ করে দেয়। সরকারের কাছে এই ধমক খেয়েই কি পাদ্রীসাহেবরা তাদের দৃষ্টি পাল্টে-ছিলেন?

কিংবা এও হতে পারে, লিখিয়ে ওয়ার্ড এই দেশটাকে, এই লক্ষ্মী-ষষ্ঠী-ঘেঁটু ঠাকুরের দেশটাকে ভালোই বেসে ফেলে-ছিলেন। এক সময়ে তাঁর তরুণ মনের কোণে প্রেমের কোরক ফুল হয়ে ফুটেছিল; তাই এর শত ত্রুটি কুসংস্কারের অন্তরালে এই দেশের শান্ত হৃদয়খানিও তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিল। হতে পারে, এমনও হতে পারে!

সে যাই হোক, সাহেব শুধু পুজোর কথাই বলেন নি। মহোৎসাহে বিজয়ার কথাও বলেছেন। আম্রশাখায় শান্তিজল, বিজয়ার আলিঙ্গন, মিষ্টিমুখ এমন কি সিদ্ধির সরবৎ কিছুই বাদ যায় নি। সাহেব গঙ্গাবক্ষে দেবী বিসর্জনের খবর দিয়েছেন। সেবার সাহেব গিয়েছেন বিজয়াদশমীর দিন বলাগড়ে। ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর, আঠার শ' তিন। বিশটা গাঁয়ের লোক এসেছিল গঙ্গায় প্রতিমা বিসর্জন দেখতে। নৌকায় দেবীপ্রতিমা তুলে সবাই নাচতে লাগল। ছেলেরা নাচছিল মেয়ের বেশে। একজন ত একেবারে উলঙ্গ হয়ে গেল। আর হা- হা করে হেসে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাই উপভোগ করতে লাগল। এই ছবি দুঃখের। লজ্জার। কিন্তু বিকৃত আনন্দে পঙ্কিল বাংলাদেশের সেই সন্ধিক্ষণে এটা এক নিরপেক্ষ আলোক-চিত্র মাত্র।

আঠার শ' আট সালের পুজোয় কলকাতায় একটা রোমহর্ষ ব্যাপার ঘটে গেল বলে খবর দিচ্ছেন পাদ্রীসাহেব। এক ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখলেন, দেবী বলছেন তাঁর বড় ছেলেকে বলি না দিলে দেবী বিজয়া হবেন না। প্রতিমা তুলতে গিয়ে দেখা গেল সত্যি দেবী জগদ্দল পাথরের মত ভারী। তোলে কার সাধ্যি! কত লোক চেষ্টা করল। দেবী আর ওঠেন না। হৈ-হৈ ব্যাপার। সারা শহর হৈ-চৈ। বহু লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসে নতুন করে পুজো করবার জন্যে সাহায্য করতে লাগল ব্রাহ্মণকে। কিন্তু শেষবেশ দেবী বিজয়া হলেন কিনা, ব্রাহ্মণ-পুত্রের জীবন সে-যাত্রা রক্ষা পেল কিনা, সে খবর ওয়ার্ড সাহেব দেখেন নি।

কলকাতায় দুর্গোৎসব

সেকালে

সমারোহ-পূর্বক এই উৎসবকরণ অল্পকাল হইয়াছে এবং তাহা প্রায় কেবল বঙ্গদেশেই হইয়া থাকে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রথমতঃ এই উৎসবকে বড় জাঁকজমক করেন এবং তাঁহার ঐ ব্যাপার দেখিয়া ক্রমে ক্রমে বৃটিশ গবর্নমেন্টের আমলে যাঁহারা ধনশালী হইলেন তাঁহারা আপনাদের দেশাধিপতির সমক্ষে ধন-সম্পত্তি দর্শাইতে পূর্বমত ভীত না হওয়াতে তদ্দৃষ্টে এই সকল ব্যাপারে অধিক টাকা ব্যয় করিতেন।

[সংবাদ কৌমুদী ।। ১৭ অক্টোবর ১৮২৯ খৃঃ]

দুর্গোৎসব বঙ্গবাসীদিগের প্রধান উৎসব। পৌত্তলিকতার সঙ্গে যত প্রকার দোষ থাকিতে পারে, ইহার মধ্যে তাহার সকলি আছে। দুর্গোৎসবের সময় লোকের অর্থগৌরব প্রকাশ করিবার সময়। দুর্গোৎসবের সময় আমোদ, প্রমোদ, অত্যাচার ও উন্মত্ততার সময়। যেখানে যাও, ধূপ-ধুনার গন্ধ—নৃত্যগীতের আমোদ—ছাগ মহিষের রক্তস্রোত—বাদ্যধ্বনি, জনকোলাহল নয়ন ও মন আকর্ষণ করে। এ সময়ে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকল লোকের মন মহা-উৎসাহে উত্তেজিত হয়, যথার্থ দেশহিতৈষীর মন নিরুৎসাহে পূর্ণ হয়। পৌত্তলিকতার দূষিত দুর্গন্ধ বায়ুর মধ্যে যখন আর আর সকলে উল্লসিত চিত্তে সঞ্চরণ করিতে থাকে, তিনি সত্যের মহিমা ম্লান দেখিয়া এই উৎসব কোলাহলের মধ্যে মৌনভাব ধারণ করেন। তিনি খিন্ন হইয়া দেখেন, সহস্র সহস্র ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া জ্ঞানশূন্যভাবশূন্য স্বহস্ত রচিত প্রতিমূর্তি সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে। ঐ সকল প্রতি-মূর্তির প্রতি যাহাতে মনে শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে, তাহাতে এমন কিছুই নাই। অভ্যাসের গুণে পৌত্তলিকতার যথার্থ কুৎসিত ভাব মনে উদয় হয় না। কেমন করিয়াই বা হইবে? বাহিরের আড়ম্বর এই প্রকার যে তাহাতেই মন সম্পূর্ণরূপে মুগ্ধ হইয়া যায়। ঈশ্বরের উপাসনার ভাব কিছুই নাই। মনকে ভুলাইয়া রাখিবার নানা সামগ্রী রহিয়াছে। নানাবিধ লোক একত্র হইয়াছে—হাস্য-পরিহাস চলিতেছে ধূপ-ধুনার গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হইয়াছে.—বলিদান হইতেছে—বাদ্যধ্বনি উঠিতেছে।...

[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ।। আশ্বিন ১৭৮৪ শক]

●

দুর্গোৎসব হিন্দু জাতির একটি মহোৎসব। ইহার সহিত ইতিহাস, দর্শন, সমাজ ও সময়ের বিশেষ সংস্রব দৃষ্ট হয়। এই উৎসবের নামমাত্রে স্মরণ হয় যেন, রাজা সুরথ বিপক্ষের হস্তে হৃতসর্বস্ব হইয়া, একাকী ভগ্নমনে বনপ্রবেশ করিয়াছেন, একজন ধর্মদর্শী মহর্ষি তাঁহাকে বৈরাগ্যের উপদেশ দিতেছেন এবং দুর্গা দেবীর আরাধনায় উৎসাহিত করিতেছেন। আবার স্মরণ হয়, যেন অযোধ্যাপতি রাম ভার্যার জন্য অতিমাত্র কাতর, মহাবল কপি-বলসাহায্যে লঙ্কা সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার জয়শ্রী লাভের জন্য ব্রহ্মা বেদমন্ত্রে দুর্গা দেবীর বোধন সাধন করিতেছেন। এই প্রাচীন কালের ঘটনা মনকে অধিকার করে বলিয়া ইহা মহোৎসব।

দ্বিতীয়টি দর্শন। হিন্দু দার্শনিকদিগের মধ্যে অনেকে বিজ্ঞানময়ী শক্তিকে সৃষ্টির মূল বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। সৃষ্টি, পালন ও সংহার এই শক্তিরই আয়ত্ত। পৌরাণিকেরা সম্ভবত এই বিজ্ঞানময়ী শক্তিকে দুর্গামূর্তিরূপে কল্পনা করিয়া থাকিবেন। এই জন্য দুর্গা দেবী আদ্যাশক্তি নামে অভিহিত হন। এই আদ্যাশক্তির পূজাকালে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পাঠ ও হোম করা

হইয়া থাকে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী বা সপ্তশতী সূক্ষ্মরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, উহা রূপকচ্ছলে প্রকৃতি বা বিজ্ঞানময়ী শক্তিরই স্তুতিবাদ করিতেছে এবং হোমের যেরূপ প্রক্রিয়া তাহা পর্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, পুরুষ ও প্রকৃতির যোগে যে সৃষ্টি হয় উহা তাহাই গূঢ়ভাবে প্রদর্শন করিতেছে। ইহা দ্বারা দুর্গা দেবী যে মূল শক্তিরই মূর্তি তাহা সহজেই অনুমিত হয়। এই দুর্গা দেবীর অপর নাম মহামায়া। মায়া বলিলে তাহার সহিত দয়া স্নেহ প্রভৃতি মঙ্গল ভাবের সম্বন্ধ হৃদ্বোধ হইয়া থাকে। পৌরাণিকেরা যেরূপে দুর্গা দেবীর মূর্তি কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে সম্পূর্ণ সোপকরণ যুদ্ধের একটি আদর্শ পাওয়া যায়। মহামায়া অমঙ্গল বা অসুরের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন। মহামায়া পার্থিব যুদ্ধোপকরণ বিদ্যা ও ধন লইয়া সিংহ বিক্রমে অমঙ্গলকে পরাস্ত করিতেছেন। তাঁহার একদিকে গণাধীশ্বর অপর দিকে সেনাপতি। দুর্গোৎসবের নামে এই দার্শনিক ব্যাপারটি মনে উদিত হয় এই জন্য ইহা মহোৎসব।

তৃতীয় সমাজ। এই উৎসবে সমাজের বহুতর আয়োজন। লোকে সংবৎসরকাল মিতাচারে অবস্থানরূপে ধন সংগ্রহ করিয়াছে, এখন তাহা ব্যয় করিবার সময় উপস্থিত। হিন্দু জাতি স্বার্থপর নয়, কেবল স্ত্রী-পুত্র ইহাদের সর্বস্ব নয়। ইহারা লৌকিকতা রক্ষা করা বিলক্ষণ বুঝে। স্বসম্বন্ধী কে কোথায় আছে এই সময়ে তাহার তত্ত্ব লওয়া হয়। ফলত এ সময়ে হিন্দু সমাজ একটি নূতন জীবন ধারণ করিয়া থাকে। বিদেশী কর্মস্থান হইতে বিদায় লইয়াছে, বহু দিবসের পর গুরুজনের শ্রীচরণ দর্শন করিবে, পত্নী উৎসুক মনে পথের পানে চাহিয়া আছে, তাহাকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিবে; শিশুগুলি চটুল নেত্রে প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিবে, এবং বন্ধুবান্ধব বহু দিন যাবৎ দূরে আছেন, তাহাদিগকে পাইয়া সুখী হইবে; এই জন্যই দুর্গোৎসব মহোৎসব।

চতুর্থ সময়। এখন শরৎকাল, আকাশ নীল রাগে অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে, মেঘ নির্জল ও শ্বেতবর্ণ, উহা সমুদ্রে ফেন-পুঞ্জের ন্যায় অনন্ত আকাশের বক্ষে বিচরণ করিতেছে, চন্দ্রমণ্ডল নির্মল, জ্যোৎস্নাজাল রজতধারার ন্যায় নিপতিত হইয়া ধরাতল অভিসিক্ত করিতেছে, বৃক্ষে নানা বর্ণের পুষ্প, নদী সকল স্বচ্ছ, পথ কর্দমশূন্য, সমস্ত প্রকৃতিই যেন উৎসবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত, শস্য পরিপক্ক হইতেছে, তদ্দৃষ্টে সকলেই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট, দুর্গোৎসব এই শরতের উৎসব এই জন্যই ইহা মহোৎসব।

[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ।। আশ্বিন ১৭৯৮ শক]

●

শারদীয় মহোৎসব ।। —এই কলিকাতা রাজধানী মধ্যে শারদীয় মহোৎসবে ত্রিবিধ লোকের আলয়েই জগদীশ্বরীর পূজা হয় সকলে স্বমতে ও বিভবানুসারে নানোপচারে তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন কেহবা ইতরাঙ্গ রাগরঙ্গের বাহুল্য না করিয়া মুখ্যাঙ্গ হোম যাগযজ্ঞাদি ও বিবিধোপহারে পূজা সাঙ্গ করেন কেহবা মহাঘটাপূর্বক ঝাড় লণ্ঠন বাদ্য নাচ কাচের আধিক্য-পূর্বক প্রকৃত কার্য পূজা সংক্ষেপেই সারেন কেহবা উভয়েই সমান আয়োজন করেন তন্মধ্যে কতক লোক ভবন মধ্যে কিরূপে করেন তাহা দুর্গাই জানেন কিন্তু বহির্দ্বারে সারজন সন্তরী স্থাপন করিয়া কিয়দ্ব্যক্তি নিমন্ত্রিত ব্যতীত দর্শনাকাঙ্ক্ষি লোকেরদিগকে ভবন প্রবেশে নিরাশ করেন কিন্তু দ্বারের সম্মুখবর্তী পথ হইয়া গমন করিলে বিহারের পরিবর্তে গাত্রে বেত্র প্রহার করিয়া থাকেন বোধ হয় তদ্গৃহপতিরা এই সকল আচরণকেই ভগবতীর সন্তোষের মূল কারণ জ্ঞান করেন সে যাহা হউক এ বৎসর ৪।৫ স্থানে বৃহৎ সমারোহ হইয়াছিল বিশেষত মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের দুই বাটীতে নবমীর রাত্রে শ্রীশ্রীযুক্ত গবরনর জেনেরল লার্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর ও প্রধান সেনাপতি শ্রীশ্রীযুক্ত লার্ড কম্বরমীর ও প্রধান২ সাহেবলোক আগমন করিয়াছিলেন পরে দুই দণ্ড পর্যন্ত নানা আমোদ ও নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণ করত অবস্থিতি করিয়া প্রীত হইয়া গমন করিলেন। ইংরেজ লোকের

গতিবিধি ঐ রাজার দুই বাটী ও রাজা রামচাঁদের বাটী ও দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের বাটী এই তিন বাটীতে প্রায় ছিল অন্যত্র অত্যল্প। বিশেষত সিংহ দেওয়ানের বাটীতে পূজায় চিহ্ন যোড়াসাঁকোর চতুরস্র পথে এক গেট নির্মিত হইয়া তদবধি বাটীর দ্বার পর্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বে আলোক হইয়াছিল তাহাতে যাঁহারা ঐ বাটীর পূজার বার্তা জানেন না তাঁহারাও ঐ গেট অবলোকন করিয়া সমারোহ দর্শনেচ্ছুক হইয়া ঐ অবারিত দ্বার ভবনে গমন করিলেন আপামর সাধারণ কোন লোকের বারণ ছিল না উপরে নীচে যাঁহার যেখানে ইচ্ছা আসনে উপবিষ্ট হইয়া নৃত্য-গীতাদি স্বচ্ছন্দে দর্শন শ্রবণ করিলেন তাহাতে কোন হতাদরের বিষয় নাই।...

[বঙ্গদূত ।। ১০ অকটোবর ১৮২৯ খৃঃ]

●

দেবী পূজা ।। হিন্দুস্থানের মধ্যে শরৎকালীন দেবী পূজা অনেক স্থানে হয় বিশেষত গঙ্গা নদীর উভয় পার্শ্বে অধিক সমারোহ হয় যদি কোন ভাগ্যবান হিন্দু এ পূজা না করে তবে রীতি আছে যে, রাত্রিকালে প্রতিমা আনিয়া লোকেরা সংগোপনে তাহার চণ্ডীমণ্ডপে রাখিয়া যায় পরে গৃহস্থ ব্যক্তি জানিয়া ধর্মভয়ে কিম্বা লোকভয়ে যেরূপে হয় তাঁহার পূজা করে। তাহাতে গত সপ্তাহে ৫ আশ্বিন মঙ্গলবার রাত্রে বেলঘরিয়া গ্রামের বালকেরা ঐ গ্রামের কোন ভাগ্যবানের বাটীতে এক দোমাটীয়া প্রতিমা রাখিয়া আসিয়াছিল ৬ আশ্বিন বুধবার প্রাতে সেই ভাগ্যবান আপন বাটীতে ঐ দোমাটীয়া প্রতিমা দেখিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইল ও আপন ঘর হইতে দা আনিয়া প্রতিমাকে শতধা করিয়া আপন পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া বাঁশ ও কাষ্ঠ দ্বারা চাপা দিয়া রাখিল। যাহারা ঐ প্রতিমা রাখিয়া আসিয়াছিল তাহারা দেখিল যে যেখানে প্রতিমা ছিল সেখানে নাই পরে অন্বেষণ করিতে২ জানিল যে প্রতিমা কাটিয়া পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়াছে আর তাহারা ঐ প্রতিমা সরকারী স্থানে আপনারা পূজা করিবেক নিশ্চয় করিয়া প্রতিমা ফিরিয়া আনিতে গিয়াছিল তাহাতে সে ভাগ্যবান ব্যক্তি তাহারদিগকে প্রতিমা উঠাইয়া লইতে না দিয়া মারপিট করিয়া বিদায় করিল।

[সমাচার দর্পণ ।। ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮২০ খৃঃ]

●

মূর্তির দুর্গোৎসব। — কলিকাতার পশ্চিম শিবপুর গ্রামে এক ব্যক্তি এক দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পূজার তাবদ্দ্রব্য আয়োজন করিয়া ঐ প্রতিমাতে সূর্তি দিয়াছে প্রত্যেক টিকট এক টাকা করিয়া আড়াইশত টিকিট হইয়াছে যাহার নামে প্রাইজ উঠিবে সেই ব্যক্তির নামে সংকল্প হইয়া ঐ প্রতিমা পূজা হইবেক।

[সমাচার দর্পণ ।। ২৬ অকটোবর ১৮২২ খৃঃ]

●

...এই পূজোপলক্ষে নগর মধ্যে নৃত্যগীতাদির বাহুল্য তিন-চারি স্থানে হইয়াছিল অর্থাৎ শোভাবাজারের মহারাজ বাহাদুরের উভয় বাটীতে ধারাবাহিক বোধন নবমী অবধি মহা-নবমী পর্যন্ত নাচ-তামাসা হইয়াছে তদ্দর্শনে এতদ্দেশীয় ও নানা দেশীয় ও নানা দিগ্দেশীয় এবং উচ্চপদাভিষিক্ত সাহেবলোক গমন করিয়াছিলেন তদ্ভিন্ন শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটিতে প্রতিপদাবধি নবমী পর্যন্ত নাচ হয় তথায় নিক্কী প্রভৃতি নর্তকী নিযুক্ত ছিল ইহাতেই সকলে বিবেচনা করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে কি প্রকার আমোদ হইয়াছে।

[সমাচার চন্দ্রিকা]

●

...রাজা সুখময় রায় বাহাদুরের পুত্রেরা ও ঠাকুর বাবুর সন্তানেরা এবং শ্রীযুত দয়ালচাঁদ আঢ্য অনেক দিবস পূজার সময় নাচ করিয়াছেন শেষে ক্রমে ক্রমে উক্ত মহাশয়েরা ক্ষান্ত হইলেন কিন্তু শোভাবাজার রাজবাটিতে এবং জোড়াসাঁকোর সিংহ বাবু-দিগের বাটিতে প্রতি বৎসর নাচ হইয়া থাকে এ বৎসর সিংহবাবুরা ক্ষান্ত হইয়াছেন ইহার কারণ আমরা কিছুই জ্ঞাত নহি। যাহা হউক ইদানীং এই নগর মধ্যে চারি স্থানে নাচে বাহুল্য ছিল সিংহ বাবুদের বাটিতে না হওয়াতে মনে ক্ষোভ হইয়াছিল মহারাজ হরিনাথ রায় বাহাদুর এ স্থানে পূজা করাতে আমাদিগের আনন্দের অঙ্গ হীন না চারিপদ পরিপূর্ণ হইয়াছে অতএব প্রার্থনা রাজাবাহাদুর বাটীতে অরোগী হইয়া এই মহানগরে বাস করত দুর্গোৎসবাদি কর্ম করিয়া এ প্রদেশীয়দিগের আনন্দজনক হউন।

[সমাচার চন্দ্রিকা ।। ২৯ আশ্বিন ১২৩৯]

তিন

কিন্তু প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ যে এত তাড়াতাড়ি এসে যাবে বুঝতে পারিনি, বিকেলের দিকে বড়সাহেবের চাপরাশী আমার টেবিলে একটা চিরকুট দিয়ে গেল। সুপ্রিয়ার লেখা আজ অফিস ছুটির পর গঙ্গার ধারে সেই জায়গায় যেন অপেক্ষা করি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুপ্রিয়া এসে পড়ল। কয়েকদিন হল অফিসের গাড়ি করে যাতায়াত করছে সুপ্রিয়া। কিছুটা দূরে ওকে ছেড়ে দিয়ে গাড়ি চলে গেল। কোর্টের দিককার নরম ঘাসের ওপর বসে বসে দেখতে লাগলাম, একটা ঋজু শরীর দ্রুত পদক্ষেপে এই দিকে এগিয়ে আসছে। সুপ্রিয়া এসে ঝুপ করে আমার পাশে বসে পড়ে শাড়ির আঁচল দিয়ে বাতাস খেতে খেতে বলল, 'বাব্বা! আজ বেশ গরম, তাই না?'

মনে মনে জানলাম, নারী চিরদিনই ছলনাময়ী।

উত্তরের আশায় কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে সুপ্রিয়াই আবার কথা বলে উঠল, 'বহুদিন পর সকাল সকাল বেরিয়েছি আজ।'

দাঁত কিড়মিড় করে শুধুমাত্র নিজেকে শুনিয়েই বললাম, যেহেতু তোমার বস আজ আউট অফ দ্য টাউন।

'তুমি দেখছি মৌনব্রত নিয়েছো। ভাল, খুব ভাল। কথা কম বললে আয়ু বাড়ে।' ওর দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারলাম ও তেরছা করে আমার দিকে তাকালে। হঠাৎ একটা গন্ধ এসে নাকে লাগল, কোন ফুলের গন্ধ, যে ফুল আমি চিনি না। অথচ গন্ধটা বিষম চেনা। এই গন্ধের সঙ্গে নীল একটা আকাশ, সাদা পাখি, আর টিয়া টিয়া রং-এর দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ জড়ানো থাকে।

বললাম, 'কথা যেখানে অর্থহীন সেখানে চুপ করে থাকাই তো ভাল।'

সুপ্রিয়া নড়েচড়ে বসল, 'অর্থহীন কথাও কিন্তু এক এক সময় ভাল লাগে। মনে করে দ্যাখো তো, বাড়ি ফেরার পথে কদিন আমরা অর্থপূর্ণ কথা বলেছি। অধিকাংশ দিনই তুমি আকাশ দেখিয়ে অনেক কিছু বলতে, যার হয়ত কোন অর্থ থাকত, না, কিন্তু আমার শুনতে ভাল লাগত। একটুক্ষণ চুপ থেকে সুপ্রিয়া আবার বলল, 'ভাল লাগত বলেই তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে জেনেও দেরী করে ফেলতাম। টিউশনী সেরে বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত।

'তুমি টিউশনী করতে? বলোনি তো।'

'শুনতে তো চাওনি কোনদিন, আমি কি করি, বাড়িতে কে কে আছে, আমাদের সংসার কীভাবে চলে।' যদিও কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিয়া হাসল মনে হল ও যেন আমাকে তিরস্কার করল।

'শুনতে চাইনি কারণ কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে অহেতুক কৌতূহল দেখান শোভন নয়।'

'কিন্তু তোমার সব খবরই আমার জানা হয়ে গেছে। তোমার মার একটু কাশি হলেই জ্বর হতে চায়, তোমাদের ঠিকে ঝিয়ের নাম যমুনা, তোমাদের পিছনদিককার পুকুর ক্রমশই বুজে আসছে, তোমার বিয়েতে খুব মাছ খাওয়াবেন বলে তোমার বাবা একদিন পুকুরটা কাটিয়েছিলেন—আরও শুনতে চাও?' সুপ্রিয়া শব্দ করে হেসে উঠল।

আমার মনটাও হঠাৎ হালকা হয়ে গেল। বললাম, 'অত কথা তোমার মনে আছে এখনও?

'এখন বলতে কি মিন করছো?' সুপ্রিয়া যেন আমার দিকে একটু সরে এল।

'এই পি এ হবার পর।'

'হ্যাঁ সব মনে আছে। আরও একটা কথা মনে আছে, সেটা তুমিও হয়ত ভুলে গিয়েছো। তোমার তেরো বছর বয়সে টাইফয়েড হয়েছিল। তারপর থেকে তোমার মাথায় গোলযোগ দেখা দিয়েছিল।'

'মোটেই না,' খুব জোরে ঘাড় নেড়ে উঠলাম।

'গোলযোগটা যে তোমার মাথায় রয়েছে এই তার প্রমাণ।' বলে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা কাগজ বার করল সুপ্রিয়া। 'কি লিখেছো। কোন সুস্থ মানুষ লেখে এই সব?'

'আমি যা লিখেছি, ভাল-মন্দ বিচার করেই লিখেছি।'

'ভাল-মন্দ বিচার করার শক্তি তোমার লোপ পেয়েছে।' সুপ্রিয়া যেন আমাকে ধমকে উঠল। 'না হলে মানুষ নিজের পায়ে কুড়োল মারে না।'

একসঙ্গে যতটা সম্ভব বিষ ঢেলে দিয়ে বললাম, 'সবাই কেরিয়ারিস্ট হয় না।'

সুপ্রিয়া চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। এক সময় খুব ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'তুমি হয়ত দারিদ্র্যের আসল মূর্তি দেখোনি, তাই মাঝে মাঝে কঠিন মাটিতে পা দিতে সাধ যায় তোমার। কিন্তু আমি দেখেছি কি করে মানুষ ধীরে ধীরে পাতালের অন্ধকারে তলিয়ে যায়। ক্ষিধের জ্বালায় মা সন্তানের মুখের অন্ন কেড়ে খায় শুনেছো কোনদিন? ভাবতে পার টেররিস্ট মুভমেন্টের সময় যে মানুষ রিভলবারের গুলিতে পর পর তিনজন মানুষকেই হত্যা করেছিল, সেই মানুষকেই সামান্য একটা শিশুর কান্নায় পাগল হয়ে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্ম-হত্যা করতে হয়েছিল। আরও শুনবে—'

হঠাৎ সুপ্রিয়ার একটা হাত চেপে ধরে বলে উঠলাম, 'না আমি শুনতে চাই না। তুমি চুপ করো।'

সুপ্রিয়া হাঁপাচ্ছিল, সেইভাবেই বলল, 'এক এক সময় মনে হয় সমস্ত পৃথিবীটা ভেঙে তছনছ করে ফেলি, এক একটা মানুষকে নখের আঁচড়ে ছিন্নভিন্ন করে দিই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, কী হবে এসব করে। তার চেয়ে যা আছে, তাই থাক। সবাই থাকুক, আমিও সবার মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখি। এর চেয়ে বেশী আমি আর কী করতে পারি, বলো।'

সুপ্রিয়ার এই রূপ আমি কোনদিন দেখিনি। যে শক্ত আচরণের আড়ালে এত-দিন নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল, এক চরম মুহূর্তে সেই আচরণ ভেদ করে নিজেকে প্রকাশ করে ফেলল। একটা হাত ওর কাঁধে রাখলাম। বললাম, 'একটা কথার জবাব দাও।'

'বলো।' দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে রেখে সুপ্রিয়া বলল।

'আমি কী করি না করি তাতে তোমার কি এসে যায়।'

'তুমি আমার বন্ধু। বন্ধু ভুল পথে গেলে তাকে শুধরে আনতে হয়। এটা ছিঁড়ে ফেলো।' বলে একটা কাগজ আমার দিকে বাড়িয়ে দিল সুপ্রিয়া।

'এটা ছিঁড়লে তুমি সুখী হবে?'

'হ্যাঁ।'

কাগজটা ছিঁড়ে ফেললাম। এ কাগজের লেখা আমার জানা। আজই এই চিঠি বড়-সাহেবকে পাঠিয়েছিলাম। আমার পাটনায় বদলির প্রতিবাদপত্র।

সুপ্রিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'অনেক রাত হল, চলো ফেরা যাক।'

হাঁটিতে হাঁটিতে পুরনো পথে এসে পড়লাম। সামনেই রাজভবনের নীচু পাঁচিল। রাত্রির অন্ধকারে ঘন হয়ে গাছগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাওয়ায় সর সর করে ওদের পাতা নড়ছে। ওরা যেন নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করছে।

সুপ্রিয়া হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে তুমি খুব নীল আকাশ দেখাতে। আকাশ কিন্তু সব সময় নীল থাকে না।'

'জানি না এই কথা বলে তুমি আমাকে কি বোঝাতে চাইছো। কথাটা তুমি আরো অনেকদিন বলেছো।'

সুপ্রিয়া আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল, 'তুমি ভয়ানক ছেলেমানুষ। ছেলে-মানুষদের মাঝে মাঝে সাবধান করে দিতে হয়, ঋতুতে ঋতুতে শুধু আকাশের রং না, সব কিছুই পালটায়। এক সময় গাছের পুরনো পাতা ঝড়ে গিয়ে নতুন পাতা গজায়।'

'আর যাই করো, গুরুগিরি ফলাতে এসো না!'

'তুমি কিন্তু আমাকে অপমান করবার চেষ্টা করছো অংশু।' বলেই সুপ্রিয়া ছেলে-মানুষের মত শব্দ করে হেসে উঠল।

সুপ্রিয়াকে এভাবে হাসতে কখনও দেখিনি। এদিকটা অন্ধকার অন্ধকার মতন। ভাল করে ওর মুখ দেখা গেল না। অথচ দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। জোরে হেসে উঠলে সুপ্রিয়াকে কী রকম দেখায় আমার জানা নেই।

'ভাল কথা, তোমার হয়ত জানা নেই, তুমি কেন পাটনায় যাচ্ছো?'

ঠিক এই মুহূর্তে সুপ্রিয়া যে এ ধরনের নীরস একটা বিষয়ের অবতারণা করে বসবে ভাবতে পারিনি। চুপ করে রইলাম।

'তোমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়ে পাঠানো হচ্ছে। পাটনা অফিসের সেল ক্রমাগতই পড়ে যাচ্ছে। অথচ কিছু একটা করা দরকার। বম্বের হেড অফিস থেকে চাপ আসছে। মিস্টার কাপুর গতকাল তাই ফ্লাই করলেন। একজন ট্রাস্টেডম্যান পাঠানো দরকার। তাই—'

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, 'ট্রাস্টেড বলো না, বল স্পাইং করার মত নির্বোধ একটা মানুষ চাই।'

সুপ্রিয়া যেন ধমকে উঠল 'তুমি মোটেই নির্বোধ না। কোম্পানী তোমাকে বুদ্ধিমান কর্মী হিসেবে দেখে। দেখে বলেই এত লোক থাকতে তোমাকে সিলেকট করেছে। পাটনায় যাওয়া মানে অদূর ভবিষ্যতে বড় একটা প্রমোশন, এমন কি সেলস ম্যানেজার হওয়াটাও অসম্ভব না।'

'যদি খুঁটির জোর থাকে।'

সুপ্রিয়া যেন চমকে উঠল, 'তোমার আবার খুঁটি কোথায়?'

'আমার খুব সামনে, হাত বাড়ালেই যাকে ছোঁয়া যায়।'

সুপ্রিয়া যেন বুঝতেই পারল না। হেসে গড়িয়ে পড়ল, 'সত্যি সত্যি তুমি নেহাতই ছেলেমানুষ।'

যতীনবাবু হঠাৎ আমার টেবিলের সামনে এসে বসে পড়লেন। কদিন ধরে খুব কাজ করছি। হাতের সব কাজ শেষ করে ফেলা দরকার। যাবার দিন ঘনিয়ে আসছে। পেপার-ওয়েট নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলেন যতীনবাবু। একসময় গলা পরিষ্কার করে বললেন, 'দিন কয়েকের মধ্যেই চলে যাচ্ছেন। আপনি হয়ত আমাকে ভুল বুঝেছেন।'

মুখ না তুলেই পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'তাতে আপনার কি এসে যায়?'

'অনেক কিছুই এসে যায়, কারণ আপনি আমার কলিগ।'

'আপনি তো বেশ গুছিয়ে কথা বলতে শিখেছেন।'

'নতুন করে শিখিনে, আগে থেকেই জানতাম।'

'জানলে হয়ত বলতেন না।'

'মানুষ তো বদলায়।'

'হয়ত বদলায়, হয়ত বদলায় না। আপনি কি সেই তর্ক তুলতে এলেন এখন?' বলে চোখ দিয়ে স্তূপীকৃত ফাইল দেখালাম।'

'না। তর্ক করা আমি পছন্দ করি না।' মনে হল ভদ্রলোক চটেছেন। মনে মনে হাসলাম। জায়গা মত ঘা দিতে পারলে শক্ত পাথরেও ফাটল ধরে। একটুক্ষণ চুপ থেকে যতীনবাবু আবার বললেন, 'আমি মানুষের মুখ দেখে অনেক কিছু বুঝতে পারি। আপনি যে আমার ওপর রেগে থাকেন, বুঝতে পারি। কিন্তু কেন রাগেন, তা বুঝি না। একটু তলিয়ে দেখলে—'

অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠলাম, 'আমি কারও উপদেশ শুনতে পছন্দ করি না।'

যতীনবাবু কথা বললেন না। উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে চলে গেলেন। মজুমদার যেন ওৎ পেতে বসে ছিল, যতীনবাবু চলে যেতেই মজুমদার এসে খালি চেয়ারটায় বসল। 'কী ব্যাপার বলুন তো? কোন শাস্তির প্রস্তাব নাকি?

'হ্যাঁ, আর বলেন কেন। প্রপোজাল আপাত দৃষ্টিতে ভালই মনে হচ্ছে।' হঠাৎ মাথার মধ্যে দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল।

মজুমদার চোখ ছোট করে টেবিলের ওপর, দিয়ে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল। বললাম, 'মিস মিত্রর তরফ থেকে ভদ্রলো[ক] বলতে এসেছেন, আমি যেন পাটনায় যে[তে] আপত্তি জানাই। যদি দরকার হয় ইউনিয়নে[র] হেলপ নিই।'

'আপনি কি বললেন।' মজুমদার [দ]ম বন্ধ করে আমার উত্তরের অপেক্ষা[য়] রয়েছে।

মজুমদারকে নিয়ে খেলার ইচ্ছে তখনও আমার মধ্যে প্রবল। বললাম, '[কী] বলা উচিত, বলুন তো?'

মজুমদার বিরক্ত হল, 'আপনি কি যতী[ন]বাবুকে সঠিক কোন জবাব দেননি?'

হেসে ফেললাম, 'যদি না-ই দিয়ে থাকি ক্ষতি কি?'

মজুমদার অপ্রস্তুত হল, 'না-না, লাভ ক্ষতির প্রশ্ন নয়। তবে ব্যাপারটা গুরুতর—'

'তাই তো সময় নেওয়া দরকার। হু[ট] করে মনোস্থির না করাই ভাল।'

'আপনি কি জানেন, আপনার পাটনায় যাওয়া বন্ধ করতে পারলে অনেকের লাভ?'

'তাই নাকি?' সত্যি সত্যি এমন কো[ন] সন্দেহ আমার মনে ছিল না।

'ডেসপ্যাচ সেকশনে কাজ করে [যে] ছেলেটি, জানেন কি, সে যতীনবাবুর ডাইরেকট ব্রাদার ইন ল।'

'কিন্তু ডেসপ্যাচ সেকসনের লোক কে[ন] আর সেলস ডিপার্টমেণ্টে ট্রান্সফার করবে না অফিস।'

মজুমদার হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'কে বললে করবে না। সব কিছুই হতে পারে এখানে। বিশেষ করে যে অফিসের হেডম্যান একটা ডিবচ, স্কাউণ্ড্রেল—

'আঃ, মিস্টার মজুমদার, আমাদের আরও সংযতভাবে কথা বলা উচিত।'

'না উচিত না। আমি যা বলছি প্রতিটি অক্ষর সত্যি। সব কিছুই চলছে এখানে পি, এ মানে তো পার্সোনাল অ্যাসিস্টাণ্ট তাই না? অফিসের পর ককটেল পার্টি থেকে বেরোবার সময় যে বড় কর্তাদের পার্সোনাল অ্যাসিস্টান্স দরকার হয়, আশা করি এ খবরটা এখনও আপনার জানা হয়নি।'

ক্রমশই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলাম। ঘাড় নেড়ে বললাম, 'না।'

মজুমদার উত্তেজিত সুরেই বলে চলল, 'স্পেসিফিক ডেট অ্যান্ড টাইমও জানিয়ে দিচ্ছি। গতকাল আলিপুর রোডের মিস্টার জয়নল আগরওয়ালার বাড়িতে যে ককটেল পার্টি ছিল, মিস সুপ্রিয়া মিত্র সেখানে যায়নি? সে মিস্টার কাপুরের বগলের নীচ দিয়ে হাত গলিয়ে দেয়নি, তাঁকে একরকম জড়িয়ে ধরেই গাড়িতে তুলে বসায় নি? ক্যান ইউ ডিনাই?'

লক্ষ ওয়াটের কতগুলো বাতি যেন ষড়যন্ত্র করে হঠাৎ একসঙ্গে নিভে গেল। অন্ধকার ঘন হবার আগে নিমেষের জন্য দেখলাম,

একটা কুকুরের মত জিভ বার করে হাঁপাচ্ছে মজুমদার। ও যেন বহু ক্রোশ পথ দৌড়ে এসেছে।

মজুমদার আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে গেল। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, না কেউ আমাদের দিকে তাকিয়ে নেই। সুপ্রিয়াকে হঠাৎ দেখতে ইচ্ছে হল। কিন্তু ও আজকাল কাঁচ লাগানো ঘরে বসে না। কাপুরের ঘরের মধ্যে আর একটা ছোট ঘর আছে সেই ঘরে বসে টাইপ করে। দরকার মত ডিকটেশন নেয়। আরও দরকার পড়লে বগলের নীচ দিয়ে হাত গলিয়ে দেয়—। মনে মনে গর্জন করে উঠলাম, 'উল্লুক, দেব কাটারী দিয়ে তোমার হাত কেটে।'

কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না, হাতটা কাটবো কার। সুপ্রিয়ার, কাপুরের, না মজুমদারের কিম্বা আমার নিজেরই। কিন্তু আমার তো শুধু হাত কাটলেই চলবে না। যদি কাটতেই হয় গোটা আমিটাকেই কেটে ফেলা দরকার, যে আমিটা কিনা প্রতি মুহূর্তেই নিজের রং বদলে চলেছে। সুপ্রিয়া বলেছিল, ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতি রূপ বদলায়। জানি না, ওর ইঙ্গিতটাই শেষ পর্যন্ত আমার জীবনে সত্য হতে চলেছে কিনা। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত সুপ্রিয়ার সম্বন্ধে মনের ভাবটা অন্যরকম ছিল। মজুমদারের মত একটা নোংরা মানুষের কথায় হঠাৎ সেই ভাবের পরিবর্তন ঘটে গেল। এই মুহূর্তে আবার কেউ যদি এসে কিছু বলে, আমি কি সেইদিকে দৌড়ব, তা হলে জীবনে কত দৌড়তে হবে আমাকে? তা ছাড়া হঠাৎ যতীনবাবু সম্বন্ধে মিথ্যে কথাটাই বা বলতে গেলাম কেন মজুমদারকে। সত্যি সত্যি যতীনবাবু তো আমার পাটনায় বদলির ব্যাপারে কিছু বলতে আসেন নি। সুপ্রিয়ার ইচ্ছেটা আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি। মাত্র দিনকয়েক আগে নির্জন গঙ্গার ধারে আমি একটা কাগজ ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। আমি আর সুপ্রিয়া ছাড়া কেউ সাক্ষী ছিল না। কিন্তু কত সহজে আমি অন্য একটা চোরা গলি দিয়ে হাঁটতে শুরু করে দিলাম। এ কি শুধু শুধু পথ চলা! মনের কোন এক নিভৃত কোণায় ক্ষীণ একটা বাসনা ছিল। মজুমদার কোন ইঙ্গিত করুক, কোন নোংরা গসিপ ওর মুখ দিয়ে বার হোক—এমন একটা ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে থাকাটা কী একেবারেই অসম্ভব ছিল?

ঘড়ির দিকে নজর গেল। কাঁটা দুটো খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে। চিন্তার বোঝাটা মগজ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলাম। সুপ্রিয়াকে নিয়ে চিন্তা করার কোন অর্থ থাকতে পারে না। মানুষ তাকে নিয়েই চিন্তা করে, যাকে ঘিরে সেই মানুষের দুর্বলতা। বুকে হাত রেখে শপথ করে বলতে পারি, সুপ্রিয়া সম্বন্ধে আমার সে ধরনের কোন দুর্বলতাই নেই। মনে মনে এই কথা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে মন শান্ত হয়ে উঠল। এত শান্ত যে কী বলবো! এক সময় শান্তি-মন্ত্র উচ্চারণ করার ভঙ্গিতে নিজেকে শুনিয়েই বললাম, একটু আগে যে কাটারী দিয়ে হাত কেটে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম, আমার অন্তরে এখন সেই ইচ্ছাটা আর নেই। ঈশ্বর করুন, এই ধরনের বদ ইচ্ছা যেন আমার মধ্যে আর কোনও দিন না আসে। আমেন।

কাজে মন বসছিল না, উঠে পড়লাম। সকালে বেরোবার সময় মা পই পই করে বলে দিয়েছিল মাসীমার সঙ্গে দেখা করে আসতে। মা জানত মাসীমার এক দেওর পাটনায় থাকে। মার ইচ্ছা প্রথম কয়েকটা দিন সেই বাড়িতে উঠে সুবিধামত বাড়িটাড়ি দেখে নিই। মাকে যত বোঝাই, হোটেলে থাকার পয়সা কম্পানিই দেবে, মা কিছুতেই বুঝবে না। সেই এক কথা 'বিদেশে বিভুঁইয়ে মানুষ আত্মীয়স্বজনের খোঁজ করে। ভগবান না করুন বিপদ আপদ কিছু ঘটলে তবু তো কাছেপিঠের মানুষ ওরা।' মাসীমার দেওর কী করে যে আমার কাছে-পিঠের মানুষ হতে পারে, মা-ই জানে। তবু মার কথা রাখতেই মাসীমাদের বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ি যাব বলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। সারা মুখে বসন্তের দাগ-অলা বড় সাহেবের চাপরাশী এসে সামনে দাঁড়াল। বলল, 'মেমসাব সেলাম দিয়া।' মনে মনে বিরক্ত হলাম। এমনিতে সুপ্রিয়া ডাকলে আমার খুশী হবার কথা। ওকে দেখতে বা ওর সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগে। কিন্তু এখন মনে হল, সুপ্রিয়া যদি কাপুর সাহেবের পি, এ না হত কিছুতেই আমাকে ডেকে পাঠাত না। যদি জরুরী কোন কথা থাকত, নিজে এসেই বলে যেত।

কাপুর ঘরে ছিলেন না। সুপ্রিয়া নিজের মনে টাইপ করছিল, ও এত গভীর তন্ময় হয়ে কাজের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল যে আমাকে দেখতে পর্যন্ত পেল না। অথচ আমার আর একটা মন বলছিল, আমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ও আমাকে দেখতে পেয়েছে, এবং সেই মুহূর্ত থেকে ও একটা নকল কাজের দুর্গ বানিয়ে তার মধ্যেই আত্মগোপন করেছে। চেয়ারে বসলাম। সুপ্রিয়া খুট খুট করে টাইপ করেই চলেছে। ও এমনভাবে টাইপ করছে, যেন একটু দেরী হয়ে গেলেই বিষম সর্বনাশ হয়ে যাবে। হাসতে হাসতে বললাম, 'তুমি যে স্পিডে কাজ করে চলেছো, আর একটা প্রমোশন খুব শিগগিরই পাবে।'

সুপ্রিয়া মুখ তুলে হাসল, চেয়ারের পেছনে নিজেকে হেলিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি মরছি কাজ করে, অথচ প্রমোশনের বেলায় তুমি। দেখো তো কী অন্যায় বিচার।' সুপ্রিয়া দুঃখী দুঃখী মুখ করল।

আমার মুখে কোন সুখ ফুটে উঠল না। বললাম, 'আমি কোন প্রমোশন পাই নি।'

'কিন্তু পাবে, যদি ভাল কাজ দেখাতে পার।' সুপ্রিয়া এমনভাবে কথাটা বলল, ঠিক যেন আমার পিঠ চাপড়ালো। চপ করে আছি দেখে ও আবার বলল, সত্যি, বিশ্বাস করো।' কথা বলতে বলতে ও আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল।

বললাম, 'তোমাদের দয়া, ক্রীতদাসের খাতায় যখন নাম লিখিয়েছি, তোমাদের আদেশ শিরোধার্য করাই তো বুদ্ধিমানের কাজ।'

সুপ্রিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ও যেন আমার অন্তস্তল দেখার চেষ্টা করছে, আমাকে বুঝতে চাইছে। বললাম, 'কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার কাজের সঠিক হদিসই পেলাম না।'

সুপ্রিয়া গোপন কথা বলার মত ফিস ফিস করে বলল, 'তোমাকে বার করতে হবে ঐ অফিসের সেল পড়ে যাবার প্রকৃত কারণ কি।'

'কিন্তু তার চেয়ে অনেক সুখকর কাজ হত, পাটনায় গিয়ে সেল বাড়ানোর চেষ্টা করা। চোরের পেছনে না দৌড়ে আগে থেকেই ঘর সামলে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। শুধু বুদ্ধিমানের কাজ না, নোংরামোর হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যায় এতে।'

সুপ্রিয়া যেন একটু ক্ষুণ্ণ হল, 'তুমি প্রথম থেকেই ধরে নিলে কেন, যে তোমাকে চোরের পেছনে দৌড়তে হবে।'

'আমি কিছুই ধরে নি-ই নি। আমি শুধু জানতে চাই, পাটনায় গিয়ে কী কাজ করতে হবে আমাকে। আর সেই কাজে কোন রকম সাহায্য পাওয়া সম্ভব হবে কিনা।'

'হ্যাঁ হবে। সেখানে অনিমেষ আছে। সে তোমাকে সাহায্য করবে।'

'অনিমেষ কে?'

'আছে একজন, বিশ্বস্ত এবং বিচক্ষণ কর্মচারী।'

হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ছ'টা বাজতে চলেছে, উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'উঠি।'

সুপ্রিয়া বলল, 'আমিও উঠবো। চলো এক সঙ্গে যাই।'

'তুমি তো গাড়ি করে যাবে।'

'তুমিও চলো।'

'থাক।'

'থাকবে কেন?'

'তোমার সঙ্গে আমাকে দেখলে তোমার বস্ অসন্তুষ্ট হবেন।'

সুপ্রিয়া ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'ফাজলামো হচ্ছে?'

দু হাত জড়ো করে বললাম, 'তোমার সঙ্গে ফাজলামো! ঘাড়ে ক'টা মাথা আমার!'

সুপ্রিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলো তোমাকে লিফট্ দি-ই। বেশ খানিকটা ঘুরেও আসা যাবে। এখান থেকে দমদম, দমদম থেকে বালিগঞ্জ, দস্তুরমত লম্বা পথ।'

'আমি আজ তোমাদের ওদিকেই যাব।'

'হঠাৎ?'

'হঠাৎ না, মা বার বার বলে দিয়েছে মাসীমার বাড়ি যেতে, বালিগঞ্জ প্লেসে থাকেন, মাসীমা।'

সুপ্রিয়া খুশী মনে বলল, 'ভালই হল, তোমার সঙ্গেই বাড়ি ফেরা যাবে।'

ছোট একটা চিমটি কাটলাম, 'একটু আগেই কিন্তু বলেছিলে লং ড্রাইভ ভাল লাগবে তোমার।'

সুপ্রিয়া দমল না। সংগে সংগে উত্তর দিল, 'তোমাকে বহুবার বলেছি, কোন কিছুই চিরস্থায়ী হয় না। একটুক্ষণ আগে বেশী ঘুরতে চেয়েছিলাম বলে বরাবর যে ঘুরতে ভাল লাগবে তার মানে নেই। তখন লম্বা দৌড় ভাল মনে হয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে বেঁটে দৌড়টাই বা মন্দ কি। এই দুটো চাওয়াই কিন্তু সত্যি।'

বললাম, 'তুমি অস্থিরচিত্ত, তাই ক্ষণে ক্ষণে তোমার মত পাল্টায়।'

'যে মানুষ যত স্বাভাবিক, সে তত বেশী পরিবর্তনশীল। প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দেখো—'

বাকীটা আমিই শেষ করে দিলাম, 'ঋতুতে ঋতুতে পৃথিবীর রং পাল্টায়। তোমার উপমাটা শুনতে ভাল, কিন্তু এর মধ্যে যুক্তি নেই।'

'কেন ?'

'মানুষ প্রকৃতি নয় বলে। মানুষ যদি প্রকৃতি হতো, বা তার কাছাকাছিও পৌঁছতে পারত, তা হলে পৃথিবীটা অন্যরকম হতো। সবাই খুব শান্ত ভাবে দিন কাটাত, আর ক্ষণে ক্ষণে রং পাল্টাতো।'

ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিতে নিতে সুপ্রিয়া বলল, 'চলো', ও যেন ইচ্ছে করেই প্রসংগটা বন্ধ করে দিল।

দুজনে পাশাপাশি বসে আছি, অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বাড়ি ছাড়িয়ে গাড়ি রেড রোডের দিকে চলেছে। শরতের অপরাহ্ন। আকাশের গায়ে এখনও সামান্য একটু আলো লেগে রয়েছে। আকাশের রং নীল, কোথাও কোন মেঘ নেই। মেঘশূন্য আকাশ দেখতে ভাল লাগে না। কী রকম যেন নিঃসংগ মনে হয়। মনে হয় এই বিরাট আকাশটার কোন সংগী সাথী নেই। যদিও ওর রং নীল, ও বয়সে একটুও নবীন না। বরং, ও যেন বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে।

সুপ্রিয়া হঠাৎ কথা বলে উঠল, 'তোমার হয়ত একটু অসুবিধা হবে। বিশেষ করে তোমার মার প্রথম প্রথম খুবই খারাপ লাগবে। একা একা থাকবেন—'

'মাকে মামার বাড়ি রেখে যাব।'

'পাটনায় গিয়ে বাড়ি ভাড়া করে মাকে নিয়ে যেতে পারবে।'

'পাটনায় কতদিন থাকতে হবে ?'

সুপ্রিয়া নড়ে চড়ে বসল, 'কি জানি, সবই নির্ভর করছে তোমার কাজের ওপর। যদি সেল ভাল দেখাতে পার, শেষ পর্যন্ত তোমাকেই হয় ত সেলস্ ম্যানেজার করা হবে।'

'সো কাইণ্ড অব ইউ। ইচ্ছে করলে তুমি অনেক খেলাই দেখাতে পার।'

'এতে খেলার কি দেখলে।' নকল রাগ দেখিয়ে বলল সুপ্রিয়া।

কথা ঘুরিয়ে দিয়ে বললাম, 'সবই তো খেলা। গোটা পৃথিবীটাই তো বড় একটা মাঠ, আর আমরা সব খেলোয়াড়।' বলেই শব্দ করে হাসতে লাগলাম।

সুপ্রিয়া কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হেসে উঠল। পর মুহূর্তেই বাইরের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বলল, 'দ্যাখো দ্যাখো কী সুন্দর হলুদ পাখিটা।'

একটা হলুদ পাখি রাস্তার ধারের কচি গাছের সব চেয়ে উঁচু ডালে বসে আপন মনে লেজ নাড়িয়ে নাড়িয়ে শিষ দিচ্ছিল।

বললাম, 'মনে ফুর্তি আছে, তাই লেজ নাড়াচ্ছে।'

সুপ্রিয়া একবার আমাকে দেখে নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। মনে হল ও যেন আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিল।

বাকী পথটা দুজনে বিশেষ কথা হল না। আমাকে নামিয়ে দেবার সময় সুপ্রিয়া শুধু জিজ্ঞাসা করল, 'মাসীর নিজের বাড়ি ?'

'হ্যাঁ, মাসী বেশ পয়সা-অলা।'

সুপ্রিয়া যে বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করে চাঁদীর ওজনে মাসীকে ওজন করতে চেয়েছিল আমি সে কথা বুঝতে পেরেছিলাম।

মাসীর বাড়ির থেকে বেরোতে অনেক রাত হয়ে গেল। বহুদিন পর এসেছি, ভাই-বোনেরা ছাড়তেই চায় না। এক মাসতুতো ভাই আমার সম-বয়সী। ছোট বোন বেবীর সংগে এককালে প্রচুর আড্ডা মেরেছি। ওর এক বান্ধবীর সংগে সেই সময় একটু বেশী রকমের ঘনিষ্ঠতাও গড়ে উঠেছিল। বেবীর মারফত হাতচিঠি চালাচালি হতো। ওর বান্ধবীর নাম ছিল করবী। 'কালো মতন মোটাসোটা মেয়েটি, ওর ঠোঁট দুটো ছিল পুরু, আর সব সময়ই যেন রসে টুস-টুসে হয়ে থাকত। একদিন হঠাৎ ওর সেই ঠোঁটে চুমু খেয়েছিলাম। জীবনে সেই প্রথম চুমু খাওয়া। মাসীদের ছাদটা সব সময় খুব নির্জন থাকত। বাড়িটা এত বড় যে ছাদে ওঠার প্রয়োজন হত না কারও। আমাদের প্রয়োজনটা অন্য কারণে। করবী ছাদে উঠে আমাকে ওদের বাড়ি দেখাতে চেয়েছিল। ও তখন পাঁচিলের ওপর বুক ঠেকে 'ঐ তো দেখতে পাচ্ছেন না' বলে আঙ্গুল বাড়িয়ে একটা বাড়ি চেনাবার চেষ্টা করছিল, আমি তখন ওর ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কথা বলার সংগে সংগে ওর ঠোঁট নড়ছিল, আর কী বলবো, আমার বুকে যেন হাতুড়ীর ঘা পড়ছিল। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আকাশের ঐ দিকটা কী ভয়ানক রকমের লাল হয়ে উঠেছে। করবীর ঠোঁট নাড়া, আকাশের অস্বাভাবিক লাল রং—এই সব মিলিয়ে আমার মনে এলোমেলো বাতাস বইতে শুরু করছিল। আমি নীচু স্বরে একবার মাত্র করবীকে ডেকেছিলাম, পরমুহূর্তেই ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম, চুমু খাওয়ার সংগে সংগে করবী যে ওর ভারী শরীর এভাবে আমার ওপর এলিয়ে দেবে বুঝতে পারি নি। আর একটু হলে পড়েই যেতাম। তারপর করবী আমাকে বিষম জোরে চেপে ধরল। অনেকক্ষণ ধরে আমার বুকে মুখ ঘষলো। আজও মনে আছে, সে দিন সুড়সুড়ি লেগে কী দারুন হাসি পাচ্ছিল আমার। আর একটু হলে হেসেই ফেলতাম। করবী মুখ ঘষতে ঘষতে বলতে লাগল, 'তুমি কী ভীষণ রকমের ভাল অংশুদা। তুমি রোজ এসো, বুঝলে, তুমি না এলে আমি একা একা থাকতে পারব না। রোজ আসবে, বুঝলে।' একই কথা ও বার বার বলতে লাগল। বলতে বলতে কেঁদে ফেলল। ওর কান্না দেখে আমার ভয় করতে লাগল। তারপর থেকে মাসীর বাড়ি যাওয়া একদম ছেড়েই দিলাম। বেবীর বিয়েতে গিয়েছিলাম কিছুদিন পর। আড়ালে পেয়ে করবী বলেছিল, 'যে পুরুষ কাওয়ার্ড হয়, তাকে আমি ঘৃণা করি।' ভাগ্য ভাল করবী সেদিন শব্দ করে আমার সামনে থুথু ফেলে নি।

বেশ খানিকটা পথ হেঁটে এসে বাসস্ট্যাণ্ড। করবীর কথা ভাবতে ভাবতে বাসস্ট্যাণ্ডে এসে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বাস এসে পড়ল, লাফিয়ে উঠে পড়লাম। বাসে বেশী ভিড় ছিল না। মাসীবাড়িতে কথায় কথায় বেশ রাত হয়ে গেল। দো-তলা বাসের ওপর তলায় বসলে, এবং সিটটা যদি জানালার ধারে হয়, আমার মাথায় চিন্তার পোকা উড়তে থাকে। মাসীবাড়ি থেকে বাসস্ট্যাণ্ড পর্যন্ত হেঁটে আসতে আসতে করবীর কথা চিন্তা করেছিলাম। ইচ্ছে করলে প্রথম দিনে করবীকে আরও অনেক কিছু করতে পারতাম। পট করে ওর ঠোঁটে যে চুমু খেয়ে ফেললাম, করবী সে জন্যে একটুও রাগ করে নি, বরং ওর কথা যদি সত্যি হয়, সেই মুহূর্ত থেকে আমাকে দারুণ ভাল লাগতে শুরু করেছিল ওর, যদিও সেই ভাল লাগাটা বেশীদিন স্থায়ী হতে পারে নি। করবীর কথা চিন্তা করতে করতে কখন সুপ্রিয়া মনের মধ্যে চলে এসেছে বুঝতেও পারিনি। নাকি মনের মধ্যেই ছিল ও, শুধু ওপরে ভেসে উঠল। আমি ইচ্ছে করে সেদিন সুপ্রিয়ার স্তন স্পর্শ করিনি। অনিচ্ছাকৃত অপরাধটুকুকে মার্জনা করার মত মনের প্রসারতা সুপ্রিয়ার নেই, তাই পাটনায় বদলির অজুহাতে আমাকে এখান থেকে সরিয়ে দিল। কিন্তু আমাকে সরিয়ে দিয়ে ওর লাভ? মনে মনে উত্তরটাও তৈরী হয়ে গেল। এক-সময় সুপ্রিয়ার যথেষ্ট অন্তরংগ ছিলাম। বলতে গেলে সমস্ত অফিসে আমিই ওর একমাত্র নিকটের মানুষ ছিলাম, যতীনবাবু-যাবু আসলে কিছুই না, আমাকে দেখানোর জন্যে খানিক ফরফরানি। কাপুরের সংগে আজকাল যা ঢলাঢলি চলছে, ও জানে, আজ হোক কাল হোক আমার কানে কথাটা আসবেই। ভয় না হোক, সংকোচ হবে, তাছাড়া আমার সংগে মেলামেশাটা কাপুরও হয়ত ভাল চোখে দেখছিলেন না। শক্ত হলেও ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। বয়স হলে রজ্জুকে সর্প ভ্রম হওয়াটা বিচিত্র নয়। মোট কথা, আমাকে পাটনায় বদলি করার মধ্যে সুপ্রিয়ার যথেষ্ট হাত রয়েছে এবং সমস্ত ব্যাপারটার পেছনেই একটা নোংরা স্বার্থের ষড়যন্ত্র আমি প্রথম থেকেই আবিষ্কার করে ফেলেছিলাম। তবে প্রতিবাদপত্র ছিঁড়ে ফেললাম কেন? আমি যেতে না চাইলে ওরা জোর করে আমাকে পাঠাতে পারত কিনা সন্দেহ। ইউনিয়ন আমাকে এ বিষয়ে নিশ্চয় সাহায্য করত। চাকরি যাওয়া অত-

কাল মুখের কথা না। সেদিক থেকে ভয় ছিল না। ভয় ছিল অন্য কারণে। একই জায়গায় দিনের অধিকাংশ সময় কাটানো এবং খুব পরিচিত একজন মানুষকে এক মুহূর্তের জন্যও কাছে না পাওয়ার মধ্যে একটা জ্বালা আছে। ভয় ছিল সেই জ্বালার তাড়নায় আবার না কোন কেলেঙ্কারী করে বসি। যতীনবাবুর সামনে হাত ধরার সেই বিশ্রী। ব্যাপারটার জন্যে আমি মনে মনে খুব লজ্জিত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু এর মানে এই নয়, যে আমি সুপ্রিয়ার প্রণয়প্রার্থী। সুপ্রিয়াকে ভাল লেগেছিল, বন্ধুর মত মিশেছিলাম ওর সঙ্গে। কলেজে পড়তে ঘোতন বলে এক বন্ধু ছিল আমার। ঘোতনকেও খুব ভালবাসতাম। একসঙ্গে দুজনে হাঁটতাম, গল্প করতাম, একদিন দেখা না হলে দারুণ মন খারাপ লাগত। সুপ্রিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও অনেকটা সেই ধরনের বলে আমি ভাবতে চেষ্টা করি। অনেকটা সেই ধরনের কেন, পুরোপুরি সেই ধরনের। আমাকে বর্জন করে দিয়ে সুপ্রিয়া যদি সেই সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলতে চায়, আমার আপত্তি নেই। ঘোতনও একদিন দূরে সরে গিয়েছিল। আমি নিঃশব্দে ওর এই দূরে সরে যাওয়া মেনে নিয়েছিলাম। ঘোতন এখন একজন খুব অস্পষ্ট মানুষ। চেষ্টা করেও ওকে আমি স্পষ্টভাবে দেখতে পাই না। গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। হু-হু করে হাওয়া আসছে। মুখে মাথায় লাগছে। সুপ্রিয়ার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ঘোতনের কথা মনে পড়ে গেল, মনে পড়ে ভালই লাগল। ঘোতনের সঙ্গে সুপ্রিয়ার তুলনা করতে পেরে স্বস্তি পেলাম।

একদিন সুপ্রিয়াও খুব অস্পষ্ট হয়ে যাবে কথাটা ভাবতে একটুও খারাপ লাগল না। মনে মনে ঘাড় দুলিয়ে সায় দিলাম, দুনিয়া ক্রমাগত বদলে চলেছে। আজ যে ফুল ফোটে, কাল সে মাটিতে লুটোয়। না কথাটা আমার না। সুপ্রিয়া বলেছিল, বেশ কিছুদিন আগে। বছর দুয়েক তো বটেই।

বোটানিকেল গার্ডেনস-এ যাবার ইচ্ছে আমার বিশেষ ছিল না। সুপ্রিয়াই জোর করেছিল। কাগজে দেখেছে, কী নাকি একটা ফুল আছে সেখানে যেটা পোকা-মাকড় খায়। সবচেয়ে মজা এই, বেছে বেছে এমন একটা দিন বার করল যে দিনটা সোমবার। যখন ওকে রোববারে যাওয়ার কথা বলে-ছিলাম, ও মুখে অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে বলেছিল, 'ভীষণ ভিড় থাকে, তা ছাড়া মাঝে মাঝে ডুব মারতে ভাল লাগে।' অথচ বছর তিনেক হল চাকরিতে জয়েন করেছে সুপ্রিয়া কিন্তু একদিনের জন্যেও ডুব মারতে দেখেছি বলে মনে পড়ল না। সামান্য কথায় কথা না বাড়িয়ে ওর সঙ্গে যেতে রাজী হয়ে গেলাম।

তখন অঘ্রান মাস। চাঁদপাল ঘাট থেকে নৌকো ঠিক করে রওনা হলাম। সুপ্রিয়া একটা মভ কালারের শাড়ি পরেছে। যদিও ওর গায়ের রং খুব ফর্সা না, এই রং-এর শাড়ি পরে ওকে বেশ দেখাচ্ছিল। নৌকোয় উঠেই ও প্রথম কথা বলল, 'বেশ দেখাচ্ছে না?'

প্রথমটা বুঝতে পারিনি, বললাম, 'হ্যাঁ আকাশটা খুব পরিষ্কার।'

সুপ্রিয়া মুখ ভেংচালো, 'আকাশের কথা না, বলছি, আমাকে বেশ দেখাচ্ছে, তাই না?'

তখন পর্যন্ত সুপ্রিয়াকে অন্যরকম ভাবতাম। ঘাড় গুঁজে কাজ করে, সময় মত অফিসে আসে, ছুটি হলে মাথা সোজা করে হেঁটে বেরিয়ে যায়, এদিক-ওদিক তাকায় না মোটে, একদিন শুধু যেচে আমার সঙ্গে আলাপ করে গিয়েছিল। তারপর থেকে প্রায়ই একসঙ্গে হাঁটতাম। হাঁটতে হাঁটতে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত যেতাম। ও যে এই ধরনের হালকা কথা বলে বসবে ভাবতে পারিনি। আমাকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে ও আবার বলল, 'আপনি কোনদিন মেয়েদের সঙ্গে মেশেননি।'

ওর কথা শুনে ইচ্ছে হল করবীর কথাটা ওকে বলে ফেলি। কিন্তু লজ্জা করল। করবীর কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর টুসটুসে ঠোঁটের কথাটা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে হল। মনে হল শত চেষ্টা করলেও আমি সুপ্রিয়ার ঠোঁটে চুমু খেতে পারব না। ওর ঠোঁট যদিও খুব পাতলা ধরনের না, কিন্তু একবারও মনে হল না সেখানে রস জমে টুসটুসে হয়ে রয়েছে! বরং মনে হল একটা ধারালো ছুরি, একটু এদিক ওদিক হলেই ফস করে ছুরির ফলাটা এসে বিঁধবে।

নৌকো খুব ঢিমে তালে চলছিল, শীতের বাতাস রোঁয়া কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। সুপ্রিয়া শাড়ির আঁচল গায়ে জড়িয়ে বসে রয়েছে। ও অন্যদিকে তাকিয়েছিল, আমি ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সুপ্রিয়ার গলা বেশ লম্বা। ওর গোটা শরীরটাই লম্বাটে ধরনের। ওর রুখু চুল হাওয়ায় নড়ছিল। ওর মুখের একটা পাশ আমার নজরে আসছে। সেই পাশটা দেখে, ও যে সুপ্রিয়া তা মনে হচ্ছিল না। হয়ত অন্য পাশটা, যা কিনা আমার চোখের আড়ালে রয়েছে সেই দিকটাই আসলে সুপ্রিয়া। আবার এমনও হতে পারে, দুটো অংশ একত্র না করলে ও কোনদিনই সুপ্রিয়া হতে পারবে না। মনে মনে যখন এই ধরনের উদ্ভট চিন্তা কর-ছিলাম, সুপ্রিয়া হঠাৎ বলে উঠল, 'আমাকে দেখার চেয়ে বাইরে অনেক সুন্দর জিনিষ রয়েছে।'

দারুণ চমকে উঠলাম। সেইক্ষণ থেকে মনে ভয় জন্মাল, ওর হয়ত পেছন দিকেও একটা চোখ রয়েছে, আর ওর কাছে গোপন বলে কোন বস্তু নেই।

অনেকক্ষণ একভাবে বসেছিল সুপ্রিয়া। যদিও সামনের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে-ছিল, আমার মনে হচ্ছিল ও বাইরের কিছুই দেখছে না। যদি কিছু দেখে, সে নিজেকেই। এক এক সময় তো মানুষ নিজেকে দেখতেই ভালবাসে। সুপ্রিয়ার কথা শোনার পর আমি দৃষ্টি বাইরের দিকে প্রসারিত করে দিলাম। চোখের সামনে খুব উঁচু কয়েকটা চিমনি, যা দিয়ে ক্রমাগত কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া উঠছিল। ধোঁয়া উঠে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছিল। আবার নতুন ধোঁয়া। এত যে ধোঁয়া উঠছে, আকাশের রং কিন্তু সেই নীল। সেই রং-এর কোন পরিবর্তন নেই, আকাশ দেখতে দেখতে সেই ছবিটা আমি খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম। সেই যে ঘন নীল আকাশ, প্রকাণ্ড একটা সাদা পাখি, নীচে টিয়া টিয়া রং-এর দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। পাখিটা উড়ছে না, শুধুই ভাসছে। এই ছবিটা দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। মনে হয় আমি যেন সেই পাখিটার মত শূন্যে ভেসে চলেছি। আমার কোন আশা নেই, তাই আশাভঙ্গের দুঃখ নেই। আমার আনন্দ নেই, তাই নিরানন্দের ঘন অন্ধকার আমাকে স্পর্শ করতে পারে না। আমি অচঞ্চল এক অমৃতলোকের মাঝে ভেসেই চলেছি। যুগ-যুগান্তর ধরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে, পৃথিবীর আদি থেকে মহাপ্রলয়ের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত।

কতক্ষণ এইভাবে শূন্যে বিচরণ করে বেড়াচ্ছিলাম জানি না। হঠাৎ আবার নিজের মধ্যে ফিরে এলাম। দেখলাম, রোদ প্রখর হয়ে উঠেছে। মাথার কাপড় তুলে দিয়েছে সুপ্রিয়া। বিস্ময় সেখানে নয়, বিস্ময় হচ্ছে, সুপ্রিয়া গান গাইছে। শুধু গান গাইছে না, ও যেন সঙ্গীতের তরঙ্গে নিজেকে

ভাসিয়ে দিয়েছে। সুপ্রিয়া গাইছিল, আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাইনি/তোমায় দেখতে আমি পাইনি। অনেকক্ষণ ধরে গাইল সুপ্রিয়া। ও যতক্ষণ গাইল, আমার দৃষ্টি কী রকম আচ্ছন্ন হয়ে রইল। দুটো মাঝি দাঁড় টানছিল, আকাশ-ছোঁয়া বড় বড় চিমনিগুলো, কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া, গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউ, এমনকি দু হাত দূরের সুপ্রিয়া—সবাইকে হারিয়ে ফেললাম। আমার তখন মনে পড়ছিল, আমরা দেওঘরে বেড়াতে গিয়েছি। আমি বাবা-মা। বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। একটু সুস্থ হতেই বায়ু পরিবর্তনের জন্যে দেওঘরে আসা হল। আমরা যে বাড়িটায় ছিলাম, সেই বাড়িটার খুব কাছেই একটা পাহাড়। বাবা ডেক চেয়ারে বসে বসে পাহাড় দেখতেন। একদিন বাবাকে বলেছিলাম, 'আপনি দূরে থেকে পাহাড় দেখেন কেন? আমি আপনাকে ধরে ধরে পাহাড়ে নিয়ে যেতে পারি।' আমার কথা শুনে বাবা আমাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ ওঠা নামা করল অনেকবার। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল, মনে মনে বলছিলাম, বাবা কিছু বলুন। এমনকি বাবা যদি আমাকে ছোট মনে করে হেসেও ওঠেন, আমি ক্ষুণ্ণ হতাম না। অনেকক্ষণ পর বাবা শুধু বললেন, 'তুমি অনেক বড় হয়েছো। আমার আর চিন্তা নেই।' সেদিনের কথা শুনে কেন জানি না, আমার বিষম কান্না পেয়েছিল। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিলাম, অথচ কেন যে কেঁদেছিলাম, সেদিন বুঝতে পারিনি। আজও পারি না। তার কিছুদিন পরই বাবা মারা গেলেন। বাবার সেই বিষণ্ণ ক্লান্ত মুখ আমি যেন চোখের খুব সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম। বলতে গেলে গোটা জগৎ জুড়ে বাবার সেই মুখ আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল।

সুপ্রিয়া আঙুল দিয়ে আমাকে স্পর্শ করতেই বাবার মুখটা হারিয়ে গেল। অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম, বলে উঠলাম, 'আপনি তো খুব ভাল গান করেন।'

সুপ্রিয়া বাধা দিয়ে বলল, 'নিজের প্রশংসা এত শুনেছি, যে তাতে আর রুচি নেই। নতুন কিছু বলুন।'

'নতুন কী বলবো বলুন তো। পুরনো জগতের মধ্যে নতুন তো কিছু নেই, সেই এক আকাশ, গাছপালা, পশুপাখি, মানুষজন।'

'কে বললে নতুন নেই, ঋতুতে ঋতুতে আকাশের রং বদলায়, গাছের পাতায় পাতায় পরিবর্তন আসে। আজ যে ফুল ফোটে, কাল সে মাটিতে লুটোয়।' বলে সুপ্রিয়া আমার দিকে এগিয়ে মিষ্টি করে হাসল। ওর চেরা চোখে আলো ফুটে উঠলো।

আমি মুগ্ধ হয়ে ওকে দেখতে দেখতে একসময় বলে উঠলাম 'আপনি যে কবি জানতাম না।'

সুপ্রিয়া শব্দ করে হেসে উঠল, 'রক্ষে করুন, কবি হয়ে আর কাজ নেই। হঠাৎ গানটা গেয়ে ফেলে এখন লজ্জা হচ্ছে। দোহাই আপনার, অফিসে কথাটা যেন রাষ্ট্র না হয়।'

'কেন? গুণ তো প্রকাশ করার জন্যেই।'

'না, আপনি কাউকে বলতে পারবেন না', ও এমনভাবে বলল, যে তখনই বুঝতে পারলাম, ও একজন জেদী মেয়ে। ওর চিবুকটা লম্বাটে ধরনের। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চিবুক আরও লম্বা দেখাল, আমার বাবার চিবুকও এই ধরনের ছিল।

সন্ধ্যে পর্যন্ত ছিলাম বোটানিকেল গার্ডেনস-এ। সুপ্রিয়া এদিক-ওদিক ঘুরল কিন্তু সেই রাক্ষুসে গাছ দেখার উৎসাহ দেখাল না। বারকয়েক ওকে সেই কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত ও আসল কথাটা বলে ফেলল, 'আপনি কি মনে করেন, গাছের ম্যাজিক দেখতে এতটা পথ অফিস কামাই করে ছুটে এসেছি।'

'তবে?' আমার চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

'আজ আমার জন্মদিন। এই একটা দিন নিজেকে উপলব্ধি করতে ভাল লাগে। ভাবতে বিস্ময় জাগে কতগুলো বছর আগে এমন একটা দিনে আমি পৃথিবীতে জন্মেছিলাম। আমি যদি না জন্মাতাম, জগতের সব কিছুই ঠিক মত চলতো— সূর্য উঠতো, ডুবতো, পাখিরা কিচির-মিচির করতো, ফুর ফুর করে হাওয়া বইতো, শুধু এই মুহূর্তে আপনার এখানে থাকা হতো না। এখন আপনি একটা বাসে ঝুলতে ঝুলতে বাড়ি ফিরতেন।' বলতে বলতে সুপ্রিয়া হঠাৎ উচ্ছল হাসিতে ভেঙে পড়ল।

তখন সূর্য অস্ত গিয়েছে। গাছের মাথায় মাথায় চক্রাকারে পাখিরা উড়ছে। ওরা যত উড়ছে তত শব্দ করছে। বড় বড় গাছের নীচ দিয়ে আমরা হাঁটছিলাম। যদিও মাথার ওপর শত সহস্র পাখিরা শব্দ করছিল, আমার হচ্ছিল আমি যেন এক প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছি। শুধু আমি না, আমার সঙ্গে চলেছে আর একজন মানুষ। হঠাৎ সুপ্রিয়ার একটা হাত চেপে ধরে বলে ফেললাম, 'তুমি জন্মেছিলে বলে অন্তত একটা দিনের জন্যেও সেই বিড়ম্বনার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেলাম।'

কথা বলেই হাত ছেড়ে দিলাম। অসতর্ক মুহূর্তে সুপ্রিয়াকে তুমি বলে ফেলেছি। সুপ্রিয়া কথা বলল না কিছুক্ষণ। এক সময় ঘনিয়ে-আসা অন্ধকারে ওর গলার স্বর কানে এল, 'রাত হলো, এবার বাড়ি চলো।'

চার

বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। মাসীমা জোর করে অনেক কিছু খাইয়ে দিয়েছিল। মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব শুনল। এমনিতে বাইরে থেকে খেয়ে এলে মা রাগ করে, আজ খুশী এল। মাসী যে আদর-যত্ন করল মার সুখ সেই জন্য। কিন্তু মা মুখে অন্যরকম বলল। নকল রাগ দেখিয়ে বলল,

'এই যে বলা নেই কওয়া নেই এত স
খেয়ে এলি, বাড়ির খাওয়া খায় কে। একা
ঠাণ্ডা মেসিন থাকলেও না হয় জিনিষগুলো
পচতো না।'

'জিনিষগুলোর জন্যে আজ কিন্
তোমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না। বরং খুশী
হয়েছো, যে আজ আমি বাড়িতে খেলা
না।'

মা বিস্ময়ের ভান করে বলল, 'কেন?'

'কি জানি কেন, কিন্তু তোমার মু
দেখে তাই মনে হচ্ছে। আচ্ছা মা, একটা
সত্যি কথা বলবে?'

মা এবার সত্যি সত্যি রাগ করল
বলল, 'আমি যেন সত্যি কথা বলি না।'

'তা বলছি না। কিন্তু মাসীরা যদি
গরীব হতো, তুমি কি এত খুশী হতে?'

'গরীব বড়লোকের কথা উঠছে কেন

'এমনি জিজ্ঞাসা করলাম। শুয়ে পড়

মা কথা না বাড়িয়ে শুয়ে পড়ল। পাশা
পাশি দুটো খাট। অন্যান্যদিন শুয়েই ম
ঘুমিয়ে পড়ে। মা ঘুমলে আমি বুঝতে
পারে। ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসে
আজ মার ঘুম আসতে দেরী হচ্ছিল
আমারও ঘুম আসছিল না। নানা চিন্ত
মাথায় আনাগোনা করছিল। নতুন জায়গা
যাব। কবে বাড়ি পাব না পাব। এতদি
মা কোথায় থাকবে। একা একা এই বাড়িতে
থাকার কোন অর্থ হয় না। অসুখ-বিসু
আছে। তাছাড়া নিঃশব্দ হয়ে মানুষ দি
কাটায় কী করে।

মা কথা বলে উঠল, 'ঘুমোলি?'

বললাম, 'না,? তোমার ঘুম আসছে ন
কেন!'

'কি জানি, ঘুম তো আছেই। তু
চলে গেলে সারাদিন ঘুমবো। কোন কা
থাকবে না তো।' মার বিষণ্ণ সুর কানে
বাজল।

'তুমি একা একা থাকবে নাকি!'

'দোকা হচ্ছি কি করে।'

'তুমি বরং মামাদের বাড়িতে থেকো।'

'না।'

'না কেন?'

'নিজের বাড়ি ছেড়ে কোথাও ভা
লাগবে না।'

'ভাইরা তো পর না। তাছাড়া বড় মাম
তোমাকে খুব ভালবাসেন।'

'তা বাসে। কিন্তু বাড়ি ছেড়ে যাব না
কবে দেখবো জবর দখল হয়ে গেছে। খালি
বাড়ি ভূতের আস্তানা।'

'বলাইকে বরং শুতে বলো।' বলা
পাড়ার ছেলে। মাকে মাসীমা বলে ডাকে
যখন তখন আসে, মার ফাই-ফরমাস খাটে
মা এটা-ওটা খেতে দেয়। বলাইয়ের ম
নেই।

'অতটুকু ছেলে একা শোবে কি?'

'বলাইয়ের বয়েস আঠরো-উনিশের ক
না।'

'আঠারো উনিশে ছেলেরা বড় হয় না
কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত তুই নিজে ধুতি
পরতে পারতিস না।'

'ধুতি পরার কথা ছেড়ে দাও, আজও হয়ত ভাল করে পরতে পারি না। বুলাই শক্ত সমর্থ ছেলে। ও ঠিক শুতে পারবে। কাল সকালে ওকে মা হয় ডেকে জিজ্ঞেস করবো।'

মা অন্য পথ ধরল, 'বলাই শুতে চাইলেও ওর বাবা দেবেন কেন? বরং অমি থাকলে বলাই রাত্রে এসে শুতে পারে।' একটুক্ষণ চুপ থেকে মা আবার বলল, 'সন্ধ্যের সময় নিতু এসেছিল।'

'কোন নিতু?'

মা রাগ দেখিয়ে বলল, 'কটা নিতু আছে আমাদের। বৌদির পিসতুতো ভাই নিতু। তুই যেন চিনিস না।'

হেসে ফেললাম, 'ও সেই নিতু।'

'হাসি নয়। সত্যি সত্যি এবার কথা দিতে হবে। ওরা তো আর অনন্তকাল ধরে বসে থাকতে পারে না।'

'বসে থাকতে কে বলেছে ওদের, হাটুক, দৌড়ুক, লাফাক, যা ইচ্ছে করুক।'

'ঠাট্টা না। আমি একরকম কথা দিয়েই ফেলেছি। অবিশ্যি সুষমাকে যদি তোর পছন্দ হয়। রোববার সুষমাকে নিয়ে আসবে দেখিস তখন।'

লাফিয়ে উঠে বসলাম, 'কী সর্বনাশ। বলে তলে এতদূর এগিয়ে গেছো? ওদের বারণ করে দাও মা, লক্ষ্মীটি, প্লীজ, তুমি বুঝতে পারছো না—'

'সব বুঝতে পারি আমি। কিন্তু আমার কথা কেউ বুঝতে পারে না। দিনকে দিন আমার বয়স যে কমছে না, এই ছোট কথাটাও বুঝতে চাস না। একা একা আমার সময় কাটে কি করে? মরে যদি পড়েও থাকি, মুখে এক বিন্দু জল দেবার নেই কেউ।' মার গলা শেষের দিকে ভারী শোনাল।

'কতদিন বলেছি, সব সময়ের জন্যে লোক ঠিক করো।'

'মাইনেকরা লোক দিয়ে সব কাজ হয় না। তাছাড়া কাজটাই একমাত্র সমস্যা নয়। মানুষ তো সঙ্গী-সাথী চায়, আপনার কেউ, যে আমাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নেবে। তোকে দেখবে, আমাকে দেখবে।' বলতে বলতে মা ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল।

বেগতিক দেখে সোজাপথ ছেড়ে বাঁকা-পথ ধরলাম, 'তুমি এখন ঘুমোও। বিয়ে তো আর এই মুহূর্তে হচ্ছে না। নতুন জায়গায় যাচ্ছি, আগে দেখি চাকরি থাকে কিনা।'

মা যেন আঁৎকে উঠল, 'চাকরির কি হল?'

'হল তো যায় না। চারদিকে যেরকম স্ট্রাইক, ছাঁটাই, লক আউট চলছে কোনদিন দেখবো এক মাসের মাইনে হাতে গুঁজে দিয়ে বলছে, খেলা খতম, এবারে বিদায় হও।' ব্যাপারটাকে হালকা করে দেবার জন্যে শব্দ করে হেসে উঠলাম।

মা হাসিতে যোগ দিল না। পরম অবিশ্বাসীর মত বলল, সবাই ভবিতব্য। যা কপালে আছে তা হবেই, তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে, 'সাধ-আহ্লাদ নেই, মানুষ সংসার করবে না, হাসবে খেলবে না, শুধু আতঙ্কে আতঙ্কে দিন কাটাবে?' নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিল মা, 'তা হয় না।'

আর কথা না বাড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। আজ সবে সোমবার। রবিবার আসতে এখনও দেরী আছে। তা ছাড়া নিতুদা যদি সুষমাকে নিয়ে আসে আসুক, যে কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে মার পরিকল্পনা বানচাল করে দেওয়া যাবে। সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনে হল। মার পরিকল্পনা বানচাল যে করতেই হবে তারই বা কী মানে আছে। মানুষ তো শুধুমাত্র নিজের জন্যে বাঁচে না। মা যে বেঁচে আছে সে কি শুধু বেঁচে থাকার জন্যেই। না কি মার এই বেঁচে থাকাটা আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। আজ যদি মাকে বলা হয়, অনেকদিন তো বাঁচলে, এবারে চলো তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাই, মা কি যমদূতকে একবারও বলবে না, আমি চলে গেলে আমার ছেলের যে বড় কষ্ট হবে, কে ওকে দেখবে? নিশ্চয়ই বলবে মা। তবে? আমি কি শুধু আমাকে নিয়েই বেঁচে আছি? মার জন্যে একটুখানি বেঁচে থাকাটাও কি আমার পক্ষে সম্ভব না। নিতুদার বোন সুষমাই হোক কিম্বা বলাইয়ের সংবোন পারুলই হোক, আমার পক্ষে সবই সমান। পারুলের কথা মনে হতেই বিষম হাসি পেল। অসম্ভব ফাজিল আর ডেঁপো মেয়েটা। প্রায়দিনই অফিসে বেরোবার সময় আসে। এঘর ওঘর ঘুরে শেষ পর্যন্ত আমার ঘরে এসে ঢোকে। সেদিন হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, 'আপনি টাই বাঁধেন না কেন? রাখাল কাকা টাই পরেন, কাকীমা বেঁধে দেন।' বলে ও চোখ ঘুরিয়ে এমনভাবে হাসল, যে মনে হল পারুলটা আর ছোট নেই, ও দারুণ বড় হয়ে উঠেছে।

শেষ পর্যন্ত পারুলের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

অফিসে গিয়ে শুনলাম, বড় সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমাদের ব্যাঙ্কের লোকদের সচরাচর বড়কর্তার চেম্বারে ডাক পড়ে না। ঘরে ঢুকতেই মিস্টার কাপুর হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। এটাও এক ব্যতিক্রম। ভদ্রলোক নাকি দারুণ অসভ্য, ডিপার্টমেন্টাল হেডদের পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রেখে কথা বলেন।

কিছুক্ষণ বসে থাকার পর কাপুর বললেন, 'আপনাকে পাটনায় ট্রান্সফার করা হয়েছে কেন জানেন?'

আমি ঘাড় নেড়ে না জানাতেই উনি বললেন, 'কম্পানীর নতুন স্কিম ওয়েস্ট-বেঙ্গলের বাইরে বিজনেস এক্সপ্যান্ড করা। এক্সপান্ড করা এবং প্রডাকশন বাড়ান। তার জন্যে চাই উপযুক্ত কর্মী। তাই আপনাকে সিলেকট করা হয়েছে। ইউ আর এ প্রমিসিং ব্রাইট বয়। আশা করি কম্পানীর ইন্টারেস্ট আপনি দেখবেন।'

ঘরে ঢোকার মুহূর্তে টাইপরাইটারের খুট খুট শব্দ কানে আসছিল। শব্দটা এখন নেই। কাপুরের ঘরটা এয়ারকণ্ডিসনড। বাইরের শব্দ ঘরে ঢোকে না। একটা অখণ্ড নৈঃশব্দের মধ্যে বসে থেকে আমার হঠাৎ মনে হতে লাগল এক গভীর ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে কেউ যেন আমাকে ঠেলে দিচ্ছে। আর অসহায়ের মত আমি সেই দিকে এগিয়ে চলেছি। পিছিয়ে আসতে চাইলেও সে উপায় নেই। পিছনের পথ অন্ধকারে ঢাকা।

কাপুরের কথা আবার কানে গেল, 'প্রথম প্রথম নার্ভাস ফিল করবেন। কিন্তু একদিন দেখবেন আমার মত সব বিষয়ে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে শিখেছেন।' জানি না চোখের ভুল কিনা। মনে হল, কাপুর যেন নিমেষের জন্য পাশের ছোট কামরাটার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, যে কামরা থেকে আমি ঘরে ঢোকার মুহূর্তে টাইপরাইটারের খুট খুট শব্দ কানে আসছিল।

আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে পড়লাম। কাপুর বললেন, 'যদি কোন অসুবিধে বোধ করেন, আমার পি, এ মিস মিত্রকে সে কথা জানাতে পারেন। সি ইজ রিয়্যালি এফিসিয়েন্ট অ্যান্ড সিনসিয়র ওয়ার্কার।' বলে আর একবার সুইং ডোর—লাগানো কামরার দিকে তাকালেন।

বেরিয়ে আসতেই মজুমদার আমাকে নিয়ে পড়ল, 'কী ব্যাপার মশাই বলুন তো?'

ভালমানুষ সেজে বললাম, 'মিস্টার কাপুর জানতে চাইলেন, এ মাসের সেল ফিগার গত মাসের ফিগার ক্রস করবে কিনা।' জানি না মজুমদারকে দেখলেই আমার মনে মিথ্যে বলার প্রবৃত্তিটা এত প্রবল হয়ে ওঠে কেন। অথচ এমনিতে মিথ্যে বলতে আমার ভাল লাগে না।

মজুমদার ছেলেমানুষের মত ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'যাঃ, বাজে কথা। আপনি কি জ্যোতিষ নাকি যে মনে পড়তে না পড়তেই সেল ফিগার বাতলে দিতে পারবেন।'

গম্ভীর চালে বললাম, 'বিগ বসরা সেটাই আশা করেন অধঃস্তন কর্মচারীদের কাছ থেকে।'

মজুমদার দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'বার করছি শালার আশা করা। অ্যাইসা ল্যাং মারবো না, দেখবেন মজা।'

'আমাকে মজা দেখিয়ে আপনার লাভ?'

মজুমদার অপ্রস্তুত হল, 'না, না আপনাকে মিন করি নি। আপনার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই। আমার বিরোধ ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে, এ হচ্ছে নীতিগত লড়াই।'

'লড়াই কেন?'

'ডোন্ট মিস-আন্ডারস্ট্যান্ড মি। এই ডিপার্টমেন্টে আপনার চেয়ে সিনিয়র অনেকে রয়েছেন, কিন্তু প্রমোশনের বেলায় আপনি। হোয়াই?'

শান্ত কণ্ঠে বললাম, 'আমার তো প্রমোশন হয়নি।'

'প্রথমে তা-ই ভেবেছিলাম। এখন দেখছি অন্যরকম। শুধু অ্যালাওয়েন্স হিসেবেই যে টাকা পাবেন, হিসেব করে

দেখবেন, সেটা একটা লোকের মাইনের সমান। এই ফেবারিটিজম চলবে না।'
মজুমদার ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল।

ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠছে দেখে বললাম, 'আমার পাটনা যাওয়ার ব্যাপারে কি আপনার আপত্তি রয়েছে? যদিও আপনার আপত্তি শুনতে আমি বাধ্য নই, তবু যদি মনে করেন, আমি না গেলে আপনার সুবিধা হবে—'

মজুমদার তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আপনি না যেতে চাইলেই যে আমাকে পাঠানো হবে, এবং পাঠাতে চাইলেই যে আমি যাব, তারই বা কী মানে আছে!'

আর ধৈর্য থাকছিল না। বললাম, 'তবে ফেবারিটিজম, ফেবারিটিজম বলে চেঁচাচ্ছেন কেন.'

'চেঁচাচ্ছি কারণ, জিনিসটা মোটেই ভাল না।'

'কোনটা ভাল! অকারণে সব বিষয় নিয়ে আপনার এই যে বিক্ষোভ, এটাই কি খুব ভাল। অকারণে মানুষকে হিংসে করা, কটু কথা বলা, এর মধ্যে কি আপনি যুক্তি খুঁজে পান?'

মজুমদার থতমত খেয়ে গেল। একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'আমি স্ল্যাঙ্ক, তাই মুখে বলি। আর সবাই ভেতরে ভেতরে গর্জাচ্ছে। কী বলছে জানেন? বলছে, শাড়ির আঁচলের নীচে বসে কাজ গুছনো চলবে না।' শিগগিরই এ সম্বন্ধে ওয়ালপোস্টার পড়বে, দেখবেন।'

হঠাৎ গা ঘুলিয়ে উঠল। ইচ্ছে হচ্ছিল শব্দ করে মজুমদারের মুখে থুথু ফেলি। মনের ভাব চেপে গিয়ে হাসিমুখে বললাম, 'আমি যে একজন নামজাদা লোক হয়ে উঠেছি ভাবতেও ভাল লাগছে।'

মজুমদার মুখ বিকৃত করে উঠে পড়ল। যাবার সময় বলে গেল, 'আছেন সুখে, ওপরেরও খাচ্ছেন, তলারও কুড়োচ্ছেন।' ইচ্ছে ছিল ওর কাছ থেকে ওপর আর তলার ব্যাখ্যাটা শুনে নি-ই, কিন্তু তার আগেই মজুমদার চলে গেল।

টেলিফোন তুলে সুপ্রিয়ার সঙ্গে কথা বললাম, 'মিস্টার কাপুর বলেছেন, দরকার বোধ করলে তাঁর পি-একে কনটাক্ট করতে। কয়েকটা জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা করার ছিল।' কথাগুলো খুব সংযতভাবে বললাম। মজুমদারের কাছে অ্যালাওন্সের কথা শুনে সন্দেহ হল অপারেটরদের মধ্যে দুইজন বাঙালী মহিলা রয়েছেন, তাঁরা হয়ত লাইন ট্যাপ করতে পারেন। কৌতূহল জিনিসটা বাঙালীদের মধ্যেই প্রবল।

সুপ্রিয়া জবাব দিল, 'নিশ্চয়ই। আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো সাহায্য করতে।' তারপর গলা নীচু করে বলল, 'ছুটির পর। আউট্রাম ঘাটের কাছে।' খুট করে লাইন কেটে গেল।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, সুপ্রিয়া আসছেই না। সন্ধ্যে হতে চলল, দেখতে দেখতে জায়গাটা নির্জন হয়ে আসছে। মনে মনে চলে যাব কিনা ভাবছিলাম দেখলাম দ্রুতগতিতে সুপ্রিয়া আসছে। ও যে হেঁটে আসবে ভাবতে পারিনি। আজকাল ও গাড়িতেই যাতায়াত করে। কাছে এসে সুপ্রিয়া ফেটে পড়ল, 'কতদূর থেকে হেঁটে আসছি জানো।'

কোথায় আমি রাগ করবো, না তার আগেই ও রাগ করে বসলো। বললাম, 'বেড়াল মারার গল্প জানো? যে আগে বেড়াল মেরেছিল, সেই জিতেছিল। তুমিই কিন্তু আগে ভাগে বেড়াল মেরে বসলে।'

মাছি তাড়াবার মত হাতের ভঙ্গি করে বলল, সুপ্রিয়া, 'রাখো তোমার বেড়াল মারার গল্প। এদিকে আমার প্রাণান্ত। লাস্ট মোমেন্টে মিস্টার কাপুর এসে হাজির। অথচ বলে গিয়েছিলেন, আজ আর ফিরবেন না।'

ফোড়ন কাটলাম, 'প্রাণের টান বড় টান।'

সুপ্রিয়া ভ্রুকুটি করে তাকাল একবার, তারপর বলল, 'কী নাকি জরুরী ডিকটেশন দিতে হবে, অথচ এমন কিছু জরুরী নয়, কাল দিলেও চলত। তারপর লিফট দেওয়ার পর্ব। জোর করে, বিশেষ কাজের দোহাই দিয়ে এসপ্ল্যানেডে নেমে পড়লাম। একটা ট্যাক্সি পর্যন্ত পাওয়া গেল না। এতটা পথ প্রায় দৌড়ে এলাম।'

সুপ্রিয়া পেছন ফিরে যেন রাস্তার দৈর্ঘ্য মেপে নিল, ও এখনও হাঁপাচ্ছিল। ওকে রাগাবার জন্যে বললাম, 'হঠাৎ এভাবে ভদ্রলোককে বঞ্চিত করার মানে হয় না।'

সুপ্রিয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

অনেকটা পথ দুজনে চুপচাপ হাঁটলাম। এতক্ষণ ধরে মনে মনে যে পরিকল্পনা এঁটেছিলাম, ক্রমশই তা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিয়াই জিজ্ঞেস করল, 'তোমার সমস্যার কথা বলো এবার?'

আড় চোখে সুপ্রিয়াকে দেখে নিলাম। ওর তীক্ষ্ম কিম্বা দৃঢ় চিবুক যদিও স্পষ্ট করে আমার নজরে পড়ছিল না, কিন্তু ওর দৃঢ় পদক্ষেপ দেখে মনের ভরসা হারিয়ে ফেলছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমি যেন মিস্টার কাপুরের পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট মিস মিত্রর সামনে আমার আর্জি পেশ করছি: এ সেই সুপ্রিয়া না, যার সঙ্গে দিনের পর দিন আমি হেঁটেছি, চিনেবাদাম খেয়েছি, কিম্বা নৌকয় চড়ে একদিন বোটানিকালে গিয়েছি, এ অন্য কেউ।

'ঠিক কিভাবে শুরু করবো বুঝতে পারছি না। অফিসের ব্যাপার বাইরে আলোচনা করার মধ্যে একটু সঙ্কোচ থেকে যায়।'

সুপ্রিয়া সামনের দিকে চোখ রেখে হাঁটছিল। সেইভাবেই বলল, 'তা হলে অফিসে বললেই পারতে, শুধু শুধু এতটা পথ হাঁপাতে হাঁপাতে আসতে হত না।'

'তুমি সেই দুঃখ এখনও ভুলতে পারছো না।'

সুপ্রিয়া উত্তর দিল না। যেমন হাঁটছিল হাঁটতেই লাগল, এদিকটা নির্জন, মানুষজন বিশেষ নেই। সুপ্রিয়ার এই উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকাটা মনে বাজল, সঙ্গে সঙ্গে একটু রাগও হল, বললাম, 'তুমি যদি জোর করে আমাকে দিয়ে চিঠিটা না ছেঁড়াতে, আমি পাটনায় যেতাম না।'

ভেবেছিলাম, এবার অন্তত সুপ্রিয়া কিছু বলবে। সুপ্রিয়া উত্তর দিল না, নির্জন পথে আমাদের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ কানে আসছিল না। আমার মনে পড়ছিল, মাস কয়েক আগে পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে আমরা কত গল্প করতাম। কিছুতেই গল্প ফুরতো না। ট্রাম, বাস, মানুষজন প্রতিপদে অসুবিধার সৃষ্টি করত। আজ কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু গল্প ফুরিয়ে গেছে। আরও কিছুক্ষণ হাঁটবার পর এক সময় বললাম, 'শুধু শুধু হেঁটে কি হবে, বাড়ি ফেরা যাক।'

সুপ্রিয়া যেন এই কথার অপেক্ষাতেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে উল্টো পথে হাঁটতে লাগল। ইচ্ছে হল বলি, মিস্টার কাপুরের সঙ্গে যেতে না পেরে মন খারাপ হয়েছে? কিন্তু বলতে পারলাম না, কথাগুলো জিভে এসে আটকে রইল।

হঠাৎ সুপ্রিয়া কথা বলে উঠল, 'একজন বয়স্ক পুরুষ যখন ছেলেমানুষের মত অসহায় বোধ করে, মানুষ তখন তাকে করুণা করে।'

'আমি অসহায় বোধ করছি না। আমার কতকগুলো অসুবিধা দেখা দিচ্ছে, যেমন মা—'

'তুমি মিস্টার কাপুরকে সেই কথা বলতে পারতে।'

'আমাকে সে সুযোগ দেওয়া হয়নি, তা-ছাড়া কাপুর আমার অসুবিধার কথা তোমাকে জানাতে বলেছিল।'

'এতক্ষণ ধরে আমি সেই কথাটাই জানতে চাইছি, তোমার প্রবলেম কী এবং কেন?'

সুপ্রিয়া এমনভাবে কথা ক'টা বলল, যেন সে আমার উপরওয়ালা কেউ, সত্যি কথা বলতে কি, এই মুহূর্তে আমি ওকে ঘৃণা করলাম। 'আমার প্রবলেম যদি কিছু থাকে, সেটা আমার ব্যক্তিগত। তার জন্যে তোমাকে বিব্রত করতে চাই না।'

ভেবেছিলাম, সুপ্রিয়া ক্ষুব্ধ হবে, আমাকে একটু কথা শোনাবে। সুপ্রিয়া কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার করল। হাল্কা সুরে বলল, 'এই তো পুরুষ-মানুষের মত কথা। যারা কথায় কথায় দুর্বল হয়ে পড়ে, সবাই তাদের ওপর সুযোগ নেয়। একটু থেমে ও আবার বলল, 'মজুমদার যদি কিছু বলতে আসে, পরিষ্কারভাবে ওকে অগ্রাহ্য করো। ওর কথা শুনতে যাওয়া মানেই ওকে আস্কারা দেওয়া।'

'তুমি কি করে জানলে যে, মজুমদার আজই আমাকে কিছু বলেছে?'

সুপ্রিয়া কথা না বলে হাসল, আবার আমার মনে হল, পিছন দিকে সুপ্রিয়ার একটা কিম্বা দুটো তীক্ষ্ণ চোখ রয়েছে। সামনের চোখ দিয়ে যা দেখা যায় না, পিছনের চোখ দিয়ে ও তাই দেখে।

রাজভবনের নীচু পাঁচিলের পাশ দিয়ে এসপ্ল্যানেডের দিকে যাচ্ছিলাম, এখানেই একদিন আমার পা পিছলে গিয়েছিল, আর আমি পড়তে পড়তে সামলে নিয়েছিলাম। হঠাৎ বলে উঠলাম, [illegible] পড়ে যাবার সময় হাতের সামনে [illegible] পায় তাকেই ধরে ফেলে। এতে কো[illegible] দোষ হয় না।'

সুপ্রিয়া উত্তর [illegible] না। অবিশ্যি ওকে যে কোন প্রশ্ন করা হয়েছে তা না। তবে কিছু একটা বলতে পারত ও। বললে শোভন হত।

বললাম, 'তুমি আজ বড্ড বেশী চুপ-চাপ রয়েছো, মন ভাল নেই?' কথার মধ্যে অন্তরঙ্গ সুর ছিল। নিজের কানেই বাজল।

সুপ্রিয়া উত্তর দিল, 'না।'

'কেন?'

'তুমি চলে যাবে বলে,' হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল সুপ্রিয়া। ওর দিকে ফিরে তাকালাম। ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। রাস্তার আলো এসে ওর মুখে পড়েছে। সেই আলোতে ওর চোখের আলো ধরা পড়েছে।

বললাম, 'তা হলে আমার যাওয়া বন্ধ করছো না কেন?'

'নিজের স্বার্থে।'

'তোমার কী স্বার্থ?'

'পাটনা অফিসে লোক নেওয়া হবে। আমার একজন ক্যানডিডেট আছে। যতীনবাবুর সম্বন্ধী। তুমি থাকলে তাকে নিতে সুবিধা হবে।'

'যতীনবাবুর সম্বন্ধী তোমার ক্যানডিডেট?'

'হ্যাঁ, তুমি হয়তো জান না, যতীনবাবু আমার আত্মীয় হন।'

'সে তো অনেক দূর সম্পর্কের।'

'অনেক দূরের লোকও সময় সময় খুব আপন হয়ে যায়, বুঝলে!' বলে সুপ্রিয়া এমনভাবে আমার দিকে তাকাল, ঈশ্বর জানেন, আমার মনে যদি কোন দুর্বলতা থাকতো, এই মুহূর্তে আমি ওর একটা হাত নিজের দু-হাতের মধ্যে নিতে নিতে গাঢ় স্বরে বলতাম, 'হ্যাঁ, সুপ্রিয়া জানি। খুব ভাল করে জানি।'

কিন্তু সে ধরনের কোন কথাই বললাম না, যে হেতু আমার অন্তরে সেই ধরনের কোন দুর্বলতার স্থান ছিল না।

একটা ট্যাক্সি ডেকে সুপ্রিয়াকে তুলে দিলাম। ট্যাক্সি স্টার্ট দিয়েছে। এক্ষুনি ছেড়ে দেবে, সুপ্রিয়া গলা বাড়িয়ে হাতের ইসারায় আমাকে কাছে ডাকল। কাছে যেতেই কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'কথাটা খুব গোপনীয়। অন্য কান যেন না হয়, কাপুর বলেছেন, তুমি খুব বুদ্ধিমান ছেলে। কথাটা বিশ্বাস করে গেলাম।' বলে হাসিতে ভেঙে পড়ল সুপ্রিয়া। শব্দ করে গাড়ি ছেড়ে দিল।

শূন্য জায়গার দিকে তাকিয়ে আর একবার সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখলাম। মনে হল আগাগোড়া ঘটনাটা এক বিরাট প্রহসন, সুপ্রিয়া গোড়া থেকেই আন্দাজ করেছিল, পাটনায় বদলী হওয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবার জন্যেই ওকে ডেকে নিয়ে এসেছি। তাই প্রথম থেকেই একজন রাগী মানুষের ভূমিকায় অভিনয় করে গেল। আমাকে দিয়ে যা ইচ্ছে করিয়ে যাচ্ছে, আর একজন বিশ্বস্ত ক্রীতদাসের মত আমি সেই আজ্ঞা পালন করে চলেছি, নিজেকেই নিজে ধিক্কার দিলাম। একবার, দুবার, বারংবার।

সত্যি সত্যি অফিসের দেওয়ালে পুরনো খবরের কাগজের ওপর লাল কালি দিয়ে লেখা পোস্টার পড়েছে। না-ছুঁই না-ছুঁই ধরনের লেখা। যেমন একটায় লেখা রয়েছে, চোরা গলি দিয়ে আনাগোনা করে যারা, তারা দেশের শত্রু। আর একটায়, আমাদের লড়াই, ন্যায়ের লড়াই; সত্যের লড়াই। ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোস খুলে ফেল। গেটের ঠিক সামনেই—ফেবারিটিজম নিপাত যাক, কায়েমী স্বার্থ ধ্বংস হোক, ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

চেয়ারে বসতে-না-বসতেই টেলিফোন বেজে উঠল, সুপ্রিয়ার গলা, 'কি, খুব নার্ভাস ফিল করছো তো। জল খেয়ে নাও। পাখাটা ফুল জম করে দিতে বলো।'

বললাম, 'মোটেই না।'

'কি মোটেই না? মোটেই ভয় পাও নি? ভেরী ভেরী গুড। তুমি সত্যিকারের একজন সাহসী লোক। তোমার চার্জ যত তাড়াতাড়ি হয় বুঝিয়ে দাও। আজই লোক যাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি হয়, বুঝলে! দেরী করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।' সুপ্রিয়ার কথা শুনে মনে হচ্ছিল, যদি সম্ভব হতো এই মুহূর্তে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে আমাকে রওনা করিয়ে দিত। এক এক সময় সত্যি সত্যি নিজেকে দারুণ অসহায় মনে হয়। মনে হয়, কি করবো, কোথায় যাবো। আমার আশে-পাশে কেউ কোথাও নেই, একটা নির্জন প্রান্তরে পথ হারিয়ে আমি যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

এমন সময় যতীনবাবু এসে সামনে বসলেন। একটা কাগজ আমার দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, 'পাটনা অফিসের আণ্ডারে যে কজন ডিস্ট্রিবিউটার রয়েছে প্রত্যেকের নামের ঠিকানা। তাছাড়া লাল কালি দিয়ে ওদের সম্বন্ধে কনফিডেনসিয়াল রিপোর্টও লেখা রয়েছে। কাগজটা সাবধানে রাখবেন।'

'আপনি এই রিপোর্ট পেলেন কোত্থেকে? আপনি তো সেলস-এ কাজ করেন না।'

'তা করি না। তবে আমার শুধু দিয়ে কিছু পাঠালে, সেটা যথাস্থানে পেঁৗছে দিতে পারি। মিস মিত্র এটা আপনাকে দিতে বললেন। প্রথমে গিয়েই যাতে মার্কেট সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে, তাই।' যতীনবাবু কাগজটা দিয়েই উঠে গেলেন না। কিছুক্ষণ বসে থেকে বললেন, 'মজুমদারের মত লোকেরা চিরদিনই চেঁচায়। ওরা কামড়ায় না। যারা কামড়ায়, তারা চেঁচায় না। তাদের কাছ থেকেই একটু সাবধানে থাকতে হয়।'

'এটাও কি আপনার মিস মিত্রের বাণী?'

যতীনবাবু একটুও চটলেন না। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'উনি সবারই মিস মিত্র শুধু আমারই নয়। বাণী দেওয়ার স্পর্ধা উনি রাখেন না। তবে এটা ওঁর অভিমত বলতে পারেন। আমি এখন উঠি, যদি কোন সময় প্রয়োজন বোধ করেন, স্মরণ করবেন।'

মনে মনে যতীনবাবুকে গালাগাল দিয়ে বললাম, যদি প্রয়োজন হয় জাহান্নামে যাব, কিন্তু তোমার মত একটা উজবুকের কাছে গিয়ে হাত পাতবো না কোনদিন। বুড়ো হয়ে শালা মরতে চলেছে, অথচ মেয়ে-মানুষের ওপর ছোঁক ছোঁক ভাবটা ঠিক যোল বছরের ছোঁড়ার মতন।

চার্জ নেবার ছেলেটি নতুন রিক্রুট। স্মার্ট ছেলে। চটপট কাজ বুঝে নিতে লাগল। জিজ্ঞেস করলাম, 'আগে কোথাও কাজ করেছেন?'

'হ্যাঁ।' কিন্তু অফিসের নাম বললো না।

'আপনি কি ইন্টারভিউ দিয়ে ঢুকেছেন, না কারও ক্যানডিডেট ছিলেন?'

'এখানে বুঝি ক্যানডিডেট হয়ে ঢুকতে হয়?'

বিজ্ঞের মত ঘাড় দুলিয়ে বললাম, 'দুনিয়ার সব জায়গায়ই আজকাল মুরুব্বির জোর থাকা চাই।'

ছেলেটি মুখ নীচু করে কাগজ দেখছিল। সেইভাবেই বলল, 'আমার তা মনে হয় না।'

'আপনার কি মনে হয়?'

'আমার মনে হয়, ইচ্ছে করলে মানুষ নিজের চেষ্টায় অনেক কিছু করতে পারে। আর সেখানেই মানুষের স্বার্থকতা।'

টেলিফোন বেজে উঠল। সুপ্রিয়া কথা বলছে, 'সময় খুব কম, মিস্টার কাপুর চান যত তাড়াতাড়ি হয় পাটনায় রওনা হও, অথচ গল্প করে নিজের এবং শুভেন্দুর সময় নষ্ট করছো।'

'ওকে তুমি চেনো?'

'হ্যাঁ। যত শিগগির পার ওকে চার্জ বুঝিয়ে দাও, বুঝলে?'

সুপ্রিয়া টেলিফোন রেখে দিল। কি আশ্চর্য, কাপুরের ঘরের মধ্যে ছোট একটা চেম্বার। সেখানে বসে মহিলাটি কি করে দেখতে পাচ্ছে, আমি গল্প করছি না কাজ করছি। হঠাৎ কি রকম সন্দেহ হতেই মাথা উঁচু করে হল ঘরের একটা বিশেষ কোণের দিকে তাকালাম। ঘাড় নীচু করে লেজার-কীপার যতীনবাবু কাজ করে চলেছেন। এত দূর থেকেও টেবিলের ওপর ফোনটা দেখা যাচ্ছিল, ইদানীং যতীনবাবুর টেবিলে একটা ফোন এসেছে, অথচ ভদ্রলোকের ফোনের যে কি দরকার! চকিতে মনে হলো, সুপ্রিয়ার পিছন দিককার একটা চোখ হয়ত যতীনবাবু স্বয়ং, আর এই যে মিনিট কয়েক আগে সুপ্রিয়া ফোন করে আমাকে চার্জ বুঝিয়ে দেওয়ার উপদেশ দিল, তার একটু আগেই যতীনবাবুর ফোনটা তাঁর হাতে উঠে আসে নি তো। দাঁতে দাঁত পিষে নিজের মনে গর্জে উঠলাম, শুয়োরের চেয়েও অধম জন্তু একটা। হারামজাদা ছুঁচো কোথাকার! স্পাইং করে বেড়ানো জন্মের মত ঘুচিয়ে দেবো তোমার।'

তাকিয়ে দেখলাম শুভেন্দু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি কাজে মন দিলাম।

(ক্রমশঃ)

আনন্দময়ীর আগমনে

আবার একটি শারদোৎসব সমাগত। যথারীতি এইবারও আনন্দের অভাব দেখা যাচ্ছে না। মহামারী, বন্যা, খরা, ঘূর্ণীঝড়্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাঙালীর জীবনের নিত্যসাথী তাই এসব আমাদের গা সওয়া ব্যাপার। প্রতিবছরই এমন হয়, মনে হয় বোধ হয় এইবার পুজোর সময় আনন্দের অভাব ঘটবে। কিন্তু যথাকালে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত চাপ বা অন্য নানারূপ অনটন আমাদের কাবু করতে পারে না।

বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলের কাপড়ের মিল মালিকগণ অতি সহৃদয়, তাঁরা বাঙালী ভাইদের জন্য নানাবিধ নয়ন বিমোহন ছিট এবং ধুতি-শাড়ি, টেরি-কট ইত্যাদি বস্তু উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছেন। এসব দ্রব্যের দামটা কিঞ্চিৎ আকাশ-ছোঁয়া, কিন্তু এ দিককার উদারচেতা স্টল ও বিপণি মালিকগণ দশ থেকে বিশ পারসেন্ট রিবেট সহযোগে সেইসব দ্রব্য অভাবনীয় আয়োজন করে উপহার দিয়ে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার চিত্ত রঞ্জিত করে তুলছেন।

সর্বত্র পুজো পুজো ভাব। বর্ষণমুখর আকাশের সেই বিষণ্ণ মুখখানির পরিবর্তে শরতের মেঘমুক্ত সোনালি আকাশ দেখা যাচ্ছে। দৃশ্যপট সহসা পরিবর্তিত। এইবার রঙ্গমঞ্চে অন্য অংক, অন্য দৃশ্য।

এখন এসেছে অনাবিল আনন্দের দিন। অন্ধকারের পর আলো। দুঃখের পর সুখ —সবই চক্রবৎ পরিবর্তনশীল। এ এক আশ্চর্য ঋতু বদল। সকল তামস কলুষ হরণ করে এক আশ্চর্য ইন্দ্রজাল প্রভাবে চতুর্দিক ঝলকিত।

বাঙালীর সব কিছু বিচিত্র। তার এই শারদোৎসবের আয়োজনও তাই বিচিত্র। এই পুজা উৎসবে তাই ভক্তির চেয়ে ভালোবাসার অভিব্যক্তি প্রকাশিত।

গিরিরাজ কন্যা উমা হৈমবতী বাঙালীর কাছে কন্যারূপিণী। তার পতিগৃহ কৈলাসে। সেখানে তার বড়ই কষ্ট। স্বামী উদাসীন শংকর, শ্মশানচর। তিনি ভোলানাথ, আত্মভোলা। অতি বড় বৃদ্ধ এবং সিদ্ধিতে নিপুণ। এহেন পতিকে নিয়ে শ্বশুরালয়ে উমাকে অতি ক্লেশে জীবন যাপন করতে হয়। বৎসরান্তে সেই কন্যারূপিণী পিতৃগৃহে আসবেন মাত্র চার দিনের জন্য —তাই বাঙালী পাষাণী ঈশানীর জন্য কোনো রকম আয়োজনের ত্রুটি রাখে না। এই পুজোর আয়োজন শুরু হয় বৈশাখ মাস থেকে এবং আশ্বিনের মাঝামাঝি খালবিলে মাঠে ময়দানে ঢাকিরা ঢাক বাজায়।

বাঙালী কবিরা প্রাচীন লোক-গীতির মাধ্যমে এই দিকটি অতি সুন্দরভাবে এঁকেছেন। এই গানগুলির নাম আগমনী গান। বৈরাগীরা পল্লীতে পল্লীতে দাশরথি রায় রচিত নিম্নলিখিত গান গেয়ে আনন্দের সংবাদ বিতরণ করেন।

"গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল—
ঐ এল পাষাণী, তোর ঈশানী।
লয়ে যুগলশিশু কোলে,
মা কৈ মা কৈ বলে
ডাকছে মা, তোরে শশধর বদনী।"

আগমনী গান বাংলার লোকসঙ্গীতের এক অমূল্য সম্পদ। আগমনী গানগুলির কোনো সামগ্রিক সংগ্রহ কিন্তু পাওয়া যায় না।

ভবের ভয়হারিণী ত্রিভুবনমান্য হরমনোমোহিনী যখন পিতৃগৃহে এলেন তখন চারদিক আনন্দে ভরে গেল। মেনকার আনন্দের সেই অপরূপ অভিব্যক্তি হরুঠাকুরের নিম্নলিখিত গানে পাওয়া যায় ঃ

'গিরি প্রাণ বাঁচালো তোমায় এনে
পূর্ণ হোল বাসনা,
ঘুচলো বেদনা সকল যন্ত্রণা
তুমি না এলে এখন, যেতো মা জীবন
মায়ে-ঝিয়ে দেখা হত না।'

এখন কন্যার আগমনে জুড়ালো হৃদয়, সমস্ত দুঃখ দূরে হোল। গিরিরাজের সংসারে যেন কোটিচন্দ্র উদিত।

কোটিচন্দ্র সর্বত্র উদিত। গিরিরাজ তাঁর কন্যাকে পতিগৃহ থেকে এনে আমাদের সকলের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। কারণ চতুর্দিকে যে পরিমাণ 'টেনস্যন' সেই 'টেনস্যন'টুকু কাটানোর প্রয়োজনে আনন্দের এই সাময়িক বিরতিটুকুর প্রয়োজন ছিল।

মহামায়া দনুজ-দলনী শ্রীশ্রীদুর্গাকে শরৎকালে দেবতাদিগের সংগে ভগবান ব্রহ্মা কৃষ্ণানবমীতে দেবীকে আবাহন করেছেন বোধন দ্বারা এবং তাঁর পূজা অর্চনা করেছেন। কালিকা-পুরাণে এই উল্লেখ আছে। দেবী দুর্গার অপর নাম শারদা।

দুর্গাপুজো করলে অশ্বমেধতুল্য ফল হয়। কলিযুগে যজ্ঞ করা নিষিদ্ধ। দুর্গোৎসব তাই এক মহাযজ্ঞ। বাঙালীর কাছে দুর্গাপুজোর দুটি অর্থ। বাঙালী জাতি ছিলো মুখ্যতঃ কৃষিজীবী। প্রাণধারক আউস ও আমন শস্য বাঙালীর কাছে এক মহামূল্যবান সম্পদ। ভাদ্রমাসে আউস ধান আর কার্তিকে আমন ধান বাঙালীর শস্যভাণ্ডার পূর্ণ করত। তাই শস্যদেবীর পুজো বাঙালীর প্রাণের উৎসব। শাকপ্রসবিনী দেবতার কল্পনা অতি প্রাচীনকালের। শাকম্ভরী দুর্গাদেবীর কল্পনা অতি প্রাচীন। গ্রীকদের 'কর্ণ গডেস' আর আমাদের শাকম্ভরী দেবী প্রায় একই বস্তু। কলা-বৌ ও নবপত্রিকা কৃষিজাত সম্পদের প্রতীক।

পুরাণে আছে শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি এবং খরা হলে দেবী তাঁর নিজের শরীর থেকে প্রাণধারক শাক বা শস্যের দ্বারা সমস্ত জনগণকে ভরণ করবেন। পৃথিবীতে তখন তাঁর পরিচয় হবে শাকম্ভরী। সেখানে 'দুর্গ' নামক মহা অসুরকে বধ করে দুর্গা দেবী নামে এই দেবীর খ্যাতি হবে।

এই পুরাণোক্ত দেবী বাঙালীর হাতে একেবারে আমাদের ঘরের মেয়েতে রূপান্তরিত। ভু-ভারতে এমনটি আর দেখা যায় না। সমগ্র ব্যাপারটি বাঙালীর আবেগপ্রবণ অন্তরের এক আশ্চর্য অভিব্যক্তি।

ঢাকার এক অজ্ঞাতনামা লোক-কবির রচনায় বাঙালীর ঘরে কন্যারূপিণী এই দেবীর কিভাবে পুজো হয় তার এক চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। এইখানে দেবী মেনকা হয়েছে 'মেনা'। দুর্গা তাঁর আদরের ঝি (ঝিয়াড়ি) তিনি কন্যা দুর্গাকে আদর করে বরণ করতে এগিয়ে এলেন—বাটাভরা পান নিয়ে। পান মুখে দিয়ে বরণ করার প্রথাটিও বাঙালীর নিজস্ব। তাই ঢাকার প্রাচীন কবি লিখেছেন ঃ

"পুণ্যধাম বাপের বাড়ি
ধাইতে চাহে সকল নারী,
ঐ দ্যাখো না দুর্গাদেবী সিংহবাহিনী
গণেশেরে কোলত্ করি আইসেন জননী।
সম্মুখেতে নন্দী আইসেন ছোট-র হাত ধরি
সিংগ চলেন পাছে পাছে ধুম্ ধুম্ করি।"

এই দৃশ্য বাঙালীর ঘরে কন্যা আগমনের দৃশ্য। বাচ্চা কোলে করে কন্যার পিতৃগৃহে আগমন। গণেশ ভাই দেবীর কোলে উঠেছেন, আর অমন যে সিংহ সেও অবস্থা বুঝে আনন্দে 'ধুতুম-তুতুম' করতে করতে আসছে পাছে পাছে সরল সহজ মেষ শিশুর মতো। আর কন্যাকে কাছে পেয়ে প্রাচীন লোক-কবির কাছে যিনি 'মেনা' তিনি কি করলেন। তিনি ছুটে এলেন নাতি-নাতনীকে বরণ করে নিতে। আনন্দে তাঁর মুখে হাসি আর ধরে না—কন্যা বৎসরান্তে পিতৃগৃহে এসেছে একি কম আনন্দের কথা।

'মেনা আইলো বরাই নিতে আদরের ঝি
ঝি নাতি দেখ্যা মেনা হাসে ভাসে সুখে
বাটা ভরি পান আনে দিতে ঝিয়ের মুখে।'

তারপর জগজ্জননী মাকে অপ্রসন্ন হয়ে বাড়ির ভিতর নিয়ে গিয়ে মহাসমাদরে পূজা অর্চনা করলেন :

"আগ বাড়াইয়া নিল মায়ে বাড়ির ভিতর
পূজা দিল, বলি দিল, খাওয়াইল বিস্তর।।
তিনদিন রাখিল মায়ে বড় যতন করি
চার দিনের দিন বিদায় দিল
যাইতে নিজের বাড়ি।।"

চার দিনের দিন পতিগৃহে ফিরলেন উমা। সবাই আর্তস্বরে আবেদন জানালো—গচ্ছ গচ্ছ মহাদেবী, পুনরাগমনায় চ। আর স্বগৃহে পদার্পণ মাত্র পতিদেবতা প্রশ্ন করলেন—

"শিব বোলে কি আনিলা আমার কারণ
আলুনি কচুশাক টুনি-পোড়া পানিভাত
গরীব বাপের বাড়ি আমার ভোজন।।

আমরা আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে গৃহস্থ বাড়ি বিজয়ার দিন প্রাতে দেবীর ভোগ অর্চনায় পান্তা ভাত, কচু শাক, মানকচু, কাঁচকলা, রাঙা আলু, মোচা, থোড় প্রভৃতি সামান্য বস্তুর সমারোহ দেখেছি। দেবীর জন্য যে মিষ্টান্ন দেওয়া হত তার নাম রসকরা। কেবলমাত্র নারকেল ও চিনির দ্বারা প্রস্তুত এই মিষ্টান্ন অতি উপাদেয় ছিল।

প্রতিমা নির্মাণ করে পূজা করাটাও বাঙালীর নিজস্ব। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর চামুণ্ডা বা মহিষমর্দিনী মূর্তি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মন্দিরগাত্রে দেখা যায়। কিন্তু বাঙালী পরিকল্পিত বোধ-পরিবারের পরিকল্পনা কোথাও নেই। আগে বাংলায় ঘরে ঘরে ঘট স্থাপনা করে পূজা হত, পরে কংসনারায়ণ প্রবর্তিত এই নূতন পরিকল্পনার প্রতিমা নির্মাণ করা হল।

বিরাট প্রতিমা নির্মাণ করে মহা-আড়ম্বরে দেবী আরাধনার প্রচলন হল ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে নয়া-ধনী 'ঠাকুর-দেব-দত্ত-দে-সরকার' প্রভৃতি, ধনী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতাদের পূজা অর্চনার ফলে। নাচ গান হল্লা পূজার অন্যতম অঙ্গ হয়ে উঠল। পূজার আকর্ষণ বৃদ্ধি পেল।

শহরের ধনীদের এই আনন্দ হুল্লোড়ের অনুকরণ ঘটলো অচিরাৎ। বৃহৎ ধনীদের অনুকরণে অপেক্ষাকৃত স্বল্পবিত্ত গ্রামের জমিদারগণও মহা আড়ম্বরে পূজা উৎসব সুরু করলেন।

এই কাল থেকে পূজার ব্যাপারে জাঁক-জমকটাই প্রধান হয়ে উঠল। তারপর ক্রমে-ক্রমে ধনী এবং জমিদারবৃন্দ যখন পথে বসলেন তখন বারোয়ারী পূজার প্রচলন হল। সেই বারোয়ারী পূজা আজ সর্বজনীন পূজা হিসাবে পাড়ায় পাড়ায় গলিতে গলিতে সুবৃহৎ প্যানডালের নীচে আশ্রয় নিয়েছে। গৃহস্থবাড়ির পূজা প্রায় বিলুপ্ত।

পূজোর ব্যাপারে হৈ-হুল্লোড়টাই এখন সর্বপ্রধান। জাঁক-জমক হৈ-হুল্লোড় সবই আছে, অভাব শুধু ভক্তির। দুর্গাপূজার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে উৎসবের আড়ালে ঢেকে আমরা আনন্দের বেসাতি সুরু করেছি।

তথাপি দুর্গাপূজা—দুর্গাপূজা।

আনন্দময়ীর আগমনে তাই সমগ্র দেশ আজ আনন্দমুখর।

—অভয়ঙ্কর

রহস্যের মায়িকা (উপন্যাস)। কৌশিক রায়। লিপিকা, ৩০।১-এ, কলেজ রো, কলকাতা ৯। দুটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কৌশিক রায় লিখিত 'রহস্যের মায়িকা' উপন্যাসটি একটি গোয়েন্দা উপন্যাস। হোটেলের মালিক মিঃ মেহেতার মৃত্যুকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মেনে নিতে পারে নি দুই বন্ধু রবি ও অমরু। এই দুই বন্ধু আমেদাবাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে এসে মিঃ মেহেতার হোটেলে জায়গা না পেয়ে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। মিঃ মেহেতার আকস্মিক মৃত্যুর পর তারা খুনের কিনারা খুঁজতে বসে। লেখক সুকৌশলে এবং রুদ্ধশ্বাস পরিবেশে কাহিনীর জটিল বন্ধ রচনা করেছেন। গোয়েন্দা কাহিনীর উপযুক্ত চরিত্র হয়ে এসেছে ইন্সপেক্টর মোহন সিং, মিঃ মেহেতার ভাইঝি মনিবেন, কর্মচারী প্রশান্ত, অধ্যাপক দেশাইবেণী মিঃ প্যাটেল ইত্যাদি চরিত্র। মায়িকা মনিবেন কাহিনীকেই রহস্যময়ী। এর কাহিনী একবার পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করা পর্যন্ত স্বস্তি আসে না। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব।

জীবন যাপন (গল্প সংকলন)। শচীন বিশ্বাস। বাক সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড। ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা ৯। চার টাকা।

সাম্প্রতিককালের বাংলা ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে শচীন বিশ্বাসের নাম উল্লেখ্য। উল্লেখ্য এই কারণে যে, এই তরুণ লেখক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ছোটগল্প রচনা করতে বসেন— যা অধিকাংশ তরুণ গল্পকারদের মধ্যে দুর্লভ। নিষ্ঠা লেখকের মানুষের অস্তিত্বের মূল্যবোধে এবং তার যথাযথ হার্দ্য রূপায়ণে। মানব্য বা মানবিকতা হল আধুনিককালের মানুষের কাছে বড় দুর্লভ বিষয়। এর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই মানুষ অসভ্য, আদিম-বর্বর ছাড়া কিছু হতে পারে না। অথচ এই মানবতাকে মর্তমানুষের মমতা দিয়ে ধরতে হবে। তরুণ গল্পকার 'জীবন যাপনের' প্রতিটি গল্পে সেই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করেছেন শিল্প-পরিমিতিবোধ বজায় রেখেই। প্রমাণ—লেখকের 'জীবজন্তুর সঙ্গে যুদ্ধ', 'শিশুমেধ', 'জীবন যাপন', 'সীমানা নেই', 'ফসল তোলার আগে', 'আজ কাল পরশু' ইত্যাদি গল্প। 'জীবন যাপনে'র মন্মথবাবু, 'জীবজন্তুর সঙ্গে যুদ্ধ' গল্পে শিবু, শিবুর বাবা পঞ্চাননবাবু, 'আজ-কাল-পরশু'র কেতকী-জয়ন্ত ইত্যাদি চরিত্র ও তাদের মানসিকতা দৈনানুদৈনিক জীবন ভাবনা ও জটিল সমস্যার আবর্তে পড়ে যেন বা বস্তুগত জীবন চিত্রের প্রতীকত্ব পেয়েছে। কোন সস্তা রোমান্টিকতা নয়, বা ফাঁকা ফাঁপা 'এক্সপেরিমেন্ট' নয়, অথবা গদ্যে পরীক্ষার নামে গদ্যের উপর অত্যাচার নয়, একটি নিরাসক্ত লেখনীতে এমন তীব্র জীবনাসক্তির চিত্র খুব কম গল্প লেখকের রচনায় মেলে। মোট এগারোটি ছোট গল্পের এই সংকলনে আলোচ্য তরুণ লেখক নিঃসন্দেহে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন।

সাহিত্য তত্ত্বের রূপরেখা (প্রবন্ধ)। বিমল-ভূষণ চট্টোপাধ্যায়। বাক সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা ৯। তিন টাকা।

সাহিত্য তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ ইদানীং বেশী সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে এটা আশার কথা। যথার্থ সাহিত্যের রস উপভোগ সহজ না হোক, তবু তা পাঠক-দের আকর্ষণ করে। কিন্তু সাহিত্য তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা সাধারণ পাঠকের কাছে কোন রসই দিতে পারে না। পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী পাঠক ও কিছু অধ্যয়নশীল ছাত্র-ছাত্রী এসব গ্রন্থের বিষয় অনুধাবনে যত্নশীল হন। এ জাতীয় গ্রন্থের পাঠক স্বতন্ত্র। লেখক শ্রীবিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায় সেই স্বতন্ত্র পাঠকশ্রেণীকে সম্যকভাবে তুষ্ট করতে পারবেন বলে মনে করি। বিশেষ করে সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এ গ্রন্থটি মূল্যবান। অল্প কথায় সহজ সরলভাবে বহু দুরূহ তত্ত্ব বোঝাতে পেরেছেন। বহু জায়গায় লেখকের মৌলিক চিন্তা প্রশংসার্হ। 'স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব', 'অনুকরণ তত্ত্ব', 'রসতত্ত্ব' 'সাহিত্যের বাস্তবতা' ইত্যাদি কয়েকটি পরিচ্ছেদ সুলিখিত ও লেখকের মৌলিক চিন্তার পরিচায়ক কোন কোন ক্ষেত্রে। আকারে ছোট হলেও লেখকের পরিশ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় গ্রন্থের প্রতিটি প্রবন্ধে ছড়িয়ে আছে।

যুগনায়ক অরবিন্দ। জীবন মুখোপাধ্যায়। পরিবেশক : বিদ্যা, কলিকাতা-৯। মূল্য : আট টাকা।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর লিখিত ভূমিকা থেকে জানা যায়, শ্রীমুখোপাধ্যায় একজন উদীয়মান ঐতিহাসিক এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁর বাস্তবধর্মী লেখনী শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের চিন্তাধারাকে সাধারণের পাঠোপযোগী করে লিপিবদ্ধ করেছেন। রচনাটির আদ্যোপান্ত মন দিয়ে পড়লে, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে শ্রীঅরবিন্দের অবদান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সহজেই করা যায়। বিভিন্ন আয়াসলব্ধ তথ্যের মাধ্যমে লেখক সার্থকভাবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে শ্রীঅরবিন্দের কাছে দেশপ্রেমই ছিল ধর্ম এবং আত্মোপলব্ধিই ছিল স্বরাজ-সাধনা। লেখকের মতে, 'ইতিহাস জীবনে বিশ্বাসী—যোগে নয়, ধর্মে বিশ্বাসী—কিন্তু ধর্মের অলৌকিকত্বে নয়'; এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তিনি শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানকে প্রশংসনীয়ভাবে সীমিত রেখে স্বীয় শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে মন্তব্য করেছেন : 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীঅরবিন্দ দুটি পৃথক সত্তা নয়— রামকৃষ্ণ সাধনার উত্তরসূরী তিনি।... তিনিই হাত ধরে আমাদেরকে পৌঁছে দেবেন সেই চির আকাঙ্ক্ষিত অমৃতলোকে।' কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্যেই গ্রন্থটি সকল শ্রেণীর পাঠকদের কাছেই সমাদৃত হবে। প্রচ্ছদে শ্রীঅরবিন্দ—'যুগনায়ক অরবিন্দ' আখ্যায়—কেন শ্রীহীন হলেন তা ঠিক বোঝা গেল না।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

চিত্রাঙ্গদা (শারদীয়া)—সম্পাদক অজিত-মোহন গুপ্ত।। ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও, ৭২।১, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২।। দাম: পাঁচ টাকা।।

পরিচ্ছন্ন মুদ্রণে ও আঙ্গিক শোভনতায় চিত্রাঙ্গদা বরাবরই আকর্ষণীয়। পাঠককে সন্তুষ্ট করার আয়োজনে কখনো বিশেষ কার্পণ্য করেনি। লেখালেখির কথা ছেড়ে দিলেও এ সংখ্যায় অন্যতম সম্পদ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, ইন্দ্র দুগার ও হেমন্ত মিশ্রের আঁকা দুটো ছবির নাম। ইন্দ্র দুগারের তুলিতে জিয়াগঞ্জের সদর ঘাট এবং হেমন্ত মিশ্রের কল্পনায় 'অমাবস্যার চাঁদ' যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এ সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য রচনাটি গল্প কিংবা উপন্যাস নয়, ভিয়েতনামে মার্কিণী নৃশংসতার ওপরে লেখা একটি সুদীর্ঘ এবং সচিত্র প্রবন্ধ। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বীণা মিশ্র, সুনীল-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, পরমানন্দ সরস্বতী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সামসুল হক এবং আরো অনেকে।

কালি ও কলম (আশ্বিন ১৩৭৯)—সম্পাদক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি পত্রিকা 'কালি ও কলমে'র শারদ সংকলন আকর্ষণীয় প্রবন্ধ গল্প কবিতা, নাটিকা, ভ্রমণকাহিনী সমৃদ্ধ। প্রবন্ধ লিখেছেন বিনয় ঘোষ, হরপ্রসাদ মিত্র, সুখরঞ্জন রায়, কাজী মোতাহার হোসেন, সুধীর করণ, আবু মোহাম্মেদ মোজাম্মেল হক (আমাদের জাগরণে প্রবন্ধ সাহিত্যের ভূমিকা), নিরঞ্জন হালদার (মানিকভাই ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা), সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, উজ্জ্বল মজুমদার এবং আশিস সান্যাল। গল্প নাটক ও ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাত দেবসরকার, বার্ণিক রায়, দেবল দেব বর্মা, তৌফিক এল হাকিম (শচীন দাশ অনূদিত), এবং অন্য কয়েকজন। মণীন্দ্র রায়, গোপাল ভৌমিক, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শংকর চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, কবিরুল ইসলাম, চন্দন সেন সামসুর রহমান, সতীকান্ত গুহ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, সুশীলকুমার গুপ্ত গৌরাঙ্গ ভৌমিক এবং প্রতিমা সেনগুপ্তের কবিতা ছাপা হয়েছে। পত্রিকা সুচিন্তিত রচনা পরিচ্ছন্ন মুদ্রণে পূর্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

পরিচয় (শ্রাবণ-ভাদ্র)—সম্পাদক : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তরুণ সান্যাল। ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৭। দাম দেড় টাকা।

প্রতিবছরের মত এবারও 'পরিচয়ের সমালোচনা সংখ্যাটি সুসম্পাদিত। উল্লেখযোগ্য দেশী বিদেশী গল্প কবিতা প্রবন্ধ গ্রন্থের সমালোচনায় সমৃদ্ধ। এই সংখ্যাটিতে লিখেছেন অশোক সেন, কার্তিক লাহিড়ী, সত্যপ্রিয় ঘোষ, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য গুহ, বরুণ সান্যাল, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, গুণময় দাস, বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, দেবেশ রায়, বাসব সরকার, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সতীন্দ্রনাথ মৈত্র, অরিন্দম দাশগুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, সিদ্ধেশ্বর সেন এবং চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রগতিমনা জিজ্ঞাসু পাঠককেই সংখ্যাটি আকৃষ্ট করবে।

সংবেদ (শ্রাবণ পূর্ণিমা ১৩৭৯)—সম্পাদক : শরৎ সুনীল নন্দী। ১১৬।২ আনন্দ পালিত রোড। কলকাতা-১৪। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

বিশেষ ছন্দ সংখ্যা। ছন্দ সম্পর্কে কয়েকটি আলোচনা আছে। কবিতাগুলি সুপাঠ্য।

রোববার (ভাদ্র ১৩৭৯)—সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুস সাকী। ই-৪৫ শহীদ লেন। পাহাড়তলী। চট্টগ্রাম। দাম—পঁচিশ পয়সা।

বাঙলাদেশ থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা। মাত্র ষোল পৃষ্ঠার এই সাহিত্য পত্রিকায় নাজমে আরা বেগমের 'প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধটি সব থেকে উল্লেখযোগ্য। অন্য যাঁরা লিখেছেন মেজবাহ খান, নাসরীন সুলতানা রুকু, সাইফুল আলম, কাজী রফিক, শিশির চৌধুরী এবং রেজাউল হক।

কুহেলি (গল্প সংখ্যা '৭৯)—সম্পাদক : চিত্রভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ৭০ আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা—২৫। এক টাকা।

জুলাই-আগস্ট, '৭২ যুক্ত সংখ্যাটি নানান ধরনের গল্পের সংকলন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন : চিত্রভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম দে, প্রভাত দেব সরকার, পান্নালাল দাশগুপ্ত, রণেন্দ্র ভট্টাচার্য, তেজেশ অধিকারী প্রমুখ।

প্রাপ্তি স্বীকার

সবুজ সংকেত (শারদ সংকলন)—সম্পাদনা : অলোক ভাদুড়ী ও শ্যামল আচার্য। পলাশখোলা। আন্দা। পুরুলিয়া।

স্বাক্ষর (আশ্বিন) সম্পাদক : শ্রীমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। রাজবল্লভ সাহা লেন। রামকৃষ্ণপুর। হাওড়া-১।

তোমাকে পাবোনা জানি ॥

মোজাফ্ফর হোসেন

তোমাকে পাবো না জানি তবু আমি তোমার স্মৃতিকে
পারি না যে ভুলে যেতে একেবারে
কেননা তোমার
মুখের সৌন্দর্যে আমি
অলৌকিক আনন্দ শোভার
সুষমা দেখেছি
আহা প্রস্ফুটিত ফুলের বিস্ময়ে।

বৃষ্টির মতন তাই প্রণয়ের ইচ্ছার কামনা
অজস্র ধারায় ঝরে জীবনের অমৃত সাগরে
প্রমত্ত ঢেউয়ে ভাসে
দুঃখ জ্বালা অন্ধকার ঘরে
ব্যথার অনলে তাই দগ্ধ হই
তবু ক্ষতি নাই
যা চেয়ে ভরেছি মন
ভুলে যেতে চাই তাই নিয়ে
তৃপ্তির নূপুরে তুলি ধ্বনি তার
হৃদয় বিছিয়ে।।

গর্তটা খুঁড়লেই ॥

উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

গর্তটা খুঁড়লেই নানা জাতের বিষধর দুই মুখো সাপ,
ছদ্মবেশী দেশজ বাদলে পোকার নগ্ন শরীর—
অতি সংযমী পুরুষের মনে ঢেউ তোলা
বেওয়ারিশ সুলভ নারীর মরা শরীরী আবেগ
চোখের পলকে ছাড়া পেয়ে বাধায় হুল্লোড় ঃ
ঘনঘন সামাজিক নীতির বড়াই শেষে খসে খসে প'ড়ে
অসহায় হাসি হাসে অনুতপ্ত গণিকার মতো।
কেঁদে ওঠার প্রথম দিনেই কে যেন ধরা গলায় বলে গিয়েছিলো
অ্যাবনরম্যাল জাতক আমরা ঃ
কবে থেকে যেন একবার নির্বীর্য সূর্যের ঔরসে,
আর একবার পলাতকা কুৎসিত চাঁদের জরায়ুটা ছিঁড়ে
মানুষের বদলে সাজি নিরীহ পাগল!
বিন্দিত অস্থিমজ্জায় তবু
অগণিত রক্তবীজের পূর্ণতা প্রবীণ মহীরুহে।

সায়ন্তন ॥

আইভি রাহা

কেবলি উত্তাপ খোঁজা অহর্নিশি একি-যে যন্ত্রণা
শেষ হয়ে গেছি বুঝি শেষ হব এইবার,
কাল তার গোনা।
আলোর উৎস থেকে চলে যাওয়া
শ্বাসরোধী মৃত্যু ভাবনায়।
অনেক শপথ মোড়া নিটোল স্বপ্ন সাধ
জ্বলে যাওয়া হতাশার তাপে
নিষ্প্রভ সোনালী সুখ
বৃষ্টি হওয়া ভালবাসা
বিসর্জিত মৌন অভিশাপে।
শুধু পরাভব—
নিঃশেষিত এ যৌবন, লুণ্ঠিত এ সমুদ্র সম্পদ;
হৃদয়ে মিনার গড়া লক্ষ কামনার
কান্না থাকে শত বঞ্চনার
রক্তাক্ত মানস পটে, বিষাদের আর্তি দিয়ে
আলেয়ার জাল তবু বোনা।।
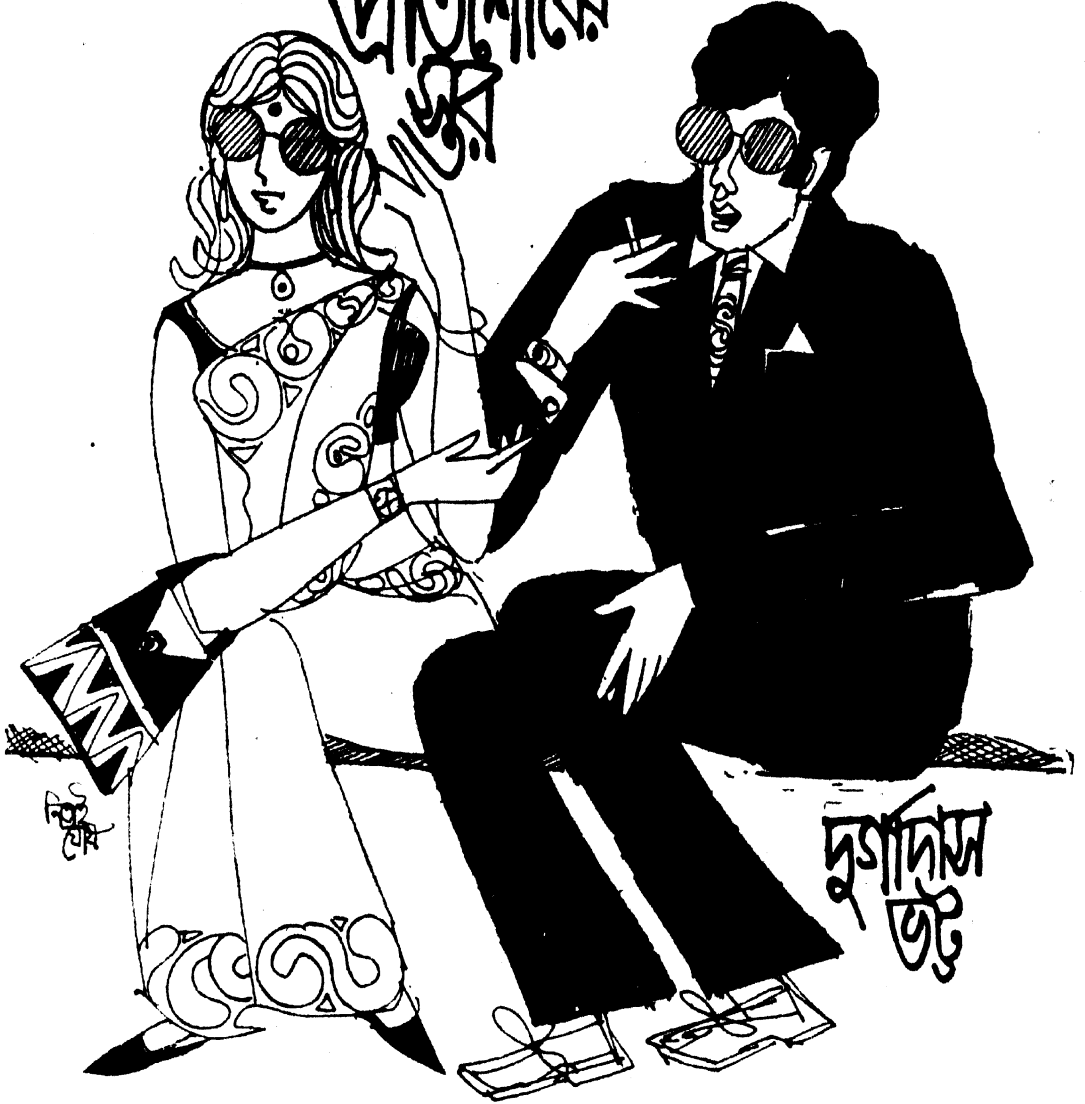
এখানে এসে যে সুজাতার দেখা পাবে বিভাস সেকথা জানত না। অথচ যখন বুঝল বোম্বে অফিস থেকে সুজাতা সরকার এই কলকাতার অফিসে চিফ রিসেপসনিস্ট কাম স্টেনোগ্রাফার হয়ে আসছে, মনে মনে চমকে উঠেছিল বিভাস। ও নামটা তার মনের একটা বিশেষ জায়গায় খোদাই করা ছিল। তার ওপর স্মৃতিবিস্মৃতির ধুলো জমেছিল কিন্তু সেই সঙ্গে সংশয়ও ছিল রীতিমতো। নাম মিলেছে বটে কিন্তু মানুষটাতো অন্য মানুষও হতে পারে।

তখন ছিল একটা যন্ত্রণার কাল। বিভাস প্রাণপণে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কেবলই স্লিপ করে নিচে পড়ে যাচ্ছিল। এমত অবস্থায় কোনো একদিন কিছুটা তাড়াতাড়িই সে যখন অফিসের দুয়োর ঠেলে ভিতরে ঢুকছে চোখধাঁধান বিদ্যুৎ চমকানোর মতোই রিসিভিং কাউন্টারে সুজাতা সরকারকে বসে থাকতে দেখতে পেল। পাশেই টেলিফোন বোর্ড। বাইরে থেকে একটা কল আসার ফলে সবুজ আলোটা জ্বলছিল। মাথার খোঁপা ঠিক করতে করতে সুজাতা হাত বাড়িয়ে টেলিফোন বোর্ডের একটা বিশেষ বোতাম টিপল এবং রিসিভারে মুখ দিয়ে কি একটা বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

ওকে একটু আড়াল করে একটা কাঠের পার্টিসানের পাশে দাঁড়িয়ে নিজের মনটাকে ঠিক করে নিতে চাইল বিভাস। বেশ কিছুদিন ধরেই কোম্পানীর নানা সূত্রে এই মহিলার নামটি তার কানে এসেছে। সে নাকি বোম্বে অফিস কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ওদিককার তিনজন ডিরেক্টরই তার হাতের মুঠোয়। শোনা যায় কলকাতা অফিসের চিফম্যানেজার সমাদ্দারের সঙ্গেও তার ঘোর যোগাযোগ। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই সুজাতাকে বোম্বে অফিস থেকে লোন করে আনা হয়েছে।

বিভাসের মনে হল এতদিনে বোধহয় একটা লাইন খুলে যাচ্ছে। যদিও কিছু অসুবিধা আছে। অতীতের কিছু ঘটনা পথরোধ করেও দাঁড়াতে পারে। কিন্তু জীবনের পথ যে সোজা নয় সেখানে গলি-ঘুঁচি আছে। আলো আছে, অন্ধকার আছে ছোটখাট গর্ত আছে আবার গভীর খাদও আছে এসব তার মতো সুজাতারও অজানা নয়। সে নিজেও যখন খেলায় নেমেছে বিভাসকেই বা খেলোয়াড় হিসাবে মেনে নিতে পারবে না কেন? বরং অতীতের ঘটনা-গুলিকে সমস্ত ব্যাপারটার একটা চ্যাপটার হিসাবেও তো সে গ্রহণ করতে পারে। ওটার ওপর বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে ওটাকেই আপাততঃ পরিচয়পত্র হিসেবে পেশ করলে এমনকি আসে যায়।

এখনো অফিস আওয়ার শুরু হতে বেশ কিছুটা দেরী। এক বন্ধুর গাড়িতে এসেছিল বলেই বিভাস কিছুটা আগে এসে পড়েছে। দু-একজন অফিসার আর দু-চারজন মিনিয়াল স্টাফ ছাড়া অফিসে তখনো বিশেষ কেউ আসেন নি। পাটের মেঝে মোছা দিয়ে অফিসের মেঝেগুলো পরিষ্কার করছিল সুইপার। বেয়ারাগুলি ফলঝাড়ু দিয়ে কেরানীদের চেয়ার টেবিল পরিষ্কার কর-ছিল। সুইংডোর ঠেলে ভিতর অফিসটা একবার দেখে নিয়ে রিসেপসান কাউন্টারের কাছে এসে বিভাস দাঁড়াল।

—আমাকে চিনতে পারো সুজাতা।

সুজাতা সরকার এবার ঘুরে তাকালো। ওপর থেকে তির্যকভাবে আলো এসে সুজাতার মুখমন্ডলের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। বিভাস দেখল সুজাতার চোখের কোলে রাত্রি জাগরণের চিহ্ন। সেই মুখ সেই ঠোঁট সেই চিবুক তবু ঠিক যেন তেমনটি নয়। অমন বঙ্কিম ভ্রূজোড়া উড়িয়ে দিয়ে তুলি দিয়ে নতুন করে আঁকা হয়েছে। যে আধখোলা খোঁপা কোনো একদিন অসংখ্য তরুণের মনে আগুন ধরিয়ে দিত, সেটি আর নেই। অদ্ভুত কায়দায় উর্ধ্বমুখী হয়েছে। দৃশ্যতঃ যা চোখে পড়েছে তাতে মাথার চাঁদিটা যে কোথায় বোঝা মুস্কিল। উঁচু করে বাঁধা খোঁপায় সুজাতাকে ভীষণ ধরনের অন্যরকম মনে হচ্ছে। মুখের রঙ প্রকৃত রঙকে আড়াল করে আছে। যাকে বলে এনামেল্‌ড ফেস। তবু ঠোঁটজোড়া এখনো চিরনতুন।

সুজাতাও হঠাৎ অতীতে চলে গিয়ে-ছিল। এইমাত্র যেন সাঁতার দিয়ে মস্তবড় একটা নদী পার হয়ে এসে ডাঙায় উঠল। মাথাটা অল্প একটু ডান দিকে কাত করে বলল—

—চিনতে পারছি বইকি, তুমি মানে আপনি বিভাস দত্ত না?

—হ্যাঁ ঠিকই চিনেছ।

—তা আপনি এখানে মিস্টার দত্ত।

চোখের নিমেষেই ওর মুখের রেখাগুলি কঠিন হয়ে যেতে দেখেছে বিভাস। এবং ভিতর ভিতরে কাঁপছে। আর ওকে সুজাতা নামে ডাকতে ভরসা পাচ্ছে না। তাই শুরুতেই নিজেকে ভাল মতো বিছিয়ে দেবার জন্যে সুজাতার পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ে বিভাস। টেবিলে দুই কনুই রেখে হাত দিয়ে নিজের মুখটা একবার চেপে ধরে বলে—

—হ্যাঁ অগত্যা এখানেই মিস সরকার।

—যতদূর শুনেছিলাম মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ আপনার রেজাল্ট ভাল হয়েছিল। আশা করি এখানে আপনি ভাল পজিসনেই আছেন।

—তা আর হল কই। আমার পিছনে তো কোন জোরালো রেকমেন্ডেসন ছিল না। তাছাড়া আরো অনেক ব্যাপার আছে। বলেই একটা নিঃশ্বাসকে ভিতরে চেপে ধরল বিভাস। প্রকাশ্যে আবার বলল—আমার অনেক কিছুই এঁদের কাছে হাসির ব্যাপার।

—অর্থাৎ।

সুজাতা তখন তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে বিভাসকে চিরে চিরে দেখছে।

—এই আমি সাহিত্য ভালবাসি। হাতে কাজ না থাকলে অকারণ ব্যস্ততা না দেখিয়ে আমার প্রিয় কোন লেখকের লেখা পড়ি। এটা এঁদের চোখে একটা গুরুতর অপরাধ।

—তাই নাকি? কিন্তু এটা কি ঠিক মিস্টার দত্ত। আফটারঅল অফিস ডিসিপ্লিন বলে একটা কথা আছে।

যদিও চিবিয়ে চিবিয়েই কথাগুলি উচ্চারণ করছিল সুজাতা। কিন্তু বিভাসের মনে হল ও যেন প্রচ্ছন্ন হাসছে। এ হাসির তাৎপর্য বিভাসের অজানা নয়। কিন্তু আপাতত কিল খেয়ে কিল চুরি করা ছাড়া উপায় কি। মুখ নামিয়ে এমন একটা ভঙ্গী করে বিভাস বসে আছে যেন মনে হচ্ছে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে বিভাস। মুখ চোখের ভাব রীতিমতো পাল্টে গেছে।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে সুজাতা আবার কথা পাড়ে।

—রীণার কি খবর?

বিভাস চমকে তাকায়। আবার নতুন করে সুজাতার চোখের হাসিকে ঠিক-মত বুঝবার চেষ্টা করে। মনে হয় সেখানে বোধ হয় বেশ কিছুটা অতীত নেমে এসেছে।

ফেড আপ মিস সরকার ফেড আপ। তখন থেকেই আমি ওকে বুঝতে ভুল করে-ছিলাম। বড় লোকের মেয়ে ওরা উচ্চাশা বলতে একটা জিনিসই বোঝে। ওর কাকা-জেঠারা তো মস্ত মস্ত এক-একটি মানুষ। যারে বলে বিগ সট। তার পাশে আমি নিতান্তই টিম টিম করছি। আমাকে বিয়ে না করলে তার কত কি হতে পারত একথাটা প্রায়ই সে আমাকে মনে করিয়ে দেয়।

—তাহলে আপনিও একজন কেউকেটো হন।

সুজাতার ঠোঁটে আবার সেই চাপা হাসি। বিভাস রেগে উঠতে গিয়েও চুপ করে যায়। কেমন একটা উদাস গলায় বলে—ঠিক আছে মিস সরকার। আমি আর কিছু বলতে চাই না। আপনি আমাকে চেনেন তাই আশা করেছিলাম আপনি আমার কথা বুঝবেন। একথাটা বুঝবেন যে আমার কাছে জ্ঞান শুধুমাত্র ব্যবহারিক প্রয়োজনেরই চাবিকাঠি নয়। তার চাইতে অনেক বড় অনেক বেশী...।

নিজের সিটে চলে আসে বিভাস। তার সিটের পাশের জানলাটি খুলে দেয়। দিনটা আজ মেঘে ঢাকা। মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ছে। থিয়েটার রোডের এই অংশটা এতক্ষণে রীতিমত জেগে উঠেছে। চারতলার ওপর থেকে পথচলতি গাড়ী-গুলোর দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইল বিভাস। তার অফিসের খুব নিকটেই একটা হাউসিং এ্যাপার্টমেন্ট। সুন্দর লন। রঙ্গন জারুল। কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুল। ভিতরে বাগানে পাইপে করে জল ছড়াচ্ছে মালী। বেশ কিছুটা দূরে নতুন তৈরী টাটা বিল্ডিং-এর একটা পাশ যেন ধূসর পাহাড় বলে মনে হয়। সবে মিলে কেমন একটা উদাস সুর ধ্বনিত হচ্ছে চারিদিকে। এমন সময় তার অপর সহকর্মী ভৌমিক বলে ওঠে—ব্যাপার কি হে দত্ত। তুমি কাজে বসবে না।

বিভাস তাড়াতাড়ি তার টেবিলে ফিরে আসে। ভৌমিকের দিকে তাকিয়ে কিছুটা লজ্জিত স্বরে বলে—

—আরে ভৌমিক। তুমি কখন এসে গেলে।

গায়ের কোটটা হ্যাঙ্গারে টাঙাতে টাঙাতে ভৌমিক বলে—এই কিছুক্ষণ। তখন থেকেই তোমাকে লক্ষ্য করছিলাম। জানলায় দাঁড়িয়ে আছ, টাই-এর নকটাও ঠিক মতো বাঁধ নি। ব্যাপার কি হে গিন্নীর সঙ্গে ঝগড়া করেছ নাকি?

—আরে না না। ভাবনাহীন মানুষ তো আর হয় না, একটা কিছু ভাবছিলাম ঠিকই, তবে সেটা আমার গিন্নীকে নিয়ে নয়...

কথা বলতে বলতে নিজের চেয়ারে ফিরে এল বিভাস। তার টেবিলের ওপর কয়েকটি ড্রইং-এর ব্লুপ্রিন্ট জড়ো করা আছে। এক পাশে কিছু বিদেশী জার্নাল এবং ইঞ্জি-নীয়ারিং-এর ইনডেক্স বই। মেঝেতে অল্প দূরেই একখানা হেপারসনিক ট্রান্সমিটার যন্ত্র খোলা অবস্থায় আছে। যা দিয়ে ট্রেনের গমনাগমনের নিরাপত্তা বিধান করা যায়।

যতদূর মনে পড়ছে তিন-চারদিন আগেই ওই যন্ত্রটা মেশিন সপ ফোরম্যানের কাছে ফেরৎ পাঠিয়েছিল বিভাস এবং প্রোডাকসান ম্যানেজার মিস্টার মুখার্জির সঙ্গে নিজে দেখা করে বলে এসেছিল যে ওই যন্ত্রের টারমিন্যাল পোস্ট এবং বোল্ট এই দুটি পার্টসের মধ্যে গোলমাল আছে। ও দুটি কেটে-ছেঁটেও কিছু করা যাবে না। ঢালাই-এর মধ্যেই গোলমাল আছে। বিভাসের কথাটা শেষ হতে পায় নি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন প্রোডাকসান ম্যানেজার। একটা বিশেষ ধরনের উত্তেজনায় তাঁর চোখ মুখ কুঁচকে গেছে। ঠোঁট উল্টে বিশ্রী একটা ভঙ্গী করলেন মিস্টার মুখার্জি।

—ওসব আজে-বাজে কথা রাখুন। নিজের অকর্মণ্যতার দায় অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছেন কেমন। আমি যদি বলি মূল লে-আউটেই ভুল আছে।

—তাহলে সেটা প্রমাণ হয়ে যাক। আমি ধামা-চাল দিয়ে লেখাপড়া শিখি নি বুঝলেন।

বিভাস নিজেকে সামলাতে পারে নি। এবং সেই থেকেই মনে মনে কাঁপছে। একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। বাড়ীতে ফিরেও মনে শান্তি ছিল না গত দু দিন। রীণার একটা বান্ধবীর বাড়ীতে পার্টি ছিল। নিতান্ত ভদ্রতা বজায় রাখার জন্যেই সেখানে যেতে হয়েছিল। কিন্তু হাল্কা মনে আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারে নি। ভোঁতা রসিকতায় অংশ গ্রহণ করতে পারে নি বিভাস। ফলে রীণা গত পরশু থেকে তার সঙ্গে ভাল করে কথাও বলে নি। কথা বলতে গেলে পাছে সংঘর্ষ হয়, আগুন জ্বলে, সেই জন্যে ইচ্ছে করেই বিভাস দূরত্ব বজায় রেখেছে।

কিন্তু এইভাবে কি চলবে? সত্যিই তো কোম্পানীর এমন কতকগুলো জিনিস বড় কর্তাদের পেয়ারের পার্টিদের কাছ থেকে চালাই হয়ে আসছে যে, তাতে কোম্পানীর গুড উইলের ক্ষতি হবেই এবং নিন্দের ভাগী হচ্ছে বিভাসের মতো কিছু হতভাগ্য ইঞ্জিনীয়ার। যাদের খুঁটির জোর নেই। জ্ঞানবুদ্ধি এবং আত্মপ্রত্যয়কেই যারা পথ-চলার অন্যতম সঙ্গী বলে মনে করে।

কিন্তু প্রথম থেকেই তো এরকম ছিল না। টেবিলে বসে কলিং বেল টিপল বিভাস। বেয়ারা রঘু এসে দাঁড়াল। তাকে এক গ্লাস জল আনতে বলল বিভাস। জল খেয়ে রুমালে মুখ মুছে সামনে পড়ে-থাকা একটা ড্রইং-এর ব্লুপ্রিন্ট মেলে ধরল চোখের সামনে। রাইটিং প্যাডটা ড্রয়ার খুলে বার করল। ড্রইং এর বিশেষ কয়েকটি অপারেশনকে খুঁটিয়ে দেখে মনে মনে একটা ক্যালকুলেশনের কথা ভাবল। যদি চার নম্বর অপারেশনটাকে পুরোপুরি বাদ দেয় তাহলে যন্ত্রটির কার্য-কারিতা পুরোপুরি বজায় থাকবে কি। তাতে লেবার কস্টও কিছুটা কমবে। কথাটা ভাবতে ভাবতেই তার কর্মজীবনের প্রথম বছরটা চট করে জেগে উঠল সামনে।

সত্যি সেটা কি অদ্ভুত একখানা বছর। বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার সোমেন সান্যাল তখন জেনারেল ম্যানেজার হয়ে এসেছেন। প্রথম দিনেই সাক্ষাৎ হয়েছিল বিভাসের সঙ্গে। বিভাসের তন্ময় চোখের ওপর দৃষ্টি স্থাপন করে কেমন যেন মুচকি হেসেছিলেন মিস্টার সান্যাল। মনে মনে খানিকটা নড়ে উঠেছিল বিভাস। তার ভাব-ভঙ্গী কথাবার্তা জীবন-দর্শন সবই এই সব কাঁচা কেরিয়ারিস্টদের তুলনায় ঘোর অভিনব। সে ইঞ্জিনীয়ার হয়েও সাহিত্য-দর্শন ইত্যাদি ভালবাসে। তার ড্রয়ারে টি এস ইলিয়টের কবিতার বই পাওয়া যায়। যা এতদিন তার আর পাঁচটা সহকর্মীদের কাছে হাসির ব্যাপার বলে মনে হত। কিন্তু সহসা মিস্টার সান্যাল মৌলিক চিন্তাশক্তির ওপরেই জোর দিলেন। বিভাসকে ডেকে বললেন—আচ্ছা মিস্টার দত্ত আমাদের কোম্পানী যে অটোমেটিক সিগন্যালিং-এর ব্যবস্থা করতে চলেছে এ বিষয়ে আপনার কি মত?

—ভালই তো। এতো খুব আনন্দের খবর। এ বিষয়ে আমরা নিশ্চয়ই কাজে লাগব।

—কি করে?

—প্রথমত বিবরণটি আমাদের দেশের পক্ষে নতুন। আর এই সিগন্যালিং মেশিনের যে পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই পেশ করা হয়েছে সেটা আমি দেখেছি। শুধু কতকগুলো অপারেশনের কিছু কিছু হেরফের করে দিলেই ওটা আমাদের কোম্পানীর পক্ষে লাভজনক হবে। কোম্পানীর প্রেস্টিজের দিক থেকেও এটা হবে একটা দৃঢ় পদক্ষেপ।

—রিয়েলি?

উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন মিস্টার সান্যাল। এতক্ষণে তিনি যেন খনির গভীর অন্ধকারে একটি উজ্জ্বল মণির সন্ধান পেয়েছেন। তারপর কয়েকটি মাস শুধু কাজ আর কাজ। বিভাসকে ঘিরেই যেন কোম্পানীর সব চিন্তা ভাবনা পাক খাচ্ছিল। সহকর্মী মহলেও চাপা উত্তেজনা। সকলেই প্রায় খাতির করতে শুরু করেছে বিভাসকে। কিন্তু সে খাতির যে নিতান্তই পোশাকী বিভাস সেটা জানে। এমন কি খোদ প্রোডাকশান ম্যানেজারও একদিন সাহিত্যরসিক হয়ে উঠলেন। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে কনটিনেন্টাল লিটারেচারের প্রভাব কতটা এ প্রসঙ্গ উঠতেই একটা কাজের অছিলায় উঠে দাঁড়িয়েছিল বিভাস।

কিন্তু সে মোটে কয়েকটি মাস। মিস্টার সান্যাল ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের একটা বৃত্তি নিয়ে বিদেশে চলে গেলেন আর দারুণ দিন এসে গেল বিভাসের। তার সব কাজের মধ্যেই ত্রুটি ধরা পড়তে লাগল। তার আশ-পাশের সহযোগীরা বিভাসকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে অথচ শুধু তাকিয়ে দেখা আর হাত কামড়ানো ছাড়া বিভাসের কিছু করার ছিল না তখন। যা সে এখনো করছে। তার দাম্পত্য জীবনেও যার চাপ গিয়ে পড়েছে। এক কথায় তার চৈতন্যের চারিধারে আগুন। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ পুড়ে কয়লা হয়ে গেল। শুধু আজ এইমাত্র সে দেখতে পাচ্ছে নতুন ডিরেক্টর মিস্টার সমাদ্দারের খাস বেয়ারা ভক্ত-গোবিন্দ অনেক দিন পরে তার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, কি যেন বলছে।

—কি?

চোখ তুলে বিভাস তাকাল।

—বড়সাহেব আপনাকে ডাকছেন।

—তুমি ভুল করেছ, উনি বোধ হয় ভৌমিককেই ডাকছেন।

—না, উনি মিস্টার দত্তের নামই বলেছেন। আমার শুনতে ভুল হয় নি।

উঠে দাঁড়াল বিভাস। টাই-এর নটটা আবার ঠিক করে নিল। ইচ্ছে করল এই মুহূর্তে একবার বাথরুমে গিয়ে মুখে চোখে একবার জল দিয়ে আসে। মন তো তার সর্বদাই জ্বলছে। চোখে মুখে তার ছায়া পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু তার সময় নেই। তাছাড়া সহকর্মীরা দেখতে পেলে হাসবে। বিভাস তাই নিজেই নিজেকে সামলে নিল। টাই-এর নটটা দেখে নিল। দু হাত দিয়ে মাথার চুল অল্প চেপে ধরে অবিন্যস্ত ভাব যদি থেকে থাকে সেটাকে ঠিক করে নিল। এবং চেম্বার থেকে বেরিয়ে সেল্‌স ডিপার্ট-মেন্ট ঘুরে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার সমাদ্দারের চেম্বারের সামনে এসে পিপিং হোল দিয়ে ভিতরে তাকাল।

ঘরের ভিতরের আলো তত উজ্জ্বল নয়। কেমন একটা ঘুমন্ত ঘুমন্ত ভাব। এয়ার কনডিসনড চেম্বার। উত্তাপ মনোরম। মিস্টার সমাদ্দার অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটা চকচকে টেবিলের ওধারে বসে আছেন। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। সারাটা মুখ গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। সুজাতা তাঁর সামনের চেয়ারে বসা। কিন্তু বিভাস লক্ষ্য করল ইতিমধ্যেই বেশবাস পাল্টে এসেছে সুজাতা। একটা হাল্কা গোলাপী রংয়ের শাড়ী তার পরণে। মাথার চুল অন্যভাবে বেঁধেছে। খোঁপাটা আর ঊর্ধ্বমুখী নয়। কেমন একটা এলানো অবস্থায় ঘাড়ের ওপর থেমে আছে।

বিভাস গিয়ে দরজা ফাঁক করতেই, মিস্টার সমাদ্দার তাকে ভিতরে আসতে বললেন। কাছে এলে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন, এবার খানিকটা কঠিন নীরবতা। ঘরের সব দিক দেখে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল বিভাস। সেখানে উজ্জ্বল দুপুর। কোথাও বাধ বন্ধ মেঘ নেই। এদিকে মিস্টার সমাদ্দার তাঁর অ্যাটাচি খুলে কিছু টাইপ করা কাগজ সামনে রেখেছেন এবং মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন। গোটা তিনেক টেলিফোনও এল। সেগুলিকে জেনারেল ম্যানেজারের ঘরে চালান করে দিলেন অপারেটর মারফৎ।

কিন্তু বিভাস তখনো বুঝতে পারছে না এই মুহূর্তে ঠিক কি ঘটনা ঘটতে চলেছে। শুধু বুঝেছে মিস্টার সমাদ্দার মাঝে মাঝে চশমার ভিতর দিয়ে বিভাসকে লক্ষ্য করছেন বিভাসের চাঞ্চল্যকে মনে মনে বুঝে বললেন—

শুনুন মিস্টার দত্ত, একটা জরুরী এবং অদ্ভুত ধরনের একটা কাজের জন্যে আপনাকে ডেকেছি। মিস সরকারের মুখ থেকে আপনার সম্পর্কে যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে একাজটা আপনি পারবেন।"

—কাজটা।

—হ্যাঁ এবার কাজের কথা শুনুন। আমাদের কোম্পানী একটা নতুন প্রোজেক্ট হাতে নিতে যাচ্ছে, আশা করি আপনি সেটা জানেন।

প্রকৃতপক্ষে তেমন কিছুই জানত না বিভাস। কিছুটা ভাসা ভাসা শুনেছিল। কিন্তু জানি না বলাটা অবস্থা অচেতন বলে মনে হবে তাই ঘাড় হেঁট করল বিভাস। মিস্টার মজুমদার বললেন—অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে ব্যাঙ্কের ওভার-ড্রাফটে আর কুলোচ্ছে না ওখানেও তো একটা লিমিট আছে। তাই বাইরের ফাইনান্সার দরকার হয়ে পড়েছে আমাদের। সেই রকম একটা পার্টির কাছেই আপনাকে পাঠান হবে। অবশ্য মিস সরকার আপনার সঙ্গে থাকবেন। সব দিক দিয়ে তাঁকে ইমপ্রেস করার দায়িত্ব কিন্তু আপনার। আপনি তো এ কোম্পানীর সব কিছুই জানেন, তাছাড়া আপনার অন্য একটা দিকও আছে যেটা এক্ষেত্রে কাজে আসবে।

সব ব্যাপারটাই ভীষণ ধোঁয়াটে মনে হচ্ছিল। ঠিক এ ধরনের কাজের সে আদৌ উপযুক্ত কিনা সেটাই এখন পর্যন্ত নিজের কাছে পরিষ্কার নয়। আড় চোখে সুজাতার দিকে তাকাতেই ঠোঁট চেপে একটা চোখ অল্প কুঁচকে একটা বিচিত্র ভঙ্গী প্রকাশ করল সুজাতা। এর দ্বারা যা বোঝানোর সে বোঝাতে চাইছে। কিছুটা ভরসা পাচ্ছে বিভাস। একটা কিছু বলা দরকার এক্ষুনি। সে বলে ফেলল—

—স্যার আমাকে যখন দায়িত্ব দিচ্ছেন, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

—দ্যাটস অল রাইট, আপনি তৈরী হয়ে নিন। ট্রান্সপোর্টে ইতিমধ্যেই আমি গাড়ীর কথা বলে রেখেছি।

কতটুকুই বা সময় তারপর। বোধ হয় মিনিট দশেক। গাড়ীটা থিয়েটার রোড থেকে ক্যামাক স্ট্রীটে এসে পড়ল। দু পাশের বাড়ী, গাছ এবং শো-কেসের চমকপ্রদ বাহার মুহূর্তেই সচেতন করে তুলছে বিভাসকে। গাড়ীটা সর্ট স্ট্রীট দিয়ে রডন স্ট্রীট দিয়ে কিছুটা যাওয়ার পর বড় গেটওয়ালা একটা বাড়ীর মধ্যে এসে থামল। এতক্ষণ সুজাতার সঙ্গে একটাও কথা বলে নি বিভাস। আসার সময় ওয়াটার বটল আর কোটটা নিয়ে এসেছিল। গাড়ী থামলে ইউনিফর্ম-পরা একজন দারোয়ান এসে গাড়ীর দরজা খুলে দিয়ে স্যালুট করে দাঁড়াল। প্রথমে বিভাস নামল এবং তারপর নামল সুজাতা। সুজাতাকে আজ অনেক আগের সুজাতা বলেই মনে হচ্ছিল। ওর সেই নরম চিবুক মিশুক ঠোঁট গালে কপালে আলগা লালিত্য এই শীতের বিকেলে যেন চিরস্থায়ী বলে মনে হয়। এখানে বয়স আসে না। অভিজ্ঞতার নির্মম হাত রূপের প্রতিমাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে টুকরো টুকরো করে না। বিভাস তাই তাকিয়ে দেখে। সুজাতা শুধু বিভাসের মুখের দিকে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। তাকে যে আজ কেমন দেখাচ্ছে সেটা সে ভাল মতই জানে। শুধু চাপা স্বরে বলে—

—দেরী হয়ে যাচ্ছে মিস্টার দত্ত। ভিতরে চলুন।

ভিতর থেকে আরো ভিতরে। দু ধারে সার সার ঘর। মাঝের প্যাসেজটা চকচকে মার্বেলে মোড়া। ওরা এগিয়ে চলেছে। বিভাস কিছুতেই তার মনের জ্বলন্ত প্রশ্নটাকে তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছে না। বার বারই ভাবছে সুজাতাকে প্রশ্ন করে কে সেই ভদ্রলোক। তাঁকে ইমপ্রেস করার দায়িত্ব বিভাসের ওপরেই বা ন্যস্ত করা হল কেন?

এতক্ষণে থমকে থেমে বলে—মিস সরকার আমার কিন্তু সবটাই গোলমেলে ঠেকছে। আপনি একটা কিছু বলুন।

—বলব, বলব আগে চলুন কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। আসল লোকের আসতে এখনো দেরী আছে। তার আগেই আপনাকে যা বলার আমি বলে দেব।

ওরা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসে। সামনে বারান্দা। সিঁড়ি থেকে এধারের সবটাই কার্পেটে মোড়া। মাঝে মাঝে পেতলের টবে ক্যাকটাস। দেওয়ালে বেশ কিছু ন্যুড ছবি। কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর বাঁদিকের একটা ঘরের দরজা খুলে ভিতরে এল সুজাতা। বিভাসকে আসতে বলল।

ঘরের ভিতরে চার দিকেই সোফা এবং ডিভান। মাঝখানে লাল রংয়ের পুরু কার্পেট। ঠিক কেন্দ্রে একটি মনোরম ধূপাধার থেকে পাক নিয়ে দিয়ে পীতাভ ধোঁয়া উঠছে। ফলে ঘরের সবকিছুই বিস্ময়কর ধরনের অপার্থিব মনে হল বিভাসের। যেন হাত দিয়ে স্পর্শ করা যাবে না। এ যেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে একটা অলীক জগৎ। সুজাতা একটি ডিভানের ওপর এলেয়ে পড়ে একটি বালিস আঁকড়ে ধরল। কিছুক্ষণ লীলায়িত ভঙ্গীতে শুয়ে থাকে। বিভাস ক্রমশই জগৎ এবং জীবনের বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। সুজাতার কাছাকাছি বসেছে। সবটাই একটা বিলম্বিত লয়ে সুর হয়ে বাজছে এখন। কি হবে জানি না। কি পাব জানি না। অনন্ত মুহূর্ত আজ ক্ষণ মুহূর্তে ধরা দিয়ে সুজাতার চোখে মুখে দেহে রংয়ে এক গভীর গোপনতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

তারপর এক সময় উঠে বসল সুজাতা। ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে দু বোতল লিমন-স্কোয়াস আর চিকেন রোস্ট রেখে গিয়েছিল। বিভাস যখন একান্ত মনোযোগে মুর্গীর ঠ্যাং চিবোচ্ছে সুজাতা বলল—

—এবার কাজের কথায় আসা যাক।

বিভাস চোখ তুলে তাকাল। সুজাতার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এখন। কোথায় এতটুকু গোপনীয়তা নেই। প্রচণ্ড বাস্তব তাকে আগুনের মতো লোলিহান করে তুলেছে।

—মিস্টার সমাদ্দারের কথা থেকে আপনি কি কিছু বুঝতে পেরেছেন।

—খুবই সামান্য বুঝেছি, কাকে আমাকে ইম্প্রেস করতে হবে তিনি কি ধরনের লোক তার আমি কিছুই জানি না।

—শুনুন ঘণ্টাখানেক পরে... মধ্য ভারতের এক নেটিভ স্টেটের প্রিন্স আলি খাঁ আসবেন। ভদ্রলোক অত্যন্ত কাব্যরসিক সাহিত্যপ্রীতি তাঁর জন্মগত। তাঁর ধারণা হয়েছে রাজাগজাদের কাল আর নেই। আজকের যুগের চাবিকাঠি ব্যবসায়ীদের হাতে তাই তিনি ব্যবসায়ী হতে চাইছেন। তিনি বেশ কিছু টাকা ইনভেস্ট করার কথাও ভাবছেন।

—এক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি?

—আপনি অনেক কিছুই করতে পারেন মিস্টার দত্ত। আপনার মনে নেই কিভাবে আপনি কলেজে মেয়েদের মধ্যে অদ্ভুত একটা ইমেজের সৃষ্টি করেছিলেন। ছেলেরাও বিভাসদা বলতে অজ্ঞান হয়ে যেত। আপনার মনে নেই রবার্ট ব্রাউনিং-এ যেখানে "ইফ দি ওয়ার্লড এন্ডস্ টু নাইট" আপনি উচ্চারণ করতেন, আমরা থর-থর করে কাঁপতাম। সেকসপিয়ারের নতুন ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে কোথায় আমি ভেসে গিয়েছিলাম, আপনার মনে নেই...

মাথা নীচু করে বসে রইল বিভাস। সত্যিই ইতিহাস বোধ হয় এইভাবেই ফিরে আসে। কি চেয়েছিলাম কি চাই নি এ কথাটা ঠিক তেমন করে বুঝতে পারে নি বিভাস। বরং না চাইতে যারা কাছে এসেছিল, বড়ই তুচ্ছ বড়ই অকিঞ্চিৎকর মনে হয়েছিল বিভাসের। রীণাই তখন তার কাছে জগতের রাণী। তার খোলসটাকেই সাচ্চা বলে মনে হয়েছিল। তার ট্রাডিসনকেই চমকপ্রদ এবং কাম্য বলে মনে হয়েছিল কিন্তু এখন সে কি বলে জবাব দেবে ভাবতে হল বিভাসকে।

সে মুখ নীচু করেই বলল—আমি যথার্থই চেষ্টা করব মিস সরকার। আপনাকে আর সুজাতা নামে ডাকার কোনো অধিকার নেই। কিন্তু আমার রক্তের মধ্যে যা দুলছে নিঃশ্বাসের মধ্যে দিয়ে যাদের যাতায়াত, যে সুর আমার পথ ভোলায় সবই আমি প্রিন্স আলি খাঁর পায়ে ঢেলে দেব। যদি তাতে কোম্পানীর কিছু সুবিধা হয়। যদি আমার ভবিষ্যৎ বলে কিছু গড়ে ওঠে। সত্যি এই আগুনের মধ্যে বেঁচে থাকার চাইতে পুরোপুরি মরে যাওয়া বোধ হয় ভাল।

এবার চোখ তুলে তাকাল বিভাস। দেখল সুজাতার মুখের ভাব আমূল পাল্টে গেছে। আবার তাকে নরম মনে হচ্ছে। সবই তার নির্জন এখন। পাছে বিভাসের সঙ্গে চোখাচোখি হয় সেই ভয়ে সে চোখ নামিয়ে বসে [illegible]

সরলা দেবী

মঞ্জু ঘোষ

নবা বাংলার জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে সরলাদেবীর নাম অন্তরঙ্গভাবে জড়িত। ব্যক্তিজীবনে তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী; কিন্তু তাঁর পরিচয় এখানেই শেষ নয়। তাঁর আপন কর্মপ্রচেষ্টা ও সাধনা তাঁকে স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়েছে।

সরলাদেবী তাঁর জীবনে বহুবিধের সাধনা করেছেন। সাহিত্য, সংগীত, স্বাদেশিকতা, সমাজসেবা সব কিছুকেই তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এর কোন একটির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়লেও তাঁর পরিচয় এককভাবে সংগীত শিল্পী বা সাহিত্যিক বা স্বদেশী নয়, সব মিলিয়েই তিনি সম্পূর্ণ। তাঁর জন্মের শতবর্ষপূর্তির লগ্নে সেই নানারূপে বিমিশ্র ব্যক্তিত্বের পরিচয়টিই অনুসন্ধান করব আজ।

কলকাতার জোড়াসাঁকোয় মাতামহ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের বাড়ীতে সরলাদেবীর জন্ম হয় ১৮৭২ খৃঃ ৯ সেপ্টেম্বর। পিতা জানকীনাথ ঘোষাল ও মাতা স্বর্ণকুমারী দেবীর কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন যথাক্রমে সাহসিকতা ও স্বদেশপ্রেম। সেকালে দেবেন্দ্রনাথের বাড়ির নিয়ম ছিল বিবাহের পর মেয়েরা জামাইসহ পিতৃগৃহে বসবাস করবে এবং বিবাহের সময় জামাইদের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিতে হবে। জানকীনাথ ঘোষালের প্রথমা কন্যা হিরন্ময়ী দেবীর রচনায় জানা যায়—"বিবাহকালে পিতৃদেব মাতামহ পরিবারের দুটি রীতি গ্রহণ করেন নাইঃ—(১) ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ (২) ঘরজামাই থাকা।"[১]

সেকালে দেবেন্দ্রনাথের এরূপ বিরোধিতা করা কম সাহসের ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ জামাইএর মতকে মেনে নিয়ে হিন্দুধর্মের নিয়ম অনুযায়ীই তাঁদের বিবাহে সম্মতি দেন। বিবাহের পর স্বর্ণকুমারী দেবীকে জানকীনাথ ঠাকুরবাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে সংসারী পেতেছিলেন। সরলাদেবী তাঁদের সংসারে তৃতীয় সন্তান।

সরলাদেবীর বয়স যখন পাঁচ, তখন তাঁর পিতা জানকীনাথ ঘোষাল উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যান। এ জন্য-ই মায়ের সঙ্গে তাঁরা তিন ভাই বোন এলেন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এসে সরলাদেবী ঠাকুর বাড়ির ঐতিহ্যে মানুষ হতে লাগলেন। এই ঐতিহ্যে মাতৃআশ্রয় বিচ্ছিন্ন দাসীর দাপটে ও স্নেহবর্জিত মাষ্টার মশায়ের সন্ত্রাস ছিল পুরোপুরি। মায়ের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন,—"ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই মায়ের সঙ্গে আমাদের আর সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকত না। তিনি আমাদের অগম্য রাণীর মতো দূরে দূরে থাকতেন। দাসীর কোল-ই আমাদের মায়ের কোল হত। মায়ের আদর কি তা জানিনে। মা কখনো চুমু খাননি, গায়ে হাত বোলান নি, শুনেছি কর্তা-দিদিমার কাছ থেকেই তাঁরা এই ঔদাসীন্য উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন।[২]"

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে মায়ের ঔদাসীন্য যতই থাকুক না কেন, এখানে এসে সরলাদেবীর জীবনের পরিধি বেড়ে গেল। ঠাকুর বাড়ির নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিবেশ, যা অন্য থেকে স্বতন্ত্র, পুরোপুরি তাকে তিনি আপন করে পেলেন।

জোড়াসাঁকোয় থাকাকালীনই তিনি বেথুন স্কুলে ভর্তি হলেন। এই স্কুলে এসেই তাঁর নানামুখী ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটলো। সমাজসেবা, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, স্বজাতির প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা তাঁর অন্তরে জাগরিত হলো। তিনি বলেছেন—"বেথুন স্কুলের আবহাওয়ায় আমি ছিলুম ভারি স্বদেশপ্রেমিক। নতুনমামা একদিন আমাদের কোন একটা সার্কাসে নিয়ে যেতে চাইলেন—একটা বাঙালী ও একটা উইলসন সাহেবের—যেটায় আমাদের অভিরুচি। আমি বললুম—'বাঙালীর সার্কাসে যাব।' টাটকা বিলেত প্রত্যাগত মেজমামীরও ছেলেমেয়েরা বললেন,—সাহেবের সার্কাসে যাবেন, কেন না বাঙালীর সার্কাস নোংরা। আমি বললুম 'হলই বা একটু নোংরা, কত কষ্ট করে বাঙালীরা নিজেদের একটা কিছু গড়ে তুলেছে—তাদের দেখব না ৫।" পরে অবশ্য তাঁর কথামত বাঙালীর সার্কাসটিই দেখান হয়। কারণ দেখাবার যিনি মালিক সেই নতুনমামাও ছিলেন স্বদেশী। বেথুন স্কুলের ছাত্রী তখন অবলা বসু, কামিনী রায় প্রভৃতি। তাঁদের আদর্শ-ই তখন ছিল সরলাদেবীর আদর্শ। এই আদর্শকে গ্রহণ করেই তিনি আপন জাতি এবং আপন দেশকে ভালবাসতে পেরেছিলেন। এই আদর্শ যে তাঁর জীবনে কত বড় ছিল, তা একটি ঘটনার উল্লেখে স্পষ্ট হবে। সরলাদেবী এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিচ্ছেন। ইতিহাস পরীক্ষার দিন তিনি দেখেন মেকলের "লর্ড ক্লাইভ" নামক পাঠ্য পুস্তকের উপর ভিত্তি করে ক্লাইভের বঙ্গবিজয় সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন রয়েছে। তাতে খুব বেশী নম্বর ছিল। তিনি সেই প্রশ্নের উত্তরে মেকলের প্রতিপাদ্য বাঙালী চরিত্রের হেয়তার প্রতিবাদ করেছিলেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ইতিহাসের পরীক্ষক ছিলেন এন ঘোষ। তিনি এই প্রশ্নের উত্তরে খুব খুশী হন এবং সরলাদেবীকে সর্বাধিক নম্বর দেন 'বাঙালী জাতি সম্পর্কে তাঁর এই আত্মাভিমান চিরকাল ছিল। বাঙালীর লাঞ্ছনা বা কাপুরুষতা কোনটাই তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

১৮৮৬ সনে, তের বছর বয়সে বেথুন স্কুল থেকে তিনি এণ্ট্রান্স পাশ করেন দ্বিতীয় বিভাগে। এণ্ট্রান্স পাশের পর তিনি ভর্তি হলেন এফ-এ ক্লাসে, বেথুন কলেজে। বেথুন কলেজে তখন মেয়েদের বিজ্ঞান পড়ার সুযোগ ছিল না। অথচ ঠাকুর বাড়ির ছেলে সুধীন্দ্রনাথ, দাদা জ্যোৎস্নানাথ প্রভৃতিদের মতো তাঁরও বিজ্ঞান পড়ার প্রচণ্ড ইচ্ছা। 'অবশেষে বাবা মহাশয়ের বন্ধু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের "Science Association' এ সান্ধ্য লেকচারে যোগদানের আয়োজন হল আমার জন্যে।

আমি একমাত্র ছাত্রী হলুম। এই রকম করে Physics শিক্ষা হল আমার। আমার দূঢ় পণ ছিল বাড়ির ছেলেদের মধ্যে সবাই Physics -ই নেব। আমার জেদ বজায় রইল। পদার্থবিজ্ঞানে আমার [illegible] প্রবেশ লাভ হল। পাসও হলুম এবং [illegible] এসোসিয়েশন থেকে একটি [illegible] পেলুম। ৬"

তিনি এফ এ পাস করার [illegible] পরে, ১৮৯০ খৃঃ ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করেন। এই পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম হন এবং পদ্মাবতী সুবর্ণ পদক লাভ৭ করেন।

স্কুলের লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্য রচনায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ছোটবেলায় একবার মায়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে যান। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন রবিমামার মতো সাহিত্য রচনার প্রয়াসী হন। একদিন নিস্তব্ধ দুপুরে তিনি একটি গল্প রচনায় উৎসাহী হলে সরোজাদিদির ৮ কাছে ধরা পড়েন এবং তখনকার মতো সে আশা জলাঞ্জলি দেন।

এরপর তাঁর সাহিত্য প্রচেষ্টা আবার শুরু হয় বালক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। ঠাকুর পরিবারের বালক-বালিকাদের সাহিত্যানুশীলনের জন্য জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে বালক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সরলাদেবী এই পত্রিকায় তাঁর প্রথম রচনা দিলেন। রচনাটি হলো একটি প্রবন্ধ, নাম 'দুর্ভিক্ষ ৯'। এই রচনাটিতে লেখিকার নাম ছিল না—'বালিকার রচনা' এই নামে প্রকাশিত হয়।

ওই পত্রিকায় তাঁর আর একটি ১০ রচনা প্রকাশিত হয়। এই দুটি রচনা প্রকাশলাভের পর মা স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁকে এ বিষয়ে উৎসাহদান দেন। ওই বৎসর 'সখা' পত্রিকায় এক প্রতিযোগিতায় তিনি 'পিতামাতার প্রতি কর্তব্য' এই রচনা লিখে পুরস্কার পান। সরলাদেবী এ প্রসঙ্গে বলেছেন—'ফার্স্ট' আমিই হলুম, প্রাইজ পেলুম একখানা ইংরেজী ক্লাসিকাল ডিকসনারী যত প্রাচীন ও রোমান মাইথলজীর গল্প। প্রকাশ্যে রচনায় এই আমার হাতে খড়ি।' ১১

১২৯৩-এ ভারতী ও বালক এক হলে এতেই সরলাদেবীর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। ১২৯৪-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় এবং ১২৯৬-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'ভারতী ও বালকে' সরলাদেবীর 'বকুলের গল্প' ও 'কুহুজন'—এই দুটি রচনা প্রকাশিত হয়। ১২৯৮-এর আষাঢ় সংখ্যায় তাঁর রচনা 'প্রেমিক সভা' সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই রচনা বের হবার পর রবীন্দ্রনাথ সরলাদেবীকে বললেন, 'নাম দিসনি বলে তোর এ লেখার ঠিক যাচাই হল। এ যদি আমার-ই লেখা লোকে ভাবত, আমি লজ্জিত হতুম না।১২' রবিমামা ঘরের লোক। তিনি [illegible] সরলাদেবীর মন উঠল না। নিজের লেখাকে [illegible]
লাগলেন। সংস্কৃত গ্রন্থ ও চরিত্রের উপর ভিত্তি করে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন। ভারতী ও বালক-এ প্রকাশিত হলো তাঁর প্রবন্ধ 'মালবিকা-অগ্নিমিত্র'১৩। ১২৯৯-এর বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় আরও একটি প্রবন্ধ 'রতিবিলাপ'। এই প্রবন্ধ দুটিই তাঁকে ঈপ্সিত সাফল্য এনে দিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনায় অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং একটি চিঠিতে সেকথা সরলাদেবীকে জানিয়েও ছিলেন। সরলাদেবী জীবনের এই মাহেন্দ্রক্ষণের উল্লেখ করে বলেছেন—'ভারতীতে আমার আঠার উনিশ বৎসরের লেখা' 'রতিবিলাপ ও 'মালবিকা-অগ্নিমিত্র' পড়ে তাঁর লেখা চিঠি। সে চিঠি সাহিত্য দরবারে দণ্ডায়মান একজন নবীনের উপর তাঁর রায় বা তাকে দুই বাহু বাড়িয়ে আদর করে নেওয়া। যদিও রবিমামার চিঠিতে তাঁরও appreciation ব্যক্ত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর চেয়েও সেদিন সাহিত্যসম্রাট ও সাহিত্যের ন্যায়াধীশ বঙ্কিমের রায়ে নিজেকে চরিতার্থ মনে করলুম।১৪" মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সরলাদেবীর রতিবিলাপ পড়ে বলে পাঠালেন 'তাঁর নতুনত্ব আছে এ লেখায়।১৫'

ক্রমে ভারতী পত্রিকা বালক থেকে আলাদা হয়ে গেলে সরলাদেবীর অনেক লেখা ভারতীতে প্রকাশিত হয়। পরে ১৩০৬ সাল থেকে ভারতী'র পুরো সম্পাদনা ভার যখন তাঁর হাতে এলো তখন তাঁর এই সাহিত্যিক প্রতিভা নবীন উদ্যমে নিজেকে প্রকাশিত করতে লাগল।

এম-এ পরীক্ষা দেবার কথা ভাবলেও সমাজসেবা এবং ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গেই তিনি বেশী জড়িয়ে পড়েন। ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনীতিতে বিপিন পাল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি বড় বড় স্বদেশী নেতারা দেশের মনকে স্বাদেশিকতা ও জাতিপ্রেমে উদ্‌বোধিত ও উত্তেজিত করবার নানা আয়োজন করছিলেন। সরলাদেবী কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কোন দলের মধ্যে গেলেন না। তিনি দেশের যুবশক্তিকে বলে বীর্যে উদবোধিত করতে চাইলেন। আর এজন্যই নানান গঠনমূলক কাজের কথা তিনি ভাবতে থাকেন। এই সময়ে মহীশূরে গিয়েছিলেন লেডি সুপারিনটেন্ডেন্টের কাজ নিয়ে। সেখানে অবশ্য বেশীদিন থাকতে পারেন নি, কিন্তু সেই অল্পদিনের মধ্যেও সঙ্গে করে নিয়ে এলেন নানান গানের সুর ও নানান অভিজ্ঞতা। মহীশূর থেকে সরলাদেবী কিছুদিন মেজমামা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে ছিলেন বোম্বাই প্রদেশে। সেখানে মারাঠা জাতির চরিত্র, সামাজিক প্রথা, উৎসব প্রভৃতির সংগে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। সোলাপুরে মারাঠী ক্লাবে 'দশেরা ও বিজয়া দশমী'১৬ উৎসব দেখে তিনি মুগ্ধ হন। তিনি বলেছেন—খালি লাঠি তলোয়ার খেলার ও নানাবিধ ব্যায়ামের প্রদর্শনী আর বীরত্বব্যঞ্জক বক্তৃতার ধারা। আমাদের দেশের [illegible] প্রভৃতির ধরন নয়।১৭'

বোম্বাই-এ আর একটা জিনিস তাঁর চোখে পড়লো। তিনি দেখলেন পাড়ায় পাড়ায় ব্যায়াম সমিতি গড়ে উঠেছে সেখানকার ছেলেদের প্রচেষ্টায়। তাদের উদ্দেশ্য হলো পথে ঘাটে, রেলে স্টীমারে গোরাদের উদ্ধত অত্যাচারের সমুচিত জবাব দেওয়া। সরলা দেবী এখানে তাঁর গঠনমূলক কাজের উৎস খুঁজে পেলেন। কলকাতায় ফিরে তাঁদের বালিগঞ্জের বাড়ীতে তৈরী করলেন ব্যায়াম সমিতি। দলে দলে ছেলেরা সেখানে শিখতে লাগলো লাঠিখেলা, কুস্তি, ছোরা, তলোয়ারের লড়াই। তাঁর এই প্রচেষ্টা খুব কার্যকরী হয়েছিল। তিনি বলেছেন—'নানা স্থান থেকে আমার কাছে দরখাস্ত আসতে লাগল তাদের দেশে আমার ক্লাবের কতিপয় ছেলেকে পাঠাতে তাদের ওখানে খেলাধুলো দেখান ও শেখানর জন্য। পূজার সময় বাঙলাদেশের বড়লোকদের ঘরে বাঈ-নাচ আনা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের প্যাটার্ণ বদলাতে থাকল।১৮'

মহারাষ্ট্রের 'দশেরা উৎসব' এর আদর্শে দুর্গা পূজার অষ্টমীতে তিনি যুবকদের উৎসাহ দেবার জন্য অস্ত্র পূজার প্রচলন করে 'বীরাষ্টমী ব্রত' ১৯ প্রচার করলেন। মহারাষ্ট্রে তিলক শিবাজী পূজার প্রচলন করেছিলেন, কিন্তু সরলা দেবী শুধু শিবাজীতেই সন্তুষ্ট রইলেন না। খুঁজলেন আর কে বীর আছেন। তাঁর নজরে পড়লেন প্রতাপাদিত্য ও তাঁর পুত্র উদয়াদিত্য। ব্যাপক অর্থে তাঁরা কতটা জাতীয় নায়ক তা নিয়ে এক বিরাট মতভেদ দেখা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সরলা একজন খুনী লোককে লইয়া মাতামাতি করিতেছে।' সরলা দেবী বলেন, 'তাঁহারা প্রতাপাদিত্যের বীরত্বকে পূজা করিতেছেন। ২০' নানান দলের মুখে এই প্রসঙ্গ নিয়ে নানা কথা চলতে লাগলো। কিন্তু স্বদেশ প্রেমের নতুন জাগা জোয়ারে সব সন্দেহ ভেসে গেল। খুব উৎসাহের সঙ্গে 'প্রতাপাদিত্য উৎসব ২১' আরম্ভ হলো। এর দু মাস পরে অর্থাৎ ১৩১০ সনের শ্রাবণ মাসে 'উদয়াদিত্য উৎসব' পালিত হয়। সরলা দেবীর বীরপূজা নিয়ে সঞ্জীবনী পত্রিকা লিখলো—'কলকাতার যুবকের উপর যুবক সভায় একটি মহিলা সভানেত্রীত্ব করিতেছেন দেখিয়া ধন্য হইলাম।' বঙ্গবাণীতেও টিপ্পনী কাটা হলো। বিপিনচন্দ্র পাল লিখলেন—

> As necessity is the mother of invention Sarala Devi is the mother of Pratapaditya to meet the necessity of a Hero for Bengal ২২

সরলা দেবী কিন্তু কোন সমালোচনা গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না। যুবশক্তির প্রাণে দেশমাতৃকার সেবার জন্য প্রেরণা জাগাতে তিনি নতুন নতুন কাজে ব্রতী হতে লাগলেন। তিনিই প্রথম রাখি বেঁধে ছেলেদের দেশসেবায় উৎসাহী করে তোলেন।

তিনি বলেছেন—'ভারতবর্ষের একখানি মানচিত্র তাদের সামনে রেখে সেটিকে প্রণাম করিয়ে শপথ করাতুম তনু-মন-ধন দিয়ে এই ভারতকে সেবা করবে। শেষে তাদের হাতে একটি রাখি বেঁধে দিতুম, তাদের আত্মনিবেদনের সাক্ষী বা সংকেত' ২৩

রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ। ইংরেজরা রেডক্রশের সাহায্যে আহতদের সেবায় উদ্যোগী। তাই দেখে সরলা দেবীও আন্তর্জাতিক রেড ক্রশের ন্যায় বাঙালীদের রেডক্রশ গঠন করতে চাইলেন। এই ব্যাপারে চারদিক থেকে সাড়া মিললো। সবাই বুঝতে পারলেন দেশে প্রাণের অভাব নেই, খালি জ্বালিয়ে দেবার জন্য একটা দেশলাইকাঠি দরকার।

ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো ১৯০১ খৃঃ। সরলা দেবী জাতীয় সঙ্গীত রচনা করলেন। গানটির নাম 'হিন্দুস্থান' ২৪। ১৯০৫ সনে ঘটলো বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন। ইংরেজ শাসন কর্তারা হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে দিলেন। হিন্দুরা চরমভাবে লাঞ্ছিত হলেন। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বরিশালে রাজনৈতিক সম্মেলন ডাকা হল। কুলার সাহেবের ২৫ নেতৃত্বে বরিশালের নিরীহ গ্রামবাসীরা গুর্খা সৈন্যদের হাতে চরম নির্যাতিত হলো। রাজনৈতিক কর্মচারীদের উপরও অত্যাচার করা হলো। সুরেন্দ্রনাথ গ্রেফতার হলেন। ঠিক এই সময়েই বরিশালে একটি সাহিত্যিক সম্মেলন ডাকা হয়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সম্মেলনের সভাপতি। রাজনৈতিক সম্মেলন পণ্ড হয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণ পকেটে পুরে বরিশাল থেকে ফিরে এলেন। সম্মেলনে আর যোগ দিলেন না।

রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে জোরালো করার জন্য বঙ্গের নারীদের 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'র স্বদেশী সব কিছুকে বরণ করার জন্য আহ্বান জানালেন। এই ব্রতকথার শপথবাণীকে সমর্থন জানালেন সরলা দেবী। তিনি তখন 'ভারতী'র সম্পাদিকা। 'ভারতী'র পাতায় পাতায় নব যুগের মর্মর নতুন জাগরণের বাণী। বঙ্গবিভাগের মাসে অর্থাৎ আশ্বিনে ছাপা হলো কেবল এক অভয়বাণী। লেখিকা ছদ্মবেশে 'কোন ব্রতধারিণী'। সেখানে তিনি লিখলেন—'হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা নির্ভয় হও, আমরা তোমাদিগের উৎসাহে বাধা দিব না, তোমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। যিনি তোমাদিগের জননী, তিনি আমাদিগেরও জননী। মাতার উদ্দেশ্যে তোমরা যে সংকল্প ধারণ করিয়াছ তাহা আমরা ধারণ করিলাম' ২৬।

সরলাদেবী স্বদেশী বস্ত্র এবং দ্রব্যের কেনাবেচার জন্য 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠা করেন। নানা জায়গা থেকে সেখানকার শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্ভার হাজির হতে লাগলো এই ভাণ্ডারে। ১৯০৪ খৃঃ বোম্বাই কংগ্রেসের প্রদর্শনীতে এই ভাণ্ডার থেকে স্বদেশীজাত বিবিধ দ্রব্যের নমুনা প্রেরিত হয়।

এলাহাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনে ১৯১০ খৃঃ সরলাদেবীর উদ্যোগে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল জাজিরার মহারাণীর সভানেতৃত্বে। সম্মেলনে
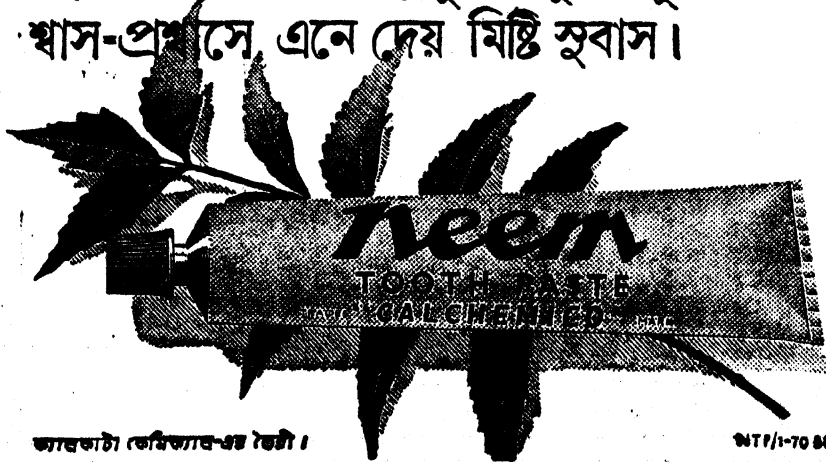
ভারতস্ত্রী মহামণ্ডলের পরিকল্পনা করে সরলাদেবী একটি ডাক দেন। পুঞ্জীভূত অন্ধ-কুসংস্কার চূর্ণ করে ভারতের নারী-সমাজকে জাগিয়ে তোলার কাজে তিনিই অগ্রণী ছিলেন।

অরবিন্দের সঙ্গে সরলাদেবীর ছিল গভীর যোগাযোগ। সরলাদেবীর নামে চিঠি দিয়ে তিনি যতীন্দ্রনাথকে২৭ কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন গুপ্ত সমিতি গঠনকল্পে। সরলাদেবী দেশের যুবশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন বল এবং বীর্যে; গুপ্ত-সমিতির উদ্দেশ্যও তাই ছিল—আর সেজন্যই অরবিন্দ সরলাদেবীকেই যোগ্যা বলে বরণ করেছিলেন। পরে অবশ্য গুপ্ত-সমিতির সঙ্গে সরলাদেবীর মনান্তর ঘটে। গুপ্ত-সমিতির হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপে সরলা-দেবীর সায় ছিল না।

সরলাদেবী শুধু নানান সংগঠনমূলক কাজ করে ক্ষান্ত হননি, গানের পর গান রচনা করে এবং সাক্ষাৎ চারণী দেবীর মতো সেই সব প্রাণোন্মাদনাকর গান গেয়ে ভারতবর্ষের যুবশক্তিকে জাগিয়ে ছিলেন। মাত্র বার বৎসর বয়স থেকে তিনি গান রচনা করেন এবং সেই সঙ্গে সুর সংযোজনাতেও তিনি কৃতিত্ব অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর গানের মধ্য দিয়েই ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি বলেছেন—'মেজ-মামীদের সঙ্গে রবিমামাও প্রথমবারের বিলেতযাত্রা থেকে বাড়ী ফিরে এসেছিলেন। আরা ছোটরা গানের ভিতর দিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কে এলুম ২৮'।

এগারই মাঘ ঠাকুরবাড়ির একটি বড়ো উৎসব। রবীন্দ্রনাথ সরলাদেবীকে বেছে নিলেন গানের জন্য। সরলাদেবীও গানের রাজা রবীন্দ্রনাথকে পেলেন উৎসাহদাতা-রূপে। নানা জায়গা থেকে নানান সুর এনে হাজির করতেন রবিমামার কাছে। তিনি বলেছেন—'যা কিছু শিখতুম তাই রবি-মামাকে শোনাবার জন্যে প্রাণ ব্যস্ত থাকত—তাঁর মত সমজদার কেউ ছিল না। যেমন যেমন আমি শোনাতুম অমনি অমনি তিনি সেই সুর ভেঙে কখনো কখনো তার কথা-গুলিরও কাছাকাছি দিয়ে গিয়ে এক-এক-খানি নিজের গান রচনা করতেন। 'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ', 'আমার সোনার বাংলা' প্রভৃতি অনেক গান মাঝির কাছে আহরিত আমার সুরে বসান।২৯'

শুধু দেশী গান নয়, য়ুরোপীয় গানের চর্চাতে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন প্রধান উৎসাহ-দাতা। তিনি এ বিষয়ের উল্লেখ করে বলে-ছেন—'আমার একটা নৈসর্গিক কুশলতা বেড়িয়ে পড়ল—বাংলা গানে ইংরিজী রকম কর্ড দিয়ে ইংরিজী 'পিস' রচনা করা। একবার রবিমামা আমাদের একটা টাসক্ দিলেন—তাঁর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাকে পিয়ানোতে প্রকাশ করা। এক-মাত্র আমিই সেটা করলুম। মনে পড়ে অতে কি আতিমিবেশ শিক্ষা দিলেন কি গভীর-ভাবে কাব্যের অর্থের বোধ ও সঙ্গে সঙ্গে সুরে ও তালে তাকে সেবদান করার অপূর্ব আনন্দরূপে আমায় ডুব দেওয়ালেন।৩০'

গানের মাধ্যম দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেও তাঁর মধুর পরিচয় ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত গান 'সাধের তরণীর' সুর সরলাদেবীই দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরমের প্রথম চার লাইনের সুর রবীন্দ্রনাথ দিয়ে বাকীটা সরলাদেবীর হাতে ছেড়ে দেন৩১। বহু সভা, সমিতি ও কংগ্রেসের অধিবেশনে নিজের গলায় এই গান গেয়ে অজস্র প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন।

দাদামশায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ফর-মায়েসী হাফেজের করেক্টি লাইনে সরলা-দেবী সুর দেন।৩২ এই গানটি নিজের গলায় গেয়ে শোনালে দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত খুশী হন এবং তাঁকে হাজার টাকার গহনা পুরস্কার দেন।

অতুলপ্রসাদের সঙ্গেও সরলাদেবীর পরিচয় ঘটে গানের মধ্য দিয়ে। অতুল-প্রসাদের 'ওঠগো ভারতলক্ষ্মী', 'মোরে কে ডাকে' প্রভৃতি বহু গানের স্বরলিপি সরলা-দেবী 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। অতুলপ্রসাদ তাঁকে একবার লখনৌতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান এবং তাঁর সম্মানে একটি পার্টি দেন। এই পার্টির শেষে সকলে সরলাদেবীর মুখে 'বন্দেমাতরম' গানটি শুনতে চান। সরলাদেবী তাঁর অনু-পম কণ্ঠে ওই গানটি গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।৩৩ ১৯২৫ সনে চৈত্র মাসে লখনৌতে 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য' সম্মেলন আহ্বান করলেন অতুলপ্রসাদ। সরলাদেবী এই সাহিত্যসভার মূল সভানেত্রী। এই সম্মেলনে অতুলপ্রসাদ তাঁর ভাষণে সরলাদেবীকে 'ভারতীর বরকন্যা' আখ্যা দেন। সরলাদেবীই অতুলপ্রসাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় করিয়ে দেন। অতুলপ্রসাদ এ প্রসঙ্গে বলে-ছেন—'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়, যখন আমি ১৮৯৫ সালে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসি। তখন আমার বয়ঃক্রম ২১।২২, শ্রীমতী সরলাদেবী আমাকে লইয়া গিয়া তাঁর সঙ্গে আলাপ করাইয়া দেন।৩৪'

গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকার মাধ্যমে সরলাদেবীর পরিচয় ঘটে। ১৩০২ সাল থেকে প্রভাত-কুমারের লেখা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ক্রমে তিনি ভারতীর একজন বিশিষ্ট লেখকরূপে পরিচিত হন। সরলা-দেবীর সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। সরলাদেবীর মেজমামা সত্যেন্দ্রনাথ তখন প্রভাতকুমারকে আপন ব্যয়ে বিলেত পাঠান ব্যারিস্টার হয়ে আসার জন্য। এবং স্থির হয় তিনি ফিরে এলে সরলাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হবে। ১৯০৩ সনের ডিসেম্বরে প্রভাতকুমার ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এলেন, কিন্তু সংসার পাতা হয়ে উঠলো না। প্রভাত-কুমারের মা এ বিবাহে মত দিলেন না। প্রভাতকুমার এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে দ্বিতীয়বার সংসার ধর্মের আশায় জলাঞ্জলি দেন। সরলাদেবীও এ ব্যাপারে অত্যন্ত দুঃখ পান এবং স্থির করেন কখনও বিবাহ কর-বেন না। পরে অবশ্য মায়ের আদেশে তাঁকে বিবাহ করতে হয়।

রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে আজকাল যে উৎসব হয় তার মধ্যে প্রধান হলো রবীন্দ্র জন্মোৎ-সব। সরলাদেবীই প্রথম জন্মোৎসবের সূচনা করেন। নতুন কিছু করাতে তাঁর ছিল প্রচণ্ড আনন্দ। তিনি বলেছেন—'রবিমামার প্রথম জন্মদিন উৎসব আমি করাই। তখন মেজমামা ও নতুনমামার সঙ্গে তিনি ৪৯ নং পার্ক স্ট্রীটে থাকেন। অতি ভোরে উল্টাডিঙ্গির কাশিয়াবাগান বাড়ি থেকে পার্কস্ট্রীটে নিঃশব্দে তাঁর ঘরে তাঁর বিছানার কাছে গিয়ে বাড়ির বকুল ফুলের নিজের হাতে গাঁথা মালা ও বাজার থেকে আনানো বেল-ফুলের মালার সঙ্গে অন্যান্য ফুল ও এক-জোড়া ধুতি চাদর তাঁর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে তাঁকে জাগিয়ে দিলুম। তখন আর সবাই জেগে উঠলেন—পাশেই নতুন-মামার ঘর। 'রবির জন্মদিন' বলে একটি সাড়া পড়ে গেল। সেই বছর থেকে তাঁর পরিজনদের মধ্যে তাঁর জন্মদিনের উৎসব আরম্ভ হল।৩৫'

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বসন্তোৎসবের প্রথম পরিকল্পনার কৃতিত্ব সরলাদেবীরই। তিনি বাঙলার দেশীয় পালাপার্বণগুলির সঙ্গে সকলের পরিচিতির জন্যই এই উৎসবের ব্যবস্থা করেন। তিনি লিখেছেন—শ্রীপঞ্চমীর দিন নিমন্ত্রণ-পত্রের উপরের পৃষ্ঠায় 'বসন্তোৎসব' লিখে ভিতর পৃষ্ঠায় চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলুম। তার সঙ্গে ফুটনোটে এক লাইন টোকা রইলো—'মেয়েদের বাসন্তী রঙের সাড়ি বা ব্লাউজ ও পুরুষদের পরিচ্ছদের কোথাও কোথাও একটুখানি বাসন্তী রঙের আভাষ ধারণ বাঞ্ছনীয়।৩৬' এই উৎসব উপলক্ষে 'হে সুন্দর বসন্ত বারেক ফিরাও। আজি মধুর অতীত কাল' গানটি রচনা করেন।

সরলা দেবী শুধু যে একজন স্বদেশ-প্রেমী গঠনশীল কর্মী এবং গীতিকার ও সুরকার ছিলেন তা নয়—তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সম্পাদিকাও ছিলেন, তাঁর সম্পাদনা কালটিকে 'ভারতী'র 'নির্দয়-নব যৌবন' এর যুগ বলা যেতে পারে। ১৩০৬ সালের বৈশাখ মাস থেকে তাঁর সম্পাদনায় 'ভারতী' প্রকাশিত হতে থাকে। এর আগে ১৩০২ হতে ১৩০৪ সাল পর্যন্ত তিনি দিদি হিরন্ময়ী দেবীর সঙ্গে একযোগে 'ভারতী' সম্পাদনা করেন। ১৩০৬ থেকে এককভাবে সবকিছু হাতে নিয়ে 'ভারতী'কে সম্পাদনা করেন। ১৩০৬ থেকে এককভাবে সবকিছু হাতে নিয়ে 'ভারতী'কে ঢেলে সাজালেন। তাঁর রাজনৈতিক মতামত ও গঠনমূলক কাজের মুখপাত্রস্বরূপে 'ভারতী' প্রস্তুত হল। সকলরকমের কাপুরুষতাকে তিনি এই পত্রি-

কার মাধ্যমে ধিক্কার জানালেন। গোরা সৈন্যদের কাছে একবার বাঙালী ছেলেরা খেলায় হেরে গিয়ে মার খেয়ে পালিয়ে গেল—সরলাদেবী 'ভারতী'তে তাদের নিন্দা করলেন। 'ঔরংজেব' অভিনয়ের সময় বঙ্গীয় মুসলমানরা পশ্চিমী গুণ্ডাদের দিয়ে মিনার্ভা হল ঘেরাও করলে, থিয়েটারের মালিক অমর দত্ত স্টেজ ছেড়ে পিছনের দরজা দিয়ে পালাল। সরলাদেবীর 'ভারতী' এই কাপুরুষতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলো। এইভাবে তাঁর হাতের ভারতী শুধু সুকুমার সাহিত্যের রঙ্গভূমি ছিল না, বাহন হয়েছিল জাতীয়তার।

'ভারতী'র সম্পাদিকা হয়ে তিনি নতুন লেখক লেখিকা তৈরী করার দিকে নজর দিয়েছিলেন। কাঁচা লেখাকে একটু পরিবর্তিত করে তিনি পত্রিকায় ছাপাতেন; এই ভাবে প্রত্যেক লেখকলেখিকার উন্নতি হতো।
'ভারতী'তে তিনিই প্রথম লেখকদের পারিশ্রমিক দেবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর প্রবর্তিত এই নিয়মের ফলে অন্যান্য পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীরা ভাল লেখকদের জন্য চাঁদার খাতা খুলতে বাধ্য হলেন।

তিনি যে সময় 'ভারতী' হাতে নিলেন, তখন কোন পত্রিকাই ঠিক সময়ে প্রকাশিত হতো না। তাই পত্রিকা হাতে নিয়েই তিনি যথাসময়ে প্রকাশের জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। পরে এমন অবস্থা হয়েছিল যে অনেকে 'ভারতী' এলে বুঝতে পারতেন আজ মাসের ১লা তারিখ।

তাঁর সময়ে 'ভারতী'তে 'খেয়ালখাতা' নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়। এই বিভাগে যিনি যা পাঠাবেন তাই ছাপার ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য সেইসব লেখাগুলিকে খাঁটি হতে হতো। এই বিভাগটিতে সেই সময় স্বাদেশিকতামূলক অনেকগুলি চমৎকার রচনা প্রকাশিত হয়।

১৩০৬ থেকে ১৩১৪ পর্যন্ত সরলাদেবী 'ভারতী'র সম্পাদনা করেন। ১৯০৫ খৃঃ পাঞ্জাবের রামভূজ দত্তচৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি স্বামীর কর্মক্ষেত্র লাহোরে চলে যান। তাই পত্রিকা সম্পাদনা কাজে তখনকার মতো ইস্তফা দেন। পরে আবার ১৩৩১ সাল হতে ১৩৩৩ সাল পর্যন্ত তিনি 'ভারতী'র সম্পাদনা করেন।

'ভারতী' সম্পাদনার আগে থেকেই তিনি বাংলাসাহিত্যের চর্চা করে আসছিলেন। কিন্তু 'ভারতী'র সম্পাদনা ভার যখন তাঁর হাতে এসে গেল, তখন এই চর্চা আরও বেড়ে যায়। 'ভারতী' সেই সময়কার একটি বিখ্যাত পত্রিকা। সরলাদেবীর প্রচুর লেখা প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকার পাতায়। কিন্তু এত লেখা থাকতেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর নাম সর্বজনপরিচিত নয়। এর কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে তাঁর লেখাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। তিনি নিজেও একথা স্বীকার করে বলেছেন—'আজ পর্যন্ত আমার সব লেখাই প্রায় ভারতীর পৃষ্ঠাতেই নিবদ্ধ এবং গানগুলি আমার খাতায় বা গায়কের মুখে মুখে। আমার লেখাকুমারীরা মাসিকে, সাপ্তাহিকে, দৈনিকে ছাপাসুন্দরী হয়েছে কিন্তু গ্রন্থের ঘরণী হয়নি।৩৭' তাঁর রচনাগুলি গ্রন্থের ঘরণী হোক আর না হোক 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় যে অজস্র রচনা ছড়িয়ে রয়েছে, সেগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে তাঁর রচনার সাহিত্যগুণের পরিচয় পাওয়া যাবে।

'ভারতী'তে সংস্কৃত গ্রন্থের৩৮ সমালোচনামূলক যে সব প্রবন্ধ পাওয়া যায় তার মধ্যে ভাবনার নতুনত্ব, যুক্তিপ্রবণতা ও ভাষার দৃঢ়তা দেখা যায়। এই প্রবন্ধগুলি-ই বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে আকর্ষণীয় হয়েছিল। সংস্কৃতগ্রন্থ ও চরিত্রের সমালোচনা ছাড়া সরলাদেবী তৎকালীন প্রকাশিত বহু বাংলা গ্রন্থের সমালোচনা করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত পারিবারিক উপন্যাস 'নয়নতারা', শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত 'দক্ষিণাপথ ভ্রমণ' সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রণীত 'ভবভূতি ও তাঁহার কাব্য' প্রভৃতি গ্রন্থের সমালোচনাগুলি উচ্চসাহিত্যগুণসম্পন্ন।

সমসাময়িক ঘটনা ও রাজনৈতিক আচার আচরণ নিয়ে সরলাদেবী 'ভারতী'তে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর হাতে 'ভারতী'র বীণা রুদ্রবীণা হয়ে বেজেছিল। ১৩০৬ সালে তিনি 'ভারতী' হাতে নিয়েই বাঙালীকে 'মৃত্যুচর্চায়৩৯ আহ্বান জানান। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—'যে বাঙালী পৈতৃক প্রাণটি বাঁচিয়ে রাখতেই সদা তৎপর যীশু তাদের ডেকে বললে, মৃত্যুকে যেচে বরণ করতে শেখ; অগত্যা তার কবলিত হয়ো না। তাকে স্পর্ধা করে তার সম্মুখীন হও।' 'বিলাতী ঘুষি বনাম দেশি কিল' প্রবন্ধেও তিনি মার খাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য নিজেদের মার দেবার শিক্ষায় শিক্ষিত হতে বলেছেন। সমসাময়িক বিষয় নিয়ে রচিত তার এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে বঙ্কিমীরীতির কিছুটা ছাপ দেখা যায়। 'হিন্দু ও নিগর'৪০ প্রবন্ধ থেকে কিছুটা উদ্ধার করলে ঐ বিষয়ে স্পষ্ট হওয়া যাবে। তিনি লিখেছেন—'আমাদের গৌরবান্বিত অতীত বাদ দিলে, আমরা এখন বর্তমানে যাহা শুধু তাহাই বিচার করিলে নিগ্রোদিগের অপেক্ষা আমরা, এতই কিসে শ্রেয়? তাহারা 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' আমরা কি নহি? তাহাদের 'পর ভাষণ পর আসন, পর পণ্যে ভরা তনু আপন—আমাদের কি নহে?' তাহারা 'পর বেশ লয়, পর দেশ যায়, তবু ঠাঁই নাহি পায় দাস বলে'—আমরা কি পাই? তবে ইংরাজ আমাদের নিগর বলিলে চটিব কেন?'

কবিতা ও গান রচনার ক্ষেত্রে সরলাদেবীর নিজস্বতা অত্যন্ত স্পষ্ট। 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় তিনি বহু কবিতা রচনা করে গিয়েছেন। এই সব কবিতাগুলি ভাবসৌন্দর্য ছন্দে, অলংকারে অপূর্ব। তাঁর রচিত 'আহিতাগ্নিকা', 'মাঙ্গলিক', 'হৃদয়বীণ', 'একা', 'বীরাষ্টমীর গান', 'কাদের বোঝা', 'আমার শ্রোতা', 'অহংকার' প্রভৃতি কবিতাগুলি উৎকৃষ্ট কবিতার সমধর্মী। 'আহিতাগ্নিকা' কবিতায় তিনি সর্বদেবে সাক্ষী করে তাঁর পথ বেছে নিয়েছেন। কিন্তু—

দৃষ্টি-বিষ সর্প সেথা জাগে অতি ভীষণ
আকার।

করে নিত্য গরল উদ্গার।

ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, রুদ্র, হিংস্র পুরাণী যতেক,
ফিরিছে গোপনে, আছে কণ্টক অনেক।

তবুও কবি তাঁর ব্রত থেকে বিচ্যুত হবেন না। মূল পারস্য থেকে ওমর খৈয়ামের রুবাইয়তের অতি সুন্দর অনুবাদ তিনি করেন।

গানের ক্ষেত্রে সরলাদেবী তাঁর রবিমামার যোগ্য উত্তরাধিকারিণী। নানান জায়গা থেকে নানান সুর আহরণ করে তিনি তাঁর গানগুলি রচনা করেছেন। তাঁর রচিত 'শতগান' আধুনিক গানের প্রথম স্বরলিপি পুস্তক। এর মধ্যে সরলাদেবীর রচিত এমন কতকগুলি গান আছে, যা আজও বহুজনের মুখে মুখে ফেরে। 'প্রীতি তুমি হে অন্তরে', 'হে সুন্দর বসন্ত' 'অতীত বাহিনী মম বাণী', 'বন্দি তোমা ভারত জননী'৪১ প্রভৃতি গানগুলি কি শব্দে, কি সুরমাধুর্যে, কি ভাবসম্পদে বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাঁর রচিত জাতীয় সংগীত আজও অনেক উদ্দীপনার সংগে গাওয়া হয়ে থাকে। বিপিনচন্দ্র পাল এই জাতীয় সংগীত রচনা প্রসংগে বলেছিলেন—"এতদিন দেশে যত জাতীয় সংগীত রচিত হয়ে এসেছে সবের-ই ভাব হতাশাময়, অতীতের স্মরণে শোকমূলক ক্রন্দনময়। এই গানের প্রাণ আর এক রকমের—বর্তমানের উপর দাঁড়িয়ে তেজস্বিতার সংগে উৎসাহময় ও ভবিষ্যতের নিশ্চিয়তায় আনন্দময়।৪২"

তিনি কয়েকটি ছোট গল্পও রচনা করেন। 'নববর্ষের স্বপ্ন'৪৩ গ্রন্থে তার কয়েকটি স্থান পেয়েছে। এই গল্পগুলি নতুনত্বে ও সম্ভাবনায় উজ্জ্বল।

বিবাহের পর লাহোরে গিয়েও তিনি নানান কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে রামভূজ দত্তচৌধুরী কারাবরণ করলে তিনি তাঁর সম্পাদিত 'হিন্দুস্থান' উর্দু পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। এই পত্রিকার একটি ইংরেজি সংস্করণও তিনি বের করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে রামভূজ দত্তচৌধুরী মুসৌরীতে

যায়া যায়। সরলাদেবী তখন আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। এর পর তিনি আবার 'ভারতী'র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং নানান কর্ম-প্রচেষ্টার উদ্যোগী হন। কাজের সঙ্গে সঙ্গে বহু লেখাও প্রকাশিত হতে থাকে।

১৯৩৫ খৃঃ মাঝামাঝি একটি অদ্ভুত পরিবর্তন এলো তাঁর জীবনে। শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মার সঙ্গে আলাপে এবং শাস্ত্রব্যাখ্যায় তিনি আকৃষ্ট হন এবং তাঁকে গুরুরূপে বরণ করেন। জীবনের শেষ দশ বৎসর তিনি একান্তভাবে গুরুসেবা করে কাটান। এই সময় তিনি ঈশ্বরের প্রতি পরম নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ১৯৪৫ খৃঃ ১৮ আগস্ট ৭৩ বৎসর বয়সে পরম তৃপ্তিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই সঙ্গে এক বিরাট কর্মকর জীবনের অবসান ঘটলো। তাঁর জীবনে একথা বহুরে অনেকে তাঁকে ভুলে গেছেন, কিন্তু অনুরূপা দেবীর ভাষায় আমরা বলতে পারি—'তাঁর মর্মবাণী স্পন্দিত হয়ে রইল ঐ গানের ভাবায় এবং 'অভিভাষণকৃত'। আগামীদের দেশবাসী যদি প্রাণে ছোঁয়াতে পারলে 'জীবন ধন্য ও পূণ্য হতে পারে তারই একটু ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গমাত্র হলেও সে আগুনেই, তার দাম আলেয়ার চেয়ে অনেক বেশী।৪৪'

---

(১) জানকীনাথ ঘোষালের শ্রাদ্ধবাসরে তাঁর কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী যে সংক্ষিপ্ত জীবনীবৃত্ত পাঠ করেন, তার থেকে এই অংশ উদ্ধৃত। যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত সরলাদেবীর 'জীবনের ঝরাপাতা' নামক স্মৃতিগ্রন্থের পরিচয় অংশে যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় হিরণ্ময়ী দেবীর যে পরিচয় দিয়েছেন উদ্ধৃত অংশ সেখান থেকেই গৃহীত হয়েছে।

(২) সরলাদেবী—জীবনের ঝরাপাতা পৃঃ ৫

(৩) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সরলাদেবী 'নতুন মামা' এবং তাঁর স্ত্রী কাদম্বরী দেবীকে নতুন মামী' বলে ডাকতেন।

(৪) সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও তাঁর ছেলেমেয়ে সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরাদেবী।

(৫) সরলাদেবীর—জীবনের ঝরাপাতা পৃঃ ২৮

(৬) সরলাদেবী—জীবনের ঝরাপাতা পৃঃ ১০৫।

(৭) ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ সর্বাধিক নম্বর প্রাপ্ত মহিলা গ্রাজুয়েটকে মাতা পদ্মাবতীর নামে 'পদ্মাবতী স্বর্ণ পদক' দেওয়ার জন্য ১৮৮৮ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এককালীন কিছু টাকা দেন।

(৮) সরলাদেবীর বড়মামা দ্বিজেন্দ্রনাথের কন্যা।

(৯) বালক ১২৯২ জ্যৈষ্ঠ।

(১০) বাঁশগাছের আত্মকথা— ১২৯২ কার্তিক।

(১১) সরলাদেবী—জীবনের ঝরাপাতা পৃঃ ১১

(১২) তদেব পৃঃ ১০১

(১৩) ১২৯৮, ফাল্গুন-চৈত্র ভারতী ও বালক।

(১৪) সরলাদেবী—জীবনের ঝরাপাতা পৃঃ ৪৪—৪৫।

(১৫) তদেব ——পৃঃ ১০১

(১৬) এই উৎসব দেখে 'ভারতী'তে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন।
দ্রষ্টব্য—বাঙ্গালী ও মারাঠী ১২৯৯ শ্রাবণ 'ভারতী ও বালক'।

(১৭) সরলা দেবী—জীবনের ঝরাপাতা পৃঃ ১০৪

(১৮) তদেব পৃঃ ১৪৪

(১৯) এই ব্রত উপলক্ষে তিনি একটি গানও রচনা করেন। গানটির প্রথম লাইন হলো—'জান কী মানব কোথাকার তুমি।'

(২০) প্রভাত মুখোপাধ্যায়— রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড পৃঃ ১২৭

(২১) সরলা দেবী 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' ১৩১০ সনের বৈশাখী পূর্ণিমায় (১৯০৩, ১১ই মে) শুরু করেন। এই উৎসবের পরেই ক্ষীরোদপ্রসাদ লেখেন 'প্রতাপাদিত্য' নাটক। মিনার্ভায় এর মঞ্চে অভিনয় থেকে সে সময় প্রতাপাদিত্যের জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

(২২) সরলা দেবী—জীবনের ঝরাপাতা— পৃঃ ১২৮

(২৩) তদেব পৃঃ ১২৬

(২৪) এই জাতীয় সঙ্গীতটি এই কংগ্রেসে হাজার জনের মিলিত কণ্ঠে গীত হয়। প্রথম লাইন 'অতীত গৌরব-বাহিনী মম বাণি!'

(২৫) এই ঘটনাকালে সরলা দেবীর 'ভারতী'তে ফুলার সাহেবকে ব্যঙ্গ করে কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়। এই রচনাগুলি খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। ফুলার চাঁদ, ফুলার বাণী, ফুলারের পদত্যাগ, ফুলারের অভিনন্দন প্রভৃতি।

(২৬) ভারতী ১৩১২, আশ্বিন 'অভয়বাণী' ব্রতধারিণীদিগের পক্ষে নিবেদন 'কোন ব্রতধারিণী'।

(২৭) যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি অরবিন্দ গুপ্ত-সমিতির এক প্রধান সদস্য। 'যতীন্দ্র উপাধ্যায়'—এই ছদ্মনামে অরবিন্দের সাহায্যে গায়কোয়াড় সৈন্যদলে প্রবেশ করেন।

(২৮) সরলাদেবী—জীবনের ঝরাপাতা পৃঃ ২৯

(২৯) তদেব—পৃঃ ৩৩

(৩০) সরলাদেবী—জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ৩১

(৩১) এ সম্বন্ধে সরলাদেবী তাঁর 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থে বলেছেন—'বাকী কথাগুলোতে দুই সুর বসা। তাই ত্রিংশকোটি কণ্ঠ থেকে শেষ পর্যন্ত কথার প্রথমাংশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে আমি সুর দিলুম। তিনি শুনে খুশী হলেন। সমস্ত গানটা তখন থেকেই চালু হয়।'

(৩২) সরলাদেবী—জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ৭৯

(৩৩) মানসী মুখোপাধ্যায়—অতুলপ্রসাদ পৃঃ ৬৪

(৩৪) মানসী মুখোপাধ্যায়—অতুলপ্রসাদ—পৃঃ ২০৩

(৩৫) সরলাদেবী—জীবনের ঝরাপাতা পৃঃ ৫২

(৩৬) সরলাদেবী—জীবনের ঝরাপাতা পৃঃ ১৭৬

(৩৭) সরলাদেবী—জীবনের ঝরাপাতা পৃঃ ৩২

(৩৮) মালবিকা-অগ্নিমিত্র—১২৯৮, ফাল্গুন, চৈত্র রতিবিলাপ—১২৯৯ বৈশাখ

মালতীমাধব—১২৯৯ অগ্রহায়ণ, মাঘ চৈত্র
মুদ্রারাক্ষস—১৩০১ জ্যৈষ্ঠ—

(৩৯) 'মৃত্যুচর্চা'—সরলাদেবীর সম্পাদনায় 'ভারতী'তে প্রকাশিত তাঁর প্রথম প্রবন্ধ (১৩০৬ বৈ ভারতী)

(৪০) ১৩০৬—জ্যৈষ্ঠ, ভারতী।

(৪১) এই গানটি জগদীশ বসুকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগীতসমাজ থেকে মানপত্র দেওয়ার উপলক্ষে রচিত।

(৪২) সরলাদেবী—জীবনের ঝরাপাতা পৃঃ ১০৩-১০৪

(৪৩) নববর্ষের স্বপ্ন—পাঁচটি গল্প আছে। এই গ্রন্থটি ১৩২৫ সনের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়।

(৪৪) অনুরূপা দেবী সাহিত্যে নারী-চরিত্র: স্রষ্টা ও সৃষ্টি পৃঃ ৩৭৭

দুঃখে সুখে বাঁচা

নিখিলচন্দ্র সরকার

।। পনেরো ।।

অনীশ চা খেয়েই বেরিয়ে পড়েছিল। বরাবরের চেয়ে আজ সে অনেক আগেই উঠেছে। তাকে বেশ চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। দেখে মনে হলো, সারারাত তার ভাল ঘুম হয়নি। চোখ মুখ গভীর ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তায় ভরা। মনের মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি যেন ক্রমাগত সে বইছে। মুহূর্তের জন্যেও সরাতে পারছে না। সানু ওর মুখের দিকে চেয়ে অবাকই হয়েছে। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করতে পারল না। সানুই উঠে চা করেছে। ও যখন বেরিয়ে আসছে তখন মানু উঠল। পথে নেমেও সে অন্যমনস্কের মতন হাঁটছিল।

প্রথমেই অনীশ স্টেশনে এলো। আর এম এস এ চিঠিটা ফেলে সে যেন এবার কিছুটা হালকা বোধ করল। সিগারেট ধরায় অনীশ। আস্তে আস্তে সে হেঁটে এসে চায়ের স্টলের কাছে দাঁড়াল। এ চিঠিটা খুবই জরুরী। অনেক রাত জেগে এক বন্ধুকে সে এ চিঠি লিখেছে। ওই বন্ধুর কাছ থেকেই মাঝে মাঝে প্রয়োজন মত সংবাদাদি সে পেয়েছে। চিঠিটা লিখতে গিয়ে অনেকগুলো পাতা সে নষ্ট করেছে। তার হাতটা কেন যেন বারবার কেঁপে গেছে। বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করেছে। চোখদুটো কেবলই ঝাপসা হয়ে উঠেছে। সব যেন আবার অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। অনীশ যেন এরই মধ্যে অনেক দুর্বল হয়ে পড়ছে। সে নিজেকে শক্ত রাখবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারছে না। এই সকালটাও তার কাছে কেমন এক বিষণ্ণতায় ভরে রয়েছে। যতদিন না উত্তর আসে, ততদিন তার কাছেও দিনগুলো ভীষণ অস্বস্তিকর; প্রতিটি মুহূর্ত তাকে একা একা এর যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। কাউকেই কিছু বলতে পারবে না। এমন কি, চিঠির জবাব না আসা পর্যন্ত অতসীর কাছেও কিছু বলা ঠিক হবে না তার। অবশ্য চিঠি পেয়েই উত্তর দেবে। কিছু না জানা পর্যন্ত যেন স্বস্তি নেই, অস্থিরতাই বাড়বে খালি।

অনীশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চা খেয়েছে। সিগারেটটা অনেক ছোট হয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে আরো খানিকক্ষণ টানল ওটা। গতকালও অতসীদের যখন এগিয়ে দেয় অনীশ, তখনও তার মন খুশীতে ভরপুর। কখনো কখনো ওরা পিছিয়ে পড়েছে, অতসী মৃদুভাবে চিমটি কেটেছে। আবছা অন্ধকারে অনীশও ওকে ধরতে গিয়ে ওর বুকে হাত দিয়ে ফেলেছে। অতসী চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'এই।'

সুরেশবাবু দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন থমকে, 'কিরে, কি হলো।'

অতসী হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিল, 'কিছু না, একটা ব্যাঙ লাফিয়ে এসে পড়েছিল।'

অতসীর মা বলেছিল, 'একটু দেখে হাঁটলেই হয়।'

এক ফাঁকে অতসী কাছে এসে অস্ফুটে বলেছিল, 'তুমি না আজকাল দেখছি ভীষণ অসভ্য হয়ে যাচ্ছো।' অতসী খিল খিল হেসে ফেলেছে।

অনীশও ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিল, 'মনে থাকে যেন, এবার থেকে তাই হবো।'

'ইস্, হয়ে দেখ না একবার, হাত কামড়ে দেবো।' অতসী এরপর কেন যেন ওর আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে পাশাপাশি পথ হাঁটছিল। অনীশ নীচু হয়ে ওর ঘাড়ে চুমু খেল।

ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সিগারেট নিতে এসেছিল সে। সিগারেট কিনতে কিনতে ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে খবরের কাগজটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। একটা জায়গায় এসে চোখটা কেমন গেঁথে গেল তার। মুহূর্তে চমকে উঠেছে অনীশ। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারল না যেন। ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পুরো ঘটনাটাই পড়ে ফেলেছে। হঠাৎ যেন তার মাথাটা ঘুরে গেল। সে বসে পড়েছে। তার কোন উৎসাহ ছিল না খবরের কাগজে। আরো খানেকক্ষণ ওভাবে বসে থেকে একসময় প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াল সে। আসতে আসতে তার মনে হয়েছিল পাগলো যড় এলোমেলো পড়ছিল। বারবার দীপেন্দুর মুখটা ভেসে উঠেছে। এখানে এসেও মাঝে মাঝে ওর কথা মনে পড়েছে। কিন্তু এখন যেন কিসের এক আশঙ্কা, ভয় বুকের মধ্যে এসে বারবার ধাক্কা দিচ্ছে। বাড়ি ফিরেও কারও সংগে সহজ হয়ে কথা বলতে পারল না। দীপেন্দুও কি ওই হতাহতের মধ্যে আছে? সত্যই যদি ওর কিছু একটা হয়ে যায়? না না, এ সে ভাবতে পারছে না। ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে। অথচ কাকেও কিছু বলতে পারছে না সে। কেন না, অনীশ ভাল করেই জানে, এ ব্যাপারে সন্দেহের মতন কিছু শুনলেই মাকে সামলানো কঠিন হবে। তখন আরো এক নতুন সমস্যায় পড়বে ওরা। তাছাড়া নিশ্চিত কিছু একটা না জেনে কি করেই বা কথাটা মাকে সে বলে! অনীশ মনে মনে যেন মাকে লক্ষ্য করে দু একবার বলার চেষ্টাও করেছে: তোমাকে কি করে কথাটা আজ বলি মা। আমাদের জন্যে আরো কত বড় ক্ষতি যে অপেক্ষা করছে কে জানে! এতসব ঘটে যাওয়ার পরও কি আরো কিছু হারাতে হবে? আমার কেন যেন মা ভয় হচ্ছে! আমি তোমাকে ঠিক স্পষ্ট করে বোঝাতে পারছি না! কি খবর বেরিয়েছে জান? শুনলে তোমারও বুক শুকিয়ে যাবে। দীপেন্দু, হ্যাঁ দীপেন্দু যে জেলে আছে, সেখানে ভয়ানক এক ঘটনা ঘটে গেছে। জেলের মধ্যেই প্রচণ্ড রকমের নাকি মারামারি হয়েছে। জেলের পাগলা ঘন্টি বেজেছে; অনেকে পালাবার চেষ্টা করছিল, পালাতে গিয়ে গুলী খেয়েছে। ভেতরেও ধস্তা-ধস্তিতে অনেক হতাহত হয়েছে। যারা মরেছে বা আহত হয়েছে, তাদের অবশ্য নাম ছিল না কাগজে। এরপর এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না আমার।

কথাগুলো নিজের কানেই যেন অন্যরকম লাগছিল। মাকে আর এসব কথা এখন বলা যাবে না। এ কোন অভিশাপ তাদের সংসারে? এত বড় সর্বনাশ যেন না হয় ওদের। তারা কেউই এ আঘাত সামলে উঠতে পারবে না। চিঠির জবাব না আসা পর্যন্ত এক অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাতে হবে তাকে। সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছে। শেষবারের মতন টেনে ওটা ফেলে দিল অনীশ। চায়ের পয়সা মিটিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো সে। রোদ উঠেছে। রাস্তায় লোকজন বেড়াতে বেরিয়েছে।

সে এলোমেলোভাবে খানিকক্ষণ ঘুরল। সিগারেট খেল। তারপর কি ভেবে একবার অতসীদের ওখানে গেল। সুরেশবাবু

বেরোচ্ছিলেন। তাকে দেখে বারান্দায় বসলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন। অনীশের মনটা আজ ভাল নেই। অতসী চা করে নিয়ে এলো। অনীশের মুখের দিকে চেয়ে কেমন একটু বিস্মিত হলো ও। একদৃষ্টে চেয়ে থাকল। সুরেশবাবু কি একটা কাজে ভেতরে গেলেন। অতসী এই ফাঁকে অনীশের খুব কাছে এসে শান্ত নম্র গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমার শরীর কি আজ ভাল নেই, এমন রুক্ষ রুক্ষ দেখাচ্ছে কেন?'

অনীশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওকে দেখল অপলকে। কিছু বলল না। সুরেশ-বাবু আবার ফিরে এসেছেন। ওর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমাকে আজ একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে কি ব্যাপার?'

অনীশ ম্লানভাবে হাসল, হেসে বলল, 'ও কিছু নয়।'

অতসী তখনো ওকে গভীর চোখে দেখছিল।

কি ভেবে অনীশ ওর মুখের দিকে তাকাল একসময়, পরে ধীর গলায় শুধলো, 'আজ বেরোলে না?'

'বেরোবো তো, কিন্তু মানুরই দেখা নেই!'

সুরেশবাবু সামান্য সময় কি ভেবে নিলেন যেন। অনীশের মুখের ওপর চোখ রাখতে রাখতে বললেন, 'তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হলো।' সুরেশবাবু আবার চুপ। তাঁকে তাঁকে অন্যদিনের চেয়ে একটু গম্ভীর দেখাচ্ছিল। খানিক পরে আবার তিনি বললেন, 'তোমরা এখানে আরো কিছুদিন থাকবে তো?'

'সে রকমই তো মার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এখন ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমার তো ভাই আর থাকার উপায় নেই: ভাবছিলাম, এরা আরো ক মাস এখানে থাকুক, তোমরাও আছ। তারপর আবার না হয় আসা যাবে।'

'তোমাকে যেতে দিলে তো!' অতসী হাসল সামান্য।

'শুনলে, পাগল মেয়ের কথাটা শুনলে একবার!' সুরেশবাবু সস্নেহ গলায় বল-লেন, বলে তাকালেন ওর দিকে। কি ভেবে হাসলেন এবার, বললেন, 'তোর আগে বিয়ে হোক, তখন না হয় চাকরি-টাকরি ছেড়ে দিয়ে তোর এখানে এসে শেষ সময়টা কাটিয়ে দেবো।'

'সে তো অনেক পরের কথা!'

'তখন দেখবো তোর বর কি করে!'

অতসী হেসে ফেলল। এক পলক সে অনীশকে চোরা চোখে দেখে নিল, পরে সুরেশবাবুর মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'আমার বরকে অত খারাপ মানুষ ভাবছো কেন মাণ্ডামামা। দেখবে আমার চেয়েও অনেক ভাল।'

'সে কি রে, মনে হচ্ছে, তুই আগে থাকতেই জানিসটানিস!' বলেই সুরেশবাবু হো হো করে হাসতে লাগলেন। বাইরে থেকে তাঁকে বোঝাই যায় না, এসবের কোন খোঁজটোজ তিনি রাখেন। অথচ কিছুই যে বোঝেন না, এমন নয়। অতসী আর অনীশের মধ্যে যে ইদানীং একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তিনি ভাল করেই তা জানেন। শুধু জানেনই না, তিনিও চান, এটা বাস্তবে সত্য হয়ে উঠুক। মনে মনে তিনি ওদের আশীর্বাদই করেছেন। মেয়েটা সুখী হোক, এর চেয়ে বড় কামনা আর কিছু নেই তাঁর। এ ব্যাপারে অনীশের মার কাছে একটা আভাসও দিয়ে এসেছেন। শুধু তাই নয়, তিনিও বুঝে এসেছেন, এতে ওদেরও পুরো সম্মতি রয়েছে। তিনি চারুর সঙ্গেও আড়ালে এ নিয়ে কথা বলেছেন। প্রথম দিন থেকেই ছেলেটির ওপর তাঁর কেমন দুর্বলতা ছিল। পরে আরো বেড়েছেই তা। সুরেশবাবু অল্পক্ষণ চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে, পরে সহাস্য মুখে বললেন, 'না, চাকরিটাই এবার যাবে দেখছি।'

অতসী আবার সুরেশবাবুর মুখের দিকে অপলকে তাকাল, এবার আর মুখে হাসি ছিল না ওর, বলল, 'তোমরা কি চাও, আবার ওদের কাছে ফিরে যাই?'

'না চাইলেও তো একবার যেতে হবে। আমি তো বলেছিলাম, আমার এখানে চলে আয়, তাতেও তো রাজী নয় তোর মা। হয়তো এমন হতে পারে, ওখানে বেশিদিন তোদের থাকতে হলো না!'

অতসী যেন একটু আহত হলো এই কথায়। সে ঠোঁট কামড়ে ধরে কোন রকমে বলল, 'বেশ, তাই হবে।' অতসী আর দাঁড়াল না ওখানে, দ্রুত পায়ে ভেতরে চলে গেল।

'আরে না, না; শোন, শোন।' সুরেশ-বাবু ডাকলেন ওকে। পরে অনীশের দিকে চেয়ে বললেন, 'ভীষণ চটে গেছে ও।'

অনীশ বিব্রত বোধ করছিল। সে চোখ তুলে একবার তাকাল, কিছু বলল না। মৃদুভাবে হাসল। আরো কিছুক্ষণ থেকে ও চলে এলো একসময়। অন্যসময় হলে এসব কথা নিয়ে সে উৎসাহ বোধ করত। সেও এই দুষ্টুমির লুকোচুরি খেলায় অতসীদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলত। ব্যাপারটা এখানেই এমনভাবে থেমে যেত না। অনীশের মনে হলো অতসীর এভাবে অভিমান করে চলে যাওয়ার কারণটা অন্য। রাগটা আসলে ওর ওপরই। তার এই নিরুত্তাপ ব্যবহারে অতসী হয়ত দুঃখ পেয়েছে। পেলেও এই মুহূর্তে কিছু করার নেই তার। পথে মানুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। অতসীর ওখানেই যাচ্ছে ও। অনীশ কিছুই বলল না ওকে। কি ভাবতে ভাবতে চলে এলো।

মনের মধ্যে আবার সেই ভাবনা উঁকি দিচ্ছে। দীপেন্দুর চিন্তাটা তো কিছুতেই মাথা থেকে সরাতে পারছে না অনীশ! মাঝে মাঝে অন্যরকমের ভাবনায় ডুব দেওয়ার চেষ্টা করছে সে। যেমন অতসীর কথা, সন্দীপ, সানু, প্রতিমা, মা আবার অতসী ইত্যাদি টুকরো টুকরো ছবি, কথা মনে পড়ছে। কিন্তু আবার সব ঠেলেঠুলে সরিয়ে দিয়ে দীপেন্দু সে জায়গা অধিকার করেছে। এ এক মজার খেলা সুরু হয়েছে যেন।

বাড়ি ফিরে এসে আজ আর বারান্দায় বসল না অনীশ। মনটা ভাল নেই। মনে হচ্ছে মুখের ওপর হিজিবিজি কাটাকুটির দাগ পড়েছে। কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল তার। এসেই শুয়ে পড়েছে। একটু পরে মা এলো চা নিয়ে। পাশেই একটা চেয়ারে এসে ওর মা কি ভেবে বসল। তিনি ওর মুখের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁরও মুখখানি কেমন শুকনো শুকনো। বেশ চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখাচ্ছিল তাঁকে।

অনীশ এক পলক চেয়েই চোখ সরিয়ে নিয়েছে। বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে তার কেমন ভয় ভয় করছে। হয়ত সবই ধরে ফেলবে। সে অন্যদিকে চেয়ে মনের এই ভাব গোপন করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিছুতেই বুঝতে দেওয়া চলবে না।

নীলিমা দেবী বললেন, 'চা খেয়ে নে, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

অনীশ মুখের দিকে না চেয়েই কাপটা টেনে নিল।

নীলিমা দেবী একটুক্ষণ নীরব রইলেন। তাঁকে বড় ক্লান্ত, দুঃখী দেখাচ্ছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তোর কি হয়েছে রে?'

'না, কি হবে!' অনীশ হাসবার চেষ্টা করল। তবে কি মা কিছু একটা আন্দাজ করছে? মনে হলো হাসিটা কেমন আলগা আলগা। আরো যেন অপ্রস্তুত হলো।

'আমার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই খোকা। মুখ দেখেই বুঝতে পারছি, কিছু একটা তোর হয়েছে।'

'সত্যি বলছি, কিছু হয়নি আমার!'

'না হলেই মঙ্গল। কিন্তু আমার মন বলছে, তুই আমাকে লুকিয়ে যাচ্ছিস।'

অনীশ কিছু না বলে চা খেল। কাপটা পরে একপাশে সরিয়ে রাখল। সে ভাবল মা হয়ত এবার উঠে যাবে।

কিন্তু নীলিমা দেবী একই রকম ভঙ্গিতে বসে থাকলেন। তিনি যেন আরো কি বলতে চান। একটু পরে উদাস গলায় বললেন, 'ছোট খোকার অনেকদিন আর কোন চিঠি-পত্র নেই!'

অনীশ যেন চমকে উঠেছে। সে কি বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। অন্য-দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল।

নীলিমা দেবী ফের বলতে আরম্ভ করলেন, 'খোকার জন্যে আমার মনটা কেমন করছে রে! কতদিন হয়ে গেল ও আজ ঘরছাড়া। আমি আর পারছি না, মনে হলে বুক ভেঙে যায় আমার।' আবার চুপচাপ।

অনীশও কি পারছে সইতে। তবু তো, এখন পর্যন্ত মার কাছে খবরটা গোপন আছে। দীপেন্দু জেলে আছে, এইটুকুই মা জানে। কিন্তু সেখানে যা ঘটে গেল, তা মাকে বলা যায় না, অন্তত এই মুহূর্তে। এমনও হতে পারে, অনীশ যা আশঙ্কা করছে, হয়ত তা মিথ্যে; দীপেন্দু সুস্থই আছে। তাই যেন শোনে ও! খানিকক্ষণ পরে ও বলল, 'অত ভাবছো কেন, ও নিশ্চয়ই ভাল আছে।' অনীশ সহজ হওয়ার চেষ্টা করছে। তবু নিজের কানেই তার কথাটা যেন বেসুরো লাগল। ও চুপ করে জানলা দিয়ে বাইরের গাছ-টাছ দেখছিল।

'ভাবা ছাড়া আর কি-ই বা করার আছে আমার।' নীলিমা দেবী সহসা গভীর এক আবেগ বোধ করছিলেন। বুকটা যেন তাঁর ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। চোখদুটো জলে ভরে উঠল দেখতে দেখতে। তিনি আঁচল চেপে ধরেছেন চোখে। প্রাণখুলে যদি কাঁদতে পারতেন একবার! কি যেন তাঁর মনে পড়েছে এই মুহূর্তে।

'কি হলো, কি হলো তোমার?'

নীলিমাদেবী কিছু জবাব না দিয়ে চোখের জল মুছলেন. আরো কিছুক্ষণ তিনি নীরব থাকলেন, পরে খানিকটা সামলে নিয়ে বললেন, 'আজ ওকে আবার স্বপ্নে দেখলাম। অনেক রোগা আর কালো হয়ে গেছে, চেনাই যায় না ওকে। ভর সন্ধ্যের সময় ও এসে হাজির। আমাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, অমন করে কি দেখছো মা, আমায় তুমি চিনতে পারছো না, আমি, আমি তোমার দীপেন্দু, ছোট খোকা। তোমাকে ছেড়ে আর আমি কোথাও যাবো না মা, যাবো না। বড় ক্লান্ত আমি, তোমার কোলে একটু ঘুমোতে দাও মা, কতকাল যে ঘুমোই নি।' নীলিমা দেবী বলতে বলতে আবার কাঁদলেন। কাঁপা কাঁপা গলায় আবার তিনি বললেন, 'এরপর, তুই-ই বল খোকা, না ভেবে থাকা যায়! মনটা যে কী করছে না, তোদের বোঝাতে পারবো না। এখানে আর এক মুহূর্তও থাকতে আমার ভাল লাগছে না।'

'এই যে বললে, তুমি অনেকদিন থাকবে এখানে।'

'বলেছিলাম ঠিকই, কিন্তু এখন আর ইচ্ছে করছে না। খোকার জন্যে মন বড় ছটফট করছে।' একটু থেমে ফের বললেন, যদুলাল মল্লিক রোডের সেই বাড়িটাও এখন ভাল লাগছে।'

অনীশ বুঝতে পারল, মার আর ভাল লাগছে না এ জায়গায়। একবার যখন মার মনে হয়েছে, কলকাতায় ফিরে যাওয়া দরকার, তখন আর তাঁকে ফেরানো যাবে না। অনীশ এবার মার মুখের দিকে তাকাল, খানিকক্ষণ পরে ধীর গলায় বলল, 'তাই চলো।'

নীলিমা দেবী আরো কিছুক্ষণ বসে রইলেন ওখানে। পরে উঠে গেলেন এক-সময়।

অনীশের মন খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ। মা যেভাবে দীপেন্দুর কথাটা বলছিল, শুনতে শুনতে তার চোখও ছল-ছল করে উঠেছে। ও কি সত্যিই আবার ফিরে আসবে তাদের কাছে? কিসের আকর্ষণে ও এমনভাবে ঘর ছেড়ে চলে গেল! ওর মনে কী এমন অসন্তোষ একটু একটু করে জমে ছিল? ও কি সত্যই এখন ক্লান্ত? একটা কাক ডাকছিল। অনীশ বালিশে মুখ গুঁজে আরো কত কি তখন ভাবছিল।

দীপেন্দুর প্রকৃতিটা বরাবরই একটু অন্য ধরনের। ভীষণ খেয়ালী। মাথায় কিছু একটা একবার এলে, তাই নিয়ে মেতে থাকল। অবশ্য বেশিদিন এর জের থাকে না। এক অদ্ভুত ধরনের ছেলে দীপেন্দু। অনীশের মনে হলো, তার সঙ্গে ওর ভীষণ অমিল।

কি খেয়াল হতে দীপেন্দু মেলা থেকে একবার খাঁচা সমেত অনেকগুলি মুনিয়া পাখি কিনে এনেছিল। তখন আর কোন-দিকে নজর নেই তার। শুধু ওই পাখি-গুলোর যত্ন আর ভাবনা ভাবতেই সময় কেটে যায়। বাবা ভীষণ অসন্তুষ্ট, পড়া-শুনোয় মন কমে গেছে। মাও বিরক্ত. খাঁচাটা এমন জায়গায় টাঙিয়েছে, যেতে আসতে মাথায় লাগে। জায়গা খুব ছোট। আলো আসে না, অন্ধকার। তারাই কোন রকমে থাকে, আবার নতুন উপসর্গ। তার ওপর বাড়িঅলার কটা বিড়াল পাখিগুলো খাওয়ার জন্যে ঘুর ঘুর করছে। তাও দেখতে হয়। দীপেন্দু কোন কথাই গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। ও মাকে আরো চটিয়ে দিয়ে মজা পায়। হাসতে হাসতে বলে, 'এবার আর মুনিয়া নয়, টিয়া, ময়না নিয়ে আসবো।'

মা, রেগে যায়, বলে, 'আন আগে পরে দেখাব।'

আস্তে আস্তে মুনিয়াগুলোকে সবাই ভালবেসে ফেলল। দীপেন্দুর চেয়ে, এখন অন্যদেরই ভাবনা বেশী। বাবা বলে 'পাখি-গুলো এনে তো ভালই করেছে খোকা।' মা বলেছে, দেখতে ভালই লাগে।'

বাবা কথার জবাবে ফের বলেছে, শুধু ভাল কি বলছো, ওগুলো আনার পরেই আমার একটা প্রমোশন হয়েছে।'

দীপেন্দু একদিন অনীশের পাশে শুয়ে শুয়ে বলল, 'কাজটা বোধহয় ভাল করিনি, তাই না রে সোনাদা?'

'কিসের কাজ?'

'ওই যে পাখিগুলো এনে খাঁচায় আটকে রেখেছি।'

'বাবা তো বলছিল, বাবার ভাগ্য নাকি লাক ফিরেছে।'

'ওসব আমি মানি না।' দীপেন্দু জোরে জোরে হেসে উঠেছে। তারপর গম্ভীর হয়ে বলেছে, 'ওগুলোকে আটকে রাখার কোন রাইটই নেই আমার।'

পরের দিন অবাক হয়ে সবাই দেখেছিল, কোন ভোরে পাখিগুলোকে দীপেন্দু ছেড়ে দিয়েছে। তার জন্যেও বকুনি খেয়েছে ও।

ছাত্র হিসেবে ও খুবই ভাল। পরীক্ষার ফল বেরোবার পর বাবা বলেছে, ডাক্তারী পড়তে, নতুবা ইঞ্জিনীয়ারিং: কোনটাতেই ও রাজী হলো না। শেষ পর্যন্ত ও জেনারেল লাইনে গেল। এজন্যে বাবা-মার ক্ষোভের অন্ত ছিল না।

অনীশ দেখেছে, খুব ছেলেবেলা থেকেই ওর মধ্যে এক ধরনের খেয়ালীপনা, অস্থিরতা। তখন ঠিক বোঝা যেত না স্পষ্ট করে। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওটা স্পষ্ট হয়েছে। মনে হয়েছে, ওর সঙ্গে কোথায় যেন তাদের সবারই একটা ব্যবধান বেড়ে চলেছে। ও যেন সকলের কাছেই ক্রমশ দুর্বোধ্য, রহস্যময় হয়ে উঠছে। এমন কি অনীশের কাছেও সব ব্যাপারটাই কেমন জটিল লাগছে। পাশাপাশি শুয়েও কতদিন তার মনে হয়েছে, দীপেন্দুটা আজকাল আর প্রাণখুলে মেশে না, কথা বলে না। ওর ভেতরে কী একটা যেন হয়েছে। অনীশ কষ্ট পেয়েছে। ওর চেহারাটাও খারাপ হয়েছে আগের চেয়ে। দীপেন্দু একদিন কথায় কথায় তাকে বলেছে, 'জানিস সোনাদা, বাঁচতে হলে মানুষের মতনই বাঁচতে হয়; এই অনাদরে, উপেক্ষায়, বাঁচার কোন মানে হয় না।'

'তোর কথা আজকাল ঠিক বুঝতে পারি না রে আমি!'

'না বোঝার তো কিছু নেই। আমি বলছিলাম, আমরা যেভাবে বাঁচছি, তা বাঁচা নয়। এভাবে এই ঘরদোরে মানুষ থাকতে পারে? পারে না, অথচ থাকছি। এর একটা সুরাহা হওয়া দরকার।'

'এর আর সুরাহা কি টাকা-পয়সা হলে না হয় অন্য বাসায় যাওয়া যায়!'

'খুব সহজেই দেখছি সমস্যাটা সমাধান করে দিলি। কিন্তু, অত সহজে সমাধানের জিনিস এটা নয়। আমার কথা হলো, কেন মানুষ ভালভাবে বাঁচবে না, তাদের অপরাধটা কোথায়?'

'ওরে বাবা, অত বড় ব্যাপার আমার মাথায় ঢোকেই না!' অনীশ ভাইকে দেখতে দেখতে পরমুহূর্তেই হেসে হেসে ফের বলেছে, 'ওসব ভাবলে আর কূল পাবি না।'

'এটা অবিচার সোনাদা, ভীষণ অবিচার।' দীপেন্দুর চোখ-মুখ আবেগে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

'এই অবিচার চিরকালই চলছে, চলবে।'

'এটা কোন যুক্তি নয়।'

'তোর কাছে হয়তো নয়, আর অত শত বুঝিও না আমি; তবে আমার দেখে দেখে যা মনে হয়েছে তাতে বুঝেছি, প্রত্যেক মানুষই মূলতঃ স্বার্থপর, নির্দয় নোংরা। বাইরে ভাল মানুষের একটা মুখোশ পরা থাকে, সময় হলেই এটা খুলে ফেলে। এই অবিচারের হাত থেকে মানুষের কোন সময়ই মুক্তি নেই। নতুন নতুন অপরাধে কেবলই জড়িয়ে যাই আমরা।

'তবে তো মানুষের সংগ্রাম বলে কিছুই থাকে না, থাকত না, অথচ ইতিহাস তো অন্যরকম কথা বলে।'

'এটা আর কিছুই নয়, প্রত্যেক কাজেরই যেমন বিপরীত একটা প্রতিক্রিয়া আছে, এও ঠিক তাই। সবটাই আমাদের নিজেদের মতন ব্যাখ্যা করে নিয়েছি মাত্র।'

'কি জানি, এসব ভাবলে আমার ঘুম আসে না রে সোনাদা, মাথাটা খালি গরম হয়ে যায়।'

ওর এ ধরনের কথাবার্তা থেকে অনীশ ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি যে অলক্ষ্যে দীপেন্দুর পথটা ক্রমশই আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আজ মনে হয়, সেই টুকরো টুকরো ঘটনা, কথাবার্তা একসঙ্গে মেলালে একটা অর্থ আছে। ওদের কাছ থেকে যে দীপেন্দু এভাবে সরে যাবে, ভাবতেই পারেনি কেউ। দীপেন্দুটা কী ছেলেমানুষ আর আবেগ-প্রবণ। এই মুহূর্তে অনীশের ওর চিঠির দু-একটা কথা মনে পড়ছেঃ...আমি ভেবে দেখেছি সোনাদা, ঘরের সুখ আমার জন্যে নয়। আমার কাছে এখনও এটা এক বিরাট জিজ্ঞাসার মতন। উত্তর খুঁজছি। এখনও সঠিকভাবে তা পাচ্ছি না। তবে তোর মতন সব ব্যাপারটাকেই অত সহজ সরল করে নিতে পারছি না। আমার বুকের মধ্যে আগুন, এ আগুন আরো অনেকের ভেতরেই জ্বলছে আমি দেখতে পাচ্ছি। মার কথা আমার মনে পড়ে খুব। কিন্তু ফেরার আর উপায় নেই আমার।

অনীশের বুকটাও কেমন তোলপাড় করছে। এসব কথা মনে হলে সেও কেমন অস্থির হয়ে পড়ে। সে উঠে বসল। চোখ-মুখ ভার ভার। ভাইয়ের জন্যে গভীর মমতা বোধ করছিল অনীশ। এতে কি ওর বুকের আগুন নিববে? না, সুদীর্ঘকালের এই অন্যায় অবিচারের অভিশাপ এতটুকুও কমবে? ওর আরো কথা মনে পড়ছে তার। দীপেন্দু লিখেছিলঃ...এখন যেখানে আছি, যদুলাল মল্লিক রোডের বাসাটা সেই তুলনায় স্বর্গ। জানিস সোনাদা, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, এই মানুষগুলো কি করে আজো বেঁচে আছে? এদের মধ্যে থাকতে প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হয়েছে আমার; এখন সয়ে গেছে। খেতে পারতাম না, ঘুম হতো না। তবে লোকগুলো বড় সোজা। আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, এখন আর খারাপ লাগে না।

অনীশ চিঠির অনেক কথাই মার কাছে গোপন করে গেছে। এই মুহূর্তে সে মনে মনে ওকে বললঃ আমাদের বাসাটা যদি তোর কাছে স্বর্গ বলেই মনে হয়ে থাকে, তবে ফিরে এলি না কেন রে? আমি জানি, তুই যা ভেবেছিস বা করছিস তার মধ্যে কোন ফাঁকি নেই, বরং এর মধ্যে বিপদ আছে। না হয় ধরেই নিলাম, সস্তা বাহবা নেওয়ার পথ এটা নয়, তাতে হলো কি? মানুষ তোদের কতটুকু বুঝবে, জানবে?

অনীশ উঠে দাঁড়াল। জানলার কাছে এলো। কুয়াশা সরে গেছে। ঝমঝমে রোদ ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দীপেন্দুর মুখটাই যেন সে সব কিছুর মধ্যে দেখছিল। ওরা কত ইয়ার্কি ঠাট্টা করেছে। একসঙ্গে বসে সিগারেট খেয়েছে। প্রতিমার ব্যাপারটা ওকেও আহত করেছিল। আরো কত অন্ত-রঙ্গ সরস মুহূর্ত। কতদিন দু ভাইয়ে মিলে খেলা দেখতে গেছে, নাইট শো-এ সিনেমা দেখেছে। পাশাপাশি শুয়ে কতদিন ওরা দুজনে স্বপ্ন দেখেছে, কি করে ওদের সংসারটাকে আরো সুন্দর করা যায়। সব, সব আজ পণ্ডই হয়ে রইল। দীপেন্দু যদি এখনও ফিরে আসে, তবু চেষ্টা করা যায় একবার। অতসীর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাটাও জানানো হলো না ওকে। ওর জন্যে এই মুহূর্তে গাঢ় আবেগে বুকটা ভরে উঠেছে ওর। একান্ত বিনীতভাবে অনীশের বলতে ইচ্ছে হলো : ওর যেন ভাল খবর আসে, কিছু যেন না হয়, না হয়।

অনীশ মাথাটা জানলায় রেখে কোনরকমে আবেগ সামলাবার চেষ্টা করছে। দূরে কোথায় একটা কাক তখন সমানে করুণ স্বরে ডেকে চলেছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)
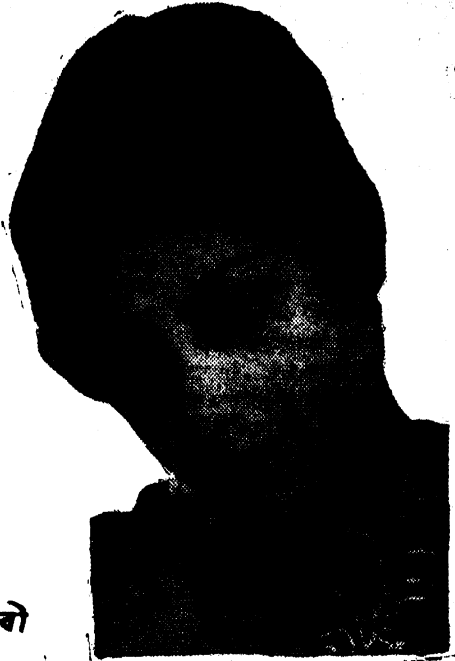
(২০)

আমরা সচরাচর জীবনে চলি একটা বাঁধা পথে। সে পথের একদিকে থাকে বটে অসুবিধা—তার একঘেঁয়েমো। কিন্তু অন্যদিকে ক্ষতিপূরণের অঙ্কটা বেশ মোটা,—তার আরাম নির্বিবাদী। কথায় বলে না, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল? বাঁধা সড়কের মস্ত দান এই স্বস্তি। তার দুঃখ বিপদ নেই এমন কথা বলছি না। কিন্তু তার সঙ্কটের মধ্যেও অভাবনীয়তা থাকে না,—অন্তত সাড়ে পনেরো আনা ক্ষেত্রে। জীবনে বাজে বেশী অভাবনীয়তা—তাই আবহমানকাল সংসারে চেনা পথেই যাত্রীর এত ভিড়। হোক না লক্ষ্য মামুলী, নাই বা থাকল তার বড় কোন তৃপ্তি। সে যে চেনা। এর মধ্যেই কি অফুরন্ত ভরসা নেই?

কিন্তু তবু বিচিত্র এই জীবনের গতিধারা, সে মানতে ব্যগ্র বটে, কিন্তু ভাঙাতেও কম তৎপর নয়। চেনা বীথিকা তার মন টানে, কিন্তু অচিন মানসসরোবরও তাকে ডাকেই দূর থেকে। তাই হঠাৎ কোন বড় কিছু করবার পাগলা খেয়ালের দমকা হাওয়ায় সে উধাও হয় অচেনা পথে।

খেয়ালের এই দমকা হাওয়ার প্রেরণাতেই সৃষ্টি হোল আরো দুটি প্রতিষ্ঠান 'মহেন্দ্র-আনন্দা স্মৃতিসমিতি' ও 'উইমেনস কালচারাল এসোসিয়েশন।' কথাটা আর একটু প্রাঞ্জল করেই বলি।

মহিলা শিল্পীমহলের অভূতপূর্ব সাফল্যের পর অনেক প্রতিষ্ঠান থেকেই আমার সাগ্রহ আহ্বান আসতে লাগল পরিচালিকারূপে যুক্ত থেকে তাঁদের কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যের সহায়ক হবার জন্য। সকলেরই কেমন একটা ধারণা হয়ে গেল কাজের তরীতে আমাকে কর্ণধাররূপে পেলে তাঁরা সকল আবর্তকে অতিক্রম করে কূলে পৌছবেনই। কিন্তু তাঁদের ঐ ধারণাই আমায় ভয় পাইয়ে দিল। আমার সকল দোষগুণ ও সীমাবদ্ধতা নিয়েই আমি একজন অতি সাধারণ মানুষ। কোনরকম দেবীত্ব অথবা অতিমানবত্বের ইমেজ থেকে নিজেকে আমি সবসময় মুক্ত রাখবারই চেষ্টা করি। কারণ ওতে নিজের ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশী।

যাই হোক, সময়াভাবে অনেককেই ক্ষুন্ন করতে হয়েছে। কিন্তু এ শৈথিল্য অনিচ্ছাকৃত। তবু এড়াতে পারি নি দুটি প্রতিষ্ঠানকে। বীণাদেবী সেনের মা-বাবার নামে করা 'মহেন্দ্র-আনন্দা স্মৃতিসমিতি' এবং সুতারা ঘোষদের 'উইমেনস কালচারাল এসোসিয়েশন।' কোন গ্ল্যামারাস ব্যাপার এখানে নেই। প্রথমটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলাদের অবসর সময়ে কাজকর্ম করার আসর। এখানে সংগৃহীত চাঁদার অর্থ শাড়ী ও পরিচ্ছদ অভাবগ্রস্ত পরিবারে বিতরিত হয়ে থাকে। এ-ছাড়াও দরিদ্র ... বারের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফি, বই খাতা

কন্যাদায়গ্রস্তদের যথাসাধ্য সাহায্যদানে এ প্রতিষ্ঠান সীমিত পরিসরের মধ্যেও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। বীণার কাছেই শুনেছি অনেক ভদ্র, দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারের মেয়ে,—হাত পেতে চাওয়া যাদের পক্ষে সহজ নয়, পুরোনো শাড়ী, ব্লাউজ, শায়া পেয়ে তাদের মুখে যে কৃতার্থভাব ফুটে ওঠে দেখলে চোখের জল রাখা যায় না।

উইমেন্স কালচারাল এসোসিয়েশন কর্মজীবিনী শিক্ষিতা মহিলাদের প্রতিষ্ঠান। সমিতির সভ্যাদের দেওয়া চাঁদার টাকায় প্রতি বছর এঁরা শহরের শ্রেষ্ঠ নাট্যসংস্থা অথবা শিল্পীদের বিচিত্রানুষ্ঠান দিয়ে অর্থসংগ্রহ করে কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করেন। এইসব অনুষ্ঠানে নামীদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক অজানা, অচেনা প্রতিভাকে জনসাধারণের সঙ্গে পরিচিত করবার চেষ্টাও হয়ে থাকে। দুটি প্রতিষ্ঠানই মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে।

অত্যন্ত খুশি হয়েছি দেখে যে, অবসর সময়ে পরচর্চা, পরনিন্দা ও অন্যের অনিষ্টচিন্তায় সময়ের অপব্যয় না করে সময়টাকে এঁরা সত্যিকারের কাজে লাগাচ্ছেন। কাজের পরিধি যত বড়ই হোক, তার একটা আলাদা মূল্য আছেই আছে। দীনতম মানুষের মধ্যেও থাকে একটা হিরো বা হিরোইন। থেকে থেকে অকারণেই সে হাঁক দিয়ে ওঠে। উপযুক্ত কাজের আনুকূল্য পেলে এই অস্থিরতাই অঘটন ঘটাতে পারে। অন্তত

মহৎ কাজের প্রবৃত্তিগুলি উদ্দীপিত হতে পারে। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতাই তার সাক্ষী।

এরই মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীর পত্তন এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই অন্যতম ডিরেক্টররূপে আমার যুক্ত থাকা। এই প্রেরণার মূলেও ঐ নিউ থিয়েটার্স। আমরা দশজন ডিরেক-টার মিলে পুরানো স্মৃতি জড়িত নিউ থিয়েটার্সকে কিনে নিলাম। রূপান্তরিত প্রতিষ্ঠানের নাম হল ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারী।

নিউ থিয়েটার্স আমায় ভুললেও আমি তাকে ভুলতে পারলাম কই? তাই এ প্রস্তাব যখন এল, মনে হল ব্যবসায়িক লাভ-লোকসানের হিসেব মাথায় থাক, ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীর সঙ্গে জড়িত থাকলে জীবনের শেষ দিন অবধি নিউ থিয়েটার্সের স্মৃতিলোকের বাসিন্দা হয়েই থাকতে পারব ত। এককালে যেখানে আমি ছিলাম শিল্পী সেখানের ডিরেক্টর হবার অভিজ্ঞতার স্বাদটাও থাক না।

উনি বিদেশ থেকে ফেরার পর কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রতি বছর নানা দেশ বেড়ানোও আমাদের প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত থাকত। এতে শুধু একঘেয়ে জীবনের ক্লান্তিই কাটে না। নানান দেশ, লোক, দৃশ্য ও ঘটনা অনেক উপলব্ধির দৃষ্টি খুলে দেয় যার অবকাশ রুটিনে-বাঁধা কর্মব্যস্ত জীবনে মেলে না।

এমন অনেকসময়ই হয় যে দুজনেই, দুজনকে স্নেহ করেছে, কিন্তু বরণ করে নি। হঠাৎই হয়ত একদিন আসে বরণের এই শুভলগ্ন। তখন স্নেহাস্পদ হয়ে ওঠে প্রিয়, বন্ধু হয়ে ওঠে বল্লভ। প্রকৃতির বেলায়ও এই কথা। কত সময় কত সুন্দর সুন্দর দৃশ্যের ঢেউ ডেকে যায়। কিন্তু পায় না আমাদের মনের নাগাল। কখনও বা এমন হয় যে, চেয়ে, চেয়ে, চেয়েও অপূর্ব দৃশ্যের মধ্যে শুনতে পাওয়া যায় না সেই সুরটি, যে পথ চেনায়, আড়াল ভেঙে ফেলে।

কিন্তু এক একদিন হঠাৎ হয় এ বাগান। কেন কেউ জানে না। কিন্তু হয়। অমনই এ বলে আমি এসেছি ও বলে আমি দেখেছি। সেদিন শাঁখ বেজে ওঠে, বাতি জ্বলে ওঠে বাঞ্ছিত লগ্ন ওঠে ঝলকে।

দার্জিলিং ভ্রমণ আমার জীবনে এইরকমই এক স্মরণীয় দিন। কারণ ঐদিনই দার্জিলিং-এর সঙ্গে হয়েছিলো আমার সত্যিকারের শুভদৃষ্টি, মালাবদল।

বিশেষ করে মনে পড়ে পাহাড়ী রাস্তাগুলির কথা। ঘোরানো রাস্তা উঠেছে ঠিক স্পাইরালের মতন, যেমন অন্য সব পাহাড়েও। এমন শোভা আর দেখিনি। একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে খাদ। বড়, বড় চেনার ও পপ্‌লারের জটলা, পাখীর ডাক, পীচ, পিয়ার ও কমলালেবুর গাছ—সে অফুরন্ত। সুন্দর রঙচঙে পাখীও দেখলাম বহু। কিন্তু মনকে মজিয়ে দিল সেখানের হাজারো নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ, লতাপাতার অন্তহীন ঐশ্বর্য আর তুষারের সমারোহ। সবুজের দৃশ্যে মনে জেগে উঠল স্নিগ্ধতা, শুভ্রজটা ধ্যানরূপে অন্তর থমকে দাঁড়ালো সম্ভ্রমে। পর্বতের লাখো রূপ আছে। ঋতুচক্রের পটপরি-বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে নিত্যনূতন বিস্ময়-মঞ্চ উদ্‌ঘাটিত করে তোলে আনন্দের পাদ-প্রদীপে। কিন্তু স্নিগ্ধতার সঙ্গে ভক্তি, তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, জিজ্ঞাসার সঙ্গে গ্রন্থিমোচন, উচ্ছলতার সঙ্গে প্রণতির পাশাপাশি রসভোগ এভাবে আর কখনও করিনি। সেইদিনই দেখেছিলাম কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়ের শিখরমন্দিরের চূড়ায় একটা মেঘের বৃত্ত রয়েছে যেন একটি বিশাল পীতনীলাভ আংটি হয়ে। আকাশ যেন পরাতে এসেছে মন্দিরের দেবতাকে। সেই বিবাহসভায় পৌঁছতে হবে কোন পথে তারই যেন ইঙ্গিত দিয়েছে ঐ বিজলী আলোর আঁকাবাঁকা সোপান; ধাপে, ধাপে।

নবীনমন/মঞ্জু দের সঙ্গে

নর্মবিধান চিত্রের আর একটি দৃশ্যে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে

পাশে বরফ-গলা নদীর মৃদু কলধ্বনি তাল দিয়ে চলেছে এই মৌনরাগিণীর সঙ্গে।

কাশী ভ্রমণের সময় মনে হয়েছে সৃষ্টি-কর্তা প্রতি মহিমময় দৃশ্যের মধ্যে নিত্য নব প্রেরণার উৎস এমন বিচিত্র উপায়ে সঞ্চিত করে রাখেন—যার রঙীন পরশ প্রতিজনকে তার অনন্ত আবেগ বিলিয়েও নিঃশেষ হয়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথের রহস্য-গভীর চোখে কাশী দেখার কথা শুনেছি। সে দৃষ্টি ত আমাদের নেই। তবু বেনারসে এসে নৌকা বেয়ে ভেসে বেড়াবার সময় মনে হয়েছে আমরা যেন সময়ের তরণীতে এক বিগত যুগের বেলায় এসে পৌঁছেছি, যেখানে পরিচিত সবকিছুই একটা অজানা-অচেনা নূতনের রঙ্গে অপরূপ মহিমাচ্ছুষিত হয়ে উঠেছে।

ভেনিসের গন্ডোলাবিহার মনোরম। ভেনিসের রূপের অবধি নাই। কিন্তু তবু যেন ভেনিস যেন গতিশীলতার প্রতি-মূর্তি। আর কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট যেন জগতের সকল আনন্দ উৎসবের অন্তরালের অনিত্যতার এক মধুর ঔদাস্যের সাক্ষী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভেনিস বর্ণের, গতির লাস্যের, সঙ্গীতের কাব্যচিত্রের অনুরাগিণী। আর মণিকর্ণিকা ঘাটের তীর ঘেঁষে—নৌকা-বিহারে মনে হয় কাশী বিগত বৈভবের লুপ্ত গৌরবের, বাসনার চরম অবসানকেই বড় করে দেখবার প্রয়াসী।

এই নদীর বুকে ভাসতে ভাসতেই মনে প্রশ্ন জেগেছে নদীকে কেন এত আপনার মনে হয়? মানুষী কীর্তির সঙ্গে জড়িত বলেই কি? পর্বতের শোভার মধ্যে সম্ভ্রমের উপাদান যথেষ্ট থাকলেও কেমন যেন পর পর লাগে। এর মধ্যে নেই সে ছন্দ যা নদীর গতিভঙ্গী ও লহরীলীলার মধ্যে পাওয়া যায়। নদীর আপনা বিলানো ভাবের মধ্যে যেন মিশে আছে মানুষের সভ্যতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে গড়ে ওঠার পুলক পরশ। সর্ব-প্রাচীন সভ্যতাও ত গড়ে উঠেছে নদীর উপত্যকারই আশেপাশে। দেখেছি কোনারক, ভুবনেশ্বরের মন্দিরশিল্প। আবার তাজ-মহলও দেখেছি।

হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরের ওপর হৃদয়ভরা শ্রদ্ধা নিয়ে দেখতে গিয়ে বড় হতাশা জেগেছে মন্দিরের অন্তঃপুরের শ্রদ্ধা-উবে-যাওয়া অযত্ন দেখে। প্রথমতঃ মন্দিরে ঢোকবার আগেই দস্যুতুল্য পান্ডা-দের উৎপাতে ভক্তিভাবের মধুর আবেশ যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তারপরে বিগ্রহের কাছাকাছি পৌঁছবার আগে জলকাদা ও নোংরা পিচ্ছিলতায় দেবস্থানের মাহাত্ম্য ভুলে আত্মরক্ষার চিন্তা মনকে অনেকটাই

উদ্দেশ্য থেকে কেন্দ্রচ্যুত করে। এছাড়া মন্দিরের চারপাশে, উঠোনে পানের পিক ও অন্যান্য দাগের কথা ত ছেড়েই দিলাম।

দেবস্থানকে অকলঙ্ক, শুচি পরিবেশে সুন্দর করে রাখা কি পূজারীদের দেবসেবার অঙ্গ নয়? তুলনামূলক বিচারে মুসলমানদের সমাধি মন্দির, মসজিদ, গির্জার পরিচ্ছন্নতা এটুকু অন্ততঃ স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে এঁদের উপাসকমণ্ডলী তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন নন।

শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রেও অনুরূপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মন্দির-শিল্পে সংযমের অভাব দৃষ্টিকেই শুধু নয়—মনকেও বড় পীড়িত করে। প্রস্তরগাত্রে কারুকার্যের আগুনের মুগ্ধকারী গুণ অস্বীকার করতে পারে কে? কিন্তু কোণারক, ভুবনেশ্বর বা পুরীর মন্দিরে কারুকার্যের বাহুল্য দেখে ভাবছিলাম এখানে কি শিল্পীদের উদ্দেশ্য ছিল সৌন্দর্যসৃষ্টি করা, না কারিগরীর অসংখ্য নৈপুণ্য দেখিয়ে মানুষকে চমকে দেওয়া? বাহাদুরী দেখানো এক, শিল্পসৃষ্টি আর। ভাবতে বিস্ময় লাগে এতবড় শিল্পদক্ষতার অধিকারী হয়েও সৌন্দর্যের মর্মবাণীটি এঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি।

এসব দেখার পর তাজমহল এবং আরো নানান জায়গায় মোগল আমলের আরো স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নমুনা দেখে মনে হয়েছিলো হিন্দু মন্দিরনির্মাতাদের যেন জীবনের একটিমাত্রই উদ্দেশ্য ছিলো। সে উদ্দেশ্য কি? না, কোনো কারুকার্যকে বাদ না দেওয়া। এ-যেন অপরিণতবোধ গায়ক-গায়িকার অনবরত তান ও গমকের আতিশয্যে রাগরাগিণীর মূর্তিকে ঢেকে দেবার সাড়ম্বর প্রয়াস। শ্রোতা ও শিল্পীর মধ্যে এক মরমী আনন্দসেতু গড়ে তোলা নয়।

কিন্তু তাজমহল? তার অকলঙ্ক শুভ্রতা নিয়ে যেন "কালের কপোলতলে একবিন্দু নয়নের জল"-এর মতই শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রকৃতির রূপবদলের মতই তারও কত রূপ-বৈচিত্র্য। কিন্তু মূল সুর এক—সেই বিরহী অন্তরের বেদনা। ভোরের আলোয় স্নান করে বিরহিণী যেন স্তব্ধ বিষাদে যমুনার দিকে চেয়ে থাকে। অপরাহ্নে অস্তগামী সূর্যের আলো স্ফটিকের গায়ে পূরবীর উদাসী বিষণ্ণতার যে অনুরণন তোলে সে আলো যেন দর্শকচিত্তকেও গৈরিক আভায় অনুরঞ্জিত করে।

জ্যোৎস্নারাতে তারই আবার আর এক রূপ। চাঁদের আবছা আলোয় দূরাভাসী ছবিখানির মতই তাজমহলের তলায় বসেই প্রথম অনুভব করি যে চাঁদনী রাত আনন্দমাখা নয়। এর মধ্যে যেন একটা একাকীত্বের বেদনা মাখানো।

এই এক তাজমহলই মনকে কত বিচিত্র রাগিণীর সুরে ভরিয়ে তোলে। কই মন্দিরগাত্রের প্রতিটি ইঞ্চিতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম কারুকার্য পারে না ত মনে সে আবেশের মায়া রচনা করতে?

তাই ত ভাবি কত যুগ যুগ সঙ্গীত সাধনায় তবে শিল্পকলার সৌন্দর্যে সরলতার গূহ্য তত্ত্বটি মানব আবিষ্কার করেছে।

কি গানে, কি চিত্রকলায়, ঐ একই সত্যকে অনুভব করা যায়। প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর গানে যে তানালাপের সংযম, অলঙ্কারের পরিমিত প্রয়োগ ও সুরের প্রশান্তি মনে বিছিয়ে যায় তার সঙ্গে বাহাদুরীলোলুপ শিল্পীর সার্গামের চর্কীবাজীর তুলনা করলে দেখি গানের ক্ষেত্রেও মানুষ বহু সাধনার পরে সঙ্গীতের আবেদনে, সরলতার দাম দিতে শিখেছে।

চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা। রেনেশাঁর আগের যুগের ছবিগুলিতে রঙের অতিপ্রয়োগ, নরমূর্তির সংখ্যাবাহুল্য, অসংখ্য দেবদেবীর আমদানী দেখতে দেখতে

জার্মানীতে

চেকোশ্লোভাকিয়ার শিল্পী ও সাংবাদিকদের সঙ্গে

যেন শ্রান্ত মন বুঝতে আরম্ভ করে কেন্দ্রগত বক্তব্যকে উপলক্ষ্য দিয়ে ঢেকে না ফেলাটাই হোলো সত্যিকারের আর্ট। আর এই সাদা সত্যটা বুঝতেই দাভিঞ্চি, রাফায়েল, মিচেল এঞ্জেলোর মত বিরাট শিল্পীর প্রয়োজন হয়েছিলো।

রাজস্থান বেড়ানোর সময়ই রাণা প্রতাপ সিংহের ছবি যেন দেখিয়ে দিয়েছে ক্ষাত্র-বীরত্বের মহত্তম অভিব্যক্তি মানুষের প্রতি ভঙ্গিতে কেমন করে ফুটে ওঠে। এমন কি নেপোলিয়নের ছবিও বীরত্বের প্রতি মনে এ সম্ভ্রমবোধ জাগাতে পারেনি।

প্রতাপ সিংহের তেজোদৃপ্ত চাহনী ও বীরত্বব্যঞ্জক ভাবভঙ্গীর পাশে তাঁরই পুত্র অমরসিংহের গোলাপফুলের দিকে চেয়ে-থাকা, হীনপ্রভ দৃষ্টি, কুণ্ঠিত গতিতে যেন বিলাসপ্রিয়তার এক অলস রূপ মনকে পীড়িত করে।

...খুব বেশী দেশ ঘোরা হয়নি। কিন্তু যেখানে যতটুকু দেখেছি ট্যুরিস্টের মত ব্যস্তবাগীশ চোখ-বোলানোর দৃষ্টি নিয়ে দেখতে পারিনি। প্রতি মানুষের মত প্রতি দেশেরও একটা নিজস্ব সত্তা আছে। আছে তার অন্তরের ভাষা, তার ভাব ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। এই অন্তরের ভাষাটিই সবসময় কান পেতে শুনতে চেয়েছি।

. প্রকৃতির উদার, মুক্তরূপ আমায় ছোটো-বেলা থেকেই বড় টানে। হয়ত সেইজন্যই কবীর রোডের বাড়ী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তৈরী করিয়েও সে বাড়ীতে বেশীদিন থাকতে পারিনি। ওখানে থাকতে বারান্দায় বা বাইরে দাঁড়ানোর উপায় ছিলো না। তখনই মনে হয়েছিলো এমন কোনো জায়গায় নিরালা একটি বাড়ী করা যায় না যেখানে প্রতিবেশী হবে আকাশ, গাছ, আর সঙ্গী হবে ফুল, লতা, ফল ও সব্জির বাগান? সেই কল্পনারই বাস্তব রূপ আমার রিজেন্ট গ্রোভের বাড়ী। এ বাড়ী বোধহয় আমার কাছে স্বর্গের চেয়েও আকর্ষণীয়।

এই বাড়ীতেই রাণাকে পেয়েছি। ও আস্তে, আস্তে বড় হোলো, সুস্থ হোলো। ওর বিয়েও দিলাম গত বছর। রাণার বিয়েও আমার জীবনে এক বেদনা-আনন্দভরা ঘটনা। অনেকেই,—এমন কি আমার স্বামীও এত অল্পবয়সে (এমন কি গ্র্যাজুয়েশনের আগেই) ছেলের বিয়েটা বড্ড বাড়াবাড়ি রকমের সেকেলেআনা বলে মনে করে-ছিলেন। কিন্তু এই সেকেলেআনা যে আমার মজ্জায়। একে ছাড়াটা প্রায় ধর্মত্যাগ করার মতই ভয়াবহ। তবু বলি নিছক সেকেলে-আনা মনই এই অপরিণত বয়স ও মনের ছেলের বিবাহ দেবার কারণ নয়।

এর প্রেরণা পেলাম কোথায়? আমারই বাগানের ডালিয়া গাছে এক বছর দেখে-ছিলাম পাশাপাশি দুটি ফুল ফুটেছে। প্রায় একই আকারের, একটু ছোটোবড়। দুটি সাথীফুলের কুঁড়ি থেকে ফুল,—সেই ফুলের পূর্ণ বিকাশ দেখে মনে হোলো আমার রাণারও যদি ছোট্ট একটি সঙ্গী এনে দিই? একসঙ্গে পড়বে, বসবে, বেড়াবে খেলবে আর লাল ডুরে শাড়ীটি পরে সারা বাড়ী আলো করে বেড়াবে? তারপর ধীরে ধীরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনও যখন পরিণতির পথে এগোবে—দুজনেই দুজনকে প্রতি মুহূর্তে নূতন করে চিনবে, জানবে, মুগ্ধ হবে, ভালবাসবে।

খুব বেশী খুঁজতে হয়নি। বিধাতা আমার কল্পতরু। খুব অল্পদিনের মধ্যেই দেখা পেলাম ফ্রকপরা, ছোট্ট সুন্দর মেয়েটির। আমার সেই ৩৩ বছরের বন্ধু অন্নপূর্ণার (মিসেস সারদা দাস) সহায়তায়। শুভকাজের আয়োজনে আমি একদিনও দেরী করিনি।

কিন্তু তবু যে দেরী হয়ে গেল। বিয়ের ঠিক আগের দিন রাত্রে। তত্ত্ব সাজানো থেকে শুরু করে সব কাজ সেরে সবাই বিশ্রাম নিতে যাবে এমন সময় ম্যার হঠাৎ প্যাল্‌পিটেশন শুরু হোলো। হার্টের রোগী। এরকম প্রায়ই হয়। আবার সেরেও যায়। যথারীতি ডাক্তার এলেন। কিন্তু তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল অন্যান্যবারের চেয়ে অবস্থাটা সঙ্গীন। এ সঙ্গীন অবস্থাও কাটল। সুস্থ অবস্থাতেই সামান্য একটু দুধ খাওয়ার পরই হঠাৎ চোখ বুজলেন।

তখনও কেউ বুঝিনি মা আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। বৌমা (অরুণের স্ত্রী) বিবাহ উপলক্ষ্যে এসেছিল। সে কি বুঝল জানি না। হঠাৎ মার কানের কাছে যেয়ে গোপালের নাম শুরু করল। ঐ নাম উচ্চারণের ভঙ্গীতেই যেন মার ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল। তারপরেই সবশেষ।

এরপর কি হোলো জানি না। আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম বলে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিলো। ঘুম আসেনি। তবে আচ্ছন্ন চেতনা সত্ত্বেও সবই বুঝতে পারছিলাম। রাণার বন্ধুরা, আমার স্বামী, দাদাবাবু (দিদির স্বামী) মিলে সব ব্যবস্থা করেছেন। নিয়ে যাবার আগে আমায় ধরে ও'রা সবাই মিলে মার সঙ্গে শেষ দেখা করাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমি যাইনি। সে দৃশ্য সহ্য করতে পারছিলাম না বলেই নয়।

ছোটোবেলা থেকেই মা ও দিদি ছাড়া আপনার বলতে কেউই ত ছিলো না। মা একাধারে আমার বন্ধু, সাথী মা সবই। ছোটোবেলায় মার গলা জড়িয়ে বলতাম—'মা আমরা দুজনে একসঙ্গে মরব।' মা বলতেন—'আচ্ছা'। আমি বলতাম—'তুমি আগে গেলে কিন্তু আমি তোমার মুখ দেখব না।' মা হেসে বলতেন, 'তাই হবে।'

তাই হোলো। ঠিক ঐ সময়ে ঐ কথাটি মনে পড়ছিলো বলেই মাকে শেষ দেখা দেখতে পারিনি। পারিনি আজীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধুর চিরবিদায়ের মুহূর্তে তাঁকে দরজা অবধি এগিয়ে দিতে যেতে।

সেই রাতেই ভাবী কুটুম্ববাড়ী, পুরোহিত সবাইকে জানানো হোলো। দিদিমা পরমাত্মীয় হলেও ভিন্নগোত্রীয়া। এ মৃত্যুতে শুভ কাজ আটকায় না।

ভাবলাম—আমার যা ক্ষতি হোলো তা ত পূর্ণ হবার নয়। তবে আর অন্যকে শুধু শুধু অসুবিধায় ফেলব কেন? ও'দের আয়োজন সম্পূর্ণ। আত্মীয়কুটুম্বে ঘর ভর্তি। এক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধ করা মানে ও'দের একরকম বিপদেই ফেলা।

গোপালের দিকে তাকালাম। মনে হোলো নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আমার বেদনার্ত অন্তরের পানে। দুটি ডাগর চোখে যেন জল টলমল করছে। আমার গোপালকে খাওয়ানো, স্নান করানো, বেশপরিবর্তন করায় কেউ কেউ আপত্তি করেছিলেন। অশৌচ অবস্থায় দেববিগ্রহ স্পর্শ করতে নেই বলে। আমি সব বিধান মেনেছি। শুধু এই একটি বিধানই মানতে পারিনি। মেনেছি আমার অন্তরের নির্দেশ। আমি যদি অশুচি হয়ে থাকি তবে গোপালকে ছুঁলেই ত শুদ্ধ হয়ে যাব। তবে? ওকে অস্নাত, অভুক্ত রেখে শুচি-অশুচির নিয়ম আমি মানতে পারব না। আমার রাণাকে ছুঁলে যদি অপরাধ না হয় ত গোপালকে ছুঁলেও অপরাধ হবে না—এই ছিল আমার অন্তরের বিশ্বাস।

সেদিন ব্যাকুলভাবে গোপালকে ডেকে বলেছিলাম, 'এমন আনন্দ কোথায় পাব যার মধ্যে কোনো দুঃখের সুরই বাজবে না? সেজন্য তোমায় দোষ দিই না। একদিকে সাধের রাণাকে তার নবজীবনের দ্বারে পেঁৗছে দেবার আনন্দ অন্যদিকে আবাল্য সুখদুঃখের আশ্রয় মাকে হারানোর ব্যথা—দুটি বিবাদী সুর মেলাবার কঠিন পরীক্ষায় যদি ফেলেছ, তুমিই এ সংকট উত্তীর্ণ করিয়ে দাও। শোককে জয় করবার, বেদনাকে বোধনায় রূপান্তরিত করবার শক্তি দাও প্রভু।'

গোপাল শুনলেন ত সেই প্রার্থনা। দিলেন ত শক্তি। শুভকাজ সুসম্পূর্ণ হোলো। বিয়ে হোলো। বড় সাধের বালিকা-বধূ ঘরে এল। সকলের পুলকের প্লাবন, উচ্ছ্বাসের উলুধ্বনিতে আমিও যোগ দিয়েছি। কাউকে বুঝতে দিইনি মনের মধ্যে কি ঝড় বইছে যখন রাঙা-চেলী-পরা বালিকাবধূর হাত ধরে রাণা গোপালের পরই তার দিদিমাকে প্রণাম করতে পারল না বলে। সকল কাজ আশ্চর্য সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবার পর মন ভরে উঠেছিল একটি চেতনার উদ্ভাসে—আমি ধন্য হয়েছি। ঠাকুরের মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছি।

(চলবে)

অনুলিখন—সন্ধ্যা সেন।

বর্ণচূর্ণ ছবিতে পদ্মাদেবীর সঙ্গে

— দশ —

মিলনের মুখের উপর একটা অস্পষ্ট মেঘ ভাসছিল।

তার মনের আয়নায় বিনিত আর সেই ফর্সা সুন্দর ছেলেটার মুখখানা বার বার প্রতিফলিত হল। সে অন্যমনস্কের মত অনেক কিছু চিন্তা করছিল। তার দৃষ্টি সামনের ছোট টেবিলটার দিকে,—যেখানে জোড়া শালিখের মত দুটি মেয়ে-পুরুষ মাথা নুইয়ে ফিসফিস করে কি সব কথা বলছিল, কিম্বা আরো দূরে থামের কাছের ঐ বড় টেবিলটার উপর। আসলে মিলন কার দিকে তাকাল, বা কি দেখছিল ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

অপরেশ বন্ধুর মুখের উপর চোখ রেখে শুধোল,—'কি হল বল দিকি তোর? ছুঁড়িগুলো চলে যেতেই কেমন মিইয়ে গেলি। তারপর থেকেই চুপচাপ,—কি যেন ভাবছিস?'

—'দূর! কি ভাবব আবার?' মিলন নড়েচড়ে তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল। ফের ঘাড় তুলে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে বলল,—'কি খাবি, এবার অর্ডার দিয়ে ফেল।'

—'সে কথাই তোকে জিজ্ঞেস করছি।' অপরেশ পাল্টা জবাব দিল। ঈষৎ রহস্য করে শুধোল,—'কি চলবে তোর? হুইস্কী, না ব্র্যাণ্ডি?'

—'কিছুই না।' মিলন নিরাসক্ত গলায় উত্তর দিল। বলল,—'এখন ড্রিঙ্ক করতে ইচ্ছে করছে না রে। আমি বরং ঝাল-চিকেন কিম্বা ফ্রায়েড-চিংড়ি খেতে পারি।'

—'খেপেছিস?' অপরেশ হাল্কা কথায় ওর আপত্তি খণ্ডন করতে চাইল। চোখ ঘুরিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, — 'বারে ঢুকে মদের গ্লাসে চুমুক দিবি না? শুধু মুরগীর মাংস আর চিংড়ি মাছ ভাজা খেয়ে চলে যাবি? তাই কি কখনও হয়?'

—'সত্যি বলছি।' মিলন প্রায় অনুনয় করল বলল—

—ড্রিংক করতে আমার একটুও ইচ্ছে করছে না রে।

—খুব ইচ্ছে করবে।' অপরেশ জোর করল। 'বারে ঢুকে মদ খেতে অরুচি? এমন সব মজার কথা বলিস না?' ফের পরিহাসের সুরে বলল,—'কোনদিন এর পর বলবি ফুলশয্যের রাত্তিরে তোর নতুন বউয়ের পাশে শুতে ইচ্ছে করছে না।'

ইঙ্গিত করতেই অর্ডার নেবার লোকটি কাছে এসে দাঁড়াল। তার গায়ে শাদা কোট, গলায় বো-টাই, পরনে ফিকে নীল রঙের প্যান্ট। হাতের আঙ্গুলে চেপে-ধরা স্লিপ-বই। ডান হাতে পেন্সিল। লোকটির ঈষৎ আনত নম্র ভঙ্গি। ঠোঁটের ডগায় নরম ক্রিমের মত মিষ্টি মন ভেজানো হাসি।

অপরেশ দরাজ গলায় অর্ডার দিল,— 'হুইস্কি।' ফের মিলনের দিকে এক পলক তাকিয়ে মুচকি হেসে যোগ করল,—'আউর সাবকে লিয়ে জিন।' তারপর আঙুলের সাহায্যে মাপ দেখিয়ে বলল,—'ছোটা একঠো।'

আধ পেগের অর্ডার শুনে মিলন আশ্বস্ত হল। ইদানীং সে হোটেলে-বারে অপরেশের সঙ্গে আসা-যাওয়া করে। তবু মদ খাওয়াটা ঠিক রপ্ত হয় নি। তার দৌড় ওই আধ পেগ পর্যন্ত। বেশী হলেই গড়-বড়। রাস্তায় বেরোলেই পা থরথর করে কাঁপে। মাথার ভিতরটা কেমন শূন্য ফাঁকা মনে হয়। একটু বেশী পেটে গেলেই বিবমিষা চেপে ধরে। খানিকটা বমি না হলে স্বস্তি নেই। অথচ অপরেশ? এক পেগ নিয়ে শুরু করে বটে। কিন্তু দ্বিতীয় পেগের অর্ডার তো অব্যর্থ। কোনদিন তিন পেগ, চার পেগ পর্যন্ত চলে। তবু অপরেশের হুঁশ থাকে। মাঝে মাঝে নেশার ঝোঁকে দু-একটা বেফাঁস কথা বলে, এই পর্যন্ত।

ইতিমধ্যে হল-ঘরটা আবার ভরে উঠতে শুরু করেছে। হাল্কা বিলিতী বাজনার সুর সুগন্ধী আতরের মত সমস্ত ঘরময় ছড়াল। টেবিলগুলোতে মেয়ে-পুরুষ, — কোথাও জোড়া শালিখের মত দুজন। কোন টেবিলে চার-পাঁচজনে মিলে হৈ-চৈ করছে। মিলন ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, কাছাকাছি একটি টেবিলও আর খালি নেই। সবগুলি পূর্ণ... ব্যস্ত বয়-বেয়ারার দল এদিকে সেদিকে দ্রুত আনাগোনা করছে।

সোডা ঢালতেই মদের পাত্রটি প্রায় ভরে উঠল। অপরেশ এক চুমুক দিয়ে বলল, —'তুই যে দেশে যাচ্ছিস, সেখানে লোকে জলের বদলে বিয়ার খায়। ঠাণ্ডা রাত্তিরে এক-আধ পেগ মাল না খেলে পরদিন সকালে জোর পাবি না, বুঝলি'

—'মজার দেশ, কি বল?' মিলন মুচকি হাসল, ফের ধীরে ধীরে বলল,—'আচ্ছা, আগে তো সে দেশে যাই।'

—'যাই মানে?' অপরেশ ভুরু কোঁচকাল। যাওয়ার তো সব ঠিক। 'এভরিথিং সেটলড।'

—'ঠিক কোথায়?' মিলন সন্দেহের সুরে বলল, 'এখনও তো পাকা খবর পাস নি।'

—'খবর পাকা জানবি।' অপরেশ গাল ফুলিয়ে ফু দিয়ে ধুলো বালি ওড়ানোর মত সকল সন্দেহ আর অবিশ্বাস দূরে করতে চাইল। ফের বলল,—'এলসী বৌদি যখন লিখেছে, তখন চাকরি ঠিক হবে। আমি আশা করছি কাল কিম্বা আজ রাত্তিরেও কেবল্ পেতে পারি।'

মিলন কোন কথা বলল না। এক টুকরো মুরগীর মাংস মুখে দিয়ে বোধহয় তার নতুন চাকরির কথা ভাবতে লাগল।

অপরেশ মদের গ্লাস থেকে মুখ তুলে বলল,—'জানিস, লাস্ট ইয়ারে এলসী বৌদি একবার ইণ্ডিয়াতে এসেছিল। অদ্ভুত মেয়ে। যেমন ফুর্তিবাজ, তেমনি ফাজিল। আমাকে দেখে বলল,—'আরে তুমি এত ফর্সা, এমন সুন্দর দেখতে নাকি? আগে জানতে আমি কখনও তোমার ওই কালো দাদাটির বউ হই?'

মিলন হা-হা করে হেসে উঠল। 'ভদ্রমহিলা খুব রসিকা মনে হচ্ছে।' সে ছোট্ট মন্তব্য করল।

—'ভীষণ! তোর সঙ্গে আলাপ হলে দেখবি এলসী বৌদি কি রকম আমুদে।' মদের গ্লাসটা হাতে নিয়ে অপরেশ কি যেন চিন্তা করল। কয়েক মুহূর্ত পরে সে প্রায় স্বগতোক্তির মত বলল,—'কলকাতায় তুই আর কটা দিন আছিস। বড় জোর টু অর থ্রি উইকস। তারপরই ফ্লাই করবি।'

ফ্লাই। মিলন উৎসাহিত হয়ে জবাব দিল। 'আমার দিক থেকে কোন অসুবিধে নেই। এক হপ্তার মধ্যে আমি রেডী হতে পারি। কিন্তু আর কিছুই তো এখনও হয়নি। মানে পাসপোর্ট, ভিসা—।'

—'তার জন্যে তোর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। ও সব ফর্মালিটিজের ভার আমার উপর। তুই শুধু সই-টইগুলো করে দিস। তাহলেই হবে।' অপরেশ বন্ধুকে নিশ্চিন্ত করল।

মিলন চুপ করে তার আসন্ন বিদেশযাত্রার কথা চিন্তা করছিল। সমস্ত ব্যাপারটা গাঢ় ঘুমে দেখা একটা স্বপ্নের মত। আর দু-তিন সপ্তাহের মধ্যেই সে তার মা-বাবা, ভাই-বোন, পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, এই বাংলা, কলকাতার মাটি সব কিছু ছেড়ে হাজার হাজার মাইল দূরের একটি দেশে পাখির মত গিয়ে পৌঁছবে। অথচ কয়েক দিন আগেও এমন একটা মধুর সম্ভাবনার কথা সে কি চিন্তা করতে পারত?

মিলন নিজের মনে হাসল। জীবন সত্যি একটা বিচিত্র নদী। তার বাঁকে বাঁকে এমন আরো কত বিস্ময় ছড়ানো। কে বা তা আগে জানতে পারে?

আকাশপথে আমেরিকা! মস্ত সামিয়ানার মত ছড়ানো অন্তহীন নীল গগনের নীচে, হাজার হাজার মাইল মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত ভেসে যাওয়া। পায়ের তলায় মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, অজানা জনপদ, কত প্রাচীন গৌরবময় নগরীর জীর্ণ, ধ্বংস কঙ্কাল। হঠাৎ কলেজ জীবনে পড়া একটা বইয়ের কথা তার স্পষ্ট মনে পড়ল। বইটার কিছু অংশ এখনও মুখস্থ। জেলে বসে বাবা তার আদরিণী ছোট্ট মেয়েকে পত্র লিখে পাঠাতেন। চিঠির পাতায় পাতায় বিশ্বের ইতিহাসের কথা। একটি চিঠির শেষে তিনি মেয়েকে লিখলেন—

> ......If you fly by aeroplane from India to Europe, you will pass over these ruins of Palmyra and Baalbak, you will see where Babylon was and many other places, famous in history and now no more........

আচ্ছা সেও নিশ্চয় এই সব মৃত নগরীর উপর দিয়ে উড়ে যাবে। গভীর নিশীথে? অথবা রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিবসে? অপরেশকে সেকথা এখনই শুধোবে নাকি?

হাতের উপর মৃদু চাপ পড়তেই তার ভাবনার সুতো ছিন্ন হল। অন্য কেউ নয়, অপরেশ। চোখের ইশারায় সে কি যেন ইঙ্গিত করছে। মিলন মাথা ঘুরিয়ে দেখল পুব-ভোরের কাছে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। কেমন উগ্র সাজ। কাটা ফলের গায়ে বসা ভনভনে নীল মাছির মত অপরেশের দুদৃষ্টি কেবলি সেখানে আটকাচ্ছে।

তাকাতাকি হতেই অপরেশ মুচকি হাসল। 'কেমন দেখলি বল?' সে বাঁ-চোখটা ঈষৎ ছোট করে অর্থপূর্ণ একটি ইঙ্গিত করল।

মিলন ওর কথার মানে বুঝতে না পেরে বোকার মত তাকিয়ে রইল। অপরেশ ভুরু নাচিয়ে রহস্য করে বলল—দাঁড়া, ছুঁড়িকে ডেকে আনি এখানে।'

—ডেকে আনবি মানে? তুই ওকে চিনিস নাকি?'

—'কি জানি।' অপরেশ আগের মতই রহস্য করল। একটু থেমে সে প্রায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—আই নো, শী ইজ এ ট্যাক্সি।'

—'ট্যাক্সি? কি বলছিস তুই?' ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য না হতে মিলন সোজাসুজি প্রশ্ন করল।

—'ঠিকই বলছি।' অপরেশ একটুও দেরি না করে উত্তর দিল। 'পথে-ঘাটে ট্যাক্সি দেখিসনি তুই? খালি থাকলে হাত বাড়ালেই দাঁড়ায়। আর এনগেজড হলে নাকের ডগা দিয়ে সোঁ করে বেরিয়ে যায়। হাতছানি দিলে ফিরেও তাকায় না।'

অপরেশের কথা সত্যি, মেয়েটি খালি, অর্থাৎ ওর কোনো এনগেজমেন্ট ছিল না। বেয়ারা গিয়ে বলতেই সে অবিকল ফাঁকা ট্যাক্সির মতো টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল।

মাথা তুলে মিলন দেখল ওকে। ভালো করে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কি উগ্র সাজ মেয়েটার। ঠোঁটে কাঁচা রক্তের মত টকটকে লাল রং। চোখে কাজল, ভুরু সুন্দর করে টানা। গলায় সুদৃশ্য পাথরের মালা। ফর্সা গায়ে কালো রঙের একটা জামা প্রায় চেপে বসেছে। পরনে শ্ল্যাকস। মেয়েটি কি জাত, কে জানে? অ্যাংলো, পাঞ্জাবি কিম্বা বাঙালিও হতে পারে। মুখ দেখে বোঝা মুস্কিল।

অপরেশ ওকে নিজের পাশে বসাল। শুধোল,—'কি নাম বল তোমার?'

—'আমার নাম অলকা,—অলকা সোম।' সে পরিষ্কার বাংলায় জবাব দিল।

অপরেশ একদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছিল। যেন জহুরী আসল হীরে কিম্বা নকল হীরে যাচাই করছে।

—'কি দেখছেন অমন করে?' মেয়েটি বিলোল কটাক্ষ করল। ফের আব্দার করে বলল, —'কই আমার জন্য ড্রিংকসের অর্ডার দেবেন না?'

—'নিশ্চয়।' অপরেশ সোজা হয়ে বসল। 'কি খাবে বল? জিন?'

—'উহু।' অলকা মাথা নাড়ল। 'জিন নয়, আমার জন্য হুইস্কি বলুন—'

মিলনের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে অপরেশ মুচকি হাসল। 'শুনলি তো, মেয়েরাও আজকাল জিন খেতে চায় না।' কয়েক সেকেণ্ড পরে ফের বলল—'তবে সত্যি কথা, হুইস্কির মেজাজই আলাদা।' সে বেয়ারাকে ডেকে তক্ষুনি এক পেগ হুইস্কির অর্ডার দিল।

অলকা এসে বসতেই মিলন কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল। কেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য এবং অপরাধী মনোভাব। আর এই সব কল-গার্ল মেয়েগুলো এমন বিশ্রী, নির্লজ্জ। অলকা কখন আর একটু সরে অপরেশের খুব কাছে ঘন হয়ে বসেছে। ওর একটা হাত অপরেশের কোলের উপর, আবার ডানহাত বাড়িয়ে মেয়েটা ঠিক নতুন-বৌ, কিম্বা প্রেমিকার মত ভঙ্গিতে অপরেশের বুকের বোতামগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। কেউ কেউ তাদের দিকে তাকাচ্ছে। কি ভাগ্যিস। অলকা তার দিকে নজর দেয়নি। আর অপরেশও তেমনি। দিব্যি নিশ্চিন্তে গা এলিয়ে রয়েছে। তার পাশে অলকা যেন রক্ত-মাংসের মেয়েমানুষ নয়। একটা লোমওলা পোষা জন্তু, কিম্বা পাখি-টাখির মত। অপরেশের কোলে-পিঠে যেখানে খুশি উঠতে পারে।

মদের গ্লাসে অল্পই অবশিষ্ট ছিল, ছিটেফোঁটা তলানি। সুরাপানে মিলন এখনও আনাড়ি। তারিয়ে তারিয়ে খেতে জানে না। গ্লাস হাতে নিয়ে চক করে খানিকটা গিলে ফেলে। তারপর মুখের বিস্বাদ দূর করতে একটুকরো মাংস কিম্বা একটা ভাজা চিংড়ি চিবিয়ে চিবিয়ে খায়।

বাকি মদটুকু গলায় ঢেলে মিলন বলল, এই আমি উঠি এখন, একটা জরুরী কাজ আছে রে।'

—'জরুরী কাজ?' অপরেশ ভুরু কোঁচকাল।

—'ভীষণ জরুরী।' মিলন নিপুণ অভিনেতার মত মুখ-চোখের একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে তার কাজের গুরুত্বকে দশগুণ বৃদ্ধি করতে চাইল। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সে ফের বলল—'পরে তোর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলব, কেমন?'

—'দাঁড়া একটু।' অপরেশ বাধা দিল। তারপর সে নিজেও উঠে দাঁড়াল। বলল—চল, তোকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।'

খানিকটা গিয়ে অপরেশ ফিসফিসিয়ে শুধোল,—'পালাচ্ছিস কেন, সত্যি করে বল দিকি? মেয়েটাকে দেখে ভয় পেলি?'

—'দূর! ভয় পাব কেন? তবে ওকে ভালো লাগে নি।' মিলন ধীরে ধীরে বলল।

অপরেশ বলল, জানিস, মেয়েটার নাম কিন্তু অলকা নয়। নামটা স্রেফ জাল। ওর আসল নাম আমি জানি।'

—'তার মানে?' মিলন অবাক হয়ে শুধোল। 'তুই ওকে চিনিস নাকি?'
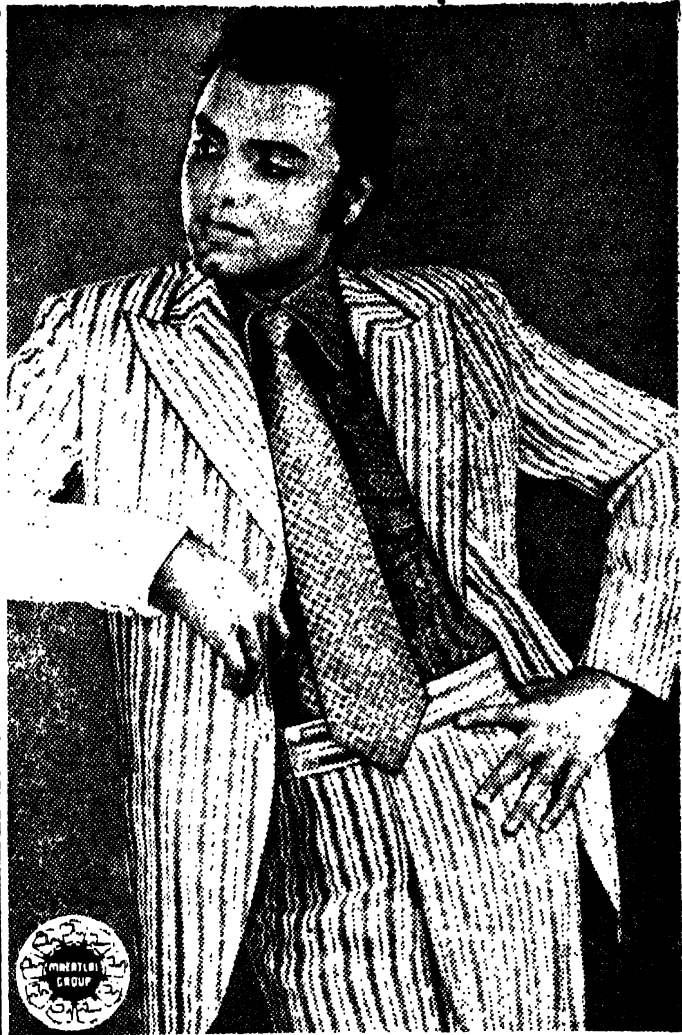
—'চিনি বৈকি।' অপরেশ মুচকি হাসল। 'তবে দূরে থেকে ঠিক ধরতে পারিনি। কিন্তু কাছে আসতেই চিনেছি। ওর নাম চপলা,—চপলা নন্দী। সার্কাস রেঞ্জে থাকে মেয়েটা। বাড়িতে ওর বুড়ি মা আর একটা খুবসুরৎ বোন আছে।'

—'তাজ্জব! তুই এত খবর জানিস ওর? অথচ মেয়েটা তোকে চিনতেই পারল না।'

—'আরো গোপন খবর দিতে পারি।' অপরেশ খাটো গলায় বলল। 'ওর বাঁ পায়ের হাঁটুর উপরে উরুর পিছন দিকে একটা কাটা দাগ আছে। যাকে তোরা মার্ক অফ আইডেনটিফিকেশন বলতে পারিস।'

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মিলন মুচকি হাসল। বলল—'খুব হয়েছে। এরকম গোপন খবর আর বেশী জানবার দরকার নেই। এখন তাড়াতাড়ি ঐ ট্যাক্সি-গার্লটাকে বিদেয় করে বাড়ি চলে যা।'

—'এত সকাল?' অপরেশ ভুরু কোঁচকাল। 'এই তো মোটে সাড়ে সাতটা। সবে সন্ধ্যে। আরো ঘন্টাখানেক অন্তত থাকি। আচ্ছা, তুই যা এখন। বাই।' অপরেশ ডান হাতটা ক্ষণিকের জন্য উপরে তুলেই পিছন ফিরল।

• • •

বাড়িতে ফিরে মিলন সোজা বাথরুমে ঢুকল। তার মুখে মদের গন্ধ,—অন্যদিন রাস্তার মোড়ে একটা দোকান থেকে একটু মশলা-টশলা, সুপুরির কুচি কিনে মুখে দেয় মিলন। প্রথম দিকে মদের দোকান থেকে বেরিয়েই সে একটা পান মুখে দিত। তবকে মোড়া সুগন্ধী মশলা দেওয়া পান। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাম্বুলের রসে ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল। কিন্তু তাই নিয়ে আর এক জ্বালা। এমনিতে পান-টান খাওয়া মিলনের অভ্যেস নেই। হঠাৎ সন্ধ্যের পর পানের রসে ঠোঁট রাঙিয়ে বাড়ি ফিরলে মা, বিনিত এমনকি হিরুটা পর্যন্ত মাঝে মাঝে মুখের দিকে তাকায়। মনে হয় ওরা যেন অন্য কিছু ভাবছে। আর তখনই সুড়সুড়ি পিঁপড়ের মত একটা ভিজে ভয়ভাব মনের ভিতর কেবলি ওঠানামা করে। তারপর থেকে পান খাওয়া সে ছেড়েছে। এখন সুরাপান করলেই দোকান থেকে সুগন্ধী মশলা-টশলা কিনে মুখে দেয়, যাতে গন্ধটা কেউ না টের পায়।

আজ তাড়াতাড়িতে বিষম ভুল হয়ে গেছে। অনেক, ছোট ছোট চিন্তা, জলের ঢেউয়ের মত এক একটা ভাবনা, রেস্তোরার কল-গার্ল মেয়েটার মুখ, তার ছোট বোন বিনিতর কোমর জড়িয়ে ধরে সেই ফর্সা সুন্দর ছেলেটার রেস্তোরা থেকে বেরিয়ে যাওয়া,—এই সব ভাবতে ভাবতে কখন সে বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছেছে তা খেয়াল করেনি। বাথরুমে দাঁড়িয়ে মিলন ভালো করে কুলকুচো করল, ...একবার, দুবার,—অনেকবার। তবু সন্দেহ কিছুতেই যায় না। মনের ভিতর দুরুদুরু ভয়ভাব। কথা বলতে গেলেই মদের গন্ধটা যদি মা টের পেয়ে যায়? তাহলে কেলেঙ্কারীর একশেষ।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে মিলন ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

উনুনে কি একটা তরকারি চাপিয়ে মনোরমা খুন্তি নাড়ছিল। আগুনের আঁচে ফর্সা মুখখানা ঈষৎ লাল। মুখ তুলে সস্নেহে ছেলের দিকে তাকিয়ে সে বলল—'আয় মিলু। বস এখানে। তোকে খাবার দিচ্ছি—।'

এখনই ফের খাওয়ার ইচ্ছে মিলনের ছিল না। তবু সে কথা বলতে গেলেই ফ্যাসাদ। খেতে অনিচ্ছে জানলে মা নানা রকম প্রশ্ন শুরু করবে। সব শুনে হয়তো দুঃখ করে বলবে,—'আজকাল তোর বাড়ির খাবার মুখে রোচে না। তাই না রে মিলু? বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হোটেল-রেস্টুরেন্টে খেয়ে বেড়াস?'

রান্নাঘরে একটা আসন পেতে মিলন বসল। মায়ের কাছ থেকে একটু দূরে। সুরার পরিচিত গন্ধটা এখনও কি তার মুখে লেগে আছে? কথা বলার আগে সে ঠিক জন্তুর মত শুঁকে সেই নিষিদ্ধ গন্ধটার অস্তিত্ব খুঁজতে চেষ্টা করল।

—'বিনিত কোথায় মা?' মিলন কথা বলার জন্য তৈরি হয়ে শুধোল।

—'সে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। স্কুল থেকে বেরিয়ে নাচের রিহার্সাল দিতে গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, মা ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। একটু আগে দেখলুম মেয়ে খাটের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে।'

—'আর হিরু?'

—'সে বাড়িতেই আছে। এতক্ষণ বই নিয়ে পড়ার টেবিলে বসেছিল। কিছুক্ষণ আগে আমাকে বলে ছাদে গিয়েছে।'

—'তোমাকে একটা কথা বলব মা?' মিলন মুখ গম্ভীর করে মুখবন্ধ করল।

—'কি কথা?' মনোরমা ভুরু কুঁচকে শুধোল।

—'স্কুল ছুটির পর বিনিত কোথায় যায়, তুমি খোঁজ নিয়েছ?'

—'বারে! এখুনি তো বললাম তোকে। স্কুল থেকে বেরিয়ে বিনিত নাচের রিহার্সাল দিতে গিয়েছিল। রোজই যায়। সামনের সপ্তাহে ওদের ফাংশন। মেয়েটা খুব ভালো নাচে। সব্বাই সেকথা বলে।'

—'বিনিতকে আজ একটি ছেলের সঙ্গে দেখলাম মা।' মিলন বাকিটুকু বলার আগে একবার ইতস্ততঃ করল।

—'কেমন ছেলে বল তো? খুব সুন্দর দেখতে? উনিশ-কুড়ি বছর বয়স? বিনিত ওর সঙ্গে একটা গাড়ি করে ফিরছিল? তাই না?—'

—'তুমি ওকে চেন নাকি? বিনিতর সঙ্গে কোনোদিন দেখেছ?' মিলন সবিস্ময়ে তাকাল।

মনোরমা হেসে বলল—'ছেলেটিকে আমি একদিন দেখেছি মিলু। ড্রাইভার না থাকলে বিনিতকে ওই পৌঁছে দিয়ে যায়। দেখতে ছেলেটা,...ভারী সুন্দর। বিনিতর পাশে ওকে চমৎকার মানায়।'

মিলন বাধা দিয়ে বলল,—'জানো মা, বিনিত আজ ওই ছেলেটার সঙ্গে একটা বারে গিয়েছিল? সেখানে দুজনে মিলে টুইস্ট নাচছিল।'

—'বারে? সে আবার কি? কি নাচছিল বললি?' মনোরমা অবাক হয়ে শুধোল।

—'বার মানে একটা মদের দোকান সেখানে খুচরো মদ বিক্রি হয় মা। তবে ওটা শুধু বার নয়, বার অ্যান্ড রেস্তোরাঁ। বিনিত ওই ছেলেটার সঙ্গে কোমর দুলিয়ে টুইস্ট নাচছিল মা।'

—'বিনিত একটা মদের দোকানে ঢুকে নাচছিল? তুই সত্যি বলছিস মিলু?' মনোরমার গলার স্বরটা হঠাৎ খুব বিষন্ন এবং কোমল শোনাল।

—'আমি নিজের চোখে দেখেছি মা। তুমি বিশ্বাস কর।' কথাটা বলেই মিলন খুব ভাবনায় পড়ল। এমন বেফাঁস কথা কেন যে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়? মদের দোকানে সে কেন গিয়েছিল, একথা মনোরমা যদি এখুনি প্রশ্ন করে বসে? মিলন তাহলে কি উত্তর দেবে? কি বোঝাবে মাকে?

কিন্তু মনোরমা কথা কইল না। সে স্তব্ধ বিষন্ন মুখে বসে রইল। বিনিত মদের দোকানে ঢুকে একটা ছেলের সঙ্গে হৈ-চৈ করে নাচছিল? এমন কথা যে মনোরমা চিন্তাও করতে পারে না। তার ছেলে-মেয়ে,—বিনিত, হিরু সকলে যেন বিদেশী বর্ণমালার মত ক্রমেই দুর্বোধ্য হয়ে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ পরে মনোরমা বলল—'মিলু, আমার একটা কথা শুনবি?'

—'কি কথা মা?'

—'তোর আমেরিকা যাওয়ার আগে বিনিতর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারিস?'

—'বিনিতর বিয়ে! মানে এত তাড়াতাড়ি? এখনও তো ও হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করেনি।'

—তোদের সকলের মুখে এক কথা। বিল্তির বিয়ের এত তাড়াহুড়ো কিসের? কিন্তু একটা কথা তোরা কেউ বুঝিস না? ওই নাচুনী মেয়ে কখনও চন্দনপুরের মত গাঁয়ে গিয়ে থাকতে পারে? শেষে বাড়ি থেকে পালিয়ে একটা কেলেঙ্কারী করবে?'

মায়ের কথার কোনো জবাব না খুঁজে পেয়ে মিলন চুপ করে রইল।

কয়েক সেকেন্ড পরে মনোরমা ফের বলল,—'আচ্ছা, তোর সেই বন্ধুর সংগে বিল্তির সম্বন্ধ করলে হয় না? মেয়ে দেখতে ভালো, নাচ গান জানে। এক নজর দেখলে বোধহয় অপছন্দ করবে না। আর অমন সোনার চাঁদ ছেলে। দেড় হাজার টাকা মাইনে পায়। তাছাড়া তোর বন্ধু—ওর নাড়ি-নক্ষত্র সব তুই জানবি—'

অপরেশের নাড়ি-নক্ষত্র মানে ওর চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্র? কিন্তু মনোরমাকে কি উত্তর দেবে মিলন? তার বন্ধু অপরেশ মদ্যপ,—বারে-হোটেলে নিত্য আনাগোনা। আজ সন্ধ্যায় বিল্তির যোগীয়ুগলের দিকে সে কেমন জ্বলজ্বল করে তাকিয়েছিল। একটা বাজারে কল-গার্ল মেয়ের বাঁ পায়ের হাঁটুর উপরে ঊরুর পিছন দিকের কাটা দাগের খবর পর্যন্ত সে রাখে। এরপর?

এরপরও কি নিজের বোনের সংগে সে অপরেশের সম্বন্ধ খুঁজতে পারবে?

(ক্রমশঃ)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

আগস্টের সৌর ঝড়

ইতিপূর্বে ১৮ নং সংখ্যায় (১৫ ভাদ্র, ১৩৭৯) সূর্যের 'বিস্ফোরণ' সম্পর্কে লিখেছিলাম। এইসংগে তার একটি ছবি উপস্থিত করছি। গত কয়েক বছরের মধ্যে এমন প্রচন্ড সৌর ঝড় দেখা যায়নি। জুলাই মাসের শেষ থেকে আগস্ট মাসের শুরু পর্যন্ত এই ঝড় চলেছিল। এই ছবিটি তোলা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাসা-র পক্ষ থেকে, গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারের ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে। ১০ই আগস্ট তারিখে ছবিটি তোলা। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সূর্যের পশ্চিম কিনার থেকে এক লক্ষ মাইল ব্যাসের ঝড় নির্গত হচ্ছে।

এই সৌর ঝড়ের খবর প্রথম জানা গিয়েছিল ২৮শে জুলাই তারিখে, অরবিটিং সোলার অবজারভেটরি নং ৭ থেকে। ৩০শে জুলাই তারিখে এই সৌর ঝড় প্রথম দেখা গিয়েছিল এবং মহাশূন্যে পরিক্রমারত দশটি ব্যোমযান থেকে তার মাপজোক নেওয়া হয়েছিল। এই দশটি ব্যোমযানের মধ্যে তিনটি ছিল একসপ্লোরার (৪১, ৪৩ ও ৪৫), দুটি পায়োনিয়র (৬ ও ১০), দুটি ওসো (৭ ও ৫) এবং তিনটি এরসো।

সৌর বিজ্ঞানীদের মতে, সৌর তেজের এমন উচ্চতম মাত্রার বিকীরণ ইতিপূর্বে আর কখনো ঘটেনি। একমাত্র ৭ই আগস্ট তারিখেই সূর্য থেকে যে পরিমাণ তেজ নির্গত হয়েছে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রয়োজন আগামী দশ কোটি বছর ধরে পূরণ করবার পক্ষে যথেষ্ট।

অত্যধিক দৌড়ঝাঁপ করার ফল সব সময় ভাল নয়

মানুষের শরীরে পাছার হাড়ের সংগে উরুর হাড় যেখানে মিলেছে তাকে বলা হয় হিপ্‌জয়েন্ট বা উরু-সন্ধি। মানুষ যখন চলা-ফেরা বা দৌড়-ঝাঁপ করে, বা এমনকি শুধু বসেও থাকে, তখন সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ে এই উরু-সন্ধির ওপরে। এক পায়ে লাফালে চাপ পড়ে আরো বেশি—শরীরের ওজনের চার গুণ। এ কারণে মানুষ যখন মধ্যবয়সে পৌঁছয়, বা বার্ধক্যে, তখন যদি দেখা যায় যে, এই উরু-সন্ধি কম-জোরী হয়ে পড়েছে তাহলে অবাক হবার কিছু নেই।

প'য়তাল্লিশ বছর পেরোলে কারও কারও উরু-সন্ধিতে কম-জোরের লক্ষণ প্রকাশ পায়। বুড়ো বয়সে খোঁড়া হয়ে পড়ার এটাই একটা বড়ো কারণ। এই রোগটিকে বলা হয় অস্টিওআরথ্রোসিস। মানুষের বয়স যখন পঞ্চাশের বা ষাটের ঘরে—জাতীয় অর্থনৈতিক উৎপাদনে মানুষের তৎপরতা যখন সবচেয়ে বেশি—সেই সময়েরই এই রোগ। ফলে পংগু হয়ে পড়তে হয় এবং অনেক সময়েই লাভজনক তৎপরতা থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। গোটা জাতির পক্ষেও এই রোগ একটা ক্ষতির ব্যাপার।

তবে সুখের বিষয়, আমাদের দেশে এই রোগ না থাকার মতো। তার কারণ কিন্তু সম্ভবত, ভৌগোলিক নয়। গ্রেট-ব্রিটেনে এই রোগ খুবই বেশি। তেমনি বেশি কানাডায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলে, অস্ট্রেলিয়ায় ও নিউজিল্যান্ডে। অপেক্ষাকৃত কম স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় ও ইউরোপের উত্তরাঞ্চলীয় দেশগুলিতে, ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলিতে কালেভদ্রে, প্রাচ্যে না থাকার মতো। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায়দের মধ্যে এই রোগ যথেষ্ট, তুলনায় কৃষ্ণকায়রা এই রোগ থেকে মুক্তই বলা চলে। এই রোগ কেন হয় তা জানলে ধারণা করা যাবে কেন এই রোগের প্রকোপ এক-একটি দেশে বেশি, এক-একটি দেশে কম।

তিনটি অবস্থার জন্যে এই রোগ হতে পারে : (১) অ্যাসিটাবুলাম বা যে-সকেটের মধ্যে উরুর হাড় স্থাপিত সেই সকেটের গড়নগত অসম্পূর্ণতা:

(২) শিশুকাল থেকে উরুর হাড়ের মুণ্ডটি পীড়াগ্রস্ত থাকা, যার ফলে অসাড়ত্ব;

(৩) সকেটের মধ্যে উরুর হাড়ের মুণ্ড ঠিকভাবে না লাগা (অত্যধিক মোটা বা অত্যধিক ঢ্যাঙা মানুষের ক্ষেত্রে এই অবস্থার বাড়াবাড়ি হতে পারে ও তার ফলে যন্ত্রণা হতে পারে, যদিও যন্ত্রণা হয়ে থাকে সাধারণত পাছায় নয়, হাঁটুতে)।

এই তিন অবস্থায় রোগ হতে পারে, একথা ঠিক। তবুও একথা কিন্তু জোর দিয়ে বলা চলে না যে এই অবস্থাগুলোই রোগের কারণ। রোগের মুখ্য কারণ কী সে সম্পর্কেও জোর দিয়ে কিছু বলা চলে না। পাছার হাড়ে বৈসাদৃশ্য যদি কিছু থাকে তো পাছার হাড়ের এক্স-রে ছবিতেই তা ধরা পড়ে যায়। অস্টিওআরথ্রোসিসের কারণ নির্ধারণের জন্যে আরও বাছবিচারশীল পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন আছে।

লণ্ডনের রয়াল ন্যাশনাল অর্থোপীডিক হাসপাতালের রেডিওলজিস্ট ডাঃ রোনাল্ড ও মারে এই রোগে আক্রান্ত ২০০ জন রোগীকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাদের মধ্যে ৯০ জন পুরুষ ও ১১০ জন স্ত্রীলোক। পাছার বা উরুর হাড় পূর্বে স্বাভাবিক এমন রোগী ছিল ৩৫ শতাংশ, তারা রোগগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ৫৮ বছর বয়সে, তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১৩, স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৫৭। গোড়ায় অস্বাভাবিক এমন রোগী ছিল ৬৫ শতাংশ। রোগগ্রস্ত প্রায় ৫৪ বছর বয়সে। সকেটের গড়নগত অসম্পূর্ণতার জন্যে রোগগ্রস্তের সংখ্যা ২৫.৫ শতাংশ, রোগগ্রস্ত প্রায় ৫১ বছর বয়সে, স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৪১, পুরুষের সংখ্যা ১০। সকেটের মধ্যে উরুর হাড়ের মুণ্ড ঠিকভাবে না লাগা বা কাৎ হয়ে থাকার ফলে রোগগ্রস্তের সংখ্যা ৩৯.৫ শতাংশ, রোগগ্রস্ত হবার বয়স ৫১.৫, পুরুষের সংখ্যা ৬৭, স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১২।

একটি সাধারণ আকারে প্রকাশ করলে এই পর্যবেক্ষণের চেহারা এইরকম দাঁড়ায় :

অস্টিওআরথ্রোসিস রোগগ্রস্ত ২০০ রোগীকে পর্যবেক্ষণ

	শতাংশ	রোগগ্রস্ত হবার বয়স	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত
গোড়ার স্বাভাবিক পাছা	৩৫	৫৭.৭	৫৭	১৩	৪.৪:১
গোড়ার অস্বাভাবিক পাছা	৬৫	৫৩.৬			
সকেটের গড়নগত অসম্পূর্ণতা	২৫.৫	৫০.৮	৪১	১০	৪.১:১
কাৎ হয়ে থাকা	৩৯.৫	৫১.৫	১২	৬৭	১:৫.৬

এই সারণিতে সবচেয়ে লক্ষণীয় শেষের লাইনটি। এখানে রোগের অবস্থাটি হচ্ছে সকেটের মধ্যে উরুর হাড়ের মুণ্ডটি ঠিকভাবে না লাগা বা কাৎ হয়ে থাকা। কিন্তু আগেকার অবস্থাগুলোর চেয়ে এই বিশেষ অবস্থার রোগীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি—মোট ৬৭ জন, স্ত্রীলোকদের চেয়ে প্রায় ছ-গুণ বেশি।

আর ৬৭ জন পুরুষ-রোগী পাওয়া গিয়েছে মোট ৯০ জন পুরুষ-রোগীর মধ্যে থেকে—শতকরা হিসেবে ৭৪.৬ জন। এই হিসেব দেখে অবাক হতেই হয়। কাৎ হয়ে থাকার দরুন রোগগ্রস্তের সংখ্যা পুরুষদের মধ্যে কেন এত বেশি?

কৈশোরে অত্যধিক ক্রীড়াচর্চার দরুন কি এমন একটি ব্যাপার ঘটতে পারে? পঞ্চাশের কোঠায় বয়স এই রোগগ্রস্তরা সকলেই বলেছে যে আগে তারা যতোখানি দৌড়ঝাঁপ করতে পারত, এখন আর তা পারে না। খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, যৌবনে তারা সকলেই ছিল অ্যাথলিট—দৌড়ঝাঁপে পারদর্শী। তরুণ অ্যাথলিট যৌবনকালে এজন্যে কোনো অস্বস্তি বোধ করেনি। কিন্তু অত্যধিক দৌড়ঝাঁপ করাটাই কি এই রোগের কারণ?

এ বিষয়ে ভালভাবে জানবার জন্যে ১৭ থেকে ২১ বছর বয়সী তিন দল যুবককে পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হল—তিন দল যুবককে তিন রকমের অবস্থা থেকে। প্রথম দলে ছিল ৯৪ জন, সকলেই এমন একটি বোর্ডিং-স্কুল থেকে যেখানকার ছেলেদের যেমন সুনাম লেখাপড়ায় তেমনি খেলাধুলায়। দ্বিতীয় দলে ৭৭ জন, এই দলটিও এমন একটি স্কুল থেকে যেখানকার ছেলেদের লেখাপড়ায় খুবই সুনাম কিন্তু খেলাধুলোয় ততোটা নয় এবং খেলাধুলো যেখানে বাধ্যতামূলক নয়। তৃতীয় দলে ৮০ জন, এই দলটি একটি কারখানা থেকে। শেষোক্ত দলের ছেলেরা সকলেই ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত এমন একটি স্কুলে পড়েছে যেখানে খেলাটা বাধ্যতামূলক ছিল না, কিন্তু জিমন্যাস্টিকস ও দৌড়পাল্লার দৌড় ছিল বাধ্যতামূলক। স্কুল ছেড়ে চলে আসার পরেও অনেকেই শখের খেলাধুলো চালিয়ে গিয়েছে। এই তিনটি দলকে পর্যবেক্ষণের ফলাফল এই রকম :

১৭থেকে ২১ বছর বয়সী ২৫১ জন যুবকের মধ্যে উরুর হাড়ের মুণ্ড সকেটে কাৎ হয়ে থাকার লক্ষণ

	পরীক্ষার আওতায় মোট কত জন	রোগগ্রস্তের সংখ্যা	রোগগ্রস্তের শতাংশ
প্রথম দল (খেলাধুলায় বেশি সুনাম)	৯৪	২৩	২৪
দ্বিতীয় দল (লেখাপড়ায় বেশি সুনাম	৭৭	৭	৯
তৃতীয় দল (কারখানা থেকে)	৮০	১২	১৫

মাত্র ২৫১ জন যুবককে পরীক্ষার ফলাফল থেকে কোনো সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত নয় কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে উরুর হাড়ের মুণ্ড সকেটে কাৎ হয়ে থাকার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান মাত্রার একটা যন্ত্রণাবোধও থেকে যায়। আরও অনুমান করা গিয়েছে—হার্ডল-রেস, লং-জাম্প ও হাইজাম্প—এই তিনটি ক্রীড়াতেই উরুর হাড় সকেটে কাৎ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। সঠিক সিদ্ধান্ত করা যায়নি, কারণ এই তিনটি ক্রীড়ায় যারা পারদর্শী তারা অন্য বহু ক্রীড়াতেও যোগ দিয়ে থাকে।

কিছুসংখ্যক পাওয়া গিয়েছে যারা ১৪ বছর বয়সের আগে কিংবা পরে কোনো সময়েই ক্রীড়াদক্ষতার পরিচয় দিতে পারেনি। তাহলে ধরে নিতে হয়, ক্রীড়াদক্ষতার পরিচয় দিতে পারার আগেই এরা এই বিশেষ অবস্থার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। এই অনুমান সঠিক বলেই মনে হয়। কেননা এমন একদলের সন্ধান নিশ্চয়ই পাওয়া যেতে পারে

যারা ১৪ বছর বয়সের আগে খেলাধ্লোয় ছিল অসাধারণ কিন্তু পরবর্তীকালে নিষ্প্রভ।

এই সমীক্ষা থেকে ডাঃ মারে, পাকা-পাকিভাবে না হলেও, একটি সিদ্ধান্ত উপস্থিত করেছেন। তা এই যে শৈশবে অত্যধিক ক্রীড়াচর্চার দরুন পরবর্তীকালে উরুসন্ধি কমজোরী হয়ে পড়তে পারে এবং তার ফলে যন্ত্রণা হতে পারে-- বিশেষ করে পুরুষদের ক্ষেত্রে। যেসব দেশে মাঝবয়সী পুরুষরা এই রোগে ভোগে, দেখা গিয়েছে সেইসব দেশেই শৈশবের ক্রীড়াচর্চা বহুল প্রচলিত এবং অনেকাংশে বাধ্যতামূলক। এ থেকে ব্যাখ্যা করা যায় কেন এক-একটি দেশে এই রোগের প্রকোপ বেশি, এক-একটি দেশে কম। শুধু দেশগতভাবে নয়, জাতি-গতভাবে কেন বেশি বা কম তাও ব্যাখ্যা করা যায়।

সংগে সংগে ডাঃ মারে জোর দিয়ে এ-কথাও বলেছেন যে, একজন স্বাভাবিক মানুষ যে-কোনো বয়সে কাৎ হয়ে পড়ার এই লক্ষণগ্রস্ত হতে পারে কিন্তু তাই বলে সংগে সংগে ধরে নেওয়া চলে না যে উরুসন্ধি কম-জোরী হওয়ার রোগে সে ভুগতে চলেছে। তিনি প্রস্তাব করেছেন, একেবারে কিশোর বয়সে প্রশিক্ষণের অঙ্গ হিসেবে দূরপাল্লার দৌড়ের (বিশেষ করে উঁচুনিচু রাস্তায়) প্রচলন থাকা উচিত কিনা তা যেন বিবেচনা করে দেখা হয়। আর ডাক্তারদের পরামর্শ দিয়েছেন, রোগী যদি শুধু হাঁটুর যন্ত্রণার কথা বলে তাহলেও যেন উরুসন্ধি পর্যবেক্ষণ করা হয়।

—জয়ন্তকান্ত
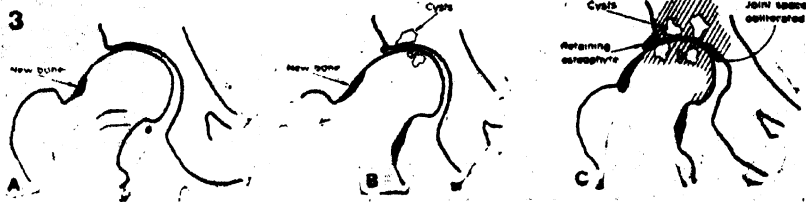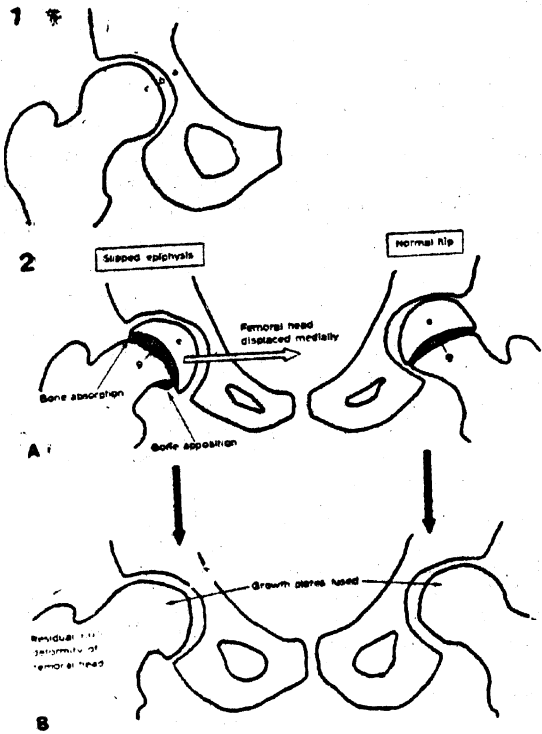
১ নং ছবিটি স্বাভাবিক দোষমুক্ত উরু-সন্ধির। ইংরেজি ছোট হরফে 'এ' চিহ্নিত অংশটি হচ্ছে অ্যাসিটাবুলাম বা সকেট, 'বি' চিহ্নিত অংশটি সন্ধির ফাঁক, 'সি' চিহ্নিত অংশটি উরুর হাড়ের মুণ্ড।

২ নং ছবিটি কৈশোরের উরুসন্ধির। ছবির ওপরের অংশে দেখা যাচ্ছে (ইংরেজি বড়ো হরফে 'এ'), উরুর হাড়ের মুণ্ডটি উরুর হাড়ের দণ্ড থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, মুণ্ড ও দণ্ডের মাঝখানে রয়েছে কার্টিলেজ জাতীয় পদার্থ। ১৬-১৭ বছর বয়সে মাঝখানের এই পদার্থটি আর থাকে না, মুণ্ড ও দণ্ড পরস্পরের সংগে যুক্ত হয়ে যায়। এই বয়সে পৌঁছবার আগে যদি উরুসন্ধির ওপরে অত্যধিক চাপ পড়ে তাহলে উরুর হাড়ের মুণ্ডটি পিছনদিকে বা এক পাশে কাৎ হয়ে পড়তে পারে। ছবির নিচের অংশে দেখানো হয়েছে ১৬-১৭ বছর বয়স পার হবার পরের উরুসন্ধি, ডানদিকে স্বাভাবিক ও বাঁ-দিকে কিছুটা কাৎ হয়ে পড়ে।

৩ নং ছবিতে দেখানো হয়েছে উরুর হাড় সকেটে কাৎ হয়ে থাকার লক্ষণযুক্ত উরু-সন্ধিতে রোগের প্রকোপ ও বিস্তার। ছবিতে তিনটি অংশ--ইংরেজি বড়ো হরফে 'এ', 'বি' ও 'সি' চিহ্নিত। প্রথম অংশে ৩৭ বছর বয়স্ক একজন পুরুষের উরুসন্ধি (অস্টিওআরথ্রোসিসের সামান্য লক্ষণযুক্ত)। দ্বিতীয় অংশে একই পুরুষের ৪৪ বছর বয়সে উরুসন্ধি। নতুন হাড় তৈরি হয়েছে, কিছু কিছু সীস্ট্‌ও। তৃতীয় অংশে আরো আঠারো মাস পরের উরুসন্ধি। নতুন হাড় আরও বেড়েছে, নতুন সীস্ট্‌ও, সকেট ও মুণ্ডের মাঝখানের শূন্যস্থান অবলুপ্ত-- রোগী প্রচণ্ড যন্ত্রণা ভোগ করছে।

পড়ন্ত বিকেলে রেল স্টেশনের ওভার-ব্রীজটার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল দীপায়ন। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। আকাশে যেন আধারের ছড়াছড়ি। কিন্তু এই মুহূর্তে দীপুর মনে হচ্ছিল যেন পৃথিবীর এই রক্তহোলির ছাপ পড়েছে আকাশে। তন্ময় হয়ে দেখছিলো দীপু, এক ঝাঁক বক উড়ে যাচ্ছে, দারুণ ঝকঝকে ফ্লোরেন্টাইন মার্বেলের মত।... ওদের দেখে মনে হচ্ছে যেন রক্তস্নাতা পৃথিবীতে নতুন আলোর বার্তা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। হঠাৎ পাশ থেকে অনুপ বলে উঠলো, এই দীপু তোর মা!

দীপু তাকালো না, কারণ ও জানে এখন মায়ের চোখে চোখ পড়লেই মা ওকে চোখ দিয়ে ডাকবে, আর এত তাড়াতাড়ি বাড়ী যাবে যে—হঠাৎ কে বলে উঠলো, দীপু তোর মায়ের সঙ্গে সে এসেছে, তোর কোনা—!

আর এতদূর ট্রেনে আসা কপালচিবুকে চিকচিকে জরির কুচি ছড়ানো বেগুনী মুখটা দেখলো দীপু। সোমা, খুব অস্ফুটে বোললো সে। বন্ধুরা হঠাৎ কি ভেবে বলে উঠলো, দীপায়ন। এই দীপায়ন। দীপুর ঠোঁটের আড়াল থেকে শুধু বেরিয়ে এলো, আঃ।

তারপর মুখ ফিরিয়ে মা বা সোমা কাউকেই দেখতে পেলো না।

সোমা এসেছে, দীপুর খুব ভাল লাগছিলো, কতদিন পর সোমার সঙ্গে দেখা হোল তার। কর গুনলো দীপু, পাক্কা ন'মাস পর। বাড়ী এলো দীপু। পড়ন্ত বিকেলে জরির কুচি পড়া বেগুনী মুখ জল করে ধুয়ে একটু উজ্জ্বল দেখাচ্ছে সোমাকে। বেশ একটা তেলতেলে ভাব সোমার মুখে। ঠিক দুর্গাপ্রতিমার মুখের মত লাইটের আলো পড়লে পিছলে যায়, জলের মত চিকচিক করে। দীপুদের বাড়ী লাইটের ভোল্টেজ খুব কম। একটু গ্রামের দিকে তো, ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ঠিকমত আলো সরবরাহ করতে পারে না। খয়েরী আলোতে সোমাকে আরও চকচকে লাগছে। এই ভাল, ভাবলো দীপু, ভীষণ উজ্জ্বল আলোতে কাউকে দেখতে ভাল লাগে না দীপুর, উজ্জ্বলতা মানেই তো সব খানা-খন্দ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া। বরং এই ভাল। এই যে মৃদু নীলচে খয়েরী আলোতে সোমাকে দেখছে দীপু, কিরকম তেলতেলে মুখ, আলো ধরছে না, ছিটকে পড়ছে, মুখের একটা দিক কিরকম অন্ধকার লাগছে, গলা-ঘাড়ের একটা দিক অন্ধকার... কেমন নেই নেই...অথচ আছে আছে...ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব...এই ভাল। নইলে যদি দারুণ উজ্জ্বল একশো দুশো পাওয়ারের আলোতে দেখতো সোমাকে, সোমার শরীরের মুখের খানা-খন্দ সব কেমন দিনের আলোর মত পরিষ্কার দেখা যেত, তবে...দেড় [illegible]

সোমার, দীপু জানে ওর নাক আর ঠোঁটের ওপর ছোট গর্ত আছে, বাঁ ভ্রূর ওপর কাটা দাগ আছে। ভীষণ দুষ্টু ছিলাম তো, হেসে হেসে বলেছিলো সোমা, একদিন দাদার সঙ্গে মারামারি করতে গিয়ে ঠেলা মেরে ফেলে দিয়ে—! বাব্বা, তারপর মা কি বকুনি, জলতরঙ্গের মত হেসে উঠেছিল সোমা, দাদার তো মুখ ভার। মা বলতে লাগলো, মেয়েদের কি অমন যেখানে-সেখানে মারতে আছে? হঠাৎ যদি বেকায়দায় লেগে যেত, ভ্রূর ওপর না লেগে যদি চোখে লাগতো—?

নারে সোমা না, শুধু চুপিচুপি দীপু বলেছিল [illegible] নিজেকে, তুইতো জানিস না, তোর ঐ [illegible] আরও

ভাল লাগে। এখন কেমন ঐ গর্তটার ওপর অন্ধকার ছোট্ট ডানা মেলে বসে আছে, কি ভাল লাগছে দীপুর।

—তারপর কি খবর। একদম লেডী হয়ে গেছিস যে? দীপুর কথাগুলো যেন সোমাকে ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল।

আহা। ভ্রূকে ধনুক করে ফেললো সোমা, তুই। তুইও তো কত বড় হয়ে গেছিস। এখন তোর সঙ্গে গেলে লোকে তোকেই আমার দাদা বলবে।

—তা ঠিক। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একবার মুখে হাত বোলালো দীপু, খুব সূক্ষ্ম কাশের মত দাড়ি, তোকে তো আমার এখনো ছোট্ট মনে হয়, সবে ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছিস।

—কক্ষনো না, আমার এখন কত বয়স জানিস! মাথা দুলিয়ে বলে উঠলো সোমা।

(আঃ সোমা, তুই জানিস না তোকে এখন কত সুন্দর দেখতে হয়েছে)—তা কত আর, 'বায়ো' কি 'তেরো'।

—বাঃ! খুব কথা শিখেছিস। হাসিতে যেন গান করে উঠলো সোমা!

—বড় হয়েছি না! দীপুও হেসে ফেললো।

—এত বড় বড় চুল রেখেছিস কেন সোমা এসে পেছন থেকে ধরলো।

উ। দীপু চুলে চিরুনি চালাচ্ছিল।

—অবশ্য, দীপুকে একটু ঠেলে সরিয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো সোমা, বড় চুলের ছেলেদের আমার দারুণ লাগে, ভীষণ সুইট। সেই কি সুন্দর—! হঠাৎ কিরকম গাঢ় হয়ে এলো সোমার গলা, বড় বড় চুল, উস্কোখুস্কো, মোটা ফ্রেমের চশমা, ঢোলা পাজামা পাঞ্জাবী, আগোছালো, ভীষণ অগোছালো, জানিস দীপু আবার স্বাভাবিক হয়ে এলো সোমার গলা, ভীষণ ভাল লাগে, যদিও ও বলে—!

—কে! ঘাড় নীচু কোরলো দীপু, কে?

—কেউ না, মানে আমার বন্ধুরা বলে কি, তুই একটা আস্ত পাগল। একগুচ্ছ চন্দ্রমল্লিকার সুরভি রেখে চলে গেল সোমা।

বন্ধুরা বলছিল, দীপু তোর মাসতুতো বোনের চেহারায় বেশ চটক আছে, কচি বাঁশের মত।...সুইটি।

হুঁ। দীপু চুপ করেছিলো।

—কারো সঙ্গে এনগেজড নাকি রে।

—দূর! হাসতে গিয়েও হাসিটা যেন একদলা কফের মত গলায় আটকে গেল।—আর এনগেজড হলেই বা—!

—আমাদের সঙ্গে আলাপ করাবিনা।

—সে পরে। দীপু আর কথা বাড়ায়নি।

—সো-মা, এই...তুই ক'দিন থাকবি!

—তোর কতদিন ইচ্ছে। ঠোঁটের ফাঁকে বেলকুঁড়ির মালা রেখে ঘরে ঢুকলো সোমা।

—বাঃ, আমি কি বোলবো, তুই-ই বল ক'দিন থাকবি।

—এই ধর, চাপা হাসিতে ভরে উঠলো সোমার মুখ, চিরকাল যদি [illegible]

(অমন কথা বলিস না সোমা, বলিস না, কষ্ট হয়।)—থাকলে থাক। ভালই তো, এখন তো দিদি নেই, তোকেই অর্ডার করবো, সোমা এটা কর ওটা কর—।

—ইস, গলা ছেড়ে হেসে উঠলো সোমা, বয়ে গেছে। তারপর দিদি এসে বলবে, আমি কি একদমই পর হয়ে গেলাম।

—আচ্ছা সোমা, দীপু সোমার চোখে চোখ রাখলো, বিয়ে হলেই মেয়েরা কিরকম পর হয়ে যায়, না? কেন বলতো?

—যাঃ! কি যে বলিস, ওসব তোরা ভাবিস। আসলে বিয়ের পর আরও বেশী আপন হয়।

—নারে, আচ্ছা তোর বিয়ের পর তুইও কেমন পাল্টে যাবি—.

—দূর, একটু লালচে দেখালো সোমার মুখ, কি যে বলিস, আর সেতো দেখতেই পাবি হোক আগে।

—আচ্ছা, দীপুর দিকে আবার তাকালো সোমা, তুই কি পার্টি করিস?

কেন? হঠাৎ অবাক হয়ে গেল দীপু।

—না, এমনি বলছিলাম, কবে কলেজে ঢুকেছিস, গরম টুইস্ট করা রক্ত তো।

বাব্বা, এমন জ্ঞান দিচ্ছিস, যেন তুই ক-ত বড়!

—নারে, একটু লজ্জা পেল সোমা, জ্ঞান কি করে দিই বল। যোগ্যতা থাকলে তো দেবো, আর আমি তো তোর থেকে মোটে এক বছরের বড়।

—দ্যাখ সোমা, হঠাৎ হেসে উঠলো দীপু, তুই আমার থেকে মোটে এক বছরের বড়, অথচ মা বলে কি, তুই ওকে দিদি বলতে পারিস না।

হঠাৎ আসা বৃষ্টির মত হাসিতে ভেঙে পড়লো সোমা।—আসলে জানিস তুই আমার সঙ্গে গেলে লোকে যদি তোকেই আমার দাদা ভাবে। আফটার অল, মেয়েদের একটা বয়স থাকে, যখন তার বয়স বাড়লো কি কমলো বোঝাই যায় না। এই দ্যাখ, আমি যদি এখন বলি আমার বয়স বাইশ লোকে বিশ্বাস করবে, আবার যদি বলি সতেরো, তবে ও তাই না?

—তুই বেশ কথা বলিস সোমা।

—কথা। হঠাৎ উদাসসুর এসে ছোঁয়া লাগালো সোমার স্বরে, কথা বলাটাও একটা আর্ট দীপু খুব সাবধানে রপ্ত করতে হয়। আর সুন্দর কথা। হুঁঃ! অনেক সুন্দর কথাই যে কত বিষাক্ত হয়—? একরকম সাপ আছে না, নিঃশ্বাসে টানে, কথাও তেমনি, কাছে টানে তারপর গ্রাস করে...একদম...! দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে।

—আরে তুই যে দার্শনিক হয়ে গেলি। হাল্কা সুরে বোললো দীপু।

—উ, দর্শন, ফিলসফি! আবার ঝিলিক দিয়ে উঠলো সোমার মুখ, বড্ড কঠিন রে দীপু বড্ড কঠিন, নিয়ে হাড়ে হাড়ে বুঝছি।

—সবাই যে বলে দারুণ ইনটারেস্টিং—

—ও যারা বলে বলুক। একটা ইজি-চেয়ারের ওপর আধশোয়া হয়ে একটা [illegible] পাতায় মুখ ডুবিয়ে চুপচাপ বসে রইলো সোমা, আর ওর ঐ আধশোয়া শরীরের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন তন্ময় হয়ে গেল দীপু। দীপুর থেকে সোমা এক বছরের বড়, সম্পর্কেও আছে, তবু মাঝে মাঝেই ওর ঐ কাঁচ কলাপাতার মত শরীর স্পর্শ করতে ভীষণ ইচ্ছে হয় দীপুর। কেন কে জানে। আসলে সোমা এমন কিছু সুন্দরী নয়, কোন বিখ্যাত সিনেমা আর্টিস্টের সঙ্গে ওর মুখের তুলনা করা যায় না। তবু কি যেন...বেশ আলগা শ্রী আছে। আর ঐ যে ওর শরীর স্পর্শ করার ইচ্ছে, ওটাও আসলে অন্য কোন ইচ্ছে নয়, দীপুর শুধু ইচ্ছে হয়, কি ইচ্ছে হয় তার সে জানে না, তবু একটু সুখের কথা মনে হয়।

সুখ...সুখ...মনের ওপর যেন একরাশ প্রজাপতি তাদের নরম রোঁয়া ডানা ছুঁয়ে দিয়ে গেল, সুখ আর অসুখ...দুই ভাই, একজন খুব কষ্ট দেয়, আরেকজন আনন্দ, শুধু আনন্দ।

দিনটা সকাল থেকেই ছায়ার ঘোমটা মুখে টেনে বসে আছে, কার ওপর অভিমান করেছে কে জানে।

—চল দীপু, বেড়িয়ে আসি।

—এই সকালে!

চা খাচ্ছিল দীপু, হঠাৎ একটু চা ছলকে পড়ে গেল। সোমা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে কাপটা ধরে ফেললো। ওর নরম আঙুলে আঙুল ছুঁয়ে গেল দীপুর। হঠাৎ কেমন সিরসির করে উঠলো দীপুর শরীর। একটা সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ বয়ে গেল। আর দীপু, কে যেন ভেতর থেকে বোললো তাকে, ছি! ছি! সোমা তোমার দিদি না, মাসতুতো বোন, তোমার আর ওর শরীরে একই রক্ত আছে।

সত্যিই তো। একই রক্ত। তবু আমার যে কী হয়, সোমার স্পর্শ লেগে আমার রক্তে স্রোত বইছে কেন। তবু বিশ্বাস করো, আমার মনে কোন পাপ নেই—কেন—!

—জানিস দীপু—! আরে কি হোল।

—উঁ! হঠাৎ চমকে উঠলো দীপু, সোমা যেন কেমনভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

(অমনভাবে তাকাস না সোমা, বুকে আমার ব্যথা হয়)।

—আচ্ছা, দীপু সহজ হোল, একটা কথা বোলবো।

—কি? সোমার চোখ একটু লক্ষ্মীট্যারা গোছের, দীপু এই প্রথম লক্ষ্য কোরলো।

—কি বল। সোমার চোখ আবার স্বাভাবিক।

—উঁ, আবার চুলে আঙুল নামালো দীপু, ভাবছি বোলবো কিনা, আই মীন, বলা উচিত হবে কিনা।

—অনুচিত মনে হলে বলিস না, চাপা হাসি সোমার মুখে।

—না বলেই ফেলি, এদিক-ওদিক তাকালো দীপু, তুইতো আমার থেকে মোটে এক বছরের বড়, তুই [illegible]
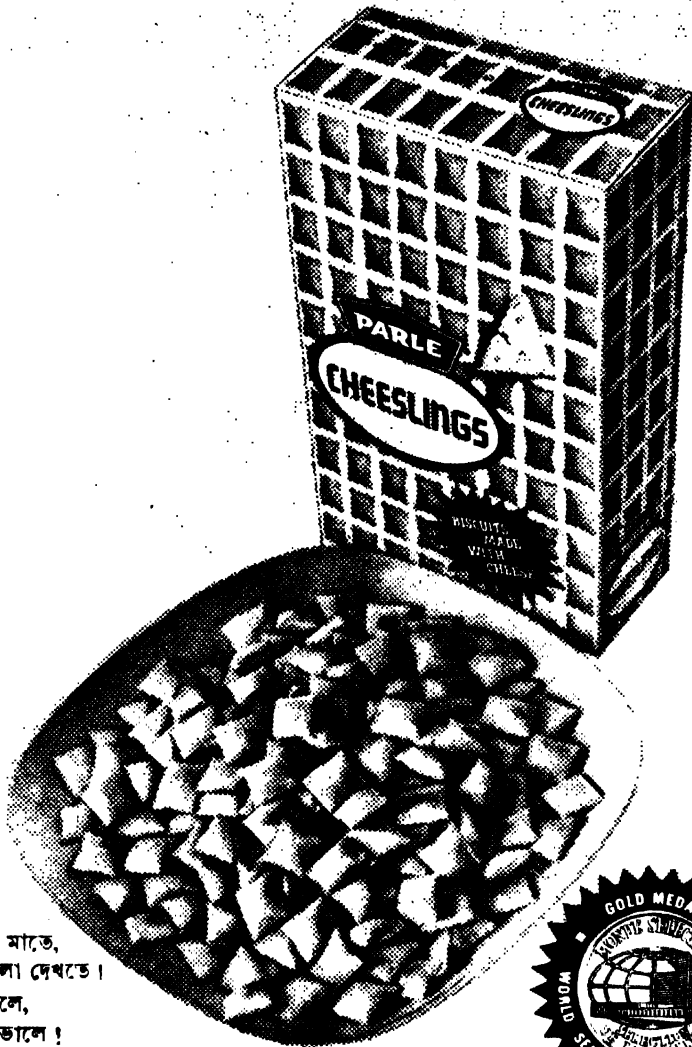
সোমা? মানে তোর কোন ইয়ে...মানে লাভার—। একটু কান গরম হোল তার। মাঝপথেই কথা থেমে গেল দীপুর, উচ্ছ্বসিত ঝর্ণার মত হাসিতে ভেঙে পড়লো সোমা, কি বললি, ভালবাসা...লাভার...?

হঠাৎ দীপুর নিজেকে খুব বোকা মনে হোল।

তারপর সোমার ঐ ভাঙা-ভাঙা চুল, আধভাঙা দেহ, কি সুন্দর লাগছে সোমাকে. চোখে জল, ঠোঁট কাঁপছে,—নাকের ডগা লাল. অবাক চোখে তাকালো দীপু, এই কথায় এত হাসির কি হোল! কি হোল! কি এমন কথা বললাম আমি!

—হাসি নয়। ঝাপটা দিয়ে চুলগুলো সরালো সোমা, এই যে তুই চট করে বললি. তুই কাউকে ভালবাসিস, তোর কোন লাভার আছে...এটা কি কোন কথা হোল! ভালবাসা কি জানিস?

—দ্যাখ সোমা. দীপু একটু অপ্রস্তুত, ভালবাসা কি তা ঠিক জানা না থাকলেও এই ধর বিশেষ কোন একজন ছেলে কি মেয়ে যাকে তুই সমস্ত শরীর মন দিয়ে...?

হঠাৎ কি রকম নিঝুম সন্ধ্যার মত হয়ে গেল সোমার মুখ, ওর চোখ দুটো হঠাৎ একমুহূর্তের জন্য ঝলকানি দিয়ে উঠলো. বলিস না. শরীর...ভাল লাগে না।

দীপু চুপ। শরীর কথাটা সে এমনিই বলেছে। কিন্তু সত্যি বলতে কি শরীর-টরীর তারও বিশেষ ভাল লাগে না। কিন্তু তবু যে সুখ...তাতো শুধু মনে নয়, শরীরেও লাগে। শরীর দিয়ে শরীর স্পর্শ, সিরসিরে হাওয়ার মত, রিমিঝিমি বৃষ্টির মত, ভারী ভাল লাগে দীপুর। এই যে শরীরের কথায় হঠাৎ কেমন নিঝুম সন্ধ্যার মত হয়ে গেল সোমার মুখ...কিন্তু সোমার ঐ ঝুরো ঝুরো শরীর দেখেও তো লোকের কত ভাল লাগে। ভর দুপুরে ক্লান্ত বিষণ্ণ মনে হঠাৎ একরাশ রজনীগন্ধার মত সুরভি নিয়ে যদি কেউ আসে, কত ভাল লাগে।

এই যে সোমার স্পর্শে ছোট একটু সুখস্রোত বয়ে গেল দীপুর শরীরে, এতে কি কোন দোষ আছে? দীপু জানে এটা এমনিই। সুন্দর জিনিস দেখেও সুখ, তার স্পর্শেও সুখ। একগুচ্ছ তিরতিরে নরম ফুল দেখে যেমন সুখ...তা হাতে নিয়ে গালে ঠেকালে, নাক ডোবালেও আরেক সুখ, খুব ভাল লাগে।

কিন্তু সোমা এখনও অমন নিঝুম হয়ে বসে আছে। তবে কি ওর শরীরের ওপর কারও লোভী দৃষ্টি পড়েছিল, যে তার মন চায়নি, শুধু...তাই।

—সোমা এই—!

সোমা চুপ।

—কিরে কি হোল! সোমার চুলে আলতো করে আঙুল ছোঁয়ালো দীপু,

উঁ...ও, কি যেন বলছিলাম।

(কি বলছিলি। সোমা তোর মুখটা কি অপ্রতিভ...কি ভাল লাগছে তোকে।)

—ও...ইয়ে, আচ্ছা দীপু, তোর এই লাইফটা কেমন লাগছে। এই স্টুডেন্ট লাইফ. কবে কলেজে ঢুকেছিস, খুব সুন্দর নারে? সোমার চোখে যেন একটা ক্লান্ত, বিষণ্ণ চন্দনা পাখী ডানা মুড়ে বসেছে।

—মন্দ না। দীপু দীর্ঘশ্বাস চাপলো। তবু মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় সব ভেঙে ফেলি, দুমড়ে মুচড়ে দলা পাকিয়ে ফেলে দি।— নিজের অজান্তেই হাত মুঠো হয়ে এলো তার, সূর্যটাকে ডিনামাইট চার্জ করে উড়িয়ে দি, চাঁদে দেই আলকাতরা মাখিয়ে।—একটা হতাশার সমুদ্রে তার গলা আছড়ে পড়লো।

—সে কিরে! এমন ইচ্ছে হয় কেন? তোর তো হ্যাপি লাইফ—?

এবার সোমার দিকে গম্ভীরভাবে তাকালো দীপু, সোমা, এটা তুই কি বললি! আমি ভেবেছিলাম তুই অন্ততঃ বুঝবি...। এখন মাথার ওপর বাবা আছেন এখনও আমি ছাত্র, কিন্তু এরপর...? কি প্রচণ্ড হতাশা, গলা ধরে এলো দীপুর. তবু এর মধ্যেই আমরা ফোঁটা ফোঁটা সুখ খুঁজিরে সোমা, সুখ তো কখনো পুরো পাবো না, তাই তার ভগ্নাংশকেই খুঁজে বেড়াই আপ্রাণ চেষ্টা করে।

—সুখ... সুখ... কিরকম, আবেগভরা গলায় বোললো সোমা।

—সুখ, ভীষণ ঘন হয়ে এলো দীপুর গলা, ধর তোর দারুণ জল পিপাসা পেয়েছে তুই কোকাকোলা খা, অরেঞ্জ খা, কিন্তু তবু দেখবি ঠিক মনের মত লাগছে না, মনে হবে কিসের যেন অভাব রয়ে গেল। কিন্তু জল পিপাসার সময় জলই খা, দেখবি সব জুড়িয়ে গেল। সুখও তেমনি। তবে আমরা তো সবটা পাইনা, তাই দু-এক চুমুক দেবার ইচ্ছে হয়। দারুণ গরমে চাতক পাখী যেমন শুধু বৃষ্টি চায়, আমরাও তেমনি ফোঁটা ফোঁটা সুখ চাই, আমাদের বড় যন্ত্রণা—!

—সত্যি! —লুটিয়ে পড়া আকন্দর মত ভীষণ করুণ দেখালো সোমার মুখ, সেই ভাল, আমরা চন্দন কৌটার মত সুখ খুঁজি না! —ছোট্ট একটা মুনিয়া পাখীর মত, থাকে মনের অন্দরে রেখে আমরা আদর করতে পারি, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বোললো সে জানিস আমার এক একসময় ইচ্ছে হয় সবাইকে সুখ দি।

(তুই খুব ভালরে সোমা, খুব ভাল)।

দুজনেই চুপ, বাইরে তখন মেঘের কোলে সূর্য একটু হেসে উঠেছে।

দীপু বাড়ী ফিরছিলো। শুক্লপক্ষের বোধহয় আর বেশী দেরী নেই। চাঁদটা কেমন ভরে উঠেছে। যৌবন যেন ওর দেহে একটু একটু করে কাঠি বুলোচ্ছে।

দীপু তাড়াতাড়ি পা চালাচ্ছিলো। সবুজ-হলদে ধানক্ষেতের মাঝে রুপোর তারগুলো ঝিলিক দিয়ে উঠছিলো. চারদিকে কেমন সোঁদা সোঁদা গন্ধ। গাছের পাতার সিরসিরানি...পায়ের কাছ থেকে সড়াৎ করে কি যেন সরে গেল, চমকে উঠেছিল দীপু। আজ একটু দেরী হয়ে গেল। মা ক'দিন ধরেই বলছে সোমাকে নিয়ে একটু বেড়াতে।

—ক'দিনই বা থাকবে ও, ওর খুব ইচ্ছে একটু গ্রামের রাস্তাঘাট দেখে...!

—বাজে বোক না, চুলগুলো ঝোড়ো হাওয়ার মত নেচে উঠেছিল সোমার. তোমাদের এটাকে মোটেও গ্রাম বলা যায় না। কত লোকজন, কি সুন্দর রাস্তাঘাট। তবে শহুরে গন্ধ নেই, ট্রাম-বাসের ধপাধপানি নেই, খুব ভাল লাগছে আমার।

—এই ক'দিন বেড়াতে এসেছিস, তাই!— দীপু বলেছিল।

সোমা হাসলো, তা অবশ্য একদিক দিয়ে ঠিক, কলকাতায় থাকতে ট্রামে-বাসে স্যান্ডউইচ হয়ে গিয়ে মনে হয়, জীবনে উঠবো না। তবু ওরই মধ্যে যেন একটা রোমান্টিসিজম আছে। হুট-হাট বাস-ট্রাম বদল এটাও বেশ থ্রীলিং—! তবে তোদের এখানে সম্পূর্ণ আলাদা. খুব সুন্দর।

আজ সোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবো. মনে মনে বোললো দীপু, এই আধফোটা চাঁদ, ধানক্ষেতের দিকে যাবো. খুব ভাল লাগবে ওর।

সোমা বারান্দায় বসে চন্দনের সঙ্গে লুডো খেলছিলো। পায়ের শব্দ পেয়ে দীপুর দিকে রাজহংসীর মত ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালো সোমা।

দীপুর যে কি হয় মাঝে মাঝে, সোমার মধ্যে যেন একটা চুম্বক আছে। এই যে কত মেয়ের সঙ্গে মিশেছে দীপু দেখেছে. কিন্তু তারা যেন কেমন, হঠাৎ গায়ে হাত ঠেকলেই বোকা বোকা হয়ে যায়. সহজভাবে কথা বলতে লজ্জা পায়, বন্ধুরা মিলে হাসসাহাসি করে। কিন্তু সোমা যেন স্বতন্ত্র। আরও তো মাসতুতো, মামাতো, পিসতুতো বোন আছে দীপুর, এক-একটি গ্রেট ন্যাকা। সব সময় যেন কিরকম নাক উঁচু করে থাকে, সব কিছুতেই—। ভাল লাগে না দীপুর। কিন্তু সোমা যেন একদম আলাদা। আকাশের সব তারাই তো সুন্দর, কিন্তু ওদের মধ্যে ধ্রুবতারা আলাদা। সব তারার নাম লোকে জানে না, কিন্তু ঐ অগণিত তারার মধ্যে ধ্রুবতারাটি যেন সবচেয়ে উজ্জ্বল, সবচেয়ে স্নিগ্ধ। সোমাও তেমনি, অনেকগুলো উচ্ছল ঝর্ণার মাঝে ও যেন উচ্ছ্বসিত জলপ্রপাত।

কিন্তু এই যে সোমাকে দারুণ ভাল লাগা, ওর কাছে থাকলে ফোঁটা ফোঁটা

সুখের তরঙ্গ শরীর মনে বয়ে যাওয়া, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আনন্দ হওয়া, এর নাম কী?

কেঁপে উঠলো দীপু, এসব কি ভাবছে সে। সোমা ওর মাসতুতো বোন, এক বছরের বড় দিদি, কিন্তু তাতে কি আছে, কাউকে ভালবাসা খারাপ নাকি।

সোমাকে খুব ভালবাসবে দীপু, চির-জীবন। এই যারা বলে একটি ছেলে, একটি মেয়ে পরস্পরকে নিবিড়ভাবে ভালবাসলেই বিয়ে করতে হয়, তা ভুল। কেউ কাউকে ভালবাসলেই যে তাকে বিয়ে করতে হবে তার কোন মানে নেই। আর এখানে তো তা অসম্ভব। তাছাড়া বিয়ে করে সোমাকে পেতে চায় না দীপু। সোমার বিয়ে হোক, ও যা হোক, ওর বরের সঙ্গে খুব মজা করবে দীপু। ও শুধু সোমাকে দেখবে আর খুব ভালবাসবে।

—এই সোমা বেড়াতে যাবি, একটা চেয়ারের ওপর বসে পড়লো দীপু।

—মা দেখো দাদা সোমাদিকে এই রাত্রে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে, চন্দন চেঁচিয়ে উঠলো।

—এই চন্দন চুপ কর। রাত্রে বেড়াতে আমার দারুণ লাগে, কিন্তু মাসী কি যেতে দেবে?

—কি আছে। আমরা তো যাই, চল দারুণ লাগবে।

—সাবধানে যাবি আসবি,' দীপুর মা এসে দাঁড়িয়েছেন।

—সে আর বলতে, ওরা দুজনেই হেসে উঠলো।

আধফোটা চাঁদ সত্যিই সদ্যযৌবনা কিশোরীর মত। চাপা হাসি, উছল হাসি, ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে সবাইকে। আবছা নীলচে ওড়না পরা ধানক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে হাঁটছিলো ওরা। কি সুন্দর! অস্ফুটস্বরে বোললো সোমা।

—ভাল লাগছে তোর। দীপু সোমার দিকে তাকালো।

অনেকটা চুল ছেড়ে নীচের দিকে একটু বিনুনী করেছে সোমা। ঘাড় অবধি চুল-গুলো ছাটা মনে হচ্ছে। একরাশ অন্ধকার যেন ওখানে জেগে পড়েছে। কপালে ছোট্ট চন্দন রঙের টিপ পরেছে, অন্ধকারে তা জ্বলজ্বল করছে। কমলা রঙের শাড়ীটা সোমা পরেছে কি শাড়ীটাই সোমাকে জড়িয়ে আছে বোঝা যাচ্ছে না। কিরকম পাকে পাকে উঠে গেছে। মেয়েরা কি চমৎকার শাড়ী পরে। আর এই ধোঁয়া ধোঁয়া জ্যোৎস্নায় কমলা রং কোথাও উজ্জ্বল, কোথাও অন্ধকার, আধখানা চুল, আধখানা গাল, চন্দন টিপের ঔজ্জ্বল্য, সব মিলিয়ে সোমাকে ভীষণ সুন্দর লাগছে দীপুর, সব-চেয়ে সুন্দর। ধানক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে সোমা যেন আলতোভাবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট একটা প্রজাপতির মত।

ঝিরঝিরে বাতাসে ওর কানের পাশের, সামনের কুচি কুচি চুল উড়ছে, কমলা রঙের শাড়ীর আঁচল উড়ছে, দীপুর মনটাও যেন কোথায় উড়ে যেতে চাইছে, চাইছে হারিয়ে যেতে।

—এই দীপু, এখন পূর্ণিমা না?

—উঁ, আকাশের দিকে চোখ মেললো দীপু, না বোধহয়, দেখছিস না চাঁদ এখনো কানায় কানায় ভরে ওঠেনি, একটু অভাব রয়ে গেছে।

—দুঃখের মত। —সোমা শব্দ না করে হাসলো? ওর হাতের চুড়িতে হঠাৎ সেতারের টুংটাং ধ্বনি বেজে উঠলো।

—এই সাবধানে আসিস, এখানে তো লাইট নেই।

—এই ভাল, সোমার স্বর অস্পষ্ট। কি সুন্দর চাঁদের ওড়না পরা মাঠগুলো, এর মধ্যে লাইট থাকলে কিরকম ফ্যাকাশে লাগতো। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত জমাট বাঁধা মাঠ, হাওয়া এসে মাঝে মাঝে ঢেউ তুলছিলো অগুনতি তারাঘেরা আকাশটা যেন হীরের খনির মত লাগছে, মাঝখানে কোহিনুরের মত চাঁদ জ্বলছে।

—একটা জিনিস লক্ষ্য কর, সোমা দীপুর আঙুল আলতোভাবে স্পর্শ করলো, আকাশে তারাগুলো কত কাছাকাছি এসেও কিন্তু একসঙ্গে মিলতে পারেনি।

—আসলে ওরা আরও দূরে, দীপু বোললো, আমরা এখান থেকে দেখছি তো তাই মনে হয় ওরা কত কাছে।

সোমার কানে যেন দীপুর কথা যায়নি, ও কেমন নিঝুম সন্ধ্যার মত গলায় বলে চললো, আমরাও যেন গ্রহ...নক্ষত্র...উপগ্রহ শুধু ঘুরছি তো ঘুরছিই। কেউ কক্ষচ্যুত হতেও পারি না, হতে গেলেই উল্কাপাত। আর দেখেছিস দীপু, সোমার গলা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এসে দীপুর মনে জোয়ার বাঁধতে চাইছিল, উল্কাপাত হলে সেগুলো হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে নেচে উঠলেও পরমুহূর্তেই তার বিনাশ—! আমরাও কেউ পারি না কক্ষচ্যুত হতে, হলেই আমাদেরও বিনাশ।

দীপু সোমার দিকে তাকালো। সোমার যেন কিরকম একটা কষ্ট আছে। কিন্তু সেটা এই আবছা জ্যোৎস্নার মতই দীপুর কাছে অস্পষ্ট। এক একসময় ভীষণ দুঃখী দুঃখী লাগে ওকে। দীপু মাথা নীচু করে হাঁটতে লাগলো। আজ পাজামা-পাঞ্জাবী পরেছে দীপু পাঞ্জাবীর কোণ হাওয়ায় উড়ছে। হাঁটতে হাঁটতে কতদূর চলে এসেছে ওরা। চারিদিকে শুধু ধানক্ষেত মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ দ্বীপের মত দু-একটা গাছ, অনেক দূরে কোন বাড়ীর জানলায় জোনাকী আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে।

হাওয়ায় দীপুর চুল উড়ছিল। কিরকম নেশাচ্ছন্নের মত লাগছে নিজেকে। একবার পুজোর সময় দীপুর বন্ধুরা সবাই নেশা করেছিল। আর কিরকম লাগছিলো ওদের, দীপু একটু মুখে দিয়েই অমৃত আমীন, গলা দিয়ে জ্বলতে জ্বলতে নামছিল যেন।

—আরে ঐ জ্বালাটাই তো আনন্দ, পিনাকী বলেছিল, সব কষ্ট ভুলিয়ে দেয়।

—আমার ভাল লাগে না। আর খায়নি দীপু। কিন্তু না খেয়েও সেই কেমন নেশাগ্রস্তের মত লাগছিল, মাথায় কেমন ঝিমঝিম...ঝুমঝুম...আবার এতদিন পর...।

ওরা পাশাপাশি হাঁটছে। এই জুঁই-ঝরানো জ্যোৎস্নায় মসৃণ সোমাকে ভীষন বিষন্ন লাগছে। কেন কে জানে! দীপুর হঠাৎ ভীষণ ইচ্ছে হোল ওর রেশমী চুলে একটু আঙুল ছোঁয়ায়, ওর নরম গালে আঙুল ডোবায়। ওর বিষন্নতা, ধূসরতা সব কিছুর মধ্যেও দীপুর মনে হোল যেন একটু সুখ পায়, নরম পালকস্পর্শের মত সুখ, ছোট্ট একটা নরম তুলতুলে পাখীর মত সুখ। সোমাকে আলতোভাবে ছুঁয়ে ওর বিষন্নতা দূরে করে একটু ভাঙা সুখ পেতে ভীষণ ইচ্ছে হোল দীপুর। এটা কেমন সুখ কে জানে, দীপু জানে এর মধ্যে কোন মাংসল গন্ধ নেই, শরীর দিয়ে শরীর স্পর্শসুখের কোন ইচ্ছা নয়, তবু এটা একধরনের সুখ। সোমার আধভাঙা শরীর...সোমা যেন কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে। সোমা তুই কোথায়... খুব অস্ফুটে বললো দীপু।

তারপর ওর আঙুল সোমার রেশমী চুল স্পর্শ করলো, আর ভেতরে ভেতরে একটা অবর্ণনীয় সুখ অথচ যন্ত্রণাবোধে দীপুর হঠাৎ কেমন কেঁদে ওঠার ইচ্ছে হোল।

সোমা, তুই হারিয়ে যাচ্ছিস কেন, সোমা আমি বড় দুঃখীরে, বড় দুঃখী...বড় যন্ত্রণা... হঠাৎ সোমার পালকের মত নরম বুকে মাথা গুঁজে প্রাণপণে ফুঁকিয়ে উঠলো দীপু। আর ওর সমস্ত সুখ সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা যেন একাকার হয়ে মিশে এক অনন্য অনুভূতির সাগরে ওকে তলিয়ে নিয়ে গেল, একদম ডুবে গেল দীপু।

চাঁদটা কি সত্যি চলে গেছে? কিন্তু সকাল হয়নি তো। সত্যিই কি সূর্যটাকে কেউ নিভিয়ে দিলো, না চাঁদটা মরে গেল। নিঃসীম শূন্যতার মাঝে গাঢ় শেওলারঙের অন্ধকারে মুখ তুললো দীপু। তার গালের ওপরে গরম স্পর্শ...ঝাপসা চোখ...মুখের ওপর ঝাউয়ের মত চুল—!

পাঞ্জাবীর হাতা দিয়ে মুখ মুছলো দীপু, সোমা চলে গেছে। ছিঃ! ছিঃ! গলার কাছে ব্যথা করে উঠলো তার, কি ভাবলো ও ...ভাবলো নাকি যে এই অন্ধকারে তাকে একা পাবার সুযোগ নিতে গিয়েছিল দীপু? কিন্তু তা তো নয়, সে শুধু একটা বিষন্ন বেদনার নোনা জল থেকে সুখের মিস্টি জলে মুখ ভেজাতে চেয়েছিল।

সো—মা, তুই বিশ্বাস কর, বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠতে চাইলো দীপু কিন্তু তার বেদনার্ত স্বর শুধু একটা গলাভাঙা খঞ্জনা পাখীর মত বাতাসে উড়ে বেড়ালো।

—দীপু!

কে ডাকছে, উঠে বসলো দীপু।

—দীপু! আমি এখানে!

সোমা সোমা তোকে আমি দেখতে পাচ্ছি না রে তুই কোথায়...কোথায়...কিন্তু ওর চুড়ির রিনিঝিনি যেন বাতাসে ভাসছে, দোয়েল পাখীর শিষের মত সোমার স্বর দীপুকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ও ওকে দেখতে পাচ্ছে না।

অসহ্য যন্ত্রণায় মাটিতে শুয়ে পড়লো দীপু।

আবার কার গলা শুনতে পাচ্ছে, ঠিক দুপুরবেলা টুপটাপ করে বটফল পড়ার মত, দীপু, তুই সুখ খুঁজেছিলি? পেয়েছিস সুখ?

কোনরকমে হাত দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলো দীপু, খুব নরম একতাল কাদার মত কি যেন স্পর্শ কোরলো, সোমা নাকি!

খুব ক্লান্ত, আহত, অস্ফুটস্বরে বোললো দীপু, সোমা আমি সুখ খুঁজেছিলাম রে। ছোট্ট মুনিয়া পাখীর মত, যাকে মনের কোণে রেখে আমি আদর করতে পারতাম। কিন্তু সোমা, গলা বুজে এলো দীপুর, ছোট ছোট সুখ খুঁজতে গিয়ে আমরা যে কতবড় দুঃখকে ডেকে আনি, নিজেরাই বুঝিনারে। একটু একটু সুখ, একটু একটু দুঃখ, এই তো জীবন। কিন্তু ছোট্ট একটু সুখও যে পেলামনা, বরং কত বড় দুঃখকে আমি ডেকে আনলাম, ভাঙা স্বরে বোললো দীপু সোমা তুই রাগ করলি?

—নারে, গাছের পাতায় টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ার মত শব্দ হোল, নারে রাগ কোরবো কেন! আমি বুঝেছি। কিন্তু আমরা তো কক্ষচ্যুত হতে পারি না। আমি তোকে ভালবাসি, তুই আমাকে ভালবাসিস, কিন্তু লোকে ভাববে শরীর...।

—না, না শরীর নয়...শরীর নয়, আহত গলায় জোর দিয়ে বলে উঠলো দীপু।

—জানি! জানি! কিন্তু লোকে তো বলবে...আমাদের ভালবাসার সাক্ষী কেবল এই ধানক্ষেত আর চাঁদ...

—চাঁদ যে মরে গেছে সোমা, আর্তনাদ করে উঠলো দীপু।

—না, না, ভীষণ সুখের মত মিষ্টি গলা, চাঁদ মরবে কেন, বেঁচে আছে, সবাই বেঁচে আছে, এই তোর আমার বাঁচার মত, এর চেয়ে সত্যি আর কিছু নেই।

কোনরকমে উঠে দাঁড়ালো দীপু।

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়ালো, কিন্তু কেউ কাউকে দেখতে পেলো না। দুজনের হাত দুজনকে অবলম্বন করার জন্য খুঁজলো, কিন্তু পেলো না। নিঃসীম শূন্য আকাশের গায়ে দুটো তারা যেন, অনেক কাছাকাছি গিয়েও দুজনে দুজনকে ছুঁতে পারলো না। কেউ পারলো না কক্ষচ্যুত হতে। হলেই যে উল্কাপাত।

ছোট্ট একটু সুখ খুঁজতে গিয়ে ওরা কি তবে আরও বড় দুঃখকে ডেকে আনলো?

দুটি সমান্তরাল রেখার মতো পাশাপাশি চলতে চলতে এই সন্দেহকে যেন ওরা অনন্তকালের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো।

সুন্দরভাবে সাজুন

রূপকথায় শুনেছিলাম এক রাজার দু রাণী ছিল—সুয়োরাণী আর দুয়োরাণী। চিরদুঃখী দুয়ো রাণীকে রাজা বনের পাশে পাতায় ছাওয়া একটা কুঁড়ে ঘরে নির্বাসন দিলেন। দুয়োরাণী সেই থেকে সেখানেই থাকে আর বনে বনে কাঠ কুড়িয়ে বহু কষ্টে জীবনধারণ করে। দুয়োরাণীর একটা খুব সুন্দরী মেয়ে ছিল। মেয়েটি রাজকুমারী হলে কি হবে, অভাব-অনটনে সেও মায়ের মতই দুঃখী। রূপ থাকতেও পোষাক-পরিচ্ছদের দৈন্যে তাকে রাজকুমারী বলে চেনাই যায় না।

এদিকে রাজার আদরিণী সুয়োরাণী তার দুটি কন্যা নিয়ে মহাসুখে আছে। দেখতে দেখতে দিন গড়িয়ে চললো। রাজকুমারীরাও বেশ বড় হয়েছে। তখন কোন এক দেশের এক রাজপুত্র ঘোষণা করলো একটি নাচের আসরে উপস্থিত রাজকুমারীদের যাকে তাঁর পছন্দ হবে তার সঙ্গে সে নাচবে আর তাকেই সে বিয়ে করবে। বলাবাহুল্য এই নাচের আসরে যাবার আমন্ত্রণ সুয়োরাণীর মেয়েরা পেল। নির্দিষ্ট দিনে সুয়োরাণীর মেয়ে দুজন সাজগোজ করে সেই আসরে চলে গেল। তাই দেখে দুয়োরাণীর মেয়েরও খুব সখ হল নাচের আসরে যাওয়ার। কিন্তু দুয়োরাণীর মেয়ের দারিদ্র্য এত বেশী ছিল যে নাচের আসরে যাবার মত তার কোন পোষাক ছিল না। অসহায় দুয়োরাণীর মেয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলো। অত যার রূপ শুধু পোষাক-আসাকের অভাবে আজ তার এত শোক! তাই দেখে এক পরীর খুব মায়া হল। সে মন্ত্রবলে দুয়োরাণীর মেয়েকে সুন্দর সুন্দর পোষাক এনে দিল।

কাঠকুড়ুনী, ঘুটে-কুড়ুনী রাজকুমারী সেই পোষাকে অপরূপ সাজে সেজে নাচের আসরে গিয়ে হাজির। রাজকুমার তো দুঃখী রাজকুমারীর রূপে পরম বিমোহিত, সে তাকে নিয়েই নাচতে লাগলো।

বর্তমান প্রবন্ধের ক্ষেত্রে এই রূপকথার গল্প কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। আসলে আমি বলতে চেয়েছি সৌন্দর্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে পোষাকের একটা অনস্বীকার্য অবদান আছে। এই সত্যটা যুগে যুগে সমানভাবে স্বীকৃত। তাই সেই আদিম কাল থেকেই নানান ঢঙের, নানা রঙের পোষাক সৃষ্টির নেশায় পাগল হয়েছে মানুষ। এযেন এক সর্বযুগের সাধনা। সেই সাধনারই মধুর ফলশ্রুতি হয়ে এদেশে এসেছিল মসলিন। সে ছিল এক অভূতপূর্ব শাড়ী। কত না কিংবদন্তী প্রচলিত আছে ঐ মসলিনকে ঘিরে। এই মসলিন পরিহিতা মোগল বেগমেরা হারেমে নবাবের উপস্থিতির অপেক্ষায় দিন গুনতেন, এই মসলিন পরেই নর্তকীরা নাচগানে আসর মাতিয়ে রাখতেন আর নবাবের চোখে নেশার আগুন ধরিয়ে দিতেন। ঢাকার তৈরি মসলিনই বেগমদের অঙ্গে শোভা পেত। অনেক সময় ধনীব্যক্তিরা প্রেয়সীকে দেবার জন্য নতুন করে তাঁত বসিয়ে মনমতো মসলিন শাড়ী তৈরি করিয়েছেন। শুধু বেগম, নর্তকী আর প্রেয়সী কেন বিশ্বের বাজারে ঢাকাই মসলিনের চাহিদা এত বেশী ছিল যে এক একটি শাড়ী অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রী হত। খলিফা বা সুলতানরা নিজেদের ভোগের জন্য বহু পূর্বকাল থেকে এই সূক্ষ্ম ও সূচিক্কন বস্ত্র শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি পরিচ্ছদ হিসাবে ব্যবহার করতেন। তখন সাতগাঁও বন্দরে বাংলার বাণিজ্য প্রভাব ছিল অক্ষুন্ন। সেই সময় মুসলমান বণিকেরা ঢাকার তৈরি মলমল বস্ত্র তুর্কের রাজধানী মোসল নগরে বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যেত। পরে অবশ্য ঢাকার তন্তুবায়সমিতির অবনতি হয়েছে। পর্তুগীজ জলদস্যুর প্রভাবেই হোক অথবা সাতগাঁওর বাণিজ্যপ্রভাব বিলোপেই হোক ঢাকাই মলমল বস্ত্রের চলন কমে যায়। সে সময় অপেক্ষাকৃত সৌখিন তুর্কীরা মোসলনগরে ঢাকাই মসলিনের অনুরূপ কাপড় তৈরির প্রচেষ্টা করে। তাদের তৈরি সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রগুলো মোসলীন বা মসলিন নামে পরিচিত হয়।

উনিশ শতকের গোড়ায় ভারতবর্ষ থেকেই সর্বোৎকৃষ্ট মসলিন বিদেশে রপ্তানী হত। কালক্রমে ম্যাঞ্চেস্টার গ্লাসগো প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট মসলিন তৈরি হতে থাকে। ১৮৫১ খৃঃ ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড আয়র্ল্যান্ডকে মসলিন কাপড়ের সুতো তৈরির জন্য স্ত্রীলোক ও ছোটমেয়েদের কয়েক লক্ষ টাকা দিতে হয়েছিল।

পূর্বভারতে যে কার্পাস তৈরি হতো সেটা সুদৃঢ় হলেও দীর্ঘস্থায়ী ছিল না কারণ এখানকার সুতো বিলেতের সুতো অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু ঢাকাই মসলিনে উৎকৃষ্টতা বহুলাংশে নির্ভর করতো তাঁতীদের কর্মকুশলতা, একাগ্রতা ও আন্তরিকতার ওপরে। সে কারণেই বোধ হয় ঢাকাই মসলিন এত বিখ্যাত।

কিন্তু কালের স্রোতে মসলিন আজ শুধু একটা নাম। একটা সুন্দর স্মৃতি। তাজমহলের মতো একটা গর্ব। তাকে চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্যও হয়তো আর আমাদের হবে না। ঢাকার সেইসব দক্ষ তাঁতশিল্পীরা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁদের শিল্পকে চিরনতুন করে বাঁচিয়ে রাখার মত দক্ষতা, ধৈর্য আর মানসিকতাকেও আমরা হারিয়ে বসে আছি। সেন্টিমেন্টকে দূরে সরিয়ে রেখে একটা কথা বললে বোধহয় মিথ্যে বলা হবে না—আজকের এই গতির যুগে, ব্যস্ততার যুগে যেখানে আমাদের জীবনযাপনের ব্যাপারটায় একটা বড় অবলম্বন যন্ত্র—সেখানে পরিবর্তিত পরিবেশে চেষ্টা করলেও হয়ত মসলিনকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম না। তাই মসলিন এর জন্য আকাঙ্ক্ষাটা সাধারণভাবেই কম। বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা সেদিনের মতো আজও আছে। সৌন্দর্য সচেতনতা, সৌখীনতা সবটুকুই বেঁচে আছে মনের স্তরে স্তরে। তবে সেই চাহিদা মেটানোর জন্যে যুগোপযোগী অন্যকোনও বিকল্প খোঁজার চেষ্টা করেছি আমরা। ছাপা সাড়ী তেমনই এক বিকল্প। মসলিনের সঙ্গে তুলনা হয় না, তবুও সৌন্দর্যবোধ ও আরামের কথা মনে রাখলে ছাপা শাড়ী অনেকাংশে আমাদের মনের চাহিদা মেটাতে পেরেছে। রঙবেরঙের ছাপাশাড়ীর ওপর মাঝবয়েসী মেয়েদের দুর্বলতাটা বোধহয় সার্বজনীন। পথ চলতে এ সত্যটা সর্বদাই উপলব্ধি করা যায়। ভ্যাপসা গরমের দিনে কর্মব্যস্ত মেয়েরা মসলিনের মতো হালকা সৌখীন বস্ত্র না পেলেও নানান রঙের রকমারী দামের বৈচিত্র্যময় ছাপাশাড়ীর মধ্যে আন্তরিক আশ্বাস পেয়েছে। আধুনিক সুবেশা তরুণীরা শাড়ীর ভাঁজে আর খাঁজে নিজেদের নিটোল দেহগঠনটাকে দেখাতে সর্বদাই ব্যস্ত। একাজে শালীনতা বাঁচিয়ে, শিল্পচেতনাকে আঘাত না করে ছাপা শাড়ী তাদের নিত্য নতুন রূপে সাজতে সাহায্য করছে প্রতিনিয়ত। আর আর্দ্র-গরম আবহাওয়ায় আরাম পেতে ছাপাশাড়ীর মতো সুন্দর পরিচ্ছদ খুব কমই আছে।

আজকের আধুনিকাদের পছন্দমাফিক যোগান দিচ্ছে একদিকে বোম্বে, কলকাতা, দিল্লী যেমন, অন্যদিকে জয়পুরই বা পিছিয়ে কোথায়? রাজস্থানের সাঙ্গানারী শাড়ী এবারের গ্রীষ্মের বাজারটা প্রায় একলাই সরগরম করে রেখেছিল। কলকাতার ডাইস প্রিন্টের ডিজাইন দিনকে দিন কেমন নতুনত্ব নিয়ে আসছে হালকা, গাঢ় বিভিন্ন রঙের ছাপার শাড়ীতে আধুনিকা, অত্যাধুনিকাদের সামনে।

বিভিন্ন রুচিকে মানিয়ে চলতে এদেশের নানান জায়গাতেই ছাপা শাড়ী তৈরী হচ্ছে। কোন শাড়ী সবচেয়ে ভাল সে বিচার যাঁরা ছাপার শাড়ী পরেন তাঁরাই করবেন।

—অঞ্জলি চৌধুরী

ছিন্নপত্র/উত্তমকুমার

প্রেক্ষাগৃহ প্রেক্ষাগৃহ প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

(১) সাংবাদিক ও তার প্রেরণা

পম্পি ফিল্মস্-এর আধুনিকতম নিবেদন, পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'মেমসাহেব' ছবিটি তরুণ সাংবাদিক অমিত—যার ডাক নাম বাচ্চু—এবং তার জীবনে যে-মেয়েটি যুগিয়েছিল বড়ো হবার সার্থক হবার প্রেরণা, সেই কাজলের স্বপ্নকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। সাংবাদিক নিমাই ভট্টাচার্যের রচনাটি যখন 'অমৃত' সাপ্তাহিকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই পাঠকমহলের সাগ্রহ দৃষ্টি এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এবং কো কয়েক বছর আগে যখন কাহিনীটি চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হবার কথা ঘোষিত হয়, তখন থেকেই বাংলা চলচ্চিত্রের উৎসাহী দর্শক বৃন্দ অধীর চিত্তে অপেক্ষা করছিলেন চিত্র রূপটি কেমন হয় দেখবার জন্যে।

'মেমসাহেব' উপন্যাসটি হচ্ছে তরুণ রোমান্স। এবং রোমান্টিক রচনার ধর্ম এই যে, পাঠকের মনকে এই রচনা কল্পনার পাখায় ভর করে নিঃসীম আকাশে খুশী মতো উড়তে সাহায্য করে।

তরুণ সাংবাদিক অমিতের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের বসন্তোৎসবে কলে

জরুকা গোলাম/নন্দা ও রাজেশ খান্না

কলকাতা '৭১/স্নিগ্ধা মজুমদার এবং সাধনা রায়চৌধুরী

ছাত্রী কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম সাক্ষাৎ থেকে শুরু করে পর পর কয়েকটি সাক্ষাৎ ঘটে দুজনকে যখন পরস্পরের সান্নিধ্যে নিয়ে এল এবং অতি শীঘ্রই একজনকে আর একজনের কাছে করে তুলল অপরিহার্য, ঠিক তখনই কাজলের কাকাবাবু একটি সুপাত্রের সঙ্গে ওর বিবাহকে প্রায় অনিবার্য করে তুললেন এবং অপরদিকে, কর্মে অমনোযোগিতার অজুহাতে অমিতের সংবাদপত্র রিপোর্টারের চাকরীটি চলে গেল।—কিন্তু এই অবস্থা বিপর্যয় দর্শকমনে কোনোরকম রেখাপাত করবার সুযোগ পায়ই না কাজলের অমিত মনোবল প্রকাশের ফলে; একদিকে, সে দৃঢ়ভাবে কাকার বিবাহ আয়োজনকে উপেক্ষা করল এবং অন্যদিকে অমিতকে যোগাল উৎসাহ ও প্রেরণা। নিজে সংগ্রহ করল কলেজের প্রোফেসরগিরি এবং অমিতকে পাঠাল রাজধানী দিল্লীতে। অমিত যখন নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সাফল্যের সন্ধান পেয়েছে তখন সে কর্তৃপক্ষের আদেশে শ্রীমতী গান্ধীর 'শান্তি মিশন'-এর বিশেষ রিপোর্টার হিসেবে বেরিয়ে পড়ে পৃথিবী ভ্রমণে। বিদেশ যাবার প্রাক্কালে কাজল এসে মিলিত হল তার সঙ্গে এবং স্থির হল দু মাস পরে কলকাতায় ওরা পাকাপাকিভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে।—কিন্তু 'শান্তি মিশন' শেষে ফিরে আসবার কয়েকদিন পরেই রণদামামা বেজে উঠল। অমিতকে ছুটতে হল পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পূর্ব রণাঙ্গনে। বিদায়ের মুহূর্তে কাজল কোন্ এক অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কাতেই বুঝি ভেঙে পড়ল। যদিও সে

কাজললতা চিত্রের প্রথমদিনের শুটিং-এ শমিতা বিশ্বাস এবং উত্তমকুমারকে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক বিকাশ রায়। ফটো: অমৃত

বারে বারেই বলেছে, তোমার আমার মধ্যে মিলনে বাধা সৃষ্টি করা ভগবানেরও অসাধ্য. তবু অমিতের শত অনুরোধ সত্ত্বেও সে তাকে হাসিমুখে বিদায় দিতে পারল না কেন?—কিন্তু আঘাতটা এল অন্যদিক থেকে। রণাঙ্গনে অক্ষত শরীরে কাজ করতে করতেই অমিত পড়ল, কলেজের পরীক্ষা বানচাল করে দেবার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় আহত।—যখন সে কলকাতায় এসে পৌঁছুল, তখন কাজল পৃথিবী থেকে বহু দূরে।—অমিতের মেমসাহেব আর নেই।—

নায়ক-নায়িকা চরিত্রে উত্তম-অপর্ণা জুটি তাঁদের স্বাভাবিক নাটনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন যথারীতি। এবং ওরই মধ্যে উত্তমকুমারকে লেগেছে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক। তাঁর মুখের 'অত টাকা কি হবে গো?', 'চল, তোমায় গায়ে-হলুদের চানটা করিয়ে আনি', 'ঐ সঙ্গে টোপরটাও কিনে ফেললে হয়' প্রভৃতি সংলাপ আমাদের অতিমাত্রায় চমৎকৃত করেছে। এবং এই দুজনেই ছবির নব্বই ভাগ জুড়ে রয়েছেন। বাকী দশ ভাগে উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন বিকাশ রায় (কাকা), বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় (কাকী), গীতা দে (মা), জহর রায় (গজানন), সুব্রত সেন (শিবুদা), অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় (দিল্লীতে অমিতের বস্), ললিতা চট্টোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, গৌর শী, পিনাকী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

ছবির কলাকৌশলের মধ্যে চিত্রগ্রহণে কৃষ্ণ চক্রবর্তী সকল স্থানে সমান পার দর্শিতার পরিচয় দিতে পারেননি। কাজলকে শ্যামবর্ণা দেখাবার প্রচেষ্টা তাঁর স জায়গায় সার্থক হয়ে ওঠেনি। এছাড়া বহু বহির্দৃশ্যের কাজে যথেষ্ট উন্নতির অবকাশ ছিল। বহির্দৃশ্যগুলির শব্দানুলেখন সর্বত্র সুস্পষ্ট হয়নি। ছবির সম্পাদন প্রশংসনীয়। ছবিতে কিছু অপটিক্যালস্ এর কাজ রাওকো দক্ষতার সঙ্গেই সম্প করেছেন। ছবির গানগুলি সুপ্রযুক্ত নয় বরং বহু জায়গায় কাজলের মুখের গু গুনানি ও ভাঙা ভাঙা এক-আধ পং গাওয়া বেশ স্বাভাবিক লেগেছে।

উত্তমকুমার এবং অপর্ণা সেন অভিনয় দীপ্ত 'মেমসাহেব' দর্শকসাধারণকে খুশী করবে।

(২) মনোজকুমারের 'কোলাহল'

বিশাল ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাকসন (প্রাইভেট) লিমিটেড নিবেদিত এবং মনোজ কুমার লিখিত, প্রযোজিত, সম্পাদিত পরিচালিত ইস্টম্যানকলারে তোলা 'শোর' সুন্দর বক্তব্য, সুন্দরতর টেকনিক্যাল গু বা কোয়ালিটি ও সুন্দরতম অভিন নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত মা একটি উচ্চ ঢক্কানাদপূর্ণ কোলাহলেই পর্য বসিত হয়েছে। 'শোর' সম্পর্কিত পুস্তিকা বলা হয়েছে, এটি হচ্ছে মানুষের অনু ভূতির গান, তার বেদনার ক্রন্দন, আত্ম আহ্বান, মানবহৃদয়ের আনন্দধ্বনি, মানুষে দুঃখের যন্ত্রণাময় অভিব্যক্তি। 'শোর' প্রেমের প্রতিধ্বনি ইত্যাদি, ইত্যাদি। সন্দেহ নেই যে, মনোজকুমার একজন চিন্ত শীল ব্যক্তি, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তি চিন্তা করতে করতে খেই হারিয়ে ফেলে দানা বেঁধে একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্র করবার আগেই তাঁর চিন্তা জট পাকি যায়। তাই যা হয়ত অনবদ্য হয়ে উঠ পারত, তা হয়ে দাঁড়িয়েছে স্রেফ কোলাহল।

কারখানা-কর্মী শঙ্করের স্ত্রী মারা য দুর্ঘটনায়, একমাত্র বালকপুত্র দীপক হ যায় বোবা।—এর ফলেই শঙ্করের কা সারা পৃথিবীর শব্দ হয়ে পড়ল অর্থহী কোলাহল। তার চেষ্টা, কি করে দীপক ত কণ্ঠস্বর ফিরে পাবে। বস্তিবাসিনী মে বস্তির বদ লোকেরা যার নাম দিয়ে রাত-কী-রানী, সে জানে না তার মা বাপ কোনো কালে ছিল কিনা। এইমাত্র জানে যে, সে রাস্তাতেই বড়ো হয়ে উঠে এবং রাস্তারই মানুষ। সে বাঁচবার জন্য ভিক্ষে করে, লোকের মনে সহানুভূ জাগাবার জন্যে মিথ্যে করে বলে, আজ মারা গেছে, তার সৎকার হচ্ছে না, বা বা ভীষণ অসুখে পড়ে, তার চিকিৎসার জন্য দু'চার পয়সা দিয়ে যাও ইত্যাদি। আর

লোকের পকেট মারবারও চেষ্টা করে কিংবা তার নিজের যৌবনের প্রতি তাদের প্রলুব্ধ করে।—কখনও বা তার দুই ছোট ছোট সাকরেদের বেহালা ও কৌটো বাজানোর সঙ্গে সে নাচে গায়—কিন্তু অনেক পরিশ্রম করে নেচে-গেয়েও 'ভালো পেলা' সে পায় না।—এই রানীর সঙ্গে শঙ্করের হোলো পরিচয় ঠকা ও ঠকানোর ভিতর দিয়েই।—কিন্তু বস্তির আর এক বাসিন্দা কাবুলি খান ঐ রানীকে নিজের মেয়ে করে নিল, তাকে ক্ষুধা-তৃষ্ণার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে করে তুলল সৎ, সুশীলা। কিন্তু বস্তির বদ্ দলের সর্দারের তা পছন্দ নয়; সে তাই খানের বিরুদ্ধবাদী হয়ে উঠল।—খানকে সে নানাভাবে নির্যাতন করতে লাগল। শঙ্কর যথাসময়ে এসে পড়ে খানকে রক্ষা করল। এরপরে দীপকের দেহে অস্ত্রোপচারের জন্যে খান যে অর্থসাহায্য করল, সেই অর্থ শঙ্করের হাত থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেল এক প্রৌঢ় আততায়ী। যখন আততায়ীর নাগাল পাওয়া গেল, তখন অর্থগুলি পুড়ে ছাই। অতএব শঙ্কর তখন অনন্যোপায় হয়ে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে আটদিন ক্রমাগত সাইকেল চালিয়ে ঘোষিত দু' হাজার টাকা পুরস্কার লাভ করে ছেলের অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করল। কিন্তু বিধি বাম! ছেলে দীপক যখন আরোগ্যলাভের পথে, শঙ্কর নিজে তখন কারখানার লোহার সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে জন্মের মত শ্রবণশক্তি হারাল।—দীপকের মধুর কণ্ঠস্বর নির্গত গান সে আর শুনতে পেল না। পিতাপুত্রের এই আনন্দ-বেদনার সন্ধিক্ষণে তাদের প্রতি সাহায্য সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিল রানী।—এই বিচিত্র কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কারখানার শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ, অবস্থান-ধর্মঘট, মালিকের বিপদে শ্রমিককুলের সহানুভূতি, জলাভাবের মধ্যে বৃষ্টি পড়ায় শ্রমিক ও বস্তিবাসীদের আনন্দ-নৃত্য প্রভৃতি।

আলাদা আলাদাভাবে দেখলে ভেবে বিস্মিত হতে হয়, এক-একটি দৃশ্যকে আকর্ষণীয় করে তোলবার জন্যে মনোজ-কুমার কি শ্রম, অর্থ ও সময় ব্যয় করেছেন। ধরুন, যেখানে শঙ্কর তার বিগত স্ত্রী সম্বন্ধে চিন্তামগ্ন কিংবা যেখানে বর্ষার মধ্যে লোকে আনন্দে নৃত্য করছে।—এমনকি যে-দৃশ্যে প্রকাণ্ড ইঁদারার মধ্যে খানকে জলে চুবিয়ে তার ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে অথবা যেখানে রাত-কী-রানী নেচে-গেয়ে সমবেত জনতার মনোরঞ্জন করছে কিংবা যেখানে চোখ, নাক, মুখ রক্তাক্ত হওয়া সত্ত্বেও শঙ্কর অষ্টম দিনে মনোবলকে সংহত করে অতি কষ্টে সাইকেল চালাচ্ছে।—প্রতিটি দৃশ্যই প্রযোজক-পরিচালক মনোজকুমারের একান্ত নিষ্ঠার পরিচায়ক। কিন্তু যেইমাত্র দৃশ্যগুলিকে গ্রথিত করে সম্পূর্ণ চিত্রটি নির্মিত হ'ল, অমনই প্রশ্ন জাগে, এই দৃশ্য-গুলি কি একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল, বক্তব্যকে দৃশ্যাবলীর সাহায্যে পরিস্ফুট করবার জন্যে ঠিক এই দৃশ্যগুলিরই কি প্রয়োজন ছিল? এত যে আয়োজন, এত যে শ্রম-অর্থ-সময় ব্যয়—এ কি সার্থক হয়েছে?

রাত-কী-রানী বা শুধু রানীর ভূমিকায় জয়া ভাদুড়ী যে বিস্ময়কর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা ভারতীয় চিত্রে বিরল। একটি রাস্তার মেয়ে—যে রাস্তায় জন্মেছে, রাস্তায় বড়ো হয়ে উঠেছে, তার ভূমিকাটিকে তিনি যে আশ্চর্য ভঙ্গীসহকারে চিত্রিত করেছেন, তার তুলনা আমরা শুধু সোফিয়া লোরেনের মধ্যে দেখতে পাই। কিন্তু চরিত্রটির প্রথম ভাগের তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধটি এমনই নিষ্প্রভ যে, শ্রীমতী ভাদুড়ীকে যেন সহসা নিস্তেজ মনে হয়। আর অবাক করেছেন কাবুলী খানের ভূমিকায় প্রেমনাথ। যদিও লেখক ভূমিকাটির প্রতি প্রচুর সহানুভূতিসম্পন্ন, কিন্তু কাবুলীর চরিত্রটি বাক্যে, আচরণে, চলাফেরায় বাস্তব হয়ে উঠেছে প্রেমনাথের অভিনয়নৈপুণ্যে। নায়ক শঙ্করবেশে মনোজ-কুমার এবং বালক দীপকবেশে মাস্টার সত্যজিৎও স্ব স্ব ভূমিকাকে জীবন্ত করে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। অপরাপর ভূমিকায় কামিনী কৌশল, মনোমোহন, নন্দা, নাজ, মনোরমা, কুলজিৎ, নানা পালসিকার প্রভৃতি সু-অভিনয় করেছেন।

সবেরা/কিরণ কুমার এবং রেহানা সুলতান

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। নারীম্যান ইরানীর চিত্রগ্রহণ ও দেশ মুখোপাধ্যায়ের শিল্প-নির্দেশনা দক্ষতার পরিচায়ক। ছবির গানগুলি লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল দ্বারা সুর-সমৃদ্ধ হয়ে সুগীলিত ও মনোরম হয়েছে। ছবিতে অপটিক্যালস্-এর কাজ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মাত্র জয়া ভাদুড়ীর অসামান্য নাট্য-নৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করবার জন্যে প্রতিটি চিত্রামোদীর শোরে ছবিটি দেখা উচিত।

স্টুডিও সংবাদ

'কলিকাতা শহরের হৈ-চৈ কর্মকোলাহলের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া এখন যখন লবটুলিয়ার বইহার কি আজমাবাদের সে অরণ্যভূভাগ, সে জ্যোৎস্না, সে তিমিরময়ী স্তব্ধ রাত্রি, ধূ-ধূ বনঝাউ আর কাশবনের চর, দিগ্বলয়হীন ধূসর শৈলশ্রেণী, গভীর রাত্রে বন্য নীল-গাইয়ের দলের দ্রুত পদধ্বনি, খররৌদ্রমধ্যাহ্নে সরস্বতী কুন্তীর জলের ধারে পিপাসার্ত বন্য মহিষ, সে অপূর্ব মুক্ত শিলাস্তৃত প্রান্তরে রঙীন বনফুলের শোভা, ফুটন্ত রক্তপলাশের ঘন অরণ্যের কথা ভাবি, তখন মনে হয় বুঝি কোন অবসর-দিনের শেষে সন্ধ্যায় ঘুমের ঘোরে এক সৌন্দর্যভরা জগতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, পৃথিবীতে তেমন দেশ যেন কোথাও নাই।

শুধু বনপ্রান্তর নয়, কত ধরনের মানুষ দেখিয়াছিলাম।...স্মৃতির স্বপ্নের মত আসিয়া আজও মাঝে মাঝে মনকে উদাস করে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, কেমন আছে কুন্তা, কত বড় হইয়া উঠিয়াছে সুরতিয়া, মটুকনাথের টোল আজও আছে কিনা ভানুমতী তাহাদের সেই শৈলবেষ্টিত অরণ্যভূমিতে কি করিতেছে, রাখালবাবুর স্ত্রী, ধ্রুবা গিরিধারীলাল, কে জানে এতকাল পরে কে কেমন অবস্থায় আছে।...'

উপরোক্ত বর্ণনা ও বিশ্লেষণটুকু কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাসিক উপন্যাস 'আরণ্যক' থেকে নেওয়া। এই উপন্যাসের নায়ক সত্যচরণ বি-এ ও ল পাশ করে বেকার বসেছিলেন। হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে পুরোনো বন্ধু অবিনাশের আগ্রহে তাঁদের পূর্ণিয়া জেলার ত্রিশ হাজার বিঘের জঙ্গল-মহালের ম্যানেজারের চাকরি পেয়ে সত্যচরণ কোলকাতা ছাড়লেন। তাঁর প্রধান দায়িত্ব হল জঙ্গল মহালে নতুন প্রজা বসানো। সেই অরণ্যভূমিতে সত্যচরণের যাওয়ার পরবর্তী অধ্যায় এবং ওখানকার ঘনারণ্যের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষদের নিয়ে বিভূতিভূষণের ক্লাসিক উপন্যাস 'আরণ্যক'-এর চিত্ররূপ দিয়েছেন পরিচালক অজিত লাহিড়ী। 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার', 'আটাশ দিন পরে' ছবিতে অজিত লাহিড়ী তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'-এ তিনি যতটা সম্ভব বৈশিষ্ট্য এবং স্বকীয়তার পরিচয় দেবেন বলে আমার বিশ্বাস।

ভাইপ্রেম প্রোডাকসন্স প্রযোজিত 'আরণ্যক' ছবির সত্যচরণের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শমিত ভঞ্জ। তাছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে মুনেশ্বর ঃ নরেন্দ্র শর্মা, গোষ্ঠবাবু ঃ প্রসাদ চ্যাটার্জি, কুন্তা ঃ সুব্রতা চ্যাটার্জি, ভানুমতী ঃ বম্বের সোনিয়া সাহনী, ত্রিলোকনাথ ঃ বকুল মজুমদার, রবি দাভে, মিহির পাল, পিনাকী ভট্টাচার্য, অরূপ মুখার্জি, উৎপল সরকার, বিদ্যা রাও,

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জু দেওগাঁও প্রভৃতি। কালিপদ সেন সুরারোপিত এ-ছবির চিত্রগ্রহণে আছেন বিজয় দে এবং সম্পাদনায় আছেন—রাসবিহারী সিংহ। সীমা ফিল্মস পরিবেশনাধীনে ছবিটি মুক্তি-প্রতীক্ষায়।

•

অভিনেতা বিকাশ রায় প্রযোজক-পরিচালক হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন অর্ধাঙ্গিনী' ছবিতে। তখনই তিনি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন বিকাশ রায় প্রোডাকসন্স। 'অর্ধাঙ্গিনী' ছবিটি তখনকার দিনে প্রচুর অর্থ ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বিকাশ রায়ও পরিচালক হিসেবে তাঁর নিজের আসন স্থায়ী করে নিয়েছিলেন। তারপর পর পর সূর্যমুখী, বসন্ত বাহার, মরুতীর্থ হিংলাজ ছবি প্রযোজনা ও পরিচালনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 'স্বর্গমর্ত্য' ছবিটিও বিকাশ রায় প্রোডাকসন্স-এর ব্যানারে তোলা হয়েছিল এবং পরিচালনা করেছিলেন অসীম পাল। কিন্তু এ-ছবিটি সফলতা লাভ করেনি।

তারপর পরিচালক বিকাশ রায় রাজা সাজা' ছবি পরিচালনা করেন কিন্তু এ-ছবিটি খুব একটা সুবিধে করতে পারেনি। বিকাশ রায় তারপর একদিন ঘোষণা করেছিলেন, তিনি আর ছবি প্রযোজনা বা পরিচালনা করবেন না। অনেক প্রযোজক বিকাশবাবুকে দিয়ে ছবি করাতে চেয়েছেন, কিন্তু তিনি তখন রাজী হননি। সেসব প্রায় ১৬।১৭ বছর আগের কথা।

দীর্ঘদিন বাদে আপনারা আবার বিকাশ রায়কে পরিচালকের ভূমিকায় দেখতে পাবেন। বিবেক প্রোডাকসন্সের হয়ে তিনি এখন যে ছবিটির পরিচালনভার গ্রহণ করেছেন, তার নাম 'কাজললতা'। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত এ-কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীরায় স্বয়ং। গত ৩ অকটোবর টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে এ-ছবির একদিনের চিত্রগ্রহণ করা হয়। অংশগ্রহণ করেছেন—উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন। এছাড়া ছবির অন্যান্য চরিত্রে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, শমিতা বিশ্বাস, জহর রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ছবির একটি নৃত্যদৃশ্যে অংশগ্রহণ করবেন—মিস জে। সুরারোপের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে অসীমা ভট্টাচার্যের ওপর। আগামী ১৯ ও ২০ অকটোবর ছবির দ্বিতীয় পর্যায়ের স্যুটিং শুরু হবে।

•

'চিত্ররূপ' নামে এক নবগঠিত প্রযোজক সংস্থা সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'শ্বেতময়ূর' গল্পের চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন। ছবিটি পরিচালনা করবেন উজ্জ্বল মিত্র এবং সঙ্গীতপরিচালনা করবেন ওস্তাদ বাহাদুর খান। চিত্রগ্রহণ করবেন দীপক দাস। খবরে প্রকাশ, ছবির চিত্রগ্রহণ করা হবে স্টুডিওর বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক সত্যজিৎ রায় তাঁর পরবর্তী ছবি 'অশনি-সংকেত' ছবির দ্বিতীয় পর্যায়ের পনেরো দিনের স্যুটিং বোলপুরে শেষ করে কোলকাতায় ফিরে এসেছেন। সম্পূর্ণ বহির্দৃশ্যে তোলা ছবিটি এখন প্রায় অর্ধেকের ওপর শেষ হয়ে গেছে বলে খবরে প্রকাশ।

শ্রীমতী সর্বাণী ভট্টাচার্য প্রযোজিত ছবির বিভিন্ন চরিত্রের শিল্পীরা হলেন—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায় ববিতা (বাংলাদেশ), শেলী পাল, সুচেতা রায়, গোবিন্দ চক্রবর্তী, রমেশ মুখোপাধ্যায়, তপন দত্ত প্রভৃতি।

ছবির চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন—সৌমেন্দু রায় ও দুলাল দত্ত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'অশনিসংকেত'-এর বাস্তব এবং অন্তরঙ্গ রূপ দিতে সত্যজিৎবাবু অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। পরিচালনা ছাড়া সত্যজিৎবাবু চিত্রনাট্য রচনা ও সংগীতপরিচালনার দায়িত্বেও আছেন।

ছবিটি সম্পূর্ণ ইস্টম্যানকলারে তোলা হচ্ছে।

মঞ্চাভিনয়

সৌরসের প্রতাপাদিত্য : ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'প্রতাপাদিত্য' একদিন নাট্যরসিকদের মনে যে আলোড়ন তুলেছিল তারই রেশের সাথে বেশ খানিকটা সুর মিলিয়ে মিনার্ভার মঞ্চে নাটকটি পরিবেশন করতে পেরেছেন 'সৌরসের' শিল্পীরা। মিনার্ভা মঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এই নাটকটি অভিনীত হয়।

নাটকটির প্রয়োগ পরিকল্পনায় শ্রীঅনিল রায় যে নিষ্ঠা ও বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। নাটকটির সম্পাদনাও সত্যি প্রশংসনীয়।

অভিনয়ে 'বিজয়া' চরিত্রে গীতশ্রী দেবীর অসামান্য ক্ষমতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। রাজকুমার বসু 'প্রতাপ' চরিত্রের ব্যক্তিত্বকে সার্থক রূপ দেন। অমর বসু মল্লিকের 'শঙ্কর' গণেশ শর্মার 'গোবিন্দদাস বাবাজী', নমিতা মণ্ডলের 'কল্যাণী', সত্য দে'র 'বসন্ত রায়'ও হয়েছে সার্থক সৃষ্টি। 'রভার' ভূমিকায় বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানিয়েছিল চমৎকার, কিন্তু তার অভিনয় আরো তীব্র গতিবেগসমৃদ্ধ হওয়া উচিত ছিল। একই কথা বলা চলে 'ভবানন্দ'রূপী গোপাল চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে।

অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন অতুল গাঙ্গুলী, অলোক পাল, অমর ভট্টাচার্য, বন্দনা বিশ্বাস, প্রবীর চ্যাটার্জী, অসিত মল্লিক, সুনীল রায়-চৌধুরী, সুবীর সেন, লোকেন রায়চৌধুরী, হীতেন রায়চৌধুরী।

আলোকসম্পাতে কাশী পালের নৈপুণ্য নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু নাটকের সঙ্গীতাংশ হয়েছে দুর্বল। বিপাশা গোস্বামীর নৃত্য পরিবেশনও হয়েছে অসঙ্গতিপূর্ণ।

কবি চণ্ডীদাস: পুরনো দিনের সুর, ছন্দ ও সংলাপ যে আজো মঞ্চের আলোয় মুখর হয়ে উঠতে পারে এবং দর্শক মনে তা প্রাণবন্ততার আলোড়ন আনে, তার সত্যরূপ কয়েকদিন আগে পরিস্ফুট উঠেছিল 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে। নাটক ছিল চণ্ডীদাস। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ উপলক্ষে এই অভিনয়ের আয়োজন কলকাতা পৌর সংস্থা আদায় প্রমোদ পরিষদের শিল্পীরা। চণ্ডী ভক্তিস্নিগ্ধ জীবন কাহিনী অবলম্বন গড়ে ওঠা এই নাকটটির প্রয়োগ-পরিক দায়িত্ব নেন প্রবীণ নট শ্রীহরিধন পাধ্যায়। তাঁর শৈল্পিক গভীরতা ও দের আন্তরিক নিষ্ঠার সমন্বয়ে প্রযোজনাটি সত্যি আকর্ষণীয় হয়ে

নাটকটির কয়েকটি বিশিষ্ট ছিলেন হরিধন মুখোপাধ্যায়, বিশ্বাস, মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, সন্তো হাজরা, সুধীর ঘোষ, ধর্মদাস ঘোষ, নন্দী, লোকনাথ চন্দ, সুশীল রায়, ভট্টাচার্য, বিষাদ মুখোপাধ্যায়, দাস, মেনকা দাস, বাসন্তী চ্যাটার্জ আরতি ঘোষ।

নেতাজী অবসারিকার সংক্রা নেতাজী অবসারিকার শিল্পীরা রঙমহল মঞ্চে বীরু মুখোপা 'সংক্রান্তি' নাটকটি অভিনয় করলেন ডি রোজারিও নির্দেশিত এই না সামগ্রিক অভিনয় মোটামুটিভাবে স মণ্ডিতই হয়।

বিভিন্ন চরিত্র-চিত্রণে ছিলেন ব্যানার্জী, প্রদীপ সাহা, সবিতা ম গণেধর রুদ্র, দেবেশ তালুকদার, ব্যানার্জী, ইরা মিত্র, বিভাস সাহা, দুলাল শর্মা, লক্ষ্মীকান্ত নাগ, দে গুপ্ত, দিলীপ ঘোষ, শান্তিময় অলকা দেবী, সবিতা মিত্র, রত্না মাঃ সুরজিৎ।

গ্রীন অ্যামেচারের 'নয়ে হাত': অ্যামেচার গ্রুপের প্রযোজনায় রোস্তাগিরের হিন্দী নাটক 'নয়ে সম্প্রতি মহাজাতি সদনে সাফল্যের অভিনীত হোল। শ্রীমতী বীণা রায়ের পরিচালনায় নাটকটি দর্শকদের তৃপ্তি সক্ষম হয়। কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করেন বাদল মুখার্জী, শঙ্কর গৌর কর, কালী রায়, অরুণকুমার, সরকার, আল্পনা ব্যানার্জী, পুষ্পা ও বীণা রায়। নাটকটির সুরস ছিলেন বারীন চ্যাটার্জি।

চতুর্থাশ্রের আগামী প্রযোজনা: চতুঃ শিল্পীরা এবার যে দুটি নাটকের প্রস্তু ব্যস্ত রয়েছেন তা হোল আন্তন চে কাহিনী অবলম্বনে 'গারদ' ও রবীন্দ্র সেই ছোট গল্প অবলম্বনে রচিত 'পণর বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করবেন দীপক সন্তু ঘোষ, শ্যামল মুখার্জী, বাচ্চু চৌধুরী, চিন্ময় ঘোষ, স্বপন কুমার, রায়, খোকা মুখার্জী, রঞ্জন কর, ব্যানার্জী, ভানু হালদার, অনীতা

রবী চক্রবর্তী, দিলীপ দাস, প্রজিৎ দাস। নাটক দুটির নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রজিৎ দাস।

বিবিধ সংবাদ

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে 'আনন্দমন্দির' যে ধারাবাহিক আলোচনা-চক্রের পরিকল্পনা করেছেন, তারই কর্ম-সূচীতে প্রথম ঘরোয়া সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ৩৪ই, নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীটে, মন্দিরের সহ-সম্পাদকের গৃহে। সেদিনকার আলোচনা বিষয় ছিল—'পুরোনো দিনের মঞ্চকথা'। প্রধান বক্তা ছিলেন অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায়। দেবনারায়ণ গুপ্ত সভার সূত্রপাত করেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে সন্তোষ সিংহ ও পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। অধ্যাপক শ্রীমুখোপাধ্যায় সহজ, সরল ভাষায় ও সাবলীল ভঙ্গীতে তাঁর অভিজ্ঞতা-লব্ধ পুরোনো দিনের থিয়েটারের হালচাল, বিজ্ঞাপন পদ্ধতি, প্রেক্ষাগারের অবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে এমন অনেক কাহিনী বলেন, যা থেকে সেকালের থিয়েটারের একটা বর্ণাঢ্য চিত্র শ্রোতাদের মনে ফুটে ওঠে—সেই সঙ্গে নানা মূল্যবান তথ্যও জানা যায়। আলোচনায় যাঁরা যোগ দেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় মৈত্র প্রভৃতি। পশুপতি চট্টোপাধ্যায় ও সন্তোষ সিংহের কাছ থেকে নানা অজানা কাহিনী শুনে শ্রোতারা বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। ঘরোয়াভাবে মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে আলোচনাটি অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী পরিবেশের সৃষ্টি করে। প্রারম্ভে উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়, স্তোত্র পাঠ করেন জ্যোতির্ময় মৈত্র এবং আনন্দ-মন্দিরের সম্পাদিকা কল্পনা দে স্বাগত জানান।

জলসা

সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গানের আসরে : সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গানের নতুন করে মূল্যায়ন করার সুযোগ ঘটল—ছন্দনীড় পরিবেশিত তাঁর একক গানের প্রভাতী আসরে।

কোন শিল্পী তিনি যতই প্রতিভাবান হোন, যতই সুকণ্ঠের অধিকারী হোন না কেন, তাঁকে আপন যোগ্যতার মানের, পরীক্ষা দিতে হয়—শিল্পী জীবনের প্রতিটি ধাপে, প্রতিটি অধ্যায়ে, প্রতিটি পথের বাঁকে। সেদিনের অনুষ্ঠানে সম্ভবত সতীনাথ মুখোপাধ্যায়কে এমনই এক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো, কিন্তু স-সম্মানে এই পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে নতুন করে তিনি রসিক সমাজে আপনার আসন প্রতিষ্ঠিতই শুধু করেননি আর একবার মনে করিয়ে দিলেন তাঁর সম্বন্ধে পঙ্কজ মল্লিকের ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের উক্তি 'বিচক্ষণ ও সুমধুর কণ্ঠসংগীতশিল্পী এবং আমার অনুজ-প্রতিম সতীনাথ মুখোপাধ্যায় গীতি, কাব্য-রস উপলব্ধিতে সচেতন এবং কাব্যরসমালা, গ্রন্থনে ও সুরালঙ্কারেও অনুরূপ সচেতন, (পঙ্কজ মল্লিক), তাঁর (সতীনাথ) কল্পনার সঙ্গীত সরোবরকে তিনি কখনও রুদ্ধতরঙ্গ বা স্ট্যাগন্যান্ট হতে দেননি, বড় প্রতিভার এ একটা বড়ো লক্ষণ। তাই গতানুগতিক না হয়ে তিনি চিরদিন সৃজনশীল।' (জ্ঞান-প্রকাশ ঘোষ)

সারা প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ। জনপ্রিয়তার এটি একটি উজ্জ্বল নিদর্শন নিশ্চয়। কিন্তু তারচেয়েও বড় কথা হোল শ্রোতাদের সারিতে বসেছিলেন শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীত সমালোচক, যথার্থ সঙ্গীতবোদ্ধা প্রাজ্ঞ-প্রবীণ ব্যক্তি। প্রায় তিন ঘন্টাব্যাপী আসরে সতীনাথবাবু গেয়েছিলেন সর্বসমেত উনত্রিশখানি গান। এর মধ্যে ভজন ছিল, ছিল আধুনিক, গজল, ভাটিয়ালী, দেহাতী, ছিল রাগপ্রধান। নজরুল গীতিও ছিল। প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রতিটি শ্রোতা আপন আপন আসনে সমাসীন থেকে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেন গায়ের সৌরভ

সম্ভার। সবচেয়ে বড় কথা যখন যে ধরণের গান গেয়েছেন মনে হয়েছে এ তাঁর নিজের একান্তই আপনার গান। এমনই অসাধারণ তাঁর গ্রহণশীলতা ও অনুশীলিত কণ্ঠের পরিবেশনার অনন্যতা।

কোন গানটি বেশী ভাল লেগেছে? বলা সহজ নয়। তবু বলি 'না যেওনা', 'রাধিকাবিহনে', 'সোনার হাতে', 'দুটি জলে ভেজা', 'কে সজনী', যেন তাঁর স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠ শক্তির দীপ্তিতে ভাস্বর। 'কে সজনী' গানটিতে গজলের ঢঙের রঙিন উচ্ছ্বাস—শিল্পীর আবেগে এবং কণ্ঠ ও হৃদয়ের অপূর্ব মেলবন্ধনে চিত্ত দুলিয়ে দেয়। রাগাশ্রিত গানগুলির তানসৌকর্য, মীড়ের কারুকৃতি ও তারসপ্তকে কণ্ঠের স্বচ্ছন্দ বিহার ও অন্তরার অংশে স্বতঃ-নির্দেশের আলোয় আকুল উদাত্ত কণ্ঠনিক্ষেপে স্বর-ব্যঞ্জনার বিশুদ্ধতা ও মাধুর্যে অভিভূত হয়ে শ্রদ্ধেয় জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে করে 'সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাংলা আধুনিক ও রাগপ্রধানের গায়কী ও চাল আজ বহু বাঙালী উন্নতি-কামী শিল্পীদের আদর্শ ও অনুসরণের বস্তু।'

নির্বাচিত নজরুল গীতি দুটিতে তিনি যেন সকলকে ছাপিয়ে গেছেন আপন শিল্পী ব্যক্তিত্বে।

আরও একটি কথা। কয়েকজন ব্যতিক্রম ছাড়া আধুনিক বাংলা গানে কথার দৈন্য বড় বেদনাদায়ক। কিন্তু অনেক গানের নিকৃষ্ট কথাও শিল্পীর গায়কীর গুণে রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে।

বিশেষ বক্তব্য হিসাবে উপসংহারে দু' কথা পেশ করতে চাই। উনত্রিশটি গানে মাঝখানে ১০ মিনিট ছাড়া কোথাও কো বিরতি না দিয়ে এবং পুনরাবৃত্তি না ক ক্রমান্বয়ে গেয়ে যাওয়ায় ভাববৈচিত্র্যই শ আসেনি শ্রোতারা নির্বিঘ্নচিত্ত হয়ে শুন পেরেছেন আর উপভোগ করেছেন চমৎ দোলা। এ গায়নশৈলী আমার খাঁর প বেশনাভঙ্গীকে মনে করিয়ে দেয় অ এইখানেই শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত।

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের হার্মোনিয়ম ও বালসারার পিয়ানো সঙ্গত অনুষ্ঠানটি মর্যাদামণ্ডিত করেছে। দাদরা, তেও কাহারবা ও ত্রিতলের বিভিন্ন ছন্দে সু সঙ্গত করেছেন শ্যামল বসু। অন্য সঙ্গতিয়াদের মধ্যে ছিলেন বংশীধর র কার্তিক ঘোষ, অমিয় মুখোপাধ্যায়।

গৌরী ঘোষের মধুর কণ্ঠের ঘো অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ।

রূপমতী—বাজবাহাদুর — উচ্চা নৃত্য ও গীতের এমন অপ সমন্বয় বিরল যেমনটি দেখলাম সুরত প্রযোজিত 'রূপমতী-বাজবাহাদুর' নৃ নাট্যে। মঞ্চ, রবীন্দ্রসদন।

মালোয়ারাজ বজবাহাদুর ও রা সর্দার দুহিতা রূপমতীর প্রণয়কাহিনী করুণ পরিসমাপ্তি এই নৃত্যনাট্যের জীব্য বস্তু।

এই কাহিনীকে নৃত্যরূপে দেবার দা গ্রহণ করেছিলেন গুরু বালকৃষ্ণ মেনন সংগীত রচনা ও পরিচালনায় ছিলেন ত গঙ্গোপাধ্যায়। উভয়েই আপনাপন দা যথাযথরূপে পালন করেছেন বলেই থেকে শেষ অবধি রূপমতী-বাজবাহাদু রুদ্ধশ্বাসে উপভোগ করবার মতই হয়েছিলো।

বাজবহাদুর চরিত্রে রাজার দৃপ্ত প্রেমিকচিত্তের মুগ্ধতা ও সংগীতানুরাগ কৃষ্ণ মেননের স্বল্প অভিনয়ে ও ক ভঙ্গিতেই সুপরিস্ফুট, যেমন সুস্পষ্ট সুদক্ষ চিত্রকরের কয়েকটি স্কেচে ছবির পূর্ণাঙ্গ রূপ।

রাগসংগীত গেয়ে মুগ্ধ ক রুক্মাবাঈ সেনগুপ্ত। সুরেলা কণ্ঠ। উ শিক্ষা ও রেওয়াজে অনুশীলিত। ফলশ্রুতি—আকর্ষণকারী এঁর প্রতিটি সংগীত। গজল-গানে আশ্চর্য রস করেছেন বেলা অর্ণব।

বিশ্বনাথ ঘোষ ভালই গেয়েছেন। স্থানে স্থানে সুরবিচ্যুতি রসহানি ঘটি কত্থকনৃত্যে বেলা অর্ণবের পরিমা ছাপ লক্ষণীয়।

সর্বশেষ কিন্তু সোচ্ছ্বাসে কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়ের নৃত্যে দিয়ে রূপায়ণের অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়ে আলোকপাতে কনিষ্ক সেন ও কা কথনে নীহারকণা মুখোপাধ্যায় বক্তব্যকে জমিয়ে তুলেছেন।

—চিত্র

দর্শক

অলিম্পিক সাঁতার

মিউনিখ অলিম্পিক গেমসে সাঁতারু-দেরই জয়জয়কার। বিশ্ব এবং অলিম্পিক রেকর্ড ভাঙায় তাঁরা অলিম্পিক গেমসের অন্যান্য বিভাগের প্রতিযোগীদের টেক্কা দিয়েছেন। পুরুষ ও মেয়েদের নিয়ে সাঁতারে যে ২৯টি বিষয় ছিল তার প্রতিটি-তেই নতুন অলিম্পিক রেকর্ড হয়েছে এবং নতুন বিশ্বরেকর্ড হয়েছে ২৩টি বিষয়ে। (পুরুষদের বিশ্বরেকর্ড ১২টি এবং মেয়েদের বিশ্বরেকর্ড ১১টি)। অর্থাৎ মাত্র ৬টি বিষয়ে যা নতুন বিশ্বরেকর্ড হয় নি: অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এ সাফল্য অলিম্পিক সাঁতারুদের পক্ষে নিঃসন্দেহে অসাধারণ দক্ষতা এবং গর্বের বিষয়।

অলিম্পিক রেকর্ড

পুরুষদের ১৫টি বিষয়েই নতুন অলিম্পিক রেকর্ড হয়েছে। এই পনেরোটি নতুন অলিম্পিক রেকর্ড করেছে এই পাঁচটি দেশ : আমেরিকা (৯টি), পূর্ব জার্মানী (২টি), সুইডেন (২টি), জাপান (১টি) এবং অস্ট্রেলিয়া (১টি)।

মেয়েদের ১৪টি বিষয়েও নতুন অলিম্পিক রেকর্ড করেছে এই তিনটি দেশ : আমেরিকা (৯টি), অস্ট্রেলিয়া (৪টি) এবং জাপান (১টি)।

বিশ্ব রেকর্ড

পুরুষদের সাঁতারে নতুন বিশ্ব রেকর্ড হয়েছে ১২টি বিষয়ে এবং একটি বিষয়ে আগের বিশ্বরেকর্ডের সমান হয়েছে। পুরুষদের সাঁতারে বিশ্ব রেকর্ড করেছে এই চারটি দেশ : আমেরিকা (৯টি), জাপান (১টি), পূর্ব জার্মানী (১টি) এবং সুইডেন (১টি)। পূর্ব জার্মানী ২০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক সাঁতারে আগের বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করেছে।

মেয়েদের সাঁতারের ১১টি বিষয়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেছে এই তিনটি দেশ : আমেরিকা (৭টি), অস্ট্রেলিয়া (৩টি) এবং জাপান (১টি)।

পদক জয়

মেয়ে ও পুরুষদের সাঁতারে যেখানে মোট পদক ছিল ৮৭টি সেখানে আমেরিকা একাই ৪৪টি পদক পেয়েছে (পুরুষদের ২৬টি এবং মেয়েদের ১৮টি)। অপর ১০টি দেশ মিলে বাকী ৪৩টি পদক পেয়েছে।

সাঁতারের বিশ্ব রেকর্ড

পুরুষ বিভাগ

দূরত্ব	মিঃ	সেঃ	রেকর্ডধারী	দেশ
ফ্রি স্টাইল				
১০০ মিটার		৫১·২২	মার্ক স্পিজ	আমেরিকা
২০০ মিটার	১	৫২·৭৮	মার্ক স্পিজ	আমেরিকা
১৫০০ মিটার	১৫	৫২-৫৮	মাইকেল বার্টন	আমেরিকা
রিলে				
৪×১০০ মিটার	৩	২৬·৪২	আমেরিকা দল	
৪×২০০ মিটার	৩	৩৫·৭৮	আমেরিকা দল	
ব্রেস্টস্ট্রোক				
১০০ মিটার	১	০৪·৯৪	নবুতাকা তাগুচি	জাপান
২০০ মিটার	২	২১·৫৫	জন হেনকেন	আমেরিকা
বাটারফ্লাই				
১০০ মিটার		৫৪·২৭	মার্ক স্পিজ	আমেরিকা
২০০ মিটার	২	০০·৭০	মার্ক স্পিজ	আমেরিকা
ব্যাকস্ট্রোক				
১০০ মিটার		৫৬·৫৮	রোল্যান্ড ম্যাথিজ	পূঃ জার্মানী
২০০ মিটার	২	০২·৮২	রোলান্ড ম্যাথিজ	পূঃ জার্মানী
ব্যক্তিগত মেডলে রিলে				
২০০ মিটার	২	০৭·১৭	গানার লারসন	সুইডেন
দলগত মেডলে রিলে				
৪×১০০ মিটার	৩	৪৮·১৬	আমেরিকা দল	

মহিলা বিভাগ

দূরত্ব	মিঃ	সেঃ	রেকর্ডধারী	দেশ
ফ্রি স্টাইল				
২০০ মিটার	২	০৩·৫৬	শেন গোল্ড	অস্ট্রেলিয়া
৪০০ মিটার	৪	১৯-০৪	শেন গোল্ড	অস্ট্রেলিয়া
৮০০ মিটার	৮	৫৩-৬৮	কিনা রোথামার	আমেরিকা
দলগত ফ্রি-স্টাইল রিলে				
৪×১০০ মিটার	৩	৫৫-১৯	আমেরিকা দল	
ব্রেস্টস্ট্রোক				
১০০ মিটার	১	১৩-৫৮	ক্যাথেরিন কার	আমেরিকা
বাটারফ্লাই				
১০০ মিটার	১	০৩·৩৪	মাউমি আওকি	জাপান
২০০ মিটার	২	১৫·৫৭	কারেন মো	আমেরিকা
ব্যাকস্ট্রোক				
২০০ মিটার	২	১৯-১৯	মেলিসা বেলোট	আমেরিকা
ব্যক্তিগত মেডলে রিলে				
২০০ মিটার	২	২৩·০৭	শ্যোন গোল্ড	অস্ট্রেলিয়া
৪০০ মিটার	৫	০২·৯৭	গেল নিয়াল	আমেরিকা
দলগত মেডলে রিলে				
৪×১০০ মিটার	৪	২০·৭৫	আমেরিকা দল	

স্বর্ণপদক জয়ের চূড়ান্ত তালিকাতেও আমেরিকা শীর্ষ স্থান লাভ করে। মোট ২৯টি পদকের মধ্যে (পুরুষদের ১৫টি ও মেয়েদের ১৪টি) আমেরিকা ১৮টি স্বর্ণ-পদক জয়ী হয়—পুরুষ বিভাগে ৯টি এবং মহিলা বিভাগে ৯টি। বাকী ১১টি স্বর্ণ-পদক পেয়েছে এই চারটি দেশ : অস্ট্রেলিয়া ৫টি, জাপান ২টি, পূর্ব জার্মানী ২টি এবং সুইডেন ২টি।

অলিম্পিক গেমসের কোন একটি অনুষ্ঠানে একটি দেশের পক্ষে তিনটি পদক (স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ) জয় নিঃসন্দেহে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়। মিউনিখ অলিম্পিক সাঁতারে একমাত্র আমেরিকা সে রকম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে দুটি অনুষ্ঠানে—পুরুষ ও মেয়ে-দের ২০০ মিটার বাটারফ্লাই সাঁতারে।

অসাধারণ ব্যক্তিগত সাফল্য

আমেরিকার ২২ বছরের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র মার্ক স্পিজ মিউনিখ অলিম্পিক সাঁতারে মোট ৭টি স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে এক অভূত-পূর্ব নজির সৃষ্টি করেছেন। তাঁর আগে অলিম্পিক গেমসের একটি আসরে কোন পুরুষ এবং মহিলার পক্ষে কোন খেলাতেই সাতটি স্বর্ণপদক জয় সম্ভব হয় নি। শুধু তাই নয়, সাঁতারের চারটি ব্যক্তিগত অনু-ষ্ঠানের প্রতিটিতে নতুন অলিম্পিক এবং বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করে মার্ক স্পিজ স্বর্ণ-পদক পেয়েছেন। তাছাড়া যে তিনটি দল-গত রিলেতে তিনি স্বর্ণপদক পেয়েছেন তার প্রত্যেকটিতেই নতুন বিশ্ব এবং অলিম্পিক রেকর্ড হয়েছে।

আমেরিকার মার্ক স্পিজের পরই ব্যক্তিগত সাফল্যের দিক থেকে অস্ট্রেলিয়ার ১৫ বছরের স্কুল-ছাত্রী কুমারী শোন গোল্ডের নাম উল্লেখযোগ্য। শোন গোল্ড ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে মোট ৫টি পদক পেয়ে-ছেন—স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ১।

সাঁতারে অলিম্পিক পদক জয়

পুরুষ বিভাগ

দেশ	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
আমেরিকা	৯	৯	৮	২৬
পূঃ জার্মানী	২	১	১	৪
সুইডেন	২	০	০	২
অস্ট্রেলিয়া	১	১	০	২
জাপান	১	০	১	২
রাশিয়া	০	১	২	৩
পঃ জার্মানী	০	১	১	২
কানাডা	০	১	১	২
ইংল্যান্ড	০	১	০	১
হাঙেগরী	০	০	১	১
মোট	১৫	১৫	১৫	৪৫

মহিলা বিভাগ

দেশ	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
আমেরিকা	৯	৫	৪	১৮
অস্ট্রেলিয়া	৪	১	২	৭
জাপান	১	০	০	১
পূঃ জার্মানী	০	৪	১	৫
ইতালী	০	১	২	৩
রাশিয়া	০	১	১	২
হাঙ্গেরী	০	১	১	২
কানাডা	০	১	১	২
পঃ জার্মানী	০	০	২	২
মোট :	১৪	১৪	১৪	৪২

মিউনিখ অলিম্পিক গেমসে আমেরিকার ১৯৬৮ সালে মেকসিকো অলিম্পিক গেমসেও সাঁতারুরা এই বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

মিউনিখ অলিম্পিক সাঁতারে সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলি বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। মেয়ে ও পুরুষদের সাঁতারে মাত্র এই তিনটি সমাজতান্ত্রিক দেশ পদক পেয়েছে — পূর্ব জার্মানী মোট ৯টি (পুরুষদের ২টি স্বর্ণপদকসহ), রাশিয়া মোট ৫টি এবং হাঙ্গেরী মোট ৩টি। তান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে স্বর্ণপদক একমাত্র পূর্ব জার্মানী (পুরুষ বিভা স্বর্ণপদক)। আমেরিকা একাই যেখানে ও পুরুষদের সাঁতারে মোট ১৮টি এবং মোট পদক পেয়েছে ৪৪টি, তিনটি সমাজতান্ত্রিক দেশ পেয়েছে ২টি স্বর্ণ এবং মোট ১৭টি পদক।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সাঁতার

আমেদাবাদে আন্তঃবিশ্ববি সাঁতারের ছাত্র বিভাগে বোম্বাই এবং বিভাগে পুণা দলগত চ্যাম্পিয়ান গত বছরের ছাত্র বিভাগের চ্যাম্পিয়ান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বছর ছাত্র বিভাগে তৃতীয় স্থান পে

চূড়ান্ত ফলাফল

দলগত চ্যাম্পিয়ান

ছাত্র বিভাগ : ১ম বোম্বাই (৪৬ প ২য় পুণা (২৫ পয়েন্ট) এ কলকাতা (২৩ পয়েন্ট)।

ছাত্রী বিভাগ : ১ম পুণা (৫২ পয়েন্ গুজরাট (৫১ পয়েন্ট)।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান

ছাত্র বিভাগ : টিওগু খাটাউ (২৭ পয়েন্ট।

ছাত্রী বিভাগ : মেধা জগলেকার (প ২৮ পয়েন্ট।

পশ্চিমবংগ রাজ্য সন্তরণ

কলকাতার পদ্মপুকুর স্কোয়ারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সন্তরণ প্রতিযো মোট ২০টি নতুন রাজ্য রেকর্ড প্র হয়েছে এবং পূর্বের একটি রেকর্ড করেছে। এই রেকর্ডগুলির মধ্যে পু ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে সাহা ৩১ বছর আগে শচীন নাগ প্র রাজ্য রেকর্ড ভেঙেছেন এবং ২০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক সাঁতারে আলি ১৯৫৫ সালে আরতি সাহা প্র রাজ্য রেকর্ড ভেঙেছেন। এই দুটি থেকেই বলা যায়, সাঁতারে পশ্চিম রেকর্ড ভাঙার দিক থেকে শম্বুক চলেছে।

চূড়ান্ত ফলাফল

দলগত চ্যাম্পিয়ান

পুরুষ বিভাগ : বৌবাজার ব্যায়াম (৬১ পয়েন্ট)।

জুনিয়র বিভাগ : বৌবাজার ব্যায়াম (৫৭ পয়েন্ট)।

মহিলা বিভাগ : ইণ্ডিয়ান লাইফ সোসাইটি (৫৪ পয়েন্ট)।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান

পুরুষ বিভাগ : সঞ্জীব সাহা (জগজ্জ

মহিলা বিভাগ : নাফিসা আলি (ই লাইফ সেভিং সোসাইটি)।

অমৃত পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে অমৃত কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষান্মাষিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার (চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১.০২
ষান্মাষিক	টাকা	০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ
২য় খণ্ড

২৫ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday, 27th October 1972 শুক্রবার, ১০ কার্তিক, ১৩৭৯ .52 Paise

এক নজরে

শত রূপে মা :

শক্তের অবশ্য রূপ, তিনি আছেন সর্বভূতে, সকল সৃষ্টিতে, প্রাণে-প্রাণে, তৃণে-তৃণে। তাঁকে যে-রূপে কল্পনা কর তিনি সে-রূপেই প্রতিভাত, যে-নামেই ডাকো, ডাকার মতো ডাকলে পরে, তিনি তাতেই সাড়া দেবেন। ভক্তদের ডাকে এবার মা সাড়া দিয়ে-ছিলেন কিনা জানি না, কারণ সেটা ভক্তদের ডাকের আকুলতার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু মায়ের রূপকল্পনায় এবার ভক্তরা যে রুচি-বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা শুধু অভিনবই নয়, তা প্রায় বৈপ্লবিক। মাটির মূর্তিতে মাতৃরূপের কল্পনায় অভ্যস্ত বাঙালীর শিল্পচেতনায় প্রথম ব্রেক থ্রু ঘটায় শোলা। শুভ্র সুন্দর নমনীয় ও কমনীয় ঐ বস্তুটি মূর্তিশিল্পে মাটির একটি আদর্শ বিকল্পরূপে স্বাগত লাভ করে সেদিন। কিন্তু শিল্পে ঐ সামান্য রুচি ও রীতি পরিবর্তনের স্বীকৃতি উদ্ভট চিন্তায় অতি পারদর্শী বাঙালীর সৃষ্টি-কল্পনাকে এমনই বলগাছাড়া করে দিল কয়েক বছরের মধ্যে যে, তার ফলে আজ মূর্তি-শিল্পের মাধ্যম উদ্ভাবনে চমক লাগানোর ব্যাপারটি পূজার প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাটি ত প্রায় গেছে, শোলাও এখন ব্যাকডেটেড ব্যাপার। কাপড়, কাঁচ, বাঁশ, কাঠ, সেও পুরানো হতে চলেছে। ছেঁড়া কাগজ, কাঠের গুঁড়ো, তুঁষ, পেরেক, দেশলাইর কাঠি ইত্যাদি নিয়েও গত বছর এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গেছে, সুতরাং এবার নতুন কিছু চাই। সেই নতুনের নেশায় এবার এসেছে ঝিনুক, খৈ, আখের ছিবড়ে, ঘাস। ঘাসবিভোরদের অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন—আহা, আমাদের সম্বৎসরের খাদ্য এমনিভাবে নষ্ট করলে, কিন্তু তাঁরা এ-বিদ্রূপকে নব উদ্ভাবনের চিরন্তন প্রাপ্য বলে ধরে নিয়েছেন। তবে শুনেছি যে, লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ের প্রচণ্ড আক্রমণে খৈ আর আখের ছিবড়ে-ওলারা বিভোর হওয়ারও অবকাশ পাননি। একটানা চারদিন ডি-ডি-টি স্প্রে করে মূর্তি রক্ষা করতে তাঁদের হিমসিম খেতে হয়েছে। সুতরাং সামনের বছর অন্তত যাঁরা আখের গুড়ের সোনালি রং বা কদমার শুভ্রতাকে মূর্তির শোভাবর্ধনে কাজে লাগানোর কথা ভাবছিলেন, তাঁরা খৈ ও আখের ছিবড়ে-ওলাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ করতে পারবেন।

পরিণয় পাঠ : বিবাহবন্ধন জন্মজন্মান্তরের যদি নাও হয় তা যে নরনারীর জীবনের সর্বাধিক স্থায়ী বন্ধন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটা ঠিক বন্ধুত্বের প্রীতিবন্ধন নয়, আবার শুধু কর্তব্যপালনের মধ্যেই এর দায়দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। এর সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং জৈব ও যৌন নানা বিষয় জড়িত আছে যে-সম্পর্কে সংসৃষ্ট উভয়পক্ষের যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না থাকলে বিবাহজীবন কিছুতেই সুখের হতে পারে না। বিবাহের প্রথম উচ্ছ্বাসের নিশার স্বপন যখন ভোর হয় তখন প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ফুলমালার ফুলগুলি ঝরে গিয়ে শুধু ডোরের বন্ধন অবশিষ্ট থাকে। সেটি ক্লান্তিকর ও বহুক্ষেত্রে অসহনীয়। তখনই বিচ্ছেদের কথা এসে যায়। অথচ, বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এরকম একটা অবস্থার সৃষ্টি কিছুতেই হতে পারে না, যদি বিবাহজীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু 'ডুজ' ও 'ডোন্টস' সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের গোড়া থেকেই অবহিত করা যায়। বিবাহজীবনের শান্তির উপর সমাজের শান্তি নির্ভরশীল, আর শান্ত পরিতৃপ্ত সমাজ হল সুখী সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের মুখ্য শর্ত। সেকারণে বিবাহজীবনকে সুখময় ও সমস্যামুক্ত করাকে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য মনে করেছেন পূর্ব জার্মানির সরকার।

পূর্ব বার্লিনে সম্প্রতি বিবাহজীবনের নানাদিক ছাত্রছাত্রী-দের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিবাহজীবনকে 'নৈরাশ্য ও বিরোধমুক্ত' করার উদ্দেশ্যে ছাত্রছাত্রীদের আগাম তালিম দেওয়া হবে ঐ শিক্ষাসূচীতে। মোট বারোটি লেকচার দেওয়া হবে 'জীবনসাথীর সন্ধান' বিষয়ে। ঐসব লেকচার দেবেন একজন বিচারপতি, একজন গায়নেকোলজিস্ট, একজন ইণ্টিরিয়ার ডেকরেটর, একজন কসমেটিশিয়ান, একজন গার্হস্থ্যবিজ্ঞানী, একজন সমাজতত্ত্ববিদ ও একজন মনস্তত্ত্ববিদ। বিবাহিত ব্যক্তিরাও ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ নিতে পারবেন এবং দৈবত জীবনের শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক যে কোন সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন করে চিঠি লিখলে তার উত্তরও ঐ স্কুলের অধ্যাপকরা দেবেন।

উপাধির ঝামেলা : আমাদের দেশে ত কত বাঘ-সিংহ-হাতী আর কাঁঠাল-কাষ্ঠ-কোটাল, ঘোষ-বোস-মিত্র-মুখুজ্জেদের মধ্যে অবাধে বিচরণ করছেন। তা নিয়ে কারও মাথা ব্যথা নেই। নেহাৎ যদি কোন হাতী বা কাঁঠালেরই এ নিয়ে মাথাব্যথা হয়ই তবে তার সংবাদপত্রের মাধ্যমে 'আজ থেকে আমি কাঁঠাল থেকে মুখার্জি হলাম' ঘোষণাতেও কেউ আপত্তি করে না। এ ব্যাপারে 'রায়'ই বোধহয় বৃহত্তম রোলার, যার নীচে সর্বাধিক সংখ্যক উপাধিবৈচিত্র্যের সমতা ঘটেছে।

কিন্তু ফ্রান্সের এক ট্রোগনেন দম্পতিকে সম্প্রতি ট্রোগনেন হওয়ার অপরাধে যে ঝামেলা পোয়াতে হল তা প্রায় অভূতপূর্ব ঘটনা। নিঃসন্তান ট্রোগনেন দম্পতি ফিলিপ নামক এক শিশুকে দত্তক গ্রহণ করার পর থেকেই ঐ ঝামেলার সূত্রপাত হয়। মেলা… শহরের অধিবাসী শ্রীজেরার্ড ট্রোগনেন সামান্য ব্যক্তি নন, তিনি ঐ শহরের একজন পদস্থ সরকারি কর্মচারী। বিবাহের দীর্ঘদি… পরেও কোন সন্তান না হওয়ায় তিনি ফিলিপকে দত্তক গ্রহ… করেন। কিন্তু সেটা বোধহয় পাড়াপড়শিদের কারও অপছ… হওয়ায় তিনি মেলান আদালতে ট্রোগননের নামে এক মামল… ঠুকে দিয়ে বলেন যে, ট্রোগনন দম্পতির দত্তক পুত্র হওয়ার ম… ফিলিপকে ভবিষ্যতে খুবই ভুগতে হবে। কারণ, ট্রোগনন উপা… নিয়ে কোন মানুষের পক্ষে সমাজে বড় হওয়া সম্ভব নয়। সুতর… ফিলিপের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তাকে ট্রোগনন দম্পতির কা… থেকে সরিয়ে আনা হক।

আদালতের শমন হাতে পেয়ে ট্রোগনন ত হতবাক। তি… বিচারককে সরাসরি প্রশ্ন করলেন—ট্রোগনন কথাটি কি এম… খারাপ যে, ঐ উপাধি নিয়ে ফিলিপকে ভবিষ্যতে ভুগতে হবে… তাঁকে ত এ নিয়ে কোন অসুবিধা বোধ করতে হয়নি? আশ্চর্যে… বিষয় যে, মেলান আদালতের রায় ট্রোগননের বিরুদ্ধে গেল। আ… সঙ্গে সঙ্গে হৈচৈ পড়ে গেল সারা ফ্রান্সে। ফরাসি ভাষায় ট্রোগন… কথাটির অর্থ বাঁধাকপির গোড়া, আর এক অর্থ আপেলের শাঁ… যাদের উপাধির ঐরকমই একটা কিছু মানে তারাই বিচলিত হ… সবচেয়ে বেশি। সবাই বলাবলি করতে লাগল, এবার কি তাদে… বাপপিতামহর উপাধি নিয়ে সরকার টানাহ্যাঁচড়া শুরু করবে…

ট্রোগনন কিন্তু বিচলিত হননি। নিম্ন আদালতের রায়ে… বিরুদ্ধে তিনি প্যারিসের আদালতে আপিল করেন এবং উ… আদালতের রায় তাঁর পক্ষেই গেছে। প্যারিশ আদালতের রা… বলা হয়েছে, ট্রোগনন কথাটা একটু বিদ্‌ঘুটে হলেও শুধুম… ঐ কারণে ফিলিপকে ট্রোগনন দম্পতির কাছ থেকে সরিয়ে আন… কোন প্রয়োজন নেই।

—প্রত্যক্ষদর্শী

শুভ বিজয়া এবং তারপর

বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব শেষ হয়েছে। আমরা বিনম্রচিত্তে সকলকেই জানাই 'বিজয়ার শুভ কামনা। অকল্যাণের বিরুদ্ধে কল্যাণের, অশুভশক্তির বিরুদ্ধে শুভশক্তির জয়ই বিজয়ার তাৎপর্য। বাঙালীর সমাজজীবনে আজ এই উৎসবের তাৎপর্য সার্থকভাবে প্রতিফলিত হোক। সকলের জীবনে আসুক সুখ ও শান্তি। দূর হয়ে যাক অজ্ঞানতার অন্ধ তমসা। প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হোক সকল মানুষ। সকলের জীবন হোক সার্থক ও সুন্দর। দেবীকে আমরা বিদায় দিই না। আমরা বলি, পুনরাগমনায় চ। আবার ফিরে আসবার জনাই এই সাময়িক বিদায়।

এই শুভ কামনাই অবশ্য যথেষ্ট নয়। কারণ কেবলমাত্র সদিচ্ছায় আমরা আমাদের জীবন থেকে দুঃখ ও দারিদ্র্য দূর করতে পারব না। এর সঙ্গে চাই সংকল্প ও কর্মক্ষমতা। বাংলার বুকের ওপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝাপটা বয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের জীবনে ছিল ভয় ও সন্ত্রাসের কালো ছায়া। এবার সেই ভয় গেছে দূর হয়ে। শান্তি ও স্বস্তির মধ্যে এবার অনুষ্ঠিত হয়েছে উৎসব। জীবনে উৎসবের প্রয়োজন আছে, আনন্দের উপকরণও চাই জীবনকে সুন্দর করে তোলার জন্য। কিন্তু উৎসবের পরে প্রতিদিনের জীবনযাপন কীভাবে আমরা করব তার ওপরেই নির্ভর করবে উৎসবের সংকল্পের সার্থকতা। কারণ, আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনে প্রত্যাশিত স্বপ্ন সফল হয়নি। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য আমাদের আনন্দোৎসবকে সে কারণেই ম্লান করে দেয় অনেকখানি।

রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি সম্প্রতি দিল্লিতে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সম্মেলন উদ্বোধন প্রসঙ্গে এই সমস্যার প্রতি আমাদের এবং বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে যে পার্থক্য বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান তা থেকেই সমস্ত অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি। এই বৈষম্যই একদিন মানুষের পক্ষে ভয় ও দুঃখের কারণ হয়ে উঠবে বলে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এ-কথা আজ সত্য যে, পৃথিবীর অনেক দেশ প্রাচুর্য ও স্বচ্ছলতায় গা ভাসিয়ে দিলেও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের দ্বারা কবলিত। চাঁদের এক পিঠে যেমন আলো এবং অন্য পিঠে চির-অন্ধকার, এই পৃথিবীরও দুই মুখ। এক মুখ আনন্দে উচ্ছল, প্রাচুর্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। অন্য মুখ ক্ষুধা ও অপুষ্টিতে শীর্ণ, রোগে ও দারিদ্র্যে পাণ্ডুরবর্ণ। এইভাবে পৃথিবীতে কোনোদিন সত্যিকারের শান্তি ও স্বস্তি আসতে পারে না। এর জন্য সুখী ও সমৃদ্ধ দেশগুলোর যে-দায়িত্ব পালন করার কথা তা তারা করেনি বলেই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য আসেনি। রাষ্ট্রসংঘ থেকে বহুবার আবেদন করা হয়েছে সমৃদ্ধ দেশগুলোর কাছে। যারা দুর্বল, যারা অনুন্নত ও অনগ্রসর তাদের প্রতি সাহায্য ও সহযোগিতা না দেখালে তারা কোনোদিনই উন্নতদের স্তরে আসা দূরে থাক, সাধারণ সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্যের মুখও দেখতে পাবে না। রাষ্ট্রপতি গিরি আবেদন জানিয়েছেন সমস্ত দেশের মিলিত উদ্যোগে পৃথিবীর বুক থেকে ক্ষুধা ও অপুষ্টিকে চিরতরে নির্বাসন দিতে। এই আবেদন আজ নতুন করা হল না। বিশ্বের মানবদরদী বহু প্রখ্যাত ব্যক্তি, এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, দরিদ্র দেশের মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে সুখী দেশগুলোর শান্তি ও নিরাপত্তা হবে ক্ষণস্থায়ী। তাদের সুখের প্রাসাদ ভেঙে পড়বে তাসের ঘরের মতো। রাষ্ট্রসংঘ বহুবার প্রস্তাব নিয়েছে উন্নত দেশগুলো তাদের জাতীয় আয়ের এক শতাংশ দিক হতভাগ্য দরিদ্র দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য।

সে প্রস্তাব কার্যকর হয়নি। কারণ, নিছক বিশ্বপ্রেমের তাগিদে সমৃদ্ধ দেশগুলো দরিদ্র দেশগুলোর জন্য অর্থ সাহায্য দিতে রাজী নয়। তার সঙ্গে জুড়ে দিতে চায় রাজনৈতিক কাঁটা যা গলায় লাগলে ক্ষতবিক্ষত হবার আশংকা। এই রাজনৈতিক চালবাজি ও ধূর্তামির জন্যই পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলোর অবস্থার হেরফের ঘটেনি।

কিন্তু তার জন্য হতাশ হয়ে বসে থাকলে চলবে না আমাদের। ধনী দেশগুলোর কৃপাভিক্ষা না করে নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে দারিদ্র্য ও ক্ষুধার বিরুদ্ধে ক্লান্তিহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের নিজের দেশের দারিদ্র্য আজ সীমাহীন। দেশের প্রায় অর্ধেক লাক এমন দারিদ্র্যের স্তরে বাস করে যাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বলা চলে না। দারিদ্র্য বলতে আমরা যা বুঝি তারও নিচেকার স্তরে বাস করে দেশের অনেক মানুষ। এরা আর কতদিন অপেক্ষা করবে? কবে হবে আমাদের সংকল্প পূরণ? কবে হবে স্বপ্নের সার্থক রূপায়ণ? আজ এই প্রশ্নগুলোর উত্তর মেলাবার দিন।

দেবী লক্ষ্মী

অথর্ববেদীয় নৃসিংহতাপনী উপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় মন্ত্রে মহালক্ষ্মী-গায়ত্রী উপদিষ্ট। গায়ত্রীটি এই—'ওঁ ভূর্লক্ষ্মীর্ভুবর্লক্ষ্মীঃ স্বঃ কালকর্ণী তন্নো মহালক্ষ্মীঃ প্রচোদয়াৎ।' গায়ত্রীটি চতুর্বিংশদক্ষরা। নৃসিংহরূপী ব্রহ্মের প্রকাশাত্মিকা শক্তিই মহালক্ষ্মী—ইনি ভূরাদি ব্যাহৃতিযুক্তা প্রণববিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা, পরমার্থবিষয়া। সুতরাং উপনিষদ-কথিত এই মহালক্ষ্মীগায়ত্রী মুখ্যতঃ আধ্যাত্মিক। লক্ষ্মীর লোক-প্রচলিত ধ্যান-স্তুতির মধ্যেও তাঁর অধ্যাত্ম মহিমার প্রকাশ সুস্পষ্ট। তিনি বিদ্যা, বিদ্যাবতী, বেদবতী; তিনি শুভা, নিত্যা, সতী বা সৎ-স্বরূপা, তিনি আত্ম-বিদ্যা, যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা; তাঁর শ্রীহস্তে অক্ষমালা বা জপমালা, তিনি বিমুক্তিফলদায়িনী—এসব স্তুতি এ-কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, দেবী লক্ষ্মী শুধু ঐহিক ধনসম্পদেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নন, তিনি পারমার্থিক ঐশ্বর্যের মুক্তিধনেরও উৎসরূপিণী। ...বিষ্ণুকে যাঁরা জগৎপিতারূপে ভজনা করেন, লক্ষ্মী তাঁদের মা।

কোজাগরী শব্দের তাৎপর্য

প্রবাদ আছে—কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার রাত্রে দেবী খোঁজ নেন, কে জেগে আছে। যে জেগে অক্ষক্রীড়া করে, লক্ষ্মী তাকে ধন দান করেন।

নিশীথে বরদা লক্ষ্মীঃ কো জাগর্তীতিভাষিণী।
তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়াং করোতি যঃ।।

'কো জাগর্তি'—কে জেগে আছ—দেবী লক্ষ্মী ডেকে ডেকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেন বলে সেই পূর্ণিমা রাত্রিটিকে বলা হয় কোজাগরী পূর্ণিমা। এক্ষণে প্রশ্ন—'কো জাগর্তি' এই বাক্যটির প্রকৃত অর্থ কি? অক্ষক্রীড়া শব্দটিতেই বা কি বুঝবো?

'অক্ষ' শব্দটির এক অর্থ পাশক। তমোগুণপ্রধান, মূর্খ ও পাপকর্মা ব্যক্তিরা ধরে নিয়েছে যে, লক্ষ্মীপূজার রাত্রে পাশা-খেলা ধনদা লক্ষ্মীর অভিপ্রেত। তারা বাজি রেখে পাশা খেলায় মেতে যায়। কোথাও বা পাশা খেলার পরিবর্তে পরের বাগানের ফল-মূলাদি চুরি এবং বাগানের তৈরী গাছপালার ক্ষতিসাধনাদির ন্যায় অর্থহীন এবং অন্যায় লৌকিক প্রথাও দেখা যায়। অক্ষ শব্দটির দ্বিতীয় অর্থ—ক্রয়-বিক্রয় চিন্তা। যারা বৈশ্য—রজস্তমঃ-প্রধান, তাঁরা লক্ষ্মীপূজার রাত্রে দেবীকে স্মরণ মনন, আরাধন-পূর্বক ক্রয়-বিক্রয় বা বাণিজ্যবৃদ্ধির চিন্তন করেন।...যাঁরা শুদ্ধ-সত্ত্বপ্রধান, আত্মরতিপরায়ণ, তাঁরা অক্ষক্রীড়া মানেই বুঝবেন জপ-মালা নিয়ে রাত্রি জাগরণপূর্বক বিমুক্তিফলদায়িনী লক্ষ্মীর ধ্যান, ধারণা, উপাসনা ও তাঁর শুভনাম জপ। 'কো জাগর্তি' বাক্যটি তাঁদের নিকট আত্মচৈতন্যের বাণী। আত্মার দিক থেকে যে জেগে থাকে, মোক্ষরূপ শ্রেষ্ঠ বর সে-ই পায়। উপনিষৎ সেই জন্যই নির্দেশ দিলেন—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' লক্ষ্মীপূজার রাত্রে দেবী আসেন, মর্তজীবের দ্বারে দ্বারে পরম আশীর্বাদ নিয়ে যেচে যান, রুদ্ধদ্বার গৃহে যে ঘুমিয়ে থাকে, হতভাগ্য সে, দেবী তার গৃহদ্বার থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে চলে যান। কিন্তু যে জেগে থাকে পরম ধনে ধনী হয়ে তারই জীবন হয় সার্থক।
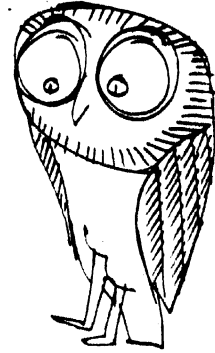
পেচক কেন লক্ষ্মীর বাহন?

অতীব বিস্ময়কর কথা বটে যে, শ্রী, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্যের, এমনকি, পরাবিদ্যারও অধিদেবতা যিনি, সেই লক্ষ্মীর বাহন কদাকার, কর্কশকণ্ঠ, দিবান্ধ, হিংস্র-স্বভাব পেচক। আপাতঃ-দৃষ্টিতে মনে হয় যেন মা-লক্ষ্মীর সবই ভাল, শুধু বাহন নির্বাচন সম্বন্ধেই তাঁর রুচি-বিকৃতি। নতুবা, অসংখ্য সুন্দর সুন্দর পশুপক্ষী থাকতে পেচকটাকে কেন তিনি এত পছন্দ করে বসবেন?...উত্তরে আমরা বলবো—লক্ষ্মীর সঙ্গে পেচকের সম্মেলন সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। অর্থ এবং পরমার্থ দুদিক থেকেই।

কি ধনতান্ত্রিক, কি সমাজতান্ত্রিক, কি গণতান্ত্রিক—সকল দেশে, সকল রাষ্ট্রেই ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে আজ চলেছে এক অশ্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। শুধু বর্তমান কালে নয়—সর্বকালে সর্বযুগেই এ প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছে। কিন্তু কোন যুগেই সকল মানুষই এ বিষয়ে পরিচ্ছন্ন বিবেকের পরিচয় দিতে পারেনি। সাধু এবং অসাধু দুটি মার্গেই ধনোপার্জনের উদ্দেশ্যে দুই শ্রেণীর মানুষের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। পেচকটা দুই দলেই আছে।

পেচকের নিজস্ব জৈব স্বভাব অতি বিচিত্র।...দিবসে সে নিরীহ গো-বেচারা, ঘনপত্রসমাচ্ছাদিত বৃক্ষের কোটরে আত্মগোপন-পরায়ণ। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে সে দুর্ধর্ষ দস্যু। নিরপরাধ ঘুমন্ত পক্ষীশাবক এবং অসাবধান ভেক, মূষিক তার শিকারের লক্ষ্য। রক্তের বীভৎস পিপাসায় সে তাদের উপর সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং লব্ধ শিকার নখতাড়নে ছিন্নভিন্নপূর্বক আপনার ক্ষুন্নিবৃত্তি করে থাকে। পেচকের পক্ষদ্বয় বিধাতা এমন সুকৌশলে নির্মাণ করেছেন যে, বিদ্যুৎ বেগে উড়ে গেলেও বিন্দুমাত্র শব্দ হয় না।...মনুষ্য সমাজেও এরূপ একদল অর্থলোলুপ পিশাচ আছে, যাদের স্বভাব পেচকের মত। এরা রাতারাতি ফেঁপে উঠতে চায়। অন্ধকার পথেই এদের চঞ্চলা লক্ষ্মীর সন্ধান। বে-পরোয়া ঘুষ, কালোবাজারী, প্রতারণা, জালিয়াতি, মুনাফাবাজী, চৌর্য বা রাহাজানি এদের নিত্য উপজীব্য। অতর্কিতে, অজ্ঞাতসারে এরা সমাজের উপর অবাধ লুণ্ঠনবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে—নিরীহ জনতার বুকের রক্ত চুষে খাচ্ছে। শুধু ব্যষ্টিগতভাবে নয়, সমষ্টিগতভাবেও এই পেচক-বৃত্তির নির্লজ্জ প্রকাশ বিরল নয়।...লক্ষ্মী এখানেই

'কলহাঙ্কুরা', তিনি এখানে অবিদ্যারূপিণী—অলক্ষ্মী। এঁ'র ভজনা করে কারা? উত্তর—অসুর, দৈত্য, দানবেরা—ভোগবাদী দস্যুরা।...

পেচক যমের দূত...যমই সংযম, যমই ধর্ম,...ধনদেবী লক্ষ্মী যমের চিহ্নটি স্বয়ং ধারণ করে ধনোপার্জনের ক্ষেত্রেও সংযমবুদ্ধি ও ধর্মীয় চেতনাই মানুষের অন্তরে জাগিয়ে দিতে চান। তিনি যেন বলছেন—'আমার বাহন পেচক যেমন দিবসে অন্ধ, তুমিও তেমনি পরধন সম্বন্ধে অন্ধ হও, পাপের পথ, পরস্বাপহরণের পথ, দস্যুবৃত্তির পথ, নিরীহ-শোষণের পথ, মুনাফাবাজীর পথ, ঘুষের পথ—সর্ববিধ দুর্নীতির পথ তুমি ভুলক্রমেও দেখো না। সে পথে গেলে দণ্ড আছে, তা পেচককে দেখে স্মরণ কর এবং সংযত হও।' ধনোপার্জন করতে হবে ঠিক, কিন্তু তা বিহিত উপায়ে, ধর্মীয় বুদ্ধিতে। এরূপ হলে অর্থ নিয়ে জগতে এত অনর্থের সৃষ্টি আর হবে না। মানুষ ক্রমশঃ হবে নিবৃত্তিমুখী—অর্থের অসারতা উপলব্ধিপূর্বক ক্রমশঃ তার অন্তরে জেগে উঠবে পরমার্থ-পিপাসা।

...লক্ষ্মী পরমার্থরূপিণীও বটেন। যিনি বৈকুণ্ঠের সম্রাজ্ঞী, তাঁর কাছে কিছু ঐহিক ধনরত্ন পেয়েই কি আমরা পরিতুষ্ট রইবো?—না। তাঁর কাছে আমাদের প্রাপ্য আছে মুক্তিধন। চাই—আমরা মাতৃকরুণা, চাই—আমরা অভয়, চাই—আমরা বিশ্রাম।...

সংযমী ও অসংযমী, ধার্মিক ও অধার্মিক, ত্যাগী ও ভোগীর চরিত্রগত ও বিচারগত পার্থক্য বিশ্লেষণ উপলক্ষে শ্রীশ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।।

সর্বভূতের যা রাত্রি, সংযমীর পক্ষে তা দিন, তাঁদের যা দিন, তাঁর তা রাত্রি। অর্থাৎ, সকল প্রাণী পরমার্থ বিষয়ে নিদ্রিত, বিষয়-ভোগে জাগ্রত, কিন্তু সংযমী সাধু পরমার্থ বিষয়ে জাগ্রত, বিষয়-ভোগে নিদ্রিত, উদাসীন, নিস্পৃহ, অচেতন। নিদ্রা ও জাগরণ—এ-দুটি বিষয়ে পেচকের বৈশিষ্ট্য কি পরমার্থকামী সাধক-সাধিকাদের অনুকরণের যোগ্য নয়? অন্যান্য প্রাণী যখন ঘুমায়, পেচক তখন জেগে থাকে, তারা যখন জাগ্রত, পেচক তখন নিদ্রিত।

সাধুরা পেচকের অন্যান্য আচরণ থেকেও অভীষ্ট সাধনার ইঙ্গিত পেতে পারেন। পেচক নিশাচর। নিশীথের নিস্তব্ধ পরিবেশই সাধুদেরও সাধনার অনুকূল। পেচক গোপনচারী। সাধকের সাধনাও লোক-লোচনের অন্তরালেই হওয়া উচিত।...

[স্বামী নির্মলানন্দ লিখিত 'দেবদেবী ও তাঁদের বাহন' গ্রন্থ থেকে সংকলিত]

ম্যানিলা ঃ সাপ্তাহিক পত্রিকা ফিলিপাইন গ্র্যাফিকের সম্পাদক লুই মরিসিও সাম্প্রতিক সামরিক আইনে গ্রেপ্তার হয়েছেন। অন্তরীণ কক্ষে বসে মরিসিও বই পড়ছেন।
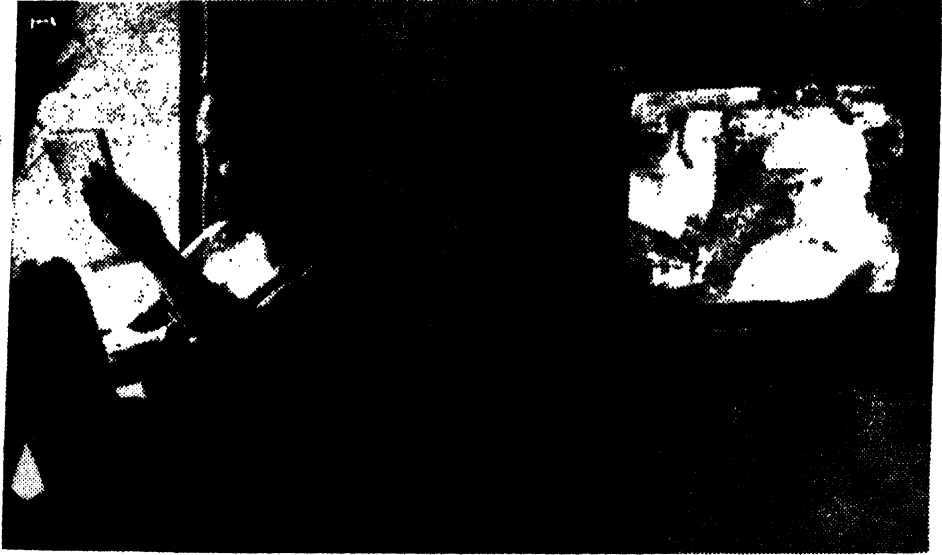
দেশে বিদেশে

আমেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে দু'দিনব্যাপী (৯ ও ১০ অকটোবর) অধিবেশন হয়ে গেল, তাতে অর্থনৈতিক বিষয়ে দু'টি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ইস্পাত মন্ত্রী শ্রীমোহন কুমার-মঙ্গলম প্রস্তাব দু'টিকে 'উন্নয়নের একটি অ-পুঁজিবাদী পথ' বলে বর্ণনা করেছেন।

অন্যান্য নেতারাও বেশ জোরের সঙ্গে একথা ঘোষণা করেছেন যে, সরকার তাঁদের সমাজতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতিগুলি পালন করছে না বলে যেসব সমালোচনা করা হয়, তা ঠিক নয়। সবচেয়ে সোচ্চার বোধ হয় ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং। প্রধানমন্ত্রীর ক্রোধের উদ্রেক হয় কংগ্রেসের একজন সরব 'তরুণ তুর্কী' সদস্য শ্রীকৃষ্ণকান্তের একটি বিরুদ্ধবাদী লিপি পেশ করার পর। শ্রীকৃষ্ণকান্ত ঐ লিপিতে বলেছিলেন যে, আজকে যেসব অসুবিধা এবং জিনিসপত্রের দাম বাড়ার জন্যে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে তার মূলে আছে অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরণে সরকারের ব্যর্থতা, প্রতিশ্রুতি পালনে অক্ষমতা, এবং জোড়াতালি দিয়ে কাজ করার প্রবণতা। ভূমিহীনদের মধ্যে পতিত জমি বিলি করার ব্যাপারে, তিনি বলেন, কোনো কাজই আরম্ভ করা হয়নি। তাছাড়া মন্ত্রীরা গ্রামাঞ্চলের জন্যে বিশেষ সময়ই ব্যয় করেন না। সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা হয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে কাজ করাকেই তাঁরা বেশি পছন্দ করেন।

এইসব উক্তির প্রতিক্রিয়া যা হবার তা-ই হলো। একের পর এক বক্তা মঞ্চে উঠে কঠোর ভাষায় শ্রীকৃষ্ণকান্তের সমালোচনার নিন্দা করলেন। এক অস্বাভাবিক রকমের উত্তেজিত ভাবাবেগ নিয়ে শ্রীমতী গান্ধী বললেন, সন্দেহবাতিকের দল একদিন ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে এবং তাঁর নীতির যাথার্থ্য শেষ শেষ পর্যন্ত সকলেই বুঝতে পারবে।

প্রায় পঞ্চাশ মিনিট ধরে কখনো ক্রোধে কখনো আবেগে তিনি বলেন, তিনি নিজে একজন প্রগতিশীল কিংবা সমাজবাদী কিনা এ নিয়ে যে যাই বলুক তাতে তাঁর কিছু এসে যায় না। তিনি এসব থোড়াই কেয়ার করেন। কিন্তু তিনি কথা দিয়ে কথা রাখেন নি এটা প্রমাণ করতে যে-কোনো লোককে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন।

এই মুড প্রকৃতপক্ষে এ-আই-সি-সি'র দু'দিনব্যাপী আলোচনায় সর্বত্র বিধৃত ছিল। নিজেদের সমাজবাদী ভাবমূর্তি সম্পর্কে নেতৃবৃন্দ যে কতটা সচেতন ছিলেন, সেটা এই থেকেই বোঝা যাবে যে, ঐ বৈঠকে অর্থনৈতিক বিষয়ক প্রস্তাব দু'টিই ছিল একমাত্র আলোচ্য বিষয়, আভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব ছিল না। এবং নেতৃবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণকান্তের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করলেও ঘটনা এই যে, অর্থনৈতিক নীতি বিষয়ক প্রস্তাবে তাঁর আনীত দু'টি সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল।

প্রস্তাব দু'টির মধ্যেও এই প্রগতিশীলতার ছাপ রাখার চেষ্টা করা হয়।

প্রথম প্রস্তাবটি খাদ্যসামগ্রীর বিতরণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত। এতে বলা হয় যে, চাল ও গমের ক্ষেত্রে পাইকারী ব্যবসা সরকার নিজের হাতে গ্রহণ করবে, আর চিনি ভোজ্য তেল, কেরোসিন ও কাপড় এই চারটি অত্যাবশ্যক পণ্যের পাইকারী ব্যবসার ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে। এই ব্যাপারে সাধারণ সদস্যদের মনোভাব এতই তীব্র ছিল যে, অনেকে সমস্ত অত্যাবশ্যক পণ্যের পাইকারী ব্যবসা জাতীয়করণের দাবী জানালেও প্রস্তাবটি সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হতে কোনো অসুবিধাই হয়নি।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্ত। এই প্রস্তাবটির কর্ণধার ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ধর। প্রস্তাবের মূল কথা হলো ঃ ১৯৫৬ সালে স্বর্গত জহরলাল নেহরুর নির্দেশে যে অর্থনৈতিক নীতি রচিত হয়েছিল সে নীতিকেই অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে অনুসরণ করা হবে। ১৯৫৬ সালের নীতিতে মিশ্র অর্থনীতির ভাবধারা ঘোষণা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে সরকারের হাতে গুরুত্বপূর্ণ ও ভারী শিল্পগুলি থাকবে যাতে সরকার বে-সরকারী উদ্যোগ সহ গোটা অর্থনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

*

পাশ্চাত্য ওষুধ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভের জন্য চীনা চিকিৎসকদের এক প্রতিনিধি দল তিন সপ্তাহব্যাপী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সফরে এসেছেন। পিকিং-এ টিউবারকিউলোসিস গবেষণা সংস্থার ডাঃ চাং-সু-সুন (সম্মুখ-ভাগে) এবং অন্যান্য চীনা চিকিৎসকগণ নিউইয়র্কে জর্জ ওয়াশিংটনের মূর্তির সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

*

শ্রীধর বলেছেন, পরিকল্পনার দৃষ্টি-ভঙ্গী আবার মৌলিক শিল্পক্ষেত্রের দিকে ফেরানো হবে, যাতে সরকার অর্থনীতির ওপর আবার তার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। পরিকল্পনা মন্ত্রীর মতে ১৯৬৫ সালের পর থেকে উন্নয়ন পরিকল্পনা এই লক্ষ্য থেকে ক্রমশ সরে আসার ফলেই আজকে অর্থনীতি তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। ইস্পাত, খনিজ তেল, সার প্রভৃতি মৌলিক শিল্প এবং বিদ্যুৎ প্রভৃতি মৌলিক ব্যবস্থা উপেক্ষিত হওয়ায় অন্যান্য শিল্পেও মন্দার অবস্থা দেখা দিয়েছে, আর তার ফলেই জিনিসপত্রের দামকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তার জন্যে দৃষ্টিভঙ্গী আবার মৌলিক শিল্পের দিকে ফেরানো এবং সেখানে সরকারী উদ্যোগকে বৃহৎভাবে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। প্রস্তাবে বে-সরকারী উদ্যোগের ভূমিকাকে স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু বলা হয়েছে যে, এই উদ্যোগকে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের অধীনে কাজ করতে হবে।

এই দুটি প্রস্তাব, মনে হয়, দলের মধ্যের প্রগতিবাদী অভিমতকে সন্তুষ্ট করবে। তবে এর সবটাই আদর্শের একেবারে অন্ধ কচকচি নয়। যেমন, প্রচণ্ড দাবী ওঠা সত্ত্বেও সরকারী অধীনে গ্রহণযোগ্য পণ্যের তালিকা দুটির বেশি (চাল ও গম) রাখা হয়নি, অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্য কেবল নিয়ন্ত্রিত করা হবে। তাছাড়া কবে পাই-কারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। এবং চাল-গমের ক্ষেত্রেও পুরোপুরি একচেটিয়া সংগ্রহ ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে না। কোন রাজ্য কিভাবে এই প্রস্তাব চালু করবে সেটাও রাজ্যের সুবি-ধার ওপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে বাস্তববোধেরই পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কারণ সকল বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসা ও সংগ্রহ ব্যবস্থা চালু করার উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা এখনও তৈরি নেই।

এই বাস্তববোধ অর্থনৈতিক নীতি-বিষয়ক প্রস্তাবের মধ্যেও প্রতিফলিত। বর্তমান পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীধর এবং প্রাক্তন পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম দুজনেই তাদের সমাজবাদী লক্ষ্য সম্পর্কে স্থির নিশ্চয়, কিন্তু দুজনের দৃষ্টিভংগীর মধ্যে পার্থক্য আছে। শ্রীসুব্রাহ্মণ্যম মনে করতেন যে, কংগ্রেস জনসাধারণের কাছে সামাজিক ন্যায়বিচারের সেইসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে সেগুলি পালনের ব্যবস্থা করাই হচ্ছে আসল কাজ। এই জন্যে মৌলিক শিল্পের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তিনি সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রকল্পগুলিকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীধরের বক্তব্য হলো, ভারতে এখনো অর্থনীতি এতটা শক্তিশালী হয়ে ওঠে নি যাতে মৌলিক শিল্পকে কিছুকাল উপেক্ষা করলেও কোনো ক্ষতি হবে না। এতে শিল্পে মন্দা-বস্থা দেখা দিতে বাধ্য আর তার ফলে সামাজিক ন্যায়বিচারের লক্ষ্যও ব্যাহত হতে বাধ্য। কাজেই সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতি-ষ্ঠার স্বার্থেই বাস্তবমুখী হয়ে মৌলিক শিল্পের দিকে নজর দেওয়া দরকার।

যাই হোক, আমেদাবাদ এ-আই-সি-সি'র প্রস্তাব দুটি কেবল একটা পথের সন্ধান দিচ্ছে মাত্র। ঐ পথে আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব কিনা সেটা নির্ভর করবে ঐ প্রস্তাব কিভাবে রূপায়িত করা হয় তার ওপর। রাষ্ট্রায়ত্ত পাইকারী ব্যবসার কথা কাগজে-কলমে পড়তে ভালোই লাগে, কিন্তু কাজের মধ্যেই কথার আসল মূল্য। তেমনি সরকারী উদ্যোগের প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টার মধ্যে আপত্তির কিছু নেই, কিন্তু তা করতে গিয়ে বে-সরকারী উদ্যোগকে নিয়ন্ত্রণের বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়, তাহলেও অর্থনীতি তার ভারসাম্য হারাতে বাধ্য। জাতির স্বার্থে যেমন বে-সরকারী উদ্যোগের ওপর খবরদারি করতে হবে, তেমনি তাকে বিকশিত হবারও সুযোগ দিতে হবে। এটা মুখে হয়ত সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কার্যক্ষেত্রে আচরণ দেখে মনে হয় যে, বে-সরকারী উদ্যোগ যেন সরকারী উদ্যোগের শত্রু।

•

ভিয়েৎনামে কি অবশেষে কিছু ঘটতে যাচ্ছে? প্রশ্নটা নতুন করে উঠেছে কেননা মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিকসনের প্রধান উপ-দেষ্টা মিঃ হেনরি কিসিংগার ইদানীং বেশ কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। দু সপ্তাহ আগে তিনি হঠাৎ প্যারিসে এসে উত্তর ভিয়েৎ-

লেবাননের সিডোনে ইসরায়েলি হানায় বিধ্বস্ত আরব গেরিলা ঘাঁটি।

নামের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা লে ডুক থো'র সঙ্গে পাঁচ দিন ধরে গোপন আলোচনা করে ওয়াশিংটনে ফিরে যান। দিন পাঁচেক পরে তিনি সবাইকে চমকে দিয়ে আবার হঠাৎ প্যারিসে উড়ে এলেন, এবার প্যারিস শান্তি বৈঠকে উত্তর ভিয়েৎনামের মুখ্য প্রতিনিধি সোয়ান টুইয়ের সঙ্গে জরুরী আলাপের জন্যে। সেখান থেকে তিনি সোজা চলে গেলেন সায়গনে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট ন্যুয়েন ভান টিউর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। আগামী ৭ নভেম্বর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে নির্বাচন। তার প্রাক্কালে মিঃ কিসিংগারের হঠাৎ এই ব্যস্ততায় পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন যে, ভিয়েৎনামের অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়ে মিঃ নিকসন তাঁর নির্বাচনকে সুনিশ্চিত করতে চান।

এই অচলাবস্থা ইচ্ছা করলে আমেরিকা আগামীকালই অবসান করতে পারে। কেননা অচলাবস্থার কারণগুলি তার নিজেরই তৈরি। একটা প্রধান কারণ হলো, যুদ্ধবিরতির পর দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্যে একটি অন্তর্বর্তী কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রশ্নটি। উত্তর ভিয়েৎনাম ও ভিয়েৎকংরা চায় ঐ সরকারের মধ্যে প্রেসিডেন্ট টিউকে কিছুতেই নেওয়া চলবে না। আমেরিকা এতদিন ঐ দাবী মেনে নিতে রাজি ছিল না, তবে এখন নাকি মিঃ নিকসনের মনোভাব অনেকটা নরম। অবশ্য প্রেসিডেন্ট টিউ মিঃ কিসিংগারকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে কোনো কোয়ালিশন করতে তিনি রাজি নন, এবং তাঁর মাথার ওপর দিয়ে কোনো মীমাংসা করা হলে তিনি তা মেনে নেবেন না। কিন্তু আমেরিকার মনোভাব এখন যদি সত্যিই নরম হয়ে থাকে তাহলে প্রেসিডেন্ট টিউয়ের বিরুদ্ধতায় কিছুই আসে যায় না। কারণ প্রেসিডেন্ট টিউ আমেরিকারই হাতের পুতুল। সেক্ষেত্রে আমেরিকার আন্তরিকতা এখনই মীমাংসার একটা ভিত্তি স্থাপন করতে পারে।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিকসন যদি ইচ্ছা করেন তাহলে ৭ নভেম্বরের পরে পর্যন্তও তিনি অপেক্ষা করতে পারেন। যখন নির্বাচনের দিন পর্যন্ত শান্তি আলোচনার এই কর্মব্যস্ততা চালিয়ে যেতে পারলেও তাঁর নির্বাচনী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, তখন তড়ি-ঘড়ি একটা মীমাংসায় আসার জন্যে তাঁর কেন তাগিদ থাকবে? সেটা তাঁর অনুসৃত ভিয়েৎনাম নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণও নয়। তিনি প্রেসিডেন্ট টিউ সম্পর্কে তাঁর মনোভাবকে নরম করেছেন, অথচ একই সঙ্গে বলছেন যে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কোনো কমিউনিস্ট-প্রভাবিত সরকার বরদাস্ত করবেন না। তিনি কি ধরনের শান্তি চান সেটা এ থেকেই পরিষ্কার। তিনি ভাবছেন, তিনি গায়ের জোরে তাঁর পছন্দমতো একটা সমাধান আদায় করে নিতে পারবেন। গত আট মাস ধরে উত্তর ভিয়েৎনামের ওপর বেপরোয়া বোমা ফেলে তিনি দেশটাকে কাবু ও তার নেতৃবৃন্দকে কিছুটা দুর্বল করে এনেছেন। এতে তাঁর আত্মবিশ্বাস আরো বেড়ে গেছে। সুতরাং মিঃ কিসিংগারের কূটনৈতিক কর্মব্যস্ততার দ্বারা কিছুই প্রমাণ হয় না। মিঃ নিকসন যখন দেখছেন গায়ের জোর অবশেষে কিছুটা ফল দিতে শুরু করেছে, তখন সাময়িক রাজনৈতিক স্বার্থের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু তাগিদ ছাড়া আর বেশি উদ্যম তিনি দেখাতে যাবেন কেন? মিঃ নিকসন ভাবছেন সাফল্য তাঁর হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে, এবং দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হতে পারলে আভ্যন্তরীণ জনমতের ভয় না করেই তিনি তাঁর লক্ষ্যপথে আরো দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে পারবেন।

২০-১০-৭২ —দেবদত্ত

রাতের অন্ধকার নেমেছে এ মহল্লায়, জমাট ঘন অন্ধকার। কোথাও আলো নেই। বাড়ির দরজা জানালাও বন্ধ, মানুষগুলো ভয়ে সিঁটিয়ে ঘরের কোণে ঢুকেছে। এতটুকু আলো বাইরে যাবার হুকুম নেই। কড়া কণ্ঠে বাইরের ছায়ামূর্তির দল গর্জে ওঠে —আলো বন্ধ করুন।

ওরা এদিক ওদিকের গলিপথের মুখে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে পাইপগান-বোমা-পিস্তল অনেক কিছু মারণাস্ত্র কোন প্রতিপক্ষের উপর ওরা হিংস্র আঘাত হানবে। অন্ধকার কাঁপিয়ে বোমার শব্দ ওঠে, ঘরবাড়ি মাটি কাঁপছে। ওই শব্দটা হিংস্র গর্জনের মত ধ্বনিপ্রতিধ্বনি তুলেছে চারিদিকে।

এ পাড়ার মুখে মুখে ছায়ামূর্তির দল তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দু-একজন পথচারী যারা সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে পারেনি, তারা কোন মতে ইষ্টনাম জপ করতে করতে আসছে। মাঝে মাঝে আবছা আলোয় ওরা সন্ধানী দৃষ্টি মেলে পথচারীদের দেখছে। ওদের ওই ছেলের দল চেনে, বাজারের থলি—খাবারের কৌটা না হয় সস্তাদরের প্ল্যাস্টিকের হাতব্যাগ নিয়ে দশটা পাঁচটার যোয়াল টেনে ফিরছে কেরাণীবাবুর দল।

অন্ধকারে কে বলে—যেতে দে, চলে যান দাদা তাড়াতাড়ি।

দয়া করেই ওদের যেন বাঁচিয়ে রেখেছে, যাতায়াতের অধিকারটুকু দিয়েছে। অন্ধকারে কে বলে—ওরা তো মরেই আছে রে। আবার মারবি কি। শলা হিজড়ের দল ওরা।

গোবিন্দবাবুর ওই কণ্ঠস্বর চেনা চেনা বোধ হয়। তবু ওই ছেলেটিকে অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করতেই কে ধমকে ওঠে।

—সোজা চলে যান।

গোবিন্দ মল্লিকের দাঁড়াবার সাধ্য নেই, সব কেমন একাকার হয়ে গেছে তাঁর সামনে। বয়স হয়েছে, অন্ধকারে পথঘাট ভালো করে ঠাওর হয় না। হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়লেন একটা বাতিল টিউবওয়েলের উপরই। পায়ে লেগেছে—ছিটিয়ে পড়েছে বাজার থেকে তাড়াতাড়ি করে কেনা আলু, বেগুন, কুমড়োটুকু। দেরী করার উপায় নেই, হয়তো এখুনিই খণ্ডযুদ্ধ বেধে যাবে দু-দলে। কারা অন্ধকারে ছুটোছুটি করছে।

গোবিন্দবাবু প্রাণভয়ে এগিয়ে চলেছেন বাড়ির দিকে।

...হাঁপাচ্ছে লোকটা। এই শীতে ঘাম ঝরছে। দরজাটা খুলে দিতেই ভিতরে ঢুকে আবছা আলোয় গিন্নীর দিকে চাইল, সারা ঘরগুলোয় নিরাভরণ দারিদ্র্যের ছায়া, মেঝেতে মাদুর পেতে সুরমা ছেঁড়া জামা-কাপড়গুলো মেরামত করছিল। ওদিকে একটু ফালিমত বারান্দায় তোলা উনুনে এনামেলের হাঁড়িতে ভাত ফুটছে, ওপাশের ঘরটা খালি। গোবিন্দবাবু উৎকণ্ঠিত স্বরে শুধায়।

বিজু, দ্বিজু আসেনি? তারা কোথায়?

সুরমা স্বামীর দিকে চাইল। ওর মুখে আজ বিরক্তির কাঠিন্য। ওই বিরক্তি ওর কণ্ঠস্বরেও ছড়িয়ে পড়েছে। স্বামীর কথায় জবাব দেয়,

—জানি না। কে যে কোথায় যায়, কি করে, আমি জানি?

গোবিন্দবাবু একটু আগে অন্ধকারে শোনা সেই কণ্ঠস্বরটাকে স্মরণ করেন। চেনা কণ্ঠস্বর, ওদের সম্বন্ধে এসব কথা কানে এসেছে, তবু বলতে পারেননি কিছু। বিজনকে দু-চার জায়গায় চাকরীর চেষ্টা করতে বলেছেন, নিজেও জীর্ণ শরীর নিয়ে অপিস কামাই করে এখানে ওখানে গেছেন। পুরানো বন্ধুদের ধরেছেন, যদি ছেলেটার একটা সুরাহা হয়। কিন্তু ক' বছর কেটে গেছে, কিছুই করতে পারেননি।

দ্বিজেনকে তবু পড়াচ্ছেন, কলেজে যায় কদাচিৎ কদাচিৎ। কারণ কলেজের মাইনেটা ঠিকমত দেওয়া হয়নি। তবু দ্বিজুটা পড়াশোনায় ভালো—যদি বি-এটা পাশ করে যা-হোক একটা কিছু জুটিয়ে নিতে পারবে। ছেলেদের এই বেপরোয়া ভাবে গোবিন্দবাবু তেতে উঠেছেন।

তাঁদের সময় ছেলেদের সন্ধ্যার মধ্যেই বাড়ি ফিরে পড়তে বসতে হতো। কর্তারা কাজ থেকে ফিরে এসে তাদের বাড়িতে না দেখলে অনর্থ বাধাতেন। আর বোনদের বাড়ির বাইরে যাবার হুকুম ছিল না সন্ধ্যার পর। এখন! তার সংসারেই এই পরিবর্তনটা দেখেছেন, গোবিন্দবাবু। জ্বলে উঠেছেন মনে মনে, ওদের শাসনও করেছেন। কিন্তু কিছুই হয়নি। খোঁজ নেন।—মায়াও ফেরেনি?

সুরমা স্বামীর দিকে চাইল। গোবিন্দবাবু বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা। সুরমাও জানে তাদের অভাব-অনটনের কথা। একটা মানুষের রোজগারে ক'জনের সংসারটা এখন ঠিকমত চলে না। ছেলেরাও বেকার, মেয়ের বিয়ে দিতে পারেনি। তাদের ঘরে বিনা-পয়সায় মেয়ের বিয়ে হয় না।

মায়াকে তাই বেঁচে থাকার জন্য চাকরীর চেষ্টায় বের হতে হয়েছে।

সুরমা বলে—একটা ইনটারভিউ আছে, চাকরীটা হতে পারে তাই গেছে।

অন্ধকারে পর পর দুটো প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ ওঠে। কাদের চীৎকার কলরব শোনা যায়। যুধ্যমান দু-পক্ষের লোকজন কলরব করছে বোধহয়। গোবিন্দবাবু স্ত্রীর দিকে চাইলেন গজগজ করে,

—ওদের বলো, চাকরী করে খাওয়াতে না পারে ক্ষতি নেই, তবু স্বস্তি দিক আমাকে। আর মেয়েরও সাহস বলিহারি! এই গোলমালে লোকজন বের হতে পারছে না—উনি কিনা রাতদুপুরে অবাধ ঘুরছেন। চাকরী— কি চাকরীর ইনটারভিউ হয় সন্ধ্যাবেলায়? এ্যাঁ।

হঠাৎ দরজাটা কঁকিয়ে ওঠে, মায়া বারান্দায় পা দিয়ে বাবার ওই কথাগুলো শুনে থমকে দাঁড়িয়েছে। স্টেশন থেকে নেমে এ গলি ও-গলি দিয়ে এসেছে কোনরকমে। রাস্তার সব আলো নেভানো। বড় রাস্তায় কি গোলমাল হয়েছে। মায়া বাবার দিকে চাইল। সুরমা নিশ্চিন্ত হয় কিছুটা ওকে দেখে।

মায়া কথা বললো না, ওপাশের সিঁড়ির নীচের কাঠের পার্টিশান ঘেরা ফালি-টুকুতে ঢুকে গেল। ওই ওর আশ্রয়। বাড়িওয়ালাকে বলে-কয়ে ওটুকু তারা ফাউ হিসাবে পেয়েছে। মায়ার মনে হয়, বেঁচে আছে সে এমনি দাক্ষিণ্য কুড়িয়েই। তবু দেখেছে চারদিকে ওই দয়ার মুখোশের অন্তরালে নিষ্ঠুর স্বরূপগুলোকেই প্রাত্যহিকের দুঃসহ গ্লানি তার মন ভরিয়ে তুলেছে। বিকৃত ধিকৃত করেছে তার সব সত্তাকে। ঘামে জামাটা ভিজে গেছে—সারা গায়ে একটা দুঃসহ ক্লান্তি আর ঘৃণা জড়ানো। জীর্ণ তক্তপোশটায় বসে একটু জিরোবার চেষ্টা করে।

মাকে ঢুকতে দেখে চাইল মায়া। মায়া জানে মা কেন এসেছে। ও এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, কোন কথাই শুধোয় না। আগে জিজ্ঞাসা করতো, চাকরী কিছু হল না হল প্রশ্ন করতো, কি আশা নিয়ে।

ক্রমশঃ যে কোন কারণেই হোক, চুপ করে গেছে। মায়া জানে সারা কলকাতার বুকে জুড়ে কি তাণ্ডব চলেছে। মানুষের মনে নেমেছে জমাট আতঙ্ক। সন্ধ্যার পর আর বড় একটা কেউ বাইরে থাকে না, যে যার আস্তানায় ফেরে। চৌরঙ্গীপাড়াও ফাঁকা হয়ে যায়। মধুলোভী মানুষগুলো মনের উদ্দামতা ভুলে কি আতঙ্কে বদলে গেছে, আর সেই সঙ্গে বদলে গেছে তাদেরও দিন। সবদিন রোজকারও হয় না। হোটেল মালিকরাই বলে।

—কারবার গুটিয়ে দিতে হবে এবার।

মায়ার চোখের সামনে আঁধার জমেছে। মা বলে, হাতমুখ ধো, চা চাপিয়েছি।

হঠাৎ ঝড়ের মত বেগে দ্বিজুকে ঢুকতে দেখে সুরমা ওর দিকে চাইল। বাইরে কাদের পায়ের শব্দ ওঠে। দৌড়চ্ছে কারা অন্ধকার ভেদ করে। দ্বিজু ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে হাঁপাচ্ছে। ওর জামায় প্যান্টে রক্তের ছিটে লেগে আছে। মুখের রেখাগুলো কঠিন দু-চোখ জ্বলছে। মাথার চুলগুলো উস্কোখুস্কো, এ যেন অন্য কোন দ্বিজেন।

সুরমা চমকে ওঠে—কি হল? দ্বিজু!

দ্বিজেন মাকে ইশারায় চুপ করতে ইঙ্গিত করে এগিয়ে এল বারান্দার উপর। চারিদিকে সাবধানী সন্ধানী দৃষ্টি মেলে কি দেখছে। ওর চোখের চাহনিতে ফুটে উঠেছে হিংস্রতা। হাতে বোধহয় রক্তের কালো দাগ লেগে রয়েছে এখনও। সেই দাগগুলোকে লুকোবার জন্যই পকেটে হাত ঢুকিয়েছে।

গোবিন্দবাবু একখানা রুটিতে একটু গুড় মাখিয়ে জলযোগ করছিলেন, সকালে চাট্টি ভাতে ভাত খেয়ে বের হয়েছেন, বার দুয়েক চা গিলে আপিসের সময় খিদেটাকে চাপা দিয়ে রাখেন, বাড়ি এসে ওই একখানা রুটিই তাঁর জল-খাবার, তারিয়ে তারিয়ে তাই খাচ্ছিলেন গোবিন্দবাবু, হঠাৎ চোখের সামনে ওই অবস্থায় দ্বিজুকে তাড়া-খাওয়া জানোয়ারের মত ঢুকতে দেখে চাইলেন। ওদের চোখেমুখে কি আদিম হিংস্রতার ছাপ মাখানো।

—কোথায় ছিলি? গোবিন্দবাবুর কথায় জবাব দিল না দ্বিজেন। জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করে না। গোবিন্দবাবু চমকে উঠেছেন। ওরা তার সন্তান। ওদের কাছে কোন সাহায্য সহযোগিতার আশা করা দুরাশা মাত্র। তারই ঘাড়ে ওরা পোষ্য হয়ে থাকবে, আর নীতির দোহাই দিয়ে তাকে জানাবে এইটা পিতৃদেবের কর্তব্য সন্তানের কোন দায় নেই। আর সেই সব পাবার অধিকারটাকে ওরা ছিনিয়ে নেবে শক্তি দিয়ে।

—কোথায় ছিলি? কি করে এসেছিস যে লুকোচ্ছিস? গোবিন্দবাবু গর্জে ওঠেন।

চকিতের মধ্যে দেওয়ালে পিঠ লাগা চোট-খাওয়া জানোয়ারের মত ফুঁসে ওঠে দ্বিজেন। পকেট থেকে বের-করা বড় আলিগড়ের স্প্রিং লাগানো ছোরার বোতাম টিপতেই তীক্ষ্ণধার ফলাটা হিস হিস শব্দে সাপের জিবের মত লকলকিয়ে বের হয়ে আসে। আলোয় ঝকঝক করছে সেটা। দ্বিজেন বলে সুরমাকে,

—ওই বুড়োটাকে মুখ বন্ধ করতে বলো। চেঁচালে, কোন খাতির করবো না।

মায়া বারান্দায় এসেই থমকে দাঁড়িয়েছে, সামনে দেখেছে ওই রক্তলোলুপ একটা হিংস্র মানুষকে। মায়ার সামনে হিংস্র লোভী মানুষগুলো অনেকেই আসে, তারা নিঃশেষে লুটে নেয় তার দেহটাকে, বিনিময়ে বেঁচে থাকার মত কিছু দিয়ে যায়। সেই পাশবিকতার মধ্যে নরকের জমাট ঘৃণা আর পাপের মধ্যে সে তলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এমনি কান্ড দেখেনি।

ওরা প্রাণটুকুরও কোন মূল্য দেয়নি। চারিদিকে, ঘরে-বাইরে তাদেরই দেখছে শুধু। মানুষ নামক এক শ্রেণীর জীব এই হিংসার আগুনে জ্বলে উঠেছে, আর সেই আগুন এসে ঢুকেছে তাদের সংসারের মধ্যেও।

—দ্বিজু! আর্তনাদ করে ওঠে মায়া।

গোবিন্দবাবুর হাত থেকে দিনান্তের আহার্য ওই রুটির টুকরোগুলো পড়ে গেছে। সুরমা নিজের সন্তানকে আজ ছুরি হাতে বাবার সামনে দেখে চমকে উঠেছে। মায়ার ওই প্রতিবাদে দ্বিজু ওর দিকে চাইল। মায়া বলে ওঠে,

—এমনি হয়ে উঠেছিস?

হাসছে দ্বিজু, আর তুই। তুই কোথায় নেমেছিস বেঁচে থাকার জন্য তা জানি না ভাবছিস?

সুরমা ধীরে ধীরে যেন চেতনা ফিরে পাচ্ছে। ওই সন্তানকে তিলে তিলে মানুষ করেছে নিজের বুকের ক্ষীরধারা দিয়ে, নিজে না খেয়ে ওদের মুখে অন্ন যুগিয়েছে আর ওই লোকটা দিনরাত পরিশ্রম করে তাদের বাঁচানোর জন্য লড়াই করছে। সুরমা দেখছে তার স্বামীকে—অসহায় বৃদ্ধ মানুষটার চোখে ভয়ের জমাট ছায়া নেমেছে, হাত থেকে ছিটকে পড়েছে ক্ষুধার ওই রুটির টুকরো। সুরমার মনে হয়, ওই দ্বিজু তার কেউ নয়, তার শত্রুমাত্র। সুরমা গর্জে ওঠে, দ্বিজু!

দ্বিজু জানে ওদের ওই ভাবনাগুলোর কথা। শুধু মাত্র ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকার মোহে ওরা সব ভুলেছে। ওরা ভীরু-স্বার্থপর এক একটা জীব। সেই স্বার্থে ওরা মায়ার দেহবেচার টাকাটাও হাত পেতে নেয়। এই লোভ—অন্যায়গুলোর জন্যই ওদের সে সহ্য করতে পারেনি। দ্বিজু মায়ের কথার জবাব

না দিয়ে এদিক-ওদিক দেখতে থাকে। ওদের ন্যাককান্নাটা তার কাছে আজ অর্থহীন, বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। দ্বিজু প্রশ্ন করে সুরমাকে, বিজে কোথায়? কোথায় লুকিয়ে রেখেছ সেটাকে—শিগ্গির বলো: আজ তার একদিন না হয় আমার একদিন।

সুরমা চমকে ওঠে—তোর দাদা!

—সাট আপ! দাদা—বাবা—মা-বোন এসব বাত ছাড়ো। আমার দলের ছেলেকে চোট করবে আর ভাই বলে তাকে মাপ করবো? ওসব নেই, বদলা। বদলা নিতে হবে। কুইক—কাম আউট। বলো সেটা কোথায়?

দ্বিজুর দুচোখ জ্বলছে, চকচকিয়ে ওঠে হাতের ছুরির দীর্ঘ ফলাটা, সুরমার সামনে ধরে ওকে শাসাচ্ছে।

গোবিন্দবাবুর কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেছে, মাথা এগোবার চেষ্টা করতেই হুংকার দিয়ে ওঠে দ্বিজু, নড়বি না। ওই নরকের পোকার জান এখুনিই খতম করে দোব।

সুরমার সামনে যেন আকাশটা ভেঙে পড়ছে, পায়ের নীচের মাটি কাঁপছে ভূমিকম্পের কাঁপনে, আলোগুলো তলিয়ে যাচ্ছে জমাট অন্ধকারে। জেগে আছে সেই অন্ধকারে শুধু হিংস্র চোখগুলো, নীলাভ দীপ্তি নিয়ে ওরা জ্বলছে। সে চোখ ওই দ্বিজেনের চোখ, আর আকাশ-বাতাসে ওঠে শুধু কান্নার হাহাকার। মেঘ গর্জাচ্ছে—সৃষ্টি রসাতলে যাবে। তারই আভাষ নিয়ে কালো অন্ধকারে বিজলী চমকে ওঠে।

—কাম আউট! মুখ বন্ধ করে থাকলে চলবে না—কোথায় সেটা!

বিজন ওইসব কোন দলেই নেই তা জানেন গোবিন্দবাবু, সে চেষ্টা করছে কোন একটা কাজকম্মো পাবার। দিন রাত ঘুরেছে সেই মরীচিকার সন্ধানে। কোন কারখানায় চাকরী পেয়েছিল তাও কিসব গোলমালে বন্ধ হয়ে গেছে। তবু সেখানেই মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে যদি কিছু সুরাহা হয়।

গোবিন্দবাবু অবাক হন—সে কি করলো?

—তার দলবলের লোকরা করেছে।

—তাই তুই নিজের দাদাকে—গোবিন্দবাবু মরীয়া হয়ে কথাগুলো বলবার চেষ্টা করেন!

হঠাৎ জীর্ণ দরজাটা খুলে ঢুকছে বিজন। গলির ওদিকে পুলিশ এসেছে একটু আগেই ওখানে কি গোলমাল হয়ে গেছে, বোম চার্জ করেছে কারা। রাস্তায় পড়ে আছে রক্তাক্ত একটা দেহ। বিজন কোন মতে অনাপথ ঘুরে এসেছে। এখনও হাঁপাচ্ছে সে। বাড়ি ঢুকেই দ্বিজেনকে ওই অবস্থায় দেখে চমকে ওঠে।

—দ্বিজু!

দ্বিজু বিদ্যুৎপৃষ্টের মত চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল। দপ্ করে জ্বলে ওঠে ওর দুচোখ।—এ্যাই যে! পীতেকে আজ চোট করেছে মদনা নিতের দল, তারই বদলা।

বিজনের সামনে এগিয়ে আসছে ওরই ছোট ভাই, হাতে ওর শাণিত ছুরিখানা, বিজন দু'বছর ধরে চেষ্টা করেছে বাঁচার জন্য, সংসারের দারিদ্র্য-অভাব-এর কথা সে জানে, দেখেছে বোনকেও পথে বের হতে হয়েছে। আর সেই অন্ন গ্রহণ করছে সে, নিজের মন ভরে উঠেছে দুঃসহ বেদনার প্লানিতে। কোথাও আশ্বাস নেই, নির্ভর নেই। ও যেন ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে আছে। কেন? কি তার সার্থকতা তা জানে না।

আজ সামনে দেখছে সবকিছুর শেষ—ওই মৃত্যুকে। দ্বিজেন নয়—তার সামনে ঘনিয়ে আসছে মৃত্যুর কালো একটা ছায়া। বাবার অসহায় চাহনি—মায়ের আর্তনাদ—বোনের কান্না সব মুছে মুছে যাচ্ছে ওই তমসায়।

—দ্বিজু! বিশ্বাস কর, আমি কিছু জানি না!

সে যেন আর্তকণ্ঠে বলবার চেষ্টা করে, অন্ধকারে ঝড়ো হাওয়ায় তার কাতর কণ্ঠস্বর ডুবে যায়—হারিয়ে যায়। চোখের সামনে একটা নীলাভ প্রতিহিংসার জ্বালা সব দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দেয়। চেতনার অনুভূতিটা অতলান্ত তমসায় হারিয়ে যাচ্ছে।

ঘরে ঘরে শ্রান্ত পরিশ্রান্ত বিজন, জীবনটাকে মনে হয়েছে শুধু বোঝা মাত্র। দুঃসহ বোঝা। তবু সেই ক্ষয়ে-আসা জীবনটুকুকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই চীৎকার করছে।...

অব্যক্ত ভাষাহীন সেই আর্তনাদ অন্ধকারে কেঁপে কেঁপে ওঠে। উষ্ণ রক্তটায় দুহাত ভিজে গেছে, পা-দুটো টলছে, সারা শরীরে অব্যক্ত গোঙানির মত নীরব একটা যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ে—কালো মেঘের মত সব আকাশ ছেয়ে নিবিড় আঁধার নামে, সেই আঁধারে হারিয়ে গেল বিজন। দু-বছরের বেকারী জীবনের আজ পূর্ণচ্ছেদ ঘটেছে।

সুরমা আর্তনাদ করে ওঠে।

—কি করলি? এ কি সর্বনাশ করলি দ্বিজু! নিজের হাতে ভাইকে—

দ্বিজু ওই ছিটকে-পড়া দেহটার দিকে চাইল। তখনও [illegible] এখন ওর [illegible] চোখের মত স্থির, নিস্পন্দ—পলকহীন হয়ে গেছে।

ছুরিটা মুছে প্যান্টের পকেটে পুরে বলে—

—কোন কথা বলবে না! ভালো হবে না।

কারোও জবাবের অপেক্ষা না করেই কালো ছায়ামূর্তিটা লম্বা পা ফেলে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল।

...কাদের আর্তনাদ-কান্নার শব্দ ওঠে। বন্ধ দরজা-জানলাগুলো দিয়ে এতটুকু আলোও পড়েনি রাস্তায়, ওই অন্ধকারে ছায়ামূর্তিগুলো হারিয়ে গেল।

গোবিন্দবাবু নির্বাক পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছেন—মায়ার দু'চোখে নিবিড় আতংক, সুরমা ভাবতে পারে না—বিশ্বাস করতে পারে না, তার চোখের সামনে এইসব ঘটে গেছে। রক্তাক্ত দেহটার দিকে নিষ্পলক চাহনিতে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। মনে হয় কোন রাতের দেখা নিষ্ঠুর স্বপ্ন—বাস্তবে এসব ঘটে না। দুঃস্বপ্নটা অন্ধকারেই হারিয়ে যাবে।

হঠাৎ কি দুঃসহ বেদনায় আর্তনাদ করে বিজনের প্রাণহীন দেহটার উপর আছড়ে পড়ে।

ওরা মৃতের রাজ্যে পৌঁছে গেছে, সে রাজ্যে আলো নেই। বসন্ত নেই। দয়া—মায়া—ভালোবাসা অন্ধকারের অতলে সেখানে হারিয়ে গেছে। কেবল মুণ্ডহীন কবন্ধের দল। অন্তরহীন কিছু আদিম জীব সৃষ্টির আদিমতম চেতনাকে খুঁজে খুঁজে ফিরছে।

গোবিন্দবাবু—সুরমা—দ্বিজেন— মায়া ওরা সবাই সেই মৃতের রাজ্যে পেঁাছেছে, দ্বিজেনও। অন্ধকারে তাদের চাপা কণ্ঠস্বর, ত্রস্ত পদধ্বনি শোনা যায়।

বাঙালীর ব্যঙ্গস্বভাব : কবিওয়ালা

সুরঞ্জন দত্তরায়

বাঙালীর ব্যঙ্গসাহিত্য প্রধানত গড়ে ওঠে ইংরাজি শিক্ষা ও ইংরাজি সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়-প্রেরণার ফলস্বরূপ। যুগজীবনের প্রভাবও এর মূলে। আসলে যুগজীবনের সঙ্গে এজাতীয় সাহিত্যসৃষ্টির সম্পর্ক গভীর। বাংলায় প্রাচীন ও নবীন-ভাবের দ্বন্দ্বে জাতীয় জীবনে যখন সংক্ষোভ ও দ্বন্দ্ব, ঠিক তখনই বাঙালী ব্যঙ্গরচনায় মনোনিবেশ করে। সমালোচনা ও আঘাতের প্রয়োজনেই তার সূচনা বলা যায়। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে শুধুমাত্র বাইরের পরিচয় এবং প্রভাব-প্রেরণার ফলে যুগজীবনের ফলস্বরূপে এর সৃষ্টি হতে পারে না, যদি না জাতির মন-মেজাজ ও রুচি-মর্জির ভিতরে—তার স্বভাবধর্মে এই চেতনাটি অঙ্কুরে থাকে। বাঙালীর স্বভাবধর্মে এই ব্যঙ্গচেতনা, বিদ্রূপ-পরিহাস ও কৌতুকের সুরটি খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলা ও বাঙালীর প্রতিদিনের ঘরকন্নায়, কথাবার্তায়, আদান- প্রদানে, হাসি-মস্করায়, ইয়ার্কি-রসিকতায়, রাগে-রঙ্গে, ছড়া-পাঁচালী, প্রবাদ, ডাকার্ণবের গানে, লোক-সঙ্গীতে এমনকি তার বাকধারায় এই রস-বোধের স্বরূপটি সুন্দরভাবে প্রকাশিত। তার জীবনের অতি সামান্যতম অভিজ্ঞতাকেও সে রঙ্গ-রসের গোলাপজলে সিঞ্চিত করে নিতে ভালোবাসে। তাই রঙ্গ-ব্যঙ্গের আয়োজন ও তার প্রকাশ বাঙালী সমাজের প্রসন্ন মাধুর্যটি সুপ্রাচীনকাল থেকে স্বীকৃত।

কবিওয়ালাদের প্রসঙ্গেও এই কথাটি মনে আসে। কবিওয়ালারা কবি নন, বাঙালীর সাহিত্যের ইতিহাসে মর্যাদার স্থান পান নি তাঁরা। এক ঘোর অরাজক যুগের অনিশ্চয়তার স্রোতে প্রবাহিত জীবনধারার সন্তান ও'রা। এক ভয়ংকর সর্বরিক্ত গ্রহণের যুগ এসেছিল এই বাংলায়। ইতিহাসের দিকে তাকালে এর স্বরূপটি অবগত হওয়া যাবে। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র মারা গেলেন, পলাশীর যুদ্ধের তিন বছর বাদে। সারা ভারতবর্ষব্যাপী তখন অন্ধকার অধ্যায়। শক্তিমান মোগলের সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও পর্যুদস্ত। ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে দেশ। প্রাদেশিক সুলতানেরা সকলেই অপদার্থ, অকর্মণ্য, বিলাসী ও ইন্দ্রিয়াচারী ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের ঢের আগে থেকেই রাষ্ট্রশাসন-কাঠামো ভেঙে পড়েছিল। রাজধানী মুর্শিদাবাদের চেহারাটি ঐতিহাসিক সমীক্ষার আলোকে দেখা যাক—

"The vivid pages of Seir Mutaqherin has already made familiar to us the depth of Luxury, debauchery and moral depravity of the period, and Ghulam Hussain in one place offers a few better remarks on the Ethicality of Murshidabad.

It must be observed, he said, that in these days Murshidabad wore very much the appearance of one of Loth's town; and it is still pretty much the same today ....Nay, the wealthy and powerful, having set apart sums of money for these sorts of amours used to show the way and to entrap and seduce the unwary, the poor, and the feeble and as the proverb says,—so is the king, so becomes his people—these amours got into fashion."

(Bengali Lit. in the Nineteenth Century,—Dr. S. K. Dey, P—29)

ক্লাইভের গর্দভ (Lord Clive- Jack-Ass) রূপে অভিহিত মীরজাফর ইংরাজের দয়ায় সিংহাসনে বসলেন। বাংলার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ও শিল্প তার আগেই ভেঙেছে। যা অবশিষ্ট ছিল, তা শোষণের অধিকার রইল ইংরাজের হাতে। দ্বৈতশাসনের রূপটি লক্ষ্য করবার মত। ১৭৬৪-তে ইংরাজের সঙ্গে সংঘাত বেঁধে উঠতে মীরকাশেমের রাজত্বও শেষ। চারদিকে দারিদ্র্য, অভাব, দুঃখদুর্দশা, হতাশা ও ভাঙনের মধ্যে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার ভাঙন। ওদিকে তখন বাণিজ্যজীবী ইংরাজের হাতে বাংলার ঐশ্বর্য-সম্পদের অবাধ অধিকার। কলকাতা নগরীর সূচনা দেখা দিচ্ছে। অর্থভিত্তিক নতুন সমাজের সৃষ্টি। দেওয়ান, কারুন, মৎসুদ্দিকুলের হাতে নতুন সমাজের সূচনা। সে-যুগের সমীক্ষা একটি কবিতায়—

ধন্য ওহে কলিকাতা, ধন্য ওহে তুমি,
যত কিছু নূতনের তুমি জন্মভূমি
দিশিচাল ছেড়ে দিয়ে বিলেতের চাল;
নকুলে বাঙালীবাবু হলো যে কাঙাল
রাতারাতি বড়লোক হইবার তরে,
ঘর ছেড়ে কলিকাতা গিয়া বাস করে।

অদূরে দুর্ভিক্ষের পদসঞ্চার; কিন্তু নবলব্ধ আনন্দ-আমোদ উদ্যোগ-আয়োজনের উল্লাসে বিত্তকৌলীন্যের মত্ততা। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের ভাষায়—

"The land revenue was forced up so high only by the heartless squeezing of the peasantry and inhuman torture of the Contractor-Collectors".

এই নষ্ট-নিরাপত্তা ও আদর্শ-বিপর্যয়ের যুগে স্বাভাবিক সাহিত্যের ফলন রুদ্ধ। শক্তিমান কবি-সাহিত্যিকের কণ্ঠ আর শোনা যায় না। এই যুগেই কবিওয়ালাদের আবির্ভাব। ডক্টর সুশীলকুমার দে-র সমীক্ষা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে—

"The existence of Kavi-songs may be traced to the beginning of the 18th century or even beyond it to the 17th but the most flourishing period of he Kabiwalas was between 1760 and 1830'.

দেখা যাচ্ছে, যুগজীবন ব্যঙ্গ-সাহিত্য-রচনার সম্পূর্ণ অনুকূল। তার অনেক আগেই রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র সমসাময়িক কালের অন্তঃসারশূন্যতা, ধর্মীয় অনাচার ও অসঙ্গতি, এবং রাজা ও রাজসভার অপদার্থতাকে শক্ত হাতে আক্রমণ চালিয়ে গেছেন। প্রচলিত মঙ্গলকাব্যধারার বাঁধা আঙ্গিকে অন্নদামঙ্গল এবং তৎকাল-প্রচলিত লৌকিক কাহিনী বিদ্যাসুন্দরের মাধ্যমে এই অসাধ্য-সাধন করেছেন তিনি। কিন্তু কবিওয়ালারা যেমন সুস্পষ্ট অর্থে কবি ছিলেন না তেমনি ব্যঙ্গসাহিত্যরচনার প্রতিভাও তাঁদের ছিল না। সেই ঘোর দুঃসময়ের চোরাবালির চরে দাঁড়িয়ে তাঁরা গান ধরেছিলেন; এবং বলাবাহুল্য তাতে আন্তরিক দুর্লভ অনুভূতির যেমন কোনো স্পর্শ ছিল না তেমনি কোনো কর্তব্যসচেতনার দায়ও ছিল না। সেই বিকৃতি ও ভাঙনের যুগে তাঁরা শুধু অর্থবান নব্য সম্পদস্ফীত বড়লোকদের আমোদ-প্রমোদ ও আনন্দ-উল্লাসের প্রয়োজনেই নিম্নরুচিসম্পন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় —"ইংরাজের নূতনসৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল? তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্ম-শ্রান্ত বণিকসম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।" দেখা যাচ্ছে, কবিগান, পাঁচালী, আখড়াই, হাফ আখড়াই প্রভৃতির মাধ্যমে সহজ ও সুপ্রচলিত শব্দের ব্যবহারে, ছন্দোনৈপুণ্যে কবিওয়ালারা নিম্ন-রুচি সম্পন্ন জনগণের রুচি চরিতার্থ করার কৌশলে ঢের বেশি অভিনিবিষ্ট ছিলেন। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করাতেই ছিল এঁদের কৃতিত্ব। এবং এই প্রয়োজনে সস্তা খিস্তি খেউড় হাস্য পরিহাস ইত্যাদির ব্যবহার ছিল অবাধে। হরগৌরী, কালী, দেহতত্ত্ব নিয়ে তাঁরা যখন গান বেঁধেছেন, ভক্তিভাবের রসসঞ্চারের উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে তখনও কিন্তু এই সস্তা লড়াই-জেতার সুরটিই প্রধান হয়ে উঠেছে। এবং সমসাময়িক ঘটনা যখন গানের বিষয় হয়েছে, তখন এই মনোভাব আরও সূক্ষ্মভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

তবু কিন্তু কবিওয়ালাদের গানে বাঙালী-সুলভ ব্যঙ্গস্বভাবের সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। সরস পরিহাসরসিকতা, কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি এবং বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের উপস্থিতি রচনাগুলিতে

সুস্পষ্ট। বলা দরকার এই যে, বিদ্রূপব্যঙ্গের সুর এ-গুলিতে থাকা সত্ত্বেও কিন্তু তাদের রচনাকে বিদ্রূপ-ব্যঙ্গাত্মক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। সমালোচনা ও সংশোধনের সুরই ব্যঙ্গসাহিত্যের প্রধান বিশেষত্ব। ব্যঙ্গগন্ধী মনোভাব থাকা সত্ত্বেও, রচনা যেখানে সমালোচনা ও সংস্কারের প্রয়াস এবং আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে, সেখানেই তা ব্যঙ্গের মানদণ্ডে নেমে গেছে; এবং কুৎসা ও নিম্নরুচিসম্পন্ন নিন্দাবাদের সুরে পর্যবসিত হয়েছে। বিদ্বেষ, বৈরিতা, প্রতিহিংসা এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীরই সেখানে প্রাধান্য। পরস্পরের মতের দ্বন্দ্বে ব্যক্তিগত ঈর্ষায় দলাদলি ইউরোপীয় সাহিত্যেও প্রচুর। এমনকি ইংরাজি সাহিত্যের Restoration যুগের খ্যাতনামা ব্যঙ্গকার Pope-Dryden এর কিছু কিছু রচনাতেও এই আদর্শভ্রষ্টতা দেখা গেছে। বাংলা সাহিত্যে রামমোহন বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির যুগেও ব্যক্তিগত আক্রমণ কবিতার মাধ্যমে পরিচালিত হতে দেখা গেছে। বলা বাহুল্য, সেগুলি আর যাই হোক, ব্যঙ্গ হলেও, ব্যঙ্গসাহিত্য পদবাচ্য নয়। কিন্তু এ-গুলিতে জাতীয় ব্যঙ্গ-স্বভাবের যে-প্রকাশ ঘটেছে, তা অস্বীকার করা যায় না। উপহাস-পরিহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ঠাট্টা-রসিকতার প্রবৃত্তিই এর মূলে। কবিওয়ালারাও, বলাবাহুল্য, মনেপ্রাণে বাঙালী ছিলেন; এবং তাঁদের দলীয়তার লড়াইকে আশ্রয় করে কৌতুক-বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের সুরটি বেশ শোনা যায়, যদিও তা কিঞ্চিৎ অপরিশীলিত ও কর্কশ মেজাজের। প্রধানতঃ উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, জাতীয়চিত্তের নিম্নাভিমুখী মানই তার মূলে। এর সংগে মিশেছে গানের লড়াইতে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার আত্যন্তিক ব্যগ্র মনোভাব এবং বাহাদুরি লাভের আকাংক্ষা। তাছাড়া, ক্লাসিক সাহিত্যের সংগে পরিচয়ের অভাবহেতু, এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে মুখোমুখে গান বাঁধার দ্রুত ক্ষিপ্রতার তাগিদে ইংগিত-সংকেত বা বুদ্ধিধর্মী ব্যঞ্জনা কিংবা অলংকার প্রয়োগের সূক্ষ্মতম কলাকৌশলের অভাব। ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর অন্য প্রমাণ হাস্যরসের ব্যবহার এঁদের রচনায়। কিন্তু মনে রাখা দরকার হাস্যরসিকতা মাত্রেই ব্যঙ্গ নয়। ইংরাজি ব্যঙ্গসাহিত্য বিশ্লেষক Hugh Walker -এর উক্তিটি মনে রাখবার মত—

"....humour is an invaluable ingredient in Satire, only when it is combined with the spirit of criticism, with the desire to teach or with ridicule, does it become satire.'—

যা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত; এবং এই প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, কবিওয়ালাদের ব্যবহৃত হাস্যরস নিম্নরুচিসম্পন্ন এবং আদিরসাত্মক, অনেক সময় অমার্জিত—যা নিকৃষ্ট শ্রেণীর মনোরঞ্জনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছিল। কবিওয়ালাদের সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলতে চাই, এক ক্ষীয়মান সংস্কৃতি যুগের বিকৃতরুচি শ্রোতাদের পরিতৃপ্তির জন্যেই এ-গুলির সৃষ্টি হয়েছিল; ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, বৈরিতা বা কুৎসাগন্ধী প্রতিহিংসা কখনোই এগুলির পশ্চাতে ছিল না। নিতান্তই আনন্দ ও রঙ্গ, কবিতার লড়াইতে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেবার মজা এগুলির পশ্চাদপট রচনা করেছিল।

যাই হোক, ইতিমধ্যে সমকালের প্রয়োজন মিটিয়ে তাঁরা হারিয়ে গিয়েছেন এবং ইতিহাসের গতি-চঞ্চল মুহূর্তগুলি আমাদের আজ নতুনকালের প্রান্তে এনে উপস্থিত করেছে। প্রতিযোগিতাকে জোরদার করে তুলতে তাঁরা যে 'চাপান' চালাতেন, এবং প্রতিপক্ষকে যে 'উতোর' দেবার জন্যে তৎপর করে তুলতেন সেগুলি আজ ইতিহাসের সামগ্রী। প্রশ্ন ও উত্তরকে কেন্দ্র করে জয়-পরাজয়ের সে-লড়াই থেকে অনেক দূরে বসে আজ যখন আমরা বিচার করতে চাই, তখন মনোরঞ্জনের মুখ্য তৎকাল-প্রচলিত আদর্শ ছাড়াও তাঁদের বুদ্ধিদীপ্ত বাক্চাতুরী বা wit এবং সরস বিদ্রূপ-কৌতুক, রঙ্গ-রসিকতা আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলা ও বাঙালীর ছড়া-প্রবাদ গান, নানা লোকসংগীত, রামায়ণ-মহাভারত, লোক-সাহিত্যের নানা শাখার অগণিত লেখকের রচনায় বাঙালীর ব্যঙ্গ-দৃষ্টির যে পরিচয় ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, উত্তরাধিকারসূত্রেই কবিওয়ালারা সেই বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিলেন। তাঁদের রচনায় নানা পুরাণ, ধর্মীয় দর্শন, রামায়ণ ও মহাভারতের ইঙ্গিত আছে। কথায় কথায় প্রয়োজনবোধে সেগুলি ব্যবহার করার কৃতিত্বও আছে। মূলত এগুলি সংগীত। এবং এই সংগীতের ধারা দীর্ঘকাল ধরে আমাদের জীবনে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। বৌদ্ধগান ও দোঁহা, মংগলকাব্যগুলি, বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত সংগীতগুলির আধ্যাত্মিক দর্শনের পাশাপাশি লোকসংগীতের ধারাটিও নানা আর্যা-তরজা পাঁচালী-খেউড় প্রভৃতি অক্ষুণ্ণ প্রবাহিত হয়ে এসেছিল। বাংলার গ্রামজীবনের শারি, জারি, মালসী প্রভৃতি গানের কথাও মনে আসে। এইসব কিছুর দ্বারাই লালিত কবিওয়ালাদের মন ও মেজাজ, রুচি-প্রকৃতি ও ধরন-ধারণ। বাঙালীর স্বভাবসিদ্ধ নানা সংস্কার, রীতি ও প্রথা, বাঙালীর ঢিলেঢালা আয়াসী জীবন, চপলতা-উচ্ছ্বাস, রাগ-রঙ্গ প্রভৃতি তাই তাদের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। কিন্তু লক্ষ্য করবার এই যে এঁদের মানসিক গঠনে দৃঢ়তা ও ঋজুতার অভাব, জীবনকে "high-serious" দৃষ্টিতে দেখার অভাব। পল্লী-ভিত্তিক পুরাতন ভেঙে পড়ছে, নিষ্প্রভ হয়ে আসছে গ্রাম-জীবনের সরল আন্তরিকতা, ভক্তি-বিশ্বাসের নম্রতার সুরটি হয়েছে শিথিল; শ্রদ্ধা-ভক্তির স্থান গ্রহণ করেছে ঠাট্টা ও রসিকতা এবং অবিশ্বাস। নতুন দিনের সত্য তাদের চোখের সম্মুখে স্পষ্ট নয়, পুরাণকেও আঁকড়ে ধরে থাকা যাচ্ছে না। নিজেদের উপরে আস্থাও কমে এসেছে এই যুগে, সমাজ-শৃংখলাবোধ এবং আদর্শের ওপরেও নেই নির্ভরতা। এই যুগে জন্ম নিয়ে এঁরা যাই-ই করুন না কেন, তাতে হয়ত বাঙালীর চিরপুরাতন ব্যঙ্গ-রঙ্গ রসপ্রিয়তার সন্ধান মেলে, কিন্তু Satirist -এর দৃঢ়ত্ব কঠোরতা-আন্তরিকতা-কৌশল ইত্যাদির সন্ধান মেলে না।

অসংখ্য কবিওয়ালা জন্মেছেন এই যুগে। রবীন্দ্রনাথের তাঁদের পঙ্গপালের সংগে তুলনা করা থেকেই তার প্রমাণ মেলে। নানা শ্রেণী ও সম্প্রদায় থেকে এসেছিলেন এঁরা। খ্যাত ও অখ্যাতকীর্তি, অগণিত। উচ্চশ্রেণীর কবিওয়ালাও যেমন ছিলেন, তেমনি নিতান্ত সাধারণ দরিদ্র কবিওয়ালারও অভাব ছিল না। শিব-দুর্গা, কালী প্রভৃতি ঠাকুর-দেবতাদের নিয়ে যেমন গান বাঁধা হত, তেমনি দেহতত্ত্ববিষয়ক এবং সমসাময়িক ঘটনাও গানের বিষয়বস্তু হত। এঁদের অগণিত রচনা নিয়ে সুন্দর আলোচনার স্বাক্ষর রেখেছেন মনীষী সমালোচক ডঃ সুশীল দে। কবিওয়ালাদের উপরে নিরঞ্জন চক্রবর্তী মশাই-র আলোচনাও বিস্তৃত। আমার বর্তমান আলোচনায় কবিওয়ালাদের নিয়ে বিস্তৃত গবেষণার কোনো অবকাশ নেই, শুধু কিছু কিছু রচনা থেকে বাঙালীর ব্যঙ্গ-স্বভাবের স্বরূপটি পরীক্ষা করে দেখানো।

কবি-সংগীতের বিভিন্ন অংগের মধ্যে আছে সখী-সংবাদ। সখী-সংবাদের প্রধান অবলম্বন শ্রীকৃষ্ণ। রসসৃষ্টির তাগিদে দেখা যাচ্ছে যে সখীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্যঙ্গবর্ষণ করে থাকেন। এই প্রসংগে প্রচলিত খেউড় বা লহরের কথা মনে আসে। এগুলিতে অবশ্য অশ্লীলতা বেশ আছে। বাককৌশল এবং শ্লেষোক্তি এগুলির মধ্যে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। মনোমোহন গীতাবলী (১৮৮৩)-থেকে একটি খেউড়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছি—সেখানে পরিচ্ছন্ন রঙ্গরসপ্রিয়তার হাল্কা মেজাজটি লক্ষ্য করবার মত :

মহড়া

ওহে মহারাজ, কাঁচুলিতে আঁটা কেন বুক?
একি দেখি অসম্ভব, গর্ভেরই লক্ষণ তব
কৈতে লাজ, একি কাজ হোলো হে,
ছি ছি কি বলে আর দেখাও কালামুখ।

তেহরান

লাজে মরে যাই ও প্রাণ তোমারে দেখিয়ে।

চিতেন,

ছ' মাসে দিলে হে দেখা
ওহে মহারাজ, নবসাজে আজ
কোনভাবে সখা।

ফুকা

কেন আচম্বিত অনুচিত বিপরীত ভাব এমন
মনোদুখে রইলে অধোমুখে ঢেকে চাঁদবদন।
দেখে হাসি পায় ও প্রাণ,

মেলতা

তোমার কোমরঘেরা ঘাঘরা—কি কৌতুক

নিতান্তই রঙ্গ, অমার্জিত রঙ্গ ছাড়া আর বিশেষ কিছু বলা যায় না। তবু দৃশ্য হিসেবে সুন্দর। যদিও বক্তব্যহীন, কিন্তু বাককৌশলের চাতুর্যটি লক্ষ্য করবার মত। সাধারণ কবিওয়ালার রচনাই, কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত মনটি এবং রসবিস্তারের চাতুর্যপূর্ণ

পার্লে গ্লুকো—
আরো বেশী
ভাল স্বাদ—
অনেক বেশী
পুষ্টিকর

PARLE
BISCUITS
Gluco

উপস্থাপনাটির মধ্যে বাঙালী মন ও মননের সুন্দর আত্মপ্রকাশ।

একটি লহরের দৃষ্টান্ত ঃ

আমি মগধপতি জরাসন্ধ বটি
হে কংসের শ্বশুরে।
ওহে কংসের ভাগ্নে কৃষ্ণ,
তুমি নাতি আমার,—সম্বন্ধ মধুরে।
তোমার সঙ্গী দুটি পারিপাটি
নামে ভীমার্জুন,
কৃষ্ণ, ভালো করে আজ আমারে দাও
উহাদের পরিচয়।
উহার কোনটি তোমার পিসতুত ভাই,
কোনটি ভগ্নীপতি হয় ?
ভদ্রঘরের মেয়ে বটে, সুভদ্রার বুদ্ধি
ভাল নয়,
ওহে ভাইকে পতি করতে গেলে,
তোমার মত কে আর হয়

উপরের দৃষ্টান্তটির মধ্যে ভক্তিভাবুকতার আন্তরিকতা আছে কি? বরং ভক্তিহীন নাস্তিক মনের এক প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপপ্রবণতা আছে, যা সে যুগের জীবনবোধ থেকে উৎসারিত রঙ্গরসের শ্লেষাত্মকতার মাধ্যমে প্রকাশিত। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, যিনি আমাদের জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের অফুরন্ত উৎস, সামান্য কবিওয়ালার অম্লমধুর শাণিত কটাক্ষ তাঁকে সইতে হচ্ছে। শেষের তিনটি লাইন প্রায় তাঁর শ্লেষজর্জর আক্রমণের ধার ঘেঁষে গিয়েছে। সুভদ্রার বুদ্ধির প্রতি খোঁটায় এবং সেই সঙ্গে "ভদ্রঘর" -এর উল্লেখে এবং শেষ পংক্তিটিতে কবিওয়ালার একটি চাপা বক্র হাসির আভাসে বক্তব্যটি উচ্চারিত বটে, কিন্তু গ্রাম্য দলাদলি বা ইতরজনোচিত কুৎসা— railery or lampoon -এর কাছ দিয়ে যায় নি, উপস্থাপনা কৌশল তাকে রক্ষা করেছে।

বাঙালী কবিওয়ালাদের মধ্যে হরু ঠাকুরের নাম বেশ পরিচিত। কলকাতার সিমলায় তাঁর জন্ম, ১৮৩৭ খৃস্টাব্দে। ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম, আসল নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি। সে যুগের কবিওয়ালাদের মতই যথেষ্ট দার্শনিক জ্ঞান, অধ্যাত্মঅনুভূতি ও পৌরাণিক কাহিনীর ইঙ্গিত তাঁর রচনায় সুলভ, কিন্তু রসচতুর মনটির প্রকাশও উপেক্ষণীয় নয়। হরুঠাকুর অসংখ্য কবিতা-যুদ্ধে রত হয়েছিলেন, এগুলিতে তাঁর কবিত্ব শক্তি, আন্তরিকতা ও কৌশলের প্রমাণ আছে। একটি গানে হরু ঠাকুর কবিওয়ালা ভোলা ময়রাকে বিদ্রূপ করে বলছেন, যে ভোলা ময়রা তাঁকেই গুরু বলে স্বীকার করেন—

সকল ভন্ড ভোলা তোর,
তুই পাষন্ড নচ্ছার।
তুই ভজিস ঢেঁকি, বলিস কিনা
গৌর অবতার।।
কিসে করিস দ্বেষ, ঘটে নাই
বুদ্ধি লেশ,
বুঝিস না সূক্ষ্ম, ওরে মূর্খ!
দিস কোন ঠাকুরের ঠেস।
তুই কাঠের ঠাকুর টাটে তুলে
নিয়ে করিস বাচাভুর।
সেই হরি কি তোর ঠাকুর?

শ্লেষচতুর বক্র উপস্থাপনাটি লক্ষ্য করবার। সেই সঙ্গে দার্শনিক জ্ঞানের দীপ্তি—

যিনি বাম করেতে গিরি ধরে
রক্ষা করলেন ব্রজপুরে,
যাঁহার অভয়চরণ শিরে ধরে,
জীব তরাচ্ছেন গয়াসুরে।।
যে রজক ছেদন করে করে
ধ্বংস করলে কংসাসুরে।
সেই হরি কি তোর ঠাকুর?
এখন বুঝলি ত এই হরু নয়,
সেই হরি সারাৎসার,
পূর্ণ ব্রহ্ম সেই হরি, ইনি প্রকান্ড অসার।
হরির সকল ভক্তে সমান দয়া
এর সে বিষয়ে অনেক থাম,
বুঝব রহিম কি ইনিই রাম!
ইনি তোমার বেলা সিদ্ধির গোঁসাই,
আমার প্রতি কেন বাম?
ইনি হিন্দুর দেবতা স্থির,
কি মুসলমানের পীর ;
তাই বল দেখি জগীর।

রচনার মুন্সীয়ানা, কবির কৌতুকরস-প্রবণতা ও অনায়াস ছন্দ-প্রয়োগদক্ষতা উপভোগ্য।

ভোলা ময়রার ভালো নাম ভোলানাথ নায়ক, ভোলা ময়রা হিসেবেই কবিওয়ালাদের মধ্যে সুপরিচিত। প্রতিদ্বন্দ্বী দল তাকে ভোলানাথ বলে বিদ্রূপ করায় তিনি জবাব দিয়েছিলেন—

আমি সে ভোলানাথ নই।
আমি ময়রা ভোলা হারুর চেলা
বাগবাজারে রই।
আমি যদি সে ভোলানাথ হই,
তবে তোরা বিল্বদলে আমায়
পূজলি কই?

বাঙালীর ঘরে ঘরে পান-সুপারী চুন-খয়েরের একটি আলাদা আদর ও কদর আছে। তার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনেও জিনিসটির ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত। এই পান নিয়ে গান বেঁধেছেন ভোলা ময়রা। গানটি দেখা যাক—

পানকে তাম্বুল বলে পর্ণ সাধুভাষা।
বরজে বিরাজ করে, চাষার বড় আশা।।
বুড়োবুড়ি, ছেলেমেয়ে, যুবক-যুবতী।
পান পেলে মন খুলে বাড়ায় পীরিতি।।
মোষের মত মুন্সীবাবু,
মসীর ন্যায় কালো।
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙায়, চেহারাখানা ভালো।
পূর্বজন্মের পুণ্যফলে পান খেতে পাই।
লক্ষ্মীছাড়া, বাসী মড়া, যার
পানের কড়ি নাই।।

কৌতূহলী পাঠক রচনাটিতে পরবর্তী-যুগের ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ-রচনার ভঙ্গিটি পাবেন। মনে রাখা দরকার, ঈশ্বর গুপ্তও কবির দলের জন্য গান বেঁধেছিলেন, 'সখী-সংবাদ' বিষয়ে অনেক গান তাঁর আছে। ভোলা ময়রার উপরে উল্লিখিত পংক্তিগুলি সরল চিত্রধর্মী উপভোগ্য রচনা। পান-খাওয়া প্রসঙ্গে কোনো এক 'মোষের মত মুন্সীবাবু'কে মনে আনা যার গাত্রবর্ণ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ তাকেই আবার পান খেয়ে ঠোঁট রাঙাতে দেখে তিনি একটু ঠাট্টা করতে ছাড়েন নি। বলা বাহুল্য, এই ব্যঙ্গ মাধুর্যটুকু উপভোগ করবার মত।

অন্য একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক, তাতেও প্রশংসনীয় ব্যঙ্গ-স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। বর্ধমান মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার জাড়া গ্রাম। আজ থেকে অনেক বছর আগে সেখানে ভোলা ময়রার সঙ্গে একবার কবিওয়ালা যজ্ঞেশ্বর ধোবার কবির লড়াই হয়। এই লড়াই আহ্বান করেছিলেন জাড়ার ব্রাহ্মণ জমিদার 'রায়বাবুরা'। যজ্ঞেশ্বর লড়াইয়ের সূচনাতেই এই জমিদার রায়বাবুদের প্রশংসা সুরু করেন। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, জাড়া গ্রাম ঠিক যেন গোলক বৃন্দাবন, আর তার জমিদার রায়বাবুরা পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মত।

ভোলা ময়রার জবাবটি দেখা যাক,—

কেমন করে বললি জগা
জাড়া গোলক বৃন্দাবন
এখানে বামুন রাজা, চাষা প্রজা,
চারদিকে তার বাঁশের বন।
কেমন করে বললি জগা
জাড়া গোলক বৃন্দাবন
জগা কোথায় তার শ্যামকুণ্ড,
কোথায় তোর রাধাকুণ্ড
ঐ সামনে আছে মানিককুণ্ড,
কোরগে মুলো দরশন
কেমন করে বললি জগা
জাড়া গোলক বৃন্দাবন।
এখানে বামুন রাজা, চাষা প্রজা,
চৌদিকে তার বাঁশের বন।
ও-রে বেটা 'কবি' গাবি পয়সা লবি,
খোসামুদি কি কারণ
কেমন করে বললি জগা,
জাড়া গোলক বৃন্দাবন
'কৃষ্ণচন্দ্র' কি সহজ কথা? কৃষ্ণ বলি কারে
সংসার-সাগরে যিনি (জগা!) তরাইতে পারে
বাবুতো বাবু লালাবাবু কলকাতাতে বাড়ি
বেগুনপোড়ায় নুন দেয় না,
এ-বেটারা তো হাড়ী।
পিঁপড়ে টিপে গুড়, মুফতের মধু আলি।
মাপ কর গো রায়বাবু,
দুটো সত্যি কথা বলি।
জগা ধোপা খোসামুদে, অধিক বলব কি।
তপ্তভাতে বেগুনপোড়া, পান্তাভাতে ঘি।

প্রতিদ্বন্দ্বী কবিওয়ালা যজ্ঞেশ্বরকে আঘাতের ছলে প্রথম দিকে অনুন্নত জাড়া পল্লীর চিত্রবর্ণনা—'চাষা প্রজা বাঁশবন প্রভৃতি দু-একটি শব্দের ইঙ্গিতে গোলক-বৃন্দাবনের সঙ্গে হাস্যকর বৈসাদৃশ্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন ভোলা ময়রার ব্যঙ্গ-দক্ষতার পরিচয় দেয়। উপরি-উধৃত অংশের দ্বাদশ-ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পংক্তিটি তীব্র তীক্ষ্ণ আক্রমণমূলক দৃষ্টির পরিচয় দেয়। প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গের লক্ষণ এতে, অমার্জিত রূঢ় উচ্চারণ।

ভোলা ময়রার অজস্র ছোট-বড় ছড়ায় তাঁর ব্যঙ্গ-রঙ্গ স্বভাবের অজস্র দৃষ্টান্ত ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। কিছু কিছু উদাহরণ নিয়ে দেখা যাচ্ছে। কাশিমবাজারের রাজবাড়িতে ভোলানাথ ও যজ্ঞেশ্বরীর দলের মধ্যে কবির লড়াই হচ্ছে। মহিলা কবি

যজ্ঞেশ্বরীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেছেন ভোলা ময়রা। সঙ্গে বিখ্যাত কবি-ওয়ালা রাম বসুকেও কৌশলে মার লাগাতে ভোলেননি। যজ্ঞেশ্বরীকে তিনি অতি ভক্তি-ভাবে মাতারূপে সম্বোধন করেছেন, আসলে তার প্রতি আক্রমণ-প্রয়োগের জন্যই ছদ্ম-বেশী বিনয়ের অবতারণা—

তুমি মাতা যজ্ঞেশ্বরী সর্বকার্যে শুভঙ্করী

যজ্ঞেশ্বরীকে মাতা-সম্ভাষণের সঙ্গে কবি-ওয়ালা রাম বসুর প্রতি 'এঁড়ে' সম্ভাষণ করে তাঁকে নিজের পিতৃত্বের গৌরব দিচ্ছেন। পরোক্ষ ইঙ্গিতটি সুস্পষ্ট। বাপ রাম বসু যদি 'এঁড়ে' হন তো ভোলা ময়রার মাতা-রূপিণী যজ্ঞেশ্বরীকে গাভী পর্যায়ভুক্ত করা হচ্ছে—

তোমার ঐ পুরাণো এঁড়ে রাম বোস আমার বাপ।

ইঙ্গিতটি খানিক পরিমাণে স্থূল হলেও প্রয়োগের মুন্সিয়ানা আছে, স্বীকার করতে হয়।

যেমন পিতা তেমনি মাতা ভোলানাথের অন্নদাতা
মা-বাপ ঠিক লাগিয়ে দিলে থাপ।।

এখন বিনীতভাবে ভোলা ময়রার জ্ঞাতব্য— গাভীমাতারূপিণী যজ্ঞেশ্বরীটি আসরে কেন ঘন-ঘন এসে হাঁক দিচ্ছেন? এবং এই হাঁক-টি যে আসলে হাম্বা রব, তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না—

এখন মা শুধাই তোরে কেন এসে এই আসরে
ঘন ঘন দিচ্ছ জোরে হাঁক।

তোমার পুত্র ভোলা গুণধর সকল কাজেই
অগ্রসর,
তোমার মতন জ্ঞাতার দুঃখ দেখিতে না-চাই
পাড়াপিড়া সপ্তমাতা শাস্ত্রে শুনতে পাই,
তুমি আমার গর্ভমাতা চল...ধরাতে যাই।।

যুগজীবন ও সমাজজীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না, এবং তার সঙ্গে এসে মিলেছে প্রশংসনীয় উইট-এর দীপ্তি। কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। ইংরাজ কোম্পানীর শোষণের প্রতি ইঙ্গিত —সমাজ-জীবনকেও—

(১) মাটি বেটি আমানী।
তিন মজে কোম্পানী।।

(২) রাঢ়ের রাঁধুনী বামুন ; বাদ্দিদের পৈতে।
নদীয়ার নবীন-নাগর ;
কে পারে গো সইতে?

সমাজ-চরিত্র ও অসঙ্গতির চিত্রটি পরিহাসের সঙ্গে রূপায়িত দেখা যাচ্ছে নিচের উদাহরণটিতে—

বামুন বলে, 'আমি বড়', কায়েৎ বলে দাস'।
বাদ্দি বলে 'ক্ষত্রি আমি' (ঢাকা জেলায় বাস)।।
যুগী বলে 'যোগী আমি', চাষা বলে বৈশ্য।
শূদ্রেতে শূদ্রত্ব ছাড়ে, যথা কালীঘাটের নস্য।।
বলে 'উগ্র', নহি 'শূদ্র', রাখি তোলোয়ার।
যোল্লে রাত্রি, উগ্রক্ষত্রি ভয়ে পগার পার।।

সামাজিক অসঙ্গতি ও অন্তঃসারশূন্যতাকে ঘা মেরে সংশোধন করার আকাঙ্খা যে এগুলির মধ্যে ছিল না তা বলা যায় না। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগরকেও যখন বলতে শুনি—'বাংলাদেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তার, হুতোম প্যাঁচার লেখকের ন্যায় রসিক লোকের এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।' (সাহিত্য-সংহিতা—১৩১২)

কবিওয়ালাদের ব্যক্তিত্বও ছিল অনেকের। ক্ষমতাবান প্রবলকেও বিদ্রূপবাণে আঘাত করতে দেখি। হরু ঠাকুরের কথা আগেও একবার বলেছি, ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে আবার উল্লেখ করবার কথা মনে হচ্ছে। সেকালের বিখ্যাত ধনাঢ্য পুরুষ রাজা নবকৃষ্ণের বাড়িতে গান হচ্ছে। গান খুবই জমে উঠেছে। বিখ্যাত হরু ঠাকুরের উপস্থিতিতে গান জমারই কথা। রাজা খুশি হয়ে এগিয়ে এলেন হরুর কাছে। মুগ্ধ মোহিত তিনি।

হরুকে পুরস্কার দিলেন শাল। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে হরু ঠাকুর তা হাত পেতে গ্রহণ করলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তা দান করে দিলেন নিজের ঢুলীকে। এ সামান্য উপহার যে ঢুলীরই প্রাপ্য এই কথা তিনি সোজাসুজি দৃপ্তভাবে জানিয়ে দিলেন। গান বাঁধলেও তারা যে ভীরু ছিলেন না, প্রয়োজনে আঘাত করতে জানতেন, এ-ঘটনা তারই প্রমাণ দেয়।

বাঙালীর ব্যঙ্গস্বভাবের সুন্দর রূপটি অনেক কবিওয়ালাদের মধ্যেই প্রকাশিত। বিখ্যাত রাম বসু কবিওয়ালাকে দেখা যাক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে জন্ম, ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু। কবিওয়ালা রামপ্রসাদ ঠাকুর রাম বোসকে বিদ্রূপ ছুঁড়লেন, নাইক রাম বোসের এখন সেকেলে পৌরুষ। এখন দম্ভ করে হয়েছেন রাম বোস,
—রামকামারের।।

রাম বোস তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন,—
তেমনি এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন।
যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে,
বাজেনাকো একটি দিন।।
যেমন রাত-ভিখারীর ধামা বওয়া
থাকে এক-একজন।
হরিনাম বলে না মুখে পেছু থেকে
চাল কুড়াতে মন

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জ্বালাময় রূপটি লক্ষ্য করবার মত। রামপ্রসাদকে নীলুঠাকুরের দলের অক্ষম গায়ক বোঝাতে 'ঢাকের বাঁয়া', 'রাত-ভিখারীর ধামা-বওয়া একেকজন' ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করেও তৃপ্তি মেটেনি, অবশেষে চিত্র-হিসেবে চরম ব্যঙ্গাত্মক হয়ে ওঠে শেষ ছত্রটিতে যেখানে 'হরিনাম বলে না মুখে, পেছু থেকে চাল কুড়াতে মন' ইঙ্গিতটি এসেছে। প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গ হলেও প্রয়োগটি হাস্যরসের আধারে—

কর্মে অকর্মা, ঐ রামপ্রসাদ শর্মা,
মন কাজের কাজী ঠাটের বাজী (ভাইরে)
ঠিক যেন ধোপার বিশ্বকর্মা—
যেমন বিদ্যেশূন্য বিদ্যেভূষণ
সিদ্ধিরস্তু বস্তুহীন।।

আক্রমণটি কিন্তু পূর্বে পরিকল্পিত নয়, মুখে মুখে আসরের গানে,—প্রতিপক্ষের মস্তবোর প্রতিবাদে। এবং এই প্রসঙ্গে ক্লাইভের গর্দভরূপে কথিত উজীরালী মীরজাফরের ঐতিহাসিক অপদার্থতাকেও ছুঁয়ে গেছে। সে-যুগে মীরজাফর-সম্পর্কে সাধারণের মনোভাবটিও এতে সাক্ষ্য :

নীলমণি বলে নীলমণির দলে, ঢুকলো
শিং-ভাঙ্গা এ'ড়ে বাছুরের পালে,
যেমন নবাব মলে নবাব হল
উজীরালী আড়াই দিন।
যেমন...কাছে গাধের লড়াই ধরে করেন জাব,
দুনিয়ার কর্মেতে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে,—
বচন গড়িয়ে করেন থাক,
তেমনি শ্রী-চাঁদ, এই পেটকো মুলকচাঁদ,
ধরে কৃষ্ণপ্রসাদ, তরেন রামপ্রসাদ...

এন্টনি ফিরিঙ্গি নামেই ফিরিঙ্গী বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে এসে বাঙালীর মধ্যে থেকে ব্রাহ্মণ-রমণীর প্রেমে পড়ে এই পর্তুগীজটিও বাঙালী হয়ে গিয়েছিলেন বলা যায়। বাঙালীর শাস্ত্র-ধর্ম রীতি-নীতি, আচার-আচরণ সব তিনি রপ্ত করে নিয়েছিলেন। এই কবিওয়ালার সঙ্গে অনেকেরই কবিতা-যুদ্ধ হয়েছিল। রাম বসু ও ঠাকুর সিংহের সঙ্গে লড়াইতে তাঁর বাক-চাতুর্য ও রসিকতার পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি অন্যদেরও।

ঠাকুর সিং এন্টনিকে বিদ্রূপ করলেন বলহে এন্টনি আমি একটি কথা জানতে চাই
এসে এদেশে এ-বেশে তোমার গায়ে
কেন কুর্তি নাই।

ধুতি-চাদর পরিহিত এন্টনি যা জবাব দিলেন, তাতে কিঞ্চিৎ সুরুচি ও শালীনতার অভাব সত্ত্বেও দক্ষতার প্রমাণ ঘটেছে—

এই বাংলায় বাঙ্গালীর বেশে
বেশ আনন্দে আছি।
হয়ে ঠাকরো সিংয়ের বাপের জামাই
কুর্তি টুপি ছেড়েছি।

রাম বসু এন্টনিকে বিদ্রূপ করলেন—
সাহেব! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি
ও-তোর পাদরী সাহেব শুনতে পেলে,
গালে দেবে চুণকালি।

এই সহজ অনায়াস কবিত্ব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপগুলিকে রসায়িত করেছে। ফলে ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ ও গালি বা কুৎসার স্তরে পৌঁছায়নি,
এন্টনিকে রামসুন্দর স্বর্ণকার বলছেন
এন্টনি ফিরিঙ্গি বড়ো চোর।

ভাকে রাত হলে সব যত চোর।।
টাটকা গোবর, শুটকো ভূতের রব
এ-কি অসভ্য,
এ হুমকি দিয়ে বস্তু লোটে সব।

এন্টনি যখন মা দুর্গার কাছে মৃত্যু-অন্তে ত্রাণ প্রার্থনা করে, বিরুদ্ধবাদীরা বলে ওঠেন,
তুই জাত-ফিরিঙ্গি জবরজঙ্গী পারবে না
মা তরাতে।
যীশুখৃষ্ট ভজগে বেটা শ্রীরামপুরের
গীর্জাতে।

লক্ষ্য করতে হবে, এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নির্মল। এন্টনি বিদেশী ও বিধর্মী বলেই যে এ আক্রমণ তা নয়, অন্য ধর্মের প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই। এ বিদ্রূপের জন্যেই বিদ্রূপ। এই বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ একটি বিশেষ জাতি-স্বভাবের প্রকাশ। একটি জীবিত জাতির জীবন ও জগতকে উপভোগের আনন্দ। শিল্পসম্মত প্রকাশ। যদিও সুরুচি অনেক সময় অমার্জিত কিন্তু বৈরিতা বা অসূয়া এগুলির পশ্চাদপট রচনা করে না। এমনকি শিষ্য গুরুর প্রতি ব্যঙ্গ করতেও ভোলে না। রামানাথ নন্দী তাঁর গুরু বিখ্যাত কবিওয়ালা নিতাইদাস বৈরাগীকে নিয়ে গান বাঁধেন—

নিতাইদাস বৈরাগী, বাজাতো ডুগডুগি,
আর, চন্দননগরে ভিক্ষা করতো,
তুম্ব বেঁধে কাঁধেতে
আমরা মরে যাই লজ্জাতে

বাঙালীর ব্যঙ্গ-স্বভাব ও তার বিদ্রূপ-হাসি-ঠাট্টা পরিহাসের বিশেষরূপটি কবিওয়ালাদের মধ্যে সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। তাদেরই কয়জনকে নিয়ে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করে দেখা গেল।

(পাঁচ)

রবিবার বড়মামা সদলবলে এসে হাজির। বাজারে যাব যাব করছি এমন সময় ওঁরা এলেন। রবিবার আমি নিজে বাজারে যাই। ভাগ্য ভাল তবু বাজার হবার আগে এলেন, না হলে বিব্রত হতে হতো। বড়মামা, মামী, নিতুদা আর একটি মেয়ে যাকে আমি চিনি না। সে নিশ্চয় সুষমা। নিমেষের জন্য ওকে দেখে নিলাম। দেখতে মোটামুটি। রং ফর্সাই হবে। মোটাসোটা গোলগাল গড়ন। চাপা হাসি মুখ। ও যে চকিতে আমাকে দেখে নিল, বুঝতে পারলাম। ওর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিল। দেখে মনে হল, নিতুদার বোন আদুরে মেয়ে আর ওর মনে সুখ আছে।

আমাকে বেরিয়ে যেতে দেখে বড়মামা বললেন, 'কোথায় যাচ্ছিস তুই? এখানে আসার সময় শেয়ালদা থেকে মাছ তরকারি কিনে এনেছি।' এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি নিতুদার হাতে একটা থলি।

মা বিষম বিরক্তবোধ করল, 'ছি, ছি, এ কী করেছেন দাদা! না, না এ হয় না। ছি, ছি, কী বিশ্রী কান্ড!'

বড়মামা বললেন, 'তাতে কি হয়েছে। আসতে আসতে দেখলাম, টাটকা জিনিসপত্র উঠেছে, নিয়ে এলাম। এর মধ্যে কিন্তুর কি আছে। তাছাড়া আমি যদি ওর জন্যে শখ করে দু-চারটে জিনিস নিয়ে আসি তুই আপত্তি করবি?' কথা বলার সময় বড়মামা এমন শান্তভাবে হাসছিলেন যে ওঁকে মহাপুরুষ-মহাপুরুষ মনে হচ্ছিল।

মা আর কিছু বলতে পারল না। আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'তুই তো বেঁচে গেলি, আর বাজারে যেতে হবে না।'

নিতুদা এতক্ষণে বলার মত কথা পেল, 'তুমি বুঝি বাজারে যেতে ভালবাস না?'

নকল বিরক্তি দেখিয়ে মা বলল, 'অসম্ভব কুঁড়ে ও।' মার কথা বলার ধরণে সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। এমন কি সুষমাও। হাসলে সুষমাকে ভাল দেখায়। যে মেয়েদের দাঁত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, হাসলে তাদের সুশ্রী দেখায়। সুষমার হাসি দেখে আমার আর একটা কথাও মনে হল। মনে হল, আমাকে দেখে সুষমারও নিশ্চয় পছন্দ হয়েছে। কী জানি কেন, ওর হাসির মধ্যে হঠাৎ যেন সেরকম একটা আভাস পেলাম। অবিশ্যি জানি না, আমার মনের ভুল কিনা।

মেয়েরা বাড়ির ভিতরে চলে গেল। যেতে যেতে বড়মামীমা বললেন, 'আজ সুষমা রাঁধবে।'

সুষমা অস্ফুট স্বরে কী বলল, শুনতে পেলাম না। ও নিশ্চয় বলল, ওর রান্না মোটেই ভাল না। মেয়েরা যা বলে আর কী।

আমরা বারান্দায় এসে বসলাম। আমার মাথায় তখনও সুষমা ঘুরছে। মনকে বারংবার বোঝাতে চাইছিলাম, মানুষ শুধুমাত্র নিজের জন্যেই বাঁচে না, কর্তব্য বলে একটা বস্তু এখনও সংসারে রয়েছে—মার প্রতি কর্তব্য। এ তো শুধু বইয়ের কথা নয়। অনেক মানুষকে কর্তব্য পালন করতে স্বচক্ষে দেখেছি। আমাদের পাড়ার কেষ্টদা বিয়ে করেননি, শুধু বোনকে বিয়ে দিতে পারছেন না বলে। বোনের প্রতি কর্তব্য নয় এটা? অফিসের বিনয় সরকার সেদিন বিয়ে করল। বৌভাতে গিয়েছিলাম। কী কুৎসিত বউ, শুধু তো বাপ-মাকে খুশী করতেই বিয়ে করল বিনয়। মাস আষ্টেক হয়ে গেছে, কিন্তু এর মধ্যে একদিনও তো বিনয়কে অসুখী বলে মনে হয় নি। বরং ও আগের চেয়ে অনেক মনোযোগ দিয়ে কাজ করে, ফর ফর করে ঘুরে বেড়ায় না। কাজ করে উন্নতির আশায়; বেশী টাকা পাবে, বৌকে, বাপ-মাকে সুখে রাখবে। সুষমাকে বিয়ে করলে মা যদি সুখী হয়, হোক।

সুষমার কথা ভাবতে গিয়ে অনেক কথা ভাববার সুযোগ পেয়ে গেলাম। বড়মামা আর নিতুদা নিজেদের মধ্যে গল্পে এমন মেতে উঠেছেন, যে তাঁদের মনেই রইল না, দু হাত দূরে আমি একজন মানুষ বসে রয়েছি। মাঝে মাঝে ওঁদের কথাবার্তা কানে আসছিল। মনে হচ্ছিল সমবয়সী দুজন মানুষ কথা বলছেন। বয়সের তুলনায় নিতুদা অনেক বুড়িয়ে গেছে। বছর কয়েক আগেও দেখেছি সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল নিতুদার। কথায় কথায় খুব হাসত তখন। এখনও অবিশ্যি নিতুদা খুব হাসছিল। কিন্তু সে হাসিতে প্রাণ ছিল না, শুধু মাত্র বড়মামাকে খুশি করার জন্যেই যেন নিতুদার হাসি। অবিশ্যি জানি না, এই কথা মনে হওয়ার মধ্যে যথার্থ কোন যুক্তি আছে কিনা। এক এক সময় বিশেষ কোন মানুষকে নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে বেশ লাগে। এই যে বড়মামা; মার ধারণা বড়মামার মত সৎ প্রকৃতির মানুষ আজকালকার দিনে বিরল। এ ধরনের মানুষের নাকি সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার কথা। নেহাৎ বড়মামীমার সিঁদুরের জোরেই সংসারে আটকে পড়ে গেছেন মামা। কোন ছোট বয়সে সামান্য বেতনে কেরাণী হয়ে ঢুকেছিলেন তিনি, তারপর শুধুমাত্র সততার জোরেই আজ সেই অফিসের হেড ক্লার্ক। বড়মামার কথা বলে মা এমনভাবে আমার মুখের দিকে তাকায় যে মনে হয় শাহানশাহ্ আকবরও বুঝি বড়মামার কাছে তুচ্ছ।

বড়মামার কথা ভাবতে ভাবতে একসময় আমার মনে হতে লাগল, সমস্ত ব্যাপারটা—এই যে কথায় কথায় নিতুদার হাসি, সুষমার সবাইকে রেঁধে খাওয়ানো, বিনা নিমন্ত্রণে ওঁদের এখানে আসা—সব কিছুর মধ্যেই কেমন যেন একটা দয়া-দাক্ষিণ্যের গন্ধ রয়েছে। নিতুদা আর ওর বোন যেন করুণা ভিক্ষা করতেই এসেছে আজ। বড়মামা সেই সুযোগটা পুরো মাত্রায় নিচ্ছেন। নিতুদার সঙ্গে যেভাবে কথা বলছেন, যেন উপরিওয়ালা কেউ। নিতুদার মুখেও অধস্তন কর্মচারীর বিনয়। অথচ সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে কেন্দ্র করেই।

অসহায়ভাবে ওঁদের দুজনকে দেখতে দেখতে একসময় মনে হল, আমি যেন ক্রমশই একটা ছোট্ট গন্ডীর মধ্যে প্রবেশ করে চলেছি। সেই গন্ডীটা আমার ব্যক্তিগত একটা জগৎ ছাড়া আর কিছুই না। সেই জগৎ শুধুমাত্র আমাকে নিয়েই। আমি ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই, এমন কি মাও না। আমি যদি আজ

মরে যাই, মার খুব দুঃখ হবে, একথা খুব সত্যি, কিন্তু মার জগৎ অচল হয়ে থাকবে না। জগৎ চলবেই, মাও চলবে। একদিন কান্নাকাটিও বন্ধ হয়ে যাবে। বাবার কথা বলে মা প্রথম প্রথম খুব কাঁদত। আজকাল মা আর বাবার কথা বিশেষ বলে না। হয়তো মনেও পড়ে না বাবাকে। আসল কথাটা হচ্ছে, মানুষ বাঁচে শুধুমাত্র নিজের জন্যই।

চমকে উঠলাম। বড়মামা আমার দিকে বিরক্তভাবে তাকিয়ে রয়েছেন, 'তুই কি জেগে জেগে ঘুমোস আজকাল?'

নিতুদাও আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, 'হঠাৎ একটু ঘুম ঘুম মতন হয়েছিল—'

নিতুদা সমবেদনার সুরে বলল, 'অসময় ক্লান্তির জন্য হরলিকস খেলে পার। আমি খুব উপকার পেয়েছি।'

নিতুদার দিকে তাকিয়ে কষ্ট হল। বেচারার চোখে মুখে স্পষ্ট ক্লান্তি আর বিষণ্ণতার ছাপ। হয়তো নিতুদা নিজের সম্বন্ধে এসব কিছুই বুঝতে পারছে না। বুঝতে পারছে না বলেই সুখে আছে নিতুদা। নাকি সুখ অসুখ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় বা ইচ্ছা হারিয়ে ফেলেছে নিতুদা। সংসারের চাকায় ঘুরতে ঘুরতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে বা।

হঠাৎ বেখাপ্পা ধরণের প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আপনার ছেলেমেয়ে কটি?'

আমি একটু কোণাকুনিভাবে বসে

ছিলাম। আমার ঠিক সামনেই পাশাপাশি বড়মামা আর নিতুদা বসে রয়েছেন। বড়মামা আঁৎকে উঠলেন, 'আমার?'

ভয়ানক অপ্রস্তুত বোধ করলাম, 'না, না, আপনাকে হঠাৎ এ প্রশ্ন করতে যাব কেন? আমি তো ওদের সবাইকেই চিনি। চিনি শুধু না, সবার সঙ্গেই তো খুব ভাব আমার।'

নিতুদা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

আবার নতুন করে অপ্রস্তুত বোধ করতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই নিতুদা বলে উঠল, 'দুই ছেলে এক মেয়ে। বড়টি সামনের বার হায়ার-সেকেন্ডরী দেবে, মেজটি ক্লাশ এইটে পড়ছে। মেয়েটি ছোট। ক্লাশ ফাইভে ফেল করেছে।'

সাধারণ কথা। এই কথার মধ্য দিয়েই মনে হল, নিতুদা একজন সাধাসিধে মানুষ। সংসারের ঘোর প্যাঁচের ধার ধারে না। এমন মানুষ আজকাল সচরাচর চোখে পড়ে না। আজকালকার মানুষ ভয়ানক ধুরন্ধর। সোজা পথ থাকতে বাঁকা পথে চলবে, দিনের আলোয় যে কাজ করা যায়, সেই কাজ করতে রাতের অন্ধকার বেছে নেবে।

যেমন সুপ্রিয়া। ও যে কী করে বেড়াচ্ছে নিজেই হয়ত জানে না। ডান হাত যা করছে বাঁ-হাত তার খবর রাখে না। এই যে আমার বদলির ব্যাপারটা নিয়ে সবসময় একটা রাখ রাখ ঢাক ঢাক ভাব, সত্যি কথা বলতে কি, এটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। কেউ বলছে, প্রমোশন, কেউ বলছে স্পাইং করতেই নাকি আমাকে পাঠানো হচ্ছে। আর এমন কথাও যে কানে আসেনি তা না—ছেলেটার সঙ্গে একসময় ভাবটাব ছিল কিন্তু এখন চক্ষুলজ্জায় আটকাচ্ছে বসকে নিয়ে বেলেল্লাপনা করতে, তাই তাল করে সরিয়ে দিল। অথচ আসল ব্যাপারটা সরল সোজাভাবে অন্তত আমাকে জানাতে পারত সুপ্রিয়া।

এইসমস্ত কথা ভেবে ইদানীং আমার মন ক্রমশই সুপ্রিয়ার ওপর বিরূপ হয়ে উঠছিল। ওকে একজন ধুরন্ধর মেয়ে বলে ভাবতে শুরু করেছিলাম। এই মহিলাটির সঙ্গে দিনের পর দিন অন্তরঙ্গভাবে মিশেছি, ভাবতেই সঙ্কোচ হয় এখন। অসতর্ক কয়েকটা মুহূর্তে নিজের মনের উদ্ভট চিন্তাগুলো ওর কাছে প্রকাশও করে ফেলেছি। বিশেষ করে সেই ছবিটা। বিরাট নীল রংয়ের আকাশ, বড় একটা পাখি, যে কিনা উড়ছে না, শুধুই ভাসছে, ঘন সবুজ মাঠ। এমন একটা ছবি যে মুহূর্তের দুর্বলতায় সুপ্রিয়ার মত মেয়ের কাছে প্রকাশ করে ফেলেছি, ভাবতেও অস্বস্তি হয়, লজ্জাবোধ করি।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে নিতুদা আবার বলল, 'সাধারণ চাকরি করি, সংসার বড়। মা, সুষমা, আমরা কজন। ভাগ্য ভাল বাবা একটা বাড়ি রেখে গিয়েছিলেন, তাই ভাড়া গুনতে হয় না। না হলে আজকাল বাড়িভাড়া দিয়ে হাতে কী থাকে বলো।'

নিতুদা এমন মুখ করে তাকাল, যে আমাকে বলতেই হল, 'তা তো বটেই।'

নিতুদা থামল না। বলতেই লাগল, 'তাছাড়া ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো, বাঙ্গালী যখন হয়েছি দুবেলা না হোক একবেলা মাছ চাই, লৌকিকতা, ভদ্রতা কিছুই তো আর বাদ দেওয়া যায় না। সব কিছুই ভয়ানক এক্সপেন্সিভ। সংসার চালানো দায় হয়ে উঠছে ক্রমশ।'

বড়মামা আরাম করে চেয়ারের পিঠে নিজেকে ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'যা বলেছো। আগেকার দিন হলে মাইনে পত্তর যা পাই বেশ চলে যেত। প্রাইস ইনডেকস যেভাবে দিনকে দিন বেড়ে চলেছে, আমার তো মনে হয় শিগগির কমপ্লিট ডেভলক হয়ে যাবে কোনদিন। কোন দেশের ইকনমি এভাবে চলে না।'

নিতুদা সায় দিল, 'তা তো বটেই। তারপর পলিটিক্যাল সিচুয়েশনও তো ভয়ানক আনসারটেন। কবে যে কী হয়!'

বড়মামা মোক্ষম রায় দিলেন, 'হবে আবার কি, কমপ্লিট ডেসট্রাকসন। নতুন সমাজ, নতুন মানুষ—এভরিথিং নিউ।' উনি এমন নির্বিকার মুখ করে বলছিলেন, যে মনে হচ্ছিল, এই নতুন সমাজ, নতুন মানুষের মধ্যে তাঁর অবস্থিতি সর্বজনসম্মত হয়ে রয়েছে আগে থেকেই।

নিতুদা হাসল। এক-একজন মানুষ হাসলেও হাসি-হাসি মনে হয় না। নিতুদা সেই মানুষ। কোথায় যে নিতুদার দুঃখ সে কথা বোঝার চেষ্টা করেছিলাম। প্রথমেই ধরা যাক, আর্থিক কষ্টে ভুগছেন ভদ্রলোক। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সেকশনের পিওন হরবিলাসের কথা মনে পড়ল। ওর বৌয়ের বছর বছর বাচ্চা হয়। অফিস শুদ্ধ সবাই জানে বছরে একবার হরবিলাসের বউ হাসপাতালে যাবেই, আর সেই সময়টায় হরবিলাস সবার হাতে-পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে টাকা-পয়সা আদায় করবেই। ডেসপ্যাচ সেকশনের রতিকান্ত রসিক ছেলে। হালে বিয়ে করেছে। একবার জোর করে হরবিলাসকে ফ্যামিলি-প্ল্যানিং সেন্টারে পাঠিয়েছিল। হরবিলাস নাকি খুব মনোযোগ দিয়ে ওদের উপদেশ শুনেও এসেছিল। পর বছরই আবার হরবিলাসের মেয়ে হল। অথচ এই হরবিলাসকে দেখলে তো মনে হয় না, ও খুব দুঃখী মানুষ, বরং কথায় কথায় এমন হাসতে আর কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

হঠাৎ মনে হল, নিতুদা আমাকে কিছু বলছে। নিতুদা বলল, 'সুষমার কথা বলছিলাম। নিজের বোন বলে বলছি না, ওর মত মেয়ে আজকালকার দিনে হয় না।'

কথাটা শুনে হাসি পেল। মানুষ সব কিছুই হালফ্যাসানের চায়। বাড়ি, গাড়ি, জামা, কাপড় সবকিছু। শুধু বউয়ের বেলায় এই ব্যতিক্রমের অর্থ?

'কাজে কর্মে সেবা-শুশ্রূষায় ওর তুলনা হয় না। মা তো বারোমেসে রুগী। মা'র সেবা-যত্ন সব কিছুই তো সুষমা করছে। তা ছাড়া সংসারের কাজ-কর্মও রয়েছে। ওর একটা ভাল বিয়ে দিতে না পারলে অথচ ভাল বিয়ে দিতে গেলে যে সামর্থ্যের প্রয়োজন, আমার তা নেই।' বলতে বলতে নিতুদার চোখের কোণায় জল চিকচিক করে উঠল।

বড়মামা বললেন, 'তুমি অতশত চিন্তা করছো কেন নিতু, খুকির (মার ডাক-নাম) যদি মেয়ে পছন্দ হয় দাবি-দাওয়ার জন্যে আটকাবে না। আর পছন্দ না হওয়ার মত কারণ তো দেখি না। ভাল ঘর, জানাশোনার মধ্যে কাজ হবে, সবচেয়ে বড় কথা মেয়েটি ভাল।' বলে বড়মামা পরম তৃপ্তিতে আমার দিকে তাকালেন।

একটা বিরাট সর্বনাশা শত্রু যেন লাঠিসোটা নিয়ে আমাকে তাড়া করেছে। আমার চতুর্দিকে একটা গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে। অফিসে ষড়যন্ত্র করে আমাকে দেশছাড়া করল এক মহিলা, এখানেও সেই মহিলা। সুষমা পাকে পাকে যড়িয়ে সংসারের আবর্তে আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে, মুহূর্তের মধ্যে এমন একটা ছবি চোখের খুব নিকটে স্পষ্ট হয়ে উঠল। নিজের মধ্যে এক বিষণ্ণ। নিতুদাকে আবিষ্কার করে হতাশায় ক্ষোভে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

বড়মামা জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় চললি?'

'আসছি একটু' বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। কোথায় যাব, কী করব, ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার মনে হল, এই বিশ্বসংসারে আমার কেউ নেই আমি সম্পূর্ণ একলা।

ঘর ছাড়বার মুহূর্তে শুনলাম, বড়মামা বলছেন, 'অংশু আজকালকার ছেলের মত না। গুরুজনদের সম্ভ্রম করতে জানে।

দেখলে না বিয়ের কথায় উঠে চলে গেল!' খুলে টেনে টেনে হাসতে লাগলেন বড়মামা।

অনেকক্ষণ বাইরে বাইরে ঘুরলাম। ছুটির দিন। রাস্তায় দু-চারজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কেউ কেউ প্রশ্ন করল কি উত্তর দিলাম জানি না। একটা ভয় যেন আমাকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে। অথচ ভয়টা কিসের আমি জানি না। মানুষ বিয়ে করে, খুব স্বাভাবিক কথা। আমার বাবা বিয়ে করেছিলেন, তাই আমি পৃথিবীতে এসেছি। আমি বিয়ে না করলে আমার সন্তান পৃথিবীর আলো-বাতাস থেকে বঞ্চিত হবে; সে অধিকার আমার নেই। কথাটা মনে হতেই শিউরে উঠলাম। নিতুদা ওঁর বিষণ্ণ মুখ নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে যেন। কানের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে যেন ফিস-ফিস করে বলছে, 'তোমার বউদি আমাকে খুব ভালবাসে। ছেলে-মেয়ে মা, সুষমা সবাই আমাকে খুব ভালবাসে। জীবনে শুধু কর্তব্য করে এসেছি, তাই দেখ আমি কত-সুখী, কথাটা উচ্চারণ করতে পারছিল না নিতুদা নাকি বিশ্রী হর্ণ বাজাতে বাজাতে একটা ট্যাক্সি চলে গেল বলে নিতুদার কথা শুনতে পেলাম না।

বাইরে বাইরে ঘুরলে চলবে না। এক্ষুনি আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। চার দেওয়ালের মাঝে যে ষড়যন্ত্রটা আরম্ভ হয়ে গেছে, যে কোন মুহূর্তে সেটা চরম পরিণতিতে এসে পৌঁছতে পারে। দ্রুতবেগে বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলাম। শেষ মুহূর্তে রাগটা গিয়ে পড়ল, সুপ্রিয়ার ওপর। পাটনায় বদলির ব্যাপারটার পর থেকেই এলোমেলো বাতাস বইতে শুরু করল। না হলে, সুষমাও ছিল আমিও ছিলাম, যে-যার পথে চলছিলাম। হঠাৎ দুজনের পথটাকে এক করে দেওয়ার দুরভিসন্ধি তো কারও মনে দেখা দেয়নি এতদিন পর্যন্ত।

বাইরের ঘরে বড়মামা একা বসেছিলেন। নিতুদার কথা জিজ্ঞেস করতেই বললেন, 'তোদের পুকুরে চান করতে গেছে, বলছিল কোলকাতায় কলের জলে চান করে করে ক্লোরিনের কোটিং পড়ে গেছে নাকি।' বড়-মামা হেসে উঠলেন। কথায় কথায় কী হাসতে পারেন ভদ্রলোক! এত বড় সংসার, সেই অনুপাতে খুব যে আয় তা না, অথচ বেশ হাসি-খুশী মানুষ বড়মামা। সুখী না হলে মানুষ তো হাসতে পারে না।

হঠাৎ, ভগবানের দয়াই বলব, বড়মামাকে ঘায়েল করার গুপ্ত মন্ত্রণা মনে পড়ে গেল।

বললাম 'আপনার পেটের অবস্থা কেমন যাচ্ছে? ক্ষিধে-টিধে হয়?'

মুহূর্তের মধ্যে বড়মামার হাসিভরা মুখে বিষাদের ছায়া পড়ল, 'আর পেট!' মামা চেয়ারের পিঠে নিজেকে ছেড়ে দিলেন।

'ভাল করে চিকিৎসা করালেই পারেন।'

বড়মামা চোখ বুজে রইলেন। কিছু-ক্ষণ পরে সেইভাবেই বলতে লাগলেন, 'মাইনে যা পাই সংসারই চলে না, আবার চিকিৎসা। দিনকে-দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে শরীর।'

মহালগ্ন উপস্থিত। সুযোগ হেলায় হারালাম না। বললাম, 'আমাদের অফিস থেকে টনিক নিয়ে আসবো গোটা কয়েক। ডাক্তারটিও ভাল। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আপনাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখাব না হয় একদিন। একদিন কেন, কালই বিকেলের দিকে নিয়ে যাব। আপনি একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবেন, কেমন।'

বড়মামার বিমর্ষ মুখে খুশীর আলো ফুটে উঠল। বাধ্য ছেলের মত ঘাড় কাত করলেন। আবার বললাম, 'সব রোগের উৎপত্তি ডেফিসিয়েন্সি ইন ফুড। ভাল খেতে-পরতে পারছে না মানুষ।'

বড়মামা কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'যা বলেছিস।'

সেই মুহূর্তে চরম বাণ হানলাম, 'আমি এখন বিয়ে করবো না বড়মামা—যা মাইনে পাই দুজনের সংসারই চলে না। একটা চাকর কিম্বা ঝি রেখে দিতে পারছি না। আর একজনকে শুধু শুধু এই কষ্টের মধ্যে নিয়ে আসা কেন?'

'বাঙালী মেয়েদের বৈশিষ্ট্যই তো হচ্ছে, কষ্টকে কষ্ট বলে স্বীকার না করা।' বড়মামা খুব তৃপ্তির সঙ্গে বললেন।

'কিন্তু আমার যে কষ্ট হবে। সংসার বাড়বে, সেই অনুপাতে মাইনে তো আর বাড়ছে না। তারচেয়ে কিছুদিন অপেক্ষা করুন, পাটনায় যাই, দেখি ওরা কী করে! তখন না হয়, তাছাড়া নিতুদার বোন তো আর পালাচ্ছে না। বলতে গেলে ঘরের মানুষই তো ওরা। আপনি কিন্তু পাটনায় যাবেন বড়মামা। শুনেছি, ওখানে নাকি একটা কুয়ো আছে, সেই জল পেটের রোগে অব্যর্থ।'

বড়মামা হাসলেন। বললেন 'যাব। কিন্তু কথা দে, তুই নিতুর বোনকেই বিয়ে করবি।'

উত্তর দিলাম না। হাসলাম। বড়মামা আর পীড়াপীড়ি করলেন না।

তিনজনে একসঙ্গে খেতে বসলাম, আমি, নিতুদা আর বড়মামা। সুষমা পরিবেশন করছিল। মা আর বড়মামীমা দাঁড়িয়ে আমাদের খাওয়া দেখছিল। অনেক রকম রান্না হয়েছে আজ। মা বলল, 'সবই সুষমা রেঁধেছে। মেয়েটি রাঁধে ভাল।'

'তুমি খেয়ে দেখেছো নাকি?' মুখে এসেছিল কথাটা। গিলে ফেললাম। সুষমা অপ্রস্তুত হবে শুধু শুধু। মাও রেগে যাবে।

বড়মামা জিভ আর তালু দিয়ে একটা শব্দ করলেন, যার একটি মাত্র অর্থ, চমৎকার! নিতুদা কথা বলল না, ঘাড় গুঁজে খেয়ে চলল। আড়চোখে নিতুদাকে একবার দেখে নিলাম, বেশ রসিয়ে রসিয়ে খাচ্ছে নিতুদা। দেখে মায়া হল। অসচ্ছল সংসারে এত পদ দিয়ে খাওয়া হয়ত সচরাচর হয়ে ওঠে না ওদের। মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, কলকাতায় ফিরে এসে নিতুদাদের আবার একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াব। সেদিন নিজের হাতে বাজার করব। মা রাঁধবে। সুষমা সেদিন পুরোপুরি অতিথি হয়ে থাকবে।

মা ছোট্ট ধমক দিল, 'তুই ঘাড় গুঁজে খেয়ে যাচ্ছিস, যেন তুই-ই অতিথি। রান্না কীরকম হয়েছে বল।'

'খুব ভাল।' বলে নিমেষের জন্য সুষমার মুখের দিকে তাকালাম। সুষমার চোখে সেই মুহূর্তে খুশী দেখতে পেলাম। এক একজন মেয়ে আছে, যাদের চোখ দেখেই বোঝা যায় তারা হাসছে না কাঁদছে। সুষমার চোখ সেই ধরনের। ওর চোখে ভাষা আছে। সুপ্রিয়ার চোখেও একদিন ভাষা ছিল। সুপ্রিয়ার চোখ দেখে আমি একসময় ওর মনের কথা বুঝতে পারতাম। ইদানীং পারি না। সুপ্রিয়ার চোখের ভাষা ক্রমশই হেঁয়ালি হয়ে উঠছে।

বড়মামা মাকে বললেন, 'তোর ছেলে তো আমাকে আগেভাগে নেমন্তন্ন করে রেখেছে। আমি যেন ওর ওখানে গিয়ে থাকি কদিন।'

মা মুখ ভার করে বলল, 'ওর ওখানে বলতে তো হোটেল।'

মামা আমার দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, 'সে কীরে! তুই হোটেলে থাকিস?'

'সে তো কয়েকটা দিন। তারপর কোম্পানী কোয়ার্টার দেবে বলেছে।'

মা মুখ বিকৃত করে বলল, 'আর দিয়েছে!'

'দেখেছেন, মার সবটাতেই রাগ।' বড়-মামাকে সাক্ষী মানলাম।

বড়মামা বললেন : 'সত্যিই তো, এ তোর অন্যায় রাগ। কোম্পানী যে ব্যবস্থা করে দেবে, ওকে তা মেনে নিতেই হবে। হোটেলের পয়সা তো ওর গাঁট থেকে খসাবে না।'

খুশী মনে বললাম, 'দেখুন তো!'

মা মুখ ভার করে বলল, 'ও যদি ভিন্ন বাড়ী করে কী বলেছি। একা একা আমাকে এই নির্জন পুরীতে পড়ে থাকতে হবে আ-জীবন!'

বড়মামা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'একা একা এখানে থাকবি তুই?'

বলার মত কথা পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'দেখুন তো, এটা মার অন্যায় জিদ নয়?'

'শুধু অন্যায় নয়, অবাস্তব। অংশু রওনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব।'

বড়মামার কথা শুনে, কী বলবো, ওঁর শুকনো গালে চুমু খেতে ইচ্ছে হল।

(ক্রমশঃ)

জেগে আছি ॥ আনন্দ বাগচী

এখন ঘুমের বদলা এই সর্বাত্মক জেগে থাকা
চোখ মেলে কান পেতে, অন্ধকারে সজাগ শরীরে
এখন মুহূর্তগুলো বড় দ্রুত ধূর্ত অশরীরী :
দরজায় ঘুণের শব্দ, অবিশ্রান্ত ইঁদুরের নির্দয় করাত
এখন কেবলই কিছু কেটে যায়, ক্যালেণ্ডার
বিশ্রী শব্দে দোলে,
বুকের ভেতর অবধি চমকে দিয়ে প্যাঁচা উড়ে যায়
ভুতুড়ে বেড়াল এসে বসে থাকে
শিয়রের কাছে,

ছুটন্ত ট্রেনের বাঙ্কে যেমন দুচোখ খুলে শুয়ে
ক্রমে ভোর হয়ে আসা দিগন্তের দিকে ছুটে যাওয়া
জানালার শূন্য ফ্রেমে ময়লা আকাশ, গাছ, জল
চোখের পলকে শুধু পিছু হটছে, বাতি নেভা
অজ্ঞাত স্টেশন
আবছা ঘুমের মত অন্ধকার লেগে আছে বুকে,
সব ফেরিঅলা চুপ কারো গলা প্ল্যাটফর্মে কাঁপে না,
নির্জনতা ঢেকে আছে সব নিষ্প্রয়োজন ছেলেখেলা
পিদিমের নিচে শোয়া কাঁথামুড়ি দেওয়া ভীরু গ্রাম।

এমন প্রেমটির জন্য ॥ দুলাল ঘোষ

এমন প্রেমটিই আজ আমাদের প্রত্যেকের
একান্ত দরকার। যেমন
কমপার্টমেণ্টে হকারেরা ঘুরে ঘুরে
: চাই দাঁতের মাজন
অবস্থা বিশেষে গলায় খক্‌খক্‌ শব্দ তুলে
পরখ করে দেখিয়ে দেয়া—
সন্দেহের অবসান

আমাদের প্রত্যেকেরই এমন প্রেমটির জন্য
ঔষধ প্রচারের পূর্বে
পরিবারের স্বাস্থ্য কামনা দরকার। কিংবা
একগাদা লোককে হতভম্ব করে
প্রত্যেকটি অঙ্গের
শ্লীল-অশ্লীল সুদীর্ঘ বক্তৃতা

আমাদের প্রত্যেকেরই দরকার
বাচালতা বন্ধ করে
হকারের মতো ডান হাতখানা এগিয়ে দেয়া
পরখের জন্য।
দরকার মুখে স্বচ্ছ হাসি এনে
নামটার স্পষ্ট উচ্চারণ—
: চাই ম-হু-য়া সিঁদুর
: চাই চ-ন্দ-না দরবার ...

তিমির লগ্ন ॥ সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

উর্বশীর অমাবস্যা সাজ।
রাতে যদি টিপ কেঁপে যায়,
মণিহার জ্বলবে না আজ
আলো দিতে স্থির আয়নায়।

উর্বশীর তিমিরাভিসার।
যদি পথে কাঁটা ফোটে পায়,
গোলাপ হবে না তাতে আর
মুছে যাবে ধূলির ধরায়।

উর্বশীর হেমন্ত অকাল।
সব্যসাচী যদি আসে দ্বারে,
গাণ্ডীব ছিনিয়ে নেবে কাল
লগ্ন যাবে ব্যর্থ অভিসারে।
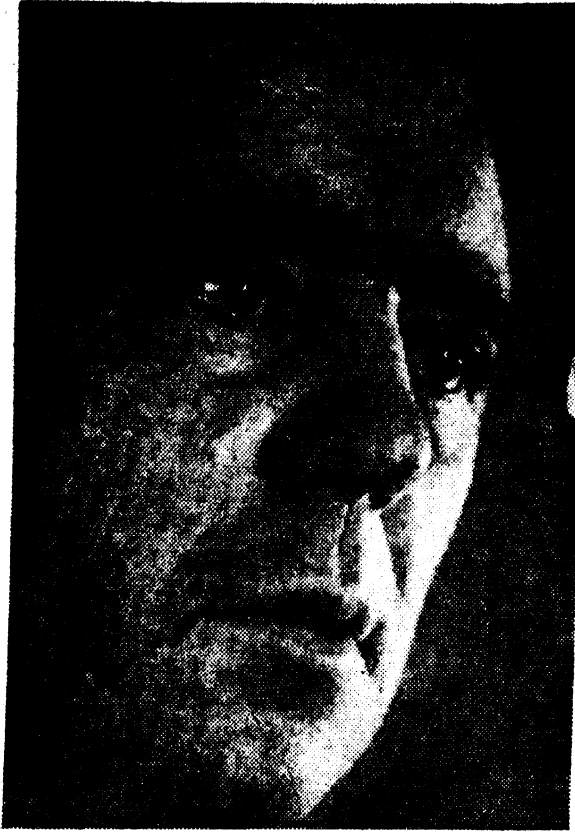
জীবনরসিক হাইনরিশ বোয়ল

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

স্টকহোম থেকে ১৯শে অক্টোবর তারিখে প্রচারিত সংবাদে জানা গেল এই বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে কথা-সাহিত্যিক হাইনরিশ বোয়লকে। হাইনরিশ বোয়ল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পশ্চিম জার্মানীর একজন শক্তিমান সাহিত্যকার। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলোনে হাইনরিশ বোয়লের জন্ম হয়। প্রাথমিক শিক্ষান্তে তিনি একটি প্রকাশন সংস্থায় শিক্ষানবিশী করেন কিছুকাল। ১৯৩৮ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত ছিলেন সাধারণ শ্রমিক। ১৯৪৫-এ আটাশ বছর বয়সে সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। যুদ্ধের পর মার্কিনী বন্দী-শিবির থেকে মুক্তির পর একটি সরকারী অফিসে তাঁকে কাজ দেওয়া হয়। জন্মস্থান জার্মানীর কলোন শহরেই স্বেচ্ছা-সাহিত্য কর্মী হিসাবে ছোটগল্প, উপন্যাস প্রবন্ধ বেতার নাটক ও সাধারণ নাটক ইত্যাদি রচনা করে হাইনরিশ বোয়ল সাহিত্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। আজ থেকে প্রায় তেতাল্লিশ বছর আগে যে জার্মান সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন তিনি টমাস মান। হাইনরিশ বোয়ল আন্তর্জাতিক পি ই এন নামক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সংঘের বর্তমান সভাপতি।

সুইস একাডেমি অব লিটারেচার-এর সম্পাদক কার্ল রাগনার গাইরো এই পুরস্কারবিষয়ক সংবাদ প্রকাশ সূত্রে মন্তব্য করেন—'জার্মানী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। সেই জার্মানীর উর্বর মাটিতে অতি অল্পকালের মধ্যে অজস্র লেখক, চিন্তাবিদ এবং গবেষক মানব জীবনে যে আলোড়ন ঘটিয়েছিল তা বিস্ময়কর। পুনরুজ্জীবিত নয়া জার্মানীর সাহিত্য-জগতে হাইনরিশ বোয়ল উল্লেখনীয় অবদানের জন্য স্মরণীয়। সাহিত্যের আঙ্গিক বা অবয়ব নিয়ে তিনি কোনো নতুন পরীক্ষা করেন নি। ধ্বংসের ভিতর থেকে পুনরুজ্জীবন শুধু নয়। এ এক অভ্যুত্থান, এই সংস্কৃতি দুঃখরজনীর অন্ধকার আর বিপর্যয়ের বিভীষিকা অতিক্রম করে নতুন জীবন ও নতুন আনন্দের সন্ধান দিয়েছে। আলফ্রেড নোবেল ঠিক এই জাতীয় সাহিত্য-কর্মকে পুরস্কারদানে সম্মানিত করতে চেয়েছিলেন।'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে শুধু জার্মানী নয় জার্মান সাহিত্য ও শিল্প একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এই সংকটের মুহূর্তে সবরকম নৈতিক ও নান্দনিক মূল্যবোধ নিরর্থক হয়ে গেল। লেখকসত্তাসম্পন্ন মানুষ ঘরে ফিরে প্রকাশযোগ্য ভাষা খুঁজে পেলেন না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কিন্তু অবস্থা ছিল অন্যরকম। তখনকার বুদ্ধিজীবীদের সামনে সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদ এক নতুন আকর্ষণ হয়ে দাঁড়াল। নতুন রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠল। একটা বিশেষ ধরণের আর্ট-ফর্ম গড়ে উঠল যার নাম 'এক্সপ্রেসনিজম্' বা অভিব্যক্তিবাদ। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সবকিছু অন্যরকমের—সব বিষয়ে একটা নিরাসক্ত নিস্পৃহতা।

নাৎসীদের আমলের জার্মানী ছিল বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এক অপ-সংস্কৃতির রাজ্য। বহু মূল্যবান গ্রন্থ 'অবক্ষয়ী' শিল্প এই কলঙ্কচিহ্নিত হয়ে ভস্মীভূত করা হয়। টমাস মান, বের্টোল্ট ব্রেশ্ট, স্তেফান ৎসোইখ প্রভৃতি সাহিত্যিকরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচলেন। রইল শুধু ফ্যাসীবাদী নাৎসী আদর্শধারী লেখকরা। এর অনিবার্য ফল সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে যখন আবার নতুন করে সাহিত্যকর্ম শুরু হল তখন সর্বপ্রথম জোর দেওয়া হল অনুবাদ গ্রন্থের ওপর। সস্তা দামে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হল জেরোম কে জেরোমের

'থ্রী মেন ইন এ বোট'। এর কিছু পরে জার্মান পাঠক স্বাদ পেল আর্নেস্ট হেমিংওয়ের বলিষ্ঠ বাস্তববাদের। যুদ্ধোত্তর জার্মানীর সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশের সর্বপ্রথম মাধ্যম 'ছোটগল্প'। অ্যাংলো-স্যাকসন রীতির ছোটগল্প আর তার সঙ্গে মার্কিনী দৃঢ়তায় পরিপূর্ণ ছোটগল্প অসীম জনপ্রিয়তা অর্জন করল। ডন পাসেস, উইলিয়াম ফকনার প্রভৃতির রচনার অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর নতুন রীতির পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু হল। জার্মানরা তাই বলে নির্বিচারে নকল করার পাত্র নন. নতুন রীতির সাহিত্য-রচনায় জার্মানীর নবযুগের সাহিত্যকারদের অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল। অভিব্যক্তিবাদী বাচনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হলেন উলফগাঙ বোরখেট। তিনি অবশ্য বেশী লিখতে পারেন নি কারণ ১৯৪৭-এ তাঁর দেহাবসান ঘটে। সার্ত্রে, কামু প্রভৃতির অস্তিত্ববাদী দর্শন থেকে নব্য-জার্মান সাহিত্যিকরা মুক্ত থাকতে পারেন না। তার সঙ্গে তাঁরা যোগ করেছেন অস্তিত্ববাদী জার্মান দার্শনিক হাইডেগার ও যাসপার-প্রভৃতির দার্শনিক নীতি। যুদ্ধোত্তর য়ুরোপের হতাশা ও ক্ষুব্ধ মনোভঙ্গীর সঙ্গে এর সহধর্মিতা ছিল।

১৯৪৭-এর কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর একটি গোষ্ঠী নিয়ে 'গ্রুপ ৪৭' নামক একটি সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে উঠল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ঘরে ফেরা সৈনিক এঁরা. এঁরা বলেছেন যে একটা যুদ্ধ তাঁদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধের নারকীয় অভিজ্ঞতা তাঁদের মধ্যে জাগিয়েছে নতুন জীবনবোধ। একটা অর্থহীন নির্বোধ যুদ্ধের যূপকাষ্ঠে বলিদান করা হয়েছে কোটি কোটি মানুষকে।

'গ্রুপ-৪৭'-এর প্রবক্তারা বললেন—আমরা 'ঐতিহাসিক প্রয়োজনমাত্র' নই, নিয়ন্ত্রিত শক্তিও নই—আমাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আমাদেরই হাতে। এই গ্রুপ-৪৭ প্রথমদিকে কিঞ্চিৎ শিথিলভাবে গড়া হলেও ক্রমে একটি শক্তিশালী সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়াল। হাইনরিশ বোয়লে এই গ্রুপ ৪৭-এর একজন। এঁদের একটি বিরোধী গোষ্ঠীও আছে এবং তার নেতা হলেন রোলাফ স্থোয়ার্স। বিধ্বস্ত জার্মানীর নাগরিক জীবনের দুর্দশা ও বৈচিত্র্যহীনতাকে প্রকাশ করাই এঁদের উদ্দেশ্য। হাইনরিশ বোয়লে কিন্তু চিন্তার দিক থেকে রোলাফ স্থোয়ার্সের সমধর্মী। ভো ভারসট ডু আদম' 'উনড সাগটে ফাইন আইনজিগেস ভোয়র্ট', 'হাউস ওনে হাটের' প্রভৃতি গল্পে উপন্যাসের মধ্যে রাইনরিশ বোয়লে সৈন্যদের ঘরে ফিরে আসার পর স্বাভাবিক জীবনের কাহিনী ও তজ্জনিত সমস্যার কথা বিধৃত করেছেন। তাঁর একটি বিখ্যাত কাহিনী 'যখন যুদ্ধ থামল—'।

এই কাহিনীটিতে ঘরে ফেরার কথা লিখেছেন হাইনরিশ বোয়ল। গল্পটির শুরু হয়েছে এইভাবে—

'আমরা যখন জার্মান সীমানায় এসে পৌঁছলাম তখন সবে ভোর হয়ে আসছে। বামে এক প্রশস্ত নদী, ডাইনে ঘন নীল অরণ্য। তার প্রান্তদেশ দেখলেই বোঝা যায় কত গভীর এই বন। গাড়ির ভিতরটা চুপচাপ, ধীরে ধীরে ট্রেনটা বাঁধা রেলরাস্তা ধরে চলছে—শেলের আঘাতে জর্জর দুই পাশের বাড়িগুলি সরে যাচ্ছে, টেলিগ্রাফের স্তম্ভগুলি দ্বিখণ্ডিত। যে বাচ্চা সৈনিকটি আমার পাশটিতে বসেছিল সে তার চোখ থেকে চশমাটা খুলে সযত্নে সাফ করতে লাগল। তারপর মৃদু গলায় আমাকে বলল—হুঁ, ভগবান! এ কোথায় এলাম আমরা? আপনার কোনও ধারণা আছে?

আমি বললাম—হ্যাঁ আমি জানি, এই যে নদীটা দেখছেন ওকেই আমরা রাইন বলি—ওর ঐ যে ওদিকের অন্ধকারটায় দেখছ ওকে আমরা বলি রাইখওয়াল্ড। এখন আমরা ক্রীডসের কাছে আসছি।

—আপনি কি এদিকের নাকি?

আমি বললাম—না।

লোকটা আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছে, সারারাত ধরে ঐ স্কুলের ছাত্রের মত গলায় আমাকে প্রশ্ন করে জ্বালিয়েছে—'

এই ছেলেটিও ঘরে ফিরছে। প্রাণে তার অদম্য কৌতূহল। আর অন্তরে অনন্ত জিজ্ঞাসা।

সে এই কাহিনীর নায়ককে বলেছে কেমন করে গোপনে ব্রেশট পড়েছে, তুখোলস্কি, ওয়ালটার বেনজামিন পড়েছে এমনকি প্রুস্ত আর কার্ল ক্রাউস। ওর নাকি সমাজনীতি পড়ার ইচ্ছে ছিল সেইসঙ্গে কিছু অধ্যাত্ম-নীতি। বাসনা ছিল জার্মানীতে নবনীতি প্রবর্তনে সহায়তা করার।

অর্থাৎ প্রতিটি জার্মান তরুণের প্রতিনিধি এই কিশোর বয়সের যুদ্ধান্তে ঘরে ফেরা সৈনিকটি।

সুন্দরভাবে এই ছেলেটির অসহায় মনোভঙ্গী ফুটে উঠেছে হাইনরিশ বোয়লের এই গল্পটিতে। সুদীর্ঘ গল্প এবং সেই গল্পের মধ্যে যুদ্ধকালীন হতাশা আর বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের পরিচয় বোয়লে দিয়েছেন অতিশয়

নতুন পোয়েট লরিয়েট

সেসিল ডে-লুইস মারা যাবার পর ব্রিটেনের নতুন পোয়েট লরিয়েট কে হবেন তা নিয়ে চলছিল বেশ জল্পনাকল্পনা। সমস্ত আলাপ-আলোচনার নিরসন ঘটল সম্প্রতি। ডে-লুইসের উত্তরাধিকার হিসেবে মনোনীত হয়েছেন ৬৬ বছর বয়স্ক কবি স্যার জন বেটজেম্যান। এ ব্যাপারে রানীর তরফ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন মিলল গত ১০ অকটোবর। খবরটা এসেছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর খাস দরবার থেকেই।

বেটজেম্যানের আগে আরো উনিশ জন পেয়েছিলেন এই সম্মান। পোয়েট লরিয়েট ব্যবস্থা শুরু হয় ১৫৯৯ সাল থেকেই। প্রাক্তন কবি-সম্রাটদের মধ্যে বেন জনসন, ড্রাইডেন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ টেনিসন, মেসফিল্ড প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই পদে নিযুক্ত কবিদের নিয়মমাফিক তেমন কোন দায়িত্ব নেই বটে তবে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপার উপলক্ষে রয়েছে কবিতা লেখার রীতি।

নব-নির্বাচিত এই পোয়েট লরিয়েটের খ্যাতি শুধু স্বদেশের সীমাতেই আটকে নেই রয়েছে বিদেশেও। বিশখানার উপর গ্রন্থের রচয়িতা কবি জন বেটজেম্যান তাঁর প্রথম আবির্ভাবেই পেয়েছিলেন বেস্ট সেলারের মর্যাদা। ১৯৩২ সালেই তাঁর প্রথম কাব্যসংকলন 'মাউন্ট জিওন' আলোড়ন তুলেছিল কাব্যরসিক মহলে। তখন থেকেই তিনি ইংরেজি কবিতায় এক বিশেষ আলোচিত ব্যক্তিত্ব।

স্যাটায়ার, হিউমারে মেশানো এক ভঙ্গিতে লিখতেই সাধারণত ভালোবাসেন কবি। ইংলন্ডের মধ্যবিত্ত মানুষের মানসিকতা, তাদের আচার-আচরণ-অভ্যাসের ছায়া দেখতে পাওয়া যায় তাঁর অধিকাংশ রচনাতেই। আর ভেতরে ভেতরে সব সময়েই অনুভব করেন তিনি এক ধরনের ধর্মীয় অনুপ্রেরণা।
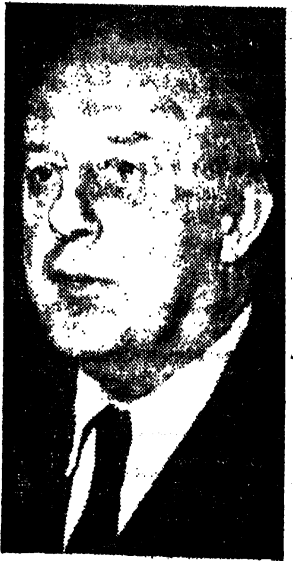
সরল ভংগীতে। গল্পটি শেষ হয়েছে নায়কের ঘরে ফেরার দিন।

নায়ক তার স্ত্রীকে ফোনে ধরার চেষ্টা করে অবশেষে পেয়েছে—'আমি এতই উত্তেজিত হয়েছিলাম যে রিসিভারটি ধরতে পারিনি। আমার হাত থেকে পড়ে গেল। ভাগ্যক্রমে গ্রেৎসেনের কোলে পড়েছিল। সে তুলে নিল। আমার কানের কাছে ধরতে বলি—হ্যালো।

সে বলল—হ্যাঁ, কিন্তু কোথায় তুমি?

আমি বললাম—আমি এখন বন-এ, যুদ্ধ শেষ হয়েছে। অন্ততঃ আমার কাছে।

সে বলল—হা ভগবান! এ যে বিশ্বাস হয় না। না, না! এ সত্য নয়।

আমি বললাম—না এই সত্য! আমার চিঠি পেয়েছিলে?

সে বলল—না, কি চিঠি?

—ধরা পড়ার পর ঐ একটি চিঠি লেখার অনুমতি পেয়েছিলাম।

সে বলল—না, গত আট মাস তোমার কোনো খবর পাইনি।

—যতসব শুয়োর। পাজী শুয়োর।

হাইনরিশ এমনই সহজ ভংগীতে সমগ্র কাহিনীটি শেষ করেছেন। যুদ্ধজনিত অবস্থার এমন নিখুঁত চিত্ররূপ কদাচিৎ নজরে পড়ে। জীবনের দুঃখ দুর্দশার শেষে আছে আনন্দের আভাস। মেঘের পরে রৌদ্র।

হাইনরিশ যুদ্ধকে একেবারে চুনকাম করে মুছে দিতে চান। তিনি হিরো-ওয়ার্শিপ পছন্দ করেন না। সামরিক জীবনের গরিমা নিয়ে গড়ে ওঠা উপকথাকে তিনি ধ্বংস করতে চান। ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি NATO চক্রে যোগদানের সময় তাঁর 'Ohne Nich' (বা নতুন সেনাবাহিনী আমার জন্য নয়) এই নীতি প্রবল হয়ে উঠেছিল। সাধারণ সৈনিকের দৃষ্টিভংগী নিয়ে তিনি যুদ্ধ দেখেন যে সৈনিক তার জীবনকে যুদ্ধক্ষেত্রে রেখে এসেছে লেখেন তাদেরই কথা।

তবু তাঁকে বলা হয় প্রতিক্রিয়াশীল। পাদরী সাহেবের উপদেশবাণীর প্রবক্তা। তথাপি হাইনরিশ বোয়লের রচনা সারা পৃথিবীর কোটি পাঠক প্রতিদিন পড়ে থাকে।

গ্রুপ ৪৭—যাঁদের আবিষ্কার করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন হাইনরিশ বোয়ল, গুনটের গ্রাস, ইলসে আইনসেনাগার প্রমুখ।

'গ্রুপেনবিলড মিট ডাম' বা 'জনৈকার সঙ্গে গ্রুপ ফটো' নামক তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাসটি বহুল আলোচিত এবং পূব ও পশ্চিম দুই জার্মানীতে সমাদর লাভ করেছে।

জীবনের পুনরুজ্জীবনের বিচিত্র ছবি এঁকেছেন হাইনরিশ বোয়ল—তিনি এক নবীন জীবনরসের রসিক।

—অভয়ঙ্কর

সাহিত্যিক ভোলা সেনের জীবনাবসান

কিছুদিন আগে বোলপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন একালের প্রায়-বিস্মৃত সাহিত্যিক ভোলা সেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

উপন্যাসের উপকরণ, গোরুর গাড়ির আত্মকথা, রক্তকরবীর মর্মকথা প্রভৃতি গ্রন্থ একসময়ে সাহিত্যিক মহলে তাঁকে বেশ খ্যাতি এনে দিয়েছিল। জগদীশ গুপ্তের সান্নিধ্যে এসে বিশেষভাবে সাহিত্যচর্চায় আসে তাঁর প্রাণের জোয়ার। এ ব্যাপারে সজনীকান্ত দাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদানও অবশ্য কম ছিল না।

বাংলাদেশের হৃদয় হতে

আমরা সাত্যিকারভাবে সাহিত্যচর্চা তখনই করতে পারবো যখন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের সীমানায় সাহিত্যকে আবদ্ধ না রেখে তাকে সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে পারবো।—কথাগুলি বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জনাব রফিকুল ইসলাম। বলেন তিনি মাত্র কিছুদিন আগে গফরগাঁও কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ দেবার সময়। এই সম্মেলনে রফিকুল ইসলাম ছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন জনাব সাঈদুর রহমান, স্থানীয় গণ পরিষদ সদস্য জনাব আবুল হাশিম, অধ্যাপক আব্দুল বাতেন মিয়া, অধ্যাপক মোহিনীমোহন চক্রবর্তী, জনাব আব্দুস সালাম এবং আরো অনেকে। উদ্যোক্তা ছিলেন ছাত্র সংসদ।

সম্প্রতি ছয় দিনের সফর করে গেলেন খ্যাতনামা মার্কিন কবি উইলিয়ম এডগার স্ট্যাফোর্ড। বাংলাদেশের কয়েকটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছাড়াও বহু প্রবীণ ও তরুণ কবি-সাহিত্যিকদের সংগে মিলিত হন। ৬৮ বছর বয়স্ক এই কবি ১৯৫৫ সালে আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট হন। বর্তমানে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমকালীন কবিতা বিষয়ে অধ্যাপনা করছেন। বেশ কয়েকটি পুরস্কারে সম্মানিত এই কবির উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল 'পশ্চিম, আপনার শহর' 'অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ভ্রমণ'।

গত ১৫ অক্টোবর, বাংলাদেশ পরিষদে 'বুদ্ধি মুক্তি আন্দোলনে'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা। উপলক্ষ্য, মনীষী আবুল হোসেনের ৩৪তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন। আয়োজনে ছিলেন ডঃ এনামুল হক। আলোচনা চলল দীর্ঘ সময়। অংশ নিলেন বাংলাদেশের বহু খ্যাতনামা শিল্পী সাহিত্যিক ও অধ্যাপক। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কবি আব্দুল কাদির, সৈয়দ মুর্তজা আলি, ডঃ আহমদ শরিফ বেগম সুফিয়া কামাল, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান, ডঃ আলিম আল রাজী, ডঃ রফিকউদ্দিন, জনাব আবু সুফিয়ান, মোঃ নাজিরুল ইসলাম প্রমুখ।

বাংলা উপন্যাসের কালান্তর (প্রবন্ধ)—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যশ্রী ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। চৌদ্দ টাকা।

শ্রীযুক্ত সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' ইতিপূর্বে বিদগ্ধ পাঠক মহলে যথাযোগ্য মূল্য ও সম্মান পেয়েছে। গ্রন্থটি আজ থেকে প্রায় বছর নয় আগে প্রথম প্রকাশিত হয় অধুনা-লুপ্ত 'নতুন সাহিত্য ভবন' প্রকাশনী থেকে। প্রকাশের সংগে সংগে গ্রন্থটি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আলোচিত হয়েছিল। সুতরাং গ্রন্থটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ হিসেবে বর্তমান গ্রন্থটির কিছু অংশ উল্লেখ্য। কারণ বিগত আট-নয় বছরে বাংলা উপন্যাসের ধারায় বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক নতুন নতুন তরুণ ঔপন্যাসিক প্রতিষ্ঠার ফলশ্রুতি নিয়ে দেখা দিয়েছেন। উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিকে কিছু বৈচিত্র্য নিয়ে এই শিল্পধারা নবরূপায়ণের পথে অগ্রসরমান। দ্বিতীয় সংস্করণে সেই নতুন রূপকে যোগ করেছেন প্রবন্ধকার। বাংলা উপন্যাস বিপুলভাবে বর্তমানে বিভিন্ন
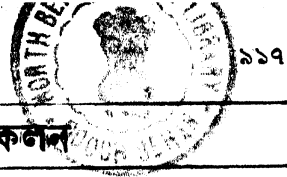
শারদ সংকলন

বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হয়েছে। আর পাঠ্য হয়েছে বলে এই আলোচনাকে অপরের ধামাধরা জাতীয় বস্তাপচা নির্বোধ আলোচনার পরিণত করতে হবে, এই ধারণার ও আলোচনা রীতির তীব্র প্রতিবাদ হল বর্তমান গ্রন্থ। বাস্তবিকই এমন মৌলিক ও বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আজ পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় দেখা দেয়নি, কেউ করতে প্রয়াসীও হননি। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জগদীশ গুপ্ত ও তিরিশের যুগের আলোচনা এবং সাধারণভাবে উপন্যাসের শিল্পরূপ পর্যালোচনায় অধ্যায়গুলি দ্বিতীয়রহিত।

ফেরা (উপন্যাস)—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। অনন্য প্রকাশন, ৬৬, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। সাত টাকা।

প্রতিষ্ঠিত তরুণ ঔপন্যাসিক বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে নতুন ভাব ও ভাবনার প্রবাহ এনে বুদ্ধিজীবী স্বভাবী পাঠকদের কাছে একটি স্বতন্ত্র আসন করে নিয়েছেন ইতিপূর্বে। সামগ্রিকভাবে তাঁর রচনায় এমন এক নিষ্ঠা, পরিশ্রমী সততা ও আন্তরিকতা আছে, এমন এক কবিপ্রাণতা অন্তঃশীলা থাকে সর্বত্র, যা তাঁর বিষয় নির্বাচন ও প্রকাশভঙ্গিকে নিত্যনূতন টীকায় ভূষিত করে। তাঁর 'ফেরা' আলোচনা করতে বসে বার বার 'ঘুণপোকা', 'পারাপার' এবং সম্প্রতি প্রকাশিত 'শূন্যের উদ্যান' উপন্যাসগুলি মনে পড়ে। উপন্যাস রচনার প্রথম দিকে শীর্ষেন্দু ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মভাবনাপ্রধান এক বিষন্নতার কথা নানাভাবে বলেছেন। শীর্ষেন্দুর গদ্যরীতি বিশিষ্ট এবং সংযম-শাসিত বলেই অবধারিত শিল্পে উজ্জ্বল। প্রথম দিকের উপন্যাস তার স্বাক্ষর। 'ফেরা' উপন্যাস বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাক্ষর। লেখক জানিয়েছেন, 'পটভূমি উত্তর বাংলা থেকে কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত। সমকালের ঘটনাবলীই এর আশ্রয়।' বাস্তবিকই শীর্ষেন্দু সমকালকে রক্তের সম্বন্ধে চিহ্নিত করে সমকালকে ছাড়িয়ে যেতে সচেষ্ট। 'ফেরা' উপন্যাসে আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে সমকালকে চিহ্নিত করেছেন। অতনু, তিতু, প্রকাশ, দুলু, বিভা ইত্যাদি চরিত্র সেই সমকালের এক-একটি দর্পণ যেন। গল্পের নায়কের ভাবনা—'পৃথিবীর অধিকার হয়ে যাচ্ছে হাতবদল! বৃথা মানুষের সংগ্রাম। আসছে উদ্ভিদ, কীট, আসছে জীবাণুরা।' অতনুর সর্বশেষ আত্মমুখীন ভাবনা—পৃথিবীর অধিকার। দুলু, আমাকে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। আমি ছাড়া আর কে করবে?' শীর্ষেন্দুর ঔপন্যাসিকের দার্শনিক মন ও মনন এইসব ভাবনায় গভীরতলাশ্রয়ী।

ষড়ঙ্গ—সম্পাদক: অরুণ মুখোপাধ্যায়। ৯০, ইব্রাহিমপুর রোড, কলকাতা-৩২। দাম দু টাকা।

সাহিত্যের কাগজ আছে। সিনেমার আছে। কিন্তু নির্ভেজাল আর্টের কাগজ বাংলা ভাষায় বেরোয়নি বললেই চলে। এদিক থেকে ষড়ঙ্গের গুরুত্ব কম নয়। মূলত শিল্পী ও শিল্পের সঙ্গে জড়িত যাঁরা আছেন, তাঁরাই পত্রিকাটির লেখক। কোনোপ্রকার আত্মঘোষণায়ও কেউ আচ্ছন্ন নন। এ সংখ্যায় লিখেছেন, সুরেন দে (জাপানের শিল্পে ধর্মের প্রভাব), সত্যেন ঘোষাল (সার্থক শিল্পসৃষ্টি), অজিতকুমার দত্ত (দূরত্ব ও নৈকট্য) এবং আরো অনেকে। শিল্পের সমস্যা ও শিল্পীর সৃজন-কৌশলের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে পত্রিকাটির গুরুত্বকে অস্বীকার করা যাবে না।

কৌশিকী—সম্পাদক তারাপদ সাঁতরা ও আনন্দ গঙ্গোপাধ্যায়। ৮, মুকরাম কানোড়িয়া রোড, হাওড়া। দাম—এক টাকা।

শিল্পের বর্তমান নয়, অতীত ঐতিহ্যের পুনমূল্যায়ন করার উদ্দেশ্য নিয়েই বোধহয় কৌশিকী বেরুচ্ছে নিয়মিত। এ সংখ্যার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লেখা লিখেছেন অদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলায় মুসলমান কীর্তি), অজিতকুমার মিত্র, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলানাথ ভট্টাচার্য, হিতেশরঞ্জন সান্যাল, কুঞ্জবিহারী পাল (লোকশিল্পের নতুন উপাদান), সুহৃদকুমার ভৌমিক (পটুয়া জাতির কোল উৎস) এবং আরো কয়েকজন। সিরিয়াস পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পত্রিকাটি সংগ্রহযোগ্য বিবেচিত হবে।

সপ্তর্ষি: সম্পাদক—ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায় বাটানগর। ২৪ পরগণা। দু টাকা দু পয়সা।

এককালীন বহু আদৃত সপ্তর্ষির পুনঃপ্রকাশ নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু আগেকার সপ্তর্ষি থেকে বর্তমান সপ্তর্ষির ব্যবধান বিশেষভাবে চোখে পড়ে। নামী লেখকদের রচনায় পত্রিকার মান উন্নয়নের চেষ্টা না করে, উন্নত মানের লেখা প্রকাশে পত্রিকাটি সমাদৃত হবে। বর্তমান সংখ্যায় দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন আশুতোষ ভট্টাচার্য (দুর্গোৎসব লোকোৎসব) এবং দীনেশচন্দ্র সিংহ (লোক-কাব্য-সঙ্গীত: সৃষ্টি-স্থিতি-লয়)। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি গল্প আছে। কবিতা লিখেছেন মণীন্দ্র রায়। পত্রিকাটিতে অনেকের লেখা আছে।

বিশ্ববার্তা: সম্পাদক—কালীপদ চক্রবর্তী। ৪৪।৪ গরচা রোড, কলকাতা-১৯। দাম দু টাকা।

শারদীয়া সংখ্যায় লিখেছেন শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, প্রমথনাথ বিশী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, মনোজ বসু এবং আরো অনেকে। একটি সুবৃহৎ রহস্য-গল্প লিখেছেন তারাপদ রাহা।

তরুণতীর্থ—তরুণসাথী সম্পাদিত। ১৮।২, ছকুখানসামা লেন। কলকাতা-৯। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বিচিত্র রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ তরুণতীর্থ কিশোর পাঠকদের সহজেই আকৃষ্ট করবে।

লেখা ও রেখা: সম্পাদক—ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। ১২/১সি, পাইকপাড়া রো, কলকাতা-৩৭। দু টাকা।

ভালো প্রবন্ধ ও সমালোচনার দুর্ভিক্ষের দিনে লেখা ও রেখার এই সংখ্যাটি যেন চিন্তাশীল পাঠকের সামনে আশ্বাসের প্রতীক বলে মনে হয়। এমন কি গ্রন্থ-সমালোচনার পাতাগুলিও অবশ্যপাঠ্য। এ সংখ্যায় লিখেছেন নারায়ণ চৌধুরী (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: ব্যক্তি ও আদর্শ), প্রণবকুমার রায় (লোকায়ণ চর্চার ঐতিহাসিক ধারা), নন্দগোপাল সেনগুপ্ত (সংস্কৃতিভাবনা, সাহিত্য ও সাধারণ মানুষ), তপোবিজয় ঘোষ, মণি মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র গুপ্ত, জগন্নাথ চক্রবর্তী, শতদ্রু চাকী, বশীর আলহেলাল, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর দে এবং আরো অনেকে। প্রথাগত লিটল ম্যাগাজিনের ভিড়ে পত্রিকাটি হারিয়ে যাবার নয়। সজল রায় ও অসীম বসুর স্কেচ দুটো ভালো।

বিজয় তোরণ: সম্পাদক—সুধীরচন্দ্র দাঁ। বর্ধমান থেকে প্রকাশিত। দাম দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখেছেন সুধীরচন্দ্র দাঁ। দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন পঞ্চানন ঘোষাল এবং অজিত ভট্টাচার্য, গল্প, কবিতা, নাটক, ফিচার সমৃদ্ধ পত্রিকাটি।

উদর্ক: সম্পাদক—পঞ্চু মিত্র। করিমগঞ্জ আসাম।

অমরেন্দ্র দত্ত (আওনাগাদের প্রধান উৎসব মোয়াতুসু), পঞ্চানন মণ্ডল (বঙ্গাচারে ডম কচ) প্রবন্ধ দুটি সবথেকে উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণু দে'র কবিতা আছে। অধিকাংশ তরুণ লেখকের রচনা হলেও পত্রিকাটি বেশ বৈশিষ্ট্যময়।

মূল্যায়ন ১৩৭৯: সম্পাদনা — সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার ও নরহরি কবিরাজ, ১০ বণ্ডেল রোড, কলকাতা-১৯। আড়াই টাকা।

মার্কসবাদী বিজ্ঞান দিয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষার আলোকে ও পরমতসহিষ্ণুতার ভিত্তিতে মতাদর্শগত সংগ্রাম প্রয়াসে এই পত্রিকাটি বাংলাসাহিত্যে এক অনন্য ও অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। এবারেও শারদ সংখ্যাটি যথারীতি মূল্যবান। অধনতন্ত্র ও জাতীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার

অবতারণা করেছেন বিভাস ঘোষ, নরহরি কবিরাজ, সরঞ্জন সেন ও সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ ও আলোচনীয় প্রবন্ধ লিখেছেন নির্মলা বাগচী। যুক্তফ্রন্ট গঠনের পথ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন রণধীর দাশগুপ্ত ও তুষার চট্টোপাধ্যায়। সুপ্রাচীন কাল থেকে ভূমিব্যবস্থার বিবর্তন সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক নিবন্ধ লিখেছেন প্রবীণ কৃষকনেতা দেবেন দাস। অন্যান্য প্রাবন্ধিকদের মধ্যে আছে পরিমলচন্দ্র ঘোষ, সুশীল জানা, সুদীপ্ত কবিরাজ, তপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রচ্ছদ এঁকেছেন সুবোধ দাশগুপ্ত।

স্বস্তিকা : সম্পাদক—সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৭।৯বি বিধান সরণি। কলিঃ-৬। দাম তিন টাকা।

গল্প প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক বিচিত্ররচনা ও আলোচনা সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটি বেশ আকর্ষণীয়। শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য অঙ্কিত প্রচ্ছদটি উল্লেখযোগ্য।

নূতন জগৎ : সম্পাদক—চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। পাক্ষিক সংবাদপত্র। ২বি. কে কে মিত্র রোড। বারাসাত।

গল্প কবিতা, প্রবন্ধ আছে। সম্পাদনায় আরও যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

ঊষা : সম্পাদক—বাণী চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য ও সংস্কৃতিপত্র। ৩৩বি, আমহার্স্ট স্ট্রীট। কলকাতা-৯। দাম দেড় টাকা।

সুবৃহৎ এই পত্রিকায় উল্লেখযোগ্য কোন রচনা চোখে পড়ল না।

রাষ্ট্র : সম্পাদক—নির্মল বসু। ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ৪৭।২এ, বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রীট। কলকাতা-৪।

সুবিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, সুশান্তকুমার রায় (রাসেলের রাষ্ট্রচিন্তা), নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, সরল চট্টোপাধ্যায়, যোগনাথ মুখোপাধ্যায় (ইদি আমিনের মানবতা-বিরোধী আচরণ) এবং নির্মল বসুর প্রবন্ধ কয়েকটি পাঠককে ভাবিত করবে।

শ্রেষ্ঠ গল্পসম্ভার : সম্পাদক— শ্যামলরঞ্জন ভট্টাচার্য। পড়ুয়ামহল। ১৬, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, কলকাতা-৯। দাম চার টাকা।

শ্রেষ্ঠ গল্পসম্ভার নাম হলেও পত্রিকাটির রচনা-বৈশিষ্ট্য অনুল্লেখ্য। আরও যত্নবান এবং মননশীলতায় রুচিশীল না হলে পত্রিকাটির কোন ভবিষ্যৎ নেই।

চিকিৎসক সমাজ—সম্পাদক : অমল ঘোষ হাজরা। ২৪০ ডায়মণ্ডহারবার রোড। কলকাতা-৬০। দাম চার টাকা।

চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা। চিকিৎসক সমাজের শারদীয়া সংখ্যাটি গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং চিকিৎসা সম্পর্কের আলোচনায় সমৃদ্ধ। লিখেছেন আনন্দকিশোর মুন্সী পশুপতি ভট্টাচার্য, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, বৈদ্যনাথ রায়, নির্মল সরকার, গোরাচাঁদ নন্দী অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় কালীকিংকর সেনগুপ্ত, হিরন্ময় ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে।

জীবনানন্দ : সম্পাদক—সুচেতা মিত্র ও পলাশ মিত্র। ২, কার্ক লেন, কলকাতা-২৬। দাম এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

বাঙালী কবিদের চোখে বাঙালী কবিদের প্রতিচ্ছবি ঘটেছে কিভাবে—জীবনানন্দের বর্তমান সংখ্যাটিতে তা বোঝা যায় স্পষ্ট। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী থেকে আরম্ভ করে সুচেতা মিত্র পলাশ মিত্র পর্যন্ত দীর্ঘ বাংলা কবিতার ক্রম-বিবর্তনের একটি প্রতিচ্ছবিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সমকালীন : সম্পাদক — আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। ২৪ চৌরঙ্গী রোড। কলকাতা-১৩। দাম: পঞ্চাশ পয়সা।

মূলত প্রবন্ধের পত্রিকা সমকালীনের বর্তমান সংখ্যাটিতে সাতটি আলোচনার মধ্যে জীবনানন্দ চট্টোপাধ্যায় (লক্ষ্মী দেবী), অশোককুমার দাস (মুঘল চিত্রশিল্পে পাশ্চাত্য প্রভাব), শিবেন্দু মান্না (লোকায়ত মৃৎশিল্প: পাঁচমুড়া)-র আলোচনায় নতুন তথ্য ও চিন্তার সন্ধান মেলে।

সারস্বত : সম্পাদক—অমিয়কুমার ভট্টাচার্য। ২০৬, বিধান সরণী। কলকাতা-৬। দাম দুটাকা।

সারস্বতের অনল দাশগুপ্ত, মিহির সেন এবং অমলেন্দু চক্রবর্তীর গল্প তিনটি সম্ভবত এবারের লিটিল ম্যাগাজিন শারদীয় পত্র-পত্রিকার মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য। কার্তিক লাহিড়ীর 'কবিতার কথা ও তৎসংক্রান্ত' এবং হারাণচন্দ্র নিয়োগীর 'প্রাচীন ভারতে সাম্প্রদায়িকতা' প্রবন্ধ দুটি মূল্যবান চিন্তার স্বাক্ষরবহ। বিষ্ণু দে, মনীন্দ্র রায়, রাম বসু, তরুণ সান্যাল, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, গণেশ বসু, সুশীল রায়, দুর্গাদাস সরকার, অমিতাভ দাশগুপ্ত কবিতা লিখেছেন আরও কয়েকজনের সঙ্গে।

আর্ষ পত্রিকা : সম্পাদক—প্রশান্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ১৭৮ বি বি ঘোষ রোড। বর্ধমান। তিন টাকা।

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, কবতা এবং কৃষি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা সমৃদ্ধ। অর্চনা মিত্র (বিবাহে আদিবাসীদের প্রভাব), পঞ্চানন মণ্ডল (জয়দেবে ওড়িয়া দাবীর আপত্তি খণ্ডন), অসিতরঞ্জন দাশগুপ্তের (নেপালী সাহিত্যিক পারসমণি প্রধান) প্রবন্ধ তিনটি উল্লেখযোগ্য।

বালার্ক : বৈশ্বানর গোষ্ঠী সম্পাদিত। বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ। দাম এক টাকা।

কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রবন্ধের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য হোল অমল রায়ের 'পশ্চিম বাংলার চিনিশিল্পের অগ্রগতি কোন পথে?' বেশ কয়েকটি কবিতা এবং গল্পে সংখ্যাটি সমৃদ্ধ।

প্রাপ্তি স্বীকার

মশাল : সম্পাদক — বঙ্কিম চক্রবর্তী। চাকপোতা। আমতা, হাওড়া। দাম এক টাকা।

পল্লব—সম্পাদক : ত্রিদিবকুমার ঘোষরায়। ৩১জি, ডাক্তারবাগান লেন। শ্রীরামপুর। হুগলী। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

উদ্দীপ্ত—সম্পাদক : সুভাষচন্দ্র পাল। ৭৩ এম্‌।৪, নিউ কেবল টাউন। জামশেদপুর। দাম এক টাকা।

অঞ্জলি—সম্পাদক : তপন দাশগুপ্ত। স্বিতল। ৯১।২ বোসপুকুর রোড। কলকাতা—৪২। দাম এক টাকা।

ছত্রাক—সম্পাদকমণ্ডলী সম্পাদিত। বনগ্রাম। নডিহা। দাম দুই টাকা।

আলোচনা—(ভাদ্র-আশ্বিন) : সম্পাদকমণ্ডলী সম্পাদিত। সৎসংগ। বিদিওঘর। এস-পি (বিহার)।

অন্বেষা— (সেপ্টেম্বর-অকটোবর) : জগন্নাথ ঘোষ। বাণীনিকেতন। বাণীপুর। ২৪ পরগণা।

বন্ধু—সম্পাদক : প্রকাশ চক্রবর্তী। ফ্রেন্ডস এসোসিয়েশন। আমতা। হাওড়া।

পরিজন—সম্পাদক : পুলক চট্টোপাধ্যায় ও গোপালচন্দ্র চন্দ্র। শুভতলা লেন। বৈদ্যবাটী হুগলী।

সংস্কৃতদীপা (জুলাই-সেপ্টেম্বর) —সম্পাদক : রবীন দত্ত, জীবনময় দত্ত। এ-১২৪, কংকরবাগ কলোনী। পাটনা-২০।

মাল্যদান—(শারদীয়া) সম্পাদক : সরোজকুমার সরকার। ৫।৩ সত্যেন রায় রোড। কলকাতা-৩৪। দাম এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা।

স্বপ্ন (১৯৭১)—সম্পাদক : সরসী সরকার। পি-৩৬, সি-আই-টি রোড। কলিকাতা-১০। এক টাকা।

বাল্মীকি (আশ্বিন)—সম্পাদক : লালমোহন বিশ্বাস ও বীথিকা প্রামাণিক। রাণীহাটি। গাড়াপোতা, ২৪ পরগনা। দাম দেড় টাকা।

নবাঙ্কুর (শারদ)—সম্পাদক : বিকাশচন্দ্র দাশ। ৩০ রামকৃষ্ণ সমাধি রোড। ব্লক-ডি, ফ্ল্যাট-১৭। কলকাতা-৫৪। দাম দেড় টাকা।

মরমী : সম্পাদক—ঈশানচন্দ্র মিত্র। ত্রৈমাসিক, 'শান্তিনিকেতন'। দক্ষিণ তেতুলমুড়ি। টেঙ্গুনিয়া, কাঁথি। মেদিনীপুর। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

বৈজয়ন্তী : সম্পাদক—সঞ্জয় ভট্টাচার্য। ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বৃন্দাবন লেন। পোঃ কুজাটী। বর্ধমান।

পাবক : সম্পাদক—সতী সেনগুপ্ত। মন্ত্রনাগুড়ি। জলপাইগুড়ি।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বিগত অর্ধশতকে নিম্ন গাঙ্গেয় বঙ্গের বিস্ময়কর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলি উপকূলে বঙ্গ তথা সমগ্র বঙ্গভূমির প্রাচীন ইতিহাসকে নূতন তথ্যে সমৃদ্ধ করেছে। এ অঞ্চলের প্রাচীন নদী সংস্থানের পটভূমিকায় আবিষ্কৃত প্রত্নস্থলগুলির ভৌগোলিক অবস্থানের সমীক্ষা করে, বহু শাখা ও উপনদীসহ ভাগীরথী বিধৌত নিম্ন গাঙ্গেয় বঙ্গের জনবসতি ও সংস্কৃতি বিস্তারণ ক্ষেত্রটিকে সাধারণভাবে দুটি উপমণ্ডলে বিভক্ত করা যেতে পারে। পূর্ব উপমণ্ডল প্রাচীন বিদ্যাধরী নদীখাত হতে অবলুপ্ত সরস্বতী নদীতট পর্যন্ত ও পশ্চিম উপমণ্ডল সরস্বতী নদীতট হতে নিম্ন বঙ্গের পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত।

সুপ্রাচীন নিম্ন গাঙ্গেয় সভ্যতার এ বিস্তারণ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত অসংখ্য ও বিচিত্র পুরাবস্তুগুলি গভীরভাবে নিরীক্ষা করে ও দীর্ঘ দিন বিস্তৃত অঞ্চলে সরেজমিন ভূমিপাঠে অনুসন্ধান বা 'সারফেস এক্সপ্লোরেসন' করে মনে হয়েছে সরস্বতী, অজয়, কংসাবতী, শিলাবতী, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, মুণ্ডেশ্বরী প্রভৃতি নদ-নদী বিধৌত পশ্চিম উপমণ্ডলে নিম্ন গাঙ্গেয় বঙ্গের সর্বপ্রথম মানব বসতির প্রসারণ ঘটে। এ অঞ্চলের সভ্যতার প্রাচীনত্ব সুদূর প্রাগৈতিহাসিক পুরোপলীয় যুগ, নবোপলীয় যুগ ও তাম্র যুগের দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অসমতল অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে পূর্ব ভারতের ও দক্ষিণ ভারতের পুরোপলীয় ও নবোপলীয় সভ্যতার যে গভীর সংযোগ ছিল, পণ্ডিতেরা তা মনে করেন। তাঁদের মতে সীমান্ত বাংলার এ প্রাচীন সংস্কৃতি প্রকৃত পক্ষে পূর্বভারত ও দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তর পুরোপলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রের একটি প্রান্তিক বিস্তারণ মাত্র। নবোপলোত্তর যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে আদি অস্ট্রাল সংস্কৃতির একটি ধারা প্রাচীন সরস্বতী নদীর নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলকে আশ্রয় করে ধীরে ধীরে উপকূল বঙ্গ পর্যন্ত যে প্রসারিত হয়েছিল ও পরবর্তীকালে সম্প্রসারিত মাগধীয় সংস্কৃতির পূর্ব প্রান্তিক বিস্তারণের সংকর্ষণে এক নব নিম্নগাঙ্গেয় সভ্যতার যে সূত্রপাত করেছিল সম্প্রতি তার কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার অসমতল অঞ্চল হতে উপকূল বঙ্গ পর্যন্ত আদিমসভ্যতার এ প্রসারণ ক্ষেত্রের বিভিন্ন অঞ্চলে পুরোপলীয়, নবোপলীয় বা তাম্র যুগের যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই বিস্ময়কর। সম্প্রতি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়, ডায়মণ্ডহারবারের প্রায় দুই কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে, প্রাচীন সরস্বতী নদী খাতে প্রবাহিত বর্তমান ভাগীরথীর তটে দেউলপোতায় নবোপলীয় বা নবোপলোত্তর যুগের যে নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী। ভাগীরথীর আরও নিম্ন প্রবাহে, ডায়মণ্ডহারবার হতে প্রায় ছয় কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে, 'নবদ্বীপ' নামে খ্যাত জনবসতিহীন অশান্ত নদীর ধ্বসে পড়া তটে অবলুপ্ত প্রাচীন সভ্যতার গভীর স্তরে বর্তমান লেখক কয়েকটি আনুমানিক নবোপলোত্তর যুগের নিদর্শন দর্শনে বিস্মিত হয়েছেন।

নিম্ন গাঙ্গেয় বঙ্গের অন্যতম প্রত্নস্থল হরিনারায়ণপুর প্রাচীন সরস্বতী নদীর অববাহিকা আশ্রিত এ সাংস্কৃতিক উপমণ্ডলের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে বর্তমান ভাগীরথী নদীতটে অবস্থিত। এককালে হরিনারায়ণপুর প্রাচীন সরস্বতী নদীর মোহনার সন্নিকটে একটি সমৃদ্ধ নগরী ও ইন্দো-রোমান বাণিজ্যের বর্দ্ধিষ্ণু কেন্দ্ররূপে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তার অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

বর্তমানে হরিনারায়ণপুর নিম্ন বঙ্গের একটি অবহেলিত গ্রাম মাত্র। ডায়মণ্ডহারবার হতে দক্ষিণে, আধুনিক ট্যুরিস্ট-লজ সাগরিকার পাশ দিয়ে নদীর পার ধরে ভেড়ীর ভাঙ্গা পথে হাঁড়া-মুকুন্দপুর অতিক্রম করে, হরিনারায়ণপুরের দূরত্ব প্রায় আট কিলোমিটার। প্রাচীন হরিনারায়ণপুরের প্রায় সমগ্র অংশই আজ নদীগর্ভে। সামান্য যে অংশটুকু অবশিষ্ট আছে তাও আজ নূতন করে ভাঙ্গনের মুখে। বিগত চল্লিশ বছরে হরিনারায়ণপুরে নদীতটে পর পর নির্মিত দুটি কঠিন পাকা বাঁধ নদীস্রোতে ভেঙ্গে নির্মূল হয়ে গেছে। প্রতিবারই নদী প্রত্নসম্পদ পূর্ণ প্রাচীন হরিনারায়ণপুরের কিয়দংশ নিমজ্জিত করেছে। তৃতীয়

বাঁধটিও হাসে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নদীতটে আবার নূতন বাঁধ নির্মাণ শুরু হয়েছে—এবার বর্তমান গ্রামের মাঝ বরাবর। নির্মীয়মান বাঁধের পশ্চাতে নদীতটে গ্রামের অংশটুকু ধ্বসে গেলেই প্রাচীন হরিনারায়ণপুরের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পাল সেন আমল পর্যন্ত যুগের অসংখ্য স্মৃতি নগর-বন্দর হরিনারায়ণপুর অতল সলিলে শয়ন লাভ করবে।

হরিনারায়ণপুরের তটে দাঁড়িয়ে বিস্তৃত জলরাশির দিগন্তে বনরাজিনীলা দশাস্তত মেদিনীপুরের তটরেখা দর্শক মনকে মুগ্ধ করে। ভাগীরথী এখানে প্রাচীন সরস্বতী নদী খাতে বিশালাকৃতি ধারণ করে মোহনার দিকে প্রবাহিতা। এ পারে নদীতটে ভাঙ্গন ধরেছে ওপারে নূতন চরা পড়েছে। বাইনাকুলার দিয়ে আরোও দক্ষিণে নজর দিলে নূতন নির্মীয়মান বন্দর হলদিয়ার তটভূমিও দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান বলতে আজ আর হরিনারায়ণপুরে কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই। তবে স্থানীয় দু-একজন আশীতিপর বৃদ্ধের বর্ণনা শুনে ও প্রায় শত বছরের প্রাচীন দলিল দস্তাবেজ ও অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ের সেটেলমেন্টের ম্যাপ পরচা দেখে অনুমান করা যায় এককালে নদী বর্তমান নদীতট হতে প্রায় এক কিলোমিটার দূর দিয়ে প্রবাহিত ছিল। নদীর ধারে বিরাট প্রান্তরে চাষাবাদ হত। তবে কোথাও গ্রামের তরুণদের খেলার মাঠও ছিল। মাঠের এখানে-সেখানে ফণীমনসার ঝোপে ঢাকা নাতিউচ্চ দু-একটি ঢিবি ছিল। মাঠের পাশে অপেক্ষাকৃত উঁচু একটা ঢিবিতে ছিল তাতাল খাঁ গাজির কবর। মুন্সী বয়নন্দিনের 'বনবিবির জহুর নামা' পুঁথিতে তাতাল খাঁ গাজির উল্লেখ আছে—

"হেনকালে উপনীত গাজী দক্ষিণ রায়।
ছালাম করিল রায় বনবিবির পায়।।
তাতাল খাঁ খোশাল খাঁ আর আলিগণ।
কর জুড়ি করিয়া আইল সর্বজন।।"

গাজির মাজারের পাশে বিরাট মাঠে সপ্তাহে দুবার হাট বসত। ফি বছর একটা বিরাট মেলাও হত—গঙ্গা বারোয়ারী মেলা। মেলার মূল উৎসব ছিল গাজির মাজারের পাশে বিশালাক্ষী মন্দিরে বিপুল সমারোহে দেবী বন্দনা। মেলাটি ছিল এ অঞ্চলের সামাজিক জীবনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। সপ্তাহ জুড়ে মেলা চলত। হরেক বেসাতির কেনাবেচা, কবিগান, যাত্রা, ভানুমতির খেলা, স্বপ্নপ্রাপ্ত ঔষধ কবচ, বেদে-বেদেনীর তুকতাক—সব মিলে কলরব মুখর হত নদীতীরের নির্জন সন্ধ্যাগুলি। ১৮০২ শকাব্দে শ্রীল শ্রীযুক্ত দুর্গারাম হালদার বিরচিত ও হরিনারায়ণপুরে লিখিত একটি জীর্ণ পুঁথিতে এ মর্মে কিছু বিবরণও পাওয়া গেছে। নদীর ধারের ঢিবিগুলি নিয়ে এককালে নানা কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল। ঢিবিতে যক্ষের বাস—অনেক সোনাদানা আঁকড়ে যক্ষ বসে আছেন। মাঝে-মাঝে নদীর ধার ধ্বসে পড়ায় নাকি অনেক 'ঠাকুর' বেরুত। অনেকে সোনার গহনা, মোহর ইত্যাদিও নাকি পেয়েছিলেন। তবে আজ সবই নদীগর্ভে নিমজ্জিত। বর্তমানে পুরাতাত্ত্বিকের কাছে হরিনারায়ণপুরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণের বস্তু পুরাবস্তু বিলুণ্ঠিত নদীতট। নদীর পাড় ধ্বসে পড়ায় হরিনারায়ণপুরের পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে নদীতটে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রত্নবস্তু—লবণাক্ত জলের নিমজ্জনে সবই প্রায় ক্ষয়প্রাপ্ত। ভাঁটার সময় নদীর জল অনেক নেমে গেলে নদীতটে প্রায় দু' কিলোমিটার দীর্ঘ অঞ্চল জুড়ে পড়ে থাকা অসং[খ্য] বিচিত্র ও বিভিন্ন ধরনের খোলাকুচি টেরাকোটা ভগ্ন মূর্তি পুতুল, প্রাচী[ন] যুগের ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রা, অলংকার ইত্যা[দি] অনুসন্ধান করে পাওয়া গেছে। বহু দ[ূর] থেকে নদীতটে পড়ে থাকা আদিকাল[ের] এ বস্তুগুলি একটি দীর্ঘ ধূসর রেখার ম[তো] দেখা যায়। গ্রামের আরেকটি গুরুত্বপূ[র্ণ] স্থান হল পূর্ব সীমায় জঙ্গলাকী[র্ণ] 'বাসা-বাড়ির ঢিবি'। ঢিবির গর্ভে অনে[ক] পূর্বে মাটি কাটার সময় প্রাচীন বসতি ও ইঁটের চিহ্ন পাওয়া গেছে। ঢিবির চা[রি] পাশে বর্ষায় মাটি ধুয়ে জল নামা[র] অসংখ্য পুঁতিদানা বা বিডস্ ও খোলা কুঁচি বেরিয়ে আসে। কয়েক বছর আ[গে] এ অঞ্চলে মাটির গভীরে একটি পাত্রে [...] কয়েকটি অঙ্কচিহ্নযুক্ত মুদ্রা পাওয়া গি[য়ে] ছিল। নূতন বাঁধ নির্মাণের সময় ৭ মিটার মাটির গভীরে স্থানে স্থানে [...] কাঁকর মিশ্রিত মাটির যে স্তর পাওয়া গে[ছে] তা সত্যই আশ্চর্যজনক। ঐ স্ত[রে] দু-একটি প্রাগৈতিহাসিক পুরাবস্তুর সন্ধান মেলেনি, তাও নয়। মনে হয় প্রাগৈ[তিহাসিক] যুগ থেকে আরম্ভ করে পাল-[সেন] আমল পর্যন্ত হরিনারায়ণপুরের সভ্যতা[র] স্তর বিন্যাস চলে এসেছে। তবে দ্বা[দশ] শতকের পরে এ অঞ্চলের ইতিহাসের নি[র]বচ্ছিন্ন প্রবাহ সম্পর্কে জোর করে কিছু বলা চলে না। হিন্দু যুগের শেষ সম[য়ে] কালে ব্যাঘ্রতটমণ্ডলে কয়েকবার বি[রাট] জলপ্লাবনের পর ও আরও পরবর্তীকা[লে] জলদস্যুদের উপদ্রবের পর এ অঞ্চল জ[ন]শূন্য হয়ে পড়াটা কিছুই বিচিত্র ন[য়]। ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ভারতের জাত[ীয়] মহাফেজখানায় রক্ষিত পর্তুগীজ ও দি[ন]মার ভাষায় লিখিত কিছু পাণ্ডুলিপি[তে] গঙ্গা-সরস্বতী নদীর মোহনা অঞ্চ[লের] পঞ্চদশ - ষোড়শ - সপ্তদশ শতকের কি[ছু] বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বিশদভাবে পা[ঠোদ্ধার] করতে গেলে উক্ত ভাষায় প্র[গাঢ়] পাণ্ডিত্য প্রয়োজন। পর্তুগীজ ভা[ষায়] অতি সামান্য জ্ঞান নিয়ে দু-একটি পা[ণ্ডু]লিপি হতে যে সামান্য তথ্য উদ্ধার ক[রা] গেছে, তাতে মনে হয় হাজিপুর (বর্ত[মান] ডায়মণ্ডহারবার) ও তার দক্ষিণে হ[রি]নারায়ণপুর, কাকদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চ[লে] বর্ধিষ্ণু জনবসতি ছিল এবং এ অঞ্চ[লের] বাজারে বিদেশীদের আনাগোনাও ছিল।

বিভিন্ন সময়ে যে সকল পুরাব[স্তু] হরিনারায়ণপুর হতে উদ্ধার করা হ[য়েছে] তার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য টেরাকোটা মূ[র্তি] পুতুল, বিচিত্র ও বিভিন্ন আকৃতির [...] ও খোলাকুচি, পুঁতিদানা ও অলংকা[র] অসংখ্য অঙ্কচিহ্নযুক্ত মুদ্রা ও প্রাচীন[...] নিদর্শন কয়েকটি ধাতব ও প্রস্তর নির্মি[ত] বস্তু। এ সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শ[ন]গুলি নিয়ে গভীরভাবে বিচার করে নি[...] বঙ্গের অন্যতম প্রত্নস্থল হরিনারায়ণপু[রের] প্রাচীন জনসমাজের সামাজিক জীবন [...] বিশ্বাস, অর্থনৈতিক জীবন, সমাজ গড়ন

শিল্পরীতির একটি প্রাথমিক পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

হরিনারায়ণপুরে মাটির গভীরে আজ পর্যন্ত প্রাগৈতিহাসিক বা ঐতিহাসিক যুগের কোন নরকঙ্কালের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ অঞ্চলের সমাজ গড়নের পটভূমিকায় নরগোষ্ঠীর মৌল উপাদান নির্ণয়ের ইঙ্গিত তাই অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বোধ্য। তবে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত অসংখ্য টেরাকোটা মূর্তি পুতুলের মুখাকৃতি ও শরীর গড়নের একটি তুলনামূলক প্রাথমিক সমীক্ষা করে মনে হয় হরিনারায়ণপুরে সুপ্রাচীন কালে এক মিশ্র নরগোষ্ঠী আশ্রিত বসতি গড়ে উঠেছিল। সবচেয়ে প্রাচীন টেরাকোটা মূর্তিগুলির প্রশস্ত নাস, ক্ষীণ ওষ্ঠ, দীর্ঘ মুণ্ড ও খর্বাকৃতি অঙ্গ দর্শনে মনে হয় এ অঞ্চলে আদিম নরগোষ্ঠীর একটি মৌল সম্প্রদায় আদি-অস্ট্রাল শ্রেণীভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর মূর্তি পুতুলগুলির বৃত্তাকার মুখমণ্ডল, নাতিদীর্ঘ ও ঈষৎ প্রশস্ত নাসিকা, উন্নত ললাট, ঈষৎ বলিষ্ঠ ওষ্ঠ, মধ্যস্ফীত অক্ষিকোটর ও গোলমুণ্ড মোঙ্গলীয় নরগোষ্ঠীর আকৃতি সদৃশ। তবে এ শ্রেণীর অধিকাংশ মূর্তিগুলি যক্ষ, যক্ষিণী ও অন্যান্য বান্তর দেবতার। রিজলী বর্ণিত বঙ্গ নরগোষ্ঠী গঠনে দ্রাবিড়-মোঙ্গলীয় সংমিশ্রণের মতবাদ বর্তমানে অগ্রাহ্য হলেও, হিমালয়ের ভৌগোলিক অবস্থান, বঙ্গ নরগোষ্ঠী সহ পূর্ব ভারতীয় জনগণের ধর্মচিন্তায় দেবতাত্মা হিমালয়ের স্থান, মোঙ্গলীয় সংস্কৃতির প্রসারণ ক্ষেত্র ও নিম্ন গাঙ্গেয় বঙ্গের বিভিন্ন প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত এ সকল টেরাকোটা যক্ষ-যক্ষিণী ইত্যাদি মূর্তিসমূহের মুখাকৃতিতে মোঙ্গলীয় প্রভাবের মধ্যে কোথায় যেন একটি গভীর যোগসূত্র বিদ্যমান। এ অজ্ঞাত যোগসূত্রটি প্রাচীন ভারতের 'পূর্ব দেশীয়' ধর্মচিন্তায় গভীর ইঙ্গিত বহন করে। দীর্ঘকায় মুখমণ্ডল, উন্নত তীক্ষ্ণ নাসা, বিস্তৃত নয়ন, প্রশস্ত বক্ষ ও ধনুর্বঙ্কিম কপালযুক্ত অপর এক শ্রেণীর মূর্তি পুতুলগুলি ইন্দো-আর্য নরগোষ্ঠীর লক্ষণযুক্ত। এ-ধরনের মূর্তি পুতুলগুলির অঙ্গভূষণ, বসন-কেশবিন্যাস গভীর আভিজাত্যের পরিচায়ক। মনে হয় এগুলি বঙ্গ নর-সমাজের উচ্চ শ্রেণীভুক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিকৃতি বিশেষ। এ ছাড়াও হরিনারায়ণপুরের কয়েকটি মূর্তি পুতুল, টেরাকোটা ফলক ও দু-একটি পানপাত্রে অঙ্কিত মনুষ্যমূর্তিতে প্রাচীন হেলেনীয় ও মিশরীয় নরগোষ্ঠীর দেহ-লক্ষণের প্রভাব লক্ষণীয়। বঙ্গ নরগোষ্ঠী গঠনে এ শ্রেণী মৌল উপাদান না হলেও, এ অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীরা যে ভূমধ্যসাগরীয় নরগোষ্ঠী-

সূর্যমূর্তির পাটপীঠ
পালভাস্কর্য
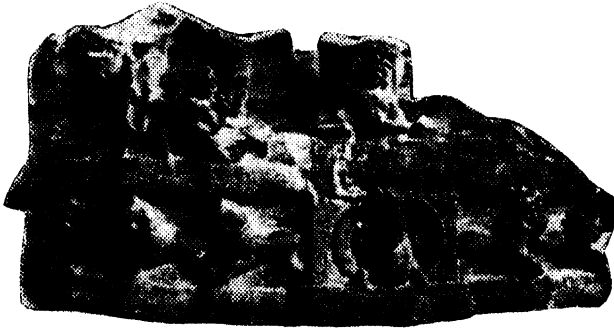
সমূহের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছিল তা অনুমান করা যায়।

হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত পুরাবস্তুগুলি এ অঞ্চলের সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিকেও আলোকপাত করে। বিভিন্ন সময়ে মাটির গভীরে প্রাপ্ত অসংখ্য নারীমূর্তি-পুতুল ও বিচিত্র অলংকারগুলি নারী-সমাজের সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও সৌখিনতা নির্দেশ করে। বিচিত্র অলংকারগুলির মধ্যে কণ্ঠহার, কর্ণাভরণ, অঙ্গুরীয়, কঙ্কণ বাজু, কবচ ইত্যাদি রয়েছে। অলংকারগুলি সাধারণতঃ তাম্র বা স্বর্ণনির্মিত। তবে রৌপ্যনির্মিত অলংকারও কিছু পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত অলংকারগুলির অধিকাংশই প্রাপকেরা ধাতু পিণ্ডতে রূপান্তরিত করে আবার ব্যবহার করেছেন। সামান্য যে কয়েকটি উদ্ধার করা হয়েছে তাতে মনে হয় সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন অলংকারের সঙ্গে এগুলির যেন আকৃতি-গত সাদৃশ্য আছে। এ ছাড়া অজস্র বিচিত্র পুঁতিদানা বা 'বিডস', বিভিন্ন রংয়ের প্রবাল দানা, সার্জিকা নির্মিত অলংকারের ভগ্নাংশ ও দু-একটি সূক্ষ্ম কারুকার্যযুক্ত হস্তিদন্ত নির্মিত অলংকারও পাওয়া গেছে। টেরাকোটা মূর্তি পুতুলগুলি সালঙ্কারা। একটি প্রায় অভঙ্গ টেরা-কোটা নারীমূর্তি দেহে দ্বাদশটি বিচিত্র অলংকারের চিহ্ন সুস্পষ্ট। তা ছাড়া অধি-কাংশ নারীমূর্তি দেহে সূক্ষ্ম বসনের চিহ্ন সৌখিনতার পরিচায়ক। স্বচ্ছ বসনের অন্তরালে দেহের প্রতিটি আবর্ত এক অপূর্ব রূপ মাধুর্যের সৃষ্টি করেছে। আনুমানিক খৃঃ পূঃ প্রথম অব্দে রচিত 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থের অজ্ঞাত রচয়িতা গঙ্গা মোহনার রাজধানী-বন্দর হতে এ ধরনের সূক্ষ্ম মসলিন বসনের বিদেশে রপ্তানীর উল্লেখ করেছেন। কয়েকটি টেরাকোটা নারীমূর্তির অলংকার ভূষিত বিচিত্র কেশ-বিন্যাস সুরুচি ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার নির্দে-শক। কেশ বিন্যাসের রীতিতে কোথাও কোথাও মিশরীয় বা হেলেনীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। দুটি টেরাকোটা শীলে উৎকীর্ণ নৃত্যরতা নারীমূর্তি ও একটি বীণা বাদন-রতা মূর্তি সমাজ জীবনে চিত্ত বিনোদনে সঙ্গীত ও নৃত্যকলার ভূমিকা নির্দেশ করে। একটি নৃত্যরতা ত্রিভঙ্গ নারী-মূর্তির সহিত মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ নির্মিত বিখ্যাত নৃত্যরতা কন্যা-মূর্তির নিকট সাদৃশ্য যে কোন গবেষককে বিস্মিত করে। এ বিশেষ নৃত্য ভঙ্গিমাটি পরবর্তীকালে ভারতের নৃত্যকলায় কোন বিশেষ রীতির প্রবর্তক কিনা তা নৃত্য-বিশারদদের বিবেচ্য। বালক-বালিকাদের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যবহৃত কতগুলি বিচিত্র মোটিফ যুক্ত মূর্তি পুতুলও আবিষ্কৃত হয়েছে। পুতুলগুলি চালনার জন্য নিম্ন-ভাগে শলাকা দ্বারা চাকা লাগাবার ব্যবস্থা ছিল। আনুমানিক কুষাণ যুগে নির্মিত এ পুতুলগুলি হস্তি, অশ্ব, মেষ, গণপতি, অগ্নি ইত্যাদি মোটিফ যুক্ত। হরিনারায়ণ-পুরে কয়েকটি রোমক বা তৎ সদৃশ্য সূক্ষ্ম বৃত্তাকার রেখাংকিত পানপাত্র পাওয়া গেছে, তা থেকে সাধারণভাবে অনুমান করা যেতে পারে ব্যাপকভাবে না হলেও সমাজের কোন কোন পর্যায়ে মদিরা বা সোমরস পানের হয়ত প্রচলন ছিল। নিম্ন গাঙ্গেয় বঙ্গের অন্যান্য প্রত্নস্থল, চন্দ্রকেতুগড়, আটঘরা, বোড়াল প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত মিথুন মূর্তি শোভিত শীলমোহরের মত হরিনারায়ণ-পুরেও কয়েকটি শীলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে। কামশাস্ত্রের সূত্রানুসারে এ-সকল শীলমোহরে উৎকীর্ণ বিভিন্ন ভঙ্গিমাগুলি সুস্থ যৌন-জীবনযাপন নির্দেশ করে। কোথাও বিকৃত রুচির পরিচয় লাভ করা যায় না। নিম্ন গাঙ্গেয় বঙ্গের বিভিন্ন প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত এ ধরনের শীলমোহরগুলির সমাজ জীবনে কোন ধর্মীয় বা বাস্তব শিক্ষাদানগত ভূমিকা আছে কিনা তা পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয়। সমাজ জীবনে জাতক কাহিনী যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, হরিনারায়ণপুরে আবিষ্কৃত কয়েকটি টেরাকোটা ফলক তার ইঙ্গিত বহন করে বলে পুরাতাত্ত্বিকেরা মনে করেন। সম্ভবত প্রাক-খৃষ্টীয় যুগে নির্মিত টেরাকোটার বিমর্ষ বদন দম্পতি মূর্তি, বাণবিদ্ধ পক্ষী হস্তে মনুষ্য-মূর্তি, লম্ফমান বানরের চিত্রযুক্ত ফলক ইত্যাদি এ অনুমানকে সত্যভিত্তিক করে তুলেছে। হরি-নারায়ণপুরে কয়েকটি বিকট দর্শন মূর্তি পুতুলও আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি হয়ত প্রাচীন লোকাচারে অপদেবতা ইত্যাদিতে আস্থাই নির্দেশ করে। তবে সমকালীন রূপকথার বিষয়-বস্তু হওয়াও অসম্ভব নয়। এ অঞ্চলের প্রাচীন সমাজে ব্যবহৃত লিপির কিছু নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছে। কয়েকটি মুদ্রায় ব্যবহৃত অক্ষর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে ব্যবহৃত ব্রাহ্মী লিপির অনুরূপ। আশুতোষ সংগ্রহ-শালার জনৈক পুরাতাত্ত্বিক হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত আনুমানিক মৌর্য যুগের মৃৎ পাত্রের ভগ্নাংশে উৎকীর্ণ ব্রাহ্মী হরফে অস্পষ্ট একটি লিপি 'শিগলস্য' বলে পাঠোদ্ধার করেন। তবে লিপিটির সম্পূর্ণ পাঠ 'শশিগলস্য' অর্থাৎ শশিগল নামক কুম্ভ-কারের' বলে তিনি মনে করেন। লিপিটি খরোস্তী হওয়াও অসম্ভব নয়। পরবর্তী সময়কালের দু-একটি শব্দ উৎকীর্ণ লিপি ফলক হরিনারায়ণপুরে পাওয়া গেছে। এগুলি প্রাক্-বঙ্গাক্ষরে লিখিত লিপি। তা-ছাড়া হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত মুখো-মুখী দণ্ডায়মান দুটি মানব মূর্তিসহ একটি শীলমোহর প্রাগৈতিহাসিক ভাবাত্মক লিপি বলেও অনেকে অনুমান করেন।

হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত পুরাবস্তুগুলি সবচেয়ে বেশী আলোকপাত করেছে নিম্ন-গাঙ্গেয় বঙ্গের প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মচিন্তা ক্ষেত্রে। এ অঞ্চলের ধর্ম-বিশ্বাসের প্রাচীনতম নিদর্শন কয়েকটি মাতৃকামূর্তি প্রাগৈতিহাসিক যুগের বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। জটাজুট ধারিণী, পীবর পীনস্তন ও গভীর উন্মুক্ত নভপদ্ম-যুক্তা অনন্ত স্বরূপা একটি মাতৃকা মূর্তি অনন্ত যৌবন ও বিশ্ব পালয়িত্রীর প্রতীক। টেরাকোটা মূর্তিটির নয়নযুগল, পীন-স্তন, অঙ্গাভূষণ ও জটাজুট অতিরিক্ত মৃত্তিকা সংযোজনে গঠিত। অপর একটি মাতৃকা মূর্তির মুখাবয়ব পক্ষীচঞ্চুর ন্যায়, মস্তকের বাম পার্শ্বে শিরস্ত্র — বৃষশৃঙ্গের ন্যায়। এ মূর্তির সহিত হরপ্পা ও মহা-স্থানগড়ের কয়েকটি অনুরূপ মূর্তির সাদৃশ্য আছে। আরেকটি ঘাঘরা পরিহিতা

প্রস্তরনির্মিত গড়েয়া

অশ্বমোণ্টিভযুক্ত ক্রীড়ানক

শিরস্ত্রাণযুক্তা মাতৃকা মূর্তির সহিত ক্রীটিতে প্রাপ্ত বর্তমানে কেম্ব্রীজ ফিৎস উইলিয়াম সংগ্রহশালায় রক্ষিত মাতৃকা-মূর্তির গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। তবে ক্রীটিতে প্রাপ্ত মূর্তিটি বিগত যৌবনা, আর হরিনারায়ণপুরের মূর্তিটি অনন্ত যৌবনের প্রতীক। এ ছাড়াও হরিনারায়ণপুরে কতগুলি ক্ষুদ্র মাতৃকা মূর্তিস্বরূপো টেরাকোটা মূর্তি পুতুল পাওয়া গেছে। মনে হয় এগুলি ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহৃত হত। মাতৃকা মূর্তির প্রাচুর্য দেখে মনে হয় এ অঞ্চলের ধর্মীয় জীবনে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে মাতৃকা উপাসনা যথেষ্ট স্বীকৃতি লাভ করেছিল। হরিনারায়ণপুরে দীর্ঘদিন অনুসন্ধানের পরও বর্তমান লেখক, আবিষ্কৃত পুরাবস্তুগুলির মধ্যে, কোন শিশ্ন বা যোনি প্রতীকের সন্ধান পাননি। দেবী আরাধনার আরেকটি নিদর্শন হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত যক্ষিণী মূর্তিগুলি। অভিজাত ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী-মণ্ডলীতে গৌণ বা জৈন ধর্ম সাধনায় ব্যন্তর দেব দেবী বলে পরিগণিত হলেও মৌর্য - সুঙ্গ - কুষাণ যুগে যক্ষ - যক্ষিণী উপাসনা এ অঞ্চলে যে যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছিল তা অনুমান করা যায়। প্রাপ্ত যক্ষিণী মূর্তিগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি উপবিষ্ট যক্ষিণী মূর্তির ভাবে ও আকৃতিতে মৌর্য যুগের শিল্পরীতির প্রভাব বর্তমান। আরেকটি সালংকারা যক্ষিণী মূর্তির ঊর্ধ্বাংশ অপূর্ব সুষমামণ্ডিত। অর্ধ নিমীলিত নেত্রযুগল, সুস্মিত ওষ্ঠাধর ও পীনোন্নত বক্ষে দেবী মহিমময়ী। আশুতোষ সংগ্রহশালায় রক্ষিত হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত আরেকটি যক্ষিণী মূর্তি দর্শক নয়নকে মুগ্ধ করে। সালঙ্কারা, সুক্ষ্ম বসনাবৃতা, ক্ষীণ কটি, পৃথুলে জঘনায় মেখলা পরিহিতা ঈষৎ ভঙ্গপদে দণ্ডায়মানা মূর্তিটি ছিন্নমস্তকা। দেবীর বাম হস্তে একটি সুমিষ্ট ফল। মূর্তিটির ভাবে মাতৃকা দেবীগণের অন্যতমা কৌমারীর ভাস্কর্যের কিঞ্চিৎ প্রভাব আছে বলে মনে হয়। একটি যক্ষিণী মূর্তির নিম্নাংশ অত্যন্ত সুন্দর। জঘনার মেখলা হতে দোদুল্যমান ছয়টি ক্ষরিত কবচের একটি চিহ্ন মৎস্য বলে প্রতিভাত হয়। পণ্ডিতগণের মতে মৎস্য প্রজননের প্রতীক। যক্ষিণী ছাড়াও বীণাপাণি, পদ্মাসনা লক্ষ্মী ও ছোট একটি টেরাকোটা ফলকে গজলক্ষ্মী মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে। মূর্তিগুলির ভাব ও গড়নে গুপ্ত যুগের শিল্পরীতির প্রভাব লক্ষণীয়। হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত দেবমূর্তিসমূহের মধ্যে টেরাকোটা নির্মিত গণপতি মূর্তির ঊর্ধ্বাংশ, শিরভূষণযুক্ত যক্ষমূর্তির মুখমণ্ডল, প্রায় অভঙ্গ একটি অগ্নিমূর্তি ও ভগ্ন একটি ইন্দ্রমূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি শীলমোহর ও মুদ্রায় পবিত্র দ্রুমের প্রতিকৃতি, একটি শালভঞ্জিকা মোটিফযুক্ত মূর্তি ও সর্প উৎকীর্ণ, মাঙ্গলিক চিহ্নযুক্ত একটি শীলমোহর এ অঞ্চলে বৃক্ষবন্দনা ও সর্প উপাসনার প্রচলন নির্দেশ করে। একটি টেরাকোটা বৌদ্ধমূর্তির ঊর্ধ্বাংশ, চৈত্য প্রতিকৃতিযুক্ত কয়েকটি মুদ্রা, ক্ষুদ্রাকৃতি একটি অভঙ্গ ধাতব বৌদ্ধ স্তূপ এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ইঙ্গিত বহন করে। তা ছাড়া কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত একটি বাসুদেব মূর্তি, সূর্য মূর্তির ভগ্নাংশ, বিষ্ণু মূর্তির নিম্নাংশ ও কয়েকটি টেরাকোটা বংশীবাদনরত কৃষ্ণ বাসুদেব মূর্তি এ অঞ্চলে গুপ্তোত্তর যুগের ধর্মবিশ্বাসে আলোকপাত করে।

হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত পুরাবস্তুগুলি হতে এ অঞ্চলের প্রাচীনকালের অর্থনৈতিক জীবনের খুব সামান্য তথ্যই সংগ্রহ করা যেতে পারে। নিম্ন গাঙ্গেয় বঙ্গের অন্য কয়েকটি প্রত্নস্থলের মত হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত অসংখ্য রৌপ্য ও তাম্র নির্মিত অঙ্ক চিহ্নযুক্ত বিভিন্ন আকৃতির মুদ্রাগুলি প্রাচীনকালে এ অঞ্চলে প্রচলিত মুদ্রা-মাধ্যম-বিনিময় ব্যবস্থার প্রতীক। মুদ্রাগুলি বিভিন্ন অঙ্কচিহ্নযুক্ত। এ সকল চিহ্নের মধ্যে দ্রুম, চৈত্য, মৎস্য, চন্দ্র, হস্তি, দীর্ঘিকা, তুলাদণ্ড প্রভৃতি প্রধান। কতগুলি মুদ্রায় খৃঃ পূঃ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে প্রচলিত কতগুলি ব্রাহ্মী অক্ষর উৎকীর্ণ আছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এগুলি 'পুরাণ' মুদ্রার পরবর্তীকালের মুদ্রা ও উৎকীর্ণ ব্রাহ্মী অক্ষরগুলি প্রাচীনকালের বিভিন্ন বণিকগোষ্ঠীর ব্যবহৃত চিহ্ন। খুব সম্ভবত মুদ্রা নির্মাণ ও প্রচলন সমসাময়িক রাজশক্তির করায়ত্ত ছিল না। এগুলি সুসংবদ্ধ বণিকগোষ্ঠীর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। অনেকের মতে ধাতুর বিশুদ্ধ প্রদর্শন ও মুদ্রার পরিমাপ প্রদর্শনের জন্যও নানাপ্রকার চিহ্ন ব্যবহার করা হত। সম্প্রতি হরিনারায়ণপুর ও দেউলপোতায় প্রাপ্ত কয়েকটি মুদ্রার একপৃষ্ঠে নানাপ্রকার চিহ্নযুক্ত ও অপর পৃষ্ঠে এক বা ততোধিক সমান্তরাল রেখা অঙ্কিত। আবার কোন কোন মুদ্রায় সমান্তরাল রেখাগুলির উপরে দুটি বা তিনটি বিন্দু চিহ্ন রয়েছে। মুদ্রাগুলি গভীরভাবে নিরীক্ষা করে মনে হয় এ সমান্তরাল রেখা ও বিন্দুগুলি মুদ্রামূল্য পরিমাপক সংখ্যাসূচক চিহ্ন। পরবর্তীকালে গুপ্ত যুগের কিছু মুদ্রায় প্রায় সমজাতীয় কিছু চিহ্নকে 'পরাক্রম' চিহ্ন বলে অনেকে অভিহিত করেন। এ ছাড়া হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত অঙ্কচিহ্নযুক্ত মুদ্রাগুলির মধ্যে কতগুলি খণ্ডিত বিখণ্ডিত মুদ্রা পাওয়া গেছে। মুদ্রামূল্যের বিভক্তকরণের জন্যই বোধহয় এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল। প্রাক্-খৃষ্টীয় যুগে নিম্নবঙ্গের এ অঞ্চলের জনপদগুলির অধিবাসীরা যে সমুদ্রপথে বৈদেশিক বাণিজ্যের সূত্রপাত করেছিলেন তার কিছু নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছে। হরিনারায়ণ-

পুরে আবিষ্কৃত মুদ্রাগুলির মধ্যে উট ও অর্ণবপোতের প্রতিকৃতি চিহ্নযুক্ত কয়েকটি মুদ্রা পণ্ডিতগণের মতে গভীর অর্থব্যঞ্জক। তাঁদের মতে এক মাস্তুলযুক্ত দীর্ঘাকৃতি একটি অর্ণবপোতের প্রতিকৃতি এ অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের নৌবিদ্যায় পারদর্শিতা ও সমুদ্রপথে বাণিজ্য প্রসারের কাহিনী ও মুদ্রায় উটের প্রতিকৃতি সম্ভবত আরব-দেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা সূচিত করে। হরিনারায়ণপুরে কতগুলি 'রুলেটেড' পানপাত্র বা পাত্রের ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি রোমে বা গ্রীসে নির্মিত বলে অনেকে মনে করেন। কতগুলি বিডস বা পুঁতিদানা পাশ্চাত্যদেশীয় নির্মাণকৌশলের স্বাক্ষর বহন করে। সুদূর মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে এদেশের যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, এগুলি তারই নিদর্শন। হরিনারায়ণপুরের পুরাবস্তুগুলি নিরীক্ষা করে তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণের যে পরিমাণ ব্যবহার দেখা যায়, তাতে মনে হয় এ সকল ধাতু ভারতীয় উপদ্বীপের অন্যত্র বা বিদেশ হতে বিশেষ পরিমাণে আমদানী করা হত। হরিনারায়ণপুরে নদীতটে অসংখ্য বিক্ষিপ্ত প্রত্নবস্তুর মধ্যে কিছুদিন পূর্বে দুটি ক্ষুদ্র প্রস্তর সদৃশ ভারি বস্তু পাওয়া গিয়েছিল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা ঐগুলি আকরিক তাম্রখণ্ড বলে নির্ধারিত হয়েছে। মনে হয় আকরিক ধাতুপিণ্ড আমদানী করে সেগুলি পরিশোধিত করার ব্যবস্থাও ছিল। এ ছাড়া প্রাচীন যুগে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা বয়নশিল্প, মৃৎশিল্প ও ধাতু শিল্পে যে যথেষ্ট দক্ষতা লাভ করেছিলেন, হরিনারায়ণপুরের পুরাবস্তুগুলি নিরীক্ষা করে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত কয়েকটি পুরাবস্তু প্রাগৈতিহাসিক পূর্বভারতীয় শিল্পরীতির সুস্পষ্ট চিহ্ন বহন করে। গাঢ় রক্তাভ বর্ণের একটি টেরাকোটা শীলমোহর এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শীলমোহরে মুখোমুখী দণ্ডায়মান দুটি মনুষ্য মূর্তি—সম্ভবত একটি পুরুষ ও অপরটি নারী। অর্ধচন্দ্রাকৃতি শিরোভূষণ-যুক্ত পুরুষ মূর্তিটি প্রাচীন মিশরীয় ভঙ্গিতে বাম পদ অগ্রসর করে দণ্ডায়মান। মূর্তিটির দক্ষিণ হস্তে ধৃত দণ্ডটির অগ্রভাগ কর্কট বাহু আকৃতি। অন্য দুটি শীলমোহরে যথাক্রমে অঙ্কিত ধনুর্ধর যুগ্ম মৃগ চিত্র ও পরস্পর ছেদী দুটি বৃত্ত চিহ্ন প্রাগৈতিহাসিক শিল্পরীতির নিদর্শন। আলোচিত শীলমোহরের চিত্রগুলি সবই রৈখিক পদ্ধতিতে অঙ্কিত এবং ক্রীট, বলকান ও মিশরীয় শিল্পরীতির সুস্পষ্ট প্রভাব এ শীলমোহরগুলিতে বিদ্যমান। একটি উচ্চস্কন্ধযুক্ত ভগ্ন ব্রাহ্মীবৃক্ষ ও অনন্তস্বরূপা পক্ষীচঞ্চুযুক্ত একটি মাতৃকা মূর্তিতে সিন্ধু সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক শিল্পরীতির প্রভাবও লক্ষণীয়। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়কালে নির্মিত কতগুলি পুরাবস্তুতে মাগধীয় শিল্পরীতির প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত একটি ক্ষুদ্রকায় ভগ্ন প্রস্তর স্তম্ভগাত্রের মসৃণতা অশোক স্তম্ভের পালিশের সমতুল্য। এ ছাড়া হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত কতগুলি ক্ষুদ্রকায় টেরাকোটা মেষ, বৃষ, হস্তি, অশ্ব প্রভৃতি পশুমূর্তি শোভিত পুতুলের অবয়ব চিহ্ন রেখার গভীরতা, দেহপেশীর বলিষ্ঠতা ও ভঙ্গির ক্ষিপ্রতা মৌর্য যুগের লৌরিয়ানন্দনগড়, সারানাথ বা বসরা-বখিরার পশু-মূর্তি ভাস্কর্যের রীতি অনুগামী। সুঙ্গ-কুষাণ শিল্পরীতির প্রভাবও যে এ পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল তারও বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। একটি সালঙ্কারা যক্ষিণীদেহের ঊর্ধ্বাংশ ও একটি গণপতি মূর্তি হস্তিদন্ত বা কাষ্ঠ খোদিত মূর্তির গঠনপদ্ধতির অনুরূপ ও বসনভূষণ পণ্ডিতদের মতে ভারহুত ও সাঁচির শিল্পরীতির প্রভাবযুক্ত। একটি মস্তকে শিরস্ত্রাণ ও কর্ণে কুণ্ডলযুক্ত যোদ্ধা মূর্তের ঊর্ধ্বাংশ কুষাণ শিল্পের স্বাক্ষর বহন করে। কয়েকটি সমভঙ্গ বা আভঙ্গ যক্ষিণী মূর্তিতে সুঙ্গ শিল্পরীতির প্রভাব পরিস্ফুট। একটি সুস্মিতবদনা, অর্ধ-নিমীলিতনয়না, মোহিনীময়ী যক্ষিণী মূর্তি, একটি প্রসাধনরতা নারীমূর্তি ও একটি কামনাবিধৃত, প্রকটযোনী, লাস্যময়ী নারীমূর্তি মথুরা শিল্পের সুষমামণ্ডিত। গুপ্ত শিল্পরীতি প্রভাবান্বিত পুরাবস্তু-গুলির মধ্যে প্রস্তর নির্মিত একটি গড়েয়া বা চৌকি, একটি গজলক্ষ্মী মূর্তি ও টেরাকোটা কয়েকটি মৌর্য পুতুল উল্লেখ-যোগ্য। কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত কয়েকটি ভগ্ন সূর্য, বিষ্ণু ও উমা মহেশ্বর মূর্তি পরবর্তী পাল-সেন আমলের শিল্পরীতি চিহ্ন বহন করে। ইহা ছাড়া হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত অসংখ্য বিচিত্র বর্ণ ও আকৃতির মৃৎদগ্ধ পাত্রগুলির আকৃতি, নির্মাণপদ্ধতি ও নক্সায় কৌশাম্বী, অহিচ্ছত্র ও সুদূর রোম ও মিশরের শিল্পরীতির প্রভাবও বিশেষ লক্ষণীয়।

(আলোকচিত্র 'নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকা ইতিহাস অনুসন্ধান প্রকল্প' এর সৌজন্যে প্রাপ্ত)

বহু দিন পর হঠাৎ প্রকাশ এসে হাজির। জামা-কাপড় চেহারা সেই আগের মতন অগোছাল, চুলে তেল পড়ে না কতকাল কে জানে। শুধু কল্যাণময় নিজের স্টুডিওতে বসে তখনও পোর্ট্রেটে চাক্কা দু-একটা টাচ লাগাতে ব্যস্ত। ছবির অধরে অত্যাশ্চর্য এক লাল রঙ খানিকটা বুলিয়ে বাঁকা ঠোঁটে হেসে বলল—কী রে, এতদিন পর। মাঝে মাঝে তোর কি হয়?

চিন্তান্বিত মানুষের মত কথার কোনও জবাব না দিয়ে প্রকাশ মৌনমুখে পায়চারি করতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাসের পর অস্পষ্ট স্বরে বলে—তোর একটা ছবি তুলব।

—ছবি? চমকে তাকায় কল্যাণময়। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখে প্রকাশের কাঁধে সত্যিই নতুন একটা ঝকঝকে ক্যামেরা ঝুলছে. ক্যামেরার ঢাকনাটা নেই, বোধ হয় ইতিমধ্যে হারিয়ে ফেলেছে কোথাও। ওর যা ভুলো মন।

—সে কীরে, আজকাল ফটো তোলা শুরু করলি নাকি?

গম্ভীর মুখে এবার মৃদু এক হাসি ফিলামেন্টের আলোর মত সূক্ষ্ম তরঙ্গ তুলল। —হ্যাঁ তাই। কি হবে ছবি এ'কে, তার চেয়ে এ-ছবিই ভাল। জীবনের মূল্যবান অংশ তো প্রায় শেষ হল, তাই এখন ইচ্ছে জীবনের যেখানে যা সৌন্দর্য চোখে পড়ে, ক্যামেরার চোখে তা ধরে রাখি। এরই মধ্যে একটা মোটা এ্যালবাম ভরিয়ে ফেলেছি।

ভেতরে অস্বস্তি অনুভব করলেও মুখে তা প্রকাশ করল না কল্যাণময়। বরং অস্বস্তি গোপন করতে বিপরীত ভাবভঙ্গীই প্রকাশ করতে লাগল। বলল—ভালই তো। এই তো আঁকছি, এই অবস্থায় তোল না।

—চা না খেলে মেজাজ আসবে না। বীণাকে বল এক কাপ চা নিয়ে আসতে।

রঙীন আলেখ্যর ওপর ছাই রঙের এক গাল ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে দেখছিল প্রকাশ ছবিটা কেমন দেখায়। মনে হল ছবিটা সপ্রাণ হয়ে উঠল। এই ধরনের বিচিত্র অনেক অভ্যেস আছে প্রকাশের। বন্ধুরা আগে বহু ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। ছবি আঁকতে গিয়ে ও এমন সব কিম্ভুতকিমাকার কাজকর্ম করত যে, বন্ধুরা কখনো-কখনো ছবি সমেত ওকে ফেলে রেখে পালিয়ে যেত। প্রকাশ বলত—এসব বুঝবি না। আসলে কোনো শিল্পই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। মন্দিরের ছবি আঁকলি, শঙ্খ ঘন্টাধ্বনি নেই, শঙ্খ ঘন্টাধ্বনি বাদ দিয়ে একটা মন্দিরকে তুই ভাবতে পারিস, মন্দিরের ট্রু ছবি হয়?

বন্ধুরা ঠাট্টা করত, বলত—কেন ছবি এ'কে শাঁখ বাজাতে থাকব। ধ্বনিকে যুক্ত করে দেব ছবির সঙ্গে—হবে না? তোর তো এটাই মত?

প্রত্যুত্তরে রহস্যময় হাসি হাসত প্রকাশ। কি করে কি হয়, তোদের কল্পনায় তা আসবে না। তবে ডিফিকাল্টিজগুলো যে বুঝেছিস—এই জন্য আমি খুশী। মেনি থ্যাংকস।

বন্ধুরা কিন্তু সমীহ করত প্রকাশকে। প্রকাশ সম্পর্কে আর্ট কলেজের অধ্যাপকদের ভীষণ উঁচু ধারণা। নীহার দত্ত তো বলতেন, প্রকাশের মধ্যে একজন 'ট্রু আর্টিস্ট' আছে। ট্রু আর্টিস্ট বিশেষত কি করে? কেবল ছবি আঁকে না, জীবনের অভ্যন্তরের রূপকে আবিষ্কার করে। এই আবিষ্কার-কর্মকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে প্রকৃত ক্ষমতা। শুধু রঙের তুলি বোলালেই আর্টিস্ট হয় না।

এর পর দীর্ঘদিন পার হয়েছে। সেই একই রকম আছে প্রকাশ, স্বভাব বদলায় নি। কলেজের শেষ পরীক্ষায় প্রকাশই প্রথম স্থান দখল করেছিল, কিন্তু পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অন্যেরা, প্রকাশ হয় নি। অন্যরা অর্থে যেমন কল্যাণময়। বাজারে এখন ওরই নামডাক। দু-চার জায়গায় কোথাও সম্পাদক, কোথাও সভাপতি হয়েছে ইতিমধ্যে। অথচ বন্ধুরা বলত কল্যাণময়ের মধ্যে কোনও প্রতিশ্রুতি ছিল না। এখনও আড়ালে বন্ধুরা, সমঝদারেরা বিরূপ মত পোষণ করে ওর সম্পর্কে। প্রকাশ্যে সে কথা বলতে সাহস অবশ্য কারও নেই। কে চাকরির খোয়াবার ঝুঁকি নেবে, কে শহরে পত্র-পত্রিকার খালে সর্বগ্রাসী নিন্দার কুমির ডেকে আনতে রাজী হবে। তাই মোটামুটি চুপ করে থাকে সবাই।

প্রকাশ সে সবের ধার ধারে না। মনে যা আসে মুখের ওপর তাই বলে দেয়। ফলে প্রকাশের এই দশা। বন্ধুরা ছাড়া ওকে এখন কেউ চেনে না, জানে না। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা যা তা হল প্রকাশ শেষ পর্যন্ত আঁকা ছেড়ে দিয়েছে। আঁকা ছাড়া যা তার খেয়াল হয় তাই করে। কিছুদিন কবিতা লিখল। হঠাৎ কি খেয়াল হ রঙীন মাছ পুষতে লাগল। সুন্দর অ্যাকুরিয়াম বানাল। নীল, লাল সোনালী মাছে ভরিয়ে তুলল, সাজিয়ে তুলল অ্যাকুরিয়াম, আর রাত্রিদিন একা একা রংসাভর দৃষ্টিতে মাছের খেলা দেখতে লাগল।

সবাই বলল—পাগল!

ও হাসল।

এর পর ধরল ক্যামেরা। এখন ওটা চলেছে। বন্ধুদের বলে—হাত পাকাচ্ছি পরে ফিল্মে চলে যাবো। দেখাব কোথা লাগে রুফো। 'কম্পোজিশন' কাকে ব দেখাব।

কল্যাণময় বলল—দাঁড়া, ড্রেসটা পাল্টে আসি — একটু আর্টিস্টিকভাবে—। ব পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

কোন দোষই করে নি কল্যাণময়, কি প্রকাশ রাগে জ্বলে উঠল। মনে মনে বলল অসাধু। রাগের জের টেনে ভাবতে লাগল এটাই ওর চরিত্র। ড্রেস পাল্টে নিজের এক বানানো ছবি তৈরী করবে এখন। হয়ে ঢিলেঢালা আজানুলম্বিত শিলপিং গা টাই পরে আসবে। চুল কিছু এলোমে করে দেবে, কেননা ও জানে ওর চু অগোছাল হলে থোলো থোলো আঙু মত দেখায়, আর সেই আকস্মিক সৌন্দর্য বেকারীর কেক রুটির মত সযত্নে তৈ করে নেবে ও। এইভাবে বানানো অকৃত্রিম দিয়ে ঢাকা চেহারাকে বয়ে এনে কথাকা অভিজ্ঞাত ভঙ্গীতে আধো উচ্চারণে বলবে 'আমি কি বসে তুলব না দাঁড়িয়ে?'

প্রকাশের অনুমান মিথ্যে নয়। 'অ কি বসে তুলব না দাঁড়িয়ে' বলে কল 'আচ্ছা একটু দাঁড়া, বীণা আসছে, গা গেছে। ওকে না দেখিয়ে ছবি তুললে চটে যাবে।'

অপেক্ষা করতে আপত্তি কি? কিন্তু মনে হল প্রকাশের—দূরে ছাই, কি ছবি তুলে। ইচ্ছে হল মুখের উপর জা দেয় কল্যাণময়কে যে সে তার ফটো তু না, ফটো তুলতে আর ইচ্ছে করছে না। মত বাজে চরিত্রের লোকের আ ছবি—ছ্যাঃ।

মনে পড়ল বহুদিন আগেকার এ ঘটনা। তখন তারা মেদিনীপুরে থাক জাপানী বোমার ভয়ের দিন সে- কল্যাণময়, সে আর যাদব। তিনজনেই ক্লাশ টেনে পড়ে জেলা হাই স্কুলে। স্কুলের সেরা ছেলে ছিল তারা। পড়াশুনার চেয়ে আঁকার দিকে মন বেশি। তাদের মধ্যে তখন যাদব সবচে ভাল ছবি আঁকে। যাদবের যেমন প্রতি তেমন চেহারা। হ্যাঁ প্রতিভাই বলতে বলা উচিত। ওই সামান্য বয়সে অসাধারণ আঁকত। আঁকা শেষ হলে, আছে, প্রকাশ আর কল্যাণময় ঝাঁপিয়ে প

ছবির উপর। কী জীবন্ত ছবি, কী অপূর্ব দেখতে। যাদবের কাছে প্রকাশ ও কল্যাণময়ের আঁকা সাগরের তুলনায় গোষ্পদ মাত্র। পরে যাদব চর্চা আরও বাড়িয়েছে। দু-চারটে পত্র-পত্রিকায় ছবিটবি আঁকে। কল্যাণময়ের কাছে ও একদিন এসেছিল ওর আঁকা একটা ছবি সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে দেবে বলে, পরামর্শ চেয়েছিল। এমন বিশ্রীভাবে কল্যাণময় ওকে সমালোচনা করতে আরম্ভ করল যে যাদব বেচারা একেবারে চুপসে গেল। নিজের ছবিখানা বগলে করে পালাতে পারলে সে বাঁচে। যেন চুরির দায়ে ধরা পড়েছে এমন এক অপরাধীর মত কালো মুখ করে গুটিসুটি সে স্থান ত্যাগ করল।

প্রকাশ স্বভাবতই কম কথা বলে। সে জিজ্ঞেস করেছিল অমন করে ওকে ডিসকারেজ করলি? সাধনা করলে যাদব তো একদিন বড় আঁকিয়ে হতই।

হায়নার মত মুখটা হিংস্র আর কুটিল হয়ে উঠল কল্যাণময়ের। তবু যেন কত শুভার্থী এমন সহৃদয়তার সঙ্গে গলা মোলায়েম করে বলল—নার্সের ছেলে ছবি এঁকে কি করবে বল। অর্থ রোজগারের দিকে মন দেয়া উচিত। এসব লাইনে জানিস তো—।

মুহূর্তের ভিতর ক্ষুদে শয়তানের এক ক্ষুদে ষড়যন্ত্র যেন ধরা পড়ল। একে ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিই-বা বলা যেতে পারে? সুদক্ষ এক ডাক্তারের 'ব্লাডলেস অপারেশন'। অস্ত্রোপচার হল কিন্তু এক ফোঁটা রক্ত ঝরল না। কল্যাণময়ের অস্ত্রোপচার সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছিল সন্দেহ নেই, কারণ যাদব আর ছবি আঁকে নি, ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছিল চিরদিনের মত।

বীণা স্নান সেরে হলুদ শাড়ী জড়িয়ে বাদল দিনের প্রথম কদম ফুলের মত হয়ে চুপটি এসে দাঁড়াল। দাঁড়াল নয়, যেন ফুটে উঠল। বলল—শুধু বুঝি বন্ধুর ছবি তুলবেন? দোরে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু দুলতে লাগল আর হাসতে লাগল।

আপনার ছবিও তুলব, ভয় নেই। যা দেখছি এখন আপনাকে ইচ্ছে হচ্ছে ফিল্মের রোলটা আপনার ছবি তুলেই শেষ করি। এ ছাড়া আপনি এত চতুর, বেশ জানেন ছোট্ট একটা কুমকুমের ফোঁটায় কি অসাধারণ উন্নতি হয় আপনার মুখশ্রীর। কলকাতা ন্যুইয়র্ক হয়ে যায়।

অন্য মেয়ে হলে এ কথায় খুশী হয়েও শেষ পর্যন্ত খুশী হতে পারত না। কলকাতার সঙ্গে ন্যুইয়র্কের তুলনাটা কাঁটা ফোটাত। কিন্তু বীণা বুদ্ধিমতী সৎসাহস রাখে। নিজের যা নেই তা আছে বলে গোঁয়ার্তুমি করে না। এ দিক দিয়ে সে কল্যাণময়ের ঠিক বিপরীত। কল্যাণময় যা তার নেই তাই সে দাবি করে। কেবল দাবি করেই ক্ষান্ত হয় না, দাবি যে তার যথার্থ একান্তই যুক্তিযুক্ত এ কথাটা পাঁচজনের মাধ্যমে পদার করে একটা মিথ্যেকে সত্যে রূপান্তরিত করতে চায়।

বীণার রুচিও খুব ভাল। এককে সময় মনে হত বীণা কল্যাণময়ের থেকে গুণী প্রকৃত গুণে, শিল্পবোধ হয়ত বীণার কল্যাণময়ের চেয়ে বেশি। পৃথিবীতে অপ্রিয় সত্যের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার সুযোগ কম। উপযুক্ত সুযোগ যদি থাকত, যদি ধীরে ধীরে বীণা সম্পর্কিত এই গোপন সত্যটা লোকের মাঝে প্রচার লাভ করত, লোকে যদি এ সত্যকেই মেনে নিতো যে প্রখ্যাত শিল্পী কল্যাণময় ভাদুড়ীর স্ত্রী শ্রীমতী বীণা ভাদুড়ী তাঁর স্বামীর থেকেও গুণী, অধিকতর শিল্পবোধসম্পন্না সুরুচিসম্পন্না। অংকনবিদ্যা সামান্যতমও আয়ত্তে থাকলে তিনিই বাজারে খ্যাতিলাভ করতেন, তাহলে বেচারা কল্যাণময় কি করতেন? মুখটা ক্যাবলা হতে হতে দুর্বল হাত হতে এক সময় তুলি খসে পড়ত। নিজের অর্ধসমাপ্ত বিশাল ছবির সামনে পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকের মত অসাড় দেহে বসে পড়তেন। এতকালের সাধনক্ষেত্র স্টুডিওতে মৃতপ্রায় লোকের মত অনেকক্ষণ নিস্তেজ বসে থেকে যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন সংকল্প গ্রহণ করছেন মনে মনে তখন হয়ত বীণা ভাদুড়ী — যিনি তাঁর মর্যাদার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন—পিছনে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে যেই একটুখানি ডেকেছেন, তৎক্ষণাৎ কল্যাণময় খ্যাটাশের মত খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠবেন, বলবেন—যাও, যাও, বিরক্ত কর না। চা করগে এক কাপ।

এ-সব কোন কারণে নয়, অন্য কোন সাধারণ কারণেই হয়ত কল্যাণময়ের মুখটা কেমন অপ্রস্তুত, ক্যাবলামার্কা হয়ে উঠল যখন সে ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়াল। তার কোনও ভঙ্গীই বীণার পছন্দ হয় না। স্ত্রীর সামনে কিছুতেই স্মার্ট হতে পারছে না বলে, আরও আনস্মার্ট হতে লাগল। বীণা বিরক্ত হয়ে এক সময়—দূর ছাই, তোমার দ্বারা কিসসু হবে না। এমন এক অসাধু মন্তব্য প্রকাশের পর সক্রোধে স্থান ত্যাগ করল। নিজে কল্যাণময় আর বন্ধু প্রকাশের যৌথ প্রচেষ্টা চলল কিছুক্ষণ তারপরেও। তা সত্ত্বেও ব্যাপারটা পছন্দমত না হয়ে ওঠায়, মানভঞ্জনের উদ্দেশে করুণ সুরে স্ত্রীর উদ্দেশে টেনে টেনে ডাকতে লাগল—বীণা বী-ণা, এ্যাই বীণা—এসো না এদিকে।—এ্যাই। ভাবটা এমন যেন কাপড় পরায় অনভ্যস্ত লোকের হঠাৎ কাছা খুলে গেছে, কাপড় সামলাতে পারছে না অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য ছাড়া উদ্ধার নেই এখন।

শাটার টিপে দিল প্রকাশ।

নেগেটিভখানা বাড়ীতে আলো জ্বালিয়ে ভাল করে দেখতে লাগল। অনেক ছবি তুলেছে সে, সেই ছবিগুলোর নেগেটিভ একে একে দেখা শেষ করে কল্যাণময়ের নেগেটিভখানায় এসে দু চোখ স্থির। একদম ভূতের মত দেখাচ্ছে তাকে। মানুষ বলেই মনে হয় না। নেগেটিভের ছবি এমনই হয় এমন হওয়াই স্বাভাবিক।

রাত্রে শুয়ে একথা ভাবতে গিয়ে তার এক সময় মনে হল নেগেটিভের সেই ভূতটা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কল্যাণময় বলে চেনা যায় না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই-ই কল্যাণময়—অস্পষ্ট, ভৌতিক শয়তান এবং শক্তিমান। অকস্মাৎ বহুদিন আগের প্রথম যৌবনের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। মীনার সেই চিৎকার, ফুঁপিয়ে কান্না—আপনার বন্ধু, ছিঃ আপনার বন্ধু।

তারা তখন থাকে টালিগঞ্জে। [illegible] কালোতে [illegible] ঢাকছে। [illegible] সংসারের ভারী ভারী তত্ত্বের চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে করতে [illegible] তখন [illegible] কল্যাণময়। কোথায় কত দূর চলে [illegible] হুঁস থাকত না। দুজনেই [illegible] তোলার রঙীন কল্পনায় [illegible] স্বপ্নের মত ঘুরে বেড়াত। এরকম ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একদিন [illegible]। [illegible] মজাদার ঝুলন্ত পুলের কাছে। সূর্য তখন অস্ত

গেছে। পশ্চিম আকাশে গনগনে গোলাপী আর সোনালী রঙের দাঙ্গা। বিক্ষত মেঘ-মালায় তারই চিহ্ন। দেখে মনে হয় যেন ইটালীর কোন ক্লাসিক চিত্রকর বিশাল ক্যানভাসে একটি বিস্ময়কর ছবি মনের আনন্দে এ'কে চলেছেন। ছবির প্রতিবিম্ব লেকের আয়নায় পড়েছে। কোনখানে চোখ রাখবে ঠিক করা শক্ত।

দুই বন্ধু মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। এমন সময় লেকের ওপারে যে ছোট্ট দ্বীপ আছে সেখানে এসরাজের চড়া পর্দায় ছড়টানার আওয়াজের মত—বিসমিল্লা—আজানের ধ্বনি কানে ভেসে এল। যেন যন্ত্রণাদগ্ধ এক মানুষ কাতর প্রার্থনায় আকাশ বাতাস ভরিয়ে তুলছে, তারই বিক্ষত হৃদয়ের আর্তিতে সারা পশ্চিম আকাশটা রাঙা হয়ে আছে।

ধীরে ধীরে ব্রিজ পেরিয়ে দ্বীপের কাছে উঠে এল তারা। মসজিদের ভেতর সেখানে আজান দিচ্ছে এক মুসলমান ফকির। দু চোখ বন্ধ, নত জানু, দুই হাত কৃপাপ্রার্থীর মত শূন্যে উত্থিত।

ঠিক এমন সময় পাশে মুখ ফেরাতে দেখে কল্যাণময় নেই। সম্ভবত আশে-পাশে কোথাও ঘুরছে সে। শিল্পীমন নির্জনতা খোঁজে, নির্জনতায় ব্যাঘাত করতে নেই এই ভেবে প্রকাশ কল্যাণময়কে খোঁজাখুঁজি করল না। সামনে একটা খালি বেঞ্চ ছিল, সেখানে গিয়ে চুপ করে বসে সে-ও নির্জনতা উপভোগ করতে লাগল। খানিক সময় কেটে গেছে, এমন সময় হঠাৎ দেখল একটি মেয়ে, বয়স ষোল সতেরো, বুকের অগোছাল কাপড় গোছাতে গোছাতে দৌড়ে পালাচ্ছে ব্রিজের ওপর দিয়ে। উদ্বিগ্ন বোধ করলেও এ ব্যাপারে তার হস্তক্ষেপ করার কিছুই ছিল না। এসব নির্জন স্থানে অশালীন অনেক ঘটনাই ঘটে, এটি হয়ত তারই একটা। কিন্তু সামান্য নজর রাখতে মনে হল মেয়েটি যেন তার চেনা, অর্থাৎ মেয়েটি সম্ভবত তারই ছোট বোনের বান্ধবী মীনা।

দৌড়ে গিয়ে মীনার কাছে যখন পৌঁছেছে তাকে দেখে মীনা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। প্রকাশ দেখল বাজপাখি তার নখের আঁচড় শিকারের সর্বাঙ্গেই রেখেছে। মীনা বলল—আপনার বন্ধু, আপনার বন্ধু—ছিঃ ছিঃ—।

প্রকাশ বলল, কি করে জানলে তুমি ও আমার বন্ধু?

—ব্রিজের ওপার থেকে আপনারা দুজনে যখন আসছিলেন তখন দেখেছি। আপনার বন্ধুকে বলেও ছিলাম সেকথা। কিন্তু বর্বর লোকটা কান পাতল না কিছুতে—।

মাথা নীচু করে শিশুর মত ফোঁপাতে লাগল মীনা।

একটু পরে অন্ধ হওয়া লোকের মত রুদ্ধ স্বরে বলল প্রকাশ—তুমিই বা একা এই নির্জন জায়গায় এসেছিলে কেন?

—আমি আসি নি।

—তবে?

—মৃণাল নিয়ে এসেছে। ও সিগারেট কিনতে গেছে। দোকানগুলো তো অনেক দূরে।

* * *

ছবির কপিখানা নামিয়ে রাখল কল্যাণ-ময়ের সামনে। ঝকঝকে সুন্দর ছবি। যেন তারই মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কল্যাণময় হাসছে। চোখে মুখে প্রভাত-বেলার নির্মল শুভ্রতা, ওষ্ঠে অধরে অদ্ভুত এক ক্ষমাসুন্দর হাসি।

বিস্মিত দৃষ্টিতে কল্যাণময় বলল—বাঃ কি সুন্দর হয়েছে! ভালই তুলেছিস। বড় করে বাঁধিয়ে রাখার মত।

প্রকাশ বলল— তুই না রাখিস, একদিন আর পাঁচজন তো রাখবে। সমর্থনের আশায় সে বীণার দিকে তাকিয়ে হাসল।

বাড়ী ফিরে এসে কিন্তু অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়া হল প্রকাশের। হঠাৎ মনে হল শিল্পী হিসেবে, মানুষ হিসেবে তার ভূমিকাও ভাল ছিল না। সুন্দরকে সে ভাল-বাসলেও অসুন্দরকে মিছেমিছি ক্ষমা করে এসেছে, সহ্য করে এসেছে এতকাল। ক্ষমা, সহ্যের পিছনে কোন নৈতিকতাই ছিল না। শিল্পী জীবনের নিজস্ব ভূমিকাটিকেও হেডমাস্টারমশাইর মত একটা লাল পেন্সিলে সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেটে খারিজ করে দিতে ইচ্ছে হল।

নিচু টেবিলের উপর কয়েকটা বহুদিন আগে ব্যবহৃত রঙের তুলি রাখা ছিল, প্রকাশ সক্রোধে তা ছুঁড়ে ফেলল। এমন কি কাঁধের ক্যামেরা এমন মমতাশূন্য অসতর্ক-ভাবে ছুঁড়ে দিল যে, ভয় হল ক্যামেরাটা নিশ্চয় অকেজো হয়ে যাবে।

অ্যাকুরিয়ামের খুব কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখল একটি মাত্র যে রঙীন মাছ শেষ পর্যন্ত টিঁকে ছিল সেটা কবে যেন মরে গেছে। সেই রঙীন মাছটার শব বদ্ধ নোংরা জলের উপর সবার অগোচরে কেবল ভেসে বেড়াচ্ছে আর ভেসে বেড়াচ্ছে।

প্রকাশ ভাবল এবার সেই মৃত রঙীন মাছটা দয়াহীন অকম্পিত হাতে বদ্ধ নোংরা জল থেকে তুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে মুহূর্তের মধ্যে। তারপর নতুন কোনো জীবনের কথা ভাববে, নতুন কোনো শিল্পের।

সমাজ, সতীদাহ ও রামমোহন

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

যুগপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের জীবনধারা ও সমাজ বারবার বদলেছে। বারবার ঘটেছে তার রূপান্তর। সমাজের এই পরিবর্তন ও রূপান্তর সর্বদাই আবর্তিত হয়েছে রাজশক্তির সংরক্ষণবিধি অথবা লোকবরেণ্য কোন মহাপুরুষের মানবতাবাদ বা কল্যাণকর নীতিকে কেন্দ্র করে। রাজশক্তি যখনই অসমদর্শী বা আগ্রাসী হয়ে উঠেছে, সমাজের কাঠামো ভেঙে পড়েছে। অনাচার ও আবিলতায় ঘোলা হয়ে উঠেছে মানব-সমাজের স্বচ্ছ জীবনস্রোত। ফলে, সমাজ হয়ে উঠেছে কুসংস্কার ও আবর্জনার স্তূপ।

শতাব্দীর পর শতাব্দী এই আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়ে মানুষের শ্বাসরোধ করেছে। বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন শুভবুদ্ধি দিশেহারা হয়ে গড্ডলিকা প্রবাহের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে অপমৃত্যুর স্রোতে। প্রেতায়িত হয়ে উঠেছে মানুষের সমাজ-জীবন। পঞ্চদশ শতকে একদিকে ধর্মান্ধতা, অন্যদিকে অনাচার এবং মুসলমান শাসক-গোষ্ঠীর একদর্শিতা ও নারীলোলুপতা হয়ে উঠেছিল হিন্দুসমাজের নানা বিপর্যয়ের মূল কারণ। মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুরা বিধর্মী বা কাফের বলে পরিগণিত হতেন, সেইজন্য হিন্দুকে বলপূর্বক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা এবং হিন্দু-নারী অপহরণ হয়ে উঠেছিল প্রাত্যহিক ঘটনা। শক্তি থাকলেও, সংঘবদ্ধতা ও রাজশক্তির আনুকূল্যের অভাবে হিন্দুরা এই উৎপীড়নের সক্রিয় প্রতিরোধ করতে পারেননি। ফলে বিপর্যস্ত হয়েছে হিন্দুর সমাজ-জীবন। নিরুপায় হয়ে অসংখ্য নর-নারীকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে স্বৈরাচারী রাজশক্তির যূপকাষ্ঠে। যদিও অনেককাল পরবর্তী ঘটনা, তবুও প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সুন্দরী কন্যা তারাকে নবাবের লোলুপ দৃষ্টি থেকে রক্ষা করবার জন্যে অর্ধবঙ্গেশ্বরী রানী ভবানীকেও যথেষ্ট বিব্রত হতে হয়েছিল।

এদেশে হিন্দু ও মুসলমান দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করেছেন। পরস্পরের ধর্মমত ও সমাজনীতি বিভিন্নমুখী হলেও সহৃদয় শাসনের, সামানীতির ফলে উভয় সম্প্রদায়ের ভিতর প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠেছে। কিন্তু সে-প্রীতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। এক সময় পূর্ববঙ্গের শাসনকর্তা মীর জুমলা ও ফকরুদ্দিন গাজী অনেক হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে বলপূর্বক দীক্ষিত করেন। ফকরুদ্দিন গাজী যাঁদের ধর্মান্তরিত করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাটরা কলাগাছি (বর্তমান ফরিদপুরের অন্তঃপাতী) নিবাসী মনোহরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর পত্নী উজ্জ্বলা দেবী। এঁদের পুত্র হরিদাস তখন অষ্টমবর্ষীয় বালক। এই বালকই চৈতন্য যুগে যবন হরিদাস নামে পরিচিত হন। এইভাবে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হওয়া ছাড়াও, বহু হিন্দু নানা কারণে স্বেচ্ছায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ মুসলমান হয়েছিলেন নবাব-বাদশাহের দরবারে উচ্চ রাজপদের লোভে, কেউ বা সমাজ-গর্বিত আচার-ব্যবহারের জন্য পতিত অথবা ব্রাত্য হয়ে মুসলমান ধর্মের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাছাড়া, কেশ কিছু সংখ্যক নরনারী অবৈধ প্রণয় বা সমাজ-নিন্দিত যৌন সম্পর্কে জড়িত হয়ে, সমাজ ও কুলত্যাগ করে ধর্মান্তরের আওতায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এই সব ধর্মত্যাগী দম্পতিদের অধিকাংশ নায়িকাই ছিলেন বিধবা। তখনকার হিন্দুসমাজে বিধবা নারীই ছিল এক দুরূহ সমস্যা। নিঃসন্তান তরুণী বিধবার সংখ্যা সমাজে কম ছিল না। পুরুষের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু বিধবা নারীর দ্বিতীয়বার স্বামী গ্রহণের কোন বিধান হিন্দুশাস্ত্রে ছিল না। ফলে, তাঁরা হয় অপরিণত বয়সে কৃচ্ছ্রসাধন করে কঠোর ধর্মচারিণী হতেন, অথবা দেহধর্মের স্বাভাবিক তাগিদে অবৈধ প্রণয়ে আকৃষ্ট হয়ে কুলত্যাগিনী হতেন। ধর্মের প্রলেপে দেহের ক্ষুধা প্রশমিত করা কোনদিনই সহজসাধ্য ছিল না। তাছাড়া, ভয় ছিল অপহরণ ও ধর্ষণের। সেই জন্য সামাজিক মানমর্যাদা রক্ষা এবং নিগ্রহের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে অনেকেই আত্মহত্যা করতেন। কেউ কেউ হয়তো পতিশোকে বিধুরা হয়ে মৃত্যুবরণ করতেন উদ্বন্ধনে বা বিষপানে, কেউ বা অগ্নিপ্রবেশ করতেন স্বামীর চিতায়। পতিশোকাতুরা নারীর এতাদৃশ আত্মঘাত এযুগেও ঘটেছে এবং এখনো ঘটে। বিরল হলেও সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সেকালে সমাজ-ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত কঠোর, এবং বিধবার জীবন ছিল অতিশয় বিপদসংকুল। কাজেই আত্মহত্যাই হয়ে উঠেছিল তাঁদের আত্মরক্ষার একমাত্র পথ। এই আত্মবিসর্জন সহমরণের রূপ নিয়ে 'প্রথায়' পরিণত হলো। অবশ্য এই প্রথাগত আত্মবিসর্জনের মূলে স্বার্থসচেতন সমাজপতি এবং বিষয়লোভী জ্ঞাতিবর্গের প্ররোচনাও থাকতো যথেষ্ট পরিমাণে।

বস্তুতঃ চারিদিক দিয়ে প্রচণ্ড ভাঙন ধরেছিল সনাতন হিন্দু সমাজে। একদিক দিয়ে অনাচার দোষে ব্রাত্য বা পতিত হয়ে উচ্চ-নীচ-বর্ণ-নির্বিশেষে অগণিত হিন্দু মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হতে লাগলেন। অন্যদিকে অবৈধ প্রণয়, ছুতমার্গ ইত্যাদি নানা কারণে দলে দলে হিন্দুরা মুসলমান ধর্মের ছত্রতলে আশ্রয় নিতে লাগলেন। সেখানেই সমাপ্তি হলো না এই ভাঙনের। অনাচার ও উচ্ছৃংখলতার আবর্তে হিন্দুর সমাজজীবন পঙ্কিল হয়ে উঠলো। আপন আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূলে সমাজপতিরা বইঠা বাইতে শুরু করলেন। সমাজে যাঁরা ধনবান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁদের প্রভাব বর্ধিত হলো। সমাজপতিরা তাঁদের কুক্ষিগত করলেন। ফলে, জনজীবন হলো বিভ্রান্ত, সমাজ দাঁড়ালো ধ্বংসের মুখোমুখী। সাধারণ মানুষের জীবনতরণী টলমল করে উঠলো।

সমাজের এই ভয়াবহ ভাঙন রোধ করবার জন্য বাংলাদেশে প্রথম অগ্রবর্তী হলেন নবদ্বীপের স্বনামধন্য স্মার্তিকার পণ্ডিত রঘুনন্দন শিরোমণি। এবং দক্ষিণ ভারতে অগ্রণী হয়েছিলেন বিজয়নগরের দিকপাল পণ্ডিত মাধবাচার্য। তাঁরা নতুন করে স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসনে বাঁধলেন ধ্বংসোন্মুখ বিশৃঙ্খল হিন্দুসমাজকে। সমাজের অগণিত অসহায় বিধবার সমস্যা তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না। তাঁরা চিন্তা করলেন নিঃসন্তান বিধবা এবং অক্ষত নারীর পুনর্বিবাহের কথা। এই সব নিরুপায় নারীর পুনর্বিবাহের কথা পূর্বে কোন মনীষী বা সমাজপতি চিন্তা করেননি। সে-সুযোগ শুধু পুরুষেরই ছিল, এমনকি, পুনর্বিবাহ ছাড়াও একাধিক বিবাহের অধিকার তাঁদের ছিল। কিন্তু সে-অধিকার নারীর ছিল না। অহল্যা দ্রৌপদী তারা কুন্তী ও মন্দোদরী প্রভৃতি ছিলেন সে-নিয়মের বিরল ব্যতিক্রম। একাধিক স্বামী ও এককালীন পঞ্চস্বামী পরিগ্রহ করেও তাঁরা সমাজে সতীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তবে এই মর্যাদা প্রচলিত সমাজবিধি লঙ্ঘন করে হিন্দু সমাজে কোনদিন স্বীকৃতি লাভ করেনি। সম্ভবতঃ পৌরাণিক যুগের এই মহীয়সী মহিলারা যাতে পরবর্তীকালে লোকচক্ষে হেয় না হন, সেইজন্যই শাস্ত্রকারেরা তাঁদের সতী আখ্যা দিয়েছিলেন। যাই হোক, পঞ্চদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত মনুর ধর্ম-সংহিতা ও লোকাচার অনুযায়ীই সমাজ-ব্যবস্থা পরিচালিত হতো। সেই জীর্ণ সমাজ-ব্যবস্থাকে পুনরায় বিধিবদ্ধ করলেন মাধবাচার্য ও রঘুনন্দন। বিধবাদের

সংরক্ষণের জন্য তাঁরা ক্ষেত্রবিশেষে পুনর্বিবাহ এবং স্বামীগৃহে অবস্থানের অধিকার সম্পর্কে বিধান দিলেন। নবদ্বীপের রঘুনন্দন বিধান দিলেন—'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' (মৃতে প্রমৃতে প্রবাসংগতে) অর্থাৎ স্বামী ভ্রষ্টচরিত্র বিপথগামী, সুরাপায়ী অথবা যক্ষ্মা কুষ্ঠ পুরুষত্বহীনতা প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিতে প্রমৃত বা মৃতকল্প হলে, স্বামীর মৃত্যু ঘটলে, অথবা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে স্বামী গৃহত্যাগী ও চিরপ্রবাসী (দ্বাদশ বর্ষের অধিক কাল নিরুদ্দেশ) হলে নিঃসন্তানা বিধবা নারী পুনর্ভূ হতে পারেন অর্থাৎ পুনরায় স্বামী গ্রহণ করতে পারেন। মাধবাচার্য ও অনুরূপ বিধান দিয়েছিলেন। মাধবাচার্য ছিলেন বিজয়নগরের বিখ্যাত স্মৃতিকার পণ্ডিত। তাঁর বিধান দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারতে প্রচলিত হলো, কিন্তু বাংলা দেশে অনুসৃত হলো রঘুনন্দনের স্মৃতি। উত্তর ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হিন্দুদের ভিতর বিধবা ভ্রাতৃজায়ার সংগে দেবরের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক এখনো প্রচলিত আছে। দেবর জীবিত থাকলে বিধবা ভ্রাতৃজায়া দক্ষিণ প্রকোষ্ঠ নিরাভরণ করেন। কিন্তু বাম প্রকোষ্ঠে কংকন রাখেন।

রঘুনন্দন বিধবার পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা দিলেন, কিন্তু বাংলাদেশে সে-প্রথা প্রচলিত হলো না। উচ্চবর্ণের ভিতর কদাচিৎ এ-অনুশাসন গৃহীত হলো। কিন্তু সমাজে সে-নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলো, সাধারণ মানুষের নাসিকা কুঞ্চিত হলো। সংস্কারের বিলোপ সাধন খুব কঠিন।

সাধারণ মানুষের মনে প্রচলিত সংস্কার ছিল দুয়েমণ—একপত্নো ভবেৎ সতী, দ্বিতীয়ে হি পুনর্ভূ স্যা, তৃতীয়ে কুলটা জ্ঞাতা, তদূর্ধ্বে তু বারাঙ্গনা।' কেউ কেউ বললেন—'রজস্য শুদ্ধ্যতে নারী।' কিন্তু সাধারণ সমাজ সে-কথা মেনে নিতে পারেনি। বংশ পিতৃগত। সেই কারণে রক্তধারার শুদ্ধতা বজায় রাখবার জন্যই বোধহয় এ-বিষয়ে সমাজের ব্যবস্থা অত কঠোর ছিল। নরনারীর যৌন মিলনে পুরুষের দেহে কোন রক্তকণিকা প্রবেশ করে না, কিন্তু নারী-দেহে প্রবেশ করে। ক্ষেত্রজ সন্তানের কথা উল্লিখিত থাকলেও, সে-রীতি কোনদিন জনস্বীকৃতি পায়নি। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ভিতর 'সাঙ্গা' পূর্বেও ছিল, পরেও রইল। এটা মুসলমান সমাজের নিকা'র মত। সুতরাং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বিধবা-সমস্যার সমাধান হলো না। সহমরণ রোধ হলো না। ছিদ্রপথে যে পরিস্রুত জল বেরিয়ে গিয়ে সমাজের বহিঃপ্রান্তে কর্দমাক্ত নালায় পড়ছিল, তাও বন্ধ হলো না। রঘুনন্দন প্রবর্তিত স্মৃতির কঠোর অনুশাসনের ফলে সমাজের সংরক্ষণশীলতা গেল আরো বেড়ে। সমাজচ্যুত হিন্দুর সংখ্যা যত বাড়তে লাগলো, তত বেশী হতে লাগলো মুসলমানের সংখ্যা। তাছাড়া, 'অচ্ছুত' ব্যাধি হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত উৎকট। নিম্নশ্রেণীর মানুষ, যারা সমাজকে সেবা করেও সমাজে মর্যাদা পায়নি, ছিল অস্পৃশ্য ও অবহেলিত, ইসলাম ধর্মের চুম্বক আকর্ষণ তাদের দলে দলে টেনে নিতে লাগলো। অবৈধ প্রণয়ে আকৃষ্ট এবং সমাজে অবহেলিত অসংখ্য নরনারী স্বেচ্ছায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে লাগলো।

স্মৃতিশাস্ত্র যা পারেনি, সমাজের সেই ভয়াবহ ভাঙন রোধ করলেন শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর প্রেমধর্ম প্রচার করে। আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ-শূদ্র যবন—সকলেই তাঁর কোলে আশ্রয় পেলো। উৎকট অস্পৃশ্যতা প্রশমিত হলো। ধর্মান্তর গ্রহণের চুম্বক আকর্ষণ শিথিল হলো। বেদাশ্রয়ী সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষা পেলো আসন্ন ধ্বংসের গ্রাস থেকে। মেঘমুক্ত সগুণ ব্রহ্মবাদের প্রাণসত্তা পক্ষ বিস্তার করলো নির্মল আকাশে। অবৈধ ও অসবর্ণ প্রণয়ে আসক্ত যেসব নরনারী সমাজ ত্যাগ করে মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করতো, তারা 'মালাচন্দন' (বৈষ্ণব বিবাহ) করে হিন্দু সমাজেই রইল। এই মালাচন্দনের পুরোহিতদের বলা হতো 'ভাবুক মহলের গোসাঁই'। সন্তান-সন্ততি সমাজে মর্যাদার সংগে স্থান পেলো। শ্রীগৌরাঙ্গের সাম্যবাদ অশেষ কল্যাণ সাধন করলো জীর্ণ হিন্দু সমাজের।

এই সময় গৌড়বঙ্গের বাদশা ছিলেন হোসেন শাহ। তাঁর পক্ষপাতশূন্য শাসনের ফলে হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর গড়ে উঠলো প্রীতির বন্ধন। বলপূর্বক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা বন্ধ হলো। গৌড়বঙ্গের এক অভাবনীয় সাংস্কৃতিক উজ্জীবন হলো। তখন বাদশাহের প্রধানমন্ত্রী (সাকর মল্লিক) ও খাস মুন্সী (প্রাইভেট সেক্রেটারী) ছিলেন অমর ও সন্তোষ। তাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমও (শ্রীজীবের পিতা বল্লভ) বাদশাহের দরবারে চাকুরি করতেন। নৈহাটি-ঝামটপুরের বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশে এঁদের জন্ম হয়, কিন্তু মুসলমানের দাসত্ব ও অন্নগ্রহণের ফলে এঁরা সমাজে পতিত ও ব্রাত্য হন এবং উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত থেকেও যবন বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। অমর ও সন্তোষ ছিলেন সংস্কৃত এবং ফার্সি ভাষায় অসামান্য পণ্ডিত। গৌড়ের সন্নিকটস্থ রামকেলিতে এঁরা শ্রীগৌরাঙ্গের সংগে মিলিত হয়ে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন থেকে তাঁরা পরিচিত হলেন সনাতন ও রূপ গোস্বামী নামে। সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন ও কাব্যে সনাতন এবং রূপ গোস্বামীর অবদান জাতির এক অবিস্মরণীয় সম্পদ। সনাতনের উৎসাহে বাদশা হিন্দু তীর্থযাত্রীদের জন্য মালদহ-গৌড় থেকে পুরীধাম পর্যন্ত চারশত মাইল দীর্ঘ এক প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ করেন। এই রাজপথ বাদশাহী সরান নামে খ্যাত। হোসেন শাহের সাম্যনীতির ফলে হিন্দুধর্মের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের পথও সুগম হলো।

সেই উদারনৈতিক শাসন ও সমাজব্যবস্থা বেশীদিন স্থায়ী হলো না। যেসব সমস্যা পূর্বে ছিল, সেগুলি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। নারীহরণ, শুচিবায়ু ও ধর্মান্তর গ্রহণের অপায় থেকে সমাজকে মুক্ত করবার আর কোন সক্রিয় প্রচেষ্টা হয়নি। হিন্দু বিধবাদের অসহায় অবস্থারও কোন পরিবর্তন হলো না। যে কারণে রাজপুত রমণীরা জহর ব্রত করেছিলেন, ঠিক সেই কারণেই অসংখ্য বঙ্গনারী প্রাণ বিসর্জন দিলেন স্বামীর চিতায় অগ্নিপ্রবেশ করে।

আদর্শের জন্য প্রাণবিসর্জনের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নয়। জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য অনেক দেশপ্রেমিক স্বেচ্ছায় প্রাণবিসর্জন দিয়েছেন। কিন্তু সে তো নিত্য ঘটনা নয়। অপহরণ ও ধর্ষণের ভয়ে হিন্দু-বিধবাদের আত্মহত্যা হয়ে উঠেছিল দেশে প্রাত্যহিক ঘটনা। এটাই সহমরণের রূপ নিয়ে জনজীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। এবং প্রথা হিসাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রচলিত হয়েছে। সহমরণ বাধ্যতামূলক সমাজব্যবস্থা হলে, মাধবাচার্য ও রঘুনন্দনের কালে বিধবার পুনর্বিবাহের প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া সম্ভব হতো না। বিধবা নিশ্চয়ই সে-সময় ছিল এবং থাকার সম্ভাবনাও ছিল।

আদর্শ! সাধারণ মানুষ আদর্শের চেয়ে জীবনকে অনেক বেশী ভালবাসে। কাজেই অনেক নারী মৃত্যুভয়ে প্রথাগত আত্মবিসর্জন থেকে বিরত হয়েছেন। আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে তাঁরা বেঁচে থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু জৈবজীবনের লালসা সহজে নিরোধ করা যায় না। ফলে, অবৈধ প্রণয়ে

আকৃষ্ট হয়ে তাঁরা গৃহত্যাগী হয়েছেন। কেউ কেউ ভেক নিয়ে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী হয়ে ঘর বেঁধেছেন। কেউবা কুলত্যাগিনী হয়ে অধোগামী জীবনের পিচ্ছিল পথে পা বাড়িয়েছেন। সমাজ এঁদের ঘৃণা করেছে, কিন্তু মানবতার সঙ্গে এঁদের কথা ভাবেনি কোনদিন।

সকলের মন তো চায় না জঘন্য জীবনের পিচ্ছিল পথে পা বাড়াতে। নারীর মন চায় পুরুষকে আঁকড়ে ধরে ঘর বাঁধতে। চায় সন্তান সংসার আর সেই সঙ্গে শেষজীবনের নিশ্চিন্ত আশ্রয়। সেই জন্য অনেক বিধবা সমাজ-নিষিদ্ধ প্রণয়ে আকৃষ্টা হয়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করে নতুন সমাজ পেতে চেয়েছেন। মুসলমান সমাজ ছিল এ-বিষয়ে অত্যন্ত উদার। তাই তাঁরা দলে দলে মুসলমান ধর্মের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। সমাজপতিরা অবশ্য সর্বদাই তাঁদের মনে আদর্শ উদ্বুদ্ধ করে আত্মঘাতে প্ররোচিত করেছেন। কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো অনিচ্ছায় তাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন। স্বেচ্ছায় যাঁরা মরতে চাননি, সমাজ তাঁদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। পতিকুল ও পিতৃকুল রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণে অগ্রসর হতে চাননি। বিষয়লোভী জ্ঞাতিবর্গ ও আত্মীয়স্বজন দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার জন্য জোর করে তাঁদের ঠেলে দিয়েছেন মৃত্যুর মুখে—স্বামীর চিতায়। সহমরণের প্রথা পর্যবসিত হয়েছে সহদাহনে। এরই সুস্পষ্ট রূপ সতীদাহ। অগ্নিদাহের অসহ যন্ত্রণা ও বিভীষিকায় আর্তনাদ করেছে নারী-হৃদয়। কিন্তু কে শুনবে সে আর্তনাদ? ঢাক বাজিয়ে, বাহবা দিয়ে সে মর্মন্তুদ আর্তনাদকে চাপা দেওয়া হয়েছে।

মুসলমান রাজত্বের অবসান হলো ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, পলাশীর যুদ্ধে। তারপর ধীরে ধীরে আত্মবিস্তার করতে লাগলো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন। মুসলমান ধর্মের আগ্রাসন প্রশমিত হলো, এলো খৃষ্টান ধর্মের জোয়ার। ইংরেজ জাতি যেখানেই আত্মবিস্তার করেছে, সেখানেই দু' বাহু প্রসারিত করে আলিঙ্গনের জন্য অগ্রসর হয়েছেন ক্রিশ্চিয়ান মিশনারীর দল, এসেছেন পাদ্রী ও ধর্মযাজকেরা। ঠিক যে কারণে একদিন অনেক হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, সেই সেই কারণেই আবার খৃষ্টান হওয়ার হিড়িক পড়ে গেল। চাকরির মোহ, খাদ্যাখাদ্য বিচারের স্বাধীনতা, সমাজনিষিদ্ধ অবৈধ প্রণয়, এবং শ্রেণীগত অবজ্ঞা বা অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি নানা কারণে অনেক হিন্দু খৃষ্টান ধর্মের আওতায় আশ্রয় নিতে লাগলেন। রহস্যচ্ছলে এঁদের 'পেন' (Pen) ক্রিশ্চিয়ান, 'হেন' (Hen) ক্রিশ্চিয়ান, 'উয়োম্যান' (Woman) ক্রিশ্চিয়ান ও 'প্যাডি' (Pad[illegible]) ক্রিশ্চিয়ান বলা হতো। সমাজে আবার ভাঙন ধরলো।

এই সময় আবির্ভাব হলো রামমোহন রায়ের। তিনি ধর্মান্তরের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ালেন। রামমোহন ছিলেন উদারনৈতিক। তিনি সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। মহামতি ডেভিড হেয়ারের সাহায্যে ইংরাজী ভাষাও শিক্ষা করেছিলেন। তারপর বারাণসীতে গিয়ে হিন্দুশাস্ত্র এবং উপনিষদ্ পাঠ করেন। বিখ্যাত ফার্সি পণ্ডিত আলবেরুণী যেমন উপনিষদ্ পাঠ করে উপলব্ধি করেছিলেন যে, মূলতঃ হিন্দু ধর্মের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের কোন পার্থক্য নাই, উভয় ধর্মই নিরাকার ঈশ্বরবাদী, তেমনি রামমোহনও উপলব্ধি করলেন যে, একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারাই হিন্দু সমাজের সাম্প্রদায়িক বিভেদ দূর করে, উদারনৈতিক ধর্মমত ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যায়। তিনি হিন্দু উপনিষদের মূলতত্ত্ব অবলম্বনে নিরাকার ব্রহ্মে উপাসনার জন্য নব ধর্ম প্রবর্তন করলেন, এবং জাতি ভেদহীন উদারনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। এই ধর্মের নাম হলো ব্রাহ্ম ধর্ম, এবং সমাজের নাম হলো ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্ম ধর্মকে স্বতন্ত্র একটি ধর্ম বললে ভুল হবে। যেমন শাক্ত, বৈষ্ণব, আউলিয়া ইত্যাদি সনাতন হিন্দু ধর্মেরই এক-একটি শাখা বা সম্প্রদায়বিশেষ, ব্রাহ্মধর্মও হলো তেমনি উপনিষদ্ আশ্রয়ী একটি নতুন পন্থা বা ধর্মমতাবলম্বী সম্প্রদায়।

প্রগতিশীল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই এই নবধর্মে দীক্ষিত হলেন। হিন্দুধর্মের আওতায় থেকে, অবাধ আহার-বিহার ও সামাজিক মেলামেশার দ্বার উন্মুক্ত হলো। চিৎপুর রোডে, জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের বাসভবনের সন্নিকট একটি ব্রাহ্ম উপাসনা মন্দির তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠিত হলো ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে। এই উদারনৈতিক, জাতিভেদ ও ছুতমার্গ বর্জিত, নব্য সমাজ প্রবর্তন করে রামমোহন হিন্দু জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করলেন। খৃষ্টান ধর্মের প্রবল আকর্ষণ থেকে হিন্দু সমাজ রক্ষা পেলো।

পরবর্তীকালে রামমোহন প্রবর্তিত এই ব্রাহ্মসমাজ তিনটি ধারায় প্রবাহিত হলো : আদি সমাজ, সাধারণ সমাজ ও নববিধান। ব্রহ্মবাদী উদারনৈতিক সমাজব্যবস্থায় নরনারীর অবাধ মেলামেশার ফলে কিছু কিছু অপায়ের উদ্ভব হয়েছিল। সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। এই অপায় নিবারণের জন্য অপেক্ষাকৃত সংরক্ষণশীল সমাজ 'নববিধান' প্রবর্তন করলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। নববিধানের বিধান হলো হিন্দু-সমাজ বিধানে গা-ঘেঁষা।

যাই হোক, একদিন মুসলমান ধর্মের আগ্রাসন থেকে হিন্দুকে রক্ষা করেছিলেন যুগাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করে, আর পরবর্তীকালে রামমোহন হিন্দু জাতিকে রক্ষা করলেন খৃষ্টান ধর্মের গ্রাস থেকে তাঁর উদারনৈতিক ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। তবে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্মের সুশীতল ছায়ায় স্থান পেয়েছিল আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ-শূদ্র-ক্ষেতমজুর-দীন-দুঃখী-দরিদ্র ভিক্ষুক; কিন্তু রামমোহন প্রবর্তিত ধর্ম ও সমাজে দীন-দুঃখী ক্ষেতমজুর ও ভিখারী স্থান পায়নি। তবুও এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে, রামমোহন তাঁর নব্য ধর্ম ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করে দেশের কল্যাণ সাধন করেছিলেন এবং জাতিকে প্রগতির পথে অগ্রসর করেছিলেন।

এত বড় অবদান সত্ত্বেও রামমোহন এ-দেশের জনমনে সংবেদন সৃষ্টি করতে পারেননি। তার প্রধান কারণ ছিল তিনটি। প্রথম, রামমোহনের ব্রহ্মবাদ উপনিষদের ব্রহ্মবাদ। ইসলামের আল্লাহ্ নিরাকার হলেও চতুর্দশ মহাগুণের আধাররূপে তাঁকে কল্পনা করা যায়। উপনিষদের ব্রহ্ম 'অবাঙ্মনোগোচরঃ'। উপনিষদকার বলেছেন—'যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্ গচ্ছতি ন মনঃ।।' অর্থাৎ বাক্য সেখানে পৌঁছতে পারে না, মন সেখান থেকে ফিরে আসে, চোখ তাঁকে দেখতে পায় না। 'নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তং শক্যোন চক্ষুষা, অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।।' বাক্য মন চক্ষু—কোনকিছুর দ্বারাই যখন তাঁকে পাওয়া যায় না, তখন একমাত্র আছেন এই কথা বলা ছাড়া অন্য কোন উপলব্ধি তাঁর সম্পর্কে হয় না। সুতরাং উপনিষদের এই কল্পনাতীত ব্রহ্মের উপাসনা জনসাধারণের

পক্ষে সম্ভব ছিল না, আজো নয়। তাই রামমোহনের ব্রাহ্ম ধর্ম নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে গেল।

দ্বিতীয় কারণ—রক্ষণশীল বৃহত্তর হিন্দু সমাজে রামমোহন স্বেচ্ছাচারী রূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। তাঁর ধর্মমত জনসাধারণ গ্রহণ করেনি।

তৃতীয় কারণ, তাঁর ইংরেজ প্রীতি। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির পর দেশবাসীর মন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সম্পর্কে বিষিয়ে উঠেছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন কোম্পানীকে ভারত থেকে বিতাড়িত করতে। কিন্তু রামমোহন চেয়েছিলেন সিমলা-কাশ্মীর ও দার্জিলিঙের অনুকূল আবহাওয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে, ইংরেজ ভারতে রাজত্ব করুন।

যাই হোক, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কয়েক বৎসর পূর্ব থেকেই রামমোহন ভারতের কল্যাণকর দুটি মহান্ ব্রতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। প্রথমটি, সরকারের সাহায্যে দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন। ইংরেজ (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী) তখন ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট। নামে মাত্র তখন দিল্লীর বাদশাহ এবং অন্যান্য নবাব ও রাজন্যবর্গ থাকলেও, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হয়ে উঠেছিল শক্তিশালী। তাঁদের আনুকূল্যে ইংরাজী শিক্ষা দ্রুত বিস্তার লাভ করলো সারা ভারতে। প্রদেশগত ভাষা-বৈষম্যের জন্য সামগ্রিক স্বদেশ-চেতনা সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। প্রাদেশিকতার সেই গণ্ডী ভেঙে গেল। ভাব আদান-প্রদানের পথ সুগম হলো। স্বদেশ চেতনায় এলো একটা নতুন জোয়ার। জাতির জীবনে নতুন করে জেগে উঠলো দেশাত্মবোধ 'ভারত ও ভারতবাসী' বোধ। এই সার্বিক দেশাত্মবোধের জন্য আমরা রামমোহনের নিকট চিরঋণী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বার উন্মুক্ত হলো রামমোহনের এই অবদানে। এই জন্যই তাঁকে বলা হয় (Maker of Modern India) নব্য ভারতের উদ্ভাবক।

তাঁর দ্বিতীয় ব্রত হয়েছিল 'সমাজ সংস্কার'। জাতিগত বৈষম্য, বর্ণবিভেদ, অস্পৃশ্যতা এবং খাদ্য-দোষে সমাজচ্যুতি

ইত্যাদি দূর করবার জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প হয়ে উঠেছিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী যেসব কুসংস্কার পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল, সেগুলি নির্মূল করতে না পারলে, সমাজ কোনদিনই কল্যাণকর মানব-সমাজ হবে না। সমাজের কতকগুলি কুপ্রথা তাঁকে উৎপীড়িত করে তুলেছিল। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে, সেগুলির মূলোচ্ছেদ ব্যতীত 'সমাজ' স্বাস্থ্যকর হবে না। কুসংস্কার এবং কুপ্রথা পৃথিবীর সর্বদেশে ও সকল সমাজে কিছু-না-কিছু আছে। কিন্তু সেই কুসংস্কার বা কুপ্রথা যখন নৃশংস অপপ্রয়োগে উৎকট হয়ে ওঠে, তখনই হয় মারাত্মক। মানুষ হয়ে ওঠে মনুষ্যপদবাচ্য হওয়ার অযোগ্য।

কৈশোরে রামমোহন দেখেছিলেন আপন পরিবারে এই উৎকট কুপ্রথার এক অমানুষিক ও নৃশংস অপপ্রয়োগ। তাঁর বিধবা ভ্রাতৃবধূকে জোর করে স্বামীর চিতায় বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল সহমরণে। অসহায় নারীর আর্তনাদ ও আবেদন ব্যর্থ হয়েছিল। আদর্শ হয়ে উঠেছিল জল্লাদের চেয়েও নির্মম। সেই সতীদাহের মর্মন্তুদ দৃশ্য রামমোহন কোনদিন ভুলতে পারেননি। তাই সমাজ-সংস্কার ও সমাজের কুপ্রথা নিবারণ হয়ে উঠেছিল রামমোহনের জীবনের আর একটি মহান্ ব্রত। বিশেষ করে, ধর্ম ও সমাজের নামে নৃশংস নারী-হত্যা 'সতীদাহ' নিবারণের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলেন এবং তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের সাহায্যে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে 'সতীদাহ নিবারণ' আইন প্রবর্তিত করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সহমরণ ছিল কয়েক শতাব্দীর পুরাতন প্রথা। প্রথা পুরাতন হলেও, সে-রীতি বাধ্যতামূলক ছিল না। তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। প্রচলিত যে প্রথা ছিল, সভ্যতার বিবর্তন ও যুগধর্মের প্রভাবে তার কঠোরতা আপনা-আপনি অনেকখানি শিথিল হয়ে এসেছিল। কদাচিৎ সংঘটিত হতো সহমরণ। তার চেয়েও বিরল হয়ে উঠেছিল সতীদাহ। যেসব ক্ষেত্রে স্বামীর জীবদ্দশাতেই কোন নারীর চরিত্রে ভ্রষ্টাচারের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠতো, অথবা যার ভরণপোষণ ও সংরক্ষণের ভার নিতে পিতৃকুল ও পতিকুল দু-ই নিতান্ত পরাঙ্মুখ হতো, তাকেই জোর করে ঠেলে দেওয়া হতো মৃত্যুর মুখে। কোথাও কোথাও আইনের চোখে ধুলো দিয়ে এই ধরনের নারীহত্যা আজও ঘটে, অথবা জ্ঞাতিদের চক্রান্তে তাঁকে কুলত্যাগিনী হতে বাধ্য করা হয়। তবে এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে, অতিবিরল হলেও, সতীদাহের দৃষ্টান্ত সে-সময় দু' একটি ছিল। কিন্তু তাকে প্রথা বলা চলে না। একটি-দুটি কোকিল ডাকলেই বসন্তকালের সমাগম হয় না, যাঁরা কোকিল শীতের রাতেও ডাকে।

একথা অস্বীকার করা যাবে না যে তদানীন্তন হিন্দু সমাজে প্রচলিত সতীদাহ কুপ্রথার যে চিত্র লোকচক্ষে তুলে ধরা হয়েছে, তা বস্তুতঃ একটি মিথ; সনাতন হিন্দু সমাজ-বিরোধী অতিপ্রচার। রামমোহন সতীদাহ-নিবারক আইন প্রবর্তন করেছিলেন ১৪৩ বৎসর পূর্বে। অর্থাৎ এখন থেকে ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষ পূর্বে। কাজেই প্রাগৈতিহাসিক বা বিস্মৃত অতীত যুগে নয়, পিতামহের পিতার আমলে। ব্যক্তিগত ভাবে আমরা যদি আপন আপন পরিবারে অনুসন্ধান করি, তাহলে জানা যাবে যে, শতকরা একটি পরিবারেও এ ঘটনা ঘটে নি। তবুও সে যুগে কোথাও না কোথাও যে সতীদাহ ঘটেছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। তার একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং রামমোহন সতীদাহ নিবারণ আইন প্রবর্তিত করে, নিরপরাধ নারীহত্যার যে মহাপাতক থেকে জাতিকে উদ্ধার করেছিলেন তা অবিস্মরণীয়। তিনি বিধবার সামাজিক মর্যাদা রক্ষা এবং সম্পত্তি ভোগদখলের অধিকার সম্পর্কে তিনি বিধান প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেছিলেন।।

উদারনৈতিক ধর্মমত প্রচার, ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন ও সতীদাহ নিবারণ—এ তিনটি মহান্ ব্রতের অগ্রপথিক হিসাবে রামমোহনকে নিঃসংশয়ে নব্য ভারতের উদ্ভাবক 'Maker of Modern India'—বলা যায়।

রামমোহনের অপর শ্রেষ্ঠ কীর্তি বাংলা গদ্য-সাহিত্যের পথনির্দেশ। বঙ্গ ভারতীর আজ যে সমৃদ্ধ বিরাট সৌধ গড়ে উঠেছে, তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন রামমোহন। তাঁর এই অবদান সতীদাহ নিবারণের চেয়েও অনেক বেশী মহান ও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাভাষা আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। বাংলা সাহিত্যের ত্রিবেণী ধারা প্রবাহিত হলো, সে-ধারা প্রবাহের ভগীরথ রামমোহন। বস্তুতঃ রামমোহন থেকে শুরু হলো আধুনিক বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ। বাংলাভাষার প্রচার প্রসারের জন্য তিনি 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকা প্রকাশ করেন, এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

সাহিত্যই জাতির গৌরব ও চিন্তাধারার বাহক। বাঙালী জাতির এই গৌরবের দ্বার উন্মোচন করেছিলেন রামমোহন। তাই সমগ্র জাতি রামমোহনের নিকট চিরঋণী। বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে রামমোহন এক অবিস্মরণীয় পুরুষ।

(ষোল)
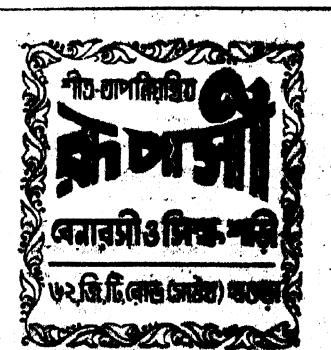
সূর্য ডুবছিল একটু একটু করে। আলোর তেজ পড়ে গেছে। এবার গুটিয়ে নিয়ে পালাবার ব্যস্ততা। মাঝে মাঝে বাতাস বইছে। কিছুটা এলোমেলো; যেন অন্য সুর। হাওয়াটা আগের মতন তেমন কনকনে নয়, ধারটা অনেক কমেছে। শীত বুঝি এবার যাওয়ার মুখে। কুয়াশার রঙটাও এখন পাতলা, ফিকে হয়ে এসেছে। দূরে চোখ রাখলে ধরা যায়। ঝিলের জলে অল্প অল্প ঢেউ। কিনারে বুনো ঝোপের গন্ধ। কলমীর ফুল ফুটেছে। জলের ধারে ধারে তখনো কয়েকটা বক কী এক নেশায় যেন বসে রয়েছে, ঘোরাঘুরি করছে লঘু পায়ে। এক জোড়া মাছরাঙা ঝাপটি মেরে বসে আছে জলের পাড়ে। এরা ছাড়াও আরো অন্য জাতের পাখিরা ওখানে তখন নেমে এসেছে, খেলায় মেতেছে ওরা। ফড়িং উড়ছিল। দূরের ক্ষেত মাঠ কিসের এক শূন্যতায় যেন ভরে উঠেছে। দেহাতী চাষীরা ঘরে ফেরার জন্যে তৈরী হচ্ছে। শান্ত নিরিবিলি জায়গা। অনীশ কী এক ঘোর লাগা চোখে এসব দেখছিল।

অতসী মুখ নীচু করে আনমনে মাটিতে কেবল দাগ কাটছে। তার চোখমুখে একটু ভার ভার। থেকে থেকে কী এক অভিমান তাকে আচ্ছন্ন করছে।

অনীশও গম্ভীর। অন্যমনস্ক। তারও মন ভাল নেই। সর্বক্ষণ এলোমেলো ভাবনায় সেও ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। একটা দিন যে কী ভাবে তার গেছে, শুধু সে-ই জানে। অতসীর সঙ্গে দেখা হয়েছে তার, কথা বলেছে সে, হেসেছে; তবু কোথায় যেন একটা অভাব থেকে গেছে অনীশের। দুদিন আগের সেই আবেগ, উত্তাপই বা কোথায়? সে জানে, অতসী তার এই আচরণে ক্ষুণ্ণ, আহত হয়েছে। তার এই কষ্ট ওকেও খানিকটা দিতে পারলে সে-ও হালকা বোধ করত, স্বস্তি পেত। কিন্তু পারল না সে এর ভাগ দিতে। মাঝের কটা দিন কী এক ঘোরের ভেতর দিয়ে তার কেটেছে। আজই সকালে বন্ধুর চিঠি পেয়েছে সে। তারপরই মনে মনে সে সব ঠিক করে ফেলেছে। এভাবে একা একা এই যন্ত্রণা সওয়ার কোন মানে নেই তার। অতসীকে নিজেই আজ সে ডেকে নিয়ে এলো। ওর কাছে সবই তার খুলে বলা দরকার। তাছাড়া এই মুহূর্তে ওকেই সব বলা যায়। বলতেই হবে তাকে।

অতসী আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শান্ত ভরাট চোখে ওর দিকে চেয়ে থাকল। পরে ধীরে ধীরে বলল, 'তোমার কি হয়েছে, এটা জানবারও কি আজ অধিকার নেই আমার?' অতসীর গলাটা কেমন ভাঙা ভাঙা শোনালো, চোখের পাতা কেমন আর্দ্র।

অনীশ তাকাল একবার। তারও চোখ দুটো বিষণ্ণতায় ভেজা, পরে অন্যদিকে চেয়ে ক্লান্ত গলায় বলল, 'যদি অধিকারেরই কথা বলো, সেখানে তুমি ছাড়া তো আর কাউকেই আমি দেখি না।'

'বিশ্বাস কর, তোমাকে দেখে এ কদিন আমার কষ্টই বেড়েছে শুধু; কতবার তোমায় জিজ্ঞেস করেছি বল, তুমি কিছুই বললে না, এড়িয়ে গেলে।' বলতে বলতে অভিমানে ঠোঁট কাঁপছিল ওর।

অনীশ বড় করে একটা শ্বাস ফেলল, বলল, 'আজ সব বলবো বলেই তো তোমায় ডেকে আনলাম এখানে।' আবার চুপ। সে-ও সামান্য অস্থিরভাবে ঘাস ছিঁড়ল। ঝিলের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। পরে কি ভেবে অতসীর মুখের দিকে চেয়ে সে বলল, 'দীপেন্দুর কথা তো তোমায় বলেছিলাম অতসী!' অনীশ দৃষ্টি সরিয়ে এনে আবার যেন কি ভাবছিল গভীরভাবে।

'হ্যাঁ, কি হয়েছে ওর?' অতসী চমকে উঠেছে। চোখেমুখে উৎকণ্ঠা, ভয়।

'এখনও ঠিক ঠিক কিছু জানি না।' অনীশ চুপ। ফের যেন আগের কোন ভাবনায় ডুব দিয়েছে সে। চোখমুখ বেদনাতুর হয়ে উঠেছে। অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে আবার সে বলতে আরম্ভ করে, 'কদিন আগে কাগজে দেখেছিলাম, ও যে-জেলে আছে, সেখানে খুব মারামারি হয়েছে। অনেকেই মারা গেছে, কেউ কেউ আহত হয়ে হাসপাতালে আছে।'

'সে কি!' অতসীর গলাটা কেমন আর্তনাদের মতন শোনালো। ওর বুকটা কেমন ধড়াস ধড়াস করছে।

'হ্যাঁ, এটা আমি কাউকেই বলিনি। আমার এক বন্ধুকে চিঠি লিখলাম তাড়াতাড়ি খবরটা জানাতে। আজকেই সেই চিঠির জবাব এসেছে।'

'কি লিখেছে?'

'স্পষ্ট করে কিছুই লেখেনি, শুধু কলকাতায় একবার যেতে লিখেছে।' অনীশের গলা কাঁপছিল, আবার বলল, 'আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না অতসী!'

অতসীও কিছু বলতে পারল না, কী বলবে সে!

অনীশ কেমন অস্থিরতা বোধ করছিল। অতসীর চোখে চোখে চেয়ে সে বলল, 'সত্যিই যদি কিছু একটা ওর হয়ে যায়; মাকে কি করে সামলাবো। আমি যে কিছু ভাবতেই পারছি না অতসী।'

'খবরটা আগে নাওই না, এখনি এসব আজেবাজে কথা ভাবছো কেন!' অতসীও মনে মনে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তবু অনীশকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে কথাগুলো ও বলল।

'আমি ভয় পাচ্ছি অতসী। মার জন্যে আরো আমার ভয়।'

'মাকে এখন কিছু জানিও না।'

'একসময় তো সবই জানবে!' অনীশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

অতসী মাথা নীচু করে রইল। ওর চোখদুটোও ছলছল করছে।

অনীশ অনেকক্ষণ নীরব থেকে একসময় স্বগতোক্তির মতন বলল, 'দীপেনটা মার কথাটাও একবার ভাবল না!'

'এ নিয়ে এখন ভেবে তো কিছু করতে পারবে না তুমি।' অতসী অনীশের মুখের দিকে অপলকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল, পরে আস্তে আস্তে বলল, 'আমার মন বলছে, খুব ভয় পাওয়ার মতন কিছু একটা ওর হয়নি। তুমি অত ভেবো না তো!'

অনীশ গম্ভীর হলো। ওর মুখে তখনো দুশ্চিন্তার ছাপ। ধীরে ধীরে আলো ফুরিয়ে যাচ্ছে। নিঃশব্দ পায়ে অন্ধকার নামছে চরাচরে। আবছা আকাশের নীচে দিয়ে এক ঝাঁক বক উড়ে গেল। বন ক্ষেত প্রান্তর থেকে কী এক শূন্যতা ছুটে আসছে।

অতসী একসময় গাঢ় চোখে অনীশকে দেখতে দেখতে বলল, 'তোমরা কি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছো?'

অনীশ না চেয়েই জবাব দিল, 'আরও এক মুহূর্তে এখানে থাকার আর ইচ্ছে নেই। কলকাতায় না ফেরা অবধি আমিও নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।'

অতসীকে এবার আরো করুণ, দুঃখী দেখাচ্ছে। সে চুপ করে থাকল অনেকক্ষণ। পরে একসময় বলল, 'কবে যাবে?'

ওর দিকে চেয়ে কেমন কষ্ট হলো অনীশের। তারা যে এত তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাবে, কদিন আগেও তো ভাবতে পারেনি। এখন না গিয়েও আর উপায় নেই। এতে তারও কি কম কষ্ট! আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে ধীরে ধীরে বলল, 'কাল সকালেই আমরা যাচ্ছি।'

'এত তাড়াতাড়ি?' অতসী যেন কেমন অবাক হয়ে গেছে। মুহূর্তে ওর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। গলার স্বরটা ক্ষীণ, অস্পষ্ট। সে কেমন একটু বিহ্বল ভঙ্গিতে তাকিয়ে থেকে চোখ সরিয়ে নিল। ভাবতেই পারছে না অতসী। গতকালও মানুর সংগে দেখা হয়েছে, কিছু বলেনি ওকে। অথচ আজ এ কি সে শুনছে? বুকের ভেতর যেন দারুণ এক কষ্ট হঠাৎ আটকা পড়েছে। সে দাঁত দিয়ে ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরেছে। কিছু দূর্বো নিয়ে ছিঁড়ছিল সে। অতসী মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে থাকল।

একটু পরে অনীশ বলল, 'চিঠিটা পাওয়ার পরই ঠিক করেছি; এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না আমার।' অনীশ এক-পলক অতসীকে দেখে নিয়ে কি ভেবে মাটি থেকে একটা ছোট ইঁটের টুকরো তুলে নিয়ে ঝিলের বুকে ছুঁড়ে মারল। একটু বিষণ্ণ, ভারী গলায় আবার সে বলল, 'যাওয়ার কথা শুনে মানুটাও কেমন মনমরা হয়ে মার কাছে কাছে খালি ঘুরছে। বিশ্বাস কর, আমার কাছেও খারাপ লাগছে।'

অতসী কিছু বলতে পারল না। মুহূর্তে কেমন ফুঁপিয়ে উঠল ও। চোখে আঁচল চেপে ধরেছে। এ খবর শোনার জন্যে আদৌ সে তৈরী ছিল না। পরিষ্কার আকাশে হঠাৎ এমনভাবে যে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসবে, ঘুণাক্ষরেও ও বুঝতে পারে নি। এ কষ্ট সইবার তাই শক্তি ছিল না ওর। সে কাঁদতেই থাকল।

অনীশ ওকে আস্তে করে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, 'এই, এই অতসী, কাঁদছ কেন? তুমি কি গো!' ওর গলাটাও কেমন ধরে এলো।

আরো খানিকক্ষণ পর অতসী শান্ত হলো। আঁচল সরিয়ে সে নতমুখী হয়ে বসে থাকল। একটু পরে গাঢ়কণ্ঠে ও বলল, 'কাঁদবার মতন চোখের জলও আমার নেই অনীশদা, অনেক কেঁদেছি এ পর্যন্ত।' বলতে বলতে ঠোঁটটা কেমন ভেঙে গেল তার। চোখ সজল হয়ে উঠল।

'শুধু তুমিই কেঁদেছ, আমি নয়?' অনীশ ওর চোখে চোখে চেয়ে থাকে।

'আমি যে এ ভাবতেও পারছি না অনীশদা!'

'আমার কাছেই কি ভাল লাগছে?' একটু থেমে খানিক পরে আবার ও বলল, 'বুকের ভেতরটা যদি একবার দেখাতে পারতাম তোমায়!'

'আমি তা জানি অনীশদা, কিন্তু এর-পর আমরাই বা এখানে আর থাকব কি করে!'

'তুমি কি ভাবছো, কলকাতায় গিয়ে আমিই খুব সুখে, নিশ্চিন্তে থাকব?'

'তা থাকবে না, কিন্তু তোমরা চলে গেলে আমাদের দিনগুলো যে এখানে কাটতেই চাইবে না।'

'তোমাদের, বিশেষ করে তোমার খুব কষ্ট হবে, আমিও জানি। এ কষ্ট তো আমারও অতসী।' অনীশ এবার একটা সিগারেট ধরায়। খানিকটা ধোঁয়া গিলে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'তোমরাও এখানে আর বেশিদিন থাকতে পারবে না। লোকজন তো কমে আসছে, আর কদিন পর শীতও ফুরিয়ে যাবে।'

অল্প সময় চুপ করে থেকে অতসী বলল, 'তুমি তো জানই অনীশদা, ওদের ওখানে আবার ফিরে যাওয়া আমাদের কাছে কতখানি অপমান, গ্লানি; ওখানে যেতে আর ইচ্ছে নেই।'

'হ্যাঁ, ওখানে আর যাওয়া যায় না!'

'তা হলেই বোঝ, ওখানে যেতে পারবো না; এখানেও সব ফাঁকা হয়ে গেল।'

'ওখানে তোমাকে যেতেও হবে না।'

অতসী চোখ তুলে তাকাল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পরে বলল, 'আমার কেন যেন খালি ভয় হয় অনীশদা।'

'এখনও ভয়?' অনীশ অপলকে ওকে দেখল একটুক্ষণ।

অতসী ধীরে ধীরে দৃষ্টি সরিয়ে আনল, পরে একান্ত দুঃখীর মতন করে বলল 'ভয়টা তোমাকে নয়, আমার কপালকেই।'

'কপাল তো সব সময় একই রকম থাকে না অতসী, থাকতে পারে না।' সিগারেটের ধোঁয়া খানিকটা গিলে ফেলেছে অনীশ। গলাটা কেমন খসখসে লাগছে। দু একবার কাশল। পরে বলল, 'আমিও তো একদিন ভাবতাম অতসী, আমার চার-পাশে শুধু দুঃখ আর দুঃখ, আমাকে ঘিরে ধরেছে। এর বাইরে আমি আর কোন দিনও বেরোতে পারব না। জীবনটা আমার কাছে বড় ছোট হয়ে এসেছিল, আমার বাঁচতে ইচ্ছে হতো না; একটা সময় কোন রকম আনন্দ, উৎসাহ ছিল না আমার। অথচ সেই ধারণাও এখানে এসে আমার পালটে গেল।' অনীশের গলা আন্তরিকতা ও আবেগে পূর্ণ।

'আমারও তাই অনীশদা; তোমাকে দেখে, তোমার সংগে মিশে আমারও যে নতুন করে বাঁচতে সাধ হলো। বুঝলাম, বেঁচে থাকাটা দুঃখেরই শুধু নয়, সুখেরও। তুমি আমাকে অনেক বড় এক সত্যকে দেখিয়েছ।' অতসীর গলা আবেগে ভরপুর।

'তবে আর ওসব ভাবছো কেন, শুধু শুধু মন খারাপ করে কি লাভ?'

'তোমরা যে এভাবে একদিন চলে যাবে, এই নির্মম সত্যটা আমার মাথায় আসেনি আগে।'

'আমিই কি ভাবতে পেরেছিলাম, এভাবে আমাদের চলে যেতে হবে!'

অতসী কি ভেবে চোখে চোখে তাকাল অনীশের, বলল, 'তোমরা চলে গেলে আমার পক্ষে এক মুহূর্তও এখানে থাকা যে কী নিদারুণ যন্ত্রণার ব্যাপার, কাউকেই বোঝানো যাবে না, বলা যাবে না। ছোট ছোট কত কথা, ঘটনাই না মনে পড়বে। কী যে অস্বস্তি না!'

'কলকাতায় বসে আমারও কি এসব মনে পড়বে না ভাবছো, পড়বে, সব পড়বে।'

অতসীর যেন হঠাৎ কি মনে পড়ল, বলল, 'মনে আছে, অনেকদিন আগে তোমাকে আমার জন্যে একটা চাকরির কথা বলেছিলাম?'

'আছে, সবই মনে আছে আমার, থাকবেও অতসী।' অনীশ সিগারেট খেতে খেতে পরমুহূর্তেই বলল, 'গিয়েই আমি চেষ্টা করবো। তাছাড়া, তুমি একাইবা অত ভাবছো কেন; আমাকেও এর কিছুটা ভাগ নিতে দাও।' অনীশ ম্লানভাবে হাসল সামান্য।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নেমে এলো। হিম পড়ছে বোঝা গেল। ঘাস মাটি এবার ভেজা ভেজা লাগছে। পাখিরা গাছে গাছে, ঝোপেঝাড়ে কলতান তুলছে। জোনাকি জ্বলছে নিবছে। মনে হলো, মুঠো মুঠো জোনাকির আলো কে যেন পিচকিরী দিয়ে অন্ধকারের গায়ে ছড়িয়ে দিয়েছে।

ওরা আরো খানিকক্ষণ নীরবে বসে থাকল। একসময় অতসী বলল, 'আমার ভাল লাগছে না কিছু।'

'কারই বা লাগছে শুনি!'

'এত তাড়াতাড়ি যে দিনগুলো ফুরিয়ে যাবে ভাবতে পারছি না।'

'আমারও ভীষণ কষ্ট হচ্ছে অতসী; আমি যে এখানে কী রেখে যাচ্ছি আজ, তোমায় ঠিক এই মুহূর্তে তা বোঝাতে পারব না।' অনীশ সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল একসময়।

অতসীও কি সব বোঝাতে পারছে এখন? তারও বুকের মধ্যে যে কী হচ্ছে! সে কিছু বলতে পারল না। নতমুখী হয়ে বসেই থাকল। গায়ের চাদরটা সামান্য সরে গেছে। শীত শীত করছে একটু। সেদিকেও যেন আজ কোন খেয়ালই নেই ওর। কত কিছুই না মনের ওপর দিয়ে দ্রুত ভেসে চলেছে। সব কিছুই এই মুহূর্তে তার কাছে স্বপ্নের মতন মনে হচ্ছে। স্বপ্ন ছাড়া কি! এমন করে জীবনের আর একটা দিক যে তার সামনে এনে কেউ দেখাবে, সে কি তা ভেবেছিল? ছেলেবেলা থেকেই তো সে বেঁচে থাকার অর্থটা অন্যরকমভাবে ভেবে এসেছে। এখানে না এলে সেই কি জন্মের মতন এত বড় অভিজ্ঞতা থেকে বাদ পড়ত না? এই গাছপালা মাটি আকাশ মানুষ-সবার কাছেই সে কৃতজ্ঞ, সবার কথাই তার মনে থাকবে। মানুষ সম্পর্কে নতুন করে তার ধারণা হলো। সবটাই মরুভূমি নয়, জীবনকে বুঝে নেওয়ার মতন ছায়াও আছে সংসারে। একটু পরে চোখ তুলে সে অনীশকে দেখল এক পলক। চোখে আবেশ। পরে গাঢ়কণ্ঠে অতসী বলল, 'আমারও এখানকার কথা চিরকাল মনে থাকবে অনীশদা।'

'এই জায়গার কাছে ঋণ কি শুধু তোমারই অতসী, আমার নয়?'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে অতসী বলল, 'ঠিকই বলেছো, জন্মের মতন ঋণী হয়ে রইলাম আমরা।' অতসী একটা ঘাস দাঁত দিয়ে কাটছিল বার বার।

'আর কখনো এখানে আসবো কিনা জানি না। চলে যাওয়ার আগে বড় মায়া হচ্ছে।'

অতসী কাশল কয়েকবার। চাদরটা এবার ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিল।

'তোমার দেখছি ঠান্ডা লেগেছে?'

'ও কিছু নয়, সেরে যাবে।'

'মাথাটা আগে ঢেকে নাও চাদর দিয়ে।'

'ঢাকছি।' অতসী কান মাথা ঢেকে নিয়েছে।

'বেশী ঠান্ডা লাগিয়ো না।' অনীশের গলায় গভীর মমতা ছিল।

অতসী কোন কথা বলল না। সে যেন আরো দুর্বল হয়ে পড়ছে। এমন করে কাল থেকে আর কে সাবধান করবে তাকে? এতদিন তো মা আর রাঙামামাই তার শরীর স্বাস্থ্যের জন্যে উদ্বেগ বোধ করেছে। প্রতিটি মুহূর্তে তাদেরই সস্নেহ সতর্কতায় ভরা থাকত। হয়ত বরাবরই তা থাকবে। কিন্তু তার জন্যে আরও একজন যে গভীর-ভাবে ভাবে, অস্থিরতা বোধ করে, এটা যেদিন প্রথম মনে হয়েছিল অতসীর, তার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। তার জন্যে তার একজনের উৎকণ্ঠার [illegible] সেই মানুষটাই এবার দূরে সরে যাচ্ছে।

এখন থেকে তার কথাও বেশী করে মনে পড়বে।

অতসীকে এভাবে চুপ করে থাকতে দেখে অনীশ বলল, 'হিম পড়ছে উঠবে নাকি?'

'আর একটু বসি না!' পরে অস্ফুটে আবার বলল, 'আজই তো শেষ এখানে!'

অনীশ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। পরে শান্ত গলায় বলল, 'আমারও উঠতে ইচ্ছে করছে না। আজকের সন্ধ্যেটা ঠিক অন্যদিনের মতন নয়, একটু আলাদা।'

অতসী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, খানিক পরে বলল, 'হঠাৎ ছেলেবেলার একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল।'

'কি?' অনীশ অপলকে চেয়ে থাকল একটু সময়।

'কি যেন হয়েছে, খুব কাঁদছিলাম আমি। কিছুতেই আর কান্না থামছে না। ছোট মামা একটা খেলনা নিয়ে এসে আমাকে লোভ দেখালো। সেই লোভে আমার কান্না থেমে গেল বটে, কিন্তু কোত্থেকে ছুটে এসে হঠাৎ বড়মামার ছেলে খেলনাটা সরিয়ে নিল।' অতসী থামল। আরো কি ভাবল চুপ করে। শেষে বলল, 'সেই থেকে ভয়টা আমার থেকেই গেল অনীশদা!'

'এখন নিশ্চয়ই কোনটা আসল আর কোনটা ভেজাল তা ধরবার তোমার বুদ্ধি হয়েছে।'

'কি জানি, বুঝতে পারি না!' অতসী হাঁটুর ওপর থুতনী রেখে আস্তে আস্তে বলল।

'কি জান অতসী, একসময় আমিও তোমার মতনই এসব ভাবতাম। মেয়েদের সম্পর্কে আমার ধারণাটা ভাল ছিল না। আমার কেমন ভয় করত ওদের।'

'আমার ভয়টা ঠিক তোমার মতন নয় অনীশদা!'

'জানি আমি।' অনীশ ওর দিকে চেয়ে ম্লানভাবে হাসল। একটা সিগারেট ধরিয়ে পরে বলল, 'আসলে, এগুলোকে আমরা নিজের মতন করে মনে মনে সাজিয়ে নিয়েছি। কোন মানেই হয় না এর।' একটু থেমে সিগারেট টানল। পরে বলল, 'আজ স্বীকার করতে কোন লজ্জা নেই আমার, প্রথম দিন তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল, তোমার সঙ্গে আমার কোথায় যেন একটা বড় রকমের মিল আছে।' অনীশ সিগারেটটা ঠোঁটে ছুঁইয়ে রাখল।

'আমি তোমার ভয় কাটিয়ে দিয়েছি বল।' অতসী আড়চোখে একবার দেখল ওকে।

'শুধু ভয়? আমাকে এতদিন পরে আবার এক বড় বিশ্বাসে ফিরিয়ে এনেছো!'

কি যেন ভাবছিল অতসী। একটু পরে ওর চোখে চোখে তাকিয়ে বলল, 'কলকাতায় গিয়ে এসব তোমার মনে থাকবে তো?'

অনীশ ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে। অতসীর এই কথায় সামান্য যেন আহত হলো সে। ধীরে ধীরে বলল, কথাটা আমিও তো তোমায় জিজ্ঞেস করতে পারি!' অনীশের গলায় চাপা এক অভিমান যেন ফুটে উঠেছে। সিগারেটটা তখনো পুড়ছে।

অতসী সামান্য হাসবার চেষ্টা করল, বলল, 'কলকাতাকে যে ভীষণ ভয় আমার অনীশদা!' অতসী সোজা হয়ে বসেছে এবার। তাকে কেমন শান্ত নিবেদিত মনে হচ্ছে।

'কেন, অবিশ্বাস?'

অতসী মুহূর্তে কেমন চমকে উঠল। সে ভাবতেই পারেনি, এমন একটা জবাব শুনতে হবে। অনীশের মুখের দিকে অপলকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সে চোখ সরিয়ে আনল। পরে কি ভেবে ওর একটা হাত টেনে নিল নিজের হাতে। আবেগে বুকটা ভরে উঠেছে অতসীর, সামান্য ধরা, ভেজা ভেজা গলায় বলল, 'ওসব কিছু ভেবে আমি বলিনি। বল, বল তুমি রাগ করনি?'

অনীশ সিগারেটটা শেষবারের মতন একটা টান মেরে ফেলে দিল, পরে অতসীর মুখের দিকে চাইতে চাইতে একটু উদাস গলায় বলল, 'এত সামান্যতেই আমার আর রাগ হয় না অতসী!'

অতসী চুপ করে রইল। খানিকক্ষণ পরে ম্লান গলায় বলল, 'আমি তো ভাল করেই জানি অনীশদা, তুমি আজ আমাকে কত-খানি মর্যাদা দিয়েছ। এরপর অবিশ্বাসের কথা আসে? ছি ছি, আমার যে তাহলে নরকেও জায়গা হবে না।'

'মিছিমিছি মন খারাপ করছো কেন?'

'আমি যে পারছি না, পারছি না গো আর।' অতসী ঠোঁট বেঁকিয়ে কেঁদে ফেলল।

অনীশ অতসীর কাঁধে মৃদু চাপ দিল। ওর কোলের ওপর হাতটা রেখে আস্তে আস্তে বলল, 'আমিই কি পারছি অতসী, আমারও বুক যে ভেঙে যাচ্ছে!'

'ভালবাসায় যে এত কষ্ট আগে জানতাম না অনীশদা, আজ বুঝতে পারছি।'

'এই কষ্টটুকুও বেঁচে থাকার এক মস্ত সম্পদ।' কথাটা যেন নিজেকেই শোনালো অনীশ।

'এই সম্পদটুকু আজ আমার একমাত্র সম্বল।' অতসী কুণ্ঠিত, আনত ভঙ্গিতে বসে থাকল।

অনীশ নীরব। তার মনে হলো, কথা-গুলোর মধ্যে এক ধরনের নেশা ও উত্তাপ আছে। এর ছোঁয়ায় সে যেন ক্রমশ দুর্বল, নরম হয়ে পড়ছে। এই মুহূর্তে কেমন বিহ্বল, অন্যমনস্ক হলো অনীশ। তার কাছেও এই অভিজ্ঞতা দেবতার আশীর্বাদের মতন। সেও আজ এখান থেকে ফিরে যাবার সময় এক মূল্যবান সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। এখানে আসার সময়ও কত ভয়, সঙ্কোচ আর দ্বিধা ছিল তার। অস্ফুট শৈশবের মধুপুরের সেই ছবিটা সে কিছুতেই ভুলতে পারত না। থেকে থেকে সেই শ্রান্ত, অসহায় ঘোড়াটার মুখ মনে পড়ে যেত তার। লোকটা কী ভয়ঙ্কর ধরনের নিষ্ঠুর, মারছে তো মারছেই, আহা রে! ওই মূক জীবটার জন্যে যেন

কোন দরদ মমতা নেই। যত বড় হয়েছে, ততই সে বুঝেছে, সংসারে অধিকাংশ মানুষই খুব দুঃখী, ওই ঘোড়াটার মতনই তারা কারো কাছে কিছু বলতে পারে না। নীরবে সরে যায়। কেমন অবহেলা আর উপেক্ষা।

অথচ এবার যেন অন্য ছবি, অন্য রঙ। যে জীবন কলকাতার মদনলাল মল্লিক রোডের বাড়িতে একটু একটু করে তার কাছ থেকে সরে সরে যাচ্ছিল, এখানে এসে কী আশ্চর্য-ভাবেই যেন আবার তা ফিরে পেয়েছে। চোখটা আগের চেয়ে স্বচ্ছ, পরিষ্কার হয়েছে। প্রতিমার কথা মনে পড়ল হঠাৎ। ওর কথা মনে হলেই একটা স্বপ্ন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ও একদিন তাকে প্রলোভন দেখিয়ে খেলার ছলে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। কত হুল্লোড়, হাসি, স্বপ্ন। ঝকঝকে আলোয় ভরে আছে সব। অনীশ যেন সেখানে ঘুমিয়ে পড়েছিল। পাশে প্রতিমাও ছিল। ঘুম ভেঙে গেলে অনীশ দেখল, ও নেই। আলো ফুরিয়ে অন্ধকারে ভরে উঠছে। প্রতিমা তাকে স্বার্থপরের মতন অহঙ্কারে অবহেলায় সেখানে ফেলে রেখে এসেছিল। এরপর থেকে ক্রমশই কোথায় তলিয়ে যাচ্ছিল। এতদিন পরে অতসী এসে যেন এখান থেকে আরো এক বড় জায়গায় তাকে তুলে নিয়ে এলো। প্রতিমাকে এটা একবার দেখাতে পারলে হতো! এখানে আসার সময়ও এরকম কোন ধারণাই ছিল না তার। সে এই মুহূর্তে অতসীকে যেন বলল : আমি তো শরীর সারাতেই এসেছিলাম অতসী। ভাবতেই পারিনি, এত তাড়াতাড়ি শরীর মন দুই-ই আজ সারিয়ে নিয়ে যাবো। এটা তোমার জন্যেই হলো অতসী। এখানে না এলে কি এমনটা কখনো সম্ভব হতো? ঈশ্বর করুণাময়, তিনি আবার আমাকে সুস্থ করে তুললেন। তুমিও ভাল হয়ে উঠবে অতসী। তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে বলেই বুঝেছি, জীবনকে এত ছোট করে দেখার কোন অধিকারই আমার নেই! শুধু আমারই নয়, হয়ত কারোই নেই।

বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো অনীশের। কেমন আবেগ বোধ করছিল সে। আস্তে আস্তে ডাকল, 'অতসী?'

'হুঁ' অতসীর গলায়ও আবেগ। চোখে সামান্য আবেশ।

'আমাকে তোমার খুব লোভী মনে হয়, না?'

'হঠাৎ একথা?'

'না, এমনি!'

অনীশ আবার যেন অন্যমনস্ক হয়। একটু পরে একটা সিগারেট ধরাল।

অতসীও খানিকক্ষণ পর শান্ত, অনুচ্চ গলায় বলল, 'কাল কটায় ট্রেন?'

'সকাল সাড়ে-ন'টা দশটা হবে।'

অতসী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল, 'ভেবেছিলাম একসঙ্গে ফিরবো।'

'আমিই কি ভাবতে পেরেছিলাম, এভাবে চলে যেতে হবে!'

অতসী চুপ করে থাকল একটু সময়। পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কিছুই দেখা হলো না, আর হবেও না।'

'আমারও আফশোস থেকে গেল।' আস্তে আস্তে সিগারেট টানছিল সে।

মাঝে মাঝে হাওয়া দিচ্ছে। শীত বাড়ছিল ক্রমশ। আবছা অন্ধকার দেখতে দেখতে গাঢ় হয়ে উঠছে। হিমে ঘাস মাটি ভিজে গেছে। জোনাকির আলোয় ঝোপ, মাঠ, ক্ষেত আরো কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। আকাশে অজস্র নক্ষত্র। কলকাতায় এত নক্ষত্র দেখা যায় না। বেশিক্ষণ ওদিকে চেয়ে থাকলে মনটা কেন যেন উদাস হয়ে যায়। এই মুহূর্তে অনীশেরও মনপ্রাণ কি বিরাট ব্যাপক এক অনুভূতিতে ভরে উঠছে। সামনের মাঠ প্রান্তর গাছপালা কেমন বেহুঁস হয়ে পড়ছে একটু একটু করে।

শীত করছিল অনীশের। আরো কিছুক্ষণ এভাবে বসে থেকে অতসীকে মৃদু একটা ঠেলা দিল, বলল, 'এবার উঠি চলো।'

'চলো।' অস্ফুটে অতসী বলল।

ওরা উঠে দাঁড়িয়েছে। এখানটায় বড় নির্জন, ফাঁকা। মনটা মুহূর্তে এক বেদনায় ছেয়ে গেল। আস্তে আস্তে ওরা হাঁটছে। বুকের ভেতরটা বার বার যেন মোচড় দিয়ে উঠছে। এই বিল মাঠ গাছগাছালি বরাবরের মতন সে ফেলে যাচ্ছে। এদের সঙ্গে এই ক মাস ধরে অলক্ষে এক গভীর আত্মীয়তা যেন গড়ে উঠেছে তার। আজ তা টের পেল। মনটা টন টন করে উঠল। এ জায়গা তাদের কত কালের চেনা যেন। অথচ আজই এর শেষ। কাল থেকে এখানকার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক থাকবে না তার। তা হলেও সব, সব তার মনে পড়বে। অতসী থেকে যাচ্ছে এখানে। এই নামটা মনে মনে গাঢ় আবেগে সে অনেকবার উচ্চারণ করল। ও তার জীবনে আজ এক বড় আশ্বাস, সান্ত্বনা।

হঠাৎ দীপেন্দুর কথাটা মনে পড়ে যায় আবার। কলকাতায় না ফেরা অবধি এক দারুণ অস্বস্তি, উদ্বেগ। যাওয়ার পর বোঝা যাবে কি ব্যাপার! নীরবে হাঁটতে হাঁটতে অনীশের এক সময় মনে হলো অতসী আর দীপেন্দু যেন তার জীবনের দু পাশে দুটো প্রশ্নের মতন ঘিরে রয়েছে। অতসীকে এই মুহূর্তে মনে মনে তার বলতে ইচ্ছে হলো : জান অতসী, দীপেন্দুর কথাটা মনে হলে আমার বুক ফেটে যায়, এ যে কী কষ্ট! ওর সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক। ওর কথা আমি কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছি না! দীপেন্দুর সঙ্গে তোমার আলাপ হলে তুমিও ওকে ভুলতে পারতে না। ওর কথা ভেবে তুমিও দুঃখ পেতে। শুধু ওই-ই নয় অতসী, কলকাতায় আমার আরো আরো অনেক দুঃখের স্মৃতি আছে। ওগুলোও এবার ফিরে গেলে মনে পড়বে। তবু, আজ এক সান্ত্বনা নিয়ে আমি যাচ্ছি, সে তুমি। তুমি আমার বিশ্বাস, ভালবাসা অতসী! তোমাকে দেখে আমার বাঁচার বড় সাধ। কোনটাই আজ আর আমার কাছে মিথ্যে নয় অতসী, বরং দুটোই সমান সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতকাল একটার মধ্যেই আটকা পড়েছিলাম। হাজারীবাগ এসে দুটোই দেখতে পেলাম।

অনীশ কেমন অভিভূত, বিহ্বল।

পাশাপাশি ওরা হাঁটছিল। কারো মুখে কোন শব্দ নেই। দুজনই নিজের নিজের ভাবনার গভীরে ডুবে যাচ্ছে। যেতে যেতে অনীশের হঠাৎ মনে হলো, কলকাতায় গিয়ে সেই অন্ধকার বাসাটা এবার বদলাতেই হবে। ওখানে তাদের কত কী হারাতে হয়েছে। মা বলে, ও বাড়িতে অভিশাপ আছে, না হলে এমন হয়। সুতরাং, আলো হাওয়া খেলে এমন একটা বাসা তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। আর সে কিছু হারাতে রাজী নয়।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা অতসীদের বাড়ির কাছে চলে এসেছে। অতসী দাঁড়িয়ে পড়েছে। পরে করুণ বিষণ্ণ ভাঙা ভাঙা গলায় ও বলল, 'আমি যাচ্ছি অনীশদা।' অতসী কথাটা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল। তাড়াতাড়ি করে চোখে আঁচল দিয়ে কোন রকমে ও ভেতরে চলে গেল। দাঁড়ালও না আর।

অনীশ বিমূঢ় হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারও চোখ ঝাপসা ঝাপসা। শেষ কথাটাও অনীশ বলতে পারল না অতসীকে। মনটাকে শক্ত করতে করতে এক সময় ঘরের পথ ধরল সে। মাঝে মাঝে শীতের বাতাস ছুটে আসছে। পা ভিজে গেছে। পথে হোঁচট খেয়েছে দু একবার। তবু, কিছুই খেয়াল নেই তার। মনে তখন অন্য সুর। এই গভীর দুঃখের মধ্যেও তার অন্তর ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে উঠল। এজন্যে ঈশ্বরের কাছে সে কৃতজ্ঞ। তাঁর করুণার শেষ নেই যেন। মনে মনে সেই মহান করুণাময় জ্যোতির্ময় পুরুষের কাছে নতজানু হয়ে বিনম্র বিনীত ভঙ্গিতে অনীশ আশীর্বাদ চেয়ে নিচ্ছিল। শুধু তার জন্যেই নয়, অতসীও আছে। এবার চাঁদ উঠছে। অনীশের মনে হলো, সেই আলোয় যেন এবার অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। আর কোন ভয় নেই তাদের।

(সমাপ্ত)
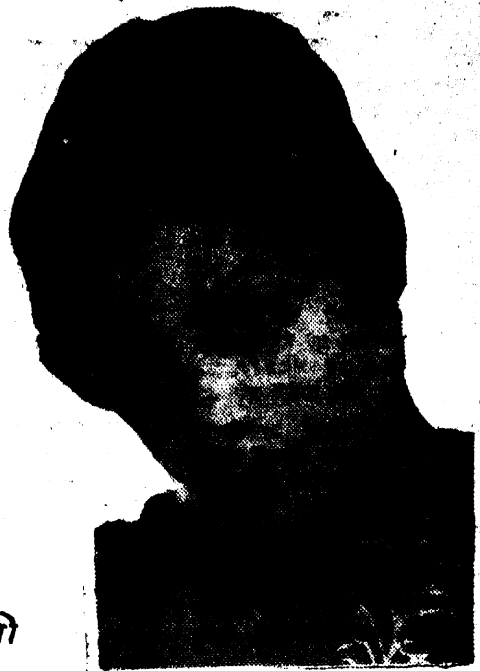
একুশ

গত সপ্তাহের 'অমৃত'খানা নিয়ে পড়তে বসেছি, হঠাৎ দেখি স্যাণ্ডি (আমার কুকুর) দু-পা তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বইটা কেড়ে নিয়ে ছিঁড়বার উপক্রম করছে। 'কি হোলো, এত রাগ কেন?'—যত আদর করে শান্ত করবার চেষ্টা করি ওর গোঙানী আর চীৎকার থামে না। রাণা আর বুলা (আমার পুত্রবধূ) ত হেসেই অস্থির। কি ব্যাপার? ওরা বলল, 'সত্যি মা, এ তোমার ভারী অন্যায়। তোমার জীবনীতে তুমি বিশ্বশুদ্ধ লোকের কথা বললে, আর স্যাণ্ডি তোমায় এত ভালবাসে ওর কথা এক লাইনও লিখলে না? ওর ক্ষোভ প্রকাশের অধিকার নিশ্চয় আছে।' শুধু রাণা, বুলাই নয়, দিদি, দাদাবাবু, বাড়ীর সবাই এমন কি আমার মালী পর্যন্ত স্যাণ্ডির দিক নিল।

সত্যিই ভারী ভুল হয়ে গেছে। আমার সারাক্ষণের সঙ্গী স্যাণ্ডির কথা না লেখাটা নিশ্চয় অপরাধ। প্রতিক্ষণ শুধু আমাকেই নয় বাড়ীর সকলকেই ও সতর্ক প্রহরায় রাখে। আমার মা যখন স্নানের ঘরে ঢুকতেন—একটু দেরী হলেই ও ছুটে গিয়ে জোরে জোরে দরজা ধাক্কা দিত। মা চেঁচিয়ে বলতেন 'স্যাণ্ডি, আমার হয়ে গেছে আসছি'—তবে শান্ত হোত। আমার পাশে কেউ বসলে (এমন কি আমার ছেলে পর্যন্ত) ও ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ঠেলে মাঝখানে বসবেই। জানোয়ার হলে কি হবে? হৃদয়ের ক্ষেত্রে ও পুরোপুরিই ক্যাপিটালিস্ট। রাণাকে আমার কাছ ঘেঁসতে দেয় না—কিন্তু আমি যদি কখনও রাণাকে বকি ও রাণার পক্ষ নিয়ে চেঁচিয়ে আমায় কামড়াতে আসে। কয়েক বছর আগে আমার হার্ট অ্যাটাকের সময় যখন আমি প্রায় জ্ঞানহারা হয়েছিলাম আর পুরো তিনদিন কোনো কথা না বলে চুপচাপ শুয়েছিলাম ওকে কেউ খাওয়াতে পারেনি। চুপটি করে বিষণ্ণ হয়ে খাটের তলায় শুয়ে থাকত আর কাঁদত। বাড়ীতে সবার কাছে শুনেছি আমায় যখন অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছিল ও জলভরা চোখে সেই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বসেছিল। কি করুণ দৃষ্টি। স্যাণ্ডির সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে "The more I see man, the more I respect my dog". এত ভালবাসা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

এরই মধ্যে আমার প্রোডাকসনের 'অভয়া-শ্রীকান্ত' মুক্তিপ্রাপ্ত হোলো। সমালোচকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেলেও এ ছবির কমার্শিয়াল সাকসেস একেবারেই হয়নি। কোনোরকমে লোকসানটাই শুধু বেঁচে গিয়েছিলো। ছবি রিলিজ হবার এগার দিনের মাথায় পাকিস্তানের যুদ্ধ ব্ল্যাক-আউট, ইত্যাদির কারণে জনসাধারণ বিপর্যস্ত। মোটমাট সব মিলিয়েই এ ছবি খুব একটা চলেনি।

এর পরে পরেই বা বলি কেন অনেক আগেই 'বিপ্রদাস' করবার পরিকল্পনা ছিলো। কিন্তু কত বাধা যে বাংলা সিনেমার চিত্র-প্রযোজকদের। ১৯৫১ সালে যখন বিপ্রদাসের মহরৎ হোলো—ভেবেছিলাম বন্দনার রোল করব আমি। মহরতের পরই আমরা বিদেশে চলে গেলাম। ফিরে এসে সুটিং-এর কাজে হাত দেব এইটেই মনে ছিল। কিন্তু ওখানে থাকাকালীন খবর পেলাম রাম চৌধুরী মহাশয় 'বিপ্রদাস'-এর কপিরাইট নিয়ে আমার বিরুদ্ধে কেস করেছেন। কেস চলতেই থাকল—বছরের পর বছর গড়িয়ে—আমারও বয়স বাড়াতে বাড়তে বন্দনার ভূমিকা গ্রহণের সময় চলে গেলো। তখন ভাবলাম নাই হোলো বন্দনা, সতীর ভূমিকাতেই নামব। দিন যেতে যেতে সতী সাজার পর্যায়ও অতিক্রান্ত হোলো। তখন ভাবতে সুরু করলাম 'বিপ্রদাসের মা সাজলে কেমন হয়?' —অবশেষে একদিন কেস সমাপ্ত হোলো, শেষ পর্যন্ত আমাদেরই জিত হোলো। কিন্তু তার অনেক আগেই মনটা অভিনয়-জগৎ থেকে সরে গিয়ে অন্যজগতে আশ্রয় নিয়েছে।

এমনই আমাদের বিচার-বিভাগের সুব্যবস্থা যে সামান্য একটা কপি-রাইটের ব্যাপারে রায় দিতে ২০ বছর গড়িয়ে যায়। কেস জিতেছি। কিন্তু টাকার হিসেব-নিকেশের পালা আজও কোর্ট থেকে শেষ হয়নি। অর্থ ও সময়ের অপব্যয়ের পরিমাণ কল্পনার অতীত। প্রাপ্য টাকা কোনোদিনও পাব কিনা জানি না। কিন্তু বিশ বছর আগে

এ প্রোডাকসন সুরু হলে হয়ত আড়াই বা তিন লাখ টাকায় ছবিটি হয়ে যেত। এখন করতে গেলে কমপক্ষেও খরচ পড়বে সাত লাখ টাকা।

সমান্তরাল বিপাকের মধ্যে চলেছে 'চরিত্রহীন'। এ বই-এর কপি-রাইটের মীমাংসাও ২০ বছর ধরে অনড় অবস্থায় পড়ে আছে। এর শেষ কোথায়—ঈশ্বরই জানেন।

এই প্রসঙ্গেই মনে আসে বাংলা ফিল্মের বর্তমান দুরবস্থার কথা। এত চিত্ররসিক, এমন রুচিসম্পন্ন দর্শক, এবং সাহিত্যিক-প্রধান দেশ হয়েও বাংলা ছবির অগ্রগতি যেন আজ থমকে দাঁড়িয়ে আছে। কেন? চট্ করে কোনো বিশেষ কারণ, বিশেষ ব্যক্তি ও গোষ্ঠিকে এর জন্য দায়ী করা চলে না। অনেক কারণ এমনভাবে জট পাকিয়ে আছে যে যথার্থ কারণটা দু-চার কথায় স্বচ্ছভাবে তুলে ধরা কঠিন। তবু চেষ্টাই করি না।

ছবি তৈরীর ক্ষেত্রে প্রোডিউসার, ডিরেক্টর ও এক্জিবিটারের ভূমিকাই প্রধান। একান্নবর্তী পরিবারের প্রতিটি জনের মত এ'রা অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। এ'রা তিন-জন যদি বাংলা সিনেমার উন্নতিকল্পে হাতে হাত মিলিয়ে ব্যক্তিগত লাভের কথাটা একটু কম চিন্তা করে চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির কথা চিন্তা করেন তাহলে এ সমস্যার কিছুটা সমাধান হওয়া সম্ভব বলেই আমি মনে করি।

প্রথমেই নিবেদন করি প্রোডিউসার ও ডিস্ট্রিবিউটর সংবাদ। আজকাল যদিও প্রোডিউসর নামক ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানটি প্রায় বাতিল হবারই উপক্রম হয়েছে (যেহেতু ডিস্ট্রিবিউটরই একাধারে সব), তবু প্রোডিউ-সরের অস্তিত্ব আছে এমন সব ছবির কথাই ধরা যাক।

প্রোডিউসর ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে টাকা নিয়ে ছবি সুরু করলেন। অনেক প্রোডিউ-সরেরই প্রবণতা থাকে স্যুটিং চলাকালেই ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে পাওয়া অর্থের বেশ কিছু অংশ আগেভাগেই নিজের তহবিলে জমা করার দিকে। বলা-বাহুল্য, ডিস্ট্রিবিউটর বোঝেন সবই। কারণ তিনি নির্বোধ নন। ব্যবসায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে সৎ-অসতের তফাৎটাও তাঁর জানা। তবু বাধ্য হয়েই নীরব থাকেন। কারণ অনেক টাকাই তখন ছবিতে নিয়োগ করা হয়ে গেছে। ফেরার পথ আর কই?

এইভাবে ছবিটি শেষ হোলো। তখন মঞ্চে এলেন ডিস্ট্রিবিউটর। তিনি পূর্বচুক্তি-মত ছবিটি কয়েক বছরের জন্য চালাতে সুরু করলেন কমিশন-বেসিসে। হাউসে ছবিটি চলতে সুরু হওয়ার পর থেকেই অনেক ডিস্ট্রিবিউটরেরই দৃষ্টি থাকে লভ্যাংশের প্রায় সমস্তটার ওপর এবং তাঁর এই সর্বগ্রাসী ক্ষুধার তাড়নায় সৎ-অসৎ উভয় প্রোডিউ-সরই প্রায়ই মার খান। (বলা বাহুল্য সব ডিস্ট্রিবিউটরের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে)।

যেমন কোলকাতায় ফ্যাপ-করা ছবি অনেক সময় মফঃস্বল এবং অন্যান্য জায়গায় হয়ত ভালই চলল কিন্তু সে হিসেবের অনেকখানিই থেকে যায় যবনিকার অন্তরালে। প্রোডিউ-সরকে ক্ষতির অঙ্কটাই দেখানো হয়ে থাকে। অতএব একটা দুটো ছবি করার পরই জোরালো আদর্শবাদী প্রোডিউ-সরের তরফেরও শিল্পানুরাগ অথবা শিল্পচর্চা স্তিমিত হয়ে আসে। তখন স্বাভাবিক কারণেই প্রযোজকের পরবর্তী ছবির সংখ্যা পরিকল্পনা ছোটো হয়ে আসে।

এর পর—এক্জিবিটারের মঞ্চগ্রহণ। এ-দৃশ্যের হিরো তিনিই। শুধু হিরো বললে কমই বলা হয়। তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি। ছবি ফ্যাপই করুক অথবা হিটই করুক ঝড়, তুফান, বৃষ্টি, বজ্রপাত যুদ্ধবিগ্রহ যাই হোক তাঁর নির্ধারিত প্রাপ্য তাঁকে দিতেই হবে। নইলে কড়া হুমকী বাংলা ছবির বদলে হিন্দী অথবা ইংরাজী ছবি চালান হবে। হাউস ফুল হলে ত লভ্যাংশের অর্ধেক তাঁরই প্রাপ্য। আবার এ নিয়মও আছে যদি কোনো ছবিতে সপ্তাহে তাঁদের নির্দিষ্ট টাকার টিকিট বিক্রী না হয়, তাহলে তাঁরা হল থেকে ছবি তুলে দেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় আমার শ্রীমতী পিকচার্সের কোনো একটি হিট পিকচারের কথা। ছবিটি প্রত্যেকটি হাউসে বেশ ভালভাবেই চলছিল, কিন্তু উত্তর কলকাতার কোনো একটি হলে দুদিন প্রচণ্ড বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট ভেসে যাবার দরুন কোনো এক সপ্তাহে চুক্তিমত যত টাকার টিকিট বিক্রী হওয়ার কথা ছিলো তার চেয়ে মাত্র ৩০ টাকার কম বিক্রী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হলের মালিক ছবি তুলে দিলেন। বলা বাহুল্য এই নির্মম ব্যবসায়িক ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হোলো আমাদের, অর্থাৎ ডিস্ট্রিবিউটার এবং প্রোডি-উসরকে। আর এই ক্ষতির আশঙ্কা যখন প্রতি পদেই, ডিস্ট্রিবিউটারকেই বা দোষ দিই কেমন করে? তাঁকেও ত দেখতে হবে, যে টাকা তিনি ব্যবসাক্ষেত্রে নিয়োগ করেছেন সেটা যেন খোয়া না যায়? এইসব নানা কারণেই বাংলা ছবির সংখ্যা অনেক কমে যাচ্ছে। যাও বা হচ্ছে রিলিজড হতে পাচ্ছে না হলের অভাবে।—বেশীর ভাগ হাউসের মালিকদের চেষ্টা থাকে হিন্দী অথবা ইংরাজী ছবি চালানোর দিকে। কারণ তাতে টাকা বেশী পাওয়া যায়।

আবার এইসব কারণেই আমার মনে হয় সেন্সার বেসিসেই ছবি রিলিজড্ হলে ভাল হয়। তাতে করে অন্ততঃ অকারণে নিশ্চল হওয়া অবস্থা এবং রিলিজের ব্যাপারে কোনো কারসাজীর হাত থেকে বাংলা ছবি বেঁচে যেতে পারে। বাংলাদেশে হাউসের সংখ্যাদৈন্যও বাংলা ছবির দুর্দশার অন্যতম কারণ। হাউসের সংখ্যা না বাড়ালে বাংলা ছবির এই অমানিশা কাটবে না।

এ-ছাড়া হিন্দী ছবির সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় বাংলা ছবির পরাজয় ত স্বাভাবিক ঘটনাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ আগেই বলেছি যে কোনো হাউসের মালিক বাংলা ও হিন্দী ছবির মধ্যে দ্বিতীয়টিকে প্রাধান্য দেবার দিকেই ঝুঁকবেন। কেন? না তাদের ছবি চালালে লাভের অঙ্ক মোটা হবে। তাছাড়া বোম্বাই ছবির চাহিদাও বাংলা ছবিকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে। কারণ? এক টাকা সত্তর নয়া পয়সায় দর্শক এখানে একাধারে রঙিন ছবি দেখার আনন্দ পাচ্ছেন। নিত্য নূতন দর্শনীয় মুখের (কারণ ওখানে রূপসমৃদ্ধ নায়ক-নায়িকার সংখ্যা-ধিক্য) দেখার বৈচিত্র্য উপভোগ করছেন। নাচ, গান, অভিনয়, উত্তেজক সেক্সের দৃশ্য ইত্যাদি সাড়ে বত্রিশভাজার মত পাঁচমিশেলী আমোদের উপকরণ পাচ্ছেন। সে জায়গায় বাংলা ছবিতে রঙিন ছবির সংখ্যা প্রায় শূন্য বললেই চলে। তারপর হিরো-হিরোইনদের ক্ষেত্রে স্বল্প কয়েকটি চেহারাকেই প্রায় সব ছবিতে ঘুরেফিরে আসতে দেখা যায়। এ'দের মধ্যেও আবার সকলের বক্স-অফিস সমান নয়। এবং সেই কারণেই বক্স-অফিসের নায়ক বা নায়িকা এমন একটা দক্ষিণার দাবী করেন যে প্রোডিউসর অথবা ডিস্ট্রিবিউটারকে মাথায় হাত দিয়ে বসতে হয়। শিল্পীদেরও দোষ দেওয়া যায় না। তাঁরা জানেন ভাগ্য-লক্ষ্মী চঞ্চলা, অতএব দিন থাকতে তাঁর অনুগ্রহের সদ্ব্যবহার করবেন নাই বা কেন? আর এতবড় প্রতিষ্ঠানের সবাই যদি আপনা-পন স্বার্থকেই প্রাধান্য দেন তাঁর একার বিবেচনায়—চলচ্চিত্র শিল্পের আর কতটা উন্নতি হওয়া সম্ভব?

তারপর সেন্সারবোর্ডের বিচারও পক্ষ-পাতহীন নয়। বাংলা ছবির এস্থেথিক বিচারের সময় তাঁরা যতটা কঠোর ঠিক ততখানিই উদার হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে। বোম্বাই ফিল্মের এমন অনেক ছবি আজকাল আসছে যা সপরিবারে বসে দেখার অযোগ্য। এসব ছবির উদ্দেশ্য থাকে তরুণ সম্প্রদায়ের যৌন-লালসাকে উদ্দীপ্ত করা আর বোধহয় পরোক্ষভাবে খানিকটা তৃপ্ত করাও (যদি দেখার মধ্যে কোনো তৃপ্তি থাকে)।

তাছাড়া হিন্দী ছবির মার্কেট বাংলা ছবির তুলনায় অনেক ব্যাপক হওয়ার ফলে শুধু বাংলাদেশের বাইরেই নয়, ভারও বাইরে হিন্দী ছবির নায়ক প্রযোজক, সঙ্গীত পরি-চালক অথবা পরিচালককে তাঁরা যত বেশী চেনেন বাংলা ছবির স্রষ্টা অথবা নায়ক-নায়িকাদের তার সিকিভাগও চেনেন না। কয়েক বছর আগে রবিশঙ্করকে একবার আমার বাড়ীতে পাবার সৌভাগ্য হয়েছিলো। সুকমলবাবু এবং আরো অনেকেই সেখানে ছিলেন। তখনই বিদেশে ভারতীয় সঙ্গীতের বর্তমান প্রসার সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে রবু বলল ওদেশের কয়েকটি জায়গায় গিয়ে একেবারে প্রথমের দিকে ও আশ্চর্য হয়ে যেত, ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বোম্বাই ছবির বিশেষ কয়েকজন সঙ্গীত পরিচালক ছাড়া কাউকেই ও'রা চিনতেন না দেখে। ভারতীয় সঙ্গীতের বিপুল সম্পদ তাঁদের কাছে একেবারেই অপরিজ্ঞাত ছিল। এখন রবু ও আলি-আকবরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রকৃত শিল্পীদের কয়েকজনকে অন্ততঃ ও'রা চিনতেই শুধু নয়, যথার্থ সম্মান দিতে শিখেছেন। আর সঙ্গীতের আলাপ শুনলে ও'দের চোখে জল

আসে। শুনে আনন্দ হয়েছিলো, আবার ক্ষোভও হয়েছিলো সঙ্গীতের ক্ষেত্রের এই সুবিস্তৃত জনপ্রিয়তা বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও কেন বিস্তৃত হবে না? কেন মুষ্টি-মেয় কয়েকজন পরিচালক ছাড়া বাংলা সিনেমা জগতের কাউকেই ও'রা চিনবেন না? বাংলা দেশে যত অভাবই থাক—প্রতিভার অভাব ত কোনোদিন ঘটেনি।

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে আমরা যারা ফিল্ম-ল্যাবোরেটরীর এবং স্টুডিওর সঙ্গে জড়িত আছি তাদের করণীয় অনেক কিছু আছে একথা আমি মানি। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই সব সময় সব কিছু করা সম্ভব হয় কি?

বাংলা দেশে ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির অগ্রগতির জন্য আমরা কি-কি করতে পারি? হিন্দী ছবির যখন এত সুবিস্তৃত বাজার, বাংলা-দেশেও হিন্দী ছবি হওয়া নিশ্চয় দরকার, যেমন হোতো নিউথিয়েটার্সের যুগে। আগেকার দিনে চিত্রনির্মাতা এবং স্টুডিও-মালিক একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হওয়ায় ছবি তৈরির যন্ত্রপাতি এবং স্টুডিওর অন্যান্য খুঁটিনাটি ব্যাপার সবই তাঁরা দেখতেন, যথাসম্ভব যত্ন নিতেন এবং যথাসাধ্য উন্নতির চেষ্টায় মন দিতেন। কিন্তু এখন স্টুডিও-মালিক ও চিত্রনির্মাতা দুটি আলাদা প্রতিষ্ঠান। ফলে স্টুডিওগুলিও ভাড়া দেওয়া বিয়েবাড়ীর মতই হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা আসেন কাজ করে চলে যান—স্টুডিওর যত্নের দিকে তাঁদের দৃষ্টি থাকে না। থাকার কথাও নয়। আর এইসব স্টুডিও ভাড়া নিয়ে আমরা এমন কিছু পাই না যা আধুনিক যন্ত্রপাতি অথবা অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামে ব্যয় হতে পারে। কারণ লেবার চার্জ ছাড়াও সেটিং-এর উপকরণ এবং অন্যান্য প্রোডাকসন খরচ যতখানি বেড়েছে সেই তুলনায় স্টুডিও ভাড়া বাড়েনি। সরকারের ট্যাক্সের হারও প্রচুর বেড়ে গেছে। হাউসের ভাড়া ত অসম্ভব রকমের বেড়েছে। কিন্তু মজা এই যে বাড়তি ভাড়ার এক পয়সাও প্রোডিউসর অথবা ডিস্ট্রিবিউটরের হাতে আসে না। যদিও তাঁরা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির উন্নতি সাধন করতে পারেন।

তাছাড়া কস্ট অফ্ লিভিং মহার্ঘ্য হওয়ার দরুন কর্মীদের অসন্তোষ, দাবী-দাওয়া বেড়েই চলেছে। সব সময় হয়ত তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। তবু আমরা মানে—ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ল্যাবরেটরীর সঙ্গে যাঁরা জড়িত আছি যথাসাধ্য চেষ্টা করি তাঁদের কাজের মর্যাদা দিতে। কারণ আমরা বিশ্বাস করি ডিগনিটি অফ্ লেবারে। প্রতি বছর বোনাস ছাড়াও লভ্যাংশের একটা ভাগ আমরা এঁদের দিই। শুধু টাকাটাই এখানে বড় নয়। সবার পরিশ্রমে যা পেলাম তার আনন্দের পরিমাণটাও সবাই মিলে মিশে ভাগ করে নিতে চাই—সে যতটুকুই হোক না কেন? কখনও কোনো ভুল বোঝাবুঝি হয়নি এমন কথা বলতে পারি না। তবে এ'রা অবুঝ নন। সবাই মিলে বসে পরিস্থিতির কথা আলোচনা করে বুঝিয়ে বললে আমাদের সমস্যাকে এ'রাও নিজেদের সমস্যা বলেই গ্রহণ করেন। তাই এ'দের সঙ্গে আমাদের ভারী সুন্দর একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আমরা সবাই এখানে এক পরিবারের মতই।

তবে আমাদের ক্ষমতা ও আয় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাই স্টুডিও ইকুইপমেন্টসের সংস্কার করাটা অবশ্য প্রয়োজনীয় বুঝেও করে উঠতে পারি না একথা আগেই বলেছি। যেমন কালার ফিল্মের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশে আর সব দেশের মতই কালার ফিল্মের চাহিদা আছে। কিন্তু প্রসেসিং-এর ব্যবস্থা নেই। সে সুযোগ বোম্বাই ও মাদ্রাজে আছে বলেই চিত্র-ব্যবসায় ক্ষেত্রে ওদের অগ্রগতি লক্ষ্য করার মতই।

বড় ছবি ছাড়াও ডকুমেন্টারী ছবি ও প্রাইভেট পার্টির ছবি যদি করা যায় তাতে আয় বাড়ে—এবং তা নিয়ে ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির উন্নতিও করা যায়। কিন্তু অফার পেলেও আমরা নিতে পারি না আমাদের ল্যাবরে-টারীতে, ব্যবস্থার অভাবে।

অতএব শেষ পর্যন্ত একটি কথাকেই দাঁড়াতে হয়, সরকারী সাহায্যের অভাব। ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি একটা ব্যাপক জিনিস। এর উত্থান-পতনের সঙ্গে অনেক পরিবারের ভাগ্য জড়িত, এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানও। কারণ, এ থেকে সরকারের আয় প্রচুর। দেশের কল্যাণের দিকে তাকিয়েই এদিকে তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়ানো প্রয়োজন। পৃথিবীর সব দেশের চলচ্চিত্র যখন দ্রুত অগ্রগতির পথে—আমরাই কি পিছিয়ে থাকব—উপযুক্ত সরকারী সাহায্যের অভাবে? পশ্চিমবঙ্গ সরকার এদিকে একটু সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এ সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব বলেই আমি মনে করি।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে বোম্বাই ও মাদ্রাজী ছবি সরকারী সাহায্য ছাড়াই চলে কেমন করে (যতদূর জানি—বোম্বে মাদ্রাজের চলচ্চিত্রে সরকারী অবদান নেই)? সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক হিন্দী ছবির টেকনিক্যাল প্রোগ্রেস এত উচ্চস্থানে পৌঁছনো সম্ভব হোলো কেমন করে? এখানেই ঘুরে-ফিরে আসে ঐ একই কথা। ওদের বহু-ধাবিস্তৃত ব্যবসা ক্ষেত্র, এবং সেই কারণেই অর্থাগমও প্রচুর। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের কারণেই তাঁরা সাহিত্য বা বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে নিকৃষ্ট মানের হয়েও বাংলা ছবির ওপর সগৌরবে বিজয়-পতাকা ওড়াচ্ছেন: অবিলম্বে সিনেমা হাউস বাড়ানো, স্টুডিও ও ল্যাবরেটারীর সকল রকম প্রয়োজনের দিকে নজর দেওয়া সরকারের অবশ্য কর্তব্য। এ-বিষয়ে তাঁদের আশ্বাস আমরা বহুদিন ধরেই পেয়ে আসছি। কিন্তু আজ বাংলা সিনেমার এই নাভিশ্বাস ওঠার মুহূর্তেও কি সে প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করার সময় আসেনি?

(আগামীবারে সমাপ্য)

অনুলিখন—সন্ধ্যা সেন

ভ্রম সংশোধন

[২৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত অধ্যায়ে 'অবাঙ্গালী মেয়ে শোকিলা'র জায়গায় 'কোকিলা' হবে। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে 'অনিলদা'র জায়গায় 'বুলাদা' (প্রশান্ত মহলানবীশের ভাই) হবে। এ ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাইছি।—কানন দেবী

উপন্যাস

এগারো

খাটের উপর বাণীব্রত চুপ করে শুয়ে ছিলেন। ইদানীং শরীরটা তেমন ভালো নয়, ডাক্তারের বারণ, তাই অফিস থেকে ফিরে বাণীব্রত আর বাড়ির বাইরে যান না। তাছাড়া কোথায় বা বেরোবেন? যা সময় যাচ্ছে। দিন-দুপুরে খুন-জখম, রক্তারক্তি কাণ্ড। দাঁতা-দানোর চিৎকারের মত বিকট শব্দ করে যখন-তখন বোমা ফাটছে। অফিস থেকে কোনোমতে বাড়ি ফিরে আসাই সমস্যা। একবার ফিরতে পারলে আবার বেরোন প্রায় দুঃসাহসিক অভিযানের পর্যায়ে পড়ে।

নিজেকে খুব নির্জীব এবং ক্লান্ত লাগছিল বাণীব্রতর। শূন্য কলসীর মত ভিতরটা কেমন ফাঁকা। অবসর নেবার দিন যত এগিয়ে আসছে, বাণীব্রত তত বেশী অবসন্ন বোধ করছেন। প্রথমে ভাবতেন চাকরি থেকে ছুটি নিলেই বুঝি হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেন। কিন্তু ক্রমেই ধারণাটা যেন বদলাচ্ছে। আজকাল অবসর নেবার কথা মনে হ'লেই একটা নিঃসঙ্গ বেদনা তিনি টের পান। কেমন অস্পষ্ট যন্ত্রণা। ঝোপের ভিতর অদৃশ্য পাখির ডাকের মত সেই ব্যথাটা দেহের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে যেন কুক্ কুক্ শব্দ করে।

শোবার ঘরে ঢুকে মিলন শুধোল,—'তোমার শরীর আজ কেমন আছে বাবা?'

ছেলের কণ্ঠস্বর শুনে বাণীব্রত মুখ তুলে তাকালেন। বললেন,—'শরীর ভালই আছে। কিরণ যে ওষুধটা এনে দিয়েছে, সেটা মন্দ নয়। খেয়ে বেশ জোর পাচ্ছি মিলু।'

ঘরের কোণে একটা ভারী চেয়ার। বছর দুই-তিন আগে মনোরমা রথের মেলায় সেটি কিনেছিল। মিলন চেয়ারটা টেনে নিয়ে বাণীব্রতর কাছে এসে বসল। কোনোরকম ভনিতা না করেই বলল—'আমাকে এবার যাওয়ার জন্য তৈরি হতে হয় বাবা। সম্ভবত আর দু-তিন সপ্তাহের মধ্যেই ফ্লাই করতে হবে।'

—'তাই নাকি?' খবরটা শুনেই বাণীব্রত উঠে বসলেন। 'তোর বিদেশের চাকরির তাহলে সব ঠিকঠাক হয়ে গেল মিলু? চিঠিপত্র পেয়েছিস বুঝি?'

—'চিঠিপত্র অবশ্য এখনও পাইনি বাবা। কিন্তু অপরেশ বলছিল চিঠি আসতে দেরি হলেও খবর তুই পাকা জানবি। এই চাকরির ব্যাপারে ওর এলসা বৌদির খুব ইনফ্লুয়েন্স—মানে হাত আছে। সুতরাং চাকরি হবেই। আর ফাইনাল খবর অর্থাৎ চিঠিপত্র কিম্বা ওর বৌদির কেবল যে কোনো সময়ে আসতে পারে। মানে আজ কিম্বা কাল,—এনি টাইম।'

—'চিঠিপত্র পেলেই তোকে তাড়াতাড়ি রওনা হতে হবে। বেশীদিন অপেক্ষা করা চলবে না। তাই না রে মিলু?'

—'অপেক্ষা করার দরকার কি বাবা? সব ঠিকঠাক হবার পর শুধু শুধু বসে থাকার কোনো মানে হয়? তাই অপরেশ আমাকে আগে থেকেই রেডি হতে বলছিল। চিঠি পেলেই যাতে চটপট ফ্লাই করতে পারি।'

দেওয়ালের গায়ে একটা ক্যালেণ্ডার টাঙানো। বেশ বড় হরফের বার-তারিখ। একজনর তাকিয়ে বাণীব্রত বললেন,—দু-তিন সপ্তাহ মানে নভেম্বরের শেষাশেষি। আমি ভেবেছিলাম তোর যেতে দেরি আছে মিলু। আরো দু-এক মাস বাদে, মানে জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি নাগাদ তুই যাবি।'

—'জানুয়ারী মাস? বল কি বাবা?' মিলন অবাক হয়ে শুধোল। 'তার তো অনেক দেরি। অত দিন কি পোস্টটা আমার জন্য খালি রেখে দেবে?'

—'তা ঠিক।' বাণীব্রত চিন্তিতভাবে বললেন, 'যেতে যখন হবেই, তখন আর উপায় কি? তবু তুই জানুয়ারী মাসের কটা দিন থাকলে আমার ভাল লাগত মিলু।'

বাণীব্রতর কথাগুলি মিলন মন দিয়ে শুনছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তার ঠিক বোধগম্য হ'ল না, সে আরো কিছুদিন থাকলে তার বাবার খুব ভালো লাগত? কিন্তু কেন? মিলন কিছুটা সংশয়ের সুরে শুধোল,—জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত তুমি কি আমাকে থেকে যেতে বলছ বাবা? তাতে কোনো সুবিধে হবে তোমার?'

'সুবিধে-অসুবিধের কথা নয়। মনে মনে আমার একটা ইচ্ছে ছিল মিলু। খুব সামান্য ইচ্ছে, তোর মা হয়তো শুনলে আমার হাসবে।' বাণীব্রত কপালে হাত রেখে কি যেন ভাবতে শুরু করলেন। সিন্দুকের একেবারে নীচে, সংগোপনে অতি সযত্নে-রাখা একটি মূল্যবান বস্তুর মত গোপন বাসনার সেই কৌটোটাকে তিনি যেন হাতড়ে খুঁজছিলেন। কয়েক সেকেণ্ড পরে বাণীব্রত আবার শুরু করলেন,—ডিসেম্বরের চব্বিশ তারিখে রিটায়ার করছি মিলু। ভাবছি জানুয়ারীর প্রথমেই চন্দনপুরে গিয়ে উঠব। অবশ্য পুরানো বাড়ি,—বাপ-ঠাকুর্দার ভিটে। কিন্তু সে তো ভাঙাচোরা একতলা ছিল। সারিয়ে-সুরিয়ে দোতলার ঘর দুখানা তো আমিই তুলেছি। নতুন বাড়ি বলতে চাইনে—তবে রং-টং করিয়ে বাড়িটাকে এখন প্রায় নতুন বলেই মনে হয় মিলু।'

—নিশ্চয় নতুন মনে হবে বাবা।' মিলন সায় দিয়ে বলল। 'চন্দনপুরের বাড়ির পিছনে তুমি কম টাকা তো খরচ করনি। ঐ টাকাতে দেশে-গাঁয়ে ছোটখাটো একটা বাড়ি তৈরি করা যায়।'

—'তা বলতে পারিনে।' বাণীব্রত ঈষৎ হাসলেন, 'তবে চন্দনপুরের বাড়ির পিছনে কিছু টাকা খরচ করেছি বৈকি। নইলে দোতলার ঘর দুখানা, বাড়ির চুনকাম, পালিশ, বাইরেটা রং করানো হত না।'

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বাণীব্রত ফের বললেন—'ভেবেছিলাম রিটায়ার করে চন্দনপুরে সবাই একসঙ্গে যাব। তোর মা, আমি, তুই, কিরণ আর বিন্তি। ছোটখাটো একটা গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান করলেও মন্দ হয় না। দিন সাত-আট দেশের বাড়িতে সবাই মিলে বেশ হৈ-হৈ করে থাকা যাবে। তারপর আবার ছাড়াছাড়ি। তুই আর কিরণ কলকাতায় ফিরে আসবি। হিরুকে পাঠিয়ে দেব বাঁকুড়োর কলেজে। হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করবে। আর বিন্তির জন্যে চিন্তা নেই। ওকে ভর্তি করব চন্দনপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে। হেড-মাস্টারের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। কো-এডুকেশন স্কুল,— ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে পড়াশুনো করে। আমি গেলেই বিন্তিকে ওরা ভর্তি করে নেবে।'

দরজার কাছে মনোরমা কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল, বাণীব্রত লক্ষ্য করেন নি। নইলে অবশ্যই ছেলের কাছে দেশের বাড়ির গল্প সবিস্তারে ফেঁদে বসতেন না। ইদানীং মনোরমা যেন আরো বিরক্ত,—চন্দনপুরের বাড়ির কথা উঠলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে।

চোখাচোখি হতেই বাণীব্রত একটু দমে গেলেন। মনোরমার মুখের ভাব কুটিল,—রুষ্ট দৃষ্টি। স্ত্রীর এই রূপ তার অজানা নয়। বাণীব্রত নিজেকে সংযত না করলে এখনি একটা বিশ্রী কলহের সূত্রপাত হতে পারে।

বিদ্রূপ করে মনোরমা বলল,—ছেলের কাছে বুঝি চন্দনপুরের প্রাসাদের গল্প হচ্ছিল?'

চন্দনপুরের বাড়ি নয়,—প্রাসাদ। মনোরমার কথার শেষে বোলতার হুল। বাণীব্রত কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলেন।

বাপের বিমর্ষ অসহায় ভাব লক্ষ্য করে মিলন বলল,—'জানো মা, চন্দনপুরে তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব না বলে বাবার খুব দুঃখ হচ্ছে।'

—'তাই নাকি?' মনোরমা বাঁকা হাসল। 'তাহলে এখন আমেরিকা গিয়ে কাজ নেই। চন্দনপুরে তোর বাবা অট্টালিকা তৈরি করেছেন সেখানে দু'দিন থেকে আসবি চল।'

চন্দনপুরের বাড়ি নয়,—প্রাসাদ, গৃহ নয়,—অট্টালিকা। মনোরমার রসনায় যেন সাপিনীর বিষ। সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দেয়, তবু বাণীব্রত হেসে বললেন,—'আহা। আমি কি তাই বলছি? তুমি এমন সব উল্টো-পাল্টা বোঝ না।'

—'হ্যাঁ। আমি বোকাসোকা, মুখ্যু মানুষ। উল্টোপাল্টা বুঝি।' মনোরমা ব্যঙ্গ করে বলল। ফের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে শুধোল,—'তোর বাবাকে সব কথা বলেছিস মিলু?'

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মিলন ঢোক গিলল। এমন একটা বিশ্রী পরিস্থিতি—এসব কথা কি বাবার সামনে উচ্চারণ করা যায়? বাণীব্রতকে কি বলবে মিলন? আজ সন্ধ্যায় পার্ক স্ট্রীটের কোনো বার অ্যান্ড রেস্তোরাঁয় তার ছোটবোনকে একটা ছেলের সঙ্গে সে টুইস্ট নাচতে দেখেছে। যাবার সময় তার চোখের সামনে ছোঁড়াটা বিন্তির অনাবৃত শুভ্র কোমর কেমন অনায়াসে পেঁচিয়ে ধরল।

একটু চিন্তা করে মিলন বলল,—'চন্দনপুরে যাওয়ার আগে বিন্তির বিয়ে দেওয়া যায় না বাবা?'

ছেলের প্রশ্ন শুনে বাণীব্রত একটুও চঞ্চল হলেন না। কথাটা তার কাছে নতুন নয়। তাড়াতাড়ি বিন্তির বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছেটা মনোরমার। স্ত্রীর এই অভিলাষের কথা তিনি জানেন। এতে অবাক হবার কিছু নেই। মিলনের মুখে তার মায়ের কথার সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি।

বাণীব্রত কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইলেন। তারপর মুখ তুলে অনুত্তেজিত শান্ত গলায় বললেন,—'বিন্তির বিয়ের বয়স কি পার হয়ে যাচ্ছে মিলু? চন্দনপুরে যাওয়ার আর কটা দিন বাকি। এর মধ্যে তাড়াহুড়ো করে ওর বিয়েটা কি না দিলেই নয়?'

—'ব্যাপারটা ঠিক তা নয় বাবা। আমি তোমাকে একটু বুঝিয়ে বলি। মা বলতে চায় যে চন্দনপুরে গিয়ে সব চেয়ে বড় সমস্যা হবে বিন্তিকে নিয়ে। আমি চলে যাচ্ছি আমেরিকায়। কিরণ থাকবে কলকাতায়। আর হিরু পড়তে যাবে বাঁকুড়ার কলেজে। শুধু বিন্তিকেই চন্দনপুরে থাকতে হবে। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ গ্রামে গিয়ে বিন্তি কি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে বাবা? ও নাচের স্কুলে যায়, —ফাংশনে নাচবার জন্যে কত লোকে ওকে ডাকাডাকি করে। এখানে যে পরিবেশে ও মানুষ হয়েছে, চন্দনপুরে যে তার ছিটে-ফোঁটাও পাবে না।'

বাণীব্রত দুঃখ করে জবাব দিলেন,—'তুই শুধু তোর ছোটবোনের দিকটাই দেখলি মিলু। আমার সমস্যাগুলোর কথা একবার ভাবলি না।'

—'তোমার সমস্যা বাবা?'—

—'হ্যাঁ, আমার সমস্যা।' বাণীব্রত নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন,—'তুই তো আমেরিকা চললি। কিরণ হাসপাতাল থেকে শ-দেড়েক টাকার মত অ্যালাউন্স পায়। চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর কলকাতায় কেমন করে থাকব বলতে পারিস? চন্দনপুরে না গিয়ে আমার উপায় আছে?'

—'হ্যাঁ কলকাতায় যত খরচ, চন্দনপুরে গেলে সব নি-খরচায় হবে।' মনোরমা টিপ্পনী কেটে বলল।

—'নি-খরচায় হবে না। তবে খরচপত্র অনেক কম। তাছাড়া চন্দনপুরে গেলে বাড়িভাড়া লাগবে না। দশ-বারো বিঘে ধানী জমি আছে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেখাশুনো করলে মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না জানবে।'

মিলন বলল,—'বিন্তির বিয়েটা হয়ে গেলে তোমার সমস্যা অনেক কমত বাবা। আর কোনো ভাবনা-চিন্তা থাকত না।'

বাণীব্রত চিন্তিতভাবে বললেন,—'বিন্তির বিয়ের কথা বলছিস? কিন্তু চট করে বিয়ে দেওয়া কি সহজ কাজ মিলু? আর শুধু হাতে তো মেয়ের বিয়ে হয় না। ভালো ঘরে, ভালো বরে মেয়ে দিতে হলে অন্তত বারো-চোদ্দ হাজার টাকা খরচ করতে হবে। রিটায়ার করেই অতগুলো টাকা বের করে দিলে আমার আর কি থাকবে বলতে পারিস?'

মনোরমা মুখ বেঁকিয়ে বলল,—'ও, তাহলে সেই কারণেই তুমি এখন বিন্তির বিয়ে দিতে চাও না?'

বাণীব্রত হেসে বললেন,—'শুধু এই কারণেই নয়। আমি বিন্তির বয়সের কথাও ভেবে দেখেছি। তোমার বড় মেয়ে অবন্তীর বিয়ে দিয়েছি উনিশ বছরে। সে আজ আট-দশ বৎসর আগের কথা। সুতরাং বিন্তির বিয়ে আরো বছর তিনেক বাদে দিলেও চলবে,—কোনো ক্ষতি হবে না।'

—'বিন্তির বিয়ে দেবার জন্যে তখন তোমার হাতে টাকা থাকবে?'—

—'আমার হাতে অত টাকা না থাকাই সম্ভব। কিন্তু ততদিনে বিন্তির দুই দাদা তৈরি হয়ে যাবে। বোনের বিয়েতে তারা নিশ্চয় আমাকে সাহায্য করবে। কি বলিস মিলু?'

মিলন তাড়াতাড়ি বলল,—'নিশ্চয় বাবা, তিন বছর বাদে আমি হয়তো একবার ইণ্ডিয়ায় ঘুরে যাব। বিন্তির বিয়ে তুমি সেই গময় দিও।'

বাণীব্রত উৎসাহের সঙ্গে বললেন,—[illegible] কথা আবার বলতে। ছোটবোনের বিয়েতে [illegible] না এলে চলবে কেন বাবা? আমি [illegible] আরো বুড়ো অথর্ব হয়ে যাব। [illegible] সম্বন্ধ বলতে কিছুই থাকবে না। [illegible] দুজনেই আমার ভরসা। দুই ভাই দাঁড়িয়ে থেকে ছোটবোনের বিয়ে দিবি। আমি [illegible] চেয়ে দেখব মিলু।

মুখটা বিকৃত করে মনোরমা বলল, 'তিন বছর পরে আর বিন্তির [illegible] [illegible] চন্দনপুরে [illegible] আর দেখতে হবে না। [illegible] মা একখানা হাল হবে। [illegible] গোবিন্দপুরে কে তোমার মেয়েকে [illegible] করতে যাবে। কোন সুপাত্রের পাল্লায় পড়বে শুনি?'

কথা শেষ করে মনোরমা আর মুহূর্তও দাঁড়াল না। রেগে গর গর [illegible] ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্ত্রী চলে গেলে বাণীব্রত [illegible] বললেন,—'তোর মা অমনি। সারাজীবন দেখে এলাম। একটুতেই রাগ-[illegible] আগুনের মত দপ করে জ্বলে [illegible] আবার তেমনি রাগ পড়তেও দেরি হয় [illegible] আসলে মানুষটা তোদের ভীষণ ভালবাসে। সর্বদা বুকে দিয়ে আগলে রাখতে [illegible] এতটুকু দুঃখকষ্টের আঁচ লাগলে [illegible] ভাবনা-চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে।'

মিলন উঠতে যাচ্ছিল। [illegible] ইঙ্গিতে তাকে নিবৃত্ত করলেন। বললেন, 'বোস না মিলু, তোর সঙ্গে আমার [illegible] দু-একটা কথা আছে।'

—'কি কথা, বাবা?'

—'কথা মানে, তোর এই [illegible] যাওয়ার ব্যাপারটা।' বাণীব্রত [illegible] করলেন, চোখের উপর [illegible] একবার বুলিয়ে নিয়ে ছেলেকে [illegible] —'আচ্ছা মিলু, তোর যাবার [illegible] রকম টাকাকড়ি, মানে খরচপত্র [illegible] হিসেব করেছিস?'

মানসাঙ্কের উত্তরটা মনে মনে করে নেবার মত ভঙ্গিতে মিলন [illegible] ভাবল। বলল,—'তা প্রায় [illegible] হাজার [illegible] টাকার মত লাগবে।'

—'সাত হাজার! অত টাকা! [illegible] কি মিলু?'

বাণীব্রত যেন একটু দমে গেলেন। মিলন বলল,—'শুনতেই সাত [illegible] টাকা বাবা। কিন্তু তুমি যদি হিসেবটা [illegible] তাহলে মনে হবে টাকাটা কিছুই নয়।'

—'কৈ, হিসেবটা বল শুনি—'

—'সোজা হিসেব বাবা।' মিলন ভনিতা করে শুরু করল, 'প্রথমে টিকিটের দাম। ওতেই প্রায় পাঁচ [illegible] টাকার মত চলে যাবে। তারপর জানো ওখানে কি প্রচন্ড শীত। আমি [illegible] শেষ দিকে যাচ্ছি। অন্তত দুটো কাপড়ের স্যুট নইলে চলতে পারে [illegible] তারপর টুকিটাকি আরো কত খরচ

সাত হাজার টাকাতে কুলোবে কিনা কে জানে?'

—'আমি ভাবছি অতগুলো টাকার কি উপায় হবে মিলু, রিটায়ার করার আগে তো আমি প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাগুলো হাতে পাচ্ছিনে। তাছাড়া তুই বড় হয়েছিস, তোর কাছে বলতে লজ্জা নেই। অবশ্য তোর আমেরিকা যাওয়ার খরচ নিশ্চয় আমারই দেওয়া উচিত, কিন্তু কী করব বলতে পারিস? আমার এখন ব্যাঙের আধুলি পুঁজি। টাকা নেই বলে চন্দনপুরে চলে যাচ্ছি। টাকার অভাবে বিন্তির এখন বিয়ে দিলাম না। কিন্তু তোর আমেরিকা যাওয়ার কি উপায় হবে? সাত হাজার টাকা কেমন করে জোগাড় করব ভেবে আমি অস্থির হচ্ছি।'

মিলন হেসে বলল,—'তুমি মিথ্যে ভাবছ বাবা, ও টাকা আমার জোগাড় হয়ে গেছে।'

—'জোগাড় হয়ে গেছে?' বাণীব্রতর দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। 'তুই বলছিস, কি মিলু? কোথা থেকে এতগুলো টাকা পেলি?'

—'টাকা পাইনি বাবা, তবে অপরেশ একটা উপায় করে দিয়েছে। যেমন ধ'র টিকিটের দাম। প্লেনের টিকিট ক্রেডিটে মানে ধারে পাওয়া যায়। আমি ওখানে চাকরি করে ইনস্টলমেন্টে টাকাটা শোধ করব।'

—'বাঃ চমৎকার ব্যবস্থা—'বাণীব্রত সপ্রশংস দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকালেন।

—'হ্যাঁ বাবা, আর বাকি টিকাটার জন্যেও তোমাকে [illegible] আমার নিজের কিছু জমানো টাকা আছে। অপরেশের কাছ থেকেও হাজার খানেক টাকা লোন পেতে পারি। এক রকম করে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

—'আমার খুব খারাপ লাগছে মিলু। তোকে আমেরিকা যাওয়ার খরচটাও দিতে পারলাম না।' বাণীব্রত দুঃখিত ব্যথিত চিত্তে জানালেন। ফের বললেন,—'তবে আমার কাছ থেকেও তুই কিছু নিস। এই ধর,—শ পাঁচেক টাকা।'

—'নিশ্চয় নেব বাবা। দরকার হলেই আমি টাকাটা তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেব।' মিলন ঘাড় নেড়ে জবাব দিল।

• •

বাণীব্রত ঘর থেকে বেরিয়ে স্ত্রীর খোঁজ করলেন। রান্নাঘরে, বারান্দায়, ও-ঘরে, এমন কি বাথরুমের দরজাটা বন্ধ আছে কিনা তাও পরখ করে নিলেন। মিলন তাকে নিশ্চিন্ত করেছে। এই মুহূর্তে তার কোনো চিন্তা নেই। সত্যি বাহাদুর ছেলে। বাপকে একটুও ভাবনায় ফেলেনি। কেমন নিজে বিদেশ যাওয়ার সব ব্যবস্থা গুছিয়ে রেখেছে। মনোরমাকে দেখতে না পেয়ে বাণীব্রত চঞ্চল হলেন। ছেলের এই কৃতিত্বের সংবাদ স্ত্রীকে না দেওয়া পর্যন্ত তার মন কিছুতেই শান্ত হবে না।

মনোরমা ছাদে ছিল। একা নয়,—মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। ব্যাপারটা বিনিতা বুঝতে পারে নি। সে ধড় মড় করে ঘুম থেকে উঠে বসেই দেখল মা সামনে দাঁড়িয়ে। চোখের ইশারায় মনোরমা তাকে সঙ্গে যেতে বলছে। তারপর ঠিক নিশি-পাওয়া মানুষের মত সে মনোরমার পিছু পিছু ছাদে গিয়ে উঠেছে।

মাথার উপর আকাশের রঙ বোঝা যায় না। ধোঁয়ার একটা আবরণ চাঁদোয়ার মত ঝুলছে বকে নক্ষত্রের আলো বহুদূরে থেকে দেখা মিটমিটে প্রদীপের মত অস্পষ্ট মনে হয়। দূরে আট-দশতলা উঁচু একটা বাড়ির মাথায় বিমান সতর্কীকরণ লাল বাতিটাকে পৌরাণিক যুগের কোনো অমিতবিক্রম বলশালী দৈত্যের রক্তচক্ষু বলে কল্পনা করা যেতে পারে।

বিনিতা ভেবেছিল মা তাকে গোপন কিছু দেখাবে বলে চুপচুপি ছাদে ডেকে নিয়ে গেছে। কিন্তু মুখোমুখি হতেই তার বুকের ভিতরটা ভয়ে দুরু দুরু কেঁপে উঠল। মার চোখে রহস্যের লেশমাত্র নেই। বরং কেমন কটমটে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। মা এখন তাকে কি কথা বলতে চায়? তার জন্যে চুপি চুপি ছাদের এক কোণে আসবার কি প্রয়োজন ছিল?

মনোরমা কোনো ভনিতা না করেই শুধোল, —'আজ স্কুলের ছুটির পর তুই কোথায় গিয়েছিলি?'

আশ্চর্য! ফাংশনের কথা কি মার মনে [illegible] স্কুলের ছুটির পর সে কোথায় যায়, সে-কথা কি মা জানে না? বিনিতা এক মুহূর্ত ভাবল। তাহলে হঠাৎ এই প্রশ্নের কি অর্থ হয়? আসলে মা কি জানতে চায়? বিকেলে সে কোথায় গিয়েছিল? শুধু তাই? বিনিতা ঠোঁট কামড়ে নিজের মনেই প্রশ্নটা করল।

—'চুপ করে রইলি কেন? জবাব দে।' মনোরমা ধমক দিল।

—'স্কুলের ছুটির পর রোজ যেখানে যাই,—গানে রিহার্সাল দিতে।' বিনিতা ঢোক গিলে বলল, 'জানো তো সামনের সপ্তাহেই আমাদের ফাংশন।'

—'জানি।' মনোরমা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে তাকাল। ফের শুধোল, —'রিহার্সালের পর কোথায় গিয়েছিলি তাই বল?'

—'রিহার্সাল শেষ হবার পর তো বাড়ি চলে এলাম।' বিনিতা আমতা আমতা করে জবাব দিল।

—'মিথ্যুক কোথাকার!' মনোরমা রাগে মেয়ের গালে একটা চড় কষিয়ে দিল। বলল,—'রিহার্সালের পর তুই একটা ছেলের সঙ্গে বিলিতী মদের দোকানে ঢুকেছিলি। সেখানে নির্লজ্জ বেহায়ার মত দুজনে ধেই-ধেই করে নেচেছিস। মিলু স্বচক্ষে দেখেছে।'

বিনিতার চোখ ফেটে জল এল। মায়ের হাতের চড় খেয়ে নয়। তার বড়দা,—মিলনের মুখখানা মনে করে। ছি, ছি! কি লজ্জা আর অপমানের কথা। এরপর রতীশের সঙ্গে যদি সে কোথাও গিয়ে থাকে? কাল সকালে বড়দার হাতে বিনিতা চায়ের কাপ তুলে দিতে পারবে? মুখ তুলে কথা বলতে লজ্জা করবে না?

মেয়ের চোখে জল দেখে মনোরমা আর কথা বাড়াল না। মিছিমিছি কেলেঙ্কারী। দশটা ফ্ল্যাটের বাড়ি। বারোয়ারী ছাদ,—এখুনি কেউ উঠে বিনিতাকে কাঁদতে দেখলে হাজারটা প্রশ্ন করবে।

একটু নরম গলায় মনোরমা বলল,—হ্যাঁরে, ছেলেটি কে? কি নাম ওর?'

বিনিতা কান্না-ভেজা গলায় জবাব দিল, —'ওর নাম রতীশ। ওদের বাড়িতেই তো ফাংশন।'

মনোরমা শুধোল,—'তোর নাচের ওরা সবাই খুব প্রশংসা করে, তাই না রে?'—

—'সবাই করে মা।' বিনিতার মুখটা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আর রতীশ কি বলে জানো? ও বলে ভালো করে নাচ শিখলে একদিন আমার খুব নাম-ডাক হবে। তখন দাদার মতো আমিও বিদেশে যেতে পারি মা!'

স্বপ্ন! স্বপ্ন! এই দুনিয়ার স্বপ্ন কতটুকু? মনোরমা অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। মাথার উপরে নক্ষত্রশোভিত রহস্যময় আকাশের দিকে [illegible] সে একবার কলকাতার [illegible] পেয়ালার মত উপচে-পড়া ধোঁয়ার স্তরের আকাশটাকে নিরীক্ষণ করল। মেয়ের দিকে না তাকিয়ে মনোরমা বলল,—'শোন বিনিতা। আর কিছুদিন পরেই আমরা চন্দনপুরে চলে যাচ্ছি। এই নাচ-গান, ফাংশন, হৈ-চৈ, তুই এবার ছেড়ে দে। চন্দনপুরে গিয়ে গ্রামের মেয়ের মত থাকবি চল।'

আবছা অন্ধকারে বিনিতা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। শুকনো দৃষ্টি, ছলছলে চোখ। ঠিক বিচারে সাজা-পাওয়া আসামীর মত। মনোরমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। প্রস্ফুটিত কুসুমের মত এমন সুন্দর মেয়ে। চন্দনপুরের রোদে-জলে এই ফুলটা আর ভালো করে ফুটবে না। ভাঙা স্বপ্নের মত কুঁকড়ে শুকিয়ে যাবে।

* * *

নীচে ঘরের ভিতরে চেঁচামেচি—হৈ-চৈ। ওরা জোর গলায় কথাবার্তা বলছে।

মনোরমা ঘরে ঢুকতেই বাণীব্রত বললেন, —'জানো, হিরু এইমাত্র তিন-চারজন ছেলের সঙ্গে বড় রাস্তার দিকে কোথায় গেল।'

'এত রাত্তিরে?' মনোরমার বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠল। 'কে ওকে যেতে দেখেছে?'

—'কিরণ দেখেছে মা।' মিলন এগিয়ে এসে বলল, 'ও গলি দিয়ে ফিরছিল। দেখল তিন-চারজন ছেলের সঙ্গে হিরু বড় রাস্তার দিকে যাচ্ছে।'

বাণীব্রত এমনিতে শান্ত, কিন্তু এই সব ব্যাপারে ভীষণ খাপ্পা। বেজায় চটে যান। রাগ করে বললেন, —'ছেলেটা কি করে, কোথায় যায় তোমরা কেউ খোঁজ রাখতে পার না, অথচ একটা বাড়িতে একই ছাদের নীচে দিনরাত্তির বাস করছ।'

মনোরমার মন ভাল নেই। তবু কথাটা তাকেই খোঁচা দিয়ে বলা। সইতে না পেরে সে চেঁচিয়ে উঠল, —'একই বাড়িতে বাস করলেই কি সব খবর জানা যায়? তোমার ছেলেমেয়ের মনের ভিতরে যে একটা করে নতুন বাড়ি হচ্ছে, তার খোঁজ রাখ?'

বাথরুমে কিরণ মুখ-হাত ধুচ্ছিল। মার কথাটা তার কানে গেল। তা সত্যি। মা ঠিকই বলেছে। তাদের মনের বাড়ির খবর বাবা-মা জানবে কেমন করে?

কাল রবিবার। রীতাবরীর আসবার কথা। দুপুরে শেয়ালদ স্টেশনে বইয়ের দোকানটার কাছে সে অপেক্ষা করবে। মার কাছে রীতাবরীর গল্প কবে করবে কিরণ? কতদিন পরে?

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

সূর্য ও তার গ্রহমণ্ডল এখনো আগের মতোই ধাঁধা

গত পনেরো বছর ধরে যতোই মহাকাশে অভিযান হোক, যতোই শুক্র বা মঙ্গলগ্রহে ব্যোমযান স্বয়ং উপস্থিত হয়ে অন্বেষণ চালাক, যতোই এমনকি বৃহস্পতি থেকে নিকট আমেরিকান পায়োনিয়র ... হোক এখনো পর্যন্ত আমাদের এই সূর্য ও তার গ্রহমণ্ডল যেমন ছিল তেমনি ধাঁধা থেকে গিয়েছে।

সৌরমণ্ডল কেমনভাবে গড়ে উঠেছে, এ প্রশ্নের উত্তর কী? জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে এটাই একটা মূল প্রশ্ন। মহাকাশ অভিযানের ফলে এত কাণ্ডের পরেও এই প্রশ্নের জবাব পাবার দিকে সুনির্দিষ্ট এগোনো গিয়েছে এমন কথা বলা চলে না। বিজ্ঞানীরা সম্ভবত নিজেরাই বুঝতে পারছেন যে তাঁদের অবস্থা এখনো পর্যন্ত এমন নয় যে এ প্রশ্নের জবাব তাঁরা পেতে পারেন। যেমন, নিউটনের আগের আমলে যদি কেউ এ প্রশ্নের জবাব পেতে চাইতেন তাহলে পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞানের অভাবে তাঁর পক্ষে কিছুতেই সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। সে সময়ে ধূমকেতুকে মনে করা হত সবচেয়ে রহস্যপূর্ণ জ্যোতিষ্ক, মানুষের অনিষ্টসাধনে যার বড়ো রকমের ভূমিকা। তারপরে যখন মহাকর্ষের তত্ত্ব উপস্থিত হল একমাত্র তখনই বোঝা গেল ধূমকেতুগুলো তুলনামূলকভাবে কতখানি অকিঞ্চিৎকর।

কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যদি গ্রহণীয় হতে হয় তাহলে পদার্থবিদ্যা ও বলবিদ্যার সূত্রগুলোর সঙ্গে তার অবশ্যই মিল থাকা দরকার। সেই তত্ত্বের মধ্যে এমন কিছু থাকবে না যাতে কোনো বিশেষ প্রক্রিয়া বা অলৌকিক প্রক্রিয়া মেনে নেওয়ার প্রয়োজন ঘটে। তাছাড়া, কোনো তত্ত্বের সাহায্যে যদি ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে, এমন ভবিষ্যদ্বাণী যা যাচাই হতে পারে—তাহলে সেই তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক মূল্যও বেড়ে যায়। কেননা যদি দেখা যায় যে, ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সত্য তাহলে সেই তত্ত্বে অবশ্যই আস্থা রাখা চলে। সূর্যের মতো অন্যান্য তারারও গ্রহমণ্ডল আছে কিনা তা বর্তমান সময়ে জানা যেতে পারে একমাত্র তত্ত্বের সাহায্যে।

কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলে বৃহৎ একটি নীহারিকা—অতি উত্তপ্ত গ্যাস ও ধূলোয় তৈরী। এই নীহারিকা থেকেই গড়ে উঠবে তারা ও গ্রহমণ্ডল।
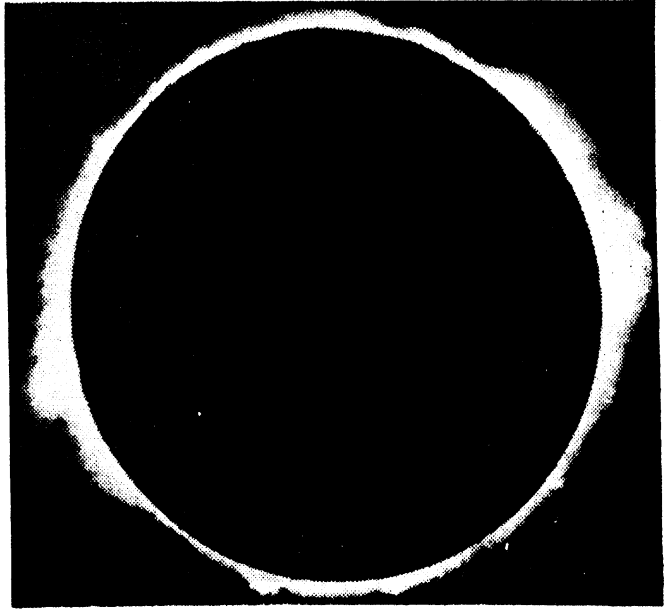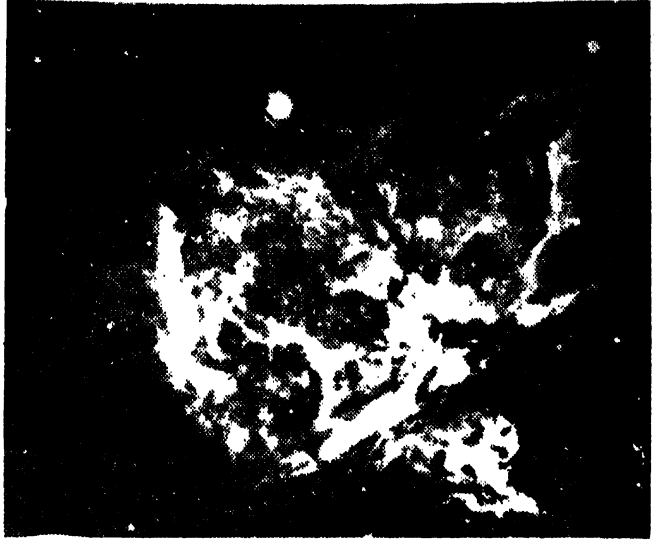
পূর্ণ গ্রহণের সময়ে সূর্য। এই একটি সময়েই সূর্যের দিকে সরাসরি ক্যামেরা তাক করা চলে। সূর্যের কালো চাকতি ঘিরে রয়েছে উত্তপ্ত গ্যাসের বলয়।

যদি একটি তত্ত্ব খাড়া করতে হয় তাহলে গোড়াতেই জানা দরকার তত্ত্বের বর্তমান লক্ষণগুলোর মধ্যে কোনগুলো—যদি থেকে থাকে—বিশেষ করে সৌরমণ্ডলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন ধরা যাক, আজকের দিনে দেখা যাচ্ছে গ্রহগুলোর কক্ষ প্রায় বৃত্তাকার ও একই সমতলে স্থাপিত। এমনটি কি চিরকাল থেকেছে? নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়। এমনকি যে সূত্রের সাহায্যে সূর্য থেকে গ্রহগুলোর দূরত্ব নির্ধারিত হয়ে থাকে তার দ্বারা গ্রহগুলোর গোড়ার বিন্যাস জানতে চেষ্টা করাটা সঠিক না হতে পারে। এমনকি গ্রহগুলোর মোট ভর গোড়ায় যা ছিল এখন তা নেই। কেননা, বাইরের দিকের বৃহৎ গ্রহগুলো—বিশেষ করে বৃহস্পতি ও শনি—এখন নিশ্চয়ই হাইড্রোজেন

বাইরের দিকের গ্রহ শনি—তার বলয়ের জন্যে সৌরমন্ডলে সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য। হাজার কিলোমিটার পুরু শনির বায়ুমন্ডল বিষাক্ত অ্যামোনিয়া ও মিথেন গ্যাসের তৈরী।

উপাদানে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। সূর্য তার গতিপথে যখন এই গ্যালাক্সির হাইড্রোজেন মেঘের ভিতর দিয়ে যায় তখন তার কিছুটা অংশ ধরে রাখে না এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

অন্যদিকে সৌরমন্ডলের গ্রহগুলো যে-ধরনের একটি বৈধিক মাত্রায় বিন্যস্ত এবং সাধারণভাবে ছোট থেকে বড়ো হওয়ার দিকে—সেটি একটি নির্ভরযোগ্য লক্ষণ এবং কোনো তত্ত্ব খাড়া করতে হলে অবশ্যই বিচার্য। সূর্য থেকে হাজারেরও বেশি সৌর ব্যাসের দূরত্বে (৮০ কোটি কিলোমিটার) রয়েছে বিপুল আকারের বৃহস্পতি, ছ-হাজার ব্যাসের দূরত্বে নেপচুন। এই ব্যাপারটি বিবেচনা করলে একটি তত্ত্ব সহজেই খারিজ হয়ে যায়, যে তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, সূর্যের গা থেকে যে-কোনো কারণেই হোক বস্তুপিন্ড ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার ফলে গ্রহমন্ডলের উৎপত্তি। গণিতের সাহায্যেই প্রমাণ করা চলে যে সূর্যের পাশ দিয়ে অন্য একটি গ্রহ চলে যাবার ফলে যদি সূর্যের গা থেকে খানিকটা বস্তুপিন্ড ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়ও তাহলে সেই বস্তুপিন্ড কখনো সূর্যকে ঘিরে একটি সীমাবদ্ধ কক্ষে স্থাপিত হতে পারে না। হয় সেই বস্তুপিন্ড আবার সূর্যের গায়েই ফিরে আসবে, নয়তো তারাটি দূরে চলে যাবার পরে মহাশূন্যে উধাও হয়ে যাবে।

তবে অন্য একটি ব্যবস্থা খাড়া করতে পারলে বস্তুপিন্ড আটক পড়ার সমস্যাটির সমাধান হতে পারে। এক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে যে সূর্যের ছিল একটি সংগী তারা এবং সেই তারার গতি ছিল এখন গ্রহগুলো যতোটা দূরে থেকে সূর্যকে পরিক্রমা করছে ততোটা দূরে। তারপরে এমন একটা ব্যাপার ঘটেছে যে তৃতীয় আরেকটি তারা এই সংগী-তারার কাছাকাছি এসে পড়েছে। এই তৃতীয় তারার আকর্ষণে যদি সংগী-তারার গা থেকে খানিকটা বস্তুপিন্ড ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে তাহলে সেই বস্তুপিন্ড গ্রহের মতোই সূর্য-পরিক্রমা শুরু করবে এবং ইতিমধ্যে সেই তৃতীয় তারার আকর্ষণে সংগী-তারা দূরে সরে যেতে পারে।

পরলোকে
ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত

খ্যাতিমান চিকিৎসক ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত ২৪ অকটোবর কলকাতায় মারা গেছেন। চুরাশি বছর বয়সের এই প্রবীণ চিকিৎসকের নামডাক সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে ছিল।

চিকিৎসক হিসাবে স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পর এই শহরে নলিনীরঞ্জন অনন্য প্রতিষ্ঠা অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। ষাট বছর ধরে একটানা প্র্যাকটিস করে তিনি চিকিৎসা জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছিলেন। চিকিৎসক হিসাবেই শুধু নয়, পান্ডিত্য ধর্মপ্রাণ এবং শাস্ত্রজ্ঞ হিসাবেও তিনি এই শহরে দুর্লভ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।

২৪ পরগণার হালিশহরে ১৮৮১ খৃঃ ২৩ মার্চ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতায় হিন্দু স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ করেন। ঢাকার কলেজ থেকে তিনি এফ-এ পাশ করার পর তিনি কলকাতার মেডিকাল কলেজে ভর্তি হন। ১৯১১ খৃঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-বি এবং তার তিন বছর পরে এম-ডি পাশ করেন। তাঁর ছাত্রজীবন বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ ছিল।

ইংরাজি, বাংলা এবং সংস্কৃত তিনি সুবক্তা এবং সুলেখক ছিলেন। কলকাতা এবং বর্ধমান থেকে তিনি দুবার পার্লামেন্ট নির্বাচনপ্রার্থী হন। করোনারি থ্রম্বসিস এবং পালমোনারি এমবলিজম-এর উপর তাঁর গুরুত্বপূর্ণ লেখা আছে। তিনি [illegible] এম এ'র কলকাতা এবং প্রাদেশিক শাখার সভাপতি পদে বৃত হন। [illegible] বিখ্যাত পাকুড় মামলায় নলিনীরঞ্জনের সাক্ষ্য [illegible] মত। বি সি রায় স্পেশালিটি ক্লিনিক [illegible] ইনস্টিটিউট [illegible] প্রমথনাথ [illegible] বেংগল টিউবারকিউলোসিস অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতির সংগে তিনি দীর্ঘকাল ধরে যুক্ত ছিলেন।

শুনে মনে হতে পারে যে, এতগুলো ঘটনার যোগাযোগ ঘটাটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু ঠিক ঠিক অবস্থাটি যদি তৈরি হয় তাহলে কেন ঘটবে না তারও কোনো কারণ নেই। তবে এক্ষেত্রে অন্য একটি কথা থেকে যায়. এমনিভাবেই যদি গ্রহমন্ডলের উৎপত্তি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই গ্রহমন্ডলের উৎপত্তি হওয়াটা একটা বিরল ঘটনা।

দুটি তারার মধ্যে ঠোকাঠুকি হবার ফলে বা সূর্যের সংগী-তারার মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটার ফলে যদি বস্তুপিন্ড বেরিয়ে আসে তাহলে সেই বস্তুপিন্ড গ্রহের আকারে দানা জমাট বাঁধবে কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এক্ষেত্রে যা হওয়া সম্ভব তা এই—বস্তুপিন্ড একটা ছড়ানো নীহারিকার রূপ নেবে এবং সাধারণভাবে সূর্যকে পরিক্রমা করবে। সম্ভবত এই বস্তুপিন্ডের চেহারাটি হবে সমতল, গ্রহের মতো গোল নয়।

গ্রহমন্ডলের উৎপত্তি নিয়ে এখন যে তত্ত্ব খাড়া করা হচ্ছে, প্রায় সবক্ষেত্রেই ধরে নেওয়া হচ্ছে যে গোড়ায় ছিল একটি নীহারিকা। তবে অনেকটাই ভাসাভাসাভাবে। নীহারিকা তৈরি হবার পরে ও নীহারিকা থেকে গ্রহমন্ডল তৈরি হবার আগের অবস্থা তার রূপ কী ছিল তা এখনো পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়নি যাতে গণিতের সাহায্য নেওয়া সম্ভব।

তবে গ্রহমন্ডল তৈরি হবার উপযোগী একটি নীহারিকা কিভাবে তৈরি হতে পারে তার কতকগুলো হদিশ সম্প্রতিকালে প্রকাশ করা হয়েছে। গ্যালাক্সি মোট যতো স্থান জুড়ে থাকে তার ১০ শতাংশ বা তার বেশি স্থান জুড়ে থাকে গ্যাস ও ধূলির মেঘ। এবং পৃথক এক-একটি মেঘের মোট ভর সূর্যের ভরের সমান মাত্রায় হওয়া সম্ভব। এখন যদি কল্পনা করা যায় যে সূর্য ও এমনি একটি মেঘ ও অন্য একটি তারার যোগাযোগ ঘটেছে তাহলে সূর্যের পক্ষে এই মেঘের খানিকটা অংশ আটক করাও সম্ভব হতে পারে। সূর্য ও গ্রহমন্ডল এমন একটি বিরাট মাত্রার ব্যাপার যে সবকিছুর মূলে এমনি কতকগুলো যোগাযোগ ধরে নিলেই একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।

আটক-পড়া না বলে যদি বলা হয় জুড়ে-যাওয়া তাহলে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হয়। সূর্য যখন কোনো একটি মেঘের মধ্যে দিয়ে যায় তখন সেই মেঘের খানিকটা অংশ সূর্যের সংগে জুড়ে যেতে পারে। কতটা অংশ জোড়া লাগবে তা নির্ভর করে সূর্য ও মেঘের আপেক্ষিক বেগের ওপরে। এই বেগ যদি হয় সেকেন্ডে কয়েক কিলোমিটার তাহলে জোড়া-লাগা অংশ এত বৃহৎ হবে না যা থেকে গ্রহগুলো তৈরি হতে পারে। কিন্তু বেগ যদি হয় আরো অনেক অনেক কম তাহলে কিন্তু জোড়া-লাগা অংশের ভর বর্তমান গ্রহমন্ডলের মোট ভরের সংগে তুলনীয় হতে পারে। সাধারণভাবে বলা চলে একটি তারার আয়ু এবং

পরে নটি শূন্য বসালে যতো হয় ততো বছর, কাজেই আমাদের এই সূর্য এতগুলো বছরের মধ্যে এমনি কয়েক শত মেঘের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে। কাজেই এমন ব্যাপারও ঘটতে পারে যে, কোনো একটি মেঘের মধ্যে দিয়ে যাবার সময়ে সূর্য ও মেঘের আপেক্ষিক বেগ ছিল খুবই কম। তা যদি হয় তাহলেই গ্রহমণ্ডল তৈরি হবার মতো মেঘের একটি অংশ সূর্যের সঙ্গে জোড়া লাগতে পারে।

মহাশূন্যের এই সমস্ত মেঘ সাধারণত আবর্তনশীল হয়ে থাকে। সেটা যতো সামান্য মাত্রাতেই হোক তা থেকেই শেষ পর্যন্ত গ্রহমণ্ডলের আবর্তন তৈরি হওয়া সম্ভব। এর পিছনে অন্যান্য কারণ থাকাও অসম্ভব নয়।

আটক-পড়ার বা জোড়া-লাগার অন্যান্য কার্যকারণের কথাও বলা হচ্ছে। এমনি একটি হচ্ছে চৌম্বক শক্তি, যার দ্বারা উপযুক্ত একটি নীহারিকা সূর্যের আয়ত্তে এসে যায়।

গ্রহমণ্ডলের উৎপত্তির আরো অনেক তত্ত্বের কথা শোনা যাচ্ছে। একটি তত্ত্বের উল্লেখ করা যেতে পারে। তারা গড়ে ওঠে বিপুল আকারের অতি-পাতলা গ্যাসের মেঘ থেকে। সেই মেঘ হয় আবর্তনশীল, কিন্তু সূর্য গড়ে ওঠার পরে গোড়ার এই সামান্য আবর্তনই হয়ে ওঠে প্রচণ্ড মাত্রার। এত প্রচণ্ড মাত্রার যে মহাকর্ষের বাঁধন ছিঁড়ে সূর্যের বিষুব অঞ্চল থেকে খানিকটা বস্তু ছিটকে বেরিয়ে যায়। তখন আবর্তনের মাত্রায় ভিতরে-বাইরে অসমতা এসে যায়। সমতা আনতে গিয়ে ছিটকে যাওয়া বস্তু আরো দূরে সরে। কিন্তু চৌম্বক শক্তির দরুন একেবারে দূরে সরে যেতে পারে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। বোঝাই যাচ্ছে এই তত্ত্বের অনেকটাই কল্পনানির্ভর, যার সপক্ষে সুনির্দিষ্ট কোনো সাক্ষ্য উপস্থিত করা যাচ্ছে না।

নীহারিকা থেকে যদি গ্রহমণ্ডলের উৎপত্তি হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আরো একটি কথা ধরে নিতে হয়। এই নীহারিকার মধ্যে অবশ্যই থাকা দরকার অল্প পরিমাণ ধূলো। নীহারিকার সবটাই যদি হয় গ্যাসীয় তাহলে জমাট বাঁধার প্রক্রিয়াটি কখনোই শুরু হতে পারে না। এ কারণেই যদি ধরে নেওয়া হয় যে গ্রহমণ্ডলের উৎপত্তি হবার আগে গোড়ার অবস্থায় ছিল ধূলোর একটি চাকতি তাহলে গোটা ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো চলে। তবে শুধু যদি একটি ধূলোর চাকতির অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হয় তাহলে গ্রহমণ্ডলের বাইরের দিকের বৃহৎ গ্রহগুলোর গ্যাসীয় উপাদান বেখাপ্পা হয়ে পড়ে। কাজেই থাকা দরকার ধূলোর চাকতির একটি সৌর নীহারিকা এবং তাকে ঘিরে হালকা গ্যাসের একটি মেঘ।

আরো একটি ব্যাপার বিবেচনা করার আছে। তা হচ্ছে গ্রহগুলোর আবর্তন। গ্রহ-মণ্ডলের উৎপত্তি সংক্রান্ত যে-কোনো তত্ত্বে এই আবর্তনেরও সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দরকার।

আবার এই আবর্তনের ব্যাখ্যার সঙ্গেই জড়িত রয়েছে আরো একটি ব্যাপারের ব্যাখ্যা। তা হচ্ছে উপগ্রহ সৃষ্টির। বুধ ও শুক্রের কোনো উপগ্রহ নেই, পৃথিবীর আছে একটি, মঙ্গলের দুটি, বৃহৎ গ্রহগুলোর আরো বেশি। মঙ্গলের উপগ্রহ-দুটি এতই ছোট যে তা সম্ভবত—উপগ্রহ বলতে আমরা যা বুঝি, যেমন পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র—তেমন উপগ্রহ নয়, আটক-পড়া গ্রহাণু। তাই যদি হয় তাহলে কেমন করে এ ব্যাপারটি ঘটেছে তার ব্যাখ্যা থাকা দরকার। আবার পৃথিবীর উপগ্রহ হিসেবে চন্দ্রকেও সাধারণভাবে উপগ্রহ-সংক্রান্ত কোনো তত্ত্বের মধ্যে ফেলা চলে না। চন্দ্র পৃথিবী থেকে এখনো ক্রমশ দূরে সরছে। এই দূরে-সরার বেগ থেকে পিছন দিকের হিসেব করলে দেখা যায় মাত্র ১০০ কোটি বছর আগেও পৃথিবী ও চন্দ্র প্রায় গায়ে গায়ে লেগে থাকার কথা। আসল ঘটনা কী তাহলে ?

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখনো স্থির করতে পারেন নি আমাদের এই সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি কি-ভাবে। অদূর ভবিষ্যতে পারবেন তেমন তথ্যও তাঁদের হাতে নেই। মহাকাশ-গবেষণায় যতোই অগ্রগতি হোক, এই মূল ব্যাপারটা এখনো আগের মতোই অন্ধকারে। (ব্রিটিশ সায়েন্স নিউজ 'স্পেকট্রাম'-এ প্রকাশিত আর এ লিটলটন এফ আর এস লিখিত প্রবন্ধ অবলম্বনে। ছবিও একই লেখা থেকে।)

—[illegible]

অধ্যাপক নির্মল বসু পরলোকে

মহাত্মা গান্ধীর একান্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী, ভারতের নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগের (অ্যানথ্রপলজিক্যাল সার্ভে অভ ইণ্ডিয়া) প্রাক্তন ডিরেক্টর অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু ১৬ অক্টোবর মারা গেছেন কলকাতায়।

অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীযুক্ত বসু তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ও খণ্ডজাতিসমূহের কমিশনার পদেও কিছুদিন কাজ করেন। তাছাড়া তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি পদেও এক সময়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯০১ খৃঃ জানুয়ারি মাসে তাঁর জন্ম হয়। ১৯২৫ খৃঃ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এস সি পাশ করেন। ১৯২৯ খৃঃ তিনি নৃতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত হন। এর পরে তিনি ইংলণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] নিয়ে যান কিন্তু লেবরেটরির অভাবে তিন মাস বাদেই চলে আসেন।

১৯৩০ খৃঃ অধ্যাপক বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলোশিপ ছেড়ে গান্ধীজীর লবণ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ খৃঃ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪৫ খৃঃ মানবিক ভূগোলের লেকচারার পদে নিযুক্ত হন। পরে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের রিডার পদ লাভ করেন। ১৯৫৯ খৃঃ থেকে ১৯৬৪ খৃঃ পর্যন্ত অধ্যাপক বসু অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ডিরেকটর এবং খণ্ডজাতি সম্পর্কে ভারত সরকারের পরামর্শদাতা পদে কাজ করেন। অবসর গ্রহণের পর তাঁকে আসামের পার্বত্য জেলাগুলি সংক্রান্ত এক সমীক্ষক দলে কাজ করতে হয়। নেফার শিক্ষা বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কেও রিপোর্ট প্রদানের জন্য তাঁর ওপর ভারার্পণ করা হয়।

১৯৪৬ খৃঃ অধ্যাপক বসু গান্ধীজীর সঙ্গে নোয়াখালি যান। পর বৎসর অমুসলিম দলগুলোর পক্ষ থেকে র‍্যাড-ক্লিফ কমিশন সম্পর্কে সর্বসম্মত দাবি উত্থাপনের জন্য কংগ্রেস সভাপতি তাঁর ওপর ভারার্পণ করেন। ১৯৬৬ খৃঃ তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

অধ্যাপক বসু ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের ফেলো এবং ১৯৪৯ খৃঃ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন, জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি সংস্থারও সদস্য ছিলেন। তিনি নৃতত্ত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

বিভিন্ন বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছাড়াও অধ্যাপক বসু ছিলেন একজন প্রকৃত মানবদরদী। এই কারণেই গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিশেষ গভীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি কিছুদিন গান্ধীজীর প্রাইভেট সেক্রেটারি রূপে কাজ করেন।

পাঁচের নাচন

অনিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

জীবন-খাতার পাতায় পাতায় পাঁচের নাচন। সে-নৃত্যের ছন্দে দুরধিগম্য রহস্য আছে; আবার রসঘন মাধুর্যও আছে। বেদান্তের পঞ্চকোষে এবং সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে পাঁচের গুরুভারাক্রান্ত গভীর গাম্ভীর পরিচয়। মদনদেবের পঞ্চশরে কিন্তু তার সহজ প্রেমের চপল প্রকাশ।

মদনদেব মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করেছিলেন। সেই অপরাধে পঞ্চানন পঞ্চশরকে ভস্মীভূত করলেন। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'পঞ্চানন' নামটি মহাদেবের একচেটিয়া নয়—পঞ্চানন বলতে শিবকেও বোঝায়, সিংহকেও বোঝায়। অর্থাৎ ঐ নামের উপর পশুপতিনাথ ও পশুপতি উভয়েরই সমান দাবি, যদিও সিংহের একটি মাত্র আনন। 'আনন'-এর বামে 'পঞ্চ' থাকাতেই বেঁধেছে পাঁচের প্যাঁচ। এখন, মা দুর্গা 'পঞ্চানন' বলে ডাকলে সাড়া দেবে কে? মায়ের বল্লভ অথবা মায়ের বাহন? উমাপতি অথবা পশুপতি?

কিন্তু যাক সে কথা। পঞ্চানন ওরফে মহাদেব শ্রীকৃষ্ণের নাম গান করেন—'পঞ্চানন গায় পঞ্চমুখে বোল হরি বোল'। একজন গায়কেরই সেই গান। কিন্তু তাঁর পাঁচটি মুখের মাধ্যমে পাঁচজন আর্টিস্ট-এর কোরাস সংগীতের অনুরণন। মহাদেব পঞ্চমুখে যাঁর নাম গান করেন সেই শ্রীকৃষ্ণের নরলীলায় পাঁচ সংখ্যাটি অর্জন করেছিল পরম গৌরবান্বিত আসন। পাঁচটি দৃষ্টান্ত:— শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাতেন পঞ্চম স্বরে; শঙ্খ বাজাতেন পাঞ্চজন্য, সখী তাঁর পঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদী (যিনি পঞ্চ মহারথ পাণ্ডবের জননী!); সাথী তাঁর পঞ্চপাণ্ডব আর তাঁর সর্বোত্তম নরলীলার বর্ণনা আছে শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে।

বিশ্ব-প্রপঞ্চে পাঁচের লীলা বোঝা দায়—'পঞ্চভূতের মাঝে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে'। শ্রীরামচন্দ্র 'পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর রাম'। সীতাকে নিয়ে তিনি সুখে ছিলেন পাঁচের আশ্রয়ে—'পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরী তটে ছিনু সুখে'। কিন্তু হায়! সেই পঞ্চবটী বনই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রকে হাপুস নয়নে কাঁদিয়ে ছাড়লো, রাবণ যখন হরণ করলেন সীতাদেবীকে। সেই পাঁচই আবার শ্রীরামচন্দ্রের সুহৃদ ও সহায়ক হলেন সীতা-উদ্ধার ব্যাপারে—বিভীষণরূপে। বিভীষণের নামে পাঁচ নেই, কাজে পাঁচ আছে। বিভীষণ মূর্তিমান পঞ্চম বাহিনী।

পাঁচের নাচনের লঘু-গুরু ছন্দ আমাদের জীবনযাত্রার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। সৃষ্টি মূলে পঞ্চতত্ত্ব ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। আবার, 'হাতের-পাঁচ' বলতে বোঝায় শেষ সম্বল। পাঁচ কখনো বিরাট, কখনো ক্ষুদ্র। পাঁচের বিরাট মূর্তি পঞ্চ মহাদেশ, পঞ্চ মহাজাতি পঞ্চ মহাসমুদ্র। পাঁচের কণিকা মূর্তি পাঁচ ফোড়ন—মৌরী, মেথি, কালজিরা, জোয়ান ও রাঁধুনি এই পাঁচ প্রকার শস্যবিশিষ্ট রন্ধনের মশলা। উপরোক্ত তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছেন রাঁধুনি। 'রাঁধুনি' বলতে শস্যবিশেষও বোঝায় পাচকও বোঝায়। 'পাচক'—শব্দের প্রথম দুই অক্ষরে পাঁচ লুকিয়ে আছে, চন্দ্রবিন্দুহীন অবস্থায়। চন্দ্রবিন্দুযুক্ত অবস্থায় পাঁচ বাস করছে পাঁচড়ার প্রথম দুই অক্ষরে। পাঁচড়া বলতে খোসও বোঝায়; বীরভূম জেলার একটি গ্রামেরও নাম পাঁচড়া। পাঁচের পাল্লায় পড়ে একই নামে পরিচিত হচ্ছে গায়ের খোস আর বীরভূমের গাঁ।

নামের মধ্যে পাঁচের চিহ্নমাত্র নেই অথচ হাড়ে হাড়ে আছে পাঁচের প্যাঁচ ইউ এন ওতে অর্থাৎ সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জ সংগঠনে। পাঁচজন আদি সদস্য নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছিল ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে। এর বুদ্ধিবাক্ 'শান্তি বারি' যে-উৎস থেকে উদ্গারিত হয় তার নাম পেন্টাগণ অর্থাৎ পঞ্চকোণী।

পাঁচের এক প্রচণ্ড প্যাঁচ পঞ্চশীল। পঞ্চশীল স্বীকৃতি লাভ করেছিল ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ব্যাণ্ডুং কনফারেন্সে। অল্পকালের মধ্যে পাঁচ ভূতের পাল্লায় পড়ে পঞ্চশীল পরিণত হল পঞ্চশালে। তারপর, অকালে এই প্রতিষ্ঠান পঞ্চত্ব লাভ করলো। পণ্ড হল পণ্ডিতজীর বিশ্বনেতৃত্বের রঙীন স্বপ্ন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাঁচের নিদারুণ ব্যর্থতার পরিচয় পাওয়া গেল। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কিন্তু পাঁ কল্যাণময়ী শুভসূচনা আছে। নিম্নলিখ পাঁচটি যুগান্তকারী তারিখ বা সাল সংখ্যার গুণিতক যথা:—১৮৮৫ খৃষ্টা কংগ্রেসের জন্ম; ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্বদে আন্দোলন; ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বিধিব হয়েছিল সেই ভারত সরকার আইন বর্তমান সংবিধানের অগ্রদূত; ১৫ই আগ স্বাধীনতা দিবস; ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ভা গণরাষ্ট্রের জন্ম।

শুভে অশুভে স্থাপিত এই সংখ্যাটি প্রহেলিকাময়ী। ১৮৮৫ থে ১৯৫০—এই ৬৫ বৎসরব্যাপী অগ্রগ ধাপে ধাপে পাঁচের শুভসংযোগ পাঁচ বার। তার পনেরো বছর পরে হল পরিবর্তন। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে পাকিস্ত আক্রমণ করলো ভারতবর্ষকে। বহিঃশত্র নেতার নাম পঞ্চাক্ষরী—আয়ুব খান। অ শত্রুর গোষ্ঠীগত নামও পঞ্চাক্ষর মিরজাফর। পাঁচ যেন সাপশুল— সংস্পর্শে কখনো সামগানসম মধুর মাচ্ছ কখনো শূলব্যথাসম তীব্র যাতনা।

ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে পাঁচ বৎ অন্তর ভোটযুদ্ধ কারও পক্ষে সাম ক পক্ষে শূল। অর্থনীতি ক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষি পরিকল্পনা দেশের পক্ষে সাম অথবা শূ এবিষয়ে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে।

সাহিত্য ক্ষেত্রে অবশ্য পাঁচের অবি শুভসংযোগ। মহাভারতের একটি নাম পঞ বেদ। পঞ্চতন্ত্র রচিত হয়েছিল খৃষ্টাব্দে। 'পঞ্চরাত্র' নাম অবলম্বন পাঁচখানি বিখ্যাত গ্রন্থ আছে—নারদ প রাত্র কাপিল পঞ্চরাত্র, ব্রহ্ম পঞ্চরাত্র, প পঞ্চরাত্র, শিব পঞ্চরাত্র। গ্রীক সাহি অনুপম অবদান পঞ্চাঙ্ক নাটক। কালিদা কুমারসম্ভব কাব্যগ্রন্থে পঞ্চম সর্গে পঞ্চতপা উমার তপশ্চর্যার অনবদ্য বর্ণ 'পঞ্চদশী' জ্ঞানমার্গের অদ্বিতীয় গ্রন্থ। খণ্ডে সমাপ্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অপ ভক্তিরসায়ন। রবীন্দ্রনাথের জন্ম ২৫ বৈশাখ মহাপ্রয়াণ শ্রাবণের শ্রাদ্ধ পঞ্চ তিথিতে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'পাঁচাপাঁ মানে চেঁচামেচি বা কথা কাটাকাটি। সা পাঁচ ভেবে যারা কাজ করে না, তা পাঁচাপাঁচি অনেক সময়ে পরিণত ইংরেজী পাঞ্চ বা ঘুঁষিতে। কা অকারণে তারা লঙ্ঘন করে পাঁচ আইন দেখতে পায় সাপের পাঁচ পা।

কলকাতায় সাধারণত সাপ দেখা না (অবশ্য সরীসৃপ সাপের কথাই হচ্ছে!)। কিন্তু পাঁচ এই নগরীতে ছড়ি রয়েছে দিকে দিকে—কখনো স্থাবর, কখ জঙ্গম। উত্তরে পাঁচ মাথার মোড়; এবং অঞ্চলের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ৫৫। দক্ষি পাঁচটি লেক, যার সংযুক্ত নাম রব সরোবর; এবং ঐ ঐঅঞ্চলের পূর্বতন ছিল ডিহি পঞ্চান্ন গ্রাম।

গড়িয়া থেকে হাওড়া পর্যন্ত যাতায় করে একটি জনভারক্লিষ্ট চলন্ত পাঁচ— বাস। হাওড়া শহরের একটি কর্মম

পুরাতন সরণির নাম পঞ্চাননতলা রোড। হাওড়া স্টেশন থেকে যাত্রা করে পৌঁছানো যায় পাঁচের রকমারি লীলাক্ষেত্রে। পাঁচটি দৃষ্টান্ত :—পঞ্চনদীর তীরে, পাঁচমারী গিরিশিরে, মুস্লিম তীর্থ পঞ্চ-পীরে, হিন্দু তীর্থ পঞ্চক্রোশী (কাশী) ধামে, এবং রুদ্র প্রয়াগ ইত্যাদি পঞ্চ প্রয়াগে।

হিন্দু শাস্ত্রে পাঁচ সংখ্যাটির বিশেষ মর্যাদা। পূজোর উপকরণে তো কথায় কথায় পাঁচের ছড়াছড়ি—পঞ্চপাত্র, পঞ্চপ্রদীপ, পঞ্চশস্য, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত ইত্যাদি ইত্যাদি। শিখ সম্প্রদায়ের আছে পঞ্চ ক-কার ও তন্ত্রমতে পঞ্চ-ম-কার। মায়ের পুজোয় পঞ্চমুখী জবা প্রশস্ত, কিন্তু গণেশাদি পঞ্চ দেবতার পুজোয় পাঁচ ফুলের সাজি লাগে। বসন্তী পঞ্চমী তিথিতে আবাহন হয় জ্ঞান-বিদ্যাদায়িণী মা সরস্বতীর ও কোজাগরী পঞ্চদশী তিথিতে সম্পদ ও শ্রীদায়িণী মা লক্ষ্মীর।

মানুষের কাছে পাঁচ আসে নানা পরিচয়ে নানা নাম ধরে। সত্যনারায়ণের পাঁচালিতে পাঁচ, গ্রামাঞ্চলের পঞ্চায়েতে পাঁচ, কবিরাজের পাঁচন পাঁচ রাখাল বালকের পাঁচন-বাড়ীতে পাঁচ। আরও কতো দৃষ্টান্ত আছে! পাঁচিলে পাঁচ, পঞ্চবাতে (বাজি রেখে কড়ি খেলা) পাঁচ, পোঁয়াপাওয়াতে পাঁচ পাঁচনরি হারে পাঁচ। পাঁচনরি হার সকল নারীর কণ্ঠে মানায় ভাল—তিনি পরমা সুন্দরীই হোন অথবা দেখতে নিতান্ত পাঁচপাঁচিই হোন।

কথা আর কাজ—এই দুই নিয়ে তো মানুষের সারা জীবনের কারবার। দুটি ব্যাপারেই পাঁচ অপরিহার্য। পাণিনি বলেছেন শব্দ উচ্চারণের মূলে পাঁচটি উপকরণ আছে—কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত এবং ওষ্ঠ। আর সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে হলে প্রত্যেক হাতে পাঁচটি আঙুল দরকার—একথা পাণিনি না বললেও সকলেই জানে। পাঁচ বিনা আমাদের চলে না, আমরাও চলতেই পারি না পায়ের পাঁচটি আঙুল না থাকলে। পদযুগলের পঞ্চাঙ্গুলি আমাদের ভারসাম্য রক্ষা করে। আর, প্রাণ, অপান সমান উদান, ব্যান—এই পঞ্চ বায়ু আমাদের জীবন রক্ষা করে। যার পাঁচ নেই তার কেউ নেই।

কেবল ব্যক্তিগত জীবন নয়, রাষ্ট্রগত জীবনেও পাঁচ সংখ্যাটির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অধিকাংশ নাগরিকের অগোচরে রাজ্য সরকারের একজিকিউটিভ অর্থাৎ নির্বাহিক বিভাগের শীর্ষস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে পাঁচের মূল্যবান সত্তা। সংবিধান মতে রাজ্যপালের মাসিক বেতন ৫,৫০০ৎ। আর জুডিসিয়াল অর্থাৎ বিচারিক বিভাগের শীর্ষস্থানে ত পাঁচের দাপট ও প্রদর্শনী অপ্রতিহত প্রভাবে চলেছে ১১০ বছর ধরে (১৮৬২), অর্থাৎ কলকাতার উচ্চ আদালতের জন্ম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত। প্রধান বিচারপতির চাপরাশির সংখ্যা পাঁচ। এই চাপরাশিসম্প্রদায় পুরুষানুক্রমে তদীয় প্রভুপাদের হিজ লর্ডশীপ মান-মর্যাদা বৈশিষ্ট্যের ধারক, বাহক ও স্মারক।

অভিধানের মধ্যে পাঁচের বিবিধ প্রয়োগের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। অভিধানের বাইরেও আছে অসংখ্য দৃষ্টান্ত। বর্তমান রচনায় উল্লিখিত উদাহরণগুলি পাঁচের নাচনের বহু বিচিত্র লীলার কয়েকটি লহর মাত্র। সেই লহরের কণিকা অবলম্বনে রচিত এই অসম্পূর্ণ সংকলন। এই উদাহরণগুলির পরস্পরের মধ্যে কোন সংগতি নাই, নাই কোন সামঞ্জস্য। কোথায় দেবাদিদেব মহাদেব আর কোথায় পশুরাজ সিংহ? কোথায় জনশৃংখলার রক্ষাকর্তা রাজ্যপাল, আর কোথায় পাঁচাপাঁচি ও ঘুষোঘুষি? কোথায় পাঁচড়া আর কোথায় পাঁচফোড়ন? কোথায় পাঁচনরি হার, আর কোথায় ৫নং বাস? কোথায় পঞ্চবটি বন, আর কোথায় পেন্টাগন? বিভিন্ন প্রসংগে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আকলিত এই বাছা বিষয়গুলি। কোনটির সংগে কোনটির সাদৃশ্য নাই, আছে শুধু অদৃশ্য পাঁচের-প্যাঁচ।

এই প্যাঁচময় পাঁচ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন ধূমোদ্বতী রূপে। সুদৃশ্য, সুগন্ধময়, সুবাসিত ধোঁয়ার কুণ্ডলী, যার উৎস ৫৫৫ সিগারেট। তারই প্রশংসায় ধূমপানকামীরা সোচ্চারে পঞ্চমুখ।

উৎসবের কাল, উৎসব শেষের স্মৃতি

শুভংকর পাঠক

উনিশ শতকের কথা।

সেদিন সন্ধ্যে নেমে আসছিল হিমালয়ের পাদদেশে। সূর্য দেখা যাচ্ছিল না। পাহাড়চূড়োয় পড়েছিল তারই সাদুকরী আভা। পাহাড়তলিতে রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন ঠাকুর রাতের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন নাগরী নদীর ধারে। একটি বাংলোয়। সামনে সেতু। ওপারে খাড়া পাহাড়। সুম্মী পর্বতের বিরাট অরণ্য। দূর থেকে মনে হচ্ছিল, যেন মেঘ জমেছে ঘন হয়ে।

দেবেন্দ্রনাথ ঐ পাহাড়ী সৌন্দর্যে মুগ্ধ ছিলেন। আধ্যাত্মিক রহস্যে মগ্ন ছিলেন।

তবু রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করেছিলেন, অন্ধকার তেমন গাঢ় নয়। হিংস্র শ্বাপদের ডাকে রহস্যময় হয়ে উঠছে না বনভূমি। মাথার ওপরে জ্বলছে লাখো লাখো ঝাড়লণ্ঠনের আলো। নাকি অজস্র প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে কেউ? তার শিখাই বুঝি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে ক্রমাগত!

না। প্রদীপ নয়। ঝাড়লণ্ঠনও নয়। আগুন লেগেছে সুম্মী পর্বতের চূড়োয়। পাহাড়ী অরণ্যে। তার মধ্যে দেবেন ঠাকুর দেখেছিলেন, দেবতার আশ্চর্য আবির্ভাবের ইঙ্গিত। সৌন্দর্যের সঙ্গে ভয়ঙ্করের মিলন। সেদিন উনি হাফিজের গজল আবৃত্তি করেছিলেন কিনা, জানা নেই। তবে আগ্নেয় সমারোহের মধ্যেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন স্মৃতির বিষাদ।

সেই রাতে দেবেন ঠাকুর ঘুমোননি—ঘুমোতে পারেননি। রাত্রিশেষে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, নির্বাপিতপ্রায় মহোৎসবের পরিণতি দেখে। এখানে ওখানে জ্বলছিল দু' একটা গাছগাছালি। অনেকটা নিভু নিভু প্রদীপের মত। কোনো জায়গা থেকে বেরুচ্ছিল সামান্য ধোঁয়ার রেখা।

এই কি উৎসবের নিয়তি! এবং পরিণতি! কে তাকে অস্বীকার করবে?

দুর্গাপুজোর আড়ম্বর, আলোকসজ্জা এবং কয়েকটি দিনরাতের মহাকোলাহল পেরিয়ে বাঙালী জীবনেও আসে অনুরূপ বিপন্নতার কাল। কেবল ধার্মিকের কাছে নয়, অধার্মিকের কাছেও এটা সত্য। এবং উপলব্ধির অন্তর্গত বিষাদে তার ছায়া প্রসারিত।

হয়তো গঙ্গার ধারে গেলে এখনো কেউ বিসর্জিত প্রতিমার কাঠামো দেখতে পাবেন। জলের ওপরে ভাসছে শোলার মুকুট, ডাকের সাজের ভগ্নাংশের, সরস্বতীর অলঙ্কার এবং লক্ষ্মীর কর্ণাভরণ। প্রতিমার কাঠামো থেকে খসে-

হাওয়া ভাসমান খড়ের টুকরোগুলি দোল খাচ্ছে ঢেউয়ের চূড়োয়। নদীর জলে মিশেছে দেবতার গায়ের রঙ। মাটির সঙ্গে মিশেছে প্রতিমার শরীর।

সব মিলিয়ে দৃশ্যটা শোকাবহ।

।। ২ ।।

এবং এই শোকের চেহারা সবক্ষেত্রে একরকম নয়। নানা ক্ষেত্রে নানারকম। শ্যামবাজারের ফেরিঅলার কাছে যেমনটি, ক্যানিংয়ের বুড়ো চাষীর কাছে ঠিক তেমনটি নয়। বালিগঞ্জের অফিসার গিন্নী যে কারণে দুঃখবোধ করেন, উত্তর কলকাতার কেরাণী-গিন্নীর কাছে তা অস্পষ্ট। একজন হয়তো ভ্রমণসূচী বাতিলের জন্য মনমরা, অন্যজন মেয়েকে ভালো ফ্রক কিনে দিতে পারেননি বলে দুঃখিত।

অথচ, এখন সকলেরই দিন যাচ্ছে মন্থরতার মধ্য দিয়ে।

মন্থর? শব্দটা ব্যবহার করেই কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে। না, মন্থরতা নয়, ক্লান্তি। একধরনের বিপুল উত্তেজনার পর সাময়িক নিশ্চেষ্টতার আভাস মাত্র। বুঝতে পারি না, এ সময়ে বিজয়ার গানের তাৎপর্য কোথায়? এককালে তার সামাজিক মূল্য ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু এখন নেই। আগমনীর গান বাঙালীর জীবনে আসে ব্যাকুলতার প্রতীক হয়ে। বিজয়ার গান বিচ্ছেদের বিষণ্ণ। কেননা, এখন সেই একান্নবর্তী পরিবারগুলি নেই। দেশ স্বাধীন হবার সময় কিছুটা ভেঙেছে। পরে আরো ভেঙেছে অর্থনৈতিক কারণে। এখন মেয়েদের পঁচিশ-ত্রিশ বছরেও বিয়ে হয় না। সেই রকম পরিস্থিতি থাকলে আগমনী-বিজয়ার গানের মর্মার্থ উপলব্ধি করা যেত।

অবশ্য সমাজ-ব্যবস্থার প্রাচীন দৃষ্টান্ত-গুলি এখনো লোপ পায়নি।

সেদিন দেখলাম একটা দৃশ্য। লরিতে প্রতিমা তোলা হচ্ছে ধরাধরি করে। পাড়ার এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক অনর্গল চোখ মুছে যাচ্ছেন। ছেলেদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তার কারণ তাঁরা পার্টির একটানা শব্দ-উল্লাসে চারদিক ছিল মুখরিত। কয়েকজন ব্যস্ত ছিল আলোকোজ্জ্বলিক শক্তিসঞ্চয়ে।

তিনজন যুবক ডায়নামোয় উৎপাদিত বৈদ্যুতিক আলোর বিকিরণ পরীক্ষা করছিলেন।

তখন একটা গোলমাল চলছিল ভাঙা মণ্ডপের ভেতরে। একজন চোঙা প্যান্টপরা তরুণের সঙ্গে পুরুত মশাইর হাতাহাতি হবার উপক্রম। কি ব্যাপার? প্রণামীর টাকা কে পাবে, তাই নিয়ে বচসা। তরুণের যুক্তি, পুরুত মশাইকে দক্ষিণা দেওয়া হয়েছে। কাজেই ও টাকা পুজো কমিটির প্রাপ্য। পুরুত মশাই তা মানতে চান না। দরকার হলে তিনি দক্ষিণার টাকা ফেরত দেবেন। তবু প্রণামীর টাকা তাঁর চাই-ই।

ভদ্রলোককে বললুম, আর কেঁদে কি হবে? এবার বাড়ি চলুন!

উনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। ঐ পুরুত মশাইকে তিনি বিলক্ষণ চেনেন। পাড়ায় রকবাজি করতে ওস্তাদ। তারপর ধীরে অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বললেন, বাড়ি গিয়েই-বা আর কি করব? নাতিনাতনীরা তো আজই ফিরে যাবে। কাল ওদের দেওঘর যাওয়ার কথা।

এতক্ষণে ওঁর বেদনার কারণ বুঝতে পারলুম বুঝি!

চাকরী থেকে অবসর নেওয়ার পর উনি অভিমানী হয়ে পড়েছিলেন। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে ছিল, এখন নেই। সেজন্যেই সারা বছর বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। একমাত্র পুজোর সময় সরগরম অবস্থা। নাতিনাতনীদের নিয়ে হৈহুল্লোড় করে কাটান মাসখানেক।

আজ তাদেরও বিদায়ের দিন।

হয়তো শ্মশানে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক আবার কাঁদবেন। স্মৃতিসংগ্রহে ব্যস্ত হবেন। সারাটা রাত এবং পরবর্তী কয়েকটা দিন নাতিনাতনীদের নাম ধরে ডেকে ফেলবেন ভুল করে। নাতি পুতের জন্য একা একা দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন। উৎসবের সেই ক্লান্তিকর অনিবার্য পরিণতিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবেন কিছুকালের জন্য।

আগমনী-বিজয়া গানের তাৎপর্য হয়তো উনি কিছুটা উপলব্ধি করতে পারেন।

।। ৩ ।।

শুনেছি, দু এক বছরের মধ্যেই, বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করবে গাঁয়ের রাস্তাঘাট। ভালোই। তাহলে গ্রামে-গঞ্জেও ছোটখাট কলকারখানা স্থাপিত হবে। শহুরে সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রামীণ সংস্কৃতির ব্যবধান সংক্ষিপ্ত হবে। পুজোর রীতিনীতি, প্রতিমার ধরণধারণেও আসবে একটা সামঞ্জস্য। পুরনো চালির প্রতিমা বিদায় নেবে হয়তো। উদ্যোক্তারা চাইবেন প্রতিমার অবয়ব কিছুটা সফিস্টিকেটেড হোক।

হায়, ঢাকের বাদ্য! তোমারও বিদায় আসন্ন!

নাকি লৌকিক উৎসের দিকেই ফিরে যাব আমরা? —এ প্রশ্নের উত্তর কুমোরটুলির প্রতিমাশিল্পীদের জানা নেই। তাঁরা নিজস্ব কোনো রীতিরও উদ্ভাবক নন। দুশো বছরের কলকাতার নানা পরিবর্তনে ওঁরা নিজেদের স্বজ্ঞাতসারে পালটেছেন বহুবার। যদিও কুমোরটুলির সঙ্গে কালিঘাটের অন্তঃপরম্পরায় বিচ্ছেদ ঘটেনি কোনোকালে। কুমোরটুলির ছবিজীবী পালের সঙ্গে ছিল কালিঘাটের সজনী চিত্রকরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

তবু ওঁরা প্রতিমাশিল্পের নিজস্ব ধারা কেন যে তৈরী করতে পারেননি, তাই আশ্চর্য।

এবার যাঁরা গাঁয়-গঞ্জে ঘুরেছেন শহরে ও শহরতলিতে প্রতিমা দেখেছেন তাঁদের মধ্যেও অনেকের জিজ্ঞাসাবাদ [illegible] শুনেছি। কেউবা ঝিনুকের তৈরী প্রতিমা দেখে [illegible]। কেউ দেখেছেন বাংলায় তৈরী প্রতিমা। আবার [illegible] [illegible] মূর্তি [illegible] [illegible] হয়েছে। বাঁশ-বেতের প্রতিমা দেখেও [illegible] কেউ বললেন বাঃ চমৎকার [illegible]?

প্রকৃতপক্ষে পালেদের এবং মজুমদার রুচিবদলের সঙ্গে সঙ্গে এইসব প্রসা[illegible] ভিন্নতর রূপ নেবে মাঝে মাঝে। মাটি[illegible] প্রতিমার বিকল্প হবে না।

আপাতত ও প্রসঙ্গ থাক।

এই শতকের তৃতীয় দশকে গোপেশ্বর পাল য়ুরোপ ঘুরে যে-দৃষ্টি পেয়েছিলেন বলা যায় প্রতিমাশিল্পের ক্ষেত্রে সেই দৃষ্টি প্রথম পরিবর্তনের সূচনা ঘটায়। তথা[illegible] ভারতীয় ভাস্কর্য-নিদর্শনের প্রতিমাশিল্প ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম গতিবেগ সঞ্চা[illegible] করেছিলেন।

আজ গোপেশ্বর পাল নেই।

গোটা কলকাতা ঘুরে এখন নানা ধাঁচে প্রতিমা অনেকেই দেখেন। আমিও দেখেছি কিন্তু প্রতিমার গঠনে শিল্পীর কৃতিত্ব [illegible] না আলোকসজ্জা ও মঞ্চের বৈশিষ্ট্যটা প্রধান, তা যেন বুঝে ওঠা মুশকিল। কোথাও প্রাচীন ভাস্কর্য-রীতির প্রতি[illegible] চোখে পড়ল। কোথাও দেখেছি চালি[illegible] কাজের বাহাদুরি।

আমার এক বন্ধু এবার বসিরহাটের কাছাকাছি কোনো এক গাঁয়ে গিয়েছিলেন দুশো বছরের প্রাচীন মূর্তি দেখার জন্য। মণ্ডপের অস্পষ্ট আলোয়, প্রাচীন পরি[illegible] বেশের চৌহদ্দিতে দাঁড়িয়ে তাঁর ম[illegible]

হয়েছিল, বুঝি বর্তমান পৃথিবীর সংগে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

আমিও মূর্তি দেখেছি, শিল্পীর স্টুডিওতে বসে। কিন্তু কোন এক মণ্ডপে গিয়ে সেই মূর্তিকে চিনতে পারিনি। চারদিকের নিয়ন লাইট, লাল-নীল আলোর মালা, এবং জলে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের দিকে তাকাতে তাকাতে মূর্তির মুখ দেখতে পাইনি।

।। ৪ ।।

তবু বাঙালীর 'জাতীয় উৎসব' এই আচ্ছন্নতার মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্তি হারায় না। হারালে মানুষ বিপন্ন বোধ করত। বেঁচে থাকতে হলে একটা কিছু চাই-ই চাই। দুঃখের মধ্যেও উৎসবের আয়োজন চলে। এমনকি যে-শ্রমিকটি বিড়ি বাঁধে, যে-কৃষক কলামূলোর চাষে নিজের দৈন্য ঢাকতে পারে না, তার কাছেও উৎসব যেন সাময়িক মুক্তির স্বাদ এনে দেয়। পুজো বোনাস আদায়ের ব্যাপারে স্বধর্মী, বিধর্মী ও অধর্মীর মধ্যে কোনো ব্যবধান কখনো লক্ষ্য করি না।

এমন কি, সংস্কৃতির বড়াই করে বলে, বাঙালীর সাহিত্যপ্রাণতারও এই সময়েই প্রকাশ ঘটে সর্বাধিক। পুজো সংখ্যাও কেনে দু' একটা। অবশ্য, অধিকাংশই সিনেমা মাসিক। লিটল ম্যাগাজিন আদৌ কেনে না। পরিচিত কোনো সাহিত্য-প্রেমিকের পাল্লায় পড়লে অবশ্য ব্যতিক্রমও ঘটে যায়।

লেখকেরাও খুব সৃজনশীল থাকেন এ সময়।

বুঝি এই সৃজনশীলতার উৎসাহে, আমাদের কাড়ীওয়ালার মেয়েও একটি গল্প লিখেছে সেদিন। কেউ বলছেন, চমৎকার লিখেছে। কেউ বলছেন, ও নাকি লুকিয়ে-চুরিয়ে আগেও গল্প লিখত।

কী আশ্চর্য!

সব পুজো সংখ্যাগুলোই ওর পড়া হয়ে গেছে। আমি তো এখনো ধরতেই পারিনি অনেকগুলো। দু' একটা লেখা পড়েছি বিচ্ছিন্নভাবে। বাছাই করে। এবং লক্ষ্য করলুম, আমি যে-লেখাগুলো পড়েছি, সেগুলোর অধিকাংশই ও পাঠের আযোগ্য মনে করে।

আমার স্ত্রীও এ ব্যাপারে কম যান না।

দু' একটা গল্প সম্পর্কে তিনি তাঁর সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন। আমার ভালো লাগেনি। সেজন্যে উনি ক্ষেপে গিয়েছিলেন। বুঝি আমার সাহিত্যবোধ সম্পর্কেই ও'র ধারণা পালটে যাবার উপক্রম। কি করি? প্রত্যেক বছরই আমি তাঁকে সিনেমা পত্রিকাগুলি কিনে দিই।

তবু বললুম, অমুকের গল্পটা পড়েছ?

'অমুক' মানে একজন বিশিষ্ট লেখক। উনি ও'র নাম জানেন। এবং অসংকোচেই তাঁকে বাতিল করে দিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, পড়েছি। তবে, ও গল্প সিনেমা হবে না।

আমি ও'র যুক্তি মেনে নিয়েছি। এ ছাড়া উপায় নেই। বাংলা গল্পের পাঠক-পাঠিকা তো ওরাই। পুজোর আগে, হাল-ফ্যাশানের শাড়ি আর বাচ্চাদের জামা প্যান্ট কিনতে গিয়ে আমাকে অনেকগুলি রঙ-বেরঙের পুজো সংখ্যা কিনতে হয়। কিন্তু হালফ্যাসানের গল্প নেই। এবার তেমন কিছু পড়েছি বলে তো মনে পড়ে না। রাজনৈতিক প্রবন্ধের সংখ্যাও কম। নির্ভেজাল সাহিত্যের আলোচনাও দুর্লভ।

কেন? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কারণ নিশ্চয়ই আছে।

খুব সাহস দেখিয়েছেন, লিটল ম্যাগাজিনের কয়েকজন সম্পাদক। এবার ও'রা কবি-সাহিত্যিকদের বয়কট করেছেন বলে মনে হয়। নিজেদের লেখা নিজেদের পয়সায় ছেপেছেন। প্রতিষ্ঠিতদের স্বারস্থ হননি। অথচ, পত্রিকার স্ট্যান্ডার্ড ভালোই।

তবে কফি হাউসের উত্তেজনাটা এবার সৃজনশীলতায় জোয়ার আনতে পারেনি। তাই নিয়ে অনেককে মনক্ষুন্ন হতে দেখা গেছে। কে যেন বলছিলেন, তাজ্জব কাণ্ড! গল্পলিখিয়েরা এখন কোথায় যাবেন? কবিদের ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গল্পের লাইনে।

তবু উৎসবের আয়োজনে লিটল ম্যাগাজিন খুব কম বেরোয়নি। বাংলাদেশের কবিরাও কবিতা লিখেছেন কম না। কেবল পাঠক সংখ্যা সংরক্ষিত। সেদিন কবিতার মহাশত্রু আমার এক প্রতিবেশিনীকে একটা দীর্ঘ কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলুম।

উনি বলেছিলেন, বাঃ। চমৎকার লেখা তো?

কৃত্রিম বেনারসী পড়ে উনি তখন ঝকমক করছিলেন। বোধহয়, সেজন্যেই কিছুটা বিরক্ত হয়েছিলুম। ভাষায়ও তার প্রকাশ ঘটে থাকবে। বললুম, পড়তেই যদি হয় কাগজটা আমার কাছে আছে। পরে পড়ে নেবেন।

আসলে, আমার রাগের কোনো কারণ ছিল না। বিজয়ার পরে রাগ করাও অশোভন। তা ছাড়া উনি আমার বাসায় এখন অতিথি। সেজন্যেই প্রসংগ ঘোরাবার জন্য বললুম, কবে পুরী যাচ্ছেন?

ও! স্বামীর এখন লম্বা ছুটি। অধ্যাপনা করেন। দেওয়ররা গেছে রাজগীরে। ফিরে এলেই ও'রাও বেরিয়ে পড়বেন। বছরে কয়েকটা দিনের জন্য নির্জন বাস তো! কি আর এমন?

।। ৫ ।।

পেয়ালা-ভাঙা শব্দের মতো এখন ট্রামেবাসে টুকরোটাকরা আলোচনা শোনা যায়। ধানের ক্ষেতে শিশির পড়া শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ নাকি পুজোর সময় কলকাতায় এসেছিলেন? উত্তরবঙ্গকে দীর্ঘায়িত করার জন্যই নাকি লক্ষ্মীপুজোকে বারোয়ারি রূপ দেওয়া হয়েছে।

কে একজন বললেন, ধানটোলায় এবার ধেড়ে কার্তিক পুজো হবে। আবার চাঁদা?

না। চাঁদার জুলুমটা এবার সামান্য কম। চেনালোকের ওপরই অত্যাচারটা হয়েছে বেশী। না হয়ে উপায় আছে? পুজোর খরচাও তো বাড়ছে দিনকে দিন।

তবু সবাই চাঁদা দেন। দিয়েছেন। গোলমাল বাধছে চাঁদার পরিমাণ সম্পর্কে। সেই মালিন্যের রেশ এখনো কারো কারো মনকে করে রেখেছে কুয়াশাচ্ছন্ন। উদ্যোক্তারা অনেকের সংগে পাল্লা দিয়ে আমোদপ্রমোদ করতে চান। এমনকি, সম্প্রদায়োদ্বোধীরাও নাকি এর ফলে শৃংখলাবদ্ধ জীবনযাপনে উৎসাহী হয়ে থাকে।

এটা অবশ্য কারো কারো ধারণা। সকলের নয়।

এবার একটি নতুন শ্লোগান দিচ্ছেন কেউ কেউ। কলকাতাকে আকর্ষণীয় করে তোলার ব্যাপারে দুর্গাপুজোর প্রয়োজনীয়তাও নাকি অপরিসীম। বিদেশী পর্যটকরা এখানে আসছেন, আসবেন, প্রতি বছর। ফলে, আরো আকর্ষণীয়ভাবে পুজোর উদ্যোগ নিতে দু' একজন তৎপর হয়ে উঠেছেন।

ভালোই।

এখন এমনি সব আলোচনাই চলবে আরো কয়েকদিন। আয়-ব্যয়ের হিসেব-নিকেশ চলবে। কোন্ পাড়ার ছেলেদের সংগে কোন্ পাড়ার মারমারি হয়েছিল, কে কতটা নেশাভাঙ করেছে—এমনি সব গাল-গল্প। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে নিতে হচ্ছে কালচারাল ফাংশানের প্রস্তুতি।

হ্যাঁ। এই তো সংস্কৃতিচর্চার সময়!

কত কিশোর ছেলে এই তিনদিনে বয়স্ক হয়ে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাঘুরি করেছে মুক্তভাবে। এবং যে-

যুবকেরা ভিন্‌পাড়ায় গিয়ে প্রেম করতে সাহস পেত না, মাত্র তিনদিনের মধ্যেই তারা সেই অসম্ভব কাজটিও করে ফেলেছে দুঃসাহসিকতার সঙ্গে।

বোঝা গেল, উৎসব ছাড়া আমাদের মিলনের পথ সঙ্কুচিত। উৎসবই আমাদের মিলিয়ে দেয়—জোড়ে-জোড়ে, জোড়ে-বেজোড়ে—নানাভাবে। এই তো সেদিন শুনলুম, পাশের বাড়ির মেয়েটির চাপা কান্না। কেন? কি হয়েছে? নিতাই গোস্বামী লেনের একটি ছেলের সঙ্গে নাকি তার দারুণ ভাব। বাবা-মা সেটাকে সুনজরে দেখছেন না। বরং প্রতিমুহূর্তে শাসাচ্ছেন—এ জন্যেই মেয়েদের প্রশ্রয় দিতে নেই।

পাড়ার ছেলেরা সেই ছেলেটিকে ধরে দারুণ মার মেরেছে।

॥ ৬ ॥

তার চেয়েও বড় বিপত্তি ঘটেছে, অন্যত্র, পথেঘাটে। কেউ গায়ের গয়নাগুলোকে বাক্সের বাইরে আনতে গিয়ে দ্বিধা বোধ করেছেন। কি জানি, রাস্তায় যদি ছিনতাই হয়। অনেকে বেরিয়েছেন, গিল্টিকরা অলঙ্কার পরে। অবশ্য সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরাও তাই করেন।

একদিন গুজব ছড়িয়েছিল, কে এক ভদ্রমহিলা নাকি নকল সোনার হার পরেও রেহাই পাননি। জনৈক পকেটমার সেই হারটা ছিনিয়ে নিয়েই বুঝেছিল, কী বোকামিটাই না করেছে!

কিন্তু তার কি আত্মসম্মান নেই।

ভদ্রমহিলার মুখের ওপর নকল হারটা ছুঁড়ে দিয়ে দুই গালে দুই চড় মেরে দিয়েছিল কী? লোক-ঠকাবার জায়গা নেই বুঝি?

ঘটনাটা শুনে আমরা হো হো করে হেসেছিলুম। তাহলে পকেটমারেরও মর্যাদা আছে? কিন্তু যার কিছু নেই, তিনি সব কিছু থেকেই মুক্তপক্ষ। পাওয়ার ব্যাপারেও। হারাবার ব্যাপারেও। ঐরকম মানুষদের সঙ্গেই আমার বসবাস।

যেমন শান্তিবাবু। কখনো কোথাও যান না। বয়েস পঞ্চাশ হল। কি একটা কারখানায় কাজ করেন। ওঁর ভাই প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার। কোথাও যাবার কথা উঠলেই তিনি বলেন, কি হবে বাইরে গিয়ে? তার চেয়ে কলকাতাই ভালো। পথে বেরুলেই এককাঁড়ি টাকা খরচা। আরে মশাই, আমরা যেখানে যাব, আমাদের দুঃখও চিরকাল পেছন পেছন ধাওয়া করবে।

আমি তাঁর অবস্থাটা জানি।

মাত্র শ' তিনেক টাকা বোনাস পেয়েছেন এবার। বাচ্চাদের জামাকাপড় কিনতেই ফুরিয়ে গেছে। এবং ঐ টাকা আদায় করতে মালিকের সঙ্গে কী ঝগড়াঝাটি—কী মনোমালিন্য—লকআউটের হুমকি। তবু পুজোর সময় বাচ্চাদের নিয়ে তাঁকে বেরুতে হয়েছে। এমনকি যে-কাজটা তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না, সেই গর্হিত কাজটাই করে ফেলেছেন বাধ্য হয়ে। ছোট ভাইঝিটা বায়না ধরেছিল, জেঠু, নাগর-দোলায় চড়বো?

বিব্রত শান্তিবাবু দশ দশ কুড়িটি পয়সা গাঁটসেলামি দিয়ে নিজেও নাগর-দোলায় চেপে বসেছিলেন, তাকে কোলে নিয়ে।

কিন্তু এখন পকেট ফাঁকা। সামনে কালীপুজো, ভাইফোঁটা, কার্তিক পুজো। কী যে করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। দুর্গা ঠাকুর একেবারে সর্বনাশ করে ছাড়বেন দেখছি—বলেই হো-হো করে শান্তিবাবু, ভাবুন তো কাণ্ডখানা!

কী কাণ্ড!

—দুর্গার দুই ছেলে, দুই কার্তিক-গণেশ আর লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রথমে তো সবাই মিলে একবার খেয়ে যাচ্ছেন। তারপর আলাদা করে লক্ষ্মীঠাকরুণ। দুর্গা আসেন কালী মেজ ছেলে কার্তিকবাবুও ভাবেন বা বাদ যাই কেন? তিনিও আসেন সংক্রান্তির সময়। গণেশবাবু যে পুজো খান, তার ঠিক নেই। সবার একটা বিবেচনা আছে। উনি মা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন।

আবারো হাসেন শান্তিবাবু ঠিক বলেছি কিনা? দুর্গা, তাঁর শিব, আর তাঁর ছেলেমেয়েরা কি কম খসাচ্ছেন?

তবু বিজয়ার দিনে, তাঁর চোখে ছিলুম বিষাদের ছায়া। অর্থাৎ মালিন্যময় প্রাত্যহিকতায় আমরা যাচ্ছি। যাঁরা কলকাতায় ছিলেন না, খানিকটা বিস্মিত হবেন—তাই এত সব কাণ্ড ঘটেছে কলকাতায়?

কারো কারো মুখে পাল্টা শোনা যাবে। সমুদ্রের গল্প। পাহাড়ে কাহিনী। এইভাবে স্মৃতিবিনিময় মাঝে মাঝে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এখন বেঁচে করতেন জানি না। উনি তো মূর্তি বিরোধী ছিলেন। কিন্তু উৎসবশেষের বিষণ্ণতায় কি তিনি অনাক্রান্ত পারতেন? সুঙ্গী পর্বতমালার সেই অগ্নিকাণ্ডের পরিণতির মতই কি আ দৃশ্যাঙ্কনে তিনি উৎসাহী হতেন না

ঘুমের ওষুধ খুনীর হাতিয়ার

শ্রীধর সেনাপতি

নতুন নতুন সাংযোগিক বিষ এবং ওষুধের আবিষ্কার শুধু টক্সিকোলজিস্টদের সামনে নয়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। অসংখ্য মানুষের হাতে এ-সব জিনিস পৌঁছে যাওয়ার ফলে তাই দিয়ে খুন আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর হার যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি তার মোকাবিলা সামলানোর জন্যে ফরেনসিক টক্সিকোলজির রীতি-প্রকরণেও আনতে হয় দ্রুত পরিবর্তন। ১৮৬৩ সালে বার্লিন অ্যাকাডেমী অব ট্রেডস-এ অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির অধ্যাপক অ্যাডলফ্ বেয়ার (পরে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী) বিজ্ঞান-জগতকে যে সাংযোগিক পদার্থটি উপহার দিলেন, সেটি বারবিট্যুরিক অ্যাসিডরূপে পরিচিত। তাঁর প্রেমিকা বারবারার নামানুসারে কাব্যিক মেজাজে তিনি তাঁর নতুন আবিষ্কৃত অ্যাসিডের নামকরণ করলেন!

তারপর কেটে গেল সুদীর্ঘ চল্লিশটা বছর। ১৯০৪ সালে সেই বারবিট্যুরিক অ্যাসিড থেকে এমিল ফিসার এবং ব্যারন জোসেফ ভন মেরিং বার করলেন দুটি যৌগিক পদার্থ—বারবিট্যাল এবং ফেনোবারবিট্যাল, যেগুলো সিডেটিভ অর্থাৎ সুপ্তিপ্রদায়ী শান্তিকর ওষুধরূপে ব্যবহার করা চলে। মেরিং-এরও ছিল সেই একই কবিকল্পনা। আবিষ্কৃত পদার্থটি সম্পর্কে নানান চিন্তায় যখন তাঁর মন ভারাক্রান্ত, সেই সময়ে ভেরোনা'র নিকটবর্তী একটা স্থান দিয়ে তিনি যেন কোথায় যাচ্ছিলেন। পদার্থটির নামকরণের সময়ে তাঁর মনে উদয় হয় ভেরোনা'র নাম, তিনি তাঁর সুপ্তি-প্রদায়ী ওষুধটির নাম রাখলেন ভেরোন্যাল। ফার্মাকোপিয়ায় ফেনোবারবিট্যাল লুমিন্যাল নামে স্থান পেল।

আবিষ্কারের প্রথম দশ বছরের মধ্যেই ভেরোন্যাল এবং লুমিন্যাল আত্মহননে ইচ্ছুকদের হাতের তুরুপের তাস হয়ে গেল। আত্মহন্তাদের দেহ থেকে বারবিট্যুরেটস্ আবিষ্কার করার সমস্যাদি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন স্বয়ং এমিল ফিসার। সে কাজ তখনও বেশী দূর অগ্রসর হয়নি, ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে ওই ধরণের মৃত্যুর হার এমনভাবে বেড়ে যেতে থাকে যে টক্সিকোলজিস্টরা যেন আর হালে পানি পান না।

ওই ঘুমপাড়ানী ওষুধগুলো মানবদেহে কীভাবে বিচরণ করে এবং শরীরকে প্রভাবিতই বা করে কী করে, সে সম্পর্কে তখনও কারো পরিষ্কার ধারণা হয়নি। তবে যেটা প্রায় সুনিশ্চিতভাবে জানা গেছে, তা হলো শারীরিক যে ক্রিয়ার দ্বারা দেহের সজীব মূল পদার্থগুলি রক্ত থেকে স্ব-স্ব পুষ্টি সাধনের দ্রব্য গ্রহণ করে (মেটাবলিজম), সেই ক্রিয়াতে ওষুধগুলো পরিবর্তন ঘটায়। পনের বিশ বছরের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন ঔষধপ্রস্তুতকারকদের উদ্যোগে একের পর এক বাজারে বেরুতে লাগলো অ্যালফিন্যাল, অ্যামিট্যাল, ডেলভিন্যাল, এভিপ্যান নেমবুট্যাল, সিকোন্যাল—এমনি অসংখ্য নামের ঘুমপাড়ানী ওষুধ, যেগুলোর মূল উপাদান ওই বারবিট্যুরিক অ্যাসিড। ১৯৩৮ সালের তুলনায় ইংলণ্ডে ১৯৫৪ সালে বারবিট্যুরেটস-এর সাহায্যে আত্মহত্যার সংখ্যা প্রায় বারো গুণ বেড়ে যায়। ১৯৫৫ সালে গ্রীষ্মকালে ইংলণ্ডে একটি শিশু হত্যার ঘটনাতে বারবিট্যুরেটস সম্পর্কে প্রকাশ পায় আর একটি নতুন সত্য, যেটা নিয়ে ইতিপূর্বে কারো তেমন মাথাব্যথা হয় নি :

বার্বিটুরেটস শুধু আত্মহত্যা করার উপায় নয়, খুনী দুর্বৃত্তের হাতেরও তা হাতিয়ার হতে পারে।

ইংলণ্ডের দক্ষিণে পোর্টসমাউথের কাছে সমুদ্রতীরবর্তী শহর গসপোর্ট সেই ট্র্যাজেডীর কেন্দ্রস্থল ১৯৫৫ সালের ২২শে জুলাই। সময় দুপুরে একটা বেজে কুড়ি মিনিট। ডাঃ বার্নার্ড জনসনের কাছে টেলিফোন করছে জন আর্মস্ট্রং। হ্যাসলারে নেভাল হসপিট্যালের সে মেল নার্স। তার পাঁচ মাস বয়স্ক শিশুপুত্র টেরেন্স গুরুতর অসুস্থ।

জরুরী আহ্বান। তার ওপর আর্মস্ট্রং-দের সঙ্গে চিকিৎসকের পরিচয়টাও নতুন নয়। জন আর্মস্ট্রংয়ের বয়স বছর ছাব্বিশ। তার স্ত্রী জেনেটকে তো একটা কাঁচ মেয়ে বললেই হয়। তবু উনিশ বছর বয়সেই তিন-তিনটি সন্তানের জননী সে। তাদের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত দেনায় ডুবে রয়েছে। সংসারে ঝগড়া-বিবাদ নিত্য-সহচর। এক বছর আগে তারা তাদের বড় ছেলে স্টিফেনকে হারিয়েছে। এখন রয়েছে পামেলা আর টেরেন্স।

দশ মিনিটের মধ্যে ডাঃ জনসন আর্মস্ট্রংয়ের বাড়ীতে গিয়ে হাজির। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে এক নজর ফেলেই তিনি বুঝতে পারলেন শিশু টেরেন্স আর বেঁচে নেই। জেনেট আর্মস্ট্রংকে কিছুটা বিক্ষুব্ধ মনে হলো। তাছাড়া তার গোলাকৃতি মুখে দুঃখ বা শোকের তেমন কোন চিহ্ন ধরা গেল না। চিকিৎসক শিশুর রোগের লক্ষণের কথা শুধোলেন। অনেক প্রশ্নের পর জানতে পারলেন যে আগের দিন বিকেল চারটে থেকে পাঁচটার ভেতরে শিশু দুটিকে দুধ খাওয়ানোর অল্পক্ষণের ভেতরে দুজনেই বমি করে ফেলে। যখন আর্মস্ট্রং সাতটার সময়ে কাজ থেকে বাড়ী ফিরে আসে, তখন শিশু দুটি বেশ ভালই ছিল। রাত প্রায় এগারোটার সময়ে হঠাৎ জেনেট লক্ষ্য করে, টেরেন্স হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছে। শরীরটা একেবারে ঠাণ্ডা। আর কোন রকম সাড়া নেই। জন আর্মস্ট্রং ডাক্তার না হলেও হাসপাতালের মেল নার্স। রোগ ও রোগী সম্পর্কে তার কিছুটা ধারণা রয়েছে। সে তখন শিশুটির গলায় আঙুলে দিয়ে বমি করানোর চেষ্টা করলো। তাতেও শিশুটো না জেগে উঠলো না বা বমি করলো। রাত প্রায় সাড়ে বারোটার সময়ে গরম জলের সেঁক-তাপ দিয়ে শিশুর দেহের উত্তাপ বজায় রাখার চেষ্টাতে ব্যর্থ হয়ে, শিশুর মুখের রঙ ক্রমশ নীল হয়ে উঠছে দেখে তারা ডাঃ বুকাননকে ফোনে খবর দেয়। জেনেট বললো, অত রাত্রে খবর দেওয়াতে ডাঃ বুকানন বেশ কিছুটা বিরক্ত হয়েছেন বুঝতে পেরে তাঁকে তক্ষুনি বাড়ীতে আহ্বান করতে তাদের সাহস হয় নি। সকালে যখন তিনি এলেন, দেখা গেল টেরেন্সের আর কোন কষ্ট নেই। কিন্তু দুপুরের পরেই যখন জন বাড়ীতে খেতে আসে আবার টেরেন্সের অবস্থা খারাপের দিকে গেল। সে হাঁ করে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো। তাকে আর ঘুম থেকে জাগানো গেল না। জন তখন স্থির করলো হাস-পাতালে ফিরে গিয়ে সে ডাঃ জনসনকে তার বাড়ীতে আসবার জন্যে অনুরোধ করবে—এই হলো কাহিনী। জনসনের মনে তখন প্রশ্ন : আর্মস্ট্রং কাছাকাছি কোন টেলিফোন কেন্দ্র ব্যবহার করে নি কেন? হ্যাসলারে তার কর্মস্থল বাড়ী থেকে প্রায় মাইল পাঁচেক দূরে। বাইসাইকেলে চড়ে সেখানে পৌঁছে আর্মস্ট্রং তাকে টেলিফোন করেছে কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর জেনেট জানে না। কিছুই জানে না সে।

ডাঃ জনসন জেনারেল প্র্যাকটিস করেন। এই সূত্রে এমন বহু পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় রয়েছে, যাদের বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম, অভাব, ছেলেমেয়ের সংখ্যা বেশী এবং তাদের ভেতরে কারো মৃত্যু হলে শোকের ধাক্কায় খুব বেশী তারা কাতর হয় না। কিন্তু টেরেন্সের মৃত্যুর কারণটা নিজের কাছে স্পষ্ট না হওয়াতে ডাঃ জনসন গস-পোর্ট করোনারকে খবর দিলেন।

করোনারের দুই সহকারী বুলি এবং এজ গিয়ে উপস্থিত হলো আর্মস্ট্রংদের বাড়ীতে। তারা মৃত শিশুর দেহের সঙ্গে শিশুর দুধের বোতল এবং যে বালিশের ওপরে আগের দিন শিশুটি বমি করেছিল, সেই বালিশ নিয়ে চলে গেল মর্গে। বিকেলে হসপিট্যাল প্যাথলজিস্ট ডাঃ হ্যারল্ড মিলার সেই মৃত শিশুদেহের ওপরে অটোপ্সী শুরু করলেন। দেখা গেল মৃত-দেহের কণ্ঠনালীর কাছে লাল রঙের ডেফনীবেরী'র খোসার মত একটা জিনিস কুঁকড়ে আটকে রয়েছে। বিবর্ণ পাকস্থলীর মধ্যেও ওই রকমই লাল রঙের আরো কয়েকটি খোসা রয়েছে। কণ্ঠনালীর কাছ থেকে যে পদার্থটিকে পাওয়া গেল, সেটিকে ডাঃ মিলার একটি ফরমাল-ডিহাইডের বোতলে সংরক্ষিত করলেন। পাকস্থলী থেকে পাওয়া পদার্থগুলোকে রাখলেন ভিন্ন একটি বোতলে। দুটো বোতলই অতঃপর রেফ্রিজারেটরে স্থান পেল। ডাঃ মিলারের ধারণা হলো, কোন রকম ফুড পয়জনিং থেকেই সম্ভবত শিশুটির মৃত্যু ঘটেছে।

ওই দিন সন্ধ্যের সময়ে আর্মস্ট্রংয়ের বাড়ীতে পুনরাগমন ঘটলো বুলি এবং এজের। তারা একটা কথা জেনে যেতে চায়। আচ্ছা, বাড়ীর কাছাকাছি কোন ডেফনী-বেরীর গাছ আছে নাকি?

হাঁ, বাগানেই আছে। আর তাতে ফলও ধরেছে প্রচুর। আর্মস্ট্রং মনে করে বললেন টেরেন্সকে কিছুক্ষণের জন্যে ওই গাছতলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শিশুর মুখের ভেতরে একটা ফল পড়লেও পড়তে পারে। পড়াটা অসম্ভব নয়। ডেফনীবেরী মারাত্মক রকম বিষাক্ত।

ডাঃ মিলার খবরটা পেয়ে মনে করলেন [illegible] গেলেন। পর দিন সকালে রেফ্রিজারেটর খুললেন। কিন্তু খুলেই চমকে উঠলেন — এ[...] ফরমালডিহাইডের শিশিতে রাখা সেই ল[...] রঙের খোসাটি অদৃশ্য। আর, ফরমা[...] ডিহাইডের রঙটাই পাল্টে হয়ে গেছে লা[...] ডাঃ মিলার অপর বোতলটির দি[...] তাকালেন। সেটার ভেতরেও ওই এ[...] পরিবর্তন। একটি খোসাও নেই। পাকস্থ[...] থেকে পাওয়া অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে রা[...] রাতি মিশে গেছে। রঙ হয়ে উঠেছে গ[...] লাল।

ডাঃ মিলার সেই বোতল দুটোকে বাচ্চ[...] দুধের বোতল এবং বালিশটির স[...] পাঠিয়ে দিলেন একটি কেমিক্যাল ল্যাব[...] টরীতে। এই ল্যাবরেটরীটি করোনার[...] জন্যে নিয়মিতভাবে টক্সিকোলজিক্যা[...] ইনভেস্টিগেশন করে থাকে। সেখান থে[...] ডাঃ মিলারের কাছে রিপোর্ট এলো। [...] পূর্বপরিচিত কোন বিষের অস্তিত্ব খুঁ[...] পাওয়া যায়নি। ডেফনীবেরী সম্পর্কে যে সন্দেহ করা হচ্ছে, সেটা সত্য বলে প্রম[...] করতে পারে নি ল্যাবরেটরী।

শিশু টেরেন্সের মৃত্যুর কারণ কি [...] হলে অজ্ঞাতই থেকে যাবে? এমন অনে[...] শিশুর মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে ঘটেও থা[...] যা কোন চিহ্নই রেখে যায় না। তবু নিজে[...] নিরাপদে রাখার জন্যে গসপোর্ট পুলিশে[...] ইন্সপেক্টর গেটস ২৮শে জুলাই অ[...] একবার আর্মস্ট্রংদের সঙ্গে দেখা কর[...] গেলেন। নতুন করে ঘরদোর তল্লাসী ক[...] তাদের জবানবন্দী নিলেন। তাঁকে কি[...] সন্দেহগ্রস্ত করে তুললো জন আর্মস্ট্রং। ত[...] ধারণা হলো যুবকটি খুব ধূর্ত। কি[...] ওই পর্যন্তই। না জেনেট, না বা জন ইন[...] স্পেক্টরের সঙ্গে কোন রকম সন্দেহজন[...] বিতর্কে জড়িয়ে পড়লো না।

তবে জন আর্মস্ট্রংয়ের ওপর [...] অখুশী বিরূপ মনোভাবটা ইন্সপেক[...] গেটস যদি পোষণ না করতেন, তাহ[...] শিশু টেরেন্সের মৃত্যুর রহস্য হয়তো বর[...] বরের জন্যে অনুদ্ঘাটিত থেকে যেতে[...] আগস্টের গোড়ার দিকে গেটস গেলে[...] হ্যাসলারে। আর্মস্ট্রং সম্পর্কে যেসব মত মত শুনলেন তাতে নিজের সৃষ্ট ধারণা সমর্থনই পেলেন তিনি।...'জন আর্মস[...] অবিশ্বস্ত' ... 'ঢিলেঢালা' ... 'কর্তব্যজ্ঞান[...] রহিত'...'হাসপাতালের কর্মচারী হিসে[...] সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত'...'চাকরীটা রয়ে গে[...] শুধু হাসপাতালে লোকজনের কিছু অভাব থাকার দরুন।...'

গেটস গসপোর্টে ফিরে গিয়ে ড[...] মিলারকে ডেকে জিগ্যেস করলেন, কো[...] আঘাতজনিত চিহ্ন মৃত শিশুটির দে[...] তিনি লক্ষ্য করেছেন কিনা। প্যাথলজি[...] জানালেন, না। তবে অটোপ্সী করার পরে তিনি কেসটা সম্পর্কে চিন্তা করেছেন যাকে তখন ডেফনীবেরীর খোসা বলে ম[...] হয়েছিল, তা কিন্তু জিলেটীনের রঙী[...] মেডিসিন ক্যাপসুলও হওয়া সম্ভব। কমল[...] লাল রঙের ক্যাপসুলের ভেতর দিয়ে সিকোন্যাল সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

সিকোন্যালের কাজটা কী? গেটস-এর প্রশ্ন।

সিকোন্যাল শক্তিশালী ঘুমের ওষুধ। সাধারণত দ্রুত কাজ করে, কিন্তু প্রভাবটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

গেটস আবার শুধোলেন, শিশুটির লক্ষণ দেখে কি মনে হয় তাকে সম্ভবত সিকোন্যালই খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল?

ডাঃ মিলার বললেন, হতে পারে। সামান্য কয়েক গ্রেনই একটি শিশুকে হত্যা করার পক্ষে যথেষ্ট। তবে এটা এখনও অনুমানের কথা। বারবিটুরেটসের সাহায্যে খুন করার কোন ঘটনা এখনও পর্যন্ত শোনা যায় নি।

গেটস তার ওপরওলা সুপারিন্টেন্ডেন্ট জোন্সের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তিনি সাহায্য চাইলেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের। পরদিন এল সি নিকলস, ১৯৫১ সাল থেকে তিনি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মেট্রোপলিটান পুলিশ ল্যাবরেটরীর ডিরেকটর, টেলিফোনে শিশু টেরেন্সের মৃত্যুসংক্রান্ত যাবতীয় জিনিসপত্র চেয়ে পাঠালেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, গেটস জিনিসগুলো সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখেন যে, কেমিস্ট সেসবের অধিকাংশই নষ্ট করে ফেলেছেন। তবে টেরেন্স যে বালিশটার ওপরে বমি করেছিল, সেটা বেশ সযত্নের সঙ্গে রক্ষিত হয়েছে এইটে সান্ত্বনা। শিশুটির মৃত্যুর প্রায় এক মাস পরে ২৩শে আগস্ট গেটস লন্ডন রওনা হলেন সংগৃহীত জিনিসগুলো ঝুলিতে নিয়ে।

এই সময়ে নিকলস 'দি সায়েন্টিফিক ইনভেস্টিগেশন অব ক্রাইমস' নাম দিয়ে একটা বই লিখছিলেন। লেখকের নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত টক্সিকোলজী সম্পর্কে একটা চ্যাপ্টার তাতে ছিল। চ্যাপ্টার শুরু এইভাবে : 'বর্তমানের টক্সিকোলজিস্টগুলো একথাই বলে যে মানুষের অভ্যাসের এবং ওষুধ ব্যবহারের নির্দেশ-পত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক বিষক্রিয়ার প্যাটার্নও যাচ্ছে পাল্টে। এই সব পরিবর্তনের ফলে টক্সিকোলজীর ক্ষেত্রের কর্মীরা আগেকার অনেক পুরনো পদ্ধতিতে কাজ করে সন্তুষ্ট থাকতে পারছেন না।' নিকলস বিশেষ করে ঘুমের ওষুধগুলো সম্পর্কে বেশী চিন্তা করেছেন। বিভিন্ন নামের বারবিটুরেটসকে পুরনো প্রচলিত পদ্ধতিতে আলাদা আলাদা করার হাঙ্গামা ছিল প্রচুর। নিকলস নিজস্ব একটি পদ্ধতি বের করেন : মিক্সড মেলটিং পয়েন্ট টেস্ট। এবং সেই পদ্ধতির নির্ভুলতা তিনি বহু বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

পেন্টোথ্যালের গলনাঙ্ক যেখানে ১৫৬ ডিগ্রি থেকে ১৫৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে, এ্যামিট্যালের ১৫৫ ডিগ্রি থেকে ১৫৮ ডিগ্রি, সেখানে সিকোন্যালের গলনাঙ্ক ৯৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কাজেই তাদের থেকে সিকোন্যালকে আলাদা করা অতি সহজ।

২৩শে আগস্ট থেকে ২৮শে আগস্ট পর্যন্ত নিকলস ইন্সপেকটর গেটসের দেওয়া জিনিসগুলো নিয়ে পরীক্ষায় মেতে রইলেন। বালিশের ওপরে শিশু টেরেন্স যে বমি করেছিল, তা থেকে নিকলস উদ্ধার করলেন প্রায় ১/৫০ গ্রেন সিকোন্যাল। আরো ১/৩ গ্রেন পাওয়া গেল পাকস্থলী থেকে সংগৃহীত পদার্থ থেকে। শিশুটিকে যে সিকোন্যালই খাওয়ানো হয়েছিল, এ সম্পর্কে কি আর কোন সন্দেহ আছে? কিন্তু মোট কত পরিমাণ সিকোন্যাল দেওয়া হয়েছিল সেই পাঁচ মাস বয়স্ক কচি শিশুকে? সেটা নির্ণয় করতে হলে মৃত শিশুর দেহটিকে মাটির নীচে থেকে বের করে আনতে হবে।

৬ই সেপ্টেম্বর অনুমতি মিললো। বলা বাহুল্য মৃতদেহে পচনক্রিয়া তখন অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে অনেক বারবিটুরেট মানুষের শরীর থেকে খুবই দ্রুত নিঃসরণ হয়ে যায়। তাহলেও বর্তমান ক্ষেত্রে শিশুটির দেহে কয়েক গ্রেন সিকোন্যাল অবশিষ্ট থাকাটা অসম্ভব নয়।

নিকলস যখন ওই কাজে ব্যস্ত, তখন হ্যাসলারে নেভাল হসপিট্যালে আর একবার দেখা গেল ইনস্পেক্টর গেট্সকে। যদি নিকলস প্রমাণ করেন যে শিশু টেরেন্সের মৃত্যুর কারণ সিকোন্যালই তাহলে, গেট্স মনে করলেন, আর্মস্ট্রংরা ওষুধটা কী ভাবে সংগ্রহ করেছিল, সেটাও জানা দরকার। প্রথমে গেট্স তেমন কোন সূত্রই পেলেন না। অবশেষে হাসপাতালের একটি নার্সের কাছ থেকে জানতে পারলেন, গত ফেব্রুয়ারী মাসে হাসপাতালের বিষাক্ত ওষুধগুলো যে কাপবোর্ডে থাকতো, সেটার কোন তালাচাবি ছিল না। ফলে একদিন দেড় গ্রেন সিকোন্যাল ক্যাপসুলের পঞ্চাশটা প্যাকেট তা থেকে যায় চুরি হয়ে। সেই রহস্যময় চুরির কিনারা করা যায় নি। আর্মস্ট্রংয়ের কর্মচারী হিসেবে সে ঘরে ঢোকার কোন বাধানিষেধ ছিল না। তাতে অবশ্য এটা প্রমাণ হয় না যে চুরিটা আর্মস্ট্রংই করেছিল।

সেপ্টেম্বরের প্রথম দুটো সপ্তাহ কেটে গেল। কাজের এই মন্থরতা ইন্সপেকটরের পক্ষে যতই অস্বস্তিকর হোক, নিকলস কিন্তু চটপট কাজ শেষ করতে চান না। একাজে সামান্য অবহেলাও সমস্ত জিনিসটাকে নষ্ট করে দিতে পারে।

ইতিমধ্যে গেটস ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে আর্মস্ট্রংয়ের বড় ছেলে স্টিফেনের যে মৃত্যু হয়, সে সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন। স্টিফেনের ডেথ সার্টিফিকেট যিনি লিখেছিলেন, সেই বিরাশী বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ চিকিৎসকের কাছ থেকে স্টিফেনের যা যা লক্ষণ জানা গেল, সে সবই শিশু টেরেন্সের লক্ষণগুলোর মতই : মুখের বর্ণ নীল হয়ে যাওয়া, ঘুম ঘুম ভাব, শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট—এবং তারপর হঠাৎ মৃত্যু। আর একটা ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৪ সালের যে মাসে আর্মস্ট্রং-এর মেয়ে পামেলা (তখন তার বয়স দু বছর) একবার ওই একই রকম কষ্ট ভোগ করেছিল। জনৈক চিকিৎসক সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যান। পামেলা দ্রুত আরোগ্য লাভ করে সেখানে।

গেটসের তদন্ত যখন এই পর্যন্ত এগিয়েছে, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি একদিন গাসপোর্টে এলো নিকলসের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এ্যানালিসিসের রিপোর্ট। শিশুর দেহ থেকেও নিকলস ১/২০ গ্রেন সিকোন্যাল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি মন্তব্য করেছেন যে শিশুটি, অন্তত তিনটি থেকে পাঁচটা ক্যাপসুল গ্রহণ করেছিল।

ওই দিনই, ১৬ই সেপ্টেম্বর সুপারিন্টেন্ডেন্ট জোন্স এবং ইন্সপেকটর গেটস আর্মস্ট্রংদের বাড়ী গেলেন নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। টেরেন্স কিভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল? ২১শে জুলাই বিকেল সাড়ে চারটের সময়ে তাকে দুধ খাওয়ানো হয়। সে বালিশের ওপরে বমি করে ফেলে (বমিতে সিকোন্যালের অস্তিত্ব রয়েছে)। ওই সময়ে শিশুর কাছে কে ছিল? শিশুটির মা, আর কেউ নয়। ওই দিন সন্ধ্যে সাতটার সময়ে জন আর্মস্ট্রং বাড়ী ফিরে আসে। শিশুর তখন আর কোন কষ্ট ছিল না। রাত এগারোটার সময়ে শিশুটি ভারী নিঃশ্বাস নিতে থাকে। দেহটা তার ঠান্ডা হয়ে যায়। ঘুম থেকে তাকে জাগানো যায় না। বারোটা কুড়ি মিনিটের সময়ে তার মুখের চেহারা নীল হয়ে যায়। খবরটা ডাঃ বুকাননকে টেলিফোনে জানান হয়। তিনি আসেন পরদিন ২২শে জুলাই সকাল আটটা চল্লিশ মিনিটে। কিন্তু তার আগেই সাড়ে সাতটার সময়ে শিশুটি ভাল আছে দেখে জন আর্মস্ট্রং হ্যাসলারে তার কর্মস্থলে রওনা দেয় বাইসাইকেলে চেপে। দুপুরে বাড়ীতে যখন সে খেতে আসে তখন সময় বারোটা বেজে পনের মিনিট। সে এসে দেখে শিশুর অবস্থা আবার সেই আগের মতই হয়ে গেছে। বেলা একটা বা সামান্য কিছু পরে জন আর্মস্ট্রং হাসপাতালে ফিরে গিয়ে ডাঃ জনসনকে খবরটা দেয়।

মোটামুটি ঘটনা তো এই? আর্মস্ট্রংরা এটা স্বীকার করে?

তারা অস্বীকার করলো না।

এবার জোন্স-এর আচমকা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : শিশুর দেহ থেকে যে মারাত্মক পরিমাণ সিকোন্যাল উদ্ধার করা গিয়েছে, তার কৈফিয়ৎ কি দিতে পারে আর্মস্ট্রংরা।

প্রশ্নটার কোন প্রতিক্রিয়া বোঝা গেল না। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বোকার মত চেয়ে রইলো সুপারিন্টেন্ডেন্টের মুখের দিকে।

অবশেষে জেনেট বললো, সিকোন্যাল জিনিসটা যে আসলে কি তাই সে জানে না। জন, যেহেতু হাসপাতালের নার্স, ওষুধটা সম্পর্কে নিজের জ্ঞানের কথা অস্বীকার করতে পারলো না।

তবু এক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সমান অপরাধী ধারণা করে নিয়ে জোন্স এবং গেটস স্থান ত্যাগ করলেন। যতই অভাবনীয় হোক, তারা দুজনেই কাঁধের ভার হাল্কা করতে চেয়েছে অমনি একটা নিষ্ঠুর উপায়ে। কিন্তু দুজনের মধ্যে কে এ কাজ করেছে?

জোন্স-এর একথা মনে হলো, সিকো-ন্যাল শিশুর শরীরে কত দ্রুত ক্রিয়া করেছে, যদি সেটার হিসেব পাওয়া যায়, তাহলে অপরাধটি সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা করে নেওয়া সম্ভব। তিনি জেনেছেন, ওষুধটা দ্রুত কাজ করে, কিন্তু ক্রিয়াটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যে দ্রুততার সঙ্গে ওষুধটার ক্রিয়া শুরু হয় সেটা নির্ভর করে পাকস্থলীতে পেঁছে ক্যাপসুলটা গলে গিয়ে ওষুধটা বেরিয়ে পড়তে যে সময় লাগছে, তার ওপরেই। যদি শিশুটির দেহে বারোটা বেজে পনের মিনিটের সময়ে মারাত্মক লক্ষণগুলো প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে সেটা প্রয়োগ করার স্বল্প কয়েক মিনিটের ভিতরেই ক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়ে-ছিল। কারণ জন আর্মস্ট্রং সকাল সাড়ে সাতটায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায় এবং বারোটার পরে বাড়ী ফিরে আসে। সকাল সাতটায় খাওয়ানো ক্যাপসুলগুলো দুপুর পর্যন্ত শরীরে তাদের ক্রিয়া বন্ধ করে রেখে-ছিল কিনা এ প্রশ্ন উঠতেই পারে না। তাহলে সন্দেহটা গোড়াতেই জেনেটের ওপরে গিয়ে পড়ে।

নিকলাস আর একবার কাজ শুরু করলেন। সিকোন্যাল ম্যানুফ্যাকচারারের দ্বারস্থ হয়ে তিনি জানতে পারলেন, ব্যবসার খাতিরে চিকিৎসকদের না জানিয়ে ফার্ম ক্যাপস্যুলের জন্যে বিভিন্ন প্রকারের জিনিস ব্যবহার করে থাকে। যে ক্যাপস্যুল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, সেটা মিথাইল সেলুলোজের তৈরী ইয়োসিনের সাহায্যে রং করা। সিকোন্যালের সঙ্গে ক্যাপস্যুলে সামান্য মাত্রায় কর্ণস্টার্চও রয়েছে। মিথাইল সেলুলোজ পাকস্থলীর ভেতরে তরল পদার্থ শুষে নেয়। ক্যাপস্যুল ভেদ করে সেই তরল পদার্থ যখন ভেতরে পেঁছোয়, তখন কর্ণস্টার্চ ফুলে ওঠে। ফলে ক্যাপস্যুলটা বিভক্ত হয়ে যায় দুটো ভাগে। তখন সিকোন্যাল সরাসরি পাকস্থলীর সংস্পর্শে আসে। পরে ক্যাপস্যুলও সম্পূর্ণরূপে গলে যায়। [illegible] হয়ে যায়। নিকলস মিথাইল সেলুলোজে তৈরী ক্যাপস্যুল নিয়ে এবার এক্স-পেরিমেন্ট শুরু করলেন। তিনি প্রমাণ পেলেন, পাকস্থলীর ভেতরে পেঁছনোর পর সাধারণতঃ আধঘণ্টার ভেতরে ক্যাপসুল ভেঙ্গে সিকোন্যাল বেরিয়ে পড়ে। তবে কোন কোন ক্যাপস্যুল সামান্য কয়েক মিনিটের ভেতরেও ভেঙ্গে যায়।

কিন্তু এই পরীক্ষায় শিশু টেরেন্সের মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনে বিশেষ সাহায্য হলো না। আর্মস্ট্রংদের স্বামী-স্ত্রীর ভেতরে প্রকৃত অপরাধী কে, সেটা নির্ণয় করা এই ভাবে প্রায় অসম্ভব। তাদের জবানবন্দী এবং বারোটা পনের মিনিটের সময়েই সিকোন্যাল শিশুটির দেহে ক্রিয়া শুরু করেছিল যদি মেনে নেওয়া যায়, তাহলে সন্দেহ হবে একা জেনেটই এই হত্যাকাণ্ডটি করেছে। কিন্তু সেটাও নিশ্চিতভাবে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ কোন কোন ক্যাপস্যুল মাত্র কয়েক মিনিটের ভেতরেও ভেঙ্গে যায়। কাজেই জেনেটকে খুনী হিসেবে সন্দেহ করা চলতে পারে, কিন্তু তার অপরাধ এতে প্রমাণ করা যাবে না।

তবু আর্মস্ট্রংদের ওপরে গেটস্-এর সন্দেহদৃষ্টি থেকেই যায়। এভাবে দু'চার মাস নয়, কেটে যায় পুরো একটা বছর। ১৯৫৬ সালের ২৪শে জুলাই গস্‌পোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের আবেদন জানিয়ে মামলা আনলো জেনেট আর্মস্ট্রং। জেনেটের অভিযোগ জন প্রতি-নিয়ত তাকে মারধর করে। লক্ষ্য করা গেল, স্বামীর ওপর জেনেটের অপরিসীম ঘৃণা। কিন্তু আদালতে সে মামলা টিকলো না।

বিচ্ছেদের অনুমতি না পাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই জেনেট আর্মস্ট্রং ইনস্পেকটর গেটস্‌কে ডেকে পাঠালো। পুলিশের কাছে সে একটা বিবৃতি দিতে চায়।

জেনেট আর্মস্ট্রং বিবৃতিতে কবুল করল: গত বছর জুলাই মাসে পুলিশের কাছে সে মিথ্যে কথা বলেছে। তাদের বাড়িতে সিকোন্যাল ছিল। হ্যাসলার থেকে জন অনেকগুলো ক্যাপসুল এনেছিল। টেরেন্সের মৃত্যুর তিনদিন পরে জন তাকে সব ক্যাপসুল বাড়ির বাইরে ফেলে দিতে বলে। তা না হলে জেনেটই নিজের শিশু-সন্তানের মৃত্যুর জন্যে দায়ী হয়ে পড়বে। ১৬ই সেপ্টেম্বর সুপারিন্টেন্ডেন্ট জোন্স এবং ইন্সপেক্টর গেটস্ তাদের বাড়ি তল্লাসী করে আবার জবানবন্দী নিয়ে চলে যাবার পর জন জেনেটকে বলেছিল, বরাত ভাল ক্যাপসুলগুলো বাড়ির বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল আগেই। ওগুলো ছিল সিকোন্যাল ক্যাপসুল। জেনেট শুধিয়ে-ছিল: 'তুমি কি টেরেন্সকে এই ক্যাপসুল খাইয়েছিলে?' কিন্তু জন হাল্কা গলায় পাল্টা প্রশ্ন রেখেছিল: 'তুমিই যে খাওয়াওনি সেটা আমিই বা কী করে জানবো?' সে তখনই পুলিশের কাছে যায়নি কেন? যায়নি, কারণ তার ভয় ছিল, সেটা জানতে পারলে জন তাকে মারধর করবে। কিন্তু এখন জেনেট জনকে পরোয়া করে না।

গেটস্ লক্ষ্য করলেন, মহি প্রতিশোধ-স্পৃহা প্রবল হয়ে উঠেছে সিকোন্যাল সম্পর্কে সে যা বলেছে, সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। জাগে এ-ব্যাপারে সে নিজে কতটা আসল সত্য যাই হোক, টেরেন্সের সময়ে তাদের বাড়িতে যে সিক ক্যাপসুল ছিল, এটা তো প্রকাশ

আরো চার মাস পরে ১৯৫৬ ৩রা ডিসেম্বর অ্যাটর্ণী জেনারেল রেজিন্যাল্ড ম্যানিংহ্যাম-বুলার জন জেনেট আর্মস্ট্রংকে নিজেদের শি টেরেন্সকে যুক্তভাবে ষড়যন্ত্র এবং করার অভিযোগে ব্যক্তিগতভাবে এক দায়ের করলেন। বিচার হলো। (নয়জন পুরুষ এবং তিনজন নারী প্রকাশ করলেন, শিশু টেরেন্সের রাধে দোষী একমাত্র জন আ জেনেটের এ অপরাধ থেকে মুক্তি সম্ভব হলো শুধু তার আইনজীবি ম্যান স্কেলহর্নের দক্ষতার জন্যে মামলায় তিনি সম্পূর্ণরূপে লাগালেন নিকলস-এর আবি ব্যাপারটা।

এটা কি সত্য নয়, তিনি করলেন, যে সিকোন্যাল ক্যাপসুল স্থলীতে গিয়ে পেঁছনোর এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টার ভেতরে যেমন গলে গি শুরু করে, তেমনি কোন কোন ক আবার বেশ তাড়াতাড়ি গলে নিকলস নিজে এ-সত্য প্রকাশ ক নরম্যান স্কেলহর্ন আরো বললেন, লতের মতে জেনেট নাকি ব প্রয়োগে স্বামীর সঙ্গে সহ করেছে। কারণ, বারোটা বেজে মিনিটের সময়ে যখন শিশুটির খারাপ হতে শুরু করে, তখন জন বাড়ি ফিরে আসেনি। কিন্তু আসল কী? এমনটা হওয়া কি সম্ভব জন আর্মস্ট্রং বাড়িতে পেঁছেই অনেকগুলো সিকোন্যাল ক শিশুটিকে খাইয়ে দেয় এবং প্রথম সুলটা খুব তাড়াতাড়ি গলে গিয়ে তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে? তারপর এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টা পরে অন সুলগুলো গলে যাওয়ার ফলে দ্রুত মৃত্যু ঘটেছে, এটা ভাবা বি বা অযৌক্তিক হবে?......

নতুন আবিষ্কৃত ঘুমপাড়ান বারবিট্যুরেট্‌স প্রয়োগে হত্যাকাণ্ডে প্রথম বিচার। এ থেকেই বিশেষজ্ঞ চিন্তার উদয় হলো টীকার একটা বিপজ্জনক শূন্যস্থান থেকে যেটাকে অনতিবিলম্বে পূর্ণ প্রয়োজন।

অঙ্গনা

সাজাব যতনে

কথায় বলে, ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ। ...কমাত্রেই রুচি ভিন্ন। কিন্তু একটি ...য়ে সব নারীর রুচি প্রায় সমান। আর ...লো সাজগোজ। এ ব্যাপারে মেয়েতে ...তে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। ...গোজের প্রতি সব মেয়েরই সমান নজর। ...য় সবাই সাজতেগুজতে জানেন এমন ... কেউ কেউ জানেন আবার কেউ কেউ ...নেও না। সাজতেগুজতে জানুন আর ...ই জানুন একটা জিনিস কিন্তু সকলের ...েই সম্ভব এবং তা হলো ছিমছাম ...। বিয়ের পর এ সম্বন্ধে কেউ কেউ ...নিক হয়ে পড়েন। তাঁরা মনে করেন, ...ন আর সাজগোজ করলে দেখবে কে? ...হবার সে তো হয়ে গেছে। সাজগোজ ... আর ছিমছাম থাকা যে এক জিনিস নয় কথা তাঁরা একটু তলিয়ে বুঝতে চান না। ...নেকে আবার সাংসারিক কাজকর্মের চাপ-...ক্লান্ত অজুহাত দাঁড় করিয়ে এদিকটা ...ড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। কিন্তু এতে ...নেকখানি ক্ষতির সম্ভাবনা। পুরুষের ...ধ্য এমনিতেই রূপতৃষ্ণা থাকে। এবং ...বাহিত জীবনে স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেকে ...ীর কাছেই তা আশা করেন। স্ত্রী যদি ...র এই আকাঙ্ক্ষা অচরিতার্থ রাখে তবে ...র প্রতি স্বামীর বিরাগ জন্মানোও সম্ভব নয়। ভুল বোঝাবুঝির শুরুও ...ত পারে এখান থেকে আর যার পরিণতি ...দূর গড়াবে কেউ বলতে পারে না।

এমনি এক বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছিল ...মলার জীবনে। তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত-...রে। ছটা সাড়ে ছটা নাগাদ বিমলার ...মী অফিস থেকে ফেরেন। দরজায় ঘন ...কড়া নাড়ার শব্দ ওঠে। কড়া একটু ...ক্ষণই নাড়তে হয়। তারপর বিমলা ...জা খুলে দেয়। হাসি হাসি মুখে ...মীকে অভ্যর্থনা জানায়। তিনি একবার ...মলার দিকে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা ...রেও কেমন গম্ভীর হয়ে যান। চেয়ারে ...স নিচু হয়ে জুতো-মোজা খোলেন। অনেকক্ষণ কোন কথাও বলেন না। স্ত্রীর কথার জবাব হুঁ, হাঁ করে সারেন। স্বামীর মনোরঞ্জনের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বিমলা সেখান থেকে সরে যায়। স্বস্থানে আশ্রয় নেয় অর্থাৎ রান্নাঘরে।

একটু পরেই বিমলা স্বামীকে জল-খাবার দেয়। তিনি নিঃশব্দে খেয়ে যান। খুব একটা দরকার না হলে কথা বলেন না। এ সময়টা বিমলা টেবিলের অপর প্রান্তে বসে থাকে। স্বামীর রুটিন তার জানা। জলখাবার খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়বেন। অনুরোধ করলেও বাড়ি থাকবেন না। এজন্য মাঝে মাঝে বিরক্তিও প্রকাশ করেন।

বিমলা স্বামীর এই বিরক্তির কারণ বুঝে উঠতে পারে না। তবে এতে যে তাকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে সেটুকু বুঝতে তার অসুবিধা হয় না। এক এক সময় সে এই ভেবে সান্ত্বনা পেতে চায় যে, পুরুষ মানুষ নানা চিন্তায় থাকে বলেই হয়তো তার ব্যাপারে খুব একটা মাথা ঘামানোর সময় পায় না। কিন্তু রোজ রোজ এই অবজ্ঞা কত সহ্য হয়! একা সে সংসারের সবদিক সামলায়। স্বামী শুধু রোজগার করেন। রান্নাবান্না থেকে শুরু করে সব কাজ সে নিজের হাতে করে। অফিস থেকে ফেরার পর কোনদিন স্বামীকে জলখাবার দিতে এতটুকু দেরি হয় না। তবু সে স্বামীর মন পায় না। দুদণ্ড বিমলার সঙ্গে তিনি কথা বলার সময় পান না। এছাড়া ইদানীং সে আর একটা জিনি... লক্ষ্য করছে যে, কোন সামান্য ব্যাপারেও তিনি এমন খিটির-মিটির করেন যে, বিমলা অবাক না হয়ে পারে না। তার শুধু মনে হয় যে কোন এক অদৃশ্য কারণে তারা পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং এর পরিণতির কথা ভেবে বিমলা মনে মনে শিউরে ওঠে। অনেক চেষ্টা করেও সে এই কারণটুকু খুঁজে পায় না।

বিমলার পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে সুলতা। তার স্বামীও প্রায় একই সময়ে অফিস থেকে ফেরে। কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্তও তার দরজা খুলতে দেরি হয় না। এ-সময়টা সে স্বামীর পথ চেয়েই বসে থাকে। সংসারের কাজকর্ম বেশ কিছুক্ষণ আগেই মিটিয়ে রেখেছে। দরজার দিকে কান পেতে ঘন-ঘন ঘড়ির দিকে তাকায়। কোনদিন ফিরতে একটু দেরি হলেই কেমন অধৈর্য হয়ে পড়ে। বারবার ব্যালকনি থেকে রাস্তার দিকে তাকায়। মন উতলা হয়ে ওঠে। সারা দিন পরে এ-যে তার প্রিয়-মিলনের মুহূর্ত। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিয়ে হাসিমুখে স্বামীকে স্বাগত জানায়। তিনিও হাসিমুখে সুলতার অভ্যর্থনার জবাব দেন।

সুলতা স্বামীর খাবার আয়োজন করে। ইতিমধ্যে তিনি অফিসের জামা-কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে নেন। সারাদিন একঘেয়ে খাটা-খাটুনির পর এখন অনেকটা ফ্রেস ফিল করেন। সুলতা তাঁকে সামনে বসে খাওয়ায়। খেতে খেতে তিনি রান্নার খুব তারিফ করেন। এক ফাঁকে স্ত্রীর দিকে নজর দেন। বেশ ছিমছাম। একটা মিষ্টি সুবাসে তিনি আমোদিত হন। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সংসারের কাজকর্ম সেরে এসময় তাঁর স্ত্রী সামান্য সাজগোজ করেন তিনি অফিস থেকে ফেরার ঠিক আগে। এই ব্যবস্থাটুকু যেন তাঁরই জন্য। তিনি ভাবেন, এ-হলো তাঁর উপরি পাওনা। তাঁর খুব ভাল লাগে। অথচ সুলতার বেশবাস আর প্রসাধনে কোন উগ্রতা নেই। সাধারণ আট-পৌরে ঘরণীর মতই। কাচা একখানা শাড়ি একটু গুছিয়ে পরেন। চুলে তেল দেয় এবং খোঁপা বাঁধে। প্রসাধন কিন্তু স্নো-পাউডারের বেশি নয়। যতটুকু প্রয়োজন সুলতা ততটুকুই করে। খাওয়ার অবসরে তিনি সুলতাকে নিয়ে কাছাকাছি কোথাও কয়েক-দিনের ছুটি কাটিয়ে আসার কথা বলেন। সুলতা সানন্দে সম্মতি জানায়। তবে শর্ত আরোপ করে কাছাকাছি এবং কম খরচে।

সেদিন স্বামী অফিস থেকে এসে জল-খাবার খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন তখন

বিমলা বসে বসে সুলেতার কথাই ভাবছিল। ওরা বেশ সুখে আছে। সুলেতার সংগে তার স্বামীর এরকম ব্যবহার কখনো নজরে পড়ে না। বেশ হেসে খেলে ওদের দিন কেটে যাচ্ছে। সুলেতার স্বামী নিজে হাসতে পারেন তেমনি স্ত্রীকেও হাসান খুব। মাঝে মাঝে তিনি এমন উচ্চরবে হেসে ওঠেন যে, বিমলার ফ্ল্যাটের দরজা পর্যন্ত সে হাসির তরংগ এসে আছড়ে পড়ে। দরজা খোলা পেলে সে হাসি তাদেরও ভাসিয়ে নিয়ে যেত। বিমলা ভাবে, ওদের জীবনে যা সম্ভব হচ্ছে তার জীবনে তা সম্ভব হচ্ছে না কেন? অনেক ভেবে-চিন্তে সে স্থির করলো যে, এর রহস্যটা সুলেতার কাছ থেকে জেনে নিতে হবে কালই। দেরি হলে হয়তো অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে।

পরদিন বিমলা এলো সুলেতার ফ্ল্যাটে। সব কথা তাকে খুলে বললো। তখন বিকেলের কাছাকাছি। সুলেতা একবার ভাল করে তার আপাদমস্তক দেখলো। একটু পরেই বিমলার স্বামী অফিস থেকে ফিরবেন। কিন্তু বিমলা সেজন্য নিজেকে প্রস্তুত করেনি। সারাদিন যে শাড়িটা পরে কাজ করেছে, সেই শাড়িটাই এখনো তার পরণে। তার কোথাও হলুদের দাগ, কোথাও কয়লার। মাথার চুল রুক্ষ। এমনকি পাউডারের পাফটুকু পর্যন্ত বুলোয়নি। সুলেতা তার মাথায় তেল দিয়ে চুল বেঁধে দিল। শাড়ি বদলে নিতে বললো। আর একটু স্নো-পাউডারে নিজেকে সাজিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিল।

বিমলা সুলেতার কথামতো তাই করলো। খানিকক্ষণ পরই তার স্বামী অফিস থেকে ফিরলেন। আজ আর দ্বিতীয়বার তাঁকে কড়া নাড়তে হলো না। সংগে সংগে দরজা খুলে গেল। দরজার সামনে দাঁড়ানো স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তো তিনি চোখ ফেরাতে পারেন না এমনি অবস্থা। একমুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে তিনি স্ত্রীর হাসির প্রত্যুত্তর দিলেন। জামা-কাপড় ছেড়ে খেয়ে নিলেন। তারপর স্ত্রীকে বললেন, চল একটু বেড়িয়ে আসা যাক। বিমলা তো অবাক। এই সামান্য জিনিসে যে এতখানি পাওয়া যায়, তা তার জানা ছিল না। ভাগ্যিস সুলেতার কাছে সে সব কথা খুলে বলেছিল, তাই এতদিনের একটা বিরাট ত্রুটি সংশোধন সম্ভব হল। অথচ স্বামীর মনোরঞ্জনের এই সামান্য দিকটির কথা সে কখনো ভেবে দেখেনি। যাক, গোড়ায় গলদ থাকলেও শেষ রক্ষা হলো ভেবে বিমলা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

শুধু বিমলা নয়, এমনিতরো ভুল অনেকেই করেন। সাধারণতঃ বিয়ের পরই ঘর-সংসার নিয়ে ব্যস্ততার মধ্যে এব্যাপারে ঔদাসীন্য আসে। সাজগোজ বা প্রসাধন তাঁরা বাহুল্য মনে করেন। এমনকি একটু ছিমছাম থাকাও। তবে সবাই নয়। তাহলে তো সুলেতা আর বিমলার একই অবস্থা হতো। যাঁরা ঘর-সংসারকে সবকিছুর উপরে ঠাঁই দেন তাঁরা স্বামী কাজকর্ম থেকে ফেরার পরও সেই একই প্রসংগ নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসেন। ছেলেপুলে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না, সারাদিন সংসারে হাড়ভাঙা খাটুনি ইত্যাদি কথাবার্তাই তাঁদের আলাপের একমাত্র বিষয়বস্তু। এরপর যে বিষয় আসে, তা হলো সংসারের অভাব-অনটন। কয়লা নেই, তেল নেই, ডাল নেই, বিরাট নেই-এর তালিকা। স্বামী তার কথা শুনছেন কিনা অথবা তিনি বিরক্ত হচ্ছেন সে সম্বন্ধে স্ত্রীর হুঁস নেই। সে একনাগাড়ে ছড়ার মত সব মুখস্থ বলে যাচ্ছে। স্বামী এদিকে হাঁপিয়ে ওঠেন। তিনি মনে ভাবেন, এই নেই-এর ঢাকের বাদ্যি থামলে বাঁচি।

এসব সাংসারিক কথাও স্বামীকে বলতে হবে বৈকি। তবে সেজন্য সময় এবং পরিবেশ দরকার। স্ত্রীর প্রথম কর্তব্য স্বামীকে আপ্যায়নে তুষ্ট করা। স্বামীর মনোরঞ্জনের প্রথম উপায় হলো স্ত্রীর পরিচ্ছন্নতা এবং প্রসাধিত রূপ। কেউ কেউ সংসারের জন্য সারাদিন প্রাণপাত পরিশ্রম করেন। রান্না থেকে বাসনমাজা সব একহাতে করেন। ঘর-দোর সাফ-সুতরো রাখেন। এসব বাড়িতে এলে মনে হবে যেন স্বর্গরাজ্যে এলাম। কিন্তু যেই ঘরণীর দিকে নজর পড়বে মন যাবে খিঁচড়ে। ঘরদোর এমন পরিষ্কার এর ঘরণী এমন হতশ্রী। আবার এমনও ঘটে স্বামী বাড়ি ফিরে দেখতে পেলেন যে, স্ত্রী তার জন্য অপেক্ষা না করে কলতলায় বসে আছে। ঘর-সংসারের কাজ সামলাতে। অথচ নির্দিষ্ট সময়ে স্বামীর পথ চেয়ে অপেক্ষা করা স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য। এতে যেমন একটি অবশ্য কর্তব্য করা হয়, তেমনি স্পরিক সম্পর্কও সুমধুর হয়।

কোন কোন ঘরণীর হাতে সময়ের তেমন নেই। দুপুরে এঁরা দিব্যি মারেন। বিকেলে উঠে চুল আঁচড়ে, কাপড় পাল্টে নেওয়া স্বাভাবিক মধ্যেই পড়ে। এজন্য তো অতিরিক্ত সময়ের দরকার নেই। আর সামান্য তো প্রয়োজন নিজেরই জন্য। থাকলে তো নিজের কাছেই ভাল লাগে অজুহাত দাঁড় করিয়ে পাশ কাটানো কারণ থাকতে পারে তা বোঝা দুষ্কর এই সামান্য পারায় যখন অনেকখানি সম্ভাবনা আছে, তখন এ-ব্যাপারে বুজে থাকা কোনক্রমেই বুদ্ধিমানের নয়। আবার এড়িয়ে চললে হ আশংকাও কম নয়।

যাঁরা চাকরি-বাকরি করেন, তাঁদে অবশ্য স্বতন্ত্র। তাঁরা রোজ অফিসে বাইরে বেরুতে হলে যে ফিটফাট হয়ে হয় সেটা তাঁরা জানেন। আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে ঘর-সংসারের কাজও ছিটেফোঁটা করতে হয়। তারপর ত কাজ তো আছেই। দুদিক সামলে সময় করে নিয়ে তাঁরা টিপটপ হয়ে ঘরণীদের বেলাও তাই। সারাদিন ভীষণ ব্যস্ত। তবু এরই মধ্যে একা করে নিতে হবে। স্বামীর অফিস ফেরার সময়টুকু তারই অপেক্ষায় হবে। অবশ্যই একটু ছিমছাম হয়ে।

স্বামী বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে কাছে পরাজয়ের গৌরব উপভোগ চান। স্ত্রীকে একথা মনে রাখতে সংসারের কাজের সংগে সংগে তাই দিকেও নজর দিতে হবে। রুক্ষু চুল দিয়ে বেঁধে নিতে হবে। প্রসাধনের প্রলেপে নিজেকে করতে হবে সুন্দর। স্বামীর কানে মুখ রেখে চুপিচুপি নিন, এখন আপনাকে কেমন লাগছে গভীর আবেগে আপনাকে অন্তরের টেনে নেবে। এভাবে স্বামীর আকাঙ্ক্ষা মেটে—স্ত্রীর সুন্দর হওয়া চরিতার্থ হয়। ভাল লাগা না লাগার থেকে একরকম তৃপ্তিসুখে জীবন উ হয়। —

কাঠের কমণ্ডলু

পুরাতত্ত্বের সন্ধানে

প্রণব রায়

॥ ৩ ॥
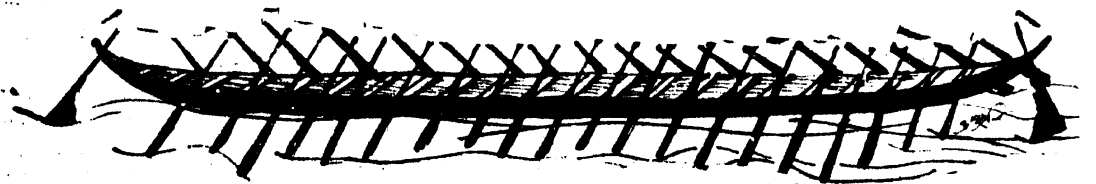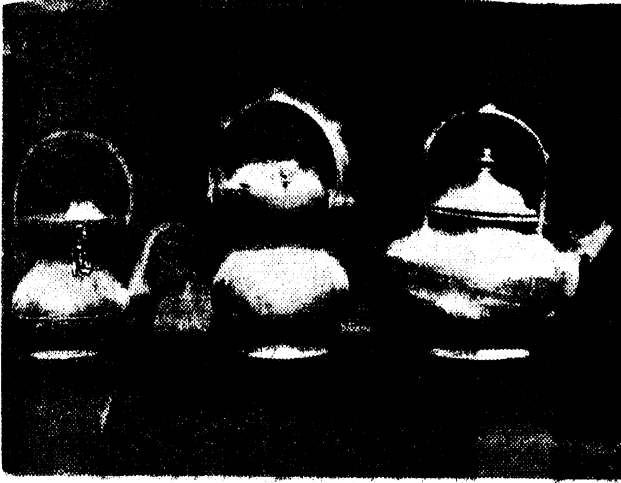
ভারতচন্দ্র কৃষ্টিকেন্দ্র : সুরনাথ সংগ্রহশালা

এর আগের লেখায় ভারতচন্দ্র কৃষ্টি-কেন্দ্রের পুঁথি বিভাগের কথা মোটামুটি আলোচনা করেছি। কিন্তু এ কৃষ্টিকেন্দ্রের নাম ভারতচন্দ্রের নামে হল কেন সে বিষয়ে এখনও কিছু বলা হয় নি। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় চেতুয়া বাসুদেবপুরের রাজবংশের ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। এ বংশের যে বংশলতা আছে তা থেকে জানা যায় রাজা আদিশূরের দ্বারা বঙ্গে আনীত সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত কবি শ্রীহর্ষ থেকে অধস্তন চতুর্দশ পুরুষ ছিলেন বড়ু ও উৎসাহ। উৎসাহ থেকে পঞ্চম পুরুষে নৃসিংহ, নৃসিংহসুত গর্ভেশ্বর তস্য সুত মুরারি, সূর্য ও গোবিন্দ। মুরারির আট পুত্রের মধ্যে চতুর্থ ছিলেন অনিরুদ্ধ ও পঞ্চম বনমালী। এই বনমালীর পুত্রই ছিলেন বাঙলার আদি ও বাঙালীর প্রিয় কবি কৃত্তিবাস। বনমালীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনিরুদ্ধের পুত্র গোপাল তার পুত্র মদন এবং মদনের পুত্র হলেন সদানন্দ বা শতা-নন্দ। তিনি ভুরশিটের রাজা চতুরানন মহা-নিয়োগীর কন্যা তারা দেবীকে বিবাহ করেন। সদানন্দের পুত্র রাজা শ্রীমন্ত (পাঁড়ুয়া বংশ, হাওড়া) ও রাজা কৃষ্ণরাম (গড়ভবানীপুর বংশ, হাওড়া)। রাজা শ্রীমন্তের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন রাজা মহেন্দ্র। রাজা মহেন্দ্রের দুই পুত্র রাজা গোপীরমণ ও রাজীব। রাজা গোপী-রমণের পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হলেন রাজা ভূপতি ও পঞ্চম পুত্র নরোত্তম। মহাকবি ভারতচন্দ্রের প্রপিতামহ ছিলেন রাজা ভূপতি। রাজা ভূপতির বংশধারা হল : রাজা সদাশিব তাঁর পুত্র রাজা নরেন্দ্র এবং রাজা নরেন্দ্রের পুত্র হলেন চতুর্ভুজ, অর্জুন, দয়ামায় ও ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্র তাঁর সত্য-পীরের কথায় আত্মপরিচয়দান প্রসঙ্গে বলেছেন :

> ভরদ্বাজ অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ
> সদাভাবে হত কংস ভুরশিটে বসতি।
> নরেন্দ্র রায়ের সুত ভারতভারতীযুত
> ফুলের মুখুটীখ্যাত দ্বিজপদে সুমতি॥

রাজা ভূপতির পঞ্চম ভ্রাতা নরোত্তমের দুই পুত্র রামসন্তোষ ও রামেশ্বর। রাম-সন্তোষের পুত্র রাধাবল্লভ, বিনোদরাম (হাওড়ার ধুলাগোড়িবংশ) ও শ্রীবল্লভ। রাধাবল্লভের পুত্র রামকৃষ্ণ। তাঁর দুই পুত্র রাজচন্দ্র ও বেচারাম। এই রাজচন্দ্রই চেতুয়া বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য বংশীয় ধরনীধরের কন্যাকে বিবাহ করে এখানের প্রথম বাসিন্দা হন। তার আগে তিনি হাওড়ার মেলকের অধিবাসী ছিলেন। রাজচন্দ্রের তিন পুত্র রামভক্ত, ঈশানচন্দ্র ও উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণ। উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণের প্রপৌত্র সুরনাথ সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ মহাশয়।

পাঠকগণ হয়তো এই দীর্ঘ বংশ-তালিকার জন্যে একটু বিরক্তবোধ করবেন। কিন্তু আঠারো শতকের শ্রেষ্ঠ কবি রায়-গুণাকর ভারতচন্দ্রের পূর্ব ও উত্তর পুরুষ-দের মধ্যে কিভাবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহতভাবেই চলতো এবং এখনও যে তা অবিচ্ছিন্নভাবে চলছে এ বংশ-পরিচয় থেকে হয়তো তা কিছুটা অনুমান করতে পারবেন। এ বংশের ইতিহাস যদি ভাল-ভাবে অনুসন্ধান করা যায় তাহলে দেখা যাবে এ বংশের কেউ-না-কেউ সাহিত্য-সংস্কৃতির আলোকবর্তিকাকে কোন-না-কোন সময় বঙ্গ-ভারতীর মন্দিরে প্রোজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণ ছিলেন উনিশ শতকের এক উজ্জ্বল-কীর্তিমান পুরুষ। সংস্কৃত-ভারতীর সেবায় তিনি নিজেকে সমর্পিত করেছিলেন। তাঁর অধস্তন ধারার মধ্যেও এ ঐতিহ্য চলে আসছে। সাহিত্য সংস্কৃতির এককালের পুরোধা মহাকবি ভারতচন্দ্রের অমর নামের দ্বারা এ কৃষ্টিকেন্দ্রটি গৌরবান্বিত হয়েছে।

ভারতচন্দ্র কৃষ্টিকেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের মধ্যে সব থেকে আকর্ষণীয় হল এর পুরা-তাত্ত্বিক সংগ্রহশালাটি। নাম হল সুরনাথ সংগ্রহশালা। উপযুক্ত স্থান ও আধারের অভাবে সংগ্রহশালাটিকে ভালভাবে সাজিয়ে রাখা সম্ভবপর হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছোট্ট একটি ঘরের মধ্যে যেসব সংগৃহীত বস্তুর সমারোহ দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে কয়েক লক্ষ বছরের প্রাচীন প্রস্তর থেকে শুরু করে গত শতকেরও অনেক লুপ্ত বস্তুর সন্ধান মিলবে। ঘরের অপ্রতুলতা ও উপযুক্ত আসবাবপত্রের অভাবে এ সংগ্রহশালাটির বিশালত্ব সহজে চোখে পড়বে না—ঠিকভাবে সাজিয়ে রাখলে এটি যে অনেক বড় আকারের হবে, তাতে সন্দেহ নেই। এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত রায়মহাশয় সংগ্রহ ব্যাপারে শুধুমাত্র প্রাচীন প্রস্তর ও পোড়া মাটির শিল্পের ওপর নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন নি, মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা থেকে তিনি এমন অনেক বস্তু সংগ্রহ করে এনেছেন, যা থেকে বাঙলা-দেশের আদিবাসী সম্পর্কিত অনেক কথা জানা যাবে। তাছাড়া মেদিনীপুর ও বাঙলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে একসময়ে যে নানা [illegible] কুটীর শিল্প গড়ে উঠেছিল এবং [illegible] আর [illegible]—তারও কিছু কিছু নমুনাও সংগ্রহ করে [illegible] তিনি। উদাহরণস্বরূপ পটুয়ার [illegible] রঙীন পটের বিষয় উল্লেখ করা [illegible] পারে। বাঙলার পটিদার সম্প্রদায় [illegible] সুন্দর সুন্দর পট চিত্রিত করে ও [illegible] ধরনের মাটির পুতুল তৈরী [illegible]

পিতলের জালতিযুক্ত ছোট আলমারি
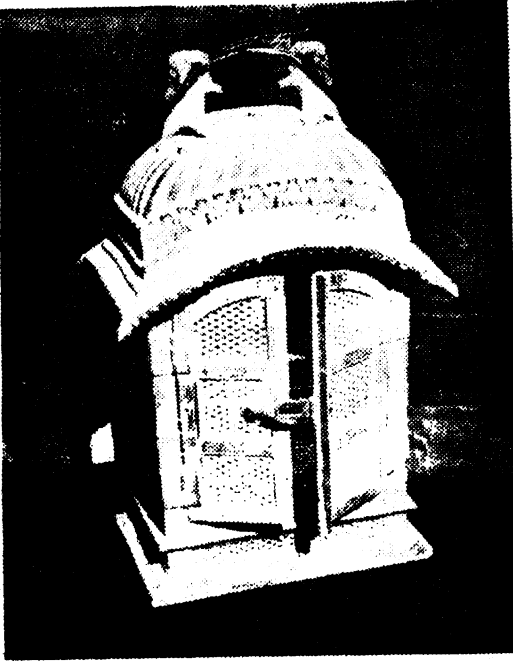
শ্রীবিষ্ণুজীর প্রস্তরমূর্তি

অক্লেশে জীবিকা অর্জন করতেন। সেই পটশিল্প আজ আর বাঙলাদেশের তেমন কোথাও দেখা যায় না, দেখা গেলেও আধুনিক পটের মধ্যে প্রাচীনকালের শিল্প-নৈপুণ্যের কোন প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না। সুরনাথ সংগ্রহশালায় বেশ প্রাচীন ও শিল্পকলায় সমৃদ্ধ এরূপ কয়েকটি পটের সংগ্রহ খুবই মূল্যবান। এ পটগুলি অন্তত দু'তিনশো বছরের পুরানো হবে বলে মনে হয়। স্বর্গত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ও বহু পট বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষ করে বীরভূম জেলা থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন। বেহালার গুরুসদয় মিউজিয়মে গেলে সেগুলি দেখতে পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, এসব প্রাচীন পট আজ বিরল হয়ে আসছে। পটীদাররা পেটের দায়ে তাঁদের পূর্বপুরুষদের আঁকা বহুকাল থেকে রক্ষিত অনেক উৎকৃষ্ট পট অনেক সময় অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রী করে ফেলছেন নেহাতই অল্পমূল্যে। বিদেশের বাজারে হয়তো সেগুলি চলে যাচ্ছে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যাসিদ্ধির জন্যে অথবা পটপ্রদর্শনের দ্বারা জীবিকা অর্জনের কোন সম্ভাবনা না থাকায় শিল্পকর্মে উৎকৃষ্ট অনেক প্রাচীন পটকে আজকের পটীদার সম্প্রদায় অনাবশ্যক ভেবে নষ্ট করে ফেলছেন। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় এ ধরনের কিছু কিছু প্রাচীন পট নিজের গ্রামের পটীদার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সাধ্যমত দাম দিয়ে কিনে রেখেছেন তাঁর সংগ্রহ-শালায়। এ ছাড়া পিতল ও কাঁসার বাসন-শিল্পের অনেক লুপ্ত নিদর্শন তাঁর সংগ্রহ-শালায় আছে। বাঁকুড়ার ডোকরা পুতুলের শিল্প ও পাঁচমুড়ার মৃত্তিকাশিল্পও এ সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে। সংগ্রহশালায় প্রাচীন কয়েকটি শালও আছে।

সুরনাথ সংগ্রহশালায় রক্ষিত উল্লেখ-যোগ্য সংগ্রহের মধ্যে কতগুলি হল : (১) কালো পাথরে খোদিত শ্রীগণেশজীর একটি অতি প্রাচীন ক্ষুদ্র মূর্তি। এটি একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট বলে অনেকের ধারণা। মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার অন্তর্গত কুলেচন্দনপুর গ্রামের একটি পুকুর থেকে এটি পাওয়া গেছে। (২) শ্রীবিষ্ণুজীর একটি বৃহৎ প্রস্তর মূর্তি (আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য)। দাসপুর থানার সেকেন্দারী গ্রামের কাছা-কাছি সোললানের এক ব্যক্তির কাছ থেকে এটি কেনা হয়েছিল। (৩) কূর্মমূর্তি শালগ্রামশিলা—মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার লোয়াদার কাছে গয়েশপুর গ্রামের কাছাকাছি কাঁসাই নদী থেকে এটি পাওয়া গেছে। (৪) ত্রিচিনপল্লীতে পাওয়া ধাতুর তৈরী রঙ্গনাথের মূর্তি, ত্রিবান্দ্রামে পাওয়া ধাতুর নটরাজমূর্তি এবং মাদুরায় পাওয়া কাঠের মীনাক্ষী মূর্তি।

সেকালের বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি জিনিসের মধ্যে আছে : (১) পিতলের জালতিযুক্ত ছোট আলমারী। (আলোকচিত্র) এটি ডেবরা থানার অন্তর্গত মলিহাটীর কামারদের তৈরী। মলিহাটীর এ শিল্পটি আজ লুপ্তপ্রায়। (২) বহুদিনের প্রাচীন, গঙ্গাজল রাখার এক পিতলের বোতল 'অমৃতি'। প্রায় তিন চারশো বছর এদেশে এটির ব্যবহার ছিল। (৩) নামে পরিচিত একপ্রকার জলঘটির প্র সেকালে ছিল। এটি একটি ছোট বাটী আকারের, তলার একটি ছোট্ট দিয়ে সম্পূর্ণ বাটীটি ভর্তি হতে লাগতো পঁচিশ মিনিট। সময়নি যন্ত্ররূপে এটির ব্যবহার হত। সাধারণত দুর্গাপুজোয় সন্ধিপুজোর সময় জানবার জন্যে এটিকে একটি জ হাঁড়ীর মধ্যে রাখা হত। (৪) সে লোহার এক ঝুলানো দীপাধার। আবির্ভাবের আগে প্রাচীন বাঙলায় বহুল ব্যবহার ছিল। একটি শিকলের সাহায্যে এটিকে ওপর সহজেই ঝোলানো যেত। (৫) গোলাকার পঞ্চপ্রদীপ। এ ধরনের পঞ্চ আজকাল আর দেখা যায় না। অনুমা চার পাঁচশো বছরের পুরানো। (৬) দেবপুরের প্রাচীন ভট্টাচার্যবংশের দু অন্যান্য পুজোর সময় বলিদানের বহুল ব্যবহৃত একটি প্রাচীন 'ক কাতানটির বয়স অন্তত তিন বছরের কম হবে না। উপরের উ বস্তুগুলি সবই ধাতুঘটিত। কিন্তু মাটির তৈরী (পোড়ামাটির নয়) যে প্রাচীনকালে বহুল ব্যবহৃত হ একটি নিদর্শন হল 'কংপা' নামে পাত্র। সংগ্রহশালায় রক্ষিত মাটির কয়েকটি 'কংপা' আছে। এগুলির

কতকটা ছোট কুঁজোর মতো। মস্‌লা বা তেলজাতীয় কিছু রাখার জন্যে এসব মাটির জিনিসের সেকালে খুব ব্যবহার ছিল। (৭) পান্নাগড় থেকে সংগৃহীত প্রায় দেড় হাজার বছরের প্রাচীন সরুমুখওয়ালা কয়েকটি মাটির পাত্র ও দুটি মাটির হাতও এ সংগ্রহশালায় আছে। (৮) সেকালে তামাক মাখার জন্যে একপ্রকারের গোল চ্যাটলা মাটির পাত্রের ব্যবহার ছিল। এগুলিকে মাবলা বলা হত। সংগ্রহশালার এটিও অন্যতম সংগ্রহ। (৯) একটি মাটির দোয়াতে সন ১২৭৫ সাল লিখিত আছে। একটি পুকুর কাটবার সময় এটি পাওয়া গেছে। এ ধরনের একটি বেশ বড়ো দোয়াত কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে।

সুরনাথ সংগ্রহশালার যেগুলি সব থেকে আকর্ষণীয় সেগুলি হল : (১) প্রাচীন প্রস্তরের অস্ত্রসমূহ ও দন্ত এবং (২) ছাপযুক্ত কতগুলি প্রস্তর। প্রাচীন প্রস্তরের অস্ত্রসমূহ ও দন্তের বেশীর ভাগ মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। এ পাথরগুলির বেশীর ভাগ সংগৃহীত হয়েছে ঝাড়গ্রাম মহকুমার শিলদা গ্রামের পশ্চিম দিকে ওড়গোন্দা গ্রামের ডুঙরী (ছোট পাহাড়) পাহাড়ের আশে-পাশে। ঐ অঞ্চলের আশাকাঁথি ও জয়পুরের মাঝামাঝি একটি নালায় এগুলি পাওয়া যায়। অস্ত্রগুলি কুঠার জাতীয়। ছাপযুক্ত প্রস্তরগুলিও ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গেছে। পাথরগুলি বহু আগে মাটি ছিল বলে অনুমেয়। এ ছাপগুলি দেখে বহু প্রাচীনকালের লুপ্ত ফার্ণ গাছের ছাপ বলে মনে হয়। এটি সত্য হলে প্রস্তরগুলির বয়স কয়েক লক্ষ বছর হবে। এগুলি ছাড়া নুড়্যেকোটিতে প্রাপ্ত প্রাচীন অস্থিজাতীয় অনেকগুলি বস্তু পাওয়া গেছে। তাছাড়া আছে সারনাথে প্রাপ্ত চতুষ্কোণ ও স্তরযুক্ত গোলাকার প্রস্তর। এটি বৌদ্ধ মন্দির বা স্তূপের কারুকার্যের অংশ হতে পারে। দ্বারকা থেকে আনা কয়েকটি কালো শাঁখ এবং পুরীতে পাওয়া দুটি বড় শাঁখ ও একটি পঞ্চমুখী শাঁখ এ সংগ্রহশালায় আছে। একটি বড় লোহার গোলা ঘাটাল মহকুমার রাণীচক গড় অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এ গোলাটিকে একটি ঐতিহাসিক গোলা বলে মনে হয়। টোডরমল ও দায়ুদ খাঁর সঙ্গে যে যুদ্ধ এ অঞ্চলে হয়েছিল, গোলাটি সে সময়ের বলে অনুমান করা যায়। মান্দারনগড় থেকে রাণীচক অঞ্চলে। সেকালে যাতায়াতের ভাল পথ ছিল। গোলাটি এখানে পাওয়া গেছে। পুষ্কর থেকে আনা একটি পাথরের পা এ সংগ্রহশালার আর একটি আকর্ষণীয় বিষয়। আজকাল বর্গীর হাঙ্গামায় ব্যবহৃত বাটুল আর তেমন দেখা যায় না। সুরনাথ সংগ্রহশালায় ছোট ও বড় আকারের অনেকগুলি বর্গীর বাটুল সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে একটি পাওয়া গিয়েছে ঝাড়গ্রাম মহকুমার শিলদা অঞ্চলের রাজদহগ্রামে। এছাড়া বহু সামুদ্রিক কড়ি, শঙ্খ, প্রবাল (প্রবালটি দ্বারকার আরব সাগরের ধারে পাওয়া গেছে। এটির পরিমাণ মাত্র তিন রতি), তাজমহলের অংশ, শঙ্খ জাতীয় নিরেট বস্তু (একজন বিশেষজ্ঞের মতে এটি হাতীর মুখের ভেতরের কষের দাঁত), সামুদ্রিক প্রাণীর খোলা, শঙ্খ মাছের লেজের চাবুক, কচ্ছের কমণ্ডলু (আলোকচিত্র), ভেতরের একটি ছোট ফুটোয় ছবি-সহ একটি বিশেষ ধরনের আংটি, এক চোখ বন্ধ করে আংটির ভেতরের এই ফুটোটি দেখলে নানান ধরনের অনেকগুলি ছবি দেখতে পাওয়া যাবে। ধনুষ্কোটির সমুদ্র থেকে পাওয়া তামিল ভাষার অক্ষরে লেখা একটি প্রাচীন পুঁথির পাতা, ঝাড়গ্রামের দুধিয়াশোল থেকে আনা ছাগলের গলায় বাঁধবার জন্যে 'ধরকা' নামে এক প্রকার বস্তু, প্রস্তরীভূত সুপুরী (ঝাড়গ্রামের পরিহাটী গ্রামে পাওয়া গেছে), রুদ্রাক্ষাদির মালা প্রভৃতি আরও কত শত প্রাচীন ও আধুনিক বস্তু এ সংগ্রহশালায় দেখতে পাওয়া যাবে। এগুলি ছাড়াও বিভিন্ন সময়ের অনেক মুদ্রাও এ সংগ্রহশালার আকর্ষণীয় বিষয়।

সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ মহাশয় বর্তমানে আরও নানা ধরনের জিনিস সংগ্রহ করে চলেছেন তাঁর এই পরিণত বয়সে ও অসুস্থ শরীরের মধ্যেও। তাই দেখতে পাওয়া যায় গ্রামের কোন প্রাচীন মন্দির ভেঙ্গে গেলে তার শিলালিপি বা পোড়ামাটির কারুকার্যের কিছু কিছু অংশও তিনি সযত্নে সাজিয়ে রাখেন তাঁর সংগ্রহশালায়, কখনও বা ধ্বংস-প্রাপ্ত নারিকেল গাছের কোন অংশে 'কাঠ-ঠোকরা পাখির বিচিত্রভাবে নির্মিত সুন্দর বাসাগুলিকে তিনি সযত্নে এনে রাখেন। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে তৈরী এক অদ্ভুত ধরনের বাঁশের লাঠিও তাঁর সংগ্রহশালায় পাওয়া যাবে। সাধারণের চোখে অত্যন্ত সামান্য জিনিসও এখানে অসামান্য রূপ লাভ করেছে। তাই উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের দুধিয়াশোল গ্রাম থেকে আনা ছাগলের 'ঠরকা' অথবা পটীদারদের তৈরী নিতান্ত সাধারণ মাটির পুতুল বা সাঁওতালের তৈরী শিকের মতো সরু তীরও এ সংগ্রহশালায় উপেক্ষণীয় হয়নি। কলকাতার কোন অভিজাত সংগ্রহশালায় হয়ত এরা নিতান্ত অপাংক্তেয় বলে গণ্য হবে, কিন্তু যে মানসিকতা থাকলে অতি তুচ্ছ জিনিসকেও বড় করে দেখা যায় পল্লীর এই নীরব সংস্কৃতিপ্রেমিক শ্রীযুক্ত রায়ের মধ্যে তা লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য সংগ্রহশালার থেকে সুরনাথ সংগ্রহশালার বিশেষত্ব এখানেই। শহরের সংগ্রহশালা নিয়ে কেউ কেউ কলকাতার কোন কোন খ্যাতনামা পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন; কিন্তু বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে এখনও এমন অনেক নীরব সংস্কৃতি-প্রেমিক আছেন, যাঁরা কোন প্রকার সাহায্য ছাড়াই গড়ে তুলেছেন দুষ্প্রাপ্য বস্তুর সংগ্রহশালা, তাঁদের নিয়ে কলকাতার খ্যাতনামা পত্র-পত্রিকায় আজ কেউই কলম ধরেন নি। কিন্তু এঁদের সম্পর্কে আজও কিছু লেখা না হলেও ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল পল্লীর এ ধরনের মানুষেরা নীরবেই তাঁদের কাজ করে যাচ্ছেন। এঁদের কুটিরে দু-চারজন বাইরের শিল্পী বা সাহিত্যিকদের শুভ পদার্পণ যে না হয়েছে এমন নয়, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা আসেন এ সব সংগ্রহশালা থেকে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে, সংস্কৃতিপ্রেমিক সত্যনিষ্ঠ পুরাতত্ত্বপ্রেমী গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে নয়। তাই এসব সংগ্রহ-শালা ও তাদের প্রতিষ্ঠাতাদের সম্পর্কে সত্যনিষ্ঠ পুরাতত্ত্বপ্রেমীদের — যাঁরা আজও হয়ত এসবের সন্ধান পান নি—জানাবার প্রয়োজন আছে। (অবশ্য সত্যনিষ্ঠ পুরাতত্ত্ব-প্রেমীদের মধ্যে বিদেশী অধ্যাপক স্বর্গত ডেভিড ম্যাককাচ্চনের নাম এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, যিনি এ সংগ্রহশালা এবং এধরনের আরও সংগ্রহ-শালার কথা ভালভাবে জানতেন।) পল্লী অঞ্চলের এরূপ আরও কয়েকটি সংগ্রহ-শালার কথা পরে পরে প্রকাশ করার ইচ্ছে রইলো।

মহেন্দ্রদা নেই
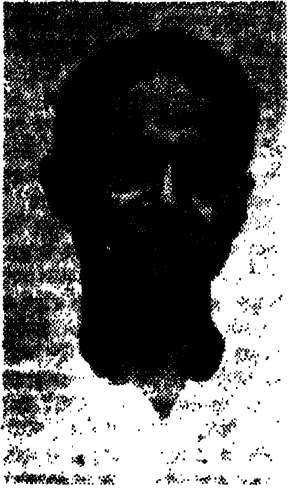
২০ অক্টোবর, শুক্রবার ঘুম থেকে উঠে টেলিফোনে প্রথম সংবাদ পেলুম—মহেন্দ্রদা নেই। শোনা মাত্র অনুভব করলুম একটা শূন্যতা, আমার জীবন-সংসারের কোথায় হঠাৎ যেন একটি ফাঁক সৃষ্টি হল, যে ফাঁক কোনোদিনই পূর্ণ হবার নয়। যুগান্তর-এর পৃষ্ঠা থেকে জানলুম, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পরদিনে প্রকাশিতব্য ছায়াছবি নাটমঞ্চ-এর পৃষ্ঠার কাজ সম্পূর্ণ করবার পরেই তিনি সহসা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসিত হবার কোনো রকম সুযোগ না দিয়েই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।—ইংরাজীতে 'ডাইং ইন হার্নেস' বলে যে কথাটি প্রচলিত আছে, মহেন্দ্রদার মৃত্যু সম্পর্কে সেই কথাটি সম্পূর্ণ-রূপে প্রযোজ্য। রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর বৎসরে যেদিন থেকে আমাদের 'অমৃত' প্রকাশিত হয়েছে, সেইদিন থেকে আমি একই গোষ্ঠীভুক্ত হিসেবে মহেন্দ্রদার সান্নিধ্যে এসেছিলুম। বলা বাহুল্য, পরিচয় ক্রমেই ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়েছে এবং চিত্রসাংবাদিকদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন'-এর দৌলতে নানা অনুষ্ঠানে আমরা অসংখ্যবার মিলিত হয়ে মাত্র ছবির ব্যাপারেই নয়, সমগ্র জীবন সম্পর্কেই পরস্পারের মত, মনোভাব ও ধারণা জানবার ও জানাবার সুযোগ পেয়েছি। স্বভাবত পরিমিতভাষী মহে[ন্দ্রদা] ছিলেন তাঁর মতামত বিষয়ে অত্যন্ত স্প[ষ্ট]বাদী ও দৃঢ়চেতা। কিন্তু তাই বলে যু[ক্তির] কাছে নতিস্বীকার করতে তিনি কখ[নো] দ্বিধা করেননি এবং বহু বিষয়ে মতা[ন্তর] হওয়া সত্ত্বেও পরিচিত বন্ধুজনের স[ঙ্গে] তাঁর মনান্তর ঘটেনি কখনও। ১৯[...] সালে 'যুগান্তর' প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থে[কে] তাঁর বিদ্যালয়ের সহপাঠী, অমৃতবা[জার] পত্রিকার চিত্র-সম্পাদক নির্মলকুমার ঘো[ষ] (এন কে জি) উদ্যোগে তিনি এই পত্রি[কার] চিত্র ও মঞ্চ সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত [হন] এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্য[ন্ত] অনলসভাবে নিজ দায়িত্ব পালন ক[রে] গেছেন। ইদানীং অর্শ, রক্তচাপ প্রভৃতি [...] তাঁকে বিব্রত করে তুললেও তাঁর কর্মনি[ষ্ঠা] কোনোদিনই শিথিল হতে পায়নি। মৃ[ত্যু]কালে তাঁর বয়স হয়েছিল একষট্টি বৎস[র।] তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র, চার কন্যা, দ[...] জামাতা, অসংখ্য আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রা[হী] বন্ধুদের ছেড়ে অমরলোকে প্রস্থান ক[রে]ছেন। আমি তাঁর একজন গুণমুগ্ধ ব[ন্ধু] হিসেবে তাঁর পরলোকগত আত্মার শা[ন্তি] কামনা করি।

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

ইংগমার বেয়ারম্যান-এর 'সাইলেন্স'

সুইডিস চিত্রপরিচালক ইংগমার বেয়ার-ম্যান আসলে একজন দার্শনিক এবং তত্ত্বানুসন্ধানী। ধর্মোপদেষ্টার সন্তান বলে তিনি বাল্যকাল থেকেই ঈশ্বরবিশ্বাসী। কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণী মন কোনো দিনই কোনো গির্জার প্রতি—তা সে প্রোটেস্টান্টই হোক, আর রোমান ক্যাথলিকই হোক—বিশ্বাস স্থাপন করতে, তাকে নিষ্ঠায় সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে নি। তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, নিজের মনোভাব ও চিন্তাধারা প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন হিসেবেই তিনি চলচ্চিত্রকে বেছে নিয়েছেন। লিখিত শব্দাবলী, সংগীত, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ না করার দুঃখ তাঁর নেই। কারণ তিনি এমন একটি ভাষার (চিত্রভাষা) মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছেন, যে ভাষায় আত্মায় আত্মায় কথা হতে পারে, অথচ যে-ভাষা বুদ্ধিজীবীদের নিয়ন্ত্রণাধিকারকে থোড়াই পরোয়া করে।

বেয়ারম্যানের কাছে চলচ্চিত্ররচনা হচ্ছে ক্ষুধা-তৃষ্ণারই মতো তাঁর অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয়। তাঁর মনের আলো-আঁধারিতে এর জন্ম হয়। পরিপূর্ণ রূপটাকে আয়ত্ত করবার জন্যে তাঁকে এই আলো-আঁধারির রাজ্যে বিচরণ করতে হয়, যতক্ষণ না তিনি এর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিভিন্ন পরিস্থিতির মাধ্যমে খুঁজে পান, তাদের মধ্যে ঠিক ঠিক যোগ-সূত্রগুলি নির্ণয় করতে পারেন, তাঁর বিভিন্ন পাত্রপাত্রী সম্পূর্ণ অবয়ব নিয়ে তাঁর মানস-চক্ষুর সামনে এসে খাড়া হয়। কোনো একটি চলচ্চিত্র সম্পর্কে প্রথম কল্পনার জন্ম দেয় হয়ত একখানি ছবি, একটি বিশেষ ঘটনা, একটি সংগীতের কলি বা ঐ ধরণের কিছু। বার্টোক-এর 'কনসার্টো ফর অর্কেস্ট্রা' থেকে রূপ লাভ করেছে তাঁর 'সাইলেন্স' ছবিটি। যেমন স্ট্রাভিনস্কির 'সাম জিনফনি' থেকে জন্ম হয়েছিল 'উইন্টার লাইট'-এর। বেয়ারম্যান বলেছেন, কেন তা জানি না, কিন্তু আমার মনে হয় সংগীতের এক-একটি অংশ যেন তাদের সম্বন্ধে কিছু বলাতে চায় তারা চায় কিছু যেন তাদের সম্বন্ধে বর্ণিত হোক এবং হয়ত অনন্তকাল লেগে যেতে পারে, এদের মাত্র কতক মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করতে।

আমার বার্টোক-এর 'কনসার্টো ফর অর্কেস্ট্রা' সংগীতটি যথাযথভাবে বাদিত হলে [illegible] মনের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তা জানি না। কিন্তু আমরা জানি, ইংগমার বেয়ারম্যান-এর 'সাই[লেন্স]' ছবিখানি তাঁর বিখ্যাত ত্রিচিত্রের [...] ভাগ। এই ত্রয়ীর প্রথম [illegible] [illegible] আজ পর্যন্ত [illegible] [illegible] দ্বিতীয় 'উইন্টার লাইট' [illegible] ভারতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র [উৎসবের] সময় দেখানো হয়। এই তিনটি ছবি [illegible] কোনো দিন পর পর দেখার সুযোগ [...] যায়, মনে তখনই আমরা এদের [illegible] বেয়ারম্যান [illegible] [illegible] ও জ্ঞান সংক্রান্ত দর্শনশাস্ত্র [illegible] প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, তা সম্যক বোধগম্য করবার আশা রাখি। নইলে [illegible] কথার অর্থাৎ পদের [illegible] উপর নির্ভর করে বলতে হয় [...] বৈজ্ঞানিক যুগে, যখন মানুষ যুদ্ধ [...] মানবিকতাবোধকে বর্জন করেছে [...] পীড়নের মারাকে বাড়িয়েই চলেছে, আস্থা স্থাপন করবার মতো একটা [...] শিলাকে মানুষ প্রাণপণে খুঁজে বেড়াচ্ছে [...] অবস্থায় ক্রুশবিদ্ধ যীশুকে ঘিরে [...] সম্বন্ধে যে-সনাতন ধারণা আছে, আজকের দিনে অচল। শুধু এ ক্লাস [...] ছবিতে বেয়ারম্যান বলতে চেয়েছেন [...] ঈশ্বর—নিষ্কাম মানবপ্রেমী ও ঈশ্বরকে [...] সমতুল্য। কিন্তু 'উইন্টার লাইট'-এর [...] আশাবাদক এই [illegible] ব্যঙ্গ করেছে। [...] যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিরপরাধ মানুষের [...] মাথেচ্ছ বোমা বর্ষণ হচ্ছে, তখন এই অশ্রদ্ধেয় ছাড়া আর কি, এই প্রশ্ন ধর[...]

যেছ দ্বিতীয় ছবিটির মধ্যে। —তৃতীয় বি 'সাইলেন্স'-এ বেয়ারম্যান বলেছেন, নবিক প্রীতির চেহারা আজ এমনই বিকৃত ং উৎপীড়নের সমগোত্রীয় যে, মানবসমাজ ত্যুমুখে চলতে শুরু করেছে। এই থিবীতে মানুষ ক্রমেই পরস্পর থেকে চ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। তাই আজকের জীবনে ধান প্রয়োজন হচ্ছে, একজনের আর এক-নের সঙ্গে (মানসিক) যোগাযোগ স্থাপন । আজ মানুষ যদি যোগাযোগের, সম-রার প্রীতির প্রথম ধাপটি অগ্রসর হতে রে তা হলেই সে বাঁচবে।

'সাইলেন্স'-এর দুই বোন—এস্থার এবং অ্যানা—দুজনেই মানসিকভাবে অসুস্থ। ড়া এস্থার পুরুষসঙ্গ সহ্য করতে পারে । একবার দৈবাৎ গর্ভবতী হয়ে সে নজেকে দুর্গন্ধময় পচনশীল মাছের মতো নে করেছিল। সে মনে মনে সমকামী, কিন্তু অভাবে সে করে স্বমেহন। অত্যধিক সিগারেট তার ফুসফুসকে করেছে জীর্ণ, সে পীড়াকাতর। ছোট বোন অ্যানার পর সে কর্তৃত্ব বিস্তার করতে চায়, তার ত্যামের ওপর ওর কড়া নজর। কিন্তু অ্যানা উদ্দাম, বছর দশেকের সন্তান ইউহানের সত্ত্বেও তার কামপিপাসায় ভাঁটা পড়েনি। দিদির চড়া কর্তৃত্ব তাকে বিরক্তির শেষ সীমানায় পৌঁছে দিয়েছে। ট্রেনে করে সুইডেনে ফেরার পথে তারা এমন একটি শহরের এক হোটেলে আশ্রয় নিল, যেখানকার ভাষা তাদের অপরিচিত, যেখানে রাস্তাগুলি অপরিসর, লোকে সর্বদাই ব্যস্ত-সমস্ত, যার রাস্তার মোড়ে মধ্যরাতে ট্যাংক এসে খাড়া হয়। মনে করে নিতে কষ্ট হয় না, এই অদ্ভুত শহরটি আজকের পৃথিবীরই একটি প্রতীক। হোটেলটি বিস্তৃত ও নির্জন, শুধু একদল বামন হোটেলবাসীদের মনোরঞ্জন করে এবং একজন বয়স্ক পরিচারক আছে। দূর থেকে আজকের মানুষগুলিকে সত্যিই কত ছোট ও কৌতুককর দেখায়। বিরাট পৃথিবীতে মানুষ আজ কতো একা। এক-আধজন বয়স্কের নীরব সহানুভূতি ছাড়া আজকের পৃথিবীতে আশা করবার কিছু নেই। —মানুষ আজ কতো নির্লজ্জ! জীব-জন্তুর সমগোত্রীয় হয়ে আজ তারা সকলের চোখের সুমুখেই যৌন-সম্ভোগ করতে পারে সহজেই।—এই দৃশ্যের দর্শক হিসেবে অ্যানার মনে লালসার বহ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং সে এক হোটেল-পরিচারককে গির্জার অলিন্দে টেনে নিয়ে গিয়ে তার কামপিপাসা চরিতার্থ করে। তার লম্বা কোটটিতে ময়লা লেগেছে কেন, দিদির এই প্রশ্নের উত্তরে সে খোলাখুলিভাবে যে-কথা বলে, তা থেকেই ছবিতে অনুপস্থিত এই ঘটনার কথা জানা যায়। এরপরে সে হনহন করে হোটেল বারান্দা দিয়ে হেঁটে গিয়ে নিজের ছেলের চোখের সামনেই চাবি দিয়ে বন্ধ দরজা খুলে ঐ লোকটির সঙ্গে একটি খালি ঘরে ঢোকে এবং আর একবার কামক্রীড়ায় মত্ত হয়। ইউহানের কাছ থেকে খবর পেয়ে এস্থার যখন দরজায় করাঘাত করে, তখন অ্যানা যেন ক্রুদ্ধ হয়ে দরজাটি খুলে দেয় এবং দিদির চোখের সামনেই পুরুষটিকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে। কিন্তু সে বেশীক্ষণ এই অবস্থায় থাকতে পারে না। তার মন তখন আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠছে। তাই সে লোকটিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিদির সামনে এসে উচ্চকণ্ঠে অভিযোগ করতে লাগল তার ওপর অন্যায় কর্তৃত্ব চালাবার জন্যে। অসহ্য মনে হওয়ায় দিদি ওখান থেকে সরে এল। পরে দিদি ঠিক মায়ের মতো মমতাভরা কণ্ঠে ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মরণাপন্ন দিদিকে প্রৌঢ় হোটেল-পরিচারকের জিম্মায় ফেলে রেখে অ্যানা তার ছেলে ইউহানকে নিয়ে উঠল ট্রেনে। শান্ত মস্তিষ্কে অ্যানা প্রেমহীন যৌনসম্ভোগের ফলে নিজের দেহকে অশুচি মনে করতে লাগল। তাই সে কাঁচের জানলা খুলে পড়ন্ত বৃষ্টিধারায় নিজের মুখমণ্ডলকে ভিজিয়ে নিয়ে শুচিস্নানে প্রবৃত্ত হল।—শুধু ইউহান রইল কলঙ্কের ঊর্ধ্বে: সে অপরকে জানবার জন্যে নতুন ভাষা শিখতে লাগল, তার মুখে এসে পড়ল একটি আশার উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা।—'উইন্টার লাইট'-এর ধর্মীয় পরিবেশ 'সাইলেন্স'-এ অন্তর্হিত; ঈশ্বরের নামোল্লেখ পর্যন্ত এতে নেই। বর্তমানের বিচ্ছিন্ন মনুষ্যসমাজকে দেখে ঈশ্বর পর্যন্ত স্তম্ভিত—তিনি নিঃশব্দ হতে বাধ্য হয়েছেন।

ইস্থার এবং অ্যানা বেশে যথাক্রমে ইনগ্রিড থুলিন (ভারতের চতুর্থ আন্ত-র্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কারপ্রাপ্তা) এবং ইয়ানেল লিন্ডব্লোম বেয়ারম্যানের কল্পনাকে রূপায়িত করেছেন অতি বাস্তবভাবে। ছোট ছেলে ইউহানের ভূমিকায় ইয়োরিয়েন লিন্ডস্ট্রোম একটি জীবন্ত পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। স্বেন নিকভিস্টের ফোটোগ্রাফী ছবিটিকে দিয়েছে কঠোর সজীবতা।

ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ অব ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইন্ডিয়া সম্প্রতি গ্লোব সিনেমায় যে বেয়ারম্যান ফিল্ম সেসান অনুষ্ঠিত করেন, তাতে দেখানো হয়েছিল 'দি সেভেন্থ সীল', 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ' 'দি ভার্জিন স্প্রীং' ও 'দি সাইলেন্স'। প্রথম

তিনখানি ছবি কলকাতায় আগেই প্রদর্শিত হয়েছে এবং যথাসময়ে তাদের সমালোচনাও করা হয়েছে 'অমৃতে' পত্রিকায়। বহু প্রতীক্ষার পরে 'দ সাইলেন্স' এই প্রথম কলকাতায় প্রদর্শিত হল এবং সেই হেতু তার সম্পর্কে সমালোচনাও করা হল। অবশ্য আমরা গোড়াতেই বলেছি, 'দি সাইলেন্স' দেখার আগে 'থ্রু এ গ্লাস ডার্কলি' এবং 'উইন্টার লাইট' না দেখলে বেয়ারম্যান-এর ট্রিলজির (ছবি ত্রয়ীর) বক্তব্য আমাদের কাছে পরিষ্কার ভাবে ফুটে ওঠা সম্ভবপর নয়। আরও বলেছি বেয়ারম্যান প্রথমে দার্শনিক, পরে চলচ্চিত্রকার, তাঁর চলচ্চিত্র তাঁর মনোজগতকে দর্শকদের সঙ্গে পরিচিত করবার বাহনমাত্র।

দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী

পরিচালক মৃণাল সেন 'চিত্রবীক্ষণ' পত্রিকার এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমি কোন দ্বিধা না করে খুব জোরের সঙ্গে বলতে চাই আমি ফিল্মকে প্রোপাগান্ডিস্টস পালপিট (প্রচারকের বেদী) হিসাবে ব্যবহার করতে রাজী আছি প্রোভাইডেড আই ক্যান মেক ইট আর্টিস্টিক্যালি অ্যান্ড ইমোসানালি ভ্যালিড (যদি আমি একে শিল্পগতভাবে এবং অনুভূতির দিক দিয়ে বৈধ গ্রহণযোগ্য করতে পারি)।' মেট্রো সিনেমায় মুক্তিপ্রাপ্ত ডি এস পিকচার্স নিবেদিত দয়াশংকর সুলতানিয়া প্রযোজিত 'কলকাতা ৭১' ছবিতে চিত্রনাট্যকার পরিচালক মৃণাল সেন ঠিক এই কাজই করেছেন। তিনি ছবিটিকে তাঁর ব্যক্তিগত বক্তব্য প্রচারের বেদীরূপে ব্যবহার করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে শিল্পগতভাবে এবং অনুভূতির দিক দিয়ে চলচ্চিত্রদর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্যও করে তুলেছেন। শ্রীসেনের বক্তব্য পরিষ্কার স্বচ্ছ। 'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান, তুমি মোরে দানিয়াছ খৃস্টের সম্মান' প্রভৃতি হচ্ছে নির্জলা মিথ্যা কথা। দারিদ্র্য মানুষকে ভাঙে, সমাজকে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে, অধঃপতিত করে। বার্নার্ড শ' বলেছেন : দারিদ্র্য হচ্ছে অপরাধ, একটি সামাজিক অপরাধ। এই অপরাধবোধ ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হয়ে একদিন শহরের বুকে ফেটে পড়েছে ক্রোধের আকারে। এই ক্রোধ কার বিরুদ্ধে? যে-সকল শক্তি মিলিতভাবে সামাজিক অবিচারগুলিকে তৈরী করেছে (এবং তাদের টিকিয়ে রেখেছে), সেই মিলিত শক্তিরূপী শত্রুর বিরুদ্ধে। শ্রীসেন মনে করেন, 'এ ফিল্মমেকার, ইফ হি ইজ গিভন এ চান্স তাহলে হয়তো তার সবচেয়ে আগে দরকার হবে টু মবিলাইজ ফোর্সেস এগেনস্ট দ্য এনিমি' (একজন চিত্রনির্মাতাকে যদি বলা হয়, তুমি বেছে নাও কি করবে, তাহলে হয়তো তার সবচেয়ে আগে দরকার (কর্তব্য?) হবে এই (সামাজিক) শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বশক্তিকে সংহত ও নিয়োজিত করা)। ১৯৭১-এ কলকাতা শহরের ভয়ংকর চেহারা শ্রীসেনকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল; তিনি এক সময় নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে করেছেন। শান্তিশৃঙ্খলারক্ষার অজুহাতে পুলিশ যদি একটি ছেলেকে গুলী মারে (শ্রীসেন নিজের চোখে দেখেছেন) তাহলে অসহায় বোধ না করে উপায় কি? কিন্তু ছবির মাধ্যমে নিজের অসহায়তায় কথা না বলে তিনি একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন ১৯৭১-এ বিক্ষুব্ধ কলকাতার সামগ্রিক ক্রোধের কারণকে বিশ্লেষণ করে। শ্রীসেন বলেছেন 'এই ছবির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এই কথা বলা যে, আমাদের ইতিহাস হচ্ছে শোষণের ইতিহাস, আমাদের ইতিহাস হচ্ছে বঞ্চনার ইতিহাস, আমাদের ইতিহাস হচ্ছে দারিদ্র্যের ইতিহাস।' এবং এই শোষণ বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের ইতিহাসকে শ্রীসেন এমন নগ্ন আপোসহীন, নিষ্ঠুর, অকরুণভাবে চিত্রায়িত করেছেন যে, দর্শক তার মর্মকথার দ্বারা নিপীড়িত, উত্তেজিত এবং কিছুটা হয়তো ক্রোধান্বিত না হয়ে পারবেন না। দর্শকমনকে এমনভাবে নাড়া দিতে আর কোনো বাংলা ছবি আজ পর্যন্ত সক্ষম হয়নি। আমরা আগে 'সমাজকো বদল ডালো' নামে একখানি হিন্দী ছবি দেখে মনের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা অনুভব করেছিলাম ... ছবি দেখতে দেখতে এতখানি বিচলি... উঠিনি। অবশ্য ছবিখানি যখন দেখ... তখন কিউবার ছবি 'লুসিয়া'র কথা ... বারে বারেই মনে এসেছে। জানি না, এই ছবিটি দ্বারা আদৌ অনুপ্রাণি...

'কাল্পনিক বিচারালয়' (ইন্টারভি... পরিশিষ্টরূপে মৃণাল সেন ... 'আত্মহত্যার অধিকার' (মানিক ... পাধ্যায় লিখিত), 'অঙ্গার' (প্রবে... সান্যাল লিখিত), 'স্মাগলার' (সমরে... লিখিত) এবং 'প্রতিদিন প্র... (অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত... পাঁচটি কাহিনীকে দারিদ্র্য কিভাবে ... সমাজকে ধীরে ধীরে, অথচ নিশ্চ... ভেঙেচুরে তচনচ করে দিচ্ছে, ... উপকরণ হিসেবে শ্রীসেন ব্যবহার ক... ইচ্ছামত মূলের রূপ ও ব্যঞ্জনাকে ... বর্তিত করে। প্রয়োজনবোধে শ... বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকে, ... স্মরণ রেখেই বলব, শ্রীসেন নিজ ... অনুকূলে মানিক বন্দ্যোপা... 'আত্মহত্যার অধিকার'-এ যে-প... সাধন করেছেন, তা অমার্জনীয় নয়।

১৯৩৩, ১৯৪৩ এবং ১৯৫৩-তে ... দারিদ্র্যের দোষে এক একটি ... পরিবারের অধোগতির যে মর্মন্তুদ ... শ্রীসেন দর্শকের চোখের সামনে ... ধরেছেন তার গভীরতার তুলনা নেই ... হয়েছে, চিত্রকার শ্রীসেন তাঁর ... রাজনৈতিক চেতনার সবখানি ... দিয়েছেন এই ছবির সৃষ্টিকার্যে।

ছবির শুরুতে নেপথ্য ... অন্ধকারের মধ্যে এক যুবকের স্বগ... শোনা যায় : আমার বয়স কুড়ি ... কুড়ি বছর বয়স নিয়ে হাজার বছর ... হেঁটে চলেছি, পায়ে পায়ে দারিদ্র্য ... আর মৃত্যুর ভীড় ঠেলে। হাজার বছর ... দেখেছি ইতিহাস, দারিদ্র্যের ইতি... বঞ্চনার ইতিহাস, শোষণের ইতি... —অন্ধকার কেটে গিয়ে পরে, ... ১৯৭১-এর অশান্ত কলকাতার ... পরেই আসে মৃণাল সেন লিখিত ... বিচারালয়ের দৃশ্য, 'ইন্টারভিউ' ছবির ... শো-কেসে রক্ষিত মডেলকে বিবস্ত্র ক... অপরাধে আসামীর কাঠগড়ায়। ... কৌতুকোদ্রেককারী প্রশ্নোত্তর এবং ... ভিউ' ছবির কিছু দৃশ্যাংশের মা... চিত্রকার শ্রীসেন একটি অবিসং... সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছান : আজকের ... রাগ করবো না, রাগ না করে বসে থাক... তা হয় না। —আজকের যুগে রাগ ... একটা সোস্যাল এন্টিটি—একটি সামা... সত্তা। —এই সামাজিক ক্রোধ দু'রকমে... এক, সামাজিক ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেল... জন্যে রাগ এবং দুই, সামাজিক ব্যব... বজায় রাখার চেষ্টায় যারা ভাঙতে চাই... তাদের বিরুদ্ধে রাগ। বিচারালয়ের প... আসে একটি ফ্যান্টাসির ছবি : অল-ইন্ডি... রেডিও থেকে যেন খবর দেওয়া হচ্ছে ... একটি বছর কুড়ি বয়েসের ছেলের অস... দেহ পাওয়া গিয়েছে ময়দানে ভোরবেল...

রাজা জানী / হেমা মালিনী

তার দেহে গুলির দাগ। —একটি সুন্দর মেয়ে যেন ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের বারান্দা থেকে নির্লিপ্তভাবে সব দেখছে—কি দেখছে, তা দেখা যাচ্ছে না, তার মুখের ওপর ভেসে আসছে সেই গোড়ার কথা ঃ দারিদ্র্য মালিন্য আর মৃত্যুর ভীড় ঠেলে আমি পায়ে পায়ে চলেছি হাজার বছর ধরে।

এর পরেই আসে ১৯৩৩-এ প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মহত্যার অধিকার'-এর চিত্ররূপ, যে চিত্ররূপ দিতে গিয়ে শ্রীসেন নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে মূলের শেষাংশে গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়ে বস্তিবাসী পরিবারকে দারুণ বৃষ্টির রাত্রে জলে ভেজার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে বড়লোকের বাইরের দালানে আরও দশটা পরিবারের এবং রাস্তার অনাথ, আতুর, ভিখারী ও কুকুরের সামিল করেন (এই কুকুরকে বস্তি-পরিবারের কর্তা কিছুক্ষণ আগেই তাঁর বস্তিঘরে ঢোকার অপরাধে লাঠি দিয়ে মেরেছেন)। কাহিনীর শেষে আবার ভেসে আসে পর্দায় সশব্দে—দারিদ্র্য, মালিন্য আর মৃত্যুর ভিড় ঠেলে আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি......

এর পরে শুরু হয়ে যায় ১৯৪৩-এ প্রকাশিত প্রবোধ সান্যালের রচনা 'অংগার'-এর চিত্ররূপ। দেশ-বিভাগ নয়, দুর্ভিক্ষের কবল থেকে এড়ানোর জন্যে একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের বিধবা মা, দুই অনূঢ়া কন্যা ও বাউন্ডুলে ছেলে এসে আশ্রয় নিয়েছে আরও পাঁচটা পরিবারের মতো একটি বড়ো বাড়ীর একখানি ঘরে, যেখানে বিনা ভাড়ায় থাকতে পারা যায়। সমাজ

আরণ্যক/বিদ্যা রাও এবং সামিত ভঞ্জ

এদের ভরণপোষণের ভার নেয় না, অথচ নিম্নমধ্যবিত্ত হিসেবে একটি মানসম্ভ্রম বজায় রাখার দায় এদেরই ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। অতএব ঘরের মেয়েদের গোপনে যৌবন বিক্রয় করে ক্ষুধাতৃষ্ণার উপশম করতে হয়। এদের কাছে সামাজিক মূল্য-বোধের কোনো অর্থ আছে কি? নীতি-বোধের কোনো অর্থ? —ওদের দিল্লীবাসী খুড়তুতো ভাই সমস্ত দেখেশুনেও কেমন অবলীলাক্রমে নিরাসক্তভাবে গোটা কয়েক উপদেশ বর্ষণ করে জরুরী কাজের অজুহাতে প্রস্থান করল? পরিবারের বড়ো মেয়ের মুখটা ভরে উঠল ঘৃণায়, ক্ষোভে এবং তারই ওপর ভেসে এল সেই স্বর : পর্দায়ও দেখা গেল লেখাগুলি : হাজার বছর ধরে......

এইবার আসে ১৯৫৩-তে প্রকাশিত সমরেশ বসুর 'স্মাগলার' গল্পের চিত্ররূপ। তেরো, চোদ্দ, পনেরো বছরের একগাদা ছেলে, ওদের মধ্যে কেউ কেউ র‍্যাশন-কার্ডে পরিবারের কর্তা—হেড অব দি ফ্যামিলি বলে অভিহিত। ওদের সকলেরই স্কুলে পড়াশুনো করবার কথা, বিকেলে খেলাধুলো করবার কথা। কিন্তু পরিবারপোষণের নৈতিক দায়িত্ব ওদের গ্রাম থেকে দশ-পনেরো কিলো চাল থলিতে ভর্তি করে বিনা পয়সায় ট্রেনযোগে শহরের কাছাকাছি —যাকে বলি শহরতলীতে গিয়ে চোরাই বিক্রি করতে বাধ্য করেছে। ওরা যে-কোনোও উপায়ে পুলিশের হাত এড়াবার কৌশল-গুলো শিখে নিয়েছে, কারণ ওরা জেলে গেলে, ওদের চালগুলি বিক্রি না হলে ওদের পরিবার থাকবে অভুক্ত। ওরা অনাহারকে ভয় করতে শিখেছে, আর কিছুকে নয়। ওরা অভিধা পেয়েছে স্মাগলার বলে। অথচ ওদের মা ওরা বাড়ী না ফেরা পর্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে ওদের জন্যে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকেন ...গৌরাঙ্গ—গৌরাঙ্গ ডাক আপনার আমার হৃদয়কে বিদীর্ণ করে।

সবশেষে আসে অজিতেশ বন্দ্যো-পাধ্যায় লিখিত 'প্রতিদিন প্রতিরাত'-এর চিত্ররূপ। এখানে মেকী দেশনেতা দেশের জন্যে ভেবে ভেবে মাতাল হন, তাঁদের মেয়ে-পুরুষ সাঙ্গোপাঙ্গ তাঁদের সামনে স্তুতি করেন, পিছনে গাল দেন। বাংলাদেশের দুঃখে বিগলিত হয়ে পার্ক স্ট্রীটে চাঁদা তোলবার পরে ক্লান্ত ধনীকন্যারা আইসক্রীম খাওয়ার বায়না ধরেন। এরাই দেশময় দারিদ্র্যকে জিইয়ে রেখেছে নিজেদের উচ্চাসনকে অটল রাখবার জন্যে। গরীব না থাকলে 'গরীবি হঠাও' শ্লোগান দেওয়া যাবে কি করে? —এই উচ্চশ্রেণীর ভণ্ডামির মুখোশ খোলবার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীসেন। এর পরেই হঠাৎ গোলমাল, চেঁচামেচি—অন্ধকারের মধ্যে শোনা যায়, একটি যুবক তারস্বরে বলছে : আপনারা চাঁচাবেন না, অকারণ আমাকে ভয় পাবেন না, আমার হাতে বন্দুক নেই, রিভলবার নেই, বোমা নেই, পাইপগান নেই, কেননা আমি মৃত। ......এই কথা বলার সঙ্গে পর্দায় আলো ফুটে ওঠে, একটি মুখ দূরে থেকে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে—তার দৃষ্টি প্রখরভাবে ক্যামেরার ওপর অর্থাৎ প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত দর্শকদের ওপর নিবদ্ধ। সেই মুখ বলে : আজ সকালে ময়দানে আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। বলে সে যখন ঘুরে দেখে, তখন দেখা যায়—তার মুখ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কে যেন চীৎকার করে ওঠে। ছেলেটি মুখের রক্ত মুছে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়। আবার দেখা যায় মুখটিকে। সে বলছে : আজ আমাকে কে মেরেছে, আমি জানি। কারা মেরেছে আমি জানি। আমি কিন্তু বলবো না, কেননা আমি চাই আপনারা তাকে খুঁজে বার করুন। আমি জানি আমার অপরাধ কি? আমার অপরাধ আমি চুপ করে থাকিনি, আমি হাজার বছর ধরে কুড়ি বছর বয়সে যুগ যুগ ধরে রিঅ্যাক্ট করেছি কারণ আমি স্থির থাকতে পারিনি। তারপর সে দর্শক-দের উদ্দেশে প্রশ্ন করে : আপনারা এত নির্লিপ্ত, এত নিস্পৃহ কেন? —আবার যুবকের মুখ অদৃশ্য হয়। পরিবর্তে ও হাতে-আঁকা নিপীড়িত মানুষের ছবি... এই ছবি থেকে যেন বেরিয়ে আসে পু কথিত গল্পগুলির প্রত্যেকটি শেষ দ ছবি......বোঝা যায়...ক্রোধ ওম... বছরের পর বছর ধরে...তারপরেই ৭১ শ্লোগান-মুখর কলকাতার অভিযান বিভিন্ন দৃশ্য। তারপরেই আসে যুবক সম্পূর্ণভাবে আজকের যুবক—সে দৌড়ু —নানা জায়গার ভিতর দিয়ে, বন, জঙ্গল গলি, সমুদ্রের ধার। এরই ফাঁকে ফাঁকে যায় মৃতদেহ...মাইলাই, বিয়াফ্রা, বাংলা থেকে সংগৃহ করা...সবশেষে সে এসে প ছুটতে ছুটতে ময়দানে—হঠাৎ গুলি খে সে মুখ থুবড়ে পড়ে—শোনা যায় আক বাণীর প্রতিদিনের সূচনা সঙ্কেতধ্বনি ছেলেটির মৃতদেহের ওপর দিয়ে ক্যামে এগিয়ে চলে ভোরের কুয়াশাচ্ছন্ন দিগন্তে পানে।

বিভিন্ন কাহিনীতে সার্থক অভি করেছেন : রঞ্জিত মল্লিক, উৎপল দ হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যা সাধনা রায়চৌধুরী, স্নিগ্ধা মজুমদ মাধবী চক্রবর্তী, বিনতা রায়, শুচিতা রা বাপী ভট্টাচার্য, গীতা সেন, সুরজিৎ নন্দ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সে গুপ্ত, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি

এ-ছবি একান্তভাবেই পরিচাল মৃণাল সেনের ছবি। তবু চিত্রশিল্পী কে. কে. মহাজন, সম্পাদক গঙ্গাধর নস্কর শিল্পনির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্ত এব সংগীতকার আনন্দশঙ্করের সুনিপুণ সহযোগিতা অবশ্য স্বীকার্য। ছবির বক্তব্য প্রকাশে বড় বেশী লিখিত বাক্য ও শব্দের ভূমিকা আছে, আধুনিক চলচ্চিত্রে ওদে ব্যবহার যত কম হয়, ততই ভালো। এ ছবির প্রথম ও শেষ কাহিনী দুটি মাঝে তিনটি কাহিনীর তুলনায় খেলো ও জোলো। তবু বলবো, কলকাতা ৭১-এ মতো এমন বেগবান সক্রিয় ছবি বাংল ভাষায় এই প্রথম।

—নান্দীকার

স্টুডিও সংবাদ

বহুদিন বন্ধ থাকার পর এইচ এস ফিল্মস নিবেদিত 'আলো ও ছায়া'র চিত্রগ্রহণ আবার ক্যালকাটা মুভীটোন স্টুডিওতে শুরু হয়েছে।

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন গৌর বাগচী এবং সুরারোপে আছেন বিজন পাল।

বিভিন্ন চরিত্রে শিল্পীদের মধ্যে আছেন দিলীপ রায়, নন্দিনী মালিয়া, জহর ব্যানার্জী ও পদ্মা দেবী।

আগামী ২৩শে অক্টোবর থেকে ক্যালকাটা মুভীটোন স্টুডিওতে দ্বিতীয় পর্যায়ের স্যুটিং শুরু হবে।

এবারে এখানেই শেষ করছি। নমস্কার।

দর্শক

ডেভিস কাপ

রুমানিয়ার বুখারেস্টে **১৯৭২** সালের ৬১তম আন্তর্জাতিক **ডেভিস কাপ লন** টেনিস প্রতিযোগিতার **ফাইনালে আমেরিকা** ৩—২ খেলায় রুমানিয়াকে **পরাজিত** করে উপর্যুপরি **৫বার (১৯৬৮—৭২)** এবং মোট **২৪বার ডেভিস কাপ জয়ের** গৌরব লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, রুমানিয়াতে ডেভিস কাপের **ফাইনাল** খেলার আসর—সমাজতান্ত্রিক দেশে ডেভিস কাপের ফাইনাল খেলার **প্রথম** নজির। তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে ডেভিস কাপের ফাইনালে খেলেছে একমাত্র রুমানিয়া, মোট **৩বার** (১৯৬৯, ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালে) এবং রুমানিয়া এই তিনবারই আমেরিকার সঙ্গে ফাইনাল খেলায় হেরেছে—১৯৬৯ সালে ০—৫ খেলায়, ১৯৭১ সালে **২—৩** খেলায় এবং ১৯৭২ সালে ২—৩ খেলায়।

১৯৭২ সালের ফাইনাল খেলার প্রথম দিনে খেলার ফলাফল **সমান ১—১** দাঁড়ায়। উভয় দেশই **একটি** করে সিংগলস খেলায় জয়ী হয়। **১৯৭২** সালের উইম্বলেডন সিংগলস চ্যাম্পিয়ান আমেরিকার **স্ট্যান** স্মিথ ১১—৯, **৬—২** ও ৬—৩ গেমে রুমানিয়ার ইলি নাস্তাসেকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় সিংগলসে রুমানিয়ার ইয়ান টিরিয়াক ৪-৬, ২-৬, ৬-৪, ৬-৩ ও ৬-২ গেমে টম গোরম্যানকে পরাজিত করে খেলার ফলাফল সমান করেন।

দ্বিতীয় দিনের ডাবলস খেলায় আমেরিকান জুটি স্ট্যান স্মিথ এবং এরিক ভ্যান ডিলেন ৬-২, ৬-০ ও ৬-৩ গেমে ইয়ান টিরিয়াক এবং ইলি নাস্তাসেকে পরাজিত করলে আমেরিকা **২-১** খেলায় এগিয়ে যায়।

তৃতীয় দিনে ফাইনালের তৃতীয় সিংগলস খেলায় স্ট্যান স্মিথ ৩ ঘণ্টার পরিশ্রমে ৪-৬, ৬-২, ৬-৪, ২-৬ ও ৬-০ গেমে ইয়ান টিরিয়াককে পরাজিত করলে আমেরিকা ৩-১ খেলায় অগ্রগামী হয়ে ডেভিস কাপ পেয়ে যায়। ফলে শুধু নিয়ম রক্ষার খাতিরেই শেষ সিংগলস খেলায় উভয় দেশকে নামতে হয়েছিল। এই শেষ সিংগলস খেলায় রুমানিয়ার ইলি নাস্তাসে ৬-১, ৬-২, ৫-৭ ও ১০-৮ গেমে টম গোরম্যানকে পরাজিত করেন।

আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতা হল পুরুষদের বেসরকারী দলগত বিশ্ব টেনিস প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৭৩ বছরের ইতিহাসে আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার সাফল্যই বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। ডেভিস কাপের ৭৩ বছরের জীবনে (১৯০০-৭২) ১২ বছর খেলা হয়নি—১৯০১ ও ১৯১০ সালে এবং দুটি বিশ্ব **যুদ্ধের** জন্যে **১০** বছর (১৯১৫-১৮ এবং ১৯৪০-৪৫)। ডেভিস কাপের ৬১ **বছরের** খেলায় মাত্র এই চারটি দেশ ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে—আমেরিকা ২৪ বার, অস্ট্রেলিয়া ২২ বার (এর মধ্যে নিউজিল্যান্ডের সংগে অস্ট্রেলেশিয়া নামে ৭ বার), গ্রেটবৃটেন ৯ বার এবং ফ্রান্স ৬ বার। শেষ ডেভিস কাপ পেয়েছে আমেরিকা ১৯৭২ সালে, অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৭ সালে, গ্রেটবৃটেন ১৯৩৬ সালে এবং ফ্রান্স ১৯৩২ সালে।

একটানা প্রাধান্য

১৯৩৮ সাল থেকে **১৯৭২** সাল পর্যন্ত মোট ২৯ বার ডেভিস **কাপের** খেলা হয়েছে, যেহেতু যুদ্ধের জন্যে ৬ বার (১৯৪০—৪৫ সাল) খেলা **বন্ধ** ছিল। এই ২৯ বারের ডেভিস কাপের খেলায় অস্ট্রেলিয়া একাই একটানা ২৫ বার (১৯৩৮—৬৮) চ্যালেঞ্জ রাউন্ড অর্থাৎ ফাইনালে খেলে ১৬ বার ডেভিস কাপ পেয়েছে, বাকি ১৩ বার ডেভিস কাপ পেয়েছে আমেরিকা। ১৯৩৮ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা—এই দুটি দেশ পরস্পর চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে খেলেছে ১৯ বার। এর মধ্যে একটানা **১৬ বার** (১৯৩৮-৫৯ সাল)। বাকি ১০ বারের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলেছে **ইতালী** ২ বার (১৯৬০-৬১), স্পেন ২ বার (১৯৬৫ ও ১৯৬৭), মেকসিকো ১ বার (**১৯৬২**) এবং ভারতবর্ষ ১ বার (**১৯৬৬**)। অপরদিকে আমেরিকার বিপক্ষে রুমানিয়া ৩ **বার** (১৯৬৯, ১৯৭১ ও ১৯৭২) এবং পশ্চিম **জার্মানী ১ বার** (১৯৭০)। ডেভিস কাপের **চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে** অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা **পরস্পর শেষ** প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে **১৯৬৮** সালে।

ডেভিস কাপ : পুরুষদের আন্তর্জাতিক লন টেনিস দলগত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলের পুরস্কার

ডেভিস কাপের ফাইনাল

এ পর্যন্ত ডেভিস কাপের **ফাইনালে** খেলেছে মাত্র এই **১১টি** দেশ—**আমেরিকা** ৪৮ বার, অস্ট্রেলিয়া ৩৭ বার, গ্রেটবৃটেন ১৬ বার, **ফ্রান্স** ৯ বার, রুমানিয়া **৩** বার, ইতালী ২ বার, স্পেন **২ বার এবং** ১ বার করে বেলজিয়াম, জাপান, মেকসিকো **এবং** ভারতবর্ষ।

ডেভিস কাপের ফাইনাল

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

১৯০০—৭২

	মোট খেলা	জয়	পরাজয়
আমেরিকা	৪৮	২৪	২৪
অস্ট্রেলিয়া	৩৭	২২	১৫
গ্রেটবৃটেন	১৬	৯	৭
ফ্রান্স	৯	৬	৩
রুমানিয়া	৩	০	৩
ইতালী	২	০	২
স্পেন	২	০	২
বেলজিয়াম	১	০	১
জাপান	১	০	১
মেকসিকো	১	০	১
ভারতবর্ষ	১	০	১

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুন **একটানা** ৬ বছর (১৯৪০-৪৫) ডেভিস **কাপ প্রতি**-যোগিতা বন্ধ ছিল। ১৯৪৬ সাল থেকে ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ড অর্থাৎ

ফাইনাল খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল নীচে দেওয়া হল।

ডেভিস কাপের ফাইনাল

বছর	বিজয়ী		বিজিত	
১৯৪৬	আমেরিকা	৫ :	অস্ট্রেলিয়া	০
১৯৪৭	আমেরিকা	৪ :	অস্ট্রেলিয়া	১
১৯৪৮	আমেরিকা	৫ :	অস্ট্রেলিয়া	০
১৯৪৯	আমেরিকা	৪ :	অস্ট্রেলিয়া	১
১৯৫০	অস্ট্রেলিয়া	৪ :	আমেরিকা	১
১৯৫১	অস্ট্রেলিয়া	৩ :	আমেরিকা	২
১৯৫২	অস্ট্রেলিয়া	৪ :	আমেরিকা	১
১৯৫৩	অস্ট্রেলিয়া	৩ :	আমেরিকা	২
১৯৫৪	আমেরিকা	৩ :	অস্ট্রেলিয়া	২
১৯৫৫	অস্ট্রেলিয়া	৫ :	আমেরিকা	০
১৯৫৬	অস্ট্রেলিয়া	৫ :	আমেরিকা	০
১৯৫৭	অস্ট্রেলিয়া	৩ :	আমেরিকা	২
১৯৫৮	আমেরিকা	৩ :	অস্ট্রেলিয়া	২
১৯৫৯	অস্ট্রেলিয়া	৩ :	আমেরিকা	২
১৯৬০	অস্ট্রেলিয়া	৪ :	ইতালী	১
১৯৬১	অস্ট্রেলিয়া	৫ :	ইতালী	০
১৯৬২	অস্ট্রেলিয়া	৫ :	মেকসিকো	০
১৯৬৩	আমেরিকা	৩ :	অস্ট্রেলিয়া	২
১৯৬৪	অস্ট্রেলিয়া	৩ :	আমেরিকা	২
১৯৬৫	অস্ট্রেলিয়া	৪ :	স্পেন	১
১৯৬৬	অস্ট্রেলিয়া	৪ :	ভারতবর্ষ	১
১৯৬৭	অস্ট্রেলিয়া	৪ :	স্পেন	১
১৯৬৮	আমেরিকা	৪ :	অস্ট্রেলিয়া	১
১৯৬৯	আমেরিকা	৫ :	রুমানিয়া	০
১৯৭০	আমেরিকা	৫ :	পঃ জার্মানী	০
১৯৭১	আমেরিকা	৩ :	রুমানিয়া	২
১৯৭২	আমেরিকা	৩ :	রুমানিয়া	২

বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতা

যুগোশ্লাভিয়ার স্কোপজি সহরে পুরুষদের ২০তম এবং মেয়েদের ৫ম বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতায় রাশিয়া দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভের সূত্রে দুটি স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। পুরুষদের দলগত বিভাগে রাশিয়া এই নিয়ে উপর্যুপরি ১১ বার বিশ্ব খেতাব পেল।

১৯৭২ সালের সদ্য সমাপ্ত বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতায় রাশিয়া পুরুষ বিভাগে মাত্র একটা খেলায় হেরেছে, হাঙ্গেরীর কাছে। অপরদিকে মেয়েদের বিভাগে রাশিয়া অপরাজিত অবস্থায় খেতাব জয়ী হয়েছে।

পুরুষ বিভাগে অংশ গ্রহণ করেছিল ৬৩টি দেশ। আমেরিকা এবং নেদারল্যাণ্ডস সমান পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে চূড়ান্ত ফলাফলের তালিকায় ৮ম স্থান লাভ করে।

মেয়ে এবং পুরুষদের মোট ৬টি পদকের সবগুলিই এই চারটি সমাজতান্ত্রিক দেশ জয় করেছে। রাশিয়া—স্বর্ণ ২, হাঙ্গেরী—রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ১, রুমানিয়া রৌপ্য ১ এবং যুগোশ্লাভিয়া ব্রোঞ্জ ১।

চূড়ান্ত ফলাফল

পুরুষ বিভাগ : স্বর্ণপদক—রাশিয়া (৪২ পয়েন্ট), রৌপ্য পদক—হাঙ্গেরী (৪০·৫ পয়েন্ট), ব্রোঞ্জ পদক—যুগোশ্লাভিয়া (৩৮ পয়েন্ট)।

মহিলা বিভাগ : স্বর্ণপদক—রাশিয়া (১১·৫ পয়েন্ট), রৌপ্য পদক—রুমানিয়া (৮ পয়েন্ট), ব্রোঞ্জ পদক—হাঙ্গেরী (৮ পয়েন্ট)।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল

ঔরাঙ্গাবাদ আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের লীগের খেলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সূত্রে স্যার আশুতোষ মুখার্জি শীল্ড জয়ী হয়েছে। এই নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল মোট ১১ বার এই শীল্ড জয়ী হল (১৯৪১, ১৯৫০, ১৯৫৩, ১৯৫৭, ১৯৬০, ১৯৬১ ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৫, ও ১৯৭২ সালে)।

পূর্বাঞ্চলের প্রাথমিক পর্যায়ের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল ২—০ বর্ধমান, ১—০ গোলে রাঁচি, ফাইনালে ১—১ গোলে বহরমপুর ফাইনালে ১-০ গোলে যাদবপুর পরাজিত করে চূড়ান্ত লীগ খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল। যাদের চূড়ান্ত লীগ পর্যায়ের খেলা গ্রহণ করেছিল এই চারটি চ্যাম্পিয়ান—কলকাতা, গত বছরের চ্যা কালিকট, বোম্বাই এবং পাঞ্জাব। ব ৩—১ গোলে কালিকট এবং ৮—০ বোম্বাইকে পরাজিত করে। কিন্তু প কাছে ০—১ গোলে হেরে যায়। গত চ্যাম্পিয়ান কালিকট গোলের গড় রানার্স-আপ খেতাব পেয়েছে।

টমাস কাপ

নিউজিল্যাণ্ডের অকল্যাণ্ডে র্জাতিক টমাস কাপ ব্যাডমিণ্টন যোগিতার অস্ট্রেলেশীয় জোনের ফ ভারতবর্ষ ৫—৪ খেলায় নিউজিল পরাজিত করে ইণ্টার-জোন খেলায় নেশিয়ার সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা করেছে। নিউজিল্যাণ্ডের দুর্ভাগ্য যে, তিনবার ভারতবর্ষের থেকে এগিয়ে শেষরক্ষা করতে পারেনি। এক নিউজিল্যাণ্ড ৪—৩ খেলায় এগিয়ে এই অবস্থায় যে দুটি খেলা বাকি ছিল একটি খেলায় জয়ী হলেই তারা বর্ষকে হারাবার গৌরব লাভ করতো। ভারতবর্ষই শেষ দুটি খেলায় জয়ী নিউজিল্যাণ্ডকে ৫—৪ খেলায় হ দেয়।

প্রতিযোগিতায় মোট ৯টি খেলা ৫টি সিঙ্গলস এবং ৪টি ডাবলস। এই খেলার মধ্যে ভারতবর্ষ ৫টি খেলায় ৩য় সিঙ্গলস ২টি এবং ডাবলস একটি করে সিঙ্গলস খেলায় জয় দীপু ঘোষ এবং দীনেশ খান্না। ডাবল খেলায় জয়—দীপু ও রমেন ঘোষ জুটি এবং জাতীয় চ্যাম্পিয়ান প্রকাশ পাড়ুক আসিফ পারপিয়া জুটি ১টি। ভারত এই জয়লাভে দীপু ও রমেন ঘোষ জয়ের অবদান সব থেকে বেশী। ভা বর্ষের ৫টি জয়ের মধ্যে তাঁরা দুজনে ৩টি খেলায় জয়ী হন—সিঙ্গলস ১টি ডাবলস ২টি। নিউজিল্যাণ্ডের বি ভারতবর্ষের পক্ষে এই ৬ জন খেলে অংশ গ্রহণ করেছিলেন—দীনেশ খান্না নায়ক), দীপু ঘোষ, রমেন ঘোষ, প্র পাড়ুকন, আসিফ পারপিয়া এবং দেব আহুজা। টমাস কাপ প্রতিযোগিতায় শে তিনজন খেলোয়াড়ের যোগদান এই প্রথম

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

আমার চাই
সবচেয়ে সাদা
ক'রে
কাপড় ধোয়ার পাউডার

আমার দরকার
সবচেয়ে উজ্জ্বল
ক'রে
কাপড় ধোয়ার পাউডার

সবচেয়ে নিরাপদ
পাউডার

৩ জন নারী। ৩টি একেবারে আলাদা চাহিদা। মানে, ৩টি আলাদা আলাদা কাপড় ধোয়ার পাউডার? "মোটেই না"—বলেন আমাদের গবেষণা কুশলী। "আমরা কাপড় ধোয়ার এমন একটি পাউডার তৈরী করব যা এই ৩টি চাহিদাই পূরণ করবে।"

ফলশ্রুতি:

নতুন তিন ভাবে কার্যকর ডেট

- নতুন ডেট একটি খুব সাদা পাউডার···যাতে রয়েছে সবচেয়ে সাদা ক'রে কাপড় ধোয়ার জন্যে একটি উৎকৃষ্ট পদার্থ।
- নতুন ডেটে রয়েছে সাদা করার বাড়তি শক্তি। এটি কাপড়ের পুরনো ময়লাও দূর ক'রে দেয় আর রঙীন কাপড় উজ্জ্বল ক'রে তোলে।
- নতুন ডেটে প্রচুর ফেনা হয় আর এই ফেনায় রয়েছে কাপড়-চোপড় নরম করার বিশেষ গুণ। এটি যেমন আপনার জামাকাপড়ের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ···তেমনি আপনার হাতের পক্ষেও সবচেয়ে নরম।
- টি নতুন সাইজে পাবেন: ডেট ২০০, ৪০০, ৬০০, ৮০০, ১০০০

ছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে—নীল ডেট

১২শ বর্ষ
২য় খণ্ড

২৬ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday 3rd November, 1972 শুক্রবার, ১৭ কার্তিক, ১৩৭৯ .52 Paise

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১.০২
ষাণ্মাসিক	টাকা	০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

এক নজরে

শিক্ষায় ওলট-পালট : দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কর্মকর্তারা শিক্ষা নিয়ে একের পর এক যে একসপেরিমেন্ট চালালেন তাকে প্রায় তুঘলকি কাণ্ডই বলা যায়। ইংরেজ শাসনকালে এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নানা কারণে 'গোলামখানা' নামে অভিহিত হত। তাই বোধহয় স্বাধীনতার উপলব্ধি ঘটাতে বিগত আড়াই দশকে শিক্ষার প্রাঙ্গণেই বলগা-ছাড়া উন্মত্তভাবে মতো আবোল-তাবোলের পালা বদল ঘটল সকলের বেশী। স্বাধীন দেশের শাসন-দায়িত্বটা মোটামুটিভাবে 'ইন্টার' ক্লাসের লোকেদের হাতে এসেছে, তাই বোধহয় ইন্টার ক্লাসগুলিকে ডিক্লাস করার দিকেই তাঁরা সবার আগে নজর দিলেন। রেলের ইন্টার ক্লাসের মতো কলেজের ইন্টার-মিডিয়েট ক্লাস বিদায় নিল, কিন্তু তাতে শিক্ষাকাল কমল না। ইন্টারমিডিয়েটের দুটি বছর ভাগ করে দেওয়া হল স্কুল ও কলেজের মধ্যে, যার ফলে স্কুল হল এগার ক্লাসের আর কলেজ তিন ক্লাসের। ভেঙে গড়া শিক্ষার কাঠামোকে কিন্তু কোনভাবেই রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, শিল্পনীতি, নিয়োগ ব্যবস্থা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করা হল না; তদুপরি জাত্যাভিমানে ইংরেজি শিক্ষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হলেও উচ্চ শিক্ষায় ও উচ্চ প্রশাসনিক প্রয়োজনে ইংরেজির স্থান ও মর্যাদা আগের মতোই থেকে গেল। ফলে দায়িত্বশীল ও কিছুটা সঙ্গতিসম্পন্ন অভি-ভাবকরা ছেলেদের হাত ধরে লম্বা লাইন দিয়ে দাঁড়ালেন ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলগুলির সামনে। আর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এগার ক্লাসে উন্নীত হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলগুলি উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে পড়ে রইল লক্ষ্যহীন, উদ্যমহীন হতাশার মধ্যে। আর এক অনর্থ ঘটাতে লাগল একই সঙ্গে পাশাপাশি টিঁকিয়ে রাখা দশ ও এগারো ক্লাসের ডায়ার্কি। যাদের টাকা নেই, ওপরতলায় ধরার মতো প্রভাবশালী লোক নেই, তারাই দশ-ক্লাসের স্কুল হয়ে পড়ে আছে—এমন একটা ধারণা প্রচলিত হল শিক্ষামহলে এবং সে ধারণা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ছিল না। সুতরাং সে স্কুলের শিক্ষার্থীর স্কুল সম্বন্ধে, বা সে স্কুলে পড়ার জন্য নিজের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা বা আস্থা পোষণ করা সত্যই কঠিন ছিল। অথচ তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

শিক্ষাব্যবস্থায় এই নৈরাজ্য, হতাশা· লক্ষ্যহীনতা ও অশ্রদ্ধার অবসান ঘটাতে আবার প্রায় কেঁচে গণ্ডুষ করতে বসেছেন শিক্ষার কর্মকর্তারা। দশ-ক্লাশ স্কুল, দু বছরের ইন্টারমিডিয়েট কোর্স, তারপর ডিগ্রি—সবই ফিরে আসছে আবার। কিন্তু ইন্টার-মিডিয়েট ক্লাস দুটিকে সেই সাবেক কালের মতো আবার কলেজে জুড়ে দিতে বড় সঙ্কোচ বোধ করছেন কর্তৃপক্ষ, বোধহয় তাতে সেই গোলামী শিক্ষাব্যবস্থাটাকে সবটাই নকল করা হবে এই ভেবে। এর পর আছে স্কুলের ও ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের নতুন শিক্ষার সিলেবাস তৈরীর দায়িত্ব। দেখা যাক, শিক্ষার কর্ম-কর্তারা সেখানে নতুন কি উদ্ভাবনী প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

শিক্ষা, দাম্পত্য ও স্বাচ্ছল্য : সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্সাস ব্যুরো থেকে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, সে দেশের যে সাতাশ লক্ষ নারীর বয়স এখন ত্রিশের গোড়ার দিকে, পঞ্চাশ পূর্ণ হওয়ার আগেই তাদের এক-চতুর্থাংশের প্রথম বিবাহ বিচ্ছেদে পরিসমাপ্ত হবে। তাদের যে এক-ষষ্ঠাংশের ইতিমধ্যে একবার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে তারা প্রায় সকলেই আবার নতুন করে সংসার পেতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ সম্পর্কে সেন্সাস ব্যুরোর ঐ সমীক্ষায় বলা হয়েছে· আর্থিক স্বাচ্ছল্য ও শিক্ষা দাম্পত্য বন্ধনকে দীর্ঘস্থায়ী করে। যে দম্পতির সংসারে অভাব-অনটন কম এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যেখানে শিক্ষিত, সাংসারিক সুখ-শান্তিও সেখানে অধিক প্রত্যাশিত এবং বিচ্ছেদের আশঙ্কাও সেক্ষেত্রে অনেক কম। সেন্সাস ব্যুরোর রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারটা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৫ সালে যেখানে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের মেয়েদের প্রতি দশ-জনের একজন প্রথম স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করত এখন সেখানে করছে প্রতি চারজনে একজন। যেসব বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয় তার অর্ধেক বিচ্ছিন্ন হয় বিবাহের সাত বছরের মধ্যে। ১৯৬৯—৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি হাজার বিবাহের মধ্যে ২৬টি বিচ্ছিন্ন হয়, যে জায়গায় ১৯২০—৩০ সালে প্রতি হাজারে বিবাহে বিচ্ছেদের সংখ্যা ছিল ১০ থেকে ১৩।

আর্থিক আয় ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণ করে ব্যুরো দেখিয়েছেন, যে দম্পতির বাৎসরিক আয় পাঁচ হাজার ডলারের বেশী তাদের মধ্যে ৭২ শতাংশের প্রথম বিবাহ স্থায়ী হয়েছে, যে সব দম্পতির আয় বছরে পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার ডলারের মধ্যে তাদের ৭৭ শতাংশ প্রথম বিবাহেই সুখী থেকেছে; যে সব দম্পতির বাৎসরিক আয় দশ থেকে ১৫ হাজারের মধ্যে তাদের ৮১ শতাংশ এবং যাদের বাৎসরিক আয় ১৫ হাজার ডলারেরও বেশী, তাদের ৮৩ শতাংশ একবারের বেশী বিবাহ করেনি। আবার শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, যেসব দম্পতির কোন পক্ষের শিক্ষার মান স্কুলের গণ্ডী পেরোয় নি তাদের ৭৫ শতাংশের প্রথম বিবাহ স্থায়ী হয়েছে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যেক্ষেত্রে গ্র্যাজুয়েট তাদের ৯০ শতাংশের প্রথম বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয় নি।

স্থানীয় সংবাদ : বহু উন্নাসিক সংবাদপত্র পাঠক এদেশের 'ভার্নাকুলার' কাগজগুলি পছন্দ করেন না শুধুমাত্র এই কারণেই যে, সেগুলিতে স্থানীয় সংবাদের অত্যধিক প্রাধান্য, যার ফলে 'ইন্টারন্যাশনাল নিউজ' একেবারেই প্রায় থাকে না। আর আন্তর্জাতিক দুনিয়ার খবরা-খবরই যদি ঠিকমত রাখা না গেল তবে কাগজ পড়ে লাভ কি? কিন্ত তাঁরা শুনলে বোধহয় অবাক হবেন যে, পৃথিবীর সকল দেশেরই সংবাদপত্রের ৭৩ শতাংশ ভাগ স্থানীয় সংবাদে পূর্ণ থাকে এবং এ ব্যাপারে ভাষা, রাজনৈতিক মতবাদ ইত্যাদি কোন কিছুই কোন ব্যতিক্রম ঘটাতে পারে নি।

এক আন্তর্জাতিক সমীক্ষক দল এক বছর ধরে তথ্যানু-সন্ধানের পর সম্প্রতি তাঁদের প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেছেন, শিক্ষা সংস্কৃতির মান, রাজনৈতিক ভাবাদর্শ বা সাংবাদিক দৃষ্টি-ভঙ্গী যাই হক, স্থানীয় সংবাদের গুরুত্ব কোন বিবেচনাতেই হ্রাস পায় নি। তাঁরা আমেরিকার প্রধান সাতটি জাতীয় দৈনিকের এক বছরের সংবাদ বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, তার শতকরা ৭৪ ভাগ হল স্থানীয় অথবা সেদেশেরই জাতীয় সংবাদ। সোভিয়েট ইউ-নিয়নের তিনটি প্রধান সংবাদপত্রও এর কোন ব্যতিক্রম নয়। ঐ তিনটি সংবাদপত্রের ৭৩-৬ শতাংশ স্থান ভরে থাকে স্থানীয় সংবাদে। এশিয়ার সংবাদপত্রগুলিতে স্থানীয় সংবাদের হার হল ৭৪-৩ শতাংশ, লাতিন আমেরিকার ৭১-৮ শতাংশ এবং সারা পৃথিবীর গড় হিসাব হল ৭২-৮ শতাংশ। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, যেবছর তাঁরা সমীক্ষা কার্য চালান সে বছরে লাওসের যুদ্ধ, ইতালীর মন্ত্রিত্ব সংকট, ভারতে সাধারণ নির্বাচন, পেন্টাগনে বোমা বিস্ফোরণ, উরুগুয়ের সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে মার্কিন বন্দীদের মুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সারা বছরে বিশ্বের সংবাদপত্রে বহির্দেশীয় সংবাদ ২৭-২ শতাংশের বেশী স্থান সংগ্রহে সমর্থ হয় নি।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

ভাষার দাবী ও জাতীয় সংহতি

এক ভাষা এক রাজ্য এই নীতিতে স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন রাজ্যের পুনর্গঠন করা হলেও একই রাজ্যে ভাষাগত সংখ্যালঘু কিছু সংখ্যক থেকে যাবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। মাতৃভাষা সকলেরই প্রিয়। কোনো ভাষাগোষ্ঠীই নিজের ভাষার অধিকার অন্য কাউকে কেড়ে নিতে দিতে পারে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অন্যান্য সব মৌলিক অধিকারের মতোই মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ ও তার চর্চার অধিকার নাগরিকরা সঙ্গতভাবেই দাবী করতে পারে। ভারতবর্ষে নাগরিকদের এই অধিকার স্বীকার করেই নেওয়া আছে। বাস্তবে তার প্রয়োগ নিয়ে কোনো কোনো জায়গায় বিতর্কের অবকাশ থাকলেও, কোনো ভাষাগোষ্ঠীকে দাবিয়ে অপর ভাষাগোষ্ঠীর প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টাকে কেউ সমর্থন করে না। ভারতের গণতান্ত্রিক বিকাশ ও জাতীয় সংহতির স্বার্থেই প্রত্যেক ভাষাগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরী।

সম্প্রতি ভাষার প্রশ্নে পশ্চিম বাংলায় দার্জিলিং জেলায় একটা বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। দার্জিলিং জেলার পার্বত্য মহকুমাগুলোতে নেপালীভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নেপালীভাষাকে একটি আঞ্চলিক ভাষারূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কাজকর্মে বাংলা ও নেপালী দুটি ভাষাই ইংরেজির পাশাপাশি স্বীকৃতি লাভ করেছে। দার্জিলিং-এর নেপালীভাষীরা যাতে কোনোরূপ অসুবিধার সম্মুখীন না হন তার জন্য উক্ত জেলার পার্বত্য মহকুমাগুলোতে, স্কুলে ও কলেজে, নেপালীভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও স্বীকৃত। নেপালীভাষীদের সুবিধার জন্য উক্ত অঞ্চলে সরকারী কাজকর্মে ইংরেজির পাশাপাশি যথাসম্ভব নেপালীভাষাকেও ব্যবহার করা হচ্ছে। সুতরাং একথা বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে ভাষাগত সংখ্যালঘু হিসাবে নেপালীভাষীরা তাঁদের অধিকার লাভ করেছেন। তবে একথা ঠিক যে, সরকারী কাজকর্মে বাংলাভাষার ব্যবহার যেমন সীমাবদ্ধ, নেপালীভাষা ব্যবহারের সীমাবদ্ধতার কারণও একই। কিন্তু নীতিগতভাবে এবং আইনগতভাবে বাংলা ও নেপালী সমান মর্যাদাই লাভ করেছে। এখন যত শীঘ্র আমরা নিজেদের ভাষায় বইপত্র লিখে, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে এবং সরকারী কাজকর্মে তাকে ব্যবহার করতে পারব ততই তার মর্যাদা হবে সুপ্রতিষ্ঠিত। নেপালীভাষীরা এখন চাইছেন সংবিধানের অষ্টম তপশীল অনুযায়ী নেপালী ভাষার জাতীয় স্বীকৃতি। লাখ পঞ্চাশেক লোক গোটা ভারতে নেপালীভাষায় কথা বলে। সুতরাং সংবিধানের স্বীকৃতি দাবী করা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু এর জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করা এবং প্রধানমন্ত্রীর সভায় হাঙ্গামা সৃষ্টি করা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য জনগণের ন্যায্য অভিযোগকে অনেকে চতুরভাবে ব্যবহার করে। তাতে আসল উদ্দেশ্যই হয় ব্যর্থ। নেপালীভাষার মর্যাদা লাভের পথে তা হয়ে দাঁড়াবে এক প্রতিবন্ধক। প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, এই দাবীর বিষয় তিনি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন। এজন্য তিনি আলোচনা বৈঠকও আহ্বান করেছেন। যা আলোচনার দ্বারা মীমাংসা করা যেতে পারে তাকে রাস্তায় বিক্ষোভের বিষয়বস্তু করে তুললে ক্ষতি হয় জনসাধারণের। এই সত্য কথাটা বিস্মৃত হলেই অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে। দার্জিলিং-এর নেপালীভাষীরা তা মনে রাখলে নিজেদেরই কল্যাণ করবেন।

ভাষা নিয়ে এর চেয়েও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে আসামে। গত এক মাস ধরে সেখানে সংখ্যালঘু বাংলাভাষীদের ওপর চলছে অকথ্য নির্যাতন। হত্যাকান্ড, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া, অসহায় সংখ্যালঘুদের বিতাড়ন চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। সংখ্যালঘুদের অপরাধ—তারা চেয়েছিল মাতৃভাষায় পড়াশোনার অধিকার। এতকাল বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অসমীয়ার পাশাপাশি ইংরেজিও ছিল শিক্ষার মাধ্যম। এখন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় একমাত্র অসমীয়াকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রবর্তন করতে চাইছে। ইংরেজিকে বছর দশেক রাখা হবে, কিন্তু সংখ্যালঘুদের ভাষার ব্যবহার চলবে না। এতে স্বভাবতই সংখ্যালঘুরা শঙ্কিত। কারণ এই সংখ্যালঘুরা আসামের অধিবাসী। আসামের সুখ ও সমৃদ্ধিতে এদের অবদান সামান্য নয়। এখন যদি তাদের মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়া হয় তাহলে সমাজে তারা দাঁড়াবে কোন ভিত্তির ওপর। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় উগ্র অসমীয়াপ্রেমিকরা চাইছেন, বাংলাভাষী অধ্যুষিত কাছাড় জেলাকে প্রয়োজন হলে আলাদা করে দিয়ে অসমীয়াকেই একমাত্র ভাষা হিসাবে চালু করতে। আসামে অসমীয়াভাষার প্রাধান্য অবশ্যই থাকবে। আসামে যাঁরা থাকবেন তাঁরা অসমীয়াভাষা শিখবেন স্বেচ্ছায় এবং আসামের প্রতি ভালবাসার জন্যই। কিন্তু নিজের মাতৃভাষা বাদ দিয়ে নয়। এই সহজ সত্য যদি অসমীয়াভাষীরা না বোঝেন তাহলে ক্ষতি হবে আসামেরই। আসামে একাধিক ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস। তাদের সহযোগিতা ছাড়া আসামের তথা পূর্বাঞ্চলের এই রাজ্যের অখন্ডতা ও সংহতি রক্ষা করা সম্ভব নয়। এই সমস্যার প্রতি সে কারণেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী আসাম সফর করে এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। আসামের ভাষাগত সংখ্যালঘু কমিটির সদস্যরা সব সময়েই বলছেন, আলোচনার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করতে। অথচ তাদের ওপর আসাম বিধানসভা এবং গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল জোর করে ভাষা প্রস্তাব চাপিয়ে দিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত যে আসামের পক্ষে ক্ষতিকর এবং জাতীয় সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করবে, এই সত্য উগ্র ভাষাপ্রেমিকরা যদি উপলব্ধি না করেন তাহলে দেশের পক্ষে তা হবে ঘোরতর দুর্দিনের সূচনা।

স্টকহোম : এবার পদার্থবিদ্যায় তিনজন মার্কিন বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে—ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ লিওন কুপারকে (বাঁয়ে) পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন রবার্ট শ্রিফারকে (মধ্যে) এবং ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জন বারডিনকে (ডানে।) ডঃ বারডিন ইতিপূর্বে ১৯৫৬ সালে আর একবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তিনিই প্রথম দুবার নোবেল পুরস্কার পেলেন।
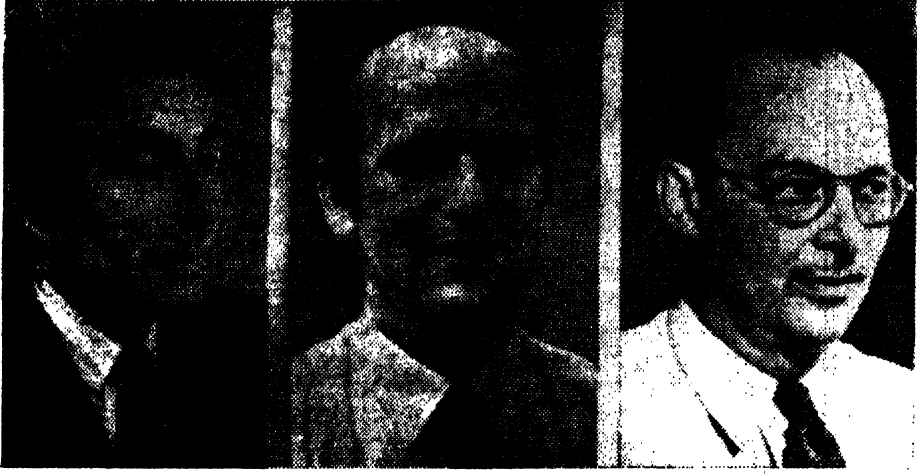
দেশে বিদেশে

'ভিয়েৎনামে শান্তি প্রতিষ্ঠা আর মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার, এমন কি তার আগেও হয়ে যেতে পারে'—এই কথাগুলি যখন ডঃ হেনরী কিসিংগারের তখন তা উপেক্ষা করার কোনো উপায় নেই। আর নভেম্বরের সাত তারিখে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগেই যখন এ সম্পর্কে একটা বোঝাপড়া হওয়ার সম্ভাবনা, তখন ডঃ কিসিংগারের কথাগুলি আরো বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। ভিয়েৎনামে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, এই ধরনের জল্পনা যে মোটেই মিথ্যে নয় ইতিমধ্যে তার নানা লক্ষণও স্পষ্ট। কিন্তু তবু কি রক্তস্নাত ভিয়েৎনাম শীঘ্রই শান্তির মুখ দেখবে?

এই সন্দেহ যদি দেখা দিয়ে থাকে তবে তা অকারণে নয়। প্রথমে মার্কিন সাপ্তাহিক **নিউজ উইক** যে সংবাদ দিয়েছিল পরে **নিউ-ইয়র্ক টাইমসও** দিয়েছে সেই সংবাদ। সেটা হল, ভিয়েৎনামে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েৎ-নামের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে। সেই সংবাদ যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেল উত্তর ভিয়েৎনাম যখন প্রস্তাবিত ওয়াশিংটন-হ্যানয় চুক্তির বিশদ বিবরণ ফাঁস করে দিল। কিন্তু ন'-দফা চুক্তি সম্পর্কে বোঝাপড়া হলেও তা যে সই হতে পারছে না সে কথাও তো ঠিক। এই অবস্থা ঘটছে কেন?

প্যারিসে শান্তি বৈঠকে উত্তর ভিয়েৎ-নামের প্রতিনিধি সুয়ান টুইয়ের অভিযোগ, 'চুক্তি সই করার ব্যাপারে আমেরিকা শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে আসছে বলেই ভিয়েৎনামে শান্তি প্রতিনিষ্ঠত হতে পারছে না। ডঃ কিসিংগারের সঙ্গে হ্যানয়ের প্রতিনিধিদের যে গোপন আলোচনা হয়েছিল সেই অনুযায়ী অকটোবরের ৩১ তারিখেই চুক্তি সই হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিকসন এখন নানা বায়নাক্কা তুলে সেই তারিখ পিছিয়ে দিতে চাইছেন, কারণ তিনি শুধু আরো আলোচনাই চালাতে চান না, ভিয়েৎনামে আরো লড়াইও চালাতে চান।

কিন্তু ঐ তারিখ পিছিয়ে দিতে উত্তর ভিয়েৎনাম মোটেই আগ্রহী নয়। তার কারণ উত্তর ভিয়েৎনামের নেতারা জানেন যে, প্রেসিডেন্ট নিকসনকে যদি কোনো শান্তি চুক্তিতে রাজী করাতে হয় তবে তা মার্কিন নির্বাচনের আগেই করাতে হবে। নির্বাচনে জিতে যাওয়ার পর (নিকসনই যে জিতবেন এটা এক রকম ধরেই নেওয়া হয়েছে) প্রেসিডেন্ট নিকসন আবার স্বমূর্তি ধরবেন এবং সহজে উত্তর ভিয়েৎনামের সঙ্গে কোনো বোঝাপড়ায় আসতে চাইবেন না। কারণ তখন তাঁর আর মার্কিন ভোটার-দের তোয়াজ করার দায় থাকবে না, এবং হাতে থাকবে আরো চার বছর সময়।

উত্তর ভিয়েৎনাম যে প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তির বিশদ বিবরণ আগে-ভাগেই ফাঁস করে দিয়েছে তার উদ্দেশ্যই হল প্রেসিডেন্ট নিকসনকে সেই সুযোগ না দেওয়া। হ্যানয় বেতারে বলা হয়েছে যে, ভিয়েৎনামে লড়াই থামাবার জন্যে অকটোবরের ৯ তারিখে একটা বোঝাপড়া হয়। মার্কিন বোমাবর্ষণ কবে থেকে বন্ধ হবে, উত্তর ভিয়েৎনামের বন্দর-অবরোধ কবে থেকে প্রত্যাহৃত হবে, হ্যানয়ে কবে শান্তি চুক্তিতে প্রাথমিক স্বাক্ষর পড়বে, তারপর কবে প্যারিসে দু দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা সেই চুক্তিতে পাকাপাকিভাবে সই করবেন সব তারিখই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। আমেরিকা অবশ্য বেশ কয়েকবার এই সব তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার জন্যে অনুরোধ জানায়। তবে শেষ পর্যন্ত অকটোবরের ২২ তারিখে একটা বোঝাপড়া হয়। প্রথমে কথা হয়েছিল, পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা চুক্তি সই করবেন ২৬ তারিখে, তারপর সেই তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয় ৩০ তারিখ পর্যন্ত এবং তারও পরে আবার ৩১ তারিখ পর্যন্ত। উত্তর ভিয়েৎনামের অভিযোগ, আমেরিকা এখন এই নতুন সময়সূচীও মানতে চাইছে না।

প্রেসিডেন্ট নিকসনের উপদেষ্টা ডঃ কিসিংগার অবশ্য ঐ নির্দিষ্ট সময়সূচীর

কথাটা স্বীকার করতে চান না। শান্তি যে আসন্ন, একথা তিনিও বলছেন, কিন্তু কোনো বিশেষ তারিখের ওপর তাঁর তেমন আস্থা নেই। তার কারণ তাঁর মতে, এখনও এ-বিষয়ে দু পক্ষের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজন আছে। এখনও অন্তত আধ ডজন সমস্যা সম্পর্কে কোনো ফয়সালা হয় নি বলে তিনি মনে করেন।

কিন্তু উত্তর ভিয়েৎনাম আর নতুন করে কোনো আলোচনায় রাজী নয়। ডঃ কিসিংগারের সঙ্গে উত্তর ভিয়েৎনামের প্রতিনিধিরা আবার মিলিত হতে রাজী আছেন, এমন কি শ্যাম্পেন পানেও রাজী আছেন, কিন্তু সেটা শুধু চুক্তিতে পাকাপাকি সই করার জন্যে, অন্য কিছুর জন্যে নয়। কারণ আমেরিকার তরফ থেকে যে সব বকেয়া সমস্যার কথা বলা হচ্ছে সেগুলো নিছক অজুহাত ছাড়া কিছু নয়। আমেরিকা এখন বলতে চাইছে যে, এই চুক্তি সম্পর্কে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট টিউয়ের সম্মতিও দরকার। কিন্তু এ-সব কথা আগে বলা হয় নি। তা ছাড়া প্রেসিডেন্ট টিউয়ের আপত্তির কথা তোলাও অর্থহীন। কারণ তিনি যতোই লম্ফ-ঝম্ফ করুন না কেন, তিনি যে নিতান্তই মার্কিন সরকারের হাতের পুতুল এটা কোনো গোপন কথা নয়। সুতরাং তাঁর আপত্তির কথা তুলে চুক্তি সই করতে দেরী করে প্রেসিডেন্ট নিক্সন আসলে কি শান্তির উদ্যোগটাই বানচাল করতে চাইছেন?

উত্তর ভিয়েৎনামের সঙ্গে আমেরিকার প্রস্তাবিত চুক্তির যে বিবরণ হ্যানয় থেকে প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে তা যদি সত্যিই রূপায়িত হয় তবে ভিয়েৎনাম আবার প্রায় ১৯৫৪ সালের অবস্থায় ফিরে যাবে। দিয়েন বিয়েন ফুর সংগ্রামে ভিয়েৎনামীদের গৌরবময় জয়ের পর সই হয়েছিল জেনেভা চুক্তি। সেই চুক্তি যদি রূপায়িত হতে দেওয়া হত তবে এই দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে এত রক্তপাত, এত প্রাণহানি, এত বোমাবর্ষণ, এত ধ্বংসলীলার প্রয়োজন হত না। নতুন যে চুক্তি সম্পর্কে উত্তর ভিয়েৎনামের সঙ্গে আমেরিকার বোঝাপড়া হয়েছে বলে প্রকাশ তার প্রথমেই বলা হয়েছে, জেনিভা চুক্তিতে ভিয়েৎনামের যে সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার কথা স্বীকৃত হয়েছে, আমেরিকা তাকে মর্যাদা দেবে। চুক্তি সই হওয়ার ২৪ ঘণ্টা পরে গোটা দক্ষিণ ভিয়েৎনামে যুদ্ধবিরতি ব্যবস্থা বলবৎ হবে। আমেরিকা ভিয়েৎনামে সব সামরিক কার্যকলাপের অবসান ঘটাবে। দু মাসের মধ্যে আমেরিকা দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে সব সৈন্য সরিয়ে নেবে। মার্কিন সৈন্য অপসারণের সঙ্গে তাল রেখে যুদ্ধবন্দীদেরও মুক্তি দেওয়া হবে।

কিন্তু যুদ্ধবিরতি বা মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের চেয়েও এই চুক্তির আরো উল্লেখযোগ্য বিষয় সম্ভবত এই যে, এর মধ্যে ভিয়েৎনামের জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছে। ন্যায্য ও অবাধ নির্বাচনের মারফৎ দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জনগণ নিজেরাই স্থির করবেন তাঁরা কোন্ ধরনের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ চান। তাছাড়া দ্বিধাবিভক্ত ভিয়েৎনামের পুনর্মিলনের কাজটিও সাধিত হবে ধাপে ধাপে, শান্তিপূর্ণ পথে।

হ্যানয় থেকে প্রস্তাবিত চুক্তির যে বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে, তা যে মিথ্যে নয়, তার প্রমাণ আমেরিকার তরফ থেকে এর কোনো প্রতিবাদ করা হয়নি। তবে ওয়াশিংটনের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে, এইভাবে আগেভাগে চুক্তির বিবরণ ফাঁস করে দেওয়া ঠিক হয়নি। কারণ তাতে বোঝাপড়ায় অসুবিধে হবে। কিন্তু এর আগে যখন ওয়াশিংটন আর হ্যানয়ের মধ্যে গোপন আলাপ-আলোচনার কথা দুনিয়ার লোক জানত না তখন প্রেসিডেন্ট নিক্সনই তো সেই কথা প্রথম ফাঁস করে দেন (এই বছরেরই গোড়ায়)। তখন তিনি বলেছিলেন যে, এইভাবে আলোচনার বিবরণ ফাঁস করে দিলেই শান্তি প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হবে।

●

এম জি রামচন্দ্রন তামিল ছায়াছবির জনপ্রিয় নায়ক, তামিলনাড়ুর রাজনীতিতেও তিনি এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তিনি যে তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে এত বড় নাটকীয় ঘটনার নায়ক হয়ে উঠবেন তা কি তিনি নিজেও জানতেন? এম জি রামচন্দ্রন যিনি সকলের কাছে এম-জি-আর নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন তামিলনাড়ুর ক্ষমতাসীন দল ডি এম কের কোষাধ্যক্ষ। এই মাসের গোড়ায় তিনি মৌচাকে ঢিল ছুঁড়লেন এই কথা বলে যে, ডি এম কে নেতারা তাঁদের ক্ষমতার সুযোগে বিরাট ব্যক্তিগত সম্পত্তি গড়ে তুলেছেন।

দলের সাধারণ কোনো সদস্য এই অভিযোগ তুললে মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি অথবা ডি এম কের অন্যান্য নেতারা তা উড়িয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু এম-জি-আর তো সাধারণ সদস্য নন, তিনি দলের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। তাঁর মুখ থেকে এই ধরনের অভিযোগ শুনে ডি এম কে নেতারা একেবারে খাপ্পা হয়ে উঠলেন এবং খাপ্পা হয়ে উঠে এম-জি-আরকে দল থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে দিলেন। কিন্তু তাঁরা তখনও জানতেন না যে, তাঁদের এই সিদ্ধান্তের পরিণাম কী হবে। গোটা তামিলনাড়ু জুড়ে রামচন্দ্রনের সমর্থকের অভাব নেই। 'এম-জি-আর মানরাম' নাম দিয়ে অন্তত বিশ হাজার গোষ্ঠী আছে ঐ রাজ্যে। ওগুলো আসলে ডি এম কে দলেরই শাখা কিন্তু, এম-জি-আরের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাবার জন্যেই ওগুলোর ঐ নাম রাখা হয়েছিল। ডি এম কের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে এম-জি-আরের মতভেদ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিশ হাজার সংগঠন তাঁর প্রতি সমর্থন জানাল। সমর্থন এল অন্যান্য অনেক মহল থেকেও। কারণ তামিলনাড়ুতে ডি এম কে বিরোধী মানুষের কমতি নেই। তাদের সহযোগিতায় তিনি ঘোষণা করলেন নতুন রাজনৈতিক দল গড়ার কথা।

নতুন দলের নাম হল আন্না ডি এম কে। দলের স্বর্গত নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী আন্নাদুরাইয়ের নাম অনুসারেই নতুন দলের নাম রাখা হয়েছে। এম-জি-আরের অভিযোগ করুণানিধির নেতৃত্বে ডি এম কে দল আন্নাদুরাইয়ের ভাবাদর্শ থেকে সরে এসেছে। নতুন দল আবার সেই সব আদর্শের জন্যে লড়াই করবে যার মধ্যে থাকবে মাদকবর্জন নীতিও।

এম-জি-আরের এই বিদ্রোহ এবং নতুন দল গঠন যে তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে একটা বিরাট ঘটনা সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ এইভাবে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ডি এম কের শক্তি ক্ষয় হবে একথা কেউ ভাবতে পারেন নি। গত নির্বাচনেই প্রমাণিত হয়েছে ডি এম কের শক্তি কতটা। কংগ্রেস পর্যন্ত সেই শক্তির ভয়ে বিধানসভার নির্বাচনে ডি এম কের কাছে সব

আসন বিকিয়ে দেয়, পরিবর্তে পায় লোক-সভার কয়েকটি আসন। সেই ডি এম কে দলকে ক্ষমতা থেকে হটানোর কোনো সম্ভাবনা যে শিগগির দেখা দেবে এমন কথা মনে করা সহজ ছিল না। আন্না ডি এম কে গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে করুণানিধিকে হটানো যাবে, এমন কথা অবশ্যই ঠিক নয়। কারণ এখনও বিধানসভায় তাঁর দলের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা রয়েছে। তা ছাড়া, এম-জি-আর ব্যক্তিগতভাবে যতোটা জনপ্রিয় ঠিক ততো বড়ো সংগঠকও কিনা তার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। তবে করুণানিধির দুশ্চিন্তার সময় যে সুরু হয়েছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ ইতিমধ্যে বিধানসভার তিনজন সদস্য নতুন দলে যোগ দিয়েছেন। ফলে এম-জি-আরকে নিয়ে বিধানসভায় নতুন দলের শক্তি দাঁড়িয়েছে চার। এটা এখনও কোনো উল্লেখ-যোগ্য শক্তি নয়। কিন্তু একটি প্রভাব-শালী তামিল দৈনিকের খবর হল, বিধান-সভার অন্তত ৫৬ জন সদস্য নতুন দলে যোগ দিতে প্রস্তুত হয়ে আছেন।

•

কট্টর কম্যুনিস্টদের হাত থেকে ফিলি-পিনকে বাঁচাবার জন্যেই প্রেসিডেন্ট ফার্দি-নান্দ মারকসকে সামরিক আইন জারি করতে হল, এই কথাটা কিন্তু সকলে বিশ্বাস করতে চাইছেন না। অবশ্য কেউই এ-কথা উড়িয়ে দিতে চান না যে গত বেশ কিছু দিন ধরেই ফিলিপিনে হিংসাত্মক ঘটনা চলছিল। এই মাসেরই গোড়ায় সরকারের তরফ থেকে সবাইকে হুঁসিয়ার করে দেওয়া হয়েছিল যে, কম্যুনিস্ট গুপ্তঘাতকের দল গোটা শরৎকাল জুড়েই তাণ্ডব চালাবে। তারপর কয়েকদিন যেতে না যেতেই চতুর্দিকে বোমা ফাটতে সুরু করে। আর গত ২২ সেপ্টেম্বর খোদ প্রতিরক্ষা সচিবকেই হত্যার চেষ্টা করা হয়।

•

এ সবেরই মূলে আছে নিউ পিপলস্ আর্মি নামে এক মাওবাদী সংস্থা—এই হল সরকারের বক্তব্য। এই সংস্থা শুধু যে চীনের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পায় তা নয়, রসদও পায় বলে অনেকের ধারণা। এদের সক্রিয় সদস্যের সংখ্যা নাকি হাজারখানেকের কম নয়। সমর্থকের সংখ্যা হবে আরো হাজার পঞ্চাশ। এদের কার্যকলাপ যে-ভাবে চলছিল তাতে দরকার হলে যে সামরিক আইন জারি করতে হতে পারে, এমন ইঙ্গিত প্রেসি-ডেন্ট মারকস আগেই দিয়েছিলেন।

কিন্তু অনেকেরই সন্দেহ, তিনি শুধু এই কারণেই সামরিক আইন জারি করেন নি। তিনি আসলে এক ঢিলে তিন পাখি মারতে চান। একটা পাখি অবশ্যই ঐ নিউ পিপলস্ আর্মি। দু নম্বর পাখি হল বিরোধী দল। মারকসের আট বছরের শাসনে ফিলিপিন্সের সাধারণ মানুষের খুব বেশি উপকার হয় নি। অর্থনৈতিক বিকাশ প্রার্থিত গতিতে ঘটে নি। বিদেশী দেনার দায় ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই অবস্থায় বিরোধী পক্ষ স্বভাবতই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্যে সামরিক আইনকে কাজে লাগানো যাবে। এই সন্দেহ যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ, সামরিক আইন জারি করার সঙ্গে সঙ্গে যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে শুধু কম্যুনিস্টরাই নেই, আছেন বিরোধী লিবারেল পার্টির সাধারণ সম্পাদক সেনেটর আকুইনো, অনেক সংবাদপত্রের মালিক ও সাংবাদিকরা। গত বছর নভেম্বর মাসে সেনেটের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট মার-কসের মনোনীত প্রার্থীরা যখন হেরে যান তখন থেকেই ম্যানিলা টাইমসের প্রকাশকের ওপর প্রেসিডেন্টের রাগ। কারণ ঐ প্রকাশকটি প্রেসিডেন্টের বিরোধিতা করেছিলেন।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট মারকস এই সঙ্গে তৃতীয় একটি পাখিও মারতে চান। তিনি পর পর গত দুবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে-ছেন। তবু তাঁর ইচ্ছে, আরো একবার তিনি প্রেসিডেন্ট হন। কিন্তু সেখানে বাদ সেধেছে দেশের সংবিধান। মার্কিনদের তৈরি (এক সময় ফিলিপিন্স মার্কিনদের অধীন ছিল) সংবিধান অনুসারে কেউ একাদিক্রমে তিনবার প্রেসিডেন্ট হতে পারেন না। সংবিধান সংশোধনের জন্যে প্রেসিডেন্ট মারকস একটি কমিশন নিয়োগ করেছেন, কিন্তু তার কাজ এগোচ্ছে খুবই ধীর গতিতে। এদিকে প্রেসি-ডেন্ট নির্বাচন আগামী বছরে। এই অবস্থায় যদি সামরিক আইন জারি করা যায় তবে নির্বাচনটা স্থগিত থাকে। ইতিমধ্যে সংবি-ধান সংশোধনেরও ব্যবস্থা করা যায়।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট মারকসের এই রণ-কৌশল কতো দূর সার্থক হবে সেটা এখনই বলা মুস্কিল। কারণ বর্তমান সংবিধানে দেশে সামরিক আইন জারির কোনো ব্যবস্থা নেই। সুতরাং সুপ্রিমকোর্ট প্রেসিডেন্টের এই আদেশ খারিজ করে দিতে পারেন। অবশ্য মারকস যদি নিজে আগামী নির্বাচনে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করতে না-ও পারেন তবে হয়ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখতে পাওয়া যাবে তাঁর সুন্দরী পত্নী ইমেল্ডাকে। সেটাও হবে বকলমে মারকসেরই শাসন।

২৮-১০-৭২ দেবদত্ত

এখন ফিরে যেতে হবে, মানে ফিরে যাওয়া উচিত। তিমির কথাটা ভাবলেন দু-একবার, সব গোছগাছ করে নিতে নিতে আধ ঘন্টা বা তারও বেশি, প্রায় সাতটা বেজে যাবে তাহলে। কখন আসা হয়েছিলো? মনে মনে হিসেব করে দেখলেন তিমির সকাল আটটার মধ্যেই এখানে পেৌঁছে গিয়েছিলেন তাঁরা। দশ-এগার ঘণ্টা সময় এখানে কাটানো গেল, চশমার কাচ মুছতে মুছতে তিমির ভাবছিলেন—বেশ হৈ-চৈ হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে দিনটা খুব সুন্দর গেল। অবশ্য আনন্দ করতেই তো আসা।

—বেশ লাগছে না? অতসী কখন রোদের ভেতর মুখ ভাসিয়ে কথাটা বলেছিলো।

—হ্যাঁ, বহুদিন পর দারুণ এনজয় করা গেল, সকলে মিলে, তিমির ঠান্ডা চোখে অতসীর শরীরে রোদ্দুরের টুকরো দেখতে দেখতে পরিতৃপ্তির হাসি হেসেছিলেন।

—তুমি তো প্রথমে তেমন গা করছিলে না, কাল বললে, অম্বলের সেই বিশ্রি ব্যথাটা টের পাচ্ছি একটু একটু, অত দৌড়-ঝাঁপ, ছুটোছুটি, পোষাবে না আমার, তোমরা যাও।

—বলেছিলাম বুঝি? তিমির খুব আলগাভাবেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কথাটা।

—আর এখানে এসে তুমিই কিন্তু ছেলেমানুষের হদ্দ হয়ে গেলে...তুমি যখন স্নান করতে নামলে, আমার এমন হাসি পাচ্ছিল। অতসীর হাসি এলোমেলো হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছিলো বিশাল মাঠে।

—কেন, হাসি কেন? তিমির বেশ গম্ভীর হতে চেষ্টা করলেন।

—বাঃ হাসবো না? এই বয়সে হাফ প্যাণ্ট পরে জলের ভেতর হাত, পা ছুঁড়ছ তুমি...খবরটা যদি পেত তোমার ছাত্রছাত্রীরা যে, তাদের প্রিন্সিপ্যাল...অতসীর সমস্ত শরীর হাসিতে কাঁপছিলো।

—হ্যাঁ অনেকদিন পর, সাইকেলও চড়লাম।

বিকেলের আলো ঢাকা পড়ে যাচ্ছিলো টিলার মাথায়, এক ধরনের বিষণ্ণ আলো মানুষের শরীর ছুঁয়ে ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে এখন, সেই আলোয় নিচু আকাশের তলায় অতসীকে দেখলেন তিমির, সামান্য হাওয়া অতসীর কপাল ছুঁয়ে চুলের ভেতর... তিমির দেখলেন অতসীর মুখ এখন প্রতিমার মত গাঢ় ও উজ্জ্বল।

—তুমিও কিন্তু কম হৈ-চৈ করলে না অতসী।

—বা রে! করবো না কেন! এলাম তো...

—আমার কিন্তু ভয় হচ্ছিল খুব, তোমার স্টেন হচ্ছে, যদি আবার সেই কার্ডিয়াক পেনটা হঠাৎ...ডঃ পালিত কিন্তু তাহলে খুব বকাবকি করতেন আমাকে, তিমির খুব শান্ত গলায় কথা বলতে থাকলেন, যা এই বিকেলের ভেতর থেকেই উঠে আসে।

—হৃদয়ের পীড়া?...তিমির টের পেলেন হৃদয় শব্দটার ওপর যথেষ্ট জোর দিয়ে অতসী চোখ তুলে তিমিরকেই দেখল একবার।

সামান্য একটু অস্বস্তি বোধ করলেন তিনি। এই বিকেলে, নিরুদ্দেশ মাঠে প্রথম ফাল্গুনের অজস্র হাওয়ার ভেতর দাঁড়িয়ে এক ধরনের বিষাদ বা অন্য কিছু যেন রক্তের ভেতর নামছে, টের পেলেন তিনি। সিগার ধরাতে ধরাতে হিসেব করলেন কত বয়স হল তার আটচল্লিশ, না উনপঞ্চাশ? বয়সের তুলনায় তাকে একটু বেশিই পিন্ট দেখায়, অতসী আড়ালে মাঝে মাঝে বুড়ো বলে গাল দেয়, অতসীর কত এখন? খুব কী কম? তাদের মধ্যে বয়সের তফাৎটা কত ছিল? তারা দুজন একই সঙ্গে পড়েছেন, একই সঙ্গে মাস্টারির চাকরি নিয়েছেন, তবে বছর-তিনেক নষ্ট হয়েছিল তার নিজের, হঠাৎ বাবা মারা যাওয়ায় সব কেমন উলটিয়ে গেল জীবনের। তখন ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র তিনি, তাহলে অতসীরও চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হল নিশ্চয়ই, আর একবার ধোঁয়ার আড়াল দুরে ভেঙে অতসীকে দেখলেন তিমির। কে বলবে এত বয়স হয়েছে অতসীর! কপাল উজ্জ্বল, মুখে এখনও দাগ পড়েনি, সমস্ত মেয়েলি চরিত্রও এখনো নিটোল, হাসলে বা জোরে কথা বললে হঠাৎ অতসীকে তিমিরের ছাত্রী বলে ভুল হয়, অথচ, অথচ...

—ইতি, রাজন্য ওরা কোথায়?

—আছে, ওদিকে সব, ওদের মধ্যে তর্ক বেঁধেছে, দু হাজার এক খৃষ্টাব্দে ওরা কোথায় বেড়াতে যাবে, চাঁদে, না মঙ্গলে?

—আর দক্ষিণা, আরতি, জয়, শুভ, যূথিকা, পার্থ—ওরা সব?

—আছে, আছে, সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, বোঝো না? অতসীর সরু চোখ ঝকঝক করে উঠলো।

ইঙ্গিতটা বুঝলেন তিমির, ও হাঁ, আমরাও তো এখানে, পারলে তিমির খুব জোরে হেসে উঠতেন।

—আজ খুব ছেলেমানুষী করেছি না?

অতসীর শুকনো ঠোঁটে আঙুল, ছায়া পড়ছে নাকি ওর শরীরে?

—আমার তো একবার মনে হয়েছিল ইতিও তোমার মত এতটা বোধহয়... তিমিরের আঙুলে এক তীব্র অস্থিরতা খেলে গেল। বিকেলের হলুদ শরীরের ভেতর দিনশেষের অন্ধকার কী টানছে এখন অতসীকে?

—হাওয়া দিচ্ছে বেশ জোরে, বাবলুকে মাফলার জড়াতে বল গলায়, ওর টনসিলের দোষ।

গরম লাগছে বেশ। দূরের টিলার মাথায় রক্তের মত রোদ গড়িয়ে নামছে, আর কচ্ছপের পিঠের মত ওই টিলাটার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন তিমির। সিগারের ধোঁয়া তিন-চার টুকরোয় অদ্ভুত আকৃতি নিয়ে যেন চোখ জুড়ে আছে, হাত-পা কেমন শিথিল লাগলো হঠাৎ, মাথার ভেতর যেন খাদের থেকে টব উঠে আসার যান্ত্রিক শব্দ...যেন বড় দুর্ঘটনার পর খুব আলগাভাবে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসছেন, কয়েকবার শরীর টান করা দম পড়লো, হাওয়ায় কী বুক ভেঙে যাবে এখন? চশমাটা বড় বেশি আঁট হয়ে বসেছে নাকের ওপর? চোখ তুললেন তিনি, টিলার মাথায় ভয়ংকর এক টুকরো মেঘ, এখন সূর্যের আগুনে জ্বলছে। মধ্য-ফাল্গুন এখন, ঝড়ের সময় নয়, তবু এক দুর্দান্ত ঝড় খেলে গেল রক্তের ভেতর, অসুস্থ লাগছে কী নিজেকে? নিজেকেই পারলে এখন বকাবকি করতেন। না, এতটা উচিত হয়নি এই বয়সে। আহ! কোনো ঠাণ্ডা ছায়ায় শরীর ছড়িয়ে এখন বড় শুতে ইচ্ছে করে, ...শরীরে হাওয়ার হাত, একটি নীল নক্ষত্র স্বপ্নের মত নামবে চোখের ওপর...শাঁখের শব্দ, বাতাসায় থালা হাতে মা, মার শরীরে পুজোর ঘরের সেই গন্ধ...চোখ বুজে আসছে...সমস্ত স্নায়ু-কেন্দ্র কী ছুটে যায়?...শরীর কাটা ঘুড়ির মত উদ্দেশ্যহীন ভাসছে এখন...না, এত শাঁতায় কাটা ঠিক হয়নি তার। সিগারের ছাইয়ের সঙ্গে চিন্তাটা যেন মিশে গেল।

বাদামি রোদ এখন আঁশফলের রঙ ধরতে শুরু করেছে। এই আলোয় নিজের শরীর কেমন রহস্যময় হয়ে ওঠে, সূর্যাস্তের এই দুঃখী আলোয় ঠাণ্ডা ছায়ার আড়ালে হারিয়ে যাওয়া অদ্ভুত! তি—মি—র! কোথায় মাঠের ভেতর থেকে বৃষ্টির শব্দের মত তার নাম—তি-মি-র... কেমন আশ্রয়হীন একা তিমির। কে তার নাম ধরে এই শেষ-বিকেলের মাঠে ডেকে উঠছে এখন? তার নাম ধরে ডাকার এখানে তো প্রায় কেউ নেই, একটা ভোঁতা 'স্যার' শব্দের নিচে কখন তিমির নামটা চাপা পড়ে গেছে। নিজেই ভেবে অবাক হয়ে যান, অতসী অবশ্য আছে, কিন্তু ওরও এখন আর নাম নিয়ে সুখের খেলার সময় নেই, শাড়ির রঙের মতই কখন অজান্তে সব অভ্যাসও পালটে গেছে, টেরই পায়নি অতসী। সেই অতসী! হঠাৎ যেন হোঁচট খেলেন তিমির... ধীরে ধীরে সব পালটায়, ধুলো জমে কী বুকের তলায়? ভেতরে দরজা বন্ধ হয়ে যায়, শুধু গুমোট অন্ধকারে কে খোঁজে পুরনো সেই মুখ? ফিলজফি। কেমন এক ক্লান্ত হাসি এখন ভেঙে দিতে চাইল তাকে ...দৃষ্টি সন্ধ্যার ধূসরতায় হারিয়ে যেতে চাইছে, এখন যদি অতসীকে কাছে ডেকে এসব কথা বলা যায়। তিমির জানেন, হাসির ভেতরও অস্বস্তি চাপা দিতে পারবে না ও, অথচ তিমিরের রক্তের ভেতর হঠাৎ এক দুরন্ত ইচ্ছের যেন ঘুম ভেঙে যায়, অতসীকে কাছে ডেকে বললে হয়...এই বিকেলের মৃত্যুর মধ্যে দাঁড়িয়ে তোমার চুলের গাঢ় গন্ধে আমার বুক ভরে নিতে দাও, তোমার ত্বকের মসৃণতায় অবাধ্য হাওয়ার মত খেলা করুক আমার আঙুল। ...ওই রাগী মেঘ কী বৃষ্টি হয়ে ছুটে আসবে? তিমির শূন্য চোখে তাকিয়েই রইলেন। চাঁপার পাপড়ির মত কী উড়ে আসছে তাঁর কাছে? সময় মুখ ফিরিয়ে...চোখ বন্ধ করেন তিমির... পাহাড়-ঘেরা বৃষ্টি...বৃষ্টি... ওই তো তুমি কেমন ছুটছো অতসী। আমার পায়ে লেগে গড়িয়ে পড়লো একটা সাদাটে পাথর, তোমার ঠোঁট নীলাভ, অসংখ্য জলকণা মেখে স্নিগ্ধ টগর ফুলের মত তোমার শরীর, বাজ পড়ার শব্দে ভয় পেলে তুমি? নাকি নকল এক ভয়ে আমার শরীর ছুঁয়ে তোমার দুরন্ত শরীর...নামছে ঢেউ হয়ে... কোন বন্যায় পাথর গড়িয়ে নামে অতসী?

আমি সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, সব অবিকল পুরনো সিনেমার মত দৃশ্যেরা আমার সঙ্গে অদ্ভুত মজার খেলা সুরু করে। গেট ঠেলে ওই তো ভেতরে ঢুকছো তুমি, উঠোনে দাঁড়িয়ে ধুয়ে ফেলছো পায়ের কাদা, পেয়ারা গাছের পাতায় বৃষ্টির জল, এখন কেমন ঠাণ্ডা গন্ধ উঠছে বাগান থেকে, বারান্দা থেকে লাফিয়ে নেমে আসা আলো ছুঁয়ে আছে তোমাকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে একবার তোমাকে দেখে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন তোমার মা, ঘরে শুয়ে শুয়ে হয়তো রাসেল পড়ছেন তোমার বাবা...আমি হেঁটে চলে যাচ্ছি, ভয় আনন্দ আর কিছুটা ছেলেমানুষী তখনো মিশে আছে তোমার দৃষ্টিতে, আকাশ দু টুকরো হয়ে গেল বিদ্যুৎ চমকে...মসৃণ পায়ে বারান্দায় উঠে গেলে তুমি, তারপর...অতসী তুমি জানো না, আজ মধ্যরাত আবার ডুবে যাবে বৃষ্টির শব্দে, আজ সমস্ত রাত কেতকীর গন্ধের মত তুমি ভরে থাকবে আমার ঘর...তুমি কী একটা স্বপ্ন দেখবে বৃষ্টিতে জল হয়ে যাচ্ছে আমাদের দু'জনের শরীর, কে তখন চারদিক থেকে মন্দিরের আরতি-ঘন্টা বাজিয়ে দিল? আমার কপালে কী যেন ছুঁইয়ে দিলে তুমি...

পরদিন লাইব্রেরিতে দেখা হলে তোমার সেই ঠোঁট ভেজানো হাসি, জানো, মা ভীষণ বকেছে কাল।

—কেন?

—বলেছে, তোমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, দু' মাসও বাকি নেই পরীক্ষা, এখন এ রকম ভিজে ভিজে একটা অসুখ বাধিয়ে বসলে...হাসির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল তোমার চুড়ির মিষ্টি শব্দ।

—আমার কী দোষ, বৃষ্টি দেখে প্রথমে তো তুমিই নেচে উঠলে ভিজবে বলে...

চমৎকার?

—কী?

—তাই বলে অমন রাক্ষুসেপনা করতেও কী আমি বলে দিয়েছিলাম তোমাকে? গাঢ় চোখে অতসী জরিপ করে তিমিরের মুখ,

—রাক্ষুসেপনা আবার কী?

—আহা-রে? কী সাধুপুরুষ? ঘুমোতে পারিনি কাল সারারাত, কাঁধের কাছটা এখনো টন টন করছে...

—এই অতসী, মা জানে এসব?

—মায়েরা এমনিতেই সব টের পেয়ে যায়, গুন্ডাদের হাত থেকে মেয়েদের বাঁচানো সব মায়েরই একটা ইনসটিংক্ট... ভারি ভারি বইয়ের ভেতর হাসি গড়িয়ে পড়েছিল অতসীর।

তিমির তাকালেন চারপাশে। একা। এখন কেউ কাছে নেই। এখন যদি চিৎকার করে কাউকে বলা যায়...কাকে বলতে পারি, ছায়ার আড়ালে অন্ধকার শরীরে এখন কোথায় অতসী? অতসী, পঁচিশ বছর আগের সেই অজস্র গোপন সুখ দুঃখ, সেই বুকের তোলপাড়, সেই দায়িত্বহীনতা, ভুল করার সাহস, সেই স্বপ্নের বেলুনটা এখন কার কাছে ফিরে চাইবো? কাছে ডেকে বললে অতসী কী কিছু বুঝবে? ওর সঙ্গের বাসকেটে ও আজ এনেছে মাথা ধরার ট্যাবলেট, ডেটল, আমার জন্য আলাদা ফুটিয়ে আনা খাবার জল। পোকার মত কী অন্ধকার উড়ে আসছে চোখের ভেতর? হাঁপাতে থাকলেন তিমির, বুকের লাবডাব্ শব্দটা এই খোলা মাঠে ছড়িয়ে পড়ছে, পা কাঁপছে, কচ্ছপের পিঠের মত ওই টিলাটা কী এখন গিলে ফেলবে তাকে? সন্ধ্যায় ছড়ানো মাঠে তি...মি...র ডাকটা কে এখন ঘন্টার মত বাজাতে বাজাতে চলে যাচ্ছে? জলপ্রপাতের মত সেই নাম এখন কী ভাসিয়ে দেবে তাকে? আর একবার তাকালেন, রোদ্দুরের ভগ্নাংশ এখনো আকাশের উঁচু ডালে ছড়ানো, একটা মুচকুন্দ গাছের ডালপালার ছায়া মেখে মেখে দূরে হেঁটে যাচ্ছে অতসী, বুকের ভেতর যেন দাঁড় টানার মন্থর ভারি শব্দ? কাকে দেখছেন তিমির? যে হেঁটে যাচ্ছে তার ঈষৎ ভারি শরীর, শাঁতের নির্ভুল চিহ্ন ঢলের ভেতর...স্তব্ধ হয়ে সব দেখতে লাগলেন তিমির।

এখন অনেক কাজ অতসীর, সব দায়-দায়িত্ব তো তারই, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা সব জিনিসপত্র গোছানো, ছেলে-মেয়ে, ওদের বন্ধু-বান্ধবদের তাড়া দিয়ে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করা, কিছু ফেলেটেলে না যাওয়া হয় তার জন্য সতর্ক চোখ রাখা, ব্যাডমিন্টন কোথায় ফেলেছে ওর সানগ্লাসটা, তাই খোঁজা-খুঁজি, জয় বোধহয় একটা রেকর্ড অসাবধানে ভেঙে ফেলেছে সেসব সামলানো, তিমির দেখছেন দিনশেষের এক ধুসর বৃত্ত উঠে আসছে অতসীর শরীরে, সাপের ঠান্ডা শরীরের মত, সরে যাও অতসী, সরে যাও, ওই ছায়া ভেঙে ফেলতে দাও আমাকে।

কৃষ্ণ মোষের মত মেঘের চেহারাটা ভেঙে ভেঙে সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে এখন, রক্তমাখা টিলাটার মাথায় আর ছাওয়া নেই, তিমির বুঝলেন এখন হঠাৎ একটা দমকা উঠতে পারে, মুচকুন্দ পথ ঢেকে আছে, টিলার মাথা ঝুলে আছে পুরনো ছবির মত। তিমির জানেন ওই টিলার মাথায় একটা ছোট মন্দির আছে, আর একটু পরেই হয়তো জনহীন শূন্যতা থেকে আরতির ঘণ্টাধ্বনি নেমে আসবে, সেই শব্দ তিমিরের বুকের ভেতর। আজ এই মরাবিকেলে নিজের সঙ্গে এক অদ্ভুত খেলার নেশায় মেতে উঠলেন তিমির, হাঁটতে সুরু করলেন তিনি, বহু যুগ আগের এক ভাঙাচোরা স্বপ্ন কুয়াশার আড়াল থেকে এখন তাকে মুঠোয় ফিরিয়ে আনতে হবে। চমকে উঠলেন তিমির, কার ছায়া পড়ল তাঁর শরীরে? কার নিঃশ্বাসে কেঁপে উঠলেন তিনি? তবে তিনি একা নন? কেউ নীরবে খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে এখন? তবে অতসীই আবার ফিরে এসেছে? তাকে দেখতে পেয়েছে, আর দেখতে পেয়ে সব দায় সব দায়িত্ব ফেলে রেখে কাছে এসেছে অতসী? আঃ! ফাল্গুনের বাতাস আবার ভরে দিচ্ছে শরীর, তাই চল, অতসী, আবার আমাদের পায়ের শব্দে গড়িয়ে পড়ুক সাদাটে পাথর, আবার হঠাৎ তোমার চিবুক জলে উঠুক বিদ্যুতে...মনে পড়ছে না তোমার চৈত্র-সংক্রান্তির সেই মেলা, সেই উৎসব? মানুষের ভিড়, মন্দির সাজানো হয়েছে আলোয়, ওই তো আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার লালরঙের শরীর ভাসতে ভাসতে নাগরদোলায় টিলার মাথা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, অতসী, তুমি ক্রমশ সূর্যাস্তের মেঘ হয়ে যাচ্ছ? কী সুন্দর! দশ পয়সার চাকা ঘোরানো লটারিতে তুমি পেয়ে গেলে একটা বুদ্ধমূর্তি, সূর্যাস্তের মেঘ আবার নামছে...নেমে আসছে হাওয়ার ভেতর...

তারপর সেই সব রাত? যেন তে-কোনা কাচের নল চোখে লাগিয়ে সব আবার দেখতে পাচ্ছি আমি, কার মুখ জলে উঠলো রঙমশালের মত? জ্যোৎস্নার ভেতর নদীর চিকন শরীর এখন এক অলৌকিক ছবি, জ্যোৎস্নার দাগ তোমার বুকে...বালি আর মিষ্টি বাতাস একাকার...

—ফিরবে না অতসী?

—কেন তোমার ভয় করছে?

—জানো কতদূরে এসে পড়েছি আমরা?

—অনেকদূরে না?...তোমার [illegible]

দু'টি জলেরই মতো কেঁপে ওঠে,

[illegible] আগে [illegible]

মহুয়ার গন্ধে এখনো ভালুক বেরিয়ে এলে...

—আসুক-না, তোমার বীরত্বের একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে...

—খুব তো সাহস দেখাছ!

গোড়ালি ভিজিয়ে জলের ভেতর নেমে যায় অতসী, কী খুঁজছে ও? নিজের ছায়া? ওর সমস্ত শরীর ঝিকঝিক করছে এই নির্জন জ্যোৎস্নায়...আকাশ কী ভেঙে পড়ছে এই আলোর প্লাবনে? চোখ আর খোলা রাখতে পারেন না তিমির, মনে হয় এই সেই প্রাচীন জলকন্যা, যে এখন আলিঙ্গনে মুহূর্তে পাতালে টেনে নিয়ে যাবে তাকে,

—উঠে এসো অতসী, ঠান্ডা লেগে যাবে

তুমি নেমে আসতে পারো না? অদ্ভুত ভাবে হাসে অতসী।

জলের ভেতর ভেঙে যায় অতসীর মুখ...হাওয়া...নদীর ঠান্ডা শরীর সব কিছু নিয়ে তোলপাড় করতে থাকে

অতসী, কো থা...য় যাচ্ছ তুমি? ডুবে যাবে যে! তিমিরের ঠোঁট ঝুলে পড়ে, হাঁপাতে থাকেন ভয়ানক। চশমার কাচে লেগে যায় ধুলোর দাগ।

না, ভুল তার, চারদিকে তাকালেন তিমির। একা হাঁটছেন তিনি। চোখে কী ধুলো উড়ে পড়ছে? এখন চারপাশে দিন শেষ হয়ে যাওয়ার শূন্যতা...রোদের রং কোথায়? অনেকটা উঠে এসেছেন তিনি। মুখ ফিরিয়ে একবার নিচে তাকালেন, সারাদিনের বিশ্রাম ও বসার সমতল জমিটুকু এখন ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে; অতসী কী একা ওই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে এখন? হালকা বাতাস টিলার মাথা থেকে নেমে যাচ্ছে নিচে, অতসীর শরীর ছুঁয়ে... তারপর...

না, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অর্থহীন। উঠতে থাকলেন তিমির। মন্দিরের মাথার সাদা তে-কোনা পতাকাটা এখন হাওয়ার টুকরো মেঘের মত ভাসছে, হাঁটুর ভাঁজে ব্যথা, গলার নিচে ঘাম জমছে, একটু দাঁড়িয়ে দেখলেন চারদিকের গাছগুলো অন্ধকার মুখে দাঁড়িয়ে আছে যেন কোনো শাস্তির অপেক্ষায়, বুকের শব্দ টের পান তিমির, আমিও কী তবে এখন এই অন্ধকারে অপেক্ষা করে আছি...এই পথে চোখ বন্ধ করে তিনি উঠতে পারেন। অসংখ্যবার উঠেছেন আগে। কিন্তু মাথার ভেতর সব কেমন জট পাকিয়ে যেতে চায় এখন, কানের খুব কাছেই কী ঝিঁঝি ডাকছে? চৌকোণা পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে একটু বিশ্রাম করে নেবেন? না, পারছেন না, কে বলেছিল আমাকে জলের ভেতর অতক্ষণ দাপাদাপি করতে? এখন ঢিলে হয়ে আসছে সমস্ত শরীর, বুক ছোট হয়ে আসছে...ঘুম এই বিশাল আকাশের নিচে ঘুম এখন বোধহয় টানছে তাকে। উঠতেই হবে। অনেকটা উঠে এসেছেন, আর পাঁচ-সাত মিনিট, ব্যস...আবার তার শরীর ছুঁয়ে তি...মি...র ডাকটা যেন টিলার মাথার দিকে চলে গেল। দ্রুত উঠতে লাগলেন তিমির। এক অদ্ভুত লুকোচুরির খেলা যেন জমে উঠেছে, ওই ডাকটা ধরে ফেলাতেই হবে, খুঁজে বার করতে পারলে বহুদিন পর আবার...

প্রায় পৌঁছে গেছেন তিমির। কয়েকটা ধাপ লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে গেলেন, খুব ভাল লাগছে এখন, আহ! যদি অতসীকেও ডেকে নিতাম। ধূসর নির্জনতার ভেতর আমি... ই...ই... চিৎকার করে উঠতে গিয়েই চোখে পড়ল তিমিরের। মেঘের রক্তাক্ত সাম্রাজ্য ভেঙে ভেঙে দুজন নিচে নেমে আসছে, কারা নেমে আসছে? চোখ যেন জ্বলে উঠলো তার, নেমে আসছে ইতি আর শুভ। অশোকের রং লেগে ওদের শরীরও এখন আগুনে টিলার মাথায় ছড়িয়ে আছে পশ্চিম আকাশের বাদামি আলো; যেন করুণাধারার মতো নেমে আসছে ওদের দুজনের মাথায়। দাঁড়িয়ে পড়লেন তিমির। ওদের পায়ের ধাক্কায় একটা পাথর কী ঠিক তার বুক লক্ষ্য করে নেমে আসবে এখন? চশমার কাচেও কী জ্বলে উঠছে ওই আগুন? স্থির চোখে দেখতে লাগলেন তিমির। হালকা শরীর নিয়ে আলো অন্ধকারের রহস্য ভেঙে নেমে আসছে পঁচিশ বছর আগের অতসী। কিন্তু অতসীর পাশে দাঁড়িয়ে কে? চোখের ভেতর অন্ধকার দুলে উঠলো, টিলার মাথাটা, মন্দিরের চুড়ো সব কী ভেঙে পড়ছে এখন? ঘুরছে... পশ্চিম আকাশ অশোকের অসংখ্য গুচ্ছ...ওই তো নেমে আসছে এক ভারি পাথর, সব ঝাপসা...ক্রমশ স্থির হয়ে আসছে সব।

বাবা!

চোখ খুললেন তিমির। কুয়াশার ভেতর থেকে চোখের ওপর ক্রমশ ইতির মুখ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ওর সম্পূর্ণ শরীর ফুটে উঠতে লাগলো। ইতির মুখ জলে ভেজানো কাগজের মত কেন? কপালে হাত নামিয়ে আনলো ইতি।

—তোমার কী হয়েছে বাবা? ওর গলায় তখন কান্না না ভয়?

—কিছু নয়, তোমাদের ব্যস্ত হবার কিছু নেই, বোধহয় মাথাটা একটু ঘুরে গিয়েছিল। পা বাড়ালেন তিমির।

—স্যার, আপনি আমার কাঁধে ভর দিয়ে নিচে নামুন, স্ট্রেন কম হবে।

তিমির পারলে বধির হয়ে যেতেন। যেন প্রাচীন কোনো গুহার অন্ধকার থেকে আবার সেই ভোঁতা স্যার শব্দটা ঝনঝন শব্দে উঠে এল, এইবার তাকে গ্রাস করে নেবে। চোখ পড়লো শুভর মুখে। ইচ্ছে হয় চেঁচিয়ে ওঠেন...চলে যাও, সবাই চলে যাও তোমরা!

এক এক করে সবাইকে দেখতে পেলেন তিমির। বাবলু, দক্ষিণা, পার্থ আরতি জয় সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখন। বাসকেট থেকে ট্যাবলেট বার করে জল নিয়ে ইতি খাইয়ে দিল। হাওয়া। সমস্ত শরীরে এখন এলোমেলো হাওয়া ভরে আছে। দূরে পুরনো ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে অতসী। খুব ইচ্ছে হল একবার কাছে ডাকেন, ওর আকুল চোখের ওপর নেমে আসুক। অতসী যদি এখন ঠোঁট চেপে ধমক দেয়—বল, কেন একা একা উঠতে গিয়েছিলে ওপরে? না, ছেলেমেয়েরা জালের মত ঘিরে আছে তাকে।

—এখন কেমন লাগছে বাবা?

—স্যার সুস্থ বোধ করছেন তো একটু?

অসংখ্য মুখ ভেসে আছে চোখের ওপর। কিন্তু কাউকে যেন চিনতে পারছেন না তিনি, চেঁচিয়ে উঠবেন—তোমরা কে?...

মসৃণ রাস্তার পেটের ভেতর দিয়ে গাড়ি চলছে এখন। অজস্র হাওয়ায় শরীর ভেসে যায় এখন। জানলার বাইরে উদাসীন মাঠের ওপর একটি সবুজ নক্ষত্র দুঃখীর মত জেগে আছে, তিমির তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। আবার সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। টুকরো টুকরো কথা কানে আসছে তার। ইতি জিয়োলজি নিয়ে পড়ছে, নীলাভ এক টুকরো অদ্ভুত পাথর ও টিলার মাথা থেকে কুড়িয়ে এনেছে, তাই নিয়ে বিশেষজ্ঞের মত কথা বলে যাচ্ছে।

—তখন থেকে পাথর ছাড়া তোমার মুখে আর কোনো কথা নেই? শুভ ইতিকে থামাতে চেষ্টা করে।

—ঠিক বলেছো শুভ, ইতি, তুমি ওপরে শুধু পাথর খুঁজতেই গিয়েছিলে? দক্ষিণা জোরে হাসে।

তিমির শ্রান্ত দেহে বাইরে চোখ রাখল। ওরা কী ভুলেই গেছে পেছনে তিমির বসে, অতসী বসে?

—জানো পার্থদা, এখানে একবার না শর্মিলা ঠাকুর কী একটা ছবির শুটিং করতে এসেছিলো! বাবলু দারুণ উত্তেজিত হয়ে কথা বলে যাচ্ছে।

—বেচারা! তখন তুই যদি খবর পেতিস, তবে আঠারো মাইল হেঁটে চলে আসতে পারতিস...কে যেন পেছনে লাগে বাবলুর।

উৎকর্ণ হয়ে সব শুনতে লাগলেন তিমির। অন্য সময় হলে হয়তো তিনি বিরক্ত হতেন, ওরাই কী সাহস পেত তার সামনে এত মুখর হয়ে ওঠার?

—ফুলের গন্ধ বন্ধুর মত জড়ায়ে ধরিছে গলে কে গাইছে গুন গুন করে, দক্ষিণা না ইতি?

—জয়, তোর তো বাড়িতে গিয়ে আর খাওয়া নেই, রাক্ষস একটা! ছটা ফিশ ফ্রাই খেয়েছে। আরতি সরু চোখে জয়ের মুখের দিকে তাকায়।

দে না। আরও ছটা এখুনি উড়িয়ে দিচ্ছি: আমি কী তোদের মত? রস নিংড়ে নাক চিপে রসগোল্লা খাওয়া।

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো জয়ের কথার ভঙ্গি দেখে।

গাড়িটা সামান্য লাফিয়ে উঠলো। অতসীর মুখের কিছুটা এখন আর আলোতে নেই, ওর চুল কী হাওয়ায় উড়ছে? না, পাথর নয় একটা দুর্দান্ত স্রোত নামছে নিচে, এর ভেতর কোথায় পা রাখবেন তিমির? ইচ্ছে হয় বলেন অতসীকে চল আমরা নেমে যাই।

—স্যার আপনি কিন্তু আজ চমৎকার সাঁতার কেটেছেন। হঠাৎ শুভ মুখ ফেরায়।

—হ্যাঁ, তোমাদের সঙ্গে মিশে একটু সময় চুরি করা গেল! তিমির হাসলেন স্মিত ভঙ্গিতে।

গাড়িটা বাঁদিকে ঘুরতেই তিমির টের পেলেন অতসীর আঙুল তার বুক ছুঁয়েছে।

—তোমার কী এখনো খুব কষ্ট হচ্ছে? নিচু গলায় এই প্রথম কথা বললেন অতসী। চশমা খুলে তিমির তাকালেন অতসীর মুখের দিকে, আলোর ভগ্নাংশের ভেতর অতসীর মুখের যতটুকু দেখা যায়, তিমির দেখলেন, সেইখানে দাগ, অনেক...অনেক। অতসীর শরীর এখন অন্ধকার। হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি ছুটছে।

—কী খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার? অতসীর মুখ কাছে সরে এল।

তিমির অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন...স্থির চোখে তাকিয়ে থাকলেন। বুঝতে পারলেন না অতসীর কথার কী উত্তর দেবেন।

রোদ্দুরে ভরে গেছে ॥ বার্ণিক রায়

আমি তলায় তলায় নিরত প্রস্তুত হচ্ছি
এবার তোমার কাছে যাবো বলে,
আকাশে যখন মেঘ ডাকে, কোলাহলে
শ্রাবণের অন্ধকারে বাতাস যখন ভরে থাকে, তখনো শুনেছি
তোমার সুরের কান্না আমাকে সর্বদা ডাকে।

বাইরে ভীষণ কাদা, কান্না চিৎকার, বিকৃদের পুরস্কার,
ঠোঁটে ঠোঁটে গভীর লড়াই, যৌনতায় হাহাকার,
ঠান্ডা বন্ধ চলে কথার আড়ালে।

কিন্তু তার ভেতরেই তোমার আহ্বান আমি শুনি,
কে যেন গোপনে বলে
যাবো, নবীন অমল ধ্বনি নিয়ে তোমার একান্ত কাছে যাবো,
তোমার আঁধার বুকে মাথা পেতে হৃদয় ভরাবো,
জন্মের অতলে যাবো, হয়তো কোথাও কেউ আছে।

দ্যাখো, পৃথিবী রোদ্দুরে ভরে গেছে।।

নীলাম ॥ মায়া বসু

সমস্ত দেওয়াল জুড়ে অস্পষ্ট ছায়ারা কাঁপছিল
এক অদৃশ্য হাত হাইরোগ্লিফিক অক্ষরে
কী যেন কী সব ভয়ঙ্কর ভবিষ্যত বাণী লিখে চলেছিল
আঁচল দিয়ে বার বার সেই দেওয়াললিপি মুছতে গিয়ে
প্রচন্ড ব্যর্থতায়, কান্না-রক্ত-ঘামে মাখামাখি হয়ে
আমি ভয়ে কেঁপে উঠেছিলাম—
আতঙ্কে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলাম!

এমন সময় কোন এক দুর্বোধ্য—গূঢ় রহস্য উন্মোচনের মত
নিওলিথিক রেখাচিত্র বুঝিয়ে দেবার মত
এক সোচ্চার-কণ্ঠস্বর আমার কানে এসে পৌঁছল—
'নীলাম—নীলাম—নীলাম
নিজস্ব নীলামে যদি বিক্রি হতে চাও—
তবে চলে এসো।
আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

প্রত্যাখ্যান স্বীকার করি না ॥

তুলসী মুখোপাধ্যায়

প্রত্যাখ্যান স্বীকার করি না
বিনা নিমন্ত্রণে তোমার বাগানে এসেছি?
মনে পড়ে যুক্ত ইস্তাহার
কতো তীব্র উচ্চারণ বিনুদ্ধ বানামে
মনে পড়ে
সৈন্ধব সঙ্গীতে কী ব্যাকুল সা রে গা মা সাধা।
প্রত্যাখ্যান প্রত্যাহার করো
অবিলম্বে তুলে নাও উচ্ছেদ নোটিশ
নতুবা—

গোবেচারা এই বাঙালীর খাপ থেকে
ভয়ানক বর্গীর হামলা বেরিয়ে আসবে।

বিনা নিমন্ত্রণে যেহেতু আসিনি
প্রাণ থাকতে প্রত্যাখ্যান স্বীকার করি না।

শ্যামা পূজা
ঃঃ
শতবর্ষ আগেকার চিত্র
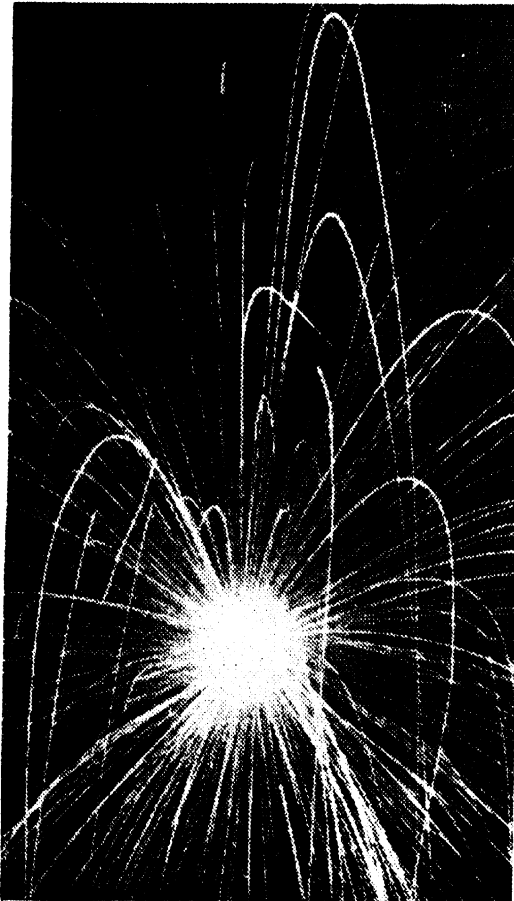
শ্যামাপূজা কলকাতার অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল শতবর্ষ আগেও। একালের মত সেকালে জাঁকজমক না হলেও পূজার্চনায় অর্থ ব্যয়ের কমতি ছিল না। সেকালে ধনী ব্যক্তির অভাব ছিল না কলকাতায়। সকলের বাড়ীতে রেওয়াজ ছিল না না শ্যামা পূজার। ধনীদের মধ্যে সাধারণত শ্যামাপূজায় বিপুল অর্থ ব্যয়ের কথা বিশেষ জানা যায় না। কোনরকমে নিয়মরক্ষা করেই তারা ক্ষান্ত হতেন। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় তার বিবরণ পাওয়া যায়।

কম্বোলীয়াটোলার রামচন্দ্র মিত্র এবং বাগবাজারের শ্যামাচরণ মিত্রের বাড়ীতে শ্যামাপূজার জাঁকজমক হত চূড়ান্ত। ভোজন, দান ও নৃত্য-গীতাদিতে দেবী আরাধনা ভিন্নরূপ পেত। সে সম্পর্কে ১৮৫৬ খৃঃ ১ নভেম্বর সম্বাদ ভাস্কর পত্রিকায় এক আশ্চর্য বিবরণ পাওয়া যায়। মিত্রবাড়ীর গুরু পূজারীরা শ্যামাপূজায় প্রাপ্ত অর্থে ধনীতে পরিণত হয়েছিলেন। মিত্ররা শ্যামাপূজায় ভগবতীর আপাদমস্তক সোনায় মুড়ে দিতেন। তৈজস বস্ত্র দেওয়া হত অগুন্তি। নৈবেদ্যে চার-পাঁচ মণ চাল দরকার হত। সেই নৈবেদ্যের পিছনে যেকোন মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারত। এক-একটা সন্দেশের ওজন ছিল কমপক্ষে পাঁচ সের। আধ মণ ওজনের সন্দেশের সংবাদ পাওয়া যায় 'সম্বাদ ভাস্করে'।

ধনী পরিবারের আয়োজিত পূজানুষ্ঠানে বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ত—অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে। শ্যামাচরণবাবু ছিলেন প্রকৃত ধর্মপরায়ণ। তার নিষ্ঠারও তুলনা ছিল না।

একালের মত সেকালেও কলকাতায় পথে প্রতিমা নিরঞ্জন উপলক্ষে শোভাযাত্রা বেরত। আলোয় আলোময়—ধুমধাম ছিল অন্তহীন। অগুন্তি মানুষের স্রোত। নানাধর্মের, বিবিধ বর্ণের মানুষ দেখা যেত নিরঞ্জন শোভাযাত্রায়। সম্বাদ ভাস্কর আক্ষেপ করে লিখেছিলঃ '...অনেকে বিসর্জন দিন রাত্রি সাত-আট ঘণ্টা পর্যন্ত পথে পথে প্রতিমা দেখাইয়া বেড়াইয়াছেন বটে তাঁহারদিগের পূজার এই ব্যয় বহুব্যয় যে রাত্রিকালে আলো করিয়া পথে পথে প্রতিমা দেখাইয়া বেড়ান, এদেশের অধিকাংশ লোক হাটে-বাটে ধর্মধ্বজিত্বের ঠাট দেখাইতে ভালবাসেন, শাস্ত্রে লেখেন শ্যামা সাধন অতি গুপ্ত সাধন রাত্রিতেই পূজা, রাত্রিতেই বিসর্জন, যাঁহাকে রজনীতে আবাহন করিয়া আনিলেন, যেভাবেই
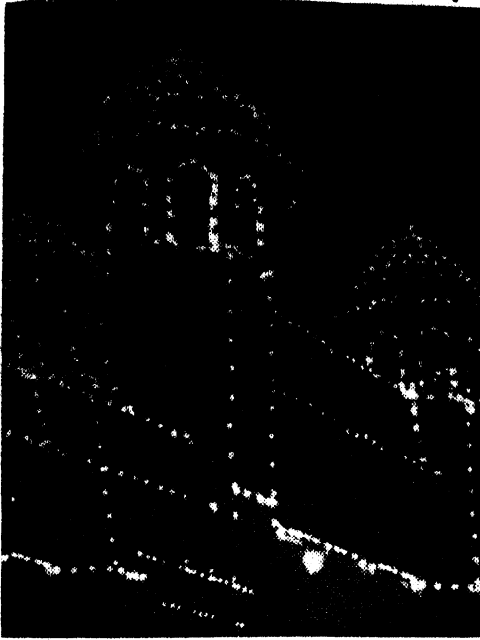
হোক ইষ্টভাব দেখাইয়া অর্চনা করিলেন এবং সেই রাত্রিতেই মন্ত্রযোগে বিদায় দিলেন যদি তন্ত্রমন্ত্র সত্য জ্ঞান করেন তবে তন্ত্র মতেই চলিতে হয়, তাঁহাকে পরদিন চণ্ডীমণ্ডপে উপবাসে রাখেন, একবিন্দু গঙ্গাজল একটি বিল্বদল দিয়াও সম্বর্ধনা করেন না, রজনীতে সেই উপবাসিনী উলঙ্গিনী ঠাট হাটে-বাটে বেশ্যাদিগকে দেখাইয়া বেড়ান, যাঁহাকে মাতা বলেন তাঁহার এই অপমান করেন ইহাতে কি তিনি সন্তুষ্ট হন? মহাদেব যাঁহার শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া ধ্যান করিতে করিতে শবাকার হইয়া গিয়াছেন, সেই ভগবতীর এই প্রকার দুর্গতি কি ধর্মকর্ম বলা যায়? তন্ত্রশাস্ত্রের কোন গ্রন্থে ইহার প্রমাণ আছে? বরং বিরুদ্ধ প্রমাণসকল দৃষ্ট হইতেছে এ প্রকার তামস ধার্মিকদিগের অধোগতি হয় 'অধো গচ্ছন্তি তাম সাঃ' অপার দর্শি লোকেরা তামসিক ব্যাপারে আপনারদিগের অধোগতির উপায় সাধন করিতেছেন, এদেশের ধার্মিকগণ ধর্মধ্বজিত্বের উপরেই অধিক নির্ভর করেন, বাহিরে যে প্রকার ধর্ম চিহ্ন দেখান যদি অন্তঃকরণে সেইরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি থাকত, তবে পরমেশ্বরের অনুগ্রহ পাইতে পারিতেন, তাহা করেন না এই জন্য ইহকালেও দুঃখ পাইলেন পরকালেও দুঃখ-ভোগ করিবেন।'

—ধর্মের নামে সেকালের মত একালেও চলেছে অন্তহীন অনাচার। বাইরের শোভা এবং অর্থের অপব্যয়ে যে উৎসাহ প্রকট, তার বিন্দুমাত্রও যদি থাকত ভক্তিতে তবে মানুষকে এমন দুর্গতি ভোগ করতে হত না। সম্পাদ ভাস্করের দৃষ্টিভঙ্গী অস্বচ্ছ ছিল না। সমাজের যে চিত্র ধরা পড়েছিল তাদের কাছে তা সামাজিক দলিল হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য।

ধর্মের নামাবলী গায়ে একালের মত সেকালেও ছিল ছদ্মবেশী ধর্মাচারী। ভাস্কর সম্পাদক ছিলেন সেকালের প্রথিতযশা ধর্মসংস্কারক এবং স্বদেশপ্রেমী। তাঁর মত বলিষ্ঠ লেখনী সেকালে ছিল দুর্লভ। হিন্দুধর্মের অনাচারের প্রতি কটাক্ষ করে ভাস্করের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়ঃ

যে সকল দেশে জ্ঞানের অধিষ্ঠান হইয়াছে সে সকল দেশীয় জ্ঞানিগণ যদি ভেক দেখিতে অভিলাষ করেন, তবে বঙ্গদেশে আসিলে অশেষ ভেক দেখিতে পাইবেন, এই ভেক জন্যই হিন্দুগণ পৌত্তলিক নামে নিন্দিত হইয়াছেন, যে সকল দেবদেবী প্রতিমাকে ইষ্ট প্রতিমা বলিয়া থাকেন সেই সকল প্রতিমা লইয়া পথে পথে ভ্রমণ করেন ইহা কি পুতুল খেলা নয়? ইংরেজ, ফিরিঙ্গী, মোসলমান, হাড়ী, মুচি, সর্বজাতীয় লোকেরা রাজপথে বেড়ান, হিন্দুরা ঐ সকল জাতিকে অস্পৃশ্য জাতি বলেন, সেই সকল অস্পৃশ্য জাতিরা পথে পথে প্রতিমা সকলকে স্পর্শ করিয়া যাইতেছেন, সর্বশাস্ত্রে লেখেন 'মিথ্যা কথা কহিবেক না' হিন্দুরা গলা গঙ্গায় অঙ্গ ঢালিয়া অনর্গল মিথ্যা বাক্য বলেন, তাহাতে পাপ-জ্ঞান হয় না, নাসিকার অগ্রভাগ পর্যন্ত অনেকে তিলক শোভা করেন।' গলায় তুলসীর মালা, হাতে মালার থলি, মাথায় তিলক এবং গায়ে জড়ান নামাবলী—অথচ সেই ব্যক্তি মিথ্যা বলে অবলীলায় অর্থ উপার্জন করে। ধর্ম ক্ষেত্রে ছদ্মবেশী দুরাত্মার অভাব ছিল না। যে সব ধনী সাত্ত্বিকভাবে অজস্র অর্থ-ব্যয় করতেন ধর্মাচরণে তাদের অধিকাংশই ছিলেন নাস্তিক। 'রজনীযোগে যতক্ষণ প্রদীপ থাকে ততক্ষণ তাঁহারদিগের আস্তিকতার অনেক চিহ্ন দৃষ্ট হয় প্রদীপ নির্বাণ হইলে আস্তিকতা চিহ্ন পর্যন্তও নির্বাণ হইয়া যায়। এদেশে জিতেন্দ্রিয় মনুষ্য কত ব্যক্তি আছেন? আমারদিগের চর্মচক্ষে প্রায় লক্ষ্য হয় না।' সাময়িকপত্রে সমাজচিত্র—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত।
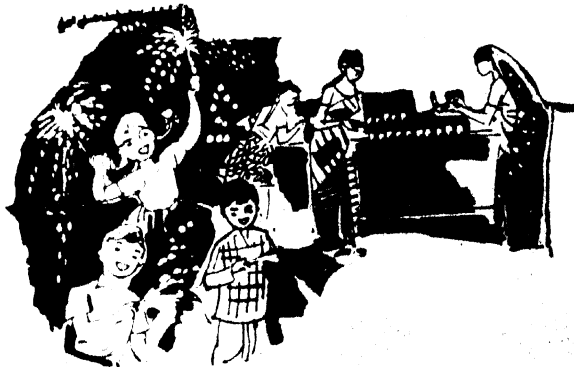
শতকীর্তির এক অক্ষয়পট

কমল সরকার

বহির্বিশ্বে রাজা রামমোহনকে দিয়ে বাঙালীর যে আন্তর্জাতিকতার সূচনা, পরবর্তীকালে বহু প্রাজ্ঞজনের অক্লান্ত কর্ম আর পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে তার পরিধি হয়েছে আরও ব্যাপক, আরও বিস্তৃত।

উনিশ শতকের জ্ঞানী-গুণীদের বহুমুখী সেই শোভাযাত্রায় মিলেছে বিবিধ সম্মান, বিচিত্র শিরোপা। কর্মের প্রয়োজনে বিদ্বত্তমদের কেউ কেউ জগৎসভায় স্বয়ং উপস্থিত। আবার কেউ গৃহকোণে বসেই পেয়েছেন বিশ্বসমাদর। শতাব্দীর অধিককালে রচিত কৃতবিদ্যদের সেই নামপত্রে নানা মনীষীর নানা স্বাক্ষর।

বহির্জগতের সেই ঐতিহ্যময় অধিকারের অন্যতম কাণ্ডারী শ্রুতকীর্তি ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২—১৮৯১)। অতলস্পর্শী পাণ্ডিত্যের অধিকারী রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থকর্ম আজও জ্ঞান-রাজ্যের বহু আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ।

ডক্টর রাজেন্দ্রলালের পাণ্ডিত্য সেকালে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। বহু খ্যাতনামা মানুষের লেখনীতে উজ্জ্বল হয়ে আছেন রাজেন্দ্রলাল। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর লেখনীতেও চিরজীবী হয়ে আছেন রাজেন্দ্রলাল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদ্বজ্জনরূপে। কবি হেমচন্দ্র তাঁর এক ব্যঙ্গ কবিতায় রাজেন্দ্রলালের যে চরিত্র-চিত্রণ করেছিলেন তা তাঁর আন্তর্জাতিক পরিচিতির চরম মানপত্র। সে হাস্যোদ্দীপক কবিতায় রাজেন্দ্রলালের উদ্দেশে হেমচন্দ্র লিখেছেন :

'তালপত্র তাম্রপত্র পুঁথিপত্র থোকা
বগলে পুটুলি বাঁধা কেতাবের পোকা
এস মিত্র লালে লপ্পি মজলিস জাঁকাও
কেদারা ঠেসান দিয়ে মোড়াসা হেলাও।
প্রত্নতত্ত্ব তল্লাসীতে দিগগজ মসনদ
খড়ি মাড় নাই খাপে—আধোয়া গরদ।

… …

বাক্‌যুদ্ধে বাগ্মিতায় লেখার লড়ায়ে
রাজনীতি রচনার সুর বাজখেয়ে।
ইংরিজি বিদ্যা বাগানে ফাস্টরেট মালী
ইউরোপের কালীঘাটে
পড়ে যায় ডালি।'(১)

'ইউরোপের কালীঘাটে' রাজেন্দ্রলাল প্রেরিত উপচারের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন স্বয়ং ম্যাক্স মুলার। তাঁর বিখ্যাত 'দি সায়েন্স অব ল্যাংগুয়েজ' গ্রন্থে রাজেন্দ্রলালকে 'অথোরিটি অন 'ফলোলজি' বলে অভিহিত করেছেন। 'অ্যান্টিকুইটিস অব ওড়িশা' গ্রন্থের জন্যে আচার্য ম্যাক্স মুলার স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রাজেন্দ্রলালকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন।

বহুভাষাবিদ, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, ঐতিহাসিক,

(১) মন্মথনাথ ঘোষ, হেমচন্দ্র, মানসী ও মর্মবাণী, পৌষ, ১৩২৭

১৯৭৪ খৃঃ বুদাপেস্টের সংবাদপত্রে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রতিকৃতি ও পরিচিতি

ললিতকলা বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, বাগ্মী রাজেন্দ্রলালের পরিচয় পৌঁছেছিল সুদূর ইটালিতেও। উনিশ শতকেই ইটালীয় ভাষার এক জীবনী অভিধানেও সংযোজিত হয়েছিল রাজেন্দ্রলালের জীবনবৃত্তান্ত।(২)

কর্মজীবনে তিনি পঞ্চাশটি ফরাশী, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ এবং সম্পাদনা করেন। তাঁর কর্মস্থল এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত 'বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা' গ্রন্থমালার তেরটি গ্রন্থ তাঁরই সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে। বায়ুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, চৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থাদি রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় 'বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়।

তাঁর অনলস গবেষণার সৃষ্টি 'ইন্দো-

(২) হিন্দু পেট্রিয়ট, ২৭ ডিসেম্বর, ১৮৮০

এরিয়ানস', 'অ্যান্টিকুইটিস অব ওড়িশা', 'বুদ্ধগয়া' এবং 'হিস্টরি অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি' গ্রন্থগুলির মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর প্রজ্ঞা। ফলে বিশ্বের একাধিক বিদ্বৎসভা সদস্যপদ দান করে সম্মানিত করে এই প্রাচ্যবিদ্যাবিদকে।

একমাত্র গ্রন্থ রচনাই নয়, সাংবাদিকতার সঙ্গেও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন রাজেন্দ্রলাল। বিগত শতকের বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও অন্যান্য সাময়িকপত্রে তাঁর প্রায় দু হাজার সম্পাদকীয়, গ্রন্থ সমালোচনা ও অন্যান্য রচনা ছড়িয়ে আছে। এ সমস্ত রচনা প্রধানত ইংলিশম্যান, ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ, স্টেটসম্যান, ফিনিক্স, সিটিজেন, ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ফিল্ড, হিন্দু পেট্রিয়ট, ক্যালকাটা রিভিয়ু প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উনবিংশ শতকের প্রথম বাংলা সচিত্র সাময়িক 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' তাঁরই সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে (১৮৫১)। পরবর্তীকালে 'রহস্য-সন্দর্ভ'এর সম্পাদকও ছিলেন তিনি।

সমাজহিতৈষী রাজেন্দ্রলাল কলকাতার আদিতম পৌরসভার সদস্য ছিলেন। রাজনীতির সঙ্গেও ছিল তাঁর অবিচ্ছেদ্য যোগ। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় যখন জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় তার অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন তিনি। যে এশিয়াটিক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে তাঁর কর্মজীবন শুরু সেই এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি পদেও নির্বাচিত হন তিনি।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড' রাজেন্দ্রলালকে সদস্য করে নেয়। ভিয়েনার 'ফিজিক্যাল ক্লাস অব দি ইম্পিরিয়াল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস' এবং 'ইটালিয়ান ইনস্টিটিউট ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অব নলেজ' তাঁকে অনারারি মেম্বার নির্বাচিত করে। 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব ইটালি'র সদস্যও হয়েছিলেন তিনি।

সঙ্গে জার্মান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি, আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি এবং এথনোলজিক্যাল সোসাইটি অব বার্লিন্-এর করসপন্ডিং মেম্বার নির্বাচিত হন জ্ঞানতপস্বী রাজেন্দ্রলাল। সুদূর ডেনমার্কের 'রয়্যাল সোসাইটি অব নর্দার্ন অ্যান্টিকুইটিস'-এর (কোপেনহ্যাগেন) ফেলো মনোনীত হন তিনি।

রাজেন্দ্রলালের গুণকীর্তনে মুখর হয়েছিল ইউরোপের অন্যতম রাষ্ট্র হাঙ্গেরী। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরীর 'রয়্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস'-এর অবৈতনিক সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। হাঙ্গেরী তখন অবিভক্ত দেশ। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী যুক্তসাম্রাজ্যের জনপ্রিয় অধিরাজ সম্রাট জোসেফ ফ্রান্সিসের (১৮৩০-১৯১৬)
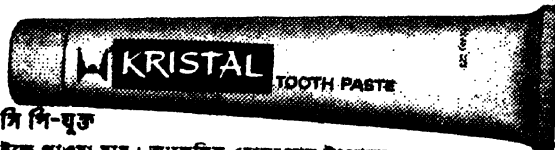
সময়ে হাঙ্গেরীর রাজকীয় বিদ্বৎসভার সদস্যপদ দান করা হয় রাজেন্দ্রলালকে।

'প্রাচ্যের হিন্দু বাবু রাজেন্দ্রলালের' হাঙ্গেরীর রাজকীয় অ্যাকাডেমির সদস্য নির্বাচিত হবার পর রাজধানী বুডাপেস্টের যেসব সংবাদপত্রে তাঁর পরিচিতি প্রকাশ করা হয় তার মধ্যে VASARNAPI UJSAG অন্যতম। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ নভেম্বরের সংখ্যায় রবিবারের এই সংবাদপত্র রাজেন্দ্রলালের এক প্রতিকৃতিসহ তাঁর কর্মজীবন প্রকাশ করে।

•

শতবর্ষ আগে সেদিনের প্রাচ্যের সাধারণ কোন মানুষের ইউরোপের সংবাদপত্র দেখার সুযোগ ছিল না। অতীতের সূত্র সন্ধানে আকস্মিকভাবে উদ্ঘাটিত হলো রাজেন্দ্রলালের শতকীর্তির সেই অক্ষয় পট।

উনিশ শতকের কলকাতার এক ইংরেজি সংবাদপত্রে ধরে রাখা হয়েছে বুডাপেস্টের ম্যাগইয়ার ভাষার সংবাদপত্রের আক্ষরিক অনুবাদ। কারিগরী নৈপুণ্যে অনগ্রসর কলকাতার সংবাদপত্রটি হাঙ্গেরীয়ান সংবাদপত্রের বক্তব্য ইংরেজির মাধ্যমে ধরে রেখেছে।

অনুসন্ধিৎসা কিন্তু অনুবাদেই সন্তুষ্ট নয়, তা আবেদন গেল নতুন দিল্লির হাঙ্গেরিয়ান রাষ্ট্রদূতের দপ্তরে। অচিরেই এল সহযোগিতার আশ্বাস। অবশেষে, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর, পাওয়া গেল শতবর্ষের পুরাতন বুডাপেস্টের সেই হাঙ্গেরিয়ান সংবাদপত্রের দুটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি যেখানে অক্ষয় হয়ে আছেন বাঙালী মনীষী ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

•

বুডাপেস্টের সংবাদপত্রটির প্রথম পৃষ্ঠার আলোচনায় রাজেন্দ্রলালের বংশ-পরিচিতির উল্লেখ আছে। আছে মোগল আমলের ঐতিহ্যশালী মিত্র পরিবারের গোড়ার কথা। ছাত্রজীবনে রাজেন্দ্রলাল যে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন তারও উল্লেখ আছে। পরীক্ষার ফল ভালো করায় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁকে যে ইংল্যান্ড নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন সে কথাও লেখা হয়েছে এই হাঙ্গেরিয়ান সংবাদপত্রের পরিচিতিতে।

প্রবন্ধের প্রায় প্রথমেই লেখা হয়েছে : 'রাজেন্দ্রলাল... আমাদের অপেক্ষা স্বতন্ত্র প্রকৃতির পরিবেশ এবং দেশের মানুষ। কিন্তু বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে বিশেষত, বিশ্ববিজ্ঞান বিষয়ে তিনি সমপর্যায়ের মানুষ। কারণ, তাঁর নিজের পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষত, সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্য বিষয়ে তিনি প্রথম শ্রেণীর গৌরবের অধিকারী এবং তাঁর এই পরিচয় নিজ সম্প্রদায় হিন্দু সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে বেশ কয়েক বছর আগেই তিনি এ মনীষার স্বীকৃতি পেয়েছেন।'

হাঙ্গেরিয়ান সংবাদপত্রের এই আলোচনায় রাজেন্দ্রলালের পাণ্ডিত্যকে ভারতের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়নি। আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর পরিচিতিকে এশিয়ার পর্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। সে কারণে লেখা হয়েছে : 'হাঙ্গেরীর রয়্যাল অ্যাকাদেমি অব সায়েন্স-এর গভর্নিং কাউন্সিল এশিয়ার এই বরেণ্য সন্তানকে সদস্য নির্বাচিত করে রাজেন্দ্রলালকে যতটা সম্মানিত করেছেন তার চেয়ে অধিকতর সম্মানিত করেছেন হাঙ্গেরীর নিজের রাজকীয় বিদ্বৎসভাকে।'

রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে নানা বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে বিগত শতকের প্রথিত-যশা হাঙ্গেরিয়ান ভাষাবিদ্ ও পর্যটক আলেকজান্ডার চোমা দে ক্যারাশ-এর (১৭৮৪-১৮৪২) বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে এই নিবন্ধে। বিশ্বপর্যটক ও ভাষাবিজ্ঞানী আলেকজান্ডার চোমা ম্যাগইয়ার জাতির আদি বাসভূমির অনুসন্ধানে এশিয়ায় এসেছিলেন। পর্যটনকালে তিনি তিব্বতে এসে শিখেছিলেন তিব্বতী ভাষা। পরবর্তীকালে যখন তিনি ভারতে আসেন তখন সরকারী উদ্যোগে তাঁর রচিত তিব্বতী-ইংরেজি অভিধান এবং একটি ব্যাকরণ কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হয় (১৮৩৪)। তিব্বতী, সংস্কৃত এবং অন্যান্য প্রায় পনেরটি প্রাচীন ও আধুনিক ভাষায় পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা হয় (১৮৩৭-১৮৪২)। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ এপ্রিল দার্জিলিং-এ মহাপণ্ডিত আলেকজান্ডার চোমা দে ক্যারাশ-এর পরলোকগমন। ক্যারাশ-এর উল্লেখ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে : 'সেই এশিয়াটিক সোসাইটিতে দশ বছর গ্রন্থাগারিক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল। আমাদের যশস্বী দেশবাসী আলেকজান্ডার চোমা দে ক্যারাশ এই এশিয়াটিক সোসাইটিতেই কর্মরত ছিলেন।

জগদ্বরেণ্য পণ্ডিত ম্যাক্স মুলারও যে রাজেন্দ্রলালের গুণগ্রাহী ছিলেন এই পরিচিতিতে সে কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

আলোচনার শেষ পর্বে লেখা হয়েছে : 'আধুনিক ইউরোপীয় ভাষায় রাজেন্দ্রলালের চমৎকার দখল আছে। ইংরেজিনবীশ রাজেন্দ্রলাল ফরাসী ও জার্মান ভাষায়ও সুপণ্ডিত। হাঙ্গেরীর মাতৃভাষা ম্যাগইয়ার এও তিনি প্রবল উৎসাহী।'

বাঙলার এই বিদ্বান মানুষটি যেদিন হাঙ্গেরিয়ান বিজ্ঞান-সভার সদস্য নির্বাচিত হন সেদিন ওদেশে তাঁর পরিচিতি প্রকাশের প্রয়োজন অবশ্যই ছিল। সে কারণে রাজেন্দ্রলালের পরিচিতির সঙ্গে তাঁর এক প্রতিকৃতিও প্রকাশ করা হয়। রাজেন্দ্রলালের এই প্রতিকৃতিটি হস্তাঙ্কিত। সংবাদপত্রে শিল্পীর নাম প্রকাশ করা না হলেও সহজেই অনুমান করা যায় যে চিত্রটি কোন ইউরোপীয় শিল্পীর সৃষ্টি।

আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় ভারতবিদ্যা ও প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়কে যেসব ভারতীয় মনীষী আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন রাজেন্দ্রলাল তাঁদের অগ্রদূত। উনিশ শতকে যে কয়জন মুষ্টিমেয় ভারতীয়ের অনলস সাধনায় পাশ্চাত্যের কাছে ভারতের প্রাচীন ভাষা, সাহিত্যচিন্তা, ধর্ম, সংস্কৃতি, চারুকলা, স্থাপত্যবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের পথ সুগম হয় রাজেন্দ্রলাল তাঁদের অগ্রজ। ভারত-সংস্কৃতির সঙ্গে বিশ্ব-সংস্কৃতির যোগাযোগের অন্যতম পথিক রাজেন্দ্রলালের পরিচয় কতদূর বিস্তৃত ছিল তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষ পরেও এই হাঙ্গেরিয়ান সংবাদপত্রের প্রতিলিপি সে কথাই আবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

(বুডাপেস্টের সংবাদপত্রের প্রতিলিপি ভারতে পিপলস রিপাবলিক অব হাঙ্গেরীর দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারি শ্রী গেজ রিবকা-র সৌজন্যে প্রাপ্ত।)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খাওয়া দাওয়ার পর বড়মামা তার নিতুদা সামনের ঘরে বসে গল্প করতে লাগলেন। ছুটির দিনে দুপুরে একটু ঘুমানো আমার পুরোনো অভ্যেস। বড়মামার অনুমতি নিয়ে নিজের ঘরে শুতে এলাম। শুতে যাব, ঘরে ঢুকল সুষমা। ওর হাতে ছোট একটা কাঁচের প্লেট, তাতে গোটা-কতক পান।

বললাম, 'আমি পান খাই না।'

সুষমা ফিক করে হেসে ফেলল, 'পান খেলে দাঁত নষ্ট হয়?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'একদিন খেলে কিছু হয় না। খেয়ে মুখ ধুয়ে ফেলবেন। নিন।' বলে প্লেটটা আমার সামনে ধরল।

সুষমার হাত বেশ নিটোল। সরু দুগাছি সোনার চুড়ি পরনে, পুরনো চুড়ি, পালিশ নষ্ট হয়ে গেছে। পেতলের মত ম্যাড়-ম্যাড় করছে। মনে হল, এইসব হাতে ঝকঝকে সোনার চুড়ি ভাল মানায়। পান দিয়ে সুষমা চলে গেল না, দাঁড়িয়ে রইল। বুঝলাম, ওর আরও কথা বলার ইচ্ছে।

বললাম, 'খাওয়া হয়ে গেছে?'

সুষমা ঘাড় নাড়ল।

বললাম, 'সে কী! দুটো বাজতে চলল—'

'আমাদের খেতে দেরী হয়।'

'দেরী করে খাওয়া ভাল না।'

'কী হয়?'

'নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে। ডিসপেপসিয়া, গ্যাসট্রিক, অম্বল—' কথার মাঝখানেই সুষমা খিল-খিল করে হেসে উঠল। বললাম 'হাসার কি হলো?'

হাসি থামিয়ে সুষমা বলল, 'প্রত্যেক মানুষই এক-একজন ডাক্তার।'

বুঝলাম, সুষমা একজন সুরসিকা।

সুষমা চলে যেতেই শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ আগে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল, এখন ঘুম আর নেই। ধীরে ধীরে পান চিবোতে লাগলাম। আবার সেই পুরোনো প্রশ্নটা মনে জেগে উঠল। মানুষ কি শুধু নিজের জন্যেই বাঁচে? আমি বিয়ে করলে মা সুখী হবে, অথচ আমি বিয়ে করতে চাই না। আসলে দায়িত্ব নিতে ভয় আমার। বলতে গেলে ভীতু প্রকৃতির মানুষ আমি। ভীতু না হলে একজন পুরুষ একটি মেয়ের কথায় ওঠে বসে না। ইচ্ছে করলে সেদিন গঙ্গার ধারে পাটনায় বদলির প্রতিবাদ-পত্র না ছিঁড়লেও পারতাম। অথচ সেই ইচ্ছেটা সময়কালে হল না। সুপ্রিয়ার ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছা পরাজিত হল। এইসব মানুষ-দেরই ভীতু বলা হয়।

কিন্তু শুধু মাত্র সুপ্রিয়ার ইচ্ছার কাছেই কি আমি পরাজয় স্বীকার করছি? নিজের ভবিষ্যৎ, তার ঔজ্জ্বল্য, সুখ, শান্তি — এসব কিছু কি আমাকে লোভ দেখায় না? সুপ্রিয়া যদি এই মুহূর্তে বলে, আমাকে বিয়ে করো, আমি কি তাই করবো? মনে মনে মাথা নাড়লাম, নেভার নেভার। তবে?

ধীরে ধীরে সুপ্রিয়ার ওপর থেকে রাগটা চলে গেল। কয়েকদিন ধরে একটা চাপা ব্যথা মনের মধ্যে পুষেছিলাম। আমার এই বদলির ব্যাপারে ওকেই সম্পূর্ণ দায়ী করছিলাম। অলস মধ্যাহ্নে সুষমার দেওয়া পান চিবোতে চিবোতে সহসা মনে হল, সুপ্রিয়া সম্পূর্ণ নির্দোষ, যেহেতু আমার ওপর ওর ইচ্ছা আরোপ করার মত অধিকার এখন পর্যন্ত ওর হাতে আসেনি। কোনদিন যে আসবে সে সম্ভাবনাও নেই। সুপ্রিয়ার মত মেয়েদের নিয়ে এক সঙ্গে কাজ করা চলে, কিন্তু ঘর বাঁধা যায় না। নিজেকেই নিজে শাসন করলাম। অবান্তর অবাস্তব কথা নিয়ে দুপুরের প্রিয় ঘুমটা নষ্ট করে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। সুপ্রিয়া দূরের মানুষ দূরেই থাক। আপাতত দুটো বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। সুষমাকে বিয়ে করার প্রশ্ন কিছুদিনের জন্য স্থগিত রইল। আর পাটনায় যাওয়ার বিষয়টা যে সম্পূর্ণ নিজেরই ইচ্ছাকৃত ভাবতে পেরে ভাল লাগল।

ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তখনও শুয়ে ছিলাম। জানালা দিয়ে গরম রোদ পায়ের ওপর এসে পড়ছিল। উঠবো উঠবো করেও ওঠা হচ্ছিল না। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল সুষমা। ওকে একটু অন্যরকম দেখাল। সকালের শাড়ি পালটেছে। মনে হল ও হাত-মুখ ধুয়েও একটু পাউডার লাগিয়েছে। দুই ভ্রূর মাঝখানে গাঢ় লাল একটা টিপ। সুষমা কি সঙ্গে করে এইসব নিয়ে এসেছিল? শাড়ি, পাউডার, লাল টিপ, এইসব?

সুষমা হঠাৎ বলে উঠল, 'আপনাদের পাশের বাড়ির মেয়েটি, পারুল, জোর করে পরাল।'

কী আশ্চর্য, সুষমা কী অদ্ভুত ধরনের মেয়ে! মুখ চোখ দেখে আমার মনের কথা ঠিক বুঝে ফেলল। হাসিমুখে বললাম, 'সত্যি সত্যি আমি ভাবছিলাম, সঙ্গে করে শাড়ি পাউডার, লাল টিপ, এইসব নিয়ে আসা হয়েছিল কিনা।'

সুষমা বলল, 'আপনি আমাকে তুমি বলবেন, বয়সে আমি ছোট।'

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললাম, 'রান্নার হাত তোমার ভাল।'

ঘর ছেড়ে যেতে যেতে সুষমা বলল, 'চা করাটা রান্নার মধ্যে পড়ে না।' বলে সুষমা হাসল। ওর মুখের একটা পাশ দেখতে পাচ্ছিলাম। তাই দেখে, ও যে সুষমা, ঠিক বোঝা গেল। একদিন সুপ্রিয়ার একটা পাশ দেখেছিলাম, আর দেখতে দেখতে ভেবেছিলাম, সেই পাশটা মোটেই সুপ্রিয়া-সুপ্রিয়া না দেখতে। একটা নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে ইদানীং। কোন মেয়ে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে একটা তুলনামূলক বিচার আমার মনের মধ্যে আসে কেন? এই যে সুষমার সঙ্গে সুপ্রিয়ার মুখের একটা অংশ নিয়ে ভাবতে বসলাম, এই চিন্তাটা সম্পূর্ণরূপে অহেতুক। সুষমার মুখের

একটা পাশ সুষমার মত দেখতে, সুপ্রিয়ার পাশটা সুপ্রিয়ার মত দেখতে না, কী এসে যায় এতে। আমি যদি আমার মত দেখতে না হই, বা আমার যা হওয়া উচিত ছিল বা যেরকম হলে ভাল দেখাত--আসল কথাটা হচ্ছে, যা হবার তা হবেই, এবং যা হবেই তা নিয়ে অহেতুক মাথা না ঘামিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকাই শ্রেয়। আবার শুয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম। মনে পড়ল টি-পয়ের ওপর চা ঠান্ডা হচ্ছে। উঠে বসলাম। চায়ের কাপে চুমুক দিলাম।

বড়মামা ঘরে ঢুকলেন। বললেন, 'তুই তো দেখছি দুপুরে খুব ঘুমোতে পারিস। আমিও পারতাম। কলেজে পড়তে ক্লাশ পালিয়ে দুপুরে এসে ঘুমোতাম, মা খুব বকাবকি করত, সবাই হাসত।' বলে বড়মামা খুব হাসতে লাগলেন। মানুষ কত ছোট ছোট কারণে বা বিনা কারণেই সময় সময় কত খুশী হয়।

আরও দু-একটা আজেবাজে কথার পর বড়মামা কাজের কথা পাড়লেন, 'তোদের আপিসের ডাক্তারের ভিজিট কত রে?'

বললাম, 'ভিজিট লাগবে না। কাল ওঁকে নিয়ে যাব, সঙ্গে করে গোটাদুয়েক টনিকও নিয়ে যাবোখন। খেয়ে যদি উপকার পান, আরও গোটাকয়েক দিয়ে যাব।'

বড়মামা খুশী মনে বললেন, 'আজকাল সব আপিসেই মেডিক্যাল বেনিফিট হয়ে গেছে। আমাদের আপিস এখনও কালের সঙ্গে তাল ঠুকে এগোতে পারছে না। ইউ-নিয়নের পান্ডারা যে কী করে!' মুহূর্তের মধ্যে বড়মামার মুখের ওপর বিরক্তি ছড়িয়ে পড়ল।

সন্ধ্যার আগেই বড়মামারা চলে গেলেন। সুষমা মাকে প্রণাম করল, আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলি।'

সুষমা বেশ সপ্রতিভ মেয়ে।

যতীনবাবু একটা কাগজ আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনার সাস্-পেনস্ ভাউচার, সই করে দিন। আর এই আপনার টাকা।' বলে একটা খাম আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

চোখ না তুলেই বললাম, 'এ-কাজটা তো ক্যাসিয়ারের।'

'উনি আজ তিনদিন ধরে আসছেন না।'

আর কথা বাড়াবার ইচ্ছে হল না। কাগজটা সই করে ফিরিয়ে দিলাম। সেটা নিতে নিতে যতীনবাবু বললেন, 'আমার ওপর কতগুলো একস্ট্রা ডিউটি দিয়েছে আপিস। এই যেমন আপনাকে টাকা দেওয়া, আপনার বার্থ রিজার্ভ করা, আর এই চিঠিটা আপনাকে দেওয়া। এই নিন।' যতীনবাবু আমার দিকে মুখ বন্ধ-করা একটা খাম বাড়িয়ে দিলেন।

খামটা একপাশে সরিয়ে রেখে বললাম, 'ঠিক আছে।'

যতীনবাবু বললেন, 'খুলে পড়বেন না?'

'পরে পড়বো।'

'আপনার যদি কিছু বলার থাকে, বলতে পারেন।'

'বলার কিছু থাকলে মিস্টার কাপুরকেই বলবো।'

'আপনি কিন্তু এখনও আমার ওপর রেগে রয়েছেন।'

কী অসহ্য আস্পর্ধা লোকটার! একমাত্র সুপ্রিয়ার আত্মীয় বলেই অযথা প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছেন ভদ্রলোক। এইসব লোককে নিয়ে ওয়াল-পোস্টার লেখা হয় না, কেউ কিছু বলেও না। মনে মনে ঠিক করলাম, যতীন-বাবুর পেছনে মজুমদারকে লেলিয়ে দিতে হবে। কিছুক্ষণ উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করে যতীনবাবু চলে গেলেন।

আমিও উঠে পড়লাম মজুমদারের টেবিলের সামনে গিয়ে বসলাম। মজুমদার একটা সিনেমার পত্রিকা পড়ছিল। আমাকে দেখে নড়েচড়ে বসল, 'কী ব্যাপার, অধমকে তলব করলেই হতো।'

হালকা সুরে বললাম, 'একা একা বোরিং লাগছিল, তাই গল্প করতে এলাম।'

মজুমদার দুই চোখ কপালে তুলে বলল, 'আমার সঙ্গে গল্প! আপনি! রিয়্যালি ইট ইজ স্ট্রেঞ্জ।'

'এক এক সময় চমকপ্রদ ঘটনাও তো ঘটে।'

মজুমদার উত্তর না দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বললাম, 'আমার সাসপেনসের টাকাটা যতীনবাবু দিয়ে গেলেন কেন?'

উদাস সুরে মজুমদার জবাব দিল, 'আমি কি করে বলবো।'

ঈষৎ ক্ষুব্ধস্বরে বললাম, 'আপনি তো সব খবরই রাখেন।'

'ইচ্ছে করে অনেক সময় চোখ বুজে থাকতে হয়।'

'কেন?'

'কারণ চোখ বুজে থাকার মধ্যে স্বস্তি আছে।'

মজুমদারকে তেতাবার জন্যে বললাম, 'একদিন কিন্তু আপনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন।'

'একদিন করতাম, আজ করি না। এখন কম্‌প্রোমাইজ করে চলতে শিখেছি। কাল থেকে সকালে মিস মিত্রকে উইস করার জন্যে সাত-সকালে অফিসে এসে বসে থাকি, জানেন?'

'না, কিন্তু কেন?'

'কারণ প্রত্যেক মানুষই জীবনে অর্থ, প্রতিষ্ঠা চায়। আমি ব্যতিক্রম হতে চাই না। এ অফিসে যখন একজন মেয়েমানুষই কর্ত্রী, তখন তাকে খুশী করা প্রত্যেকেরই তো কর্তব্য।'

'আমি এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানাতে এসেছি।'

আমার কথা শুনে মজুমদার কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'বুঝলাম না।'

'আমি এই ব্যবস্থা মানি না। বিশ্বাস করুন মজুমদারবাবু, রিয়্যালি আই অ্যাম ফেড-আপ। আমার আর ভাল লাগছে না। এই যে যতীনবাবু যখন তখন এসে উপদেশ দেবেন, একজন স্টেনোর মাস্টারগিরি করবেন আর মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াবেন, অসহ্য।'

মজুমদার চোখের দৃষ্টি দিয়ে আমাকে ওজন করে নিতে নিতে বলল 'সত্যি আপনি এই ব্যবস্থার প্রোটেস্ট জানাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, আমাকে বিশ্বাস করুন।' আমি যেন চোখ দিয়ে মজুমদারের পা স্পর্শ করলাম। মজুমদার ইদানীং ইউনিয়নের এক্‌জিকিউটিভ কমিটির মেম্বার হয়েছে। ওকে হাতে রাখা দরকার। সুপ্রিয়ার চেয়ে মজুমদারের পায়ে তেল ঘষা অনেক সহজ কাজ।

মজুমদার আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'হাতে হাত মেলান। আজকালকার দিনে আইসোলেটেড হয়ে বাঁচতে পারবেন না। আমাদের সঙ্গে একটিভ পার্ট নিন, দেখবেন ম্যানেজমেন্ট আপনার টিকিও স্পর্শ করতে পারবে না।' একটু থেমে মজুমদার আবার বলল, 'তারপর বলুন যতীনবাবু কি করেছে?'

'একটা টাকার খাম আর এই চিঠিটা দিয়ে গেছেন।'

মজুমদার চিঠি খুলে পড়তে লাগল।

চিঠি পড়া শেষ করে মজুমদার বলল, 'মনে হচ্ছে ওরা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চায়। পাটনায় যাবার জন্যে আপনাকে এক হাজার টাকা দেওয়ার কি মানে বুঝলাম না। হয়তো টাকার লোভ দেখিয়ে আপনাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে। কাপুর লোকটা যে বদমাস আর মাতাল সবাই জানে। ও হয়ত সহ্য করতে পারছে না, যে ঐ মেয়েমানুষটির সঙ্গে আপনার মেলামেশা চলুক। তাই মেয়েমানুষটিকে দিয়ে আপনাকে সরিয়ে দিল। আপনি মশাই লাইনও বোঝেন না। পাটনার ম্যানেজার দেশপান্ডে কাপুরের কাউন্টারপার্ট। যেমন চরিত্রহীন, তেমন চোর। তার আন্ডারে বদলি করা আর সাপের জঙ্গলের নীচে ফেলে দেওয়া একই কথা। অথচ আপনি সেই কাজটা করে বসলেন। এখনও যদি পারেন, সরে পড়ুন।'

'তা হয় না, সব ঠিক হয়ে গেছে, যা হয় হবে, চলি,' বলে উঠে পড়লাম।

মজুমদার বলল, 'আমাদের সবার সাপোর্ট রইলো আপনার পক্ষে।'

কাজ সেরে উঠতে যাচ্ছিলাম সুপ্রিয়ার চাপরাশী এসে বলল, 'মেমসাব সেলাম দিয়া।'

বললাম, 'এখন যেতে পারবো না বিশেষ কাজ আছে, আমি এখন চলে যাচ্ছি।'

মুহূর্তমাত্র দেরী না করে বেরিয়ে পড়লাম। ধর্মতলার চেম্বার থেকে ডাক্তার বাবুকে নিয়ে বড়মামার বাড়ি যাব। বড় মামার বাসা বালীগঞ্জে। সেখান থেকে

চীজলিং! হরদম খান! চিবিয়ে যান!
চীজের গন্ধে ভরপুর, অনন্য স্বাদে টৈটম্বুর!
চীজলিং! কুড়মুড়ে তাজা, খেয়ে পাবেন মজা!

সেই সঙ্গে পার্লে থেকে পাবেন আরো ৪টি সুস্বাদু বিস্কুট

জেকস্—স্বাদগন্ধে মন মাতে,
একদম পাতলা দেখতে।

ওর্দে—খাস্তা মুখে দিলে,
মসলায় মন ভোলে!

ফানিয়ান্—পেঁয়াজের স্বাদ তাজা,
খেয়ে দেখুন বড় মজা!

শিপন-এচ্—মেথি দিয়ে তৈরী,
সকলেরই প্রিয় ভারী!

চীজলিং—খেয়ে তৃপ্তি, দিয়ে আনন্দ—
আসরেবাসরে খুশীর স্রোত!

পার্লে

আপনার জন্য ভারতে সেভারী
স্ন্যাকের সর্বপ্রথম নির্মাতা

everest/277d/PP ben

মাসীর বাড়ি হয়ে ফিরব। মা বার বার করে মাসীর বাড়ি হয়ে আসতে বলেছে। মাসীর দেওরের মায়ে একটা চিঠি যেন অতি অবশ্যই নিয়ে আসি মেসোর কাছ থেকে।

এক একদিন কী অদ্ভুত ধরনের ঘটনা যে ঘটে যায়। মাসীর বাড়িতে করবীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রথমেই নজর গিয়ে পড়ল ওর ঠোঁটের ওপর। করবীর ঠোঁট ঠিক আগের মতই টুসটুসে আছে। অথচ করবীর একটা প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটে গেছে। করবী আগে কালো ছিল, এখন ফর্সা হয়েছে। আগে মোটা মোটা মতন ছিল, এখন বেশ স্লিম বলা চলে। আগে ওর চোখ দুষ্টু থাকত, এখন বেশ শান্ত। সব চেয়ে বড় কথা, করবী আগে অনর্গল কথা বলত, এখন ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে মাত্র গোটা আষ্টেক কথা বলেছে। প্রথমে আমিই জিজ্ঞেস করলাম, 'কি খবর, ভাল?'

করবী হাসিমুখে ঘাড় কাৎ করল শুধু।

বললাম, 'অনেকদিন পর দেখা হল।'

করবী বলল, 'হ্যাঁ'।

'কোথায় থাকা হয় আজকাল।'

'বরাবর জামসেদপুরেই আছি।'

বেবীও শ্বশুর বাড়ি থেকে এসেছে। ও বলল, 'করবীর স্বামীর খুব বড় ব্যবসা। ওরা খুব বড়লোক।'

করবী প্রতিবাদ করল না। শুধু হাসি-মুখে তাকিয়ে রইল। কয়েকটা বছরের মধ্যেই করবী কী সাংঘাতিকভাবে বদলে গেল।

মাসী জোর করে খাইয়ে দিল। বেশ রাত হয়ে গেছে। উঠে পড়লাম। বেবী বলল, 'তুমি তো দমদম যাচ্ছো, ওকে শ্যামবাজারে ছেড়ে দিয়ে যাও না। ওর দেওরের আসার কথা ছিল, এখনও তো এল না।'

ভেবেছিলাম, করবী ওর দেওরের জন্যে অপেক্ষা করতে চাইবে। করবী সে রকম কিছু বলল না। চুপচাপ বসে রইল।

ট্যাক্সিতে পিছনের সীটে দুজনে বসলাম। মাঝে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। করবী গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই যে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল, একবারও আমার দিকে তাকাল না। অথচ করবী যে আমার ওপর রেগেছে, তাও মনে হল না। শুধু মনে হল, কয়েকটা বছরের মধ্যে করবী কী সাংঘাতিকভাবে বদলে গেল। অথচ ওর আগে তো বেবীর বিয়ে হয়েছে। বেবী আগের মতই চেঁচায় লাফায়, অকারণে হেসে গড়িয়ে পড়ে। অথচ করবী যে দুঃখে আছে, তাও মনে হল না। করবীর গা-ভর্তি গয়না। মাঝে মাঝে বাইরের আলো এসে করবীর গায়ে পড়ছিল। করবী যেন জ্বলে জ্বলে উঠছিল। চেনা-জানা মানুষ, পাশা-পাশি নীরবে বসে থাকা যায় না। একসময় বাধ্য হয়ে আমাকে বলতেই হল, 'রাতে এত গয়না পরে না বেরোনই ভাল। দিনকাল সুবিধের না।'

করবী কথা বলল না। বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। লাল বাতি জ্বলছে। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনেই একটা ডবল-ডেকার। মানুষের ঠাসাঠাসি। ট্যাক্সিটা ক্রমাগত হর্ন টিপছে। নীল বাতি জ্বলে উঠেছে। তবুও বাসের ছাড়ার নাম নেই। ড্রাইভার গলা বাড়িয়ে একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছে। হঠাৎ করবী বলে উঠল, 'বিয়ে করেছেন?'

'কে, আমি?' অসতর্ক মুহূর্তে কথাটা বলে ফেললাম।

'ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করিনি নিশ্চয়।' যদিও করবীর মুখ ওপাশে ঘোরান ছিল, মনে হল, ও একটু হাসল।

'তুমি অনেক পাল্টে গেছো।'

'কি রকম?'

'আগে খুব কথা বলতে, হাসতে।'

করবী হাসতে হাসতে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'এখনও হাসি।'

'কিছুক্ষণ আগে, ও-বাড়িতে থাকতে, একটুও হাসছিলে না, কথাও বলছিলে না।'

'মানুষ সব সময় হাসে না কথাও বলে না।' করবী আর মুখ ঘুরিয়ে বসল না, আমার দিকেই তাকিয়ে রইল।

'তুমি কবে যাবে?'

'সবে তো পরশু এলাম।'

'জামসেদপুর কেমন লাগে?'

'অন্য কথা বলুন।'

'কি কথা?'

'বিয়ে করেন নি কেন?'

'বিয়ে হয়নি বলে।'

'কবে হবে?'

'দেখি, একজনের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে।'

'কে?'

'সুষমা।'

'সুষমা কে?'

'নিতুদার বোন।'

করবী শব্দ করে হেসে উঠল। 'বেশ তো, নিতুদার বোনকেই বিয়ে করে ফেলুন। নিতুদার বোনেরা খুব ভাল হয়। আমার এক বন্ধু ছিল, তার দাদার নামও ছিল নিতু। ও খুব ভাল ছিল। বিয়ে করে ইউ-কে'তে সেটল্ করেছে। মাঝে মাঝে চিঠি দেয়। একটি মেয়ে হয়েছে।'

'তোমার ছেলেমেয়ে কটি।'

'সাত কোটি।' বলে খিল খিল করে হেসে উঠল করবী। ও কথায় কথায় এত হাসছিল, যেন সুদে-আসলে গম্ভীর হয়ে থাকাটা উশুল করে নিচ্ছে।

আমিও হেসে ফেললাম, 'সাত কোটি নয় এখন, অনেক বেড়ে গেছে। যে অনু-পাতে লোক বাড়ছে—'

'দোহাই পলিটিক্স শুরু করে দেবেন না যেন। এখানে এসে অবধি সেই এক কথা। কে কাকে ছুরি মারল, কার মাথায় বোমা পড়ল, কোথায় গুলি চলল, যত সব মাথা গরম-করা খবর।'

'তোমাদের ওখেনে বুঝি এসব নেই।'

'বিলকুল নেহি। একেবারে ঠাণ্ডা। এক-একসময় মনে হয়, জমে বরফ হয়ে যাব। তাই তো ছুটে আসি। কিছুদিন হট্টো-গোলের মধ্যে থেকে চাঙ্গা হয়ে আবার ফিরে যাই।'

'তোমার কর্তা আসেনি?'

'ওর খুব কাজ।'

'কি করে?'

'বিজনেস।'

'বিজনেসম্যানরা খুব বড়লোক হয়।'

'হ্যাঁ।'

করবী খুব স্বাভাবিকভাবে হ্যাঁ বলল, কিন্তু ওকে একটুও অহঙ্কারী বলে মনে হল না। ও যে বড়লোক হয়েছে, ওর দামী শাড়ি, গা-ভর্তি গয়না দেখেই বুঝেছিলাম।

বললাম, 'আজকাল কোলকাতায় কেউ গয়না পরে বেরোয় না।'

'কেন?' করবী সরল মুখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

'যা গুণ্ডা বদমাইসী চলছে। কোনদিন দেখবে সব কেড়েকুড়ে নিয়ে গেছে।'

'বেঁচে যাই তাহলে।'

'কেন?'

'আর বোঝা বয়ে বেড়াতে হয় না।'

'গয়না মেয়েদের কাছে বোঝা?'

'আমার কাছে বোঝা।'

'তবে পর কেন?'

'ও ভালবাসে।'

'তুমি তো স্বামীর খুব বাধ্য! স্বামী কথাটার মধ্যে কেমন মালিক মালিক গন্ধ রয়েছে, তুমি দেখছি তা বিশ্বাস করো।'

'হ্যাঁ।' করবী আবার সরল মুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ওর মুখ দেখে একটুও মনে হল না যে ও পরিহাস করছে।

করবীর কথা শুনতে ভাল লাগছিল, আবার বললাম, 'এখন তো তোমার স্বামী এখানে নেই, ইচ্ছে করলে তুমি তোমার বোঝা নামিয়ে রাখতে পারতে।'

করবী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল, তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করতে পারতাম। লাফাতে পারতাম, নাচতে পারতাম, গাইতে পারতাম—সব কিছুই পারতাম। কিন্তু ইচ্ছে করে না।'

(ক্রমশঃ)

সাধারণ রঙ্গালয় বাংলা নাটকের মুক্তি

বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত

বিনোদিনী

(ক)

প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় বা পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হল ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়ী এই রঙ্গালয় স্থাপিত হয়েছিল। নাম 'ন্যাশানাল থিয়েটার'।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা, শুধুমাত্র সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই নয়, বাঙ্গালীর সার্বিক জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রেও এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সাধারণ রঙ্গালয় বঙ্গ-সংস্কৃতির এক নবদিগন্ত উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় মানসিকতাকেও এক নব চেতনা ও আবেগে উত্তীর্ণ করেছিল। তারপর আরও রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হল; পেশাদার অভিনেতা, অভিনেত্রী, গীতিকার, নৃত্য-শিল্পী, স্টেজ-ম্যানেজার ও অন্যান্য কলা-কুশলীরা অভিনয়ে উৎকর্ষ আনলেন। নাটকের মধ্য দিয়ে স্বাজাত্যাভিমান জাগ্রত হল। প্রহসনের তীব্র কষাঘাত সমাজের নানা কুসংস্কার ও ভণ্ডামির ওপর আঘাত হানল। বাঙ্গালীর নাট্যপিপাসা তৃপ্ত হল। উদ্ভব হল পেশাদার নাট্যকার সম্প্রদায়ের। অভিজাত শৌখিন নটগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটল। এক কথায় বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা ও তদনুসারী নাট্যপ্রবাহ এক প্রবল ও বিপুল ভাবাভিঘাত সৃষ্টি করল, যার ঢেউ শতাব্দী অতিক্রম করে এই শতাব্দীর চেতনার বেলাভূমিতেও কলরোল এনে দিল।

সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। কোনো এক নট-ভৈরব গিরিশ বা নটর্ষি অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির নাট্যপ্রচারের উদ্দেশ্য বা কোনো এক ধনী নীল-কুঠিয়াল মধুসূদন সান্যালের বাণিজ্যিক স্বার্থ বা স্কুল-মাস্টার ধর্মদাস সুরের খেয়াল চরিতার্থ-তার পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর পিছনে ছিল বাঙ্গালীর যুগান্তব্যাপী সারস্বত সাধনা, নাট্যপিপাসা, যাত্রা চপ পাঁচালীর ঐতিহ্য এবং সর্বোপরি রেনেশাঁর আলোকে উজ্জ্বল জাতীয় মানসিকতার নব নব দিগন্তে ছড়িয়ে পড়বার প্রবণতা। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জাতীয় সংস্কৃতি ও সার্বিক চেতনার এক অন্তঃস্রোত শতসহস্র ধারায় উৎসারিত হল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হেরাসিম লেবেডেফের চেষ্টায় সর্বপ্রথম ইংরাজী থেকে বাংলায় অনূদিত নাটকের অভিনয় হয়েছিল। লেবেডফের পর নাট্য-আন্দোলনের ধারা বাহ্যতঃ শুকিয়ে গেল। কোলকাতায় তখন একাধিক ইংরাজী নাট্যশালা কেবল-মাত্র ইংরাজ ও অভিজাত বাঙালীর মনোরঞ্জন করত। কিন্তু ইংরাজীনবীশ বাঙ্গালীরাও এই অভিনয় দেখে তৃপ্তি লাভ করতে পারতেন না। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'সে সময়ে (১৮৫৬-৫৭) সহরে ইংরাজদের একটি প্রসিদ্ধ রঙ্গালয় ছিল, তাহাতে দেশের অনেক শিক্ষিত লোক ও বড়লোক অভিনয় দেখিতে আসিতেন। দেখিয়া আসিয়া আমাদের মধ্যে এইরূপ রঙ্গালয় নাই কেন বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। তাহার ফলস্বরূপ সহরের দুই-একজন বড়লোক উদ্যোগী হইয়া ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের অভিনেতা করিয়া বন্ধুবান্ধবদের চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন।' (রামতনু লাহিড়ী ও তৎ-কালীন বঙ্গসমাজ। শিবনাথ শাস্ত্রী। ২য় সংস্করণ, ১৯০৯। পৃঃ ২২৫, নবম পরিচ্ছেদ)

কিন্তু তারও আগে প্রসন্নকুমার ঠাকুর একবার তাঁর শুঁড়োর বাগানে উইলসন সাহেব অনূদিত 'উত্তররামচরিতের' অভিনয় করিয়েছিলেন। হেয়ার একাডেমী এবং ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতেও ইংরাজী নাটকের অভিনয় হয়। ইংরাজী রঙ্গালয়ের উদ্যোগে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ভবনে 'ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার' খুলে (১৮৫৪) শেকস্‌পীয়রের নাটকের অভিনয় শুরু হয়। বাঙ্গালী পাড়ায় ইংরাজী নাটকের অভিনয় তখনকার দিনের বাঙ্গালী সমাজে তুমুল সাড়া জাগিয়েছিল।

ঐ বছরই জোড়াসাঁকোর প্যারিমোহন বসুর বাড়ীতে ইংরাজী নাটক অভিনীত হয়েছিল। নাটকের নাম 'জুলিয়াস সিজার'। ১৮৫৪ খৃঃ ৫ই মে তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' তার সমালোচনা বার হয়েছিল। শুধুমাত্র 'পঞ্চম প্রকরণ' (পঞ্চম অঙ্ক) অভিনীত হয়েছিল। সংবাদ প্রভাকর লিখে-ছেন, 'যদিও হেয়ার একাডেমীতে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদের দ্বারা ইংরাজী নাটক দেখাইবার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তারপর ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের ছাত্ররাও নাটক নাটক কাণ্ড করিয়াছেন তাহার-দিগের দ্বারাও উত্তমরূপে সকল ব্যাপার সমাধা হইয়াছে তথাচ এইরূপ সর্বাঙ্গ-সুন্দররূপে সম্পাদন হয় নাই।' (সংবাদ-পত্রে বাংলার সমাজজীবন/বিনয় ঘোষ/ প্রথম খণ্ড/সংবাদ প্রভাকর)

এই সকল নাটকের দর্শক ও অভি-নেতাগণ বিদেশী নাটক দেখেছেন ও তাতে অভিনয় করেছেন, কিন্তু তাঁদের নাট্যানু-রাগ ছিল খাঁটি স্বদেশী। ইংরাজী খাতে ক্ষীণধারায় প্রবাহিত হলেও সাধারণ রঙ্গালয় গঠনে এই ধারার অবদানও নিতান্ত কম ছিল না।

(খ)

কিন্তু প্রধান ধারাটি বয়ে চলেছে দেশী খাতে।

সংস্কৃত ও ইংরাজী থেকে অনূদিত বাংলা নাটকের অভিনয়ও করেছেন শখের অভিনেতারা। এই অভিনয়েরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কোলকাতার ধনী বাঙ্গালী। সাধারণ দর্শকদের এই অভিনয় দেখার সুযোগ ছিল না। আমন্ত্রিত দর্শকদের মধ্যেও অর্থ ও

সামাজিক কৌলিন্য অনুযায়ী আসন নির্দিষ্ট করা হত। ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) বাড়ীতে 'শকুন্তলা' অভিনয় উপলক্ষে এমনি একটি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। 'নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ যখন টিকেট দেখাইয়া উঠানে নাট-মন্দিরে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন এক ব্যক্তি অভ্যাগত ব্যক্তিদের পোষাক দেখিয়া 'মহাশয় ফ্রন্ট সিট, মহাশয়, সাইড সিট' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকেন।' (পুরাতন প্রসঙ্গ/ বিপিনবিহারী গুপ্ত/পৃঃ ১৫২)

এই সকল বৈষম্য থাকলেও বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে কোলকাতার ধনীদের পৃষ্ঠপোষিত এই সকল অভিনয়ের অবদান কিছু কম নয়।

১৮৩৫ খৃঃ শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু তাঁর বাড়ীতে বিলাতি ধরনের রঙ্গমঞ্চ তৈয়ারী করে বাঙ্গালী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দিয়ে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয় করিয়েছিলেন। (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস/ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/ পৃঃ ১৩) ১৭৯৫ খৃঃ ২৭শে নভেম্বর লেবেডফ কোলকাতার ধর্মতলায় যে অভিনয় করিয়েছিলেন, তার চল্লিশ বছর পর নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে বাংলা নাটকের অভিনয় হল।

প্রখ্যাত শৌখিন অভিনেতা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরবর্তীকালের বাংলা নাটকের সপ্তপর্বের বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী চড়কডাঙ্গা রোডে রামজয় বসাকের বাড়ীতে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় হল এই সাত পর্বের প্রথম পর্ব। থিয়েটারের দ্বিতীয় পর্বের স্থান ছিল ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) বাড়ী। এখানে নন্দকুমার রায় রচিত 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় হয়। নাটকের গান রচনা করেছিলেন কবিচন্দ্র। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের থিয়েটার অনুষ্ঠিত হয়েছিল যথাক্রমে পাইকপাড়ায় রাজাদের বাড়ী ও কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ী। এই পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া মঞ্চে 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখেই মাইকেল বাংলা নাটক রচনায় কৃতসংকল্প হন। পরের পর্বে সিন্দুরিয়া পটীতে মেট্রোপলিটান কলেজে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক' অভিনীত হয়েছিল। পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকের অভিনয় হল ষষ্ঠ পর্বে। এখানে বিদ্যাসুন্দর, রুক্মিণীহরণ, মালতীমাধব, উভয়সংকট, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, বুঝলে কিনা, প্রভৃতি নাটক ও প্রহসনের অভিনয় হয়েছিল।

(পাথুরিয়াঘাটার) 'ঠাকুরবাড়ীতে থিয়েটারের জন্য একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহার সভ্য ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়, মাইকেল মধুসূদন, কেশব গাঙ্গুলী, দীনু ঘোষ। এই কমিটি বাছাই করিয়া দিত আমাদের মধ্যে কে কি সাজিবে।' (পুরাতন প্রসঙ্গ/বিপিনবিহারী গুপ্ত/কলিকাতা ১৩২০, পৃঃ ১৫৬)

পাইকপাড়ার দুই রাজার একজনের মৃত্যু হলে নাটকে রাজবাড়ীর পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ হল। অন্যান্য ধনীদের উৎসাহও কমে গেল। নিমাইচাঁদ শীলের 'কাদম্বরী নাটকের' প্রস্তাবনায় এর জন্যে বিলাপ আছে—

'এ কি বিধির বিড়ম্বনা ভারতবর্ষে
কুরসে পুরিলো পুন, কপালের দোষে!
দেশের দুর্দশা হেরি, গুণিসনে যত্ন করি
সরস রস-মাধুরী প্রকাশিয়ে অনতোসে।
নাটকের অভিনয়, হয়েছিল দেশময়—
পুনঃ বিধি বাদী হ'লে, ঘুচাইল সব শেষে'

(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস/সুকুমার সেন/নাটক ১৮৫২-১৮৭২)।

কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ধনীর পৃষ্ঠপোষকতার অভাব জাতীয় সংস্কৃতির প্রাণধারাকে রুদ্ধ করতে পারেনি। এগিয়ে এলেন 'ভগীরথেরা'। তাঁরা বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ধর্মদাস সুর প্রমুখ নাট্যসাধকেরা। সপ্তম পর্বে ১৮৭২ খৃঃ সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হল।

(গ)

বাংলা নাটক ও রঙ্গালয়ের ক্রমবিকাশে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর অবদানও কম নয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গুণেন্দ্রনাথ দুইজনেই নাট্যামোদী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জীবন-স্মৃতিতে যাকে 'অদ্ভুতনাট্য' বলেছেন, তাও এই দুইজনেরই সৃষ্টি।

'তাহারা দুইজনে মিলিয়া, বাড়ীতেই একটি নাটকীয় দলের সৃষ্টি করিলেন। অভিনয়, তাহাদের আয়োজন, অভিনয়োপযোগী নাটক নির্বাচন প্রভৃতি কার্যের জন্য একটি সমিতি গঠিত হইল।...সমিতির নাম হইল কমিটি অফ ফাইভ। কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিবাবু, অক্ষয়বাবু (চৌধুরী) এবং জ্যোতিবাবুর ভগিনীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এই পাঁচজন নাট্যসমিতির সভ্য হইলেন।'

প্রথমে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটকের' অভিনয় হল। তারপর 'একেই কি বলে সভ্যতা?' অভিনয়ও হয়ে গেল। এই কমিটি অফ ফাইভ রামনারায়ণ তর্করত্নের ওপর নতুন একখানি সামাজিক নাটক লিখবার ভার দিলেন। রামনারায়ণের এই নাটকের নাম 'নব-নাটক'। এজন্যে নাট্যকারকে ৫০০, টাকা দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল।

'প্রথম দিনের অভিনয়ে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় শেষ হইলে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া—'যারা পলাট নাই পলাট নাই বলে, এখানে একবার এসে দেখে যাক'—সমালোচকদের ওপর এইরূপ মধুবর্ষণ করিতে করিতে, তিনি আপনার আনন্দ-সাফল্যে গর্বিত হইয়া খুব আস্ফালন করিয়াছিলেন।' (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি/বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়/পৃঃ ১১২)

পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বয়ং নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন। ১৮৭৫ খৃঃ প্রকাশিত হল তাঁর 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক'। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চোদ্দ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন 'আমি ও রামসর্বস্ব দুইজনে রবির পড়ার ঘরে বসিয়াই 'সরোজিনীর' প্রুফ সংশোধন করিতাম। রামসর্বস্ব খুব জোরে জোরে পড়িতেন। পাশের ঘর হইতে রবি শুনিতেন ও মাঝে মাঝে পণ্ডিত মহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া, কোন স্থানে কি করিলে ভালো হয়, সেই মতামত প্রকাশ করিতেন।...তিনি বলিলেন এখানে পদ্য রচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারিবে না। প্রস্তাবটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। কারণ প্রথম হইতেই আমারও মনটা কেমন খুঁৎ-খুঁৎ করিতেছিল। কিন্তু এখন আর সময় কৈ? আমি সময়াভাবের আপত্তি উত্থাপন করিলে রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতাটির পরিবর্তে একটি গান রচনা করিয়া দিবার ভার লইলেন, এবং তখনই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত

পাবলিক থিয়েটারের অভিনয়সখীর দল

দ্বিতীয় সংস্করণের টাইটেল পেজ

সুরেন্দ্র-বিনোদিনী

নাটক।

৺ দুর্গাদাস দাস প্রণীত।

কলিকাতা :

রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গিত অশ্রুমতী নাটকের উৎসর্গপত্র

উৎসর্গ পত্র।

ভাই রবি

তুমি অশ্রুমতীকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে আছ। এই লও, আমার অশ্রুমতীকে তোমার কাছে পাঠাই। ইংলন্ড-প্রবাসে, তাকে দেখে, তোমার প্রবাস-কষ্ট যদি অল্পমাত্রও ঘোচে, তা হ'লে আমি সুখী হব।

তোমার

করিয়া দিলেন। 'সরোজিনী' প্রকাশের পর হইতেই আমরা রবিকে প্রমোশন দিয়া আমাদের সমশ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম।'

(ঐ, পৃঃ ১৪৭-১৫১)।

বাংলা নাটক মহাকবির হাতের স্পর্শ লাভ করল। পরবর্তীকালে তিনি বাংলা নাটককে উৎকর্ষের স্বর্গলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে ইতিহাস এ নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত নয়। জ্যেষ্ঠ নাট্যকার কনিষ্ঠকে নাট্য-সাধনায় বরণ করে নিলেন শুধু তাই নয়। বিলাত প্রবাসী রবীন্দ্রনাথকে 'অশ্রুমতী নাটক' উৎসর্গ করে বাংলা নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগসূত্র দৃঢ় করে দিলেন।

(ঘ)

সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা জাতীয় জাগরণে প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বিশেষ করে নারীজাগরণ এবং সংস্কৃতি-আন্দোলনের সঙ্গে নারীর সংযোগ একালীন এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। লক্ষ্য করবার বিষয়, বর্তমান কালেও বাঙালী মহিলাদের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার নেই। সাহিত্যের মাধ্যম হিসাবে নাটক যখন আজকের সমাজে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে, তখন এই শাখা আজকের লেখিকাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হল কেন তা বিশেষভাবে ভাবা উচিত। ভাবলে অবাক হতে হয়, শতাধিক বছর আগে যখন সাহিত্য-চর্চা গৃহস্থ মহিলার পক্ষে দুঃসাহসিকতা বলে গণ্য হত, তখনও স্বনামে ও বেনামে অনেক মহিলা নাটক রচনা করেছেন। এর সাহিত্য-মূল্য কতটুকু সে প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। এই রচনার মধ্য দিয়ে যুগ-যুগান্তের বন্দী নারী-মানসিকতা মুক্তি পেয়েছে, এটাই সবচেয়ে বড় কথা। মুক্ত মানসিকতার আবেগে যে রচনা করেছে, সাহিত্যের মানদণ্ড দিয়ে তার বিচার হয় না। তার বিচার হওয়া উচিত ইতিহাসের মানদণ্ড দিয়ে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা নারীকে মুক্ত চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে।

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বেই কোন কোন দুঃসাহসিকা নাটক রচনায় হাত দিয়েছেন। 'উর্বশী নাটক' লিখেছিলেন দ্বিবজ তনয়া, প্রকৃত নাম কামিনীসুন্দরী দাসী। এই নাটকখানি প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খৃঃ। প্রাক্-সাধারণ রঙ্গালয় যুগের আরও দুয়েকজন মহিলার নাটক পাওয়া গেছে। তবে এর সবগুলিই মহিলাদের রচনা কিনা সন্দেহ আছে।

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর অনেক মহিলা নাটক রচনায় অবতীর্ণ হলেন। প্রখ্যাত অভিনেত্রী সুকুমারী দত্ত (গোলাপী) প্রণীত 'অপূর্ব সতী নাটক' (১৮৭৫), লক্ষ্মীমণি দেবীর 'চির-সন্ন্যাসিনী' (১৮৭২), ও 'সংতাপিনী নাটক' (১৮৭৬), শ্রীমতী স্বর্ণলতার 'শুরবালা' সুলোচনা, নয়নতারা দেবীর 'মণিমোহিনী', মণিমোহিনীর 'বিনোদকানন', প্রফুল্লনলিনী দাসীর 'সংচরিতা প্রহসন' এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বসন্ত উৎসব' এ যুগের উল্লেখযোগ্য নাটক।

'অপূর্ব সতী নাটকের' লেখিকা সুকুমারী দত্ত সু-অভিনেত্রী ছিলেন। তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু পতিতা-কন্যার প্রেম-নিষ্ঠা। ঊনিশ শতকের পতিতা-সমাজ সংস্কৃতির দীপালোকটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। অথচ সমাজে তাঁরা ছিলেন ঘৃণিত। সংস্কৃতির নতুন চেতনায় মানবিক দৃষ্টি দিয়ে তাদের দেখার প্রবণতা এলো। স্টেজে অভিনয় করে যাঁরা যশস্বিনী হয়েছিলেন তাঁদের কেউ কেউ এই তথাকথিত পতিতাসমাজ থেকে এসেছিলেন। 'অপূর্ব সতী নাটক' এক হিসাবে ঊনিশ শতকের মুক্ত মানসিকতার দিকদর্শন।

নারীর মানসিকতা ও বুদ্ধির মুক্তি লক্ষণীয় গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাঈ' নাট্যকাব্যে (১৮৯২)। মীরাবাঈয়ের অলৌকিক জীবন-কাহিনী লৌকিক পরিমণ্ডলে স্থাপন করা হয়েছে এই নাটকে। গিরীন্দ্রমোহিনী সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন মীরাবাঈ-এর অলৌকিক জীবনী-নাটক রক্তমাংসের উৎসলোক থেকে উৎসারিত সংবেগ এনে। রাণাকুম্ভের দ্বিতীয়া স্ত্রী শ্রুতি রাঠোর যুবক রত্নসিংহের প্রতি আবাল্য অনুরক্ত। এবং এই সাহসিকা তাঁর স্বামীর নিকট তা স্বীকার করতে লজ্জিতা নয়। অতঃপর রাণাকুম্ভের মৃত্যু তাঁর পুত্র উদয়সিংহের হাতে, তাঁর চিতায় শ্রুতির আত্মবিসর্জন এবং শ্রুতির প্রেমিক রত্নসিংহের পতন ও মৃত্যু।

পুত্রের হাতে পিতার মৃত্যু হিন্দু সংস্কারের পক্ষে এক অভিনব ব্যাপার। কিন্তু ঊনিশ শতকের বাঙালী সংস্কারের গভীরে প্রোথিত মূল্যবোধ পরিদর্শনের জন্যে নাট্যাভিমুখী হননি। বরং তারা থিয়েটারের দর্পণে বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রধান লক্ষণ মুক্ত, স্বাধীন, সমাজ-নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বের বিকাশ দেখতে চেয়েছিলেন। ঊনিশ শতকের মেলোড্রামায় এই দোষ

সামাজিক মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিসত্তা।

এই কালের আরেক বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিত্বের অন্তর্দ্বন্দ্ব। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিমানুষ সমাজ-সম্পর্কিত ব্যাপারে ছিল দ্বন্দ্ব ও সংকোচহীন। দেবতা, ইংরেজ, বাবু, পণ্ডিত, মনু ও স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দেশ মধ্যবিত্ত বাঙালী অপ্রতিবাদ্য বলে গ্রহণ করতেন। কিন্তু সবল স্বাধীন ব্যক্তিত্বের ধ্বজা তুললেন মধুসূদন, বিশেষভাবে তাঁর প্রহসনে, এবং দীনবন্ধু তাঁর নাটকে ও প্রহসনে। বাঙালী পাবলিক থিয়েটারে দেখলেন পুরাতন সামাজিক মূল্যবোধের ওপর স্বাধীন সার্বভৌম ব্যক্তিত্বের বিজয়-অভিযান। সবকিছু বিচার করে, বাজিয়ে, উল্টেপাল্টে দেখবার ঝোঁক এল। জীবনকে নতুন এবং নতুনতর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার প্রবণতা প্রবল হল।

পুরাতন সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অনূদিত শেকসপীয়রের নাটকের অবদান কম ছিল না। তদুপরি বুর্জোয়া অর্থনৈতিক বিকাশ শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে। এই সামগ্রিক ঘটনার ফলশ্রুতি হল এই ব্যক্তিত্ব জটিল হল, বৈচিত্র্যময় হল, বর্ণাঢ্য ও গভীর হল।

নির্মাট মৃত্যু, ত্রিকোণ প্রেম, বীরত্ব, যুদ্ধ ইত্যাদি উনিশ শতকের মেলোড্রামার যাবতীয় লক্ষণ 'সন্ন্যাসিনী নাট্যকাব্যে' তার সবই আছে। নাটকীয় উপাদানে যে নতুনত্ব আছে তা হল সামাজিক মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের ফলে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব। পূর্ববর্তী অন্যান্য নাটকে যদিও এর অপ্রতুলতা নেই, কিন্তু মহিলা-রচিত নাটক 'সন্ন্যাসিনীতে' এই অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও বিচিত্রতা লাভ করেছে, তৎকালীন মুক্ত নারী-মানসিকতার যা লক্ষণ—। উদয়সিংহ পিতাকে হত্যা করেছে শুধু তাই নয়, সে বিমাতার প্রণয়-প্রার্থী। মহিলা নাট্যকার এখানে সমাজের সংস্কার ছিঁড়ে ফেলেছেন, ব্যক্তিত্বকে তার বিষণ্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এইখানে তাঁর 'আধুনিকতা'। উদয়সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্বকালীন এই সংলাপ অতীব আকর্ষণীয়—

'উদয়সিংহ।

ভেবেছিনু প্রণয়েতে
হস্তগত করি বিমাতারে,
তারি হাতে করে নেব কণ্টক উদ্ধার:
পারে না সে দেখিবারে বৃদ্ধ মহারাজে,
এক লোষ্ট্রে দুই পক্ষী হইবে শিকার।
—রমণীর প্রেম আর রত্ন সিংহাসন।
কিন্তু প্রত্যাখ্যাত প্রেমলিপি মোর,
অসহ্য যেমন বৃদ্ধ পিতার জীবন,
তার চেয়ে অসহ্য নারীর অহংকার!
ধর্মমদে প্রেমমদে গর্বিতা রমণী,
দেখিব কেমনে,

অটুট রাখিবে এবে চরিত্র গৌরব!'
(চতুর্থ অঙ্ক/অষ্টম দৃশ্য/আবু পর্বত-শিখরস্থ প্রাসাদের এক কক্ষ)

তারপর রাণাকুম্ভকে হত্যা করতে গিয়ে পুত্র উদয়সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্ব—

'একি দুরু দুরু কেন করিছে হৃদয়?
দূর হও বৃথা ভয়, স্নেহের শাসন,
কেন মনে পড়িতেছে শৈশব দিবস,—
ধরিয়া পিতার কণ্ঠ নিশ্চিন্ত শয়ন!
কিন্তু বহুদূরে আসিয়াছি,
আর ত না হয়।
দূরে হও বৃথা মায়া পাপ বিভীষিকা,
পড়ে যাক যবনিকা, কিস্মৃতির পট
এখন ফিরিতে গেলে বহুল সংকট।

— — — — — — — — — —

(স্বগত)

বৃথা মায়া দেখাইয়া নারিবে ফিরাতে
আসিয়াছি বহুদূরে, আর নাহি হয়।
কর্তব্য বিমুখ যেই অলস দীর্ঘায়ু,
তাহার জীবন শুধু বিড়ম্বনাময়?

(নেপথ্যে কর্ণ দিয়া)

উঠিছে না পুরবাসী,
আসিছে না এই দিকে?
তবে আর নয়:
বৃথা মায়া হও অন্তর্হিত।
হও হস্ত বিশ্বাসী আমার।
যাক খুলে নরকের দ্বার,
মন্ত্রীর রাজত্বভোগ আর নাহি সয়!
(উন্মত্তভাবে আঘাত করিয়া প্রস্থান)
(চতুর্থ অংক, নবম দৃশ্য)

ভাষা ও ঘটনা শেকসপীয়রের নাটক স্মরণ করিয়ে দেয় সন্দেহ নেই। কিন্তু নারীর মুক্ত মানসিকতার বাধাবন্ধহীন উত্তরন যে 'আধুনিকতার' দ্বারা চিহ্নিত তার নির্মাণে পাবলিক থিয়েটারের অবদানেও সন্দেহ করবার কিছু নেই।

শ্রুতি চরিত্রও নারীর ব্যক্তিসত্তা প্রকাশ করেছে। রাজঅন্তঃপুরে থেকেও শ্রুতি অকপটে তার স্বামী রাণাকুম্ভের কাছে প্রকাশ করছে যে সে আবাল্য একজনকে ভালোবাসে। কৌলীন্য প্রথা, একাধিক সতীন নিয়ে সংসার, পর্দা, পচাগলা পুরনো সামাজিক ও নৈতিকবোধ, অশিক্ষা—এই ছিল উনিশ শতকের নারীর পারিবারিক ও

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

উৎসর্গ।

অপ্রতিমক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায় বি, এ,
সুহৃদ্বরেষু।

[illegible]

অভিন্ন-হৃদয়
শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

নবীন তপস্বীর উৎসর্গপত্র

সামাজিক পরিমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য। গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রভৃতি এর তীব্র প্রতিবাদ।

(৬)

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বাঙালীর নাট্যরুচি যে খুব উঁচু স্তরের ছিল না, হেরাসিম লেবেডফ তার উল্লেখ করেছেন। বিদেশী বলেই তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করা উচিত হবে না। অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল পরে মধুসূদনও তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের (১৮৫৯) প্রস্তাবনায় বাঙালীর 'অলীক কুনাট্যরঙ্গের' জন্য আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে/তাহে হয় তনুমন ক্ষয়। মধু কহে জাগো জাগো, বিভুস্থানে এই মাগো/সুরসে প্রবৃত্ত হউক, তব তনয় নিচয়।'

বাঙালীর নাট্যরুচি সম্পর্কে লেবেডফের মন্তব্য আরও তীব্র। লেবেডেফের 'A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialect with Dialogues Affixed'. গ্রন্থের প্রস্তাবনায় তিনি লিখেছেন, 'the Indians preferred mimicry and drollery to plain grove solid sense, however purely expressed......?

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য বাঙালীর এই রুচির যথার্থতা প্রমাণ করবে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থে উনিশ শতকের প্রথম যুগের বাবুর লক্ষণ নির্দেশ করেছিলেন এইভাবে, 'মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান/খোষ পোষাকী যশমী দান।। আড়িঘুড়ি কানন ভোজন/এই নবধা বাবুর লক্ষণ।' এই বাবুশাসিত সমাজে সিরিয়াস নাটক দেখবার রুচি মধুসূদনের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত অনুপস্থিত ছিল। এই জন্যেই আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।'

মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাটক সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে লেখা। সাধারণ রঙ্গালয় তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি ঠিক, কিন্তু অভিনয়-উপযোগী যে নাটক লিখিত হলে থিয়েটারের দর্শকদের কাছে দর্শনীর বিনিময়ে উপস্থিত করা যায় সেই নাটক মধুসূদন দীনবন্ধুই লিখেছিলেন। কাজেই তঁদের নাটকের মধ্যেই পাবলিক থিয়েটারের ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল।

মধুসূদন বাঙালীর নাট্যরুচিকে সমুন্নত করে দিলেন। তাঁর 'পদ্মাবতী নাটক' গ্রীক পুরাণের আখ্যায়িকা অবলম্বনে লেখা। মধুসূদন এই নাটকে সংস্কৃত কাব্যরীতির আধারে গ্রীক কাহিনী পরিবেশন করলেন।

দীনবন্ধুর দ্বিতীয় নাটক 'নবীন তপস্বিনী' বাঙালী পাঠক দর্শকের সঙ্গে, হালকা রসের ও চালের মধ্য দিয়ে, জমাটি এক বাস্তব সামাজিক ঘটনার পরিচয় ঘটালেন। তা-ও অবশ্য বড় কথা নয়। নীলদর্পণ নাটকেরও বাস্তব সামাজিক ভিত্তি রয়েছে। কিন্তু ভাষায়, সংলাপে ও বাক্‌ধারায় দীনবন্ধু কাল্পনিক কাহিনীর মধ্য দিয়ে বাস্তব সমাজকে এনে উপস্থিত করলেন। নীলদর্পণ নাটকের পটভূমি গ্রামবাংলা। কিন্তু নবীন তপস্বিনীর কাহিনী যদিও কাল্পনিক তবু তার মধ্যে উনিশ শতকের মধ্যকালের ভাষা, বাক্‌ভঙ্গী, আচার প্রভৃতি নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে। এদিক থেকে নবীন তপস্বিনী 'কলিকাতা কমলালয়' বা 'নববাবু বিলাসের' সমগোত্রীয়। মধুসূদন আনলেন বিদেশী কাহিনীর আদর্শ, দীনবন্ধু নিয়ে এলেন দেশীয় সমাজের পটভূমিকা। উনিশ শতকের নাট্যরুচি গড়ে তুলতে এই দুই মহানাট্যকারের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু দীনবন্ধুর ভাষা যতই বাস্তব হোক না কেন তা ছিল অশ্লীল। নীলদর্পণ নাটকে অশ্লীলতা ছিল, কিন্তু তা ঘটনার অশ্লীলতা। নবীন তপস্বিনীতে ভাষার যে অশ্লীলতা রয়েছে এ যুগের মানুষের কাছে তা প্রায় অশ্রাব্য। যথা—

মালতী। ও ভাই শুনবি, মহারাজ যদিও ছোটরাণী আর মায়ের ভয়েতে বড় রাণীর ঘরে যেতে পারেন না, কিন্তু সুযোগ পেলে কখন কখন তাঁর ঘরে যেতেন, কপালক্রমে বড়রাণীর পেট হলো......।

জগ। আমি আর ছেনালের কথায় ভুলিনে, আমি সচক্ষে দেখিচি; পোড়াকপালিরা ঘরে থাকতে না পারিস, নাম লেখা গে, নতুন নতুন পুরুষ পাবি, কত রাজা পাবি, কত মন্ত্রী পাবি।' (প্রথম অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

কিন্তু থিয়েটার স্থাপিত হবার পর ভিন্ন ভিন্ন রুচির নারীপুরুষ দর্শকের সম্মুখে এই জাতীয় নাটক খুব বেশী দিন সম্বর্ধনা পেল না। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, রাজকৃষ্ণ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ পরবর্তীকালের নাট্যকারদের নাটক ও প্রহসনে পরিশীলিত রুচির উৎসার লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক গ্লানির চেহারা প্রকাশ করতে গিয়েও তাঁরা স্থূলতা পরিহার করার চেষ্টা করেছেন। বাঙালীর নাট্যরুচিকে 'আধুনিক' ও পরিশীলিত করা পাবলিক থিয়েটারেরই কীর্তি।

দুর্গেশনন্দিনীতে আয়েষার ভূমিকায় তারাসুন্দরী

(৮)

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন বাংলা সরকার নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন জারী করে।

বাংলা নাটক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে এ এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। স্মরণীয়, এই ঘটনার নয় বৎসর পর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। সশস্ত্রবাদী জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম বৈপ্লবিক সংগ্রামের সূচনা ঘটে তারও তেইশ বছর পরে, যখন কিংসফোর্ডের গাড়ীর ওপর বোমা ছুঁড়লেন ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী।

১৮৭৫ খৃঃ 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' নাটক প্রকাশিত হয়। এই নাটকে ম্যাজিস্ট্রেটের অত্যাচার আছে, অত্যাচারের প্রতিরোধ আছে, জেলখানার বন্দীদের বিদ্রোহ আছে। এক কথায় ইংরাজের অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের দিকদর্শন এই নাটক। রুদ্ধশ্বাস ঘটনার পরম্পরা নাটকের অভিনয়কে বিশেষ জনপ্রিয় করে তুলেছিল। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আদি যুগে এই নাটকখানি দর্শক-মানসে বিপুল অনুপ্রেরণা জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। সরকার তাই রুষ্ট হয়ে নিয়ন্ত্রণ আইন জারী করে নাট্যকারের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল এবং নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দিয়েছিল।

উপেন্দ্রনাথ দাসের পূর্ববর্তী নাটক 'শরৎ-সরোজিনী'ও শাসন-কর্তৃপক্ষকে রুষ্ট করেছিল। নাট্যকার এই নাটকখানি 'দুর্গাদাস দাস' এই ছদ্মনামে লিখেছিলেন। বিপ্লবী মানসিকতা ও ভাবনাবাহী এই নাটকখানি নির্মিতির দিক থেকে পরবর্তী নাটক 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' অপেক্ষা দুর্বল হলেও, বক্তব্যের বলিষ্ঠতার দিক থেকে আরও ইংরাজ-বিরোধী। এই নাটকের নায়িকা সরোজিনীর পিস্তল থেকে নিক্ষিপ্ত গুলিই ইংরাজের বিরুদ্ধে 'স্বদেশী' বাঙালীর প্রথম গুলি।

উপেন্দ্রনাথ দাসের উল্লিখিত নাটক দুখানি প্রকাশিত হবার পূর্বেও কাব্যে নাটকে বা উপন্যাসে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়নি এমন নয়। রঙ্গলাল, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্রের কাব্য ও কবিতায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ কথা-সাহিত্যিকের রচনায়, গানে, হিন্দুমেলায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার বাণী ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু, প্রথমত, তা প্রত্যক্ষ ছিল না, দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ প্রতিরোধের কথা কোথাও বলা হয়নি। ফলতঃ তৎপূর্ব-বর্তীকালে এরূপ মানসিকতাই গড়ে ওঠেনি। কাজেই উপেন্দ্রনাথের মানসকন্যা সরোজিনীর পিস্তলের গুলি 'গোরা ডাকাতের' বুকেই শুধু বিদ্ধ হল না, তা সরাসরি গিয়ে সাম্রাজ্যবাদীর ভবিতব্যে বিদ্ধ হল।

'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' নাটকে হুগলীর জেলখানার কয়েদীদের বিদ্রোহ নাট্যকারের বিপ্লবী মানসিকতার নিদর্শন। 'কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙ্গে ফেল করে রে লোপাট, রক্ত-জমাট শিকলপূজার পাষাণবেদী' বা 'এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল' বা 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে মোদের বাঁধন টুটবে' এই জাতীয় বিপ্লবী-সঙ্গীত রচিত হয়েছিল এমন দিনে বিপ্লববাদ যখন বাঙ্গালার রাজনীতিতে শ্রীঅরবিন্দ, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথের সাধনায় 'সন্ধ্যা' 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকতায়, অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি বিপ্লবী গোষ্ঠীর সংগঠনে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শহীদের রক্তে রাজনৈতিক চেতনা যখন তপ্ত ও ভাস্বর হয়েছে। ভাবলে অবাক হতে হয়, এ-সকল ঘটনার প্রায় তিন দশক আগে উপেন্দ্রনাথ দাস তাঁর নাটকে ইংরেজ হত্যা, ইংরাজের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ঘৃণা, সর্বোপরি বিদ্রোহের দৃশ্য উপস্থাপিত করলেন।

হুগলীর জেলখানার কয়েদীরা সাধারণ অপরাধী হলেও তাদের কণ্ঠে ইংরাজশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ধ্বনি স্থান পেয়েছে। ঘটনার নাটকীয়তা, বিন্যাস ও সংলাপ এবং প্রয়োগের বলিষ্ঠতায় এই দৃশ্য বাঙ্গালা নাটকে চিরকাল অবিস্মরণীয় বলে বিবেচিত হবে—

সুরেন্দ্র-বিনোদিনী/উপেন্দ্রনাথ দাস

চতুর্থ অঙ্ক। পঞ্চম গর্ভাঙ্ক। হুগলীর কারালয়। বন্দী-বিদোহ বন্দীগণ। ভাঙ্গ মার কপাট! এই দরজাটা ভাঙ্গ। (কঠোবাদির দ্বারা কবাট ভঙ্গের প্রয়াস) ১ম বন্দী। অরে ও যে লোহার দরজা। ওকি তোরা সহজে ভাঙ্গতে পারবি, দেল ভাঙ্গ। সকলে। ভাঙ্গ দেল ভাঙ্গ দেল। (ভিত্তি ভঙ্গ-করণের চেষ্টা)।

১ জন বন্দী। এই ইংরাজের অত্যাচার আর সওয়া যায় না। হয় পায়ের শিকল ছিঁড়ব, না-হয় মরব। আর এ শিকল টেনে নিয়ে বেড়াতে পারি নে। যে যেখানে আছিস দাদা,—যে কেউ কখনো ঐ পাঁজী ইংরাজের জুতো লাথি খেয়েছিস—আয় সব দোড়ে আয়। এ জেলের দেল ভাঙ্গা, এ বিলিতি লোহার শেকল ছেঁড়া এক-আধজনের কর্ম নয়। আয় ভাই, দাদা, সকলে আয়—যে যেখানে আছিস দোড়ে আয়। হিঁদু হস, মুসলমান হস, বাঙ্গালী হস, খোট্টা হস—ছেলে হস বুড় হস—যার শরীরে এক ফোঁটা দেশী রক্ত আছে—আয় সব দোড়ে আয়। সকলে চেষ্টা না করলে হবে না। (সুরেন্দ্র-বিনোদিনী। উপেন্দ্রনাথ দাস। দ্বিতীয় সংস্করণ, কোল-কাতা ৮ই আশ্বিন, ১২৮৭ সাল)।

'শরৎ-সরোজিনীর নায়িকাও বিদ্রোহিনী। সে নিজে পিস্তলের গুলিতে গোরা ডাকাত হত্যা করেছিল। কেননা সে বুঝেছিল, ইংরাজ রাক্ষসদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার এ ভিন্ন উপায় নাই।'

(ছ)

প্রথম স্থায়ী সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পর পেশাদারী অভিনয় বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফলে একটির পর একটি পেশা-দারী নটগোষ্ঠী ও রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। শিল্পের একটি নতুন পথ খুলে যায়, এবং বিভিন্ন রঙ্গালয়ে প্রচুর পরিমাণ অর্থের বিনিয়োগ ঘটে। অভিনেতা-অভিনেত্রী বা কলা-কুশলী ছাড়াও বেশ কিছু ব্যক্তি এই জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হয়। একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই যে, দুটি রঙ্গালয়ের বিভিন্নকালে স্বত্বাধিকারী ছিলেন দুই অবাঙ্গালী। এঁরা হলেন প্রতাপচাঁদ জহুরী এবং গুরুমুখ রায়। গুরুমুখ রায় জাতিতে ছিলেন পাঞ্জাবী। বঙ্গসংস্কৃতি এইভাবে জাতীয় সংহতিতেও সহায়তা করে। ১৮৭২ খৃঃ থেকে পরবর্তী পঞ্চাশ বছর নিম্নলিখিত রঙ্গালয়গুলি কোলকাতায় নাটকাভিনয় প্রদর্শন করত :

রঙ্গালয়ের নাম	**প্রতিষ্ঠার কাল**	**স্বত্বাধিকারী বা পরিচালকের নাম**
ন্যাশনাল থিয়েটার	ডিসেম্বর, ১৮৭২	অর্ধেন্দুশেখর, ধর্মদাস সুর প্রমুখ; পরবর্তীকালে প্রতাপচাঁদ জহুরী; অন্যান্য
হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার (গ্রেট ন্যাশনাল)	মার্চ, ১৮৭৩	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভুবনমোহন নিয়োগী।
ওরিয়েন্টাল থিয়েটার	১৮৭৩	
গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোং	১৮৭৪	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বেঙ্গল থিয়েটার		শরৎচন্দ্র ঘোষ
রয়াল বেঙ্গল থিয়েটার		বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার	১৮৭৫	কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়
নিউ এরিয়ান (লেট ন্যাশনাল)		ধর্মদাস সুর
ষ্টার থিয়েটার	১৮৮৩	গুরুমুখ রায়
এমারেল্ড থিয়েটার	১৮৮৭	গোপাললাল শীল; শরৎকুমার রায়
বীণা		রাজকৃষ্ণ রায়
ইন্ডিয়ান থিয়েটার		অমরেন্দ্রনাথ দত্ত
সিটি থিয়েটার		
ক্লাসিক থিয়েটার	১৮৯৪	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত
মিনার্ভা		
কোহিনূর		

এতগুলি রঙ্গালয় যে পাশাপাশি বেঁচে ছিল তা নয়। প্রতিটি রঙ্গালয়ই একাধিকবার হস্তান্তরিত হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার নাম পরিবর্তিত হয়েছে।

শরৎকুমার রায় যখন গোপাল শীলের কাছ থেকে এমারেল্ড থিয়েটার ক্রয় করেন তখন তার দাম দেন ১০৮,০০০ (এক লক্ষ আট হাজার টাকা), মিনার্ভা থিয়েটার হস্তান্তরের সময় তার দর হয় ৬০,০০০ (ষাট হাজার টাকা), 'মীরকাসিম' ও 'সিরাজদ্দৌলা' অভিনয়কালে মিনার্ভা থিয়েটার বার্ষিক লক্ষাধিক টাকা আয় করে। 'কোহিনুর' থিয়েটার খোলা হলে প্রথমাভি-নয় রজনীতে ২২৫০ টাকার টিকেট বিক্রয় হয়েছিল।

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দক্ষিণা অবশ্য বড় মুখ করে বলবার মতো ছিল না। পরবর্তীকালে অবশ্য এর উন্নতি ঘটে। কিন্তু 'স্টার' বা তারকারূপে যারা খ্যাতিলাভ করে তাদের বেতন কম ছিল না। গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটারে মাসিক ৪০০ বেতন পেতেন এবং থিয়েটারের নীট লাভের এক পঞ্চমাংশের অধিকারী ছিলেন। পরবর্তী কালের পেশাদার রঙ্গমঞ্চের ভিত্তি এইভাবে উনিশ শতকের শেষ তিন দশকেই দৃঢ় অর্থ-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

(জ)

থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হবার পর নাটকের কাটতি বেড়ে যায়। অভিনয় ও পাঠের জন্যে নাটকের চাহিদা দ্রুত বেড়ে যেতে থাকে। ফলে এ-জাতীয় গ্রন্থের বাজারও বেশ তেজী হয়।

উদাহরণ-স্বরূপ মনোমোহন বসুর 'হরিশ্চন্দ্র নাটক' ১৮৭৫ খৃঃ প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কন হয় চার বছর পরে; ১৮৯৮ খৃঃ ৭ম মুদ্রণ বের হল। 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'র দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে প্রকাশক লিখেছেন, 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর দ্বিতীয় সংস্করণ এতদিনের পর প্রকাশিত হইল; প্রথম মুদ্রিত সহস্র খণ্ড কয়েক মাস মধ্যে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়াছে।' অমৃতলাল বসুর প্রহসন-গুলির চাহিদা ছিল খুব। 'কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রার' প্রকাশকাল ১২৯৯ বঙ্গাব্দ; কিন্তু ১৩০৬ বঙ্গাব্দেই নাটক-খানির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তার 'বিবাহ-বিভ্রাট' চোদ্দ বছরে পাঁচবার মুদ্রিত হয়। গিরিশচন্দ্রের নাটকের চাহিদা ছিল আরও বেশী। এর ফলে পেশাদার নাট্যকার-শ্রেণীর উদ্ভব হল। এর পূর্ব পর্যন্ত যাঁরা কাব্য-কবিতাদি লিখতেন তাঁরাই সখ করে মাঝে মাঝে নাটক প্রহসনাদি লিখতেন। অথবা ধনাঢ্য শ্রেণীর ব্যক্তিরা বাড়ীতে অভিনয়ের জন্যে নাটক লিখতেন বা লেখাতেন। এতে নাটকের উৎকর্ষ হত না। পেশাদার নাট্যকারদের আবির্ভাব হওয়ায় উৎকৃষ্ট নাটকাদি লিখিত হতে থাকে।

নাট্যমঞ্চে অভিনয় এবং নাটক-পাঠকদের জন্যে নাটক প্রকাশনা যে লাভজনক হয়ে উঠেছিল মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটকে মুদ্রিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে তা বোঝা যায়। মাইকেলের মৃত্যুর পর তাঁর কাব্য ও নাটকগুলির স্বত্ব নীলাম হয়ে যায়। এই গ্রন্থগুলির তৎকালীন স্বত্বাধিকারী শ্রীরাজকিশোর দে বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করেছেন, '...ইত্যাদি পুস্তক সমুদয়ের গ্রন্থস্বত্ব আমি মেসার্স মেকিঞ্জি লায়েল এন্ড কোম্পানীর ১৮৭৮ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখের প্রকাশ্য নীলামে ক্রয় করিয়াছি। এক্ষণে ঐ সকল পুস্তক আমার, এবং আমার উত্তরাধিকারি-গণের স্বত্ব হইয়াছে; অতএব যিনি উল্লিখিত পুস্তক সমুদয় আমার কিম্বা আমার উত্তরাধিকারিগণের বিনানুমতিতে মুদ্রিত কি প্রকাশিত কিম্বা কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া অন্য পুস্তকে সংযোজিত করতঃ প্রকাশ করিবেন, তিনি গ্রন্থস্বত্বের আইনানুসারে দণ্ডার্হ এবং ক্ষতিপূরণের দায়ী হইবেন।।' শ্রীরাজকিশোর দে। কলিকাতা, ২৩-এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ (চতুর্থ মুদ্রণ, শ্রীঅরুণোদয় ঘোষ দ্বারা আপার চিৎপুর শোভাবাজার ২৮৫ সংখ্যক ভবনে বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত)।

(খ)

এই যুগে নাট্য-সমালোচনারও প্রভূত উন্নতি হয়। নাটক-বিচারে সর্বকালীন কোন সাধারণ মানদণ্ড থাকতে পারে না। অভি-নয়ের দর্শক এবং গ্রন্থের পাঠকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। যতকাল নাটক অভিনীত হত না, কেবলমাত্র পঠিত হত তখন সমালোচনা হত পাঠকের দৃষ্টিতে। বিভিন্ন রঙ্গালয়ে নাটক অভিনীত হতে থাকায় একটি সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নাটক সমালোচিত হতে থাকে। তার সংলাপ, কাহিনী, ঘটনা বিন্যাস, ক্লাইম্যাক্স, অভিনয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য অসাফল্য, দৃশ্যপট, সঙ্গীত, নৃত্য এবং প্রযুক্তির অন্যান্য দিক সমালো-চনার আওতায় এসে যায়। উপন্যাসের সমা-লোচনায়ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আসে।

উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সমালোচিত হয়েছিল। এই সমালোচনার ধারা লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নাটক সেই সময়েই বেশ গুরুত্ব লাভ করেছিল এবং সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গীও বেশ প্রখর এবং বাস্তবসম্মত হয়ে উঠেছিল।—

'অমৃতবাজার পত্রিকা।...গ্রন্থকর্তা পদে পদে দেখাইয়াছেন যে তিনি একজন যোগ্য ব্যক্তি।'

'সোমপ্রকাশ। গ্রন্থকার নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় নাট্যোল্লিখিত পাত্রদিগের অতি সুন্দর-রূপে চিত্রিত করিয়াছেন।...উপসংহার ভাগটি অতি সুন্দর।'

'সাধারণী।.. শরৎ-সরোজিনী নাটকে ভুবনমোহিনীর মৃত্যুর দৃশ্যটিও সেইরূপ রুদ্ররসে চমৎকার।'

'এডুকেশন গেজেট।...'শরৎ-সরোজিনীর বাংলাও অতি উৎকৃষ্ট।'

'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকের দ্বিতীয় মুদ্রণের পরিশিষ্টে এ ছাড়াও প্রতিধ্বনি, বান্ধব, ঢাকাপ্রকাশ, মধ্যস্থ, আর্যদর্শন, সহচর ভারত সংস্কারক, হাবড়া-হিতকারী প্রভৃতি পত্রপত্রিকার মতামত মুদ্রিত আছে।

নাট্যকার মনোমোহন বসুর 'দুলীন বা রণজিৎ সিংহ-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক অপূর্ব নবন্যাস' সম্পর্কে পত্র পত্রিকার মতামত ছিল নিম্নরূপ—

'হিতবাদী। ঐতিহাসিক নবন্যাসেও যে তিনি এমন কৃতিত্ব দেখাইবেন, তাহা আমরা ইতিপূর্বে ভাবি নাই। দুলীন অভিনব প্রকরণে রচিত।...ফলতঃ কল্পনা, রচনা, ঘটনার যোজনা, চরিত্রের বৈচিত্র্য ও সামঞ্জস্য সকলই উচ্চশ্রেণীর।'

'বঙ্গবাসী। সত্যসত্যই দুলীনের বিচিত্র জীবন,সরল সুন্দর ভাষার পারিপাট্য এবং সৌন্দর্যসৃষ্টি ও শিল্পনৈপুণ্যে 'দুলীন' বড় কৌতূহলোদ্দীপক ও প্রীতিপ্রদ হইয়াছে।'

মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকের অভিনয়ের সমালোচনায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বেঙ্গলী' পত্রে লেখেন,—

Chhatrapati is one of the best and most powerful Dramas ever produced on the Indian stage'

'হিতবাদী' পত্রিকায় সখারাম গণেশ দেউস্কর ঐ নাটক সম্পর্কে বলেন, 'শিবাজীর চরিত্রের বিভিন্ন সদগুণ এবং তাঁহার সচিব ও কর্মচারীদের চরিত্রের বিশেষত্ব এই নাটকে অতীব দক্ষতার সহিত পরিস্ফুট করা হইয়াছে।'

এই নাটকে গিরিশচন্দ্র আওরংগজেবের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর অপূর্ব অভিনয় প্রসঙ্গে 'বঙ্গবাসী'র সমালোচনার এক লাইন এই—[illegible] এ মহীমণ্ডলে।'

(গ)

পাবলিক থিয়েটারের যুগে রঙ্গালয়ে অভিনেত্রী পাওয়া গেল। লেবেডফ তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখেছেন যে, তিনি স্ত্রীলোকের দ্বারা স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় করিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে অর্ধ-শতকের বাংলা নাটক অভিনয়ের ইতিহাসে বাঙ্গালী অভিনেত্রীর দেখা মেলেনি। এই কালে পুরুষেরাই স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ব্যাপারের এক কৌতুকাবহ বিবরণ লিখে গিয়েছেন। 'জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে তখন নব-নাটকের অভিনয় হচ্ছে। 'জ্যোতিবাবু নটীর বেশ পরিয়াই, সাজঘরে কনসার্টের সহিত হারমোনিয়াম বাজাইতেছিলেন। হাই-কোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত Seton Car সেদিন নিমন্ত্রিত হইয়া অভিনয়-দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি কনসার্ট শুনিবার জন্য কনসার্টের ঘরে ঢুকিয়াছিলেন। ঢুকিয়াই Beg your pardon জেনানা জেনানা' বলিয়া অপ্রস্তুত হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পরে তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে জেনানা কেহই ছিল না, যাহাকে দেখিয়াছিলেন তিনি স্ত্রী-সাজে সজ্জিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।' (জ্যোতি-রিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। বসন্তকুমার চট্টো-পাধ্যায়। কলিকাতা ১৩২৬, পৃঃ ১১৫)।

কিন্তু স্ত্রীলোকের ভূমিকায় শিক্ষিত ব্যক্তির অভিনয়ও সহজ ছিল না। নব-নাটকের অভিনয়ের দিন স্ত্রীভূমিকায় অভি-নয়কারী পুরুষেরা 'সাজঘরে ঘনঘন মূর্চ্ছা যাইতে লাগিল।'...'স্ত্রী-বেশে সজ্জিত আমার কবি-বন্ধু, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী শেষ মুহূর্তে কিছুতেই সাহস করিয়া দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখীন হইতে পারিলেন না। আমাদের উপরোধ অনুরোধ সবই ব্যর্থ হইল। কি করা যায়, অগত্যা তাহাকে বাদ দিতে হইল।' (ঐ পৃঃ ১০৮)।

আর তা ছাড়া অভিনয়ে স্ত্রীলোকের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে অভিনয় জমে না, রস প্রগাঢ় হতে পারে না। প্রেমের দৃশ্য অভিনয়কালে সুন্দরী যুবতী বিপরীত ভূমিকায় অভিনয় করলে নটের ভাবের অভিব্যক্তি গভীরতর হবেই। আবার বিরহ, মিলন বা করুণদৃশ্যের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকায় পুরুষ উপযুক্ত অভিবেগ সঞ্চার করতে পারে না। অভিনয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল দর্শকের। স্ত্রীপুরুষের সহ-অভিনয় পুরুষ ও স্ত্রী দর্শকের হৃদয়ে রসাবেশ ঘটাতে পারে, অন্যথায় তার হানি ঘটে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক মানসিকতা কাব্য, ইতিহাস, উপাখ্যানের পৃষ্ঠায় মথ খুঁজে ছিল। সেই রোমান্টিক মানসিকতার সহৃদয় হৃদয়সংবেদন হল স্ত্রীপুরুষের অভিনয়ের মধ্যে। স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার ফলে সমাজের নিম্ন অংশের স্ত্রীলোকেরা নৃত্য-গীতাদি মনো-রঞ্জক পেশাদি গ্রহণ করতেন, তাঁরা রঙ্গালয়ের সম্মানিত ও নির্ভরযোগ্য জীবিকার সন্ধান পেলেন। ফলে বহু

প্রতিভাবান নারী অভিনেত্রীর জীবিকা গ্রহণ করেছিলেন।

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হবার পর একাধিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হল।... "আশুতোষ দেবের ভাগিনেয় শরৎচন্দ্র ঘোষ 'বিডন স্ট্রীটে বেঙ্গল থিয়েটার খুলিলেন। বাংলাদেশে এই থিয়েটার দলই সর্বপ্রথম অভিনেত্রী গ্রহণ করিয়াছিল। প্রথম অভিনেত্রীদের মধ্যে নামকরা ছিল জগত্তারিণী, গোলাপকামিনী (পরে নাম হয় সুকুমারী দত্ত) এলোকেশী এবং শ্যামা।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস/শ্রীসুকুমার সেন/নাটক ঃ ১৮৭২—১৯১২)

কিন্তু এ'রা ছাড়াও আরও কয়েকজন প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী তাঁদের প্রতিভার আলোকে উনিশ শতকের বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চ আলোকিত করেছিলেন। শ্রীমতী বনবিহারী ছিলেন সুগায়িকা। তাঁর ডাকনাম ছিল 'ভুনী'। গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলায়' তিনি নিতাইয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর মধুর কণ্ঠস্বরে গীত সংগীত সমসাময়িক বাংলাদেশকে মাতিয়ে দিয়েছিল। শ্রীমতী হরিমতী (ব্লাকী), ছিলেন আর একজন যশস্বিনী অভিনেত্রী, গিরিশচন্দ্রের 'ফণীর মণি' নাটকে তিনি বেদেনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এই গীতিনাট্য মিনার্ভা থিয়েটারে ১১ই পৌষ, ১৩০২ বঙ্গাব্দে প্রথম অভিনীত হয়েছিল। বেদেনীর ভূমিকায় তাঁর গান 'এনেছি ভাতার ধরার ফাঁদ' অশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

শ্রীমতী নবীসুন্দরী স্টার থিয়েটারে অভিনীত বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের নাট্যরূপে দলনীর ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁকে তখনকার দিনে 'কোকিলকণ্ঠী' বলা হত। প্রকাশমণি ও হেমন্তকুমারী গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেন। আর একজন প্রতিভাবান অভিনেত্রী রাণীমণি অল্পবয়সে মারা না গেলে বাংলা রঙ্গালয়কে সমৃদ্ধ করতে পারতেন। রঙ্গিনী ও চঞ্চলা নারীর ভূমিকায় অভিনয়ে পারদর্শিনী ছিলেন চারুশীলা এবং সুগায়িকারূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন রাণীসুন্দরী। নীরদা-সুন্দরী নৃত্যকুশলা অভিনেত্রী ছিলেন।

এই কালের একজন নামকরা অভিনেত্রী ছিলেন সুশীলাসুন্দরী। সংগীতে ও অভিনয়ে এ'র অসাধারণ দক্ষতা ছিল। উনিশ শতকের অভিনেত্রীদের মধ্যে তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুসুমকুমারী শুধুমাত্র নৃত্যগীতকুশলাই ছিলেন না, নৃত্য-শিক্ষাদানেও যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন।

সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগের নাট্যসম্রাজ্ঞী ছিলেন বিনোদিনী। চৈতন্যলীলা নাটকে তাঁর অভিনয় দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হন। 'তোমার চৈতন্য হোক' বলে তিনি বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র বলেছেন যে কল্পনা-চিত্রিত চরিত্রাভিনয়ে তিনি অদ্বিতীয়া ছিলেন। ভূমিকা অনুযায়ী কেশবিন্যাস, পোশাক ও মেক-আপ্ গ্রহণ করবার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল। 'বাসনা' ও 'কনককাননী' নামে দুখানি কাব্যগ্রন্থ এবং 'বিনোদিনীর' কথা আত্মজীবনী রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের শেষভাগকে অভিনেত্রীদের দিক থেকে 'বিনোদিনী-যুগ' বলে চিহ্নিত করা যায়।

রঙ্গালয়ের এক বিস্ময়কর প্রতিভা ছিলেন তিনকড়ি। গিরিশচন্দ্রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকায় তিনি অপূর্ব অভিনয় করেছিলেন। কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীতে 'বিবাহ বিভ্রাট' নাটকে তিনকড়ি ঝি-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র এই অভিনয় দেখে তাঁর প্রতি আগ্রহী হন। লেডী ম্যাকবেথ ও জনার ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য তাঁর নাম বংগরঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আরেকজন প্রখ্যাত অভিনেত্রী নারায়ণী উনিশ শতকের শেষভাগের একজন জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বলে সংবাদপত্রে আখ্যাত হয়েছিলেন।

এ যুগের অন্যান্য খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী শশিমুখী, তারাসুন্দরী, সরোজিনী (ন্যাড়া) চারুশীলা, তিনকড়ি (ছোট), নীরদাসুন্দরী, ভুবনেশ্বরী, বিনোদিনী (হাঁদী)। জগত্তারিণী গ্রন্থকর্ত্রীরূপেও খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

(ট)

সাফল্যের সংগে অভিনীত হলে নাটকের পাঠকও বেড়ে যায়। সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার পর বাংলা নাটক দর্শক ও পাঠকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করল। এর ফলে পেশাদার নাট্যকার-শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল।

সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার পর, তাই দেখি, অজস্র নাটক লেখা হয়েছে। গুণগত উৎকর্ষ লাভ করেছে, সেই সংগে নাটকের বিষয়বস্তুতেও বৈচিত্র্য এসেছে। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী কয়েক বছর, যথা ১৮৬৭, ১৮৬৮, ১৮৬৯, ১৮৭০ এবং ১৮৭১ খৃঃ মোটামুটি হিসাবে যথাক্রমে ১০, ১৫, ১০, ১৮ এবং ১৩খানি নাটক প্রকাশিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ১৮৭২ খৃঃ ২৬খানি এবং ১৮৭৩ খৃঃ ২৪খানি নাটক প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই সংখ্যা আরও বেড়ে যায়।

বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে বিচার করলেও উন্নতি চোখে পড়বে। প্রাক্-পাবলিক থিয়েটার যুগে প্রকাশিত অধিকাংশ নাটক ছিল হয় পৌরাণিক, না হয় সুনীতি-প্রচারক বা ঐতিহাসিক। সামাজিক নাটকের সংখ্যা ছিল খুব কম। সামাজিক নাটক যা দু'চারখানা ছিল তা 'সিরিয়াস' নাটক নয়, প্রহসনধর্মী। 'আধুনিক' সামাজিক নাটক সৃষ্টি হল থিয়েটারের যুগে। নাটকের অভিনয় শিক্ষিত দর্শককে ক্রমশঃ যত বেশী আকর্ষণ করেছে, সামাজিক নাটকের আদর তত বেড়েছে। নিম্নের তালিকাটি দেখলে উপরি-উক্ত মন্তব্যগুলি সমর্থিত হবে—

১৮৭১ খৃঃ

অক্ষয়কুমার সাধু—রতনেই রতন চেনে
কৃষ্ণকমল গোস্বামী—দিব্যোন্মাদ
কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র—জ্ঞানদারঞ্জন
গিরিশচন্দ্র চূড়ামণি—পার্বতীহরণ
চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—রাজবালা
তারকনাথ চক্রবর্তী—গিরিবালা
দ্বারকানাথ দত্ত—বাঙ্গালার ভাবীমংগল
ধীরেশচন্দ্র দাসঘোষ—কুসুমকামিনী
বিপিনবিহারী দে—একাদশীর পারণ
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—মৈথিলী মিলন
মহেশচন্দ্র দাস দে—কুলপ্রদীপ
রামনারায়ণ তর্করত্ন—রুক্মিনীহরণ
ঐ —লোভে পাপ পাপে মৃত্যু

* দুই তালিকায়ই এই সময়ে প্রকাশিত কয়েকখানি নাটকের নাম নেই।

দু'-একখানি নাটকের প্রকাশ কাল, ডঃ সুকুমার সেনের তথ্য, অনুযায়ী ঠিক নয়।
যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ—মোহন্তের এই কি কাজ?
রামনারায়ণ তর্করত্ন—স্বপ্নধন

১৮৭৩ খৃঃ

কালিদাস মুখোপাধ্যায়—মৎস্য-ধরা
কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ভারতমাতা
ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—চন্দ্রোপাখ্যান
দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়—চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী
দয়ালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সুশীলা সরলা সুন্দরী
দীনবন্ধু মিত্র—কমলে কামিনী
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—স্বর্ণলতা
নিত্যানন্দ শীল—আর কেহ যেন না করে
নিমচন্দ্র মিত্র—শরৎকুমারী
নিমাইচাঁদ শীল—তীর্থমহিমা
বেনীমাধব ঘোষ—প্রেমকৌতুক
ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—মা এসেছেন
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—অকাটমূর্খ
মনোমোহন বসু—সতী নাটক
মীর মোশারফ হোসেন—জমিদার দর্পণ
ঐ —বসন্তকুমারী
লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী—নন্দবংশোচ্ছেদ
লক্ষ্মীনারায়ণ দাস—মোহন্তের এই কি কাজ?
শিশিরকুমার ঘোষ—বাজারের লড়াই,
হরলাল রায়—হেমলতা নাটক
হরিনাথ মজুমদার—অক্রূর সংবাদ

(দীনবন্ধু রচনাবলী/ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত/কলিকাতা, ১৯৬৭)

বাংলা নাটকে সমসাময়িক ঘটনা ফলিত হয় 'মোহন্ত' সিরিজের নাটকে। তারকেশ্বরের মোহন্তকে নিয়ে এই সময় অনেকগুলি নাটক প্রহসন লিখিত হয়েছিল। তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধবগিরি গৃহস্থ-বধূ এলোকেশীর ওপর পাশবিক অত্যাচার করে। বিচারে তার জেল হয়। এই ঘটনা অবলম্বনে ১৮৭৩-৭৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে অনেকগুলি নাটক-প্রহসন লিখিত হয়েছিল। নাটকে সমসাময়িক ঘটনার প্রকাশ ও প্রচার নাট্যকারদের সমাজ-সচেতনতা প্রমাণ করে।

পরবর্তী কয়েক বছরে বাংলা নাটক আরও উৎকর্ষ লাভ করে। সংখ্যায়ও বেড়ে যায়, বৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পায়। নাটকের বিষয় ও বক্তব্যও সমাজমুখী হয়। ১৮৭৪ খৃঃ প্রকাশিত 'কেরাণী দর্পণ' নাটক কেরাণীর জীবনের বাস্তব পটভূমিকায় রচিত। ডঃ সুকুমার সেনের মতে এই নাটককে 'নীলদর্পণের' সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। শ্বেতাঙ্গ চা-করদের অত্যাচারের পটভূমিকায় রচিত 'চা-কর দর্পণ নাটকের' কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

(৬)

কিন্তু সাধারণ নাটকের চেয়ে প্রহসন সমাজের সঙ্গে গভীরতরভাবে অন্বিষ্ট ছিল। প্রহসন সাধারণভাবেই সমাজকেন্দ্রিক হয়। কিন্তু প্রথম যুগের রামনারায়ণের প্রহসনগুলিতে সামাজিক কুসংস্কার আক্রান্ত হয়েছে, কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়। নাটকের কুশীলবগণ সামাজিক মানুষের প্রতীকমাত্র। আবার মধুসূদনের প্রহসনের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলিও সামাজিক অনাচার ও উন্মার্গ-গামিতাকে উন্মোচন করেছে, কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি তারা নয়। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র দীনবন্ধু। কিন্তু তিনি 'সধবার-একাদশীর' কেন্দ্রীয় চরিত্র 'নিমচাঁদ' মাইকেল মধুসূদনকে লক্ষ্য করে রচনা করেন নি, তাঁর এই বক্তব্যের পর তাঁর নাটকে ব্যক্তিনির্দেশের অভিযোগ আর থাকে না।

কিন্তু উনিশ শতকের শেষ তিন দশকের প্রহসনগুলি ছিল দুঃসাহসিক ও বলিষ্ঠ। কিছুৎ পরিমাণে ঝাঁঝালো এবং রুক্ষ। সমাজ বা ব্যক্তি কেউই তাদের শরসন্ধান থেকে বাদ যায় নি। এ যুগের প্রহসনকারগণ সমাজের বিরুদ্ধে আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের একটি অংশ, শ্রেণী, বা সম্প্রদায় বা বিশেষ ব্যক্তির বিরুদ্ধেও আক্রমণ চালিয়েছেন। রামনারায়ণ, মধুসূদনের আক্রমণে জ্বালা ছিল না, কিছু থাকলেও কৌতুকের রসে তা মিশে গিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালের প্রহসনে কৌতুকরস যতটা গাঢ় তার চেয়েও গাঢ় হয়েছে জ্বালা। অবশ্য শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষা মোলায়েম হয়েছে, তিক্ত স্বাদের ওপর চিনির প্রলেপ পড়েছে; কিন্তু বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভাষা মোলায়েম হলেও শাণিত হয়েছে বেশী। এ'র উদাহরণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অমৃতলাল বসুর প্রহসনগুলি।—

কিন্তু সাধারণভাবে ভাষা ও ঢং-এ তীব্র জ্বালা যুক্ত হল। সামাজিক অসংগতি বা সামাজিক আদর্শের সঙ্গে ব্যক্তি-আদর্শের সংঘাত বা ব্যক্তির মধ্যেকার স্ব-বিরোধিতা প্রভৃতি উন্মোচন করতে গিয়ে একালের প্রহসনগুলি আরও আক্রমণাত্মক হয়েছে। এর কারণ হল নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব এবং চেতনার 'আধুনিকতার' আবির্ভাব। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ডাক-তার ও রেলওয়ের প্রসার, গ্যাসের আলো, কোম্পানীর কলের জল' এবং নাগরিক জীবনে অন্যান্য আরও সুযোগ-সুবিধা সংবন্ধ নাগরিক জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। রেলওয়ে এবং দেশী বিদেশী সওদাগরী 'হৌসে' এক শ্রেণীর শিক্ষিত 'বাঙ্গালী' প্রথম 'হোয়াইট কলার ওয়ার্কার'-রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। কলকারখানা গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে, সামন্তযুগের অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছে, কিন্তু পুঁজিবাদ বিকাশ লাভ করে নি, দুই সমাজের চেতনা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে এই মধ্যবিত্ত সমাজ। দুই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংঘাতে যে অমৃত ও হলাহল উঠেছিল, এই মধ্যবিত্ত সমাজ তার নীলায়ুতকণ্ঠ।

প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ ও সামাজিক চেতনা এই নাগরিক সমাজের দুই বৈশিষ্ট্য। ক্ষমতা সীমিত, কিন্তু বিদ্রোহ প্রবল। নববিকশিত চেতনার আবেগে এ'রা সমাজের ওপর-তলার মানুষগুলোর স্ব-বিরোধিতা, অন্তঃসারশূন্যতা ও ভণ্ডামির বিচারে বসলেন। কখনো কখনো তাঁরা প্রতিষ্ঠিত মনীষীদেরও আক্রমই করেছিলেন। চেতনার প্রথম আবেগে এই দিকভ্রান্তি কিছুটা অনিবার্য ছিল। রামনারায়ণ, মধুসূদন এবং দীনবন্ধুও এই কালের, এই সমাজেরই লোক। কিন্তু এই চেতনা তাঁদের মধ্যে অনুপস্থিত, কেননা মধুসূদন চেতনার দিক থেকে আন্তর্জাতিক, রামনারায়ণ ইংরাজী জানতেন না এবং দীনবন্ধুর জীবনভাবনার মূলে প্রোথিত ছিল যৌথ পরিবার, ঐতিহ্য ও সমাজের মধ্যে। পরবর্তী প্রহসনকারগণ কিন্তু প্রকৃত 'মধ্যবিত্ত'।

'উড়ুম্বর চট্টোপাধ্যায়ের' ভূমিকায় বঙ্কিমের প্রতি কটাক্ষ হল (বিধবার দাঁতে মিশি/গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়); কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার সঙ্গে কুচবিহারের রাজার বিবাহ উপলক্ষ করে প্রহসন রচিত হল, বিষ্ণুশর্মার 'কপালে ছিল বিয়ে'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসনেও কেশবচন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ আছে। গিরিশচন্দ্র, নববিধান ব্রহ্মসমাজ, প্রখ্যাত সাংবাদিক কেউই প্রহসনকারদের আক্রমণ থেকে বাদ পড়লেন না। তারকেশ্বরের মোহন্তকে নিয়ে লেখা নাটক ও প্রহসনগুলিও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

'কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রা' প্রকাশিত হয় ১৮৯২ খৃস্টাব্দে। ঐ বৎসরই ১১ই পৌষ স্টার রঙ্গমঞ্চে অমৃতলাল বসুর এই প্রহসনখানি অভিনীত হয়েছিল। নাটকখানির পটভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। রাজা রামমোহন এদেশীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম বিলাত যান। দ্বারকানাথ ঠাকুর যান তারপরে। এই সময়ে হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা 'শাস্ত্রমতে' নিষিদ্ধ ছিল। রাজা রামমোহন হিন্দু সমাজ-পণ্ডিতদের বিধান মানেন নি এবং বিলাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথমবার বিলাত থেকে ফিরে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন।

পরবর্তীকালে বিলাতযাত্রা অভিজাত ধনী যুবকদের মধ্যে একটা হুজুগে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ইঙ্গবঙ্গের বিলাতযাত্রা' শীর্ষক কবিতাটি স্মরণীয়—

'বিলাতে পালাতে ছটফট করে
নব্য গৌড়ে
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ বিহগ
প্রাণ দৌড়ে
স্বদেশে কাঁদে সে গুরুজন বশে
কিছু হয় না
বিনা হ্যাটটা কোটটা ধুতি পিরহানে
মান রয় না।
পিতা মাতা ভ্রাতা নবশিশু অনাথা
হুট করি
বিরাজে জাহাজে মাস মলিন কুর্তা
বুট পরি,
'সগারে উদ্গারে মুহুর্মুহুঃ
ধূমলহরী
সুখ স্বপ্নে আপ্নে মুকুলপতি মানে
হরি হরি।'

রাজা রামমোহনের চরিত্রবল বা দ্বারকানাথের মত অর্থ বিদেশগমনেচ্ছু ধনী যুবকদের ছিল না। এই সময় বিলাত-যাত্রার অনুকূলে শাস্ত্রীয় বিধান লাভ করবার চেষ্টা হয়। অমৃতলাল বসুর 'কালাপানির' এই হল পটভূমিকা—।

নাটকের নায়ক দুলালচাঁদ 'কলকাতাস্থ ধনাঢ্য যুবক। পণ্ডিতজী 'ইংরাজী শিক্ষিত পণ্ডিত'। অন্যান্য চরিত্র : সাধুরাম ও মাখনলাল নায়কের সহচর, তিনকড়ি প্রতিবেশী, পাকমারা ও তাহার পত্নী, মেজ বৌ, ন-বৌ কাঁসারীপিসী, নাপিতিনী, দেওয়ানজী, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, বালক-বালিকাগণ, বিলাতযাত্রীগণ, অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ ও সাহেব বিবিগণ।

"দুলালচাঁদ। ...বিলাতযাত্রার ব্যবস্থার পত্রে সই করবে না? সে কতবড় তর্ক-চূড়ামণি আমি দেখে নিচ্ছি। মাধবরামবাবু! আজই নোটিশ দেবেন তো যেন তিনদিনের ভিতর সমস্ত খাজনা চুকিয়ে দিয়ে আমার জমি ছেড়ে উঠে যায়......।

মাখন। একটা কথা বলছিলাম কি দুলালচাঁদবাবু, তর্কচূড়ামণির দরুণ জায়গাটা খালি হলে আমার হাতে একটি প্রজা আছে, আমার প্রেসম্যানের ভাই, একটি হোটেল করতে চায়, ও অঞ্চল হলেই তার সুবিধা হয়, আমাদেরও তাতে সুবিধা আছে, ব্যায়রাম স্যায়রাম নিত্যি আছে, ডাক্তারের ব্যবস্থামত সুরুয়া খেতেই হয়, জিনিষটা ঠিক পাওয়া যাবে; বিশেষ সে এগ্রিমেন্ট লেখাপড়া করে দেবে। কেরোসিনের বাতি জ্বালাবে না, কয়লার জ্বাল ব্যবহার করবে না, খাঁটি হিন্দুমতে ঘোগনোয় করে গঙ্গাজলে ফাউলকারী তৈয়ের করবে।

দুলাল। বেশ বেশ, সে যদি হিন্দুমতে ইংরাজী হোটেল চালায় তা হলে তো সে একজন দেশহিতৈষী, তাকে জায়গা দেওয়া তো আমার কর্তব্যকর্ম।

* * *

দুলাল। সেই যে একটি বিধবাকে আমি লুকিয়ে ফণ্ড থেকে পাঁচটি টাকা দান করলেম, তারপর যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, পই পই করে মানা করে দিয়েছি যেন একথা না প্রকাশ করে, আর তুমি একেবারে আমার নাম দিয়ে তোমার বাঙ্গালা কাগজে ছাপিয়ে দিলে? শুধু তাই নয় আবার তাতে আমার নামের আগে 'মহারাজ' পর্য্যন্ত জুড়ে দিয়াছিলে!

সাধু। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ কাগজে কেউ ওর বিষয়ে লিখলেই বাবু চটে যান; কার মুখ আপনি বন্ধ করবেন, আপনি দেশের জন্য যে রকম লেগেছেন তাতে ভারতমাতা একেবারে থরহরকম্প, চারদিকে যশের জগজ্জম্প বাজছে, চেপে রাখবার যো কি!" (প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য/ দুলাল চাঁদবাবুর বৈঠকখানার ছাদ/দুলালচাঁদ, মাখনলাল ও সাধুরাম)

ঊনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ প্রহসনকার অমৃতলাল বসুর নাট্যরুচি ছিল অত্যন্ত মার্জিত। তথাপি ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তিনি ক্ষমাহীন এবং তাঁর প্রহসনের সংলাপ কোথাও কোথাও অত্যন্ত শাণিত। তাঁর 'বিবাহ বিভ্রাট' নাটকের একটুকরো সংলাপ এই রকম—(প্রথম অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

"বিলাসিনী কারফরমা। নন্দবাবু, আপনি বিলাত গেলে 'চাদর নিবারণী সভা' চালাবে কে?

নন্দ। আমাদের সেকেন্ড ইয়ারে সবাই উপযুক্ত লোক, একজন যে হয় ভার নেবে; আর একবার ফিরে আসি, চাদর কি—'ভাতকাপড়-নিবারণী সভা' করবো।

বিলাসিনী। গৌর, তুমি বসে এসব কি শুনছ? যাও রান্নাঘরে যাও, কিছু বুঝতে পারছ না শুধু স্টুপিডের মত চেয়ে আছ।

গৌরি। এই যাই। (স্বগত) খুব সায়েন্টিফিক মাগ পেয়েছি বাবা—মাগ যেন পুলিশ!" (বিলাসিনী কারফরমা—উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত রুপসী মহিলা; গৌরিকান্ত কারফরমা—বিলাসিনীর স্বামী; নন্দলাল সরকার—গোপীবাবুর পুত্র (বর))

বিলাসিনী 'পুরুষ দমন সভার' একজন উদ্যোক্তা!

রসরাজ অমৃতলালের প্রহসনের কুশীলবদের পরিচয়ও তীব্র ব্যঙ্গাত্মক। তাঁর 'রাজাবাহাদুর'-এর সঙের তালিকা (পাত্রপাত্রী) এইরকম: "গানিক্যধন (মণ্ডল) রায়—সামান্য সম্পত্তিবিশিষ্ট মূর্খ সেয়ানেজেল জমিদার; মানিক্যধন মণ্ডল—গানিক্যর সাবেক পিতা; বনুকম্যান ফিশ—দুর্দশাপন্ন সাহেব; বাঁশীমোহন, কীর্তিবাস—মোসাহেবগণ।"

(ঙ)

বাংলা নাটকে গানের সংযোগ এই কালের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ নাট্যকারদের পূর্ববর্তী নাটক প্রহসনে প্রকৃত গান নেই। সংলাপে কোথাও কবিতার ছন্দ ব্যবহার করে, কোথাও ছড়া ব্যবহার করে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। (নীলদর্পণ নাটকের ছড়াগুলি স্মরণীয়) দীনবন্ধুর লীলাবতী নাটকে রাগিণী শঙ্করা, আড়খেমটায় একটি গান আছে (নেশার রাজা মদের মজা/না খেলে কি বলতে পারি); আর মধুসূদনের নাটকেও গান আছে। (যথা, পদ্মাবতী নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক, খাম্বাজ মধ্যমান, নেপথ্যে গান 'কেন হেরেছিলাম তারে/বিষম প্রেমের জ্বালা বুঝি ঘটিল আমারে')

কিন্তু যে গান দর্শক-শ্রোতার সঙ্গীত-পিপাসা মেটায় এবং ঘটনাস্রোতকে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, প্রাক্-গিরিশ নাটকে তা নেই। শুধুমাত্র অপেরা বা গীতিনাট্যকেই নয়, পরবর্তীকালের যে কোন নাটককেই সঙ্গীত আসর জমিয়ে ও মাতিয়ে রেখেছে। গিরিশচন্দ্রের নাটকে অসংখ্য অজস্র গান আছে। তার বিভিন্ন রাগিণী, বিচিত্র সুর। ভাবনা কোথাও উদাত্ত গম্ভীর গভীর, কোথাও উচ্ছল, কোথাও কৌতুকময়। এ সকল গানের প্রায় সবগুলিই তাঁর নিজের রচনা।

গিরিশচন্দ্রের 'তপোবল' নাটকের একটি গান, বিভাস মিশ্র কীর্তন, লোফা—

"যদি শরণ নিতে পার রাঙ্গা পায়।
নাম নিলে তার হৃদয় ভরে,
কলঙ্ক কোথায় পালায়।।
নাম কলঙ্কভঞ্জন, ডাকলে নিরঞ্জন,
থাকে অঞ্জন
লাঞ্ছনা গঞ্জনা কি রয়,
ভেসে যায় তাঁর করুণায়।।'

ইত্যাদি (ভুবনমোহিনীর প্রতি রুক্মিণী)

দেবেন্দ্রনাথ বসুর 'বেজায়-আওয়াজ' প্রহসনে গিরিশের লেখা একটি গান, ভীমপলাশী মিশ্রিত খেমটা—

"আমার মাটনকারী ভোগ
শালগেরামের প্রসাদ করা,
থাকবে না রোগ শোক।
আমার ফাউলকারী খেয়ে
মেরী তর্কপঞ্চানন
হ্যাম দেখে তার ঝরে নোলা
বিকন কোল্ড মাটন,
আমার শুদ্ধখানা নাইকো মানা,
স্মৃতির এ ব্যবস্থা যোগ।।"
(হোটেলওয়ালা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী)

গীত রচনায় গিরিশের প্রতিভা ছিল বিস্ময়কর। নিজের নাটক ছাড়াও, তিনি মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা, দীনবন্ধুর সধবার একাদশী, রমেশচন্দ্র দত্তের মাধবীকঙ্কণ, যাত্রা, সঙ প্রভৃতির জন্য গান রচনা করেছিলেন।

গিরিচন্দ্র ইংরাজী গান লিখেছেন। চোরবাগানের রাজা অমৃতলাল মিত্রের পুত্রের বিবাহোৎসব উপলক্ষে তাঁর বাড়ীতে 'ছোটলাটের' শুভাগমন ঘটে। এই উপলক্ষে গিরিশচন্দ্র দুখানি ইংরাজী গান লিখেছিলেন, একখানি মৌলিক আর একখানি অনুবাদ। মৌলিক গীতিখানির নাম

'Plague Tableau Vivant, Plague and his followers—Dust, Foul Water, Putrid Smell etc., Angel Song'.

নাটকের জন্যে গিরিশচন্দ্রকে একটি জাপানী গানও লিখতে হয়েছিল। এর জন্যে তাকে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার সাহায্য নিতে হয়। গানটি এই—

'ডায়া নাইপন কিমি নাই হুন
ডেন্টাকু রিক্স নরাম নো
টোবাকো কাসুটোরা সিন্টো
মিকাডো মনচে মনচু পন।
গো আই স্যাগ আই টে কাই ডামিও
সেনসর সি সেক হায়া গো
হাটাম টো মচ ডায়াকেন।।

(গিরিশচন্দ্র বা গিরিশ গীতাবলী অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৩২০)

বোধকরি গানটির কোন সুসংবদ্ধ অর্থ নেই। জাপানী পরিবেশ রচনার জন্যেই হয়তো জাপানী শব্দ-সমষ্টি সংকলিত করে সুর-যোজনা করেছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর নাটকের জন্য অনেক গান লিখেছেন। তাঁর রচিত কোনো কোনো গানের ছায়া রবীন্দ্রনাথের গানে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর অশ্রুমতী নাটকের নেপথ্যে গাওয়া একটি গান, সিন্ধু-ভৈরব, মধ্যমান—

"ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমার পাখী
(আমার সাধের পাখী)
বলেদে কে তোরা রাখলি ধরে
অবলারে দিসনে ফাঁকি।
বাঁধা ছিল প্রেম-শিকলে
কে তারে নিলি গো ছলে?
কোথা গেল দে গো বোলে
হৃৎ পিঞ্জরে ধরে রাখি।"—

রঙ্গালয়ে গীতিবহুল নাটক বা গীতিনাট্য প্রবর্তনের কৃতিত্ব রামতারণ সান্যাল, হরিমোহন রায় ও নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অমৃতলাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে প্রহসনে প্রাণ-মাতানো উচ্ছল গান আছে। বিজাতি গৎ ভেঙ্গে

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর নাটকের গানে যে সুর দিয়েছিলেন, তা বাংলা রঙ্গমঞ্চ মাতিয়ে রেখেছিল।

অমৃতলাল বসুর একাধিক নাটকে ইংরেজী গান আছে। নাটকের যবনিকা পতনের আগে বিলাতি কায়দায় গান দিয়ে দর্শকদের বিদায় সম্ভাষণ জানানো হত।

অমৃতলালের 'রাজা বাহাদুর' স্টার থিয়েটারে ১৮৯১ খৃঃ বড়দিনে প্রথম অভিনীত হয়। নাটকের শেষে 'Gala city—Ballad' দিয়ে দর্শকদের শুভনববর্ষ কামনা করা হয়। 'ব্যালাড' এই—

"পটপরিবর্তন"
উজ্জ্বল দৃশ্য
ফ্যান্সী পোষাকে বিবি ও সাহেবগণ

(গীত)

'Gala city—Ballad'

Blooming fresh,
In fancy dress,
Sing and dance
Jump and prance,
Jolly Jhonny Polly Molly Jemina
Tarara, Tarara la la la la la la la

Queen of Beauty,
This Gala City,
Dirty-no no-Pretty Municipality
O! O! O! O! Quite first-rate:—
Its Bloody Code,
Its floody Road
Grimy Gas,
Dreamy Cash,
Scanty Water,
Tax every quarter,
Blessed—blessed Sewage scent
Blessed Nineteen-half per cent.
To-day gay day forget all

Hurrah! Hurrah! Be of cheer—
"Christmas comes but once a year!"

যবনিকা।"

(চ)

বাংলা নাটকে গানের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পেশাদার সুরকারদের আবির্ভাব ঘটল। বাংলা গানকে জনপ্রিয় করে তুলবার পিছনে এদের অবদান অসীম। প্রকৃতপক্ষে, 'আধুনিক' গানের স্রষ্টা এ'রাই। সামান্য বেতনে বিভিন্ন রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে এই সকল সুরকার ও কণ্ঠশিল্পীরা কেবলমাত্র গানের নেশায় মঞ্চে তাকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনা করেছেন।

এমনি একজন শিল্পী ছিলেন দেবকণ্ঠ বাগচী। সার্থকনামা এই শিল্পী গিরিশচন্দ্রের অনেক গানে সুর দিয়েছেন। নৃত্যসহযোগে সঙ্গীত আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় রঙ্গালয়ের উপযোগী নৃত্যশৈলী গড়ে তোলেন। সমসাময়িক আর একজন নৃত্যশিক্ষক ছিলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু। নাটকের চাহিদা অনুযায়ী নৃত্য-পরিকল্পনায় তিনি বিশেষ কৃতবিদ্য ছিলেন। সঙ্গীতে ও নৃত্যে সুরসংযোগে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন রামতারণ সান্যাল। তিনি গিরিশচন্দ্র, রাধানাথ মিত্র, বিনোদবিহারী দত্ত, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, কুঞ্জবিহারী বসু প্রমুখের নাটকের গানে সুরসংযোগ করেছিলেন।

এই কালে নৃত্য-গীতের সঙ্গে ঐকতান বাদন যুক্ত হয়ে তা আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, "তখন কনসার্ট পদবাচ্য ভালো কনসার্ট ছিল না বলিলেই হয়। এক যাহা ছিল তাহা যতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতেই ছিল। তাহার পর 'নবনাটক' উপলক্ষে আমাদের বাড়ীতেও একটি দল হইল। সর্বসাধারণের মধ্যে এখনও কনসার্ট প্রচলিত হয় নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের বিষ্ণুবাবুই তখন কনসার্টের গৎ তৈয়ারী করিয়া দিতেন।"

সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগে কনসার্টের বহুল প্রচলন হয়। ঠাকুরবাড়ীতে নবনাটকের অভিনয়ে কনসার্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল এই বাদ্যযন্ত্রগুলি:—হারমোনিয়াম, একাধিক বেহালা, ক্লারিওনেট পিকলো; বড় বাস্ বেহালা, করতাল, ঢোল; বাঁয়া-তবলা এবং মন্দিরা। (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি/বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়/পৃঃ ১১৫।১১৬)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'চাঁদবিবি' নাটকের অভিনয় দিয়ে 'কোহিনুর' থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। এই অভিনয় কনসার্ট পরিচালনা করেছিলেন প্রোফেসর দক্ষিণাচরণ সেন ও সম্প্রদায়। সাধারণ দর্শকবৃন্দ এই প্রথম কনসার্টের মাধুর্য উপভোগ করে মুগ্ধ হল।

(ণ)

পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দর্শকদের আকর্ষণ ও মুগ্ধ করবার জন্যে মঞ্চ-প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতি হয়। বিশেষ করে পৌরাণিক নাটকে মঞ্চে অলৌকিক দৃশ্যাবলীর অবতারণা করা হয়। দৃশ্যপট রচনারও মনোহারিত্ব আসে। তা ছাড়া সমগ্র নাটক প্রযোজনা ও উপস্থাপনার জন্যেও কুশলী অধ্যক্ষের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এইভাবেই পেশাদার 'স্টেজ ম্যানেজারদের' আবির্ভাব ঘটল। এদের প্রতিভার স্পর্শে মঞ্চের ওপর কারিগরী কৌশল ও আলোক সম্পাতের সাহায্যে নাটকের উপযোগী দৃশ্যাবলীর অবতারণা সম্ভব হল। উনিশ শতকের দর্শকবৃন্দ মঞ্চের ওপর এই সকল কৌশল দেখে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়তেন।

পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠার আগেও অবশ্য মঞ্চাভিনয়ে এই সকল কৌশল প্রযুক্ত হয়েছে। তবে তা ছিল স্থূল। মঞ্চশিল্প এখনো গড়ে ওঠেনি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী 'নবনাটক' অভিনয় উপলক্ষে, "তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদের দিয়ে দৃশ্যগুলি অঙ্কিত হয়েছিল। স্টেজও যতদূর সাধ্য সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজানো হইয়াছিল। দৃশ্যগুলি বাস্তব করিতে চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীনখানাকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী আটা দিয়া জুড়িয়া অতিসুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হলে মঞ্চ-প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতি হয়। ন্যাশনাল থিয়েটারের অন্যতম সংগঠক ধর্মদাস সুরের পরিকল্পনায় প্রথম থিয়েটার-বাড়ী গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের মঞ্চ নির্মিত হয়েছিল। ধর্মদাস সুর মঞ্চ-প্রযুক্তির সাহায্যে মঞ্চে অলৌকিক দৃশ্যাবলীর উপস্থাপনা করতেন। 'শংকরাচার্য' নাটকে মঞ্চের ওপর নদী প্রবাহ, নদীর বুকে পদ্মফুল ফোটা, শংকরের কমণ্ডলুর মধ্যে গঙ্গার প্রবেশ প্রভৃতি বিস্ময়কর দৃশ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে দর্শকদের অভিভূত করতেন। সমসাময়িক আর একজন বিখ্যাত 'স্টেজ ম্যানেজার' ক্যালীচরণ দাস। তিনি মঞ্চে ইন্দ্রজাল রচনা করে যশস্বী হয়েছিলেন।

(ত)

পাবলিক থিয়েটারকে ঘিরে যে পেশাদার নটসম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, নিঃসন্দেহে, গিরিশচন্দ্র ছিলেন তার মধ্যমণি। অভিনেতাগোষ্ঠী গড়ে তোলার পেছনেও তাঁর অবদান বিরাট। তাছাড়া অভিনয়ের যে অতিনাটিকীয় ধারা তিনি গড়ে তুলেছিলেন, সমসাময়িক এবং পরবর্তী দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাই-ই ছিল অভিনেতাদের আদর্শ। সমসাময়িক প্রায় প্রতিটি খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রীকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন এবং তারপর শিক্ষাদান করে তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। প্রজাপতি দক্ষ, ম্যাকবেথ ও যোগেশের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। গিরিশের সমসাময়িক আর দুইজন খ্যাতিমান নট হলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী ও গিরিশের পুত্র সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (দানীবাবু)। এঁদের অভিনয়-প্রতিভা সম্পর্কে ইতিপূর্বে অনেকেই আলোচনা করেছেন। তবে দু'-একজন অভিনেতার নাম সাধারণ আলোচনা থেকে বাদ পড়ে। গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক নটদের মধ্যে মহেন্দ্রলাল বসু 'ট্র্যাজেডিয়ান' ছিলেন। করুণ রস ফুটিয়ে তুলতে তাঁর সমকক্ষ তখনকার দিনে আর কেউ ছিল না। অমৃতলাল মিত্র প্রথম শখের যাত্রায় অভিনয় করতেন।

গিরিশচন্দ্র তাঁকে ন্যাশনাল থিয়েটারে নিয়ে আসেন। বীররসাত্মক চরিত্রের অভিনয়ে তিনি কৃতী ছিলেন। মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু) হাস্যরসাত্মক ভূমিকার অভিনয় করে নাম করেছিলেন। টাইপ চরিত্রের অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন এন ব্যানার্জী (থাকবাবু)। প্রিয়নাথ ঘোষ নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। সাজাহান নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করে তিনি দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন। ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনয়েই নাম করেছিলেন হীরালাল চট্টোপাধ্যায়। অহীন্দ্রনাথ দে, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরও যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

একাধারে অভিনয় ও সংগীত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন অঘোরনাথ পাঠক। দীর্ঘদেহী জোয়ান্‌ো ও ভরাট কণ্ঠস্বর এবং সংস্বাস্থ্যের অধিকারী অঘোরনাথ যেমন সু-অভিনেতা ছিলেন, তেমনি তাঁর দক্ষতা ছিল কোরাস পরিচালনায়। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত নাট্যসংগঠক এবং অভিনেতা—এই দুই রূপেই খ্যাতিমান ছিলেন।

অভিনয়ের এক ধারার প্রবর্তক গিরিশচন্দ্র। তিনি বলতেন, "The best art is to conceal art" কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁর অভিনয় ছিল অত্যন্ত আবেগময়। আর একটি ধারা, যদিও একটা সম্পূর্ণ নয়, প্রবর্তন করেছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী। তাঁর অভিনয় ছিল গম্ভীর, দ্যোতনাময় এবং চরিত্রের ব্যক্তিত্ব উপযোগী (অভিনেতার ব্যক্তিত্ব অনুসারী নয়)। বাগবাজার 'সধবার একাদশী' নাটকে জীবনচন্দ্রের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র স্বয়ং অত্যন্ত প্রীত হন।

"তাহার পর ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হইয়া টিকিট বেচিয়া প্রথম নীলদর্পণ অভিনয় আরম্ভ হয়। অর্ধেন্দুবাবু একা গোপাল বসু, উড্ সাহেব একজন রায়ত এবং সাবিত্রীরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়া সমগ্র দর্শকমণ্ডলীকে স্তব্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত নিখুঁতভাবে সাহেবের ভূমিকায় কেহ অভিনয় করিতে পারিত না—এবং পারিবে না, সেই অবধি তাঁহার 'সাহেব ডাকনাম হইয়াছিল।" (দেবগণের মর্তে আগমন / দুর্গাচরণ রায় পৃঃ ৬১১)

(খ)

১৮৭২ খৃঃ ৭ই ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধন হয় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক নিয়ে। তার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাটকের পরিচর্যা হয়েছে শৌখিন নাট্যসমাজে। এই নাট্যসমাজগুলি শুধু বাংলা নাটকের লালন করেছে তাই নয়, পরিচর্যা করে, তাকে উপযুক্ত করে, পাবলিক থিয়েটারের মঞ্চে পৌঁছে দিয়েছে। পরবর্তীকালেও পাবলিক থিয়েটারের পাশাপাশি শৌখিন নাট্যসমাজগুলি অভিনয়ের অপেশাদারী ধারা বাঁচিয়ে রেখেছে, আজকের নাটকের উৎকর্ষের পেছনে যার অবদান কিছু কম নয়। শৌখিন নাট্যসমাজের অভিনয় কোন বিচ্ছিন্ন নাট্যধারা নয়, বরং সাধারণ রঙ্গালয়ের অনুপূরক।

পাবলিক থিয়েটার যখন প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তখন দীনবন্ধু মিত্রের দুঃসাহসিক নাটক অভিনীত হয়েছিল এমনি একটি শৌখিন নাট্যসমাজের উদ্যোগে সেই নাট্যসমাজের নাম হল 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' (যা বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার)।

এই নাট্যসমাজের উদ্যোগেই ১৮৬৮-৬৯ খৃঃ মোট চারবার দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হয়। "সেই দুঃসাহসী যুবকেরা বাংলা নাট্যমঞ্চের সবচেয়ে বিপ্লবী শক্তি হয়ে উঠেছিল। তাঁরাই ন্যাশনাল থিয়েটারের স্রষ্টা। অভিজাতবর্গের শখের থিয়েটার যখনও পুরানাশ্রয়ী নাট্যরসে মগ্ন, তখন এ'রা প্রধানতঃ সমাজ-বাস্তবতার রূপকার।" (দীনবন্ধু রচনাবলী / ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত ঊনিশ)

পাবলিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার পরও এই ধারা অব্যাহত গতিতে চলেছে। পাবলিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা এই শৌখিন নাট্যধারাকে অনুপ্রাণিত করেছিল নিশ্চয়ই। গত শতকের কোলকাতার সামাজিক ইতিহাস খুঁজলেই দেখা যাবে, কোলকাতার সংস্কৃতির প্রাণপ্রবাহকে অব্যাহত করার পেছনে এই ধারার অবদান কতখানি।

১৮৭৫ খৃঃ প্রকাশিত মনোমোহন বসুর 'হরিশ্চন্দ্র নাটক' উৎসর্গিত হয়েছিল 'প্রণয়াস্পদ মান্যতম শ্রীযুক্ত বহুবাজার নাট্যসমাজ সভ্য মহোদয়গণ সমীপেষু'। উৎসর্গ পত্রে নাট্যকার লিখেছেন, "বিশুদ্ধ-রুচি ও সমাজশুদ্ধির প্রবৃত্তিবশতঃই যে আপনারা অভিনয় কার্যে লিপ্ত, বঙ্গীয় সমাজের সহৃদয় মাত্রেই ইহা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। নচেৎ এতাধিক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকারপূর্বক অমন চিত্তবিনোদন অবৈতনিক নাট্যশালা স্থাপনের প্রয়োজন কি ছিল?......বিশেষতঃ জানা আছে আপনারা নানা রসাত্মক নীতিগর্ভ প্রগাঢ় নাটকাভিনয়েরই পক্ষপাতী—কোন কোন বৈতনিক নটমহাশয়দিগের ন্যায় লঘু প্রদর্শনজনিত লঘু আমোদ জন্মাইয়া দেশ মধ্যে কেবল 'হুস্' ধাতুমূলক রুচি বর্ষণে উৎসাহী নন।" (হরিশ্চন্দ্র নাটক/শ্রীমনোমোহন বসু কর্তৃক প্রণীত/৭ম মুদ্রণ, কলিকাতা, খৃঃ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮)

শৌখিন রঙ্গালয় পাবলিক থিয়েটারে প্রতিভাবান অভিনেতা পেশাগত। পেশা হিসাবে অভিনয় খুব সম্মানিত ছিল না নিশ্চয়ই। কিন্তু বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ প্রমুখ মনীষীরা রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখতে গিয়ে এবং নট-নটীদের উৎসাহ দিয়ে রঙ্গালয়কে অশেষ গৌরব দান করেছিলেন। ফলে সাধারণ সমাজে সম্মানিত না হলেও, শিক্ষিতমহলে অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ আর অচ্ছুৎ রইলেন না। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ক্লাসিক থিয়েটারের নটনটীদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করে এই পেশাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন। অভিনেত্রীদের মধ্যে বিনোদিনী, নারায়ণী, তিনকড়ি এবং অভিনেতাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, দানীবাবু প্রমুখের অসাধারণ অভিনয়-খ্যাতির জন্যে এই পেশা 'গ্লেমার'-যুক্ত হল। তাই বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের অনেক শিক্ষিত যুবক এই জীবিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

শৌখিন অভিনেতারাও অনেকেই অভিনয়-খ্যাতি লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে এ'রা অনেকেই পাবলিক থিয়েটারে যোগ দিয়েছেন।

শৌখিন অভিনেতাদের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় খুবই নাম করেছিলেন। চড়কডাঙ্গা রোডের রামজয় বসাকের বাড়ীতে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' তাঁর সংগে আর যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁরা হলেন—ইস্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর এজেন্টের অফিসের বড়বাবু রাজেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও জগদ্দুর্লভ বসাক। বসাকমহাশয় পণ্ডিত সেজেছিলেন। আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) বাড়ীতে নন্দকুমার রায়ের 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় হয়েছিল স্টেজের ওপর বিশ হাজার টাকার গহনা পরে ছাতুবাবুর নাতি শরৎবাবু শকুন্তলা বেশে দাঁড়ালে দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হন।' ফিনান্স অফিসের কর্মচারী কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী সে যুগের সেরা বিদূষক ছিলেন। (পুরাতন প্রসঙ্গ/বিপিনচন্দ্র গুপ্ত, পৃঃ ১১০)

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতেও গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গণেন্দ্রনাথের উদ্যোগে 'নবনাটক' অভিনীত হয়। এই সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, "আমাদের বন্ধু অক্ষয় মজুমদার নাটের প্রধান নায়ক গবেশবাবু সেজেছিলেন—নাট্যাভিনয়ে সেই তাঁর প্রথম উদ্যম। পরে তিনি ঐ ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর আরও উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন, তাকে ছেড়ে আমাদের কোন অভিনয় সিদ্ধ হত না। হাস্যরসের অভিনয়ে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।" (আমার বাল্যকথা / সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর/পৃঃ ৩৭)।

"সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন পৃথিবীর মানচিত্রে ভারত এক শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে চিহ্নিত হবে।

আমি জানি না সেদিন আমি জীবিত থাকব কিনা। হয়ত আপনাদের মধ্যেও কেউ কেউ থাকবেন না। কিন্তু আমি একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি, আমাদের উত্তরাধিকারীরা দেখবেন তাঁদের সামনে ভারতের এক নতুন রূপ। সে ভারত বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে অভিষিক্ত। সামরিক শক্তিতে নয়, শান্তি এবং সৌহার্দ্যের নীতি নিয়েই সে জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলবে।"

—ইন্দিরা গান্ধী

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ইতিহাসের বেদীতে বীরাঙ্গণা

প্রখ্যাত সাংবাদিক নিখিল সেন সম্প্রতি 'ইন্দিরা দূরদর্শিনী' নামে একটি তথ্যপূর্ণ ইন্দিরা জীবনী রচনা করেছেন। অজস্র চিত্র শোভিত ও সুমুদ্রিত এই গ্রন্থে জয়যাত্রার রথের রশি যে মহান নেত্রীর হাতে তাঁর কথা বলেছেন মনোজ্ঞ ভঙ্গীতেই। বলা বাহুল্য, বাজারে ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে আরো কয়েকটি বই পাওয়া যায় কিন্তু নিখিল সেনের এই গ্রন্থটির মধ্যে আছে এক আশ্চর্য লিপিকুশলতার পরিচয়। ইতিহাসের পরিবেশনায় তিনি সুললিত ভাষা ও এক সহজ আঙ্গিক গ্রহণ করেছেন এবং সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

এলাহাবাদের আনন্দ ভবন আধুনিক ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় পীঠস্থান। পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখ ভারতের যে সব মহান নেতৃবৃন্দ অসমসাধারণ দেশ-ভক্তির পরিচয় দিয়েছেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রচনা করেছেন এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় তাঁদের আলোয় আলোকিত এই আনন্দ ভবন। আর সেই ঐতিহাসিক ভবনেই বর্তমান ভারতের কর্ণধার প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরার আবির্ভাব ঘটেছে।

১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহ-যোগিতায় মোতিলাল স্বরাজ্য পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের রাজনৈতিক ইতি-হাসে ঘটতে লাগল দ্রুত পরিবর্তন। আর চার বছরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯২৫-এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অকাল মৃত্যু। এবং ১৯২৬-২৭-এ দেশের সর্বত্র আন্দোলন গড়ে উঠল, ইংরেজ বিদ্বেষ প্রবলতর হয়ে উঠল। অন্য দিকে অল্প-স্বল্প সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ভারতবাসীকে তুষ্ট করার জন্য বৃটিশ সরকার সচেষ্ট হলেন।

এই সময় জওহরলাল পত্নী কমলা নেহরুর অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ায় নেহরুরা সপরিবারে য়ুরোপে গেলেন। সঙ্গে রইলেন বালিকা ইন্দিরা। সেই যাত্রায় ওঁরা দেখলেন নতুন রাশিয়া। ভারতের বাইরে যে সব বিপ্লবীরা ছিলেন তাঁদের সঙ্গেও দেখা করলেন জওহরলাল, সঙ্গে ইন্দিরা ছিলেন। ১৯২৭-এর ২৭শে ডিসেম্বর নেহরু পরিবার ফিরলেন স্বদেশে। সেবার মাদ্রাজে কংগ্রেস অধিবেশন বসেছে—সভাপতি ডাঃ আন্সারী।

এর পরের বছর ১৯২৮-এ কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে, তার সভাপতি হলেন পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু। সেই বছর ফেব্রুয়ারীতে সাইমন কমিশন ভারতে এসেছিল—সেই উপলক্ষ্যে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রবল হয়ে উঠেছিল। মোতিলাল নেহরুর পর ১৯২৯-এ লাহোর অধিবেশন এবং সেই অধিবেশনে সভাপতি হলেন মোতিলাল তনয় জওহরলাল। মোতিলাল পুত্রের হাতে কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্বভার তুলে দেওয়ার সময় বলেছিলেন—

'ব্যক্তিগত জীবনে তুমি যেমন আমার উত্তরাধিকারী তেমনই রাজনৈতিক জীবনেও হও যোগ্য উত্তরসাধক।'

এই কথা কটি বিশেষভাবে স্মরণ-যোগ্য। জওহরলাল সুদীর্ঘকাল জাতির নেতৃত্ব করেছেন, পিতার প্রত্যাশা পূর্ণ করেছেন আর জওহরলালের ইন্দুর হাতে প্রায় অনিবার্য ভঙ্গীতেই ভারতের স্বরাজ-রথের রশি এসে পড়েছে। বালিকা ইন্দিরা কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবিকার বেশে পিতার পাশে ১৯২৯-এ বসে থেকে দেখেছেন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার সংকল্প বাণী উচ্চারিত হতে। আগের রাতে এই খসড়াটি প্রস্তুত করেন জওহরলাল এবং সম্পূর্ণ হওয়ার পর বালিকা ইন্দুকে তা পড়ে শোনাতে বলেন। স্বাধীনতা দিবসের সংকল্প বাক্য—'ভারতের পক্ষে বৃটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্ণ স্বরাজ লাভ ব্যতীত আর অন্য পথ নেই।'

এর পর ১৯৩০-এ শুরু হয়েছিল ঐতিহাসিক লবণ আন্দোলন। আইন অমান্যের দায়ে সবাই একে একে ধরা পড়লেন আর তারপর বালিকা ইন্দিরা মাত্র বারো বছর বয়সেই 'বানর সেনা' গড়ে তুললেন স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে। তিনি সেদিন সহযাত্রিনীদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, পুলিশ আমাদের চাবুক পেটা করবে ঠিক, কিন্তু তাই বলে কি আমরা দেশের কাজ করবো না?

ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনীর জন্ম যে পরিবারে সেই পরিবার যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন একথা বলা বাহুল্য। এই পরিবারে জন্মেছেন ইন্দিরা। তাঁর বাল্য ও শৈশবে আনন্দ ভবনের প্রতিটি কোণ ছিল দেশপ্রাণতায় পরিপূর্ণ। অল্প বয়সে বার বার পিতৃসঙ্গ থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়েছে ইন্দিরাকে, কারণ পিতা জওহরলাল ইংরেজ সরকারের হাতে বন্দী হয়ে কারা-জীবন যাপন করছেন।

স্নেহময় পিতা কিন্তু পিতৃকর্তব্য বিস্মৃত হন নি। তিনি কারান্তরাল থেকে কন্যাকে যে সব চিঠিপত্র দিতেন সেইগুলি জাতীয় সম্পত্তি। সর্বকালের সকল ছেলে-মেয়েদের সম্পদ।

একটি চিঠি জওহরলাল ছোট্ট ইন্দুকে লিখছেন—

'তুমি শিগ্গির বড় হয়ে ওঠো। চিঠি লেখা শেখ। জেলে এসে আমাকে দেখে যাও। তোমাকে দেখতে আমার খুব ইচ্ছা করে। দাদু তোমাকে যে সুতোকাটার যন্তরটা কিনে দিয়েছেন, সেটা চালাতে শিখছ ত। মা-র সঙ্গে প্রতিদিন উপাসনা করো ত?'

যুগপুরুষ অজস্র পত্র লিখেছেন তাঁর কন্যাকে। এই চিঠিগুলি 'লেটারস ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে পাওয়া যায়। অতি সরল ভঙ্গীতে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা ও বিশ্ব-রাজনীতির পাঠ সেদিন কন্যাকে দিয়েছিলেন জওহরলাল।

এ ছাড়া দেশ-বিদেশের রূপকথা, বিশ্ব-সাহিত্যের গল্প ও উপন্যাসগুলির শিশু সংস্করণ কন্যাকে পড়িয়েছেন জওহরলাল। যেবার কমলা নেহরুকে নিয়ে য়ুরোপ গিয়েছিলেন সেইবার কিছু দিনের জন্য সুইজারল্যাণ্ডে একটি স্কুলে ইন্দিরাকে ভর্তি করে দিলেন জওহরলাল। অল্প কালের জন্য হলেও ইন্দিরার জীবনের সেই সব ছোটখাট দিনগুলি বিফলে যায় নি।

এর পর শান্তিনিকেতনে ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে কিছুকাল পড়েছেন ইন্দিরা। শান্তিনিকেতনে বেশী দিন থাকা হয় নি। মা-র অসুখের সংবাদ পেয়ে প্রায় আঠারো মাস কাটিয়ে তাঁকে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করতে হয়। এই প্রসঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী যে কথাগুলি বলেছেন তা মূল্যবান :

'শান্তিনিকেতনে যাওয়ার আগে মনে হত শিল্প কবিতা এসব বাইরের বস্তু। কিন্তু শান্তিনিকেতনে এসে জানলাম, শিখলাম শিল্পকলা জীবনের সঙ্গে মেশান। গুরুদেবই আমাকে শিখিয়েছেন জীবন আর শিল্প এক সূত্রে বাঁধা।'

রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা প্রসঙ্গে জওহরলালকে বলেছিলেন যে, 'ইন্দিরা চমৎকার মেয়ে, সে তার শিক্ষক ও সহপাঠীদের মনে একটা মধুর স্মৃতি রেখে গেছে। তোমার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আদর্শ সে পেয়েছে এবং আত্মসুখপরায়ণ ইংরেজ সমাজের সঙ্গে সে যে খাপ খাওয়াতে পারে নি তাতে আমি মোটেই আশ্চর্য হই নি।'

১৯৩৬-এর ফেব্রুয়ারী মাসে কমলা নেহরুর মৃত্যু হয় সুইজারল্যাণ্ডের লুসেন নামক অঞ্চলের এক স্যানেটোরিয়ামে। কমলা নেহরুর মৃত্যুতে সমগ্র জাতি সেদিন শোক-মগ্ন হয়েছিল। নেহরু পরিবারের ব্যক্তিগত শোক সেদিন জাতীয় শোকে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত স্মরণসভার ভাষণে জাতির এই সময়কার বিবাদময় মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তিনি বলেছিলেন :

'আজ এই আমাদের বলবার কথা যে, আমরা লাভ করলুম এই বীরাঙ্গনাকে আমাদের ইতিহাসের বেদীতে। আধুনিক কালের চলমান পটের উপর তিনি নিত্যকালের চিত্র রেখে গেলেন। তাঁকে হারিয়েছি এমন অশুভ কথা কোন মতেই সত্য হতে পারে না।'

ইন্দিরা প্রায় সেই সময় থেকেই পরিপূর্ণভাবে স্বদেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর পিতৃদেব তাঁকে একটি পত্রে লিখেছিলেন :

'আমরা এমন কিছু যেন কখনও না করি যার জন্য আমাদের একদিন লজ্জা পেতে হবে। এমন কিছু না করি যা লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন রাখতে হবে। গোপন করার চেষ্টা ভীরুর—সে চেষ্টা ভারতের মুক্তিসেনার অযোগ্য। মনের সাহস ও হৃদয়ের বল-ই হল সব চেয়ে বড় ভরসা।'

ইন্দিরা উত্তরকালে পিতৃদেবের এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন এবং তার পরিচয় তাঁর স্বদেশবাসী পেয়েছেন।

শ্রীযুক্ত নিখিল সেন এই গ্রন্থের মধ্যে ইন্দিরা জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায় 'বাংলাদেশ-পর্ব' নিয়ে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। সমকালীন ইতিহাস মানুষের মনে এখনও তাজা তাই তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। লেখক অসামান্য কৌশলে সমগ্র গ্রন্থটির মাধ্যমে ইন্দিরা দূরদর্শিনীকে ফুটিয়ে-তুলেছেন সেই কারণে তিনি অভিনন্দনযোগ্য।

—জওহরলাল

ইন্দিরা দূরদর্শিনী (সচিত্র জীবন কথা)—নিখিল সেন প্রণীত। প্রকাশক : রূপা। এলাহাবাদ, বোম্বাই, দিল্লী। দাম দশ টাকা।

উৎকল ভূমি থেকে ।। পঁচিশে অকটোবর। উৎকল সাহিত্য আকাদমী আয়োজন করলেন একটি অনুষ্ঠানের। সেখানে সম্মানিত করলেন ৩৪ জন সাহিত্যিককে। ১৯৭১ ও '৭২ সালের জন্য দেওয়া হল এই পুরস্কারগুলি।

লেখকদের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন একালেরই একজন বিশিষ্ট গল্পলেখিকা, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী শতপথী। বলাই বাহুল্য, ওড়িশা সাহিত্য আকাদমীর সভানেত্রীও তিনি। শ্রীমতী শতপথী তাঁর ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন সম্মানিত সাহিত্যিকদের। বললেন, সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদরাই সমাজের সত্যিকারের নেতা। কেননা, বিস্মৃতপ্রায় যুগ থেকে তাঁরাই জনগণকে পরিচালিত করেন পরিবর্তনের পথে। নিজের অভিজ্ঞতাকেই ঝালিয়ে নিয়েই আরো বললেন, বর্তমান সংকটেও নেতৃত্ব দেওয়া উচিত তাঁদের। নইলে সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করতে পারার মতো তেমন জোরালো সাংস্কৃতিক জীবন দেখতে পাওয়া যাবে না। সুতরাং লেখকদের দায়িত্ব অনেক।' ঠিকই বলেছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনন্দিনী শতপথী। কারণ কবি-সাহিত্যিকরাই হলেন 'আত্মার কারিগর।'

নীল নদের দেশ থেকে ।। খবর এসেছে গোপনে প্রচার হচ্ছে একটি বিবৃতি। মিশরের পাঁচশোরও বেশী লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীর একটি জোরালো বিবৃতি দেশে দেশে সাহিত্যিক ও মনীষী মহলে কিছুটা চাঞ্চল্য এনেছে। সংবাদটি বিদেশী সূত্রে পাওয়া।

বিবৃতিতে নাকি বলা হয়েছে যে, ঐতিহ্যপূর্ণ মিশরীয় সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটতে চলেছে নানান টানাপোড়েনে। রাষ্ট্রনৈতিক, ধর্মীয় আর সামাজিক কড়াকড়ির খপ্পরে পড়ে তার নাকি দফা-রফা হবার জোগাড়। অভিযোগ মিশরের সংস্কৃতিকে পণ্যের পর্যায়ে পুরোপুরি নামিয়ে আনা হয়েছে। বিদেশ থেকে বই আর পত্র-পত্রিকা আমদানীর ক্ষেত্রেও নানান বিধি-নিষেধের বেড়াজাল। স্বাক্ষরকারী ঐ পাঁচ শতাধিক লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীর মতে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁদের পক্ষে জনগণের বিবেকের অংশ হিসেবে কাজ করা রীতিমত দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। ঐ বিদেশী সূত্রের খবরেই প্রকাশ যে, মিশরীয় লেখক সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক খ্যাতনামা লেখক ও নাট্যকার জনাব ইউসুফ ইদ্রিস কোন কোন আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছেন।

বাঙলা একাডেমী সংবাদ ।। ধ্বংসের ভেতর দিয়েই জন্ম নিয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলাদেশ। ফলে জীবনের সব ক্ষেত্রেই এখন সেখানে নতুন চেতনার ঢেউ। পুনর্বিন্যাসের তরঙ্গ। আর এই নবচিন্তার স্বাক্ষর মিলছে বাংলা একাডেমীর পুনর্বিকাশের সংবাদেও।

বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতি ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য নবপর্যায়ে গ্রহণ করা হয়েছে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কর্মসূচী। ইতিমধ্যেই চার-চারটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণাধর্মী রচনা নিয়ে এক দিকে যেমন প্রকাশিত হবে 'বাঙলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা', অন্য দিকে তেমনি সৃজনশীল বাংলা সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদে সমৃদ্ধ হয়ে বেরুবে 'বেঙ্গলি একাডেমী জার্নাল।' এ ছাড়া আর যে দুটি কাগজ বেরুচ্ছে তার মধ্যে একটি শিশু-কিশোর উপযোগী সাহিত্য পত্রিকা, অন্যটি হচ্ছে সংস্কৃতি পত্রিকা।

হঠাৎ গাওয়া গান (গল্প সংকলন)—তপতী রায়। সংস্কৃতি পরিষদ, ১।১৬, রোলান্ড রোড, কলকাতা-২০। পনেরো টাকা।

সম্প্রতিকালে মহিলা কথা-সাহিত্যিকদের সংখ্যা বেশ বেড়েছে। উনিশ শতকে বিহারীলালের সমকাল ও উত্তরকালে, রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে এবং পরে শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্রে রেখে পুরুষদের মত কিছু মহিলা কবি-সাহিত্যিক ভিড় জমিয়েছিলেন এবং তাঁদের কারো কারো একক কৃতিত্ব এবং সামগ্রিকভাবে মহিলা সাহিত্যিকদের অবদান এখন সাহিত্যের ইতিহাসের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। বিশ শতকে ঠিক এইভাবে মহিলা সাহিত্যিকরা সমবেত বা আবির্ভূত হন নি, তবে এককভাবে কৃতিত্ব দেখিয়ে সাহিত্যের দরবারে আসন করেছেন বেশ কিছু লেখিকা। তাঁদের মধ্যে শ্রীতপতী রায়ের নাম নিশ্চয়ই উল্লেখ্য।

উল্লেখ্য এই কারণে যে তিনি যেমন বিভিন্ন ছোট-বড় পত্রিকায় গল্প লিখে একটি নির্ভুল পরিচিতির জগত তৈরী করেছেন ইতিমধ্যে, তেমনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করে সমালোচকদের সুচিন্তিত তৎপরতার সংযোগ করে দিয়েছেন। তাঁর 'হঠাৎ গাওয়া গান' গল্প সংকলনটি সমালোচকদের নতুন করে ভাববার অবকাশ দেবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সংকলনটিতে মোট পনেরোটি গল্প আছে। লেখিকা দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে ছোটগল্প রচনা করেছেন। এই দীর্ঘ সময়ের সমস্ত গল্প নয়, কয়েকটি বিশিষ্ট গল্প এতে সংকলন করেছেন। উনিশ 'শ একাত্তরের লীলা পুরস্কার-ধন্য 'অরণ্যের আগুন' উপন্যাসের লেখিকা তপতী রায় গল্পকার হিসেবে যে যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষমতা রাখেন, আলোচ্য সংকলনটি প্রকাশ করে তা প্রমাণ করেছেন।

গল্পগুলির প্রত্যেকটিই উল্লেখ্য। শ্রীতপতী রায় সমাজ, বর্তমান বিষম অর্থনীতি, দরিদ্র মানুষের অসহায়তা, হতাশা, ভালবাসা-দেহ-দেহাসক্তি-হীনতা, সামাজিক অবক্ষয়, মধ্যবিত্ত মানুষের ক্ষয়-রোগের মত জরাজীর্ণতা, আবার দরিদ্র হলেও আভিজাত্যবোধ নিয়ে বাঁচার বাসনা—এই সমস্ত বস্তুগুলিকে মানবিক মমতাবোধে ও শৈল্পিক সূক্ষ্মতায় তাঁর গল্পে চিত্রিত করতে পেরেছেন। গ্রন্থের নাম গল্পটির নায়িকা জুনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষিকা মাধবী ও তার বেকার স্বামীর মধ্যে সন্তান-বাসনার স্বাভাবিক পরিণতিভাবনা বাস্তবিকই স্বভাবী পাঠককে মুগ্ধ করবে।

'অর্কিড' গল্পের জয়ন্তী অর্থাৎ মিস সেন ও বড়বাবু তাপস রায়, 'কমলালেবু' গল্পের হরিপদবাবু ও পুত্রের আত্মাভিমান-বোধ, 'সহকার' গল্পের বিপিনবাবু, স্ত্রী অনিতা ও অনিতার বাল্যবন্ধু নিখিলবাবুর সম্পর্ক জটিলতা, 'নির্মোক' গল্পের সীতেশ-আরতির অসবর্ণ ভালবাসার মহনীয়তার উত্তরণ, 'তৃতীয় নয়ন' গল্পের নায়িকা শিউলির মানস-উত্তরণ, 'চোরাবালি' গল্প বেকার জীবনের সকরুণ অভিশপ্ত চিত্র, 'বিচিত্র মন' গল্পে নারীদেহ বাসনা ও তার নিষ্ফলতা, 'দলছুট'-এর বিনতার আধুনিক ব্যক্তিত্বময়ী নারী হয়ে ওঠা—ইত্যাদি বিষয়গুলিকে লেখিকা এমন এক ছোটগল্পের নিটোল শৈল্পিক মর্যাদা দিয়েছেন, যা স্বভাবী পাঠকদের সহজেই আগ্রহী করে তুলবে।

লেখিকার পরিণত মনের পরিচয় আছে কেবল বিষয় নির্বাচনে নয়, ভাষা রীতিতেও। মানব-মনের জটিল প্রশ্নকে এমন সহজ করে বলার ক্ষমতা খুব কম লেখকের রচনায় মেলে। বাস্তবিকই সংলাপে, বর্ণনায় এবং গল্প তৈরী করার মধ্যে এমন স্বচ্ছ বাস্তবতা ও 'স্বচ্ছন্দ গতিময়তা' লেখিকা সম্পর্কে শ্রদ্ধা বাড়ায়। লেখিকার দীর্ঘ জীবন-অভিজ্ঞতা গল্পগুলিতে ওতপ্রোত। গ্রন্থের প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়।

একটি কাপুরুষের কাহিনী (নাটক)—চিত্তরঞ্জন ঘোষ। ৪৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। তিন টাকা।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন ঘোষ নাট্যকার হিসেবে ইতিপূর্বে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর একাধিক একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যেমন পেয়েছি, তেমনি কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে অভিনীত হতে শুনেছি। হাল্কা লঘু চালে বাংলা নাটক লিখতে যেমন তিনি অভ্যস্ত, তেমনি আবার গম্ভীর নাটকেও তাঁর হাত পটু। বর্তমান নাটক 'একটি কাপুরুষের কাহিনী' একটি গম্ভীর রসের নাটক।

নাটকটি দুটি অঙ্কে বিভক্ত। কাহিনী অংশে ঘটনা বাহুল্য হয়ত আছে, কিন্তু তা নাটকের 'অ্যাকশন'-এ যতটুকু প্রয়োজন, তার বেশী কিছুমাত্র নয়। কাহিনী এক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত। বিধুভূষণের বৈধ কন্যা শামতা। কিন্তু অবৈধ সন্তান সৌরভকে তিনি তাঁর সংসারেই পরিচয় গোপন রেখে পালন করেছেন। সৌরভকে কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে হিসেবে মানুষ করেছেন বিধুভূষণ। শামতার সঙ্গে তার যখন প্রণয় জমে ওঠে, তখনি তার মা মালতী আসে সৌরভকে নেবার জন্যে। সৌরভ তার কুমারী বয়সের সন্তান। নীল পার্টির দল কমলের দলের সৌরভকে ছাড়াতে চায়। এই সংঘর্ষের মধ্যে মালতী নীল পার্টির দলের হাতে প্রাণ দেয়। সৌরভও মারা যায়। নাটকের শেষে ভয়ংকর এক 'প্যাথস' নেমে আসে।

নাট্যকারের কুশলতা বর্তমান রাজনৈতিক সংকটকে প্রতীকের ব্যঞ্জনায় চিত্রিত করার মধ্যেই। নাটকের আরম্ভ ভয়াবহ, পৈশাচিক ও যথার্থই নাটকীয়। অভিনয়কালে দর্শকদের প্রথম থেকেই এক ভয়াবহ জায়গায় নিয়ে যায়। তার পরেই 'ফ্ল্যাশ' ব্যাকের কৌশলে সৌরভ-শামতা-বিধুভূষণ মালতী ইত্যাদিদের চিত্রণ। নাট্যকার সুকৌশলে সে চিত্রকে গতিদান করেছেন। অঙ্কবিন্যাস, মুখসন্ধি থেকে বিমর্ষসন্ধি পর্যন্ত ভাবের গতিময়তা নাটকটিকে উজ্জ্বল ও স্থায়ী রসমূল্য দান করেছে।

বিষণ্ণ বনভূমি (কাব্যগ্রন্থ)—প্রদীপ বসু। সময়ের কবিতা প্রকাশনী, ৩৮।এ প্যারীমোহন রায় রোড, কলকাতা—২৭। এক টাকা।

বয়সে তরুণ হলেও, প্রদীপ বসু কবি হিসেবে নিষ্কলঙ্ক। রাত্রিশেষের অন্ধকারে ও তৎসম্পৃক্ত অনুষঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন বেশী। এবং একনয়নের স্বচ্ছসাম্য উচ্চারণে স্বতঃস্ফূর্ত।

'বিষণ্ণ বনভূমি' তাঁর পূর্ণাঙ্গ কাব্য-সংকলন নয়, একটি কবিতা পুস্তিকা। এতে জায়গা পেয়েছে কবির আঠারোটি কবিতা। এবং কবিতাগুলির অধিকাংশই যতিচিহ্ন-হীনতায় কিংবা বিরল-যতিচিহ্নের ব্যবহারে, একেকটি উপলব্ধির স্মৃতিবাহী, যা অনেকেরই ভালো লাগবে।

শারদ সংকলন

চতুষ্কোণ ঃ সম্পাদক—শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী। ৭৭।১, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিঃ-৯। দাম তিন টাকা।

চতুষ্কোণ সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। রুচিসম্মত চিন্তাধারা এবং আধুনিক জীবনভাবনায় স্পষ্ট স্বাক্ষর থাকে প্রতিটি সংখ্যায়। শারদীয় পত্র-পত্রিকাকে যখন রঙীন প্রচ্ছদে শোভিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, চতুষ্কোণ সেক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছে। সর্বপ্রথমেই তা উল্লেখনীয়। প্রচ্ছদে আছে কালীঘাট পটের এক স্নিগ্ধময় রমণীর রেখাচিত্র।

প্রবন্ধ লিখেছেন নেপাল মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, অশোক ভট্টাচার্য, নীহাররঞ্জন চৌধুরী, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য এবং নারায়ণ চৌধুরী। গল্প ও কবিতা লিখেছেন মিহির আচার্য, মণি মুখোপাধ্যায়, অশোককুমার সেনগুপ্ত, মৃণাল চৌধুরী, কৃষ্ণ

চক্রবর্তী, সুভাষ সমাজদার, সাধন চট্টোপাধ্যায়, দেবদত্ত রায়, ছবি বসু, অমিয় চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কৃষ্ণ ধর, সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য এবং মধু গোস্বামী। বাকিশটি সনেটগুচ্ছে যাঁদের রচনা আছে—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, গোপাল ভৌমিক, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সুশীল রায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, কবিতা সিংহ, শ্যামসুন্দর দে, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, দুর্গাদাস সরকার, আবুল কাশেম রহিমউদ্দিন, পরিতোষ আচার্য, নলিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, পলাশ মিত্র, কবিরুল ইসলাম, আশিষ সান্যাল, আশিস সেনগুপ্ত, রমলা বড়াল, প্রণব চট্টোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজনের।

সাহিত্যচিন্তা : সম্পাদক—কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। ষাণ্মাসিক। ৩১১ গাঙ্গুলী বাগান। কলকাতা—৪৭। দেড় টাকা।

বারট্রাণ্ড রাসেল সম্পর্কে একটি স্মরণযোগ্য আলোচনা করেছেন চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। পল ভালেরি ও আঁদ্রে জিদের দুটি চিঠি অনুবাদ করেছেন বিজয় দেব। প্রতিষ্ঠিত ও তরুণ কবিদের সুনির্বাচিত কবিতায় সমৃদ্ধ পত্রিকাটি।

সময় : সম্পাদক—উৎপলকুমার গুপ্ত। সাহিত্য সংস্কৃতি ত্রৈমাসিক। ৩ গোয়ালপাড়া লেন (রাধিকামোহন সেন রোড)। বহরমপুর। দাম একটাকা।

'মুর্শিদাবাদের বিবাহকালীন ছড়া' বিষয়ে লিখেছেন পুলকেন্দু সিংহ। কবিতা লিখেছেন মনীশ ঘটক, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, কবিরুল ইসলাম, রত্নেশ্বর হাজরা, মনীষীমোহন রায়, উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে। গল্প লিখেছেন প্রলয় সেন, অজয় ভট্টাচার্য, দিব্যেশচন্দ্র লাহিড়ী এবং উৎপলকুমার গুপ্ত। তাছাড়া কয়েকটি গল্প ও কবিতার অনুবাদ আছে।

সীমান্ত : ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক—দীপেন রায়। ৩১।২, হরিতকী বাগান লেন, কলকাতা—৬। একটাকা।

বর্তমান সংকলনটি শারদীয় সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হলেও এটি পত্রিকার বিংশতিতম সংকলন। আকারে ছোট কিন্তু প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও পুস্তক সমালোচনা ইত্যাদি বিভাগীয় রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে পত্রিকাটি মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। একটিমাত্র গল্প লিখেছেন চণ্ডী মণ্ডল। গল্পটি সুলিখিত। কবিতা লিখেছেন ভবানী সেন, গোলাম কুদ্দুস, সতীন্দ্র মৈত্র, চিত্ত ঘোষ, দুলাল ঘোষ, শান্তনু দাস, বিপ্লব মাজী, আশিস সেনগুপ্ত, দীপেন রায় প্রমুখ। সুনির্বাচিত ও সুলিখিত প্রবন্ধের লেখকদের মধ্যে আছেন পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, চার্বাক সেন, অনন্ত মাজী, বিনয় মাহাতো, পবিত্রকুমার সরকার। পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য হল, একটি নিজস্ব চরিত্র গড়ে তুলতে পেরেছে যা অন্য বহু 'লিটল ম্যাগাজিনে' দুর্লভ। পবিত্র মুখোপাধ্যায় লিখিত দীর্ঘ সমালোচনা বিতর্কমূলক হলেও সুলিখিত। পত্রিকাটি সংগ্রহ করে রাখার উপযোগী।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান : সাহিত্য ও বিজ্ঞানবিষয়ক ত্রৈমাসিক। সোদপুর, ২৪ পরগণা। দাম—একটাকা।

সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মকে মেলানো যায় হয়ত। কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে যায় কি? পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলী এ সম্পর্কে কোনো ফতোয়া জারি করেননি। প্রথম প্রবন্ধে নির্মলেন্দুবিকাশ চৌধুরী আলোচনা করেছেন 'বৈষ্ণব কবিতায় মিস্টিসিজম' নিয়ে। কিন্তু অন্য একটি প্রবন্ধে সংখ্যাতত্ত্ব বিশ্লেষণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন দেবীপ্রসাদ সরকার। পত্রিকাটির নিজস্ব গুরুত্বও এখানেই। প্রবন্ধগুলি সুলিখিত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ। লিখেছেন পূর্ণেন্দুনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, সুশান্তমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ সরকার, অশোক সরকার এবং আরো অনেকে।

আন্তর্জাতিক আঙ্গিক : সম্পাদক—রাণা সরকার। চলচ্চিত্রবিষয়ক প্রবন্ধের সচিত্র পত্রিকা। ১১০ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড। কলকাতা-২৬। দাম—একটাকা।

বাংলা চলচ্চিত্রের সংকট প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, বিমল ভৌমিক, তপন সিংহ, রাজেন তরফদার, অজয় কর, পূর্ণেন্দু পত্রী, তরুণ মজুমদার, অরুন্ধতী দেবী, পার্থপ্রতিম চৌধুরী এবং হরিসাধন দাশগুপ্ত লিখিত আলোচনাগুলি মূল্যবান।

ভাবীকাল : সম্পাদক—সুধাংশু গুপ্ত। ৮৬।৩এফ সুরেন সরকার রোড, কলকাতা—১০। দাম—দু টাকা।

দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধসহ অন্যান্য প্রবন্ধগুলি ভালো। পাঠককে ভাবায়। লিখেছেন হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু এবং আরো অনেকে। সূচীপত্রে লেখকের নামের আগে 'শ্রদ্ধেয়' শব্দের প্রয়োগ নতুন লাগলো।

প্রিয়ম্ : সম্পাদক—হৃষীক। ৬৭।১ উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা—৪। একটাকা।

বাংলা হরফে ছাপা সংস্কৃত পত্রিকা। লিখেছেন দীননাথ ত্রিপাঠী, ভূপতিভূষণ ভট্টাচার্য, সীতানাথ দেবশর্মা, রঘুনাথ ঘোষ, নীরদবরণ ভট্টাচার্য, ধনঞ্জয় চক্রবর্তী, ভাস্করপ্রসাদ চক্রবর্তী এবং হৃষীক। সাধারণ পাঠকরা অনুস্বার বিসর্গের বহুল প্রয়োগ দেখে বিস্মিত হবেন। কিন্তু সংস্কৃতপিপাসু পাঠকপাঠিকারা উপকৃত হবেন পত্রিকাটি হাতে পেয়ে।

জয়পুর দুর্গাবাড়ী এসোসিয়েশন [সুভেনীর] সম্পাদক—জ্যোতির্ময় দাস। জয়পুর।

সুদূর জয়পুরে গিয়েও বাঙালী তার আপন সংস্কৃতিকে বিস্মৃত হয়নি—এই সুভেনীরটি হাতে নিলেই যেন মনে পড়ে। এক ধরনের নস্টালজিয়ায় আচ্ছন্ন হতে হয়। প্রচলিত দুর্গা মাহাত্ম্য বর্ণনা না করে, এ সংকলনে লিখেছেন অসীমকুমার বসু, অজিতকুমার দত্ত, আদিত্য সেন, জ্যোতির্ময় দাস, প্রশান্ত দাস, তপেশ নিয়োগী, পি, সি, রায় এবং এইচ, এন, ব্যানার্জি। জয়পুর দুর্গাবাড়ীর বাস্তবতা ও সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন পি এন ব্যানার্জি।

চিরন্তনী : সম্পাদক—বিমলকান্তি ঘোষ ও সত্যেন রায়চৌধুরী। পি১১৩ প্রিন্সেপ স্ট্রীট, কলকাতা—১৩। এক টাকা।

লিখেছেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র, কালিদাস রায়, আশাপূর্ণা দেবী, সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। মুদ্রিত আলোকচিত্রগুলি চমৎকার।

অপ্সরা : সম্পাদক মৃণাল দাস ও মীরা মুখোপাধ্যায়। ৩৯সি ডেন্টমিশন রোড, কলকাতা-২৩। দাম : চার টাকা।

একটি উপন্যাস, দুটো বড় গল্প ও এক ডজন ছোট গল্প আছে। ঘোষণা অনুযায়ী এটি : 'সিনেমা ও রোমান্টিক গল্প-উপন্যাসের সংকলন।" কভারে সিনেমার ছবি আছে। লিখেছেন জগৎ লাহা, কুমারস্বামী কামরাজ, বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় এবং অনেকে।

প্রগতি : সম্পাদক মৃণাল চট্টোপাধ্যায় ও অমিয়ধন মুখোপাধ্যায়। ৩৯বি ডেন্টমিশন রোড, কলকাতা-২৩। তিন টাকা।

উল্লেখযোগ্য তিনটি প্রবন্ধের লেখক তরুণ সান্যাল, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ও অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতা লিখেছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে। দু-একটা গল্প এক্সপেরিমেন্টাল। লিখেছেন আশা দেবী, বিমান চট্টোপাধ্যায়, শিশির ভট্টাচার্য প্রমুখ কয়েকজন।

উত্তর ভারতী : সম্পাদক কুমারেশ ঘোষ, রাণা বসু ও শশাঙ্কশেখর সিংহ। ৩২ মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৬। দু টাকা।

কোনো রকম স্টান্ট দেওয়ার জন্য পত্রিকাটি বেরোয় নি। লিখেছেন বনফুল, মন্মথ রায়, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, শুভ মুখোপাধ্যায়, শান্তি লাহিড়ী, স্বদেশরঞ্জন দত্ত এবং আরো অনেকে। এ সংকলনের উল্লেখযোগ্য একটি প্রবন্ধের লেখক সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়। গল্পগুলি সুখপাঠ্য। একটি চীনা গল্পের অনুবাদ করেছেন মিঠু দাস।

ধরিত্রী : সম্পাদক দাশরথি রায়। সাপ্তাহিক পত্রিকা। ধরিত্রী কার্যালয়। বি এল চৌধুরী রোড, বর্ধমান। দাম এক টাকা।

বর্ধমানের মুস্লিম তীর্থ এবং রাঢ় সংস্কৃতির নিদর্শন সম্পর্কে লিখেছেন

যথাক্রমে মুহম্মদ আয়ুব হোসেন এবং শৈলেন্দ্রনাথ সামন্ত। গল্প কবিতা এবং আরো আকর্ষণীয় রচনায় সমৃদ্ধ।

ঐকতান : সম্পাদক মুকুলেশ বিশ্বাস। ত্রৈমাসিক সাহিত্য-সংকলন। পূর্বাশা প্রকাশনী। নগেন্দ্রনিলয়। রাজারমাঠ। নদীয়া। দাম এক টাকা।

গল্প কবিতা প্রবন্ধ লিখেছেন নরেন বিশ্বাস, আহমদ শরীফ, সিরাজউদ্দিন আহমেদ, অমল চক্রবর্তী, কালিদাস রক্ষিত, হুমায়ুন কবির, অসীম সাহা, মহম্মদ নূরুল হুদা, খোন্দকার জাহাঙ্গীর, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ বিশ্বাস এবং আরো অনেকে।

অতিথি : সম্পাদক অসিতকৃষ্ণ দে। ৩৫।১ বাগবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৩। এক টাকা।

লিখেছেন বড়রা এবং অল্প বয়স্কেরা—সবাই। যেমন 'রাজকীয় চুরি' সম্পর্কে রমাপদ চৌধুরীর গল্প আছে, তেমনি আছে পূর্ণেন্দু গুপ্ত, সনৎ রাণা, বীরেন্দ্র চক্রবর্তীর কবিতাও। উল্লেখযোগ্য লেখকদের মধ্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, বিমল কর, ভবানী মুখোপাধ্যায়ও আছেন।

প্ল্যাটফরম : চুনী দাশ। মলয়নগর, পোঃ যোগেন্দ্রনগর, ত্রিপুরা। এক টাকা।

কবিতার কাগজ। লিখেছেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, রণেন্দ্র দেব, শিশির ভট্টাচার্য, শান্তনু দাস এবং অনেকে। প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে একটি।

শারদীয় গন্ধবণিক : সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র কুণ্ডু। ৮০ আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৫। তিন টাকা।

বেশ মোটাসোটা। কয়েকশ পাতার বই। গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের মুখপত্র হলেও লিখেছেন সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলেই। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধে সমৃদ্ধ। উল্লেখযোগ্য লেখক-লেখিকাদের মধ্যে আছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, রমা চৌধুরী, সুনীল পাল, শিবরাম চক্রবর্তী, সমীর রক্ষিত, চণ্ডী লাহিড়ী, কাফি খাঁ এবং আরো অনেকে। প্রশান্ত দাঁ লিখেছেন একটি উপন্যাস। মোটামুটি সুখপাঠ্য।

পদক্ষেপ : প্রকাশক পি কে নন্দ। পদক্ষেপ সাহিত্য পরিষদ, বিলাসপুর, মধ্যপ্রদেশ।

দুটো গল্প, তিনটি প্রবন্ধ ও এক গুচ্ছ কবিতা ছাপা হয়েছে। ভালোই। বাংলাদেশের বাইরে থেকে যে পুরো দু বছর ধরে পত্রিকাটি বেরুচ্ছে—এতেই পরিচালকদের আন্তরিকতা প্রকাশ পায়।

জাগরী : সম্পাদক অপূর্বকুমার সাহা। ৭৪।৫এ বাগবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৩। এক টাকা।

প্রচ্ছদে দুর্গার ছবি। এবং সূচনায় শ্রীঅরবিন্দের বাণীসহ এ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে সুফিয়া কামাল, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত প্রমুখের কবিতা ও দিব্যেন্দু পালিত, অম্লান দত্ত, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের গল্প, প্রবন্ধ ও রম্যরচনা।

সাহিত্য বিচিত্রা : সম্পাদক কমল চট্টোপাধ্যায়। আদ্রা, পুরুলিয়া।

লিখেছেন অনেকে। প্রথাগত ও প্রথা-বিরোধী উভয় ধরনের রচনায় সমৃদ্ধ। জীবন সরকারের রচনাটি একেবারে আলাদা মেজাজের।

কৃশাণু : সম্পাদক—দীনেশচন্দ্র সিংহ। ৯৩, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৬। দাম এক টাকা।

কৃশাণু একমাত্র গল্পের পত্রিকা। আধুনিক গল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে পত্রিকাটি বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রেখেছে। রত্নেশ্বর বর্মণ, হরিপ্রসাদ ভৌমিক, রথীন্দ্রনাথ ঘোষ, দুলেন্দ্র ভৌমিক, প্রভাসকান্তি ভদ্র, অসীম চক্রবর্তী, মদন দাশ, প্রবীর সাহা, রমেন্দ্র রায় এবং দীনেশচন্দ্র সিংহের গল্প আছে।

জয়শ্রী : সম্পাদক—সুনীল দাশ। ২০-এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড। কলকাতা-২৬। দাম তিন টাকা।

গল্প, কবিতা, প্রবন্ধের সমাবেশে পত্রিকাটি এবার খুব একটা আকর্ষণীয় হয়নি। সরোজেন্দ্রনাথ রায়ের 'ভারত ইতিহাসে রামমোহন' প্রবন্ধটিতে নতুন বক্তব্য রয়েছে।

নবাহ : সম্পাদকমণ্ডলী সম্পাদিত। ১০৭, উলটাডাঙ্গা মেন রোড। ৩।২০ সি-আই টি বিল্ডিংস। কলকাতা-৪। দাম এক টাকা

গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লিখেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, মণীন্দ্র গুপ্ত, আশিস সান্যাল, রত্নেশ্বর হাজরা, শিবশম্ভু পাল, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বলরাম বসাক, দিলীপ সেনগুপ্ত, সুশীল সাহা এবং আরো অনেকে। সংখ্যাটি বেশ আকর্ষণীয়।

প্রাপ্তি স্বীকার

পার্থসারথি : সম্পাদক প্রীতিকুমার ঘোষ। ৫এ অক্ষয় বোস লেন, কলকাতা-৪। পঁয়তাল্লিশ পয়সা।

সাহিত্য জানাই : সম্পাদক বিশ্বনাথ ঘোষ। পোঃ রসুলপুর, বর্ধমান।

আলিকালি : সম্পাদক সুভাষ দেবরায় ও নির্মল বিশ্বাস। রসুলপুর বাজার, বর্ধমান। পঁচাত্তর পয়সা।

অঙ্কুর : সম্পাদক প্রশান্ত লাহিড়ী। মল্লিকপাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

শঙ্খবিষ : সম্পাদক গৌর খাঁড়া। রাজারবাগান, মেদিনীপুর। ষাট পয়সা।

বিনিদ্র : সম্পাদক বেনু সরকার, তপনকুমার ঘোষ ও ছানু সাহা। পঞ্চাশ পয়সা।

দিশারী : সম্পাদক দিলীপকুমার চক্রবর্তী। প্রভাত স্মৃতি, লাইব্রেরী রোড, ভদ্রেশ্বর।

মুকুর : সম্পাদক সৌম্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকা। তেইশের বি বাই সাত গোয়ালাপাড়া রোড, কলকাতা-৬০। দাম দেড় টাকা।

কবিতা প্রতি মাসে : সম্পাদক সুমর জোয়ারদার। তরুণ কবিদের কবিতার মাসিক পত্রিকা। ৮০।১৩ বারুইপাড়া লেন, কলকাতা-৩৫। দাম পনের পয়সা।

নিক্কন : সম্পাদক শিখা বিশ্বাস। কবিতা ও কবিতা বিষয়ক পত্রিকা। বৌবাজার। কৃষ্ণনগর, নদীয়া। দাম ৫৯ পয়সা।

বারবেলা : সম্পাদক অর্ধেন্দুশেখর দেব। বাণীপুর, ২৪ পরগণা। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন সত্য গুহ এবং গৌরীশঙ্কর দে।

সম্প্রীতি : সম্পাদক প্রণব মাইতি। কবিতা ও কবি সম্পর্কিত দ্বিমাসিক পত্রিকা। অস্তাচল, কাঁথি, মেদিনীপুর।

মণির খনি : সম্পাদক বেণুগোপাল মোদক। মাসিক শিশু পত্রিকা। আমপুলিয়াপাড়া। পঁচমাথা। নবদ্বীপ, নদীয়া।

পটভূমি : সম্পাদক কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়, হিমাংশু দে। কবিতা সংকলন। ৩৯।১ ইংটেল্যাণ্ড, ইছাপুর, ২৪ পরগণা।

গোবরডাঙ্গা : সম্পাদক মণি দাশগুপ্ত। খাঁটুরা। গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা। দাম ত্রিশ পয়সা।

আবর্ত : সম্পাদক দীপাঞ্জন দত্ত। ২।৪৩ নাকতলা। কলকাতা-৪৭। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

জোনাকি মন : সম্পাদক সুন্দরগোপাল সাহিত্যরত্ন। সাহিত্য ত্রৈমাসিক। পড়াশোনা (হরগৌরীতলা)। পোঃ বোলপুর। বীরভূম।

মাটির প্রদীপ : সম্পাদক ভোলানাথ হাজরা। রেডিও কনসার্ন। মোবারক বিল্ডিং। বর্ধমান। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

খামখেয়ালী : সম্পাদক রাজেন্দ্রকুমার মিত্র। মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। ১১বি গোকুল মিত্র লেন। কলকাতা-৫।

কিশলয়-এর মেলা : সম্পাদক নিখিলেন্দু চক্রবর্তী। নব বারাকপুর। মাসুন্দা। দাম এক টাকা।

ভুবন : সম্পাদক নয়নকুমার রায়। দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকা। ২ ভুবননগর। পোঃ চন্দননগর। হুগলী। দাম এক টাকা।

বর্ণালী : সম্পাদক জয়দেব দাস। ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা। ১৯৫ জি টি রোড শেওড়াফুলী। হুগলী।

নেপালের শিল্পকলা

নির্মল দত্ত

নেপালে এসে শুধু পশুপতিনাথকে দেখেই ফিরে যাওয়া যায় না। এখানকার মন্দিরে যে শিল্প-ঐশ্বর্য ছড়িয়ে আছে তার আকর্ষণ কম নয়। মন্দিরের দেশ নেপালে এসে তাই বারবার মনে হয়েছে, পাহাড়ী উপত্যকার ছোট্ট এই দেশটিতে হিন্দু আর বৌদ্ধ মন্দিরে কি ঠাসাঠাসি, আর তার গায়ে গায়ে কি অপূর্ব শিল্প-কলার নিদর্শন! বেশীর ভাগই কাঠ আর পাথরের ওপর খোদাই করে এই শিল্পের সৃষ্টি। তাছাড়া ধাতুর ওপরও শিল্পকাজ রয়েছে।

শুধু মন্দিরের গায়ে শিল্পকাজ কেন, চিত্রাঙ্কন, হস্তশিল্প, কাঠের ও ধাতুজ জিনিসের ওপর কারুকার্য—এমন কি, সুন্দর সুন্দর কার্পেট তৈরীতে নেপালী শিল্পীদের দক্ষতার তুলনা নেই। জানা যায়, সপ্তম শতাব্দী থেকেই নেপালের শিল্প-কলার উন্নয়ন ও প্রসার হ'তে থাকে। মূর্তি নির্মাণেও নেপালী শিল্পের খ্যাতির কারণ স্পষ্ট বোঝা যায় এখানকার মন্দিরে মন্দিরে মূর্তিগুলি দেখে।

হিন্দুধর্মই নেপালের প্রাচীনতম ধর্ম হলেও পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মেরও প্রসার-লাভ ঘটে এখানে। তাই হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেরই সমন্বয় ঘটেছে নেপালে। হিন্দুধর্মের মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব, তন্ত্র, ব্রাহ্মণ্য—সব শ্রেণী ধর্মেরই বিকাশলাভ ঘটেছে। নেপালে যেমন আছে শিবভক্ত, তেমনি আছে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। যেমন আছে মন্দির আর প্যাগোডা, তেমনি আছে বৌদ্ধস্তূপ। মন্দিরের অধিকাংশ প্যাগো-ডার ঢঙেই তৈরী। এর মধ্যে কোনটা বা সাধারণভাবে কারুকার্য করা, কোনওটা বা সুন্দর ও সূক্ষ্ম কারুকার্যময়। এই কারু-কার্যময় মন্দিরের কোন কোনটাতে বা দেখা যায় বিভিন্ন ভঙ্গিমায় নরনারীর যৌন মিলনের দৃশ্য। কাঠের খোদাই-এ এই সব দৃশ্য দেখা যায় বেশী। পাথরের ওপরও আছে। যৌন-মিলন বিষয়ক এই খোদাই-গুলি শিল্প-চাতুর্যেরও নিদর্শন।

নেপালের অধিবাসীরা প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত : কিরান্তী, নেওয়ারী আর প্রভাতী। নেওয়ারীরাই হচ্ছে শিল্পীর জাত। নেপালে যত শিল্পকলা দেখা যায়, তার অধিকাংশই হল নেওয়ারীদের দান। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, প্রভাতীরা হল সামরিক জাতি। প্রভাতীরা আবার মোট চারটি ভাগে বিভক্ত : খাস, ঠাকুরি, গুরুংস আর গুর্খা।

নেপালীরা যে কত বড় শিল্পী জাতি তা নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু নামের উৎপত্তি থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়। একটি মাত্র গাছের কাঠ থেকেই তৈরী হয়েছিল এখানকার গোরখনাথের মন্দির। এই মন্দির থেকেই শহরের নামকরণ হয়েছে—কাঠ-মাণ্ডু। 'কাষ্ঠমণ্ডপ' থেকে কাঠমণ্ডু বা কাঠমান্ডু। একে কাঠমন্দিরও বলা হয়ে থাকে। কাঠমাণ্ডু শহরের বাজারে আজও রয়েছে এই মন্দিরটি। অবহেলিত ও পরিত্যক্ত অবস্থায়। কিন্তু ইংরেজি ১৫৯৬ খৃঃ নির্মিত এই মন্দির-গাত্রে আজও যে কারু-কার্য রয়েছে, তা নেপালী প্রাচীন শিল্প-কলার একটি নিদর্শন। আর যে-গাছের কাঠ থেকে মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল, সে গাছটিও নিতান্ত ছোট ছিল না।

নেপালের 'গোচর' বিমানবন্দর থেকে গাড়ীতে না এসে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেও পৌঁছানো যাবে পশুপতিনাথের মন্দিরে। বাগমতী নদীর ধারেই মন্দির। পশুপতি-নাথের একটা আকর্ষণ আছে। শিবরাত্রি মেলার সময় নেপালী ও ভারতীয়ের মিলন-ক্ষেত্র হয়ে ওঠে এই স্থান। তাছাড়া অন্য বিদেশীরাও বাদ নেই। অপূর্ব কারুকার্য পশুপতিনাথ মন্দিরের। মন্দিরের গায়ে গায়ে সোনালী আর রুপোলীর কাজ। মাথায় স্বর্ণচূড়া। মন্দিরের ভেতরে পশুপতিনাথ বা শিব। কৃষ্ণবর্ণ মূর্তি। পরিপাটি করে সাজানো। মূর্তির চারটি মস্তক। মাথার ওপরে স্বর্ণছত্র। মন্দিরের চারদিকেই দরজা। চার দরজা থেকেই দেখা যায় মূর্তিকে। মন্দিরের সামনের চত্বরে বিরাট-কায় পিতলবর্ণ নান্দী। আর দক্ষিণ দিকে মহাভৈরব। সদাই জাগ্রত সশস্ত্র প্রহরী। মন্দিরের দিকে সজাগ দৃষ্টি তাদের। ত্রয়ো-দশ শতাব্দীতে তদানীন্তন শাসক জয়সিংহ রামদেব তৈরী করান এই মন্দির। মন্দিরের উল্টোদিকে বাগমতীর তীরে সারি সারি আরও শিবমন্দির।

আমাদের জিপের ড্রাইভার সানুভাই। এর ওপরই ভার ছিল নেপালের শিল্প-নিদর্শনগুলি দেখানোর। আর সঙ্গে ছিলেন নেপালের তরুণ কবি বিক্রমপ্রসাদ ঠাকুর—আমাদের পথপ্রদর্শকরূপে।

গোরখনাথের মন্দির। নেপালী শিল্পকলার অন্যতম নিদর্শন!

তুরজা ভবানী বা তালেজু মাজু মন্দিরের গবাক্ষগুলি অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত। এই কারুকার্য বেশীর ভাগই পিতলের উপর।

নেপালের গুহ্যেশ্বরী মন্দির বাহান্ন পীঠের এক পীঠ বলে কথিত। জিপ এসে থামল সেখানে। ভেতরে প্রবেশ করে দেখি, মন্দির ছোট বটে, কিন্তু সোনা আর রুপোর শিল্পকাজের ঝলমলানি এর সারা গায়ে। সতীর গুহ্য পড়েছিল নাকি এখানে। তারই নিদর্শন মন্দিরে। মূর্তি কিছু নেই। এ-মন্দিরেও জাগ্রত প্রহরী। ছবি তোলারও নিয়ম নেই।

বিক্রমপ্রসাদ বললেন—আমরা দেখে নিই ভকতপুর আর ললিতপুর। কাঠমাণ্ডু তো দেখেছেন। ভকতপুর আর ললিতপুর শহর দেখলেই নেপালের অনেকখানি দেখা হয়ে যাবে।

সানুভাই জিপে স্টার্ট দিয়ে বলল তার ভাষায়—তাহলে আগে ভকতপুরেই যাওয়া যাক।

কাঠমাণ্ডু শহর ছাড়িয়ে হনুমতী নদী পেরিয়ে থিমি গ্রামকে পেছনে রেখে জিপ এসে থামল ভকতপুরের দত্তাত্রেয় মন্দিরের সামনে। ভকতপুরের আর এক নাম ভাতগাঁও। এই ভকতপুরই ছিল নাকি নেপালের প্রাচীন রাজধানী। দত্তাত্রেয় মন্দির খুব প্রাচীন। সারা গায়ে তার নকসার কাজ। মন্দিরে আছে শিবমূর্তি। এখান থেকে আর একপাশে একটু এগিয়ে গেলে প্রসন্নশীল মহাবিহার মন্দির। এই মন্দিরেও শিল্পকাজের নিদর্শন প্রচুর। মন্দিরে আছে দীপঙ্করের মূর্তি। প্রসন্নশীল মহাবিহার থেকে পিছিয়ে এসে শহরের প্রধান রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেই 'তুরজা ভবানী' বা 'তালেজু মাজু' মন্দির। শিল্পকাজের অপূর্ব নিদর্শন সারা মন্দির জুড়ে। শিল্পকলার এই প্রাচুর্য চোখকে ধাঁধিয়ে দেয় যেন! মন্দিরের ভেতরে যেমন বিভিন্ন অবতারের মূর্তি শোভিত—তেমনি মূর্তির মিছিল সারি সারি মন্দিরের গায়ে। জানা যায়, বখ্তিয়ার খিলজি অযোধ্যা জয় করতে এলে এই মূর্তি নাকি এখানে আনা হয়েছিল। আর সেই থেকে নেওয়ারী শাসকদের গৃহ-দেবতা হয়ে আছেন ভবানী।

ভবানী মন্দির থেকে রওনা দিই ললিতপুরের পথে। ললিতপুরের আর এক নাম পাটন। নেপালের আর একটি বর্ধিষ্ণু শহর। এখানকার কৃষ্ণমন্দিরই হচ্ছে সবপ্রধান। রাজা সিদ্ধি নরসিংহ মাল্লা তৈরী করালেন এই মন্দির। সে প্রায় তিনশো বছর আগের কথা। মথুরার কৃষ্ণমন্দিরের চিত্রপট দেখিয়ে হুকুম দিলেন শিল্পীদের—ঠিক এমনটিই গড়তে হবে মন্দির। শিল্পীরা মনপ্রাণ ঢেলে দিল মন্দির গড়তে। পাথর কেটে কেটে চলল খোদাইয়ের কাজ। মথুরার মন্দিরের চেয়েও হল সে আরও সুন্দর। ভারতীয় কলাকার্যের ওপর নেপালী শিল্পীদের শিল্পকলা মিশিয়ে হল সে সুন্দরতম—হল সৌন্দর্যময়। কিন্তু তবু যেন এর সর্বত্র একটা আটপৌরে ছাপ! একটু আগে দেখে এলাম ভবানী মন্দিরকে—কি তার চাকচিক্য, ঝলমলে রূপ! হবেই না বা কেন, রাজ-রাজড়ার ব্যাপার। আর কৃষ্ণমন্দির যেন সবার—সব মানুষের। মন্দিরের কৃষ্ণমূর্তি। কালো ঢলঢলে সে আপন-করা, পাগল-করা রূপ।

কৃষ্ণমন্দির থেকে উত্তর-পশ্চিমে একটু এগিয়ে গেলে শাক্যমুনি বা মহাবোধি মন্দির। বৌদ্ধমন্দির হলেও এরও জাঁকজমক কম নয়। ভগবান বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন কাহিনী ধারাবাহিকভাবে খোদাই করা আছে এখানে মন্দিরের গায়ে পাথরের ওপর। এর কারুশিল্প শুধু অপূর্বই নয়, স্থাপত্যশিল্পের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রতিটি ইঁটে ভগবান বুদ্ধের মূর্তি খচিত। মন্দিরটি তৈরী করেছিলেন চতুর্দশ শতকে ––শ এক পুরোহিত অভয়রাজ।

এবার যাত্রা স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের উদ্দেশ্যে। তাই পাটন ছেড়ে আসি। আবার কাঠমাণ্ডু শহর ডিঙিয়ে ফাঁকা রাস্তা ধরে এসে উপস্থিত হই একটি পাহাড়ী টিলার ওপর। এইখানেই স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির। সুসজ্জিত চারধার। তার বৌদ্ধস্তূপ, মন্দির আর চত্বর।

স্বয়ম্ভুনাথ থেকে আবার ফিরে চলি কাঁচা রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে। এবার বালাজু বাইশধারায়। ঝরনার জল একটি আধারে সঞ্চিত হয়ে তা সারি সারি বাইশটি মুখ দিয়ে ধারায় ধারায় বয়ে যাচ্ছে ঝরঝর করে। আধারের জলে রং-বেরং-এর মাছ। এরই আর এক পাশে 'বুড়া নীলকণ্ঠ'। জলের ওপর অনন্তশয়নে শায়িত বিষ্ণুমূর্তি। কালো পাথরের ওপর খোদাই করে তৈরী সে মূর্তি।

নেপালের সবচাইতে বড় যে বৌদ্ধস্তূপ তা হল 'বোধনাথ'। এখানকার যিনি ধর্মগুরু, তিনি হলেন 'চিনাইলামা'। দালাই-লামার প্রতিনিধি ইনি। এককালে তিব্বত, সিকিম ও ভুটান থেকে দলে দলে বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীরা আসতেন এখানে। এখনও আসে। কিন্তু তিব্বত থেকে নয়। এখন তিব্বত থেকে যারা এসে আছে, তারা উদ্বাস্তু।

নেপালে আছেন 'দক্ষিণকালী'। আরও আছে বহু ছোটখাট মন্দির নেপালের এখানে ওখানে ছড়ানো। ছোট মন্দিরগুলি পর্যন্ত কারুশিল্পময়।

নেপাল যেন মন্দির-তীর্থের পীঠভূমি। তারই জন্যে যেন সাধনা করে আসছে নেপালীরা যুগ যুগ ধরে। তাই গড়ে উঠেছে এমন শিল্প-সম্পদ—শিল্পকলার এমন চাতুর্য আর ঐশ্বর্য!

নেপাল যেন সেই আপন গর্বে আপনিই বিভোর!

(বাইশ)
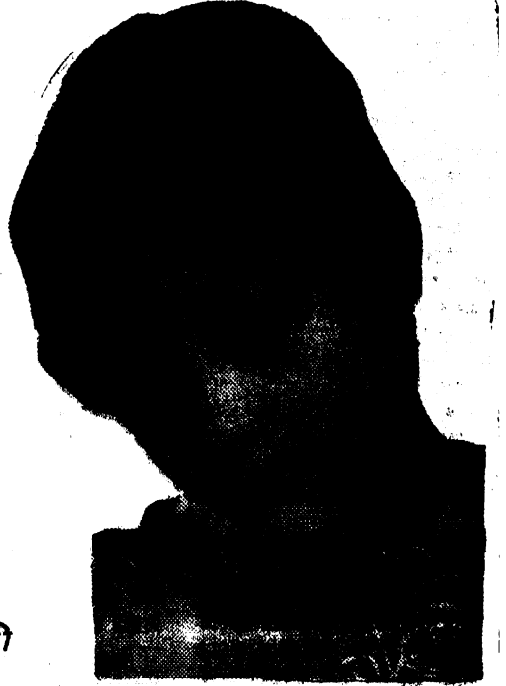
অবশেষে স্মৃতিপরিক্রমার শেষ অধ্যায়ে এসে পৌঁছলাম। এ-ও এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা বইকি। কোনোদিন এধরনের স্মৃতিচারণে ব্রতী হবার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। কারণ প্রথমেই বলেছি 'জীবনী' লেখার মত বৃহৎ জীবনের অধিকারী বলে আমি নিজেকে কোনোদিন মনে করি না। জীবনী লেখা তাদেরই সাজে যাঁদের আলোকস্তম্ভের মত জীবন অপরকে অল্প-বিস্তর পথের দিশা দিতে পারে। আমার সে সম্বল কই? তাই অনেকেরই অনুরোধ, অনুনয়কে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে। 'অমৃত'র তরফ থেকে যখন তাগিদ এল তখনও যে মনের মধ্যে দ্বিধা ছিল না তা নয়। তবু রাজী না হয়ে উপায় ছিল না—যখন জানলাম এ ইচ্ছেটা এমন একজন মানুষ প্রকাশ করেছেন যাঁকে ফেরাবার সাধ্য আমার নেই। চিরদিন কন্যার মত স্নেহ পেয়ে এসেছি যে তুষারবাবুর কাছে তাঁর স্নেহের দাবীর প্রীতি সম্মান জানাবার জন্যই অত্যন্ত সঙ্কোচ-ভরে এ কাজ শুরু করেছিলাম।—আর এ দায়িত্বের গুরুত্ব সম্বন্ধে যথাসম্ভব সচেতন থাকবার চেষ্টাও করেছি।

চেতনার শুরু থেকে জীবনের প্রতিটি পরিচ্ছেদ, অনুভূতির প্রতিটি মোড়-ঘোরাকে দেখেছি পুণ্যার্থী তীর্থপরিক্রমীর সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাভরা দৃষ্টি নিয়ে; পুণ্যার্থী বলছি এইকারণে, কোনো মানুষের জীবনই শুধু আপনাকে নিয়েই সম্পূর্ণ হতে পারে না। চারপাশের পরিবেশ, দৃশ্য, জনপদ, মানুষ, বিভিন্ন মানুষের জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গীর অভিজ্ঞতা থেকে তিল তিল করে বৈচিত্র্য-সম্ভার আহরণ করেই গড়ে ওঠে আমাদের জীবন ও ব্যক্তিত্ব। আপন লক্ষ্যে পৌঁছবার পরও যদি তীর্থপরিক্রমার মতই ফেলে-আসা সুদীর্ঘ জীবনপথের স্মৃতিচারণা করা যায় তখন—সেই অনুভবের জ্বলে ওঠা আলোতেই দেখতে পাই এমন অনেক কিছু যা আগে দেখা হয়ে ওঠেনি হয়ত, বা এগিয়ে চলার দুর্বার আবেগের প্রসাদেই চেনা যায় এমন অনেক সত্যকে, যে চেনা সম্ভব হোতো না গম্ভীরতাবোধে স্থিতধী না হলে।

তাই বলছিলাম স্মৃতিরেখার এই পথ বেয়ে অতীতচারণ করতে করতেই যেন তীর্থ-যাত্রার আনন্দ ও শুচিতার পুণ্যস্পর্শে ধন্য হলাম। নূতন করে জানলাম জীবন ও জীবনদর্শনকে। আর প্রণাম জানাবার অবকাশ পেলাম তাদের যাঁদের অবদানে জীবনপাত্র ভরে উঠেছে। হয়ত সবকথা গুছিয়ে বলতে পারিনি, অতি-নিকটত্বের কারণে অতি আপনজনও অনেকসময় দৃষ্টির পরিধির বাইরেই থেকে গেছেন, এমন কোনো অপরাধ ঘটাও বিচিত্র নয়। তবু আমি এই আশাই রাখব, আমার এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিকে কেউ অকৃতজ্ঞ মনের ঔদ্ধত্য ভেবে আমার প্রতি অবিচার করবেন না।

আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনকাহি[নী] শুরু হবার পর থেকে বহু পাঠকের চি[ঠি] টেলিফোন, বন্ধুজনের অভিনন্দন আমায় ম[ন] খুলে কথা বলবার প্রেরণা যুগিয়েছে[।] সকলের দরদী দৃষ্টির স্নিগ্ধ ছায়ায়, ক্ষম[া]-সুন্দর চিত্তের অভয় আশ্বাসে বেরিয়ে এসে[ছে] মনের অনেক গোপন বিদ্রোহ, অন্তরগহ[ন]-অভিমানী বেদনা। একবারও মনে হয়[নি] অগণিত অপরিচিত পাঠকপাঠিকার কা[ছে] জীবনের কথা বলতে এসেছি। এই কমা[স] সহৃদয় পাঠকের সঙ্গে স্নেহবন্ধনে যেন ভা[রি] সুন্দর একটা সংসার গড়ে উঠেছে, যা[র] গোড়াপত্তন ছিল আমাদের পারস্পরি[ক] শ্রদ্ধাভরা বোঝাপড়া।

আজ আর বলতে দ্বিধা নেই, প্রতি মুহূর্তেই একটি ছবি ভাসত আমার চোখে[র] সামনে। আমি যেন ঝড়ের রাতে ছোট্ট একটি নৌকো বেয়ে সমুদ্রের বুকের ঝঞ্ঝা-তুফা[ন] অতিক্রম করে ছুটে আসছি বালুক[া]-বিস্তৃত সমুদ্রবেলার দিকে। মাঝে মাঝে আলোর রেখার মত তটভূমির আভাস জে[গে] উঠছে। আবার পাহাড়-প্রমাণ ঢেউ-এ[র] আঘাতে মিলিয়ে যাচ্ছে কোন অতলে[।] কিন্তু দুরন্ত ইচ্ছাশক্তির তাড়নায় [...] অচৈতন্য-ভাব কাটিয়ে আবার ভেসে উঠ[ি]

সেই ঢেউ-এর চূড়ায়,—দেখছি সেই আলো-ত যেন আমায় ডাকছে।

অবশেষে একসময় এসে পৌঁছলাম। জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। নীল চন্দ্রাতপের তলায় অগণিত মানুষের ভীড়। তাঁদের দিকে এগোতে এগোতে মনে হোলো সবাই যেন আমার পরমাত্মীয়,—উদ্বিগ্ন-চিত্তে আমারই প্রতীক্ষায় বসে। আমায় দেখে সবাই ছুটে এলেন। কেউ আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন সিক্ত চুল। কেউ বা ক্ষতবিক্ষত অঙ্গে প্রলেপ লাগিয়ে দিলেন। সকলেরই চোখে ফুটে উঠল সাগ্রহ জিজ্ঞাসা—তুফানভরা সাগর পেরিয়ে কেমন করে তাঁদের কাছে পৌঁছতে পারলাম? শুধু কি তারাই? টোকলামাথায় দুষ্টু মেঘের সাথে লুকোচুরি খেলতে খেলতে চাঁদও যেন স্থির হয়ে দাঁড়ালো। ঝিকঝিকে ফুলের মত তারারা পাপড়ি মেলে ফুটে উঠলো। কানে আসছে তটের বুকে সমুদ্রের অশ্রান্ত আছড়ে-পড়ার মিলন বোল। এ কল্লোলধ্বনি উচ্ছল, তা মানি, কিন্তু কান পেতে শুনলেই যেন অনুভব করা যায় যে সমুদ্রের এই অঝোরধ্বনি ছলকায় তার জলগর্ভের এক অতল নীরবতার উৎস থেকে।

একনিমেষে জনতা হয়ে উঠল মিলন-মেলা। এ যেন আমার অগণিত পাঠকের সঙ্গে বোঝাপড়ার মিলনোৎসব। কত রকমের মানুষ এই মেলায়। কিন্তু তাঁদের স্নেহ ও সহানুভূতির আনুকূল্যেই জীবনের সকল স্ববিরোধ যেন গলে ডুবে মজে গেছে অতল সিন্ধুমৌনে। সকলের দৃষ্টি থেকে যেন ঝরে পড়ছে একটি সুরের আভাস যা শান্ত রসাস্পদ আর যার মধ্যে আছে সামন্তোত্রের উদাত্ত শান্তি। এ দৃষ্টি শিশুর চঞ্চল, নিষ্কলুষ চাউনীর চেয়েও শুভ্র, রোগশয্যায় পীড়িত সন্তানের দেহপ্রহরী মায়ের অভয়দৃষ্টির চেয়েও করুণাভরা। ভাবের জোয়ারে এই আনুকূল্যের ঢেউয়েই বুঝি বেজেছে চাপা সুখের ছন্দ, গূঢ় তৃপ্তির তান। এই করুণাভরা দৃষ্টির আলোই পুনঃ আমার অন্তরে লুকোনো অদেখা জগৎকে আমার কাছে উদ্ভাসিত করে তুলল।

জীবনে এইখানেই যত সত্যকার অন্ত-রঙ্গতা—এই বেদনার অন্তঃপুরে।

কিন্তু জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই নীলাকাশের তাঁবুর তলার এই মিলন-মেলাতেও ঠিক দলাদলি না হোক ছাড়াছাড়ির দুটো সুরবৈষম্য কি মাঝে মাঝে ধ্বনিত হয়নি আর? একটা সংসারের মধ্যেও যেন আর একটি সংসার। আর এই দুটি সংসারের রান্না আলাদা নয় বটে,—কিন্তু কান্না আলাদা।

আমার স্বীকৃতিতে ভান নেই, আমার জীবনস্পন্দ এ কাহিনীতে অন্তরস্পর্শী রূপ নিয়েছে, আমার নিঃসংকোচ নির্ভরতা সবাইকে আনন্দ দিয়েছে একথা যেমন শুনেছি, শুনেছি তার উল্টোটাও।

যেমন আমি অনেকের সম্বন্ধে এমন কথা বলেছি যা না বললেও পারতাম, এমন জায়গায় পর্দা তুলে ধরেছি যা অন্তরালে থাকাই বাঞ্ছনীয় ছিল। আবার কোনো বন্ধুকে এমন মন্তব্যেরও সম্মুখীন হতে হয়েছে যে আমি নিজের ছবি যতটা ভাল

করে এ'কেছি অত 'ভাল'-আমি নই। এর অনেকটাই আমার ভান।

প্রথম অভিযোগের উত্তরে এই কথাই বলব, আমি শুধু অভিনয় অথবা সঙ্গীত-শিল্পের সঙ্গেই জড়িত নই, প্রযোজনা, পরিচালনা, বিচারকমণ্ডলী, ওয়েলফেয়ার বোর্ড তথা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির প্রতিটি বিভাগের সঙ্গেই আমি যুক্ত—এবং দীর্ঘকাল ধরেই সংশ্লিষ্ট। যখন নীরব ছিলাম,—নীরবই ছিলাম। কিন্তু বলার দায়িত্বে যখন স্বীকৃতির স্বাক্ষর দিয়েছি তখন সত্যকথনের তাগিদে কিছুটা নির্মম না হয়ে উপায় ছিল না। কারণ আমার এ বিবৃতি শুধু সৌখীন চিত্তবিনোদনের বা অবসরবিনোদনের আমোদপ্রমোদের কোনো বস্তুও নয়। মরণ পণ করে যে জীবনে সংগ্রাম করতে চেয়েছি কোনটা পেয়েছি তা আমার বিচার্য নয়, যদিও আনন্দটাই আমার। তাকে নিয়ে আর যাই হোক ছেলেখেলা করা যায় না। এ নিয়ে কেউ যদি ব্যথা পেয়ে থাকেন, দুঃখিত হলেও আমি নিরুপায়।

সত্য সামনে এসে যখন দাঁড়াবে, বাধা পেলেই বা চলবে কেন? সত্য যে আসলে ডাকাত। যখন এসে বলে দাও আমার খাজনা, তখন উটপাখির মত মিথ্যার বালুতে মুখ লুকোলেই সে তো আর অদৃশ্য হবে না? কোনো কিছুতে সত্যনিষ্ঠ হব এ অঙ্গীকারের মানে কি এই নয় যে সত্য বলে যাকে বুঝব তাতে বাধা পেলে সেই বাধাকেই দেব বিদায়? আলো ও অন্ধকার পাশাপাশি থাকতে পারে কিন্তু সত্যকে যদি বলি এসো, তাহলে তার পাশাপাশি বাধা পেলেও মিথ্যাকে বলতেই হয় যাও। নইলে সত্যকে মর্যাদা কোথায়?

দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তরে অতিবিনয় অথবা ঔদ্ধত্য কোনোটাকেই প্রশ্রয় না দিয়েও সাধারণভাবেই বলা যায়, মানুষকে অনেক-সময় ইচ্ছের বিরুদ্ধে অনেক অরুচিকর পরিবেশের মধ্যে পড়তে হয়, যার ওপর তার কোনো হাত থাকে না এবং সেজন্য তাকে দোষীও করা যায় না। কিন্তু সচেতনভাবে কদর্য আবেষ্টনীর সঙ্গে আপনাকে সংশ্লিষ্ট করাটা অবশ্যই অমার্জনীয় অপরাধ। জীবনের ক্ষেত্রেও তাই। যে জীবন পড়ে পাওয়া তার অনিবার্য পরিচয়ের দায়দায়িত্ব আমার নয়। কিন্তু এই পড়ে পাওয়া জীবনকে অতিক্রম করে যে জীবন ও জগৎ আমি রচনা করেছি আমার সারাজীবনের ভাবভাবনা, চিন্তাকল্পনা, একাগ্রতা ও অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠা দিয়ে, গর্ব করে নয় সবিনয়েই জানাচ্ছি, আমার সে সৃষ্টি এতবড়ই হোক, আর এতটুকুই হোক তার মধ্যে কোনো খাদ নেই। আমার সারাজীবনের এত সাধের সৃষ্টি সম্বন্ধে এতটুকু বিদ্রূপের আঘাতও আমি সইব না। এ বিষয়ে আমি স্পর্শকাতরই শুধু নই—এ হোলো আমার সারাজীবনের চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জে যদি কোনো গলদ থাকত আজ সকলের স্নেহসিক্ত হয়ে এমন মন খুলে এত কথা বলতে পারতাম না! আর যদি তা মিথ্যার বেসাতি বা আবাদে গলদ হোতো আপনারাও এত ধৈর্যসহকারে এতদিন ধরে তা সহ্য করতেন না। কারণ যা মিথ্যা তা আপন স্বভাবধর্মেই ভেঙে যায়, মনের গভীরে কোনো স্থায়ী রেখাপাত করতে পারে না।

এই অবকাশেই বলতে চাই কতকগুলো চিন্তাকর কথা সম্বন্ধে আমার ধারণা। যেমন চরিত্র একটি মস্তবড় কথা এবং তার চেয়েও অনেক বড় এর ব্যঞ্জনা ও ওজন। নরনারীর অসামাজিক মিলনমাত্রকেই চরিত্রের অধঃপতন বলা যায় না, একথা সত্য। কিন্তু তাই বলে একথাও আমি বলব না, যে অবাধ দেহউপভোগেও চরিত্র বজায় থাকে। না, তা থাকে না, থাকতে পারে না। কিন্তু এ সবের বাইরেও মানুষের চরিত্র-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবার একটা দায়দায়িত্ব নিশ্চয় আছে এবং সে দায় মনুষ্যত্বের দায়। জীবনে কোনোরকম দেহবিলাস না করেও মানুষ চরিত্রহীন হতে পারে। অনেকসময় খ্যাতিমান মানুষের চেয়েও অখ্যাত, অজ্ঞাত লোকের মধ্যেও চরিত্রের বিকাশ দেখা দেয়। চরিত্র মানে সকল দোষত্রুটি, দুর্বলতা, মহত্ত্ব নিয়ে একটা পরিপূর্ণ মানুষ। কতসময় দেখেছি, কোনো একটা বিশেষ দিকে বড় হতে গিয়ে অন্যান্য দিকে মানুষ এত ছোটো হয়ে যায় যে তাকে তখন ঠিক মনুষ্য-পদবাচ্য বলে ধরা যায় না। যেসব কথা যথাযথভাবে তুলে ধরা যায় না বলেই হয়ত বাংলাভাষায়—জীবনচরিতের চেয়ে 'চরিতামৃতের' প্রাধান্যই বেশী—যেখানে জীবন্ত মানুষের চেয়ে ভক্তের গুণকীর্তনের মুখরতাই জুড়ে থাকে অনেকটা জায়গা।

'জীবনী' লেখার যোগ্য জীবন অ নয়। কিন্তু লিখতেই যদি হয় আমার স সম্পূর্ণতা, অসম্পূর্ণতা মেশানো পুরো আমাকেই বা মেলে ধরব না কেন? বলতে দ্বিধা করব আমার অযোগ পরিমাপকে অগ্রাহ্য করেও চিরকাল কিছুর স্বপ্নই দেখেছি, গভীরের পিপ বহন করেছি?

যতটুকু সার্থক হয়েছি তার সকলের অবদানের কাছেই আমি নতশি যা হয়নি তার জন্য কোনো ক্ষোভ নেই। ক্ষতিপূরণস্বরূপ এইটুকু সান্ত্বনাই থ যে কোনো সতকর্তার প্রলোভনের য আমার আপনাকে হারিয়ে ফেলিনি।

এই প্রসঙ্গেই বলি আর এ কথা। কেউ কেউ আমার স্মৃতি পড়তে গিয়ে হতাশ হয়েছেন এ কই ইসাডোরা ডানকান অথবা চ চ্যাপলিনের মত হোলো না? বে চাঞ্চল্যকর উত্তেজক বস্তুর অভাবই ত বেশ কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেছে।

বিদগ্ধ রসিকের এহেন প্রত্যাশা আ হতাশই শুধু নয় বিস্মিতও ক আমার সারাজীবনের অভিজ্ঞতাপ্র জীবনদর্শন, জীবনকে অধ্যয়ন ও অ চিন্তা, ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির ছাঁচেই এ একজনের বক্তব্য অপরের কাবনকী অপরের জীবনের প্রতিধ্বনি হতে কেমন করে? যদি হয় তবে সেই চেষ্ আকর্ষণসৃষ্টিতে একটা কৃত্রিমতা এসে না কি?

এছাড়াও একটি সহজ সত্য কেন এ দৃষ্টি এড়িয়ে গেল যে প্রাচ্যদেশের শিল্প পাশ্চাত্যের শিল্পীর ধ্যানধারণা, স্বপ্ন আদর্শে একটা প্রকৃতিগত বৈষম্য থাকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাতেই বোঝা যায় দেশের মানুষের জীবনকে দেখবার কত আলাদা।

বহুদিন আগে কবিগুরুর শতবর্ষপ উৎসব উপলক্ষ্যেই এক পত্রিকায় কোনো অধ্যাপকের একটি রচনা মনকে বড় করেছিল। হ্যামলেট ও কর্ণের তুলনায় আলোচনায় তিনি সুন্দরভাবে দেখিয়েছি জননীর চিত্তচাঞ্চল্যের প্রতি দুই দে দুই সন্তানের দৃষ্টিপাতের তফাৎটা। নাটকীয় মুহূর্তে হ্যামলেট পিতার হত্যা খুল্লতাতের সঙ্গে বিবাহিত মাতার দুই ধিক্কার দিয়ে তাঁকে তীব্র ভর্ৎসনা বলছেন

'You are your husband's broth wife.'

আর কর্ণ? সারাজীবন মাতৃস্নেহে ব থাকার দুঃখ, বেদনা, অপমানের সীমা যন্ত্রণা—তাঁর কঠিন সংযমের শা সংহত। শান্ত, গৌরব অভিমান যেন দুঃ অশ্রুধারার মত ঝরে পড়ল একটি ব 'তুমি কুন্তী? অর্জুনজননী?'—

একজন অন্তরের ফেটে-পড়া ক্ষো আত্মজ জননীকে যেন অপরের অন্য কঠোর দণ্ড দিতে উন্মুখ, আর একজ

ডাক্তারবাবু, আপনি ঠিকই বলেছিলেন— আজকাল বাড়ীর সকলেরই কত স্ফূর্তি, কত প্রাণ...

অন্তরের কাতরতা ধ্বনিত তার কান্নাভেজা অনুযোগে—

> 'মাতৃস্নেহ কেন সেই দেবতার ধন
> আপন সন্তান হ'তে করিলে হরণ,
> সে কথার দিও না উত্তর।"

আপন সন্তান যখন অপরিচিতের মত মাকে বলে 'তুমি অর্জুনজননী'—তার চেয়ে বড় শাস্তি আর মার পক্ষে কি হতে পারে? এখানে মাতৃস্নেহ পাওয়ার তৃষ্ণা, পেয়েও হারানোর বেদনা,—সবই আছে। কিন্তু অত্যুজ্জ্বল ক্ষাত্রধর্মের তেজোবিভূষিত বলেই তার মহিমা এমন উজ্জ্বল। মার প্রতি কর্ণের অভিমানের অন্ত নেই। কিন্তু মুহূর্তের জন্যও আত্মবিস্মৃত হয়ে তাঁর এতটুকু অসম্মান করেননি। বিদ্রোহ ও প্রত্যাখ্যানের কঠোরতাও যেন অভিমানে কোমল—

> 'যে ফিরালো মাতৃ স্নেহপাশ
> তাহারে দিতেছ মাতঃ রাজ্যের আশ্বাস?'

তারপর সকল প্রখরতা, দর্জয় অভিমান যেন স্তব্ধ বিষন্নতায় রূপান্তরিত ঃ

> 'জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডবসন্তান
> আমি রব নিস্ফলের—হতাশের দলে।'

জন্মরাত্রে জননীর কাছ থেকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যাত হবার বেদনা ভুলতে পারেননি আত্মসম্মানী বীর, যদিও স্নেহবুভুক্ষু পুত্রের রিক্ত অন্তর চিরঅশ্রুমুখী। এই ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযম বিনয় ও ওজস্ কি কোনো পাশ্চাত্য কবির কল্পনায় সম্ভব? কি করে তা হতে পারে? জীবনের কাছে ওদের চাওয়ার ধরন যে সম্পূর্ণ আলাদা।

এই প্রসঙ্গে দিলীপদারই সম্প্রতিকালের বইয়ে পড়া একটি ঘটনা উল্লেখের লোভ সামলাতে পারছি না। খুব সম্ভব আমেরিকা ভ্রমণকালেই একটি হোটেলে থাকাকালে পাশের ঘরে পিতাপুত্রের যে সংলাপ তাঁর কানে এসেছিলো সেইটুকুই পাশ্চাত্য জীবনধারাকে প্রত্যক্ষ করবার পক্ষে যথেষ্ট। গভীররাতে নর্মসহচরীকে সঙ্গে নিয়ে জনৈক মার্কিন তরুণের হোটেলে ফিরে পিতার দরজায় করাঘাত ঃ

'বাবা দরজা খোলো শীগ্গির।'

'অসম্ভব, এখন কি দরজা খোলা যায়?'—পিতার উত্তর।

'কিন্তু, সঙ্গে যে আমার গার্লফ্রেন্ড।'—'ভেতরে আমার সঙ্গেও একটি আছেন বসে—এমতাবস্থায় তোমায় দরজা খুলি কি করে?'

ওদেশে পিতাপুত্রের মধ্যে এহেন কথোপকথন কি এদেশে কোনো পিতা অথবা পুত্র ভাবতে পারেন? না, স্ত্রী-পুরুষের এহেন মিলন স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে নির্বিকার চিত্তে মেনে নেওয়া হয়?

প্রেমের কাছে, জীবনের কাছে ওরা চায় কি? শান্তি? স্থায়িত্ব? স্নিগ্ধদ্যুতি? না তো! চায় বিদ্যুজ্জ্বালা, গর্জন, বর্ষণ, উচ্ছ্বাস, বর্ণবৈভব সর্বোপরি অফুরাণ বৈচিত্র্য। নিজেদের ওরা ভুলেও গুটিয়ে নেয় না, সংবরণ করতে জানে না। তাই ভেতরের দিকে চায় না, কেবলই হাত পাতে বাইরের কাছে। তাই ত বিজ্ঞান, ভ্রমণ, দেশাবিষ্কার, যানবাহনের গতিবৃদ্ধি এসবে ওরা আশ্চর্য সাফল্যলাভ করেছে। কিন্তু প্রেম, ত্যাগ, ধ্যান—তথা অন্তর্মুখী সাধনায় আজও কি এরা শিশু নয়? জীবনের কাছে আমরা যে চাই একেবারেই আলাদা বর।

তাই বলছিলাম ইসাডোরা ডানকানের জীবনের চাওয়া এবং আমার জীবনের চাওয়া যে বয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে। একের জীবনতৃষ্ণা ঠিক অন্যের মত হতে পারে কেমন করে?

আর চমক, উত্তেজনা, হৃদয়াবেগের নাটকীয় ওঠাপড়ার উপকরণ যোগানোর জন্য ত রয়েছে সহস্র আধুনিক উপন্যাস, বোম্বে ফিল্ম আরো কত কিছুই। তার জন্য এখানেই বা এত অধীরতা কিসের?

আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলছি জীবনের কাছে আমি চেয়েছি মধুর শান্তিনিলয়, স্বপ্নভরা আরামকুঞ্জ উদার আকাশ। লক্ষ্যহীন, সাথীহীন গতি আমায় ত্রস্ত করে। বিষন্নতায় মন ভরিয়ে দেয়।

সকল ক্ষুদ্রতাকে উত্তরণের যে স্বপ্ন জীবন ভোর দেখেছি আমি চেয়েছি শুধু তারই একটু আভাস দিতে। কারণ তার বেশী কিছু দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

জীবনে পরীক্ষা বড় কম দিতে হয় নি। কিন্তু মহাসঙ্কট লগ্নেও উদ্বিগ্ন হলেও চঞ্চল যে হই নি তার কারণ বোধ হয় জ্ঞান হওয়ার আগেই দীক্ষা পাবার আশ্চর্য যোগাযোগ (এ সিরিজের আগের এক সংখ্যায় সে কাহিনী বলেছি)। খুব ছেলেবেলায় খেলাঘরের সংসারেই ছোট্ট হাঁড়ির মধ্যে পেয়েছিলাম আই[illegible] খোদাই-করা গোপালের ছোট্ট একটি [illegible] হঠাৎ পাওয়া সেই ছোট্ট মূর্তিটিই উঠেছিল আমার ধ্যান, জ্ঞান, জপমন্ত্র। পর থেকে একটি দিন, একটি মু[illegible] আমার সঙ্গে গোপালের ছাড়াছাড়ি হ[illegible] সেই মূর্তি থাকে আমার লকেটে।

বাড়ীতে মন্দির তৈরী করে গো[illegible] প্রতিষ্ঠার জন্য বিগ্রহের খোঁজে নামাম দোকানে। দেখলাম অজস্র [illegible] জয়পুরের, রাজস্থানের, নানা জায়গার কত রকমের। কিন্তু কোনটাই আর লাগে না। সবাই যেন অবাঙ্গালী, হু[illegible] পরিণত চেহারার মূর্তি। কোথায় যশোদানের শ্যামলিমা-মাখানো [illegible] মায়ের আদরের ননীচোরা? যে কোমল, রহস্যে গম্ভীর, কৌতুকে সদা[illegible] ফিরেই আসছিলাম। হঠাৎ ওপরের অযত্নে-রাখা অনেকগুলি মূর্তি[illegible] একটি মূর্তি চোখে পড়ল। আস্তরণে প্রায় সবটাই ঢাকা। তবু মধ্যে দুটি ডাগর চোখের চাউ[illegible] আমায় প্রবল বেগে আকর্ষণ দোকানীকে বললাম, 'নামান ঐ মূর্তি[illegible] ত অবাক। সেরা সেরা মূর্তি পছন্দ আর পছন্দ হবে ঐ ধুলোয়-ঢাকা, এব[illegible] সরিয়ে রাখা নিরেস বিগ্রহ?

যাই হোক মূর্তিটি নামান হল। ঝাড়মোছ করতেই ধুলোর মধ্যে থেকে ঢেউ তুলে বেরিয়ে এলেন আলোর দ[illegible] আমার সেই ছোট্ট, আদরের গোপাল।

বাড়ীতে এনেও কিন্তু তাকে রাখতে পারি নি। রেখেছি আমার ঘরে। যাতে চলতে, ফিরতে, উঠতে, ওকে দেখতে পাই।

সেই খেলাঘরের সংসার থেকে গোপাল আজ এই বৃহৎ সংসারের [illegible] কেন্দ্র হয়ে সকল দুঃখ, ঝঞ্ঝা, সাগর অনায়াসেই পার করে দিচ্ছেন অন্তহীন ভালবাসাকে অনুভব কা[illegible] ঘরে, বাইরে সকলের ভালবাসায়। মানুষের স্নেহে, সম্মানে, আদরে, অ[illegible] যখনই কারো শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় ম[illegible] ওঠে। মনে হয় গোপাল আমার ওপর খুশি আছেন। তাঁর ভালবাসা, স্পর্শই রয়েছে এই সম্মানপ্রাপ্তিতে কোথাও ব্যথা পাই মনে হয় নিশ্চয় গোপালের কাছে কোন অপরাধ তাই সে রাগ করে আমায় দুঃখ জীবনের প্রতিটি কর্মময় মুহূর্ত অ[illegible] পূজার এক একটি লগ্ন। আমার দিনের প্রতি মুহূর্তের এই পূজোয় সবার প্রতিই থাকে আমার প্রণাম. আশীর্বাদে, ভালবাসায়, স্নেহাদ[illegible] আজ এই আমি হয়েছি। তাই 'রহিল মোর তাঁহাদের সবারে প্রণাম'—ক[illegible] এই চরণটি উচ্চারণ করেই আমার ব[illegible] সমাপ্তি টানলাম। অনুলিখন—[illegible]

(শেষ)

।। বারো ।।

দশটা বাজবার একটু পরে হিরু বাড়ি ফিরল। দরজায় শব্দ শুনেই মনোরমা বুঝতে পারল। কলকাতার এই বাসায় নেহাৎ কম দিন হল না। কত বছর কেটে গেল। এই আড়াইখানা ঘর, দেওয়াল আর ছাদ, এখানে সেখানে পেন্সিলের দাগ, চটা-ওঠা মেজে, জানালা দিয়ে ভেসে আসা সকালের রোদ্দুর, রাত্তিরে এক চিলতে জ্যোৎস্নার আলো। নিজের হাতে গড়া এই ছোট্ট জগৎটুকু বারম্বার দেখা করতলের একটি রেখার মত তার খুব চেনা আর পরিচিত।

দরজায় কড়া বেজে উঠতেই মনোরমা দাঁড়াল। নিশ্চয় হিরু এসেছে। ছেলে-মেয়ে, বাণীব্রত, বাড়ির ঠিকে-ঝি এমন কি বাসন-ওয়ালী মেয়েটা পর্যন্ত কেমন করে কড়া নাড়ে, মনোরমা নির্ভুল বলে দিতে পারে। প্রত্যেকটি ধ্বনিই আলাদা,—পৃথক সুর। দুটি মানুষের মুখের আদলের মত ভিন্ন।

এতক্ষণ রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়ির সামনে চুপ করে বসেছিল মনোরমা। বাণীব্রতর শরীর ভালো নয়,—তার বেশী রাত্তির করা চলে না। ডাক্তারের বারণ। সন্ধ্যের পরই খাওয়াদাওয়া সেরে নিতে বলেছে। মনোরমারও বয়স বাড়ছে। ইদানীং তার দেহটাও ভালো যাচ্ছে না। কদিন ধরে ঘাড়ের কাছে কেমন একটা যন্ত্রণা। সন্ধ্যের পর মাথাটা ভারী লাগে। তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়ার পাট চুকলে মনোরমা একটু বিশ্রাম পায়। হিরু ঘরে থাকলে সে এতক্ষণ হেঁসেল তুলে দিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ত।

দরজা খুলতেই হিরু নিঃশব্দে ঘরের ভিতর ঢুকল। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মনোরমা একটু চিন্তিত হল। হিরু অমন হাঁপাচ্ছে কেন? উস্কোখুস্কো চুল,...... অস্থির ভাবভঙ্গি, মনের মধ্যে কোথায় যেন চিন্তার ঝড় বইছে, তাইতেই মুখখানা এত গম্ভীর নাকি? আর আশ্চর্য! নভেম্বরের এই অল্পস্বল্প শীতে হিরুর কপালে, চিবুকের উপর ছোট ছোট স্বেদবিন্দু কেন দেখা দিয়েছে?

মাকে দেখে হিরু ম্লান হাসল। একটু লজ্জিতভাবে বলল,—'আমার জন্য খুব ভাবছিলে, তাই না মা?'

ছেলের ক্লান্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে মনোরমার মায়া হল। সে নরম গলায় বলল, —'ভাবনা হয় বৈকি বাবা। কি রকম দিন-কাল পড়েছে দেখছিস তো। এই রাত্তির-বেলায় তুই কাউকে কিছু না বলে হুট করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলি। আর আমরা ঘরে হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারি? তোর বাবাকে নিশ্চয় জানিস? কি রকম ব্যস্ত মানুষ। আর একটু দেরি করলেই মিলু আর কিরণকে তোর খোঁজে বেরোতে হত।'

হিরু কোনো জবাব দিল না। তার বুকটা ঘন ঘন ওঠানামা করছিল। সে একপাশে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে লাগল।

মনোরমা ফের শুধোল,—'কিন্তু তুই অমন হাঁপাচ্ছিস কেন হিরু? এত রাত্তিরে কোথায় গিয়েছিলি?'

মায়ের প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে হিরু দম বন্ধ করে একটা লাঠির মত সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর ব্যাপারটা একটু সহজ করবার চেষ্টা করে বলল,—'ও কিছু নয় মা। অনেক রাত্তির হয়ে গেল কিনা। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছিলাম। বোধহয় একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাই অমন মনে হচ্ছে।'

কিন্তু ছেলের কথায় মনোরমা ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারল না। তার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ দানা বাঁধছিল। হিরু কি তাকে সত্যি কথা বলছে? তাড়াতাড়ি হেঁটে এলে মানুষ অমন করে হাঁপায় নাকি? তাও হিরুর মত একটা অল্পবয়সী ছেলে।

হঠাৎ বছর দুই আগের আর এক রাত্তিরের কথা মনে পড়ল তার। স্কুলের দু-তিনজন বন্ধুর সঙ্গে হিরু যেন কোন মাঠে খেলা দেখতে গিয়েছিল। সন্ধ্যে হতে চলল, তবু ছেলে বাড়ি ফিরল না দেখে মনোরমা ভেবে অস্থির। এত রাত্তির সে কোনোদিন করে না। তাহলে ছেলেটা গেল কোথায়? পথে কোনো বিপদ আপদ হয়নি তো? একটা অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কায় মনোরমার বুকের ভিতরটা দুরু দুরু কেঁপে উঠল।

ঠিক সাতটা নাগাদ হিরু বাড়ি ফিরল। তখনও সে বেশ হাঁপাচ্ছে। তার ছোট্ট বুকটা দ্রুততালে কেবলি ওঠানামা করছিল।

মনোরমা ব্যগ্র হয়ে শুধোল,—'কিরে, অমন হাঁপাচ্ছিস কেন?'

—'পুলিশে তাড়া করেছিল মা—

—'পুলিশ?' হিরুর কথা শুনে ভয়ে মনোরমার মুখ শুকিয়ে এল।

—'হ্যাঁ মা।' হিরু তার আঁচলে মুখটা মুছে বলল, 'খেলা শেষ হবার আগেই দু' দল ছেলেতে প্রচণ্ড মারামারি। শেষে পুলিশের গাড়ি এসে হাজির। ওরা লাঠি নিয়ে তাড়া করতেই সব ভো—ভোঁ। কে কোন দিকে পালাল তার ঠিক নেই। আমরা দু-তিনজন বন্ধু মিলে একসঙ্গে দৌড় দিয়েছি। তিন-চারটে রাস্তা ঘুরে তবে তো বাড়িতে এলাম। নইলে কি আর এত দেরি হত?'

মনোরমার মনের কোণে গর্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা একটা কালো গুবরে পোকার মত সেই সন্দেহটা কেবলি উঁকি দিচ্ছিল। তবে কি হিরু আজও পুলিশের তাড়া খেয়ে বাড়ি ফিরেছে? কিন্তু যা ছেলে তার। কখনও মার কাছে সে কথা স্বীকার করবে?

তবু মনোরমা আর একবার চেষ্টা করল,—'হ্যাঁরে, তুই কোথায় গিয়েছিলি? সে কথা বললি না তো।'

—'একটু কাজ ছিল মা।' হিরু ঈষৎ হাসল। মাকে বলল,—'আচ্ছা, তুমি আমার জন্য এত ব্যস্ত হও কেন বল দিকি?'

—'ওমা! কথা শোনো ছেলের। বাইরে মারামারি, গণ্ডগোল। দুমদাম বোমা ফাটছে। আর তুই এত রাত অব্দি বাইরে থাকলে আমি ব্যস্ত হব না?'

পিছন থেকে বাণীব্রত গম্ভীর গলায় শুধোলেন,—'কিন্তু রাত্তির নটার পর গা ঢাকা দিয়ে তুমি কোথায় বেরিয়েছিলে, সে কথা বললে না তো?'

মনোরমা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বাণীব্রত কখন বিছানা ছেড়ে উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। যা গম্ভীর গলা। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রীতিমত ভয় পেল মনোরমা। বড় কঠিন রাগ মানুষটার। এমনিতে ভালো, দিব্যি শান্ত। সাতে-পাঁচে থাকে না। কদাচিৎ রাগে। কিন্তু একবার ক্ষেপে উঠলে আর রক্ষা নেই। তাকে সামলানো কঠিন। শুকনো খড়ে আগুন লাগলে যা অবস্থা হয়, তেমনি চেহারা। তখন হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়।

—'কই, আমার কথার তুমি উত্তর দিলে না?'

বাণীব্রতর কণ্ঠস্বর আরো তীব্র হয়ে উঠল।

—'বললাম তো, আমার একটু কাজ ছিল।' হিরু মুখ না তুলেই জবাব দিল।

—'কি এমন কাজ ছিল, তাই তোমার কাছে জানতে চাইছি।' বাণীব্রত রীতিমত চড়া গলায় কথা কইলেন।

তবু হিরু কোনো উত্তর দিল না। সে জেদী ঘোড়ার মত ঈষৎ ঘাড় হেলিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল।

বাণীব্রত কয়েক সেকেন্ড ছেলের মুখের উপর চোখ রাখলেন। তারপর বেশ রাগের সঙ্গে বললেন, — 'তোমার ব্যাপারটা কি আমি জানতে চাই হিরু। কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছি, তুমি কেমন অন্যমনস্ক। পড়াশুনোয় আগের মত মন নেই। মাঝে মাঝেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে হঠাৎ কোথায় চলে যাও। কারা যেন তোমাকে ডাকতে আসে, তাদের নাম-ধাম ঠিকানা কিছুই জানাতে চাও না। আজ আমি স্পষ্ট জবাব চাই। তুমি কোথায় যাও, কেন যাও, কাদের সঙ্গে মেলামেশা কর—সব পরিষ্কার বলতে হবে।'

কিন্তু হিরু অটল, দৃঢ়, অনমনীয়। সে ঘাড় শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল। মুখ তুলে একটি কথাও বলল না।

বাণীব্রত নিজেকে আর সংযত করতে পারলেন না। তার মস্তিষ্কের শিরা-উপশিরা বেয়ে কি একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মত বস্তু দ্রুত সমস্ত দেহটাকে নাড়া দিয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাণীব্রত চিৎকার করে উঠলেন,—'কি, আমার কথার তুমি জবাব দেবে না?'

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনোরমার মুখটা ভয়ে শুকিয়ে এল। কি রকম কটমটে দৃষ্টি,...রাগে বাণীব্রত থর-থর করে কাঁপছেন। রোগা মানুষ,...এখনও তেমন ভালো সারে নি। এই তো কদিন আগে কিরণ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে বড় ডাক্তারকে দেখিয়ে এল। সেখানে রক্ত-টক্ত আরো কি সব পরীক্ষা হবার পর এক কাঁড়ি ওষুধ আর নানা রকম পথ্যের ফিরিস্তি দিয়েছে। রাগারাগি করে ফের যদি সেই বুকের ব্যথাটা শুরু হয়। তারপর রাত্তির দুপুরে বাড়াবাড়ি হলে কি উপায় হবে? কিরণ হালে ডাক্তার,—সেদিন মোটে পাশ করেছে। তার সাধ্য কি এই সব বিদঘুটে ব্যামো ঠিকমত ধরতে পারে—।

ছেলেকে মৃদু ভর্ৎসনা করে মনোরমা বলল,—'তুই দিন দিন ভীষণ জেদী হচ্ছিস হিরু। উনি বার বার জিজ্ঞেস করছেন, আর তুই একটা জবাব পর্যন্ত দিলি নে। ছি-ছি! এ কি রকম শিক্ষা পেয়ে তুই—'

চেঁচামেচি, গণ্ডগোল শুনে মি[...] কিরণ দুজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে [...] বিনীত অনেকক্ষণ আগে খেয়ে-দেয়ে [...] পড়েছে। তার চোখে রাত্তির দুপুরের [...] ঘুম। এত কলরব চিৎকারেও সে [...] ভাঙে নি।

বাণীব্রত রাগে, অসন্তোষে থর[...] করে কাঁপছিলেন, তাকে ওই অবস্থায় [...] কিরণ ছুটে এসে বলল,—'বাবা, তুমি [...] হও দিকি। এত উত্তেজিত হচ্ছ [...] তোমার না হাই প্রেসার? ডাক্তার সি[...] খুব চুপচাপ আর বিশ্রামে থাকতে [...] ছেন। আর তুমি এই রাত্তিরে খা[...] দাওয়ার পর চেঁচামেচি শুরু করেছ?'

ছেলের অনুরোধে কিম্বা নি[...] শরীরের অবস্থার কথা চিন্তা করে বাণ[...] একটু শান্ত হলেন। মিলন এগিয়ে [...] তাকে ধরে শোবার ঘরের দিকে নিয়ে [...]

তবু হিরু একটা পাথরের মূর্তির [...] দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। সে নড়ল [...] একটি কথাও বলল না।

মনোরমা আক্ষেপ করে বলল,—[...] আমার কপাল। নইলে হিরুর মত বু[...] ছেলে এমনি আকাট গোঁয়ার হয়? [...] ভালোয় ভালোয় পরীক্ষাটা চুকলে [...] তারপর যা হয় একটা কিছু বিহিত [...] হবে।'

কিরণ কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সে [...] হেসে বলল,—'হিরুকে জিজ্ঞেস করেছ [...] টেস্ট পরীক্ষার জন্যে ও কেমন তৈরী-

হচ্ছে? সেদিন বাবাকে বলছিল যে পরীক্ষা-টরীক্ষা হবে না।—'

—'তুই থাম দিকি।' মনোরমা মেজছেলেকে মৃদু ধমক দিল। 'তোর যত অলক্ষুণে কথা। পরীক্ষা হবে না অমনি বললেই হল? তাহলে স্কুল-কলেজগুলো কি সব উঠে যাবে? ছেলেরা পাশ-টাশ করবে কেমন করে?'

—'সে প্রশ্ন ওকেই করতে পারি।' কিরণ এক মুহূর্ত কি ভাবল, ফের আড়চোখে ছোটভাইয়ের মুখের উপর এক পলক দৃষ্টি বুলিয়ে শুরু করল,—'অবশ্য ওর অন্য কথা বলবে মা। স্কুল-কলেজ, সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান রসাতলে গেলেও ওর কোনো আপত্তি নেই। হিরুর মতে এদেশে যা চলছে, তা একটি পচা অসুস্থ শিক্ষা-ব্যবস্থা। সুতরাং প্রয়োজনে জীর্ণ অট্টালিকাকে যেমন শাবল-গাঁইতির সাহায্যে ভেঙে ফেলতে হয়, তেমনি এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকেও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে দোষ কি?'

—'তুই চুপ কর বাবা।' মনোরমা কিরণকে প্রায় মিনতি করল। মনে মনে বলল—একে মা মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ। এসব কথা কি এখন না আলোচনা করলেই নয়? তারপর রাত-দুপুরে দুই ভাই মিলে চেঁচামেচি, কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবে আর গোটা ফ্ল্যাটের যত লোক এসে ছি-ছি করে যাক।

ঘরের মধ্যে থেকে মিলন বলল,—'ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি সব বক্তৃতা করছিস কিরণ? রাত তো অনেক হল। নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড় না। মিছিমিছি কথা বাড়িয়ে লাভ কি?'

কিরণ ঘরের মধ্যে ঢুকতেই মনোরমা এসে ছেলের হাত ধরল। বলল,—'রাগ-রোষ ছাড় দিকি। এখন হাত-মুখ ধুয়ে খাবি চল। আমাকে আর কত রাত্তির পর্যন্ত রান্নাঘরে আটকে রাখবি বল?'

আশ্চর্য! মনোরমার কণ্ঠস্বরে কি যেন মেশান ছিল। এতক্ষণ বাণীব্রতর চড়া গলা আর ধমক শুনে হিরু একটি কথাও বলে নি। কিন্তু মা এসে ছেলের হাত ধরতেই জিদের অটল পাহাড় নিমেষে বরফের মত গলতে শুরু করল। হিরু ম্লান হেসে শুধোল,—'বড়দা, মেজদা সকলের খাওয়া হয়ে গেছে? তুমি শুধু আমার জন্যে বসে আছ, তাই না মা?'

—'তা হোকগে।' ছেলের মাথায় আর পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে মনোরমা আদর করল। বলল,—'এখন বাড়ী ফিরেছিস। আর দেরী করিস নে বাবা। রাত অনেক হয়েছে। চল, তাড়াতাড়ি মা-বেটা দুজনে খেয়ে নিই গে।'

হিরু বাথরুমের দিকে যেতেই মনোরমা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ওই এক-রোখা ছেলেকে তার বিশ্বাস নেই। যেমন ভীষণ জেদ, তেমনি গোঁ। এখনই মুখের উপর যদি না বলে বসে, তবে তার সাধ্য কি ছেলেকে ভাতের থালার সামনে ফের বসাতে পারে?

রান্নাঘরে ঢুকে মনোরমা খাবার আয়োজন করছিল। খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাটের মত শীতল বাতাসের কণা এসে গায়ে বিঁধছে। দু-একদিন হল রাত একটু গভীর হলেই বেশ ঠাণ্ডা লাগে। আচমকা এক ঝলক হাওয়ার স্পর্শে শরীরটা কেমন শিরশির করে ওঠে। নভেম্বরের শুরুতে এই অবস্থা। কলকাতায় এবার পোষ-মাঘ মাসে কনকনে ঠাণ্ডা পড়বে মনে হয়। কিন্তু এই শহরের শীত-গ্রীষ্মের কথা ভেবে লাভ নেই তার। কলকাতায় সে আর কদিন থাকছে? বড় জোর দুটো মাস। জানুয়ারীর প্রথমেই বাণীব্রত চন্দনপুরে যাবেন বলেছেন। সেখানে ভীষণ ঠাণ্ডা। পোষ-মাঘ মাসে হি-হি কাঁপুনি। রাত্তির বেলায় পুরু লেপের তলায় শুয়েও শীত বাগ মানে না। বুকের ভিতরটা গুর-গুর করে কাঁপে।

উনুনে আগুনগুলো এখনও ধিকিধিকি জ্বলছে। ডাল-তরকারি একটু আগেই মনোরমা ফের গরম করে নিয়েছে। ভাতের হাঁড়িটা উনুনের পাশে বসান ছিল। শীতকালে বরাবরই তাই থাকে। তবু খাওয়ার সময় একটু গরম গরম মনে হয়। নইলে ঠাণ্ডার দিনে আর মুখে দেবার উপায় নেই। রাত দশটার সময় হাঁড়ির ভাত দলা পাকিয়ে ঠিক অসেদ্ধ চালের মত শক্ত হয়ে ওঠে।

ছেলের সামনে আহারের আয়োজন রেখে মনোরমা নিজেও খেতে বসল। সকালে বাণীব্রত বাজার থেকে ইলিশ মাছ এনেছিলেন। গোটা ইলিশ নয়, আর এক-জনের সঙ্গে ভাগাভাগি করে অর্ধেকটা মাছ নিয়েছিলেন। তার ছেলেমেয়েরা সকলেই ইলিশ মাছ ভালবাসে। বিশেষ করে হিরু আর বিনি। মাছের দাম অনেক দিনই আক্রা। তবু মনোরমার মনে হয় বছর সাত-আট আগে বাজার এত চড়া ছিল না। বর্ষাবর্ষার দিনে কিম্বা আমদানী ভালো হলে ইলিশের দর আরো একটু নামত। অফিস থেকে ফেরার সময় বাণীব্রত মাঝে-মাঝেই একটা ইলিশ মাছ হাতে ঝুলিয়ে বাড়ী ফিরতেন। সন্ধ্যাবেলায় রান্নাঘরে মাছ দেখে হিরু আর বিনির কি উল্লাস! ইলিশ-ইলিশ বলে দুই ভাইবোনে এমনি চেঁচামেচি শুরু করত যে মনোরমা ধমক দিয়েও তাদের থামাতে পারত না। সেই ইলিশ রূপোলী ইলিশ। মনোরমার মনে হল গ্রামে গেলে শুধু কলকাতার সঙ্গে নয়, ইলিশের সঙ্গেও রসনার সম্পর্কে ছেদ পড়বে। চন্দনপুরে ইলিশ কোথায়? বর্ষা-শুমের সময় বাঁকুড়ায় চালানী মাছ আসে। কিন্তু অত দূর থেকে চন্দনপুরে কে মাছ আনছে?

খেতে বসে মনোরমা তাই ছেলেকে বলল, — 'ভালো ইলিশ পেলে তোর বাবাকে এখন রোজ আনতে বলেছি।'

—'রোজ কেন?'

—'বারে! এই কটা দিন খেয়ে নে।' মনোরমা ভাতের ডেলা পাকিয়ে নিয়ে বলল, 'চন্দনপুরে গেলে তো আর ইলিশ পাবি নে। অবশ্য তুই বাঁকুড়ার কলেজে পড়বি। সেখানে বরষুমের সময় চালানী মাছ পাওয়া যায় বলে শুনেছি। কিন্তু বিনিটার কপাল মন্দ। ওকে এখন গ্রামের স্কুলেই পড়াশুনো করতে হবে।'

—'চন্দনপুরে গিয়ে তোমার খুব কষ্ট হবে, তাই না মা?' হিরু জিজ্ঞাসা করল।

—'কষ্ট তো হবেই। কিন্তু উপায় নেই। তোর বাবার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। একবার যখন বলেছেন চন্দনপুরে গিয়ে থাকবেন, তখন তার আর নড়চড় নেই।' এক মুহূর্ত থেমে মনোরমা ফের ছেলের মুখের দিকে তাকাল। বলল, 'তো গ্রামে গিয়ে তোরও নিশ্চয় ভাল লাগবে না হিরু? কলকাতার মত এমনি ইলেকট্রিক আলো, ট্রাম-বাস, এত বন্ধুবান্ধব, ফাংশন-থিয়েটার, খেলাধুলো,
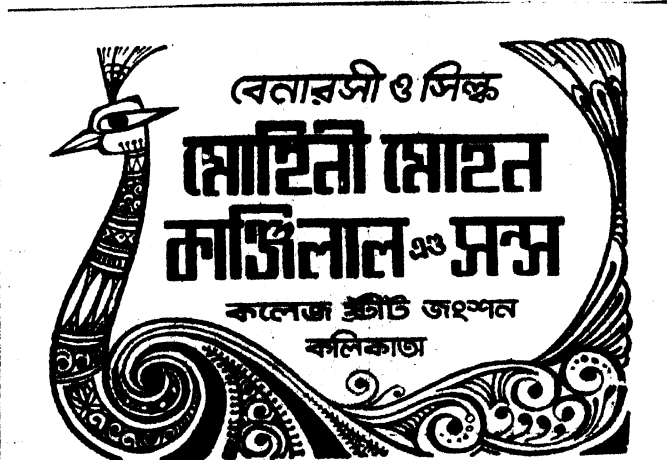
হাসি-আনন্দ,—গ্রামে গিয়ে এসব কোথায় পাবি?'

—'তা ঠিক মা। গ্রামে এসব কিছুই নেই। সেখানে শুধু দুঃখ-কষ্ট, অন্ধকার আর দারিদ্র্য। লোকে দু-বেলা পেট ভরে খেতে পায় না।'

হিরু চুপ করে কি ভাবল। ফের মুখ না তুলে প্রায় স্বগতোক্তির মত বলল,—'তাই আমাদের সেখানেই যেতে হবে। গ্রাম থেকেই আমরা কাজ শুরু করব।'

—'গ্রাম থেকে তোরা কাজ শুরু করবি? তার মানে কি হিরু?' মনোরমা সোজা হয়ে বসল। 'কি সব বলছিস তুই? গ্রামে আবার তোদের কি কাজ আছে রে?'

মার চোখে একটা ঘন সন্দেহ। মা যেন তাকে কেমন করে দেখছে। ব্যাপারটা সহজ করার জন্য হিরু তাড়াতাড়ি বলল,—'কাজ মানে,...এমনি কাজ। ও কিছু নয় মা।' সে হাত মুখ নেড়ে মাকে অন্যভাবে বোঝাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু মনোরমার মন থেকে সন্দেহের ছায়া দূর হল না। একটা অদ্ভুত ভয়ের অনুভূতি তাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করছিল। তার কেবলি মনে হতে লাগল হিরু যেন একটা গুরুতর বিষয় গোপন রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। গ্রামে গিয়ে হিরু কি কাজ শুরু করবে? তাও সে একা নয়। কথাটা জিজ্ঞেস করতেই হিরু অমন চমকে উঠল কেন? সমস্ত ব্যাপারটা তাহলে খুব গোপনীয়? কিন্তু মনোরমা কেমন করে ওর মনের কথা জানবে? ছেলের কতটুকু খবর সে রাখতে পেরেছে? হিরু কোথায় যায়, কাদের সঙ্গে মেলামেশা করে বাড়ীর লোকে তার বিন্দুবিসর্গও জানে না।

মনোরমা দুঃখ করে বলল,—'আমি মুখ্য-সুখ্য মেয়েমানুষ। তোর মত বুদ্ধিমান নই হিরু। কিন্তু তুই যে আমার কাছে অনেক কথা লুকোচ্ছিস, তা আমি বুঝতে পারি বাবা।'

হিরু চুপ করে রইল। একটি কথাও কইল না। সে নিঃশব্দে মুখ নীচু করে থালার ভাত-তরকারী নাড়াচাড়া করতে লাগল।

মনোরমা ফের বলল,—'এখন তুই বড় হয়েছিস হিরু। মা-বাবার দুঃখ-কষ্ট তোর মনকে স্পর্শ করে না। নইলে ঠিক বুঝতে পারতিস তোর ব্যবহারে উনি আজ কত দুঃখ পেয়েছেন। দিন দিন তুই অন্য মানুষ হয়ে যাচ্ছিস। কেমন অন্যমনস্ক,...নিজের ঘরে চেয়ার-টেবিলে বসে একমনে কি চিন্তা করিস। তোর কাছে কারা যেন আসে। সময়-অসময় নেই, তুই হঠাৎ তাদের সঙ্গে কোথায় চলে যাস বাড়ীর কেউ তা বলতে পারে না। আমি তোর মা। আমি বলছি হিরু, সব কথা এমন করে মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখিস নে। তোর বাবা-দাদাদের কাছে বলতে ইচ্ছে না করলে দরকার নেই। এখন এই রাত্তির বেলায় ওরা সবাই ঘুমোচ্ছে। তুই আমার কাছে লুকোস নে বাবা। সব খুলে বল।—'

শেষের দিকে মনোরমার গলার স্বর কেমন ভিজে ভিজে শোনাচ্ছিল। তবু এত অনুনয় বিনয়েও হিরুর মুখ থেকে একটি মৃদু শব্দ বের হল না। তার ঠোঁট দুটো বুঝি কেউ শক্ত সুতো দিয়ে সেলাই করে রেখেছে।

ছেলের দিকে সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার বাপের বাড়ীর দিনগুলির কথা মনে পড়ছিল মনোরমার। খিড়কির পিছনে নোনা-ধরা পাঁচিলের উপর একটা বহুরূপী গিরগিটিকে সে কতদিন বসে থাকতে দেখেছে। ক্ষণে ক্ষণে সেটা রঙ বদলাত, হিরুর মুখের ভঙ্গী, চেহারা ঠিক তেমনি ধীরে ধীরে পাল্টাচ্ছে। একটু আগেই সে হাসিমুখে মায়ের সঙ্গে কথা বলছিল। আর এই মুহূর্তে ওর ঠোঁটে, চিবুকের গায়ে সেই জেদের ভঙ্গীটা কত স্পষ্ট। তার চোখের সামনে হিরুর মুখভাব কেমন শক্ত, দৃঢ় হয়ে উঠছে।...

হঠাৎ ঝোলমাখা ভাত তরকারি ফেলে রেখে হিরু উঠে দাঁড়াল, কিন্তু আশ্চর্য! মনোরমা একটি কথাও বলল না। সে নিশ্চেষ্ট দর্শকের মত চুপ করে রইল। যেন সে জানত, বুঝতে পেরেছিল। এমনি একটা কিছু ঘটবে। অথচ তার এতে কিছু করবার নেই।

কিন্তু মনোরমার এমন স্বভাবই নয়। দু দিন আগে হিরু এমনি ভাত ফেলে উঠে যেতে চাইলে সে ঝপ করে ওর হাতটা ধরে ফেলত। জোর করে ওকে ফের থালার সামনে বসিয়ে বলত,—'খবর্দার হিরু। আমার একটি ভাতও যেন না নষ্ট হয়। এ তোমাদের রেশনের চাল নয় জানবে। অনেক কষ্ট করে ভালো জিনিস আমাকে জোগাড় করতে হয়েছে। বাজারে চালের দর কত, সে খেয়াল কারো আছে?—'

কিন্তু মনোরমার হাতে পায়ে আর সে বল নেই। কেউ যেন গোপনে তার সর্বস্ব চুরি করে তাকে নিঃস্ব, ফতুর করে ফেলেছে। ছেলেকে ধমক দিয়ে কিছু ব[lost] তেমন জোর কই মনোরমার? হিরু কি [lost] নাগালের মধ্যে?

রান্নাঘরে শেকল তুলে দিয়ে মনে[lost] ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। [lost] ফেটে জল আসছিল তার। আজ সন্[lost] কার মুখ দেখে উঠেছিল কে জানে? [lost] মেয়ে দুজনকে নিয়ে এখন দু[lost] সমস্যা। মনোরমা কেমন করে [lost] মোকাবিলা করবে?...

জানালার ফাঁকে কার্তিকের শি[lost] ভেজা আকাশ চোখে পড়ে। রাত বাড়[lost] আরো হিম ঝরবে। পাল্লা দুটো বন্ধ ক[lost] সে এগিয়ে গেল। ঋতু পরিবর্তনের সম[lost] একটু অনিয়ম হলেই জ্বরজারি। যা প[lost] শরীর সব,—সামান্য ঠাণ্ডা লাগলে বাণ[lost] আর বিন্তি দুজনেই ভুগবে।

শান্ত ঘুমন্ত কলকাতা এখন চ[lost] আলোয় হাসছে। কার্তিকের জ্যো[lost] ভারী সুন্দর—বড় উজ্জ্বল। এত [lost] হানি, মারামারি,...হিংসায় উন্মত্ত প[lost] তবু চাঁদ তেমনি,—এই কলকাতার [lost] পথে, প্রাসাদোপম অট্টালিকায়, [lost] চন্দনপুরের ধুলো-ওড়া মেঠো পথে, [lost] গাছালী আর খড়ো ঘরের আঙিনা[lost] সর্বত্রই তার অকৃপণ উদার হাসি।

অনেক রাত্তিরে স্ত্রীর কান্না শুনে [lost] ভেঙে গেল বাণীব্রতর। পাশে শুয়ে [lost] রমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বাণ[lost] বিছানার উপর উঠে বসলেন। ধীরে [lost] ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে[lost] 'ওগো, কাঁদছো কেন?'

—'কবে চন্দনপুরে নিয়ে [lost] আমাদের?' মনোরমা কান্না-ভেজা [lost] শুধোল।

—'চন্দনপুরে?' বাণীব্রত মুহূ[lost] জন্য ভুরু কোঁচকালেন। মনোরমা চন্দন[lost] যেতে চাইছে? ঘুমের ঘোরে তিনি [lost] শোনেন নি তো?

শেষ রাতে মনোরমার দুই চোখের [lost] ভারী হয়ে বুজে এল। ঘুমিয়ে ঘ[lost] স্বপ্ন দেখছিল সে। যেন চন্দনপুরে [lost] ট্রেন ছাড়তে আর দেরী নেই। প্ল্যাট[lost] কত লোকজন,...সিগ্রেট-পান চাই বলে [lost] ছোকরা কেমন স্বচ্ছন্দে হাঁটতে হ[lost] ট্রেনটার অন্য প্রান্তে চলে গেল। হুইসিল বাজিয়ে সবুজ পতাকা ওড়[lost] বাণীব্রত বলছেন,—'ওগো তাড়াতাড়ি [lost] পড়। একার ট্রেন ছেড়ে দেবে। কিন্তু [lost] আর বিন্তি? তার ছেলেমেয়ে? ওরা [lost] কোথায়? চন্দনপুরে কি ওরা যাবে [lost]

...নির্বাক পাষাণ-মূর্তির মত বাণ[lost] তার সামনে দাঁড়িয়ে। কোনো জবাব [lost] পারছেন না।

(ক্র[lost]

মদন মাতাল

পশুপতি ভট্টাচার্য

আমাদের বাড়ির মাঝে ছিল মদনবাবুর বাড়ি। কথাটা বলা একটু ভুল হলো বরং বলা উচিত ছিল মদনবাবুর বাড়ির গায়ে আমাদের বাড়ি। কারণ দুই মিলিয়ে এক সময় গোটা বাড়িটাই ছিল মদনবাবুর পূর্ব-পুরুষদের, তারই অর্ধেকটা আমার দাদামশাই অন্য শরিকদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন। গোটা বাড়িটাই ছিল একতলা সেকেলে গাথনি, দাদামশাই তাঁর অংশটা ভেঙেচুরে দোতলা করে নিয়েছিলেন। একতলা বাড়িতে দোতলার দেয়ালের আড়ালে পড়ে থাকতে বাধ্য হওয়া, এটাই ছিল মদনবাবুর যত আক্রোশ এবং রাগ এবং ক্ষোভের হেতু। তিনি সোচ্চারে সরোষে সেটা জানিয়ে দিলেন।

মদনবাবুরা উচ্চবংশীয় কায়স্থ। বাড়ি তাদের তিন পুরুষের। ভাই ভাই ভাগ হয়ে গিয়ে ঝগড়াঝাটি হতে থাকাতে অন্য শরিকরা তাদের অংশ বিক্রয় করে দিয়ে অন্যত্র সরে গেল। আমরা সেই অর্ধাংশ বাড়িতে বাস করতে থাকলাম।

বাকী অর্ধেক অংশে রইলেন মদনবাবু এবং তাঁর স্ত্রী। সংসারে অন্য কেউ ছিল না। তাঁরা নিঃসন্তান। অত বড় বাড়িতে কেবল স্বামী--স্ত্রী থাকতেন।

মদনবাবু রেলে ভালো কাজ করতেন। লাইনের পি, ডব্লু, আই ছিলেন। রেলের কুলিমজুর নিয়ে তাঁর কাজ। ন্যায়ভাবে ও অন্যায়ভাবে প্রচুর কাঁচা পয়সা তিনি পেতেন এবং প্রত্যহ প্রচুর মদ্যপান করতেন। সকালে বেরিয়ে যেতেন, ফিরে আসতেন সন্ধ্যার আগে, তখন তিনি পুরো মাতাল। চেহারাটা গোলগাল, বেঁটে একটু ভুঁড়ি ছিল, মাথায় টাক। গায়ের বর্ণ ফরশা, কিন্তু মুখখানা ঘোর কালিমাময়, মুখ দেখে মনে হয় না যে গায়ের রং অত ফরশা। বোধ করি রোদে ঘুরে ও অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে মুখ অমন কালো হয়ে গেছে।

মদনবাবু স্ত্রীকে খুব ভালোবাসতেন। প্রত্যহ বাড়ি ফেরার সময় রোজ। ভরে বড়বাজার থেকে দামী দামী খাবার কিনে আনতেন স্ত্রীর জন্য।

কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই দেখতেন পাশের দোতলা বাড়ির দেয়াল! আর তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে দাদামশাইকে লক্ষ্য করে অকথ্য ভাষায় প্রচন্ড গালিগালাজ শুরু করে দিতেন। এত জোরে চেঁচাতেন যে পাড়াসুদ্ধ বিব্রত শঙ্কিত হয়ে উঠত।

মাতালের মুখের কোনো আঁট ছিল না। কেউ যদি তখন প্রতিবাদ করতে যেতো তাহলে তখন তিনি আরো দ্বিগুণ জোরে গমক দিয়ে গালিবর্ষণ করতেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করতেন। তাইতে আরো ক্রুদ্ধ হয়ে স্ত্রীকে বেদম প্রহার দিতে শুরু করতেন।

স্ত্রী বলতেন যে আমাকে মারো যত খুশি, তাতে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু পূজনীয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে গালি দিলে তোমার পাপ হবে, নরকেও ঠাঁই হবে না।

স্ত্রীকে কিছুকাল প্রহার করবার পর মদনবাবুর অতঃপর অনুশোচনা হতো, তখন তিনি নানারূপ আদর করে গায়ে হাত বুলোতেন, পিঠে তেল মালিশ করতেন।

স্ত্রী ছিলেন ভক্তিমতী। ঘরের কুলুঙ্গিতে একটি কৃষ্ণ-রাধিকার পট ছিল, সেই পট তিনি প্রত্যহ ফুল দিয়ে সাজাতেন এবং সামনে বসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত পূজো করতেন। কিন্তু ঠাকুরকে ভোগ দেবার সময় ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। তাই তিনি আমাকে তাঁর ব্রাহ্মণ করে নিয়েছিলেন। আমাকে ডাকতেন বাবাঠাকুর বলে।

আমার তখন ছাত্রাবস্থা পড়ি। মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি না। কিন্তু, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তিনি বলতেন যে ব্রাহ্মণ নিবেদন করে দিলেই ঠাকুর তা গ্রহণ করেন। কাজেই আমাকে প্রত্যহ একবার যেতে হতো ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করতে। দক্ষিণাস্বরূপ প্রত্যহ পেতাম দুই জোড়া রাতাবি সন্দেশ।

মদনবাবুও আমাকে খুব মানতেন। আমাকে বলতেন 'দেবতা'। একটা ঘটনাতে আমি তাঁর কাছে দেবতা হয়ে দাঁড়ালাম।

সেদিন পল্লী প্রান্তে পাশের বাড়ির চেঁচামেচি শুনে ঘুম ভেঙে গেল। বেরিয়ে এসে দেখি মদনবাবু খুব চেঁচামেচি করছেন আর তাঁর স্ত্রী খুব কাঁদছেন। সকালবেলাতে কি ব্যাপার? শুনলাম, মদনবাবুর খোঁয়াড়ি ভাঙা হচ্ছে না, তাঁর স্ত্রী তাঁকে সকালে মদ্যপান করতে দিচ্ছেন না, বোতল আলমারিতে বন্ধ করে রেখে তাঁকে চাবিটা দিতে বলছেন। কিন্তু সকালে একটু না পান করে তিনি যাবেন না।

আমি গিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে চাবি নিয়ে আলমারি খুলে বোতল বের করে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পান করে পরম পরিতৃপ্ত হয়ে আমার পায়ের ধুলো জিভে ঠেকিয়ে বললেন, 'আপনি আমার দেবতা'।

তখন থেকে আমি তাঁর দেবতা হলাম। রাস্তায় ঘাটে যেখানেই দেখা হোক তৎক্ষণাৎ যেন দারুণ লজ্জিত হয়ে জিভ কেটে আমাকে প্রণাম করতেন এবং জুতোর ধুলো হাতে নিয়ে জিভে ঠেকিয়ে দেবতা সম্বোধন করে খুব আনন্দ প্রকাশ করতেন।

আমাকে মানতেনও খুব বেশি। রাতে হয়তো বাড়ি ফিরে খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমার দাদামশাইকে এমন গালিগালাজ করছেন যে কান পাতা যায় না, দাদামশাই-এর ভাগবত পাঠে বিঘ্ন হচ্ছে, আমি তখন যদি তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বলতাম—'কি হচ্ছে মদনবাবু?' অমনি তৎক্ষণাৎ লজ্জায় জিভ কেটে পায়ের ধুলো নিয়ে বলতেন—'বাস্ বাস্, দোষ কেটে গেল, আর বলব না।' তারপর একেবারে চুপ করে যেতেন।

স্ত্রীকে প্রহারের সময়েও তাই হতো। আমি গিয়ে উপস্থিত হলেই প্রহার করা থেমে যেতো, লজ্জায় তিনি জিভ কেটে মুখ লুকোতেন।

কিন্তু তিনি যে আমাকে দেখলেই প্রণাম করতেন, তাতেও এক মুশকিল হতে দেখা গেল। আমার যিনি দিদিমা, তিনি ছিলেন একটু শুচিবাইগ্রস্ত। তিনি একদিন দেখতে পেলেন যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মদনবাবু আমাকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিচ্ছেন। আমি সেকথা জানতে পারিনি।

বাড়িতে ঢুকতেই তিনি আমাকে বললেন—'ঘরে ঢুকিস না, তুই ঐ মাতালটাকে ছুঁয়ে এলি তো?'

আমি বললাম—'কেন, ছুঁলেই বা, ও কি অস্পৃশ্য নাকি?'

তিনি বললেন—'তা তো বটেই, অতো যে মদ খেয়েছে তার কি কোনো বিচার-আচার আছে? সাত ছিস্টি মজিয়ে এসেছে, দু পায়ে কত নোংরা মাড়িয়ে এসেছে তার ঠিক কি? মা গো মা, আবার তোর জুতোর ধুলো নিয়ে জিভ দিয়ে চেটে খেলে। ছি-ছি, অস্পৃশ্য বৈকি। যা কাপড় ছেড়ে আয়, মাথায় গঙ্গাজল ছিটোই।'

বাধ্য হয়ে কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল মাথায় নিতে হলো। তার পর থেকে সতর্ক থাকতে হতো, আবার কাপড় ছাড়তে না হয়।

একবার ঐ মদনবাবু আমার খুবই উপকার করেছিলেন।

আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে পরামর্শ করলাম, পুরী বেড়াতে যেতে হবে। কিন্তু যাতায়াত ও থাকা-খাওয়াতে অনেক টাকা লাগবে। কি উপায় করা যায়। মদনবাবুকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, কারণ তিনি ঐ লাইনেই কাজ করেন। তিনি বললেন, তার জন্যে কোনো ভাবনা নেই, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমাদের জন্যে তিনি পাঁচখানি ফ্রি পাস এনে দিলেন, তাঁর আত্মীয় বলে। শুধু তাই নয়, তাঁর যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, তিনি পুরীর রেলওয়ে হোটেলে আমাদের জন্য থাকা-খাওয়ারও ব্যবস্থা করে দিলেন, প্রায় বিনা খরচ দিয়ে, সামান্য কিছু দিতে হয়েছিল রেল কর্মচারীদের যেটুকু দিতে হয়। আমরা সাতদিন আনন্দে বেড়িয়ে এলাম।

কিন্তু মদনবাবু বেশিদিন বাঁচলেন না। অতিরিক্ত মদ্যপানে তাঁর লিভারটি একেবারে অকর্মণ্য হয়ে গেল। পেটে জল জমে উদরী দেখা দিল। কোনো চিকিৎসাতেই কিছু উপকার হলো না। সকলেই বুঝতে পারল যে মৃত্যু অবধারিত।

তখন মদনবাবুর স্ত্রী বললেন যে তোমার পাপেই এ-রোগ হয়েছে। তুমি যে ব্রাহ্মণকে গালিগালাজ করেছ সেই পাপে এই দুর্দশা তোমার হলো। তুমি তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চাও, নতুবা কিছুতে সারবে না।

মদনবাবু দাদামশাইএর কাছে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। আমি তাঁকে যেতে নিষেধ করে দাদামশাইকেই তাঁর কাছে উপস্থিত করলাম।

মদনবাবু দাদামশাইএর পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন, হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'আপনাকে কুকথা বলে অনেক পাপ করেছি, আমি তো বাঁচবোই না, কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা না করলে আমি নরকে পচে মরবো।'

দাদামশাই তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ক্ষমা করে আশীর্বাদ করে এলেন।

তারপর একদিন মদনবাবু দেহত্যাগ করলেন।

বাড়িটি তাঁর স্ত্রীর নামে লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তো নিঃসন্তান, বাড়ি বেচে দিয়ে তীর্থবাস করতে মনস্থ করলেন। দাদামশাইকে তাঁদের অংশটাও কিনে নিতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু তিনি কিনলেন না। তখন অন্য একজনকে বাড়ি বিক্রয় করে ভদ্রমহিলা বৃন্দাবনে চলে গেলেন।

রতনের স্বপ্ন

বিভূতিভূষণ গুপ্ত

প্রাণপণ চেষ্টা করেও খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না রতন মন্ডল। সকলে মিলে ষড়যন্ত্র করে তাকে মাটির বুক থেকে তুলে এনে ইটপাথরের বন্দী-শালায় আটক করে রেখেছে। কিন্তু এই পথে কি রতন মন্ডল সেদিন চিন্তা ক'রে দেখেছিল?

বাবুদের চৌকস ছেলেদের চাল-চলন, তাদের কথার ধার, পোষাক-পরিচ্ছদের চমক —এককথায় জীবন ধারণের উ'চু মান যে তাকে কত বেশী আকর্ষণ করেছিল একথা কি রতন অস্বীকার করতে পারে?

হীনমন্যতার জ্বালায় জ্বলে মরেছে আর নিজের অক্ষমতাকে মনে মনে ধিক্কার দিয়েছে। এবং আপন বংশধরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে। শুধু স্বপ্নই দেখেনি— তার স্বপ্নকে সফল করে তুলতে বাপ-ঠাকুর্দার উপদেশ ভুলেছে, নিজের সুখ-সুবিধার কথা পর্যন্ত অবহেলা করেছে। তার একটি মাত্র ছেলেকে সে ভদ্রলোকের মত মানুষ করে তুলবে। দশজনের একজন হয়ে সে তার মুখ উজ্জ্বল করে তুলবে। হাল চাষী রতন মন্ডলের ছেলের দিকে দশজনা প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে। তাকে আর রোদ, ঝড়, জল মাথায় করে লাঙ্গল নিয়ে মাঠে যেতে হবে না। নিশ্চিন্ত আরামে পায়ের উপর পা রেখে সসম্মানে জীবন কাটাবে।

রতনকে তার ছেলে নিয়ে এই পথে চিন্তা করবার রসদ যুগিয়েছেন পাঠশালার পন্ডিতমশাই।

বলেছেন, রামগোপালের মাথাটা বড় সাফ রতন। সুযোগ পেলে ছেলেটা একদিন মানুষের মত মানুষ হবে।

পাঠশালার পাঠ চুকিয়ে স্কুলে প্রবেশ করার পর থেকেও একই কথা সে আরও বহুবার শুনেছে। কিন্তু নিজের সামর্থের কথা ভেবে এগিয়ে গেলেও এক-একবার পিছিয়ে গেছে। তবে একেবারে আশা ছাড়তে পারেনি। কেনই বা পারবে। পরের বছর থেকেই বিনা-বেতনে চলছে রামগোপালের।

প্রধান শিক্ষক মশাই রতনকে ডেকে পাঠিয়ে খাতির করে বলেছেন, স্কুলের খরচ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না রতন। সব দায়িত্ব আমার।

রতন ছোট ছেলের মত কে'দে ফেলেছে। বলেছে, সবই আপনাদের দয়া মাস্টার সাহেব। নইলে আমার আর সাধ্য কি......

বাধা দিয়ে প্রধান শিক্ষকমশাই বলেছেন, না রতন এ ছেলের জন্য কাউকে দয়া করতে হবে না। রামগোপাল নিজের শক্তিতে নিজের ব্যবস্থা করে নিয়েছে—ভবিষ্যতেও করবে। তোমাকে ভাবতে হবে না। এ তুমি দেখে নিও।

রতন শিক্ষক মশাইর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে গদগদ কন্ঠে বলল, যদি কিছু হয় সেও আপনাদের আশীর্বাদে।

আশীর্বাদের জোরেই হোক কিংবা রাম-গোপালের ঐকান্তিক চেষ্টার জনাই হোক ধাপে ধাপে ক্লাশের পর ক্লাশ রেকর্ড নম্বর পেয়ে সে স্কুলের দরজা পার হয়ে গেল। শুধু পার হওয়া নয় রামগোপাল স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছে। খবর দিতে ছুটে এলেন স্বয়ং প্রধান শিক্ষক মশাই। আনন্দে ফেটে পড়ে বললেন, এখানেই শেষ করে দিও না রতন। আমি ভবিষ্যৎবাণী করে যাচ্ছি সুযোগ পেলে তোমার ছেলে শুধু তোমার নয় গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করবে। ওকে সহরে পাঠাও। জলপানির টাকার সঙ্গে আর কিছু হলেই ওর চলে যাবে। সহরে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও আমিই আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে করে দেব।

রতন কি বলবে কি করবে ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছিল না। শুধু ওর দুচোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়াতে লাগল।

প্রধান শিক্ষকমশাই একটুও দাঁড়িয়ে থাকেন নি। নিজেই উদ্যোগী হয়ে রামগোপালকে তাঁর বাল্যবন্ধু কেদারের কাছে সহরে পাঠিয়ে দিলেন। আর রতন আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতে লাগল ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে। যে ভবিষ্যৎকে রামগোপাল গড়ে তুলল তার ঐকান্তিক সাধনার দ্বারা। কেদারের নিঃস্বার্থ সহযোগিতার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে রামগোপাল বিজ্ঞান সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভে সক্ষম হলো। অর্থ, যশ, প্রতিষ্ঠা এবং সেই সঙ্গে উপযুক্ত সংসার সব মিলিয়ে রামগোপাল আজ সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ। কিন্তু রতন? কেন সে পারছে না বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে। কেন নিজেকে সর্বদা বড় একলা আর অসহায় বলে মনে হচ্ছে। এই বাড়ী-ঘরদোর, বাড়ীর মালিক, তার স্ত্রী-পুত্র কন্যা কেউ যেন তার নিজের নয়। সবাই যেন দূরের—অনেক দূরের। ওদের কাছে সে পৌঁছাতে পারছে না—সহজ হওয়া সম্ভবপর নয়। তাই এগোতে গেলে পিছিয়ে আসে। পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। রতন পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। নিজেরই চোখে তাকে বড় বেমানান লাগে। ভয় পেয়ে সকল দিক দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। এর চেয়ে গ্রামে বাবুদের কাছে হাতজোর করে দাঁড়ানও তার কাছে অনেক সহজ ছিল। তাদের স্পষ্ট অবহেলাকে সহ্য করে জীবন কাটানর মধ্যেও অপমানের জ্বালা কম ছিল।

ছেলে, বৌমা, তার বাপের বাড়ীর আত্মীয়স্বজন এমন কি নিজের নাতি-নাতনীর সঙ্গে বসে টেবিলে খেতে সে ঘেমে ওঠে। পুত্রবধূকে ডেকে চুপি চুপি বলে, আমাকে তুমি থালায় করেই খেতে দিও বৌমা। নইলে খেয়ে আমি সুখ পাইনে। তোমার ঐ ভাই আর ছাওয়ালদের ঠুকাব খাওয়ার পাশে আমাকে বড় বেমানান লাগে বাপু। বড় লজ্জা পাই।

লজ্জা পাবার কথাও। রতনের যথেষ্ট বয়স হলেও এখনও বেশ ভালই খেতে পারে। পাকা আধ কিলো চালের ভাত না হলে তার চলে না।

নাতি-নাতনীর কাছে তাদের দাদুর এই খাওয়াটা বেশ উপভোগ্য হলেও তাদের মামা ত খাওয়া দেখে একদিন তার বোনকে বলেই বসল, তোমার স্বামীর পিতৃদেব একটি ক্রিমিনাল দিদি। আজকের দিনে আধ কিলো চালের ভাত! কাজ নেই কর্ম নেই—শুয়ে-বসে কাটিয়েও হজম করেন কেমন করে?

রামগোপালের স্ত্রী ভাইকে থামিয়ে দেয়। এসব আলোচনা ভবিষ্যতে না করার জন্য সতর্ক করে দেয়।

রামগোপালের সময় কম। ছোটখাট সংসারের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর তার নেই। স্ত্রীকে মাত্র একদিনই ডেকে বলে দিয়েছে, বাবা গ্রাম্য, তোমাদের সঙ্গে সব দিক দিয়েই সম্পূর্ণ আলাদা। মানিয়ে চলবে।

রামগোপালের স্ত্রী সাধ্যমত মানিয়ে চলতে চেষ্টা করলেও তার আধুনিক চিন্তাধারা, বর্তমান যুগের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী যেমন ঐ নিঃসঙ্গ মানুষটির অন্তরের সন্ধান নিতে পারেনি, রতন মন্ডলও তেমনি কিছুতেই নিজের মত করে গ্রহণ করতে পারেনি। যে কারণে ব্যবধানটা তাদের অজ্ঞাতেই ক্রমশঃ বেড়ে চলল।

নাতি-নাতনীর অল্প বয়স। তাদের ছোটখাট অসংযত কথাকে রতন গায় মাখে না। কিন্তু বৌমার ভাইর মুখের অবজ্ঞা-ভরা উক্তি আকস্মিকভাবে কানে যেতে সে মরমে মরে গেল। এই বাপের ঐ ছেলে……

এই একই কথা হয়তো আরও অনেকেই বলে। নেহাত কানে যায় নি তাই। নইলে কথাটা ত' আর মিথ্যে নয়। তবুও রতন ব্যথা পায়। একটা বোবা কান্না তার অনুভূতিকে ভিজিয়ে দেয়। তার সমগ্র চেতনা আর সজাগ দৃষ্টি শুধুমাত্র ছেলের উপরই নিবদ্ধ রেখে রতন এতকাল চুপ করে ছিল! আজ কিন্তু তার নীরবতাকে নিছক ঔদাসীন্য ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে না পেরে হতাশায়

এবং বেদনায় ভেঙ্গে পড়ল। ঐ একটি
কেন্দ্রবিন্দুতে রতনের জীবনের
প্রত্যাশা আবদ্ধ হয়েছিল। সেখানেও বি
নইলে … এর বেশী ভাবতে পারে না রত
ভাবতে চায়ও না। কিন্তু না চাইলেও তা
ভাবতে হয়। ভাবতে বসেছে নিজের ব
আর বিবেচনা দিয়ে। কয়েক মুহূর্তের ম
সে তার অতীত জীবনটা পর্যটন করে
বর্তমানের দিকে খোলা চোখে তাকাল।
মন বলল, তুমি ভুল করেছ রতন। তো
জীবনের প্রধান শিকড় ছিল মাটির মে
সেখান থেকে রস সংগ্রহ করে জীব
স্বাদ গ্রহণ করেছ তুমি। কিন্তু… ওরা
তোমাকে সেখান থেকে তুলে এনে বাহা
টবে বসিয়েছে। এখানে তুমি সে রস কে
করে পাবে। তাইত শুকিয়ে যাচ্ছে তো
মনের স্বাস্থ্য, মরে যাচ্ছে তোমার কল্প
ভবিষ্যৎ।

রতনের মন নিয়ে যে ওরা কেউ ভাব
জানে না। তাই কেউ ওকে বোঝে না। নি
মনকে খুলে ধরতে কি কম চেষ্টা সে করে
পরিবর্তে অদৃষ্টে জুটেছে বিদ্রূপ। র
গেঁয়ো, রতন মেঠো, রতন হালচাষী, এ
কি ওরা কেউ জানে না! তবুও বিদ্রূপ কে

নাতি একদিন হেসে বলেছিল, আ
দাদু তোমার ছেলেকে তুমি নিজের কাজ
শিখিয়ে লেখাপড়া শেখাতে গেলে কেন

কথা কটির মধ্যে যে বাঁকা সু
লুকান ছিল রতনের কানে তা ধরা প
না। সে খুশী হয়ে হাসিমুখে জবাব দি
ভুল হয়ে গেছে গো দাদুভাই, বেজায়
হয়ে গেছে। সেই ভুলেরই এখন প্রায়শ্চি
করছি।

সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের চেহারাটা রত
কাছে ভিন্ন হলেও সে নিজেকে খাপ খা
বার প্রাণপণ চেষ্টা করতে বারবার
হয়েছে। তবুও কিন্তু রামগোপালের
থেকে অন্য কোথাও চলে যাবার কথা ভাব
পারে নি। ওরা দুঃখ পাবে ভেবে চুপ
ছিল। আজ কিন্তু মনে হলো তার এখ
উপস্থিতিটাই ওদের কাছে একটা বড় লজ
তার দূরে থাকাই ওদের কাম্য। সে নি
হাতে যে বিরাট ব্যবধান একদিন সৃষ্টি করে
তা বুজিয়ে দেবার মত শক্তি যে তার
এটা যদি আর কয়েকটা বছর আগে
বুঝতে পারত…

রতন অবশ্য এখানে আসতে চায়নি
বাধা দিয়ে রামগোপালকে বলেছে, আমা
আমার মাঠ আর বাপের ভিটেতেই প
থাকতে দে বাপ। তোদের শহরের হা
আমার সইবে না।

রামগোপাল বাপের কথায় কান দেয়
বলেছে, তোমার ছেলে, ছেলে-বৌ, না
নাতনীদের চেয়েও যদি ঐ ভিটে আর ম
বেশী হয় তাহলে বলবার কিছু নেই। কি
আমার ইচ্ছে জমিজের কথাটা একবার দে
না কেন বাবা। জীবনভর ত অনেক দ

কষ্ট করেছ এবার না হয় হেসে খেলে আনন্দ করে কাটাও।

পুত্রগর্বে বুক ভরে উঠেছিল রতনের। একথাটা তার ভাবা উচিত ছিল।...অনেক দুঃখ কষ্ট করেছে রতন। ঠিক কথা। এ বয়সে আর... রাজী হয়েছিল রতন।

* * *

রতন কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে।

বোন চুপি চুপি ডাকলে, দাদা —সর্বনাশ হয়েছে। দাদু বোধ হয় মামার কথাগুলো শুনে ফেলেছে। তাই চলে গেছেন।

জানলি কেমন করে?

মা ফোনে মামাকে খুব বকাবকি করছিল যে।

তাতে তোর আমার ভয় কিসের?

মা বলছিল ভীষণ কাণ্ড হবে।

রামগোপালের স্ত্রী রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। বুড়ো মানুষ। শহরের রাস্তা ঘাটের সঙ্গে তেমন পরিচয় নেই। যদি একটা কিছু ঘটে যায়... আর এমনই দুর্ভাগ্য যে এই সময় স্বামীও কলকাতার বাইরে। ফিরে আসবেন আগামী কাল সন্ধ্যায়। এতটা দীর্ঘ সময় চুপ করে থাকা সম্ভব না। ট্রাঙ্ককলে পাওয়া গেলে দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসতে পারেন।

সৌভাগ্যবশতঃ রামগোপালকে পাওয়া গেল। খবর পেয়ে এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে সে চলে এসেছে। কিন্তু তার বাবা না বলে গেলেন কেন...চলে যাবার কোন কারণ ঘটেছে কিনা খোঁজখবর করেও কোন সদুত্তর পেল না তখন সঙ্গে সঙ্গে বার হয়ে যাবার উপক্রম করতেই স্ত্রী বাধা দিয়ে বলল, একটু বিশ্রাম নিয়ে খেয়ে দেয়ে বার হলে হতো না?

শান্ত কিন্তু কতকটা কঠিন গলায় রামগোপাল বলল, তোমার কাছে আর একটু বুদ্ধির পরিচয় পাবার আশা করেছিলাম। এতক্ষণে বাবার চলে যাবার একটা কারণ অন্ততঃ খুঁজে পেলাম। ছিঃ।

রামগোপাল যে প্রয়োজনে এতটা কঠিন হতে পারে এটা তার স্ত্রীর কল্পনাতীত। এই তিরস্কার তার প্রাপ্য বোধেই প্রতিবাদ না করে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে সেও এসে গাড়ীতে উঠে বসল। বলল, বাধা দিও না। আমাকেও সঙ্গে নাও। অন্যায় করে থাকলে তা সংশোধন করবার সুযোগ দাও।

রামগোপাল স্ত্রীকে একটি কথাও না বলে ড্রাইভারকে পেট্রল পাম্পে যাবার নির্দেশ দিল। সেখান থেকে পুরো ট্যাঙ্ক তেল নিয়েও কিছু বাড়তি তেল সঙ্গে নিতে ভুলল না।

গাড়ী বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলল তাদের গ্রামের উদ্দেশে। গ্রাম ছাড়া অন্য কোথাও যে তার বাবা যেতে পারেন না এটা সে ধরেই নিয়েছে।

প্রায় চার ঘণ্টা একটানা পথ চলে তারা এসে যখন গ্রামে পৌঁছাল তখন সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। সর্বপ্রথমে গাড়ী এসে দাঁড়াল রামগোপালের ভূতপূর্ব প্রধানশিক্ষক মশাইর বাড়ীর সম্মুখে। তিনি তখন ঘরের দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে রামগোপাল প্রথমে পরে তার স্ত্রী ওঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিল।

বৃদ্ধ তাদের আশীর্বাদ করে সহাস্যে বললেন, আমি জানতাম তোমরা আসবে। আমি তখনই রতনকে বলেছি যে, কাজটা তুমি ভাল করনি। ছেলেটাকে অকারণে দৌড় করাবে।

হাঁপ ছেড়ে রামগোপাল বলল, বাবা তাহলে এখানেই এসেছেন?

শোন কথা বোকাছেলের। বলি আমার কাছে আসবে না ত' কার কাছে যাবে। তুমিই কি তা জান না? নইলে এখানেই প্রথমে ছুটে আসবে কেন। তবে হ্যাঁ তোমাদের না বলে চলে আসায় আমি তাকে তিরস্কার করেছি। তা রতন কি জবাব দিলে জান... বলতে গেলে কি আসা হতো মাষ্টারমশাই।

রামগোপাল ক্ষুণ্নকণ্ঠে বলল, আসবার কি কোন প্রয়োজন ছিল মাষ্টারমশাই?

এটা তো তোমার কথা রাম। তোমার বাপের মনটাকে যদি বুঝতে চাও তবে বেশী দূরে নয় আমার বাড়ীর পিছন থেকে ঘুরে এসো। তোমার প্রশ্নের জবাব নিজের কাছেই পাবে। চলো আমিও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি।

জবাব পেতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হয় নি রামগোপালের। কিন্তু বুঝতে পারলে না রামগোপালের স্ত্রী। তাই সে বায়না ধরল শ্বশুরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য। হয়তো তার অপরাধী মন অনুতপ্ত।

রতন চুপচাপ বসে ছিল ধানক্ষেতের পাশে। হাওয়ায় দুলছে পাকা ধানের সোনালী শীষগুলি। দু-চোখ ভরে দেখছে। চোখে-মুখে তার বিমল আনন্দের সুস্পষ্ট প্রকাশ। মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ে রতন পরম স্নেহে ধানের শীষ স্পর্শ করছে আর আপন মনে বিড় বিড় করছে আর মাথা নাড়ছে।

পুত্র ও পুত্রবধূকে তার পাশে এসে দাঁড়াতে দেখে কেমন একপ্রকার ভীত অসহায় দৃষ্টিতে তাদের পানে চেয়ে থাকে রতন। কথা বলতে পারে না। ঠিক যেন পলাতক আসামী।

রামগোপালের স্ত্রী এগিয়ে এসে বলল, আপনাকে যে আমরা নিয়ে যাবার জন্য এসেছি।

রতন সহসা শিক্ষকমশাইকে লক্ষ্য করে মৃদুকণ্ঠে বলল, ওরা কি সত্যি সত্যিই আমাকে নিয়ে যাবে মাস্টারসাহেব?

রাম এগিয়ে এসে বাপের গা ঘেঁষে বসে আশ্বাসভরা কণ্ঠে বলল, তোমাকে আর কোন দিন নিয়ে যাবার কথা মুখে আনব না। এখানেই তুমি তোমার মত করে থাকবে। আমি প্রতি সপ্তাহে খোঁজখবর করে যাব। আমারই বোঝার ভুলে এতদিন তুমি কষ্ট পেয়েছো।

স্ত্রীকে বলল, তুমি ফিরে যাও শ্রীলা, আমাকে আজ থাকতে হবে। এখানের একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে তারপর ফিরব।

কিন্তু...

বাধা দিয়ে রামগোপাল বলল, এর মধ্যে আর কিন্তু নেই। তুমি কি এ সমস্ত অস্বীকার করবে যে এরচেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর হতে পারে না? বাবার জীবনের সঙ্গে মাটির নিকট সম্বন্ধ। এই মাটিতেই তাঁকে তাঁর মত করে সহজভাবে বাঁচতে দাও।

শ্রীলা মাথা নীচু করল। রতনের চোখ-মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

শীতলামংগল কাব্যের পাতা

অনুরাগী গবেষকরা সেই অজ্ঞাত কবিদের রচনা ও পরিচিতি অক্লান্ত পরিশ্রম করেও জনসমক্ষে উপস্থাপিত করে চলেছেন।

১৫শ—১৭শ শতকের দেবকৃপানির্ভর সমাজ ১৮শ শতকে পদার্পণ করলে সমাজ ও সংস্কৃতির ভিত যায় ভেঙে। মুসলিম আদর্শ নিষ্ঠাহীন হিন্দুয়ানাকে প্রায় নষ্ট করে দিতে চায়। ফলে মঙ্গল কাব্যের বৃহৎ বৃহৎ অঙ্গে যে দেব-দেবীরা বর্ণিত থাকতেন তাঁদের প্রতি নিষ্ঠা কমে আসায় দেব-দেবীর লঘু হাস্যপরিহাস, কৃত্রিম রচনাবিন্যাস ও চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলীকে মানুষের মন গ্রহণ করতে চাইলো। তাই এ যুগে রচিত মংগলকাব্যগুলি পূর্বযুগের মঙ্গলকাব্যগুলির তুলনায় অনেকাংশে ভিন্নধর্মী, নানাভাবে আঞ্চলিক-বৈশিষ্ট্যে সমন্বিত ও অখ্যাত কবির সুনিপুণ প্রতিভারসে আপ্লুত। আঞ্চলিক লৌকিক দেব-দেবীদের মহিমা কীর্তন করেও রচিত হতে শুরু করল মঙ্গলকাব্য, পাঁচালী, পালাগান ইত্যাদি। দ্বিজমাধব, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, ঘনরাম চক্রবর্তী, মানিক গাঙ্গুলী প্রমুখ কবিরা এ সময় নিজ নিজ কাব্য রচনা করে যশস্বী হন।

এমনি এক অজ্ঞাত কবি শংকর দে। মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার নানা গ্রামাঞ্চলে পুঁথি সংগ্রহকালে বর্তমান লেখক ঐ মহকুমার দাবাপুর থানার কলাই-কুণ্ড নামক গ্রাম থেকে 'শংকর' ভনিতা বিশিষ্ট নানা কাব্যের খণ্ডিত ও সম্পূর্ণ পুঁথি পান। এর পর ঐ কবির আরো কিছু কিছু পুঁথি সংগৃহীত হয়। ইতি-পূর্বে 'শংকর' রচিত 'কেস্যারার পালা' নামক কাব্যের পুঁথি সাহিত্য পরিষদে সংগৃহীত হয়ে থাকলেও সে সম্পর্কে বিশদ কোন আলোচনা হয় নি। গবেষক অধ্যাপক পঞ্চানন চক্রবর্তী একদা 'শংকর' নামক কবির সন্ধান পান। শংকর দে রচিত যে সমস্ত কাব্যের খণ্ডিত ও পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গেছে সেগুলি হোল 'শীতলামঙ্গল কাব্যের' চারখানি পালা (লংকা পূজা, বিরাট জাগরণ পালা, নীলধ্বজ রাজার পূজা পালা, নিমা জগাতীর পালা), 'দিগ্‌বন্দনা', 'পঞ্চাননের গান', 'গঙ্গা-মঙ্গল', 'কামাক্ষ্যার গীত' ও 'কেস্যারার পালা।' এ ছাড়া 'রঘু দত্তের পালা' নামক একখানি বৃহৎ ও সম্পূর্ণ 'শীতলামঙ্গলের' পুঁথিও সদ্য পাওয়া গেছে।

অতিখ্যাত 'চণ্ডীমঙ্গল', 'মনসামংগল', 'ধর্মমঙ্গল' বা 'শিবমঙ্গল' কাব্যের কোন পুঁথি শংকর দে রচনা করেছিলেন কিনা তা অবশ্য জানা যায় নি।

মুসলমান শাসক মুর্শীদকুলি খাঁর সময় সমগ্র বাঙলাদেশকে ১৬৬০টি পরগণায় ভাগ করা হয়। ঘাটাল মহকুমার দক্ষিণাংশে ১০৪-১৯ বর্গমাইল এলাকার প্রায় ২০০টি গ্রাম নিয়ে চেতুয়া নামক একটি পরগণার সৃষ্টি হয়।* উত্তরে শিলাবতী ও দক্ষিণে কংসাবতী নদীবেষ্টিত ও সরকার মান্দারণের অধীন এই চেতুয়া পরগণার মধ্যবর্তী অংশের একটি গ্রামের নাম পশ্চিম মালিকা। এ গ্রামের পাশ দিয়ে গেছে কংসাবতী নদী। এই পশ্চিম মালিকা গ্রাম বর্তমানে তমলুক মহকুমার পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত। এটিই কবির পূর্ব নিবাস। কবির পূর্বপুরুষরা এ গ্রামে বসবাস করতেন। 'বিরাট জাগরণ' পালায় ভনিতায় কবি শংকর বলেছেন,—

'সংগ্রাম দেবের সুত
হরিদাস দেব খ্যাত
পশ্চিম মালিকা পূর্ববাস।
সুদাম দেব তার সুত
পুণ্যশ্লোক গুণযুত
তাহার তনয় কৃষ্ণদাস।
মাধবী জঠরে জন্ম
সদাচেষ্টা গান কর্ম
চেতুয়া কলাইকুণ্ডে স্থিতি।
কংসাবতী নদীতীর
পিয়ুস সমান নীর
যথা অধিষ্ঠান সরস্বতী।'

পরবর্তীকালে কবির পূর্বপুরুষ কেউ পশ্চিম মালিকার পূর্ববাস ত্যাগ করে ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানার কলাইকুণ্ড গ্রামে নতুন বাসস্থান নির্মাণ করেন। তবে ঠিক কত সালে যে কলাইকুণ্ড গ্রাম কবি শংকরের নতুন বাসভূমিরূপে স্থিরিকৃত হয় তা জানা যায় নি।

কবির পূর্বপুরুষরা গায়েনের কাজ করতেন। তাৎকালিক বর্ধমান রাজ ঐ গায়েন দলের সুকণ্ঠের গান শুনে কৃষ্ণদাস দে (কবির পিতা)-কে উপহারস্বরূপ প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেন। স্বভাবকবি শংকর পরবর্তীকালে দেবী সরস্বতী কর্তৃক স্বপ্না-দিষ্ট হয়ে 'শীতলামঙ্গল' কাব্য রচনা

* আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ আছে।

করেন। শীতলামঙ্গলের 'বিরাট জাগরণ পালা' কাব্যটিই তাঁর প্রথম সাহিত্যকীর্তি হিসাবে অনুমিত হয়। কবির নানা কাব্যের ভনিতা কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ—

(১) মাধবী জঠরে জন্ম
সাধা চেষ্টা গান কর্ম
বিরচিলা শীতলা মঙ্গল।
ব্রজমহলেরে দয়া
দিবে চরণের ছায়া
মহাদেবী চিন্তিবে কুশল।।

(২) যশোদানন্দনদির্বনারায়ণ
ফর্দি পণ্ডিত কবি।
তার অভিমত শঙ্কর রচিত
পীরের কদম সেবি।

(৩) চেতুয়ার শেষ খণ্ড
নিবাস কলাইকুণ্ড
যথা অধিষ্ঠান সরস্বতী।
শীতলার পদসেবী
কহেন শঙ্কর কবি
মায়ের চিন্তহ অন্ততি।।

(৪) নিবাস কলাইকুণ্ড
চেতুয়া পরগণা।
ব্রাহ্মণের পাদপদ্ম
সদাই ভাবনা।।
রচিল শঙ্কর কবি
শীতলা মঙ্গল।
হরিপ্রসাদ বসু বার
চিন্তামা কুশল।

কবি শঙ্কর নিজেও গায়েন হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। একদা তিনি গান করতে হাওড়া জেলার আমতা থানান্তর্গত কুলিয়া গ্রামের প্রখ্যাত জমিদার ঠাকুরদাস চৌধুরীর বাটিতে উপস্থিত হন। 'শীতলা-মঙ্গল' কাব্যের একটি ভনিতায় তিনি বলেছেন—

'পরগনা মণ্ডলঘাটে
ডাটোরার সন্নিকটে
কুল্যা গ্রামে মনোহর;
সেই কুল্যা গ্রামে বাস
চৌধুরী ঠাকুরদাস
পুণ্যশ্লোক দেবীর কিঙ্কর।।
তার পতিব্রতা নারী
মোরে পুত্র স্নেহ করি
দিলা নানা বস্ত্র অলঙ্কার।
শীতলা চরণ সেবি
কহেন শঙ্কর কবি
দেবি করে হল্য ধনাধর।।

রেশমের ফলাও ব্যবসা করে ঔরঙ্গ-জীবের আমল থেকে কুলিয়ার চৌধুরীরা জমিদারী ক্রয় করেন। সেকালে চৌধুরীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এঁরা জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের যথেষ্ট সমাদর করতেন। মঙ্গলকাব্যধারার আর এক বিস্মৃত-প্রায় কবি কৃষ্ণকিঙ্কর নিজ কাব্যে জমিদার ঠাকুরদাস চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র বাঞ্ছারাম চৌধুরীর নানা গুণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

কবি শঙ্করের কাব্য রচনার কাল সম্পর্কে নানা সন্দেহ প্রকাশের কোন অবকাশ নেই। বোধ হয় আগামী যুগের কিংশ ব্যক্তিদের নানা সমস্যামূলক মন্তব্যের কথা ভেবেই তিনি নিজ কাব্যমধ্যে সাল তারিখের সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। কোথাও কোন প্রচ্ছন্ন প্রহেলিকার আশ্রয় গ্রহণের কথা ভাবেন নি। 'লঙ্কাপুজা' পালার এক স্থানে তাঁর ভনিতা নিম্নরূপ ঃ—

'সন এগার চুয়াল্লিশ সালে
শুক্রবার সন্ধ্যাকালে
শুক্লপক্ষ ২৮ আশ্বিনে।
কাতরে শঙ্কর বলে
ঝড় বৃষ্টি মহীতলে
শীতলা সদয় সেইদিনে।।'

বাংলা ১১৪৪ সালের ২৮শে আশ্বিন তারিখে কবি শঙ্কর দেবী শীতলার স্বপ্না-দেশক্রমে এ কাব্য রচনা করেন। অর্থাৎ ১৭৩৮ খৃস্টাব্দের পার্শ্ববর্তী কালে শঙ্করের অন্যান্য কাব্যগুলি রচিত হয়। যাই হোক, অন্যান্য কাব্য অপেক্ষা তাঁর 'শীতলামঙ্গল' কাব্যই যে তাঁকে সমধিক খ্যাতি দান করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে অন্যান্য কাব্যগুলিও নানা গুণে সার্থক।

'শীতলামঙ্গল' কাব্যধারার প্রথম কবি হিসেবে এ পর্যন্ত কাশীযোড়ার রাজা রাজ-নারায়ণের সভাকবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তীই পরিচিত। তিনি ১৭৭৭ থেকে ১৭৮৩ খৃস্টাব্দের মধ্যে তাঁর বিখ্যাত 'শীতলা-মঙ্গল' কাব্যের বিরাট পালা ও গোকুল পালা রচনা শেষ করেন।[১] নিত্যানন্দের পূর্ববর্তী কোন 'শীতলামঙ্গল' রচয়িতার খোঁজ মেলে না। এক্ষেত্রে শঙ্কর যে 'শীতলামঙ্গল' কাব্যধারার প্রথম কবি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নিত্যানন্দের কাব্য রচনার প্রায় আটত্রিশ বছর পূর্বে শঙ্কর নিজ কাব্যসমূহ রচনা করেন। তাই উভয় কবির রচনাগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হলে বলা যাবে নিত্যানন্দই পূর্ববর্তী কবি শঙ্করের কাব্য রচনার আদব-কায়দা ও রীতি-প্রকৃতি অনেকাংশে গ্রহণ করে থাকবেন। অবশ্য শঙ্করের কাব্যে (১৭১২ খৃঃ রামেশ্বর ভট্টা-চার্যের শিবায়ন রচিত হয়) কবি রামেশ্বরের প্রভাব কিছু কিছু যে পড়ে নি তা নয়।

প্রাপ্ত, কবির 'কেস্যারার পালার' পুঁথি ১২৪২ সালে, 'লঙ্কাপুজা পালা' ১২৫৩ সালে, শীতলার জাগরণ পালা ১২৮৯ সালে, 'নীলধ্বজ রাজার পালা' ১২১০ সালে, 'বিরাট জাগরণ পালা' ১২৬৫ সালে, 'গঙ্গামঙ্গল' ১২০৭ সালে ও 'রঘুদত্তের পালা' ১১৯৮ সালে অনুলিখিত হয়। কয়েক খানি পুঁথিতে লিপিকরের নাম, সাল, স্থান উল্লেখ নেই। এগুলি কবির স্বহস্তে লিখিত বলে মনে হয়। কলাইকুণ্ড গ্রামে কবির বংশধরদের গৃহ থেকে এ জাতীয় পূর্ণ ও খণ্ডিত পুঁথিগুলি পাওয়া গেছে।

শঙ্করের 'গঙ্গামঙ্গল' কাব্যখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পাঁচালী জাতীয়। তবু কবি যেহেতু মঙ্গলকাব্য বলেছেন, আমা-দেরও তাই মত। স্বর্গ থেকে মর্তে গঙ্গা আনয়নের সাধারণ কাহিনীটি এতে বর্ণিত। 'শীতলামঙ্গল' কাব্যখানি মোট পাঁচখানি পালায় বিভক্ত। সমগ্র কাব্যের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৭। তুলটের জোড়া পাতায় সুন্দর হস্তাক্ষরে কাব্যখানি লিখিত। 'লঙ্কাপুজা' পালার প্রথম অংশে কবি দুঃখ করে বলেছেন,

'প্রথমের পুঁথিখানি রচিল্যাম যতনে।
গোপনে লইয়া তারে গেল কোনজনে।।
অনেক করিলাম চেষ্টা না হলা উদ্দেস।
দিনে চারি গীত তার রয়্যা গেল শেষ।।'

'শীতলামঙ্গল' কাব্যখানিই কবিকে যথার্থ সম্মান দিয়েছে। একথা আগেই বলেছি। একাব্য করুণ ও হাস্যরস বর্ণনে গার্হস্থ্য জীবনের বিচিত্রতায় ও কবির অলংকার চতুর কবিত্ব গুণে সার্থক। সর্বোপরি চৌষট্টি রকমের বসন্ত রোগের নাম ও অসংখ্য জ্বরের নাম কবি যেভাবে সংগ্রহ করেছেন তা থেকে তাঁকে চিকিৎসা বিদ্যাতেও যথেষ্ট পারদর্শী বলে মনে হয়। সমাজের সামগ্রিক বর্ণনায় কবি বলেছেন উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলেই স্ব স্ব অধিকারে সমাজে বসবাস করত। শঙ্করের বলিষ্ঠ কবিত্ব ও আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় পেয়ে বলা যায়, বিশ শতকের এই দশকে জন্মালে তিনি একজন উচ্চ স্তরের কথাসাহিত্যিক হতেন নিঃসন্দেহে।

'দিগ্বন্দনা' কাব্যখানি সম্ভবত পালা রম্ভের পূর্বে নানা দেব-দেবী ও গুরুজন-দের বন্দনা। মঙ্গলকাব্যের প্রায় সব কবিই এরূপ এক-একটি দিগ্বন্দনা কাব্য রচনা করে গেছেন। শঙ্করের এ কাব্যে হাওড়া হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার নানা খ্যাত-অখ্যাত আর্য-অনার্য দেবদেবী, নানা জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতবর্গ ও কবির গুরুস্থানীয় আত্মীয়-পরিজনদের বন্দনা পরিলক্ষিত হয়।

'পঞ্চাননের পালা' শীর্ষক কাব্যখানিতে কোন লিপিকারের নাম উল্লেখ না থাকায় এটিকে কবির স্বহস্ত লিখিত কাব্য বলেই মনে হয়। অনার্য দেবতা পঞ্চানন কিভাবে সমগ্র সমাজে পুজো পেতে শুরু করলেন তা এ কাব্যে বর্ণিত।

'কৈলাস পুজা' পালার একটি খণ্ডিত পুঁথিতে কবির পিতামহীর নাম মিলে ঃ—

'কৌশল্যা তনয় সুত রচিল মঙ্গল।
নিজ দাসদাসী গনে চিন্তিবে কুশল।।'

এবার ইতিহাসখ্যাত চেতুয়া পরগনার বৃহৎ অঞ্চলে কবি শঙ্করের শীতলা-মঙ্গলের জনপ্রিয়তা বর্তমান কালেও যথেষ্ট। তাছাড়া তাঁর 'কেস্যারার পালা' কাব্যখানির পুঁথি এখনও নানা গৃহে ভক্তির সঙ্গে পাঠ করা হয়। শুধু এ অঞ্চলে ছাড়াও বৃহত্তর বঙ্গের নানা অংশে শঙ্করের কাব্যের আরো পুঁথি ছড়িয়ে থাকা সম্ভব। নিবিড় প্রচেষ্টার পর শঙ্করের উপর সম্যক গবেষণার কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হলে এই অজ্ঞাত কবির সম্পর্কে আরো নানা তথ্য ও সেকাল বাংলার এক অজ্ঞাত অধ্যায়ের দ্বার উন্মোচিত হবে নিঃসন্দেহে।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (৫ম সং) আশুতোষ ভট্টাঃ পৃঃ ৭৯১।

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—৫ম বর্ষ পৃঃ ৩২—৭০।

কবির বংশধর শ্রীঅতুল দে গায়েন এ পুঁথিগুলির সন্ধান দিয়েছেন।

প্রদর্শনী

বিড়লা আকাদেমিতে সম্প্রতি সোসাইটি অভ কনটেমপোরারী আর্টিস্টস-এর সভ্যদের একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল।

বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক যে কথাটি এই প্রদর্শনী দেখার পর মনের মধ্যে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে, সেটি হল চিত্রকরদের সঙ্গে ও আধুনিক চিত্রকলার সঙ্গে চিত্রামোদী জনসাধারণের যোগাযোগ। এঁদের এবারকার প্রদর্শনীর সমস্ত ছবির যে সামান্য লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, তাকে বলা যায় প্রসাদগুণ, যে-গুণ থেকে সাম্প্রতিক চিত্রশিল্প বিশেষভাবে বঞ্চিত। ছবির মেজাজে, নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রতীকের পরিবর্তে সর্বজনস্পর্শবহ প্রতীকের ব্যবহারে, বর্ণ নির্বাচনে, এই প্রদর্শনীতে এই অত্যাধুনিক, গূঢ়গর্বী ও ব্যক্তিস্বরূপে অতিমাত্রায় বিশ্বাসী ক্রুদ্ধ তরুণ শিল্পীযূথ যেন ইচ্ছে করেই, জনতার কাছে না হোক, অন্তত রসপিপাসু কিন্তু অদীক্ষিত চিত্রামোদীর কাছাকাছি পৌঁছতে চেয়েছেন। তার ফলও পাওয়া গেছে হাতে-হাতে, ছবির বিক্রয়সংখ্যা সাধারণ গড়সংখ্যাকে সহজেই লংঘন করে গেছে। এমন কি শ্যামল দত্তরায়ের ছবি বিক্রি হয়েছে, কিনে নিয়ে গেছেন অচেনা শিল্পরসিক।

এই প্রদর্শনী থেকে কলকাতার সমস্ত তরুণ ও ক্রুদ্ধ শিল্পীর শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করি। বিশেষ করে কলকাতার কথা এই কারণে বলছি, যে দিল্লী ও বোম্বাইয়ের ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। সেখানে কৃত্রিম হোক না খাঁটি হোক, সাম্প্রতিক ছবির একটা বাজার তৈরী হয়ে গেছে। সেখানে ছবি বিক্রি হয়। ফ্যাশানের তাগিদে যেমন অনেক নিকৃষ্ট চোখ-ধাঁধানো ছবি বিক্রি হয়, তেমনি সেই সঙ্গে উৎকৃষ্ট ছবিও বিকোয় কিছু-কিছু। কিন্তু কলকাতা, ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতা সম্পর্কে চিত্রীদের চিরন্তন অভিযোগ, কলকাতায় চিত্রবেত্তা নেই, প্রদর্শনীতে জনসমাগম হয় না, রাশি-রাশি উৎকৃষ্ট ছবি অনালোচিত অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকে। ফলত অভিমানী শিল্পীরা বোদলেয়ারী ভ্রমে অভিভূত হয়ে কুকুরের সামনে মাংসখণ্ড ছুঁড়ে দেবার মতো করে প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। দর্শককে শিক্ষিত করবার চেষ্টা করেন না, তার চিত্রবোধ জাগাবার প্রয়াস পান না, দর্শক ও শিল্পীর মধ্যেকার দূরপনেয় দূরত্ব ঘোচাবার কোনই চেষ্টা করেন না। একেই তো চিত্রপ্রদর্শনীর কোন বিজ্ঞাপন দেবার চল নেই কলকাতায়। অতি নগণ্য কবিযশোপ্রার্থীও বই ছাপিয়ে অন্তত দুয়েকটি বিখ্যাত সাহিত্যসাপ্তাহিকে বিজ্ঞাপন ছাপায় কিন্তু চিত্রপ্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন শ'খানেক নিমন্ত্রণপত্র ও প্রদর্শনী চলাকালীন প্রেক্ষাগৃহের সামনের লাল শালুর ফেস্টুন কিম্বা একটি মাঝারী আকারের পোস্টারে সীমাবদ্ধ। পোস্টারটি নেহাৎ দিতে হয় তাই দেয়—যাতে কর্মহীন পথিক সহসা আকৃষ্ট হতে পারে। চিত্রকরদের মূলে উদ্দিষ্ট হলেন আমন্ত্রিত সেই শ'খানেক অতিথি—তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সংবাদপত্রের ও সাহিত্যপত্রিকার প্রতিনিধি, কিছু বিদেশী দূতাবাসের সদস্য ও কিছু প্রথিতযশা চিত্রকর, এবং শিল্পীর ব্যক্তিগত বন্ধুবান্ধব। এর বাইরে, সত্তর লক্ষের অধ্যুষিত এই মহানগরে, আর কেউ জানতেই পারেন না কোথায় কোন চিত্রপ্রদর্শনী হচ্ছে, বা হবে।

এবং দর্শকেরা স্বভাবতই নিরাসক্ত। তাঁরা জানতে পারেন না প্রদর্শনীর খবর, কদাচিৎ ভিতরে ঢুকে পড়লে, ছবি-বিষয়ক শিক্ষার অভাবহেতু যথার্থ রসগ্রহণ নিজের থেকে করতে পারেন না। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে পান না সহানুভূতি বা সদুত্তর। ফলত, স্রষ্টা ও ভোক্তার মধ্যে ব্যবধান থেকেই

ঝিনুকের দুর্গা প্রতিমা

এবারের দুর্গোৎসবে এমন একটি শিল্পনিদর্শন চোখে পড়ে, যা সাম্প্রতিক শিল্পকর্মে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সংঘমিত্রর ঝিনুকের অর্ধনারীশ্বর দুর্গামূর্তি কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এ মূর্তিটি নির্মাণ করেছেন তরুণ প্রতিভাবান শিল্পী শ্রীঅমল কুণ্ডু। পুজোর সময় পশ্চিমবাংলার লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী এ মূর্তিটি দেখেছেন। যাঁরা সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তাঁরা নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে যাদুঘরের কলা-বীথিকার এক নতুন পরিবেশে মূর্তিটি দেখতে পাবেন।

চলে। চিত্রকরেরা, দর্শকসাধারণের প্রতি অভিমানে, শুধু তেমন ছবিই প্রদর্শনীতে উপস্থিত করেন যেগুলি বিশেষভাবে দুর্বোধ্য বা কখনো-কখনো মনে হয় খানিকটা ইচ্ছাকৃতভাবেই দর্শককে আঘাত করবার জন্যই নির্বাচিত। এই প্রদর্শনীতে বিকাশ ভট্টাচার্য পুরোন্দরের বস্তবানুগ প্রথায় পুরোনো ঢং-য়ে আঁকা দুটি ছবি দিয়েছেন, সে দুটি বিশেষভাবে দর্শকের প্রশংসা অর্জন করেছে। অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ততদূর প্রধানুগভাবে না আঁকা হলেও শীতলতার গুণে আদৃত হয়েছে। এমন কি সুনীল জানা পর্যন্ত চিত্র নির্বাচনে প্রসাদগুণের প্রতি আনুকূল্য দেখিয়েছেন। এর ফলে অভিজ্ঞ দর্শকের কাছে এই প্রদর্শনী এক বহুকাঙ্ক্ষিত সমতলভূমির এফেক্ট সৃষ্টি করেছে, এবং অদীক্ষিত দর্শকের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।

কলকাতার দর্শককুল নিঃসাড় নন, বা সংখ্যাতেও নন আঙ্গুলীমেয়। চিত্রীকে তাঁর প্রাপ্য শ্রদ্ধা দিতে তাঁরা প্রস্তুত আছেন, কিন্তু পরিবর্তে তাঁরাও দাবি করতে পারেন ন্যূনতম মনোযোগ। তাঁরা চান, প্রদর্শনীর জন্য ছবি নির্বাচন করার সময়ে শিল্পী বিদগ্ধ রসজ্ঞ ও সমব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁদের কথাও স্মরণে রাখবেন। প্রদর্শনীতে এসে তাঁরা সংগত কারণেই দাবি করতে পারেন শিল্পীর অভিনিবেশ। এবং সর্বোপরি, কোথায় কখন কার প্রদর্শনী হচ্ছে, তা তাঁরা জানতে উৎসুক।

চিত্রশিল্পীদের চেয়ে কবিদের কতগুলি মৌল সুবিধে আছে। চিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ, কবিতা সহানকালাতীত। ছবির প্রিন্ট থেকে ছবিকে পাওয়া যায় না, কিন্তু কবিতা দ্রুতহাতে টুকে নিলেও তার রস অবিকৃত থাকে। এবং দীর্ঘকালের সংগ্রামের ফলে কবিদের পথ এখন অনেক মসৃণ ও প্রশস্ত হয়ে গেছে। তদুপরি, অক্ষর-পরিচয় হলেই কবিতা পড়া যায়, কিন্তু লাল নীলে ভেদ-জ্ঞান থাকলেই ছবি জানা যায় না। এগুলি খুব গোড়ার কথা, কিন্তু দেখেছি অনেক শিল্পী সাহিত্য সম্পর্কে একটা নাতিগোপন প্রতিযোগিতার মনোভঙ্গী পোষণ করেন। এই মনোভাব সম্পূর্ণ অবাস্তব—ছবি ও কবিতায় কোন প্রতিযোগিতা চলে না। কলকাতাবাসী সাম্প্রতিক তরুণ চিত্রকরকে দর্শক ভোলাতে হলে এই বাস্তব সত্যগুলো যা প্রায় তথ্যের মতো নিরঞ্জন, এদের নিয়ে ভাবতে হবে। এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে। এবং সৎভাবে চেষ্টা করলে সমাধান যে খুব দুরূহ নয়, তারই প্রাসঙ্গিক উদাহরণ এই আলোচ্য প্রদর্শনী।

সুনীলকুমার নন্দীর প্রদর্শনী

সম্প্রতি চারুকলা ভবনের পশ্চিম গ্যালারীতে সুনীলকুমার নন্দীর অঙ্কিত চিত্রের একটা প্রদর্শনী হয়ে গেল। চিত্রে সুপ্রযুক্ত রঙের বর্ণালী দর্শকদের মনকে ক্ষণকালের জন্য নিষ্করুণ বাস্তব জগৎ থেকে আনন্দলোকে উত্তরণ করে।

একই সঙ্গে হাল্কা ও গাঢ় র বিস্ময়কর প্রয়োগ নৈপুণ্য মনে এমন অনাবিল আনন্দ পরিবেশন করে যে, হয় যেন আমরা কল্পলোকে বিহার ক যেখানে নেই এই বিষাদখিন্ন জগতের দ টুকুও। শ্রীনন্দী নির্ধারিত কয়েকটি র মধ্যে চিত্রগুলিকে সীমিত না নির্বাচিত করেছেন নানা রঙ স্বাধীনভ

তাঁর 'কল্পনারশ্মি' (৫) শান্ত-সমা ভাবের দ্যোতক। যা আমাদের মনকে আ করে এমন জগতে নিয়ে যায় যেখানে সুন্দর আর সুন্দর। আবার বাস্ত আদলে অঙ্কিত 'বাতায়ন পাশে' (৯) ত যেন চিত্তাকর্ষক। এতে এমন ব্যবহার করা হয়েছে যেন ব ছাট এসে পড়ছে জানলার কাচে। 'প্রকৃ বুকে' (৮) চিত্রটি দেখলে মনে পড়ে প্রকৃতির নির্জন অরণ্যচারিণী শকুন্তলাকে

ঝাপসা ও অস্পষ্ট চিত্র দুটি স ফুটে উঠেছে। 'আত্মার গহ্বরে' (৩) চি এতে প্রকাশ পেয়েছে অনির্বচনীয় শৈ দক্ষতা ও সূক্ষ্ম তুলির টানে অ পশ্চাৎপটটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে শ্রীনন্দীর পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতা প্র পেয়েছে 'ছন্দ' (১৩), 'স্মৃতি' (২) 'প্রসাধন' (১৪) প্রভৃতি চিত্রে।

তাঁর 'ঐকতান' (১৮) ও 'এরে রিয়াম' (১৯) চিত্র দুটিও অভিনব। তিনি কাগজে ব্যবহারযোগ্য তেলরং প্র করেছেন। কাগজে যে শিল্পচাতুর্য দেখিয়েছেন তা স্মরণযোগ্য, এবং কল্পন প্রসারিত করতে সাহায্য করে।

—চিত্ররসি

ওরিগামি

ছোটোবেলায় খাতার পাতা ছিঁড়ে নৌকো বানাননি এমন কেউ আছেন? তারপর রকেট, এয়ারোপ্লেন—এসবও নিশ্চয়ই করেছেন। কিন্তু শুধু কাগজ ভাঁজ করে কত রকমের চেহারার জিনিস বানাতে পারেন—সেটা কখনো ভেবে দেখেছেন কি? মনে হতে পারে, কাগজ ভাঁজে আর কী-ই বা পাওয়া যাবে, শুধু সরলরেখায় আব কটা জিনিসের বাইরের আকৃতিটুকু আসবে! জাপানের প্রথাগত শিল্পকর্ম ওরিগামি দেখার পরে আর এ-কথা বলতে পারবেন না। কত রকমের পশু, পাখি, ফুল, কত পেশার মানুষের আকৃতি যে শুধু ভাঁজ করে করা যায় তা না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না।

মনে রাখবেন, ওরিগামি মানে কাগজ ভাঁজ। আপনার দশটা আঙুল হলো যন্ত্র, চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ একটুকরো কাগজ হলো মাধ্যম, উপায় হচ্ছে ভাঁজ। টয়েনবি একবার বলেছিলেন, বাঁদরের পক্ষে দু-পায়ে হাঁটার মতোই মানুষের পক্ষে চিন্তা করা চেষ্টাসাধ্য ব্যাপার। স্কুলে তো নিশ্চয়ই জ্যামিতি পড়েছেন, সরলরেখা কাকে বলে নিশ্চয়ই মনে আছে। এখন একটু ভেবে দেখুন তো, যখন একটা চিঠি ভাঁজ করেন, তখন মধ্যের ভাঁজটা কাগজের ধারের সঙ্গে সমান্তরাল না হলেও, সরলরেখায় ভাঁজ না হতে পারে কি? এই রকম আড়াআড়ি, সোজাসুজি ভাঁজ করে সবরকমের দ্বিমাত্রিক ছবি অর্থাৎ শুধু দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে এমন জিনিস করা যায়। অর্থাৎ পেন্সিল, পেন বা তুলি দিয়ে দাগ না কেটে শুধু ভাঁজের দাগ দিয়ে অনেক ছবি তৈরি হয়, দেওয়ালের চুণ-বালি খসে গেলে যেমন অনেক ঐতিহাসিক-প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

এটা কি ওরিগামি হলো? দ্বিমাত্রিক জায়গায় ত্রিমাত্রিক মূর্তি করাটা এমন কোনো ব্যাপার নয়, ছবি আঁকার ব্যাপারে একটু ধারণা থাকলেই করতে পারবেন। কাঁচি বা ব্লেড দিয়ে কাগজ কেটেও চমৎকার ছবি আসবে। কিন্তু ত্রিমাত্রিক মূর্তি তৈরি করাটা অত সহজ নয়। ফর্ম সম্বন্ধে ধারণা থাকলেই ওরিগামি করা যায় না। এর নিজস্ব জ্যামিতি আছে এবং তা দিয়ে একটা ৪"×৪" কাগজ থেকে একটা চড়ুই পাখি বানানো যাবে যেটা দু পায়ে ভর দিব্যি ভারসাম্য বজায় রেখে দাঁ থাকবে। কালো পিঁপড়ে থেকে প্রাগৈ হাসিক জন্তু টিরানোসরাস রেক্স বেরিয়ে আসবে ভাঁজে ভাঁজে।

কাগজ নির্বাচনের ওপর অবশ্য মডে সৌন্দর্যের অনেকখানি নির্ভর করে। ধ জিরাফের মডেলগুলো। কোনো রঙ ব্যব করা হয়নি, শুধু নানা রঙের চৌখু কাটা ডেকরেটিভ পেপার দিয়ে জি পরিবার তৈরি হয়েছে। এদের চোখ নেই বটে, তবে পেছনের জিরাফটার নুইয়ে পেছনের পা-দুটো বিরাট ফাঁক পাতা খাওয়ার মধ্যে দিয়ে একটা আ জীবন্তভাব আনা হয়েছে। প্রত্যেকটা জি পিছু পঞ্চাশ-ষাটটা ভাঁজ লেগেছে।

ব্যাপারটা এমন নয় যে, ওরিগ করতে বিশেষ ধরনের কাগজ লাগে অবশ্যই জাপানে অদ্ভুত ভালো ওরিগ পেপার তৈরি হয়, যার বৈশিষ্ট্য হলো ভ করলে আস্তে আস্তে খুলে আসবে বেশ শক্ত হয়ে পাটে পাটে লেগে থাক খবরের কাগজ দিয়ে করতে গেলে এর ক

একটু অসুবিধে হবে, কিন্তু একটু মোটা ধরনের কাগজ, যেমন ধরুন সানলিট কভ পেপার (যে-কোনো কাগজের দোকানে পাওয়া যায়) দিয়ে চমৎকার মডেল হবে। দোকান থেকে বই কিনলে যে ব্রাউন পেপারে বইটা মুড়ে দেয়, তা দিয়ে সুন্দর বাঘ-সিংহ বানানো যায়।

অল্প, অর্থাৎ আট-দশটা ভাঁজে তৈরি করা যায় ঘরগেরস্থালীর জিনিস, যেমন কাপ আর হরেক রকমের পাখি, উইণ্ডমিল, ইত্যাদি। আরেকটু বেশি ভাঁজ আর কৌশলে তৈরি হয় হাতি, খরগোস, সিংহ, ময়ূর (আর কেউ কেউ দাবি করেন), সোনালো পাখি। (অস্কার ওআইল্ড-এর গল্পটা মনে আছে?)

ওরিগামির জ্যামিতির মূল জিনিস দু ধরনের ভাঁজ—আপনার কনুই থেকে হাতটা ভাঁজ করে নিজের দিকে নিয়ে আসার ভাঁজকে বলে ঢাকনি-বন্ধ ভাঁজ, ইংরিজিতে ভ্যালি ফোল্ডের ঠিক উল্টো ভাঁজ, অর্থাৎ একটা কব্জাওয়ালা স্যুটকেশের ঢাকনি খুললে ঢাকনিটা যেমন পেছনে চলে যায়, তাকে বলে ঢাকনি-খোলা ভাঁজ, মাউণ্টেন ফোল্ড। এই দু ধরনের ভাঁজ মিলিয়ে নানান ভাঁজে চলতে চলতে আসবে নানা জাতের ভিৎ, যার এক নম্বর হলো পাখির ভিৎ, বার্ড বেস। এই ভিৎ থেকেই তৈরি হয় সবরকমের পাখি ছাড়াও সিংহ, ঘোড়া, বেড়াল ইত্যাদি অনেক চতুষ্পদ।

এখন জাপান, স্পেন, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও আর্জেণ্টিনায় ওরিগামির রমরমা—একেবারে কিণ্ডারগার্টেন স্তর থেকে শেখানো শুরু হয় ভাঁজের বিচিত্র লীলা। এখন তো ওরিগামি করে তৈরি হচ্ছে জগদ্বিখ্যাত ছবিগুলির ত্রিমাত্রিক রূপ—উইসলার-এর মা ছবিটা দেখে থাকলে একবার র‍্যাণ্ডলেটের 'সিক্রেট অব ওরিগামি'তে তার ওরিগামায়িত ছবিটা দেখে নেবেন।

বেশ উৎসাহ পাচ্ছেন তো? এবার তাহলে নেমে পড়ুন ওরিগামি করতে। দেখুন : ওয়ার্লড অব ওরিগামি। কাসাহারা। জাপান পাবলিকেশনস ট্রেডিং কোম্পানি।

সিক্রেটস অব ওরিগামি। রবার্ট হার্বিনস। ওল্ডবর্ন প্রেস।

কলকাতায় একটি ভাঁজ করিয়ে সংস্থা রয়েছে ইণ্ডিয়ান ওরিগামিস্ট। বাগবাজারে পুজোর সময় এঁরাই একটি চমৎকার প্রদর্শনী করেছিলেন। এঁরা প্রায়ই গেয়ে থাকেন :

উৎসাহ থাকে যদি অবিরত চা-পানে
দল বেঁধে চলো যাই অরুণোত্ত জাপানে।
পাটে পাটে ভাঁজ করো, ভাঁজে ভাঁজে পাট
বয়স হোক না কেন আট, দশ, ষাট,
হও তুমি কাঁচ খোকা, রও রোগী হাঁপানে!

—শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অঙ্গনা

উপহারে নতুন চিন্তা

পাশের বাড়ির মিঠুর জন্মদিন। এ বাড়ির অপর্ণার নেমন্তন্ন। নেমন্তন্ন পাবার পর অপর্ণার ভাবনা জন্মদিনে মিঠুকে কি উপহার দেওয়া যায়। চেনা-জানা সকলের কাছে সে এই কথা জানতে চেয়েছে। চেয়েছে তাঁদের পরামর্শ। সবাই প্রায় সেই বাঁধা গতের উপহারের কথা বলেছেন। জামা-কাপড়, লজেন্স-টফির বাক্স অথবা টেবিল ল্যাম্প। কেউ কেউ বলেছেন খেলনার কথা। আবার দু-একজন পরামর্শ দিয়েছেন যদি সামর্থ্যে কুলোয় তবে একগাছি সরু সোনার চেন, নিদেন একটি আংটি। অপর্ণা সবার কথা মন দিয়ে শুনেছে। কিন্তু কোন পরামর্শ তার মনঃপুত হয়নি। এদিকে সে নিজেও কিছু ঠিক করতে পারছে না। সে শুধু ভাবছে এমন কিছু একটা উপহার দিতে হবে জন্মদিনে সচরাচর যা কেউ দেয় না। নেমন্তন্ন পাবার পর এরকম চিন্তা প্রায় সবাই করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সেই বাঁধা গতের উপহার। আন্তরিকতার অভাব না থাকা সত্ত্বেও নতুন কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। অপর্ণাও তেমনি নতুন কিছু উপহারের কথা ভাবছে। তবে চিন্তা করে কোন কুলকিনারা পাচ্ছে না।

অপর্ণারা এবাড়িতে নতুন এসেছে। মিঠুর মায়ের সঙ্গে প্রথম থেকেই ঘনিষ্ঠতা। সেই সুবাদে মিঠুও তাকে খুব ভালবাসে। বছর নয়েক বয়স মিঠুর। মা-বাবার একমাত্র সন্তান। ক্লাশ ফাইভে পড়ে। পাড়াপড়শীদের কাছে অপর্ণা শুনেছে যে, মিঠুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে বেশ সমারোহ হয়। অনেক লোকের সমাগম ঘটে। উপহারে উপহারে মিঠুর প্রায় ডুবে যাওয়ার অবস্থা হয়। সে আরো শুনেছে যে, মিঠুর মা-বাবা সারা বছরে এই দিনটির পথ চেয়ে থাকেন। তাই অপর্ণার আরো ভাবনা উপহারটা যাতে খুব জুতসই হয়, ভিড়ের চাপে যেন হারিয়ে না যায়।

এরকম সাত-পাঁচ ভাবনা নিয়ে অপর্ণা একদিন একজন বন্ধু নিয়ে উপহার পছন্দ করতে বেরল। এ দোকান সে দোকান ঘুরতে লাগলো। প্রায় সব দোকানেই বাচ্চাদের জন্মদিনের নানা জিনিস তাকে দেখানো হলো। কিন্তু সবই গতানুগতিক। কোনটাই অপর্ণার মনে ধরে না। কোন কোন দোকান-দার তো বলেই বসলেন, বাচ্চাদের দেবার মত এর বিকল্প আর কিছু নেই। অপর্ণা সব শোনে। আবার এক দোকান ছেড়ে আরেক দোকানে ঢোকে। ইতিমধ্যে তার বন্ধু বিরক্তি প্রকাশ করে। অপর্ণা একটু লজ্জিত হয়। তারপর কিছু না কিনেই চলে আসে।

বাড়িতে এসে অপর্ণা আবার ভাবতে বসে। মিঠুর জন্মদিনের উপহারের ভাবনা তাকে ভীষণভাবে পেয়ে বসেছে। যতক্ষণ পছন্দসই জিনিসটা কেনা না হচ্ছে ততক্ষণ তার সোয়াস্তি নেই। কিন্তু কেনা তো দূরের কথা কি কিনবে তাই এখনো ঠিক করতে পারছে না। ভাবতে ভাবতে অপর্ণার মনে পড়ে মিঠু প্রায় তাকে ছড়া শোনায়। এরকম অবশ্য সব ছেলেমেয়েরাই শোনায়। বিশেষ যারা মা-বাবার আদুরে। আর মিঠুর ক্ষেত্রে তো আদরের প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, তাকে নিয়েই তার মা-বাবার সংসার। তবে সে মিঠুর এবছরের প্রোগ্রেস রিপোর্ট দেখে বুঝেছে যে পড়াশোনায় মেয়েটি বেশ ভাল। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় একটা চিন্তা খেলে যায় মিঠুর জন্মদিনে ছড়া-ছবি আর গল্পের বই উপহার দিলে কেমন হয়। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সে আবিষ্কারের আনন্দে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে। পাশের ঘরে ছিলেন অপর্ণার মা। তিনি এই ঘরে এসে মেয়ের কান্ড দে তো অবাক। তিনি ভাবলেন, মেয়ের ব কিছু হলো। তিনি প্রায় চিৎকার কর যাবেন এমন সময় অপর্ণা মায়ের হাত চে ধরে বললো, মিঠুর জন্মদিনের উপহা জিনিস খুঁজে পেয়েছি। তবে তা এক্ষ বলবো না। যথাসময়ে দেখতে পাবে। এবার মেয়ের কথায় খুশি হন। এজন্য অপর্ণা তাকে কম জ্বালাতন করেছে। চবি ঘন্টা কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান, মা এ কিছুর নাম কর না যা দিলে বেশ ন হবে। তিনি অনেক নাম করেছেন কি অপর্ণার পছন্দ হয়নি। শেষে মে পাগলামিতে তিনিও বিরক্তি প্রকাশ কর শুরু করেছিলেন। যাক, কাঁধ থেকে এ বোঝা নামলো। মা বেশ খুশিমনেই রান্নাঘ ঢুকলেন।

মিঠুকে বই দেওয়ার কথাটা অপ আবিষ্কারের মতো মনে পড়লো বটে কি একটু পরেই যেন মুষড়ে পড়লো। পাশ পাশি আর একটা ঘটনা তার চো সামনে ভেসে উঠলো। অপর্ণা কলেজে প তখন। ওদের এক বন্ধুর দিদির বিয়ে। ক কয়েকজনের নেমন্তন্ন হলো। সেদিনও এ একই সমস্যা দেখা দিয়েছিল বিয়েতে দেওয়া যায় সেই নিয়ে। এক-একজন এ একরকম কথা বলেছিল। কেউ বলেছি প্রেসার কুকার। কেউ বা কাশ্মিরী কা জিনিসের কথা, আর একজন বলেছিল গয় কথা। এর কোনটাই অপর্ণার মনে ধরেনি সে বলেছিল বইয়ের কথা। তখন সবেম পরশুরামের রচনা সংকলন বেরিয়েছে। নির্দোষ মনে সমস্ত সেট উপহার দেয় কথা বলেছিল। সকলের গুরুগম্ভী প্রস্তাবের সামনে অনেকটা মুখ ফস্কে কথাটা তার বেরিয়ে এসেছিল। সঙ্গে সং একজন ফোঁশ করে উঠলো তোর য আজগুবি বুদ্ধি। বিয়েতে আবার উপহার দেওয়া যায় নাকি! আর একজ বলেছিল, ঠিক আছে আমাদের জানা রইলে তোর বিয়েতে আমরা সব রচনাসম্ভা উপহার দেব। তীব্র আক্রমণের মুখে অপ

চুপ করে গিয়েছিল। যেন বইয়ের কথা বলে সে গুরুতর অপরাধ করে ফেলেছে।

সেদিনের সেই কথা অপর্ণার আজ আবার মনে পড়লো। একটু দ্বিধাও দেখা দিল। উপহার দেখে সবাই যদি নাক সিঁটকায়। তাই সে ভাবলো এ সম্বন্ধে আরো দু-একজনের সঙ্গে কথা বলে নেবে।

একটু পরেই সে মায়ের কাছে রান্নাঘরে গিয়ে বসলো। মা তাকে দেখে বললেন, কিরে তুই যে হঠাৎ রান্নাঘরে, রান্নাবান্না শিখবি নাকি? মায়ের কথায় অপর্ণা হাসলো। কি বলবে সে ঠিক করতে পারছে না। প্রথমেই যদি মায়ের কাছে প্রস্তাবটা নাকচ হয়ে যায় তবে তো আর কারো পরামর্শ নেবার জো থাকবে না। খানিকটা আমতা আমতা করে সে বললো, মা, তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করতে এলাম। কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটু ভেবেচিন্তে উত্তর দিও। মা অধৈর্য হয়ে বললেন, আগে তোর কথাটা কি তাই শুনি না। অপর্ণা বলে, সেটা তোমায় বলতেই তো এলাম। এবার সে আসল কথাটা বলে, আচ্ছা মা, মিঠুর জন্মদিনে যদি আমি ছড়া-ছবি আর গল্পের বই দিই তো কেমন হয়। অপর্ণার মুখ থেকে কথা পড়তে না পড়তে মা সেটা লুফে নিলেন। বইয়ের চেয়ে ভাল উপহার আর কি হতে পারে। তুই যে এরকম একটা কিছু ভাবছিস তা আমি আগেই আঁচ করতে পেরেছিলুম। আমারও ইচ্ছে ছিল বইয়ের কথা বলি। কিন্তু তোরা আজকাল-কার মেয়ে যদি বইয়ের কথা মনে না ধরে সেজন্য বলিনি। তারপর তিনি বললেন, হ্যাঁরে খুকি তুই কি ভুলে গেছিস যে ছেলে-বেলায় তোকে কত বই আমি কিনে দিতাম। অপর্ণা বলে সেকি ভোলার কথা মা। প্রতি পুজোয় নতুন জামা-কাপড়ের সঙ্গে নতুন বই তুমি আমায় কিনে দিতে। তোমার কাছ থেকে এমন শিক্ষা পেয়েই তো আমি সব ব্যাপারে বই উপহার দেওয়ার কথা ভাবি। অন্যকিছু আর মনে ধরে না।

এবার মা বললেন, আর আমি এশিক্ষা পেয়েছিলাম আমার বাবার কাছ থেকে। আমার বাবা বলতেন ছেলেমেয়েরা এমনিতে পড়াশোনা করতে ভালবাসে না। খেলা-ধুলা ছেড়ে পড়ায় ওদের মন বসানো দায়। তাই পড়ায় যাতে ওদের অনুরাগ আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার এবং সে ব্যবস্থা মা-বাবাকেই করতে হবে। মাঝে মাঝেই বাবা তাই আমাদের বই কিনে দিতেন। পুজোর সময় নতুন জামা-কাপড়ের সঙ্গে তো বটেই। সেদিন বাবার কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি তোকে আমি তাই শিখিয়েছি। পড়া আর জানার আগ্রহে আমি কখনো ক্লান্ত হই না। অথচ দেখবি পড়া-শোনার কথায় আমাদের ছেলেমেয়েরা কি ভীষণ ভয় পায়। যেন জুজু দেখে। এজন্য দায়ী আমরাই। ছেলেমেয়েদের পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলি না। অথচ একটা কথা অনেকের মুখেই শোনা যায় যে, ছোটদের জন্য ভাল বই বাংলায় লেখা হচ্ছে। একসময় তো ছোটদের জন্য কত বই লেখা হতো। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী আর সুকুমার রায় তো ছোটদের জন্যই লিখেছেন। এরকম ঐতিহ্য থাকতেও সে ধারাটি হঠাৎ শুকিয়ে যাবার কারণ নিশ্চয়ই আছে। সবাই ছোটদের ছেড়ে বড়দের মুখ চেয়ে লিখছেন। একে ছোটদের জন্য লেখা যেমন পরিশ্রমসাধ্য তায় বইও তেমন বিক্রি হয় না। যাঁরা অভিযোগ করেন তাঁরা বই কেনেন না। আমাদের যদি নিয়মিত ছোটদের জন্য বই কেনার অভ্যাস থাকে তবেই লেখকরা তাগিদ পাবেন নতুন ভাবনায় কলম ধরতে। আর এ তো খুবই স্বাভাবিক যে। চাহিদা থাকলেই যোগান থাকবে। তাই এই অভ্যাসটি আমাদের গড়ে তুলতে হবে।

মায়ের কথা যেন আর ফুরোতে চায় না। তিনি একনাগাড়ে বলে চলেন, ইংরাজিতে ছোটদের জন্য কত বই পাওয়া যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল সব বিষয়ে ছোটদের বই আছে। আমাদের অবশ্য এত বই নেই। তবে আমরা রামায়ণ-মহাভারত দিয়ে শুরু করতে পারি। এ দুই মহাকাব্যের তো ছোটদের খুব ভাল সংস্করণ আছে। গল্প-ছড়াও আছে। আর ইদানিং কিছু কিছু লেখাও হচ্ছে। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি আর অলিম্পিক নিয়ে বাচ্চাদের জন্য কত সুন্দর সুন্দর বই লেখা হতে পারে। আসলে আমরা চাই না বলেই লেখা হচ্ছে না।

তাছাড়া আর একটা জিনিস মনে রাখা দরকার। আমাদের সময়ে আর তোদের সময়ে বিস্তর তফাত। এখন পড়ার আর জানার জিনিস অনেক বেড়েছে। বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কার ঘটছে। মর্তসীমা ছাড়িয়ে মানুষ চাঁদে পাড়ি দিচ্ছে। এসব কথা গোড়া থেকেই ছোটদের জানিয়ে রাখা দরকার। তাহলে ভবিষ্যতে আরো আগ্রহ বাড়বে। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ভূগোল আর ইতিহাস নিয়ে সুন্দর সুন্দর বই লেখাও শুরু। এভাবে প্রায় আমাদের সব চাহিদাই মিটবে।

তোকে আর বেশিক্ষণ আটকাবো না খুকি। ছোট্ট একটা গল্প বলেই তোকে ছেড়ে দেব। তো ন' মাসিমা বিলেত থেকে এসে আমাকে গল্পটি বলেছিলেন। লণ্ডন থেকে সে পাশাপাশি আর একটি জায়গায় গিয়েছিল। গিয়ে তো মহা বিড়ম্বনা। কিছুই জানে না, চেনে না। এমন সময় পরিচয় হলো এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে। তোর ন' মাসিমা ভারতীয় শুনে তো ভদ্রমহিলা মহা খুশি। তারপর তিনি একে একে তার দেশের সব পরিচয় দিলেন। ইতিহাস থেকে ভূগোল পর্যন্ত। সব দর্শনীয় স্থান ঘুরিয়ে দেখালেন। তোর ন'মাসিমা ভেবেছিলেন যে, ভদ্রমহিলা সম্ভবত স্কুলের শিক্ষিকা হবেন। না হলে ইতিহাস-ভূগোল এত সুন্দর বলবেন কোত্থেকে। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে জানতে পারলো যে, তিনি এক অফিসের স্টেনো। এর বেশি কিছু নয়। একবার ভেবে দেখ খুকি, ওদেশের একজন অফিস স্টেনোর পক্ষে যা সম্ভব আমাদের কতজনের পক্ষে তা সম্ভব? আমাদের দেশে এমনও কেউ কেউ আছে যারা ঠিক ঠিক দেশের সীমা বলতে পারবে না।

তাই পড়া আর জানার অভ্যাস ছোট-বেলা থেকেই গড়ে তোলা দরকার। তুই মিঠুকে বই দিবি শুনে আমার দারুণ আনন্দ হচ্ছে। জন্মদিনে এরচেয়ে ভাল উপহার আর কিছু হতে পারে না। আর সেই সঙ্গে তোকে দেওয়া আমার শিক্ষাও সার্থক হলো।

—প্রমীলা

রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কী সম্পর্কে আজকের একটি প্রশ্ন

সুবোধ বসু

রবীন্দ্রনাথের গান জনপ্রিয় হবার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি প্রশ্নও দেখা দিয়েছে। তা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গান সঠিক সুরে, বিশুদ্ধ রীতিতে গাওয়া হচ্ছে কিনা। জনপ্রিয়তার সঙ্গে এ সমস্যার সম্পর্ক কতটা বা শিল্পীদের ব্যক্তিগত সাফল্য, ব্যর্থতা বা রুচির প্রশ্ন কতটা জড়িত তা ভেবে দেখার সময় বোধহয় এসেছে।

কবির মৃত্যুর পর ত্রিশ বছরেরও বেশী সময় পার হয়ে গেছে। কবির জীবিত অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের গান শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী, কিছু রবীন্দ্রভক্ত শিল্পী এবং কলকাতায় কিছু পরিবারের ড্রয়িং রুমে সীমাবদ্ধ ছিল। আজ সেই গান ড্রয়িং রুমের চৌহদ্দি পেরিয়ে বাঙালীর এক বৃহৎ অংশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

গোড়ার আমলে কবির জীবৎকালে কবির গান বিকৃত সুরে গাওয়া হত এ অভিযোগ কবির মুখেই শোনা গিয়েছিল। কবি সেই সঙ্গে গান গাইবার রীতি বা ঢঙ কি হবে তা নিয়েও নানা মতামত প্রকাশ করেছেন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। যেহেতু তান গাইবার রীতি অংকশাস্ত্র নয়, তাই সঠিক গায়কী কি তা প্রমাণ করার জন্য নমুনা হাজির করা দরকার। যাতে তুলনা করা সম্ভব হয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবিত অবস্থায় যেভাবে তাঁর গান গাওয়া হত সেটাই তাঁর গানের সঠিক গায়কী ধরে নেওয়া যায় কি? ফিল্ম, রেডিও, রেকর্ডে কবির গান প্রচারিত হয়েছে কবির জীবদ্দশাতেই। কিন্তু রেকর্ড-রেডিওর গান সম্পর্কেও কবির ক্ষোভ ছিল। রেকর্ডে কবির পরিবারের যাঁদের গান আজও আমরা শুনতে পাই বা রেকর্ডে কবির স্বকণ্ঠে যে গান আমরা শুনোই সেই ঢঙটিকেই কি রবীন্দ্রনাথের গানের সঠিক গায়কী ধরে নিতে হবে? কবির জীবদ্দশাতে নামী ওস্তাদের কণ্ঠেও তাঁর গানের রেকর্ড আমরা শুনেছি। তিনি রবীন্দ্রনাথের গানে তান ব্যবহার করেছেন। অন্যান্য শিল্পীদের রেকর্ডের গানের সুর কবির গানের সুরের থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। এ থেকেই বোঝা যায় কবির জীবদ্দশাতে তাঁর গানের রেকর্ডের উপর কবির কোন অধিকার ছিল না। পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড এবং স্বরলিপি বিভাগের দৌলতে এ নৈরাজ্য অনেকাংশে কমেছে। কিন্ত নৈরাজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছে একথা জোর করে আজও বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের গানের জনপ্রিয়তার পিছনে যেসব কারণ কার্যকরী হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা দরকার। কবির গানের আবেদন কবির সাহিত্য রচনার চেয়ে কম নয়। তবু রবীন্দ্রনাথের গান জনপ্রিয় হবার পিছনে বহু শিল্পী ও রবীন্দ্রনাথের গানের সাধকের অবদান আছে। কবির পাশে থেকে তাঁর গানকে স্বরলিপিতে বেঁধে রেখেছেন---শিল্পীদের গলায় সে গান তুলে দিয়েছেন। অথচ, সেইসব গুণী মানুষগুলি অলক্ষ্যেই রয়ে গেছেন।

শিল্পীদের অবদানও যথেষ্ট রয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানের জনপ্রিয়তার পিছনে। শান্তিনিকেতনের শিল্পীগোষ্ঠীর পাশাপাশি কলকাতার এক শিল্পীগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের গান জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ ছিল বেশী। কলকাতার শিল্পীদের রবীন্দ্রনাথের গান শিখতে যথেষ্ট শ্রম-স্বীকার করতে হয়েছিল। অথচ তুলনায় শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের চেয়ে কলকাতা শিল্পীগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের গান জনপ্রিয় করে তোলার কাজে অধিক কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। অবশ্য কলকাতার শিল্পী-গোষ্ঠীদের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের শিল্পী ও সঙ্গীত শিক্ষকদের একটা যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। সে আর এক ইতিহাস। কলকাতার বহু শিল্পী একটি মাত্র গান শেখার জন্য একাধিকবার শান্তিনিকেতনে গেছেন এমন নজীর আছে। কলকাতায় প্রথম রবীন্দ্রনাথের গান শেখানোর স্কুল প্রতিষ্ঠা হয় ঠিক কবির মৃত্যুর পরই। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন গুণী ব্যক্তি এর উদ্যোক্তা।

অভিযোগ আছে কলকাতার শিল্পী-গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের গানের সুরবিকৃতি ঘটিয়েছেন এবং বিশুদ্ধ গায়কী থেকে সরে গেছেন। এ অভিযোগের পিছনে আংশিক সত্যতা থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু শান্তিনিকেতনে গান শেখেননি কলকাতার এমন একজন অন্তত মহিলা শিল্পী বহু রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ড করেছেন এবং আজও তাঁর গানের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচকরাও বিশেষ কথা বলেন নি। কলকাতা গোষ্ঠীর একটি সুবিধা ছিল। শ্রোতার অভাব তাদের ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথের গান শোনার বা শেখার জন্যও রুচির প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতায় কবির কাব্য-সাহিত্যে ভক্ত-অনুরক্তদের অভাব কোনদিন ছিল না। তাছাড়া নিউথিয়েটার্সের কল্যাণে ফিল্ম মারফৎ রবীন্দ্রনাথের গান ব্যাপকভাবে মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আর রেডিও মারফৎ বহু কলকাতার শিল্পী কবির গান প্রচার করেছেন। শান্তিনিকেতন গোষ্ঠীকে ছোট করে দেখাবার মনোভাব নিয়ে একথা বল[...] চেষ্টা করছি না। কথাগুলিকে ঐতিহা[...] কারণেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। [...] করে ডজনখানেক শিল্পীর নাম করা য[...] যাঁরা কলকাতায় বসে কবির গান শি[...] গান গেয়ে কবির গানকে জনপ্রিয় ক[...] নিজেরাও শিল্পী হিসেবে জনপ্রি[...] হয়েছেন। ঐ তালিকার কয়েকজনকে [...] দিলে দেখা যায় বাকী শিল্পীরা রবী[ন্দ্র]নাথের গানই প্রধানত গেয়ে থাকেন [...] গাইতেন।

শান্তিনিকেতন গোষ্ঠীর মধ্যে কবি[র] গানের ভাণ্ডারীর সংখ্যা যত জন[...] শিল্পীর সংখ্যা তত নয়। তবু অন্ত[...] শান্তিনিকেতনে তিনপুরুষ বাস এমন এ[ক] মহিলা শিল্পী একাই একশো—বলে বাঙা[লী] মেনে নিয়েছে। কবির জীবিত অবস্থ[ায়] তাঁর গানের প্রথম রেকর্ড হয়। আ[...] তিনি গান গেয়ে চলেছেন। এছাড়া নিষ্ঠ[ার] সঙ্গে কবির গান প্রচার করেন এ[...] একাধিক শিল্পী আছেন যাঁরা গা[নের] তালিম শান্তিনিকেতনেই পেয়েছেন।

কিন্তু কবির মৃত্যুর ত্রিশ বছর পর[ে] প্রশ্ন উঠছে কবির গান বিশুদ্ধ রীতি[তে] গাওয়া হচ্ছে কিনা। কারণ, একই গ[ান] একাধিক বিভিন্ন ঢঙে গাইছেন এটা [...] অভিযোগ নয়---রবীন্দ্রনাথের গানের [...] মানুষ মাত্রেরই তা অভিজ্ঞতা। আর [...] অভিযোগ শুধু মাত্র কলকাতার শিল্পী[দের] বিরুদ্ধেই নয়। শান্তিনিকেতনের পু[...] তালিম নেওয়া এক পুরুষ শিল্পী সম্প্র[তি] একক গানের আসর করে স্বাতন্ত্র্য লা[ভ] করলেও যেভাবে তিনি গান করছে[ন] (বর্তমানে) তাকে রবীন্দ্রনাথের গানে[র] সঠিক গায়কী বলে মেনে নেওয়া কঠিন[।] এটি একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব ঢঙ।

একথা স্বীকার করতেই হবে শিল্পী[র] সহজাত কণ্ঠমাধুর্য ও লালিত্য শ্রোতাদে[র] প্রবল আকর্ষণ করে সহজেই। কিন্তু তা[র] সঙ্গে শিল্পীর নিজস্ব উচ্চারণভঙ্গী 'ম্যানারিজম'—খাদ হিসেবে মিশে যায়। এ[র] প্রমাণ একটু কান খাড়া করলেই পাও[য়া] যাবে।

আমার ধারণা, একবার বিতর্ক সু[রু] হলে হয়ত আমরা আমাদের প্রশ্নে[র] উত্তর পেতে পারি। কারণ, এখনও অনেকে জীবিত আছেন যাঁরা কবিকণ্ঠে গা[ন] শুনেছেন---কবির গানের অনেক খব[র] রাখেন। তাঁদের এ বিষয়ে মুখ খোলা[র] সময় কি আসেনি?

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

পদি পিসীর বর্মী বাক্স/ছায়াদেবী

(১) মনের আঁধার কেটে গেল

সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে সরোজ; মামার বাড়ীতে মানুষ। মিঃ মালহোত্রার বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের বিরাট দোকানে সে সেলস্‌-গার্ল-এর চাকরী করে। মালহোত্রার ছেলে যতীনের দিন কাটে নিত্য হোটেল ও রেস্তোঁরায় নাচগানে, আমোদ আহ্লাদের মধ্যে। হঠাৎ একদিন সে এসে হাজির হল বাপের দোকানে। স্টোরের ম্যানেজার মিঃ শুক্লা এবং পুরোণো সেলস গার্ল-এরা তটস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু সরোজ তার পরিচয় জানেনা। সে যতীনকে একজন খরিদ্দার ভেবে নিয়েছিল।—এই সহজ, সরল মেয়েটিকে যতীনের ভালো লেগে গেল এবং আশ্চর্য, ও সরোজকে ভালোবেসে ফেলল। অপ্রতিরোধ্য ওর ভালোবাসা। সেই অবাধ ভালোবাসা সরোজের স্বাভাবিক সংযমবোধকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিল। সে একদিন আবিষ্কার করল, সে মা হতে চলেছে। যতীনকে সে তাগিদ দিল বিবাহের জন্যে; কারণটাও জানাতে ভুলল না। যতীন বললে, ওটাকে নষ্ট করে ফেলা যাক। তাহলে যতীন কি ওকে সত্যি ভালোবাসে না? শুধু ওর দেহটাকে নিয়ে কয়েকদিন ফুর্তি করেছে? না, তা নয়। যতীন তো ওকে বিবাহ করতেই চায়। তবে অত শিগগির সন্তান হলে বিবাহের আমোদটাই যে মাটী! কিন্তু সরোজ মা হওয়ার আনন্দ থেকে যখন কিছুতেই বঞ্চিত হতে চায় না, তখন ও সরোজের অভিপ্রায়কেই সম্মান দিয়ে বিবাহ করতে প্রস্তুত হল। হরিষে বিষাদ! বিবাহ করতে আসার মুহূর্তে যতীন দৈব দুর্ঘটনায় মারা গেল: আর ওর বন্ধু অমর কঠিন অস্ত্রোপচারের পরে কোনোক্রমে রক্ষা পেল। অমর ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রীণ্ডলেজ ব্যাঙ্কের সেই শাখায় কাজ করত, যেখানে ছিল সরোজের অ্যাকাউন্ট। সরোজ অমরের মনকে আকর্ষণ করেছিল এবং যদি সে না জানত যে, বন্ধু যতীন সরোজের পানিপ্রার্থী, তাহলে সে নিজেই হয়ত সরোজের কাছে বিবাহ প্রস্তাব করে বসত। যতীনের আকস্মিক মৃত্যুর পরে আন্তরিক সমবেদনা জানায় অমর সরোজের প্রতি। এবং পরে সময় বুঝে ওর কাছে বিবাহের প্রস্তাবও করে বলে : সরোজ সম্বন্ধে সমস্ত কথাই সে বন্ধু যতীনের কাছ থেকে শুনেছে, কোনোও কথাই সে লুকোয় নি। সরোজ যে অন্তঃসত্ত্বা, সে কথা ওর মা, মামা-মামীও জেনেছিলেন। কাজেই যখন অমর ওর মামার কাছে ওর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল, তখন সরোজ মামাকে অনুরোধ করেছিল, অমরের কাছে যেন কোনো কথা গোপন করা না হয়। ওর সম্বন্ধে সকল কথা জেনেই অমর ওকে ভালো বেসে বিবাহ করেছে, এই চিন্তা সরোজকে প্রচুর খুশীতে ভরিয়ে দিয়েছে এবং ওদের বিবাহিত জীবন সুখেই কাটছিল। এরই মাঝে একদিন যে ডাক্তার অমরের দেহে অস্ত্রোপচার করেছিলেন, তার সংগে অমরের দেখা হয় এবং কথায় কথায় তিনি বলেন, ওদের দাম্পত্যজীবন সুখের হোক, এই কামনা করেও তিনি ওকে জানাতে বাধ্য হচ্ছেন যে, সন্তানের পিতৃত্ব থেকে সে চিরজীবনের জন্যে বঞ্চিত। বিষণ্ণ, ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ীতে এসে সে শুনল, তার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। অন্তঃসত্ত্বা! সে যে পিতৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত! তা হলে! না, অমর জানতনা, যতীনের সংগে অবাধ মেলামেশার ফলে সরোজ বেচারার এই হাল! অপরের সন্তানের পিতা সে কেমন করে হবে!—লক্ষ বৃশ্চিক দংশনে সে যে জ্বলছে, এই দৃশ্য সরোজকে উন্মনা করে তুলল। তাই অমরকে শান্ত করবার জন্যে, অবাঞ্ছিত পিতৃত্বের দায় থেকে তাকে মুক্ত করবার জন্যে, সে ছুটে গেল নার্সিংহোমে সকলের অজান্তে। কিন্তু অমরও তৎক্ষণে মানসিক ঝড়কে শান্ত করতে পেরেছে। তুমিতো আমার সম্বন্ধে সকল কথাই জানো—সরোজের এই প্রশ্নের নিহিতার্থ

সে খ'ুজে পেয়েছে। সরোজের প্রতি ভালোবাসার সে দাম দেবে যতীনের সন্তানের পিতৃত্বের দায়কে হাসিমুখে গ্রহণ করে।—এরপর সরোজকে তার কাম্য মাতৃত্ব থেকে যে বঞ্চিত হতে হল না, এ কথা বলাই বাহুল্য।

—এই-ই হচ্ছে রাজগুরু ফিল্ম মেকার্স নিবেদিত, গুরনাম প্রযোজিত এবং ভি কে শর্মা পরিচালিত গেভাকলার চিত্র সবেরা'র কাহিনীসার। অনুমান করা কঠিন নয়, এই কাহিনীকে অবলম্বন করে একটি কঠিন বাস্তবধর্মী ছবি গড়ে ওঠা খুবই সম্ভব ছিল। কিন্তু চিত্রনাট্যকার (কাহিনীকার স্বয়ং) এবং পরিচালক ভী কে শর্মা কাহিনীর আবেগ ও ভাবালুতার দিকে বেশী দৃষ্টি দেওয়ায় বাঁধাধরা সমাজ ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহী ভাবাপন্ন এই কাহিনীটিকে দর্শকচক্ষে বড্ড বেশী মোলায়েম করে তুলেছেন এবং ছবিটিকে সাধারণ দর্শকের কাছে উপভোগ্য করে তোলবার চেষ্টায় এর নাট্যমুহূর্তগুলিকে তীব্র করার পরিবর্তে বহু পরিস্থিতিকে কাকতালীয় করেছেন এবং স্থানে অস্থানে নৃত্যগীত আমদানি করেছেন। ফলে, এই কাহিনীর রুক্ষ দুঃসাহসিক রূপ দর্শক-মনে যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারত, তার থেকে ছবিটি বঞ্চিত হয়েছে। প্রযোজক গুরনাম একটি বিপজ্জনক কাহিনীকে অবলম্বন করে তাঁর প্রথম পদ-ক্ষেপেই চিত্রজগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত ছবিটি তার থেকে অনেকখানি দূরে সরে এসেছে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, হিন্দী ছবি তৈরীর সাধারণ প্রচলিত পথে না গিয়ে প্রযোজক শ্রীগুরনাম এমন একটি কাহিনীকে তাঁর প্রথম ছবির জন্যে নির্বা-চন করেছেন, যা বর্তমান যুগের একটি জীবন্ত সমস্যাকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছে। এবং মাত্র এই কারণেই তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

নায়িকা সরোজের ভূমিকায় রেহানা সুলতান নিঃসন্দেহে তাঁর নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় আর একবার করে দিলেন। কি প্রেমের পুলক প্রকাশে, কি চিত্তের অস্থিরতা প্রকাশে, কি অন্তর্বেদনাকে রূপায়িত করতে তাঁর দক্ষতার তুলনা নেই। কোনো এক সমালোচক তাঁকে সেকস গার্ল হিসেবে অভিহিত করেছেন। অভিধাটি ঠিক নয়। তিনি একজন অশেষ গুণসম্পন্না অভিনেত্রী; অভিনয়কলা সম্পর্কে পার-দর্শিনী তাঁর তুল্য অভিনেত্রী ভারতের চলচ্চিত্র জগতে খুব কমই আবির্ভূত হয়েছেন। অপরদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই যে চরিত্র চিত্রণের প্রয়োজনে তিনি নগ্নতার দিকে অনেক দূরে অগ্রসর হতে পারেন মনে কোন দ্বিধা না রেখেই। রেহানা সুলতানের মতো প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী যে কোনও দেশেরই গর্বের বস্তু। নায়ক অমরের ভূমিকায় কিরণ-কুমারের বাচনভঙ্গী প্রশংসনীয়: তাঁর কণ্ঠস্বরটি খুবই মারকোচিত। তাঁর মুখ চোখ কিন্তু ততখানি ভাবপ্রকাশক নয়। যতীন বেশে সাজিদ যতখানি চরিত্রোচিত স্মার্ট বা কায়দাদুরস্ত, বাচনকেও ঠিক সেইভাবে দুরস্ত করবার চেষ্টায় শ্রুতি-গ্রাহ্যতাকে কিছুটা উপেক্ষা করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় অভি ভট্টাচার্য, মুকুলো দেবী, দীনা গান্ধী, বিনোদ শর্মা, সত্যেন্দ্র কাপুর, রাধা সালুজা, অনিল ধাওয়ান, জয়শ্রী টি, হেলেন প্রভৃতি স্ব স্ব ভূমিকার প্রতি সুবিচার করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে গেভাকলারে চিত্রগ্রহণ সর্বত্র সমতা রক্ষা করতে পারে নি এবং ছবিটিকে বহু পরিমাণে নিষ্প্রভ করেছে। ছবির সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় যথাক্রমে বি দেশপান্ডে ও দেশ মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ছবির সংগীতাংশ অত্যন্ত আকর্ষণীয়। মজরু লিখিত গানে রাহুল দেববর্মণ যোজিত সুর ছবির চারখানি গানকেই উপভোগ্য করে তুলেছে।

রাজগুরু ফিল্ম মেকার্স নিবেদিত ও গুরনাম প্রযোজিত সবেরা আধুনিক সমাজের বাস্তব সমস্যা সম্পর্কিত একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র।

(২) স্ত্রীর সম্ভ্রম রাখতে চাকরের ভূমিকায় স্বামী—

ইংরাজীতে বরকে বলা হয়েছে কনের সহিস—ব্রাইডগ্রুম। এবং বর্তমান যুগে অধিকাংশ স্বামীই যে স্ত্রীর গোলাম, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নে[ই]। কিন্তু ইউনাইটেড ফোর নিবেদিত এ[বং] এ ভীম সিং পরিচালিত ইস্টম্যান ক[ালারে] তোলা ছবি জরুকা গুলাম-এ স্বা[মী] বেচারাকে সত্যি সত্যিই স্ত্রীর গুলাম চাকর সাজতে হয় স্ত্রীরই মুখ চেয়ে।

ধনী বাপের ইচ্ছা তাঁরই মতো ধন[ী] গৃহেই মেয়ের বিয়ে হবে। কিন্তু মে[য়ে] কল্পনা ভালোবেসে বসলেন এক গর[িব] চিত্রকরকে এবং শেষ পর্যন্ত বাপের মো[র] তর অমত সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করলে[ন]। বাপের ঠাট্টা-বিদ্রূপের হাত এড়াবার জ[ন্যে] কল্পনা বাপকে পত্রযোগে (দুজনের বা[স]স্থানের মধ্যে দূরত্ব কল্পনীয়) জানা[তে] থাকল : সম্প্রতি রাজেশ (স্বামীর না[ম]) একটা প্রকাণ্ড বাড়ী কিনেছে, সেদিন [এ]কটি বিরাট মোটরগাড়ী কেনা হয়েছে ইত্য[াদি] ইত্যাদি অর্থাৎ আমরাও বর্তমানে বড়লো[ক] হয়েছি, আর আমার স্বামীকে ফেল[না] ভেবো না। অথচ সব ব্যাপারটাই ভুয়[ো]। ইতিমধ্যে ওদের ঘর আলো করে [এসেছে] একটি পুত্রসন্তান। নাতিকে দেখব[ার] আগ্রহ দমন করতে না পেরে দাদামশ[াই] মেয়ের বাড়ী মাত্র দুটি দিনের জন্যে যা[চ্ছেন] বলে চিঠি দিলেন। মেয়ে পড়ল মহ[া ফ]্যাসাদে। স্বামীও কাছে নেই যে [তার] সঙ্গে পরামর্শ করে, সে গেছে ছবি বেচ[তে] শহরে। কাজেই বান্ধবীর সঙ্গে পরাম[র্শ] করে তারই সহায়তায় সে করল মাত্র দু[টি] দিনের জন্যে এক অট্টালিকা ভাড়া এ[বং] তাকে সাজালো ভাড়া করা আসবাব দিয়ে। ঐ সঙ্গে সোফার সমেত এ[কটি] প্রকাণ্ড গাড়ীও ভাড়া করল। আ[র] একটি কাজ সে করল। বাপ এসে ও[র] স্বামীকে না দেখতে পেয়ে যদি কোন রকম সন্দেহ করেন এবং ওর স্বামী ফেরা পর্যন্ত থেকে যেতে চান, সেই পরি[-]স্থিতির হাত থেকে উদ্ধার পাবার জ[ন্যে] মেয়ে বান্ধবীর স্বামীকে অনুরোধ ক[রল] দুটি দিনের জন্যে ওর স্বামীর ভূমিক[ায়] অভিনয় করবার জন্যে। অতিকষ্টে [ভদ্র]লোককে রাজী করা গেল। বাপ এসে মে[য়ে] জামাইকে দেখলেন, সুন্দর নাতিকে দে[খে] আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠলেন। কি[ন্তু] আশ্চর্য হলেন, অত বড়ো বাড়ীতে কো[নো] চাকর-বাকরকে না দেখে এবং তাঁর ম[নে] হোলো, মেয়ে ও জামাইয়ের মধ্যে কে[মন] যেন আড়োআড়ো. ছাড়োছাড়ো ভা[ব]। মেয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল, শ্বশুরে[র] সামনে জামাই একটু অস্বাচ্ছন্দ্য অনু[ভব] করছে, আর ওরাতো ছোট্ট পরিবার, নিজে[দের] অঢেল ফুরসৎ, তাই চাকরবাকর রে[খে] কুঁড়ে হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন কি? ইত্যা[দি] ইত্যাদি এবং দু-একজন চাকর ঠিক [এই] সময়টাতেই ছুটি নিয়ে দেশে গেছে - হবি তো হ—স্বামী দেবতা রাজে[শ] অপ্রত্যাশিতভাবে এই সময়েই ফিরে এ[ল]। তাকে তাড়িয়েও দেওয়া যায় না. অ[থচ] তার আসল পরিচয়ও ব্যক্ত করা যায় না। অতএব রাজেশকে সাজতে হল বাড়ি[র]

…ম্বাইন্ড হ্যান্ড—চাকর ও রাঁধুনী এক-সঙ্গে। চিত্রকর, আর্টিস্ট রাজেশ না পারে চাকরের কাজ, না পারে রান্নার কাজ।—সে এক বিভ্রাট! অপর দিকে, মাধবী লুকিয়ে চুরিয়ে স্বামীর সান্নিধ্য চায়। রাজেশও যে স্ত্রী কল্পনাকে …কে পেতে চায়! এর ওপর ফর্মাশ …র মেয়ের বাপের, চাকর তাঁর গা হাত-পা টিপে দিক। —অতএব সব সময়েই সত্য … ধরা পড়ার ভয়—পরিস্থিতির পরে পরিস্থিতি! বিশেষ যখন দুদিনের পরেও বাপ ফিরে যেতে চান না এবং অপর দিকে গাড়ী ছেড়ে দেবার তাগাদ আসে, আসবাব … টেনে বার করে নিয়ে যায়, সোফার সমেত গাড়ী অদৃশ্য হয়, তখন মেয়ের … কি হতে পারে, কল্পনা করার … জরু-কা-গুলাম ছবিতে দেখলে নিশ্চয়ই উপভোগ্য হবে।

—মধুসূদন কালেলকার রচিত কাহিনীটির উপরোক্ত সংক্ষিপ্তসার নিশ্চয়ই একটি হুল্লোড় হাসির ছবিতে রূপান্তরিত হবার আশ্বাস দেয়। কিন্তু জরু-কা-গুলাম-এর চিত্রনাট্য রচয়িতারা (কাহিনীকার শ্রীকালেলকার, আখতার-উল ঈমান এবং সি জে. পাভরী—এই তিনজন) পিতার অমতে কল্পনার রাজেশকে বিবাহ করা এবং পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে রাজেশের সঙ্গে কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটাতে কাটাতে সন্তান হওয়া পর্যন্ত ঘটনাকেই ছবিটির অর্ধভাগ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন। বলা বাহুল্য, এই অংশে ছবিটি প্রায়শই গুরুগম্ভীর এবং এতে হাসির উপাদান ঢোকানো হয়েছে অত্যন্ত কৃত্রিম-ভাবে। ছবি দেখতে দেখতে মনে হয়েছে, স্বাভাবিক উপায়ে পরিস্থিতি সৃষ্টি কর বার মতো রসবুদ্ধির এদের একান্তই অভাব।—পরবর্তী অংশে দাদামশাই যখন নাতিকে দেখবার জন্যে এসে উপস্থিত হন এবং রাজেশকে ভৃত্যরূপে বাহাল হতে হয়, মাত্র তখনই বেশ কয়েকটি স্বাভাবিক হাসির পরিস্থিতি দর্শকদের পুলকিত করে।

"বাবুর্চি"র রাজেশ খান্নার পটুত্বের তুলনা যেমন নেই, ঠিক তেমনই এই ছবিতে স্বনামের চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে রাজেশ খান্না চাকর ও রাঁধুনী রূপে কত-খানি আনাড়ী হওয়া যায়, তার নজীর রেখেছেন। এবং তাঁর সঙ্গে হাসির খোরাক যুগিয়েছে কল্পনার বাবার ভূমিকায় ওমপ্রকাশ। নায়িকা কল্পনা বেশে নন্দা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই চরিত্র-চিত্রণ করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় শারদ-কুমার, মনীষা, অচলা সচদেব রমেশ দেও মুকুলা, নানা পালসিকর, ইফতেকার প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। …করে চিত্রগ্রহণ, শিল্প নির্দেশনা ও সম্পাদনায় যথাক্রমে জি বালকৃষ্ণ, সন্ত

স্ত্রীর পত্র/মাধবী মুখোপাধ্যায়

সিং এবং এ পল ডোরাইস্বামীর কাজ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। ছবির ক্রেডিট টাইটেল-গুলি লক্ষণীয়। আনন্দ বকসীকৃত গান-গুলিতে সুর যোজনা করেছেন কল্যাণজী আনন্দজী। কিশোরকুমারের কণ্ঠে 'বরষ গৈ রে তরস গৈ রে তেরে দরশ কো নজরিয়া' গানখানি বারংবার শোনবার মতো। 'ফির কোন সী জাগহ হৈ খালি' ও মতওয়ালী মায় কস্থা রহুগা' দ্বৈত গানখানিও উপ-ভোগ্য হয়ে উঠেছে লতা ও কিশোর কণ্ঠে।

নন্দা, রাজেশ খান্না এবং ওমপ্রকাশ অভিনীত ইউনাইটেড ফোর নিবেদিত জরু-কা-গুলাম' দেখে দর্শকরা একটি নূতন-ত্বের স্বাদ উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে বেশ-খানিকটা হাসতে পারবেন।

(৩) লোভ বড়ো, না প্রেম?

'ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়', লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু', 'মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢাকা যায় না।' —এই ধরণের যে কোনো নীতিশিক্ষাই আমরা গ্রহণ করতে পারি সেভেন আর্টস পিকচার্স নিবেদিত, মদন মোহলা প্রযোজিত এবং মোহন … পরিচালিত ইস্টম্যান কালারে তোলা ছবি 'রাজা-জানী' থেকে। কিন্তু তবু, … "রাজা-জানী" ছবি হচ্ছে নতুন বোতলে পুরোনো মদের সামিল অর্থাৎ এ-ধরণের কাহিনী আমরা "আন্" থেকে শুরু করে "নানহা ফারিস্তা" এবং তারও পরে দেখা বহু ছবির কাহিনী থেকে খণ্ড খণ্ডভাবে আবিষ্কার করতে পারি। আলোচ্য ছবি-টির মধ্যে যদি কিছু আকর্ষণীয় থাকে, সে হচ্ছে শাম্মো নামক নায়িকা চরিত্রটির একটি বিশেষ দিক, যা প্রকাশিত হয় রাজাজানীর গৃহে প্রথম আগমনের পরে রাজার ওপর তার একান্ত নির্ভরতা ও বিশ্বাসমূলক আচরণের দৃশ্যগুলির মাধ্যমে। এ ছাড়া আর যা-কিছু ঘটনা আছে, সবই চর্বিত চর্বণ।

তারাগড় এস্টেটের বৃদ্ধা রাণীমার স্থির বিশ্বাস ছিল একদিন না একদিন বারো বছর আগে তাঁর হারিয়ে যাওয়া নাতনী রত্না ফেরৎ আসবেই আসবে। তিনি খবর পেয়েছিলেন, জঙ্গলের পথে তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূকে দুর্বৃত্তরা হত্যা

কারণেও তাঁর, রাজ্য ছাড়ার বয়েসের, নাতনী রত্না লোভাতুরদের তাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল ... যোগ-সওয়ার ... কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই নাতনী অদৃশ্য হল। কোথায় সে গেল, তার কোনো হদিসই তিনি পাননি। বৃদ্ধা রাণীমার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাঁর বৃদ্ধ দাওয়ান একটি নকল রত্নাকে রাজকুমারী বলে প্রতিষ্ঠিত করবার মতলব করেছিলেন এবং এ-ব্যাপারে তিনি প্রভাবশালী রাজা জানীর সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন। পুণা শহরের পথে পথে নেচে গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায় রূপসী শানো। রাজা দেখল, শানোর চেহারার ... মিলে যায় বালিকা রত্নার সঙ্গে। রাজার কথায় দেওয়ানজী নিজে এসে শানোকে দেখলেন। হ্যাঁ, চেহারায় অদ্ভুত মিল আছে বটে! কিন্তু তাই বলে রাস্তায় নাচনেওয়ালী মেয়ে হবে রাজকুমারী রত্না! দেওয়ানজী হাসলেন। রাজা তাঁকে বেশ জোরের সঙ্গেই বললে, সে ভার আমার।—রাজার পরিশ্রম ও চেষ্টায় শানো রত্নাতে পরিণত হল। বৃদ্ধা রাণীমা তাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। দেওয়ানজীর ছেলে প্রতাপ চাইল রত্নাকে অধিকার করতে এবং সে পথে রাজাকে প্রতিবন্ধক জেনে তাকে বাপ-বেটা মিলে পাঠাল কারাগৃহের অন্ধকারে। এর পরে কেমন করে জানা গেল যে, শানোই হচ্ছে সেই হারিয়ে-যাওয়া রত্না এবং কেমন করে দুরভিসন্ধিপূর্ণ দেওয়ানজী ও তাঁর ছেলে রাজার হস্তে নিগৃহীত হল ও সব শেষে রত্নার সঙ্গে রাজার মিলন সম্ভব হোলো, তাই নিয়েই ছবিটির উত্তেজক শেষ দৃশ্যগুলি রচিত।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ছবিটিতে ঘটনার ভীড় এবং যে-ছবিতে এমন ঘটনার ভীড়, সে ছবিতে শিল্পীদের ... কোনো উল্লেখযোগ্য অভিনয় প্রত্যাশা করাই অন্যায়। তবু বলব, নায়িকা শানো—যিনি পরে হারিয়ে যাওয়া রত্না বলে প্রতিপন্ন হচ্ছেন, তাঁর—ভূমিকায় হেমা মালিনী নাচে, গানে, অভিনয়ে চরিত্রটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। রাজাজানী বেশে ধর্মেন্দ্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বলিষ্ঠ অভিনয় করেছেন। দেওয়ান ও তাঁর কুটবুদ্ধিপরায়ণ পুত্র প্রতাপের ভূমিকায় যথাক্রমে প্রেমনাথ ও প্রেম চোপরা খল চরিত্র দুটিকে সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন। রাজা-জানীর ভৃত্য মতিলাল বেশে বহুদিন বাদে জনিওয়াকারকে দর্শকদের হাসির খোরাক যোগাতে দেখা গেল। বৃদ্ধা রাণীমার চরিত্রে দুর্গা খোটে একটি ব্যক্তিত্ব অর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে স্নেহবতী রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। অপরাপর ভূমিকায় নাদিরা সজ্জন, হীরালাল, মনোমোহন ও বিন্দুর অভিনয় উল্লেখ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চিত্রগ্রহণে মদন সিংহ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। এ ছাড়া শিল্প নির্দেশনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন কার্তিক বসু। আনন্দ বকসী রচিত গানগুলি লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলালের সুরযোজনা এবং কিশোর-কুমার ও লতা মঙ্গেশকারের মুখনিঃসৃত হওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠেনি।

(৪) ছকে বাঁধা কাহিনীতে দ্বৈত-ভূমিকায় উত্তমকুমার

আশীষের বাবা আর একটা বিবাহ করেছিলেন এবং সেই বিবাহের ফলে তাঁর যে সন্তান হয়েছিল, তার নাম প্রতীপ। এই প্রতীপ একদিন কলকাতায় আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার পর মুহূর্তে আশীষ আকস্মিকভাবেই তার সামনে এসে পড়ে এবং দেখে অবাক হয়, নিহত ব্যক্তির চেহারা হুবহু তার নিজের মতো। কাছ থেকে কুড়িয়ে-পাওয়া একটি মানিব্যাগ নিহতের নাম-ঠিকানা তার কাছে প্রকাশ করে এবং সেই সূত্র ধরে সে লক্ষ্ণৌ গিয়ে উপস্থিত হয়। প্রতীপ ফিরে এসেছে মনে করে সকলেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। অবশ্য এরই মধ্যে প্রতীপের মা—আশীষের

মধ্যা—ও যে প্রতীপ নয়, তা ধরে ফেলে
আশীষ শেষ পর্যন্ত তাঁকে জানিয়েই
প্রতীপের মৃত্যু সংবাদ এবং এও জা
এই কথাটুকু জানাতেই সে এতদূর দে
এসেছিল। কিন্তু প্রতীপের মা আশী
তখনই ছেড়ে দিতে চান না, তিনি
অনুরোধ করেন, প্রতীপের অন্ধ বাবার
চেয়েও যেন কিছুদিন থেকে যায়। আ
কিন্তু জানাল না যে, সে প্রতীপেরই
ভাই। ক্রমে আশীষ বাপের কারখানা দে
শুনো করার ভার পেল এবং এতেই
সংঘর্ষ বাধল কারখানার ম্যানেজার স
জিতের সঙ্গে। যে-নষ্ট মেয়েটিকে স
দিয়ে সুরজিৎ প্রতীপকে কলকাতায় পাঠি
ছিল। অকস্মাৎ সেই মুন্না ফিরে আ
সুরজিৎ হালে পানি পেল। সে আশী
আদালতে অভিযুক্ত করল প্রতীপের হ
কারী রূপে। —এরপরে কিভাবে আ
নিজেকে অপরাধমুক্ত করতে সক্ষম হল
সকল সমস্যার সুচারু সমাধান হল,
নিয়েই ছবির শেষ দৃশ্যগুলি গড়ে উঠেছে

কলামন্দিরের দ্বিতীয় নিবেদন, ধা
পরিচালিত 'ছিন্নপত্র'-এর ডাঃ নীহার
গুপ্ত লিখিত কাহিনীটি এবং উমা
ভট্টাচার্য রচিত চিত্রনাট্যটি যে বড়ো বে
সাজানো নাটকীয়তায় ভরা ও সেই কা
বাস্তব থেকে অনেক দূরে, একথা,
করি, না বললেও চলে। আজ যেখানে মা
চাইছে জীবনের মুখোমুখী দাঁড়াতে, সেখ
এ ধরণের বাস্তববর্জিত কাহিনীকে
চিত্রের জন্যে নির্বাচন করে প্রযো
সুবিবেচনার পরিচয় দেননি।

অভিনয়ের একটি মোটা অংশ জ
রয়েছেন উত্তমকুমার দ্বৈত-ভূমিকায়;
আশীষ বেশে এবং দুই, প্রতীপ রূ
আশীষ ধীর, স্থির, বিবেচক বুদ্ধিদী
প্রতীপ খেয়ালী, বেপরোয়া, বিসালী
উচ্ছৃঙ্খল। দুটি চরিত্রের বিভিন্নতা স্প
ভাবে রূপায়িত করেছেন উত্তমকুম
সুরজিৎ বেশে দিলীপ মুখোপাধ্যায় খলত
পরিস্ফুট করেছেন তাঁর অভিনয়ের মাধ্য
যখন সুরজিৎ হেরে গিয়ে আত্মহত্যা ক
তখন শ্রীমুখোপাধ্যায়ের ভঙ্গী অন
প্রতীপের বাবার শুভানুধ্যায়ীর ভূমি
অসিতবরণ ও তাঁর কন্যা—ছবির তোমা
নায়িকা বেশে মাধবী চক্রবর্তী—দজ
সংযত, অথচ হৃদয়স্পর্শী অভিনয় করেছে
ক্যাবারে, নাচিয়ে-গাইয়ে মুন্নার ভূমি
সুপ্রিয়া দেবী গৃহীত চরিত্র-চিত্রণে
করেননি। অন্যান্য ভূমিকায় কমল
চন্দ্রাবতী দেবী, আনন্দ মুখোপাধ্যায়,
মুখোপাধ্যায়, সুব্রত সেন, জহর রায়, হ
মুখোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি উ
সু-অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভ
একটি উচ্চমান রক্ষিত হয়েছে। নচিকে
ঘোষ রচিত সুরযোজিত গানগুলি
ছবিতে সুপ্রযুক্ত হয়নি।

কলামন্দির-এর নিবেদন, ধাত্রিক
চালিত 'ছিন্নপত্র'-এ উত্তমকুমার হ
বিশিষ্ট আকর্ষণ।

স্টুডিও সংবাদ

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের সৌন্দর্যের কথা কে না জানে? কিন্তু পহেলগাঁও-এর সৌন্দর্যের কথা এক কথায় বর্ণনা করা অসম্ভব। তাই প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় দেখতে পাই বিভিন্ন হিন্দী ছবির নির্মাতারা কাশ্মীরের পহেলগাঁও-এর স্যুটিং করতে গেছেন।

এমনি একটি প্রযোজক গোষ্ঠী তাঁদের সম্পূর্ণ ইউনিট নিয়ে স্যুটিং করতে গেছেন পহেলগাঁও-এ। এ স্যুটিং পর্যায়ে নায়িকা থেকে আরম্ভ করে সবাই এসে গেছেন, শুধু এসে পৌঁছাননি ছবির হিরো। পরের দিন তাঁর এসে পৌঁছুবার কথা। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে তিনি এসে পৌঁছুলেন না। প্রযোজক পরিচালক থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকের মাথায় তখন বজ্রাঘাত। এমতাবস্থায় কি করা যায়? অথচ এ পর্যায়ে স্যুটিং করতে না পারলে এতগুলো টাকা নষ্ট হবে। তাছাড়া প্রশ্ন আছে হিরোইন এবং অন্যান্য শিল্পীদের ডেট পাওয়ার। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করা হলো—হিরোর ডামী একজন যোগাড় করে স্যুটিং শেষ করা হবে। দৃশ্যটি খুব সোজা—হিরোর সঙ্গে হিরোইনের বিয়ের দৃশ্য। সুতরাং হিরোর মত একটা ডামী যোগাড় করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। প্রোডাকশন ম্যানেজার অনেক খোঁজ-খবর করে অবশেষে অবিকল এ ছবির হিরোর মত দেখতে এক গ্রাম্য যুবককে ধরে নিয়ে এলেন।

অবশেষে কোনরকমে সেই বিয়ের দৃশ্যগ্রহণ করা হোল। কিন্তু স্যুটিংশেষে এই যুবককে নিয়ে মহাফাঁপড়ে পড়লেন এ ছবির নির্মাতারা। কেননা এই সরল-নিষ্পাপ গ্রাম্য যুবক এই সাময়িক অভিনয়কে সত্য ভেবে তার সঙ্গে যার বিয়ে হোল তাকে দাবী করে বসলো। সে দাবী করে বসলো, যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে অগ্নিসাক্ষী রেখে তাকে অর্থাৎ তার বিবাহিতা স্ত্রীকে সে সংগে নিয়ে যাবে। এ গ্রাম্য যুবকের অবস্থা দেখে ছবির হিরোইনের চোখ তো ছানাবড়া। এ বলে কী!

এদিকে হিরোইনকে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে অনেক কষ্টে বোঝানো হচ্ছে। প্রোডাকশান ম্যানেজার তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন—এ কিছুই নয়।

নীচে অর্থাৎ যে রেস্টহাউসে এ ইউনিটটি আশ্রয় নিয়েছে তার একতলায় ঐ গ্রাম্য যুবক বসে বসে অধৈর্য হয়ে উঠেছে আর তাকে পাহারা দিচ্ছে ছবির প্রযোজক ও পরিচালক।

কিন্তু যুবকটি বেপরোয়া। গ্রাম্য যুবকটি প্রযোজক এবং পরিচালককে উদ্দেশ্য করে বললো—

গ্রাম্য যুবক: অব জাউঁ উপর?

প্রযোজক: বাস থোড়ী সী দের—আউর সারী রসমেঁ যব পুরী যায়েংগী তো বুলা লেংগে—

গ্রাম্য যুবক: ইয়ে কৈসী রসম্ হৈ আপকী দেশকী—সারাদিন ইহাঁ বৈঠে বৈঠে গুজার দিয়া—

প্রযোজক তাকে শান্ত হয়ে একটু বসতে অনুরোধ জানায়। কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরই আবার যুবকটি রুখে দাঁড়ায়—

—ইয়ে কৈসে শাদী হ্যায় আপকে দেশকী, পতি পতি হো করভী—পত্নীকে পাস নেহী যা সকতা? আব তো ম্যয় যাউংগা—

উপরোক্ত ছবির কাহিনী এবং দৃশ্য-পর্যায়টি গৃহীত হোল গত রবিবার টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে। এস এম এস প্রোডাকসন্স-এর ইস্টম্যানকলার-এ রঙীন হিন্দী ছবি 'অভিনয়'-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের স্যুটিং শুরু হয়েছে এবং তা একটানা চলবে ২৬শে অকটোবর পর্যন্ত।

হৃষীকেশ মুখার্জীর অন্যতম সহকারী অনিল ঘোষ এ ছবিটি স্বাধীনভাবে পরিচালনা করছেন। ছবির সম্পূর্ণ স্যুটিং কোলকাতায় গৃহীত হবে এবং এটাই হবে পশ্চিমবাংলা থেকে রঙীন ৩য় হিন্দী ছবি।

উপরের দৃশ্যে অভিনয় করলেন—গ্রাম্য যুবক: সমিত ভঞ্জ, ছবির প্রযোজক: রবি ঘোষ, পরিচালক: সুব্রত সেন, প্রোডাকসন ম্যানেজার: শেখর চ্যাটার্জি এবং হিরোইন: রাধা সালুজা।

গ্রাম্য যুবকের চরিত্রটি সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সমিত ভঞ্জ এবং প্রযোজকের চরিত্রে রবি ঘোষের জবাব নেই। তাঁর বাচনভঙ্গী এবং অভিব্যক্তিতে আমরা উপস্থিত সেটের সবাই অনেক কষ্টে হাসি চাপতে পেরেছিলাম।

এছাড়া ছবির অন্যান্য চরিত্রে আছেন—উৎপল দত্ত, কল্যাণ চ্যাটার্জি, আম্রপালী প্রভৃতি। ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ডি এন মুখার্জী এবং সংলাপ ও গীত রচনা করেছেন গুলজার। সুরারোপের দায়িত্বে আছেন মদনমোহন। ছবির চিত্রগ্রহণ করছেন দিলীপরঞ্জন মুখার্জি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে চিত্রগ্রাহক দিলীপ রঞ্জন মুখার্জি এখন পাকাপাকিভাবে বম্বেতে বসবাস করছেন। ওঁর হাতে এখন অনেক ছবি। এ ছবি ছাড়া বম্বেতে দিলীপবাবুর হাতে এখন ৬।৭ খানা হিন্দী ছবি।

গত রবিবার লক্ষ্মীপুজার দিন সকাল ১০টায় টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর স্কোরিং থিয়েটারে কালিপদ সেনের সুরারোপে দু'খানা গান রেকর্ড করা হয়েছে। আর ডি প্রোডাকসন্স প্রযোজিত এবং অজিত লাহিড়ী নিবেদিত এ ছবিটির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন বকুল মজুমদার। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে শ্রীমজুমদার পরিচালক শ্রীঅজিত লাহিড়ীর সঙ্গে দীর্ঘদিন যাবত সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। এ ছবিটি তিনি স্বাধীনভাবে পরিচালনা করছেন।

যে দুটি গান ঐদিন গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রথম কয়েকটি লাইন নিম্নে তুলে ধরছি:

প্রথম গান: 'কি দেবে কি নেবে কি ভেবে নেবে যাও
কিছু কি বোঝো না
তোমারি ও পথে আমার
ডেকে নাও
কেন এ মন খোঁজো না।।
ছাড়ো ছাড়ো পথ ছাড়ো
ভালবাসা আমার নয়।'

এই গানটি দ্বৈত কণ্ঠে গেয়েছেন অসীমা ভট্টাচার্য ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয়টি: 'না ফুটেই ঝরে গেল ফুল
ভালোবাসা হয়ে গেল ভুল
ভেঙে ভেঙে গেল হায়
সব খেলা
খেলা মোর শেষ মাতো ফুল।'

এই গানটি একক কণ্ঠে গেয়েছেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। গান দুটোর রচয়িতা গৌরী-প্রসন্ন মজুমদার। অনেকদিন পর কালিপদ সেন আবার সুনাম অর্জন করবেন। সুরের মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করার মত শুধু তাই নয়— শিল্পীদ্বয় দরদভরা গলায় গেয়েছেনও সুন্দর। এ ছবি রিলিজ হলে আপনারা আমার ভবিষ্যদ্বাণী মিলিয়ে নেবেন। খবরে প্রকাশ, প্রথম গানটি ছবির টাইটেল সং হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং বিভিন্ন দৃশ্যপর্যায়ে ব্যবহৃত হবে। দ্বিতীয় গানটিও নেপথ্যে শোনা যাবে অর্থাৎ চিরাচরিত প্রথায় হিরো-হিরোইনের লিপে এ ছবিতে কোন গান থাকছে না। প্রবোধকুমার সান্যাল রচিত এ ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মৃগাঙ্কশেখর রায়। এবং শিল্পী তালিকায় এ পর্যন্ত যাদের নাম পেয়েছি তাঁদের মধ্যে আছেন—সমিত ভঞ্জ, সোমা দে প্রসাদ চ্যাটার্জী, মিহির পাল প্রভৃতি।

আগামী মাসের প্রথম দিক থেকে ছবির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হবে।

৩ নভেম্বর: পদি পিসীর বর্মি বাক্স

অনিন্দ্য চিত্র-এর রঙীন ছবি 'পদি পিসীর বর্মি বাক্স' ৩ নভেম্বর রাধা, পূর্ণ ও অন্যত্র শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাঃ লিঃ ও অনিন্দ্য চিত্র-র পরিবেশনায় মুক্তি লাভ করবে। প্রযোজনা, পরিচালনা ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন অরুন্ধতী দেবী। কাহিনী রচনা করেছেন লীলা মজুমদার। প্রধান চরিত্রে আছেন—ছায়া দেবী, চিন্ময় রায়, অজিতেশ ব্যানার্জি, রবি ঘোষ, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, পদ্মাদেবী, কেতকী দত্ত, শম্ভু, মাঃ তপন ভট্টাচার্য প্রভৃতি। কাহিনীবৈচিত্র্যে ও অভিনয়বৈচিত্র্যে পদি পিসীর বর্মি বাক্স—সব বয়সের দর্শকদের মন জয় করবে বলে জানা গেছে।

বিবিধ সংবাদ

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্বর্ধনা

২২ আশ্বিন ছিল সৌম্যেন্দ্রনাথের শুভ জন্মদিন। সাহিত্য তীর্থের প্রেক্ষাগৃহে এই দিন আনন্দ মন্দিরের আয়োজনে তাঁর ৭৩ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে তাঁকে একটি আনন্দোজ্জ্বল সমাবেশে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অন্তর্লিনা বন্দনা দের স্বাগত আবাহনের পর সভাগণ সৌম্যেন্দ্রনাথকে ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুসরণে বৈদিক প্রথায় বরেণ্য-বরণ করেন। মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়ের উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনের পর সভার উদ্বোধন করেন কবি ও সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসু। তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এবং সৌম্যেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের নানা তথ্য উপস্থাপিত করে বলেন যে, তিনি কখনই নিজের নীতি ও আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হননি। তিনি নিষ্ঠাবান অগ্নিবর্ণ অনন্য পুরুষ। সভাপতির ভাষণে প্রবীণ দর্শনাচার্য ডঃ সরোজকুমার দাস তাঁকে রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তর-সাধক বলে অভিহিত করেন এবং বলেন যে, রবীন্দ্র-সঙ্গীত-শাস্ত্রে ও রবীন্দ্র-দর্শনে অধুনাকালে তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি কেউ আছেন বলে তাঁর জানা নেই। মৈত্রেয়ী দেবী বলেন যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট ছাড়া রবীন্দ্র-সৃষ্টির সমগ্র ও সুষ্ঠুভাবে আজকাল কোথাও অনুশীলন হয় না, এমন কি শান্তিনিকেতনেও নয়। অখিল নিয়োগী সৌম্যেন্দ্রনাথের জীবনের পুরানো দিনের ঘটনা উল্লেখ করে স্মৃতি চারণ করেন। কবি রমেন্দ্র মল্লিক, মহিলা কবি খেলা দেবী ও শ্রীমান গৌতম দে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। আনন্দ-মন্দিরের পক্ষ থেকে তাঁকে যে মানপত্র দেওয়া হয়, তা পাঠ করেন প্রবীণ সাহিত্যিক অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং মানপত্রটি শ্রদ্ধার সহিত সহ-সভাপতি ক্যাপ্টেন কেশব দে, সৌম্যেন্দ্রনাথের হাতে তুলে দেন। আনন্দ-মন্দিরের পক্ষ থেকে সৌম্যেন্দ্রনাথকে রেশমী চাদর, কাশ্মীরী ট্রে, কাশ্মীরী ক্যাসকেট, ফল-মূল ও মিষ্টান্ন উপহার দেওয়া হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য কান্তি দাস।

আমেরিকায় ভারতীয় নৃত্য

'১৯৩০-এ উদয়শঙ্কর ও রামগোপালের ভারতীয় নৃত্য দেখে আমেরিকাবাসী এই প্রাচ্য নৃত্যকলা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেও এই নৃত্য ছিল তাদের কাছে দূরের বস্তু, অনধিগম্য। কিন্তু আজ আর তা নেই। আজ তারা দলে দলে ভারতনাট্যম, কথাকলি, মণিপুরী নাচ শিখছে আগ্রহ ভরে এবং কোন মুদ্রার কি অর্থ, কিভাবে তার প্রয়োগ করা হয় তাও তারা অনুসন্ধিৎসুর মন নিয়ে জানছে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় নৃত্যের কোনো কোনো অংশ, ভঙ্গী, মুদ্রা তারা তাদের আধুনিক নৃত্যের অংগীভূতও করে নিতে আদৌ কুণ্ঠিত হচ্ছে না'—এই কথা শোনালেন প্রখ্যাতা নর্তকী মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার সেদিন ইউ এস আই এস-এর কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত একটি ছোট্ট আসরে। শ্রীমতী চাকী সরকার ১৯৬৬ থেকে ম্যাসাচুসেটস-এ আর্টিস্টস কলোনী বিখ্যাত উডস্টক-এর কাছাকাছি একটি জায়গায় বাস করছেন। তিনি নিউইয়র্কের স্টেট ইউনিভার্সিটি ও মাউন্ট সেন্ট মেরীজ কলেজে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে গত তিন বছর ধরে শিক্ষা দিচ্ছেন। তাছাড়া নিউ পালজ-এ তাঁর একটি নিজস্ব স্টুডিওতে তিনি ছাত্রছাত্রীদের নৃত্যশিক্ষা দিচ্ছেন। নিউইয়র্ক শহরে তিনি সতেরোজন শিল্পীর (যাঁদের মধ্যে এগারোজন হচ্ছেন আমেরিকান) সহায়তায় রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' সাফল্যের

মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার

সংগে মঞ্চস্থ করেছিলেন। তিনি বেশ জোরের সংগেই বলেন, নিউইয়র্ক শহরের বহু তরুণ-তরুণী ভারতীয় নৃত্যকে নিজের করে নিতে আগ্রহান্বিত।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী জন্মজয়ন্তী : গত ২রা অকটোবর পশ্চিমবংগ নাট্য সংরক্ষণ সমিতির সদস্যদের উদ্যোগে নিজস্ব সংসদ ভবন প্রাঙ্গণে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক লক্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করার পর বিভিন্ন বক্তা নাট্যাচার্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর অসাধারণ অভিনয় প্রতিভা ও সুদক্ষ পরিচালনার কথা বলেন। এছাড়াও জাতীয় নাট্যশালা এবং রবীন্দ্র-মঞ্চ প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করার দাবী জানানো হয়। এদিন দুপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশান ঘাটে (কাশীপুর) সমিতির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি-দল সেখানে গিয়ে শিশির ভাদুড়ীর স্মৃতি-সৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। সভার প্রারম্ভে 'উত্তর-রবি'র শিল্পীরা বি... নাটকের কয়েকটি জনপ্রিয় ও দেশাত্মবো... সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং মু... রচিত 'শিল্পীর স্মরণে' নামে একটি ... নাটক অভিনীত হয়। সভায় বহু ... সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি, নাট্যকার, ... পক্ষ ও বাংলাদেশের কয়েকজন সাহিত্য... রাগী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বোম্বাইয়ে দুর্গোৎসবে আতুল... অনুষ্ঠান : মহাসপ্তমীর সন্ধ্যায় বো... 'ঘরোয়া' গ্রুপ 'মাতৃবন্দনা' নামে স... সুষ্ঠু একটি অনুষ্ঠান তেজপাল হলে... স্থাপিত করেছিলেন। শারদীয় আ... বাতাসে মায়ের অপরূপ বন্দনা গা... মন্ত্রের মূর্ছনায় ঝংকৃত করে তুলে... শিশুদের সমবেত সংগীতে ও ... বোম্বাইয়ের বিখ্যাত শিশু কলাশিল্পী ... (নন্দিনী দাশগুপ্ত) তন্ময় হয়ে একাগ্র... 'মেঘের কোলে'র গান দর্শক সমাজের... শ্রোতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে...

একক গায়িকাদের মধ্যে শ্রীমতী সু... সেনগুপ্তের সুমধুর কণ্ঠে মায়ের আরা... গান অপূর্ব হয়েছিল। শ্রীযুক্ত মলয় ... পরিচালনা প্রশংসনীয়।

একমাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা : ৮ অকটোবর '৭২ বেলা ২-৩০ মি... রবীন্দ্র সরোবরে 'লেক ফ্রেন্ডস' পরিচা... ১৬ বছরের বালক-বালিকাদের এক ... সন্তরণ প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে ... হয়। বালকদের মধ্যে—প্রথম শ্রীসুধীর দাস (বৌবাজার) ২৩ মিঃ ১৯-৫ ... দ্বিতীয় শ্রীআশীষরঞ্জন দাশ (ঐ) ২... ২৭সেঃ, তৃতীয় শ্রীখগেন দত্ত (ভবানী... ২৪মিঃ ৩৩-৩সেঃ।

বালিকাদের মধ্যে—প্রথম রেখা ... (বাগবাজার) ৩১মিঃ ৮সেঃ, দ্বি... কাজল দে (আই এল এস এস) ৩২মিঃ ... সেঃ, তৃতীয় বুলবুলি নাথ (লেক ফ্রে... ৪১মিঃ ১-৩সেঃ। অনুষ্ঠানে পৌরো... করেন রথীন তালুকদার এম-এল-এ ... সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মণি সা... আহ্বায়ক ছিলেন অরুণকুমার করঞ্জা... রণজিৎ দেবনাথ।

বোকারোয় স্বাধীনতা দিবসের ... জয়ন্তী উৎসব : স্বাধীনতার রজতজ... বর্ষ উপলক্ষে ডি-ডি-সি বোক... 'চৈতালী'র সভ্যরা গোপাল ... পরিচালনায় এবং বোকারো ক্লাবের ... জনায় ক্লাবের স্থায়ী মঞ্চে নাট্যকার ... ভট্টাচার্যের "এক্কা গাড়ির ঘোড়া" না... সম্প্রতি সাফল্যের সংগে মঞ্চস্থ ক... অভিনয়াংশে ছিলেন মদন রায় (অর... সন্তোষ মুখার্জি (সুশান্ত), গোপা... (মনীষ), স্বপন রায়চৌধুরী (শ... নারায়ণ মজুমদার (জয়প্রকাশ) এবং দি... দত্ত (গংগাপদ)। নাটকের পূর্বে ক... নির্বাচিত দেশাত্মবোধক সংগীত পরি... করেন নারায়ণ মজুমদার, কৃষ্ণনাথ মু... শিখা মুখার্জি, সতী মজুমদার, দী... ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য।

াত্রাভিনয়

সম্প্রতি বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে লোকনাট্য দিত 'জানোয়ার' অভিনীত হলো। পালায় 'জানোয়ার' নিঃসন্দেহে এক ত্রপূর্ব সৃষ্টি। নাট্যকার ভৈরব াপাধ্যায় 'জানোয়ার' নাটকের মূল টি প্রকাশ করেছেন এক অনন্যসাধারণ গকের মাধ্যমে। মানুষের পূর্বপুরুষেরা জানোয়ার—বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ্উইন-এর এই সূত্র ধরে এ নাটকের কাহিনী বর্তমান মানব সভ্যতার আদিম থেকে চলতে শুরু করে দুরন্ত গতিতে য় গেছে ঠিক সেইখান পর্যন্ত, যেখানে ় দাঁড়িয়েছে বর্তমান মানব সভ্যতা। নীর নায়ক 'অরণ্য' কুদর্শন, বহুধা- ় বন্য জীবনের জীবন্ত প্রতীক। গভীর া পিয়াসী নদীর ধারে তার সংগে হলো শহরের শিক্ষিতা সুন্দরী দর্শী ঈশিতার সংগে...সুন্দরকে দেখে ন্দর যেন আরণ্যক হিংসায় উন্মত্ত হয়ে া। বিকট মুখ বিকৃত করে সুন্দরের ক ঈশিতাকে অসুন্দরের প্রতিচ্ছবি বলল—তোমাদের ওই সৌন্দর্যের ই মেকি-কৃত্রিম—অপ্রয়োজনীয়। দুটি ধর্মী চরিত্রের মধ্যে সৃষ্টি হলো ব সুলভ সংঘর্ষ। কাহিনী চললো অন্য । দেখা গেল, উত্তরবঙ্গের কোন এক গানের কতকগুলি বৈচিত্র্যময় চরিত্রের গোনা। ডাঃ অরিন্দম বোস এল, জ্জার মিঃ রায় এল, এল ওজনবাবু, ন তলাপাত্র। অরণ্য সংসারের মানুষ তার মা, বনানী, মেজভাই পল্লব। ছোট টুকুনকেও দেখা গেল। তারা কাহিনীর কখানি দখল করে আছে। অরণ্যের বোন নী। অর্থাভাবে তার বিবাহ হয়নি—তাই ফেটে পড়েছে বর্তমান সভ্যসমাজের র্শকগণের প্রতি...বলছে 'আমি এককাপ তাহলে আমাকে কেউ চুমুক দিয়ে খাচ্ছে কন?' মূল কাহিনীর বুকে উপকাহিনীর াস নাট্যকারের মুন্সিয়ানার পরিচয় দেয়। ত পাগল বেকার যুবক টুকুন তাই কণ্ঠে গেয়ে ওঠে 'নয়া ইতিহাস আর লেখা হবে। পুরোনো ভূগোল করে হবে শেষ...স্বাস্থ্য যে আজ ভেঙ্গে গেছে বীর, অশুভ কর্মে নিয়মিত বিজ্ঞান...' ক মেয়ে মাতাল পাখীর পায়ে বাজে ার মল—নেশায় বিভোর হয়ে পাখী —'বুকে যদি থাকে তোমার ভালবাসার নাখানি দেখে নাও কত রূপ এই গ।'

উপকাহিনীর প্রারম্ভে দেখা গেল দীপ চৌধুরী আততায়ীর হাতে নিহত া...পুলিশ অফিসার নিলেন তদন্তের —তিনি এক জায়গায় বলেছেন 'দেখলাম কত নীরবে চলে যায়—আর অন্যায় হার পাঠায় এক পেয়ালা চা'...মানবিকতার গ মেকিসভ্যতার লড়াইয়ের এই পালায় কে মনে হয়েছে নাটকেরই একটি চরিত্র। অভিনয় দেখতে দেখতে মনে হলো মানুষের জন্য এত কথা এর আগে আর কোন পালায় শুনিনি। জানোয়ার যাত্রা জগতের জয়যাত্রাকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার দাবী নিয়ে জন্মেছে একথা বলতে দ্বিধা নেই। সেই সঙ্গে বলতে হয় সুরকার প্রশান্ত ভট্টাচার্য সম্পর্কে একটি কথা—প্রশান্তবাবু এ নাটকে সুরের গঙ্গা বইয়ে দিয়েছেন। অভিনয়ের দিক থেকে বিচার করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে অরণ্য সেজের ভূমিকায় শেখর গাঙ্গুলীকে। শ্রীগাঙ্গুলীর প্রাণবন্ত অভিনয়ে অরণ্য চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ডাঃ অরিন্দম বোসের চরিত্রাভিনয় করেছেন অনাদি চক্রবর্তী। তাঁর সুঅভিনয় ভোলা যায় না। সাজনের ভূমিকায় তপনকুমার উজ্জ্বল। মহিলা চরিত্রে প্রথমেই বলতে হয় পাখীর কথা। কুমারী অঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাখী অনেকদিন মনে থাকবে। ঈশিতার ভূমিকায় বর্ণালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে চমৎকার মানিয়েছে। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের গানগুলি যে যাত্রা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করবে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

'কবি চন্দ্রাবতী' যাত্রাভিনয় : পূর্ব-বাংলার একটি সুন্দর লোককাহিনী জয়চন্দ্র চন্দ্রাবতীর প্রেম ও বিরহকে কেন্দ্র করে শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে 'কবি চন্দ্রাবতী' পালা রচনা করেছেন। এই সুন্দর পালাগান অতি দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনয় করেন কলকাতার প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা গিরিজা নাট্য সংসদ গত ৭ অক্টোবর বাগবাজারে মদনমোহন মন্দির প্রাঙ্গণে। সূচনা থেকে শেষ অবধি এই যাত্রাভিনয়ের মধ্যে শিল্পীদের অভিনয়দক্ষতায় বিশেষ রূপটি ফুটে উঠেছে। কোন সময়েই মনে হয়নি যে অভিনয় হচ্ছে বরং মনে হয়েছে যে দর্শকমন এক অন্যজগতে চলে গিয়েছে। সংঘাতময় বৈচিত্র্যময় ও করুণ রসাত্মক এর কাহিনী দর্শক-দলকে মুগ্ধ করেছে। শ্রীঅসিত সাহা এ নাটকটির পরিচালনায় ও নাম-ভূমিকায় ছিলেন। অভিনয়ের মূল সুরটি তিনি সঠিকভাবে প্রকাশ করেছেন। কার্তিক বাগচির কেনারামের ভূমিকা বিশেষ হৃদয়-গ্রাহী হয়েছে। এছাড়া সমীর ব্যানার্জী, শশাংক চ্যাটার্জী, গৌরচন্দ্র পাল, গৌর

যদুবংশ/শর্মিলা ঠাকুর ও ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা : পার্থপ্রতিম চৌধুরী

অধিকারী, প্রদীপ ব্যানার্জী, সুরেশ ঘোষ, তারাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পূর্ণেন্দু মুখার্জী, ইতু মুখার্জী, বুলা ভট্টাচার্য, ঝর্ণা ও অন্যান্য শিল্পীরা সু-অভিনয় করেন। সমগ্র নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সুলেখা ব্যানার্জী। নাট্য-উপদেষ্টা হিসাবে ছিলেন ধীরেন চক্রবর্তী।

মঞ্চাভিনয়

সম্প্রতি মুক্ত-অংগনে নৈহাটির যান্ত্রিক-গোষ্ঠী বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র ভট্টাচার্য রচিত 'আমার জননী' নাটকটি সাফল্যের সংগে অভিনয় করেন। একদিকে বাংলাভাষার অধ্যাপক ডঃ হোসেন, তাঁর দুই ছেলে ও মেয়েরা বাংলা ভাষাজননীকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষারূপে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখবার জন্যে জীবন পণ করেছেন। অন্যদিকে ছোটসাহেব হাবিব প্রভৃতি সরকারী পদস্থ ব্যক্তিরা সেখানে উর্দুকে কায়েম করবার জন্যে অপরপক্ষকে যৎপরোনাস্তি পীড়ন করে চলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত ২১ ফেব্রুয়ারী গণ-আন্দোলনের ফলে পরাজয় স্বীকার করলেন—এই-ই হচ্ছে শ্রীভট্টাচার্য রচিত নাটকের কাহিনীর সারমর্ম। বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজ্যে পরিণত করবার চেষ্টার বিরুদ্ধে খানসেনারা যে অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল, তারই কিছু ছায়া যেন নাটকটিতে প্রতিফলিত।

বিভিন্ন চরিত্রে সার্থক রূপদান করেছেন নিখিল ভট্টাচার্য (ডঃ হোসেন), দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় (মকবুল), স্বপন ভট্টাচার্য (হামিদ চৌধুরী), বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (হাবিব), রন্দীপ ভট্টাচার্য (ছোট সাহেব), রূপা গংগোপাধ্যায় (রোশন), যূথিকা চট্টোপাধ্যায় (রাবেয়া)। সামগ্রিক নাট্য প্রযোজনাটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন।

'গন্ধর্ব'র মজার মজা : কিছু নাটক দেখে মনে হয়, নাটক দেখছি না, দেখছি সুখ-দুঃখ, অনুভব অনুরাগে আঁকা জীবনের কয়েকটি চেনা ছবি। মঞ্চের সংগে এই নিবিড় একাত্মতায় যে আস্বাদন আছে তার মধ্য দিয়েই তো বিকশিত হয় জীবনের নিটোল শিল্পসৃষ্টি। গন্ধর্ব নাট্যগোষ্ঠীর সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'মজার মজা' দেখতে গিয়ে হয়তো দর্শকমন এই উপলব্ধির গভীরেই ডুব দেবে। নাট্যকার দেবকুমার ভট্টাচার্য এ নাটকে কোন সোচ্চার প্রতিবাদ বা সংগ্রামের ধ্বনি তোলেননি, জীবনে যেটা ঘটছে তারই মুখর নাটকীয় মুহূর্তগুলোই মুন্সিয়ানার সংগে তুলে ধরেছেন। জীবনে কত্তো মজাই না আমরা প্রত্যক্ষ করি, এ মজায় যন্ত্রণা আছে, রাগও আছে। এই নিয়েই 'মজার মজা' নাটক।

নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করে[illegible] নাট্যকার। তাঁর প্রয়োগপরিকল্পনা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। দ[illegible] অভিনেতার মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান প্রযোজনায় অপসারিত হয়েছে। [illegible] অসাধারণ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর [illegible] জগন্নাথ হালদার ও দেবকুমার [illegible] অন্য কয়েকটি ভূমিকায় সপ্রতিভ [illegible] করেন দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবা[illegible] ঝুমুর ভট্টাচার্য ও বিপ্লব চৌধুরী[illegible]

সংগীত আর মঞ্চ পরিকল্পনা[illegible] সিংহরায় ও শান্তনু দাসের [illegible] স্বাতন্ত্র্যই স্পষ্টতার ভাষা পেয়েছে।

কবি : চলচ্চিত্রের রূপালী পর্দ[illegible] মঞ্চের আলোয় যে নাটকটির [illegible] একদিন সবারই মনকে বিহ্বল ক[illegible] ছিল, তাকে যাত্রাগানে পরিবেশন ক[illegible] সমান আলোড়ন তোলা যায় তা[illegible] বেশ সুস্পষ্টতায় চিহ্নিত হোল [illegible] তারাশঙ্করের অমর সৃষ্ট 'কবি'[illegible] জনায়। আজ থেকে বেশ কয়েক ব[illegible] 'কবি' নাট্যামোদীদের আপ্লুত [illegible] আর সেই একই রসময়তায় ভর[illegible] উঠেছিল মন সেদিনকার পালাগানে[illegible] অভিনয়ে।

'কবি'র যাত্রাপযোগী নাট[illegible] সুগভীর শিল্পবোধ ও সংযমের [illegible] রেখেছেন নির্মল মুখোপাধ্যায়। [illegible] শংকরের সৃষ্টির অতলে তি[illegible]

রৌদ্রছায়া/উত্তমকুমার

ণ্ঠার সংগেই প্রবেশ করতে পেরেছেন। টকের মূল চরিত্র কবিয়াল নিতাইয়ের মিকায় গুরুদাস ধাড়ার প্রাণবন্ত অভিনয় লবার নয়. তাঁর দরদী কণ্ঠে গান সম যোজনায় এক মধুর আবেশ সৃষ্টি করেল। দুই নায়িকা 'ঠাকুরঝি' আর 'বসনের' মিকায় সাবলীল অভিনয় করে দর্শকমনে খাপাত করতে পেরেছেন শিখা বোস ও োৎস্না দত্ত। রেলের পয়েন্টম্যান 'রাজেনের মিকায় পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নিষ্ঠার ঙ্গে অভিনয় করেছেন।

অন্যান্য চরিত্রে রূপ দেন অজিত দাস, ারক দাস, প্রসেনজিৎ চৌধুরী, নির্মল ুখোপাধ্যায়, জয়দেব গাঙ্গুলী, মুকুল , মণ্টু ঘোষ, নারায়ণ মণ্ডল, শ্রীমতী ন্দী, মন্দিরা ঘোষ, স্বপ্না ঘোষ।

এ নাটকের অপরূপ সুরসংযোজনা করেছেন প্রখ্যাত সুরকার অনিল বাগচী।

আগন্তুকে'র 'রাতের অতিথি' : উৎপল ত্তের বহু অভিনীত 'রাতের অতিথি' নাটকটি সম্প্রতি মুক্ত অংগনে পরিবেশিত হোল। এই সফল নাট্যানুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিলেন 'আগন্তুকে'র শিল্পীরা। মানবিকতার সুমহান পবিত্র দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে সমাজকে যারা কলুষিত করবার চেষ্টা করছেন, সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর জীবনকে যাঁরা প্রতিনিয়ত অনিশ্চয়তার অতল অন্ধকারে নিমজ্জিত করতে চাইছেন তাঁদেরই মুখোস উন্মোচিত হয়েছে এ নাটকে।

মঞ্চ ও আলো পুরোপুরিভাবে মূল নাটকের গতিছন্দের সংগে তাল মেলাতে না পারলেও শিল্পীদের দরদী অভিনয় প্রযোজনাটিকে যথেষ্ট আকর্ষণীয়ই করে তোলে। বিভিন্ন চরিত্র-চিত্রণে ছিলেন সলিল চ্যাটার্জি, পঞ্চানন দাস, গোবিন্দ ঘোষ, উৎপল ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র দাস, রমা গুহ, উমাপ্রসাদ ব্যানার্জী, বিপ্লব মুখার্জী, শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জি।

কথামঞ্চের নাট্যাভিনয় : দক্ষিণ কলকাতার 'কথামঞ্চ' নাট্যগোষ্ঠী সম্প্রতি থিয়েটার সেন্টার মঞ্চে 'অভিনয়' ও 'হৃদ-বদলের মেলায়' নামে দুটি একাঙ্ক নাটক পরিবেশন করে নাট্যানুরাগীদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছেন।

নাটক দুটির শিল্পী তালিকায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা হোলেন তপনকুমার দেব, তপনকুমার দাস, চয়ন দস্তিদার, প্রশান্ত চৌধুরী, স্বপনকুমার চক্রবর্তী, ভূপেন দেব, মৃত্যুঞ্জয় দাস, তপনকুমার রায়, অশোক গুহ।

নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল : শিয়ালদহ নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট আয়োজিত একাঙ্ক নাট্যপ্রতিযোগিতার ফলাফল সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে। প্রথম শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা—'যাদুঘর' (নৈহাটি ওয়াই এম সি এ), ২য় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা—'নো এনট্রি' (উত্তরপাড়া আমরা নাট্যগোষ্ঠী), ৩য় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা—'ওরা কাজ করে' (শান্তিপুর রেলওয়ে রিক্রিয়েশন ক্লাব)। শ্রেষ্ঠ পরিচালক—শ্যামতনু দাশগুপ্ত (যাদুকর), দ্বিতীয়—স্বপন গাঙ্গুলী (নো এনট্রি) এবং সুনীল আচার্য (জটায়ু সংবাদ)। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার—অরুণ মুখার্জী (জটায়ু সংবাদ)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—নিশীথ চক্রবর্তী। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—ছবি তালুকদার (আলো ছায়ার আলো)।

সংগঠনীর 'লালবাই' : বারাসতের প্রখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী সংগঠনীর শিল্পীরা আগামী ৯ নভেম্বর নৃত্য-গীত সমৃদ্ধ 'লালবাই' নাটকের পুনরভিনয় করবেন। নাট্য-নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন বরুণ চ্যাটার্জী। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষাল। তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করবেন সাধন ঘোষাল।

বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন বিশ্বনাথ দে, কিরণ চ্যাটার্জী, বরুণ চ্যাটার্জী, রামপদ মুখার্জী, সমরজিৎ দে, মৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জী, শিশির চ্যাটার্জী, অরুণ দে, সুকু দাস, শুক্লা গাঙ্গুলী, আলো সেনগুপ্ত, প্রতিমা দাস, নীলিমা দাস, মঞ্জু গাঙ্গুলী, অঞ্জলি ভট্টাচার্য, দিলীপ মৌলিক ও ছন্দা চ্যাটার্জি।

স্ফুলিঙ্গ কালচারাল ক্লাবের 'দিশাহারা' : স্ফুলিঙ্গ কালচারাল ক্লাবের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি শংকরনাথের 'দিশাহারা' নাটকটি মঞ্চস্থ হোল। নাটকটির দলগত অভিনয় সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন রাকেশ সুকলা, সুজিত দাস, সরোজ সাহা, মানিক মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব ভঞ্জচৌধুরী, সনৎ পাইন, চণ্ডী দাস, তপন মুখোপাধ্যায়, বাবুল ভট্টাচার্য, সরোজ মুখোপাধ্যায়, প্রবীর দাস ও শংকরনাথ। নাট্যকার স্বয়ং নির্দেশনা ও সঙ্গীত পরিকল্পনার দায়িত্ব নেন।

ঘণ্টাফটক : অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রফেশনাল ওয়ার্কসের কলকাতা শাখার সদস্যরা সম্প্রতি প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে প্রশান্ত চৌধুরীর 'ঘণ্টাফটক' নাটকটি মোটামুটি সাফল্যের সংগেই অভিনয়

করলেন। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন নির্মল ঘোষাল (দর্পনারায়ণ), অনুভা ঘোষাল (রমা), মুকুল বসু (অনন্তনারায়ণ), পূর্ণিমা দত্ত (পিয়ারী), অভিজিৎ সেনগুপ্ত (পরিমল), স্মৃতিপ্রসাদ চ্যাটার্জী (শ্রীকান্ত), কুমার রায় (নেপাল), ননী চক্রবর্তী (মুকুন্দ), অনন্ত মুখার্জী (গটক), বিজন আচার্য (নিতাই), প্রসাদ চৌধুরী (মুন্সিজ আসমন)।

একাংক নাট্যপ্রতিযোগিতা : সংগঠনী আয়োজিত ২৪ পরগণা একাংক নাট্য-প্রতিযোগিতা আগামী ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে শুরু হবে। যোগাযোগের ঠিকানা : সম্পাদক, সংগঠনী, উদয়পুর, কলকাতা-৪৯।

'শান্তিনিকেতন' 'সোনা মাটির চর' : গত ৬ অক্টোবর রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী 'শান্তিক' তাদের ২য় বার্ষিক অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁরা 'সোনা মাটির চর' নামে একটি নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। এই নৃত্যনাট্যটি শুধু যে তাঁদের পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন তাই নয় এর মাধ্যমে দলগত নৈপুণ্যের যে স্বাক্ষর তাঁরা রেখেছেন তাতে এ'দের ভবিষ্যৎ যে যথেষ্ট উজ্জ্বল তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

এ'দের প্রথম প্রয়াস ছিল 'গ্রাম শহর বন্দর'। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত এই নৃত্যনাট্যটি ইতিপূর্বেই মৈত্রী-মেলা সহ বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হয়েছে এবং সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বর্তমান নাটকটিও একটি গ্রামীণ প্রেম কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত। কিভাবে কৃষকের সন্তান রাতু জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে জেলের মেয়ে ঝিমলির সঙ্গে মিলিত হল তাই এই নাটকের উপজীব্য। স্বভাবতই এই উপলক্ষে গ্রাম-জীবনের নানা দিকে নাটকের সন্ধানী আলো পড়েছে এবং টুকরো টুকরো ছবির মধ্যে দিয়ে করুণ ... এক জীবনের ... সৌন্দর্য আছে ... আছে।

... নৃত্যনাট্যের চর্চা খুবই ... দু-একটি সংস্থা নৃত্যনাট্যের চর্চা ... তাঁরা ... পৌরাণিক কাহিনী বা রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যই ... করেন। একেবারে আধুনিক জীবন নিয়ে নৃত্যনাট্য খুব বেশি হয়েছে বলে জানা নেই। 'শান্তিক' গোষ্ঠী যদি ... বর্তমান কালকে নৃত্যে রূপায়িত করার চেষ্টা করেন তবে তাঁরা যে উল্লেখ-যোগ্য কাজ করবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নৃত্য ও অভিনয়ে এই গোষ্ঠীর প্রতিটি শিল্পীই পরিণত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তবু বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় বিশাখা ভাদুড়ী, রমা বসু মধুরাকা দত্ত, সুস্নাতা আচার্য চৌধুরী, অর্চনা ভাদুড়ী আদিত্য মিত্র। করবেণু ব্যানার্জি, বাবুল দাস ও তপন চক্রবর্তীর কথা।

নৃত্যনাট্যটির সাফল্যে সঙ্গীতের অবদানও কম নয়। মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাত চোখে পড়ার মত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সতীন্দ্রনাথ মৈত্র।

হাজারীবাগে 'মহুয়া'র নাট্যানুষ্ঠান : মহালয়ার দিন হাজারীবাগের সৌখীন নাট্য-সংস্থা 'মহুয়া' স্থানীয় সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল হলে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক অভিনয়ের আয়োজন করেন। 'মহুয়া'র এই অনুষ্ঠানটি হাজারীবাগে বিশেষ কৌলিন্যের দাবী রাখে। সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রুচিশীলতার ছাপ পড়েছিল সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে। অনুষ্ঠান সুরু হয় সানাই-এ পূরবী বাজিয়ে। এরপর সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন প্রধান অতিথি রমেন্দ্রনারায়ণ সিংহ (ডি আই জি পুলিশ ট্রেণিং) এবং সংস্থা সভাপতি অমলকৃষ্ণ বসু। নাটক প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নাট্যকার পরিচালক আশিসকুমার সান্যাল দর্শক-শ্রোতাদের মন কেড়ে নেন। এরপর আশিসকুমার সান্যাল (স্থানীয় ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার অ্যাকাউন্টেন্ট)—রচিত পরিচালিত 'আমরা' নাটকটি অভিনীত হয়। কফি হাউসের চার দেয়ালের প্রতীকি ফ্রেমের মধ্যে আমাদের ঘরেরই কয়েকটি ছেলে-মেয়ের জীবন-স্পন্দকে নাট্যকার এমনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যে নাটকের চরিত্রগুলির সঙ্গে দর্শকরা সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন।

একটি প্রস্তাবনা দৃশ্য দিয়ে নাটক সুরু করে পরিচালক বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। নাটকটির সুরুতে 'আমরা নূতন যৌবনেরই দূত' ও শেষে 'ভরা থাক স্মৃতি-সুধায়' এই দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রয়োগ নাটকটির অন্তর্নিহিত ভাবটিকে পরিস্কার করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

অভিনয় প্রসঙ্গে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় 'মহুয়া'র টিম-ওয়ার্ক অতি উচ্চ-মানের—এ ব্যাপারে পরিচালক নিঃসন্দেহে মুন্সিয়ানা দাবী করতে পারেন। চরিত্রগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন উজ্জ্বলা ঘোষ (ট্রাস), অসিত মিত্র ... সেনগুপ্ত (প্রণব) অনিল ... (কেবলরাম), আশিস সান্যাল (খো... সমীরেন্দ্র লাহিড়ী (দেবীপ্রিয়)। ... চরিত্রে সু-অভিনয় করেন অজ... (গোপা), সত্যদেব শূহরায় ... আশিস সরকার (রাণা) ও ... মুখার্জি (নবীন)।

মঞ্চ পরিকল্পনা ও আলোক ... ভার নিয়েছিলেন যথাক্রমে অসিত ... শিবনাথ মুখার্জি। সুন্দর আ... সৃষ্টি করেছিলেন বাগীশ্বর ঝা।

বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতি কর্তৃক আয়োজিত প্রকাশচন্দ্র ঘো... সর্বভারতীয় পূর্ণাঙ্গ বাংলা ... যোগিতা অন্যান্য বছরের ন্যায় ক্লাবের অতুল নাট্যমঞ্চে সুরু হ... ৯ ডিসেম্বর, ৭২ থেকে। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ৫০১ টাকা ও ২য় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ২৫১ টাকা অন্যান্য ... ছাড়াও দেওয়া হবে। প্রতি... যোগদানের শেষ তারিখ ১৯ নভে... নিয়মাদির জন্য এই ঠিকানায় ... করুন। সাধারণ সম্পাদক। বেঙ্গল... যুবক সমিতি। ২০, শিবাজী ... লউনৌ-১।

ব্যারাকপুরে নাটকাভিনয় : দুর্গোৎসব সম্মিলনী এ বছর ... উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী উৎসব ... আয়োজন করেন। নাটক অভি... প্রধান আকর্ষণ। মহাসপ্তমী র... সংসদের সভ্যবৃন্দ শৈলেশ গুহ ... 'ফাঁস' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। বি... সফল রূপদান করেন প্রেমব্রত ... (ডেপুটি), তপন ব্যানার্জি ... অমল সেনগুপ্ত (বিমান) প... (সুভাষ), শিবচন্দ্র সাধু (অঘোর ... চক্রবর্তী (নবীনকুমার), অমূল্য ... (জনার্দন), জহর সেনগুপ্ত ... সুবোধ চক্রবর্তী (জুরাম), উপেন ... (কমলেশ), দেবাশীষ বোস (ত... চক্রবর্তী (কপিল), শ্রীমতী গীত... (তরলা) ও শ্রীমতী বসন্ত... (সোনালী)। মঞ্চ ব্যবস্থাপনা... দিলীপ গোস্বামী ও স্বপন ঘোষ ... যোজনায় সৌরেন ভাদুড়ী।

মজঃফরপুরের সুভাষ সঙ্ঘ ... বছরের ন্যায় মহাঅষ্টমীর রাত্রে ব... রঙ্গমঞ্চে 'সুভাষ সঙ্ঘের' শিল্পী... করেন অমিতাভ গুপ্তের বহুবিত... 'হিমালয়ের থেকেও ভারী!' নাট... অসাধারণ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রা... পরিচালক প্রদীপ চৌধুরী। ... গুণে নাটকটি জমাট ও বাস্ত... ওঠে। স্থানীয় জনসাধারণ তাঁর ... আরও ভাল নাটকের আশা রা... প্রতিটি শিল্পীই প্রাণোচ্ছল ... করেছেন। তবে বিশেষ করে দর্শ... মনে রাখবেন তাঁরা হলেন শি... (হরিদাস) অর্ণব নাগ (নারায়ণ),

নরেশ)। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন সনৎ চক্রবর্তী, কিশোর গুহ; দিগ্বিজয় ঘোষ, গুপ্ত ও প্রদীপ চৌধুরী।

অঙ্গ-বিহঙ্গের সফল অভিনয়: গত ৰিশে সেপ্টেম্বর নেতাজী সুভাষ নস্টিটিউট হলে স্কট এণ্ড স্যাকসবি মণ্ডলায়িক রিক্রিয়েশন ক্লাব-এর বার্ষিক সেব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ধীরেন্দ্র-থ চক্রবর্তীর 'অঙ্গ-বিহঙ্গ' নাটক মঞ্চস্থ য়। নাটকটি পরিচালনা করেন শীতলপ্রসাদ খোপাধ্যায় ও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। সত্তর কের অস্থির সমাজজীবনে দিশেহারা নুষেরা অঙ্গ--বিহঙ্গের মত পথ খুঁজে রেছে। সমাজ-জীবনের এই অঙ্গ-বিহঙ্গরা বিস্ত হয়ে উঠেছে অভিনেতাদের বলিষ্ঠ ভিনয়ে। দলগত অভিনয় ছাড়াও যাঁরা তন্ত্রের স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁরা হলেন ীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (শশীভূষণ) শীতলা-সাদ মুখোপাধ্যায় (শান্তনু) নির্মলচন্দ্র হা (হিমাদ্রি), দীপা হালদার (বন্দনা), চন্দ্র মুখার্জী (ল্যাংচা) ও অমিয়ভূষণ কার (হরি)। মঞ্চসজ্জা ও আলোক পাত মোটামুটি। আবহসংগীতে রবীন । যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

রঙ্গমঞ্চ শতবর্ষ পূর্তি অভিনয়: সম্প্রতি ড়া রবীন্দ্রভবন মঞ্চে তিনদিনব্যাপী এক । উৎসব হয়ে গেলো। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বাঁকুড়া জেলা বংগ মঞ্চ শতবর্ষ পূর্তি উৎসব কমিটি এই ট্যাৎসবের আয়োজন করেন। জেলার বিভিন্ন ন থেকে সাতটি নাট্য সংস্থা এতে যোগ য়াছিলো। প্রতিদিন শত শত দর্শক বিপুল াহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে নাট্যোৎসবটি ভোগ করে। প্রথমদিন ডিষ্ট্রিকট ফসার্স ক্লাব রতনকুমার ঘোষের 'বিষুব া' ও অপরূপ নাট্যসংস্থা সুধাংশু গুপ্তের 'আমি এই চাইনি' মঞ্চস্থ করেন। ও সি-র 'বিষুবরেখা' দ্বিতীয়বার ভনীত হোল। 'অপরূপের' আরও অনু-ীন দরকার। দ্বিতীয়দিন তিনটি নাট্য থা তিনটি একাঙ্ক অভিনয় করেন। ম খাতড়ার সংতর্ষি রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের ালে' মঞ্চস্থ করেন। দলগত অভিনয়ের ছন্দ্য আছে, তবে কার কার উচ্চারণ ও ষ্ট ভঙ্গি ভাল লাগেনি। দ্বিতীয় ভনয় মিলন তীর্থের বীরু মুখোপাধ্যায়ের ঘাত'। মিলনতীর্থ নিজেদের সুনাম রক্ষা ছেন। নির্দেশনায় অনাদি বসু সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তৃতীয় ভনয়—বাঁকুড়ার নব সাংস্কৃতিক সংস্থা ন্দমের 'পাপপুণ্য'। রতনকুমার ঘোষের কটি বিমলেন্দু বন্দোপাধ্যায়ের নির্দে-য় পরিবেশিত হয়। 'পাপপুণ্য' ক্রাইমড্রামা । রূপক নাটক। অমল শীলা বুবুন । কোন বিশেষ ব্যক্তি নয়। জীবনের ভগ্ন বস্তুর প্রতীক। দারোয়ান কালেন রক। সেখানে সত্য নিরাবরণ রূঢ় র্তাহ। অনেকদিন বাদে দলগত নৈপুণ্যে ক্ষেপণে ও অভিনয় চাতুর্যে এক সুন্দর ক দেখা গেল। নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৃদ্ধ তার অভিনয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তৃতীয়দিন প্রথম অভিনয় করেন মঞ্চরঙ্গের শিল্পীবৃন্দ রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'রক্তে রোয়া ধান' নির্দেশক রমাপ্রসাদ পাত্র কর্মকারের সুষ্ঠু পরিচালনায় নাটকটি মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। কেশার ভূমিকায় রমাপ্রসাদ পাত্র-কর্মকারের অভিনয় সুন্দর ও সাবলীল। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় সদানন্দের মেলার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'পুষ্পক রথ' একাঙ্ক অভিনয়-এর মাধ্যমে। সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্য-সংস্থা তাদের সুনাম অনুযায়ী নাটকটি পরিবেশন করেন। বাস্তব নাটক পুষ্পক রথ সকলের ভাল লেগেছে। হরপ্রসাদ বন্দ্যো-পাধ্যায় ও গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায় দুইটি ভিন্ন চরিত্রে অপূর্ব অভিনয় করেন। সংলাপের উপর দখল ও স্বচ্ছন্দ অভিনয়ে প্রত্যেকের অভিনয়ই প্রশংসনীয়।

ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড রিক্রিয়েশন ক্লাব অভিনীত ক্ষুধা নাটকের দৃশ্য।

'অজানা' প্রযোজিত 'আগুন': আজকের যুগযন্ত্রণায় বিধ্বস্ত সমাজের একটি স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে সমর মুখোপাধ্যায় রচিত 'আগুন' নাটকে। এই বলিষ্ঠ বাস্তবনিষ্ঠ নাটকটিকে কয়েকদিন আগে মিনার্ভা মঞ্চে পরিবেশন করলেন 'অজানা'র শিল্পীরা।

এ নাটকে যাঁরা উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন তাঁরা হোলেন তারক ঘোষ, খোকন ব্যানার্জী, গোলক সেন, সুশীল দে, শুভেন্দু মুখার্জী, শংকর সেন, সূর্য-গোপাল ঘোষ, জয়ন্ত রক্ষিত, মৃণাল রায়, রথীন সিকদার, সুকুমার ঘোষ, দীপ্তি দে, সর্বাণী চ্যাটার্জী, রূপা রায়চৌধুরী।

নটমল্লারের 'খন্দর': সমাজে এক ধরনের লোক আছে যারা সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ আর দাবিদের সুযোগ নেয় এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সর্বনাশের অন্ধকারে টেনে এনে সারা জীবনটাকে বিষময় করে তোলে। এদেরই স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে একটি নাটকে। নাটকটির নাম 'খন্দর'। শিবপ্রসাদ অগ্নিহোত্রীর লেখা এই নাটকটি সম্প্রতি মিনার্ভা মঞ্চে পরি-বেশন করলেন 'নটমল্লারে'র শিল্পীরা। বক্তব্যনিষ্ঠ এই নাটকটির প্রয়োগ পরি-কল্পনায় ছিলেন নাট্যকার স্বয়ং।

বিভিন্ন চরিত্রচিত্রণে ছিলেন দেবদাস গাঙ্গুলী, কান্তি গাঙ্গুলী, সৌমেন মুখার্জী, অজিত ব্যানার্জী, গোপাল দাস, রেণু ঘোষ, অঞ্জলি ভট্টাচার্য, আরতি মল্লিক, প্রবীর সেনগুপ্ত, নির্মল সিকদার, সমীর ঘোষ, অনুপ বোস, গৌতম সিনহা, প্রফুল্ল দত্ত, জ্যোৎস্না মিস্রি ও শিবপ্রসাদ অগ্নিহোত্রী।

কথক গোষ্ঠীর দুটি নাটক: দক্ষিণ কলকাতার প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর শিল্পীরা সম্প্রতি দুটি নাটকের অভিনয় করে নাট্যরসিকদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন কুড়িয়েছেন। নাটক দুটি হোল 'আলোকাভিসার' (লেডী গ্রেগরী রচিত 'রাইজিং অফ দি মুন' অবলম্বনে) ও 'কমলাকান্তের জবানবন্দী' (বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' অবলম্বনে)। এই দুটিরই নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীঅমিতাভ রায়। নির্দেশনারও ছিল তাঁর।

'আলোকাভিসারে'র দুটি মুখ্য চরিত্রে সাবলীল অভিনয় করেন বিশু চট্টোপাধ্যায় (পুলিশ ইনস্পেকটর) ও ভাস্কর ঘোষ (বিপ্লবী)।

'কমলাকান্তের জবানবন্দী' প্রযোজনা হিসাবে আরো বলিষ্ঠ হোতে পেরেছে। দল-গত অভিনয়ে কোথাও কতটুকু শৈথিল্য দেখা যায়নি। বেলা রায়চৌধুরীর প্রসন্নময়ী, বাসব মিত্রের 'ফরিয়াদী উকীল' ও অমিতাভ রায়ের 'কমলাকান্ত' সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে নেয়।

জলসা

[illegible] ঃ হিজ মাস্টার্স ভয়েস নেবেছেন সম্প্রতি প্রকাশিত সুশীল চক্রবর্তীর কৌতুকাভিনয় 'সুদের বদলের পালা'—এক উপভোগ্য আলেখ্য। হার্ট ইক[illegible]কে উপলক্ষ করে এ হেন হাস্যরস [illegible] সাজাকারের রসবোধের পরিচয় [illegible] কৌতুক-পরিবেশন রীতির জন্য কৃতিত্বের প্রধান অংশ প্রাপ্য—আলেখ্য-রচয়িতা খগেন দাশগুপ্ত ও শিল্পী সুশীল চক্রবর্তীর। অন্যান্য সহশিল্পীরা হলেন সর্বশ্রী মেনকা দাস, পঙ্কজ ভট্টাচার্য এবং অনুপমা গাঙ্গুলী।

'ভারতী' রেকর্ড কোম্পানীর শারদার্ঘ্য ঃ অন্যান্য বারের মত এবারেও 'ভারতী' রেকর্ড কোম্পানী তাঁদের শারদার্ঘ্যের ডালি নিয়ে সঙ্গীতরসিকদের দরবারে উপস্থিত হয়েছেন।

সুবিখ্যাত কীর্তনীয়া শ্রীরথীন ঘোষের কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের 'অষ্টোত্তর শতনাম' নিঃসন্দেহে বাঙালীর অতি আদরের বস্তু হয়ে উঠবে।

সমর গুপ্ত রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে অতি পরিচিত একটি নাম। এবারের গাওয়া দুটি গান—'এতদিন যে বসেছিলেম' ও 'জানি তুমি এসেছ এ পথে' সেই পরিচয়েরই স্বাক্ষরবাহী। সুস্মিত সেন গত কয়েক বছর ধরেই নিষ্ঠার সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করে আসছেন। এবারের গাওয়া 'মনমোহন গহন যামিনী শেষে' ও 'নিশীথ শয়নে' গান-দুটিতে এই নবীন শিল্পীর পরিবেশনায় উন্নততর মান ও অনুশীলনীর পরিচয় পাওয়া যায়। অতুলপ্রসাদের দুটি গান গেয়েছেন মঞ্জুলিকা ভাদুড়ী। জয়ন্তী সেনের কণ্ঠের দুটি আধুনিক গান তাঁর পূর্বখ্যাতি অক্ষুণ্ন রেখেছে। পূজার নানারঙা পুষ্পস্তবকে বর্ণসমৃদ্ধ করে তুলেছেন অন্যান্য যেসব শিল্পী তাঁরা হলেন দেবকুমার লাহিড়ী, কেশব দাস, রঞ্জিৎ বসুরায়, কমল চক্রবর্তী, বীরেন নন্দী, জয়শ্রী সেনগুপ্ত, সুব্রত চন্দ, সুবোধ গাঙ্গুলী, সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সৃষ্টিধর দত্ত, মণিদীপা সাহু, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ দত্ত, সলিল দাস ও চায়না দাস, বিশ্বেশ্বর সরকার, শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়, মলয় দাস। এছাড়াও কাহিনীমূলক গান গেয়েছেন সোমেন দত্ত, ইলেকট্রিক গীটারে জনপ্রিয় হিন্দী গানের সুর বাজিয়েছেন সুভাষ পাল এবং কৌতুককণিকা পরিবেশন করেছেন মলয় সাহা। প্রতিটি বিষয়-বস্তুতেই নবীন শিল্পীদের আন্তরিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়। এতগুলি নবীন প্রতিভাকে রসিক সমাজের গোচরে আনার জন্য ভারতী কোম্পানী ধন্যবাদার্হ।

গীতিকার ও সুরকারের মধ্যে আছেন সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীলবরণ, অজিত চৌধুরী, ভবেশ গুপ্ত, কৃষ্ণমোহন ঘোষ, অজয় দাস, শ্যামল গুপ্ত, অজয় দাস, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস গুহ, লক্ষ্মীকান্ত রায়, মিণ্টু দে, অজিত চৌধুরী, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, বিধান গুহ, শঙ্কর বসু, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, অনল চট্টোপাধ্যায়, অজয় দাস, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, হিমাংশু বিশ্বাস, বিনয় রায়, ওয়াই এস মুলকী, অরুণ বসু, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

অরবিন্দ বিশ্বাসের একক সঙ্গীতাসর ঃ সম্প্রতি একাডেমি অফ ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে ভানুতীর্থ নিবেদিত একক রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আসরে শুনলাম শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাসের গান। শ্রীবিশ্বাস তরুণ গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের মধ্যে ইতিমধ্যেই নিজস্ব আসন করে নিয়েছেন। সেদিনের নির্বাচিত প্রতিটি গানে শিল্পীর মননশীলতা, নিষ্ঠা ও আবেগের স্পর্শ প্রতিটি শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছে। কণ্ঠ-সৌভাগ্যের সঙ্গে আত্ম-বিশ্বাস—ভাবের সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টির সমন্বয়েই এ আসর এমন চিত্তগ্রাহী হয়ে উঠতে পেরেছে।

সংস্কৃতি সংসদের মনোজ্ঞ আসর ঃ গত ২৪-৯-৭২ তারিখে 'সংস্কৃতি ভবনে' সংস্কৃতি সংসদের আয়োজিত একটি কীর্তনানুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে ডঃ রমা চৌধুরী প্রতিষ্ঠানের ও সম্পাদিকার গঠনশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন। সাধারণ সম্পাদিকা ডঃ তপতী রায়ের ভাষণে জানতে পারা যায়, এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৪৮ সালে চতুরঙ্গ নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ও নাটক, নাট্য, চিত্রকলার প্রদর্শনী ইত্যাদির সাংস্কৃতিক কাজের মাধ্যমে রীতিমত করা প্রতিষ্ঠান হয়েছিল। পরে এই আরেকটি নাট্য-প্রতিষ্ঠান খ্যাত [illegible] পরিবর্তিত নামে (সংস্কৃতি সংসদ) ২৪ বছর তাঁদের অনুষ্ঠান করে আ[illegible]

১।১২, রোলাণ্ড রোডে স[illegible] নিজস্ব নতুন ভবনে কীর্তন দিয়ে অ[illegible] আরম্ভ হয়। প্রধান অতিথিরূপে[illegible] আশুতোষ ভট্টাচার্য ও বিশেষ অতিথি[illegible] শ্রীমতী অমলাশঙ্কর উপস্থিত ছি[illegible] সংসদের এই ঘরোয়া অনুষ্ঠানে [illegible] কীর্তন (মাথুর) গান করেন [illegible] কীর্তনীয়া শ্রীনারায়ণ রায় গোস্বামী [illegible] অপূর্ব সুরেলা ভাবময় কণ্ঠ ও কথ[illegible] মধ্যে দিয়ে মাথুর পালাটি অপূর্ব সুরময় মণ্ডিত হয়েছিল। সংসদের [illegible]পতি শ্রীসব্যসাচী মুখোপাধ্যায় স[illegible] ধন্যবাদ জানান।

রেকর্ড পরিক্রমা ঃ এবার মেগাফোন ৪৫ আর পি এম লে[illegible] সেরা রেকর্ড কানন দেবীর কণ্ঠের সেই নতুন গান 'সজল নয়ন করি' এবং '[illegible] আওব যব রসিয়া' যা একটি বিশেষ [illegible] বিশেষ পরিবেশের আবেগ রোমাণ্[illegible] সংগীত ভাবনার রূপটি তুলে ধরে। পাওনা হিসেবে পাওয়া যায় কানন [illegible] অতুলনীয় কণ্ঠের ঐশ্বর্যদীপ্তি—[illegible] সৌকর্য ও ভাবগম্ভীরতা।

একদা বাংলাদেশে গ্রামোফোনের কারীমাত্রেরই কমলা ঝরিয়ার দরাজ [illegible] রেকর্ড থাকত অবশ্য সংগ্রহে[illegible] তালিকায়। সেই যুগেরই দুটি 'নন্দনন্দন' ও 'এস শঙ্খচক্র' [illegible]খানি প্রকাশিত করে—মেগাফোন [illegible] প্রতি কর্তব্য পালন করেছেন। আ[illegible] মূল্যবান সংকলন ভবানী দাসের কণ্ঠের 'বন্দেমাতরম'—যে 'বন্দেমা[illegible] আজও অন্য কারুর বন্দেমাতরম [illegible] উঠতে পারেনি—এক দিলীপ রায়ের [illegible]মাতরম' ছাড়া।

এই কোম্পানীর অন্যান্য রে[illegible]

পুরোভাগে রয়েছেন উৎপলা সেন ও সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

উৎপলা সেনের 'কোকিল গুরুর পাঠশালাতে'—গানটিতে সুর ও কথার অভিনবত্ব আকর্ষণকারী। এর ওপর শিল্পীর কণ্ঠমাধুর্য ত আছেই। 'আমরা দুজনে শুধু দুজনার'—গানটিও সুখশ্রাব্য। গান দুটির রচয়িতা পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরকার অলোক দে ও সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্ব-সুরে গীত 'এমন অনেক কথাই তুমি' ও 'কে পিয়া বলে'-র একটিতে আধুনিক গানের মেজাজ অন্যটিতে তিলককামোদের আলতো ছোঁয়ায় শিল্পীর স্বকীয় ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত।

ই পি ডিস্কের—দুটি মূল্যবান অবদান হোল 'জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর কন্ঠের দুটি গান—'দীনতারিণী' ও 'নন্দদুলালচন্দ্র'—'রুনুঝুনু' ও 'যোগীশ্বর হর' ও তারাপদ চক্রবর্তীর চারটি রাগসঙ্গীত বাংলাদেশে দুই যুগের দুই স্রষ্টা ও শিল্পীকে নব-বৈশিষ্ট্যে উপহার দিয়েছে।

'ভবানীচরণ দাসের অভিজ্ঞ কন্ঠের চারটি শ্যামাসঙ্গীত মুগ্ধ হয়ে শোনবার মত।

বীরেন দাশগুপ্তের কথা ও মিন্টু দাশগুপ্তের সুরে গাওয়া শৈবাল মজুমদারের গাওয়া দুটি সুরে শিল্পীর সুকণ্ঠ ও প্রতিভার পরিচয় মুদ্রিত।

শ্যামাপ্রসাদ রায়ের কন্ঠে দুটি নজরুল গীতি সুগীত।

অন্যান্য শিল্পীরা হলেন পলি রায়চৌধুরী, নারায়ণ কুণ্ডু, অসিত ভট্টাচার্য; নিশীথ সাধু, রত্না চ্যাটার্জি, নিমাই ঘোষ। ভিন্নস্বাদ এনেছে দিলীপ রায়ের বেহালায় বাজানো দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর।

শ্যামল মিত্রের ভাই সলিল মিত্রের কন্ঠের দুটি গানে প্রতিশ্রুতির পরিচয় মুদ্রিত। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্যামলী মুখোপাধ্যায় পূর্ব মান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বিশেষ উপহার হোল এল পি ডিস্কে শরৎচন্দ্রের অমর কাহিনী 'রামের সুমতি'র নাট্যরূপ। রূপকচরিত্রে জহর গাঙ্গুলী, বঙ্কিমদেব, সুহাসিনী কেতাবাণী ও রাজলক্ষ্মী।

পলিডোরের একটি নবীন প্রতিভার যথার্থ পরিচয় মেলে 'ওগো রাত চলে যেওনা' ও 'হায় মোর মন' গান দুটিতে। টপ্পা ও ঝুমুরের ঢঙে চিত্তগ্রাহী সুররচনা করেছেন প্রবীর মুখোপাধ্যায়। কথা সুহাস চৌধুরী ও অমিয় চট্টোপাধ্যায়।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের নৃত্যনাট্য ও নৃত্যাবলিয়া: ৯ অকটোবর, সন্ধ্যা ৬টায় বালীগঞ্জ শিক্ষা সদনে মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের সম্বর্ধনা সভায় আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের

আঁধার পেরিয়ে/শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং মাধবী চক্রবর্তী। পরিচালনা : তপন সিংহ

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য ও নৃত্যবিচিত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সংগীত পরিচালনা করেন কমলা বসু। সহকারী নৃত্য পরিচালকরূপে ছিলেন স্বপ্না সেনগুপ্তা ও কৃষ্ণা রায়। প্রত্যেকটি শিল্পীর নৃত্যনৈপুণ্য দর্শকবৃন্দকে আকৃষ্ট করে। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ডাঃ এ এন গুপ্ত এম-এল-এ।

হাজার বছরের বাঙলা গান

'হাজার বছরের বাংলা গান'-এর দ্বিতীয় অনুষ্ঠান হয় ৭ অকটোবর মহাজাতি সদনে উল্টোডাঙার প্রযোজনায়। অনুষ্ঠান পরিবেশনে এবার অনেক উন্নতি লক্ষিত হয়। অনুষ্ঠানটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে এবার নতুন কিছু গানের সংযোজন হয়। তার মধ্যে 'ময়মনসিংহ গীতিকা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গান ভাল গেয়েছেন রাধারাণী (চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস), ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য (রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত) নমিতা ঘোষ (শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন), দীপ্তিপ্রকাশ (চর্যাগীতি ও আলাওল), পীযূষকান্তি সরকার (দৌলত কাজী) অংশুমান রায় (সত্যপীরের পাঁচালী) ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় (রাগপ্রধান)। অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন দীপ্তিপ্রকাশ মজুমদার। গ্রন্থনায় ছিলেন গৌতম বসু। সঙ্গীত উপদেষ্টা জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ।

তরুণ সঙ্গীত শিল্পী সম্মেলন: মধ্য ইন্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন আয়োজিত 'তরুণ সঙ্গীত শিল্পী সম্মেলন'-এর পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন এবারে সাতদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে। যেসব তরুণ সঙ্গীত শিল্পী অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাঁদের নাম ১৮ নভেম্বরের মধ্যে পাঠাতে হবে। যোগাযোগের ঠিকানা: ১৪৪এ, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা-১৪।

এপার ওপার/সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং অপর্ণা সেন। ফটো : অমৃত

নৃত্যমের 'শেষলগন': নৃত্যমের সভ্যবৃন্দ বর্ষপূর্তি উৎসব উদযাপন করলেন রবীন্দ্রসদন মঞ্চে 'শেষলগন' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করে।

অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সংস্থার সভাপতি পাহাড়ী সান্যাল বলেন, সুন্দরের সাধনায় ব্রতী এই সংস্থার উদ্যোক্তারা ধন্য হয়েছেন সমাগত রসিকবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতায়। স্বল্প পরিসরের মধ্যে হলেও এ'দের আন্তরিকতায় ,কোনো খাদ নেই। এ'দের এই নিষ্ঠা যেন কল্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদধন্য হয়। প্রধান অতিথি ডঃ রমা চৌধুরী এ'দের আশীর্বাদ জানান।

উৎসব সুরু হয় দেবব্রত বিশ্বাসের একক সঙ্গীতানুষ্ঠান দিয়ে। রবীন্দ্রসঙ্গীতানুষ্ঠানের আগে ইনি স্বরচিত 'গুরুবন্দনা' তথা রবীন্দ্রবন্দনার গান গেয়ে অনুষ্ঠান সুরু করেন। নিষ্প্রাণ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বিদ্রোহ, অভিমান, সর্বোপরি স্পর্শকাতর শিল্পীচিত্তের অশ্রুসজল বেদনার ছোঁওয়ায় দুটি গানই অত্যন্ত চিত্তগ্রাহী হয়ে ওঠে।

'নৃত্যের তালে' জীবনমরণে নাচের দোলানের সঙ্গতে যেন বেজে উঠল 'দুই হাতে কালের মন্দিরা'—তারপরই ছন্দদোলা মন্থর হয়ে আসে 'সে আসে ধীরে'তে। ভাববিস্তার—সমাপ্তিতে পেঁছালো যখন ধরলেন শেষ গানের চরণ 'ফুলগুলি সব ঝরা'—

এরপরই নৃত্যনাট্য 'শেষলগন'। 'গানের ডালি ভরে দেব'-র প্রভাতী সুরে ঘুমভাঙ্গার মধুর আবেশ রচিত হোল।

তারই মায়ায় দেখলাম রাজকন্যা তার প্রণয়ী মৈত্রীরাজপুত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বী কুমারসিংহকে। সেই চিরন্তন ত্রয়ীর দ্বন্দ্ব, ক্লাইমেকস ও মিলন সুনির্বাচিত কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত ও নৃত্যের ছায়ায় উপভোগ্য রসমূর্তি লাভ করেছে। পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়ের নাচ আগেও দেখেছি। এবারে তিনি আরো পরিণতমানা, আরো সৌন্দর্যবোধসম্পন্না। মণিপুরীর লাস্যমাধুর্যে প্রথম প্রণয়ের লজ্জারুণ আভাস, মিলনের উল্লাসে ভারতনাট্যমের পদম-এর মুখর উচ্ছ্বাস এবং ছন্দবিহীন অভিনয় ভঙ্গীতে বিরহের ছায়াম্লানতা এ সবই যেন চিত্রকল্প রূপ পরিগ্রহ করেছে রূপসমৃদ্ধা, কিশোরী নৃত্যশিল্পীর নৃত্যভঙ্গিমায়।

মৈত্রীরাজকুমার ও কুমারসিংহের ভূমিকায় ধূর্জটি সেন ও প্রদীপ্ত নিয়োগী চরিত্রানুগ।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য সখীদের নৃত্য এই জন্য যে এ'রা গতানুগতিক সখীনৃত্যের নিষ্প্রাণতার অপবাদ খণ্ডন করতে পেরেছেন। সঙ্গীতাংশে অপর্ণা চট্টোপাধ্যায়, সৌমেন্দ্র ঘোষ ও গৌতম দাশগুপ্ত উদীয়মান শিল্পীরূপে আপনাদের সুধীসমাজে নিবেদন করতে পেরেছেন। অপর্ণা চট্টোপাধ্যায়ের পরিবেশনায় কণিকার আদল আসে। উপযুক্ত শিক্ষা ও অনুশীলনীতে যথাযথ আত্মনিয়োগ করলে উচ্চমানের রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীত্বের পর্যায়ে পৌঁছতে এ'র দেরী হবে না।

নৃত্যশিল্পী হিসাবে পূর্ণিমা উ'চুদরের। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য পরিকল্পনাও সমমানে পৌঁছবে বলেই আমরা আশা করি। একক নৃত্য ছাড়াও সমবেত নৃত্যের স্থানে স্থানে তাঁর অভিনিবেশের ছোঁয়া ছিল।

নৃত্যনাট্য রূপদানে সুনন্দা মুখোপাধ্যায় ও সামগ্রিক পরিচালনায় যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন প্রীতি চট্টোপাধ্যায়। পুলিনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠের স্তোত্রপাঠ ভাব-গম্ভীর পরিবেশ রচনা করে।

নৃত্যনাট্যে তুলসীদাস : ভক্ত কবি তুলসীদাসের জীবন ও চেতনার জাগরণ নৃত্য ও নাট্যের মাধ্যমে রবীন্দ্র সদনে মঞ্চস্থ করে সৌরভ প্রতিষ্ঠান সুধীজনের অভিনন্দন লাভ করেছেন। তুলসীদাস ভক্ত, তিনি রামায়ণ রচয়িতা এ খবর জানা। কিন্তু তাঁর বাল্যজীবন, দীক্ষালাভ ও সন্ন্যাসব্রত উদযাপনের ক অনেকেরই জানা নেই। সেই কাহিনীকে রসিকসমাজের গোচরে প্রচেষ্টাই শুধু প্রশংসার্হ নয় সাংস্কৃতিক দায়িত্ব এ'রা যথাসাধ্য করেছেন।

অংশগ্রহণকারী শিল্পী সংখ্যা এক এ'রা সকলেই সৌরভ প্রতিষ্ঠানের বৃন্দ। নৃত্যনাট্য আলোচনাকালে এই ব মনে রাখতে হবে।

আর এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার দেখলে তুলসীদাস চরিত্র সৌরভে অপূর্ব রূপায়ণ।

নামভূমিকায় গায়ত্রী দাস নৃত্য ত উভয় অংশেই দক্ষতার পরিচয় দিে রত্নাবলী চরিত্র-চিত্রণে মধু কোটারীর ভিনয়ও তারিফ করবার মতই।

চমৎকার মানিয়েছিলো তুলস হুলসী দেবীর ভূমিকায় চন্দনা পাধ্যায়কে। স্নেহময়ী জননীর স পুত্রের জন্য উদ্বিগ্ন ব্যাকুল রূপ পরিসরের মধ্যেই মূর্ত হয়ে উঠেছে। ভূমিকা দীপালী রায়ের কৌতুক সারা প্রেক্ষাগৃহে হাসির হিল্লোল দিয়েছে।

কোর্ট ডান্সার রূপে মায়া চট্টোপা নৃত্য নাটকের এক উপভোগ্য অংশ। কোটারী ও নূপুর মিত্রের নৃত্য প্র শংসার্হ। একাধারে নৃত্য রচনা, নাট্যরূপে ও পরিকল্পনার বিবিধ দায়িত্ব পালনে সাধুবাদ অবশ্যপ্রাপ্য যাঁর তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপা নমিতা চট্টো দীপালি রায় নৃত্য পরিচালনায় পরিচয় দিয়েছেন।

যন্ত্রসঙ্গীত পরিচালনায় খগেন গুপ্তের সুরসৌকর্যের উল্লেখ বাহুল্য সর্বোপরি এবং সবচেয়ে আকর্ষণের ছিল জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কণ্ঠসঙ্গীত চালনা। নানান রাগসঙ্গীতের শিল্প প্রয়োগে শ্রীঘোষের মুন্সিয়ানার স্বাক্ষ ভরিয়ে দেয়।

নেপথ্য সঙ্গীতে ছিলেন দীপ্ত মজুমদার, চিত্রা কাঞ্জিলাল, প্রণব অলোক মিত্র, চিত্রা কাঞ্জিলাল, শ্রীবাস্তব, অসীমা চট্টোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়। ভাষ্য • ঘোষণায় ছিলেন দেব, রবি যাজ্ঞিক, শশী শ্রীবাস্তব, চট্টোপাধ্যায় ও নমিতা চট্টোপাধ্যায়।

স্তোত্রপাঠে ও আলোকপাতে প্রণব ভট্টাচার্য ও অনিল সাহা।

—চি

দর্শক

আই এফ এ শীল্ড

আই এফ এ-র টুর্ণামেণ্ট কমিটির সভায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে ১৯৭২ সালের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৭২ সালের আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল দলের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মোহনবাগান। এখানে উল্লেখ্য, এই দুই দলের ১৯৭২ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলাটি প্রথম দিন গোলশূন্যভাবে ড্র যায়। দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলা ৩৪ মিনিট খেলার পর প্রবল বৃষ্টির দরুণ বন্ধ করতে হয়েছিল। এই সময় মোহনবাগান ১—০ গোলে এগিয়েছিল। আই এফ এ কর্তৃপক্ষ ফাইনাল খেলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে মোহন-বাগান-ইস্টবেঙ্গল দলের অসমাপ্ত ফাইনাল খেলার দিন ধার্য করেন ৩০ অকটোবর। কিন্তু মোহনবাগান ক্লাব কর্তৃপক্ষ ৩০ অকটোবর তারিখের ফাইনাল খেলায় তাঁদের দলের পক্ষে যোগদান সম্ভব নয় জানিয়ে-ছিলেন এই কারণে যে, দলের বেশ কয়েক-জন নামকরা খেলোয়াড় দৈহিক আঘাতের ফলে খেলতে অক্ষম। আই এফ এ কর্তৃপক্ষ মোহনবাগানের বক্তব্য নাকচ করে শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল দলকে ১৯৭২ সালের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী ঘোষণা করেছেন।

ইস্টবেঙ্গল ১৯৭২ সালের আই এফ এ শীল্ড জয়ের সূত্রে মোট ৭ বার একই বছরে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ এবং আই এফ এ শীল্ড জয়ের গৌরব লাভ করলো। ইতিপূর্বে তারা এই 'ডাবল' খেতাব লাভ করেছে ১৯৪৫, ১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৬১, ১৯৬৬ এবং ১৯৭০ সালে। ইস্টবেঙ্গল আই এফ এ শীল্ড জয়ী হয়েছে মোট ১১ বার—১৯৪৩, ১৯৪৫, ১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫১, ১৯৫৮, ১৯৬১ (মোহনবাগানের সঙ্গে যুগ্ম বিজয়ী), ১৯৬৫, ১৯৬৬, ১৯৭০ ও ১৯৭২ সালে। এখানে উল্লেখ্য, সর্বাধিক বার (১১ বার) আই এফ এ শীল্ড জয়ের রেকর্ড ইস্টবেঙ্গল দলের। তাদের পরই মোহনবাগানের ১০ বার এবং ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের ৯ বার আই এফ এ শীল্ড জয় উল্লেখযোগ্য।

ডি সি এম ট্রফি

উত্তর কোরিয়ার এপ্রিল ২৫ ক্লাবকে ১৯৭২ সালের দিল্লী ক্লথ মিলস ট্রফি বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের ফাইনাল খেলার প্রতিদ্বন্দ্বী পশ্চিম জার্মানীর বায়রিশার ক্লাব তাদের খেলোয়াড়-দের দৈহিক আঘাতের কারণে দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলায় যোগদানের অক্ষমতা জানিয়েছিল। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলাটি ১—১ গোলে ড্র ছিল।

প্রতিযোগিতার প্রথম সেমি-ফাইনালে উত্তর কোরিয়ার এপ্রিল ২৫ ক্লাব তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী গত তিন বছরের ডি সি এম ট্রফি বিজয়ী তেহারাণের তাজ ক্লাবের বিপক্ষে 'ওয়াক-ওভার' পেয়েছিল। তাজ ক্লাব দ্বিতীয় দিনের সেমি-ফাইনাল খেলায় দলের খেলোয়াড়দের দৈহিক আঘাতের কারণে অংশ গ্রহণ করেনি। এই দুই দলের প্রথম দিনের সেমি-ফাইনাল খেলাটি গোল-শূন্য ছিল। অপরদিকে দ্বিতীয় সেমি-ফাইনাল খেলায় পশ্চিম জার্মানীর বায়রি-শার দল ২—০ গোলে বিকানীরের রাজস্থান আর্মড কনস্টাবুলারী দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

সন্তোষ ট্রফি

আগামী ১১ই নভেম্বর থেকে গোয়াতে ২৯তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসবে। গত বছরের সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী বাংলা, গতবারের রাণার্স-আপ রেলওয়ে এবং গোয়া—এই তিনটি দলকে প্রাথমিক পর্যায়ে খেলতে হবে না।

অষ্টম সর্বভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের ভলিবল প্রতিযোগিতায় মহীশূর দলের ফাইনাল খেলার একটি দৃশ্য। খেলায় মহীশূর জয়ী হয়।

নিখিল ভারত স্কুল গেমস

ইম্ফলে আয়োজিত ১৮শ নিখিল ভারত স্কুল গেমসের চূড়ান্ত ফলাফলের তালিকায় পশ্চিমবাংলা দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে মহারাষ্ট্র এবং তৃতীয় স্থান রাজস্থান।

ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে পশ্চিমবাংলা ১—০ গোলে গতবারের বিজয়ী আসামকে পরাজিত করে।

বিভিন্ন খেলার ফলাফল

ফুটবল : ১ম পশ্চিমবাংলা, ২য় আসাম, এবং ৩য় রাজস্থান।

বাস্কেটবল (ছাত্র) : ১ম রাজস্থান, ২য় হরিয়ানা ও ৩য় পাঞ্জাব।

বাস্কেটবল (ছাত্রী) : ১ম মহারাষ্ট্র, ২য় রাজস্থান ও ৩য় দিল্লী।

কাবাডি (ছাত্র) : ১ম রাজস্থান, ২য় পাঞ্জাব ও ৩য় হরিয়ানা।

খো-খো (ছাত্র) : ১ম মহারাষ্ট্র, ২য় দিল্লী ও ৩য় পাঞ্জাব।

খো-খো (ছাত্রী) : ১ম মধ্যপ্রদেশ, ২য় মহারাষ্ট্র ও ৩য় গুজরাট।

টেবল টেনিস (ছাত্র) : ১ম পঃ বাংলা, ২য় আসাম, ৩য় দিল্লী।

টেবল টেনিস (ছাত্রী) : ১ম মহারাষ্ট্র, ২য় পঃ বাংলা ও ৩য় পাঞ্জাব।

সাঁতার (ছাত্র) : ১ম পঃ বাংলা (৫৯ পয়েন্ট) ও ২য় ত্রিপুরা (২৯ পয়েন্ট)।

সাঁতার (ছাত্রী) : ১ম পঃ বাংলা (২২ পয়েন্ট) ও ২য় ত্রিপুরা (২০ পয়েন্ট)।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান (ছাত্র) : সুধীর দাস (পঃ বাংলা)—১৫ পয়েন্ট।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান (ছাত্রী) : বাণী দাস (ত্রিপুরা)—১০ পয়েন্ট।

স্যার হোমি মোদী ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

জামসেদপুরের কিনান স্টেডিয়ামে স্যার হোমি মোদী ক্রিকেট টুর্ণামেন্টের ফাইনালে রাজস্থানের পি এম রুংতার একাদশ দল প্রথম ইনিংসে ৪ রান বেশী করার সুবাদে রুসী মোদীর একাদশ দলকে পরাজিত করে স্যার হোমি মোদী মেমোরিয়াল ট্রফি জয়ী হয়েছে। রুংতা একাদশ দলের অধিনায়ক ছিলেন টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দিলীপ সরদেশাই এবং রুসি মোদী একাদশ দলের অধিনায়কত্ব করেন রমেশ সাক্সেনা।

প্রথম দিনে রুসী মোদী একাদশ দল ৩ উইকেট খুইয়ে ২৪০ রান সংগ্রহ করেছিল। দলের অধিনায়ক রমেশ সাক্সেনা ১০৫ রান করে অপরাজিত ছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে রুসী মোদী একাদশ দলের প্রথম ইনিংস ৩৪৮ রানের মাথায় শেষ হয়। সাক্সেনা ১১৭ রান করে আউট হন। রেগে ৯৫ রানে ৫টা উইকেট পান। খেলার বাকি সময়ে রুংতা একাদশ দল প্রথম ইনিংসের মাত্র ১টা উইকেট খুইয়ে ১৪০ রান সংগ্রহ করে। দুরানী ৭১ রান করে নট আউট থাকেন।

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে রুংতা একাদশ দলের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩৫২ (৫ উইকেটে), অর্থাৎ রুসী মোদী একাদশ দলের থেকে ৪ রান বেশী। রুংতা একাদশ দলের উল্লেখযোগ্য রান—লক্ষণ সিং ৮৯, দুরানী ৭১, বেঞ্জামিন ৫৮ এবং সরদেশাই নট আউট ৫১ রান। চা-পানের বিরতির দু' মিনিট পর রুসী মোদী দলের অধিনায়ক খেলায় হার স্বীকার করে নিলে খেলা শেষ হয়ে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

রুসী মোদী একাদশ : ৩৪৮ রান (সাকসেনা ১১৭ এবং শুক্লা ৭১ রান। রেগে ৯৫ রানে ৫ উইকেট)

রুংতা একাদশ : ৩৫২ রান (লক্ষণ সিং ৮৯, দুরানী ৭১, বেঞ্জামিন ৫৮ এবং সরদেশাই নট আউট ৫১ রান। শুক্লা ৯১ রানে ৩ উইকেট)—৫ উইকেটে।

মৈনুদ্দৌল্লা গোল্ড কাপ

ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

হায়দরাবাদের লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্টেডিয়ামে আয়োজিত মৈনুদ্দৌল্লা গোল্ড কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ৮ উইকেটে ইউ ফোম দলকে পরাজিত করে উপর্যুপরি ৫ বার মৈনুদ্দৌল্লা গোল্ড কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। চতুর্থ অর্থাৎ শেষ দিনে খেলা শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের ... খেলায় জয়-পরাজয়ের নি...

প্রথম দিনে ইউ ফোম ... প্রথম ইনিংসের ৮টা উইকেট ... রান সংগ্রহ করেছিল। ... খেলোয়াড় সুনীল গাভাস্কা... আউট হয়ে দর্শকদের হতাশ ... দিন দলের সর্বোচ্চ ৭... মাইকেল দালভি।

দ্বিতীয় দিনের ২৫ মি... ইউ ফোম দলের প্রথম ইনিংস ... মাথায় শেষ হলে স্টেট ব্যাঙ্ক ... বিনিময়ে ২৭৯ রান তুলেছি...

তৃতীয় দিনে স্টেট ... ইনিংস ৪৩৪ রানের মাথায় ... ১৬৫ রানে এগিয়ে যায়। ... আবিদ আলি ২২২ মিনিট ... বাউণ্ডারীসহ ১৩৪ রান ক... বাকি ১৬৫ মিনিট সময়ে ইউ ... ২য় ইনিংসের ৩টে উইকেট ... রান সংগ্রহ করেছিল।

চতুর্থ অর্থাৎ শেষ দি... একাদশ দলের ২য় ইনিংস ... মাথায় শেষ হলে স্টেট ব্যাঙ্ক ... ২টো উইকেটের বিনিময়ে জ... জনীয় ৭৩ রান তুলে দিয়ে ... জয়ী হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইউ ফোম একাদশ : ২৭৩ ... ৭১ রান। বেদী ... উইকেট)

ও ২৩৭ রান (পি কে ... রান। বেদী ৭৭ রানে ... কার ৮১ রানে ৪ উইকে...

স্টেট ব্যাঙ্ক : ৪৩৪ রান (... ১৩৪ এবং এম এস গ... চন্দ্রশেখর ১৩১ রানে ... রানে ৩ এবং জয়সীম... উইকেট)

ও ৭৩ রান (২ উইকেটে)

রঞ্জি ট্রফিতে ৫,০...

গত ২১ অক্টোবর ... রঞ্জি ট্রফির খেলায় সার্ভি... দানী তাঁর রঞ্জি ট্রফির ... রান পূর্ণ করার গৌরব ল... এখানে উল্লেখ্য, তাঁর আগে ম... খেলোয়াড় রঞ্জি ট্রফির খেলা... পূর্ণ করেছেন—বিজয় হা... রান), পঙ্কজ রায় (৫,১৪... মুস্তাক আলী (৫,০১৩ র...

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলি... হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।